সূচীপত্র

সূচীপত্র

ওড়িশার প্রাচীন পট

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী

শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্যে

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য চোত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥

ব্লক ও মুদ্রণ: স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

মা আসিতেছেন। দশভুজে দশপ্রহরণ ধারিণী আমাদের জননী। মায়ের মুখ মলিন। তাঁহার অধরের মধুর হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি ভীমা, ভৈরবনাদিনী তিনি। করালী মায়ের প্রতি অঙ্গ হইতে অত্যুগ্র জ্বালা-মালা দিগন্তে বিকীরিত হইতেছে। তাঁহার পদভরে পৃথিবী কাঁপিতেছে; ভূধর টলিতেছে; সিন্ধুজল উচ্ছলিত হইয়া চারিদিক পরিপ্লাবিত করিতেছে। আলুলায়িত তাঁহার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত কুণ্ডলজালে মেঘমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইতেছে। বিপুল বেদনার মূর্চ্ছনাময়ী জননীর বুকে প্রলয়-লীলার আবর্ত উঠিতেছে। দনুজদলনী সন্তানস্নেহে উন্মাদিনী বেশে বাঙ্গালীর অঙ্গনে ছুটিয়া আসিতেছেন। আকাশে বাতাসে আমরা মায়ের সেই লীলার আভাস পাইতেছি। প্রচণ্ড দোর্দণ্ড দৈত্য দর্পনিসূদনী অগ্নিবর্ণা জননীর অন্তরের তাপ আমাদিগকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। আমাদের ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত সঞ্চারিত হইতেছে। এ চেতনা রোধ মানে না; বোধ মানে না। মায়ের পূজায় আমাদের সর্বস্ব নিবেদন করিবার জন্য অলঙ্ঘ্যবীর্যে তাঁহার উন্মদ আকর্ষণ আমরা আজ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছি।

এসো মা, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। জাগো ভীমা ভৈরবীরূপে জাগো। আমরা হৃদয়ের রক্তপদ্মের অর্ঘ্যোপচারে তোমার পূজা করিব। সর্বস্ব বিকাইয়া দিব তোমার পায়। আমাদের সকল ভয় কাটিয়া যাইবে। শরতের প্রভাতে সূর্যের স্বর্ণাভ কিরণচ্ছটায় আমাদের অঙ্গন উজ্জ্বল হইবে। বাজিয়া উঠিবে মাতৃ-পূজার মঙ্গলবাদ্য। বাঙ্গালীর সেই পূজায় দেবতারা আসিয়া যোগ দিবেন। তাঁহাদের সমুচ্চ কণ্ঠে সিংহবাহিনীর জয়ধ্বনি উত্থিত হইবে। আমরা অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব।

॥ দেবী দুর্গার আবির্ভাব ॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

ই জগতের সর্বত্র শক্তির খেলা দেখিতে পাই। কোথা হইতে এই জগৎ উদ্ভূত হইতেছে, কে এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং এই জগৎ কোথায় বা কাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, এ দেশের আধ্যাত্ম-চেতনায় এই প্রশ্ন বারংবার উত্থিত হইয়াছে। বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে বিশেষভাবে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তে ইহা বিনিশ্চিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ঋক্‌বেদের দুর্গা-সূক্ত এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সূক্তে আমরা দুর্গাদেবীর অনুধ্যান পাই—তিনি অগ্নিবর্ণা, সকল শক্তির মূলে তিনি, জগতের বহুভাবের ভিতর দিয়া এই দেবীরই অভিব্যক্তি ঘটিতেছে।

চণ্ডী দেবী সূক্তেরই ভাষ্যস্বরূপ। রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্যের প্রশ্নের উত্তরে মেধস্ মুনি জগতে বহুভাবে ব্যক্ত এই শক্তিকে মহামায়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সর্বেশ্বরী। তিনি পরমামুক্তির হেতুভূতা সনাতনী, অথচ তিনিই সংসার-বন্ধনে জীবকে আবদ্ধ করেন। প্রশ্ন উঠে, 'আমাদের প্রাণ লইয়া কেন তাঁহার এমন খেলা? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রাণের দায়েই তাঁহার এই লীলা। আমরা তাঁহার সন্তান; আমরা তাঁহার প্রাণের প্রাণ। আমরা তাঁহাকে চাহি না। আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় পড়িয়া তাঁহাকে ভুলিয়াছি। তাঁহাকে ছাড়িয়া এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছি। কিন্তু তিনি আমাদিগকে ছাড়িতে পারেন না। জগতের বিভিন্ন ভাবের ভিতর দিয়া তিনি আমাদের পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু বিভিন্ন ভাবের মূলে চৈতন্যস্বরূপিণী তাঁহারই বদান্যলীলা চলিতেছে। বিভিন্ন ভাবে তাঁহার এই অভিব্যক্তিই মায়া। মায়ার জাল তিনিই ছড়াইতেছেন। কিন্তু এ জাল ছড়াইয়াও লক্ষ্য তাঁহার ঠিকই আছে। এই জালে জড়াইয়া পড়িয়া আমরা নিজেদের বন্ধন-বেদনা যখন একান্তভাবে অনুভব করিব এবং তাঁহার শরণাগতি অবলম্বন করিব, তিনি সেই মুহূর্তে ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে কোলে তুলিয়া লইবেন। ফলত দুঃসহ দুঃখের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া আমাদের স্বার্থ-সংস্কার ভস্মীভূত না হইলে মায়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না; মায়ের নাম আমাদের মুখে ফুটে না। অসুরেরা আমাদের মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে; আমরা মুখ খুলিয়া বুকের ব্যথা মাকে ব্যক্ত করিতে পারি না। জাগতিক বহু ভাবের ভিতর দিয়া মায়ের অখণ্ড ভাবটি উপলব্ধি করা দুরূহ। দুর্গম সে পথ। পদে পদে প্রতিকূলধর্মী অসুরদের বাধা সেখানে রহিয়াছে। আমাদের চিত্ত মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হইলে মহামায়া যিনি, যিনি জগজ্জননী, তিনি আমাদের মনোমূলে অবতীর্ণা হন। অসুরের বিনাশসাধন করিয়া তিনি আমাদিগকে আপনার করিয়া লইয়া থাকেন। চণ্ডীর মধ্যমচরিত বা মহিষাসুর নিধন-লীলায় বিশ্বজননীর আত্মভাবে আমাদের নিকট ব্যক্ত হইবার মন্ত্রবীজটি নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু মহিষমর্দিনী এবং বাঙালীর আরাধ্যা দুর্গাদেবীর বীজটি এক হইলেও ভাবের অভিব্যক্তি বা অনুভাব এক নয় অর্থাৎ আমাদের উপলব্ধির স্তরে দেবীর ব্যাপ্তিশীল দীপ্তির প্রভাবের বিচারের দিক হইতে উভয়তত্ত্বের অনুধ্যানে কিছুটা পার্থক্য আছে। আমাদের মন ও বুদ্ধি জড় সংস্কারে প্রভাবিত থাকার অবস্থায় আমরা মনের মূলে মহিষমর্দিনীর সাড়া পাই না। ক্ষিতির স্তর অতিক্রম করিয়া সেজন্য উপরে উঠিতে হয়। অন্তরে মায়ের জন্য জ্বালা না জাগিলে আমাদের গ্রন্থিমোচনে দেবীর কৃপাণের খেলা সুরু হয় না। স্থূল অহংকার এবং তাহার প্রভাবজনিত জড়বিকার কিছুটা কাটাইয়া উপরে উঠিলে মহিষমর্দিনীর সংবেদনে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইতে সমর্থ হয়। বস্তুত স্থূল অহংকারের স্তরে আত্মাহুতির আকুতি নাই। বহ্নি-মণ্ডলে মাকে স্মরণ করিতে হয়। বহ্নিবীর্যে দেবীর মাধুর্য ফুটে এবং তাহার ফলে আমাদের অবীর্য দূরীভূত হয়। আমাদের অন্তরে আগুন কোথায়? আমরা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি নাই। আমরা মুখেই নিজদিগকে মানুষ বলি; কিন্তু মননের সূত্রে জীবনের ব্যাপ্তিশীল দীপ্তি আমরা অনুভব করি কি? মৃত্যু আমাদের চারিদিক ঘিরিয়া রহিয়াছে। আমরা জীবনকে সত্য বা নিত্য করিয়া পাই নাই। অবিদ্যার জন্য কর্মফলের সংস্কারবশেই আমরা চলিতেছি। আমাদের চারিদিকে আঁধার। আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি স্বরূপে দেবগণ রহিয়াছেন। আমরা যে ভাবে তাঁহাদিগকে ভজনা করিতেছি, কর্মফল অনুসারে তাঁহারা আমাদিগকে তেমনভাবেই ভজনা করিতেছেন। তাঁহারা কর্মসচীব। মহিষমর্দিনীর রাজ্যে দেবগণের এই অবীর্য নাই। তাঁহার কৃপার সম্পর্ক-ক্ষেত্র আমাদের সম্বন্ধে দেবতাদের কাজ বলিতে গেলে শেষ হয়। সন্তানের কাছে মায়ের কোলে ছুটিয়া যাইবার পথটি তখন খোলা মেলা হইয়া পড়ে। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মা তখন আমাদের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার চরণে দেবগণের প্রণতিতে আনন্দময়ী জননীর নিজ ভাব আমাদের মন, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের সর্বেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে ছন্দোময় হইয়া উঠে। আমরা ভিতর বাহির জুড়িয়া মাকে পাই।

বাংলায় দেবীর অকালবোধন। বাঙালী মাতৃ-মন্ত্রের সাধনায় অখণ্ডভাবে মায়ের প্রভাব অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছে। বিশ্বজননী সকল ভাবের অভাব মিটাইয়া বাঙালীর কাছে মৃণ্ময়ীরূপে আনন্দচিন্ময়-রসে বিলসিত হইয়া জাগিয়াছেন। বাঙালী মায়ের সেই রূপের সাগরে ডুব দিয়াছে, ক্ষিতিতত্ত্বে অর্থাৎ জড়চেতনার এই স্তরে মাকে নামাইয়া আনিয়াছে, বাঙালীর ঘর আলো করিয়া বিশ্বজননী কন্যারূপে ধরা দিয়াছেন। বাঙালীর দেবী দুর্গা এই দিক হইতে শুধু মহিষমর্দিনী নহেন, তিনি সর্বশক্তিস্বরূপিণী। তিনি জড়ের ঊর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব নহেন; পরন্তু পারাপারব্যাপ্ত করিয়া তাঁহার পরিস্ফূর্তি — অপরিচ্ছন্ন তাঁহার সম্মূর্তি। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, আনন্দময়, সর্বতোব্যাপ্ত প্রভাবে দেবী দুর্গারূপে তাঁহার এই উদয়।

বাঙালীর শক্তি-সাধনার এই বৈশিষ্ট্য। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অন্তরের এমন ঘনিষ্ঠতা বাঙালী কি ভাবে পাইল, ইহা এক পরম বিস্ময়। এই সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে 'দেবীর আবির্ভাবের মূলতত্ত্বটি অধিগত হওয়া প্রয়োজন। দেবগণের কার্য-সিদ্ধির জন্য দেবী অবতার গ্রহণ করিয়া

থাকেন। পৃথিবী যখন অসুরের দ্বারা উপদ্রুত হয়, তখন সৃষ্টি রক্ষার জন্য দেবতাগণ ভগবদাবির্ভাব কামনা করেন। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্যভাগবতীশক্তির জগতে আবির্ভাব ঘটে। বাঙালীর সাধনার মূলে ভগবৎশক্তির আবির্ভাবের রীতিটি কিন্তু এমন নয়। কলির যুগাবতার মহাপ্রভুর আবির্ভাবের রীতি-প্রকৃতির অনুধ্যান করিলে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের জন্য দেবগণকে ক্ষীরোদসাগরে গিয়া প্রার্থনা-পরায়ণ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের জন্য ব্যাকুল বেদনার আবর্ত এই মর্ত্যভূমি হইতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে উত্থিত হইয়াছে। ভক্তগণের চিত্ত করুণরসে প্লাবিত করিয়া তাঁহার এখানে আগমন। জনগণের বেদনায় ভক্ত এখানে কাঁদিয়াছে। ভক্তগণের সেই বেদনা পরব্যোমমণ্ডলের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিশ্বদেবতাকে বিচলিত করিয়াছে। তিনি সর্বাত্মময় প্রভাবে মহাভাবের রঙ্গময় বিভঙ্গীতে এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

বাংলার দেবী দুর্গার আবির্ভাবের মূলেও বাঙালীর অন্তরের এই উদার প্রভাবই কাজ করিয়াছে। যিনি রুদ্রা, তিনি নিত্যস্বরূপে এখানে জাগ্রত হইয়াছেন। যিনি গৌরী, তিনিই ধাত্রীরূপে এখানে ধরা দিয়াছেন। শরৎচন্দ্র-নিভাননী জননীর করুণার জ্যোৎস্নাধারা আকাশ বাতাস আলো করিয়া বাঙালীর অঙ্গন পরিপ্লাবিত করিয়াছে। বাঙালীর মাতৃসাধনা স মা জ চে ত না র পথে আ ত্ম ভা ব না কে সম্প্রসারিত করিয়াছে। সে সাধনা স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপ্তিতে মানব-মূর্তি বেদনাকে বর্ত্তিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া পরবর্তী যুগে ভারতের রাষ্ট্রজীবনকে বিশ্বে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার পথ প্রশস্ত করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে দেবতার কার্যসিদ্ধির প্রয়োজন মায়ের এমন আবির্ভাবের মূলে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে কাজ করে নাই। ভক্তের আকর্ষণে মা এখানে আসিয়াছেন এবং ভক্তকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার আত্ম-মাধুর্য সর্বাশ্রয়স্বরূপে প্রাচুর্য বা পূর্ণতা লাভে পরিস্ফূর্ত হইয়াছে। বাঙালীর সাধনা কালাতীত নিত্যসত্যে উজ্জ্বল। ভক্তকে আশ্রয় করিয়াই মায়ের আত্মতত্ত্বের এমন ব্যাপ্তভাবে প্রকট লীলা সম্ভব। চণ্ডীতে এই সত্য উদ্দীপ্ত। দেবগণ মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া এই ভক্ত-মাহাত্ম্যই কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, মা, তুমি বিশ্বেশ্বরের দ্বারা বন্দিত। বিশ্বকে আশ্রয় দিতে পার না। যাঁহারা তোমার ভক্ত, তাঁহারাই বিশ্বের আশ্রয়। মা, তোমাকে আশ্রয় করিলে জীবের কোন বিপদ থাকে না, কিন্তু তোমাকে সর্বভাবে যাঁহারা আশ্রয়-স্বরূপে লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই জীবকে আশ্রয় দিতে পারেন। ভক্তচিত্তে প্রভাবিত মায়ের এই আত্মভাবের উদ্দীপ্তিতেই আমাদের সকল ভয় দূর হইতে পারে এবং সেই উদ্দীপনা কালাকালের অপেক্ষা রাখে না, ঘটাইতে পারে প্রলয় পলকে। মায়ের পায়ে যাঁহারা সর্বস্ব নিবেদন করিয়াছেন, সেই মাতৃভক্তগণেরই জয়। এ মহাদুর্দিনে আমরা তাঁহাদের দিকেই তাকাইয়া আছি।

শ্রীশ্যামল সেনের সৌজন্যে

সেকালের বড়মানুষ

সরলাবালা সরকার

বরানী দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ছাদে, সামনে চওড়া রাস্তা নতুন কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। রাস্তাটা এখনও পুরোপুরি তৈরী হয়নি, যেন একটা প্রকাণ্ড মাঠ বলে মনে হচ্ছে, এধারে ওধারে দুই ফুটপাথ, মধ্যে অনেকখানি জমি, জমিতে কচি কচি ঘাসও দেখা যাচ্ছে।

শ্যামবাজারের বাজারের খুব কাছেই, তাই এইটাই শহরের জনবহুল অংশ। শ্যামবাজারের সম্মুখ দিয়েই যে রাস্তাটা একটু ঘুরে গঙ্গার দিকে চলে গিয়েছে, সেটা হল বাগবাজার রোড।

শিবরানী চেয়ে ছিল তাদের ফুটপাথের সামনের ফুটপাথে যে তিনতলা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে সেই দিকে। এই বাড়ির যিনি মালিক ছিলেন, তিনি ছিলেন কলিকাতার অভিজাত মহলের এক বিখ্যাত ব্যক্তি, তিনি এখন নেই, কিন্তু বাড়িটা তাঁর নাম ঘোষণা করছে। ভুবন মিত্রের বাড়ি বললে এমন একজনও এপাড়ার বাসিন্দা নেই, যে বাড়িটা চিনবে না।

এককালে এই বাড়িতে সাহেবমেমের বল-নাচ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে, জাঁকজমকের আদি-অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ যেন সব ঝিমিয়ে গিয়েছে, এখন যিনি বাড়ির মালিক, মিত্র মশায়ের সেই ভাইপো এম-এ বি-এল পাস-করা উকিল বটে, কিন্তু বড়মানুষী জাঁক-জমকে একেবারেই তাঁর রুচি নেই।

অতি অল্পবয়সে বিপত্নীক হয়েছেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহের নামও সহ্য করতে পারেন না, তাই এ বাড়িতে ঘটক-ঘটকীর আনাগোনা একেবারেই নির্বন্ধ। তাঁর ডেকসে তাঁর একটা ডাইরিতে কয়েক ছত্র লেখা পড়লেই তাঁর মনের ভাবের কিছু আভাস পাওয়া যায়। লেখাটা 'উত্তররামচরিত' থেকে বাংলায় অনুবাদ। তার ভাবটা ছিল এই :—

"স্ত্রী সুন্দরী অথবা রূপহীনা যাই হোক না কেন, যাকে জীবনের সহচরীরূপে বরণ করে নেওয়া হয়েছে একদিন দেবতা ও অগ্নি সাক্ষী করে, সেই স্ত্রীর বিয়োগে আবার এক স্ত্রী গ্রহণ করে তারই স্থান পূর্ণ করা এও যদি মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে মানুষ আর পশুতে পার্থক্য কী থাকে? আর যে স্ত্রী সীতার মত একাধারে সখো নর্মসহচরী, মন্ত্রণায় মন্ত্রী, সর্বকার্যে প্রেরণাদাত্রী, ভীরু অথচ বীরজনের যোগ্যা সহচরী, সহকারে-আশ্রিতা লতার মত একান্ত পতিপ্রাণা, পতি-অবলম্বনপরায়ণা—"

এই পর্যন্তই কেবল লেখা হয়েছে, আর-কিছু লেখা হয়নি।

কিশোরীলাল মিত্র নিঃসন্তান জ্যেঠ-তাতের বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েও ধনীসন্তানের পক্ষে যেগুলি একান্ত আভিজাত্যের পরিচায়ক সেরূপ কোন নেশার অধিকারী হতে পারেননি, তাই তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা বলেন, "কিশোরীর বাড়ির আসর যেন নিরামিষ আসর। যে আসরে মদ নেই, বাইজী নেই, তবলার চাঁটি নেই, ঘুঙুরের ঝুনঝুন নেই, সে আসরে যোগ দিয়ে সুখটা কী? এ যে দেখছি ভট্‌চার্যির টোল।"

তবুও তাঁর বাড়িতে বন্ধুবান্ধবের যাওয়া-আসা যে কম ছিল তা নয়। খাওয়াদাওয়ার আয়োজন বেশ ভালই থাকত, কিন্তু বোতলের ব্যাপার একেবারেই থাকত না। তবে সাহিত্যিক আলোচনা থাকত, গান-বাজনাও থাকত।

কলকাতার বনেদী বড়মানুষ, অথচ বড়-মানুষির নামগন্ধ নেই, এমনটা খুব কমই দেখা যায়। তাই কিশোরীবাবুর জ্যাঠাইমা আক্ষেপ করতেন, "কিশোরী একেবারে সন্ন্যাসী হল। বউ মরেছে বলে ছাব্বিশ বছর বয়সে আর মেয়েছেলের নামও করবে না, এ আবার কী রকম? ওর জ্যাঠার সময় এই বাড়িতে হপ্তায় হপ্তায় নাচের মজলিস বসেছে, আমি মাসের মধ্যে হয়ত একটা দিন দেখা পেতাম তার, যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। আর সে দেখাকে কি আর দেখা বলা চলে? বেহুঁশ মানুষকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যেত ভগলু, রাতের মধ্যে হয়ত হুঁশই হত না,

আবার সেই মানুষের লাট সাহেবের দরবারে আনাগোনারও ত কমতি ছিল না। তারা ছিল 'বাঘা মানুষ'।"

তবে অন্য একটা দিকও ছিল এ'দের বড়-মানুষির। সেটি হল আভিজাত্য। রাজা রাজ-বল্লভের সঙ্গে নাকি কী সম্পর্ক ছিল এ'দের, তাই সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখতে পাওয়া যায় একটা প্রকাণ্ড অয়েলপেন্টিং, সেটা রাজা রাজবল্লভের দরবারের ছবি।

ছবিটা দেখিয়ে একদিন কিশোরীবাবুর মেয়ে হেমনলিনী তার পাশের বাড়ির মেয়ে বিমলাকে বলেছিল, "ছবিটা দেখেছিস ভাই, কী জমাট দরবার দিয়ে বসে আছেন রাজা রাজবল্লভ, বাহাদুর! তখনকার দিনে ও'র মত বড়মানুষ আর ক'জন ছিল! কোম্পানির কাছ থেকে ও'র গুষ্ঠির কত লোক আজও মাসোহারা পাচ্ছে!"

শুনে বিমলার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

২

ওপারের ফুটপাথের উপর যে দোতলা বাড়ির ছাদটা দেখা যায় সেইটাই শিবরানী-দের বাড়ি। শিবরানীর বাবা হরিশ নিয়োগী লেখাপড়া শিখে হাইকোর্টের উকিল হয়েছেন, আবার তিনি কবিতাও লেখেন।

মেয়ে শিবরানী, হেমনলিনী আর বিমলার চেয়ে দু-তিন বছরের বড় হলেও এক সময় তাদের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। অবশ্য বন্ধুত্ব এখনও আছে, কিন্তু এবাড়ি ওবাড়িতে যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই শিবরানী ন্যাড়া ছাদে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে সামনের ফুটপাথের বাড়ির তিনতলার দিকে।

চেয়ে থাকে,—কিন্তু ভয়ে ভয়েই চেয়ে থাকে,—মা হয়ত দেখতে পাবেন, আর বলবেন, "ওবাড়ির দিকে অমন হাঁ করে, কী দেখছিস?"

শিবরানী ভাবছিল "সে যদি হেমনলিনী আর বিমলার মত ভাগ্যবতী হত?—" ওদের দুজনের মা নেই, কিন্তু ওদের বাবা কী রকম ভালবাসেন তাঁর মাতৃহীন সন্তানদের?

তার বাবার সন্তানদের মধ্যে হেমনলিনীই সকলের বড়। গেল শ্রাবণ মাসে তার বিয়ে হয়েছে বারো বছর বয়সে। বয়সটা অবশ্য বিয়ের বয়সের চেয়ে কিছু বেশীই হয়েছিল, কিন্তু বাবা কিছুতেই মেয়ের বিয়ে দিতে চান না, যেন চিরদিন আইবুড়োই রেখে দেবেন তাকে।

ভাইকে পিসিরা বলেন, "মেয়ে এগারো উতরে যাচ্ছে যে, কিশোরী কি চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিস নাকি? ওর মা যদি বেঁচে থাকত ত সে ভাবনায় রাত্রে ঘুমুতেও পারত না, পেটে ভাত-জলও দিতে পারত না।"

"কী সর্বনেশে কাণ্ড! মেয়ে যে এগারো উতরুতে চলল। কিশোরী, ভেবেছিস কী তুই? মেয়ের রঙ একটু ময়লা বটে, তা তোর মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা? মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে না পারিস না হয় ঘরজামাই নিয়ে এসে ঘরেই রাখ।" পিসি এসে বললেন।

'ঘরজামাই' কথাটা কিশোরীবাবুর ভাল লাগে না, অথচ মেয়েকে কাছছাড়া করবেন একথা যেন ভাবতেও পারেন না। উপায় কী, বিয়ে ত দিতেই হবে।

স্ত্রীবিয়োগের পর এই তিনটি মেয়ে আর ছেলেটিকে নিয়েই ত দিন কাটাচ্ছেন তিনি। খেতে বসেন, ছেলেমেয়েরা চারধারে ঘিরে বসে, না হলে তাঁর খাওয়াই হয় না। এর মধ্যেই যদি একটি বাড়ি থেকে পরের বাড়ি যায়! কী নিয়ে থাকবেন তিনি তাহলে?

দুখানা বাড়ির পরেই বোসেদের বাড়ি, ওদের বাড়ির ছেলেটির সঙ্গে দিলে কেমন হয়?—মনে মনে ভাবেন তিনি।

ছেলেটি স্বাস্থ্যবান, আঠারো বছর বয়স। এবার এনট্রান্স পাস করেছে। কলকাতার অভিজাত বংশের ছেলেরা এই বয়সে এর চেয়ে বেশী পড়াশোনায় এগোয় না।

অবশ্য তিনি নিজে ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তাঁর ইচ্ছা, ছেলে অনিলও তাঁরই মত এম-এ বি-এল হয়। কিন্তু জামাই কি আর তাঁর মনের মত হবে? পরের ছেলে, তিনি ত তাকে মনের মত করে গড়ে নিতে পারবেন না।

জ্যাঠাইমা বললেন, "প্রজাপতির নির্বন্ধ। ছেলের বাবা-মা নেই, কিন্তু মাথার উপর বড় ভাই আছে। কলকাতায় পাঁচখানা বাড়ি পাঁচ ভাইয়ের, ভাগে এক-একখানা পড়বেই ত। আর নগদ টাকাও আছে শুনেছি ব্যাঙ্কে।"

তাই বিয়ে হয়ে গেল হেমনলিনীর পাশের বাড়ির সেই ছেলেটির সঙ্গেই। বিয়ের পর ছেলে মেতে উঠল বউ নিয়ে। পড়াশোনা যে আর হবে সে আশায় শ্বশুর হতাশ হলেন।

সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে তিন দিন জামাই থাকে এবাড়িতে, আর চারদিন নিজেদের বাড়িতে।

সে চারদিন নিজেদের বাড়ির চিলের ঘরে বসে এই বাড়ির দিকেই চেয়ে থাকে, রোজ একখানা করে পত্রও আসে ঝিয়ের হাতে, আবার সেইদিনই সেই চিঠির জবাব যায় ঝিয়ের হাতে। ডাকখরচ নেই।

হেমনলিনীর বিদ্যা দ্বিতীয় ভাগের র-ফলা পর্যন্ত, গুরুজনেরা বলেন, "মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট।"

কিন্তু জামাইয়ের কাছ থেকে যে সব আট-দশ পাতার চিঠি আসে তার উত্তর দিতে হবে ত।

গুরুজনেরাই অবশ্য উত্তর দেবার ভার নিতেন, কিন্তু এবাড়িতে এক জ্যাঠাইমা ছাড়া গুরুজনও কেউ নেই। তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

"হেমা, তোর বন্ধু বিমলাকে ডাকতে পারিসনি, তাঁতি-ঝিকে দিয়ে? আস্তাবলের খিড়কি দিয়ে রোজই ত আসতে পারে একবার করে। ওরও ত মা নেই, বাড়িতে আর-কেউ নেই, তবে এখানে এসে বিকালটা তোর সঙ্গে গল্পগুজব করে গেলেই ত পারে। আমিই চুল বেঁধে দোব, বিকালে এখানেই খাবার-টাবার খেয়ে তার পর সন্ধ্যার পর না হয় বাড়ি যাবে।"

এ প্রস্তাবে হেমনলিনী আর বিমলার খুবই আনন্দ। তবে বিমলার বাবার মত নিতে হবে।

এ বাড়ির ছাদ থেকে শিবরানী দেখছিল ওদের দুই বন্ধুকে, কেমন গলাগলি হয়ে বসেছে। ও-ও একদিন ওদেরই সঙ্গে এই-ভাবে গলাগলি হয়ে বসত, জ্যাঠাইমা ওরও চুল বেঁধে দিতেন বিকালে, তিন বন্ধু এক সঙ্গেই খেলা করত। হায় রে, কোথায় গেল সে আনন্দের দিন! কী ক্ষণেই যে গেল বছর দোলের দিনে তার স্বামী সতীশ এল শ্বশুরবাড়িতে, সেইদিন কী তুমুল কাণ্ড বাধল, তার স্বামীর সঙ্গে একেবারে কাটান-ছিঁড়েন হয়ে গেল তাদের বাপের বাড়ির।

উঃ, এদের বড়মানুষির কী অহঙ্কার! তার ঠাকুরদাদা শ্যাম নিয়োগী বাগবাজারের মস্ত বড় জমিদার। প্রকাণ্ড বাড়ি, লোকজন দাসীচাকর গমগম করছে। বাগবাজারের গঙ্গার একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন, সেই ঘাট "নিউগীর ঘাট" নামে বিখ্যাত। ঘাটের উপর মেয়েদের কাপড় বদলাবার ঘরও করে দিয়েছেন। বাগবাজারের জোড়া শিবমন্দির ত তাঁরই কীর্তি। বৈষ্ণব পরিবার, কিন্তু এদিকে আবার শিবভক্ত। বাগবাজারের ঠাকুরবাড়িও আছে, রথে দোলে ঘটাঘটির অন্ত থাকে না। তাই, দোলের তত্ত্বে শিবরানীর শ্বশুরবাড়ি যে তত্ত্ব পাঠানো হয়েছিল, পনেরো জন ভারী বাঁকে করে নিয়ে গিয়েছিল সেই তত্ত্বের জিনিস।

শ্বশুরবাড়িতে টিনের ঘর আর খড়ের ঘর। একখানি কেবল কোঠাঘর, সেটি শ্বশুর-বংশের গৃহদেবতা শ্যামরায়ের মন্দির।

কেন এ গরিবের কুঁড়েতে মেয়ের বিয়ে দিলেন তাঁরা, কেনই বা জামাইকে বিদ্বান করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন শিবরানীর বাবা? কী দরকার ছিল তার?

শিবরানী ভাবে সে যদি গরিবের মেয়ে হত! না হয় ঘর নিকত, গরুর গোয়াল কাড়ত। বিয়ে হবার পর তাহলে তার শ্বশুরবাড়ি থাকত, যে বাড়ি মেয়েদের নিজের বাড়ি।

তার শাশুড়ী বিয়ের সময় বউ নিয়ে যেতে পারেননি, শ্যামরায়ের বাড়িতে চিরকাল বর-কনে এসে প্রণাম করে, তার পর ওঠে ধানের কাঠা মাথায় নিয়ে। তার বেলায় সেটা হয়নি, কেননা শ্রাবণ মাসে সেই জলকাদার দেশে পাঠাতে তার বাবা রাজী হননি। সতীশও তখন কিছু বলেনি। এবার মায়ের আদেশ পালন না করে উপায় নেই, কেননা বংশের প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশনে শ্যামরায়ের প্রসাদই প্রথম মুখে দিতে হয়।

তাই সতীশ ভয়ে ভয়ে বলেছিল শাশুড়ীকে, "শিবরানীকে দশ-বারো দিনের জন্যে এবার পাঠাতেই হবে। মা বলে দিয়েছেন ছেলের মুখে প্রথম ভাত শ্যামরায়ের প্রসাদ না দিলে নাকি অকল্যাণ হয়।"

"কী বললে? আমার মেয়ে যাবে কচি ছেলে নিয়ে সেই খোপজঙ্গলের দেশে? তোমার বলতে কি একটু বাধল না মুখে? তোমার মা ত বউকে সাধ দিতেই নিতে চেয়েছিলেন সেই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে। দেখেছ ত, মেয়ের জন্যে নার্স আর ডাক্তারের ঘটা? ডাক্তার দাস হপ্তায় হপ্তায় এসেছেন পোয়াতিকে দেখতে। সেখানে পাঠালে মেয়ে বাঁচত? কুঁড়েঘর আর হেড়েনী দাই! এবারেও আবার ওই কচি বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি? আমরাও ঠাকুর-দেবতা মানি, তা বলে প্রসাদ মুখে দিতে গিয়ে মেরে ফেলতে দিতে পারিনে ত। প্রসাদ এখানেই এনে দাও না বাপু! সাধ? সাধ ত দিয়েছিলেন এক কস্তাপেড়ে ছিলেওয়ালা জোলাই শাড়ি! তার আবার কথা : ও শাড়ি যেন যত্ন করে রাখা হয়। বলিহারি তোমার মায়ের আক্কেলকে!" বলতে বলতে লক্ষ্য করলেন জামাই তাঁর কথা পুরোপুরি শোনবার জন্য সে ঘরে অপেক্ষা করে নেই।

"ও মা, কী অসভ্য জামাই! হবে না কেন, পাড়াগাঁর ছেলের আর কতটা সভ্যতা হবে? কথাটা দাঁড়িয়ে শুনতেও পারলেন না বড়-মানুষের ছেলে?"

সেই অবধি বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে স্বামীর সঙ্গে শিবরানীর। সেই অবধি শিবরানীর আর স্বামীর দেখা পায়নি। তবে চিঠি পেয়েছে।

হেমনলিনীর বর সতীশের বন্ধু, তারই হাত দিয়ে চিঠি এসেছে অতি গোপনে। এ বাড়ির তাঁতি-ঝি পেটকাপড়ে করে চিঠি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে, আবার নিয়েও গিয়েছে তার উত্তর।

সেই থেকে এবাড়ি আর ওবাড়ি আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এতদিনের ভালবাসা আর মাখামাখি এক মুহূর্তেই যেন চুকে গিয়েছে, যেন ওদের কোনদিন মুখ-চেনাও ছিল না। অবশ্য হেমনলিনীর বাবা এসব কিছু জানেন না।

হেমনলিনীর জ্যাঠাইমা বলেছেন, "শিবুর মা তার মেয়েকে এবাড়ি আসতে দেয় না, তুই কেন গায়ে পড়ে যাবি ওবাড়ি? কী জানি, কোনদিন কী বলে বসবে আবার!"

মেয়ের যাওয়া বন্ধ হলেও তাঁতি-ঝি যেত, তার বোনঝি ওবাড়ি কাজে লেগেছে তাই বোনঝির সঙ্গেই দেখা করতে যেত। কিন্তু শিবরানীর ভয়ে তার যাওয়ার উপায় ছিল না। "তোমার আবার এ ঘরে কী দরকার? তোমার বোনঝি ত নীচেই আছে?" বলতেন শিবরানীর মা।

তবুও এরই মধ্যে চিঠি চালাচালি চলে এসেছে, কিন্তু আর খুঁশি চলে না। শিবরানীর মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে চিঠি দেওয়া সহজ নয়। চিঠিপড়াও অসম্ভব হয়ে উঠেছে, উত্তর পাঠানো ত আরও অসম্ভব। দোয়াত কলম নিয়ে মেয়েকে বসতে দেখলেই শিবরানীর মা কাছে এসে দাঁড়ান। "কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে?" প্রশ্ন শুনে শিবরানী থতমত খেয়ে যায়।

এবার সতীশ লিখেছে, "জেলখানার কয়েদীও পালায় জেল থেকে, তুমি কি পালাতেও পারবে না, এটুকুও সাহস হবে না তোমার? আমি তোমার দাদাবাবুর বাড়ির খিড়কির কাছের গলিতে গাড়ি নিয়ে থাকব, তুমি ও বাড়ির কাকার বউভাতের দিনে পালিয়ে এসে গাড়িতে উঠবে। শুধু খোকাকে নিয়ে এস একটা তোয়ালে জড়িয়ে। গয়নাগাটি সব খুলে রেখে এসো।"

শিবরানী ভাবে, 'উপায় কী হবে? কেমন করে পালাবে সে? গেলে ত জন্মের মতই যেতে হবে, আর এমুখো হবার উপায় থাকবে না।

তবু যেতেই হবে তাকে।

জীবনে অনেকের অনেক রকম বিপদ হয়, কিন্তু শিবরানীর মত এমন বিপদ কার হয়েছে?

৩

বিমলা জামাইবাবুর চিঠির জবাব দিতে বসেছে। সে ত চিঠি নয়, সাতকাণ্ড মহাভারত। ষোল পৃষ্ঠা চিঠি, বানান ভুলে ভরা। ষোল পৃষ্ঠায় আট পৃষ্ঠা সম্বোধন। "প্রাণেশ্বরী, প্রাণপ্রতিমা, প্রাণপ্রিয়া, প্রিয়তমা...!"

তারপর চিঠি। পদ্য গদ্য সব মিলিয়ে ছাপালে একটা ছোট চটি বই হয়ে যায়।

খানিকটা দীনবন্ধুবাবুর 'নবীন তপস্বিনী' হয়ে নায়িকার জঙ্গলে যাওয়ার বর্ণনা। আবার "কেন ভালবাসি?" এই প্রশ্নের উত্তর। এটি কতকটা কবিতার, কতকটা গদ্যে।

"প্রাণ-প্রিয়তমে, জিজ্ঞাসা করেছিলে কেন তোমাকে এত ভালবাসি? বলেছিলে, আমি কেলে পেঁচী, তুমি কার্তিকের মত রূপবান। শোন তবে, রাধারানী বিদ্যুৎ-বরণী হয়েও কালাচাঁদকে কেন ভালবেসেছিলেন?

"তোমার চিঠিখানা বুকে রাখলুম। আজ সোমবার। মঙ্গলবার বুধবার দুদিন পরে বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় আবার তোমার দেখতে পাব, এ কয়দিন এই চিঠিই আমার সম্বল।

"তুমি পত্র, তুমি চিত্র, সর্বস্ব আমার,
অক্ষরে অক্ষরে পত্রে, রেখায় রেখায় চিত্রে,
কত জিজ্ঞাসিয়া কত কাঁদিয়াছি হায়?
কেন ভালবাসি আহা বুঝ না আমায়?

"কেন ভালবাসি? প্রাণেশ্বরি, রাধিকা কেন ভালবেসেছিলেন কালাচাঁদকে?

"তুমি বলেছিলে তুমি নাকি কালো। ওই কালোর প্রেমের তুলনা তো জগতে খুঁজে পাইনি আমি।

"কেন ভালবাসি তার কী দিব উত্তর?
যদি মসী অনন্ত হত বিজলী লেখনি,
কালি তোয়নিধি কিংবা নয়নের পানি,
পত্রের অক্ষর হত তারকার রাশি,
তবে ত উত্তর হত কেমন ভালবাসি।
কেন ভালবাসি যদি জানিতে বাসনা,—
তবে, নিষ্ঠুর সংসারধাম
ছাড়ি বনে চল প্রাণ,
সাজিয়া নবীন যোগী
নবীনা যোগিনী
প্রণয়সঙ্গীতে ভাসি দিবস রজনী—

"তা হলে আর মঙ্গলবার বুধবারের বিরহযন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না আমাদের।

"বনে তো খাবার ভাবনা নেই।
খাব বনফলমূলে
পরিব বাকল,
বসি বনতরুমূলে,
বসি তটিনীর কূলে
বাহুতে বাহুতে বাঁধি রব দিবানিশি,
শুধাইব কলস্বনে 'কেন ভালবাসি'।

"পারিবে কি বনে যেতে? সংসারের সুখ তুচ্ছ করে বেনারসী শাড়ি ছেড়ে বাকল দিয়ে অঙ্গ ঢাকতে?

"না পার, দাঁড়াও তুমি সংসারবেলায়,—
"প্রেমের প্রতিমাখানি
দেখিতে দেখিতে আমি

ডুবিব, ঢাকিবে যবে নীল অম্বুরাশি—
চাহিও, বুঝিবে তবে কেন ভালবাসি?"

এই পর্যন্ত শুনিয়াই হেমনলিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভাই বিমলা, খুব বাহাদুরি করেছে, এর একটা এমন উত্তর দিতে হবে যেন হেরে যায়। চিঠির লড়াইতে ওকে হারিয়ে দিতেই হবে। জানিস ভাই, কী রকম দুষ্টু, এই বাড়ি নিয়েই ত জ্যাঠাবাবু তোর বিয়েতে বরযাত্রী খাইয়েছিলেন, তার পরদিন ও এসে বললে কী জানিস? বললে—'তোমাদের বাড়িতে ত দেখলুম বিয়ের ঘটা, আমি ভাবলাম তোমারই নিশ্চয় বিয়ে হচ্ছে, না হলে এ বাড়িতে আর কার এত ঘটা করে বিয়ে হবে? ভাবলুম, আমার ভাগ্যেই নেমন্তন্নের চিঠি এল বুঝি'।"

বিমলা বললে, "দেখ্ ভাই, শিবরানী ছাদে দাঁড়িয়ে কী রকম করে এ বাড়ির দিকে চেয়ে আছে!"

"আহা বেচারা, ওর মনে আমাদের দেখে কী হচ্ছে তা বুঝতে পারছি। যদি পাখি হত, উড়ে আসত আমাদের কাছে। জানিস ভাই, সতীশবাবু শেষ চিঠিতে লিখেছেন যে, শিবরানী যখন ওদের দাদামশাইয়ের বাড়িতে যাবে বউভাতের নেমন্তন্নে তখন সতীশবাবু গলির মধ্যে গাড়ি এনে রাখবেন, খিড়কির দুয়োর খুলে শিবরানী যেন পালিয়ে আসে। আমার ত ভাই বুক কাঁপছে, উনিও এই পরামর্শের মধ্যে আছেন ত, যদি ধরা পড়ে যায়! বাঘা মানুষ ওর দাদামশায়, যদি ধরা পড়ে যায় কী যে হবে তাই ভাবছি।"

বিমলার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বললে, "তোমাদের বড়মানুষদের অহঙ্কার দেখে গা যেন জ্বলে যায়। তুই ত বড়মানুষের মেয়ে, তোর সঙ্গে যেন কথা বলতে ইচ্ছে করে না।"

হেমনলিনী কাঁচুমাচু মুখে বললে, "তুই বড্ড রেগে যাস। আমি কী করলাম ভাই, আমার উপর রাগ করিস কেন?"

৪

ধরাই পড়ে গেল শিবরানী; খিড়কির দুয়ারে আসতেই সতীশ যেমনি ছেলে নিয়েছে তার কোল থেকে, অমনি পিছনে চিৎকার শোনা গেল, "ছেলে নিয়ে পালাচ্ছে, ধর—ধর।"

শিবরানীর পা যেন অবশ হয়ে গিয়েছে, সেও আর এগবে এমন সাধ্য নেই, সতীশ যদি ছেলে নিয়ে যায়, সে যদি না যেতে পারে!

আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল শিবরানী, "ওগো, আমার খোকা, খোকাকে নিয়ে পালাল।"

"ধর্ ধর্, মার্ মার্, ছেলে নিয়ে পালাল—ভেবেছে কী?"

সতীশ বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে, যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একজন তাকে চেপে ধরল, একজন ছেলেকে কেড়ে নিলে তার কোল থেকে।

মাসি পিসি কাকি দিদির দল এসে পড়লেন। "সেকি, খিড়কিতে গিয়েছিলি কেন ছেলে কোলে নিয়ে? জানিস না দস্যি আছে ওত পেতে। বাবা, ভাগ্যে আমি দেখেছিলাম! না হলে কি আর ছেলে পাওয়া যেত?"

অপমানিত লাঞ্ছিত সতীশ। শিবরানীর উপর তাঁর ভয়ানক রাগ হল, এমন বিশ্বাসঘাতিকা স্ত্রীর মুখ দেখতে নেই। সতীশ শিবরানীকে জন্মের মত ত্যাগ করবে, আবার বিবাহ করবে গরিবের ঘরের কোন মেয়েকে? থাকুক শিবরানী বাপের বাড়ির আদর আহ্লাদ নিয়ে।

কিন্তু খোকা? এক মুহূর্তের জন্যে তার স্পর্শ পেয়েছে সতীশ! আর কি সে তাকে কোলে পাবে না?

না, তার ছেলের উপর তার কি অধিকার নেই? সে মোকদ্দমা করবে, দেখবে শ্বশুরের কতখানি আইনের জোর?

তবে শিবরানী যদি বাবার পক্ষে সাক্ষী দেয়? যদি বলে, তাঁর কোলের ছেলেকে কেড়ে নিয়েছিল নিষ্ঠুর স্বামী, তাহলে?

মেয়েদের অসাধ্য নেই, তারা সবই পারে।

বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শের জন্য সতীশ এসেছে, এমন সময় সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ? শিবরানী ছুটে আসছে ছেলে বুকে নিয়ে: "নাও, তোমার ছেলে নাও," বলে স্বামীর কোলে ছেলে দিতে গিয়ে ছেলেকোলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

গোলমাল চিৎকার।

"ডাক্তার ডাক, ডাক্তার ডাক।"

ছুটে এলেন মনোমোহনবাবু।

"ব্যাপার কী? ব্যাপার কী?"

এদিকে এলোচুলে ছুটে এসেছেন শিবরানীর মা: "বেঁচে আছে ত?" হেঁটেই রাস্তা পার হয়েছে, গাড়ি চাপা পড়েনি সেইটাই সৌভাগ্য।"

কবি হরিশ নিয়োগী ব্যাপার দেখে একেবারে স্তম্ভিত। জ্যাঠাইমা ছুটে এসেছেন বাইরের ঘরে।

মনোমোহনবাবু বললেন, "হরিশ, তুমি না কবি? মেয়েদের নিয়ে কবিতা লেখ? এই কি তোমার কবিত্ব? মেয়েকে চাও জামাইয়ের কাছছাড়া করতে? তুমি ত আইনও জান? সতীশ যদি নালিশ করে, তুমি জবরদস্তি করে তার পরিবারকে আটকে রেখেছ? কোর্টে যদি সাক্ষী দিতে মেয়েকে দাঁড়াতে হয়, তোমার মর্যাদাটা কোথায় থাকবে?"

ডাক্তার বললেন, "আপনারা গোলমাল থামান।"

শিবরানীর মা ডুকরে উঠলেন: "শ্যামরায়, এমন শাস্তি দিও না। আমি আজই শিবু আর খোকাকে নিয়ে গিয়ে তোমার আঙিনায় নামিয়ে দেব,—রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

বেচারী সতীশ। তার মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গিয়েছে। যদি মা বাঁচে? শিবরানী যদি না বাঁচে?

ড্রাগনের দাঁত

অন্নদাশঙ্কর রায়

আসামে যা ঘটে গেল তা ভারতে প্রথম হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে অভূতপূর্ব নয়। ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় সর্বত্র ধর্ম নিয়ে হানাহানি বাধে। সেই একই খ্রীষ্টধর্মের দুই শাখা নিয়ে দ্বৈধ। ইউরোপের লোক অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার ঊর্ধ্বে ওঠে। তার পর উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হলো ভাষা নিয়ে কাটাকাটি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পর যেসব দেশ স্বাধীন হয়—যেমন পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, বলটিক রাজ্যগুলি—সেসব দেশে সমস্তক্ষণ আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব লেগে থাকে ভাষার প্রশ্ন নিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেটা এখন ধামাচাপা পড়েছে, সমস্যার সমাধান মিলেছে বলে নয়, কমিউনিজমের পক্ষে ও বিপক্ষে জোটবন্দী হওয়া আরো জরুরি বলে। রাশিয়া ও আমেরিকা যদি সরে যায় তা হলে আবার ওইসব দেশের অমীমাংসিত সমস্যাটা ধামার ভিতর থেকে বেরোবে।

সেই দুটি শক্তি—ধর্ম ও ভাষা ভারতবর্ষের ইতিহাসেও সক্রিয়। আমাদের ছেলেবেলা থেকে আমরা ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা দেখে আসছিলুম। তার চূড়ান্ত দেখলুম ইংরেজ বিদায়ের আগে ও পরে প্রায় পাঁচ বছর ধরে। এখনো তার জের ভালো করে মেটেনি। কাশ্মীর নিয়ে যদি যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে তবে যুদ্ধও যে বাধ পড়বে তাই বা কেমন করে বলি? এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে ভারতখণ্ডে ও পাকিস্তানখণ্ডে ধর্মের নামে যুদ্ধ আগের মতো উন্মত্ততা জাগাতে পারবে না।

কিন্তু ভাষার নামে যুদ্ধ? আসামের ব্যাপার দেখে আশঙ্কা হয় সবে কলির সন্ধ্যা। আমরা যদি এর মূলে না যাই, যদি গোড়া ঘেঁষে সমাধান না করি, তবে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে এর অনুরূপ ঘটতে পারে। যথেষ্ট বিদ্বেষ তলে তলে জমছে। একুশ বছর আগে আমি বম্বে ও মাদ্রাজ বেড়াতে গিয়ে মরাঠা-গুজরাতী ও তামিল-তেলুগুর পারস্পরিক বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করে আসি। কোথায় লাগে তার কাছে হিন্দু মুসলিম বিদ্বেষ! গান্ধীজীর ও গুজরাতীদের বিরুদ্ধে আমার মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বন্ধু এমন বিষ উদ্গীর্ণ করেন যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কর্তৃক গুজরাতী গান্ধীহত্যা। বলা বাহুল্য, ভাষার পিছনে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ কাজ করে। যেমন ধর্মের পিছনে। একদল মুসলমান যেমন আবার সেই মোগল সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল তেমনি একদল মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরও অন্তরের সংকল্প ছিল আবার সেই মরাঠা সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনা।

ভাষার লড়াইয়ের প্রথম অধ্যায়টা এই তেরো বছরে মোটামুটি শেষ হয়ে এসেছে। তেলুগুরা পেয়েছে তেলুগুভাষী অন্ধ্র প্রদেশ। তামিলরা পেয়েছে তামিলভাষী মাদ্রাজ রাজ্য। কন্নাড়ীরা পেয়েছে কন্নাড়ীভাষী মৈশুর রাজ্য। মালয়ালিরা পেয়েছে মালয়ালিভাষী কেরল। মরাঠারা পেয়েছে মরাঠীভাষী মহরাষ্ট্র। গুজরাতীরা পেয়েছে গুজরাতীভাষী গুজরাত। ওড়িয়ারা আরো আগে ওড়িয়াভাষী ওড়িশা পেয়েছিল। তারও আগে বাঙালীরা পেয়েছিল বাংলাভাষী অবিভক্ত বঙ্গ। এখন পাঞ্জাবীভাষী প্রদেশের জন্যে আন্দোলন চলেছে। সব পাঞ্জাবীভাষীর ধর্ম এক হলে এদের দাবী এতদিনে মিটে যেত। মিটছে না তার কারণ পাঞ্জাবীভাষী হিন্দুরা মাতৃভাষার চেয়ে পিতৃধর্মকেই আপনার মনে করে। তার জন্যে তারা হিন্দীকেই তাদের মাতৃভাষা বলে ঘোষণা করে। যদিও বাড়ীতে কথা বলে পাঞ্জাবীতেই।

আসামের ব্যাপারটার বিচার করতে হবে এই পরিপ্রেক্ষিতে। সবাই যদি যে যার ভাষার ভিত্তিতে এক একটা রাজ্য আদায় করে নেয় ও সে রাজ্যে নিজের ভাষাকেই করে সরকারী ভাষা তা হলে আসামের অসমীয়ারাই কি একমাত্র ব্যতিক্রম হবে? কোনো কোনো বুদ্ধিমান বলেন, আসাম রাজ্যের নামটা যদি আসাম না হয়ে পূর্বোত্তর প্রদেশ হতো তা হলে অসমীয়াদের দাবী যুক্তিতে টিকত না। বটে? মাদ্রাজ নামটা কি আগে ছিল না? এখনো কি নেই? বম্বে নামটা কি আগে ছিল না? রাখতে কম চেষ্টা করা হয়েছে? পূর্বোত্তর প্রদেশ নাম দিলেও একই ব্যাপার ঘটতে পারত ও আবার ঘটতে পারে। কথা হচ্ছে ভারতের অন্যান্য ভাষা যদি এক একটি রাজ্যের ভিত্তি হয়ে থাকে, যদি এক একটি রাজ্যের সরকারী ভাষা হয়ে থাকে তা হলে অসমীয়া কি এই প্রোসেসের বাইরে না ভিতরে?

আমি ভারত বিভাগের পূর্বে ভাষাভিত্তিক প্রদেশে বিশ্বাস করতুম। তার পর দেশের ছত্রভঙ্গ অবস্থার ভয়ে সে বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখতে পারিনে। তারপর একে একে অন্ধ্র প্রদেশ, কেরল ইত্যাদি সংগঠিত হতে দেখে হাল ছেড়ে দিই। "এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে!" আমি ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষী দিতে পারি যে জবাহরলাল একে রোধ করতে আপ্রাণ করেছিলেন। নিতান্ত নাচার না হলে তিনি পুরোনো মাদ্রাজ ও বম্বে, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দরাবাদ ভেঙে দিতে রাজী হতেন না। গণতান্ত্রিক নেতা জনমতের সঙ্গে রক্ষা করতে বাধ্য। জনমত যা চেয়েছে তাই হয়েছে।

একটি পরিবারের বড়, মেজ, সেজ, ন' প্রভৃতি যতগুলি ভাই একটি ছাড়া প্রত্যেকেই যে যার অংশ ষোলো আনা আদায় করে নিয়েছে। বড় তো ষোলো আনাতেও সন্তুষ্ট নয়। তাকে দিতে হবে বত্রিশ আনা। বাকী আছে ছোট ভাই। সেই বা কেন তার বখরা না পাবে! অসমীয়াদের দাবীটা আর সকলের দৃষ্টান্ত দেখার ফলে। যারা দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তাদের অগ্রণী হলো বঙ্গ। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ সর্বপ্রথম গঠিত হয় ১৯১২ সালে। ইংরেজ থাকতে, ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া করে, তাকে বোমা মেরে। সে বোমায় মরেন কয়েকজন ইংরেজ মহিলা। সম্পূর্ণ নিরীহ। ভাষা নিয়ে যারা এতদূর যেতে পারে তাঁরা কোন্ মুখে বলবে যে ভাষার উপর ভিত্তি করে প্রদেশ বা রাজ্য গঠন করা উচিত নয়? তারা কোন্ মুখে বলবে যে আসামের নাম রাখা উচিত ছিল পূর্বোত্তর প্রদেশ? বাঙালীই সর্বপ্রথম ভাষাভিত্তিক প্রদেশ আদায় করে নিয়েছে। তার পরে ওড়িয়া ও সিন্ধী। তার পরে তেলুগু। এখন তো বাদবাকী সবাই। আসামের থেকে

সিলেট চলে যাবার পর অসমীয়ারা যা পাবার তা একরকম পেয়ে গেছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য। নতুনের মধ্যে তারা যা দাবী করছে সেটা হলো সরকারী ভাষার সম্মান। এক্ষেত্রে অগ্রণী হয়েছে তামিলভাষী পুনর্গঠিত মাদ্রাজ। মাদ্রাজ এটা রাতারাতি করত না, করল হিন্দীর সর্বগ্রাসী দাবীর পাল্টা চাল হিসাবে। এখন খুব জোর কদমে তামিলী-করণ চলেছে। তাকেও ছাড়িয়ে যেতে চায় সদ্য-ভূমিষ্ঠ মহারাষ্ট্র গুজরাত। পশ্চিমবঙ্গ এদের তুলনায় অনেক বেশী সাবধান ও মন্থর। এর জন্যে আমি তাকে শিরোপা দেব। বাঙালীরা চালে ভুল করলে দার্জিলিং হারাবে।

আসাম একটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য হবে। অসমীয়া সে রাজ্যের সরকারী ভাষা হবে। অসমীয়ারা মোটামুটি এই চায়। এখন এটা না চায় কে? চায় না সে রাজ্যের বাঙালীরা ও পাহাড়িয়ারা। এদের পক্ষেও যুক্তি আছে। এরা নগণ্য মাইনরিটি নয়। এক একটা জেলায় এরা অবিসংবাদিত মেজরিটি। এমনটি ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। এদিক থেকে আসাম একটা ব্যতিক্রম। এদের মাথার উপর এদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দিতে গেলে এরা সহ্য করবে কেন? তার চেয়ে আসাম থেকে এরা বেরিয়ে গিয়ে পৃথক একটা রাজ্য গঠন করবে। যেমন করেছে নাগারা। এখানে মনে রাখতে হবে যে অসমীয়াদের এতে আপত্তি নেই। তারা বরং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নিয়ে সন্তুষ্ট হবে, তবু তাদের মূল দাবী ছাড়বে না। এতটুকু পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আমরা [illegible] পূর্ববঙ্গ বিসর্জন দিলুম কেন? তার কারণ আমরা চেয়েছিলুম অবিসংবাদিত মেজরিটি। গণতন্ত্রের যুগে এর দাম আছে। দাম দিতে হয়েছে ও হচ্ছে। উপায়ান্তর নেই দেখলে অসমীয়ারাও দেবে। আমার তো আশংকা আসামের পার্টিশন অবশ্যম্ভাবী।

দেখছি বাংলা কাগজে লেখালেখি হচ্ছে যে আসামে অসমীয়ারা মেজরিটি নয়, গতবারের আদমসুমারিতে নাকি কারচুপি ছিল। এটা কতদূর সত্য আমি জানিনে। যা কিছু লেখা হয় বা বলা হয় তাই সত্য নয়। কিন্তু এসব কথা যারা লেখে বা বলে তাদের জানা উচিত যে এর ফলে অসমীয়ারা আরো উগ্র হতে পারে। দিল্লীতে বসে যদি হিন্দীভাষীরা লেখে বা বলে যে বৃহত্তর কলকাতায় হিন্দী-ভাষীরাই মেজরিটি তা হলে বাঙালীরাও ক্ষেপে গিয়ে মাড়োয়ারীর ভুঁড়ি ফাঁসাতে পারে, বড়বাজারের গদি পোড়াতে পারে, বিহারীদের মেরে ভাগিয়ে দিতে পারে। দেশের সব জায়গাতেই আগুন চাপা রয়েছে। সে আগুন ওই মেজরিটি মাইনরিটি প্রশ্ন নিয়ে। কেউ চায় না মেজরিটি হারাতে। কাজেই মেজরিটিকে "আদমসুমারির কার-চুপি" বলে উড়িয়ে দিতে যাওয়া মানে ড্রাগনের দাঁত বোনা। সেসব দাঁত থেকে গ্রীক পুরাণের মতো যোদ্ধা জন্মাবে। তখন ভারত খণ্ড খণ্ড হবে।

ড্রাগনের দাঁত দেড় শ' বছর ধরে বপন করা হয়েছে। তারই সমবেত ফল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বর্বরতা। অসমীয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ভারতীয় ভাষা। যেমন স্বতন্ত্র মৈথিলী বা ওড়িয়া। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা কোনো দিন মুসলিম অধিকারে আসেনি। বাঙালীও সেখানে থাকতে যায়নি গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের আগে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বলতে আমি গোয়ালপাড়া বাদ দিয়ে বলছি। ইংরেজরা ১৮২৬ সালে কাছাড়ের দিক থেকে গিয়ে বর্মীদের হাত থেকে তাদের দ্বারা বেদখল অহোম রাজ্য উদ্ধার করে ও ১৮৩২ সালে পুরাতন অহোম রাজবংশের একজনকে সিংহাসনে বসায়। বছর কয়েক পরে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে ইংরেজরা প্রত্যক্ষ শাসনের দায়িত্ব নেয়। এতকাল অসমীয়া ভাষাই ছিল অহোম রাজ্যের ভাষা ও তার লিপি ছিল স্বতন্ত্র। সে ভাষায় কেবল যে উচ্চাঙ্গের পদ্য লেখা হয়েছিল তা নয়, তার গদ্যও ছিল উন্নত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নিজের একটা ঐতিহাসিক ধারা ছিল, সে ধারা মুসলিম যুগের বা ব্রিটিশ যুগের ভারতের সঙ্গে মিলত না। অসমীয়া ভাষায় সেই ইতিহাস লেখা হয়েছিল। এসবই ১৮৩৬ সালের আগে। ঐ সালে আদালতে ও বিদ্যালয়ে অসমীয়ার বদলে প্রবর্তিত হলো বাংলা। ইংরেজরা এই ড্রাগনের দাঁত বোনে তাদের বাঙালী কর্মচারীদের পরামর্শে। তাদের বোঝানো হয় যে অসমীয়া একটা ভাষা নয়, একটা উপভাষা। বাংলার উপভাষা। ইতিমধ্যে ১৮১৭ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা তাঁদের বাংলা ছাপাখানায় অসমীয়া ভাষায় অনূদিত বাইবেল বাংলা হরফে মুদ্রণ করেছিলেন। তার থেকে প্রমাণ করা শক্ত হলো না যে বাংলা লিপিই অসমীয়া লিপি। কেবল পেটকাটা বা ছাড়া অসমীয়ার আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। অতএব অসমীয়া বাংলার একটি উপভাষা! কয়েকজন বাঙালী কর্মচারী ওড়িশাতেও ইংরেজকে অনুরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্থানীয় বাঙালীরাই এর প্রতিবাদ করে ওড়িশাকে বাঁচান।

আদালত থেকে, বিদ্যালয় থেকে অসমীয়া উঠে গেল। বাংলা বসল তার জায়গায়। এও একপ্রকার বিজয়। অসমীয়ারা বিজিত হলো একভাবে ইংরেজের হাতে, আরেক ভাবে বাঙালীর হাতে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে আন্দোলন চালায় প্রধানত শিবসাগরের আমেরিকান মিশনারীরা। অসমীয়া ভাষায় তারা অসংখ্য বই লিখে প্রমাণ করে দেয় যে অসমীয়া একটি স্বতন্ত্র ভাষা। এই আন্দোলনের অসমীয়া পুরোধা ছিলেন আনন্দরাম ফুকন। কলকাতার হিন্দু কলেজে শিক্ষিত। অবশেষে ১৮৮২ সালে ইংরেজরা ভ্রমসংশোধন করে। অসমীয়া হয় আদালতের ও বিদ্যালয়ের ভাষা তাদের অধ্যুষিত জেলাসমূহে। লিপি কিন্তু বাংলাই রয়ে যায়। সামান্য ইতরবিশেষ বাদ দিলে। অসমীয়াদের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ও বাঙালীদের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স গোড়ায় ছিল ভাষাগত, তারপর হলো লিপিগত। আশ্চর্য হব না, যদি বাঙালীর উপর রাগ করে ওরা বাংলা লিপি ত্যাগ করে। দেবনাগরী তো আগ বাড়িয়ে বসে আছে শূন্য স্থান পূর্ণ করতে। অসমীয়ার সঙ্গে বাংলার, তথা বাঙালীর, মস্ত বড় এক মিল ছিল এই জায়গায়। বাংলা কাগজওয়ালারা যদি কেবল বর্বরতার নিন্দা করেই ক্ষান্ত হতো তা হলে এই একটি মিল থেকে আরো কয়েকটি মিল বেরোত। কিন্তু নিন্দাটা কখনো জাত তুলে, কখনো মেজরিটি অস্বীকার করে, কখনো গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে চলেছে। এর পরিণামে বাঙালী হয়তো নিরাপদ হবে, কিন্তু ভারতের যে প্রান্তটি সব চেয়ে বেশী বাংলা-প্রভাবিত সে প্রান্ত থেকে বাংলার প্রভাব মুছে যাবে।

রাজনীতি নিয়ে আমি কোনো কথা বলব না। স্বেচ্ছায় আমি রাজনীতিক প্রবন্ধ লেখা বন্ধ করেছি। তবে আজকাল সব প্রশ্নের সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে গেছে। সব প্রশ্নের পশ্চাৎপট রাজনীতি। কিন্তু "অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস" (ইংরেজীতে লেখা) পড়তে পড়তে যে নালিশটা আমি লক্ষ করছি সেটা নিছক রাজনীতিগত নয়। অসমীয়ারা ভাবতে চায়, বলতে চায় যে তারা মরাঠা গুজরাতী বাঙালীদের মতো স্বতন্ত্র একটি জাতি, তাদের ভাষা স্বতন্ত্র একটি ভাষা। কেবল যে তারা স্বতন্ত্র তাই নয়, তারা সমান। এবং তাদের রাজ্যে তারাই বড়, যেমন বাঙালীদের রাজ্যে বাঙালীরা। এসব আজকের দিনে অস্বীকার করছে কে? যে করছে সেই তাদের শত্রু। এমনি করে একটা জাতিবৈর জন্ম নিচ্ছে। ড্রাগনের দাঁত।

বাঙালীকে বিজ্ঞ হতে হবে। আপনাকে পর করে দেওয়া বিজ্ঞতা নয়। যদিও তার বর্বরতা নিন্দনীয়। সেক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে ড্রাগনের দাঁত বোনা হয়েছে ১৮৩৬ সালে। ফসল তো ফলবেই একদিন না একদিন। ইতিহাসে যা ঘটে তা শত শত বর্ষের কর্মফল। যেমন ১৯৪৬ সালে তেমনি ১৯৬০ সালে। এখন আর একটা ১৯৪৭ না এলেই বাঁচি। অর্থাৎ আর একটা পার্টিশন।

আমি আগেই বলেছি যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীরা কোনোদিন মুসলিম

স্কেচ
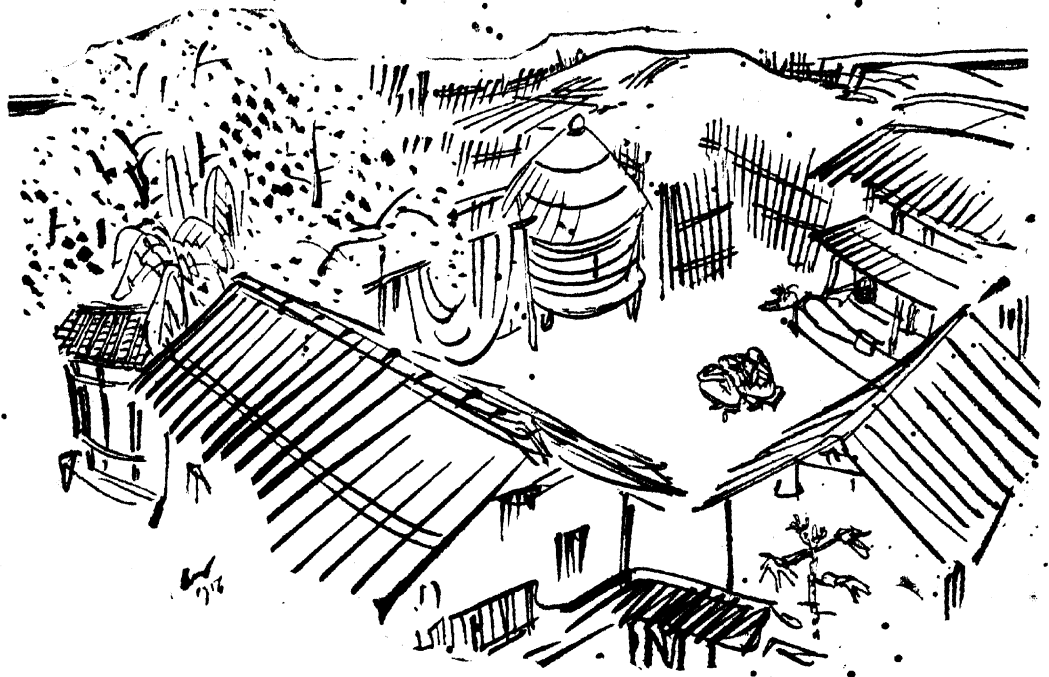
শিল্পী ঃ শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত

রাজশক্তির অধীনে আসেনি। তার আগেও তারা কখনো মৌর্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন হয়নি। যতবার পশ্চিম দিক থেকে তাদের জয় করার চেষ্টা হয়েছে ততবার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বঙ্গবিজেতা মহম্মদ বিন বখতিয়ারকে তারা হটিয়ে দিয়েছে, মীর জুমলাকেও তারা ভাগিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির আনুগত্য তারা সর্বপ্রথম স্বীকার করল ১৮৩২ সালে। তার আগেও তারা ইংরেজকে ঢুকতে দেয়নি। এবার দিল ইংরেজের চেয়েও যে খারাপ সেই মগকে সরাতে। কেন্দ্রীয় আনুগত্যের ঐতিহ্য তা হলে মাত্র একশত ত্রিশ বছরের। ইংরেজ অপসরণ করেছে। এখনকার আনুগত্য স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারের প্রতি। এই সরকার যদি একান্ত সতর্ক না হয় তা হলে কী ঘটবে তা নাগাভূমির দিকে তাকালেই মালুম হয়। আমরা যখন কথা বলি তখন ধরে নিই যে অসমীয়ারাও আমাদের মতো হিন্দু, সুতরাং আমাদেরি মতো কেন্দ্রানুগ। এটা আমাদের অজ্ঞতা।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ কামরূপ কোনোদিন কেন্দ্রানুগ না হলেও মোটামুটি আমাদের সঙ্গেই ছিল। কামরূপ বলতে কোচবিহারকেও বোঝাত। এক সময় কোচ রাজধানী ছিল কামরূপের রাজধানী। সে সময় অসমীয়া কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কোচ নৃপতি। কামরূপের আরো পূর্বে শিবসাগর প্রভৃতি অঞ্চলের ইতিহাস অন্যরূপ। বর্মার উত্তরে যে শান রাজ্য আছে সেইখান থেকে বা আরো দূর থেকে পাহাড় পর্বত পেরিয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করে অহোম জাতি। এরা হিন্দু তো ছিলই না, ছিল ঘোরতর হিন্দুবিরোধী। হিন্দুদের উপর রাজত্ব করার পর এদের স্বভাবের পরিবর্তন হয়। এরা বর্বরতা ছাড়ে। সভ্য হয়। একই ভাষায়, একই ধর্মে, একই সূত্রে গ্রথিত হয়। অহোমবংশীয়দের হিন্দুয়ানীর বয়সও তিন শ' বছরের বেশী নয়। তার আগে এদের সঙ্গে না ধর্মে, না ভাষায়, না রক্তে, না দেশগত আচারে ব্যবহারে কামরূপবাসীদের বা আমাদের লেশমাত্র মিল ছিল। পরে অবশ্য এরা মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। কিন্তু এদের নাড়ীর টানটা ভারতের প্রতি না বর্মার প্রতি তা কে জোর করে বলবে? দেখা তো গেল যে আমাদের স্বজাতীয়দের এক ভাগের নাড়ীর টান মক্কার প্রতি। তারা ঢাকাকেও মক্কার সঙ্গে বাঁধবে। দিল্লীর সঙ্গে নয়। ইতিহাসে কী সম্ভব আর কী সম্ভব নয় তা বলবার সাধ্য কোনো মহাপুরুষের নেই। না গান্ধীর, না নেহরুর। সুতরাং সাবধান হওয়াই ভালো।

একদা আমরা যা ধরে নিয়ে তাসের কেল্লা গড়েছিলুম তা ১৯৪৭ সালে ধ্বসে গেল। তাই আর ধরে নিতে পারছিনে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিন্দুত্বের চিরন্তন বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়েছে বলে অবিভাজ্য। মূঢ়তা! মূঢ়তা! মূঢ়তা! মূঢ়তা!"

আসামের বিভীষিকার একটা ব্যাখ্যা বোধ হয় এই যে সে রাজ্যের কতক লোক উপরে উপরে হিন্দু হলেও তলে তলে বর্মার শান জাতির মতো উগ্র। কিন্তু [illegible] হাজার বছর আগেও চৈনিক পরিব্রাজক কামরূপ অধিবাসীদের দেখে নোট করেছিলেন যে তারা করাল। কিন্তু সোজা। আর অধ্যয়নশীল। দেশটাই ছিল তান্ত্রিক। তাবে বৈষ্ণব করা আরম্ভ হলো পঞ্চদশ শতাব্দীতে। আমাদের মতো ওদেরও শাক্ত বৈষ্ণবের বিবা দীর্ঘকাল ধরে গড়ায়। অহোমরা যখন হিন্দ হয় তখন শাক্ত হয়। শাক্ত ধর্মই হয় রাজ ধর্ম। বৈষ্ণবদের ধর্মে কিন্তু তারা হস্তক্ষেপ করত না। এইভাবে একটা সমঝোত হয়েছিল। সেটা নষ্ট হয় গত শতাব্দী গোড়ার দিকে। রাজেশ্বর সিংহের রানী ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁর রাগ পড়ল বৈষ্ণব দের একভাগের উপরে। বৈষ্ণবপীড় করতে গিয়ে রাজ্য হলো ছারখার। শাসন যন্ত্র ভাঙতে ভাঙতে গেল ভেঙে। তখ অহোম সেনাপতি বদন বড়ফুকন আমন্ত্র করলেন বর্মীদের। এমনি করে মগ ঢুক ১৮১৭ সালে। তারপরে ও তার ফলে ঢুকল ইংরেজ। তার অনুচর সিলে কাছাড়ের বাঙালী।

ইংরেজের ছোট তরফ হয়ে বাঙাল

ভারতের যতগুলি প্রান্তে গেছে প্রত্যেকটিতে সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক চেতনা ও আধুনিকতা বিস্তার করেছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেও কি করেনি? করেছে বইকি। কিন্তু ইতিহাসের যে অমোঘ নিয়ম আধুনিকতার প্রধান প্রবর্তক ইংরেজকে বিদায় করেছে সেই একই নিয়মই ছোট-তরফকেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদায় করে দিচ্ছে। বাঙালী যেসব অঞ্চলে ইংরেজের আগে গেছে সেসব অঞ্চলে সে শিকড় পেতেছে। কিন্তু শিকড় যারা পেতেছে তারাও এখন ভুগছে ছোটতরফের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে। ছোটতরফ ইংরেজের চেয়ে ছোট হলেও তাঁর বড়াই কম নয়। কাউকে তিনি বলবেন "উড়ে"। কাউকে "মেড়ো"। "মেড়ো" থেকে "মেড়া" বা "ভেড়া।" "উড়ে মেড়া" বলতেও আমি শুনেছি। আমারি লেখা সমালোচনা পড়ে এক মহাপ্রভু বলেছিলেন, "ছি ছি! উড়ের হাতে মার!" অথচ আমিই এককালে তাঁর স্বেচ্ছাসেবক ছিলুম।

বড়তরফ ইংরেজ মানে মানে সরে পড়েছে তেরো বছর আগে। ছোটতরফ! তুমিও মানে মানে যা হয় একটা কিছু কর। আর কদ্দিন মহাপ্রভুত্ব করবে! সেসব দিন আর নেই। "বৃহত্তর বঙ্গ" ইত্যাদি বোলচাল বঙ্গের বাইরে আর সুধাবর্ষণ করে না। ষাঁড়ের কাছে লাল ন্যাকড়া তেমনি ওই শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান। যে সত্যিই শ্রেষ্ঠ সে ও-কথা মুখে আনে না। সে অত্যন্ত বিনয়ী। কেবল মুখে নয়, সর্বতোভাবে বিনয় অনুশীলন করাই শ্রেয়স্কর। শ্রেষ্ঠত্ব যদি থাকে আপনি ফুটে বেরোবে। কিন্তু ফেটে বেরোবে না।

নোয়াখালির বিভীষিকার সময় আমি জজ ছিলুম ময়মনসিংহে। এই জিনিস সেখানেও ছড়াত। ছড়াত কী, ছড়িয়েছিল কয়েকটি জায়গায়। ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ সাহেব দুজনেই ছিলেন মুসলমান। তাঁরা কিন্তু মুসলমানকে হিংসায় প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, কখনো স্ববেশে কখনো ছদ্মবেশে ঘুরে হিংসাপন্থী মুসলমানদের দমন করেন। তাঁরা যদি কর্তব্যবিমুখ হতেন, যদি ধর্মান্ধ হতেন, তা হলে নোয়াখালির বিভীষিকা পূর্ববঙ্গ-ব্যাপী হতো। তাঁরা যা করেছিলেন তার জন্যে তাঁদের নাম আমার স্মরণে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু সেদিনকার পরিস্থিতিটাই ছিল এমন অদ্ভুত যে ভালোর জন্যে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁদের উপর কারো নজর ছিল না। সবটা নজর কেড়ে নিয়েছিল গুণ্ডারা আর তাদের পলিটিকাল মতারা। আমিও সমস্তক্ষণ ক্রোধে জ্বলতুম আর মনে মনে প্রার্থনা করতুম সেইদিনটির জন্যে যেদিন ইংরেজ রাজত্বের অবসানে আমরা মুসলিম লীগের পলিটিসিয়ানদের নিয়ে "যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার" আদালত বসাব। উল্টো বিচার বিধাতার। আরে বাবা, তারাই কিনা দেশের এক ভাগ কেড়ে নিয়ে রাজা হয়ে বসল! সেই ময়মনসিংহ থেকেই আমাকে অসময়ে বিদায় নিয়ে বাঁচতে হলো। আর আমার বন্ধু সেই দুই মুসলমান অফিসার পাকিস্তান হবার আগেই লীগ সরকারের আস্থা হারিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন। তাঁদের দেওয়া হয় অল্প দায়িত্বের কাজ।

তা হলে কি "যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার" হলো না? হলো বইকি। হলো বিধাতার নিজের হাতে। তারপর আয়ুব খাঁর হাতে। তেমনি আসামেও হবে। এসব অপরাধ আপাতত ন্যায়ের কবল এড়াতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের বিচারশালা তো বরাবর খোলা পড়ে থাকবে। শাস্তি একদিন না একদিন একভাবে না একভাবে হবেই। কিন্তু সেইটেই কি বড় কথা? নোয়াখালির পরে ভালোর জন্যে যাঁরা কাজ করেছিলেন তাঁরা না থাকলে কী প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারই না হতো? তেমনি আসামেও কি কেউ ভালোর জন্যে কাজ করেনি? আমরা কি সব খবর রাখি? নিশ্চয়ই বহু অসমীয়া আপনাদেরকে বিপন্ন করে বাঙালীকে রক্ষা করেছেন। কোথায় তাঁদের শুভকর্মের স্বীকৃতি বা প্রশংসা! কেবলি তো বর্বরতার কথাই শুনছি। যেন সব অসমীয়াই আসামী। তাঁদের অসমীয়া না বলে "আসামী" বলা হচ্ছে দুই অর্থে। এই যে একচোখোমি এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে অতিরঞ্জন। যেমন নোয়াখালীর বেলা। এতে আপাতত কিছু লাভ হতে পারে, কিন্তু আখেরে লোকসান। নোয়াখালীটাই আমরা হারালুম। এবার কী হারাচ্ছি কে জানে! হাঁ, আমাদেরও বিচার আছে। ইতিহাসের বিচারশালায়। কেননা আমরা ভালো দেখতে পাচ্ছিনে আর মন্দকে বাড়িয়ে দেখছি। ক্রোধ কারো মঙ্গল করে না। ক্রোধ থেকে আসে মোহ। যেমন এলো নোয়াখালীর পর। শেষে মোহভঙ্গ। যার নামান্তর ভারতভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ। আমরা সবাই যদি সে সময় শান্ত থাকতুম তা হলে জিন্নার দলের হাত থেকে হাতিয়ারে খসে পড়ত। অন্যরকম সমাধান খুঁজে পেতো হিন্দু মুসলমান।

অন্যরকম সমাধান কি আজকের পরিস্থিতিতে নেই? চিন্তা করতে হবে। তার জন্যেও চাই অক্রোধ। আসামের উপর রেগে টং হয়ে কেন্দ্রের উপর চোখ রাঙানো আর স্বাধীনতা-দিবসে কেন্দ্রকে দেখিয়ে দেখিয়ে চোখের জল ঝরানো একই রকমের ছেলেমানুষী। কেন স্বাধীনতা-দিবসে আর সব ভারতীয়ের মতো আনন্দ করব না, এর আমি কোনো সন্তোষজনক হেতু আবিষ্কার করতে পারিনি। কই তেরো বছর আগে যেদিন হৈ হৈ করে দেশটাকে আর প্রদেশটাকে ইংরেজের খাঁড়ার কোপে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলো সেদিন কি কারো অন্তরে শোকের দহন ছিল না? তা সত্ত্বেও তো আনন্দের বান ডেকে গেল। সেটা অতি স্বতঃস্ফূর্ত অতি স্বাভাবিক আনন্দ। কারণ ইংরেজ সত্যি সত্যি সরে গেল। ইউনিয়ন জ্যাক সত্যি সত্যি নামিয়ে দেওয়া হলো। জাতীয় পতাকা সত্যি সত্যি সরকারী ভবনে উড়ল। তেরো বছর পরে কি আমরা সে আনন্দের কণামাত্র অনুভব করতে অক্ষম?

কতরকম দুর্যোগের ভিতর দিয়ে ফরাসীরা গেছে। কিন্তু কখনো শুনিনি যে চোদ্দই জুলাই তারা আনন্দ করতে অস্বীকার করেছে। যেহেতু তাদের মন শোকাকুল। মানুষের মন এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে এতে শোকের দিনেও আনন্দের কারণ থাকলে আনন্দ জাগে। সুতরাং শোক সত্ত্বেও স্বাধীনতা-উৎসবে সারা ভারতের সঙ্গে হাত মেলানো সম্ভব ছিল, উচিত ছিল। এই যে খারাপ নজির দেখানো হলো এর জন্যে পরে পস্তাতে হবে। বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করে অবশিষ্ট ভারত কাল তা চিন্তা করে। এই খারাপ নজিরেরও অনুসরণ করা হবে। তখন জাতীয় সংহতি আর ডিসিপ্লিন বলে কিছু থাকবে না। দেশ তো দুর্বল হলোই, দেশের স্বাধীনতাও কমদামী হয়ে গেল। বিদেশীদের সামনে আমাদের সকলেরই মুখ আসামের দরুন কালো হয়েছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গের শোকাকুলদের জন্যে আরো এক পোঁচ কালো হলো। আসামের অসভ্যতার জন্যে ভারতের সুনামহানির শরিক আর সকলের মতো আমরাও। আবার পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা-দিবসের আচরণের জন্যে ভারতের গৌরবহানির শরিক আমাদের মতো আর সকলেও। বিশ্বসভায় ভারতের আসন বোধ হয় সামনের সারি থেকে সরে গেল।

ভুল করতে করতেই মানুষ শেখে। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়েরই শিক্ষা হবে। কিন্তু তার আগে মন্দ যেন মন্দতর না হয়। হতে হতে আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়। শুধু বাঙালী কেন, সব ভারতীয়কেই ভারতের সর্বত্র বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ। সকলের সর্বত্র যাতায়াতের ও বসবাসের অবাধ ও আইনসঙ্গত অধিকার মানতে ও মানাতে হবে। এটাও স্বতঃসিদ্ধ। এই মহামারীর ফলে এই দুটি স্বতঃসিদ্ধ যদি সর্ববাদিসম্মত হয় তা হলে নিরীহ নারী ও শিশু ও অসহায় পুরুষের দুর্ভোগ ব্যর্থ যাবে না। যেসব অধিকার কাগজে কলমে আবদ্ধ ছিল সেসব অধিকার কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হবে। কতক লোক দাম দিল। অধিক লোক ভোগ করবে। ইতিমধ্যেই একটি সুফল লক্ষ করছি। মাদ্রাজে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলে এসেছেন যে হিন্দীকে

কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। তা যদি হয় তবে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। যা চাপিয়ে দিতে পারা যায় না তার পিছনে আইনের বল নেই। তা হলে আইনের মূলগ্রন্থে তার স্থান কেন? আমি তো মনে করি হিন্দী বাংলা তামিল তেলুগু অসমীয়া কোনোটাই কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সব ভারতীয় ভাষাই সব ভারতীয়ের ভাষা। তেমনি যে রাজ্যে যতগুলো ভাষা চলে ততগুলো ভাষাই রাজ্যের ভাষা। নিজের সুবিধাটি ষোলো আনা দেখব, প্রতিবেশীর সুবিধা অসুবিধার দিকে ফিরেও তাকাব না, এর নাম জাতীয়তাবাদ নয়। এমন যদি করি তো আমরা এক নেশন নই। বহু নেশন। যদি বহু নেশন হয়ে থাকি তবে এই সত্য একদিন ভারত ভেঙে বলকান করবে।

নাটের গুরু হচ্ছে হিন্দী। হিন্দী যদি তার উচ্চাভিলাষ পরিহার করে তা হলে তার মহান দৃষ্টান্ত সকলে অনুসরণ করবে। হিন্দী ততটুকুই চলবে যতটুকু বিনা বাধায় চলবে। তেমনি বাংলা ততটুকুই চলবে, তেমনি অসমীয়া ততটুকুই চলবে যতটুকু বিনা বাধায় চলবে। সীমানা সেটা নির্ধারিত হয়ে যাবে তার নিজের ভোটের জোরে বা লাঠির জোরে নয়। তার প্রতিবেশীর সঙ্গে মিটমাটের দ্বারা। মিটমাটের মনোভাব আসুক, তা হলে আসামের অনর্থ থেকে কল্যাণ উদ্গত হবে। তা যদি হয় তবে আর রাজ্য ভেঙে তছনছ করতে হবে না। এই প্রোসেসটার দোষ এই যে কেন্দ্র যদি কোনো দিন দুর্বল হয়ে যায় তা হলে রাজ্যগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসবে। কোথাও একজন বদন বড়ফুকন তাঁর স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করবেন চীনকে ডেকে। কোথাও একজন মীর জাফর তাঁর স্বাধীনতার শ্রাদ্ধ করবেন মার্কিনকে আমন্ত্রণ করে। সুতরাং গুরুতর কারণ না থাকলে এর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

এই ব্যাপারে আর একটা জিনিস স্পষ্ট হলো। যেখানে যত বাঙালী আছে সকলের নিরাপত্তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ দায়ী বলে লোকের বিশ্বাস। এর পরে যেখানে যত মাড়োয়ারী আছে সকলের নিরাপত্তার জন্যে রাজস্থান দায়ী বলে দাবী করবে। যেখানে যত তামিল আছে, সকলের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে চাইবে মাদ্রাজ। এর নাম এক্সট্রাটেরিটোরিয়াল অধিকার ও আনুগত্য। এ এক ভয়ঙ্কর মনোভাব। একে দমন না করলে নির্ঘাত গৃহযুদ্ধ ও রাষ্ট্রভঙ্গ। আগেকার দিনে এ মনোভাব ছিল ভারতীয় খেলাফতীদের। এখন দেখছি বাঙালীরও। এর পরে একদিন শুনব কলকাতা শহরে পাঞ্জাবী শিখদের বাস চালাতে দেওয়া হচ্ছে না বলে চণ্ডীগড় থেকে কৈফিয়ৎ তলব করা হচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। সব কটা মন্ত্রিমণ্ডল কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের অধীনে বলে আমরা এখনো এ ধরনের সঙ্কটে পড়িনি। কিন্তু এমনও তো একদিন হতে পারে যে এক একটি দল এক একটি রাজ্যের কর্ণধার। তখন কর্ণধারে কর্ণধারে কান ধরাধরি বেধে যেতে কতক্ষণ? সেইজন্যে এখন থেকেই ঠিক করে ফেলতে হবে যে অতি বড় বিভীষিকা ঘটলেও আমরা এক্সট্রাটেরিটোরিয়াল মনোবৃত্তির পরিচয় দেব না। আমরা দিলে অন্যেরাও দেবে।

বাঙালী যদি আসামে থাকে ভারতের নাগরিক হিসাবে থাকবে, তা হলে কেন্দ্রীয় সরকার হবে তার শরণ। আর থাকবে আসামের অধিবাসী হিসাবে। তা হলে আসামের সরকার হবে ন্যায়ত তার সংরক্ষক। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আসে কোন্ সূত্রে? আসে সহানুভূতি সূত্রে। কিন্তু সে সহানুভূতিরও একটা ভদ্র সীমা আছে। নইলে আসামের সঙ্গে, কেন্দ্রের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধবে। এর কোনোটাই কাম্য নয়। আমরা বাঙালী হিসাবে অনুরোধ কিংবা প্রতিবাদ করতে পারি। তার বেশী যদি করতে হয় তা হলে করব ভারতীয় নাগরিক হিসাবে। কিন্তু তা যদি করি তবে এমন কোনো নজির স্থাপন করব না যার ফলে অন্যেরা আমাদের এখানকার ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে হরতাল বা ধর্মঘট করবে। সেও তো এক প্রকার চাপ দেওয়া। অন্যেরা আমাদের উপর চাপ দিক এটা কি আমাদের কাম্য? কোনো কোনো মহাজন বিপ্লবের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। বাঙালী নাকি বিপ্লব করবে এই নিয়ে! মহাজনদের বোধ হয় জানা নেই যে বিপ্লবের উত্তরে প্রতিবিপ্লব বলেও একটা কথা আছে। তার থেকে বাঙালীকে বাঁচাবে কে? কথায় কথায় বিপ্লব করাই যদি নিয়ম হয় তবে মরাঠা ও রাজপুত ও পাঞ্জাবীরাও বিপ্লব করতে জানে। ভারত বাঁচবে কি?

অশুভ চিন্তা, অশুভ বাক্য, এগুলিও এক একটি বীজ। আকাশে এগুলি বুনলে মাটিতে এর ফসল ফলে। সেইজন্যে এসব ড্রাগনের দাঁত বুনতে নেই। যাঁরা বুনছেন তাঁরা হয়তো দেখতে পাবেন না। যারা পরে আসছে সেই হতভাগারাই ফসল কাটবে। তাদের মুখ চেয়ে তাদের পিতামহদের নিবৃত্ত হওয়া উচিত। যে উত্তরাধিকার তাঁরা বাঙালীর ছেলেদের জন্যে রেখে যাচ্ছেন তার তুলনায় আসামের বিভীষিকাও নিষ্প্রভ হবে। তারা কি ধন্যবাদ দেবে?

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না ঃ এই গানটি হলো এই ছোট শহরের প্রথম রবীন্দ্র সংগীত। তার মানে এই শহরের ছোট্ট একটি উৎসবের আসরে এই গানটি যেদিন গাওয়া হলো, তার আগে রবীন্দ্রনাথের আর কোন গান এই ছোট শহরের কোথাও কোন উৎসবে গাওয়া হয়েছে বলে কেউ মনে করতে পারে না।

কেউ মনে করতে পারে না বলেই অবশ্য ধারণাটা একেবারে নির্ভুল নয়। প্রতি বছর মাঘোৎসবের সময়ে সমাজবাড়িতে উপাসনার অনুষ্ঠানে দীননাথবাবু যে-সব গান গাইতেন, তার অনেকগুলিই তো রবীন্দ্রনাথের গান। কিন্তু বিমল আর অভয়, যারা দু'জন আজ এই ছোট শহরের জীবনে ওদের গানের গলার গুণে বিখ্যাত হয়েছে, তারাও বলবে, বাণীদির মুখেই আমরা প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শুনেছিলাম। আর গানটা হলো ওই গানটাই—দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়...।

শহরটা ছোট; কিন্তু অনেক বড়-বড় জ্ঞানী আর গুণী মানুষ এ শহরে আসতেন আর চলে যেতেন। একবার এসেছিলেন কবি কামিনী রায়। যে-সময় এই ছোট শহরের মহিলাদের আর মেয়েদের জীবনে যেন একটা উৎসবের সাড়া জেগেছিল। কত বড় বিদুষী কবি, কী চমৎকার মুখশ্রী, আর কী সুন্দর কথা বলতে পারেন; এহেন মানুষও বামাচরণবাবুর মত একজন মুহুরী মানুষের বাড়িতে এসে মেয়েদের সংগে কত খুশি হয়ে কত কথা বললেন। এই ছোট শহরের সব মহিলার মন সেদিন যেন বেশ একটা গর্বে, সেই সংগে বেশ একটা তৃপ্তিতেও ভরে গিয়েছিল।

কিন্তু একটা কথা বলে আক্ষেপ করেছিলেন বিদুষী কামিনী রায়—এ শহরের মেয়েরা লেখাপড়ায় এত পিছিয়ে আছে কেন?

একদিন নিজেরই বাড়িতে শহরের সব মহিলা আর মেয়েদের একটা সভা ডেকে সবাইকে অনেক অনুরোধের কথা বলেছিলেন তিনি; শেষে বলেছিলেন—আর চার-পাঁচ বছর পরে এসে আমি যেন দেখতে পাই, এই শহরেরই একটি গ্র্যাজুয়েট মেয়ে আমার সংগে কথা বলছে। আমার আশা যেন বিফল না হয়।

চার-পাঁচটা বছর পার হয়ে গেলেও আর এই ছোট শহরে আসতে পারেননি বিদুষী কামিনী রায়। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে এই ছোট শহরের অনেক বাড়ির মহিলারা কেঁদে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর আশা বিফল হয়নি। যদি বেঁচে থাকতেন তিনি, আর সেই পুরনো কথা স্মরণ করে সত্যি একবার এ-শহরে আসতে পারতেন, তবে তিনি এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ের সংগে কথা বলে সুখী হতে পারতেন। তিনি দেখে বোধহয় একটু আশ্চর্যও হতেন; ঐ যে সেই মেয়ে, মুহুরী মানুষ বামাচরণবাবুর যে মেয়েকে তিনি তাঁরই লেখা কবিতার বই 'গুঞ্জন' উপহার দিয়েছিলেন, সেই মেয়েটিই হলো এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। সেই মেয়েরই নাম বাণী। আজ বিমল আর অভয়কে জিজ্ঞেসা করলে ওরাও বলবে, হ্যাঁ, বাণীদিই হলেন আমাদের এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে।

এই শহরেরই মেয়ে বাণীদি, এই শহরেরই একজনের সংগে বিয়ে হয়ে যাবার পরেও বিমল আর অভয়দের কাছে বাণীদি আগের মতই বাণীদি হয়েই রইলেন। শৈলেশদার সংগে বিয়ে হলেও বাণীদিকে কোন নতুন নামে, তার মানে বাণী বউদি

বলে ডাকতে হয়নি।

এই বাণীদিকে আর-একটি ব্যাপারেও এই ছোট শহরের প্রথম মহিলা বলে মেনে নিতে পারা যায়। বসন্ত পঞ্চমীর দিনে এই ছোট শহরের ছোট ড্রামাটিক ক্লাব যে থিয়েটার করতো, সেই থিয়েটার দেখবার জন্য দর্শকদের জায়গাটা দুভাগে ভাগ করা থাকতো। একদিকে থাকতো চিক দিয়ে ঘেরা মেয়েদের জায়গা; আর একদিকে পুরুষদের খোলা-মেলা জায়গা। বাণীদিই হলেন এই শহরের প্রথম মহিলা, যিনি চিকের বাইরে একটা টুলের উপর বসে থিয়েটার দেখতেন।

আজ নয়, অনেকদিন আগে বিমল অভয় আর ওদেরই সমবয়সী বন্ধুরা একদিন নিজেদের মধ্যে গল্প ক'রে ক'রে খুবই খুশির একটা কথা আলোচনা করেছিল। খুব ভাল হতো, শৈলেশদার সঙ্গে যদি বাণীদির বিয়ে হতো। বাণীদির মত মেয়ের যদি অন্য শহরের কারও সঙ্গে বিয়ে হয়, তবে বাণীদিকে নিশ্চয় এ-শহর ছেড়ে দিয়ে সেই শহরেই থাকতে হবে। এ-শহর তাহলে যে কানা হয়ে যায়।

অভয় আর-একটা কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল—তা হলে শৈলেশদারও যে বুক ফেটে যাবে।

বিমলও হেসে ফেলেছিল—চুপ কর!

নীহার বলে—বাণীদিরও কি তাহলে কিছু কম দুঃখ হবে?

বিমল আবার চেঁচিয়ে হেসে ধমক দেয়। সায়লেন্স! চুপ!

শেখর বলে—কিন্তু একটা অসুবিধে আছে। বাণীদি শৈলেশদাকে বলেছেন, বি এ পাশ না করার আগে বিয়ে করবেন না।

বিমল—কিন্তু আমি নিজের কানে শুনেছি, শৈলেশদা প্রতিজ্ঞা করে বাণীদিকে বলছেন, আগে বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর আমিই তোমাকে বি এ পড়াবো।

আজ থেকে অনেকদিন আগে যেদিন এই ছোট শহরের ছোট স্কুলটার ছোট ময়দানের ঘাসের উপর বসে আর সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে একদল খুশি পাখির কলরবের মত এইসব কথা বলে গল্প করতো বিমল অভয় নীহার আর শেখর, সেই সময়েরই কথা।

বামাচরণবাবু মারা গিয়েছেন তিন বছর হলো। বাণীদিকে পড়াবার জন্য কী কষ্টই না করেছিলেন বামাচরণবাবু। দীননাথবাবু বলতেন, মেয়ের বই কেনবার জন্য টাকা যোগাড় করতে গিয়ে বামাচরণ আজকাল একবেলা ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বাণী মেয়েটাও বা কী কম কষ্ট করছে।

বিমলের মা বলতেন, মেয়েটা বিছানার পুরনো ছেঁড়া চাদর কেটে আর সেলাই করে সায়া তৈরী করেছে আর সেই সায়া পরেছে। তবু নতুন সায়া কেনেনি। নতুন সায়া কেনবার পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনেছে।

কলকাতায় গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল বাণী; আই এ পাসও করেছিল। এমন সময় মারা গেলেন বামাচরণবাবু। বি-এ পড়বার স্বপ্ন ছেড়ে দিয়েছিল, আর একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছিল বাণী।

বিমলের মা মাঝে মাঝে নীহারের মা'র কাছে আক্ষেপ করে বলতেন, বামাচরণবাবু সত্যিই একটা ভুল করে গেলেন। মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে এত চেষ্টা আর এত কষ্ট না করে যদি মেয়ের বিয়েটা দেবার জন্য একটু চেষ্টা আর একটু কষ্ট করতেন, তবে এতদিনে বিয়েটা হয়েই যেত নিশ্চয়। এখন কি উপায় হবে?

নীহারের মা বলতেন—বাণীর কলকাতার এক মাসী নাকি একটা সম্বন্ধ এনেছে। ছেলে বেশ ভাল সরকারী চাকরি করে।

বিমলের মা—জানি না। তবে খুব ভাল হয়, যদি বিয়েটা হয়ে যায়।

শেখরের মা হঠাৎ একদিন বলে ফেললেন—কোন চিন্তা নেই। শৈলেশের সঙ্গেই বাণীর বিয়ে হবে।

—কে বললে?

শেখরের মা হেসে ফেললেন—বলেছে ওরা, তারা কিছু না বুঝলেও সব চেয়ে ভাল বোঝে।

—তার মানে?

—বলেছে শেখর। বলেছে, আপনাদের বিমল নীহার আর অভয়।

—ওরা কেমন ক'রে কি বুঝলো?

—ওরা বলছিল, বাণীদির গান নাকি শৈলেশদার ভয়ংকর ভাল লেগে গিয়েছে।

ঠিকই, যারা কিছুই বোঝে বলে মনে হয় না, তারা ঠিকই বুঝেছিল। শৈলেশেরই সঙ্গে বাণীর বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু আজও ওরা স্কুলের ময়দানের ঘাসের উপর বসে সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে যেন একটা ঘটনার ধাঁধার সমাধান করতে গিয়ে নানা কথা বলে।

—শৈলেশদা যদি সেদিন বাণীদির গানটা না শুনতেন, তবে বোধহয় বাণীদির সঙ্গে শৈলেশদার বিয়ে হতো না।

—শৈলেশদার সঙ্গে বাণীদির বিয়ে না হলে বাণীদির আর বি-এ পড়তেও হতো না।

—কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? প্রকাশদা যদি বাণীদিকে না পড়াতেন, তবে বাণীদি এত খুশি হয়ে আর এত জোর গলায় বলতে পারতেন না যে, নিশ্চয় পাশ করবেই ছাড়বেন।

[দুই]

তবে তো ধাঁধার সমাধান হয়েই গেল। এখন আর নতুন করে ভাববার আর বোঝবার কিছু নেই। প্রকাশদা হলেন এই স্কুলের সেকেণ্ড স্যার। শৈলেশদা হলেন এই স্কুলের সেক্রেটারী। আর বাণীদি হলেন শৈলেশদারই স্ত্রী, কিন্তু প্রকাশদার ছাত্রী।

এবং বোঝাই যাচ্ছে, কোন সন্দেহ নেই, বাণীদি এ-শহরের প্রথম মেয়ে গ্র্যাজুয়েট হবেনই। শুধু আক্ষেপ এই যে, কামিনী রায় নামে সেই বিদুষী মহিলা আর আসবেন না; এ-শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়েকে তিনি চোখে দেখে যেতে পারলেন না। গল্পটা ওরাও শুনেছিল। বিমল এখনও মনে করতে পারে, পুলিশ ট্রেনিং কলেজের ময়দানটার কিনারা ধরে আরও কিছুদূর এগিয়ে যেয়ে, পোলো কটেজ নামে চমৎকার বাংলো বাড়ির ফটকটা পার হয়ে, ঐ মস্ত লিচুবাগানের পাশে যে হলদে রং-এর বাড়িটার গা ঘেঁষে আজও ঝুমকো জবা আর সাদা গোলাপ ফুটে থাকে, সেই বাড়িতে মা আর কাকিমার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একদিন বিদুষী কামিনী রায়কে দেখেছিল বিমল। মনে আছে, লিচু আর চকোলেট দিয়েছিলেন কামিনী রায়।

আরও মনে পড়ে, সেদিন সেখানে বাণীদিকেও দেখতে পেয়েছিল বিমল। খুব সুন্দর সিল্কের একটা নতুন ফ্রক পরে বিদুষী কামিনী রায়ের গা ঘেঁষে বসে আর একটা স্লেট হাতে নিয়ে অঙ্ক করছিল সেদিনের সেই ছোট্ট বাণীদি।

বাড়ি ফেরার সময় কাকিমার কাছে কথাটা বলেছিলেন মা, তাই কথাটা আজও মনে আছে বিমলের; বাণীকে ঐ নতুন ফ্রকটা কামিনী রায়ই উপহার দিয়েছেন।

বাণীর মত মেয়ের সঙ্গে শৈলেশের মত ছেলের বিয়ে হয়ে গেল; দেখে এ শহরের সবাই খুশি হয়েছেন। আরও খুশি হতেন সবাই, যদি আরও আগে বিয়েটা হয়ে যেত। বেচারা রামাচরণকে তবে মেয়ের লেখা-পড়ার জন্য এত চিন্তা চেষ্টা আর কষ্ট সহ্য করতে হতো না।

বেশ বড় জমিদারী করেছিলেন, ওকালতী করেও অনেক টাকা উপায় করে-ছিলেন, এবং এ-শহরের সব চেয়ে বড় আর সুন্দর বাড়িটা যিনি তৈরী করেছিলেন, তিনি হলেন শৈলেশের বাবা মহিমবাবু। স্কুলটা মহিমবাবুই অনেক টাকা খরচ ক'রে স্থাপন করেছিলেন। এখনও যে স্কুলটা বেশ ভাল চলছে, সেটা মহিমবাবুরই একটা দানের দয়ার ফল। বিশ হাজার টাকার একটা ফণ্ড রেখে গিয়েছেন মহিমবাবু। তা ছাড়া গবর্নমেণ্ট আর জেলা বোর্ডও সাহায্য দেয়। তা ছাড়া, দরকার পড়লে শৈলেশও মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে সাহায্য করে থাকে। প্রাইজের বই কেনবার সব টাকা, আর ফুটবল ও হকিস্টিক কেনবার সব টাকা শৈলেশই দিয়ে থাকে। স্কুলের সেক্রেটারী হয়ে শৈলেশ যেমন তার বাবার সম্মান অক্ষুন্ন রেখেছে, তেমনই নিজেরও সুনাম বাড়িয়েছে। স্কুলটার জন্য মহিম-বাবুর যেমন যত্ন ছিল, শৈলেশেরও প্রায় সেই রকমের যত্ন আছে। সেজন্য স্কুলটার দিন দিন উন্নতিও হয়ে চলেছে। স্কুলটা ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠেছে। বিমল নীহার শেখর অভয়, আর, আরও প্রায় কুড়িজন ছাত্র ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠেছে। আর চারটি বছর লাগবে, ওরাই ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন হয়ে তারপর ক্লাস টুয়েলভ হবে যাবে। স্কুলটাও খাঁটি হাইস্কুল হয়ে যাবে।

খেলা শেষ হবার পর স্কুলের ছোট ময়দানের সবুজ ঘাসের উপর সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে বসে ওরা গল্প করে, বিমল অভয় শেখর আর নীহার: শৈলেশদার মত সেক্রেটারী না থাকলে স্কুলটার এত তাড়াতাড়ি এত উন্নতি হতো না ঠিকই, কিন্তু...।

—কিন্তু আবার কি?

—কিন্তু ক্লাস এইটে কি এত ছাত্র হতো? কখখনো না।

—কেন হতো না?

—অর্ধেক ছেলে মিশন হাইস্কুলে চলে যেত। ভাগ্যিস প্রকাশদা সেকেণ্ড স্যার হয়ে এসেছিলেন।

—তা বটে।

—প্রকাশদার মত বিদ্বান মানুষ সেকেণ্ড স্যার হয়েছেন, আর এত চমৎকার পড়াচ্ছেন, তাই না এত ছেলে এসে আমাদের স্কুলে ভিড় করেছে।

—প্রকাশদা কিন্তু এম-এ নন। শুধু বি-এ।

—তাতে কি আসে যায়? হেড স্যার রাখালবাবুর মত বি-এ'কে শিখিয়ে দিতে পারেন প্রকাশদা।

—সত্যি; হেড স্যার নিজেও একদিন প্রকাশদার কাছে কথাটা বলছিলেন।

—কি বলছিলেন?

—বলছিলেন, তুমি কাছে থাকলে আমার আর ডিক্সনারি দরকার হয় না হে প্রকাশ।

হেড স্যার রাখালবাবু যেমন স্কুলের অফিস-ঘরে, তেমনি পড়াবার ক্লাসে কেমন-যেন মনমরা হয়ে থাকতেন। মুখের চেহারাটাও বেশ উদ্বিগ্ন দেখাতো। আর হাতের কাছে সব সময় থাকতো একটা ইংরেজী ডিকসনারি। স্কুল ইনস্পেক্টরের কোন চিঠি হোক, কিংবা ব্যাংকের কোন চিঠি হোক, পড়তে গিয়ে তিনবার চশমা মুছতেন হেড স্যার। আর, বার বার ডিকসনারি খুলতেন। কপালটাও যেন দুশ্চিন্তার ভারে কুঁচকে যেত।

ক্লাসে পড়াতে এসেও হেড স্যার ভুরু কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাতেন। ইংরেজী পোয়েট্রি হোক, আর ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি হোক, দুইই যেন হেড স্যারের কাছে সমান বিস্বাদের দুটো বস্তু, দুটো নিম-তেতো ওষুধ। বই খুলে এক লাইন পাঠ করেই দু'বার ডিকসনারি খুলতেন হেড স্যার। ভাবতেন, ঘাড়ের উপর হাত বোলাতেন। তারপরেই বেশ জোরে, যেন বেশ একটু ক্ষিপ্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠতেন—টেক থ্রি নট ইন মোর্ণফুল নাম্বার্স! ভেরি ইমপর্টেণ্ট। আণ্ডার লাইন ইট! লাল পেন্সিল দিয়ে আণ্ডার লাইন কর।

এইভাবেই ইংরেজী পোয়েট্রি পড়াতেন হেড স্যার রাখালবাবু। ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রিও এইভাবে। লাল পেন্সিল দিয়ে আণ্ডার লাইন করে করে ছাত্রদের ইংরেজী পোয়েট্রির আর ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রির বই দুটো রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল।

প্রকাশ আসবার পর হেড স্যার রাখাল-বাবুর মুখে হাসি ফুটেছে। ক্লাসে

পড়ানো প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন হেড স্যার রাখালবাবু। ক্লাস এইটের ইংরেজী আর হিস্ট্রি পড়াবার দায়িত্ব খুশি হয়ে সেকেণ্ড স্যার প্রকাশ নিজেই নিয়েছে। বিমল আর অভয়ও মাঝে মাঝে হাঁপ ছেড়ে বলাবলি করে—যাক, আণ্ডার লাইনের মার থেকে বইগুলো খুব বেঁচে গেল।

থার্ড স্যার, ফোর্থ স্যার আর পণ্ডিত মশাই আড়ালে আড়ালে হাসেন আর গল্প করেন।—হেড কিন্তু আজও বুঝতে পারেননি।

—কি?

—তাঁহাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

—তার মানে?

—হেডকে শিগগির বোধহয় বেহেড হতে হবে। আর প্রকাশই হেড হয়ে...।

—আরে না না; দু' বছর হয়ে গেল তবু পার্মানেণ্ট হতে পারলে না প্রকাশ। প্রকাশের ফিউচার সুবিধের নয়।

—কিন্তু এটা কেমনতর হলো? সেক্রেটারী তো সবই দেখছেন আর বুঝছেন, তবু প্রকাশকে টেম্পোরারি করে রেখেছেন কেন?

—বুঝতে পারি না মশাই।

—সেই জন্যেই বোধহয় রাখালবাবু এত নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন।

—তাই তো মনে হয়।

—আর প্রকাশের মতিগতিও তো ঠিক বোঝা যায় না। হেড যে ওরই ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে এত সুখ করছেন, তবু প্রকাশের মনে যেন কোন জ্বালা নেই।

—না, তা নেই। বরং কেমন যেন একটা উপেক্ষা আছে।

—হ্যাঁ, আমিও এদিকে-ওদিকে খোঁজ করে জেনেছি, একদিনের জন্যেও সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে প্রকাশ একটা মুখের কথাও বলেনি যে, মাইনে বাড়িয়ে দিন কিংবা পার্মানেণ্ট করুন।

—কিন্তু সেক্রেটারীর নিজের থেকেই একটু সুবিচার করা উচিত ছিল। কে না জানে, প্রকাশের পড়াবার সুনামের জন্যেই দু' বছর ধরে স্কুলের ছাত্র বেড়ে চলেছে।

—তা ছাড়া, প্রকাশ যখন সেক্রেটারীর স্ত্রীরও টিউটর, তখন তো প্রকাশের সম্পর্কে একটু বিশেষ হয়ে করা...অর্থাৎ একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

—প্রকাশের মতিগতির রকমটাও তো বোঝা যায় না। যখন বুঝছে যে, উন্নতির বিশেষ কোন সুযোগ নেই, তখন এমন মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেলেই তো পারে।

—হ্যাঁ, আমাদের না হয় মেখে মেখে অনেক বেলা হয়েছে; বয়সের গাছপাথর পেকে গেছে। কিন্তু প্রকাশ তো বলতে গেলে নিতান্ত কাঁচা বয়সের একটা ছেলে।

—কত বয়স হবে প্রকাশের, আন্দাজ?

—ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

—আমাদের সেক্রেটারীও তো...।

—সেক্রেটারীও প্রায় তাই। এই তো বছর পাঁচ হলো বি-এ বি-এল হয়েছে।

—তবে স্ত্রীর জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটর রাখলেন কেন? নিজেই তো পড়াতে পারতেন।

—তা হয় না হে পণ্ডিত, বি-এর ছাত্রীকে পড়ানো একটা যেমন-তেমন এম-এ'র দ্বারাও সম্ভব হয় না। দেখছোই তো আমাদের হেড রাখালবাবুর দশা। ক্লাস এইটের পোয়েট্রি পড়াতে হলেই চোখে অন্ধকার দেখেন।

—তা হলে তো বলতে হয়, আমাদের প্রকাশ একজন অসাধারণ রকমের...।

—নিশ্চয়। তা না হলে সেক্রেটারী কি প্রকাশকে এমনিতেই স্ত্রীর টিউটর করেছেন?

[তিন]

বিখ্যাত থিয়সফিস্ট জিনরাজ দাস এসেছেন; আর ধর্মের কথা নিয়ে এই ছোট শহরের মুখে আর মনে যেন একটা তর্কের তুফান চলছে। শহরটা ছোট, কিন্তু এই তুফানটা ছোট নয়। বার লাইব্রেরীর ঘরেও তর্কের লড়াই প্রবল হয়ে ওঠে।

অগত্যা একদিন সম্মুখ সমরের মত একটা কাণ্ড বাধাবার ব্যবস্থা করলেন স্বয়ং জিনরাজ দাস। প্রসাদ মেমোরিয়াল হলে একটা জনসভা ডাকা হবে। জিনরাজ দাস থিয়সফির পক্ষে বলবেন। আর, যাঁর ইচ্ছে হবে তিনিই তাঁর ধর্মের পক্ষে বক্তৃতা করবেন।

প্রসাদ মেমোরিয়াল হল সেদিন মানুষের ভিড়ে ভরে গিয়েছিল। সব চেয়ে জোরালো বক্তৃতা দিলেন স্বয়ং জিনরাজ দাস। জেসুইট মিশনের ফাদারও কম যান না। দীননাথবাবুও চমৎকার বললেন। উকীল মণ্টুবাবু নাস্তিকতার পক্ষে বললেন। কিন্তু বক্তৃতাগুলি যেন তপ্ত ভাষার এক-একটা হল্কা। সভায় গোলমাল বাড়ে, কথা কাটাকাটি হয়, শ্রোতাদের মধ্যে কেউ-কেউ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে হৈ-হৈ করে ওঠেন। বার দুই শেম ধ্বনিও বেজে ওঠে।

হঠাৎ প্রকাশ মাস্টারকে দেখতে পেয়ে দীননাথবাবু ডাক দিলেন, বক্তৃতা করতে বললেন। আর পুরো আধ-ঘণ্টা ধরে ইংরেজী ভাষাতেই বক্তৃতা দিল প্রকাশ মাস্টার।

প্রসাদ মেমোরিয়াল হলের এতক্ষণের এত উত্তেজিত শ্রোতার ভিড় একেবারে শান্ত হয়ে প্রকাশ মাস্টারের বক্তৃতা শুনলো। আসল কথা হলো, প্রকাশ মাস্টারের বক্তৃতা শুনেই শ্রোতারা শান্ত হয়ে গেল। জেসুইট মিশনের সাহেব স্নিগ্ধভাবে হাসলেন। মণ্টু উকীল একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আর, জিনরাজ দাস জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

সভা ভাঙবার পর স্কুল-সেক্রেটারী শৈলেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকেই প্রকাশ মাস্টারের মুখটার দিকে অদ্ভুত ভাবে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে। আর, বিমল অভয় নীহার আর শেখর ওদের সেকেণ্ড স্যার প্রকাশের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে বলাবলি করে:

—বাবার কাছে গল্প শুনেছি।

—কি?

—অনেকদিন আগে ঠিক এরকম একটা চমৎকার কীর্তি করেছিলেন......।

—কে?

—স্বামী বিবেকানন্দ।

—কোথায়?

—চিকাগোতে।

—কোথায়?

—আমেরিকাতে।

টিচারেরা আর পণ্ডিত মশাইয়েরা তাঁদের মেসবাড়ির বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে আর তামাকের ধোঁয়ায় সেই অন্ধকারকে আরও ঘন করে দিয়ে যে-সব কথা আলোচনা করেন, তাতেও বোঝা যায় যে, তাঁরাও একটা ঘটনার ধাঁধার সমাধান করতে পারছেন না। সেকেণ্ড মাস্টার প্রকাশ এই বয়সেই এত অসাধারণ রকমের যোগ্যতার আর বিদ্যার মানুষ হয়েও পঞ্চাশ টাকার মাইনেতে এখানে পড়ে আছে। এ মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার কোন লক্ষণও প্রকাশের কথায় বা ব্যবহারে দেখা যায় না। সেক্রেটারী শৈলেশও প্রকাশের বিদ্যাবত্তার মূল্য বোঝে; তা না হলে স্ত্রীকে বি-এ পাশ করবার দায়িত্বটা প্রকাশের উপর ছেড়ে দেবে কেন শৈলেশ? অথচ প্রকাশের জন্য পাঁচ টাকা মাইনে বৃদ্ধির একটা অর্ডার লিখতেও সেক্রেটারীর কলমে কালি সরে না। যেন কঠোর রকমের একটা অনিচ্ছা আর আপত্তি আছে সেক্রেটারীর। মুখে না বললেও সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। ব্যাপারটা বেশ জটিল একটা ধাঁধা বলেই তো মনে হয়।

কিন্তু টিচারেরা আর পণ্ডিত মশাইয়েরা, আর ছাত্রেরাও একটা কথা জানে না। সত্যিই, অনেকদিন আগেই চলে যেতে চেয়েছিল প্রকাশ। সেকেণ্ড মাস্টার হয়ে এক বছর কাজ করবার পর প্রকাশ একদিন নিজেই সেক্রেটারী শৈলেশের বাড়িতে এসে বলেছিল—আমার মেয়াদ তো ফুরিয়েছে।

শৈলেশ—তার মানে?

প্রকাশ—আমাকে তো এক বছরের জন্যে কাজটা দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ।

—এক বছর তো হলো।

—তা তো হলো।

—তা হলে এবার আমাকে বিদায় দিন।

একটু চমকে উঠেছিল শৈলেশ। কারণ, যেটা শুনবে বলে আশা করেছিল শৈলেশ, ঠিক তার উল্টো কথাটাই বলেছে প্রকাশ। চাকরির মেয়াদ বাড়াবার অনুরোধ করতে আসেনি। বিদায় চাইতে এসেছে। শৈলেশের চোখে নয়, বোধহয় মনেরই ভিতরে ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি শিউরে উঠেছে, তা না হলে হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে যাবে কেন শৈলেশের মুখটা?

আসল কথাটা এই যে, প্রকাশ মাস্টারের এই হাসি-হাসি অহংকারের কথাটা শৈলেশের মনের একটা আশাকেই একটু অসুবিধেয় ফেলেছে। বাণীকে এবার কি বলে বোঝাবে শৈলেশ?

এই তো, বোধহয় তিনটে মাসও পার হয়নি, শৈলেশের বিয়ে হয়েছে। ছোট শহরটার প্রাণের উপর সেই বিয়ের উৎসবটা যে আবেশ ছড়িয়ে দিয়েছিল, সে আবেশ এখনও ফুরিয়ে যায়নি। বাণীর নতুন হাসির মুখটাকে আরও ভাল করে দেখবার জন্য এখনও এবাড়িতে এপাড়া আর সে-পাড়ার মেয়েদের ভিড় হয়।

শৈলেশই জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কি বি-এ পড়বার আশা ছেড়েই দিলে, বাণী?

বাণী হেসেছিল—না ছেড়ে দিয়ে উপায় কি?

—কেন?

—তুমি যে ভুলেই গিয়েছ।

—কি?

—সেদিন যে-কথা বলেছিলে।

—সে জন্যে মনে মনে বোধহয় খুব একটা...।

—খুব না হোক, একটু দুঃখ আছে বইকি।

—কিন্তু তোমার চেয়ে আমার দুঃখটাই বোধহয় একটু বেশি।

—কেন?

—আমি যে তোমার চেয়েও বেশি একটা গর্ব আশা করেছিলাম। শুধু গর্ব নয়, প্রেস্টিজ।

—তার মানে?

—তার মানে, আমার স্ত্রীই এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে হবে।

—তাহলে ব্যবস্থা কর।

—কলকাতায় থেকে পড়বে?

—না, তা হয় না।

—তবে?

—তোমার কাছে থেকেই পড়বো।

—আমার কাছে থাকলে কি পড়া হবে?

—খুব হবে।

—কিন্তু...। বলতে গিয়ে হেসে ফেলে শৈলেশ।

—হাসছো কেন?

—বলছি, সে পড়ায় কি পাশ করা চলবে?

—চলবে বই কি।

—আমার সন্দেহ আছে।

—কেন?

—তুমি পড়তেই পারবে না। পড়তে তোমার বেশ অসুবিধে হবে।

—কিসের অসুবিধে?

—আমিই হলাম অসুবিধে।

—তা কেন হবে? তুমিই পড়াবে।

—তা হলেই হয়েছে!—আমি পড়ালে সেটা ফেল করবারই গ্যারেন্টি হবে।

—মোটেই না। তুমি পড়াবে।

—আমি কিন্তু একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যেটা তোমার পাশ করবার নির্ঘাত গ্যারেন্টি হবে।

—কি?

—একজন টিউটর এনে দিতে পারি, যার কাছে পড়লে তুমি যে খুব ভাল করে পাশ করবে, তাতে আমার এক ফোঁটা সন্দেহ নেই।

—কোন দরকার নেই।

—সত্যি, আমি বাড়িয়ে বলছি না বাণী; সত্যি এরকম একজন টিউটর পাওয়া যেতে পারে।

—পাওয়া যায় যদি, তবে মন্দ কি?

—যদি নয়, হাতেই আছে। তুমি রাজি হলেই ব্যবস্থা করে ফেলতে পারি।

—কর।

—কিন্তু সত্যিই কি কিছু বুঝতে পারলে না, কার কথা বলছি?

—না।

—আমার স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার প্রকাশ।

—ও...হ্যাঁ...শুনেছি, ভদ্রলোক খুব ভাল পড়াতে পারেন।

—তুমি লোকটিকে কখনও দেখনি?

—দেখেছি।

—কবে দেখেছো?

—বোধহয় বিমল কিংবা অভয় একদিন দেখিয়ে দিয়েছিল, ভদ্রলোক তখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

—হতে পারে। কিন্তু আরও একটা দিনে দেখেছো। সেকেন্ড মাস্টার বুড়ো জলধরবাবুর বিদায় সভাতে।

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

—যাই হোক, তুমি রাজি কিনা বল।

—তুমি রাজি হলেই আমি রাজি। কিন্তু...

—কি?

—প্রকাশবাবু কি রাজি হবেন?

—তোমার আবার এ সন্দেহ হলো কেন?

—বিমল কিংবা অভয়ই বলেছিল, প্রকাশ মাস্টার কোন ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াতে রাজি হননি। তিনি নিজেই নিজের পড়াশোনা নিয়ে সব সময় ব্যস্ত।

—বাজে কথা। এই মাসেই আমার কাছে আরজি করতে আসবে প্রকাশ মাস্টার।

—কিসের আরজি?

—চাকরির মেয়াদ বাড়াবার জন্যে! কিংবা পার্মানেন্ট হবার জন্যে। নয়তো মাইনে বাড়াবার জন্যে। আমি তো ওকে মাত্র এক বছরের জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম।

—কিন্তু প্রাইভেট পড়াতে যে রাজি হবেন, সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না।

—রাজি না হয়ে যাবে কোথায়? রাজি না হলে ওর চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে আমিও রাজি হব না।

—দেখ তা হলে। কিন্তু...

—আবার কিন্তু কিসের?

—খুশি হয়ে রাজি না হলে কাউকে চাপ দিয়ে কাজ করালে তাতে কোন লাভ হবে না। তা ছাড়া, এটা হলো পড়াবার কাজ; অনিচ্ছায় আর যে কাজই চলুক না কেন, পড়ানোর কাজ চলে না।

—অনিচ্ছা করবে কেন প্রকাশ মাস্টার? বলা মাত্র খুশি হয়ে রাজি হবে। তাছাড়া এসব লোককে চাপ দিলেই বরং ভাল কাজ পাওয়া যায়।

সেই প্রকাশ মাস্টার নিজেই এসে বলছে, বিদায় দিন। চলেই যাচ্ছে যে, তাকে আর চাপ দেবার উপায় কোথায়? যার কোন দাবী নেই তাকে বিমুখ করবার ভয় দেখাবারও যে উপায় নেই।

শৈলেশ বলে—আপনি চলে যাচ্ছেন কেন?

প্রকাশ—আমার তো চলে যাবারই কথা।

শৈলেশ—যদি আরও দু বছর এক্সটেনসন দিই; তবে তো চলে যাবেন না?

প্রকাশ—কি দরকার? এই এক বছর তো বেশ কাটিয়ে গেলাম। আর কেন?

—নিশ্চয় অন্য কোথাও এখানকার চেয়ে বেশি মাইনের একটা কাজ জুটিয়েছেন?

—আজ্ঞে না।

—তবে?

—তবে জুটিয়ে নিতে পারবো বলে আশা করছি। এখানকার চেয়ে বেশি মাইনের না হোক, অন্তত কম মাইনের একটা কাজ পেয়েই যাব বোধহয়।

কত শান্ত স্বরে আর কত মৃদু হাসি হেসে কথা বলছে প্রকাশ মাস্টার। কিন্তু বুঝতে পারছে না নিশ্চয়, সেক্রেটারীর মনের যত উদ্ধত যুক্তি-বুদ্ধি সবই কি ভয়ানক একটা যন্ত্রণা সহ্য করতে গিয়ে নিঃশব্দে ছটফট করছে। একটু মহৎ হয়ে, একটু উদার হয়ে, আর একটু কৃপাপরবশ হয়ে কথা বলতে চাইছেন সেক্রেটারী; কিন্তু পঞ্চাশ টাকা মাইনের এক খামখেয়ালী টিচার যেন সাংঘাতিক একটা কৌতুকের চুক করে সেক্রেটারীর মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে।

শৈলেশ বলে—আমার ইচ্ছা, আপনি অন্তত আরও দুটো বছর থাকুন।

প্রকাশই যেন মিনতি করে বলে—আজ্ঞে
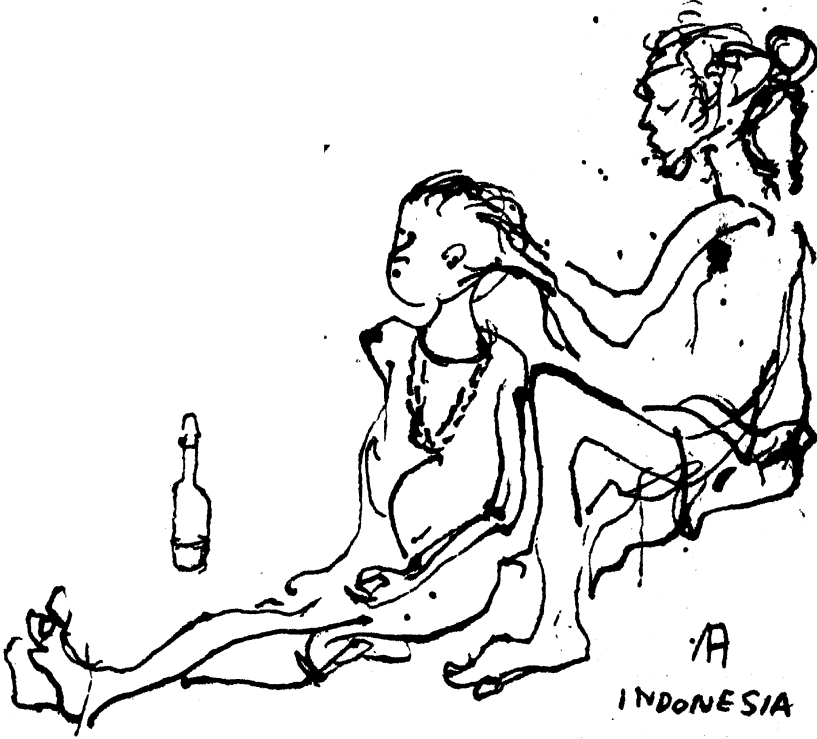
শিল্পী : শ্রীআফান্দি

শ্রীজয়শ্রী সেনের সৌজন্যে

না, ছেড়ে দিন; আপনি আর এমন ইচ্ছে করবেন না।

শৈলেশ—আপনারই একটা সুবিধে হবে।

প্রকাশ যেন আশ্চর্য হয়ে যায়।—আমার সুবিধে?

—হ্যাঁ।

—কি?

এইবার যেন নিঃশ্বাসের সব শক্তি নিয়ে আর জোর ক'রে হেসে ফেলে শৈলেশ।—আপনার কিছু উপরি আয় হবে, এমন একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—কি দরকার?

—তবুও বলছেন দরকার নেই?

—না। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার এখন এখান থেকে চলে যেতেই ভাল লাগছে।

—কিন্তু আমার যে এখন আপনাকে ছেড়ে দিতে ভাল লাগছে না।

—কেন বলুন তো?

—একটা দরকার ছিল।

—আপনার দরকার?

—হ্যাঁ।

—তাহলে বলুন। যদি সম্ভব হয়, তবে আমি থেকে যাব।

—আমার স্ত্রী বি-এ পড়তে চান। তাঁরই জন্যে টিউটর দরকার। আমার মনে হয়েছে, আপনি পড়ালে ভাল হবে।

—মাপ করবেন। আমি প্রাইভেট পড়াতে পারি না, ভালই লাগে না, ইচ্ছেই করে না।

—ভাল টাকা পেলেও কি পড়াবেন না?

—ভাল টাকা মানে কত টাকা?

—ধরুন পঞ্চাশ টাকা।

—আপনার কথায় রাজি হতে পারলে আমি নিজেও খুশি হতাম। কিন্তু পারবো না। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

—কিন্তু আমি যে আমার স্ত্রীর কাছে একরকম জোর করেই বলেছি যে, আপনি খুশি হয়ে পড়াতে রাজি হবেন, পড়াবেন। আর সে'ও আশা করে বসে আছে।

প্রকাশ মাস্টারের চোখ দুটো বিপন্ন মানুষের চোখের মত করুণ হয়ে যায়। আবার যেন আতঙ্কিতের মত একবার চমকেও ওঠে। আবার, আনমনা মানুষের চোখের মত হঠাৎ একবার উদাস হয়ে যায়।

আর সেক্রেটারী শৈলেশের মাথাটা যেন একটা আহত প্রেস্টিজের বিনত আক্রোশ। একটা গরজের বিনয়। যেন জোর করে একটা হুংকার চেপে রেখে নম্রস্বরে কথা বলতে হচ্ছে। ভাবতে একটা দুঃসহ শাস্তির মতই লাগছে। সহ্যও করতে হচ্ছে; তা না হলে বাণীর কাছে এত জোর গলা ক'রে বলা সেইসব কথা, সেই মুখর প্রতিশ্রুতির সব সম্মান যে মিথ্যে হয়ে যাবে। বাণীও হয়তো ভুল বুঝবে, কিংবা কিছু না বুঝেও মুখে কিছু বলবে না। কিংবা শৈলেশকে বোধ হয় একটা অসার হামবড়াই বলে মনে করে আড়ালে হেসে ফেলবে। তাই, উপায় নেই বলেই, দুরন্ত ঘৃণার জ্বালাটাকে চাপা দিয়ে প্রকাশ মাস্টারকে বিনীত ভাষায় অনুরোধ করতে হয়েছে। কিন্তু কী ধূর্ত এই প্রকাশ মাস্টার; আর কী সাংঘাতিক লোকটার বিদ্যাবত্তার অহংকার, যেন সেক্রেটারী শৈলেশের অপ্রস্তুত অবস্থার শাস্তিটাকে আরও দুঃসহ করে দেবার জন্য এখনও চুপ করে ভাবছে।

—বলুন, কি বলতে চান? রুক্ষ রূঢ় আর অপ্রসন্ন স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে শৈলেশ।

চমকে ওঠে প্রকাশ। কিন্তু সেই মুহূর্তেই যেন একেবারে শান্ত হয়ে গিয়ে

প্রকাশ মাস্টারের চোখ হেসে ওঠে।—আমি রাজি আছি। শুধু একটু ভেবে নিলাম। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

[চার]

হেড মাস্টার রাখালবাবু এইবার যে বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছেন, সেটা এরই মধ্যে ধরে ফেলতে পেরেছেন টিচারেরা আর পণ্ডিত মশাইয়েরা। টিচারদের মেসবাড়ির বারান্দায় সন্ধ্যায় অন্ধকারে তামাকের ধোঁয়াও তাই বেশ প্রসন্ন হয়ে ফুরফুর করে। এবার তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে, প্রকাশ মাস্টারের উপর সেক্রেটারীর বিশেষ সুনজর আছে। প্রকাশ মাস্টার আরও দু' বছর এক্সটেনসন পেল, তা ছাড়া সেক্রেটারীর স্ত্রীকে পড়াবার মত একটা গুরুভার দায়িত্ব পেয়ে গেল; এসব তো রাখালবাবুর ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল লক্ষণ নয়।

থার্ড টিচার অনন্তবাবুর কাছে একদিন উদ্বেগের কথাটা বলেই ফেলেছেন হেড মাস্টার রাখালবাবু!—মনে হচ্ছে, আমার মেয়াদও আর মাত্র দু' বছর।

—কেন এরকম মনে হচ্ছে আপনার?

—সেক্রেটারীর স্ত্রী বি-এ পাশ করতে যতদিন বাকি, ততদিন আমিও আছি। তারপর আর নয়।

—তার মানে?

রাখালবাবুর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরও যেন একটা রাগ চাপতে গিয়ে ছটফট করে ওঠে।—মানে বুঝতে না পারলে ডিকসনারি দেখুন।

—আজ্ঞে...।

—মানে বুঝতে এত দেরি করেন কেন মশাই? মানে হলো, প্রকাশ মাস্টার এবার তার প্রসপেক্ট বুঝতে পেরেছে। সেক্রেটারীর স্ত্রী বি-এ পাশ করলেই যে পুরস্কারটা পাবে প্রকাশ, সেটা কি অনুমান করতে পারছেন না?

—ঠিক পারছি না।

—আমাকে কচু বনে গিয়ে বাস করতে হবে, আর আপনাদের হেড হবেন ঐ ছোকরা প্রকাশ। নিতান্ত একটা আধুনিক বি-এ, না হয় কয়েকটা আউট-বুক পড়েছে; তাকে একটা মহামহোপাধ্যায় বলে মনে ক'রে এতটা লাই দেওয়া কি উচিত হচ্ছে?

—না না; আপনি একটু বাড়িয়ে ভাবছেন। উদ্বিগ্ন আর সন্দিগ্ধ রাখালবাবুকে একটা সান্ত্বনার ভাষা শুনিয়ে দিতে গিয়েও থার্ড টিচারের মুখটা অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে।

সেই হাসি মেসবাড়ির এই বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায় রোজই উচ্ছল হয়ে বাজে। মনে হয়, রাখালবাবু যত উদ্বিগ্ন হবেন, এই বারান্দার সান্ধ্য হাসিটা তত উচ্ছল হয়ে উঠবে।

কিন্তু মেসবাড়ির এই সান্ধ্য প্রসন্নতাকে বেশ বিষণ্ণ করে দেবার মত আর-একটা চিন্তা আছে। এবং এই চিন্তাটাই এসে মেসবাড়ির তামাকের সান্ধ্য ধোঁয়াটাকে বেশ বিষণ্ণ করে দেয়, যেন একটু থিতিয়ে দেয়। সে ধোঁয়া আর ফুরফুর করে না।

ফোর্থ টিচার বিষ্ণুবাবু বলেন—রাখালবাবুর হেড কাটা যাবে, সেটা না হয় মেনে নেওয়াই হলো। তাই বলে প্রকাশ মাস্টারের হেড তুলে ধরতে হবে কেন? এটা ভাল করছেন না সেক্রেটারী। বিজ্ঞাপন দিলে অনেক ভাল আর অনেক যোগ্য হেড মাস্টার পাওয়া যায়।

অধর পণ্ডিত বলেন—আমার কিন্তু সব ব্যাপারটাই ধাঁধার মত মনে হচ্ছে।

—কেন?

—কেন নয় বলুন? কাউকে প্রাইভেট পড়াবে না বলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল যে মানুষ, সে হঠাৎ এক মহিলার প্রাইভেট টিউটর হতে চট করে রাজি হয়ে যায় কেন?

—হুঁ, একটা ভাববার মত কথা বটে।

—তা ছাড়া আরও একটা কথা, মাপ করবেন আপনারা, প্রকাশ মাস্টার যে একটা অবিবাহিত যুবক, এটা তো সেক্রেটারীর অজানা নয়?

—খুব জানেন।

—তবে?

—আমার তো আরও একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

—কি?

—সেক্রেটারী না হয় একটু বেশি রকমের উদার মানুষ। কিন্তু মহিলা কি বলে রাজি হলেন? ও'র তো আপত্তি করা উচিত ছিল।

—আশ্চর্য!

অভয়কেও একদিন বলতে হয়েছে—আশ্চর্য!

রবিবার, সেই জন্যেই ক্লাস এইটের বিমল অভয় নীহার আর শেখর সকালবেলাতেই বেড়াতে বের হয়েছিল। টাউনের ধুলোছড়ানো ছড়ানো সড়ক যেখানে শেষ হয়েছে, আর ঝকঝকে সাদা কাঁকরের রাস্তা দু' পাশে আমের আর নিমের ছায়া নিয়ে যেখান থেকে শুরু হয়ে দূরের পাহাড় আর শালবনের দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে চমৎকার একটা লাল মাটির ডাঙ্গা আছে। ডাঙ্গাটা মিঠে খেজুরের জন্যে বিখ্যাত। তা ছাড়া ডাঙ্গাটা দেখতেও বড় সুন্দর। রাস্তার গা থেকে ডাঙ্গাটা একটানা ঢালু হয়ে ছোট্ট একটা ঝর্ণা-নদীর কাছে এসে শেষ হয়েছে। সে ঝর্ণানদীর কিনারার অনেকগুলো ছোট-ছোট সমাধি আর শ্বেতকরবী।

প্রকাশদা বোধহয় একটু কবি-মনের মানুষ। তা না হলে, মাঝে মাঝে এই ডাঙ্গাটার উপরে একা-একা ঘুরে বেড়াবেন কেন? নিশ্চয় মিঠে খেজুরের লোভে নয়; কোন সন্দেহ নেই, ডাঙ্গার এই চমৎকার লাল মাটি, কালো পাথর, সাদা কাঁকর আর সবুজ ঘাস দেখতে; আর, ঝর্ণা-নদীটার কলকল শব্দ আর শ্বেতকরবীর ঝোপের দুর্গা-টুনটুনির ডাক শুনতে আসেন প্রকাশদা।

ঢিল মেরে অনেক মিঠে খেজুর নামিয়ে আর খেয়ে, তারপর ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে যখন হাঁপ ছাড়ে বিমল, তখন অভয়ও হাঁপ ছাড়তে গিয়ে বলে ওঠে।—আশ্চর্য।

—কিসের আশ্চর্য?

—প্রকাশদা আমাকে পড়াতে রাজি হলেন না; কিন্তু বাণীদিকে পড়াতে রাজি হয়ে গেলেন।

—বোধহয় ভাল টাকা দিচ্ছেন শৈলেশদা।

—কে জানে! বাবাও তো প্রকাশদাকে ভাল টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তবু রাজি হলেন না।

—কেন রাজি হননি?

—বলেছিলেন, প্রাইভেট পড়াতে ভাল লাগে না।

—কেন ভাল লাগে না?

—বলেছিলেন, একটু নিরিবিলি থাকতে ভালবাসেন।

—নিরিবিলি কেন?

—সেটা আমি কি করে বলবো? আমি তো কারও অন্তর্যামী নই।

চমকে ওঠে নীহার—চুপ।

—কেন?

—প্রকাশদা আসছেন।

হ্যাঁ, প্রকাশদাই আসছেন। কিন্তু একা নন। সঙ্গে রয়েছেন আর-একজন মানুষ, যাঁর বাড়িটাকে এখানে বসেই দেখতে পাওয়া যায়, ঐ যে, মেহদি গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা যে বাড়িটা অনেকগুলো দেবদারুর ছায়ার কাছে ঝলমল করছে। বিখ্যাত বিদ্বান পি কে রায় ঐ বাড়িতে থাকেন। অভয়ের বাবা বলেছেন, ওরকম বিদ্বান মানুষ খুব কমই আছে। লজিকের অনেক বই লিখেছেন। এডিনবরার যত ছাত্র আর প্রফেসার একদিন এই পি কে রায়ের প্রতিভা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ের স্কুল থেকে শুরু করে এডিনবরা, কোন পরীক্ষায় সেকেন্ড হননি পি কে রায়। পি কে রায় হলেন চিরকালের ফার্স্ট।

প্যান্ট কোট আর টুপি, সাহেবী সাজে সেজে থাকেন, আর বেতের একটি স্টিক হাতে নিয়ে সকাল-বিকাল এদিকের রাস্তায় রোজই আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ান এই বিদ্বান বুড়ো-মানুষ পি কে রায়। বিমল অভয় নীহার আর শেখর একদিন বিকালে

সাহস করে বলেই ফেলেছিল—গুড মর্নিং স্যার।

থমকে দাঁড়ালেন পি কে রায়। সাংঘাতিক গম্ভীর স্বরে বললেন।—শোন।

—আজ্ঞে?

পি কে রায় বললেন—বল নমস্কার।

—নমস্কার। নমস্কার।

তারপরেই হেসে উঠলেন পি কে রায়। নীহারের মাথায় হাত বোলালেন, অভয়কে গাল টিপে আদর করলেন। তারপরেই বললেন—তোমরা বিকেলবেলা খেলা কর না?

—করি।

—তবে এখন এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন?

—এমনি।

—না, এই অভ্যেস ভাল নয়। খেলবে, দৌড়বে, গাছে চড়বে। মোট কথা, শরীর মজবুত করা চাই, স্বাস্থ্যও ভাল করা চাই।

—যে আজ্ঞে।

—মনে রেখ, মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো।

সেদিন, সেই বিকালেই প্রকাশ মাস্টারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেসা করেছিল অভয় আর বিমল, শেখর আর নীহার।—কথাটার মানে কি প্রকাশদা?

—কি কথা?

—বিদ্বান পি কে রায় বললেন, মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো।

—মানে হলো, সুস্থ দেহ সুস্থ মন। শরীর সুস্থ থাকলেই মন সুস্থ থাকে। তোমাদের ভালর জন্যই খুব ভাল একটা উপদেশ দিয়েছেন পি কে রায়। উপদেশটা মনে রেখ।

—হ্যাঁ, প্রকাশদা।

বিদ্বান বুড়ো-মানুষ পি কে রায়কে দেখে আর তাঁর বিদ্যার গল্প শুনে আশ্চর্য হয়েছিল যারা, তারা সেদিন তাদের সেকেন্ড স্যার প্রকাশদাকেও যেন নতুন আশ্চর্য বলে মনে করেছিল।

সেই প্রকাশদা আসছেন; সেই পি কে রায়ও সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। মনের ভেতরে মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো' উপদেশটাও যেন কথা বলছে, কিন্তু এখনই যে একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়ে যেতে হবে। ঘাসের উপর অলস হয়ে লুটিয়ে বসে থাকবার যে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া যাবে না।

দৌড় দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু বিমল বলে—লুকিয়ে পড়া যাক।

ফুটকার ঘন ঝোপ। থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে। গাদা গাদা ফড়িং উড়ছে। লুকিয়ে পড়বার একটা জায়গা আছে। লুকিয়ে পড়ে চারটে কৈফিয়ৎ-ভীরু প্রাণ।

পি কে রায় আর প্রকাশদা এই ফুটকা

শিল্পী: শ্রীইন্দ্র দুগার

ঝোপেরই ওপাশ দিয়ে গল্প করে ক'রে চলে গেলেন। কি আশ্চর্য, পি কে রায় যে সত্যিই একটা অদ্ভুত কথা বলছেন।—তুমি কি অক্সফোর্ডে ছিলে?

প্রকাশদা হাসেন—আজ্ঞে না, আমি কখনও বিদেশে যাইনি।

—এখানে কি কর?

—আমি মহিম সেমিনারির সেকেন্ড টিচার।

—অ্যাঁ? যেন চমকে উঠলেন পি কে রায়।

চলে গেলেন পি কে রায় আর প্রকাশদা।

ফুটকা ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে আর চারজনে যেন চারটে মুগ্ধ কৌতূহলের চোখ তুলে দেখতে থাকে, বিদ্বান পি কে রায় প্রকাশদার কাঁধে হাত রেখে গল্প করতে করতে চলে যাচ্ছেন।

অভয় বলে—সত্যি বলছি বিমল, প্রকাশদার জন্যে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছে।

বিমল—কেন বল তো?

অভয়—প্রকাশদার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল ছিল। পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে প্রকাশদার মত মানুষের এখানে একটা সেকেন্ড স্যার হয়ে পড়ে থাকা

একটুও ভাল দেখায় না।

নীহার—চলে গেলেই তো পারতেন প্রকাশদা।

শেখর—আমিও তো তাই বলছি। আমাদের স্কুল অবিশ্যি কানা হয়ে যাবে, তবু প্রকাশদার তো ভাল হবে।

বিমল—আমাদের স্কুলটার জন্যে প্রকাশদার খুব বেশি মায়া পড়ে গেছে।

অভয় রাগ করে বলে—আমি তো দেখছি, একটা টিউশনির জন্য প্রকাশদার খুব বেশি মায়া পড়ে গেছে।

শেখর—যাঃ, বাজে কথা।

নীহার হাসে—আমি একটা কথা বলতাম, কিন্তু বলবো না।

শেখর—বল্ না।

নীহার—আচ্ছা, শৈলেশদার সঙ্গে বাণীদির যদি বিয়ে না হতো, তবে কার সঙ্গে বিয়ে হলে খুব মানাতো?

বিমল—প্রকাশদার সঙ্গে।

অভয়—আমি বলবো, প্রকাশদার সঙ্গেই বাণীদিকে বেশি মানাতো।

শেখর—কিন্তু, বাণীদি যে নিজেই শৈলেশদাকে পছন্দ করে...।

অভয়—প্রকাশদাকেও তো পছন্দ করতে পারতেন বাণীদি।

বিমল—চুপ চুপ! আর এসব কথা নয়। এখন একটা কাজ করা যাক।

—কি?

—মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো করা যাক।

—তার মানে?

—একসঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে পি কে রায় আর প্রকাশদার পাশ কাটিয়ে চলে যাই। দেখে খুশি হবেন পি কে রায়।

—ঠিক বলেছিস।

[পাঁচ]

প্রথম যেদিন পড়াতে এসেছিল প্রকাশ মাস্টার, সেদিন এই ঘরেই টেবিলের কাছে দুটি চেয়ারে বসে গল্প করছিল শৈলেশ আর বাণী।

প্রকাশ আসতেই খুশি হয়ে হেসেছিল শৈলেশ—আসুন।

আর, বাণী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মুখে কোন অভ্যর্থনার ভাষা না থাকলেও বাণীর চোখ দুটোই হেসে হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। মাথার কাপড়টাও একটু বড় করে টেনে দিয়েছিল বাণী।

কিন্তু শৈলেশ যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আর বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তুমি বসো।

শৈলেশের সেই গম্ভীর শাসনের কথাটা যেন একটা সতর্ক প্রেস্টিজের গম্ভীর কথা। প্রকাশ মাস্টার বোধহয় শুনতে পায়নি; কারণ বেশ একটু মৃদুস্বরে আর চাপা গলায় কথাটা বলেছিল শৈলেশ।

প্রকাশ মাস্টার শুনেছে বলেও মনে হয় না। প্রকাশ মাস্টার যেন তার মুখভরা হাসির আবেশেই বধির হয়ে রয়েছে। ঘরের ভিতরে ঢুকেই টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা বইগুলির দিকে তাকায় প্রকাশ। তারপরেই বলে—আমি আজ শুধু বইগুলি একবার দেখবো। কাল থেকে পড়াবো আর বেশ শক্ত টাস্কও দিয়ে যাব।

শৈলেশ হাসে—মোট কথা, আপনার কাছ থেকে গ্যারেণ্টি পেতে চাই, বাণী যেন এক চান্সেই বেশ ভাল করে পাশ করতে পারে।

প্রকাশ হাসে—তাহলে উনিও আমাকে গ্যারেণ্টি দিন। টাস্ক যা দিয়ে যাব, সেটা ফেলে রাখবেন না। রোজ নিয়মমত খাটতে হবে।

বাণী হেসে ফেলে—ইচ্ছে করে ফাঁকি নিশ্চয়ই দেব না।

প্রকাশ—তাহলেই হলো।

বই দেখে প্রকাশ, আর মাঝে মাঝে শৈলেশের সঙ্গে কথাও বলে। বাণী হঠাৎ ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়। তারপরেই ট্রে'র উপর সাজিয়ে চায়ের পেয়ালা আর খাবারের ডিস নিয়ে ঘরের ভিতরে দেখা দেয়।

শৈলেশের চোখ আবার যেন একটা ক্ষুব্ধ বিস্ময় ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বাণী যেন একটা ভয়ানক শ্রদ্ধার নৈবেদ্য হাতে নিয়ে ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়েছে। বাণীর চেহারাটা যেন একটা নিদারুণ খুশির ব্যস্ততা।

চা আর খাবার খেয়ে চলে যায় প্রকাশ মাস্টার। আর শৈলেশের এতক্ষণের ক্ষুব্ধ বিস্ময়টা এইবার গলার স্বরেই জ্বলে ওঠে।

—তুমি এসব আবার কি আরম্ভ করলে?

বাণী—কি হলো?

—চা আর খাবার তুমি নিয়ে এলে কেন?

—কি বললে?

—ও কাজটা রামদয়াল করবে। তুমি মিছিমিছি কেন...?

—আমাকে পড়াবেন যিনি, তাঁকে রামদয়াল কেন চা-খাবার এনে দেবে? এটা আবার কি-রকমের কথা বলছো তুমি?

—ঠিক বলছি। তুমি বোধহয় তোমার নিজেরই প্রেস্টিজের দিকটা ভেবে দেখতে ভুলে গিয়েছ।

—প্রেস্টিজ?

—হ্যাঁ। প্রকাশ মাস্টারকে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেব। এটাই যথেষ্ট। এর বেশি সম্মান করবার কোন দরকার হয় না।

—বুঝলাম না।

—কি বুঝলে না?

—আমি নিজে চা-খাবার এনে দিলে ভদ্রলোককে এমন কি বেশি সম্মান করা হয়।

—হয় বইকি।

—ছাত্রী তার টিউটরকে যদি একটু সম্মানই করে...।

—না। সম্মান করবার কোন প্রশ্নই এর মধ্যে আসে না।

—অসম্মান করাও তো উচিত নয়।

—আমি তো অসম্মান করতে বলছি না। রামদয়াল আমার মক্কেল সীতারাম আগরওয়ালাকেও চা এনে দেয়। তাতে কি সীতারামের অসম্মান হয়েছে?

—তুমি কার সঙ্গে কার তুলনা করছো।

—সীতারাম আগরওয়ালা লক্ষপতি মানুষ। প্রকাশ মাস্টার পঞ্চাশ টাকা মাইনের মানুষ। তুলনা চলে না ঠিকই।

শৈলেশের মুখের দিকে বোবা বিস্ময়ের দুটো চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে বাণী। ঠিকই, মুহুরী বামাচরণবাবুর মেয়ে মানুষের প্রেস্টিজতত্ত্বের নিয়ম-কানুন জানে না, বুঝতেও পারে না। শৈলেশের ইচ্ছার কথাগুলিকে বুঝতে পারছে না বলেই ভাল লাগছে না। ঠিকই, মাটির চোখ দিয়ে আকাশের কোন দুঃখকে দেখতে পাওয়া যায় না। শৈলেশের মত মানুষের প্রেস্টিজের দুঃখটাকেও তাই চিনতে পারছে না বাণী।

বাণী বলে—আমি ঠিকই বুঝতে পারিনি।

শৈলেশের চোখের দৃষ্টিটা হেসে ওঠে।—আমারও তাই মনে হয়েছে। তুমি ঠিক বুঝতে পারনি বাণী। তাই আমার সঙ্গে এত তর্ক...।

বাণীও হেসে ফেলে—না, আর তর্ক করবো না। বরং...।

—কি?

—আমার কোন ভুল দেখতে পেলে তখুনি বলে দেবে।

না, আর কোন ভুল দেখতে পায় না শৈলেশ। বরং দেখতে পায়, বাণী নিজেই ওর প্রেস্টিজ সম্বন্ধে খুব সজাগ আর খুব সতর্ক হয়েছে। পড়ার কথা ছাড়া প্রকাশ মাস্টারের সঙ্গে অন্য কোন কথা ভুলেও আলোচনা করে না বাণী। আর প্রকাশ মাস্টারও বেশ ভাল অর্থাৎ সৌজন্যের হাসিটাকে অনেক সংযত করে ফেলেছে। দেখে খুশি হয়েছে শৈলেশ, প্রকাশ মাস্টার সত্যিই একটি কঠোর টাস্ক-মাস্টার। সারারাত জেগে আর অনেক ভেবে ভেবে ম্যাকবেথের বিবেক সম্বন্ধে দশপাতা ভরে যে প্রবন্ধ লিখেছে বাণী, সেটা পড়েই ধমক দিয়ে উঠেছিল প্রকাশ মাস্টার—রাবিশ!

বাণী বলে—তাহলে বলে দিন...।

প্রকাশ—তাহলে মন দিয়ে শুনুন।

এক ঘণ্টা ধরে ম্যাকবেথের মন আর বিবেক ব্যাখ্যা করে চলে গেল প্রকাশ মাস্টার।

হ্যাঁ, দেখে খুশি হয়েছে শৈলেশ, প্রকাশ মাস্টার যখন আসে, তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় না বাণী। টেবিলের বইগুলির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকে। দেখেছে শৈলেশ, রামদয়াল চা-খাবার এনে দিয়েছে। বেশ খুশি হয়ে খেয়েছে প্রকাশ মাস্টার।

[ছয়]

ছোট শহরের মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থাটা বড়রকমের হতে পারে না। মিউনিসিপ্যালিটি একটু বেশি গরীব বলেই পথের পাশে বেশি আলো জেলে দিতে পারে না। একটা কেরোসিনের বাতির পোস্ট এখানে, আর একটা হয়তো তিন শো গজ দূরে। শুক্লপক্ষের দিনে পথের পাশের এই টিমটিমে বাতিও জ্বলে না। আর সেটাই যেন একটা সৌভাগ্য। চাঁদনি সন্ধ্যায় কিংবা রাতের এই ধুলো-জঞ্জালের ছোট শহরও একটা মায়াপুরীর মত দেখায়।

যেখানে বাসস্ট্যান্ড, যেখানে দু'চারটে দোকানের আলো পথের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানেও স্ট্যান্ডের গাড়ি আর মানুষের ভিড়কে একগাদা জ্যোৎস্নাময় শরীরের ভিড় বলে মনে হয়। সবই অস্পষ্ট, তবু মুখগুলিকে যেন স্পষ্ট চিনে ফেলতে পারা যায়।

বিমল বলে—ও কে যে দেখছি?

—কে? কোথায়?

—ঐ যে বাস-অফিসের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনছে?

—তাই তো। নিশ্চয় প্রকাশদা।

ঠিকই দেখতে পেয়েছে বিমল। অভয় আর একটু এগিয়ে যেয়ে দেখে আসে; হ্যাঁ, প্রকাশদাই টিকিট কিনছেন। কিনে ফেলেছেন।

প্রকাশদার সঙ্গে তো কেউ নেই। তবে কার জন্যে টিকিট কিনলেন প্রকাশদা? প্রকাশদা নিজেই কোথাও যাবেন? না, অন্য কেউ যাবে?

নীহার বলে—প্রকাশদা সত্যিই যে গয়া যাবার রাস্তার দিকে যাচ্ছেন।

অভয়—গয়াতে কি এখন পিতৃপক্ষ চলছে?

নীহার—এখানে পিতৃপক্ষ হবে কেমন করে?

TINOPAL BVN
স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোকের
পরনের সাদা জামাকাপড় সব
টিনোপাল
দিয়ে কাচা
geigy
টিনোপাল
এদের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক—জে.আর. গায়গী, এস. এ., বাল, সুইজারল্যাণ্ড
সামান্য একটু টিনোপাল ব্যবহার-করলে সাদা জামাকাপড় সবচেয়ে বেশী সাদা হয়ে ওঠে ॥
প্রস্তুতকারক: সুহৃদ গায়গী প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াডী ওয়াডী, বরোদা
একমাত্র পরিবেশক: সুহৃদ গায়গী ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, পো: বক্স নং ৯৬৫, বোম্বাই ১
SISTA'S-SG-102-BEN
প্রাইভেট লিমিটেড, পি-১১, নিউ হাওড়া ব্রিজ এ্যাপ্রোচ রোড, কলিকাতা—১

—তবে?

—কালকের দিনটাও তো ছুটির দিন নয়!

—তা ছাড়া, প্রকাশদা তো ছুটি নেননি।

—আজও তো কালকের পড়া বলে দিলেন প্রকাশদা।

—হেড স্যারও তো বললেন না যে, প্রকাশদা ছুটি নিয়েছেন।

—হ্যাঁ, না বলে কয়ে চলেই যাচ্ছেন প্রকাশদা।

—এর মানে কি?

ঠিকই, গয়ার বাসের ভিতরে উঠতে যাচ্ছিল প্রকাশ, তখনি পিছনের এক গাদা ব্যস্ত আহ্বানের শব্দ শুনে চমকে ওঠে: কোথায় যাচ্ছেন স্যার? কেন যাচ্ছেন স্যার? গয়াতে কেন স্যার?

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে প্রকাশ। তারপর হেসে হেসে বলেই ফেলে —আমি সত্যিই চলে যাচ্ছি।

—কেন স্যার?

—আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

—কিন্তু কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ কেন চলে যাচ্ছেন?

প্রকাশ আবার হাসে। —কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ এসে পড়েছিলাম যে।

—আপনি চলে গেলে আমাদের কিন্তু খুব ক্ষতি হবে।

—কিছু ক্ষতি হবে না। কোন ক্ষতি হবে না। চমৎকার একজন নতুন সেকেণ্ড স্যার আসবেন।

অভয় বলে—কিন্তু বাণীদিকে কে পড়াবে স্যার?

বাস-স্ট্যাণ্ডের ভিড়ের ছুটোছুটির ব্যস্ততায় ধুলো উড়ছে; ধুলোতে জ্যোৎস্নাতে মাখামাখি হয়ে একটা অদ্ভুত ধাঁধা হয়ে উঠেছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকে প্রকাশ মাস্টার।

বিমলের হাতে খুব জোরে একটা চিমটি কেটে অভয় এবার যেন একটা নির্ভয় উৎসাহের আবেগে চেঁচিয়ে কথা বলে—বাণীদির কিন্তু সত্যিই ক্ষতি হবে স্যার।

প্রকাশ মাস্টার পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে। তারপর সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতে থাকে। তার পর থমকে দাঁড়ায়। তারপর বেশ ব্যস্ত-স্বরে কথা বলে—তোমরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? বাড়ি যাও।

অভয়—আপনি স্যার?

প্রকাশ—আমিও বাড়ি যাচ্ছি। এখনই যাব।

একটু দূরে চলে গিয়েই মুখ ফিরিয়ে তাকায় বিমল আর নীহার, শেখর আর অভয়। আর, চার জোড়া চোখ থেকে যেন চার-জোড়া খুশির জ্যোৎস্না উপচে পড়ে। বাস-অফিসের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে টিকিট ফেরত দিচ্ছেন প্রকাশদা।

বাড়ি ফিরে যাবার জন্য সড়কের মোড় ঘুরে সোজা হাঁটতে থাকে ছোট শহরের ছোট-ছোট বুদ্ধির চারটি দোসর; বিমল আর অভয়; নীহার আর শেখর। কিন্তু হেঁটে যাবার দুরন্ত ভঙ্গীটা যেন একটা জগজ্জয়ী দুরন্ত উল্লাসের ভঙ্গী।

রাস্তার পাশে একটা বাড়ি। দেখলে পড়ো বাড়ি বলেই মনে হয়। কারণ, এ-বাড়িতে আজকাল আর কেউ থাকে না। পাঁচিলের কাছে একটা টক-পেয়ারার গাছের মাথায় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে।

বিমল বলে—মনে পড়ে অভয়?

অভয়—কি?

বিমল—এই গাছটাকে।

—পড়ে বইকি; কিন্তু গাছটা বড় কাহিল হয়ে গেছে রে বিমল।

বিমল—আর ঐ জানালাটাকে মনে পড়ে?

এটা হলো সেই মুহুরী রমাচরণবাবুর বাড়ি; যে-বাড়িতে আজকাল আর কেউ থাকে না। ঐ জানালাটা হলো সেই জানালা, যেখানে একদিন বাণীদির সেই সুন্দর মুখটা হাসছিল; আর শৈলেশদা এসে...। বিমল আর নীহার তখন ঐ টক-পেয়ারা গাছের উপরের ডালে চুপ করে বসেছিল।

মহিম-ভবনের ফটক পার হয়ে চলে যাবার সময় অভয় হঠাৎ ছটফট করে ওঠে। —চল্ বিমল, বাণীদির সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

মহিম-ভবনের বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের জানালার লেসের পর্দাগুলি কাঁপছে। আর টেবিলের উপর বই রেখে একমনে বই পড়ছে বিমল আর অভয়দের সেই বাণীদি। বাণীদির সেই সুন্দর মুখটা এখনও সেইরকমই সুন্দর দেখাচ্ছে।

হঠাৎ চমকে উঠে দরজার দিকে তাকায় বাণী; যেন নিজেরই মনের ভিতরে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে। হাততালি দিয়ে একসঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢোকে বিমল আর অভয়, শেখর আর নীহার। —কেমন? ভয় পেয়েছেন কিনা?

বাণী—তোমরা হঠাৎ কোত্থেকে এলে?

অভয়—হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম, তাই হঠাৎ খবর দিতে চলে এলাম।

বাণী—কিসের অদ্ভুত ব্যাপার?

বিমল—আর একটু হলে প্রকাশদা চলেই যেতেন।

বাণী—কোথায়?

অভয়—কে জানে কোথায়? বোধহয় গয়াতে।

বাণী—কেন?

নীহার—এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না প্রকাশদার।

বাণী—ছুটি নিয়েছেন?

শেখর—কিছু না, কাউকে না বলে কয়ে হঠাৎ চলে যাচ্ছিলেন।

বাণী—শেষ পর্যন্ত যাননি তাহলে?

বিমল—না।

নীহার—ওঃ, কি-ভয়ানক সাধতে হয়েছে, তবে যাওয়া বন্ধ করলেন প্রকাশদা।

অভয়—কোন সাধাসাধিতে কিছু হয়নি। যেই বললাম, বাণীদিকে তবে পড়াবে কে, বাণীদির ক্ষতি হবে যে, অমনি চুপ করে গেলেন।

নীহার—কেনা টিকিট ফেরত দিলেন।

বাণী বলে—বেশ রাত হয়েছে অভয়, তোমরা এখন...।

—হ্যাঁ, যাচ্ছি বাণীদি। শুধু এই কথাটা জানাবার জন্যেই...।

হুড়মুড় করে একসঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেল, ক্লাস নাইনের চারটি মানুষ; যেন চারটি কৃতার্থতার একটি দুরন্ত টীম।

[সাত]

সেকেণ্ড স্যার প্রকাশ মাস্টারকে সত্যিই ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বিমল নীহার অভয় আর শেখর বেশ আশ্চর্যও হয়েছে। প্রকাশদা নিজেও যেন একটা ধাঁধা। যেন দুটো মানুষ। একটা মানুষ বাইরে-বাইরে থাকেন, আর-একটা মানুষ ঘরের ভিতরে চুপ করে পড়ে থাকেন।

স্কুলেতে প্রকাশদা খুব হাসি-খুশি মানুষ। কত ব্যস্ত মানুষ। কত জোরে-জোরে চেঁচিয়ে কথা বলেন। বাণীদিকে যখন পড়াতে যান প্রকাশদা, তখনও দেখতে পায় শেখর আর নীহার, যেন বাণীদিকে পড়াবার জন্যে নয়, বাণীদির গলার সেই গানটা শোনবার জন্য প্রাণ-মন ব্যস্ত করে ছুটে চলেছেন।

কিন্তু বিমল আর অভয় দুজনেই বাণীদির বাড়িতে গিয়ে অনেকবার উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে, প্রকাশদা শুধু চেঁচিয়ে পড়িয়ে চলেছেন। বাণীদির মুখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়েও দেখছেন না।

বাণীদি পড়তে বসেন যে ঘরে, বাড়ির বাইরের দিকের সেই প্রকাণ্ড ঘরের ভিতরে একটা হারমোনিয়মও আছে। কিন্তু বিমল আর অভয় সে-ঘরের বাইরে জানালার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও বুঝতে পেরেছে, গানের কোন কথাই আলোচনা করছেন না প্রকাশদা। এই এক বছরের মধ্যে বাণীদির হারমনিয়ম টুঁ শব্দও করেনি। সন্দেহ হয়, বাণীদি নিজেই কি রাগ করে গান ছেড়ে দিলেন?

শৈলেশদাই বা কি-রকমের সখের মানুষ? বাণীদির যে-গান শুনে শৈলেশদা...।

বিমল বলে—থাক সে কথা। বোঝা যাচ্ছে, শৈলেদার প্রাণেও আর গান নেই।

অভয় বলে—শৈলেশদার প্রাণে এখন অন্য একটা সখ চেপেছে।

—কিসের সখ?

—রায়সাহেব হবার।

—কোথায় শুনলি?

—বাবা বলছিলেন।

সখ আছে সবারই, সখ নেই বোধহয় শুধু এই প্রকাশদার। এমন কি বাণীদিকে একদিন ভুলেও গান গাইতে বললেন না প্রকাশদা। অদ্ভুত!

যাই হোক, বাইরে একরকম আর ঘরের ভিতরে ওরকম কেন প্রকাশদা? বিমল অভয় শেখর আর নীহার, কতবার হঠাৎ গিয়ে দেখেছে, ঘরের ভিতরে একেবারে নীরব নিথর হয়ে বসে আছেন প্রকাশদা। খাটের উপর কয়েকটা বই ছড়ানো আছে; টাকা-পয়সা ছোট্ট একটা টেবিলেরই উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। দু' চারটে জামা-কাপড় আলনাতে ঝুলছে। ঘরটাও খুব ছোট। তারই মধ্যে যেন একটা সমাধির ছায়ামানুষের মত চুপ করে বসে আছেন প্রকাশদা। মুখে হাসি নেই, চোখে ঝকঝকে চাহনিও নেই।

টাউনের ভিতরে একটা ছোট সড়কের এক কিনারায় ছোট্ট এই ঘর, যে-ঘরে থাকেন প্রকাশদা। জায়গাটা মোটেই নিরিবিলি নয়। লোকের হাঁকডাক চেঁচামিচি চারদিকে হৈ-হৈ করছে। অথচ প্রকাশদা বলেন, তিনি একটু নিরিবিলি থাকতে ভালবাসেন।

হ্যাঁ এটাও একটা নিরিবিলি বটে। ধুলো ধোঁয়া আর বাজারে চিৎকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নিদারুণ একটা নিরিবিলি। অথচ দেখতে পাওয়া যায়, এই প্রকাশদাই টাউনের বাইরের সেই খোলামেলা লাল-মাটির ডাঙাটাকে কত ভালবাসেন। সেখানে যে মানুষ হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে বেড়ায়, সে মানুষ এখানে এই ঘরের ভিতরে এত নিথর হয়ে বসে থাকতে পারে কেমন ক'রে?

শুধুই কি চুপ ক'রে বসে থাকেন? শেখর একদিন দেখেছে, বালিশটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে আর চোখ বন্ধ করে বিছানার উপর যেন একটা আহত মানুষের মত পড়ে আছেন প্রকাশদা, আর...সত্যি বলছি নীহার, স্বচক্ষে দেখলাম, প্রকাশদার চোখের পাতা ভিজে গিয়েছে।

নীহার কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ বলে ওঠে।—বাণীদিন পরীক্ষাটা কবে?

শেখর—কে জানে কবে?

প্রকাশদাকে একটা রহস্য বলেও মনে হয়। বাইরে থেকে দরখাস্ত করে আর কাজের চিঠি পেয়ে তিনি এখানে আসেননি। তিনি এখানেই ছিলেন। কোথা থেকে আর কবে যে এই ছোট শহরে এসে বসেছিলেন, তা'ও কেউ জানে না। হেড স্যার একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, প্রকাশ আগে বর্মাতে একটা স্কুলে মাস্টারী করতো।

সেই যে সেকেণ্ড স্যার বুড়ো জলধরবাবু কাশীবাস করবার জন্যে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, তাঁকে বিদায় দেবার জন্য স্কুলেরই ছোট হলঘরে যে উৎসবটা হয়েছিল, যে উৎসবে সেই গানটা গেয়েছিলেন বাণীদি, সেই উৎসবে প্রকাশদাও কেন যেন উপস্থিত ছিলেন। একটা সংস্কৃত কবিতা, বোধহয় কবি কালিদাসের কবিতা, সেই সভাতে আবৃত্তি করেছিলেন প্রকাশদা।

তার কদিন পরেই সেকেণ্ড স্যার হয়ে স্কুলে দেখা দিলেন প্রকাশদা, আর ক্লাস

ইটকে হিস্ট্রি পড়িয়ে চলে গেলেন। হেড্‌ম্যার রাখালবাবু বলেছিলেন—সেক্রেটারী হঠাৎ কোথা থেকে খুব সস্তায় একটা সেকেণ্ড মাস্টার এরই মধ্যে জোগাড় করে ফেলেছে।

তারপর তো দেখাই গেল, এই সস্তার সেকেণ্ড স্যার কি কাণ্ডই না করলেন।

এত সস্তা হয়ে এখানে পড়ে আছেন প্রকাশদা। তাতে লাভ হচ্ছে সবারই। স্কুলের লাভ, টাউনের লাভ, বাণীদির লাভ। কিন্তু প্রকাশদার লাভ কোথায়?

বিমল বলে—বাণীদি তো কোনদিন নিজের হাতে এক কাপ চা পর্যন্ত প্রকাশদাকে খাওয়ালেন না।

অভয় বলে—বাণীদি তো আগে এরকম ছিলেন না। মনে আছে তো বিমল?

বিমল—খুব মনে আছে।

নীহার—কি?

অভয়—বাণীদির তখনো বিয়ে হয়নি। আমরা কতবার দেখেছি, নিজের হাতে ঘটি থেকে জল ঢেলে ভিখিরীগুলোকে জল খাওয়াচ্ছেন বাণীদি।

নীহার—তাহলে কি প্রকাশদাকে একটা ভিখিরীর চেয়েও বাজে লোক মনে করেন বাণীদি? কখ্খনো না।

অভয়—তাই তো বলছি; প্রকাশদার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছেন কেন বাণীদি?

বিমল—সত্যি বাণীদিকে একটুও বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

[আট]

এই ছোট শহরের জীবনে দুটি খবর হলো দুটি বড় রকমের চাঞ্চল্যের খবর। বাণী, এই শহরেরই মেয়ে বাণী বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে, এটা যেমন শহরের মহিলা আর মেয়েদের আশা আর আগ্রহের কাছে বড় খবর; তেমনই এই ছোট শহরের ভদ্রলোকদের কাছে একটা বড় খবর এই যে, শৈলেশের সত্যিই রায়সাহেব হবার সম্ভাবনা আছে।

পাটনাতে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে এসেছে বাণী। শৈলেশও সঙ্গে গিয়েছিল। পাটনাতে সে দশটা দিন শৈলেশও চুপ করে বসে থাকে নি। চেষ্টা করে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছে, আর গভর্নরের বন্যা রিলিফ ফাণ্ডের জন্য পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক গভর্নরের হাতে তুলে দিয়েছে। শোনা গেছে, রায়বাহাদুর কালিকাপ্রসাদ চেষ্টা করে গভর্নরের সঙ্গে মোলাকাতের এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

যাঁরা এই খবরটা জানেন, তাঁরা কিন্তু এখনও একটু সন্দিগ্ধ হয়ে আছেন। প্রশ্নটা হলো, এদিক থেকে জেলার ডেপুটি কমিশনার যদি শৈলেশের নামটাকে রায়সাহেব খেতাবের জন্য সুপারিশ না করে পাঠান, তবে কি কোন সুফল হবে? শোনে তো হয় না।

ডেপুটি কমিশনার লিস্টার সাহেব বড় কড়া মেজাজের মানুষ। এই তিন বছর ধরে তিনি এই জেলার একটি মানুষের নামও খেতাবের জন্যে সুপারিশ করেননি। এই শহরের কেউ আজ পর্যন্ত রায়সাহেব হতে পারেননি। সীতারাম আগরওয়ালা লিস্টার সাহেবের কাছে গিয়ে কতবার কত ছুতো করে ধর্না দিয়েছে; হাসপাতালের নতুন বাড়ি তৈরী করবার জন্য দশ হাজার টাকা দানের চেক লিস্টার সাহেবের হাতেই তুলে দিয়েছিল সীতারাম আগরওয়ালা। জয়পুরী কারিগর আনিয়ে লিস্টার সাহেবের একটা মার্বেল মূর্তি তৈরী করিয়ে উপহারও দিয়েছিল। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

এহেন ডেপুটি কমিশনার লিস্টার সাহেব যেদিন মহিম সেমিনারির প্রাইজের অনুষ্ঠানে এলেন, সেদিন স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট পড়লো সেক্রেটারী শৈলেশ রায়। আর সেদিনই বুঝতে পারা গেল, শৈলেশের ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। যে লিস্টার সাহেব কোন রাজাগোছের জমিদারের মুখের দিকেও তাকাতে চান না, সে লিস্টার সাহেব যেন বিস্মিত হয়ে, আর বেশ মুগ্ধ হয়ে সেক্রেটারী শৈলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট শুনলেন। ফুলস্কেপ কাগজের দশ পাতার একটা রিপোর্ট। রিপোর্ট তো নয়; যেন এডুকেশন সম্বন্ধে একটা থীসিস। এডুকেশনের নানা অসুবিধা আর সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে একটা চমৎকার আলোচনা।

প্রাইজের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর লিস্টার সাহেব শৈলেশকে ডাকলেন। হেসে হেসে অনেক কথা বললেন। তারপর রিপোর্টটাকেও চেয়ে নিলেন।

হেডমাস্টার রাখালবাবু বেশ আশ্চর্য হয়েছিলেন। —আমি তো এই চার বছরের মধ্যে কোন বছরেই সেক্রেটারীকে এমন জ্ঞানের আর এমন জমকালো ভাষার রিপোর্ট পড়তে দেখিনি। সত্যি একটি রিপোর্ট হয়েছে বটে, লিস্টার সাহেবের কড়া মেজাজও গলিয়ে দিয়েছে।

বাণীরও চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের খুশি সুস্মিত হয়ে ওঠে। —বিমলের মা একটা কথা বলে গেলেন; কথাটা কি সত্যি?

শৈলেশ—কি কথা বলে গেলেন বিমলের মা?

—তোমার নাকি রায়সাহেব হবার কথা উঠেছে।

—এখনও ওঠেনি; উঠবে বলে আশা হচ্ছে।

—কেন?

—লিস্টার সাহেব যখন আমার উপর খুশি হয়েছেন, তখন মনে হচ্ছে, আশা করা ভুল হবে না। আসল ফাঁড়া তো এখানেই ছিল। ডেপুটি কমিশনার সুপারিশ না করলে কিছুই হবার নয়। যাক্, সে ফাঁড়া কেটে গিয়েছে।

—কি করে কাটালে?

—এডুকেশন সম্বন্ধে একটা চমৎকার তাক-লাগানো রিপোর্ট পড়ে লিস্টার সাহেবকে শুনিয়েছি। স্কুলের প্রাইজে লিস্টার সাহেব এসেছিলেন।

—কবে রিপোর্ট লিখলে?

শৈলেশ হেসে ফেলে—আমি লিখিনি। একজনকে দিয়ে লিখিয়েছি।

—কি বললে?

—প্রকাশ মাস্টারকে দিয়ে রিপোর্টটা লিখিয়ে নিয়েছি। যাক্, এতদিনে লোকটাকে দিয়ে একটা ভাল কাজ করিয়ে নিতে পারা গেছে।

বাণী বলে—তুমি কি এখনই আবার বের হচ্ছো?

শৈলেশ—হ্যাঁ।

বাণী—কোথায়?

—স্কুলেই যাচ্ছি। প্রকাশ মাস্টারকে দিয়ে আর একটা কাজ করাবার আছে। এটাও খুব দরকারের কাজ।

—কিসের কাজ?

—ঐ, আর-একটা রিপোর্ট লেখাতে হবে। এই জেলার একটা ইকনমিক রিপোর্ট। চেয়েছেন সেন্সাসের বড় সাহেব, মিস্টার লেসি, আই সি এস, যিনি গভর্নরের সেক্রেটারী ছিলেন।

বাণী যেন হাঁসফাঁস করে আস্তে আস্তে একটা বিস্ময়ের আতঙ্ক সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে—এই সাহেবকে আবার কোথায় পেলে?

—এই তো, একমাস হলো এখানেই সার্কিট হাউসে আছেন মিস্টার লেসি। আরও ভাল খবর হলো, মিস্টার লেসি আমাকে বলেই দিয়েছেন যে, তিনি নিজে চিঠি লিখে গভর্নরকে আমার নামটা জানিয়ে দেবেন। এখন আর আমার কোন সন্দেহ নেই বাণী; এই বড়দিনেরই খেতাবের লিস্টে দেখতে পাবে......।

শৈলেশের কৃতার্থ উৎফুল্ল মূর্তিটা যেন একটা অদ্ভুত হাস্যময় ব্যস্ততার মূর্তি হয়ে চলে যায়।

আজ আর এই পড়ার ঘরে বসে থাকবার কোন মানে হয় না। তবু চুপ করে বসে থাকে বাণী। টেবিলের উপর বইগুলি যেন শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে চুপ করে পড়ে আছে। প্রকাশ মাস্টার আর পড়াতে আসবেও না।

—কেমন আছেন বাণীদি?

চমকে ওঠে, তার পরেই হেসে ফেলে বাণী

—এতদিনে বাণীদিকে মনে পড়লো?

বিমল বলে—এতদিন আপনার কাছে ঘেঁষবারও কি কোন উপায় ছিল?

বাণী—কেন? একথার মানে কি?

নীহার—যা সাংঘাতিক পড়া শুরু করেছিলেন, যেন মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

বাণী—বাঃ, এই দু'বছরে নীহারের কথার বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি।

অভয়—আমরা যে এখন ক্লাস টেন, ভুলে যাচ্ছেন কেন বাণীদি?

বাণী—ওরে বাবা! সত্যিই, সব দিকেই উন্নতি।

শেখর—আপনিই বা কোন্ দিকে উন্নতির বাকি রাখলেন বাণীদি?

বাণী—তার মানে?

বিমল—একজন হতে চলেছেন, এ শহরের ফার্স্ট মেয়ে গ্র্যাজুয়েট, আর একজন এ-শহরের ফার্স্ট রায়সাহেব।

বাণী ভ্রূকুটি করে হাসতে থাকে।

—বুঝলাম, আজ দলবেঁধে আমাকে ঠাট্টা করতে আসা হয়েছে।

বিমল—না বাণীদি। বিশ্বাস করুন, আমরা ঠাট্টা করতে আসিনি, আমরা নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

বাণী—কিসের নেমন্তন্ন?

অভয়—ধীরেনদাদের ড্রামাটিক ক্লাব বিল্বমঙ্গল অভিনয় করবে। এই নিন কার্ড। অবশ্যই যাবেন কিন্তু।

নীহার—ধীরেনদা বার বার বলে দিয়েছেন, আপনার যাওয়া চাইই।

শেখর—শৈলেশদাকে আগেই কার্ড দিয়েছি।

{ নয় }

ছোট শহরের ছোট ড্রামাটিক ক্লাবের স্টেজও বেশ ছোট। কিন্তু তাই বলে থিয়েটারের আনন্দটা ছোট নয়। মস্ত বড় বাড়িতে আর অনেক লোকজনের মধ্যে একটি মাত্র ছোট ছেলে থাকলে তার কদরকেরে যেমন আদর হয়, এ-শহরে এই ছোট স্টেজের থিয়েটারেরও তেমনি আদর। বছরে মাত্র দু'দিন থিয়েটার করে ড্রামাটিক ক্লাব; কিন্তু সেই দুটো দিন এই ছোট শহরের জীবনে যেন দুটো উৎসবের দিন। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা সকাল থেকেই ব্যস্ত হয়ে থাকে; মহিলারা দুপুর থেকে, আর ভদ্রলোকেরা বিকেল থেকে। যে-সব বাড়িতে রান্নার ঠাকুর নেই, সে-সব বাড়িতে রাত্রির রান্না দিনের বেলাতেই সেরে রাখা হয়।

ড্রামাটিক ক্লাবের থিয়েটারের আয়োজন আর উৎসাহে শৈলেশ বরাবরই একটু বেশি সাহায্য করে থাকে। বেশি টাকা দেয় শৈলেশ, আর একটু বেশি খোঁজখবরও নেয়। ধীরেন স্বীকার করে, শৈলেশদার মত পেট্রন এখনও আছেন বলেই ড্রামাটিক ক্লাব এখনও হেসে-খেলে চলছে।

পেট্রন শৈলেশ এবছরের এই বসন্তোৎসবের থিয়েটারকে একটা নতুন গৌরবের ব্যাপার করে তুলেছে। ডেপুটি কমিশনার লিস্টার সাহেব আর সেন্সাসের সুপার মিস্টার লোসি থিয়েটার দেখতে এসেছেন। শৈলেশ নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিল, আর দুই সাহেবই খুশি হয়ে থিয়েটার দেখতে রাজি হয়েছেন।

অন্য বছর সন্ধ্যা হবার পর ভিড় হয়, এ-বছরের এই বসন্তোৎসবের বিল্বমঙ্গলে সন্ধ্যার অনেক আগেই ভিড় জমে গেছে। সামিয়ানার ভিতরে আর লোক ধরবে না বলেই মনে হয়। সবচেয়ে বেশি ভিড় করেছেন বয়স্ক ভদ্রলোকেরাই।

সাতটায় আরম্ভ হবে বিল্বমঙ্গল। সাতটা বাজবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগেই চলে এসেছেন দুই সাহেব, লিস্টার আর লোসি। শৈলেশই এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে দুই সাহেবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। সামনের সারির ঠিক মাঝখানে, সিংহাসনের মত দেখতে দুটো প্রকাণ্ড চেয়ারে দুই সাহেব বসলেন। এই স্পেশাল চেয়ার দুটোকে শৈলেশই কুমার সাহেবের বাড়ি থেকে আনিয়ে রেখেছিল।

বিমল অভয় নীহার আর শেখর—ওরা হলো ভলান্টিয়ার। শৈলেশ যেমন সাহেব দুজনকে আপ্যায়িত করবার কাজে ব্যস্ত হয়ে আছে; ওরা তেমনই ওদের বাণীদিকে আপ্যায়িত করবার কাজে ব্যস্ত। মেয়েদের জায়গাটা যে চিক দিয়ে আড়াল করা, সেই চিকের বাইরে একটা চেয়ারের উপর বসেছে বাণী। পেট্রন শৈলেশও আজ যেন হেড ভলান্টিয়ারের মত ঘুরে ফিরে দেখা-শোনা করছে, আর মাঝে মাঝে সাহেবদেরই কাছের একটা চেয়ারে বসছে।

ধীরেন হঠাৎ এসে শৈলেশের কানের কাছে যেন একটা চাপা আর্তনাদের স্বরে কথা বলে। শৈলেশের চোখে-মুখেও যেন একটা আতঙ্ক চমকে ওঠে।

কি-যেন ভাবে আর ভাবতে গিয়ে ছটফট করে শৈলেশ। তারপরেই উঠে এসে বিমলকে ডাক দেয়—এখনই যাও, এই মুহূর্তে প্রকাশ মাস্টারকে ডেকে নিয়ে এস। আমার নাম করে বলবে, আমি ডাকছি।

চলে যায় বিমল। শৈলেশ আর ধীরেনও ব্যস্তভাবে বাইরে চলে যায়।

সাতটা বাজতে আর আধ মিনিট বাকি। শৈলেশ আবার ব্যস্তভাবে ফিরে এসে সাহেবদের পাশের চেয়ারে বসে। বিমল ছুটে এসে বাণীর কাছে এসে হাঁপাতে থাকে। যেন খুশি হয়ে হাঁপাচ্ছে বিমলের চোখ দুটো। নীহার শেখর অভয় বলে—কি ব্যাপার? বাণী বলে—কি হয়েছে বিমল?

বিমল বলে—বিল্বমঙ্গল হবেন যিনি, সেই পরেশদাই হঠাৎ পড়ে গিয়ে আর জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়েছেন। কাজেই, প্রকাশদা বিল্বমঙ্গল হবেন।

—সে কি! চেঁচিয়ে ওঠে নীহার আর শেখর।

অভয় বলে—পার্ট মুখস্থ নেই, কেমন ক'রে......!

বিমল—হ্যাঁ, তবু রাজি হয়েছেন প্রকাশদা।

সাতটা বাজতেই ড্রপ সীন উঠলো। অভিনয় শুরু হলো। এক বর্ণও বাংলা বোঝেন না, তবু দুই সাহেবও যেন মুগ্ধ হয়ে দেখছেন আর শুনছেন। অভয়ের কানের কাছে ফিসফিস করে বিমল—প্রকাশদা যে সত্যিই মাত্ করে দিচ্ছেন।

প্রথম ড্রপ পড়ে যাবার পর দুই সাহেব চলে গেলেন। কিন্তু, বয়স্ক ভদ্রলোকদের ভিড়টা সে-জন্য একটুও হালকা হয়ে গেল না, অথচ এই ভিড়টা হলো, ঐ দুই সাহেবের থিয়েটার-দেখা দেখবার ভিড়।

অভয় বলে—দেখছিস বিমল, মেজ-কাকাও কেমন চুপটি করে আর হাঁ করে বসে আছেন।

শেখর—প্রকাশদার বিল্বমঙ্গল দেখে একেবারে জমে গিয়েছেন মনে হচ্ছে।

নীহার বলে—কারও সাধ্য নেই যে উঠে যায়।

আবার শুরু হয়েছে অভিনয়। বিল্বমঙ্গলের চোখে জল। বিল্বমঙ্গলের গলার স্বর কি-ভয়ানক ব্যাকুল হয়ে ছটফট করছে—আমি অতি দীন, আমি অতি হীন। হে রাখাল, জান যদি বল, হৃদয়ের আলো, কোথা বনমালী কালো? দাও এনে দাও, প্রেম-ক্ষুধা তৃপ্ত কর মোর।

হাততালি দিল অভয় আর বিমল; শেখর আর নীহারও হাততালি দিয়ে ফেলতো; কিন্তু হাততালি আর হাততালির উৎসাহ সেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। ভ্রূকুটি করে ছুটে এসে ধমক দেয় শৈলেশ—স্টপ! স্টুপিড!

অভয় বলে—কি দোষ হলো শৈলেশদা?

—চুপ! রুক্ষ স্বরে আবার ধমক দেয় শৈলেশ।

মাথা হেঁট করে আর চুপ করে বসে থাকে অভয়। বিমল নীহার আর শেখরের মুখও যেন হঠাৎ চড়-খাওয়া মুখের মত লালচে হয়ে ওঠে।

চলে যেতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় শৈলেশ। চমকে উঠেছে শৈলেশের চোখ দুটোও। ওভাবে অমন করে স্টেজের দিকে তাকিয়ে আছে কেন বাণী? কি দেখছে বাণী? বাণীর চোখে পাতা পড়ে না কেন?

.ক শুনেছে বাণী? বাণীর চোখ ছলছল করে কেন?

শৈলেশের চোখের ভ্রুকুটি একবার ছটফট করে শিউরে ওঠে। চলে যায় শৈলেশ। নিজের চেয়ারে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

থিয়েটার ভাঙবার পর বাণীকে সঙ্গে নিয়ে আর গম্ভীর হয়ে যখন চলে যেতে থাকে শৈলেশ, তখন বিমল শেখর আর নীহার অভয়কে সামলাতে গিয়ে হয়রান হতে থাকে। আপত্তি আর অনুরোধ কিছুই শুনতে চাইছে না অভয়। অভয় যেন একটা বিদ্রোহ। —না না, আমি বলবোই।

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললো অভয়। —হাততালি একদিন শুনতেই হবে। এর চেয়ে আরও ভাল হাততালি।

মুখ ফিরিয়ে পিছনের দিকে একবার তাকায় শৈলেশ। চোখের ভ্রুকুটি আর একবার শিউরে ওঠে।

[দশ]

মহিম-ভবন, তার মানে স্কুল সেক্রেটারী শৈলেশের বাড়ি আজ একটা উৎসবের বাড়ি। শৈলেশের বিয়ের দিনে যে-রকমের চাঞ্চল্য আর হর্ষ নিয়ে এই মহিম-ভবন মুখর হয়ে উঠেছিল, আজ আবার প্রায় সেইরকমেরই মুখর হয়ে উঠেছে। কত লোক আসছে হাসছে আর চলে যাচ্ছে। মহিলারা আসছেন, প্রবীনা নবীনা সকলেই। চায়ের পেয়ালার শব্দ সকাল থেকেই ঝনঝন করছে। ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টি আসছে আর ফুরিয়ে যাচ্ছে।

মহিম-ভবনের দুটি মানুষের জীবনের ঘটনা বটে, কিন্তু এই ছোট শহরের জীবনেরও দুটো গৌরবের ঘটনা। বি-এ পাশ করেছে বাণী। খবরটা এসেছিল কাল দুপুর বেলাতেই। আর পাটনা থেকে কালিকাপ্রসাদবাবুর টেলিগ্রামটা এসেছিল কাল রাত্রি দশটায়; রায়সাহেব খেতাব পেয়েছে শৈলেশ।

মহিম-ভবনের বাইরের ঘর, যে-ঘরটা দু' বছর ধরে বাণীর পড়ার ঘর ছিল, সে-ঘরের টেবিলে আর শেলফে আজও বইগুলি সাজানো আছে। ঘরটাকে অনেক ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে।

—কই গো, আমাদের শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে কি করছেন? দুপুর হতেই বিমলের মা এসে আর ঘরের ভিতরে ঢুকে বাণীর গলা জড়িয়ে ধরেছেন।

বিকেল হবার পর বিমল শেখর নীহার আর অভয় আসে। অভয় বলে—আমরা কিন্তু রায়সাহেবকে সেলাম দিতে আসিনি বাণীদি।

বাণীদি হাসেন—তোমার রাগ এখনও পড়েনি দেখছি, অভয়।

অভয়—ও রাগ পড়বার নয়, বাণীদি; আপনি কিছু মনে করবেন না।

বিমল বলে—না অভয়, আজকের দিনে কোন রাগারাগির কথা নয়। ওসব কথা ভুলে যা।

শেখর বলে—হ্যাঁ, আজ যে আমাদের একটা গর্বের দিন।

বাণী হাসে—কিসের এত গর্ব, শেখর?

শেখর—গর্ব হলেন আপনি। আপনি এই শহরের গর্ব।

নীহার—আপনি আমাদেরও গর্ব।

বিমল—আপনি শৈলেশদারও গর্ব।

অভয়—আপনি প্রকাশদারও গর্ব।

ঘরের একটা জানলার কাচের পাট বন্ধ ছিল। ব্যস্তভাবে উঠে গিয়ে জানলার কাচের পাট দুটো খুলে দেয় বাণী। শেষ বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে ছুটে এসে ঘরের ভিতরে ঢোকে। টেবিলের উপর রাখা ফুলদানির ফুলের পাপড়ি শিউরে উঠতে থাকে।

বিমল বলে—প্রকাশদা এসেছিলেন নাকি, বাণীদি?

বাণী বলে—না। তোমরা খাবার না খেয়ে চলে যেও না। একটু বসো।

খাবার আনতে চলে যায় বাণী।

—বাণী; একটা মজার খবর আছে শুনে যাও। ও-ঘরের ভিতর থেকে ডাকছে শৈলেশ। সত্যিই একটা হাস্যোচ্ছল কৌতুকের ডাক, একটা ব্যাকুল খুশির ডাক।

বাইরে বের হবার জন্য তৈরী হয়েছে শৈলেশ। সাজ সারা হয়ে গিয়েছে। শৈলেশ হাসে—একটু কাছে এসে দাঁড়াও গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। কথাটা চেঁচিয়ে বলবার কথা নয়।

—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—যাচ্ছি সার্কিট হাউসে। আজ সন্ধ্যায় মিস্টার সাহেবকে একটা চা-পার্টি দেবার ব্যবস্থা করেছি। যাক্, কথাটা হলো, যে-কথাটা কোনদিন তোমাকে বলিনি। ইচ্ছে করেই চেপে রেখেছিলাম। কারণ, আমার দরকার ছিল কাজ হাসিল করা। তাই বাধ্য হয়ে চুপ করে ছিলাম, আর ঐ জোচ্চোর প্রকাশকে সহ্যও করেছিলাম।

চমকে ওঠে বাণী। চোখের তারা দুটোও দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে।

শৈলেশ—তুমি বোধহয় আগে বুঝতেই পারতে না, কেন আমি প্রকাশ মাস্টারের সম্পর্কে শক্ত কথা বলতাম। তুমি জানতে না বলেই বুঝতে পারতে না।

বাণী—আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

শৈলেশ বলে—আজ এখন আমি খুব ব্যস্ত; এখন আর হবে না। সন্ধ্যে হলেই পার্টি থেকে ফিরে এসে প্রকাশকে পুলিসের হাতে তুলে দেব।

—কি-ভয়ানক কথা বলছো?

—একটুও ভয়ানক কথা নয়।

—কেন?

—প্রকাশ বসু নামে ঐ মাস্টার প্রকাশও নয়, বসুও নয়, বি-এ'ও নয়।

—তার মানে?

—তার মানে একটা ঠগ। পৃথিবীতে প্রকাশ বসু নামে বি-এ পাশ এক ভদ্রলোক ঠিকই আছেন। তিনি রেঙ্গুনে মাস্টারী করেন।

—ইনি তবে কে?

—ইনি একটি ধাপ্পা; একটি ভ্যাগাবণ্ড।

—কবে এসব খবর জানলে তুমি?

—জেনেছি দু'বছর আগেই।

—তবে তখনই ওকে পুলিসে দিলে না কেন?

—সেটা এখনও বুঝতে পারছো না কেন?

—কেন?

—আমাদের সুবিধের জন্য ওকে এখানে আরও দুটো বছর রাখবার দরকার ছিল। এখন তো আর কোন দরকার নেই। আমি রায়সাহেবী পেয়ে গিয়েছি, তুমিও পাস করেছো।

—তোমার পায়ে পড়ি। চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলে বাণী।

—খুব ভুল করছো বাণী। একটা ঠগের জন্যে এসব সেণ্টিমেণ্টের কোন মানে হয় না।

—হলোই বা ঠগ, কিন্তু লোকটা তোমার আমার কত উপকার করেছে, ভেবে দেখ।

—সব ভেবে দেখেছি। আরও একটা কথা ভেবে দেখেছি, যেটা কোনদিন তোমাকে বলবো না।

কি-সাংঘাতিক একটা প্রতিজ্ঞার আগুন শৈলেশের চোখ দুটোতে জ্বলতে শুরু করেছে। বোধ হয় বাণীর এই কান্নাভেজা মুখটাকে একটা অভিশাপের মুখ বলে সন্দেহ করছে শৈলেশ। বোধহয় একটা ভয় পেয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে শৈলেশের সেই ভালবাসার চোখ, যে-চোখে একদিন এই বাণীর মুখটাকে স্বপ্নলোকের এক মেয়ের মুখ বলে মনে হয়েছিল।

বাণী বলে—তুমি এমন কি কথা ভেবেছ, যা আমাকে কোনদিন বলতে পারবে না? এমন কি কথাই বা থাকতে পারে?

—জিজ্ঞাসা করো না।

—ছিঃ, এমন ভুল করো না। বিশ্বাস কর, তোমার ভাববার কিছুই নেই।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। দোহাই তোমার, লক্ষ্মীটি, তুমি প্রকাশ মাস্টারকে পুলিসের হাতে দিও না। ওকে চুপে চুপে তাড়িয়ে দাও।

—কি বললে?

—চুপে চুপে চোরের মত এসেছিল, চুপে চুপে চোরের মতই চলে যাক্, লোকটা। ওকে
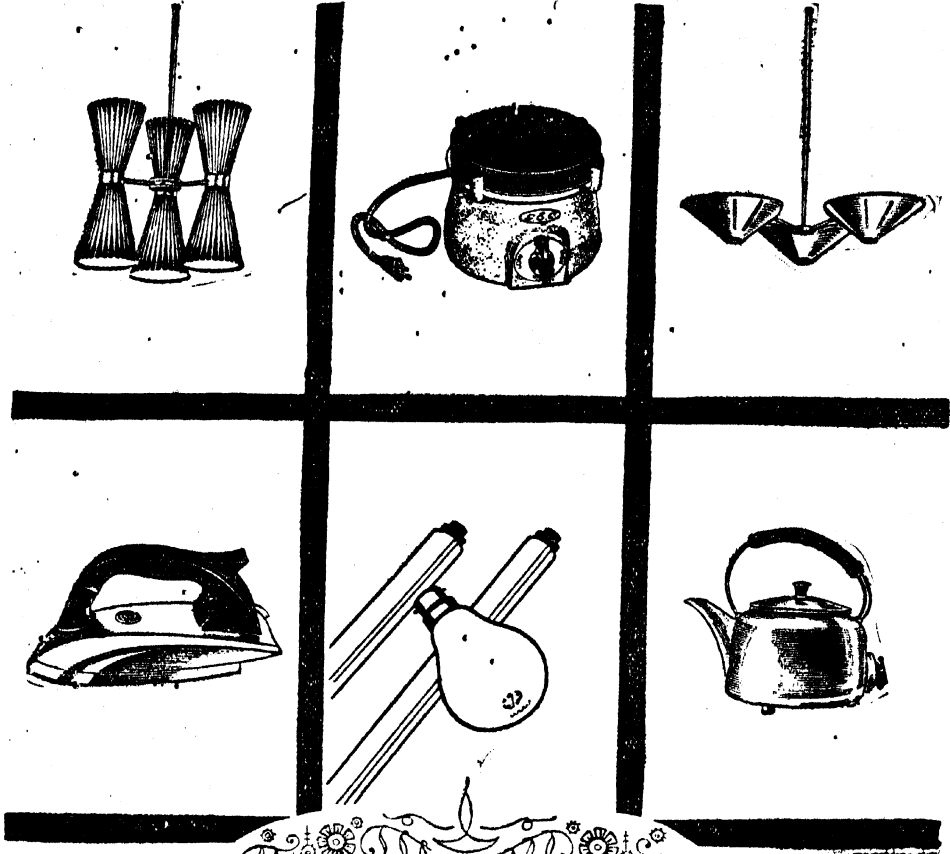
পুলিসে দিয়ে আমাদের কি লাভ?

—লাভ আছে।

—কিছুছু লাভ নেই। বাণীর গলার স্বর যেন ধুলোয় লুটিয়ে পড়া একটা আহত প্রাণীর গলার স্বর।

—লাভ আছে। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। শৈলেশের গলার স্বরও যেন একটা পাথরের প্রতিজ্ঞার স্বর।

—না। কোন লাভ নেই। বরং......।

—কি?

—ক্ষতি হবে?

—কার ক্ষতি?

—তোমার ক্ষতি, আমার ক্ষতি।

—বাজে কথা।......আমি চলি।

শৈলেশের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বাণী—ভুল করো না।

চোখ দুটো উদাস করে, যেন একটা মৃত্যু-ভয় থেকে বাঁচবার জন্য আবেদন করছে বাণী। কি-ভয়ানক করুণ হয়ে কাঁপছে বাণীর কথাগুলি, ভুল করো না।

শৈলেশ বলে—তুমি এক কাপ চা খেয়ে আর সুস্থ হয়ে একটু ভাব, কোথায় বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে; পুরীতে না সিমলাতে?

বাণীর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চলে যায় শৈলেশ।

দেখে আশ্চর্য হয় বিমল আর অভয়, শেখর আর নীহার। মিষ্টি খাবার আনতে গিয়ে নিজেই যেন একেবারে তেতো হয়ে গিয়েছেন বাণীদি। হাতে খাবারের ডিস নেই, শূন্য হাতে যেন একটা শূন্যতাকে আঁকড়ে ধরে, আর বেশ উতলা হয়ে ভিতরের ঘরের দিক থেকে ছুটে এলেন। এই তো এই মাত্র, বাইরে বের হয়ে গেলেন শৈলেশদা, কিন্তু এরই মধ্যে ভিতরের ঘরের জীবনে এমন-কি কান্ড হয়ে গেল, যে-জন্য এরকম একটা অদ্ভুত আর আলুথালু মূর্তি নিয়ে বের হয়ে এলেন বাণীদি?

পড়ার ঘরের খোলা জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে আর শেষ বিকেলের রাঙা আলো ছড়ানো সামনের মাঠটার দিকে তাকিয়ে ছটফট করে বাণী। —বিমল!

—বলুন।

—তোমাদের প্রকাশদা কোথায় কতদূরে থাকেন?

চেঁচিয়ে ওঠে অভয়—এই তো, এখান থেকে বড় জোর বিশ মিনিট; টেম্পল্ রোড পার হয়েই......।

—আমাকে এখনি একবার নিয়ে যেতে পারবে?

—কোথায়?

—তোমাদের প্রকাশদার বাড়িতে।

—নিশ্চয়।

জানালার গরাদটা আঁকড়ে ধরে বাণী। —না থাক্,......তবে একটা কাজ কর।

—বলুন।

—প্রকাশদাকে এখনি একবার ডেকে নিয়ে আসতে পারবে?

—খুব পারবো।

জানালার গরাদ ছেড়ে দিয়ে, দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, আর জোরে একটা হাঁপ ছেড়েই চেঁচিয়ে ওঠে বাণী—না থাক্।......তবে একটা কাজ কর।

—বলুন।

—তোমরাই যাও। গিয়ে বল যে, এক্ষুনি যেন এই শহর ছেড়ে চলে যান প্রকাশদা। এক মিনিটও যেন দেরি না করেন। বলবে, আমি বলেছি।

—কেন বাণীদি?

বাণী—না চলে গেলে ধরা পড়ে যাবেন তোমাদের প্রকাশদা। বিপদ হবে। পুলিস আসবে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে বাণী।

বিমল বলে—আমরা এখনি যাচ্ছি।

—হ্যাঁ, যাও লক্ষ্মী ভাই। কিন্তু শুধু প্রকাশদাকেই বলবে; আর কাউকে এসব কথা বলবে না।

—কখ্খনো না।

ছুটে চলে যায় বিমল আর নীহার, শেখর আর অভয়। টেম্পল রোড পার হয়ে যেতে দশ মিনিটও লাগে না।

ঘরের ভিতরেই বসে ছিল প্রকাশ মাস্টার। বিমল আর অভয়ের উদ্বেগের বার্তা শুনে চমকে ওঠে; তারপরেই হাসতে থাকে। —এখুনি যাচ্ছি।

বিমল—কিন্তু আপনি চলে যাবেন কেন স্যার?

প্রকাশ—কেন? তোমাদের বাণীদি কিছু বলেন নি?

নীহার—না।

প্রকাশ হাসে—আমি বি-এ পাস-টাস নই। মিথ্যে কথা বলে তোমাদের স্কুলের সেকেণ্ড স্যার হয়েছিলাম।

আলনা থেকে শুধু কামিজটাকে তুলে নিয়ে গায়ে দেয় প্রকাশ। ঘরের আর কোন জিনিসের দিকে তাকায় না। ঘরের ভিতরে আর কোন জিনিস আছে বলে যেন মনেই করতে পারছে না; চোখেই দেখতে পাচ্ছে না।

ঘরের বাইরে এসে দরজার কপাটটাকে শুধু ভেজিয়ে দেয় প্রকাশ। একটা তালাও লাগায় না।

অভয় বলে—সত্যিই চলে যাচ্ছেন স্যার?

প্রকাশ—নিশ্চয়।

বিমল—তাহলে প্রণাম করি স্যার?

চোখ বড় করে হেসে ফেলে প্রকাশ—আমাকে প্রণাম করবে? কর তাহলে।

চার ছাত্র প্রণাম করে। ভুয়া বি-এ, নাম-ভাঁড়ানো এক কপট সেকেণ্ড স্যার একটুও বিহ্বল বা বিচলিত না হয়ে, বরং, হেসে হেসে যেন বুকভরা একটা তৃপ্তির ভারে নম্র হয়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যেতে থাকে।

অভয় বলে—বাণীদিকে কিছু বলতে হবে স্যার?

প্রকাশ—না।

কোথায় কোন্ দিকে চলে গেলেন সেকেণ্ড
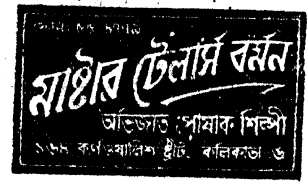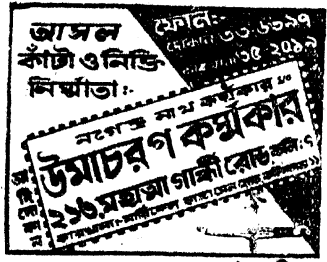
স্যার প্রকাশদা, কে জানে? রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে এসে, স্কুলের মাঠের কাছে পৌঁছতেই মনে হয়, প্রকাশদা যেন আবছায়াময় সন্ধ্যাটার বাতাসে চিরকালের মত মিশে গিয়েছেন।

মাঠের ঘাসের উপর লুটিয়ে বসে পড়েই অভয় বলে—প্রকাশদাকে এতদিনে চিনতে পারা গেল। বাণীদির জন্যেই......।

বিমল—তার মানে?

অভয়—বাণীদি চলে যেতে বললেন বলেই চলে গেলেন প্রকাশদা।

নীহার—কিন্তু বাণীদিকে তো জানিয়ে দেওয়া উচিত।

শেখর—কি?

নীহার—প্রকাশদা সত্যিই চলে গিয়েছেন।

অভয়—ঠিক কথা।

[এগার]

মহিম-ভবনের ফটকে ঢুকতে গিয়েই চমকে উঠে এক পাশে সরে বিমল আর অভয়, নীহার আর শেখর। কি ভয়ানক স্পীড নিয়ে আর কি-সাংঘাতিক হর্ন বাজিয়ে চিৎকার করে ছুটে আসছে শৈলেশদার গাড়িটা। যেন রেগে ধক্ ধক্ করে জ্বলছে শৈলেশদার গাড়ির হেডলাইট দুটো। ফটকের কাছে এসে গাড়িটা যেন পাগল মাতালের মত একটা প্রচণ্ড ভিরমি খেয়ে টার্ন নিল; চার চাকার ঘষা খেয়ে কাঁকর ছিটকে পড়লো চারদিকে।

গাড়ি থেকে নামছেন শৈলেশদা, মহিম-ভবনের ফটকের কাছেই দাঁড়িয়ে ওরা দেখতে পায়। বাণীদির পড়বার ঘরে যে আলো জ্বলছে, তা'ও দেখা যায়: আর, একটু এগিয়ে যেয়েই দেখা যায়, হ্যাঁ, বাণীদি চুপ করে ঐ ঘরেই একটা চেয়ারে বসে আছেন। বাণীদির সুন্দর মুখটা এই একবেলার মধ্যেই যেন দুপুরের রোদে পোড়া ফুলের মত শুকিয়ে ঝিরঝির করছে।

শুনতে পাওয়া যায়, শৈলেশদার জুতোর শব্দ যেন বাইরের বারান্দার মেজেটাকে ঠুকে-ঠুকে অন্যদিকের ঘরের ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে সেই আক্রোশের পদাঘাত আবার শব্দ ক'রে ক'রে বের হয়ে এসে বাণীদির ঘরের দিকে চললো। বারান্দার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে শৈলেশদার চেহারাটা যেন একটা কালো পাথরের চেহারার মত শক্ত হয়ে সেই ঘরের ভিতরে ঢুকলো, যে-ঘরের ভিতরে একটি চেয়ারে বাণীদি চুপ করে বসে আছেন, আর টেবিলের উপরে একগাদা বই স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে।

অভয় ডাকে—আয় বিমল। নীহার শেখর, শিগ্‌গির আয়।

একেবারে নিথর হয়ে, বারান্দার অন্ধকারের সঙ্গে গা মিশিয়ে দিয়ে, এক ভুয়া সেকেণ্ড স্যারের চারটি দুরন্ত ছাত্র যেন ওদেরও এক দুঃসহ কৌতূহলের সমাপ্তি দেখবার লোভে চার-জোড়া চোখ সুস্থির করে আর উঁকি দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

শৈলেশ বলে—আমি থানা থেকে আসছি। পুলিস বললে, লোকটা পালিয়েছে।

বাণীদি—কখন্ পালালো?

শৈলেশ—সেটা পুলিস জানে না, কিন্তু তুমি জান।

বাণীর মাথাটা হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে।

শৈলেশ—কথা বল। উত্তর দাও।

মুখ তোলে বাণী—কি বলবো?

শৈলেশ—কখন্ পালালো লোকটা?

বাণী—তা জানি না।

শৈলেশ—কখন্ পালিয়ে যেতে বলেছিলে তুমি?

উত্তর দেয় না বাণী।

শৈলেশ—তুমি নিজে গিয়ে বলেছিলে?

বাণী—না।

শৈলেশ—লোকটা নিজেই এসেছিল?

—না।

—লোকটাকে তুমি ডেকে পাঠিয়েছিলে?

—না।

—তবে?

—বলে পাঠিয়েছিলাম।

—কা'কে পাঠিয়েছিলে?

—বিমল অভয় আর......।

—তোমার সেই চারটে বকাটে আর আদুরে এজেণ্টকে?

কথা বলে না বাণী।

শৈলেশ—উত্তর দাও।

বাণী—কি?

—তুমি কেন লোকটাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলে?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় বাণী। বোধহয় অন্য ঘরে চলে যেতে চায়। বাণীর দিকে দু'পা এগিয়ে যেয়ে আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ায় শৈলেশ।

বারান্দার অন্ধকারে ফিসফিস করে বিমল—অভয়, শৈলেশদার হাতে একটা বেত।

অভয় বলে—চুপ।

শৈলেশ বলে—ঐ লোকটাকে পুলিসে দিলে তোমার কি ক্ষতি হতো?

শৈলেশের মুখের দিকে শুধু অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে বাণী, কোন উত্তর দেয় না।

চেঁচিয়ে ওঠে শৈলেশ—কষ্ট হতো?

বাণী—হতো।

দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে শৈলেশ—কেন কষ্ট হতো? লোকটা তোমার কে?

বাণী—টিউটর।

শৈলেশ—তোমার শ্রদ্ধা?

বাণী—হ্যাঁ।

—তোমার কৃতজ্ঞতা?

—নিশ্চয়।

—তোমার মায়া?

—তাই।

শৈলেশের হাতের চকচকে বেতটা যেন একটা হিংস্র আক্রোশের বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে বাণীর মুখের উপর আছড়ে পড়ে। —বল, তোমার ভালবাসা?

বাণী বলে—হ্যাঁ।

বাইরের বারান্দার অন্ধকার যেন সেই মুহূর্তে পাল্টা হিংসার আনন্দে, প্রতিশোধের উল্লাসের মত হাততালি দিয়ে ফেলে। অভয়ের হাত চেপে ধরে বিমল—চুপ চুপ চুপ।

শৈলেশের হাতের বেত কাঁপছে। —হাততালি দিল কে? অভয়?

বাণীর বাঁ মুখের একটা দিকে, কপাল থেকে বাঁ চোখের পাশ দিয়ে গাল পর্যন্ত লম্বা একটা লালচে দাগ যেন ধিকধিক করে জ্বলছে। কিন্তু বাণীর মাথাটা একটুও কাঁপে না, মাথাটা হেঁটও করে না বাণী। আর চোখ দুটো যেন নির্বিকার নির্ভয় আর শান্ত দুটো অপলক চোখ।

শৈলেশের হাতের বেতটা মরা সাপের মত ঝুপ করে মেজের উপর পড়ে যায়। শৈলেশের কঠোর চেহারাটাও হঠাৎ একেবারে অলস হয়ে চেয়ারের উপর অসহায়ের মত বসে পড়ে।

দরজার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে বাণী।

শৈলেশ—মুখের উপর ঐ দাগ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? সবাই যে দেখে ফেলবে?

বাণী—সবাই দেখুক, তুমি একা দেখবে কেন?

দরজার কাছে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় বাণী। যেন হোঁচট খেয়েছে বাণী। মুখ ফিরিয়ে তাকায় বাণী। ঠিকই, ভয়ানক একটা শব্দ করে শৈলেশের একটা অদ্ভুত নিঃশ্বাস বেজে উঠেছে।

ফিরে এসে শৈলেশের চেয়ারের কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাণী। শৈলেশের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে; তার পরেই ঘরের শেলফের দিকে তাকিয়ে কি-যেন খুঁজতে থাকে বাণী।

বিমল বলে—দেখ দেখ অভয়, বাণীদি কি করছেন?

অভয়—কি আশ্চর্য, শৈলেশদাকে পাখার বাতাস দিচ্ছেন কেন বাণীদি?

বিমল—শৈলেশদার চোখ দুটো যে ছল-ছল করছে।

অভয়—হাততালি দেব?

বিমল—থাক্।

অভয়—কিন্তু......

বিমল—কি?

অভয়—বাণীদিকে কিন্তু ঠিক চিনতে পারা গেল না।

শিল্পী : শ্রীগোপাল ঘোষ

সতেরই শ্রাবণ।

আজ আমার জন্মদিন। জীবনের পঁচিশটা বছর কাটিয়ে ছাব্বিশ বছরে পা দিলুম। শতাব্দীর সিকি'ভাগ কেটে গেল। কী পেলুম? কী দিলুম?

বাইরে ঘনঘোর বর্ষা নেমেছে। ঝর্‌ঝর্‌ ঝম্‌ঝম্‌ একটানা বৃষ্টি। রাত্রি এখন দশটা, এরই মধ্যে কলকাতা শহর নিঝুম হয়ে পড়েছে। রাস্তায় লোক নেই, গাড়ি চলাচল নেই। কেবল রাস্তার ধারের আলোগুলো নিজের নিজের মাথার চারপাশে জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার জন্মদিনে প্রতি বছর বৃষ্টি হয়। ভরা শ্রাবণ মাসে যার জন্ম তার জন্মদিনে বৃষ্টি হলে আশ্চর্য কিছু নেই। কিন্তু আমার জীবনে এমন একটা জন্মদিন আসেনি যেদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়েনি। বাবা বলতেন, আমি যেদিন জন্মেছিলুম সেদিনও নাকি আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়েছিল। মা আমার নাম দিয়েছিলেন—বাদল। যতদিন বেঁচে ছিলেন আমাকে 'বাদল' বলেই ডাকতেন। আমার মা! তিনি আজ কোথায়! আর আমার বাবা—তিনিও চলে গেছেন। আমাকে আর 'বাদল' বলে ডাকবার কেউ নেই। এখন আমি মিস্‌ প্রিয়ংবদা ভৌমিক।

কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সে প্রিয়ংবদা ভৌমিক ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেছে কেন? যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, অনেক দেখেছেন, অনেক কাজ করেছেন, তাঁরা নিজের জীবনচরিত বা ডায়েরি লিখলে শোভা পায়। কিন্তু প্রিয়ংবদা ভৌমিক সামান্য একজন নার্স, সে ডায়েরি লেখে কোন্‌ পর্যায়? কী আছে তার জীবনে? রোগীর শুশ্রূষা করা তার জীবিকা; রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো টেম্‌পারেচার নেওয়া, রাত জেগে পাহারা দেওয়া, এই তার কাজ। তবে সে ডায়েরি লেখে কেন?

এর উত্তর খুব জোরালো নয়, তবু একটা উত্তর আছে। আমি কাজের সময় মন দিয়ে কাজ করি, মনটা কাজেই লিপ্ত

থাকে। কিন্তু কাজ যখন থাকে না তখন মনটাকে নিয়ে কী করব ভেবে পাই না। আমার বন্ধু শুক্লাও আমার মত নার্স; আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি। কিন্তু দুজনের একসঙ্গে ছুটি পাওয়া ঘটে ওঠে না। তাছাড়া তার—তার মনের যাহোক একটা আশ্রয় আছে; আমার কিছুই নেই। দৈবাৎ যখন দুজনে একত্র হতে পারি তখন খুব গল্প করি। কিন্তু সে কতটুকু? বেশীর ভাগ সময় মনটা খালি পড়ে থাকে। তাই ঠিক করেছি ডায়েরি লিখব। নাই বা পড়ল কেউ; আমি নিজের মনের সঙ্গে কথা বলব। তবু তো একটা কিছু করা হবে।

ডায়েরির আরম্ভে নিজের জীবনের গোড়ার কথাগুলো লিখে রাখি। আমি কে সেটাও তো নিজেকে জানিয়ে রাখা দরকার।

জন্মেছিলুম পূর্ববঙ্গে; জীবনের প্রথম ষোলটা বছর সেখানেই কেটেছে। বাবা ছিলেন কবিরাজ, খুব পসার ছিল। মা মারা যান যখন আমার বয়স পাঁচ বছর। বাবা আর বিয়ে করেননি। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান; বাবা আমাকে নিজের হাতে মানুষ করেছিলেন। লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন। ষোল বছর বয়সে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছিলুম।

ম্যাট্রিক পাস করবার কিছুদিন পরে হঠাৎ আমরা কলকাতায় চলে এলুম। তখনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হয় নি। কিন্তু বাবা বুঝতে পেরেছিলেন প্রচণ্ড দুর্যোগ আসছে। তিনি বাড়ি-ঘর বিক্রি করে সঞ্চিত টাকাকড়ি নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। তার কয়েকমাস পরেই দুরন্ত কালবোশেখী ঝড়ের মত মহাদুর্যোগ এসে পড়ল. দেশ দু ভাগ হবার সূত্রপাত হল। সেই সময় এই কলকাতার রাস্তাঘাটে যে অকথ্য বর্বরতা দেখেছি তা ভোলবার নয়।

বাবা এখানে এসে আবার কবিরাজী ব্যবসা খুলে বসেছিলেন, কিন্তু আর পসার হল না। পুঁজি ভেঙে সংসার চলতে লাগল। বাবা ভারি বিচক্ষণ ছিলেন, দূরদর্শী ছিলেন; তিনি আমাকে কলেজে ভর্তি করলেন না, বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ভেবেছিলেন, পুঁজি ফুরোবার আগে যদি আমার একটা সদ্‌গতি করতে পারেন তাহলে তাঁর একলার জীবন কোনোরকমে কেটে যাবে।

যোগ্য ঘর-বর কিন্তু জুটল না। আমি সুন্দরী না হতে পারি, কিন্তু একেবারে স্যাওড়াগাছের পেত্নীও নই। রঙ ফরসা, মুখ চোখ গড়ন কোনোটাই নিন্দের নয়। তাছাড়া বাবা টাকা খরচ করতে রাজী ছিলেন। তবু আমাকে বিয়ে করতে কেউ

রিম্ ঝিম্

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এগিয়ে এল না। তার কারণ, আমার একটা মারাত্মক দোষ ছিল; আমি পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা মেয়ে। তখনকার দিনে পূর্ববঙ্গ থেকে যে-মেয়ে পালিয়ে এসেছে তার দৈহিক শুচিতা সম্বন্ধে সকলের মনেই সন্দেহ। আমি যে দাঙ্গা আরম্ভ হবার আগেই পালিয়ে এসেছিলাম, এ কথায় কোনও বরকর্তাই কান দিলেন না।

কলকাতায় আসার পর বাবার শরীর আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করেছিল। ছিলেন রোজগেরে মানুষ, এখানে এসে রোজগার নেই। তার ওপর আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কলকাতার জলহাওয়াও তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে অসুখে পড়েন, আমি সেবাশুশ্রূষা করি। তিনি সেরে ওঠেন, আবার কিছুদিন পরে অসুখে পড়েন। এই ভাবে বছর দেড়েক কেটে গেল।

একদিন বাবা অম্বলের ব্যথা নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আমি পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলুম। তিনি একবার বালিশ থেকে মাথা তুলে আমার পানে তাকালেন, আস্তে আস্তে বললেন, 'তুই বেশ সেবা করতে পারিস। নার্সের কাজ শিখবি?' এই বলে যেন একটু লজ্জিতভাবে আবার বালিশে মাথা রাখলেন।

বুঝতে পারলুম, রোগের মধ্যেও তিনি আমার কথাই ভাবছেন। হয়ত রোগের মধ্যে নিজের মৃত্যু-চিন্তা মনে এসেছে; ভাবছেন তিনি যদি হঠাৎ মারা যান তখন আমার কী গতি হবে। তাঁর মেয়ে নার্স হবে এ চিন্তা তাঁর কাছে সুখের নয়। কিন্তু উপায় কী? ভাল ঘরে-বরে যখন বিয়ে দিতে পারলেন না তখন একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে তো, যাতে আমি ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে পারি।

তাঁর প্রশ্নে আমার চোখে জল এল। কান্না চেপে বললুম, 'হ্যাঁ বাবা, শিখব। সেবা করতে আমার খুব ভাল লাগে।'

বাবা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেই ভাল। সেরে উঠি, তারপর চেষ্টা করব।' একটু থেমে আবার বললেন, 'নার্সের কাজ খুব ভাল কাজ। মানুষের সেবা, রুগ্ন মানুষের সেবা; এর তুল্য কাজ আছে!' কিন্তু তাঁর কথায় খুব জোর পৌঁছল না।

মাসখানেক পরে প্রোবেশনার নার্স হয়ে নার্সদের কোয়ার্টারে উঠে এলুম। তিন বছরের কোর্স, তিন বছর পরে পাকা নার্স হয়ে বেরুব। নার্সদের হস্টেলে একটি ঘর পেলুম। আমাদের ওপর নিয়মের খুব কড়াকড়ি, সব কাজ কাঁটা ধরে হয়। কাজের সময় ছাড়া নার্সরা ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে পারে না। হপ্তায় এক বেলা ছুটি। আমি ছুটির এক বেলা বাড়ি যেতুম, বাবার কাছে তিন-চার ঘণ্টা থেকে আবার হস্টেলে ফিরে আসতুম।

হস্টেলে শুক্লার সঙ্গে ভাব হল। সে আমার চেয়ে এক বছরের সীনিয়র। দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয়, কিন্তু মুখখানি ভারি মিষ্টি আর মমতা-ভরা। এত মমতা নিয়েও জন্মেছিল পোড়ারমুখী, নিজের জীবনটা ভাসিয়ে দিলে।

হস্টেলে অনেক প্রোবেশনার মেয়ে ছিল; একজন টিউটর-সিস্টর ছিলেন। আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে দাঁড়াল শুক্লা। লিখতে লজ্জা করে, কিন্তু এমন সময় এল যখন আমার মনে শুক্লা আমার বাবার চেয়েও বেশী জায়গা জুড়ে বসল। কেন এমন হয় কে জানে! হয়ত যৌবনে মানুষ চায় সমবয়সী মানুষের সঙ্গ। বুড়োরাও কি তাই চায়?

কী জানি! বাবাকে লক্ষ্য করেছি, তাঁর কোনও সমবয়স্ক বন্ধু ছিল না; দু-চারজন পরিচিত লোক ছিল। সারা হপ্তা তিনি আমার পথ চেয়ে থাকতেন; যেন আমার জন্যই বেঁচে ছিলেন। তাঁর ভালবাসার কথা যখন ভাবি, নিজেকে বড় অকৃতজ্ঞ আর হৃদয়হীন মনে হয়। তাঁর স্নেহের কী প্রতিদান দিয়েছি আমি?

দিন কাটছে। হস্টেলে থাকি, ক্লাসে লেকচার শুনি, হাসপাতালে কাজ শিখি। রাত্তিরে যখন হস্টেলের আলো নিভে যায় তখন শুক্লা চুপিচুপি আমার ঘরে আসে, নয়ত আমি শুক্লার ঘরে যাই। দুজনে মুখোমুখি বিছানায় শুয়ে ফিস্‌ফিস্ করে গল্প করি। কী মাথামুণ্ডু গল্প করি তা জানি না। কোনও দিন গল্প করতে করতে রাত বারোটা বেজে যায়।

হাসপাতালে যখন কাজ করতে যাই, অনেক ছাত্র এবং ডাক্তারের সঙ্গে কাজ করতে হয়। তাছাড়া রোগী ত আছেই। রোগীরা বেশীর ভাগ গরিব বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কী অবস্থার পড়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তাই ভেবে আমার বড় কষ্ট হত। ডাক্তারেরা বেশীর ভাগই তাড়াহুড়ো করে রোগী দেখে চলে যেতেন। ছাত্রেরা বেশ মন দিয়ে দেখত; কিন্তু তাদেরও ছিল নির্লিপ্ত ভাব। তারা যেন রোগটাকেই দেখত, রোগীকে দেখত না।

ছাত্রেরা ইউনিফর্ম-পরা নার্সদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে, কিন্তু নার্সদের যেন মানুষ বলে লক্ষ্য করে না। আমরা যেন কলের পুতুল। দু-একজন লক্ষ্য করে। তাদের চোখ ভোমরার মতন এক নার্সের মুখ থেকে আর-এক নার্সের মুখে ঘুরে বেড়ায়, মধুর সন্ধান করে। এরা যেন কলার ব্যাপারী, রথের মেলায় কলা বেচতে এসেছে। রথ দেখা কলা বেচা দুই কাজ একসঙ্গে করে।

একটি ছাত্র ছিল, তার নাম মন্মথ কর। পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র, শুনেছিলুম ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে। লম্বা মানানসই গড়নের চেহারা, চটপটে স্বভাব; অন্য ছেলের যে-কথা বুঝতে দশ মিনিট সময় লাগত, সে তা এক মিনিটে বুঝে নিত। তার চোখের দৃষ্টি ছিল আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে একটু হাসত।

আমার তখন যে বয়স সে-বয়সের মেয়েরা মনে মনে কল্পনার জাল বুনতে আরম্ভ করে। মন্মথ কর ভাল ছাত্র, তার চেহারা ভাল; সে আমার মতন একজন প্রোবেশনার নার্সের পানে চেয়ে মুখ টিপে হাসে কেন? আমার মন আমাকে তার পানে টানতে থাকে। তার ওপর চোখ পড়লে শরীরের রক্ত চনমন করে ওঠে; চোখ তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, আবার নিজের অজান্তেই তার দিকে ফিরে চায়। কিন্তু সবই চুপি-চুপি, মনে মনে। দরকারের কথা ছাড়া ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার হুকুম নেই; এমন কী তাদের পানে চেয়ে হাসলেও সেটা অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। একবার আমাদের দলের একটি মেয়ে একজন ছাত্রের সঙ্গে হেসে কথা বলেছিল, সিস্টার নীলিমাদিদি দেখতে পেয়েছিলেন। নীলিমাদিদি ভীষণ কড়াপ্রকৃতির। তখন মেয়েটিকে কিছু বললেন না, কিন্তু কাজ সারা হবার পর তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে যা বলেছিলেন তা আমরা পরে শুনেছিলুম। বলেছিলেন, 'ছাত্রদের মন ভোলাবার জন্যে তোমরা এখানে আসনি। ওসব বেহায়াপনা চলবে না। মনে রেখো একথা যেন দ্বিতীয়বার বলতে না হয়।'

আমরা সবাই নীলিমাদিদিকে যমের মতন ভয় করতুম। তাঁর কাছে বকুনি খায়নি এমন মেয়ে ছিল না। একদিন আমিও বকুনি খেলুম।

হাসি মস্করা বেহায়াপনার জন্যে নয়, কাজে ভুল করে-ছিলুম। দোষ আমারই। কিন্তু নীলিমাদিদির এমন নিষ্ঠুর

মন্মথ কর তেমনি খাটো গলায় বললে, 'আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে।'

বিঁধিয়ে কথা বলেন যে, মনে হয় তার চেয়ে দু' ঘা মারাও ভাল।

বকুনি খাবার পর হাসপাতালের পিছন দিকে নিরিবিলি একটা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। চোখ ফেটে জল আসছিল। মন্মথ করের সামনে না বকলে কি চলত না? এমন সময় পিছনে শব্দ শুনে ফিরে দেখি—মন্মথ কর। আমার কাছে এসে দাঁড়াল, চট করে একবার চারদিকে চেয়ে নিয়ে খাটো গলায় বলল, 'সিস্টার নীলিমাকে ধরে মার দিতে হয়।'

আমিও ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকালুম। কেউ যদি দেখে ফেলে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছাত্রের সঙ্গে কথা বলছি, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না; নীলিমাদিদি জানতে পারবেন, আবার আমার মুণ্ডুপাত হবে।

সে তেমনি খাটো গলায় বলল, 'আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে। কত নার্স তো রয়েছে, আপনি তাদের মত নয়।' এই কথা বলতে বলতে তার উজ্জ্বল চোখ দুটি হেসে উঠল।

আমার মনের মধ্যে ভীষণ টানাটানি চলেছে। একদিকে ইচ্ছে হচ্ছে পালিয়ে যাই, অন্যদিকে ইচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনি।

'আপনার নাম কী নার্স?'

'প্রিয়ংবদা'—এইটুকু বলে আমি ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেলুম।

কিন্তু মনটা সারাদিন নেশায় টলমল করতে রইল। তখন জানতুম না সেটা কিসের নেশা। শরীর যখন যৌবনের ডাকে আস্তে আস্তে জেগে উঠতে থাকে তখন তার একটা নেশা থাকে, ঘুম ভাঙার নেশা। এসব তখন কিছুই জানতুম না। কীই বা জানতুম তখন! সে আজ আট-নয় বছর আগেকার কথা। কী ন্যাকা যে ছিলুম ভাবলে হাসি পায়।

তার পর থেকে যখনই ওর সঙ্গে দেখা হয়, ও মুখ টিপে হাসে, মনে হয় যেন হাসিটা আরও ঘনিষ্ঠ, যেন ওর আর আমার মধ্যে একটা গোপন সম্বন্ধ হয়েছে। আড়ালে-আবডালে দেখা হয়ে গেলে চট করে দুটো কথা কয়ে নেয়—'কেমন আছেন?'... 'দুদিন দেখা পাইনি'—এই ধরনের কথা।

এই ভাবে দু-তিন মাস চলল। একদিন একটু বেশীক্ষণ কথা বলবার সুযোগ ঘটে গেল। দুপুরবেলা আমি দোতলার একটা ওয়ার্ডে কাজ সেরে বেরুচ্ছি, দেখি ও সিঁড়ির মাথায় [illegible]

নেই। একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলুম।

'কাল ত আপনার বিকেলবেলা ছুটি ?'

আমার গলা দিয়ে ধরা-ধরা আওয়াজ বেরুল, 'হ্যাঁ।'

'চলুন না, আমার সঙ্গে চা খাবেন।'

'অ্যাঁ—কোথায় ?'

'কোন একটা সাহেবী হোটেলে। আমি চারটের সময় এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু—ছুটির দিনে আমি বাবাকে দেখতে যাই।'

'ও! আপনার বাবা বুঝি কলকাতাতেই থাকেন? তা বেশ ত। আমার সঙ্গে চা খেয়ে আপনি বাবার কাছে চলে যাবেন। ঘণ্টাখানেক দেরি যদি হয়ই তাতে ক্ষতি কী ?'

আমি কী উত্তর দেব ভেবে পেলুম না। এতক্ষণে আমরা সিঁড়ির নীচে পৌঁছেছি। ও বলল, 'তাহলে ঠিক রইল। কাল চারটের সময় আমি আপনার হস্টেলের বাইরে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকব। কেমন?' একটু মুখ টিপে হেসে সে চলে গেল।

সারাদিন ওই কথাই মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। আগে কখনও একজন পুরুষের সঙ্গে হোটেলে গিয়ে চা খাইনি। এই চা-খাওয়ার অনুষ্ঠানের মধ্যে কত অজানা অভিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে। ভয়-ভয় করছে, আবার এই নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ পাবার জন্যে মনটা ছটফট করছে।

রাত্তিরে আলো নিভে যাবার পর শুক্লা এল আমার ঘরে। শুক্লার কাছে আমি কোন কথাই লুকোই না, কিন্তু কেন জানি না, এ-কথাটা তাকে বলতে পারলুম না, সঙ্কোচ হল, লজ্জা হল; এ যেন আমার একান্ত গোপনীয় কথা, কাউকে বলবার অধিকার নেই। চায়ের নেমন্তন্নর কথা মনে মনেই রাখলুম।

পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আজেবাজে গল্প হতে লাগল। নীলিমাদিদির মেজাজ আজকাল এমন হয়েছে যে কাছে যেতে ভয় করে।...হার্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর লালমোহন সরকার কয়েক দিন হাসপাতালে আসেননি, তাঁর নিজেরই হার্ট অ্যাটাক্ হয়েছিল।...তুই মেটার্নিটি শিখবি?...না ভাই, তার চেয়ে চাইল্ড নার্সিং...আজ মেটার্নিটি ওয়ার্ডে কী মজা হয়েছিল জানিস ?—

হঠাৎ শুক্লা বলল, 'হ্যাঁরে, মন্মথ কর তোর দিকে চেয়ে মুচকে হাসে কেন বল্ দেখি ?'

কিছুক্ষণের জন্যে কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেলুম। শেষে বললুম, 'তুই দেখেছিস ?'

শুক্লা বলল, 'দেখিনি আবার! আরও অনেকে হয়ত দেখেছে। কী ব্যাপার বল্।'

তখন আর উপায় রইল না, শুক্লাকে বললুম। চায়ের নেমন্তন্নর কথাও শোনালুম। শুনে শুক্লা বিছানায় উঠে বসল, চাপা গলায় তর্জন করে বলল, 'খবরদার প্রিয়া, ওর ফাঁদে পা দিসনি। সাংঘাতিক ছোঁড়া ওটা, যাকে বলে উল্‌ফ্—তাই।'

আমি বললুম, 'উল্‌ফ্! সে কাকে বলে? উল্‌ফ্ মানে ত নেকড়ে বাঘ!'

শুক্লা বলল, 'মানুষের মধ্যেও নেকড়ে বাঘ আছে। তারা কাঁচা বয়সের মেয়েদের ধরে ধরে খায়। মন্মথ কর হচ্ছে সেই নেকড়ে।'

বললুম, 'যাঃ! তুই ঠাট্টা করছিস। কী করে জানলি তুই ?'

শুক্লা বলল, 'আমাকেও ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। লেখাপড়ায় যেমন ভাল ছেলে, বজ্জাতিবুদ্ধিতেও তেমনি পাকা। আমাকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসত, তারপর একদিন আড়ালে পেয়ে বলল, তোমাকে বড় ভাল লাগে। নার্স ত অনেক আছে, কিন্তু তুমি তাদের মত নও। কিছুদিন পরেই চায়ের নেমন্তন্ন।'

সবই মিলে যাচ্ছে। আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল; তবু বললুম 'ওর মতলব খারাপ তা বুঝলি কী করে ?'

'নমিতা বলেছিল। নমিতাকে তুই দেখিসনি, তুই আসবার আগেই সে নার্স হয়ে বেরিয়ে গেছে। দেখতে ভাল ছিল, মনে ছিল প্রেমের খিদে। মন্মথ-নেকড়ে প্রায় তাকে মুখে পুরেছিল, নেহাৎ কপাল জোর তাই বেঁচে গেল।'

চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলুম, তারপর আবার শুয়ে পড়লুম। মনটা যেন আঁতকে উঠে অসার হয়ে গেছে। এত বড় ধাক্কা জীবনে খাইনি। মনে হল যেন ফুল-বাগানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা লতা-পাতায় মুখ ঢাকা কুয়োয় পড়ে যাচ্ছিলুম।

শুক্লাও আমার পাশে শুলো: 'কী ভাবছিস ?'

বললুম, 'কিছু না। আচ্ছা শুক্লা, তোর কখনও কারুর সঙ্গে ভালবাসা হয়েছে ?'

এবার শুক্লা একটু চুপ করে রইল, শেষে বলল, 'কী জানি! ভালবাসা কাকে বলে ?'

ভালবাসা কাকে বলে! কথাটা কখনও ভেবে দেখিনি। গল্পে উপন্যাসে পড়েছি, দুটি মানুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হল, দুজনের দুজনকে ভাল লাগল। এই কি ভালবাসা? না, আর-কিছু আছে ?

বললুম, 'তুই বল না ভালবাসা কাকে বলে।'

সে আস্তে আস্তে বলল, 'জানিনে ভাই। ভালবাসার কতখানি চোখের নেশা কতখানি মনের মিল, কতটা স্বার্থপরতা কতটা আত্মদান, বুঝতে পারি না। যাঁরা বড় বড় প্রেমের গল্প লেখেন, কবিতা লেখেন, তাঁরাও জানেন কি না সন্দেহ। হয়ত আগাগোড়াই জৈব বৃত্তি।'

শুক্লা বিছানা থেকে নামবার উপক্রম করল: 'যাই ভাই, অনেক রাত হয়ে গেছে। ঘুম পাচ্ছে।'

আমি তার আঁচল টেনে বললুম, 'কাউকে ভালবাসিস কি না বললি না ত।'

সে বলল, 'ভালবাসা কী তাই জানি না। কী করে বলব?'

বললুম, 'তাহলে আছে কেউ একজন! কে রে শুক্লা?'

সে একটু থেমে বলল, 'আজ নয়, আর-একদিন বলব। তুই নেকড়ে বাঘের সঙ্গে চা খেতে যাবি না ত?'

'না, যাব না। কিন্তু গেলেই বা কী ক্ষতি হত? আমার মন যদি শক্ত থাকে, ও কী করতে পারে?'

'তুই বুঝিস না। চড়ুই পাখি ভাবে, আমি উড়তে পারি, অজগর উড়তে পারে না, ও আমার কী করতে পারে? তারপর যখন অজগরের সম্মোহন দৃষ্টির সামনে পড়ে যায় তখন আর নড়তে পারে না।—আচ্ছা এবার ঘুমো, নইলে সকালে উঠতে পারবি না।'

শুক্লা নিঃশব্দে চলে গেল। আমি একলা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম—নেকড়ে বাঘ......অজগর সাপ......সংসারে কত ভয়ঙ্কর জন্তুই না আছে! ভাবলে ভয় করে।

পরদিন থেকে মন্মথ করের সঙ্গে আর চোখোচোখি হয়নি। সে আসছে দেখলেই মনে হত—নেকড়ে বাঘ! অজগর সাপ! শুক্লা এমন ভয় আমার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, সে-ভয় আজ পর্যন্ত যায়নি। কোন পুরুষ হেসে কথা কইলেই মনে প্রশ্ন জাগে—অজগর, না নেকড়ে বাঘ?

শুক্লা কিন্তু একজনকে ভালবেসেছিল। [illegible]

তার নাম বলেনি। বৌদিদি বলল, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।...

দুটো বছর কোন্ দিক দিয়ে কেটে গেল। প্রতি হপ্তায় বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি; কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার মনের যে পরিবর্তন হচ্ছে তা বুঝতে পারিনি। প্রথম প্রথম মন পড়ে থাকত বাড়ির দিকে; এক হপ্তা পরে বাবাকে দেখব এই আশায় মন উৎসুক হয়ে থাকত। কিন্তু ক্রমে বাড়ির দিকে টান কমে যেতে লাগল, হস্টেল এবং হাসপাতালের পরিবেশ আমার মনকে টেনে নিল। তখন হপ্তায় হপ্তায় বাড়ি যাওয়া একটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। বাবার শরীর যে ক্রমে আরও খারাপ হচ্ছে তা লক্ষ্য করেছিলুম কি? করেছিলুম বই কি। কিন্তু মনে কোন আশঙ্কা জাগেনি। বাবা কি বুঝতে পেরেছিলেন আমার মন তাঁকে ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে? হয়ত বুঝেছিলেন, হয়ত মনে দুঃখ পেয়েছিলেন; কিন্তু কোনদিন একটি কথাও বলেন নি। আজ সে-কথা ভেবে চোখে জল আসে; তিনি ত আমার জন্যেই বেঁচে ছিলেন, আমি কেন আমার সমস্ত মন তাঁকে দিতে পারলুম না? কেন আমার মন অবশে তাঁর কাছ থেকে সরে গেল? আমার মন তখন বড় হাল্কা ছিল, শ্যাওলার মত জলের ওপর ভেসে বেড়াত। হয়ত সব ছেলে-মেয়েরই ও-বয়সে অমন হয়, জীবনে নিত্য-নতুনের আবির্ভাব পুরনোকে ভুলিয়ে দেয়।

শুক্লার তিন বছরের কোর্স শেষ হল, সে পাস করে ডিপ্লোমা পেল। ইচ্ছে করলেই সে স্টাফ নার্স হয়ে থাকতে পারত। কিন্তু সে থাকল না। স্বাধীনভাবে প্র্যাক্‌টিস করবে। আমার তখনও এক বছর বাকী। শুক্লা চলে গেলে আমার এই এক বছর কী করে কাটবে?

যেদিন শুক্লা হস্টেল ছেড়ে চলে গেল তার আগের রাত্রে আমি তার ঘরে গেলুম। তার গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলুম। সেও একটু কাঁদল, তারপর চোখ মুছে বলল, 'ভাবিসনি। এক বছর কাটুক না, তোকেও টেনে নিয়ে যাব। তোকে ছেড়ে আমি একলা থাকব ভেবেছিস!'

সে-রাত্রে কথায় কথায় শুক্লা তার মনের অন্তরতম কথাটি বলল, ডক্টর নিরঞ্জন দাসের কথা। স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। আমি ভেবেছিলুম ছাত্রদের কারুর সঙ্গে শুক্লার ভালবাসা হয়েছে; ডক্টর দাসের কথা একবারও মনে আসেনি।

ডক্টর নিরঞ্জন দাস ছিলেন আমাদের 'গাইনকোলজি'র প্রফেসর। হপ্তায় একদিন আমাদের পড়াতেন, তাছাড়া নিয়মিত হাসপাতালে আসতেন। নামজাদা ডাক্তার, বিপুল প্র্যাক্‌টিস। বয়স বোধ হয় চল্লিশের আশেপাশে, কিন্তু দেখলে মনে হত ত্রিশের বেশী নয়। চেহারাতে যেমন ছেলেমানুষি ছিল, স্বভাবেও তেমনই; সকলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা রঙ্গ-তামাসা করতেন। তবু মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি তাঁর চোখের মধ্যে মর্মান্তিক ট্রাজেডি লুকিয়ে আছে। তখন তাঁকে বড় ক্লান্ত নিষ্প্রাণ দেখাত।

আমরা সবাই নির্বিচারে তাঁকে ভালবাসতুম। সবাই ভালবাসতুম বলেই বোধ হয় শুক্লার ভালবাসা চোখে পড়ত না। যাকে সবাই ভালবাসে তাকে যে একজন বিশেষভাবে ভালবাসতে পারে একথা কারুর মনে আসে না।

ডক্টর দাস বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী জীবিতা। এইটেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

তাঁর কথা বলতে বলতে শুক্লার গলা ভারী হয়ে বুজে এল, সে ঘন ঘন আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

পঁচিশ বছর বয়সে ডক্টর দাস বিয়ে করেছিলেন। সুন্দরী বউ, বড় ঘরের মেয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু বউয়ের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। অত্যন্ত মুখরা সে, কথায় কথায় অন্যের ছলছুতো ধরা তার অভ্যেস, ঝগড়ার একটা সুযোগ পেলে আর রক্ষে নেই, চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করবে। সবচেয়ে মারাত্মক তার হিংসে। স্বামীর প্রতি কিছুমাত্র স্নেহ নেই, কিন্তু নিজের অধিকার-বোধ আছে ষোল আনা। স্বামী যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে হেসে কথা বলেন অমনই তেলে-বেগুনে জ্বলে যায়, দশজনের সামনে কেলেঙ্কার-কাণ্ড বাধিয়ে বসে।' স্বামী গাইনকোলজিস্ট, স্ত্রী-রোগের চিকিৎসা করেন, এটা তাঁর চরিত্রহীনতার লক্ষণ, এই নিয়ে অষ্টপ্রহর খিটিমিটি চেঁচামেচি।

ডক্টর দাসের সংসারে ছিলেন তাঁর বিধবা মা; আর এক পুরনো ঝি, যে তাঁকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল। বউয়ের রকমসকম দেখে ঝি প্রথমে গেল, তারপর মা কাশীবাস করতে গেলেন। সংসারে রইলেন ডক্টর দাস আর তাঁর খাণ্ডার বউ।

ডক্টর দাসের অসীম ধৈর্য। তিনি যদি কড়াপ্রকৃতির মানুষ হতেন তাহলে বোধ হয় তাঁর এত দুর্দশা হত না। কিন্তু তিনি শান্তশিষ্ট মানুষ। ক্রমে ক্রমে স্ত্রীর অত্যাচার যত বাড়তে লাগল ডক্টর দাসের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ততই কমে আসতে লাগল। সারাদিন নিজের ডিস্পেন্‌সারিতে থাকতেন কাজকর্ম করতেন, কেবল রাত্রে বাড়িতে শুতে যেতেন। তাও বাড়ির আবহাওয়া যখন বেশী গরম থাকত তখন ডিস্পেন্‌সারিতেই রাত কাটাতেন, বাড়ি যেতেন না। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে! তিনি বাড়ি না গেলে স্ত্রী ডিস্পেন্‌সারিতে এসে হাঙ্গামা বাধাতেন; কম্পাউণ্ডারদের নানারকম বিশ্রী প্রশ্ন করতেন; কেলেঙ্কারির একশেষ হত। ডক্টর দাসের সহকর্মীদের মধ্যে এই নিয়ে হাসাহাসি চলত। তবে একটা উপকার হয়েছিল। সারাক্ষণ ডিস্পেন্‌সারিতে থাকার জন্যে ডক্টর দাসের প্র্যাক্‌টিস্ খুব শিগগির জমে উঠেছিল। স্ত্রীরোগের চিকিৎসক বলে তাঁর নামডাক শহরময় ছড়িয়ে পড়েছিল।

ডক্টর নিরঞ্জন দাসের বিবাহিত জীবনের প্রথম বারো-তেরো বছর এইভাবে কেটেছিল। রুগী হাসপাতাল লেকচার-রুম ডিস্পেন্‌সারি, ঘর-সংসার কেবল নামে। তপস্বীর জীবন।

শুক্লা যখন প্রথম প্রোবেশনার হয়ে এসেছিল তখন সেও অন্য সকলের মতন ডক্টর দাসের মধুর স্বভাবের কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু শুক্লার মনটা বড় মরমী, দু-চার দিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল যে, বাইরে ডক্টর দাস যতই হাসি-তামাসা নিয়ে থাকুন, অন্তরে তিনি বড় দুঃখী। শুক্লার সমস্ত মন তাঁর দিকে ঢলে পড়ল।

কিন্তু শুক্লার সবই মনে মনে। বাইরে কেউ কিছু বুঝতে পারল না, এমন কী ডক্টর দাসও না।

কিছুদিন পরে একটি ব্যাপার ঘটল।

পুরুষমানুষ মনের মতন কাজ পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। ডক্টর দাসকে সামলাবার কেউ নেই। দিনরাত খেটে খেটে আর নাওয়া-খাওয়ার অনিয়ম করে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল; একদিন লেকচার দিতে দিতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অন্য ডাক্তারেরা তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন, রোগ কিছু নেই, কিন্তু ক্লান্তি আর অবসাদে জীবনশক্তি কমে গিয়েছে; কিছুদিন হাসপাতালের কড়া নিয়মে থাকা দরকার। হাসপাতালের প্রাইভেট ওয়ার্ডে একটি কেবিনে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। একজন ডাক্তার-বন্ধু বললেন, 'তোমার বাড়িতে খবর পাঠাব?' তিনি ম্লান হেসে বললেন, 'পাঠাও।'

ডক্টর দাসের সেবা করবার জন্যে নার্সদের মধ্যে কাড়াকাড়ি। যারা তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছে তারা ত আছেই, যারা হয়নি তারাও ছুটি পেলে তাঁকে এসে দেখে যায়। ডাক্তারেরা তাঁর ঘরে উঁকি না-মেরে কেউ চলে যান না।

ডক্টর দাসের পরিচর্যার জন্যে যারা নিযুক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে শুক্লা একজন। দুপুর বেলা তার পালা। তাঁকে ঠিক সময়ে খাওয়ানো, টনিক দেওয়া, খবরের কাগজ পড়ে শোনানো, গল্প করা, এই সব তার কাজ। দুপুরবেলা হাসপাতাল কিছুক্ষণের জন্যে ঝিমিয়ে পড়ে; তখন ডক্টর দাস বিছানায় বসেন, শুক্লাকে নানান প্রশ্ন করেন : তোমার বাড়িতে কে কে আছে?...কেউ নেই, মা বাবা মারা গেছেন। ...কেউ নেই? তোমার খরচ জোগায় কে?...বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তাছাড়া যা হাতখরচ পাই তাতেই চলে যায়।...প্রোবেশনার নার্সের আর খরচ কী? এবার শুয়ে থাকুন, খাবার পর একটু বিশ্রাম করতে হয়। আপনারাই বলেন।

তিন-চার দিন যেতে-না-যেতেই দুজনের মনে এক নতুন উপলব্ধি জেগে উঠল। এতদিন ডক্টর দাসের কাছে শুক্লা ছিল একশো মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে; এখন সে বিশিষ্ট একটি মেয়ে, এখন সে শুক্লা। মরমী শুক্লা, দরদী শুক্লা, শুধু নার্স নয়। শুক্লার মন আগে থেকেই উন্মুখ হয়ে ছিল, এখন ডক্টর দাসের মন তার কাছে এসে দাঁড়াল। যেন মনের সঙ্গে মনের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল। বন্ধনহীন গ্রন্থি।

ডক্টর দাসের শরীর বেশ তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে লাগল; কিন্তু শরীর সারবার সঙ্গে সঙ্গে মনও বিষণ্ণ হতে লাগল। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়েছেন, কিন্তু একবারও দেখতে আসেননি। দিন ছয়-সাত কেটে যাবার পর একদিন দুপুরবেলা ডক্টর দাস শুক্লার হাত ধরে করুণ হেসে বললেন, 'শুক্লা, তুমি জান না, আমার জীবন একটা মস্ত ট্র্যাজেডি।'

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শুক্লার বুক কান্নায় ভরে উঠল, সে বলল, 'জানি। কিন্তু কী নিয়ে ট্র্যাজেডি তা জানি না।'

ডক্টর দাস শুক্লার হাত ধরে খাটের পাশে বসালেন। নিজে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আস্তে আস্তে নিজের দাম্পত্যজীবনের কাহিনী বললেন।

তার পরই বিচ্ছিরি কাণ্ড।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, হঠাৎ যেন ঝড়ের ধাক্কায় খুলে গেল। দুদ্দাড় শব্দে ঘরে ঢুকলো ডক্টর দাসের স্ত্রী। রণচণ্ডী মূর্তি। মুখ দিয়ে যে-সব কথা বেরুচ্ছে তা ভদ্রলোকের মেয়ের মুখ দিয়ে বেরোয় না, অন্তত বেরুনো উচিত নয়। মুহূর্ত মধ্যে দোরের কাছে লোক জমে গেল; ডোম মেথর ঝাড়ুদারনী, সবাই ছুটে এসে দোরের কাছে ভিড় করে দাঁড়াল।

শুক্লা থ হয়ে গিয়েছিল; তারপর রাগে তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। সে উঠে গিয়ে দোরের কাছে দাঁড়াল, আঙুল দেখিয়ে বলল, 'বেরিয়ে যান এখান থেকে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান। এটা রুগীর ঘর, মেছোহাটা নয়।'

মিসেস দাস চোখ রাঙিয়ে অসভ্য অশ্লীল কথা বলতে আরম্ভ করলেন। শুক্লা তখন একজন মেথরকে ডেকে বলল, রামদীন, এঁকে বাইরে নিয়ে যাও।'

রামদীন ঝাড়ু হাতে এগিয়ে এল। মিসেস দাস তখন বেগতিক দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ডক্টর দাস এতক্ষণ চোখ বুজে বিছানায় বসে ছিলেন, এবার চোখ খুলে শুক্লার দিকে তাকালেন। তাঁর চাউনির মানে—দেখলে ত আমার স্ত্রীকে!

কয়েকদিন পরে ডক্টর দাস সেরে উঠে আবার কাজকর্ম আরম্ভ করলেন। শুক্লার সঙ্গে তাঁর একটি নিভৃত সম্পর্কের সূত্রপাত হল। কিন্তু তাদের চোখে চোখে কখন কী কথা হত, কখন নির্জনে দেখা হত, কেউ জানতে পারল না।

আজ হস্টেলে শুক্লার শেষ রাত্রি। কাল সে চলে যাবে। ডক্টর দাস তার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ভাল পাড়ায় একটি ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়েছে। শুক্লা সেইখানে থাকবে, আর স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস করবে। ডক্টর দাসের অগাধ পসার, অগাধ প্রভাব, শুক্লাকে একদিনও বসে থাকতে হবে না।

রাত্রি বারোটা বোধ হয় বেজে গেছে। পাশাপাশি শুয়ে ভাবছি। ভালবাসার স্বরূপ কী রকম? যে ভালবেসেছে সে মনে মনে কী ভাবে? ডক্টর দাস শুক্লার চেয়ে বয়সে অনেক বড়; ভালবাসা কি বয়সের বিচার করে না? তবে কিসের বিচার করে? কী চায়? কী পায়?

একটা কথা মনে এল। শুক্লাকে জিগ্যেস করলুম, 'ডক্টর দাস তোকে বিয়ে করবেন ত?'

শুক্লা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'উনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, আমি রাজী হইনি।'

'তুই রাজী হোসনি!'

'না। এক বউ থাকতে আবার বিয়ে করলে ওঁর বদনাম হত, প্র্যাকটিসের ক্ষতি হত। বিয়ের দরকার কী ভাই! ভালবাসাই ত বিয়ে।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু নেই প্রিয়া। যদি কোন দিন সত্যিসত্যি ভালবাসিস, বুঝবি ওতে কিন্তু নেই।'

'নিজের কথা ভাবলি না?'

'ভেবেছি। এই ত আমার গর্ব। আমি যা পেয়েছি তা কটা মেয়ে পায়?'

'কী পেয়েছিস?'

'ভালবাসা। একটি মানুষের মন।'

পরদিন শুক্লা চলে গেল। কয়েকদিন পরে আমি চুপিচুপি তার বাসা দেখতে গেলুম। কী সুন্দর বাসাটি! দোতলায় বড় বড় তিনটি ঘর, সামনে বারান্দা। একটি ঘর অফিসের মত সাজানো, টেলিফোন আছে, দ্বিতীয় ঘরটি শুক্লার শোবার ঘর; তৃতীয় ঘরটি একরকম খালিই পড়ে আছে, আমি এসে থাকব। শুক্লা জিগ্যেস করল, 'কেমন?'

আমি তার গলা জড়িয়ে বললুম, 'আমার আর তর সইছে না, ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুনি চলে আসি।'

শুক্লা বলল, 'আমিও পথ চেয়ে আছি। একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

দুজনে বিছানার পাশে বসলুম, প্রশ্ন করলুম, 'ডক্টর দাস আসেন?'

শুক্লার মুখখানি নববধূর মত টুকটুকে হয়ে উঠল; সে ঘাড় নেড়ে একটু হাসল।

বললুম, 'কেমন লাগছে?'

তার চোখ দুটি স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়!'

শুক্লা গান গাইতে পারে। তখন পর্যন্ত জানতুম না, তারপর অনেকবার শুনেছি। ভারি মিষ্টি গলা।

সেদিন চলে এলুম। তারপর সুবিধে পেলেই গিয়েছি। শুক্লা বলেছিল একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তা গেল বটে, কিন্তু আমার অতীতকে একেবারে নির্মূল করে দিয়ে গেল। বছর শেষ না-হতেই বাবা মারা গেলেন।

বাবার মৃত্যু বড় আশ্চর্য। যেন আমার ডিপ্লোমা পাবার অপেক্ষায় তিনি বেঁচে ছিলেন। যেদিন ডিপ্লোমা পেলুম তার দু-দিন পরে তিনি হার্ট ফেল করে মারা গেলেন। শরীর ভিতরে ভিতরে জীর্ণ হয়ে পড়েছিল, কেবল মনের জোরে বেঁচে ছিলেন।

বাবার কথা ভাবি। বাপ নিজের ছেলেমেয়েকে যত ভালবাসে, ছেলেমেয়েরা বাপকে তত ভালবাসতে পারে না কেন? প্রকৃতির নিয়ম! এ রকম নিয়মের মানে কী? স্নেহ শুধু নিম্নগামী না হয়ে ঊর্ধ্বগামী হলে কী দোষ হত? বুঝতে পারি না।... আমি যদি শৈশবে পিতৃহীন হতুম তাহলে কি ভাল হত? কিংবা বাবা যদি আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতেন তাহলে ভাল হত? বুঝতে পারি না। মৃত্যুকালে তাঁর হাতে মাত্র সাতশো টাকা ছিল: বেশীদিন বেঁচে থাকলে হয়ত অর্থকষ্টে পড়তেম। আমি রোজগার করে তাঁকে খাওয়াব সে-ভাগ্য কি

করেছি? মেয়ে খালি নিতেই পারে, দিতে পারে না।

শক্লার বাসায় এসে উঠলুম। এই বাসা। এখানে পাঁচ বছর কেটেছে। একটা ঘরে শক্লা থাকে, একটা ঘরে আমি; অফিস-ঘরটা ভাগের। একটি ছোট্ট রান্নাঘর আছে, তাতে যার যেদিন ছুটি সে রান্না করে, দুজনে মিলে খাই। যেদিন দুজনেরই কাজ থাকে সেদিন সামনের হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খাই। একটা শুকো ঝি দিনের বেলা কাজ করে দিয়ে যায়। কী সুখে আছি আমরা তা বলতে পারি না। এই ছোট্ট বাসাটি আমাদের স্বর্গ।

কাজের দিক দিয়েও সুবিধে হল। আগে শক্লা একলা সব কাজ সামলাতে পারত না, এখন দুজনে মিলে সামলে নিই।

ডক্টর দাস মাঝে মাঝে আসেন। রোজ আসেন না, হপ্তায় একদিন কি দু-দিন। একটু রাত করে আসেন। আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন; রাত শেষ হবার আগেই চলে যান। নিজের জন্যে তাঁর ভাবনা নেই, কিন্তু পাছে শক্লার বদনাম হয় তাই সতর্কভাবে যাওয়া-আসা করেন। তাঁর স্ত্রী জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে।

আমার সঙ্গে এ বাসায় যেদিন তাঁর প্রথম দেখা হল তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'প্রিয়ংবদা, তুমি এসেছ খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু দেখো, শক্লার মত কেলেঙ্কারি কোর না, যাকে ভালবাসবে তাকে বিয়ে কোরো।'

আমি ও-কথার উত্তর না দিয়ে বললুম, 'আমি কিন্তু আপনাকে জামাইবাবু বলে ডাকব।'

তিনি আমার দুই কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আর আমি তোমাকে কী বলে ডাকব?—প্রিয়া?'

'আপনার প্রিয়া ত ওই'—এই বলে আমি শক্লাকে দেখালুম। শক্লা পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিল।

তিনি বললেন, 'তাহলে তোমাকে সখী বলব। তুমি যেমন শক্লার সখী তেমনি আমারও সখী।'

সেই থেকে তিনি আমাকে 'সখী' বলে ডাকেন।

পুরনো কথা লিখতে লিখতে অনেক পথে-বিপথে ঘুরে বেড়ালুম, এবার ফিরে আসি। আজ আমার জন্মদিন। বাইরে অবিশ্রাম ধারাবর্ষণ চলেছে। লিখতে লিখতে মন বসে গিয়েছিল, এদিকে রাত্রি এগারোটা। শক্লা আটটা বাজতে-না-বাজতেই বেরিয়েছে, তার আজ সমস্ত রাত কাজ; সেই ভোরবেলা ফিরবে। বাসায় আমি একা।

শক্লা আজ আমার জন্মদিনে একটি চমৎকার জিনিস উপহার দিয়েছে। একটি আয়না, চার ফুট লম্বা, আড়াই ফুট চওড়া। দু-জনে মিলে আমার শোবার ঘরে টাঙিয়েছি, তার মাথায় ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌, নীচে আমার কাপড়চোপড় রাখার ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটের মাথায় প্রসাধনের তেল ক্রীম স্নো'র শিশি সাজিয়েছি। কী সুন্দর দেখাচ্ছে! ঘরের শ্রী ফিরে গেছে।

ডক্টর দাস পাঠিয়েছেন প্রকাণ্ড একটি কেক। আমরা আজ এ-বেলা রান্না করিনি, কেক খেয়েই পেট ভরিয়েছি। আজ ডক্টর দাস আসবেন না, তিনি জানেন শক্লা কাজে বেরিয়েছে। কাল বোধ হয় আসবেন। তখন তাঁকে আমার জন্মদিনের কেক খাওয়াব।

শক্লা বেরিয়ে যাবার পর আমি ডায়েরি লিখতে বসেছি। এখন এগারোটা বেজে গেছে। অনেক রাত হল—

কিড়িং কিড়িং—। পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। এত রাত্রে কার দরকার হল।

১৮ শ্রাবণ

কাল রাত্তিরে সে কী কাণ্ড!

অফিস-ঘরে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলুম, নিজের টেলিফোন-নম্বর দিয়ে বললুম, 'কাকে চাই?'

হেঁড়ে গলায় উত্তর এল, 'প্রিয়দম্বা ভৌমিককে চাই।'

রাগে গা জ্বলে গেল। কি রকম অসভ্য! আমার নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করতে জানে না। বললুম, 'প্রিয়দম্বা নয়' প্রিয়ংবদা। আমিই মিস ভৌমিক। কী চাই বলুন?'

হেঁড়ে গলা বলল, 'আমার বাচ্চা মেয়ের ভয়ানক অসুখ, তাকে রাত জেগে দেখা-

ডক্টর দাস শক্লার হাত ধরে খাটের পাশে বসালেন।

শোনা করবার কেউ নেই। আপনাকে আসতে হবে।'

রাত দুপুরে ডাক আসা আমাদের পক্ষে কিছু নতুন নয়। কিন্তু আজ মনটা কেমন বেঁকে বসল। তবু এক কথায় বাধ না বলা চলে না। বললুম, 'আপনি কে? কোথা থেকে বলছেন?'

'আমি শঙ্খনাথ ঘোষ। ১১৭ বেলেঘাটা নিউ অ্যাভিনিউ থেকে বলছি।'

'রাত্তিরে কাজ করলে আমার ফী পঞ্চাশ টাকা।'

'দেব পঞ্চাশ টাকা।'

'কিন্তু এই বিষ্টিতে যাব কী করে? এত রাত্রে ট্যাক্সিও পাওয়া যাবে না।'

'আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসুন।'

গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে! আশ্চর্য লোক। আমি যেতে পারব কি না, বাড়িতে আছি কি না, না-জেনেই গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে! কিন্তু এখন আর এড়াবার উপায় নেই। টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে গেলুম।

শোবার ঘরে নার্সের ইউনিফর্ম পরতে পরতে ভীষণ রাগ হতে লাগল। বড়মানুষ নিয়েই আমাদের কাজ; যারা গরিব তারা ত আর রোগীর সেবার জন্যে নার্স ডাকতে পারে না, নিজেরাই যতটুকু পারে সেবা-শুশ্রূষা করে। কিন্তু এই বড়মানুষগুলো যেন কী রকম, ওদের চালচলন ভাবভঙ্গী সব আলাদা। দু-চক্ষে দেখতে পারি না। যাঁরা বনেদী বড়মানুষ তাঁরা ভদ্র ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু মুরুব্বিয়ানা অনুগ্রহের ভাব; টাকাকড়ি সম্বন্ধে ভারি চালাক; এ'দের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা আদায় করা কঠিন কাজ। আর যাঁরা ভুঁইফোড় বড়মানুষ তাঁরা দু-হাতে টাকা ছড়াতে ভালবাসেন। কিন্তু ব্যবহার একেবারে চাষার মত। মেয়েদের সঙ্গে কী-ভাবে ব্যবহার করতে হয় জানেন না; ভাবেন টাকা দিলেই যথেষ্ট, ভদ্রতার দরকার নেই। এই শঙ্খনাথ ঘোষটি বোধ হয় ভুঁইফোড় বড়মানুষ। প্রিয়ম্বদা! কী কথার ছিরি! লেখাপড়া শিখেছেন বোধ হয় পাঠশালা পর্যন্ত। অথচ টাকা আছে।

ভোঁ ভোঁ। রাস্তায় দোরের সামনে মোটর-হর্নের আওয়াজ শুনে বুঝলুম মোটর এসেছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সদর-দরজায় তালা লাগিয়ে বেরুতে হল, বাসায় কেউ থাকবে না। শুক্লার কাছে আলাদা চাবি আছে, সে যদি আমার আগে ফেরে কোন অসুবিধে হবে না।

নীচে নেমে দেখলুম প্রকাণ্ড জাহাজের মতন একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল, আমি টুক করে গাড়িতে উঠে পড়লুম; তবু মাথা মুখ বৃষ্টিতে ভিজে গেল। বাবা, কী বৃষ্টি! আষাঢ় জন্মদিন বেশ জানান দিচ্ছে।

গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে ড্রাইভার জিগ্যেস করল, 'আপনি মিস ভৌমিক?'

'হ্যাঁ।'

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। ঝাপ্সা নির্জন রাস্তা দিয়ে কোথায় চলেছি বোঝা যায় না। যেন স্বপ্নের মধ্যে কোন এক রহস্যময় অভিযানে চলেছি, জেগে উঠে দেখব ডায়েরি লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

পাঁচ মিনিট পরে গাড়ি লোহার ফটক পার হয়ে ছাদ-ঢাকা গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একজন ফিটফাট উর্দি-পরা চাকর বেরিয়ে এল, গাড়ির দোর খুলে বলল, 'আসুন মিস।'

আমি নামলুম। চাকরটা ড্রাইভারকে ফিসফিস করে কী বলল, তারপর তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন, দোতলায় যেতে হবে।' ড্রাইভার মোটর ঘুরিয়ে আবার বেরিয়ে গেল।

আমি চাকরের সঙ্গে যেতে যেতে নীচের তলার কয়েকটা ঘর দেখতে পেলুম; সব ঘরেই উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। একটা ঘর ড্রয়িং-রুমের মত সাজানো। কিন্তু কোথাও লোকজন নেই। বাড়িটা চমৎকার, ঝকঝকে নতুন। মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ভাবলুম, ভুঁইফোঁড় বড়মানুষই বটে; বোধ হয় যুদ্ধের বাজারে ধান-চালের ব্যবসা করে লাখপতি।

ওপরতলাটা আলোয় আলো, যেন বিয়ে-বাড়ি। কিন্তু মানুষ নেই। চাকর আমাকে নিয়ে একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড ঘর, নার্সারির মত সাজানো; শিশুর ছোট্ট খাট, দোলনা; নানা রকম ছোট-বড় খেলনা ঘরের চারিধারে ছড়ানো রয়েছে। দুটো বড় বড় বাল্‌ব্ জ্বলছে। একটি ঘাগরা-পরা ঝি-জাতীয় স্ত্রীলোক দোরের পাশে উবু হয়ে বসে আছে। আর, একজন পুরুষ একটি শিশুকে বুকে নিয়ে পায়চারি করছেন।

চাকর দরজার কাছ থেকে নিচু গলায় বলল, 'বাবু, নার্স এসেছেন।'

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন। ঘন ভুরুর নীচে থেকে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইল। তারপর চোখ দুটো আমার মুখ থেকে নেমে দোরের পাশে ঝিয়ের ওপর পড়ল। 'কলাবতী!' ঝি তখনই উঠে গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াল—'খুকিকে শুইয়ে দাও। দেখো, ওর ঘুম না ভেঙে যায়।'

ঝি অতি সন্তর্পণে শিশুকে কোলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল; শিশু একটু উসখুস করল, কিন্তু জাগল না। তখন ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। তামাটে ফরসা রঙ, দোহারা গড়ন, কিন্তু ভুঁড়ি নেই; মুখখানা যেন পেটাই-করা লোহা দিয়ে তৈরী। একটু রুক্ষ-রুক্ষ ভাব। মেয়েকে নিশ্চয় খুব ভালবাসেন, নিজেই তাকে বুকে করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু ও'র স্ত্রী কোথায়? তবে কি বিপত্নীক?

লোকটির প্রতি মনে একটু সহানুভূতি জাগতে শুরু করেছিল, কথা শুনে সহানুভূতি উবে গেল। যেন বেশ আশ্চর্য হয়েছেন এমনিভাবে বললেন, 'তুমি নার্স? প্রিয়ম্বদা ভৌমিক?'

অপরিচিত মহিলাকে আপনি বলতে হয় তাও ইনি জানেন না। তার ওপর প্রিয়ম্বদা! দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, 'প্রিয়ম্বদা নয়—প্রিয়ংবদা।'

তিনি বললেন, 'ও একই কথা। তুমি নার্স! রুগীর সেবা করতে জান?'

'ডিপ্লোমা দেখবেন?'

'দরকার নেই। ডাক্তার যখন রেকমেণ্ড করেছে তখন জান নিশ্চয়। আমার ধারণা ছিল নার্সদের বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশ হয়।—সে যাক, আমার মেয়ের বড় অসুখ, রাত্তিরে তার দেখাশোনা করবার লোক নেই। যতদিন দরকার তোমাকেই রাত্তিরে থাকতে হবে।'

প্রশ্ন করলুম, 'রোগটি কী?'

'মেনিন্‌জাইটিস্।'

'কোন্ ডাক্তার দেখছেন?'

'দেখেছে অনেক ডাক্তারই। চার্জে আছে আমার ফ্যামিলি ডাক্তার। সে আজ রাত্রি দশটা পর্যন্ত এখানে ছিল। এস, তাকে ফোন করতে হবে। সে তোমাকে ইনস্ট্রাকশন দেবে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি পাশের ঘরে গেলেন, আমি সঙ্গে গেলুম। এ ঘরে টেলিফোন আছে; তিনি টেলিফোন তুলে নিয়ে নম্বর ডায়েল করলেন, বললেন, 'হ্যালো ডাক্তার, নার্স এসেছে, তাকে কী বলতে চান বলুন।' এই বলে টেলিফোন আমার হাতে দিলেন।

ডাক্তারের কথা শুনলুম। রোগ এখন পড়তির দিকে; ভয়ের অবস্থা কেটে গেছে। তবে নজর রাখতে হবে। কী কী করতে হবে আমাকে জানালেন, তারপর স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'কাল সকালে দেখা হবে। গুড্ নাইট্ নার্স।'

'গুড্ নাইট্ ডক্টর।'

ডাক্তারের নাম জানতে পারলুম না, টেলিফোনে গলা শুনেও চেনা গেল না। বোধ হয় জামাইবাবুর কোন বন্ধু; নইলে আমাকে রেকমেণ্ড করবেন কেন!

পাশের ঘরে ফিরে গিয়ে রুগীর চার্জ নিলুম। রাত্রি তখন ঠিক বারোটা। শঙ্খনাথবাবুকে বললুম, 'আপনার আর এখানে থাকবার দরকার নেই। তবে বাজার বা বাড়ি মাঝে মধ্যে এসে দেখে যেতে চান ত দেখে যেতে পারেন।'

শংখনাথবাবুর মুখের চেহারা বদলে গেল, গলার আওয়াজ কর্কশ হয়ে উঠল। তাঁর গলা স্বভাবতই মোটা, তার সঙ্গে রাগ মিশে গলার আওয়াজ বাঘের চাপা গর্জনের মতন শোনাল। তিনি বললেন, 'ওর মা! সে ত নাচতে গিয়েছে।'

আমি ভুরু তুলে চেয়ে রইলুম। তিনি বললেন, 'নাচ জান না? একজন পুরুষকে জাপ্টে ধরে ধেই-ধেই নাচ। আজ বিলিতী হোটেলে পার্টি আছে, আমার বউ না-গিয়ে থাকতে পারে? মেয়ের অসুখ, তাতে কী? নাচবার এত বড় সুযোগ কি ছাড়া যায়?'

আমি লজ্জিত হয়ে পড়লুম। ঘরের কেচ্ছা যে শংখনাথবাবু একজন অপরিচিতার কাছে এত সহজে প্রকাশ করবেন তা আশা করিনি। খুব রাগ হয়েছে বলেই বোধ হয় মনের কথা চেপে রাখতে পারেননি। কুণ্ঠিত হয়ে বললুম, 'তিনি নিশ্চয় এখনি ফিরবেন।'

'বলে গিয়েছিল দশটার মধ্যে ফিরবে, বারোটা বেজে গেছে। দুত্তোর!' বলে তিনি একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

আমার মনে আবার সহানুভূতি এল। স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল নেই; এ যেন ডক্টর দাসের দাম্পত্যজীবনের উল্টো পিঠ। জিগ্যেস করলুম, 'আপনি বুঝি পার্টিতে যান না?'

শংখনাথবাবু চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন: 'আমি পার্টিতে যাব! কী বলছ তুমি প্রিয়দম্বা? আমি মুখ্খু অসভ্য, নাচতে জানি না, ব্রিজ খেলতে জানি না, ছুরি-কাঁটা ধরে ডিনার খেতে জানি না— আমি পার্টিতে যাব! লোকে হাসবে না! আমার স্ত্রী সমাজে মুখ দেখাবে কী করে? তাছাড়া মেয়েটাকে দেখবার একটা লোক চাই ত। আজ তিন রাত্তির ঘুমুইনি।' তিনি ক্লান্তভাবে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন।

কেন জানি না আমার আবার রাগ হল। বললুম, 'আগে নার্সের ব্যবস্থা করেননি কেন? তাহলে ত তিন রাত্তির জেগে থাকতে হত না!'

তিনি দুই হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'প্রিয়দম্বা, আমি গরিবের ছেলে, গরিবি চালে মানুষ হয়েছি। বাড়িতে কারুর অসুখ হলে মা-খুড়ি বাপ-খুড়োরাই সেবা করে। এখন আমার টাকা হয়েছে, কিন্তু নার্স রেখে তার ঘাড়ে সেবার ভার তুলে দেওয়া যায় একথা মনেই আসেনি। আজ ডাক্তার বলল তাই খেয়াল হল।'

লোকটি মুখ্খু এবং অসভ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু স্পষ্টবক্তা। নিজের সম্বন্ধেও স্পষ্ট কথা বলতে সংকোচ নেই। আমি বললুম, 'আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে। কোনও চিন্তা নেই, আমি এখানে রইলুম।'

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'আমি আর কোথায় যাব, এই ঘরেই শুয়ে থাকি। —কলাবতী!'

পশ্চিমা ঝি-টা আবার গিয়ে দোরের কাছে বসে ছিল, উঠে এসে কাছে দাঁড়াল। থ্যাব্ড়া-থ্যাব্ড়া মুখ, নাকে নোলকের আংটি; বয়স আন্দাজ তিরিশ। শংখনাথবাবু তাকে বললেন, 'তুমিও তিন রাত্তির জেগে আছ, যাও ঘুমোও গিয়ে। আর শিউসেবককে বলে দিও মালকিনী না ফেরা পর্যন্ত যেন জেগে থাকে।'

'জি'—কলাবতী চলে গেল।

এই সময় বিছানায় বাচ্চা একটু উসখুস করল। আমি গিয়ে চেয়ার টেনে বিছানার পাশে বসলুম; তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বর আছে; কিন্তু বেশী নয়। আমি গায়ে হাত রাখতেই সে আবার শান্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল।

তার মুখের পানে চেয়ে রইলুম। বয়স বছর দেড়েকের বেশী নয়; মুখখানি যেন গোলাপফুল ফুটে আছে। এত অসুখেও চোখ ফেরানো যায় না। শংখনাথবাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে খাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি তাঁর পানে চোখ তুলে চাইতে দেখলুম তিনি সপ্রশ্ন চোখে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম—ঠিক আছে।

তিনি গিয়ে দূরের একটা জানলা খুললেন, আবার তখনই বন্ধ করে দিলেন। বাইরে বৃষ্টি চলেছে, বিরাম নেই বিশ্রাম নেই।

জানলার কাছে একটা গদি-মোড়া ডিভান ছিল, শংখনাথবাবু তাতে বসলেন, আমাকে লক্ষ্য করে চাপা গলায় বললেন, 'পাশের ঘরে চায়ের সরঞ্জাম আছে, যদি রাত্তিরে খেতে চাও—'

আমি নিঃশব্দে হাত তুলে তাঁকে আশ্বাস দিলুম, দরকার হলে খাব। তিনি তখন ডিভানের ওপর লম্বা হয়ে শুলেন।

আধ ঘণ্টা শিশুর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি।......মেনিনজাইটিস। কঠিন রোগ, কিন্তু এখন রোগ বশে এসেছে; শিশু সেরে উঠবে। শুধু নজর রাখা দরকার, এতটুকু ত্রুটি না হয়।......এই শিশুর মা—কী রকম মা? আধুনিকা অনেক দেখেছি, আমিও ত আধুনিকা। কিন্তু নিজের রুগ্ন সন্তানকে বাড়িতে ফেলে নেচে বেড়াতে কাউকে দেখিনি। হয়ত এটা আধুনিকতার দোষ নয়, ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষ। কিন্তু মেয়ের মায়ের দোষ যতই থাক, নিশ্চয় অপূর্ব সুন্দরী। মেয়ে এত রূপ বাপের কাছ থেকে পায়নি। বাপের চেহারা ত গুণ্ডার মতন।

ঘাড় ফিরিয়ে শংখনাথবাবুর দিকে চাইলুম। তিনি কনুইয়ে ভর দিয়ে করতলে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে আছেন, দৃষ্টি আমার ওপর। কিন্তু দৃষ্টিতে আপত্তিকর কিছু নেই, কেবল নির্বাক কৌতূহল। আমার মতন জীব তিনি জীবনে দেখেননি, তাই নিষ্পলক চেয়ে আছেন। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হবার পরও তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন না, একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

মুখের পানে একদৃষ্টে কেউ চেয়ে থাকলে অস্বস্তি হয় না? আমি উঠে গিয়ে ডিভানের কাছে দাঁড়ালুম; তিনি উঠে বসলেন। বললুম, 'আমি যখন চার্জ নিয়েছি, তখন আপনার জেগে থাকার মানে হয় না। আপনি ঘুমবার চেষ্টা করুন না।'

তিনি বললেন, 'ঘুমবার চেষ্টা! আমাকে চেষ্টা করতে হয় না, চোখ বুজে শুলেই ঘুমতে পারি। আজ ইচ্ছে করে জেগে আছি।—পিউ এখন কেমন আছে?'

'পিউ! খুকীর নাম বুঝি পিউ?'

'হ্যাঁ। কেমন আছে?'

'ভালই আছে' বলে আমি আবার গিয়ে বসলুম।

পিউ! পাপিয়ার ডাক। ছোট্ট একটি পাখির মিষ্টি একটু কাকলি। এই মেয়েটি পাখি নয়, পাখির কূজন। যে নাম রেখেছে তার রসবোধ আছে। শংখনাথবাবু নিশ্চয় নয়।

পিউ একটু উসখুস করল। তাকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিলুম। সে আবার শান্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল।

একটা বেজে গেছে। বৃষ্টির ঝরঝর ঝম-ঝম শব্দ যেন একটু মন্দা হয়ে আসছে। মনে হল নীচে গাড়ি-বারান্দায় একটা মোটর এসে থামল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, শংখনাথবাবু উঠে বসেছেন। তাঁর চোখে গনগনে আগুন, চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরে ওপরের বারান্দায় মেয়েলী জুতোর খুট্‌খুট্‌ শব্দ শুনতে পেলুম, আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। আমার ঘাড় আপনিই সেই দিকে ঘুরে গেল, দোরের পানে চেয়ে রইলুম।

দোরের সামনে এসে দাঁড়াল একটি মূর্তি। আরব্য উপন্যাসের হুরী-পরীদের দেখিনি, কিন্তু তারা এত সুন্দর কখনই ছিল না। মনে হল মেঘে-ঢাকা আকাশ থেকে এক ঝলক বিদ্যুৎ দরজার ফ্রেমের মাঝখানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছিপছিপে লম্বা ধরনের গড়ন, দুধে-আলতা রঙ; মুখখানি কুঁদে কাটা। পরনে খুব ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ি, তার চেয়ে একটু গাঢ় নীল রঙের ব্লাউজ; সবার ওপরে একরাশ হীরে আর পান্নার গয়না শিশিরবিন্দুর মতন ঝলমল করছে। —কিন্তু ওর রূপের বর্ণনা আর লিখতে পারি না; নিজেরই হিংসে হয়।

দরজার সামনে এসে প্রথমেই তার চোখ পড়েছিল আমার ওপর। সে আমাকে এক-

নজর ভাল করে দেখে নিল। তার নরম রাঙা ঠোঁটে একটু মিষ্টি হাসি খেলে গেল।

হাসিটি কিন্তু স্থায়ী হল না। শংখনাথবাবু পাগলা হাতির মতন তার সামনে ছুটে এলেন, চাপা গর্জনে বললেন, 'দশটা বেজেছে?'

একটি আঙুল ঠোঁটের ওপর রেখে পরী বলল, 'চুপ! পিউ জেগে উঠবে।'

শংখনাথবাবু ভেংচি কাটার স্বরে বললেন, 'পিউ জেগে উঠবে! এতক্ষণ পিউয়ের কথা মনে ছিল না?'

পরীর মুখখানি ব্যথায় ভরে উঠল, সে করুণ সুরে বলল, 'মনে ছিল না! সারাক্ষণ কেবল পিউয়ের কথাই ভেবেছি। কিন্তু আসব কী করে? যা বিষ্টি, সাপের মুখ ছিঁড়ে যায়।'

শংখনাথবাবু বললেন, 'যখন বেরিয়েছিলে তখন বিষ্টি কিছু কম ছিল না। বেরুলে কেন? একটা দিন না-নাচলে কি চলত না?'

পরী চকিত আড়-চোখে আমার পানে তাকাল। বাইরের লোকের সামনে দাম্পত্য কলহ বাঞ্ছনীয় নয়। সে স্বামীর কথার উত্তর না-দিয়ে ঘরের মধ্যে এগিয়ে এল। পিউয়ের খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। মেয়ের পানে একবার তাকাল কি তাকাল না, আমার পানে চেয়ে নরম হেসে বলল, 'আপনি বুঝি নার্স? বাঁচলুম। পিউয়ের জন্যে আর ভাবনা নেই।'

শংখনাথবাবু স্ত্রীর সংগে সংগে এসেছিলেন, তিনি গলার মধ্যে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করলেন। বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলেন—পিউয়ের জন্যে ভেবে ভেবে তোমার ত ঘুম হচ্ছে না। কিন্তু তিনি কোনও কথা বলবার আগেই পরী আবার ঠোঁটে আঙুল রেখে তাঁকে থামিয়ে দিল। ফিসফিস করে বলল, 'চুপ! তোমার গলার আওয়াজে পিউ চমকে উঠবে।'

আমি কব্জির ঘড়ি দেখে বললুম, 'আপনারা বিশ্রাম করুন গিয়ে। আমাকে এবার ইন্‌জেকশন দিতে হবে।'

'ইন্‌জেকশন!' পরী ত্রস্ত হয়ে উঠল,—'চল, আমরা যাই।' এই বলে সে আর দাঁড়াল না, দোরের দিকে পা বাড়াল।

শংখনাথ একটু ইতস্তত করলেন, বললেন, 'আমি থাকব?'

'না, দরকার নেই' বলে আমি ব্যাগ তুলে নিলুম। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলুম, আগে আগে পরী এবং পিছন পিছন দৈত্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইন্‌জেকশন তৈরি করতে করতে পরীর কথাই মনের মধ্যে ঘুর ঘুর করতে লাগল। হয়ত আমুদে আহ্লাদে মেয়ে; নিজের সংসারে আমোদ-আহ্লাদের সুযোগ কম, তাই বাইরের দিকে মন পড়ে থাকে। মেয়েকে ইন্‌জেকশন দেওয়ার নামে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল। হয়ত শরীরের কষ্ট দেখতে পারে না। অনেক লোক আছে যারা রক্ত দেখলে ভির্মি যায়। আমি নিজেই বা কী ছিলুম? প্রথম যেদিন হাসপাতালে মড়া দেখি সেদিন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম। এখন অবশ্য সবই গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। পরী ত আর নার্স নয়, সে এসব দেখতে পারে না। কিন্তু কথাবার্তা চালচলন খুব মিষ্টি। আর কী রূপ! শংখনাথবাবুকে ভাগ্যবান বলতে হবে। এমন বউ সকলের ভাগ্যে জোটে না।

ইন্‌জেকশন দিলুম। পিউ একটু নড়ে-চড়ে কাঁদবার উপক্রম করল, সুন্দর মুখখানি কুঁচকে উঠল; কিন্তু সে কাঁদল না। চোখ মেলে কিছুক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে রইল, তারপর ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আজ রাত্রে আমার আর কোনও কাজ নেই। শুধু পিউয়ের মুখের পানে চেয়ে বসে থাকা।

বৃষ্টি বোধ হয় থেমে গেছে; বাইরে আর সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে থেকে দুটি গলার আওয়াজ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। একটি স্বর মোটা এবং অস্পষ্ট, অন্য স্বর মিহি এবং স্পষ্ট। বোধ হয় শোবার ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা হচ্ছে।—

...'তুমি বুঝতে পারছ না কেন, ইচ্ছে করলেই কি পার্টি ছেড়ে চলে আসা যায়? আমি ত চলেই আসছিলুম, কিন্তু সবাই পথ আগলে দাঁড়াল, বলল, এত বিষ্টিতে যেতে দেব না। গাড়িও ছিল না—' তারপর কিছুক্ষণ মোটা গলার আফসানি...তারপর আবার মিহি গলা—'সমাজে থাকতে গেলে সকলের সংগে মানিয়ে চলতে হয়, সকলের সংগে মিশতে হয়···বোরকা মুড়ি দিয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকার দিন কি আর আছে? লোকে হাসবে যে। তুমি মেলা-মেশা করতে ভালবাস না, তাই আমাকেই করতে হয়। লৌকিকতা না রাখলে চলবে কেন?'...

এইভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কথা-কাটাকাটি চলল, তারপর আস্তে আস্তে সব ঝিমিয়ে পড়ল। বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, আমি বসে বসে ভাবছি...দাম্পত্য কলহ...বাবা বলতেন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া...ওরা ঝগড়া-ঝাঁটি করে ...এক বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে...ওদের মধ্যে ভাল কে? মন্দ কে? হয়ত মানুষ হিসেবে দুজনেই ভাল, কিন্তু বিপরীত ধাতের মানুষ। স্বামী উগ্র রুক্ষ অশিক্ষিত, স্ত্রী আধুনিকা প্রগতিশীলা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এরা মানুষ হয়েছে; কেউ কারুর সংগে খাপ খাওয়াতে পারছে না। এমনিভাবে ঝগড়া করে আর এক বিছানায় শুয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেবে।...

আমি নার্স, জেগে জেগে ঘুমিয়ে নিতে পারি। রুগীর বিছানার পাশে চোখ চেয়ে বসে আছি। রুগী ঘুমচ্ছে, আমার কোন কাজ নেই। সোজা বসে আছি চোখ মেলে, কিন্তু মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে; জেগেও নেই, আবার ঘুমচ্ছিও না। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। যারা রাত জেগে সেবা করে তাদের মন এইভাবে বিশ্রাম করে নেয়।

খস্‌খস্‌ শব্দে দোরের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলুম শংখনাথবাবু দু হাতে দু পেয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢুকছেন। ঘড়ি দেখলুম, তিনটে বেজে গেছে।

আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, এক পেয়ালা চা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

চায়ের পেয়ালা নিলুম। তিনি মেয়ের দিকে একবার চোখ বেঁকিয়ে ভ্রূ তুলে আমার পানে চাইলেন। আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম—ভাল আছে।

তিনি তখন একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিজের পেয়ালায় চুমুক দিলেন। আমিও উঠে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালুম। পেয়ালা ঠোঁটে ঠেকাতেই মনটা খুশী হয়ে উঠল। শেষ রাত্রে অপ্রত্যাশিত গরম চা বড় মিষ্টি লাগে।

নিচু গলায় বললুম, 'আপনি চা তৈরি করলেন?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আর কে করবে? আমার গিন্নী? তিনি ঘুমচ্ছেন, বেলা দশটার আগে বিছানা ছাড়বেন না।'

গিন্নীর প্রসংগ বাড়তে দেওয়া উচিত নয়, তাই প্রশ্ন করলুম, 'আপনি ঘুমলেন না কেন?'

তাঁর মুখখানা বিরাগে ভরে উঠল,—'ঘুমতে ইচ্ছে হল না। আর কতটুকুই বা রাত্রি আছে, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ভোর হয়ে যাবে।'

চা খাওয়া শেষ হলে শংখনাথবাবু পেয়ালা দুটো পাশের ঘরে রাখতে গেলেন, আমি আবার পিউয়ের বিছানার পাশে গিয়ে বসলুম। শংখনাথবাবু ফিরে এসে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আমি বসে বসে অনুভব করলুম, তাঁর চোখ থেকে থেকে আমার দিকে ফিরছে। আমার সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময় আর কৌতূহল এখনও কাটেনি।

তারপর ক্রমে ফরসা হল, জানলার কাচের ভিতর দিয়ে দিনের আলো দেখা গেল। বৃষ্টি থেমেছে কিন্তু মেঘ কাটেনি।

বাড়ি জেগে উঠল। প্রথমে ঘরে এল কলাবতী, তারপর শিউসেবক। কলাবতী পিউয়ের খাটের পাশে মেঝের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসল, তারপর পিউয়ের পানে হাত বাড়াল। আমি অবাক হয়ে বললুম, 'এ কী?'

কলাবতী হেসে বলল, 'বাচ্চা দুধ খাবে।'

বললুম, 'দুধ! কোথায় দুধ?'

কলাবতী নিজের বুকের ওপর হাত রেখে

বলল, 'এইখানে।'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম। কলাবতী আমার মুখের ভাব দেখে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল।

শঙ্খনাথবাবু কলাবতীর পিছনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কী হয়েছে?'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'ঝি বলছে পিউ নাকি—'

উনি বললেন, 'কলাবতীর দুধ খায়? হ্যাঁ, জন্মে পর্যন্ত পিউ কলাবতীর দুধ খায়। ওর মা ত ওকে দুধ দেয়নি।'

আমার মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠল, কোন্ দিকে তাকাব ভেবে পেলুম না। শেষে বললুম, 'ডাক্তারের আপত্তি নেই?'

'না। আপত্তি হবে কিসের জন্যে?'

'না না, তা বলছি না, কিন্তু—'

ইতিমধ্যে কলাবতী পিউকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম। কী যে এদের রীতিনীতি কিছুই বুঝি না। এরকম ব্যাপারে আমার অভ্যেস নেই। কিন্তু ডাক্তার যখন অনুমতি দিয়েছেন তখন আর বলবার কী আছে?

শিউসেবক খাটো গলায় বলল, 'নার্স সাহেব, পাশের ঘরে চা দেওয়া হয়েছে, আপনি মুখ ধোবেন কি?'

সাদা টাইল বাঁধানো ঝকঝকে বাথরুমে গেলুম, তারপর ডাইনিং রুমে গিয়ে চা খেতে বসলুম। প্রকাণ্ড ঘর, মাঝখানে লম্বা টেবিল, তার এক পাশে খাবার দেওয়া হয়েছে। শুধু চা নয়, টোস্ট, ডিম, এক গেলাস গরম দুধ। শঙ্খনাথবাবু টেবিলের পাশে বসেছেন, তাঁর সামনে কেবল এক গেলাস দুধ।

আমি খেতে আরম্ভ করলুম, বললুম, 'নার্সকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ানোর কিন্তু নিয়ম নেই।'

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'নিয়মকানুন আমি জানি না। বলেছি ত আমি চাষা মনিষ্যি, যা মনে আসে তাই করি।'

আমি খেতে লাগলুম, তিনি মাঝে মাঝে দুধের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে আমার খাওয়া দেখতে লাগলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথা বলে চললেন। ছাড়া ছাড়া কথা। তা থেকে তাঁর পারিবারিক পরিস্থিতির কিছু খবর পেলুম। কলাবতী হচ্ছে শিউসেবকের বউ। ওরা চার-পাঁচ বছর ও'র বাড়িতে চাকরি করছে। ওরা পশ্চিমা পাহাড়ী জাতের লোক, বোধ হয় গাড়োয়ালী; শঙ্খনাথবাবুর অত্যন্ত অনুগত, ও'র জন্যে প্রাণ দিতে পারে। ...শঙ্খনাথবাবুর স্ত্রীর নাম সলিলা; রিটায়ার-করা সিভিলিয়ানের মেয়ে। বছর তিনেক আগে বিয়ে হয়েছে। কী দেখে সলিলা শঙ্খনাথবাবুকে বিয়ে করেছিল জানি না; বোধ হয় টাকা দেখে। ...পিউ তাঁদের একমাত্র সন্তান। জন্মাবধি ঝিয়ের কোলেই মানুষ। কলাবতীরও একটি বছর দেড়েকের ছেলে আছে।

বেলা আটটার সময় ডাক্তার এলেন।

ডাক্তারকে দেখে চমকে উঠলুম: মন্মথ কর। তেমনই ধারালো মুখ, তেমনই ফিটফাট চেহারা। পরনে শার্ক-স্কিনের সুট্। দেখে মনে হয় প্র্যাক্টিস্ বেশ ভালই চলছে। মুচ্কি হেসে বললেন, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন দেখছি।'

তাঁকে প্রথম দেখে চমকে উঠেছিলাম বটে, কিন্তু নেকড়ে বাঘ আর অজগর সাপের ভয় আমার কেটে গেছে। বললুম, 'হ্যাঁ, কাল টেলিফোনে গলা শুনে চিনতে পারিনি। আপনি ভাল আছেন?'

হেসে বললেন, 'চলছে একরকম। আপনি ত আলাদা বাসা নিয়ে প্র্যাক্টিশ করছেন, টেলিফোন ডিরেক্টরিতে দেখলাম। সঙ্গে

'চাপা গর্জনে বললেন, '[illegible]?'

পরী বলল, 'চুপ। পিউ জেগে উঠবে।'

আর কে থাকেন?'

বললুম, 'শুক্লা। আমার বন্ধু শুক্লা। আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি।'

তিনি ভাবতে ভাবতে বললেন, 'শুক্লা—তিনিও কি নার্স?'

'হ্যাঁ। তাকে আপনার মনে নেই। দেখলে হয়ত চিনতে পারবেন।—আসুন, আপনার পেশেন্টের কাছে নিয়ে যাই। পেশেন্ট ভাল আছে।'

ডাক্তারকে পিউয়ের ঘরে নিয়ে গেলুম; শঙ্খনাথবাবুও সঙ্গে এলেন। কলাবতী পিউকে আবার শুইয়ে দিয়ে খাটের পাশে মেঝেয় বসে আছে। পিউ জেগে উঠেছে, চুপটি করে শুয়ে পিটপিট করে চাইছে।

ডাক্তার পিউকে পরীক্ষা করলেন, তার রিফ্লেক্স দেখলেন। আমি ডাক্তার দেখে দেখে পেকে গেছি, কোন্ ডাক্তার কী ভাবে রোগী পরীক্ষা করেন, তা থেকে বোঝা যায় তিনি কী রকম ডাক্তার। দেখলুম বয়সে তরুণ হলেও ইনি বিচক্ষণ ডাক্তার। এঁর পরীক্ষা করার ভঙ্গিতে বেশ একটি সতর্ক আত্মপ্রত্যয় আছে, অথচ আড়ম্বর নেই।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার বললেন, 'বাঃ! খুকী ত সেরে গেছে। আর দু-চার দিন ভালভাবে নার্স করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'আর ইন্‌জেক্‌শন দিতে হবে না?'

ডাক্তার বললেন, 'না, ওরাল্ ওষুধেই কাজ চলবে।'

তিনি ওষুধ পথ্য এবং পরিচর্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন; যাবার সময় আমার পানে একটু মুচকি হেসে গেলেন।

আমি শঙ্খনাথবাবুকে বললুম, 'আমিও এবার যাই।'

উনি বললেন, 'আচ্ছা। দিনের বেলাটা আমি সামলে নেব। তুমি কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি এসো প্রিয়দম্বা! আমি ঠিক নটার সময় গাড়ি পাঠাব।'

'আমাকে কি আর দরকার হবে?'

'হবে।' তিনি পকেট থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বার করে আমার হাতে দিলেন।

'আচ্ছা, আসব।'

নীচে গাড়ি-বারান্দায় মোটর দাঁড়িয়ে ছিল; আমি নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠলুম। শিউসেবক গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেলাম করল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করল।

যেতে যেতে দেখলুম আকাশ এখনও পরিষ্কার হয়নি; পাতলা ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘের মধ্যে দিয়ে পানসে রোদ দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল আজ সকালে পিউয়ের মাকে একবারও দেখিনি। তিনি বোধ হয় এখনও ঘুমুচ্ছেন। মাঝরাত্তির না শুলে সকালবেলা ঘুম ভাঙবে কী করে? মানুষের শরীর ত। অথচ শঙ্খনাথবাবু না-ঘুমিয়ে দিব্যি রাত কাটিয়ে দিলেন। লোহার শরীর বোধ হয়।

বাসায় এসে দেখলুম শুক্লা আগেই ফিরেছে, নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে। ঝি বোধ হয় ডাকাডাকি করে চলে গেছে। আমি নিজের ঘরে গিয়ে নার্সের কাপড়চোপড় ছাড়লুম, তারপর স্নান করে শুয়ে পড়লুম।

ঘুম ভাঙল বেলা তখন দুটো। শুক্লা বিছানার পাশে বসে কাঁধ ধরে নাড়া দিচ্ছে, আমি চোখ মেলতেই জিগ্যেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলি কাল রাত্রে?'

বিছানায় উঠে বসে শুক্লাকে সব বললুম। শুনে শুক্লা শঙ্খনাথবাবুর পারিবারিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে কিছু বলল না, ডাক্তার সম্বন্ধে বলল, 'নেকড়ে বাঘ এখনও তোর আশা ছাড়েনি। সাবধান থাকিস।'

বললুম, 'দূর! সে বয়স আর নেই।'

শুক্লা বলল, 'কিছু বলা যায় না। পড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।—নে ওঠ্। রান্না করেছি, খাবি চল্।'

শুক্লার জীবন যে-পথেই চলুক, মনটা তার গোঁড়া।

দুজনে খেতে বসলুম। আজ রাত্রে শুক্লার কাজ নেই, সে বাড়িতেই থাকবে। বোধ হয় ডক্টর দাস আসবেন; শুক্লার মুখ দেখে যেন মনে হচ্ছে।

খাওয়া সেরে ডায়েরি লিখতে বসেছি। রাত্রি নটায় গাড়ি আসবে।

১৯ শ্রাবণ

ঠিক নটার সময় গাড়ি এল। রাত্তিরের খাওয়া সেরে নার্সের সাজপোশাক পরে তৈরী ছিলুম, গাড়িতে উঠে বসলুম।

গাড়ি যখন শঙ্খনাথবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন দেখলুম, তাঁর স্ত্রী সলিলা সেজেগুজে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে; বোধ হয় গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ সাজপোশাক একেবারে অন্য রকম, আগাগোড়া সাদা। সাদা সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ, গলায় মুক্তোর কণ্ঠী, পায়ে সাদা হাই-হিল্ জুতো; হাতে চুড়িবালা নেই, কেবল আঙুলে একটি মুনস্টোনের আংটি, চুলে এক থোলো শ্বেতকরবী। সব মিলিয়ে যেন একটি ফুলন্ত রজনীগন্ধার ছড়। আমি গাড়ি থেকে নামতেই সে আমার পানে একটু মিষ্টি হাসির সুগন্ধ বিলিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ি পাক খেয়ে বেরিয়ে গেল। আজও নাচের পার্টি নাকি?

শিউসেবক বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল; হাসিমুখে বলল, 'আসুন মিস্। পিউরানী আজ ভাল আছে, দুপুরবেলা খেলা করেছে।'

শিউসেবকের সঙ্গে ওপরে চললুম। সে পরিষ্কার বাংলা বলে। কলাবতী কিন্তু বাংলা বলতে পারে না।

পিউয়ের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। ঘরের মাঝখানে দুর্বাসা মুনির ভঙ্গিতে বুকে হাত বেঁধে শঙ্খনাথবাবু দাঁড়িয়ে আছেন, চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে। আমাকে দেখেই তিনি ফেটে পড়লেন,—'আমার বউ আজও পার্টিতে গেছে, বুঝেছ? কর্নেল হড়বড় সিংয়ের বাড়িতে পার্টি। খাঁটি পাঞ্জাবী কর্নেল, তার ছেলের নাম লেফটেন্যান্ট লট্‌পট্ সিং। এই লট্‌পট্ সিংয়ের সঙ্গে আমার বউয়ের ভারি ভাব। ভারি স্মার্ট ছোকরা লট্‌পট্ সিং, এক টানে এক বোতল হুইস্কি সাবাড় করে দিতে পারে। আরও অনেক গুণ আছে। বুঝলে? কলকাতার যত উচ্চশ্রেণীর যুবক-যুবতী আছে, সব আজ সেখানে গিয়ে জুটেছে আমার বউ সেখানে না গিয়ে থাকতে পারে!'

আমার মনটা বিরক্ত হয়ে উঠল। বললুম, 'আপনার যখন ইচ্ছে নয় তখন স্ত্রীকে পাঠালেন কেন?'

তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আমি পাঠিয়েছি! তুমি কী বলছ প্রিয়দম্বা! সভ্য-সমাজের প্রগতিশীলা মহিলাদের তুমি চেন না। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন জেনানা ওরা, ওরা কি স্বামীর অনুমতির তোয়াক্কা রাখে! ওরা নিজের ইচ্ছেয় চলে, নিজের খুশিতে নাচে, নিজের গরজে মিষ্টি কথা বলে। মিষ্টি কথায় কাজ না হয় স্পষ্ট কথা আছে। কে কার কড়ি ধারে!'

ব্যাপার বুঝতে দেরি হল না। স্বামীর নিষেধ উপেক্ষা করে সলিলা পার্টিতে গিয়েছে। কিন্তু শঙ্খনাথবাবুর কথায় সায়-উত্তর দিলে কথা বেড়েই যাবে, তাঁর রাগও বাড়বে। আমি আর কোনও কথা না বলে পিউয়ের খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

পিউ জেগে আছে, কিন্তু চুপটি করে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল; চোখ দুটি হাসিতে ভরে উঠল। তারপর সে আমার দিকে দু হাত বাড়িয়ে দিল।

আমার বুকের মধ্যে যেন সব ওলটপালট হয়ে গেল। আমি তাকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলুম। ফুলের মতন হাল্কা মেয়েটা, আমার কাঁধে মাথা রেখে চুপটি করে রইল।

শঙ্খনাথবাবু কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেছে। বিগলিত স্বরে বললেন, 'পিউ একেবারে সেরে গেছে—না?'

বললুম, 'হ্যাঁ।'

'আর কোনও ভয় নেই?'

'না।'

তিনি একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি এসেছিলে তাই পিউ এত শিগ্‌গির সেরে উঠল। তুমি ভারি পয়মন্ত প্রিয়দম্বা।'

আমি পিউকে নিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি

করলুম। মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে ডাকলুম, 'পিউ!'

পিউ ঘুমোয়নি, পাখির মতন সরু গলায় বলল, 'উঁ?'

আমি তাকে আবার বিছানায় শুইয়ে দিলুম। সে আবার একটু হাসল। হাসিটি একেবারে মায়ের হাসি বসানো। আমি তার খাটের পাশে বসে বললুম, 'পিউ, তোমার খিদে পেয়েছে?'

পিউ ঘাড় নেড়ে বলল, 'হুঁ!'

'তাহলে তোমার জন্যে দুধ তৈরি করে আনি? বোতলে দুধ খাবে ত?'

পিউয়ের চোখ আমার মুখ থেকে নেমে দোরের কাছে গিয়ে স্থির হল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম কলাবতী দোরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

বুঝতে বাকী রইল না পিউ কী খেতে চায়। তবু বললুম, 'বোতলে দুধ খাবে না? খুব মিষ্টি দুধ, আমি তৈরি করে দেব—অ্যাঁ?'

পিউয়ের চোখ কিন্তু কলাবতীর ওপর থেকে নড়ল না। তার ঠোঁট দুটি একটু একটু ফুলতে লাগল, তারপর সে পরিষ্কার মিহি গলায় বলল, 'দুধ খাব না, কলা খাব।'

আমি চোখ তুলে শঙ্খনাথবাবুর পানে চাইলুম, তিনি হা-হা করে হেসে বললেন, 'কলা খাব মানে বুঝলে না? বোতলের দুধ খাবে না, কলাবতীর দুধ খাবে।'

তখন আর উপায় কী! আমি উঠে গিয়ে চেয়ারে বসলুম, কলাবতী এসে পিউকে খাওয়াতে লাগল। শঙ্খনাথবাবু একটা চেয়ার টেনে আমার কাছে বসলেন, বললেন, 'তোমার ইচ্ছে নয় পিউ কলাবতীর দুধ খায়—কেমন?'

আমি বললুম, 'দশ মাস বয়সের পর আর দরকার হয় না। ছাড়িয়ে দেওয়াই ত ভাল।'

তিনি বললেন, 'তুমি যখন বলছ তখন নিশ্চয় ঠিক কথা। চেষ্টা করব। কিন্তু পিউ বড় কান্নাকাটি করবে।'

বললুম, 'এখন থাক্। একেবারে সেরে উঠুক।'

তিনি বললেন, 'সেই ভাল। তুমি খাওয়া-দাওয়া করে এসেছ ত? যদি না খেয়ে এসে থাক—'

'আমি খেয়ে এসেছি।'

তিনি উস্‌খুস্ করলেন; মনে হল তিনি যেন আমাকে কোন প্রশ্ন করতে চান। হঠাৎ বললেন, 'কী দিয়ে ভাত খেলে?'

সভ্যসমাজে এ প্রশ্ন চলে না। কিন্তু আমার রাগ হল না, বরং হাসি এল। বললুম, 'মুগের ডাল, কুচো চিংড়ির চচ্চড়ি, ইলিশ মাছের ঝোল আর ডিম ভাতে।'

শঙ্খনাথবাবু হেসে উঠলেন। প্রাণখোলা সরল হাসি, তাতে বড়মানুষির অবজ্ঞা নেই। তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে একটু করুণ সুরে বললেন, 'আমিও আগে ওই খেতাম। কিন্তু এখন আর ও-খবার জো নেই। আজকাল বাবুর্চির রান্না খেতে হয়।...হরদম কালিয়া পোলাও, মটন মুরগি, একেবারে মোগলাই ব্যাপার।'

নিশ্বাস ফেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আমি খেতে যাচ্ছি। তুমি আসবে না? একটা কাটলেট? একটু পুডিং?'

'না।'

তিনি চলে গেলেন।

পিউ কলাবতীর কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। আমি খাটের পাশে চেয়ার টেনে বসলুম, কলাবতীকে বললুম, 'তোমাকে আজ আর দরকার নেই, তুমি যাও।' সে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

রাত্রিটা একরকম ঠাণ্ডাভাবেই কাটল।

খাওয়া শেষ করে শঙ্খনাথবাবু ঘরে এলেন, প্রকাণ্ড একটা হাই তুললেন। আমি বললুম, 'আপনি আবার এ ঘরে কেন? যান, শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

তিনি বললেন, 'আমাকে দরকার হবে না?'

'না।'

'আচ্ছা। যদি কিছু দরকার হয় এই বোতাম টিপো, তা হলেই শিউসেবক আসবে।' বলে দোরের পাশে বোতাম দেখালেন।

'শিউসেবক বাড়িতেই থাকে?'

'হ্যাঁ। নীচের তলায় পিছন দিকে চাকরদের থাকবার জায়গা। শিউসেবক, কলাবতী, বাবুর্চি, আরও দুটো চাকর, সবাই সেখানে থাকে। আমি যাই, ঘুমে চোখ ভেরে আসছে।'

তিনি খাটের ওপর ঝুঁকে পিউয়ের মুখখানি একবার দেখলেন, তারপর আর-একটা হাই তুলে চলে গেলেন।

ঘণ্টাদেড়েক আর কোন সাড়াশব্দ নেই। পিউ নিঃশব্দে নিশ্বাস ফেলছে। কী অদ্ভুত সুন্দর মেয়েটা, হঠাৎ যেন বিশ্বাস হয় না।... আমাকে ত চেনে না, অথচ কেমন স্বচ্ছন্দে আমার কোলে এল। যেন কতকালের চেনা। ওকে কোলে নিয়ে আমারও মনে হল যেন ও একান্তই আপনার; বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। কত বাচ্চাকেই ত নার্স করেছি, কিন্তু এমন কখনও মনে হয়নি। জাদু জানে মেয়েটা।

কিন্তু ওর মা এমন ধিঙ্গী কেন? ঘরে মন বসে না! এমন যার বাড়ি-ঘর, এমন যার মেয়ে, তার ঘরে মন বসে না!...পিউও কি বড় হয়ে মায়ের মতন ধিঙ্গী হবে? আশ্চর্য কী, যা দেখবে তাই ত শিখবে। কী জানি বাপু, ভাবতেও খারাপ লাগে।...

দরজার বাইরে খুব মৃদু আওয়াজ পেয়ে সেইদিকে চোখ ফেরালুম। পিউয়ের মা চোরের মতন পা টিপে টিপে দোরের সামনে দিয়ে চলে গেল। মেয়ের ঘরে এল না, ঘরের দিকে একবার তাকাল না। ঘড়িতে দেখলুম পোনে বারোটা। যাক, আজ তবু সকাল সকাল পার্টি থেকে ফিরেছে।

শঙ্খনাথবাবু নিশ্চয় ঘুমিয়েছেন, কারণ গণ্ডগোল চেঁচামেচি কিছু হল না। অনেকক্ষণ কান পেতে রইলুম, কিছু শুনতে পেলুম না।

বসে আছি, কিছু করবার নেই। একখানা বই আনলে ভাল হত, তবু খানিকটা সময় কাটত। শঙ্খনাথবাবুর বাড়িতে বোধ হয় বইয়ের পাট নেই। কে পড়বে? শঙ্খনাথবাবু সম্ভবত খবরের কাগজ ছাড়া আর-কিছু পড়েন না। আর সলিলা—সে বই পড়ে সময় নষ্ট করবে? এ ধরনের মেয়েরা বই পড়ে না।

রাত্রে আমার আর কোনও কাজ নেই। পিউয়ের যদি ঘুম ভাঙে, সে যদি খেতে চায়, তাকে দুধ তৈরি করে খেতে দেব। পাশের ঘরে সব ব্যবস্থা আছে। একবার গিয়ে দেখে এলে হয়, সব ঠিক আছে কি না! যদি না থাকে শিউসেবককে ডাকতে হবে বোতাম টিপে।

পিউ নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। পা টিপে-টিপে উঠে গেলুম। পাশের ঘরটা বোধ হয় আসলে গেস্ট-রুম, এখন সেখানে পিউয়ের খাবার সরঞ্জাম রাখা হয়েছে। টিনের দুধ, গ্লুকোজের কৌটো, দুধ খাওয়ানোর বোতল, ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ—সবই মজুত আছে। শিউসেবককে ডাকবার দরকার হবে না।

ফিরে এসে বসলুম। পিউয়ের গায়ে আস্তে আস্তে হাত রাখলুম। মেয়েটা যেন মাখনের দলা; ইচ্ছে করে দু হাতে চটকাই, তারপর বুকে চেপে ধরে চুমু খাই।...কিন্তু রোগীর প্রতি নার্সের এ-রকম মনোভাব ভাল নয়। নার্স প্রিয়ংবদা ভৌমিক, পরের সোনা কানে দিও না!

'তুমি ভারি পয়মন্ত'—শঙ্খনাথবাবু আমাকে বলেছিলেন। কথাটা ঘুরে-ফিরে মনে আসছে। পয়মন্ত! কী জানি। অবশ্য আজ পর্যন্ত আমার হাতে একটিও রোগীর মৃত্যু হয়নি। তাকেই কি পয়মন্ত বলে?... শঙ্খনাথবাবু যতই অসভ্য আর অশিক্ষিত হোন, তাঁর মন ভাল। সরল সহজ মানুষ। মেয়েকে কী ভালই বাসেন! স্ত্রীকেও হয়ত ভালবাসেন। কিন্তু—

রাত্রি সাড়ে তিনটে। শঙ্খনাথবাবু দু পেয়ালা চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বললুম, 'আপনার ঘুম হয়ে গেল?'

তিনি পাশে এসে দাঁড়ালেন,—'খুব ঘুমিয়েছি। আমার পাঁচ-ছ ঘণ্টার বেশী ঘুম দরকার হয় না।'

আমি উঠে তাঁর হাত থেকে চা নিলুম। পিউয়ের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলুম। নিচু গলায় কথা হতে লাগল।

তিনি বললেন, 'চা কেমন হয়েছে?'

বললুম, 'ভাল।'

'সঙ্গে কিছু খাবে? দুটো বিস্কুট?'

'না।'

'পিউ রাত্তিরে জেগেছিল?'

'না। একবার নড়েওনি।'

'আর বোধ হয় ভয়ের কিছু নেই।'

'না।'

'আজ থেকে আবার আমাকে কাজে বেরুতে হবে। সাত দিন কাজের কথা ভাবতে পারিনি।'

ভাবলুম তিনি যদি আমাকে 'কি দিয়ে ভাত খেলে' জিগ্যেস করতে পারেন, আমিই বা জিগ্যেস করব না কেন—'কী কাজ করেন?'

জিগ্যেস করলুম। তিনি অশিষ্ট প্রশ্ন লক্ষ্যই করলেন না, বললেন, 'ঠিকেদারি। ইঁট আর কাঠের ব্যবসা।'

আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ইঁট আর কাঠের ব্যবসায় কত টাকা রোজগার করেন শঙ্খনাথবাবু!

তিনি বললেন, 'আজ থেকে বেরুতেই হবে। নিজের কাজ নিজে না দেখলে পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খায়।'

আমি বললুম, 'আজ থেকে আমাকেও দরকার হবে না।'

তিনি চোখ বিস্ফারিত করে আমার পানে চেয়ে রইলেন,—'দরকার হবে না! তুমি না এলে রাত্তিরে পিউকে দেখবে কে?'

বললুম, 'যে এতদিন দেখেছে সে দেখবে। কলাবতী দেখবে। পিউ ত এখন সেরে গেছে।'

'সেরে গেলেও কলাবতীর হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না।'

'তাহলে আপনি মেয়ের জন্যে গভর্নেস্ রাখুন।'

'গভর্নেস্! না প্রিয়দম্বা, ওসব সাহেবী কাণ্ডকারখানা আর নয়, এমনিতেই সাহেবিয়ানার ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আমি একজন ভালগোছের ঝিয়ের তল্লাশ করছি। যতদিন না পাই, তুমি এসো। লক্ষ্মীটি। তুমি না এলে রাত্তিরে আমি ঘুমতে পারব না।' শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর বড় করুণ শোনাল। যে-পুরুষ স্ত্রীর ওপর নির্ভর করতে পারে না তার অবস্থা সত্যিই শোচনীয়।

একটু হেসে বললুম, 'মিছিমিছি পঞ্চাশ টাকা রোজ খরচ করবেন?'

তিনি অবহেলাভরে বললেন, 'করলেই বা। আমি বছরে সওয়া লাখ দেড় লাখ টাকা রোজগার করি। ও আমার গায়ে লাগে না।'

সওয়া লাখ দেড় লাখ! ইটকাঠের ব্যবসায়! আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি আমার হাত থেকে খালি পেয়ালা নিয়ে সাগ্রহে বললেন, 'তাহলে রাজী? যতদিন ভাল ঝি না পাই ততদিন আসবে?'

'আসব।'

শঙ্খনাথবাবু আহ্লাদে আটখানা হয়ে পেয়ালা রাখতে চলে গেলেন। আমি আবার গিয়ে বসলুম। এই মেয়েটাকেই আমার ভয়। জাদু জানে ও, আমাকে মোহের জালে জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করছে।

ছোট ছেলেমেয়ে কার না ভাল লাগে? বিশেষত যদি পিউয়ের মতন সুন্দর হয়। কিন্তু এ তা নয়। পিউকে দেখে অবধি আমার মনের মধ্যে কী একটা ঘটতে আরম্ভ করেছে। ...পঁচিশ বছর বয়সে এ সব কেন? যা হবার নয় তার জন্যে লোভ কেন? প্রিয়ংবদা ভৌমিক, সাবধান! পরের সোনা দিও না কানে—

বেলা আটটার সময় ডাক্তার এলেন। পিউকে পরীক্ষা করে বললেন, 'আর ওষুধ খাওয়াবার দরকার নেই। যে শিশিটা চলছে সেটা শেষ হলেই বন্ধ করে দেবেন। কাল থেকে আমারও আর আসবার দরকার নেই।'

শঙ্খনাথবাবু বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হয়েছিলেন, বললেন, 'ধন্যবাদ ডাক্তার। প্রিয়দম্বাকে আমি আরও কয়েকদিন আসতে বলেছি।'

ডাক্তার মুচকি হেসে আমার পানে তাকালেন,—'বেশ ত।' তাঁর হাসির আড়ালে একটা গোপন প্রশ্ন রয়েছে মনে হল।

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'তাহলে চল প্রিয়দম্বা, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি কাজে চলে যাব।'

ডাক্তার বললেন, 'আচ্ছা, আমি তাহলে চলি।'

ডাক্তার মুচকি হেসে চলে গেলেন। আমি পিউয়ের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পিউ জেগে আছে; আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে দু হাত বাড়িয়ে দিল। আমি তাকে কোলে তুলে নিলুম। সে একটু আদুরে-আদুরে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'কলা খাব।' যেন আমার অনুমতি চাইছে।

আমি হেসে উঠলুম, বললুম, 'কলা খাবে ত আমার কাছে এসেছ কেন? যাও কলার কাছে।'

কলাবতী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে হাত বাড়াল। পিউ কিন্তু তখনই তার কাছে গেল না; আমার গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুক্ করে একটু শব্দ করল। বোধ হয় অনুমতির জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাল।

শঙ্খনাথবাবু হা-হা করে হেসে উঠলেন। আমার চোখে কিন্তু জল এল। আমি তার গালে তাড়াতাড়ি একটি চুমু খেয়ে তাকে কলাবতীর কোলে দিলুম। শঙ্খনাথবাবু তখনও হেসেই চলেছেন।

এতে হাসির কী আছে এত? একটু বিরক্ত হয়েই বললুম, 'চলুন এবার।'

'চল।'

মোটরে আসতে আসতে ও'র সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল।

আমরা দুজনেই মোটরের পিছনের সীটে বসেছিলুম; তিনি এক কোণে, আমি অন্য কোণে। তিনি আমাকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে একটু অনুনয়ের সুরে বললেন, 'প্রিয়দম্বা, তুমি রাগ করেছ?'

আমি রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইলুম। রাগ অবশ্য আমি করিনি, কার ওপরেই বা রাগ করব? কিন্তু মনটা কেমন যেন অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। ডাক্তারের সামনে আমাকে 'প্রিয়দম্বা' বলে না ডাকলেই কি চলত না? তারপর, পিউ যদি আমাকে চুমু খেয়েই থাকে তাতে হাসির কী আছে! কী রকম যেন সব!

শঙ্খনাথবাবু আবার বললেন, 'তুমি রাগ কোর না প্রিয়দম্বা। পিউয়ের ওই স্বভাব, যাকে ওর ভাল লাগে তাকেই চুমু খায়।'

কী উল্টো-বোঝা মানুষ! আমি যেন ওই জন্যেই রাগ করেছি। বললুম, 'পিউ একরত্তি মেয়ে, ও যাই করুক দোষ হয় না। কিন্তু আপনি ত ছেলেমানুষ নন, আপনি অমন করেন কেন?'

তাঁর চোয়াল ঝুলে পড়ল,—'আমি কী করেছি?'

এইবার সত্যিসত্যি আমার মাথায় রাগ চড়ে গেল। বললুম, 'আপনি আমায় 'প্রিয়দম্বা' বলেন কেন? মিস্ ভৌমিক বলতে পারেন না?'

তিনি হেসে উঠলেন, 'এই জন্যে রাগ? কিন্তু মিস্ ভৌমিক বলব কেন? ওসব বিলিতি ঢঙ আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া মিস্ ভৌমিক বললেই মনে হয় পঞ্চাশ বছরের বুড়ী। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে নাম ধরে ডাকাই ত ভাল।'

রাগ আরও বেড়ে গেল, বললুম, 'আমি মোটেই ছেলেমানুষ নই, পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় হতে পারেন, কিন্তু আমাকে 'তুমি' বলে ডাকবার অধিকার আপনার নেই।'

তিনি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, বললেন, 'তবে কী বলে ডাকব?'

'আপনি বলবেন। আমি আপনাকে 'আপনি' বলি, আপনি আমাকে 'তুমি' বলবেন কেন?'

'কিন্তু—কিন্তু—কমবয়সী মেয়েকে আপনি বলব কী করে? ভদ্রসমাজে বলে শুনেছি; ষাট বছরের বুড়ো আঠারো বছরের মেয়েকে 'আপনি' বলে। কিন্তু আমার যে অভ্যেস নেই।'

'তবে অভ্যেস করুন। ভদ্রসমাজে থাকতে গেলে ভদ্র ব্যবহার অভ্যেস করতে হয়।'

তিনি কিছুক্ষণ ঘাড় গুঁজে চুপ করে রইলেন, ভাবলুম খোঁচা খেয়ে আহত হয়েছেন। তারপরই তিনি মুখ তুলে বললেন, 'আচ্ছা, এক কাজ কর না। আমি তোমাকে "তুমি" বলি, তুমিও আমাকে "তুমি" বল। তাহলে তো আর কোনও গোল থাকবে না। কেমন, বলবে?'

তখনও আমার রাগ পড়েনি, বললুম, 'বলবই তো।'

তিনি খুশী হয়ে বললেন, 'বেশ বেশ। লোকে শুনলে মনে করবে আমি তোমার পিসে-মেসো গোছের আত্মীয়। কেউ কিছু মনে করবে না।'

গাড়ি এসে আমার বাসার সামনে থামল। আমি নামবার উপক্রম করছি, তিনি আমার হাতে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'ঠিক নটার সময় গাড়ি আসবে। তৈরী থেকো।'

আমি নেমে পড়লুম। তিনি গলা বাড়িয়ে বাসাটা এক নজরে দেখে নিলেন। তারপর গাড়ি চলে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আমার আর রাগ রইল না, মনটা হঠাৎ যেন হেসে লুটিয়ে পড়ল। কী ছেলেমানুষিই করলুম!

শুক্লা বোধ হয় ওপরের বারান্দা থেকে গাড়ি আসতে দেখেছিল, সিঁড়ির দরজা খুলে দিল। তার মুখ দেখে থমকে গেলুম। মুখ শুকনো, চোখ ছলছল করছে। মুখে হাসি টেনে এনে বলল, 'এত দেরি হল যে? সকাল-বেলা কিছু খেয়েছিস?'

বললুম, 'খেয়েছি। জামাইবাবু এসেছিলেন?'

সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। আয়, চা তৈরি করে তোর পথ চেয়ে আছি।'

দুজনে বসবার ঘরে গেলুম। শুক্লা এক প্লেট নিমকি ভেজে চা ভিজিয়ে টি-পটে টি-কোজি ঢাকা দিয়ে রেখেছে। আমি নিমকি নিলুম না, এক পেয়ালা চা ঢেলে নিয়ে শুক্লার সামনে বসলুম, বললুম, 'এবার বল্ কী হয়েছে।'

শুক্লা আর আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করল না, কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'ভাই, দুর্ভাবনায় কাল সারা রাত্তির ঘুমুতে পারিনি।'

শুক্লা তখন আস্তে আস্তে সব বলল। কাল রাত্রে ডক্টর দাস আন্দাজ পৌনে এগারোটার সময় এসেছিলেন। খাওয়াদাওয়া সবে সারা হয়েছে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। শুক্লা টেলিফোন ধরল। অচেনা পুরুষের গলায় কে তাকে প্রশ্ন করল, 'ডক্টর দাস আছেন?'

শুক্লা একেবারে কাঠ হয়ে গেল। কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বলল, 'কে ডক্টর দাস?'

টেলিফোনে উত্তর এল, 'ডক্টর নিরঞ্জন দাস, গাইনকোলজিস্ট।'

এমন ত কখনও হয়নি, মেয়েটা বাঘ্, জানে

শুক্লা ইতিমধ্যে একটু সামলে নিয়েছে, বলল, 'তিনি ত এখানে নেই। আপনি কে?'

টেলিফোনে একটু হাসির আওয়াজ এল। তারপর আর সাড়াশব্দ নেই, যে ফোন্ করছিল সে ফোন্ ছেড়ে দিয়েছে।

শুক্লা ডক্টর দাসকে বলল। শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। বলে গেলেন, 'কেউ জানতে পেরেছে। হয়ত খোঁজ নিতে আসবে।'

তিনি চলে যাবার পর শুক্লা সারারাত প্রায় জেগেই কাটিয়েছে। কিন্তু কেউ আসেনি, টেলিফোনও করেনি।

যে লোকটা টেলিফোন করেছিল তার গলার স্বর আর কথা বলবার ভঙ্গী থেকে তাকে ভদ্রশ্রেণীর লোক বলে মনে হয়। কে লোকটা? হয়ত ডক্টর দাসের কোনো গুপ্ত-শত্রু, জানতে পেরেছে তিনি রাত্রে এখানে আসেন। কিন্তু টেলিফোন করার মানে কী? তার যদি শত্রুতা করাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে এখানে টেলিফোন না করে ডক্টর দাসের স্ত্রীকে টেলিফোন করলেই ত পারত। হয়ত এখানে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল, তারপর ডক্টর দাসের স্ত্রীকে খবর দিয়েছে। এখন সেই রণ-রঙ্গিণী মহিলাটি যদি এখানে এসে উপস্থিত হন তাহলেই চরম।

কিন্তু কিছু করবার নেই, চুপটি করে দুর্যোগের প্রতীক্ষা করতে হবে। উঃ, কী ছোটলোক এই মানুষ জাতটা! তাদের সংসর্গে এক দণ্ড শান্তি নেই। এর চেয়ে বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে বনে বাস করা ভাল।

শুক্লা ম্লান হেসে বলল, 'ভেবে আর লাভ কী, যা হবার তাই হবে। তুই যা, স্নান করে একটু ঘুমিয়ে নে।'

মনটা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে কিছু ভাল লাগছিল না। চায়ের পেয়ালা রেখে উঠে

দাঁড়ালুম। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। শুক্লা টেলিফোনের কাছে ছিল, সে যন্ত্রটি তুলে নিয়ে বলল, 'হ্যালো—'। তারপরই তার চোখ দুটো দপ করে উঠল। কিছুক্ষণ কথা শুনে সে নিঃশব্দে টেলিফোন আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, অর্থাৎ আমার কল্। কিন্তু তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে রইল।

টেলিফোন কানের কাছে ধরতেই আওয়াজ এল—'মিস্ ভৌমিক? আমার গলা বোধ হয় চিনতে পারছেন না? ডক্টর কর—মন্মথ কর।'

'ও' বলে আর কিছু বলতে পারলুম না, মুখে কথা জোগালো না। হঠাৎ বুক ঢিবঢিব করে উঠল। ভেবেছিলুম নেকড়ে বাঘ আর অজগর সাপের ভয় কেটে গেছে। কাটেনি এখনও।

ডক্টর কর সরল কণ্ঠে বললেন, 'শঙ্খনাথবাবুর বাড়িতে আপনার সঙ্গে ভাল করে কথা বলার সুযোগ হল না, মিস্ ভৌমিক। শঙ্খনাথবাবু লোকটি বেশ ভাল, টাকাকড়ির ব্যাপারে মুক্তহস্ত। আপনি প্রাপ্য টাকা পাচ্ছেন তো? আমিই আপনাকে এনগেজ্ করিয়েছিলাম, আমার এ বিষয়ে একটা দায়িত্ব আছে; তাই জিগ্যেস করছি।'

বললুম, 'হ্যাঁ, টাকা পাচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ।'

তিনি বললেন, 'না না, ধন্যবাদ কিসের। আপনাকে সেই ছাত্রাবস্থা থেকে চিনি, এ ত আমার কর্তব্য। কিন্তু ও-কথা থাক। মিস্ ভৌমিক, মনে আছে, অনেক দিন আগে আমি আপনাকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলাম? আপনি তখন নেমন্তন্ন রক্ষে করেননি। বাট্ ইটস্ নেভার টু লেট টু মেন্ড্। আসুন না একদিন একসঙ্গে চা খাওয়া যাক। কী বলেন? আপনিও আর ছেলেমানুষ নয়, আমিও একজন দায়িত্বশীল ডাক্তার। সুতরাং কেউ কিছু মনে করবে না।'

আমি তোতলা হয়ে গেলুম,—'তা—তা—নেমন্তন্নের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এখন তো আমার ছুটি নেই ডক্টর—মানে—সারা রাত জাগতে হয়—'

ডক্টর কর শান্তস্বরে বললেন, 'বেশ তো, তাড়া নেই। আপনার যখন ছুটি থাকবে তখন হবে। দু-চার দিন পরে আবার আমি ফোন করব। আপনি যাঁর সঙ্গে থাকেন তিনি বুঝি আপনার বান্ধবী? কী নাম বলেছিলেন মনে পড়ছে না।'

'শুক্লা সেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তিনিও ত নার্স। বিবাহিতা কি?'

আমার গলা শুকিয়ে গেল। বললুম, 'না।'

তিনি বললেন, 'তাঁকেও আপনার সঙ্গে নেমন্তন্ন করতাম। কিন্তু জানেন তো—টু ইজ্ কম্পানি, থ্রী ইজ্ এ ক্রাউড্। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। নমস্কার।'

ফোন রেখে দিলুম। শুক্লা এতক্ষণ একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে ছিল, প্রশ্ন করল, 'মন্মথ কর?'

আমি ঘাড় নাড়লুম। সে আবার প্রশ্ন করল, 'চায়ের নেমন্তন্ন?'

আমি আবার ঘাড় নেড়ে বললুম, 'তুই ফোন তুলে অমন চমকে উঠেছিলি কেন?'

সে খানিক আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে শুকনো মুখে বলল, 'আজ মন্মথ করের গলা শুনে মনে হল কাল রাত্রে যে ফোনে কথা বলেছিল তারই গলা।'

২০ শ্রাবণ

কাল ডায়েরি লেখা শেষ হল না।

শুক্লার সঙ্গে ওই কথা নিয়ে তোলাপাড়া করতে করতে বেলা বেড়ে গেল, তখন একেবারে নাওয়া-খাওয়া সেরে শুতে গেলুম। শুক্লার আজ দুপুরে কাজ, সে বেরিয়ে গেল। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, কাল যে ফোন করেছিল সে যদি মন্মথ কর হয় তবে তার মতলব কী? ব্ল্যাকমেল?......

ঘুমিয়ে উঠে ডায়েরি লিখতে বসেছিলুম, লেখা শেষ হবার আগেই দেখি আটটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলুম। ঠিক নটার সময় গাড়ি এল।

গিয়ে দেখি, পিউয়ের ঘরে শঙ্খনাথবাবু আছেন, দোরের পাশে কলাবতী হাঁটু উঁচু করে বসে আছে; পিউ বিছানায় বসে পুতুল নিয়ে খেলা করছে। আমাকে দেখে শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'দেখ একবার কাণ্ড। পিউ এখনও ঘুমোয়নি।'

জিগ্যেস করলুম, 'খেয়েছে?'

কলাবতী দাঁত বার করে ঘাড় নাড়ল। আমি তখন পিউয়ের কাছে গিয়ে একটু ধমকের স্বরে বললুম, 'পিউ, তুমি এখনও ঘুমোওনি?'

পিউ আমার পানে মুখ তুলে মিষ্টিমিষ্টি দুষ্টু-দুষ্টু হাসি হাসল, কচি দাঁতগুলি ঝিকমিক করে উঠল। তার এই হাসি দেখে বুঝলুম তার মনের ওপর থেকে রোগের ছায়া সরে গেছে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে।

তারপর সে পুতুল ফেলে আমার দিকে দু হাত বাড়িয়ে দিল।

কোলে তুলে নিলুম। সে আমার গলা জড়িয়ে কাঁধে মাথা রাখল।...মেয়েটাকে কোলে নিলে বুক জুড়িয়ে যায়।

তাকে নিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করবার পর বিছানায় শুইয়ে দিলুম। সে তখনও জেগে আছে, কিন্তু চোখ দুটো ঘুমে ভরে উঠেছে। পাখির মত মৃদু কূজন করে বলল, 'ঘুমুই?'

'ঘুমোও' বলে আমি তার গায়ে হাত রাখলুম।

আশ্চর্য, এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি বিছানার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শঙ্খনাথবাবুর দিকে চাইলুম; তিনি ফিস্-ফিস্ করে বললেন, 'পিউ তোমার জন্যেই জেগে ছিল।'

এই সময় দোরের কাছে এক অপরূপ মূর্তির আবির্ভাব হল। পিউয়ের মা যে আজ বাড়িতেই আছে তা জানতুম না। দেখলুম আটপৌরে ঘরোয়া পোশাকেও তাকে কম মানায়নি। সাদাসিধে ঢিলেঢালা সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ, তার ওপর একটি জাপানী কিমোনো, পায়ে লাল মখমলের স্লিপার, চুলগুলি একটু শিথিল। গায়ে গয়না নেই, কেবল গলার কণ্ঠিতে কাঁইবিচির মত একটি চুনি ধক্‌ধক্ করছে।

এত রূপ! শুক্লার মুখে গান শুনেছি—ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়। এ যেন তাই। কিন্তু গুণ কি একটিও নেই?

শঙ্খনাথবাবুর পানে আড়চোখে তাকালুম। তিনিও সলিলার পানে চেয়ে আছেন; তাঁর চোখে আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটা দ্বন্দ্ব চলছে। তৃষ্ণা আর বিতৃষ্ণা একসঙ্গে। কী অদ্ভুত এদের সম্পর্ক!

'আমার কাজ আছে—নীচে যাচ্ছি'—এই বলে শঙ্খনাথবাবু চলে গেলেন। সলিলা তাঁর পানে একবার তাকালও না।

আজ সে বেড়াতে বেরোয়নি কেন কে জানে! হয়ত নেচে নেচে হাঁপিয়ে পড়েছে, একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

শঙ্খনাথবাবু বেরিয়ে যাবার পর সলিলা পিউয়ের খাটের পাশে এসে দাঁড়াল, হাসি-হাসি মুখে পিউয়ের পানে একবার তাকিয়ে বলল, 'পিউ ঘুমিয়েছে?'

বললুম, 'হ্যাঁ, এই ঘুমোল।'

সলিলা আমার পানে প্রশংসা-ভরা চোখে চাইল, একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, 'কী সুন্দর আপনার জীবন! শিশুর সেবা!' তার কথাগুলি মুখে মিলিয়ে গেল।

শুধু শিশু নয়, দরকার হলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও সেবা করে থাকি—এ কথা আর বললুম না। এবং আমার কর্মজীবনে সুন্দর যদি কিছু থাকে, তা সম্পূর্ণ আকস্মিক, একথা বলেও কোন লাভ নেই।' বললুম, 'সুন্দর কি না জানি না, কিন্তু আমার ভাল লাগে।'

সলিলার চোখের প্রশংসা আরও গাঢ় হল, সে বলল, 'আপনাকে হিংসে হয়।'

মনে মনে আশ্চর্য হলুম। সলিলা আমাকে হিংসে করে! কিন্তু আসল কথাটা কী? আমার মতন সামান্য নার্সের কাছে লক্ষপতির

স্ত্রী সলিলা কী চায়? হয়ত কিছুই চায় না, কথা কইবার একজন লোক চায়। কিংবা—অপরিচিতের কাছে নিজেকে ভাল মেয়ে প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছে মেয়েদের স্বাভাবিক ধর্ম, হয়ত সলিলা সেই চেষ্টাই করছে।

সে বলল, 'আচ্ছা, আপনার সত্যিকার নামটি কী বলুন ত? শঙ্খ-ডার্লিং কী একটা অদ্ভুত কথা বলে—'

বললুম, 'প্রিয়দম্বা। আমার সত্যিকার নাম প্রিয়ংবদা।'

সে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল—'প্রিয়ংবদাকে প্রিয়দম্বা বলে! পুওর শঙ্খ, হাউ ফানি হি ইজ্‌!'

মনে মনে ভাবলুম, ফানি বইকি, ভীষণ ফানি। কিন্তু তার চেয়েও ফানি, তুমি স্বামীকে শঙ্খ-ডার্লিং বল।

জিগ্যেস করলুম, 'মাফ করবেন, আপনি কি বিলেতে মানুষ হয়েছেন?'

সলিলা মুখখানি করুণ করে বলল, 'বিলেত যাওয়া আর হল কই! এত যাবার ইচ্ছে, কিন্তু শঙ্খর মত নেই। হাজব্যান্ডস্‌ আর ফানি, ডোন্ট ইউ থিংক?'

হেসে বললুম, 'জানি না। আমার বিয়ে হয়নি।'

এই সময় কলাবতীর ওপর চোখ পড়ল। সে দোরের পাশে হাঁটু তুলে বসে সলিলার পানে তাকিয়ে আছে। একটা দাসীর চোখে গৃহস্বামিনীর প্রতি এতখানি ঘৃণা আর অবজ্ঞা আমি আগে দেখিনি, দেখলে চমকে উঠতে হয়।

সলিলার কিন্তু সেদিকে নজর ছিল না, সে বলল, 'বিয়ে হয়নি! হাউ লাকি ইউ আর! আসুন না আমার ঘরে, খানিক বসে গল্প করা যাক।'

বললুম, 'কিন্তু পিন্টু—'

'কলাবতী ততক্ষণ পিন্টুকে দেখবে।'

পিন্টু ঘুমুচ্ছে, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে হাসি-গল্প করলে সে জেগে উঠতে পারে। বললুম, 'চলুন।'

কলাবতীকে ডেকে বললুম, 'তুমি পিন্টুয়ের কাছে একটু থাক, আমি আসছি।'

'আসুন' বলে সলিলা এগিয়ে চলল, আমি পিছু পিছু গেলুম। দেখাই যাক না ওর মনে আরও কী আছে।

সলিলা আমাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। বারান্দার শেষ প্রান্তে ঘরটি, মৃদু নৈশ দীপ জ্বলছে। ঘুম-নগরের রাজকুমারী যে-ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন, এ যেন সেই ঘর। সলিলা সুইচ্‌ টিপে কয়েকটা উজ্জ্বল আলো জেলে দিল, ঘরটি ঝলমল করে উঠল।

চৌকশ ঘর, লম্বায় চওড়ায় বোধ হয় বিশ ফুট। ঝকঝকে নতুন আসবাব দিয়ে সাজান। প্রত্যেক দেয়ালে বড় বড় আয়না, তা ছাড়া একটি অপূর্ব ড্রেসিং টেবিল। ঘরের মাঝখানে খাট। কিন্তু জোড়া-খাট নয়, একজনের শোবার মত খাট। বিছানায় পুরু সিল্কের চাদর পাতা।

ঘরের দু পাশে দুটি 'পর্দা-ঢাকা দোর। ঘর দুটিতে কী আছে দেখতে পেলুম না; একটি বোধ হয় বাথরুম, অন্যটি হয়ত শঙ্খনাথবাবুর শোবার ঘর।

ড্রেসিং-টেবিলের কাছে কয়েকটি গদি-মোড়া উঁচু তাকিয়ার মত আসন রয়েছে; সলিলা একটিতে আমাকে বসতে বলল, আর একটিতে নিজে বসে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায় নিজের মুখ একবার দেখে নিল; হাসিমুখে বলল, 'এটা আমার শোবার ঘর।'

তা না বললেও চলত। তবু এটা শঙ্খনাথবাবুরও শোবার ঘর কি না তাই জানবার জন্যে মন উসখুস করছে। কিন্তু জিগ্যেস করা ত যায় না।

বললুম, 'সুন্দর আপনার ঘরটি।'

সে তৃপ্তি-ভরা চোখে একবার ঘরের চারিদিকে তাকাল, বলল, 'মনের মতন করে সাজাতে কী কম খরচ হয়েছে! দশটি হাজার টাকা।'

তা হবে। আমি কেমন করে জানব! বললুম, 'টাকা থাকলে ভাল বাড়ি করা যায়, সাধ মিটিয়ে বাড়ি সাজান যায়।'

কথাটা সলিলার বোধ হয় খুব মনঃপূত হল না, সে একটু বিমনা হয়ে বলল, 'তা হয়ত যায়। কিন্তু সব সাধ কী টাকায় মেটে?'

খুবই উচ্চাঙ্গের কথা। কিন্তু সলিলার কোন্‌ সাধটা মেটেনি জানবার জন্যে ভুরু তুলে তার পানে চাইলুম। সে বলল, 'টাকায় কি স্বাধীনতার সাধ মেটে? ধরুন না কেন আপনি। আপনার স্বাধীনতা আছে, যখন যা ইচ্ছে করতে পারেন। সবাই কি তা পারে?'

ও, ব্যথা তবে ওইখানে। স্বাধীনতার অভাব। স্বামীর টাকায় বড়মানুষি করব, কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় চলব। যখন যা ইচ্ছে করতে পারাটাই স্বাধীনতা। বললুম, 'আমার স্বাধীনতা আছে বটে কিন্তু যখন যা ইচ্ছে করতে পারি না। তার জন্যে টাকা চাই। ভগবান বোধ হয় সকলের সব সাধ মেটাতে ভালবাসেন না।'

আমার দিকে একটি বাঁকা কটাক্ষ হেনে সে আয়নার দিকে চোখ ফেরাল, তাচ্ছিল্যভরে বলল, 'যাকগে ওসব কথা, মন খারাপ করে লাভ কী? আমার চুলগুলো কি বিশ্রী হয়ে আছে!'

সে উঠে গিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার মুখোমুখি বসল, চুলগুলোকে আরও একটু আল্‌গা করে দিয়ে হাল্কাভাবে বুরুশ চালাতে লাগল। চুল খুব লম্বা নয়, কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা; কিন্তু রেশমের মতন নরম আর উজ্জ্বল।

আমি বসে বসে তার চুলের প্রসাধন দেখতে লাগলুম। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর নানা জাতের নানা রঙের শিশি-বোতল কৌটো সাজান; তেল সেন্ট্‌ ক্রীম পাউডার। আরও কত কী, যা কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু একটি জিনিস সেখানে নেই; পিন্টু কিংবা শঙ্খনাথবাবুর ফটোগ্রাফ নেই। ঘরে কোথাও স্বামী বা মেয়ের ছবি নেই; ঘরে স্বামীর বা মেয়ের ছবি রাখেনি সলিলা। কী জানি, যারা সর্বদা চোখের সামনে রয়েছে তাদের ছবি দরকার নেই বলেই বোধ হয় রাখেনি। শুনেছি ড্রেসিং-টেবিলে প্রিয়জনের ছবি রাখা বিলিতী রীতি।

আর-একটি জিনিস নেই। সিঁদুরকৌটো। আগেও লক্ষ্য করেছিলুম সলিলা সিঁথিতে সিঁদুর পরে না। টেবিলে গালে মাখবার রুজ আছে, ঠোঁটে লাগাবার সোনা-বাঁধানো লিপস্টিক আছে; কিন্তু সিঁদুরকৌটো নেই। ওদের প্রগতিশীল সমাজে সিঁদুর পরা বোধ হয় ঘোর কুসংস্কার।

চুল বুরুশ করা শেষ হলে সলিলা টেবিল থেকে একটি সেন্টের শিশি তুলে নিয়ে তার কাচের ছিপি খুলে গন্ধ শুঁকলো, তারপর আয়নার ভিতর দিয়ে আমার পানে চেয়ে বলল, 'দেখি আপনার রুমাল!'

ভাগ্যে হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে একটা পাট-না-ভাঙা রুমাল ছিল, বার করে দিলুম। সলিলা সেটাতে এসেন্সের ছিটে দিয়ে বলল, 'এবার শুঁকে দেখুন। কেমন গন্ধ?'

সত্যি কী গন্ধ! অতি মৃদু গন্ধ, কিন্তু নেশা লেগে যায়; মনে হয় বসন্তের সমস্ত ফুল ওই শিশির মধ্যে তাদের মধু ঢেলে দিয়েছে। বললুম, 'অপূর্ব গন্ধ।'

সলিলা হেসে আমার দিকে ফিরল, শিশিটি দুই আঙুলে তুলে ধরে বলল, 'কত দাম জানেন? এই শিশিটির দাম আড়াই শো টাকা।'

হবেও বা। কিন্তু দাম শুনে গন্ধের মাধুর্য যেন কমে গেল। সলিলা মৃদু হেসে বলল, 'আমার একটি বন্ধু উপহার দিয়েছে।'

বন্ধু! নিশ্চয় পুরুষ-বন্ধু। মেয়ে-বন্ধু এত দামী জিনিস উপহার দেবে না; অন্তত ওদের সমাজের মেয়ে দেবে না। আমি হেসে ঘাড় নাড়লুম। শঙ্খনাথবাবুর মনের ভাব কতকটা যেন বুঝতে পারছি।

সলিলা হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, আপনি ত স্বাধীন, আপনার নিশ্চয় অনেক বন্ধু আছে?'

স্বাধীনতার সঙ্গে বন্ধুর নিশ্চয় গাঢ় সম্পর্ক আছে। আমি সাবধানে প্রশ্ন করলুম, 'কোন্‌ বন্ধুর কথা বলছেন? পুরুষ-বন্ধু? না মেয়ে-বন্ধু? আমার একটি বান্ধবী আছে। তার নাম শুক্লা—'

'না না, পুরুষ-বন্ধু। মানে, ইয়ং মেন—'

আমি দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললুম, 'ও-রকম বন্ধু আমার একটিও নেই।'

অবাক হয়ে সলিলা বলল, 'একটিও না?'

'একটিও না। তবে একজন পরম বন্ধু আছেন, তাঁর বয়স কিন্তু চল্লিশের ওপর। তিনি কোনদিন আমাকে চায়ের নেমন্তন্ন পর্যন্ত করেননি, সিনেমা দেখতেও নিয়ে যাননি।'

সলিলা চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ে রইল, বোধহয় বিশ্বাস করল না।—'কিন্তু—শুনেছি—নার্সদের সঙ্গে ইয়ং ডক্টরদের ভাব-সাব থাকে—আপনি ত দেখতে শুনতে ভালই—' কথাটা ঠিক রুচিসম্মত হল না ভেবেই সে বোধ হয় থেমে গেল।

'একজন ইয়ং ডক্টর ভাব-সাব করবার চেষ্টা করেছিলেন, এখনও করছেন; কিন্তু সুবিধে করতে পারছেন না।—আচ্ছা, এবার পিউয়ের কাছেই যাই। আপনার বোধহয় ঘুমুবার সময় হল।' বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

সলিলাও উঠল। বলল, 'না না, তার এখনও ঢের দেরি। আসুন, আমার ড্রেসিং রুম দেখবেন না?'

নিরুপায় হয়ে বললুম, 'চলুন দেখি।'

সলিলার স্বাধীনতার সাধ মেটেনি বলেই বোধ হয় আমাকে তার ঐশ্বর্য দেখিয়ে বড়-মানুষির সাধ মেটাতে চায়। যার সারা অঙ্গে এত রূপ তার মন এত খেলো কেন? সেখানে কি এতটুকু লাবণ্য থাকতে নেই?

পর্দা সরিয়ে সলিলা আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটি শোবার ঘরের চেয়ে ছোট। দেয়ালের গায়ে সারি সারি ওয়ার্ডরোব, সবগুলির কপাটে আয়না লাগান। একটা দেয়ালে লম্বা র‍্যাকের ওপর প্রায় ত্রিশ জোড়া জুতো। কত রঙের কত ঢঙের জুতো: লাল সাদা নীল সোনালী; কোনটা হাই-হিল, কোনটা হীললেস, কোনটা নাচের পাম্প। জুতোর বাহার দেখেই চোখ ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে যায়।

তারপর সলিলা একে একে ওয়ার্ডরোবগুলি খুলে খুলে আমাকে দেখাতে লাগল। কোনটিতে শাড়ি ব্লাউজ, কোনটিতে শালোয়ার পায়জামা ওড়না; অন্তর্বাস বহির্বাস, কাঁচুলি ব্রাসেয়ার, আরও কত কী। বলে শেষ করা যায় না।

মুগ্ধ হয়ে দেখছি, তবু মনটা ছটফট করছে। পরের ঐশ্বর্য দেখে আমার কী লাভ? এসব জামাকাপড় পোশাক পরিচ্ছদ আমি ত কোনদিন কিনতে পারব না। এসব জিনিস আমার কাছে আকাশের চাঁদের চেয়েও দুষ্প্রাপ্য।

আয়নার ওপর ছায়া পড়ল। শঙ্খনাথবাবু দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। সলিলাও তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, চট করে ওয়ার্ড-রোবের কপাট বন্ধ করে বলল, 'চলুন চলুন, দেখা হয়েছে। কী-ইবা দেখবার আছে, সামান্য দু-চারটে কাপড়—' বলতে বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।'

শঙ্খনাথবাবু বিরক্তিভরা মুখ নিয়ে তার পিছন পিছন বেরুলেন। আমি তাঁর পিছনে বেরুলুম। একটা দাম্পত্য দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠেছে। আমি আর দাঁড়ালুম না, সোজা গিয়ে পিউয়ের পাশে বসলুম। কলাবতী মেঝেয় বসে ঢুলছিল, তাকে বললুম, 'তুমি এবার যাও।' সে চলে গেল।

কান খাড়া করে শুনছি। শোবার ঘর থেকে মিহি আর মোটা গলার ডুয়েট আসছে, কিন্তু কথাগুলো ধরা যাচ্ছে না। শঙ্খনাথবাবু চটলেন কেন, সলিলাই বা তাঁকে দেখে ড্রেসিং-রুম থেকে অমনভাবে পালাল কেন? শঙ্খ-নাথবাবু কি পছন্দ করেন না যে সলিলা তার কাপড়চোপড় অন্যকে দেখায়? কেন পছন্দ করেন না?

পনেরো মিনিট পরে শঙ্খনাথবাবু এলেন। পিউয়ের খাটের পাশে বসে গম্ভীরমুখে আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'প্রিয়দম্বা, তুমি কিছু মনে কোর না, নিজের জাঁক দেখানো সলিলার অভ্যেস।'

তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলুম। 'চাষা-মনিষ্যি'র মনে জাঁক দেখানো সম্বন্ধে সংকোচ আছে তাহলে! বললুম, 'সব মেয়েই জাঁক দেখাতে ভালবাসে, নিজের গয়না-কাপড় দেখাতে ভালবাসে। এতে মনে করার কী আছে?'

তিনি বললেন, 'তুমি দেখাতে ভালবাস?'

'আমার থাকলে ভালবাসতুম।'

'হুঁ'—বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন; আর কোন কথা বললেন না, পিউয়ের পানে এক-বার চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমার নিশি-জাগরণ আরম্ভ হল। আজও বই আনতে ভুলে গেছি। বসে বসে ভাবছি... এ ভাবে আর কতদিন চলবে? সুস্থ মেয়েকে রাত জেগে পাহারা দেওয়া কি নার্সের কাজ? ...সলিলা...মেয়ের কথা ভাবে না, স্বামীর কথা ভাবে না...এত পেয়েছে তবু তৃষ্ণার শেষ নেই। সে নির্বোধ নয়, বুদ্ধি আছে; কিন্তু তার বুদ্ধিকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অন্ধ ভোগতৃষ্ণা...এর শেষ কোথায়? চিরদিন ত রূপযৌবন থাকবে না, তখন ও কী করবে?... আর শঙ্খনাথবাবু? গরিবের ছেলে, নিজের চেষ্টায় বড়মানুষ হয়েছেন; কিন্তু মন মধ্য-বিত্ত রয়ে গেছে। সাদাসিধে আটপৌরে মন, এখনও বড়মানুষির আঁচ মনে লাগেনি। কিন্তু লাগতে কতক্ষণ!

পিউ একটু উসখুস করল। তাকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিলুম, সে আবার শান্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল।

একটা—দুটো—তিনটে। রাত শেষ হয়ে আসছে। আজ কেন জানি না একটু ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। আমি রাতের পর রাত জেগে সেবা করেছি, কখনও ক্লান্তি আসেনি। আজ ক্লান্ত মনে হচ্ছে; দেহের ক্লান্তি কি মনের ক্লান্তি বুঝতে পারছি না। কিন্তু যাকে সারা-জীবন এই কাজ করতে হবে, তার ক্লান্তি এলে চলবে কেন? ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

সাড়ে তিনটের সময় দোরের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি শঙ্খনাথবাবু দু পেয়ালা চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন; মুখে একটু হাসি। উঠে গিয়ে তাঁর হাত থেকে চা নিলুম। বললুম, 'আপনি রোজ রোজ এত রাত্রে আমার জন্যে চা তৈরী করে আনেন কেন? আমার দরকার হলে আমি নিজেই ত চা তৈরি করে নিতে পারি।'

তিনি বললেন, 'শুধু কি তোমার জন্যে তৈরি করেছি! শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুমুতে পারি না, তখন চা খেতে ইচ্ছে করে। নিজেই চা তৈরি করে খাই। তুমি জেগে থাক তাই তোমার জন্যেও করি।'

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম, 'ধন্যবাদ। আপনি—'

তিনি তর্জনী তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমি খানিক তাঁর হাসি-হাসি মুখের পানে চেয়ে বললুম, 'কী হল?'

তিনি বললেন, 'আমাকে "আপনি" বলছ যে! "তুমি" বলবার কথা। কী চুক্তি হয়ে-ছিল?'

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম। কিন্তু সত্যিই ত আর ভদ্রলোককে 'তুমি' বলা যায় না, মুখ দিয়ে বেরুবে কেন? রাগের মুখে কী বলে-ছিলুম, উনি সেটি মনে গেঁথে রেখেছেন।

ও-কথা এড়িয়ে বললুম, 'শঙ্খনাথবাবু, একটা কথা বলি?'

তিনি সন্দিগ্ধভাবে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, 'কী কথা?'

একটু ইতস্তত করে বললুম, 'এবার আমাকে ছুটি দিন। পিউ ত এখন সেরে গেছে—'

'কথা ছিল যতদিন না ভাল ঝি পাই তত-দিন তুমি থাকবে।'

'তা সত্যি, কিন্তু কতদিনে আপনি ভাল ঝি পাবেন তার ঠিক কী? আমি—অন্য কাজও ত আছে আমার—'

'যদি আরও বেশী টাকা চাও—'

'না না, টাকার কথা নয়। টাকা আপনি যথেষ্ট দিচ্ছেন, কিন্তু—'

'বুঝেছি, সলিলার ব্যবহারে তুমি রাগ করেছ। কিন্তু পিউ ত কোনও দোষ করেনি!'

আমার চোখে জল এসে পড়ল। কোনমতে সামলে নিয়ে বললুম, 'কেউ কোন দোষ করে-নি। কিন্তু আমাকে আর এখানে দরকার নেই, কাল থেকে আর আমি আসব না।'

এবার তাঁর সুর কড়া হয়ে উঠল—'বেশ,

আয়নার ভেতর দিয়ে আমার পানে চেয়ে বলল, 'আপনার রুমালটা দেখি।"

আসতে না চাও এসো না। আমি কারুর ওপর জোর করতে চাই না। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি বলেই থাকতে বলেছিলাম।' এই বলে হঠাৎ চলে গেলেন।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। শঙ্খনাথবাবু এতটা অবুঝ হবেন ভাবিনি। তাঁকে অসন্তুষ্ট করে চলে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না, ভালয় ভালয় যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু উপায় কী? বাঁধন তো ছিঁড়তে হবে।

সকালে পিণ্টু জেগে ওঠবার আগেই চলে এলুম। ইচ্ছে হল পিণ্টুর ঘুমন্ত গালে একটা চুমু খাই। কিন্তু কাজ নেই মায়া বাড়িয়ে।

শঙ্খনাথবাবু গম্ভীরমুখে টাকা চুকিয়ে দিলেন, কথা কইলেন না। মোটর বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল।

পিণ্টুর কথা মনে পড়ছে আর বুকের মধ্যে টনটন করে উঠছে। আর হয়ত কোন-দিন ওকে দেখতে পাব না। কিন্তু এই ভাল।

বাসায় পৌঁছে দেখলুম শুক্লা কাজে বেরুচ্ছে। বলে গেল, 'এ-বেলা রান্না হল না, হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খাস। আমার ফিরতে সন্ধ্যে হবে।'

কিন্তু হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খেতে ইচ্ছে হল না। বাড়িতে ডিম ছিল, তাই দুটো সেদ্ধ করে খেলুম। তারপর শুয়ে পড়লুম।

ঘুম ভাঙল পৌনে দুটোর সময়। উঠে রান্না চড়ালুম। বেশী কিছু নয়, ভাত ডাল আর একটা নিরামিষ তরকারি। শুক্লা ফিরলে দুজনে মিলে খাব। যদি দরকার হয় হোটেল থেকে মাংস আনিয়ে নিলেই হবে।

রান্না শেষ করে ডায়েরি লিখতে বসেছি। আজ রাত্রে জামাইবাবু আসবেন কি না কে জানে! মনটা ওই ব্যাপার নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। যদি আসেন রাত্রি দশটার আগে আসবেন না। তখন ও'র জন্যে ভাল করে রান্না করব। আজ রাত্তিরে আমার ত কোথাও যাবার নেই।

২১ শ্রাবণ

শুক্লা ফিরল সন্ধ্যে পেরিয়ে। একটা বড় নার্সিং হোমে নার্সের ঘাটতি হয়েছে, শুক্লা সেখানে যাচ্ছে। দিনের বেলা কাজ।

শুক্লা ইউনিফর্ম ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে এল, দুজনে খেতে বসলুম। খাওয়া শেষ হলে দুজনে বিছানায় গিয়ে শুলুম, মুখোমুখি শুয়ে গল্প করতে লাগলুম। সেই আগের কালের মতন, যখন হস্টেলে থাকতুম। এখনও সুবিধে পেলেই আমরা ওইভাবে গল্প করি।

শুক্লাকে সলিলার কথা বললুম, শুনে সে হাসতে লাগল। আমি ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে তাকে গন্ধ শোঁকালুম, সে চোখ বুজে চুপটি করে পড়ে রইল; তারপর গুনগুনিয়ে

গাইল,—'গগন মগন হল গন্ধে, সমীরণ মূর্ছে আনন্দে—'

আমি বললুম, 'এমন গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মরেও সুখ, কী বলিস?'

শুক্লা বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের কপালে নেই। মরণকালে আমাদের এ গন্ধ কে শোঁকাবে বল্?'

মরণকালের এখনও বোধ হয় দেরি আছে। থুত্থুড়ি বুড়ী হয়ে যাব, তবে মরব। তখন বুড়ী নার্সকে আড়াই শো টাকা দামের গন্ধ কে শোঁকাবে!...

এক সময় জিগ্যেস করলুম, 'হ্যাঁরে, সেই টেলিফোন আর এসেছিল?'

'না, আর আসেনি। কিন্তু যদি মন্মথ কর হয়, আর জেনেশুনে বজ্জাতি করবার জন্যে ফোন্ করে থাকে—'

'তাহলে?'

'তাহলে সহজে ছাড়বে না। না-ছোড়বান্দা লোক। দেখছিস না, তোর আশা এখনও ছাড়েনি।'

'জামাইবাবুকে তোর সন্দেহের কথা বলেছিলি?'

'তার পর থেকে দেখাই পাইনি, বলব কাকে? টেলিফোনও করেননি।'

'আজ হয়ত আসবেন।'

রাত্রে আমরা যে-সময়ে খাই সে-সময় খেলুম না। শুক্লা ছটফট্ করে বেড়াচ্ছে, হয়ত জামাইবাবু আসবেন। রান্না তিনজনের মতই করে রাখা হয়েছে।

প্রায় পৌনে দশটার সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আমি ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরলুম। নিশ্চয় জামাইবাবু।

মোটা গলায় আওয়াজ এল,—'হ্যালো—প্রিয়দম্বা?'

এক মুহূর্তের জন্যে থতিয়ে গেলুম, তারপর বললুম, 'শঙ্খনাথবাবু! এত রাত্রে কী খবর?'

তিনি বললেন, 'খবর আর কী, পিউ কিছুতেই ঘুমুচ্ছে না, কেবল দম্মা দম্মা বলে কাঁদছে।'

'দম্মা দম্মা বলে কাঁদছে! তার মানে?'

'বুঝতে পারলে না? তোমাকে ডাকছে। তোমার পুরো নামটা বলতে পারে না, তাই দম্মা বলে।'

ভারি রাগ হল, বললুম, 'এ আপনার কাজ, আপনি ওকে শিখিয়েছেন দম্মা বলতে!'

'আরে না না, আমি শেখাব কেন? ও যা শোনে তাই শেখে। আমাকে প্রিয়দম্বা বলতে শুনেছে, তাই—'

'যাকগে। ওকে খানিকটা ওভাল্টিন খাইয়ে দিন। তাহলেই ঘুমিয়ে পড়বে।'

'খাওয়াবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু খাচ্ছে না। কেবল কাঁদছে। তুমি না এলে ও ঘুমুবে না।'

কী উত্তর দেব, চুপ করে রইলুম। শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'তুমি একটিবার আসবে? গাড়ি পাঠাব?'

গলার স্বর যতদূর সম্ভব নীরস করে বললুম, 'পাঠান। কিন্তু পিউ ঘুমুলেই আমি চলে আসব।'

'আচ্ছা আচ্ছা।'

টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে গেলুম নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে শুক্লা এসে ঢুকল,—'কী রে, এখন বেরুবি নাকি?'

তাকে বললুম পিউয়ের কথা। শুনে সে বলল, 'আহা, বেচারী মায়ের আদর ত কখনও পায়নি, তাই তোকেই আঁকড়ে ধরেছে। আজ কি সারারাত থাকবি?'

বললুম, 'না, ওকে ঘুম পাড়িয়ে ফিরে আসব।'

পনরো মিনিটের মধ্যে গাড়ি এল।

গিয়ে দেখলুম পিউ ঘুমিয়ে পড়েছে। শঙ্খনাথবাবু ঘরে আছেন, কলাবতী পিউয়ের খাটের পাশে মেঝেয় বসে আছে।

শঙ্খনাথবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'এইমাত্র কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল।'

পিউয়ের পাশে গিয়ে বসলুম। চোখের কোলে জল শুকিয়ে আছে, ঠোঁট দুটি ঘুমের মধ্যেও ফুলে ফুলে উঠছে। ইচ্ছে হল দু হাতে ওকে বুকে চেপে ধরে ঘুম ভাঙিয়ে দিই। কিন্তু না, কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে হয়ত আর ঘুমুবে না। যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন ঘুমুক।

আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত রাখলুম। একটি ছোট্ট নিশ্বাস পড়ল; যেন আরও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল। ঘুমের মধ্যে কি বুঝতে পেরেছে যে আমি এসেছি?

আধ ঘণ্টা তার গায়ে হাত দিয়ে বসে রইলুম। কলাবতী উঠে গিয়ে দোরের পাশে বসল। শঙ্খনাথবাবু ঘরের এমুড়ো-ওমুড়ো পায়চারি করতে লাগলেন। সলিলা বোধ হয় আজ নাচতে বেরিয়েছে, তাকে দেখলুম না।

সাড়ে দশটার পর উঠলুম। শঙ্খনাথবাবু পায়চারি থামিয়ে তীব্র চোখে আমার পানে তাকালেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, বললুম, 'আমি এবার যাই।'

'যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। আমার থাকার দরকার নেই।'

তিনি আরও কিছুক্ষণ তীব্র চোখে চেয়ে রইলেন, তারপর পকেট থেকে টাকা বার করে আমার সামনে ধরলেন।

রাগে গা জ্বলে গেল। আমি যেন টাকার জন্যে এসেছি। বড়মানুষ কিনা, টাকা ছাড়া আর-কিছু বোঝেন না। খুব ধীরভাবে বললুম, 'টাকার দরকার নেই।'

'নেবে না?'

'না।'

শঙ্খনাথবাবু নোটগুলো মুঠিতে পাকিয়ে পকেটে পুরলেন। মনে হল তিনি ভীষণ অপমানিত হয়েছেন এবং দাঁত কিড়মিড় করছেন। আমি আর দাঁড়ালুম না, ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত নীচে নেমে গেলুম। যা রাগী লোক, এখনই হয়ত চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন। এমন মানুষ দেখিনি; নিজের মনের মতন সব হওয়া চাই, তা না হলেই চিৎকার লাফালাফি। আমার ইচ্ছে আমি টাকা নেব না। উনি মেজাজ দেখাবার কে?

বাসায় ফিরলুম প্রায় এগারোটা।

জামাইবাবু এসেছেন। এখনও খেতে বসেননি, আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এস সখি। তোমার নাকি একটি মেয়ে জুটেছে?'

তাঁর পাশে গিয়ে বসলুম। শুক্লা বলল, 'আর বসিস্নি প্রিয়া, কাপড় বদলে আয়। আমি ভাত বাড়তে চললুম।'

আমার মনটাও কেমনধারা হয়ে গিয়েছিল, জামাইবাবুর সঙ্গে বসে একটু হাসি-গল্প করব তা আর ইচ্ছে হল না। নিজের ঘরে গিয়ে কাপড়চোপড় বদলে মুখে চোখে জল দিয়ে এসে খেতে বসলুম।

বসবার ঘরে টেবিলের ওপর চাদর পেতে আমাদের খাওয়াদাওয়া। যা যা রান্না হয়েছে টেবিলের ওপর এনে রাখা হয়, তারপর যার যেমন দরকার নিজের হাতে তুলে নিয়ে খাই।

খেতে খেতে কথা হল। জামাইবাবুই বেশীর ভাগ কথা বললেন। শুক্লা তাঁকে মন্মথ করের কথা বলেছে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। জামাইবাবু তাকে চেনেন; ভারি ভাল ছেলে, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। কয়েক বছরের মধ্যে প্র্যাক্টিস্ বেশ জমিয়ে নিয়েছে। সে মিছিমিছি পরের গুপ্তকথা নিয়ে ঘাটাঘাটি করবে কেন?

একটা ভাল খবর এই যে, জামাইবাবুর সহধর্মিণীর কানে কথাটা এখনও ওঠেনি। তাই তিনি একটু আশ্বস্ত হয়েছেন। বললেন, 'তুমি বোধ হয় ভুল করেছ শুক্লা। টেলিফোনে গলার আওয়াজ সব সময় ঠিক ধরা যায় না। একজনের গলা আর-একজনের গলা বলে মনে হয়।'

শুক্লা বলল, 'কিন্তু একজন কেউ জানতে পেরেছে।'

জামাইবাবু বললেন, 'হয়ত পেরেছে। কিন্তু তার মনে কোনও কু-অভিপ্রায় নেই। থাকলে এতদিন শহরময় ঢি-ঢি পড়ে যেত, আমার বাড়ি ঢোকবার উপায় থাকত না।'

শুক্লা চুপ করে রইল; কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করল, 'মন্মথ করের বিয়ে হয়েছে কি না জান?'

জামাইবাবু আশ্চর্য হয়ে চোখ তুললেন,—'বিয়ে! যতদূর জানি, সে বিয়ে করেনি। কেন বল দেখি?'

শুক্লা তখন চায়ের নেমন্তন্নর কথা বলল। সব শুনে জামাইবাবু বেশ কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইলেন। তারপর বললেন, 'তাই নাকি! ওর এসব গুণ আছে তা জানতাম না। কিন্তু মতলবটা কী? চাপ দিয়ে প্রিয়ংবদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চায়?'

আমি হাল্কা সুরে বললুম, 'কিন্তু তাতে ক্ষতিই বা কী? ওর সঙ্গে চা খেলে আমার তো আর জাত যাবে না!

জামাইবাবু মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'না সাঁখ, ও যদি এই ক্লাসের লোক হয় তাহলে তুমি কক্ষনো ওর চায়ের নেমন্তন্ন নেবে না। কোন্ কেসে ডাকলেও যাবে না। ও যা পারে করুক। ইতিমধ্যে আমি খোঁজ নিচ্ছি ও কেমন লোক। যদি সত্যিই পাজি লোক হয়, —' তিনি কপাল কুঁচকে চুপ করলেন, কথাটা শেষ করলেন না।

খাওয়া শেষ হলে জামাইবাবুকে পান এনে দিলুম। তিনি হেসে বললেন, 'কই, তোমার মেয়ের কথা বললে না?'

বললুম, 'শুক্লার কাছে শুনবেন। আমার ঘুম পাচ্ছে, শুতে চললুম।'

ওরা বসে রইল, আমি শোবার ঘরে এসে দোর বন্ধ করলুম। যেদিনই জামাইবাবু আসেন, আমি খাওয়ার পর একটা ছুতো করে নিজের ঘরে চলে আসি। ওদেরও তো একটু নিরিবিলি দরকার।

আজ কিন্তু সত্যিই আমার শরীরটা ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম পিউয়ের কথা। আজ সে আমার জন্যে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে; কাল হয়ত আর কাঁদবে না, এমনিই ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর ক্রমে আমাকে ভুলে যাবে। ছেলেমানুষ তো, ওদের স্মৃতিশক্তিই বা কতটুকু! পরে যদি কোনদিন আমাকে দেখতে পায়, চিনতেই পারবে না।

মাত্র তিন দিন তো পিউ আমাকে দেখেছে, এরই মধ্যে এত ন্যাওটা হল কী করে? মায়ের আদর পায়নি তাই? কী জানি! আমারই বা ওর ওপর এত মন পড়ল কেন? সুন্দর মেয়ে, তাই? কী জানি......

২৭ শ্রাবণ

কয়েকদিন ডায়েরি লেখা হয়নি।

শুনেছি যারা ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করে, প্রথম প্রথম তারা খুব আগ্রহের সঙ্গে লেখে; তারপর ক্রমে তাদের মন এলিয়ে পড়ে। আমারও হয়ত তাই হয়েছে। ক'দিন থেকে বৃষ্টি বন্ধ আছে, বেশ গুমোট চলেছে।

বর্ষাঋতু প্রায় শেষ হয়ে এল। এ সময় শরীর ভাল থাকে না। তার ওপর আমার একটা নতুন কাজ জুটেছে; বেলা দুপুর থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত একটি রোগিণীর সেবা করতে হয়। যখন কাজ সেরে ফিরে আসি তখন আর ডায়েরি লেখার মতন মনের অবস্থা থাকে না।

রোগিণীর বয়স হয়েছে, বড়সাহেবের গিন্নী। রোগও এমন কিছু মারাত্মক নয়; কিন্তু মহিলাটি বাড়িসুদ্ধ লোককে তটস্থ করে রেখেছেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হুকুম চালাচ্ছেন; ছেলেরা ছুটোছুটি করছে, পুত্রবধূরা ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। কর্তা মাঝে মাঝে দরজায় উঁকি দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর ঘরে ঢোকবার হুকুম নেই। পাছে আমার ওপর তাঁর চোখ পড়ে।

এমনই বিরক্তিকর পরিবেশের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়। কিন্তু যাক গে, ভাল লাগে না এসব ছোট কথা লিখতে।

কাল কাজ থেকে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন রাত্রি সাড়ে আটটা। পোশাক ছেড়ে স্নান করলুম, তারপর হাল্কা একটা শাড়ি পরে শুক্লার সঙ্গে চা খেতে বসলুম। শুক্লার আজ কাজ নেই, সে বাড়িতেই ছিল; রান্নাবান্না সব করে রেখেছে।

চা খাওয়া শেষ হয়েছে, আমরা বসে গল্প করছি, এমন সময় নীচে দরজার সামনে একটা মোটর এসে থামার শব্দ হল। শব্দটা যেন চেনা চেনা। উঠে গিয়ে বারান্দা থেকে নীচে তাকালুম। বুকটা ধক করে উঠল। শঙ্খনাথবাবুর প্রকাণ্ড গাড়িখানা এসে দাঁড়িয়েছে এবং তিনি গাড়ি থেকে নামছেন।

ছুটে গিয়ে শুক্লাকে বললুম, 'শঙ্খনাথবাবু আসছেন।' তারপর সদর দরজা খুলে দিতে গেলুম।

ক্লান্তভাবে সিঁড়ি বেয়ে উঠে শঙ্খনাথবাবু দরজার সামনে দাঁড়ালেন। আমার পানে নিষ্পলক চেয়ে রইলেন।

আমি অস্বস্তি দমন করে বললুম, 'আসুন। পিউ ভাল আছে?'

তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন কি না সন্দেহ। হঠাৎ বললেন, 'বাঃ! তোমাকে এ-বেশে কখনও দেখিনি। যেন লক্ষ্মী ঠাকরুন।'

জড়সড় হয়ে পড়লুম, কী বলব ভেবে পেলুম না। তিনি আমার আরও কাছে সরে এসে করুণস্বরে বললেন, 'প্রিয়দম্বা, আজ রাত্তিরে আমাকে দুটি খেতে দিতে পারবে? এই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।'

আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। শঙ্খনাথবাবু খেতে এসেছেন আমার কাছে! তারপর সামলে নিয়ে বললুম, 'আসুন আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরে বসবেন চলুন।'

তাঁকে ঘরে এনে বসালুম। দেখলুম ইতিমধ্যে শুক্লা চায়ের বাসন সরিয়ে ফেলেছে এবং নিজেও অন্তর্ধান করেছে।

শঙ্খনাথবাবু ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'খাসা বাসাটি! তা আমাকে খেতে দেবে ত?'

আমি ব্যাকুল হয়ে বললুম, 'শঙ্খনাথবাবু, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি ঠাট্টা করছেন, না, সত্যি সত্যি বলছেন!'

তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কী মুশকিল! ঠাট্টা করব কেন! আমি সত্যিই খেতে এসেছি।'

'কিন্তু কেন? কেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। বাড়িতে খাবেন না কেন?'

তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল, বললেন, 'আমার বাড়িতে আজ মোচ্ছব। তাই আগেভাগেই চলে এলাম।'

'মোচ্ছব! সে আবার কী?'

'মোচ্ছব বুঝলে না? নাচগানের মোচ্ছব। ছাতের ওপর আসর বসবে, রেডিওতে নাচের বাজনা বাজবে, সারি সারি টেবিল সাজিয়ে বুফে ডিনার তৈরি থাকবে। বোষ্টম-বোষ্টমীরা নাচবে আর খাবে।'

'ওঃ! আজ বুঝি আপনার বাড়িতে পার্টি?'

'হুঁ। গোটা পঞ্চাশ ন্যাড়া-নেড়ীর নেমন্তন্ন হয়েছে। নটা থেকে পার্টি আরম্ভ হবে, তার আগেই আমি কেটে পড়েছি।'

ও'র কথা শুনলে হাসিও পায় দুঃখও হয়। হাসি চেপে বললুম, 'আপনি না হয় পালিয়ে এলেন, কিন্তু পিউ কোথায় রইল?'

'কলাবতীর কাছে। সে আর কোথায় যাবে, তার তো পালাবার উপায় নেই।'

একবার ইচ্ছে হল জিগ্যেস করি, 'তাকে নিয়ে এলেন না কেন?' কিন্তু তা না বলে প্রশ্ন করলুম, 'পিউ আর আমার জন্যে কান্নাকাটি করে না?'

তিনি বললেন, 'কান্নাকাটি আর করে না, তবে মাঝে মাঝে "দম্মা দম্মা" বলে ডাকে। সে যাক, এখন খেতে দেবে কি না বল। যদি না দাও হোটেলে চেষ্টা দেখি।'

বললুম, 'হোটেলে চেষ্টা দেখতে হবে না, এখানেই খাবেন। কিন্তু শাক ভাত। তার বেশী বোধ হয় কিছু দিতে পারব না।'

খুশী হয়ে বললেন, 'শাক ভাতই যথেষ্ট।'

'তাহলে আপনি বসুন, আমি এখনই আসছি'—বলে আমি রান্নাঘরে গেলুম।

শুক্লা রান্নাঘরে ছিল, আমার পানে চোখ বড় করে তাকাল। আমি ফিসফিস করে তাকে সব বললুম। শুনে সে মাথায় হাত দিয়ে বসল।

'বড়মানুষ অতিথি, কী খেতে দেব রে?'

'কী কী আছে?'

'আজ কি কিছু রেঁধেছি। পুঁইশাক

আর কুচো-চিংড়ি দিয়ে বাটি-চচ্চড়ি, কাঁকড়ার ঝাল আর ভাত।'

'তা আর উপায় কী, ওই দিয়েই চালাতে হবে। ভাত বোধ হয় কুলবে না—'

'আমি দু মুঠো ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে হয়ে যাবে। তুই যা।'

'না, তুই আয় আমার সঙ্গে, শঙ্খনাথবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তুই ও'র কাছে বসে গল্প করিস, আমি রাঁধব। তুই একা সারাক্ষণ রেঁধে মরবি কেন?'

'বেশ, তোর যখন তাই ইচ্ছে—'

দুজনে বসবার ঘরে গিয়ে দেখি, শঙ্খনাথবাবু চোখ বুজে হাত জোড় করে বসে আছেন; তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ছে, যেন বিড়বিড় করে কিছু বলছেন। আমাদের পায়ের শব্দে তিনি চোখ খুললেন। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'ও কী হচ্ছে!'

তিনি বললেন, 'মা-কালীর কাছে মানত করছিলুম—হে মা, আজ রাত্তির বারোটার আগে যেন বিষ্টি হয়, ওদের মোচ্ছব যেন ভেসে যায়।'

আমরা দুজনেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলুম, 'কী মানুষ আপনি! পরের অনিষ্ট-চিন্তা করছেন?'

তিনি চোখ পাকিয়ে বললেন, 'অনিষ্ট-চিন্তা করব না! যারা আমার জীবনটা ছারখার করে দিয়েছে তাদের অনিষ্ট-চিন্তা করব না?'

আমার হাসি থেমে গেল। বললুম, 'ও কথা যাক। এই আমার বন্ধু শুক্লা। আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি, একই কাজ করি।'

তিনি বললেন, 'বেশ বেশ, বয়সও প্রায় একই। তা আজ আমি তোমাদের দুজনেরই অতিথি।'

বললুম, 'হ্যাঁ। একটু দেরি হবে কিন্তু। ততক্ষণ আপনি শুক্লার সঙ্গে গল্প করুন। ইতিমধ্যে যদি চা খেতে চান—'

'দরকার নেই।'

আমি রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে রান্না চড়ালুম। ভাঁড়ারে চাট্টিখানি ভাল চাল ছিল, বাঁকতুলসী চাল, তাই চার মুঠি চড়িয়ে দিলুম। শঙ্খনাথবাবুর খোরাক কী রকম তা ত জানি না; তবে চেহারা দেখে খোশ-খোরাকী মনে হয় না। একটু বেশী করে ভাত রাঁধাই ভাল, নইলে শেষে লজ্জায় পড়ে যাব।

আমাদের দুটো প্রেশার-স্টোভ আছে; একটাতে ভাত চড়িয়ে দিলুম, অন্যটাতে আলু-বেগুন-বড়ি দিয়ে ঝোল চড়ালুম। তবু তিনটে ব্যঞ্জন হবে। তার কম কি ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়?

সাড়ে নটার সময় শঙ্খনাথবাবুকে খেতে দিলুম।

ইতিমধ্যে শুক্লার সঙ্গে তাঁর ভাব হয়ে গেছে। শুক্লাকেও তিনি গোড়া থেকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করছিলেন এবং জোর গলায় তাকে লেকচার দিচ্ছিলেন। লেকচারের মর্ম—তোমাদের মতন মেয়েরা বিয়ে করে না বলেই তো দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে।—শুক্লা গালে হাত দিয়ে বসে শুনছিল। কী বলবে সে? বলবার তো কিছু নেই।

আমি টেবিলের ওপর সাদা চাদর পেতে অন্ন-ব্যঞ্জন তার ওপর রাখতেই তিনি চেয়ার টেনে খেতে বসে গেলেন। আমাদের একবার জিগ্যেস করলেন না, আমরা তাঁর সঙ্গে খাব কি না! কথাটা বোধ হয় তাঁর মনেই আসেনি। শুক্লা আড়চোখে আমার পানে চেয়ে একটু হাসল।

খুব তৃপ্তি করে খেলেন শঙ্খনাথবাবু। প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন চেখে চেখে, প্রত্যেকটি গ্রাসের স্বাদ নিয়ে। বাটি-চচ্চড়ি দুবার চেয়ে খেলেন। তারপর খাওয়া শেষ করে মাঝারি গোছের একটি ঢেঁকুর তুলে মুখ ধুয়ে এসে বসলেন। পরম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আঃ!'

শুক্লা বিনয় করে বলল, 'কিছুই ত খেলেন না।'

তিনি পেটে হাত বুলিয়ে বললেন, 'পেটে জায়গা থাকলে আরও খেতাম। কে রেঁধেছে? এমন রান্না তিন বছর খাইনি।'

শুক্লা বলল, 'আমরা দুজনেই রেঁধেছি।'

তিনি বললেন, 'তোমরা আমার লোভ বাড়িয়ে দিলে। আবার একদিন এসে যদি খেতে চাই, খেতে দেবে তো?'

শুক্লা বলল, 'নিশ্চয় দেব। কিন্তু দয়া করে অন্তত দু ঘণ্টা আগে খবর দেবেন।'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'সেটি হবে না। যখন আসব হঠাৎ আসব। তোমরা নিজেদের জন্যে যা রেঁধেছ তাই খাব।'

বললুম, 'তাহলে বাটি-চচ্চড়ি আর কাঁকড়ার ঝাল ছাড়া আর-কিছু জুটবে না।'

'যা জুটবে তাই খাব। প্রিয়দম্বা, তোমরা এখনও বাটি-চচ্চড়ি আর কাঁকড়ার ঝোলের মর্ম বোঝনি। যদি তিন বছর বাবুর্চির হাতের কালিয়া কাবাব খেতে তাহলে বুঝতে।' কব্জির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইস্, এগারোটা বাজে। তোমাদের খেতে দেরি হয়ে গেল। আজ উঠি।'

তিনি বারান্দায় এলেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে এলুম। আকাশে অল্প মেঘ আছে, তার ফাঁকে ফাঁকে তারা মিটমিট করছে। আমি বললুম, 'আপনার প্রার্থনা মা-কালী শুনতে পাননি মনে হচ্ছে।'

তিনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বিমর্ষভাবে 'হুঁ' বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলুম তাঁর গাড়ি চলে গেল। তখন আমরা এসে খেতে বসলুম।

শুক্লা বলল, 'যা-ই বলিস লোকটি ভাল। সত্যি ভাল।'

'আমি কি বলেছি মন্দ!'

'শুধু বাইরের পালিশ থাকলেই হয় না। মন্মথ করের ত খুব পালিশ আছে, তাই বলে সে কি ভাল লোক?'

'কে বলেছে মন্মথ কর ভাল লোক? তবে ভদ্রসমাজে বাস করতে হলে একটু পালিশ দরকার বইকি।'

খাওয়া শেষ করে আমরা রাত বারোটা পর্যন্ত গল্প করলুম। তর্কে শুক্লা প্রমাণ করে দিল শঙ্খনাথবাবু খাঁটি সোনা, তাঁর পালিশের দরকার নেই; আর মন্মথ করের যতই পালিশ থাকুক সে একটা নেকড়ে বাঘ এবং অজগর সাপ; হাড়ে হাড়ে বজ্জাত।

গল্প করতে করতে এক বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকাল বেলা উঠে দেখি আকাশ বেশ পরিষ্কার, রাত্তিরে বৃষ্টি হয়নি। শঙ্খনাথ-বাবুর মনস্কামনা সিদ্ধ হল না। আমার মনটাও একটু খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টি হলে বেশ মজা হত।

বেলা আন্দাজ দশটার সময় শঙ্খনাথবাবুর মোটর এসে সামনে দাঁড়াল, মোটর থেকে নামল শিউসেবক। তার হাতে একটা বাদামী কাগজ-মোড়া চৌকো গোছের বাক্স। আমি সিঁড়ির দরজা খুলে দিলে সে সেলাম করে বাক্সটা আমার হাতে দিল, সসম্ভ্রম হেসে বলল, 'বাবুজি পাঠিয়েছেন।'

আমি আর শুক্লা বাক্সটি টেবিলের ওপর রেখে কাগজের মোড়ক খুললুম। দেখি একটি ঝকঝকে সুন্দর ইলেকট্রিক স্টোভ।

শুক্লা হাততালি দিয়ে কলকণ্ঠে হেসে উঠল, 'দেখছিস ভদ্রলোক কাকে বলে?'

শিউসেবককে দু টাকা বকশিশ দিলুম।

৬ ভাদ্র

কয়েকদিন ডায়েরি লেখা হয়নি। কী করব, হয়ে উঠছে না। কাজকর্ম করে তবে ত ডায়েরি লেখা!

জীবনের চাকা আবার বাঁধা-ধরা পথে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। রোগীর সেবা করা, খাওয়া ঘুমোনো গল্প করা; থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।

জামাইবাবু রাত্রির অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতন আসা-যাওয়া করেন; কোনদিন জানতে পারি, কোনদিন পারি না। শুক্লার মুখে শুনেছি, মন্মথ কর সম্বন্ধে কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ভয়ানক ধূর্ত লোক। একদিন আমাকে ফোন করেছিল, 'কেমন আছেন? চায়ের নেমন্তন্ন মনে আছে ত?'

তিনি পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আঃ'। শুক্লা বিনয় করে বলল, 'কিছুই ত খেলেন না।'

বলেছিলুম, 'মনে আছে। কিন্তু ভীষণ ব্যস্ত, সময় নেই।'

সে বলেছিল, 'ব্যস্ত? আমার একটা কেসে নার্স দরকার, ভেবেছিলাম আপনাকেই ডাকব।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু এখন তো পারব না।'

'আচ্ছা, আপনি যাঁর সঙ্গে থাকেন, কী নাম মনে পড়ছে না, তিনিও কি এন্‌গেজড্‌?'

'হ্যাঁ, শুক্লা অন্য জায়গায় কাজ করছে।'

'ওঁ! তা আমি অন্য ব্যবস্থা করব। আচ্ছা, আপনি ডক্টর নিরঞ্জন দাসকে চেনেন কি?'

একটু চমকে গেলুম, 'ডক্টর দাসকে চিনি বইকি। তাঁর কাছে পড়েছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ভারি চমৎকার লোক—না?'

'তাই ত মনে হয়। কেন বলুন দেখি?'

'তিনি অমন ভাল লোক, কিন্তু তাঁর স্ত্রী শুনেছি ভীষণ দজ্জাল খাণ্ডার মেয়েমানুষ। আপনি নিশ্চয় জানেন?'

'ডাক্তারদের ঘরের খবর আমি কোত্থেকে জানব?'

'তা বটে। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। চায়ের কথাটা মনে রাখবেন।'

আর সন্দেহ নেই, মন্মথ করই শুক্লা আর ডক্টর দাসের কথা জানতে পেরেছে। কী চালাকির সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দিল। ডক্টর দাসের স্ত্রী দজ্জাল খাণ্ডার মেয়েমানুষ; অর্থাৎ তাঁর কানে খবরটা তুলে দিলে কী ব্যাপার হবে তোমরা ভেবে দেখ। উঃ, সাংঘাতিক লোক এই মন্মথ কর।

কিন্তু কেন? শুক্লা আমার বন্ধু, তাকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি মন্মথ করের সঙ্গে চা খেতে যাব, এই জন্যে? কিংবা ও হয়ত ভেবেছে আমাদের দু'জনের সঙ্গেই ডক্টর দাসের ঘনিষ্ঠতা। কী নোংরা নিষিদ্ধ মন লোকটার! কিন্তু আমার ওপরেই বা এত নজর কেন? লম্পটের চোখে আমি কি এতই লোভনীয়?

কী আছে স্ত্রীলোকের শরীরে যার জন্যে পৃথিবীজুড়ে এমন টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি? খানিকটা রক্ত-মাংস বই ত নয়। এরই জন্যে এত? কিংবা ওরা হয়ত ভাবে শরীরটা পেলে সেই সঙ্গে আরও কিছু পাবে। যা খুঁজছে তা পায় না, তাই বোধ হয় ওদের দেহের ক্ষুধা মেটে না; একটা দেহ ছেড়ে আর-একটা দেহের পানে ছুটে যায়। তারপর যখন নেশা কেটে যায় তখন দেখে সব ভাঁড়ই শুকনো, কোনও ভাঁড়ে রস নেই।

যাকগে। এসব অরুচিকর কথা ভেবে লাভ নেই। আমার জীবনে ও জিনিসকে আমি কাছে ঘেঁষতে দিইনি, কখনও দেবও না। আমি বেশ আছি, শান্তিতে আছি। শুক্লা সেদিন আপন মনে গাইছিল—'সই, কে বলে পিরীতি ভাল, হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া কাঁদিয়া জনম গেল।'—

দরকার নেই আমার পিরীতি করিয়া। পিরীতি করার কত সুখ তা তো চোখেই দেখছি। শুক্লার মনে একদণ্ড শান্তি নেই, স্বস্তি নেই; যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছে।

পিউকে অনেকদিন দেখিনি। শঙ্খনাথ-বলে গিয়েছিলেন আবার একদিন খেতে আসবেন, কিন্তু আসেননি। কাজের লোক, হয়ত ভুলে গিয়েছেন। সেদিন শুক্লা বলল, 'ভদ্রলোক আর তো এলেন না। এমন সুন্দর জিনিস উপহার দিয়েছেন, আমাদের উচিত ও'কে ধন্যবাদ দেওয়া। একবার ফোন কর না।'

ফোন করলুম, কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। বাড়িতে বোধ হয় কেউ নেই। শিউসেবকও যদি ফোন ধরত তাকে পিউয়ের কথা জিগ্যেস করতুম। এতদিনে নিশ্চয় বাড়িময় ছুটোছুটি আর খেলা করে বেড়াচ্ছে।

ভাদ্র মাস পড়ে অবধি বৃষ্টি বন্ধ ছিল, আকাশে মেঘও ছিল না। ভেবেছিলুম বর্ষা বুঝি শেষ হল। কিন্তু আজ সকাল থেকে আবার টিপ্‌টিপ্‌ আরম্ভ হয়েছে।

আমার জীবনে একটা বিচিত্র ব্যাপার বার বার ঘটতে দেখেছি। এক তো জন্মদিনে বৃষ্টি হবেই। তাছাড়া হঠাৎ যদি অসময়ে বৃষ্টি নামে সেদিন আমার জীবনে একটা কিছু ঘটবে, তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। বাবা যেদিন মারা যান সেদিন বৃষ্টি পড়েছিল। তাই ভাবছি, আজ কিছু ঘটবে নাকি? কী ঘটতে পারে? কী ঘটা সম্ভব?

১ ভাদ্র

কাল ডায়েরি লেখা শেষ করলুম বিকেল পাঁচটার সময়। সওয়া পাঁচটার সময় টেলিফোন এল।

শঙ্খনাথবাবু ফোন করছেন; গলার আওয়াজ একটু যেন অন্য রকম। বললেন, 'প্রিয়দম্বা, তুমি একবার আসবে?'

উৎকণ্ঠিত হয়ে বললুম, 'কী হয়েছে! পিউ কেমন আছে?'

তিনি বললেন, 'পিউ ভালই আছে। আমার নিজের একটু শরীর খারাপ হয়েছে।'

'শরীর খারাপ! কী রকম শরীর খারাপ?'

'সামান্য জ্বর হয়েছে। আর গায়ে ব্যথা। একটু দুর্বল বোধ করছি।'

'বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ডাক্তার কী বললেন?'

'ডাক্তার ডাকিনি। সামান্য জ্বরে ডাক্তার কী করবে? তুমি একবার আসবে? আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা। আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।'

শুক্লা বাড়ি নেই। তাকে একছত্র চিঠি লিখে তৈরী হয়ে নিলুম। ব্যাগে সব জিনিস আছে কিনা দেখে নিলুম। হয়ত রাত্তিরে থাকতে হবে। শঙ্খনাথবাবু বললেন বটে সামান্য জ্বর, কিন্তু বলা যায় না। এক ধরনের মানুষ আছে যারা নিজের অসুখকে অসুখ বলেই মনে করে না।

পৌনে ছটার সময় গাড়ি এল। টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লুম। আকাশ অন্ধকার, কিন্তু রাস্তায় এখনও আলো জ্বলেনি।

শঙ্খনাথবাবুর বাড়িতেও আলো জ্বলেনি। শিউসেবক গাড়ি-বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, সেলাম করে বলল, 'আসুন মা-জী। বাবু নীচেই আছেন।' শিউসেবক আজ আমাকে প্রথম 'মা-জী' বলল।

বাড়িতে ঢুকেই সামনে লবি; লবির বাঁ পাশে ড্রয়িং-রুম, ডান পাশ দিয়ে ওপরের সিঁড়ি উঠে গেছে। আর লবির মুখোমুখি একটা ঘর। ঘরটা অন্ধকার ছিল। শিউসেবক আমাকে সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে আলো জ্বেলে দিল। মাঝারি গোছের ঘর; একটা টেবিল, টেবিলের ওপর টেলিফোন; গোটা দুই চেয়ার, আর একটা খাট। খাটের ওপর শঙ্খনাথবাবু দোরের দিকে মুখ করে শুয়ে আছেন।

শঙ্খনাথবাবুর চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, তার ওপর মুখে দু'তিন দিনের দাড়ি। একটু হেসে হাত বাড়ালেন,—'এস প্রিয়দম্বা।'

বললুম, 'এ কী, আপনি এখানে শুয়ে আছেন যে!'

তাঁর মুখ একটু ম্লান হল। বললেন, 'এটা আমার অফিস-ঘর। বাড়িতে যখন কাজকর্ম করি, এখানেই বসি।'

বললুম, 'তা বেশ ত, কিন্তু অসুস্থ শরীরে এখানে শোবার কী দরকার?'

তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, তাই নীচেই থাকবার ব্যবস্থা করেছি। শেষে ছোঁয়াচ লেগে বাড়িসুদ্ধ পড়বে!'

টেবিলের উপর ব্যাগ রেখে চেয়ার টেনে তাঁর খাটের পাশে বসলুম। বললুম, 'দেখি আপনার নাড়ী।'

তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তারপর—তারপর—

কিন্তু নিজের কথা পরে বলব; আগে ও'র কথাটা শেষ করে নিই।

নাড়ী দুর্বল এবং চঞ্চল। গা বেশ গরম। টেম্পারেচার নিলুম: এক শ এক পয়েণ্ট চার।

'কবে থেকে জ্বর হয়েছে?'

'পরশু রাত্তির থেকে।'

'ওষুধ-বিষুধ কিছু খেয়েছেন?'

'কয়েকটা অ্যাস্‌পিরিনের বড়ি খেয়েছি।'

'আর পথ্য?'

'সাবুর জল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবলুম, তারপর মুখ তুলে বললুম, 'আপনার ফোন ব্যবহার করতে পারি?'

'কাকে ফোন করবে?'

'ডাক্তারকে।'

'ডাক্তার ডাকা দরকার?'

'দরকার।'

'বেশ, ডাক। ডক্টর করের ফোন-নম্বর—'

'ডক্টর করকে ডাকব না। আমার একজন জানা ডাক্তার আছেন, তাঁকে ডাকব।'

'যা ভাল বোঝ কর।'

জামাইবাবুকে ডাকলুম। তিনি ভাগ্যক্রমে নিজের ডিস্‌পেন্সারিতে ছিলেন, সব শুনে বললেন, 'ইনফ্লুয়েঞ্জাই ত মনে হচ্ছে।'

বললুম, 'আপনি একবার আসবেন?'

তিনি বললেন, 'আমি স্ত্রী-রোগের ডাক্তার আমাকে কেন?'

'আপনি আসুন।'

'আচ্ছা যাব। কিন্তু একটু দেরি হবে একটা কল্‌ সেরে যাব। সাতটা বাজবে।'

'তাই সই।'

ফোন ছেড়ে দিলুম। কব্জির ঘড়িতে ছটা বেজেছে।

শিউসেবককে ডেকে বললুম, 'এক পট্‌ কড়া কফি তৈরি করে নিয়ে এস। আর গোটা কয়েক টোস্ট। টোস্টে মাখম লাগিও না।'

'জী', বলে শিউসেবক চলে যাচ্ছিল তাকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, 'পিউ কোথায়?'

শিউসেবক বলল, 'পিউ-দিদি ওপরেই আছে। কলাবতী তাকে খেলা দিচ্ছে। এখানে আনতে বলব?'

'না না, এখানে আনতে হবে না। তুমি যাও, কফি আর টোস্ট তৈরি করে আন।'

শিউসেবক চলে গেল। শঙ্খনাথবাবু কাতরভাবে বললেন, 'কিন্তু আমার যে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না প্রিয়দম্বা।'

'ইচ্ছে করুক আর না-করুক, খেতে তো হবে।'

তিনি মুখ বিকৃত করে শুয়ে রইলেন।

আমি অন্য কথা পাড়লুম, 'সেদিন আপনি যে চমৎকার স্টোভ উপহার দিয়েছিলেন তার জন্যে শুক্লা ধন্যবাদ জানিয়েছে।'

তিনি বললেন, 'সেদিন তোমরা যা খাইয়েছিলে অমন তৃপ্তি করে অনেকদিন খাইনি।'

বললুম, 'আবার যাবেন বলেছিলেন, গেলেন না তো।'

তিনি বালিশের ওপর কনুই রেখে উঁচু হয়ে বললেন, 'যাব কোত্থেকে? ওই ব্যাটা লটপট সিং বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে।'

'লটপট সিং কে?'

তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল,—'লটপট কে জান না? কর্পোরেশনের বড় বড় দিগ্‌গজ

ব্যাটা লেফটেনেণ্ট লটপট সিং। আমার বউয়ের প্রাণের বন্ধু।'

শঙ্খনাথবাবুর অভ্যেস লোকের নাম উল্টোপাল্টা করা। বোধ হয় লোকটার নাম লজপৎ সিং, উনি তাকে লটপট সিং করেছেন।

বললুম, 'তা যাতায়াত শুরু করেছে ত কী হয়েছে! বাড়িতে অতিথি আসবে না?'

তিনি বললেন, 'অতিথি আসুক। ড্রয়িং-রুমে বসে গল্প করুক, চা খাক, তারপর চলে যাক।—আমি সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরি না, সেদিন একটা দরকারে চারটের সময় ফিরে এসে দেখি, লট্‌পট্ সিং আমার বউয়ের শোবার ঘরে আয়নার সামনে বসে সিগারেট খাচ্ছে। ভেবে দেখ দিকি!'

'আপনার স্ত্রী সেখানে ছিলেন?'

'সলিলা পাশের ঘরে সাজ-পোশাক পরছিল। মানে দুজনে মিলে বেরুবে।'

'তারপর?'

'তারপর লট্‌পট্ সিংকে বললুম,—নিকালো হিঁয়াসে। ফের যদি আমার বাড়িতে মাথা গলিয়েছ ঠেঙিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব।' বেটা নেড়ি কুত্তার মত পালাল।'

'আর আপনার স্ত্রী?'

'সলিলার বাইরে বেরুন বন্ধ করে দিয়েছি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? ঘরে বন্ধ করে রাখতে তো পারি না, তাই নিজেই বাড়ি আগলে পড়ে আছি। প্যান্‌প্যান্ নাকে-কাঁদুনি শুনছি। আমি সভ্য-সমাজের চাল-চলন বুঝি না, তাই মিছিমিছি সন্দেহ করি। নিজের স্ত্রীকে যারা সন্দেহ করে তারা মানুষ নয়, যারা ঘরে আটকে রাখে তারা পশুর অধম।—বুঝলে?'

তিনি ক্লান্তভাবে আবার শুয়ে পড়লেন। আমি বললুম, 'আপনার শরীর দুর্বল হয়েছে, বেশী কথা কইবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন। এ অবস্থায় বেশী উত্তেজনা ভাল নয়।'

তিনি চোখ বুজে রইলেন।

বাইরে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি চলেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—এইজন্যে অসময়ে বৃষ্টি নেমেছে। আমার মাথা খাবার জন্যে! কিন্তু—এ আমার কী হল? এ কী হল? কেন মরতে ওঁর নাড়ী দেখতে গিয়েছিলুম।

উনি বললেন, 'আর একবার নাড়ী দেখ তো প্রিয়ম্বদা। যেন আরও দুর্বল মনে হচ্ছে।'

ভয় পেয়ে ওঁর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলুম। না, ভয়ের কিছু নেই, তবে নাড়ী আরও দুর্বল হয়েছে। কী করি এখন! জামাইবাবুর আসতে দেরি আছে। শিউসেবক কফি নিয়ে এল না এখনও। আমার মাথাটা যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে হচ্ছে ডাক ছেড়ে কাঁদি।

মনটাকে হিঁচড়ে টেনে খাড়া করলুম। না, এখন ওসব নয়; কাঁদবার অনেক সময় আছে।

'আমি ওষুধ দিচ্ছি,' বলে উঠে টেবিলের পাশে গেলুম। আমার ব্যাগে স্পিরিট অব অ্যামোনিয়া আছে, তাই ফোঁটা কয়েক খাইয়ে দিই—

শিশি বার করেছি এমন সময় এক কাণ্ড! সে কী কাণ্ড!

দেখি উনি হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসেছেন, জ্বলজ্বলে চোখে দোরের বাইরে তাকিয়ে আছেন। তারপর এক হুঙ্কার ছাড়লেন, 'সলিলা! কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

গলা বাড়িয়ে দেখলুম, সলিলা লবির কিনারায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার পরনে গাঢ় নীল রঙের শাড়ি, হাতে একটা ছোট ব্যাগ। বোধ হয় পা টিপেটিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ভেবেছিল শঙ্খনাথবাবু দেখতে পাবেন না। আমি যদি তাঁর সামনে চেয়ারে বসে থাকতুম তাহলে বোধহয় দেখতে পেতেন না।

সলিলার শরীরের মোড় বাইরের দিকে, মুখখানা আমাদের দিকে। এইভাবে সে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ফিরে এসে দোরের সামনে দাঁড়াল। তার মুখখানা ফ্যাকাসে, চোখের মিশমিশে কালো মণি দুটো আরও কালো দেখাচ্ছে।

শঙ্খনাথবাবু আবার বললেন, 'যাচ্ছ কোথায় তুমি?'

সলিলার চোখ দুটো একবার আমার দিকে ফিরল। মুখখানা শক্ত হয়ে উঠল। এত নরম সুকুমার মুখ এত কঠিন হয়ে উঠতে পারে ভাবা যায় না। কিন্তু সে নিচু গলাতেই বলল, 'আমার বাবা এসেছেন, গ্র্যান্ড হোটেলে আছেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'বাবা এসেছেন! মিথ্যে কথা। যাও, ওপরে যাও—বাড়ি থেকে তুমি বেরুতে পাবে না।' এই বলে শঙ্খনাথবাবু সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখালেন।

সলিলার চোখের দৃষ্টি যেন বিষিয়ে উঠল, সে বলল, 'আমি যাব।'

'না, তুমি যাবে না। আমার হুকুম, তুমি বাড়িতে থাকবে।'

'তোমার হুকুম আমি মানি না। আমি যাচ্ছি। কেউ আমাকে আটকাতে পারে না।'

শঙ্খনাথবাবু ধড়মড় করে খাট থেকে নামবার উপক্রম করলেন। আমি এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম, এখন ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললুম। তারপর যা বলেছি যা করেছি সব পাগলের কাণ্ড।

তিনি খাট থেকে নামতে নামতে চিৎকার করে উঠলেন, 'কী, এত বড় স্পর্ধা!—'

আমি দুই হাত তাঁর বুকের ওপর রেখে তাঁকে আটকে রাখবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু আটকে রাখা কি যায়! তিনি যেন উন্মত্ত, এখনই আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন। আমি তখন সমস্ত শরীর দিয়ে চেপে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম, হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, 'না, তুমি উঠতে পাবে না। দুর্বল শরীরে তোমার হার্ট ফেল করে যাবে। যার ইচ্ছে যাক, যেখানে ইচ্ছে যাক। তোমাকে আমি উঠতে দেব না।'

লিখতে লিখতে ভাবছি, সত্যিই কি এই কথাগুলো আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল? না, আমার অন্তর্যামী আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিলেন? আমি ত ভেবে-চিন্তে কিছু বলিনি, প্রচণ্ড ব্যগ্রতায় আপনা হতে কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

যাহোক, আস্তে আস্তে তিনি শান্ত হলেন; কিন্তু চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে রইল। আমি কে, তাও বোধহয় অনুভব করলেন না। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলুম সলিলা চলে গেছে। মোটরের আওয়াজ শুনিনি; বোধহয় হেঁটে বাড়ির ফটক পার হয়েছে, তারপর রাস্তায় ট্যাক্সি ধরেছে।

ইনি নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছেন, যেন গায়ের জোর সব ফুরিয়ে গেছে। ওষুধ খাইয়ে দিলুম, স্পিরিট্ অ্যামন অ্যারোম্যাট্ বিশ ফোঁটা। তারপরে কফি আর টোস্ট নিয়ে শিউসেবক এল। এদিকে যে এত ব্যাপার হয়ে গেছে, তার মুখ দেখে মনে হল সে কিছু জানে না।

শিউসেবক টেবিলের ওপর ট্রে রাখল। আমি খাটের ধারে গিয়ে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম, 'কফি ঢেলে দেব?'

তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। এতক্ষণে যেন আমাকে দেখতে পেলেন, বালিশ থেকে মাথা তুলে বললেন, 'প্রিয়ম্বদা, গ্র্যান্ড হোটেলে ফোন কর ত। ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নাও প্রাণগোপাল সেন হোটেলে উঠেছে কি না!'

'প্রাণগোপাল সেন কে?'

'পি জি সেন, আই সি এস—সলিলার বাপ।'

আমি বড় মুশকিলে পড়ে গেলুম। সলিলা যদি মিছে কথা বলে থাকে, তার বাপ যদি না এসে থাকেন, তাহলে ইনি জানতে পারলে আবার লাফালাফি শুরু করে দেবেন। কী করি! খানিক ইতস্তত করে বললুম 'আগে কফি টোস্ট খেয়ে নিন, তারপরে ফোন করব।'

আপত্তি করলেন না। আমি বিছানার ওপর ট্রে রেখে কফি ঢেলে দিলুম, উনি বসে বসে খেতে লাগলেন। এক টুকরো শুকনো টোস্টও খেলেন। কতকটা সামলেছেন মনে হচ্ছে।

খাওয়া শেষ হয়েছে কি না-হয়েছে অমনি বললেন, 'এবার ফোন কর।'

নাছোড়বান্দা মানুষ। কিন্তু ফোন করতে হল না, এই সময় জামাইবাবুর মোটর এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। জামাইবাবু যখন আমাদের বাসায় যান তখন মোটরে যান না, কিন্তু তাঁর একটি মোটর আছে। বেশী বড় গাড়ি নয়, কালো রঙের ছোট একটি গাড়ি। এই গাড়িতে চড়ে তিনি রুগী দেখতে যান।

আমি লবিতে বেরিয়ে গিয়ে তাঁকে ঘরে নিয়ে এলুম। তাঁর পরনে কোট্ প্যাণ্ট টাই, পকেট থেকে স্টেথস্কোপ উঁচু হয়ে আছে। মন্মথ করের মতন অমন ফিটফাট নয়, কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদ চেহারা মিলিয়ে একটি অনায়াস আভিজাত্য আছে। অনেকদিন তাঁকে এ বেশে দেখিনি।

শঙ্খনাথবাবু খাটে বসে ছিলেন, কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে নতুন ডাক্তারের পানে চেয়ে রইলেন, তারপর তাঁর মুখের সংশয় পরিষ্কার হয়ে গেল। একটু অনুযোগের সুরে বললেন, 'দেখুন না ডাক্তারবাবু, আমার কিছুই হয়নি, মিছিমিছি প্রিয়ংবদা আপনাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে আনল।'

জামাইবাবু হাসলেন, 'কিছু হয়েছে কি না আমি দেখলেই বুঝতে পারব। আপনি শুয়ে পড়ুন।'

শঙ্খনাথবাবু শুলেন। ডাক্তার তাঁর নাড়ী দেখতে দেখতে সহজভাবে কথা বলতে লাগলেন, 'আপনার মেয়ে নাকি প্রিয়ংবদার খুব ন্যাওটা হয়ে পড়েছে!'

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'মেয়ে ন্যাওটা হলে কী হবে, প্রিয়ংবদা তাকে একটুও ভালবাসে না।'

এমন না হলে পুরুষমানুষের বুদ্ধি। আমি পিউকে ভালবাসি না! জামাইবাবুকে বললুম, 'আপনি পরীক্ষা করুন, আমি চট্ করে পিউকে দেখে আসি।'

ডাক্তার রুগীকে বললেন, 'আপনি এবার গায়ের জামা খুলুন।'

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখলুম, পিউয়ের ঘরে কলাবতী মেঝের ওপর বসে আছে, আর পিউ তার কোলে শুয়ে বেশ শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব, বাড়ির গিন্নী যে কর্তার সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়েছে, তা কেউ জানে বলেও মনে হয় না।

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পিউ চোখ চেয়ে আমাকে দেখল, হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠে দাঁড়াল।

আমি বললুম, 'পিউ!'

'দম্মা!' বলে পিউ ছুটে এসে আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরল। ভোলেনি আমাকে। চোখে জল এল, কোলে তুলে নিয়ে আদর করলুম, চুমু খেলুম; চুপিচুপি তার কানে কানে বললুম, 'পিউ, তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে?'

পিউ বলল, 'উঁ?'

বললুম, 'কিছু না। খেয়েছ, এবার ঘুমিয়ে পড়।'

সে আমার কাঁধে মাথা রাখল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম, কলাবতীকে বললুম, 'তুমি থাকবে তো?'

সে বলল, 'জী, রাত্রে আমি পিউরানীর কাছে শুই।'

'বেশ। আমি আবার দেখে যাব।' বলে আমি নীচে নেমে গেলুম।

পরীক্ষা শেষ হয়েছে, জামাইবাবু চেয়ারে বসে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখছেন, আমাকে দেখে মুখ তুললেন,—'আশঙ্কার কিছু নেই, কিন্তু পাক্কা দু দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। নড়াচড়া বারণ। এই ওষুধটা আনিয়ে নাও—তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে। আজ রাত্রে এক দাগ দিলেই চলবে, বাকী ওষুধ কাল খাবেন।'

প্রেসক্রিপশন নিয়ে জিগ্যেস করলুম, 'কী খেতে দিতে হবে? কাল পরশু সাবুর জল খেয়ে ছিলেন, আজ আমি এসে কফি আর টোস্ট খাইয়েছি।'

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক করেছ। চা কফি কোকো টোস্ট দিতে পার। কাল জ্বর নেমে যাবে, তখন মুরগির সুপ, হাফ্ বয়েলড ডিম দেওয়া চলবে।' তিনি উঠে দাঁড়ালেন, রুগীর দিকে হেসে তাকালেন, 'দুটো দিন একটু কষ্ট করুন, তারপর চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।—আচ্ছা, চলি।'

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনার ফী—'

ডাক্তার বললেন, 'আপনি তো আমাকে ডাকেননি। আপনার কাছ থেকে ফী নেব কেন? প্রিয়ংবদা ডেকেছে, ওর কাছ থেকে নেব।'

ডাক্তার ঘর থেকে বেরুলেন, আমি সঙ্গে গেলুম। জিগ্যেস করলুম, 'রাত্তিরে কি আমার থাকা দরকার?'

বললেন, 'আমি তো কোন দরকার দেখি না।'

তখন আমি সলিলদার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথা বললুম। শুনে তিনি বললেন 'তাই নাকি! তাহলে তো আমাকে থাকতে হয়। মহিলাটি যদি দুপুর রাত্রে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হয়ে যায়, তখন রুগীকে সামলাবে কে?'

'বেশ, আমি থাকব।'

'আচ্ছা। আমি শুক্লাকে খবর দেব যে আজ রাত্তিরে তুমি ফিরবে না।'

একটু হেসে তিনি গাড়িতে উঠলেন, গাড়ি চলে গেল। শিউসেবক লবিতেই ছিল তাকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে বললুম, 'ওষুধটা ডিস্‌পেন্সারি থেকে আনিয়ে দাও।' সে চলে গেল।

আমি ঘরে ফিরে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে রুগীর হুকুম হল, 'এবার গ্র্যাণ্ড হোটেলে ফোন কর।'

আর এড়ানো যায় না। ডাইরেক্টরিতে নম্বর খুঁজে ফোন করলুম। ম্যানেজারকে পাওয়া গেল না, তার বদলে যে লোকটা ছিল সে স্পষ্টভাবে বলতে পারল না প্রাণগোপাল সেন নামে কেউ হোটেলে আছেন কি না! ভালই হল, শঙ্খনাথবাবুকে তাই বললুম। তিনি মুখ অন্ধকার করে শুয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'ডাক্তারবাবুটি বেশ লোক, চ্যাংড়া ডাক্তার নয়। নাম কী?'

'নিরঞ্জন দাস।'

'তোমার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে দেখলাম।'

'হ্যাঁ, আমি ওঁর ছাত্রী, ওঁর কাছে পড়েছি।'

আর কিছু বললেন না, চোখ বুজে শুয়ে রইলেন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে যাবার পর তিনি চোখ খুলে আমার দিকে ঘাড় ফেরালেন, 'রাত্তিরে থাকবে?'

'থাকব।'

তুমি তো খেয়ে আসনি!'

'না।'

তিনি তখন ডাকলেন, 'শিউসেবক!'

শিউসেবক বোধহয় অন্য কোন চাকরকে ওষুধ আনতে পাঠিয়ে নিজে লবিতে দাঁড়িয়ে ছিল, সে ঘরে এসে বলল, 'জী?'

'ইনি আজ এখানে খাবেন। ওঁর খাবার এই ঘরে নিয়ে এস।'

আমি বললুম, 'এই সবে আটটা বেজেছে। এখন নয়, নটার পর। সেই সঙ্গে এঁর জন্যে দুধ দিয়ে কোকো তৈরি করে আনবে।'

'জী।' শিউসেবক চলে গেল। সে পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে কিন্তু মালিকের সামনে হিন্দীতে কথা বলে। কলাবতী একেবারেই বাংলা বলতে পারে না, চেষ্টাও করে না।

সাড়ে আটটার সময় ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এল। এক দাগ খাইয়ে দিলুম।

তারপর আস্তে আস্তে সময় কাটতে লাগল। রুগী কখনও চুপচাপ শুয়ে থাকছেন, কখনও এপাশ ওপাশ করছেন। শরীরে যদি বা স্বস্তি থাকে, মনে স্বস্তি নেই। মনটা শরশয্যায় শুয়ে আছে।

সওয়া নটার সময় শিউসেবক খাবারের প্রকাণ্ড ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল, টেবিলের ওপর ট্রে রেখে বলল, 'আজী, খানা এসেছি!'

ন্যাপকিন দিয়ে ট্রে ঢাকা, কী খাবার এসেছে দেখতে পেলুম না। জিগ্যেস করলুম, 'বাবুর জন্য কোকো এনেছ?'

'যার ইচ্ছা থাক্, যেখানে খুশী থাক্, তোমায় আমি উঠতে দেব না।'

'জী এনেছি।'

উঠে গিয়ে ট্রে থেকে ন্যাপকিন তুললুম। বাদশাহী ব্যাপার। পোলাও চাপাটি মাছের ফ্রাই মাংসের কালিয়া চিংড়িমাছের মালাই-কারি চাটনি রাবড়ি সন্দেশ। এক পাশে একটা বড় পেয়ালায় গরম মিল্ক-কোকো।

পেয়ালা নিয়ে খাটের কাছে গেলুম,—'উঠে বসুন, খাবার এনেছি।'

উঠে বসে পেয়ালা হাতে নিলেন, বললেন, 'তুমি খেতে বোস।'

ঘরের লাগাও বাথরুম, সেখানে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিজের মুখখানা আয়নায় দেখলুম। প্রিয়ংবদা ভৌমিক, তোমার জীবন ওলট-পালট হয়ে গেছে, কিন্তু মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না।

ফিরে এসে খেতে বসলুম। উনি বসে বসে আমার খাওয়া দেখতে লাগলেন। এক সময় জিগ্যেস করলেন, 'কেমন রেঁধেছে?'

বললুম, 'কলকাতার বাজ বাটি-চচ্চড়ির চেয়ে ভাল।'

একটু হাসলেন, মুখে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল। বেশ বোঝা যায় উনি মানুষকে খাওয়াতে ভালবাসেন, মানুষকে তৃপ্তি করে খেতে দেখলে নিজে তৃপ্তি পান।

খুব তৃপ্তি করেই খেলুম। উনি বসে বসে দেখলেন। পিউসেবক পাশে দাঁড়িয়ে খাওয়া তদারক করল; তারপর খাওয়া শেষ হলে বাসন তুলে নিয়ে চলে গেল।

হাতমুখ ধুয়ে খাটের ধারে চেয়ারে এসে বসলুম, 'এবার আপনি শুয়ে পড়ুন। দশটা বেজে গেছে, ঘুমুবার চেষ্টা করুন।'

'আমি ঘুমুব, তুমি একা জেগে থাকবে?'

'আমি চেয়ারে বসে বসে ঘুমুতে পারি। নিন, আর কথা নয়, শুয়ে পড়ুন।'

আর কথা হল না, উনি শুলেন। চোখের ওপর একটা বাহু রেখে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এইবার নিজের কথা লিখি। কিন্তু কী ছাই লিখব? মরণের ধরন আছে! কেউ তিল তিল করে পুড়ে মরে, কেউ আতশ-বাজির মতন এক লহমায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এরই নাম ভালবাসা!

ভালবাসার কথা গল্প উপন্যাসে পড়েছি, শুক্লার মুখে কিছু কিছু শুনেছি। সে একবার বলেছিল—'ভালবাসার কতখানি চোখের নেশা, কতখানি মনের মিল, কতটা স্বার্থপরতা কতটা আত্মদান বুঝতে পারি না, হয়ত সবটাই জৈববৃত্তি।' কিন্তু প্রেম যে হঠাৎ এসে এক মুহূর্তে জীবনকে তোলপাড় করে দিতে পারে এ কথা সে বলেনি। তবে কি সকলের প্রেম একরকম নয়?

প্রথম দর্শনেই প্রেম হয় শুনেছি। শকুন্তলার হয়েছিল, রোমিও-জুলিয়েটের হয়েছিল; আজকালও নিশ্চয় হয়। কিন্তু আমার হল না কেন? ওই যে মানুষটি একমুখ দাড়ি নিয়ে শুয়ে রয়েছেন ওঁকে ত আজ নতুন দেখছি না, বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি; তবে এতদিন কিছু হল হয়নি কেন? বরং ওঁর কথাবার্তা আচারব্যবহার খারাপই লেগেছিল। তারপর অবশ্য গা-সওয়া হয়েছিল, লোকটি যে অন্তরে খাঁটি তাও বুঝতে পেরেছিলুম। কিন্তু তাই বলে এ-রকম হবে এ যে কল্পনার অতীত! পুরুষের স্পর্শে কি ম্যাজিক আছে? এই জন্যেই কি আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—ঘি আর আগুন!

কিন্তু তাই বা কেন? আমার পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে; কচি খুকী নই, প্রথম-প্রণয়-ভীতা নবীনা কিশোরী নই। কাজের সূত্রে অনেক পুরুষের সঙ্গে হাত ঠেকাঠেকি হয়েছে; জামাইবাবুর সঙ্গে কতবার খেলার ছলে পাঞ্জা লড়েছি, কখনও কিছু মনে হয়নি। তবে আজ আমার এ কী হল! এ কি কারুর হয়? একি সম্ভব?

নাড়ী দেখবার জন্যে ওঁর কব্জি আমার হাতে নিয়েছিলুম। মনে হল আমার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত একটা শিহরণ বয়ে গেল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল; বুকের মধ্যে ঝড়ের বেগে মৃদঙ্গ বেজে উঠল। তারপর যন্ত্রের মতন কী করেছি আবছা মনে আছে। হঠাৎ যখন সচেতন হলুম তখন দেখি, ওঁকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছি আর পাগলের মতন বলছি—'না, তুমি উঠতে পাবে না...তোমাকে আমি উঠতে দেব না।'......

এ আমার কী সর্বনাশ হল! শুক্লা বলেছিল—পুরুষদের মধ্যে নেকড়ে বাঘ আছে, অজগর সাপ আছে। লখনাথবাবু কি

তাই? আমাকে মোহাচ্ছন্ন করেছেন? কিন্তু তাই বা কী করে হবে? কোনদিন ও'র চোখে লোভ দেখিনি। সরল সহজ মানুষ। তবে কি আমারই দোষ? আমার মন দুর্বল? কিন্তু কী দেখে আমার মন ও'র দিকে আকৃষ্ট হল! উনি বিবাহিত, স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে। ছি-ছি, আমার মন এত অবুঝ? ঘেন্নাপিত্তি নেই?

এই ভালবাসা! এই প্রেম! হোক প্রেম, কিন্তু নিকষিত হেম নয়। প্রেমের এত গুণ-গান শুনেছি, সব মিথ্যে। চণ্ডীদাস জানতেন প্রেম ভাল নয়, তাতে খাদই বেশী। আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। সারা জন্ম ধরে কাঁদাবে।......

বারোটা বাজল। উনি চোখের ওপর হাত রেখে ঘুমুচ্ছেন, টেবিলের ওপর ঘোমটা-ঢাকা ল্যাম্প জ্বলছে। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। আমি আস্তে আস্তে উঠে বাইরে গেলুম।

লবিতে আলো জ্বলছে না, ঘরের আলো দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে অন্ধকারকে একটু স্বচ্ছ করেছে। দেখলুম, লবির এক পাশে দেয়াল ঘেঁষে শিউসেবক একটা কম্বল পেতে শুয়ে আছে। বোধ হয় জেগেই ছিল, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল; আমার কাছে এসে খাটো গলায় বলল, 'মাজী, কিছু দরকার আছে কি?'

বললুম, 'শিউসেবক, তুমি এখানে শুয়েছ ভালই করেছ। এখন কিছু দরকার নেই, যদি দরকার হয় তোমাকে ডাকব।'

'বহুৎ আচ্ছা মাজী।'

শিউসেবক প্রভুভক্ত চাকর। ওকে কেউ এখানে থাকতে বলেনি, নিজে থেকেই আছে। লক্ষ্য করেছি শিউসেবক আর কলাবতী দুজনেই মালিকের অন্ধ ভক্ত। কিন্তু মালিকের স্ত্রীকে বোধ হয় একটুও শ্রদ্ধা করে না।

লবির কিনারায় গিয়ে বাইরের অন্ধকারে হাত বাড়ালুম, হাতে বৃষ্টির ছিটে লাগল। এখনও টিপিটিপি চলেছে।

ঘরে ফিরে গেলুম।

চেয়ারে বসেছি, উনি চোখের ওপর থেকে হাত নামিয়ে বললেন, 'সলিলা ফিরেছে?'

'না।'

আবার চোখের ওপর হাত রেখে শুলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'মেয়েমানুষের দাবাই কী জান? চাবুক। সকালে একবার, রাত্তিরে একবার। তবে তারা শায়েস্তা থাকে।'

বললুম, 'চাবুক লাগালেই পারেন। কে মানা করেছে?'

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, 'ওইটে যে পারি না। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলতে যদি পারতাম তাহলে কি আমার এ দশা হত!'

'তবে আর ভেবে কী হবে! ঘুমিয়ে পড়ুন, রাত এখনও অনেক বাকী।' আমিও যে মেয়েমানুষ সেকথা আর বললুম না। অবশ্য তিনি একটি বিশেষ মেয়েমানুষকে লক্ষ্য করে কথাটা বলেছিলেন। এবং একথাও আমার বুঝতে বাকী থাকেনি যে, সলিলা যতই মন্দ হোক তাকে তিনি ভালবাসেন। সলিলা তাঁকে ভালবাসে না, সে অতি নীচ প্রকৃতির মেয়ে; তবু তাকেই তিনি ভাল-বাসেন, আর কাউকে নয়।

কিন্তু আমার বুকের মধ্যে অনাহত মৃদঙ্গ-ধ্বনি বেজে চলেছে। কী চুলোর ছাই পেয়ে মৃদঙ্গ বাজছে? কী পেলুম, কী ছিলুম?

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। ইনি মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছেন, আবার জেগে উঠেই প্রশ্নভরা চোখে চাইছেন; আমি মাথা নেড়ে উত্তর দিচ্ছি—না, সলিলা আসেনি।

রাত্রি আড়াইটের সময় একবার চুপি চুপি ওপরে গেলুম। পিউয়ের ঘরে দাউ দাউ করে দুটো বালব্ জ্বলছে; কলাবতী পিউয়ের বিছানায় শুয়ে তাকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমুচ্ছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে পিউকে দেখলুম; ইচ্ছে হল কলাবতীকে সরিয়ে আমি পিউকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমুই। কিন্তু—

আজ একবার পাগলামি করেছি, বার বার পাগলামি ভাল নয়। তাছাড়া নীচে রুগী আছেন।

একটা বালব্ নিভিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে গেলুম। রুগী চোখ চেয়ে আছেন। তাঁর চোখের নিঃশব্দ প্রশ্নের উত্তরে বললুম, 'না, আসেনি। আমি পিউকে দেখতে গিয়েছিলুম।'

তিনি আবার চোখের ওপর বাহু রাখলেন।

রাত কেটে গেল, সকাল হল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে; কাঁচা রোদ্দুর ভিজে আকাশের গায়ে সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে।

রুগীর টেম্পারেচার নিলুম; জ্বর কমেছে, সাড়ে নিরেনব্বুই। তাঁকে কফি টোস্ট খাওয়ালুম, নিজেও এক পেয়ালা চা খেলুম। শিউসেবককে বললুম, 'আধ ঘণ্টা পরে এক দাগ ওষুধ খাওয়াবে, তারপর তিন ঘণ্টা অন্তর ওষুধ খাইয়ে যাবে।' ব্যাগ তুলে নিয়ে রুগীকে বললুম, 'আমি এবার চললুম। আর একটু বেলা হলে দাড়িটা কামাবেন।'

দরজা পার হয়েছি, পিছন থেকে ডাক এল, 'শুনে যাও।'

ফিরে গিয়ে সামনে দাঁড়ালুম। চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন, 'একবার "তুমি" বলবার পর আবার "আপনি" কেন?'

আমি উত্তর দিলুম না, ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠলুম। অত রাগারাগির মধ্যেও লক্ষ্য করেছেন!

বাসায় ফিরে গিয়ে শুনতে পেলুম শুক্লা নিজের শোবার ঘরে গান গাইছে—'অংগনে আওব যব রসিয়া।'

দোরের কাছ থেকে উঁকি মেরে দেখি, সে স্নান করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। বললুম, 'ও গান নয় শুক্লা, সেই গানটা গা—কে বলে পিরীতি ভাল।'

সে চিরুনি হাতে কাছে এসে দাঁড়াল আমার মুখের পানে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, 'কী হয়েছে রে?'

বললুম 'যা হবার তাই হয়েছে। তুই যেমন মরেছিলি, আমিও তেমনি মরেছি। তোর তবু একটা সুরাহা ছিল, জামাইবাবু তোকে ভাল-বাসতেন। আমার কিছু নেই।'

চোখ থেকে হঠাৎ জল বেরিয়ে এল।

শুক্লা আমাকে জড়িয়ে নিল, তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যা, আগে স্নান করে ঠাণ্ডা হ, তারপর শুনব।'

যেতে যেতে বললুম, 'আর ঠাণ্ডা! এজন্মে আর ঠাণ্ডা হব না।'

পরে শুক্লাকে সব বললুম। আর সাবধান করে দিলুম, 'জামাইবাবুকে কিছু বলবি না।'

সে বলল, 'তাঁকে কিছু বলতে হবে না। তিনি ডাক্তার, রুগীর মুখ দেখে রোগ ধরতে পারেন। কিন্তু এ আমাদের কী হল ভাই! দুজনের কপালের লেখাজোখা কি একই রকম?'

বিকেল বেলা ফোন করলুম—'আমি প্রিয়ংবদা। এবেলা শরীর কেমন?'

তিনি বললেন, 'ভালই মনে হচ্ছে। জ্বর বোধ হয় নেই। তবে একটু দুর্বলতা আছে।'

'ডাক্তারের হুকুম মনে আছে ত? দু দিন নড়াচড়া বারণ।'

'মনে আছে।'

'বাড়ির খবর কী?'

'বাড়ির খবর—মানে, সলিলার খবর? সে ফেরেনি। যাকগে, যা ইচ্ছে করুক, আমার কী?' কথাগুলো ভারি বৈরাগ্যপূর্ণ শোনাল।

'পিউ ভাল আছে?'

'আছে। কাল রাত জেগে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে ত?'

কষ্ট! মনে মনে ভাবলুম, আমার কষ্ট তুমি কী বুঝবে? মুখে বললুম, 'রাত জাগতে আমার কষ্ট হয় না।'

একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কাল তুমি খুব বাঁচিয়ে দিয়েছ। রাগ হলে আমার মাথা ঠিক থাকে না। চাষা-মনিষ্যি তো।'

বললুম, 'আপনি চাষা মনিষ্যি নয়। কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করি, লেখাপড়া শেখেননি কেন?'

ধমক দিয়ে বললেন, 'আবার "আপনি"!'

দু-তিনবার ঢোক গিললুম, তারপর বললুম, 'আচ্ছা বল, লেখাপড়া শেখনি কেন?'

সহজভাবে বললেন, 'শিখব কখন? বাবা সামান্য চাকরি করতেন; আমার যখন তেরো বছর বয়স তখন তিনি মারা গেলেন। সংসার

ঝাড়ে পড়ল। তারপর মা মারা গেলেন, তারপর ছোটবোনটাও মরে গেল। ব্যস্‌, সংসারে আমি একা, আর লেখাপড়ার দরকার কী? রোজগারের ধান্দায় লেগে গেলাম।'

ইচ্ছে হল জিগ্যেস করি, এমন বউ জোগাড় করলেন কোত্থেকে? কিন্তু সংকোচ হল, প্রশ্ন করতে পারলুম না। বললুম, 'আচ্ছা, কাল আবার ফোন করব।'

'আচ্ছা।'

ফোন রেখে দিলুম। শরীরের সমস্ত স্নায়ুশিরা যেন টান হয়ে আছে। আবার এবেলা স্নান করব। তারপর খেয়ে ঘুমুব. যত পারি ঘুমুব। যতক্ষণ ঘুমুব অন্তত ততক্ষণ মনটা শান্ত থাকবে।

স্নান করে এসে শোবার ঘরে দোর বন্ধ করলুম। আলো জ্বেলে আয়নার সামনে দাঁড়ালুম। আয়নায় আমার দেহের প্রতিবিম্ব পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে নেবার মতন নয়। কিন্তু কতদিন থাকবে এ যৌবন? মেয়েদের যৌবন কতদিন থাকে? সকালবেলার ফোটা ফুল সন্ধ্যে বেলায় শুকিয়ে যায়।

রাত্রি নটার সময় আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। ভেবেছিলুম ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু কোথায় ঘুম! এগারোটা পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়লুম। চোখে মুখে জল দিয়ে আলো জ্বেলে ডায়েরি লিখতে বসেছি।

রাত্রি এখন আড়াইটে। বেশ আছি আমি; দিনে ঘুম নেই, রাত্রে ঘুম নেই। একেবারে তপস্বিনী হয়ে গেছি।

১৫ ভাদ্র

এই কয়েক দিনের মধ্যে কত কাণ্ডই না হয়ে গেল! বাব্বাঃ, যেন কালবোশেখীর ঝড়। শুধু আমার জীবনে নয়, শুক্লার জীবনেও।

আজ রবিবার। গত বুধবারে ডাক্তার মন্মথ করের ফোন এল। গলার আওয়াজ আগের মতই মোলায়েম, কিন্তু মনে হয় মখমলের খাপের মধ্যে ধারালো ছুরি ঢাকা আছে। বললেন, 'মিস ভৌমিক, ভাল আছেন ত? খবর পেলাম শঙ্খনাথবাবুর অসুখ হয়েছিল আপনি সেবা করতে গিয়েছিলেন। দেখছি শঙ্খনাথবাবুর সঙ্গে আপনার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। আমাকে ডাকবার আগেই তিনি আপনাকে ডাকেন।'

আমার গলা বুজে এল। এ কথার কী উত্তর দেব? তিনি আবার বললেন, 'আরও শুনলাম ডক্টর নিরঞ্জন দাসকে কল দেওয়া হয়েছিল। আমি শঙ্খনাথবাবুর ফ্যামিলি ডক্টর, অথচ তাঁর অসুখে আমাকে না-ডেকে ডাকা হয়েছিল নিরঞ্জন দাসকে! কে ডেকেছিল? আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'মিস ভৌমিক, শঙ্খনাথবাবুর যেবার যখন অসুখ হয় তখন আমিই আপনাকে ডেকে কাজ দিয়েছিলুম। সে কথা এখন আপনার মনে নেই, কারণ শঙ্খনাথবাবুর সঙ্গে এখন আপনার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে—তাছাড়া নিরঞ্জন দাসও আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু—'

আমি মরিয়া হয়ে বললুম, 'আপনি ভুল করছেন, ডক্টর কর। শঙ্খনাথবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা নেই তিনি আমাকে কল্‌ দিয়েছিলেন তাই গিয়েছিলুম। অবশ্য ডক্টর দাস আমার বন্ধু; কিন্তু তিনি ডাক্তার হিসেবে শঙ্খনাথবাবুকে দেখতে যাননি, ফী নেননি। তাঁকে আমি ডেকেছিলুম, কারণ তাঁর কথাই আমার আগে মনে পড়েছিল—'

'তা ত পড়বেই!' বাঁকা হাসির সঙ্গে কথাগুলো আমার কানে বিঁধল—'আপনি খাসা আছেন। একদিকে বড়মানুষ শঙ্খনাথ ঘোষ, যিনি গাড়িতে করে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেন, অন্যদিকে বড় ডাক্তার নিরঞ্জন দাস, যিনি রাত দুপুরে আপনাদের বাসায় যাতায়াত করেন। অথচ আমি চায়ের নেমন্তন্ন করলে আপনি সময় পান না!'

আমার মুখচোখ গরম হয়ে উঠেছিল, বললুম, 'আর কিছু বলবার আছে?'

তিনি বললেন, 'বলবার আছে অনেক কিছুই। কিন্তু আপনাকে নয়। যেখানে বললে কাজ হবে সেখানে বলব। আমি আপনার উপকার করেছিলাম আপনি তার চমৎকার প্রতিদান দিয়েছেন, আমাকে সরিয়ে নিরঞ্জন দাসকে ডেকে এনেছেন। একথা আমার মনে থাকবে। আচ্ছা, নমস্কার।'

টেলিফোন রেখে সেইখানেই বসে রইলুম। কী হবে এখন! হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারপর শুক্লা এল, তাকে বললুম। তার মুখখানিও সিঁটিয়ে শুকিয়ে নীল হয়ে গেল।

পরদিন সকাল আটটার সময় আবার টেলিফোন। আমি আর শুক্লা দুজনেই ঘরে ছিলুম, আড়ষ্ট হয়ে টেলিফোনের দিকে চেয়ে রইলুম; যেন টেলিফোন নয়, একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, এখনই ফণা তুলে ছোবল মারবে। শুক্লা শেষে বলল, 'তুই ফোন ধর প্রিয়া, আমার হাত-পা কাঁপছে।'

ফোন তুলে কানের কাছে ধরলুম, চিঁচিঁ সুরে বললুম, 'হ্যালো!'

জামাইবাবুর গলা—'প্রিয়ংবদা! শোন, তুমি এখনই একবার আমার বাড়িতে আসতে পারবে? একজনকে নার্স করতে হবে।' তাঁর কণ্ঠস্বর দৃঢ়, কঠিন; ডাক্তারের কণ্ঠস্বর।

ভয় কেটে গেল, ব্যগ্র হয়ে বললুম, 'কী হয়েছে? কাকে নার্স করতে হবে?'

তিনি একটু থেমে বললেন, 'আমার স্ত্রীকে। হঠাৎ তাঁর স্ট্রোক হয়েছে, প্যারালিটিক স্ট্রোক। তুমি ফ্রী আছ? আসতে পারবে?'

কিছুক্ষণ কথা কইতে পারলুম না, তারপর বললুম, 'পারব। আধ ঘণ্টার মধ্যে গিয়ে পৌঁছব।'

'বেশ। বাড়ির ঠিকানা জানা আছে, চলে এস।' তিনি ফোন রেখে দিলেন।

শুক্লা দাঁড়িয়ে একতরফা কথা শুনছিল। সে বুঝতে পেরেছিল জামাইবাবু ফোন করেছেন এবং একটা গুরুতর কিছু ঘটেছে। সে আমার আঁচল খামচে ধরে শীর্ণ গলায় বলল, 'প্রিয়া—কী—কী—?'

'আমার ঘরে আয়, বলছি। হয়ত—হয়ত ভগবান তোর পানে মুখ তুলে চেয়েছেন।'

শোবার ঘরে কাপড় বদলাতে বদলাতে শুক্লাকে বললুম। সে আমার বিছানায় বসে শুনছিল, আস্তে আস্তে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। তার মুখখানা মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আশা! যে-মানুষ আশা ছেড়ে দিয়েছে সে যদি হঠাৎ আশার আলো দেখতে পায় তাহলে আচমকা ধাক্কা সামলাতে পারে না। আমিও আশা করছি, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আশা করছি, জামাইবাবু যেন মুক্তি পান। শুক্লার জীবন যেন ফলে ফুলে ভরে ওঠে।

কিন্তু তবু, ভেবে দেখতে গেলে, কিসের জন্যে আশা? একটা মানুষ সাংঘাতিক পীড়িত, সে যেন বেঁচে না-ওঠে এই আশা? খুব উচ্চাঙ্গের আশা নয়। তবু স্বার্থপর মন ওই আশাকেই আঁকড়ে ধরেছে। ভাবছি, জামাইবাবুর মনেও কি ওই আশা উঁকি-ঝুঁকি মারছে?

বললুম, যদি সুবিধে পাই ফোন করব। ব্যাগ নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। জামাইবাবুর বাড়িতে কখনও যাইনি, কিন্তু খুঁজে নিতে পারব।'

জামাইবাবুর বাড়ি কলকাতার উত্তরাংশে। দোতলা বাড়ি; নীচের তলায় একটা সাধারণ বসবার ঘর, চাকরদের ঘর, রান্নাঘর ভাঁড়ার। একজন চাকর সদরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে দেখে বলল, 'আপনি কি মিস ভৌমিক? এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান, ডাক্তারবাবু ওপরে আছেন।'

দোতলায় সিঁড়ির মুখেই একটা ঘর, ড্রয়িং-রুমের মতন সাজানো। সোফা-সেট্‌ আছে, সাজসরঞ্জাম আছে; কিন্তু কিছুরই ছিরি-ছাঁদ নেই। সব এলোমেলো অপরিচ্ছন্ন।

জামাইবাবু সোফায় বসে একজন বৃদ্ধ ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ডক্টর বর্ধন কলকাতার ডাক্তার-সমাজের মাথার মণি; প্রায় সব ডাক্তারই তাঁর শিষ্য। তিনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি তাঁকে চিনি। আমি যখন ঘরে ঢুকলুম তখন তিনি শান্ত গম্ভীর গলায় বলছেন,—'......তুমি নিজের হাতে রেখো না—' আমাকে দেখে থেমে গেলেন।

জামাইবাবু বললেন, 'না স্যর্‌। এস প্রিয়ংবদা।'

ডক্টর বর্ধন বললেন, 'আমি উঠি। দরকার হলে জানিও।'

'জানাব স্যর্।'

ডক্টর বর্ধন চলে গেলেন। জামাইবাবু তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে এলেন, আমাকে বললেন, 'বোস সখি।' আমি সোফার একপাশে বসলুম। তিনিও সোফায় বসে কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে কী ভাবলেন, তারপর আমার দিকে ফিরে একটু ফিকে হেসে বললেন, 'তোমাকে ডেকে ভুল করেছি সখি। যাহোক, এসেছ যখন দেখে যাও।'

'কখন কী হল আগে বলুন।'

তিনি হেলান দিয়ে বসে উস্কখুস্ক চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কাল রাত্রি দশটার সময় কেউ একজন ফোন করেছিল......আমি বাড়ি ছিলাম না......ফোন পাবার পর আমার স্ত্রী ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করেন, তারপর রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। আমি এসে দেখি—স্ট্রোক হয়েছে, বাঁ অঙ্গটা পড়ে গেছে।'

বললুম, 'কে ফোন করেছিল জানা গেছে কি?'

তিনি চকিত হয়ে চাইলেন, 'না। তুমি জান?'

'জানি। মন্মথ কর।' বলে কাল বিকেলের ঘটনা বললুম।

তিনি একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, 'হুঁ। আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল। মন্মথ করের উদ্দেশ্য কিন্তু সিদ্ধ হল না, সে যা চেয়েছিল তার উল্টো ফল হল।—এস।'

তিনি আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। খাটের পায়ের কাছে একজন ঝি দাঁড়িয়ে আছে, আর খাটে শুয়ে আছেন একটি মহিলা। আগে তাঁকে দেখিনি, এই প্রথম দেখলুম। লম্বা হাড়ে-মাসে শরীর, মুখে বেশী মাংস নেই, রঙ লালচে সাদা, ঘন জোড়া-ভুরু, নাকটা মুখের ওপর খাঁড়ার মতন উঁচু হয়ে আছে। মুখের বাঁ দিকটা রোগের আক্রমণে বেঁকে গেছে। তবু যৌবন-কালে ইনি উগ্র ধরনের সুন্দরী ছিলেন তা এখনও বোঝা যায়। ইনিই ডক্টর নিরঞ্জন দাসের স্ত্রী।

আমরা খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। রোগিণী আমাদের দিকে মাথা ঘোরাতে পারলেন না, কেবল চোখ ফিরিয়ে তাকালেন। মানুষের চোখে এমন বিষাক্ত আক্রোশ আর বোধহয় কখনও দেখিনি। চমকে উঠতে হয়। তারপর তাঁর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল; বিকল স্বরযন্ত্রের আওয়াজ, কিছু বোঝা গেল না। জামাইবাবু তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বলবে?'

আবার তাঁর মুখ দিয়ে গোঙানির মতন শব্দ বেরুল, যার মানে বোঝা না-গেলেও মনের ভাব বুঝতে কষ্ট হয় না। জামাইবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'চল, আমাদের দেখে উনি উত্ত্যক্ত হচ্ছেন।'

বাইরের ঘরে ফিরে গিয়ে জামাইবাবুর মুখের পানে চাইলুম। তিনি বললেন, 'ভেবেছিলাম নিজেই চিকিৎসা করব, তোমরা দেখাশোনা করবে। কিন্তু মাস্টারমশাই যা বলে গেলেন তার পর আর তা সম্ভব নয়। স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনিবনাও নেই একথা জানাজানি হয়ে গেছে, এমন কী মাস্টার মশায়ের কানে পর্যন্ত উঠেছে। আমার চিকিৎসায় যদি কিছু মন্দ ফল হয়—বুঝতে পারছ? তার চেয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া ভাল। সেখানে অন্য ডাক্তার চিকিৎসা করবেন, আমার কোনও দায় থাকবে না। আমি কেবল বাইরে থেকে দেখাশোনা করব।'

জিগ্যেস করলুম, 'রোগের প্রগ্নোসিস কী রকম?'

মাথা নেড়ে বললেন, 'কিছু বলতে পারি না।। অবশ্য আরাম হবার কোনও আশাই নেই, কিন্তু এই অবস্থায় পাঁচ বছর বিছানায় শুয়ে থাকাও সম্ভব।'

বুক দমে গেল। তিনি আমার মনের অবস্থা বুঝে একটু হেসে বললেন, 'সখি, দুনিয়ার কাছে কিছু আশা কোরো না, তাহলেই ধাক্কা খাবে। সংসার নিজের নিয়মে চলে, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার তোয়াক্কা রাখে না।—চল, গাড়িতে তোমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

প্রায় আঁতকে উঠলুম, 'আপনি এখন যাবেন?'

তাঁর মুখে কেমন একরকম হাসি ফুটে উঠল; তার কতকটা ব্যঙ্গ কতকটা আত্মগ্লানি। বললেন, 'এখন আর ভয় কিসের? লজ্জাই বা কিসের? আমি অবশ্য কোনদিনই লজ্জা করিনি, কিন্তু কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় ছিল; এখন আর তাও নেই।—চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে হাসপাতালে যাব। সেখানে একটা প্রাইভেট ক্যাবিনের ব্যবস্থা করে আজই রুগীকে রিমুভ করতে চাই।'

বাসার সামনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'শুক্লাকে ব'লো যেন বেশী বিচলিত না হয়। আমি যদি পারি রাত্তিরে আসব।'

শুক্লা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, আমি আসতেই আমাকে খামচে ধরল,—'ফিরে এলি যে?'

যা দেখেছি যা শুনেছি সব তাকে বললুম, সে আমাকে খামচে ধরে বসে রইল। শেষে ভয় জড়ানো সুরে বলল, 'কী হবে প্রিয়া?'

বললুম, 'জামাইবাবু বলেছেন, দুনিয়ার কাছে কিছু আশা কোরো না, তাহলেই ধাক্কা খাবে। তোকে বেশী বিচলিত হতে মানা করেছেন। আজ রাত্তিরে হয়ত আসতে পারেন।'

শুক্লা কিছুক্ষণ বুকে ঘাড় গুঁজে বসে রইল, তারপর উঠে স্নান করতে চলে গেল। স্নান করে যখন ফিরে এল তখন তার মু[illegible] দেখে বুঝলুম, সে মন শক্ত করেছে। উ[illegible] আশা মানুষের মনকে কী দুর্বলই করে দিতে পারে!

জামাইবাবু কিন্তু রাত্তিরে এলেন না, বাড়ি থেকে ফোন করলেন,—'আজ হাসপাতালে ক্যাবিন পাওয়া গেল না। কাল একটা খালি হবে। আজ তোমাদের বাসায় যেতে পারব না, রুগীর কাছে থাকতে হবে।'

'আমি যাব?'

'না, তাতে বিপরীত ফল হতে পারে। শুক্লাকে ডেকে দাও, তার সঙ্গে দুটো কথা বলি।'

শুক্লার হাতে ফোন দিয়ে আমি সরে গেলুম—

পরদিন শুক্রবার। সন্ধ্যের পর জামাই-বাবু এলেন। আমি নিজের ঘরে ছিলুম, বেরিয়ে এসে শুক্লার ঘরে গলার আওয়াজ পেয়ে সেই দিকে গেলুম। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখি, জামাইবাবু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আর শুক্লা তাঁর বুকে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদছে।

পা টিপে টিপে সরে আসছিলুম, জামাই-বাবু হাত নেড়ে বললেন, 'সখি, এদিকে এস। তুমি শুক্লাকে বোঝাও যে এবার বিয়ে করলে কেউ নিন্দে করবে না।'

আমি সসংকোচে ঘরে ঢুকলুম; ওরা যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জা করতেও ভুলে গেছে। জামাইবাবু বললেন, 'এত বোঝাচ্ছি কিছুতেই বুঝছে না।'

শুক্লা মাথা নেড়ে কান্না-ভরা গলায়, বলল, 'না, আমি বুঝব না। তুমি আমাকে লোভ দেখিও না। এখন বিয়ে করলে সবাই তোমায় ছি-ছি করবে, শহরে কান পাতা যাবে না। তুমি শ্রদ্ধা হারাবে, সম্মান হারাবে, পসার হারাবে। সে আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

জামাইবাবু বললেন, 'এখনই ছি-ছির কিছু বাকী আছে? তোমার-আমার কথা সবাই জানতে পেরেছে।'

'তা জানুক। তাতে আমার নিন্দে; তুমি পুরুষমানুষ, তোমার নিন্দে নেই। কিন্তু যদি বিয়ে কর, সবাই জো পেয়ে যাবে। তুমি গাইনকোলজিস্ট, কেউ তোমাকে মেয়েদের চিকিৎসা করতে ডাকবে না।'

জামাইবাবু গাঢ় স্বরে বলে উঠলেন, 'কিন্তু শুক্লা, আমি যে সংসার চাই, ছেলেমেয়ে চাই—'

'আর আমি কি চাই না?' শুক্লা ভিজে চোখ তুলে তাঁর মুখের পানে তাকাল।

হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেল। ওদের মনের এই দিকটা এতদিন দেখতে পাইনি। সন্তানের জন্যে কী তীব্র কামনা ওদের মনে! সাধারণ পাঁচজনের মতন সংসারের সাধ, সন্তানের সাধ। অথচ [illegible]

অবস্থায় তা তো হবার নয়। তাই জামাইবাবু শুক্লাকে বিয়ে করবার জন্যে এমন ক্ষেপে উঠেছেন। কিন্তু শুক্লা তা হতে দেবে না; বুক ফেটে গেলেও সে জামাইবাবুর এতটুকু অনিষ্ট হতে দেবে না।

শেষ পর্যন্ত জামাইবাবু রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, আমি হাত ধরে ফিরিয়ে আনলুম, —'না-খেয়ে যেতে পাবেন না।'

তাঁর রাগ কিন্তু বেশীক্ষণ রইল না। খানিক পরেই হেসে বললেন, 'বিয়ে না-করলে তো বয়ে গেল, গোঁফজোড়াতে দিলে চাড়া তোমার মত অনেক পাব। কিন্তু একটা কাজ তো করতে পার; আমার বাড়িটা গরুর গোয়াল হয়ে আছে, সেটাকে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে দিতে পার। করবে?'

আমি বলে উঠলুম, 'নিশ্চয় পারব। আমরা দুজনে মিলে আপনার বাড়ি তকতকে ঝকঝকে করে দেব। কী বলিস শুক্লা?'

শুক্লার কান্না-ধোয়া চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

আমি বললুম, 'কাল সকালেই আমরা যাব। একদিনে যদি কাজ শেষ না হয় পরশুও যাব। আপনার বাড়ির পঙ্কোদ্ধার করে ছেড়ে দেব। অনেক খরচ কিন্তু। দরজা-জানলার পর্দা ফেলে দিতে হবে, সোফা-সেটের স্প্রিং গদি সব বদলাতে হবে। পাঁচ শো টাকার কমে হবে না। দেবেন তো?'

জামাইবাবু ভীষণ খুশী হলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর কিন্তু তিনি রইলেন না। হাসপাতালে গিয়ে স্ত্রীর রিপোর্ট নেবেন, তারপর বাড়ি যাবেন।

পরদিন, অর্থাৎ কাল সকালবেলা, চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। শুক্লার একটু ভয়-ভয় ভাব, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করছে না। বাড়িতে পৌঁছে দেখলুম, জামাইবাবু কাজে বেরিয়ে গেছেন; চাকর বলল, 'আমার নাম সুবোধ। বাবু হুকুম দিয়ে গেছেন আপনাদের যা চাই সব যোগাড় করে দিতে। আমি দুটো জন-মজুর ডেকে এনেছি। আর কী কী চাই হুকুম করুন।'

আমি বললুম, 'আমরা আগে বাড়িটা আগাগোড়া দেখতে চাই।'

'আজ্ঞে আসুন', বলে সুবোধ আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল। আড়চোখে লক্ষ্য করলুম শুক্লার চোখে জল এসেছে। আমি আর তার পানে তাকালুম না।

বাড়িতে একটা চাকর একটা ঝি, সুবোধ আর শশী। তাছাড়া রান্নার জন্যে বামুন-মেয়ে আছে। মোটর-ড্রাইভার পঞ্চুও বাড়িতেই থাকে। নীচের তলাটা অত্যন্ত অপরিষ্কার; রান্নাঘর জলে কাদায় একহাঁটু হয়ে আছে; ছাতলা-ধরা কলতলাতে পা দিতে ভয় করে। জামাইবাবুর অর্ধাঙ্গিনী শুধু চেঁচাতে পারতেন, সুগৃহিণী ছিলেন না।

সুবোধকে ডেকে বললুম, 'খানিকটা চুন আর বালি আনিয়ে নাও; আর নারকেল ছোবড়া। মজুর দুটোকে লাগিয়ে দাও, তারা ঘষে-মেজে কলতলা পরিষ্কার করুক।'

সুবোধ 'আজ্ঞে' বলে চলে গেল।

বামুন-মেয়ে ধোঁয়া-ভরা রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল। বেঁটে মোটা আধ-বয়সী মেয়েমানুষ, চোখ-ভরা কৌতূহল। তাকে ডেকে বললুম, 'আজ দুপুরবেলা আমরা দুজন এখানে খাব। ডাক্তারবাবুও খাবেন।' সে থানের আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে দিতে ঘাড় নাড়ল। আমাদের কী ভাবল কে জানে!

নীচেরতলার মোটামুটি ব্যবস্থা করে আমরা ওপরে গেলুম। ওপরতলার অবস্থা ওরই মধ্যে ভাল, কিন্তু তবু দেখলে গা কিচকিচ করে। জানলার কাচে এত ময়লা জমেছে যে আলো ঢোকে না, মেঝে এত নোংরা যে মোজেইকের কাজ প্রায় দেখা যায় না। তাছাড়া জানলা-দরজার পর্দা, খাট বিছানা চেয়ার টেবিল টেনে ফেলে দিলেই

ওরা যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল, লজ্জা করতেও ভুলে গেছে।

ভাল হয়।' শশী-ঝি ওপরে ছিল, আমাদের দেখে কাছে এসে দাঁড়াল। তাকে বললুম, 'তুমি বাড়ির ঝি? এ কী অবস্থা করে রেখেছ বাড়ির? বাড়িতে কি ঝাঁটপাটও পড়ে না?'

শশী-ঝি বুঝেছিল আমরা হে'জিপে'জি নই, তাই ন্যাকা সুরে আরম্ভ করল, 'আমি একা মানুষ, কোন্ দিক দেখব মা! নীচে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কুটনো কোটা, বাটনা বাটা; ওপরে গিন্নী-ঠাকরুনের ফাই-ফরমাজ, পান সাজা। তার ওপর মুখ-ঝামটা। সারাদিন ওপর আর নীচে, ওপর আর নীচে। একটা গতরে কত সামলাব?'

বললুম, 'আচ্ছা, হয়েছে। বাড়িতে গুঁড়ো সাবান আছে?'

শশী বলল, 'আছে মা, কাপড় কাচার গুঁড়ো সাবান আছে।'

'বেশ। নীচে গিয়ে এক বালতি জল গরম করে তাতে গুঁড়ো সাবান দিয়ে নিয়ে এস। ঘরদোর সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।'

'হ্যাঁ মা,' বলে শশী চলে গেল।

আমি আঁচল দিয়ে গাছ-কোমর বাঁধতে বাঁধতে শক্রোকে বললুম, 'নে, কোমরে আঁচল জড়া। তোকেও কাজ করতে হবে। তোর ঘর-দোর আমি একা পরিষ্কার করতে পারব না।'

শক্রো লাল হয়ে উঠল, তারপর কোমরে আঁচল জড়াতে লাগল।

দুপুর পেরিয়ে জামাইবাবু এলেন। সঙ্গে অনেক খাবার এনেছেন; মধুক্ষরার নিখুঁতি, দুই সন্দেশ। বাড়ি দেখে বললেন, 'আরে বাঃ! বাড়ির চেহারা ফিরে গেছে। তোমাদের খাবার কী ব্যবস্থা হয়েছে জানি না, তাই বাজার থেকে খাবার এনেছি।'

বামুন-মেয়ে অবশ্য রান্নাবান্না করে রেখেছিল। ওপরে খাবার দিয়ে গেল, আমরা তিনজনে একসঙ্গে বসে খেলুম। তারপর খানিকক্ষণ গল্পসল্প করে আমাদের হাতে পাঁচ শো টাকা দিয়ে জামাইবাবু চলে গেলেন।

আমরাও বাজার করতে বেরুলুম। পর্দা, বিছানার চাদর, মশারি, বালিশ, কত কী যে কিনতে হবে তার ঠিক নেই।

সন্ধ্যের পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাসায় ফিরে এলুম। এ আমার ভালই হয়েছে, নিজের কথা ভাববার সময় পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে যাচ্ছে তখন বুকের মধ্যে খচ্‌খচ্ করে উঠছে।

স্নান করে তাড়াতাড়ি রাত্রির খাওয়া খেয়ে নিলুম। তারপর শুয়ে পড়লুম। সারারাত্রি খুব ঘুমিয়েছি, একবারও ঘুম ভাঙেনি। রাত্রে জামাইবাবু এসেছিলেন কি না তাও জানতে পারিনি।

আজ সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, আকাশে মেঘ জমেছে, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।

কাল জামাইবাবুর বাড়ির কাজ শেষ হয়নি; আমরা দুজনে চা খেয়ে বেরুতে যাচ্ছি, টেলিফোন বেজে উঠল। হয়ত জামাইবাবু, তাঁর স্ত্রীর কোন খবর আছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরলুম। কিন্তু জামাইবাবু নয়, শঙ্খনাথবাবু। গলার আওয়াজ ভারী-ভারী। বললেন, 'তুমি আছ? আমি এখনি যাচ্ছি।'

'কী হয়েছে?'

'মুখেই বলব।'

'আচ্ছা, আসুন।'

ফোন রেখে শক্রোকে বললুম, 'শঙ্খনাথ-বাবু আসছেন। কী দরকার বললেন না। তুই বরং এগিয়ে যা, আমি পরে যাব।'

শক্রো বলল, 'না, দুজনে একসঙ্গে যাব।'

পনেরো মিনিট পরে খট্‌খট্ করে দোরের কড়া নড়ে উঠল। গাড়ি কখন এসেছে জানতে পারিনি; দোর খুলে দেখি, সামনে শঙ্খনাথ-বাবু, তাঁর পিছনে পিউকে কোলে নিয়ে কলাবতী।

ইঁটের পাঁজায় আগুন দিলে বাইরে থেকে আগুন দেখা যায় না; কিন্তু কাছে গেলে গায়ে আঁচ লাগে। উনি যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন তখন আমার গায়ে যেন আঁচ লাগল। কী হয়েছে? ভয়ংকর একটা কিছু হয়েছে। পিউকে নিয়ে উনি এসেছেন কেন?

আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না, নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলুম। উনি তখন কথা বললেন। যেন অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে রেখেছেন এমনইভাবে বললেন, 'প্রিয়দম্বা, পিউকে নিয়ে এসেছি, সে দিন-কতক তোমার কাছে থাকবে।'

এই কথা শুনে আমার অবস্থা কী হল তা আমি বোঝাতে পারব না, শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—'পিউ আমার কাছে থাকবে!'

'হ্যাঁ। আমি—'

শক্রো আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বলল, 'আগে ঘরে এসে বসুন। এই বুঝি পিউ? ওমা, এ তো মেয়ে নয়, এ যে চাঁদের কোণা!' এই বলে পিউকে কলাবতীর কোল থেকে কেড়ে নিল।

শঙ্খনাথবাবু ঘরে এসে বসলেন,—'আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। পিউকে তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি ছাড়া আর-কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।'

আমরা দেয়ালে-আঁকা ছবির মত দাঁড়িয়ে রইলুম। শেষে বললুম, 'কিন্তু—কিন্তু—হঠাৎ—'

তিনি পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন, বললেন, 'এই টাকা রইল, যা দরকার হয় খরচ কোরো। কলাবতীকে এখানে রাখলে ভাল হত; কিন্তু ওর নিজের বাচ্চা আছে, তাকে ছেড়ে এখানে থাকতে পারবে না। ও দু বেলা এসে পিউকে খাইয়ে যাবে।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কতদিনের জন্যে যাচ্ছেন?'

'কিছু ঠিক নেই। দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই ফিরব বোধ হয়।'

তিনি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন দেখে আমার আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল। বললুম, 'কী হয়েছে আমি জানতে চাই।'

এতক্ষণ তিনি সংযতভাবে কথা বল-ছিলেন, এবার একেবারে হুঙ্কার ছেড়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। শক্রো তাই দেখে পিউকে নিয়ে ঘর ছেড়ে পালাল, কলাবতী তার পিছু পিছু গেল। শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'কী হয়েছে! যা হবার তাই হয়েছে। সলিলা পালিয়েছে। ওই শালা লট্‌পট্ সিংয়ের সঙ্গে পালিয়েছে। আমাকে মিছে কথা বলেছিল, বাপ আসেনি, কেউ আসেনি। সেই রাত্রেই পালিয়েছে।'

মনটা যেন অসাড় হয়ে গেল। সেই রাত্রেই সলিলা আমার চোখের সামনে স্বামীকে ছেড়ে আর-একজনের সঙ্গে চলে গেছে। কিন্তু—

প্রশ্ন করলুম, 'আপনি কী করে জানলেন যে ওই লোকটার সঙ্গেই পালিয়েছে?'

বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি। ডাক্তার মন্মথ কর কাল রাত্রে টেলিফোন করেছিল—সে দেখেছে হাওড়া স্টেশনে সলিলা আর লেফটেন্যান্ট লট্‌পট্ সিং একসঙ্গে ট্রেনে উঠেছে।'

এখানেও মন্মথ কর! পরের জীবনের গুপ্ত রহস্য খুঁজে বেড়ানই বোধ হয় ওর কাজ।

'আমি ভেবেছিলাম সলিলা ঝগড়াঝাঁটি করে বাপের কাছে চলে গেছে। ইচ্ছে করেই খোঁজ নিইনি, আসবার হয় আপনি আসবে। এখন দেখছি বাপ নয়, নাগরের সঙ্গে পালিয়েছে। শুধু-হাতে যায়নি, নিজের গয়নাগাটি যা ছিল সব নিয়ে গেছে।—যাকগে, চুলোয় যাক গয়না। আমি চললুম। পিউকে দেখো।'

তিনি দোরের দিকে চললেন। আমার মাথার মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে গেল, ছুটে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালুম—'সলিলা পালিয়েছে, কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়? সলিলাকে ফিরিয়ে আনতে? তাকে ফিরিয়ে এনে আবার ঘরকন্না করবে?'

তিনি গর্জে উঠলেন, 'না, ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি না। সে আমার মুখে চুনকালি দিয়েছে, তারই জবাব দিতে যাচ্ছি।'

'জবাব! কী জবাব দেবে তুমি?'

'এই যে জবাব!' এই বলে পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে দেখালেন। পিস্তল আগে কখনও দেখিনি, সিনেমায় দেখে তার চেহারা জানা ছিল। কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'খুন করবে?'

দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'কুকুরের মত গুলি করে মারব জানোয়ার দুটোকে।'

'কিন্তু—কিন্তু যদি ধরা পড়?'

'ধরা পড়ি, ফাঁসি যাব।'

'না না, আমি তোমাকে যেতে দেব না—'

তারপর মুহূর্তের জন্যে বোধ হয় জ্ঞান ছিল না, যখন জ্ঞান হল, দেখি সিঁড়ির দরজা ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, উনি চলে গেছেন।

৮ আশ্বিন।

তিন হপ্তা হল লোকটা চলে গেছে। আর কোনও খবর নেই।

পিউ আমার কাছে আছে। পিউকে না পেলে বোধ হয় মরে যেতুম। ও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

কাজকর্ম মাথায় উঠেছে। কাজের ডাক যখন আসে তখন বলি, আমার সময় নেই, অন্য কাজ আছে। পিউ এখন আমার একমাত্র কাজ। ওর পিতৃদেব এক হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন পিউয়ের খরচ চালাবার জন্যে। সে টাকা আমি পিউয়ের নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছি। পিউয়ের খরচ চালাবার ক্ষমতা আমার আছে।

কী মেয়ে পিউ! একবার কাঁদল না, একবার বলল না 'বাড়ি যাব'। যেন এই বাসাটাই তার চিরদিনের ঘরবাড়ি; আমি তার চিরকালের আপনজন। জানি না, হয়ত আগের জন্মে ওকে পেটে ধরেছিলুম।

দম্মা দম্মা দম্মা—সারাক্ষণ খালি দম্মা। পুতুল নিয়ে খেলা করছে, হঠাৎ ছুটে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল—'দম্মা!' কোলের মধ্যে কিছুক্ষণ মুখ গুঁজে থেকে, ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে আবার গিয়ে খেলা করতে লাগল। আমি রাগ দেখিয়ে বলি, 'তুই আমাকে দম্মা বলবি কেন?'

ঘাড় হেলিয়ে মিটিমিটি হেসে তাকায়, বলে, 'উঁ!'

'প্রিয়ংবদা বলতে পারিস না?'

আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে,—'পিও 'দম্মা?'

'তবে রে!' চড় তুলে ছুটে যাই, সে খিলখিল করে হেসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে। দুষ্টু কি কম?

চুপিচুপি জিগ্যেস করি, 'হ্যাঁরে, তোর মা কোথায়?'

'মা নেই-নেই।' বলে আবার খেলা শুরু করে। মা সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ নেই; মাকে ও চেনে না।

ওকে মায়ের কথা একেবারে ভুলিয়ে দিতে হবে। বড় হয়ে যেন জানতে না পারে, ওর মা কুলত্যাগিনী। কিন্তু কী করে ভোলানো যায়? একমাত্র উপায়, ও যদি আর-কাউকে মা বলে চিনতে শেখে। একদিন শুক্লা আর জামাইবাবুর সামনে কথা উঠেছিল, জামাইবাবু গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, 'সখি, তুমি এক কাজ কর। ওকে শেখাও তোমাকে মা বলতে, তাহলে সব গোল মিটে যাবে।' ও'র কথা শুনে চুপিচুপি উঠে পালিয়ে এসে-ছিলুম। উনি সব জানেন, শুক্লা যদি নাও বলে থাকে, উনি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু ও আমি পারব না, মনে যাই থাকুক।

রাত্রে পিউকে আমি নিজের কাছে নিয়ে শুই। শোবার ঘরে একটা নাইট-ল্যাম্প লাগিয়েছি, সারারাত সেটা জ্বলে। রাত্তিরে দু-তিনবার পিউয়ের ঘুম ভাঙে, ঘর অন্ধকার দেখলে ভয় পায়। ওকে রাত্তিরে কোলের কাছে নিয়ে যখন শুই, কত কথা মনে আসে। একদিন ভেবেছিলুম, পরের সোনা কানে দেব না, কিন্তু এখন? সেই সোনা শিকল হয়ে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরেছে, কিন্তু কই, ছাড়াবার চেষ্টা ত করছি না!...চেষ্টা করব কোত্থেকে? একটা দুর্দান্ত বর্বর যে আমার মাথা খেয়ে দিয়ে চলে গেছে। আমার লজ্জা নেই, ঘেন্না নেই, আত্মসম্মান নেই, কিচ্ছু নেই—

ওর কথা আমি ভাবি না, ভাবতে চাই না; জোর করে ওর চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখি। কিন্তু গভীর রাত্রে যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন ঝাঁকে ঝাঁকে দুশ্চিন্তা এসে মনকে জুড়ে বসে। কোথায় চলে গেল মানুষটা! সারা ভারতবর্ষ একটা অপদার্থ স্ত্রীলোকের পিছনে পিস্তল নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে! ধরতে পারবে কি? যদি ধরতে পারে খুন না করে ছাড়বে না। তারপর? খুন করে পুলিসের হাত এড়ানো কি সহজ? ধরা পড়ে যাবে; হয়ত খুন করে নিজেই গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা দেবে। তারপর—আদালতে খুনের বিচার! আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। পিউকে বুকে আঁকড়ে চোখ বুজে পড়ে থাকি।

আগে আমার খবরের কাগজ পড়া অভ্যেস ছিল না, আজকাল রোজ পড়ি। ভয় করে, বুক দুরদুর করে, তবু না পড়ে পারি না। হয়ত কাগজ খুলে দেখব, অমুক তার পলাতকা স্ত্রীকে খুন করেছে। ভগবানের দয়ায় এখনও সে-রকম খবর চোখে পড়েনি। যদি খুঁজে না পায়, যদি হতাশ হয়ে ফিরে আসে, বেশ হয়। পিউকে এত ভালবাসে তার কাছে ফিরে আসতে কি মন চায় না?

পিউ কিন্তু এখন আমার হয়ে গেছে। এখন যদি ওর বাপ এসে মেয়ে ফেরত চায়, বলব, দেব না মেয়ে, যাও তুমি বাউণ্ডুলের মতন বউ খুঁজে বেড়াওগে। পিউকে আমি ছাড়ব না। পিউও আমাকে ছেড়ে কক্ষনো বাপের কাছে যেতে চাইবে না।

কিন্তু—তা কি পারব? ও এসে যদি হাত পেতে দাঁড়ায়, আমি 'না' বলতে পারব কি? হা ভগবান, এ তুমি আমার কী করলে? ও একটা নেকড়ে বাঘ, একটা অজগর সাপ; তোমাকে 'না' বলবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমাকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেল, নিশ্চিন্দি হই।...

কলাবতী রোজ সকাল-সন্ধ্যে আসে। শিউ-সেবক তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে, আবার পিউয়ের খাওয়া হলে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। সন্ধ্যেবেলা কলাবতী বেশীক্ষণ থাকে না, পিউ ঘুমিয়ে পড়লেই চলে যায়। কিন্তু ভোরবেলা যখন আসে, পিউকে খাইয়ে দুদণ্ড পা ছড়িয়ে বসে গল্প করে। আমি তাকে চা জলখাবার দিই, সে তাই খেতে খেতে বাঁকা বাঁকা হিন্দীতে কথা বলে।

ওদের দেশ ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিমে। ভারত যখন ভাগ হল তখন ওরা পড়ে গেল পাকিস্তানে। সেই মারামারি কাটাকাটি নিষ্ঠুর পাশবিকতার মধ্যে থেকে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ওরা নিঃস্ব অবস্থায় ভারতবর্ষে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখানে এসেও ওদের দুর্দশা ঘুচল না। খাদ্য নেই, মাথা গোঁজবার জায়গা নেই; মীরাটের রাস্তায় রাস্তায় ওরা কেঁদে বেড়াচ্ছিল। সেই সময় শঙ্খনাথবাবু কী কাজে মীরাটে ছিলেন, ওরা তাঁর নজরে পড়ে যায়। তিনি ওদের কলকাতায় নিয়ে আসেন। সেই থেকে ওরা ওঁর কাছে আছে। উনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ মহাদেব।

মহাদেবের মহাদেবীর প্রতি কিন্তু কলা-বতীর মোটেই ভক্তি নেই। ওদের চোখের সামনেই সলিলা বিয়ে হয়ে এসেছে। প্রথমে সলিলার রূপ দেখে ওরা মুগ্ধ হয়েছিল, তারপর যতই সলিলার গুণ প্রকাশ হতে লাগল, ততই ওদের ভক্তি চটে যেতে লাগল। পিউ জন্মাবার পর ওদের মন সলিলার ওপর একেবারে বিষিয়ে উঠল; পিউকে সলিলা দেখে না, নিজের নাচ গান আমোদ নিয়ে মত্ত থাকে। কলাবতী আমাকে বলল, 'মাজী, "বহু"র রূপ আছে বটে, কিন্তু সে ভাল মেয়ে নয়; আমার বাবুজীর উপযুক্ত "বহু" নয়। ছোট ঘরের মেয়ে। ভাল ঘরের মেয়ে কি তয়ফাওয়ালীর মত নেচে বেড়ায়? ছি-ছি-ছি! ও চলে গেছে ভালই হয়েছে। ও-রকম মেয়ে কখনও ঘরে থাকে না।' এখন ভগবানের কাছে মানছি, আমার বাবুজী যেন ঘরে ফিরে আসেন, একটি ভদ্রঘরের মেয়ে বিয়ে করে শান্তিতে থাকেন।'

কলাবতী রোজ সকালে পিউয়ের ঘুম ভাঙবার আগেই এসে হাজির হয়। একদিন বেচারী আসতে পারেনি। সে কী কাণ্ড! সকালবেলা চোখ চেয়েই পিউ বলল, 'কলা খাব।' কিন্তু কোথায় কলা! তাকে ভোলা-বার চেষ্টা করলুম, বললুম,—'আজ কলা নেই-নেই। আজ তুমি বোতলে করে দুধু খাবে। কেমন? লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে—'

কে কার কথা শোনে? পিউ বিছানায় শুয়ে শুয়েই কান্না শুরু করল,—'কলা খাব।' সে সহজে কাঁদে না, কিন্তু ঠিক সময়ে 'কলা' না পেলে রক্ষে নেই।

তার কান্না শুনে শুক্লা দোরের কাছে এসে দাঁড়াল,—'পিউ-মেয়ে কাঁদে কেন?'

'কলাবতী আসেনি, তাই কাঁদছে।' আমি পিউয়ের পাশে শুয়ে তাকে আদর করে

বললুম, ছি, কাঁদতে নেই। তুমি এখন বড় হয়েছ, কাঁদলে লোকে নিন্দে করবে। বলবে, —পিউ দুষ্টু মেয়ে, পিউ কথা শোনে না। আমি এক্ষুনি তোমার জন্যে দুধ আনছি—'

পিউ কান্না থামিয়ে বিছানায় উঠে বসল, একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইল; যেন নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে। তারপর 'দুম্মা খাবো' বলে আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার বুকের মধ্যে মুন্ডু গুঁজে দিলে। রাক্কুসী!

কী করি আমি তখন! দিশেহারা হয়ে শুক্লার পানে তাকালুম। মুখপুড়ী আমার দশা দেখে মুখে আঁচল গুঁজে হাসছে।

পিউ কিন্তু ভারী ঠকে গিয়েছিল সেদিন।

শুক্লা পিউকে ভালবাসে। সেই প্রথম দিন ওকে কোলে নিয়ে আদর করেছিল, তারপর থেকে কিন্তু বেশী কাছে আসে না। যখন বাইরে যায় ওর জন্যে কত রকম খেলনা কিনে নিয়ে আসে; কিন্তু নিজে দূরে দূরে থাকে। আমি তা লক্ষ্য করেছিলুম; একদিন জিগ্যেস করলুম, তখন সে ম্লানমুখে বলল, 'না ভাই, আমি ওকে ছোঁব না। জানিস ত আমার পেটে কী প্রচণ্ড ক্ষিদে। পিউকে ছুঁলে ওর যদি অনিষ্ট হয়! যদি নজর লাগে!'

সত্যি ওদের জীবন কেমন যেন দরকচা-পড়া হয়ে আছে। সন্তানের জন্যে দুজনেই পাগল, কিন্তু উপায় নেই। জামাইবাবুর স্ত্রী হাসপাতালে আছেন; জলের মতন টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু তিনি মরবেনও না, সেরেও উঠবেন না। কতদিন এইভাবে চলবে কেউ বলতে পারে না। আমার এক-এক সময় অসহ্য মনে হয়, ইচ্ছে হয় হাসপাতালে গিয়ে মহিলাটির গলা টিপে দিই। কিন্তু জামাইবাবুর ধৈর্য আছে বলতে হবে। হাসি-মুখে কর্তব্য করে যাচ্ছেন। ওঁর প্রাণের ব্যথা শুক্লা জানে আর আমি জানি।

শুক্লা মাঝে মাঝে জামাইবাবুর বাড়িতে যায়, ঘরকন্না তদারক করে আসে। আমার সেই প্রথম দিনের পর আর যাওয়া হয়নি। শুনেছি, বাড়ির এখন ছিরি ফিরেছে। কিন্তু ছিরি ফিরলে কী হবে, সবই ঝি-চাকরের হাতে। জামাইবাবু একলা মানুষ, বেশীর ভাগ সময় বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়। শুক্লা ত সেখানে গিয়ে থাকতে পারে না। জামাইবাবু কাশী থেকে মাকে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, কাশী ছাড়তে চান না। বুড়ী ঝিটাও কয়েক বছর আগে মরে গেছে।

এদিকে পুজো এসে পড়ল। এখনও পুজোর বাজার হয়নি। একদিন কলাবতীকে পিউয়ের কাছে বসিয়ে আমি আর শুক্লা যাব বাজার করতে। শুক্লা কেবল একটা শাড়ি কিনবে; আমিও নিজের জন্যে বিশেষ কিছু কিনব না, কিন্তু পিউয়ের জন্যে জুতো জামা সব কিনব। ভাবছি ওর শীতের পোশাকও এই সময় কিছু কিনে রাখব; এক সেট ভাল উলের পোশাক। কলাবতীর জন্যেও একখানা শাড়ি কিনতে হবে। ওর বাবুজী বাড়ি নেই, পুজোর সময় ও যদি নতুন শাড়ি না পায়, ওর মনে দুঃখ হবে।

বাবুজী যে কবে ফিরবেন তা বাবুজীই জানেন।

৩ কার্তিক

'দরশ বিনু দুখন লাগে নয়ন'—শুক্লা নিজের ঘরে অলস গলায় মীরার ভজন গাইছে।

ও কেন এ গান গায়? ওর ত দরশ পাবার কোনও অসুবিধে নেই। ও কেন বিরহের গান গায়?

রাজবধূ মীরা। গিরিধরকে কী ভালই বেসেছিল! কিছু চায়নি সে গিরিধরের কাছে। বলেছিল—গিরিধর যদি আমাকে বিক্রি করে দেয় আমি বিক্রি হয়ে যাব। হয়ত ভগবানকেই এত ভালবাসা যায়; মানুষকে কি মানুষ এত ভালবাসতে পারে? মানুষকে মানুষ ভালবাসে রক্তমাংস দিয়ে, যেমন দিতে চায় তেমনই পেতে চায়। ঠাকুর, তোমাকে মীরার মত ভালবাসার শক্তি আমার নেই। আমি একটা মানুষকে ভালবেসেছি, রক্তমাংস দিয়ে ভালবেসেছি। তোমার কাছে সে ভালবাসার কি কোন দাম নেই?

পুজো এল, চলে গেল। মহাষ্টমীর দিন পিউকে সাজিয়ে গুজিয়ে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম, ঠাকুর দেখে কী খুশী! তাকে বললুম, 'পিউ, হাত-জোড় করে ঠাকুরকে প্রণাম কর; বল—ঠাকুর, আমাদের সকলের ভাল কর।' সে কপালে হাত ঠেকিয়ে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করল। বিজবিজ করে কী বলল তা কিন্তু বোঝা গেল না। ঠাকুর হয়তো বুঝেছেন।

কার্তিক মাস আরম্ভ হয়ে গেছে। দেড় মাস হয়ে গেল, একটা খবর নেই। কোথায় গেছেন, কী করছেন, কিছু জানবার উপায় নেই। কাউকে জিগ্যেস করবার নেই। বেঁচে আছেন ত?

ভাবতে পারি না, মাথা গোলমাল হয়ে যায়। রাত্রে পিউকে বুকের কাছে নিয়ে কাঁদি। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, কাঁদব না? কাঁদবার জন্যেই ত জন্ম।

৭ কার্তিক

শেষরাত্রি থেকে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আশ্বিনে ঝড়বৃষ্টি হয়, এবার কার্তিক মাসে হল। অকালের বাদল। আমার কপালে কী আছে জানি না।

দুর্যোগের জন্যে সকালে কলাবতী আসতে পারেনি। পিউ ঘুম ভেঙে হাঙ্গামা শুরু করেছিল, অতি কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করেছি। টিনের দুধ খেয়েছে; কিন্তু গাল ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ফোলাচ্ছে। কী যে করি ওকে নিয়ে!...

দুপুরবেলা পিউ ঘুমুলে ডায়েরি লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভাল লাগল না। বাইরে ঝড় থেমেছে, রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। মনটা উদাস হয়ে গেল। পিউয়ের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম; ঘুম ভেঙে গেল শুক্লার গলার আওয়াজে। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে—'আসুন আসুন—কেমন আছেন?'

তারপরই মোটা গলার আওয়াজ—'প্রিয়দম্বা কোথায়? পিউ কোথায়?'

আমার শরীর নিথর হয়ে গেল; তারপর থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করল। কিছুতেই কাঁপুনি থামাতে পারি না; যেন ম্যালেরিয়ার জ্বর আসছে। পিউ আগেই জেগে উঠেছিল, বিছানায় বসে পুতুল নিয়ে খেলা করছিল। সে ঘাড় হেলিয়ে শুনছে, বাপের গলা চিনতে পেরেছে।

শুক্লা ছুটে ঘরে ঢুকল, আমার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল, 'এই প্রিয়া, শিগ্গির ওঠ। শঙ্খনাথবাবু এসেছেন।' বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

দশ মিনিট পরে আমি যখন পিউকে কোলে নিয়ে বাইরের ঘরে গেলুম তখন শরীরের কাঁপুনি থেমেছে, মনও শক্ত করেছি। কিছুতেই হৃদয়াবেগ প্রকাশ করা হবে না, সহজভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষ যেমন কথা বলে তেমনই কথা বলব।

তবু তাঁকে দেখে বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। রোগা হয়ে গেছেন, চোখের কোলে কালি; আগুনে-ঝলসানো চেহারা। বসে ছিলেন, আমাদের দেখে উঠে এসে পিউয়ের দিকে হাত বাড়ালেন। পিউ একটু ইতস্তত করে তাঁর কোলে গেল, আবার তখনই আমার কোলে ফিরে এল। কারুর মুখে কথা নেই।

কলাবতীকে উনি সঙ্গে এনেছেন, সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল; এখন এগিয়ে এসে আমার কোল থেকে পিউকে নিয়ে চুপি চুপি বলল, 'চল পিউরানি, আমরা খেলা করি গিয়ে।' আমাকে বলল, 'মাজী, পিউকে ফুটপাথে নিয়ে যাই? বিষ্টি থেমেছে।'

'যাও।'

সে পিউকে নিয়ে চলে গেল।

শুক্লা গলা বাড়িয়ে বলল, 'চা করছি। শঙ্খনাথবাবু, চলে যাবেন না।'

উনি গলার মধ্যে সম্মতিসূচক শব্দ করে চেয়ারে চেপে বসলেন। আমি একটু দূরে বসলুম।

দুজনে চুপ করে বসে আছি। উনি কী ভাবছেন উনিই জানেন; আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। কী বলব? এ-রকম অবস্থায় মানুষ সহজভাবে কোন্ কথা বলে?

শেষ পর্যন্ত উনি প্রথম কথা কইলেন।
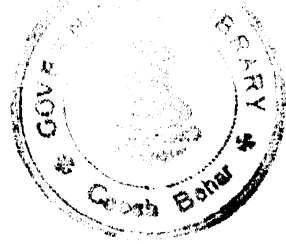
আমার দিকে মুখ না তুলে বললেন, সলিলা মরে গেছে।

আমার পানে চোখ না তুলেই বললেন, সলিলা মরে গেছে।'

মরে গেছে! বিদ্যুতের মতন সলিলার চেহারা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। এত রূপ, এমন যৌবন—মরে গেছে! তাহলে উনি তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন! তাহলে—!

তারপর তিনি এলোমেলো কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কখনও দুটো কথা বলে চুপ করে বসে থাকেন। কখনও গড়গড় করে খুব খানিকটা কথা বলেন। গলার স্বর কখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়, আবার কিছুক্ষণের জন্যে জোরালো হয়ে ওঠে। আমি আচ্ছন্নের মতন বসে শুনছি। শুনতে শুনতে কখ তাঁর কাছে গিয়ে বসেছি জানতে পারিনি বাইরে বৃষ্টি থেমেছে, পশ্চিমের আকাশে মেঘের গায়ে আলতাপাটি শিমের রঙ ধরেছে ঘরের মধ্যে বেশী আলো নেই। আমি যেন ছেলেমানুষের মতন বসে রোমাঞ্চকর গল্প শুনছি।—

শঙ্খনাথবাবু যখন জানতে পারলেন যে সলিলা লেফটেনেন্ট লজপৎ সিংয়ের সঙ্গে পালিয়েছে তখনই তিনি তার বাপ কর্নেল হরবংশ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। হরবংশ সিংয়ের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ; তাগড়া চেহারা, অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক। শঙ্খনাথবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লজপৎ সিং কোথায়?'

হরবংশ সিং শঙ্খনাথবাবুকে চিনত, আগে দু-একবার দেখেছে; কিন্তু এখন চিনতে পারল না। বলল, 'হু আর হউ? কী চাও?'

শঙ্খনাথবাবু বললেন, 'তোমার ব্যাটা লজপৎ সিংকে চাই। কোথায় সে?'

হরবংশ সিং চোখ রাঙিয়ে এগিয়ে এল, বলল, 'সে খবরে তোমার দরকার কী? মিলিটারী গুপ্ত কথা জানতে এসেছ? যাও —গেট আউট।'

শঙ্খনাথবাবু তার গালে একটি চড় মারলেন। সে মাটিতে পড়ে গেল, কিন্তু চেঁচামেচি করল না। একটা আর্দালি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, বোধ হয় লজপৎ সিংয়ের ব্যাপার জানত; সে ছুটে এসে শঙ্খনাথবাবুকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল, রাস্তা পার করে দিয়ে খাটো গলায় বলল, 'বাবুজী এখানে কি জন্যে এসেছ? দিল্লি যাও।'

পরদিন সকালে পিউকে আমার কাছে রেখে সন্ধ্যের গাড়িতে তিনি দিল্লি যাত্রা করলেন। প্লেনে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্লেনের টিকিট পেলেন না।

ট্রেনের কামরায় একটি বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনিও দিল্লি যাচ্ছেন, মিলিটারী অফিসার, মেজর হরিদাস মৈত্র, দিল্লিতে পোস্টেড, ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলেন, আবার কাজে জয়েন করতে যাচ্ছেন। কথায় কথায় শঙ্খনাথবাবু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, লেফটেনেন্ট লজপৎ সিংকে তিনি চেনেন কি না! মেজর মৈত্র লজপৎ সিংকে চেনেন না, তার বাপ হরবংশ সিংয়ের নাম জানা থাকলেও পরিচয় নেই। আর্মিতে হাজার হাজার অফিসার আছে, কে কাকে চেনে?

পরদিন সন্ধ্যেবেলা নয়াদিল্লি স্টেশনে পৌঁছে শঙ্খনাথবাবু মেজর মৈত্রকে বললেন, 'আপনাদের মিলিটারী মহলে খোঁজ নিলে লজপৎ সিংয়ের খবর পাওয়া যাবে কি?'

মেজর মৈত্র বললেন, 'আপনি এক [illegible] করুন। আমার ঠিকানা দিচ্ছি, পরশু আমার সঙ্গে দেখা করবেন। ইতিমধ্যে আমি খবর সংগ্রহ করে রাখব।'

তিনি ঠিকানা দিয়ে চলে গেলেন। শঙ্খনাথবাবু একটা হোটেলে উঠলেন। সেই রাত্রেই তিনি অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। কাছেপিঠে কয়েকটি হোটেল ছিল, সেখানে খোঁজ নিলেন। পিস্তল তাঁর পকেটে আছে। কিন্তু সন্দেহজনক কাউকে পেলেন না।

পরদিন সকাল থেকে রীতিমত তল্লাশ শুরু হল। দিল্লিতে অসংখ্য হোটেল; নয়াদিল্লির অশোক হোটেল থেকে পুরনো-দিল্লির মোসাফিরখানা পর্যন্ত নানা শ্রেণীর হোটেল আছে। শঙ্খনাথবাবু পিস্তল পকেটে নিয়ে একটির পর একটি হোটেল তল্লাশ করে বেড়াতে লাগলেন। কি-

কোথাও আশাজনক কোন খবর পেলেন না। একটা হোটেলে গিয়ে শুনলেন, এক জোড়া স্ত্রী পুরুষ কয়েকদিন থেকে সেখানে আছে; তারা বাইরে বেশী বেরোয় না, ঘরের মধ্যেই থাকে। তাদের ভাষা খুব পরিষ্কার নয়, বাঙালী কিংবা মাদ্রাজী হতে পারে। বর্ণনা শুনে শঙ্খনাথবাবুর সন্দেহ হল এরাই সলিলা আর লজপৎ সিং। তিনি ম্যানেজারের কাছ থেকে ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

তিনতলার ওপর ঘর। শঙ্খনাথবাবু এক হাতে পকেটের পিস্তল চেপে ধরে অন্য হাতে দরজায় টোকো দিলেন। দরজা খুলে দাঁড়াল ড্রেসিং গাউন পরা এক ছোকরা, তার পিছনে একটি তরুণী। সলিলা আর লজপৎ সিং নয়। দুজনেই বাঙালী; নতুন বিয়ে হয়েছে, রাজধানীতে মধুচন্দ্র যাপন করতে এসেছে। পরস্পরের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে, বাইরে বেরোয় না। শঙ্খনাথবাবু মাফ চেয়ে চলে আসছিলেন, কিন্তু ওরা ছাড়ল না। অনেক-দিন তারা বাঙালীর সঙ্গে কথা বলেনি; তারা শঙ্খনাথবাবুকে ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক গল্প করল, চা খাওয়াল। তারপর 'আবার আসবেন' বলে ছেড়ে দিল।

সমস্ত দিন খোঁজাখুঁজির পর রাত্রি দশটার সময় শঙ্খনাথবাবু নিজের হোটেলে ফিরে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে ধোঁকা লাগল: ওরা যদি হোটেলে না উঠে থাকে? যদি কোন বন্ধুর বাসায় উঠে থাকে? কিন্তু শঙ্খনাথবাবু সহজে হতাশ হবার লোক নন; তিনি প্রথমে দিল্লির সমস্ত হোটেল দেখবেন, এখনও অনেক হোটেল বাকী আছে। তারপর অন্য রাস্তা ধরবেন। ভারতবর্ষ তোলপাড় করে ফেলবেন; যতক্ষণ পলাতকদের ধরতে না পারবেন ততক্ষণ নিরস্ত হবেন না।—

শুক্লা এই সময় চা আর জল খাবার এনে টেবিলে রাখল; নিজেও বসল। শঙ্খনাথবাবু কিছুই লক্ষ্য করলেন না, আপন মনে ছাড়াছাড়া ভাবে গল্প বলে যেতে লাগলেন।

—পরদিন তিনি মেজর মৈত্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মেজর মৈত্র বললেন, 'হেড কোয়ার্টার থেকে খবর যোগাড় করেছি। লেফটেনেন্ট লজপৎ সিং কলকাতায় পোস্টেড ছিল, দশ দিন আগে হঠাৎ কমিশনে রিজাইন করেছে। ওরা জলন্ধরের লোক। ইস্তফা দিয়ে হয়ত দেশে ফিরে গেছে।'

'আর কোনও খবর নেই?'

'না।'

সেখান থেকে শঙ্খনাথবাবু অশোক হোটেলে গেলেন। বিরাট হোটেল। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হল না, কিন্তু ম্যানেজারের অসংখ্য সহকারীর মধ্যে একজন বাঙালী যুবক ছিল, শঙ্খনাথবাবু তাকে ধরলেন। বর্ণনা শুনে যুবক বলল, 'হপ্তাখানেক আগে এই রকম একটি দম্পতি এসেছিল। মহিলাটি অপূর্ব সুন্দরী: বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তাঁরা দু রাত্রি ছিল, তারপর চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে বলতে পারেন?'

যুবক একটা বাঁধানো খাতা খুলে দেখল, বলল, 'এই যে, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এল সিং। না, ঠিকানা রেখে যায়নি। কিন্তু—দাঁড়ান।' যুবক খাতা বন্ধ করে খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইল, তারপর বলল, 'মনে পড়েছে। তারা বম্বেতে তাজমহল হোটেলে স্যুট রিজার্ভ করবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছিল।'

সেই রাত্রেই শঙ্খনাথবাবু প্লেনে বোম্বাই যাত্রা করলেন।

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ তাজমহল হোটেলে পলাতকদের খোঁজ পাওয়া গেল। তারা এসে দু রাত্রি ছিল, তারপর চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না।

শঙ্খনাথবাবু একটা সূত্র পেয়েছিলেন, আবার তা হারিয়ে গেল। বম্বেতে দু দিন খোঁজাখুঁজি করে আবার তিনি দিল্লি ফিরে গেলেন। সেখান থেকে জলন্ধর গেলেন, সেখান থেকে অমৃতসর পাটিয়ালা। কিন্তু কোথাও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

এইভাবে দু হপ্তা কেটে গেল। একদিন শঙ্খনাথবাবুর কী মনে হল, তিনি আগ্রা গেলেন। আগ্রায় তাজমহল দেখলেন, হোটেলগুলোতে অনুসন্ধান করলেন, আগ্রা ফোর্ট, ফতেপুর সিকরিতে ঘুরে বেড়ালেন; কিন্তু কোনই ফল হল না। ওরা যদি এখানে এসেও থাকে, তিনি আসবার আগেই পালিয়েছে। কোথাও তারা দু রাত্রির বেশী থাকে না।

পরদিন সকালে তিনি স্টেশনে গেলেন, এখান থেকে মথুরা যাবেন। ওদের অবশ্য তীর্থস্থানে যাওয়ার সম্ভাবনা কম; কিন্তু তীর্থস্থানে নিত্য অচেনা লোকের ভিড় লেগে থাকে, সেখানে লুকিয়ে থাকার সুবিধে আছে।

টিকিট কিনে তিনি প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেন। কিন্তু তাঁকে মথুরা যেতে হল না, আগ্রার রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মেই তিনি সলিলার দেখা পেলেন।

তখনও ট্রেন আসেনি, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে বেশ একটু উত্তেজনা। যাত্রীরা, কুলিরা, এমন কী স্টেশনের কর্মচারীরাও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পূব দিকে যেখানে রেলের লাইন দূরে চলে গেছে সেই দিকে তাকিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে। শঙ্খনাথবাবু একজন টিকিট-চেকারকে জিগ্যেস করলেন, সে বলল, 'স্টেশন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটি স্ত্রীলোকের লাশ পাওয়া গেছে, তাকেই আনা হচ্ছে। মনে হয় রাত্রে সিগ্ন আপ গাড়ি আগ্রা ছাড়ার পর কেউ তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছে। রাত্রে জানা যায়নি, সকালে গুমটি থেকে খবর এসেছে।'

একটা ট্রলি আসছে দেখা গেল। ক্রমে ট্রলি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। তার ওপর শুয়ে আছে সলিলার দেহ। মুখখানা আশ্চর্য রকম অবিকৃত, কিন্তু দেহ চূর্ণ হয়ে গেছে। সিল্কের শাড়ি রক্তে মাখামাখি, গায়ে একটিও গয়না নেই।

ব্যাপার অনুমান করা শক্ত নয়। লজপৎ সিং সলিলাকে নিয়ে সারা ভারতবর্ষ ছুটো-ছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, প্রেমের নেশাও ছুটে গিয়েছিল। কাল দুপুর-রাত্রে তারা আগ্রা স্টেশনে ট্রেনে উঠেছিল, তারপর লজপৎ সিং সলিলার গায়ের গয়না কেড়ে নিয়ে তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

শঙ্খনাথবাবু কাউকে কিছু বললেন না, লাশ সনাক্ত করলেন না। মথুরার টিকিট বদল করে কলকাতার টিকিট কিনে বাড়ি ফিরে এলেন। লজপৎ সিং সম্বন্ধে তাঁর মন সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছে। সে মরুক বাঁচুক এখন আর কিছু আসে-যায় না।

গল্প শেষ হবার পর আমরা কিছুক্ষণ নিঃঝুম হয়ে বসে রইলুম। তারপর শুক্লা উঠে পেয়ালায় চা ঢেলে ও'র হাতে দিল। তিনি পেয়ালা নিয়ে কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর এক চুমুকে পেয়ালা শেষ করে টেবিলের ওপর রাখলেন। শুক্লা মৃদু স্বরে বলল, 'একটু কিছু মুখে দেবেন না?'

'না।' তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন; এমন ভাবে চারদিকে তাকালেন, যেন কোথায় আছেন ঠাহর করতে পারছেন না।

শুক্লা তাঁর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার চোখ ছলছল করছে, সে গাঢ় স্বরে বলল, 'শঙ্খনাথবাবু, যা হয়ে গেছে তা ভুলে যাবার চেষ্টা করুন। আমরা আপনাকে নিতান্ত আপন জন মনে করি তাই বলতে সাহস করছি। জীবনে অনেক দুঃখ শোক আসে, তাই বলে ভেঙে পড়লে ত চলবে না।'

উনি বললেন, 'কে ভেঙে পড়েছে! আমি?' বলে একটা শুকনো কঠিন হাসি হাসলেন।

শুক্লা বলল, 'কোনও দুঃখই স্থায়ী নয়, অতিবড় শোকও মানুষ ভুলে যায়। সংসার ছাড়া তো আমাদের গতি নেই, তাই ভুলতেই হবে। আপনিও সেই চেষ্টা করুন। অতীতকে ভুলে গিয়ে আবার সংসারের দিকে মন ফিরিয়ে আনুন। আপনার কতই বা বয়স—'

তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'আবার সংসার! কী বলছ তুমি? আর না—আর না। মেয়েমানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আমার জন্মের মত চুকে গেছে।'

শুক্লা থতমত হয়ে বলল, 'কিন্তু পিউয়ের কথাও তো ভাবতে হবে।'

'পিউ!' তিনি চারদিকে চাইলেন,—'পিউ কোথায়? তাকে নিয়ে যাব।'

এই সময় কলাবতী পিউকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

কান্নায় আমার গলা বুজে এসেছিল। বুকের মধ্যে ঝড় বইছিল। আমি ছুটে গিয়ে পিউকে কোলে নিলুম, তাকে বুকে চেপে বললুম, 'না, আমি পিউকে যেতে দেব না। ও এখন আমার। আমি ওকে ছাড়ব না।' এই বলে পিউকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলুম।

বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলুম। পিউও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, সে চুপটি করে শুয়ে রইল।

খানিক পরে চোখ মুছে দেখি, উনি বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখা-চোখি হতেই বললেন, 'প্রিয়ম্বদা, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?' তাঁর কণ্ঠস্বর বড় করুণ, দীনতাভরা।

পিউকে জড়িয়ে ধরে বললুম, 'না, পিউকে আমি দেব না।'

'পিউ তোমার কাছেই থাক্। কিন্তু তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না।' এই বলে খুব আস্তে আস্তে আমার গায়ে হাত রাখলেন।

আমার সমস্ত শরীর শিউরে কেঁপে উঠল। আমি আবার বালিশে মাথা গুঁজে আর্তস্বরে বললুম, 'না না, আমাকে ছুঁয়ো না। তুমি যাও—তুমি চলে যাও।'

তাঁর হাত আমার কাঁধের ওপর থেকে সরে গেল। কিছুক্ষণ পরে চোখ মুছে মুখ তুললুম, দেখি উনি নিঃশব্দে চলে গেছেন।

শুক্লা ঘরে ঢুকল। যেন কিছুই হয়নি এমনই সহজ সুরে বলল, 'শঙ্খনাথবাবু কলাবতীকে নিয়ে চলে গেলেন। রাত হয়ে গেছে, এবার ওঠ। পিউকে খাওয়াতে হবে না?'

পিউ আজ বোতলের দুধ খেতে কোন হাঙ্গামা করল না। তাকে খাইয়ে আবার বিছানায় শুলুম। শুক্লাকে বললুম, 'আমি আজ কিছু খাব না। খিদে নেই।'

শুক্লা মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে চলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, 'উনি কি রাগ করে চলে গেলেন?'

'না—হ্যাঁ—ওই একরকম—' বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল।

পিউ সহজে ঘুমুল না; তারও বোধ হয় ঘুম চটে গেছে। পিটপিট করে তাকিয়ে রইল। আমি তখন তার কানে কানে বললুম, তোর বাবাটা যাচ্ছেতাই, না পিউ?'

পিউ মুখ গম্ভীর করে বলল, 'হুঁ।'

'তোকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি দিইনি, তাই আমাকে বকেছে, মেরেছে।'

পিউ চোখ গোল করে বলল, 'মেরেছে!'

'হ্যাঁ, মেরেছেই ত। মারা আর কাকে-বলে? আয় এবার ঘুমুই।'

কিছুক্ষণের মধ্যে পিউ ঘুমিয়ে পড়ল। আমি সারা রাত চোখ চেয়ে জেগে রইলুম। জেগে জেগে এক সময় মনে হল, পিউ যে মাতৃহীনা হয়েছে একথা কারুর খেয়াল হয়নি। মা-হারা মেয়ে বলে কেউ তার জন্যে দুঃখ করবে না।

২৩ কার্তিক

কার্তিক মাস ফুরিয়ে এল। একটু একটু শীতের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে; ভোর-রাত্রে গায়ে চাদর দিতে হয়।

উনি সেই যে চলে গিয়েছিলেন, আর সাড়াশব্দ নেই। নিশ্চয় রাগ করে আছেন। আমি না-হয় কেউ নয়, আমার ওপর রাগ করতে পারেন। কিন্তু মেয়ে ত নিজের, তার খোঁজ কি একবার নিতে নেই? আমি আর পারি না বাপু। ইচ্ছে করে পিউকে ফেরত দিয়ে আসি, বলি, এই নাও তোমার মেয়ে, আমাকে রেহাই দাও। মেয়েমানুষের সঙ্গে যখন সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছ তখন নিজের মেয়ে নিজে মানুষ কর। আমার কিসের দায়?

শুক্লাও যেন আজকাল কেমন এক রকম হয়ে গেছে। বেচারীকে দোষ দেওয়াও যায় না। একদিকে নিজের কাজ, অন্যদিকে জামাইবাবুর সংসার। সে রোজ সকালে গিয়ে বাড়ি তদারক করে আসে, জামাইবাবুর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। তার ওপর গিন্নী ঠাকরুনের ভাবনা। হাসপাতালে তাঁর মাঝে বেশ বাড়াবাড়ি হয়েছিল, রক্তের চাপ বেড়ে গিয়ে আবার একটা আক্রমণ হব-হব হয়েছিল; কিন্তু সামলে গেছেন। কী দরকার ছিল সামলাবার তা জানি না।

শুক্লা হঠাৎ কিছু না বলে-কয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কোথায় যায়, কী করে, কিছুই জানতে পারি না। জিগ্যেস করলে ভাসা-ভাসা উত্তর দেয়। মাঝে মাঝে জামাই-বাবুর বাড়ি থেকে ফিরতে দেরি করে। প্রশ্ন করি, এত দেরি যে! সে বলে, 'শশী ঝিকে নিয়ে বড় মুশকিল হয়েছে। রোজ বাড়ি থেকে জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে। কী যে করি।' আমি বলি, 'বিয়ে করে ফেল্।' সে জবাব দেয় না, হাসেও না; হতাশ চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এইভাবে দিন কাটছে। সংসারে এত জ্বালা তবু সংসারের জন্যে আমরা পাগল। দূর ছাই, কিছু ভাল লাগে না। পিউ যদি না থাকত, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে যেদিকে দু-চক্ষু যায় চলে যেতুম।

আজ সকালে শুক্লা জামাইবাবুর বাড়ি থেকে ফিরেছে এমন সময় ফোন বেজে উঠল। আমি ফোন ধরলুম। আজ ষোল দিন পরে ও'র গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম—'কে, প্রিয়ম্বদা! কেমন আছ?'

বুজে-যাওয়া গলায় কোনমতে বললুম, 'ভাল।'

'তোমার মেয়ে কেমন আছে?'

'আমার মেয়ে?'

'মানে—পিউ কেমন আছে?'

'ভাল।'

'বেশ বেশ। শুক্লা আছে? তাকে একবার ডেকে দাও।'

শুক্লার হাতে ফোন দিয়ে আমি সরে বসলুম। কী ব্যাপার!...শুক্লা বেশী কথা বলছে না, 'হুঁ' 'হাঁ' দিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবছি—'তোমার মেয়ে কেমন আছে' মানে কী? ঠাট্টা? আমি পিউকে যেতে দিইনি তাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ? তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কী দরকার? জোর করে মেয়েকে কেড়ে নিয়ে গেলেই পারেন। ও'র গায়ে যথেষ্ট জোর আছে, পকেটে পিস্তল আছে। তবে ভয়টা কিসের?...কিন্তু শুক্লার সঙ্গে এত মনের কথা কেন!

'আচ্ছা আসি' বলে শুক্লা ফোন রেখে দিল, আমার পাশে এসে বসল। আমি আগ্রহ দেখালুম না, তখন সে নিজেই বলল, 'শঙ্খ-নাথবাবু আজ বিকেলে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন। পিউয়েরও নেমন্তন্ন।'

চমকে উঠলুম,—'হঠাৎ—কী মতলব?'

সে বলল, 'মতলব আবার কী? উনি নেকড়ে বাঘও নয়; অজগর সাপও নয়। তা তো তুই জানিস। তোর জামাইবাবুকেও নেমন্তন্ন করেছেন।'

'কিন্তু হঠাৎ নেমন্তন্ন কেন?'

'তা কী জানি! আমরা একদিন ওকে খাইয়েছিলুম, হয়ত তারই জবাব দিচ্ছেন।'

'আমি যাব না।'

শুক্লা ভুরু তুলে আমার পানে তাকাল, —'যাবি না!'

'না। তোকে নেমন্তন্ন করেছেন তুই যা। আমি যখন ফোন ধরেছিলুম তখন আমাকে তো কিছু বলেননি। আমি যাব কেন?'

'তোর কি হিংসে হচ্ছে নাকি?'

চোখ ফেটে জল এল। বললুম, 'তোকে হিংসে হচ্ছে না। কিন্তু ও কেন আমাকে কিছু বলল না? আমি যাব না।'

এবার শুক্লা রেগে উঠল, কঠিন সুরে বলল, 'দেখ প্রিয়া, তুই বড় বাড়াবাড়ি করছিস। ভগবানের দান হাত পেতে না নিলে ভগবান হাত গুটিয়ে নেবেন। তখন সারাজন্ম ধরে কাঁদলেও আর পাবি না। মনে রাখিস।'

আমি কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরলুম, বললুম, 'শুক্লা, আমার মাথার ঠিক নেই। তুই তো সব বুঝিস। আমি যাব। তুই যা বলবি তাই করব।'

—আজ এইখানেই ডায়েরি লেখা শেষ করি। দুপুরবেলা পিউ ঘুমিয়েছে, আমি ওই ফাঁকে ডায়েরি লিখছি। কিন্তু মনটা ভারি ছটফট করছে।

বিকেলে পাঁচটার সময় আমরা বেরুব। কী জামা-কাপড় পরব তাই ভাবছি। পিউকে গরম জামা পরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজ

আবার মেঘ করেছে, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে।

২৪ কার্তিক

বুকের মধ্যে অনাহত মৃদঙ্গ বাজছে। কী করে লিখব?

'যখন প্রথম ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করে-ছিলুম, তখন কে জানত, আমার বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন জীবন এমন রঙে রসে ভরে উঠবে! মাত্র তিন মাস কেটেছে, এরই মধ্যে সব বদলে গেল। যেন বিশ্বাস হয় না।

আমার জীবনের দৃশ্য-কাব্য বেশ তোড়-জোড় করে আরম্ভ হয়েছিল, তারপর হঠাৎ যেন ঝপ করে শেষ হয়ে গেল। কিংবা এইটে হয়ত শেষ নয়, নাটকের প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়ল। এর পর আরও অনেক আছে; অনেক দুঃখ সুখ, কান্না হাসি—

আজ আমার শেষ ডায়েরি লেখা, আর লিখব না। যখন লিখতে আরম্ভ করে-ছিলুম, তখন আশ্রয় ছিল না; নিজের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। কিন্তু এখন আর আমার সময় নেই; একদিকে পিউ, অন্যদিকে একটি চাষা মনিষ্যি।...ভাবছি, ডায়েরির এই পাতাগুলো যদি কোন প্রবীণ লেখককে পাঠিয়ে দিই, কেমন হয়? তিনি হয়ত পড়বেন না, ফেলে দেবেন। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি পড়েন! যদি পড়ে তাঁর ভাল লাগে—?

পাঁচটার সময় ট্যাক্সিতে চড়ে বেরুলুম। পিউকে পশমের জামা পশমের টুপি পরিয়ে নিয়েছি। যে-রকম ভিজে ভিজে হাওয়া বইছে, বৃষ্টি নামল বলে।

শুক্লা বেশ সাজগোজ করেছে। পুজোর সময় যে মেহদী রঙের মাদ্রাজী সিল্কের শাড়িটা কিনেছিল সেইটে পরেছে। এই রঙের শাড়িতে ওকে খুব মানায়। আমার কিন্তু সাজগোজ করা হল না, পিউকে সাজাতে সাজাতেই দেরি হয়ে গেল। কী বা হবে সাজগোজ করে। একটা ফিকে নীল রঙের পুরনো জর্জেটের শাড়ি পরেছি। চুলগুলো এলোখোঁপা করে জড়িয়ে নিয়েছি। এই যথেষ্ট।

আমি সাজগোজ করিনি দেখে শুক্লা মুখ টিপে হেসেছে, কিছু বলেনি। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বললুম, 'শুক্লা, ও'র সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে, সত্যি কিনা বল। মিথ্যে বললে অনন্ত নরকে পচে মরবি।'

সে বলল, 'মিথ্যে বলব কোন্ দুঃখে! হয়েছে দেখা।'

'কেন? তোর সঙ্গে ও'র কী দরকার?'

'বলব না।'

'আমার হিংসে হচ্ছে কিন্তু।'

'তুই থাম্। সত্যি হিংসে হলে মুখ ফুটে বলতে পারতিস না।'

'কেন পারব না!' ও না-হয় আমাকে চায় না, তাই বলে হিংসে হবে না!'

শুক্লা জবাব দিল না, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। সন্দেহ হল সে হাসছে।

ট্যাক্সি গিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। গাড়ি-বারান্দার সামনে উনি দাঁড়িয়ে আছেন, এক-পাশে কলাবতী অন্য পাশে শিউসেবক। শিউ-সেবক গাড়ির দরজা খুলে দিতেই কলাবতী পিউকে ছোঁ মেরে নিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

উনি বললেন, 'এস, অন্য অতিথিরা এখনও আসেননি।'

আমার দিকে একবার তাকালেন; যেন একটু অপ্রস্তুত ভাব। তারপর আমাদের ড্রয়িং-রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ও'র চেহারা অনেকটা ভাল, সেই আগুনে-ঝলসানো ভাব আর নেই।

ড্রয়িং-রুমের ভেতরে এর আগে আসিনি; ছবির মত সাজানো। আমি আর শুক্লা একটা সোফায় বসলুম। শুক্লা বলল, 'অন্য অতিথিরা কারা? একজন ত ডক্টর দাস—?'

উনি বললেন, 'দ্বিতীয় ব্যক্তি ডক্টর মন্মথ কর।'

আমরা হকচকিয়ে তাকালুম। মন্মথ করকে আমাদের সঙ্গে নেমন্তন্ন করেছেন! এ কী কাণ্ড!

কিন্তু আর কোনও কথা হবার আগেই বাইরে জামাইবাবুর গাড়ির হর্ন শোনা গেল। উনি বাইরে গেলেন।

আমি আর শুক্লা মুখ-তাকাতাকি করলুম। দুজনের চোখে একই প্রশ্ন—মন্মথ করকে আবার কেন?

ও'রা দুজনে কথা কইতে কইতে ঘরে এলেন। জামাইবাবুর ডাক্তারী পোশাক; আমাদের দেখে কৌতুক-ভরা হাসি হাসলেন, বললেন, 'আমি কিন্তু বেশীক্ষণ থাকব না, চা খেয়েই পালাব। হাসপাতালে কাজ আছে।'

উনি বললেন, 'না ডাক্তারবাবু, আজ আপনাকে একটু থাকতে হবে। মন্মথ করকে ডেকেছি, আপনাদের সামনেই তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।'

জামাইবাবুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, তিনি তীক্ষ্ণ চোখে ও'র পানে তাকিয়ে বললেন, 'মন্মথ কর! তার সঙ্গে কিসের বোঝাপড়া?'

ও'র মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল,—'আছে। পরশু মন্মথ কর এসেছিল।' আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'ওদের দুজনের নামে অকথ্য মিথ্যে কথা বলে গেছে। আপনাকেও বাদ দেয়নি। আমি তখন কিছু বলিনি, কেবল শুনে গেছি। আজ তাকে আসতে বলেছি, আপনাদের তিনজনের সামনে ভাল করে শিক্ষা দেব।'

আমরা কাঠ হয়ে বসে রইলুম। জামাই-বাবুর কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছিল, আস্তে আস্তে তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি একটু হেসে বললেন, 'মন্মথ কর যে সত্যি কথা বলেনি আপনি জানলেন কী করে? আমাদের আপনি কতটুকুই বা জানেন?'

তিনি মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'জানি। আমার অন্তরাত্মা জানে আপনারা খাঁটি মানুষ। আমি মানুষ চিনি। জীবনে মাত্র একবার মোহের নেশায় মানুষ চিনতে ভুল করেছিলুম, গিলটিকে সোনা মনে করেছিলুম। সে ভুল আর দ্বিতীয়বার করব না।'

জামাইবাবু ও'র একটু কাছে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'শুক্লার সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ আপনি জানেন?'

উনি উঁচু গলায় বললেন, 'জানি। শুক্লা নিজেই আমাকে সব বলেছে। আপনি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, ও আপনাকে বিয়ে করেনি। যেদিন ওর মুখে এই কথা শুনে-ছিলাম, ইচ্ছে হয়েছিল, ওকে কাঁধে তুলে নাচি। ডাক্তারবাবু, আমি ভালবাসার কাঙাল, যখন সত্যিকার ভালবাসা দেখতে পাই তখন আমার মাথা ঠিক থাকে না।'

শুক্লার দিকে তাকিয়ে দেখলুম সে রুমালে ঠোঁট চেপে মুখ নিচু করে আছে। জামাই-বাবু কিন্তু হেসে উঠলেন, বললেন, 'ভালই করেছেন ওকে কাঁধে তুলে নাচেননি, তাতে ওর গুমর আরও বেড়ে যেত, হয়ত কোনদিনই আমাকে বিয়ে করত না।—যা হোক, মন্মথ কর আমাদের অনেক অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেছে, কিছুটা কৃতকার্যও হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাকে মারধোর করবেন নাকি?'

উনি চোয়ালের হাড় শক্ত করে বললেন, 'সেটা নির্ভর করবে তার ব্যবহারের ওপর।'

জামাইবাবু একটি নিশ্বাস ফেলে আমার পাশে এসে বসলেন, আমার কানে কানে বললেন, 'সখি, দেখছ কী, একেবারে আস্ত গুণ্ডা।'

মনে মনে বললুম, 'তা কি আমি জানি না! কিন্তু এমন গুণ্ডা পৃথিবীতে কটা আছে!'

এই সময় বাইরে একটা ছোট গাড়ি এসে দাঁড়াল। উনি বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন। আমার বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল।

জামাইবাবু বললেন, 'দেখ, মন্মথ করকে সিধে করা আমাদের কম্ম নয়। যেমন বুনো ওল তেমনই বাঘা তেঁতুল দরকার।'

মন্মথ কর ও'র সঙ্গে ঘরে ঢুকল, তারপর আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মুখ এক মুহূর্তে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

উনি বললেন, 'কী ডাক্তার, এদের চিনতে পার?'

স্মার্ট ডাক্তার মন্মথ করের অবস্থা দেখে কষ্ট হয়; সে থতমত খেয়ে ঠোঁট চেটে বলল,

'আমি—দেখুন—আড়ালে আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই—'

উনি আস্তিন গুটিয়ে হুংকার ছাড়লেন, 'আড়ালে নয়, যা বলবে সকলের সামনে বল। কী বলবার আছে তোমার?'

এক পা পেছিয়ে গিয়ে মন্মথ কর বলল, 'আমি—দেখুন—আমি তো নিজে কিছু দেখিনি, পাঁচজনের মুখে যা শুনেছি—। এসব যে মিথ্যে গুজব তা আমি কী করে জানব?'

ও'র ডান হাতটা মন্মথ করের কাঁধের ওপর পড়ল, আঙুলগুলো চিমটের মতন তার শার্ক-স্কিনের কোট চেপে ধরল; বাঘের মতন চাপা গর্জনে উনি বললেন, 'ডাক্তার, আজ তোমাকে ছেড়ে দিলাম। ফের যদি শুনতে পাই তুমি এদের কুৎসা করেছ, তোমার জিভ উপড়ে নেব। যাও।' উনি তার কাঁধ ছেড়ে দিলেন, ডাক্তার টাউরি খেতে খেতে ঘর থেকে চলে গেল।

মন্মথ কর আমাকে কয়েকবার দুষ্ট মতলবে চায়ের নেমন্তন্ন করেছিল, উনি কি শুক্লার মুখে তাই জানতে পেরে তার জবাব দিলেন? শুক্লা ও'কে আমাদের জীবনের অনেক গোপন কথা বলেছে; কেন বলেছে জানি না, নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে। শুক্লা তো বাইরের লোকের কাছে ঘরের কথা বলার মেয়ে নয়।

মন্মথ করের গাড়ি চলে গেল, আওয়াজ পেলুম। আমার এক পাশে শুক্লা অন্য পাশে জামাইবাবু। গৃহস্বামী দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। কারুর মুখে কথা নেই। ঘর অন্ধকার হয়ে আসছে।

উনি হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলেন, ঘরটা দপ করে হেসে উঠল। হঠাৎ যেন রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্তন হল।

শিউসেবক ঘরে ঢুকল; আমার পিছনে এসে একটু ঝুঁকে খাটো গলায় বলল, 'মাজী, চা আনি?'

আমি চমকে ঘাড় ফেরালুম; শিউসেবক আমার পানেই সসম্ভ্রমে চেয়ে আছে। কিন্তু—চা আনবে কি না একথা শিউসেবক আমাকে জিগ্যেস করছে কেন? কেমন যেন বোকা হয়ে গিয়ে বললুম, 'আন।'

শিউসেবক চলে গেল। আমি জামাইবাবুর দিকে তাকালুম; তিনি ভালমানুষটির মতন চুপ করে বসে আছেন, কিন্তু তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির আভাস লেগে আছে। শুক্লার দিকে চোখ ফেরালুম; পোড়ারমুখী দুষ্টুমি-ভরা চোখ আকাশপানে তুলে বসে আছে। বাড়ির কর্তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি চোখ ফিরিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এদের মনে কী আছে বুঝতে পারছি না; বোধ হচ্ছে যেন সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে।

শিউসেবক এবং আর-একজন চাকর চা

তুমি ওসব কথা ভুলে যাও, আমি তোমাকে ভুলিয়ে দেব।

নিয়ে এল। চায়ের সঙ্গে ট্রে-ভরা দেশী-বিলিতী খাবার; কচুরি সিঙাড়া কেক প্যাটি। চাকরেরা টেবিলের ওপর ট্রে সাজিয়ে রেখে চলে যাবার পর জামাইবাবু বললেন, 'আমাকে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। সখি, আমাকে চা ঢেলে দাও। এবং একটা কচুরি। বেশী কিছু খাব না।'

আমি উঠে গিয়ে টি-পট থেকে চা ঢাললুম। গৃহস্বামী জানলার দিক থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ বললেন, 'সখী! সখী কে?'

জামাইবাবু বললেন, 'প্রিয়ংবদাকে আমি "সখী" বলে ডাকি। আর শুক্লা বলে "প্রিয়া"।'

উনি টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন, হাসিমুখে একবার আমার পানে চেয়ে বললেন, 'তাই নাকি! আমি ওকে প্রিয়দম্বা বলি, কিন্তু নামটা বোধহয় ওর পছন্দ নয়। একদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। তাহলে আমিও কি ওকে সখী বলে ডাকব? কিংবা প্রিয়া?'

আমার কান গরম হয়ে উঠল। জামাইবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'নিজের মনের মতন সবাই করুক নামকরণ, বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার খুড়া রামচরণ। প্রিয়দম্বা আমার ত খুব খারাপ লাগে না; মনে হয় যেন জগদম্বার মাসতুত বোন।'

আমি দুজনকে চা দিলুম, তারপর নিজের আর শুক্লার চা নিয়ে শুক্লার পাশে গিয়ে বসলুম। চা খাওয়া চলতে লাগল। ওদিকে ও'রা দুজনে কী সব গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু করেছেন। শুক্লা বলল, 'খিদে পেয়ে গেছে রে! তোর পায়নি?'

উঠে গিয়ে একটা প্লেটে খাবার ভরে নিয়ে এলুম, দুজনে খেতে লাগলুম। কলাবতী পিউকে কোলে নিয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল; তার মুখে এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত হাসি। বলল, 'পিউরানী খেতে চাইছে।'

পিউ কলাবতীর কোল থেকে পিছলে নেমে পড়ল, আমার কাছে ছুটে এসে প্লেটের দিকে ছোট্ট আঙুল দেখিয়ে বলল, 'উই খাব।'

ওকে ভারী জিনিস খেতে দিই না, কিন্তু আজ আর 'না' বলতে ইচ্ছে হল না। বললুম, 'কী খাবে তুলে নাও।'

পিউ সন্তর্পণে একটি প্যাটি তুলে নিয়ে আমার পানে তাকাল,—'খাই?'

বললুম, 'খাও।'

পিউ তখন প্যাটিতে ছোট্ট কামড় দিয়ে ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'ভাল।'

কলাবতী এতক্ষণ দাঁত বার করে আমার পানে তাকিয়ে ছিল, পিউ তার কাছে ফিরে গেল। দুজনে ঘর থেকে চলে গেল। দোরের কাছ থেকে কলাবতী ঘাড় ফিরিয়ে আর-একবার দাঁত বার করল।

কী হয়েছে এদের? সবাই যেন আমার

সম্বন্ধে একটা গুপ্ত কথা জানতে পেরেছে, কিন্তু বলছে না।

চা খাওয়া শেষ হল।

জামাইবাবু রুমালে মুখ মুছে বললেন, 'আমি তাহলে এবার—'

উনি হাত তুলে বললেম, 'একটু বসুন ডাক্তারবাবু। আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকার আছে।'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম, ও'র মুখে সেই অপ্রস্তুত-ভাব ফিরে এসেছে। উঠে দাঁড়ালেন, গলা ঝাড়া দিলেন, যেন বক্তৃতা দেবার উদ্যোগ করছেন। তারপর ধরা-ধরা গলায় বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনি ওর— মানে—প্রিয়—প্রিয়ংবদার অভিভাবক। তাই আপনার কাছে—ইয়ে—প্রস্তাব করেছি, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।'

আমার অবস্থা বলবার চেষ্টা করব না, চেষ্টা করলেও বলতে পারব না। যখন বাহ্য-জ্ঞান ফিরে এল তখন জামাইবাবু ও'কে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়াচ্ছেন; শুক্লা আমার একটা হাত চেপে ধরেছে। সে কানে কানে বলল, 'চল, আমরা ওপরে যাই।' আমার হাত ধরে টানতে টানতে সে দোরের দিকে চলল।

জামাইবাবু ডেকে বললেন, 'ও কী, চললে কোথায় সখি! প্রস্তাবের উত্তর দিয়ে যাও।'

শুক্লা বলল, 'ও উত্তর দেবে কেন? শংখনাথবাবু তো ওর কাছে প্রস্তাব করেননি। তবে আমি বলতে পারি, সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। আর প্রিয়া।—তুমি যেন পালিও না, আমরা এখনই আসছি।'

ওপরে পিউয়ের নার্সারিতে কেউ নেই, কিন্তু আলো জ্বলছে। শুক্লা আমার গলা জড়িয়ে বলল, 'প্রিয়া! আর হিংসে হচ্ছে না তো?'

শুক্লার কাঁধে মাথা রেখে একটু কাঁদলুম। মনটা হালকা হলে জিগ্যেস করলুম, 'তুই আমার কথা ওকে কী বলেছিস?'

শুক্লা নিরীহভাবে বলল, 'কিছু তো বলিনি।'

'শুক্লা! সত্যি বল, নইলে এমন চিমটি কাটব—'

'না না, বেশী কিছু বলিনি। শুধু বলে-ছিলুম, তুই মরে যাচ্ছিস। পুরুষমানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কি ওরা কিছু দেখতে পায়!'

এমন চিমটি কেটেছি শুক্লাকে, অনেকদিন কালশিটে থাকবে।

নীচে নেমে এসে শুক্লা জামাইবাবুকে বলল, 'চল, তুমি আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে। পিউ আর প্রিয়া পরে যাবে, শংখনাথ-বাবু ওদের পৌঁছে দেবেন।'

ওরা হাসতে হাসতে চলে গেল। আমার একটা নিশ্বাস পড়ল। এত প্রীতি, এত মমতা, এত দরদ ওদের প্রাণে! ভগবান কবে যে ওদের মুক্তি দেবেন!

ওরা চলে যাবার পর উনি ঘরের বড় আলো নিভিয়ে দিয়ে একটা ছোট আলো জ্বেলে দিলেন। গোলাপী প্রভায় ঘরটি স্বপ্নময় হয়ে উঠল।

আমি সোফায় এক কোণে বসে ছিলুম, উনি আমার পাশে এসে বসলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমাকে কী বলে ডাকব আগে ঠিক হোক। প্রিয়দম্বা চলবে না?'

আমার নিশ্বাস ঘন ঘন বইতে আরম্ভ করেছিল, যথাসাধ্য দমন করে বললুম, 'না।'

'তবে—প্রিয়া? সখী?'

আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'আমার মা-বাবা আমাকে বাদল বলে ডাকতেন।'

'বাদল! বাদল!' তিনি নামটা কয়েকবার আবৃত্তি করে বললেন, 'এই ত খাসা নাম। আমিও আজ থেকে তোমাকে "বাদল" বলে ডাকব।'

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। আমার সারা গায়ে যেন অসংখ্য উইপোকা চলে বেড়াচ্ছে। খোঁপাটা হঠাৎ খুলে গিয়ে পিঠে এলিয়ে পড়ল।

উনি বললেন, 'ও কী, তুমি কাঁপছ কেন? ভয় করছে?'

বললুম, 'না।'

'তবে?'

চুপ করে রইলুম

উনি হঠাৎ আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন, 'প্রিয়দম্বা, তুমি আমাকে ভয় কোরো না। আমি বড় অসহায়। আমাকে তুমি নিজের হাতে তুলে নাও। সত্যি আমি চাষা মনিষ্যি, আমাকে তুমি সভ্য করে নাও, ভদ্র করে নাও। একটু স্নেহ একটু ভালবাসা—এর বেশী আর কিছু আমি চাই না।' তাঁর গলা বুজে এল।

আমি কী উত্তর দেব? আমার কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল। তারপর উনি হঠাৎ আরও ব্যগ্র স্বরে বলে উঠলেন, 'তুমি কোন-দিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না?'

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না, ও'র মুখখানা দু হাতে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বললুম, 'তুমি ওসব কথা ভুলে যাও। আমি তোমাকে ভুলিয়ে দেব—'

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

'মম্মা!'

দোরের কাছ থেকে মিহি আওয়াজ পেয়ে দুজনেই মুখ তুললুম। পিউয়ের ছোট্ট চেহারাটি দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; বোধ হয় কলাবতী তাকে দোরের কাছে নামিয়ে দিয়ে সরে গেছে। সে এদিক ওদিক চেয়ে আমার কাছে এল; একবার বাপের দিকে তাকাল, তারপর আমার কোলে মাথা রেখে বলল, 'ঘুম পাচ্ছে।'

আমি পিউকে কোলে নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। পিউ আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুবার উপক্রম করল।

উনি পাশে এসে দাঁড়ালেন, পিঠের ওপর দিয়ে আমাদের দুজনকে বাহু দিয়ে ঘিরে খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'পিউ যেন কোনদিন জানতে না পারে তুমি ওর মা নও।'

না, পিউ জানতে পারবে না। পিউকে জানতে দেব না। কিন্তু—বুকের মধ্যে একবার মুচড়ে উঠল—পিউ কি আমার পেটে জন্মাতে পারত না? জন্মালে কী দোষ হত?

কিন্তু না, এই ভাল। পিউ আমার পেটে জন্মালে এত সুন্দর হত কি?...

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে—রিমঝিম রিমঝিম।

দেওয়াল

বনফুল

টেলিফোনটা বেজে উঠল। বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল শোভনলাল। তার ধারণা হয়েছিল টেলিফোনটাও খারাপ হয়ে গেছে। সে খাটে বসে ছিল। খাট থেকেই শুনতে পাচ্ছিল টেলিফোনটা বাজছে। কে এ সময় টেলিফোন করছে? তার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, ঘরের ভিতর ঢুকতে ভয়ও করছিল। এ সময় কে টেলিফোন করতে পারে? তাকে টেলিফোন করবার মতো কে-ই বা আছে এ শহরে। সুজাতার সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইবার লোভেই সে অনেক খরচ করে ফোনটা নিয়েছে। ওই ফোনেই সুজাতার সঙ্গে সামান্য যা একটু যোগাযোগ হয় ক্কচিৎ। তা-ও সুজাতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কখনও কথা বলে না। সুশোভন ফোন করলে তবে এসে ফোনটা ধরে। যখন কথা বলে, তখন পাশে নাকি তার মা দাঁড়িয়ে থাকে। তবু তার কথা শোনা যায় তো। এইটুকুই শোভনলালের তৃপ্তি। সুজাতার জন্যেই এই বিহারে এসে পড়ে আছে সে। সুজাতার কাছাকাছি আছে এই সান্ত্বনা।

......ফোনটা বেজেই চলেছে।

হঠাৎ শোভনলালের মনে হল, সুজাতা ফোন করছে না কি? কিন্তু সুজাতা তো নিজের থেকে কখনও ফোন করে না। তাছাড়া সে তো এখানে নেই, কাল মুঙ্গেরে গেছে। ফিরেছে কি এর মধ্যে? বলেছিল সাত আট দিন পরে ফিরবে। হয়তো ফিরেছে।

শোভনলাল খাট থেকে উঠে ভিতরে গেল। ভিতরে যেতেই থেমে গেল ফোনটা। তবু তুলে নিল সে রিসিভারটা।

'হ্যালো — কে —'

কোন সাড়া নেই।

'হ্যালো — হ্যালো —'

কোন সাড়া নেই।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আবার খাটে এসে বসল।

সুজাতার কথাই ভাবতে লাগল। ছেলে-

বেলা থেকে সুজাতার সঙ্গে আলাপ। বাল্যকালে একই স্কুলে পড়েছিল দুজনে। একসঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল। তারপর সে কলেজে পড়বার জন্যে কোলকাতা চলে গেল। সুজাতাকে চিঠি লিখত সেখান থেকে। সুজাতা কি সে চিঠিগুলি রেখে দিয়েছে এখনও? ফোনে একদিন বলেছিল পুড়িয়ে দিয়েছি। সুজাতার কয়েকখানা চিঠিও তার কাছে আছে। অতি সংযত সাধারণ চিঠি, কিন্তু তার মধ্যেই, ওই সহজ অনাড়ম্বর কথাগুলোর মধ্যেই শোভনলাল নূতন মানে খুঁজে পেত। সে কখনও লিখত না 'আমি ভাল আছি'। লিখত, 'আমার শরীরটা ভাল আছে'। এর মধ্যে অনেক নিগূঢ় ইঙ্গিত পেত শোভনলাল। 'শরীরটা ভাল আছে' মানেই মনটা ভাল নেই, মন কেমন করছে। একথা তো খোলাখুলি লেখা যায় না। লিখত, 'আপনি কোলকাতার কলেজে অনেক বন্ধুবান্ধব পেয়ে আনন্দেই আছেন নিশ্চয়।' কখনও লেখেনি, 'আমাকে বোধহয় ভুলে গেছেন'। ওটুকু উহ্য থাকত, ওইটুকু [illegible] বুঝতে শোভনলালের অসুবিধা [illegible] সুজাতার অনুক্ত 'কথাগুলিই বেশী অর্থ বহন করত শোভনলালের কাছে। শোভনলালের মনে হ'ত যেটুকু ও বলেনি সেটুকু যেন আরও ভাল করে বলা হয়েছে। বললে, সব ফুরিয়ে যেত। না বলাতে অসীম অনন্তের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে সেটা। সীমা নেই, শেষ নেই। সুজাতার ছোট ছোট চিঠিগুলো কতবার যে পড়েছে শোভনলাল তার ঠিক নেই। প্রতিবারেই নূতন একটা অর্থ আবিষ্কার করেছে। একটা চিঠিতে লিখেছিল —'পড়াশোনার কোনও ব্যাঘাত হচ্ছে না আশা করি'। এর মধ্যে যে নীরব ব্যঙ্গটা ছিল তা খুব উপভোগ করেছিল শোভনলাল। সুজাতার চিন্তাতেই তন্ময় হয়ে গেল শোভনলাল। সন্ধ্যার অন্ধকারে, ঝিঁঝি পোকার অশ্রান্ত ঝনৎকার, আকাশের কালো কালো মেঘ আর তার ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা তারা, স্তূপীকৃত অন্ধকারের মতো ওই বিরাট বটগাছটা সব যেন সুজাতা-ময় হয়ে উঠল। শোভনলালের মনে হতে লাগল — এই যে অন্ধকার এ তো সুজাতারই জীবনব্যাপী অন্ধকারের মতো। এই অশ্রান্ত ঝিল্লীর ঝঙ্কার — এ তো আমরা রোজই শুনি, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত আকুতি অনুভব করি কি? সমস্ত অন্ধকারকে যে বাণী স্পন্দিত করছে তার মর্মন্তুদ মর্ম কি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি? সুজাতাকে কি আমরা বুঝেছি? মেঘের মাঝে মাঝে দু'একটি উজ্জ্বল তারার মতো তার কচিৎ দীপ্ত আনন্দ-প্রকাশকে কি আমরা মূল্য দিতে পেরেছি? ওই ঘনীভূত অন্ধকারের ভিতর যে একটা প্রাণবন্ত বটগাছ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, যার শিরায় উপশিরায় প্রাণ-প্রবাহ, যার পাতায় কিশলয়ে আনন্দের উন্মুখতা, যার নীরব সত্তায় প্রচ্ছন্ন উৎসবের সমারোহ তাকে আমরা চিনেছি কি? চিনিনি। সুজাতাকেও চিনিনি। সুজাতা একবার বলেছিল, 'আমাদের স্বাধীনতা কাগজে কলমে।' আমাদের চারিধারে যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া হয়ে আছে, তার রংটা মাঝে মাঝে বদলেছে হয়তো, কিন্তু দেওয়ালটা ভাঙেনি। তা আগেকার মতোই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে আছে।' সুজাতার মা মারা যাওয়াতে প্রাচীরটা আরও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে। সুজাতার মা শোভনলালকে ভালবাসতেন। তাঁকে বললে, তিনি হয়তো রাজি হতেন। বৈদ্য-ব্রাহ্মণে বিয়ে তো আজকাল কত হচ্ছে। কিন্তু তাঁকে বলবারই সুযোগ পায়নি শোভনলাল। হঠাৎ মারা গেলেন তিনি হার্টফেল করে। তারপর সুজাতার বাবা বদলি হয়ে এলেন বিহারে। শোভনলালও চেষ্টাচরিত্র করে বিহারে এল। কারণ সুজাতার কাছ থেকে দূরে থাকা অসম্ভব ছিল তার পক্ষে। কোলকাতাতেও বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হ'ত, এখানেও বাড়ি ভাড়া করেছে। এখানে বাড়ি ভাড়া কম। বেশী হলেও শোভনলাল আসত। আমার কোন বাধা নেই, কারণ কোনও বন্ধনই নেই তার। বাপ মা ভাই বোন তো নেই-ই, পেশা বা চাকরির বন্ধনও নেই। সে কবি, লেখক। বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স না থাকলে অকূলপাথারে পড়ত। কিন্তু পড়েনি। সুজাতার বাবা বেহারে আসবার ছ' মাস পরে শোভনলাল এসেছিল। এসেই গিয়েছিল সে সুজাতাদের বাড়ি। গিয়ে দেখল সুজাতার বাবা বিয়ে করেছেন। আর বিয়ে করেছেন অমিতাকে। অমিতা শোভনলালের সহপাঠিনী ছিল। শুধু তাই নয়, তার প্রেমে পড়েছিল। তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। অমিতার লেখা অনেক চিঠি অনেক দিন সে রেখে দিয়েছিল সুজাতাকে দেখাবে বলে। কিন্তু সে সুযোগ হয়নি। পুড়িয়ে দিয়েছে চিঠিগুলো। সেই অমিতা যে সুজাতার সৎমা এবং অভিভাবিকা হয়ে দাঁড়াবে তা কে কল্পনা করেছিল! এখানে এসে প্রথমে যখন সে সুজাতার বাড়ি গিয়েছিল, তখন অমিতাকে দেখে চমকে উঠেছিল। অমিতাও উঠেছিল নিশ্চয়। কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করেনি। শোভনলালকে দেখে আধঘোমটা দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গিয়েছিল সে। যেন চেনে না, যেন কখনও দেখেনি। শোভনলালও আর বেশীক্ষণ থাকতে পারেনি সেখানে। সুজাতার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাবটা সে করেছিল পত্রযোগে। যে উত্তরটা এসেছিল, তা এখনও মনে আছে শোভনলালের—

প্রিয় শোভনলাল,

তুমি শিক্ষিত। তোমার নিকট এ পত্র প্রত্যাশা করি নাই। তোমাকে নিজের ছেলের মতো স্নেহ করি, সুজাতাকেও তুমি নিজের ভগ্নীর মতো দেখিবে ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। তাছাড়া সুজাতা ব্রাহ্মণ-কন্যা, তুমি বৈদ্য। বৈদ্যরা নিজেদের আজকাল ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সমাজে এখনও তাহা স্বীকৃত হয় নাই। সুজাতার মা, যদিও তাহার সৎমা, কিন্তু সে প্রকৃতই তাহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী, সে এ বিবাহে কিছুতেই রাজি হইবে না। তাহাকে তোমার পত্র দেখাইয়াছিলাম, সে বলিল, যদি এ বিবাহ দাও আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। সুজাতার মা আর একটা কথাও বলিয়াছে। তোমার মনের ভাব যখন এইরূপ তখন তোমার আমাদের বাড়িতে না আসাই ভালো। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ভগবান তোমাকে সুমতি দিন। ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীহরানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সত্যিই প্রাচীরটা দুর্লঙ্ঘ্য। অমিতা আসাতে আরও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে। অমিতা যে কেন এত হিতাকাঙ্ক্ষিণী হয়েছে তা শোভনলালের বুঝতে দেরি হয়নি। অমিতা যদি না থাকত তাহলে হরানন্দবাবুকে হয়তো শোভনলাল রাজি করতে পারত। হরানন্দবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল ঝাউ-কুটির মাঠের ধারে। ওই নির্জন জায়গাটায় শোভনলাল রোজ বেড়াতে যায়। ঝাউ-কুটি একটা প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ি। খাপরায় ছাওয়া, বাংলো ধরনের। চারদিকে বড় বারান্দা, লম্বা লম্বা সিঁড়ির সারি। আর চারদিকে প্রকাণ্ড হাতা। জায়গাটা বড় ভালো লাগে শোভনলালের। রোজ বিকেলে বেড়াতে যায় সেখানে। সুজাতাকে একদিন ফোনে সে বলেছিল 'আমার তো তোমার বাড়ি যাওয়ার উপায় নেই। তুমি একদিন কোনও ছুতো করে ঝাউ-কুটিতে এস না, তোমাকে অনেক দিন দেখিনি।' সুজাতা আসতে রাজি হয়নি। তার দিন দুই পরে হরানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঝাউ-কুটির মাঠে। গভর্নমেণ্ট নাকি বাড়িটা কিনতে চান, গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে তিনি বাড়িটা দেখতে এসেছিলেন।

'কি শোভন এখানেই আছ এখনও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'কতদিন থাকবে?'

'বরাবরই থাকব।'

উত্তরটা শুনে একটু থমকে গেলেন হরানন্দবাবু।

তারপর জিগ্যেস করলেন, 'তোমার মাথা ঠিক হল?'

সবিনয়ে উত্তর দিয়েছিল শোভনলাল — 'আমার মাথা তো কখনও খারাপ হয়নি। আমি আপনাকে যা লিখেছিলাম তা বাজে কথা নয়। আমি সুজাতার জন্যে সারাজীবন অপেক্ষা করব। আপনারা যদি সহজ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতেন আমার উপর রাগ করতেন না।'

হরানন্দবাবু কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'সুজাতাকে

আমি জিগ্যেস করেছিলাম, তার অমত নেই। যা যুগের হাওয়া তাতে আমিও শেষ পর্যন্ত হয়তো রাজি হতুম, কিন্তু মুসকিল হয়েছে সুজাতার মাকে নিয়ে। তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম তা ও'রই ডিকটেশনে। ও বলেছে এ বিয়ে হলে হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, না হয় গলায় দড়ি দেবে। এ অবস্থায় কি করি বল। অপেক্ষা কর, দেখা যাক যদি ওর মত বদলায়।'

শোভনলাল জানে মত বদলাবে না। আর এ-ও জানে হরানন্দবাবু বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্যার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবেন না।

......সুজাতার কথাই ভাবতে লাগল শোভনলাল। হঠাৎ একবার তার মনে হল পিছন দিকে কে এসে দাঁড়াল যেন। সে-ও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কই, কেউ নেই। আবার বসল। হু হু করে কনকনে হাওয়া বইছে। তবু বসে রইল সে। একটু পরে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। আবার উঠে দাঁড়াল শোভনলাল। টর্চ ফেলে ফেলে দেখল চারিদিকে। কেউ নেই। কুকুরটা খানিকক্ষণ ডেকে থেমে গেল। তারপর ডাকতে লাগল পেঁচাগুলো। কর্কশকণ্ঠে কি একটা যেন বলতে চাইছে তারা, শোভনলাল বুঝতে পারল না। একটু পরে মনে হল ওরা যেন বলছে — দেখছ না, দেখছ না, দেখছ না। কি দেখবে? অন্ধকার ছাড়া কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। ক্লান্ত হয়ে গা এলিয়ে দিলে সে ইজিচেয়ারটার উপর। কিন্তু তার মনে হতে লাগল কে যেন তার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিঃশব্দ সঞ্চরণে কার আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে, চুলের মৃদু গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে যেন। আবার সব থেমে গেল। অসাড়ের মতো পড়ে রইল শোভনলাল।

......ফোনটা বেজে উঠল আবার।

তাড়াতাড়ি ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেল শোভনলাল।

'হ্যালো, কে, সুজাতা? ও, সুজাতা— কি খবর?'

'আপনি একবার আসুন। এবার এলে দেখা হবে—'

কোন সুদূরে থেকে যেন ভেসে আসছে— সুজাতার স্বর।

'তোমাদের বাড়িতে যাব?'

'না, ঝাউ-কুঠিতে। আপনি একদিন যেতে বলেছিলেন, তখন যেতে পারিনি। আজ এসেছি। আপনি আসুন—'

'এত রাত্রে ঝাউ-কুঠিতে কি করে গেলে—'

'আসুন, এলে বলব।'

ঝাউ-কুঠিতে গিয়ে শোভনলাল দেখল, সিঁড়ির উপর সুজাতা বসে আছে। একা। প্রথমে দেখতে পায়নি। টর্চ জ্বালবার পর দেখা গেল।

'সুজাতা?'

স্কেচ — শিল্পী : শ্রীইন্দ্র দুগড়

'হ্যাঁ। এইবার আমার চারদিকের দেওয়ালগুলো ভেঙে গেছে, আমি মুক্তি পেয়েছি — আর কোন বাধা নেই।'

টর্চের আলোতে শোভনলাল দেখতে পেল সুজাতার চোখে-মুখে আনন্দ ফুটে উঠেছে।

'মুক্তি পেয়েছ মানে?'

'মুঙ্গেরে গিয়েছিলাম। একটু আগে মারা গেছি বাড়ি চাপা পড়ে। এখানে ভূমিকম্প হয়নি?'

'হয়েছিল—'

'আপনি, তাহলে—'

'না, আমার কিছু হয়নি। আমি বেঁচে গেছি—'

'তাহলে তো আপনার দেওয়াল ভাঙেনি। আমরা তাহলে মিলব কি করে?'

হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে সুজাতা। শোভনলাল ধরতে গেল, কিন্তু ধরা গেল না। সব হাওয়া, সুজাতা অশরীরী।

'আমরা তাহলে মিলব কি করে? আমার সব দেওয়াল তো ভেঙে গেছে। কিন্তু আপনার তো ভাঙেনি। মিলব কি করে—'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সুজাতা।

'তুমিই বল কি করে মিলব। তুমিই আমাকে বলে দাও সুজাতা—'

'ওই যে। লাফিয়ে পড়ুন ওর মধ্যে। ভেঙে ফেলুন দেওয়াল—'

সুজাতা আঙুল দিয়ে প্রকাণ্ড বড় সেকেলে ই'দারাটা দেখিয়ে দিলে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শোভনলাল।

'আসুন—'

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সুজাতা ই'দারাটার দিকে। শোভনলালও অনুসরণ করতে লাগল তাকে, যন্ত্রচালিতবৎ।

ই'দারার ধারে এসে সুজাতা বললে— 'লাফিয়ে পড়ুন। ভেঙে ফেলুন দেওয়াল, দূর করে দিন সব বাধা—'

শোভনলাল কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর লাফিয়ে পড়ল।

পরী

প্রমথনাথ বিশী

বড়ে মিঞা প্রকাণ্ড একটা হাণ্ডায় গোস্ত চাপিয়েছে, উনুনের তাপে আর মাংসের খুশবুতে প্রখর শীত সত্ত্বেও ঘরের মধ্যেটা সরগরম, সকলে কাঁথা কম্বল গায়ে টেনে নিয়ে বেশ জমে বসেছে।

একজন বলে উঠল, বড়ে মিঞা একটা কেচ্ছা বলো।

বড়ে মিঞা উনুনের জ্বাল ঠেলে দিতেই আগুন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, স্পষ্টতর হয়ে উঠল তার রুপোলি লম্বা দাড়ি, পাকা চুল, সারা মুখের অজস্র বলিচিহ্ন।

বলি, বড়ে মিঞা একটা কেচ্ছা বলো।

এবারে গোস্তটা বেশ ক'রে ঘেঁটে দিয়ে সে বলল, বাপজান, বড়ে মিঞা কেচ্ছা বলে না, যা বলে তা সব সাচ্চা। এই পর্যন্ত বলে সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো, জানলায় পাল্লা খড়খড়ির বালাই ছিল না, তাই দেখবার কোন অসুবিধা নাই। বড়ে মিঞার চোখে পড়লো দূরে জুমা মসজিদের মিনারের চূড়ার সংগে আটকে রয়েছে, নখকাটা ঘুড়ির মতো মস্ত পূর্ণিমার চাঁদখানা। আর ঐ হাতের কাছেই মোতি মসজিদের গম্বুজে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ক্ষয়ে যাওয়া পালিশের উপরে নূতন পালিশ ঘষে দিয়েছে। পূবের জানলা দিয়ে তাকাতেই, কোন দরজা জানলায় কপাট পাল্লার বালাই ছিল না, চোখে পড়লো, মোতিমহল, হামাম, দেওয়ানী খাস, সাহী বুরুজ—সব যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আর এক দিনের, সেই বাদশাহী সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখছে।

—মিঞা জ্বালটা একটু ঠেলে দাও।

তাইতো, বলে দু'খানা নূতন জ্বালানি দেয় উনুনে—আর খুঁচিয়ে দেয় আগুনটা। আবার উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে পাকা দাড়ি পাকা চুল, গালের কপালের বলিচিহ্ন, সেই সংগে চোখের কোণে জলের আভাস। কিন্তু ঐ শেষের চিহ্নটা চোখে পড়ে না শ্রোতাদের। শ্রোতারা সকলেই ছোকরা। যৌবন অনগ্রদর্শী।

ছোকরাদের মধ্যে একজন বলে ওঠে, আরে আমিও তাই বলি, বড়ে মিঞা সাচ্চা ছাড়া ঝুটা বলে না।

কে ও? খিজির নাকি? ঠিক বলেছ বাপজান। আর ঠিক বলবেই বা না কেন? তোমার বাপ আর আমি সর্বদা থাকতাম বাদশাহী ফৌজের আগে আগে। আলমগীর বাদশা নিজ হাতে আমাদের মোহর বকশিশ করেছিলেন।

শ্রোতাদের সবাই জানে ইতিহাস হিসাবে কথাটা সত্য নয়। আলমগীর বাদশা মারা গিয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর হল, আর সে ঘটনাটাও নাকি ঘটেছে হিন্দুস্থানে নয়, দক্ষিণে। দেশ ও কাল দুয়ের বিচারেই কথাটা মিথ্যা। বড়ে মিঞার বয়স অবশ্য সত্তর পেরিয়েছে; কিন্তু সে ফৌজী নয়, কখনো ছিল না—সে হচ্ছে লালকেল্লার বাদশাহী আস্তাবলের হেড সহিস;—আর সে কখনো নর্মদা পেরিয়ে দক্ষিণে যাওয়া দূরে থাক, চম্বল পেরিয়েছে কিনা গবেষণার বিষয়। তবু প্রকাশ্যে আপত্তি সম্ভব নয়, শ্রোতারা সবাই হচ্ছে আস্তাবলের সহি[...] বড়ে মিঞার সাগরেদ। যদিচ আস্তাব[...] বলতে এখন পাঁচ ছয়টা রোগা পটকা কা[...] খোঁড়া ঘোড়া—তবু তো বাদশাহী আস্তাবল ঘাটি না ডুবলেও তালপুকুরকে ডোবা ব[...] চলে না।

বড়ে মিঞার পিতৃদত্ত নাম অবশ্যই এক[...] কিছু ছিল, আর খুব সম্ভব সেটা ছি[...] জাঁকালো রকমের কিছু। কিন্তু অনেক[...] হ'ল চাপা পড়ে গিয়ে বেরিয়ে আছে [...] ক্ষুদ্র মিনারটি—"বড়ে মিঞা"। লাল কেল্লা[...] ছোট বড় সবাই ডাকে বড়ে মিঞা, শহ[...] শাজাহানাবাদে যারা তাকে চেনে ঐ নামে ডাকে—বড়ে মিঞা। এখন শাজাহানাবাদে আর হিন্দুস্থানেরই সবাই জানে, দিল্লী বাদশাহীর আর সেদিন নাই, আরো যা[...] বেশি খবর অর্থাৎ একেবারে হাঁড়ির খব[...] রাখে তারা জানে বাদশার হারেমে সব দি[...] খানা তৈয়ার হয় না। আর অনেক সম[...] গভীর রাত্রে দেউড়ি-ই-সালাতিনে অর্থা[...] যেখানে নাকি আগেকার বাদশাদের বেগম [...] ছেলেমেয়ে নাতিরা থাকে, সেদিক থেকে আর্তকণ্ঠে চিৎকার শুনতে পাওয়া যা[...] "খানে বেগর মরে লেড়কা জরু।" কিন্তু ক[...] বন্দুক দেখি ঘৃণাক্ষরে এসব কথা ব[...] মিঞার কাছে—তখনি ঘোড়ার চাবুক হাতে তাড়া করবে, বলবে, বেঈমান।

ছোকরার দল জানে, মিষ্ট কথায় তু[...] ক'রে বুড়োর কাছ থেকে কেচ্ছা আ[...] করতে হয়। তাই খিজির আবার বল[...] তোরা সব চুপ কর তো। বড়ে মিঞা আ[...]

বড়ে মিঞা আগে সাচ্চা কথা বলুক.........

সাচ্চা কথা বলুক, তারপরে সময় থাকলে না হয় কেচ্ছা শুনিস।

ক্লিস্ট বাক্যের ফল ফলল, মিঞা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—খিজির লায়েকের মতো কথা বলেছে।

আস্তাবল মহলে বড়ে মিঞার বুজরুক অর্থাৎ কিনা মন্ত্রতন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে খ্যাতি ছিল। অনেকের বিশ্বাস, সে মন্ত্র প'ড়ে পরীর আবির্ভাব ঘটাতে পারে। অনেকে নাকি দেখেছে। মিঞা নিজে কখনো অস্বীকার করেনি, অনেকের মুখে নিজের কীর্তি শুনতে শুনতে এখন হয়তো বা নিজের গুণপনায় সত্যই বিশ্বাস করে। ছোকরার দল অনেক দিন ওর সাধ্যসাধনা করেছে, আজ ঠিক করেছে, যেমন করেই হোক বুড়োকে রাজি করিয়ে, কবে ম'রে যায় বুড়ো তার ঠিক কি, পরীর আবির্ভাব দেখে নেবে। তারা শুনেছে যে, পূর্ণিমা রাত পরী, জিন প্রভৃতির আবির্ভাবের অনুকূল, যেমন অনুকূল অমাবস্যা রাত ভূত পেত্নী মামদো ব্রহ্মদত্তি প্রভৃতির পক্ষে।

বুড়োকে আরো একটু তোয়াজ করবার উদ্দেশ্যে একজন বলে উঠল, বড়ে মিঞা, গোস্তর যা খুশবু বেরিয়েছে।

আর একজন বলল, তামাম শাজাহানাবাদে তোমার মতো কেউ রসুই করতে পারে না।

প্রশংসা বাক্যগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রাপ্য ব'লে গ্রহণ ক'রে বুড়ো বলল—তবে!

এই তবে শব্দটার তাৎপর্য খুব স্পষ্ট নয়, ভাবটা যেন এই, তাছাড়া অন্য রকম আর কি সম্ভব।

কাদের বলে উঠল—তাই বলছি কিনা।

—জানিস, আমার নানা বাদশা শাজাহাঁর খাস কাবার্চি ছিল। সকলেই বুঝলো যে তা সম্ভব নয়, প্রায় একশ বছর শাজাহাঁর মৃত্যু হ'য়েছে, কিন্তু পরীর গল্প আদায় করবার ইচ্ছা থাকলে প্রকাশ্য প্রতিবাদ করা চলে না।

—এখনো বেগম সাহেবাদের হারেম থেকে বাঁদীরা এসে আমার কাছে রসুই শিখে যায়।

সবাই জানে এটি অসম্ভব। বেগম সাহেবাদের রসুইখানায় হাঁড়ি চড়ে না বললেই হয়। গোস্ত দূরে থাক পোড়া রুটি কালেভদ্রে জোটে তো যথেষ্ট। এই তো সেদিন হারেম থেকে শাহাজাদীরা ক্ষুধার তাড়নায় শহরের মধ্যে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষা মেগেছিল। উজীর সাহেব ফৌজ লাগিয়ে তাদের ভিতরে টেনে নিয়ে আসে। কে না জানে, কে না দেখেছে।

হাঁ সবাই জানে, সবাই দেখেছে, এক ঐ বড়ে মিঞা বাদে। সে ঐ দেওয়ানী খাসের মতো মোগল বাদশাহীর জৌলুষের স্বপ্নে বুঁদ হ'য়ে আছে।

খিজির বলল, বড়ে মিঞা, গোস্ত হোক, ততক্ষণ তুমি একটা সাচ্চা গল্প বল, কেচ্ছায় আমার দরকার নাই।

—হবে রে হবে, আগে পেট ভ'রে গোস্ত খেয়ে নে, তোদের জন্যেই তো পাকাচ্ছি, নইলে আমি কি একা এতখানি গোস্ত খাবো?

—বেশ তো, গোস্ত হতে থাকুক, গল্পও চলুক। তোমার হাতের গোস্ত খেলে কি আর জেগে থাকতে পারবো—তখনই যে ঘুমিয়ে পড়বো।

বুড়ো এবারে খুব খুশী, বলল, আচ্ছা তবে শোন।

বুড়ো সাচ্চা গল্প শুরু করে, সবাই বেশ জমাট হ'য়ে বসে।

—দুশমন নাদির সাকে দেখেছিলি তোরা? যখন তাকে আমরা বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছিলাম লাল কেল্লায়?

শ্রোতারা চুপ ক'রে থাকে।

—তা বটে, কি ক'রে দেখবি তোরা, তখন তোদের জন্মই হয়নি যে। তা না দেখিস তো শুনেছিস দুশমন নাদির সা হিন্দুস্থানের বাদশা মহম্মদ সার সঙ্গে লড়তে এসে নাজেহাল হ'য়ে গিয়েছিল। তাকে সবাই মিলে বন্দী ক'রে নিয়ে এলাম, মাস খানেক কয়েদ হ'য়ে থাকলো লাহোরী দরজার উপরের ঘরটাতে। তারপরে আম-দরবারে বাদশার সামনে সাড়ে তিন হাত মেপে নাকে খৎ দিয়ে দেশে ফিরে যায়! কী ফুর্তিই না হ'য়েছিল তখন।

এই বলে বুড়ো হাঃ হাঃ শব্দে হেসে ওঠে। ভগ্নাবশেষ প্রাসাদের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে সে হাসির শব্দ বুকফাটা কান্নার মতো শোনায়।

শ্রোতারা এ "সাচ্চা" গল্প হাজারবার শুনেছে, আজ নিয়ে হাজার একবার হ'ল।

—বড়ে, সে লড়াইয়ে তুমি গিয়েছিলে?

—যাইনি! উজীর সাহেব ইতিমাদদ্দৌলা কোমারউদ্দিন খাঁ, ভকিল সাহেব নিজাম-উল-মুলক আসফ জা, আমীর উল উমরা মীর বকিস সামসামউদ্দৌলা খাঁ দৌরান, হেদায়েতুল্লা মীর্জা আজিমাবাদী মেধ্রম খাঁ...

ছোকরার দল বাধা দিয়ে বলে, শেষের ও লোকটা কে?

কতক বিনয়, কতক লজ্জা, কতক গৌরবের সঙ্গে বলে—ঐ আমার আসল নাম কিনা। তোরা ভালবেসে বড়ে মিঞা বলিস বলিস, বলুক দেখি আর কেউ!

—তাই বলো বড়ে মিঞা, এতদিন ওরা আমাদের শুনিয়ে আসছে যে বাদশার হার হ'য়েছিল।

—ওরা সব হারামজাদা, ওদের কথা কেন শুনিস। আরে, বাদশাকে হারানো কি মুখের কথা! তোরা তো কেচ্ছায় একটা রুস্তমের নাম শুনেছিস, বাদশার ফৌজে এমন হাজার হাজার রুস্তম ছিল, অবশ্য তাদের মধ্যে আমিই ছিলাম মাথায় সবচেয়ে উঁচু—আর গায়ে কি জোর ছিল, তলোয়ারের এক ঘায়ে হাতির গর্দান নামিয়ে দিতে পারতাম!

তারপরে একটু থেমে বলে, আজকের এই বুড়োটাকে দেখে সেদিনকার মেধ্রম খাঁকে বিচার করিস না।

খিজির বলে, সেই রকমই শুনেছি চাচার কাছে।

বুড়ো বলে, খুব মনে আছে তোর চাচাকে, একদিন নিয়ে আয় না।

খিজিরের পক্ষে সে কাজটি একেবারেই সম্ভব নয়, কারণ তার চাচা কোন কালেই ছিল না।

সবাই বলে, তারপরে কি হ'ল বড়ে মিঞা।

যে-যুদ্ধ সে কখনো করেনি, যে-যুদ্ধে বাদশার সম্পূর্ণ হার হ'য়েছিল, সেই "যুদ্ধ জয়ের" আনন্দে উৎসাহিত হ'য়ে উঠে বড়ে মিঞা আবার বলতে শুরু করে—বন্দী নাদির সার ফৌজে আর হাতি ঘোড়ায় ভ'রে গেল শাজাহানাবাদ, রাস্তায় ভিড় ঠেলে চলে কার সাধ্য। তা ছাড়া তারা এমনি ভয় পেয়ে ছিল যে, যাকে দেখে তাকেই কুর্নিশ করে। আর খোদ নাদির সা তো নকড়খানা থেকে কুর্নিশ করতে করতে দেওয়ানী-আমে বাদশার পায়ের তলায় গিয়ে মাথা রাখলো, বলল, শাহেন শা, তামাম হিন্দুস্থানের মালিক, এখন এই গোলামকে রাখতে হয় রাখো, মারতে হয় মারো।

—তখন বাদশা বুঝি তাকে কোতল করবার হুকুম দিল?

—আরে ছি ছি, আমাদের বাদশা তেমন নয়, তার দিলখানা যমুনা নদীর চেয়েও চওড়া। বাদশা কি বলল জানিস, বলল, আরে ভাই এসো পাশে বসো, তুমি ভুল করেছ বলে কি আমিও ভুল করবো।

তখন নাদির সা রুমাল দিয়ে দুই হাত বেঁধে সামনে দাঁড়ালো। বাদশা মহম্মদ সা বাঁধন খুলে দিয়ে পাশে বসাল তাকে। নাদির সা তার আমীর ওমরাদের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখ, দেখে নেও বাদশা কাকে বলে।

—তারপরে, তারপরে? সবাই কৃত্রিম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, তারপরে?

তারপরে মাসখানেক থাকবার পরে বাদশা বিদায় ক'রে দিল নাদির সাকে। সঙ্গে দিল পথে চড়বার জন্যে হাতি ঘোড়া উট, পথ খরচের জন্যে বস্তা বোঝাই মোহর আর জহরৎ। আর তার ফৌজ তো একদম নিকেশ হ'য়ে গিয়েছিল, তাই দিল কিছু বাদশাহী ফৌজ। ওরা কাঁদতে কাঁদতে বিদায় হ'য়ে যায়, হেসে মরে তামাম হিন্দুস্থান।

ছোকরার দল গোস্তর সুগন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে "সাচ্চা" কাহিনীটা পরিপাক করবার চেষ্টা করে এমন সময়ে মিঞা আবার বলে ওঠে, কিন্তু ওরা এমনি বেঈমান যে, দেশে ফিরে গিয়ে রটালো, লড়াই ফতে ক'রে ফিরেছে—বাদশার দেওয়া হাতি ঘোড়া জহরৎ আর লোকজন দেখিয়ে বলল, এই দেখো, সব কেড়ে এনেছি।

কি নিমকহারাম।

আর শুধু কি তাই! মুন্সীদের ইনাম দিয়ে কেতাব লেখাল, মহম্মদ সার হার হ'য়েছে। আর বলব কি শরমের কথা বাপজান, এদেশের অনেক লোকেও এখন সেই কথা বিশ্বাস করে। তারা "সাচ্চা" আর "কেচ্ছায়" তফাৎ বুঝতে পারে না। বেওকুফ! বেওকুফ!

—আচ্ছা বড়ে মিঞা, অনেকে যে বলে, মহম্মদ সাকে হারিয়ে নাদির সা তখত-তাউশ নিয়ে গিয়েছে।

—বলে অনেকেই না? কি বলিস, বলে তো, ঠিক শুনেছিস?

—শুনেছি বই কি।

—আমরাও চাই যে লোকে ঐ কথা বিশ্বাস করুক।

"আমরা" বলতে কারা তা আর ছোকরার দল জিজ্ঞাসা করল না, কেননা বড়ে মিঞার মুখে "আমরা" বলতে যে আমীর উল ওমরা, মীর বক্সি, খান-সামান প্রভৃতি তা ওরা এতদিনে বুঝে নিয়েছে।

—তোরা তো আমার আপনি লোক, তোদের বলতে আর বাধা কি। শুনবি তো কাছে আয়।

সকলে ঘেঁষে বসলো, তখন চারদিক ভালো ক'রে দেখে নিয়ে গলার স্বর যতদূর সম্ভব নিচু ক'রে বুড়ো বলল—লুকিয়ে রাখা হ'য়েছে, দেওয়ানী খাসের নীচে যে তয়খানা আছে সেখানে তখৎ তাউশ আর বাদশাহী হীরে জহরৎ লুকিয়ে রাখা হ'য়েছে।

কেউ কেউ শুধায়, কেন?

—সে কথা বড় হ'য়ে বুঝবি। কিন্তু আমার মুখ থেকে যা শুনলি তা যেন আর-কাউকে বলিসনে, আল্লার কসম।

গল্প যতই "সাচ্চা" হোক তারও একটা শেষ আছে, কাজেই শেষ হ'ল বড়ে মিঞার "সাচ্চা" কথা, বাজে "কেচ্ছা" সে বলে না।

পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, নাদির সার আক্রমণ সম্বন্ধে ইতিহাসের সঙ্গে বড়ে মিঞার "সাচ্চা" কাহিনীর কিছু প্রভেদ আছে। তা থাক, ইতিহাস ও বড়ে মিঞা

[illegible] কাছে ওরা কে?

কাউকেই আমরা নিজের সিদ্ধান্ত থেকে নড়াতে পারব না—তাই দুটোই মেনে নিলাম। তবু ইতিহাসের মর্যাদা যখন বড়ে মিঞার চেয়ে কিছু বেশি ইতিহাসের অনুকূলে দুটো কথা সেরে নিই।

বড়ে মিঞার দুনিয়া লালকেল্লার আস্তাবল। ঐ মহল্লায় বাদশাহী ঘোড়া নিয়ে কেটেছে তার সারাজীবন, তার বাপ-নানাও জন্মেছে মরেছে এখানে। তাকে নিয়ে তিন পুরুষ কেটেছে লালকেল্লার আস্তাবলে। ইতিমধ্যে যে বাদশাহীর গোধূলিবেলা এসেছে তা কি খোঁজ রাখে বড়ে মিঞা! সেদিন যখন বিজয়ী নাদির সা মহাসমারোহে লালকেল্লায় প্রবেশ করল, বাদশা মহম্মদ সা তাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে বসাল পাশের আসনটিতে আম-দরবারে, নাদির সার নামে জুম্মা মসজিদে খুৎবা উচ্চারিত হ'ল, মুদ্রায় ছাপা হ'ল তার নাম—নাদির সার হুকুমে দিল্লীর মাটি ভেসে গেল নিরীহের রক্তে, এ সবের প্রকৃত তাৎপর্য ঢোকেনি তার মনে। সে ধ'রে নিয়েছে যে বাদশাহী অচল অটল—ঐটুকু ধরে নিয়ে বাকি সব ঘটনাকে সাজিয়েছে, কাজেই নাদির সা যে বিজয়ী আর দিল্লীর বাদশা যে পরাজিত কেমন ক'রে বুঝবে সে! বেশ একটি স্বপ্ন গড়ে নিয়ে বাস করছিল সে। সেই স্বপ্ন-জগতের উপরে প্রথম ধাক্কা এলো যখন তার আস্তাবলের ঘোড়াগুলোর তলব হ'ল। নাদির সার লুটের মাল বহনের জন্য তিনশ হাতি, দশ হাজার ঘোড়া আবশ্যক। এত হাতি ঘোড়া কোথায় পাওয়া যাবে—যুদ্ধে মরেছে অনেক। তাই শেষ পর্যন্ত লালকেল্লার বাদশাহী আস্তাবলে হাত বাড়াতে হ'ল। কিন্তু কাজটা অত সহজে হয়নি। বড়ে মিঞা তার সাগরেদদের নিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালো। খবর শুনে উজীর বলল, এ-ও তো মন্দ মজা নয়, নাদির সার সঙ্গে লড়তে হবে, আবার ঘরের লোকের সঙ্গেও। অবশেষে দিতেই হ'ল ঘোড়াগুলো। তখন সেই শূন্য আস্তাবলের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রথম তার মনে হ'ল, কোথাও একটা গোল ঘটেছে! সেই থেকে শূন্য আস্তাবলের হেড সহিস সেজে বসে রয়েছে সে। বাদশাহীতে যেটুকু নাজাই পড়েছে সেটুকু পূরণ করে নিয়েছে সে স্বপ্ন দিয়ে।

বড়ে মিঞার "সাচ্চা" কাহিনী শুনে ছোকরার দল কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ ক'রে উঠল, বলল, মিঞা তুমি ছিলে তাই "সাচ্চা" ঘটনা জানতে পারলাম, বেইমানরা কত কি ঝুটো কথা বলে!

বুড়োর মুখ খুশীতে ভরে ওঠে।

তখন ওরা বলে, বড়ে মিঞা আজ তো আসমান ভরা জোছনা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মিঞা, পরী দেখাও।

আগেই বলেছি যে, ছোকরা মহলে বুজরুক বলে বা জ্ঞানী পুরুষ অর্থাৎ যারা মন্ত্রতন্ত্র জানে, আর মন্ত্রতন্ত্রযোগে নানা রকম অলৌকিক কাণ্ড করতে পারে,—একটা খ্যাতি ছিল বুড়োর। সে নাকি জ্যোৎস্না রাতে মন্ত্র পড়ে পরী নামাতে পারে—কতদিন কতজনকে দেখিয়েছে। ছেলেরা তাই তাকে চেপে ধরল।

মিঞা প্রথমটা উড়িয়ে দিল, বলল, দূরে পাগল, মানুষে কি পরী দেখাতে পারে?

—মানুষে পারে কিনা জানি না, তবে তোমার মতো বুজরুকের কি অসাধ্য!

—তুমি কতজনকে দেখিয়েছ।

—দূর, দূর, ওসব মিথ্যা কথা।

কিন্তু ছোকরার দল আজ নাছোড়বান্দা।

খোসামোদ মিথ্যা হ'লেও মধুর, আর মিথ্যা না হ'লে খোসামোদ বলছে কেন। অবশেষে জয় হ'ল মধুর মিথ্যার।

বুড়ো পরী দেখাতে পারে কিনা জানি না, কিন্তু শতবার শতজনের মুখে শুনতে শুনতে, পারে বলেই বিশ্বাস ক'রে ফেলেছে। তাছাড়া অনেক রকম মন্তর তন্তর শিখেছে সে, তার মধ্যে সত্যই একটা ছিল পরীর মন্তর। কখনো পরীক্ষা করে দেখেনি—ভাবলো, আজ একবার পরীক্ষা ক'রে দেখাই যাক না কি হয়!

—আচ্ছা একটু সবুর কর, আগে গোস্তর হাঁড়িটা নামিয়ে নিই।

এই বলে গোস্তর হাঁড়ি নামিয়ে রেখে, হাত পা ধুয়ে শুচিশুদ্ধ হ'য়ে হাঁটু ভেঙে বসলো সে—আর তারপরে মুদ্রিত চক্ষুতে তন্ময় হ'য়ে বিড়বিড় ক'রে শুরু করল মন্ত্রোচ্চারণ, ছেলের দল নিশ্বাস রোধ ক'রে নির্বাক বসে রইল—কখন পরী দেখা দেয়।

মিনিট দশেক না যেতেই চমকে উঠল ছেলের দল। দরজার কাছে ওরা কে? সাত আট-জন তরুণী, মাথার উপর থেকে পা পর্যন্ত ঝুলেছে ওড়না, ঐগুলোই কি ডানা? ছোট্ট পায়ে জরির কাজ করা মখমলের ছোট্ট জুতো, ভুরুর কালোতে, ঠোঁটের লালে, গালের নবনী আভা সাদাতে, সে এক আশ্চর্য সংগত। মানুষ কখনো এত সুন্দর হয় না—নিশ্চয় পরী।

ছোকরার দল বিস্মিত ভীত।

সবচেয়ে বিস্মিত আর ভীত বড়ে মিঞা। তবে কি সত্যি সে পরী নামাতে পারে।

পরীর দল মুহূর্ত-কাল বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে ঢুকে পড়লো ঘরে, আর তারপরে ঘরের লোকজনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে মাংসের হাঁড়িটা ধরাধরি ক'রে তুলে নিয়ে যেমন নিঃশব্দে ঢুকেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল, আগমন ও নির্গমন দুই-ই ভূমিকা-বর্জিত। ওদের কারো সাহস হ'ল না, সাধ্য হ'ল না যে নিষেধ করে, বাধা দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওদের সম্বিৎ হ'ল। কোথায় গেল পরীর দল! খিড়ির দরজার কাছে বসেছিল, তার মনে হ'ল ওরা যেন হারেমের দিকে গেল। মিঞা বলে উঠল, পরীর আসা যাওয়া লক্ষ্য করতে নেই, চোখ নষ্ট হ'য়ে যায়, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাক।

তারপরে বলল, তোরা তো আজকালকার ছেলে কিছু বিশ্বাস করতে চাস না, এখন নিজের চোখে দেখলি তো মন্ত্র পড়ে পরী নামানো যায়।

—পরী যদি, গোস্তর হাঁড়ি নিয়ে গেল কেন?

—যাবেই তো, জোর ক'রে ওদের নামানোয় রাগ করেছে—সাজা দিয়ে গেল।

তারপরে বলল, যা-এখন ঘরে গিয়ে-খা গে।

ছেলেরা যার যার ঘরে রওনা হ'ল, সকলেই জানে ব্যাপারটা কি ঘটলো। ওরা পরীর মতোই বটে তবে পরী নয়, বাদশার হারেমের বুভুক্ষু উপোসী শাহাজাদীর দল। কিন্তু কারো সাহস নাই কথাটা উচ্চারণ করে। বড়ে মিঞা তখনি ঘোড়ার চাবুক নিয়ে তাড়া করবে—নিমকহারাম, বেওকুফ, বাদশার হারেমে বুভুক্ষু শাহাজাদী। বলবে, কোথায় শিখলি এসব ঝুটো কথা বেল্টমানের দল। ওরা পরী, পরী, একশবার পরী।*

"Shakir Khan, the Diwan of Prince Ali Ganhar, narrates how when he took a mug of broth from the Pauper Charity Kitchen to the prince for official inspection, the prince asked him to give it to the palace ladies, as no fire had been kindled in the harem kitchen for three days! We read, in the Court Chronicle of his reign, how one day the princesses could bear starvation no longer, and in frantic disregard of Parda rushed out of the Palace for the city; but the fort gates being closed they sat down in the men's quarters for a day and a night, after which they were persuaded to go back to their rooms." Fall of the Mughal Empire, page 26-27; Vol. I, 1st. Ed. by Jadunath Sarkar.

বৈদিক যুগের বেশ-ভূষা ও প্রসাধন-রুচি

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

দিক আমলের নরনারী কি জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করতেন এ বিষয়ে আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে। এ সম্বন্ধে কিন্তু স্থূল ধারণা করাই চলে, গ্রন্থ-গত উপকরণ থেকে বেশি কিছু জানবার উপায় নেই। বৈদিক সমাজের পুরুষ ও মহিলাদের পোশাকে পার্থক্য ছিল কিনা তাও বোঝা যায় না সুস্পষ্টভাবে। মেয়েদের প্রসঙ্গে যে বেশভূষার উল্লেখ দেখা যায় তার বিশেষ ব্যতিক্রম নেই পুরুষের প্রসঙ্গেও। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে অন্তর্বাস, বহির্বাস এবং বক্ষ-আচ্ছাদন দ্বারা নারী ও পুরুষ উভয়েই সজ্জিত হতেন।

পরিধেয় বস্ত্রের নীচেও একখানি আঁটসাঁট ক্ষুদ্রাকার বসন-খণ্ড পরিধানের রেওয়াজ ছিল মনে হয়। এই অন্তর্বাসের নাম ছিল নীবি। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের পোশাকের তালিকায় নীবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একালের পুরুষদের আণ্ডার-অয়ার এবং মেয়েদের সায়ার কথা মনে রেখে বোধ হয় নীবি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাবে না।

পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র (বাসঃ পরিধানং) ছাড়াও অতিরিক্ত নীবির উল্লেখ থেকে সূচিত হয় অন্তর্বাস। (অথর্ব ৮।২।১৬—যত্তে বাসঃ পরিধানং যাং নীবিং কৃণুষে ত্বম্, নীবি=inner wrap, Whitney)

নীবি যে অন্তর্বাস তা প্রমাণ করতে কোন অসুবিধা হয় না। নব-পরিণীতা বধূর 'প্রিয়তমা তনু' বা অধোদেশ বস্ত্র দেখে ভীত হয়, সেইজন্য নীবির ব্যবস্থা ছিল। (অথর্ব ১৪।২।৫০—যা মে প্রিয়তমা তনূঃ সা মে বিভায় বাসসঃ। তস্যাগ্রে নীবিং কৃণুধ্ব)

গর্ভরক্ষার জন্য যে ভেষজের ব্যবস্থা ছিল তা বেঁধে দেওয়া হতো নীবির অংশ-বিশেষে। এই বিবরণ থেকে প্রতিভাত হয় যে নীবির সঙ্গে গর্ভিনীর কটিদেশের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটত। (অথর্ব—৮।৬।20—গর্ভং তে উগ্রৌ রক্ষতাং ভেষজৌ নীবি-ভার্যৌ); [নীবি = under-garment, Whitney]

এক ধরণের বক্ষ-আচ্ছাদন ব্যবহৃত হতো বৈদিক সমাজে। এর সঙ্গে কতকটা তুলনীয় হতে পারে একালের চাদর (উত্তরীয়) এবং ওড়না। ঋগ্বেদে বর্ণিত "অধিবস্ত্রা বধূঃ" ওড়না-পরিহিতা যুবতীর চিত্র উপস্থাপিত করে। (ঋ ৮।২৬।১৩—অধিবস্ত্রা বধূঃ ইব; সায়ণ—অধিবস্ত্রা উপরি-নিহিত-বস্ত্রা)

ঋগ্বেদে উল্লিখিত "অধীবাস" সায়ণ-ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হয়েছে "উপরি-আচ্ছাদন"-রূপে। (ঋ ১।১৪০।৯—অধীবাসম্; সায়ণ—উপর্যাচ্ছাদন-স্থানীয়ম্; ঋ ১।১৬২।১৬) [অধিবাস=upper garment or mantle, Monier Williams]

প্রাচীন শিরোভূষণের নমুনা

অথর্ববেদে "উপবাসন" সম্বন্ধীয় উক্তি দৃষ্ট হয়। উপবাসন সম্ভবত মেয়েদের দ্বারা ব্যবহৃত ওড়না জাতীয় গাত্রাবরণ। (অথর্ব—১৪।২।৪৯) [উপবাসন=dress, garment, M Williams]

নববধূর দুইখানি বস্ত্রের আভাস পাওয়া যায় একটি উক্তি থেকে। এই উক্তিতে 'বাধূয়ং বাসঃ' এবং 'বধ্বঃ বস্ত্রম্' একত্র উল্লিখিত হয়েছে। এস্থলে বোধ হয় পরিধেয় বস্ত্র এবং গাত্রাচ্ছাদন সূচিত হচ্ছে। (অথর্ব ১৪।২।৪১)

বৈদিক পরিভাষায় বস্ত্র-বাচক বিভিন্ন শব্দ দৃষ্ট হয়, যথা,—বাসস্, বস্ত্র, অৎক, নির্ণিজ, তন্ত্র ইত্যাদি। ম্যাকডোনেলের মতে নির্ণিজ্ হচ্ছে উজ্জ্বল বস্ত্র এবং অৎক হচ্ছে বস্ত্র (ঋ ৫।৬২।৪—নির্ণিক্; ঋ ৯।১০১।১৪—আঃ জামিঃ অৎকে অব্যত; [pp 34, 256, Vedic grammar]

দুই যুবতী কর্তৃক তন্ত্র বয়নের কথা বিবৃত হয়েছে একটি অথর্ব-মন্ত্রে। এক্ষেত্রে প্রসঙ্গ-গত তাৎপর্য বিশ্লেষণ ক'রে প্রতীত হয় যে তন্ত্র হচ্ছে বস্ত্র। (অথর্ব ১০-৭।৪২ তন্ত্রম্ যুবতী বয়তঃ:) [তন্ত্র=web, Whitney]

ক্ষুমা* বা অতসীর তন্তু থেকে প্রস্তুত বস্ত্রকে বলা হতো ক্ষৌম। মৈত্রায়নী সংহিতায় দুইটি ক্ষৌম বস্ত্র পরিধানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। দুই বস্ত্রের উদ্দেশ্য শরীরের অধোভাগ এবং উর্ধ্বভাগ আচ্ছাদন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মেষ-লোম-জাত বস্ত্রের বৈদিক নাম ছিল কম্বল। (অথর্ব ১৪।২।৬৬)

উত্তরীয়ের তাৎপর্য পরিস্ফুট হয় 'বাস্র' এবং 'দ্রাপি' শব্দের অর্থ বিচার ক'রে। দেবতা বরুণ নির্ণিজ্ পরিধান করেন এবং দ্রাপি ধারণ করেন। সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে দ্রাপি হচ্ছে কবচ। কিন্তু লিথুয়ানীয় ভাষা-গত 'দ্রপন' শব্দের অর্থ হচ্ছে চাদর। এই সূত্র ধরে এবং প্রসঙ্গ বিবেচনা ক'রে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে দ্রাপি চাদরের একটি নাম। অর্থাৎ, বরুণ দেব* পরনে কাপড় এবং গায়ে চাদর পরিধান করেছেন এই ধরণের ব্যাখ্যা প্রস্তাবিত হলে অন্যায় হয় না। 'বাস্র' শব্দও শিথিল বক্ষ-আচ্ছাদনের ধারণা জাগ্রত করে। শুধুমাত্র 'বাস্র'-নামধেয় পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে, অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্রবিহীন অসুর

গর্ভিনীকে নিদ্রায় জাগরণে আক্রমণ করে গর্ভ বিনাশ করবার জন্য। এই জাতীয় বর্ণনা হতে উত্তরীয়ের কল্পনা সমর্থিত হয়। (ঋ ১।২৫।১৩ সায়ণের 'ভাষ্য); [P. 73, Hymns from the Rigveda Peterson; দ্রাপিসং=wrap—garmented, Whitney, অথর্ব ৮।৬।২]

বৈদিক সজ্জার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উষ্ণীষ ধারণ। পুরুষেরা শিরোদেশে উষ্ণীষ এবং পায়ে জুতো (উপানহ্) পরতেন। মেয়েরাও এক ধরণের উষ্ণীষ পরতেন। উষ্ণীষ—অথর্ব ১৫।২।৫: বা সং ১৬।২২: ইন্দ্রাণ্যাঃ উষ্ণীষঃ—বা সং ৩৮।৩; দ্বে উপানহৌ—প ব্রা ১৭।১।১৫)

মেয়েরা বোধ হয় বিভিন্ন ধরণের শিরোবেষ্টন ব্যবহার করতেন। কুরীর ও কুম্ব মস্তককে ধৃত হোত। এই দুটি জিনিস উষ্ণীষের প্রকারবিশেষ বলেই মনে হয়। কোন পুরুষের ক্লীবত্ব কামনা ক'রে কল্পনা করা হতো যে সে ওপশ, কুম্ব ও কুরীর ধারণ করেছে। এই জাতীয় বিবরণের ধরণে স্ফুট হয় যে ওপশ, কুরীর এবং কুম্ব নারীর বেশভূষার অন্তর্ভুক্ত। ওপশ হয়ত এক জাতীয় শিরোভূষণ। এই তিনটি ছাড়াও আর একটি মস্তকে পরিহিত অলংকার বা বেষ্টনের নাম পাওয়া যায়। গর্ভ বিনাশকারী অসুর কখনও কখনও নাকি ক্লীব-রূপে ধারণ ক'রে এবং তিরীট পরিধান ক'রে আবির্ভূত হয়। ক্লীবের শীর্ষদেশে যে জিনিস শোভা পায় তা নারীর ব্যবহার্য বস্তু না হয়ে পারে না। [অথর্ব ৬।১৩৮।২—ক্লীবং কৃধি ওপাশিনম্ অথো কুরীরিণং কৃধি; ৬।১৩৮।৩—ক্লীবং মা অকরং কুরীরম্ অস্য শীর্ষণি কুম্বং চ; ৮।৬।৭—ক্লীবরূপান তিরীটিনঃ) [কুম্ব, কুরীর= head dress for Women; তিরীট= tiara, Monier Williams; ওপশ= head-ornament, Roth, P178, Peterson's Hymns from the Rigveda]

সূর্যার প্রসংগে কুরীর, ওপশ এবং প্রতিধির উল্লেখ দেখা যায়। কুরীর যদি শিরোবেষ্টন হয়, তাহলে ওপশ এবং প্রতিধি সম্বন্ধেও অনুরূপ তাৎপর্য আশা করা যায়। সায়ণের মতে ওপশ হচ্ছে শয্যার উপকরণ এবং প্রতিধি হচ্ছে শকটের অংশ বিশেষ। কিন্তু প্রসংগ-গত বিচারে ওপশ এবং প্রতিধিকে নারীর অংগসজ্জার উপকরণরূপে গণ্য করাই সমীচীন। (ঋ ১০।৮৫।৮ স্তোমাঃ আসন প্রতিধয়ঃ, কুরীরং ছন্দঃ ওপশঃ সূর্যায়াঃ; সায়ণ ভাষ্য;) [অথর্ব ১৪।১।৮, Whitney's tr. and notes]

বৈদিক সমাজে সোনার গহনার প্রচলন ছিল। পুরুষেরা নিষ্ক, রুক্ম এবং মণির সাহায্যে তনুশোভা বর্ধন করতেন। নিষ্ক হচ্ছে হার-জাতীয় কণ্ঠাভরণ। রুক্ম যে কি জাতীয় স্বর্ণালংকার তা বোঝা যায় না। মণি হচ্ছে মূল্যবান প্রস্তর (jewel)। ওষধিকেও মণি (amulet)-রূপে ধারণ করবার প্রথা চালু ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে ধনীর দুহিতারা নিষ্ককণ্ঠী হয়ে থাকতেন। [নিষ্কগ্রীবঃ—ঋ ৫।১৯।৩; অথর্ব ৫।১৭।১৪; নিষ্ককণ্ঠ্যঃ—ঐ ব্রা ৮।৪।৮; পঞ্চ রুক্মা জ্যোতিঃ অস্মৈ ভবন্তি—অথর্ব ৯।৫।২৬; [মণি= jewel, Whitney, অথর্ব ১৫।২।৫; মণি=amulet, whitney অথর্ব ২।৪।১]

স্নান দ্বারা শুচিতালাভের ধারণা প্রসার লাভ করেছিল এবং আলঞ্জন ও অভ্যাঞ্জন ব্যবহার করা হতো অংগ-বিলেপন হিসেবে। সুরভি অভ্যঞ্জন নির্ঋতির অশুভ প্রভাব নিবারণ করে;—এইরূপ বিশ্বাস ছিল। নবাগত অতিথিকে অভ্যর্থনা ক'রে উপবেশনের জন্য কশিপু (মাদুর) এবং উপবর্হণ (তাকিয়া) প্রদান করা হতো, তাঁর সম্মুখে আঞ্জন ও অভ্যাঞ্জন রক্ষিত হোত। (অথর্ব—৬।১১৫।৩—স্বিন্নঃ স্নাত্বা মলাৎ ইব; অথর্ব ৬।১২৪।৩; ৯।৬।১১)

বৃক্ষনির্যাস ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। লাক্ষা (গালা) এবং গুগ্গুলু ভেষজ-রূপে পরিচিত ছিল। যক্ষ্মার প্রতিষেধক-রূপে বিবেচিত হতো গুলগুলুর সুরভি গন্ধ। অরুন্ধতী নামক লতার নির্যাস ছিল লাক্ষারস; ভগ্ন অস্থি সংযোজনে এর প্রয়োগ বিহিত ছিল। লাক্ষা-জাত আলতার ব্যবহার জানা ছিল কিনা বোঝা যায় না। (অথর্ব ৫।৫।৫—অরুন্ধতি; ৫।৫।৭—লাক্ষে; ৪।১২।১: লাক্ষা=অলক্তঃ, অমর ২।৬।১২৫: "গুগ্গুলু"=bdellium, P. 479 Vedic grammar)

বৈদিক নরনারী কেশ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং কেশ দৃঢ় করবার জন্য বীরুধ্ সংগ্রহ করতেন। কেশ-বর্ধনী লতার রস মস্তকে সিঞ্চন করা হতো চিকুরের অপচয়-রোধক ভেষজ হিসেবে। বৃহৎ-পত্র-যুক্ত শমীবৃক্ষের উগ্র গন্ধ নাকি ব্যক্তিবিশেষের টাকের কারণ হতো এবং বেচারাকে জন-সমাজে উপহাসাস্পদ করত। এই বৃক্ষকে সুতি করা হোত কেশের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার জন্য। (অথর্ব ৬।১৩৬।৩: ৬।৩০।২, ৩)

গৃহস্থালীয় পরিবেশে "কেশ-বর্ধনী" লতার খুব আদর ছিল। জমদগ্নি তাঁর কন্যার জন্য ভূমি খনন দ্বারা এই লতা সংগ্রহ করেছিলেন এবং অসিতের গৃহ থেকে বীতহব্য এই ওষধি লাভ করেছিলেন। "ঘোড়ার লাগামের সংগে তুলনীয় কেশ হোক, নল-খাগড়ার মতো চুল বেড়ে উঠুক"—এই জাতীয় প্রার্থনার রীতি ছিল। অথর্ব ৬।১৩৭।১, ২)

কেশ প্রসাধনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উক্তি দৃষ্ট হয় অথর্ব-মন্ত্রে। নববধূর কোমল অপসারণের উদ্দেশ্যে শত দাঁত-যু "কৃত্রিম কণ্টক" ব্যবহার করা হতো। এ কৃত্রিম কণ্টক চিরুণী জাতীয় উপকরণ ব মনে হয়। এক শ্রেণীর মেয়েরা "কণ্টক" প্রস্তুত করত এবং কণ্টকীকারী-রূ আখ্যাত হতো। কণ্টকী ও কণ্টক কেশ প্রসাধনীর নাম হওয়া বিচিত্র নয়। কাঁট গাছের শাখার সংগে তুলনা ক'রে বোধ হ এই পারিভাষিক নামের উদ্ভব ঘটেছে অমরকোষেও চিরুণীর নাম হচ্ছে কংকতিকা এর সংগে অথর্ববেদে উল্লিখিত বিকঙ্কত নামক কাঁটাগাছের তুলনামূলক সম্পর্ক হয়ত কোনকালে ছিল এইরূপ অনুমান অসংগত নয়। (অথর্ব ১৪।২।৬৮—কৃত্রিমঃ কণ্টকঃ শতদন্যঃ অপ অস্যাঃ কেশ্যং মলম্ অপ শীর্ষণ্যং লিখাৎ; কণ্টকীকারীম্—বা সং ৩০।৮; কংকতিকা—অমর ২।৬।১৩৯; বিকঙ্কত অথর্ব ৫।৮।১) [কণ্টক=comb?—Whitney]

পুরুষের কেশ-শ্মশ্রু সংস্কারের ব্যাপারটি কৌতুকজনক। এ বিষয়ে মন্ত্রের জাঁকজমক দেখে পারিবারিক প্রথার ধারণা হয়। ক্ষৌর-কর্ম-বিষয়ক একটি অথর্ববেদীয় সূক্তের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এইরূপ,—

"সবিতা ক্ষুর নিয়ে এসেছেন; হে বায়ু-দেবতা, তুমি উষ্ণ উদক নিয়ে এস; আদিত্য, রুদ্র ও বসুগণ সোমরাজাকে সিক্ত করুন; অদিতি শ্মশ্রু বপন (shaving) করুন; প্রজাপতি চিকিৎসা করুন; যে ক্ষুরের দ্বারা সবিতা সোমরাজার এবং বরুণের শ্মশ্রু বপন করেছিলেন, সেই ক্ষুরের সাহায্যে এই ব্যক্তির বপন-কর্ম সমাধা হোক। (অথর্ব ৬।৬৮।১, ২, ৩)

বৈদিক সমাজে বেশ-ভূষা ও বিলাস-দ্রব্য সম্পর্কীয় চেতনা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। স্নান, অনুলেপন, বপন-কর্ম, অংগসজ্জা, গন্ধদ্রব্য পুড়িয়ে সুবাস সৃষ্টির ব্যবস্থা থেকে পরিস্ফুট হয় শুচিতা ও শালীনতা-বোধের অগ্রগতি। সামাজিক রুচির প্রয়োজন থেকে কিছু কিছু জীবিকাও উদ্ভূত হয়েছে। যথা, হিরণ্যকার গহনা তৈরী করত; মণিকার মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রহ করত; চর্মম্ন চর্ম বা জুতো প্রস্তুত করত; আঞ্জনীকারী অনুলেপন দ্রব্যের যোগান দিত; রজয়িত্রী বস্ত্র-রঞ্জনের কাজে নিযুক্তা ছিল; বাসঃ পল্পুলীর কাজ ছিল বস্ত্র প্রক্ষালন; বপ্তা (নাপিত) ক্ষৌরকর্মের প্রয়োজন মেটাত। এই দৃশ্যটি একালের চোখেও খুব অপরিচিত নয়। (হিরণ্যকার—তৈ ব্রা ৩।৪।১৪; মণিকার—বাসং ৩০।৭; চর্মম্ন ঋ ৮।৫।৩৮; বা সং ৩০।১৫; তৈ ব্রা ৩।৪।১৩; আঞ্জনীকারী—বা সং ৩০।১৪; রজয়িত্রী, বাসঃ পল্পুলী—বা সং ৩০।১২; ক্ষুরেণ বপ্তা বাপসি কেশ-শ্মশ্রু—অথর্ব ৮।২।১৭)

এদেশে কথায় বলে—"গেরস্তকে জেরবার করতে হলে তাকে একটা হাতী কিনিয়া দাও; আর দুষ্টু রায়তকে জেরবার করতে হলে পাশের জমিটা 'বাধিয়া'কে দাও।" বাধিয়া হচ্ছে শীর্ষাবাদিয়া শব্দের অপভ্রংশ।

শেষ জীবনে তাই পীরগঞ্জ কুঠির বুড়ী মেম স্থানীয় প্রজাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে হাসানু শীর্ষাবাদিয়াকে আনিয়েছিলেন এখানে গঙ্গার বুকে ভঁইসদিয়ারা চর থেকে। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

শোনা যায় শীর্ষাবাদিয়ারা নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর হাবসী সৈন্যদের বংশধর। এতকাল লাঙল ধরে, আর পান্তভাত খেয়েও, এদের রক্তের গরম আজও কাটেনি। কথায় কথায় হেঁসোদা দিয়ে লোকের গলা কাটতে চায়। গঙ্গার বুকে নতুন চড়া পড়লেই এরা হানা দেয়।......এতকাল থেকে এখানে বসবাস করছে—আজ সে বুড়ো অথর্ব—কিন্তু একদিনের জন্যও হাসানু পীরগঞ্জ জায়গাটকে ভালবাসতে পারল না। থাকতে হয়, তাই আছে। বিবির সঙ্গে মেজাজের মিল না হলেই কি, মিয়া তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে? রুজিরোজগার, ছেলেপিলে, সুবিধা-অসুবিধা, আরও কত কিছুর কথা ভেবে চলতে হয় এই দুনিয়াতে। জায়গার বেলাতেও তাই।

হাসান্ শীর্ষাবাদিয়া আর পীরগঞ্জের সেওরা নদী, তেল আর জল। .

...গঙ্গাও নদী, আবার সেওরাও নদী। রাঘববোয়ালও মাছ, আবার চুনোপুঁটিও মাছ। নামে নদী, আসলে নালা। কচুরিপানার খেত। হেঁটে পার হওয়া যায় বছরে দশ মাস। এপারের রাখাল গরু চরাতে চরাতে ওপারের রাখালের সঙ্গে হাসিগল্প করে সারাদুপুর। ওই সবই পারে এখানকার লোকে। কেবল গল্প আর খয়নিডলা, কাজ করে কতটুকু। আর ভালবাসে মেয়েদের আঁচল ধরে ফষ্টিনষ্টি করতে। লাঠির জোরও নাই, মনের জোরও নাই, গায়ের জোর তো নাই-ই। হাসানরা আসবার আগে এখানকার লোকের এতটুকু মুরদ ছিল না যে ঘাট থেকে কচুরিপানা তুলে ফেলে, হেঁটে নদী পার হবার পথটুকু পরিষ্কার করে নেয়। সেইসব কথাই হাসান্ বসে বসে ভাবে।

সেওরা নামটা সে কখনও মুখে আনে না; বলে নালা।

এখন ভাদর মাসে নালাটা অন্যবারের চেয়ে একটু বেশী ভরে উঠেছে, তাইতেই এখানকার লোকের কি তড়পানি! ভরা দুপুরেও ব্যাঙ ডাকছে নালার ধারে। এই নালার ধারের লোকের কলেজা আর কতটুকু হবে! বড় জল আর ছোট জল। বড় জলের লোকেরা সামনাসামনি লড়াই করে; ছোটজলের ছিঁচকেরা চিমটি কাটে পিছন থেকে। এরা বানের জলে ঘরদুয়ার ডুবতে দেখেনি, বর্ষার তোড়ে নদীর পাড় ভাঙ্গতে দেখেনি, নতুন চর দখল করেনি লাঠির জোরে কোনদিন। বুকের পাটা আসবে কোথা থেকে এদের! ছোট নদীরা বাঁজা; তাই তাদের বুকে চর লাগে না, আর পাড়ে মরদ জন্মায় না।

জলের কথা বাদই দাও। এরা হল ডাঙ্গার মানুষ; কিন্তু বালিই কি এরা কোনদিন দেখেছে? জলের ঢেউ-এর তবু এরা নাম শুনেছে, কিন্তু বালির ঢেউয়ের কথা শুনলে হাসে। গরমের সময় একসার বালির ঢেউ কেমন করে আর একসার বালির ঢেউকে তাড়া করে তা কি এরা জানে? শুকনো বালির উপর চরের হাওয়ার সিরসিরুনি আঁকাজোকার খেলা দেখেছে? সে শীতের কুয়াশা, সে বালির ঝড়ের গরম, সে কাদা-পাঁকের নরম, সে হাওয়া, সে বিদ্যুৎ, সে মেঘের খেলা কোথায় পাবে এখানে? ছাই! বড় নৌকাই দেখেনি এরা জীবনে। এখানকার আমকাঁঠালের বাগান আর বট অশথ গাছ লোককে ডাকে গাছতলায় বসে সারাদিন গল্প করবার জন্য। চরে আছে শুধু মানুষের পাঁচা কলাগাছ, আর বুনো ঝাউগাছ; তারা বুকেরপাটাওয়ালা মানুষদের ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম করে দিনরাত। এখানকার মানুষে কুঁড়েরবাদশা হবে না তো হবে কি!

সেই হাসান্ শীর্ষাবাদিয়ার আজ এই হাল! ঘরের মধ্যে বসে জুম্মার নমাজ সারতে হল! এ কি কম দুঃখের কথা! তাকে এখানে ধরে রাখবার জন্যই পঞ্চাশ বছর আগে বুড়ী মেম নীলের-চৌবাচ্চা-ভাঙ্গা ইট দিয়ে একটা মসজিদ তয়ের করিয়ে দিয়েছিল। চরে না থেকে ডাঙ্গায় থাকার এইটুকুনই ছিল লাভ। তাও নাই কপালে! বুড়ো হয়েও বাঁচতে হলে, তার দাম দিতে হয় কড়িগুণে।

"ওরে মুন্না! কদুর তেলের শিশিটা এনে দেতো!"

এই ভাদ্দুরে রোদে নাতিটা নালার ধারে কলকে ফুলের বিচি দিয়ে হারজিত খেলা খেলছে আর দুটো ছেলের সঙ্গে।

"নিজে পেড়ে নাও না। আমি এখন যেতে পারব না।"

প্রায় চারকুড়ি বছর বয়স হ'ল; তার মুখের উপর বেয়াদবি করে রেহাই পেয়েছে কেউ কোনদিন, এমন লোকের কথা মনে পড়ে না। হাতী পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে। নাতি না ছাই! রক্ত ফিকে হয়ে গিয়েছে ওদের। ওর মা যে এখানকার মেয়ে। তখনই পইপই করে বারণ করেছিলাম ছেলেকে। রহিম কিছুতেই শুনল না। তার মাকে দিয়ে বলাল যে সে এখানকার মেয়েই সাদি করবে। কর বাবা যা ইচ্ছা! ওর মা তো চলে গেল যেখানে যাবার; এখন ভোগান্তি যে বুড়ো বেঁচে থাকল, তার।

মুশকিল হচ্ছে যে তার সময়ের শীর্ষাবাদিয়াদের মত তাদের ছেলেরা এখানকার লোকদের পর বলে ভাবে না। জাতবেরাদার হলেই হল। ওদের আর দোষ দিয়ে কি হবে; সে নিজেই নিজের দেশের ভাষা প্রায় ভুলে গিয়েছে আজকাল।

কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে। তবু আজ এমন পচা গরম! যত বেলা বাড়ে তত মাথার যন্ত্রণাটা বাড়ে। চোখের ভিতরের টনটনানিটাও বাড়ে। খোলা হাওয়ায় বসতে পারলে মাথার যন্ত্রণাটা কমত। কিন্তু সে জো কি আছে! বুড়ো হবার নানান লেঠা। দিন আর রাত প্রায় এক হয়ে এসেছে। তবু রাত্রিতেই সুবিধা। আলো সহ্য হয় না। রোদের দিকে তাকালে চোখ দিয়ে জল পড়ে।

ইচ্ছা করে নাতিটার সঙ্গে জন্মের মত কথা বন্ধ করে দিতে; কিন্তু স্বার্থে বাধে। ওটা মাঝে মাঝে কুঠির জঙ্গল থেকে ময়নাফল, বকুলফল, আঁশফল, এইসব দু'চারটে এনে দেয়।

হাত বুলিয়ে হাসান্ নিজের মাথার গরমটা আঙুলের ডগায় একবার পরখ করে নিল। মাথার মধ্যেখানটা চৌকোণা করে কামানো। সেই জায়গাটা দিয়ে আগুন বার হচ্ছে। সেইখানটাতে ভাল করে কদুর-বিচির-তেল বসাতে বলেছে হাকিম। তেলটা এত ঠান্ডা যে লাগান মাত্র নাক দিয়ে জল গড়ায়। বুড়ো বেশী মেখে ফেলবে ভয়ে রহিমের বউ শিশিটাকে ওঘরে রেখে দেয়। হাসান্ উঠল শিশিটাকে আনবার জন্য। মাথা গরম হলেই তার মাথা ঘোরে। তাই লাঠিটা নিল হাতে। মাথা যখন ঘোরে তখন উঁচু নীচু জায়গায় চলাফেরা করতে অসুবিধাটা হয় বেশী। হাঁটুর কাছটাতেও জোর পায় না, অনেকদিন থেকেই। মেঝে, চৌকাঠ, সিঁড়ি যা দেখ সব তিরতির করে কাঁপছে।

ওঘর থেকে কদুর তেলের শিশিটা আনবার সময় ঘরের চারিদিকে ভাল করে দেখে নিল কোথাও কিছু খাবার জিনিস আছে কিনা। না। ছেলের বউ খাবার জিনিস সব লুকিয়ে লুকিয়ে রাখে। বারান্দায় ওটা কী যেন হলদে হলদে? আলোতে তাকান যাচ্ছে না। কাক ডাকছে কেন বারান্দায়? চোখ আধবোজা করে একটু আগিয়ে যেতেই চৌকাঠে হোঁচট খেল। বড় মাছিগুলো উড়ল ভোঁ করে। খুব বেঁচে গিয়েছে তেলের শিশিটা! কেউ নাই তো? এদিকে তাকিয়ে নাই তো সেই শকুনচোখো মাগীটা? যা ভয় করেছিল ঠিক তাই।

তালের আঁটিটা তুলে নিতেই নদীর পাড় থেকে হাঁ হাঁ করে উঠেছে রহিমের বউ। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছে বুড়ো। টপ করে তালের আঁটিটা ফেলে দিয়ে লুঙ্গিতে হাত মুছে নিল।

"না না আমি শুধু দেখছিলাম জিনিসটা কি। আমি এসেছিলাম তেলের শিশি নিতে।"

কেউ তার কাছ থেকে জবাবদিহি চায়নি; কেউ শুনছে না; শুনলেও কেউ বিশ্বাস করবে না; তবু সে বারবার বলবে ওই কথা।

হাসান্ আবার এসে বসল চাঁদিতে কদুর তেল লাগাতে।

"নৌকা আসছে! নৌকা! হাঁড়ির নৌকো!"

মুন্নার দল ছুটে গেল ঘাটের দিকে। বর্ষার সময় সেওরায় জল বাড়লে গঙ্গার ধারের মনিহারী থেকে মাটির হাঁড়ি বোঝাই নৌকা দুই-একখানা আসে এদিকে প্রতি বছর। মাঝারি সাইজের নৌকাও এখানে একটি দ্রষ্টব্য জিনিস। তাই হাঁড়ি কিনবার দরকার না থাকলেও ভেঙ্গে পড়ে গ্রামের ছেলেবুড়ো সকলে হাঁড়ির-নৌকা দেখবার জন্য। হাসান্ ঘরের মধ্যে থেকে বুঝতে পারছে যে গ্রাম-সুদ্ধ সবাই ছুটছে ঘাটের দিকে। তার নিজেরও ইচ্ছা করছে নৌকার হাঁড়িওয়ালার সঙ্গে একবার দেখা করতে। ...লোকটা কি আর ভুঁইসদিয়ারার চর হয়ে আসেনি! অনেক খবর জানবার ছিল লোকটার কাছ থেকে। কিন্তু যাবার সামর্থ্য যে নাই।......গঙ্গার বুকের এঁটেল মাটি না হলে কি ভাল হাঁড়ি হয়! পাবে কোথায় সে মাটি এখানকার লোকে। ঠকিয়ে খুব বেশী দাম নিয়ে যায়, হাঁড়িওয়ালা এখানকার বেকুব লোক[illegible]

তার মাথায় একটা বিরাট বোঝা

কাছ থেকে তবে বেশ হয়। শুধু কি বেকুব! ছোট নজর এদের। না খাইয়েই মারতে চায় তাকে রহিমের বউ। তালের আঁঠিটা নিয়ে কী ছোটই না হতে হল খানিক আগে! তালের আঁঠি কি ফেলে দেবার জিনিস? ছেলের বউ যখন হাঁ হাঁ করে উঠেছিল তখন যদি সে বলত যে কাকের হাত থেকে তালের আঁঠিটাকে বাঁচিয়ে তুলে রাখবার জন্য সে ওটাকে নিয়েছিল, তাহলেই ঠিক হত। কিন্তু ঠিক সময়ে কথাটা মুখে যোগাল কই? ওই রকমই হয় আজকাল। যে কথাটা মনে আসা উচিত, ঠিক সেইটাকে ছাড়া বাকি সব কথা মনে আসে।......কদুর তেলের গন্ধতেও হাতেলাগা তালের গন্ধটা ঢাকা পড়েনি।...

ঠাণ্ডা তেলটা মাখতে মাখতে ঝিমুনি আসে। ঢুলুনি ভাঙবার মুহূর্তে নিজের নাকের ডাক নিজের কানে শুনতে পেল হাসানু। তেল জবজবে হাতটা এখনও তার মাথায়।

......দূরে ওই রহিমের বউয়ের গলা না? নালার ধারের বটতলার দিকে? কার সঙ্গে কথা বলছে? চেনা গলা। বাকর না? বাকরটাকে সে কোনদিন দুচক্ষে দেখতে পারে না। বড় ফক্কড়! ওর বাপটাও ছিল ওরই মতন। ওই শুনতেই জাতবেরাদার! না আছে কথা বলবার ঢঙ, না আছে কথার ঠিক-ঠিকানা। বিশ্বাস করতে পারা যায় না ওদের। পাটের শাক দিয়ে ভাত খাবার সময় কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে—'হ্যাঁরে ওটা পাটের শাক নাকি রে'—অমনি হাত দিয়ে ঢেকে নেবে শাকটাকে—যেন কি দিয়ে ভাত খাচ্ছে বললে আমি সেটাকে খেয়ে নেব। স্বভাব! যদি বলে পুবে যাচ্ছি, তবে যাবে পশ্চিমে।

নালার এপারে একজন, ওপারে একজন।

"তুই হাঁড়ি কিনতে গেলি না যে?"

"মুন্নার বাপই আছে সেখানে হাঁড়ি কেনবার জন্য।"

"দু হাতে দুটো হাঁড়ি নিয়ে আসবার সময় যদি রহিমের গায়ের দাদ চুলকে ওঠে, তাহলে কি হবে?"

"হবে আবার কি। বাকরের মত দোস্ত যখন সঙ্গে নেই, তখন অন্য কেউ চুলকে দেবে।"

"বর্ষায় মোষে-দাদ দগদগে হয়ে উঠেছে। কখন যে সুড়সুড় করে উঠবে বলা যায় না।"

দুজনে হাসছে। রহিমের বউ হাসছে খিকখিক করে। নালার ওপার থেকে বাকর হাসছে হো হো করে। এত বেহায়া! বুড়ো শ্বশুর যে শুনতে পাচ্ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই! রহিমের সর্বাঙ্গে দাদ; সেইজন্য বউ এক চাটাইতে ওর সঙ্গে শোয় না। একথা তার জানা; কিন্তু তাই বলে স্বামীকে নিয়ে ঠাট্টা করবে বাইরের লোকের সঙ্গে? যতই হক না কেন বাকর, বউয়ের ছেলেবেলার বন্ধু!

"তা তুই নৌকো দেখতে গেলি না কেন রে বাকর?"

"তুইও যে জন্য যাসনি আমিই সেইজন্য যাইনি।" আবার হাসছে দুটোতে মিলে! জানে যে বুড়ো শুনতে পাবে, তাই বোধহয় সাটে কথা বলছে। ওকথার আর কোন মানে হতে পারে না। দুটোর মধ্যে আশনাই আছে এ সন্দেহ তার আগেও হয়েছে।

অজানতে হাত চলে গিয়েছে পাশেরাখা হেঁসো দাখানার উপর।

রহিমের বউ জিজ্ঞাসা করছে—"তুই জুম্মার নমাজ সেরে আসছিস বুঝি মসজিদ থেকে?"

"না। পরবের দিন ছাড়া নমাজপড়া হয়ে ওঠে না, যাদের নিজের জমি নেই তাদের।"

"তোর যেমন কথা! মসজিদে জুম্মার নমাজ পড়ার সঙ্গে আবার জমি থাকা না থাকার কি সম্বন্ধ? তোর ইচ্ছা করে না, যাস না; তার মধ্যে আবার সাত রকমের কথা কিসের!"

"আরে যারা মজুরি খেটে খায় তারাই জানে যে জুম্মায় নমাজের দাম সাত পয়সা।"

"না না, ওসব কথা বলতে নেই।"

"আরে, ওদাম কি আর আমি ফেলেছি। ওদাম ফেলেছে তোদেরই ইসমাইল বাধিয়া। একদিন জুম্মার নমাজের জন্য এক ঘণ্টা ছুটি নিয়েছিলাম। মজুরি দেবার সময় চোদ্দ আনার মধ্যে থেকে সাত পয়সা কেটে নিয়েছিল।"

"সত্যি?"

"সত্যি, না তো কি মিছে কথা বলছি? তবে তুই বলেছিস ঠিকই। আমার মত লোকের দৌড় ওই পীরের টিলা পর্যন্তই। মেয়েরা যায় 'চিথরিয়া পীর'-এ ন্যাকড়া বাঁধতে দিনের বেলায়, আর আমি যাই মোষ চরাতে চরাতে রাত একটায়।"

হাসছে দুটোতে মিলে।

"চুপ কর বলছি বাকর।"

ওরা নিশ্চয়ই সাটে কথা বলছে, যাতে অপর কেউ শুনলেও বুঝতে না পারে। রাগে সর্বশরীর জ্বালা করে হাসানুর।...... ইসমাইল মজুরি থেকে সাত পয়সা কেটে নিয়েছে বলে, বাকর জুম্মার নমাজ নিয়ে ওরকমভাবে কথা বলবে!...শরীরে এখন যে সে শক্তি নাই!

......সে কথা এই পিঁপড়েগুলোও বোঝে। তাই এসেছে জ্বালাতন করতে হাতে তালের গন্ধ পেয়ে!......একটা দুটো নয়! এ যে অনেক!...চাটাই ভরে গিয়েছে! ...গায়ের পিঁপড়ে ঝাড়তে ঝাড়তে হাসানু উঠে দাঁড়াল। ভাল করে লক্ষ্য করে সে দেখে।

......তাই বল! তালের গন্ধে আসতে যাবে কেন? ঝড়বাদল হবে নিশ্চয়ই। তাই বেরিয়েছেন শালারা!......

গা হাত পা থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে ছাড়াতে, সে কোনরকমে বাইরের দাওয়ায় এসে বসে। বাইরে রোদের তেজ কমে গেল কখন? তাকাতে কষ্ট হচ্ছে না তো। মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হল। তবু মনের মধ্যে একটা সন্দেহ কিরকির করে বেঁধে। এদেশের ভাষায় 'চিথরিয়া পীর' মানে ন্যাকড়া পীর। বাকর 'চিথরিয়া পীর'-এ রাত্রিতে যাবার কথাটা বলল কেন? এখনও ওদের হাসি-গল্প থামেনি।

"অত জোরে জোরে বলছিস-তোর শ্বশুর আবার হেঁসো দিয়ে তোর জিভ না কেটে নেয়।"

"ওর ভয়ে তো পিঁপড়ের গর্ত খুঁজতে হবে! দিনরাত কী জ্বালাতন যে আমার হয়েছে ওকে নিয়ে! মুন্না তালের আঁটি চুষে ফেলে দিয়েছে উঠনে; সেটাকে নিতে গিয়ে খানিক আগে আছাড় খেয়ে পড়েছে। অষ্টপ্রহর খাইখাই। কটা পাকা কদমফুল এনে রেখেছিলাম; সব কটা রাত্রিতে খেয়েছে। একদিন দেখি একখণ্ড কাগজ চিবুচ্ছে। পচা, গলা, যে কোন জিনিস হলে হল, কিছু না পেলে নিজের মাড়ি চিবয়।"

"বুড়ো যাতে তাড়াতাড়ি মরে সেজন্য চিথরিয়া পীরে ন্যাকড়া বাঁধিস না কেন?"

হাসছে দুজনেই!

"চিথরিয়া পীরে ন্যাকড়া বেঁধে যদি ওর পরমায়ু কমানো যেত, তাহলে বুড়ো অনেক আগেই খতম হত। তোর বাপ কি আর সেকালে পরখ করে দেখেনি?"

"দেখে থাকবে হয়ত। সেই ন্যাকড়া বাঁধার ধকেই বোধহয় তোর শ্বশুরকে দিয়ে জেলখানার ঘানি ঘোরাতে পেরেছিল।"

বারান্দায় হাসানুর মাথা গরম হয়ে ওঠে আবার, এই মিথ্যা কাথাটা শুনে।...জেল তার হয়নি। তাকে বাকরের বাপ শীষবাদিয়া না বলে 'বাধিয়া' বলেছিল, তাই তার জিভ কেটে নিতে গিয়েছিল হাসানু হেঁসো দা দিয়ে। মামলায় হাকিম জরিমানা করেছিল পঁচিশ টাকা। সে টাকাও 'বুড়হিয়া মেম' দিয়ে দিয়েছিল।......মিথ্যাবাদীর ঝাড়!......

আজ আর 'বাধিয়া' বললে এখনকার শীষবাদিয়ারা কেউ চটে না।

হাসানু জোরে জোরে কেশে পুত্রবধূকে জানিয়ে দিল যে সে বারান্দায় এসে বসেছে।

এখনকার মত ওদুটোর হাসিগল্প শেষ হল। কিন্তু তার চিন্তার শেষ নাই। বসে বসে ভাবা ছাড়া আর তো কোন কাজ নাই আজকাল।

যাক। মাথার দরদবানি কমে গিয়েছে গরমটা কাটবার সঙ্গে সঙ্গে। জলো হাওয়া দিচ্ছে অল্প অল্প। হাঁড়ি কিনে যারা বাড়ি ফিরছে, তারা বলে গেল--গঙ্গা আর কুশী কানায় কানায় ভরে উঠেছে—আর জল নিচ্ছে না—আর জল বাড়লে ঠেলবে উপরের দিকের নদীনালাগুলোতে। এ খবর নৌকাওয়ালার কাছ থেকে পাওয়া। বুড়ো সোজা হয়ে বসে। এই খবরহীন দুনিয়াতে এটা তবু একটা নতুন খবর। ধরে তাদের বসাতে চায়, এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করবার জন্য। কিন্তু সবাই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়। বুড়োর সঙ্গে বাজে কথা বলে কেউ সময় নষ্ট করতে রাজী নয়। ছুটে যেতে ইচ্ছা করে নৌকার কাছে; কতটুকুই বা দূরে। কিন্তু নিজের ক্ষমতার উপর ভরসা পায় না। ভুঁইসদিয়ারার কাশ-গাছগুলো দেখা যাচ্ছে কিনা এপার থেকে? তাহলেই আন্দাজ পাওয়া যায় জল কতটা বেড়েছে গঙ্গায়। জল বাড়লেই হরিণ-কোলের 'কুণ্ড'এর কাছে পশ্চিম থেকে ভেসে আসা শুকনো গাছের গুঁড়িগুলো অনবরত ঘুরপাক খেতে থাকে। হাঁড়িওয়ালা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে সে জিনিস। জানতে পারলে হত!......

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হল। রহিমের বউ ছুটে এল নালার ধার থেকে, শুকতে দেওয়া চট, মাদুরগুলো তোলবার জন্য।

তারপর থেকেই চলল ছিপছিপে বৃষ্টি আর জলো হাওয়া।

রাত্রিতে কেউ ঠাহর করতে পারেনি। ভোর বেলাতে উঠে সকলে দেখে অবাক-কাণ্ড! এত জল সেওরা নদীতে কেউ জীবনেও দেখেনি। কান খাড়া হয়ে উঠেছে হাসানুর। এ তো শুধু বৃষ্টিতে জল বাড়া নয়। এ যে অন্য রকমের একেবারে! নৌকা-ওয়ালা যা বলেছিল তাই। গঙ্গা মেরেছে ঠেলা। ঠেলছে জল উপরের দিকে মালা বেয়ে। যা যা, ঘাটে নৌকাওয়ালাকে ভাল করে জিজ্ঞাসা করে আয়, এ জিনিষ ঠিক তাই কিনা? আলবাত তাই! জিজ্ঞাসা করবার আর দরকার নাই!......

এমনিতেই রাত্রিতে আজকাল ঘুম হয় না। কাল রাতের অনিদ্রাটা আরও কিরকম যেন লেগেছিল। নিশ্বাসের সঙ্গে কি যেন একটা এড়িয়ে যাচ্ছে। বলে বুঝানো যায় না এমনি একটা অস্বস্তি। হাওয়া বাতাসের শব্দ আর গন্ধ কি রকমের যেন। এতক্ষণে বুঝল। বুক কেঁপে উঠেছে তার। ছেঁড়া ছেঁড়া দল-ছাড়া কচুরিপানা আবার উলটো দিকে চলেছে। নালাটা নদী হয়ে উঠেছে। সে নিজে যেতে পারেনি তাই গঙ্গা উজিয়ে এসেছে তার দুয়ারে। তাই জলে বাতাসে ফেলে আসা স্বর্গের চেনাচেনা গন্ধ। বুক-ভরে টেনে সে নিশ্বাস নিল। শুষে নিতে চায় সে এই সোঁদা গন্ধটাকে; ঝাপসা চোখ দিয়ে গিলতে চায় উপচে-পড়া সেওরা নদীকে। বড় সুবিধা আজ রোদ নাই। হ্যাঁ নদীই তো। সেওরা নদী। বাড়ুক, বাড়ুক, জল আরও বাড়ুক! গঙ্গা আরও ঠেলুক। ঝোঁকের মাথায় লাঠি না নিয়েই বারান্দা থেকে নেমে পড়ল সে, আরও কাছ থেকে দেখবার জন্য।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে পীরগঞ্জের লোকরা বুঝতে পারল যে ব্যাপারটা আর মজা দেখবার মত নাই। জল ক্রমাগত বাড়ছে একটু একটু করে। পাড় ডুবল; রাস্তা ডুবল, নীচু জায়গাগুলোর দিকে জলের স্রোত বইল; গেরস্তবাড়ির উঠনে জল গেল; সিঁড়ি ডুবল; গরুর খাবার নাদা ভাসল; ঘুঁটের মাচা ভাসল; উখলি ভাসল; বারান্দায় জল উঠল। এইবার ঘরের মটকায় জিনিস বেঁধে ভাবতে হল আশ্রয়ের কথা। গ্রামের মধ্যে উঁচু জায়গা, দুটি টিলা। এক টিলার উপর মসজিদ; আর এক টিলার উপর চিথরিয়া পীরের নেকড়া বাঁধবার গাছ। কাজেই মসজিদে ছেলেমেয়ে বুড়োদের পাঠিয়ে দেওয়া হল। বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষরা এখনকার মত থাকল বাড়িতে, গাই বলদ, ঘরদুয়ার, জিনিসপত্র সামলাবার জন্য; দরকার পড়লে পরে যাবে মসজিদে।

সুবিধার মধ্যে সারাগ্রামে জল কোথাও বেশী নয়। নীচু জায়গাগুলোতে জল এক কোমর; অন্য জায়গায় হাঁটুজল।

হাসানু মসজিদে যাবার সময় হেঁসো আর লাঠিটা নিয়েছে। সে ধর্মপ্রাণ লোক; বহু-দিন পর মসজিদে এসেছে; কিন্তু মন তার পড়ে রয়েছে অন্য দিকে। চারিদিকে শুধু

দুর্গদ্বার, আগ্রা

•আলোকচিত্র ঃ শ্রীচঞ্চল মিত্র

থই জল। মসজিদের টিলাটাকে মনে হচ্ছে যেন গঙ্গার বুকের চর। ঘাটের নৌকাখানা ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে। শঙ্খচিল বসেছে মসজিদের উপর। ছেলেরা মসজিদের সিঁড়ির নীচে কলাগাছের ভেলা তয়ের করছে। তাদের বাড়ির জিনিসপত্রের কি হাল হবে, সে সম্বন্ধে হাসানুর কোন দুশ্চিন্তা নাই। মসজিদের বারান্দায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি কান্নাকাটি করছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। ছোটছেলের হাত থেকে পড়ে যাওয়া গুড়ের টুকরো তুলে খাবার কথা আজ আর তার মনে আসছে না। সে অনর্গল কথা বলে চলেছে—ছেলের দল শুনুক আর নাই শুনুক।

......গঙ্গার মধ্যে দিয়ে স্টীমার চলে ভোঁ-ও-ও। ধোঁয়ার কুণ্ডলী হাওয়ায় উড়ে যায়, বকের সারের সঙ্গে সঙ্গে।...সে বানের জলের কী স্রোত! বড় বড় গাছ ভেসে যাচ্ছে। জ্যান্ত, মরা জন্তু জানোয়ার, মানুষ অগুনতি। ......ওই স্রোতের মুখ থেকে হরিণ ধরে আনতে যে-সে লোক পারে? সে পারত হাসানু শীর্ষাবাদিয়া।...রাতদুপুরে সে একা সড়কি দিয়ে দাঁতওয়ালা বুনোশুয়োর মেরেছে কতবার। একবার কাশের বনে তাকে দেখে কয়েকটা লোক নৌকার মধ্যে থেকে আঁতকে চীৎকার করে উঠেছিল—বুনোমোষ ভেবে।... গঙ্গার বুকের ঘূর্ণিজলে যেসব শুকনো কাঠ অনবরত ঘুরপাক খায়, সেইগুলোকে সে প্রত্যহ সাঁতরে নিয়ে আসত জ্বালানি করবার জন্য।......দশটা বন্দুকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের দল একবার একটা চর দখল করেছিল। সে যে কী কাণ্ড!......

হাসানু বলে চলেছে নিজের মনের তাগিদে। মনে মনে না ভেবে মুখের কথার মধ্যে দিয়ে ভাবা। বড় নদীর বুকের উপরের জীবন আবার তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।... মাথায় আজ আর তার ঠাণ্ডা তেলের দরকার নাই; চলবার সময় লাঠির দরকার নাই; মেথলা না থাকলেও আজ বোধহয় দিনের বেলায় বাইরে তাকাতে তার কষ্ট হত না। শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে আনবার ফুরসত নাই। কতকাল আগেকার হারিয়ে যাওয়া মন ফিরে পেয়েছে সে আবার। রহিমের বউ এসেছিল মুন্নাকে দেখতে। ছেলেকে দেবার পর শ্বশুরের হাতেও একটু গুড় দিতে গেল। আজ প্রথম হাসানু এরকম-ভাবে ছোটছেলের মত হাত পেতে গুড় নিতে লজ্জা পেল। পুত্রবধূর কাছ থেকে সে জানতে পারল যে রহিমরা গিয়েছে থানাতে, পীরগঞ্জের দুরবস্থা দারোগাকে বুঝিয়ে বলবার জন্য। হাঁড়িওয়ালার নৌকাতে গিয়েছে।

হাসানু মনে মনে হাসে; এরা কখনও বানের জল দেখেনি কিনা, তাই ঘাবড়ে গিয়েছে। লুঠতরাজও নয়, দাঙ্গাহাঙ্গামাও নয়; এর মধ্যে দারোগা করবে কি? হাত দিয়ে বানের জল আটকাবে? নৌকাওয়ালাদের রাজী করিয়ে কাল সেও বার হবে বানের জল দেখতে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে ফিরতিমুখো নৌকাখানাকে দেখবার প্রতীক্ষায় ছিল।

দেখতে পায়নি। বোধহয় কাল ফিরবে তাহলে। ছেলের বউকে হাসানু বিশ্বাস পায় না। ও-ই ইচ্ছা করে পাঠায়নি তো থানায় রহিমকে? কিছু বলা যায় না!

ছেলেদের সঙ্গে গল্প করবার উৎসাহ ক্রমে মিইয়ে আসে।......ওরে তোরা গাঙশালিখের বাসা দেখিসনি সেই গঙ্গার পাড়ের?...নদীর ঢেউয়ের কিলবিলুনির উপর রোদ ছিটকে পড়তে দেখেছিস কোনদিন?......ঢেউভাঙ্গা ফেনা কখন হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়েছিস? ......তোদের যদি সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় একবার, তবে হাওয়া বাতাসের গুণে ঠান্ডা রক্ত দেখতে দেখতে গরমে উঠবে। দেখিস না, শীতে আধমরা সাপ গরম বাতাস পেলে হঠাৎ কিলবিল করে ওঠে। সেইরকম।......

বলতে বলতে আনমনা হয়ে যায় হাসানু। চিথরিয়া পীরের দিকে তাকিয়ে দেখে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। গাঁয়ের বাড়িগুলোর দুই একটা আলো শুধু দেখা যায়। ছেলেপিলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে মসজিদের বারান্দায়। কত রাত হল ঠিক বোঝা যায় না। জলো হাওয়া দিচ্ছে। বানের জলের বুকে অন্ধকার জমাট হয়ে চেপে বসেছে। মনের আঁধারও বাড়ছে।

......বড় হালকা স্বভাব রহিমের বউটার! ......যত ভাবে তত মাথা গরম হয়ে ওঠে।... পরিবারের ইজ্জতের প্রশ্ন। আজকের হাসানু, গঙ্গার চরের দুর্দান্ত হাসানু শীর্ষাবাদিয়া। এ হাসানু বাড়ির ইজ্জতের প্রশ্নে গোঁজামিল রাখতে চায় না। ভিজে মোসুমী বাতাস সাহারার 'সিমুম' ঝড়ের কঠোর পরোয়ানা বয়ে আনে। শিরায় উপশিরায় ঝিমিয়েপড়া হারসীরক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মসজিদের সিঁড়িতে নতুন করে ধার দিয়ে হেঁসোর ফালাটার উপর একবার বুড়ো আঙুল বুলিয়ে নিল হাসানু। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবার ধৈর্য থাকে না। তার শিথিল পেশীগুলো কোথা থেকে আজ এত শক্তি পাচ্ছে কে জানে! মসজিদের সিঁড়ির নীচ থেকে ছেলেদের কলাগাছের ভেলাটি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। বাঁশের লাঠিটা লগির কাজ করছে। নিজের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে আজ সে সংশয়হীন। যত অন্ধকারই হক, শীর্ষাবাদিয়াদের জলের মধ্যে দিগভ্রম হয় না। চিথরিয়া পীর কতটুকুই বা দূর। লগি ঠেলবার সময় একটুও যাতে শব্দ না হয় সে বিষয়ে সে সজাগ আছে। এত তাড়াতাড়ি শ্রান্ত হয়ে পড়বে তা সে ভাবেনি। দেহ শ্রান্ত হলে কি হবে, মাথা বেশ পরিষ্কার আছে। টিলা থেকে খানিক দূরেই ভেলা ছেড়ে দেওয়া উচিত, একথা সে জানে। সামান্য অনবধানতায় শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এ সুযোগ প্রত্যহ আসবে না। কয়েকটা গরুমোষ জল ছপছপ করতে করতে গেছে পাশ দিয়ে। অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বলছে। হাসানু বোঝে যে এরা যাচ্ছে উঁচু জায়গার দিকে। চিথরিয়া পীরের টিলা কাছেই। ভেলা ছেড়ে দিয়ে, এদেরই সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে ওঠে ডাঙ্গায়। হাঁপাতে হাঁপাতে সে থকথকে কাদার উপরই বসে পড়ে।......না, কাদা না, গোবর। চারিদিকে অগণিত চোখ জ্বলছে। এত গরুমোষ যে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে সেকথা সে ভাবতে পারেনি।

চিথরিয়া পীরের বিরাট গাছটা তার সম্মুখে। জোনাকপোকা জ্বলছে নিভছে। গাছে বাঁধা সাদা নেকড়াগুলো অন্ধকারে যেরকম দেখা যাওয়া উচিত ছিল সেরকম দেখা যাচ্ছে না; বোধহয় বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে বলে। গরুমোষগুলো গাছতলায় যাবার জন্য ঠেলাঠেলি করছে। গাছের গুঁড়ির কাছেই ঠেলাঠেলিটা সব চেয়ে বেশী। গলা বাড়িয়ে নীচু ডাল থেকে পাতা খাবার চেষ্টা করছে। ওইসব ডালগুলোতেই ন্যাকড়া বাঁধা থাকে বেশী; সেইগুলোকেই হয়ত টেনে নামাবার চেষ্টা করছে খিদের জ্বালায়।...... তাকে মারবার জন্য ন্যাকড়া বাঁধতে সলা দিয়েছিল রহিমের বিবিকে বাকরটা!......

হঠাৎ গাছের উপর একটা আলো জ্বলে উঠল। বুক কেঁপে উঠেছে ভয়ে। বুড়ী মেম নাকি! না, মানুষ! বিড়ি ধরাচ্ছে দিয়াশলাই দিয়ে। সেই শালা! যেটা জুম্মার নমাজের দাম সাত পয়সা ফেলেছিল! শক্ত মুঠোয় সে ধরেছে হেঁসোর হাতলটা।...... শালা গাছে উঠে লুকিয়ে বসে প্রতীক্ষা করছে সেই বদ মেয়েমানুষটার! ইচ্ছা হয়, ছুটে গিয়ে এখনই ওটাকে টেনে গাছ থেকে নামায়! অতিকষ্টে সে নিজেকে সংযত করে, দুটোকে এক সঙ্গে ধরবে বলে। উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপছে তার। মোষের আড়ালে থাকলেও নড়তে চড়তে ভয় হয়, পাছে গাছ থেকে বাকর আবার দেখে ফেলে তাকে। মশা কামড়ালেও হাত নাড়াবার উপায় নাই। পাশের গরুটা মুখচোখের উপর অনবরত ভিজে লেজের চামর দোলালেও কিছু বলবার উপায় নাই!

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। জলের মধ্যে ছপছপ শব্দ! আরও গরুমোষ আসছে বুঝি। না, সে আওয়াজ অন্যরকমের। এ মানুষ! হাসানু কান খাড়া করে রাখে। ......এগিয়ে আসছে। একজন তো? অন্য কেউ না তো?

"কিরে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?"

রহিমের বিবির গলা। আর কোন সন্দেহ নাই। গরুমোষগুলো ঠেলাঠেলি করছে ওই আওয়াজটা যেদিক থেকে এল সেইদিকে যাবার জন্য। হাসানুর পা মাড়িয়ে চলে গেল একটা গরু, সেদিকে তার খেয়াল নাই। অন্ধকারে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ বুঝি ফেটে গেল তার।......আসছে সেই মাগী!......

গাছের উপর থেকে বিকৃত মিহিগলায় একজন বলল—"হামি বুড়িয়া মেম আছি।"

আবার সেই খিকখিক করে গা-জ্বালানে হাসি রহিমের বিবির!

গরুমোষের দলের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছে।

"হট্! হট্!"

গরু তাড়াতে তাড়াতে রহিমের বউ এসে উঠল ডাঙ্গায়। হাসানু শীর্ষাবাদিয়া কখন উঠে দাঁড়িয়েছে, কখন গরুমোষ ঠেলে পুত্রবধূর দিকে আগিয়ে গিয়েছে তা সে নিজেই জানে না।......একটা অতিকায় কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের মত কি যেন আসছে তার দিকে। মুখ চোখে সে একটা কিসের যেন ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আঘাত জোরে নয়; ঘষটানি গোছের।

"কী পিছলে পড়ে গেলি?" বলেই সেই খিকখিকে হাসি। পিছনে আর একজন কে আসছে! তার মাথায়ও এইরকমই একটা বিরাট বোঝা।

গাছের লোকটা বিকৃত গলায় বলল— "বুড়িয়া মেমকে বড় পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে।"

মুহূর্তে বিস্ময়। কে? কী? কিরে?

চেঁচিয়ে উঠেছে রহিমের বউ, চীৎকার করছে পিছন থেকে রহিম, প্রশ্ন করছে গাছ থেকে বাকর; বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছে হাসানু।

"তুমি এখানে?" ছেলে জিজ্ঞাসা করে বাপকে।

"তুই না থানায় গেছলি?" বাপ জিজ্ঞাসা করে ছেলেকে।

"হ্যাঁ, দারোগাবাবু নৌকা ছাড়ল না। বানের সময় নৌকার দরকার তাঁর। তাই আমরা ভেলায় করে ফিরে এসেছিলাম।"

এখানকার ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝতে বেশ একটু সময় লাগল হাসানুর। গরু-মহিষের খাদ্য শুকনো ভুট্টা গাছের বোঝা, বানের হাত থেকে বাঁচিয়ে উঁচুতে রাখবার জন্য, এরা এনে জমা করছে এখানে। বাকর সেগুলোকে গাছের উপর রশি দিয়ে বেঁধে বেঁধে রাখছে। নইলে গরুরা কি নীচে রাখতে দেয় খাওয়ার জিনিস এখন! এরা আগেও বার কয়েক স্বামী-স্ত্রীতে ভুট্টাগাছের বোঝা বয়ে বয়ে এনেছে এখানে। আরও আনতে হবে।

হাতের মুঠি শিথিল হয়েছে হেঁসো দার হাতলে। চিথরিয়া পীরের আকাশে বাতাসে গঙ্গার বালুচরের পরিচিত গন্ধ।

ছেলে বউয়ের জেরার উত্তরে, এই রাত্রিতে চিথরিয়া পীরে আসবার একটা কারণ হাসানুকে খুঁজে বার করতেই হল।

হেঁসো দিয়ে নিজের লুঙ্গির কোণা থেকে একটা লম্বা ফালি কেটে নিয়ে সে পুত্রবধূর হাতে দেয়।

"স্বামীর গায়ের দাদ সারাবার জন্য মানত করে বাঁধ নেকড়াটা গাছে! খুব উঁচুতে বাঁধিস; নইলে এই উটের মত গরুগুলো, এখনই টেনে খেয়ে ফেলবে।"

ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ

অবশেষে সেই ঘটনাই ঘটলো! সেই ভয়ঙ্কর নির্লজ্জ দুর্ঘটনা। যার আতঙ্কটা এতদিন ধরে একটা ছুঁচলো ছুরির মত সংসারের পাঁজরে বিঁধে বসেছিল।

আতঙ্কের শেষ হয়েছে।

ছুরিখানা সেই পাঁজরকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে সমস্ত সংসারটাকে রক্তাক্ত করে দিয়ে।

বুলা পালিয়েছে।

এ বাড়ীর ছোট বৌ বুলা। পুরো নামটা যার বুলবুল।

হিসেব মত আমি এদের সংসারের কেউ নই, দৃশ্যতঃ পরিচয় হচ্ছে—আমি এদের বাড়ীওলার মেয়ে। কিন্তু শুনতে পাই আমি জন্মাবার আগে থেকেই এরা আমাদের একতলার ভাড়াটে, কাজেই হাঁটতে শিখেই

আশাপূর্ণা দেবী

আমি প্রথম বেড়াতে এসেছি নীচতলায়, এদের বাড়ীতে।

তারপর তো কত শীত, কত গ্রীষ্ম, কত বছর গেল, কিন্তু বেড়াতে আসার প্রধান জায়গা আমার এটাই রয়ে গেল। আমি প্রায় এদেরই পরিবারভুক্ত হয়ে গেছি, এদের নাড়িনক্ষত্র সব আমি জানি।

আমি জানতাম এ বাড়ীর প্রত্যেকের মনের মধ্যে অনুমানের প্রতিযোগিতা চলছে—বিঁধোনো ছুরিখানা সত্যিই এই ভয়াবহ নৃশংসতা করবে, না কোনও এক সময় তীক্ষ্ণতা হারিয়ে শিথিল হয়ে খুলে পড়বে।

অথচ এ নিয়ে স্পষ্ট আলোচনা কেউ কোনদিন করেনি। করেনি, কারণ করতে পারেনি। কেন পারেনি তাও আমি জানতাম।

বুলাকে চটাতে চাইত না কেউ। বুলার কাছ থেকে সবাই সেবা পায়, যত্ন পায়, কাজ পায়, বুলা নইলে কারো চলে না।

বুলার শ্বশুরে, রাজেনবাবু দিনে দুবার নির্দিষ্ট সময় ধরে ডাকতেন 'ছোটবৌমা!' বুলা তাড়াতাড়ি বলে উঠতো 'যাই বাবা!' আমি বুঝতাম বুলা এখন ওর শ্বশুরের হাঁটুতে কবরেজী তেল মালিশ করবে অনেকক্ষণ ধরে। রাত্রে বুলা এসে ডাকতো— "বাবা, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?" রাজেনবাবু গলাটা কেমন একরকম সুরে ঝেড়ে নিয়ে বলতেন, "না, এই ঘুমটা এসেছিল।"

বুলা ফ্লানেলের টুকরো আর কাঠকয়লার আগুন নিয়ে ঘরে ঢুকতো। ঘুমের আগে হাঁটুতে সেঁক দিয়ে গরম কাপড় জড়িয়ে তবে ঘুমোন রাজেনবাবু।

বুলার শাশুড়ী সুশীলাবালা দিনে তিনশো, সাড়ে তিনশোবার ডাক দিতেন "ছোটবৌমা!"

সবগুলো ডাকের হিসেব দিতে না পারি, আমি জানতাম সুশীলাবালা বেশীর ভাগই এমন সব কাজে ডাকেন, যার জন্যে না ডাকলেও চলে। যেমন "ছোটবৌমা, কাল থেকে আমার পানে সুপুরি কম দিও, ছোটবৌমা, আমার বিছানাটা একবার রোদে দিলে পার, ছোটবৌমা, ভিজে কাপড়গুলো সব মেলা হয়েছে? ছোটবৌমা, তখন সদরে কে কড়া নাড়লো?" নিদেন পক্ষে একথাও বলবেন, "ছোটবৌমা ঘরে আজকাল পিঁপড়ের উপদ্রব এমন বেড়েছে কেন বলতো?"

বুলার বিধবা বড় জা ডাকতেন দিনে অন্ততঃ নশো নিরানব্বইবার। "বুলা, উনুনটা ধরিয়ে দাও এবার, বুলা, চায়ের জল চাপিয়েছ? বুলা, এখনো তোমার কুটনো কোটা হয়নি? বুলা, ময়দাটা কখন মাখবে? বুলা, হাত চালাও চটপট।"

বুলার আইবুড়ো ননদ ঊষা বুলার চাইতেও যে বয়সে বড়, আর বুলার বিয়ের আগে থেকেই যে বিছানায় পড়ে আছে, সে চিঁচিঁ গলায় যখন তখন ডাকে, "ছোট বৌদি, তোমার হলো?"

বুলা তাড়াতাড়ি কাছে যায়, বলে, "কি ঊষা কি?" ঊষা মুখ ঝামটে বলে "কিচ্ছু না। কিছু বলিনি।"

বিধবা বড় জায়ের অনেক বয়সের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, তারা প্রত্যেকেই অনেকবার করে ডাক দেয় "ছোটকাকী!"

"ছোটকাকী আমার নীল খাতাটা যে এখানে ছিল?

"ছোটকাকী, আমার বেল্টটা কোথায় রেখেছ?..." "ছোটকাকী আমার স্কুলের বেলা হয়ে গেল।" "ছোটকাকী দেখ না ও আমায় মারছে।"... "ছোটকাকী আমার ফিতেটা বেঁধে দিয়ে যাও না।"

ছোটবৌমা, ছোটবৌদি, ছোটকাকী।

একই নামের হের-ফের। কথাগুলোও একই ভাবের, "একই সুরের শুধু অক্ষরের হেরফের।

তবু বুলাকে আমি কোনদিন রাগতে দেখিনি। বুলো সব দিন, সব সময় হাসছে, সব সময় কাজ করছে, সব সময় ছেলেমেয়েদেরকে বকছে ধমকাচ্ছে, ফিতে বেঁধে দিচ্ছে, জামায় সাবান লাগাচ্ছে। ঊষা যেন ওর চাইতে ছোট এইভাবে তাকে ভোলাচ্ছে। আমার কাজও করে দিয়েছে কতদিন, ডেকে সেধে। 'ও কি ভাই, সেফটিপিন দিয়ে জামা পরেছ কেন? দাও বোতাম বসিয়ে দিই।' আমি 'না না'—করলে হাসতো, ইস্ ছেলের কী লজ্জা!

এই বুলা।

একে চট করে চটানো যায় না। তাই বুলার পাশের বাড়ীর জানলা দেখায় চাঞ্চল্য দেখে আড়ালে আড়ালে শুধু এক আধটা মন্তব্য, শুধু সংসারের প্রত্যেকটি সদস্যের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়। সে দৃষ্টির অর্থ হচ্ছে 'এ মেয়ে আর ঘরে থেকেছে!'

বড় জায়ের বড় মেয়েটা, যে এই সবে ক্লাশ নাইনে উঠল সেও যোগ দেয় এই দৃষ্টি বিনিময়ে, সেও কোন এক সময় এসে ফিস ফিস করে 'ছোটকাকীর একটা খামে চিঠি এল।' বলে 'ওবাড়ীর বিজুকাকার যেন আর কাজ নেই, খালি ছোটকাকীর ঘরের জানলার দিকে তাকিয়ে আছেন।'

'এর জানলা খোলা তো?' সুশীলাবালা হিস্‌হিসিয়ে বলে ওঠেন।

'খোলা তো সব সময়।' ঠোঁট উল্টে বলে নাতনী।

আর অমনি সকলের মনের মধ্যে একটা আশংকা ঘুলিয়ে ওঠে 'ভগবান জানেন কী সর্বনাশ করবে!'

ভগবান থেকে এবার সকলেই জানলো।

সর্বনাশের মত সর্বনাশ করেছে বুলা, শ্বশুরে বাড়ীর এই সহস্র বন্ধন ছিন্ন করে পালিয়েছে।

'অনেকদিনই জানতাম।' বললো বড়জা, 'বিজুকে আমি চিঠি ছুঁড়তে দেখেছি নিজের চক্ষে।'

সুশীলাবালা কপালে ঘা মেরে বলেন, 'আমি আরও আগেই জানতাম। টের পেয়েছিলাম ওর গুণে। নইলে আর আমার সুখেন সন্ন্যাসী হয়।'

মাসীমার এ কথার কেউ প্রতিবাদ করে না করলে মাসীমা রেগে আটখানা হবেন ভেবে, না প্রতিবাদ করলে বুলার অপরাধের ওজনটা কমে যাবে ভেবে, কে জানে!

নইলে অনায়াসেই তো বলতে পারা যেত 'সুখেন তো তোমার বরাবরই স্বামীজীদের পায়ে পায়ে ঘুরতো, আঠারো বছর বয়েস থেকেই তো সুখেন হাফ-গেরুয়া। মিশন থেকে ধরে এনে তো বিয়ে দিয়েছিলে ওর।'

প্রতিবাদ করা রোগ আমার একটু ছিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারলাম না। কারণ আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা চাকরী ধরে বসেছি ইস্তক মাসীমা মেসোমশাই আমার সংগে কথা কন না।

নইলে আমি আর এ বাড়ীর জানি না কি? সুখেনদার 'স্বামীজী-গিরির' গোড়া থেকেই তো জানি।

সত্যি বলতে কি, ছেলেটার চেহারা ছিল অতীব সুন্দর। ছেলেবেলায় বলতে গেলে আমি একরকম ওর রূপে বিমোহিতই ছিলাম। ও যদি মানুষের মত হতো, নির্ঘাৎ তাহলে এ বাড়ীতে একটা প্রেমে পড়াপড়ি ব্যাপার ঘটতো।

কিন্তু ষোলো সতের বছর বয়েস থেকে ওর ওই পাকামি দেখা দিল। ওই স্বামীজী-গিরি। ছুটি হলেই মঠে মিশনে ছোটা, যত সব ধর্মগ্রন্থ আর মহৎ জীবনী এনে পড়া, মেয়েদের দিকে তাকিয়ে না দেখা, এইসব নানা দুর্লক্ষণ! আমি প্রথমটায় ঠাট্টার চোটে ওর ঘাড় থেকে ভূত নামাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম সুখেন একেবারে বেদম সিরিয়স।

হাল ছেড়ে দিয়ে লেখাপড়ায় মন দিলাম।

ওদিকে ক্রমশঃ সুখেন পাকামিতে আরও দুরন্ত হয়ে উঠল, চিন্তায় পড়ে মাসীমা ওর বিয়ের ঠিক করলেন, আর বিয়ের আগের দিন সুখেন ভাগলো।

তারপর সে কত কাণ্ড কত ছিপ্টি করে ধরে আনা, প্রায় পুলিশ প্রহরার মত পাহারা দিয়ে বিয়ে করতে পাঠানো—নামান ইতিহাস।

কিন্তু বেশ দেখিয়েছিল সুখেন বিয়ের পর কটাদিন। জরিপাড় ধুতি পরেছিল, মাথায় গন্ধ তেল মেখেছিল, রোজ দাড়ি কামিয়েছিল। রাত বারোটা পর্যন্ত ধর্মগ্রন্থ পাঠের সদভ্যাস ত্যাগ করে সন্ধ্যে থেকে শোবার ঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করেছিল।

তখন আবার বাড়ীতে সে কী হাসাহাসির ঘটা! মাঝে মাঝে সে হাসি তিক্ত হাসিতেও পর্যবসিত হচ্ছিল। 'ছি-ছি-ছি। লাজলজ্জার বালাই নেই'...'বকধার্মিক আর কাকে বলে?' ...'খুব দেখালি বাবা যা হোক।'...আর সমালোচনা চলেছিল বুলার। 'কী পাকা মেয়ে এলো গো বৌ হয়ে! তপস্বীকে তপঃভ্রষ্ট করতে পারে, সে মেয়ে কি সোজা?'

একদিন মাসীমা এমন কথাও নাকি বলেছিলেন, তাঁর সাধু ছেলেকে এভাবে অধোগামী করায় নাকি বুলার মহাপাপ ঘটছে। শাস্ত্রে নাকি এই রকম স্ত্রীলোককেই 'পাপিষ্ঠা' বলে। স্ত্রী হচ্ছে সহধর্মিণী, স্বামীর ধর্মপথের সহায়। পড়নি রামকৃষ্ণর জীবনী? সারদামণির জীবনী?'

তা' বেশীদিন আর বুলাকে এ সব শুনতে হয়নি। খুব তাড়াতাড়িই চৈতন্য হয়েছিল সুখেনের। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার বেলা ধরা পড়লো সেটা।

ঘুম থেকে উঠেই নাকি কোথায় চলে গেছে সুখেন।

কোথায়? কোথায়?

একটু পরেই জানা গেল 'কোথায়।' গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল সুখেন। স্নানান্তে এসে ঘোষণা করলো আজ সে নির্জলা উপবাস করবে, কাল থেকে তিন-দিন মৌনী থাকবে, আর চারদিনের দিন আনুষ্ঠানিকভাবে সংসার ত্যাগ করবে। আর আটকাবার চেষ্টা করলে? একেবারে নিরুদ্দেশ।

সেই একদিনই মাত্র আমি বুলার চোখে জল দেখেছিলাম। গাল দুটো কাঠের মত শক্ত আর কালো কালো দেখাচ্ছিল, সেই গালের উপর একটা জলের রেখা গড়াচ্ছিল, আর শুকিয়ে যাচ্ছিল।

পরে একদিন বলেছিল বুলা, 'সেদিন দুঃখে কাঁদিনি আমি, কেঁদেছিলাম অপমানে।'

কিন্তু ওই সেই একদিন!

তারপর আর কেউ কোনদিন বুলার মুখ মলিন দেখেনি।

কিন্তু সেও তো ভাল না?

সেও তো দোষের, সেও তো নিন্দের?

স্বামী যার স্ত্রীকে ত্যাগ করে নিবৃত্তির পথে গেছে, তার কি করে প্রবৃত্তি হয় হাসতে, কথা বলতে, বাচ্চাগুলোর সঙ্গে হুড়োমি করতে? বাচ্চারা একেবারে 'ছোটকাকী' বলতে অজ্ঞান! হবে না কেন? ছোটকাকীর মত এত রং ঢং আর কে করবে? এত পদ্য, এত ছড়া, এত গল্প, এত নাটক শিখলই বা কি করে বুলা? এই তো বাড়ীতে আরও তিনটে মেয়েমানুষ আছে, তাদের মধ্যে এত কথা কে কয়? এত গান কে গায়?

দিনগত পাপক্ষয়ের ধারশোধ করতে করতেই তো মরে যাচ্ছে সবাই। অথচ বুলা, যার প্রাণের মধ্যে প্রাণ থাকবার কথা নয়, মরমে মরে যাবার কথা, তার যেন ষোলো আনার উপর আঠারো আনা প্রাণের ঢেউ।

আর সে ঢেউ যে পাশের বাড়ীর জানলায় গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে, তাও তো জানতে কারুর বাকী ছিল না?

'স্বামীকে বাঁধতে পারলি না, পর-পুরুষকে বাঁধছিস?' এ উক্তিটা হয়তো অনুক্ত থাকতো, কিন্তু তার ঝাঁজটা ছড়িয়ে পড়তো বুলার উপর।

স্বামীকে অধোগামী করলে বুলার হয়তো মহাপাপ হতো, কিন্তু সংসারটার তো একটা সুরাহা হতো? ইশারায় ইঙ্গিতে একথা সবসময় শুনতে হতো বুলাকে।

সুখেনের বিরহযন্ত্রণাটা ক্রমশঃই ফিকে হয়ে আসছিল, কিন্তু সংসারের একমাত্র রোজগারী ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে মঠে গিয়ে উঠলে সংসারে যে অসুবিধে সেটা তো আর

'সেদিন দুঃখে কাঁদিনি আমি, কেঁদেছিলাম অপমানে'

ক্রমশঃ ফিকে হয়ে যায় না, বরং ক্রমশঃ ঘোরালোই হতে থাকে।

নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলো ভেঙে যায়, ছিঁড়ে যায়, ক্ষয়ে যায়, আর কেনা হয়ে ওঠে না, দৈনন্দিন প্রয়োজনের সীমানা সংকীর্ণ করে আনতে হয়, করতে হয় আরও কত কত ছাঁটাই! রান্নার লোক ছিলই না, এক-মাত্র চাকরটাকেও ছাড়িয়ে দিতে হয়।

আর—

আর মাস কাবার হলেই বড় বৌদির মেজ মেয়েটা আমাদের দোতলায় উঠে এসে চুন চুন' মুখে বলে, "দিদা বললেন, ভাড়াটা এমাসটাও দিতে পারলেন না—"

আরও কিছু হয়তো শেখানো থাকতো তাকে, আরও একটু বিনয়বাদী, আরও কিছু মিনতি, কিন্তু বলতে পারে না বেচারা, ড্যাস টেনে চুপ করে যায়।

আমি জানি, আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে যতই আত্মীয়তা ভাব থাকুক, এ কথায় মার ভুরুটা কুঁচকে ওঠে, বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, কিন্তু মেয়েটা মাটির দিক থেকে চোখ তোলে না বলেই সে দৃশ্য থেকে রক্ষে পায়।

রাজেনবাবু আর সুশীলাবালা, তাঁদের বিধবা বড়বৌ আর দু'ন মেয়ে, সকলেরই মনে হ'তো সংসারকে এই অসুবিধেয় ফেলার জন্যে বুলাই দায়ী, বুলারই ক্যাপাসিটির অভাব এটা। এর জন্যে বুলার লজ্জিত অপরাধী অপরাধীভাবে থাকা।

কিন্তু বুলা তা থাকে না।

বুলা একেবারে অনারকম।

বুলা যে এ বাড়ীর বৌ, সে কথা যেন ভুলে গেছে বুলা। বাড়ীর বড় আই-বুড়ো মেয়ের মত থাকবে সে।

কিন্তু এটা কে বরদাস্ত করতে পারে?

তাই সবাই আড়ালে অস্ফুটে বলেছে

'এ বৌ আর ঘরে থেকেছে! বলেছে 'না জানি কি সর্বনাশ করবে?' শুধু উষা নিশ্বাস ফেলে বলেছে 'আমার জায়গাটা ছোট বৌদি সমস্ত দখল করে নিয়েছে।'

কিন্তু বুলা যখন চলে গেল, সব জায়গা ছেড়ে দিয়ে, তখন আরও অনেক জোর নিশ্বাস ফেললো উষা। বললো, 'পৃথিবীর সবাই যা খুশি করতে পারে।'

কিন্তু এ কী খুশির খেলা?

সংসারের মুখে আগুন লাগাবার, সংসারের পাঁজর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করবার খুশি কেন জাগল বুলার?

আমিও ভাবলাম বুলার সঙ্গে এই খুশিটাকে যেন ঠিক খাপ খাওয়ানো যায় না।

আগেকার আমলে ঘরের বৌ ঝি কুল-ত্যাগ করলে কেউ হৈ চৈ করতো না। 'রাত্তিরে কলেরা হয়ে মারা গেছে, রাত্তিরেই দাহ করা হয়ে গেছে,'...'মাঝরাতে সাপে কেটেছিল শেষরাতে কলার ভেলায় করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে', এমনি একটা কিছু রটনা করে সমাজের মুখোমুখি আক্রমণ থেকে রক্ষা পেত লোকে।

ভিতরে ভিতরে তো সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, 'ঢাকে ঢোলে কাঠি' শুধু উলু দিতে মানা!'

এখন সমাজ নেই, জাত যাবার প্রশ্ন নেই, তাই মিথ্যা রটনারও প্রয়োজন নেই। এখন বৌ মেয়ে হারিয়ে গেলে, যত পারো হৈ চৈ করা চলে, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া চলে। 'ফিরে এসো' বলে কাকুতি মিনতি করা চলে।

রাজেনবাবু অবিশ্যি কাগজে ছাপালেন না, কিন্তু বাড়ী ছাপিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মনের জ্বালা যন্ত্রণা জানিয়ে এলেন। আর বাড়ীতে যতটা সম্ভব চেঁচিয়ে রায় দিলেন, 'আজ থেকে যদি কেউ সেই হারামজাদীর নাম মুখে আনবে তো তাকে জ্যান্ত গোর দেব।' বললেন 'এ বাড়ীতে যেন তার চিহ্নমাত্র না থাকে, সব পুড়িয়ে জ্বালিয়ে নির্মূল করে দাও।'

বুলার চারটি বই ছিল, সেগুলো টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে উনুন ধরাবার জন্যে ঘুঁটের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন সুশীলাবালা, বুলার বিয়ের সময় তোলা ছবিখানা দেয়াল থেকে নামিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে কাচখানা ভাঙলেন, তারপর বড় নাতনীকে বললেন, "এর থেকে সুখেনের ছবিটুকু কাঁচি দিয়ে কেটে রেখে বাকীটা উনুনে ফেলে দিগে যা।'

বুলার বড়জা নরম নরম মুখে বললো, ওর তোলা গহনাগুলো কি আপনার কাছে ছিল মা? না ওর কাছে?'

'আমার কাছে আবার কি?' সুশীলাবালা দাঁতে দাঁত চাপলেন 'ঢলানি সর্বনাশী আমার কাছে কবে কি রেখেছে?'

'তাহলে সেগুলো নিয়েছে।' বড়জা বললো আরও নরম নরম মুখে। 'এক বস্ত্রে চলে গেছে বুলা'—এ তথ্যটুকু অন্তত পাড়াপড়শির মনকেও কিঞ্চিৎ নরম করে আনতে পারে ভেবেই কি বড় বৌ মুখটা অত নরম করলো?

আমি অবাক হয়ে চাইলাম ওর দিকে, ভাবলাম ভুলে গেল নাকি? এত স্পষ্ট ঘটনা ভুলে যেতে পারে মানুষ?

বেশী গহনা ছিল না বুলার। মামারা বিয়ে দিয়েছিল। তবু দিয়েছিল মোটামুটি। সে গহনাগুলো তো একখানি একখানি করে বেচেছে বুলা বড় জায়েরই বাপের বাড়ীর স্যাকরার কাছে। বড় জাই ডেকে দিয়েছে।

আমি যেন কেমন করে সব টের পেয়ে যাই। গহনা বেচার সময় বড়জা যে প্রথমটা অপ্রতিভ অপ্রতিভ হয়ে 'না না' করেছিল এ কথা আমি জানি, আর বুলা যে একটা অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে সে আপত্তি খণ্ডন করে-ছিল সেও জানি।

বুলার নাকি গহনা পরতে ভাল লাগে না। আর পরতে যখন ভালই লাগে না, তখন নিয়ে কি হবে? বাক্সে পড়ে পড়ে পচা বৈ তো নয়!

এত সব কথা বড় বৌদি কি করে ভুলে গেল, ভেবে অবাক লাগল আমার। কিন্তু কিছুতেই কেন তখুনি মনে করিয়ে দিতে পারলাম না কে জানে।

উষা আমারই বয়সী, উষা ছোট বৌদি বলতো, কিন্তু আমি বলতাম না। আমি 'বুলা' বলতাম। বলতাম 'তুমি এত খাটো কি করে বলতো?' বুলা হেসে বলতো, 'খাটো মানুষদের যে খাটাই সর্বার্থ, না খাটলে কি নিয়ে তারা থাকবে-বল তো?

'বুলা সুখেনদাকে একটা চিঠি লিখবো?'

'আর লোক হাসিও না ভাই।'

'কিন্তু স্ত্রী সংসার, বুড়ো মা বাপ, সকলের দায় এড়িয়ে সন্ন্যাসী হওয়াই কি ধর্ম?'

'ধর্ম, একথা আবার কখন বললাম?'

'চৈতন্য করে দেওয়া উচিত নয় ওকে?'

বুলা হেসে উঠে বলতো 'অচৈতন্য হওয়াই যার লক্ষ্য, তাকে একখানা চিঠির ঢিল ফেলে চৈতন্য করাতে পারবে?'

বুলা চলে যাওয়ার পর থেকে ওদের ওখানে আমার যেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু আরও বেশী বেশী যেতে হয়। বাড়ী ভাড়া যত জমছে, মাসীমা ততই আমাকে আদর করে করে ডাকছেন, আর সংসারের যত অভাব অভিযোগের কথা বলছেন কেঁদে কেঁদে।

কাঠ হয়ে বসে বসে শুনতে হয় আমাকে—মাসীমার সমস্ত কাপড় ছিঁড়ে গেছে, আর কিনতে পারা যাচ্ছে না, মেসোমশাইয়ের আর ওষুধ আনা হয় না, বড় বৌদির ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুল ছাড়িয়ে নেওয়া ছাড়া গতি নেই, আর উষা তো স্রেফ পথ্যির অভাবেই তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছে।

না, কথাগুলো সুশীলাবালার বানানো নয়। রাজেনবাবুর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাগুলো ফুরিয়ে যাওয়া ইস্তক সংসারে দারিদ্র্যের চেহারা কদর্য হয়ে উঠছে, দেখতে পাচ্ছি চোখের ওপর। এ আক্ষেপগুলো বানানো নয়, বানানো হচ্ছে শুধু শেষ আক্ষেপটা।

'কী জানি, কী কালনাগিনীই ঘরে এনে-ছিলাম মা, সংসারটা বিষে জর্জর হয়ে গেল!'

অর্থাৎ এইসব কিছুর জন্যেই বুলাই দায়ী।

ভয়ানক একটা রাগ হতো, কিন্তু কী বা বলবো। বুলার হয়ে কিছু বলবার জো কি!

বুলার হয়ে তো দূরের কথা, বুলার কথাই কি বলবার জো আছে? বুলা যে লুকিয়ে অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করেছে, আর

বুলা সিনেমায় নামবে বলে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে, এ গল্প ঊষার কাছেও করতে সাহস করেনি।

কিন্তু এ গল্প কি চাপা থাকে?

আগুন কি আত্মপ্রকাশ না করে ছাড়ে? খবরের আগুন এসে লাগল রাজেনবাবুদের বাড়ী। বড় বৌদির বড় মেয়ে নিয়ে এল সেই আগুন।

বুলা সিনেমায় নেমেছে।

কোন এক সিনেমা পত্রিকায় ছবি দেখে এসেছে সে। নবাগতা বুলা ব্যানার্জির ভাবেভরা হাসিভরা মুখের ছবি।

সাহিত্যিক বিজয় বোসের লেখা বইতে বুলার অভিনেত্রী জীবন সুরু।

বিজয় বোস!

অর্থাৎ ওদের বাড়ীর বিজু। অর্থাৎ সমাধান হলো একটা ধাঁধার, মীমাংসা হলো একটা অমীমাংসিত অঙ্কের। বুলা চলে যাওয়া থেকে আজ পর্যন্ত যেটা জিজ্ঞাস্যর প্রশ্নের মত তীক্ষ্ণ হয়েছিল।

বুলার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বিজুও যদি বাড়ী থেকে অন্তর্হিত হ'তো, তাহ'লে দুই আর দুইয়ে চারের হিসেব মিলিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা যেত, কিন্তু তা' তো হয়নি। বিজু দিব্যি বাড়ী বসে আছে, অবিকল অবিচল।

অতএব কি আর করা যায়?

বিজুদের বাড়ী গিয়ে তার মা বাপকে যাচ্ছেতাই করা যায় না, যায় না পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াতে। পারা যায় শুধু এ বাড়ীর লোকদের ও বাড়ী যাওয়া বন্ধ করতে।

বিজু সাহিত্যিক, বিজুদের বাড়ীতে অগাধ পত্র পত্রিকা, তাই বড় বৌদির মেয়ে দুটোর ওইটাই ছিল পড়ে থাকবার জায়গা, আর বিছানার রোগী ঊষার ও-বাড়ীটা ছিল লাইব্রেরী।

'ওই পাজীটার বাড়ী যদি আর যাবি তো ঠ্যাং খোঁড়া করবো তোদের।' বলে রেখেছেন রাজেনবাবু নাতনীদের। অতএব ওদের অসুবিধে ঘটেছে বিস্তর। কিন্তু 'লুকো-চুরির' ছিদ্রপথ বন্ধ করবার মত আইন আর পৃথিবীর কবে কোথায় হয়েছে?

সেই পথেই অগ্নিস্রাবী খবরটা এসে পৌঁছল এ বাড়ীতে। উত্তেজনার মাথায় ভুলে গেল এরা 'কোথা থেকে জানলি?' উত্তর দিতে হবে।

'কই আন তো সে বই দেখি?' বললো বড় বৌদি। মেয়েরা এনেছিল আগেই, এখন বিছানার তলা থেকে বার করে দেখাল।

দেখল বড়বৌ, দেখল তার বাকী ছেলে-মেয়েরা, দেখল ঊষা। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ছবি নিয়ে, বাঁচানো গেল না কর্তা গিন্নীর কান।

বোমার মত ফেটে পড়লেন সুশীলাবালা, 'কী বললে বৌমা?' বললেন, সেই লক্ষ্মী-ছাড়া নষ্ট মেয়েমানুষটার কথা নিয়ে এখনো এত কথা কেন তোমাদের?' বললেন, 'জাহান্নামে যাক সে, নরকে যাক, তার ছবি এনে বাড়ী ঢুকিয়েছ তোমরা কোন লজ্জায়?' বললেন, 'দূর করে ফেলে দাও। মুখখানা আস্তাকুড়ে ঘসটে দাও পা দিয়ে।'

রাজেনবাবু পাগলের মত হাত পা ছুঁড়ে চেঁচাতে লাগলেন 'কোথা থেকে জানলি বল? বল? জবাব দে?' জবাব দেবার ক্ষমতা অবশ্য ওদের আর থাকে না। রাজেন-বাবু চেঁচাতেই থাকেন, 'কেটে কুচিকুচি করবো সব কটাকে, খুন করে ফাঁসি যাবো। আলোচনার আর প্রসঙ্গ জুটছে না? জগতে ঘেয়ো কুকুর নেই? পচা ইঁদুর নেই? নেই কৃমিকীট, নর্দমার পোকা? তাদের নিয়ে আলোচনা করতে পারো না?"

এরপর সত্যিই বন্ধ করতে হলো লুকো-চুরি, সত্যিই এ বাড়ীতে বন্ধ হলো বুলার প্রসঙ্গ।

কিন্তু রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে যে বুলার মুখের পোস্টার। 'নবাগতা', কিন্তু মুখখানা যে দেখাবার মত।

'দেশত্যাগী হতে হবে এবার।'

বলেন রাজেনবাবু।

'গলায় দড়ি দিতে হবে এবার।'

বলেন সুশীলাবালা।

আর ঊষা শুয়ে শুয়ে ভাবে, 'দেশত্যাগী হ'বার ইচ্ছেটা বাবার যদি আরও অনেক উগ্র হতো!'

বাবা গেলে, মা নিশ্চয় সঙ্গ ছাড়বে না, আর ঊষাকে কি ফেলে রেখে যাবে মা বাপ?

কিন্তু রাজেনবাবু ইচ্ছের চাইতে সুশীলা-বালার ইচ্ছেটা যদি বেশী জোরালো হয়?

বোধ করি অনেকক্ষণ ভেবে উষা আমার কাছে বলেছে নিশ্বাস ফেলে, 'কি মনে হয় জানো রানু, তা'তেও বুঝি কিছু বৈচিত্র্য হবে আমার। তবু তো বাড়ীতে কিছু বদল হবে?'

বললাম, 'বুলা চলে গেল, অতবড় বদল হলো—'

উষা বললো 'চুপ চুপ, সর্বনাশ! মুখে এনো না ও নাম, গলা কাটা পড়বে তোমার!'

কিন্তু বুলা আছে হাতের বাইরে, বুলার বোধ করি ভয় নেই গলাকাটা পড়ার, তাই সেই নাম স্বাক্ষর করে জলজ্যান্ত একটা চিঠিই পাঠিয়ে বসে এ বাড়ীতে।

এ বাড়ীতে একবার আসতে চায় বুলা, একবারটি দেখা করতে চায় এদের সঙ্গে।

'কী বললি? আসতে চায়? দেখা করতে চায়? সেই অনুমতি চেয়ে চিঠি দিয়েছে? উঃ, মেয়েমানুষের মত দুঃসাহস? এত বড় বুকের পাটা?"

বললেন রাজেনবাবু, বললেন সুশীলাবালা, বললো তাদের বাড়ীর বড়বৌ। ছোট বৌয়ের আস্পর্ধা দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল সবাই।

চিঠিখানা যতগুলো কুচি করা সম্ভব, তা করে পুড়িয়ে ফেলা হলো।

আর একদিন অফিসে আসে বুলা।

বড় গাড়ী করে।

পরিচালকের গাড়ী। এসে মুখ নীচু করে টেবিলে পিন ঘষে খানিকক্ষণ, তারপর বলে, 'ওবাড়ীর খবর কি?'

'তাতে তোমার কি দরকার বুলা?' আমি বলি হতাশ হয়ে।

বুলার চোখে জল টলটল করে। সেই হাশিখুশি বুলা।

আমি বলি, 'ওরা তোমার নাম মুখে আনে না বুলা, তোমার চিঠি ছিঁড়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।'

বুলা মাথা তুলে বলে, 'তা ছাড়া আর কি করবে বল? আমি ওদের মুখ পুড়িয়েছি।'

মুখ নিচু করে বসে রইল একটু, তারপর মুখ তুলে বলল, 'বুঝতেই পারছি আমার মুখ ওঁরা আর দেখতে পারবেন না। তুমি আমার একটা কাজ করবে রানু? একটা জিনিস পৌঁছে দেবে ওখানে?'

আমি হাত জোড় করি, বলি, 'তোমার জিনিস ডাস্টবীনে যাবে বুলা, যাবে আগুনে।'

বুলা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তবে কি হলো রানু? তবে কি জন্যে—' কথা শেষ করে না বুলা, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

কিন্তু তবু বুলা হার মানে না, চেষ্টা ছাড়ে না। সুশীলাবালা যে বলেন, 'সাংঘাতিক মেয়ে জাঁহাবাজ মেয়ে', মিথ্যে বলেন না। বুলার বুকের পাটা দেখে আমিও স্তম্ভিত হয়ে গেছলাম। প্রত্যক্ষই দেখেছিলাম কি না। ছিলাম সেখানে দাঁড়িয়ে, পিয়ন এসে 'সুশীলাবালা দেবী'র খোঁজ করছে, আমিই বলে দিলাম।

সুশীলাবালার কাছে পিয়ন!

হ্যাঁ টাকা এসেছে রেজিস্টার্ড ইনসিওরে, সই করে নিতে হবে। পাঠিয়েছে বুলা ব্যানার্জি।

টাকা পাঠিয়েছে বুলা, সুশীলাবালার নামে! স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ কী ধৃষ্টতা বুলার, এ কী দুর্মতি! কাঁটা হয়ে উঠি। কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি ভয়ংকর একটা ঝড়বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্রপাতের আশংকায়। কি হয়, কি হয়!

ভয় করছে পিয়নটার জন্যে। নিরপরাধ লোকটা না মার খায়। বাড়ীসুদ্ধ সবাইতো হুমড়ে এসে পড়েছে এখানে।

কিন্তু ঝড়বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্রপাত কিছু হল না, হঠাৎ যেন সমস্ত প্রকৃতি থমথমে হয়ে গেল!

মিনিট খানেক সমস্ত নিথর।

তারপর সুশীলাবালার গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল 'কে পাঠিয়েছে বললে?'

'বললাম তো, বুলা ব্যানার্জি। সইটা করে দিন তাড়াতাড়ি।'

ক—কত টাকা?

'দু হাজার!'

'দু হাজার'! আমার মনে হল শব্দটা যেন সমস্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, সকলের মুখ থেকে উঠলো তার প্রতিধ্বনি।

'নেবার দরকার নেই, ফেরৎ দিয়ে দাও।'

ধরা ধরা গম্ভীর গলায় রায় দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন রাজেনবাবু। উচ্চারণটা কেমন যেন দুর্বল শোনালো, চলে যাওয়াটা শিথিল দেখালো।

'রানু, কি করি বল তো মা?'

বললেন সুশীলাবালা।

'আমি কি বলবো!' বললাম ধূসর গলায়। সত্যিই তো কি বলবো? এ টাকা যখন ফেরৎ যাবে, বুলার মুখটা কি রকম হয়ে যাবে, আমাকে দেখতে হবে না এইটাই যা রক্ষে।

আমি উত্তর দিলাম না, দিতে পারলাম না। আমার হয়েই যেন উত্তর দিল বড় বৌদি; 'ফেরৎ দিলে অবশ্য মনে খুবই আঘাত পাবে। যতই হোক পাঠিয়েছে আশা করে।'

'সেই কথাই ভাবছি। অথচ তোমার শ্বশুরের যা মেজাজ দেখলাম—'

'সইটা করুন তাড়াতাড়ি—' অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে পিয়নটা, 'না তো লিখে দিন নিতে চান না।'

'নাঃ বাবু, তুমি যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ, একটু ভাবা চিন্তার সময় দিলে না। দাও, কোথায় সই দিতে হবে বল।'

প্রকৃতির সমস্ত রোষ কেমন করে যেন নিবৃত্ত হয়ে গেছে। উদ্দাত ঝড় শান্ত নিরুদ্দাম। শুধু মেঘমুক্ত আকাশে এক চিলতে বিদ্যুৎ চমকালো, 'দেখলে তো বড়-বৌমা, মিথ্যে বলি আমি? দেখলে তোমার ছোট জাটির বুকের পাটা?'

পিয়নটা মার খেল না দেখে বেঁচেছিলাম, কিন্তু পায়ের কাঁটাগুলো মিলোতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল আমার।

ছেলে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আজ মা-মণি আসবে! 'আজ মা-মণি আসবে! কী মজা, আসবে আজ মা-মণি। সকাল থেকেই মন্তু হল্লা শুরু করে দিয়েছে।

'মোটেই আজ আসবে না।' জেঠতুত ভাই পিন্টু খেপাতে এল।

'আসবে না! তুমি বললেই হবে?'

'কী করে আসবে? আজ কি রবিবার?'

'ও মা, কী বোকা! আজ রবিবার নয় তো আমি ইস্কুল যাচ্ছি না কেন?' বাবা কেন এখনো খবরের কাগজ পড়ছে? জেঠু কেন এখনো দাড়ি কামাতে বসেনি?' ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল মন্তু।

'কেউ আপিস-ইস্কুল যাচ্ছে না বলেই আজ রবিবার হল?' পিন্টুও চলে এল বারান্দায়।

'তবে কি আজ শুক্রবার?' মন্তু ঝাঁজিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, শুক্রবারই তো। ক্যালেণ্ডার দ্যাখ না।' হাত ধরে ঘরের দিকে টানল তাকে পিন্টু।

মন্তু ক্যালেণ্ডারের কী বোঝে! তবু ফের এল ঘরের মধ্যে। পিন্টু দু' বছরের বড়, অনেক সে বেশি জানে, তাই তাকে সমীহ করতে হয়। কিন্তু আজকের বার সম্বন্ধে কী সে প্রমাণ দেয় একবার দেখা ভালো।

ক্যালেণ্ডারে একটা লাল তারিখের উপর সরাসরি আঙুল রেখে ভারিক্কি চালে পিন্টু বললে, 'কী, এটা শুক্রবার তো? আর দেখছিস, এটা লাল। তার মানে কী?'

ড্যাবডেবে চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মন্তু। কী মানে, তা সে কী জানে! তার মা-মণি এলে পারত বুঝিয়ে দিতে।

'তার মানে' পিন্টু বললে, 'আজকে শুক্রবারটা ছুটি। লালটা যে ছুটির চিহ্ন, তা জানিস তো? ছুটির দিন হলেই সেটা রবিবার হবে এমন কোনো কথা নেই। অন্য-

বার, শুক্রুরবারও ছুটি হতে পারে। তাই আজ দেখছিস তো ক্যালেন্ডার, শুক্রুরবার হয়েও ছুটি। ইস্কুল-আপিস সব বন্ধ।'

'মিথ্যে কথা।' কোনো ব্যাখ্যাতেই বিচলিত নয় মন্তু।

'কী মিথ্যে কথা?'

'ঐ যে বলছ মা-মণি আজ আসবে না। মিথ্যে কথা। মা-মণি আজ আসবে ঠিক আসবে।' রাস্তায় কী শব্দ শুনে মন্তু আবার বারান্দায় ছুটে গেল। 'ঐ এল বুঝি।'

পিছু নিল পিন্টু। কই, কিছু না, ফক্কা।

'কী করে আসবে? শুক্রুরবার তো আর তার দিন নয়।' বললে পিন্টু।

'হ্যাঁ, দিন। আজ যে বারই হোক, আজই মা-মণি আসবে। তুমি দেখে নিও।'

'তুই একটা গাধার মতন কথা বললে আমি শুনব কেন?' উকিলের মত তর্ক তুলল পিন্টু। 'যদি আজ শুক্রুরবার হয় তা হলে কোর্ট থেকে তোর মা-মণিকে আসতে দেবে কেন?'

'দেবে। দেবে।' কেঁদে ফেলল মন্তু।

কান্না দেখে পিন্টু দে-দৌড়।

'এ কী, কাঁদছিস কেন?' জেঠাইমা, সুভদ্রা দেবী, কোলের মধ্যে মন্তুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'কে কী বলেছে?'

'বড় মা, আজ রবিবার না?' ডাগর চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল মন্তু।

'না কে বলছে?'

'পিন্টু-দা বলছিল, আজ শুক্রুরবার। কোর্ট থেকে মা-মণিকে আজ আসতে দেবে না।'

'দেখেছ পিন্টুটা কী বজ্জাত! ছেলেটাকে খেপাচ্ছে। এই, পিন্টু! পিন্টু!'

কোথায় পিন্টু!

'ছেলেটা কবে থেকে দিন ঠেলছে। সেই বুধবার থেকে। কবে রোববার আসবে, কবে আসবে ওর মা-মণি!' মন্তুর মাথা ভর্তি চুলে হাত বুলুতে লাগলেন সুভদ্রা। 'এক-দিনেই কেন দুটো করে বার আসে না, দিনে একটা রাত একটা, রোববারটা কেন এত দেরি করে, কেন এত আস্তে হাঁটে—এ নিয়ে ছেলের কত আমাকে অনুযোগ।'

ইতিমধ্যে ছোট জা দীপিকা সামিল হয়েছে, তাকেই লক্ষ্য করলেন। 'তারপর বহু প্রতীক্ষার পর যদি রোববারের নাগাল পেল, তাকে বলা হচ্ছে কিনা, এটা শুক্রুর-বার। হতচ্ছাড়াটা গেল কোথায়?'

সুভদ্রার শাড়ির আঁচলে চোখের জল মুছে এক মুখ সুখ নিয়ে মন্তু বললে, 'তাহলে মা-মণি আজ ঠিক আসবে বড়-মা!'

'আসবে তো! কিন্তু এখন তো প্রায় সাড়ে দশটা—' টেবিলের উপর টাইমপিস ঘড়িটার দিকে তাকালেন সুভদ্রা।

মন্তুকে এবার দীপিকা টেনে নিল। বললে, 'বেলা হয়েছে। চলো এবার তোমাকে চান করিয়ে দি।'

সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিল মন্তু। বললে, 'না। আজ আমাকে মা-মণি চান করিয়ে দেবে।'

'রোজ তো আমিই করাই।'

'তার মধ্যে দু-একদিন মা-মণিকে ছেড়ে দিতে পারো না? মা-মণি কেমন সুন্দর আঁচল দিয়ে গা মোছায়—' মন্তুর চোখ আবার ছলছল করে উঠল। 'কত সুন্দর গল্প করে।'

'দে, ছেড়ে দে।' বললেন সুভদ্রা। 'এখুনি এসে পড়বে তপতী'।

ছেড়ে দিতেই মন্তু ফের বারান্দায় চলে এল।

দেখতে লাগল, কোথায়, কতদূরে রিকশা চলেছে। মা-মণি তো রিকশা করেই আসে। রাস্তাঘাট কোনো বারই তো ভুল হয় না। আজ দেরি হচ্ছে কেন?

খোলা রিক্সা যা দেখা যায় তা এক নজর তাকিয়েই নিশ্চিন্ত হতে পারে মন্তু। ওসব রিক্সাতে মা-মণি নেই। মা-মণির রিক্সা ছপ্পর-তোলা। অমনতর ছপ্পর-তোলা রিক্সা দূর দিয়ে চলে গেলেই মন্তুর ভাবনা শুরু হয়, বুঝি ভুল পথ দিয়ে চলে গেল! বেশ তো, এদিক দিয়ে একটু ঘুরে গেলেই হত! তাহলে মন্তু ঠিক বুঝতে পারত রিক্সাটাতে একটা বাজে লোক চলেছে।

'এই যে, এই বাড়ি।' কাছাকাছি একটা ঢাকা রিক্সা দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছে মন্তু। পারে তো রাস্তায়ই নেমে পড়ে।

রাস্তার ধারের পানের দোকানের কাছে রিক্সাওয়ালাটা কী যেন হদিস নিচ্ছে, আর পানের দোকানের লোকটা মহা পণ্ডিতের মত হাত-মাথা নেড়ে দূরের কী একটা গলির ইশারা করছে। পানের দোকানের লোকটা কিচ্ছু জানে না। শুধু ভুল খবর দেয় আর খামোকা হয়রানি বাড়ায়। ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দিতে হয় দোকানটাকে।

ঠিক হয়েছে। রিক্সায় যে যাচ্ছে সে পান-ওয়ালার কথা শোনেনি, উল্টো দিকে, মন্তু-দের বাড়ির দিকেই আসছে। জুতোর স্ট্র্যাপ আর শাড়ির পাড় দেখা যাচ্ছে। নির্ঘাৎ মা-মণি। নির্ঘাৎ।

না, অন্য কারু মা। রিক্সাটা সামনে দিয়ে চলে গেল ঘণ্টা বাজিয়ে।

পিন্টু আবার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কেন মিছিমিছি তাকিয়ে আছিস রাস্তার দিকে? তোর মা-মণি আজ আসবে না।'

টিটকিরি দিয়ে উঠল মন্তু, 'আজ শুক্রুর-বার? তাই না? আজ লাল তারিখ? হেরে গিয়ে আবার কথা কইতে এসেছে!'

'হলই বা না আজ রবিবার। কিন্তু ঘড়ি দেখেছিস?'

'কেন?' ভয় পেল মন্তু। 'ঘড়িতে কটা বেজেছে?'

'বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট।'

'মিথ্যে কথা।' ঝামটা মেরে উঠল মন্তু।

'তা ঘড়িটা গিয়ে দ্যাখ না।'

অসহায় মুখ করে মন্তু বললে, 'আমি কি ঘড়ি দেখতে জানি?'

'তা হলে যা বলছি তা মেনে নে। আরো এক মিনিট এর মধ্যে কেটে গেল। তাহলে এখন বারোটা বাজতে চার মিনিট।' পিন্টু

মরুবিস্ময়ানা চালে বললে, 'এখন যদি তোর মা-মণি আসেও মোট চার মিনিট সময় তাকে তোর কাছে পাবি। এই চার মিনিটে না হবে স্নান, না বা খাওয়া, না বা কাছে নিয়ে একটু ঘুমোনো।'

'বড় মা! বড় মা!' চেঁচাতে শুরু করে দিল মন্তু। 'দেখ না পিণ্টু-দাটা আবার আমাকে খ্যাপাচ্ছে! জ্বালাচ্ছে!'

সুভদ্রা লম্বা হাঁক পাড়তেই পিণ্টু আবার অদৃশ্য হল।

বাইরের ঘরে ঢুকল এবার মন্তু। দেখল হিমাদ্রি তখনো খবরের কাগজ পড়ছে।

'কটা বেজেছে, বাবা?' গা ঘেঁষে দাঁড়াল এসে মন্তু।

'য়্যাঁ?' চমকে উঠল হিমাদ্রি। দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। 'এগারোটা বাজে। এ কি, তোর মা-মণি আসেনি এখনো?'

এই মুহূর্তে তার জন্যে মন্তুর তত ভাবনা নেই, পিণ্টুর চালটা যে টিকল না এতেই সে খুশি। ম্লান মুখখানিতে হাসির রেখা ফুটিয়ে মন্তু বললে, 'পিণ্টুদা বলছিল বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট।'

'তা বারোটার আর বাকি কী! আসছে না কেন তোর মা-মণি?'

'কেমন করে বলি?' মুখে আরো এক পোঁচ কালি মাখাল মন্তু।

ঘড়ির দিকে আবার তাকাল হিমাদ্রি। প্রায় নিজের মনে বললে, 'আর কখনই বা আসবে! এলেও বা থাকবে কতক্ষণ। আর, ঘণ্টাখানেক তো মেয়াদ।'

হিমাদ্রির গায়ের উপরে মৃদু হাত রাখল মন্তু। বললে, 'বাবা, তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসবে?'

'না, না, আমি যাব কোথায়?' খবরের কাগজেই মন দিল হিমাদ্রি।

'আমার মনে হচ্ছে কী জানো?' খুব বিজ্ঞের মত মুখ করল মন্তু।

সর্বসমস্যাতেই মন্তুর এই কল্পনার দৌড়। আমার মনে হচ্ছে কী জানো? বলেই এক অদ্ভুত মন্তব্য।

সে মন্তব্য শোনার আর এখন স্পৃহা নেই হিমাদ্রির। স্বরে স্পষ্ট বিরক্তি এনে বললে, 'তোমার কী মনে হচ্ছে তাই জেনে তো আর কিছু এগুচ্ছে না। তুমি এখন যাও, কাকিমাকে বলো স্নান করিয়ে দিতে।'

দরজার পাশেই দীপিকা তৈরি। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'চলে এস। কেমন তোমার জন্যে নতুন তোয়ালে এনেছি দেখ। রঙিন তোয়ালে।'

'না, না, মা-মণি আসবে। মা-মণি স্নান করিয়ে দেবে।' মন্তু আর্ত প্রতিবাদ করে উঠল।

'এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই!' হিমাদ্রি আবার নিজের মনে তর্জন করে উঠল। 'ছেলেটা যে সকাল থেকে আশা করে থাকে, দেরি করে এলে যে ওর নাওয়া-খাওয়াও পিছিয়ে যায়, এতটুকু ভাবে না। সবটাই যেন ছেলেখেলা।' পরে ছেলের দিকে রুষ্ট চোখে তাকিয়ে বললে, 'না, আর দেরি নয়। বেশি দেরি করে খেলে শরীর খারাপ হবে। আজ কাকিমার হাতেই নাও-খাও গে। বৌমা, নিয়ে যাও মন্তুকে।'

চেয়ারের হাতলটা সজোরে আঁকড়ে রইল মন্তু। কান্নাভরা গলায় বললে, 'দেরি করে খেলে ককখনো আমার অসুখ করবে না। মা-মণিই আমাকে নাইয়ে-খাইয়ে দেবে। নাওয়ানোর সময় মা-মণি কেমন সুন্দর গান গায়। কাকিমা পারে গাইতে?'

নুলিয়া

-শ্রীরণেন আয়ন দত্ত
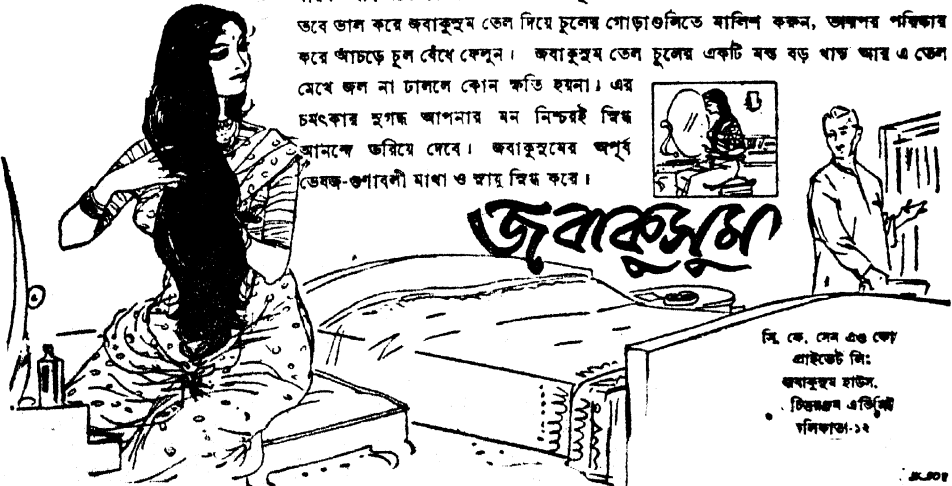
'কিন্তু তোর মা-মণি না এলে কী করা যাবে? উপোস করে থাকবি?' হিমাদ্রি ঝাঁজিয়ে উঠল।

'ঠিক আসবে, ঠিক আসবে দেখো।' বিশেষজ্ঞের মত মুখ করল মন্তু। 'এর আগে আর কোনো রবিবারেই তো মা-মণির দেরি হয়নি। আজ যখন দেরি হচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।'

'কোনো কারণ নেই।' হিমাদ্রি অস্থির হয়ে উঠল। 'দিন-তারিখ স্রেফ ভুলে গিয়েছে। এত মত্ত, কোনো দিকে, পেটের ছেলেটার দিকেও আর হুঁশ নেই—'

'মোটেই তার জন্যে নয়।' আবার বিচক্ষণ টিপ্পনী কাটতে চাইল মন্তু, 'আমার মনে হচ্ছে কী জানো?'

'তোমার কী মনে হচ্ছে তা জেনে আমাদের কাজ নেই। তুমি এখন চলো, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।' জোর করেই মন্তুর হাতের মুঠটা চেয়ারের হাতল থেকে আলগা করে নিল হিমাদ্রি। 'চলো, আমার সঙ্গেই চান করবে।'

'না, মা-মণি ছাড়া আর কারু সঙ্গে আমি চান করব না।' সাধ্যমত বাধা দিতে চাইল মন্তু।

'না, আর মা-মণি নয়।' হুমকে উঠল হিমাদ্রি।

'বা, বারোটা-পর্যন্ত তো দেখবে।' গাঢ়-সিক্ত চোখে তাকাল মন্তু। 'কোর্ট তো বারোটা পর্যন্ত টাইম দিয়েছে।'

'তা হলে তুই বারোটার পর স্নান করবি?' মন্তুর হাত ধরে আবার টানল হিমাদ্রি।

বাইরে একটা ট্যাক্সী এসে দাঁড়াল। সোয়ারিকে নামিয়ে দিয়ে টুং-টুং-টুং করে তিনটি মিষ্টি শব্দ তুলল।

'এসেছে! এসেছে! মা-মণি এসেছে।' তিনটি মিষ্টি আওয়াজ তুলল মন্তু।

কখন অজান্তে হাত ছেড়ে দিয়েছে হিমাদ্রি, মন্তু ছুটে গিয়ে তপতীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল। উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'ট্যাক্সী করে এসেছ মা-মণি?'

'হ্যাঁ, ভাগিস, তবু পেলাম ট্যাক্সীটা।' মন্তুর গায়ে-পিঠে হাত বুলুতে-বুলুতে তপতী বললে, 'না পেলে আরো কত না জানি দেরি হত।'

'কিন্তু এত দেরি করার মানে কী?' প্রায় তেড়ে এল হিমাদ্রি।

যেন কৈফিয়ৎ চাইছে। যেন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য তপতী। তবু, ভুরু দুটো আপনা থেকে একটু কুঁচকে উঠলেও চোখে মুখে রাগ আনল না। বললে, 'সম্প্রতি শ্যামবাজারের দিকে গানের দুটো টিউশান পেয়েছি। রোববার সকাল ছাড়া ছাত্রীদের নাকি সুবিধে নেই। তাই টিউশান সেরে আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'তোমার টিউশানে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই', রুক্ষস্বরে বললে হিমাদ্রি, 'কিন্তু না-নেয়ে না-খেয়ে তোমার জন্যে কতক্ষণ হা-পিত্যেশ করবে ছেলেটা?'

হাত-ঘড়ির দিকে তাকাল তপতী। বললে, 'তা খুব বেশি আর কী দেরি হয়েছে? এখন মোটে এগারোটা বেজে দশ। ছুটির দিন—'

'হোক ছুটির দিন। এগারোটার মধ্যেই ছোট ছেলেপিলেদের খাওয়া-দাওয়া সারা উচিত। সেই রকমই কথা।'

'কখন নাইতে হবে বা কটার মধ্যে খেতে হবে এমন কোনো নির্দিষ্ট কড়ার করে দেয়া হয়নি।' তর্ক করবে না ভেবেছিল, তবু তপতীর জিভে তর্ক এসে পড়ল। পর-মুহূর্তেই আবার সামলে নিল তাড়াতাড়ি। 'যাক গে, এখুনি নাইয়ে-খাইয়ে দিচ্ছি সোনাটিকে।' বলে চিবুক ধরে মন্তুকে একটু আদর করল। গলা নামিয়ে বলে, 'তোমার জন্যে সেই জিনিসটা এনেছি সেই যে সেদিন চেয়েছিলে?'

'এনেছ?' মা-মণির হাতব্যাগের দিকে লোলুপ দৃষ্টি ছুঁড়ল মন্তু।

ব্যাগের থেকে একটা কাগজের ঠোঙা বের করল তপতী। আর, ঠোঙার মধ্যে চোখ পাঠিয়ে মন্তু দেখল তার লোভনীয়তম সম্ভার, কাগজে মোড়া নানান রঙের লজেন্স আর টফি, আর ওগুলো বুঝি চকোলেট—

ঠোঙাটা তপতী মন্তুর দু হাতের মধ্যে সঁপে দিতে যাচ্ছে, ছোঁ মেরে সেটা কেড়ে নিল হিমাদ্রি। মুখিয়ে উঠে বললে, 'খাবার জিনিস এনেছ কোন সর্তে?'

'ওগুলো কি খাবার জিনিস?' তপতী হতভম্বের মত মুখ করল।

'খাবার জিনিস নয় কি দেখবার জিনিস? ঘর সাজাবার জিনিস?'

'কোনো রান্নাকরা জিনিস আনব না, এনে খাওয়াব না, যতদূর মনে হচ্ছে, এই তো আছে ডিক্রিতে।' পাংশু মুখে তাকাল তপতী।

'মোটেই তো নয়। লেখা আছে কোনো খাবার জিনিসই আনতে পারবে না, দিতে পারবে না ছেলেকে। খাবার জিনিসকে কোনোভাবেই কোয়ালিফাই করা নেই। দেখবে ডিক্রিটা? পড়ে মনে করিয়ে দেব?'

'না। তুমি যখন বলছ তখন সম্ভবত তাই আছে।'

'সম্ভবত?' জ্বলে উঠল হিমাদ্রি।

তপতী আবার নম্র হল। 'সম্ভবত নয়, যথার্থই তাই আছে। কিন্তু এ সামান্য কটা লজেন্স—খোকন কত ভালোবাসে—এ ওকে দিতে তোমার আপত্তি কী?'

'একশোবার আপত্তি। কোর্টের ডিক্রিতে যা বারণ বা নির্দেশ আছে তাই মানতে হবে অক্ষরে-অক্ষরে। এক চুল এদিক-ওদিক হতে পারবে না। তুমি যে আজ এ বাড়িতে ঢুকতে পেরেছ তাও কোর্টের কথায়। নইলে ঐ ট্যাক্সী থেকে তোমাকে আর নামতে হত না, ঐটে করেই ফিরে যেতে হত।'

'তা, সবই ঠিক। কিন্তু লজেন্সে তো কিছু সন্দেহ করবার নেই।' করুণ চোখে তাকাল তপতী। আমি তো ওর সঙ্গে এমুম

নিশ্চয়ই কিছু মিশিয়ে আনতে পারি. না যা খেয়ে আমার খোকনের অনিষ্ট হবে।'

'কী জানি কী হবে। আইনত আনতে যখন পার না আনবে না।' বলে ঠোঙাটা বাইরে রাস্তায়, গ্যাসপোস্টটার কাছে যেখানে আবর্জনার কুড় হয়েছে, সেইখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল হিমাদ্রি।

মূক শোকে মন্তু তপতীকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরল।

তপতী এবার ফণা তুলল। 'খুব বাহাদুরি দেখালে।'

'আমি কেন দেখাতে যাব? বাহাদুরি তো তুমি দেখালে!' পালটা ছোবল মারল হিমাদ্রি। 'আর কিছু পেলে না, ঢঙ করে সস্তায় কটা লজেন্স কিনে আনলে। নতুন সংসারে এর চেয়ে বেশি আর কিছু জুটল না।'

'শস্তা বলে নয়, সবচেয়ে নির্দোষ বলে লজেন্স এনেছিলাম। কিন্তু তুমি যে এখনো সেই আগের মতই ছোটলোক আছ তা বুঝিনি।'

'গালাগাল দেবে তো বাড়ি থেকে বার করে দেব।' তৈরিয়া হয়ে দাঁড়াল হিমাদ্রি। 'ছেলেকে ধরতে দেব না।'

সংঘাতে দৃঢ় হল। 'রবিবার সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ছেলে আমার হেপাজতে—হলই বা না এ বাড়িতে—আমার হাতের মধ্যে। কেন, ডিক্রির সেই সর্তটা মুখস্থ নেই? বাধা দিয়ে দেখ না। দেখ না তখন পুলিশ ডেকে আনতে পারি কিনা। পুলিশ মোতায়েন রেখে পারি কি না ছেলেকে ধরতে।'

'কী তোরা এখনো ঝগড়া করিস।' সুভদ্রা এসে তপতীকে টেনে নিয়ে গেলেন। 'এদিকে খিদেয় ছেলেটার যে কী দশা তা কারু খেয়াল নেই। যা, ছেলেটাকে নাইয়ে-খাইয়ে দে শিগগির।'

মন্তুকে নিয়ে তপতী বাথরুমে ঢুকল।

কিন্তু আজ মন্তুর স্নানটা তেমন জুতসই হচ্ছে না। মা-মণির জল ঢালাটা কেমন যেন আজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে। লাইন দিয়ে বেয়ে গিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে ভেঙে যাচ্ছে না। তা ছাড়া আজ গান গাইছে না মা-মণি। জল ধারানির গান।

বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি লাগাবার হুকুম নেই। মন্তু শুধু আলগোছে ভেজিয়ে রেখেছে। হলই বা না সে মোটে পাঁচ বছরের, তবু সে মনে করে বে-আবু হবার মত সে অপোগণ্ড নয়। শুধু মা-মণির কাছে তার লজ্জা নেই।

বাথরুমের নিরিবিলিতে মন্তু ভার-ভার গলায় বললে, 'মা-মণি, আর কতক্ষণ বাদেই তো তুমি চলে যাবে। আবার আসবে সেই আরেক রবিবার।'

'কী করব বলো।' তোয়ালে দিয়ে মন্তুর গা মোছাতে-মোছাতে তপতী বললে, 'কোর্টের তাই হুকুম।'

'কোর্টটা খুব পাজি, তাই না?'

'ভীষণ।'

'আমি যদি পারতুম এক চড়ে ওকে উড়িয়ে দিতুম।'

'তাই দেওয়া উচিত।' মিষ্টি হেসে সায় দিল তপতী।

'আচ্ছা মা-মণি, আমার ইস্কুলে তো

বনবাদাড় খালখন্দ পেরিয়ে পালকি চলে।

বৌয়ের মন চলে তারও আগে। সোঁদামাটি আর

শিউলি ফুলের গন্ধে মন আনচান।

বাপের বাড়ীর দেশ আর কতদূর?

উত্তর বাংলায় দূরান্তের যাত্রী সবচেয়ে সহজ রেলে

পূর্ব রেলওয়ে

উড়িষ্যার লোকশিল্পের নিদর্শনে।

বেস্পতিবারটাও ছুটি। সেদিন আসতে পারো না?'

'কোর্টকে বলে দেখব।'

'হ্যাঁ, দেখো না বলে। শুনেছি,' মুখে-চোখে বিজ্ঞ গাম্ভীর্য আনল মন্তু, 'কোনো-কোনো কোর্ট খুব ভালো। কথা শোনে।'

'হ্যাঁ, তারপর—' ষড়যন্ত্রীর মত গলা নামাল তপতী। 'তারপর তুমি বড় হবে। পথঘাট নিজেই সব চিনতে পারবে। কটা রাস্তার পরে এই কাছেই তো আমার নতুন বসা। ঠিক পথ চিনে চলে যাবে একদিন। আমি যদি তোমাকে নিয়ে যাই, কোর্ট আমাকে বকবে, কিন্তু তুমি যদি চলে যাও একা-একা, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না—'

'কী মজা! তখন তোমার কাছে গিয়ে পড়লে তুমি আমাকে কত খাওয়াবে, কত জিনিস কিনে দেবে, কত গল্প বলবে টার্জানের—'

'কী, এতক্ষণ কী হচ্ছে?' ভেজানো দরজায় ধাক্কা মারল হিমাদ্রি।

'বাথরুমের দরজায়ও ধাক্কা মারার বিদ্যে হয়েছে নাকি আজকাল?' তপতী মুখের রেখাটা কুটিল করল।

'তা তোমার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তো।' নিষ্ঠুরের মত বললে হিমাদ্রি।

স্নান করাবার সময় হাতের ঘড়িটা খুলে রেখেছিল তপতী, তা ফের পরতে-পরতে বললে, 'আমার দিকে লক্ষ্য রাখবার আর তোমার এক্তিয়ার কী।'

'তোমার দিকে নয়। বলতে ভুল হয়েছে। আমার ছেলের দিকে।'

'কেন, ছেলেকে আমি কী করব?'

'কে জানে কী করবে! হয়তো নিরিবিলি পেয়ে কুশিক্ষা কুমন্ত্র দেবে। তোমার কিছুই অসাধ্য নয়। তাই চোখে-চোখে রাখা দরকার।'

'স্পাইং করতে পারবে কোর্ট এমন নির্দেশ দেয়নি তোমাকে।'

'এ আর নির্দেশ দেবে কী। এ তো স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেটার কিছু অসুবিধে বা অনিষ্ট হচ্ছে কিনা এ তো খোলা চোখে পরিবার দেখবেই।'

'আমি মা হয়ে ছেলের অনিষ্ট করব?' জ্বলে উঠল তপতী।

'থাক্, বেশি বক্তৃতা দিয়ো না। ছেলেকে খাওয়াবার কথা, খাওয়াও। তারপরে পথ দেখ।' বাইরের ঘরে চলে যাবার উদ্যোগ করল হিমাদ্রি।

কী একটা তপতী বলতে যাচ্ছিল, সুভদ্রা বাধা দিলেন। 'কথার তো শেষ হয়ে গিয়েছে, নতুন করে আবার কথা কেন?' ভাতের থালা রাখলেন টেবিলের উপর। 'খিদেয় ছেলেটার মুখ শুকিয়ে গেছে। নে, খাওয়া, ছেলেটাকে দুটো মিষ্টি কথা বল।'

মন্তুর পাশে আরেকটা চেয়ারে বসল তপতী। মন্তু নিজের হাতেই খেতে পারে। শুধু তাকে একটু মেখে দিতে পারলেই সে খুশি। আর নচ্ছার ঐ মাছের কাঁটাগুলো যদি একটু বেছে দাও।

'জানো মা-মণি, যদি একটা মাছের কাঁটা গলায় বেঁধে', হাসতে-হাসতে মন্তু বললে, 'তাহলে বাবা নিশ্চয়ই বলবে তুমি ইচ্ছে করে বিঁধিয়েছ।'

চোখ নিচু করে কাঁটা বাছতে-বাছতে তপতী বললে, 'আমি নাকি ছেলের অনিষ্ট করব আর তাই কিনা এরা পাহারা দিচ্ছে!'

দীপিকা টেবিলের কাছে ঘুর ঘুর করছিল, তাকে লক্ষ্য করে মন্তু চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি এখানে কী করছ? আমার আর কিছু লাগবে না। যদি লাগে মা-মণিই

দিতে পারবে। তোমাকে সর্দারি করতে হবে না, তুমি চলে যাও।'

হাসতে-হাসতে দীপিকা চলে গেল রান্নাঘরে।

চারদিকে তাকিয়ে কেউ কোথাও নেই দেখে মন্তু বললে, 'তুমি কিছু ভেবো না মা-মণি, আমাকে একটু পথঘাটটা চিনিয়ে দাও, আমিই ঠিক চলে যাব তোমার কাছে। বলো না মা-মণি, তোমার নতুন বাসাটা কেমন? কে কে আছে সে-বাসায়?'

তপতী দই দিয়ে ভাত মেখে দিতে লাগল।

বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রিটার নকলে আরেকবার চোখ বুলোলো হিমাদ্রি।

হ্যাঁ, স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টের বিয়ে, আপোষেই বিচ্ছেদ করে নিয়েছে। আর যে কণ্টক বীজ ফাটল ধরাবার মূল সেই হিমাদ্রির বন্ধু অমিতাভকেই পরে বিয়ে করেছে তপতী। আর পূর্ব বিবাহের ফল যে একমাত্র সন্তান মন্তু, তার সম্বন্ধে আদালতের সাময়িক নির্দেশ হয়েছে যে সে তার বাবার কাছে, হিমাদ্রির অভিভাবকত্বেই থাকবে, শুধু প্রতি রবিবার দু ঘণ্টা, বেলা দশটা থেকে বারোটা, হিমাদ্রির বাড়িতে এসে তপতী ছেলের সঙ্গে থাকতে পারবে, যদি চায়, নাওয়াতে খাওয়াতে পারবে। নাওয়াতে মানে হিমাদ্রিদের বাড়ির জলে নাওয়াতে, খাওয়াতে মানে হিমাদ্রিদের বাড়ির রান্না খাওয়াতে। ঐ দু ঘণ্টার মধ্যে তপতী ছেলেকে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না, কোনো জিনিস উপহার দিতে পারবে না, চাই কি, ছেলে নিয়ে নিরালা হতে পারবে না। সকলের চোখের সম্মুখে বায় করতে হবে সেই দু ঘণ্টা।

হ্যাঁ, রবিবার, দু ঘণ্টা। আরেকবার ভালো করে দেখে নিল হিমাদ্রি। হ্যাঁ, রবিবার যে কোনো দু ঘণ্টা নয়, নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, বেলা দশটা থেকে বারোটা।

হঠাৎ দ্রুত পায়ে খাবার ঘরে ঢুকে হিমাদ্রি তপতীর হাতের তলা থেকে ভাতের থালাটা কেড়ে নিল। পরুষ কণ্ঠে বললে, 'তুমি এবার ওঠো, বারোটা বেজে গিয়েছে, চলে যাও এবার।'

'সে কী?' মূঢ় নিস্পন্দন হয়ে রইল তপতী।

'নিজের হাতেই তো ঘড়ি বেঁধে এনেছ। দেখ না কটা।'

'আহা, ছেলেটা শেষ ভাত কটা খাচ্ছে দই দিয়ে—'

'খাবে, নিশ্চয়ই খাবে। দই-মাখা ভাত ও নিজেই খেতে পারবে হাত দিয়ে। তোমাকে আর সাহায্য করতে হবে না। তোমার টাইম-লিমিট পার হয়ে গিয়েছে। উঠে এস টেবিল ছেড়ে।'

তপতী নড়ল না। বললে, 'মোটেই পার হয়ে যায়নি। আমার দু ঘণ্টা থাকবার কথা। দু ঘণ্টা হয়নি এখনো।'

'তোমার ইচ্ছেমত দু ঘণ্টা নয়। দশটা থেকে বারোটা দু ঘণ্টা। উঠে এস বলছি। আমাকে না মানো কোর্টকে তো মানবে। আর কোর্টকে যদি না মানো অন্য উপায় দেখতে হবে।'

'তার মানে গায়ের জোর ফলাবে?'

'ওভারস্টে করতে চাইলে তাই করতে হবে বৈকি। বেলা বারোটার পর তুমি তো ট্রেসপাসার—'

'একেই বলে ছোটলোক।' উঠে পড়ল তপতী।

থালাটা তখন মন্তুর সামনে নামিয়ে রাখল হিমাদ্রি। বললে, 'আর তোমাকে কী বলে

তা আর ছেলেটার সামনে শুনতে চেয়ো না।'

এই নিয়ে তুমুল শুরু হয়ে গেল।

আর সেই ঝগড়ার মধ্যে দই-মাখা ভাতকটা নীরবে খেতে লাগল মন্তু।

পরের রবিবার আবার তপতী এল। তেমনি দেরি করে।

কিন্তু আশ্চর্য, মা-মণিকে দেখে আজ মন্তুর এতটুকু উৎসাহ নেই। এতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করে আছে, দুই চোখে নেই সেই ঔজ্জ্বল্য। ছুটে এসে কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না। উথলে উঠছে না আনন্দে।

দরজা ঘেঁষে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, নায়নি, খায়নি। চুল গুলি রুক্ষ, হাতে-পায়ে ধুলো, মুখখানি শুকনো।

নিজেই ছেলের দিকে হাত বাড়াল তপতী।

কী আশ্চর্য, মন্তু গুটিয়ে গেল, পিছিয়ে গেল।

'সে কী, চান করবে না আজ?' দু পা এগিয়ে গেল তপতী।

'না।' সরে গেল মন্তু। 'কাকিমা চান করিয়ে দেবে।'

তক্ষুনি কোত্থেকে দীপিকা এসে হাজির। মন্তুর গা থেকে জামাটা খুলে নিয়ে দিব্যি তার গায়ে-মাথায় তেল মাখিয়ে দিতে লাগল।

আর দিব্যি তাই চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তপতী।

'কার হাতে খাবে?' তপতী আবার জিজ্ঞেস করল।

কেউ শিখিয়ে দিচ্ছে না, মন্তু নিজের থেকেই বলছে, 'কাকিমার হাতে।'

ম্লান রেখায় হাসল তপতী। বললে, 'কেন, আমি কী দোষ করেছি?'

চোখ নত করে মন্তু মাটির দিকে তাকাল। বললে, 'তুমি এসেই বাবার সঙ্গে ঝগড়া করো, অশান্তি করো। তাই তোমার হাতে আর নাব না খাব না।'

দীপিকা কত সহজে বাথরুমে টেনে নিয়ে গেল মন্তুকে। মন্তু একবার ফিরেও তাকাল না।

'ওর বাবা কোথায়?' পিণ্টুকে জিজ্ঞেস করল তপতী।

'বাড়ি নেই।' পিণ্টু পালিয়ে গেল সামনে থেকে।

হিমাদ্রি বারোটা বাজিয়েই তবে বাড়ি ফিরল। এসে দেখল তপতী তখনো বসে আছে।

'তোমার জন্যেই বসে আছি।' তপতী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে।

'এস বাইরের ঘরে। ঐ ঘরটাই এখন নিরিবিলি।'

দু জনে মুখোমুখি বসল দু চেয়ারে।

'তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে।'

'কী, বলো?' সমস্ত ভঙ্গিটা কোমল করল হিমাদ্রি।

'রোববার-রোববার যখন আসব তখন তুমি আমার সঙ্গে একটু ভালোবাসার অভিনয় করবে।'

'কিসের অভিনয়?' চমকে উঠল হিমাদ্রি।

'ভালোবাসার অভিনয়।'

'তার মানে?'

'ছেলেটা আজ আমার হাতে নাইল না, খেল না, কাছেই এল না। বললে, তুমি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করো, অশান্তি করো, তোমার হাতে নাব না খাব না।' বলতে বলতে তপতীর চোখ ছলছল করে উঠল।

'আমাকে কী করতে হবে বলো?' সহানুভূতিতে আর্দ্র হিমাদ্রির কণ্ঠস্বর।

'ওর সামনে আমাকে একটু মিষ্টি করে কথা কইবে, কথায় আদর দেখাবে, একটু বা ভালো বলবে আমার। পারবে না?' সজল চোখ তুলল তপতী। 'এমন একটা ভাব দেখাবে যে আমি তোমার পর নই, তোমার পর না হলে ওরও পর নই ও ভাববে। আমাকে দেখে খুশি-খুশি ভাব করবে, এস-এস ভাব করবে, একটু খাতির-যত্ন করবে—'

'সে আর কী করে হয়?' গম্ভীর হল হিমাদ্রি। 'সে আর হয় না।'

'তোমার পায়ে পড়ি, কেন হবে না? আমি তো আমার জন্যে বলছি না, ছেলেটার জন্যে বলছি।' অঝোর কাঁদতে লাগল তপতী 'নইলে বলো, আমি আসব আর মন্তু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমাকে পর ভাববে, শত্রু ভাববে, আমার কাছে আসবে না, আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, আমাকে নাওয়াতে-খাওয়াতে দেবে না—এ আমি কী করে সহ্য করব?' দু হাতে মুখ ঢাকল তপতী।

কখন এক ট্যাক্সী এসে থেমেছে দরজায়, কেউ খেয়াল করেনি।

অমিতাভ ঘরে ঢুকে একেবারে থ হয়ে গেল। বললে, 'এ কী, এত দেরি হচ্ছে কেন? দেরি দেখে ভয় হল কোনো বিপদ-টিপদে পড়লে নাকি? এখন প্রায় একটা।'

তপতী পত্রপাঠ উঠে পড়ল। দ্রুত আঁচল বুলিয়ে মুছে নিল চোখ মুখ। কোনো দিকে দৃকপাত না করে—ট্যাক্সীটা অমিতাভ ছেড়ে দেয়নি—ট্যাক্সীতে গিয়ে উঠল।

অমিতাভ পাশে বসল।

'আমি কিন্তু এতক্ষণ ছেলের জন্যে কাঁদছিলাম।' ট্যাক্সীটা চলতেই অন্যমনস্কের মত বললে তপতী।

অমিতাভ একটাও কথা বললে না। নীরবে সিগারেট ধরাল।

ফণা

প্রবোধকুমার সান্যাল

পুরাণে রক্ষসকুলের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ ভয়াবহ বর্ণনা আছে।—

গণেশবাবুর চেহারা সম্পর্কে আত্মীয় পরিজন এবং বন্ধু-মহলে যে-ধারণাটা বরাবর চলে এসেছে, সেটি খুব শ্রুতিসুখকর নয়। এর কারণ ছিল। তাঁর চাহনি দেখলে কাছাকাছি কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পেত না, এবং তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল ঘনকৃষ্ণ। অনেকে বলে, তাঁর যে বিবাহ হয়নি অথবা ভাল একটা চাকুরি জোটেনি, এর জন্য তাঁর চেহারাই প্রধানত দায়ী। শিক্ষা-

দীক্ষায় তিনি ছিলেন গ্রাজুয়েট, এবং স্বভাব চরিত্র ছিল নির্মল এবং প্রসন্ন।

পরিবারের অন্যান্য সকল ব্যক্তির থেকে তাঁর চেহারাটি ছিল একটু পৃথক, এবং সহোদর ভাইবোনদের পাশে তিনি দাঁড়ালে কোনপ্রকারেই তাঁকে পরিবারের একজন ব'লে মনে হত না। সেই কারণে বাল্যকাল থেকেই তিনি নিজকে একক এবং নিঃসঙ্গ মনে করতেন।

এই ব্যবধানবোধটি ছিল অনেকটা বেদনাদায়ক। তাঁর বয়স যত বাড়তে লাগল, ততই তিনি দূর থেকে দূরে হারিয়ে যেতে লাগলেন, এবং তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পর এই কথাটাই দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, কেবলমাত্র তাঁর চেহারাটার জন্যই এই পরিবারের কোনও ব্যক্তির মনে তাঁর এতটুকু ঠাঁই নেই। এর ফলে একদিন তিনি নিঃশব্দে সমগ্র যৌথ পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, এবং তার জন্য কারও মনে বিন্দুমাত্রও ব্যথা বাজল না। নেবু-বাগানের একটি নিভৃত অঞ্চলে গিয়ে কোনও একটি পুরনো বাড়ির দোতলায় একখানি ঘর ভাড়া নিলেন এবং নিজের হাতেই দুবেলা ভাত ফুটিয়ে খেয়ে দিন চালাতে লাগলেন। কোনও একটি ফার্ণিচারের কারখানায় কিছু-কাল থেকে হিসাবপত্র রাখার একটি চাকরি তিনি পেয়েছিলেন।

গণেশবাবুদের একটি বিশেষ বংশানুক্রমিক ব্যাধি ছিল। সেই রোগের ইতিহাস তাঁর প্রপিতামহের আমল থেকে অদ্যাবধি চলে এসেছে, এবং এর থেকে বিশেষ কেউই রেহাই পায়নি। এই রোগের আক্রমণ ছিল এমনিই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে, পরিবারের

একজন অন্যজনকে যে কোনও সময় এবং যে কোনও স্থান থেকে অচেতন অবস্থায় তুলে এনে বাড়িতে শুইয়েছে এবং সেবা করেছে। পাঁচ ছয় ঘণ্টা অবাধ রোগী অজ্ঞান অবস্থায় থেকেছে, এবং জ্ঞানলাভ করা মাত্র সুস্থ হয়ে আবার আপন কাজে মন দিয়েছে। অনেক-কাল ধরে অনেক প্রকার চিকিৎসা করা সত্ত্বেও চক্রবর্তীগোষ্ঠী থেকে এই রোগ তাড়ানো সম্ভব হয়নি।

বহুকাল পরে গণেশবাবু সেবার অকস্মাৎ এই রোগে আক্রান্ত হলেন।—

সকালবেলা স্নানাহার সেরে তিনি যাচ্ছি-লেন কারখানার দিকে, কেবল এইটুকুই তাঁর মনে পড়ে। তারপর ঘটনাটা কিভাবে ঘটল, এবং তার প্রতিকার কিভাবে হল, এসব আর তাঁর স্মরণ নেই। তিনি যখন চোখ মেললেন, দেখলেন তিনি এক বিরাট প্রাসাদ সদৃশ অট্টালিকার বৃহৎ একটি কক্ষে নরম শয্যায় শুয়ে রয়েছেন এবং সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জন দুই ডাক্তার ও একটি নার্স মহিলা। অনুভব করলেন তাঁর মাথায় ও পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। গণেশবাবু আবার চোখ বুজলেন।

গল্পটি আরম্ভ করেছিল দেবরায় দিল্লী মেলের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় ব'সে। প্রভাতের দিকে ডেহরি-অন্-শোন স্টেশন পেরিয়ে গাড়িখানা মোগল সরাইয়ের দিকে চলেছে। দেবরায়ের সঙ্গে আছেন মাত্র দুজন সহকর্মী,—মিঃ বেদী এবং আপ্পা-রাও। ও'রা সেন্ট্রাল পি-ডব্লু-ডির কাজে দিল্লী যাচ্ছিলেন। সম্ভবত আগামী মাস থেকে সরযূ নদীর উপরে নতুন একটি সাঁকো নির্মাণের কাজ আরম্ভ হবে। অক্টোবরের মাঝামাঝি। পশ্চিমের হাওয়ায় শীতের মৃদু রোমাঞ্চ ছিল।

গাড়ি দ্রুতবেগে চলেছে।—

মুখ হাত ধুয়ে ফিরে এসে দেবরায় একটি সিগারেট ধরাল। পরে বলল, মাসেক খানেক অবধি গণেশবাবুকে ওই হাসপাতালে পড়ে থাকতে হল। তাঁর মাথার ক্ষত ছিল গভীর এবং তাঁর একখানা পা বিশেষভাবে জখম হয়েছিল। দেখা গেল, রোগী যতই সেরে উঠছে, নার্স মহিলাটি ততই গণেশবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে পরিস্থিতিটি এবম্প্রকার দাঁড়াল যে, একজন অপরজনকে কিভাবে চিরদিনের জন্য সঙ্গীরূপে লাভ করবেন সেই চিন্তায় তন্ময় হয়ে উঠলেন।

গণেশবাবুর চল্লিশ বছর বয়স হয়েছিল। কিন্তু এই প্রথম তাঁর যৌবননিকুঞ্জে পাখী ডেকে উঠল। সেদিন শেষ রাত্রের দিকে এক ফাঁকে যখন নার্স মহিলাটি কাছে এসে গণেশের হাতে হাত রেখে দাঁড়ালেন তখন গণেশবাবু স্নেহসিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তুমি কতদিন আগে বিধবা হয়েছ, কমলা?

কমলা বললেন, পাঁচ বছর হল।

তোমার মেয়েটির এখন বয়স কত?

এই আট বছরে পড়েছে।

মিষ্টমধুর কণ্ঠে গণেশবাবু বললেন, যেদিন আমাদের বিয়ে হবে সেইদিনই তুমি তোমার মেয়েটিকে কাছে এনো। সে হবে তোমার আমার দুজনেরই মেয়ে। এখন সে কোথায় আছে?

চোখের জল মুছে কমলা বলল, আমার মায়ের কাছে।

আচ্ছা কমলা,—গণেশবাবু একবারটি ঢোক গিলে প্রশ্ন করলেন, একটা কথা আমার স্পষ্ট জানতে ইচ্ছে করে। তোমার মনে কি তোমার প্রথম স্বামীর কোনও দাগই নেই?

গণেশবাবুর হাতের ওপর আর একটু নিবিড়ভাবে নিজের হাতটি রেখে কমলা বলল, তোমাকে পেয়ে আমার অতীত জীবন সব মুছে গেছে, একথা কি তুমি মানতে চাও না?

নিশ্চয় চাই, কমলা—গণেশবাবু বললেন, এতদিনে জানলুম, চল্লিশ বছর ধ'রে কা'র পথের দিকে চেয়ে বসেছিলুম। তুমি আমার লক্ষ্মী, তোমাকে যেদিন ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলব সেইদিনই আমার জীবনের সার্থকতা। আমি তোমার হাত থেকেই আমার নতুন জীবন লাভ করলুম, কমলা।

নরম হাতখানা নিশ্চেষ্টভাবে গণেশের হাতের মধ্যে স্থির হয়ে থাকাতেই বুঝতে পারা গেল, কমলা সম্পূর্ণভাবে আত্মদান ক'রে বসেছে।

একমাস পরে গণেশবাবু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার সেই নেবুবাগানের শূন্য-ঘরে গিয়ে উঠলেন। কারখানার মালিকরা গণেশবাবুর কাজে বিশেষ তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা যে কেবল ছুটি মঞ্জুর করলেন তাই নয়, গণেশবাবুর বিবাহ প্রস্তাবের কথা যখন তাঁদের কানে উঠল—তখন তাঁরা কিছু কিছু নতুন আসবাবপত্র উপহার দিয়ে গণেশের ঘর সাজিয়ে দেবারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। খবরটি যথাসময়ে শুনে কমলা বিশেষ উৎসাহ লাভ করল।

গণেশবাবু সংরক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের ছেলে। তিনি দলিলে সই ক'রে অসবর্ণ বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়েছেন বটে, তবুও একদিন তিনি হাতীবাগানের টোলে গিয়ে কোষ্ঠী বিচার করতে ভুললেন না। টোলের পণ্ডিত বললেন, রাশি ও নক্ষত্রে চমৎকার মিল আছে দুজনে। তাছাড়া গোত্র যেখানে এক, সেখানে নরগণ ও রাক্ষকগণে বিরোধ কোথাও নেই। এ বিবাহ রাজযোটক হবে।

আটটি টাকা প্রণামী দিয়ে খুশী হয়ে গণেশবাবু এই শুভ সংবাদটি কমলার কাছে পৌঁছে দিতে গেলেন। বহুবাজারের একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে কমলা একটি ঘরে বসবাস করে। নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে গিয়ে দেখা করার সুবিধা ছিল।

প্রাচীন চক্রবর্তী-পরিবারে প্রণয়ঘটিত বিবাহ কা'রো ঘটেনি। শুধু তাই নয়, গণেশবাবুর চেহারায় যে আসুরিক লক্ষণ-গুলি ছিল সেগুলির প্রতি একটি নারী ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করল না, এটি অভিনব। কমলার দুই চক্ষু ভাবাবেগে এবং রসকল্পনায় অভিভূত এটি তার নার্স বন্ধুরা সবাই ধরে নিল। একজন বললেন, তুমি ত নিতান্ত নাবালিকা নও কমলা, আর কিছু না হোক তিরিশ বছর তোমার বয়স হয়েছে। এমন সুখের চাকরি ছেড়ে কিনা বিয়ে করবে? পরের অধীন হবে?

ডাঃ দাস বললেন, তোমাকে আমি এ শুভ কাজে বাধা দিতে চাইনে কমলা, তবে চাকরিটি তুমি পেয়েছিলে অনেক ছুটোছুটির পর। অর্থনীতির দিক থেকে যতটা স্বাধীনতা রাখা যায় ততই ভাল। মনে হচ্ছে কোথায় যেন তোমার জীবনে একটা ভুল থেকে যাচ্ছে, কমলা!

বন্ধু মহলের মতামত শুনে গণেশবাবু বললেন, বেশ ত, চাকরি ছেড়ে দেওয়াটা হাতেই রইল। বিয়ের পর কিছুদিন দেখা যাক তারপর যা হয় করা যাবে। তুমি কিছু ভেবো না, কমলা।

আবেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে কমলা বলল, এ হাতে অন্যের সেবা আর আমার করবার ইচ্ছে নেই। তুমি অনুমতি কর তোমার কাজেই যেন জীবনটা খরচ করতে পারি।—তার দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই ওরা শুভকার্য
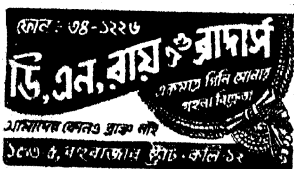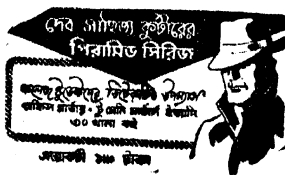
দেখে দলিলপত্রে সই ক'রে ফিরল, এবং নতুন ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ ক'রে একদিন বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ করে ভুরিভোজ দিল।

মোগলসরাই এসে পড়েছে। 'রেস্টুরেন্ট কার' থেকে চাপরাশি এসে একে একে ওদেরকে প্রাতরাশ দিয়ে গেল। সকাল সাড়ে সাতটা এখনও বাজেনি। মিঃ বেদী এবং আপ্পারাও তৎপর হয়ে গরম গরম চা ঢালতে লাগলেন। কিছু ফল কেনা হল ওরই মধ্যে।

প্রাতরাশটা মন্দ নয়। কলকাতার সন্দেশ কিছু ছিল সঙ্গে। গাড়ি ছাড়বার আগে চাপরাশিকে ব'লে দেওয়া হল, এলাহাবাদে আরেকবার যেন চা দেওয়া হয়।

আপ্পারাও হেসে বললেন, স্যার, যদি অনুমতি করেন ত বলি। আপনার গল্প জমে অন্ধকার রাত্রে,—যখন আপনার পেটে কিছু এল্‌কোহল্‌ পড়ে! আপনার স্মরণশক্তি সতেজ হয়।

দেবরায় হাসল। বলল, দেখো ভাই জীবনের চেহারা কোথাও একরকম নয়, কোনো ঘটনা স্থূল, কোনোটা বা সরস। গল্প জমবে, এজন্য গল্প বলিনে। আমি নির্ভুল সত্যকে তুলে ধরতে চেষ্টা করি মাত্র। সত্য অনেক সময় রস আর রং ছাড়িয়েই ওঠে।

মিঃ বেদী বললেন, এটা যুক্তিসংগত বৈ কি।

দিল্লী মেল আবার দ্রুতগতি লাভ করেছিল।

দেবরায় বলল, ওদের প্রণয়ের মধ্যে ফাঁকি ছিল বলে আমি মনে করিনে, কিন্তু বর্ণাঢ্যতা বেশি ছিল। দুইজনের মুগ্ধমনের বাইরে সংসারটা ছিল অতি বাস্তব। সাংসারিক অভিজ্ঞতায় কমলা ছিল প্রখর, কিন্তু গণেশবাবুর পক্ষে সবই ত নতুন। তিনি চিরকালই ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপ্রেমী,—কিন্তু এখন একথা জানতে হল, অপরের জন্যও নিঃস্বার্থভাবে কিছু করতে হয়। কমলার প্রথম পক্ষের মেয়েটির নাম বুনি, বয়স বছর আষ্টেক। তাকে এনে একদিন কমলার মা পেশছিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু নব জামাতার চেহারাটি দেখে তিনি সেই যে বিদায় নিলেন, —এ পথ আর মাড়ালেন না।

বুনি তার মায়ের কাছে আসতে পেরেছিল বলেই তার কিছু ধৈর্য ছিল। তবু গণেশবাবুকে দেখামাত্র আতঙ্কের বিভীষিকায় মেয়েটি যদি শিউরে না উঠত তাহলে তার পক্ষে কল্যাণকরই হত, কিন্তু ভয়ের থেকে সে মুক্তি পেল না। গণেশবাবুকে এড়িয়ে মায়ের কাছাকাছি সে ঘে'ষে রইল। এতে গণেশবাবুর একটু ভাবান্তর ঘটল।

বুনির কাছে গণেশবাবু যা আশা করেছিলেন তা পেলেন না।

দু মাসের মধ্যেই কমলা তার নতুন ঘরকন্নাকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে তুলল। বাড়িওলা ভদ্রলোক প্রীতিপরবশ হয়ে বারান্দার একটি অংশ পার্টিশন ক'রে আরেকটি ঘরের মতো ক'রে দিয়েছেন। সেখানে বুনির জন্য একটি চৌকি ও বিছানা পড়েছে। ঘরকন্নার সমস্ত ছোটখাটো কাজের মধ্যে বুনিকে পাওয়া যায়। মাছ কোটায়, চাল ধোওয়ায়, বাটনা বাটায়, ঘর ঝাঁড় দেওয়ায়, বিছানা করায়, সন্ধ্যায় আলো জ্বালায়,—বুনি সকল কাজেই সচেতন থাকে। শুধু দুপুরবেলায় সে নিজের মনে পড়তে বসে। মায়ের যত্নে তা'র লেখাপড়া হয়।

হঠাৎ এক-একদিন গণেশবাবু অসময়ে তাঁর কারখানা থেকে এসে পড়েন। পায়ের শব্দ করে তিনি আসেন না। হঠাৎ আচমকা পিছন থেকে তিনি আবির্ভূত হন। কেন আসেন, তিনি ভিন্ন কেউ জানে না। হয়ত দশ মিনিট পরে তিনি আবার চলেও যান এক ফাঁকে। কে জানে, হয়ত সাজানো সংসারটা তিনি একবার পলকের মধ্যে দেখে যান। কমলা হাসিমুখে শুধু বলে, ওই এক ধরণ। বুনি তা'র বইখাতাগুলো লুকিয়ে ফেলে বিছানার তলায়,—কমলা সেটি লক্ষ্য করে। ছমাস হতে চলল, বুনি সহজ হয়নি।

এমন অনেক দিন গেছে, কমলা ওঘর থেকে এঘরে এসে দেখে এর মধ্যে কখন যেন ফিরে এসেছেন গণেশ নিঃশব্দে—সে জানতেও পারেনি। কমলা হাসিমুখে কাছে এসে বলে ওমা, কখন ফিরেছ?

গণেশবাবু জবাব দেন, তা অনেকক্ষণ হ বৈকি—

দাঁড়াও, জল খাবার আনি। চা ক' দিচ্ছি এক্ষুনি—বলতে বলতে কমলা বেরিয়ে যায়।

সকাল দশটা থেকে পাঁচটা গণেশের চাকি —কমলা এটি জানে বৈকি। সুতরাং এক একদিন স্বামীর এবম্প্রকার নাটকীয় আনা গোনাটা তার কেমন যেন লাগে। নতু স্বামীরা ভালবাসার জন্য তরুণী স্ত্রীদে আশেপাশে নানা কাজের অছিলায় ছোঁ ছোঁক করে, একথা কমলা জানে বৈকি। কিন্তু এটা ঠিক সে প্রকার নয়। সেদিকে গণেশবাবু আকুলতা তেমন প্রকাশ পায় না। তিনি আসেন অনেকটা অন্য কাজে—সেটি তাঁ নিজের কাছেও যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কমলা ঠিব বুঝতে পারে না। মানুষের প্রকৃতি চল্লিশ

বছরে এসে কোথায় কোন্ জটিল মনস্তত্ত্বের গহ্বরে বাঁক নিয়েছে, তার সন্ধান পাওয়া বড়ই কঠিন। গণেশবাবুকে ইদানীং একটু ভিন্ন রকমের মনে হচ্ছিল।

এক একদিন সহসা কাঠের ওই পার্টিশনের বিশেষ একটি গর্তের দিকে চোখ পড়তেই বুনি আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। কমলা প্রশ্ন করে, কি রে বিনু, কি হয়েছে? অমন করছিস যে?

বুনি কোনমতেই তার মাকে বোঝাতে সাহস পায় না যে, ওই পার্টিশনের গর্তটার ভিতর দিয়ে একটা সাংঘাতিক কালো চোখের তারা ওধার থেকে তাকে নিঃশব্দে এতক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছিল।

কমলা চট ক'রে এধারে এসে দেখে, গণেশ তাঁর বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছেন! কমলা বলে, এমন অসময়ে এলে যে?

গণেশবাবু বলেন, বাঃ, তুমি আজকাল ভারি অন্যমনস্ক। আজ যে শনিবার, মনে নেই? মায়ে ঝিয়ে একখানে থাকলে বুঝি দুনিয়া সংসার সব ভুলে যেতে হয়?

কমলা এক গাল হাসি হাসল। কিন্তু তার খটকা লাগল স্বামীর শেষ কথাটায়। তামাসাটার পিছনে কোথায় যেন একটি মৃদু হুল লুক্কায়িত রয়েছে। কমলা স্বামীর পা টিপতে ব'সে গেল।

এমনি ক'রেই দেখতে দেখতে বছর দেড়েক কেটে গেল এবং এরই মধ্যে যে পুত্রসন্তানটি কমলা প্রসব করেছিল, তার বয়সও প্রায় মাস-দশেক হতে চলল।

এলাহাবাদ স্টেশনে চা খেতে খেতেই মিনিট দশেক চ'লে গেল। মাঠে মাঠে শরতের সোনার রৌদ্র ঝলমল করছে। শাদা মেঘের পাহাড় উঠেছে মাথা চাড়া দিয়ে। আকাশের নীলিমা নিবিড় হয়ে উঠেছে।

বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেবরায় বলল, শিশুটির সম্বন্ধে একটি অস্বাভাবিক মোহ গণেশবাবুকে পেয়ে বসেছে—

বেদী বাধা দিয়ে বললেন, অস্বাভাবিক বলছেন কেন? চল্লিশ বছর বয়সে প্রথম সন্তান হলে বাপ মাত্রই একটু অন্ধ হয়।

দেবরায় বলল, তবু বলব একটু অস্বাভাবিক। গণেশবাবুর ধারণা হতে লাগল, তাঁর ছেলের যথেষ্ট যত্ন হচ্ছে না, কেননা মায়ের মন রয়েছে অন্যত্র। বুনির প্রতি কেমন যেন তিনি বিশ্বাস এবং বিবেচনা হারাচ্ছিলেন। শিশুটি একটু জোরে কাঁদলে তাঁর মনে নানাবিধ কুসন্দেহ উঁকিঝুঁকি দেয়। তাঁর বিশ্বাস, শিশুটি যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য পাচ্ছে না। খাদ্যসামগ্রীগুলি স'রে যাচ্ছে অন্যত্র।

গণেশবাবু ঘরে যতক্ষণ থাকেন, শিশুটি ততক্ষণ থাকে তাঁর কোলে। তিনি ওটাকে কাঁধে নিয়ে ঘোরেন ঘরময়, এবং যতক্ষণ না তিনি নিজে ক্লান্ত হয়ে বাচ্চাটাকে তা'র বিছানায় শুইয়ে দেন, ততক্ষণ অবধি কমলা তাঁকে কিছু বলতে সাহস পায় না। অন্ধকারে কমলা চুপ ক'রে জেগে থাকে এবং অনুভব করে শিশুটির উপর তার মাতৃত্বের অধিকার যেন কতকটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ভবিষ্যৎটাকে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না।

মাঝ রাত্রে কোনও সময়ে ছেলেটি কাঁদলে কমলাকে অনুমতি চেয়ে নিতে হয়,—ওর খিদে পেয়েছে, একটু কাছে নেবো?

গণেশবাবু একটু হেসে জবাব দেন, তুমি ওকে কাছে নাও কিনা দেখবার জন্যেই আমি জেগে আছি!

এটাও বোধ করি একপ্রকার পরিহাস। কিন্তু স্বামীর কণ্ঠস্বরে যেন অন্য রকমের একটা ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। কমলা একটু আড়ষ্ট হাতে শিশুকে কাছে টেনে নেয়। ছেলেটা যেন ওর নয়!

এর মধ্যে সংসারের খরচ কিছু বেড়েছে বৈকি। চাল ডাল তরিতরকারি তেল মসলা ইত্যাদির দাম এখন অনেক বেশি। কার-খানার হিসাবনবিশের মাসিক বেতন আর কতই বা। ঠিকে ঝি রাখা এবং জলখাবার যোগানো আর গণেশের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং বুনিকেই বাসনপত্র মাজতে হয়, কয়লা ভাঙা, উনুন ধরানো, রান্নাঘর, ধোওয়া, কাপড়-কাঁথায় সাবান দেওয়া প্রভৃতি সবই করতে হয়। আট বছরের মেয়ে দশ বছরে পড়েছে, সুতরাং এখন আর সে নিতান্ত নাবালিকা নয়। তা ছাড়া মেয়েটার স্বাস্থ্যের যে কিছু উন্নতি ঘটেছে, এটি গণেশবাবুর চোখ এড়ায়নি। ইদানীং যে কারণেই হোক না কেন, গণেশ-বাবুর মন যথেষ্ট খুশী থাকতে পারছে না। কেবল শিশুটির সম্বন্ধে একটি অনির্দিষ্ট দুর্ভাবনায় মন যেন সর্বক্ষণ রি রি ক'রে জ্বলছিল। এই কথাটি তাঁকে পেয়ে বসেছে, পৃথিবীর সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ শক্তির কবল থেকে এই শিশুটিকে নিরাপদে রাখতে না পারলে তাঁর চলবে না!

মাস কয়েক পরে হঠাৎ একদিন অসময়ে বাড়ি ফিরে গণেশবাবু দেখলেন, ছেলেটা বসতে গিয়ে পিছন থেকে উলটিয়ে প'ড়ে চিৎকার করছে এবং কাছে পিঠে কেউ নেই। বুনি বাসন মাজার কাজকর্ম নিয়ে এমন ব্যস্ত যে, ছেলেটার চেঁচামেচির দিকে সে ভ্রূক্ষেপও করেনি। ছেলেটার প্রায় দশ এগারো মাস বয়স হতে চলল। গণেশবাবু তাকে শশব্যস্তে কাঁধে তুলে নিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করলেন।

ঠিক বেলা পাঁচটায় কমলা বাড়ি ফিরে এল। বাচ্চাটার মাথায় একটু চোট লেগেছিল সেজন্য গণেশবাবু এর মধ্যে ফলাও করে চিকিৎসার আয়োজন করেছিলেন। মাথায় জলপটি দেওয়া, বাক্স খুলে 'আর্নিকা' খাওয়ান, নরম বিছানায় পাশ ফিরিয়ে শোওয়ান, হাতপাখার বাতাস করা ইত্যাদি। ঘরে এসে দাঁড়িয়ে কমলা বলল, কি হয়েছে ছেলের?

কি হয়েছে!—গণেশবাবু এবার যেন ফেটে উঠলেন, আমাকে লুকিয়ে যাও কোথায় তুমি রোজ রোজ? তুমি কি মনে করো পাড়ার লোকের কাছে আমি কোনও খবর পাইনে? ছেলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়নি, এই যথেষ্ট তা জান? তোমার মেয়েকে এমনভাবে শিখিয়ে রেখেছ যে, ঘেন্নায় সে ছেলেটাকে ছুঁতেও চায় না। কাল-কেউটে ঘরে পুষছি!

হঠাৎ যেন আজ অতর্কিতে বারুদের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল কমলা, পরে কাছে এসে ছেলেটার মাথায় হাত দিয়ে দেখল, বিশেষ কিছুই হয়নি। পিছন দিকে মাথাটায় একটু লেগেছে মাত্র। এমন হয়েই থাকে। চোট না লেগে কোনও শিশু বড় হয় না। আঘাত-অপঘাত কতকটা দরকার বৈকি।

কমলা স্বামীর কোনও কথার জবাব না দিয়ে অন্য ঘরটিতে গেল, এবং তারপরে সন্ধ্যার রান্নাবান্নার আয়োজনের দিকে মন দিল। ছেলেটার জন্য বিন্দুমাত্র সমবেদনা সে প্রকাশ করল না। একবার কেবল দেখে গেল, বাচ্চাটা বিছানার উপর ব'সে খেলা করছে। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে গণেশবাবুর দুটো চোখ সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। এক সময় তিনি উঠে গায়ে জামাটা চড়িয়ে জুতোটা পরে বেরিয়ে গেলেন, এবং আধ ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে ঘোষণা করলেন, আজ আর তিনি কিছু খাবেন না। তাঁকে বাদ দিয়েই রান্নাবান্না হোক।

কমলা সবেমাত্র উনুন ধরিয়ে তরকারি কুটে আটা-ময়দা বার করছিল। স্বামীর কথা শুনে সে রান্নাঘরে গিয়ে উনুনে খুঁচিয়ে নিবিয়ে দিয়ে এল, তারপর ঘরে এসে নিজের

ছোট বাক্সটি খুলে কিছু পয়সা বার ক'রে বুনির হাতে দিয়ে বলল, মোড়ের ময়রার দোকান থেকে খাবার এনে খাস, বুনি।

বুনি একটু অবাক হয়ে বলল, বাবার জন্যে রান্না করবে না, মা?

থাম—গণেশবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, বাবা বাবা! আমি তোর বাবা কে বললে? উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে!

বুনি ভয়ে ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আড়াই বছর পরে বোধ হয় আজ কমলার প্রথম চোখে পড়ল, তার দ্বিতীয় স্বামীর চেহারার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। চোখের তারা দুটো ভয়ানক বড়, এবং তার অন্তর্ভেদী রুক্ষতা দেখলে গা ছমছম করে। হাত দুখানা অস্বাভাবিক ধরনের দীর্ঘ,—চিড়িয়াখানার বনমানুষের মতো। গণেশবাবুর সমগ্র আকৃতি, প্রকৃতি ও প্রকাশের মধ্যে যে বীভৎসতার আভাস ছিল, আড়াই বছর আগে প্রণয়সঞ্চারকালে সেটি কমলার চোখে পড়েনি। তখন তার মুগ্ধ চক্ষু ছায়াচ্ছন্ন ছিল। পাত্রকে বিচার করেনি, পুরুষকে পেয়ে সে খুশী ছিল।

কমলা নিজের কাছেই ঘৃণ্য হয়ে উঠল।

গণেশবাবু এবার যেন ফেটে উঠলেন, "আমাকে লুকিয়ে যাও কোথায় তুমি রোজ রোজ" :

গণেশবাবু কিন্তু ওখানেই থেমে যাননি। একদিকে তিনি চেষ্টা করছিলেন, জননী ও বুনির প্রতি বাচ্চাটা যেন বিশেষ আসক্ত না হয়ে ওঠে, এবং অন্যদিকে কমলা ও বুনিকে অবিশ্রান্তভাবে পর্যবেক্ষণ করার অবসরগুলি তিনি সন্ধান ক'রে নিয়েছিলেন।

একদিন প্রকাশ্যেই তিনি কথাটা তুললেন, আমার ছেলেটি দিন দিনই যেন কাহিল হচ্ছে, অথচ আর যারা এ বাড়িতে আছে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটছে কেমন ক'রে বলতে পার?

কমলা শান্তকণ্ঠে বলল, বাপের কোলে দিনরাত থাকলে কোনও শিশু সন্তানই সুস্থ থাকে না!

বটে, তুমি তাহলে আমার সংগে বিবাদই করতে চাও?

একেবারেই না—ব'লে কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন গণেশবাবু তাঁর স্ত্রীকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রে বসলেন, তোমাদের উৎপাতে আমার সামাজিক সম্ভ্রম নষ্ট হতে বসেছে তার খবর রাখ?

জলখাবারের রেকাব ও গরম চায়ের পেয়ালা স্বামীর সামনে রেখে কমলা একবারটি দাঁড়াল। ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল না।

গণেশবাবু অনুযোগ জানিয়ে বললেন, তেরো চোদ্দ বছরের একটা ছেলের সংগে তোমার বুনিকে লুকিয়ে ঘুরিয়ে ভাব করতে দেখি,—এর পরিণাম কি, তোমাকে কি বুঝিয়ে বলতে হবে?

কমলা ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, বুনি যখন তোমার মেয়ে নয়, তখন এ নিয়ে তুমি মাথা নাই বা ঘামালে?

রুক্ষ দুটো বৃহৎ চক্ষুতারকা কমলার প্রতি নিবদ্ধ হল। গণেশ বললেন, বুনি কি আমার ভাত খেয়ে মানুষ হচ্ছে না?

কমলা আর স্থির থাকতে পারল না। বলল, ভাতের সব অংশটুকু বোধ হয় তোমার একার নয়। যে অংশটুকু তোমার, সেই অংশে বুনি তোমার বাড়ির ঝিগিরি করে। রাতদিনের ঝিয়েরা তিনটে জিনিস পায়—খাওয়া, পরা এবং মাইনে। প্রথমটা একটা অংশমাত্র পায় বুনি,—বাকি দুটো সে পায় না।

কমলা বাইরে চ'লে যাচ্ছিল, গণেশবাবু ডাকলেন, শোনো—

শান্তভাবে কমলা ফিরে দাঁড়াল। গণেশবাবু বললেন, তাহলে আমি যা সন্দেহ করি তা সত্য! পাড়ার লোক তাহলে মিথে বলে না?

কমলা বলল, পাড়ার লোক থাক, তুমি য সন্দেহ কর তাই বলো।

গণেশবাবু বললেন, তুমি যে লুকিয়ে লুকিয়ে রোজগার করছ, আমাকে বলোনি কেন?

কমলা জবাব দিল, বিয়ের আগে তুমি ব বলোনি যে, আমাদের দুজনকে আধপেট খাইয়ে রাখবে? সংসারের সব খরচ কি তুমি দিয়েছ কোনদিন? কোনদিন কি জানতে চেয়েছ, তোমার ওই গোণাগুনতি টাকায় দুবেলা দুমুঠো জোটে কিনা?

উগ্রকণ্ঠে গণেশবাবু বললেন, তুমি নাকি পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের প্রসব করিয়ে টাক পাও? শোনো, চ'লে যেয়ো না—

পুনরায় ফিরে দাঁড়িয়ে কমলা বলল অন্যায় কিছু করিনি। এর বেশি আর

শুনতেও চেয়ো না আমার কাছে। আজ ন'দিন থেকে খুনির জ্বর ছাড়ছে না, আমাকে আর তুমি যন্ত্রণা দিয়ো না!

কমলা হঠাৎ নিজের চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে গেছে। ট্রেন চলেছে অতি দ্রুতগতিতে। দেবরায় এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, দাঁড়াও স্নান ক'রে নিই। ফতেপুর আসতে দেরি নেই।

হাতঘড়িটি খুলে রেখে দেবরায় তোয়ালে ও পাজামা নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। মিঃ বেদী দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট মুখে শুধু বললেন, ভাগ্যের কী বিদ্রূপ মেয়েটির ওপর।

আপ্পারাও বললেন, জীবনটা জুয়া! মেয়েটি বার বার মার খাচ্ছে!

ফতেপুর আসবার আগে একে একে তিনজনে স্নান সেরে নিল। গাড়ি যখন স্টেশনে এসে থামল, তখন দেবরায়ের সঙ্গে ওরা দুজন নেমে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য রেস্টুরেণ্ট কার-এ উঠে পড়ল। ওদের অফিসের চাকরটি জিনিসপত্র দেখাশোনার জন্য এ কামরায় উঠে আগলে ব'সে রইল। এর পর গাড়ি থামবে কানপুরে।

একটি টেবল দখল ক'রে ওরা বসল তিনজনে। হোটেল-বয়রা যখন খাবার দিতে আরম্ভ করল, তখন আপ্পারাও ঔৎসুক্য আর চাপতে পারলেন না। বললেন, স্যর, আপনার কি ধারণা, বিয়ে ক'রে কমলা ভুল করেছে?

দেবরায় হাসল। বলল, আমি ত জীবনের টীকাকার নই!

বেদী বললেন, নিয়তির ওটা চক্রান্ত, আপ্পারাও! তবে আমার ধারণা, গণেশের গুপ্ত প্রকৃতির উপর স্ত্রীলোকের জারক রস প'ড়ে তার পাত্রটা গাঁজলায় ছাপিয়ে উঠেছে। নারীসঙ্গ অপেক্ষা সৎসঙ্গ ওর বেশি দরকার ছিল।

হয়ত তাই,—আপ্পারাও বললেন, জীবনে কোথাও লোকটা স্নেহ পায়নি, তাই নিরীহ দুটো জীবনের ওপর ফণা উঁচিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

দেবরায় আবার হাসল। বলল, এত ভেবে চিন্তে ফণা তুলছে কি? আমার মনে হয় লোকটা আসলেই অজ্ঞান!

আপ্পারাও বললেন, ছেলেটার প্রতি ওর যে ভালবাসা সেটা কি অন্ধ বাৎসল্যের আসক্তি নয়? জন্তুর সঙ্গে তফাৎ কোথায়?

হাসিমুখে দেবরায় শুধু বলল, কমলা এর জবাব দিতে পারত!

তিনজনে মিলে লাঞ্চে বসে গেল।

স্বামীর কাছে সম্পূর্ণ সত্যবাদিনী কমলা ছিল না। বিধবা নারী তার দ্বিতীয় স্বামীর কাছে কখনও পরিপূর্ণ সত্যভাষণ করে না। কমলা মনে করেছিল, তার ব্যক্তিগত জীবনের কোন কথাই শেষ অবধি গণেশবাবুর নিকট চাপা রাখবে না। কিন্তু ইদানীং তাদের সম্পর্কটা দাঁড়িয়েছিল ভিন্ন রকমের।

খুনির সহোদর একটি ভাই আছে বছর দুইয়েকের বড়, এটি গণেশবাবুকে প্রথম থেকেই বলা হয়নি। ছেলেটির নাম মণ্টু, এবং সে তার দিদিমার কাছে থাকে।

চামচখানা প্লেটের উপর নামিয়ে রেখে আপ্পারাও চোখ তুলে স্তব্ধ হয়ে দেবরায়ের দিকে তাকাল। মিঃ বেদী অস্ফুটভাবে কি যেন বললেন।

দেবরায় এক চামচ ভাত মুখে তুলে বলল, হ্যাঁ, কমলার প্রথম সন্তান। সুন্দর একটি বলিষ্ঠ বালক,—যেমন ভদ্র তেমনি বিনয়ী। কিন্তু কি জানি কেন, কমলা এ ছেলেটির কথা লুকিয়ে রাখল তার দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে। জানিনে কেন তার এই নির্বুদ্ধিতা, কেন বা এই অপরিণামদর্শিতা! ওটার মধ্যে বোধ হয় বিধবা প্রণয়িনীর আত্মসম্মানের প্রশ্ন ছিল। একটিমাত্র সন্তানের কথা প্রকাশ করলে হয়ত স্বামীর কাছে সে বেশি সমাদর পাবে, এই বিশ্বাস ছিল।

স্বামীর চোখে দেহের লক্ষণগুলি ধরা পড়েনি বলতে চান?

দেবরায় বলল, ডাক্তাররা বলেন দ্বিতীয় সন্তানের চিহ্নগুলি প্রথম সন্তানের নামেই চ'লে যেতে পারে। গণেশবাবু যে ডাক্তার নন এটা কমলা জানত বৈকি।

বেদী বললেন, সমস্যা জটিলই বটে। তারপর?

আহারাদিতে আপ্পারাওর রুচি চলে গিয়েছিল। জলের গেলাসে একবারটি চুমুক দিয়ে রেখে সে বলল, এরপর কমলার প্রতি আর শ্রদ্ধা রাখা যায় না, স্যর। নোংরা লোভের থেকে তার প্রণয়ের জন্ম হয়েছিল, একথা সবাই বলবে। কমলার রুচিবোধ ছিল না।

দেবরায় হাসল। বলল, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মেয়েপুরুষের এই একই রুচি, একই লোভ। কমলা তা'র ব্যতিক্রম নয়।

বেদী বললেন, সন্দেহ নেই, মেয়েটি বড়ই দুর্ভাগ্য। তারপর?

দেবরায় একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল, এমন সময় কানপুর এসে পড়ল। গাড়ি থামলে ওরা তিনজনে নেমে এল।

কয়েকজন সাহেবসুবো এসেছিলেন দেবরায়ের সঙ্গে দেখা করতে। অনেকে নিজেদের কাজের হিসেব দিল। কেউ কেউ ওই সময়টুকুর মধ্যেই ফাইল-পত্র খুলে দেখাল। এখানে যে এক বিরাট নির্মাণকার্য চলছে গঙ্গার ধারে, দেবরায় তার মোটামুটি হিসাব নিল। দেখতে দেখতে গার্ডের বাঁশী বাজল।

ফিরে এসে গাড়িতে ওরা উঠল বটে, কিন্তু গল্পটা আপাতত স্থগিত রেখে দেবরায় তা'র লোয়ার বার্থেই একটু গড়িয়ে নিল। শ্রোতা দুইজনের অসীম কৌতূহলের প্রতি কিছুমাত্র সুবিচার না করে মাত্র দু মিনিটের মধ্যেই দেবরায় ঘুমে অচেতন হল। গাড়ির দোলায় সেই নিদ্রা আরও আনন্দদায়ক হয়ে উঠল।

ঘুম ভাঙ্গল টুণ্ডুলায়। অপরাহ্ন তখন ম্লান হয়ে এসেছে। চা দিয়ে গেল রেস্টুরেণ্ট-বয়। দেবরায় মুখ ধুয়ে এসে স্থির হয়ে বসল। বেদী বললেন, স্যর, আপনার এ কাহিনীর পরিণাম আমরা দুজনে ব'সে এতক্ষণ আলোচনা করছিলুম।

চায়ে চুমুক দিয়ে দেবরায় সহাস্যে প্রশ্ন করল, কি প্রকার সিদ্ধান্ত হল?

আপ্পারাও বলল, লোকটা যে রকম দুর্মতি, তা'তে কমলাকে ধরে শেষ পর্যন্ত ঠেঙ্গাতে পারে। তবে আমাদের বিশ্বাস, মণ্টু হঠাৎ এসে মায়ের পক্ষে রুখে দাঁড়াবে। কি বলেন আপনি?

দেবরায় একটা সিগারেট ধরাল। পরে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ঘটনার গতি সেভাবে বাঁক নিলে হয়ত ভালই হত। কিন্তু তা হয়নি। খুনি অসুখটা বেড়েছিল, কমলার চোখ ছিল সেইদিকে। গণেশবাবুর এটি ভাল লাগেনি যে, তাঁর সাজানো ঘরকন্নায় কোনও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাঁর মনে

প্রশ্ন উঠল, ঝুনির চিকিৎসার জন্য খরচপত্র করছে কে? কে দিচ্ছে দুধ বার্লি? এত বরফ আর আইস-ব্যাগ জোগাচ্ছে কে? ছানার জল আসছে কোত্থেকে? কে দিচ্ছে ডাক্তারের ফী?

ওরই মধ্যে হঠাৎ একদিন তিনি কমলাকে ডেকে বললেন, তোমরা নিজের দিকটাই শুধু দেখলে, ছেলেটাকে নিয়ে আমি কি অসুবিধেয় পড়েছি, দেখতে পাচ্ছ না?

কমলা বলল, অসুবিধে হচ্ছেই ত!

শোনো কমলা, আমি চাইনে আমার ঘরে এসব উৎপাত বেশিদিন চলে। এর প্রতিকার একটা দরকার।

কমলার চোখে জল আসছিল। নিজকে সামলিয়ে সে বলল, কি করতে বলো?

গণেশবাবু বললেন, তোমার মেয়েটাকে ওর সেই দিদিমার ঘরে রেখে এলেই পারতে? এসব বাজে ঝঞ্ঝাট আমার ওপর তুমি চাপাতে চাও কেন?

শান্তকণ্ঠে কমলা বলল, আমার মেয়ে আমার কাছে থাকবে, এই চুক্তিই ত ছিল!

এই চুক্তিও কি ছিল যে, তোমার মেয়ের জন্যে আমার ছেলেটাকে পথে ভাসিয়ে দেবে? তোমাদের রোগের ছোঁয়াচ আমি বরদাস্ত করতে যাব কেন? গণেশবাবু আক্রোশে কাঁপতে লাগলেন।

এবার কমলা কান্না চাপতে পারল না। বলল, সুস্থ মেয়েকে ঝিগিরির জন্যে বাড়িতে রাখব, আর অসুস্থ হলে তাকে দূরে সরিয়ে দেবো,—মা হয়ে এ কাজ কেমন ক'রে করব?

নাকি কান্না কাঁদলে আসল কথাটা চাপা পড়ে না, মনে রেখো। আমার ছেলের ভবিষ্যৎ এভাবে আমি নষ্ট হতে দেবো না, ব'লে রাখলুম।—গণেশবাবু উঠে জামাটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। ছেলেটা অকাতরে তখন ঘুমোচ্ছিল।

বৃষ্টি এসে পড়েছিল। সেই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গণেশবাবু বোধ করি না খেয়েই আপিসে গেলেন। কমলা বারান্দা পেরিয়ে এঘরে আসছিল, হঠাৎ রান্নাঘরের পিছন দিয়ে মণ্টু বেরিয়ে এল। চাপা কণ্ঠে বলল, ভয় পেয়ো না মা, আমাকে দেখতে পাননি উনি।

কমলা ছেলেকে কাছে টেনে নিল। আঁচলে চোখের জল মুছল।

মণ্টু বলল, মা, ঝুনি একটু ভাল হলেই ওকে আমাদের ওখানে পাঠিয়ে দিয়ো। আমরা বেশ থাকব। দিদিমা বড্ড আসতে চাইছে এখানে, আনব মা?

ব্যস্ত হয়ে কমলা বলল, না না, খবরদার—এমন কাজ করিসনে। আর অশান্তি সইতে পারিনে, মণ্টু।

নিচের সিঁড়িতে ডাক্তারের সাড়া পাওয়া গেল। দু পা এগিয়ে কমলা গলা বাড়িয়ে ডাকল, আসুন—

ডাক্তার সোজা উপরে উঠে এসে ঝিনুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঝুনি একপ্রকার নিশ্চেতন হয়ে প'ড়ে রয়েছে বিছানায়। চোখের চেহারা উৎসাহজনক নয়। ডাক্তার নিচের ঠোঁটটি টেনে দেখে চুপ করেই গেলেন। থার্মমিটার বা'র ক'রে জ্বর দেখলেন। তারপর তাঁর ব্যাগ থেকে ইঞ্জেকশনের উপকরণ বার করলেন।

কমলা এক ফাঁকে মণ্টুকে সরিয়ে এনে চাপা গলায় বলল, নিচের তলায় কান রাখিস মণ্টু,—সাবধান!

ইঙ্গিতটি বুঝে মণ্টু দরজার বাইরে এসে
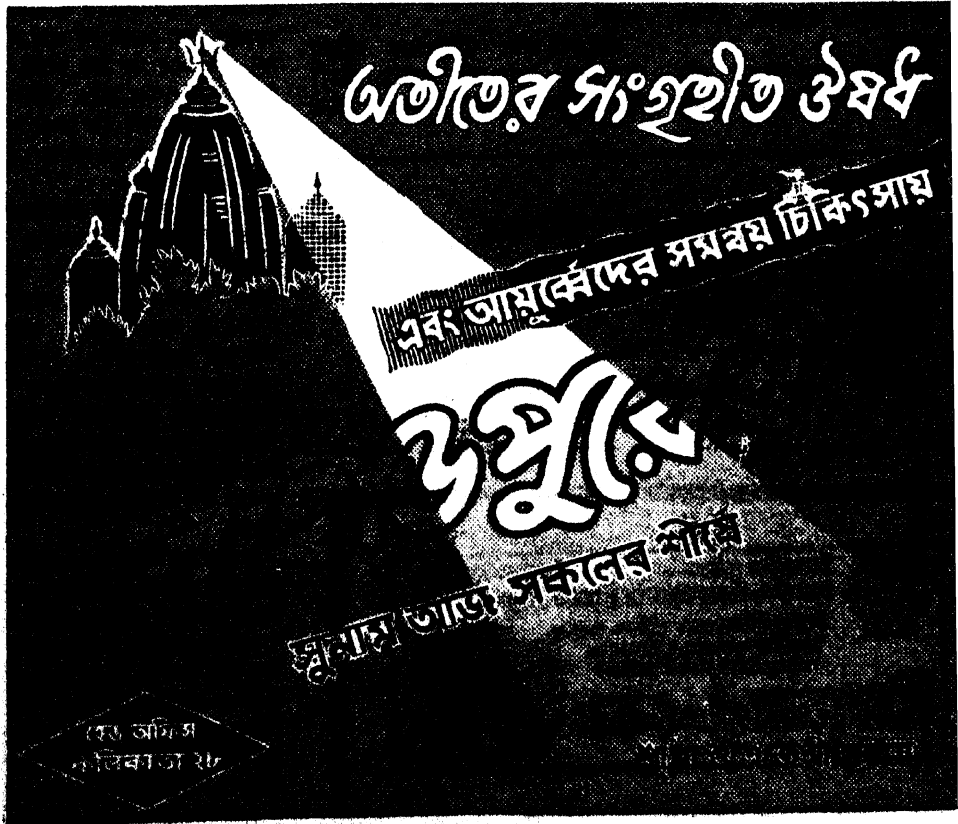
ড়াল—যাতে সিঁড়ির দিকে তার চোখ াকে। কিন্তু কমলার অনুমান মিথ্যে য়নি। বৃষ্টি অবিশ্রান্তভাবে চলছিল, এবং ণেশবাবু সম্ভবত পথে নেমে কোথাও তক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন।' আকাশের র্যোগের চেহারা দেখে তিনি, ফিরেই লেন, এবং তাঁর গন্ধ পাবামাত্রই কিশোর লকটি মুহূর্তের মধ্যে দোতলারই কোথায় ন অদৃশ্য হয়ে গেল।

গণেশবাবু সটান এসে তাঁর ঘরে ঢুকলেন। গ্র দুর্যোগের-কালো মেঘ এবং ঘনঘটা তাঁর খর চেহারায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ক্ষ্য পথ দিয়ে ভয়ার্ত মণ্টু পা টিপে টিপে রের মতো নিচে নেমে গেল। সমগ্র লাটাই আতঙ্কে ভরা।

কমলার পারিবারিক চেহারাটি ডাক্তার র অজানা ছিল না। তিনিই একদা াকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে নিষেধ ছিলেন। নার্সের কাজটা ছেড়ে দিতেও ন কমলাকে বাধা দিয়েছিলেন। সে যাই হ, অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে বাইরে এসে ন বললেন, টাকাকড়ির যদি কিছু দরকার হ নিতে পার, পরে শোধ দিয়ো।

কমলা বলল, দরকার হলে নিশ্চয় নেবো, ারবাবু। তবে এর মধ্যে তিন চারটে ায়নিটি কেস' ক'রে কিছু টাকা পেয়েছি। টই চ'লে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবু, খুনিকে ন দেখলেন?

ডাক্তার দাস ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি হয় হাতে অনেক রোগী নাড়াচাড়া করেছ, কমলা। এটা একটু শক্ত রকমের টাইফয়েড কেস—বুঝতেই পাচ্ছ। তুমি দুর্বল হলে চলবে কেমন ক'রে?

ডাক্তার দাস নিচে নেমে গেলেন। কমলা এক ফাঁকে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে, সেখান থেকে বেরিয়ে দ্রুতপদে নেমে গেল নিচের তলায়। সিঁড়ির পাশের ফাঁকটিতে নিতান্ত অপরাধীর মতো মণ্টু দাঁড়িয়েছিল টলটলে চোখের জল নিয়ে। কমলা তাড়াতাড়ি কাছে এসে ছেলেটাকে বুকের মধ্যে নিয়ে চাপাকণ্ঠে বলল, চুপ কর মণ্টু, চুপ কর,—এ বাড়িতে দয়া কোথাও নেই। চুপ কর বাবা—

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মণ্টু বলল, ডাক্তার কেন ব'লে গেল খুনি ভাল নেই?

রুদ্ধ আবেগ সামলিয়ে নিয়ে কমলা বলল, না, কিছু না মণ্টু, ডাক্তার অমন বলেই থাকে, ওরা জানে কি? নে বাবা, মুখ শুকিয়ে চ'লে যাসনে। এই মিষ্টিটুকু মুখে দিয়ে যা। পেয়ারাটা পকেটে রাখ—

সহসা উপরের সিঁড়ি থেকে গণেশের কঠিন গলার আওয়াজ শোনা গেল : কোলে ক'রে নিয়ে খাবার খাওয়াচ্ছ,—ছেলেটি কে?

মুহূর্তে বিপ্লব ঘটে গেল। সর্পাহতার মতো শিউরে স'রে এসে যথাসম্ভব সহজ গলায় কমলা বলল, ছেলেটি! না, কেউ না। হ্যাঁ, আমি চিনি ওকে,—ওর মা নেই তাই আসে!

মণ্টু সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে চ'লে গেল। এবার গণেশ বললেন, পৃথিবী সুদ্ধ সবাইকে খাইয়ে বেড়াচ্ছ। শুধু স্বামীর রান্নাটা চড়ল কিনা, এবং দেড় বছরের শিশুটির দুধটুকু গরম হল কিনা এটি খোঁজ নেবার সময় তোমার নেই!

জন্মাষ্টমীর ভয়াবহ দুর্যোগের রাতটা নির্বিঘ্নে কোনমতেই আর কাটতে চাইল না। সন্ধ্যার দিকে কমলা নিজেই ছুটে গিয়ে ডাঃ দাসকে এনেছিল, এবং তিনি এসে তাঁর শেষ কথাটাই ব'লে গেলেন। কমলা কোন সময়ই সংযম হারায়নি।

কিন্তু সংযম হারিয়েছিলেন গণেশবাবু। সেই সেদিনকার ছেলেটার গালে হঠাৎ সেদিন তিনি সজোরে একটা চড় মেরে সতর্ক ক'রে দিয়ে বলেছিলেন, এ বাড়ির দোতলাটা হোটেলও নয়, বারোয়ারিতলাও নয় যে, যখন খুশি আসবে, যখন খুশি খাবে।

মণ্টু চোখের জল চেপে সেদিন দরজা থেকে চ'লে গিয়েছিল। মায়ের নিষেধক্রমে সে কোনমতেই নিজের পরিচয়টি প্রকাশ করতে পারল না। তবুও ছেলেটা আজও বিকালে তার সহোদরার অন্তিম কালটি একান্ত গোপনে এসে ক্ষণকালের জন্য দেখে গেছে!

ডাক্তার চ'লে যাবার পর ঘরের মধ্যে রুদ্ধ আক্রোশে গণেশবাবু ফুলছিলেন। বাইরের লোকের এ হেন অবারিত আনাগোনায় তাঁর ঘরকন্নার আব্রু এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। দোতলার সব দিক খোলা,—সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। দিনকাল মন্দা, ঘটিবাটি হাতসাফাই হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ করছে কে? এ পাড়ায় চোরের উৎপাতের কথা কে না শুনেছে?

গণেশবাবু কোনমতেই আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে একেবারেই আস্থাশীল নন। তা ছাড়া আভাসে অনুমান করা যাচ্ছে, মেয়েটার অসুখ আজ একটু যেন বাড়াবাড়ি। কমলা বোধ করি তাই নিয়েই ব্যস্ত। সুতরাং গণেশবাবু এবার উঠলেন, এবং নিজের পৈতার থেকে চাবিটি নিয়ে তাঁর নিজস্ব কাঠের আলমারির তালাটি খুলে নিয়ে সোজা নিচে নেমে গেলেন, এবং সিঁড়ির নিচেকার দরজার তালাটি বন্ধ করে দিয়ে আবার উপরে উঠে এলেন।

সন্ধ্যার ঠিক আগে কমলা স্বামীর জন্য সুস্বাদু খিচুড়ি রান্না ক'রে শোবার ঘরে রেখে দিয়েছিল। গণেশবাবু ওরই মধ্যে এক সময় নৈশভোজন সেরে নিয়ে তার ছেলেটির জন্য ছোট্ট স্পিরিট স্টোভে দুধটুকু ফুটিয়ে নিলেন। ছেলেটিকে যথাসময়ে খাইয়ে তিনি বিছানায় তুললেন, এবং প্রবল বৃষ্টির ছাট বাঁচাবার জন্য ঘরের জানলা দরজা প্রয়োজন মতো বন্ধ ক'রে বিছানায় উঠলেন।

রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত তাঁর কোনদিনই

শিল্পী : শ্রীগোপাল ঘোষ.

হয়নি। কমলা সেদিকে বিশেষ সতর্ক ছিল।

আলীগড় পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। গাড়ি রাইট টাইম চলছে। গাজিয়াবাদ আসতে বিলম্ব নেই।

স্তব্ধ চক্ষে এবং রুদ্ধ নিশ্বাসে বসেছিলেন মিঃ বেদী এবং আপ্পারাও। ওদের একজনের চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন মনে হল।

হঠাৎ মিঃ বেদী প্রশ্ন করলেন, আপনি এত খুঁটিয়ে কেমন ক'রে জানলেন, স্যর?

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে দেবরায় বলল, আমার স্ত্রী ছিলেন কমলার সহপাঠী। আজও ওরা দুজন ঘনিষ্ঠ।

তারপর?

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দেবরায় বলল, হ্যাঁ, জন্মাষ্টমীর সেই সাংঘাতিক রাতটা আর কাটতে চাইল না। বাইরে অন্ধকার আকাশ আর দানবী প্রকৃতি—উভয়ের প্রচণ্ড সংগ্রামে সৃষ্টি স্থিতি যেন ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছিল। সেই প্রবল বর্ষণের ফলে কেবল যে পথঘাট সম্পূর্ণ জলমগ্ন হল তাই নয়, দুরন্ত ঝড়ের তাড়নায় ইলেকট্রিক কারেণ্ট ফেল ক'রে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুব দিল কলকাতার ওই অঞ্চলটা।—

নিচের তলার সিঁড়ির দরজায় মাঝে মাঝে কে যেন অল্প-স্বল্প ধাক্কা দিচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। কমলার বোধ করি কোনও সম্বিদ ছিল না। রাত কত বলা কঠিন। যে বজ্রাগ্নির ঝলক এক একবার জানলার ফাঁক দিয়ে ভিতরটাকে ঝলসিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল, তারই আভায় ক্ষণে ক্ষণে কমলা দেখে নিয়েছে বদ্রিনি কেমন ক'রে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মধ্যে লীন হয়ে গেছে!

কমলা সংযম হারায়নি। একবার বুবি সে কাতরোক্তি ক'রে ফুঁপিয়ে উঠেছিল তারপরেই চুপ। ভোরের অপেক্ষায় সে মৃতদেহের পাশে নিশ্চল হয়ে বসেছিল।

সহসা আশপাশের প্রতিবেশী মহলে একটা ভয়ানক চিৎকার শুনে সে চমকে বারান্দার ঠিক পাশে রেন-পাইপ ধ'রে চোর ঢুকেছে এটি ভাল ক'রে উপলব্ধি করার আগেই গণেশবাবু কলরব ক'রে উঠলেন, এবং প্রথমেই মস্ত একগাছা লাঠি নিয়ে বারান্দায়

দরজা খুলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

লোকজনের চিৎকারে প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারা গেল না। কিন্তু সেই অন্ধ বর্ষণ এবং ঝড় দুর্যোগের অন্ধকারে বিদ্যুৎ-ঝলকের মধ্যে দেখা গেল, গণেশবাবুর বাড়ির ঠিক পাশে রেন্-পাইপ ধ'রে চোর উঠছিল দোতলায়। গণেশবাবু এ সুযোগ ত্যাগ করতে পারলেন না। তাঁর প্রকাণ্ড লাঠির আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাত সইতে না পেরে চোর নামক সেই ব্যক্তিটি রেন-পাইপের গা-ঘেঁষে-নীচের দিকে পড়ে গেল, এবং তার আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না!

কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থের জান্তব উল্লাস গণেশবাবু চেপে রাখতে পারলেন না। কমলাকে একবার ডাক দিয়ে তিনি দ্রুতপদে নিচে গিয়ে সিঁড়ির দরজার তালা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু সে মিনিট খানেক মাত্র। যখন শুনলেন, চোরটা প'ড়ে গিয়ে খুন হয়েছে তখন সহসা তিনি পুলিশ ও খুনের মামলার সম্বন্ধে সচেতন হলেন, এবং সভয়ে কমলার পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেলেন। একমাত্র সান্ত্বনার কথা রইল এই, অবিশ্রান্ত বর্ষার ফলে সমস্ত রক্তের চিহ্ন ধুয়ে মুছে যাবে। গণেশবাবু ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

•

দুর্যোগের রাত্রের সেই হৈ-হট্টগোলের মাঝখানে ব্যাপারটা সঠিক কি প্রকার দাঁড়াল এটা আনুপূর্বিক জানা গেল না। তবে উপস্থিত সকলের নিষেধ অমান্য ক'রে সেই অর্ধমৃত, অচেতন ও রক্তাক্ত ছেলেটিকে কাঁধে তুলে পাগলিনী সেই রাত্রে কোন্‌দিক যে ছুটল, গণেশবাবু তার কোনও খবরই পেলেন না। শোনা যায়, পরের দিন প্রভাতকালে ডাঃ দাস নিজে উপস্থিত থেকে বুনির মৃত-দেহের যথোচিত সৎকার করেছিলেন।

মাসখানেক অবধি কমলার কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। অবশেষে একদিন আদালত থেকে গণেশবাবুর নামে একখানা বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশ এল। চিঠিখানা প'ড়ে তিনি একেবারে অবাক। ভেবে চিন্তে তিনি স্থির করলেন, স্ত্রীর সন্ধান যখন পাওয়াই গেছে তখন তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনাই দরকার। নচেৎ এই দু বছরের শিশুকে কে মানুষ ক'রে তুলবে?

বিনাসর্তে ক্ষমা চাইতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। আপোষরফা হ'য়ে গেলে আদালত এ নোটিস প্রত্যাহার করবেন।

হাসপাতালে গিয়ে খবর পেলেন, কমলা বিশেষ সম্মানের সঙ্গে পুনরায় তার পূর্বতন কাজে নিয়োজিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে ছেলেটিকে তিনি লাঠির আঘাতে মৃত্যুমুখী করেছিলেন, সেটি কমলার প্রথম সন্তান। ছেলেটি ধীরে ধীরে বেঁচে উঠেছে। এটি তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

দারোয়ান তাঁকে নিয়ে গেল ভিজিটার্স রুমে। সেখানে শান্তভাবে দাঁড়িয়েছিল কমলা। গণেশবাবু গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন।

দারোয়ান চলে যাচ্ছিল, কমলা ডাকল—ভজন সিং, একটু দাঁড়াও। কি চাও তুমি?

ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে গণেশবাবু বললেন, তুমি বাড়ি ফিরবে না?

কমলা জবাব দিল, না।

কচি নাবালক ছেলের কি হবে?

ছেলে আমার নয়।

স্ত্রীর চেহারা ও ভাবগতিক দেখে গণেশ-বাবু একটু ভয় পেলেন। বললেন, আমার অন্যায় হয়ে থাকলে ক্ষমা করো, কমলা।

জ্বলজ্বলে দুই চক্ষে কমলা এই লোকটার দিকে তাকাল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, তোমার দরকার ছিল সন্তান, আমার দরকার ছিল একটা পুরুষ-জন্তু। দুজনেরই দরকার এবার মিটেছে। যাও, দূর হয়ে যাও।—

হঠাৎ একটা নাটকীয় ভঙ্গী গণেশকে পেয়ে বসল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, কমলা, কমলা—তোমার সন্তান, তোমার সংসার, তোমার স্বামী—

বাধা দিয়ে কমলা বলল, ভজন সিং, লোকটা যদি না যেতে চায়, গলাধাক্কা দিয়ে বা'র ক'রে দিয়ো।

কমলা ঘর ছেড়ে হাসপাতালের ভিতর-মহলে চ'লে গেল।

•

যমুনা ব্রীজ পেরিয়ে ডাক স্টেশনে এসে পেঁছিল।

দ্বিতীয় হৃদয়ের জন্য

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

 যার সঙ্গে 'অভিন্নহৃদয়েষু' সে তার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া সেই দ্বিতীয় হৃদয়ের দরজা খুলতে কি ব্রজবুলি ব্যবহার করে তা ভিন্নহৃদয়েষু কোনজনের জানা বা জেনে চিচিং-ফাঁক করার চেষ্টাও অসাধ্য ব্যাপার! মায়াজাল এমনি, কথাই হল মনের বিজনঘরে ঢোকবার চাবিকাঠি। তরুণদের মাই-ডিয়ার ভাবখানা বেশী, এ বলে কথা উড়িয়ে দিলে চলবে না। ছোট থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবাই কাতরকণ্ঠে মন্দমধুর হাঁকছে এবং ডাকছে—যে ডাকার ফলে হৃদিরঞ্জন হচ্ছে। এ কাজে বাদ কোন শর্মাই যান না। সব দেশে সব মুখে সোহাগের রব আছে। রাশিয়ানরা ডাকছে, আমেরিকানরা ডাকছে, চীনেরাও, এসকিমোরাও, ফিলিপিনোরাও। ডেকে হৃদয়-গুহার পথ কাটছে।

সেদিন ছিল নিউইয়র্কে ভ্যালেনটাইন ডে। রুডলফ্ ভ্যালেনটিনোর নামানুসারে ভালবাসার পাত্রপাত্রীদের পরবের দিন। একটি লম্বা টেবিলে একজোটে প্রায় বারো দেশের বারোরকম জীব লাঞ্চে বসেছি। মাথায় খেলে গেল, এই খাওয়ার অবসরে যদি এই বিভিন্ন দেশের মুখপাত্রদের মুখ দিয়ে বার করা যায় নিজের নিজের ভাষায় প্রেমিক প্রেমিকাকে কী বলে—সেটা মন্দ হবে না। অন্তত নানা ধরনের হরেকরকমবা শোনা ত যাবে। সেদিন যা শুনেছিলুম, একটু সবুর করুন, আমার মনের রেকর্ডটা বাজিয়ে শোনাচ্ছি। তার আগে নির্জলা বাংলায় সোহাগস্তোত্রটা কী-ভাবে পাঠ করা হয় তাই দেখা দরকার।

কোন বাংলার বধূ ভালবাসায় আকণ্ঠ ভরপুর হয়েও প্রকাশ্যে পুরুকণ্ঠে সোয়ামীর নাম ডাকা দূরে থাক, উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারে না। সে নাম সবার সামনে বলতে গেলে জিভ কাটতে হয়, নয়ত বিষম লাগে।

ছেলেবেলায় এক বৃদ্ধাকে দেখতুম মাঝে মাঝে আসতেন বাড়িতে। সারা তল্লাটে অমন নিখুঁত বড়ি দেবার ও'র মত জুড়ি কেউ ছিল না। ও'র তখন বেশ বয়স হয়েছে। রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে বসে এক গামলা বাটা ডালকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে সারি সারি করে বড়ি দিতেন। ফোকলা মুখে কেবল বার হত 'ফরি' 'ফরি'। 'ফরি'র অর্থ কী, প্রথম শুনে কেউ ঠাওর করতে পারবে না। ঠাকুমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করার পর জানতে পারলুম, ও'র স্বামীর নাম হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাই আসল হরিকে ফরি করতে হয়েছে দায়ে পড়ে। সেই থেকে ছোটমহলে ও'র নাম করা হল 'ফরি-পিসিমা'। পতি-দেবতা, গুরুজন, প্রায় শ্বশুরের ক্যাটিগরি।

সব সময়ে সলজ্জ...।

কিন্তু বাইরে যত লজ্জার আর ভক্তির বহর থাক না; এই ভক্তিভাজন লোকটিই মহিলার স্বপনতরীর নেয়ে হয়ে ভালবাসার বোট-রেসে বছর বছর জয়ী হয়েছেন। তার তেরোটি সাক্ষী বর্তমান!

বাঙালীর সংসারে 'উনি' ডাকটি 'কুহু' ডাকের মত মিষ্টি। এমন ধন্বন্তরি নাম কেউ কখনও শোনেনি। এতে পাষাণ গলে, হৃদয় খোলে, দুঃখ ভোলে।

'উনি' ডাকটা ইদানীং নাকি কম প্রচলিত, কারণ উনি'র মধ্যে অহেতুক ভক্তির গন্ধ আছে। ভালবাসায় যারা সমান, তারা একজন আর একজনের চেয়ে ছোট বা হেয় নয়। দুজনে সমান্তরাল। তাই আলগোছাতে শুধু 'এই' কিংবা 'লক্ষ্মীটি' অথবা 'শুনচ' বা 'ধ্যাৎ' এসব সোহাগের ছোট ছোট ছররাও মুখের বন্দুক দিয়ে বিশেষ লোকের দিকে টিপ করে বার হয়।

'ওগো' ডাকটা দ্বৈতমধুর। ঠাকুরদা ঠাকুমাকে বলছেন 'ওগো', বাবা মাকে, ছেলে বউকে বড় বাঁধনপরানো পরানগলানো ডাক। কখনও পুরনো হয় না। সাবেকী কাল থেকে হালের কাল পর্যন্ত বুক-জল-করে-দেওয়া ডাক।

নতুন বিয়ের পর মর্মের কথা অন্তরব্যথা ফুটে ওঠে 'রাজা' আর 'রানী' বলাতে। এসব তালুকমুলুকহীন রাজারানী—মনের কোণের মহারাজা-মহারানী। দুঃখের সংসারে অলীক বাদশাবেগম ঝমঝমাঝম। এত না বলে এক কথায় সেরে দেওয়া যায় 'আমার পরান যাহা চায় তুমি তা'। কিন্তু নিরলংকার আরাধনায় কারও মন সহজে ওঠে না। মুখে বললে বেজায় নাটকীয় শোনাবে, কিন্তু কাব্যের

দোহাই এনে বহু কচকচি করার উপায় আছে —যেমন ঘুমভাঙানো, রাতজাগানো, সন্ধ্যা-বেলা প্রভাত-আনা. কিংবা তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, রাত্রের বিভাবরী, ভোরের বেলার ভৈরবী। কিন্তু আজকাল অবসরের অভাব, সবকিছুই শর্টকাট। সন্ধ্যার মেঘমালাকে শুধু মালা কিংবা মঞ্জুলরূপের নির্ঝরিণীকে শুধু মঞ্জু কিংবা ঝরনা বললেই 'মোর দ্যান এনাফ'। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শুধু শতবর্ষ পরে নয়, চিরকাল থাকবেন। এবং তাঁর লেখা 'ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু, ও রতনের হার, পরানের বঁধু'ও চিরকাল থাকবে।

নাম ধরে ডাকাটা ক্রমে প্রচলন হচ্ছে। আর্যপুত্রেরা প্যাণ্ট পরছে। মেয়েরাও লাজুকলতা নয়। তপোবন বলতে সিনেমা বুঝছে। চিরবিরহের কামনা চৌরঙ্গীর কোন রেস্তরাঁর নিরিবিলি কোণটা, সেখানে শুধু সুজিত, অমল, জয়ন্ত কিংবা বেলা, রেবা, অদিতি বলাটাই যথেষ্ট। কণ্ঠ কামদেবের শঙ্খ হয়েই আছে, সেটা তো বদলায়নি।

শুরু করেছিলুম ভ্যালেনটাইন ডে দিয়ে। সেদিন যে আসরে জীবনপদ্মে নামের কত-রকম মধু আহরণ করা হয়েছিল তাই আপনা-দের পরিবেশন করি। প্রস্তাবটা ছিল ইণ্ডিয়ার তরফ থেকে যার যার নিজের ভাষায় প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতিশব্দ ঘোষণা করতে হবে।

প্রথমেই বারবারা। খাঁটী আমেরিকান। সদ্য-বিবাহিতা। মন্তব্যের ভার এবং ধার দুই স্পষ্ট। ও বললে, মার্কিন মুলুকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রণয়ের গুনগুন একটি কথা দিয়ে—'হনি'। নতুন বিয়ের পর আনকোরা বধূ, তুমিও মধু আমিও মধু। মধুমিতা। মিতামধু। যতক্ষণ অবশ্য বিবাহবিচ্ছেদের ভাবনা আসবে না।

বারবারার এমন হলিউডী ঢঙে বলার পর সবার দৃষ্টি প্রায় একই সঙ্গে গিয়ে পড়ল অক্স-ফোর্ডের তরুণ সুপুরুষ ম্যালকম হার্ডিঞ্জের উপর। যতদূর আমরা জানি, ম্যালকমের যে ইস্পিটি আছে সেটি কেবল ইলেকট্রিকের সাহায্যে চলে, জামাকাপড় পাট এবং ধোপ-দোরস্ত রাখে। রক্তমাংসের কেউ নেই। তবু সবাই ওর দিকে কান বাড়িয়ে শুনলাম, আমাদের ইংলণ্ডে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'মাই-ডিয়ার' বলাটাই প্রচলিত। যে যার প্রাণের প্রিয়প্রতিমা, তাকে 'ডাভ' (ব নয় ভ) কিংবা 'সুইট পাই' এসবও বলে। বোঁ করে বাংলা প্রতিশব্দটা আমার মনে এল। ডাভ অর্থাৎ ঘুঘু মেয়ে—মেয়েঘুঘু। এ ত সম্ভাষণ নয় —সাংঘাতিক ব্যাপার! সুইট পাই'য়ের সঠিক বাংলা কী হতে পারে মাথায় আসে না। মিষ্টি পিটে বা মোহনপুরী গোছের কিছু। এসব বললে সব প্রসপেক্ট সাদা হয়ে যাবে।

ম্যালকমের পাশে ছিল ইসরাইলের এক মহিলা। ও'কে খুব কমই আমাদের সঙ্গে খেতে দেখেছি। ম্যালকমের সঙ্গে মাঝে মাঝে এখানে বসেন। বেশ সপ্রতিভ। উনি একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে না ভণিতা করে বললেন—জুদের অ্যাডম হল ইয়োকিরি এবং ঈভ ইয়োকিরিটি।

তারপর আরপাড নাজি বললে—আমার মতন সব হাঙেগরীয়ানরা বউকে বলবে সিভেম। স্বামী হল কিস আপা—অর্থাৎ লিট্‌ল্ ড্যাড। অনেক সময় একান্ত আপনার জনকে বলা হয় এ' ড্যাস। আরপাডের পাশে ছিল মিকাইয়েল। মুখে খাবার চিবুতে চিবুতে ধরা গলায় বললে—আমরা সাথীকে বলি সাওসি। আমার মগজে অনুবাদ হল জনমমরণের সাথী। মেকাইয়েল বলে চলল —লিবলিং অর্থে স্ত্রীকে বুঝায়। আমাদের সুইজারল্যাণ্ডে, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান তিন ভাষার প্রচলন। সুইজারল্যাণ্ডের কোন্ প্রান্তে গেছ তার উপর শুনতে পাবে কী ভাষার তাঁর ব্যবহার হচ্ছে। জুরিক গেলে জার্মান শুনবে। জেনিভা গেলে ফ্রেঞ্চ আর লুগানো গেলে ইটালিয়ান। জার্মানভাষী রমণীর হৃদয়-মন্দিরে প্রাণাধীশ হচ্ছে 'মাইন-ম্যান'—আমার মানুষটি। গালিবটে—প্রিয়তমা। গালিবটার—প্রিয়। ফ্রেঞ্চদের বুকে চমক-লাগানো সব ডাক আছে। প্রিয়সখীরা হল মাপোতিত, মাদাম, লা ফেম, মাশেরী। পুরুষ-দের জন্য রয়েছে ম-নামুর, ম-শের। যে রমণী বাঁশির মত বাজে তাকে লাফ্লুইং বলা হয়। পথের ধারের মেয়ে।

মিকাইয়েল ইটালিয়ানদের উপর কোন বিধান দেবার আগেই, বন্ধু কার্লো ডিআমাটো বাধা দিয়ে বললে—ওটা আমার জন্যে থাক্। ইটালিয়ানদের স্বভাবসিদ্ধ চনমনে ভাব মুখে চোখে মাখিয়ে কার্লো বললে—স্বামীদের বলা হয় ইলমারিত। বউরা হল লামোনিয়ে। আর বিয়ের সীমানার বাইরে ভালবাসার স্বপ্নমানসীটি হল লামান্তে। কার্লো বললে—আমাদের সব ভাল, শুধু যা আমাদের মেজাজে বিষুব-রেখার ছেঁকা লেগে গেছে। এই ধর না, আমার স্ত্রী তার ইলমারিতের জন্যে পাগল। কিন্তু দু দণ্ড যদি আমায় ডেকে উত্তর না পায় তাহলে তার মুখ পিস্তলের মত গুলী বার করে। আমরা চেপে ধরলুম—বলই না বাপু মুখ দিয়ে তখন কী বাক্যবাণ বার হয়। অনেক কিন্তু-কিন্তু করে কার্লো বললে—ডেকে না পেলে শুনবে ওর মুখ দিয়ে অনর্গল বার হচ্ছে—কার্লো, বীরবান্তে, বীরবোলে, মাসকালজইও, ডোক্ত এ। কার্লো খুনে, দস্যু, মুচি, এখুনি এস। অবশ্য ওগুলো রাগ করে ভালবাসা, ভালবেসে রাগ করা। বলার ধরন শুনে সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলুম।

কার্লো থামলে অস্ট্রিয়ান মহিলাটি বললেন—আমাদের নিজের দেশে জার্মান চলে, তবে নতুন কিছু এখানে শোনাতে পারি। রুমানিয়াতে বলে জানি, মেয়েপ্রেমিকা ড্রাগা—পুরুষ-প্রেমিক ড্রাগু। চেকোশ্লো-ভাকিয়াতে প্রিয়া হল মিলা আর প্রিয় মিলু। ন্যাপকিনের কাগজের উপর আমি একের পর এক লিখে যাই যত রকম ভাষায় মিলা আর মিলু কানে আসছে।

টেবিলের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত একের পর এক সবাই রসান জোগাল। টেবিলের এদিককার কোণে বসেছে হেনরি বুদাকিয়ান। পারস্যে জন্ম। কাইরোর মানুষ। এখন আমেরিকায় বিজ্ঞানী। রুসতম ব্যাবলোনিয়ান বললে, আর্মেনিয়ানে পতি অর্থে আমুসিন। পত্নী হল গিন (গিন্নীর একটা ন আর ঈ-কার কাটা)। আর বাইরের মেয়েমানুষ হোমানুহি। আরবীতে ঘরের মানুষ হল গোস্। ঘরের বউ মুরোদ। বাইরের মেয়েমানুষ হাদিবা। পারস্যে স্বামী সোহার —যে সোহাগ করে। জান্ স্ত্রী। ম্যাসুগে বারবণিতা। আবিসিনিয়া ভাষাভাষীরা স্বামীকে গেথচ ও স্ত্রীকে মেগে বলে। আর রাশিয়ানে স্ত্রী জোনা, রুশদেশের ভাষায় তোমায় ভালবাসি হল 'লাবলু'।

পাশে ছিল বন্ধু চ্যাঙ-এর স্ত্রী মেলিঙ। সব সময়ে সলজ্জ। মুখে কথাই বার হয় না। শেষে যেটুকু বার হয় তাও সবার কর্ণ-গোচর হয় না। কার্লো সেটাকে হেঁকে সবার কাছে জাহির করে দিল। ও বললে, চৈনিকে কোন ভদ্রমহিলা যদি 'আমার স্বামী' কথাটি বলেন ত বলবেন—ওডি (আমার) জ্যাংফু (স্বামী)। আর 'আমার স্ত্রী' ওডি (আমার) টাই টাই (স্ত্রী)। টাইটাই শুনে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ল। ইংরেজীর ডিয়ার অর্থে শুনলুম চিন নাড্যা।

এরপর আমাকে সবাই চেপে ধরলে— তোমাদের ভাষায় কী বলে শোনাও। বাংলায় এত কিছু বলে তা ওদের বলে কী করে বোঝাই বলুন। আপনাদের যা বলেছি আগে তা ত ওদের বলে বোঝানো যাবে না—পণ্ড-শ্রম হবে। ডাকবার অনেক হীরামাণিক্যের মধ্যে অনেক ভেবে ঠিক করা গেল এদের কাছে ওই কর্তা ও গিন্নী দুটি অ্যাটম বম ছাড়লেই চলবে। যথারীতি বললুম, হাসব্যাণ্ড হল কত্তা; ওয়াইফ গিন্নী। ইংরেজীতে কেউ কেউ বানান চাইলে ন্যাপকিনের উলটো দিকে বড় বড় করে লেখা হল Katta আর Ginni। বলা বাহুল্য, উচ্চারণ দুখানি স্পষ্ট কখনও কারও মুখে শুনিনি। তবে এই আসরের পর করিডোরে পথে ঘাটে একাধিক জনকে বলতে শুনেছি, তোমার গৃহিণী কেমন? অবশ্য উচ্চারণটা গাইনান, জিনি, গাইনাই এমন কত বিচিত্র রকমের মাউমাউ। ণ আর ন-র আওয়াজ হলেই আঁচ করে নিতুম গিন্নী বলতে চাইছে। বলতুম, ফাইন, থ্যাঙ্ক ইউ। গিন্নী যদি শয্যাও নিয়ে থাকেন তাহলেও এই উত্তরই শোনা ও শোনানর রেওয়াজ।

গ্রহণ-লাগা চাঁদ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী
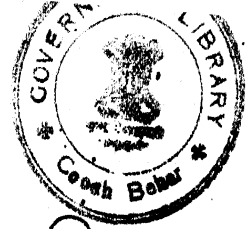
১৯১৬ সালের কথা।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। বাংলার দুঃসাহসী তরুণেরা পরাধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত হবার এই সুযোগ ছাড়তে রাজী নয়। পলাতক বিপ্লবীদের সাহায্যে জার্মানী থেকে অস্ত্র আমদানী করে বিশ্ব-যুদ্ধে বিব্রত বৃটিশ শক্তিকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়াবার স্বপ্ন দেখছে তারা।

অন্যদিকে ভারতের বৃটিশ রাজশক্তিও এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক এবং তৎপর হয়েছে। পুলিশ এবং 'স্পাই'-এর সাহায্যে তারাও একটা ত্রাসের রাজত্বের সৃষ্টি করেছে। বহু তরুণ, এবং স্বল্পসংখ্যক তরুণীও, বিনা বিচারে কারারুদ্ধ। উঠতি-বয়সের শিক্ষিত ছেলেমেয়ে নিয়ে নিরীহ পিতা-মাতার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। বাপ-মায়ের কাছে নিজেদের সন্তানরাই সব চেয়ে অপরিচিত ব্যক্তি।

এমনি দুঃসহ এবং অনিশ্চিত আবহাওয়ার মধ্যে সূর্যোদয়ের পূর্বেই বিহারের একটি কলেজ লাল-পাগড়িতে ঘেরাও হয়ে গেল। ভিতর থেকে কারও বাইরে আসবার অথবা বাইরে থেকে কারও ভিতরে যাবার উপায় নেই।

লোহার গরাদ-দেওয়া কলেজের ফটক এবং বহির্বেষ্টনীর ফাঁক দিয়ে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। শুধু ভিতরের দিকের বারান্দা দিয়ে মিশনারী ইউরোপীয় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের বহির্বাসের প্রান্ত মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে যায়। বোঝা যায়, তাঁরা খুব ব্যস্ত, বিব্রত এবং উদ্বিগ্ন। সংলগ্ন ছাত্রাবাসের একটি ছাত্রের মুখও জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। সামনের বারান্দায় তাদের সব পুলিশ পাহারায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়েছে। জানালা দিয়ে অন্তত ইঙ্গিতেও বাইরে ছাত্র-জনতার কাছে কেউ যে কিছু জানাবে, তার উপায় নেই।

জানাবেই বা কি? কেউ কি কিছু জানে?

সমস্ত আবাসিকের ঘরই খানাতল্লাসী হচ্ছে ইউরোপীয় অধ্যক্ষ এবং সহাধ্যক্ষের সামনে।

সে এক ভয়ংকর দৃশ্য।

প্রত্যেকটি ঘরে বইগুলো মেঝেয় ছড়ানো। ডেস্কের ভিতর, খাটের তলা, এমন কি একটি ঘরে বিছানা পর্যন্ত ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই! যদি তার ভিতরে একটা রিভলবার, কি কোনো বিপ্লবী বন্ধুর গোপনীয় সংকেত-পূর্ণ কোনো চিঠি পাওয়া যায়।

কিছুই পাওয়া গেল না। না চিঠি, ন রিভলবার। শুধু পাঠ্যপুস্তক 'পলিটিক্সে'র কিছু হাতে-লেখা নোট। খানিকটা অধ্যাপকের দেওয়া, অবশিষ্ট পাঁচখানা বই দেখে নিজেরই সংগ্রহ-করা।

কিছু পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু ঘণ্টা দুই পরেই বোঝা গেল, অন্যান্য অবাসিকদের ঘর খানাতল্লাসীটা ভাঁওতা মাত্র। সকলে
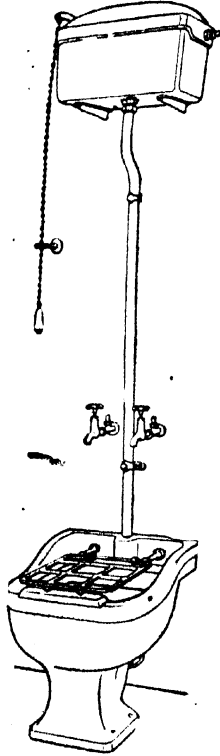
দৃষ্টি অন্যদিকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে। খানাতল্লাসীর আসল উদ্দেশ্য এই ঘরটি, এই মনোবিলাসের ঘর।

মনোবিলাস চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। পড়াশুনোয় ভালো। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছেলে।

বেশ লম্বা-চওড়া, বলিষ্ঠ চেহারা। খেলা-ধূলোয় নাম আছে। কিন্তু কারও সঙ্গে মেলা-মেশা বড় করে না। কেমন মনমরা। সকালে-সন্ধ্যায় নিজের ঘরে বসে পড়াশুনা করে। দুপুরে কলেজ, বিকেলে খেলার মাঠ। কমনরুমে অথবা বন্ধুবান্ধবের ঘরে বসে আড্ডা দিতে বড় একটা দেখা যায় না। সাধ্যমত সকলকে এড়িয়ে চলে।

সমস্ত আবাসিক দোতলার বারান্দায় এই দু' ঘন্টা ধরে দুরু দুরু বক্ষে সারি দিয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

পুলিসের ইন্সপেক্টর তাদের এসে মিষ্ট-বাক্যে জানালে, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের খানিকটা কষ্ট দিলাম। এখন আপনারা নিজের নিজের ঘরে যেতে পারেন।

বলামাত্র ছেলেরা বেঁচে গেল। তারা ছুটে নিজের নিজের ঘরে চলে গেল। মনো-বিলাসের কথা তাদের মনেই হল না। নিজেরা যে পুলিশের কবল থেকে অব্যাহতি পেলে এই আনন্দেই তখন ভরপুর।

আনন্দের সেই প্রথম ধাক্কাটা কাটতেই মনে পড়ল মনোবিলাসের কথা।

কোথায় সে? কি করছে? পুলিশ এই-বার তাকে নিয়ে কি করবে?

দু' একজন দুঃসাহসী ছেলে পা টিপে টিপে বেরিয়ে মনোবিলাসের ঘরের কাছে আসতেই পুলিশের ধমক খেয়ে পিছিয়ে এল।

কিন্তু এত বড় একটা উত্তেজক মুহূর্তে নিজের ঘরে একা-একাই বা কতক্ষণ বসে থাকা যায়?

কেউ গামছা কাঁধে স্নানের অছিলায়, কেউ বা দাঁতের মাজন-ব্রাশ নিয়ে মুখ ধোবার অছিলায় (ভোর থেকে যে কাণ্ড চলছে তাতে অনেকেই দাঁত মাজার অবকাশ পায়নি।) একে একে পুলিশ বাহিনী থেকে দূরে ওদিকের কোণের ঘরে এসে জমতে লাগল।

কারও মুখে কথা নেই।

এতক্ষণ ধরে প্রকাণ্ড একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল যেন। প্রত্যেকের জীবন যেন প্রকাণ্ড একটা নাড়া খেয়ে অসাড় হয়ে গেছে। এতক্ষণ ধরে কী যে হল এখনও তা যেন ভালো করে উপলব্ধি করতে পারছে না। আনন্দ-চঞ্চল ছাত্র-জীবন যেন একটা আকস্মিক দুরন্ত হিমপ্রবাহে জমে বরফ হয়ে গেছে। স্রোত খেলছে না।

কারও মুখে কথা নেই। কেউ খাটে, কেউ চেয়ারে, কেউ বা জানালায়, যে যেখানে পেরেছে নিঃশব্দে নতমুখে বসে। কেউ বা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ অবিনাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, এ আমি জানতাম।

সবাই চমকে উঠল। সকলের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন কর্ণমূলে এসে জমায়েৎ হল ঃ

কি জানতে? কি জানতে?

যে মনোবিলাস বিপ্লবী।

অবিনাশের গলার স্বর নেমে এসে যেন আরও গূঢ় হল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেরও ঃ

জানতে তুমি? কি করে জানলে?

এবারে অবিনাশ ঘাড় নেড়ে কথাটাকে আরও নির্ভুল করবার চেষ্টা করলে ঃ জানতাম মানে কি, অনুমান করেছিলাম।

কি করে? আমরা তো কখনও টের পাইনি,—কথায় কিংবা ব্যবহারে।

কথায় নয়। কথা মনোবিলাস বরাবরই কম বলে, যদিও ওটাও বিপ্লবীদের একটা লক্ষণ। কিন্তু ব্যবহার থেকে টের পাওয়া সকলেরই উচিত ছিল, অন্তত তোমার।

বলে অবিনাশ প্রবোধের দিকে চাইলে।

প্রবোধ তো অকূলে সমুদ্রে পড়ল। বললে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

পারছ না?

অবিনাশ প্রবোধের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি হানলে ঃ মনে কর গতবার পুজোর ছুটির সময়। তুমি তো আমাদের সঙ্গে ছিলে।

হাঁ। সে একটা ব্যাপার ঘটেছিল। গত-বার পুজোয় কলেজ বন্ধ হলে ওরা চারটি ছেলে, তার মধ্যে প্রবোধ এবং অবিনাশও ছিল, মনোবিলাসের প্রস্তাব মত কলেজ থেকে স্টেশন পর্যন্ত চল্লিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা যে একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার আজ সকালের আগে পর্যন্ত বোধ করি অবিনাশেরও মনে হয়নি।

প্রস্তাবটা মনোবিলাসেরই এবং যৌবন-সুলভ দুঃসাহসিকতাও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বেশি আর কিছুই নয়।

তখন পুশপুশের যুগ। পুশপুশ এক-রকমের পালকী-গাড়ি। দুজন সামনে থেকে টানত আর দুজন পিছন থেকে ঠেলত। মাঝে মাঝে কুলী-বদলের চটি ছিল।

শহর থেকে স্টেশন যেতে ওই ছিল তখন একমাত্র যান। যাত্রীরা সন্ধ্যার পর খেয়ে-দেয়ে পুশপুশে উঠত, সকালে পৌঁছুত। মাঝে মাঝে বাঘের মুখেও পড়ত। কিন্তু বিপদ ঘটত না। কুলীরা জঙ্গলের লোক। বাঘ তাদের প্রতিবেশী বললেই হয়। পরস্পরের হালচাল পরস্পরের বিশেষভাবে জানা।

সুতরাং ওপক্ষের কথা জানি না, কিন্তু এপক্ষ ওপক্ষের সান্নিধ্য যথাসময়ে টের পেয়ে যেত। তখন কুলীরাও যাত্রীদের সঙ্গে পশু-পশুদের নিরাপদ কোণে আশ্রয় নিয়ে তারস্বরে চীৎকার করত আর পশুদের গা বাজাত।

বাঘ কিছুক্ষণ শিকারের জন্যে মিথ্যে অপেক্ষা করে এক সময় চলে যেত। ভিতর থেকেই কি যেন এক অদ্ভুত উপায়ে কুলীরা তা টের পেত এবং বেরিয়ে এসে আবার গাড়ি টানতে আরম্ভ করত।

ছাত্রাবাসের সমস্ত ছাত্রই এইভাবে স্টেশনে যাওয়া-আসা করে।

সেবার হঠাৎ, বোধ করি অবিনাশই প্রস্তাব করে বসল, পুশপুশটা নিতান্তই মেয়েলি ব্যাপার। এবার চল, কয়েকখানা সাইকেল জোগাড় করে আমরা সাইকেলে যাই।

শহরের ছাত্র বন্ধুদের কাছ থেকে সাইকেল জোগাড় করার অসুবিধা কিছু ছিল না। জন দশেক ছাত্র উৎসাহিত হয়ে উঠল।

মনোবিলাস বলেছিল, দেখ ওটাও ঠিক যুবজনোচিত নয়। যদি করবার মতো কিছু করতে হয় তাহলে চল পায়দল।

এই চল্লিশ মাইল পথ!

সকলে সভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল।

না তো কি! সঙ্গে থাকবে একটা কাপড়ের পুঁটলি আর খান দুই বই, একখানা কম্বল আর কিছু রুটি-মাখন, চা-চিনি-দুধ। ভোরে এখান থেকে বেরুব। এগারোটা নাগাদ যে গ্রাম পাব, কি সাঁওতাল পল্লী সেই-খানে মধ্যাহ্নভোজন এবং বিশ্রাম। ফের দুটোয় বেরুব ছটা নাগাদ যে গ্রাম পাব সেইখানে নৈশভোজন এবং রাত্রিবাস। পারবে?

দশের মধ্যে সাতজন তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে গেল। রোমাঞ্চকর অভিযানের আকর্ষণে তিনজন রয়ে গেল।

সমস্ত কলেজে হৈ চৈ পড়ে গেল।

চল্লিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে। তাও যেমন-তেমন পথ নয়। চড়াই-উৎরাই তো আছেই, তা ছাড়া রয়াল বেঙ্গল টাইগার, হুড়ার, কি নেই?

রোমাঞ্চ তো বুঝি, কিন্তু এ যে প্রাণান্তের ব্যাপার। প্রবীণ অধ্যাপকেরা এমন খেলা কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাঁরা একযোগে এতে বাধা দিলেন।

তার ফল হল এই যে, যে তিনটি ছেলের মন বিপদ এবং কষ্টের কথা ভেবে ভিতরে ভিতরে দুলেছিল তারা শক্ত হয়ে গেল। যুবচিত্তের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাধাদান, তারা সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু সকলে বাধা দিলেও শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ তাদের উৎসাহ দিলেন, সাহস দিলেন এবং দীর্ঘপথ ভ্রমণের যে সমস্ত প্রক্রিয়া আছে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সে সম্বন্ধেও তাদের উপদেশ দিলেন।

এই হিসাবে, বলা যেতে পারে, তিনিই ছিলেন ওদের একমাত্র উৎসাহদাতা।

অনেক দিন পরে সেই দিনের কথা ওদের আবার নতুন করে মনে পড়ল। সেই চড়াই-উৎরাই পথ, সেই শাল-মহুয়া-পলাশ-আমলকির বন। কত ফুল, কত পাতা। সাঁওতাল-পল্লীর অকৃত্রিম আতিথেয়তা। পথ-চলার দুঃখ ও আনন্দ।

মনে পড়ল আজকের পুলিশ-হামলার সূত্রে, কী সাংঘাতিক দুঃসাহসী ছেলে এই মনোবিলাস!

অন্ধকার থাকতেই পুলিশবাহিনী কলেজ ঘেরাও করেছিল। একটু ফর্সা হতেই কলেজে ঢুকে পড়ে। তারপর থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। প্রতি ঘরে এবং বারান্দায় ছড়ানো ছেঁড়া কাগজ ও বইএর পাতার টুকরোয় এবং ছেঁড়া বিছানার উড়ন্ত তুলোয় তার চিহ্ন রয়ে গেছে।

কেউ কোনো কাজই করতে পায়নি। সকালের চা'টা পর্যন্ত পান করা হয়নি।

ওরা তো গেল গামছা কাঁধে, টুথব্রাশ ও মগ নিয়ে। মনোবিলাস তার বিপর্যস্ত শয্যার এক কোণে নিঃশব্দে গালে হাত দিয়ে বসে।

দরজার সামনে একজন কনস্টেবল। ঘরের মধ্যে চেয়ারে একজন সাব-ইন্সপেক্টর, কোমরে রিভলবার।

ইন্সপেক্টর অধ্যক্ষের অফিসে। শুধু অধ্যক্ষ আর তিনি।

একটা চাকর এসে দুজনের চা নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

অধ্যক্ষ লাফিয়ে উঠলেন। চা দেখে তাঁর মনোবিলাসের কথা মনে পড়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলেন, গারা লম্বরমে দিয়া?

নেহি সাব। দেনে গিয়াথা। লেকেন হুকুম নেহি মিলা।

হুকুম! কিস্‌কা হুকুম?

পুলিশকো।

অধ্যক্ষ ইন্সপেক্টরের দিকে চাইলেন।
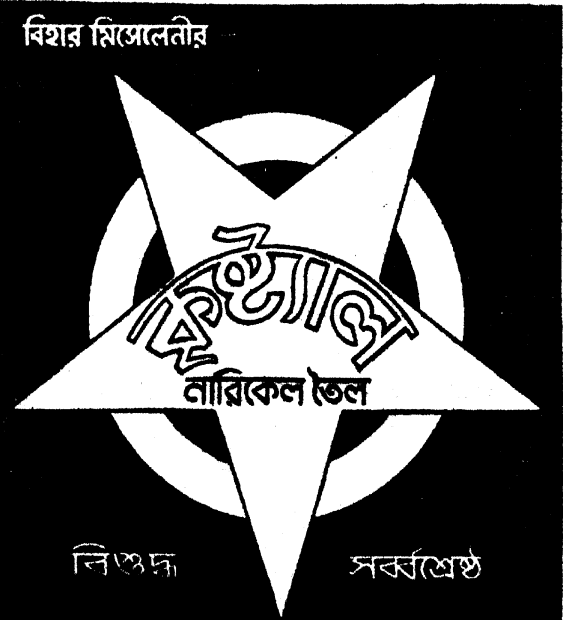
ইন্সপেক্টর লজ্জা পেলেন সে দৃষ্টিতে। কিন্তু তিনি নিরুপায়। আইন আইন। বাইরের কারও হাতে বন্দীর খাবার অধিকার নেই। তার জীবনের দায়িত্ব সরকারের।

বললেন, তুমি চা নিয়ে এস। আমি নিজের হাতে দিয়ে আসব। ও'র বোধ হয় হাত-মুখ ধোয়াও হয়নি।

না। কখন হবে?

তারও ব্যবস্থা করুন। সব চেয়ে ভালো হত যদি এখনই নিয়ে যেতে পারতাম।

কিন্তু তা হল না। অধ্যক্ষের অনুরোধে ইন্সপেক্টর এখান থেকে মনোবিলাসকে, খাইয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছেন। বন্ধুদের সঙ্গে কলেজের হস্টেলে তার শেষ ভোজন। সমস্ত দায়িত্ব অধ্যক্ষের।

সেও এক দৃশ্য!

প্রকাণ্ড হলে বসে গেছে আবাসিকবৃন্দ। মাঝখানে মনোবিলাস। তার ডান পাশে অধ্যক্ষ এবং বাম পাশে মহাধ্যক্ষ।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সবাই। হাতের গ্রাস মুখে ওঠে না কারও। সুমুখের থালা ঝাপসা হয়ে গেছে। দু'জন পাড়ে পরিবেশন করছে। তাদেরও সেই অবস্থা। হাত কাঁপছে, বুক ফুলে ফুলে উঠছে। অশ্রুর ধারা বয়ে চলেছে গাল বেয়ে।

শুধু মনোবিলাস স্তব্ধ, শান্ত। শুধু একটু অন্যমনস্ক, একটু চিন্তান্বিত। থেকে থেকে ললাটে ভ্রূকুটির রেখা উঠেই তখনই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। খেতে পারছে না, শুধু খাবার নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করছে। থেকে থেকে এক-আধ গ্রাস মুখেও তুলছে। সবই অন্যমনস্কভাবে।

হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে সকলের দিকে চাইলে। খাবার হলটা কী অস্বাভাবিক শান্ত! যেন কলেজের সেই ভোজনালয়ই নয়। যেন মধ্যরাত্রে চলতে চলতে সে এক কবরখানায় এসে পড়েছে।

মৃদু হেসে অধ্যক্ষকে বললে, খুব অদ্ভুত নয় স্যার?

অদ্ভুত কি। ওরা তোমার বন্ধু।

হ্যাঁ বন্ধু। তবু অদ্ভুত এই জন্যে যে, পৃথিবীতে কখন কার জন্যে কে কাঁদে, আগে থেকে জানা যায় না।

অধ্যক্ষ মাথা নিচু করলেন। তিনি জানেন, মনোবিলাস কি বলতে চায়। তাই মাথা নিচু করলেন।

অবশেষে কবরখানার ছমছমে আবহাওয়ার মধ্যে ভোজনপর্ব শেষ হল।

ইন্সপেক্টর দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করছেন। হাতে সময় বেশি নেই। সাড়ে দশটায় কলেজ বসবে। তার আগেই মনোবিলাসকে নিয়ে যাওয়া দরকার। নইলে ভিড় হতে পারে।

কোথায়?

আপাতত সেণ্ট্রাল জেলে। সেখান থেকে কখন কোথায় যায় কেউ জানে না।

আহারান্তে হাত-মুখ ধুয়ে মনোবিলাস চলল, নিজের ঘরে নয়, ইন্সপেক্টরের পাশে পাশে, কলেজের ফটকে, যেখানে তার জন্যে কালো রঙের ঢাকা গাড়ি অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল কয়েদী-গাড়ির দরজা এবং কলেজের ফটক।

সমুদ্রের ঢেউএর মতো একটা চাপা-কান্নার শব্দে ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্ধ ফটকে, কলেজ কম্পাউণ্ডের রেলিঙে।

সেদিন কলেজ বন্ধ হয়ে গেল।

সমস্ত কলেজে যেন একটা গভীর শোকের ছায়া থমথম করতে লাগল। গাছের পাতায় পাতায় যেন শন শন অতি মৃদু চাপা কান্না।

অপরাহ্ণের দিকে সেই নিস্তব্ধ কলেজে অধ্যক্ষের ঘরে অতি মৃদু টোকা পড়ল।

ভিতর থেকে ধরা গলায় অনুমতি এল, ভিতরে এস।

অবিনাশ আর প্রবোধ।

অধ্যক্ষ ওদের বসতে বললেন। ওদেরই যেন তিনি খুঁজছিলেন। মনোবিলাসের ঘনিষ্ঠ দু'জন বন্ধুকে।

রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছে রুমালটা হাতের হাতায় পুরে নিলেন।

ওকে কিছুতেই বাঁচানো গেল না।

অবশেষে তিনি বললেন। যেন একটা গল্প শেষ থেকে আরম্ভ করলেন।

ও কিছুতেই পালাতে রাজি হল না। আমি অনেক অনুরোধ করেছিলাম।

বিস্ময়ে প্রবোধ এবং অবিনাশের দম বন্ধ হবার উপক্রম : কে পালাতে রাজি হল না? আপনি কার কথা বলছেন?

মনোবিলাসের। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাকে বুঝিয়েছি। সাহসী ছেলে। ওকে আমি মোটরবাইকে স্টেশনে পোঁছে দিতে রাজি হয়েছিলাম। ভোরে পুলিশ আসবার আগেই আমি কলেজে ফিরতে পারতাম। টাকা দিতে রাজি হয়েছিলাম যাতে কিছুদিন ওর চলে যায়।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি স্যার, আগে জানতে পেরে-ছিলেন?

পেরেছিলাম। কি করে, জিগোস কোরো না। কিন্তু ও কিছুতেই পালাতে চাইলে না। কেন জান? ওর বাপ ওকে ধরিয়ে দিচ্ছেন।

অতর্কিতে খোঁচা খেলে মানুষ যেমন চীৎকার করে লাফিয়ে ওঠে তেমনি করে ওরা দুজনেই লাফিয়ে উঠল : অ্যাঁ!

হ্যাঁ, ওর বাবা। কোথাকার যেন ডি এস পি। মনোবিলাস নিজে বলেছে, বছর দুই আগে ওর দাদাকে ধরিয়ে দিয়ে তিনি ইন্সপেক্টর থেকে ডি এস পি হন, এবারে এস পি হবার ইচ্ছা। ও জানত। তাই পালাতে রাজি হল না। বাঁচবার ইচ্ছেই নষ্ট হয়ে গেছে। যাওয়া অস্বাভাবিক।

সকলে নিস্তব্ধ।

অনেকক্ষণ পরে অবিনাশ বললে, ওর মা নেই, সংমা।

এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন স্পষ্ট হল। অধ্যক্ষ ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, তাই। অর্থাৎ মা থাকলে এমন সম্ভব হত না।

হঠাৎ এক সময় অধ্যক্ষ বললেন, ও বিপ্লবী নয়। কোনো বিপ্লবী দলের সঙ্গে ওর জানা নেই। নিজেই আমাকে বলেছে। আরও বলেছে, এবারে জানা হবে।

অবিনাশ সবিস্ময়ে বললে, ও বিপ্লবী নয়?

না। সত্যিকার বিপ্লবীর কাছে ভাবালু-তার স্থান নেই। পালাবার সুযোগ সে ছাড়ে না।

এবারে অধ্যক্ষ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
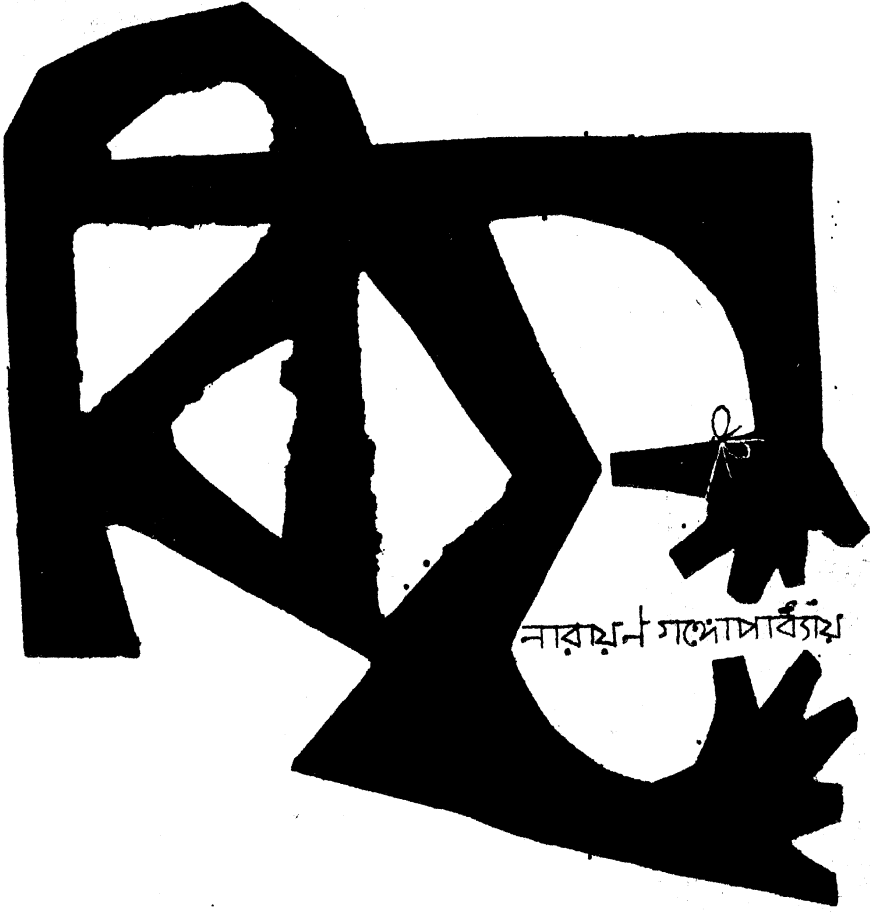
ক দরজার বাইরেই লিফটটা সমানে ওঠানামা করছে। তাকিয়ে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করে জয়গোপাল।

প্রকাণ্ড সাততলা বাড়ী। নানা জাতের অফিস, ডাক্তারের চেম্বার, ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী। খোলা দরজা দিয়ে একটা মৃদু মিশ্র গুঞ্জন, জুতোর শব্দ, টেলিফোন আর কলিং বেলের আওয়াজ, টাইপরাইটারের দ্রুতধ্বনি। একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতে নিঃসঙ্গ মানুষের মতো নিজেকে মনে হয় জয়গোপালের।

'আমার অফিসটাই ভালো'--জয়গোপাল ভাবে। স্ট্র্যাণ্ড রোডের ধারে পুরোনো বাড়ী। বাঙালি কোম্পানীর অফিস। নোনাধরা দেওয়ালে দু বছর চুণের আস্তর পড়েনি। চেয়ারগুলো মটমট করে। পুরোনো কালো হয়ে যাওয়া পাখাগুলো স্পার্ক দেয়, বিবর্ণ পার্টিশনের ওপারে বসে মালিক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আলাপ করেন টেলিফোনে; সামনের রাস্তায় সাবেকী ট্রামগুলো কর্কশ আওয়াজে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, ট্রেনের ধোঁয়া ফাইলের ওপর কালো আস্তর ফেলে যায়। বেয়ারা বলে, হামি কী করে সাফা রাখবে বাবু, ধুলো আর ধোঁয়া হরবখৎ আসছেই—আসছেই।

এই নতুন সাততলা বাড়ীর আবহাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করে জয়গোপাল। খোলা দরজা দিয়ে লিফটের ওঠানামা দেখতে থাকে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দৃষ্টিটা এলোমেলো হয়ে যায়, মনে হয় ওই লিফটের সঙ্গে সমস্ত বাড়ীটাই পিস্টনের মতো ওঠানামা করছে।

বাইরে থেকে ফিরিয়ে আনে চোখ দুটোকে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে। সামনের টেবিল থেকে তুলে নেয় একটা ছবিওলা পত্রিকা। মাস ছয়েকের পুরোনো, হাতে হাতে জীর্ণ হয়ে গেছে। বিলিতী ফ্যাশান ম্যাগাজিন। প্রায় দিগ্‌বসনা থেকে বিচিত্রবসনা নারীদের ভীড়। একটা অসম্ভব আশায় জয়গোপালের মনে হয়—সামনের খোলা দরজা দিয়ে এই রকম পোশাকের একটি যে-কোনো মেয়ে যে-কোনো সময় এই ঘরে এসে দাঁড়াতে পারে। এ বাড়ীতে সবই সম্ভব।

কিন্তু বাইরে দরজা দিয়ে নয়। জয়গোপালের পেছনে, ভেতরের দরজা খুলে আসে ডাক্তার অজয় নাগ। জয়গোপালের ছেলেবেলার বন্ধু। বিলেত থেকে ফিরে এসে এখানে চেম্বার খুলেছে। ষোলো টাকা করে ফী নেয় চেম্বারে। কিন্তু জয়গোপালকে এক পয়সাও দিতে হবে না। অজয় নাগ তার ছেলেবেলার বন্ধু।

—এই যে—অজয় হাসে : কতক্ষণ?

—মিনিট পঁচিশেক হবে।

—সরি। একটা ব্লাড টেস্ট করছিলুম আর ভেতরে।

জয়গোপাল উঠে দাঁড়ায়। বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকায় একবার। ব্যাণ্ডেজটা ময়লা হয়ে গেছে। স্ট্র্যাণ্ড রোডের অফিসে ওটা খারাপ লাগত না—ভারী বেমানান দেখায় এখানে।

আয়—দেখি একবার আঙুলটা। এমন কি ঘা বানিয়ে বসেছিস—যা কিছুতেই সারছে না।

জয়গোপাল অজয়কে অনুসরণ করে।

নতুন মোজেইকের ওপর সাতদিন কালি না করা জুতোটাকে ভারী অশোভন মনে হয়। আঙুলের ব্যাণ্ডেজটাকে আরো খারাপ লাগে।

দুজনের পেছনে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হয়। দরজার সঙ্গে রবারের প্যাড লাগানো আছে—লক্ষ্য করে জয়গোপাল। চেম্বারে ঢুকে হঠাৎ একটা একশো পাওয়ারের আলো জেলে দেয় অজয়। জয়গোপাল চমকে ওঠে একবার—চোখে প্রচণ্ড একটা আলোর ঘা লাগে।

—বোসো।

একটা ভারী চেয়ারের পুরু কুশনের ওপর নিজেকে ছেড়ে দেয় জয়গোপাল। চোখ মেলে তাকাতে কষ্ট হয়। এইটুকু ঘরে এত আলোতে সারা শরীর যেন জ্বালা করতে থাকে।

অজয় পাশে এসে দাঁড়ায়।

—দেখি আঙুল।

জয়গোপাল হাতটা বাড়িয়ে দেয়। আস্তে আস্তে ময়লা ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলে অজয়।

—হুঁ। কতদিনের ব্যাপার?

—প্রায় তিন মাস। আধবোজা চোখে, সামনের একটা পেপার ওয়েটে ইন্দ্রধনুর রং দেখতে দেখতে জয়গোপাল জবাব দেয়।

—সবটা খুলে বল। —অজয়ের গলাটা অদ্ভুত মোটা মনে হয়।

একশো পাওয়ারের আলোয় পেপার ওয়েটের ভেতর ইন্দ্রধনুর রং ঝিলমিল করে। জয়গোপাল দেখে—ক্ষতটার ইতিহাস বলে চলে। নিঃশব্দে শোনে অজয়।

তারপর:

—লাগছে জয়গোপাল?

—না।

—কোনো সেন্‌সেশন পাচ্ছিস?

—উঁহু।

—হুঁ।

অজয় সরে যায়। একভাবে, আধবোজা চোখে বসে বসে জয়গোপাল শোনে একটা ওয়াশবেসিনে হাত ধুচ্ছে অজয়। লিকুইড সোপের গন্ধ আসে। জয়গোপাল এবার পুরো চোখ খুলে আঙুলে ময়লা ব্যাণ্ডেজটা জড়িয়ে নেয়। আলোটা অনেকখানি সয়ে এসেছে এতক্ষণে।

তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে অজয় এসে দাঁড়ায়। একটু পেছনে, একটু যেন দূরত্ব বাঁচিয়ে।

—আই অ্যাম্ সরি। রিয়্যালি সরি।

আচ্ছন্ন মনের ওপর যেন চাবুক পড়ে। কুশনের চেয়ার যেন স্প্রীঙের একটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তুলে ফেলে তাকে।

—কী হয়েছে অজয়?

আস্তে আস্তে অজয় বলে, লেপ্রসি।

একশো পাওয়ারের আলোটা দশ হাজার কিলোওয়াটে জ্বলে উঠেই যেন কেটে চৌচির হয়ে যায়। এই সাততলা নতুন বাড়ীটা একটা অতিকায় লিফট হয়ে মহাশূন্যে উঠতে উঠতে আচমকা আছাড় খেয়ে পড়ে। একরাশ অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যেতে যেতে জয়গোপাল শোনে কানের কাছে পাঁচশোটা সিংহের মতো গর্জন তুলে অজয় বলছে: লেপ্রসি—লেপ্রসি!

অজয় বলেছিল, এত নার্ভাস হচ্ছিস কেন? আজকাল অনেক কেসই তো সারছে। মডার্ন ট্রীটমেন্ট—

আর কী কী বলেছিল, কিছু মনে নেই। জয়গোপাল শুনতেও পায়নি।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে একবার তাকিয়ে দেখেছিল সাততলা বাড়ীটার দিকে। মহাশূন্য থেকে আছড়ে পড়া প্রকাণ্ড লিফটটা নিথর হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এত বড় দুর্ঘটনাতেও ও বাড়ীর কারো এতটুকু ক্ষতি হয়নি। জুতোর শব্দ উঠছে, কলিং বেল আর টেলিফোনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—দ্রুতধ্বনিতে বাজছে টাইপ-রাইটার। কেবল স্ট্র্যাণ্ড রোডের জীর্ণ বাঙালী অফিসের কেরাণী জয়গোপাল রায় ভেঙে চুরে একটা রক্তমাংসের পিণ্ডে পরিণত হয়ে গেছে। অনধিকার প্রবেশের প্রায়শ্চিত্ত।

তবু, অস্তিত্বহীন, পিণ্ড হয়ে যাওয়া জয়গোপালের শরীরটা পথ বেয়ে এগিয়ে চলে। এখন আর বুড়ো আঙুলটাই নয়; তার সারা শরীর, সমস্ত অস্তিত্ব—একটা দুর্গন্ধ বিষাক্ত ঘায়ে পরিণত হয়েছে। কুষ্ঠ।

সারে। অজয় বলেছিল, সারে।

সারে? কিন্তু তার আগে?

রাজা লেনে আড়াইখানা ঘরের বাড়ী। আধখানায় রান্না হয়, বাকী দুখানাতে মা, ছোটভাই, স্ত্রী, নিজের দুটি ছেলেমেয়ে। ছোট ছোট ঘর, দেওয়াল চেপে আসে চারদিক থেকে, তক্তপোষ পাতবার জায়গা হয় না—শুতে হয় মেজেতে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলতে হয় প্রত্যেক মুহূর্তে। তার মধ্যে কুষ্ঠ। চমৎকার।

মা, স্ত্রী, ভাই, ছেলেমেয়ে—পৃথিবীর সবাই আজ দূরে সরে গেছে—কোনো সমুদ্রের ভেতর, এক টুকরো দ্বীপে একটা বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি করে তার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছে জয়গোপাল। কাছে কেউ নেই, কেউ থাকবে না। সে ভয়ংকর—সে পিশাচে পাওয়া। তার নিঃশ্বাস পর্যন্ত সাংঘাতিক।

চিকিৎসা করালে হয়তো সারে। তার আগে?

চাকরিটা যাবে। কে রাখবে তাকে অফিসে? হয়তো তারই জন্যে পাঁচ পাঁচ বছর পরে চুণের আস্তর পড়বে অফিসারের দেওয়ালে, ফিনাইল—লাইজল দিয়ে ধোয়া হবে চেয়ার টেবিল, সহকর্মীরা আতঙ্কে তিনদিন ধরে কার্বলিক সাবান দিয়ে স্নান করবে। স্ত্রী তার ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে যাবে বাপের বাড়ী—মা ছোটভাইকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হবেন দেশের দিকে। তাকে দেখে পাড়ার লোক সভয়ে পথ ছেড়ে দেবে—দূর থেকে আঙুল বাড়িয়ে বলবে—ওই লোকটার কুষ্ঠ হয়েছে।

পায়ের নিচে রাস্তাটা দোল খায় জয়গোপালের। পাশের বাড়ীগুলো যেন সেই লিফটার মতো আকাশে ওঠানামা শুরু করতে থাকে। অন্ধের মতো রাস্তা পার হয় জয়গোপাল। একটা ট্যাক্সী প্রায় গা

পথে বেরিয়ে যায়, ড্রাইভারের গর্জন শোনা যায়ঃ আভি খতম হো যাতা—শূয়ারকা বাচ্ছা!

একটা ডবল্‌-ডেকারের গরম গ্যাস মুখের ওপর আছড়ে পড়ে। জয়গোপাল গড়ের মাঠে এসে পা দেয়। বর্ষার ভিজে ভিজে ঘাস গোড়ালি ছাপিয়ে ওঠে—কতকগুলো সাপের ছানার মতো কিলবিলে ঠান্ডা ছোঁয়া বুলিয়ে জয়গোপালের উদগ্র উন্মুখ স্নায়ু-গুলোকে চকিত করে তোলে। দূরের ফোর্ট উইলিয়ম একটা জাহাজ হয়ে যায়—সবুজ সমুদ্রের মতো দুলতে থাকে। গাছগুলো নেচে চলে ছায়াবাজীর মতো—মনুমেণ্ট হেলে পড়ে। কিলবিলে সাপের ছানার মতো বর্ষার নতুন ঘাস পা জড়িয়ে টানতে থাকে জয়-গোপালকে। সেই আকর্ষণের কাছে নিজেকে ছেড়ে দেয় সে, সবুজের সমুদ্রের তুফান ওঠে—জাহাজের মতো ফোর্ট উইলিয়মটা কাত হয়ে ডুবে যাচ্ছে মনে হয় তারপর—

তারপর জয়গোপাল যখন উঠে বসে তখন বেলা পড়ন্ত। মাঠে লাল রোদ। হু হু করে খ্যাপা হাওয়া ছুটেছে গংগার দিক থেকে। সেই হাওয়ার ঝাপটায় জয়গোপাল চোখ কচলায়।

মাথাটা যেন কংক্রীট দিয়ে জমানো। একটা নিরেট অন্ধকারের পর্দার সামনে সমস্ত অনুভূতি কিছুক্ষণের জন্যে থমকে থাকে। ধীরে ধীরে পর্দাটা সরে যেতে থাকে। ঠিক ঘাড়ের নিচ থেকে কয়েকটা ধারালো যন্ত্রণার শলা ছুটে এসে মস্তিষ্ককে বিদ্ধ করে জয়-গোপালের। দু হাতে মাথাটা চেপে ধরে জয়গোপাল। সমস্ত মনে পড়ে যায়।

দু হাতের দশটা আঙুলে, সেই অনুভূতি-হীন ব্যাণ্ডেজ জড়ানো আঙুলের ডগাটাকে কানের পাশে চেপে ধ'রে, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে মাথাটাকে ভেঙে ফেলতে চায় জয়-গোপাল—একটা মাটির ভাঁড়ের মতো গুঁড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। তারপর আঙুলের গাঁট-গুলো যখন ফেটে যেতে চায়—তখন হাত দুটোকে ছেড়ে দেয় সে—কাঁধের থেকে যেন আলাদা হয়ে গিয়ে তারা ঘাসের ওপর আছড়ে পড়ে।

ব্যাণ্ডেজ জড়ানো আঙুলটার দিকে বিভ্রান্ত হিংস্র দৃষ্টিতে তাকায় জয়গোপাল। একটা ছুরি থাকলে ওটাকে কেটে এখুনি দূরে ফেলে দিত। দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলা যায় না? যায়? হয়তো যায়। কিন্তু আঙুলে যার সূচনা, সেইখানেই তো তার শেষ নয়; ওই আঙুলকে ছাড়িয়ে বিষ এখন তার প্রত্যেকটা শিরায় ছড়িয়ে গেছে। প্রতিটি রোমকূপে—প্রতিটি চুলের গোড়ায়। একটা আঙুল ছিঁড়ে ফেলে দিলে আর একটায় দেখা দেবে—তারপর এক-একটা করে

পঁচিশটা সিংহের মত গর্জন করে জজর বলছে, লেপ্রসি, লেপ্রসি

খসে পড়বে—গলে যাবে নাক-ঠোঁট—কত-গুলো রক্তাক্ত বীভৎস ক্ষত—

প্রায় চিৎকার করে ওঠে জয়গোপাল। একটা নেড়ী কুকুর দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে।

খবর পেয়েছে? এত তাড়াতাড়ি? এখুনি?

জয়গোপাল আবার চিৎকার করে। অদ্ভুত জান্তব স্বর বেরোয় গলা দিয়ে। হাতের কাছেই বৃষ্টিতে পচা একটা সিগারেটের বাক্স পড়ে ছিল। সেইটে তুলে নিয়ে ছুড়ে দেয় কুকুরটার দিকে। কুকুরটা ছুটে পালায়। খানিক দূর দিয়ে দুজন কুলি চলেছিল, এক-বার দাঁড়িয়ে পড়ে আশ্চর্য হয়ে দেখে জয়-গোপালকে—তারপর আবার এগিয়ে চলে যায়।

টের পেয়েছে—টের পেয়েছে তা হলে। তার শরীর থেকে বিষাক্ত ব্যাধির গন্ধটা এর মধ্যেই তবে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে! এখন একটা এসেছে—এর পরে দুটো আসবে—তারপরে দল বেঁধে আসবে, তারও পরে—

সমস্ত মাঠটা বিকেলের রোদে যেন রক্ত-মাখা। ফোর্ট উইলিয়মটাকে একটা রক্তাক্ত ক্ষতের মতো দেখাচ্ছে। মাংস ছিঁড়ে খাওয়া রক্ত জড়ানো একটা হাড়কে কে যেন মাটিতে পুঁতে রেখেছে—মনুমেণ্ট। জয় গোপাল শিউরে চোখ বন্ধ করে।

স্মৃতি। ছেলেবেলার একটা ভয়ঙ্কর স্মৃতি।

জেলখানার উল্টো দিকে সেই প্রশস্ত আম বাগানটা। বিকেলে সেই বাগান থেকে আম কুড়িয়ে ফেরবার সময় দেখেছিল কুষ্ঠ রুগীটাকে।

কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। নাক নেই, ঠোঁট নেই, গালের একদিকের মাংস খসে পড়ে কতকগুলো দাঁত বেরিয়ে এসেছে। হাতে পায়ে সব শুদ্ধ গোটা চারেক আঙুল আছে কি না সন্দেহ। একটা ময়লা পুঁটুলি আর লাঠি পড়ে আছে পাশে—গাছতলায় বসে হা হা করে হাঁপাচ্ছে লোকটা।

—এ'কটু জল দেবে খোকা?

জল দেবার সাহস পায়নি—ওরা তিন-চারজন ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

তারপর রাত হলে অন্ধকার বাগানটার ভেতরে শেয়ালের ঝগড়া আর গোঙানি কানে এসেছিল কারো কারো। কিন্তু অত রাতে কে ঢুকতে যায় ওই পুরোনো বাগানে? গোখরো সাপের আড্ডা ওর ভেতরে—ভূতের ভয় না আছে তা-ও নয়।

ব্যাপারটা বোঝা গিয়েছিল সকালে।

সমস্ত রাত ধরে অসহায় লোকটাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই শেয়াল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। আঙুল খসে পড়া হাতের দুর্বল মুঠোয় লাঠি ধরেও সে বাঁচতে পারেনি। টুকরো টুকরো মাংস লেগে থাকা কঙ্কালটা পড়ে আছে গাছতলায়—কেবল চোখ দুটো অক্ষত—বিস্ফারিত হয়ে সে চোখ শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছে।

সারা শরীরে ঝাঁকুনি লাগে। জয়গোপাল উঠে দাঁড়ায়।

সারে। অজয় বলছিল। হয়তো প্রভিডেন্ট ফান্ডের সব ক'টা টাকা নিয়ে, নিজের ঘড়ি আংটি বিক্রী করে দিয়ে কোনো কুষ্ঠাশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নিলে একদিন সে সেরেও উঠতে পারে। কিন্তু যদি না সারে? আজ পর্যন্ত কারো কুষ্ঠ সেরে গেছে বলে সে তো শোনেনি।

যদি না সারে? তা হলে এক-একটা করে আঙুল খসে পড়বে, নাক-মুখ গলে যাবে, কোথাও আশ্রয় মিলবে না—দূর থেকে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দেবে—তারপরে সেই লোকটার মতো কোনো এক আমবাগানের ভেতরে—

কুকুরটা দলবল জুটিয়ে ফিরে আসছে নাকি? এরই মধ্যে? এত তাড়াতাড়ি?

জয়গোপাল চলতে আরম্ভ করে। হঠাৎ যেন পালাতে চায় এই মাঠের নির্জনতা থেকে। একটু পরেই রাত নামবে—আসবে অন্ধকার তখন—। জোর পায়ে পায়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে এগোতে এগোতে মনে পড়ে—কলকাতার অনেক জায়গায় সে কবিরাজের সাইনবোর্ড দেখেছে। 'কুষ্ঠ ও ধবল নিরাময় হয়।' কিন্তু সত্যিই কি ওরা সারাতে পারে? সারিয়েছে কাউকে?

কিন্তু তারও আগে তো বাড়ীতে ফিরতে হবে। স্ত্রী প্রশ্ন করবে, মা জানতে চাইবেন।

—কী হয়েছে আঙুলে? ডাক্তার কী বললে?

মিথ্যে কথা বলবে জয়গোপাল? মিথ্যে কি চাপা থাকবে বেশি দিন? যেমন করে কুকুরটা টের পেয়েছে—তেমনি করে তার বিষাক্ত ব্যাধির দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে। শিউরে সরে যাবে স্ত্রী—দু চোখ-ভরা আতঙ্ক নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে মা—ছেলেমেয়েরা ডাকলেও আর কাছে আসবে না—পাড়ার লোক আতঙ্কে পথ ছেড়ে দেবে—আঙুল বাড়িয়ে বলবে—

নিচের ঠোঁটে ঠোঁটে দাঁত চেপে ধরে জয়গোপাল। ঠোঁটটাকে কেটে নিজের রক্তের স্বাদ নিতে চায়। দাঁড়িয়ে পড়ে।

পায়ের কাছ দিয়ে লাল একটা রবারের বল গড়িয়ে যায়। তিন চারটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়ে বল নিয়ে খেলা করছে। চার থেকে ছয়ের ভেতর বয়েস—কয়েকটা ফুটন্ত ফুল যেন ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক।

হিংস্রভাবে জয়গোপালের মনে হয় এক-একটা বাচ্চাকে সে নিষ্ঠুর হাতে জাপটে ধরে—তারপর নিজের বিষাক্ত আঙুল থেকে খানিকটা রস ওদের গালে মাখিয়ে দেয়। প্রত্যেকটি শিশুকে—প্রতিটি নীরোগ সুস্থ মানুষের গায়ে সে ছড়িয়ে দেয় বিষ—সারা পৃথিবী জুড়ে দগদগে কুষ্ঠের ঘা ছাড়া কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না।

—স্যালি—জোন—এডি—কাম্ অ্যাওয়ে—কুইক্—

দূর থেকে মেয়েলি গলার ডাক আসে। মায়ের মন কি জয়গোপালের কুৎসিত ইচ্ছেটা টের পেয়েছে? বল কুড়িয়ে নিয়ে বাচ্চারা ছুটে চলে যায়। একটা তিক্ত নৈরাশ্যে চুপ করে গোপাল দাঁড়িয়ে থাকে, হাতের মুঠো শক্ত হয়ে কড়কড় করে ওঠে। তার স্ত্রীও তো এমনি করেই টের পাবে, স্যালি-জোন-এডির মতো ছেলেমেয়েরা ছুটে পালাবে সামনে থেকে!

বিকেলের লাল রোদটা গঙ্গার হু-হু হাওয়ায় যেন দপ করে নিবে যায় এক সময়। তরল সন্ধ্যার ছায়া নামে চৌরঙ্গীতে। এক সঙ্গে যেন হাজার হাজার আলো জ্বলে ওঠে—নিয়নের রঙ ছুটোছুটি করে—সামনের সিনেমা হাউসটা মায়াবি হরফে হাতছানি দেয়।

জীবন। সুস্থ, উচ্ছল, মদির।

নিজের চারদিকে বিষাক্ত বিচ্ছিন্নতার বলয় নিয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকে জয়গোপাল। এই জীবনে—এই মানুষের হাসি আর আনন্দের ভেতর সে আর কেউ নয়। সেই প্রকাণ্ড সাততলা বাড়ীটা লিফটের মতো আকাশে লাফিয়ে উঠে তাকে নিঃসঙ্গতার এই দ্বীপের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। হারিয়ে গেছে জয়-গোপাল—এই জীবনের ভেতর থেকে ফুরিয়ে গেছে চিরকালের মতো। এখন তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে একটা অন্ধকার আমের বাগান, কতগুলো শ্যাওলা ধরা ভুতুড়ে ডালের ওপর ডাইনির চুলের পোকায় কাটা জীর্ণ পাতার রাশি, হাওয়ায় তারা ফিসফিস করে কথা কইছে; আর অসংখ্য জোনাকির ভেতরে কয়েকটা হঠাৎ অস্বাভাবিক বড় হয়ে উঠে—হিংস্র সবুজ আলো ছড়াতে ছড়াতে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে আসছে তার দিকে। শেয়ালের চোখ!

—মাগো!

একটা মরণান্তিক আর্তনাদ জয়গোপালের

আলোকচিত্র ঃ শ্রীসুব্রত রায়

নিরালা

বুক থেকে ঠিকরে উঠতে চায়, গলার কয়েকটা শিরা থর থর করে কাঁপতে থাকে। সামনের সার-বাঁধা শিরিষ গাছগুলো গঙ্গার উদ্দাম হাওয়ায় যেন হো হো করে হেসে ওঠে। অকারণে একবার পেছনে তাকিয়ে দেখে জয়গোপাল—তারপর পাগলের মতো ময়দানের সীমা ছাড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে এল।

—কেয়া হুয়া বাবু?

একজন পাহারাওলা জিজ্ঞেস করে।

—কুছ নেহি—

জয়গোপাল দাঁড়িয়ে পড়ে। বিষাক্ত আঙুলটা দিয়ে লোকটাকে একবার স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়। আঃ—এই পাহারাওলাটার যদি কুষ্ঠ থাকত!

আবার রাস্তা পার হয় জয়গোপাল। ট্রাফিকের সংকেত মেনে, দাগকাটা ফালি পথটা দিয়ে একদল মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে। একটা অদ্ভুত প্রত্যাশায় তার সমস্ত স্নায়ুগুলো চকিত হয়ে ওঠে। এই এতগুলি মানুষের গায়ে নিজের বিষ তিল তিল করে হয়তো ছড়িয়ে দিচ্ছে সে। আজ নয়—এই মুহূর্তে কেউ কিছু টের পাচ্ছে না। কিন্তু একদিন হাতের একটা আঙুল একটুখানি ফুলে উঠবে, যন্ত্রণাহীন একটা ঘা দেখা দেবে, তারপর—

হয়তো এমনিভাবেই কোনোদিন আর একজন হিংস্রভাবে এই কথাটা ভেবেছিল, ভেবেছিল জয়গোপালের হাতে নিজের বিষাক্ত হাতটাকে ছুঁইয়ে দিয়ে। সেইদিনও হয়ত এই রকম দল বেঁধে লাইন-টানা গণ্ডীর ভেতর দিয়ে চৌরঙ্গীর রাস্তা পার হচ্ছিল জয়গোপাল। মনে হল, পৃথিবীর আদিম কুষ্ঠরোগীর একটা প্রতিহিংসার শৃংখল দেশ-কাল ছাড়িয়ে ছড়িয়ে চলেছে, বেড়েই চলেছে ক্রমাগত; জয়গোপাল সেই শৃংখলে একটা নতুন আংটার মতো বাঁধা পড়েছে। সেও শেষ নয়—তাকে দিয়ে আর একজন—আরো অনেকজন—আরো অনেকজনকে দিয়ে লক্ষ—কোটি কোটি—তারপর পৃথিবীর সব মানুষ একদিন কুষ্ঠরোগীতে পরিণত হয়ে যাবে। একজনও বাকী থাকবে না।

রাস্তা পার হয়ে একটা গাড়ী-বারান্দার থামে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে জয়গোপাল। মানুষ চলে, ফিরিওলা আসে যায়—খুশিতে ভরা প্রাণের স্রোত চলে সামনে দিয়ে। চলতি ডবল-ডেকারের ঝোড়ো আওয়াজ কানে আসে—কোথা থেকে বিলিতী বাজনা শোনা যায়। প্রসাধনের গন্ধ—চুরুটের গন্ধ—বেলফুলের গন্ধ। সামনে কাচের শো-কেস ঝকঝক করে চলে—চোখ দুটো জ্বালা করে জয়গোপালের।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আঙুলটাকে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরকের মতো মনে হয় তার। এই মুহূর্তে বিকট শব্দ করে ওটা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে—আশপাশের সমস্ত মানুষকে বিষাক্ত বীজাণু দিয়ে দূষিত করে দিতে পারে। সেই অসম্ভব সম্ভাবনার

কথা ভাবতে ভাবতে এক দৃষ্টিতে আঙুলটার দিকে তাকিয়ে থাকে জয়গোপাল। কিন্তু কিছুই ঘটে না; শুধু তারই রক্তের ভেতরে, রিমেক্স নিঃশব্দ ক্রিয়াটা চলতে থাকে।

সিনেমা হাউসটার আলোর হরফ হাতছানি দেয়। 'ওয়ার্লডস মোস্ট বিউটিফুল উয়োম্যান।' পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির দুটো ঠোঁট যদি কুষ্ঠের ঘায়ে খসে পড়ে—কেমন হয় তা হ'লে?

একটা জৈবিক ইচ্ছার তাড়নায় সিনেমা হাউসের দিকে এগোয় জয়গোপাল। কাউণ্টারে গিয়ে দাঁড়ায়। ছবি আরম্ভ হতে দেরী নেই। উঁচু দামের খান কয়েক টিকেট অবশিষ্ট আছে কেবল। জীবনে সিনেমা দেখতে গিয়ে জয়গোপাল কখনো পাঁচ সিকের বেশি খরচ করেনি। আজ পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দেয় একটা।

টর্চের আলো দেখে নিজের সীটে এসে বসে। দি মোস্ট বিউটিফুল উয়োম্যান অফ দি ওয়ার্লড। পর্দার ওপর রূপালি ছায়ায় সে দেখা দেবে—তার শরীরটা থাকবে না। যদি থাকত—যদি থাকত, তা'হলে এখুনি পাগলের মতো ছুটে যেত জয়গোপাল, তার বিষাক্ত ক্ষতের খানিকটা রস মাখিয়ে দিত তার গালে-মুখে—তারপর—

অন্ধকার হলের ভেতর সারি সারি মানুষের মাথা। সামনের রঙিন আবরণ সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে—শাদা পর্দায় এবার ত্রিসিংহ-চিহ্নিত নিউজ রীল শুরু হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে নতুন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন—কুটীর শিল্প প্রদর্শনীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভাষণ—অমৃতসরের এক জনসভায়—

জয়গোপাল দাঁতে দাঁত চাপে। প্রগতির পথে ভারত। কলে কারখানায়—শিক্ষায়—স্বাস্থ্যে! স্বাস্থ্যে! আর ভারতবর্ষ জুড়ে লক্ষ লক্ষ কুষ্ঠরোগী—এক-একটা করে অঙ্গ খসে পড়ছে তাদের, তারপর কোনো অন্ধকার আমের বাগানে—

ঠিক সামনের রো-তে ফাঁপানো চুলের নিচে একটি মেয়ের মরালগ্রীবা। পর্দার আলোয় অন্ধকার হলের ভেতরটা একটুখানি স্বচ্ছ হয়ে এসেছে—অদ্ভুত শাদা গলাটিতে চিকচিক করছে সোনার হার। সুখ আর সৌন্দর্য।

হাত নিশপিশ করে। কিছুতেই আর থাকতে পারছে না জয়গোপাল—কিছুতেই না। রক্তের ভেতর বন্য ইচ্ছার তুফান উঠেছে তার। এখুনি—এই মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে গলাটাকে ছোঁয়া যেতে পারে—বুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে নিজের বিষাক্ত স্পর্শটাকে। জয়গোপাল বিশ্রীভাবে নড়ে ওঠে—চেয়ারটায় উৎকট শব্দ হয়—পেছন ফিরে একবার তাকায় মেয়েটি।

ফণা-তোলা সাপের মতো উঠতে যাচ্ছিল হাতটা—সঙ্গে সঙ্গে, গুটিয়ে আসে। পারবে না, কিছুতেই পারবে না জয়গোপাল। পৃথিবীর সমস্ত সুস্থ নীরোগ মানুষ তাকে চিনতে পেরেছে, তার প্রতিটি নিঃশ্বাসের গন্ধ তাকে নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দিয়েছে। জয়গোপালের মনে হয় এতক্ষণে সবাই তার উপস্থিতির খবরটা জেনে ফেলেছে। একটু পরেই ম্যানেজার এসে দাঁড়াবে তার পাশে—নিষ্ঠুর কঠোর গলায় বলবে: ইউ মিস্টার, প্লীজ গো আউট। দিস ইজ নো প্লেস ফর এ লেপার—ইউ কানট এনডেনজার আওয়ার পেট্রনস্!

জয়গোপাল একটা আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। বোম্বাইয়ের খেলার মাঠ থেকে একদল মাথা বিরক্ত বিস্ময়ে ঘুরে যায় তার দিকে। পাশের সীট থেকে লোকটা জিজ্ঞেস করে: হোয়াটস রং? জয়গোপাল দেখতে পায় না—শুনতে পায় না—এর পা মাড়িয়ে—ওকে ধাক্কা দিয়ে ছুটে যায় এক্জিটের লাল হরফের দিকে।

—হোয়াটস ইট?

—এলিং?

—ননসেন্স!

—দি ফেলো ইজ একসেনট্রিক—

ততক্ষণে ছুটে রাস্তায় নেমে পড়ে জয়গোপাল। এয়ার কণ্ডিশনিং থেকে বেরিয়ে এসে রাত্রির বাতাস যেন আগুনের ঝাপটা মারে চোখে মুখে। সেই আগুনের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে সামনে যে বাসটা পায় তাতেই লাফিয়ে ওঠে জয়গোপাল।

সে বাস থেকে আর একটায়। তারপর আর একটায়। জয়গোপাল পালাচ্ছে। পালাচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর ঘৃণার কাছ থেকে।

ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে শেষ বাসটা ছুটছে। টার্মিনাসের টিকেট করেছে জয়গোপাল।

বাইরে রাত্রির মাঠ। ঘন মেঘে আকাশ অন্ধকার—বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্র ডাকছে। একটি আলোর চিহ্ন নেই কোথাও। বাসটা এমন করে ছুটছে কেন? সোজা গিয়ে কি ডায়মণ্ডহারবারের গঙ্গাতেই ঝাঁপ দিতে চায়?

—রোখকে—থামাও—থামাও—

জয়গোপাল চিৎকার করে।

—এখানে কোথায় নামবেন? এই মাঠের ভেতর?—আশ্চর্য হয় কণ্ডাক্টার।

—এখানেই নামব—থামাও, থামাও বলছি—

বিভ্রান্ত কণ্ডাক্টার ঘণ্টা বাজায়। হাত পনেরো কুড়ি এগিয়ে ঘস করে থেমে যায় বাসটা। সম্পূর্ণ থামবার আগেই লাফিয়ে পড়ে জয়গোপাল—ছুটে চলে অন্ধকার মাঠের দিকে।

—পাগল নাকি? কে যেন বলে। বাস আবার ছুটে যায় নক্ষত্রবেগে, পেছনের লাল আলোটা অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

জয়গোপাল জলকাদায় ভরা মাঠের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলে। কণ্টিকারীর কাঁটায় পায়ের খানিকটা ছড়ে যায়—পিছনে মুখ থুবড়ে পড়ে একবার—টলতে টলতে আবার উঠে দাঁড়ায়।

ঝোড়ো হাওয়ায় সামনে এক সার তালগাছ দাপাদাপি করছে। বজ্র গর্জায়—চোখ ধাঁধিয়ে যায় বিদ্যুতের আলোয়। আকাশের দিকে মুখ তুলে—বাইবেলের সেণ্টের মতো দুটো হাত দুদিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জয়গোপাল।

—ছড়িয়ে দেব—এই ঝোড়ো হাওয়াতে আমার বিষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেব। একজন মানুষ বাকী থাকবে না—একজনও নয়—

আকাশ থেকে এক ঝলক নীল আগুন জয়গোপালের চোখ দুটোকে অন্ধ করে দিয়ে আছড়ে পড়ে মাটিতে। দুটো তালগাছের মাথায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে মশাল জ্বলে ওঠে। মাঠের জলের ভেতর কয়েক লক্ষ সাপের শিসের মতো শব্দ ওঠে একটা। বজ্রের ডাকে মাটিটা থরথর করে কাঁপতে থাকে।

হাত দুটো তেমনি জড়িয়ে দিয়ে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে জয়গোপাল।

ভোরের আলোয় বাজে পোড়া মাটির কোন ফাটল থেকে বেরিয়ে আসে পিঁপড়েরা। জয়গোপালের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আঙুলটার দিকেই তারা প্রথমে অগ্রসর হয়।

পিঁয়াজ খেয়ে পয়জার

শিবরাম চক্রবর্তী

আমার নকুড়মামা বলতেন, কখনো কারো বিয়ের সম্বন্ধ করবিনে। বিয়ে কখনো সুখের হয় না। বিবাহিত জীবন আনহ্যাপি হতে বাধ্য—বিয়ের কিছুদিন পরেই। তা প্রেমে পড়েই বিয়ে হোক কি সম্বন্ধ করেই বিয়ে হোক। প্রেমে পড়ে হলে তারা পরস্পরকে দুষবে, আর ঘটকালির বিয়ে হলে তার সব কালিটা পড়বে গিয়ে ঘটকের গালে। মেয়েটা বলবে তোর জন্যেই তার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল। তুই কি একটা মেয়ের জীবন ব্যর্থ করতে চাস?

'না না—' আমি বাধা দিয়ে বলেচি: 'তাহলে ত নিজেই বিয়ে করতাম।'

'তবে? তাহলে কখনো কোনো ঘটকালি করতে যাবিনে।'

নকুড় মামার সেই উপদেশ কুড়োবার পর থেকে ঘটক-ব্যাপারে আমি একনম্বরের কুড়ে। কেউ পাত্রপাত্রী সন্ধানের কথা তুললে আমি একেবারে গা লাগাইনে। কিন্তু আমাদের ঠাকুর মশাই যখন তাঁর বয়স্থা মেয়ের জন্যে একটি ভালো ছেলে খুঁজে দিতে বললেন তখন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সোজাসুজি 'না' বলতে আমার আটকালো।

দেখলামও একটি পাত্র। তবে বলতে কি, পাত্রটির একটু খুঁৎ ছিল। কিন্তু একথাও বলতে হয় যে তেমন খুঁৎখুতে হলে এ বাজারে পাত্রই মেলে না। নিখুঁৎ পাত্র কোথায় বলুন?

'দেখেছি ত পাত্র!' বললাম গিয়ে ঠাকুর মশাইকে: 'কিন্তু পাত্রটির একটু দোষ আছে। খুব সামান্যই একটু দোষ।'

'সামান্য দোষ? কী দোষ শুনি?' শুধোলেন তিনি।

'পেঁয়াজ খায়।' আমি জানালাম।

'পেঁয়াজ খায়!' শুনে তিনি চমকে উঠলেন। ভট্টপল্লীর পরম বৈষ্ণব ঠাকুর মশাই আমার কথায় যেন একটা চড় খেলেন। তাঁদের ঘরে পেঁয়াজখোর জামাইয়ের কথা তিনি ভাবতেই পারেন না।

'পেঁয়াজ খাওয়া কি সামান্য হল, তুমি বলো কি? পেঁয়াজ কি সামান্য জিনিস?'

'না, সামান্য নয়, তা জানি। পরমহংস-দেব বলতেন, পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে অবশেষে যেমন কিছুই থাকে না, তেমনি ব্রহ্মের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে, মানে কি না, এই ব্রহ্মাণ্ডকে ছাড়িয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মও লোপাট! এই রকম কী একটা কথা বলতেন, তার মানে ঠিক আমি বুঝতে পারিনি। আসলে পেঁয়াজ হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড একটা পেঁয়াজি, অর্থাৎ

পেঁয়াজ আসলে মায়া। মায়াই।'

'মায়াই হোক আর যাই হোক, মায়া বলে পেঁয়াজকে উড়িয়ে দিয়ে চলবে না।' আমাদের ঠাকুর বংশে তো পেঁয়াজের আমদানী হতে পারে না বাপু!'

'সে কথা আপনি বুঝুন। তবে আমি বলছিলুম কি, পাত্রটি ভালোই। একটু ঐ যা; পেঁয়াজ খায়। তাই কি রোজই খায়? তা নয়, মাঝে সাঝেই খেয়ে থাকে। এই মাংসটাংস হলেই—'

'অ্যাঁ? মাংসও খায় নাকি আবার?'

'রোজ কি? পাচ্ছে কোথায় রোজ রোজ? এই মাঝে সাঝেই—বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়লেই—' সাফাই গাইবার চেষ্টা আমার।—'বন্ধুবান্ধবরা ধরলেই খায়।'

'মাংস খায়!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন গোঁসাই ঠাকুর।—'আমাদের নিরামিষ গোস্বামী বংশ। আমাদের বংশে এসে মাংস খাবে!'

'খায় বলে কি আর অ্যাতো অ্যাতো? পেট ঠেসে খায় নাকি? একটু আধটু খেয়ে থাকে—চাটের মুখে।'

'চাটের কথা কী বলছো?' ঠাকুর মশাই আবার যেন এক চোট খান—'চাট তো লোকে ...চাট তো লোকে......!' কথাটা ভাষায় ব্যক্ত করতে তাঁর আটকায়।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যা ধরেছেন।' আমি সায় দিয়ে চাট সামলাই।—'শুধু শুধুই কি চাট মারে? গাধা তো নয়। আনুষঙ্গিক হিসেবেই ওটা খেয়ে থাকে।'

'নেশাভাঙ করে নাকি আবার?'

'নেশাভাঙ করে বলে কি গাঁজা আফিঙ খায় নাকি? তা নয়।' আমি আপত্তি করি। এমন ভালো সম্বন্ধটার ভাঙচুর হয় আমি চাই না।—'এমনকি ভাঙও খায় না পাত্র। তবে ঐ যে বলেছি, মাঝে সাঝে বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়লে সঙ্গদোষে কী না হয় বলুন!'

'গাঁজা আফিঙ খায় না, তবে কি মদ টানে, বলচ তুমি?'

'এই মাঝে সাঝে। চাট তো মদের মুখেই খায় মানুষ। আর ঐ চাট হিসেবেই এক আধটু মাংস টাংস মুখে তোলে আর কি!'

'মদ খায় মাংস খায় চাট খায়...' ঠাকুর মশায়ের গলায় যেন হায় হায় বাজতে থাকে।

'মাংস আর চাট এক জিনিস।' আমি প্রতিবাদ করি—'আলাদা আলাদা খায় না।'

'একই কথা হল।' তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন—'এদিকে মেয়েটিরও বয়স হয়ে যাচ্ছে কি করি...'

'ভালো পাত্র এনেছি ত! আর কোনো নেশা নেই, বিড়ি টিড়ি খায় না...'

'বিড়ি খায় না?'

'না। সিগারেট টানে। পরের পয়সায় পেলে তবেই।'

'শাক্ত নাকি পাত্র? কারণ পান করে না

'আঁ'......

তো?' তিনি সন্দিগ্ধ সুরে শুধান।
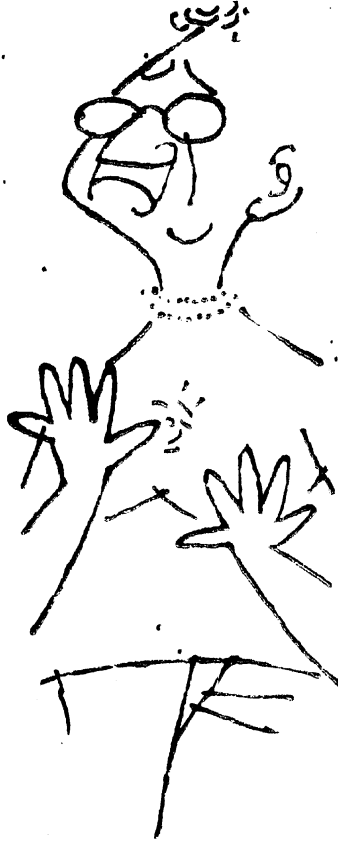
'না না, শাক্ত ফাক্ত নয়। আপনি ভীত হবেন না। গোঁসাই পরিবারে আমি কি শাক্ত আমদানী করব, আপনি বলেন কি? কারণ ফারন নয়।' আমি জানাই: 'তবে হ্যাঁ, একথাও বলতে হয়, অকারণে খায় না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বাগানে টাগানে গেলেই...'

'বাগানেও যায় না কি আবার? বাগান বাড়িতেও গতিবিধি আছে?' আবার তিনি চমকান।

'পিকনিক করতে হলে কোথায় যায় মানুষ? বাড়িতে কি পিকনিক হয়? বাগানে টাগানেই হয়ে থাকে......'

'কিন্তু বাগানে গিয়ে চড়ুইভাতি করা আর বাগানবাড়িতে যাওয়া এক নয়। বাগানে যাওয়া এক কথা আর বাগানবাড়িতে......'

'তাতো বটেই। তবে কিনা, বাগান থাকলে তার সঙ্গে ছোটখাটো একখানা বাড়ি থাকেই। তাকেই যদি আপনি বাগানবাড়ি বলেন......'

'আমি কি বলছি? লোকে বলে। বাগানবাড়িতে বাইজিটাইজি যায় বলে শুনেছি।'

'তাতো যায়ই। বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফুর্তি করতেই বাগানবাড়িতে যায় লোক। একটু নাচগান আমোদ-আহ্লাদ হয়েই থাকে।' আমি সাফাই গাই: 'তবে আমি যদ্দূর জানি তাতে একথা বলতে পারি যে আপনার পাত্রের কোন চরিত্রদোষ নেই।'

'দুশ্চরিত্র নয় বলছ?'

'নিশ্চয়। তবে সাধারণ মানুষ সাধারণত যা হয়ে থাকে—নিশ্চরিত্র বলা যায়।'

'দুশ্চরিত্র আর নিশ্চরিত্র! ওতো কেবল উপসর্গের তফাৎ!' তিনি গম্ভীরমুখে ঘাড় নাড়েন—'বিশরকমের উপসর্গ আছে আমি জানি। কিন্তু আমার হবুজামাইয়ের যে কতগুলি উপসর্গ তা এখনো আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছি না।'

'ওর বন্ধুরাই হচ্ছে ওর উপসর্গ। তাদের সঙ্গে মিশেই ওর যা কিছু। তাছাড়া আর কোনো দোষ নেই ওর। কেবল ওই সঙ্গদোষেই ওকে মেরেছে......' আমার ক্ষুব্ধ কণ্ঠ থেকে বেরয়: 'কিন্তু তাও বলি, বিয়ের পরে এটা কেটে যাবে মনে হয়। তখন তো নতুন সঙ্গী পাবে, মনের মত সঙ্গীই পাবে একজন। পুরনো সঙ্গীদের তখন হয়ত ভুলে যেতে পারে।'

'আর পেরেছে! তার সঙ্গীরা তাকে ভুললে তো!' তিনি যেন তেমন ভরসা পান না: 'তার সঙ্গীরা কি তাকে ছাড়বে ভেবেচ?'

'কতক্ষণ ধরে থাকবে? তাদের নিজেদের কাজকর্ম নেই? নিজেদের বিষয়কর্মেই তো ব্যস্ত থাকতে হয় তাদের। কাজের তালে কে যে কোথায় চলে যায় পাত্তাই পাওয়া যায় না কারো। অনেকদিন একদম টিকি দেখা যায় না।'

'ফেরার হয়ে যায় নাকি?'

'ফেরার হয় কিনা জানিনে তবে তারা ফেরার পরেই তাদের মজলিস জমে ওঠে, তখনই এইসব চাটফাট বাগান ফাগানের ঝামেলা এসে জোটে......'

'জুটুক গে!' চুলোয় যাক। আমি আর ভাবতে পারি না। মদ টানে, অসৎ সঙ্গে মেশে, বাগানে গিয়ে বাইজিদের নিয়ে ফুর্তি করে, ...আমি ভাবছি এমন ছেলের হাতে মেয়েকে দিলে কি সে সুখে থাকবে? মদ খেয়ে অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফিরে আমার মেয়েকে ধরে ঠেঙাবেই হয়ত। ওর অত্যাচারে আমার মেয়ে হয়ত......'

'কদিন আর করবে অত্যাচার? কদিন সে সুযোগ পাবে বলুন? বছরের মধ্যে এগারো মাস তো তার জেলখানাতেই কাটে। বৌয়ের গায়ে হাত তোলার যো পেলে তো?' আমি ভরসা দিই: 'আপনি কিছু ভাববেন না। জেল থেকে বেরিয়ে তিন চার দিন বাইরে থাকতে না থাকতেই আবার তাকে ধরে নিয়ে যায় পুলিস!'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
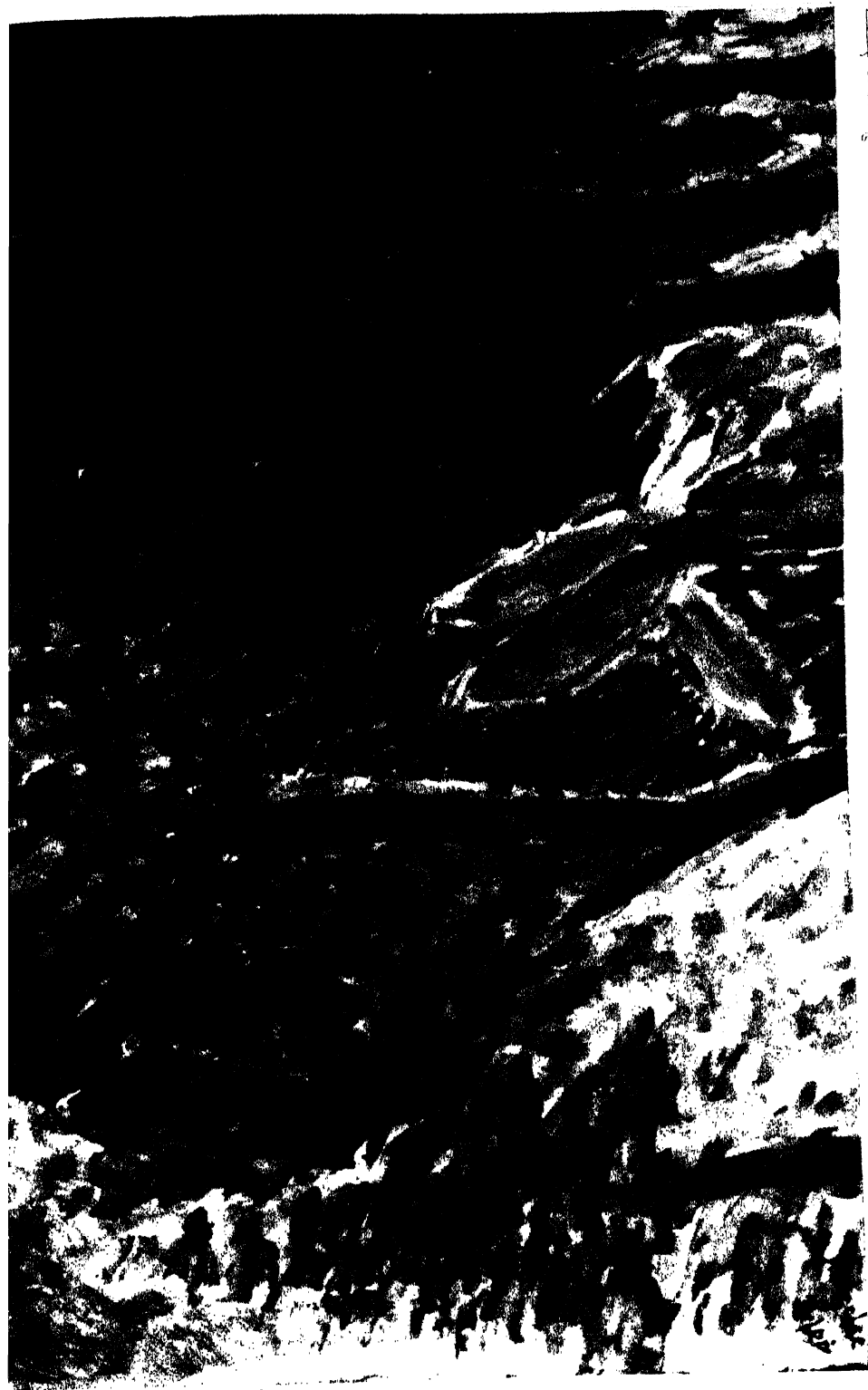
বনবাণী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে

মুদ্রণ ঃ বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

শ্বেত ময়ূর

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নী ল রঙের একটি দোতলা বাস পশ্চিম থেকে পূবে ছুটে যেতে না যেতেই নতুন ঘন নীলের আর একটি বাস পূব
ক পশ্চিমে ছুটে এল। আর শীলাদের
ড়র সামনের স্টপটাতেই দাঁড়িয়ে পড়ল।
স্টের গায়ে আঁটা গোল চাকতিতে স্টপ
লেখা থাকলেও সব বাস এই স্টপে
ায় না। যাত্রী থাকলেও নয়। 'বাঁধো
ধা' করতে করতে ড্রাইভার
ী বাসটাকে আরও দূরে স্কুলের সামনে
স্টপটা সেদিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাদের
ড়র সামনে বাস না থামলে মাঝে মাঝে
লার রাগ হয়। আবার কোন কোনদিন
ানুভূতি হয় ড্রাইভারের ওপর। বাস
াতে শুরু করলে তা বোধ হয় আর
াতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, কেবলি
াই কেবলি চালাই। বাসের দোতলায়
বার উঠে বসলে শীলার যেমন আর
াতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় কেবলি
। কেবলি চলি।
কন্তু চলা তো আর সবসময় যায় না।
জকাল শীলা খুব কমই বাড়ি থেকে
রাতে পারে। সংসারে অনেক কাজ।
াড়া সে ঢের বড় হয়ে গেছে। এখন বি
। যখন তখন বাইরে বেরোলে চলে
তু বাড়ির বাইরে না গেলেও সিঁড়ি
ন্ত আসতে দোষ কি। বসবার ঘরের
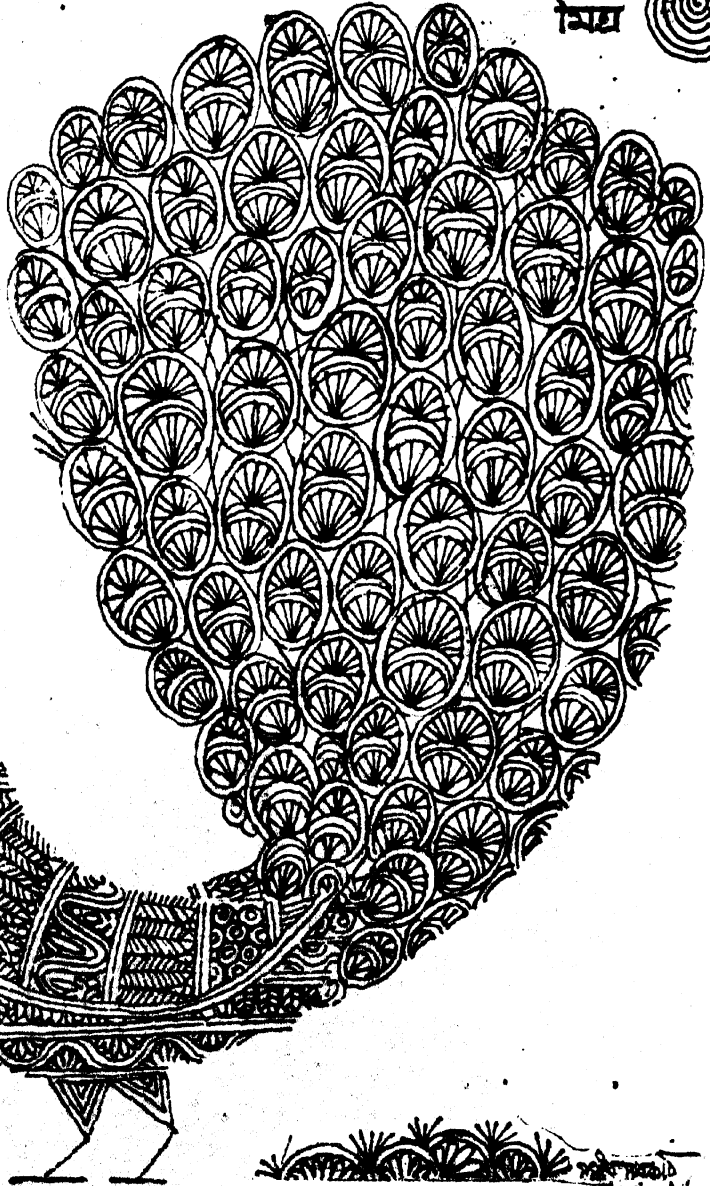
জানলা দিয়ে, কি সদর দরজার আধখানা পাট মেলে, লোকজনের চলাচল, ট্যাক্সী, কার, আর বাস চলাচল দেখতে তো দোষের কিছু নেই। চলন্ত বাসের ফাঁক দিয়ে মানুষকে দেখতে বড় ভালো লাগে শীলার। এই পাড়ার লোককেই মনে হয় অচিন দেশের মানুষ। মা অবশ্য তার সদরে এসে দাঁড়ানো বেশি পছন্দ করেন না। প্রায়ই ধমক দেন, 'কি যখন তখন হাঁ করে রাস্তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকিস? লজ্জা করে না? ষোল উৎরে সতেরয় পড়লি এখনো কি সেই ছোটটি আছিস?' কিন্তু পড়লই বা সতেরয়। তাই বলে কি আর শীলার দেখতে ইচ্ছা করে না? এই গাছপালা লোকজন রোদবৃষ্টি পৃথিবীর সবই যে কত সুন্দর মা তো তা জানে না।

'কি শীলারানী, একেবারে দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছ যে! আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে নাকি?' বাস স্টপে নেমে রাস্তা পার হয়ে দুজন ভদ্রলোক যে একেবারে তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তা শীলা লক্ষ্যই করেনি। নীল মেঘের মত চলন্ত বাসটাই তার দুটি কৌতূহলী চোখকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছিল।

একটু জিভ কেটে লজ্জিত ভঙ্গিতে শীলা পিছিয়ে এল। আগন্তুক হেসে বলল, 'ও কি, পালাচ্ছ কেন।'

পালাবার কিছু নেই। ছোড়দির বর অনিন্দ্যদাদা। আত্মীয়! আপন জন। কিন্তু ও'র পাশে উনি কে। অনিন্দ্যদাদার চেয়ে মাথায় আধ হাতখানেক লম্বা। দুধের মত ফর্সা চেহারা। সবুজ রঙের একটা জামা গায়ে আর চোখ দুটিও নীল নীল। কে উনি?

শীলা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'অনিন্দ্যদা, কে উনি? উনি কি সাহেব?'

অনিন্দ্য সরবে সগৌরবে হেসে বলল, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ট্যাংলো ইন্ডিয়ান নয় একেবারে খোদ সাহেব। দ্বীপবাসী ইংরেজ তনয় নয়, কন্টিনেন্টের জাত জার্মান।'

তারপর অতিথির দিকে ফিরে অনিন্দ্য বলল,

'Man, she is my sweet sister-in-law—the youngest, the sweetest and the best.'

শীলা মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল, 'অনিন্দ্যদা, ও কি হচ্ছে। আমি ছোড়দিকে ঠিক বলে দেব।'

কিন্তু ততক্ষণে সাহেব হাত এগিয়ে দিয়েছে, উদ্দেশ্য—করকম্পন। পরমুহূর্তেই তার কি মনে পড়ে গেল। জোড়হাত কপালে তুলে বলল—'নো-মস্কার।'

তার উচ্চারণ আর নমস্কার জানাবার ভঙ্গি দেখে হাসি চেপে রাখা শীলার পক্ষে কঠিন হল। উচ্ছ্বসিত হাসি সংবরণের চেষ্টায় প্রতিনমস্কারের কথা তার মনে রইল না। অনিন্দ্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ও'কে নিয়ে ভিতরে আসুন।'

নীলাদ্রি মুখ হাত ধুয়ে চাটা খেয়ে ছোট তক্তপোষখানার ওপর সবে সেতারটির ঢাকনি খুলেছে, শীলা তার ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'ফুলদা, দেখ কে এসেছেন।'

নীলাদ্রি স্মিতমুখে বলল, 'কেরে?'

'অনিন্দ্যদা, আরো যেন কে। বেরিয়ে এসে দেখই না। বাইরের ঘরে আছেন।'

কোন রকমে তাকে খবরটা দিয়ে শীলা পাশের ঘরে এসে ঢুকল। এ ঘরেও একখানা তক্তপোষে বিছানা গুটানো রয়েছে। তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কোমল সুন্দর মুখখানাকে শক্ত করে চেপে ধরল শীলা। ডুরে শাড়িপরা তার তনুদেহ বিপুল আবেগে ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

আলমারি থেকে বাজারের টাকা বের করে দেওয়ার জন্যে সরোজিনী এসে ঘরে ঢুকলেন কিন্তু আঁচলের চাবি আলমারির তালায় লাগাবার আগে মেয়েকে দেখে হঠাৎ থমকে গেলেন।

মৃদু কিন্তু উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কী ব্যাপার। কী হোলো তোর।'

তারপর নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে মেয়ের মুখখানা একটু দেখে নিয়ে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'ও হাসছিস, তাই বল। আমি ভাবলাম কী আবার হোলোরে বাপু। এই সাত সকালে কে আবার তোকে বকুনি লাগাল।'

শীলা এবার মুখ তুলে বলল, 'বাঃ রে বকুনি আবার কে দেবে। মা জানো, অনিন্দ্যদা কোত্থেকে এক জার্মান সাহেবকে নিয়ে এসেছে। কী তার বাংলা বলবার কায়দা আর নমস্কার জানাবার বহর। যাও, দেখ গিয়ে। বাইরের ঘরে সব বসে আছে।'

'অনিন্দ্য এসেছে নাকি? কোথায়!' আলমারি খুলে পাঁচ টাকার একখানি নোট বের করলেন সরোজিনী, তারপর মাথার আঁচলটা একটু টেনে দিয়ে বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। হাসির কয়েকটি উচ্ছল তরঙ্গকে বিছানার মধ্যে ঢেলে দিয়ে শীলাও চলল মার পিছনে পিছনে। যখন তখন খিল খিল করে হাসলে ফুলদা বড় বিরক্ত হয়। যার তার সামনে কড়া ধমক লাগায়। কিন্তু হাসি পেলে কেউ না হেসে পারে। তবু তো আগের চেয়ে আজকাল অনেক কম হাসে শীলা। আগে তেমন সাংঘাতিক রকমের হাসি পেলে মেঝেয় লুটোপুটি খেত। গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে তক্তপোষের তলায় চলে যেত। চোখে জল না আসা পর্যন্ত হাসি তাকে ছেড়ে যেত না।

ফুলদা বলে, 'হাসিটা ওর এক রোগ। শীলা একটা আস্ত পাগল।' আহা পাগল এ সংসারে কেই বা না। তোমাকেও তো লোকে পাগল বলে। গান-পাগল, সুর-পাগল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাস্তার ধারের বসবার ঘরখানা একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছে। ফুলদা গিয়েছে, মা গিয়েছে, দোতলা থেকে খবরের কাগজ হাতে বাবাও নেমে এসেছেন। সাহেব এসেছে খবর পেয়ে বাজারের থলি হাতে কয়েকটি কৌতূহলী ছেলে এসে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছে।

শীলা আর ভিতরে ঢুকল না। আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। আর দেখতে লাগল। দেখবার মতই রূপ। কী সুন্দর। কী অদ্ভুত সুন্দর। ফর্সা আর লম্বা। লালচে চুল, সিঁদুরে ঠোঁট আর নীল রঙের চোখ। শীলা এ পর্যন্ত যত পুরুষ দেখেছে, জামাই

বাবুদের আর দাদার মত বন্ধুদের দেখেছে তাদের কারো সঙ্গেই এর মিল নেই। কী করে থাকবে। উনি তো এ-দেশের মানুষ নন। অনেক দূরের ইউরোপের মধ্যে সেই জার্মানী। কোথায় যেন দেশটা। ইউরোপের পুরো ম্যাপটা শীলার ঠিক মনে পড়ল না। উত্তর পশ্চিমে নীল সমুদ্রের মধ্যে লাল রঙের গ্রেট ব্রিটেন আর তার কোলে ছোট আয়র্ল্যান্ড দ্বীপটিকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু মূল ভূভাগে ফ্রান্স জার্মানীর অবস্থানটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। থার্ড ক্লাসে ইউরোপ তাদের পাঠ্য ছিল বটে কিন্তু শীলা ভালো করে পড়েনি আর ভূগোল তার মোটেই ভালো লাগত না। ভূগোলের দিদিমণির চোখাচোখা পরিহাস তার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিত। কিন্তু কী হবে ইউরোপের ম্যাপ দিয়ে। সবুজ জার্মানী একেবারে তাদের বৈঠকখানার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। টিয়াপাখির মত দুটি লাল ঠোঁটে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। এত কাছে দাঁড়িয়ে রক্তমাংসের কোন সাহেবকে শীলা চোখে দেখেনি। ফুলদার সঙ্গে সিনেমায় দু একখানা বিলিতী বইতে সাহেবদের ছুটোছুটি লাফালাফি দেখেছে কিন্তু জীবন্ত সাহেব এই প্রথম। তাও যে সে সাহেব না, রূপকথার রাজপুত্রের মত পরম সুন্দর সাহেব।

সরোজিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেসে বললেন, 'আয়। আর ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আমার সঙ্গে সঙ্গে চা আর খাবার টাবার করবি আয়। অনিন্দ্য নাকি এক্ষুনি চলে যাবে।'

শীলা চমকে উঠে বলল, 'এক্ষুনি চলে যাবেন? ও'কেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন নাকি?'

সরোজিনী হেসে বললেন, 'নারে, তা নিতে পারবে না। নীলু ওকে কেড়ে রেখেছে। এ বেলা আমাদের এখানে খাবে। আমার নীলুর তো ও গুণ খুব আছে। অল্প সময়ের মধ্যে অচেনা মানুষের সঙ্গে খুব ভাব করে নিতে পারে। যেন কত কালের বন্ধুত্ব।'

বাড়ির কর্তা আর চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে সরোজিনী মেয়েকে নিয়ে রান্না-ঘরের সামনে লুচি বেলতে বসলেন। বাইরের ঘর থেকে কথাবার্তা আর হাসির শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। সরোজিনী মেয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তোর মন বুঝি ও-ঘরেই পড়ে রয়েছে। আচ্ছা তুই যা। আমি একাই সব করে নিতে পারব।'

শীলা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, 'হুঁ, ও, ঘরে পড়ে রয়েছে তোমাকে বলেছে। আমাকে ছাড়া তোমার কোন কাজটা হয় শুনি?'

সরোজিনী বললেন, 'তা ঠিক। আজকাল তোর হাতের চা ছাড়া বাবুদের অন্য চা পছন্দ হয় না। তুই পান সেজে না দিলে—'

কথা শেষ না হতেই বাইরের ঘর থেকে অনিন্দ্য নতুন জুতোর মচ মচ শব্দে সামনে এসে দাঁড়াল।

'ম্যাকসকে তো ফুলদা এ বেলার জন্যে রেখে দিল। আমি তাহলে এখন যাই মা। হস্টেলে আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

সরোজিনী বললেন, 'তাই কি হয় বাবা। চা'টা কিছু মুখে না দিয়েই কি যেতে হয়। শীলা, তোর জামাইবাবুকে—অনিন্দ্যদাকে—একটা মোড়া এনে দে তো, বসুক এখানে। আমরা আমাদের বড় ভগ্নীপতিকে জামাই-বাবু বলে ডাকি। আরো আগে ছিল দাদা-বাবু। এখন আবার সেই পুরোন চলন ফিরে এসেছে। কিন্তু যাই বলো জামাইবাবুর মত মিষ্টি ডাক আর হয় না।'

অনিন্দ্য শ্যালিকার এনে দেওয়া মোড়াটায় বসে হাসিমুখে চুপ করে রইল। কাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কান বদলায়, ভাষা বদলায়, মাধুর্যের আধারেরও বদল হয়। এই দু বছরের মধ্যে সে এ বাড়ির প্রায় ছেলের মত হয়েছে। জামাতার সেই দূরত্ব আর নেই। সম্বোধনটা আর কী করে থাকবে।

সরোজিনী তাঁর মেয়ে ইলার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আদরের বউ হয়েছে শ্বশুর শাশুড়ীর। কৃষ্ণনগরে তাঁদের কাছেই আছে। এই প্রথম পোয়াতী। আর কয়েক-মাস পরেই সরোজিনী তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন।

শীলা আর একটি বিশেষ প্রসঙ্গের জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। এসব পুরোন ঘরোয়া আলোচনায় তার আর মন নেই।

একটু ফাঁক পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শীলা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা অনিন্দ্যদা, আপনি ও'কে কোথায় পেলেন?'

'কাকে?'

শীলা একটু হেসে বলল, 'আপনার ওই নতুন বন্ধুকে?'

অনিন্দ্যও হাসল, 'ও ম্যাকসের কথা বলছ? বন্ধুই বটে। দুদিনেই ও আমার পরম বন্ধু হয়েছে। জার্মান কনসালেট অফিসে আমার একজন জানাশোনা ভদ্রলোক আছেন। তিনিই ওকে আমাদের হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ দেশের ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে চায়, আলাপ পরিচয় করতে চায়। টুরিস্ট হয়ে এসেছে ইণ্ডিয়া দেখবে। আপাতত বঙ্গ দর্শন। আমি ওকে বলেছি, দেশকে যদি দেখতে চাও বড় বড় হোটেলে থেকে তার পরিচয় পাবে না। কলেজ-হস্টেলে থেকেও নয়। চল তোমাকে আমি কলকাতা শহরের একটি আইডিয়াল ফ্যামিলিতে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে দিন কয়েক বাস করো। একটি পরিবারের ভিতর দিয়ে গোটা দেশের পুরো পরিচয় তুমি পেয়ে যাবে। যে-সে পরিবার নয়। যেমন বনেদী তেমনি—।'

সরোজিনী লুচি ভাজবার জন্যে রান্না-ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

শীলা অনিন্দ্যকে একা পেয়ে হেসে বলল, 'আহা, আমাদের সামনে শ্বশুরবাড়ির খুব সুখ্যাতি করা হচ্ছে। আড়ালে গিয়েই তো নিন্দা করবেন। খোঁটা দেবেন দিদিকে। আমরা সব জানি।'

অনিন্দ্যকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা গেল না। ব্যস্ত প্রফেসর। দুটো সিফটে পড়ায়। তারপর আবার হস্টেলের ছেলেদের খবরদারি করে। শ্বশুরবাড়িতে বেশিক্ষণ বাস করবার তার সময় কই। ষোড়শী শ্যালিকার অনুরোধও তাকে ঠেলতে হয়। কাজের এমনি চাপ।

জামাইবাবুদের মধ্যে অনিন্দ্যকেই সবচেয়ে পছন্দ শীলার। ভারি আমুদে আর শৌখীন মানুষ। সেবার কোত্থেকে একটা হরিণ নিয়ে এসে উপস্থিত। আর একবার এনেছিলেন বিচিত্র বর্ণের একজোড়া চীনা মোরগ। তার একটা মোরগ আর একটা মুরগী। কিন্তু

এবার যা এনেছেন তার তুলনা হয় না। তাঁর এই সাদা রঙের নীল চোখো প্রাণীটি সবচেয়ে সেরা। আচ্ছা, ম্যাকস কথাটার মানে কী? কে জানে কী মানে। শীলা লক্ষ্য করে দেখেছে অনেক নামের মানেই অভিধানে মেলে না। সে মানুষের নামই হোক আর জায়গার নামই হোক। নামের মানে তুমি যা ভাববে তাই। নামের মানে তুমি যা মনে করবে তাই। ম্যাকস কথাটার কোন মানে আছে-কিনা শীলা জানে না। কিন্তু ওকে দেখবার পর থেকেই ফলুদার সেই সাদা ময়ূরের গল্পের কথা মনে পড়ছে শীলার। ফলুদার ছেলেবেলার এক মেয়ে-বন্ধু নাকি ময়ূরভঞ্জের মহারাজার কাছ থেকে চমৎকার এক সাদা ধবধবে ময়ূর উপহার পেয়েছিল। কী বা তার পাখা আর কী বা তার পেখম। আকাশে কালো মেঘ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার পেখম ছড়িয়ে দিত। তাকে নিয়ে দাদার সেই সখীর সোহাগের অন্ত ছিল না। সাদা ময়ূর শীলা চোখে দেখেনি। কিন্তু পর পর দুদিন স্বপ্নে দেখেছে। আর আশ্চর্য, সেই সুখস্বপ্নের পর এক অপরূপ দিবা-স্বপ্নের মত ম্যাকস এসে উপস্থিত। ময়ূরে কি সুখের বাহন?

অন্তত, ফলুদার ভাবভঙ্গি দেখে তাই মনে হচ্ছে। সকালে অন্তত তিন চার ঘণ্টা ঝাড়া রেওয়াজ করে ফলুদা। কিন্তু আজ কোথায় গেল তার রেওয়াজ, কোথায় গেল কী। বসবার ঘর থেকে ম্যাকসকে একেবারে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এনেছে ফলুদা। ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে ফুলের টব। যে টবগুলিতে শীলা রোজ জল দেয়, গাছের শুকনো পাতা বেছে ফেলে। বড় বড় গাঁদা ফুল দেখে ম্যাকসের কী আনন্দ। গাঁদা ফুল তো আর ওদের দেশে নেই। ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে এঘর ওঘর একতলা দোতলা। ছাদ। দেখিয়েছে ঠাকুরদার আমলের পুরোন লাইব্রেরী। টুং টুং করে সেতারের একটু বাজনাও শুনিয়ে দিয়েছে এক ফাঁকে। ম্যাকস দেখছে শুনছে হাসছে আর শীলা যখন নানান কাজে এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠছে নামছে—দুটি নীল চোখ মেলে ম্যাকস তাকাচ্ছে তার দিকে। কিন্তু শীলাকে অত লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবার কীই বা আছে। সে তো আর দিদিদের মত অত সুন্দরী নয়। সে তো মেঘের মতই কালো। তার দিদিরা যদি এখানে কেউ থাকত ও হয়তো তার দিকে ফিরেই তাকাত না। কিন্তু এখনই বা কী দেখছে এত। ও কি সারা বাড়িটাকেই আকাশ ভেবেছে নাকি। আর সেই আকাশভরা মেঘ দেখছে? মেঘ দেখলে কি ময়ূরে খুশি হয়? ফলুদা তো তাই বলে।

বেলা প্রায় এগারটার সময় নীলাদ্রির সময় হল। সে রান্নাঘরের সামনে এসে বলল, 'শীলা আমাদের আরো দু কাপ চা দে।'

সরোজিনী মাছের কালিয়া রাঁধছিলেন।

শুনতে পেয়ে ছেলেকে ধমকে উঠলেন, 'না, এত বেলায় আর চা নয় বাপু। আমার রান্না হয়ে গেছে। এবার তোমরা চানটান করে খেয়ে নাও।'

নীলাদ্রি বলল, 'তাই নেব। আজ যখন বাজনা টাজনা কিছু হলই না।'

শীলা সুযোগ পেয়ে বলল, 'কী করে হবে ফলুদা। আজ তো তুমি সেই সকাল থেকে নাচছ। বাজাবে আর কখন।'

নীলাদ্রি এগিয়ে এসে বোনের বিনুনী টেনে ধরল, 'কী, কী বললি। কে যে নাচছে তা আমিও দেখতে পাচ্ছি।'

শীলা দাদার হাত থেকে চুল ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়াল।

সরোজিনী বললেন, 'কী এত গল্প করছিসরে ওর সঙ্গে। কোন ভাষায় কথা বলছিলি তোরা?'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ভাষা নয় মা, ভঙ্গি। বেশির ভাগ ভঙ্গি দিয়েই কাজ সারতে হচ্ছে। যৎসামান্য ইংরেজী জানে। যেটুকুও জানে উচ্চারণ অপূর্ব। অবশ্য আমার উচ্চারণও ওর কানে অভূতপূর্ব শোনাচ্ছে। কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। তবু ওর কত কথাই না শুনে নিলাম। জানো মা কী সাহস। ইংরেজী জানে না, হিন্দী জানে না, উর্দু জানে না, এদিকে সঙ্গী নেই, সাথী নেই টাকার জোরও তেমন নেই; শুধু মনের জোরে ফার ইস্ট টুর করে এসেছে এই ইণ্ডিয়ায়। ওর ইচ্ছে পৃথিবীর কোন জায়গা বাকি রাখবে না।'

সরোজিনী উনুনের ওপর থেকে কড়াটা নামাতে নামাতে বললেন, 'ভালোই তো। হয়তো তুমিও একদিন যাবে।'

নীলাদ্রি একটু হাসল, 'আমি? ওকে দেখে অবশ্য আমার সেই ঘুমন্ত সাধ জেগে উঠছে। পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়?'

শীলা বলল, 'এবার তোমরা নাইতে যাও ফলুদা। আমি বাথরুমে ঢুকলে শেষে যে মিনিটে মিনিটে তাড়া লাগাবে তা চলবে না।'

স্নান তো করবে, কিন্তু সমস্যা হল ম্যাকস পরবে কী। ওর ব্যাগ আর বিছানা সবই তো সেই হস্টেলে ফেলে এসেছে। নীলাদ্রি বলল, 'তাতে কী হয়েছে। ও আমার লুঙ্গি পরে চান করুক। নেয়ে উঠে আর ট্রাউজার্স নয়, আমার একখানা ধুতিই পরবে। শীলা আমার সেই নকশী চুলপেড়ে ধুতিখানা বের করে রাখতো। আর একটা ফর্সা পাঞ্জাবি—।'

শীলা হেসে বললে, 'দাদা তোমার পাঞ্জাবি কিন্তু ও'র গায়ে ছোট হবে।'

নীলাদ্রি বলল, 'তা হোক। খানিকটা তো ঢাকবে। ধুতি পাঞ্জাবিতে সাহেব বেশ আরাম পাবে। এখানে এসে ওর খুব গরম লাগছে মনে হচ্ছে।'

ফাল্গুনের মাঝামাঝিতেই এবার বেশ গরম পড়ে গেছে। বাড়ির দু দুটো ফ্যান অচল। ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার আর দেখা নেই।

শুধু সেতারে নয়, ফলুদার হাত সব ব্যাপারেই খোলে। সত্যিই ম্যাকসকে একেবারে বাঙালীবাবু সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে ওকে ধুতি পরা শিখিয়েছে, পাঞ্জাবির বোতাম-গুলি নিজের হাতে এঁটে দিয়েছে। মেয়েদেরই পুতুল খেলার শখ থাকে। কিন্তু ফলুদাকেও যেন হঠাৎ পুতুল খেলার শখে পেয়ে বসেছে। যে মানুষের স্বভাব অত গুরুগম্ভীর, যে মানুষ রাতদিন সেতার নিয়ে পড়ে থাকে, তার মধ্যেও যে এমন একটি ছেলেমানুষ লুকিয়ে আছে তা কে জানত।

বড় ঘরের মেঝের আসন পেতে নীলাদ্রি ম্যাকসকে পাশে নিয়ে খেতে বসল।

সরোজিনী বলেছিলেন, 'টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা করে দে। ওকি ওভাবে খেতে

দেখবার মতই রূপ, কি সুন্দর, কি অদ্ভুত সুন্দর

পারবে? ওর কষ্ট হবে। খাওয়াও হবে না।'

কিন্তু নীলাদ্রি নাছোড়বান্দা। সে বলল, 'খুব পারবে মা। কতক্ষণ বা আছে। এলই যখন, বাঙালী জীবনের সব স্বাদ ওকে পাইয়ে দি। আমাদের কথা ওর চিরদিন মনে থাকবে।'

দেখা গেল ম্যাকসেরও তাতে অশান্তি নেই। এরই মধ্যে সে একেবারে নীলাদ্রির মন্ত্রশিষ্য হয়ে গেছে। সে যা করছে ম্যাকস তারই অনুসরণ করছে। চলাফেরা ওঠাবসা সব লক্ষ্য করে করে দেখছে আর প্রাণপণে তা নকল করবার চেষ্টা করছে।

শীলা ভেবেছিল, এত সব কাণ্ডকারখানা দেখে সে বুঝি হাসতে হাসতে মরেই যাবে। কিন্তু সামলানো যায় না এমন বেয়াড়া হাসি এই [illegible] আর জোর [illegible] না। পরিবেশকার কাজ সে বেশ গম্ভীর-ভাবেই করে যেতে লাগল। ভাত ডাল মাছ তরকারি সবই সাহেবের জন্যে বসে বসে রেঁধেছেন মা। সেই সঙ্গে রুটি মাংসও করে রেখেছেন। কী জানি যদি ওসব কিছু না খেতে পারে। খেতে পারুক আর না পারুক সাহেবের উৎসাহের অভাব নেই। চামচে তুলে তুলে সব একটু একটু চেখে চেখে দেখছে। ভালো না লাগলে মুখ বিকৃত করছে।

বাবা এই সঙ্গে খেতে বসেননি। অফিস থেকে রিটায়ার করলে কি হবে, সেই দশটা পাঁচটার অভ্যাসটি ঠিক আছে। ঠিক আগের সময়ের হিসেবে নেয়ে খেয়ে এখন আর ছুটতে ছুটতে গিয়ে বাস ধরেন না, কাগজ কি বই-টই কিছু একখানা নিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েন। তারপর দু চারপাতা ওলটাতে না ওলটাতেই তাঁর নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। শীলার মনে আছে, খুব ছেলেবেলায় মাঝরাত্রে কি শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেলে বাবার এই নাকের শব্দ কানে গেলে কী ভয়ই না সে পেত। মার কাছে সরে এসে তাঁকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরত।

খেতে খেতে নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মা, ধুতি-পাঞ্জাবিতে ম্যাকসকে কেমন মানিয়েছে বলো তো?'

সরোজিনী একটু হেসে বললেন, 'বেশ মানিয়েছে।'

নীলাদ্রি গম্ভীরভাবে বলল, 'অনিন্দ্য দত্তের ছোট ভায়রা বলে মনে হচ্ছে না?'

সরোজিনী হেসে বললেন, 'হতভাগা কোথাকার। তোর না আপন বোন? অনিন্দ্যর ভায়রা হলে তোর কী হয়?'

নীলাদ্রি বলল, 'তার চেয়ে তোমার সঙ্গে সম্পর্কটাই ভালো। একেবারে জামাই জামাতা। চমৎকার অনুপ্রাস।'

বলতে বলতে নীলাদ্রি হো হো করে হেসে উঠল।

ম্যাকস নীলাদ্রির দিকে চেয়ে বলল, 'what's the fun ?'

নীলাদ্রি বলল, 'Nothing nothing. In our national dress you are looking like a typical জামাইবাবু।'

জামাইবাবু কথাটার মানে বুঝতে না পেরেও ম্যাকস হাসতে লাগল। কিন্তু হাসির বদলে প্রচণ্ড রাগ হোলো শীলার। ছি ছি ছি একী অসভ্যতা। সে কী সেই ছোট্ট খুকু আছে? কিচ্ছু বোঝে না? ফুলদার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি। জীবনেও শীলা আর তার সঙ্গে কথা বলবে না।

বিকালবেলায় পাড়ার ছেলেমেয়েরা জার্মান সাহেবকে দেখতে এল। এদের মধ্যে কেউ কেউ শীলার বন্ধুও আছে। রীণা, দীপ্তি বরুণা। স্কুলে এক সঙ্গে পড়ত। রীণা আর দীপ্তি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। একজন আর্টস নিয়েছে আর একজন সায়ান্স। আর বরুণা পেয়েছে দাম্পত্য জীবন। আর্টস আর সায়ান্সের মিকসড কোর্স।

দীপ্তি বলল, 'ওঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেবেন না ফুলদা?'

নীলাদ্রি বলল, 'আমি কিছু জানিনে দীপ্তি। ম্যাকস বাওয়ার এখন ষোল আনা শীলার সম্পত্তি।'

শীলার আর সহ্য হোলো না। তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করে উঠল, 'এসবের মানে কী হচ্ছে ফুলদা? তুমি ওঁকে এক মিনিট কাছ ছাড়া করছ না আর বলছ আমার সম্পত্তি?'

নীলাদ্রি বলল, 'আহা আমি তো তোর সামান্য প্রাইভেট সেক্রেটারী মাত্র। কি তোর Personnal circusএর ম্যানেজারও বলতে পারিস। জানো বরুণা, প্রোপ্রাইট্রেস শীলা রয়ের কাছে দু রকমের টিকেট আছে। শুধু দেখলে দু আনা আর কথা বলতে গেলে চার আনা।'

টিকিটের কথা শুনে তিন সখী খিল খিল করে হেসে উঠল।

রীণা বলল, 'আমরা কিছু কনসেসন পাব না ফুলদা?'

শীলা মনে মনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে ফুলদার আর মুখদর্শন করবে না।

দীপ্তিরা ম্যাকসকে আড়াল থেকে দেখে টেখে বিদায় নিল। কিন্তু নতুন বন্ধুকে নীলাদ্রি অত সহজে ছেড়ে দিল না।

সে বলল, 'অনিন্দ্যের হস্টেল থেকে তোমার বাকস বিছানা এক্ষুনি আনিয়ে নিচ্ছি। তুমি এখানেই আরো কটা দিন থেকে যাও। যদি চাও তো আমরা দুজনে তোমার গাইডের কাজ করে দিতে পারি। পয়সা লাগবে না।'

ম্যাকস আপত্তি তো করলই না, বরং খুশি হয়েই নীলাদ্রির আতিথ্য নিল। ফুলদার পাশের ঘরে ওর বিছানা পেতে দিল শীলা। জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিক করে রাখল। সুগন্ধি ধূপকাঠি জেলে দিল। শুকনো শূন্য ফুলদানিটা জলে আর ফুলে ভরে উঠল।

নিজের বিছানা দোতলায় তুলে নিয়ে গেল শীলা। বাবা-মার পাশের ঘরে সে থাকবে। বড়দা ছোড়দা সপরিবারে একজন দিল্লীতে আর একজন চণ্ডীগড়ে। বাড়িতে এখন আর ঘরের অভাব নেই। কিন্তু একতলার ঘরগুলি খালিও বড় একটা থাকে না। ফুলদার গানবাজনার গুণী বন্ধুদের কেউ না কেউ এসে হাজির হন। ফুলদা সহজে কাউকে ছাড়তে চায় না।

ম্যাকস যদিও গান বাজনা জানে না, কিন্তু দূর দেশের মানুষ তো। আর কত দূর দেশের খবর সে নিয়ে এসেছে। তাই বোধ হয় ফুলদার কাছে ওর এত আদর। গান বাজনা নিয়ে বেশি সময় কাটালেও ফুলদা যে শুধু গান বাজনাই ভালোবাসে তা নয়। সে মানুষজন ভালোবাসে, ঘরদোর সাজাতে গুছাতে ভালোবাসে পাড়ার বউদিদের, বন্ধুর বউদের শাড়ির রঙ আর পাড় পছন্দ করে দিতে ভালোবাসে। সেই সঙ্গে ম্যাকসকেও ভালোবেসেছে দেখে শীলা খুব খুশি হল।

তাদের এই বাড়ি তাদের এই পাড়া ম্যাকসের নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগে গেছে। যে মানুষের সকালে এসে বিকালে চলে যাবার কথা সেই মানুষ পরদিন গেল না, তার পরদিনও গেল না, তার পরদিনও নয়। নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ও এখানে থেকে যাবে। যা আদর যত্ন পাচ্ছে ওর বিশ্বপরিক্রমা এখানেই শেষ।' শীলার দিকে চেয়ে চেয়ে নীলাদ্রি হাসতে লাগল।

শীলা রাগ করে বলল, 'ফুলদা ভালো হবে না কিন্তু। ফের যদি অমন কর তা হলে তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি হয়ে যাবে।'

আর কোন ভাইবোন তো এখন আর বাড়িতে থাকে না। ফুলদাই একমাত্র। সে একই সঙ্গে দাদা আর দিদি, সখা আর সখী।

সপ্তাহে দু তিনদিন বাইরে টিউশনি করে ফুলদা। সেতারের টিউশনি। দু চারজন ছাত্রছাত্রী বাড়িতে এসেও শেখে। বাকি সময়টা ফুলদা বাজায়। এখন তার আরো কাজ বেড়েছে। কাজ নয় খেলা। ম্যাকসের সঙ্গে বসে বসে গল্প করে। কোনদিন ক্যারম খেলে। কখনো বা খেলাচ্ছলে তাকে বাজনা শোনায়।

ম্যাকস কি ফুলদার বাজনা বোঝে? এই-সব বিদেশী সুর তার ভালো লাগে? ম্যাকসের মুখের হাসি চোখের উল্লাস দেখে মনে হয় সত্যিই ও খুব উপভোগ করছে।

মাঝে মাঝে আবার রাগরাগিণীর নামও জিজ্ঞাসা করে ম্যাকস। 'What is this tune!'

ফুলদা জবাব দেয়, 'দেশ।'

ম্যাকস তার বিদেশী জিহ্বা দিয়ে চেখে চেখে উচ্চারণ করে 'ডেস।'

'What is this one?'

সেতারের আলাপ শুনে ম্যাকস আর
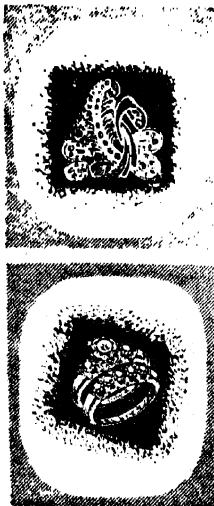
একটি রাগের নাম জিজ্ঞাসা করে।

ফলুদা বলে, 'খাম্বাজ।'

ম্যাকস অদ্ভুতভাবে কথাটা উচ্চারণ করে নিজেই হেসে ওঠে।

শীলা একদিন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ফলুদা, ও'কে যে অমন করে রাগরাগিনীর নাম মুখস্ত করাচ্ছ, উনি কি তোমার বাজনা কিছু বুঝতে পারেন?'

নীলাদ্রি জবাব দিল, 'একটু একটু পারে বইকি। তোর চেয়ে ভালোই পারে। ম্যাকস কত বড় বাজিয়ের দেশের লোক তা জানিস! কত বড় বড় কম্পোজার ওর দেশে জন্মেছেন। বিটোফেনের নাম শুনেছিস?'

নামটা যেন শোনা শোনা। শীলা ঘাড় কাত করে। আস্তে আস্তে বলে, 'উনি কি এখনো বাজান নাকি ফলুদা!'

নীলাদ্রি হেসে ওঠে, 'গ্যেটের সমসাময়িক ছিলেন, তিনি এখন আর নেই। কিন্তু তাঁর অমর সিম্ফনিগুলি রয়ে গেছে। আচ্ছা তোকে একদিন রেকর্ড শোনাব। মোৎসার্ট ভাগনার শুবার্ট শুম্যান সুরে সুরে সারা ইউরোপকে ছেয়ে দিয়েছেন।'

তাঁদের সেই সুর যেন এই মুহূর্তেও ফলুদা শুনতে পাচ্ছে। তার কথার সুরেলা আবেশ, মুখ চোখের ভাগর মুগ্ধতা দেখে শীলার সেই রকমই মনে হোলো। তারপর ওইসব সুরকারের কথা নিয়ে ম্যাকসের সঙ্গে ফলুদা আলোচনা আরম্ভ করল। শীলা আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এল। তার তো অত বিদ্যা নেই যে সব বুঝতে পারবে। ইংরেজী ম্যাকস যে তার চেয়ে বেশি ভালো জানে তা নয়। অমন দু চারটে কথা ভাঙা ভাঙা শব্দ শীলাও বলতে পারে। কিন্তু বলতে এত লজ্জা করে। একটা কথাও মুখ থেকে বেরোয় না। কী জানি যদি উনি হাসেন। ফলুদা ও'র সঙ্গে এত কথা বলে, কিন্তু ও'কে বাংলা শিখতে বলে না কেন। বাংলা শেখায় না কেন। উনি যদি বাংলা জানতেন কী চমৎকারই না হোতো। শীলা ও'র সঙ্গে কথা বলতে পারত, গল্প বলতে পারত।

এর মধ্যে অনিন্দ্য এল আর একদিন খোঁজ নিতে। শীলাকে ডেকে বলল, 'কী ব্যাপার শীলাবতী। তুমি নাকি ম্যাকস সাহেবকে একেবারে বন্দী করে রেখেছ। একজোড়া নীল নেত্রকে কিছুতেই কালো চোখের আড়াল করতে চাইছ না। নীলাদ্রি ফোনে বলছিল।'

শীলা রাগ করে বলল, 'কী বাজে বাজে কথা বলছেন অনিন্দ্যদা। ফলুদাই তো ও'কে নিয়ে রাতদিন মশগুল হয়ে আছে। রোজ বেড়াতে বেরোচ্ছে। আজ জু কাল মিউজিয়াম, পরশু আর্ট একজিবিশন। আমাকে কি সঙ্গে নেয়?'

অনিন্দ্য চুকচুক শব্দ করে বলল, 'ভারি আফশোসের কথা। সত্যিই ভারি অন্যায়। তোমাকে অবশ্যই সঙ্গে নেওয়া উচিত। আর এই জার্মান টুরিস্টটিই বা কী। মনে কি কোন রস কস নেই? আমি হলে তোমাকে ছাড়া বেড়াতে বেরোতামই না। ওই রাঙা-বরণ শিমুল ফুলকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণকলির হাতে হাত রেখে বিশ্ববিজয়ে বেরিয়ে পড়তাম।'

শীলা বলল, 'থাক থাক আপনার ওই মুখেই সব। বেরোবার কত সময় হয় আপনার।'

অনিন্দ্যদা মৃদু হেসে ফলুদার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ম্যাকসকে সামনে রেখে ও'দের মধ্যে ইংরেজীতে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হোলো। দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে সঙ্গীতে জার্মানী পৃথিবীকে অনেক দিয়েছে। কান্ট হেগেলের দেশ জার্মানী, গ্যেটে-শিলারের দেশ

জার্মানী, মার্কস এঙ্গেলসের দেশ জার্মানী। আইনস্টাইনের দেশ জার্মানী। ম্যাকস যেন তার নিজের দেশের প্রতিনিধি। তাকে লক্ষ্য করে দুজনের প্রীতি আর প্রশস্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সব কথা শীলা বুঝতে পারল না। কোন কোন নাম সে এর আগে দু একবার শুনেছে। কিন্তু শুধু নামমাত্রই। আর কিছু সে জানে না। শীলা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল সে যেমন বুঝতে পারছে না, ম্যাকসেরও তেমনি সব কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। একখানা ছোট ডিকসনারি আছে ম্যাকসের পকেটে। ইংরেজী কথার জার্মান মানে আর জার্মান কথার ইংরেজী মানে তাতে আছে। ম্যাকস বার বার পকেট থেকে সেই ডিকসনারিখানা বার করছে। পাতা উল্টে উল্টে শব্দগুলি খুঁজে নিচ্ছে। তারপর তারিফ করার ধরনে বলছে, 'Oh, I see!' কখনো বা শব্দের অর্থে মজার সন্ধান পেয়ে হো হো করে হেসে উঠছে। কিন্তু সে হাসি অনেক বিলম্বিত। অনিন্দ্যদা আর ফুলদা তখন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন।

মুখে আঁচল চেপে শীলা সেখান থেকে সরে এল। কিন্তু আজ আর তেমন জোর হাসি তার পেল না। বেচারা ম্যাকসের ওপর তার সহানুভূতিই হোলো। সে সাত-সমুদ্র তেরনদী পার হয়ে এসেছে, কিন্তু ভাষার দেয়াল টপকাতে পারছে না। শীলার মতই সে অসহায়। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শীলা ভাবতে লাগল। কিন্তু ইংরেজী ভাষা না জানলেও ম্যাকস অনেক কিছু জানে। কত দেশ দেশান্তর ঘুরে এসেছে। কত বিদ্যা শিখেছে। আর শীলা? সে তো কিছুই জানল না, শিখল না। থার্ড-ক্লাসে দু দুবার ফেল করে সে অভিমানে পড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে রইল। ভেবে-ছিল প্রাইভেট পড়বে। পড়ে পড়ে পরীক্ষা দেবে। কিন্তু তাও আর হয়ে উঠল না। এদিকে তার সঙ্গে যারা পড়ত তারা কত এগিয়ে গেল। স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে কলেজে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু শীলার আর এগোনও হোলো না, পৌঁছানোও হোলো না। সে কেবল পিছুতেই লাগল। দু চারদিন গান নিয়ে চেষ্টা করল, ছেড়ে দিল। বাজনাও তেমনি। ফুলদা বলল, 'তোর মন নেই।'

শীলা বলল, 'বেশ, নেই তো নেই।'

সে সরে এল মায়ের কাছে, মায়ের পাশে। চা করে, পান সাজে, বিছানা পাতে, রান্না-বান্নার জোগান দেয়। বেশ ছিল। সব আফশোস আর আক্ষেপ সংসারের কাজের মধ্যে চাপা পড়ে ছিল। হঠাৎ সব আজ দ্বিগুণ বেগে ফেটে বেরোল। শীলার মনে হতে লাগল, 'ছি ছি ছি এ কী করেছে সে। নিজের হাতে নিজের সব পথ বন্ধ করেছে। কিছুই জানেনি, কিছু শেখেনি, কোন যোগ্যতা অর্জন করেনি।

হঠাৎ কেন যেন কান্না পেতে লাগল শীলার।

সরোজিনী এসে পিছনে দাঁড়ালেন, 'ওকি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছিস। চুল বাঁধবিনে?'

শীলা পিছনে না তাকিয়েই বলল, 'বাঁধব। তুমি যাও মা।'

সরোজিনী বললেন, 'ওরা যে ডাকছে তোকে। আজ নাকি তোকে সঙ্গে নিয়ে প্রিন্সেপ্স্ ঘাটে যাবে। যা না। জাহাজ টাহাজ দেখে আসবি। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে তাহলে।'

শীলা মাথা নেড়ে বলল, 'না আমি যাব না।'

অনিন্দ্যও এসে খানিকক্ষণ সাধাসাধি করল।

'ফ্রয়েলাইন রায়, হের বাওয়ার ডাকছে তোমাকে। তাকে নিরাশ কোরো না, চলো। ফ্রয়েলাইন মানে জানো? কুমারী। আর ফ্রাউ তার পরের অবস্থা। আমাদের এইটুকু জানলেই হল। এখন চল যাই।'

কিন্তু শীলাকে কিছুতেই কেউ নড়াতে পারল না।

সেই রাত্রে শীলা স্বপ্ন দেখল সত্যিই সে বেড়াতে বেরিয়েছে। প্রিন্সেপস ঘাট থেকে প্রকাণ্ড এক জার্মান জাহাজ সমুদ্রের দিকে যাত্রা করেছে। সে জাহাজে আর কেউ নেই। শীলা আর প্রকাণ্ড এক ময়ূর। সাদা ধবধবে তার গায়ের রঙ। কী সুন্দর আর কী সুন্দর। কিন্তু অত মানুষ-প্রমাণ ময়ূর কখনো হয়! শীলা আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখল—ওমা, এতো ময়ূর নয়, এ যে—। না না না, আমি বাড়ি যাব আমি বাড়ি যাব। ছি-ছি-ছি, সবাই কী ভাববে। কিন্তু যে যাই ভাবুক জাহাজ আর ফিরল না। ভাসতে ভাসতে একেবারে মাঝ সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে আরও দূরে আরও দূরে। আর কী নীল সেই সমুদ্রের জল। এই নীলের আভাস দুটি চোখ আগেই নিয়ে এসেছিল। তারপর সেই নীল সমুদ্র হঠাৎ ফেনিল হয়ে উঠল। 'আকাশে ঝড়ের আভাস। 'উত্তরে চাই দক্ষিণে চাই ফেনায় ফেনা আর কিছু নাই।' তাদের জাহাজ সেই উত্তাল সমুদ্রের বুকে টলতে লাগল দুলতে লাগল। শীলা তো ভয়েই অস্থির। সবসুদ্ধ ডুবে মরবে নাকি। কিন্তু নীল দুটি চোখ তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। সে চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। কেন থাকবে। তার তো ঝড়ের সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজে করে যাতায়াতের অভ্যাসই আছে। সে কাছে এগিয়ে এসে শীলার হাত ধরল। তারপর পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'অত ভয় পাচ্ছ কেন, আমি তো আছি।' ছি ছি ছি, কী লজ্জা, কী লজ্জা। যদিও দেখবার মত কেউ নেই তবু দুজনকে তো দুজনে দেখতে পাচ্ছে।

মায়ের ডাকাডাকিতে শীলার ঘুম ভেঙে গেল। সরোজিনী বললেন, 'সেই সন্ধ্যা থেকে কী ঘুমই না ঘুমোচ্ছিস।'

শীলা বলল, 'লম্বা একটা সিনেমার গল্প স্বপ্নে দেখছিলাম মা।'

সিনেমার গল্পই তো। ফুলদার সঙ্গে মাস কয়েক আগে যে ইংরেজী ছবিটা দেখতে গিয়েছিল শীলা, তাতেও এই রকম জাহাজ ছিল, সমুদ্র ছিল, ঝড় ছিল। সেই ঝড়ের ঝাপটায় নায়িকা নায়কের—। ছি-ছি-ছি।

সারা সকালের মধ্যে ম্যাকসের মুখের দিকে তাকাতে পারল না শীলা। অন্য দিনের মতই সে ওকে চা দিল, খাবার দিল, কিন্তু চোখে চোখে তাকাতে পারল না। ম্যাকস কিন্তু আগের মতই তার দিকে তাকাচ্ছে

হাসছে, একথা সেকথা বলছে ও। কী সুবিধে। একজনের স্বপ্ন আর একজন দেখতে পারে না, একজনের স্বপ্নের কথা আর একজন ভাবতেও পারে না।

শীলা কিন্তু বেশিক্ষণ ম্যাকসকে এড়িয়ে থাকতে পারল না। ফুলদাই সব মাটি করে দিল। শীলাকে ডেকে বলল, 'আজ কিন্তু ম্যাকসের সঙ্গে তোর খেলতে হবে।'

শীলা বলল, 'আমি পারব না ফুলদা। কেন, তুমি কী করবে।'

নীলাদ্রি বলল, 'আমার পরশু রেডিও প্রোগ্রাম। দুদিন আমাকে দারুণ রেওয়াজ করতে হবে। কেন, ম্যাকসের সঙ্গে কথা বলতে তোর অত ভয় কিসেররে। ছড়বেছড় ইংরেজী বলবি। ইংরেজী ম্যাকসের কাছেও বিদেশী ভাষা, আমাদের কাছেও তাই। গ্রামার ট্রামারের অত ধার না ধারলেই হোলো।'

শীলা মৃদু হেসে বলল, 'আমি পারব না ফুলদা। তোমরা পারো। গ্রামার শুদ্ধ করেও বলতে পারো, আবার ভুল করেও বলতে পারো। আমার সবই আটকে যায়।'

নীলাদ্রি বলল, 'তাহলে বাংলাতেই বলবি। তোর কথা ও শুনতে খুব ভালোবাসে।'

শীলা লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ।'

নীলাদ্রি বলল, 'সত্যি বলছি। তুই যখন কথা বলিস ও কান পেতে থাকে। অর্থ দিয়ে কী হবে। ধ্বনিই ওর ভালো লাগে। সেদিন বলছিল, তোর গলার স্বর নাকি আমার এই ইনস্ট্রুমেন্টের মতই মিষ্টি। একেই বলে ভাগ্য। আমি বারো বছর ওস্তাদের বাড়িতে ধর্ণা দিয়ে, দুবেলা রেওয়াজ করেও যা করতে পারিনি আর তুই অশিক্ষিত পটুতায়—।'

শীলা তাকে বাধা দিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল, 'কী যে বলো ফুলদা, শুধু আমার কথা কেন হবে। তোমার কথা, মার কথা সবাইর কথাই উনি অবাক হয়ে শোনেন বিদেশী কিনা। বাংলা ভাষাটাই ও'র কাছে মিষ্টি লাগে।'

নীলাদ্রি সঙ্গে সঙ্গে সেতারে একটা বাজিয়ে নিল, 'আমরি বাংলা ভাষা! মোদের গরব মোদের আশা।'

শীলা একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এল।

নীলাদ্রি সেতার বাঁধতে শুরু করেছিল চোখ, না ফিরিয়েই বলল, 'কীরে।'

শীলা তার বাসন্তী রঙের শাড়ির আঁচল চাঁপার কলির রঙের না হোক সেই গড়নের আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, 'ফুলদা, একটা কথা বলব, রাখবে?'

'বল না। বেড়াতে যাবি? সিনেমায় যাবি?'

শীলা বলল, 'না। ওসব কিছু না। আমাকে ফের শেখাবে ফুলদা?'

'কী শেখাব?'

'তোমার ওই সেতার।'

নীলাদ্রি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, 'হঠাৎ যে এই সুমতি? আচ্ছা আচ্ছা। শেখাব।'

শীলা এবার সামনে থেকে নীলাদ্রির পিছনে চলে আসে। তারপর দাদার পিঠে গাল ঠেকিয়ে বলে, 'আর একটা কথা। আমি আবার পড়ব। আমাকে কয়েকখানা বই কিনে দেবে ফুলদা? তিন চারখানা কিনে দিলেই হবে।'

নীলাদ্রি আঙুলে মেরজাপটা পরতে পরতে বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা। তুই যদি সত্যিই ফের পড়তে শুরু করিস তাহলে তিন চারখানা বইতো ভালো গোটা কলেজ স্ট্রীটটাই এখানে তুলে নিয়ে আসব।'

শীলা বেরিয়ে এলে নীলাদ্রি দোরে খিল দিয়ে বাজাতে শুরু করল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর নিঃসঙ্গ ম্যাকস এসে আজ নিজেই শীলাকে ডেকে নিল।

'Come, no harm, no shame. Play and be happy.'

ক্যারম বোর্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে মুখের ভঙ্গিতে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন টানল ম্যাকস।

শীলা হেসে সায় দিল। তারপর বোর্ড-খানা নামিয়ে নিয়ে এল।

প্রথমে সরোজিনী খানিকক্ষণ বসে বসে দেখলেন। ম্যাকস তাঁকেও ইশারায় খেলতে ডাকল।

সরোজিনী হেসে বললেন 'না বাপু, ওখেলা আমি জানিনে। তাসটাস হোলে না হয় দেখা যেত। তোমরা খেল, আমি একটু গড়িয়ে নিই।'

সরোজিনী চলে গেলেন।

ম্যাকস হাঁ করে সেই বাংলা কথাগুলি শুনল। হাসল। তারপর শেষ দুটি শব্দ নিজস্ব ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল 'গড়িয়ে নি।' শেষে হেসে বলল 'Well Sheela, will you be my interpreter?'

ইনটারপ্রেটার কথাটার অন্য কোন অর্থ আশঙ্কা করে শীলা বলে উঠল 'No No No'.

ম্যাকস তার ভঙ্গি দেখে হাসতে হাসতে

বলল 'You have learnt only no no no . And I have learnt yes yes yes. Very good. Let us begin.'
খেলা চলতে থাকে। বোর্ডের ওপর টকাটক টকাটক গুটির শব্দ হয়। ওঘরে সেতারে 'দেশ' রাগের রেওয়াজ চলে। এঘরে শীলা বিদেশীর সংগে ক্যারম খেলে। এও আর এক ধরনের বাজনা। সেতারের চেয়ে কম মধুর নয়।

খেলায় ম্যাকসেরই জিত হয় বেশি। আঘাতে আঘাতে গুটিগুলি ঠিক গিয়ে পকেটে পড়ে। শীলা খেলবে কি, মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ম্যাকসের দিকে তাকিয়ে থাকে। এর চেয়ে বড় বিস্ময় বড় রহস্য যেন আর নেই। কোথায় কোন দেশের মানুষ। শীলা সে দেশের ভাষা জানে না, ইতিহাস জানে না, ভূগোল জানে না, কিছুই জানে না। সেই অচিন দেশের অপরূপ এক মানুষের সংগে শীলা নিজের ঘরে বসে ক্যারম খেলছে। দুদিন বাদে একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? এই মানুষটিরই বা সে কী জানে, কতটুকু জানে। ফুলদার কাছে শুনেছে, পশ্চিম জার্মানীর কোন্ এক শহরে থাকে। সে শহরের নাম ফুলদাই উচ্চারণ করতে পারে না আর তো শীলা। সেখানে বাবা আছে, মা আছে, ভাই আছে। না স্ত্রী নেই। এত অল্প বয়সে ওরা বিয়ে করে না। বাবার ছোটখাটো ব্যবসা আছে। ও নাকি একটা টেকনিক্যাল স্কুলে পড়ে। কিন্তু পড়াশুনোয় তেমন মন নেই। এদিক থেকে শীলার সংগে ওর খুব মিল আছে। পৃথিবীটাকে ও নিজের চোখে দেখতে চায়। শীলার যদি সাধ্য থাকত সেও তাই চাইত। সেও অমনি করে ঘুরে বেড়াত। ম্যাকস সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কিছু শীলা জানে না। কিন্তু এটুকু জানাও যেন বাহুল্য। এটুকু না জানলেও ম্যাকসকে যেমন আপন মনে হচ্ছে, তেমনি আপন মনে হত শীলার। বন্ধুত্বে কোন বাধা হত না। বন্ধু! কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করতেও যেন লজ্জা হয়। সে কি ওর বন্ধু হবার যোগ্য! শীলা যে থার্ড ক্লাসের ওপরে আর উঠতে পারেনি। কোন গুণ-যোগ্যতাই যে আয়ত্ত করতে পারেনি সে। কিন্তু ম্যাকসের তাকাবার ভঙ্গি, শীলার সংগে তার মেলামেশার ইচ্ছা দেখে তো মনে হয় না গুণ-যোগ্যতা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা আছে। শীলাকে দেখেই ও খুশি, তার কথা শুনেই ওর আনন্দ। শুধু দেখবার মত হওয়া আর শোনবার মত কথা কওয়া। যে বলে 'তোমাকে এর চেয়ে বেশি কিছু আর হতে হবে না', তার চেয়ে বড় আপন আর কে আছে।

কিন্তু না। আর একজন না চাইলে কি হবে, শীলার কি যা আছে তাই থাকলেই চলে? তার কি আরো জানবার শোনবার শিখবার আরো যোগ্য হবার ইচ্ছা হয় না? যেমন ইচ্ছা করে সাজতে, ভালো শাড়ি পরতে, গয়না পরতে, সুন্দর করে চুল বাঁধতে, কাজল পরতে—তেমনি ইচ্ছা করে আরো যোগ্য হতে। যোগ্যতার মানে তো পড়াশুনো? সবাই তাই বলে। গুণ মানে তো গাইতে জানা বাজাতে জানা? যদি এমন কোন বর পাওয়া যেত যাতে পৃথিবীর সমস্ত বই একরাত্রের মধ্যে মুখস্থ হয়ে যায়, এমন বর যদি পাওয়া যেত সমস্ত রাগরাগিণী তার গলায় এসে বাসা বাঁধে, আর ফুলদার মত তারও আঙুলের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় সেতারের তার-গুলি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে! যদি এমন হোতো!

শীলাকে খেলায় হারিয়ে দিয়ে ম্যাকস হো হো করে হেসে উঠল: You know nothing, you know nothing,'

হঠাৎ কি যেন মনে হোলো ম্যাকসের। কী একটা কথা বলতে গিয়ে শব্দ সমুদ্রে যেন হাবুডুবু খেতে লাগল ম্যাকস। তারপর লাইফবেল্টের মত বেরোল সেই ডিকসনারি। হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল ম্যাকস: 'Yes, Joke, just the word. Joke, only joking, don't be sorry. Are Are you ?'

দুঃখিত হবে কি শীলা ম্যাকসের সেই শব্দ হাতড়ানোর ভঙ্গি দেখে ওর ভিতরের হাসির সিন্ধু আবার উথলে উঠেছে।

মেঝের ওপর প্রায় লুটোপুটি খেতে লাগল শীলা। খিল খিল খিল। কুল কুল কুল। জলপ্রপাতের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

ম্যাকসও মৃদু মৃদু হাসতে লাগল 'I see! No sign of sorrow. The world is full of happiness.'

বেরিয়ে এসে শীলা গুনগুন করতে লাগল জার্মানী জার্মানী। ম্যাকস ভারতের কথা অনেক জানে। কিন্তু শীলা কিছু জানে না। যদি জানত, তাহলে শীলা সেসব বিষয় নিয়ে ম্যাকসের সংগে আলোচনা করতে পারত। এখন আর তার ভয় নেই। ওইরকম yes no very good করে সেও কথা চালিয়ে যেতে পারে।

একটা দেশকে চোখে দেখেও জানা যায় আবার বই পড়েও জানা যায়। এই মুহূর্তে ম্যাকসের দেশকে তো আর চোখে দেখবার

উপায় নেই শীলার। বইয়েরই শরণ নিতে হবে।

কোণের ঘরটায় ঠাকুরদার আমলের স্তূপাকার বই জমে আছে। শীলা চুপি চুপি এসে সেগুলি ঘাটতে লাগল। অনেক বইয়েরই খানিকটা খানিকটা উই আর ইঁদুরের পেটে গেছে। আরো অনেকগুলি ধূলি-ধূসর। আইনের বই, রোমের ইতিহাস, যোগাবশিষ্ট রামায়ণ, দামোদর গ্রন্থাবলী সব জাতি বর্ণ মর্যাদার শ্রেণীভেদ ভুলে একসঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু শীলা যা চায়, তা কোথায়?

মা এসে ধমক দিলেন, 'এই অবেলায় তুই আবার ওগুলো ঘাটতে গেলি কেন? কী চাস বলতো।'

শীলা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'কিছু না মা।'

'তাহলে চলে আয়, কিছুতে কামড়ে টামড়ে দেবে। সেদিন একটা বিছে দেখেছিলাম।'

ফিরে এসে শীলা অগত্যা সেই পুরান স্কুলপাঠ্য আদর্শ ভূপরিচয়খানাই খুঁজে খুঁজে বার করল। অনাবশ্যক বলে এসব বই তাকের ওপর তুলে রেখেছিল। ধূলি আর মাকড়সার জালের আড়ালে অনাদরে পড়েছিল বছরের পর বছর। শীলার কোমল হাতের স্পর্শে আজ সেই নীরস ভূগোল নতুন গৌরবে নতুন মূল্যে মূল্যবান হয়ে উঠল, সিঞ্চিত হোলো কাব্যরসের ধারায়।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে পাতা উল্টে উল্টে ইউরোপের মানচিত্র বার করল শীলা। সতৃষ্ণ চোখে তাকাল একটি বিশেষ দেশের ওপর। তার উত্তরে সমুদ্র। এই নীল সমুদ্রেই কি সেই স্বপ্নের জাহাজ ভেসেছিল।

সরোজিনী এসে ফের তাড়া দিলেন, 'গা-টা ধুবিনে? কী আবার পড়ছিস বসে বসে?'

'কিছু না মা।'

শীলা তাড়াতাড়ি ভূগোলখানাকে আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল। যেন পরম নিষিদ্ধ এক নভেল। সমস্ত জার্মানী দেশটাকে সে যেন এমনি করে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারলে বাঁচে।

দিন দুই বাদে অনিন্দ্য এল খবর নিতে। 'কি, তোমাদের সেই জার্মান অতিথি কি পালিয়েছে না আছে?'

নীলাদ্রি বলল, 'পালাবে কেন? পালালে জামিনদার তোমাকে গিয়ে ধরতাম না?'

অনিন্দ্য হাসতে লাগল।

একটু বাদে বলল, 'তুমিতো কলকাতা শহরের কিছুই আর বাকি রাখোনি, সবই ওকে দেখিয়েছ। কিন্তু শহরটাই তো আর দেশ নয়। একটা গ্রাম ওকে দেখিয়ে নিয়ে এসো। এখনো দেশ বলতে গ্রামকেই বোঝায়।'
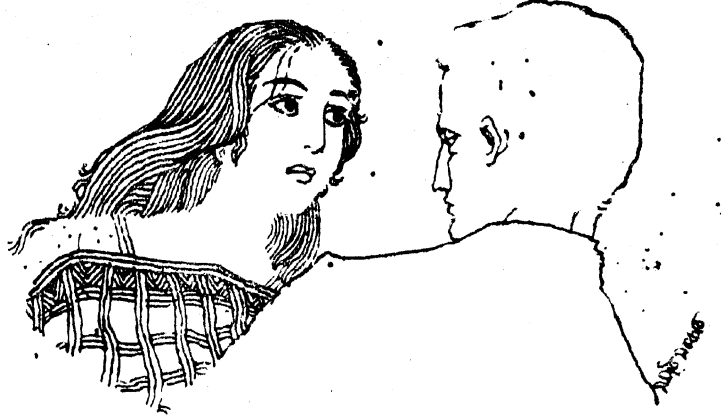
নীলাদ্রি বলল, 'কিন্তু গ্রাম নিয়ে কি আমরা আর সত্যিই গর্ব করতে পারি? সেই 'স্নেহ সুনীবিড় শান্তির নীড়ের' অস্তিত্ব কি আর আছে? স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এখন শুধুই স্মৃতি।'

চা টোস্ট পরিবেশনের পর শীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও'দের আলোচনা শুনতে লাগল।

অনিন্দ্য চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'যাহোক, তুমিতো আর কন্ডাকটেড টুরের ভার নাওনি যে, বেছে বেছে শুধু ভালো জিনিসই দেখাবে। ওকে সবই দেখতে দাও। তাহলেই এই দেশ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ইমপ্রেশন নিয়ে যেতে পারবে।'

গ্রাম দেখবার প্রস্তাব শুনে ম্যাকস লাফিয়ে উঠল। সে নিশ্চয়ই যাবে। ইণ্ডিয়ায় এসে গ্রাম না দেখলে সে আর কী দেখল। এখানকার সভ্যতাইতো গ্রাম-সভ্যতা।

গ্রামের সঙ্গে তিন পুরুষের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই নীলাদ্রিদের। কিন্তু বাবার এক খুড়তুতো বোন আছেন বর্ধমান জেলার মদনপুরে। সেই পিসিমার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়নি।

গেলে সেখানেই যেতে হয়।

নীলাদ্রি অনিন্দ্যকে বলল, 'তুমি যখন হুজুগটা তুললে তুমিও চল।'

কিন্তু অনিন্দ্যের সময় নেই। তার অনেক কাজ। সে যেতে পারবে না।

যার কাজ নেই, যে যেতে পারে তাকে কেউ বলে না। শেষ পর্যন্ত শীলা নিজেই এসে নীলাদ্রির কাঁধে গাল ঘষল। যেন এক কৃষ্ণসার হরিণী দেবদারু গাছকে আদর করছে।

'আমাকে নিয়ে যাও না ফুলদা।'

নীলাদ্রি বলল, 'তুই যাবি? বড় কষ্ট হবে যে। পারবি সহ্য করতে?'

'তোমরা যা পারবে আমিও তাই পারব।'

উপেনবাবু দোতলা থেকে নেমে এসে বাধা দিলেন। 'না না, কোথায় আবার যাবি! যত-সব বাজে হুজুগ।'

তিনি বাড়ি ছেড়ে নিজেও বেরোবেন না, ছেলেমেয়েরা কেউ বেরোতে চাইলেও তার পথ আগলে ধরবেন। এই পাড়াটুকুর বাইরে পৃথিবীর সমস্ত জায়গা তাঁর কাছে অগম্য, বাসের অযোগ্য। সাপ বাঘ বিপদ আপদে ভরা।

কিন্তু সরোজিনী শীলার সহায় হলেন। স্বামীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'অমন করছ কেন? একদিনের জন্যে যেতে চাইছে যাক না। সেখানে ছেলেমেয়ে নিয়ে বিনয়বাবু আছেন, ঠাকুরঝি আছেন অত ভয় কিসের তোমার।'

অনুমতি পেয়ে শীলা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যেন বর্ধমানের এক গ্রামে যাচ্ছে না। বিশ্ব-পরিব্রাজকের সঙ্গে সেও পৃথিবী পরিক্রমায় বেরোচ্ছে।

ছোট স্টেশন। লোকজনের ভিড় নেই। প্লাটফর্মের বাইরে এসে নীলাদ্রি দেখল মদনপুরে যাওয়ার বাস আছে, সাইকেল রিক্সা আছে। স্টেশন থেকে পিসিমার বাড়ি মাইল তিনেক দূরে। এগিয়ে নেওয়ার জন্যে পিসতুতো ভাই সুরেশ্বরও এসেছে।

কিন্তু ঝাপটানো বটগাছটার নীচে একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। একটু আগে সনের আটিগুলি নামিয়ে রেখে গাড়োয়ান বিড়ি টানছে।'

ম্যাকস সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল— What's that.'

নীলাদ্রি তাকে বুঝিয়ে বলল, 'এ আমাদের দেশীয় যান, আদি আর অকৃত্রিম।'

ম্যাকস এগিয়ে গিয়ে সেই গাড়িতে উঠে বসল। যেতেই যদি হয় এই গাড়িতেই সে যাবে। বাসের ব্যবসা তাদের নিজেদেরই আছে। বাস সম্বন্ধে তার আর কোন

দুটি সজল কালো চোখ দুটি নীল ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে রইল

কৌতূহল নেই। কিন্তু গরুরগাড়ি জীবনে সে এই প্রথম দেখল। তাতে না চড়ে সে ছাড়বে না।

দেরি হবার আশংকা, কষ্টের ভয় দেখিয়েও নীলাদ্রি তাকে নামাতে পারল না। ম্যাকস বলতে লাগল, আর কেউ যদি নাও যায় সে একাই যাবে।

গাড়োয়ান সবিনয়ে বলল 'কোন কষ্ট হবে না বাবু, আসুন।' ওপরে ছাপ্পড় আছে। নীচে আমি মোলায়েম বিছানা পেতে দেব। আপনাদের কোন কষ্ট হবে না।'

ম্যাকসকে তো আর একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে নীলাদ্রি আর শীলাও তার পাশে উঠে বসল।

কৌতূহলী চাষী কামলারা চারদিকে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। তারা যুদ্ধের সময় সাহেব যে দু একজন না দেখেছে তা নয়। কিন্তু গরুর গাড়ির ওপর সাহেবকে এই প্রথম দেখল।

সাহেবও তাদের দিকে উল্লাস আর ঔৎসুক্যভরা দুটি নীল চোখ মেলে রাখল।

ধুলোভরা কাঁচা রাস্তায় ক্যাঁচর ক্যাঁচর করে গরুর গাড়ি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। রাস্তার দুদিকে দিগন্ত ছোঁয়া মাঠ। মাঠভরা রোদ। নীল আকাশের নীচে মাঝে মাঝে রক্তবর্ণ কৃষ্ণচূড়া।

নীলাদ্রি একবার হাতঘড়িতে চোখ বুলোল। তারপর হেসে বলল, 'ঈস, কী স্পীডেই যাচ্ছি আমরা। আমাদের দেশের অগ্রগতির সিম্বল।'

কিন্তু শীলা সে কথা ভাবছিল না। তার সেই স্বপ্নের জাহাজের কথা মনে পড়ছিল। সেই স্বপ্নের জাহাজ এই গরুর গাড়িতে এসে ঠেকেছে, সেই উত্তাল নীল সমুদ্র রূপ নিয়েছে এসে শূন্য শুকনো মাঠে। আশ্চর্য, তবু স্বপ্ন সফল। এমন পুরোপুরিভাবে কোন স্বপ্নই বোধ হয় আর ফলে না।

অনেকদিন আগে পাঠ্য বই থেকে মুখস্ত করা কবিতার একটি অংশ শীলা মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল,

'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা
শৈল চূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গেরা
নারিকেলের শাখে শাখে ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে'

ম্যাকস কান পেতে শুনেছিল। হেসে বলল, 'very sweet, don't stop, go on.'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'এই দুপুর রোদে মাঠের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তোর মনে সমুদ্রের দ্বীপ ভেসে উঠল যে।'

শীলা মুখ নিচু করে বলল, 'এমনিই।'

নীলাদ্রি ম্যাকসের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, This is from our Tagore's তারপর লাইন কয়েকটির অনুবাদ করে শোনাল।'

ফেরার পথে শীলারা অবশ্য আর গরুর গাড়িতে ফিরল না। বাসে করেই স্টেশনে এল। কিন্তু যে গ্রামে মাত্র একদিন তারা থাকবে ভেবেছিল, সেখানে তিন দিন কাটিয়ে দিয়ে গেল। বাড়ি ঘর আর বিশ্ব ভ্রমণের কথা সব ভুলে গিয়েছিল ম্যাকস। তিন দিন সে গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে হৈহৈ করে কাটিয়েছে। পুকুরে সাঁতার কেটেছে। পেয়ারা গাছে উঠে ডাল ভেঙে পড়তে পড়তে কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছে। পুরোন শিবমন্দির দেখেছে। দশ মাইল দূরে পঁচিশ বছর আগের মসজিদ দেখতে ছুটেছে সাইকেলে করে।

মাঝখানে একদিন ছিল হোলি উৎসব। পিসিমার ছেলেমেয়েরা প্রথমে ভয়ে ভয়ে কাছে এগোয়নি। কিন্তু পরে একটু ইশারা পেয়ে সবাই এসে ম্যাকসকে রঙ দিয়েছে। আবীরে আবীরে প্রবাল গিরির আকার নিয়েছিল ধবল গিরি। পিসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে শীলাই ছিল দলনেত্রী। ঘোমটা একটু তুলে সাহেবের এই রঙ খেলা দেখে নিয়েছে গাঁয়ের বউরা। ছেলেরাও বিদেশী অতিথির অভ্যর্থনার জন্যে সব সম্পদ এনে জড়ো করেছে। একদিন দেখিয়েছে সাঁওতালদের নাচ, একদিন কীর্তন আর একদিন যাত্রাভিনয়। পালার নাম সুভদ্রাহরণ। আসবার সময় ম্যাকস বলে এসেছে এমন গ্রাম আর এমন চমৎকার মানুষ সে আর দেখেনি। গ্রামবাসীরা বলেছে সাহেবের স্বভাবও যে এমন মধুর হয়, তা তাদের ধারণা ছিল না। ভাষার মিল নেই, চালচলনের মিল নেই, তবু ম্যাকসের মিশবার কোন বাধা ছিল না। তার তুলনায় ফুলদাকেই বরং ওদের কাছে দূরের মানুষ, কলকাতার ফুলবাবু মনে হচ্ছিল শীলার।

আসবার পথে বাসে আর ট্রেনে ওরা অনর্গল কথা বলতে বলতে এল। মাঝখানে ফুলদা। ডানদিকে ম্যাকস, বাঁদিকে শীলা।

নীলাদ্রি হেসে বলল, ম্যাকস কিছুরই নিন্দা করছে না। বলছে এদেশের সব ভালো।'

শীলা বলল, 'তাহলে একথা [illegible] মনের কথা নয়। সব দেশে [illegible] করবার জিনিসও থাকে, [illegible] জিনিসও থাকে। ওঁকে জিজ্ঞেস করোনা ফুলদা, সত্যিই আমাদের দেশের কোন কোন জিনিস ওঁর খারাপ লেগেছে।'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'তুই জিজ্ঞেস করনা। আচ্ছা, আমি তোর দোভাষীর কাজ করে দিচ্ছি। আমাকে টাকা দিতে হবে কিন্তু।'

শীলা বলল, 'বেশ দেব।'

নীলাদ্রি ম্যাকসের সঙ্গে খানিকক্ষণ ইংরেজীতে আলাপ করে শীলাকে তার বঙ্গানুবাদ শোনাল।

'আমি বললাম হে বিদেশী, শীলাদেবী তোমাকে জিজ্ঞেস করছে এদেশের কোন দোষত্রুটিই কি তোমার চোখে পড়েনি? এদেশের মেয়েদের গায়ের কালো রঙ কালো চোখ, কালো চুল নতুন বলে তুমি না হয় পছন্দ করতে পারো, কিন্তু এর কালো বাজার, আঁধারের মত কালো কুসংস্কার, দারিদ্র্য অশিক্ষা, স্তরে স্তরে অব্যবস্থা

তুমিতো ভালো করে দেখনি। তবে শহরের নোংরা রাস্তা, বস্তীর নোংরা জীবন তো কিছু কিছু দেখেছ। গাঁয়ের খানা ডোবা এঁদো পুকুরের সঙ্গে দীনদরিদ্রের জীবনযাত্রাও কিছু কিছু দেখে গেলে। আমরা চাই তুমি মন খুলেই আমাদের সামনে চাঁদের উল্টোপিঠের সমালোচনা করে যাও।'

শীলা বলল, 'উনি কী জবাব দিলেন।'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'বেশি জবাব আর কী দেবে। ইংরেজীতে ভাষাটা ওকে বেকায়দায় ফেলেছে। ম্যাকস হিটলারের মত দেশের পর দেশ জয় করতে পারে, কিন্তু বিদেশিনী ভাষার পাণিগ্রহণ ওর পক্ষে সহজ নয়। তবু আমাদের বিদেশী বন্ধু মোটামুটি একটা জবাব দিয়েছে। ও বলতে চায়, দুদিনের জন্যে এসে ওতো আর আমাদের দেশকে তেমন খুঁটে খুঁটে ক্রিটিকের চোখ নিয়ে দেখতে পারেনি। ও রিফর্মারও নয় পলিটিসিয়ানও নয়। ও সাধারণ টুরিস্ট। ও আমাদের দেশকে দেখেছে পাখির চোখে। আর হয়তো কিছুটা আর্টিস্টের চোখে। জানিস শীলা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের এই টুরিস্ট ম্যাকসও এক ধরনের আর্টিস্ট। সারা পৃথিবীটা ওর সেতার। আর দুটি মুগ্ধ চোখ ওর বাজাবার আঙুল।'

ম্যাকস আরো গল্প করতে করতে চলল। ওর নানা দেশ ভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী। পূর্ব জার্মানী ছাড়া আশেপাশে সব দেশ ও সাইকেলে ঘুরেছে। পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছে। পূর্ব জার্মানী ওর এক গোপন দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো। এদিক থেকে বাংলা দেশের সঙ্গে ওদের দুর্ভাগা দেশের মিল আছে। দুটি দেশই পুবে-পশ্চিমে দ্বিধা বিভক্ত। ম্যাকস ধনীর ছেলে নয়। আর্থিক অবস্থা মাঝারি ধরনের। তাই এদেশে সে প্লেনে চড়ে আসতে পারেনি। স্টীমারে আর ট্রেনে সব দেশের জল মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছে। পথে বিপদ-আপদ কম হয়নি। কিন্তু ওসব ভয় করলে কি আর পথে বেরোন চলে? একবার ফার ইস্টের এক হোটেলওয়ালার মেয়ে তাকে বড় বিপদে ফেলেছিল।

ম্যাকসের মুখে আর এক দেশের মেয়ের নাম শুনে শীলার মনে ঈর্ষার সূঁচ বিঁধল।

'কিরকম বিপদে ফেলেছিল ফুলদা?'

নীলাদ্রি ম্যাকসের কাছ থেকে ঘটনাটা শুনে নিয়ে হেসে বলল, 'টাকা চুরি করেছিল।'

শীলা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ছি ছি ছি, মেয়েরা আবার চোর হয়?'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ম্যাকস বলছে হয় বইকি।'

ফুলদা বড় অসভ্য। শীলা জানলার দিকে মুখ করে বসে সবুজ গাছপালার মধ্যে চোখ ডুবিয়ে দিল।

বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই উপেনবাবু

মেঘের পরে মেঘ   আলোকচিত্র : শ্রীনীরদ রায়

খুব একচোট ধমকে নিলেন। এ কি যাচ্ছেতাই কান্ড। একদিনের কথা বলে তিন দিন গিয়ে বাইরে কাটিয়ে আসা। তাদের জন্যে কি ভাববার কেউ নেই? দুশ্চিন্তায় কদিন ধরে তাঁর ঘুম হয়নি।

নীলাদ্রি ফিস ফিস করে মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিনে না রাত্রে?'

কিন্তু আরো খবর আছে। সরোজিনী একখানা এয়ার মেলের চিঠি ম্যাকসের হাতে দিলেন। কনসুলেট অফিস থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। দুদিন ধরে পড়ে আছে চিঠিটা।

চিঠি পড়ে ম্যাকসের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ম্যাকস? খবর কি?'

খবর সুবিধা নয়। ব্যবসায়ে দারুণ লোকসান যাচ্ছে। ম্যাকসের বাবা টাকা আর পাঠাতে পারবেন না। সে যেন অবিলম্বে দেশে চলে যায়। ম্যাকস শুধু বাপে টাকার ভরসায় আসেনি। তবু বাবার বিপ[illegible] তারও বিপদ।

ম্যাকস কালই এখান থেকে চলে যাবে [illegible] যদি নাও হয়, কাল সন্ধ্যার বো[illegible] মেল তার ধরা চাইই।

শীলা স্তব্ধ হয়ে গেল। সে কি। এ[illegible] হঠাৎ? এমন তাড়াতাড়ি?

এই মুহূর্তে সে ভুলে গেল ম্যাকস এ[illegible] ছিলও এমনি আকস্মিকভাবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রের ওপর দারুণ রাগ হ[illegible] লাগল শীলার। অবুঝ অভিমানের সঙ্গে মনে মনে বলতে লাগল, 'এমন হবে জান[illegible] আমি কিছুতেই বেড়াতে যেতাম না।'

ম্যাকস তার [illegible] গুছোতে [illegible]

পূর্বপুরুষদের দান

তখনো ইতিহাস লেখা হয়নি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ যে ফসল প্রথম ফলাতে সুরু করেছিল তা হচ্ছে বার্লি। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেকার মিশরের মিনার-এর যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে শস্যের নিদর্শন রয়েছে তা বার্লি বলেই পণ্ডিতেরা বলেন। তাছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও স্পেনের প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও বার্লির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ২৭০০ বছর আগে সম্রাট সেংসুঙ এর চাষ সুরু করেছিলেন চীনে।

আমাদের সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে যবের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদড়োয় সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের মধ্যেও জানা গেছে যে বার্লির ফলন খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ছিল। বেদে যবের উল্লেখ থেকে আরো মনে হয় ধান বা গম চাষের অনেক আগেই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বার্লিশস্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বার্লির পুষ্টিকর গুণগুলির কথা জানতেন। পালা-পার্বণ ও উৎসবে এবং প্রাত্যহিক আহার্য ও পানীয় হিসেবে বার্লির ব্যবহার ছিল। এই কারণে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বার্লিশস্য একাত্ম হ'য়ে আছে।

আজো বার্লি মানুষের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ বার্লির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লি-শস্য থেকে উৎপন্ন পাল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক ব'লে রুগ্নদের জন্যেই এর বহুল ব্যবহার।

শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ও যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে বার্লির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'পিউরিটি বার্লি' প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ-এর সর্বাধুনিক কারখানায় উঁচুজাতের বার্লিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বার্লি তৈরী হয়। এই জন্যেই 'পিউরিটি বার্লি' রুগ্ন, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যুবা ও বৃদ্ধরাও এই বার্লি খেয়ে উপকার পান।

আটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

পরদিন সবাইকে বলল, সে গোড়ায় ভেবে এসেছিল তিন দিনে কলকাতা সফর শেষ করে সে বিদায় নেবে। কিন্তু তিন দিনের জায়গায় তিন সপ্তাহেরও বেশি কেটে গেছে, সে যেতে পারেনি। কী করে যে কেটেছে, তা সে টের পায়নি। যদি সময় থাকত আরো তিন মাস সে এই শহরে বাস করে যেত। কিন্তু আরো তিন বছর থাকলেও সাধ মিটত না।

বেলা পড়ে এল। ম্যাকসের গলা আরো করুণ শোনাতে লাগল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সে নীলাদ্রি আর সরোজিনীকে বলতে লাগল, তার পথযাত্রীর জীবনে সে এখানে এসে যা পেয়েছে, তা আর কোথাও পায়নি। এমন ভদ্রতা, সৌজন্য—শুধু সৌজন্য নয়, এমন আত্মীয়ের মত ব্যবহার কোথাও তার ভাগ্যে জোটেনি। এখানে এসে সে নিজের বাড়িকে ভুলে ছিল। এখানে এসে সে নিজের ঘরকেই ফিরে পেয়েছিল। এমন আদর, এমন যত্ন, এমন সেবা, এমন স্নেহ সে আর কোথাও পায়নি।

ম্যাকসের কথাগুলি নীলাদ্রি তার মাকে অনুবাদ করে করে শোনাতে লাগল।

সরোজিনীর চোখদুটি ছলছল করে উঠল।

নীলাদ্রি বলল, 'মা তুমি কিছু বলো।'

সরোজিনী বললেন, 'আমি আর কী বলব বাবা। তুই ওকে বল আমি ওর জন্যে কিছুই করতে পারিনি। আমার কতটুকুই বা সাধ্য। ও যে ওর মার কাছে ফিরে যাচ্ছে, সেই আমার আনন্দ। ওকে বল, আমি ওর এখানকার মা হয়ে চোখের জল ফেলছি আর সেখানকার মা হয়ে ওর জন্যে দিন গুনছি।'

একথার উত্তরে ম্যাকস নিচু হয়ে সরোজিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। শ্রদ্ধা জানাবার এই ভারতীয় পদ্ধতি ম্যাকস এরই মধ্যে লক্ষ্য করেছিল।

নীলাদ্রির সঙ্গে ঠিকানা বিনিময়ের পর হঠাৎ তার খেয়াল হল শীলা এখানে নেই। কখন উঠে নিজের ঘরে চলে গেছে। ম্যাকস তার কাছে বিদায় নিতে গেল। এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শীলা জানলার শিক ধরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশের বাড়ির পুরোন প্রকাণ্ড এক দেওয়াল ছাড়া যদিও বাইরে আর কিছুই দেখবার নেই। ম্যাকস তার দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দোভাষী নীলাদ্রি আজ আর তার সঙ্গে গেল না।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একটু হেসে ম্যাকস মৃদু কোমল সুরে ডাকল: 'Now, Miss No No No!'

শীলা চমকে উঠে ফিরে তাকাল। ওর মুখে হাসি নেই। কিন্তু ম্যাকসের মুখে হাসি দেখে তার মনে হোলো কী নিষ্ঠুর, ওরা কী নিষ্ঠুর। জার্মান জাতটা এই সেদিনও ফ্যাসিস্ট ছিল। চিরকালের যোদ্ধার জাততো। নিষ্ঠুরতা হবেই।

ম্যাকস তেমনি হাসি মুখেই বলতে লাগল: Miss No No No, what will you say today? Please say something. I hope today you will say—yes. If not thrice, once at least.'

শীলা রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল। আজও ঠাট্টা। এখনও ঠাট্টা। সে না হয় ইংরেজী নাই বলতে পারে। কিন্তু ঠাট্টা বুঝবার শক্তিতো তার আছে। কী নিষ্ঠুর। কী নিষ্ঠুর।

ম্যাকস চুপ করে আরো কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

'Sheela :'

শীলা ফিরে দাঁড়াল। বিদেশীর কণ্ঠে ভিন্ন রকমের উচ্চারণে নিজের নাম এই প্রথম শুনতে পেল শীলা। কিন্তু এই আহ্বানে সে কোন সাড়া দিল না। শুধু দুটি সজল কালো চোখ আর দুটি নীল ছল ছল চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু বাদে ম্যাকস আবার বলল, 'Sheela : I—I—I can't express me in foreign language. It has become my foe. Please allow me my mother-tongue.'

তারপর ম্যাকস তার নিজের জার্মান ভাষায় একটানা বলে যেতে লাগল। সে কি গদ্য না ওদের ভাষার কবিতা—শীলা বুঝতে পারল না। সে কি ওর নিজের কথা না কি কোন মহাকবির কাব্যের আবৃত্তি—শীলা বুঝতে পারল না। সে কি সাধারণ সৌজন্য নাকি তীব্রতর অন্তর্ভেদী, আগুনের মত, বিদ্যুতের মত প্রণয় ভাষণ—শীলা বুঝতে পারল না।

শীলার মনে হল, অনেক দিন বাদে অনেক চেষ্টা যত্নের পর যদি জার্মান ভাষা সে কোনদিন শিখতেও পারে, তাহলেও কি একবার মাত্র শোনা এই অপূর্ব মধুর শব্দগুলি সে ফের খুঁজে বার করতে পারবে? পারবে না, পারবে না, পারবে না। দুর্বোধ্য ভাষার আড়ালে যে প্রেম-সম্ভাষণ আজ রচিত হল, বিস্মৃতির গভীর অতলে তা চিরকালের মত তলিয়ে থাকবে।

একটু বাদে ম্যাকস বেরিয়ে এল। করকম্পনের আর চেষ্টা করল না। সে ওকে বাক্য দিয়ে ছুঁয়েছে, কাব্য দিয়ে ছুঁয়েছে, অন্তর দিয়ে ছুঁয়েছে। হাত দিয়ে ছোঁয়ার তার আর দরকার নেই।

দোরের সামনে ট্যাক্সি এসে হর্ন দিতে লাগল। শীলাকে ডাকতে এসে সরোজিনী থমকে দাঁড়ালেন। মেয়ে তার বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়েছে। আর সেই প্রথম দিনের মত তার সর্বাঙ্গ দমকে দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এ কম্পন যে কিসের, তা তিনি আর পরখ করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

ম্যাকসকে হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলাদ্রি তার নিজের ঘরে গিয়ে সেতার নিয়ে বসল।

সরোজিনী এসে তার কাছে দাঁড়ালেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'মেয়েতো উঠলও না, খেলও না। সেইভাবেই পড়ে আছে।'

নীলাদ্রি কোন কথা না বলে স্মিতমুখে সেতারে আঙুল রাখল।

সরোজিনী ভ্রু কুঁচকে উদ্বেগের সুরে বলতে লাগলেন, 'তুমি হাসছ। কিন্তু তুমিই বাপু সব নষ্টের গোড়া। তুমিই শুরু থেকে ঠাট্টা করে করে এই কাণ্ড বাধিয়েছ। এখন এই মেয়ে নিয়ে আমি কী করি।'

নীলাদ্রি মার দিকে তার প্রশান্ত দুটি চোখ মেলে ধরল। তারপর মৃদু, স্নিগ্ধ মধুর আশ্বাসের সুরে বলল, 'কিছু ভেব না মা। দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জীবনে এর চেয়েও কত বড় বড় কথাতো আমরা ভুলি।'

গোপনে নিঃশ্বাস চেপে মনে মনে বলল, 'জীবনে কত বড় বড় ব্যথাও তো আমাদের ভুলে থাকতে হয়।'

সরোজিনী আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দরজার পাট দুখানি নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিয়ে এলেন আসার সময়।

একটু বাদে ফের ধ্বনির তরঙ্গ উঠল। ও-ঘরের একটি হৃদয়যন্ত্রের তালে তালে এঘরের একটি তার-যন্ত্র সারা বাড়ির আকাশে বাতাসে গৌড়মল্লারে সুরটমল্লারে এক অন্তহীন কূলহীন বিষাদসিন্ধুর ঢেউ সারা রাত ধরে ছড়িয়ে দিতে লাগল।

অসবর্ণ বিবাহ

শ্রীকালিদাস রায়

মহেশবাবু — (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) তাহলে রমু, তুই চেষ্টার ত্রুটি করিসনি, বলছিস। সতীশও অনেক চেষ্টা করল। কিছুতেই তোরা পরেশের মতি ফেরাতে পারলি না। রেজেস্টারি করেই বিয়ে করছে! তিন দিন থেকে তার দেখা নেই। কোথায় আছে? বাড়ির একমাত্র ছেলে যে রে!

রমেশ—নাঃ দাদা, অনেক বোঝালাম তার আফিসে গিয়ে। বললাম,—আমাদের এত বড় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশ—আমাদের পিতামহ দশখানা গাঁয়ের সমাজপতি ছিলেন। দেশের বাড়িতে কৌলিক দেবতা লক্ষ্মী-জনার্দনের নিত্য সেবা, দোল, রাস, ঝুলন ইত্যাদি পার্বণে দশখানা গ্রামের লোক উৎসবে যোগ দেয়। চারদিকে আমরা নিষ্ঠাবান আত্মীয়-পরিবারে বেষ্টিত। বললাম,—তুই যদি একটা অ-কুলীন পাঁটিবেচা গরিব বামুনের বা একটা বর্ণের বামুনের মেয়েকেও বিয়ে করতিস—তা হলেও হ'তো,' একেবারে বেজাতের মেয়েকে বিয়ে করবি? সে কোন উত্তরই দিল না। মতিচ্ছন্ন হলে—

মহেশ—তাতেই বা কি হতো? আমি তাকে লেখাপড়া শেখালাম, মানুষ করলাম, তাকে এম-এস-সি পর্যন্ত পড়াতে কত ব্যয় করলাম! আমি বাপ, একটা হেঁজী-পেঁজী বাপ নয়। কত আশা ক'রে আছি—একটা সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী কনে নিজে পছন্দ ক'রে বিয়ে দিয়ে আনব, সাত দিন ধরে উৎসব করব। হাইকোর্টের জজদের নিমন্ত্রণ ক'রে আনতাম। আমার মত না নিয়ে, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সাধ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষার একেবারে তোয়াক্কা না রেখে সে নিজে একটা কোথাকার এক হা-ঘরের মেয়েকে বিয়ে করবে। এতে আমার মান-মর্যাদা, সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি সব যে একেবারে রসাতলে গেল রে! আমি এখন হাইকোর্টে আর সমাজে মুখ দেখাই কেমন করে? গালে-মুখে চড়িয়ে মরতে ইচ্ছা করছে!

রমেশ—মোহ, দাদা মোহ,—একেবারে Infatuation, Temporary Insanity বললেই হয়।

মহেশ—থাম, থাম, এখন মোহ-মোহ করছিস! তুই-ই তো যত নষ্টের মূল! যত বাজে ছেলে-ক্ষেপানো গল্প আর পদ্য লিখিস্—আর তাতে কেবল প্রেম—প্রেম—প্রেম, স্বর্গীয় প্রেম, তার জন্য জীবনও উৎসর্গ করা যায়, তার কাছে ইহ-সংসারের সবই তুচ্ছ। এই সব লিখে আসছিস।—ছোটবেলা থেকে সেই সব পড়ে পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়েছে। তার উপর ভাইপোকে আদর করে ঘন ঘন সিনেমা দেখানোর আর

সাহিত্যিক গুণ্ডাদের আড্ডায় নিয়ে যাওয়ার ফলভোগ কর এখন।

রমেশ—দাদা, আমার গল্পে বেজাতের সঙ্গে প্রেমের কথা একটাও লিখিনি—এমন প্রেমের কথা লিখেছি—যাতে গোত্রের পর্যন্ত তফাত রেখেছি। আর একটাও, চাটুয্যের সঙ্গে চাটুয্যের তো নয়ই, চাটুয্যের সঙ্গে বাগচি বা সান্যালের প্রেমও দেখাইনি। আর শেষ পর্যন্ত সব পবিত্র শাস্ত্রসম্মত বিয়ে দিয়ে উপন্যাস শেষ করেছি। কোষ্ঠীর পর্যন্ত—

মহেশ—খুব বাহাদুর! ওরে স্টুপিড, কিন্তু প্রেমের নামে অর্থাৎ সাময়িক মোহ নিয়ে যদি বাড়াবাড়ি করিস—তবে যেসব ছেলে ঐসব রাবিশ পড়বে, তাদের জাত-বেজাত আর জ্ঞান থাকে? এ তোর সেই রকম কথা হলো, মদ খাই, কিন্তু মেজার গ্ল্যাসে মেপে, মাত্রা ঠিক রেখে,—আরে মাত্রা ছাড়াতে কতক্ষণ?'

রমেশ—আমার লেখাই তো শুধু সে পড়েনি দাদা, সব গল্প-নভেলই পড়েছে, সেসবের মধ্যে কত রকম দূষিত অবৈধ প্রেমের কথা আছে—তাতো তুমি জান না, দাদা। আমি আর কতটুকু দায়ী? গোটা বাংলা-সাহিত্যই এজন্য দায়ী, যুগটাই দায়ী, যুগধর্ম দায়ী, প্রগতিবাদ দায়ী।

মহেশ—থাম, প্রগতিবাদ, ভাঙনবাদ জিন্দাবাদ—যত বাদের বাঁদর তোরা। স্বজাতের মেয়ের সঙ্গেই হোক, আর বেজাতের মেয়ের সঙ্গেই হোক, প্রেম কথাটা শুনলেই আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে। মানুষের একটা দুর্বলতাকে পরম-ধর্ম বানিয়ে তোলা কত বড় অকল্যাণ, তা তোরা বুঝবি না। ইন্দ্রিয়লালসাকে যারা প্রেম ব'লে নির্বোধ পাঠকদের ভোলায়, তাদের জেল হওয়া উচিত। আইন করে সাহিত্যের নামে এই অপচার বন্ধ করা উচিত। আমি আসছে বার এম এল এ'র জন্য দাঁড়াব ভাবছি।

রমেশ—দাদা, দাঁড়াও যদি, আমাদের গ্রাম থেকে দাঁড়িয়ো। এখান থেকে দাঁড়ালে হতে পারবে না। কারণ—

মহেশ—থাম, ওসব বাজে কথা রাখ।

রমেশ—পরেশটা যদি একটা গরিব ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে ভাব করে আমাদের তার পছন্দের কথা বলত, তাহলে আমরা বিয়ে দিয়ে আনতাম, কোন আপত্তি করতাম না। গোল করল—

মহেশ—বেশ বললি, তা হলেই হয়ে গেল? অমলার বিয়েতে আমার কত খরচ পড়েছে তোর মনে আছে? তুই-ই তো সব হাতে করে খরচ করেছিস্, বল্—

রমেশ—এগারো হাজার সাত শো বারো টাকা দশ আনা।

মহেশ—আর কোথাকার কে পাকিস্তানের একটা অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল জাদুকর বিনা পয়সায় আমার সোনার চাঁদ ছেলেকে ভুলিয়ে দখল করে নিলে? এ যে চিলের মতো হাতের খাবার ছোঁ মেরে নেওয়া। জানিস্, আমি হাইকোর্টে কেস করতে পারি।

রমেশ—এক উপায় আছে। বৌদিদি যদি

এক ডলা আফিম হাতে করে বলেন,—পরেশ, তুই এই মতলব ছাড়, নয়ত এই আফিম ডলা গিলে ফেলব—তা হলে—তা লক্ষ্মীছাড়াকে যে বাড়িতেই তো পাওয়া যাচ্ছে না। এতে কিন্তু ফল হয়েছিল—তুষার চৌধুরীর বেলায়। মা বেঁচে থাকতে বিয়ে করতে পারেনি।

মহেশ—তবু সে শেষ পর্যন্ত তার জেদ বজায় রেখেছিল। তোর গুণধর ভাইপো বলবে—মা তুমি মরবে মরো, একদিন তো মরতেই হবে। স্বাধীন প্রেম জিন্দাবাদ। থাক—

অমল—বাবা, তুমিত দেখনি, তাও, যদি মেয়েটা দেখতে ভালো হ'ত। একেবারে কালো না হোক ফরসা তো নয়। লম্বা, রোগা, মাথায় বেশি চুল নেই, নাকটাও খুব টিকলো নয়। গড়নটা যেন কাঠ-কাঠ। দেখেছি, এবাড়িতে দু'একবার দাদার সঙ্গে এসেছিল, দাদার চেয়ে বয়সও হয়ত বেশি।

মহেশ—অদৃষ্টে তার সুশ্রী স্ত্রী নেই তার আর কি হবে? এরমধ্যে জাদুমন্ত্রের ক্রিয়া আছে। কত সুন্দরী মেয়ে দেখলাম, কতজন দশ হাজার টাকা পর্যন্ত নগদ দিতে রাজি ছিল। দীনুবাবু তো একটা মোটর পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল। এমন বিয়ে দিতে পারতাম, যাতে এ-বাড়ির চেহারা ফিরে যেত। কাপড়-চোপড়, আসবাব-পত্রে ভ'রে যেত। একশো ভরি সোনার গহনা বাড়িতে আসতে পারত। অমলার বিয়েতে দেনা যা হয়েছে, তা শোধ দিতে পারতাম—তেতালায় ওর জন্যে একটা নতুন ঘরই তৈরি করাতে পারতাম। বিয়ে দিয়ে বিলাত পাঠাতে পারতাম। কত-কালকার প্ল্যান ভেস্তে দিলে, সব আশায় ছাই পড়ল। হ্যাঁরে রমেশ, বিয়ে ক'রে কোন্ চুলোয় যাবে? কোথা থাকবে? সেটা ভেবেছিস? আমার যে একমাত্র ছেলে রে!

রমেশ—সেটা তারই ভাববার কথা! দু-চার দিন শ্বশুরবাড়িতে কিংবা হোটেলে থাকবে বোধহয়; তারপরে একটা ছোট বাসা দেখে নেবে। ওর হবু শ্বশুরের তো মাত্র দুটো ঘর নিয়ে অতিকষ্টে থাকে—সেখানে দু-চার দিনও থাকা চলবে না।

মহেশ—বাসা যে করবে—নিজের বাড়ি থাকতে বাড়ি ভাড়া করবে? ওর চলবে কি করে? মাইনে তো পায় তিনশো টাকা। বল্—পেরেম সব ক্ষতিপূরণ করবে। আমি কিন্তু একটি পয়সাও দেব না। তুই যে গোপনে গোপনে টাকা দিয়ে আসবি, তা হবে না। তাহলে তোকে ত্যাজ্য-ভাই করব। মনে রাখিস—আমি মহেশ চাটুয্যে। আমি ছেলে-পাগলা জগদ্ মুখুয্যে নই।

রমেশ—তার যেরূপ তেজ দাদা, তোমার সাহায্য নিতে সে আসবে না। বৌটা তো অনার্সে বি-এ পাশ করেছে। বি-টি পড়ছে—সে-ও কোন স্কুলে চাকরি করবে। দুজনার আয়ে বেশ চলে যাবে।

পরেশের মা—ও-মা, সেকি কথা? ঘরের বৌ চাকরি করবে? আমাদের যে মাথা-কাটা যাবে। ওদের না-হয় চলে গেল, বাপ্পা তাকে ২৫ বছর ধরে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করলে তাদের প্রতি, ওর ভাই-বোনের প্রতি কোন কর্তব্য নেই?

রমেশ—তা হলে বৌদিদি ওকে বাড়িতেই আনতে হয়। আনলে এ-যুগে এমন কি...

মহেশ—কি বললি হতভাগা?

পরেশের মা—একে তো বেজাতের মেয়ে, তাতে বি-এ পাশ-করা, নিশ্চয়ই খুব দেমাক, মেমসাহেবী চালচলন, লজ্জা-সরম নেই, হয়ত আমাদের সাক্ষাতে পরেশকে নাম ধরে ডাকবে। সংসারের কাজকর্মে সাহায্য করা দূরে থাক—দু বেলা আমাকে রেঁধে-বেড়ে হয়ত তার শোবার ঘরের টেবিলে খাবার দিয়ে আসতে হবে—আমি কি তার দাসী হয়ে থাকব? কি ঘেন্না, মাগো! গাঁই-গোত্র, বংশ-কুল মেলানো নেই। কোষ্ঠী মেলানো নেই—বিয়ের দিনক্ষণ দেখা নেই, পুরুত নেই, মন্তর নেই, স্ত্রী-আচার নেই, বরযাত্রী নেই, যাগযজ্ঞি নেই। এ-বিয়ে বিয়েই নয়। কি করে তাদের এ-বাড়িতে আনবে ঠাকুরপো? এ-পরিবার যে একেবারে মেলেচ্ছ পরিবার হয়ে যাবে। বাড়ীর কোন মেয়ের বিয়েই হবে না। আমরা যে একঘরে হয়ে থাকব।

মহেশ—ক্ষেপেছ তুমি? বাড়িতে তাদের আনবে? তোমাকেই আমার ভয় ছিল। তাকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম। তুমি আরো শক্ত হও। অমন অবাধ্য অনাচারী অ-হিন্দু ছেলের মুখদর্শন করব না। মনে করব ছেলে আমার মরে গিয়েছে।

পরেশের মা—ষাট, ষাট, ওসব বলতে নেই। যেখানেই থাক, বাছা আমার বেঁচে-বর্তে সুখে থাকুক (অশ্রুপাত)। আমাদের কাজ আমরা করেছি—তার যদি কর্তব্যজ্ঞান না থাকে, তবে কি করা যাবে? সবই অদৃষ্ট! নইলে অমন চার-পাঁচটা পাশ-করা সোনার চাঁদ ছেলের এমন দুর্মতি হবে কেন? কোনদিন মাথা উঁচু করে কথা বলেনি, মাইনের টাকা সবটাই এনে হাতে দিয়েছে—আমার কাছে প্রতিদিন হাত-

খরচ চেয়ে নিয়েছে। সে-ছেলে যদি এমন হয়, তবে অদৃষ্ট ছাড়া আর কি?

রমেশ—পরেশ যদি বৌ নিয়ে এ-বাড়িতেই এসে পড়ে—তখন কি হবে?

মহেশ—(টেবিলে চাপড় মেরে) তাহলে, তাহলে জুতো মেরে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে—(এমন সময় বাড়ির দুয়ারে একখানা ট্যাক্সি এসে লাগল—তাতে পরেশ ও তার নববধূ)।

মহেশ—(ব্যস্ত হয়ে উঠে) রমেশ, যা-যা, ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দে। (উচ্চকণ্ঠে) ভজুয়া, ভজুয়া—সুটকেশ ট্রাঙ্ক নামিয়ে নে।

রমেশ—অমলা, শাঁখ বাজা, শাঁখ বাজা। বৌদিদি, বৌমাকে নামিয়ে নাও। ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরপ্রণাম করাও। অমলা, তোর খুড়ীকে ডাক, জলের ঝারি নিয়ে আসুক।

পরেশ—(বধূকে) ঊর্মি, মা বাবা কাকা খুড়ীমাকে প্রণাম করো। (চোখে জল)

পরেশের মা-বাপের চোখে জল। মা-বাপের পায়ের তলে প্রণত পরেশের চোখের জলে মা-বাপের পা ভিজে গেল। অমলা ঊর্মিলাকে বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে শাঁখ বাজাতে বাজাতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল।

(কয়েক ঘণ্টা পরে সন্ধ্যায়)

অমলা—বাবা, বেশ বৌ হয়েছে—আগে যা দেখেছিলাম, তার চেয়ে ঢের ভালো। রোগা নয়, দোহারা চেহারা। ঝুঁটি খুলে দেখলাম, মাথায় চুলও খুব, হাসিটি কি মিষ্টি। দাঁতগুলো মুক্তোর মতো চোখ দুটো বোতের কলার মতো, মুখশ্রী তো বরাবরই ভালো, রংটা আরো একটু উজ্জ্বল হয়েছে। বৌদি দাদার চেয়ে চার বছরের ছোট। কত আস্তে আস্তে কথা বলে। আমার খোকাটাকে এসেই সেই যে কোলে তুলে নিয়েছে—এখনও ছাড়েনি, খোকাও আর কোল ছেড়ে আসছে না। বড় শান্ত, ধীর, ভদ্র। দেশে অবস্থা খুবই ভালো ছিল। বৌদিদির বাবা প্রোফেসর ছিলেন—এখন রিটায়ার করেছেন।

পরেশের মা—ওগো, বৌমাটি বেশ লক্ষ্মী মেয়ে, এত যে বিদ্যে একটুও দেমাক নেই, অভিমান নেই, আহা যেন কত অপরাধিনী, মুখ তুলে চাইতে পারছে না। বিয়ের কনের মতই খালি পায়েই এসেছে। আমাকে কি বললে জান—"আমার মা নেই, পাঁচ বছর বয়সে মাকে হারিয়েছি, এতদিনে আবার আমি মা পেলাম। আমাকে আপনার দাসী করে পায়ের তলে রাখুন," বলে কাঁদতে লাগল।

মহেশ—হুঁ, রমেশ, একটা প্রীতি-সম্মেলন করতে হয়। রবিবারেই কর। বৌভাত নাম দিয়ে কাজ নেই—আত্মীয়-বন্ধুদের বলতে হয়—আমার বার-লাইব্রেরির সকলকে বলতে হয়। যে আসে, সে আসবে, না আসে নাই আসবে। মহেশ চাটুয্যে কারো তোয়াক্কা রাখে না (টেবিলে চাপড় দিয়ে)।

রমেশ—সবাই আসবে, দাদা। যুগের হাওয়া বদল হয়েছে—এখন শিক্ষিত ভদ্র-সমাজকেই একজাত মনে করা হয়। তবে কাল কুশণ্ডিকাটা করাব। কুশণ্ডিকাই আসল বৈদিক বিবাহ কিনা। পুরুত? আমাদের আফিসের রাম ভটচাজ পৌরোহিত্য করবে। তাকে আগেই বলে রেখেছি।

মহেশ—পরেশকে একথা বলেছ?

রমেশ—হ্যাঁ, বলেছি। সে বললে—কাকা, তুমি যা বলবে তাই করব। ভালো কথা, বৌদিদি বলছিলেন, বেহাই একবারে ফাঁকি দেননি, গয়না অনেকগুলো দিয়েছেন। বৌমা তার মায়ের গয়নাগুলো সবই পেয়েছে কিনা!

মহেশ—ড্যাম ইয়োর গয়না। আমি কি গয়না দিতে পারি না? কালই স্যাক-রাকে ডাকবি। ছেলের বিয়ে দিয়ে পণযৌতুক নেওয়া, জবরদস্তি করে ওগুলো গয়না নেওয়া রীতিমত বার্বারাস! ক্রিমিন্যাল! আমাদের পেনাল কোডে, এর জন্য স্বতন্ত্র ধারা যোগ করে তাতে দণ্ডবিধান থাকা উচিত। উপযুক্ত শিক্ষিত ছেলে, বেঁচে থাকুক, ওর ক্রমে উন্নতি হবে, অনেক টাকা ঘরে আনতে পারবে। বেহাই-এর দেওয়া টাকা হয় ভিক্ষা, নয় ধার। নগদ টাকা বা প্রচুর যৌতুক ঘরে এলো না বলে মনে কোন ক্ষোভ রাখিস না, রমেশ! সুশিক্ষিতা ভদ্রকন্যা ঘরে এলো এটাকে কম লাভ মনে করিস না। জানিস তো 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'। ছোট বৌকে বলে দে, বৌমার কোন কষ্ট যেন না হয়—কেউ যেন ব্যঙ্গবিদ্রূপ না করে। জামাই সতীশকে ও পরেশের মামাদের ফোন করে দে। আর বৌমার কাছে নাম-ঠিকানা নিয়ে বেহাইকে আমন্ত্রণ করে আয়। বলে আয়—নেভার মাইণ্ড, চীয়ার আপ।

রমেশ—নাম-ঠিকানা সবই জানি, দাদা। নাম সুরপতি দাশগুপ্ত। ঋষিতুল্য মানুষ। আজ সকালেও গিয়েছিলাম কিনা।

মহেশ—আর বুঝলি, কেউ কিছু বললে বলবি—এখন ছেলেরা সব বিলাত যাচ্ছে, আর একটা করে অজ্ঞাতকুলশীলা মেম বিয়ে করে নিয়ে আসছে—দেশে থেকেই পণ্ডিত বা পণ্ডিতের মেয়েকে বিয়ে করছে। ছেলেপুলের মাকেও বিয়ে করছে, নিজের মামাতো পিসতুতো বোনকেই বিয়ে করছে, আমার ভাইপো ভদ্রঘরের একটা শিক্ষিতা সুশীলা মেয়েকে বিয়ে করেছে। বামুন বদ্যি কায়েত কোন তফাত আছে নাকি? একদিন হয়ত তফাত ছিল। মান্ধাতার আমলের নিয়মকানুন স্বাধীন ভারতে আর চলবে না। (পরেশের এক মামা—'চলবে না—চলবে না আমাদের দাবি মানতে হবে।' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকলো)।

রমেশ—এস বিনোদ, তোমাকে ফোন করব ভাবছিলাম।

বিনোদ—ফোন পেতে কি কারো বাকি আছে?

মহেশ—শোন বিনোদ তাই বলছিলাম রমেশকে, ও বড় মুষড়ে পড়েছে কিনা, বলছিলাম—পরেশ অপরাধটা কি করেছে? ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে—কদিন কে হাসবে? দশ বছর বাঁচলে ঘরে-ঘরে অনেক কিছু দেখে যাব। কে কদিন নিন্দা করবে?

বিনোদ—মুখরোচক খাদ্য খেতে খেতে রসনা যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর সে-খাদ্য চায় না, মুখরোচক নিন্দাবাদ করতে করতেও সকলের রসনাও ক্লান্ত হয়ে নীরব হয়ে পড়ে। নতুন একটাকে পেলেও পুরনোটাকে ছেড়ে দেয়।

মহেশ—হ্যাঁ, ও দুই দিনের মামলা।

বিনোদ—আমি বলি, আপন আপন ঘর সব সামলা। যাই, বৌমাকে আশীর্বাদ করে আসি। শুয়োরটা কোথা? সে বুঝি কুয়োর ভিতর লুকিয়েছে?

উপন্যাস

বিমল মিত্র

রায়বাহাদুর বললেন—আসল কথা হলো ফার্স্ট হতে হবে—তা সে সাঁতার কেটেই হোক, এভারেস্টের চূড়োয় উঠেই হোক, কিংবা নেচেই হোক। মোট কথা ফার্স্ট হওয়া চাই। তবেই আপনাকে লোকে পুজো করবে। এ এক বিচিত্র যুগে আমরা বাস করছি। সংসারে সবাই আমরা সাকসেস্ দিয়েই মানুষকে বিচার করি। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, সৎপথে থেকে জীবন কাটিয়ে গেল। জীবনে একটা মিথ্যে কথা বললে না, কারোর কোনও ক্ষতি করলে না, সারাজীবন সততা নিষ্ঠা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে গেল, এমন লোক আমি অসংখ্য দেখেছি। কিন্তু কে তাদের মনে রেখেছে? কেউ তাদের স্মৃতি[illegible] করা দূরে থাক, তাদের নামোচ্চারণ পর্যন্ত করতেও শুনিনি কাউকে। কারণ তাদের সাকসেস হয়নি। আবার চিরকাল জাল-জোচ্চুরি করে পরকে ঠকিয়ে মিথ্যে কথা বলে জীবনটা কাটিয়ে দিলে, অথচ দু'চারখানা পদ্য কি একখানা উপন্যাস লিখে একেবারে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল—এমন ঘটনাও দেখলাম! তাহলে বলুন তো দাঁড়ালো কী?
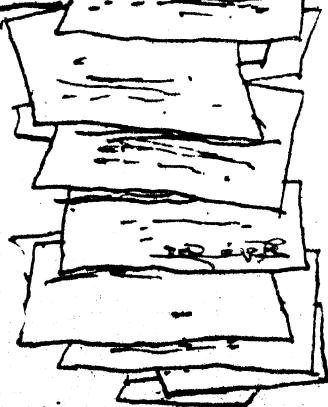
অঘোরবাবুও রিটায়ার্ড গেজেটেড অফিসার।

তিনি বললেন—এই আমার কথাই দেখুন না রায়বাহাদুর। সারা জীবন ঘুষ নিলুম না, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত প্রাণ দিয়ে অফিসের কাজ করলুম, তার ফল হলো কি? না, এই আড়াই শো টাকা পেনশন—আড়াই শো টাকায় আজকাল সংসার চলে? অথচ আমি মশাই ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট।

কালীকিংকরবাবু এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন।

বললেন—তবে শুনুন, আমি যাঁর বাড়িতে ভাড়া আছি সে-লোকটা মশাই একটা আকাট মুখ্যু, সারা জীবন কেবল গাঁজা-ভাং খেয়ে কাটিয়েছে, হঠাৎ হলো কি, রেস খেলে একদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে গেল—এখন বাড়ি করেছে গাড়ি করেছে, দিব্যি আরামে আছে—আর আমি বেটা...

রায়বাহাদুর হাতের কাছের একটা বুক-কেস থেকে একটা বই পেড়ে নিলেন হঠাৎ। তারপর পাতা উল্টে একটা জায়গায় এসে থামলেন। বললেন—এই দেখুন, এই লেখক কী বলছে শুনুন—

In history as in life it is success that counts Start a political upheaval and let yourself be caught, and you will hang as a traitor. But place yourself at the head of a rebellion, gain your point, and all future generations will worship you as the Father of their country.

বুঝলেন?

যাঁরা প্রতিদিন রায়বাহাদুরের বাড়িতে আড্ডা দিতে আসেন, তাঁরা সবাই কথাটা শুনলেন। প্রতিদিনই এমন আড্ডা হয়। বৃদ্ধ রিটায়ার্ড গেজেটেড অফিসারদের দল। সন্ধ্যাবেলা আসেন, আর ঘণ্টা দুয়েক আজে-বাজে আলোচনা করে চলে যান।

রায়বাহাদুর হাতের বইটা যথা-স্থানে রেখে দিয়ে বলতে লাগলেন—আপনারা কেউ সুশীতল ভট্টাচার্যির নাম শুনেছেন? 'সুখের সংসার' 'বিধিলিপি' 'মিলন-বিরহ' এই তিনটে উপন্যাসের লেখক, সুশীতল ভট্টাচার্য?

সুশীতল ভট্টাচার্যের নাম কেউই শোনেননি বললেন।

রায়বাহাদুর বললেন—তাঁর নাম যে আপনার শোনেননি তা আমি ভালো করেই জানি, তবু একবার জিজ্ঞেস করে দেখলাম! যা' হোক, সেই সুশীতল ভট্টাচার্য ছিল পোর্ট কমিশনার্সের জেনারেল সেকশানের বড়বাবু। সুশীতল আর আমি, আমরা দুজনেই এক-গ্রামের ছেলে, একই স্কুলে পড়েছি, একই সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছি, আই-এ পাশ করেছি। তারপর সে আমাকে পাশ কাটিয়ে বি-এ এম-এ সব কিছু পাশ করে অফিসে ঢুকেছে। সুশীতল বরাবরই ফার্স্ট স্ট্যাণ্ড করত—একেবারে গোড়া থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত! বরাবর স্কলারশিপ পেয়েছে। পড়ার খরচ কখনও তার নিজের পকেট থেকে দিতে হয়নি! আর আমি?

রায়বাহাদুর চাইলেন সকলের দিকে। বললেন—আর আমি ছিলাম স্কুলের মোস্ট অর্ডিনারী বয়। জীবনে কখনও ফার্স্ট তো হই-ই নি, এক-কথায় কোনও কিছুই হতে পারিনি। কিন্তু আজ আমিই হয়ে গেলাম রায়বাহাদুর। শুধু রায়বাহাদুরই নয়, এই গাড়ি বাড়ি এই যা-কিছু দেখছেন আপনারা সব করলাম আমার এই এক জীবনে! অথচ আই-এ পাশ করার পর আমি আর লেখা-পড়াই করিনি! আমি আই-এ পাশ করে সাত বছর বসে থাকার পর পোর্ট কমিশনার্সে ঢুকেছিলাম পঁচিশ টাকা মাইনেতে। আর সুশীতল এম-এ পাশ করে ঢুকেছিল সেই একই অফিসে। তার মাইনে ছিলো তখন চল্লিশ। আর আমার মাইনে হলো পঁচিশ টাকা। ছোট বেলায় আমরা যেতাম সুশীতলের কাছে অংক বুঝতে। বয়েসের অনুপাতে সুশীতলের মেধা ছিল বেশি। স্কুলের হেডমাস্টার মশাই সুশীতলকে আদর্শ ছাত্র বলে মনে করতেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলতেন—একদিন সুশীতল গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে। একদিন সুশীতল দেশের মুখও উজ্জ্বল করবে। সুশীতল ইংরিজী, বাংলা, অংক তিনটে সাবজেক্টেই ফার্স্ট হতো। এমন ছেলে আমাদের হরিনাভি হাই স্কুলের ইতিহাসে কেউ কখনও আগে দেখেনি।

তা এম-এ পাশ করার পর সুশীতল যখন পোর্ট কমিশনার্স অফিসে চাকরি নিলে, তখন সবাই বলেছিলেন—তা হোক, কিন্তু একদিন সুশীতল ওই অফিসের শীর্ষমণি হয়ে উঠবে—

সুশীতলের তখনও সেই বিনীত ব্যবহার সকলের সংগে!

মাস্টার মশাইদের সংগে রাস্তায় দেখা হলে সুশীতল সেই আগেকার মতই পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাতো। যদুবাবু কখনও জুতো পায়ে দিতেন না। সংস্কৃত পড়াতেন। এক-পা কাদা। তবু সেই কাদা পায়ে হাত দিতেও বাধতো না সুশীতলের।

যদুবাবু জিজ্ঞেস করতেন—কী সুশীতল, কী করছো আজকাল?

—আজ্ঞে পোর্ট কমিশনার্সের অফিসে চাকরি করছি।

—কত বেতন পাচ্ছো?

সুশীতল বলতো—চল্লিশ টাকা।

সেকালের চল্লিশ টাকা এখনকার মত নয়। তবু মাস্টার মশাইরা যেন খুশী হতেন না। বলতেন—তোমার উন্নতির রাস্তা খোলা আছে তো?

—আজ্ঞে তা আছে!

যদুবাবু জিজ্ঞেস করতেন—তেমন উন্নতি হলে কত বেতন হবে?

সুশীতল বলতো—তা তিন শো-ও হতে পারে, আবার হাজারও হতে পারে—

যদুবাবু তখন নিশ্চিন্ত হতেন।

বলতেন—হবে হবে, তোমার হবে, তোমার হাজার টাকা মাইনেই হবে—সায়েবদের আপিস তো, ও-বেটারা গুণের কদর জানে—

তা আমিও ঘটনাচক্রে সেই একই অফিসে চাকরি পেলুম। আমি আই-এ পাশ করার পর সাত বছর বসে ছিলুম। চাকরি পাইনি কোথাও। সব জায়গায় দরখাস্ত পাঠিয়েছি আর দু'দিন বাদে জবাব এসেছে—'নো ভেকেন্সি'।

শেষকালে একদিন সুশীতলের অফিসেই গিয়ে হাজির হলাম।

সুশীতল তখন মাইনে পায় কম কিন্তু প্রতিপত্তি খুব তার। আমি তাকে আমার দুঃখের কথা সব খুলে বললুম। আমার বাবার মৃত্যুর কথা বললাম। সুশীতল সব মন দিয়ে শুনলে। বললে—একখানা দরখাস্ত তুমি দাও আমার কাছে, আমি দেখি কী করতে পারি—

তার কথামত দরখাস্ত একখানা দিয়ে এলাম পরদিন।

সুশীতল আমাকে নিয়ে একেবারে বড়-সাহেবের ঘরে ঢুকে গেল। আমার সামনে আমার দুঃখের কথা সবিস্তারে বললে বড়-সাহেবকে। [illegible] সুশীতল গড়-গড় করে যেভাবে [illegible] সাহেবকে বলতে লাগলো তা শুনে আমিই
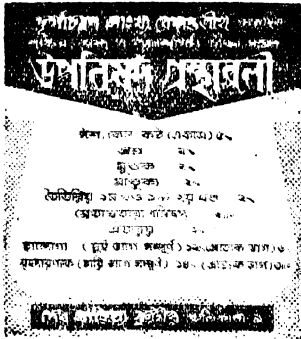
অবাক হয়ে গেলাম। সুশীতলকে আমি সত্যিই হিংসে করতাম বরাবর তার বিদ্যে-বুদ্ধির জন্যে। সেদিন তার ইংরিজী-বলা দেখে আরো হিংসে হলো! কবে আমি এমন করে সুশীতলের মত ইংরিজী বলতে পারবো। কবে আমি এমন করে সাহেবদের প্রিয়পাত্র হবো।

তা, বলতে গেলে, সুশীতলের জন্যেই আমার সেদিন চাকরিটা হলো বলা চলে। অর্থাৎ সে-ই এক রকম তাদের অফিসে ঢুকিয়ে দিলে। আসলে বড়-সাহেব ছিল উপলক্ষ্য মাত্র।

আমার অফিসে ঢোকার প্রথম দিনটি থেকেই সুশীতল নানা-রকম উপদেশ দিয়েছে। প্রথম দিন অফিসে যেতেই সুশীতল বললে—অফিসে এলে। এখন থেকে অন্যভাবে জীবন কাটাতে হবে তোমাকে। এ এক অন্য জগৎ, এখানে যতক্ষণ থাকবে, কাজের কথা ছাড়া আর কিছু ভাববে না। দরকার হলে রাত সাতটা আটটা পর্যন্ত কাজ করতেও যেন কখনও পেছপা হোয়ো না—বুঝলে ভাই—

—আর একটা কথা!

সুশীতল বললে—সাহেবরা অন্য দেশের লোক, তারা তোমার বংশ-পরিচয়ও জানে না, তারা বামুন-কায়স্থও বোঝে না, ওরা বোঝে শুধু কাজ, যদি সাহেবদের মন পেতে চাও তো কাজ দিয়ে তাদের খুশী করতে চেষ্টা করবে, তবেই উন্নতি হবে—

আমি সত্যিই সুশীতলের কাছে চির-কৃতজ্ঞ। সুশীতলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আমি কখনও কার্পণ্য করিনি সারা-জীবন। এই যে আজ এত বড় হয়েছি, এত সম্মান-প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, আর্থিক জগতে সাধারণ লোকে যা কামনা করে তার সব কিছু পেয়েছি, এর প্রথম সূত্রপাত করেছিল সেদিন সেই সুশীতল। সেই সুশীতল ভট্টাচার্য। ওই 'সুখের সংসার' 'বীথিলিপি' 'মিলন-বিরহ' বই-এর লেখক!

অঘোরবাবু বললেন—তিনি উপন্যাস লিখতেন আবার চাকরিও করতেন নাকি?

কালীকিংকরবাবু বললেন — অনেকে চাকরি করতে করতেই আবার লেখে শুনেছি, বঙ্কিম চাটুজ্জেও শুনেছি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-গিরি করতেন দিনের বেলায় আর রাত্রে নাকি বেশি রাত জেগে উপন্যাস লিখতেন—

রায়বাহাদুর বললেন—না, সে-কথা পরে বলছি—আমাদের সুশীতলের ব্যাপারটা ছিল একটু অন্যরকম!

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন রায়-বাহাদুর—সুশীতল তখন মাইনে পেত

চল্লিশ টাকা, আর আমি ঢুকলাম পঁচিশ টাকায়। আমি রোজ টিফিনের সময় সুশীতলের কাছে গিয়ে বসতাম। সুশীতলই আমাকে চা, খাওয়াতো। সুশীতল বেশি মাইনে পেত আমার চেয়ে। তাই আমাকে চায়ের দাম দিতে দিত না। চা খেতে খেতে নানা-রকম উপদেশ দিত আমাকে। বলতো, সাহেবরা অফিসে আসার আগেই অফিসে আসা ভাল। সকালবেলা অফিসের কাগজ-পত্র ফাইল যা কিছু, সব কিছু সাহেব আসবার আগে পড়ে রাখা উচিত। সুশীতল নিজেও তাই করতো। অফিসে যখন কেউ আসেনি, দরোয়ান সবে গেট খুলেছে, ঝাড়ুদার ঝাঁটও দেয়নি তখন, সেই সময়েই সুশীতল নিয়ম করে অফিসে যেত। গিয়ে অফিসের কাগজপত্র পড়ে দেখে নোট লিখে রাখতো। সাহেব জিজ্ঞেস করলে যেন অপ্রস্তুত না হতে হয়। তারপর একে একে বিকেলবেলা পাঁচটার পর যখন সবাই বাড়ি চলে যেত, তখনই সুশীতলের আসল কাজ আরম্ভ হতো! দেখা হলে আমাকেও সুশীতল সেই রকম করতে বলতো। আমি সারা-জীবন লেট-লতিফ লোক। ঘুম থেকে উঠতেই আমার বরাবর দেরি হতো! তারপর তাড়াহুড়ো করেও কখনও ঠিক সময়ে অফিসে যেতে পারতাম না। তিন দিন লেট হলে একদিনের ক্যাজুয়েল-লিভ কাটা যেত। -রকম ক্যাজুয়েল-লিভ কাটা যাওয়া আমার [illegible]মশাই হয়েছে। জীবনে কখনও কোনও [illegible]াজ ঠিক সময়ে করতে পারিনি। বিকেল বেলা পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে গেছি বরাবর!

সুশীতল এজন্যে আমাকে রোজ কথা শুনিয়েছে।

বলেছে—এ-রকম করে চাকরি করলে তোমার কিন্তু প্রমোশন হবে না ভাই, এই তোমায় আমি বলে রাখলুম—যদি সাহেবদের হাত করতে চাও তো, লেট-আওয়ার্স অফিসে থাকবে, সন্ধ্যে সাতটা-আটটা পর্যন্ত, যতক্ষণ সাহেবরা থাকে! আর এদিকে সাহেবরা আসবার আগে অফিসে ঢুকবে—

আমি সুশীতলের কথাগুলো মন দিয়ে শুনতুম। কথাগুলো কাজে লাগাবারও চেষ্টা করতুম, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঠিক পালন করতে পারতাম না।

বলতাম—সকালে ঘুম থেকে উঠতেই যে দেরি হয়ে যায় ভাই—

সুশীতল বলতো—কেন দেরি হয়ে যায়? এই আমার কথা ভাবো তো, আমি কী করে আসি! আর তাছাড়া তোমাকে তো আমার মত সকালবেলা ছেলে পড়াতে হয় না, বাজার করতে হয় না, তা সত্ত্বেও পারো না কেন?

সত্যি সত্যি সুশীতলের অধ্যবসায় দেখে অবাক হয়ে যেতাম। থাকতো মনসাতলার একটা ছোট্ট দু'কামরা ঘরে। তখন বিয়ে করেছে সুশীতল। একটা ছেলেও হয়েছে। সেই ঘরের ভাড়া দিত বারো টাকা। কিন্তু সে বড় জঘন্য ঘর। কিন্তু সেই ঘরেই সুশীতল বেশ নিশ্চিন্তে থাকতো। বলতো—মনসাতলায় থাকলে অফিসে হেঁটে যাওয়া যায় কিনা। পয়সা খরচ নেই। আর ভবানীপুরে থাকলে বাস-ট্রামেই অনেক খরচ পড়ে যাবে যে!

তা সেই কোন্ ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে রোজ সকালে রেস-কোর্সের দিকে গিয়ে মর্নিং-ওয়াক করতো সুশীতল। সেখান থেকে বাড়িতে এসে ছাত্র পড়াতে যেত। তারপর ছাত্রের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে একেবারে বাজারটা সেরে বাড়ি আসতো। আর তারপর আধঘণ্টা কি তিন কোয়ার্টারের মধ্যে ভাত খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে অফিসে গিয়ে পৌঁছুতো।

সুশীতল নিজের সকাল বেলার রুটিনটা বলে আমাকেও তার অনুসরণ করতে উপদেশ দিতো। বলতো—এ-রকম না-করলে কিন্তু ভাই তোমার চাকরি করাই উচিত নয়। আর চিরকাল তো পঁচিশ টাকায় পড়ে থাকলে চলবে না—চাকরিতে তো উন্নতি করতে হবে—

আমি বললাম—তা তো বটেই—

—তা হলে আর এ-রকম করো কেন? আমাকে দেখেও তো তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত!

তা সুশীতলের দেখাদেখি আমিও কয়েক-দিন ভোরে উঠে বেড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বেশিদিন নিয়ম মেনে চলা আমার ধাতে নেই। শেষকালে আবার আমার সেই আগেকার মত চলতে লাগলো। আবার বেলা আটটায় ঘুম থেকে ওঠা, আর দেরি করে অফিসে যাওয়া আর সাহেবের কাছে বকুনি খাওয়া।

সুশীতল শেষকালে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলে। একদিন বললে—না তোমার দ্বারা কিছু হবে না—

কিন্তু আশ্চর্য!

আশ্চর্য বলে আশ্চর্য! তিন বছর চাকরি করার পরেই একদিন যে প্রমোশন হয়ে গেল আমার। কেন এবং কেমন করে যে প্রমোশন হলো তা খুলে বলার দরকার নেই। সুশীতল ছিল জেনারেল সেক্শান আর আমি ছিলাম ট্রাফিক অফিসে।

দুপুর বেলা গিয়ে সুশীতলকে খবরটা দিলাম।

বললাম—ভাই, আমার প্রমোশন হয়েছে—

সুশীতল অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কি? কোন্ গ্রেড?

বললাম—সিনীয়র গ্রেড—

—কী ক[illegible] হলো?

বললাম—[illegible] তো জানি না, হঠাৎ আজকে এস্টাবলিশমেণ্ট সেকশান থেকে লিস্ট বেরিয়েছে—দেখলাম—

সুশীতল খানিকক্ষণ কিছু কথা বলতে পারলে না।

তারপর বললে—তুমি নিজের চোখে দেখেছ? না কারো মুখে শুনেছ?

বললাম—না, নিজের চোখে দেখলাম, আর আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেন ভূপেশ-বাবু—

সুশীতল অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো নিজের মনে মনে! সুশীতলই আমাকে অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছে, সুশীতলই আমার মুরুব্বি, সেই সুশীতলকেই আমি টপকে গেলাম, এটা যেন সুশীতলের ঠিক মনঃপুত হলো না। সুশীতল দশ বছর কাজ করে পঁয়তাল্লিশ টাকা পাচ্ছিল আর আমি তিন বছর কাজ করেই তার সমান হয়ে গেলাম, আমার মাইনেও তার সমান-সমান হয়ে গেল। এটা ঠিক সুবিচার হলো না যেন। তাছাড়া সুশীতল এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ, কাজের লোক, সকাল বেলা আসে আর বেশি রাত পর্যন্ত খাটে। আর আমি রোজই লেট, আমার কামাইও অনেক। আমি আই-এ পাশ, খাটিও কম।

আমার অবস্থাটা সঙ্গীন হলো। অপ্রত্যাশিত প্রমোশন পেয়ে কোথায় আমি
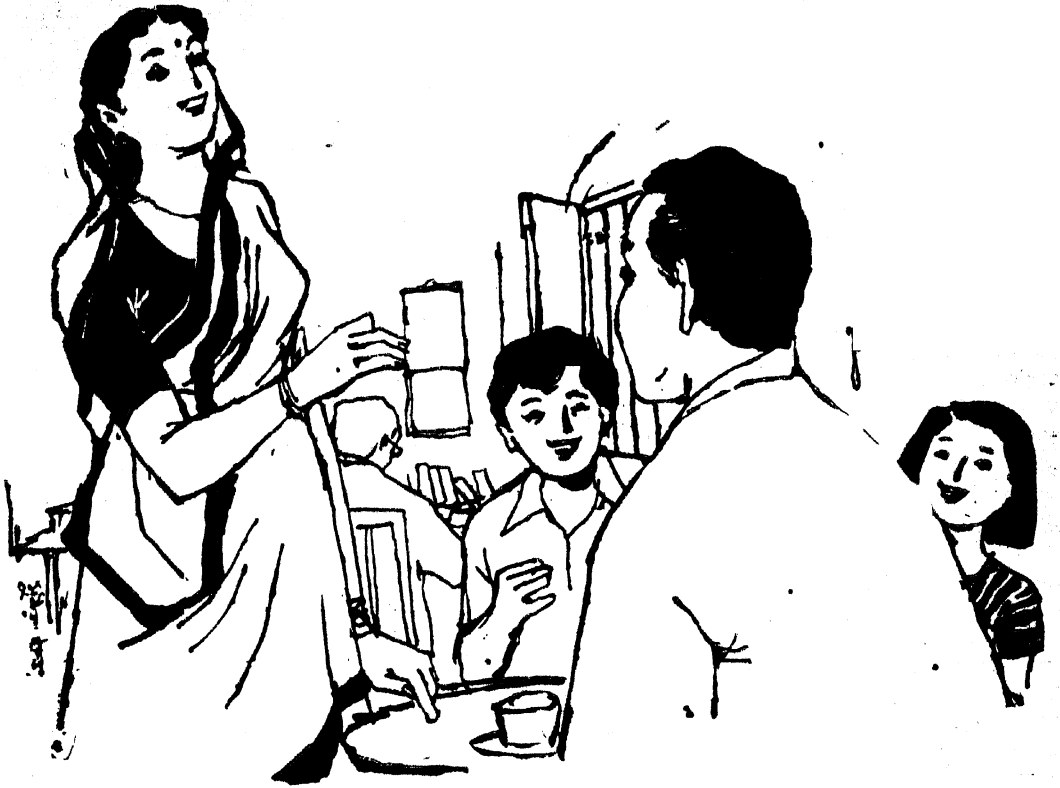
"তাহলে আমাদের মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন কবে ঠাকুরপো?"

একটু আনন্দ করবো, তাও করতে পারলাম না। সুশীতলের সামনে মুখটা আমার গম্ভীর করেই থাকতে হলো। যেন প্রমোশন হওয়ায় আমিই অপরাধী হয়ে পড়েছি।

সুশীতল খানিক ভেবে বললে—বড়দিনের সময় তুমি কি ফ্লেচার সাহেবকে ভেট দিয়েছিলে কিছু?

বললাম—না, আমি ভেট পাঠাতে যাবো কেন?

—তা হলে?

সুশীতল খুবই চিন্তিত হয়ে উঠলো। বললে—ফ্লেচার সাহেবই তো সেবার ফাইন করেছিল তোমায়?

বললাম—হ্যাঁ—

—তা হঠাৎ সেই ফ্লেচার সাহেবই আবার তোমায় সিনীয়ার গ্রেড দিলে যে?

বললাম—তাই তো দেখছি।

সুশীতল বললে—বোধহয় সাহেব সে-সব কথা ভুলে গেছে—কিন্তু...

তারপর আবার যেন একটা সমস্যায় পড়লো সুশীতল! বললে—কিন্তু এসটাবলিশমেন্ট সেকশন থেকেও কেউ সেইসব পয়েন্ট-আউট করেনি?

বললাম—হয়ত করেনি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো ভাই, গ্রেড পেয়ে আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি—

সুশীতল বললে—তুমি এসটাবলিশমেণ্ট সেকশনে কিছু ঘুষ-টুষ দিয়েছিলে নাকি?. নিদেন্ চা-রসগোল্লা-টোল্লা খাওয়ানো...

বললাম—কিচ্ছু করিনি, তুমি তো জানো আমাকে, ও-সব আমি করতে পারি? ও-সব কি আমার দ্বারা পোষায়?

শেষ পর্যন্ত ভেবে ভেবে কোনও কূল-কিনারা না পেয়ে সুশীতল হাল ছেড়ে দিলে!

কিন্তু আমারই হলো আসল মুশকিল! আগে যদিও বা দিনে একবার করে সুশীতলের সঙ্গে দেখা করতাম, তারপর থেকে ঘন-ঘন দেখা করতে লাগলাম। সময় পেলেই সুশীতলের সঙ্গে দেখা করতাম। পাছে সুশীতল না মনে করে যে সিনীয়র গ্রেড পেয়ে গিয়ে আমার অহঙ্কার হয়েছে। অফিসের ছুটির পর সুশীতলের সঙ্গে তার বাড়িতে যেতাম এক-একদিন। তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতাম। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতাম। সুশীতলের বাড়িতে গিয়ে চেয়ে চেয়ে চা খেতাম, মুড়ি খেতাম, পাঁপড়ভাজা খেতাম। আগে যদি বা একটু দূরত্ব ছিল, সিনীয়র পাবার পর ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়িয়ে দিলাম

রায়বাহাদুর বলতে লাগলেন—
আবার বিপদ হলো। একটা
কাটতে না কাটতে আর একটা বিপদ
গেল তিন বছরের মধ্যেই।

হঠাৎ আর একটা গ্রেড পেয়ে গেলাম
সুশীতলের মাইনে তখন ছাপ্পান্ন টা
আমি একেবারে লাফিয়ে সত্তর টাকায়
ঠেকলাম। সুশীতলকে গিয়ে খবরটা
সুশীতল একটু হাসলো শুধু। বল
সত্যি—খুব সুসংবাদ—

সন্ধ্যেবেলা সুশীতলের সঙ্গে
বাড়িতে গেলাম।

বৌদি বললেন—তাহলে আমাদের
খাওয়াচ্ছেন কবে ঠাকুরপো?

ছেলে-মেয়েরাও বললে—কাকাবাবু
দের একদিন খাইয়ে দিন তাহলে!

বৌদিকে বললাম—সুশীতলের
তো আমার চাকরি বৌদি, আ
খাওয়ানো তো আনন্দের ব্যাপার,

না-বললেও খাওয়াতাম—

পরদিন অফিসের পর বৌবাজারের দোকান থেকে সবচেয়ে সেরা মিষ্টি কিনে নিয়ে গেলাম সুশীতলের বাড়ি। প্রায় কুড়ি টাকার মিষ্টি কিনেছিলাম। বৌদি, ছেলে-মেয়েরা খুব খুশী। সুশীতল অফিস থেকে এসে সব দেখলে। কিন্তু কিছু মুখে দিলে না। মুখ যেন তার বেশ ভার-ভার।

বললাম—কী হলো সুশীতল, তুমি খাবে না? আমি আনন্দ করে নিয়ে এলুম—

সুশীতল বললে—আমার খেতে ভালো লাগছে না এখন, শরীরটা খারাপ, তোমরা খাও ভাই—

বলে পাশের ঘরের ভেতর গিয়ে কী করতে লাগলো। সেই সময়েই যে তার কী এত জরুরী কাজ পড়লো তা বুঝতে পারলাম না। আমার প্রমোশন সুশীতল যে ভালো-ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার কাছে! কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমার কীসের অপরাধ? আমার নিজের যদি হাত থাকতো তো আমি সুশীতলকেও প্রমোশন দিয়ে দিতাম! সত্যিই তো, সুশীতল তো আমার চেয়ে অযোগ্য নয়। বরং নানা বিষয়ে সে আমার চেয়ে বেশি কাজের, বেশি পরিশ্রমী, বেশি নিষ্ঠাবান, বেশি বিদ্বান, বেশি বুদ্ধিমান। সে বিষয়ে তো কারো কোনও সন্দেহই ছিল না। তবু যে জীবনে কেন এমন হয়, কেন এমন অসামঞ্জস্য ঘটে, তার কিনারা কে করতে পারে!

অঘোরবাবু বললেন—বড় মর্মান্তিক, সত্যি! তারপর? তারপর কী হলো?

কাশীবিশ্বেশ্বরবাবু বললেন—তা তাঁর তো মন খারাপ হওয়াটা অন্যায় নয় মশাই, তিনি আপনাকে চাকরি করে দিলেন, আর আপনি তাকে টপকে যাবেন, এটা তো মনে লাগবেই! তারপর?

রায়বাহাদুর বললেন—তারপর ব্যাপারটা আরো মর্মান্তিক হয়ে উঠলো! ফ্লেচার সাহেবের পর টাউনসেণ্ড সাহেব এলো। আমাকে ভারি পছন্দ তার। সব কাজেই ডাকে। আমিও তখন উৎসাহ পেয়ে মন দিয়ে কাজ করি। সকাল-সকাল অফিসে যাই, লেট-আওয়ার্স অফিসে থাকি! সাহেবের কথায় আমি উঠি বসি। সাহেবও আমার কথায় ওঠে বসে!

সেবার আমার প্রমোশন হলো। একেবারে দেড়শো টাকার প্রমোশন! সাহেব নোট দিলে যে আমার মত এফিসিয়েণ্ট হ্যাণ্ড নাকি অফিসে দুটি নেই।

সুশীতল কিন্তু তখন একশো তিরিশ টাকায় গিয়ে আটকে আছে। তখনও সেই মনসাতলায় দু' ঘরওয়ালা ভাড়া-বাড়িতে ছ'টা ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকে, আর হেঁটে হেঁটে অফিসে যাওয়া-আসা করে। অফিস থেকে বাড়িতে ফাইল নিয়ে গিয়ে রাত জেগে কাজ করে। কাজের পাহাড় তার সেকশানে। সেই আগেকার মতন ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠে, বেড়িয়ে আসে রেস-কোর্সের দিকে। তারপর ছাত্র পড়াতে যায়, ফিরে আসবার সময় খিদিরপুর বাজার থেকে মাছ-আলু-পটল কিনে আনে। কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে আটটার সময় অফিসে আসে, বাড়ি যায় রাত আটটায়-নটায়। তারপর রাত্রেও বাড়িতে আলো জেলে অফিসের কাজ করে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। চোখে সেই প্রতিভার দীপ্তি নেই আগেকার মত। মোটা চশমা উঠেছে চোখে। গায়ের পাঞ্জাবী আধ-ময়লায় রূপান্তরিত হয়েছে, পরনের ধুতিখানাও সাবান-কাচা। আর তেমন করে আমাকে উপদেশ দেবার সাহস নেই। দেখা হলে না-কথা বললে নয় তাই কথা বলে।

বলি—কেমন আছো সুশীতল?

সুশীতল বেশিক্ষণ সামনে দাঁড়ায় না। বলে—আমাদের আর থাকা!

বলেই চলে যায়। যেন আমার চোখের সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু তখনও আমি সুশীতলের বাড়িতে যাই মাঝে মাঝে। গিয়ে বৌদির কাছে চেয়ে-চেয়ে চা মুড়ি খাই। বৌদির সঙ্গে রান্না-ঘরের সামনে মোড়ায় বসে গল্প করি। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিই। সুশীতল অফিস থেকে ফিরে আমাকে দেখেই কাজের ছুতো করে কোথায় বেরিয়ে পড়ে। হয়ত উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। তারপর যখন বোঝে যে আমি চলে গেছি, তখন চুপি চুপি বাড়ি ঢোকে।

কিন্তু আমার বিপদের তখনও বুঝি অনেকখানি বাকি ছিল।

টাউনসেণ্ড চলে যাবার আগে কী হলো কে জানে, আমাকে একেবারে গেজেটেড র‍্যাংক দিয়ে গেল। আর বসালো একেবারে সুশীতলের মাথায়। অর্থাৎ আমিই তখন সুশীতলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কী বিপদ, আপনারা ভাবুন একবার। একেবারে ন'শো টাকার গ্রেড—

যেদিন প্রমোশনটা হলো, সেদিনই আমি গেলাম সুশীতলের সেকশানে।

খবরটা আগেই পেয়েছিল সে। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু মুখটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে। যেন দেখতেই পায়নি আর কি! আমি সেই আগেকার মতই পাশে গিয়ে বসলাম। আমাকে হঠাৎ দেখেই সুশীতল দাঁড়িয়ে উঠলো।

বললাম—একি, দাঁড়ালে কেন সুশীতল?

সুশীতল বললে—না, ঠিক আছে, বলুন—

হঠাৎ আমার হাসি এল। সুশীতল সেই আমাদের সুশীতল ভট্টাচার্য, যার কাছে আমরা ইংরিজী অঙ্ক বাংলা শিখেছি যার রচনা দেখে ধন্য ধন্য করেছেন হেড-মাস্টার, সেই সুশীতলের ব্যবহার দেখে আমার হাসিই এল।

নিজের চেম্বারে গিয়ে চাপরাশি দিয়ে সুশীতলকে ডেকে পাঠালাম।

সুশীতল এসে গম্ভীর হয়ে ঘরে ঢুকলো। বললে—আমাকে ডেকেছিলেন স্যার?

আমি তার হাতটা ধরলাম। বললাম—সুশীতল, তুমি এটা কী করছো? কাকে স্যার বলছো? তুমিই যে একদিন আমাকে এই অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছিলে! তুমি না ঢোকালে সেদিন আমি যে উপোষ করতাম! সে-সব কথা সব ভুলে গেছে?

সুশীতল স্থির পাথরের স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে রইল। আমার কথার কোনও উত্তর দিলে না।

তারপর খানিক পরে চলে যেতে বললাম।
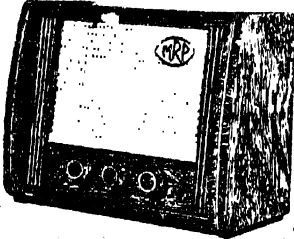
সুশীতল যেন এতক্ষণ আগুনের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। আমি চলে যেতে বলাতে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে!

অঘোরবাবু বললেন—তা কষ্ট তো হবারই কথা রায়বাহাদুর—

কালীকিঙ্করবাবু বললেন—সত্যি বড় প্যাথেটিক মশাই,—

রায়বাহাদুর বললেন—তা আমার অবস্থাটার কথাটা আপনারা একবার ভাবুন! আমার অবস্থাটা যে সুশীতলের চেয়েও প্যাথেটিক। আমি যেন তার মাথার ওপর অফিসার হয়ে বসে আরো মহা-অপরাধ করে ফেলেছি! আমার তখন বাড়িটা হয়ে গেছে। জমিটা অফিস থেকে লোন নিয়ে আগেই কিনেছিলাম। সেখানে বাড়িটা আরম্ভ করে দিয়েছি। যেদিন গৃহপ্রবেশ হলো সেদিন আত্মীয়-স্বজন সকলকে নেমন্তন্ন করে-ছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন হয়েছিল। সুশীতলকে বাড়িতে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছিলাম।

বলেছিলাম—সুশীতল, তোমার কিন্তু যাওয়া চাই-ই ভাই, না-গেলে আমি ভীষণ রাগ করবে—

বৌদিকেও বলে এসেছিলাম বিশেষ করে। বলেছিলাম—আপনার কিন্তু যাওয়া চাই-ই বৌদি, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাবেন!

বৌদি বলেছিলেন—আমার ছ'টা ছেলে-মেয়ে নিয়ে গেলে আপনাদের আনন্দ-টানন্দ সব পণ্ড হবে—

আমি বলেছিলাম—না, ছেলে-মেয়ে নিয়ে গেলে আনন্দ পণ্ড হবে, কে বললে? না নিয়ে গেলে সত্যিই আমি মনে করবো, আমি বড় হয়ে গিয়েছি বলে আপনাদের দুঃখ হয়েছে—

তা অনেক কষ্টে আমি সকলকে রাজি করিয়েছিলুম। আমার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমি তখন আরো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার আরো বন্ধু জুটেছিল। আত্মীয়-স্বজন কৃপা-প্রার্থী শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যাও তখন বেড়ে গিয়েছে। তখন আর বাসে-ট্রামে অফিস যাওয়া মানাতো না, আর স্বাস্থ্যেও কুলোত না। পদমর্যাদা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে যে অনিবার্য পরিবর্তন আসে আমারও তা এসেছিল। আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা, তাদের পোশাকে পরিচ্ছদে, আচারে হাব-ভাবে ঐশ্বর্যের চিহ্ন প্রকাশ হতো নিশ্চয়ই। তা আমার পক্ষে বন্ধ করার উপায় ছিল না। আমার বাড়িতে তখন বিলাসের বাহুল্য প্রকাশেই নজরে পড়তে আরম্ভ করেছে। আমার বাড়িতে শহরের বিখ্যাত লোকদের পদধূলি পড়ে। প্রতিদিন দু'একখানা সম্ভ্রান্ত গাড়ি আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। পাড়ায় সমাজে আমার প্রতিপত্তি তখন ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু তবু আমি সুশীতলের সঙ্গে আগেকার সম্পর্ক বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করতুম। আমি তখনও সময় পেলেই সুশীতলের বাড়ি যেতাম, গিয়ে বৌদির কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে চা, মুড়ি, পাঁপড়ভাজা খেতাম। বৌদি বিব্রত হয়ে পড়তেন একটু। আমি গিয়ে হাজির হলে কী খেতে দেবেন, কোথায় বসতে দেবেন তাই নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন। বৌদি ঠিক সেই আগেকার মতন আর ব্যবহার করতে পারতেন না আমার সঙ্গে। তাঁরও যেন কোথায় একটু সঙ্কোচ হতো তখন বুঝতে পারতাম। কিন্তু আমি গিয়ে সেই আগেকার মতই ফরসা ট্রাউজার্স পরে মেঝের ওপর বসে পড়তাম। কিন্তু কোথায় যেন একটা সঙ্কোচের বেড়া ছিল, একটা দ্বিধার পাঁচিল ছিল—তা আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

আমার ভবানীপুরের বাড়ির গৃহ-প্রবেশের দিন পরিচিত বন্ধুবান্ধব সকলকেই নেমন্তন্ন করেছিলাম। হরিনাভির হেড মাস্টার মশাই, সংস্কৃতের মাস্টার যদুবাবু, খুঁজে খুঁজে সকলকে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছিলাম। একদিন যারা আমার দুরবস্থার কথা জানতো তাদেরও বলেছিলাম। মনের মধ্যে হয়ত আমার প্রচ্ছন্ন একটা অহঙ্কার ছিল। আমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে সেটা বাইরে প্রকাশ করবার দুর্নিবার আকাঙ্খাকে হয়ত এই উপলক্ষ্যেই পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন আমি বিনীত করজোড়ে সকলকে অভ্যর্থনা করেছি ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচ সকলকে সমান মর্যাদা দিয়েছি।

হেড মাস্টার বললেন—তা তুমি যে বাবা, এত উন্নতি করবে, তা আমরা তখন কল্পনাও করতে পারিনি—

তাঁর ধারণা তিনি অকপটেই প্রকাশ করলেন। সত্যিই তো, আমি সেদিন ইংরেজী, অঙ্ক, বাংলা তিনটেতেই কাঁচা ছিলাম। অনেকবার অঙ্কতে পাশ-নম্বরও পাইনি। তাঁর কোনও দোষই নেই।

যদুবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বেতন কত এখন?

যদুবাবু সেই আগেকার মতই আছেন। তিনি তখনও বেতন দিয়েই মানুষের মূল্যায়ন করেন দেখলাম।

আমার উত্তর পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আর সুশীতল? সুশীতল কত বেতন পায়?

যদুবাবুর দোষ নেই। তিনি সেকালের মানুষ। কিন্তু সেকালেরই বা দোষ কী! একালে তো অর্থ-কৌলীন্য আরো বেড়ে গেছে! আরো কুটিল হয়ে উঠেছে, আরো

জটিল হয়েছে এ যুগ। সুশীতলের মাইনের অঙ্কটা শুনে তিনি প্রকাশ্যেই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন। বললেন—সুশীতলটা একেবারে অপদার্থ—

তা আমার কৃতিত্বে সবাই সুখী হয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন শেষ পর্যন্ত। সমস্ত দিন পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম। তবু সুশীতলের কথা আমি ভুলিনি। সুশীতল এল না। তার স্ত্রী পুত্র কন্যা কেউ-ই এল না। বুঝলাম, সুশীতলই তাদের আসতে দেয়নি।

আমি সেই রাত্রেই সুশীতলের জন্যে, সুশীতলের বাড়ির সকলের জন্যে খাবার পাঠিয়ে দিলাম। ভেবেছিলাম সে খাবার তারা ফেরত দেবে। আমার ড্রাইভার খাবারগুলো নিয়েই আবার ফিরে আসবে। কিন্তু না, ততখানি অভদ্রতা করবার প্রবৃত্তি তখনও তাদের হয়নি। তারা সে-খাবার সেদিন গ্রহণ করেছিল।

শুধু তাই-ই নয়। আমার বাগান থেকে যখনই তরি-তরকারী এসেছে, পুকুর থেকে মাছ এসেছে, আমি তাদের বাড়িতেও কিছু অংশ পাঠিয়ে দিয়েছি বরাবর। তখনও সেসব অস্বীকার করবার মত অভদ্রতা করেনি তারা। আমি সেজন্যে সুশীতলের ওপর খুশীই ছিলাম। কিন্তু সুশীতলের দুর্ভাগ্যকে দূর করবার ক্ষমতা আমার হাতের মধ্যে ছিল না। যখনই সুযোগ এসেছে আমি তার উন্নতির জন্যে রেকমেণ্ড করেছি, তার প্রমোশনের জন্যে চেষ্টাও করেছি বরাবর। কিন্তু প্রত্যেকবারই ওপর থেকে সে-নোট প্রত্যাখ্যান হয়ে ফিরে এসেছে। একটা-না-একটা খুঁত দেখিয়ে প্রত্যেকবারই তার কেস ফিরে এসেছে। এ-সব কথা সুশীতল জানতো না। আমি যে তার প্রমোশনের জন্যে এত চেষ্টা করে যাচ্ছি তা তাকে জানিয়ে আর কষ্ট দিতাম না।

এর পরেই আমি 'রায়সাহেব' হলাম।

আমি খুব যে ব্রিটিশের খয়ের-খাঁ ছিলাম তা নয় কিন্তু। টাউনসেণ্ড সাহেব ছিল আমার গুণগ্রাহী। সেই সাহেব আমাকে জানায়ওনি যে আমাকে 'রায়সাহেবি'র জন্যে রেকমেণ্ড করেছে। একেবারে হঠাৎ চমকে দেবার জন্যেই জানায়নি। খবরটা পেয়ে আনন্দ হলো নিশ্চয়ই, কিন্তু পুরোপুরি আনন্দটা যেন ভোগ করতে পারলুম না। খবরটা পেয়েই আমার প্রথমেই সুশীতলের কথা মনে পড়লো।

খবর নিয়ে জানলাম, সুশীতল সেদিন আসেনি অফিসে। বোধহয় খবরের কাগজেই খবরটা পড়েছিল সকাল-বেলা।

সেইজন্যেই বলছিলাম আপনাদের, যে আমার জীবনে একটার পর একটা বিপদ এসেছে। সারা জীবন ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সে উন্নতি কখনও মনে-প্রাণে পুরোমাত্রায় ভোগে আসেনি। আমি গাড়ি চড়েছি, বাড়ি করেছি, পাখার তলায় আরাম করে রাত কাটিয়েছি, বাড়িতে রেফ্রিজারেটার, রেডিও, টেলিফোন নিয়েছি—কিন্তু সমস্ত বিলাস সমস্ত আরামের মধ্যেও ওই সুশীতলের কথাটা আমার মনের মধ্যে কাঁটার মত খচ খচ করে কেবল বিঁধেছে। তাই আমি জীবনে এত সুখ পেয়েও কখনও তৃপ্তি পাইনি।

শেষকালে এক কাজ করলাম। সুশীতলের কোনও উপকার করতে না পেরে আমি সুশীতলের দুই ছেলের দু'টো চাকরি করে দিলাম। একটা মেয়েরও বিয়ে দিয়ে দিলাম।

এর পর অফিসে সুশীতলের সঙ্গে আর আমার দেখাও হতো না। আমি ইচ্ছে করেই তাকে আর আমার কামরায় ডেকে এনে তার অশান্তি বাড়াতাম না। সে তখনও জেনারেল সেকশনের বড়বাবু। তখনও মাইনে পায় একশো তিরিশ টাকা। আর টিউশানি থেকেও মাসে তিরিশ-চল্লিশ টাকা উপায় করে। তবে তখন দুই ছেলের চাকরি হওয়াতে তার স্ত্রীর কিছু উপকার হয়েছিল।

তার ছেলেদের চাকরি করে দেবার পর বৌদি শুধু একটা চিঠি লিখে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছিলেন।

রায়বাহাদুর বললেন—কিন্তু তখন কি জানি যে সেই সুশীতল শেষকালে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তার নিজের ওপরে সে এমন চরম প্রতিশোধ নেবে?

অঘোরবাবু বললেন—প্রতিশোধ কী রকম?

কালীকিংকরবাবু বললেন—বলেন কি রায়বাহাদুর, নিজের ওপর প্রতিশোধ?

রায়বাহাদুর বললেন—হ্যাঁ, চরম প্রতিশোধ!

অঘোরবাবু তখন আর স্থির থাকতে পারছেন না। সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—ছেলে-মেয়েদের খুন করলে নাকি?

রায়বাহাদুর বললেন—না—

কালীকিংকরবাবুও উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। বললেন—তবে কি আত্মহত্যা করলে নাকি? শিগগির বলুন!

—না, তাও না!

রায়বাহাদুর বললেন—শেষের দিকে আমি আর তেমন যেতে পারতাম না সুশীতলের বাড়ি আগেকার মতন। তার কারণ আমারও বয়েস বাড়ছিল, আগেকার মতন আর সে স্বাস্থ্যও ছিল না, পরিশ্রম করতে পারতাম না তেমন। আমার ছেলেকে তখন জার্মানীতে পাঠিয়েছি, সে তখনও স্টুডেণ্ট—তার খরচ পাঠাতে হয় মোটা। আমার দায়-দায়িত্ব বেড়েছিল আগেকার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু খবর রাখতাম সবই। খবর দিত সুশীতলের ছেলে। সে মাঝে-মাঝে আসতো আমার কাছে। তার কাছেই শুনতাম, সেই বুড়ো বয়েসে তখনও সুশীতল দু'টো টিউশানি করছে সকালে-বিকেলে। হেঁটে হেঁটে অফিসে আসছে। তখনও একটা ছেলের চাকরি হতে বাকি। আর দু'টো মেয়েরও তখন বিয়ে দিতে হবে!

কিন্তু আবার বিপদ ঘটলো আমার কপালে।

এবার আর এক ধাপ প্রমোশন পেলাম। 'রায়সাহেব' থেকে সেবার হলাম 'রায়বাহাদুর'।

এখন যেমন 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ'—এই সব হয়েছে, তখন ও-গুলোর নামই ছিল 'রায়সাহেব' 'রায়বাহাদুর'। তবে তখনকার দিনে একটা মহলে ওগুলোর একটু বেশি খাতির ছিল। অন্ততঃ সরকারী মহলে একটু বেশি প্রতিপত্তি! এখনকার রাজ্যপালদের দরবারে যেমন 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ'-দের খাতির, তখনকার দিনে লাটসাহেবদের দরবারে 'রায়সাহেব' 'রায়বাহাদুর'দের সামান্য একটু বেশি খাতির ছিল। কারণ এখনকার মত তখন ওগুলো যাকে তাকে দেওয়া হতো না। এখন যেমন 'সিনেমা-স্টার'রাও 'পদ্মশ্রী' পায়, তখন সে-সব ছিল না—তা যাই হোক, সেবার সুশীতলের জন্যে

একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো ভাবলাম।

নিজেই সুশীতলের কেসটা রেকমেণ্ড করে ওপরে নোট পাঠালাম। নিজেও গিয়ে একেবারে খোদ কর্তাকে বললাম। বললাম—সুশীতল ভট্টাচার্য এতদিনের সিনীয়র লোক, কোয়ালিফায়েড, তার প্রমোশন হওয়া অবশ্য দরকার।

সাহেব ছিল জাঁদরেল। গড-উইন সাহেব। বললে—কিন্তু রায়বাহাদুর, শুধু কোয়ালিফায়েড হলে তো চলবে না, শুধু সিনীয়র হলেও তো চলবে না, ভট্টাচার্যির যে এজিলিটি নেই!

ওই একটা কথা! এজিলিটি!

ইংরেজী-ভাষায় অনেক কথা আছে যার বাঙলা তর্জমা করা সম্ভব হয়ত। কিন্তু 'এজিলিটি' যে কী জিনিস তা এতদিন চাকরি করেও বুঝতে পারিনি। যাঁর কোনও খুঁত নেই, তাঁরও খুঁত বার করা সহজ। 'এজিলিটির' অভাব আছে বললেই হলো। কোনও প্রমাণের দরকার নেই।

গড্‌উইন সাহেবকে শেষ পর্যন্ত রাজি করিয়ে এনেছি কোনওরকমে, ঠিক এমন সময় সুশীতলই চাকরি ছেড়ে দিলে।

দরখাস্তখানা পেয়েই ডেকে পাঠালাম।

সুশীতল আসতেই বললাম—এ কী করছো সুশীতল?

সুশীতল কোনও উত্তর দিলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বললে—তোমার প্রমোশনের সব ব্যবস্থা বে করে ফেলেছি। গড-উইন সাহেবও রাজি হয়ে গেছে—। তুমি এখন রিজাইন দিলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে সুশীতল, তুমি করছো কী?

সুশীতল তবু কোনও জবাব দিলে না।

আবার বললাম—তোমার এখনও দু'টো মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি, একটা নাবালক ছেলে রয়েছে, তাদের কথা ভাবো। আর তাছাড়া এখনও পাঁচ বছর রয়েছে চাকরির, মোটা প্রভিডেণ্ট ফণ্ড পাবে—

সে-সব কোনও কথাতেই কান দিলে না সুশীতল, শুধু পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রিক্তপত্র   আলোকচিত্র ঃ শ্রীরমেন বাগচী

সেইদিনই অফিসের পর সুশীতলের বাড়ি গেলাম। বৌদিকে বুঝিয়ে বললাম সব। এখন রিটায়ার করলে মাত্র কুড়ি হাজার টাকা পাবে সুশীতল, আর কোনওরকমে পাঁচটা বছর চালিয়ে যেতে পারলে অন্ততঃ তিরিশ হাজার টাকা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে জমতো। এমন বোকামী কেন সে করছে কে জানে! কোনও বুদ্ধিমান লোক এমন বোকামি করে! বিশেষ করে যখন দু'টি মেয়ে রয়েছে বিয়ে দিতে, একটা নাবালক ছেলে।

কিন্তু কিছুতেই সুশীতল বুঝবে না।

সুশীতলের স্ত্রী ছেলে-মেয়ে সকলের সামনেই কথাগুলো বললাম। সুশীতল এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। বার বার কথাগুলো বলতে শেষ পর্যন্ত সুশীতল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর বহুদিন আর কোনও খবর রাখিনি। সুশীতল প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কুড়ি হাজার নিয়ে অফিসে আসা বন্ধ করলে। আমার তখনও পাঁচ বছর সার্ভিস ছিল। আমার চাকরি ছাড়লে চলবে না। আমার ছেলে জার্মানী থেকে না ফিরলে চাকরি ছাড়ার প্রশ্নই আসে না। আর তাছাড়া চাকরি ছাড়বোই বা কেন? আমার যা-কিছু সম্মান প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সবই তো অফিসের জন্যে। আর ওদিকে সুশীতল বোধহয় তখন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ভাঙছে আর খাচ্ছে। কিংবা সমস্ত দিনই টিউশানি করছে!

কিন্তু সে-যে আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে অমন করে নিজের ওপর প্রতিশোধ নেবার কল্পনা করেছে, তা কেমন করে কল্পনা করতে পারবো।

প্রথমে ব্যাপারটা জানতাম না। শুনলাম তার ছেলের কাছে।

একদিন ভোর বেলা তার ছেলে এল আমার বাড়িতে। সুশীতলের ছেলেকে এত ভোরে আসতে দেখে একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম—কী হলো তোমার অফিস নেই আজ?

ছেলে বললে—আছে কাকাবাবু, কিন্তু একবার আপনাকে এখুনি ডাকছে—

—বৌদি? কেন?

—আপনি মা'র কাছ থেকেই শুনবেন!

হঠাৎ কী হলো বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি গাড়ি করতে বললাম। তারপর সে গেলাম মনসাতলায়। গিয়ে দেখি বাড়ি প্রায় কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

বললাম—কী হলো বৌদি?

বৌদি চোখের জল মুছে বললেন—আপনাকে একটু কষ্ট দিলুম ঠাকুরপো, আপনি ও'কে একটু বুঝিয়ে বলুন। ও'র মাথায় কী সব ভূত চেপেছে— :

—সে কী ?

বৌদি বললেন—হ্যাঁ ঠাকুরপো, উনি আপিস থেকে কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছেন, উনি বলছেন, ও টাকা ও'র, উনি যেমনভাবে ইচ্ছে খরচ করবেন, ওতে কারো নাকি অধিকারই নেই—পরশু চেক ভাঙিয়ে এনেছেন—

বলতে বলতে বৌদি কেঁদেই ফেললেন। বললেন—কী করে যে এত বছর সংসার চালিয়েছি তা শুধু ভগবানই জানেন, এই দেখুন বিয়ে হবার পর থেকে শুধু দু'গাছা শাঁখা হাতে দিয়ে আছি, কখনও সোনার মুখ দেখিনি—আর আপনি ছিলেন তাই বড় মেয়েটার যা হোক একটা বিয়েও হয়েছে, আর ছেলে দু'টোরও চাকরি হয়েছে! এখনও দুটো মেয়ে রয়েছে বিয়ে দিতে, খোকা রয়েছে—ওদের কী হবে ঠাকুরপো? আমার নিজের কথা আমি ভাবিনে, কিন্তু ওদের কথা ভাবলে আমার প্রাণটা যে হু হু করে ওঠে—

—কই, সুশীতল কোথায় ?

বৌদি বললো—ওই পাশের ঘরে রয়েছেন। কালকেই দু' হাজার টাকা খরচ করে উড়িয়ে দিয়েছেন! টিউশানিগুলোও ছেড়ে দিয়েছেন—

—কেন ?

বৌদি বললেন—উনি বলছেন ও'র যেমন ভাবে খুশী টাকাগুলো খরচ করবেন, তাতে আমাদের কিছু বলবার নেই—

আমি পাশের ঘরে গেলাম। দেখি এলাহি কাণ্ড। চেয়ারে বসে একমনে কী লিখছে সুশীতল। বরাবর একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ সুশীতল। আমাকে দেখেও কিছু বললে না।

বললাম—শুনলাম, তুমি নাকি কী সব পাগলামি শুরু করেছ ?

সুশীতল মুখ তুলে চাইলে আমার দিকে। বড় করুণ বড় কঠোর সে চাউনি।

আমি পাশে গিয়ে বসলাম। বললাম—কী সব পাগলামি করছো ?

সুশীতল গম্ভীর গলায় বললে—তোমাকে কে ডেকে আনলে এখানে ?

বললাম—যেই ডাকুক, তুমি সব কী ছেলে-মানুষী করছ, শুনেছি—! কুড়ি হাজার টাকা পেয়ে তুমি নাকি নিজেই খরচ করবে বলেছ ? কুড়ি হাজার টাকা তুমি কীসে খরচ করবে ?

সুশীতল বললে—ও-টাকার ওপর কারোর কোনও অধিকার নেই। আমি সারাজীবন কষ্ট করে চাকরি করেছি, ছেলে-মেয়েদের খাইয়েছি, এখন আমি মুক্তি চাই। এতদিন আমি নিজের সুখ-সুবিধে নিজের স্বার্থ নিজের লাভ-লোকসান কিছু দেখিনি। সকালবেলা উঠে ছেলে পড়িয়েছি, বাজার করেছি, অফিসে গিয়েছি, তারপর সারাদিন অফিসের কাজ করেছি, রাতেও অফিসের ফাইল নিয়ে এসে কাজ করেছি। নিজের কথা একবার ভাববার সময়ও পাইনি—কিন্তু এবার ঠিক করেছি, আর কারো কথা, আর কোনও কথা ভাববো না, এবার শুধু নিজের কাজ করবো—

নিজের কাজ ?

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। নিজের কাজ মানে? এই স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবার সংসার এরা কি সুশীতলের নিজের নয়? এরা যদি তার নিজের না-হয় তো কার ?

বললাম—এরাও তো তোমার নিজের লোক সুশীতল! এদের কাজই তো তোমার নিজের কাজ ?

—না!

সুশীতলের মুখের চেহারাটা যেন আরো কর্কশ হয়ে উঠলো।

বললে—এতদিন ওদের সকলের কাজ করে করে আমি ফতুর হয়ে গেছি, এবার আমি কেবল আমার নিজের কাজ করবো। ছোটবেলা থেকে আমার বরাবর যা সাধ ছিল, সংসারের চাপে এতদিন তা করতে পারিনি, এবার ওরা বড় হয়ে গেছে, ওরা চাকরি করছে, মেয়ে দুটোর বিয়ে ওরাই দেবে। আমি এখন থেকে লিখবো—ছোটবেলা থেকে আমার লেখক হবার সাধ ছিল, এবার আমি লিখবো কেবল—

—কী লিখবে ?

—উপন্যাস!

আমি হাসবো কি কাঁদবো বুঝতে পারলাম না। ভালো করে জানবার জন্যে আবার জিজ্ঞেস করলাম—তুমি উপন্যাস লিখবে? সত্যি কথা বলছো ?

সুশীতল বললে—হ্যাঁ—

—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

সুশীতল বললে—হয়ত পাগলই বলবে তোমরা। কিন্তু জীবনে আমার একটা সাধ ছিল, সেটা না হয় মেটালামই। এতদিন সংসারের জন্যে নিজের সব কিছু তো জলাঞ্জলি দিয়েছি, এখন না-হয় পাগলামিই করলাম! আমার টাকা, নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা টাকা, সেই টাকা আমি খরচ করবো, পাগলামী করবো, যা খুশী করবো, তাতে কার কী বলবার আছে ?

তারপর একটু থেমে বললে—আমি আর কারোর কথাই শুনবো না—আমি একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করে দিয়েছি — নাম দিয়েছি 'সুখের সংসার'। এ-সংসার দুঃখের সংসার নয়, সুখের। যে সুখের সংসারের আশায় মানুষ বিয়ে করে, চাকরি করে, সংসার করে—সেই সুখের সংসার। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন লিখবো। আমার অনেক বলবার কথা মনে জমে উঠেছে। এতদিন যা বলতে পারিনি, এবার সব বলবো। বলা যায় না, হয়ত বাঙলা-সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবো আমি, কিংবা হয়ত ভেসে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো—কিন্তু এই পথ থেকে আমাকে আর কেউ টলাতে পারবে না—ওই দেখ, কাগজ কিনে এনেছি কাল দু' হাজার টাকার—

ঘরের কোণের দিকে স্তূপীকৃত কাগজ রয়েছে দেখলাম।

সুশীতল আমার দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে আবার নিজের মনে লিখতে লাগলো।

অঘোরবাবু মন দিয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ। বললেন—তারপর ?

কালীকিঙ্করবাবু বললেন—আমি অবিশ্যি বাঙলা উপন্যাসের খবর-টবর রাখিনে, তবে বঙ্কিম চাটুজ্জের নাম শুনেছি—শেষকালে সুশীতল ভট্টাচার্যের নাম হয়েছিল নাকি ?

রায়বাহাদুর বললে—নামটা বড় কথা নয়। সেই কথাই তো আপনাদের গোড়ায় বলছিলাম—আমরা মানুষকে বিচার করি কেবল সাক্সেস দিয়ে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সৎপথে থেকে জীবন কাটিয়ে গেল। জীবনে একটা মিথ্যে কথা বললে না, কারোর কোনও ক্ষতি করলে না,—এমন আরো অনেক লোক দেখেছি—কিন্তু কে তাদের মনে রেখেছে ? কারণ তাদের সাক্সেস্ হয়নি! সুশীতল তাই সেই পঞ্চাশ বছর বয়েসে, স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একলা অমানুষিক পরিশ্রম করে উপন্যাস লিখতে লাগলো। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই লিখতে বসে, দুপুরবেলা একটু থেমে নিয়ে আবার লেখে। লেখে রাত আটটা নটা পর্যন্ত। শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম

নেই। কোথাও পৃথিবীর কোনও কোণে তার জন্যে এতটুকু সহানুভূতিও নেই। হয় সে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, নয় তো ভেসে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুশীতলদের বাড়িতে যখনই গিয়েছি, দেখেছি, লিখছে সে। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যেয়, রাত্রে—সব সময়ে। একবার লিখছে, আর একবার প্রুফ দেখছে। আবার কখনও নিজের লেখাই কাটছে আপন মনে।

ছ'মাস পরে তার প্রথম বই বেরোল—'সুখের সংসার'।

আমি জীবনে কখনও উপন্যাস পড়িনি। বিশেষ করে বাঙলা উপন্যাস। বঙ্কিম চাটুজ্জের লেখা পড়েছিলাম ছোটবেলায়, কিন্তু কী পড়েছি তা আজ আর মনে নেই। তারপর শরৎ চট্টোপাধ্যায় বলে একজন লেখক ছিলেন শুনেছি, কিন্তু তার কোনও বই পড়িনি। 'সুখের সংসার' আমাকে একখানা দিয়েছিল সুশীতল। চারশো পাতার বই। আমি দশ পাতার বেশি পড়তে পারিনি। আর অন্য কারো মুখেও বইটার প্রশংসা শুনিনি।

একদিন যখন দেখা হলো জিজ্ঞেস করলাম—লোকে কেমন বলছে সুশীতল?

সুশীতল তখন আর একখানা বই লিখতে শুরু করেছে। বললে—এটা তেমন ভালো হলো না—

জিজ্ঞেস করলাম—এবার কী বই লিখছো?

সুশীতল বললে—'বিধিলিপি'। এটার খুব নাম হবে—এটা ভাল হচ্ছে—

আবার মাস ছয়েক পরে 'বিধিলিপি' বেরোলো।

অনেক দিন পরে একদিন দেখা হতে জিজ্ঞেস করলাম—এটা কেমন হলো সুশীতল? লোকে কেমন বলছে?

সুশীতল দেখলাম তখন সত্যিই বুড়ো হয়ে আসছে।

বললে—এটাও তেমন ভালো হলো না—তবে এবারের বইটা খুব ভাল হবে,—

—কী নাম দিয়েছ এ-বইটার?

সুশীতল বললে—'মিলন-বিরহ'—

'মিলন-বিরহ'ও একদিন ছাপা হয়ে বেরোল। সব মানুষেরই মনের মধ্যে আর একটা মানুষ লুকিয়ে থাকে—সে মানুষটা বড় আশা করতে ভালবাসে। সে আশা করে যে তার অর্থ হবে, ঐশ্বর্য হবে, চাকরিতে প্রমোশন হবে, সব দিক থেকে মঙ্গল হবে। যার সে-আশা মেটে, লোকে তাকে বলে সাকসেসফুল লোক—বলে পুরুষ সিংহ। আর যার মেটে না তাকে বলে—অপদার্থ! শুনেছি ফরাসী দেশের লেখক ব্যালজাক নাকি অক্লান্ত পরিশ্রম করতো খেলার জন্যে—সেই ব্যালজাক পৃথিবীর লোকের কাছে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ ব্যালজাক সাকসেসফুল। আর সুশীতল? সুশীতল অফিসেও যেমন, বাড়িতেও তেমনি। সারাজীবন ব্যালজাকের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করে গেছে। কিন্তু তার পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে বলেই লোকে তাকে অপদার্থ বলেছে। অফিসের সাহেব তাকে অপদার্থ বলেছে। তার স্ত্রী তাকে অপদার্থ বলেছে, তার ছেলে-মেয়ে সবাই তাকে অপদার্থ বলেছে। যারা তার 'সুখের-সংসার' 'বিধিলিপি' 'মিলন-বিরহ' পড়েছে তারাও তাকে অপদার্থ বলেছে। হরিনাভি স্কুলের হেডমাস্টার, সংস্কৃতের টীচার যদুবাবু সবাই যখন শুনেছেন যে এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ পেলেও অফিসে সে মাইনে পায় মাত্র একশো তিরিশ টাকা—তখন তাঁরাও তাকে অপদার্থ বলেছেন। কেউ কিন্তু তার পরিশ্রম দেখেনি, কেউ তার নিষ্ঠা দেখেনি, কেউ তার সততা দেখেনি, কেউ তার আন্তরিকতা দেখেনি। দেখেছে শুধু সাকসেস। তাই জন্যেই তো বলছিলুম—In history as in life it is success that counts. গান্ধীজী সাকসেসফুল হয়েছিলেন বলেই তিনি মহাত্মা গান্ধী। ফাদার অব দি নেশন। হেরে গেলে তাঁকেই আবার আমরা বিশ্বাসঘাতক বলে ফাঁসি দিতাম। সাকসেস-এর কোনও খুঁত থাকতে নেই। সাকসেস নিষ্কলুষ। সাকসেসের কাছে সব কিছু তুচ্ছ—এমন কি ব্যাকরণও তুচ্ছ—বলেছিলেন ভিকটর হুগো! ইসকাইলাস্ বলেছিলেন—মানুষের চোখে সাকসেসই ভগবান—!

তা তারপর আর একটা বইও লিখতে শুরু করেছিল সুশীতল।

সুশীতল বলেছিল—এ বইখানা আমাকে নির্ঘাত অমর করে রাখবে—দেখো—

বিরাট বই সেটা। নাম দিয়েছিল 'মরীচিকা'।

অঘোরবাবু বললেন—সে বই বেরিয়েছিল?

কালীকিংকরবাবু বললেন—নামটা যেন শোনা-শোনা মনে হচ্ছে মশাই—কোথায় যেন দেখেছি—

রায়বাহাদুর বললেন—না, সে-বই অর্ধেক লেখা হবার পর সুশীতল একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই সে বই আর শেষ হয়নি তার। সুশীতল ভেবেছিল একজনকে মুখে মুখে ডিকটেশন দিয়ে লিখিয়ে শেষ করবে। কিন্তু তার অমর হবার শেষ চান্স আর সে পায়নি। তার কয়েকমাস পরেই সে মারা গিয়েছিল। তখন তার কুড়ি হাজার টাকার মধ্যে প্রায় সবটাই বই ছাপাতে আর বাঁধাতে আর বিজ্ঞাপন দিতে খরচ হয়ে গিয়েছে। মাত্র সামান্য কয়েকটা টাকা খরচ হতে বাকি ছিল তখনও। কিন্তু সে-কটা টাকাও শ্মশানে তার সৎকারের সময় কাজে লেগে গেল।
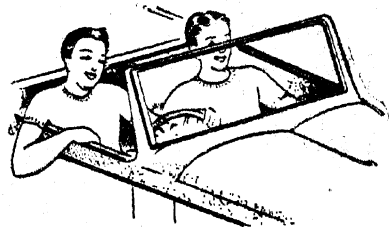
ভারতীয় ভাস্কর্যে প্রকৃতি-পুরুষ

আমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মপাশে বদ্ধ নরনারীর যে-সকল মূর্তি বহুকাল যাবৎ ভারতীয় মন্দিরগুলির অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, এ-দেশীয় ভাস্কর্যশিল্পশাস্ত্রে সেগুলিকে "মিথুন" মূর্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। এরূপ ভাস্কর্য প্রধানত হিন্দু মন্দিরগুলিতে স্থানলাভ করলেও জৈন বা বৌদ্ধ দেবালয়গুলি যে এই অলংকরণ রীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল একথা বলা যায় না। বস্তুত, স্টেলা ক্র্যামরিশের মতে, ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন "মিথুন" মূর্তি খৃীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে সাঁচির বৌদ্ধস্তূপে উৎকীর্ণ হয়েছিল। আবার, মুল্করাজ আনন্দের টীকা-সম্বলিত, সম্প্রতি-প্রকাশিত "কামকলা" গ্রন্থে একথা উল্লিখিত হয়েছে যে, অধুনা লখনউ যাদুঘরে রক্ষিত একটি জৈন স্তম্ভেই নাকি প্রথম "মিথুন" ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রাচীনত্বের গৌরব যারই কেন না প্রাপ্য হোক, "মিথুন" ভাস্কর্যের সংখ্যাবাহুল্য ও অভিনবত্বের মর্যাদা যে ভারতীয় হিন্দু মন্দিরগুলিরই অনায়াসলভ্য সে-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। মধ্যভারতের বিভিন্ন মন্দিরে, বিশেষ করে খাজুরাহোয়; উড়িষ্যার তাবৎ দেবালয়ে, বিশেষত কোনারকে, ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে হালেবিড় ও বেলুড়ে এ-জাতীয় ভাস্কর্যের একদা প্রচুর ব্যবহার হয়েছে। উপাসনার স্থানে, দেবোপলব্ধির পুণ্যক্ষেত্রে এহেন মূর্তিরচনা কতখানি সমীচীন হয়েছে, সে-বিষয়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের পণ্ডিতেরা অতি উগ্র রকমের ভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে কামবন্ধ এই ভাস্কর্যগুলির সর্বৈব নিন্দা করবার লোকের যেমন অভাব হয়নি, তেমনি এগুলিতে দেবভাব আরোপ করে নির্মল দৃষ্টিতে এগুলির মর্মোদ্ধার করবার চেষ্টারও বিরতি হয়নি কখনও। বস্তুত, ভারতীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এহেন বিতর্ক-মূলক বিষয়বস্তু বেশী নেই।

* * *

উত্তর ভারতের প্রথম আর্য উপনিবেশগুলি স্থাপনের প্রাগৈতিহাসিক যুগে অগ্নি, রুদ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দেবগণ কল্পিত হয়েছিলেন। তখনও দেবলোকে নারী-পুরুষ ভেদ বা পুরুষ ও প্রকৃতির রূপক-কল্পনার সূচনা হয়নি। হয়েছিল পরে। বেদ ও উপনিষদের যুগে। এই দর্শন ও ধর্মগ্রন্থগুলিতে, বিশেষ করে অথর্ব বেদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে, মানবীয় প্রেমের মর্যাদা স্বীকৃত ও উদ্গীত হয়েছে। একথা মনে করবার কারণ আছে যে, সর্বশেষে সংকলিত হলেও অথর্ববেদের শ্লোকগুলি অন্যান্য বেদের সমকালীন ও এগুলি সম্ভবত একই সময়ে গীত হত। উপনিষদগুলি আরও পরবর্তীকালের। পুরুষ ও প্রকৃতির রূপ-কল্পনার ছায়ায় মর্ত্য-লোকের নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণের অতিশয় সুস্থ দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে। আধুনিককালে, প্রধানত পাশ্চাত্ত্য-চিন্তাপ্রভাবে, নরনারীর প্রেমানুভূতিকে আমরা সন্দেহের যে বক্র দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি, সেই "অনগ্রসর" যুগে তা কল্পনাতীত ছিল। অতীন্দ্রিয় লোকে পুরুষ ও প্রকৃতির লীলায় এই বিশ্বচরাচর উৎপন্ন। পার্থিব মানব-মানবীর মিলনেচ্ছা তারই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। যে-সৃষ্টির প্রেরণায় জগৎস্রষ্টা অনুপ্রাণিত তারই ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ এসে [illegible] ধরায় ধূলায়। সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষার

নিয়োজিত এই মানবীয় মিলনেচ্ছায় সেজন্য কোনো গ্লানি নেই, কোনো মালিন্য নেই। নেই এজন্য যে, এই প্রবণতা ঈশ্বর-নির্দিষ্ট, ঈশ্বর-অভীপ্সিত বিধানেরই পালন মাত্র। এই সহজ সুস্থ ধারণা পরবর্তীকালের ভারতীয় যৌন-দর্শনের মূলসূত্রস্বরূপ। একেবারে আধুনিক কাল ছাড়া, এই ধারণাই ভারতীয় যাবৎ জৈব চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সময়ে সময়ে যে অল্প-স্বল্প ইতরবিশেষ হয়নি এমন নয়। কিন্তু মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, এই মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুতর কিছু পরিবর্তন পরবর্তীকালে বড় একটা হয়নি। এই তথ্যটি মনে রাখলে, উত্তরকালের হিন্দু যৌন-দর্শনের গতি ও প্রকৃতি ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পকলার মর্মোদ্ধার করা সহজ হবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে একথা বলা হয়েছে যে, আদিতে পুরুষ ছিলেন দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ নরনারীর ন্যায় একাত্ম। তিনি এক দ্বিতীয় সত্তা কামনা করলেন। অতএব পুরুষসত্তা বিভক্ত হয়ে দুই পৃথক সত্তার উদ্ভব হল—পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ তখন প্রকৃতির সহিত মিলিত হলেন। এই মিলনই মোক্ষ; পুরুষ ও প্রকৃতি এই দ্বিবিধ সত্তার পূর্ণতম পরিণতি।

এই দুই সত্তাকে শিব ও শক্তি বলেও অন্যত্র কল্পনা করা হয়েছে। এদের একের অভাবে অন্যটি নিরর্থক। এদের মিলনেই পূর্ণতা, মিলনেই সামঞ্জস্য। অতএব, শিবকে বাদ দিয়ে শক্তি যেমন অসম্পূর্ণ, শক্তির অভাবে শিবও তাই। এই দুই বিপরীত সত্তার নিবিড় সান্নিধ্যেই সৃষ্টিতত্ত্বের শেষ কথা নিহিত। এই অন্তিম স্তরে অন্তর-বাহির ভেদাভেদ নেই। অতৃপ্ত বাসনার অবকাশ নেই। চূড়ান্ত উপলব্ধির, পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির এই স্তরকেই মোক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর যাবতীয় দেবোপাসনার উদ্দেশ্য যে মোক্ষলাভ, সেকথা বলাই বাহুল্য।

ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে নরনারীর আলিঙ্গনাবদ্ধ যে-সকল মূর্তি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি প্রধানত এই পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির মিলনেরই দ্যোতক। প্রধানত বলছি এইজন্য যে, বেদ-উপনিষদ-কল্পিত এই সুস্থ ব্যঞ্জনা পরবর্তীকালে সর্বত্র যে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে এমন নয়। উত্তরকালের অন্যান্য সাধনপদ্ধতিও যে "মিথুন" ভাস্কর্যরীতিকে কিছু কিছু প্রভাবিত করেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

• • •

মহীশূরের হালেবিড় বেলুড়, মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো ও উড়িষ্যার কোনারকের হিন্দু মন্দিরগুলিই "মিথুন" ভাস্কর্যের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। এছাড়া খ্যাত অখ্যাত অনেক অনুরূপ দেবালয় ভারতের সর্বত্র ছড়ান আছে; তাদের সবগুলিকে এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। বয়সের দিক থেকে মহীশূরের মন্দিরগুলিই সর্ব-প্রাচীন আর কোনারক হল আধুনিকতম। বৌদ্ধধর্মকে উৎখাত করে প্রবল বন্যার ন্যায় হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে হালেবিড় বেলুড়ের মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। এ-মন্দিরগুলিতে শৃঙ্গার রসের ব্যঞ্জনা সেজন্য সৌন্দর্য ও লালিত্যে বিধৃত। হয়সালা স্থপতিদের এই ভাস্কর্যগুলিতে যুগলমূর্তির অভাব না থাকলেও, নৃত্য বাদ্য প্রভৃতি অনুষঙ্গ-কলার মাধ্যমেই অধিকাংশ মূর্তি রচিত হয়েছে। বেদ-উপনিষদ-কল্পিত প্রকৃতি-পুরুষের রূপক থেকে ভারতীয় যৌন-দর্শনের ধারা তখনও বেশী দূরে গিয়ে পড়েনি।

ইতিমধ্যে দু'তিন শতাব্দী অতীত হওয়ায় খাজুরাহোর "মিথুন" ভাস্কর্যে কিছু পরিবর্তন এসেছে। যুগলমূর্তিরা এখানে সংখ্যায় বেশী ও তাদের স্থান মন্দিরের বহির্গাত্রে অতি-প্রকাশ্য জায়গায়। হালেবিড় বেলুড়ের যুগ থেকে খাজুরাহোর যুগ অবধি যে-সময়ের ব্যবধান, সেই সময়ে সাবেক যৌন-দর্শনের সঙ্গে কৌল, কাপালিক ও তন্ত্র সাধনার খাদ মিশেছে অনেকখানি। এমনকি একথা মনে করবার ঐতিহাসিক কারণ আছে যে, খাজুরাহো অঞ্চলে এ-সকল উত্তর-সাধনা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হত। তবুও খাজুরাহোর "মিথুন" মূর্তিগুলি—যুগল বা একক যাই হোক না কেন—কখনই রুচিসম্মত শিল্পকলার বাইরে গিয়ে পড়েনি। স্ত্রী-পুরুষের মিলনলীলায় যে মোক্ষের আস্বাদন সম্ভব, এই দর্শনের যোগ্য রূপালাপ হিসাবে খাজুরাহোর উৎকৃষ্ট "মিথুন" ভাস্কর্যগুলি সর্বদাই স্বীকৃত হবে।

খাজুরাহো থেকে কোনারকের কাল আরও দু'এক শতাব্দী পরে। কোনারকের ভাস্কর্য সেজন্য অনাবিল সুস্থতা থেকে যে আরও কিছুটা ভ্রষ্ট হয়েছে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই তবু একথা স্বীকার্য যে, কোনারকের ভাস্কর্যে কামলিপ্সা তুলনায় অধিকতর প্রকট হলেও নৃত্য বাদ্য প্রভৃতি শৃঙ্গার রসের অনুষঙ্গ প্রকাশগুলি যে-নিপুণতার সঙ্গে সৃষ্ট হয়েছে, এমন বোধ করি আর কোথাও হয়নি। প্রকৃতি-পুরুষের মিলনলীলায়

হালেবিড় ঃ সুরসুন্দরী

কোনারক : চুম্বন

বেলুড় : নৃত্যরতা দিব্যাঙ্গনা
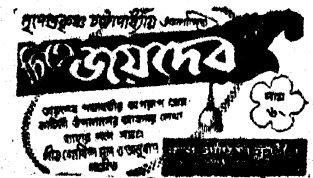
প্রতিচ্ছবি অঙ্কন কোনারকেরও উপজীব্য তবে তার পদ্ধতি কিছু ভিন্ন। দেশকাল-ভেদে এ-পার্থক্য স্বাভাবিক।

কোনারকের পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শনকে যে-সাধনা সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত করেছে, তার অবলম্বন রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা। ইউরোপীয় সমালোচকগণ বা পাশ্চাত্ত্যশিক্ষামুগ্ধ কিছু কিছু ভারতবাসী এই নব-দর্শনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেও এ-মতবাদ খণ্ডিত হয়নি যে, কৃষ্ণ-লাভের জন্য রাধিকার অভিসার পরম-পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য নিখিল মানবাত্মার ব্যাকুলতারই প্রতীক। এই রূপক পূর্ববর্তীকালের পুরুষ-প্রকৃতির রূপক থেকে মূলত কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। শুদ্ধ পুরুষসত্তার সঙ্গে অমলিন নারী-সত্তার পরিপূর্ণ মিলনের সেই একই কল্পনা, একই দর্শন। এই সুস্থ দর্শন যুগে যুগান্তরে ভারতীয় হিন্দু ধর্মসাধনার বিভিন্ন ধারাকে প্রভাবিত করে এসেছে। মন্দির-অলংকরণে এই ধ্যান-ধারণা যে নিজেকে প্রকাশিত করবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দেবোপাসনার স্থানে "মিথুন" মূর্তি দেখে যাঁরা বিব্রত বোধ করেন, তাঁরা পশ্চাৎপটের এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর খোঁজ রাখেন না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাক্লিষ্ট মন নিয়ে তাঁরা যে-বিষয়ের বিচার করতে বসেন, সেই বিষয় সৃষ্টির কালে এহেন "শিক্ষিত" মনের যে অস্তিত্ব ছিল না, এই সহজ সত্যটি তাঁরা ভুলে যান। মোট কথা এই যে উত্তরকালের বহু পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমরা কয়েক শতাব্দী পূর্বের শিল্পকলার বিচারে প্রবৃত্ত হই—যে-শিল্পকলার রচয়িতারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক ভাবধারায়। ফলে, ভুল ব্যাখ্যা অবশ্যম্ভাবী, নিরর্থক মনস্তাপও।

এ-প্রবন্ধের পাঠকপাঠিকাদের অনেকেরই হয়ত মহীশূর বা খাজুরাহোর মন্দিরগুলি দেখবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু তাঁদের অনেকেই সম্ভবত কোনারকের সূর্যমন্দির দেখে থাকবেন এবং আরও অধিক সংখ্যক নিশ্চয়ই দেখেছেন, পুরীর জগন্নাথের মন্দির। এই শেষোক্ত মন্দিরটির স্থাপত্য আশ্চর্য হলেও ভাস্কর্যের ঐশ্বর্য নগণ্য। এ-মন্দিরের "মিথুন"-ভাস্কর্যকলার পক্ষে ওকালতি নয় এ-প্রবন্ধ, তা বলাই বাহুল্য। হালেবিড়, বেলুড়, খাজুরাহো ও কোনারকের অতুল বৈভবের পাশে এই অক্ষমতাটুকু হয়ত অগ্রাহ্য করা যেতে পারে।

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

যাত্রা

জীবনানন্দ দাশ

জানি না কোথাও শুভ বন্দর রয়েছে কিনা;
কোথাও প্রাণের কল্যাণ-সূর্যালোক আছে?
কোথাও এ-অসময় সময়ের নদী পার হওয়া যায়?
পার হলে সাগর কি শান্তি আলো মুক্তির ভেতরে
যাত্রীকে আশ্বাস দেয়?
মানুষের ভঙ্গুর সাহস ভয় যাত্রা আর জীবনের মানে
স্থান পায়—স্থানে এসে পরিণতি পায়?
হয়তো-বা পেয়ে যায়; অথবা সকলই অন্ধকার।
মানুষ যাত্রা করে—
যাত্রার প্রথম ফল সাগরের পথে নিরাপদে চলা
বন্দরের দিকে নিরুদ্বেগে যেতে পারা
বন্দরের থেকে বন্দরের বাঁধা পথ ছেড়ে দিয়ে
সমুদ্রের বড় আবিষ্কারে নেমে পড়া;
হৃদয় অন্তিম ফল হিসেবে আনন্দ চায়
শান্তি চায় নীল মহাসাগরের ভোরের আলোয়
আর একবার তার তারার আলোয়।
মানুষ জাহাজে চড়ে জীবনের সমুদ্রে ভিড়েছে;
সাগর চলেছে—সময় চলেছে—মানুষ চলেছে—
ক্যাবিনের ছ্যাঁদার ভেতরে ঢুকে একা
(সাগরের স্পন্দনে শরীর অসহায়
বমি করে—কাঠবমি হল যেন—
নাড়ি যেন ছেড়ে গেছে ব'লে মনে হয়।)
ডেকে পাইচারি করে একা। একা। একা।
বর্শার ফলার মতো আলো এসে পড়ে।
স্তব্ধ হয়ে কোনো-এক বিন্দুর ভিতরে থেমে থাকা
অনেকের সাথে পরিচয় হয়, হাসিগল্প চলে,
মন ব্যথা পায়, বোকার মতন লাগে, ভীষণ অবাক মানে;
শোকাবহ ক্লান্তি রয়ে গেছে; ভয়াবহ খেদ আছে;
সূর্যের নক্ষত্রের জাহাজের বিদ্যুতের আলোর ভিতরে
কেউ-কেউ গুঞ্জরণ উচ্চারণ ক'রে যায়;
কেউ-কেউ অবচেতনায় চেপে রেখে দিতে চায় সব;
কারো-কারো মন স্বভাবত নিহতচেতন;
হাসছে খেলছে গুলগল্পে মরমে মেতে আছে—
খাচ্ছে—ছুটছে—চালানি মালের মতো দিনরাত দিচ্ছে নিচ্ছে
দেহ—ভালবাসা—(দেহ-মাংস);—
সারাদিন চামড়া মাংস বিকিকিনি শেষ হয়ে গেলে
তারার আলোয় এসে অ-মানুষের মতো এরাও মানুষ:
আচ্ছন্ন করুণ, চেতনা জেগেছে, পথ নেই, বিন্দুর ভিতরে
স্তব্ধ হয়ে রয়েছে জাহাজ—মুর্গির খাঁচার মতো যেন;
তবুও তা নয়;—
আকাশ বিমুক্ত হয়ে আছে।
অনন্তে যে-কথা আছে সব [illegible]
বেতারের [illegible] এসে পড়ে;
জিজ্ঞাসার আলোড়ন—প্রশ্নের মীমাংসা—[illegible]
[illegible]

জাহাজ চালায় যারা, বুদ্ধিমান—নৌবিদ্যাপ্রবীণ
তবু বলে: জাহাজডুবির গল্পে সাগর ভরাট,
হাজার বছর ধ'রে কেবলই ডুবছে,
যাত্রীরা ম'রে গেছে—নতুন যাত্রীর দল তারপর,
নৌজ্ঞান এবারে গভীরতর হয়েছে যদিও
কেবলই বিপদ আছে বাঁকে—পথে—তবু
যাত্রীরা বিপন্ন চিরদিন—
ম'রে যেতে হবে—যাত্রী, তবু চলো—
না ডুবেও ডুবে যাওয়া যায় দুটো সাগরের জলে—
না মরেও প্রতি মুহূর্তেই তবু ম'রে যেতে হয়;
জীবনের বিনিপাত প্রতি নিমেষেই আছে—
প্রতি নিমেষেই জীবন মরছে, যাত্রী, সাগরনির্জন তলাতলে
কোথায় ডুবছে চিন্তা অনুবেদনায় ভরপুর যাত্রীদের মাথা
বুদবুদের শূন্যে ভরপুর
মৃত মাথা আপনার জীবনের খবর রাখছে—
কত বার মৃত্যু হল ভাবছে—গুণছে—
সাগরের তলে—আরো অন্ধকার তলে লীন হয়ে গিয়ে তবু
জাহাজের ডেকের ওপরে ফিরে আসা,
খাওয়া হাসা, খেলা করা, কথা বলা, চিন্তা করা,
বন্ধু হওয়া, ডেক ধ'রে থাকা, পরামর্শ দেওয়া,
রেজিস্ট্রির সময় হয়েছে ভেবে খাতায় স্বাক্ষর ক'রে বিয়ে করা
কাকে যেন; জীবন তো বিবাহিত হয়েছিল ঢের বার;
বার-বার: বিচ্ছিন্ন হয়েছে, বার-বার
হয়তো এ-জন্মে নয়—এই দিকে—এই প্রান্তে নয়—
চারিদিকে অন্ধকার বেড়ে ওঠে;
ঘুমোবার ভান ক'রে প'ড়ে আছে ঢের যাত্রী
ভান ঢের ভালো হলে অঘোরে ঘুমোবে;
কারো চোখে ঘুম নেই;
মৃত্যু হলে শব সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়—
সেই মৃত্যু নেই;
অন্য-এক হেঁটে চলা ব'সে থাকা কথা শেষ—
কথা শেষ না করার মৃত্যু আছে।
এক জোড়া তাস নিয়ে জাদুকর হয়ে
খেলা করা যেত যদি এই অন্ধকারে,
জাহাজ ভর্তি সব পুরুষমেয়েকে যদি খানিক উড়ুক্কু ভোজবাজি
কী ক'রে টুপির থেকে অনেক পায়রা বার ক'রে
উচ্ছ্বাসে ওড়ানো যায়—দেখিয়ে ওড়ানো যেত হৃদয়কে
অনন্ত রাত্রির দিকে উন্মাদ উৎসবে—
জাহাজডুবির গল্পে সাগর ভরাট,
হাজার বছর ধ'রে কেবলই ডুবছে,
যাত্রীরা ম'রে গেছে—নতুন যাত্রীর দল তারপর,
নৌজ্ঞান এবারে গভীরতর হয়েছে যদিও
কেবলই বিপদ আছে বাঁকে—পথে—তবু
যাত্রীরা বিপন্ন চিরদিন—
ম'রে গিয়ে তবু
মৃত্যুশীল—মৃত্যুর নিঃশেষ যেই—নেই—যাত্রী চলেছে।]

সাপ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রথম সাপ-টা দেখবে নিথর পাথর সম্মোহিত।
কোন সে আদিম অন্ধ অঘোর অন্বেষণের স্পৃধা
আঁধার-চোয়ানো ছায়া-বিদ্যুৎ হেনে খোলে কুণ্ডলী।

তারপর সাপ অনেক দেখবে
কেঁপে ওঠা শরবন।
কাঁটা দেওয়া ঘাস সভয়ে শুনবে
গোপন সঞ্চরণ,
—শোনা না-শোনার সীমানায় শুধু সতর্কতা নিহিত।

সবশেষে এক সাহসী সকাল
গহন অতল থেকে,
হিমেল হিংস্রা ছেঁকে নিয়ে এসে
রোদ্দুরে মেলাবে কি?
ছন্দে মেলাবে ঘৃণা-পিচ্ছিল বিবরের
সরীসৃপের বিবরণ আর পাখীদের নীল নভে।

কতকাল

বিষ্ণু দে

আকাশে নেই পরিখা গড় প্রাকার, তাই মেলবে
আজীবন কি ডানার দুটি পাল?
হায় হৃদয়! হে যৌবন! সুখের গাঙে আর নয়।

কালিন্দীতে গাহন সেরে ভোরের ভেজা সূর্য
এবারে জেনো পাহাড়পারে অন্ধকারে মেলবে,
পালটে যাবে বিলম্বিতে তাল।

অষ্টাদশী মুরলী ফেলে পঞ্চাশের তূর্য
খুঁজবে বৃথা ফসল খোলা মাঠের তাজা শামায়,
নবান্নের রাতের হিমে ধরবে বৃথা হাল।

শহরে পেতে সারাজীবন, মনের নীলে খেলবে
এখনও কত কাল?
এপার-ওপার উদ্বা প্রেমে বাঁধবে কতকাল
প্রেমের সাঁকো এখনও ফাঁকা কামায়।

যা আছে, যা নেই

হরপ্রসাদ মিত্র

কখনো ভোলেনি এই
যা আছে, যা নেই।
যা হাতে পেয়েছি তাও,
আর যা যা ভুলেই খুঁজেছি
প্রতিটি দিনের চলা
চলে চলে যা কিছু বুনেছি।
সমস্ত যাবেই যদি
এ দেয়ালে কালিও ফিরবে।
সবুজে হাসবে জানলা,
অকস্মাৎ নতুন পালিশে—
সেগুন, শিশুর ডানা, মেহগিনি হাসবে সবাই।
শুধুই আনন্দে ঠোঁটে তুলি দিয়ে প্রথম যোগেশে,
করবী ফুটবে লাল
ফটকে ফটকে
নতুন জানলা বসন্তে
দেখা দেবে প্রকাণ্ড আকাশ।
এখানে ছিলুম আমরা
এ বিষাদ মিলিয়ে সে দুঃখে
মনকে পাঠিয়ে সেই আগামী সকাল—
বিষাদ মিলালো সুখে
দুঃখ সেই গভীর বিষাদে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

জ্বালাময়ী দ্বিপ্রহরে :
স্তব্ধ এক নির্জন পাহাড়
গ্র্যানিটের রুক্ষ আর লাল শাদা কোমল পর্দায়
বিচিত্র মধ্যের স্তর
তাকে শুধু চাই
অন্তরে বন্ধুর দাহ উপরে মসৃণ...
জমাট সমুদ্র ফেনা, অশ্রু আর ছাই—
পৃথিবী খনিজ-পুঞ্জ, উন্মোচিত অরণ্য-কাহিনী।

আমার তোমার ঋণ
শোধ হবে, যদি বেঁচে থাকে ঐ শতাব্দীর দিন :
কত রক্ত
লবণাক্ত
ক্ষেতে রবে, যদি দেখে মরেনিকো বিহ্বল সৈনিক
শোষণের বাষ্প-জমা নিষ্ঠুর দুপুরে
উষ্ণ-শিরা, শোকে আর শোকে শুধু শাণিত দুপুরে!
সে তো নয় তিমিরার্দ্র নিশাবন ছলনা ক্ষণিক।

মায়াবী তানের ছন্দে যে আত্মবিস্তার,
পাথুরে আলোর ভেঙেছে দ্বার ;
দিনের নির্মম জ্বালা, নব শুদ্ধ আর—)
উড়ে যায় নিরোজ্জ্বল প্রাণ......

শরতের ভোরের সীমানায়

অরুণ মিত্র

আমার চোখের মণিতে যেন এক নিবিড় রোদ
আমি নিয়ে এসেছি। জল ঝরে গেছে, শ্যাওলার অন্ধকার
ফিকে হয়েছে। কুঁড়ি বাকল ডানা হাজার সুখ আমার
দিকে উসখুস করে। যেন আমি এক ঝলকে অবাধ
আকাশ মেলে ধরব।

অথচ ভালো ক'রে যদি দেখ, আমার শিয়রে
ঝড় জ'মে আছে। দিগন্তে আমার যে হাত রেখেছি
তার উপর জলের ভার। আমার দৃষ্টির ভিতরে
আকুল সংসার, কীর্তিনাশা, আচমকা ঘুম ভাঙার
পর নিরুদ্দেশ মিছিল। এত বছরের। শরতের
ভোরের সীমানায় আমি অন্ধ এক ইতিহাস
বয়ে এনেছি।

মণীন্দ্র রায়

সেদিন সানাইবাজা জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যায়
খোঁপায় জুঁইয়ের মালা জড়িয়ে এ ঘরে
এসেছিলে পূর্ণিমার মতো।
তোমাকে হৃদয়ে নিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ে
জোয়ারের কলোচ্ছ্বাসে বলেছি, আমাকে ভালোবাস
কতোখানি এখন বল ত'?

অর্ধমুকুলিত চোখে, শিথিল শরীরে
স্ফীতনাসা আবেগের আত্মদানে তুমি
সে জীবনে নতুন প্রবাসী,
অজস্র ভাষায় ভেঙে জানালে—পাখির
যেমন আকাশ, জল যেমন মাছের,
কিংবা প্রাণ নিয়ে বাঁচে যেমন শরীর,
তেমনি তোমাকে ভালোবাসি!

উন্মাদ যৌবনশেষে মধ্যরাতে আজ
নিদ্রাহীন দুজনে একাকী,
একই বিছানায় শুয়ে প্রশ্ন করি আবার, বল ত'
ভালোবাস নাকি?

তুমি চোখ ফিরালে না, হাতের উপর
দিলে না স্পর্শের তাপ; শুধু শান্ত ঠোঁটে
ছড়ালো ভোরের মতো রেখাহীন হাসি।
আর, কথা-না-কথায় মিশানো নিশ্বাসে
মনে হল একবার শোনা গেল আমারই প্রশ্নের
শুধু প্রতিধ্বনি—ভালোবাসি!

আর এক আকাশ

দিনেশ দাস

আর-এক শূন্যতা আছে এই মহাশূন্যের ভিতর
আকাশের ভিতরে আকাশ,
সে-আকাশ আমার অন্তর।
নিঃসীম নৈঃসঙ্গ হ'তে আকাশ যেমন
জন্ম দেয় নক্ষত্র নেবুলা অন্তহীন:
আমার আকাশ-মনে রাত্রিদিন দিনের, রাত্রির আবর্তন,
বিচিত্র ঋতুর প্রদক্ষিণ,
আলোর কৌতুকনাট্য, তমসার বিয়োগান্ত লীলা।

শূন্যে কোনো মানচিত্র নেই:
অজ্ঞাত রহস্যলোকে অদৃশ্য আলোয়
জীবনের আবির্ভাব!
জীবন, চেতনা, জ্ঞান গ্রন্থি বাঁধে একটি লগ্নেই
একটি উজ্জ্বল স্বর্ণতারে।
তবু যেন মনে হয়, এই খণ্ড-জ্ঞানের ওপারে
আছে এক সর্বভোর—অখণ্ড চেতনা জবা-কুসুমসকাশ:
সেই মহাশূন্যে ছুঁয়ে আমার আকাশ॥

সমুদ্র বাতাস

উমা দেবী

সমুদ্র-বাতাস—আহা—সমুদ্র-বাতাস—
দুরান্তের উদ্দাম উল্লাস!
হয়তো আসবে ভেসে এ বাতাসে দিগন্তের মেঘ—
পুঞ্জ পুঞ্জ কৃষ্ণদ্যুতি হৃদয়ের প্রমত্ত ও প্রখর আবেগ।
এ বাতাসে পাল তুলে দিয়ে শুধু মুহূর্তেক কাল
ডুবিয়ে জীবন-তরী হয়তো পৌঁছাতে পারি কোনো এক
অদৃশ্য পাতাল।

তোমার পর্যাপ্ত কেশ বার বার উড়ে পড়ে আকুল বাতাসে
রক্তিম-সুবর্ণ-সন্ধ্যা নেমেছে অকূল ছুঁয়ে দৃষ্টির আকাশে।
সন্ধ্যামণি-বাসনারা ফুটেছে কোথায়
কোথায় হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্নের হাওয়ায়।
সমুদ্র-বাতাস—আহা—সমুদ্র-বাতাস—
হৃদয়কে দিয়েছে আশ্বাস!

জানি কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর এ বাতাস স্তব্ধ হয়ে যাবে।
মেঘগুলি উড়ে গেলে নক্ষত্রেরা দীপ্তি খুঁজে পাবে।
তারা তো জ্বলবে ধীরে
আকাশের ঘুমন্ত কুটীরে—
ঝিলমিল বাতির মতন,
আকাশ প্রশান্ত যেন কোনো এক গৃহস্থের মন।
—তবু আহা সমুদ্র-বাতাস—
একবার দিয়ে যাক দুরান্তের উদ্দাম আভাস!

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ভাজা ইলিশের গন্ধে গলি ছেড়ে কিছুতেই নড়তে চায় না হাওয়া
বুড়োরা গিয়েছে পার্কে খিদে করতে। পাঁচিলে ন্যেড়াল দিচ্ছে তান
কেননা আলস্যের কাজ। গালে হাত দিয়ে ভাবছে এক খোকা ছাদ—

হায়, মেয়েটির আজ পাকা দেখা। পাত্র কিমল মেড-ইন-লণ্ডন।
হাতে আরশি। গোঁফ ছেঁটে বাবু দেন আপনাকে আপনি বাহ্বা-বা!
রাস্তায় রজনীগন্ধা হেঁকে যাচ্ছে। কেনো ফুল এক-আধ ডজন।

রোয়াকে বসেছে আড্ডা পুরোদমে। আজ কিন্তু চা শুধু। টা নেই।
আকাশটা দেখা যায় না। দেখা গেলে মনে পড়ত কবিতা টবিতা
দমকল-পুরুত গেল ঘণ্টা নেড়ে। কিছু একটা ঘটেছে কাছেই।

এখনও পোকার খারাদি ট্রাঙ্কে তোলা তার সেই সুন্দর ছবিটা।
ঠিকে-ঝি বাসন মেজে চলে গেছে। কলে জল পড়ছে তো পড়ছেই
চোখের জলের মত। হায়, আজ পাকা দেখা! অমনি পাকা-গিন্নী পৃথিবীটা

শাড়ির আঁচলে হাওয়া নেড়ে দিয়ে বলে উঠল : ছেই ছেই ছেই।

[illegible]শংকর সেনগুপ্ত

সে ফিরে আসবে, তার সাক্ষাৎ সন্ধান
ব্যস্ত হাওয়া, বিকেলের রোদ
জানতে পারবে একদিন।

পাখী ওড়ে নীলান্ত রোদ্দুরে,
কাক ডাকে তীক্ষ্ণ সুরে,
কুণ্ডলিত ধোঁয়া নীলে লীন।

হুহু শীত টলে টলে হারায় কোথায়,
সিক্ত মাঠে আবার ফাল্গুন,
জাগে ফুল পাতায় পাতায়।

কেউ কেউ ফিরে আসে,
ফিরে আসে গুঞ্জরিত শ্রান্ত মক্ষিকারা,
মিষ্টি মন, তীক্ষ্ণ স্বাদ আশেপাশে।

গুমোট ছড়ানো অন্ধকার
দীর্ণ ক'রে মাঘশেষে দূর নদীজলে
দ্বাদশীর বিহ্বল জোয়ার।

সবাই সজ্জিত থাকে সে আসবে ব'লে।
ঝড়ের ঝাপটে যে এখন উধাও
ফিরবে সে সুশান্ত অঞ্চলে

একটি সুস্থির স্বাদ বুকে নিয়ে।
অশ্রুজল স্বেদ তিক্ততার
বিনিময়ে পল্লবিত এই অংগীকার॥

ডাক

গোবিন্দ চক্রবর্তী

তবু থেকে-থেকে দোলাবেই সেই
ফেরার হওয়ার ভাবনা—
ফিরতে যেখানে চাইলেও আর
কিছুতেই ফিরে যাব না।
সকল সুখের শিয়রে-শিখরে
কেন নীল এক তারকা শিহরে,
কারণটা খুঁজে হয়রাণ হব;
খেইটুকু শুধু পাব না।
ঘন গাঢ় রাত, তারাদের তাত ঝাঁঝালো—
আধো তন্দ্রায় শুনব কোথায়
নাগারা-টিকারা বাজালো।
জানলার নীচে যুঁইয়ের লতাটা
জড়াবে রজনীগন্ধার ডাঁটা,
দূর দিগন্তে হঠাৎ দেখব
সেই গ্রামটাই সাজালো।
আকাশ পাহারা—ছোট্ট সে শিলাশৈল।
এক পাশে টুকরো বসতি—
নদীও একটি বইলো।
ওঠা-পড়া সেই উল্লাস নাচ :
মাদলে, মশালে ছড়াবে খোঁয়াচ,
জংলী গানের ধুয়োটা ঘুরবে
'—আহা, সই, সই, সই লো।'
যতই গড়ি না গড় ও নগর, বন্দর—
সায়মেটা ভরি বাগানে-পুকুরে
তবুও হয় কি অন্দর?
উৎসের ডাক আসবেই ঠিক :
অতলেও সেই তারার স্ফটিক;
বুঝব ফাঁকিটা—যতই পেরোই
ভাবি না অথবা ভাব-না॥

মৌলিক নিষাদ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর নদীর ঠিক পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি, রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে
যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর সময়ে বেঁচে আছি।

এই এক আশ্চর্য সময়।
যখন আশ্চর্য বলে কোন-কিছু নেই।
যখন নদীতে জল আছে কি না-আছে,
কেউ তা জানে না।
যখন পাহাড়ে মেঘ আছে কি না-আছে
কেউ তা জানে না।
পিতামহ, আমি এক আশ্চর্য সময়ে বেঁচে আছি।
যখন আকাশে আলো নেই,
যখন মাটিতে আলো নেই,
যখন সন্দেহ জাগে, আলোকিত ইচ্ছার উপরে
রেখেছে নিষ্ঠুর হাত পৃথিবীর মৌলিক নিষাদ—এই ভয়।

পিতামহ, তোমার আকাশ
নীল—কতখানি নীল ছিল?
আমার আকাশ নীল নয়।
পিতামহ, তোমার হৃদয়
নীল—কতখানি নীল ছিল?
আমার হৃদয় নীল নয়।
আকাশের, হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা
আপাতত কোন-এক স্থির অন্ধকারে শুয়ে আছে।

পিতামহ, আমি সেই ভয়ের নিবিড় অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি, রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।
মনে হয়, আমি এক অমোঘ মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে
যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।

অন্ধকারে জেগে আছে মৌলিক নিষাদ—এই ভয়।

হল না কিছুই আজ

অরুণকুমার সরকার

হল না কিছুই আজ।
আমন্ত্রিত সুন্দরীরা এসে চলে গেল
কুটিল কটাক্ষ হেনে অসন্তুষ্ট শীতের হাওয়ায়
মাঝরাতের অন্ধকার শুশ্রূষায় নূয়ে।
রেখে গেল বিস্রস্ত শয্যায়
অর্ধমৃত একটি প্রেমিক।

হল না কিছুই আজ
নৃত্যগীত মান-অভিমান। ভগ্নোদ্যম শব্দসুন্দরীরা
রেখে গেল বিস্রস্ত কাগজে
কয়েকটি দুর্বোধ্য রেখা
পরস্পরবিরোধে কুটিল।
রেখে গেল হৃদয়ে আমার
দলিত মথিত সুর
মৃত্যুহিম তীব্র হলাহল!

আরণ্য-প্রেম

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

সে কোন বরাঙ্গী নয়, নিরূপা ওরাঁও কন্যা;
শেষ-শীত আলোর আশ্লেষে,
আদিম অরণ্য-কায়া
মেলে দিল কিছুক্ষণ মুক্ত কামনায়। কিন্তু তার
অলস বিলাসে, দেখা গেল,
কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে—একালীন বিদ্যুৎ-সম্ভার।

মন ত খবর রাখে, বলে,
এ-ও এক তন্বী শ্যামা, যে চায় ক্ষণিক মুক্তি
আর দিতেও যে পারে
নিবিড় আরণ্য মুক্তি
পিয়ালের পাতাঝরা বনের আঁধারে।
সহরের সীমা আর
মহুয়ার কত বন পেরিয়ে এলেম,
সে তার সন্ধান জানে।
বৃন্দাবনের চেয়ে কত পুরাতন এর প্রেম
ইতিহাস সে কথাও মানে।
সহস্র বৎসর ধরে ধন্য হল গুহার আঁধার;
ধন্য হ'বে আর
আজকের আলোর ত্রিযামা।
মন বলে—
অপরূপ পেথলু রামা!

ইজেল ও বুনো পারাবত

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমীরালি এভেন্যুয়ে গুলমোরের হলুদ ছড়ানো
মুগ্ধ ছাতিমের ছায়া চকিত শালিকটিকে ছুঁতে চায়
চকিত শালিকটিকে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে
বারে বারে ছুঁতে চায়.
ট্রামের মর্মর বাজে বুলভারে, ঘনশ্যাম ঘাসের ভেলভেটে
সহসা-বৃষ্টির দাগ অকারণ-স্নেহের মতন লেগে থাকে,
বুনো পারাবত ওড়ে নীলকালো আকাশে, যেন
ক্লান্ত শরীরের দুটি সুইমিংপুলের স্থির জলে।
সেখানে তরুণ শিল্পী, আর্ট স্কুলের, একলা ইজেল নিয়ে বসে,
ক্রিকেট মাঠের তাঁবু এই-রোদ-এই-ছায়া খেলা দেখে
ইজেলের গায়ে,

বুনো পারাবত ওড়ে—মুক্তির নীরব গান যেন
নীল-কালো আকাশে :
"দোতলা বাসের মধ্যে একগাদা যাত্রীর ভীড়ে কাল"—
মনে ভাবে—
"শান্তাদি কেমন ধারা আরেক বন্ধুর সঙ্গে—মানে সে বান্ধবী—
অনর্গল চেঁচিয়ে বলছিল তার পরীক্ষার কথা, কাল, এমনি সময়ে
দু নম্বর নীল স্টেটবাসে, রাস্তায় বৃষ্টির জলে যখন
চমৎকার আলোছায়া, হাপুসনয়ন কান্না স্টলের ক্যানভাসে
সমুদ্রের মতো থৈথৈ ভবানীপুরের সিক্ত সুন্দর জুলাই।
শান্তাদি সুন্দরী নয়, তবু তার শরীরের পোজে
কোথায় কোথায় যেন ভাস্কর্যের স্পষ্ট ছাপ আঁকা—
দৃঢ়-নমনীয় গ্রীবা, অবিকল কণ্ঠস্বর তার ছাঁচে ধরা.
স্নিগ্ধ নয়, শান্ত নয়, কর্কশও না, মধুরও না,
নাচের ঘুঙুর যদি আরো চাপা হ'ত,
ট্রামের মর্মর যদি ঘনশ্যাম ঘাসের ভেলভেটে
আরেকটু অস্পষ্ট হ'ত, আরেকটু সংযত
তাহলে অনেকটা যেন শান্তাদির স্বর হ'ত তারা।
রবীন্দ্র সঙ্গীত গায় কেন যে শান্তাদি"—
মনে মনে ভাবে—
"কেন যে বাংলা পড়ে এম-এ ক্লাশে,
কেন যে এমন রোদে বৃষ্টিতে বর্ষায়
ইজেলের সামনে এসে না দাঁড়িয়ে
অনর্থক গল্প করে নীল স্টেটবাসে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে
কে জানে?"

গুলমোরের হলুদ ছড়ানো এভেন্যুয়ে
আর্টস্কুলের তরুণ ছেলেটি
যতোক্ষণ রোদ ছিল আকাশের ছাদে
দেখেছে দুচোখ ভরে শুধু, যতদূর চোখ যায়,
বুনো পারাবত ওড়া—
শান্তাদির আত্মার মতন।

নির্জন দে চৌধুরী

এখনো তোমার ভাবনায়
বেলা যায়, প্রতীক্ষার দীর্ঘ বেলা যায়।

কৃষাণী-কন্যার কণ্ঠে নবান্নের গান
শেষ হয়ে আসে, শস্য-শ্যামল স্বপ্নের অঘ্রান
এখন সর্বস্ব-রিক্ত; আর
দিগন্তে ঘনায় গাঢ় শান্ত অন্ধকার।

পাতা ঝরে। মৃত্তিকার সব সাধ স্বপ্নের শিয়রে
করুণ ক্লান্তির ছায়া নামে, পদ্মবিল
সিরসিরে হাওয়ার মর্মরে
কেঁপে ওঠে; তারও প্রাণে আকাঙ্ক্ষা যে এখনো উর্মিল!
নিঃসঙ্গ নক্ষত্র-কামনায়—
বেলা যায়, তারও প্রতীক্ষার বেলা যায়।

তুমি আজও আসমিক'। প্রতীক্ষার তীর
তবু জাগে এ উদ্বেল বিনিদ্র নিশীথ রজনীর
ঘুমের, স্বপ্নের, শান্তির।
নির্জন হাওয়ায়—
রাত্রি যায়, প্রতীক্ষার দীর্ঘ রাত্রি যায়!

চিত্ত ঘোষ

দেয়ালে কালের ছবি। আলমারিতে পরিচ্ছন্ন বই।
এ্যালবামে অলীক ফটো। অফুরন্ত একাকার নদী।
বিষাদিনী ভালবাসা। তরঙ্গেরা অগাধ অথই
জন্মদিন, মৃত্যুদিন, অন্তরঙ্গ বিবাহ-বার্ষিকী

বই তো স্মৃতির জন্য। আশ্বিনের উজবোনা বিকেলে
গর্হিত আলোয় মগ্ন অক্ষমতা, কলরব, গ্লানি,
অন্তরালে অন্ধকার দশমুখে পরিণাম ঢালে—
প্রবাহের জলশব্দ, পাহাড়ের গাঢ় প্রতিধ্বনি।

শিকড়ে কে ঢালবে জল? কারো হাতে প্রতিজ্ঞা, সংকল্প—
বন্ধুরা বাড়ীতে ফেরে সঙ্গে করে মোহের উৎসব ;
বান্ধবীরা ক্ষয়ে ক্ষীণ—যেন কোন অতীতের গল্প
কেউ ক্লান্ত মেদভার, ব্যবহারে শ্লথ অবয়ব।

জটিল রেখার দৃশ্যে চিহ্নিত সময়, অভাবিত আরেক সংজ্ঞার
আসন্ন আগুনে জ্বলবে পাতা, ফুল এমন কি স্মৃতি
আবার জ্বালাবে বলে রেখেছিলে যে কটি অঙ্গার
আজ তারা একমাত্র, মহিমায় সবচেয়ে কুন্তী॥

স্বপ্নে দেখা জীবন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রূপসী রাত্রির ওষ্ঠে, চক্ষে, মুখ-বিলাসে
পদতলে
কতদিন, কতকাল আমি শুয়ে আছি;
কপিশ রাত্রির চোখ ক্লান্ত দেহের স্বাদ বড় ভালবাসে
বড় জ্বলে
সিংহের মতন খোঁজে অন্ধকার হিংস্র কৌতূহলে।

বিপুল শ্রোণীর ভারে, স্তনের উদ্যত গর্বে, মুক্ত মেখলায়
ঈষৎ সম্মুখে ঝুঁকে দুর্লভ দণ্ডায়মান এই মূর্তিখানি
চিরকাল
আমাকে পায়ের নীচে রেখে হাসে, কুন্তল দোলায়;
খড়্গের মতন জঙ্ঘা, চন্দ্রের মতন ওই নাভি, আমি জানি
নিমেষেই ছিঁড়ে ফেলবে রহস্যের সব অন্তরাল,
মুছে দেবে অন্য সব দৃশ্য, শোভা, আকাশের শান্ত নীল বাণী।

সব গ্রন্থ শেষ হলে, পুরান' গ্রন্থেরই মত নিসর্গের স্বাদ
যুবক-জিহ্বায় লাগে বড় নষ্ট, বড়ই ধূসর;
মানুষের দিকে ফিরলে চোখে পড়ে মানুষেরই ধ্রুব-পরমাদ!
আত্মার কান্নার মত দণ্ড-পল-মুহূর্তের শব
চকিত-বিদ্যুৎ সব বুকে বেঁধে, আমি ঘুরে ঢলে পড়ি
সেই পদতলে
সিংহের মতন এসে অন্ধকার শুঁকে যায় হিংস্র কৌতূহলে।

পৃথিবীর শেষতম নির্জনতা মনে হয় রমণী শরীরে
আমি তার অস্থি, স্বেদ, অশ্রু পান করি,
চক্ষু ঘিরে
লক্ষ লক্ষ ঢেউ ওঠে, ভেঙে যায়, স্বপ্নে দেখা সমুদ্রের তীরে।

স্পর্শমণি

অরবিন্দ গুহ

মনে করি হাত বাড়ালেই স্পর্শ পাবো। সমুদ্রকে
একটি দুঃসাহসী স্পর্শে নিয়ে আসতে পারি, মনে করি।
আমার অস্থির সুখে, আমার সুস্থির দিবালোকে
আমার আড়ালে থাকে একজন সমুদ্র। সুন্দরী।
আমার আড়ালে তুমি, হে সমুদ্র, হে সুন্দরী, তুমি
স্পর্শে আনন্দিত ক'রে রেখেছো আমার জন্মভূমি।

সমুদ্রের ক্ষুধাতৃষ্ণা অন্ধকার তরঙ্গধ্বনিরা
তোমার প্রগাঢ় রূপে, হে সুন্দরী, সার্থক, জীবিত।
যে-সমুদ্র চিনেছেন ত্রিকালজ্ঞ প্রাচীন ঋষিরা
তারই সারাংশের মূল্যে তোমার সর্বস্ব বিরচিত।
আমার আড়ালে একটি সজল মধুর জয়ধ্বনি;
তুমি সব চেনো, কিন্তু হে সুন্দরী, নিজেকে চেনোনি।

ঋতুর নতুন শস্য বাতাসে বিহ্বল হ'য়ে থাকে।
আমার কৃতার্থ আত্মা মগ্ন থাকে তোমার গভীরে
যেখানে সহস্র গ্রীষ্ম বিচলিত করেনি তোমাকে।
ঊর্ধ্বাকাশ থেকে সূর্য প্রতিদিন পশ্চিমের তীরে
আস্তে নামে। হে সমুদ্র, হে সুন্দরী, ব'লে দিতে পারি,
সব প্রেম ক্ষয় ক'রে দু-জন নিঃসঙ্গ নরনারী

কী অসীম যন্ত্রণায় অগ্নির আশ্রয় ভিক্ষা করে।

কিন্তু অগ্নি দূরে থাক। আমি তো তোমাকে পেতে পারি
একটি দুঃসাহসী স্পর্শে, একটি স্পর্শাতীত কণ্ঠস্বরে।
আমার হৃদয়ে অন্য পরিচ্ছদ, হাতে তরবারি
নেই, সামনে দিবালোক, আড়ালে তোমার উপস্থিতি।
রক্তের যৌবনে শুধু প্রজ্জ্বলিত স্পর্শের প্রতীতি॥

নিদ্রার প্রার্থনা

সুনীল বসু

এখন ত নয় [illegible] পালা
একদা [illegible] ছিল [illegible]।
ফুলের ফলে [illegible] মায়া-বৈভবে
ছিল যে আমার সাজানো বাগান।
আজকাল বসে দেখি চুপচাপ
হাউ হাউ জ্বলে মায়া-সংসার;
চারিদিকে চলে [illegible] সংহার
[illegible] ফোঁটা ঝরে টুপটাপ।
শুধু দেখি চলে নিয়তির ভোজ
রক্ত মাংস সঁপে দিই মেদ।
পুণ্যতে মানুষে নেই আজ ভেদ
ভালোবাসা নেই [illegible] নিখোঁজ।
[illegible] হাতে জগতের ভার
[illegible] হয়ে গেছে চোখ [illegible]।
[illegible] আমার ঘুমচোখে [illegible]
[illegible]

ভুবন-সুন্দরী

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

প্রসাধন শেষ হলে কুন্তলে জড়িয়ে কুন্দমালা
বাসববিজয়ী মুখ দর্পণে রেখো না, অতুলনা!
কপোলে লোধ্রের চূর্ণ, চোখে ক্রূর কাজলের জ্বালা
ঈষৎ বঙ্কিম থাক ঃ ও মুখশ্রী দেখো না, দেখো না।
মোহিনী রূপের মায়া চেয়ে দেখে স্তম্ভিত ত্রিকাল
মানুষ তো বাকহারা, কথা কয় গুহার পাথর,
সমুদ্রের ঢেউ বুঝি অঙ্গে অঙ্গে হয়েছে উত্তাল
দেহের সীমায়, যেন লক্ষ্মীপূর্ণিমার কোজাগর।

তুমি যদি আত্মপ্রেমে মগ্ন হও মুকুরকুমারী,
মন্দিরে কলিঙ্গ আর হবে নাক সঙ্গীত-মুখর;
সূর্য-মন্দিরের শীর্ষে বাজবে কি মন্দিরা-ঝঙ্কার-ই
বিচিত্র আনন্দে বাজে মৃদঙ্গে যে-মেঘমন্দ্র স্বর
তাও বুঝি স্তব্ধ হবে; অঙ্গান্বিত হও তুমি নারী
ভুবনবিজয়ী রাত্রি যেন—লক্ষ্মী-পূর্ণিমার কোজাগর।

সত্যের সহজিয়া

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

কে বলেছে সত্য এক, আমার জীবনে দেখি সত্য আছে ঢের—
টিট্‌কারি দেয় লোকে, বলে—আড়ম্বর দ্যাখো মিথ্যার পুজোর;
কী ভদ্র ভণ্ডামি আহা! তুমি বুঝি একমাত্র পেয়েছিলে টের
নিরর্থক কখনো না বাঁচবার যত কিছু বেসাতি আমার।
জীবনের বহু প্রশ্নে ঠেক খেয়ে বহুবার বহুতর পেয়েছি উত্তর;
সংশয় মুছেছি যত লোকনিন্দা তত যেন হয়েছে প্রখর।
তোমাকে শুধাই—'বলো, সব কিছু জানা আর না-জানার পারে—
হিরন্ময় মুখ কার? কে আজো প্রচ্ছন্ন ক'রে রাখে আপনারে?'
জবাবে বলোনি কিছু; হেসে শুধু একবার কাছে এসেছিলে,
জীবনের শেষ প্রশ্নে কী সহজে সমাধান তুমি এনে দিলে?

অন্তরাল

আরতি দাস

আমি ত মৃত্যুকে তাই ভুলে থাকি সকল প্রহরে;
হয়ত ভাঙলো ঘর, ভাসলো বা বন্যা-জল-ঝড়ে,
সযতনে বেড়া বাঁধি। এই দুটি লুব্ধ চঞ্চুপুটে
পাখির মতন খুঁজে দিনের সঞ্চয় রাখি খুঁটে।
নিজেকে অশেষ জালে যে জড়াই সে ত এই
আশা—
মৃত্যুও পাবে না খুঁজে আতঙ্কের কাঁটার
এ বাসা।

সম্রাট

দুর্গাদাস সরকার

একটি যৌবন কাঁদে। অর্ধনগ্ন, অথবা উলঙ্গ।
যদিও তরঙ্গ কাঁপে বিকলাঙ্গ দীর্ঘ দেহ-তটে—
ডান হাত প্রসারিত। ভিক্ষাপাত্র সামনে। অস্পষ্টে
একটি পুরুষ খোঁজে চলন্ত ট্রামেই বসে সঙ্গ
সোনার বোতামে এঁটে শার্ট। তার ধুতিতেও আর্ট।
হাতে ঘড়ি। চোখে চশমা। নিঃসঙ্গ মেজাজ তার ভারী।
সেও দেখে যেতে যেতে বসে আছে পথের ভিখারী,
এবং নিজেকে ভাবে অনঙ্গের অনন্য সম্রাট।
যখন নিস্তব্ধ রাত্রি। ছায়া ছায়া ফুটপাত। বাজে
গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টা। পুনঃস্তব্ধ। তখন হঠাৎ
আস্তে গেলে দেখা যায়ঃ দিবস-ভিখারী—সেও সাজে
আশ্চর্য সম্রাট। তার থলি থেকে বের হয়—হাত-
ঘড়ি দু-আনার। ভিক্ষালব্ধ ছেঁড়া কোট। জমে ঠাট
বিকলাঙ্গ দেহে। আর চারিপাশে নারীদের হাট!!

বটকৃষ্ণ দে

আকাশে ভাসিয়ে ভেলা, লঘুপক্ষ পাখীর মতন,
কীসের অন্বেষা নিয়ে, চলে গেছে। দিয়েছে আমাকে
স্মৃতির মেঘের ভার, দুঃখধারাসার, আর মন,—
যে তার কাহিনী কাব্যে-শ্লোকে-ছন্দে নিরন্তই ডাকে!

উড়ন্ত পাখীর কণ্ঠ বলে শুনি,—যে যায় ফেরে না!
বাতাসে সান্ত্বনা বাজে, সন্ধ্যাবধূ করে তার স্তুতি—
কিন্তু মন?—কিছুতেই বুঝবে না, সে যে তার দেনা
শোধ ক'রে, নতুন বাণিজ্যে এক করেছে বসতি!

কেন রে হৃদয় তোর এ দুর্দম অবুঝ দুরাশা!
সবুজ সকাল ঘুরে পীতাভ দুপুরে মিশে যাবে,
মধ্যাহ্ন-ও অপরাহ্ণ হবে,—এই নিত্য যাওয়া-আসা
চক্রবৎ, এরই মধ্যে হাসি জ্বলে কান্নার কিংখাবে!

এক বসন্তের গান ফুরালো, কোকিল-ও কণ্ঠ-হারা!
স্মরণের স্বরলিপি তবু বাজে, পার হয়ে ঋতুর পাহারা!!

শান্তিব্রত ঘোষ

শাদা অন্ধকারে আজ ঢেকে গেছে পাইনের শাখা
শাদা সমুদ্রের লোনা জল খেয়ে আমি এক বিপন্ন পুরুষ
শাদা হিমে রক্তহীন মৃতের মুখের মধ্যে মৃত্যুকেই দেখা
বিপদ বা মৃত্যু আর অন্ধকারে অন্তরীণ পৃথিবীর
সকল মানুষ।

বিষণ্ণ বিস্ময়

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বড়ো পরিচিত লাগে এই দৃশ্যাবলী, নীলাকাশ,
বড়ো চেনা মনে হয় বিকেলবেলার শান্ত নদী—
নিস্তরঙ্গ সুরে স্রোত বহে যায় ক্লান্ত নিরবধি,
ঝাউয়ের বিপন্ন ডালে কান্না তোলে অস্থির বাতাস।
বড়ো পরিচিত এই রক্তের প্রবাহ, দর্পণের
মুখোমুখী এক ছায়া আযৌবন, তেইশ বছর,
টেবিলে সবুজ ঢাকা, ফুলদানি. বই, ধুলো, ঘর;
অপরিবর্তিত দৃশ্য কোনো দীর্ঘস্থায়ী নাটকের।

বড়ো পরিচিত লাগে, ক্লান্তিকর; একা, একা, একা!
অথচ জেনেছি স্থির আশ্চর্য কোথাও আছে, ঠিক।
কোথাও নদীর বাঁকে সূর্যাস্তের মতন, অথবা
অনেক বৃষ্টির পর অরণ্যের মত্ত মনোলোভা
রূপ—এক মুহূর্তের ভগ্নাংশে হয়তো যাবে দেখা ঃ
অচেনা রহস্যে জ্বলে উঠবে এই স্তব্ধ দশদিক!!
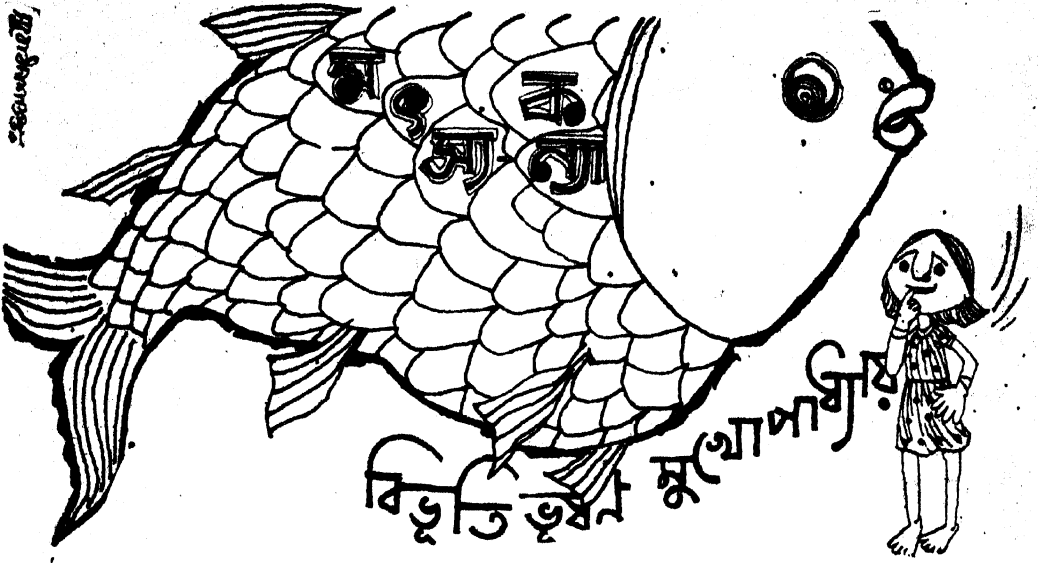
এ কটু ঢিলে যে আমি দিই একথা অস্বীকার করতে পারি না। বাজারে গিয়ে যা করে দেখতে যাই না, কিন্তু বাড়িতে একটা জিনিস কিনতে গেলে যে হাট ব'সে যাবে এটা বরদাস্ত হয় না।

বিশেষ ক'রে মেছুনী যদি মাছ নিয়ে এল। দরদস্তুর,—সেই এক আলাদা পর্ব। তারপর মাছটাকে নাকের কাছে তুলে ধ'রে শ‍ুকতে হবে, তার কানকো টেনে দেখতে হবে, দাঁড়িপাল্লা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তার 'পাষাণ' দেখতে হবে, মাছটা পাল্লায় চড়াবার সময় পরিষ্কার করবার ছুতো ক'রে কতটা তাতে জল ছড়িয়ে দিচ্ছে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর অতিরিক্ত সাধারণ যা ব্যবস্থা—বাটখারা যাচাই করে নেওয়া। ওজনের সময় আঙুলের টিপের দিকে নজর রাখা সবাই মিলে, এ তো আছেই। এদিকে সবার নিজের নিজের মন্তব্য—এটা করো, ওটা দেখে নাও, ওদিকে মেছুনী সমানে দিব্যি গেলে যাচ্ছে—"আধ গল যায়—বেটা মর যায় (হাত তুলে) গঙ্গামুঙ্গে শপথ খাইছি মাইজী—জানে বাবা দীনানা"—অর্থাৎ একটুও ঠকাই তো চোখ গলে যাবে। বেটা মরে যাবে, গঙ্গামুখো হয়ে দিব্যি গালছি, বাবা দীননাথ জানেন আমি কী ধরনের মেয়ে।

—হাট-বসে যায় বাড়িতে। মেয়েরা, পাচক ঠাকুর, চাকর; ওদিকে মেছুনী সে একাই একশ; ভালো লাগে না। অথচ বাঙালীর হেঁসেল, একটু আঁশ-গন্ধ না হলে চলে না মাছের দুর্ভিক্ষ, একটু বড়সড় মাছ দেখলে মেয়েদেরও পড়তে হয়।

আমি [illegible] বারণ করে দিই — বলি, "নিয়ে নাও নেবে তো। কত আর ঠকাবে? একটা মানুষ অত ক'রে দিব্যি গেলে যাচ্ছে।"

আমি থাকলে নাকি নির্ঘাৎ দিয়েও যায় ঠকিয়ে।

মেয়েটা বলে—"তুমি ওদের দিব্যির ফাঁকি ধরতে পারবে না মেজোকাকা, শুধু ছেলে থাকলে মেয়ের দিব্যি গালবে, শুধু যদি মেয়ে রইল তো ছেলের দিব্যি। আর যেদিন দেখবে সমানে হাত তুলে বলে যাচ্ছে ঠকাই তো যেন বিধবা হয়ে যাই, সেদিন জানবে তাদের বাপ-মিনষের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। চেনো না ওদের তুমি।"

মাছটাকে নাকের কাছে তুলে ধরে শ‍ুকতে হবে

রাস্তা থেকেই যতটা পারে সন্ধান নিয়ে নেয় বাড়িতে "মেঝলাবাবু" আছে কিনা। যদি কিছুদিনের জন্য বাইরে গেলাম তো খোঁজ নেয়, কবে নাগাৎ ফিরব। একটা লোক যাকে সংসারের দিক থেকে আর সবাই বাতিল ক'রে রেখেছে, মায় মেয়ে পর্যন্ত তার বুদ্ধি-বিবেচনার কদর করবার লোকের যে একেবারেই অভাব নেই একথা ভাবতে ভালোই লাগে।

ঢোকেও প্রায় তাক বুঝে, পাঁচটা অতিরিক্ত কেমন যেন আরও একটা ইন্দ্রিয় শক্তি আছে। খেতে বসেছি, উঠানে [illegible] দিয়ে বলল—"মাছ নেবে মাইজী?"

মেয়ে বাতাস করছিল, ঘুরে দে[illegible] উল্লসিত হয়ে উঠল—

"কী সুন্দর মাছ দ্যাখো মেজোকা[illegible] অনেকদিন আসেনি এরকম!"

কাঠের বারকোশে একটা বড় কাৎলা ম[illegible] একদিকে মুড়ো আর একদিকে ল্যা[illegible] বেশ খানিকটা ক'রে উঁচু হয়ে রয়েছে। [illegible] পড়েছে মেয়েটা, একবার নির্বিকারভ[illegible] ওদিকে দেখে নিয়ে বললাম—"ঐ [illegible] বোকার মতন উলসে উঠিস সব তাতে, তা[illegible] আরও ঠকাবার জো পায় তোদের। [illegible] শুনে দর করে নিবি ভালো ক'রে।"

চারে মাছ ভিড় করে আসবার ম[illegible] চারদিক থেকে জুটল সবাই মাছের চারি[illegible] এসে; ওপর থেকে, নীচে থেকে, ভাঁড়ার [illegible] পুজোর ঘর থেকে। মেয়ে ঘুরে ব[illegible] "একটু বসে থাও মেজোকাকা, ডিমে[illegible] মাছ, এক্ষুনি দেবে ঠাকুর।"

বললাম—"হ্যাঁ, ঐসব ব'লে বোকার দর বাড়া। চিনিস নে তো ওদের।"

একটা উল্টো চাল দিয়ে কাটান দেওয়ারও চেষ্টা করলাম—"আর অত পাকা মাছ নিয়ে হবে কি? যেতেই বল বরং।"

কিন্তু শেষ-রক্ষা করতে পারি না।

শোঁকা, কানকো পরীক্ষা পর্যন্ত চলল একরকম ক'রে, তারপর যখন দর কষাকষি আর ওজন করায় এসে পড়ল, একস্‌পার্ট হিসাবে রান্নাঘর থেকে পাচক-ঠাকুরের ডাক পড়ল, এদিকে মেছুনীর দিব্যি গালা পর্দায় পর্দায় চ'ড়ে উঠতে লাগল, তখন আর সহ্য করা গেল না। বললাম—"নেবে তো নিয়ে নাও, খাওয়ার সময় বাড়ি মেছোহাটা ক'রে তুলতে হবে না।"

মেয়েটাই ওদিকের প্রতিভূ হয়ে কথা বলে, বলল—"ঠাকুর বলছে আজ বাজারে বড় মাছের দর এক টাকা বারো আনা ক'রে গেছে, এ চায় আড়াই টাকা।"

বললাম—"শোওয়া দু'টাকা দেয় তো তৌলে দিতে বল, নয়তো থাক।"

"সের পিছু আট আনা করে বেশি দিতে হবে? বোধ হয় সের চারেকের মাছটা হিসেব ক'রে দ্যাখো না কত গচ্ছা যায়।"

ওরা নিজেদের হিসাবের গলদটা ধরতে পারে না, তাইতে আরও বাতিল হয়ে পড়ি আমি। নইলে সত্যই যে এত বে-হিসাবি-পনা নিয়ে সংসার করে আসছি এতদিন এমন নয়। কথাটা হচ্ছে, ঠাকুর-চাকরে বাড়িতে জিনিসপত্র কেনা পছন্দ করে না। ঐ যে বাজারে হঠাৎ আজ অত দর নেমে গেল তার মূলে ঐ পরম সত্যটুকু। এ তথ্য প্রকাশ করেও বলবার জো নেই, কাজেই বোকা সেজে থাকতে হয়।

প্রশংসাও যে নেহাৎ না পাওয়া যায় এমন নয়। মেছুনীই অবজ্ঞার সঙ্গে নাক সিঁটকে বলল—"ইস, বাবু এত বড় সংসারটা চালাচ্ছেন, তিনি কি জিনিসের কি দর জানেন না, যত জানেন ঠাকুর!"

প্রশংসাই তো। কিন্তু বিপক্ষীয়ের প্রশংসা স্বপক্ষীয়দের মুখে বিদ্রূপের হাসিই ফোটায়।

তবু নীরবে দরটা মেনে নেয় সবাই।

ওজন-পর্ব এসে পড়ে।

ভালো করে জল ছিটিয়ে বারকোশ থেকে মাছটা তুলে নিয়ে পাল্লায় চড়াতে যায় মেছুনী।

দরটা নীরবে মেনে নিতে হয়েছে ব'লে মুখিয়েই আছে সবাই, গোড়া থেকেই আরম্ভ হয়ে গেল—

"তুই জল দিতে গেলি কেন অমন করে?"

"দাঁড়িপাল্লা ঘুরিয়ে নে।"

"ঐ তোর পাষাণ ভাঙা হোল? দেখ দিকিন চোখের মাথা না খেয়ে।"

"বেশ, ও আবার ঘুরিয়ে নিয়ে মাছটা এই দিকে চড়াক।"

"ওটা কি তোর—সের? ওটা..."

"ঠাকুর, আমাদের সেরটা নিয়ে এসো তো।"

বাটখারার হাঙ্গামা মিটিয়ে পাল্লায় মাছ তোলা হয়েছে—অবশ্য অতুল শান্তির মধ্যেই নয়—আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠে পড়লাম।

"তুমি ডিম খেলে না মেজোকাকা?"

হাত মুছতে মুছতে একটু এগিয়ে গেলাম। বললাম—"পেটের মধ্যে ঢুকে তো খেতে পারি না।"

"বেশ ওবেলায়ই খেয়োখন।"—নিশ্চিন্ত কণ্ঠেই বলল, যেন এ মানুষ সরেজমিন থেকে সরে যায় তো ভালোই। মেছুনীটাকে

বলল—"নে ভালো ক'রে তৌল কর, কোন তাড়াতাড়ি নেই আর।"

কি মনে হতে একটু দাঁড়িয়েই গেলাম আমি—মাছ ওজন দেখবার একটা সূক্ষ্ম আনন্দ তো আছেই আমাদের। আমি সামনে আসতে গোলমালটাও আর নেই।

দুলে দুলে দাঁড়িপাল্লা স্থির হয়ে গেলে মাছ নামিয়ে বাটখারার হিসাব নেওয়া হোল; বড় ছোট মাঝারি সব মিলিয়ে ওজন হোল পাঁচ সের সাড়ে দশ ছটাক।

সমস্ত উঠানটা একেবারে নিঃশব্দ, কারুর মুখে একটি কথা নেই, শুধু দারুণ বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি। তারপরে আরম্ভ হয়ে গেল—"কোন মতেই অত হতে পারে না ও মাছ!"

"অন্তত সের খানেকের এদিক-ওদিক করেছিস; সওয়া চার সাড়ে চার সেরের বেশি হ'তেই পারে না।"

"কী কায়দা করেছিস বল, নয়তো..."

আবার বাটখারা ঠিক করে দেখে নাও; যাত্তা সব।"

"পাশের বাড়ি থেকে বাটখারার পুরো সেট'টা নিয়ে আয় তো যেয়ে..."

"একচুল এদিক-ওদিক হলে তোকে পুলিসে দেওয়া হবে।"

"ওরা মন্তর জানে। যখন হাতের কায়দায় কুলোয় না, তখন ভরে দেয় তাই দিয়ে।"

মুড়োসার কাৎলা মাছ একটু ভারি হয়ই, তায় ডিমে ভরা একেবারে, তবু ওজনটা সত্যি এত হওয়ার কথা নয়। মেছুনীটাও একেবারে হতভম্ব হয়ে বসে আছে। মাছের দিকে চেয়ে। কোন দিব্যি জোগাচ্ছে না।

পাশের বাড়ি থেকে ঢালাই লোহার বাট-

তোরা কেউ ছিলি না?'

হিসেব করে দেখোনা কত গচ্চা যায়

খারা এল। দাড়িপাল্লা ধরল ঠাকুর। ঐ ওজন, কাঁটায় কাঁটায়। নির্বিকারভাবে বসেই ছিল মাগিটা, বোধ হয় একটু জোর পেয়ে দু'হাত তুলে গঙ্গা মাঈয়ের শপথ খেতে যাচ্ছিল, আমি ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলাম।

নিজের আন্দাজটা বললাম সবাইকে—মাথা-সার মাছ, তায় ডিমে ভরা...

"তাতে কখনও অত তফাৎ হতে পারে না।"—এ আপত্তিটা বড়দের দিক থেকে।

তর্কেরও তো জিদ আছে। আমি বললাম—"আস্ত বড় মাছের ওজনের আন্দাজও কমে আসছে মানুষের। দেশ থেকে তো লোপাটই পেয়েছে।"

"কিছু গুণ করেছেই, ওরা অনেক রকম জানে। ও মন্তর-পড়া মাছ নেওয়া হবে না। ...যা তুই।"

চুকেই যাচ্ছিল, মেয়েটা আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল, ফোঁস ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মাছের ডিম বড় ভালোবাসে।

পা বাড়িয়েছিলাম বাইরের দিকে, মেছুনীও মাছটা বারকোশে তুলে রাখছে কেমন যেন মনমরা হয়ে গিয়ে; ঘুরে বললাম "কী করেছিস! এখন আমার অত তলিয়ে দেখবার ফুরসৎ নেই, নইলে বের করতামই, ভালো হোত না সেটা তোর পক্ষে। এক কাজ কর, আধসেরের দাম বাদ দিয়ে রেখে যা মাছটা, রাজী আছিস?"

বাড়িটা টপ করে ছাড়ে না; বিশেষ করে আমি থাকলে। অন্তত সের পিছু আনা চারেক তো বেশি টেনেছেই বাজার থেকে।

"পোটাকের দাম কেটে নিন বাবু, আপনি যখন বলেছেন, তুলে নিয়ে যাব না বাড়ি থেকে মাছ। পোটাকের দাম।...জানে গঙ্গামাঈ আঁখ গল যায় বেটা..."

মেয়ে বলল—"দিয়ে দাও মেজোকাকা আর আধপোর দাম। এত যখন ইচ্ছে তোমার।"

বললাম—"তোদের কেমন ঐ দোষ; আমার হাত বন্ধ করে দিবি সব কথায়।"

বড় মাছ কোটায় যাঁর হাত ভালো তিনি পুজো থেকে উঠে এসেছিলেন, ওটুকু সেরে আসতে গেলেন তাড়াতাড়ি। তবু ঘণ্টা-খানেকের স্থলে প্রায় আধ ঘণ্টাটাক লেগেই গিয়ে থাকবে তাঁর, আমি পান চিবুতে চিবুতে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে একটা খবরের কাগজ পড়ছি, একটু তন্দ্রাও এসে গেছে, ভিতরে একটা হৈ হৈ উঠল—

"দ্যাখো কারচুপি মাগির!...পেটে পেটে বুদ্ধি!...ও হারামজাদিকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না!...ওমা! এ যে ফুরুতে চায় না!...ঠাকুর, বাড়ি চেন' মাগির? ......মালাপাড়ায় তো হবে; খোঁজ নিয়ে ধ'রে আনুক, পুলিশে দিক মাগিকে..."

চাপা গলাতেও আছে—"ভালো মানুষ পেয়ে...তাই বাড়িতেও আসতে চায় না—বাইরে বাইরে গছিয়ে দিয়ে পালায়..."

আর ভালো লাগে না, কানেও তুলছিলাম না, নাতিটা ছুটে এসে চোখ বড় বড় ক'রে আরম্ভ করল—"ও দাদু, দ্যাখোসে তোমা[র] ভালো মানুষ পেয়ে..."

হাতজোড় করে বললাম—"মাফ করো ভাই চোর জোচ্চোরের হিসেব রাখা ছাড়া আমা[দে]র অন্যরকম কাজ আছে।"

জোরেই বললাম। তারপর আবার কাগ[জে] মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করছি, মেয়েটা এ[ক] আঁজলা ছোট ছোট বাটখারা নিয়ে উপস্থি[ত]

ও দাদু দ্যাখোসে তোমার ভালমানুষ ?

হোল। ধোয়াই, কিন্তু মাছের গন্ধ ভ্যাক-ভ্যাক করছে। বেশ নাটকীয়ভাবেই আমার চোখের সামনে নীচে বিছিয়ে দিয়ে বলল—"এই দ্যাখো মেজোকাকা, কাৎলা মাছের ডিম। মাগিকে ফাঁসি দিতে হয় না?"

মুখের দিকে চেয়ে রইল আমার।

গোটা পাঁচেক লোহার আধপোয়া ছটাক, এই রকম। বাকিগুলো নুড়ি, দুটা ক্ষয়া ইটের ঢেলাও আছে।

"কোথায় ছিল এগুলো?"—সংগত প্রশ্নের অভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম।

"বললাম তো, তোমার কাৎলা মাছের ডিম..."

ভেতরের বারান্দায় জড়ো হয়ে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আছে সবই। একটু কড়া চোখেই চেয়ে বললাম—"তোরা কেউ ছিলি না? আমি তো তবু ভেতরে কিছু একটা গলদ আছে আন্দাজ করে আধসের দাম কাটিয়ে দিয়েছিলাম।"

"কি করা হবে এগুলো নিয়ে?"

"ভেঙ্গে তো খাওয়া যাবে না। সবগুলো মিলিয়ে দ্যাখ কত ওজন হয়, সেই আন্দাজ দাম কেটে নিতে হবে। ফাঁসি দেওয়াও চলবে না, কথায় কথায় পুলিশ ডাকাও চলে না অত গিরস্থ বাড়িতে। আর মাগিটাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না বাড়িতে। ঠাকুর-চাকরদের বলে দিতে হবে।"

"ঠকালে অমন ক'রে, অথচ কোন সাজা পেলে না..."

নীচু গলায় গরগর করতে করতে আবার ওগুলো আঁজলায় তুলে নিয়ে ভেতরে চ'লে গেল।

একটু পরে এসে বলে গেল—"তেরো ছটাক হয়েছে সবগুলো মিলিয়ে, তিনপো আর এক ছটাক।"

"অথচ তোরা বলছিলি একসের-দেড়সের বেশি হবে। মিছে দোষ একটা মানুষের নামে।"

উলটে আসামীর হয়েই ওকালতি; আর কিছু না ব'লে মুখ ভার করে আস্তে আস্তে চলে গেল।

অযথা কথা বাড়িয়ে ফল নেই বলেই ওভাবে ওকালতি করা, কিন্তু মনটা তো খুব একচোট নাড়া খেয়েছে। বিকালে বাইরের বারান্দায় বসে সেই কথাই ভাবছিলাম—ভ্যাজাল-দৈত্য চালে-ডালে ঘিয়ে-তেলে সূক্ষ্মরূপে ছিল এতদিন, সাহস বেড়ে গিয়ে এবার যদি এই রকম স্থূল আকারে এসে উপস্থিত হয় তার উপায় কি? হাঙ্গামা করতে যাও তো তার সহযোগীকে নিয়ে হাজির হবে। ধর্মঘট। দেওয়া যায় মাগিকে পুলিশের হাতে। ফল সমস্ত বাজারে মাছ বন্ধ, আমাদের বাড়ি চিহ্নিত করে বয়কট করবে সব।

এর সঙ্গে আর একটা প্রশ্নও যে থেকে থেকে উঁকি মারছিল না মনে এমন নয়,—সত্যই নিজে হতে করবে কি এমন কাজ?... ওর সেই হতভম্ব ভাবটা—আর সবারই মতো...

মেছুনীটা এসে ওদিক দিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। দামটা নিতে এসেছে। ঝড় উঠতে যাচ্ছিল, মেয়েটাকে ডেকে বলে দিলাম—"ঐ ওজনের দামটা কেটে নিয়ে, বাটখারাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বিদেয় ক'রে দে। এই নিয়ে সমস্ত দিন হৈ চৈ করবার দরকার নেই। বরং বলে দে আর যেন না ঢোকে বাড়িতে।"

ও গিয়ে জানিয়ে দিতে গোটা কতক অর্ধস্ফুট মন্তব্য এসে কানে পৌঁছাল—"কে ওকে কিছু বলতে যাচ্ছে?...কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে?...মামা করবে হয় নিজেই করুন, আমাদের অত আস্পর্ধা হয়নি..."

নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটে গেল।

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। বেড়িয়ে এসে বাগানের ধারে একটা বেঞ্চে বসে ছিলাম, দেখি খানিকটা দূরে একটু পাশ ঘেঁষে একটি স্ত্রীলোক কখন এসে দাঁড়িয়েছে, সঙ্গে একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কে?"

প্রশ্নটা শুনে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল মেয়েটার হাত ধরে। কাছে এসে কপালে হাত দুটো ঠেকিয়ে বলল—"গোড় লাগি মেঝলাবাবু।"

মেয়েটাকেও বলতে সে পা ছুঁয়ে কপালে হাতটা ঠেকাল।

মেছুনীটাই। সন্ধ্যার গাঢাকা অন্ধকারে টের পাইনি, চোখে চশমাটাও নেই। তা ভিন্ন মেয়েটিও ধোকা দিয়েছিল খানিকটা। বেশ ফুটফুটে, তার ওপর পরিষ্কার করে একটি রঙীন ফ্রক পরিয়েও নিয়ে এসেছে।

প্রশ্ন করলাম—"কী ব্যাপার?"

আঁচল খুলে গুটি কতক নোট আর কিছু খুচরা আমার পায়ের কাছে রেখে দিয়ে, হাত দুটো তুলে—"জানে গঙ্গামাঈ—এই বেটির মাথায় হাত দিয়ে..." বলে আরম্ভ করেছে, ধমক দিয়ে থামিয়ে বললাম—"কিন্তু কি হয়েছে বলবি তো আগে?"

"আমি নয় বাবু। অত সাহস কখনও হয়? রোজ যাওয়া-আসা করছি আজ বোধ হয় পনেরো-বিশ বছর ধ'রে। ভুলচুক হয়ে যায়, গরীব মানুষ, তা বলে পেটের মধ্যে বাটখারা ঢুকিয়ে..."

"তাহলে মাছটা নিজেই গিলেছিল পুকুরে। নুড়িগুলোর কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু লোহার পোয়া আধপোয়াগুলো..."

"এই মেয়েটা বাবু। আমারই মেয়ে..."

"অ্যাঁ!! এতটুকু মেয়ের পেটে এত বুদ্ধি! এ যে..."

"সেই জন্যেই নিয়ে এলুম মেঝলাবাবু আপনার কাছে।"—হুহু ক'রে কেঁদে ফেলল মাগি, তারই মধ্যে ব'লে চলল—"অত বুদ্ধি নিয়ে ও কি আমাদের গরীবের ঘরে বাঁচবে? না, ও বাঁচতে আসেনি মেঝলাবাবু, আমাদের ছলতে এসেছে। তাই বললুম—চ', ব্রাহ্মণ মহাত্মা তিনি, দণ্ড দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আসবি চ'।"

পা দুটো চেপে ধরল—"ওকে দিন আশীর্বাদ বাবু, যেন যেমন এসেছে তেমনি এই বুদ্ধি নিয়ে আমার ঘর আলো করে বেঁচে থাকে। করুন আশীর্বাদ মেঝলা-বাবু..." —অঝোরে কেঁদে যেতে লাগল।

উল্টো স্পর্ধা দেখে আমার দুটো রূঢ় কথাই বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু মেয়েটার দিকে চেয়ে ঠোঁট দুটা যেন আপনিই চেপে গেল।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে; চোখ দুটিতে নিরীহ শৈশবের শান্ত দ্যুতি। শত দোষের মধ্যেও নিরীহ।

মনটা আমারই গেল উল্টে। টাকা রেজগি-গুলো ওর হাতে তুলে দিয়ে হাতটা মাথায় চেপে বললাম—"বাঁচবে বৈকি, বাঁচবে না তো কি?"

তারপর, এ আশীর্বাদের সঙ্গে অন্য কতজনকে অভিসম্পাৎ দিয়ে বসলাম সে-কথাই ভাবছি এখন।

ছায়া হরিণ

(একটি অবাস্তব গল্প)

দেখ," কল্পনা বলল, "তুমি রোজরোজ এস না।"

বিছানার ধারে উঠে এসে পা ঝুলিয়ে বসেছিল কল্পনা, মাথার পিছনে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অজস্র চুলগুলো গুটিয়ে রাখছিল, খেলা শেষ, বেদেনীর সাপ এবার ফের ঝাঁপিতে কুণ্ডলী হবে, পায়ের পাতা দুটিও শাড়ির পাড়ে ঢেকে কল্পনা বলল, "দেখ, তুমি রোজ-রোজ এস না।"

আয়নার অরুণের চোখে চোখ রেখে কল্পনা এ কথা বলল। যে-অরুণ চুলে এখন চিরুনি চালাচ্ছে, তাকে নয়। তার দিকে তাকাতে পারে না কল্পনা। বুকের ভিতর থেকে অনেকখানি রক্ত ঝিলিক দিয়ে উঠে মুখে ছড়িয়ে যায়।

আয়নার অরুণ চিরুনিটা নামিয়ে রাখল। "আসব না কেন?"

—"ও যদি একদিন এসে পড়ে, যদি দেখে ফেলে, যদি টের পেয়ে যায়?"

অরুণ হাসল।—"দেখবে না। দেখার চোখই ওর নেই।"

অদ্ভুত বিশ্বাস, অসম্ভব সাহস। কল্পনা আর কিছু বলল না। টুপ করে নেমে পড়ল খাট থেকে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার এই জ্যোৎস্না রঙের আলো। একটু নীল-নীল, নরম। যেন ফু দিলে এই আলো উবে যাবে। কল্পনা একবার দিলও। গেল না। অথচ ব্র্যাকেটে যে বালবটা জ্বলছে, এই আলো তার নয়। ষাট-ওয়াট বালবটার আলোর রঙ কল্পনা চেনে। হলদে, ময়লা-ময়লা। ফুট করে কবে ফেটে যায় তার ঠিক নেই। তবে? পাশের কোন বাড়ি থেকে ঠিকরে আসে কি না দেখবে বলে কল্পনা জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। হতে পারে। যদিও চোখে পড়ল না। তা-ছাড়া চাঁদ-চোয়ানো আলোটাকে ওরা কি রোজই জ্বালবে ঠিক একই সময়ে, অরুণ যখন আসবে?

ঘরের ভিতরটা একটু ধোঁয়া-ধোঁয়া, ধোঁয়া নয়, কুয়াশা। খোলা জানালা দিয়ে কতক্ষ[ণ] ধরেকেজানে ঢুকে ঘরটাকে ছেয়ে ফেলেছে[?] আলোর রঙ তাই এমনি—কুয়াশাই হল[?] রঙটাকে নীল-নীল করে দিয়েছে[?] হবেও বা।

কল্পনা হাত বাড়িয়ে জানালার প[াল্লা] টেনে দিতে যাচ্ছিল, পারল না। অবাক হ[য়ে] দেখল, তার কব্জি অরুণের হাতের মুঠো[য়]। অরুণ কখন খপ করে ধরে ফেলেছে।

ব্যথা নয়, অস্বস্তি থেকেই কল্পনা অ[...] গলায় বলল, "ছাড়!"

অরুণ হাসছিল। সেই হাসি স্প্র[...] কল্পনার মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, থা[ক], খোলা থাক।

—হিম ঢুকবে যে। যদি ঠাণ্ডা লাগে? যদি জ্বর হয়?

"লাগবে না। জ্বর হবে না।" অরু[ণ] প্রেরিত পুরুষের মত প্রত্যয়-স্থির বলল। সেই প্রত্যয় কব্জি থেকে স[...]

য়ে গেল কল্পনার শরীরে। সে আর কিছু বলল না।

তা-ছাড়া তখন সেই গন্ধটার অস্তিত্ব ছড়িয়ে পড়েছিল কল্পনার সত্তায়, তাকে ঘিরে ফেলেছিল। খুব মৃদু গন্ধ আর মিষ্টি। একটু ঝিম-ধরানো—কল্পনার অনেক দিনের চেনা। এই গন্ধটা কবে সে প্রথম টের পেয়েছিল মনে নেই। সেই অ্যালবামটার নয় ত—অনেক অনেকদিন আগে নাকের কাছে ধরতে যে গন্ধটা ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল? সেই অ্যালবামটার পাতার ভাঁজে একটা শুকনো পাপড়ি ছিল— পাপড়িটার গন্ধও হতে পারে। তার সঙ্গে ন্যাপথলিনের ঘ্রাণও মিশেছিল, হয়ত পুরু-পুরু ওই বিলাতী কাগজগুলোরও, কিন্তু এত বছর ধরে কি সেই একই গন্ধ ফিরে ফিরে আসতে পারে। যদি পারেও, অরুণের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী। সে এলেই কেন গন্ধটা একটু-একটু করে ছড়িয়ে পড়ে, কল্পনা ডোবে...ডোবে, খানিকটা ভেসে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষে একেবারে তলিয়ে যায়?

অরুণ ওর দিকেই চেয়ে ছিল। তখনও সেই সুন্দর হাসিটি লেগে আছে অরুণের চোখে, কল্পনার ঘাম-ঘাম কপালটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে মুছে দিচ্ছে।

অরুণ বলল, চলি। দরজার দিকে পা বাড়াল। ছিটকিনি খুলে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল কল্পনা, বাধা দিল না। অরুণ ওর হাতে একটু চাপ দিল। তার পরেই অরুণ আর নেই। বাইরের বারান্দা অন্ধকার। যেখানটায় অরুণ চাপ দিয়েছিল, হাতের সেই অংশ কল্পনা ঠোঁটে ছোঁয়াল। চোখ বুজল সঙ্গে সঙ্গে। এইবার ঘরের কুয়াশা কেটে যাবে, গন্ধ মিলিয়ে যাবে একটু একটু করে, নীল-নীল নরম আলোটা আবার হলদে হবে, আমি জানি আমি জানি, তার আগেই চোখ বন্ধ করে ফেলি। আমি জানি, অনেক বছর ধরে এই একই ব্যাপার দেখছি যে।

চোখ বুজেই বিছানায় ফিরে কল্পনা চাদর মুড়ি দিল।

কুলেশের নাক ডাকছিল। রোজই ডাকে, আজও ডাকছিল। রোজই কল্পনার ঘুম ভাঙে, আজও ভাঙল।

অন্ধকারে বোঝা যায় না রাত কত, সকাল ঠিক কত দূরে এসে আটকে আছে। কুলেশই বা কোন্‌খানে, পাশেই? আন্দাজে হাত বাড়িয়ে কল্পনা তার হদিশ পেল। কম্বলের রোঁয়ার মত কুটকুটে লাগছে, নিশ্চয় কুলেশের বুক। প্রকাণ্ড বুক চিতিয়ে লোকটা পড়ে আছে। মাথার নীচে বালিশটা কল্পনা ঠিক করে দিল কুলেশের নাক হয়ত থামবে এই আশায়। কিন্তু থামাতে গিয়ে বিপদে পড়ল। দু-একবার ভোঁস ভোঁস করেই কুলেশ পাশ ফিরল, মোটা মোটা হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল কল্পনাকে। যদি আরও কাছে টানে, যদি পিষে মারে! কল্পনা হাঁসফাঁস করছিল, অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

গা ঘুলিয়ে ওঠা ভাব তখনও গেল না। ঘুমোলে কুলেশের ঠোঁট দিয়ে কষ গড়ায়, লালায় বালিশ ভেজে। কল্পনার গালে লালা লেগে থাকবে, চিটচিট করছিল। আর ঘাম। লোকটা এত ঘামে কেন?

ঘেমেছিল কল্পনাও। দরজা জানালা দুইই বন্ধ। বাইরে কিন্তু মেঘ ডাকছে। শ ক আগে দু চার ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে

থাকবে। এখন গুমোট। জানালাটাও বন্ধ করল কে, ফুলেশ নিজেই? ও ওই রকমই ফুরফুরে। সর্দির ভয়, হাঁচির ভয়, কাশির ভয়।

জানালা খুলে দেবে বলে কল্পনা জামা-কাপড় গুছিয়ে উঠে বসেছিল, কিন্তু স্যাঁত-সেঁতে মেঝেয় পা দেবার কথা ভাবতেই গা শিরশির করল। খাটের নীচে খড়খড় করছে—কী ওটা? বোধহয় বেড়াল। মাছের কাঁটা টেনে নিয়ে এসেছে। তক্তপোষে টকাটক আঙুল ঠুকে কল্পনা বেড়ালটাকে তাড়াতে চেষ্টা করল। আঃ কখন যে মোরগ ডাকবে, সকাল হবে, কুচকুচে রাতটাকে চিবিয়ে আকাশটার দাঁতের মাড়ি টকটকে হবে!

ফুলেশ কী যেন বলল, ঘুমের ঘোরে। ঘুমের ঘোরেই একটা পা তুলে দিল কল্পনার হাঁটুর ওপরে। ঝড়ে-ভাঙা খুঁটি চাপা পড়লে কলাগাছ থেঁতলে যায় নাকি? দম বন্ধ, দাঁতে-দাঁত, কল্পনা চুপ করে পড়ে রইল।

কবে আমি তোমাকে প্রথম দেখি অরুণ। আমার বিয়ে হয়েছে এই তিন বছর—তা হলে ঠিক পাঁচ বছর আগে। লীলাদি যেবার বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এল। সকাল গেছে হুলস্থুলু কান্নাকাটিতে, দুপুরে লীলাদিকে দেখতে গেলুম। লীলাদি কাঁদছিল না। চুপ করে শুয়ে ছিল, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। আমাকে দেখে ফিরে তাকাল, হাসল। কালোপাড় শাড়ি, গলায় সরু হার, হাতে এক গাছি করে চুড়ি।

খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছিল লীলাদির। বর এখানকার সব ক'টা পাশ দিয়ে আরও কী শিখতে বিলেত গিয়েছিল। সেখানে বরফ জলের কোন হ্রদে নৌকো বাইতে গিয়ে ডুবে মরেছে। চোখের জল মুছছিল আর বলছিল লীলাদি। অ্যালবাম খুলে ফটো দেখিয়েছিল। তখনই ত সেই গন্ধটা আমি প্রথম পেলাম। নানা বয়সের ছবি ওর বরের, পাসের পোশাকের; বিয়ের সময়কার—ধুতি সাদা চাদর, টোপর: বিলাতের—ছিপছিপে, ফর্সা, চমৎকার ছাঁটা কাটা পোশাক, অল্প অল্প হাসি। ওলটানো চুল, একটু ফাঁপানো, ঠিক আড়াইটে ঢেউ। মরা ফুলের পাপড়িটা পাতার ভাঁজে রেখে অ্যালবামটা মুড়ে লীলাদিকে ফিরিয়ে দিলাম।

অরুণ, তোমাকে সেদিনই কি প্রথম দেখি? আর সেই গন্ধ! বাড়ি ফিরে গা শুঁকেছি, গন্ধ তবে আমাদের। মা-ও হতে পারে। চুলে যে মেথিফুলের গন্ধতেলটি, হয়ত তার। কড়কড়ে ভাঁজভাঙা শাড়িরও একটা গন্ধ আছে। ছাদ থেকে ঝুঁকে পড়ে একটা ডাল ভাঙলুম। সবুজ পাতা চটকাতে ইচ্ছে হল।

খুব আলগোছে ছুঁয়ে-যাওয়া হাওয়া দিচ্ছিল, ধুলো একটুও উড়ছিল না, অরুণ, তখনই তোমাকে সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলুম। মাথা তুললে একবার, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে ফের মুখ নীচু করলে।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম, একেবারে রান্নাঘরে। চমকে উঠে মা বলল, কীরে! বললুম, কিছু না। বুক তখনও ধুকপুক করছিল। মা আর কিছু বলল না। খুন্তি দিয়ে মাছভাজা উলটে দিতে দিতে বলল, খুকু, কাল তোকে দেখতে আসবে।

তারপর থেকে এক রকম রোজ।

সেদিন কারা এল, কী দেখল, কী জানতে চাইল সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না, আমার একবার মনে হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন অনেকটা তোমার মত দেখতে। এক কোণে বসেছিল, একটু লাজুক, চুরি করে চাইছিল। আমি ভাল করে তাকাতে পারিনি।

ওরা যেই গেল, আমি অমনই ছুটে উঠে গেলুম ছাদে। সেই মিষ্টি গন্ধটা তখন ছড়িয়ে পড়ছিল, বাচ্চা ছেলে ভারী বই নিয়ে যেমন করে—হাওয়া খুব হালকা হাতে গাছের পাতাগুলো উলটে পালটে দেখছিল।

তোমাকে দেখলাম। আজও তুমি একবার দাঁড়ালে। মাথা তুলে খুব সুন্দর করে হাসলে, অরুণ কী সাহস তোমার! সাহস আমারই বা কম কী, অচেনা মানুষের হাসি জমা রাখতে সেই এই ভেবেই কি সঙ্গে সঙ্গে হাসিটা ফিরিয়ে দিলুম?

সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ও হল, মাথা ফিরিয়ে দেখে নিলুম, মা বা আর কেউ দেখে ফেলেনি ত!

তারপর থেকে রোজ।

বিকেল হলেই গন্ধ ছড়াত, ছাদটা আমাকে ওপরে টেনে নিত। একবার থমকে দাঁড়ানো, হাসি বদলাবদলি। কথা নয়।

কিন্তু অরুণ, সাহসের সত্যিই সীমা নেই তোমার, থাকলে দুপুর বেলা জানালায় এসে টোকা দাও?

জ্বর হয়েছিল, গলা অবধি চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে ছিলুম। চোখ বন্ধ, মাথায় যন্ত্রণা। মা একবার এল, হাতে বার্লির বাটি, কপালে হাত দিয়ে দেখে দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল। অনেক কষ্টে চোখ মেললুম। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলুম ফটোটা, বালিশের নীচে লুকানো ছিল। লীলাদির বরের, অ্যালবাম থেকে চুরি করে, খুলে এনেছিলুম। খসখসে কাগজ, কিন্তু খুব চাপা একটা গন্ধ। আমাকে ওরা পছন্দ করে গেছে, যারা দেখে গিয়েছিল তারা। কী নাম আমার বরের? ফুলেশ কিংবা ওই রকমই যেন কী। দেখতে কি লাজুক-লাজুক সেই ছেলেটি ত নয়? জানি না।

টোকা শুনলুম, ধরতে পারিনি। আমার

চোখ বন্ধ করলুম। চোখ বুজেই টের পাচ্ছিলুম, কী একটা যেন পরিবর্তন ঘটছে ঘরটায়, জমাট ছায়া একটু করে ফিকে হয়ে আসছে। নিশ্বাসেরও শব্দ। কার?

চোখ মেলে দেখি, তুমি!

শিয়রে বসেছ, তোমার ফর্সা লম্বা আঙুল আমার হাত ছুঁয়ে। লজ্জা হল, পটপট করে জামার বোতাম আঁটলুম, উঠেও বসতে যাব, তুমি ইশারায় মানা করলে।

—কেউ দেখেনি? ক্লান্ত গলায় বলেই বাবার বিছানায় ঢলে পড়লুম। আমার হাত তখনও তোমার হাতে ধরা।

—কেউ না।

—এলে কী করে।

—সদর খোলা ছিল। ঠেলতেই খুলল। রা সকলে বোধহয় ঘুমিয়ে।

অনেক পরে বললুম, যদি দেখতে পেত?

তুমি শুনে শুধু হাসলে।

আস্তে আস্তে আবার বললুম, এলেই বা না। তুমি ত আমাকে চেন না?

—চিনি।

আর কোন কথা হল না, অনেকক্ষণ সব চুপ। তোমার মুখের একটা দিকই দেখতে পাচ্ছি। ঢেউ তোলা, অল্প অল্প সোনালীর ছিটে আছে।

—কী দেখছ?

—তোমাকে। কী সুন্দর তোমার চুল! একটু থেমে বললুম, তোমার সবই সুন্দর। সেই ঘি রঙের জামাটা আজ পরে এলে না কেন?

—তোমার পছন্দ?

—খুব। বলেই কনুই দিয়ে চোখ ঢাকলুম।

—বেশ, কাল সেটাই পরে আসব।

—কালও আসবে?

—রোজ। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তুমি বললে।

—অদ্ভুত লাগছে, আমি বললুম, একেবারে যেন বানানো-বানানো।—সত্যি রোজ আসবে?

মায়া-মায়া চোখ দুটি আরও বড় করে তুমি হাসলে। তোমার ঠাণ্ডা হাত কপালের ওপর রেখে বললুম, সত্যি তুমি যদি আবার আস, যদি কপালে হাত বুলিয়ে দাও আর আমি এইভাবে চোখ বুজে থাকতে পারি তা-হলে বোধহয় আমার অসুখ দুদিনেই সেরে যায়।

কী তেল তুমি চুলে মাখ, অরুণ, সেদিন বুঝতে পারিনি। তার সুবাস কিন্তু আমার নাকে, মুখে লাগছিল, আমার গলা আমার বুকের তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল।

সেদিন যতক্ষণ ছিলে ততক্ষণ তোমার হাতখানা আমার কপালে রেখেছিলে। এত কাছে তোমাকে এর আগে পাইনি, এত কাছ থেকে দেখিনি।

হো-হো করে হেসে উঠল কুলেশ, বলল, বটে! থিয়েটার দেখার সাধ হয়েছে? কিন্তু দুঃখিত, কী করব বল, আজ আমাকে ইভনিং ডিউটি দিয়েছে।

কল্পনা বলল, ও।

তা-ছাড়া, জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে পকেটটা বাইরে টেনে এনে কুলেশ বলল, তা ছাড়া দেখছ ত, আমার পকেট মনে মুখে এক? কুচো চিংড়ি এনে দিয়েছি, তাই খাও

আর চৌয়া ঢেকুর তোল। থিয়েটারের শখ এ-মাসের মত তোলা থাক।

—ও মাসেও তুমি এই কথাই বলেছিলে।

—আমি দু-কথা ত বলি না।

কুলেশ হাসছিল, দুটো চোখের পাতা তিরতির করে নড়ছিল, টেরছা হয়ে গিয়েছিল একটা চোখের চাউনি।

তারপর কুলেশ অনেকক্ষণ ধরে তেল মাখল, কুচকুচে চুলগুলো চুপচুপে করল। চান সেরে এসেই বলল, চটপট খেতে দাও। বার তিনেক ভাত চেয়ে চেয়ে খেল।

হাফ প্যান্টের তলায় খাকির শার্টটা যখন গুঁজছিল কুলেশ, কল্পনা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। এই রঙটা তার দু চোখের বিষ, হাফ প্যান্টও বিশ্রী। পুরুষকে বেমানানভাবে বালক করে রাখে। কুলেশ বলে, উপায় নেই, আমার যে কাজ তার এই হল উর্দি, শর্টস পরাই সরকারী নিয়ম।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কুলেশ চুকচুক করে আফশোস উচ্চারণ করছিল—এ'হে, সব উঠে যাচ্ছে—এবার থেকে শালার চুলে কবরেজী তেল লাগাব।

—বিচ্ছিরি গন্ধ হবে কিন্তু। দাগ পড়বে বালিশে।

—পড়ুক। তবু চুল ত টি'কবে।

গামছা দিয়ে শেষবারের মত কপাল আর ঘাড় ঘষে কুলেশ সোজা হয়ে দাঁড়াল। সব চুল পাটপাট, পরিপাটি। একটিও উড়ছে না।

হঠাৎ অরুণকে দেখতে পেয়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিল কল্পনা। অরুণ এখানেও আসবে সে ভাবতে পারেনি।

চিৎকার কারও কানে যায়নি। দরজা বন্ধ ছিল।

কিন্তু অরুণ এলই বা কী করে। পরে অনেক দিন ধরে ভেবেও কল্পনা কূলকিনারা পায়নি। মনে আছে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুপুরের খাওয়া সেরে পানটি মুখে পুরতেই শক্ত সুপুরির একটা ডেলা ঠেকল দাঁতে, মাথা কেমন যেন ঘুরে উঠল। এই সাড়ে বত্রিশভাজা বাড়িটা একবার দুলে উঠেই মিলিয়ে যেতে থাকল। সদর-রাস্তায় কুষ্ঠ-রোগী-টানা ঘর্ঘরঘর্ঘর কাঠের গাড়ি নেই, ঠনঠন বাসনওয়ালা নেই, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে পাড়া মাৎ করা ঝালাইকরের দোকানটাও চুপ করে গেছে। শব্দগুলো মুছে গেল একটু একটু করে, পরে রঙও মুছল। দেওয়ালে জবজব তেলের ছাপে আঁকা মোষের মাথাটা দেখা গেল না, কিছু সাহেবের পানের পিকের চিহ্ন ফিকে হতে থাকল। তখনই সেই ঘুম ঘুম গন্ধটা টের পেল কল্পনা। অনেক দিন পরে। চোখ মেলতেই দেখা পেল অরুণকে। কল্পনা চিৎকার করে উঠল।

অরুণ হাসছিল—যেভাবে হাসতে খালি অরুণই পারে। কয়েক পা এগিয়ে আসতে ওর চেহারা স্পষ্টতরও হল। দেয়ালের ভিতরে গাঁথা দেরাজটার ডালা আলগা হয়ে কাঁপছিল। কল্পনা এক দৃষ্টে চেয়েছিল সেদিকে। অন্যমনস্ক, অবাক।

—এই! কী দেখছ?

অরুণের কথায় হঠাৎ যেন লজ্জা পেল কল্পনা বলল, কিছু না। অরুণের বুকে মুখ লুকিয়ে আধো-আধো গলায় বলল, শুনলে তুমি বলবে পাগলামি। আমার অদ্ভুত একটা কথা মনে হয়েছিল।

—কী।

অনেক কষ্টে সংকোচ কাটিয়ে কল্পনা বল, ঘর অন্ধকার, দরজা ভেজানো। দেরাজের ডালা খোলা; মনে হয়েছিল তুমি যেন ওই দেরাজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলে।

দুষ্টু-দুষ্টু ধরনে হাসছিল অরুণ।—তাই ত এলাম। কিন্তু আর কাউকে বোলো না। কুলেশবাবু শুনলে বলবেন, তোমার চোখ খারাপ, মাথা খারাপ।

—ও তো ওই রকমই বলে! কিন্তু সত্যি তুমি কী করে এলে বলো না! দেরাজটা যদি বন্ধ থাকত?

—তা হলেও আসতাম। দেয়ালে ফুঁ দিতাম, ইট আলগা হয়ে যেত, আমি যে মন্ত্র জানি।

অরুণের গালে আদর করে একটা টোকা দিয়ে কল্পনা বলল, ঠাট্টা! বলেই দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল, ওদিকে মুখ ফিরিয়ে।

—এই! শুনতে পেল অরুণ বলছে, এই!

—উঁ।

—এদিকে ফের।

—তোমার সংগে কথা বলব না আমি।
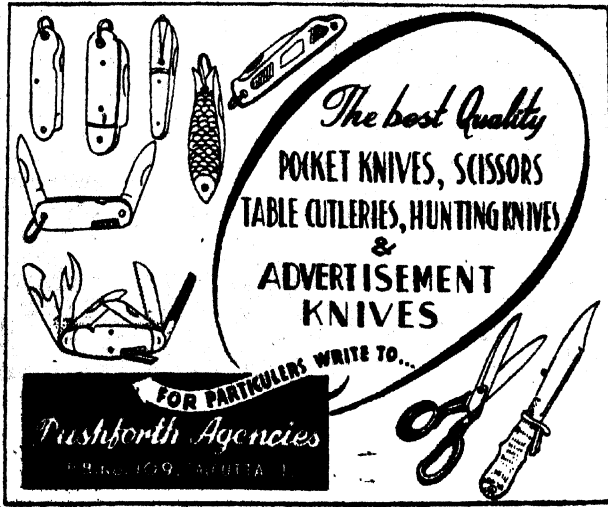
—ফের বলছি! অরুণের নিশ্বাস পড়ছে ওর কানের গোড়ায়। কল্পনার গায়ে কাঁটা দিল। সর্বনাশ, অরুণ কি শুয়ে পড়েছে নাকি, ওর পাশেই, এই বিছানায়? বালিশে যে কুলেশের লালার দাগ এখনও দেখতে পাওয়া যাবে। ঘরটা আধো-অন্ধকার তাই রক্ষা—কুশ্রিতা, আস্তর-খসা চেহারা—সব ঢাকা পড়ে গেছে।

—এই! তোমার বুক কাঁপছে কেন? হাত সরিয়ে দিয়ে কল্পনা বলল, কাঁপছে না তো!

—তুমি তো কাঁদছ!

—কাঁদব না? হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে কল্পনা বলল, কাঁদব না? আমার বিয়ে হয়েছে এই সাত মাস, এতদিনে তুমি প্রথম আসবার ফুরসুৎ পেলে?

অরুণ কিছু বলছিল না। কল্পনার একটা হাত টেনে নিয়ে এক-দুই করে যেন আঙুলগুলো বারে বারে গুনছিল।

—আমার বিয়েতেও ত তুমি আসনি!

অরুণ আস্তে আস্তে বলল, এসেছিলাম। তুমি দেখতে পাওনি। তোমাকে সাজিয়ে দিয়ে ওরা ঘিরে বসেছিল, মনে নেই? আমি সেই ঘরের বাইরের জানালায় দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছিলাম।

চকিতে কল্পনার কী যেন মনে পড়ে গেল। অস্ফুট, যেন মনে-মনে বলল, তখন বৃষ্টি পড়ছিল। একবার মনে হল বটে, ছায়ার মত কী যেন সরে গেল। সে তবে তুমি?

অরুণ বলল, আমি।

ওর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে কল্পনা বলল, তারপর?

—তারপর তোমাকে ওরা যখন পিঁড়িতে তুলে পাকে পাকে ঘোরাতে থাকল, তখন আমি চলে এলাম।

—তখন আমার মাথা ঘুরছিল। জান, শুভদৃষ্টির সময়ে আমি চমকে উঠি? আর-একটু হলেই ফিট হত।

—ফিট হত কেন?

—ও যে একটুও তোমার মত নয়! জানো অরুণ, বিয়ের সম্বন্ধ যখন ঠিক হল, আমি তখন থেকেই রোজ ভাবতাম, বর কেমন হবে। ভাবতাম, যদি এমন হয় যে, বিয়ের সময় চোখ তুলে দেখি, তুমিই টোপর পরে আমার সামনে? তা হলে খুব মজা হয়। তা সে-সব ত হল না, স্বপ্ন কি আর সত্যিই ফলে? তোমাদের কুলেশবাবু একেবারে আলাদা জাতের। যাক গে, অরুণ, তুমি এতদিনে বুঝি আমার ঠিকানা পেলে?

—এতদিনে পেলাম।

হঠাৎ পাখির মত ঝটপট করে উঠল কল্পনা, পাখির মত কলকল ভাষাতে বলল, বললে বিশ্বাস করবে না অরুণ, কিন্তু আমি জানতাম আজ তুমি আসবে।

—কী করে?

—চান করে এসে ধোয়া শাড়ি একটাও পেলাম না। সব ছিঁড়ে এসেছে। তখন তখন বাক্স খুলে সব লাট করে ফেললাম। নেই। খুললাম সবচেয়ে নীচের সবচেয়ে ভারী তোরঙটা। বিয়ের পর সেটা আর খোলা হয়নি। হাতড়াতে গিয়ে সেই কাঠটা হাতে ঠেকল যে। লীলাদির ঘরের সেই ছবিটা, তোমাকে বলিনি?—বিলেতে গিয়ে ছাব্বিশ বছর বয়সে যে মারা গিয়েছিল। অরুণ, তোমার বয়সও ত ছাব্বিশ?

—তাতে কী?

—জানি না কী। আমার মন কেবলই বলল, তুমি আজ আসবে।

ওর আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে অরুণ বলল, মেয়েলি বিশ্বাস।
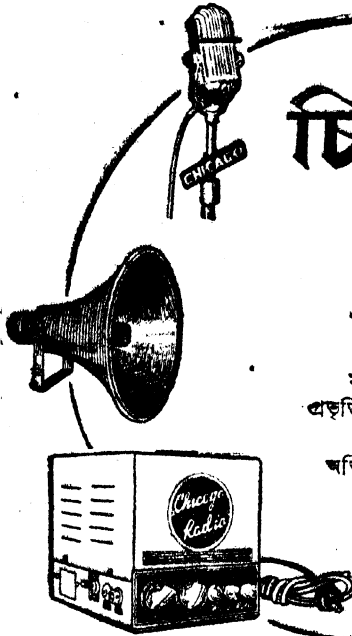
—যাই হোক, সেই ...

দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল ওদিকে মুখ ফিরিয়ে

বিশ্বাসেরই জিত হল তো! অরুণ তুমি সত্যিই ত আজ এলে।

বাইরের রাস্তায় তখনই কী একটা সোরগোল উঠল, চঞ্চল হয়ে অরুণ বলল, আজ আমি আসি।

কিন্তু দু হাতে ওর কোমর জড়িয়ে কোলে মাথা রেখে ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে কল্পনা, ধরাধরা গলায় বলছে, না, তুমি এখনই যাবে না। থাকো, থাকো না আর-একটু। তুমি যতক্ষণ আছ, এই ভ্যানিলা সরবতের মত মিষ্টিমিষ্টি গন্ধটাও ততক্ষণ আছে অরুণ। তুমি থাকলে কী ভাল যে লাগে। আমাকে তুমি জড়িয়ে নাও, ছেয়ে থাক, অনেক নিয়েও অনেক তুমি ফিরিয়ে দিতে পার।

—আমি এবার চলি, কল্পনা।

ক্ষুণ্ণ, একটু-বা আহত গলায় কল্পনা বলল, এস। সারাক্ষণ ধরে ত রাখতে পারব না। বেলা গেল, কলে জল এল, এখুনি ঠিকে ঝি আসবে, আমিও এবার উঠব। আমাদের দশ ঘরের কলতলায় সার দিয়ে দাঁড়াতে হয়, এর পর গেলে গা ধুতে পারব না। উনুনে আঁচ দেবার আগেই হয়ত দেখব আমাদের রাবু হুট করে হাজির হয়েছেন। কাল আবার এস, কেমন? কখন আসবে বলো ত, কোন্ রাস্তায়? দরজা খুলে রাখব?

রহস্যময় ধরনে হেসে অরুণ বলল, দরকার নেই। এই মান্ধাতার বাড়িটার সব গুপ্ত পথ আমি চিনি। জানো, এটা দেড়শো বছর আগে তৈরি—এর তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ আছে, ইচ্ছে হলে গঙ্গায় চলে যেতে পার।

—সেখানে কী আছে?

—ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে।

—যদি চড়ে বসি?

—মাঝিরা কাছি খুলে দেবে, পাল তুলে দেবে।

—অরুণ, আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?

—যাব।

তুমি একটুও অরুণের মত না, তুমি একটুও অরুণের মত না। কল ঘরে গায়ে মগ্-মগ্ জল ঢালছিল কল্পনা আর বিড়-বিড় করে বলছিল। বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি এই কলতলাটা। শ্যাওলা-পড়া, আর-একটু হলেই আমি পিছলে পড়তাম। ঝাঁঝরির মুখ বন্ধ, পচাপচা গন্ধ। ঢুকলেই গা ঘিনঘিন করে। প্লাসটা কাজ করে না—নোংরা, নোংরা, ছিঃ! কে যেন টিনের ঝাঁপটায় টোকা দিল, বোধহয় কোণের ঘরের গিন্নী। অসভ্য, ইতর, ওর যেন আর তর সয় না। খুলব না, কিছুতে খুলব না আমি, এক ঘণ্টার মধ্যে বেরোব না, দেখি ও কী করে। আমরাও ভাড়া দিয়ে থাকি। টিনের ঝাঁপটায় একটা ফুটো হয়ে আছে, সেদিন দেখেছি। ওদের কেউ ওখানে চোখ রাখেনি ত! রাখলেই বা কী, আমি ত ভিজে গামছা গায়ে জড়িয়ে আছি।

তুমি একটুও ওর মত নও, কল্পনা বলছিল নিজের মনে, ঘরে ফিরে আসার পরেও, কাপড় ছেড়ে যখন চুল বাঁধা হয়ে গেছে তখনও। রান্নাঘরে কড়াটা হ্যাঁক হ্যাঁক করছিল, পুড়ুক, পুড়ুক, তোমাকে আমি পোড়া ছেঁচকিই ধরে দেব।

তুমি ওর মত একটুও না। সে আমি প্রথম দিন থেকেই টের পেয়েছি। বিয়ের পরদিন সকালেই গরম নুন জলে বিকট আওয়াজ করে তুমি গার্গল করছিলে। সেটা অবিশ্যি এমন কিছু খাপছাড়া ব্যাপার নয়, তবু আমার কানে খারাপ ঠেকেছিল। ঘরে ঢুকে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে তুমি বোকার মত দাঁত বার করে বললে, শ্লেষ্মার ধাত কিনা, অনেক দিনের, তাই সকালে আমার নুন-গরমজল চাই-ই চাই।

পানের ছোপ লাগা দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক—চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম।

ঘর করতে এলাম, ঠিক পনেরো দিন পর। ছত্রিশ ভাড়াটের এক বাড়ি, কী ঘুপচি, কী ঝুরঝুরে, কী পাথর চাপা। এই আমাদের বাসা?

লজ্জার লেশ নেই, বেহায়া, তুমি হাসতে হাসতেই বললে, আবার কী। আমার যা রোজগার তাতে এর চেয়ে ভাল বাসা মেলে না।

দাঁতে দাঁত চেপে শুনলুম। তোমার রোজগার ঠিক কত? তাও টের পেতে পেতে দেরি হল না। বিয়ের আগে শুনে-

ছিলুম মাইনে চারশো না সাড়ে চারশো, বিয়ের পরে এই ক' মাসে এক সংগে দেড়শোর বেশি দেখিনি। তাও মাইনে নয়, কমিশন। কোন্ ঠিকেদারের হয়ে কুলি খাটাও, তার দালালি।

সকালে উঠি, উনুন ধরাই, চা গিলি, তোমাকে গেলাই, মাছ কুটি, ফ্যান গালি, ফোস্কা পড়ে তবু উহু-আহা করিনে, ভিড় ঠেলে কোনদিন চান করা হল ত হল, নইলে, সমস্ত দুপুর চুল ছিঁড়ে পাকিয়ে মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করি, বিকেলে হাওয়া যদি দিল ত গা জুড়োল, বিষ্টি নামল ত সব ভাসল—একেবারে রসাতল, সারা রাত্তির মাদুর বালিশ ঘরের এ-কোণে-ও কোণে টানা-টানি। সাপে যে কাটেনি, কাঁকড়াবিছে আজও কামড়ায়নি, সে নেহাৎ পরমায়ুর জোরে।

শব্দ করে থুথু ফেলল কল্পনা, পাথার ডাঁটি পিঠে ঢুকিয়ে ঘামাচি মারল। তুমি আমাকে ঘামাচি দিয়েছ, তুমি আমাকে ছোট করেছ, যে ফিরিস্তি দিলুম, তা তো শুনলে। এর কোন্‌টাকে বাঁচা বলে।

কোনোটাকে না। এ বাড়িতে একটা বই নেই যে পড়ি। একটা পত্রিকা নেই যে পাতা উলটে সময় কাটাই। অথচ বই পড়তে আগে কী ভালই না বাসতাম! একটা নেশার মত ছিল।

গা ধুয়ে বসে আছি, এখন তুমি আসবে না। থিয়েটারে যেতে চেয়েছিলাম, তোমার আজ সময় হল না, ইভনিং ডিউটি। সময় হলেই বা কী হত। তোমার সংগে বেড়ানোর কত সুখ তা হাড়ে হাড়ে জানি।

সেবার পুজোর সময় হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে পায়ের খিল খুলিয়ে দিয়ে ছেড়েছিলে। পাশ দিয়ে কত বাস যাবে আমরা উঠব না, রিক্সা চলবে, আমরা নেব না, তুমি খালি বলবে, আর-একটু আর-একটু। চার আনা বাঁচিয়ে সেই পয়সায় একটা সস্তা চায়ের দোকানে তুমি চা খাওয়াবে। সে-সব দোকানে খুপরি থাকে না, কাটা দরজা থাকে না, কোন লজ্জা নেই।

ঠাণ্ডা একটা দোকানে বসে আইসক্রীম খাব—আমার অনেক দিনের এই ছোট্ট শখ আজও মিটল না।

কুলেশবাবু, তুমি একটুও অরুণের মত নও। যখন ধর, তখন পিষে মার, গোগ্রাসে ভাত গেলার মত কর। যত ছাড়, তখন সারা শরীরে বাথা, একটুও ভাল লাগে না। অথচ অরুণ—সে তার ছোঁয়া সমস্ত দেহে-মনে ফুলের মত ছড়িয়ে দেয়।
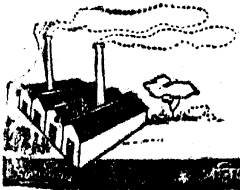
—তুমি থাকো এখানেই, এই চিলে কোঠায়? কই, কোনদিন ত বলনি?

—জানতুম তুমি একদিন জেনে ফেলবে, আর তাইতেই বেশি মজা।

—তিনতলার ওপর এই ছোট্ট ঘরটা ভাড়া নিয়েছ কেন?

—তোমার কাছে হবে বলে।

—ও। জান, আমি রোজই তুমি বেরিয়ে যেতে উঁকি দিয়ে দেখতে চেয়েছি তুমি কোনদিকে যাও। দেখতে পাইনি তুমি কি হাওয়ার মত চল, হাওয়াতে মিলিয়ে যাও?

—যা খুশি তুমি ভেবে নাও।

—জান, ক'দিন থেকেই আমার কেমন লাগছিল। অনেক রাত, শুয়ে আছি, ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। সেদিন হঠাৎ একটা ছায়া দেখলুম। মনে হল, অরুণ, তোমার মত, যেন তুমি। পায়চারি করছ। আমি চেয়েই রইলুম যতক্ষণ পারি। জোৎস্না তার সঙ্গে ছাদের ওপাশে পড়ে গেল। অন্ধকারে

মনে হল, তুমি যেন চিলেকোঠায় ঢুকে গেলে। ঠিক সেখানে?

—ঠিক।

—পর পর তিন দিন। তাই তো আজ দুপুরে পা টিপে টিপে উঠে এলাম। কী সুন্দর ছাদ, এতদিন কেন যে উঠিনি! জান, ওরা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। আদ্যিকালের বাড়ি ত এটা—এই চিলে কোঠায় কবে নাকি কে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। সেই থেকে এটা বন্ধ থাকে। কে যেন থেকে থেকে ধুপধুপ করে নাচে—কই এই যে আজ আমি এলাম, দরজা ঠেলে ঢুকলাম, কিছু নেই ত! তোমাকে পেয়ে গেলাম। ইদুর না, চামচিকে না, হাড়গোড় না, ধবধবে বিছানাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ফুল তোলা বালিশ, চাদরে ফুল ছড়ানো, তোমার ঘর ত অরুণ, এ-রকম ত হবেই। ধবধবে দেয়াল, ধূপ পুড়ছে, ধোঁয়া উড়ছে। সারা দিনই কি এ-ঘরে ধূপের গন্ধ থাকে?

—এক সঙ্গে, কল্পনা, তোমার ক'টা কথার জবাব দেব?

—দিও না, শুধু শুনে যাও। আমার কী-যে মজা লাগছে, নিজেকে হালকা মনে হচ্ছে, এখন বোধহয় আমি পাখি হয়ে উড়ে যেতে পারি। তোমার কাছে আসতে ওই জন্যেই ত ভাল লাগে অরুণ, সব ভার নেমে যায়। যা হতে চাই, তাই হতে পারি, যা চাই তাই পাই। ইচ্ছে হলে তোমার হাত ধরে ধরে তরতর করে নেমে এখনই আইস-ক্রীম খেয়ে আসতে পারি, আর শো-কেসের সেই আগুন রঙের শাড়িটা? আঙুল দিয়ে দেখালেই তুমি আমাকে কিনে দেবে, জানি, দেবে না?

—দেব।

—তাই ত বলছি। আমাদের কুলেশবাবুর মত পায়ে পায়ে পয়সার হিসেব তোমাকে করতে হয় না, আর সেই জন্যেই ত অরুণ, তুমি অরুণ। তুমি ট্যাক্সি চাপিয়ে আমাকে ময়দানের হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেতে পার, কিংবা তার চেয়েও আরও দূরে। পার না?

—পারি।

—তবে চুপে চুপে তোমাকে বলছি, চল না। সেই যে সুড়ঙ্গ পথের কথা বলেছিলে, তা কি সত্যি? আমরা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উঠব, নৌকো খুলে দেবে, তারপর—তারপর কী? খিলখিল হাসি, আর হাততালি। আমরা যাবই—এই ঘিনঘিনে ঘর থেকে তুমি বাইরে নিয়ে যাবেই। তুমি যেদিন বলবে সেদিনই দেখবে আমি তৈরি। এখানে আমি তিলে তিলে মরছি, মরে আছি, অরুণ তোমার একটু মায়া হয় না!

—হয়, কল্পনা।

—আঃ, তোমার হাত কী ঠাণ্ডা! আর একটু রাখ আমার কপালে, তোমার গাল আমার গালে রাখ। তোমার গা কখনও ঘামে না, গন্ধ হয় না, গেঞ্জি জবজবে হয় না, সব সময়েই ফুরফুরে সোনালী চুল উড়ে—সত্যি কী অদ্ভুত তুমি। আর তোমার চোখের রঙ—তুমি জান না অরুণ, ওই টলটলে নীল চোখ দুটো তোমাকে কতখানি মায়াবী করেছে।

কল্পনা ফুঁসছিল, আর বলছিল, মিথ্যুক, মিথ্যুক, কোথাকার।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘষছিল কুলেশ আর হাসছিল—মিথ্যে কেন হবে। এই ত রয়েছে ডাক্তারের রিপোর্ট, পড়ে দেখ না।

কাগজটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে কল্পনা বলল,

চাইনে দেখতে। জানোয়ার, ছোটলোক! খাঁচায় আমাকে পুরেছ, তাতেও আশ মেটেনি। এবার একেবারে শেকল পরিয়ে রাখতে চাও?

হাসতে হাসতেই বেরিয়ে গেল কুলেশ, কল্পনা তখনও ফুঁসছিল। টলতে টলতে এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। বালিশে মুখ ডুবিয়ে দিল। চোখ কেটে কেটে নোনা জল ফেটে পড়ছে। রিপোর্টেই বা দরকার কী, সে-ত নিজেই জানে। চোখের কোণে কালির ছোপ, সব কিছুতেই অরুচি, এর মানে তার নিজেরও যে অজানা তা-তো নয়। রিপোর্ট শুধু ভয়টাকেই পাকা করেছে।

কুলেশ হাসছিল—পশু। ওর হাসি, দাঁড়াও, ঘুচিয়ে দিচ্ছি। চোখ রগড়ে উঠে বসল কল্পনা। ওকে জব্দ করতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে শেকল পরাতে চাইলেই পরানো যায় না, শেকল কাটারও ফিকির আছে। ওষুধ আছে। সেই ওষুধ আনিয়ে নিতে হবে। অরুণকে বললেই—

অ-রু-ণ! হাত-পা আবার হিম হয়ে গেল কল্পনার। অরুণ আর কি আসবে? এলেও দু-হাতে মুখ ঢেকে কল্পনাকে ছুটে পালাতে হবে—এ মুখ অরুণকে সে কী করে দেখায়! বুকের তামাটে চাকতি দুটো কুচকুচে কালো হবে, কোমরটাকে দেখাবে ফাঁপানো ফানুসের মত, তখন অরুণই কি ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে না! তারপর এই আটসাট বিছানার মত বাঁধা শরীরটা খুলে গিয়ে তুলো ঝুরঝুরে তোষকের চেহারা নেবে, তার আগে কি মরণ হয় না কল্পনার?

চোখ জলে টসটস করছিল, কল্পনা আবার উবুড় হয়ে পড়ে বালিশে ডুব দিল। পিঠ ফুলে ফুলে উঠছিল, পেটের নাড়ীসুদ্ধ গলায় এসে ঠেকেছে, মাথা ঘুরছে, আঃ এই সময়ে একবার যদি আসত অরুণ, কোলে ওর মাথা টেনে নিত, হাত বুলিয়ে দিত কপালে, সব জ্বালা নিমেষে জুড়িয়ে যেত। লজ্জা? না, লজ্জার সময় এখন নয়।

অরুণের হাত দুটি চেপে ধরত কল্পনা, এখনও সময় আছে, ওকে অরুণ নিয়ে যাক যেখানে খুশি, এই কাঁটার কষ্ট থেকে রেহাই দিক।

কিন্তু অরুণ এল না।

একবার চোখ মেলে কল্পনা দেখতে পেল কুলেশকে। ময়লা গেঞ্জিটা সে তুলে নিয়ে নাকের কাছে ধরল, মুখ শিটকে তবু পরল সেটাকেই. তারপর সেই হাঁটু বের করা প্যান্টটার বেলট কষে আঁটল। কুচকুচে চুল, রোমশ হাত—কল্পনা সেই হাতে যেন একটা সাঁড়াশি দেখতে পেল। এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসবে লোকটা, ওই সাঁড়াশি দিয়ে তার কণ্ঠনালী চেপে ধরবে।

কল্পনা ভয়ে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠল।

এস অরুণ, বোস। না-না এখানে নয়, ওই মোড়াটা টেনে বোস। দেখছ না, এই বিছানাটা কী নোংরা, তা-ছাড়া নীলুর ঘুম ভেঙে যাবে। ওর ঘুম পাতলা, থেকে থেকে চমকে ওঠে, জেগে উঠলে আমাকে খাবে। কত বড় হাঁ দেখছ না, এটা একটা খুদে রাক্ খোস।

তা-ছাড়া বিছানার অর্ধেকটায় অয়েল ক্লথ পাতা, তুমি বসবেই বা কোথায়। গন্ধ তোমার নাকে যাবে, তুমি যা শৌখীন অরুণ, রুমালে নাক ঢাকবে। নীলুর বাবার অবিশ্যি অত ঘেন্নাপিত্তি নেই, চেনো ত, ওরই ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে চটকে চটকে বাচ্চাটাকে শেষ করে ফেলে।

অরুণ, তুমি অনেক দিন পরে এলে। শেষবার যেদিন আস, সেদিন ওই ক্যালেণ্ডারটার সব কটা পাতা ছিল, এখন আছে একটা।

সেই প্রথম দিককার যন্ত্রণা আর লজ্জা তুমি জান না। নিজেকে লুকিয়ে রাখতাম আর কাঁদতাম। দুপুরে যখন কেউ নেই, এই ঘরটা ছাই-ছাই রঙের হয়ে গেছে, তখন বারবার দেয়ালটার দিকে, দেরাজটার দিকে চেয়ে থেকেছি। সেই ম্যাজিকটা, ভাবতাম, এবার ঘটবে। দেরাজের পাল্লা কাঁপবে, তুমি, বরাবর একরকমের তুমি, বেরিয়ে আসবে।

তুমি একদিনও আসনি কেন, অরুণ? কোথায় পালিয়েছিলে? রাত্রে ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, তোমাকে পায়চারি করতে দেখা যায় কি না। যায়নি। চিলে কোঠাটা ফের ভুতুড়ে হয়ে গেছে।

ভাবতেও পারবে না অরুণ, তখন রোজ তোমাকে কত ডেকেছি। বাচ্চাটা ভেতরে নড়ে নড়ে উঠত, সেটাই অসহ্য লাগত। একটা ভয়ানক ফন্দীও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। তুমি এলে দুজনে পরামর্শ করে সেটা কাজে লাগাব ভেবেছিলাম।

তুমি এলে না। তখন ভাবলাম বিষ খাব। মরীয়া হয়ে একবার ভেবেছি, ছাদে যাব, তোমার চিলে কোঠার দরজায় টোকা দেব। কিন্তু সিঁড়ির মুখ থেকে ফিরে এসেছি। এ অবস্থায় নাকি সন্ধ্যার পর ছাদে যেতে নেই। তা-ছাড়া আস্তে আস্তে আমার কেমন ধারণা হয়েছিল, ওই চিলে কোঠাতে তুমি আর নেই। ছেড়ে গিয়েছ।

ঠিক না?

ভালই হয়েছে, অরুণ তুমি আসনি। এলে সবশেষে কোন্‌ বুদ্ধিতে কী করে বসতাম ঠিক কী!

দেখ তো অরুণ—না-না আমাকে ছুঁতে বলছি না, শুধু চেয়ে দেখে বল—আমি খুব রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছি, কেমন? মাথার চুল—ঢের উঠে গেছে, রোজই যাচ্ছে, কী করি। তোমার চুল কিন্তু ঠিক তেমনি আছে, ঢেউ খেলানো, সোনালী-সোনালী। দেখি তোমার চোখ দেখি? তেমনি নীল। অরুণ তোমার বয়স একটুও বাড়ে না।

হাসপাতাল থেকে ফিরেছি—তাও প্রায় দিন দশেক হয়ে গেল, এখনও ভাল করে চলাফেরা করতে পারি না। দুটো টনিক আছে, তা থাকলে হবে কী, সারারাত এই ডাকাতটা যে জাগিয়ে রাখে। গলা ফাটিয়ে যখন চেঁচায় পাড়াসুদ্ধ সাড়া পড়ে, কে বলবে মোটে এক মাসও পোরেনি। আগেকার মেজাজ থাকলে কী করতাম জানি না, এখন—এখন কিন্তু অতিষ্ঠ হলেও একবারও ওটাকে গলা টিপে মারতে ইচ্ছে হয় না। আসল কথা তোমাকে খোলাখুলি বলব? পেটে থাকতে যেটা ছিল কাঁটা, মাটিতে পড়তেই দেখি, আরে কাঁটা ত নয়, ফুল!

তেল মাখাই, টিপে টিপে দেখি, নরম তুলতুলে। তোমার মত একটুও নয় কিন্তু, সব ওর বাবার মত পেয়েছে। ওই রকমই গাট্টাগোট্টা হবে আর কী।

ওর বাবা, তোমাদের কুলেশবাবুকে তুমি হালে বোধহয় দেখনি। খুব রোগা হয়ে গেছে। ভাবনায়, খাটুনিতে। খুব খাটছে যে। নিজে রাঁধছে, হাত পুড়িয়ে, তবু আমাকে রান্নাঘরে যেতে দেয়নি। রোজই একটা-না-একটা ওষুধ আনবে, নয়ত আঙুর, কিংবা অন্য কোন ফল। অথচ নিজের দিকে নজর নেই। বলে, আর কিছু দেখতে হবে না, তোমার ছেলেকে তুমি সামলাও। ছেলে হয়েছে কিনা, তাতে আবার নিজের মত দেখতে, বাবুর গর্ব খুব।

সত্যি বলতে কী অরুণ, ওকে, তোমাদের কুলেশবাবুকে, এদিক থেকে আমি কোনদিন দেখিনি। সারাদিন যে খাটে, যেখান থেকে যা পারে কুড়িয়ে সংসারে আনে, আমার জন্যে, ওর ছেলের জন্যে। কী যেন বদলে গেছে, হয়ত ও নিজেই। কিংবা ও যা ছিল তাই আছে, বদলে গেছে আমার দেখার ঢঙ।

একটু মাথা যখনই তুলতে পারব অরুণ, গায়ে জোর পাব, তখনই রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকব। ওকে ঘরে বাইরে খেটে খেটে শেষ হতে দেব না।

অরুণ, তুমি উঠছ? নীলুটা কেমন হাসছে, যাবার আগে একবার দেখে যাও। ঘুমের ঘোরেই ওমনি হাসে। ওরা ভগবানের সঙ্গে কথা বলে, না?

অরুণ, উঠো না, আর-একটু বোসো। বকবক করে তোমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি, জানি। খানিক পরে ও জেগে উঠে চেঁচাবে, ওকে দুধ খাওয়াতে বসব, তখন ত যেতেই হবে তোমাকে। তার আগে বরং আরও একটু বসেই গেলে।

না-না, ভয় পেও না। আমাকে নিয়ে পালাতে আর বলব না। আগে খুব পাগলামি করতাম, না? চাইলেই বা আর পালাতে দিচ্ছে কে। দেখছ বটে ছোট ছোট হাত, ওর কিন্তু জোর খুব। আঁকড়ে যখন ধরে, ছাড়ানো মুশকিল।

কী করি বল, আর উপায় নেই। বলেছি ত, একটু সেরে উঠলে আমি রান্নাঘরে ঢুকব, ময়লা বিছানার চাদর রোজ সকালে রোদ্দুরে দেব। সেই চাদর তুলে টানটান করে পাতব বিকেলে। শোব। জানি কোন কোন দিন সকালে শরীরটাকে নিংড়ে নেওয়া, ছিবড়ের মত ঠেকবে, তবু ভোরে উঠতেই হবে, রান্না চাপাব, কুটনো কুটতে গিয়ে আঙুল কেটে, রক্ত বেরুতে পারে; ফ্যান গালতে গিয়ে হয়ত পায়ের পাতা দগদগে হবে, ঘেমে নেয়ে উঠব, ঘাম মুছেও ফেলব। কিন্তু পালাব না।

—কল্পনা, আমি এবার যাই। আমাকে তোমার ত আর দরকার নেই।

—নেই? কী জানি, বলাও যায় না। হয়ত আছে। মাঝে মাঝেই তোমাকে ডাকতে হবে। পালাব না বটে, কিন্তু এটাও ত ঠিক, কোন-কোন দিন খুব একঘেয়ে ঠেকবে, ছটফট করব। যখনই দম বন্ধ হবে, অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, তখনই চাইব তাকে, যার চোখ নীল, মুখে মায়াবী হাসি, সুন্দর সোনালী চুল বাতাসে ওড়ে; যে কখনো রেগে যায় না, ঘামে না, হাঁপায় না, হিসেব করে যাকে খরচ করতে হয় না। আলগা একটা ছোঁয়া দিয়ে যে ছেয়ে রাখে। যেদিনই দুপুরটা অসহ্য হবে, সেদিনই অরুণ, জানি, ওই দেরাজের ডালা কাঁপবে, হঠাৎ সুবাস ছড়িয়ে পড়বে, তুমি বেরিয়ে আসবে। ওই য়্যালবাম থেকে। বরাবর যেমন এসেছো, কিংবা আমিই টেনে এনেছি তোমাকে।
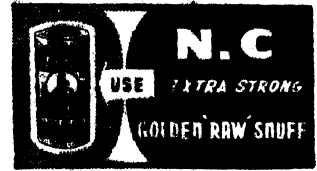
কণ্ঠস্বর * সুশীল রায়

আমার খুব দুর্নাম রটে গিয়েছে। বন্ধুবান্ধবরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে। তাদের কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি, যাকে নাকি বলে সিম-প্যাথি, তো পাইনে, উপরন্তু তারা আমাকে গঞ্জনা দেয় নানা রকম।

হরগোবিন্দ বলে, "ভূপতিটা পুরুষ-মানুষই না। একটা মেয়ের প্রেম থেকে বঞ্চিত হলেই এমন উদাসীন আর উড়নচণ্ডে হয়ে যেতে হবে? লোকে বলতেই বলে—দেশে দেশে কলত্রাণি।"

তাকে সায় দেয় ত্রিদিবেশ, সে একটা গল্প বলে তার মেসোমশায়ের ভাইয়ের জীবনের। সে ভদ্রলোক নাকি সত্যিকারের এক সাচ্চা পুরুষ, যাকে বলে ম্যাস্কুলিন জেন্ডার। একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি, কিন্তু আজ-বলি-কাল-বলি করতে করতে একদিন দুম করে কথাটা তাকে বলে ফেলতেই মেয়েটা ফোঁস করে উঠল। মেসোমশায়ের ভাই সেই কুলোপানা চক্র দেখে ডরালেন না, তার মুখের উপরেই নাকি বলে দিলেন — অত অহংকার ভালো না। তোমাকে ভালো লেগেছিল এ তোমার ভাগ্য। বেশ, দেখে নিয়ো তোমার চেয়ে তিনগুণ ভালো মেয়ে বিয়ে করব পাঁচ দিনের মধ্যে। মেসোমশায়ের ভাই নাকি সেই মরদ-কা-বাত রেখেছিলেন, এবং সেই অহংকারী মেয়েকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসে তাঁকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল।

হরবিলাস জিজ্ঞাসা করল, "কান্না কেন?"

ত্রিদিবেশ বলল, "কাঁদবে না? মেয়েটি গিয়েছিল তার দর বাড়াতে। কিন্তু দেখল তার দর কানাকড়ি। অমন সুপাত্রটা হাত থেকে ফসকে গেলে কোন্ মেয়ের কান্না না আসে বল্।"

যেখানে বসে এসব আলোচনা চলছিল সেটা একটা হোমিওপ্যাথ ডাক্তারখানা। ডাক্তারবাবুর নাম মহেশচন্দ্র বাজপেয়ী। মানুষটির বয়স অনেক, কিন্তু বড় আমুদে। মাথার সব চুল সাদা ধবধবে, দাড়ি-গোঁফও সাদা; কিন্তু তামাক টেনে টেনে গোঁফের খানিকটা জায়গা হলদে হয়ে গিয়েছে।

তিনি সব শুনছিলেন, এতক্ষণে তিনি হাসলেন, বললেন, "সেকাল কি আর আছে হে? এখন প্রেম হয়ে গেছে সস্তা। ছেলে-মেয়েরা এখন যত্রতত্র মেলামেশা করতে পারছে—কত সুবিধে। এখন ইচ্ছে হলেই প্রেমে পড়া যায়, মনের কথাটা বাস্-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে বলে ফেলাও যায়। কিন্তু আমাদের আমল ছিল আলাদা। তখন প্রেমে পড়াটাই ছিল মস্ত অ্যাডভেঞ্চার, প্রেমের স্বাদও ছিল তখন আলাদা। যদি কোনো মেয়ের প্রেমে তখন পড়া যেত, এবং যদি সুযোগ বুঝে হঠাৎ মনের কথাটার একটু আভাস মাত্র জানানো যেত তা হলে তার দরুন বুকের দুরুদুরানি থামাতে লাগত একটা মাস। এখন তোমাদের প্রেম কেমন? না — এক পক্ষ বলল, আমি তোমাকে ভালোবাসি; অপর পক্ষ বলল, তাই নাকি? আচ্ছা। আর, পরের দিনই হয়ে গেল রেজি-স্ট্রেশন। প্রেম এখন কেউ চেখে দেখে না; পাওয়া মাত্র গিলে ফেলে। বলো, এতে কোনো টেস্ট তার পাওয়া যায়! মাস-ভোর বুক দুরু-দুরানির কষ্টটাই প্রেমের প্রথম পুরস্কার।"

মহেশবাবু এ-রকমের পুরস্কার কখনো পেয়েছেন কি না, পেলেও কতবার পেয়ে-ছেন—সেসব কথা আর জানা হয়নি।

বন্ধুবান্ধবরা আমার হালচাল দেখে, আমাকে পুরুষমানুষ বলে তো না-ই, যেন মানুষ বলেও গ্রাহ্য করতে নারাজ। অপরাধের মধ্যে আমি একটু উদাসীন হয়ে পড়েছি, অনেক সময় দাড়ি কামাতে ভুলে যাচ্ছি, চুল যে বহুদিন ছাঁটা হয়নি, সে খেয়ালও থাকছে না। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরতাম, কিছুদিন থেকে তাও নাকি বর্জন করেছি। স্বীকার করি, আমি সত্যিই যেন কেমন হয়ে গিয়েছি। কিন্তু এ-রকম কেন হলাম, বন্ধুরা তা জিজ্ঞাসাও করেনি, জিজ্ঞাসা করলেও ঠিক বলতে পারতেম কিনা জানিনে।

ওরা জানত — বহুদিন থেকে আমার প্রেম

চলেছে একটি মেয়ের সঙ্গে। ওরা ভুল জানত না।

আমার বয়স যখন আঠারো তখন আমি প্রথম প্রেমে পড়ি। নীলিমার বয়স তখন পনেরো।

পাশের বাড়ির মেয়ে সে নয়, অত সহজে অর্জন করা নয় সে। আমার এক দাদার বিয়েতে গিয়েছিলাম সিরাজগঞ্জে। জায়গাটা নতুন, বয়সটাও নতুন; তাই মেজাজটাও খুব নতুন ঠেকছিল। গলায় গান আসে-কি-না-আসে সে হিসাবই ছিল না। বরযাত্রীদের জন্যে যে বাসাবাড়ি ঠিক হয়েছে তারই একটা লম্বা ঘরে মেঝের উপর টানা বিছানায় আমরা রাতটা কাটালাম। সকালে সেই বিছানাটাই হয়ে গেল ফরাস। ফরাসে বসে সামনে সুট-কেস খুলে নিয়ে — না, কামাবার মত দাড়ি তখন গজায়নি—প্রসাধন সেরে নিয়ে বারান্দায় বসে ধরলাম গান। বিয়ে-বাড়িটাও লাগোয়া। একটু বাদে চেয়ে দেখি, এক ঝাঁক মেয়ে ও-বাড়ির বেড়ার ও-ধারে দাঁড়িয়ে এই গান শুনছে। হঠাৎ চোখ পড়ল তাদের দিকে। আমি তাকানো মাত্র ওরা এক ঝাঁক শালিকের মত ঝট করে পালিয়ে গেল। দাদার শ্যালিকা ওরা হতে পারে বলে ওদের দেখে শালিকের কথা মনে পড়েনি, ওদের পরনের শাড়ির রং দেখে আর ওদের ঝাঁক বেঁধে পালাবার রকম দেখে মনে পড়েছে।

এতগুলো শ্রোতা সহজে জুটে যাওয়ায় গানের তোড় বেড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু এতে ফল হল উলটো — সারাদিনের মধ্যে আর গান গাইনি।

বিকেলবেলা আমরা যখন বিয়ের আসরে যাওয়ার জন্যে নিজেদের তৈরি করছি, বর-যাত্রীরা আসল সাজে নিজেদের সাজিয়ে তোলার জন্যে কঠোর পরিশ্রমে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ চেয়ে দেখি — দরজায় এক ঝাঁক শালিক।

ওখানে দাঁড়িয়েই ওরা বলল, 'আমরা গান শুনব।"

সম্পর্কে আমার ভাগনে, বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়, তিনকড়ি। তিনকড়ি-ভাগনে দাড়ি কামাচ্ছিলেন, আয়না থেকে মুখ তুলে বললেন, "পয়সা লাগবে।"

ঐ ঝাঁকের মধ্যে থেকে একজন একটু ঝুঁকে বলল, "দেব। কিন্তু পরে।"

তিনকড়ি-ভাগনে বললেন, "ধারে কারবার এখানে হয় না।"

সেই মেয়েটিই আরো একটু ঝুঁকে বলল, "আজ ধার, কাল নগদ।"

তিনকড়ি-ভাগনে আমার দিকে চেয়ে এক চোখ একটু ছোট করে ইশারা করলেন— আরম্ভ কর।

কিন্তু আরম্ভ করতে পারলাম না। আমার গলা একেবারে ধরে গেল। বুক দুরুদুরু করে উঠল।

আমার বড় ভগ্নিপতি স্নান সেরে মাথা মুছতে মুছতে দরজার ওপারে পৌঁছে এদের দেখে বললেন, "কি ব্যাপার?"

ওরা সমস্বরে বলে উঠল, "গান।"

তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ জানিয়ে উঠলেন, বললেন, "না না, এখানে গান-টান চলবে না। গান হবে বাসরঘরে। এখন শুনতে চাইনে। যাও, এখন গিয়ে রেওয়াজ কর।"

ওরা হতভম্ব হয়ে গেল, বুঝিয়ে বলতেই পারল না যে, ওরা গান গাইতে আসেনি, গান শুনতে এসেছে।

ওরা চলে গেলে তিনি হাসতে লাগলেন।

আমি কিন্তু কোনো দিকে না তাকিয়ে এক মনে নিজেকে পালিশ করে নিতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, ওরা আমার গান শুনতে এসেছিল — এটা ওদের আমার গানের তারিফ, না, আমার গানের—

তিনকড়ি-ভাগনে বললেন, "থাক্ রে, আর মাঞ্জা দিসনে, বাচ্চুমামা। ওরা ঠাট্টা করতে এসেছিল। ভুল বুঝে অত উৎসাহ ভালো না।"

একটু থেমে তিনি বললেন, "বেশ জায়গা এটা। এখানে এসে গাইয়ে হয়ে গেল বাচ্চুমামা।"

বেশি উৎসাহ আমি দেখাইনি, নিজের মুখও বেশি মাজিনি — ওরা ঠাট্টা করে গেল বটে, কিন্তু তিনকড়ি-ভাগনের ঠাট্টাটা আরও যেন ভীষণ হয়ে উঠল।

বিয়ের আসরেও তিনি ছাড়েননি তাঁর এই বাচ্চুমামাটিকে। কানে কানে বলেছেন, "মনে হচ্ছে মেয়েটা যেন একটু ঝুঁকেছে। বুঝতে পারছি ঐ আমার নেক্সট্ মামী হবে।"

নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন কে সেই নীলিমা।

নীলিমার সঙ্গে সেই আমার প্রথম দেখা। কিন্তু সোজাসুজি কোনো কথা হয়নি তার সঙ্গে। অথচ, একটা ব্যাপার বড় আশ্চর্য ঠেকেছে। মহেশবাবু বুকের মধ্যের যে দুরু-দুরানির কথা বললেন, তাকে দেখা মাত্র আমার বুকের ভিতর অবিকল ঐ রকম ধড়-ফড় করে উঠত।

তারপর? তারপর তো অনেক দিন কেটে গিয়েছে। এখন বয়স আমার আটাশ।

আমের কথাগুলো আপনাদের আর জানিয়ে লাভ নেই। কিন্তু এটুকু নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, এই লম্বা সময়টা তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। কিন্তু যাকে যোগ বলা যায়, এতদিন তা ঘটে ওঠেনি আমার বাবা-মায়ের জন্যে। তাঁরা এ-ব্যাপারে ঘোর বিরোধী। যে বাড়ি থেকে একটি বৌ এসেছে, সেই বাড়ি থেকে দ্বিতীয় আর একটি বৌ তাঁরা আনতে চান না; তার উপর তাঁরা চান নগদ-বিদায়।—অর্থাৎ মোটা টাকা।

কিন্তু আমার ইচ্ছেটা আলাদা। আমার ইচ্ছে—আজ ধার, কাল নগদ। প্রথমে কিছু না দিলে, মনের মত বধূ ঘরে এলে তাতে মুনাফা অনেক। আমি না হয় আনাড়ি, যাঁরা অনেক জানেন-শোনেন তাঁদেরও এই রকম অভিমত বলে শুনেছি।

আমরা একটা রফা করে নিয়েছি। তাই অপেক্ষা করে চলেছি আমরা। আশা আছে এই যে, একদিন হয়তো বাবা-মায়ের মত বদলাবে।

যোগাযোগটা আছে, কিন্তু দেখা হয় খুব কম। নীলিমা ছুটিতে কলকাতায় এলে ওর মামাবাড়িতে ওঠে—গোমেশ লেনে। সেখানে গিয়ে দেখা করি।

নীলিমা বি এ পাস করেছে কয়েক বছর হল। এখন চাকরি করে গুপ্তিপাড়ার ইস্কুলে —ওখানেই থাকে। তার অনেক দিনের ইচ্ছে আমি একবার গুপ্তিপাড়ায় যাই। কিন্তু তার এই ইচ্ছেটা আমি ইচ্ছে করেই পূরণ করিনি। মনে হয়েছে অতটা ভালো না। বাবা-মায়ের কানে উঠতে পারে কথাটা, আত্মীয়স্বজনরা জেনে ফেলতে পারে। তাতে আমার চেয়ে বেশি ক্ষতি ওরই। ওর উপর যদি কোনো শ্রদ্ধা এ'দের থেকে থাকে, এতটা মাখামাখি দেখলে হয়তো তা নষ্ট হয়ে যাবে। আমা-দের মধ্যে রফা যখন একটা হয়েই আছে তখন আর ভাবনা কি।

কিন্তু নীলিমা চায় আমি একবার গুপ্তি-পাড়ায় যাই। জায়গাটার অনেক লোভনীয় বর্ণনা দিয়ে চিঠি লেখে। গঙ্গার কিনারের কথা, ওপারের শান্তিপুরের কথা, নদীতে নৌকোর কথা — অজস্র কথা সে লেখে।

আমার যে দাদার বিয়েতে সিরাজগঞ্জে গিয়েছিলাম, নীলিমা সেই দাদার দূর-সম্পর্কের শ্যালিকা। এর বাবাও ইস্কুল-মাস্টারি করতেন, কিছু দিন হল মারা গিয়ে-ছেন। একমাত্র ভাই বিয়ে করেছেন, নাগপুরে আছেন। নীলিমার সঙ্গে থাকেন তার মা।

নীলিমা নাকি একেবারে অসহায় বোধ করে ওখানে। কেউ মাঝে-সাঝে গেলে সকলে বুঝতে পারবে যে, সত্যিই তার কেউ আছে। এ জন্যেও নাকি একবার আমার যাওয়া উচিত।

কিন্তু তার এক তরফের উচিত-টা জেনে কাজ আমি করতে পারি, আমার দিকের কথাও আমি ভেবেছি। তাই, কিছুতেই আমি যাইনি গুপ্তিপাড়ায়।

সেবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে-ছিলাম শান্তিপুরে। রাসের মেলায়। [illegible] পরদিন অনেকটা রাস্তা হেঁটে গঙ্গায় গিয়ে-ছিলাম স্নান করতে। স্নানের আগে একটা নৌকো ভাড়া করে কিছুক্ষণ গঙ্গায় [illegible] ভেসে বেড়ালাম। মাঝির কাছে, এবং [illegible] বন্ধুটির কাছেও, আশপাশের [illegible] নাম শুনতে লাগলাম।

দূর থেকে আঙুল দিয়ে [illegible] বলল, "আর, ঐ যে বাবু, [illegible] নিয়ে আসছে একটা বৌ — [illegible] পাড়া।"

বুকটা দুরুদুরু করে উঠল [illegible]

বাবু যে দুয়েদুয়ানির কথা বলেছেন হয়তো ঠিক সেইভাবেই।

বললাম, "আর না, চলো ফিরি।"

বন্ধুটি বলল, "এরই মধ্যে? তবে অযথা নৌকোটা ভাড়া করা কেন?"

বললাম, "কড়া রোদ উঠেছে। সারা রাত রাস দেখেছি — শরীর ভালো লাগছে না।"

শরীর হয়তো ঠিকই ছিল, কিন্তু মনটা কেমন বিকল হয়ে গেল। হিসেবটা আগে ঠিক জানতাম না। শান্তিপুরের ঠিক ওপারটাই গুপ্তিপাড়া জানা ছিল না।

কথাটা গোপন করব ভেবেছিলাম। কিন্তু বেশি দিন চেপে রাখতে পারলাম না। নীলিমাকে লিখলাম, একটু কাব্য করেই লিখলাম—'তোমার অনেক কাছে চলে গিয়েছিলাম, মাঝখানে ছিল মাত্র একটা মাত্র সরু বাধা, তার নাম গঙ্গা।'

তপ্ত জবাব এল তার কাছ থেকে, লিখেছে—'তুমি বুঝতে পার না তুমি কত নির্দয়। মানুষকে আঘাত দিয়ে তুমি আরাম পাও। এত কাছে এসেছিলে, তবু একবার দেখা করে গেলে না। তবে, এ-খবরটা আমাকে জানালে কেন! না জানালে খুশি হতাম।'

লিখলাম, 'এবার পুজোর ছুটিতে কলকাতায় আসা চাই। অবশ্য এস।'

নীলিমা লিখল, 'মাকে একা ফেলে কি করে যাব বলো!'

'তাঁকে নিয়েই এস-না।'

'মা বার-বার তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে উঠতে চান না। জান না, মায়ের ভাইরা বড়লোক।'

লিখলাম, 'পুজোয় না এলে বড়দিনে নিশ্চয় আসবে।'

এর কোনো উত্তর পেলাম না। সাত দিন গেল, পনেরো দিন গেল — কোনো জবাব নেই। কোনো খবর নেই।

আশ্চর্যই ঠেকল। আবার চিঠি দিলাম, 'রাগ করেছ বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মত নিরীহ লোকের উপর রেগে লাভ কি! শিগগির উত্তর দাও।'

কয়েকদিন পরে একটা চিঠি এল, বেশি কথা নেই, লিখেছে, 'তুমি একবার এসো।'

এর কি উত্তর দেব কয়েকদিন ধরে ভাবছি, কি করব তাও ঠিক করতে পারছিনে, আবার চিঠি এল, 'মা তোমাকে দেখতে চাচ্ছেন, অবশ্য এসো।'

এরও কোনো উত্তর দিলাম না। নীলিমার উপর রাগই হল। তার মা আমাকে দেখতে চান সে-কথা তিনি নিজে জানাতে পারতেন। তার মাকে দেখা দেওয়ার জন্যে আমার কোনো গরজ নেই। তাঁর কন্যারই যদি আমার দেখা পাওয়ার কোনো আগ্রহ না থাকে, তবে আর কি! তবে তো চুকেই গেল ল্যাঠা।

হঠাৎ এল টেলিগ্রাম। নীলিমা সিরিয়াসলি ইল্‌ — বন্দনা।

ব্যাপারটি কেমন-কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠছে। এ আবার কে — এই বন্দনা?

তিন সঙ্গী

আলোকচিত্র : শ্রীঅনিল বসু

অনেকক্ষণ ভাবলাম। একটু-একটু যেন মনে পড়ল, এর নাম নীলিমা তার চিঠিতে দু-একবার উল্লেখ করেছে। ওদের ইস্কুলেরই একজন টিচার।

প্রথমেই ধরে ফেললাম — এটা একটা ধাপ্পা। আমাকে টেনে গুপ্তিপাড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে এটা একটা চক্রান্ত।

একদিন চুপ করে থাকলাম। কিন্তু পরদিন মনটা কেমন চঞ্চল হল। মনের চাঞ্চল্য থামাতে চেষ্টা করলাম। মন গুমট হয়ে উঠল। মনে হল নীলিমা যেন আমাকে ডাকছে, যেন তার গলার স্বরটাই বেজে উঠল কানের মধ্যে।

আমার মন যে রীতিমত দুর্বল হয়ে পড়েছে, বুঝতে কষ্ট হল না। কিন্তু কষ্ট বোধ করতে লাগলাম যেন নীলিমার জন্যে। যদি এটা ধাপ্পা না হয়, যদি সত্যিই ও অসুস্থ হয়ে থাকে, তবে এখন নিশ্চয় সত্যিকারের অসহায় হয়ে পড়েছে।

সাত-পাঁচ ভেবে ঠিক করলাম — যাব। কতই-বা আর দূরে। হাওড়া থেকে তিন-চার ঘণ্টার জার্নি। সকাল থেকে মনটা ভারী হয়ে আছে, কাউকে কিছু না জানিয়ে দুপুরে গিয়ে ট্রেনে চাপলাম।

গুপ্তিপাড়ায় গিয়ে যখন নামলাম তখনো সন্ধ্যা নামেনি। না-শহর না-গ্রাম জায়গা, পথঘাট নেই চেনা — অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে পৌঁছতে পারলে হয়। কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল।

ঠিকানাটা একবার আউড়ে নিলাম — বাণী-কুটীর, রতনপল্লী, নিয়ার্ শীতল মান্না'স গার্ডেন হাউস।

এই মান্না-মশাই নিশ্চয় এককালের খুব নামজাদা লোক; নিশ্চয় খুব শৌখিন পুরুষ ছিলেন। তাঁর বাগান-বাড়িটার দশা এখন কেমন জানিনে, কিন্তু এটা এখন একটা পথের নিশানা হয়ে আছে।

হাতে একটা ছোট সুটকেস। আমি রওনা হলাম পদব্রজে। মিনিট দশেক হাঁটার পরই রাস্তায় লোকসংখ্যা রীতিমত কমে গেল। পথের ধারের একটা ছাউনির সামনে একটি দেশোয়ালি মেয়ে ছোলা ভাজছিল। তার

কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "শীতল মান্নার বাগানবাড়ি তো এই দিকে ?"

আগে যে নিশানা জেনে নিয়ে রওনা হয়েছি, এসেছি অবশ্য সেই পথ ধরেই। কিন্তু রাস্তা ও আকাশ ইতিমধ্যে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, এইজন্যে নিশানাটা ঝালাই করে নেওয়ার ইচ্ছেতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "শীতল মান্নাকা বাগান কোঠী কি ইধর মে ?"

আমার ভাষাই সে বুঝতে পারল না, না, সে ঐ বাগানবাড়িটা চেনে না — তার চাউনি দেখে তা ঠিক ধরতে পারলাম না। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে, ধীরে ধীরে আবার হাঁটতে লাগলাম।

রাস্তার দু-ধারের গাছ ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। অন্ধকারও ক্রমশ নামছে ঘন হয়ে। আমার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল।

যতই ভয় লাগছে, ততই দ্রুত পা চালাচ্ছি। শহরে জীবন কাটছে, এত গাছ দেখার অভ্যাস নেই, এমন অন্ধকারও দেখা হয়ে ওঠে না। এইজন্যে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

তবু রক্ষে, রাস্তা একেবারে জনমানবশূন্য নয়। মাঝে-মাঝে দু-একজন লোক এই পথ দিয়ে যাচ্ছে। দূরে থেকে তাদের দেখে ভরসা বাড়ছে, তারা কাছে এসে পৌঁছলো মাত্র জিজ্ঞাসা করছি, "শীতল মান্নার—"

তারা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে দিচ্ছে—"সোজা।"

কিন্তু রাস্তাটা অত সোজা মনে হচ্ছে না, বড়ই কঠিন ঠেকছে।

একমনে হেঁটে চলেছি, ভয়ভীতের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে। হঠাৎ চমকে উঠলাম, আমার সামনে লম্বা একটা ছায়া রাস্তার উপর শুয়ে শুয়ে নড়ছে। সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল, চীৎকার করেই উঠেছিলাম প্রায়, এমন সময় দেখি — হারিকেন হাতে করে একটা লোক আসছে পিছন থেকে. ওই আলোতে আমারই ছায়া পড়েছে আমার সম্মুখে।

লোকটা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে ধরে ফেলল। বললাম, "কত্তা, কতদূর যাবে ?"

"আপনি কোথায় যাবে ?"

"শীতল মান্নার—"

"বাগানবাড়িতে ? সে তো পোড়ো-বাড়ি।"

"না। তারই লাগোয়া বাণীকুটীর ? সেখানে। আর কত দূর রাস্তা ?"

রাস্তা নাকি আর বেশি না। আর খানিকটা গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিতে হবে; তার পরেই একটা মজা দিঘি, দিঘির গা দিয়ে রাস্তা। একদিকে বাগানবাড়ির পাঁচিল, একদিকে দিঘি — মাঝখানে পথটা।

লোকটা হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগল। আমিও ওর সঙ্গ না ছাড়ার জন্যে ওর সঙ্গে প্রায় দৌড়তে লাগলাম।

বললাম, "তুমিও বুঝি ওই রাস্তায় যাবে ?"

"না গো বাবু। আমি যাব উল্টো পথে, আর-একটু গিয়েই ডানে বাঁক নেব।"

শান্তিটা ভালোই হল আমার। পথঘাট নেই চেনা। আর এই রাত্রির অন্ধকার। এত-বার আমাকে এখানে আসার জন্যে সাধ্যসাধনা করেছে নীলিমা, তার কথা না শোনার এই ফল।

লোকটার গতি সত্যিই অস্বাভাবিক। চট্ করে ডান দিকের সরু একটা গলো পথের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। তার হারিকেনের আলো সরে যাওয়া মাত্র রাস্তাটা ভয়ঙ্কর অন্ধকার হয়ে উঠল।

পা ছমছম করে উঠল আমার। ইচ্ছে হল, ফিরে যাই। কিন্তু সামনে আর পিছনে দু দিকই সমান অন্ধকার। কি করব ভেবে না পেয়ে হাঁটতে লাগলাম।

দু-পাশের গাছে হরেকরকম শব্দ হচ্ছে—পাখির পাখা-ঝাপটানি, না, ডালে-ডালে ঘষাঘষি—বুঝতে পারলাম না। কখনো সর্-সর্ শব্দ, কখনো মড়মড় আওয়াজ।

বুকের ভিতরটা দুর্দুর্ করে উঠল।

রাস্তার বাঘের গায়ের চাকা-চাকা দাগের মত চিহ্ন চোখে পড়া মাত্র উপরে তাকালাম। চাঁদ। চাঁদ উঠেছে আকাশে। পাতার ফাঁক দিয়ে তার নির্জীব আলো এসে পড়েছে রাস্তায়।

এই আলো দেখে একটু ভরসা হল। সেই ভরসায় ভর করে বাঁয়ে বাঁক নিলাম।

আর-কি। এবার নিশ্চয় এসে গিয়েছি। হ্যাঁ, তাই। এই যে মজা দিঘি, এই-যে- সেই প্রাচীর—নুনে খেয়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে এর সারা গা। ভিতরটা গুমট অন্ধকার। মজা দিঘিটার জল দেখা যায় না। চাঁদের আলোয় লম্বা-লম্বা কচুরিপানারা দুলে-দুলে যেন খেলা করছে।

ভয় যায়নি। কিন্তু গায়ের ছমছমানি-ভাবটা কমেছে। হয়তো এতক্ষণের অভ্যাসে ভয়টা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

দু-একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাঁশের বেড়া দেওয়া চারধার। চাঁদের আলোয় ছবির মত লাগছে দেখতে।

আমি এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগোচ্ছি, একটু দূরে থেকে কে যেন আমাকে ডাকল, বলল, "ওদিকে কেন ? এদিকে এস।"

গলাটা চেনা। অনেকদিন পরে শুনলাম ঐ গলা। বুকটা দুর্দুর্ করে উঠল।

আমি এগিয়ে গেলাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম নীলিমা। বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে হাসছে। আমি আরো কাছে যেতেই সে আমার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে বলল, "কেমন জব্দ ! তবে নাকি আসবে না গুপ্তি-পাড়ায় !"

"তোমার অসুখের খবর যে মিথ্যে, তা বুঝতে পেরেছিলাম।"

"তবে এলে কেন ?"

"এলাম।"

"বেশ করেছ। এসো।"

নীলিমা আগে-আগে গেল, তার হাঁটাটাও বড্ড ছটফটে, আমি তার পিছন-পিছন চললাম। একটা বারান্দা পার হয়ে আর-একটা বারান্দায় গিয়েই হারিয়ে গেল নীলিমা।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়ালুম। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কাউকে না পেয়ে ডাক দিলাম—"নীলিমা !"

কারও উত্তর না পেয়ে আবার ডাকলাম, "নীলিমা !"

আশ্চর্য ! এমন অভদ্র হয়ে গেল কি করে এরা ? বাড়িতে অতিথিকে দাঁড় করিয়ে রেখে—

গলায় জোর দিয়ে ডাকলাম, "নীলিমা !"

চালের মাথা থেকে উড়ে গেল একটা প্যাঁচা।

"কে ?"

গলার স্বরে চমকে পিছনে চেয়ে দেখি একটা মেয়ে। সে এগিয়ে এল, বলল, "আপনি ভূপতিবাবু ?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

সে বলল, "টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন ? আমি বন্দনা। আসুন। ঘরে আসুন।"

ঘরে ঢুকতেই কেঁদে উঠল কে ও ? কি, কি, ব্যাপার কি ?

নীলিমার মা আমাকে দেখে কেঁদে উঠেছেন। বন্দনা চোখ মুছল, বলল, "চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। আজ সকালবেলা—"

আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল, কথা বন্ধ হয়ে গেল। আমি পড়ে গেলাম।

আর কিছু জানিনে। সকালে যখন জ্ঞান হল, দেখি আমার মাথার কাছে সুটকেসটি। বন্দনা বলল "আপনি পুরুষ মানুষ। অমন অধৈর্য হলে চলে ? এই সুটকেসটা ফেলে এসেছিলেন উঠোনে।"

সুটকেসটার দিকে চেয়ে শরীর হিম হয়ে গেল।

প্রায় এক বছর হল। সেই ঘোর এখনো কাটে নি। কাউকে কিছু বলিনি। কেউ বিশ্বাস করবে না। নিজেকেও কিছুতে স্বাভাবিক করে তুলতে পারছি নে। সব সময় যেন তার গলা শুনছি, আর, এক-একদিন রাত্রে—

সে কথা থাক্। ভাবছি, মানুষ [illegible] মানুষকে খুলে বলব নাকি সব ? [illegible] কোনো ওষুধ জানা থাকে।

"এই, শুনছ—!"

"উঁ…"

"ঘুমোলে—?"

"না।"

"দরজায় কে কড়া নাড়ছে।"

"শুনেছি।"

"শুনেও দিব্যি শুয়ে আছ!…যাও, দেখ কে কড়া নাড়ছে।"

"পিয়ন।"

"পি…য়…ন! রাত দশটায় পিয়ন—?"

"টেলিগ্রামের পিয়ন। সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে শুনলে না।"

"…"

"আমাদের বংশী পিয়নই হবে।"

'যে পিয়নই হোক ওঠো তো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে মত ভণিতা হচ্ছে। এমন নিশ্চিন্ত পুরুষমানুষ আর আমি দেখিনি। যাও, দেখ গিয়ে কী আবার দুঃসংবাদ এল। দুর্গা দুর্গা…"

*

[[illegible] এক ঘর]

তোমায় প্রথম দেখেছিলাম ঘোড়াদির বিয়েতে। বাসরঘরে লাল [illegible] ছোট

কার্পেটে বসেছিলে, পা মুড়ে। শরীরটা সামনের দিকে ঈষৎ নোয়ানো, পিঠ একটু ভাঙা, বাঁ-হাত কার্পেটের ওপর। হেলানো দেহের ভর যেন হাতে ধরে রেখেছে। পিছনে দু পা জোড় করে রাখা। তোমার পায়ে আলতা টকটক করছিল। জামাইবাবু কপালের ঘাম মুছছিল, ছোড়দি নতমুখে। মিনে-করা ফুলদানিতে কত ফুল। ছোড়দির পাশে যে ফুলদানিটা ছিল, তাতে একরাশ রজনীগন্ধা। ফুলের ভারে, নরম আগা নুয়ে পড়েছিল। তুমিও তোমার ভারে নুয়ে পড়েছিলে। অজস্র মেয়ে। তার মধ্যে তুমি। তবু মনে হল তুমি তোমার মনোগ্রাম।

*

[ঘড়ির দু ঘর]

"বউদি আসছে। বসুন।"

"..."

"আপনাকে বিয়ের সময় দেখেছি।"

"..."

"খুব খাটছিলেন।...বউদির কাছে গল্পও শুনেছি।"
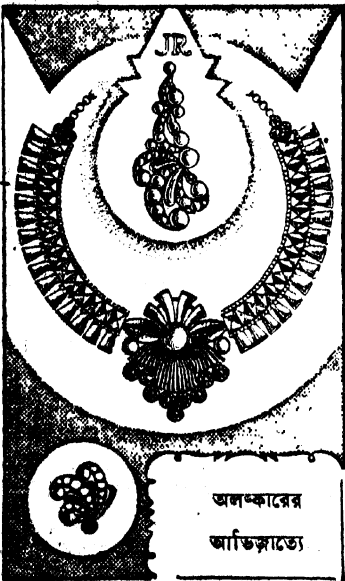
"আপনাকেও দেখেছি বিয়েতে—"

"নাকি, কখন—?"

"বাসরঘরে।"

"বাব্বা! আপনি বাসরেও ঢুকেছিলেন।"

"আলো নিবে যাচ্ছিল, ঠিক করে দিতে গিয়েছিলাম।"

"সত্যি সেদিন আলো যা মুশকিলে ফেলেছিল। আমার আবার কাজকর্মের বাড়িতে আলো নিবে গেলে ভীষণ ভয় হয়।"

"চোরের ভয়?"

"কি জানি।...শুনছেন—?"

"কে যেন কাঁদছে।"

"পাশের বাড়িতে। ওদের জ্বালায় আর তিষ্ঠোবার যো নেই। বউটা পাগল। থেকে থেকে কেবল কাঁদে।"

*

[ঘড়ির তিন ঘর]

ছোড়দিও কাঁদত। জামাইবাবু হাসপাতালে। ছেলেটা পেটের মধ্যেই মরে গেল। তুমিও কাঁদতে, তোমার ডান চোখে রক্ত জমত। ডাক্তারেরা বলেছিল, বারবার যদি এইভাবে চোখের শিরা ছিঁড়ে রক্ত ঝরে—তবে একদিন অন্ধ হয়ে যেতে হবে। আমিও কাঁদতাম; আমার একটা চাকরি জুটছিল না, তুমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছ।

*

[ঘড়ির চার ঘর]

"সুখবর দিতে এলাম।"

"চোখের ওষুধটা পেয়েছ।"

"না।...চাকরি পেয়েছি একটা।"

"পেয়েছ। বাব্বা বাঁচলে। কোথায় পেলে?"

"বাইরে, ধানবাদে।"

"কিসের চাকরি?"

"কেরানীগিরি। কোয়ার্টার পাব।"

"তা হলে ত ভালোই।"

"মন্দ কি। আমাদের জন্যে কে আর জজ মুন্সেফীর চাকরি নিয়ে বসে আছে।"

"তোমার বাড়ির লোক খুব খুশী।"

"খু—ব। মা শুধু খুঁত খুঁত করছে। এখানে হলেই ভাল হত, এক সংসারে হয়ে যেত, সাশ্রয় হত।"

"তা ঠিক। তবে এও ভাল। সবাই এক জায়গায় গাদাগাদি করে থাকা ভাল না। একটু ছাড়াছাড়িতে সদ্ভাব থাকে।"

"..."

"চা খাবে?"

"না। ছোড়দি ফিরেছে?"

"এ-খন! এত তাড়াতাড়ি!"

"ছটা বেজে গেছে।"

"ওঁর ফিরতে সাতটা আটটা। কোনো কোনো দিন আরও রাত হয়।"

"কেন?"

"জানি না। এখন তার রোজগারে আমাদের পেট চলছে। দেরি করে কেন ফেরে কে জিজ্ঞেস করবে।"

"..."

"দাদার চিঠি আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ি। বউদির পায়ে যেন মাথা বিকিয়ে দিয়েছে।"

"ছোড়দি না থাকলে জামাইবাবু বাঁচত না।"

"ওই ত চটে উঠলে। এ-সব কথা এই জন্যেই বলি না। নিজের দিদির দোষ কে দেখে!"

"দোষ থাকলে কেন দেখব না। আমার দিদি বলে বলছি না—একটা টি বি রুগীর কিছু খরচ, তার ওপর এই সংসারের খরচ যে চালায়, তাকে অনেকটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়।"

"কর্তব্য করছে। বউদির কিছু হলে দাদাও করত।"

"ওই ত—"

"কি?"

"সদরে কড়া নাড়ছে। ছোড়দি ফিরে এসেছে।"

"তোমার ছোড়দি নয়।"

"ছোড়দি না—, তবে কে?"

"দুলাল ডাক্তার। যার মাথা ঘোরার রোগ হয়েছে, বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারে না। হোমিওপ্যাথী গুলি খাওয়াতে এসেছে।"

*

[ঘড়ির পাঁচ ঘর]

তুমি অন্ধ হলে না। আমিই অন্ধ হলাম। বাড়িতে সবাই বারণ করেছিল, পাল্টাপাল্টি বিয়ে ভাল না। তা ছাড়া, ওদের বংশগত রোগ যদি হয় ওটা—জামাইবাবু যাতে মরমর! আমি কান দিইনি। ছোড়দি বলেছিল, যা করবার ভেবে চিন্তে করতে। আমার অত ভাববার মন ছিল না। বাসরঘরে যেদিন তোমায় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, সেদিন কি ভেবেছিলাম, কেন মুগ্ধ হচ্ছি। মানুষ অত শত ভাবে না। ভাবলে মুগ্ধ হওয়া যায় না, ভালবাসা যায় না। ভেবে ভেবে বাড়ির নকশা করলে ভাল বাড়ি হয়, পুব দক্ষিণ খোলা রাখা যায় হয়ত, কিন্তু ভেবে ভেবে ভালবাসতে গেলে ভালবাসা হয় না, কোনো দিকই আর খোলা থাকে না, সব আটকা পড়ে যায়। যদি আমি ভাবতে বসতাম এক এক করে, তোমায় আর ভালবাসতে পারতুম না। বাসরঘরে তোমার গায়ের বাদামী রঙের চামড়ার ওপর পুরু করে স্নোআইভোরি আর পাউডার ছিল। চোখে কাজল। কপালে কুমকুমের ছোট্ট টিপ। গলায় মটর হার। তোমার মাথায় মস্ত গোল খোঁপা, বেল ফুলের মালা জড়ানো। অত চুল তোমার মাথায় নেই আমি পরে দেখেছি। তোমার সেদিনের বসার ভঙ্গি যত [illegible]

দেখাচ্ছিল—তুমি অত নরম নও, লজ্জামুখী নও। পারে তুমি কদাচিত আর আলতা পরেছ। আমার ছোড়দিকে তুমি দুশ্চরিত্র ভাবতে, তার পরিশ্রমের অন্নে প্রতিপালিত হয়েও তাকে তুমি ঘৃণা করতে ঈর্ষা করতে। আমি একে একে সবই জেনেছি, তবু ভাবিনি, ভাবলে তোমায় ভালবাসতে পারতুম না।

*

[ঘড়ির ছ ঘর]

"মা বলছিল, বিয়েতে দু চার ভরির বেশী সোনা দিতে পারবে না।"

"নাই বা দিলেন।"

"শুধু হাতে কি মেয়ে দেওয়া যায়!... তোমাদের বাড়িতে পরে যে আমায় খোঁটা দেবে...। এখন থেকেই তোমার ছোড়দির মুখ হাঁড়ি হয়ে আছে।"

"আমার বাড়িতে কেউ কিছু বলবে না। সবাই জানে জামাইবাবু এখনও হাসপাতালে, ছোড়দি চাকরি করে সংসার চালায়।"

"তোমার ছোড়দির ত ইচ্ছে আমাদের মাথা গোঁজার এই জায়গাটুকু বিক্রি করে দি।"

"দিয়ে তোমায় সোনা দিয়ে সাজানো?"

"কে সাজাচ্ছে আমায় সোনা দিয়ে, বয়ে গেছে। আসলে এই হুড়োর কিছু টাকা পেলে বলবে, হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। ওনার তাতে সুবিধে, মাস মাস আর স্বামীর জন্যে গুনতে হবে না।"

"..."

"বিয়ের পর আমায় কতদিন তোমাদের এখানকার বাড়িতে ফেলে রাখবে।"

"বেশি দিন নয়।"

"তবু শুনি।"

"দিন দশ—"

"বাব্বা বাঁচি তা হলে।...তুমিও থাকবে, নাকি বিয়ের পর কলকাতা ফেলে চলে যাবে, তারপর আমায় নিতে আসবে?"

"আমি থাকব না।"

"তুমি না থাকলে আমি মরব।"

"কেন?"

"বা, তুমি থাকবে না কাছে—আমার কিসের সুখ। শ্বশুরবাড়িতে দুখ সুখে দিন কাটাবো।"

"কটা দিন বাদ।"

"শোনো, তোমার কোয়ার্টারে কটা ঘর?"

"দুটো।"

"দুটোই বড়?"

"মোটামুটি।"

"রান্নাঘর আছে?"

"আছে একটা বারান্দা। উঠোন আছে, কল আছে।"

"বেশ [illegible] না—?"

—বউদি আসছে বসুন

"একেবারে। অনেক গাছ ঝোপ ঝাড়, উঁচু উঁচু চিমনি কারখানার।"

"আর বাড়ি নেই?"

"ওই ত পাশের তিনটা কোয়ার্টার।"

"আমার বাপু আজই যেতে লোভ হচ্ছে। ...হাসছ! যা অসভ্যতা করো না।...তুমি মাটিতে শোও নাকি?"

"ভাঙা তক্তপোশ একটা আছে।"

"তাহলে যা বলি শোনো, এবারে গিয়েই একটা চওড়া দেখে তক্তপোশ জোগাড় করবে। তোশক বালিশ করিয়ে নিয়ো। আর সংসারের টুকটাক কিছু আস্তে আস্তে কিনতে শুরু করে দিও—যেমন, আজ একটা হাঁড়ি কিনলে, কাল হয়ত হাতাখুন্তি—এমনি করে আর কি। সবই ত একসঙ্গে পারবে না। বাকি যা, আমি গিয়ে পছন্দমত আনাবো।"

"তোমায় কে যেন ডাকছে।"

"আমায়। কই না—।"

"মনে হল তোমার নাম শুনলাম।"

"ও, না-না। বলো না আর, আমরা একজনকে ভাড়াটে বসিয়েছি। দুই বোন। বড়টা বিধবা, নার্স ছোটটাও চুকবে। ছোটটারও নাম কমলা। এক নাম হওয়ায় আমার হয়েছে মুশকিল।"

"ও!"

"ওই ছোটটার বিচ্ছিরি স্বভাব। কী রকমের একটা ভাই আছে, সেটা নিত্য এসে বসে থাকে। সেই হতচ্ছাড়াটাই হবে আর কি।"

*

[ঘড়ির সাত ঘর]

তোমায় কি কেউ কোনোদিন ডাকত না, কমলা! হয়ত ডাকত। ডাকা স্বাভাবিক। বাঙালী ঘরের আইবুড়ো মেয়ে আর গাছের আম এক জিনিস। ঢিলের ঘা খেয়ে পড়ে, চুরি যায়, ঝড়ে ঝরে পড়ে, পেকে গেলে কাকে ঠোকরায়। এ-সব এত সাধারণ কথা, সরল জিনিস যে আমি গ্রাহ্যই করতাম না। আমি ছোট, বড়দির বিয়ে হয়েছিল; আমি যুবক, ছোড়দির বিয়ে হল। বড়দির বেলায় দেখেছি—একটা লোক আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে আসতে গান গাইত: কে তিনি ফুল, টগর দুটি বেল মালতী। বড়দির নাম ছিল মালতী। ছোড়দির বেলায় পুলিসের সন্দেহ হয়েছিল আমাদের বাড়ির আশে-পাশে কোথাও মদ চোলাই হয়—নয়ত যখন তখন রাত বিরাতেও ছোকরাটোকরার দল ঘোরাঘুরি করে কেন।......না না, আমি এ-সব গ্রাহ্যই করিনি। ছোড়দি যে বলেছিল, ভেবেচিন্তে কাজ করতে—তার মধ্যে তোমার স্বভাবচরিত্রের এদিক পানেও যে একটু আধটু ইঙ্গিত না ছিল, এমন নয়। আমি জানতাম। কিন্তু যাকে পথে বেরুতেই হবে—তার পক্ষে আকাশের কোথায় একটু মেঘ জমল কি মেঘলা হল

কিম্বা বৃষ্টির গন্ধ ভেসে আসছে দূর থেকে —এ-সব খেয়াল করলে চলে না।

*

[ঘড়ির আট ঘর]

"তোমার বাপু একটা ছাতা দরকার।"

"...."

"এই কাঠফাটা রোদে যাওয়া আসা, পথও অনেকখানি।"

"ছায়ায় ছায়ায় যাই।"

"তা হোক; বর্ষায় কি করবে?"

"আসুক ত বর্ষা।"

"আসতে আর কদিন। আষাঢ় পড়ল।"

"আমার ছাতা আছে।"

"আছে......! ওমা, কোথায় তোমার ছাতা। আজ সাত আট মাস ঘর করছি তোমার, সংসারে কোথায় কি আমার মুখস্ত; তুমি বললেই হবে ছাতা আছে।"

"...."

"হাসছ যে মুখ টিপে।"

"হাসিনি, গোঁফটা চুলকোচ্ছে—তাই ....."

"আহা, তামাশা। আমি আর বুঝি নে। তা হলে ওই ছাতা নিশ্চই কাউকে দিয়ে বসে আছ, তারপর আর মনে নেই, অন্য জায়গায় পড়ে আছে।"

"আরে না—।"

"না ত কই, বের কর ছাতা।"

"করব করব—দরকারে ঠিক করব। বল ত কে যাচ্ছে—"

"কই কে যাবে আবার—"

"শুনতে পেলে না, রাস্তা দিয়ে গেল।"

"রাস্তা দিয়ে হাজার লোক যায়, আমি কি তাদের পায়ের শব্দ গুণে রেখেছি।"

"আরে না। সাইকেলের কেমন কোঁ কোঁ নতুন হর্ন বাজিয়ে গেল। এ-শব্দ একটাই, অন্য যারা যায়, তারা ঘণ্টি বাজায়।"

*

[ঘড়ির নয় ঘর]

বিশ্রী শব্দ কখনও শ্রুতিমধুর করা যায় না। সাইকেলের ইলেকট্রিক হর্ন এমন একটা কদর্য ধাতব শব্দ তুলত যে, সেই শব্দকে গলা তুলে ডাকার মতন করা যেত না। অথচ কত না চেষ্টা দেখতাম। কাকের স্বর কোকিলের স্বর হবার চেষ্টা করত। আমি গ্রাহ্য করতাম না। হবে না, ও হবে না; কাক কোকিল হবে না। যদি হয়, যদি অসম্ভবই সম্ভব হয়ে যায়? আমার মনের এই ভয় আমি মাছি তাড়ানোর মতন করে তাড়িয়ে দিতাম। মাছি বড় পাজি। সহজে সরে যায় বটে, কিন্তু ছেড়ে যায় না। বার বার আসে, বার বার।

*

"কমলা, এই দেখ।"

"ছাতা!"

"ভীষণ বর্ষা নেমেছে...আর পারা যাচ্ছিল না।"

"এ ত নতুন ছাতা। তবে গো মশাই, খুব যে আছে আছে করছিলে।"

"ছিল, সত্যিই ছিল..."

"তবে হারিয়েছে; যাকে দিয়েছ সে আর ফেরত দিল না। বড্ড আখুটে মানুষ তুমি।"

*

[ঘড়ির দশ ঘর]

ছাতাটা সত্যিই কেমন করে যেন হারিয়ে গেল। কমলা, কত কষ্টে কতকাল ধরে এই ছাতা আমি আমার কাছে রেখেছিলাম। রোদ বৃষ্টি ধুলোর ঝড় বাঁচাতে ভগবান আমায় ওটা দান করেছিলেন। ছোড়দির বিয়েতে বাসরঘরে তোমায় দেখার পর পাঁচ ছ'টা বচ্ছর আমি কি কিছু গ্রাহ্য করেছি? ভয় পেয়েছি বা থমকে গেছি কিছুতে? না। তুমি হাজার ভেবেও হ্যাঁ বলতে পারবে না। ...কিন্তু, আজ আর পারলাম না। দোকান থেকে একটা নতুন ছাতা কিনতে হল। কাপড়টা খুব মোটা, কুচকুচে কালো, শিক-গুলো সব পাকাপোক্ত, বাঁটটা মুঠোয় একেবারে ছোরার মতন—বা তরোয়ালের মতন ধরা যায় শক্ত করে।

*

[ঘড়ির এগার ঘর]

"কই গো, কি হল! ওঠো—"

"উঠি।"

"উঠি উঠি নয়, ওঠো এবার। বংশী পিয়ন কি টেলিগ্রাম হাতে তোমার দরজায় সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে।"

"..."

"আবার কি হাতড়াচ্ছ বিছানায়?"

"দেশলাই। বড্ড অন্ধকার, বাতিটা জেবলে নিই।"

"আমার বালিশের তলায় দেশলাই থাকে না কি! গলার পাশ থেকে হাত সরাও। বিড়ি খাবে তুমি দেশলাই থাকবে আমার কাছে। নিজের বালিশের তলা দেখ।"

"পাচ্ছি না।"

"তবে দেখ মাটিতে পড়ে গেছে।"

*

[ঘড়ির শেষ ঘর]

দেশলাই পাওয়া গেল না। অগত্যা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দরজার খিল খুলে বাইরে এল মিহির। উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকল ক' দণ্ড। তারার আলোয় অন্ধকার যেন ঈষৎ হালকা দেখাচ্ছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। গাছপালার গন্ধ। পাঁচিলের ওপর গলা বাড়িয়ে জামগাছের ডালটা পত পত শব্দ করছে। ছোট উঠোন জুড়ে অন্ধকারের ছায়া স্তূপীকৃত হয়ে আছে। মিহিরের মনে হল, জলস্রোতের ওপর সে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই স্রোত এখন তাকে ক্রমশই অবশ করবে, এবং শেষাবধি ভাসিয়ে নেবে।

নিজের ডান হাত বুকের কাছে আনল মিহির। হাতে ঘড়ি ছিল না, তবু মিহিরের মনে হল, তার ঘড়ি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি দাগ ঘুরে এখন একই বৃত্ত অনুসরণ করছে। স্মৃতির এই ঘড়ি বন্ধ হবার নয়। যতক্ষণ নিশ্বাস ততক্ষণ রক্তের মধ্যে এই ঘড়ি চলছে—চলছেই।

উঠোনটুকু আস্তে আস্তে পেরিয়ে সদরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মিহির। শরীরের সর্বাঙ্গে কেমন অসাড়তা বোধ করছিল। যেন কেউ গোপনে এই অসাড়ত্ব তার রক্তে মিশিয়ে দিয়েছে। এখন সেই নিষ্প্রাণতা খুব দ্রুত অথচ ঘন বিষের ক্রিয়ার মতন তার চেতনায় কাজ করে যাচ্ছে। মিহিরের পা কাঁপল, হাত কাঁপল। অব্যক্ত এক যন্ত্রণা বুকের মধ্যে ফুসফুসকে যেন ফুলিয়ে তুলতে লাগল।

সদরের খিল খুলে ফেলল মিহির। শেষ শরতের কিঞ্চিৎ আর্দ্র উদ্দাম বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ঝড়ো শব্দ হচ্ছিল। অন্ধকারে কাউকে দেখা গেল না।

মিহির ব্যস্ত হল না, উৎকণ্ঠিত হল না, এমন কি ক্ষীণতম আগ্রহবশেও দু পা এগিয়ে বংশীকে খুঁজল না। বংশীর বয়ে আনা টেলিগ্রামে কি ছিল, কোন দুঃসংবাদ, মিহির যেন তা জানে।

জানে বলেই মনে মনে টেলিগ্রামের কথা-গুলো মনে মনে পড়তে পারল। তোমার জিনিস খোওয়া গেছে।

ছাতাটা আর পাওয়া যাবে না, মিহির জানত। হারিয়ে গেছে। কাল থেকে নতুন ছাতা ব্যবহার করবে মিহির, যা ভীষণ কালো পুরু, যার শিক খুব শক্ত তীক্ষ্ণ; আর যার হাতলটা ছোরার মতন—না—তরোয়ালের মতন হিংস্রভাবে ধরা যায়। কমলা কাল থেকে দেখবে, নতুন ছাতা হাতে মিহিরকে কেমন মানিয়েছে।

পুরোনো ছাতাটার স্মৃতি যেন এখনও চোখে ভাসছে এমন চোখে মিহির আর-একবার আকাশের দিকে তাকাল।

বাবুদের সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীপান্থ

বাবুদের সম্পর্কে জনৈক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যা লিখে গেছেন অতঃপর কোম্পানির কাগজের মত তা ভাঙিয়েই অনায়াসে আমরা গোটা দু-তিন শতক চালিয়ে দিতে পারতাম। কেননা, ইতিমধ্যে বঙ্গীয় বাবুকুলে মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয়নি বলেই অত্র কলকাতার কনিষ্ঠতম বাবুটির (ইনি একটি মাঝারি গোছের সওদাগরী আপিসে ডেসপ্যাচ ক্লার্ক এবং তাঁর মাসিক রোজগার আশি টাকার উপর) বিশ্বাস। তবে জ্যেষ্ঠ এবং প্রতিষ্ঠিতরা (এঁদের কেউ কেউ গভর্নমেণ্ট হৌসে বড়বাবু এবং কেউ কেউ দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ঠিকাদার) সখেদে বলেন—শুধু বঙ্কিমবাবুর সেই দশ অবতার আজ মেট্রিক সিসটেমে রাতারাতি সহস্র অবতারে পরিণত হয়ে গেল এই যা!

আক্ষেপের কথা হলেও কথাটা সত্য। নানা রূপে, নানা ভাবে 'বাবু'রা আজও জীবিত। সুতরাং তাঁদের নিয়ে যদি কোন 'বাবু' আজ লিখতে বসেন তবে তা পরচর্চা বলে গণ্য হবে না নিশ্চয়। তা ছাড়া আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। বঙ্কিমবাবু 'বাবু'দের শ্রেণী-বিন্যাস করেছেন বটে, কিন্তু আদি সন্ধানে প্রবৃত্ত হননি। হয়ত তিনি জানতেন নদী, নারী এবং কুলের মত 'বাবু'র উৎস সন্ধান করতে গেলেও বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা।

আজ এ সম্ভাবনা একেবারে নেই এমন কথা আমরা বলছি না। তবে ভরসার কথা এই, আজ উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁড়ি ভাঙলেও তা নিয়ে কোর্ট-কাছারি হবে না। কেননা, 'বাবু'রা আজ চিৎপুর আর চৌরঙ্গীতেই শুধু বাস করেন না, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ছাড়া বাড়িটির জন্যেও তাঁরা দরখাস্ত করেন এবং তা না-পেলে খোলার বস্তিতেও আপত্তি করেন না। তা ছাড়া, তাঁরা আজ ট্রামে চড়েন এবং দরকার হলে পায়েও হাঁটেন। আমি অন্তত আসা-যাওয়ার পথে মাইল-প্রতি গড়ে এক হাজার সাত শ ষাট জন 'বাবু'র দেখা পাই। নিজেকে গুনলে অবশ্য—এক হাজার সাত শ একষট্টি জন!

সুতরাং, এমন সর্বব্যাপ্ত যে কুল তাকে নিয়ে নির্ভাবনায় আমরা আজ আলোচনায় নামতে পারি। কেননা, পদবীটা আজ যথার্থই সর্বজনীন। এবং গণতন্ত্রের শিক্ষা,—যা সর্বজনের তা কারও নয়। সুতরাং এই অধম বাবুটিকে কুলকুলাঙ্গার আখ্যা দেওয়ার মত কাউকেও তাঁর কুলে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ!

'বাবু'কে আমরা যখন প্রথম দেখি তখন তিনি 'ফুলবাবু' হয়ে গেছেন। তিনি ডেংপু বাজিয়ে গঙ্গা স্নান করতে যান, বিড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা উড়িয়ে দেন, কবির আসরে বসে নোট ফেলেন এবং

এবম্বিধ। তাঁর সর্বাঙ্গে তখন 'বাবু-লক্ষণ।'

'বাবু-লক্ষণ' দু রকমের। এক ধরনের লক্ষণগুলোকে বলা যেতে পারে শাস্ত্রীয়,—অন্যগুলো লৌকিক।

লৌকিক লক্ষণের মধ্যে অগ্রগণ্য 'বাবু'র চেহারা। গায়ের রঙ সোনালী হতে হবে এমন কোন কথা নেই। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, এমন কি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হলেও আপত্তি নেই। তবে তৈলাভাস থাকা চাই। তার চেয়েও জরুরী কথা, সেই তৈলচিক্কণ দেহটির পরম্পরাগত অ্যানাটমির বাঁধন ভাঙা চাই। প্রকৃত বাবুর উদরের সঙ্গে পদযুগলের কিংবা দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের পুরোপুরি অসামঞ্জস্য থাকা চাই।

দ্বিতীয়ত, তাঁর বাক্য বা পোশাক এমন হওয়া চাই যাতে অনায়াসে বাঙালীদের থেকে তাঁকে বেছে নেওয়া যায়। 'বাবু' ধুতি-চাদর পরতে পারেন তবে সেই ধুতিটি যেন ঢাকাই ধুতি হয়। এবং তার জরির পাড়-খানা যেন কদাপি ও'র কোমরে চোট না দিতে পারে! 'বাবু' সব সময় একদিকের পাড় ছিঁড়ে পরবেন এবং তার কোঁচা সব সময় 'উড়ে কোঁছা' হবে। নয়ত 'ত্রিকচ্ছ'। যদি তিনি ইচ্ছে করেন তবে তাঁর পক্ষে 'মোজা ওয়াকিং শুজ বা ইজারাদি' পরতে বাধা নেই, কিন্তু কদাপি তেমত অবস্থায় তিনি যেন শুদ্ধ বাংলা বা ইংরেজী না বলেন। প্রকৃত বাবু ভুলেও তা বলেন না। 'সমাচার দর্পণে'র খবর তিনি "যেখানে বলিতে হইবে অমুক বড় কৌতুক করিয়াছে সেখানে' কহেন বা কি হন্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও স্থানে লিএজা চুঁচড়া চুড়া ফারাসডাঙ্গা ফড্ডাঙ্গা (এবং) কামড়িয়েছে কেমড়েছে।" তাঁর কাছে "টাকার নাম—ট্যাকা এবং মুখের নাম বাৎ।"

ফড্ডাঙ্গার বিছাপেড়ে ধুতি পরে এই ভাষায় অতঃপর যখন তিনি বাৎচিৎ আরম্ভ করেন সাহেবের তখন সন্দেহ থাকে না যে, তিনি কোন অধস্তন মোগলের সঙ্গে কথা বলছেন। রাজ্যটা মোগলদের হাত থেকে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং 'বাবু'কে খাতির করতে হয়।

এদিকে নিজের বৈঠকখানায়ও 'বাবু'র বিলক্ষণ খ্যাতি। কেননা, এখানে তিনি কথায় কথায় ইংরেজী বাৎ বলেন। যদিচ—"নোটের নাম লোট, বডি গার্ডের নাম বোগি-গরাদ লৌরি সাহেব নৌরি সাহেব।" এবং "এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়া সর্বদাই তিনি হুট গোটেহেল ডোনকের ইত্যাদি বাক্য" ব্যবহার করেন। আমার মনে হয়, এগুলো শত্রুদের রটনা। 'বাবু' যে এর চেয়ে অনেক ভাল ইংরেজী বলতে এবং লিখতে পারেন তার নমুনা পরে হবে।

যা হোক, এইসব লৌকিক লক্ষণ নিয়ে 'বাবু'র মাথাব্যথা নেই। শাস্ত্রীয় লক্ষণাদি তার মধ্যে যে পুরোপুরি বর্তমান তাই তিনি প্রমাণ করতে চান। তিনি 'ব্রাহ্মণের ছেল্যা'। তাঁর ইংরেজীতে দরকার নেই। গায়ত্রী শিখলেই যথেষ্ট। তিনি বিদ্যা ভিন্ন অন্য কিছু দেখাতে চান।

"ঘুড়ী তুড়ী জস আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান,
(আর) অষ্টাহে বনভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ।"

সুতরাং, বাবু দিন-রাত ঘুড়ি ওড়ান,

তুড়ি মারেন, আখড়া সাজান এবং উদ্যোগ করে 'বুলবুলাক্ষ্য পক্ষীর যুদ্ধ' দেখান। অণ্টাহে বনভোজনে তাঁর মন ভরে না। সুতরাং পানসী করে তিনি নদীভ্রমণে বের হন। গঙ্গাসাগর অনেক দূর এবং অধিকতর বিপজ্জনক সুতরাং মাহেশই তাঁর পছন্দ। কেন, সে কথা আর নাই বললাম। 'হুতোম'ই যথেষ্ট।

আসল কথা, 'বাবু' শুধু ভোগ চান না, খ্যাতি চান। যদি ঘুড়ি উড়িয়ে হয় ভাল, যদি পকর যাত্রায় হয় তাও ভাল। যদি তাতে না হয় তবে অন্য কিছুতেই তাঁর আপত্তি নেই। তিনি 'কবিতা সঙ্গীত সংগ্রামে'র আয়োজন করতে পারেন, সুপ্রীম কোর্টে কোন কিছু উপলক্ষ্য করে ব্যয়বহুল মোকদ্দমায় নামতে পারেন, দরকার হলে নিকির মত নর্তকীকে মাসে এক হাজার টাকা 'বেতন দিয়ে চাকর' রাখতে পারেন কিংবা যা খুশী। মোট কথা, তাঁর খ্যাতি চাই। নিম্নোক্ত ঘটনাগুলোর মধ্যে খ্যাতির পক্ষে কোন্‌টি অধিকতর কার্যকরী তা বিচারের ভার পাঁচজনের উপরই রইল।

ভোলানাথ চন্দ্রের বিবরণ। "নিমাইচাঁদ মল্লিকের শ্রাদ্ধে তাঁর আট ছেলে মিলে নগদ আট লাখ টাকা শুধু কাঙালীবিদের দিয়েছিলেন। এক বামুন ঠাকুর একাই পেয়েছিলেন এক ঠেলা টাকা। (এটা অবশ্য দান নয়, টাকা বিলতে বিলতে একটা ঠেলা তিনি নিজের বাড়ির দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন মাত্র!)

পরবর্তী পুরুষে মল্লিকবাড়িতে আর-একটা 'গেজেটে' উঠবার মত উৎসবের আয়োজন হল। এবার বিয়ে। "নিমাইচাঁদের নাতি রামরতনের বিয়ে। ভোলানাথেরই খবর : সেই উপলক্ষে চিৎপুরের দুই মাইল রাস্তা গোলাপজলে ভেজানো হয়। এবং সেই শোভাযাত্রা দেখবার জন্যে এমন ভিড় হয় যে মাথা-পিছু তিরিশ-চল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়েও ছাদের কার্নিশে একটু জায়গা পাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়!

রাজা সুখময়ের দুর্গোৎসব বা রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃক্রিয়ার কাহিনী সর্বজনবিদিত। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তা ছাড়া প্রধান ক্রিয়া হলেও মাতৃশ্রাদ্ধ নবকিষণের চতুর্থ ক্রিয়া। তাঁর একটা ছোটখাট ক্রিয়ার কথাই শুনুন।

১৭৯১ সনের কথা। খানাকুলের বসুদের মেয়ের সঙ্গে নবকিষণের ছেলে রাজকৃষ্ণের বিয়ে। খরচপত্র বা দানসামগ্রীর কথা বলাই বাহুল্য। সেই বিয়েতে বরযাত্রী সাজলেন—'দেশের প্রধান শাসনকর্তা বা গভর্নর-জেনারেল, প্রধান প্রাড়বিবাক এবং অন্যান্য রাজপুরুষেরা।' সুতরাং খ্যাতি হবে না মানে? 'নবকৃষ্ণ রাজা বাহাদুর উপাধির সহিত মসনাব পঞ্চহাজারী এবং মহারাজা বাহাদুর উপাধির সহিত মসনাব সাতহাজারী মর্যাদা প্রাপ্ত হন।' এই মর্যাদা অনুসারী মহারাজা বাহাদুর ইচ্ছে করলে সাকুল্যে সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখতে পারেন। নবকৃষ্ণ কবিদের পোষ্টা। লড়িয়ে গোরার চেয়ে লড়িয়ে কবিতে তাঁর বেশী মন। তবুও তিনি বললেন—আলবত রাখব। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ধার করে চার হাজার সৈন্য নিয়ে এলেন। তাঁরা বিয়ের দিন বরের পিছনে পিছনে মার্চ করল।

অতঃপর খ্যাতি না হওয়ার কথা নয়! অবশ্য যশ যদি এতৎসত্ত্বেও অন্যের বৈঠকখানা না ছাড়তে চায় তবে তাঁকে ভুলিয়ে আনার অন্যতর উপায়ও আছে। সেটি দেখালেন চুঁচড়ার স্বনামধন্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার মশাই (১৮২৭)।

যশ কলকাতায় নজরবন্দী দেখে তিনি চিনসুরাতে বসে কোম্পানির কাগজে চুরুট ধরালেন। দেখতে দেখতে দেশ-বিদেশে খ্যাতি রটে গেল। প্রাণকৃষ্ণ এতদ্দেশে নবম 'বাবু' হলেন। তাঁর পূর্ববর্তী আটজন বিখ্যাত 'আটবাবু।' হালদার খ্যাতিটাকে চিরস্থায়ী করতে চাইলেন। তিনি দুর্গোৎসব করলেন। এমন অঢেলা উৎসব বড় একটা হয় না। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গোটা কলকাতাকে নিমন্ত্রণ জানানো হল। খৃীষ্টান হও, মুসলমান হও, ফিরিঙ্গী হও সকলের জন্য পছন্দ মত মেনু, মনোমত প্রমোদের বন্দোবস্ত!

প্রাণকৃষ্ণ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যশের আরাধনায় অবতীর্ণ হলেন। যশ মিললও। তবে অন্যভাবে। জালিয়াতির অপরাধে তিনি বন্দী হলেন। কলকাতা মথিত করে মোকদ্দমা হল; এবং 'বাবু'দের হাসিয়ে ও ভক্তদের কাঁদিয়ে তিনি কারাগারে চলে গেলেন। অর্থাৎ অমর হলেন।

কৃষ্ণনগরের এক জমিদারবাবু ভাবলেন—

অমরত্ব কি এতই দুর্লভ? পলাশীর লড়াইয়ের মাঠটা তাঁর হাতে ছিল। কুড়ি হাজার টাকায় তিনি তাই বেচে দিলেন। তারপর সেই টাকায় সোনা এবং রুপোর কাপ গড়িয়ে দু হাতে তাই বিলিয়ে দিলেন! লোকে খ্যাতির কাজ করে কাপ মেডেল পায় —তিনি কাপ বিলিয়ে খ্যাতি পেলেন।

'বাবু'র তখন ভীষণ খ্যাতি। কলকাতায়, চিনসুরায়, কৃষ্ণনগরে—সর্বত্র 'বাবু'র জয়-ঢাক। সাহেবরা তাঁকে 'বাবু' বল্লেন, মোগলরা(!) তাঁকে 'বাবু' বলেন, নর্তকীরা তাঁকে 'বাবু' বলেন। তিনি-ভিন্ন জগৎ অন্ধকার। তিনি যে শুধু মুক্তাভস্মে পান খান তাই নয়,—তিনি 'গ্রন্থমুদ্রণার্থ চাঁদার খাতায়' নাম দেন, 'সতী'র পক্ষে বা বিপক্ষের আর্জিতে সহি দেন, 'টৌন হলে' মৃদু মন্দ সভা হলে বাগ হাঁকিয়ে সেখানে হাজিরা দেন এবং দরকার হলে বাষ্পীয়পোত, নির্মাণ বিষয়ে পর্যন্ত কথা বলেন! সুতরাং, নিজের সৃষ্টিকে দেখে সৃষ্টিকর্তারাও এবার চমকালেন। তাঁরা চোখ রগড়ে বললেন—'ইজ ইট?'

বলা বাহুল্য, নিজেদের হাতে বাঙালী নামক একটা অদ্ভুত জাতিকে ('The biable plastic and receptive inhabitants of Bengal') যাঁরা বিশ্বকর্মার মর্ত 'বাবু'ভাবে সাজিয়েছেন তাঁরা 'সাহেবলোগ' (Sahiblogue)। কী করে তাঁরা এমন একটা আশ্চর্য-দর্শন অদ্ভুত-স্বভাব মনুষ্যকুল সৃষ্টি করলেন এ

বিষয়ে তাঁদের মতামতটা শোনা দরকার। কেননা, তা না হলে 'বাবু'র বংশপরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

'বাবু'রা তখন বাঙালীর বেশে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় সহসা খবর এল—সুতানটীর ঘাটে জাহাজ ভিড়েছে। 'বাবু' শুনলেন—জাহাজ যাঁরা নিয়ে আসে তাঁদের মাঝি বলে না। তাঁরা-'কাপ্তান'। কিয়ংকাল তিনি মুর্শিদাবাদে এবং অন্যত্র মসনদ ধরার কারবার করেছেন। এবার 'কাপ্তান ধরা' তাঁর ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল। অনেক বাঙালী তাতে 'জেণ্টু' হয়ে গেলেন। তাঁরা সাহেবের সঙ্গে ভাবেভঙ্গীতে কথা বলে বিস্তর রোজগার করে ফেললেন। ইতিহাসে এঁরা—'দোভাষী'। বিনে মূলধনের কারবারে কলকাতায় তাঁরাই প্রথম 'বাবু'। এ শ্রেণীর বাবুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রত্নু সরকার এবং পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নকু ধর,—ওরফে লক্ষ্মীকান্ত ধর। বিশুদ্ধ ব্যবসা করে যাঁরা বড়লোক হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বল্পখ্যাত উল্লেখযোগ্য তিনজন—পীড়িতরাম 'মাড়' (১৭৮০), কৃষ্ণকান্ত এবং বিখ্যাত বৈষ্ণবচরণ শেঠের বাবা। পীড়িতরাম 'মাড়' পদবী পেয়েছিলেন ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাঁশ বেচে এবং কৃষ্ণকান্ত আড়ংঘাটার ছোলা বিক্রি করে। শেঠবাবুর ব্যবসা ছিল গঙ্গাজল এক্সপোর্ট করা।

পরবর্তী শ্রেণীর 'বাবু'রা চাকুরে কিংবা ব্যবসায়ী তা স্থির করা একটু কষ্টকর। কেননা, তাঁদের পদবী 'সরকার'। তারা সাহেবের কুঠিতে কাজ করেন বটে, কিন্তু মাইনে নেন না। তাঁদের একমাত্র প্রাপ্য 'দস্তুরি'। সওদাগরী হৌসে দালালের দস্তুরি তখন টাকায় আধা পয়সা। ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন—

'Dustoor is the breath of a Hindoo's nostrils, the mainspring of his actions and the staple of his conversations ? (G.O. Travelyan, "The competitionwallah')

ডাকঘরে টিকিট কিনতে গিয়েও 'বাবু' দস্তুরী দাবী করেন। আর একবার এক সাহেব দেশে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁর আসবাবপত্র সব বিক্রি হচ্ছে। একজন মস্তবাবু এসেছেন সেগুলো কিনতে। দরদাম সব ঠিক হল। টাকা নিতে গিয়ে সাহেব দেখলেন — কিছু যেন কম। তিনি বললেন,—বাপু হে, কি ব্যাপার? (প্রসঙ্গত বলা দরকার — হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'বাবু' শব্দটি 'ব্যাপু' থেকে জাত এবং বঙ্গদেশে তা পশ্চিম থেকে আগত। তাঁর মতে—'বাপু' মুণ্ডারি শব্দ। অবশ্য কোন কোন সাহেবের অনুমান—শব্দটি আসলে এসেছে পূব থেকে। জাভা বালি কিংবা ওসব এলাকা থেকে। সেকালের 'বাবু'দের অযোগ্য উত্তরপুরুষ হলেও আমি তা মানতে নারাজ। কেননা, সন্ধান নিয়ে দেখেছি ওদিকে 'বাবু' মানে এখনও—'মেয়ে-ছেলে' ('Female attendent'।)

যাহক, সাহেব বললেন—কি হে বাপু, চুপ করে রইলে যে?

'বাবু' মাথা চুলকে উত্তর দিলেন—আমার পাওনাটা কেটে রেখেছি, মি লর্ড!

—তোমার পাওনা?

—ইয়েস, মি লর্ড, মাই দস্তুর!

সাহেব হাসলেন। হেসে আরও দুটো টাকা বখশিশ দিয়ে দিলেন। 'বাবু' পরমানন্দে তা পকেটে পুরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

ট্রেভেলিয়ান লিখছেন—কি করে বিনে পরিশ্রমে রোজগার করা যায় 'বাবু'র কেবল সেই চিন্তা। রোজগারের জন্যে সে সব কর্মে রাজী। কেবল ইউরোপীয়ানরা যাকে বলে 'কাজ' (work) সেটি বাদ দিয়ে। আমি ভেবে পাই না আমরা এদেশে আসার আগে এই মানুষগুলো কি করে পথঘাট তৈরী করত, নৌকো বানাত বা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাতায়াত করত!

'বাবু'র এসব রহস্যালাপে কান দেওয়ার সময় নেই। তাঁর হাসি ঠাট্টার নিজস্ব সময় আছে, স্থান আছে, পদ্ধতি আছে। আপাতত তার বিজনেস বা কাজ (work নয় কিন্তু) 'বাবু' খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। যথা—ব্রীজমোহন। (আমরা তাকে 'বাবু বি বানরজী' লিখতে পারতাম কিন্তু 'সমাচার চন্দ্রিকা'র 'কস্বচিৎ স্বজাতীয়াক্ষর ত্যাগে বিরক্তস্য' মহাশয়ের জন্য তা সম্ভব হল না। সুদূর ১৮২৯ সনে তিনি লিখেছিলেন—'যাঁহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তেঁহ K. Banerjee বা কৃ. বানরজী লিখেন। বানরজীর বা অর্থ কি?')

ব্রীজমোহন বাবু বিষয়ক একটি বিশিষ্ট ইংরেজী বইয়ের নায়ক। (The Baboo and other Tales By Augustas Smith) তার বাবা সম্পন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু 'বাবু' ছিলেন না। ব্রীজমোহনের ধারণা সে উচ্চতর উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মেছে। ভবিষ্যতের 'বাবু'র তালিকায় নাম লিখিয়েই সে পৃথিবীতে এসেছে।

সুতরাং সাধনা সুরু হল। 'কাপ্তেন-ধরা' ব্যবসা ছেড়ে ব্রীজমোহন রাইটার এবং ফাইটার ধরার কাজে হাত দিল। গোরা সৈন্যরা যখন খুঁজে খুঁজে হন্যে ব্রীজমোহন তখন তাদের সামনে আর্ক এঞ্জেল-এর মত এসে হাজির হয়। তার বেনিয়ানের তলায় দামী শেরীর বোতল!

ছোকরা রাইটাররা অসময়ে ধার চায়। ব্রীজমোহন বলে—দিতে পারি, তবে এক শর্তে। প্রয়োজন হলে কিন্তু কুড়ি গুণ ফেরত চাই।

সাহেব বলল—আলবৎ পাবে।

ব্রীজমোহন বলল—তবে এই নাও।

সাহেবদের একটা প্রশস্ত পদ্দ শুদের আর যাই থাক, কথায় ঠিক আছে। যথাসময়ে টাকাটা পাওয়া যায়। তৎসহ 'থ্যাঙ্কস' এবং বখশিশও।

ফলে, ক' বছর কাটতে না কাটতেই দেখা গেল ব্রজমোহন 'বাবু' হয়ে এসেছে। অর্থাৎ, তার আদি চেহারাটার চার স্টোন মাংস জমে গেছে। বলা বাহুল্য, এদিকে সিন্দুকেও যথারীতি মেদবাহুল্য ঘটে গেছে।

ব্রজমোহন একটা সিন্দুক বাঁধা রেখে একটা সরকারী চাকরী কিনল। সে এখন কালেক্টার আপিসের খাজাঞ্চী। তবে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'। সুতরাং, সে পূর্ব ব্যবসাও ছাড়ল না। যুগপৎ এখনও সে বহু সওদাগরী কুঠির বেনিয়ান এবং অনেক সাহেবের সরকার! স্মিথ লিখছেন—'সবাই তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু ব্রজমোহন সব সময়ই হাসে। হেসে বলে—আই এ্যাম দাই স্লেভ!

ভাববেন না, 'ইয়ুর মোস্ট অবিডিয়েন্ট সার্ভেণ্ট'এর বেশী যাঁরা এগোন না তাঁরা 'বাবু' নন। তাঁরাও 'বাবু'। 'হবসন-জবসন'-এর মতে 'বাবু' মানে — 'এ নেটিভ ক্লার্ক হু রাইটস ইংলিশ।'

রাজনারায়ণ বসু শিবনাথ শাস্ত্রী থেকে বিলেতের 'পাঞ্চ' কাগজ কেরানীবাবুর ইংরেজী নিয়ে অনেক হাসাহাসি করেছেন। সুতরাং, আমরা এবিষয়ে আর বেশী ঘাটাঘাটি করব না। শুধু গোটা দুই নমুনা শোনাব।

বিশ্বম্ভর মিত্র জনৈক সাহেবের কাছে কেরানীর কাজ করেন। সাহেব সেদিন কুঠিতে নেই। সন্ধ্যায় ভীষণ ঝড় এল। ঝড়ে সাহেবের আপিসের জানালা দরজা সব ভেঙে গেল। বিশ্বম্ভর প্রভুকে সে সমাচার জানিয়ে লিখছেন:

'yesterday vesper a great hurricane the valves of the window not fasten great trapidetion and palpitation and then precipetated into the precinct. God grant master long long life and many many posts.

P.S. No tranquility since valve broken. I have sent carpenter to make reunite. etc.'

(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে)

বিশ্বম্ভর এতটা না লিখলেও পারতেন। কেরানীদের ডাঃ জনসনের ডিক্সনারীটা পুরো মুখস্ত করতে হবে এমন কথা ছিল না। তাদের কাজ ছিল নকল করা। তদুপরি কেউ যদি দু' দুই শব্দ 'বোঝাতে পারতেন' তবে ত কথাই ছিল না! তবুও জনৈক বিশ্বম্ভর মিত্র কেন তাঁর ইংরেজীবিদ্যা দেখাবার এই সুযোগটা হাতছাড়া হতে দিলেন না সেটা বুঝতে হলে আবার আমাদের 'বাবু'-চরিত শুনতে হবে।

'স্যার আলিবাবা ওরফে Aberigh Mackay নামে এক সাহেব এসেছিলেন এদেশে। তিনি লিখে গেছেন—প্রকৃত বাবুর লক্ষণ চারটে। (১) পায়ে পেটেণ্ট চামড়ার জুতো, (২) মাথায় সিল্কের ছাতা, (৩) মনে আবছা আবছা ইংরেজী ভাবাদর্শ এবং (৪) মুখে—

ten thousand horse-power English words and phrases! (Mackay, 'Twenty one days in India')

কথাটাকে বিশদ করতে গিয়ে তিনি বলেন—'বাবু'র ভেতরটা ঠিক লড়াইয়ের পর যুদ্ধক্ষেত্রের মত। মৃতদেহের মত এখানে ওখানে রাশি রাশি ইংরেজী শব্দ প্রবাদ প্রবচন ঠাসাঠাসি করে পড়ে আছে। কোনমতে ঠেলা বোঝাই করে সেগুলোকে সাফাই করতে

পারলেই যেন তিনি বেঁচে যান। মুখ দিয়ে আগে কি বেরিয়ে গেল, পরে কি আসছে সে দিকে তার কোন ভাবনা নেই!

তার আসল ভাবনা ক্রমে যা দাঁড়াল তা—ইংরেজদের মত ভাবতে হবে (অর্থাৎ, রামমোহন বা দ্বারকানাথের মত)। একান্ত যদি তা না পারা যায়, তবে ইংরেজদের মত চলতে হবে, বলতে হবে এবং লিখতে হবে! সুতরাং, পাকা লিখিয়ে বিশ্বম্ভর যখন মালিককে ঐ ভাষায় চিঠি লিখছেন তখন জনৈক 'নেটিভ-বয়' খবরের কাগজের সম্পাদককে সখেদে জানাচ্ছেন:

'.... I am a poor native boy rite hutiful English—and rite good sirkulars for Mateland Sahib..very ceap, and gives one ruppes eight annas per diem, but now a man say he makes betterer English, and put it all rong and gives me one ruppes....'

অথচ কি দুঃখের কথা দেখুন। ছেলেটি যে শুধু 'ভাল' ইংরেজীই লিখতে পারে তাই নয়, তার অন্য গুণও আছে। সে লিখছে—

—I make potery (কবিতা) and country Korruspondanse."

চিঠিটা নাকি ছাপা হয়েছিল ইংলিশম্যান কাগজে। পড়ে কে কি ভেবেছিলেন আমরা জানি না। কিন্তু—একজন সাহেব ভাবিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মেকলে। তিনি বসে বসে বিশ হাজার পাউণ্ড হর্স-পাওয়ার-বিশিষ্ট ইংরেজী গদ্যে 'বাবু'কে সম্পূর্ণ করার এক পরিকল্পনা রচনা করলেন। তাঁর সেই 'মিনিট' সর্বজনবিদিত। আমরা বরং এখানে অল্পজ্ঞাত কয়টি বিশ্বকর্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি জর্জ ক্যাম্পবেল। টাকা দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে সর্বস্বান্ত বাবুরা মেকলের বিধান অনুযায়ী যখন ইংরেজী পদ্যে জীবন-দর্শন ঘোষণা করছেন—

"Here today and gone tomorrow
In this vale of tear and sorrow;
Never lend, but always borrow
Kuchpurwani, Mari Jan !"

তখন এই ক্যাম্পবেল সাহেবই তাঁদের হাত ধরে স্বর্গের তোরণে এনে দাঁড় করালেন। 'বাবু'দের তিনি সরকারী চাকরির অধিকার দান করলেন। তবে এর চেয়ে তাঁর বড় অবদান—'বাবু'দের তিনি ফুটবল ও ফুটপাথ চেনালেন। ফলে পা দুখানা একটু পুষ্ট হল এবং উদরখানা আয়ত্তাধীনে আসার লক্ষণ দেখা গেল।

লর্ড অকল্যাণ্ড সদাশয় ব্যক্তি। তিনি সে পায়ে জুতো পরবার অনুমতি দিলেন এবং তাঁর পরবর্তীরা ক্রমে ক্রমে পেটভরে খাওয়ার অনুমতিটা কেড়ে নিলেন। ফলে মেকলের কারখানার প্রথম গ্রাজুয়েট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন—'বাবু'রা শুধু যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছেন তাই নয়, তাঁরা ভোরবেলায় জুতা পায়ে গোলদিঘির চারদিকে ঘুরে বেড়াতেও শিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাই দেখে লিখলেন—'বায়ুকেই ইহারা ভক্ষণ করিবেন—ভদ্রতা করিয়া সেই দুর্ধর্ষ কার্যের নাম রাখিবেন, বায়ু সেবন।'

ম্যাকে সাহেব লিখেছিলেন—'বাবু' হাসতে জানে না। যদি জানত তবে 'সি আই ই' নামক জীবগুলোকে দেখে নিশ্চয় তার হাসি পেত। বঙ্কিম জানালেন—'বাবু' আরও এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি নিজেকে দেখেও হাসতে শিখেছেন।

দুঃখের বিষয় এই অধম'বাবু' আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও আজ হাসতে পারছে না। কেননা, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাবু'দের দেখে হেসেছিলেন কিংবা কেঁদেছিলেন তাই আজও সে ঠাহর করে উঠতে পারছে না।
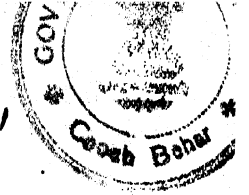
মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

অনেক ভেবেচিন্তে অনেক চেষ্টা করে নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত আপনাকে চিঠি লিখছি। আপনার সাহায্যই আমার শেষ ভরসা।

এমন অনুরোধ আপনাকে করা উচিত হবে কিনা, তাও জানি না। কারণ খবরের কাগজের আপিসের ভিতরের ব্যাপার সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। একবার মাত্র দূরে থেকে আপনাদের বাড়িটা দেখেছি। শ্রীলেখা ও আমি একদিন আপনাদের আপিসের রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেই সময় ও আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, ঐখানে বসে বসেই আপনারা না কি, রাতারাতি অতোগুলো পাতা অমন সুন্দরভাবে লিখে ফেলেন। আমি তো শুনে অবাক। সত্যি, কী করে ঐ বাড়িটার একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে বসে বসে সমস্ত পৃথিবীর খবর আপনি যোগাড় করেন?

এই তো আসামে আমার ভগ্নীপতি, আমার বোন, ওদের তিনটে বাচ্চা পড়ে ছিল। দাঙ্গার মধ্যে ওদের খবর নেওয়ার জন্য প্রথমে চিঠি পরে এক্সপ্রেস চিঠি, তারপরে বাধ্য হয়ে টেলিগ্রাম পর্যন্ত পাঠালাম। অথচ কোন উত্তরই এল না। একটা লোকের খবর নিতে গিয়ে শ্রীলেখা ও আমি হিমসিম খেয়ে গেলাম। অথচ আপনি কাগজে প্রতিদিন কত মানুষের খবর দিচ্ছেন। তাদের দুঃখের কথা, তাদের পোড়া কপালের কথা চোখের জলে ভিজিয়ে আপনি লিখছেন। আপনি জানেন,

এখান থেকে বহুদূরে আমাদের কুম্ভকর্ণ ভাগ্যবিধাতা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন। বার বার চিৎকার করে, অসংখ্য মানুষের নীরব কান্নাকে মুখর করে যদি তাঁর তন্দ্রা ছোটানো যায়।

এসব আমার নিজের কথা নয়; শ্রীলেখার কাছে শুনেছি। ও যে আমার থেকে অনেক গুণের মেয়ে, সে আপনি নিশ্চয়ই জানেন; নইলে আপনাদের নারী বিভাগে ওর লেখা ছাপালেন কেন? শুধু ছাপানো নয়, ওকে একখানা কাগজ আর মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

সেই টাকা পেয়েই, শ্রীলেখা আমাকে বলে-ছিল, 'তোমাকে একজোড়া জুতো কিনে দিই।'

আমি কিছুতেই রাজী হইনি। আমারও তো একটা আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। তা ছাড়া সরস্বতীর প্রসাদের বিনিময়ে জুতো কেনা! অভাবে পড়লেও ,আমি বাঙালী তো— সেই জাতের লোক তো যারা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ক্যামেরা দিয়ে বিশ্ব-জেতা সিনেমা তুলছে, ভাঙা তুলি আর কলম দিয়ে আজও ইণ্ডিয়ার সেরা ছবি আঁকছে ও সাহিত্য সৃষ্টি করছে। শ্রীলেখা অবশ্য আমার কথা শোনেনি, কিছু একটা দেবেই ও আমাকে।

শেষ পর্যন্ত একটা পেন কিনে দিয়েছিল, আর সেই পেন দিয়েই তো আপনাকে লিখছি। তবে অনুগ্রহ করে, এখন ও কাহিনীটা আর কাউকে বলবেন না। ও-বেচারা লজ্জায় পড়ে যাবে। তাছাড়া আপনি তো জানেন, লজ্জার ভয়েই সে নিজের বাড়ির ঠিকানার বদলে আমার ঠিকানায় আপনাকে টাকাটা পাঠাতে বলেছিল।

ওঃ দেখুন তো, কোন্ প্রসঙ্গ থেকে কোথায় সরে এসেছি! এই তো আমাদের দোষ। এসপ্ল্যানেড থেকে যাওয়া দরকার বেহালা, অন্যমনস্ক হয়ে হাজির হই শ্যাম-বাজারে। আমার কিন্তু একবার সত্যিই তাই হয়েছিল। আমাদের ইংরেজীর প্রফেসর এস পি বি'র বেহালার বাড়ি থেকে সাজেসন আনবার কথা ছিল। কিন্তু ভুল করে শ্যাম-বাজারের ট্রামে চড়ে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, শ্রীলেখাদের বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। সেদিন খুব ইচ্ছে হয়েছিল, ওদের বাড়ির কড়া নাড়ি। কিন্তু তা করলে বেচারা বেশ লজ্জায় পড়ে যেতো। কিন্তু কেন এমন হয় বলুন তো? আমরা তো কিছু অন্যায় করছি না। চুরি করছি না, জোচ্চুরি করছি না, সভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছি না। পৃথিবীর যতো বাধা, যতো নীতি যেন আমাদের বেলার জন্যই ফাঁদ পেতে বসে রয়েছে। অথচ কতো লোক বুক ফুলিয়ে মোটরে চড়ে ঘোড়ার মাঠে যাচ্ছে; প্রতিদিন রাত বারোটা পর্যন্ত পার্ক স্ট্রীট, ধর্মতলা স্ট্রীট, চৌরঙ্গীতে মদের দোকানে বসে মদ খাচ্ছে, প্রায় উলঙ্গ মেয়েদের নাচ দেখছে, গান শুনছে, তাদের কোনো লজ্জা নেই। নাঃ, আমি বড্ডো রেগে যাচ্ছি। আপনি আমার অবস্থাটা কল্পনা করে নিশ্চয়ই হাসছেন। হয়তো তাই, বাঙালী জাতটাই আমরা বেজায় খিট্‌খিটে হয়ে গিয়েছি, কিন্তু আমার অবস্থা একটু বিবেচনা করুন।

সামান্য কেরানী, নগদ এগারো নয়া পয়সা খরচ করে শ্যামবাজার গিয়েও শ্রীলেখাদের বাড়িতে আমি ঢুকতে পারলাম না। আর আমাদের আপিসেরই বাসু সায়েবকে মিস মৈত্র নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে নিয়ে যান। বাসু সায়েব এই তো সবে সোভিয়েট রুশিয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছেন। আবার আমেরিকায় যাচ্ছেন উনি আপিসের কাজে। ওদের বিয়ের এখনও অনেক দেরি। কিন্তু মিস মৈত্রের বাড়িতে বসে বসে রোজ কতক্ষণ গল্প করেন।

কিন্তু এইসব সামান্য ব্যাপারের জন্য আজ আপনার শ্বারস্থ হইনি। এবারের মতো মাপ করুন, আমাকে। সুযোগ পেয়েই নিজের দুঃখের কথা, নিজের অভিযোগের কথা বলতে শুরু করেছিলাম। ইংলন্ড, আমেরিকাতেও লোকে কাগজের সম্পাদক হয়। কিন্তু কোটি কোটি অর্ধাহারী অসুস্থ লোকের অন্তহীন দুঃখের কথা শুনতে শুনতে আপনার মতো তাদেয় কান ঝালাপালা হয় না। তবুও, দয়া করে রাগবেন না। আগে আমাদের সোনার দেশ ছিল, গোলাভরা ধান ছিল, আমাদের নেতা ছিল, আমাদের মূহ্যমান মুখে ভাষা দেবার জন্য বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ছিলেন। কিন্তু আজ আমাদের খবরের কাগজ ছাড়া যে আর কিছুই নেই। সেইজন্যই আজ আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

আমাদের আপিসের হরিপদবাবু বলেছিলেন, একমাত্র কাগজের গ্রাহকরাই নাকি সম্পাদককে চিঠি লিখতে পারে। ষোল নয়া পয়সা খরচ করে রোজ কাগজ কেনার মত সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু আপনার লেখা প্রতিটি লাইন আমি খুঁটিয়ে পড়ি। আগে সকাল বেলায় লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়তাম। কিন্তু একখানা কাগজ নিয়ে একশজন লোক ওখানে টানাটানি করে। এখন আমি তাই সন্ধ্যাবেলায় বহুজনের দলিতমর্দিত কাগজখানা পড়ি। আপনি নিশ্চয়ই এসব জানেন। যারা আপনার লেখা পড়ে, আপনার সদাজাগ্রত লেখনী যাদের প্রতিমুহূর্তে রক্ষা করছে, তারা সবাই যদি আপনার কাগজ কিনে পড়তো, তাহলে আপনার পত্রিকার প্রচার সংখ্যা এতোদিনে লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, টোকিওর লোকদেরও চিন্তিত করে তুলতো। হরিপদবাবু বলা সত্ত্বেও সাহস করে আপনাকে লিখছি। আমাদের আপিসের ডেপুটি কন্ট্রোলার ট্যান্ডন সায়েব বলেন, 'বেঙ্গলী পেপারগুলো শুধু সারকুলেশন বাড়াবার জন্যই গরম গরম লিখে যাচ্ছে। ওদের কোনো প্রিন্সিপল নেই।' এর উত্তর অবশ্য আমরা সবাই জানি। আমাদের আপিসের কজনই বা আপনার কাগজ কিনে পড়ি? তবু আমাদের কথাই তো লিখে যাচ্ছেন শুধু।

আমি যে কে তাই বলা হয়নি। আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি নাইট স্টুডেন্ট। শুনেছি প্রাচুর্যময় সমুদ্রের ওপারে ডে-স্কলাররা রাত্রিটা নাইট ক্লাবে কাটান। আর এপারে গঙ্গানদীর ধারে আমরা একাধারে ডেলি প্যাসেঞ্জার, ডে-ওয়ার্কার এবং নাইট স্টুডেন্ট। আমাদের কলেজের বিরাট বাড়িটা বোধহয় আপনি দেখেননি। দেখলেও বোধ হয় দিনের শিফটে দেখেছেন। হয়তো দিবাভাগের ছাত্রদের বাৎসরিক সাহিত্যপত্রও দেখেছেন। সেইখানেই একটা ছেলে লিখেছিল:—চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের আউটডোরে প্রতীক্ষারত শিয়ালদহের কালো কালো হাড়-জিরজিরে রক্তহীন দোতলা বাড়িগুলো যেন আমাদের দীর্ঘল পূর্ণায়ত দেহের নতুন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছে হিংসুক, ভাগ্যহীনা প্রতিবেশীদের সর্বপ্রকারের বাধা সত্ত্বেও, সূর্যের কিছুটা আলো প্রতিদিনই এই নবযৌবনার বক্ষদেশে আছড়ে পড়ে আত্মসমর্পণ করে।

কিন্তু আমাদের আপনি দেখেননি। কারণ যখন আমরা পাঁচটা বাজার একটু পরেই পড়ি-কি-মরি করে ওখানে জমা হই তখন আপনারও কাজের সময়। বৈঠকখানা বাজারের মধ্যে ঐ বাড়িতে যখন আমরা হাজির হই, আত্মনিবেদনে ক্লান্ত সূর্যদেব তখন বিদায় নিয়েছেন।

কলেজের খাতায় লেখা আছে—আমরা সবাই চাকরি করি। চাকরি না থাকলে, রাত-কলেজে ভর্তি হওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষেরও তাতে কাজের সুবিধা সারাদিন ফ্রী, হাফ-ফ্রী, কোয়ার্টার ফ্রীর এবং ফাইন মকুবের তদ্বিরে কানটা ঝালাপালা হবার পর, সন্ধ্যার সময় কে না একটু শান্তি আশা করেন? কিন্তু সে শান্তি মাত্র কয়েক দিনের। সেশন আরম্ভ হবার কিছু দিনের মধ্যেই সব প্রকাশ হতে আরম্ভ করে—আমাদের মধ্যেও অনেকে বেকার। দিনের বেলায় তারা চাকরির উমেদারি করে, আর রাত্রে পড়ে।

আমাদের কলেজে ভর্তির জন্য আপিসের ডেপুটি কন্ট্রোলারের লিখিত অনুমতির দরকার। 'উইদাউট পারমিশনে' কলেজে পড়ে বি এ পাস করার জন্য আমাদের সুধাংশুর সেবারে চাকরিটাই যেতে বসেছিল। হেড আপিস থেকে 'টপ সিক্রেট' খামে ডিসচার্জের অর্ডার এসেছিল নাকি। শেষ পর্যন্ত ডেপুটি কন্ট্রোলার দয়াপরবশ হয়ে ডি ও লিখে ফাইট করে সে-যাত্রা সুধাংশুকে রক্ষে করে দিলেন। তিন বছরের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হওয়ার উপর দিয়েই সুধাংশুর ফাঁড়াটা কেটে গেল। তার পরের বছরে পারমিশনের জন্য আমরা আবেদন করতেই ট্যান্ডন সায়েব বেজায় চটে উঠেছিলেন। স্টেনোকে বলেছিলেন, 'ক্লারিক্যাল স্টাফ আমার গুড-নেসের সুযোগ নিয়ে আমাকে এক্সপ্লয়েট্ করছে।' ট্যান্ডন সায়েব এস্টাব্লিসমেন্ট-ব্র্যাঞ্চকে নোট দিয়েছিলেন, উনি কাউকে পারমিশন দেবেন না। সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ডেকে বলেছিলেন, 'বেঙ্গলে বেয়ারাগুলো পর্যন্ত কলেজে পড়ে গ্র্যাজুয়েট হতে চায়। এতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলতে পারে না। এখন কান্ট্রির যা পজিশন তাতে আমরা এডুকেশন্ চাই না, আমরা স্যাক্রিফাইস্ চাই, হার্ড ওয়ার্ক চাই।'

সুপারিন্টেন্ডেন্ট পরে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'আপনাদের ভালবাসি বলেই বলছি। কিন্তু আপনারা ভেবেছেন কী? সবাই বি-এ পাস করে রাতারাতি হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যাবেন? না, সবাই এসে আমার চেয়ারে বসবেন?'

আমি কোনো উত্তর দিইনি। সত্যিই, উনি গুরুজন, নেহাত আমাদের ভালবাসেন বলেই তো ভিতরের কনফিডেনশিয়াল কথাগুলো বলে দিচ্ছেন।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাদের পাঁচজনকে আরও বলেছিলেন, 'আমাদের বেঙ্গলীদের এই একটি মহৎ দোষ। বড্ড সংকীর্ণ মন আমাদের। দেশের এই 'ক্রুশিয়াল' অবস্থায় সমস্ত কান্ট্রির কথা না ভেবে, আমরা কেবল নিজেদের পার্সোনাল স্বার্থের কথা ভাবছি।'

আমি তখন অ্যাপ্লিকেশন ফিরিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আড়ালে ডেকে ধমক দিয়ে বললেন, 'লাইফে তুমি কিছু করতে পারবে না। যা করবে, একলা চুপি চুপি করবে, ঢোল বাজিয়ে, দল প্যাকিয়ে করবার কোনো দরকার নেই।'

সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের স্নেহদৃষ্টি যে আমার উপর একটু ছিল, তা আমার অজানা নয়। ও'র ভাইঝিটির জন্য অনেক দিন থেকেই একটি পাত্র খুঁজেছেন! ট্যাণ্ডন সায়েবের সংগে অনেকক্ষণ রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে, উনি বাইরে এলেন, আমার কানে দ্রুত বিড়বিড় করে কয়েকটা কথা বলে আবার আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

ট্যাণ্ডন সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন তুমি হায়ার স্টাডি করতে চাও?'

শেখানো বুলি উপচে দিলাম—'যাতে আপনাকে আরও ভালো সার্ভিস দিতে পারি।'

'পড়াশোনার জন্য আপিসের কোনো কাজের ক্ষতি হবে না তো?

'মোটেই না। বরং আপনার দয়ার জন্য চিরদিন কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।'

ঐভাবেই কলেজে ঢুকেছিলাম। ময়লা শার্ট, ক্রীজভাঙা প্যাণ্ট, কালিবিহীন জুতো পরে কলেজের পাশের ছোট্ট রেস্টুরেণ্টে আরও যারা ভিড় করে, তাদের সবার পিছনেই হয়তো এর থেকেও অনেক দুঃখের ইতিহাস রয়েছে।

ডাক্তাররা বলছেন, খাদ্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। কিন্তু বটুবাবুর রেস্টুরেণ্টে এসে একবার দেখবেন। কাটলেট চপ, কসা-মাংস পাবেন। কিন্তু ডিমসেদ্ধ নেই—ওতে খাদ্যপ্রাণ বেশী থাকলেও লাভের পরিমাণ কম। পাশের স্টেশনারী দোকানে রুটি-মাখন পাওয়া যায়। সেইজন্যই নগদ এক টাকা খরচ করে বটুবাবুকে সাইন বোর্ড ঝোলাতে হয়েছে, 'বাহির হইতে আনা খাবার, এখানকার চায়ের সংগে খাওয়া বারণ।'

আমরা তবু ওর মধ্যেই ঝগড়াঝাটি করে বাইরে-থেকে-আনা খাবার খাই। কিন্তু আমাদের ক্লাসে সাইড বেঞ্চিতে বসেন যাঁরা? ভদ্রমহিলাদের দেখবার জন্যে আপনার কোনো ফোটোগ্রাফারকে সময়মতো একদিন সন্ধ্যাবেলায় শিয়ালদহের মোড়ে পাঠিয়ে দেবেন। ও'রা সকালে সংসারের কাজ করেন, দুপুরে চাকরি করেন, তারপর সন্ধ্যাবেলায় সরস্বতীর পাদবন্দনা। যাঁদের ভাগ্য ভাল তাঁরা ফিরে গিয়ে দুটো রান্নাভাত পান। অনেকে পাউরুটি আর চিনি দিয়েই কাজ সারেন। পাউরুটি কোম্পানিগুলো না থাকলে, দেশের যে কী হতো জানি না। বিকেল বেলায় ও'দেরও বোধহয় চা খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাজারে নামলেও, বাজারে বসে চা খেতে এখনও ও'দের লজ্জায় বাধে। ও'রা পারেন না। নেহাত মাথা ধরলে, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দল পাকাতে হয়। চার পাঁচজন সহপাঠিনী মিলে বৌবাজার স্ট্রীটের ওপর কোনো দোকানে ঢুকতে হয়। কিন্তু তাতেও কি শান্তি আছে? বয়কে ও'রা বলেন, 'শুধু চা, ভাই;' কিন্তু সে দুষ্টুমি করে জিজ্ঞাসা করবে, 'মাটনকারী? চিংড়ি মাছের কাটলেট্? চিকেন দো পিঁয়াজা? শামি কাবাব?' যতই ও'রা না বলবেন, ওর লিস্টি ততই বেড়ে যাবে। আর দোকানের অন্য অন্য খরিদ্দার হয়তো মাছের ফ্রাইতে একটা কামড় দিয়ে, ও'দের দিকে তাকিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করবেন।

তবুও ও'দের কিছুই বলবার থাকে না। কোনরকমে চা-এর কাপটা নিঃশেষ করে দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে কলেজের দিকে ছুটতে হয়। কারণ প্রফেসরের টেবিলের কাছাকাছি না বসলে, লেকচারের কিছুই শুনতে পাওয়া যাবে না। এ পাড়ার বাসিন্দারা অত্যন্ত ধর্ম-ভীরু। চোরাবাজারের সান্নিধ্যে ভীত হয়েই বোধহয় সন্ধ্যা থেকে কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে ভগবানকে খুশী রাখার চেষ্টা করেন। সেই সংগে উনুনের ধোঁয়া। ট্যাণ্ডন সায়েব এক-দিন ও'র স্টেনোকে বলেছিলেন, 'তোমাদের পেপারে যে লেখে, অভাবে লোকের অন্ন জুটছে না, তার ওয়ান পারসেণ্টও যদি সত্যি হতো, তাহলে কলকাতায় এতো ধোঁয়া থাকতো না।' আমাদের কলেজের প্রতি-বেশীরা রোজই বোধ হয় লাটসায়েবদের মতো খায়, নইলে অতো উনুনের ধোঁয়া কোথা থেকে আসে?

ধোঁয়া ও আওয়াজের জ্বালায় চোখ ও কান দুই বন্ধ করে অধ্যাপক পড়িয়ে যান। আমরা ও সাইড বেঞ্চির মেয়েরা নীরবে শুনে যাই। এক এক সময় ইচ্ছে হয় ডবলবেঞ্চির উপর মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়ি; কিংবা ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাই। কিন্তু সংগে সংগে মনে হয়, ওই তো আমাদের দোষ। ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাসটা বেংগালীদের মজ্জায় মিশে রয়েছে।

রাত্রি আরও বাড়বার সংগে সংগে পুজোর ঘণ্টা থেমে যায়। শিয়ালদহের তপ্ত আকাশ যেন ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হতে আরম্ভ করে। মাথার ওপর ফ্যানগুলো এতক্ষণ ওভারটাইম করে, এবার যেন ক্লান্ত হয়ে—একটা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ হতে থাকে। কিংবা হয়তো আমাদের সবারই মনের ভুল। বাইরের আওয়াজটার জন্য ফ্যানের আওয়াজটা এতক্ষণ কানে আসেনি।

এবার বাইরে অন্য নাটক শুরু হয়। পৃথিবীর যতো নেড়ীকুত্তা দল বেঁধে শোভা-যাত্রা করে কলেজের বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান তুলতে থাকে। প্রতিদিন একই সময় ওরা এসে প্রতিবাদ জানায়। বক্তব্যটা বোধ হয়, 'সারাদিন তো তোমাদের জ্বালায় তিতিবিরক্ত হয়ে থাকতে হয়। রাত ন'টার সময়ও তোমরা আমাদের একটু শান্তি দেবে না?'

দলবদ্ধ প্রতিবাদের কাছে কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করতে হয়। ইলেকট্রিক বেলে শেষ ঘণ্টা বেজে ওঠে। পাগলা কুকুর এবং বৈঠকখানা বাজারের মাতাল মানুষদের হাত এড়িয়ে বইগুলো বুকে করে ছাত্রীদের শিয়ালদহে বাসের জন্য আসতে হয়। তবুও এরা আসে। জ্ঞানের জন্যে নয়, বিদ্যার বাহাদুরীর জন্য নয়। ইস্কুল মাস্টারীতে বি-এ পাস না হলে চাকরি থাকবে না, আর যদি ভাগ্যগুণে শিকে ছেঁড়ে তাহলে কিছু মাইনে বাড়বে। ট্যাণ্ডন সায়েবরা হয়তো বলবেন, এটা লোভ। আমাদের পূজনীয় অনেকেই যখন ক্রমশ স্বেচ্ছায় কম মাইনে নিচ্ছেন, তখন এ আরও চাইছে। আপনি তো ইতিহাসের ক[illegible] অর্থনীতির সমস্যা, ইত্যাদি জানেন।[illegible] যে এতো লোক আরও চাই, আরও [illegible]

করেছে, তাতে কী আমাদের মঙ্গল হবে?

আপনি হয়তো উত্তরটা এখনই দিয়ে দেবেন। বলবেন, এই প্রশ্নটা সহজভাবে, ছোটভাবেই করলে হতো। প্রতিষ্ঠাবান ঔপন্যাসিকদের মতো এতো ফেনিয়ে বলবার কী ছিল? না সম্পাদক মশায়, এ প্রশ্নের উত্তর না পেলেও আমার কিছু এসে যাবে না। সত্যিকথা বলতে কি, দেশের জন্য, সাধারণের জন্য, অতো চিন্তা করবার মতো সামর্থ্য আমার নেই। আমি সামান্য লোয়ার ডিভিসন কেরানী। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে নিজের সংসারটুকু চালাতে পারলেই আমাদের দেশসেবা হলো।

আমি আপনাকে শ্রীলেখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করব। শ্রীলেখা বসু। ভারী সুন্দর নামটি, তাই না? সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে আপনি হাজার হাজার মেয়ের নাম দেখেন, আপনার কাছে তেমন অবাক-করা না হয়তো; কিন্তু আমার কানের মধ্যে নামটা একটা মিষ্টি গানের রেকর্ডের মতো বেজে চলেছে। শ্রীলেখাদের আপিসে অনেক মেয়ে কাজ করে। মধুছন্দা, সংঘমিত্রা, ইন্দ্রাণী, মহাশ্বেতা, ওদের আপিসের মেজসায়েব মিস্টার রামচন্দ্রণ তো এইসব নাম শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন বলেই ফেলেছিলেন, 'বেঙ্গলের কালচার, বেঙ্গলের টেগোরের উপর আমার পুরো রেসপেকট রয়েছে। কিন্তু এতোদিনে, কলকাতায় এসে বুঝলাম, কেন ইংরেজরা কলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই যে ঔদ্ধত্যের ভাব। মোস্ট অর্ডিনারী গার্লস—লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক, স্কুল মিস্ট্রেস—তাদেরও সব এমন নাম যা আমাদের সাউথে ডি-এম, ডেপুটি ডি-এমরাও তাঁদের মেয়েদের দিতে সাহস করেন না।'

শ্রীলেখাকে দেখলে আপনারও হয়তো তাই মনে হবে। অমন সুন্দর যার নাম তাঁর সঙ্গে তাল রেখে দেহটা তৈরি করা উচিত ছিল।

শ্রীলেখার তা নেই। শ্রীলেখা গৌরাঙ্গী নয়। ছোট্ট মেয়েটি। রসে, রহস্যে, চটুলতায় প্রাণবন্ত নয়। সর্বাঙ্গের পরিণত যৌবনের প্রাচুর্য নিয়েও ও কোনোদিন মাথা ঘামায়নি। কিন্তু ওর চোখ দুটো? ওই টানাটানা দুটি আঁখির পেছনে যে সমুদ্রের গভীরতা রয়েছে, তা আমি প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিলাম।

প্রথম যেদিন আপিসের পর ডালহৌসী থেকে বৌবাজারের ট্রামে চড়ে কলেজে যাচ্ছিলাম, সেই দিনই ওকে প্রথম দেখি। বসতে জায়গা না পেয়ে, ঝুঁকে পড়ে লেডিজ সীটের কোণটা ধরে ট্রামের মধ্যে কোনরকমে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন জানতাম না ওকেও উইলিয়মস লেনের মধ্য দিয়ে স্কট লেনে যেতে দেখবো। আমাকে বোধ হয় ও ভাল করে নজরেও আনেনি। তারপরে দেখলাম আমাদের সেকশনেই এসে বসলো সে।

সময়মতো পড়াশোনা করলে অনেক বছর আগেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সই করা ডিগ্রি পেয়ে যেতাম। কিন্তু তা তো হয়নি। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের অনেকের আরও দেরি হয়ে গিয়েছে—কারও দশ বছর, কারও কুড়ি বছর। তাই বেশ লজ্জা লজ্জা করছিল, যখন অধ্যাপক এস-পি-বি আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন। নাম না জানিয়ে চুপি চুপি অপকর্মটা সেরে শিয়ালদহ বাজার থেকে কেটে পড়তে পারলেই সুবিধে হতো। কিন্তু তা হবার নয়। সাইড-বেঞ্চির মেয়েরাও রক্ষা পেলো না। তখনই জানলাম ওর নাম শ্রীলেখা।

ডালহৌসীর ট্রাম স্টপেজে আমাদের আবার দেখা হয়েছে। পরিচয়ও হয়েছে ক্রমশ। কেমন করে? সে বর্ণনা করে আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনি সম্পাদক মানুষ, আপনার ভালো লাগবে না। শ্রীলেখার কাছে শুনেছি, সাহিত্যিকরা হলে, আর সব সমস্যা বাদ দিয়ে শুধু এটুকুই শুনতে চাইতেন।

ওর দূরসম্পর্কের এক মামা কিছুদিন আগে বই লিখে প্রাইজও পেয়েছেন। শ্রীলেখার সঙ্গে যখন হৃদ্যতাটা জমে উঠেছিল, তখন রসিকতা করে বলেছিলাম, 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ।'

শ্রীলেখা হেসে যাবার মেয়ে নয়। বলেছিল, 'নর। নারী নয়। সুতরাং আমি মামার মতো হচ্ছি না।'

সত্যি ওকে দেখে হয়তো আশ্চর্য কিছু মনে হয় না। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বললে, অবাক হয়ে যেতে হয়। শ্রীলেখা খুব কম কথার মেয়ে। ক্লাসের আর পাঁচটা ছাত্রীর মতো দিনরাত সরু গলায় বকবক করে না। আর ওর স্মৃতিশক্তি? রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত, নজরুলের কতো কবিতা যে ওর মুখস্থ। আরও কয়েকজন আধুনিক কবি যে খুব ভাল লিখেছেন, তা শ্রীলেখার কাছেই আমি প্রথম শুনেছিলাম। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, 'আপিসের চাকরি, কলেজের পড়া, সংসারে কাজ করে তুমি আবার কবিতার বই পড়ো কখন?'

ও গম্ভীরভাবে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখটা দাঁতে কাটতে কাটতে বলেছে, 'কই? কলেজে ঢোকার পর আর পড়া হয় কই? আমার কিন্তু খুব ইচ্ছে করে ঐসব বই পড়তে।'

একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে নয়। সে অ্যাডভেঞ্চার বাবার পয়সায়-পড়া ছেলেরা করতে পারে, আমরা পারি না। কলেজে এসে শুনলাম একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের আকস্মিক তিরোধানের জন্য ক্লাস বন্ধ। আমরা দুজনে সেই হঠাৎ-পাওয়া মুক্তিকে উপভোগের জন্য বাসে চড়ে বসেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, চিড়িয়াখানায় যাবো। কিন্তু শ্রীলেখা সামনের সিংহওয়ালা ন্যাশনাল লাইব্রেরির বাড়িটা দেখিয়ে বললে, ওইখানে চলো। লাইব্রেরির চারদিকে সবুজের সমারোহ। যে মাঠে একদিন বড়লাটের ছেলে, মেয়ে, বৌরা ঘুরে বেড়াতেন সেইখানে ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে অনেক কবিতা শুনেছিলাম। রেডিওতেও কতো মেয়ের আবৃত্তি শুনেছি, কিন্তু ওর মতো অতো ভাল নয়। কি একটা নাম বললে—জীবনানন্দ দাশ। যে কবি ট্রামে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিলেন। আধুনিক সভ্যতার বিষে জর্জরিত মানুষদের অনেক দুঃখের কথা তিনি নাকি লিখে গেছেন। মনেও রাখতে পারে বটে শ্রীলেখা। অতো কবিতা, একবারও না থেমে আস্তে আস্তে কেমনভাবে আমাকে শুনিয়ে গেল। এতদিন ধরে কষ্ট করে কেন যে কণ্ঠসহ করেছিল কে জানে—হয়তো আমারই মত কারোর সঙ্গে যে দেখা হবে তা ও জানতো। আমারও ইচ্ছা করেছিল কোনো কবিতা বলি, কিংবা কোনো গান গাই। কিন্তু [illegible] না। তাই আপিসের

গল্প বলেছি। শ্রীলেখা তাই মন দিয়ে শুনেছে।

শেষ ট্রেনে সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছি। পরে মনে মনে ভয় হয়েছে—পড়ার সময়টা একটা মেয়ের পিছনে ঘুরে নষ্ট করছি। কিন্তু সেদিকে আমার ভাগ্য ভাল। শ্রীলেখা নিজেই তা হতে দেবে না। ওর চোখ এড়িয়ে পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। শ্রীলেখাদের সরকারী আপিসে দুপুর বেলায় যেতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু ও রাজী হয়নি। বলেছে, 'সারাদিন তো গরুখাটা খাটতে হয়। টিফিনের আধঘণ্টা একটু বিশ্রাম নাও।'

আমি বলেছি, "না, তোমার ওখানে যেতেই আমার ভালো লাগবে। দুজনে কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে পি-এম-জি আপিসের তলা থেকে মশলামুড়ি কিনে খাবো।"

ও হেসে বলেছে। "হ্যাঁ, আর রাজ্য সুদ্ধ লোক আমাদের দেখুক।"

"দেখুক না," আমি বলেছি।

ও বলেছে, "আমাদের আপিসটাকে তো চেনো না।"

আমিও ভেবেছি ঠিকই বলেছে ও। শ্রীলেখাকে যতোই দেখেছি, ততই ভাল লেগেছে। মনে মনে ভয় হয়েছে ডালহৌসীর ডেলি প্যাসেঞ্জার খুদে কেরানী নিজের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক বেশীদূর এগিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা, এই অভাবের মরুভূমির মধ্যে কোন্ সাহসে ভালবাসার ওয়েসিসের স্বপ্ন দেখছি?

আমি জানি শ্রীলেখা দেখতে ভাল নয়। আর আমারও টিপিক্যাল বাঙালী চেহারা। হয়তো অনেক অনেকদিন পরে আমাদের মেয়েদের বিয়ে দিতে কষ্ট হবে। কিন্তু শ্রীলেখার গুণের অর্ধেক পেলেও আমাকে তাদের কথা ভাবতে হবে না। আর ততদিনে পৃথিবীও কিছু আজ যেখানে রয়েছে সেই-খানে পড়ে থাকবে না।

শ্রীলেখার বাংলা লেখা আপনি ছাপিয়েছেন তো। বলুন তো—সুযোগ পেলে, উৎসাহ পেলে ও অনেক বড়ো হতে পারত কিনা? শ্রীলেখা অবশ্য সংসারে খুব জড়িয়ে নেই। অল্পবয়সে ওর বাবা মারা গিয়েছিলেন, সংসারের মাল-বোঝাই রিস্সা এতদিন তাই ওকেই টেনে আসতে হয়েছে। কিন্তু শ্রীলেখার ভাই দুটো পড়ায় ভাল। বড় ভাই প্রেসিডেন্সী থেকে কেমিস্ট্রি অনার্সে ভালভাবে পাস করে বেরিয়েছে। চাকরি একটা পাবে।

আমরাও স্বপ্ন দেখেছি। আর সেই স্বপ্নের মধ্য দিয়েই কলেজের দুটো বছর যেন কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছে। ও আপনাদের কাগজে লিখেছে, সেই লেখার পয়সায় আমাকে কলম কিনে দিয়েছে। আমিও ঠিক করে রেখেছিলাম, পে-কমিশনের কৃপায় যে পুরনো টাকাটা পাবো, সেই দিয়ে ওকে

একান্তে আলোকচিত্র ঃ শ্রীজীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

অবাক করে দেবার মত কিছু কিনবো। আমি জানি, প্রথমে ও নিতে চাইবে না। তখন আমাকে গম্ভীর হয়ে উঠতে হবে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হবে, "তুমি কি আমার পর?" তখন আর শ্রীলেখার আপত্তি করবার মুখ থাকবে না।

আরও স্বপ্ন দেখেছি আমরা। সুযোগ বুঝে আমার মাকে বলতে হবে ব্যাপারটা। শ্রীলেখা ওর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে প্রশ্ন করেছে, "কেমন করে পাড়বে কথাটা?"

আমি বলেছি, "সেটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও। মায়ের জন্য তো আর যা-তা মেয়ে পছন্দ করিনি আমি।"

"খুব বুঝেছি। এখন আর লেক্‌চার শুরু করতে হবে না।"

শ্রীলেখা সত্যি একেবারে অন্যছাঁচে গড়া মেয়ে। জিজ্ঞাসা করেছে, "তোমার ভাই কেমন পড়াশোনা করছে?"

"খুব সুবিধে নয়।"

শ্রীলেখা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছে, "মাস্টার রাখা দরকার। ঠিক আছে, আমি একবার আসি, তখন তো আমাদের আয় অনেক বেড়ে যাবে।"

আমি সত্যই সেদিনের স্বপ্ন দেখেছি, যেদিন বধূ হয়ে ও আমার ঘরে এসেছে।

আমরা অনেক স্কীম করেছি। চুঁচড়ো থেকে চলে আসব আমরা। শ্রীলেখার এক বন্ধু আছে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টে। আমাদের ব্যাপারটা সে জানে। সে বলেছে, কম ভাড়ায় একটা ফ্ল্যাট পাইয়ে দেবে। ওইখানে আমরা সবাই এসে থাকবো। শ্রীলেখা নিজেই বলেছে, দেওরকে ও ভাল কলেজে ভর্তি করিয়ে দেবে—আমাদের দুজনের মতো শিয়ালদহের রাত্রির অন্ধকারে ওকে পড়তে পাঠাবে না।

আমাদের পরীক্ষার ফল বেরোতে দেরি নেই। শ্রীলেখা অন্তত সম্মানের সঙ্গে পাস করবে; ওর চাপে পড়ে আমারও যা পড়া হয়েছে তাতে পাস করে গেলেও আশ্চর্য হব না।

শ্রীলেখা সারাজীবন ধরে যাকে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে এসেছে সে হলো সম্মান। সেই সম্মানের জন্যই, বিধবা মা, ভাইদের জন্য ও চাকরি করতে বেরিয়েছে। সম্মানের সঙ্গেই ওর ভাই পাস করে এবার রোজগার আরম্ভ করেছে। আপিসেও হয়তো শ্রীলেখা এবার প্রমোশন পাবে—মাইনে বাড়বে।

আমি বলেছি, "শ্রীলেখা যাই করো আমাদের ফ্ল্যাটে, প্রতি মাসে কিছু বই কিনতেই হবে।"

শ্রীলেখাও রাজী হয়ে গিয়েছে। বই-এর

নাম করেছে—ভাল ভাল কবিতার আর গল্পের বই। "সেই সঙ্গে রোজ একখানা খবরের কাগজও" শ্রীলেখা বলেছে।

এই সব চিন্তার মধ্য দিয়ে বেশ কেটে যাচ্ছিল জীবনটা। হঠাৎ কোথা থেকে স্ট্রাইকের ঝড় উঠলো। ১৯৬০ সালের এগারই জুলাই থেকে নাকি রেলের চাকা আর ঘুরবে না, টরে টক্কা করবে না; হাওয়াই জাহাজ উড়বে না। শেষ যেদিন আপিস থেকে বেরিয়ে, ন্যাশনাল লাইব্রেরির মাঠে এসে বসেছিলাম আমরা, সেদিন আমাদের ক্ষণেকের সাহচর্যের মধ্যেও স্ট্রাইকের ছায়া নেমে এসেছিল, শ্রীলেখা তার আগের দিনে ওদের আপিসের শোভাযাত্রায় বেরিয়েছিল। এসপ্লানেডের মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম, শোভাযাত্রায় শ্রীলেখাকে কেমন দেখায় দেখবো। আপনাদের ফোটোগ্রাফার সেদিন নিশ্চয়ই ওকে আর ওর বন্ধুদের দেখেছিল। ওরা কী রাস্তায় বেরিয়ে দাবি জানাবার মেয়ে; তবু ওরা বেরিয়েছে। আর ওদের জন্যেই বোধ হয় এসপ্ল্যানেডের বাধা-বন্ধ-হীন স্ফূর্তির পরিবেশেও যেন ক্ষণ-কালের বিষণ্ণতা দেখা দিয়েছিল। যে মেয়ে গল্প লেখে, যে মেয়ে কবিতা পড়ে, যে মানুষের স্নেহদৃষ্টিতে আমার মতো মানুষের দাবদগ্ধ জীবনও সবুজ সরস হয়ে ওঠে, পাঁচটা টাকার জন্য সেও মিছিলে বেরিয়েছে। সংসারের ঐসব অপ্রিয় কাজের জন্য তো আমরা পুরুষেরা রয়েছি। শিল্প-বিপ্লবের বহ্নিশিখায় আমাদের নরম নরম কম বয়সের মেয়েগুলোকে পুড়িয়ে মেরে কী হবে? আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে শ্রীলেখা মধুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলেছিল, "কেন আমাদের সম্মান তো কম হয়নি।" তারপর সে আমাকে ভাবতে দেয়নি, ওর প্রিয় কবির কবিতা শুনিয়েছিল ঃ—

"ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায়; তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালবাসে; মানুষের মন জানে জীবনের মানে ঃ সকলের ভাল করে জীবনযাপন।"

শ্রীলেখাদের আপিসের ছেলেগুলো রুখে দাঁড়িয়েছে, সেই দেখে মেয়েগুলোও গরম হয়ে উঠেছে। ওরা ধর্মঘট করবেই। আমাদের ছোট্ট আপিস, সেখানে ট্যান্ডন সায়েবের দোর্দণ্ড প্রতাপ। শ্রীলেখা জিজ্ঞাসা করেছিল, "তোমরা কী করছ?"

বলেছিলাম, "এখনও ঠিক হয়নি।"

তারপর সত্যিই ঝড় এলো। আকাশের এক কোণে অভিযোগের যে মেঘ জড়ো হয়েছিল, তা যে সত্যই হঠাৎ উন্মাদের মতো সব বন্ধন ছিন্ন করে সমস্ত আকাশকে গ্রাস করে ফেলবে, তা কেউই আশা করেনি। সেই কদিন শ্রীলেখার কথা বারবার মনে হওয়া সত্ত্বেও, কিছুই করতে পারিনি। ধর্মঘটে যোগ দিইনি আমরা। দরজা বন্ধ করে রাত্রির গভীরেও জরুরী কাজ করেছি—আর শ্রীলেখার কথা ভেবেছি।

সাত দিন পরে যখন ঝড় থামলো, সেই রবিবারে আপিস থেকে আবার ডালহৌসীতে এসেছিলাম। বৃষ্টি পড়ছিল তখন। সেই জনহীন লালদীঘির এলাকায় শ্রীলেখার সঙ্গে দেখা হলো। এই কদিন আমি যখন ওর কথা ভেবে ভেবে জলে পুড়ে মরেছি, ও তখন বাড়িতে বসে বসে কবিতার বই পড়েছে, আপনার কাগজের জন্য কী একটা লেখাও শেষ করেছে। ওদের আপিসের দরজার গোড়ায় তখন বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে। হেরে-যাওয়া ধর্মঘটীরা একমনে দেওয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া নামের লিস্ট পড়ছে। অনেকের চাকরি গিয়েছে, কাউকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আমি তখন মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, হে ঈশ্বর, ওর মধ্যে যেন শ্রীলেখার নাম না থাকে। কিন্তু আমার প্রার্থনার আগেই তো রামচন্দ্রণ সায়েবের লিস্ট টাইপ করে টাঙানো হয়ে গিয়েছিল। এবং সেখানে ছাঁটাই-এর ভূমিকায় শ্রীলেখা বসুর নামটা জ্বল জ্বল করছে।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে শান্তভাবেই নিজের নামটা ও দেখলো। একটু ভেঙে পড়লো না কিন্তু। ওর মধ্যে যে অমন জোর আছে, তা আমার জানা ছিল না। বললে, "ইস্, ছাড়ালেই হলো। আমাদের সবাইকেই আবার ফিরিয়ে নিতে হবে।"

আমি গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম, "কিছুই বলা যায় না।"

ও বলেছিল, "খুব বলা যায়। আমরা ফাইট করবো।" তারপরই আমার কথা জিজ্ঞাসা করল, "রাত্রে টেবিলের উপর ঘুমোতে তোমার কষ্ট হতো না?"

বললাম, "এমন কিছু নয়।"

"এই কদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি মোটা হয়ে গিয়েছি; আর রাত জেগে জেগে তোমার চোখ দুটো বসে গিয়েছে।" শ্রীলেখা এমনভাবে কথা বলছিল যেন ওর কিছুই হয়নি।

আমি বলেছিলাম, "তোমার জন্য ট্যান্ডন সায়েবের স্টেনোকে ধরবো নাকি? তোমাদের আপিসের রামচন্দ্রণ সায়েবের স্টেনোকে উনি চেনেন।"

শ্রীলেখা হেসে ফেলেছিল। "তুমি মিথ্যে চিন্তা করছো। দেখো না, আমি একাই একশ।"

সত্যি একাই একশ বটে শ্রীলেখা। ছুটির পরে ন্যাশনাল লাইব্রেরির মাঠে অপেক্ষা করেছি আমি। সাদা সবুজপাড়ের শাড়ি আর সবুজ রঙের ব্লাউজ পরে ও যখন ঘাসের উপর এসে বসলো, তখন যৌবনের লাবণ্যে টলোমলো ওর মুখখানি দেখে কে বলবে ও ছাঁটাই হয়েছে; ওর চাকরি নেই। মনের জোরও অনেক। বললে, "চাকরি আমি করবই; আর ঐ আপিসেই।"

সত্যি প্রতিজ্ঞা রেখেছিল, শ্রীলেখা। কদিন পরে ওদের আপিস থেকেই ট্যান্ডন সায়েবের স্টেনোর থ্রু দিয়ে খবর পেয়েছিলাম, শ্রীলেখা বসু আবার চাকরি পেয়েছে। খবরটা পেয়ে আমার যে কী আনন্দ হল। ইচ্ছে হচ্ছিল তখনই গিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরে বলি, ধন্য মেয়ে তুমি।

কিন্তু তখন কোথায় শ্রীলেখা? ওদের আপিসে বাইরের লোকের দেখা করবার বেজায় অসুবিধা। বিকেলবেলায় সেদিন ওর জন্য লাইব্রেরির মাঠে বৃথাই অপেক্ষা করেছিলাম। ও আসেনি। ভাবলাম, নিশ্চয়ই প্রথম দিন, কাজ করে বেরোতে দেরি হয়ে গিয়েছে। পকেটে করে চারটে কড়াপাকের সন্দেশ এনেছিলাম—ওর জয়লাভে মিষ্টি-মুখ করবো বলে। তারপর লাইব্রেরির ক্যান্টিনের চা তো আছেই। সেগুলো ফেরার পথে কালীঘাটে পুজো দিয়ে গেলাম।

শ্রীলেখা পরে টেলিফোন করেছিল, ছুটির দিনে দেখা করার খুব দরকার বলেছিল। ওর জন্য রবিবার, চিড়িয়াখানার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। সবুজ রঙের সিঙ্গাপুরী স্লিপার পায়ে গলিয়ে ও যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন আমি চমকে উঠেছি। মুখটা গম্ভীর, চোখের কোণে ক্লান্তি রেখা। এ মেয়ে তো যুদ্ধে-জেতা স্ট্রাইক-করা মেয়ে নয়। জীবনের যুদ্ধে এ যেন হেরে ভূত হয়ে গিয়েছে।

শ্রীলেখাকে চাকরিটা ফেরত পাবার জন্য অভিনন্দন দিতে যাচ্ছিলাম। ও আমার হাতটা ধরে এনে সবুজ ঘাসের মাঠের উপর বসালো। বলতে বোধ হয় ওর লজ্জা করছিল। ঠোঁটটা দ্বিধায় কেঁপে উঠলো। তারপর ঘাসের দিকে তাকিয়ে কোন রকমে বললে, "মাকে বলে একটা দিন ঠিক করো।" যে শ্রীলেখা বারবার পরীক্ষা আর ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশনের কথা বলে বলে, দিন পিছিয়েছে—সেই আজ নিজে থেকে বলছে!

যন্ত্রণায় ওর গাল দুটো ক্ষণেকের জন্য নীল হয়ে উঠেছিল। চেপে রাখার চেষ্টা করেও যেন পারলে না। আমার হাতটা ধরে হঠাৎ কেঁদে ফেললে। কাঁদতে কাঁদতে আমার কোলে মুখ লুকিয়ে বললে, "আমি আর ওদের চাকরি করবো না। আমার মোটেই ভাল লাগছে না। একেবারে যাদের উপায় নেই তারা করুক। আমার তো তুমি আছ।"

শাড়ির আঁচলে চোখটা মুছে বললে, "জানো, ওরা আমাদের মানুষের মধ্যে মনে করে না।" অপমান অসহ্য হয়ে উঠেছে শ্রীলেখার। জেদ করেছিল, চাকরিটা ফেরত নেবেই। তা পেয়েছে। কিন্তু ওর অন্তরাত্মা যেন তিলে তিলে অপমানিত হয়েছে। এবার তাই চাকরিটা ছেড়ে প্রতিশোধ নিতে চায়। "শাস্তি দিক, অত্যাচার করুক, তাও সহ্য হয়। কিন্তু তা বলে অপমান?" শ্রীলেখা দয়াহীন ডালহৌসীর বিরুদ্ধে সব অভিযোগটা আমার কাছে নিবেদন করেছিল।

কিন্তু আপনিই বলুন তো ওকে আমি কি বোঝাই? আমি যদি বলি চাকরি ছেড়ো না, তা হলে মনে করতে পারে আমার স্বার্থে ওকে বারণ করছি। কলকাতার ফ্ল্যাট, আমার ভাই-এর কলেজে পড়া, ইজি চেয়ারে বসে রেডিও শোনার লোভে আমার অভিমানিনী প্রিয়াকে অপমানের প্রতিবাদ করতে বারণ করছি। বিশ্বাস করুন, ওই সব সামান্য জিনিসের থেকে শ্রীলেখা আমার কাছে অনেক বড়।

কিন্তু আপনি সম্পাদক। আপনার রচনা শ্রীলেখার মতো ছেলেমেয়েরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ে। আপনি কি ওকে বোঝাতে পারেন না, আমরা যারা সাধারণ মানুষ, ভদ্রতা করে যারা পরস্পরকে এখনও মধ্যবিত্ত বলি, তাদের অতো পাতলা চামড়া হলে চলে না। অবহেলায়, অপমানে, অসম্মানে বিচলিত হওয়াটা আমাদের পক্ষে মারাত্মক বিলাসিতা। আর এইসব সূক্ষ্ম বিলাসিতার জন্যই তো ইতিহাসের দরবারে আমাদের অনেক দাম দিতে হয়েছে। তবু আমাদের শিক্ষা হয়নি। আর সেই জন্যই তো স্বাধীন ভারতে আমরা বিলাসী বাঙালীরা ক্রমশ জাতি হিসাবে অন্য সকলের পিছনে পড়ে যাচ্ছি।

আপনার কলমের জোরে পাকিস্তানের অনেক হতভাগা মানুষ আজও বেঁচে রয়েছে, আসামের অনেকে শুধু আপনাদের জন্যই এ-যাত্রা রক্ষা পেল। এবার শ্রীলেখাকে বকুনি দিয়ে এই সামান্য কেরানীকে একটু দয়া করুন না। ইতি—শ্রীবঙ্গচন্দ্র পাল
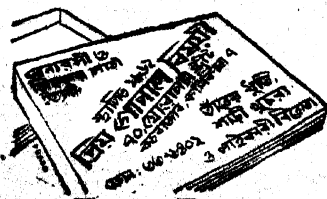
বাংলা ছবি

তপন সিংহ
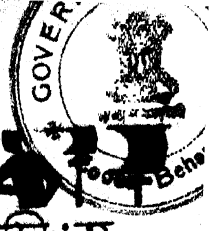
বাংলা ছবি নিয়ে লিখতে বসে স্বভাবতই খানিকটা সংকোচ বোধ করছি। প্রথমত ফিল্মের সংগে আমি বিশেষ জড়িত। এ ধরনের আলোচনায় যে-নির্লিপ্ত-বোধ ঠিক নয়,—mental detachment-এর দরকার তা হয়ত আমার নেই, আর দ্বিতীয়ত এই বিষয়ে আমার জ্ঞান ধারণাই বা কতটুকু। তবু লিখছি এই জন্যেই যে সাময়িক সাহিত্যে ফিল্মের যা আলোচনা হয় তা অনেকটা একচোখো। সাপ্তাহিক বা দৈনিক কাগজে সিনেমা পাতা (Cinema page) পাচ্ছেন, কিন্তু সিনেমার জন্য পাতা নেই। বই-এর সমালোচনা আছে; পরিচালনা, অভিনয়, আবহসংগীত বা আঙ্গিক রূপসজ্জার ভাল-মন্দ, ত্রুটি-বিচ্যুতির মতামত পাওয়া যায়, কিন্তু থাকে না শিল্পের গতিপথ বা পথনির্দেশ নিয়ে মর্মগ্রাহী আলোচনা। যদি বা থাকে ফিল্মের ধারাবাহিক ইতিহাস, মেলে না প্রকাশ ভঙ্গির রূপান্তরের ইতিবৃত্ত।

অথচ আলোচনার প্রয়োজন আছে বৈকি? সমাজ-জীবনে ছবি আজ অপরিহার্য—তা চিত্তবিনোদনের জন্যই বলুন আর শিক্ষার সোপান হিসেবেই বলুন।

বাংলা ফিল্ম আজ এক অচিন্তনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন। একদিকে এর সৃজনী-প্রতিভা যেমন ইতিহাসের পাতায় অক্ষর এঁকে যাচ্ছে, অন্যদিকে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যে, ফিল্ম-শিল্পকে ঐতিহ্য অনুযায়ী বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একথা ভাবতেও ভাল লাগে, বাংলা ছবি বিশ্ব-ছবি প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র also ran-এর সম্মানে সামিল হয়নি।

শ্রীসত্যজিৎ রায় বিশ্ব-দরবারে বাঙালী-মহিমাকে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মানে ভূষিতই শুধু করেননি, নতুন ভাবধারার প্রবর্তন করে পশ্চিমী ছবির গতির মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন। 'পথের পাঁচালি' শুধু ভাল ছবি নয়, নতুন গঙ্গোত্রীর উৎসও বটে। সে কথা পরে বলছি।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ফিল্ম-শিল্প কদিনেরই বা। লক্ষনীয় এই যে, প্রথম থেকেই পাশ্চাত্যের ভাবধারা সাতসাগর ডিঙিয়ে এই বাংলা দেশেই দানা বেঁধেছে। হলিউড বা জার্মেনীর ফিল্ম-শিল্পের উত্তরসাধক হিসেবে দূরে বা নিকট প্রাচ্যে একমাত্র এই বাংলা দেশই অনুসরণকে নিজস্ব মহিমায় স্বকীয় মর্যাদা দিয়েছিল।

হলিউডের টেকনিক এবং আদর্শ আমাদের মধ্যে তেমন সাড়া তুলতে পারেনি, তার কারণ বোধহয় আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং আমাদের একান্ত নিজস্ব বাঙালী চরিত্র। ইতিমধ্যে জার্মেনীর ফিল্ম-শিল্পের টেকনিক আমাদের নূতন পথের সন্ধান দেয়। এরজন্য অবশ্য জার্মেনী আগত (U.F.A) কুশলীরাই প্রধানতঃ দায়ী। Franz Osten প্রমুখরাই ছবিতে নূতন সুর দিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিয়ো মারফৎ এঁরাই প্রথম ইয়োরোপীয় ছাঁচে Classics-এর মত প্রথিত-যশা লেখকদের বইয়ের চিত্ররূপ দেবার প্রেরণা দেন। অবশ্য Sex বা Stunt-ক্লান্ত হলিউডও ভিক্টোর হিউগো বা ডুমার বইএর ইয়োরোপীয় চিত্ররূপের সাফল্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং নিজস্ব অনুভাবনায় আপনার করে নিলেন। কিন্তু Court intrigue বা Swashbuckling বেশীদিন মনকে আনন্দ দিতে পারেনি, তাই দেখি জেমস হিলটন প্রমুখদের উপন্যাস হলিউডে আদৃত হল। হলিউডের এই নূতন metier বাংলা চিত্রশিল্প সহজেই গ্রহণ করলেন। শরৎ-সাহিত্য বাংলা চিত্ররূপের প্রধান খোরাক হল।

এল যুদ্ধ ঃ যুদ্ধের পটভূমিকায় সব কিছুই বিজ্ঞাপনী বা প্রচারধর্মী হয়ে দাঁড়ায় এবং তা নিতান্তই সাময়িক।

যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার সব কিছু ভেঙে গেছে, দৃষ্টিভঙ্গিতে এসেছে পরিবর্তন, চিন্তা গেছে বদলে (Change in Values)। হলিউডের চিত্রশিল্প দিশেহারা, ইয়োরোপে সব কিছু গেছে ভেঙে। এই ভগ্নস্তূপের পটভূমিকায় হৃত আদর্শ, ছন্নছাড়া জীবনের কাহিনী নিয়ে ছবির নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিলেন ইটালীর ডি সিকা, রোজালিনো, যাভাথানি। চিত্রশিল্পে এঁরা নিয়ে এলেন উপদ্রুত জীবনের সমস্যা-কণ্টকিত আলেখ্য। অনুকূল পরিবেশে ইটালী আগত এই নিও-রিয়লিজম সহজে বাংলা ফিল্মে স্থান পেলো; এই নবতর বাস্তববাদে ইদানীন্তন বাংলা ছবি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হল।

সে-যুগের একটি বাংলা ছবি—'বিদ্যাপতি'র দৃশ্য

এ-যুগের একটি বাংলা ছবি—'পথের পাঁচালী'র দৃশ্য'।

ইতালীয় এই বাস্তববাদী ছবির মধ্যে এমন একটি রূঢ় কাঠিন্য আছে যা দীপ্তি যদি-বা দেয় তার চেয়ে বেশী দেয়, দাহ। এই কুলিশ বাস্তববাদ (rugged realism) মানুষের আশাবাদী মনকে অতৃপ্তির কুয়াশা দেয়, স্নিগ্ধ স্বচ্ছতার আনন্দ দিতে পারে না। বাস্তবধর্মী মন কর্মকীর্ণ দুঃখদীর্ণ দিনের অবসরে কল্পনার ইন্দ্রপুরী (Ivory Towers) গড়তে চায় না, কিন্তু চায় একটু ফুলের হাসি, একটু পাখির গান।

এই ফুলের হাসি, পাখির গান, বাস্তব জীবনে কবিতার সুর এনে দিলেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। 'পথের পাঁচালি' জীবন নয়—তার চেয়ে বেশী, 'পথের পাঁচালি' কবিতা নয়—তার চেয়ে বড়; 'পথের পাঁচালি' কবিতা জড়ানো জীবন। দুঃখ এখানে দুর্দশা নয়, দুঃখ এখানে স্মৃতি। আঁখির জলে রঙের ছবি, কান্নায় ফোটে হাসির ঝিলিক। অপু নয়, সমস্ত ফিল্ম-শিল্প নূতন বিস্ময়ে প্রকৃতির প্রথম পরিচয় নিল।

এইত ইয়োরোপ, আমেরিকা চাইছিল, নবতর বাস্তববাদের পর idyll-এর নূতন প্রভাত। শ্রীসত্যজিৎ রায় শুধু শ্রেষ্ঠ পরিচালক নন, তিনি নূতন ভাবধারার ভগীরথ—ছবির মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

বাংলা ফিল্ম-শিল্প-টেকনিকে যে জোয়ার এসেছিল, শ্রীরায় তার উচ্চতম তরঙ্গ। প্রাণ-প্রাচুর্য্যে এ উচ্ছ্বলতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বহু বাংলা ছবি সেজন্যেই সুধী-আদৃত এবং সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছে।

কথাটা পরস্পর বিরোধী (Paradox) মনে হতে পারে—বাংলা ছবির উৎকর্ষতা বাংলার ফিল্ম-শিল্পে এনেছে বিপর্যয়। যে কোন ছবি আজ বাংলায় চলবে না। নানা কসরতের বোম্বে ফিল্ম দেখতে লোক যায়, কিন্তু শুধুমাত্র ব্যবসা-মন্য (কমার্শিয়াল) বাংলা ছবি আজ অপাংক্তেয়। ফলে দাঁড়িয়েছে, দু-একজন পরিচালক কাজ পাচ্ছেন। অন্যদের প্রযোজকরা তেমন নিতে চান না। আর্টিস্ট যাঁরা আছেন, তাঁদের দেখুন : হাতে গোনা যায়, কয়েকজন আর্টিস্ট শুধু কন্ট্রাক্ট পাচ্ছেন, বাদবাকীরা প্রায় বসে আছেন। টেকনিশিয়ানদেরও অনেকটা তেমনি অবস্থা।

দেশ বিভাগের ফলে বাংলা ছবির দর্শক-পরিধি অনেক কমে গেছে। শুধু দর্শক বেশী বলেই হিট না হলেও হিন্দী ছবি বাজারে গা বাঁচিয়ে আসতে পারে। বাংলা ছবি না চললো তো একেবারেই ডুবলো। এমনি মনে হবে, বাংলা ছবি দেখার লোক অনেকটা বেড়েছে ছবির উৎকর্ষতার জন্য। কিন্তু সে কয়টা ছবি? একদা এই এলাকায় গোটা বারো স্টুডিয়ো ছিল, আজ দেখুন অর্ধেকও নেই। টাকা খরচ না করলে টাকা আসে না। কিংবা ছবির পুষ্ট বাজেট দরকার একথা বাংলা ছবির প্রযোজকদের বোঝানো যাবে না। ওরা বাজার চেনেন—কংসের গমে কসের আটা হয় তা জানেন। টাকা? হ্যাঁ অমুক ডিরেক্টর, অমুক আর্টিস্ট হলে থলের মুখ খুলতে রাজী, তা না হলে, যত পারো খরচ কমাও! বোম্বের ছবি আর বাংলা ছবির বাজেট দেখুন? কি করে ছবি ভাল হবে?

আমি এই অবস্থা নিয়ে ভেবেছি। কয়েকটি ছবি তুলে আমার খানিকটা অভিজ্ঞতাও হয়েছে বৈ কি? আমার মনে হয় বাংলা চিত্রশিল্পকে বাঁচতে হলে—নিছক বাঁচার কথাই আমি এখানে বলছি—দুটি দরজা খোলা আছে—প্রথমত ছবির মান (standard) ঠিক রাখতে এবং উৎকর্ষতা বাড়াতে হবে। আর দ্বিতীয়ত দর্শক-পরিধি বাড়াতে হবে।

ছবির মান বা চিত্রের উৎকর্ষতা (Quality of production) রাখতে হলে যেমন দরকার ব্যক্তিগত পরিশ্রমের, তেমনি দরকার সরকারী এবং বেসরকারী সাহায্যের। ফিল্ম-শিল্প শিক্ষা এবং সাধনার জিনিস, অথচ শিক্ষায়তনের ভিতর দিয়ে শিল্প-প্রতিভার ভিত পত্তন, পথ-নির্দেশ বা পরিপূর্ণ বিকাশের কোন ব্যবস্থাই আমাদের দেশে নেই। স্টুডিয়োতে কাজ শিখে যাঁরা হাত পাকান, তাঁদের শিক্ষায় থাকে অনেক গলদ। এমনি অবস্থা, যদি ফিল্ম টেকনিক নিয়ে বেশী কিছু জানতে চান তাহলে আপনাকে বাইরে বিদেশে যেতে হবে, অথচ বাইরে যাবার সুযোগ সুবিধে ক'জনের হয়?

শিক্ষার সর্বাঙ্গীনতার জন্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে যাতে শুধু ফিল্ম-কলাই শেখানো হবে না, হবে স্ব-নির্ভর তথ্যানুসন্ধান, হবে ফিল্ম বিজ্ঞানের গবেষণা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কিংবা কোন পরিষদ মারফৎ এই প্রতিষ্ঠানের পরি-চালনা ভাল হবে কি না, সে বিচার দেশবাসী করুন। আমরা শুধু চাইব এমন কিছু যেখানে শিক্ষা শুধু পুঁথিগত কিংবা এক-দেশদর্শী হবে না, অথবা বৈজ্ঞানিক অনু-শীলন বহিরাগত নির্দেশের জন্য ব্যাহত হবে না।

মনে হচ্ছে, এ রকম একটা ফিল্ম একা-ডেমী বা শিক্ষানুশীলন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশবাসী তেমন সজাগ নন কিংবা উৎসাহ বোধ করছেন না। ছবির ব্যবসায় যারা পয়সা কামিয়েছেন, কিংবা দেশের শিল্প-প্রগতির প্রচেষ্টায় যারা উদ্বুদ্ধ, তাঁদের কেউ বড় একটা এগিয়ে আসছেন না সমষ্টিগত ভাবে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে।

যতদূর জানি—আমার জানা অবশ্য খুব বেশী নয়—একমাত্র 'কাবুলিওয়ালার' প্রযোজক শ্রীঅসিত চৌধুরী মহাশয় এই ধরনের ফিল্ম টেকনিক শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছেন এবং এ

নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটামুটি টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না এবং যেহেতু বাংলা চিত্রের প্রগতির অনুভাবনা ভারত সরকারের কাছ থেকে তেমন ভাবে পাওয়া যেতে পারে না, রাজ্য সরকারকেই তাই এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে।

চিত্র উৎসাহী কিংবা শিল্পোন্নতিকামী জননায়কদের বিশেষ করে বিবিধ চিত্র প্রতিষ্ঠানদের. অনুরোধ জানাব, তাঁরা যেন এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে একটি পরিকল্পনা নেন, যাতে করে সরকারী সাহায্যপুষ্ট এ জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে উঠতে পারে।

তা না হলে ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভা. কিংবা চিত্রবিশেষের সাফল্য বাংলা ছবির উঁচুমান জীইয়ে রাখতে পারবে না।

ছবির মান বাঁচানো যেতে পারে, কিন্তু ফিল্মের প্রাণ বাঁচাতে আসলে চাই চিত্রের অর্থকরী সাফল্য এবং দর্শকের পরিধি বাড়ানো। ফিল্ম আর্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে কম বড় নয়, এই আর্ট পরিবেশনে পয়সা এলো কি না। অবশ্য সস্তা কমার্শিয়াল ছবি তোলার কথা কেউ বলবে না। বিশেষ করে ভাল ছবির পুনরাবর্তন চলে, সস্তা কমার্শিয়াল মরসুমী, একান্তভাবেই সাময়িক। দেখতে হবে ছবি চলবে কি না? একেই ব্যবস্থা হিসেবে সিনেমায় আসার লোক কম: ছবি মার খেয়ে গেলে 'ট্রাই ট্রাই এগেন' বলা চলে না বা নূতন রক্ত সিনেমাতে হুট করে ঢোকানো যায় না। নিছক ভালো হলেই হবে না, ছবি হতে হবে বক্স-অফিস-সাফল্যে সার্থক। শুধু ভাল ছবির সুনাম কিনতে মোটা টাকার ভর্তব্য দেবে এহেন ভাল লোক পাবেন না।

বাংলা ছবির দর্শক পরিধি কী করে বাড়ানো যেতে পারে? সিনেমা ধীরে ধীরে লোক-প্রিয় হচ্ছে, প্রেক্ষাগৃহ সারা বাংলায় আরো বাড়বে এবং এতে সমস্যার খানিক সমাধান হবে। কিন্তু তাতে তো ছবি সর্বভারতীয় হবে না, আজ যা হিন্দী ছবির বেলায় হচ্ছে! হিন্দী ছবি হিন্দী ভাষী অঞ্চলেই নয়, অহিন্দী অঞ্চলে এবং বাইরে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ও দূর প্রাচ্যে এমনিতেই চলছে। অনেক দেশে—যেমন শ্যাম, ইন্দোচীনে—কথা অন্যের মারফৎ বলিয়ে (Dubbing) চালানো হচ্ছে। বাংলা ছবি dubbing করে চালানোতে খানিক অসুবিধে আছে। আসল অসুবিধে, বাংলা ছবির একান্ত ঘরোয়া কাহিনী, নিজস্ব সংলাপ এবং একান্তভাবে বাঙালী আবেদন। dubbing করে যা পাওয়া যাবে তা শুধু হবে ইংরেজীতে যাকে বলা যেতে পারে fringe benefits.

দর্শক পরিধি বাড়িয়ে ছবিকে বৃহৎ ভারতীয় করতে হবে। ছবির আবেদন করা চাই সার্বজনীন। সংলাপ হওয়া চাই সহজ বোধ্য, ঘটনার অভিনবত্ব এবং চমৎকারীত্ব সাবলীল চলবে গল্পের প্রেরণায়, সংলাপের সংকেতে নয়। একান্তভাবে বাঙালী পরিবেশও চলতে পারে, যদি আবেদন হয় ব্যাপক, যদি না থাকে সংলাপের প্রাধান্য। ছবি যদি নিছক সামাজিক না হয় তা হলে. দেখতে এবং দেখে আনন্দ পেতে কারোরই অসুবিধে হয় না।

'ক্ষুধিত পাষাণে'র মাধ্যমে বাংলা চিত্রের একটি সর্বভারতীয় না হোক বৃহৎ ভারতীয় রূপ দেওয়া যায় কিনা আমি তার চেষ্টা করেছি। কাহিনী সহজেই সহজবোধ্য এবং সর্বদেশীয় আবেদনশীল। বাংলা ও উর্দুর সংলাপ, পটভূমিকায় বৃহৎ ভারতীয় পরিবেশ, এবং কাহিনীর সংবেদনশীল আবেদন ছবিকে বাংলার বাইরে ও ভেতরে চালু করার সম্ভাবনাও আছে। মনে হয় বাঙালী দর্শক উর্দু সহজেই বুঝবেন এবং উর্দু সংলাপের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কথা সব না বুঝুন ভাবার্থ বুঝে নিতে কষ্ট হবে না হিন্দুস্থানীদের।
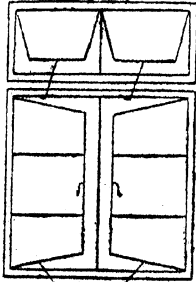
অবশ্য সব সময় এরূপ ভারতীয় back-ground-এ গল্প পাওয়া যাবে তা নয় এবং বাংলা সমাজচিত্র-অপাংক্তেয় করতে হবে তাও নয়। বৃহৎ ভারতীয় প্রচেষ্টার এক অবশ্যম্ভাবী ফল হবে, ধীরে ধীরে নিছক বাংলা ছবির বৃহত্তর চাহিদা।

শুধু মাত্র টেকনিকাল উৎকর্ষতার জন্য বাংলা ছবি একদা বাইরে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল। বাইরের রুচির যোগান দিতে পারলে ছবি যেমন চালু হবে, সর্বভারতীয় সংস্থামূলক ছবি তেমনি ধীরে ধীরে নিছক বাংলা সমাজচিত্রের পথিকৃৎ হবে।

সবশেষে ছবির কাহিনীই বলুন, সংলাপই বলুন, সাজসজ্জাই বলুন, মূলত এর প্রধান উপাদান হ'লো বিশ্বমানবের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বমানবের অনুভূতি। উপচার চারদিকে ছড়িয়ে আছে শত সহস্র। বৈশাখের রুদ্ররূপ—ঘন যৌবন বরষার হিল্লোল, পায়ে তার বৃষ্টির নূপুর, চোখে তার বিদ্যুতের ঝিলিক। আবার বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণ সন্ধ্যায় তার মৌন নিস্তব্ধতা—হেমন্তে আকাশভরা তারার মেলা, শীতে কুহেলীর অবগুণ্ঠন। এর ঠিক মাঝখানে প্রাণ কেন্দ্রস্বরূপ রয়েছে বিশ্বমানবের বিরাট জীবন যা পরিপূর্ণতার প্রয়াসে অপ্রতিহত গতিতে ছুটে চলেছে স্বরচিত এক ইতিহাস থেকে আর এক ইতিহাসের দিকে...।
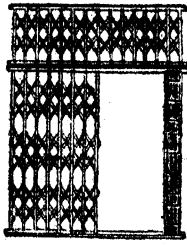
নৈবেদ্য
প্রার্থিত কোনো বিষয়ে সফলতা লাভ করলে, ব্যষ্টিগতভাবেই হোক আর গোষ্ঠীগতভাবেই হোক, আমরা সকলেই চাই অর্ঘ্য-নিবেদনের ংশ দিয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে। পশ্চিমবঙ্গের নানা অভাব। সে অভাব দূর করতে পশ্চিমবঙ্গবাসী অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। সাহস ও আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে একটি একটি করে বাধা অতিক্রম করে,— কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, পরিবহন এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রেই তাঁরা এনেছেন বিশেষ সাফল্য।
পশ্চিমবঙ্গবাসী এই দিয়েই সাজিয়েছেন তাঁদের অর্ঘ্যের ডালি। দ্বিগুণ কর্মশক্তি লাভ করে যাতে আরো কঠিন কাজ করতে পারেন— সেই হলো তাঁদের প্রার্থনা।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত
WBF-1-59.

আমি আমার সেই পুরনো দিনগুলিকে স্মরণ করতে চাই। কারণ আমি বুঝতে পারছি, আমার দিন যেন ঘনিয়ে আসছে। অবধারিত মৃত্যুই কিনা সেই অনাগত, পা' টিপে টিপে আসা ভয়ংকর ছায়াটি, তা' জানি নে। মৃত্যুর কি কোনো রূপ আছে? বোধহয় আছে। কিন্তু যে-ছায়াটি আমার চারদিকে, খুব ধীর গতি চোখধাবলার মত এগিয়ে আসছে একটু একটু করে, সে মৃত্যুই কি না আমি জানি নে। হলে আমি অবাক হব না।

কেন?

না, আমি পুরনো দিনগুলির কথা চিন্তা করতে চাইছি। চাইছি বললে ভুল বলা হয়। প্রাকৃতিক নিয়মের মত একটি অপ্রতিরোধ গতিতে পুরনো দিনের সেই সব স্মৃতি যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছে। অনেকদিন ধরেই বোধহয়, মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকা সেইসব দিনের কাহিনী আমার পাথুরে প্রতিরোধকে ভাঙছিল একটু একটু করে। ফাটল সে পেয়েছে। একবার যখন তা চোঁয়াতে আরম্ভ করেছে, এ বাঁধ ভাঙতে আর দেরী হবে না।

কেন এত ভয় আমার সেই পুরনো দিনগুলিকে স্মরণ করতে? কারণ, এ যেন খানিকটা রক্ষাকবচের মত। মৃত্যুবাণের মত। তাকে যতদিন রক্ষা করা যায়, ততদিনই জীবন। হারায় যেদিন, সেদিনই মৃত্যু। পুরনো দিনগুলিকে মনে করা আমার পক্ষে তেমনি। তাকে যতদিন ভুলে থাকা যায়, ততদিনই রক্ষা। কিন্তু একবার যদি সেই বন্ধ-দেওয়া অন্ধকারের চিরবন্ধ দরজাকে খোলা যায়, তা' হলে অন্ধকারের অদৃশ্য বাহু আমাকে আর কোনোদিন ছেড়ে কথা কইবে না। কিন্তু কোন্ সোনার

হরিণকে আজ আমার চোখে পড়ল, জানিনে। আমার সব গণ্ডী গেল ঘ'চে। ভয়ংকরের সব ত্রাস তুচ্ছ হয়ে গেল আমার কাছে।

বসন্তের সেই ঘোর দুপুরে দিনটির মুখো-মুখি দাঁড়ালাম আমি। বিশ বছর? না, বিশ নয়, বাইশ বছর। এটা উনিশশো কত? ও! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঠিক বাইশ বছরই হবে। বাইশ বছর আগের সেই প্রথম চৈত্রের ঘোর দুপুরে দিনটিও যেন অনেক বুঝে সুঝে মোকাবিলা করতে দাঁড়াল আমার মুখোমুখি।

যা ভাবছি, এসব কথা ঠিক এভাবে লিখতে পারলে আমাকে হয়তো লেখক বলা যেতে পারত। কিন্তু লেখা মানেই তো প্রেম। মেয়ে পুরুষের প্রেম। প্রেম নেই, বিরহ মিলন নেই, আমি লিখলেই বা কি আসে-যায়। লোকে কি তাই বলে না? লোকে কি তাই চায় না? আমি তো তাই জেনে এসেছি। তাই শুনে এসেছি।

তা' ছাড়া আমি লিখতে পারব না। আমি যে লিখতে পারি নে তা' নয়। কিন্তু আমি যা ভাবছি তা লেখা যায় না। লিখতে গেলেও হয় তো কলম কোথাও থেমে যেতে পারে। কারণ, বাইশ বছর ধরে নিজের সঙ্গে সব ফাঁকি আমি নিজেরই কাছে খুলে ধরব। সেসব কথা কি লেখা যায়? আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কি কেউ লিখতে পেরে-ছেন? আমি জানি নে। শুনেছি, কেউ কেউ পেরেছেন। সত্যি? সত্যি পেরেছেন? তাঁদের লজ্জা করেনি? সংকোচ হয় নি? ভয় হয় নি? আত্মসম্মানের ভয়ের কথা বলছি নে। পাগল কিংবা বিকৃত পশুসুলভ জীব ভেবে লোকের পীড়নের ভয়।

তা হলে সেটাই ছিল বোধহয় তাঁদের লেখার কায়দা। না, ভুল ভাবছি। 'তাঁদের লেখার কায়দা' একথাটি বললেই লোকে আমার ওপর রুষ্ট হবে। আসলে, তাঁরা মহৎ বলেই বোধহয় তাঁদের পাপের কথা পরিষ্কার করে লিখতে পেরেছেন।

পাপ? কিন্তু আমি তো কোনো পাপ-ই করি নি। কারণ, কোনো পাপ করবার যোগ্যতাই নেই। কোন এক মহাপুরুষ পতিতালয়ে গিয়েছিলেন, আমি তাঁর জীবনীতে পড়েছি। এরকম আরও হয়তো দেশী কিংবা বিদেশী মহৎ মানুষের জীবনীতে আমি পড়েছি। বেশ্যাবাড়ি যাওয়া শুধু নয়, আরো নানান রকম ওই জাতীয় অপরাধের স্বীকারোক্তি। সেগুলি ঠিক অপরাধ কি না জানি নে। কিন্তু লোকে জানে, ওসব অপরাধ। এবং স্বীকারোক্তিটাই এত বিস্ময়কর যে, মুহূর্তে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। ভক্তিতে মন গদগদ হয়ে ওঠে।

আর সমাজে যেন ওই একটিই মাত্র অপরাধ আছে। যিনি ওই বিষয়ে তাঁর সব কিছু স্বীকার করতে পেরেছেন, তিনিই যেন আশ্চর্যরকম সৎ বলিষ্ঠ ও সাহসী মানুষ বলে খ্যাত হয়েছেন।

কিন্তু আমি তো কখনো মেয়েদের গায়ে হাতই দিইনি। পনর বছর বয়সের পর থেকে এমন সুযোগ কখনো আসেনি যে মেয়েদের গায়ে হাত দিতে পারি একটু। আমি জানি না, মেয়েদের গা' কেমন। এখন আমার সাঁইত্রিশ বছর বয়স। যদিও আমাকে দেখে কেউ সে কথা বলবে না। এতখানি বয়সেও আমি জানিনে, মেয়েদের গা' কেমন। হাত দিলে কেমন লাগে।

আচ্ছা, বোবা কি জানে, কথা কী? জানে, নিশ্চয় জানে। বোবা যেরকম জানে, কথা কী, আমি সেরকমই জানি মেয়েদের গা কেমন। তার বেশী কিছু নয়।

বোবা কথা বলতে পারে না। কিন্তু বলার জন্যে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় পশুর মত আঁ আঁ করে। যেন তার কথা বলবার মুখে কেউ টুঁটি টিপে ধরে রাখে।

মেয়েদের সম্পর্কে এই বোবার মত কথা বলার ইচ্ছেটা আমার খুবই চাপাচাপি চুপি চুপি বিষয় নয় কি? এই সব মহৎ মানুষদের পাপের স্বীকারোক্তির চেয়ে, আমার অক্ষম বাসনা অনেক বেশী অশ্লীল বলে আমার ধারণা। তাই সেসব কথা লেখা দূরের কথা, যার প্রমাণ থাকে না, সেই মুখের কথাও মুখ ফুটে বলা যায় না। কিন্তু বাসি খবরের কাগজে যে-সব লোম-হর্ষক অপরাধের সংবাদ আমি পড়ি, ফুসলানো, ভুলানো, ধর্ষণ, খুন, কিংবা আরো সব সামাজিক অপরাধ, যেমন বেশ্যা-বাড়ি যাওয়া, মাতলামি, চুরি, জোচ্চোরি, আমি এসবের ধারে কাছেও কোনোদিন যাই নি। কারণ, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমার পা' নেই। হাঁটুর বেশ খানিকটা ওপর থেকে আমার দুটি পা'-ই কাটা। আমি বাইশ বছর ধরে, রাস্তার ধারের এই ঘরের দরজায় বসে আছি। দরজার নীচেই মানুষ-ডোবা নর্দমা। তারপরে খোয়া-ওঠা সরু রাস্তা। রাস্তার ওপাশে আরো একটি ছোট নর্দমা। ওই নর্দমায় এই ঘোর দুপুরে তিনটি ছোট ... জলোমায়ে বসে আছে, একটি মেয়ে, দুটি ছেলে। ওদের আমি
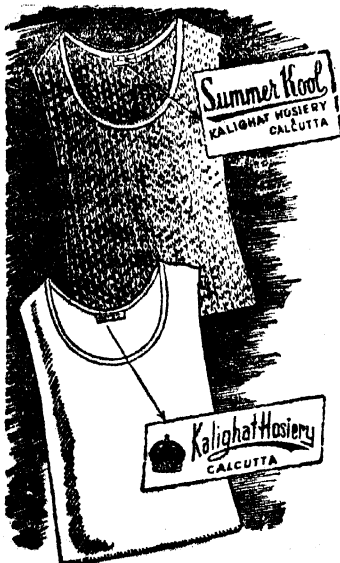
জন্ম থেকেই চিনি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে নিতাই ময়রার। আর একটি ছেলে নিতাইয়ের দাদা গোরের।

এখানে, ঠিক আমার দরজার মুখোমুখী ওরাই বেশী বসে। ওদের দাদা দিদিরাও বসত। তারা এখন বড় হয়ে গেছে। বিয়েও হয়ে গেছে কারুর কারুর। বিশেষ করে মেয়েদের। এমন কী ছেলেপিলেও হতে শুরু করেছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে দেখতে পাই। সময় হয়ে এল, এবার তাদের বাচ্চাকাচ্চারাও মুখোমুখী নর্দমায় এসে বসবে।

এখন যে-তিনজন বসেছে, শুধু এরাই নয়। আরো অনেক আসে। বেচু পাল, গগন সাধুখাঁ, বিপিন ঠাকুর, সকলের বাড়ির ছেলেমেয়েরাই আসে। তবে ময়রাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাই বেশী আসে। আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা, (আমাদের বাড়িকে সাধু কুণ্ডুর বাড়ি বলা হয়) এ বাড়ির ছেলে-মেয়েরাও আসে।

ওরা যখন প্রথম প্রথম আসতে শেখে নর্দমার ধারে, তখন আমার দিকে ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপরে আস্তে আস্তে ভুলে যায়। আমি যে একটা মানুষ, একটা জীব এখানে বসে আছি—সে কথা একবারও ওদের মনে হয় না আর। দেয়াল রাস্তা খোয়া দুর্বা এসব যেমন অলক্ষ্যে থেকে যায়, আমি ওদের কাছে তেমনি। কিন্তু একটা পাখি এসে বসুক। ওরা ঢিল ছুঁড়বে, ভ্যাংচাবে পাখিটাকে। একলা হলে কথাও বলবে। কিন্তু আমার দিকে তাকা-বার কথা মনে থাকে না ওদের। আমি অবশ্য নতুন মুখ দেখলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিই: এই তুই কোন্ বাড়ির ছেলে রে? কোন্ বাড়ির মেয়ে তোরা?

ওরা প্রথমে ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়। তার-পরে ঘৃণা করে। তারপরে ভুলে যায়। অনেকদিন দেখতে দেখতে ভুলে যেতেই হয়। আমিও যেমন ভুলে যাই এক এক সময়। ভুলে যাই, খেয়াল থাকে না, ওরা কখন এল, কখন গেল। আমি যেমন আমার এই পা-হীন, বিরাট, লোমশ, দাড়ি-গোঁফওয়ালা চেহারাটা নিয়ে ওদের চোখের সামনে মিশে যাই; মানুষ-ডোবা নর্দমায়, শেওলা ধরা দেয়ালে, খোয়া-ওঠা রাস্তায়, রাস্তার কুকুরের সঙ্গে কিংবা শহরের ভ্রাম্যমাণ শুয়োরের সঙ্গে, তেমনি ওরাও হারিয়ে যায়। সামনের জেরাফটায়, পথের লোকের মধ্যে, গগন সাধুখাঁর বাড়ির সদর দরজার মাথায় গজানো বড় বড় ঘাসে, ঘাস পার হয়ে সাতু চক্কোত্তির দোতলায় জানালায়, জানালা পার হয়ে আকাশটায়। আমার ঘরের পাশে রাধা-বল্লভের মন্দিরের নানান কথায়, শাঁখ ঘন্টার শব্দে। ধূপ চন্দনের গন্ধে, খোল-করতালের সঙ্গে গানে, আর আমার নিজের জন্যে চিন্তার অনামনস্কতায়। নিজের জন্যে চিন্তার অন্যমনস্কতা, ওটাই সবচেয়ে ভয়ংকর। ওটা অনামনস্কতা নয়। একটা আধমরা পিঁপড়ে, যখন নিজের হুল নিজের মুখে ঢুকিয়ে, গোল হয়ে পাক খায়, সেরকম। তখন সে তার জগতের সংবাদ রাখে না। কালা হয়ে যায়। অন্ধ হয়ে যায়। কুৎসিত হয়ে যায় দেখতে। আগে আগে কাট-পিঁপড়েকে ওরকম করতে দেখে হাসি পেত আমার।

আমার সঙ্গে আমার লড়াই, সেটা। আমি চুল টানি, দাড়ি টানি। রাত্রে দেয়ালে আমার ছায়াটার গায়ে আমি থুথু ছিটিয়ে দিই। নিজের কাছে মিছে বলা যায় না। এ সব কথা কি আত্মজীবনীতে লেখা যায়? আরে? আমার আত্মজীবনীর কথা আসছে কেন? না, যদি লিখতে চাই, লেখা যায় কি এসব? এ সবই তো নিশ্চয় একটা বিকার। নিশ্চয়ই বিকার। মিছে নয়, তার পরমুহূর্তেই হয় তো আমি একটা স্বপ্ন দেখতে চেয়েছি।

একটি স্বপ্ন, আমার শরীরে, আমিই জাগিয়েছি, আমার রক্তে। আমার রক্তে, কোষে কোষে, কণায় কণায় উল্লাস, উন্মত্ত আনন্দের স্বপ্ন। ভীষণ ব্যথিত, অসহ্য যন্ত্রণা, ভয়ংকর নিষ্ঠুর। এবং ওই স্বপ্ন-টার সময় নিশ্চয় আমাকে জেলে ধরে নিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তারপরে শুধু কষ্ট। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা ছাড়া আমার কোনো উপায় থাকে না। আর অবসাদ আসতে থাকে। তখন মুক্তি আসতে থাকে। ঘুম নামে। কিংবা অন্ধকার ঘর থেকে বাইরের আর একটা স্বপ্নের মধ্যে যাই।

আর একটা স্বপ্ন, যেখানে রাস্তার আলোয় ছায়া ফেলে ফেলে, পায়েরা যায়। আমার চোখ তখন পা' ছাড়িয়ে ওঠে না। আমি শুধু পায়ের মিছিলের স্বপ্ন দেখি। নানান ধরনের জুতো, স্যাণ্ডেল পরা কিংবা খালি পা। রোগা-মোটা, দুর্বল-সবল, পুরুষ-মেয়ে, যুবক-বৃদ্ধদের পা। নানান শব্দে, নানান ভঙ্গিতে আমার স্বপ্ন-দেখা চোখের ওপর দিয়ে পায়েরা যেতে থাকে। তারপর হাততালি। মা'য়ের হাততালি আর, 'থী, থী, থী! খোকন হাঁটে, বাবু হাঁটে, থী, থী, থী!'...

ঘুম নামতে থাকে। স্বপ্নময় ঘুম। কেবল, আমার উরুতের নীচে একটা শূন্য স্থান কাঁপতে থাকে থর্‌থর্ করে। আর মন্দিরের ভিতর থেকে সাতু চক্কোত্তির ভাগবত পাঠ ভেসে আসতে থাকে। আমি জানি নে,

ভাগবতে কী আছে। শুনেছি, সাতুঠাকুর নাকি রোজই রাত্রে ভাগবত পাঠ করে। কিন্তু আমার বরাবর মনে হয়েছে, সাতুঠাকুর যেন আমাকে বলছে, 'এবার তুই ঘুমো। নরেন্দ্র! এবার তুই ঘুমো।'......

আমি ঘুমোই। কিন্তু স্বপ্ন আমাকে ছেড়ে যায় না। আমি ঘুমোই। আমি ঘুমন্ত স্বপ্নের ঘোরে নিজেকেই বলতে থাকি, 'ঘুমো, নরেন্দ্র, এবার তুই ঘুমো।' আর আমি দেখি, সাতু কুণ্ডুর ছেলে, নরেন্দ্র কুণ্ডু, ঠিক একটি মরা বুনো মোষের মত, ফাটা চটা দুর্গন্ধময় মেঝের ওপর পড়ে আছে।

তারপর সকালবেলা সেই বুনো মোষটা আবিষ্কৃত হয় অপরের চোখে। আমাদের ভিতর বাড়ির লোকেদের চোখে। আমাদের ভিতর বাড়ি, যেখানে প্রায় বারো তেরো-খানি ঘর আছে একতলা দোতলায়। সাধু কুণ্ডুর বাবার তৈরী বাড়ি। তিন পুরুষেই বাড়িটার পলেস্তারা খসে গেছে। শেওলা ধরেছে। ফাটলে ফাটলে ইঁট-ঘাস আর অশত্থের চারা গজিয়েছে। কিন্তু বিজলী বাতি আছে ঘরগুলিতে। সুরেন্দ্রর ঘরে রেডিও আছে। বীরেন্দ্রের ঘরেও আছে। সত্যেন্দ্র ওসব পছন্দ করে না। নামগুলি সাজাতে হলে, এভাবে সাজাতে হয়, সত্যেন্দ্র, সুরেন্দ্র, তারপরে একটা ফাঁক দিয়ে বীরেন্দ্র। মাঝখানের ফাঁকটা পনর বছর বয়স পর্যন্ত নরেন্দ্র ভরতি করত। এখন আর করে না। এখন সাধু কুণ্ডুর তিন ছেলে। ধান চাল তিল তিসি খৈল তেলের পৈতৃক ব্যবসা যাদের। শুধু একজন বাদ পড়ে গেছে।

শুধু একজন বাদ পড়ে গেছে, কারণ সে অন্য কিছু হতে চেয়েছিল। আর তাই সে ঐ বাইরের বাড়ির মানুষ-ডোবা নর্দমার ধারের ইঁদুরের আড্ডায় বাসা পেয়েছে।

আমার ভয় করছে সেই দিনটিকে স্মরণ করতে। সেই দিনটি, যে দিনটি আমাকে অন্য পথে যেতে দেয় নি। এখানে ফেলে দিয়েছে। এই বাইরে। আমার ভয় করছে, কিন্তু অপ্রতিরোধ সেই চুঁইয়ে আসার স্রোত। ফাটল সে পেয়েছে। আমার বাইশ বছরের বাঁধ ভাঙছে। আমি ভাঙতে চাই নি। আপনি আপনি ভাঙছে। আমি জানি, একটা কী আসছে আমাকে ঘিরে। বুকে হাঁটা, ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মত, খুব ধীরে ধীরে, চারদিক থেকে গণ্ডী বেঁধে ঘিরে আসছে। তার অপলক স্থির চোখ আমি দেখতে পাচ্ছি শুধু। যে-চোখের মধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখছি বাইশ বছর। এই বিবরে। এই অন্ধকার গর্তে।

—এই, এই ছেলেটা, শোন্ বাবা। আমাকে এক বাল্তি জল এনে দে না বাবা ওই কল থেকে।

অনেকক্ষণ জল খাই নি। আমাকে রাস্তার ছেলেদের ডেকে জল আনিয়ে নিতে হয়। সবাই এনে দেয় না। কেউ ভ্যাংচায়। কেউ কেউ ঢিল মেরে পালায়। কেউ ফিরে না-তাকিয়েই চলে যায়। তা যাক। এখন আর এসব আমার গায়ে লাগে না। একজন না একজন কেউ এনে দেবেই। দরজার ওপরে, নর্দমাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে এরকম ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে করতে কেউ না কেউ এক সময়ে এনে দেবে। কারুর না কারুর দয়া হবেই। তবে আমি ছোট ছোট ছেলেদের কাছেই বেশী চাই। কারণ বড়রা কখনোই সাহায্য করে না। ছোটরা এনে দেয়। ওদের দয়া বেশী। কৌতূহল বেশী। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে

অনেক ছেলেরা। যারা নতুন আসে এ শহরে। কেউ কেউ ওদের কোমল, কৌতূহলিত, এমন কি আমার বয়সকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছিল আপনার পায়ে?

আমি চুপ করে থাকি। পালক ছেলেটা। পালাক। এসব কথা আমার একদম ভাল লাগে না। আমি মাথা নিচু করে থাকি। আমার মনে পড়ে না কী হয়েছিল। আমি ভুলে গেছি।

জবাব না পেয়ে আমাকে পাগল ভাবা ছাড়া উপায় থাকে না। হতাশ হয়ে, বিরক্ত হয়ে চলে যেতে হয় সেইসব ছেলেদের।

কিন্তু আমি ভুলিনি। ভুলে থাকতে চেয়েছি। মনে করেছিলুম, আমি ত্য পারব। পারলাম না। আজ আমি সেই দিনটির মুখোমুখী দাঁড়াতে যাচ্ছি। সেই দিন, ফাল্গুন না চৈত্র? চৈত্র মাসেরই ঘোর দুপুরে, মানদা পুলের কাছে, কালাসাহেবের বাগানের ধারে।

কিন্তু একটু জল? আর একটু বাদেই কলের জল বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে, ও ভাই, ও মশাই......।

অথচ আমি শুনতে পাচ্ছি, জল পড়ছে ছল্ ছল্ করে, আমাদের বাড়ির ভিতরের চাতালে। শেওলা ধরা পিছল উঠোনটা চারদিকের ঘরের ছায়ায় অন্ধকার। সেখানে একটা কুয়ো আছে। আর আছে জল কল। সেখানে জল পড়ছে ছর্ছর্ করে। ঝিয়েরা আর বউয়েরা কাজ করছে, শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ওরা আমাকে একটুও জল দেবে না। চিৎকার করে মরে গেলেও না। উপরন্তু নানা অঙ্গভঙ্গি করবে, হাসবে, বাসন মাজার ছোবড়া ছুঁড়ে মারবে জানালা দিয়ে। দরজাটা খোলা পায় না। আমার দাদা আর ভাইয়েরা দরজায় একটা ভারী তালা মেরে রেখে দেয়। জানালাটা বন্ধ করে দেয় না। এইখান দিয়ে আমি বাড়িটার ভিতরে দেখতে পাই। কাল, সুরেনের স্ত্রী, আমার মেজবৌদি, এক ঘটি জল আমার গায়ে ঢেলে দিয়েছে। আমি জল চেয়েছিলাম।

আজ সকাল বেলাই তো মার খেলাম? হ্যাঁ, আজ সকালেই বীরেন এসে মেরে গেছে আমাকে। চন্দ্রনাথ ব'লে কোথায় নাকি একটা তীর্থ আছে? পাহাড় আছে নাকি সেখানে? যেখানে গেছল আমার বাবা। সেখান থেকে নিয়ে এসেছিল একটা লাঠি। লাঠির সারা গা খোঁচা খোঁচা। ছেলেবেলায় আমি ওটা তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করতাম। কারণ ওগাটা বেশ সরু আর ছুঁচলো, আগাটি মোটা। সেই লাঠিটা এখন বীরেনের ঘরে থাকে। ওইটা দিয়ে সে আমাকে মেরে গেছে। কারণ, আজ সকালেও আমাকে বাড়ির বউয়েরা আর ঝি'য়েরা ওইভাবেই আবিষ্কার করেছে। কুঁড়ি বাইশ চব্বিশে যে-মোষটা

ওগো ওটা কি ঐ নিচের জানলায়।

রোজ মরে পড়ে থাকত, সে এখনো মাঝে মাঝে মরে পড়ে থাকে। এই সাঁইত্রিশ বছর বয়সে।

এই সাঁইত্রিশ বছর বয়সে, সাতু চক্কোত্তির দোতলার নীল আলো জবলা ওই ঘরটায় কাল রাত্রে আবার আমার দৃষ্টি পড়েছিল। আমি জানিনে, ওই জানালায় যা দেখেছিলাম, কিংবা প্রায়ই দেখে থাকি, তার মানে কী? আমি খালি দেখি, একজন একজনের হাত ধরে টানে। যাকে টানে, তার যেন হাড়গোড় নেই। লতিয়ে বুকে পড়ে যায়। দু জোড়া হাত যেন বাদুকরের খেলার মত নানান ভঙ্গিতে নড়াচড়া করতে থাকে। মুখে মুখ ঠেকায়।

তৎক্ষণাৎ আমি দেয়ালে আশ্রয় খুঁজি। ফাটা-ফুটো, আরশোলা বিছে-ঘোরা দেয়ালের কোথাও নিজেকে ঢোকাবার জন্যে, লুকোবার জন্যে আমি মাথা কুটতে থাকি। হামা দিয়ে পাক দিতে থাকি সারা ঘরটার মধ্যে। নিজেকে গালাগাল দিই কুৎসিত ভাষায়। নিজের দাড়ি ধরে চুল ধরে টানি। ঘৃণা উথলে উঠতে থাকে আমার বুকের মধ্যে। ঘৃণায় থুথু ছিটিয়ে দিই নিজের গায়ে।

শুধু সেই নিষ্ঠুর স্বপ্নের সব লক্ষণ আমার শরীরে ফুটে ওঠে। ঘৃণায় এবং আনন্দে, আবার রক্তের উল্লাসকে আমিই উন্মত্ত খেলাই মাতাই। সাতু চক্কোত্তি, হে রাধাবল্লভ, তোমরা নিশ্চয় জান, আমি সত্যি জ্ঞান হারাই না। আমি সত্যি পাগল নই। আমি সত্যি পশু-বিকারকে লালন করিনে মনের মধ্যে। তবু সেই খ্যাপা মোষটাকে আমি মরতে দেখি। একটি অদৃশ্য বিষাক্ত তীরের মার খেয়ে, ওকে আমি মরতে দেখি। অবসাদ, ঘুম, মুক্তি আসতে থাকে।

তারপরেই সেই তালার মধ্যে চাবি ঢোকাবার শব্দ। আমার ঘুম ভেঙে যায়। নিজের দিকে ফিরে তাকাবার খেয়াল থাকে না আমার। সামনে রুদ্র মূর্তি। আমার ছোট ভাই বীরেন। হাতে সেই কাঁটা-ওঠা চন্দ্রনাথের লাঠি। জানালায়, মুখের হাসি আঁচল চাপা বউ ঝিয়েরা। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি আমার কাপড়টা খুঁজতে থাকি। আর তখনই সপাং সপাং লাঠি পড়তে থাকে। —'আবার, হারামজাদা, আবার 'তুই ন্যাংটো হয়ে ভেতরবাড়ির জানালার কাছে শুয়েছিলি?'

আমি চিৎকার করি। কারণ কাঁটাগুলি আমার গায়ে বেঁধে। রক্ত বেরোয়। ঘরময় হামা দিয়ে ছুটোছুটি করি, আর চিৎকার করে বলি, 'আমি জানি না বীরু, মাইরি বলছি আমি জানি না, কখন কাপড় খুলে গেছে। বিশ্বাস কর, আপনু গড়'—

আপনু গড়। আমাদের পনর বছর বয়সে কথাটা বলা একটা অদ্ভুত ফ্যাসান ছিল। কিন্তু বীরেন বিশ্বাস করে না। চিৎকার শুনে বড়দা ভুঁড়ি কাঁপাতে কাঁপাতে আসে। মেজদা দোতলার জানালা থেকেই উঁকি মেরে দেখে। আর বীরেন মারতে থাকে অন্ধের মত। —'শয়তান, বদমাইস, পাগলামির ভান তোমার?'

সপাং। সপাং। রাস্তার ধারের জানালায় ভিড় জমে যায়। কারুর মার খাওয়া দেখতেও লোকের এত ভাল লাগে! নর্দমা টপকে, ছোট ছোট ছেলেগুলি জানালার গরাদ ধরে ঝুলে দেখতে থাকে। আমি বুঝতে পারি, বীরেনের সম্মান তাতে নষ্ট হয় না। বাইরের লোক দেখে, ওর মারের নেশা আরো বাড়ে। আর বউ ঝিয়েরা হাসে।

তারপরে এক সময়ে বীরেন থামে। তালাটা এঁটে দিয়ে চলে যায়। কাপড়টা খুঁজে পাই। পাঁচ হাত কাপড়টা আমারই চোখের সামনে পড়ে থাকে। মার খাওয়ার সময় আমার চোখে পড়ে না। আর তখন ঘুম ভাঙে রাধাবল্লভের।

তখন রাধাবল্লভের ঘুম ভাঙানো হয় ঘণ্টা বাজিয়ে। রাধাও আছে মন্দিরটার মধ্যে। আমার মনে আছে, কালো পাথরের রাধাবল্লভ। সোনার অলংকার তার সারা গায়ে। আর শাদা পাথরের রাধা। আমার জ্যাঠামশায়ের প্রতিষ্ঠিত। আমার বাবা মারা গেছে। মা মারা গেছে। জ্যাঠামশাইও মারা গেছে। কিন্তু দু চোখ অন্ধ জ্যাঠাইমা বেঁচে আছে। সে মন্দিরেই থাকে। মন্দিরের পাশে একটা ছোট ঘরেই তার ঘরকন্না। ভোগ খেয়ে বেঁচে থাকে জ্যাঠাইমা। ভোগ রান্না করে একজন ব্রাহ্মণ বিধবা। শুনেছি, সে সাতু চক্কোত্তির বিধবা শালী।

রাধাবল্লভের ঘুম ভাঙানো হয়। জ্যাঠাইমা তখন তাঁর সরু ভাঙা ভাঙা চড়া গলায় গান গাইতে থাকে,

এ আঁধারো অম্বরো
পার কর রাধাবল্লভো।

মরার কথা আমার একটুও মনে হয় না তখন। তবু আমিও গানটা গাইতে থাকি। কাপড়টা পরতে পরতে, মনে মনে গাই। কারণ, চেঁচিয়ে গাইলে, আবার হয় তো বীরেন ছুটে আসবে। —'ওরে, আবার ধম্মের গান গাওয়া হচ্ছে?' যদিও ধর্ম নয় সত্যি, এমনি আমি মনে মনে আওড়াই। আমার গলা শুনলে হয় তো জ্যাঠাইমা-ই গান থামিয়ে দেবে। মুখ ঝামটা দিয়ে বলবে, 'আ মলো, নরা খোঁড়াটাও গাইছে নাকি?' নরা হল নরেন্দ্র।

আমার অতিরিক্ত লোমশ গায়েও দু'এক জায়গায় রক্ত ফুটে ওঠে তখন। হাত দিয়ে মুছি। কিন্তু আমার যন্ত্রণাবোধ কি নেই? কী জানি। খুব তাড়াতাড়ি আমার কষ্ট দূরে হয়ে যায়। হামা দিয়ে এগিয়ে আসি, দরজা খুলি। আমার খোলার সুবিধার জন্য দরজার কুলুপটা নীচের দিকে। দরজা খুললেই, রাস্তার ওপারের নর্দমায় সারি সারি ছেলে-মেয়েদের চোখে পড়ে। উলঙ্গেরা বসেছে পাইখানায়। তবু, ওরা গল্প করে।

—আমার এ্যাত্তো ফিতে আথে।

—তোল্ তো নদেন্ নেই, হাঁ।

আর গোয়ার ছেলেটা গৌর মোদকের। সেটা প্রায় গাঁজাখোরের মত গলা করে এক রাশ কথা বলে উঠবে, 'না তোদেল্ ফিতে নেই। নদেন্ নেই। আমাল্ এ্যাত্তো ঘোলা আথে। গোলা (অর্থাৎ গোরা, অর্থাৎ গৌর, বাবাকে ও নাম ধরে আদর করে ডাকে, কারণ শেখানো হয়েছে) আমাকে ঘোলা এনে দিয়েথে। তোদেল্ তাপ্তে দেব না। গোলা নদেন্ আনবে, ফিতে আনবে, দেখিত্। গোলাকে বলে তোদেল্ পিতুনি খাওয়াব, দেখিত্। তোদেল্ কিথু নেই।

কারুর কিছু নেই, ওর সব আছে। আর কারুর কিছু থাকলেই ওর রাগ। যদিও ওই সঙ্গিনী দুটি ছাড়া, গোঁয়ারটাকে আমি কখনো একলা দেখতে পাইনে।

ওরা বকবক করে নর্দমায় ঝুলে বসে। তবু জ্যাঠাইমা ঘণ্টাটা বাজাতে থাকে তিমে তেতালায়। আর 'এ আঁধারো অম্বরো'...... গাওয়া হতে থাকে। কাকেরা আসে। কুকুরটা এসে বসে থাকে নর্দমাটার ধারে। আমাকেও এই সময়, আমার ঘরের পাশে মানুষ-ডোবা নর্দমাটায় ঝুলে বসতে হয়। আশে পাশে জানালা দরজা বন্ধ হতে থাকে ঠাস ঠাস করে। রাস্তার লোক হাসে, গালাগাল দেয়। দু চারটে ঢিল পাটকেল এসে গায়ে পড়ে। কিন্তু আমার কোনো উপায় নেই। আমাকে আর বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

আবার আমি ঠিকঠাক হয়ে বসি দরজার। পায়েরা যাতায়াত শুরু করে। স্কুলের পা

বাজারের পা, অফিসের পা, বেড়াবার পা, ডাক্তারখানায় যাবার পা, রাত জেগে ফিরে আসা পা, ভিক্ষেয় আসা পা, পালানো পা। নানান পায়ের মিছিল।

—এই, এই খোকা, আমাকে এক বালতি জল এনে দাও না।

চলে গেল। কেন? আমার মুখটা নিশ্চয় বদলে গেছে। গলার স্বরটা শুনেও তবে দয়া হতে চায় না কেন?

গায়ের মধ্যে কী যেন একটা বেয়ে বেড়াচ্ছে। হাত দিয়ে চেপে ধরলাম। এক ফোঁটা রক্ত। বেয়ে পড়ছিল। বীরেন মেরেছে আজ সকালেও। অথচ, কই সাতু চক্কোত্তির ছেলের জানালাটা শুধু গরাদের ওপারে একটি চৌকো অন্ধকারে কিছুই নেই।

কবে আমাকে বীরেন প্রথম মেরেছিল? বীরেন নয়। মেজদা প্রথম মেরেছিল। সুরেন্দ্র। তখন মেজবউদি আমাকে খেতে দিতে আসত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়াও দেখত। গেলাসে জল ঢেলে দিত। এঁটো পেড়ে নিয়ে যেত খাওয়া হয়ে গেলে।

মেজবউদির দিকে চোখ তুলে তাকাতে গেলে, আমার দৃষ্টি নেমে যেত। কেন? আমি জানতাম না। তখন কত বছর বয়স আমার? বাইশ? চব্বিশ? ছাব্বিশ? মনে নেই। দৃষ্টি আমার নেবে যেত। কিন্তু কোনো কোনো সময় ভুলে যেতাম, চোখ নামাতে মনে থাকত না।

মেজবউদি হেসে মুখ ঝামটা দিত, অমন বাঁদরের মত তাকিয়ে কী দেখছ?

তাড়াতাড়ি লজ্জায় চোখ নামাতাম। কী দেখতাম আমি? আমার রক্তের মধ্যে একটি দুর্বোধ্য ইচ্ছা, একটি দুর্বিনীত আকাঙ্ক্ষাকে আমি দেখতাম। মেজবউদি কি আমার গায়ে একটু হাত ঠেকিয়ে আদর করতে পারে না? পোষা বাঁদরকে আদর করার মতই না হয় হল। একটু কাছে বসে দুটি কথা? আমাকে আমার কথা একটু আধটু জিজ্ঞেস করা?

তা কি কখনো হয়? অমন সেজেগুজে পান খেয়ে, তেল স্নোর গন্ধ ছড়িয়ে, একটু যে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়া দেখে যেত, সে-ই তো অনেক। তবু, হে সাতু চক্কোত্তি, হে রাধাবল্লভ, তোমরা জানতে, আমার জ্ঞান ছিল। আত্ম ও পরসম্মানবোধ ছিল। এমন কি সাধু কুণ্ডুর বাড়ির এই ঘষে ঘষে টাকা গোণা আর সিন্দুকে ভরা জীবনের রীতি-নীতি আমার ভাল লাগত না। স্থূলে মনে হত। অযোগ্য, নীচু, ছোটলোক মনে হ'ত নিজেকে। তবু, কালো কুচকুচে একটা খ্যাপা মোষ দাপিয়ে কেন উঠত আমার রক্তে? কেন আমি বলতে গেছলাম, মেজবোঠান একটু বস

আমার কাছে?

—কেন?

একটা বাঁকা তীক্ষ্ন শলা যেন আমার চোখে বুকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল মেজবউদি।

—কেন, কী দরকার?

আমার হাত আমার কথা শোনে নি। হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরেছিলাম। —একটু বস'না, একটু কথা বল। মেজদার ব্যবসা আজকাল কেমন—

একটি ঝটকাতেই আমার হাত ছিটকে পড়েছিল। আমি অবাক হয়ে, প্রায় কাঁদতে গিয়ে থমকে তার ছিটকে বেরিয়ে যাবার পথের দিকে তাকিয়েছিলাম। পর মুহূর্তেই দরজায় আবির্ভাব হয়েছিল মেজদার। সে বুঝি তখুনি তার গদী (দোকান) থেকে ফিরেছিল। আমার সারা গায়ে কিল চড় লাথি পড়েছিল মুহুর্মুহু। —'খোঁড়া বদমাইস, ভাজের গায়ে হাত দিতে শিখেছ? এতবড় সাহস তোমার? কানে শুনেছ বুঝি, তোমার প্রাণের বন্ধু হারাণ ঘটক বে' করেছে। তাই আর সামলাতে পারছে না নিজেকে?' বলা আর মার।

হারাণ ঘটক? আমার বুকের মধ্যে আমি প্রলয় শঙ্খের গর্জন শুনতে পেলাম। আজ বাইশ বছর বাদে। বাইশ বছর পরে, এই চৈত্রের বেলায়, প্রতি পলে পলে সেই দিনটি আমার মুখোমুখি এগিয়ে আসছে। হারাণ ঘটক। নামটা মনে পড়ল, আর মুহূর্তে আমি আমার উরুতের নীচে শূন্য ঘৃণ্য জায়গাটার দিকে ফিরে তাকালাম। জল চাইনে। তৃষ্ণা নেই আমার। দরজাটা জোরে ঠেলে দিয়ে, ঠ্যাং ঘষে ঘষে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। হারাণ ঘটক! হারাণ ঘটক! আজ আমি তোমাকে অফিস-যাওয়া পায়ের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। বাইশ বছর পরে, এই প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডু লেনের রাস্তায় তোমার নিউ-কাট পরা পা দুটি আমি দেখতে পেয়েছি। শক্ত পা, মোটা গোড়ালি, চকচকে জুতো। দেখেছি। দেখেছি, তোমার শক্ত পা তবু একবার থমকে গিয়েছিল আমাকে দেখে। মাটি বোধহয় কেঁপে উঠেছিল তোমার পায়ের তলায়। বাইশ বছর পরে, তোমার নিয়তি তোমাকে টেনে এনেছে এ রাস্তায়। আমার শেষ, তার আগে তোমার নিষ্কৃতি নেই।

আমার ঘুঁটে কয়লা যে-কোণে থাকে, সেখানে ছুটে গেলাম আমি উরুতে ঘসটে ঘসটে। কিন্তু যেতে গিয়ে থমকে গেলাম আবার। কে? ও জানলায় কে? বীরেন। বীরেন আর তার বউ। বীরেন বউয়ের চোখ টিপে ধরেছে। আমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম, দেখতে পেলে বীরেন এসে মারবে আমাকে। বললে, 'ছোট ভাইয়ের জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা করে না পাজী?' বলেই মারবে। আমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। দেখলাম, জানালা দিয়ে কখন গুটি কয় আলু, দু একটা পেঁয়াজ, কাঁচা লংকা ফেলে দিয়ে গেছে। নিজের রান্না নিজেকেই করে নিতে হয় আমার। অনেকদিন, প্রায় দশ বছর আর ওরা আমাকে রান্না করে দেয় না।

নিয়মটা বীরেনই করে দিয়েছিল। যখন ও আমাকে প্রথম মারতে শুরু করেছিল। তখন নতুন বিয়ে করেছে বীরেন। আমাকে জানালা দিয়ে বিয়ে দেখতে হয়েছে। বড়দা মেজদার বিয়ে আমি বাইরে, সকলের সঙ্গে বসেই দেখেছিলাম। বীরেনের বিয়ের সময় আর সে সুযোগ পাইনি। কারণ, আমি যদি মেয়েদের গায়ে হাত দিই। আমি তো বিকার-গ্রস্ত জড়বুদ্ধি পশু ওদের কাছে। নইলে, আমি কখনো মেজবউদিকে ও-কথা বলতে পেরেছিলাম? আমি কেন দেয়ালে মাথা ঠুকি? আমি কেন এক এক সময় আপন মনে কাঁদি? আমাকে কেন উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায় ঘরের মধ্যে? মার খেয়েও আমি মরিনে কেন? নিশ্চয়ই আমি আর মানুষ নেই। কিন্তু হে সাত চক্কোত্তি, হে রাধাবল্লভ! তোমরা জানতে, বীরেনের বউকে আমি জেনেশুনে ইচ্ছে করে ভয় দেখাইনি। কত-টুকুন ছেলেমানুষ তখন মেয়েটি। আমার ভাদ্রবউ না? আমি ভাসুর। কখনো ভয় দেখাতে পারি?

তবু বউটি ভয় পেয়েছিল। বীরেনের খেয়াল ছিল না। জানালার সামনেই বউকে আদর করছিল ও। আমার ঘরে আলো জ্বলছিল। আমি কালো ছায়ার মতো আমার জানালায় ছিলাম। প্রথমে খেয়াল করিনি। কিন্তু যখন খেয়াল হয়েছিল, তখন আর সরে আসতে পারিনি। বীরেনের গায়ে যে রক্ত, আমার গায়েও সেই রক্ত কি ছিল না? মনে হয়েছিল, আমার হাতও যেন কাউকে জড়িয়ে ধরেছে। আদর করছে। সেই বোবার কথা বলার মত। একটা অবোধ যন্ত্রণাদায়ক অনু-ভূতিতে আমার বুকের মধ্যে নীরব আর্তনাদ উঠেছিল।

ঠিক সেই সময়েই, একটি মেয়েলী আর্ত-নাদ উঠেছিল, 'ওগো, ওটা কী? ওটা কী ওই নীচের জানালায়?'

বীরেন তৎক্ষণাৎ ছুটে এসেছিল। সেই প্রথম চন্দ্রনাথের লাঠি, আমার গায়ে কেটে কেটে বসেছিল। —'জানোয়ার, ভাদ্দর-বউয়ের দিকেও তোমার নজর?'

দাদারা বউদিরা বলেছিল, এটাকে এবার বিষ দিয়ে মেরে ফেলা উচিত।

আমি পারি, এসব কথা আমি লিখতে পারি। কিন্তু হায়, এমন আত্মকথা কখনো লেখা যায়? এতে কোনো নতুন সংবাদ নেই। কোনো মহত্ত্ব নেই। অথচ সংসারের সহস্র রকমের পাপের সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই। তবু আমার কথা লেখা যায় না। বলা যায় না। আমি যদি বলি, 'আমার দেহ

বলে এখন আর কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই। তাই শরীরে আঘাত করলে, এখন আর আমার লাগে না। দেহটা একটা পাথরের মত, তার তলায়, কোথায় যেন আমি আছি। আমি নিজেও সেটা ভাল জানিনে।' এও নিশ্চয় পাগলের প্রলাপ। কিন্তু কথাগুলি তো সত্যি। আমার দেহের কষ্ট এখন আর নেই বললেই চলে। সত্যি, আমার কোনো প্রতিবাদ কেউ কখনো শুনল না। মার খেয়ে খেয়ে, আমিও যেন ঘাঁটা পড়া, অবাক অবুঝ রাস্তার কুকুরটার মত হয়ে গেছি। আমি নিজেও সেটা বুঝি।

তবু পাথরের তলায় চাপা পড়া নরম মাটিতে কচি ঘাস গজানোর মত এ জীবনটার কথা প্রতিনিয়ত কেন নতুন করে অংকুরিত হত? কেন হয়?

আমি বুঝতে পারতাম, ওরা আমাকে বিষ দিয়ে মারতে ভয় পায়। ভয় পায়, তার কারণ, আমি সাধু কুণ্ডুর সম্পত্তির মালিক। আমি যে খাই, সেটা আমারই টাকায় খাই। বাড়িতে আমার অংশটা তিন ভাই কিনে নিয়েছে। তার দরুণ যে-টাকা আমার পাওনা, তাই দিয়ে আমার খাওয়া চলে। যদিও ওরা বলে, আর আমার টাকা নেই। সবই ওরা দয়া করে দেয় এখন। বাইরের দিকে এ ঘরটা মা আমাকে জীবন স্বত্ব দিয়ে গেছে। তাই ওরা আমাকে তাড়াতে পারে না।

কিন্তু যদি ওরা আমাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলে, তাহলে পুলিস আসবে। এ কথা ওরা আমার সামনেই আলোচনা করে। পুলিস এসে নাকি ওদের হেনস্থা করবে। বলবে নাকি, 'লোকটার সম্পত্তি বিক্রীর টাকাটা তোমরা মেরে দেবার জন্য মেরে ফেলেছ। জীবনস্বত্ব ঘরটা ভাড়া খাটাবার লোভে, লোকটাকে চিরজীবনের জন্য সরিয়েছ।'

বাবা রে! ওরা এত কথাও চিন্তা করতে পারে? আমি পারি না। আমি শুধু নিজের চিন্তায় ভোর হ'য়ে থাকি। একটি জড় পদার্থ, অচৈতন্য থাকতে গিয়েও আমি দেখলাম, অনুভূতি আমার মরছে না। বোধ শূন্য হ'চ্ছে না। আমার রক্তের মধ্যে সে চুপি চুপি জেগে থাকে। দশজনের দশ রকমের কথা যেগুলি আমার কানে আসে, তার মধ্যে আমি আমার বোধকে দেখতে পাই।

তবু নিজের প্রতি ঘৃণাটা আমার যায় না। কারণ, মাঝে মাঝে একটা কালো কুচকুচে খ্যাপা মোষকে আমি দেখতে পাই। এ মোষটা নিশ্চয়ই পৃথিবীর কোনো সুস্থ মানুষের মধ্যে নেই? এ নিশ্চয় শুধু আমারই রক্তে? মহৎ সৎ 'জীবন চরিত্র মালা' সিরিজের ব্যক্তি-চরিত্রগুলির কথা বাদই দিই। আর যাঁরা আত্মচরিত লিখতে পেরেছেন, তাদের কথাও বাদ। কারণ, তাদের হয়তো কিছু পাপের কথা বলা আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষদের সচ্চিন্তার সঙ্গে নিশ্চয় আমার তুলনা চলে না। আমি কী? আমি কি পাপ? একটা বলির পশু কি পাপ? তা নয়। বলির জন্যই পশু। আমি বোধহয় তেমনি পশু।

অথচ যুদ্ধ গেল, মন্বন্তর গেল, স্বাধীন হল দেশ। আমি চেয়ে চিন্তে খবরের কাগজ পড়েছি। আমি কোনো কিছুতেই অবুঝ হইনি।

তবু আমার সর্বাঙ্গ কুৎসিত। আর এই কুৎসিতের মধ্যে সৃষ্টিহীনের যন্ত্রণাটা তবু গেল না কোনোদিন। সেই যন্ত্রণা আমার কখনো কমল না চারিদিকের মানুষকে দেখে। পুরুষ মেয়েদের দেখে। দেখে দেখে, নিজের মুখে নিজের হুল পুরে দেওয়া, পাকখাওয়া পিঁপড়েটার মত মরছি।

এটাই তো আমার জীবন। বাইশ বছরের স্মৃতিতে আমার এইটুকু তো ওলট পালট ক'রে দেখা। এই দেখাটাকেই আমি ভয় পেয়েছি। কারণ, এই দেখাটাই তো জীবনের শেষ। আর আমার কী দেখা বাকী থাকে? কিছু না।

আজ আমার ভয় গেল। আজ সেই বাঁধ ভাঙল। আজ আমি হারাণ ঘটককে দেখেছি। আর আমার ভয় নেই। এই তো আমি দাঁড়িয়েছি সেই দিনটির মুখোমুখি। অনেকক্ষণ আগেই দাঁড়িয়েছি। শুধু গিয়ে পৌঁছুতে যেটুকু সময় লাগে। যে মুহূর্তে আমি হারাণ ঘটকের অফিস-যাওয়া পা থমকাতে দেখলাম, সেই মুহূর্তেই আমার যাত্রা শুরু হয়েছে। আমি বাইশ বছর পেছিয়ে তোমার পা দেখলাম হারাণ ঘটক। তোমার নিয়তি তোমাকে আজ বাইশ বছর বাদে টেনে নিয়ে এসেছে এই প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডু লেনে। বাইশ বছর আমাকে ছেড়ে কথা কইবে না। আমিও আর ছেড়ে কথা কইব না। আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হবে। আজ রাত্রে আমি বাইশ বছর বাদে প্রথম বেরুব আমার এই গর্ত থেকে। আমার পলাতক, মার-খাওয়া কুণ্ডলী আমি আজ ধীরে ধীরে খুলব। হে সাতুঠাকুর, হে রাধাবল্লভ, আর আমি ঘুমোব না। আর আমি নিজের ছায়াকে মারব না। তারপরে গিয়ে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব হারাণ ঘটক! হারাণ! হারু! কেন দেখা করবে তুই বুঝতে পারছিস? সমস্ত যন্ত্রণাটাকে

শেষ করব বলে। কোন্ যন্ত্রণা, তোর মনে আছে?

মনে আছে, সেই গঙ্গার ধারে, মাদার তলায়, তুই আর আমি বসেছিলাম? বাইশ বছর আগে, আমরা পনর বছরের দুইজন। হারাণ ঘটক আর নরেন্দ্র কুণ্ডু। দুই প্রাণের বন্ধু।

তুই বললি, পারবি তো নরেন?

আমি বললাম, খুব পারব। তুই পারবি তো হারু?

তুই বললি, আমার আর কোনো ভয় নেই। চল তবে যাই।

দুজনেই উঠে পড়লাম। আমাদের দুজনের জীবনের সব লজ্জা, সব বিদ্রূপ, সব মিথ্যা এক ঠাঁই এক প্রাণ ক'রে দুজনেই গেলাম সেই মানদার রেল পুলের নীচে। কালা সাহেবের বাগানের শুকনো পাতা মাড়িয়ে আমরা এগুতে লাগলাম। শুকনো পাতার শব্দগুলি কেমন যেন বুকের মধ্যে মরমর করছিল। আমরা দুজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমরা হাসতে চেয়েছিলাম। পারিনি। শুধু মনে হয়েছিল, আমাদের দুজনেরই জ্বর হয়েছে।

তোকে বাড়িতে মেরেছিল। আমাকে মারেনি, কিন্তু বাবা দাদা মা অপমান করেছিল। সবাই আমাদের দুজনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বলেছিল, এই যে মাণিকজোড়। গোল্লায় গেছে দুটিতে।

আমরা সেই সব স্মরণ করে ক্রমেই এগিয়ে গিয়েছিলাম কালাসাহেবের বাগান দিয়ে। বাগান শেষে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙোতে গিয়ে আমাদের গা ছ'ড়ে গিয়েছিল। (এখন মনে হ'লে কী ঘেন্না করে! কত অবাস্তব! না হারু?) আমরা দেখেছিলাম, ডাউন দিয়েছে, ট্রেনটা আসছে। যদিও ট্রেনটা দেখা যায় না। কারণ আমরা একটা বাঁকের মুখে ছিলাম।

তুই প্রথমে একটা লাইনে গলা পেতে দিলি। বললি, আর একটা লাইনে, মুখো-মুখি গলা পাত নরেন।

আমরা দুজনেই গলা পেতে দিয়েছিলাম। তুই বলেছিলি, আর একবার পরীক্ষা দিলে নিশ্চয়ই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারতাম। কিন্তু কেন মারল আমাকে?

আমি বলেছিলাম, ওরা আমাদের অবিশ্বাস করে। এ লজ্জা নিয়ে আমি বাঁচতে চাই না।

তখন লাইনে ঝম্ঝম শব্দ হচ্ছিল। আমাদের মনে হয়েছিল, আমাদের বুকেই শব্দ হচ্ছে। গাড়িটা দেখা দিতে না দিতেই, আমাদের কাছে এসে পড়ল। হুইসল দিল। তুই মাথা তুললি, আমি দেখলাম। সেই যে মাথা তুললি, আর পাততে পারলিনে।। লাফ দিয়ে উঠে প'ড়ে বলেছিলি, পারব না নরেন, আমি পারব না।

তোকে উঠতে দেখেই আমিও লাফ দিয়ে উঠেছিলাম। তোর দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু যাওয়া হল না। এঞ্জিনটা আমার গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল।

তারপরে যখন আমার জ্ঞান হল, আমি জানলাম, আমি মরিনি।

আমি মরিনি হারাণ ঘটক! সেদিন তুমি মনস্থির করতে পারনি। আজ কিন্তু আমার মন স্থির।

না, আমার জল চাইনে। আমার তৃষ্ণা নেই। সন্ধ্যা বুঝি হ'য়ে এল। আমার ক্ষুধাও নেই। আমার সামনে থেকে তরকারি-গুলি আমি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। উন্মত্ত ঘরে ঘরে আমার রান্নার জায়গায় গেলাম। কোথায় সেটা? আমার তরকারি কাটার ধারালো ছোট বঁটিটা? সেটা অনেক-দিন অনেক রকমভাবে আমার চোখের

সামনে নেচেছে, ডেকেছে, হেসেছে।

এই যে! পেয়েছি। আমার হাতে অসুরের বল পেলাম। মোচড় দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে, কাঠ থেকে বঁটিটাকে আলাদা ক'রে নিলাম।

হারাণ ঘটক, আজ প্রাণকৃষ্ণ লেনে তুমি তোমার অন্তিম দিনে ঢুকেছিলে। তুমি পরের বছর, ম্যাট্রিক পাশ করেছিলে। ভাল চাকরি পেয়েছ, বিয়ে করেছ। তোমার কয়েকটি ছেলে মেয়ে হয়েছে। চাকরিতে তোমার বেশ উন্নতি হয়েছে। তুমি আজকাল নাকি মদ্যপানও কর। স্ত্রীতে অনাসক্তির দরুণ, বেশ্যালয়ে নাকি তোমার আনাগোনা। আরো শুনেছি, তোমার উন্নতির মূলসূত্র নাকি চটকলের রেশন চুরি। একবার তোমার চাকরি যেতে গিয়েও, ঘুষ দিয়ে বেঁচে গেছ।

মহৎ নও জানি। আত্মচরিত আমার তোমার কারুরই, লেখবার মত নয়। তবু তুমি সাধারণ মানুষদের রঙ্গমঞ্চে লীলা করছ। আমি সেই মঞ্চের তলায়, কাঠের আর পেরেকের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। কেন হারাণ?

তখন আমরা ছেলেমানুষ ছিলাম। শুধু সেই একটুখানি ছেলেমানুষির জন্য? না, তা হবে না। আজ আমি আবার যাব হারাণ। আমরা আবার দুজনে মরব। আমার সঙ্গে মরণের নিয়তির হাত থেকে তোমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

ঢং ঢং ঢং! কাঁসর ঘণ্টা বাজনা আরম্ভ হ'য়ে গেল। রাধাবল্লভের আরতি শুরু হ'য়ে গেল। কাঁসরের শব্দটা আমি কোনদিনই ভালবাসিনে। আজকে আমার কানে ঢুকল না। আমি জামা গায়ে দিলাম। ধারালো বঁটিটা গুঁজে নিলাম কোমরে। তারপর দরজায় গিয়ে বসলাম।

পা'য়েরা চলেছে। পা'গুলি সবই প্রায় ঘরমুখো। উজানে কিছু বেড়ানো-পা। আজ আর আমি কোনোদিকে তাকাব না। সাতু চক্কোত্তির দোতালায় নয়। আজ আর আমি আমার রক্তের সঙ্গে মিশে, নিজেকে হারাব না।

কাঁসর থামতেই ভাগবত পাঠ শুরু হল। না, হে সাতু ঠাকুর, আজ আমি ঘুমোব না। আমি জানি, তুমি আমাকে শান্ত করতে চাইবে। কিন্তু তুমি জান, এ সেই বাসুকীর কুণ্ডলী খুলেছে। আজ তুমি বল না, 'নরেন্দ্র ঘুমোও।'

থেমেছে ভাগবত পাঠ? হ্যাঁ, থেমেছে। আবার জ্যাঠাইমা'র সেই গলা,

এ আঁধারো অম্বরো

পার কর রাধাবল্লভো।

অভ্যাসবশে আমিও মনে মনে আওড়ালাম। রাস্তা একেবারে নির্জন হল। দরজা বন্ধ হল মন্দিরের। এবার আমি যাব। ... আমি ... তোমার

অপেক্ষা করব তুমি জান? তোমাদের বাড়ির পিছনে একেবারে বাগানের ধারে। কারণ, সেখানেই তোমাকে আমি একলা পাব। আমি দেখতে পাচ্ছি, মিলে যাবার আগে, ভোররাত্রেই তুমি গামছাটি পরে, গাড়ু হাতে আসছ নির্জন বাগানে, খিড়কীর দোর খুলে। তোমার কানে থাকবে হয় তো পৈতা জড়ানো। তুমি তো আবার সাত্ত্বিক মানুষ।

কোন খান দিয়ে ঢুকব? কেন, তোমাদের বাড়ির যে-দিকটায় পুকুর, সেই পুকুরের পাড় দিয়ে, সেই ঝুপসি বটগাছটার তলা দিয়ে, বাগানে যাব। গিয়ে অন্ধকার সিঁড়ির পাশে লুকবো। তুমি যে মুহূর্তে সিঁড়িতে পা দেবে, সেই মুহূর্তেই আমার শক্ত হাতে তোমার পা' ধরে হ্যাচকা টান দেব। টেনে মাটিতে ফেলব, যাতে তুমি দৌড়ুতে না পার। তারপর তোমার বুকে চেপে—

বীরেন! চলি ভাই। আর তোর আমাকে দেখে রাগ হবে না। আমার কিন্তু ভাদ্দর বউয়ের সশ্রদ্ধ ভাসুর হ'তে খুব ইচ্ছে ছিল রে। মেজদা, চলি। আমার মুখ দেখে আর তোমার অযাত্রা হবে না। মেজ-বৌঠান, মিছে বলব না। তোমার কাছে আমি একটু চিরকাল ধরে বসতে চেয়েছি। কিন্তু তোমায় দুঃখ দেবার জন্যে নয়। বড়দা, বড়বৌঠান, তোমাদের আমি আমার বাবা মা'য়ের মত দেখেছি। তোমাদের দুজনের কি মাঝে মাঝে মনে হ'ত, আমার জীবনটা সত্যি বড় অসহায়, করুণ! কাল কিন্তু তোমরা সবাই চমকে উঠবে। জেঠি, মরতে চাইনি। তবু তোমার গান ছাড়া আমি আর গান শিখিনি।

কোমর থেকে বঁটিটা খুলে, আগে রাস্তার ছুঁড়ে ফেললাম। আমাকে ঝাঁপ দিয়ে নর্দমাটা পার হ'তে হবে। কারণ মাঝখানে কিছু পাতা নেই। আমি যদি বেরিয়ে যাই, সেইজন্যই কখনো কিছু পেতে দেওয়া হয়নি। ঝাঁপ দিতে গিয়ে প'ড়ে গেলে, আমি আর উঠতে পারব না। কালকে বীরেনরা মারতে মারতে তুলবে।

তবু এই গর্তে আর নয়। আমি ঝাঁপ দিলাম।

এ কি? আমার গা'য়ে এ কিসের স্পর্শ? আমি লুটিয়ে পড়লাম রাস্তায়। হাতড়ে হাতড়ে ঠাণ্ডা বস্তুটি অনুভব করলাম। ও! মাটি! নীচু হ'য়ে আমি গন্ধ নিলাম। মাটি! আমি মাটির স্পর্শ ভুলে গেছি? ওই গর্তটায় এতদিন এ গন্ধ তো পাইনি।

আমার গা'য়ে বাতাস লাগল। আমি তো এ বাতাস কখনো পাইনি আমার গা'য়ে! এ কোথাকার বাতাস? এই পৃথিবীর?

আমার উচ্ছিষ্টভোগী পরিচিত কুকুরটা এসে দাঁড়াল কাছে। বঁটিটা শুঁকল। বঁটিটা তুলে আমি কোমরে গুঁজলাম। প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডু লেনটা পার হ'তে লাগলাম উবু ঘসটে ঘসটে। আমার মনে পড়ল আমার গন্তব্য। আশ্চর্য! এমন অন্যমনস্ক আমি?

আচ্ছা, ডানদিকের এ বাড়িটা কাদের? বিশুদের তো? আর বাঁদিকে? নয়ন ন্যাকরার না? তা' কি ক'রে হবে। বাঁ দিকেরটায় তো সেই একুশ আঙুলে ডাক্তার-বাবু ছিলেন। আমি কি সব ভুলে গেছি?

বাতাস লাগল আবার। এ কি, এটা কোথাকার বাতাস? এই পৃথিবীর? আমার গা'য়ে কাঁটা দেয় কেন তবে? আমার গায়ের লোমগুলি এমন শিউরে শিউরে উঠছে কেন?

প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডু লেনের মোড়ে এলাম আমি। আমি যেন একটা বড় ব্যাং। হাতে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এলাম। এ রাস্তাটার নাম যেন কী? হাচিনসন রোড? না, এটা তো সেই পুরনো হাড়িপাড়া। নাম ছিল হরিলক্ষ্মী রোড।

এ কি! কিসের গন্ধ লাগছে আমার নাকে? ফুল, ফুলের গন্ধ? আমি পাগলের মত চারি-দিকে তাকাতে লাগলাম। বহু জন্ম আগে যেন এ গন্ধটাকে আমি চিনতাম? ও! এ কি সেই বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধ? আমি তো এ গন্ধ বড় ভালবাসি।

এজন্য কেন কাঁদি? আমি কি জানতাম, এসব রয়েছে এ পৃথিবীতে? হঠাৎ চমকে উঠলাম একটা শব্দে। গোঁ গোঁ শব্দ হ'চ্ছে। আমি হরিলক্ষ্মী রোডের ডানদিকে তাকালাম। আমার চোখের ওপর দিয়ে একটা মোটর গাড়ি চলে গেল। মোটর গাড়ি! মোটর গাড়ি! আমি কখনো বুঝি দেখিনি। সহসা আমার সমস্ত স্মৃতি তোলপাড় ক'রে উঠল। আমি ছেলেমানুষের মত ছুটতে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলাম মুখ থুবড়ে।

কিন্তু আবার! - আবার মোটরগাড়ি। ওই তো যাচ্ছে। আরে? আমার হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল।

কুকুরটা এসে দাঁড়াল আমার মুখোমুখি। আমার গন্তব্যের কথা মনে পড়ল। কিন্তু ডান দিকে তো আমার যাওয়া চলবে না। বাঁ দিকে যেতে হবে। বাঁ দিকে গিয়ে, তারপর ডানদিকে, রথোকালীতলার পথে যেতে হবে। আমার সব মনে পড়ছে। বাঁয়ে মোড় নিলাম আমি।

কিন্তু সেই গন্ধটা তো বিদায় হয়নি। ধুলো উড়ছে বাতাসে। আঃ! ধুলো হাতে নিয়ে ঘাটতে এত ভাল লাগে? আমার হাতের প্রতিটি বিন্দু, ধুলোর প্রতিটি চূর্ণকে যেন অনুভব করছে।

এ আবার কিসের গন্ধ? এটা সেই হরি-আনন্দদে'র বাড়ি না? হ্যাঁ, তাই এত কনক-চাঁপার গন্ধ। এ গন্ধটা তা' হ'লে এ পৃথিবীতে ছিল? মাগো, তুমি না কত ভালবাসতে এ ফুল? 'ও নরু বাবা, আমায় দুটি কনকচাঁপা এনে দিস কোথাও থেকে।' মা, আমিও যে বড় ভালবাসতাম এ গন্ধ।

আ, আমি কেন কাঁদি? এত আনন্দ আমার কোথায় ছিল? সত্যি, কেমন ক'রে গন্ধ হয়? আঃ, ইস! পাকা বেলের গন্ধ লাগছে আমার নাকে। আরে, তুলসী পাতার এমন গন্ধ তো আমি কখনো পাইনি। জ্যাঠাইমা না আমাকে কত বলত, 'ও বাবা নরু, আমাকে ভাল তুলসী পাতা তুমি এনে দিও। তোমাকে বাতাসা দিয়ে তুলসী পাতা খেতে দেব। রাধাবল্লভ তোমাকে খুব ভালবাসবে।'

ধুলোয় মুখ রেখে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললাম। আঃ! আমার এত আনন্দ আমি আর ধরে রাখতে পারছি নে। এসব যে ছিল, আমি তো জানতাম না। এত আনন্দ হলে বুকে বড় ব্যথা লাগে।

কিসের শব্দ আসছে? ওই দূরে, আকাশের গা'য়ে ওটা কী? এ কি, আকাশে ওটা কালপুরুষ না? ওই তো বুঝি সপ্তর্ষিমণ্ডল। এই তো ছায়াপথ আমার ডাইনের আকাশে। মৃগশিরা নক্ষত্র যেন কোথায়?

সবই তো আছে? এ পৃথিবীতে কিছুই তো হারায়নি। আমি না কী হ'তে চেয়ে-ছিলাম? বিজ্ঞানী। আরে! কাঁচা আমের গন্ধ পাচ্ছি যেন। কিসের শব্দ আসছে? দূরে আকাশের গায়ে ওটা কী?

আমি এগিয়ে গেলাম। এ কি, গঙ্গা! গঙ্গা ঠেকে আছে আকাশে? গঙ্গার জলের গন্ধ আমার চেনা।—মনু আমাদের বড়

পুণ্যিমন্ত ছেলে। হ্যাঁ বাবা নরু, এক কলসী গঙ্গা জল এনে দিও। তোমার জেঠির লাগবে, আমারও লাগবে। ভগবান তোমাকে বছর বছর পাশ করিয়ে দেবে।'

মা গো, তুমি কী ক'রে বলেছিলে মা? না, আমি কেন কাঁদি? আসলে তো আমার হাসিই পাচ্ছে। আমি কি তখন বুঝতাম? আমি তো ছেলেমানুষ ছিলাম।

আমি গঙ্গার জল একটু ছোঁব। মা কত সন্ধ্যায় গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিয়েছে গা'য়ে। —'দেখি রে নরু, একটু বাইরের দোষ কাটিয়ে ঘরে ঢোক। তবে না লেখাপড়ায় মন বসবে রে।'

আহা! আহা! মা গো, ও জেঠি, আমি একটু গঙ্গা জল ছোঁব। বড্ড যে ঢালু এ জায়গাটা। তবু নামি। সাবধানে গড়িয়ে গড়িয়ে নামি।

এই তো, বিষকাটারির জঙ্গল। হাত পা কাটলে, এ পাতা থেঁতো ক'রে কত লাগিয়েছি। আঃ কী নরম মাটি। পলি মাটি।—'ও বাবা নরু, একটু গঙ্গা মাটি আমাকে এনে দিও বাবা, রাধাবল্লভের আসনের নীচে একটু লেপে দেব। রাধাবল্লভ তোমাকে সুমতি দেবেন।'

আঃ, এই না সেই মাটি! না, আমার এত আনন্দে বড় কষ্ট হচ্ছে। হামা দিয়ে আমি জলের কাছে গেলাম। হাত দিলাম জলে। আর আমি আমার বুকে চেপে রাখা তীব্র আনন্দময় কান্নাটার চীৎকার থামাতে পারলাম না। এখানে আমি কত ভেসেছি। কত ডুবেছি। কী আশ্চর্য! এ পৃথিবীতে তেমনি গঙ্গা গান গেয়ে যায়?

ওটা কি? সহসা নদীর বুকে একটি কালো ছায়া আমার চোখে পড়ল। একি, একটা নৌকা? কালো নৌকা। পালটাও কি কালো? কে আসে ওই নদীতে। রাত্রি কি নেই? তাই তো, আকাশে যে আলোর রেখা দেখি? হারাণ, আমার যে সময় হ'ল না। আর আমি সময় চাইনে। আমি কি জানতাম, বাইরে পৃথিবীটা আছে। সেখানে এত আনন্দ আছে? শুধু আমিই গর্তের মধ্যে বাইশ বছর ধরে, একটা ধিক্কার, বিকার, কষ্ট, দুঃখ, অনুশোচনা, যন্ত্রণাকে বাড়িয়েছি। বিরাট করেছি, বিশাল করেছি।

আর করব না। ওই নৌকাটা কোথায় যাচ্ছে? জেলে নৌকা নাকি? কী রকম কালো, কিন্তু ঢেউয়ে কেমন নাচছে। ওর মধ্যেও একটা হিল্লোল আছে। তরঙ্গে চলছে। আরো বেলা হ'লে অমন কালো ছায়া দেখাবে না।

হারাণ, তুই কাজে যা। আজ বুঝি শুধু তোর কাছেই আমার বিদায় নেওয়া বাকী ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য মোটা আমার হাড়। চামড়াও। বঁটিটা ভেদ ক'রেও রক্ত কেমন থমকে রইল পাঁজরায়। আমার বুকের হাড়ও খুব শক্ত। এত জোরে বঁটিটার ওপর শুয়েও, তার আমূল আমি অনুভব করছি হৃৎপিণ্ডে। এখনো আমি গঙ্গার জলের ছলছলানি শুনছি। কিন্তু আমার শরীরের অনুভূতি তো কবেই মরেছে।

পৃথিবীর এমন হাসি আমি কতদিন শুনিনি। আমার পাথরের তলায় নরম ঘাস গজানো মাটিতে সেই জল ঘা খাচ্ছে। আমি ওখানেই ছিলাম। শেষ মুহূর্তেও রইলাম।

এই নিদয়ার ঘর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি

ব্লক ও মুদ্রণঃ স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

রূপবতী

মনোজ বসু

পানদা'র দীঘির কথা শোনেন। এই। তেপান্তর হয়ে আছে। চাঁপাতলার বাঁধাঘাটটি। আর আজকের দশা দেখুন। চাতাল ফেটে হাঁ হয়ে আছে। আস্ত একটা মানুষ ঢুকে যায়—শেয়াল-কাঁটার জঙ্গলে পা ফেলতে পারবেন না। পা ফেলতে আসেও না কেউ এখানে। পশ্চিম পাড়ের বাঁড়ুয্যেপাড়া একেবারে নিশ্চিহ্ন। ঠাকুর-বাড়িতে ঠাকুর গোপালের নিরম্বু উপোস যাচ্ছিল, তারপরে কে বুঝি হিন্দুস্থানের পারে তুলে নিয়ে গেছে। উত্তর পাড়ের কামারপাড়াটা টিমটিম করছে কোন রকমে। তা-ও কি থাকবে? কামারশালা তো এখনই গেছে। লোহা পেটানোর শক্তসমর্থ জোয়ান-পুরুষ সবাই ওপারে। আছে গোটাকতক বুড়োবুড়ি শ্মশানের দিকে মুখ তাকিয়ে। দীঘিতে তাদের আসতে হয়। চাঁপাতলার বাঁধাঘাটে নয়—খানিকটা দূরে তালের গুঁড়ি বসিয়ে হিঞ্চেকলমির দাম কেটে আলাদা ঘাট করে নিয়েছে। গুঁড়ির উপর বসে বাসন মাজে, ঘটি ভরে জল তুলে তুলে মাথায় দেয়। নেমে স্নান করবার জো নেই, গাদের মধ্যে কোমর অবধি বসে যাবে।

আমার গল্প কিন্তু আগের দিনের। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হল, তার অনেক আগে। শান-বাঁধানো ঘাট তখন ঝকঝক

করে। তারা কামারনীর মেয়ে টুনির্মাণ সকালবেলা এসে ঝাঁটপাট দেয়। তারপরে হল বা বঁটি পেতে পাকা তেঁতুল কুটতে বসে। কিম্বা বড়ি দিয়ে আধপাগলি মা'কে কাক [illegible] বসিয়ে দিয়ে গেল। ঠাকুর-গোপালের সঙ্গে তারা কামারনীর বড় ঝগড়া। কর কর করে কোন্দল করে ঠাকুরের সঙ্গে, আর উত্তেজনার মুখে লাঠির ঘা মারে চাতালের উপর। ঠাকুরের কী হয় জানা নেই, কাকে কিন্তু বাড়ির ঠোকর দিতে সাহস পায় না। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ডালে ডালে স্বর্ণচাঁপা [illegible]ই। মিত্তিরপাড়া বাইতিপাড়া জোয়াদ্দার-[illegible] থেকেও গিন্নিবান্নি মেয়েবউরা এত দূরে আসে জল নিতে। ঢেউ দিয়ে জলের উপরের [illegible]সমস্ত কুটোকাটা সরিয়ে কলসিতে জল ভরে। ভকভক ভকভক করে একসঙ্গে অমন তিন-চার কলসি ভরা হচ্ছে। চাতালের উপুর কলসি বসিয়ে নিজেরা পাশে জুত করে বসল। আর কতক জলে নেমে তখনো গা ধুচ্ছে। ডাল বাঁকিয়ে ধরে চাঁপাফুল পাড়ে কমবয়সি কেউ কেউ। সখের প্রাণ—খোঁপায় ফুল গুঁজে বাহার করবে।

কী রাঁধলে দিদি ও-বেলায়?

মোচার ঘণ্ট আর পুঁটিমাছের ঝোল। কী ছাই রাঁধি বল। জিনিসপত্তর আগুন। খাওয়া-দাওয়া উঠে গেল এবারে। আটটা প্রাণীর ওই তো একফোঁটা সংসার—তা দু-পয়সার মাছে একটা বেলাও হয় না।

মাছ দেখছ তুমি—এর পর ভাতই তো জুটবে না। পাঁচ টাকা মণের চাল ক-জনে কিনে খাবে?

তড়িৎ মিত্তিরের ছেলে হীরক যে বিয়ে করে এল। বলি দেখেছ সে বউ? হীরের টুকরো ছেলে—মাগো মা, আর বউটা সাঁড়া গাছের পেত্নী। গাছ থেকে সদ্য নেমে এসেছে।

ডাক্তারি পড়ার খরচা দেবে যে শ্বশুরে—শ্বশুরবাড়ি থেকে পড়বে। [illegible] বউয়ের দুটো হাত দুটো পা দুটো চোখ ঠিকঠাক আছে। আবার কি।

উলু, উলু, উলু—

কথাবার্তা থামিয়ে ঘাটের মানুষ কান পেতেছে। কী হল কার বাড়িতে? পাড়ার কোন বাড়ি কে পোয়াতি, মোটামুটি খবর জানা আছে। উলুটা আসছে কোন দিক থেকে রে? কঁঝাক উলু, গণে যাও। মেয়ে হলে তিন ঝাক, ছেলে হলে সাত কিম্বা নয়। মেয়ে হওয়া দুঃখের ঘটনা, উলু দিয়ে রীতিরক্ষা। ছেলের জন্মে আনন্দ।

কিন্তু নয় দশ এগার বার—উলু যে বেড়েই চলল। আ মরণ! দক্ষ-পিসিমা এক গাল হেসে ফেলেন: কী তোমরা গোণাগুণি করছ। রাধি পোড়ারমুখী। মনে কিসে পুলক লেগেছে, কলকল করে এপাড়া ওপাড়া উলু দিয়ে বেড়াচ্ছে।

মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুয্যের মেয়ে রাধি—রাধারাণী। সর্বক্ষণ তার উল্লাস। সময় সময় উল্লাসের বান ডেকে যায়, উলু হয়ে খানিকটা বেরিয়ে পড়ে।

টুনির্মাণ বলে, গলা ঠিক শানাইয়ের মতো ওঠে। যেন নবমীপুজোর তান ধরেছে।

দক্ষ-পিসি বলেন, দেখতেও লক্ষ্মী-ঠাকরুনটি। বয়সকালে ওর মা-ও ডাক-সাইটে রূপসী ছিল। ঠাকুর গোপালের দুয়োর ধরে মেয়ে পেয়েছে। ছেলে চেয়েছিল অনেক করে। ছেলে না দিয়ে ঠাকুর কোল খালি করে নিজের ঠাকরুনটি দিয়ে দিলেন।

ঘোড়া যেমন কদমের চালে লাফ দিতে দিতে ছোটে, উলু দিয়ে তেমনিভাবে রাধা-রাণী ঘাটে এসে পড়ল। হাঁটনাই এই রকম, রয়ে সয়ে দেখেশুনে হাঁটে না।

চললি কোথা রাধি?

হাত ঘুরিয়ে রাধারাণী বলে, ওই মিত্তির-পাড়ায়—

পাড়া যেন চোখের উপরে দেখা যাচ্ছে।

দক্ষ-পিসি বলেন, রাত্তিরবেলা ম্যাচম্যাচ করে একলা অন্দরে যাস, ভয় করে না? এই বয়স, এই চেহারা তোর।

যাচ্ছি হীরক-দা'র বাড়ি। [illegible] ঘাটের কুলগাছে শাকচুন্নিরা থাকে তো—হীরক-দা'র কাছে বাজি রেখে সেই কুলের ডাল ভেঙে এনেছিলাম জান না?

দক্ষ-পিসি স্নেহস্বরে বলেন, তুইও শাক-চুন্নি একটা। মানুষে হলে এমন করে বেড়ায় না। কিন্তু ওনাদের না মানিস, মা-মনসাকে মানিস তো? কাঁচাখেগো দেবতা।

রাধি হেসে বলে, তাই তো শব্দসাড়া করে যাচ্ছি। উলু দিই কি জন্যে? দু-পেয়ে জীবকে সবাই ভয় করে। সাপ হোক বাঘ হোক, দু-পেয়ের সাড়া পেলে সরে যাবে।

চাঁপাফুল পাড়ছে রাধি। আগে মাটিতে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে দেখল। তারপরে হতভাগা মেয়ে করল কি—আঁচলে কোমর বেঁধে বিশাল চাঁপাগাছের মাথায় তরতর করে উঠে পড়ল। ফুল ভেঙে ভেঙে ফেলছে, মেয়ে এসে কুড়োবে।

টুনির্মাণ বলে, রাধি মাসি, আর জন্মে তুমি হনুমান ছিলে।

রাধি বলে, মিত্তিরবাড়ি নতুন বউ এল না—খাসা মানুষটা, বড় মিষ্টি কথাবার্তা। চাঁপা-ফুল পাতা তার সঙ্গে। মালা দুটো চাই—ওর গলায় একটা দেব, আমার গলায় ও একটা দেবে। ছড়াটা কী যেন পিসিমা? সাক্ষী লতা সাক্ষী পাতা সাক্ষী পাখপাখালি, আজ হইতে তুই আমার চাঁপাফুল হলি—

সেই দীঘি। চাঁপাগাছটাও খাড়া আছে, বাড়বাড়ন্ত নেই। দীঘির পশ্চিম পাড়ে মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুয্যের ভিটার উপর রাধি আজ মারা গেল। অসতী, কলঙ্কিনী—কাপাস গ্রামের মুখ পুড়িয়েছে। মড়া গাঙে ফেলে দিতে গেছে, তবু উঠোনের কালকাসুন্দে জঙ্গলে পাতিশিয়াল খ্যা-খ্যা করে কামড় কামড়ি লাগিয়েছে।

রাধিকে নিয়ে গল্প।

এক

রাধারাণীর বাপ মৃত্যুঞ্জয় শয্যাগত অনেকদিন। জয়ঢাকের মতন উদর। পাড়ার লোকে বলে, বিস্তর পয়সা খরচ করে ও ঢাকখানা বানানো। পোস্টমাস্টার ছিলেন দীর্ঘকাল, নানান জায়গায় বদলি হয়ে বিস্তর ঘাটের জল খেয়েছেন। মৃত্যুঞ্জয় তাতে খুশিই ছিলেন। যত বেশি জায়গায় বদলি করত, তত খুশি। শুধুমাত্র জল খাওয়া নয়, রকমারি খাদ্য খাওয়া যেত। সেই তল্লাটের মিষ্টিমিঠাই মাছমাংস দুধ-ঘি তরিতরকারী যত কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু—সমস্ত সংগ্রহ করে বাসায় আনতেন। সরকারি কাজটা রুজি-রোজগারের আসল কাজ হল—ওই সমস্ত গাঁয়ের লোক দুখানা খাম-পোস্ট-কার্ড কিনতে এসেছে—তাকেও বসিয়ে খবরা-খবর নিতেন কার বাড়ি কী ভাল জিনিস পাওয়া যাবে। হাটবারের দিন তাড়াতাড়ি কাজ সেরে হাটে গিয়ে বসতেন, জেলে-নিকারিরা অল্প দিনেই চিনে ফেলত তাঁকে। একটা ভাল মাছ এসেছে, খদ্দেরে ঝুঁকে পড়ে দর জিজ্ঞাসা করছে—তারা জবাবই দিতে চায় না: টেপাটোপ করে এ জিনিস কেনা যায় না। পোস্টমাস্টার মশায়ের জন্য এনেছি। আসুন তিনি, দেখতে পাবে। ঠিক তাই। মৃত্যুঞ্জয় এসেই বিনাবাক্যে মাছটার কানকো ধরে খালুইতে তুলে নিলেন। দরের কথা পরে। নিত্যদিনের খদ্দের—দরও কেউ বেশি নেয় না তাঁর কাছে।

যত বয়স হচ্ছে এবং মাইনে বাড়ছে, খাদ্যের বোঝা ততই বেশি বেশি চাপছে। যাবতীয় স্বাস্থ্য শেষটা উদরে গিয়ে ভর করল। অচল হয়ে পড়ছেন দিনকে-দিন। পেন্সন ছেড়ে থোক টাকা নিয়ে তখন কাপাসদা'র পৈতৃক বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। কাজকর্ম পেরে ওঠেন না, একটি কাজেই শুধু ক্ষমতা ষোলআনা বজায় আছে—খাওয়া। শুয়ে শুয়েও যা টানেন, দু-তিন মরদে লজ্জা পেয়ে যাবে।

দীর্ঘকাল এ হেন স্বামীর পরিচর্যা করে মনোরমারও ভাল খাওয়ার অভ্যাস। সর্বক্ষণ রান্নাঘরেই পড়ে থাকেন। রাধি ছাড়া আরও তিনটে মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু এমন ঘরে জন্ম নিয়েও পোড়া অদৃষ্টে বেঁচে থাকতে পারল না। চার সন্তানের আহারের দায় অতএব একলা রাধির উপর বর্তেছে। পরিমাণে সে বেশি খায় না, কিন্তু বারম্বার এবং বহু রকম খেতে হয় তাকে। খায় আর নেচেকুঁদে বেড়ায়। আদুরে মেয়েকে কেউ কিছু বলে না। স্বাস্থ্য আর রূপ তাই [illegible]।

রূপ কেবল গায়ের রঙে নয়—হাতের নখ, এমন কি মাথার চুলও যেন রূপে ঝিলমিল করে।

কিন্তু এবারে মৃত্যুঞ্জয় আহার ও প্লীহার মায়া কাটাচ্ছেন। তাতে আর সংশয় নেই। জল-বার্লি ছাড়া কিছু পেটে তুলায় না—একগুণ খেলেন তো তিনগুণ বেরিয়ে এল। খাওয়ার জন্যে জীবন-ধারণ, সেই খাওয়ার শক্তি গেল তো জীবনের আর মূল্য কি রইল? মরা-বাঁচার ব্যবস্থায় মৃত্যুঞ্জয়ের যদি হাত থাকত, নিজের ইচ্ছাতেই তিনি সরে যেতে চাইতেন, ডাক্তার-কবিরাজের এই ছোঁড়াছুঁড়ি হতে দিতেন না।

খবর পেয়ে মনোরমার বড় ভাই হারাণ মজুমদার এসে পড়লেন। তিলভাণ্ডার বাড়ি, ট্রেনে যেতে হয়। বিষয়কর্ম নিয়ে থাকেন—অর্থাৎ এর পিছনের আটা ওর পিছনে লাগিয়ে কলে কৌশলে দুটো পয়সা বের করে নেওয়া। হয়ে থাকে ভালই। পৈতৃক যা পেয়েছিলেন, বাড়িয়ে গুছিয়ে তার দশগুণ করেছেন। তিন কুঠুরি দালানও দিয়েছেন সম্প্রতি।

চুপি চুপি হারাণ বোনকে প্রশ্ন করেন, রেখে যাচ্ছে কী রকম?

সে তো জানিনে। বুঝিও নে কিছু। তুমি এসেছ, দেখ এইবারে সমস্ত।

রোগী মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পর্কে দেখবার আর কিছু নেই। মনোরমা আলমারির চাবি দিয়ে দিলেন, যাবতীয় কাগজপত্র বের করে হারাণ খাতিয়ে খতিয়ে দেখছেন। অল্পস্বল্প জমাজমি—রিটায়ার করবার পর তারই উৎপন্ন ছিল ভরসা। জমির ধান এনে এনে খেয়েছেন, কিন্তু খাজনার বাবদে পাইপয়সাও ঠেকাননি মৃত্যুঞ্জয়। ডিক্রি হয়ে আছে কতক, নিলাম হয়ে গেছে বেশির ভাগ জমি।

শুধুই খেয়েছেন দেখছি বাঁড়ুয্যে মশায়। মাছ-শাক কেবল নয়—বিষয়আশয় সমস্ত। বাস্তুভিটে দু-দশটা গাছগাছালি আর দেড় বিঘে ধানজমি—এইমাত্র সম্বল। পেনসনও বিক্রি করে পেটে দিয়েছেন। ক'খানা কাগজ কিনেছিলেন তোর নামে—তাই কেবল খেতে পারেননি।

মনোরমা বলেন, তা-ও খেয়েছেন। সবগুলো পেরে ওঠেননি। চিরকালের খাইয়ে মানুষ—খেতে চাইলে আমি না বলতে পারতাম না। এক একখানা করে বের করে দিয়েছি। ওই ক'খানা রয়ে গেছে খাওয়ার তখন আর জো ছিল না বলে। হয়তো রাধির কপালে—তার বিয়ের খরচখরচা। ঠাকুর গোপাল সদয় হয়ে ও ক'টা টাকা থাকতে দিলেন।

রাধারাণী কাছাকাছি ঘুরছিল। সেইদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হারাণ ঘাড় নাড়লেন: না, মেয়ের বিয়ের তোর এক পয়সাও লাগবে না মনো। লুফে নেবে। বলিস তো উল্টে কিছু উসুল করেও আনতে পারব বরের ঘর থেকে।

মনোরমা বলেন, সে তো পরের কথা। এখানকার কি ব্যবস্থা—খাই কি, সোমত্ত মেয়ে নিয়ে থাকি কোথায়—সেই ভাবনা ভাব এইবার দাদা। অবস্থা চোখের উপরেই তো দেখতে পাচ্ছ।

যা হবার তাই ঘটল। মৃত্যুঞ্জয় মারা গেলেন। যে কষ্টটা পাচ্ছিলেন—কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, দিনরাত্রি চোখের কোণে জল গড়াত—মরে যেন বেঁচে গেলেন তিনি। ক'দিন পরে ভাই-বোনে আবার সেই প্রসঙ্গ উঠল: রূপসী মেয়ে বলছ দাদা, আমার বুক কাঁপে মেয়ের গায়ে যে রূপের জলুনি। দিনকে দিন দাউদাউ করে উঠছে। দালান-কোঠার মধ্যে পাইক-দরোয়ানের পাহারায় রেখেও লোকের ভয় কাটে না। বিধবা বেওয়া মানুষ আমি কোন সাহসে একা একা ভিটের উপর নিয়ে থাকি?

হারাণ লোক খারাপ নন। এসব তিনিও ভাবছেন এই ক'দিন ধরে। বললেন, আমার ওখানে চল তোরা। বোন-ভাগনীকে ফেলে দিতে পারিনে। দালানকোঠার কথাটা যখন বললি, দালানের মধ্যেই রাখব। মোহিত বউমাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা করেছে, তার কুঠুরিতে থাকবি তোরা।

আবার বলেন, আমার কিন্তু হিসাবি সংসার। খাউন্তি-দাউন্তি মানুষ তোরা—তোর খাওয়া তো বিধাতা ঘুচিয়ে দিলেন, কিন্তু রাধি পারবে তো মামার বাড়ির খাওয়া খেয়ে?

এখানে কোন খাওয়াই তো জুটবে না। দেড় বিঘের ধানে ক'মাস চলবে। আমরা ছাড়াও তারা কামারনী আর তার মেয়ে। তারা ওঁকে ধর্মবাপ বলেছিল, উনি আশ্রয় দিয়ে গেছেন। চোখ বুজতে বুজতে দূর করে দিতে পারিনে তো! খাওয়ার কথা কী বলছ দাদা, সেসব সেই মানুষটার সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে।

হারাণ সগর্বে গোঁফ চুমরে নেন: তবেই বোঝ আখের ভেবে কাজ না করার ফল। বাঁড়ুয্যে মশায়ের সম্বন্ধে ভাবতে, অমন ধনুর্ধর স্বামী হয় না। স্বর্গে পা ঠেকাতে না ঠেকাতে এক্ষুণি আবার উল্টো সুর ধরেছ। আর আমারও দেখো। বাড়ির লোকে সর্বক্ষণ খিচখিচ করে, পারলে আমায় দাঁতে ফেলে চিবাত। আমি কঞ্জুষ, না খাইয়ে রাখি আমি সকলকে, ছেলে-বউ না-খাওয়ার দুঃখে কলকাতা পালাল। কিন্তু বলে রাখছি, আমি যখন চোখ বুজব, ওই ছেলে-মেয়েরা স্ফূর্তিতে বগল বজাবে: এমনধারা বাপ হয় না। পেটে না খেয়ে পুঁটিমাছের পোঁটা গেলে ভবিষ্যৎ গুছিয়ে রেখে গেছে।

হারাণ মজুমদারের স্ত্রী শান্তিবালাও জাঁদ। গরুর গাড়ি দক্ষিণের ঘরের পৈঠার নীচে এসে থামল। গাড়োয়ান গরু দুটো খুলে বেড়ার জিওলগাছের সঙ্গে বেঁধেছে। সকলের আগে হারাণ গাড়ি থেকে নামলেন। রান্নাঘরে হলুদ বাটতে বাটতে শান্তিবালা তাকাচ্ছেন ঘাড় বাঁকিয়ে।

হারাণ বললেন, কাঁদাকাটি থেকে চুকিয়ে বুকিয়ে এল।

হলুদের হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে শান্তিবালা উঠানে এলেন। রাধি প্রণাম করতে যায়।

একি রে—অ্যাঁ? অশৌচের মধ্যে প্রণাম করে, কখনো?

জড়িয়ে ধরলেন তাকে। কোলের দিক নিয়ে চেঁচামেচি করছেন: মেয়েরা গেল কোথা? সোনার প্রতিমা কাকে বলে, দেখে যা চক্ষু মেলে।

চার মেয়ে, আরতি বড়। আর ছেলে মোহিত কলকাতায় চাকরি করে, বউ নিয়ে বাসা করেছে। দালানের ভিতর চার বোনে লুডো খেলছিল, না কি করছিল, হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে।

শান্তিবালা বললেন, দিদি হয় তোদের। আরতি, তোর নয়। রাধির তুই দেড় বছরের বড়।

নতুন জায়গায় চেনাজানা করতে রাধির এক মিনিটও লাগে না। বাপের সঙ্গে বাসায় বাসায় ঘুরেছে বলে। হেসে উঠে সে বলে, এ কেমন হল মামিমা? অশৌচ বলে আমায় প্রণাম করতে দিলেন না, আমার পায়ে বোনেরা কেন এসে পড়ে?

শান্তিবালা বলেন, তবে আসল কথা বলি রে বেটি। অশৌচ একটা ছুতো। লক্ষ্মীঠাকরুন কার পায়ে মাথা ঠেকাবেন রে? তাঁকেই সব গড় করবে। স্বয়ং কমলা তুই কন্যে হয়ে এসেছিস। উঠোন আলো হয়ে গেল।

রাধির একটা হাত তুলে চোখের সামনে এনে ধরেন। হাত ছেড়ে দিয়ে মুখখানা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন। বলেন, হস্তেলের মতন গায়ের রং। চোখ-মুখ-নাক যেভাবে যেমনটি হলে মানায়। বিধাতাপুরুষ বাটালি ধরে গড়েছেন। তুই আর পাশে দাঁড়াসনে আরতি, বড্ড উৎকট দেখাচ্ছে।

অগ্নিদৃষ্টি হেনে আরতি সাঁ সাঁ করে চলে গেল। শান্তিবালার হুঁশ হল তখন। মেয়ে আর ছোটটি নয়, সামনের উপর এমন কথা বলা অনুচিত হয়েছে। যত রাগ গিয়ে পড়ে তখন স্বামীর উপর: যক্ষি হয়ে ধন-সম্পত্তি আগলাও, এক পয়সা খরচ করতে বুকের একটা পাঁজরা ছিঁড়ে যায়। চেহারা হবে কিসে মেয়ের? লাউ-কুমড়োর মাচায় একটা-দুটো বীজ রেখে দেয়—মেয়ের কপালেও তাই। বিয়ে দিতে হবে না, চিরজীবন ঘরে রেখে পুষো।

হারাণ হুঁকো-কলকে নিয়ে তামাক

সাজছিলেন। মুখ তুলে সদম্ভে বলেন, হয় কি না দেখো। চেহারায় কিছু খামতি থাকে তো পণ দিয়ে তার পূরণ হবে। একটা সম্বন্ধ মাকচ হচ্ছে, আর পণের টাকা দু-শ করে বাড়িয়ে দিচ্ছি। বারশ অবধি উঠেছে, দেখা যাক কদ্দূর গিয়ে লাগে।

কলকেয় আগুন দিতে দিতে রান্নাঘরের দিকে ঢুকে পড়লেন।

শান্তিবালা শুধু বাড়ির মধ্যেই নিরস্ত হচ্ছেন না, পাড়ায় গিয়ে হাঁকডাক করবেন। মুশকিল হয়েছে, রাঁধাবাড়ার সময় এখন, তারপরে আবার খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা। কায়ক্লেশে দুপুরটা না কাটিয়ে উপায় নেই। দুপুর না গড়াতেই উঠে পড়লেন।

রান্নাঘরে ঢুকে রাধিকে বলেন, চল্—

রাধারাণী চক্ষের পলকে অমনি উঠে দাঁড়ায়।

শান্তিবালা হেসে বলেন, মর মুখপুড়ী। কাপড়চোপড় পরবি, সাজগোজ করবি তো একটু।

মনোরমা প্রশ্ন করেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বউ?

এ-পাড়ায়, ও-পাড়ায়। সময় হয়তো খালপারেও একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসব।

মনোরমা বলেন, কপালে জয়পত্তর লিখে সেকালে অশ্বমেধের ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। তোমার যে দেখি সেই বৃত্তান্ত। বউ তুমি পাগল।

শান্তিবালা উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, ইন্দু বলে একটা মেয়ে আছে, তাকে নিয়ে বড় গরব। আরতিকে কুচ্ছো করেছিল ইন্দুর মা। এবারে দেখিয়ে আসি, সেই ইন্দু আমার রাধারাণীর পা ধোয়ানোর যুগ্যি নয়।

তা বলে সোমত্ত মেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়ে বেড়ানো কি ভাল? হারামজাদি মেয়ে তো লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছে, তুড়ুক-সওয়ার—বললেই অমনি উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু তোমার মুখ ছোট হয়ে যাবে না?

তাই বটে! উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে শান্তিবালার। থমকে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল ভেবে বললেন, রাধারাণী, তুমি বাড়ি থাক মা। সেজেগুজে একটা চেয়ারের উপর রাণী হয়ে বসে থাক। যাদের ইচ্ছে হবে, বাড়ি এসে দেখবে। পাড়ায় কী জন্যে যেতে যাবে তুমি?

মাথায় সত্যিই ছিট আছে শান্তিবালার। একপাক ঘুরে বাড়ি ফিরে এলেন। তারপরে দেখা যায়, গিন্নিবান্নিরা আসছেন দু-একজন করে। গিন্নিরা ফিরে গিয়ে বলছেন তো বউ-মেয়েরা আসছে। পুরুষও কয়েকজন একটা কোন দরকার মুখে নিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেলেন। শান্তিবালা বসতে বলছেন তাঁদের, আসন দিচ্ছেন, পান দিচ্ছেন, জল দিচ্ছেন। তারই মধ্যে সগর্বে একবার বা তাকিয়ে নিলেন মনোরমার দিকে।

নিরিবিলি পেয়ে এক সময় মনোরমা বলেন, রূপ নিয়ে জাঁক করছ বউ, এসব কিন্তু ভাল নয়। আমার গা কাঁপে।

শান্তিবালা বলেন, রূপ হল ভগবানের দান। ক-জনে পায়? পেয়েছে যখন কেন জাঁক করব না। হাঁকডাক করে সকলকে দেখাব ঠাকুরঝি।

মাসখানেক পরে আরতিকে দেখতে এসেছে একদল। পাঁচজন তাঁরা, সবাই প্রবীণ। সম্বন্ধটা সত্যি ভাল—এক বছরের উপর চিঠি লেখালেখি হচ্ছে। হারাণ নিজে বার দুয়েক গিয়ে খোশামুদি করে এসেছেন। নিয়ম-দস্তুর গয়নাগাঁটি ও বরসজ্জা ছাড়াও নগদ বরপণ বার-শ' টাকা। তা সত্ত্বেও পাত্রপক্ষ গা করেন না। মেজাজ হারিয়ে তখন এক সঙ্গেই তিন-শ' তুলে পণ পুরোপুরি দেড় হাজার হেঁকে দিলেন। তারপরেই এসেছেন এঁরা। আদর-আপ্যায়ন যথোচিত গুরুতর হয়েছে, জলখাবার খেয়েই কুটুম্বেরা বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। আসন পেতে মেয়ে এনে বসালে কর্তব্যবুদ্ধির চাপে তখন উঠে বসতে হল।

পাত্রের বাপ মুখুজ্জে আরতিকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে বললেন, আর একটা মেয়ে দেখলাম মজুমদার মশায়! আমাদের জলখাবার দিচ্ছিল।

আমার ভাগনী।

সে মেয়েও দিব্যি বিয়ের মতন হয়েছে। স্বাস্থ্যশ্রীর দিক দিয়ে তার বিয়েই বরঞ্চ আগে হওয়া উচিত।

হারাণ হাত ঘুরিয়ে বলেন, হলে হবে কি? ভাঁড়ে মা ভবানী। বাপ মরবার সময় শুধু ওই মেয়ে রেখে গেছেন। আর গোটা দশেক খাজনার ডিগ্রি।

পাত্রের বাপ বললেন, খাসা মেয়েটা। পটের পরী।

হারাণ বিরক্ত স্বরে বললেন, আরতিকে কেমন দেখলেন তাই বলুন।

চোখের দেখায় তো হবে না। কুষ্ঠিটা দিয়ে দিন। মিলিয়ে দেখা হবে। তারপরে খবর দেব।

কুষ্ঠি নেই।

তাহলে জন্মপত্রিকা—কোন তারিখে কোন সময় জন্মেছে, সেইটে পেলেই হবে।

হারাণ সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেন, মেয়ে পছন্দ হয়নি তবে?

সে কী কথা! পছন্দ হলেও তো কুষ্ঠি চাই। মেয়ের বিয়ে দেবেন অথচ কুষ্ঠি নেই—পাকা লোক হয়ে এটা কি রকম হল মজুমদার মশায়?

সেইজন্যেই তো ওদিকে গেলাম না। যারা বোঝে না, তারাই গণককে পচ্চা দিয়ে মরে। বিয়ের মেয়ের কুষ্ঠি লোকে আটঘাট বেঁধেই করে। কুষ্ঠি থাকলে দেখতে পেতেন রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া আর আরতি হুবহু এক লগ্নে জন্মেছে। তবু কিন্তু মিল হত না। তার চেয়ে সোজাসুজি বলে দিন দোষটা কি দেখলেন আমার মেয়ের।

ভদ্রলোক ডিবে থেকে দুটো পানের খিলি মুখে পুরে নীরবে চিবাতে লাগলেন। আরতি উঠে গেল ভিতরে। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, স্পষ্টই বলি তবে। মেয়ের রঙ কাল। গোড়াতেই বলেছি, কাল মেয়ে হলে চলবে না।

হারাণ বলেন, কোন চোখ দিয়ে দেখলেন বলুন তো। আমার মেয়ে কাল বলেন তো ফর্সা মেয়ে বাংলামুলুকে পাবেন না। বিলেত থেকে জাহাজে বয়ে আনতে হবে।

ভদ্রলোক বলেন, কেন, ওই যে ভাগনী আপনার। ফর্সা ওকেই বলে।

অমন লাখে একটা। রফা করে হারাণ বলেন, বেশ, ভাগনীকেই তবে নিয়ে নিন। সে-ও আমার দায়। হলে বুঝব, আপনার পিছনে বছর ভোর ঘোরাঘুরি মিছে হয়নি।

বেশ তো। বলে ভদ্রলোক পায়ের উপর পা তুলে আঁটোসাঁটো হয়ে বসলেন: আপনার ভগিনীপতি কিছুই রেখে যেতে পারেননি। সেই বিবেচনায় চার-শ' পাঁচ-শ কম করে নেওয়া যাবে। কি বল হে?

বলে সমর্থনের জন্য পাশের পারিষদটির দিকে তাকালেন।

হারাণ মজুমদার ঘাড় নাড়ছেন: উঁহু, শুধুমাত্র শাঁখা-শাড়ি। সেই শাঁখা আর শাড়ির খরচটা মশায় বহন করলে ভাল হয়। পুরুতের দক্ষিণাও মশায়ের। যে ক'জন বরযাত্রী আসবে, হিসেবপত্তর করে তাদের খোরাকি সঙ্গে আনবেন। পটের পরী ঘরে নিয়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়।

অধিক কথা না বাড়িয়ে পাত্রপক্ষ এর পর উঠে পড়লেন।

আরতি সেই গিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছে বিছানার উপর। ভাল কাপড়-চোপড় পরে গয়নাগাঁটি গায়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থায় অমনি পড়েছে। কেউ কিছু বলতে গেলে ঝেঁকে উঠছে। উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, শান্তিবালা জোর করে তুলতে গিয়ে দেখেন মেয়ের চোখে জল। চোখের জল দেখে মায়ের প্রাণে মোচড় দিয়ে উঠল।

রোগা বলুক আরতিকে, নাক থ্যাবড়া চোখ ছোট বলুক, শতেক কুচ্ছো করুক। কিন্তু কাল বলে ওরা কোন বিবেচনায়?

মেয়ে দেখানো ব্যাপারটাও পাড়াগাঁয়ে পরব। গিন্নিবান্নি ও বউমেয়ে কয়েকজন এসেছেন। একজনে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলেন, যাই বল মোহিতের মা, মেয়ের বিয়ে দেওয়া তোমাদের মনোগত ইচ্ছে নয়। তাহলে এই কেলেঙ্কারিটা করতে না।

শান্তিবালা আকাশ থেকে পড়েন: আমরা কি করলাম?

রাধারাণীটাকে খাবার দিয়ে পাঠিয়ে

চোখের উপর রূপ দেখিয়ে ঘুরঘুর করতে লাগল। মুনির মন টলে যায়। বলি, ফর্শার উপরেও তো আরো ফর্শা থাকে। সুন্দরী থাকতে তারা নজরে পড়ে না কেন? রাধিকে দেখে তারপরেই তো ওরা কাল বলে মুখ ফেরাল।

প্রথম দিনের সেই তুলনার পর থেকেই আরতি রাধারাণীর দূরে দূরে থাকে। শান্তিবালার এত উচ্ছ্বাস, তিনিও কেমন চুপ হয়ে গেছেন। দেখে শুনে মনোরমা মরমে মরে যান। দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে, আর তাদের সঙ্গে শত্রুতা সাধছেন বিয়ের সম্বন্ধ পণ্ড করে দিয়ে। অত রূপের মেয়ে নিয়ে আসা শত্রুতা ছাড়া আর কিছু নয়। মনে মনে মনোরমার ভয় হচ্ছে। পাড়ার গিন্নিরা যেমন করে বলছেন, একদিন শেষটা পথে বের করে না দেয়। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন? একলা হলে দায় ছিল না, পেটের শত্রু রয়েছে—সর্ব অঙ্গে যার পাগল-করা রূপ। যার কথায় হারাণ বলেন, লাখের মধ্যে একটি।

মনোরমা বলেন, মেয়ের গতি করে দাও দাদা। নয়তো মাথা খুঁড়ে মরব। কত ভরসা দিয়েছিলে তুমি, মেয়ে নাকি লুফে নেবে। কোথায়?

হারাণ বলেন, এখনো বলছি তাই। তোর মেয়ে পড়তে পাবে না। কিন্তু সময় দিবি তো খুঁজে পেতে আনতে? আরতিটার জন্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরছি। বচন ছেড়ে ছেড়ে তোর ভাজ আমায় পাগল করে তুলেছে। এটা চুকিয়ে দিয়ে তারপরে দেখিস কী সম্বন্ধ নিয়ে আসি রাধির জন্যে।

আবার দেখতে আসছে আরতিকে। পাত্র নিজে আসছে, সঙ্গে মহাকুমা শহরের উকিল মুরারি হালদার। মুরারি উকিলের মক্কেল হলেন হারাণ, মুরারি সেরেস্তায় তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম। সেই সূত্রে খাতির-ভালবাসা। হারাণ কতবার রাত্রিবাসও করেছেন উকিলবাবুর বাড়ি। পাত্র ম্যাট্রিক পাশ, কী রকমের একটা আত্মীয়তা আছে মুরারির সঙ্গে। পুরোপুরি না হলেও খানিকটা মুহুরিও বটে। পুরানো পাকা মুহুরি সুরেশ বক্সী একলা সব পেরে ওঠেন না, এই ছোকরা সাথেসঙ্গে থাকে। মুরারিই একবার তুলেছিল সম্বন্ধটা। হারাণের চার মেয়ে শহরে বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিল, পাত্র সেই সময় একনজর দেখেও ছিল আরতিকে। তিন চার বছর আগেকার কথা, ছোট মেয়ে তখন। ছেলে অপছন্দ করেনি। কিন্তু নিতান্ত উকিলের মুহুরি বলে হারাণই না করলেন না। মোক্তারি পরীক্ষা দিয়েছে সেই ছেলে এবার। মুহুরিগিরি ছেড়ে মোক্তার হয়ে সে কাছারি বেরুবে। মুরারি হালদার বলেছে, মক্কেল জুটিয়ে মোক্তার করে দেওয়ার দায়িত্ব তার। এটা উকিলবাবু স্বচ্ছন্দেই পারবে। কথা দিয়েছে হারাণের কাছে। মুখে যতই আস্ফালন করুন, চার মেয়ের বাপ হারাণ একজনের বিয়েয় সর্বস্ব ব্যয় করে ফতুর হতে পারেন না। পুরানো প্রস্তাব অতএব খুঁচিয়ে তুলেছেন আবার। ভাল করে মেয়ে দেখে সম্ভব হলে তারা একেবারে পাকা কথা দিয়ে যাবে। মহরম উপলক্ষে কাছারি দু-দিন বন্ধ। অভিভাবক স্বরূপ মুরারি উকিলকেও পাত্র টেনেটুনে নিয়ে আসছে।

শান্তিবালা মুখ কাল করে রাধিকে বললেন, তোমায় মানা করে দিচ্ছি বাছা। ফরফর করে এবারে অমন কুটুম্বর সামনে যেও না।

রাধিকে জলখাবার দিয়ে আসতে শান্তিবালাই কিন্তু বলেছিলেন। সে কথা বলতে গেলে কলহ বেধে যায়। মেয়ের দোষ মেনে নিয়ে মনোরমা তাড়াতাড়ি বললেন, হতচ্ছাড়ির একটু যদি লাজলজ্জা থাকে! ভেব না বউ, সেদিন অ[illegible] তালা-চাবি দিয়ে আটক করে রাখব।

সত্যি বিশ্বাস নেই রাধিকে। আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়, বাপ আদর দিয়ে মাথাটি খেয়ে রেখে গেছেন। নীতি-উপদেশ বড় একটা কানে নেয় না। এত কথা-কথান্তরের পরেও কুটুম্বদের সামনে গিয়ে উঠতে না পারে এমন নয়। ঠিক তালা-চাবি না দিন, মনোরমা কড়া নজরে রেখেছেন মেয়েকে। কুঠুরির বাইরে না যায়। আরতিকে দেখে কথাবার্তা শেষ করে কুটুম্বরা বিদায় হয়ে গেলে তবে সে বেরুবে।

মুরারি উকিল বলে, মেয়ে তো খাসা। আহা-মরি না হল, গৃহস্থ-ঘরের বউয়ের যেমন হওয়া উচিত। এদিককার সব হয়ে গেল মজুমদার মশায়, বাকি এখন লেনদেনের কথাটা। তাও সেরে যেতে পারি, সে জোর আছে ওদের উপর। কিন্তু পাত্রের বাপ উপস্থিত থেকে মীমাংসা করবেন, সেইটে ভাল, কি বলেন?

আরতিকে বলে, তুমি মা বসে বসে ঘামছ কেন? চলে চাও, দেখা হয়ে গেছে।

পাত্র এমনি সময় ফিসফিসিয়ে মনে করিয়ে দেয়: মেয়ে আর একটা আছে।

ও, হ্যাঁ। মজুমদার মশায়, আর একটি মেয়ে আছে তো আপনার বাড়ি। ভাগনী আপনার।

হতভম্ব হয়ে হারাণ বলেন, শুনলেন কার কাছে?

মুরারি উকিল হেসে বলে, তিলভাণ্ডায় মক্কেল আপনি একা নন। বলে দিল, কনে দেখতে যাচ্ছেন তো সে মেয়েটাও দেখে আসবেন।

পাংশু মুখে হারাণ দরজার ভিতরে ঢুকে গেলেন। ক্ষণপরে ফিরে এসে বলেন, অসুখ করেছে রাধির। শুয়ে আছে।

কি অসুখ?

এত বড় পাটোয়ারি মানুষ হয়েও হারাণের জিভের ডগায় কোন একটা শক্ত অসুখের নাম এল না। বলে ফেললেন, জ্বর—

মুরারি শশব্যস্তে বলেন, তবে আর উঠে এসে কাজ নেই। আমরা গিয়ে এক নজর দেখে আসি। মানে, বড্ড সুখ্যাতি কিনা আপনার ভাগনীর, সবাই বলে দেখে আসবেন। সাপ না ব্যাং—দেখে যাই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে।

আচ্ছা, বসুন। আসছি আমি—

দরজার ওদিক থেকে ঘুরে এসে হারাণ বললেন, বসুন আপনারা। রাধিই আসছে। আপনারা কষ্ট করে যাবেন, সে হয় না।

উকিল মুরারিকে কোনক্রমে চটানো চলবে না। শান্তিবালা অতএব পুবের দালানের দোরগোড়ায় গিয়ে ডাকলেন: যেতে হবে, ডাকছে।

রাধি কাপড়ের উপরে উল দিয়ে রাধাকৃষ্ণ তুলছিল। বুনানি ফেলে উঠে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছিল যেন এমনি একটা কিছুর।

শান্তিবালা তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলেন, ছুঁড়ি অমনি একপায়ে খাড়া। তুমি ঠাকুরঝি দিব্যি বসে বসে দেখছ। বলি, ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরেই কি যাবে? চাকরানি ভাববে এ-বাড়ির।

মনোরমা বলেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বউ?

ডেকে পাঠিয়েছে। চোখে একবার না দেখে ওরা নড়বে না। আমরা চেপে রাখলে কি হবে, চারিদিক জুড়ে ঢাকের বাদ্যি।

মনোরমা বলেন, কারো সামনে যাবে না মেয়ে।

মেয়ের উপর তাড়া দিয়ে ওঠেন: যা করছিলি কর বসে বসে।

শান্তিবালা ক্ষেপে গেলেন: উকিলবাবুর অপমান করা হবে। আরতিকে এক রকম পছন্দ করেছেন—সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে চলে যাবেন। জমাজমির গোলমাল বাধলে ওঁর কাছে ছুটতে হয়, ভাতভিক্ষে সমস্ত ওঁর সেরেস্তায় বাঁধা। শত্রুতা করে যদি সব লণ্ডভণ্ড করতে চাও, হোক তাই ঠাকুরঝি।

মনোরমা সঙ্গে সঙ্গে কাতর হয়ে যান: এত সব আমি জানতাম না বউ। রাধি তোমারও মেয়ে, যেখানে খুশি নিয়ে যাও। কিন্তু যাবে তো এই কাপড়েই যাক। চাকরানি ভেবে ওঁরা মুখ ফিরিয়ে থাকুন। সেবারের ওই কাণ্ডের পর আমি যে মুখ দেখাতে পারিনে তোমাদের কাছে।

বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন: ময়লা কাপড় কী বলছ! কিছু মনে না কর তো হাঁড়ির তলায় কালিঝুলি এনে খানিক ওর মুখে মাখিয়ে দিই। মেয়ে নিয়ে আমার ভয় ঘোচে না, কি করব ভেবে পাইনে।

রাধারাণী সহজভাবে বলে, সেবারে গিয়ে

অপেক্ষা করছিল যেন এমনি একটা কিছুর

তো খাবার দিলাম। আজ গিয়ে কি করতে হবে, বলে দাও মামিমা।

কিছু করবি নে। ঢিবঢিব করে দুটো প্রণাম সেরে চলে আসবি।

ঘাড় বাঁকিয়ে রাধি বলে, সে আমি পারব না। কোন গুরুঠাকুররা এসে বসলেন যে প্রণাম করতে হবে!

মনোরমা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, না, কিছু করবিনে তুই। বেশি কাছেও যাবি নে। কোন রকমে দায় সেরে বেরিয়ে আসবি। ভাববে, মেয়েটা ভব্যতা জানে না। ভালই হবে।

আবার এসে হারাণ ভাগনীকে নিয়ে চললেন। সভয়ে নজর রাখছেন। যা ভেবেছেন, তাই। তার চেয়েও বেশি। যেই মাত্র রাধারাণী গিয়ে দাঁড়াল, উকিল-মুহুরি দু-জনেরই দেবচক্ষু। পাঁঠা বলি হবার পর কাটা-মুণ্ডের উপর স্থির নিমীলিত যে দুটো চোখ, তার নাম দেবচক্ষু। কুটুম্বদের দু-জোড়া চোখের অবিকল সেই অবস্থা।

পাত্র ফিসফিস করে বলে, চেয়ে দেখুন সার। চোখের উপরেও যেন হাসি মাখানো। মুখের আদলটাই অমনি।

মুরারি স্পষ্টভাষী। বলল, আপনার মেয়ে দেখলাম। আর এই দেখছি। যাই বলুন মজুমদার মশায়, সেই মা-লক্ষ্মীর কেমন যেন গোমড়া মুখ। ঠোঁট ফুলিয়েই আছেন।

পাত্র আবার বলে, হাতের তেলোর দিকে একবার দেখুন সার। টুকটুক করছে। রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে যেন।

মুরারি রাধারাণীর বাঁ-হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়ঃ কী কোমল! আর সেই মা-লক্ষ্মীর খরখরে হাত। মজুমদার মশায় অবস্থাপন্ন মানুষ। নয়তো বলতাম, মেয়েকে দিয়ে বাসন মাজিয়ে মাজিয়ে ওই অবস্থা করেছেন।

হস্তরেখা দেখছে অনেকক্ষণ ঘু
ফিরিয়ে। উকিলবাবুর হয়ে গেল তো মু
তখন পরে। দেখা গেল যে দু-জ
জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী। দেখাশু
পর একটু নিরিবিলি আলোচনা।
মৃদু চাপ দিয়ে পাত্র বলে, আগেরটা
সার। এইটে—এই মেয়ে।

মুরারি খিঁচিয়ে ওঠে ঃ ন্যাড়া মেয়ে
শুধু। মেয়ের সঙ্গে লকডঙ্কা। বলি, তে
বাপকে সামলাবে কি করে? গড়ভাঙার
কিনবেন তিনি বরপণের টাকায়, দরদাম
বসে আছেন। তখন যে বাপে ছেলের
ক্ষেত্তর বেধে যাবে। আমি নিমি
ভাগী হব না।

নিজেদের কথাবার্তা শেষ করে মু
হারাণকে বলে, পরশু-তরশু যেদিন
আমার এখানে চলে আসুন। যা বলবার
সময় বলে দেব। আসবেন নিশ্চয়, অক
দেরি করবেন না।

চলে গেল ওরা। অনেক কথাই শা
লার কানে গেছে। স্বামীর উপর রে
করে উঠলেন ঃ মেয়ের বিয়েই যদি দে
রূপসী ভাগনীকে বাড়ি এনে তুললে
বিবেচনায়? ভগ্নিপতি মরাতে না মর
বয়ে আনতে হল, দুটো পাঁচটা দিনও সব
সইল না?

হারাণ বলেন, আমি না হয় নি
এসেছি, দোষ করেছি। কিন্তু ঘ
মধ্যে ঢুকে কে আর দেখত? থাক
খেত, ঘুমাত। তুমি যে একেবারে ক্ষে
গিয়ে পাড়ার মানুষ ডেকে ডেকে দেখা
লাগলে। দেশময় চাউর হয়ে গেছে।
ঠেলা এখন।

বিদেয় করে দাও।

সে তো হয় না। পর নয়—আপন বে
ভাগনী। উঠবে গিয়ে কোথায়? আ
নিন্দে রটে যাবে। বিয়ে দিয়ে রাধিট
বিদেয় করব। মনোও তাই বলে। কা
কাটি করে। ভেবেছিলাম, আরতি
বড়, তার বিয়েটা আগে হোক তার
দেখব। সে আর নয়। মুরারি উকি
কাছ থেকে ফিরে এসে কোমর বেঁধে রা
জন্য লেগে যাব।

মনোরমা এসে দাঁড়িয়েছেন কোন
বলে উঠলেন, বিদেয় করতে না পার
দাদা, কালিঝুলি মাথানো নয়, একদিন
এসিড ঢেলে দেব মেয়ের মুখে। উনি
নলহাটি পোস্টাপিসে, একটা মেয়ের
এসিড ঢেলে দিয়েছিল। মা হয়ে আমা
তাই করতে হবে। চান করেনি ক'দিন,
চুল—তার উপরে ছেঁড়া ত্যানা
পাঠালাম, হারামজাদি তবু লঙ্কাকাণ্ড
এল।

হারাণ শহরে গেছেন। মুরারি
ডেকে বলেননি, তবুও মনোরমা বড়
করে আছেন। তুমুল খবর হচ্ছে

কাপাসদা'র ঠাকুর গোপালের কাছে শতেক বার মনে মনে মাথা খুঁড়ছেন। কিন্তু ফেরার পর হারাণের মুখের চেহারা দেখে কোন আর সংশয় রইল না। এগিয়ে এসে তবু মনোরমা প্রশ্ন করেন, খবর কি দাদা?

একদিকে খারাপ, আর একদিকে ভাল। ভাল যেটুকু, সে হল আশার অতীত।

শোনা গেল সবিস্তারে। শান্তিবালা সে সময়টা পাড়ায় বেরিয়েছেন। ধীরসুস্থে হারাণ তাই বলতে পারলেন। মুহুরি ছোঁড়াটা মুরারি উকিলের অনুরোধ সত্ত্বেও সম্বন্ধ নাকচ করে দিল। অথচ আগেও সে দেখেছে আরতিকে—দেখেশুনে তবে তো এগুলে। রাধিকে দেখে তার মাথা ঘুরে গেছে।

মনোরমা সভয়ে বলেন, বউ শুনে রক্ষে রাখবে না। মেয়ের মা তাকে দোষই বা দিই কেমন করে? আর কাজ নেই, আমরা কাপাসদা'য় চলে যাই দাদা। আরতির বিয়ে থাওয়া হয়ে যাক, তারপরে না হয় আসব।

হারাণ বলেন, রাধির জন্যে চলে যাবি—তার বিয়ে এখনই তো হয়ে যায় তুই যদি মত করিস।

এই পাত্রের সঙ্গে? না দাদা, মত নেই আমার। লোকে কি বলবে? আরতিরই বা কি রকম মনে হবে?

মুহুরির সঙ্গে নয়। উকিলবাবুরই বড্ড পছন্দ রাধারাণীকে। ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে ধরেছেন। সহোদর ভাই নয়, বৈমাত্রেয়। কিন্তু একান্নবর্তী। শহরের উপর মস্তবড় দোতলা বাড়ি তাঁদের, বাসুদেবপুরে তালুকের মালিক—সেখানেও পাকা কাছারি। ভাই সেখানে থেকে তালুক-মুলুক দেখাশোনা করে। উকিলবাবু বললেন, মেয়ে তো রাজকন্যে। মুহুরির হাতে দেবেন কি, আমার এই বাড়ি এনে তুলব। আশার অতীত তবে আর কী জন্যে বলি!

ফড়ফড় কয়েকবার টেনে হুঁকো থেকে মুখ তুলে হারাণ বলেন, তবে হ্যাঁ, খুঁতও আছে। ছেলের রং কাল। আমি চোখে দেখিনি, মুহুরি ছোঁড়াই বলল। কাল মানে বেশ কাল।

মনোরমা বলেন, হোক গে। ছেলে কাল আর ধান কাল। তাছাড়া ভাগনী তো তোমার ফর্সা আছে। ছেলেপুলে খুব একটা কুচ্ছিৎ হবে না।

ছেলে দোজবরে। উকিলবাবুই বললেন সেটা। মুহুরিটা আবার ফিসফিসিয়ে বলে, দোজবরে নয়, তেজবরে। ছোঁড়াটার মনের জ্বালা মিথ্যেকথাও বলতে পারে।

ছেলে-মেয়ে নেই তো? দোজবরে তেজবরে তাহলে গাল একটা। ও কিছু নয় সম্বন্ধ আমার জ্ঞান ত দাদা। তার মধ্যে সমস্ত সারতে হবে। বেশি খুঁত খুঁত করলে হবে কেন?

সম্বল তোর পুরোপুরি থেকে যাবে মনো। এক আধলাপয়সাও খরচ নেই। মুরারি উকিল সেটা খোলাখুলি বলে দিয়েছেন। রোখ চেপেছে, এ মেয়ে নেবেনই ঘরে—

সহসা গলা খাটো করে হারাণ বললেন, লোকে বলবে মেয়ে বেচা। নয়তো উল্টে কিছু পাইয়েও দিতে পারি। কি বলিস তুই?

মুরারি হালদারের বৈমাত্রেয় ভাই গোবিন্দ হালদারের সঙ্গে রাধারাণীর বিয়ে হয়ে গেল। শান্তিবালা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন : আরতির বিয়ের সবচেয়ে বড় আপদটা বিদায় হল বাড়ি থেকে।

দুই

আর একটা কথার প্রচার নেই। গোবিন্দ হালদার বয়সে কিছু বড় মুরারির চেয়ে। রোগা-লিকলিকে দেহ বলে এমনি দেখে বোঝা যায় না। কিন্তু প্রতাপ বিষম। গলায় যেন ঝাঁঝ-ঘণ্টা বাজে। বাসুদেবপুরের প্রজারা তটস্থ বড়বাবুর দাপটে। ফুল-শয্যার রাত্রে মেয়েদের কাছেও তার কিছু পরিচয় দিল।

তিন বোন এসেছে বিয়ে উপলক্ষে। আর মুরারির বউ ছবি। তা ছাড়া এবাড়ি ওবাড়ির কয়েকটা মেয়ে এসে জুটেছে। বড় বোন অমলা ডাকাডাকি করে : রাত যে পুইয়ে যায় দাদা। তুমি ছাড়াও পরিবেশন করার লোক আছে। নতুন বউ ঘুমে ঢুলছে।

বারবার বিরক্ত করায় গোবিন্দ খিঁচিয়ে ওঠে : শাস্ত্রীয় রীতকর্ম যেটুকু নইলে নয়, তাই করবি। এক কাঁচ্চা বেশি নয়। এক গাদা ফক্কড় মেয়ে জুটিয়ে এনে ভোররাত্রি অবধি ফষ্টিনষ্টি চালাবি তো জুতিয়ে লাট করব কিন্তু।

স্থান-কাল জ্ঞান নেই গোবিন্দর। বাইরের ওরা সব এসেছে, ওদের সামনেই। মেজ বোন অপর্ণার ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে। শ্বশুর-শাশুড়ির আদরের বউ। সে গ্রাহ্য করে না। দূরে ছিল, একেবারে কাছে সামনাসামনি ঝড়ের মতন পড়ে : কী, কী বললে? কী এমন বাল্মীকি মুনি রে! একটা দিন বরবউকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করে থাকে মেয়েরা।

গোবিন্দ বলে, সে একটা দিন কবে হয়ে গেছে! একটা কেন দু-দুটো দিন হয়েছে।

কিন্তু বউ হয়ে যে এল, তার তো এই প্রথম। তার মনে সাধ-আহ্লাদ আছে তো। তার সাধ মেটাতে পারবে না, আবার তবে কলাতলায় কি জন্যে গেলে?

অপর্ণার মুখের কাছে গোবিন্দ জব্দ। সুর পালটে নেয় তাড়াতাড়ি : সে জন্যে নয় রে অপর্ণা। সেকেণ্ড কোর্টের পেস্কার মশাই আসেনি এখনো। ডাক্তার-বাবু আসেননি। আগেভাগে ফুলশয্যার খাটে চড়ে বসলে তারা কি ভাববে বল দিকি? ডাক্তারবাবু মুখফোঁড় বলে বসবেন, সন্ধ্যেবেলা চড়কে চাপলে, দু-দু'বারেও সখ মিটল না? কথায় ভয় তাঁর বড্ড ও'র।

অমলা বলে, এগারটা বেজে গেছে, সন্ধ্যে হল তোমার এখন! চল বড়দা, বউ ঘুমিয়ে পড়ছে।

মিছে কথা, বয়ে গেছে রাধারাণীর ঘুমুতে। ঠায় বসে আছে। বুক ঢিবঢিব করছে তার : বর দেখেছিল মামার বাড়ি প্রথম যখন গোবিন্দ এসে বরাসনে বসল। লুকিয়ে দেখে নিয়েছিল। শুভদৃষ্টির সময়টা তার-পরে সে চোখ বন্ধ করে ছিল। বর হয়তো ভেবেছে লজ্জা। আসলে ভয়। ফুলশয্যার হোক না দেরি আরও, ডাক্তারবাবু ইত্যাদি এসে যান। সকাল হয়ে যাক। নেহাৎ পক্ষে এমন সময় ঘরে নিয়ে আসুক, রীতকর্ম সারতে সারতে পাখপাখালি ডেকে ওঠে। ননদদের সঙ্গেই যাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে রাধারাণী।

তা হল না, তিন বোনে টেনেটুনে গোবিন্দকে ঘরে আনল। ছবি আসেনি। রোগা মানুষ, কোলে-কাঁকালে চার ছেলে-মেয়ে, পেটেও এসেছে আবার একটি। তাছাড়া ভাসুরের বাসরে ভাদ্রবউ হয়ে আসবেই বা কেন? পাড়ার মেয়েদেরও কারো উৎসাহ নেই, খেয়েদেয়ে সব বাড়ি চলে যাচ্ছে : গোবিন্দ হালদারের ফুল-শয্যা নতুন করে কি দেখব? আগে দেখেছি তো কতবার। বর মুখ ভোঁতা করে থাকবে, রসের কথা বললে মা একটি। অন্য কেউ বললে হাসবে না। আর হাসলেও যদি, গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে হাসি হারিয়ে যাবে—কারও নজরে আসবে না।

শেষ অবধি ওই তিন বোন—রাধির তিন ননদ। বউয়ের ঘুম ধরেছে বলছিল, কিন্তু গোবিন্দই তো ঢলে ঢলে পড়ছে খাটনির ক্লান্তিতে।

অপর্ণা ফিসফিসিয়ে বলে, ছুতো। জান বউদি, তাড়াতাড়ি যেতে বলছে আমাদের। গেলে তখুনি নিজ মূর্তি ধরবে। তোমারও সেই ইচ্ছে—অ্যাঁ?

মোটাসোটা নিটোল গড়ন অপর্ণার। বর্ষার পরিপুষ্ট কলার বোগের মতন। যৌবন সামাল মানে না পাতলা শাড়ি ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। মুখেও অবিরত অসভ্য কথাবার্তা, ঠারেঠোরে স্থূল ইঙ্গিত। বলে, সবুর সইছে না মোটে! আচ্ছা, যাই চলে তবে।

রাধি হাত জড়িয়ে ধরে বলে, যেও না ভাই। সত্যি সত্যি বলছি। ভয় করছে আমার।

ভয় তরাসি দেখমহাসি!—আট বছরের খুকি এসেছেন, ভাজা মাছ উলটে খেতে জানেন না।

কেমন করে বোঝাবে রাধারাণী, মুখের

কথা মোটেই নয়—মনে প্রাণে চাইছে, থাকুক—এই অপর্ণা থাকুক রাধিকে জড়িয়ে ধরে। রাতটুকু নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিয়ে চলে যাবে।

আরও জোরে হাত চেপে ধরেছে, আর অপর্ণা তো হেসে খুনঃ থাক, ঢের হয়েছে। ভয় করে তো নেমে গিয়ে মেজেয় মাদুর পেতে ঘুমিও। সেখানেও যায় তো চেঁচিয়ে উঠবে হাউমাউ করে। আমরা আশেপাশে সব রইলাম।

হেসে আবার বলে, আমি ঘুমোব না বউদি। ঘুমোতে দেবে না তোমার ঠাকুর-জামাই।

নতুন বউয়ের সঙ্গে ফিসফিস গুজগুজ করে হেসে লীলায়িত ভঙ্গিতে বাসরের সর্বশেষ মেয়ে অপর্ণা বেরিয়ে যায়। কত গন্ধ মেখে এসেছিল মাগো—চলে গেছে, গন্ধ ভুরভুর করছে তবু। আর কথায় ও ইসারায় যা সমস্ত বলে গেল, দেহে মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। একটুকু থমকে দাঁড়িয়ে অপর্ণা আবার বলে, দেখে শুনে দুয়োর বন্ধ করে শোবে বউদি ভাই। চোরের উৎপাত। এই বড়দা'রই আগের ফুলশয্যায় দুটো চোর লুকিয়ে ছিল খাটের তলে। ঠাকুরমা তখন বেঁচে, তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

রাধারাণী নতুন বউ, সে কেন দরজা দিতে যাবে? যাদের বাড়ি, সেই মানুষ উঠে দিয়ে আসুক। কিন্তু ওরা চলে যেতে না যেতে গোবিন্দ নেতিয়ে পড়েছে একেবারে। রাধি আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। নতুন জায়গা—চোরের কথা বলল, সত্যি চোরও তো ঢুকে পড়তে পারে। তড়াক করে এক সময় উঠে দরজায় হুড়কো তুলে দিয়ে এল। দরজা দিয়ে বিছানায় ফিরছে, প্রদীপের আলোয় দেখল—হাঁ, সে স্পষ্ট দেখেছে—চোখ মিটমিট করছিল গোবিন্দ এতক্ষণ। ঘুমোয়নি, ঘুমের খেলা। নতুন বউ মুখ ফেরাতেই, আগের মতন আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

রাধিও ঘুমিয়ে পড়ুক তবে। ভাল হল, শাপে বর হয়ে গেল। এমন ঘুম ঘুমাবে, ময়দা মাখার মতো চটকে পিষ্টে ধরে বসিয়ে দিয়েও তাকে জাগাতে পারবে না। কিছুতে জাগবে না, এই পণ। বিশাল খাটের শেষ প্রান্তে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। নতুন বউ আর বরের মাঝখানে অন্তত আরও দু-জনের শোয়ার মতন ফাঁক।

এবং সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন কত বড় ধকল গিয়েছে—এমন ক্ষণেও ঘুমিয়ে পড়া যায়। কতক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছে, ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ। শিরশির করে পোকামাকড় হাঁটছে যেন গায়ের উপর দিয়ে। জানত, এমনিধারা হবে। রাধির সহচরীদের মধ্যে চার-পাঁচ জনের বিয়ে হয়েছে। সকলের চেয়ে বেশি ভাব চাঁপাফুল ভক্তিলতার সঙ্গে। কত সব গল্প করে ভক্তিলতা আর সেই মেয়েরা, কত রসালো ঘটনা। বাঃ, অসভ্য—ভক্তিলতার মুখ সরিয়ে দিয়েছে। হেসে হেসে আরও রসিয়ে ভক্তিলতা তার নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলত। আর বিরক্তির ভান করে রাধারাণী দুই কানে গিলে এসেছে সেই সব। তার জীবনে আজকে সেই ব্যাপার। এখনই। পোকামাকড় নয়, গোবিন্দর হাতের আঙুল চোরের মতন রাধির অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চরণ করছে। গায়ে কাঁটা দিয়েছে। জেগেছে, কিন্তু চোখ খোলে না। একখানা কাঠ হয়ে পড়ে আছে। চোখ খুলছে না বর দেখতে হবে, সেই ভয়ে। কোদালের মতন বেরিয়ে আসা থুতনি, থুতনির উপর দিকে গুহার ভিতরে ঢুকে-যাওয়া ঠোঁট,—গোঁফের জঙ্গলের ভিতর লুকানো সে-বস্তু অনুমান করে নিতে হয়। জঙ্গলের ঊর্ধ্বে অত্যুচ্চ নাসিকা-শিখর। শিখর ঢালু হয়ে যেখানে ললাটে মিশেছে তার দু-দিকে বটিকা প্রমাণ চোখ দুটো। রাধারাণী না তাকিয়েও বুঝতে পারে গোবিন্দর সেই কুতকুতে চোখ দুটো জ্বলছে এখন।

যা খুশি করুক। নইলে চক বাসুদেবপুরের বৈষয়িক কাজকর্ম ফেলে বিয়ের হাঙ্গামায় আসতে যাবে কেন? বিশ-বাইশ বছর ধরে লালন-করা কৌমার্য কেড়ে নেবার অধিকার পেয়েছে মন্ত্রপাঠ করে। প্রতিকার নেই, সে শাস্তি নিতেই হবে নির্বিকারে।

চোখ বুজে আছে এখন— চোখ বুজেই থাকবে যত দিন না পুরানো হয়ে যাচ্ছে। গোবিন্দ ভাববে, বউ লাজুক—দোষ না হয়ে বরঞ্চ সেটা গুণেরই হবে। কালধর্মে সব-কিছু সয়ে যায়, অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আর চোখে লাগবে না। ছোটবেলার একটা কাল কুকুর-বাচ্চা দেখে ভয়ে সে দরজায় খিল দিত, সেই কুকুরকেই আ-তু-উ-উ বলে ভাত খাইয়েছে কত দিন, গায়ে কত হাত বুলিয়েছে।

এমনি ভাবছিল এলোমেলো। খেয়াল হল, হাত সরিয়ে নিয়েছে গোবিন্দ, সাড়াশব্দ নেই, নিঝুম অবস্থা। দারুণ তৃষ্ণা বোধ করে রাধারাণী, এক কলসি জল খেলে তবে বোধ হয় গলা ভিজবে। মানুষটা ঘর ছেড়ে নিঃসাড়ে চলে গেল নাকি? খুলতে হয় চোখ। দূরে সেই আগেকার জায়গায় মড়া হয়ে পড়ে আছে। না, ঠিক মড়া নয়—তাকাচ্ছে রাধারাণীর দিকে। চোখোচোখি পড়ে গেল। কাপড়চোপড় সামলে নেয় রাধি। তাড়াতাড়ি কথাও ফুটল মড়ার মুখে ঃ উঃ, কী গরম! হাতপাখা তুলে নিয়ে জোরে জোরে বাতাস খাচ্ছে।

গরম রাধিরও। জ্বর উঠেছে যেন গায়ে, গা পুড়ে যাচ্ছে। খাট মচমচ করে হঠাৎ গোবিন্দ উঠে পড়ে। পিছন দিককার দরজা খুলছে। খোলা কি সোজা—বাক্সপেঁটরায় ঠাসা দরজার খোপ। আগে সেগুলো সরাতে হল। আমবাগান ও ঝোপঝাপ ওদিকটা। খিড়কির পুকুর। কোথায় চলল গোবিন্দ নতুন বউকে একলা ফেলে? ভয়ে ভয়ে রাধারাণী উঠে পড়ে। দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। চাঁদ উঠেছে বেশি রাত্রে, আমের ডালের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। গোবিন্দ খিড়কি-ঘাটে গেল, ডুবে মরতে নয়—ঘটি ভরে হুড়হুড় করে জল ঢালে মাথায়। দু-হাতের কনুই অবধি ধোয়, হাঁটু অবধি ডুবিয়ে জলে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে মুখে ছিটায়। গামছায় হাত-পা-মাথা ভাল করে মুছে আবার ঘরে আসছে। রাধি শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। গোবিন্দ যেমন দেখে গিয়েছিল, তেমনিধারা পড়ে আছে। চোখ বন্ধ করে অসাড় হয়ে সে অপেক্ষা করছে।

ঝিঁঝি ডাকছে ঝিমঝিমঝিম—তা ছাড়া একেবারে নিঃশব্দ। বৈঠকখানার দেয়াল-ঘড়িতে টং করে একবার বাজল। রাত একটা। অথবা দেড়টা আড়াইটা সাড়ে-তিনটাও হতে পারে। আধ ঘণ্টা হবার সময়েও একবার শুধু বাজে। কিন্তু কই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? চোখ মেলে দেখে, নিদ্রা কি জাগরণ জেনে কোন লাভ নেই। দাঁড়ি টেনে দিয়েছে এই ফুলের শয্যার উপর। ডাইনের পাশবালিশ মাঝে এনে দিয়ে পাশবালিশের ব্যূহের আড়ালে চোখ বুজে আত্মরক্ষা করছে। করুণা হল রাধারানীর। আঙুলের স্পর্শ এক সময় পোকামাকড় ভাবছিল—দুর্ধর্ষ গোঁটা লোকটাকে এবার পোকামাকড় বলে মনে হয়। রাধির পাশবালিশ বাঁয়ের দিকে। সেই পাশবালিশটা তুলে এনে অন্যটার গায়ে রাখল। ডবল দাঁড়ি পড়ল। দুর্ভেদ্য প্রাচীর। ফুলশয্যায় বর-বউয়ের না হয়েছে তো বালিশ দুটো গায়ে গায়ে থাকল।

সকালবেলা ঘাড়ে লাগে ওই অপর্ণাটা। মুখ বিষম আলগা। বলে, জানি গো, জানি। সমস্ত রাত দুপুরে পুকুরঘাট তোলপাড়। ঘুমুচ্ছিলাম, তোমার ঠাকুরজামাই ঠেলাঠেলি করে জাগালঃ শুনছ গো, ওই শোন। ঘাটে গিয়ে ওরা জলের ঢেউ দিচ্ছে। বললাম, গোসাপ জলে পড়েছে। ছেঁদো কথায় ভোলবার মানুষ!

রাধারাণী ঘাড় নেড়ে বলে, আমায় দোষ দাও কেন ঠাকুরঝি। আমি ওর মধ্যে নেই। তিন সত্যি করছি। গোসাপ বলেছিলে তুমি—তা আদ্য অক্ষরে মিল আছে। গো বটে উভয়েরই।

খিলখিল হাসি। হেসে গড়ায় দু-জন। তারপরে আর দুই ননদ ও ছোটবউ হাঁক [illegible]

কাঠফাটা রোদে

আলোকচিত্র ঃ ডঃ অনিল দত্ত

পড়ে। এবাড়ি-ওবাড়ির আরও দু-তিনটি মেয়ে। দিনটা আমোদে কেটে যায়। এরই মধ্যে এক কাণ্ড। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর অপর্ণা বলে, বড়দা পাশা খেলতে বেরিয়ে গেল, এস বউদি আমরা তাস খেলি। মাদুর পেতে নিল দালানে। তাস বের করল। বলে, তাসখেলা জান তো ভাই বউদি? যা জান তাতেই হবে। বসে পড়ল।

তাস ভাঁজছে। ডাবরে পানের খিলি, ডাবর পাশে নিয়ে বসেছে। কপকপ করে খিলি মুখে ফেলছে। মুখ বিকৃত করে বলে, পান খাচ্ছি না ঘাস চিবোচ্ছি বোঝা যায় না। হু, মুক্তিকপাতি জর্দা আছে বড়-দা'র। কোটোটা তোমার ট্রাঙ্কের উপর। এনে দাও না ভাই বউদি।

আছে সত্যি। রাধারানী দেখেছে সেই কোটো। ঘরে ঢুকেছে, ঝনাৎ করে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে দরজায় শিকল। আর উচ্ছ্বসিত হাসি ঃ তাসখেলা তুমি মোটেই জান না বউদি। যা জন, তাই খেল। জানলাটা দিয়ে দাও। চায়ের পর খুলে দেব।

তাকিয়ে দেখে, সত্যিই রে—খাটের উপর লম্বা হয়ে পড়েছে গোবিন্দ। ঘুম—ভেক-ধরা ঘুম নয় কাল রাত্রের মতন। মা গো মা, কত রকম কারসাজি অপর্ণার! আগে থেকে শোনাচ্ছে, পাশাখেলায় বেরিয়ে গেছে গোবিন্দ। তাস আর পানের ডাবর সাজিয়ে নিয়েছে। তিলেক সন্দেহ না আসে মনে। ফাঁদ সাজিয়ে রেখে পাখিকে যেমন তার মধ্যে এনে ফেলে। কিন্তু এই জায়গায় না আটকে বাঘের সঙ্গে এক খাঁচায় দিলে অনেক ছিল ভাল।

দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। পথ আছে পালাবার। পিছন দিকদার দরজা—যে দরজা খুলে গোবিন্দ কাল রাত্রে পুকুরঘাটে গিয়েছিল। দরজার খোপের বাক্সপেটরা সরিয়ে পথ করা আছে, সেটা খেয়াল করেনি অপর্ণা। দেরি নয়। চক্ষের পলকে বেরিয়ে পড়ল রাধারানী। ঘুরে আবার ওদের তাসের আড্ডায়। তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। পারলে আটক করতে?

ও মা, কেমন করে বেরুলে? বড়দা ছেড়ে দিল? মুখেই কেবল তম্বি, কাজে কিছু নয়! পড়তে তোমার ঠাকুরজামাইয়ের পাল্লায়—

অমলার বয়স এদের সকলের বেশি। সে ধমক দেয়ঃ বেশ করেছে। দিন দুপুরে বর নিয়ে শোবে—গেরস্তঘরের বউ এত বেহায়া কেন হতে যাবে? বর তো রইলই—ফুরিয়ে যাচ্ছে না তো বর!

অপর্ণা কানে কানে বলে, দেখ বউদি, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। গুরুজন হলেও না বলে পারিনে। তোমার হল পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ। কদিন বা আছে দাদা বাড়িতে! বাসুদেবপুর চলে যাবে। রসগোল্লা যতক্ষণ মুখের সামনে, গোগ্রাসে গিলে খাও।

একবার বেরিয়ে এসেছে, আর ওমুখো নেওয়া যাবে না রাত্রের আগে। রাত্রিবেলা রান্নাঘরে খেতে খেতে মেয়েদের গল্প চলছে। খাওয়া হয়ে গেছে, আর সকলে উঠতে যায়—রাধারাণী বলে, শুনুন না দিদি, তারপরেও আছে। নতুন গল্প জমিয়ে বসে আবার

একটা। বউয়ের শুধু রাণীর মতন চেহারাই নয়, অনেক গুণ। দু-দিনে আপন করে নিয়েছে জা-ননদদের। অমলা তাই বলছে, বাপের বাড়ি আমরা কতবার আসি। শুয়ে বসে খেয়ে কাজ করে এত মজা কখনো পেয়েছি? একটা মানুষ পা দিয়েই বাড়ির চেহারা বদলে দিয়েছে।

অপর্ণা বলে, ননদিনী রায়বাঘিনী। বাঘিনীদের বশ করে ফেলেছ বউদি, দাদাকে তো ভেড়া বানাবে। কখন বড়দা ঘরে চলে গেছে, ওঠ দিকি এইবারে।

রাধারাণী বলে, ঠাকুরজামাই চলে গেলেন, তুমি ভাই একলা। আজ আমি তোমার সঙ্গে শোব।

অপর্ণা বউয়ের গালে ঠোনা মেরে কানে কানে বলে, তোমার সঙ্গে শুয়ে লাভটা কি আমার শুনি? বরঞ্চ গোলমাল হবে। ঘুমের মধ্যে তুমি আমায় বড়দা ভেবে নেবে। আর আমি ভাবব—। এমনি অসভ্য কথা—মেয়েয় মেয়েয় হলেও লজ্জায় রাধারানীর গাল রাঙা হয়ে ওঠে।

ছবি তাড়া দিয়ে ওঠে। বড় জা হলেও রাধি বয়সে অনেক ছোট। বলে, সেকেলে লজ্জাবতীদের হার মানিয়ে দিলে বড়দি। যাও এবারে, ঢের হয়েছে। আমাদেরও তো ঘুমটুম আছে, না সারা রাত বকরবকর করলে চলবে!

সমুদ্রে কূল দেখা যায় না কোন দিকে। কী করবে এখন রাধি, আর কী বলতে পারে এদের? ঘরে না যাবার জন্য যত কৌশল, এরা সমস্ত লজ্জা বলে ধরে নিচ্ছে। তার গরিমা বেড়ে যাচ্ছে। জা-ননদের কর্তব্যই হল প্রতিবাদ কানে না নিয়ে ঠেলেঠুলে বরের ঘরে পৌঁছে দেওয়া।

অপর্ণা বলেও তাইঃ শোন, অমন যদি [illegible] বোন আর ছোট বউদি মিলে চ্যাং-[illegible] করে ছুঁড়ে দেব বড়দা'র কোলের [illegible]।

সে কাজ সত্যি সত্যি পারে না, এমন নয়। চারজন, আর সে একলাটি। কতক্ষণ লড়বে তাদের সঙ্গে? মধুসূদনের নাম স্মরণ করে। "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ, সঙ্কটে মধুসূদন" ছোটবেলায় বাপের মুখ থেকে শ্লোক মুখস্থ করেছিল। চিরকালের ডাংপিটে মেয়ে, বাজি রেখে শ্মশানের সাড়াগাছের ডাল ভেঙে আনার মেয়ে। আরও ছোট যখন, রাধি দাঁতাল মারা দেখতে গিয়েছিল বাগানের ভিতর। শড়কির ঘা খেয়ে দাঁতাল গোঁ ধরে ছুটেছে, রে-রে-রে রব উঠেছে চতুর্দিকে—মেয়ে তখন ফন ফন করে খাড়া জামগাছের উপরে চড়ে বসল! গাছে তার আগে কখনো ওঠেনি, কিন্তু অবলীলাক্রমে গেল উঠে। এমনি সব অসমসাহসী কাজ করে এসেছে, আর বরের ঘরে যেতে পারবে না এখন! হাত ছাড়িয়ে নিল সে ঘরের সামনে এসে, মাথার ঘোমটা ফেলে দিল। হঠাৎ যেন এক ভিন্ন মেয়ে। সাহেবরা বলে, গুডনাইট—সেই শোনা কথাটা এদের বলে হেসে সশব্দে সকলের মুখের উপর দরজা এঁটে দেয়।

তাকাচ্ছে একদৃষ্টে গোবিন্দর দিকে। হাসে। জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল খাটের পাশে।

ঘুমুলে?

ঘুমন্ত মানুষ সাড়া দেয় আর কেমন করে? হাসে রাধি খলখল করে। বলে, কাল ঘুমুলে, দুপুরে ঘুমুলে আবার এখনো ঘুমুচ্ছ—বেশ মজার মানুষ হয়েছি তো আমি, কাছে এলেই তোমার ঘুম পেয়ে যায়।

অপর্ণার সাগরেদ হয়ে পড়েছে রাধি—অপর্ণা তা জানে না। সেরা সাগরেদ। এই দুটো দিনে দাম্পত্য গল্প যে অনেক করেছে রাধির সঙ্গে। সবই যে সত্যি, বিশ্বাস হয় না। কিন্তু অসম্ভব নয়—ঘটানো যেতে পারে তেমনটি।

গোবিন্দ আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা দিয়ে আছে। কচ্ছপ যেমন খোলার মধ্যে থাকে। সেই চাদরের প্রান্ত শক্ত মুঠিতে এঁটে ধরল রাধারানী। একটানে সরিয়ে ফেলবে। টানতে গিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে খুলে দিল মুঠি। হেরিকেন-আলোর জোর কমানো। কেমন এক আতঙ্ক হল, আলো মৃদু হলেও মুখ দেখা যাবে যে গোবিন্দর। দাঁড়কোদাল মডেল করে বিধাতাপুরুষ যে থুতনিখানা গড়েছেন, গোঁফের নীচেয় যে মুখটা বর্ষার গাছগাছালিতে ঢাকা ডোবার মতন......চোখে দেখতে না হয়, হেরিকেন নিভিয়ে পুরোপুরি অন্ধকার করে দিল। এবারে পারবে। ভূত-পেত্নীর সেই সাড়াগাছের ডাল ভেঙেছিল, আর নিষুতি আঁধারের বরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না?

বউ ঘুমিয়েছে জেনে তুমি কাল যে খেলা খেলতে গিয়েছিলে, তাই আজ রাধির। খানিকটা খানিকটা অপর্ণা শুনে নিয়েছে, ওষুধ বাতলে দিয়েছে সে-ইঃ ন্যাকা মেয়ে। আট-বছুরে গৌরী-দান করে পাঠায়নি তোমায়। বয়স বিশ বছর বলেছে—কোন্-না বাইশ-চব্বিশ। বড়দাও পাঠশালের পড়ুয়া নয়, দু-দুটো ডাগড়া বউ পার করেছে। ছেড়ে কথা বলবে না আজ, কিসের অত! ঘুম ভাঙিয়ে তবে ছাড়বে।

ঘরে আসতেই হল—আসা কিছুতে রদ হল না—অতএব এইমাত্র পথ। অন্ধকার আছে, ভয়টা কিসের? বর লাফিয়ে উঠে পিটুনি দেয় যদি? সে ভাল, অনেক ভাল। জীবন্ত আছে, প্রমাণ পাওয়া যাবে তখন। পিটুনি সহ্য হবে, কিন্তু কালকের ওই লাঞ্ছনা আর নয়।

কানের উপরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কু দিচ্ছে। সূঁচ ফোটাচ্ছে যেন কানের গর্তে। তারই মধ্যে একবার বলে নেয়, এতক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছ। ঘুমুতে হবে না আর এখন। জাগ—

গোবিন্দ সজোরে ঝাঁকি মারে, রাধারানী গড়িয়ে পড়ে একদিকে। মানুষটার গায়ে শক্তি আছে। বলে, বড্ড জ্বালাতন করছ। বাইরে থেকে লুকিয়ে দেখছে ওরা। ছি-ছি!

পেঁচা তো নয়, এই আঁধারে দেখবে কি করে? আমিই বসে দেখতে পাচ্ছিনে তোমায়, তার ওরা দেখবে!

নাঃ, বড় বেহায়া তুমি! লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছ। বাজারের মেয়েমানুষও এতদূর করে না।

কিন্তু রাগ করবে না কিছুতে রাধারানী। অপর্ণা বলে দিয়েছে। রাগ হলেও ঠোঁটে আসবে না রাগের কথা। অপর্ণা পাখি-পড়ান পড়িয়েছে। রাধি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, বাজারের মেয়েমানুষ নই বলেই তা করতে পারছি। লজ্জার সম্পর্ক কি তোমার সঙ্গে? লজ্জা বলে কি, নিন্দা-ঘৃণা মান-অপমানের সম্পর্কও নয়। মন্ত্র-পড়া পাকা গাঁথুনির সম্পর্ক আমাদের।

আবার বলে, আরও তো বিয়ে করেছিলে। দু-দুবার। বিয়ে না-করা পরিবারও বাসুদেবপুরে আছে, শুনতে পাই। তারা কি করে, তাদের গল্প বলতো শুনি।

শেষ কথাটা কানে গিয়ে পুরুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেঃ কক্ষনো নয়। এসব মিথ্যা অপবাদ কে রটায়?

আমিও বলি, রটনা মিথ্যা। যারা রটায় তাদের সঙ্গে আমি ঝগড়া করব। এই ক'দিনের বিয়ের বউ হয়ে বলছি, আর যা-ই হোক ও-দোষ তোমার থাকতে পারে না।

নিঃশব্দতা বেশ খানিকক্ষণ। হঠাৎ এক-সময় গোবিন্দ আত্মগতভাবে বলে ওঠে, কী গরম! ঘাম পড়ছে দরদর করে।

একদিকে রাধি পাথর হয়ে বসেছিল। হেসে ওঠেঃ পুকুর-ঘাটে ডুব দিতে যেও না কালকের মতো। ঘামের কথা বাড়িসুদ্ধ লোক জেনে যায়। আমায় জিজ্ঞাসা করে, যা নয় তাই সব শোনায়। ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে আজ ঘাম মার।

এতক্ষণে এইবার বিষম রেগেছে গোবিন্দ। রাগের চোটে তিড়িং করে উঠে বসে। কাঁপছে। গলায় সেই ঝাঁঝঘণ্টাবাজা আওয়াজ।

ইঃ, ভারি যে মুখ ফুটছে! ইটেভিটে ঘুচিয়ে তো মামার বাড়ি এসে উঠেছ। দু-সন্ধ্যে ভাত দিতে যাদের মুখ বেজার। কোন খবরটা জানি নে? বলি, এত জোর কে জোগাচ্ছে পিছন থেকে? অঙ্গের চিকন ছটার কে মজল?

রাধি বলে, আমার মনের জোর। সত্যের জোর। গরিব বাপের মেয়ে হয়েও সেই জোরে গাঁয়ের মধ্যে ডঙ্কা মেরে বেড়িয়েছি।

নিজের মাথার বালিশটা ছুঁড়ে দিল মেজেয়। মাদুর পেতে মেজের উপর শুয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ ধরে এপাশ ওপাশ করে শেষ রাত্রের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। রোদ উঠে গেছে, ঘুমুচ্ছে পড়ে পড়ে তখনো। অপর্ণা এসে তুলে দিল। বলে, বড়দা চলে গেল। ঝগড়া হল বুঝি, ঝগড়া করে নীচে শুয়েছ? পইপই করে তোমায় যে বলে দিলাম বউদি। আর বড়দা'রও কাণ্ড! ছেলে মানুষটি নয়—নতুন বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়!

এক বাণ্ডিল নথিপত্র বগলে, মুরারি চটি ফটফট করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামছে। শুনতে পেয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল: বড়ভাই হয়, কী আর বলি! ওটা মানুষ নয়। মুক্তোর হারের কদর মানুষে হলে বুঝত। চুলোয় যাকগে। বলি, সম্পত্তির অংশ তো আমারও। আমার আর মায়ের দুই অংশ, আর ওর একটা। কিন্তু যা সমস্ত শুনি, বাসুদেবপুর মুখো হতে প্রবৃত্তি হয় না। দাঁতে মিশি বিলাস দাসী মন টেনেছে। কাছি দিয়ে বেঁধে রাখলেও ছিঁড়ে ছুটত।

দুঃখের মধ্যেও রাধারাণীর হাসি পেয়ে গেল। না—না—না—শতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠতে চায়। মিথ্যে কলঙ্ক তার জিতেন্দ্রিয় স্বামীর নামে। হাজারো রকম অন্য বদনাম দাও, কিন্তু চরিত্র হারানোর আশঙ্কা নেই গোবিন্দর। এদিক দিয়ে রাধি নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ।

অপর্ণা ভাইয়ের উপর ধমকে ওঠে: মেয়েদের কথার মধ্যে তুমি কি জন্যে ছোড়দা? সেরেস্তায় যাচ্ছিলে, তাই যাও।

যেতে যেতে তবু মুরারি বলে, ভদ্রলোকের মেয়ে আমিই পছন্দ করে নিয়ে এসেছি এবাড়ি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বউ-ঠাকরুন। কোনদিন আপনার কোন রকম অসুবিধা না হয়, আমি সে দায়িত্ব নিচ্ছি।

মুরারির কথাগুলো বড় ভাল লাগে, রাধারাণী ভরসা পায়। বউয়ের জ্বলজ্বলে রূপ দেখে মেয়েমহলে ঈর্ষা। সত্যি সত্যি আপন করে পেয়েছে বোধ করি এই অপর্ণাকেই শুধু। আর পুরুষের মধ্যে মুরারিকে। বিষয়সম্পত্তি পৈতৃক। গোবিন্দ কাছারি পড়ে থাকুক আর যা-ই করুক—সম্পত্তির অংশ, মুরারি ওই যা বলে গেল, তিন ভাগের এক ভাগ। কর্তা সেই মর্মে উইল করে দিয়ে গেছেন। এর উপরে মুরারির ওকালতির রোজগার। রীতি-মতো ভাল পয়সা রোজগার করে সে। তার জন্যেই হালদার-বাড়ির নামডাক ষোল আনা বজায় আছে। একান্ন-পরিবারে মুরারির খাতির সেজন্য সকলের বেশি। তার কথার উপরে কথা নেই। সেই মানুষটি রাধির পক্ষে। তবে আর ভাবনা কিসের?

রাধির কোলে মণ্টু। মুরারির সেজ সন্তান। কাদার মতন লেপটে আছে গায়ে। মণ্টুর উপরের মেয়ে মায়া নতুন জ্যাঠাইমার আঁচল ধরে ঘুরছে। ছবি-বউ দেখে এক গাল হেসে ফেলে: এ কী গো! গণ্ডা ছেলে এমন ভদ্রলাক হল কি করে? মায়াও আর বাগানের তলায় তলায় ঘুরছে না।

মণ্টুর জানি ছোড়-দি।

ঠিক তাই। বেঁচেছি বাবা এই খানিকক্ষণ। হাড় ভাজা-ভাজা করে দেয়। আমার দুটো-একটাকে কোলে-পিঠে তুমি মানুষ করে দাও ভাই। আর আমি পেরে উঠিনে।

বাজারের মেয়েমানুষেও এতদূর করে না

কণ্ঠ করুণ হয়ে আসে। হেসে আবার একটু লঘু করে নেয় : মায়ের কাছে তো চলে যাচ্ছ। ক'দিনে যা ন্যাওটা করেছ, মণ্টু তোমায় খুঁজবে। এক কাজ কর—মণ্টুকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। নয়তো মন্তরটা বলে যাও, অমনি যাতে ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।

রাধারাণী বলে, মন্তর নয় ছোড়-দি। কলি-যুগে মন্তরতন্তর খাটে না। ঘুস। দেদার ঘুস দিয়ে যাচ্ছি। বাখারিতে দড়ি বেঁধে ধনুক তৈরি করেছি, পাটকাঠির মাথায় কাদা চেপে দিয়ে তীর। ধনুকে তীর ছুঁড়ে পরীক্ষা দিতে হল। সুপারি-খোলায় বসিয়ে ছাতের উপর টেনেছি এতক্ষণ। মায়া ভারি কাজের মেয়ে, ও-ই সব জুটিয়ে এনে দেয়। ও না থাকলে হত না। পুতুল গড়ে দিয়েছি এঁটেল-মাটি দিয়ে। কাগজের নৌকো, কাগজের দোয়াত। তবে বলুন, জ্যাঠাইমা ছেড়ে আপনাদের কাছে কোন লোভে যেতে যাবে? আপনারা তো এসব ভাল ভাল জিনিস দেবেন না, খালি দুধ খেতে বলবেন।

ধবধবে গায়ের রং ছবির, এক ফোঁটা বেঁটে-খাট মানুষটি। কিন্তু হাড়ের উপরেই চামড়া—মাঝে একটু মাংসের প্রলেপ দিতে ভুলে গেছেন বিধাতা পুরুষ। রক্ত-মাংসের অভাবেই বোধ করি অসম্ভব রকমের ফর্সা দেখায়।

সেই কথা উঠল। ছবি বলে, তোমার মতন না হোক, ছিল সমস্ত আমার ভাই। বিয়ের সময় ফোটো তুলেছিল—আলমারির মধ্যে না কোথায় আছে—খুঁজে পেতে দেখাব তোমায়। মাংস-রক্ত সবই ছিল, কচি লাউয়ের মতো থুকথুকে শরীর। তা পেটের শত্তুরগুলো শুষে খেয়ে নিল সব। এ বন্যের জল থামেও না।

ঝাট ঝাট—করে ওঠে রাধি : অমন করে বলে না ছোড়দি। ছেলেপুলে মা-ষষ্ঠীর দান—সোনা হেন মুখ করে নিতে হয়। কত মেয়ে আছে, মাথা কুটে কুটে একটা সন্তান পায় না।

সেই তো বলি। ষষ্ঠী ঠাকরুণের দয়ার শেষ নেই। মণ্টুর পরে ঝণ্টু—তার এই সবে দাঁত উঠবার মতন। এরই মধ্যে আবার একটি—মাঘ মাস নাগাত কোলে এসে যাবে। নিজে মরি সূতিকার অসুখে, তার ভিতরে এই শোবার ঘর আর আঁতুড়ঘর চলছে।

রাধারাণী বলে, এবারের আঁতুড়ঘরের জন্য ভেব না ছোড়দি। আমি আছি। মণ্টুকে এই দেখছ। তোমার ঝণ্টুকেও এর ভিতরে এমন করে নেব, মায়ের কোল ফেলে সে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাচ্চা ছেলেপুলে বশ করতে আমার জুড়ি নেই। বড্ড ভাল লাগে তাদের। ছোট্ট বয়স থেকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতাম এর ওর ছেলেমেয়ে কোলে করবার লোভে। মা তাই নিয়ে কত গালিগালাজ করত।

ছবি বলে, তুমি এসেছ—একটুখানি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। কর তাই, নিজের পেটে যদ্দিন কিছু না আসছে। সে আর কত? এক বছর না হয় দু-বছর। আমার তো জনম ভোর এই চলবে। সে আমি জেনে বসে আছি। মরণ না হলে আমায় ছাড়বে না।

সকৌতুকে রাধি ঘাড় দোলায়। এক বছর না হয় দু-বছর—তাই বটে! এক-শ' বছর দু-শ' বছর বরের সঙ্গে যদি ঘর করে, তবু সে বাচ্চা দেবে না। বড় কঞ্জুষ বর।

মক্কেলের কাজকর্ম সেরে সেই রাত্রে মুরারি ভিতর-বাড়ি এল। মুরারির মা তারকেশ্বরী গোবিন্দর সংমা—বুড়ো মানুষ সন্ধ্যার অনতিপরেই ঘুমিয়ে পড়েন। শাশুড়ির কাছে বসে রাধারাণী মণ্টুকে ঘুম পাড়াচ্ছে। ঘুমিয়ে ছিল, কি জানি হঠাৎ জেগে পড়েছে। ছবি আর অপর্ণা রান্নাঘরে।

দরজায় ছায়া দেখে রাধি তাড়াতাড়ি উঠতে যায়। মুরারি বলে, উঠতে হবে না বউ-ঠাকরুন। দেখছিলাম আমি। মণ্টুর আপনি মায়ের চেয়ে বেশি হয়েছেন। সেই যা তখন বলেছি—কোনরকম দুর্ভাবনা করবেন না। বড়ভাই হলে কি হবে, বংশের কুলাঙ্গার ওটা। গোবরে পদ্মফুল ফুটেছিল, তার মহিমা বুঝল না। বাসুদেবপুর গিয়ে উঠেছে—সে সম্পত্তি আমাদেরও। আমরা কিছু নিতে খেতে যাইনে। বড়দা'র উপরে নির্ভর না করে ঐ সম্পত্তির একটা অংশ যাতে আপনি পান, সেই ব্যবস্থা করব। আর কিছু গয়না আছে আপনার শাশুড়ির গায়ের। সেটা সম্পূর্ণ আপনার, ছবির তাতে অংশ নেই।

বকবক করে অনেক ভাল ভাল কথা শুনিয়ে মুরারি গিয়ে খেতে বসল। রাধারাণী মৃদু হাতে থাবা দিচ্ছিল মণ্টুর কপালে। মুরারির কথা শুনতে শুনতে হাত থেমে গিয়েছিল এক সময়। আবদেরে ছেলে অমনি উম-হুম করে পাশমোড়া দেয়। আবার দ্রুত থাবা দিচ্ছে...

এত খুশি কেন ঠাকুরপো তার উপরে? মণ্টুর আদর যত্ন দেখে! ছবি-দিদি পেরে ওঠে না। ঢিলে স্বভাবের মানুষ, শরীরের গতিক ওই—বড় হেনস্থা ওর ছেলেপুলের। কে কবে এমন বুকের মধ্যে নিয়ে মণ্টুকে ঘুম পাড়িয়েছে! বাচ্চা ছেলের আরাম দেখে বাপের প্রাণে আনন্দ। গোবিন্দ যে চুলোয় ইচ্ছে গিয়ে থাকুক। বিধবা হয়েও মেয়ে-মানুষ সংসার করে। মণ্টু রাধির হাত ধরেছে, মায়া আঁচল টানছে, কোলে ঝণ্টু—আর আসন্ন ওই সবশেষের বাচ্চাটি ছবি-দিদির গর্ভ থেকে সোজা একেবারে রাধির বুকের উপর। রাজেন্দ্রাণী রাধারাণী! দেবী-দশভুজার ডাইনে বাঁয়ে ছেলে-মেয়ে, উপর থেকে চালচিত্রের দেবতা-গোঁসাইরা উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখছেন—সেই প্রতিমা যেন রাধিরই।

দিন দুয়েক পরে আবার রাধির প্রসঙ্গ উঠেছে। তারকেশ্বরী বলছেন মুরারিকে : বুধবারে ওদের তো জোড়ে পাঠানোর কথা। দ্বিরাগমন। গোবিন্দ সরে পড়ল। বড়-বউমা একলাই তবে যাবে। আর উপায় কি?

মুরারি বলে, না গেলেই বা কী! বাপের বাড়ি নয়, মামার বাড়ি। সে মামা আমারই মক্কেল—অনেকদিন থেকে জানি। বোন-ভাগনী কাঁধের উপর নেহাৎ চেপে এসে পড়ল—কি করবে? দায় উদ্ধার করে দিয়েছে, এখন তো আর চিনতে পারবে বলে মনে হয় না।

তারকেশ্বরী বলেন, কিন্তু মা আছেন যে। বড্ড মিনতি করে বেহান আমায় চিঠি দিয়েছেন। মেয়ে পাত্রস্থ হয়েছে, কাশীবাসী হবেন এইবার। পেটমোছা কোলমোছা ওই মেয়ে—যাবার আগে একমাস দু-মাস নেড়ে-চেড়ে যেতে চান। এমন অবস্থায় 'না' বলা যায় কেমন করে?

মুরারি জবাব দেয় না, ভাবছে। তারকেশ্বরী বলতে লাগলেন, আমাদের এখানেই বা কী এখন? মেয়েরা ছিল এদ্দিন, হাসিখুশিতে কেটেছে। এক অপর্ণা—সেও চলে যাচ্ছে পরশু। নতুন এসেছে তো, আমি বলি, আসুক না বেড়িয়ে কিছুদিন। মা চলে গেলে আর হয়তো কখনো যাওয়া ঘটবে না।

তবু যেন মুরারির ইতস্তত ভাব। অপর্ণা এসে পড়ল কথার মধ্যে। আর অপর্ণা যখন—পিছন দিকে অদূরে কপাটের অন্তরালে রাধারাণীও কি নেই? দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে মুরারি বলে, তা বেশ তো। তোমার বাড়ির বউ, তুমি যা করবে তাই হবে। তবু একবার জিজ্ঞাসা কর বউঠাকরুনকে। তিনি কি বলেন। মণ্টু আর মায়াকে ছেড়ে থাকতে পারবেন তো তিনি?

অপর্ণা বলে, বউঠাকরুন বউঠাকরুন কর কেন ছোড়দা? শুনে গা ঘিনঘিন করে। মনে হয় কোন সেকেলে বুড়োহাবড়া দিদিমা।

মুরারি হেসে বলে, কি বলব তবে? বড় ভাইয়ের স্ত্রী তো বটেন! কেউটেসাপ ছোট হলেও বিষ কিছু কম থাকে না। সম্পর্কে বড়, পূজনীয়া। বউদি ডাক মুখে আসে না, বয়সে বড্ড ছোট। ভাসুরের মতন দেওর আমি। আমার বয়সটা কিছু কম হলে বউদি ডাকতে পারতাম।

অপর্ণা বলে, ভাসুরেও তো কত আজকাল ভাদ্দরবউয়ের নাম ধরে ডাকে। রাধারাণী না হল, রাণী বলে ডাকতে পার।

তারকেশ্বরী ধমক দিয়ে ওঠেন : আগ্নিকোড়া! বড় ভাজের নাম ধরে ডাকবে! বউঠাকরুন বলছে, ওই বেশ ভাল। যা তুই।

রাধি শুনছে। ভাবে, সকল রকম বিবেচনা মানুষটির। গুণ না থাকলে বড় হয়! এই বয়সে এমন পশার। একটা মানুষ সকল দিক সামলে রেখেছে।

তিন

এই তো কাঁদন মায় শ্বশুরবাড়ি ঘুরে এল, তিলভাণ্ডা মামার বাড়ির ভিন্ন এক চেহারা। বাপ মরার পরে প্রথম এসে যেমনটা দেখেছিল। শান্তিবালা এসে জড়িয়ে ধরলেন। রাধি বিবাহিত এখন, আরতির বিয়ের আর সে বাধা নয়। সর্বাঙ্গে গয়নাগাটি, রূপ আরও যেন সহস্র গুণ হয়েছে।

রাধি বলে, আমার আসল শাশুড়ি তো নেই, তাঁর গয়না এই সব। আমি রেখে আসছিলাম। গাঁ-ঘরে এত সোনা পরে বেড়ানো ঠিক নয়। দেওর শুনলেন না। সমস্তগুলো পরে তবে আসতে দিলেন।

এই কথা নিয়ে শান্তিবালা পাড়া মাথায় করেনঃ সোহাগি বউ কাকে বলে চেয়ে দেখ তোমরা। রাধারাণীকে পাড়ায় টেনে নিয়ে গিয়ে হাত তুলে কঙ্কণ দেখান, বাহুর অনন্ত দেখান। কাঁধের আঁচল সরিয়ে সীতাহার দেখান, কানের চুল সরিয়ে মাকড়ি দেখান। কোন গয়নায় কি পাথর বসানো, ধরে ধরে দেখান সমস্ত। এই এখন তাঁর দিনের এক কাজ হয়েছে।

মনোরমা গাঢ়স্বরে বলেন, তোমাদেরই জন্য বউ। একেবারে নিখরচায় এবকম সম্বন্ধ ভাবতে পারতাম? দাদা জুটিয়ে আনলেন, তুমি কোমরে আঁচল বেঁধে লেগে গেলে, তবে হল। নয়তো নিঃস্ব বিধবা মানুষ আমার কী ক্ষমতা ছিল বল।

শান্তিবালা এক সময় রাধির মুখ তুলে ধরে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেন, জামাই কি বলে রে? মেয়ের সুখশান্তি জানবার জন্য মায়েরা পাগল হয়ে থাকে। নিজের মুখে বল্ তুই। লজ্জা কিসের? মারফতি কথা শুনে সুখ হয় না।

শুনতে চাচ্ছেন এত আগ্রহ নিয়ে, তাঁদের রাধি বঞ্চিত করবে কেন? হেসে সে মুখ নিচু করে। আনন্দে গলে গিয়ে শান্তিবালা বলেন, থাক থাক, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এল না কি জন্যে জামাই? শুনতে পেলাম চকের কাছারি চলে গেছে।

রাধারাণী বলে, আসবার ঠিকঠাক মামিমা, চক থেকে হঠাৎ জরুরি খবর এল। বিষয়-আশয়ের ব্যাপার সমস্ত ওই একজনের মুঠোয় তো! দেওর নিজের মক্কেল নিয়ে পাগল, ওদিককার কিছু দেখেন না। কাছারিটা পাকা বাড়ি—আমাকেও যেতে হবে নাকি। দোতলার একটা নতুন ঘর তোলা হচ্ছে।

মনোরমাও শান্তিবালার মুখে শুনলেন। মেয়ের মাথায় হাত রেখে নিঃশব্দে আশীর্বাদ করেন তিনি। চোখে জল গড়াচ্ছে। মেয়ের এত সুখ মৃত্যুঞ্জয় দেখে যেতে পারলেন না।

আরতির সঙ্গেই কেবল জমে না। রাধারাণীকে দেখলে সে পাশ কাটায়। যত শুনছে রাধির শ্বশুরবাড়ির গল্প, তত আরও মনমরা হয়ে পড়ছে। বিয়ে গাঁথল না এতদিনের মধ্যে। ইতিমধ্যে আবার এক জায়গা থেকে দেখে গেছে। যেমন বরাবর হয়ে আসছে—চিঠিতে খবর দেব বলে তারা সরে পড়েছে। বয়সে ছোট হয়ে রাধারাণীর ঘর-বর হল, লজ্জাটা যেন রাধিরও।

কাশীযাত্রার গোছগাছ হচ্ছে, দিনও ঠিক হয়েছে। ইহজন্মের দিন ফুরিয়ে এল, পরকালের চিন্তা এবারে। মৃত্যুঞ্জয়ের বৎসামান্য সঞ্চয় রাধির বিয়েয় লাগেনি, এই কাজে খরচ হবে। মনোরমার এক খুড়তুত বোন থাকেন বাঙালিটোলায়। তিনিও বিধবা, অনেকদিন থেকে কাশীবাসী। দুই বোনে একত্র থাকবেন, স্নানান্তে শিবের মাথায় জল ঢেলে ঢেলে বেড়াবেন। তারপরে একদিন বাবা বিশ্বনাথ টেনে নেবেন পাদপদ্মের নীচে। অন্য কোন সাধবাসনা নেই।

হঠাৎ এই সময়ে মোহিত আর সন্ধ্যা এসে পড়ল কলকাতা থেকে। কী আনন্দ, কী আনন্দ! ঠাকুর গোপাল মনোরমার কোন সাধ অপূর্ণ রাখলেন না। যাবার আগে দেখা হল দাদার ছেলে-বউর সঙ্গে। কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে মোহিতরা এসেছে। আপাতত চাকরি নেই। বিলাতি মার্চেন্ট-অফিসের কাজ—এক দেশি কোম্পানিকে ব্যবসা বিক্রি করে তারা চলে গেল। নতুন কোম্পানি এখন বুঝসমঝ করছে, দরকার হলে ডাকবে। ডাকবে নিশ্চয়ই, তবে মাস পাঁচ-ছয়ের আগে নয়।

হারাণ বলেন, ডাকলেও যাবে না। ঘরবাড়ি ছেড়ে কি জন্যে পরের গোলামি করতে যাবে? কোন দুঃখে? সাতটা নয় পাঁচটা নয়, বাড়ির তুমি এক ছেলে। সারাজন্ম এক কড়া দু-কড়া করে সামান্য কিছু করেছি। এখন থেকে দেখেশুনে না নিলে আমার চোখ বোজবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নয়-ছয় হয়ে যাবে।

সে যাকগে। ডাক তো আসুক কোম্পানি থেকে, সে ভাবনা তখন। মনোরমাকে ডেকে একদিন মোহিত বলে, অতদূর কাশী কি জন্যে যাবে পিসিমা? ধর্ম কি এখানে থেকে হয় না? সেখানে খেয়েপরে থাকবে, এখানেও। কাশী কি দুনিয়ার বাইরে?

মনোরমা বলেন, বাইরে বই কি বাবা। কাশী শিবের ত্রিশূলের উপর। মরলে শিবত্ব-লাভ।

মোহিত হেসে বলে, ভিতরের কথাটা বল দিকি। বাবার সংসারের হিসাবি খাওয়া

সহ্য হচ্ছে না। সংসারে বিবাগী হয়ে সেই-জন্যে বেরিয়ে পড়ছ। উঁ?

শান্তিবালা লুফে নিয়ে বলেন, ঠিক। সত্যি কথা বলেছিস তুই। রাধির বাপ খাইয়ে-মানুষ ছিলেন। নিজে খেতেন, পর-অপর মানুষকে ধরে নিয়ে আকণ্ঠ খাওয়াতেন। এরাও চিরকাল ভাল খেয়েছে। দায় উদ্ধার হয়েছে, কি জন্যে ওবে আর কষ্ট করবে? কাশী নাকি সেদিক দিয়েও বড্ড ভাল।

ইন্দুর মা তীর্থ করতে গিয়েছিল, তার কাছে শোনা। দু-পয়সায় এই বড় ফুল-কপি। চার পয়সা বেগুনের সের, দুধ চার আনা, ঘি দু-টাকা। গঙ্গার পোনামাছ ধড়-ফড় করছে, তাই নাকি ছ-আনা সেরে বিকোয়। আরে ছি-ছি-ছি বিধবা মানুষের খাওয়ার মধ্যে পোনামাছের কথা কি জন্যে বলতে গেলাম!

সকলে মিলে স্টেশনে গিয়ে মনোরমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল। সন্ধ্যা ভারি মিশুকে, আরতির ঠিক উল্টো। গলায় গলায় ভাব জমেছে রাধারাণীর সঙ্গে।

সন্ধ্যা বলে, পিসিমা গেলেন, আর তুমিও সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরমুখো ছুটবে, সে কিন্তু হবে না। বাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে। দক্ষিণের ঘরে একা থাকতে পারবে না—তোমার ভাই থাকুকগে সেখানে। তুমি আর আমি পুবের কোঠায়।

কিন্তু ব্যবস্থা তার আগেই হয়ে গেছে। মোহিত এসে পুবের কোঠা ছেড়ে দিয়ে মনোরমা আর রাধি দক্ষিণের ঘরে গিয়েছিল। হারাণ নিজে থাকছেন এখন দক্ষিণের ঘরে, রাধি মামির সঙ্গে মাঝের কোঠায় থাকবে।

রাধি বলে, ঘরের জন্য হচ্ছে না—যেদিন সমন এসে পড়বে, তখন তো উপায় থাকবে না।

সমন যাতে না আসে, সেই ব্যবস্থা কর। জামাইবাবুকে লিখে দাও না, তিনি এসে ঘুরে যান কয়েকটা দিন। প্রাণ জুড়োবে, কিছু-দিনের মতো আর টান থাকবে না।

রাধি অন্তরঙ্গভাবে গায়ের উপর এসে বলে, সত্যি কথা বলি তবে শোন। টানছে আমায় মণ্টু আর মায়া। ছেলেটা আর মেয়েটা এমন করত—সময় সময় মনে হয়, পাখি হয়ে উড়ে গিয়ে একবার তাদের কোলে কাঁখে করে আসি।

সন্ধ্যা খিলখিল করে হাসেঃ এ যে আসলের চেয়ে সুদের দাম বেশি হয়ে গেল ভাই। নিজের কোলে আসুক, তখন আলাদা কথা! যদ্দিন না আসছে, ঝাড়া হাত-পা নিয়ে দিব্যি হেসেখেলে আমোদ করে বেড়াও। এই আমার মতন।

চার

সমন এসে গেল এরই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে। আগে ডাকের চিঠি এল, তারপরে এসে পড়লেন বিশ্বাসী প্রবীণ মুহুরি সুরেন বক্সী মশায়। ঝণ্টুর অন্নপ্রাশন। বিস্তর লোক জমবে। বাড়ির বউ আগে গিয়ে গোছগাছ করবেন। বড়বাবু গোবিন্দও আসছেন। তিনি আসবেন একদিন আগে চক থেকে ভোজের মাছ কলাপাতা ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে।

অমলা অপর্ণা অণিমা তিন বোন এসে পড়েছে। উৎসবের বাড়ি গমগম করছে। বিনামেঘে বজ্রাঘাত। গোবিন্দ নৌকো বোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে আসছিল, সেই নৌকো বানচাল। বাসুদেবপুরের অল্প দূরে দুই গাঙের মোহানায়। দাঁড়ি-মাঝি জল ঝাঁপিয়ে ডাঙায় উঠল, কিন্তু গোবিন্দ ভেসে গেছে কোথা। অথচ সাঁতার সে ভালই জানত। কাল পূর্ণ হলে কোন শিক্ষাই কাজে লাগে না—এ ছাড়া অন্য কি বলা যায়?

একজন দাঁড়ি ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিল। রাত পোহালে এত বড় অনুষ্ঠান। যজ্ঞপণ্ড তো বটেই অনেকের সঙ্গে মুরারিও বাসুদেবপুরে ছুটল। সেখান থেকে মোহানায়, দুর্ঘটনা যেখানে হয়েছে। দড়া-জাল নিয়ে জেলে নামানো হয়েছিল আগেই। মৃতদেহ পাওয়া গেল না। শীতকালে গাঙের টান প্রখর নয়। তবু এত দূরে ভেসে গেছে অথবা কুমিরে-কামটে এমন করে খেয়েছে যে একখানা হাড়ের পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া গেল না।

রাধারাণীকে জড়িয়ে ধরে অপর্ণা হাউ-হাউ করে কাঁদে। রাধারাণীর চোখে জল নেই, যেন সে পাথর। হঠাৎ এক সময় সে বাহুবেষ্টন ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে মণ্টুকে বুকে তুলে নেয়। মণ্টুকে ছেড়ে দিয়ে ঝণ্টুকে। ঝণ্টুকে নামিয়ে মায়াকে তুলে ধরে উঁচু করে। অশ্রুহীন শুষ্ক চোখে হাসছে যেন—কেমন এক ধরনের হাসি। রাধা-রাণীর এই বৃত্তান্ত যার কানে যাচ্ছে, চোখ মুছে সে কূল পায় না। এই বয়স আর এমন রূপ—কিন্তু কী কপাল নিয়ে জন্মেছে রে হতভাগী!

গা ভরে গয়না দিয়ে সাজিয়েছিল, এক একখানা করে খুলে নিতে হল। মুরারি এর মধ্যে এসে পড়েঃ গয়না সমস্ত খুলো না মা। হাতের বালা জোড়া অন্তত থাকতে দাও। সাদা থান পরিও না, কালাপেড়ে ধুতি পরুন। নইলে চোখ তুলে চাওয়া যাবে না বউঠাকরুনের দিকে।

মেয়েরা বাপের বাড়ি উৎসব করতে এসে-ছিল। কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল—চলে গিয়ে বাঁচল যেন তারা। বাড়িটাই শ্মশানের মতো হয়েছে। শ্রাদ্ধশান্তি রাধারাণী করবে। অপঘাতে মৃত্যু, এর বিধিবিধান আলাদা—যেটুকু নিতান্ত নইলে নয় সেইভাবে সংক্ষেপে দায়সারা হল। মুরারি সান্ত্বনা দেয় মাঝে মাঝেঃ অমন ঝিম-ধরা কেন বউঠাকরুন? কী হয়েছে। ছবির অবস্থা দেখেছেন, সে কিছু পারে না। মণ্টু-ঝণ্টুর জ্যাঠাই-মা আপনিই এবার হাল ধরে বসুন। আমরা সকলে আপনার তাঁবেদার।

যথাসময়ে ছবি আঁতুড়ঘরে গেল। ঝণ্টুর জন্য ভয় ছিল—তার জন্মের সময় যেমনটা হয়েছিল মণ্টুকে নিয়ে। কী কান্না কাঁদে মায়ের কাছে যাবার জন্য—ঝি-চাকর এবং বাপ মুরারি অবধি নাজেহাল। এবারে এক রাধারাণীই সবগুলোকে সামলাচ্ছে, অন্য কাউকে লাগে না। বাড়িতে বাচ্চা ছেলেপুলে আছে কিনা বোঝাই যায় না। সন্ধ্যার পরেই রাধির এপাশে ওপাশে শুয়ে পড়ে।

মক্কেলের কাজ করতে করতে মুরারি সেদিন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। পেট চেপে ধরেছে। ভিতরে এসে রাধারাণীর ঘরের সামনে একটু দাঁড়ায়ঃ ওরা ঘুমিয়েছে? মরে যাচ্ছি বউঠাকরুন, ফিকব্যথাটা আবার উঠেছে। একবার উঠতে পারেন যদি—বোতলে গরম জল ভরে আমার ঘরে দিয়ে যান। এসব কাজ ছবি বেশ পারে।

অসুস্থ হয়েছে মানুষটা, এত কথা বলবার কি? রাধারাণী জল গরম করে বোতলে ভরে নিয়ে এল। মুরারি যন্ত্রণায় মুখ আকুঞ্চিত করে ও-ও আওয়াজ করছে এক একবার। দেহ ধনুকের মতন বেঁকে উঠছে।

জলের বোতল হাতে রাধারাণী দাঁড়িয়ে আছে। এ মানুষ নিজের হাতে সেঁক দেবে কি করে? কষ্ট দেখে রাধির চোখে জল আসবার মতো। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে তবু মুরারি দেখতে পাচ্ছে না। দেখে তার-পর টেনে টেনে বলছে, এসে গেছেন? ফ্লানেলের টুকরোটা দিন আগে, ড্রয়ারে রাখা আছে। গরম বোতল গায়ের উপর রাখা যাবে না তো!

কম্বল একটা মুরারির গায়ে। বাঁহাত-খানা বেরিয়ে ফ্লানেল নিয়ে আবার কম্বলের তলে ঢুকে গেল। চোখ বুজে সহসা আর্তনাদ করে ওঠে। ব্যথাটা বড় চাগিয়ে উঠল বুঝি! খানিকটা সামলে নিয়ে আবার হাত বাড়িয়ে মুরারি মিনমিন করে বলে, দিন এবারে বোতল।

বোতল গেল কম্বলের নীচে। সঙ্গে সঙ্গে বের করে বিছানার উপর ছুঁড়ে দিল। রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে রাধি কি করতে পারে ভেবে পায় না। বলে, কি হল?

মুরারি টেনে টেনে বলে, পারছি নে আমি। পেটের উপর ফ্লানেল রেখে বোতল গড়িয়ে দিচ্ছিলাম। হাত কাঁপছে কিনা। ফ্লানেল সরে গিয়ে খালি চামড়া পুড়ে গেল হয়তো।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই উকিল হাকিমের সামনে কথার ঝড় বইয়ে দেয়। মামা হারাণ মজুমদারের মুখে অনেকবার এসব শুনেছে। সেই মানুষ কী রকম অসহায়। ক্ষীণস্বর কানে যায় কি না যায়।

মুরারি বলছে, ছবি নেই আর ব্যথাটা কিনা আজকেই উঠল। রোগের সেবায় ছবি বড় ভাল।

রাধারাণী মৃদু কণ্ঠে বলে, আমি চেষ্টা করে দেখব?

পারবেন আপনি? নাঃ, থাকগে। দেখুন, এমন কষ্ট—এখন যদি বিষ পাই তো খেয়ে নিই। এ যন্ত্রণার চেয়ে মরণ ভাল।

রোগী তো শিশুর সামিল। নয়তো এমন কথা বেরুচ্ছে মুরারি হেন মানুষের মুখ দিয়ে! মণ্টুর যদি এমনি হত, রাধি চুপ করে থাকতে পারত? বসে পড়ল রাধি রোগীর পাশে।

ব্যথা কোনখানটা, দেখিয়ে দিন।

রাধারাণীর হাত ধরে মুরারি দেখিয়ে দেয়। নরম হাত ছাড়ছে না, এ'টে ধরেছে জোর করে। যন্ত্রণার আক্ষেপে হয়তো। সহসা বোতল কেড়ে ফেলে দিয়ে কঠিন মুঠিতে হাত ধরে যন্ত্রণার জায়গায় বুলিয়ে দিচ্ছে। পাথর হয়ে গেছে রাধি, বুক ঢিবঢিব করছে। কোথায় ফিকব্যথা? রোগি নয়, যেন মত্ত সিংহ। অভিনয় তবে সমস্ত? তিন মাস বিয়ের পরে আজও রাধি কুমারী। উঠে পালাবে সে শক্তিও নেই তার দেহে। শুধু একবার কে'দে পড়ে: আপনি যে আশ্রয় আমার—।

ছি-ছ কী ন্যাকা মেয়েমানুষ তুমি!

কাঁদছে রাধারাণী। বাঁধ-ভাঙা অশ্রু-স্রোত। মুখে কথা নেই। আষ্টেপিষ্টে কাপড় জড়িয়ে বসে আছে সেই খাটের প্রান্তে। এ কি হল? ছবি যে তার বোনের মতো। তার উপরে বিশ্বাসঘাতকতা!

মুরারি ধমক দিয়ে ওঠে: কাঁদছ কেন, কী হয়েছে? নীচে চলে যাও। পুতুল হয়ে বসে থেক না, চোখ মোছ। রান্নাঘরের ওরা সব জিজ্ঞাসা করবে। ভাল করে মুছে ফেল। ছি-ছি, কী ন্যাকা মেয়েমানুষ তুমি! একটা কথা জেনে রাখ, তোমায় আমি ফেলব না কোনদিন।

রাধারাণী গুটিসুটি পা ফেলে নীচের তলায় নিজের ঘরে এল। যাবে না রান্না-ঘরে, কারো সামনে যাবে না। বামুন-মাসি ডাকতে এসেছিল, খাবে না বলে দিয়েছে। অশুচি দেহ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পচা ঘায়ের মতন থিকথিক করছে। জ্বলছে। কী করবে, কী এখন করতে পারে সে? উবু হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে মেজেয়। খাটের উপরে বিছানায় যেতে পারে না, মণ্টু-ঝণ্টু ঘুমুচ্ছে সেখানে। তাদের অকল্যাণ হবে।

স্বামীর উপর ভালবাসায় মন ভরে যায় হঠাৎ। কর্কশভাষী মানুষটা—অক্ষম অপদার্থ নির্বোধ। নৌকোর দাঁড়ি-মাঝিদের সঙ্গে চক্রান্ত করে তাকে মারল কিনা কে বলবে? কী ভেবে সে পিছন-দরজাটা খুলে ফেলল, ফুলশয্যার রাত্রে গোবিন্দ যেমন খুলেছিল। খিড়কির ঘাটে গিয়ে মাথায় জল ঢালে। জল ঢেলে শীতল হয় না, জলে নেমে ডুব দেয়। ডুব দিল পাঁচটা সাতটা দশটা—।

থাকবে না এ বাড়ি, থাকবার তো উপায় রাখছে না। ওই যে কাণ্ড হয়ে গেল, মুরারি ছোঁক-ছোঁক করে সেইদিন থেকে। মক্কেল ভাগিয়ে সকাল সকাল ভিতর-বাড়ি চলে আসে। ঝণ্টু ঘুমিয়েছে, মণ্টুকে হয়তো ঘুম পাড়াচ্ছে সেই সময়। মুরারির সবুর সয় না, পা টিপে টিপে এসে রাধির হাত ধরে টান দেয়। হে'চকা টান—ডানা ছি'ড়ে আলাদা হয়ে যায় বুঝি টানের চোটে। এক রাত্রের অপরাধের পর থেকে দেহটার উপর যেন তার পুরো আধিপত্য।

যাবে চলে যেদিকে দু-চোখ যায়। কিন্তু মণ্টু-ঝণ্টু—চলে গেলে কে তাদের খাওয়াবে? থাবা দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াবে কে? তার

উপরে আছে মায়া। মায়াবিনী। জ্যাঠাইমা জ্যাঠাইমা করে সারাদিন পায়ে পায়ে ঘোরে। অতিকায় মাকড়সার মতো মুরারি কিলবিল করে জড়িয়ে ধরে রাধির রক্তশোষণ করছে। কান্না পায়, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে। খিড়কির ঘাটে গিয়ে অনেকগুলো ডুব দিয়ে এসে খাটে উঠে মণ্টুকে জড়িয়ে ধরে। ঘুম আসে তখন।

পাঁচ

দ্বিজপদ ঘুঘুলোক। হাটে হাটে কেনাবেচা করে। চারজন ভাগিদার। ভাড়া-করা এক ডিঙি আছে তাদের। কেশবপুর ডাঙা-অঞ্চলের হাট। এই শীতকালে খেজুরগুড় ওঠে প্রচুর, দামও সস্তা। সোমবারের হাটে গুড় কিনে ডিঙি বোঝাই করল। ওদিকে আবাদ-এলাকার হাট কাটাখালিতে ধান-চালের আমদানি, ডাঙা-অঞ্চলের জিনিসের টান খুব সেখানে। বুধবার কাটাখালির হাটে দ্বিজপদরা গুড় নিয়ে নামাল, কিনল ধান। এই কাজ-কারবার। দু-চার টাকা যা মুনাফা হল, তাতেই খুশি। টাকা তো ঘুরছে অবিরত। আরও আছে। চিটেগুড় কিনে মাটি মিশাল দেয়, ধান-চালে চিটে-কাঁকর। বাড়তি মুনাফা এই প্রক্রিয়ায়।

এক হাটবারে বেশি রাতে ঘরে ফিরল। মুনাফা ভাল হয়েছে, মনে স্ফূর্তি। হাটে মোরগ কিনে কেটে-কুটে তৈরি করেছে ডিঙিতে বসে। চার ভাগিদারে মিলে ফিস্টি হবে। কথা উঠল, এইসব খাসি-মোরগে চই দিলে জমে ভাল। চই একরকম লতানে গাছ, পানের মতন পাতা, দেয়াল অথবা মোটা গাছের গায়ে শিকড় বসিয়ে বসিয়ে লেপটে থাকে। হালদার মশায়দের খিড়কির পাঁচিলে আছে একটা চইগাছ—খানিকটা ডাল কেটে আনলে হয়। এ আর কী এমন শক্ত—কাস্তে নিয়ে দ্বিজপদ বেরুল। এক জায়গায় খানিকটা ডাঙা সেইখানে উঠে বসে কাস্তে দিয়ে নরম হাতে পোঁচ দিচ্ছে। দালানে সেই দিককার একটা দরজা খুলে গেল। শীতের ঘোলাটে জ্যোৎস্না। আড়াল নেই দ্বিজপদর কোনদিকে। এক্ষণি তো দেখে ফেলবে। যে মানুষ বেরিয়ে এল দেখেই চেঁচাবে। তৈরি দ্বিজপদও। লাফ দিয়ে পড়বে ওপারে। দৌড় দৌড়—তারপরে ঝুপ করে বসে পড়বে একটা ঝোপজঙ্গল দেখে। দেয় লাফ আর কি!

কিন্তু যে বেরুল সে-ও আর এক চোর। মুখ দেখা না যায়, কেউ চিনতে না পারে, এমনিভাবে ঘাড় নিচু করে হনহন করে চলল। ঘরে চলল ভিতর দিকে সিঁড়ির তলায়। যতই মুখ নামাক দ্বিজপদ চিনেছে মানুষটাকে। মজাদার ব্যাপার বলে ঠেকছে—খুঁটিয়ে দেখতে হয় তবে তো! লাফটা পাঁচিলের ওধারে না দিয়ে এধারে দিল। যে ঘর থেকে মানুষটা বেরিয়ে এসেছে, উঁকি-ঝুঁকি দেয় সেখানে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বাড়িতে তিনজন তারা গালিগালাজ করছে চই নিয়ে না ফেরার দরুন। আজকে থাকল এই অবধি, দেখতে হবে আর একদিন। চইগাছ ধরে টেনোহিঁচড়ে পাঁচিলের উপর উঠল। দিল লাফ ওপারে।

দিন তিনেক পরে কাটাখালির হাট থাকা সত্ত্বেও ঘাটে ডিঙি বাঁধা। ব্যাপারবাণিজ্য তো বারোমাস আছে, এমন মজা ক'দিন পাওয়া যায়?

পাঁচিল টপকে এসে রাধারাণীর ঘরের পিছনে চারজনে তুমুল চেঁচাচ্ছে: চোর, চোর! ঘরে চোর ঢুকে পড়েছে।

চাকরবাকর সব বেরিয়েছে। সুরেন বক্সী মুহুরি মশায় উঠেছেন। চোরের নামে দু-চারজন পাড়ার মানুষও সদর ফটক দিয়ে ঢুকে পড়েছে। বুড়ি তারকেশ্বরী শীতের মধ্যে তুরতুর করে উঠে দোর ঝাঁকাচ্ছেন: বড় বউমা, ওঠ। চোর ঢুকেছে তোমার ঘরে।

আর দ্বিজপদ ওদিকে বিশদভাবে চোরের বৃত্তান্ত শোনাচ্ছে: আমাদের বাড়ি গিয়েছিল সিঁদ কাটতে। তাস-টাস খেলে চারজনে শুয়ে পড়েছি। গাঙখালে-খোরা মানুষ মশায়, চোখে ঘুমুই, কান দুটো ঠিক সজাগ থাকে। তাড়া করেছি তো পাঁই-পাঁই করে ছুটল। ছুটতে ছুটতে এই বাড়ি। ভাঙা পাঁচিলের ওই জায়গা দিয়ে তরতর করে উঠে পড়ল। আমরাও উঠছি। চোর লাফ দিয়ে পড়ল তো পিছন পিছন আমরাও। ভুল করে বোধ হয় দোর দেওয়া হয়নি। ঘরে ঢুকে পড়ে চোর খিল এঁটে দিল। এখনো আছে।

এমন ঝাঁকাঝাঁকি, দরজা খান-খান হয়ে পড়ে আর কি! মণ্টু জেগে উঠে ভয় পেয়ে, হাউ-হাউ করে কাঁদছে। রাধারাণী খিল খুলে দু-দিকে কবাট টেনে দিল। তারকেশ্বরী ঢুকলেন। পিছনে মুহুরি মশায় আর পাড়ার ইতরভদ্র যারা এসেছে।

ওরে মুরারি, তুই?

ছোটবাবু, এখানে?

উকিলবাবু যে! নমস্কার—

তারকেশ্বরী গর্জন করে ওঠেন: কালামুখি শতেকখোয়ারি, জলজ্যান্ত ভাতারটা চিবিয়ে খেয়ে এবার দেওরের ঘাড়ে লেগেছিস?

আর, কী আশ্চর্য—সারা বাড়ি এত হৈ চৈ, ছবি বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে উপরের ঘরে। আঁতুড়ের মেয়াদ শেষ করে ক'দিন হল ঘরে এসে উঠেছে। চোখের উপর এত বড় কাণ্ড, সে কিছু জানে না। এমন হাবাগবা মেয়েমানুষ এই যুগে! কপালও সেইজন্যে পুড়ছে।

মুরারি এক ছুটে উপরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তবু কি ঘুম ভাঙে না ছবির? এবার তারকেশ্বরী মুরারির উপর গর্জাচ্ছেন: ওই তো যত নষ্টের গোড়া। কালসাপিনী পছন্দ করে ঘরে এনে তুলল। কুল-মান সবসুদ্ধ এখন যায়।

রাধারাণী স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। উঠে এবার পিছনের দরজা খোলে। দ্বিজপদর দলটা যেখানে। কাউকে সে গ্রাহ্য করল না, কোনদিকে তাকাল না। দুমদুম করে দৃপ্ত পা ফেলে সকলের চোখের উপর দিয়ে ঘাটে গেল। স্নান করল মাঘের নিশিরাত্রে। ভিজে কাপড় সপসপ করতে করতে ফিরে গেল ঘরের মধ্যে।

দ্বিজপদ ফ্যা-ফ্যা করে হাসছে। মুরারি হালদারকে ধরিয়ে মজা করতে এসেছে তারা। হালদার-বাড়ির রূপবতী ভ্রষ্টা বউটাও স্নান করে চোখের উপর দিয়ে এমনি বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে গেল, এটা উপরি লাভ।

সুরেন মুহুরিকে তারকেশ্বরী বলছেন, এ বাড়িতে আর তিলার্ধ নয় মুহুরি মশায়। পাপের আগুনে আমার সর্বস্ব যাবে। যা করবেন, এই রাত্রের মধ্যেই। পরামাণিক ডেকে মাথা ন্যাড়া করে দিন। ন্যাড়া মাথায় ঘোল ঢেলে কুলো বাজাতে বাজাতে স্টেশনে নিয়ে ভোরের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসুন। যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক। হাজার চুলো হাঁ করে আছে ওসব নষ্ট মেয়েমানুষের জন্য।

আবার হাঁক দিয়ে ওঠেন: কই গো, কে যাচ্ছে পরামাণিক-বাড়ি?

সুরেন বক্সী বিচক্ষণ মানুষ, কর্তার আমল থেকে এবাড়ি আছেন। কেউ না শোনে, এমনি ভাবে বললেন, ওসব সেকালে হত। এখন করতে যাবেন না মা। আইন খারাপ। বউমার মামা লোকটাও কিচেন খুব। ভারি মামলাবাজ! ঘোল ঢালাঢালি করলে তো জুত পেয়ে যায়। মোটা খেসারত আদায় করবে। যা-কিছু করবেন মাথা ঠাণ্ডা রেখে। উকিলবাবুকেই বরঞ্চ একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

ঘরের ভিতরে রাধারাণীর বড় ভয় লেগেছে। মাথা ন্যাড়া করবে বলে—মেঘের মতন ঘন ঠাসা চুল পিঠ ছাড়িয়ে পড়ে, নাপিত এসে ক্ষুর চালাবে তার উপর। তাড়াতাড়ি সে দরজা এঁটে দেয়। জনতার মধ্য দিয়ে কুলো পিটিয়ে তাড়াবে, সেটায় তত ডরায় না। এমন রসের খবর সকাল হতে না হতে এমনিই তো মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়বে।

বেলা হল। বাড়ি চুপচাপ। সুরেন মুহুরি আরও অনেক বুঝিয়েছেন, তারকেশ্বরীর তড়পানি একেবারে বন্ধ। চেঁচামেচির উত্তেজনার পর ঘুমুচ্ছেনই বোধ হয় ক্লান্তিতে। মুরারি শয্যা ছেড়ে দাঁতন ঘষে জিভছোলা দিয়ে সশব্দে জিভ পরিষ্কার করে যথানিয়ম কতকগুলো নথিপত্র নিয়ে

হেলতে দুলতে বাইরের ঘরে গিয়ে বসেছে। চা চলে গেছে সেখানে এতক্ষণ। এবং মক্কেলও নিশ্চয় জমতে শুরু করেছে। রোজ যেমন হয়ে থাকে। ভয়ে ভয়ে রাধি দরজা একটুখানি ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখে। না, কোনদিকে কেউ নেই। তবু বাইরে যাচ্ছে না। হয়তো বা টুক করে ধরে নাপিতের সামনে বসিয়ে দিল। তারপরেই ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল স্টেশনে......

দরজা ঠেলে এসে ঢুকল—ওমা আমার কি হবে, এ যে ছবি। কাঁদছে ছবি। রাধি কোথায় মুখ ঢাকবে, ভেবে পায় না। ছবি কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরে। কাল রাতে সকলের সামনে এত লাঞ্ছনাতেও রাধারাণীর চোখে জল আসেনি, ছবির কান্নায় অপরাধী সেও এবার কেঁদে ভাসাল। রাধির চোখের জলে ছবির বুক ভাসছে, ছবির চোখের জলে রাধির মাথা।

রুদ্ধস্বরে রাধি বলে, বয়সে ছোট তবু সম্পর্কে বড়, সেজন্যে পায়ের ধুলো নিল সেদিন। তার এই মান রাখলাম। জড়িয়ে ধরেছ কেন, পায়ের চটি খুলে মার আমায়। কেঁদে কেঁদে এত শাস্তি দিও না ভাই।

ছবি বলে, কাঁদছি ওই মণ্টু-ঝণ্টু-মায়ার কথা ভেবে। ওদের আর ছুঁতে পারবে না তুমি। শাশুড়ি বলে দিয়েছেন, ছুঁলে নোড়া দিয়ে হাত থেঁতো করে দেবেন তোমার। আমারই ভুলের জন্য এতদূর হল। তোমার হেনস্থার জন্য দায়ি আমি।

অবাক হয়ে গেছে রাধারাণী। এ কোন কথা বলছে ছবি, তার দায়টা কিসে হল?

ছবি বলে, এতখানি বুঝতে পারিনি। ঘুমিয়ে পড়ে থাকি, শাশুড়ি বলেন। ঘুম আমার চোখে নেই। চোখ বুঁজে বুঁজে দেখি সমস্ত! দাঁতে দাঁত চেপে থাকি, প্রাণের যন্ত্রণা অন্যের কানে না যায়। উনি উঠে বেরিয়ে চলে যান—জানিনে জানিনে করে ঘুমুই। বিমলা ঝিয়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারি ছড়িয়ে পড়ল, আমি সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলি: ভগবান, কত দয়া আমার উপর! না হলে তো আমারই মরণ! তখন কি জানি, ও-মানুষে বাড়ির বউয়েরও সর্বনাশ করতে পিছ-পাও নয়। তোমার ঘরে চলে যায়। তা হলে আড় হয়ে পড়তাম। যা হবার আমার উপর দিয়েই হোক। দেখ, গোড়া থেকেই ওর বদ মতলব। বটঠাকুর কিছুতে বিয়ে করবেন না, ও একেবারে আদা-জল খেয়ে লাগল। রোজগেরে ভাইয়ের কথা ফেলতে পারলেন না তিনি। আমরা ভাবি, উদাসীনের মতো চকের কাছারি পড়ে থাকেন, তাঁকে সংসারে টেনে আনছে।

বলতে বলতে চোখ মুছে এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকে ছবি: পতি পরম গুরু, বলতে নেই। কিন্তু ও যদি মরত, আমি হয়তো বাঁচতে পারতাম। এর উপর আবার একটা যদি আসে, আঁতুড়ঘর অবধি যেতে হবে না, তার আগেই চোখ উলটে পড়ব।

দুপুরবেলা পাথরের থালায় রাধির ভাত-তরকারি দিয়ে গেল। পাথরের থালা মরে না, মাজতে ঘষতে হয় না। দিয়ে গেল ঝি এসে, বামুনে মাসি হাতে করে দিল না। ঘরের সামনে রোয়াকের উপর ঠকাস করে রেখে গেল। রান্নাঘরে ঢোকা অতএব মানা। রান্নাঘরে যখন, ঠাকুরঘরে তো বটেই। অন্য কোন কোন জায়গায় সঠিক বলা যাচ্ছে না। সেই শঙ্কায় রাধি সারা দিনমানের মধ্যে একটি বার শুধু বেরিয়ে খিড়কি-পুকুরে ডুব দিয়ে এসেছে।

ভর সন্ধ্যায় উপরের বারান্ডায় মণ্টু গলা ফাটিয়ে কাঁদছে জ্যাঠাইমা বলে। মায়ার বয়স হয়েছে, তাই শব্দ করে কাঁদে না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, আলো জ্বালবে কোন লজ্জায়? সেই অন্ধকারে রাধি উৎকর্ণ হয়ে বসে বাচ্চা ছেলের কান্না শোনে। আহা, একজন কেউ কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করতে পারে না? সবাই কি কালা হয়ে গেল। ছবি নিজে তো অসুস্থ, সে পারবে না। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে মণ্টু আপনিই শান্ত হয়ে যাবে। হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়বে ঠাণ্ডা মেঝের উপর। সারা রাত্রি পড়ে থাকবে, বিছানায় তুলে শোয়াবার মানুষ হবে না।

ঘরের দরজা ফাঁক করে একজন ঢুকল অন্ধকারে। টিপিটিপি পা ফেলার ধরন দেখে বুঝেছে। কোর্ট থেকে ফিরে জলটল খেয়ে মুরারি এবারে বাইরে-বাড়ি যাচ্ছে। চোখের জল মুছিয়ে দিতে এল। টুক করে একখানা খাম ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত পদে সে বেরিয়ে যায়। জানলার ধারে গিয়ে একটা কবাট খুলে রাধি আঁটা খাম ছিঁড়ে ফেলল। চিঠি নয়, এক বর্ণ লেখা নেই—দশ টাকার নোট তিনখানা।

মাথার মধ্যে চনমন করে ওঠে। ভয় হল রাধির—ব্রহ্মতালু জ্বলে গেছে, দুম করে মরে পড়ে যাবে এইবার। কিন্তু কিছুক্ষণ যে বাঁচার দরকার। মুরারির মুখোমুখি হবে বাইরে-বাড়ি গিয়ে। মক্কেলরা এসে থাকে, আরও ভাল, তাদের সামনেই হবে সমস্ত।

টাকা কেন? কিসের দাম? যা নিয়েছে, টাকায় তার শোধ হয় না।

নোট তিনটে ছুঁড়ে দিল মুরারির মুখের উপর। মক্কেল জমেনি এখনো। একলা মুরারি নিবিষ্ট হয়ে খবরের কাগজ দেখছিল। চোখ তুলে তাকাল।

উকিল মানুষ, কথা বেচে খায়, মুখে আড় নেই। বলে, দোকান খুলে প্রথম যে বউনির টাকা—কম হোক, বেশি হোক—কপালে ঠেকিয়ে তুলে রাখতে হয়। বাণিজ্য ভাল জমে। টাকা অমন ছুঁড়ে দিও না, তুলে নিয়ে কপালে ঠেকাও।

জবাব শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে নেই রাধারাণী। ভিতর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে, আর ঢুকল না। ফরফরিয়ে চলল। চলল স্টেশনে। মামার বাড়ি তিলভাণ্ডার ভাড়া টাকা দেড়েক। সে পয়সা আছে তার কাছে।

ছয়

বাড়ির মধ্যে শান্তিবালা ওঠেন সকলের আগে। ভোরবেলা দরজা খুলেই দেখেন দক্ষিণের ঘরের পৈঠার উপর কাত হয়ে বসে একটা মেয়ে।

কে রে?

রাধারাণী মুখ ফেরাল। মুহূর্তকাল তাকিয়ে দেখে শান্তিবালা আর্তনাদ করে ওঠেন: ওরে মা, কাপড়চোপড় গয়নাগাটি পরে রাজরাণী হয়ে এলি সেবার, এ কোন ভিখারিণী আজ আমার উঠোনে!

কান্নাকাটিতে ঘুম ভেঙে সবাই বাইরে এল। সন্ধ্যা, আরতি, আরতির অন্য তিন বোন। মোহিত ওঠে নি—কলকাতার চাকুরে বাবু—গায়ে রোদ না লাগলে ঘুম ভাঙে না। আর হারাণ বাড়ি নেই, কোর্টে মামলা, এই

খানিকক্ষণ আগে রাত থাকতে রওনা হয়ে গেছেন।

সন্ধ্যা কেঁদে বলে, এমন ভাবে বসে কেন ভাই? ঘরে চল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাধি বলে, না—

শান্তিবালা অবরুদ্ধ কণ্ঠে প্রবোধ দিচ্ছেন:

বুকের মধ্যে দাউ-দাউ করে জ্বলে। বুঝি মা বুঝি। আমার অজিত মা-শীতলার দয়ায় ছটফট করতে করতে চোখ বুজল। কতকালের কথা। আজও ভুলতে পারিনে। যে চলে গেল, তাকে ফেরানো যাবে না। তবু বাঁচতে হবে, সবই করতে হবে। তোর মা নেই এখানে, কিন্তু আমরা তো সব রয়েছি।

আরতি ইদানীং কথা একরকম বন্ধ করেছিল রাধির সঙ্গে। তারও চোখে জল। শুকনো চোখ শুধু রাধারাণীর। একটা জায়গায় সেই থেকে একভাবে বসে আছে। নড়েচড়ে না, চোখেও বোধকরি পলক নেই।

এরই মধ্যে একবার শান্তিবালা বলেন, তোর জিনিষপত্তর কোথায় রাধি? তুলেপেড়ে রাখুক।

কিছু নেই। যা পরে এসেছি, এই শুধু।

সন্ধ্যা আবার বলে, ঘরে এস ভাই। কাপড় বদলাবে। শাড়ি চলবে না—তা কাচা ধুতি আছে ওর।

রাধারাণী ঘাড় নাড়ে। তেমনি বসে থাকে।

কিছু বিরক্ত হয়ে শান্তিবালা বলেন, এইখানে সমস্ত দিন কাটাবি নাকি? খাবি এখানে? শুবি এই জায়গায়?

রাধি বলে, খেতে দাও যদি, এখানে বসেই খাব। শোওয়া তো রাত্রিবেলা—অনেক দেরি, সেই সময় ভাবব।

কেমন এক ধরনের হাসি। ভয় হল শান্তিবালার, মাথা খারাপ হয়ে এল নাকি? জিজ্ঞাসা করেন, সঙ্গে কে এসেছে?

কেউ নয়।

আরতি বলে, বাবাও তো খানিক আগে স্টেশনে চলে গেলেন। পথে দেখা হল না?

মামা তো গরুর গাড়ি করে রাস্তা দিয়ে গেছেন। আমি মাঠ ভেঙে পায়ে হেঁটে সোজাসুজি এসেছি।

এবারে কঠিন হয়ে শান্তিবালা বললেন, কী হয়েছে খুলে বল আমায়।

মামা যখন গেছেন, তাঁর মুখেই শুনতে পাবে মামিমা। আমি বলতে পারব না।

বলে টালি-ছাওয়া সেই পৈঠার উপর আঁচল পেতে রাধি গড়িয়ে পড়ল।

সারাদিন এমনি কাটে। পৈঠার উপরে নয়, দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় উঠে বসেছে। পাড়ায় রটনা, হারাণ মজুমদারের ভাগনি রাধি কী এক বিষম কাণ্ড করে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে, তারা এক কাপড়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। কত লোক দেখে গেল। জমিয়ে আলাপ করতে চায়, কিন্তু রাধির জবাব পায় না।

শান্তিবালা কাজের এক ফাঁকে আবার এসে পড়েন। রীতিমত ঝাঁঝালো সুর: বাইরে পড়ে থেকে আর কেলেঙ্কারি করিস নে। সংসার করতে হয় যে আমাদের, লোকের কাছে মুখ দেখাতে হয়। মুখ না খুলিস তো ঘরে ঢুকে মুখ লুকিয়ে থাক।

মোহিতের কানে গেছে। সে বলে, কেন জ্বালাতন কর মা? যেমন আছে পড়ে থাকতে দাও। মন খানিকটা ভাল হলে আপনি ঘরে যাবে। নিজের কাজে চলে যাও তুমি।

ছেলেকে ভয় করেন শান্তিবালা। ছেলের তাড়া খেয়ে ঘরে গেলেন, ত্রিসীমানায় আর নেই।

সন্ধ্যার পর হারাণ মহকুমা-শহর থেকে ফিরলেন। এসেই বললেন, রাধি এসেছে নাকি? কেন সব তোমরা ঘিরে দাঁড়িয়েছ, কী তোমাদের? মোহিত আর মোহিতের মা থাকুক, তোমাদের শোনবার কিছু নয়।

সামনে থেকে সরে গিয়ে সন্ধ্যা ও মেয়েরা দরজার আড়ালে দাঁড়াল। হারাণ গিয়েছিলেন কুটুম্ব-বাড়ি। মুরারি উকিলের সেরেস্তায় কাজ—তখন জানতেন না এসব কিছু। রাধির শাশুড়ি সমস্ত বললেন। সুরেন মুহুরির সূত্রেও শুনে এসেছেন।

শান্তিবালা গালে হাত দিলেন: কী সর্বনাশ গো, এমন কে কোথায় দেখেছে! কালামুখি কলঙ্কিনী—ভাল বলতে তো হবে তাদের, ঝাঁটার বাড়ি মেরে দূর করে দেয় নি। রাত দুপুরে নিজে বেরিয়ে চলে এল।

মোহিত এরই মধ্যে উল্টো কথা বলে, ঝাঁটা মারলে তো দু-জনকেই মারতে হয়। মুরারি হালদারটাকেও।

শান্তিবালা বলেন, যতই হোক পুরুষমানুষ সে—

মানুষটা লেখাপড়া জানে, বউ-ছেলেপুলে নিয়ে থাকে সেই বাড়িতে। রাধি যদি ঝাঁটার এক বাড়ি খায়, সে খাবে তিনটে। কিন্তু আমি বলি মা, বিচারটা আপাতত মুলতুবি থাক। রাত দুপুরে শখ করে বেরোয় নি, মামামামির কাছে জুড়োতে এসেছে। ক'দিন একটু শান্ত হতে দাও ওকে। প্রাণে বেঁচে থাকতে দাও।

আরতি দরজার আড়াল থেকে শুনে ছুটে গিয়েছে রাধির কাছে। হাত ধরে টানে: সারা রাত বাইরে থাকবে কেমন করে? ঘরের ভিতর যাও।

রাধি বলে, মামার কাছে শুনলে তো সব? ভাবছি গোয়ালে গিয়ে শোব। ভগবতীরা আছেন, গোয়াল কখনো অশুচি হয় না।

থাক, খুব হয়েছে। ঘরে যাও বলছি। নয় তো দাদা ভীষণ রাগ করবে।

দাদা কিছু জানে না বুঝি?

জেনে শুনেই তো সে তোমার পক্ষে। যাও—

দিন দশেক কাটল। কেলেঙ্কারির কথা ইতর-ভদ্র জানতে কারো বাকি নেই। এই তিলডাঙা গ্রামে শুধু নয়, চতুর্দিকে সারা অঞ্চল জুড়ে। যা ঘটেছে তার সহস্রগুণ রটনা। ভাল গৃহস্থঘরের আশ্চর্য রূপসী মেয়েটা যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে, খাতায় নাম লিখে বাজারে বসাটাই বাকি এখন শুধু। পুরুষ-মেয়ে সবাই ছি-ছি করে। পারতপক্ষে রাধি ঘরের বার হয় না। কিন্তু মানুষের দেহ নিয়ে কখনো সখনো না বেরিয়ে তো উপায় নেই—পুরুষ কারো যদি সামনে পড়েছে, দুটো চোখ হুলের মতো ক্ষতবিক্ষত করবে তার সর্বদেহ, জিহ্বার মতো লেহন করবে, এক্স-রে রশ্মির মতো বসনের অন্তরালও রেহাই দেবে না। আর মেয়ে হলে তো কথাই নেই। বাইরে ওৎ পেতে থাকতে হয় না, সমবেদনার অছিলা নিয়ে সরাসরি তারা ঘরে ঢুকে পড়ে। দুটো চারটে কথার পরে মতলব গোপন থাকে না—মুরারির সঙ্গে সেই প্রথম রাত্রি এবং পরবর্তী রাত্রিগুলোর কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনা। আরতিও যেখানে থাক এসে পড়বে এই সময়। তা রাধারাণীও বঞ্চিত করে না, আশার অধিক দেয়। কী এক আক্রোশে পেয়ে বসেছে তাকে। শুধু ওই মুরারি হালদার কেন—আরও জনকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে বলে। মেয়েগুলো মাতালের মতন গেলে।

দক্ষিণের ঘরে একলা শোয় রাধি। ভয়ের কথা হয়ে দাঁড়াল—রাত্রিবেলা যত লোকজন আনাগোনা বাইরে। ছ্যাঁচাবাঁশের বেড়ার ঘর—[illegible] কেটে ঘরে ঢোকে যদি! মনোরমা কাশী চলে গেলে সে মাঝের কোঠায় মামির কাছে শুত, হারাণ এসেছিলেন এই ঘরে। এবারে তা নয়। পাপিনীকে কোঠাঘরে তুলতে যাবে কি জ্বালা?

ভয়ে ঘুমুতে পারে না। একদিন জ্যোৎস্নারাতে দেখল, বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে—

কে, কে ওখানে?

ওদিকে পুবের কোঠায় মোহিতের সঙ্গে সন্ধ্যার লেগে গেছে: আপদ কদ্দিন পুষবে বাড়িতে?

মোহিত বলে, যাবে কোথায়? বল। ভুল করেছে, কিন্তু আমরা তাড়িয়ে দিলে আরও তো রসাতলের দিকে গড়াবে।

বাড়িতে লোক হাঁটাহাঁটি করছে—

নিস্পৃহ কণ্ঠে মোহিত বলে, হতে পারে। মধুর গন্ধ পেলেই মৌমাছি আসবে।

ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে সন্ধ্যা বলে, মধু নয়—পায়খানার ময়লা। আসে যত ময়লার মাছি।

মোহিত বলে, এক দিক দিয়ে ভাল। চারিদিকে চোরের উৎপাত। রাত্রে পাহারার কাজ হচ্ছে আমাদের বাড়ি। চোর ঢুকতে পারবে না।

সন্ধ্যা বলে, যত সব বদ লোক—তারাই যদি চুরি করে। ভাল লোকে তো আসে না।

আসে না কে বলল? শীতকাল বলে আরও জুত হয়েছে। ভাল লোক মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে আলোয়ানে মুখ ঢাকা দিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারে।

হঠাৎ সন্ধ্যা কঠিন সুরে বলে ওঠে, সেই ভাল লোক একজন তুমিও। চোখ পাকিও না। চুরি করবে আবার চোখ পাকাবে, দুটো একসঙ্গে হবে না। মায়া বিষম উথলে উঠল, সেই সময় থেকেই জানি। রাত্রে রোজ তুমি বেরিয়ে যাও।

সন্দেহ-বাতিক ছাড়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে থাক নাকি?

দুয়োর আঁটবার সময় কাগজের টুকরো দিয়ে রেখেছিলাম দুই কপাটের ফাঁকে। সেই কাগজ সকালবেলা দেখি বাইরে পড়ে আছে। দুয়োর না খুললে কাগজ পড়তে পারে না।

এত প্রতাপ মোহিতের, কিন্তু স্ত্রীর কাছে মিইয়ে গেছে। বলে, ছি-ছি, মাথা খারাপ তোমার। কী সব নোংরা কথা! কত নিকট-সম্পর্ক—আপন পিসতুত বোন হল রাধি—

বোন আগে ছিল। নষ্টদুষ্ট হয়ে গেলে পুরুষের সঙ্গে তখন অন্য সম্পর্ক। আজ আমি ছাড়ছি নে। আমার আঁচলের সঙ্গে তোমার কোঁচার মুড়োয় গিঁট দিয়ে রাখব। গিঁঠ খুলে দেখি কেমন করে পালাও।

মরীয়া হয়ে উঠেছে। সত্যি সত্যি গিঁঠ বাঁধে সন্ধ্যা। গর্জাচ্ছে। দ্রুত নিশ্বাসে উঠা-নামা করছে বুক। বলে, বাজারে চলে যাক, বাজারে গিয়ে ঘর বাঁধুকগে। কটা রং আছে, ঢং আছে—সেই দেমাকে ভাবছে, বাজারে কেন যেতে যাব—যেখানে থাকি, সেইখানেই তো বাজার। সে হবে না বাড়ির উপর থেকে। স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেব কাল। না যায় তো ঝাঁটা মারব। যা ওর শ্বশুরবাড়িরা করেনি।

সকালবেলা উঠে অবশ্য রাগ অনেকখানি পড়েছে। রাধারাণীকে কিছু বলল না, কিন্তু জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে মোহিতের। কোনদিকে বেরিয়েছে তো শতেক রকমে জেরা: কোথায় গিয়েছিলে? ধাপ্পা দিও না, আমার চোখে ফাঁকি চলবে না।

কী জ্বালা, কাজেকর্মেও বেরুনো যাবে না? পোস্টাপিসে গিয়েছিলাম চিঠি রেজেস্ট্রি করতে।

সোহাগ — আলোকচিত্র: শ্রীঅনিল বসু

রাধি ঠাকরুণও ঠিক ঐ সময়টায় বেরুল কেন? কোন্ ঝোপজঙ্গলে গিয়েছিলে বল রাসলীলা করতে? বেশ, নিজে আমি পোস্টমাস্টারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসব।

কিন্তু ঈশ্বর জানেন, একেবারে ভিত্তিহীন কুৎসা। রাত্রে একদিন দু দিন বেরিয়েছিল অবশ্য, বেড়ায় চোখও রেখেছিল। রাধি ওই সময়টা কি করে, সেইটে শুধু দেখে আসা—তা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু স্বীকার করতে গেলে আরও সর্বনাশ, সোজা তাই বেকবুল যাচ্ছে। ঘরের বার না হয়েই দেখবে দিন কতক। নিতান্ত বেরুবে তো একাকী কদাপি নয়। হারাণের সঙ্গে অথবা অন্য দু-চার জন জুটিয়ে। অর্থাৎ সন্দেহাতীত সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ। কিন্তু তাতেও কি রক্ষা আছে?

দক্ষিণের ঘরের দিকে চেয়ে হাসাহাসি ইঙ্গিত আমি বুঝি দেখতে পাইনে, আমি কানা?

ঈশ্বর সাক্ষী, এই সময়টা মোহিতের দৃষ্টি ছিল দক্ষিণে নয়—সোজা উত্তরের দেয়ালের দিকে।

একদিন সন্ধ্যা শাশুড়ির কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল: আমায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন মা। চোখের উপরে অত শয়তানি দেখতে পারি নে।

শান্তিবালা বলেন, তুমি ঘরের লক্ষ্মী, তুমি কেন যাবে মা? বাইরের আপদ বিদেয় করে দেব।

সে তো পারবেন না মা। কিছুতে পারবেন না। খুঁটোর জোর আছে। ছেলে হয়ে মায়ের মুখের উপর হুমকি দিয়ে ওঠে, সেই তখনই টের পেয়েছি।

এমনি সময় সুরাহা হয়ে গেল। অদৃষ্ট ভাল মোহিতের। কলকাতায় জোর লেখালেখি করছিল—সেই কোম্পানি ডেকেছে আবার তাকে। মাইনে আগের চেয়ে কম। কিন্তু বিনি-মাইনেয়—এমন কি চাকরিটা না হলেও তো বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে পড়বার অবস্থা।

ছেলে-বউ চলে গেল। তখন শান্তিবালা হুংকার দিয়ে পড়লেন: যাদের ঘরবাড়ি

তাদের বিদেয় করে দিয়ে এবারে অষ্টঅঙ্গ মেলে সুখ করবি ভেবেছিস? দূরে হ।

কোথায় যাব, বলে দাও মামিমা।

যেখানে খুশি। আমি বলি, নরলোকে আর ও কালামুখ দেখাসনে। পুকুরে জল আছে, গোয়ালে গরুর দড়ি আছে। কিছু না হোক, ঘরের পাশে কলকেফুলের এত বড় গাছ—তার বীচি বেটে খেয়েও তো মরতে পারিস।

ঘর থেকে বেরিয়ে রাধারাণী হারাণের কাছে চলে যায়ঃ মামি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন মামা—

হারাণ চুপ করে থাকেন।

মামি তো আত্মঘাতী হতে বলেছেন। তা ছাড়া উপায়ও দেখছিনে। তাই করব মামা?

হারাণ বলেন, মনোর মেয়ে তুই। কিন্তু কি করব, নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছিস তুই যে মা। আরতির বিয়ে ঝুলছে কাঁধের উপর, যামিনীটাও ধাঁ-ধাঁ করে সেয়ানা হচ্ছে। আরও ছোট তার পরে। পাড়াগাঁ জায়গা, সমাজ-সামাজিকতা রয়েছে। তুই বাড়িতে আছিস, তাই নিয়ে ঢি-ঢি পড়ে গেছে—কোন সম্বন্ধ এগোয় না, যেখানে যাচ্ছি মুখ ফেরায়। মামি তোর মনের ঝালে ওইসব বলেছে। কিন্তু মেয়েদের দিকটাও ভেবে দেখবি তো মা।

কথা একই—শান্তিবালার কথারই রকম-ফের। হারাণ মিষ্টি করে বলছেন বিদায় হয়ে যেতে।

বললেন, শুধু হাতে যাসনে। কিছু দিয়ে দিচ্ছি। ভাল হয়ে থাকিস। মেয়ে কটার বিয়ে হয়ে যাক, আবার নিয়ে আসব। আসবে না তো মনের জোরে ফেলে দিতে পারি আমি? অনটনে পড়লে লিখবি, সাধ্যমতো কিছু কিছু পাঠাব।

শ্বশুরবাড়ি গেলে। [illegible] বাড়ি থেকেও ঠাঁই গেল। [illegible] এর পায়ের লাথি খেয়ে ওর পায়ে। সেখান থেকে আর এক পায়ে—। কিন্তু আর সে জায়গা মামি বাতলে দিলেন, সেটা [illegible] মনে ধরে না। কেন ধরবে? জন্ম দেবার পর কষ্ট করে এত বড়টা হয়েছে, অপঘাতেই এই রূপ—অমনেই তো চুকে গেল। পুড়িয়ে ফেলে দেবে। আর পোড়ানোর কষ্ট না নিয়ে যদি গাঙে ফেলে দেয় স্রোতে ভেসে ভেসে পচে গিয়ে দুর্গন্ধ হবে দেহ, কচ্ছপ-কামট-মাছে খুঁড়ে খাবে। শিয়ালে হয়তো টেনে তুলবে ডাঙায়, শকুনে ছেঁড়াছেঁড়ি করবে, লুব্ধ কাক সারি সারি গাছের ডালে বসে থাকবে এক-টুকু উচ্ছিষ্ট নাড়িভুঁড়ি পাবার আশায়। মা গো মা, সে বড় বিশ্রী। কিছুতে এসব হতে দেবে না। মরবে না রাধি, বেঁচে থাকবে। জলে ডুব দিয়ে গায়ের ময়লা ধোয়—তেমনি ডুব দিয়ে দিয়ে ডুব দিয়ে দিয়ে সে ভিতরের কালি ধুয়ে সাফসাফাই করবে।

হারাণকে বলে, কাপাসদা গিয়ে থাকিগে মামা। আর কিছু না থাক, ঘর দু-খানা আছে, টুনিমণি আর তারাদিদি আছে। আর গোপালবাড়ির ঠাকুর গোপাল আছেন। গোপালকে নিয়ে পড়ে থাকব দক্ষ-পিসিমার সঙ্গে। মানুষ বড্ড ছুঁচো, দরকার নেই অন্য মানুষের।

সাত

দিন কতক বেশ শান্তিতে কাটল। লোকে বরঞ্চ আহা-ওহো করে রাধির সম্পর্কে। এমন মেয়েটা দেখ, যৌবনে যোগিনী হয়ে ঠাকুরসেবা নিয়ে আছে। শুধু ঠাকুর-সেবা কেন, গাঁয়ের লোকের বিপদ-আপদে—বিশেষ করে ছেলে-পুলের রোগপীড়ায় সে বুক দিয়ে পড়ে খাটে। খাওয়া থাকে না, ঘুম থাকে না। শিয়রে বসে বাতাস করছে, তেষ্টা পেলে জল এগিয়ে দিচ্ছে—তাড়িয়ে দিলেও সেখান থেকে নড়বে না।

আধ-পাগলী তারা। একটা দিনরাত্রির মধ্যে ওলাওঠায় সাজানো সংসার পুড়েজ্বলে গেল। স্বামী কৈলাস গেল, টুনিমণির বর সতীশ গেল, টুনিমণির পিঠো-পিঠি মেয়ে সোনামণিও গেল। কড়েরাঁড়ি টুনিমণিকে নিয়ে আছে। মাথা খারাপ সেই থেকে। অন্য কিছু নয়—বিড়বিড় করে বকে, আর সময় সময় ক্ষেপে উঠে শাপশাপান্ত করে ঠাকুর গোপালকে। তারা রান্নাঘরে গিয়ে উঠেছে—সেখানে পড়ে পড়ে আপন মনে যা খুশি বকুক। দেয়াল-দেওয়া বড় ঘরখানায় রাধি আর টুনিমণি। ভালই আছে।

কাশীনাথ মল্লিকের নাতনিটা পগার লাফাতে গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়েছে, পা মচকে গেছে। রাধি কোলে করে তুলে এনে তেল মালিশ করছে আহত জায়গায়। কাশীনাথ হঠাৎ আগুন হয়ে এসে পড়লেনঃ শোন, এ-বাড়িতে এস না আর তুমি। মানা করে দিচ্ছি। যা হবার হোক বুলুর, খোঁড়া হয়ে পড়ে থাকুক, ছোঁবে না তুমি ওকে।

কাপাসদা গাঁয়েও খবর তবে এতদিনে এসে গেল। রসের কথা যে একবার শুনল, অন্যের কানে না দেওয়া পর্যন্ত কিছুতে সে সোয়াস্তি পায় না। এ-কান থেকে সে-কান করে বার ক্রোশ পথ পার হয়ে পৌঁচেছে খবর।

ঠিক তাই। দক্ষ-পিসি এত ভালবাসেন। ছোট্ট বয়সে কোলে-কাঁখে করে নাচাতেন—সেই ভাবটা এখনো যেন। সেই মানুষে মুখ কালো করে বললেন, ঠাকুরবাড়ি ঢুকবিনে আর কখনো। আমরা না জানি, তোর নিজের তো সব জানা। কোন আক্কেলে এদ্দিন ছোঁয়াছুঁয়ি করেছিস?

হল কি বল তো পিসিমা? কোথা থেকে কী তুমি শুনে এলে—

পাপ আর পারা চাপা থাকে না, ফুটে বেরুবে একদিন না একদিন। ওই যে তার থাকে তোর সঙ্গে। কড়েরাঁড়ি—বর মরেছিল, বয়স তোর চেয়ে অনেক কম তখন। বাড়ি হতে চলল—কই, তার নামে তো কেউ কখনো বলতে পারল না।

হাসিতামাশায় রাধারাণী ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চায়ঃ ঠাকুরের সঙ্গে আমার যে আলাদা সম্পর্ক পিসিমা। তোমরাই বলতে গোপাল ঠাকুরের দুয়োর ধরে মা আমায় এনেছে।

হেসে উঠল খিলখিল করেঃ ঠাকুর কোল খালি করে আমায় দিয়েছিলেন। রাধারাণী নাম সেইজন্যে। গোপালের সেবা না করে উপায় আছে আমার?

দক্ষনন্দিনী আরও কঠিন হয়ে বলেন, সে যখন ছিলি তখন ছিলি। এখন নরক। গোপাল চণ্ডালের হাতের পুজো নেবেন তো তোর হাতের নয়। পুরুতঠাকুর বলে পাঠিয়েছেন গোপালবাড়ির চৌকাঠ মাড়াবিনে তুই আর।

পুজোর যোগাড়ে ঠাকরুণ ঢুকে গেলেন তাড়াতাড়ি। রাধি থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে বলে, আমার কি দোষ বল ঠাকুর? ভাল থাকব, তা হলে এমন রূপ দিলে কেন? টুনির মতন কেন হলাম না? ছাতার কাপড়ের মতো গায়ের রং, ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে-আসা একজোড়া গজদন্ত। যে পুরুষ একবার তাকাল, দ্বিতীয়বার আর সে নজর তুলবে না। গজদন্তে এফোঁড়-ওফোঁড় হবার শঙ্কাও আছে। এমন হলে আপনা থেকেই ভাল থাকা চলত ওই টুনির মতন।

বাড়ি ফিরছে পায়ে পায়ে। চোখের জলে বারম্বার বলে, আমি কি ভাল থাকতে চাই নি? এখনো চাই ভাল হতে। গৃহস্থঘরে সারা-দিনের খাটাখাটুনির পর আরামের ঘুম—সেই ঘুম তো চেয়েছিলাম আমি ঠাকুর। মন্ত্রের মতো একটি ছেলে কোলের ভিতর, পাশে স্বামী—ঘুমের ঘোরে হাতখানা পড়েছে স্বামীর গায়ে......

বাড়ি এসে টুনিমণির কাছে কেঁদে বলে, শোন্ টুনি, কী নাকি কথা উঠেছে আমার নামে। ঠাকুরবাড়ি ঢুকতে মানা। কারো উঠোনে কেউ আমায় যেতে দেবে না। ফাঁকা বাড়ি জীবন আমার কাটে কেমন করে?

ফাঁকা দিনের বেলাটাই। খাওয়াদাওয়ার রাত অবধি। তারপরে জমে ওঠে বাইরে। দেয়ালের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থেকেও সমস্ত টের পাওয়া যায়। প্রহরে প্রহরে শিয়াল ডেকে যত রাত বাড়ে, তত পাতার খড়খড়ানি, মানুষের পদশব্দ। তারা পাগলী শুয়ে শুয়ে রাত্রি জাগে। তার মেয়ে টুনিমণির ঠিক উল্টো—মরে ঘুমোয়। খাড়া দাঁড় করিয়ে দিলেও বোধ করি তার ঘুম ভাঙবে না। কড়েরাঁড়ি হওয়া

সত্ত্বেও টুনির সতীত্বের উপর কখনো যে দাগ পড়েনি, চেহারা ছাড়াও এই নিশ্ছিদ্র ঘুম একটা কারণ। টুনি কিছু টের পায় না, রাধির গা শিরশির করে সারারাত।

রাত থাকতে উঠে পড়ে রাধারাণী। উঠানে গোবরজল ছিটায়, উঠান ঝাঁট দেয়। খর-খর-খর সপ-সপাং।

শেষটা টুনিমণি বিদ্রোহ করেঃ আর তো পারিনে মাসি তোমার জ্বালায়। রাত না পোহাতে আজকাল ঝাঁটা ধরছ।

রাধি হাসেঃ তোর গায়ে তো লাগে না।

কানে লাগে। এক পহর রাত থাকতে শুরু কর, ঘুম কেঁচে যায়। ভাতের কষ্ট সওয়া যায়, ঘুমের কষ্ট পারিনে। উঠোন ঝাঁট দেওয়া একটু বেলায় হলে ক্ষতিটা কি?

রাধি বলে, আমার গা ঘিনঘিন করে টুনি, যতক্ষণ না ঝাঁট দিয়ে ফেলি। সকালে ঠাকুরের নাম করতে করতে উঠতাম, কিন্তু আর পারিনে। মনে হয়, আদাড়-আস্তাকুড় জমে আছে। তার মধ্যে ঠাকুরের নাম হয় না। ঝাঁট দিয়ে গোবরজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নিই।

হঠাৎ সে সপাং সপাং করে ঝাঁটা মারতে লাগল মাটির উপরে। টুনি বলে, কী মারছ মাসি, সাপটাপ নাকি?

রাধারাণী কেমন একভাবে তাকায়। বলে, হ্যাঁ টুনিমণি। কত সাপ কিলবিল করে বেড়িয়েছে, বৃষ্টি হয়েছিল তো—নরম মাটির উপর দাগ পড়ে আছে।

খানিকটা অপ্রত্যয়ের ভাবে টুনি ঘর থেকে উঠানে নেমে এল। রাধি পাগলের মতো ভিজা মাটির উপর ঝাঁটা মারছে।

ঠাহর করে দেখে টুনি বলে, সাপ কোথা গো? মানুষ হেঁটে বেড়িয়েছে, সেই দাগ।

সন্ধ্যাবেলা এর একটাও ছিল না। রাতের মধ্যে ছোট-বড় কত পা পড়েছে। কত মানুষের।

কণ্ঠে কান্নার সুর এল রাধির। বলে, রাতে যে উঠোনে মচ্ছব পড়ে যায়। কেন, আমি কী?

উৎপাত দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। নচ্ছার ছোকরাগুলো শুধু নয়, মান্যগণ্য প্রবীণেরাও ক্রমশ দেখা দিচ্ছেন। মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে অতিশয় সতর্কভাবে তাঁদের চলাফেরা, সেইজন্যে আরও বিপাকে পড়ে যান।

বড় ঘরের উত্তরে অনতিদূরে শীতল বাঁড়ুয্যের বাগিচা। লিচু পাকতে শুরু হয়েছে। বাদুড়ে না খায়, সেজন্য ফলন্ত ডালগুলো জালে ঢেকে দিয়েছেন। কিন্তু ইস্কুলে যাবার পথ বাগিচার পাশ দিয়ে। ছেলেগুলো বাদুড়ের বেশি, ইস্কুলে না গিয়ে গাছের মাথায় চড়ে বসে। তাড়া দিলে ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়। বাঁড়ুয্যেমশায় সেজন্য কাঁটাতারে বাগিচা ঘিরেছেন এবার। ফুট করে অমন ঢোকা যাবে না, তাড়া খেয়ে চোঁচা দৌড়ও দিতে পারবে না।

দুপুর রাতে বিষম একটা শব্দ বেড়ার দিকে। কী পড়ল রে, রসিক নাগর কোনটা অপঘাতে মরে দেখ। গালি দিতে দিতে হেরিকেন হাতে রাধি দোর খুলে বেরোয়। এই এক চিরকালের ব্যাধি, লোকের কিছু ঘটলে তখন তার ভয়ডর থাকে না। আপন-পর, ভাললোক-মন্দলোক, যে-ই হোক।

অপর কেউ নয়—মল্লিক মশায়। স্বয়ং কাশীনাথ মল্লিক। মানী লোক বলেই বুঝি উঁচুতে উঠেছিলেন, আজে-বাজে দশজনার মতো উঠোনে না ঘুরে। উঁচু লিচুডালে বসে নিরিবিলি ঠাহর করা যায় ভাল। না, বাড়ি থেকে একদিন দূর করে দিয়েছিলেন, সেজন্য আমার বাড়ির এলাকার মধ্যে পা দিতে ভরসা হয়নি? রাতে ভাল দেখেন না, সরু ডাল ভেঙে এসে বেড়ার উপর পড়েছেন।

মানের কী দায়—কাঁটাতারে ছিঁড়ে সর্বাঙ্গে যেন লাঙল চষে গিয়েছে, কিন্তু উঃ—বলে আওয়াজটুকুও করবার উপায় নেই। ধরে নিয়ে রাধারাণী দাওয়ায় বসিয়েছে, তখনও কোঁচার কাপড়ে মুখ ঢেকে আছেন। বাড়ি গিয়ে বললেন, স্বভাবের প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে ন্যাড়াসেজির ঝোপের উপর পড়েছিলেন না দেখে।

পরের দিন শীতল বাঁড়ুয্যে বাগানে এসে স্তম্ভিত। শালের খাতির সঙ্গে পেরেক ঠুকে কাঁটাতার বসানো, সেই বেড়ার মাটির উপরে পড়েছে।

বাঁড়ুয্যে চেঁচামেচি করেছেন, এ তো বড় বিপদ! শক্ত করে তারের বেড়া দিয়েও ঠেকানো যায় না!

রাধির কানে গেছে। খানিকটা স্বগতভাবে বলে, ছেলেগুলোকে কাঁটাতারে ঠেকায়, বুড়োগুলোকে ঠেকানো যায় না। হলে তো জো-সো করে তার দিয়ে আমার উঠোন ঘিরতাম।

শীতলের ভাইপো ভগীরথ প্রণিধান করে বলে, গাছে চড়েছিল কাকা। উপর থেকে ডাল ভেঙে বেড়ার উপর পড়েছে।

শীতল বলে, মানুষ নয়—মোষ তবে গাছে চড়েছিল। মানুষ পড়ে গিয়ে এরকম ভাঙে না।

রাধির পুনশ্চ স্বগতোক্তিঃ মোষ নয়, ঐরাবত। মোষের ওজন আর কতটুকু?

এই চলেছে। অবস্থা আরও সঙিন ক্রমশ। উঠান কিম্বা বাঁড়ুয্যের বাগিচা নয়—

মানুষ ইদানীং দাওয়ায় উঠে ধুপ-ধাপ করে। দরজায় টোকা দেয়। সাড়া পেল না তো ঝাঁকাঝাঁকি করে দরজা, লাথি মারে। চেঁচামেচি করে দেখেছে রাধি, উল্টো ফল। উপদ্রব বেড়ে যায়। মিহি গলায় সে বলে, যাও ভাই, লোক রয়েছে ঘরে। এখন হবে না।

বিকৃত সুরে—গলা শুনে মানুষ না চেনা যায়—একদিন রাধির কথার পালটা জবাব এলঃ এমনি আসিনি গো, পকেট ভরতি নোট। দরজা খুলে দেখ।

রাধারাণী হাসে—হাসছে, সেইরকম ভাব দেখায়। বলে, মরণ!! টাকার লোভ দেখাচ্ছে। টাকা সবাই দিয়ে থাকে, মুফতের কেউ নয়। ঘরে লোক থাকলে কি করব?

ব্যঙ্গধ্বনি বাইরে থেকেঃ শহরের হীরালাল ডাক্তারের পশার গো! রোগী মোটে ছাড়ে না।

রাগে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না রাধারাণীর। অভিনয়ের মুখোস খসে পড়ে। দড়াম করে হুড়কো খুলে বেরিয়ে আসে দাওয়ার উপর। একবার শুরু করে দিলে কিছুই আর মুখে আটকায় না। এ-প্রদেশে [illegible]। আপনারা বিদগ্ধ জনে বলেন, গালির ব্যাপারে রাষ্ট্রভাষা হিন্দী বড় জবর। প্রাকৃত বাংলার প্রতাপটা [illegible] একবার দয়া করে অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে। দেখেশুনে আত্মপ্রসাদ লাভ করুন। নৈশ প্রেমিকের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশপুরুষ সম্পর্কে রাধি তারস্বরে বিশেষণ প্রয়োগ করে চলেছে। পর পর দু-তিন ডজন বিশেষণ চলল, মুড়োদাঁড়া নেই। দরিয়ার মুখে নদীস্রোতের মতন। ছুটেছে।

বলে, আমি তো নষ্ট মেয়েমানুষ। নিজের বাড়ি দোর দিয়ে ঘুমুচ্ছি। তোরা সব দিন-মানের ঋষিপুত্তুর রাতে এসে ভূতের উৎপাত লাগাস। গোবরজল ছিটিয়ে যে কুল পাইনে সকালবেলা।

তুমুল চেঁচামেচির ছিটেফোঁটা ঘুমন্ত টুনিমণির কানে গিয়ে থাকবে। পরের দিন সদুপদেশ দিচ্ছেঃ গালাগাল দাও কেন? ওতে আরও পেয়ে বসে। ঘরে ঢুকতে পারছে না তো ওই গালি শুনবার লোভে আসবে মানুষ। দরজা ঝাঁকাঝাঁকি করে বেশি করে গালি আদায় করবে।

কথা ঠিক বটে। বাইরের মচ্ছবটা পরের রাতে সত্যিই যেন অনেক বেশি। মানুষ হল মহিষের মতোই এক জীব যত পাঁক গায়ে লাগবে, তত খুশি। আজকে রাধি প্রতিজ্ঞা করেছে, রাগের মাথায় দরজা খুলে অমন কাণ্ড করবে না। বেরুবে না মরে গেলেও। মুখও খুলবে না। যা খুশি করুকগে ওরা। ভূতের নৃত্যে ক্লান্ত হয়ে এক সময় ফিরে চলে যাবে।

নৃত্যই বটে। দাওয়ার মাটি দুমদুম করে কাঁপে। রাধারাণী দু-কানে আঙুল দিল। যাতে কিছু শুনতে না পায়। নড়াচড়া করে না, একেবারে মরে আছে যেন সে। মড়ার সঙ্গে কতক্ষণ শত্রুতা চালাবে, মড়ার কাছা-কাছি কতক্ষণ টিকতে পারবে?

এদিকে না পেরে শেষটা ঢেঁকিশালে গিয়ে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। ঢ্যা-কুচকুচ ঢ্যা-কুচকুচ। এই রেঃ—চিঁড়ের ধান ভিজানো কলসিতে, তারাকে নিয়ে সকালবেলা চিঁড়ে কুটবার কথা। শনির দৃষ্টি সেদিকেও পড়েছে, চিঁড়ে-কুটে খেয়ে তবে ওরা মচ্ছব শেষ করবে।

না, গালিগালাজ একেবারে নয়—কিন্তু ঘরের বার না হয়ে উপায় কই? চকচকে ধারালো রামদাখানা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে দরজা খোলে। টিপিটিপি যাবে চলে ঢেঁকি-শালে। গিয়ে যেখানে চিঁড়ে কোটা হচ্ছে, ঝেড়ে দেবে কোপ। মরে তো ভালই। তার জন্যে যদি রাধারাণীর ফাঁসি হয়, আরো ভাল। সে মরণে সান্ত্বনা থাকবে, শত্রু কয়েকটা নিপাত করে গেলাম।

দরজা খুলতে হুড়াস করে কী বস্তু ঢেলে পড়ল দাওয়ায়। দাওয়ায় যেই নেমেছে, পা পিছলে পড়ে যায়। হাতের রামদা ছিটকে পড়ে দূরে। ছিটকে গেছে রক্ষা, ওই দায়ে নইলে নিজেরই কাটা পড়বার কথা। পড়ে গিয়ে ব্যথা কতটা লেগেছে, সেটা বুঝবার আগে ওয়াক করে বমি ঠেলে এল। অন্ধকারে চোখে ঠাহর হচ্ছে না বটে, কিন্তু দুর্গন্ধে বস্তুটা মালুম পাওয়া গেল। গায়ে মাথায় কাপড়-চোপড়ে লেপটে গেছে। লিচুতলার দিক থেকে হাসির আওয়াজ আসে খিকখিক করে।

আলো জ্বালার প্রয়োজন। কিন্তু দাওয়ার উপরে এই কাণ্ড, ঘরেই বা যায় কেমন করে? ঐ বস্তু না মাড়িয়ে? পায়ে পায়ে সারা ঘর নোংরা হয়ে যাবে। ডাকছে, টুনিমণি, ওরে টুনি ওঠ একবারটি। দেখ উঠে কী কাণ্ড!

টুনি যথারীতি নিঃশব্দ। গা ঝাঁকিয়েও সাড়া পাওয়া যায় না, এ ডাক তো বাইরে দূর থেকে। রান্নাঘর থেকে তারা চেঁচিয়ে ওঠেঃ কানা ঠাকুর চোখে দেখে না, কালা ঠাকুর কানে শোনে না। মুখ পুড়িয়ে ঠাকুর ক্ষীরোদ সমুদ্দুরে শয়ানে রয়েছেন!

বড় ঘরে একবার যেতেই হবে—আলো জ্বালতে না হোক, তালাচাবি আনতে। পুকুরে গিয়ে ডুব না দিয়ে উপায় নেই, কিন্তু ঘুমন্ত টুনিমণির ভরসায় ঘর খোলা রেখে ঘাটে গেলে যা-কিছু আছে হাতিয়ে নিয়ে যাবে অলক্ষ্যে হাসারত মানুষগুলো। নড়া চলবে না এখান থেকে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারা রাত কাটাবে নাকি এমনি ভাবে? উৎকট গন্ধে গা বমি-বমি করছে, কখন বমি হয়ে যায়। হায় ভগবান!

মনের আক্রোশে অলক্ষ্য আততায়ীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠেঃ ও অলপ্পেয়েরা, বলি তোদেরও নরকভোগ কমটা কী হল? এই জিনিষ ভাঁড়ে করে বয়ে তো এনেছিস এত-খানি পথ!

চৌকিদার রোঁদে বেরিয়ে হাঁক দিচ্ছে। অকূল সমুদ্রের তরী—রাধি এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। চেঁচাচ্ছে, ও নটবর, শোন—দেখসে এসে কী কাণ্ড আমার উঠোনে।

নটবর ছুটে এসে দাওয়ায় লণ্ঠন তুলে দেখে বলে, এ-হে-হে—এমনধারা করে মানুষে!

উঠানের এদিক-ওদিক লণ্ঠন ঘোরাচ্ছে। রাধি বলে, দেখ কী, কেউ নেই আর এখন। আলো দেখেছে, চামচিকে আর থাকতে পারে? এখানে একটু দাঁড়াও নটবর, গোটাকতক ডুব দিয়ে আসি।

ডুব দিয়েই হল না। ছাঁচতলায় বাইরের কলসি—সেই কলসি ভরে ভরে দাওয়ায় জল ঢালে। কাঁচা মেজে কাদা-কাদা হয়ে যায়। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, অত্যাচারটা দেখ নট-বর। এক কুনকে চিঁড়ের ধান ভিজিয়েছিলাম। বলি, তারা আমি দু-জনে রয়েছি, আমরাই ভেনে-কুটে তা নেব। তা দেখ ওরাই নয়-ছয় করে গেল। ঢেঁকিতে পাড় পড়ছিল, কিন্তু ঘর খোলা রেখে যাই কেমন করে?

ঢেঁকিশালে গিয়ে দেখে—যা ভাবতে পারা যায় না—এই ভাঁড়ের বস্তু খানিকটা লোটের মধ্যে ঢেলে পাড় দিয়েছে। ছিটকে ঘরের চাল অবধি উঠে গেছে। কত শয়তানি আসে যে মানুষের। সকালবেলা চিঁড়ে কোটা বন্ধ। ঢেঁকিশাল মুখো হওয়া যাবে না, এই নরককুণ্ড সাফাই না হওয়া অবধি।

হীরককান্তি বাড়ি এসেছে গ্রীষ্মের ছুটিতে। তড়িৎকান্তি মিত্তিরের ছেলে হীরক। টুনিমণি দেখেছে তাকে। পাশের গাঁয়ের সঙ্গে ফুটবল-ম্যাচ—হীরক মাঠ পরিষ্কার করছিল ছেলেদের নিয়ে। এক মুহূর্ত চুপচাপ থাকবার পাত্র নয়—সমবয়সি কতকগুলোকে জুটিয়ে একটা না একটা হুজুগে মেতে আছে। এ স্বভাব ইস্কুলে পড়বার সময় থেকে। দরিদ্র-ভাণ্ডার করেছিল কাপাসদা গ্রামে। লাইব্রেরি। নৌকো-বাইচ আর সাঁতার-প্রতিযোগিতা। এখন কলকাতায় থাকতে হয় বলে গ্রাম ঠাণ্ডা। তার দলের ছেলেগুলো কতক কাজেকর্মে বাইরে চলে গেছে, বেশির ভাগ গ্রামের নিষ্কর্মা।

হীরকের নামে রাধি উজ্জ্বল হয়ে ওঠেঃ একলা এল, না আবার চাঁপাফুলকেও নিয়ে এসেছে? খোঁজ নিয়ে দেখ তো টুনি।

ভাক্তলতার সঙ্গে সেই যে রাধি চাঁপাফুল

পাঠিয়েছিল। কলকাতার মেয়ে—তাদের ওখানে থেকে হীরক মেডিকেল কলেজে পড়ে। শ্বশুরের খরচায় ডাক্তারি পড়াটা হবে, তড়িৎকান্তি সেইজন্য সকাল সকাল ছেলের বিয়ে দিলেন। বুড়ো বয়সে বাতে তাঁকে বড় কাহিল করেছে, শয্যাশায়ী। নিরাময় হবার আশা নেই এ-বয়সে; এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্র হীরকও বাতরোগের বিশেষজ্ঞ নয়। তড়িৎকান্তি তবু সুযোগটা নিয়ে নিলেন, রোগের সম্বন্ধে ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখলেন কলকাতায়। আসুক ছেলেটা বাড়িতে—বাপ-মায়ের কাছে কয়েকটা দিন থেকে বাগানের আম-কাঁঠাল ও ঘরের গাইয়ের দুধ খেয়ে চলে যাবে। এসেছে একলাই, ভক্তিলতাকে পাঠালেন না তার বাবা। পাড়াগাঁয়ে উড়োকালে সাপখোপের ভয়—দশ-বারটা দিনের জন্য কেন আর?

কিন্তু বাপ-মায়ের কাছে হীরক থাকে কতক্ষণ! হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে। গ্রামের গৌরব, য়্যুনিভার্সিটির দুটো পরীক্ষাতেই সে স্কলারশিপ পেয়েছে। টুনিমণিকে রাধি বলছে, জননেতা হয়ে এসেছে হীরক-দা। এক একটি মানুষ থাকে ওই রকম। ছোটবেলায় আমরাও ও'র কত সাগরেদি করেছি। সাঁতারের পাল্লা হত মেয়েদের পেন্সিল ছুরি চুলের-ফিতে এই-সব প্রাইজ দিত। এক-আধটা এখনো বোধহয় পড়ে আছে আমার বাক্সর তলায়। আমার গাছে চড়া দেখে পিঠে থাপ্পড় দিয়ে বলেছিল, বীরকন্যা! উঃ, কত কাণ্ড করা গেছে! আমরা সব বদলে গেছি, হীরক-দা ঠিক সেই রকম।

হীরক এসেছে, তার কাছে নালিশ করবে। বিচার পাবে সুনিশ্চিত। তোমার সামনে সব সাধু-সচ্চরিত্র, কিন্তু রাতে আমার বাড়ি কি দেশদেশান্তরের মানুষ আসতে যায়? আসে ওরাই সব। আমায় তাড়িয়ে তুলছে। আমি ভাল হয়ে থাকব, তার জন্য কত চেষ্টা করছি। কেউ তা হতে দেবে না।

ফুটবলের মাঠে যাবে তো ওরা। শীতল বাঁড়ুজ্যের বাগানের ওধার দিয়ে পথ। বাড়িতে গেলে তড়িৎকান্তি হয়তো দূর-দূর করবে—রাধি তাই ঠিক করেছে, পথে ধরবে হীরককে। দাঁড়িয়ে আছে সেই কখন থেকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হবার জোগাড়। অবশেষে কলরব পাওয়া গেল। দলের ওইগুলোকে রাধি মুখ দেখাতে চায় না। তারা তাকিয়ে দেখে না, চোখ দিয়ে গেলে। হীরকও আজ ওদের সঙ্গে মিশে ওদেরই একজন হয়ে চলেছে—রাধারাণীর মনে বড় লাগে। সদাশিব ভোলানাথ তুমি—তোমায় ঘিরে যারা চলেছে, জান না, তারা ভূত আর প্রেত।

তেঁতুলগুঁড়ির আড়ালে সরে দাঁড়িয়েছিল, হীরককান্তি চকিতে একবার তাকাল তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল। গতিবেগ বাড়িয়ে দিল—প্রায় দৌড়ান। টের পেয়েছে, পাপের বাসা কাছাকাছি এইখানে, পাপ থেকে ছুটে পালাচ্ছে যেন। রাধিকে তুচ্ছ করে একটা মানুষ চলে যায়, এমনি ব্যাপার এই প্রথম। বড় আনন্দ রাধারাণীর—আনন্দে যেন নেচে নেচে বাড়ি ফিরে গেল।

ভর সন্ধ্যায় রাধি সেই পথে আবার গিয়ে দাঁড়ায়। মাঠ থেকে ফিরছে। স্বামিজীর বই-পড়া কিশোরকালের পবিত্র হীরক-দা এখনো—তার কাছে সংকোচ কিসের? মাঝপথ অবধি এগিয়ে গিয়ে সেই আগেকার মতো রাধারাণী বলে, কারা জিতল হীরক-দা?

স্বৈরিণীর দুঃসাহসে অন্য ছেলেরা হতভম্ব। হীরকও জবাব দেয় না।

চুপ করে আছ—হেরে গেছ, বুঝতে পারছি। সে থাকগে। একটা কথা আছে, আলাদাভাবে বলতে চাই।

কঠিন কণ্ঠে হীরক বলে, কথা আমারও একটা আছে। সেটা সদরে সকলের মধ্যে বলি। কাপাসদুয় ছেড়ে তুমি চলে যাও। গ্রাম জ্বালিয়ে তুলেছ।

রাধি বলে, ঠিক উল্টো কথাই যে আমার। ঘরে দোর দিয়ে আমি নিরিবিলি থাকি, তোমার এই প্রেত-পিশাচগুলো গিয়ে জ্বালাতন করে। ক্ষমতা থাকে তো শাসন কর ওদের।

হীরকের সঙ্গীদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রাধারাণী ফরফর করে চলে গেল। হীরক দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভগীরথ বোবার মতন ফেটে পড়েঃ নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল নষ্ট মেয়েমানুষ। আমাদের প্রেত-পিশাচ বলে গেল।

হীরক বলে, নষ্ট মেয়েমানুষ মুখে বললে কি হবে? প্রমাণ চাই তো কিছু।

হরিসাধন বলে, আজব বলছ হীরক। চুপিসারের ব্যাপার—সাক্ষী রেখে কেউ নষ্টামি করে নাকি? মা জানে না পেটের মেয়ে কখন কী করে আসে। স্ত্রী টের পায় না, কোল থেকে কখন স্বামী উঠে বেরোয়।

রাত্রি। আকাশ মেঘে ভরা। উল্টোপাল্টা বাতাসে গাছগাছালি পাগলের মতো মাথা দোলায়। বৃষ্টির পশলা মাঝে মাঝে।

হীরকেরা বিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকারে জল চকচক করছে, ধানের চারা ডুবে গিয়েছে অকাল-বর্ষায়। তফরা উঠছে জলে। ছলাং-ছলাং করে ঘা দিচ্ছে ডাঙার গায়ে।

ডোঙা জোগাড় হয়েছে দুটো। পাশা-পাশি বাইবে। জলের উপরে ঘুরে ঘুরে আলোর মাছ মারবে। তিনজন করে লাগে ডোঙায়। একজনে আলো ধরে ডোঙার মাথায় বসে, একজনের হাতে ধারাল দাও। আলো দেখে মাছ মাথা ভাসান দিয়ে ওঠে জলের উপর। একচুল নড়ে না, সম্মোহিত হয়ে আছে আলোর রশ্মিতে। দাও ঝেড়ে কোপ মারবে। ঘোলা জল পলকের মধ্যে রাঙা-রাঙা হয়ে যায়। জলে ডুববার আগে কাটা-মাছ তাড়াতাড়ি তুলে ডোঙার খোলে ফেলে দাও। মাছ কাটতে গিয়ে সাপও কাটা পড়ে কখনসখন—তুলতে গিয়ে সভয়ে হাত ফিরিয়ে নেয়। ডোঙায় আর যে তৃতীয় ব্যক্তি—সে এতক্ষণ শক্ত করে লগি মেরে পাথরের মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে। মাছের সামনে আলো ধরা ও মাছ-শিকারের মধ্যে যে লোকটা নেই, কিন্তু তার কাজ শক্ত সকলের চেয়ে। ডোঙা চালায় সে খুব নরম হাতে, আওয়াজ একেবারে নেই, জলের খলবলানিতে মাছ যাতে সরে না যায়। আলো-ধরা মানুষটা বাঁ-হাত তুলবে হঠাৎ এক সময়, সঙ্গে সঙ্গে লগি জলতলে বসিয়ে ডোঙা একেবারে স্থির। যেন চুন-সুরকি দিয়ে জলের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে।

পাঁচজন বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে আছে, গণেশ শুধু নেই। হীরকের ডোঙা গণেশ বাইবে। ডাঙায় হাঁটাহাঁটির চেয়ে ডোঙায়

চলাচল গঙ্গেশের বেশি রপ্ত; চৈত্র-বৈশাখে বিল শুকিয়ে গেলে ক'মাস তার বড় দুঃসময়।

হীরক বলে, দেখা যাক আর একটু।

আবার এক ঝাপটা বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিয়ে যায়। গা কুটকুট করছে—তাই তো, মস্ত এক পানিজোঁক উরুতে। রক্ত খেয়ে ঢোপা হয়েছে। রবারের মতন টেনে ছাড়াতে হল। এ'টেল মাটি চেপে দিয়ে রক্ত বন্ধ করে। তেপান্তর বিলে কত আলো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। সকলে নেমে গেছে, আর দল বেঁধে এসে হাত-পা কোলে করে এরা বিলের ধারে দাঁড়িয়ে।

হীরক বলে, এখনো আসে না—কী আশ্চর্য!

ভগীরথ বলে, তুমি বেরিয়ে পড় হীরক। আমাদের ডোঙার হরিসাধন চলে যাক তোমার সঙ্গে।

তোমরা?

গঙ্গেশ আসে তো যাব। নয় তো গেলাম না। আমাদের কী—কতই তো যাচ্ছি। তুমি জলকাদা ভেঙে এদ্দুর এসে ফিরে যাবে, সেটা কিছু ঠিক হল না।

হীরক দৃঢ়স্বরে বলে, যাই তো সকলে মিলে যাব। নয়তো কেউ যাব না। মাছ মারতে যাওয়ার জন্যে নয়—সকলে মিলে আমোদ করা। গঙ্গেশেরই বেশি পুলক—দু-ক্রোশ ভেঙে গঞ্জ অবধি গিয়ে টর্চের নতুন ব্যাটারি নিয়ে এল। অথচ সময় কালে দেখা নেই।

ভগীরথ বলে, বর্ষার রাত্রে বড় আমোদ পেয়েছে অন্য জায়গায়। নিশ্চয় তাই। যাবে তো বল, আমি নিয়ে যেতে পারি সে জায়গায়।

একজনের জন্য সমস্ত পণ্ড। এক কথায় সকলে রাজি। কোথায় আছে চল, ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে আসব।

পথ চলেছে পা টিপে টিপে। পা পিছলে যাওয়ার ভয়। তা ছাড়া নিঃসাড়ে যাওয়া উচিত। টিপিটিপি পিছনে গিয়ে ক্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরবে। গঙ্গেশকে ধরবে, আর কপালে থাকে তো ফাউ স্বরূপ অতিরিক্ত কিছু দেখা যাবে। মাঝবিলে মাছ ধরার চেয়ে সে মজা কিছু কম হবে না।

রাধির উঠোনে এসে পাঁচটা মানুষের দশটা চোখ নানান দিকে সঞ্চরণ করছে। ব্যাং ডাকছে খানাখন্দে, লিচুডাল থেকে টপটপ করে জল ঝরছে। না, বাইরে কোনখানে তো দেখা যায় না।

ভগীরথ ফিসফিস করে বলে, তবে গঙ্গেশ ভিতরে ঢুকে পড়েছে। অভদ্দার মধ্যে ভিতরে ঠাঁই হলে বাইরে কেন ভিজতে যাবে? দাঁড়াও—

দাওয়ায় উঠে পড়ে ভগীরথ। এরা সব ছাঁচতলায়। ঠুক-ঠুক করে টোকা দেয় দরজায়। তিনবার। পরিপাটি হাত, আওয়াজ কেমন আলাদা। ভিতরে ঢুকবার সকরুণ আবেদন যেন। একটু বিরতি দিয়ে পুনশ্চ তিনবার।

রাধারাণীর গলা : লোক রয়েছে, হবে না এখন।

বিজয়গর্বে ভগীরথ দাওয়া থেকে নেমে আসে : শুনলে তো? নিজের কানে শুনতে পেলে। সতীসাধ্বী বলে পথের উপর জাঁক করে এল, হাতেনাতে প্রমাণ নাও। লোক আলাদা কেউ নয়—গঙ্গেশ। আমরা জলে ভিজছি, সে হতভাগা এখানে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েছে।

হীরকই এবার দাওয়ায় উঠে দুমদুম করে দরজায় লাথি মারে। রাধি করকর করে ওঠে : ভদ্দার রাতে বেরিয়েছিস মুখপোড়ারা, ঘরে তোদের মা-বোন নেই?

পাড়াগাঁয়ের এইসব ছোঁড়া কাপুরুষ নয়। গালি শুনে এ-ওর গা টেপে আর ফিকফিক করে হাসে। হীরক গর্জন করে উঠল : দুয়োর খোল বলছি, নয় তো ভেঙে ফেলব।

গলায় চিনতে পেরে নিমেষের মধ্যে রাধারাণী একেবারে ভিন্ন রকম : হীরক-দা, তুমি? ওমা আমার, কত ভাগ্যি, তুমি এসেছ বাড়ির উপর—

শয্যা ছেড়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। বৃষ্টিতে নেয়ে এসেছ একেবারে। কী করি বল দিকি। আমার কাপড় দিই, তাই পরে শুকিয়ে ফেল।

এইবারে এতক্ষণে উঠানের দিকে নজর পড়ল। বলে, আপদগুলো জুটিয়ে এনেছ, একলা আসতে বুঝি সাহস হল না হীরক-দা? কামরূপ-কামিখ্যের মতো গুণ করে ফেলি যদি তোমায়? হি-হি-হি। তা করব না—চাঁপাফুলে রক্ষে রাখবে তা হলে?

হাসতে হাসতে কণ্ঠ সহসা কাতর হয়ে ওঠে। বলে : আজকে তোমার পিছন ধরে এসে ওরা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বক্ত কষ্ট দেয়, আমি বলেই টিকে আছি। ভিতরে এস হীরক-দা, আর ওদের যেতে বলে দাও। আমার দুঃখের কথা সব বলি।

তার আগেই হীরক কাদা-পায়ে ঢুকে পড়েছে। টর্নিমেণ্ট নেই, রান্নাঘরে তাবাও নেই। কামারপাড়ায় বিয়ে হচ্ছে, বিয়েবাড়ি গেছে। একলা রাধারাণী। টর্চ ফেলে হীরক কিছু না দেখতে পেয়ে সকলকে ডাকে : করছ কী তোমরা? চলে এস।

ঢুকে পড়ে তারা বিছানা উলটায়, তক্তাপোশের নীচে উঁকিঝুঁকি দেয়। চালের কলসির ওদিকটা গিয়েও নাড়ানাড়ি করছে। পাঁচজন মানুষ ওইটুকু ঘরের মধ্যে পাক-চক্কর দিচ্ছে।

আরক্ত মুখে কঠিন কণ্ঠে রাধারাণী বলে, রোজ রাত্রে এরা সব চুরির মতলবে ঘোরাফেরা করে, তুমি আজ ডাকাত হয়ে ঢুকলে হীরক-দা। কিন্তু পায়ের কাদা যদি ধুয়ে আসতে। বাইরে কলসিতে জল আছে লেপাপোঁছা। গোবরমাটি দেওয়া ঘর আমা তছনছ করে দিলে।

হীরক বলে, ধুতু ফেলতেও আসতাম না তোমার লেপাপোঁছা ঘরে। গঙ্গেশটা কোথা দেখিয়ে দাও। তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

গঙ্গেশ বুঝি এখানেই আছে—এই ঘরের মধ্যে? তা দেখবার তো কসুর করছ না। চালের কলসি তেলের শিশি কিছুই বাদ নেই।

হীরক বলে, হার স্বীকার করছি। তুমি বলে দাও এবার।

ঘরের আড়াব দিকে রাধারাণী আঙুল দেখায়। পাঁচজনের পাঁচজোড়া চোখ উপরমুখো।

ভগীরথ অধীর হয়ে বলে, কোথায়?

ওই যে, ভয় পেয়ে গেছে গঙ্গেশ গুটি-গুটি সরে যাচ্ছে।

নজর করে দেখে নিয়ে হীরক বলে, টিক-টিকি একটা। ওই দেখাচ্ছ?

আমি যে মন্তর জানি। কামরূপ-কামিখ্যেয় ভেড়া করে রাখে, গঙ্গেশকে আমি টিকটিকি করে রেখেছি।

বলে খিলখিল করে, যেন ঢেউ দিয়ে দিয়ে হাসতে লাগল। সে হাসির শেষ হয় না। অবমানিত ছোঁড়ার দল চিৎকার করে ওঠে : বোকা বানিয়ে হাসছ তুমি এখন—

বানাতে হল আর কোথা? ঘর তো এই-টুকু। টর্চ ফেলে তন্নতন্ন করে দেখলে, তবু বলে মানুষ বের করে দাও।

ভগীরথ হুঙ্কার দিয়ে বলে, মানুষে আছে নিজের মুখে স্বীকার করলে। আমরা সবাই শুনেছি।

রাধি বলে, মিথ্যে বলতে হয় আত্মরক্ষার জন্য। তোমাদের পিরীতের ঢেউ নয়তো সামলাতে পারিনে। ঘর-দরজা ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

বলতে বলতে কণ্ঠ প্রখর হয়। হীরকের দিকে চেয়ে বলে, এই নালিশটাই তোমার কাছে জানাতে চেয়েছিলাম। কেন আমায় ভাল থাকতে দেবে না? কলকাতায় থাক, ভেবেছিলাম এদের ঘোঁটের বাইরে তুমি। কিন্তু আমার কোন কথাই কানে নিলে না। গ্রাম ছাড়তে হবে, এই হল তোমার রায়। স্রোতের কুটোর মতো ঠেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। কিন্তু মুশকিলটা ভেবে দেখেছ তোমার সাগরেদদের? এ তবু গাঁয়ের মধ্যে চেনা ঘরে এসে ঢু' দিচ্ছে। আমি চলে গেলে জল ঝাঁপিয়ে হোঁচট খেয়ে কোন ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, ঠিকঠিকানা নেই।

দলটা বেরিয়ে যেতে রাধারাণী দরজার হুড়কো তুলে দিল।

গঙ্গেশকে পথেই পাওয়া গেল। তার নিজের পুকুরটা কানায় কানায়। সোঁতা ছেড়ে

দিয়ে মাছ মারছিল এতক্ষণ। সেই ঝোঁকে দেরি হয়ে গেল। তা নাই বা হল আলোর মাছ মারা! দেড় ঝুড়ি মাছ পেয়েছে, সকলকে মাছ দিয়ে দেবে। কষ্ট করে বিল ঠেঙিয়ে যা মিলত, ভালই হবে সে তুলনায়।

আট

দিন তিনেক পরে হারাণ মজুমদার এসে পড়লেন। বলেন, খবর পাইনে অনেকদিন। দেখতে এলাম।

মনোর মেয়েকে ফেলে দিতে পারবেন না, বাড়ি থেকে তাড়াবার সময় বলে দিয়েছিলেন। তাই বোধ হয়। চোখের দেখা দেখতে উতলা হয়ে এত পথ আসবেন, মামা কিন্তু এ রকম ছিলেন না আগে। চেহারাতেও যা দেখছে—যেন শ্মশানের চিতার উপর থেকে সদ্য উঠে আসছেন। বিষম-কিছু ঘটেছে। ব্যস্ত হতে হবে না, বেরিয়ে আসবে দু-পাঁচ কথার মধ্যে।

তা-ই হল। আম কেটে দিয়েছে রেকাবিতে, কাঁঠালের কোয়া ছাড়িয়ে দিয়েছে। মুখে ফেলতে ফেলতে হারাণ বললেন, আরতিকে নিয়ে ভারি বিপদ!

অসুখ করেছে?

অসুখ ছাড়া আবার কি। হীরালাল ডাক্তারকে জানিস তো—তোর শ্বশুরবাড়ির চিকিচ্ছেপত্তরও তিনি করেন। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু ডাক্তারবাবু সাফ জবাব দিয়ে দিলেন। সেখান থেকে সোজা তোর কাছে ছুটে এসেছি।

রাধি ভেবে পায় না, মহাকুমা-শহরের অত বড় প্রবীণ ডাক্তার যে ব্যাধিতে হার খেয়ে গেলেন, তার জন্য এখানে ছুটে আসবার হেতুটা কি? সে কী করতে পারে? আরতির জন্য ভাবনা হচ্ছে। গোড়ার ব্যবহার যাই হোক, শেষের দিকে কিন্তু সে বড় যত্ন করত রাধিকে। আহা, ভাল হয়ে উঠুক বেচারি, রোগ নিরাময় হোক।

হীরালাল ডাক্তারের সঙ্গে হারাণের পুরণো ঘনিষ্ঠতা। কী যেন একটু আত্মীয়তাও আছে। মরীয়া হয়ে মহকুমা-শহর অবধি এসে হারাণ তাঁর কাছে গিয়ে পড়লেন।

ইচ্ছে করে অধিক রাত্রেই গেলেন। সাড়ে-নটা বাজে, রোগীরা তবু একেবারে ছাড়েনি। জন পাঁচ-ছয় এখনো। একজনের বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে হীরালাল বললেন, কী সমাচার হারাণ-দা? কবে এলেন?

প্রশ্নই করলেন। জবাবের অপেক্ষা না করে রোগীর দিকে তাকিয়ে বলেন, দুটো বুকেই প্যাচ পাওয়া যাচ্ছে। দেখি, পিঠ ফিরে বসুন।

বুক-পিঠ পরীক্ষার পর আরও কিছু প্রশ্ন করে ডাক্তারবাবু প্রেস্কৃপশন লিখছেন। হঠাৎ একবার মুখ তুলে বলেন, কই, কিছু বললেন না তো।

হারাণ বলেন, এদিককার সব মিটে যাক।

এই ক'জনের হলেই বুঝি মিটে গেল? আর রোগী আসবে না? মিটতে সেই রাত দুপুর।

বলতে বলতে দ্বিতীয় জনের বুকে যন্ত্র বসিয়ে দেন। সে রোগী বলে, বুকের কিছু নয় ডাক্তারবাবু। দাঁত চাগিয়েছে। এমনি বোধ হয় যাবে না, তুলে ফেলতে হবে। দেখে দিন একটু ভাল করে।

এমনি ভাবে একের পর এক রোগী দেখে যাচ্ছেন। হারাণ এক পাশে চোরের মতো চুপটি করে বসে। বাড়ি থেকে সকাল সকাল দুটি খেয়ে বেরিয়েছিলেন, তারপর থেকে নিরম্বু। উদ্বেগে খাওয়ার কথা মনেও হয় নি। এখন ঝিমিয়ে পড়েছেন। রোগীর পঙ্গপাল কতক্ষণে খতম হবে, কে জানে!

হঠাৎ এক সময় হাত ধুয়ে ফেলে হীরালাল সিগারেট ধরালেন। হারাণের দিকে চেয়ে বলেন, চলুন, চেম্বারে গিয়ে শুনে আসি। আপনারা বসুন একটুখানি।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বলেন, বলুন কি ব্যাপার।

শান্তিবালা সবিস্তারে যাবতীয় লক্ষণ বলে দিয়েছেন। কথাটা ডাক্তারের কাছে কি ভাবে পাড়তে হবে, ট্রেনের মধ্যে সারাক্ষণ ভাঁজতে ভাঁজতে এসেছেন। কিন্তু সময় কালে মুখ দিয়ে কিছু বেরুতে চায় না। বললেন, বিপদে পড়ে এসেছি ডাক্তারবাবু।

হীরালাল হেসে বললেন, সে তো জানিই। বিপদ না হলে কেউ শখ করে কি উকিল-ডাক্তারের বাড়ি আসে?

মানে, আমার এক আত্মীয়, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু—তার মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। সেই জন্যে আপনার কাছে আসা। কী হবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, ছেলে হবে কিম্বা মেয়ে—।

হারাণ ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন, কুমারী মেয়ে যে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার তেমনি সুরে বললেন, কুমারী হোক সধবা-বিধবা যাই হোক, ওই দুয়ের একটা হবে। তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। রোগ-পীড়ে যখন নয় হারাণ-দা, আমার কিছু করবার নেই। আচ্ছা—

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। হারাণ আর্তনাদ করে উঠলেন: মানের দায় ডাক্তারবাবু। বড় আশা করে এসেছি! আমার সেই আত্মীয় খরচপত্র করতে পিছপাও নয়। যার তার কাছে এ সমস্ত বলা যায় না। আপনি আমার পরমাত্মীয়—

তাই আমায় ফাঁসাবার জন্য এসেছেন। তীক্ষ্মদৃষ্টিতে হারাণের দিকে চেয়ে ডাক্তার বলতে লাগলেন, আপনার

হারাণ বললেন, ডাক্তার মেজাজ দেখাল

মুখ-চোখ দেখে বুঝেছি, মেয়েটা খুব নিকট-জন। উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে সতর্ক হয়ে করা যায় বইকি! রোগিনীর স্বাস্থ্যের কারণে করতেও হয় কখনসখন। কিন্তু আপনি যে রকম বলছেন, ঘোরতর বেআইনি কাজ। জেলে যাওয়ার ব্যাপার। টাকার লোভে ভুঁইফোঁড় ডাক্তার কেউ হয়তো রাজি হবে। প্রসূতিকে তারা মেরেই ফেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। নয় তো সারা জীবনের মতো পঙ্গু করে দেয়। ওসব করতে যাবেন না, হিত কথা বলছি।

বেরিয়ে আবার রোগীর ঘরে গেলেন। এক মুহূর্ত গুম হয়ে থেকে হারাণ অন্য দরজা দিয়ে বেরুলেন। ডাক্তারের মুখোমুখি হতে এখন লজ্জা করছে। উঃ, কী [illegible]তাই যে করল নচ্ছার মেয়ে!

তখন ভাগনীকে মনে পড়ে। শান্তিবালা ও বলে দিয়েছেন। ডাক্তার হলে নিরাপদ। নইতো অন্য যেসব পথ আছে।

হারাণ বললেন, ডাক্তার মেজাজ দেখাল। [illegible]নাই আছে যে কপালে! কালামুখি রে তো রক্ষেকালীর পুজো দিই।

রাধারাণী বলে, মরলে বেশি বিপদ মামা। পেট চিরবে মড়ার। এই অবস্থায় বাপ-মায়েরা যা করে—বলবে, তোমরাও তাই করতে গিয়ে মেরে ফেলেছ। পুলিশ হাতকড়া দিয়ে সবসুদ্ধ টানতে টানতে নিয়ে যাবে।

হারাণ খপ করে রাধারাণীর হাত জড়িয়ে বললেন: সেইজন্যে তোর কাছে এসে পড়েছি মা। তুই একটা উপায় করে দে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাধারাণী বলে, নষ্ট মেয়েমানুষ আমি, আনুষঙ্গিক সকল কাজে ওস্তাদ। তাই ভেবেই দরদ হল বুঝি আজ দেখতে আসবার?

হারাণ আকুল হয়ে বলেন, গুরুজন হয়ে আমি তোর পা জড়িয়ে ধরব, সেইটে চাচ্ছিস রাধি?

রাধারাণী খিলখিল করে হেসে ওঠে: মন্দ মেয়েরও দরকার পড়ে তবে তোমাদের?

হারাণ বলেন, তুই মন্দ কি ভাল সে কথা থাক। কিন্তু পরের জন্য তুই যে বুক দিয়ে পড়ে করিস, তোর অতি-বড় শত্রুও তা অস্বীকার করবে না।

হাসির উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে রাধারাণী বলে উঠল, মামা, ভাগনী তোমার অসতী—কিন্তু খুনী নয়।

খুন? কাকে কে খুন করতে যাচ্ছে? মানুষ কোথায় এর মধ্যে যে খুন হবে?

ছোট জা ছবির শরীর খারাপ বলে পেটের বাচ্চা নষ্ট করার কথা একবার উঠেছিল। পুষ্টু হবার সময়। ছবি তা কিছুতে হতে দেয়নি। মণ্টু তাই হতে পেরেছে, এমন খাসা ছেলে হয়েছে। রাধারাণী বলে, আরতির গর্ভে যা এসেছে—তোমরা যদি খোঁচাখুঁচি না কর—শিশু হয়ে একদিন জন্ম নেবে। বড় হয়ে মানুষ হবে স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি মামা, আমি তোমাদের খুনোখুনির মধ্যে নেই।

রাধির তো দায় নয়, তাই এসব সাধু সাধু বাক্য মুখে আসছে। মুখের দিকে তাকিয়ে হারাণ নিঃসংশয়ে বুঝলেন, অনুনয়-বিনয় করে অথবা টাকাপয়সার লোভ দেখিয়ে—কোন রকমেই হবে না। চোখে অন্ধকার দেখেন তিনি। মহকুমার মধ্যে বিশিষ্ট মানুষ—দু-কান পাঁচ কান হতে হতে কেলেঙ্কারি ছড়িয়ে পড়লে মুখ দেখাতে পারবেন না তো কারও কাছে। মুখ নাই বা দেখালেন। কিন্তু আরতির পরে আরও তিনটে মেয়ে—তাদের কী হবে? কোনদিকে কূলকিনারা দেখেন না। হাঁটুতে মাথা গুঁজে হারাণ একই ভাবে বসে আছেন সেই জায়গায়।

দেখা গেল, চোখের জল গড়াচ্ছে হাঁটু বেয়ে। রাধি বলে, আমি একটা বুদ্ধি দিতে পারি মামা। ভেবে দেখ।

ভরসা পেয়ে হারাণ মুখ তুলে বলেন, কি?

আরতির বড়মামা ওকে তো কলকাতায় নিতে চাচ্ছেন। তাঁর বাসায় পাঠিয়ে দাও।

হারাণ বলেন, বুদ্ধিমতী হয়ে এটা তুই কি বললি রাধি? কুটুম্বর বাসায় কিছু কি চাপা থাকবে?

বাসা অবধি যেতে যাবে কেন? থাকবে শেয়ালদা স্টেশনে। কিম্বা কোন হোটেলে এক-আধ বেলার মতো। মায়ের বড্ড শরীর খারাপ—আমারও মন টানছে কাশী যাবার জন্য, মায়ের কাছে গিয়ে থাকব। শুধু টাকার অভাবে পারছিনে। তা মানসম্ভ্রমের জন্য তুমিও তো অঢেল খরচ করতে রাজি।

কাপাসডাঙার লোকের হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল, রাধারাণী নেই। টুনিমণির কাছে প্রশ্ন করে পাওয়া গেল, তীর্থধর্মে বেরিয়েছে। ধর্ম না কচু। ডবকা ছুঁড়ি—এ বয়সে তীর্থ করতে যাবে কোন দুঃখে? এ লাইনের যারা, বুড়ো হয়ে যাবার পর তারা তীর্থে যায়। কিন্তু টুনিকে আর বেশি জিজ্ঞাসা করলে তেড়ে ওঠে: তোমরাই সব খেদিয়ে তুললে মাসিকে। যেখানে খুশি যাক, তোমাদের কি?

হীরক বুকে থাবা দিয়ে বলে, পাপ বিদেয় হল আমারই জন্যে। যাক, গ্রাম জুড়াল।

ভগীরথ কিন্তু এত সহজে ছাড়ে না: তীর্থ-টির্থ মিছে কথা। কোন মতলবে কোথায় গিয়ে উঠল বল দিকি?

কী দরকার আমাদের? একা যায়নি, কারও ঘাড়ে চেপে গিয়েছে—এই বলে দিলাম। রাধির না হোক, সেই নাগর মশায়ের হদিশটা নেব।

উদ্যোগী লোকের অভাব নেই গ্রামে। খবরের জন্য ঘুরছে। সঠিক তারিখটা বেরুল। সময়টাও বেরুল—ভোররাত্রে পায়ে হেঁটে গিয়ে বাস ধরেছে। সেই ভোরবেলা কোন কোন নম্বরের বাস ছেড়েছে গঞ্জের আপিসে গিয়ে খবর নাও, ড্রাইভার-কণ্ডাক্টরের নাম বের কর। কণ্ডাক্টরের মনে পড়ল, একটি অল্পবয়সি মেয়ে গিয়েছিল বটে—ঝকঝকে রূপসী বলেই মনে পড়ে গেল। সঙ্গে ছিল বই কি মানুষ—খুব রোগা এক বৃদ্ধ লোক, মাথায় টাক। মিলছে?

নাগর নয়, রাধির মাতুল হারাণ মজুমদারই হবে। ভণ্ড ভাগনী গ্রামের উপর কেচ্ছা করছে—হারাণ এসেছিলেন তাকে বিদায় করতে। অঞ্চল তো একটাই—মানী মানুষ, তিলডাঙার থেকে তাঁরও কি মুখ পুড়ছে না?

হীরক বলে, তার উপর আমি যে রকম আদাজল খেয়ে লেগেছিলাম—

ভগীরথ একটা নিশ্বাস ফেলে বলে: তাহলে ভাই, তুমি হলে মরশুমি পাখি—দু-দিন এসেছ, আবার কলকাতায় ফিরে উড়বে। শুধু গ্রামের উপর একখানা ছিল। [illegible] তারা আর টুনিমণির হাতে আবার সেই ছাড়া-বাড়ি হয়ে পড়বে।

নয়

স্বৈরিণী মেয়েটাকে কাপাসডাঙার মানুষে ভুলে গেছে। দশ বছর কেটেছে তারপর। ডাক্তারি পাশ করে [illegible] এসে বসেছে। ভক্তিলতাও [illegible]। টুনিমণি এখন ভক্তিলতার কাছে, তার ছেলেপুলে দেখে। ভক্তি বলেছে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নার্সিং পড়াতে দেবে। ইতিমধ্যে বাংলা-ইংরেজি শিখে নিক একটু। তাই শেখে ভক্তিলতার কাছে।

অনেকদিন আগে রাধি ভক্তিলতাকে এক চিঠি লিখেছিল: ভাই চাঁপাফুল, বাবা বিশ্বনাথ আর মা অন্নপূর্ণার পদতলে পড়ে আছি। বড় শান্তি। সকাল-সন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করি। পাপ ধুয়ে সাফ না করে ছাড়ছিনে। আবার যদি কখনো যাই, দেখতে পাবে নতুন মানুষ—

ভাল। এর চেয়ে ভাল খবর আর কি! ভক্তিলতা নতুন বউ এল, সেদিন সকলের আগে গিয়ে পড়ল রাধি। স্বর্ণচাঁপার মুকুট গড়ে মাথায় দিল, চাঁপাফুল পাতাল। সেই আশ্চর্য মেয়ের এই পরিণাম!

শোনা গেল, রাধারাণী ফিরেছে। মনোরমা মারা গেছেন। তারপরেও এত বছর যা-হোক করে চালিয়েছে। আর এখন কাশীতে থাকবার অবস্থা নেই। গাঁয়ে ফিরে এসেছে। উঠেছে বাঁড়ুয্যেপাড়ায় নিজেদের বাড়ি

টুনিমণি কখনসখন মাকে দেখতে যায়, ভক্তিলতাও একদিন তার সঙ্গে গিয়েছিল। কেউ আর যায় না ও-মুখো। পাড়া একেবারে ফাঁকা। মরেহেজে গেছে। আর ওই যে রব উঠেছে, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হবে—আগেভাগে কতক গিয়ে ওপারে ঘর তুলেছে। তারা কামারনী একলা থাকে। বড়ঘরে তালা ঝুলিয়ে সঙ্কীর্ণ সেই রান্নাঘরেই রয়েছে। অত বড় ঘর লেপেপুঁছে পারে না। বুড়োমানুষের পক্ষে এই ভাল—রান্নাঘরের এক পাশে রাঁধাবাড়া, এক পাশে শোওয়া। একলা মানুষের কত আর জায়গা লাগে! খাওয়ার ভাবনা নেই—সেই দেড় বিঘের ধান বর্গাদারে দিয়ে যায়। তার উপরে আমকাঁঠাল নারকেল-সুপারি এটা-ওটা আছে।

এতকাল পরে রাধারাণী বাড়ি ফিরে এল। এসেছে দুপুরবেলা, খবর শোনা অবধি ভক্তিলতা ছটফট করছে। কী রকম নতুন হয়ে এল রাধি এই দশ বছরে—ইঁদুরে মাটি তুলে ডাঁই করেছে, সেই বড় ঘরের মধ্যে আছে সে কী অবস্থায়? সকলের চোখের উপর দিয়ে হুট করে যাওয়া চলে না—দিন গেল, রাত্রিটাও গেল—পরের দিন সকালবেলা হিঞ্চেশাক তুলবার ছুতোয় দীঘিতে গিয়ে সেখান থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে রাধির উঠানে।

উঠান আর কি—বড়ঘরের ছাঁচতলা অবধি হেড়াঞ্চি ও কালকাসুন্দের জঙ্গল। খুব ব্যস্ত রাধারাণী, আর তারা বুড়িও গেছে দেখি তার সঙ্গে। কাটারি দিয়ে তারা ঠুকঠুক করে জঙ্গল কাটে আর হাঁপায়। বড়-ঘরে ওঠার মতো পথটুকু হলে যে হয়। তালা খুলে ফেলেছে বড়ঘরের—ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি এনে রাধি ইঁদুরের গর্তে ঢালছে। দুরমুশ করছে ঢেঁকির ছেয়া খুলে এনে। তুমুল ব্যাপার। এমনি সময় বড়লোকের বউ ভক্তিলতা এসে দাঁড়াল।

রাত কাটালে এরই মধ্যে নাকি? কী সর্বনাশ! আমায় একটা চিঠি দিলে তো হত।

রাধি রান্নাঘরের দিকে আঙুল দেখায়: ওইখানে তারা-দিদির পাশে পড়েছিলাম। সুনামের তো অন্ত নেই আমার! খবর চাউর হয়ে গেছে, আজ থাকলে রান্নাঘরের ঝগড়াঝেলে বেড়া রাতারাতি ছুড়ে উড়িয়ে দেবে, তারা-দিদির শাপ-শাপান্তে ঠেকাবে না। যেমন করে হোক সন্ধ্যের মধ্যে এঘরে এসে দরজায় খিল দেব। কালকের রাত ভাল গিয়েছে, আজকে মানুষ শুনবে না।

তারপর হেসে উঠে বলে, চিঠি দিলে কি করতে ভাই চাঁপাফুল? তোমাদের বাড়ি জায়গা দিতে? ঘরে না হোক গোয়ালে দিলে নাকি দোষ হত না। কিন্তু তোমার কর্তার যা রাগ আমার উপর—দু-জনে ঝগড়াঝাটি হবে, সেইজন্য কিছু জানাইনি।

ভক্তিলতার কিন্তু কথাবার্তা কানে যাচ্ছে না। একনজরে সে রাধারাণীর ধুলোমাটি-মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে। বলে, কী মন্তর জান ভাই চাঁপাফুল—দশ বছরে যে দশটা দিনেরও বয়স বাড়েনি!

রাধি বলে, আর কিছু নেই, আছে এই সম্বলটুকু। তার জন্যে টিকতে পারিনে। যেখানে যাই, মাছির মতন লোক ঘোরে। দশাশ্বমেধ ঘাটে কথকতা শুনে ফিরছি, পিছন ধরে লোক আসছে। যত দেবস্থান, নোংরামি তত বেশি। তবু কেউ কিছু পেরে ওঠেনি সেই যা তোমাকে লিখেছিলাম, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। মাকে বলতাম, নাইট্রিক-এসিডে মুখ পোড়াবার কথা বলতে—কই? মায়ায় পড়ে পারছ না।

ভক্তিলতা মুগ্ধ স্বরে আগের কথাই বলে চলেছে, পশ্চিমের জলে হাওয়ায় শতদল-পদ্ম হয়ে ফুটে এসেছে। মুনির মন টলে যায়। মেয়েমানুষ না হলে আমিও তো পিছু নিতাম, জড়িয়ে ধরতাম একেবারে।

রাধি তাড়া দিয়ে ওঠে: চুপ! অমন করে চেঁচিয়ে বলে! ছেলের মা আমি এখন। ও হরি, তা বুঝি বলিনি—ছেলে নিয়ে এসেছি। রান্নাঘরে শুয়ে আছে—শরীরটা ভাল নয় বলে উঠতে দিইনি। ছেলের কানে এসব গেলে বড় লজ্জা।

সাপ দেখে মানুষ যেমন ত্রস্ত হয়, ভক্তিলতা তেমনিভাবে বলে, তোমার ছেলে—ছি-ছি, কী বল তুমি!

রাধি অভিমানের সুরে বলে, আ আমার কপাল! ছেলে বাড়িতে এল—কোথায় সকলে উলু দেবে শাঁখ বাজাবে—তা নয়, আমার আপন মানুষ হয়ে তুমি সুদ্ধ ছি-ছি করছ। ছেলে তোমায় দেখাব না চাঁপাফুল। যাও, চলে যাও তুমি—

ভক্তিলতা নড়ে না। বলে, অন্য কাউকে বলেছ নাকি ছেলের কথা?

কেন বলব না? বাড়িতে পা দিয়েই তারা-দিদিকে বললাম। ভগীরথ-দা এসে জিজ্ঞাসা করল, তাকেও বলেছি। ছেলেকে ছেলে ছাড়া আর কি বলব?

ভক্তিলতা রাগ করে বলে, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার। ব্যাপার যাই হোক, মুখে তো বলতে পারতে কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে।

রাধারাণী নিরীহভাবে বলে, তাতে কী হত? কাপাসদা'র সবাই আমায় জানে, বিশ্বাস করত না। উল্টে ছেলে আমার দুঃখ পেত সেই কথা শুনে। নিজে তুমি ছেলের মা—ভেবে দেখ না, তোমার ছেলে নিয়ে যদি এমনি কথা ওঠে?

স্তব্ধ হয়ে থাকে মুহূর্তকাল। হাতের কাজ বন্ধ। বলে, এই ছেলে বাঁচিয়ে তুলতে যত কষ্ট করেছি, সংসারের কোন মা তা করতে পারে জানিনে। সেই যা তোমায় লিখেছিলাম—সত্যি সত্যি শান্তিতে ছিলাম আমি, পাপের ময়লা মন থেকে ধুয়ে-মুছে গিয়েছিল। কিন্তু মা মরার পরে একেবারে অচল অবস্থা। উপোস যায় একদিন দু-দিন। নিজের কিছু নয়, কিন্তু ছেলের শুকনো মুখ দেখে পাগল হয়ে উঠি, কাণ্ড-জ্ঞান থাকে না। যে রূপের ব্যাখ্যান করছ, তাই বেচে বেচে শেষটা চাল-ডাল তেল-নুন কিনতে হয়।

ভক্তিলতা পাথর হয়ে শুনছে। বলতে বলতে রাধির দু-চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। আঁচলে মুছে ফেলে বলে, ছেলে এখন বড় হয়ে গেছে, বোঝে সব। যদি কিছু টের পায়, সেদিন আমার গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। সেই ভয়ে পালিয়ে এলাম। বিঘে দেড়েক ধান-জমি আছে, আওলাতপশার কিছু আছে, দুঃখে [illegible] চালাব। তারপর আমার ছেলে মানুষ হয়ে গেলে আর তখন ভাবনা কি? পায়ের উপর পা রেখে ছেলের ভাত খাব।

ভক্তি-বউয়ের হাত জড়িয়ে [illegible] কণ্ঠে বলে, হীরক-দা বাড়ি রয়েছে—সেই আমার বড় শত্রু। তাকে বলে এই কাজটা কোরো চাঁপাফুল, লক্ষ্মীছাড়া মানুষ বাড়ির ছায়া না মাড়ায়! ছেলের সামনে কেউ কেলেঙ্কারি না করে বসে!

ছেলের নাম দীপক। নাম রাখায় যখন পয়সা-খরচের ব্যাপার নেই, তখন একটু জমজমাট নাম হবে না কেন? ভক্তিলতা চলে গেল, দীপক ঘুমুচ্ছে তখনও। কাশী থেকে বেরিয়ে পুরো তিনদিন পথে পথে—ছেলেমানুষের উপর দিয়ে বড্ড ধকল গেছে। আহা ঘুমোক—খুব খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

দুপুরবেলা খাওয়ার সময় হল, তখনো ঘুমুচ্ছে। রাধি গায়ে হাত দিয়ে দেখে, একটু যেন গরম। সন্ধ্যা নাগাদ স্পষ্ট জ্বর হল। বড়ঘরে তক্তাপোশের উপর শুইয়ে দিয়েছে। শয্যার পাশে রাধারাণী জেগে বসে আছে। আলো জ্বলে সমস্ত রাত। নতুন জায়গায় ভয়-ভয় করছে; তার উপর রোগীর কখন কি অবস্থা হয়, চোখে না দেখে সোয়াস্তি পাবে না। পাগলী তারা যথা রীতি রান্নাঘরে। বলেছে বটে, দরকার পড়লে ডাকিস আমায় রাধি। কিন্তু কী বোঝে, আর কী করবে ওই মানুষ?

সকালবেলাটা জ্বর কিছু কম। কিন্তু বিজ্বর নয়। নাথপাড়ায় সতীশ নাথ কবি-রাজি করে। তারাকে বসিয়ে রেখে রাধি সেখানে চলে যায়। কবিরাজ বাড়ি এল না—জ্বর কেন, কুরুক্ষেত্তর ঘটলেও আসবে না

লক্ষণ শুনে গোটা কতক রাঙাবড়ি দিল—মৃত্যুঞ্জয় রস। মৃত্যুকে করতে জয় নাম হইল মৃত্যুঞ্জয়—পানের রস আর মধু দিয়ে মেড়ে প্রাতে এক বড়ি বৈকালে এক বড়ি খাইয়ে যাও, জ্বর আরাম হবে।

তিনদিন এমনি গেল। জ্বর কমে না। ছেলে নেতিয়ে পড়েছে, অজ্ঞান অবস্থা। পেটে আঙুলের ঘা দিয়ে দেখে, ঢপঢপ করছে। ভয়ে রাধি কাঁটা। ক্রমেই তো খারাপের দিকে যাচ্ছে। পাগলের মতো ছুটে ঠাকুর-বাড়ি চলে যায়। তখন মনে পড়ল, মন্দিরে ঢুকতে পারবে না তো। বাইরের ইঁটের রোয়াকে মাথা কোটে : গোপাল, দেশদেশান্তর থেকে তোমার পায়ে ছেলে নিয়ে এসেছি—ওকে আরোগ্য করে দাও। দীপক ছাড়া কেউ নেই আমার।

অনেক রাতে একটু বুঝি ঘুম এসে গিয়েছিল দীপকের পাশে বাঁকা হয়ে শুয়ে দীপকের উত্তপ্ত পিঠে হাত রেখে। স্বপ্নে দেখে, সদ্যাসাময় বংশীবদন ঠাকুর ধমক দিচ্ছেন : পরের আপদ কুড়িয়ে আনলি, মর এখন ছটফট করে। সত্যি তাই। গর্ভধারিণী যে মা, তারই কাছে আপদ হল নিজের ছেলে। আহা, এই কপাল নিয়ে কেউ যেন দুনিয়ায় না আসে! দীপকের গায়ে মাথায় রাধি হাত বুলায়। হাত যেন পুড়ে যাচ্ছে।

ভক্তিলতা কি ভাবে খবর পেয়েছে। তার সেই পুরানো কৌশল—হিঞ্চেশাক তুলতে এল দীঘিতে। সেখান থেকে ধাপ আর পচা-কাদা ভেঙে ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাধির উঠানে। উঠান থেকে ঘরের মধ্যে।

ছেলের পাশে বসে রাধি পাখা করছে। ডান হাতে পাখা, বাঁ হাত কপালে ঠেকিয়ে দেখে মুহুর্মুহু। একবার মনে হয়, কমেছে জ্বর। কমেছে বই কি—হ্যাঁ, তাই। কবিরাজের ওষুধে কাজ হয়েছে। পরক্ষণে সন্দেহ হয়, কপালের তাপ তো যেমন তেমনি।

এমনি সময় ভক্তিলতা। ঘরে ঢুকে ভক্তিলতা দরজা বন্ধ করে। খুট করে একটু শব্দ হয়, সেই শব্দে রাধারাণী মুখ তোলে। কাল ঠাকুরের কাছে মাথা কুটে এল, নিশ্চয় সেই জন্যে গোপাল পাঠিয়েছেন। ব্যাকুল কণ্ঠে রাধি বলে, চোখে আঁধার দেখছি চাঁপাফুল। আমি কী করব?

নির্জন সর্বত্যক্ত এই বাড়ির মধ্যে একাকী মা রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসে আছে। চোখ বসে গিয়েছে—কতদিন অনাহারে আছে যেন, কত রাত্রি ঘুমোয়নি। ছেলেপুলের মা ভক্তিলতাও। রোগীর গায়ে হাত দিয়ে বলে, কই, গা তেমন গরম কোথায়? মনের তাড়সে তুমি জ্বর দেখছ। প্রায় তো সেরেই গেছে, পরশু-তরশু ভাত দিতে পারবে।

রাধারাণী নির্বোধ নয়, মুখে তবু হাসির ঝিলিক ফোটে। মা ভোলানো এত সোজা! জ্বর এমন-কিছু নয়—তারও এবার সেই রকম মনে হচ্ছে।

ভক্তিলতা বলে, আমি আছি, চান করে কিছু মুখে দিয়ে এস চাঁপাফুল। এক কাপড়ে অমন বসে থাকতে নেই। অলক্ষণ। কথা না শোন তো চলে যাচ্ছি—

বলতে বলতে অবশেষে রাধি উঠল। স্নান করে গুড়-নারকেল মুখে দিল একটু। দীপক ঘুমুচ্ছে। ভক্তিলতা বলে, নিজের সর্বনাশ নিজেই বেশি করেছ চাঁপাফুল। তাই এমন একা। এতবড় গাঁয়ের মধ্যে থেকে রোগা ছেলের পাশে একটু বসবার মানুষ পাও না। বার্লি ফুটিয়ে দেবার একজন কেউ নেই।

রাধারাণী কাতর চোখে তাকাল : আমার দোষ নয় চাঁপাফুল—বিধাতাপুরুষের। হাড়-মাস-চামড়ার উপরটা যে এমন করে সাজিয়েছে। তার উপরে কোনদিন তো আমি এক টুকরো সাবান ঘষিনে। ধুলো-মাটি কালিঝুলি মেখে বেড়াই। পোড়া রূপ তবু যায় না। জীবন ভোর এর জন্য হেনস্থা। এঁটোপাতার মতো কুকুরে এসে চাটে। মা মরে গেলে ঠিক করলাম, ঝিগিরি রাঁধুনীগিরি করে খাব। যেখানে কাজ করতে যাই, বাড়ির পুরুষ ছোঁক-ছোঁক করে। রাজি না হলে ছুতোনাতায় তাড়িয়ে দেয়। ওই একটা জিনিস ছাড়া কেউ আমায় সিকি পয়সা দেবে না।

ভক্তিলতা বলে, সে যা-ই হল, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি লোম মিথ্যার পালিশ দিয়ে বেড়াও না তুমি। দুনিয়ার তাই যে নিয়ম। যে যা করুক, মুখে বলে না কেউ। সব মানুষে অভিনয় করে বেড়াচ্ছে। তুমি যে তা পেরে ওঠ না, স্পষ্টাস্পষ্টি বলে খালাস। এই ছেলের ব্যাপারে যেমন। এত বড় চোট সমাজ কিছুতে মানিয়ে নিতে পারে না।

অনেকক্ষণ কাটল। এবারে উঠবে ভক্তিলতা। বলে, মন এখানে পড়ে রইল চাঁপাফুল। ফাঁক পেলেই আবার আসব।

রাধি বলে, থার্মোমিটার হলে জ্বরটা ঠিক ঠিক বোঝা যেত। কোথায় পাই? থাকলেও পাড়াপড়শি কেউ দেবে না। গঞ্জেও পাওয়া যায় না শুনেলাম, ব্ল্যাকে চলছে।

ভক্তিলতা বলে, ডাক্তারের বাড়ি থার্মোমিটার আছে। দেব পাঠিয়ে।

সাগ্রহে রাধি বলে, আমি যাব তোমার সঙ্গে? বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব।

উঁহু, জানাজানি হয়ে যাবে যে! তাহলে তো টুনিকে দিয়ে পাঠাতে পারতাম। তোমার কাছে আসি, কেউ না টের পায়! পাঠাবার জন্যে কি—খোদ ডাক্তারই নিয়ে আসবে। শুধু টেম্পারেচার নিলেই তো হবে না, দেখেশুনে ওষুধ দিয়ে যাবে। কিন্তু ব্যস্ত মানুষ জান তো—আসতে বেশ রাত হবে। বাড়ির লোকজন ঘুমুলে পাঠিয়ে দেব। এসে দুয়োর ঠেলবে, তখন ভয় পেয়ে যেও না কিন্তু ভাই।

রাতের ভয় কী দেখাও চাঁপাফুল? মচ্ছব তো তখনই। পেঁচা ডাকে, বাদুড় ওড়ে, সাপ বেরোয় গর্ত থেকে—আমার উঠোনে তখন মানুষের দাপাদাপি, গোড়ায় একদিন-দুদিন ভাল ছিল—আবার লেগে গেছে! ছেলের এত বড় অসুখ, তাই বলেও দয়া করবে না।

নিশ্বাস ফেলে বলে, কিন্তু হীরক-দা কি আসবেন আমার বাড়ি? কী ছিলাম, কী হয়েছি—বড় ঘেন্না যে আমার উপর। ওই একটা মানুষই দেখেছি ঘেন্না করে মুখ ফিরিয়ে নেন।

স্বামী-গর্বে ভক্তিলতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে : তুমি বলে নয় ভাই। ও মানুষ অমনি। ঘেন্না বল তুচ্ছতাচ্ছিল্য বল, সকলের সম্পর্কে। একলা এই আমি ছাড়া কোন মেয়ের দিকে তাকায় না। আমি বললে ঠিক সে আসবে। না এলে তোমার ছেলের চিকিচ্ছের কি হবে? কবিরাজের উপর ফেলে রাখা চলবে না।

হেসে উঠে আবার বলে, চাঁপাফুল ভাই, অনেক ক্ষমতা তোমার শুনতে পাই। অনেক মাথা নাকি চিবিয়ে খেয়েছ। ওর মাথায় কামড় দিতে যেও দেখি। দাঁত তোমার ভেঙে যাবে।

হাসতে হাসতে ভক্তিলতা বেরিয়ে গেল।

দশ

প্রস্তাব শুনে হীরক অবাক হয়ে যায়। ভক্তিলতা ঝগড়া করছে : ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে তুমি গ্রামের উপর থাকতে? মানুষ হিসাবে পছন্দ না কর, ডাক্তার হিসাবে যাও। চাঁপাফুল যদি দু-টাকার জায়গায় দশ টাকা ভিজিট দিতে পারত, তখন সুড়সুড় করে চলে যেতে।

রাগ দেখে হীরক হাসতে লাগল : আমি যেতে চাইলেও তোমারই তো বাধা দেওয়া উচিত। আর দশটা পতিপ্রাণা সতীর মতো। ওই রাধি আমাদের মুখের উপর একদিন জাঁক করেছিল, কামরূপ-কামাখ্যার মন্তর জানে সে। গুণ করে যদি ভেড়া বানিয়ে রেখে দেয়!

তখন ভক্তিলতাও হেসে ফেলে : তাই কী আর হবে শেষ অবধি? কপাল বড় পাথর-চাপা। কতবার কত রকমের আশা করি, শেষ অবধি ভেস্তে যায়। চাঁপাফুল ভারি কাজের মেয়ে—মানুষ হও ভেড়া হও, তার কাছে সেবাযত্নের ত্রুটি হবে না। আরামে থাকবে। একটা মানুষ দু-খানা হাতে ছেলের জন্য যা করছে! তোমার দায় নিশ্চিন্ত হলে ছ-মাস তখন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব।

হীরক বলে, জানি গো জানি। হয়তো খুঁজেছ। এক যুগ বিয়ে হয়েছে——এক পুঁথি কতবার পড়তে ভাল লাগে? কিন্তু আমাকে না সরিয়ে তুমি নিজেই ইচ্ছে মতন সরে গেলে পার। মানা করতে যাব না।

ভক্তিলতা ঘনিষ্ঠ হয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, হ্যাঁ গা, বলে দাও না কার সঙ্গে সরে পড়ব? চাঁপাফুল আমার চেয়ে অনেক—অনেক ভাল। রূপে গুণে ভাল, বুদ্ধি-সাহসে ভাল। তোমার তো এত বন্ধু-বান্ধব—কলেজের আমল থেকে দেখছি—চা করতে করতে হাত পুড়িয়ে কাল করে ফেললাম, তার মধ্যে একটাও তো ভাল দেখলাম না তোমার চেয়ে। নিয়ে এস না ভাল দু-একটা জুটিয়ে—পুরোনো ছেড়ে নতুন পুঁথি পড়ে দেখি।

স্বামীকে রাজি করিয়ে ভক্তিলতা চুপিসাড়ে দরজা খুলে দিল। বাড়ির লোকে টের না পায়।

বড়ঘরের দাওয়ায় উঠে হীরক দরজা নাড়ল। কথা আছে তাই। আনাড়ি হাত—অন্যেরা যেমন করে, সে রকম নয়। চিনে নিয়ে রাধি তাড়াতাড়ি খিল খোলে।

হেরিকেন জ্বলছে। একটা পুরোনো পোস্টকার্ড চিমনির গায়ে গুঁজে দেওয়া—দীপকের চোখে আলো না পড়ে। মেঘে ভরা আকাশ। বৃষ্টি নেই, বিষম গুমোট। খুব ঘামছে ছেলেটা—গরমের জন্যেই। কিন্তু রাধারাণী তা মানবে না—জ্বর রেমিশন হচ্ছে বলেই ঘাম। হাতপাখা রয়েছে, গরমে আই-ঢাই করছে। তবু পাখাটা নাড়বে না, হাওয়া লেগে দীপকের ঘাম পড়া পাছে বন্ধ হয়ে যায়। ঠাকুর গোপাল, পাঁচ পয়সার ভোগ দিয়ে আসব খোকার জ্বর ছেড়ে গেলে। সঙ্গে সঙ্গে ধক করে মনে পড়ে যায়, ঠাকুরবাড়ি ঢোকা তার মানা হয়ে গেছে। নাই বা গেল গোপালের কাছে—কেউ যখন থাকবে না, চুপি চুপি রোয়াকের উপর ভোগের বাতাসা রেখে আসবে। পুরুত হাতে করে না দিলেও অন্তর্যামী ঠাকুর নিয়ে নেবেন।

এই সব ভাবছে, এমনি সময় হীরক এল। কাল গগল্‌স পরেছে চোখে, বৃষ্টি নেই তবু বর্ষাতিতে আপাদমস্তক ঢাকা। একটি কথা না বলে রাধির দিকে না তাকিয়ে থার্মোমিটার দীপকের জিভের নীচে দেয়। হাতঘড়ি দেখছে। আলোর কাছে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরিখ করে দেখে থার্মোমিটার আবার খাপে ঢুকিয়ে রাখে।

কী মানুষ, একটি কথা নেই এতক্ষণের মধ্যে! তখন রাধিকেই বলতে হয়, কত দেখলে?

তিনের উপর।

জবাব দিচ্ছে, মুখের দিকে তাকায় না।

রাধি আকুল হয়ে বলে, কী হবে হীরক-দা?

হীরক বলে, কয়েকটা প্রশ্ন করছি। যা বলবার তারপরে বলব।

রোগের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন। পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে হীরক লিখে নিচ্ছে। শেষ হলে ভাবছে সেই লেখা-কাগজের দিকে চেয়ে।

রাধারাণী বলে, কবে সেরে উঠবে খোকা?

গম্ভীর নিস্পৃহ কণ্ঠে হীরক বলে, এখন কিছু বলা যায় না। টাইফয়েড—আসল নয়, প্যারাটাইফয়েড। তা-ও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আর দু-চারদিন না গেলে।

ডাক্তারি-ব্যাগ নিয়ে এসেছে। এটা-ওটা মিশিয়ে শিশিতে ঢেলে ওষুধ বানায়। বলে, এই ওষুধ চলবে আপাতত। কিন্তু এ রোগের চিকিৎসা ওষুধে নয়। শুশ্রূষাই হল আসল। মন বোঝে না, সেইজন্য এক দাগ দু-দাগ ওষুধ খাওয়ানো।

ওষুধ রাধির হাতে দেয় না, ছুঁতে হয়তো বাধছে, মেজেয় রেখে দিল। থার্মোমিটার তাকে নিয়ে রাখল। বলে, অসাবধানে পড়ে গিয়ে না ভাঙে। টেম্পারেচার ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাখতে হবে। ও, ঘড়িও তো নেই—

নিজের হাতঘড়িটা খুলে থার্মোমিটারের পাশে রেখে আসে। পথ্য কখন কি দেবে, জ্বর বেশি হলে মাথায় কি ভাবে ঢালবে ইত্যাদি আনুপূর্বিক বুঝিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল হীরক। বলে, কাল নয়, পরশু আসব এই সময়।

রাধি অনুনয় করে বলে, কালও একটি-বার এস হীরক-দা।

না, দরকার হবে না—

গটমট করে হীরক বেরিয়ে গেল। নীরস কাটা-কাটা কথা। রাধি রাগে গরগর করছে। আবার আনন্দও হয় ভক্তিলতার ভাগ্যে। জাঁক করবার মতো স্বামী। হীরক তো সত্যি সত্যি হীরের টুকরো। আদাড়ে আস্তাকুড়ে যেখানে খুশি ফেলে রাখ—ময়লা ধরবে না, জ্যোতি কমবে না।

একদিন বাদ দিয়ে অমনি নিশিরাত্রে হীরক রোগী দেখতে এল আবার। প্যারা-টাইফয়েডই বটে, আশঙ্কার কিছু নেই, তবে সতর্ক থাকতে হবে। দুর্বল শরীরে ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে নিউমোনিয়া না ধরে।

আবার ক'দিন পরে এল। এমনি চলছে। জ্বর একেবারেই থাকে না সকালবেলা। সন্ধ্যার দিকে একটু হয়।

হীরক বলে, এটুকুও যাবে। ভাবনা কোরো না। দিন দশেক আমি থাকছি নে। একটা ভাল চাকরির ইণ্টারভিউ পেয়েছি কলকাতায়, সেই তদ্বিরে যাচ্ছি।

বড় আনন্দ আজ রাধারাণীর। ছেলে আরোগ্যের পথে—সেই এক, আর হীরক খুব অন্তরঙ্গভাবে আজকাল কথা বলছে। দশদিন আসবে না, সেই বলাটুকু যথেষ্ট। না বললেই বা কি! সেই বলার সঙ্গে আবার কতখানি কৈফিয়ৎ জুড়ে দিল—কলকাতায় ভাল চাকরির কথা, চাকরির তদ্বিরের কথা। আর একটা জিনিস—সোজাসুজি তাকায় না, কিন্তু আড়চোখে সে লুকিয়ে দেখে। রাধির চোখে চোখ পড়তে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাড়াতাড়ি লজ্জায়। লাজুক নববধূর মতন। মজা লাগে।

কিন্তু দশ নয়, তার অর্ধেক পাঁচ ...—তিনদিনের দিন হীরক এসে পড়ল।

এত শিগগির কাজ মিটল?

হীরক আমতা-আমতা করে ... অসুখ দেখে গিয়েছিলাম, মনটা উতলা ছিল। আর আমি ভেবে দেখলাম, চাকরি নিয়ে কলকাতায় পড়ে থাকা পোষাবে না। স্বাধীন প্র্যাকটিশ ভাল। সেই কথা শ্বশুর মশায়কে বলে চলে এলাম।

মুখ তুলে চোখ চেয়ে আজ কথাবার্তা। রাধি উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, কী হয়েছে চাঁপা-ফুলের?

মানে, সর্দিকাশির ধাত তো! বর্ষার এই সময়টা হাঁপানির টান হয় একটু—

টেম্পারেচারের চার্ট তুলে নিয়ে মনোযোগ করে দেখছে। বলে, আর কি! অন্নবসাটা কাটিয়ে ভাত দিয়ে দাও। রোগের চিকিচ্ছে হয়ে গেল, ভিজিট পায়নি কিন্তু এখনো ডাক্তার।

তেমনি তরল সুরে রাধারাণীও বলে বলছি তো তাই। ভয়ে বলি না নির্ভয়ে বলি হীরক-দা?
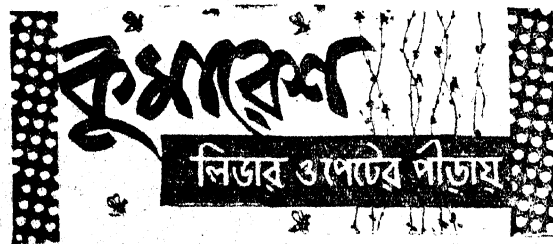
বলতে গিয়ে থেমে বাঁ-হাতের আঙুলে আঁচল জড়াতে লাগল। সংকোচ ঝেড়ে ফেলে তারপর বলে, ইচ্ছে করে হীরক-দা, দীপকের অন্নপথ্যের দিন তুমিও এখানে বসে দুটি খেয়ে যাও। দিনের বেলা হবে না, রাত্রে এই যেমন সময় এসে থাক। আমার হাতের রান্না। গৃহস্থঘরের মেয়ে, বাবা খাইয়ে লোক ছিলেন, রান্নাবান্না বেশ ভালই শিখেছিলাম—খাবে?

কেন খাব না? কলকাতায় এত অজাত-কুজাত গলায় ক'গাছা সুতো ঝুলিয়ে বামুন সেজে রেঁধে রেঁধে খাইয়েছে, তোমার রান্নায় কী দোষ হল?

রাধি কেঁদে বলে, তারা অজাত হোক কুজাত হোক, সে দায় বিধাতাপুরুষের। আমি যে নিজের কাজে জাত খুইয়ে বসেছি হীরক-দা।

রাত্রিবেলা এই সমস্ত কথা—দীপকের ভাল [illegible] আনন্দে। পরদিন ভক্তিলতা এসে উপস্থিত। রাধি কলকণ্ঠে আহ্বান করে: এসো ভাই চাঁপাফুল। অসুখ কেমন [illegible]?

অসুখ হয়ে মরে গেলে মজা জমে তোমাদের! ভক্তিলতা ঝংকার দিয়ে উঠল: কিন্তু সে আশায় ছাই। এমন ধারাশ্রাবণে এত জল বসাচ্ছি, হাঁচিটি পর্যন্ত হয় না।

তক্তাপোশের কাছে এসে দীপকের গায়ে হাত দিয়ে দেখে। বলে, ছেলের জ্বর ছেড়ে গেছে তবু আমার স্বামীকে ছাড়ছ না কেন? ভাল করলাম তার শোধ তুলছ? যে পাতে খাও সেই পাত নোংরা কর তোমরা। গলায় দড়ি জোটে না নেমকহারাম পাজি মেয়েমানুষ? দূর হয়ে যাও, নিজেদের পাড়া বানিয়ে নাও গে। দূর, দূর—

ক্ষিপ্তের মতন থুতু দেয় রাধির দিকে। থুতু গিয়ে পড়ে দীপকের বিছানায়। ভয় পেয়ে রোগা ছেলে আর্তনাদ করে উঠল।

বুকের মধ্যে তাড়াতাড়ি তাকে আগলে ধরে রাধি বাঘিনীর মতো ডাকাল: কত দিন বাছা না খেয়ে আছে, থুতু দিলে তুমি তার গায়ে? ছেলেপুলের মা না তুমি! বেরোও আমার ঘর থেকে, রোগা ছেলে কাঁপছে।

ততক্ষণে দরদর ধারা নেমেছে ভক্তিলতার গাল বেয়ে। বলে, রাত দুপুরে আসা-যাওয়া কোনখানে আর চাপা নেই। গ্রামসুদ্ধ ঢি-ঢি পড়েছে। সে নিন্দে মিথ্যেও নয়। আগে আগে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দিতাম। এখন সারাদিন অত খাটনি খেটে এসেও বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। বাবা কলকাতায় একটা ভাল চাকরির জোগাড় করলেন, আমিও চাই তাড়াতাড়ি নিয়ে পালাতে। তা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ইন্টারভিউ না দিয়ে চলে এল। নরকের টান ধরেছে—থাকবার জো আছে বাইরে দুটো দিন সুস্থির হয়ে?

ভক্তিলতা চলে গেছে। বজ্রাহত রাধি। বড় লজ্জা, ব্যাপারটা ঘটল দীপকের চোখের উপরে। দীপক সমস্ত শুনল। লজ্জার চেয়ে ভয় বেশি। দীপকের জন্যই কাশী থেকে পালিয়ে এল। পাড়ার ছেলেরা কী সমস্ত বলেছিল দীপককে। বাড়িতে এক মাস্টার পড়াত, তাকে নিয়ে কথাবার্তা। বড় হয়েছে দীপক। শুনে এসে হাউহাউ করে কাঁদে। গল্প করে, হাসির কথা বলে, গঙ্গায় নৌকা করে ঘোরায়—কিছুতে ঠাণ্ডা করা গেল না। ছেলের জন্য কাশী ছেড়ে গাঁয়ে চলে এসেছে।

সন্ধ্যার পর বার্লি খেয়ে দীপক চোখ বুজেছে। রাধিও পাশে শুয়েছে একটু। সকালবেলা ভক্তিবউ এসে কেলেঙ্কারি করে গেল সেই কথা ভাবে, আর জিভ কাটে মনে মনে। খোকা, তুই ভাল হয়ে ওঠ। খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যা দিকি। এ পোড়া দেশেও থাকব না। বড় হয়ে রোজগারপত্তর করবি—অনেক দূরে চলে যাব যেখানে কেউ আমাদের চেনে না। ঘর থেকে বেরুবই না, যতদিন একেবারে বুড়ো না হচ্ছি। কুনেকেটে এনে দিবি তুই, ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে রাঁধব। বুড়ো-থুথুড়ে হয়ে গেলে আর তখন ভয় কি! বউ এসে যাবে ততদিনে তোর। না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি রাত্রে, বউ দুধ আর সবরিকলা নিয়ে এসে ডাকছে। ঘুমের ঘোরে বলছি, ক্ষিধে নেই, গলায় গলায় হচ্ছে মা। বউ বলছে, আপনি না খেলে কেউ আমরা খেতে যাচ্ছি নে, বাড়িসুদ্ধ উপোস। কত সুখ হবে আমার তুই খোকা যখন বড় হয়ে যাবি—

গায়ে হাত দিয়েছে দীপকের। চমক লাগে। গা যেন ছাঁৎ-ছাঁৎ করে। মিছা, মিছা। মায়ের হাত ভুল করে অমনি। কিন্তু থার্মোমিটার ভুল করবে না।

একশ'-একের উপর। ক'দিন সম্পূর্ণ ভাল থেকে আবার জ্বর কেন? শুধু জ্বর নয়, একটু পরে ওয়াক টানছে। যে বার্লিটুকু খেয়েছিল, হড়হড় করে বমি হয়ে বেরুল। তারপরে আরও দু-বার। নেতিয়ে পড়েছে ছেলে। চিঁ-চিঁ করছে: ওমা মুখ তিতো হয়ে গেছে, মিছরি দাও। তার মানে পিত্তি বেরুচ্ছে বমি হয়ে। রাতে কী করে এখন? হীরক আসবে না, ভক্তি ঠিক তাকে আটক করেছে। কোনদিন আসতে দেবে না। কালই বা কী করবে আবার সেই যাদব কবিরাজের শরণ নেওয়া ছাড়া?

দরজা খটখট করে ওঠে। ফিসফিসিয়ে বলে, দোর খোল— আমি, আমি। তড়াক করে রাধারাণী উঠে পড়ে। হীরকই তো! এমন সকাল সকাল আসে নি আর কখনো।

দরজা খুলে দিয়ে রাধারাণী কবাটের আড়ালে দাঁড়াল। হীরক ঢুকে গেলে দাওয়ায় নেমে পড়ে। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, আবার জ্বর হল কেন খোকার?

দেখছি—। বলে থার্মোমিটার বের করে হীরক ঝেড়ে ঝেড়ে পারা নামাচ্ছে। ঝাড়ছে তো ঝাড়ছেই। দৃষ্টি বাইরের দিকে—রাধি কথা বলছে যে অন্ধকার দাওয়া থেকে। ঘুমন্ত দীপকের একটা হাত সে উঁচু করে ধরল।

রাধি বলে, হাড্ডিসার হয়ে গেছে খোকা। বগলে তাপ উঠবে না, তুমিই তো সেজন্য মুখে দিতে বলেছ।

হীরক বেকুব হল। মুখের ভিতর থার্মোমিটার দিয়ে বলে, কী হয়েছে বল এইবারে শুনি।

বমি তিনবার হয়েছে। জ্বর। তবে পেটটা ফাঁপেনি দেখলাম।

বিরক্ত হয়ে হীরক বলে, অত দূর থেকে কথা ছুঁড়লে তো হবে না। সামনে এসে ভাল করে বল।

রাধারাণী একটু চুপ করে থেকে বলে, কেন যাচ্ছিনে তুমি তো দেখছ হীরক-দা। কাপড়ের উপর খোকা বমি করেছে, সে কাপড় কেচে দিয়েছি। যা পরে আছি, সামনে যাবার উপায় নেই।

কিন্তু হীরকই উঠে ইতিমধ্যে দরজায় চলে এসেছে। হাত খানেকের ব্যবধান। বলে, হ্যাঁ বল এইবার সমস্ত।

রাধারাণী আবার আদ্যন্ত বলে গেল কানে যাচ্ছে কি কিছু হীরকের? সার্চলাইটের মতন নজর ফেলছে কেবলই রাধারাণীর উপর। কথা শেষ হয়ে গেলে বলে, হুঁ, পেট ফেঁপেছে, আবার জ্বর। মুশকিল হল দেখছি।

রাধারাণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, পথ দাও আমি ঘরে আসছি।

হীরকের দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে সে দীপকের শয্যায় বসল। পাশের টুলখান দেখিয়ে বলে, বস এখানে। ভাল হয়ে বসে জিজ্ঞাসাবাদ কর।

শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া পরনে। মনকে প্রবোধ দেওয়া—একটা-কিছু পরা আছে, একেবারে উলঙ্গ নয়। এক-পা এক-পা করে এসে হীরক টুলে বসে পড়ল।

অসুখের কথা কিছুই তুমি শুনলে না হীরক-দা। মন খারাপ বুঝি?

এবারে হীরক অনেকগুলো কথা বলে ফেলে: ভক্তি একেবারে ক্ষেপে গেছে। মানুষজন মানে না, কিছু না। কেলেঙ্কারি ব্যাপার ওর ধারণা, মজে গেছি আমি তোমার ভালবাসায়।

ফিকফিক করে হাসে হীরক। এ হাসি রাধারাণীর অনেক দেখা আছে। কিন্তু হীরকের মুখে ভাবতে পারা যায় না। [illegible] ঝিনঝিন করে, হাত-পা যেন অসাড় হয়ে আসে।

হেসে হেসে হীরক বলছে, খোকা [illegible]

আবার এদিকে! মেজাজ দেখিয়ে দুয়োরে খিল দিল। বয়ে গেছে আমায় খোশামুদি করতে! বৈঠকখানায় শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, যেমন মিথ্যে বদনাম দেয় তার আজ শোধ তুলব।

খপ করে সে রাধির হাত চেপে ধরে।

এ কী হীরক-দা?

ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো হীরক অসহ আবেগে ধুঁকছে। রাধারাণী কাতর হয়ে বলে, তোমার পায়ে পড়ি হীরক-দা। ছেলের আবার নতুন করে জ্বর হল। আমার মনের অবস্থা বুঝে দেখ একবার।

হীরক উড়িয়ে দেয়ঃ ওটা কিছু নয়। এ রোগের দস্তুর এই। যাবার মুখে একবার দু-বার ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। জ্বর দেখে ভয় পাবার কিছু নেই—

আবার সেইরকম হাসি হাসছে। বলে, ডাক্তারের ভিজিট না দিলে অসুখ সারে কখনো? ভিজিট শোধ কর, জ্বরও দেখবে নেই। লিখিত গ্যারাণ্টি দিতে রাজি আছি।

রাধিকে জোর করে আলিঙ্গনে বেঁধেছে। বলি-দেওয়া ছাগলের মতো অসহায় রাধি হাত-পা ছুঁড়ছে। হীরক খিঁচিয়ে ওঠেঃ ঢং ছাড় দিকি। বড্ড যে সতীপনা!

রাধি কেঁদে বলে, সতী আমি নই—দেশ-সুদ্ধ লোক জেনে গেছে। কিন্তু আমি যে তোমায় সকলের থেকে আলাদা ভাবতাম হীরক-দা। অসতী বলে ঘেন্না কর, তাই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম এত দিন।

হীরক জড়িত কণ্ঠে বলে, ঘেন্না—হুঁ, ঘেন্না বই কি! কোন্ ছুঁচো বলেছে? ভক্তি ঝগড়া করে। বলে, ভালবাসায় আমি মজে গেছি। সত্যি সত্যি তাই।

রাধি বলে, সত্যি যদি হয় মুখে আগুন তোমার। নিজের চেয়ে বেশি কাউকে তো লোকে ভালবাসে না, আমিই ঘেন্না করি নিজেকে। নিজের এই দেহকে। এই মুখ এই ঠোঁট কামুকের থুতু মেখে নোংরা হয়ে গেছে। ধারালো ছুরি দিয়ে এক পর্দা যদি তুলে ফেলতে পারতাম, তবে শান্তি।

বলতে বলতে থেমে পড়ে হঠাৎ। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন দৃষ্টিতে দেখে হীরকের কাণ্ড। বলে, ছাড় হীরক-দা একটুখানি। এ চেহারা তোমার দেখতে পারছি নে।

হেরিকেন নিভিয়ে দিল। অন্ধকার।

হীরকের কণ্ঠ বড় মধুর এখন। পাখির কলকাকলি। বলে, ভেব না রাধি। তোমার ছেলের জন্য ভাবনা নেই। অসুখ সারানো শুধু নয়, ভাল ভাল পথ্যের ব্যবস্থা করে একমাসের মধ্যে চেহারা কী করে দিই দেখো। আমি রোজ আসব।
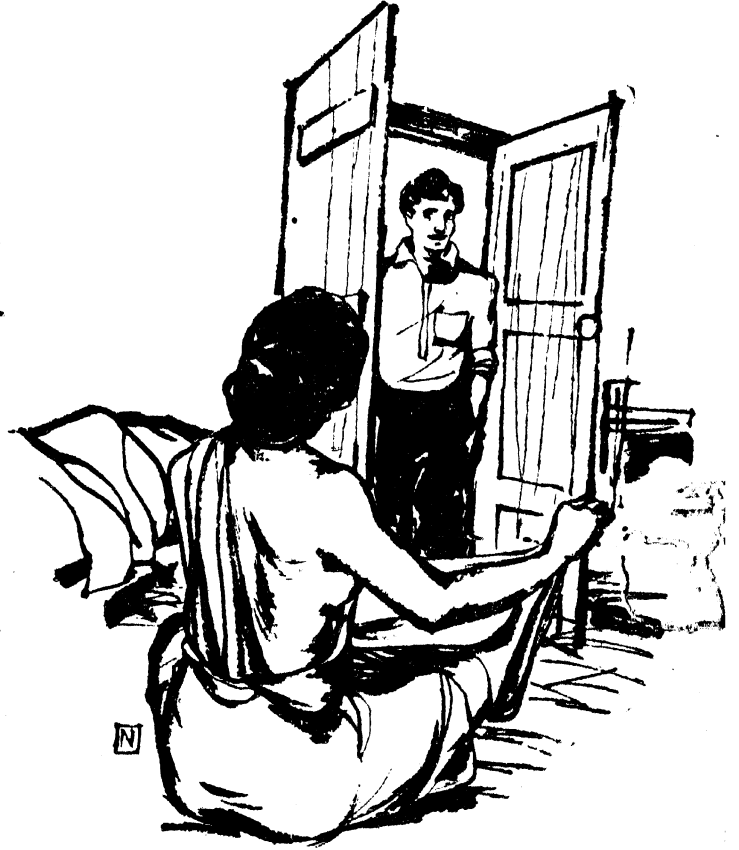
উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে রাধারাণী বলে, যেও না হীরক-দা। খোকার কাছে একটু বস। আমি আসছি।

কোথায় যাও?

দীঘির ঘাটে দুটো ডুব দিয়ে আসি।

জোর বাতাস দিয়েছে বাইরে, টিপটিপে বৃষ্টি। হীরক অবাক হয়ে বলে, কী সর্বনাশ! এই রাতে এখন দীঘিতে যাচ্ছ?

রাতের রাক্ষসি আমি যে, আমার কে কী করতে পারে? ডুব দিয়ে অমনি ঠাকুরবাড়ির রোয়াকে মাথা ঠেকিয়ে আসব আমার খোকার নাম করে।

দীঘির ঘাটে ডুবের পর ডুব দিচ্ছে। মা গঙ্গা, পতিতপাবনী সনাতনী, গা জ্বালা করছে, জুড়িয়ে দাও। পাপের পুঁজরক্ত মাখিয়ে দিয়েছে, সাফসাফাই করে দাও।

এগারো

পরের রাতে হীরক এসেছে। ডাক্তারি-ব্যাগের সঙ্গে কাপড় একখানা, আর বড় ঠোঙায় বেদানা-কমলালেবু। মিহি বুননের ভেলভেট-পাড় ধুতি। ধুতিখানা মেলে ধরল। বলে, সাইকেল নিয়ে নিজে গঞ্জে গিয়ে পছন্দ করলাম। তোমায় মানাবে ভাল। সাড়ি হলে আরও মানাত, কিন্তু বিধবার যে পরবার জো নেই।

এত শিগগির কাজ মিটল?

রাধি সভয়ে বলে, চাঁপাফুল দেখে নি তো?

দেখবে কি করে? বাপের বাড়ি চলে গেছে। চেঁচিয়ে কেঁদে এক হাট মানুষ জড় করল যাবার মুখটায়। তোমাদের টুনিটাকেও নিয়ে গেল। টুনি মাকে একবার দেখে যাবে বলছিল, তা হাত ধরে হিড়হিড় করে গরুর গাড়িতে তুলে দিল। যাকগে, আপদ গেছে। পর দিকি কাপড়টা, কেমন হয় দেখি।

রাধি ব্যঙ্গের স্বরে বলে, আস্ত কাপড় কেন আনতে গেলে?

হীরক চোখ পাকিয়ে বলেঃ বড্ড যে কথার ধার! আমি নিজে আসিনি এ-বাড়ি। ভক্তি পাঠিয়েছিল তোমারই গরজে। চলে যাচ্ছি—

গরগর করতে করতে উঠে পড়ল। রাধা-রাণী ঝাঁপিয়ে পড়েঃ যেও না, খোকার চিকিচ্ছের তা হলে কি হবে? অনেক ভিজিট পাওনা যে তোমার। এতদিনের ভিজিট, তার উপরে ওষুধ আর লেবু-বেদানার দাম।

কাপড়ের দামের কথা বলব না, বললে আবার রেগে যাবে। কিন্তু কোনদিন কেউ আমায় ছাড়ে নি। কাশীতে খোকার মাস্টার মাইনে নিয়ে নিয়েছে, বাড়িওয়ালা বাড়িভাড়া আদায় করেছে।

হীরক আর নতুন কী করবে? দেহ একখানা শুকনো কাঠ—জীবন নেই, অনুভূতি নেই। পেতে দেয় সেই কাঠখানা—যার যেমন খুশি লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে নেচেকুঁদে যায় তার উপরে। মনের উপরেও এমনি পক্ষাঘাত এনে দাও ঠাকুর গোপাল। ভক্তিলতার মতো সরল উপকারী মেয়ের সর্বনাশ করে আর হীরকের মতো শিক্ষিত বলিষ্ঠ মানুষকে পশু বানিয়ে—তারপরেও রাধি যেন হি-হি করে হাসতে পারে।

দীপক সেইদিনই কেবল অন্নপথ্য করেছে। হঠাৎ এক কাণ্ড। রোগীর তক্তাপোশ মচমচ করে উঠল। জেগে পড়েছে দীপক, চোখ মেলে তাকিয়েছে। তাকিয়ে থাকা শুধু নয়, উঠে দাঁড়াল রোগা ছেলে। পা টলমল করছে।

হীরক অক্টোপাস হয়ে জড়িয়ে ধরেছে, ছাড়ানো কী যায়! ছাড়িয়ে নিয়ে রাধি এক ছুটে ছেলে ধরতে গেল। অমনি কে যেন সপাং করে চাবুকের বাড়ি মারে। দেহে নয়, দেহের উপর মারলে রাধির লাগে না। বুকের মধ্যে চাবুকের ঘা পড়ল: অশুচি তুমি। ঠাকুরবাড়ি যেমন ঢুকতে মানা, ছেলেও ছোঁয়া চলবে না তেমনি।

দীপক আকুল হয়ে কাঁদছে: থাকব না আর এখানে। চলে যাব, এক্ষুণি যাব।

রাধারাণী সায় দিয়ে বলে, যাবি বই কি বাবা। এ কী একটা থাকবার জায়গা রে? সেরে ওঠ, গায়ে একটু বল হোক, আমি সঙ্গে নিয়ে যাব ভাল জায়গায়।

হীরক দোর খুলে চোরের মতন নিঃশব্দে কখন সরে পড়েছে। দীপকও শুয়েছে আবার। দাঁড়ানোর বল নেই—কী ভাগ্য, মুখ থুবড়ে পড়ে যায় নি। শুয়ে পড়ে বালিশের উপর মাথা এপাশ-ওপাশ করে আর কাঁদে: আমি থাকব না মা, আমি থাকব না। চোখের জল গড়িয়ে বালিশ ভিজে যায়।

শান্ত করবে রাধি, চোখের জল মুছিয়ে দেবে। কিন্তু উপায় তো নেই। ছোঁয়া যাবে না। ডুব দিয়ে আসবে, কিন্তু এই রাত্রে ছেলে একলা ফেলে যায় কেমন করে? স্নান হবে না, সমস্তক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখের সান্ত্বনা দেবে যতক্ষণ না দীপকের ঘুম এসে যায়।

না না আমার কাছে আর নয়। অনেক তো বড় হয়ে গেছিস—এবারে ভাল একজনের কাছে গিয়ে থাকবি। আমার মামাতো বোন—মামার বড় মেয়ে আরতি। কলকাতায় মস্ত বাড়ি, মোটরগাড়ি, ছেলেমেয়ে সুখশান্তি মান-ঐশ্বর্য। আরতি নিয়ে গিয়ে মায়ের মতন দেখবে তোকে। ঠিক যেন নিজের মা। তিল-ডাঙায় চলে যাব সোমবারেও নয়—পরের দিন মঙ্গলবারে।

তিলডাঙায় হারাণ মজুমদারের সর্বশেষ মেয়ে উৎপলার বিয়ে এই শনিবারে। ডাকযোগে একটা ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছে রাধারাণীর নামে। শুধু সেই চিঠির ছাপা দেখেই বোঝা যায়, জাঁকজমকের বিয়ে। বাড়ির এই শেষ কাজে আরতি এসেছে নিশ্চয়। শনিবারে বিয়ে হয়ে গেল, রবিবারে কনে-বিদায়। উৎসব-ক্লান্ত মানুষের বিশ্রামের জন্য সোমবারটাও বাদ দেওয়া যাক। দীপককে সকাল সকাল খাইয়ে তারা-দিদিকে বসিয়ে রেখে তিলডাঙায় যাবে। একটা—দুটো কথা—কতক্ষণ আর লাগবে! সন্ধ্যার আগে ফিরবে। না গিয়ে তো উপায় নেই।

দেবদারু-পাতার ফটক করেছিল, পাতা শুকিয়ে এসেছে। রাধি ভিতরে ঢুকল না। কী জানি, সন্ধ্যা হয়ত তেড়ে আসবে ঝাঁটা নিয়ে। ফটকের পাশে জিওলতলায় দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

হারাণ মজুমদার বাইরে থেকে হন্তদন্ত হয়ে আসছিলেন। থমকে দাঁড়ালেন, ভূত দেখেছেন যেন।

কে রে—রাধি? কী খবর? নেমন্তন্ন চিঠি পেয়েছিলি আমার?

রাধি বলে, চুকেবুকে গেছে কিনা, তাই বলতে পারলে। সত্যি সত্যি এসে পড়তাম যদি?

এলে কী আর হত? যজ্জিবাড়ি শতেক জাত এসে পাত পেড়ে গেল।

তুমি কিন্তু বলেছিলে মামা, সব মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে আবার আমায় নিয়ে আসবে।

সদুঃখে হারাণ বলেন, সবার হল আর কোথায়? নাতনি হয়েছে আবার যে দুটো। মোহিতের দুই মেয়ে।

এমন অবস্থায়ও হাসি আসে রাধারাণীর, সে তো বটেই। নাতনি দুটো পার হতে হতে মোহিত-দা'রও কি নাতনি হবে না? ভয় নেই, থাকতে আসিনি আমি মামা। আরতিকে একবার ডেকে দাও, তার সঙ্গে কথা আছে।

হারাণ ইতস্তত করেন: আজকে হবে না মা। বাড়ি-ভরা কুটুম্ব। নন্দদুলাল বাবাজিও আছেন। এর মধ্যে কথাবার্তা কখন হয়! আর একদিন।

দৃঢ়কণ্ঠে রাধি বলে, এত পথ এসেছি, কথা আজ বলবই। জোরজবরদস্তি কিছু নয়। কথা বলেই চলে যাব। ডেকে দাও।

আরতি পান সাজছিল। রাধারাণী ডাকছে শুনে তারও মুখ পাংশু: যাব না। কাজ ফেলে কী করে এখন যাই? দরকারটা কী, ওখান থেকেই শুনে এসো না কেন বাবা?

আরতির স্বামী নন্দদুলাল সেখানে। সে বলে, ঘেন্না কর সে জানি। কোন্ গেরস্ত-বউ ঘেন্না না করবে? তবু বোন তো বটে! আশা করে এদ্দূরে চলে এসেছে, মন নরম করে একবার দেখে আসা উচিত।

হেসে বলে, দরকার অবিশ্যি বোঝাই যাচ্ছে অভাবে পড়েছে। ও-পথের ওই তো দস্তুর। যাদের সঙ্গে আনাগোনা, তারা সব শয়তান ধড়িবাজ—অসুবিধা বুঝলে পিঠটান দেয়। সবে কলির সন্ধ্যে, এখনো হয়েছে কি! তবে বাড়ি বয়ে এসেছে, দিয়ে দাও গোটা কয়েক টাকা—

সুপুষ্ট মণিব্যাগটা বের করে নিয়ে নন্দদুলাল চলল। যখন যাচ্ছে—কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বেরিয়ে পড়ে—আরতিরও যেতে হয় পিছু পিছু।

রাধারাণী সজল চোখে বলে, টাকা নয়। ছেলেটাকে আর বাঁচাতে পারছি নে। সেই ভার নিয়ে নিক আরতি।

প্রস্তাব শুনে নন্দদুলাল এক-পা পিছিয়ে যায়: একটা আস্ত ছেলের ষোলআনা ভার নেওয়া—যে-সে ব্যাপার নাকি? আর, তোমার কুলোজ্জ্বলকারী ছেলে তো—পেট থেকে পড়লেই যার গালে নুন পুরে মেরে ফেলে। মায়া করে বাঁচিয়েছ তো অন্য লোকে নিতে যাবে কেন?

আরতির দিকে চেয়ে সাক্ষী মানে: অ্যাঁ—কি বল?

আরতি কিন্তু করুণা-বিগলিত। বলে, অমনি একটা দশ-বার বছরের ছেলে বাড়ি থাকলে বড্ড সুবিধা হয়। দোকানে ছুটে গিয়ে এটা ওটা এনে দিল, ভদ্দরলোক এলে বৈঠকখানা খুলে বসতে দিল, গোয়ালা গাই দুইছে—সেখানে গিয়ে বা দাঁড়াল।

স্ত্রীর কথার উপরে কথা নেই। নন্দদুলালের মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যায়: তবে নিয়ে চল। ভালই হবে।

রাধারাণীর কথা আছে তবুও। বলে, শুধু খাটিয়ে নিলেই হবে না কেবল। ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে, মানুষ হবে দীপক—

ভ্রূভঙ্গি করে নন্দদুলাল: ওঃ, ইস্কুলে পড়ে বুঝি বিদ্যেসাগর হবে? এঁটোপাতের ধোঁয়া স্বর্গে গিয়ে উঠবে?

কিন্তু আরতির করুণার শেষ নেই। তাড়া দিয়ে ওঠে নন্দদুলালের উপর: ওসব কী জন্যে বলছ? না হয় করপোরেশনের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। ফ্রী পড়বে, এক পয়সা তোমার খরচা হবে না।

নন্দদুলাল বলে, খরচার জন্য কে বলছে? যতই হোক, সম্পর্কে বোন-পো হল তোমার। ছেলের যদি মাথা থাকে, পড়াশুনো ভাল ভাবে করে, আলবৎ পড়াব। যদ্দূর পড়তে চায়, পড়াব।

আরতি বলে, ইস্কুলেই পড়বে দীপক। ঘরের ছেলের মতো থাকবে। আমাদের কলকাতা যেতে আরও ছ-সাত দিন। যাবার

আগে লোক পাঠাব। তদ্দিনে ছেলেও তোমার আর খানিকটা সুস্থ হোক।

অন্য লোক নয়, হারাণ মজুমদার নিজে দীপককে নিতে এসেছেন। চাপা গলায় বলেন, বুঝিস তো, বাইরের লোক এর মধ্যে ঢুকতে দেওয়া যায় না। এই টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে আরতি, বিস্তর করেছিস তুই। যে ঋণের শোধ হয় না।

নোট ক'খানা রাধির হাতে দেন নি, তক্তা-পোশের উপর রাখলেন। হাতের ঠেলায় সেগুলো মেজের উপর ছড়িয়ে রাধারাণী কেটে কেটে বলে, গরু পোষানি দেয় মামা, আরতি ভেবেছে তেমনি ছেলে পোষানি। ভাগ্যবতী তোমার মেয়ে—ভাল ঘরবর হয়েছে, টাকাকড়ি হয়েছে। কিন্তু টাকায় আমার গরজ নেই, কুড়িয়ে নিয়ে যাও ওগুলো।

ছেলে আবার আরতির কাছে চলে যাচ্ছে, হারাণ প্রসন্ন নন এই ব্যাপারে। দাঁতে দাঁত ঘষে মনে মনে বলেন, না, টাকার অভাব কি তোর? ছেলেটা সরিয়ে দিয়ে আরও ঝাড়া হাত-পা হলি।

দীপক নেই, কেউ নেই। দুনিয়ার সবাই ভাল রইল, আরতি ভাল—রাধিই কেবল ভাল থাকতে পারল না। বড় ঘরে সে একা। আর রান্নাঘরে তারা পাগলী জেগে বসে কখনো বিড়বিড় করে আপন মনে, কখনো বা হাঁকাহাঁকি করে ঠাকুর গোপালের উদ্দেশে। যে ঠাকুর একটা দিনের ভিতর তার পুরো সংসার নিয়ে নিলেন—কৈলাস সতীশ আর সোনামণি ধড়ফড় করে মরল, এক-সঙ্গে বেঁধে শ্মশানে নিয়ে গেল। কিন্তু তা বলে মানুষের কি অভাব রাধি সুন্দরীর? দগদগে ঘা দেখলে মাছি আপনি এসে ভনভন করে, তাড়িয়ে পারা যায় না।

কিন্তু ওই যে পাগলী তারা—দরদ যা-কিছু ওই একটা মানুষের। কথাবার্তায় বোঝা যায়। যত রাত হয়, তারার পাগলামি বাড়ে। ইদানীং আবার একটা ডাল ভেঙে রাখে হাতের কাছে। গোপালের সঙ্গে শুধুমাত্র মুখের কোন্দল করে জুত হয় না, বেড়ার উপর সপ-সপ করে ডালের বাড়ি মারে। তারই মধ্যে এক একবার চেঁচিয়ে উঠছে, ওই মরল রে রাধিটা নোংরা মাড়িয়ে—

শীতটা বড় পড়েছে এবার। শীতের মধ্যে ভুরভুর করে গিয়ে রাধি দীঘির জলে ডুব দেয়। তারার কান বড় তীক্ষ্ণ—জলের শব্দ শোনে আর চেঁচায়। ডুব দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে রাধি ফিরে আসে—গায়ের জ্বলুনি গেল, অশুচি বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হল।

কিন্তু কতক্ষণ? আবার যেতে হয় দীঘির ঘাটে। আবার ডুব। শীতের দীর্ঘ রাত্রের মধ্যে পাঁচবার সাতবার ডুব দিয়ে আসে এক এক-দিন। আর তারা চেঁচামেচি করেঃ মরবি রে সর্বনাশী। মরবি, মরবি। বড্ড নোংরা ঘাট-ছিস। ডুব দিতে দিতেই মারা পড়বি।

তারপরে একদিন দেখা যায়, রাধারাণী নেই। গ্রাম ছেড়েছে। কাপাসদার অভিশাপ বিদায় নিয়েছে। সেই সঙ্গে দেখা গেল, এমন পশার-প্রতিপত্তি ছেড়ে দীপক ডাক্তারও উধাও। তুমুল রসাল আলোচনা। সেই সঙ্গে গালিগালাজ রাধির নামেঃ ডাকিনী মাগি এমন মানুষটা গুণ করে নিয়ে গেল। এমন একজন পাশ-করা ডাক্তার চলে যাওয়ায় পাড়াগাঁর লোক মাথায় হত দিয়ে পড়ে।

মাস কয়েক পরে হীরক ডাক্তারের খবর হল। না, রটনা বোধহয় মিথ্যা। কল-কাতায় চাকরি নিয়েছে হীরক, বউ ছেলে-পুলে নিয়ে সুখেই আছে। কিন্তু রাধারানীর কথা কেউ বলতে পারে না।

•

কতকাল পরে সেই রাধারাণী বাড়ি এসেছে। হাটুরে মানুষেরা প্রথম তাকে দেখে। সে রাধি নেই, পাপের দাগ সর্ব অঙ্গে। মা মনোরমা মায়া করে এসিড ঢালেন নি, বিধাতাপুরুষ নিষ্ঠুর হাতে তাই বুঝি ঢেলেছেন।

তারা পাগলী মারা গেছে অনেকদিন। রান্নাঘরটা গেছে; বড়ঘরের দেয়াল ভাঙা, চালে খড়কুটো নেই, মাটির মেজেয় গোছা গোছা উলুঘাস জন্মেছে। পাকা শালের খুঁটি বলেই চাল ক'খানা রয়েছে খুঁটির উপরে। কখন পৌঁছল রাধি, কার সঙ্গে এল —কোন পুরানো প্রেমিক খুব সম্ভব দয়া করে রেখে গেছে। রাধি হয়তো ভেবেছিল—ঘর আছে, তারা-দিদি আছে, ধানজমি ও বাগবাগিচা আছে। গিয়ে পড়লেই নিশ্চিন্ত। গতিক বুঝে সঙ্গের সাথী লিচুতলায় ফেলে চলে গেল। বড়ঘরের উলুবনের চেয়ে ছায়াময় লিচুতলাটা অনেক বেশি সাফসাফাই।

রাত্রিবেলা সেইখান থেকে রাধি চেঁচাচ্ছেঃ এই, এইও—মেরে ফেলব। এই, এইও—

খ্যা-খ্যা আওয়াজ তুলে শিয়ালে শিয়ালে ঝগড়া। গঞ্জের হাট করে গঙ্গেশরা পাঁচ-সাতজন বাড়ি ফিরছে। হাতে লণ্ঠন, কাঁধের ধামায় হাটবেসাতি, গল্প করতে করতে যাচ্ছে।

মানুষের সাড়া পেয়ে শিয়াল পালিয়ে যায়। আলো দেখে রাধারাণী আর্তনাদ করেঃ ওগো, কারা তোমরা—দেখে যাও। নড়তে পারিনে, শিয়ালে ধরে টানছে।

গঙ্গেশ বলে, দেখছ? স্বর্গ-নরক সবই এইখানে—এই পিরথিমের উপর। পাপের শাস্তিটা চেয়ে দেখ। জ্যান্ত মানুষ খুবলে খুবলে শিয়ালে খায়।

হাল আমলের নাস্তিকও কিছু কিছু আছে, তারা পাপের শাস্তি ও পুণ্যের জয় দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘরে ফিরতে পারে না। তেমনি কজনে কাঁধের ধামা নামিয়ে রেখে ভিটার উলুঘাস কতকটা উপড়ে রাধিকে চালের নীচে তুলে দিল। পাটকাটির আঁটি বেঁধে আগুন ধরিয়ে দিল, জ্বলবে অনেকক্ষণ। আগুন যত-ক্ষণ আছে, শিয়াল এগুবে না। একগাদা মাটির ঢিল এনে রাখল হাতের কাছে। আর কোথাকার এক নাতিল ভাঁড় সংগ্রহ করে দীঘি থেকে ভরে এনে পাশে রাখল। বলে, নড়তে না পার, হাতে আর মুখে তো জোর-আছে তোমার। চেঁচাবে আর ঢিল ছুঁড়বে, শিয়ালে কায়দা করতে পারবে না। তেষ্টা পেলে ভাঁড়ের জলে কাপড় ভিজিয়ে মুখের মধ্যে দিও।

অনেক করল তারা। ব্যবস্থা করে দিয়ে যে যার ঘরবাড়িতে গেল। রাধারাণী চেঁচায়, ঢিল ছোঁড়ে। ক্ষণে ক্ষণে চেতনা স্তিমিত হয়ে যায় কেমন। যেন সে ছোট মেয়ে হয়ে গেছে আবার, উলু দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। বাতাসে নিবন্ত পাটকাঠির আগুন দপ করে এক-একবার জ্বলে ওঠে। সেই আলোয় শিয়াল দেখতে পায়। খানিক খানিক জমাট-বাঁধা অন্ধকার যেন। লুব্ধ হয়ে আছে তারা, গুটিগুটি এগুচ্ছে। সুযোগ পেলেই এসে ধরবে। তারা সেই রূপময় যৌবনে নাগরেরা যেমন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত দেহের উপর। আতঙ্কে গলার সকল জোর দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, ঢিল ছোঁড়ে এদিক সেদিক।
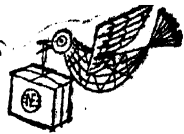
সকাল হল। লিচুর ডালে কাক এসে বসছে। শকুন উড়ছে মাথার উপর। সবাই কেমন টের পেয়ে যায়। শকুনের দল নেমে এসে অদূরে রান্নাঘরের ভিটায় বসে গেল সারি সারি। ঘাড় বাঁকিয়ে শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। প্রবীণ পণ্ডিতেরা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ওই যেন পুঁথিপত্রের বিধান দিতে বসে গেছেন।

প্রহরখানেক বেলায় [illegible]ধ বাড়ির ভিটার উপরে চোখ বুজল।

= শেষ =

ন্যাশনাল একো রেডিও

এই উৎসবের রঙে রঙীন দিনে বাড়ীর সবাইকে গানবাজনা ও আমোদপ্রমোদে মাতিয়ে রাখুন ; একটি সুন্দর অল-ওয়েভ ন্যাশনাল-একো রেডিও কিনুন। আপনার চেনা ন্যাশনাল-একো রেডিও বিক্রেতার দোকানে গিয়ে এই মডেলগুলি আজই দেখুন !
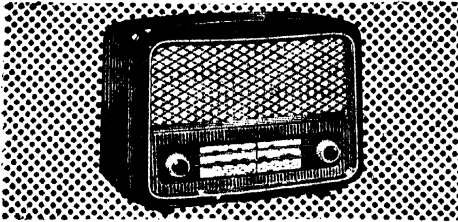
মডেল ইউ-৭১৭ : ৫ নোভাল ভাল্‌ব — ৮ ভাল্‌বের কাজ করে; ৩-ব্যাণ্ড—এসি বা ডিসি। বাদামী রঙের ব্যাকেলাইট ক্যাবিনেট। দাম ২৫০৲। ক্রীম, নীল ও সবুজ রঙেরও আছে— দাম—২৬০৲
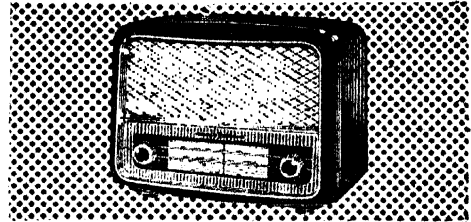
মডেল বি-৭১৭ : ৪ নোভাল ভাল্‌ব—৬ ভাল্‌বের শক্তিসম্পন্ন ; ৩-ব্যাণ্ড—ড্রাই ব্যাটারিতে চলে। বাদামী রঙের ক্যাবিনেট। দাম—২৫০৲। ক্রীম, নীল ও সবুজ রঙেরও আছে— দাম—২৬০৲
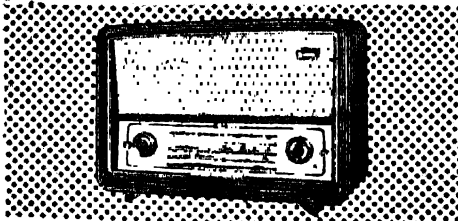
মডেল এ-৭৪৪ : ৪-ব্যাণ্ড, এসি রেডিও। ৬ নোভাল ভাল্‌ব—৯ ভাল্‌বের কাজ করে। পিয়ানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশন। মনোরম ছাঁচে-তৈরী ক্যাবিনেট। দাম—৪১৫৲
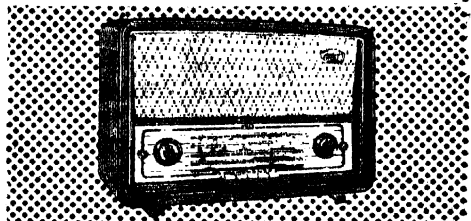
মডেল বি-৭৫১ : মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটির মত —এটি ট্রানজিস্টারযুক্ত ; ড্রাই ব্যাটারীতে চলে। ৩টি ট্রানজিস্টার সমন্বিত—৯ ভাল্‌ভের শক্তিসম্পন্ন ৪ নোভাল ভাল্‌ব। দাম—৪২৫৲
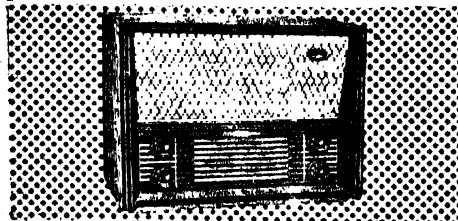
মডেল ৭৩০ : ৬টি নোভাল ভাল্‌ব—৯টি ভালভের কাজ করে, ৮-ব্যাণ্ড ; "ম্যাগ্নি-ব্যাণ্ড" টিউনিং। চকচকে কাঠের ক্যাবিনেট। মডেল এ-৭৩০ এসিতে চলে ; মডেল ইউ-৭৩০ এসি বা ডিসি। দাম—৪৯৫৲
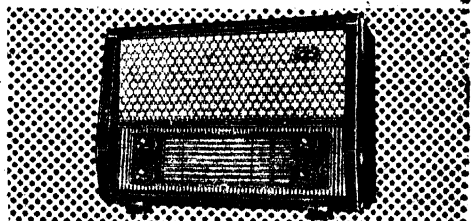
মডেল এ-৭৩১ : ৭টি নোভাল ভাল্‌ভ—১০টি ভাল্‌ভের কাজ করে, ৮ ব্যাণ্ড, এসি। শব্দগ্রহণে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। আর, এফ স্টেজে টিউনড। উচ্চাঙ্গের ভিনিয়ার কাঠের ক্যাবিনেট। দাম—৬২৫৲

সমস্ত দামই নেট। স্থানীয় কর আলাদা।
কেবলমাত্র আমাদের অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো রেডিও বিক্রেতার কাছ থেকে কিনুন !

জেনারেল রেডিও এণ্ড এপ্লায়ান্সেজ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ • পাটনা • দিল্লী • ব্যাঙ্গালোর • সেকেন্দ্রাবাদ

TGRA 1140A

টলস্টয়ের অন্তিমপর্ব

সরোজ আচার্য

রদূরান্ত থেকে চিঠি আসে, ভক্ত-অনুরক্তদের অনুযোগ-ভরা চিঠি টলস্টয়ের কাছে। "মহাত্মন, এ কী আচরণ আপনার? মিল কোথায় আপনার বাণীর সঙ্গে আপনার জীবনের? দারিদ্র্যকে, সর্ব-রিক্ততাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মানতে শিখিয়েছেন আপনি; সেই আপনিই কেন দারিদ্র্যকে বরণ করতে অনুৎসাহী, কেন আপনি নিজেই বিলাস-বৈভবের মায়া-মুগ্ধ?" টলস্টয় জানেন ভক্তদের অনুযোগ মিথ্যা নয়; তাঁর অন্তরে গভীর আত্মগ্লানি। আশী বছরের টলস্টয়, বিশ্বজোড়া তাঁর সত্যদর্শী পরিচিতি। তবুও তাঁর জীবনসাধনায় তীব্র অপূর্ণতা; অভ্যাস ও পরিবেশের কঠিন বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার উপায় খুঁজে পান না টলস্টয়। তাঁর দিনপঞ্জীতে (১৯০৮) কাতরোক্তি—"এখানে ইয়াসনায়া পলিয়ানায় (পারিবারিক বাসভবনে) জীবন বিষাক্ত। একটা বিষয় আমাকে ক্রমেই উদ্বিগ্ন করে তুলছে—চার পাশের দারিদ্র্যের মধ্যে এই ভয়াবহ ভোগবিলাস দিনে দিনে আমার কাছে যন্ত্রণা হয়ে উঠছে। আমি ভুলতে পারিনে, চোখ বুজে থাকতে পারিনে।" তবু এ বড়ো কঠিন বন্ধন, দুস্তর পরীক্ষা; পরিবার-পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আসক্তির টান কাটানো বড়ো কঠিন—টলস্টয়ের পক্ষেও। ভক্তদের তিরস্কার-ভরা অনুযোগের উত্তরে টলস্টয় পরম বিনয়ে মেনে নেন, "এ আমারই দুর্বলতা; এর জন্য ভগবানের কাছে নিয়ত আমি অনুতাপ করছি।"

টলস্টয়ের জীবনের অন্তিম পর্বের ট্র্যাজিডিটা বড়োই করুণ। জীবনকে সব জটিলতা, সব বাহুল্য থেকে মুক্ত করে সহজ হবার সাধনা তত্ত্ব হিসাবে প্রতিপাদন করা সহজ; সহজ নয় তার বাস্তব প্রতিফলন। টলস্টয়ের শেষ জীবন ও মৃত্যু তাই এক ভীষণ সুন্দর পরম ব্যর্থতার মাধুরী-মণ্ডিত। পরিণত বয়সে যাঁর জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র উপকরণবর্জিত আদিম মৃত্তিকা-নির্ভরতা, ক্রোধ-বিদ্বেষ-বাসনামুক্ত খৃষ্টীয় প্রেম ও ভক্তির অনুশীলন তাঁর শেষ জীবনের সঙ্কটটা আশ্চর্য রকমে বাসনা-বিকার-সংক্ষুব্ধ। বিরাশী বৎসর বয়সে টলস্টয় একদিন শেষ রাত্রে গভীর অন্ধকারের মধ্যে ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন। সেই তাঁর শেষ যাত্রা। শান্তির সন্ধানে তিনি তাঁর জীবন-সঙ্গিনীকে ছেড়ে দূরে বহু দূরে অজ্ঞাতবাসের ইচ্ছা নিয়ে বার হয়েছিলেন। সে ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারেনি। ছোট্ট একটি অখ্যাত রেল স্টেশনের বিশ্রামাগারে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত টলস্টয়ের মৃত্যু হল আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ১৯১০ সনের ৭ই নভেম্বর। টলস্টয় কেন গৃহ-বিবাগী হয়েছিলেন, আটচল্লিশ বৎসর ধরে যিনি ছিলেন টলস্টয়ের জীবন-সঙ্গিনী, সহধর্মিণী, তেরটি সন্তানের জননী এবং পরিবারের গৃহকর্ত্রী তাঁর সঙ্গে এমন কী নিদারুণ বিরোধ ঘটেছিল যার জন্য টলস্টয়ের জীবন অসহনীয় হল? এ রহস্য কোনদিনই হয়ত পুরোপুরি আবিষ্কৃত হবে না।

গার্হস্থ্যধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরে সর্ব-সমর্পিত আদর্শ জীবনের জোড় মেলানো চিরকালই দুষ্কর। পদে পদে স্খলন, পর্বে পর্বে বিপত্তি। তারপর বিশ্বজোড়া খ্যাতির বিড়ম্বনা; ভক্তদের ভক্তির আতিশয্যে দেবতাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেলনা করার অন্তহীন মূঢ়তা। টলস্টয় দেবতা নন, এমন কী অতি-মানুষও তিনি নন। সে কথা টলস্টয় নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন—কখনও কখনও আত্মসমালোচনার স্বচ্ছ আলোকে। টলস্টয় অসাধারণ মানুষ, তবুও তিনি মানুষ, তাই জীবনের প্রাত্যহিক চর্যায় প্রতিনিয়ত তিনি নির্বিকল্প সাধনার অমানুষিক প্রয়াসে সফলকাম হতে পারেননি। টলস্টয়ের মহৎ জীবনের উপসংহারটা তাই বড়ো নিষ্করুণ, মর্মান্তিক।

এর জন্য অনেকে দায়ী করে থাকেন টলস্টয়-পত্নী কাউণ্টেস সোফিয়া অ্যান্দ্রিয়েভ-নাকে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূর্বরাগ ও ও প্রথম প্রণয়ে আন্তরিকতা ও গাঢ়তার অভাব ছিল না। বিবাহ যখন হয় সে-সময় টলস্টয় প্রফেট তথা পরমপুরুষত্ব লাভের ভাবে বিভোর হননি; যুদ্ধ-ফেরত অভিজাত-বংশীয় তরুণ টলস্টয় তখন রাজধানীর সম্ভ্রান্ত সমাজে বিচরণশীল। উৎসবে ব্যসনে তাঁর অরুচি নেই; কিন্তু বিলাস-লীলার ফাঁকে ফাঁকে তখনই টলস্টয় অনুভব করেছেন নিঃসঙ্গতা—এক অনির্বচনীয় মহাজাগতিক অতৃপ্তি আর বিরাট রাশিয়ার দৈন্যপীড়িত সর্ব-অধিকারবঞ্চিত জনসমষ্টির বেদনা অভিভূত করেছে তার হৃদয়কে, অলক্ষ্যে সঞ্চারিত করে তাঁর সৃজনী আবেগ। টলস্টয়ের জীবন ও প্রতিভা বিকাশের বৃত্তান্ত থাকুক। তাঁর শেষ জীবনের বিপর্যয়ের রহস্য নিয়ে এই আলোচনা। টলস্টয় যাঁকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে শেষ জীবনের প্রাণঘাতী বিরোধটা অদ্ভুত, অচিন্তনীয় মনে হয়। সত্যিই হয়ত এমন কিছু অদ্ভুত নয়। স্বামীস্ত্রীর অন্তরঙ্গ পরিচয়ে শুদ্ধ প্রেম নয় ঘৃণাও উপজাত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের "পুরুষের উক্তি" ও "নারীর উক্তি" যুগ্ম কবিতায় মোহান্ধতা, মোহমুক্তি এবং সর্বশেষে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার যে সহজ সত্যের ইঙ্গিত রয়েছে টলস্টয়-দম্পতির শেষ জীবনে তা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। টলস্টয় এবং তাঁর স্ত্রী সোফিয়ার মধ্যে চরিত্রগত বৈসাদৃশ্য প্রথম থেকেই ছিল, একথা মানলেও আটচল্লিশ বৎসর বিবাহিত জীবন যাপনের পর শেষ বয়সে তাঁদের দুজনের মধ্যে নাটকীয়ভাবে মারাত্মক বিচ্ছেদকে স্বাভাবিক কল্পনা করা যায় না।

টলস্টয় এবং টলস্টয়-পত্নীর মধ্যে বিরোধ-বিচ্ছেদের জন্য সম্ভবত দুজনেই সমান দায়ী। আরও বেশী দায়ী শেষ জীবনের ঋষি-পদবাচ্য টলস্টয়ের অত্যুৎসাহী ভক্ত এবং স্তাবকবৃন্দ। পরিণত বয়সে টলস্টয় নতুন মানবীয় ধর্মের সত্যসন্ধানী এবং নিজেরাই জীবনে সেই সত্য অনুশীলনে আগ্রহী। কাউন্টেস টলস্টয় ঘরণী গৃহিণী, নিপুণা গৃহকর্ত্রী; টলস্টয়ের খামারবাড়ির নিস্তরঙ্গ জীবনের চেয়ে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং আমোদ-আহ্লাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অনেক বেশী। তারপর ঋষি টলস্টয় তাঁর তেরটি সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা প্রতিপালন ব্যাপারে একেবারে নিস্পৃহ। ভক্তদের চোখে ভোগসুখনিরাসক্ত টলস্টয় পরম-পূজ্য হলে কী হল, টলস্টয়-গৃহিণীর প্রাত্যহিক হিসেবে তাঁর স্বামী পুরো দস্তুর রক্তমাংসে গড়া মানুষ। শ্রীমতী টলস্টয় তাঁর স্বামীর সৃজনী প্রতিভা বিকাশের সহায়তায় কখনও কার্পণ্য করেননি। "ওয়র য়্যান্ড পীসের" মত বিপুলাকার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি

টলস্টয়

কাউন্টেস টলস্টয় স্বেচ্ছায় সাতবার নকল করে দিয়েছিলেন।

সন্তান প্রতিপালন, মস্ত একটি সংসারের যাবতীয় দৈনন্দিন কর্তব্যের দায় একলা তাঁরই; তা সত্ত্বেও স্বামী-সেবায় তিনি ছিলেন অক্লান্তপ্রাণা। বিরোধের বীজ সম্ভবত ওরই মধ্যেই—স্বামীকে একেবারে নিজস্ব সম্পত্তি জ্ঞানে দিনরাত্রি আগলে রাখতে চেয়েছিলেন কাউন্টেস টলস্টয়। এদিকে টলস্টয়ের জীবন ও মনন তাঁর পরিবার পরিজনের অভ্যস্ত আচার আচরণ মনোভঙ্গির দৈনন্দিন সামাজিক বৃত্তের বাইরে অনেক অনেক দূরে এবং ঊর্ধ্বে প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু তা বলে টলস্টয়ের নিজের আচরণেও অসংগতি কম নয়। টলস্টয় তাঁর অধ্যাত্ম জীবনে নতুন সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যগ্র; পরিবারকেও তিনি চান তাঁর নবধর্মের পথ অনুসরণ করতে। এদিকে কাউন্টেস টলস্টয় আর যাই হোন তিনি কষ্টব্রতা নন; তিনি কাউন্ট টলস্টয়ের প্রণয়িনী, সহচরী এবং লৌকিক অর্থে জীবনসঙ্গিনী: তিনি সৃজনশিল্পী টলস্টয়েরও সহযোগিনী; ঋষি টলস্টয়ের সাধনসঙ্গিনী হতে তাঁর কিছুমাত্র উৎসাহ নেই। কাউন্টেস টলস্টয়—শ্রীমতী সোফিয়া তাই একসময়ে উত্ত্যক্ত হয়ে লিখছেন, "নয়-নয়টা ছেলেপিলে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক চাকিবাজী খেলা আমার পোষায় না।" লিখছেন, "আমার স্বামীর ইচ্ছামত যদি সমস্ত সম্পত্তি আমি বিলিয়ে দিতাম তাহলে নয়টি ছেলেমেয়ে নিয়ে দাঁড়াতাম কোথায়?" স্ত্রীর সঙ্গে টলস্টয়ের মানসিক বিচ্ছেদ শুরু হয়েছিল আরো আগে; বিয়ের প্রথম বৎসরেই টলস্টয় তাঁর দিনপঞ্জীতে অনুশোচনা প্রকাশ করছেন, "স্ত্রীপুত্র, ঐশ্বর্য ইত্যাদি থেকে সুখের আশা করা মারাত্মক নির্বুদ্ধিতা। নিজেকে আমার খুব হীন এবং ঘৃণার্হ মনে হচ্ছে। আর আমার এ অবস্থা ঘটেছে যে নারীকে আমি ভালবাসি তাকে বিবাহ করে।" আশ্চর্য মানুষের মন; দৈব বাসনার হাত থেকে নিষ্কৃতি চায়, আবার ভোগরাগের আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হতে চায় না। টলস্টয় তাঁর বিবাহের পর কৃতকর্মের জন্য মর্মপীড়া বোধ করেছেন (১৮৬৩ সনে) অথচ সে সময় থেকে ১৮৮৮ সন পর্যন্ত তেরটি সন্তানের জন্মদাতা টলস্টয় আর-পাঁচজনের মতই সংসারাশ্রমের সুখও উপভোগ করেছেন। দুটি পরস্পর-বিরোধী ধারা টলস্টয়ের আচরণ ও মননকে দ্বন্দ্বজর্জরিত করেছে। একটি যাকে বলা হয় তাঁর ধর্মপ্রবণতা, মহাজাগতিক অতৃপ্তি এবং অধ্যাত্মপিপাসা। আর একটি তাঁর প্রবল জৈবিক আসঙ্গলিপ্সা যা কখনও কখনও টলস্টয়কে তাঁর স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীর প্রতিও আকৃষ্ট করেছে। কাজেই ঘোর সংসারাভিজ্ঞ কাউন্টেস টলস্টয় কখনও তাঁর স্বামীর নবধর্মমত—কামিনীকাঞ্চনে নিরাসক্তির তত্ত্বদর্শনকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেননি। স্বামীস্ত্রীর মনোমালিন্য এবং পারিবারিক অশান্তির একটা কারণ নিঃসন্দেহে টলস্টয়ের অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্ব। টলস্টয় নিজে কি কখনও ভোগসুখে প্রগাঢ় আসক্তি থেকে মুক্ত হতে সমর্থ হয়েছিলেন? বোধহয় নয়। এই একটি কারণ যার জন্য কাউন্টেস টলস্টয় তাঁর জগৎপূজ্য স্বামীর চরিত্রের ছোটবড় দুর্বলতা, দুটি বিচ্যুতি নিয়ে বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। ভক্তদের অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টিতে ঋষিতুল্য; স্ত্রীর কাছে তাঁর কামনা-বাসনার গূঢ়তম পরিচয় নগ্ন, নিরাবৃত। ইংরেজী প্রবচন বলে, "নো ম্যান ইজ এ হিরো টু হিজ ভ্যালেট"—কোনো লোকই তার ভৃত্য বা পার্শ্বচরের কাছে নিখুঁত নয়। তার চেয়ে খাঁটি কথা বোধ হয় "নো ম্যান ইজ এ সেন্ট টু হিজ ওয়াইফ"—নিজের স্ত্রীর কাছে কেউই পরম সন্ত নয়। শ্রীমতী টলস্টয় এটা খুব বেশী করে বুঝেছিলেন যার ফলে টলস্টয়ের অন্তর্জীবনের মহৎ বেদনা, আদর্শ জীবন যাপনের জন্য ব্যাকুলতা কাউন্টেস টলস্টয়ের পক্ষে শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে অনুধাবন করা অসম্ভব হয়েছিল। স্বামীর উপর তাঁর অধিকার সম্পর্কেও শ্রীমতী টলস্টয় ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন, ঈর্ষাপরায়ণ। শ্রীমতী টলস্টয়ের আসঙ্গলিপ্সা দুর্বার ছিল তাঁর পরিণত বয়সেও। শ্রীমতী তাঁর দিনপঞ্জীতে তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন, টলস্টয় যে সময় অন্য সকলকে সম্ভোগ-লিপ্সা দমন করতে উপদেশ দিচ্ছেন তখন তিনি নিজে ভোগ-কামনার বহ্নিতে উদ্দীপ্ত; তিনি প্রচার করেছেন সভ্য নাগরিক জীবনের আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করা ঘোর অন্যায়, মহাপাপ; অথচ নিজে তিনি সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগে বিরত হননি। শ্রীমতী টলস্টয় বুঝতে চাননি যে টলস্টয় নিজেও তাঁর আচরণের অসংগতির জন্য লজ্জিত, আত্মগ্লানিপীড়িত। শ্রীমতীর চোখে টলস্টয়ের অনুশোচনাবোধটাও নিতান্ত কপটতা; তাঁর দিনপঞ্জীতে ১৮৯৭ সনে লিখেছেন, "আমি তার (টলস্টয়ের)

দোশয়তায়, মানবপ্রেমে বিশ্বাস করিনে। আমি জানি তার সব কাজের উৎস হল অদম্য অন্তহীন গৌরবাকাঙ্ক্ষা।" টলস্টয় খৃষ্টীয় প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার করছেন; আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর দিকে তাঁর দৃষ্টি দেবার সময় নেই, তিনি একান্তে অধ্যাত্ম চিন্তায় মগ্ন। অবহেলায়, ক্ষোভে জ্ঞানহারা কাউণ্টেস টলস্টয় তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখছেন, "পৃথিবীর লোকে যদি জানতে পারত সত্যিই তার (টলস্টয়ের) করুণা এবং মমতাবোধ কত যৎসামান্য; তার সব কাজই তার তত্ত্বচিন্তা-প্রণোদিত, হৃদয় থেকে উদ্ভূত নয়।"

কাউণ্টেস টলস্টয় তাঁর অসাধারণচরিত্র স্বামীর ধ্যান ধারণা আদর্শ প্রেরণার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি চেয়েছেন টলস্টয়কে একান্তভাবে তাঁর স্বামী হিসেবে, তার সন্তানসন্ততির পিতা হিসেবে। টলস্টয় নিজেও রমণী-হৃদয়ের অপরূপ রহস্য অনুধাবনে কুশলী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্ত্রীর চিত্তবিকারের কারণ সন্ধানের চেষ্টা করেননি। তিনি অধৈর্য হয়েছেন, সমস্ত স্ত্রী জাতির উপর তাঁর বিদ্বেষপরায়ণতা প্রায় দার্শনিক তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ১৮৬২ সনে বিবাহের পর তরুণ টলস্টয় লিখেছিলেন, তাঁর আনন্দ অনির্বচনীয়। সেই টলস্টয়ই পরিণত বয়সে নতুন প্রেমধর্মের প্রবক্তা হয়েও লিখছেন, "কেবল স্বামীরাই স্ত্রীজাতিকে বুঝতে পারে এবং বুঝতে পারে বড়োই বিলম্বে।" অন্তিম পর্বের মর্মান্তিক ট্রাজিডি যখন আসন্ন তখন ৪৮তম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে টলস্টয় লিখছেন, "আজ আমার বিবাহের কথা স্মরণ করে মনে হচ্ছে ওটা একটা মারাত্মক বিপত্তি। এমন কী আমি কখনও ভালবাসিনি, কিন্তু তবু বিবাহ না করেও পারিনি।" স্ত্রীর প্রতি বিরূপতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে টলস্টয়ের অশ্রদ্ধা যেভাবে প্রবল হয়েছিল তার সঙ্গে খৃষ্টীয় প্রেম ও করুণার অসঙ্গতি সুস্পষ্ট। টলস্টয় লিখছেন, "সত্তর বৎসর ধরে স্ত্রীজাতি সম্পর্কে আমার ধারণা ক্রমেই নিচু হচ্ছে।" "মেয়েরা শয়তানের হাতিয়ার; তারা সাধারণত বুদ্ধিহীন, শয়তান তার মতলব সিদ্ধির জন্য মেয়েদের বুদ্ধি দিয়ে থাকে, ইত্যাদি।" নারী নরকের দ্বার এ তত্ত্ব অবশ্য বহু ধর্মতত্ত্বে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু টলস্টয়ের জীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা থেকে এই নারী-বিদ্বেষী দর্শনের বিশেষ সার্থকতা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

যে পূজার যে মন্ত্র—সংসারধর্মের ন্যায্য দাবী সংসারীকে পূরণ করতেই হয়। সংসারধর্ম ছাড়তে চেষ্টা ক'রেও টলস্টয় ঠিক মৃত্যুর মুখোন্মুখ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংসারাশ্রম ছাড়তে পারেননি। নিজের আদর্শের সঙ্গে আচরণের সঙ্গতি স্থাপনের জন্য ভূসম্পত্তির ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার ছাড়তে চেয়েছেন, কিন্তু আসলে সে-সম্পত্তি পরিচালনা এবং উপস্বত্ব সংগ্রহের ভারটা বর্তেছে তাঁর স্ত্রীর উপর। তাঁর পারিবারিক বাসভবনে, খামারে স্বচ্ছন্দে বসবাসে অসুবিধা ঘটেনি কাউণ্টেস টলস্টয়ের নিপুণ পরিচালনা ও পরিচর্যাগুণে। টলস্টয়ের অন্তরে ক্ষোভ স্ত্রীপুত্র পরিবার তাঁর আদর্শ-সাধনার পথানুসারী নয়। এদিকে সংসার, বিষয় সম্পত্তি, সন্তানসন্ততি নিয়ে কাউণ্টেস টলস্টয়ের দুর্ভাবনার অন্ত নেই, অথচ স্বামীর বিচারে তিনিই টলস্টয়ের আদর্শ সাধনার প্রবল প্রতিবাদী। ক্লান্ত, উত্ত্যক্ত, স্নায়বিক অবসাদগ্রস্ত শ্রীমতী টলস্টয় অনুযোগ করছেন, পরিত্রাণের মানে যদি সবচেয়ে আপনজনের হাড় জ্বালাতন করা হয় তাহলে অবশ্যই তাঁর স্বামী পরিত্রাণের সন্ধান পেয়েছেন। স্বামীস্ত্রীর মনোভঙ্গিতে, প্রাত্যহিক জীবনধারার এই মৌল বিরোধের পরিণাম বিপর্যয়কর হওয়া আশ্চর্য নয়।

এরপর ভক্তদের অত্যাচারে অত্যুৎসাহে টলস্টয়ের অন্তিম পর্বের ট্রাজিডি অপ্রতিরোধ্য হল। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে ভিড় করে ঋষি টলস্টয়ের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য। ভক্তদের সান্নিধ্যে টলস্টয় নিজেও তাঁর বিশ্বাসকে তাঁর নিজেরই নিগূঢ় সংশয়ের পীড়ন থেকে মুক্ত করার প্রেরণা পান। আবার ভক্তের কাছে ভবিষ্যদ্দর্শী তাপসের ভূমিকা অভিনয়ের আকাঙ্ক্ষাও আছে। গর্কির কাছে টলস্টয় স্বীকার করেছিলেন, ভক্তরা যাতে নিরাশ না হয় সেজন্য তাঁর অধ্যাত্ম জীবনকে ঘষামাজা করে কিছুটা দর্শনগ্রাহ্য না করে উপায় নেই। এদিকে ভক্তদের প্রতি কাউণ্টেস টলস্টয় স্বভাবতই অপ্রসন্ন, তাঁর সংসারাভিজ্ঞ দৃষ্টিতে, "লিও নিকোলেভিচের এইসব

টলস্টয়ের পত্নী

শিষ্যরা কী বিশ্রী লোক, এদের একজনও সুস্থমস্তিষ্ক নয়।" শ্রীমতীর একতরফা বিচারে ভুল ঘটলেও টলস্টয়-ভক্তদের ধূর্ত সুযোগসন্ধানী লোকের অভাব ছিল না। এদের মধ্যে চের্টকভ নামে একজন অত্যুৎসাহী টলস্টয়ভক্ত আবির্ভূত হলেন অন্তিম পর্বের ট্রাজিডির সূত্রধাররূপে। টলস্টয়ের অগাধ বিশ্বাস চের্টকভের উপর, চের্টকভ নিত্য টলস্টয়ের কানে মন্ত্র দেন, আপনার স্ত্রীই আপনার সাধনা-সিদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কাউন্টেস টলস্টয় প্রমাদ গণলেন; চের্টকভকে বাড়িতে উপস্থিত দেখামাত্র শ্রীমতী টলস্টয় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হন। সংকট ঘনীভূত হল চের্টকভ যখন নানা ছলনায় টলস্টয়কে বশীভূত করে তাঁর অত্যন্ত গোপনীয় দিনপঞ্জীগুলি হস্তগত করেন। কাউন্টেস টলস্টয় এ ঘটনায় বিচলিত, স্তম্ভিত, কারণ টলস্টয়ের এই গোপনীয় দিনপঞ্জীগুলিতে এমন বহু মন্তব্য থাকবার সম্ভাবনা যা তাঁর স্ত্রী এবং পরিবার সম্পর্কিত। শ্রীমতী টলস্টয় চের্টকভের কাছ থেকে টলস্টয়ের দিনপঞ্জীগুলি ফেরত চাইলেন। টলস্টয়ের বিশ্বাসভাজন চের্টকভ নির্লজ্জ ধৃষ্টতার সঙ্গে কাউন্টেস টলস্টয়কে জবাব দিলেন, "কাউন্টেস! আপনার এবং আপনার পরিবারের কলঙ্ক প্রকাশ করে দেবার ক্ষমতা আমার যথেষ্টই আছে, প্রকাশ করিনি যে তার কারণ লিও নিকোলোভিচকে আমি ভালবাসি।" দুর্বিনীত স্পর্ধিত চের্টকভ শ্রীমতীকে আরও শুনিয়ে দিলেন, "আমার যদি এরকম স্ত্রী থাকত তাহলে আমি হয় আত্মহত্যা করতাম নয়ত আমেরিকায় পলায়ন।" ভক্তদের হাতে খৃষ্টীয় প্রেম ও করুণার মহৎ বাণীর কী অপূর্ব প্রয়োজনা!

চের্টকভের প্ররোচনায় বৃদ্ধ টলস্টয় আবার ভাবতে শুরু করলেন, "আর নয়, সংসার ছেড়ে পালিয়ে আমাকে যেতেই হবে।" ধূর্ত চের্টকভের আধিপত্য, টলস্টয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সংসারবিতৃষ্ণা, শ্রীমতী টলস্টয়ের স্নায়বিক বিকার—সব মিলিয়ে ১৯১০ সনের শেষ দিকে টলস্টয়-পরিবারে খৃষ্টীয় প্রেম ও

রুণার লেশমাত্র অন্তর্হিত, তার স্থানে প্রচণ্ড বিদ্বেষ বিকার এবং অহমিকাসঞ্জাত পীড়া যুদ্ধের আবহাওয়া। যন্ত্রণায় কাতর শ্রীমতী টলস্টয়ের মনে মাঝে মাঝে আত্মহত্যায় সব জ্বালা জুড়ানোর চিন্তা।

ধূর্ত চের্টকভ তার নিজের ভূসম্পত্তি, ঐশ্বর্য দরিদ্র খৃস্টীয়ান ভ্রাতাদের মধ্যে বতরণের চেষ্টামাত্র করে নি; কিন্তু টলস্টয়ের কানে মন্ত্রণা দিচ্ছে, গুরুদেব তাঁর সর্বস্ব উৎসর্গ করে সর্বত্যাগী জীবনাদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। টলস্টয়ের ভূসম্পত্তি তাঁর হাতছাড়া হয়েছে; সম্বল শুধ তাঁর গ্রন্থস্বত্ব। কাউণ্টেস টলস্টয়ের প্রবল আপত্তি গ্রন্থস্বত্ব নিঃশর্তে ত্যাগ করায়। চের্টকভের প্ররোচনায় টলস্টয় অত্যন্ত গোপনে বাড়ি থেকে দূরে নিভৃত বনাঞ্চলে বসে তাঁর শেষ উইল রচনা করলেন। এ ঘটনা ১৯১০ সনের ২২শে জুলাই। এই উইলের কথা কাউণ্টেস টলস্টয়ের অজ্ঞাত থাকলেও তাঁর সন্দেহ উদ্রিক্ত হল। এরপর চের্টকভের হস্তগত টলস্টয়ের দিনপঞ্জীগুলি ফিরিয়ে পাওয়া নিয়েও পারিবারিক অশান্তি তীব্র হতে থাকল। বিরাশী বছরের বৃদ্ধ টলস্টয় লিখলেন, "এরা সবাই আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এদের কাছ থেকে পালিয়ে যাই তবে? মাঝে মাঝে তাই ভাবছি।" ঘটনাটা ঘটল অক্টোবরের সাতাশ তারিখ শেষ রাত্রে। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে টলস্টয় দেখেন তাঁর স্ত্রী পাঠাগারে বসে চুপি চুপি টলস্টয়ের কাগজপত্র হাতড়াচ্ছেন। ওই ঘটনা প্রসঙ্গে টলস্টয় লিখে গেছেন, "কেন জানি না, আমার মনে ঘৃণা প্রবল হল, ঘৃণা এবং বিদ্রোহের ইচ্ছা"। সেই রাত্রেই টলস্টয় দু একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়ে তাঁর স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন।

বৃদ্ধ টলস্টয়ের বিড়ম্বনা যেমন ভয়াবহ তেমনি শোকাবহ তাঁর স্ত্রীর অন্তর্বেদনা। টলস্টয় চলে গেছেন এ সংবাদ শোনামাত্র শ্রীমতী টলস্টয় পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েন; অনুতাপদগ্ধ, শোকবিহ্বলা এই রমণীকে তাঁর স্বামীকে জীবিতাবস্থায় শেষবার দেখবার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। ভক্তদের এমনই খৃষ্টীয় ক্ষমাশীলতা। গৃহবিবাগী টলস্টয় তাঁর জন্মস্থল, পরিবার প্রিয়জনের বাসকেন্দ্র, তাঁর সাধনার তীর্থক্ষেত্র ইয়াস-নায়া পলিয়ানা থেকে বহুদূরে বিয়াজানের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যস্থলে আস্টাপোভো নামে এক অখ্যাত স্টেশনের বিশ্রামাগারে মৃত্যুপথযাত্রী। সারা রাশিয়া উৎকণ্ঠা-কাতর; ৭ই নভেম্বর, ১৯১০ সন; ছোট্ট স্টেশনটিতে টলস্টয়ের মৃত্যু শয্যাপ্রান্তে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, শিল্পী, অভিনেতা, সুরকার, ভক্ত, অনুরক্তদের ভিড়ে ঠাসাঠাসি। সেখানে ঠাঁই নেই তবুও কাউণ্টেস টলস্টয়—সোফিয়া আন্দ্রিয়েভনার। স্টেশনের আনাচে কানাচে, বিশ্রামাগারে—যেখানে মরণোন্মুখ টলস্টয় শয্যাশায়ী তার বন্ধ জানালার আশে পাশে ঘুরে বেড়ান অনুতাপবিদ্ধা স্বামী-সন্দর্শনে ব্যাকুল সোফিয়া আন্দ্রিয়েভনা। টলস্টয়ভক্তদের, শুশ্রূষাকারীদের অদ্ভুত জিদ—প্রতিটি জানালায় ভারী পর্দাফেলা, যাতে কোনমতেই স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর শেষ দৃষ্টি বিনিময় পর্যন্ত না হতে পারে। সমাগত ভক্ত, পরিচিত অপরিচিত আর সকলেই প্রায় অবাধে টলস্টয়ের মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে যাবার সুযোগ পেয়েছেন। মরণোন্মুখ স্বামীর চৈতন্য বিলুপ্ত হবার পূর্বে শেষ দর্শন লাভে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত হয়েছেন কেবল সেই শোকাতুরা রমণী আটচল্লিশ বৎসর পূর্বে অনেক সংকোচ সংশয় ও ভয় কাটিয়ে ভালবাসায় মুগ্ধ যে অষ্টাদশী তরুণী কাউন্ট টলস্টয়কে তার ভীরু কম্পিত হাতখানি (এবং হৃদয়ও) সমর্পণ করেছিল।
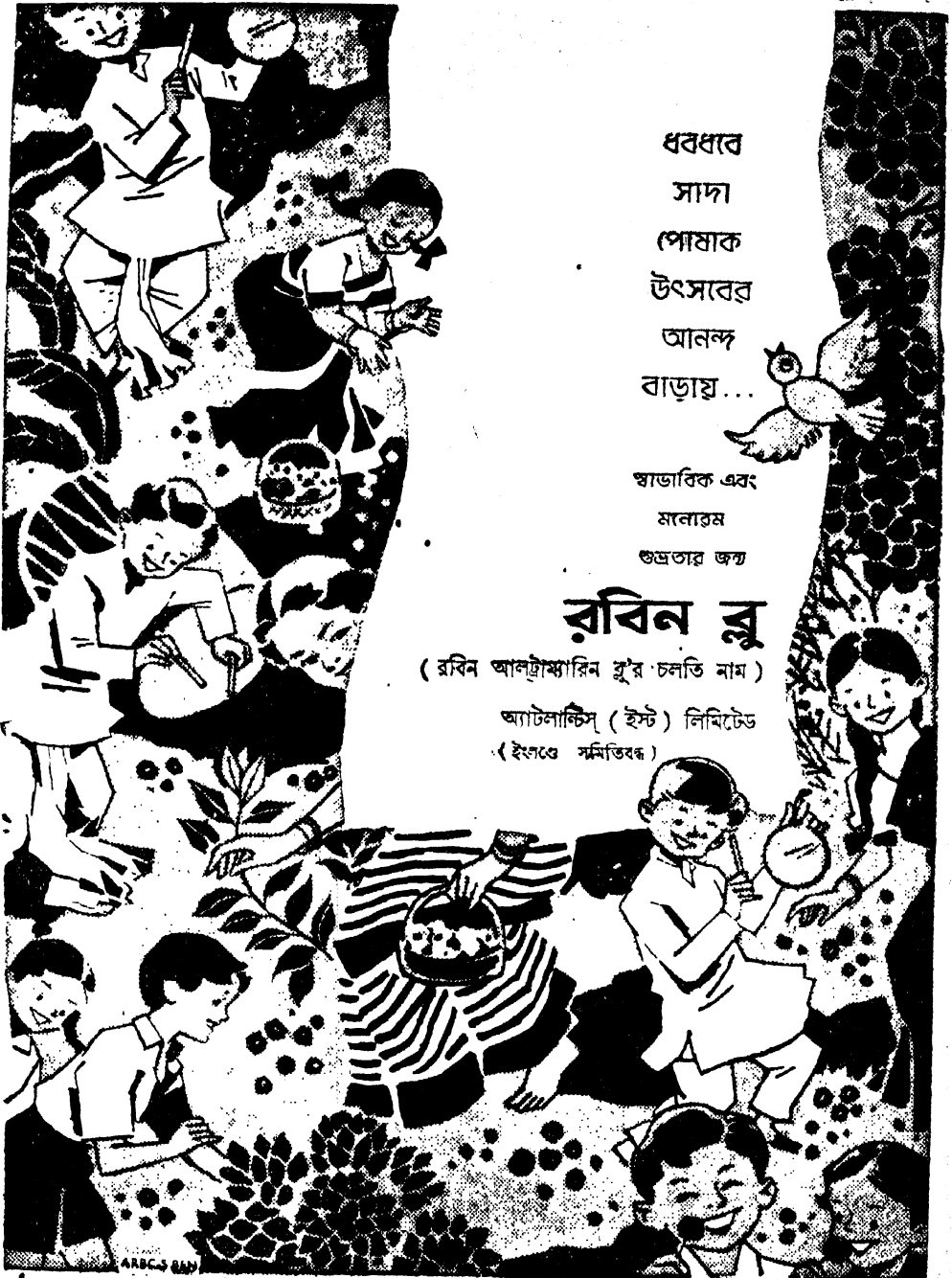
ধবধবে
সাদা
পোষাক
উৎসবের
আনন্দ
বাড়ায়...
স্বাভাবিক এবং
মনোরম
শুভ্রতার জন্য
রবিন ব্লু
(রবিন আলট্রামেরিন ব্লু'র চলতি নাম)
অ্যাটলান্টিস্ (ইস্ট) লিমিটেড
(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)
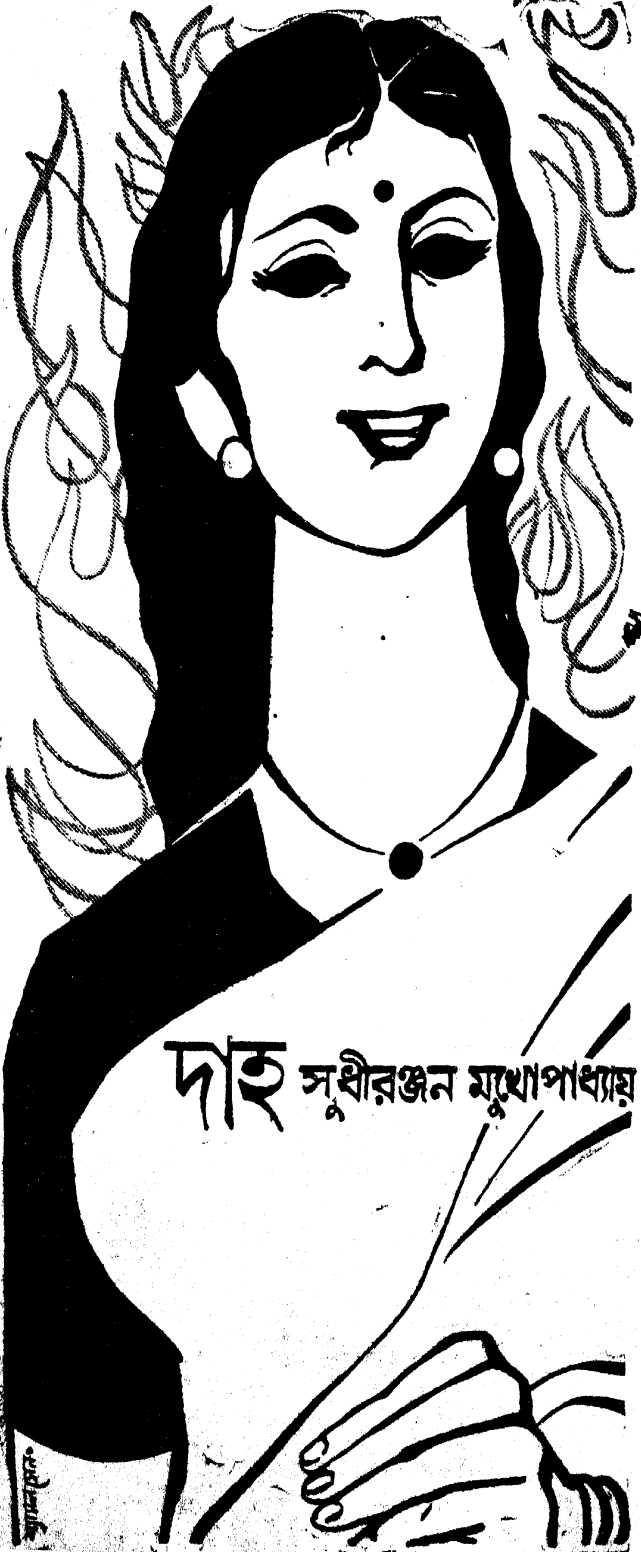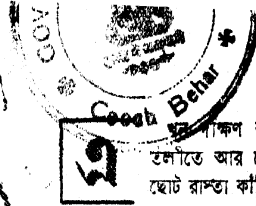
এখন দক্ষিণ কলকাতার শহরতলীতে আর কোন শব্দ নেই। ছোট রাস্তা কাঁপিয়ে শেষ বাসটা চলে গেছে প্রায় আড়াই ঘণ্টা আগে আর তারও আগে থেকে তালের ভেঙে পড়া বড় বড় পাতা রাতের সব ক্লান্তি নিয়ে গাছের গায়ে সেঁটে আছে।

এখন যতদূর দেখা যায় ততদূর শুধু মিশকালো বোবা পশুর মতো নিস্তব্ধ অন্ধকার আর অনেক দূর থেকে থেমে থেমে শেয়ালের একটানা ডাক — হুক্কা—হুয়া! ইচ্ছে না থাকলেও মাত্র একটি মানুষ অসহ্য যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সেই ডাক শুনছে।

হয়তো দক্ষিণ কলকাতার শহরতলীতে শেষ চৈত্রের নিঝুম থরোথরো মাঝ-রাত্তিরে একটি মানুষই জেগে আছে তখন। তার নাম রুচিরা রায়। তার ডান হাতটা কপালের ওপর। বাঁ হাতের দুটো আঙুল মশারির কোণ ছুঁয়েছে। চোখ দুটো খোলা। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে রুচিরা। কিন্তু আশ্চর্য, একবারও নড়ছে না—কখনও দেখছে না নিরঞ্জনকে।

হ্যাঁ, আর একজনও আছে রুচিরার পাশে। তার স্বামী নিরঞ্জন রায়। ঘুমে অচেতন। এ পাশ ফিরে না তাকালেও রুচিরা শুনতে বাধ্য হচ্ছে নিরঞ্জনের নাক ডাকার মৃদু ধ্বনি। আত্মতৃপ্তির স্পষ্ট সঙ্কেতের মতো। অজ রাতে ওর ঘুম কিছুতেই ভাঙবে না।

কাল ভোরে সূর্য যখন গড়িয়ে-গড়িয়ে উঠে যাবে অনেকদূরে আর ফাঁকা শহরতলীতে রোদের তেজ একটু বেশি রকম প্রখর হয়ে উঠবে তখন চোখ রগড়ে বিছানার ওপর নিরঞ্জন উঠে বসবে। ঘুমের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে রুচিরাকে জিজ্ঞেস করবে, 'কটা বেজেছে?' উত্তর শুনে চোখ কুঁচকে বলবে, 'এত বেলা হয়ে গেল!' মুখ ধুয়ে খুব তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নেবে নিরঞ্জন। তারপর খবরের কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে বলবে, 'একটু সকাল-সকাল বেরুতে হবে আজ—কাজ আছে।' কিংবা 'ফিরতে রাত হবে—ব্যবসায়ীদের বড় মিটিং আছে।' না হয়, 'সন্ধ্যেবেলা তৈরি থেক, আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব—ঘোষালের ওখানে নেমন্তন্ন আছে।' তোতাপাখিকে শেখানো বুলির মতো রোজই ওই এক কথা।

অন্ধকারের কাঁপা-কাঁপা ম্লান আলোয় এতক্ষণ পর রুচিরা, একবার দেখে নেয় নিরঞ্জনকে। গম্ভীর গর্বিত একটা মুখ ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতীক — অজ[illegible] বেহিসাবী যৌবন কোন প্রশ্রয় পায় না যা[illegible] কাছে। কাজের সময় ক্লান্তিতে তার চো[illegible] বুজে আসে না কখনও। কিন্তু এখন তা[illegible] পূর্ণ বিশ্রাম। হাওয়া যদি হঠাৎ অস্তে[illegible]

একটা সূক্ষ্ম তরংগ তোলে—নিরঞ্জন জাগবে না। তালের বড় বড় পাতা যদি দারুণ চঞ্চল হয়ে তার ঘুম ভাঙাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে—ব্যর্থ হবে। রুচিরার শরীর-জোড়া রূপ যৌবন আর ক্ষুধা কোন দিনও নিরঞ্জনকে একটি পুরো রাত জাগিয়ে রাখতে পারবে না।

কিন্তু তবু এখুনি—এই মুহূর্তে হঠাৎ একটা বৈদ্যুতিক আঘাত দিয়ে নিরঞ্জনকে খাট থেকে মাটিতে নামিয়ে দিতে পারে রুচিরা। কিছু না। চাবিটা নিয়ে একবার আলমারীর কাছে গেলেই হল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ—ছোট দুটো শব্দ। ব্যাকুল একটা প্রশ্ন তখুনি ভেসে আসবে মশারির ভেতর থেকে, 'কে?' যদি রুচিরা সাড়া না দেয় তবুও বিচলিত নিরঞ্জনের খেয়ালে আসবে না যে সে পাশে নেই। ব্যগ্র হাতে মশারি সরিয়ে লাফিয়ে খাট থেকে নামবে নিরঞ্জন। টুক করে আলোর সুইচ টিপবে। আর ভয়ংকর বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবে রুচিরার দিকে।

'তুমি! সাড়া দাওনি যে?'

নীরস কঠিন সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'দেখ-ছিলাম।'

'কি?'

'নতুন নেকলেসটা।'

'এত রাতে?' ত্রস্ত নিরঞ্জন দ্রুত চাবি ঘুরিয়ে আলমারী খুলবে। হাতড়ে হাতড়ে দেখবে গয়নার সব কটা বাক্স ঠিক আছে কিনা। তারপর বিরক্তির কয়েকটা রেখা ফুটে উঠবে তার কপালে, 'এমন করে যখন-তখন আলমারী খুল না,' চাবি ঘুরোতে ঘুরোতে সে বলবে, 'জান না কত রকম কান্ড হয় আজকাল কলকাতা শহরে?' ভয়ে-ভয়ে সে একবার এদিক-ওদিক তাকাবে। না, কেউ কোথাও নেই। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আলো নিবিয়ে দেবে নিরঞ্জন। আবার গড়িয়ে পড়বে বিছানায়। কিন্তু আলমারীর চাবিটা এবার নিজের বালিশের তলায় রাখবে। আর যদি জেগে জেগে রাত ভোর হয় রুচিরার—তার রাত জাগার খবর জানবার কোন আগ্রহ থাকবে না নিরঞ্জনের।

কিন্তু সত্যি এই নির্বিকার রাতের মুহূর্মুহূ ফোঁসফোঁসানি ঈর্ষা আর আক্রোশের একটা কঠিন আঘাতে রুচিরাকে খাট থেকে ঠেলে নামিয়ে আলমারীর কাছেই নিয়ে আসতে চায়। আর অলংকার নয়, কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর এক-একটি খনিজ দম্ভকে সে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে চায়, তাজা সবুজ ঘাসের ওপর। যার খুশি সে নিয়ে যাক। তখন তাকে দেখে বিমূঢ় হয়ে যাক নিরঞ্জন। রূপের জ্যোতিতে চমকে উঠুক। তার অলংকারের দম্ভ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ুক।

এখনও বুক ভাঙা একটা নিশ্বাসের সঙ্গে দেহটা জ্বলে ওঠে রুচিরার। সে-চোখ নেই তার স্বামীর। সোনা-চাঁদির পালিশ ছাড়া জীবনে অন্য কোন রঙ লাগাবার সূক্ষ্ম কৌশলের কথা সে কল্পনাই করতে পারে না। টুকরো টুকরো অর্থহীন কথা, বেহিসাবী যৌবনের আবছায়া কল্পনা, কাঁপা-কাঁপা আলো আর এলোমেলো হাওয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ার দুর্দম ইচ্ছা আর যার জন্যেই হোক—নিরঞ্জনের জন্যে নয়।

কথাটা বুঝতে খুব বেশি দেরি লাগেনি রুচিরার। আর সব বুঝে গেছে বলেই শোবার ঘরের লাগালাগি কালো লম্বা বারান্দা এখন তার কাছে মূক পাষাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানে দাঁড়িয়ে দূরে ঘন ঝাউ-এর ফাঁকে ফাঁকে আকাশের নতুন রূপ খোঁজবার কোন চেষ্টাই করে না সে। আর নিরঞ্জনের হাত টেনে শহরতলীর নির্জনতায় হঠাৎ উড়ে আসা নীল-হলুদ রঙের পাখিও দেখায় না।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম ছুটির ভিজে ভিজে দুপুরে হাতটা অনেক দূর মেলে দিত রুচিরা, 'দেখ দেখ, প্রায় নিরঞ্জনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে দেখত, ওদিকে একদিন বেড়াতে যাবে?'

'ওদিকে জঙ্গল,' নিরঞ্জন বলত, 'তাছাড়া অনেক দূর—'

'হোক না জঙ্গল, হোক না দূরে—আমাকে নিয়ে অনেক দূরে যেতে তুমি বুঝি ভয় পাও?'

কিন্তু প্রকৃতির শোভার দিকে নিরঞ্জনের চোখ নেই তখন আর। এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকত রুচিরার হাতের দিকে। তার হাতটা এক সময় কাছে টেনে নিত নিরঞ্জন। মুখের কাছে তুলে আনত। দেখুক। চাপা খুশির আভা ছড়িয়ে পড়ত রুচিরা মুখে। হাতের এমন অপূর্ব শ্রী ও আর দেখেছে কখনও।

'এ বালাজোড়া কে দিয়েছে তোমায়?'

শাণিত অস্ত্রের একটা খোঁচায় রুচিরার হাত যেন খসে পড়ত মাটিতে, 'কেন?'

'বড় পাতলা,' নিরঞ্জনের গম্ভীর স্বর বিবর্ণ করে তুলত রুচিরার মুখ, 'একজোড়া ভারী বালা গড়িয়ে নিও তাড়াতাড়ি—'

খুব আস্তে রুচিরা বলত, 'নেব।'

কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর কথার এদিক-ওদিক হয় না। কথা রাখত নিরঞ্জন। রুচিরাকে নিয়ে যেত গয়নার দোকানে। যেটা খুশি বেছে নিক সে। এখন পছন্দ না হলে ইচ্ছে মতো একটা বানাতে দিয়ে যাক। দামের কথা যেন না ভাবে রুচিরা। সেটা নিরঞ্জনের ভাবনা। তারপর একদিন সন্ধ্যায় সাবধানে সেই অর্ডার দেয়া বালাজোড়া পকেটে নিয়ে বাড়ি ফিরত নিরঞ্জন। দুই ঠোঁটের ফাঁকে গর্বিত হাসির ঝিলিক। যন্ত্রের মতো খোলা বাক্সটা এগিয়ে দিত রুচিরার সামনে, 'পরে দেখ—'

তবুও বালাজোড়া ঠেলে ঠেলে পরত

রুচিরা। আয়নার সামনে হাত মেলে নিজেই দেখত। কৌশলে দেখাত নিরঞ্জনকে। একবার ও বলুক, অপূর্ব! কাছে এগিয়ে এসে চোখের উত্তাপ ছড়িয়ে দিক, কী সুন্দর মানিয়েছে!

কিন্তু বোবা নিরঞ্জন। অন্ধ। কাছে এগিয়ে আসতে জানে না। ঠোঁট কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে দম্ভের চোখা চোখা তীর ছুঁড়ে মারতে জানে শুধু, 'পুরো পাঁচ ভরি,' খুক-খুক করে সে হাসত, 'একদিন দেখিয়ে এসো তোমার ছোট মামাকে—আমি নাকি শুধু ব্যবসা করে টাকা ওড়াই, আর কিছু করি না—এখন সোনার দাম উনি জানেন নিশ্চয়ই। এই পাঁচ ভরির বালা আমারই টাকায়—'

সেই দিন প্রথম রুচিরার মনে হয়েছিল কোন্ দাম নেই তার রূপের। কেন সে এই পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত মেয়ে হল না! এই মুহূর্তে জরা আর বার্ধক্য নেমে আসুক তার শরীরের ওপর। দৃষ্টি নিভে যাক। শিথিল হোক শ্রবণ। আর তাল তাল সোনা দিয়ে স্থূলে নিরঞ্জন তার শ্লথ বিকল দেহটা মুড়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তির ক্রূর হাসি হাসুক। কিন্তু তবু আর একজনের সব দম্ভ ভেঙে নিজের স্বাধীন খেয়ালে বেঁচে উঠতে চেয়েছিল রুচিরা—যত উত্তাপ জড়ো করে দৈনন্দিন জীবনের এই স্থূলে ধারাটা ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিল। পুজোর ঠিক আগে আগে। আশাতীত উপার্জনের অহংকারে বিভোর নিরঞ্জন। নতুন অলংকারের কথা প্রায়ই বলে রুচিরাকে। অনেকবার প্রশ্ন করে তার পছন্দ-অপছন্দর কথা জেনে নিতে চায়।

শুধু সোনা আর সোনা,' শরীরের শিথিল একটা ভঙ্গি করে রুচিরা এগিয়ে আসে নিরঞ্জনের কাছে, 'কে চায় অত সোনা? তুমি কি মনে কর আমি এতই সাধারণ যে শুধু গয়না ঝমঝম করে খুশি থাকব?'

'তবে?' কৌতূহল ফুটে ওঠে নিরঞ্জনের চোখে, 'গিনি কিনে রাখতে চাও?'

'না না,' রুচিরা মাথা ঝাঁকায়, 'দূর! ওসব কিছু না—'

'তাহলে?' হঠাৎ যেন বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিরঞ্জন, 'বল শিগগির। নগদ টাকা বেশিক্ষণ কাছে রাখা ঠিক নয়। যা-তা করে খরচ হয়ে যেতে পারে—'

'যায় যাক', তখনও হাসির পাতলা রেখাটা একেবারে মিলিয়ে যায় না রুচিরার ঠোঁট থেকে, 'চল এবার দুজনে কোথাও ঘুরে আসি?'

'কোথায়?' তার কথা যেন বুঝতে পারে না নিরঞ্জন।

'পুরী রাঁচি কিংবা দার্জিলিং,' নিরঞ্জনের আরও কাছে সরে এসে রুচিরা বলে, 'যেখানে হয়—'

কিন্তু নিরঞ্জনের হাসির দমক যেন বিপুল একটা ধাক্কা দিয়ে রুচিরাকে দূরে সরিয়ে দেয়, 'হাওয়া খেয়ে টাকা ওড়াবার সময় কোথায় আমার? আর কোন রোগ ধরেছে আমাদের যে এ এখুনি হাওয়া বদলের দরকার?'

'হ্যাঁ,' দৃঢ়স্বরে রুচিরা বলে, 'কঠিন রোগ ধরেছে আমার। কিন্তু তুমি তা কোনদিনও ধরতে পারবে না? আচ্ছা, আমার কোন ইচ্ছেকে তুমি কি কখনও প্রশ্রয় দেবে না?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে নিরঞ্জন তাকায় তার দিকে, 'প্রশ্রয়?'

ধরা গলায় চিৎকার করে ওঠে রুচিরা, 'আমার কথা তুমি বুঝবে না—বুঝবে না—'

বিরক্ত হয়ে নিরঞ্জন বিড়বিড় করে ওঠে, আশ্চর্য! আরও কিছু হয় তো বলতে যায় নিরঞ্জন, কিন্তু তার বাকি কথা শোনবার ধৈর্য রুচিরার নেই বলে সে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে না।

কিন্তু রুচিরার ধৈর্য না থাক, ধৈর্য আছে নিরঞ্জনের—একটা মানুষের মনের কপাট পুরোপুরি বন্ধ করে তাল তাল সোনার স্তূপ গড়ে তোলার অসীম ধৈর্য। একটা পুরুষের এমন সাংঘাতিক সঞ্চয় লিপ্সার কথা কোনদিনও কল্পনা করতে পারেনি রুচিরা। কিন্তু কার জন্যে আলমারীর তাকে তাকে এত রকম গয়নার বাক্সের ভিড়? কার জন্যে মূল্যবান ধাতুর এই নিঃশব্দ শোভা বিকিরণ? আর নিরঞ্জনের ঠোঁটের ফাঁকে চাপা হাসির ঝিলিক? সব কিছুই তার অসহ্য একক দম্ভ—যেখানে রুচিরার কোন প্রশ্রয় নেই। সোনার কঠিন জাল দিয়ে তাকে যেন পাকে পাকে বেঁধে রেখেছে নিরঞ্জন। হাত মেলা যায় না। পা দোলানো যায় না। বয়সের খুশির উত্তাপে ভেঙে পড়বার উপায় নেই। একটু নড়াচড়া করতে গেলেই আগুনের কড়া তাপের মতো সোনার জালটা ঝাপটা মারে রুচিরার মুখে। আর তখন শহরতলীর হু হু হাওয়া ব্যঙ্গ করে যায় তাকে। রাতের আকাশে জ্বলজ্বলে তারা যন্ত্রণায় হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। শুধু মাঝে মাঝে রুচিরার হাতের চুড়িগুলো ঠুনঠুন শব্দের তরঙ্গ তোলে জেলখানার সর্দার-প্রহরীর সতর্কীকরণের ঘণ্টার মতো। আর এই শৃঙ্খল ঝনঝনা চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দেয়ার জন্যে হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে ওঠে রুচিরা। নিরঞ্জনের দম্ভে অন্ধ চোখ দুটো কঠিন আঙুলের খোঁচায় খুলে দেবার জন্যে প্রায় আভরণহীন হয়ে যায় এক নেমন্তন্নের আসরে। কিন্তু জোড়া জোড়া চোখ ফিরে ফিরে দেখে তার রূপ—তার সুঠাম দেহ অলংকারের আভা যেন ম্লান হয়ে যায়, তা রঙের দ্যুতিতে। এমন দেহকে দিয়ে কী প্রয়োজন রাশি রাশি অলংকারের বোঝা বহন করাবার! অসংখ্য অতিথি সপ্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে-কথাটা বুঝিয়ে দিলেও বাড়ি ফিরে উত্তেজনার প্রবল দাহে নিজেকে সংযত করতে পারে না নিরঞ্জন।

'ছি ছি ছি,' যেন আকণ্ঠ লজ্জায় দেহ কেঁপে ওঠে নিরঞ্জনের, 'এমন দুঃস্থর মতো পাঁচজনের সামনে কেন তুমি যাও? গয়না গুলো তোমাকে কি আলমারীতে সাজিয়ে রাখবার জন্যে গড়িয়ে দেয়া হয়েছে?'

ঝাঁজের বিপুল একটা তোড় যেন বেরিয়ে আসে রুচিরার উষ্মায় বিকৃত মুখ থেকে, 'গয়না পরে কারুর সঙ্গে পাল্লা দেয়ার কথা আমার বাড়ির কেউ কখনও আমাকে শেখায়নি—'

রূঢ়স্বরে নিরঞ্জন বলে, 'সব বাড়ির নিয়ম-কানুন এক নয়। এখানকার ধর একটু আলাদা। বোকার মতো নিজের গোঁ বজায় রাখবার চেষ্টা করলে সুখে ঘর করা যায় না—আর তাতে আমার মানই যা শুধু—'

স্থির দৃষ্টিতে বোধহয় রুচিরা এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে নিরঞ্জনকে। তারপর যেন সংযমের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে থেমে থেমে বলে, 'বেশ। এবার থেকে আমি সুখে তোমার ঘর করব।'

মাটিতে পা ঠুকে খট করে একটা শব্দ তুলে নিরঞ্জন বলে, 'অনেক আগে থেকেই তা করা উচিত ছিল—আশ্চর্য'

আর কারুর মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু হঠাৎ যেন আলমারীর মধ্যে থেকে খনিজ পদার্থের গোপন একটা সঙ্কেত ভেসে আসে। আর একমাত্র নিরঞ্জনই বোধহয় তা অনুভব করে। অন্যজন হাঁপায়। হা স্বীকার করে নেয়। তাকেও যেন তুলে আনা হয়েছে কোন খনির গভীর গহ্বর থেকে সতর্ক প্রসাধনের প্রলেপ বুলিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে শহরতলীর ঠাণ্ডা নির্জনতায়

আর মাঝে মাঝে দম দেয়া পুতুলের মতো ঠেলে দেয়া হচ্ছে এখান থেকে ওখানে। তাই দেয়া হোক। রূপের চেয়ে, জীবনের চেয়ে, প্রাধান্যের গৌরব নিয়ে নিরঞ্জনের মনে ঝলসায় স্থূলে খনিজ পদার্থের সূক্ষ্ম কারুকাজ!

তাই জীবনের সম্পূর্ণতম পাওনার কথা ভেবে আর চোখের জল ফেলে না রুচিরা। মনটা যেন পুড়ে-পুড়ে পাহাড়ে শ্যাওলা-পড়া হিম-পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠেছে। শুধু অনেক রাত অবধি তার ঘুম আসে না। চোখ দুটো কটকট করে। আর মাথার মধ্যে সে যেন একটা ভারী জিনিসের চাপ অনুভব করে। তখন তার একটা হাত আপনি এসে পড়ে কপালের ওপর। আর পাতলা মশারি অল্প অল্প কাঁপিয়ে পাখার হাওয়া তার গায়ে লাগে কিনা—সে বুঝতে পারে না।

কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আবার হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্যে বাঁচবার উদ্দীপনায় মনের একটা ক্ষিপ্র গতি অনুভব করেছিল রুচিরা। হাঁপাতে-হাঁপাতে কাঁচা রাস্তা কাঁপিয়ে এক-একটা বাস যাচ্ছে। অপরাহ্ণের গৈরিক রঙ সবুজ-ফ্যাকাশে আভা বুলিয়ে দিচ্ছে ফাঁকা মাঠ আর ক্লান্ত গাছের শুকনো-হলুদ পাতার ওপর। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার ঝাপটায় তামাটে ধুলোর ঘূর্ণী শহরতলীর আলস্যের ক্লান্তি ভাঙছে। ঠিক তখন নিরঞ্জন এল। এত আগে আসবার কথা ছিল না। আজ কোথাও যাবার কথাও নেই রুচিরার। তাই আশঙ্কার একটা হিম ইঙ্গিত সে যেন হঠাৎ অনুভব করে।

'খুব অবাক হয়ে গেছ না?' হাসিতে যেন উছলে পড়ে নিরঞ্জন, 'বলতো কেন আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম?'

'কেন?' প্রশ্ন করেই পাথরের মূর্তির মতো ওপরে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায় রুচিরা।

'না, তোমার কিছুই মনে থাকে না,' হা-হা করে হাসে নিরঞ্জন, 'আজ আমাদের বিয়ের দিন না?'

আকস্মিক চমকে মুহূর্তে মুখ নামায় রুচিরা। উত্তেজনায় দেহটা কেঁপে ওঠে এক-বার, 'ও!'

'এই যে,' সন্তর্পণে ত্রিকোণ নীল একটা বাক্সের ডালা খুলে নিরঞ্জন বলে, 'এই নেক-লেসটা নিয়ে এলাম তোমার জন্যে—'

যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে সেটা নেয় রুচিরা। কাছের ছোট গোল কাশ্মীরী টেবিলটার ওপর রেখে দেয়। দেখে না। শূন্য চোখে বাইরে তাকিয়ে থাকে'

'পছন্দ হয়নি?'

'হয়েছে!'

'পরবে না?'

ঝুঁকে পড়ে নেকলেসটা তুলে নিয়ে এক মিনিটে গলায় ঝুলিয়ে দেয় রুচিরা। একটু দূরে সরে যায়। ঘরের মধ্যে তখন অল্প অন্ধকার জমা হয়েছে। আরও ঘন হোক। তার চোখের দিকে, গলার দিকে, সারা শরীরের দিকে এখন যেন কিছুতেই না তাকায় নিরঞ্জন। তার দৃষ্টি সহ্য করতে পারবে না রুচিরা। হয়তো ভেঙে পড়বে—কান্নার উত্তেজনায় লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।

কিন্তু নিরঞ্জন আলো জেলে দেয়। এগিয়ে আসে। তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে যেন স্পর্শ করে সেই নেকলেস, 'দেখ, কী সুন্দর কাজ! আমার একার পছন্দ কিন্তু এবার—তা প্রায় হাজারের কাছাকাছি দাম। পরশু গজেন গোস্বামীর বাড়িতে বিরাট ভোজ। সেদিন এটা পরেই যেও তাহলে ওখানে—'

এক-পা এক-পা করে রুচিরা এগিয়ে আসে টেবিলের কাছে। দ্রুত হাতে খুলে ফেলে নিরঞ্জনের দেয়া নবতম অলঙ্কার। কোন কান্না নেই এখন পৃথিবীর কোথাও। মূক পাষাণ বারান্দায় পালিয়ে এসে সে যেন তৃপ্তির একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

চিৎকার করে নিরঞ্জন, 'আশ্চর্য, এটা এমন করে এখানে ফেলে গেলে! এত দামী জিনিস—তুলে রাখ—'

বারান্দা থেকে একটা যন্ত্র যেন বিকল হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে নড়ে ওঠে, 'আলমারীর চাবি ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে—তুমিই তুলে রাখ—'

হাওয়া নেই। রুক্ষ অন্ধকার চিরে-চিরে মাঝে মাঝে গাড়ির আলো ঝলসাচ্ছে। তীক্ষ্ণ কর্কশ হর্ন। তাও বোধহয় রুচিরার কানে যায় না। ক্লান্ত নিরঞ্জন। কিন্তু তার জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করবার কথাটাও হঠাৎ খেয়ালে আসে না রুচিরার। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

রাতের আয়োজন ক্লান্তি ঘুচিয়ে দেবার জন্যেই বোধহয় চৈত্রের থমথমে শেষ প্রহর হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে। হু হু হাওয়ার ক্ষিপ্র বেগ আছড়ে পড়ে হেলানো তালের দেহে আর ভেঙে-পড়া শুকনো পাতা আর্তনাদ করে ওঠে, খড়াস—খড়াস! কিন্তু এখনও নিথর নিরঞ্জন—এখনও স্থূলে তৃপ্তির রেখা তার মুখে।

গতির শিহর রুচিরাকেও কঠিন একটা নাড়া দিয়ে যায়। খণ্ড খণ্ড হয়ে যাক তার দেহ। ছাই হয়ে যাক। আর অলঙ্কারের স্তূপ জড়ো করে একা একাই পড়ে থাক তার স্বামী নিরঞ্জন রায়।

কিন্তু হঠাৎ চমকে বিছানার ওপর উঠে বসে রুচিরা। দপ দপ দপ! সাপের মতো লিকলিক করে ওঠে রঙের ঝিলিক। হাওয়ার দাপটে উত্তাপের কঠিন স্পর্শ গায়ে লাগে। রাঙা হয়ে ওঠে পাতলা নেটের মশারিটাও। নিরঞ্জনকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই যেন জ্বলতে জ্বলতে ঝপ করে এখুনি খুলে পড়বে তার মুখের ওপর।

দিশাহারা জ্বলন্ত কয়েকটা মুহূর্ত। আগুন—বলে চিৎকার করে নিরঞ্জনকে জাগিয়ে দেবার আগেই যেন একটা হিংস্র কুমীর চোখা চোখা লেজের ঝাপটা মেরে রুচিরাকে ঠেলে নিয়ে আসে কয়েক গজ দূরে আলমারীটার কাছে, আর নিরঞ্জন কোথায় হারিয়ে যায়—সে বুঝতে পারে না।

জ্বলন্ত একটা গতি পাল্লা দেয় হাওয়ার সঙ্গে। সোঁ সোঁ একটানা শব্দ। ধোঁয়ার উৎকট গন্ধ। তাপের এক-একটা ঝিলিক ধাঁধা লাগিয়ে দেয় চোখে। কিছু দেখা যায় না শুধু দাউ দাউ আগুনের ভয়ঙ্কর রূপ।

হঠাৎ নিরঞ্জনের অসহায় ডাক আছড়ে পড়ে, 'রুচিরা—'

'এই যে' হাওয়া আর আগুনের ধোঁয়াটে আবরণ ভেদ করে তৎপর রুচিরা সতেজ উত্তর দেয়, 'আমি আলমারী খুলেছি—'

আর্তস্বরে চিৎকার করে নিরঞ্জন, 'তুমি কোথায়? রুচিরা! শিগ্‌গির বেরিয়ে এস—উঃ!'

ধক! ধক! ধক! উত্তাপের প্রচণ্ড উল্লাস ফণা মেলে নাচানাচি করে রুচিরাকে ঘিরে, 'নেকলেস! বালা! এই যে পেয়েছি। কিন্তু আর বাক্সগুলো কোথায়! আমি পাচ্ছি না। ওগো, সব জ্বলে গেল—পুড়ে গেল—'

কঠিন তাপের মুহুর্মুহু ছোবল সহ্য করতে পারে না রুচিরা। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গুমরে ওঠে। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়ে তখুনি আবার উঠে দাঁড়াতে যায়।

'রুচিরা' তীক্ষ্ণ আকুল আর একটা ডাক।

উগ্র আলোর বিদ্যুৎ-রেখায় রুচিরার চোখের সামনে ঝলসে ওঠে নিরঞ্জনের উত্তেজনা থরোথরো লালচে মুখ। দুজনেই মুহূর্তের জন্যে দেখতে পায় দুজনকে। আর অন্ধ উন্মত্ত নিরঞ্জন আগুনের মতোই যেন ছুটে আসে রুচিরার কাছে। প্রাণপণ শক্তিতে তার দৃঢ় মুঠি শিথিল করে দূরে ছুঁড়ে দেয় ধিক ধিক জ্বলা-নেভা ছোট বড় বাক্স। তার-পর আগুনের কড়া আঁচের মধ্যেই দুঃসাহসের বিপুল উন্মাদনায় কাঁধে তুলে নেয় রুচিরার পোড়া-পোড়া উষ্ণ দেহ।

বাইরে বেরিয়ে আসে নিরঞ্জন। একবার এদিকে তাকায়। একবার ওদিকে। ফেণা-ওঠা অশ্বের গতিতে সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। তরতর করে নিচে নামে।

কিন্তু নিরঞ্জন বুঝতে পারে না যে, আগুনের ভয়ঙ্কর তাপ ছাড়িয়ে আর এক মধুর উত্তাপের স্বাদ জীবনে প্রথম পায় রুচিরা। আর সে দেখতেও পায় না সব যন্ত্রণা তুচ্ছ করে তার ঠোঁটে হাসির একটা রেখা ফুটে ওঠে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিরঞ্জন শুধু রুচিরার অস্ফুট গুঞ্জন শোনে, 'আমাকে বাঁচাও!'

॥ বিশ্বকোষের গোড়ার কথা ॥

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

য় চল্লিশ-প'য়তাল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা। বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে বীরভূমের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের কাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তখনকার দিনে লাভপুরের নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব নাম। খ্যাতনামা নাট্যকার, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, ধনীসন্তান, বিনয়মধুর ব্যবহার, সাহিত্যিকগণের বন্ধু। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বীরভূমের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম দাঁড়কা এবং দাঁড়কার পাশে "লাঘোসা" গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, একটি সমাধিফলকে লেখা আছে—

"ওঁ তারা
দয়াসিন্ধু র্মহাযোগী বিশ্বকোষ প্রবর্তকঃ।
জীয়া চ্চিরং রঙ্গলালো হৃদয়ে বিশ্ববাসিনাম্॥
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়
আবির্ভাব গ্রাম রাহুতা জেলা ২৪ পরগণা
২৪শে আষাঢ় ১২৫০
তিরোভাব ১৭ই কার্তিক ১৩১৬ বঙ্গাব্দ
ঘটস্থ যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেহপি তা দৃশম্।
নষ্টে দেহে তথেবাত্মা সমরূপো বিরাজতে॥"

নির্মলশিবের মুখে রঙ্গলাল ডাক্তারের অনেক কথা শুনিলাম। গ্রামের প্রবীণ লোক কয়েকজন তাঁহার ডাক্তারির বিশেষ সুখ্যাতি করিলেন। শুনিলাম, তিনি ভাল লেখক ছিলেন, মুখে মুখে কবিতা বাঁধিতে পারিতেন। নির্মলশিব রঙ্গলালকে বহুবার দেখিয়াছেন। রঙ্গলাল এক সময় লাভপুরেও চিকিৎসা করিতে আসিতেন।

আমার মনে একটা খটকা লাগিল। আমাদের বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ই তো 'বিশ্বকোষে'র সম্পাদক। কোন্‌দিন তিনি সে কাজ শেষ করিয়াছেন। এখন আবার হিন্দী বিশ্বকোষ ছাপিতেছেন। সে কাজও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তবে রঙ্গলাল কীরূপে বিশ্বকোষ-প্রবর্তক হইলেন? আমি লাভপুরে ফিরিয়া তথা হইতেই কলিকাতা রওনা হইলাম। কলিকাতায় প্রথম প্রথম হেতমপুর-রাজের রিপন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়া উঠিতাম। ইদানীং বিশ্বকোষ প্রেসের উপরতলায় থাকি। নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রঙ্গলালই বিশ্বকোষের প্রবর্তক। 'কঙ্কাবতী' 'খাঁদা ভূত' প্রভৃতি গ্রন্থের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ রঙ্গলালের সহোদর ভ্রাতা। ত্রৈলোক্যনাথও তাঁহাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপানো আছে।

'বঙ্গভাষার লেখক' একখানি সংগ্রহ করিলাম। বঙ্গবাসীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী বরদাপ্রসাদ বসুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। বঙ্গবাসী কার্যালয়ে বসিয়া বসিয়া বঙ্গবাসীর পুরানো ফাইল ঘাঁটিলাম। রঙ্গলালের অনেক কবিতা, পাদপূরণে মুখে-মুখে-রচিত কবিতা সংগ্রহ করিলাম। আশ্চর্য কবিত্বশক্তি ছিল রঙ্গলালের। একটা কবিতা দেখিলাম—যতদূর মনে আছে গোড়ার অক্ষর ধরিয়া পড়িয়া গেলে রাখালের উক্তি, মাঝের অক্ষরের হিসাবে পাওয়া যাইবে জননী যশোদার উক্তি। কবিতাটি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, নেহাৎ ছোটও নহে। কবিতাগুলি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, 'বীরভূম বিবরণ' দ্বিতীয় খণ্ডে গুটি দুই ছাপা আছে।

জীবনী সংগ্রহ করিয়া রঙ্গলালের একখানি ছবির জন্য ছুটিলাম রাউতা গ্রামে। শ্যামনগর স্টেশনে নামিয়া রাউতা অনেকখানি পথ। পথের দুই ধারে বন, বাঁশের বন,
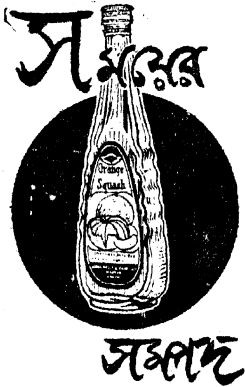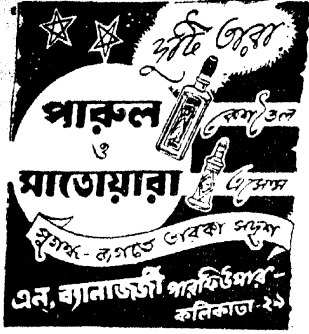
দিনেই সূর্যের আলো সাবধানে প্রবেশ করে। গ্রামে গিয়া বিশেষ কোন খবর পাওয়া গেল না। রঙ্গলালের পুত্রাদি ছিল না। অপর ভাইদের বংশধর ছিলেন। তাঁহাদের নিকট এইটুকু জানা গেল, ভবানীপুরে চন্দ্রনাথ চাটুজ্জের স্ট্রীটে সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট রঙ্গলালের একখানি তৈলচিত্র আছে। ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। শ্যামনগর স্টেশনে চিঁড়া গুড় ছাড়া কোন খাবার মিলিল না। পরদিন সুধীরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তৈলচিত্রখানি সংগ্রহ করিলাম। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী কে ভি সেন তাহা হইতে একখানি ছবি তুলিয়া ব্লক তৈরি করিয়া দিয়াছিলেন। 'বীরভূম বিবরণ' ২য় খণ্ডে রঙ্গলালের ছবি ছাপা আছে।

রঙ্গলালের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। সংক্ষেপে লিখিতেছি। ইঁহারা খড়দহ মেলের কুলীন, কামদেব পন্ডিতের সন্তান, এই বংশ "ত্রিকুল থাক্" নামে পরিচিত। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে মুখোপাধ্যায়-বংশের একজন পূর্বপুরুষ নাম শ্রীনন্দন মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের এক নীচকুলোদ্ভবা ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিয়া সমাজে পতিত হন, কুল কলঙ্কিত হয়। শ্রীনন্দনের এই বিপদে বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার দুই বন্ধু আসিয়া অভয় দান করেন। তিনজনে ত্রিবেণীর ঘাটে গিয়া গঙ্গাজল স্পর্শপূর্বক শপথ গ্রহণ করিলেন—

(১) আমাদের এই তিন বংশেই পরস্পরের পুত্রকন্যার বিবাহকার্য সম্পাদিত হইবে।

(২) একান্ত প্রয়োজন ভিন্ন কেহ একটির অধিক বিবাহ করিতে পারিবে না।

(৩) পুত্রকন্যার বিবাহে অর্থের আদান-প্রদান রহিত হইল। পুত্রের বিবাহে কেহ জোড়া ধুতি ও একটি টাকা দক্ষিণার অধিক গ্রহণ করিলে তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।

রঙ্গলালের কনিষ্ঠ সহোদর ত্রৈলোক্যনাথ কিন্তু চারিটি বিবাহ করিয়াছিলেন, অবশ্য বিনাপণে। রাউতায় গিয়া শুনিলাম, তখনও তাঁহারা এই প্রথা মানিয়া চলিতেছেন।

রঙ্গলালের পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম ভবসুন্দরী দেবী। রঙ্গলালের আরও পাঁচটি সহোদর ছিলেন, সর্বকনিষ্ঠ রাজেন্দ্র সতের বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। বাল্যকালে রঙ্গলালের লেখাপড়া শিক্ষার কোন সুযোগ ঘটে নাই। গুরু মহাশয়ের পাঠশালে হাতে-খড়ি, তাহার পর গ্রামের ইংরাজী-বাংলা বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। শেষ মানভূম-পুরুলিয়ায় খুল্লতাত শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে গিয়া সামান্য ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলাম। বিদ্যালয়ের শিক্ষা এই পর্যন্ত। কারণ এই সময় পিতামাতা উভয়ের পরলোকগমনের পর রঙ্গলালকেই সংসারের ভার গ্রহণ করিতে হয়। তাহার প্রথম চাকুরি বালির পশ্চিমস্থিত বলুটি গ্রামের ইংরাজী-বাংলা বিদ্যালয়ে, এখানে তিনি ইংরাজীর শিক্ষকতা করিতেন। ১২৭০ সালে রঙ্গলাল সাহিত্য ও গণিতের শিক্ষকরূপে চন্দননগরে বদলি হন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়, পত্নী বৈদ্যবাটীর লক্ষ্মীনারায়ণ পন্ডিতের কন্যা—নাম জ্ঞানদা দেবী।

বিবাহের পর তিনি উৎকট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। সৌভাগ্যক্রমে ম্যালেরিয়া সারিল, কিন্তু প্লীহা-যকৃতের উপসর্গ তাঁহার শরীরকে শীর্ণ করিয়া তুলিল। রোগে ভুগিয়া রঙ্গলাল চিকিৎসক-বন্ধু রমণচন্দ্র সাধুর এবং ডাঃ আই হ্যাণ্গার্ডের নিকট অ্যালোপ্যাথি শিখিলেন। এই সময় কলিকাতার প্রথম এবং প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত বায়ু পরিবর্তনের জন্য চন্দননগরে আসিয়া বাস করেন। খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ বেরিনী সাহেব মাঝে মাঝে রাজেন্দ্র দত্তের বাসায় আসিয়া দুই-চারিদিন থাকিতেন। রঙ্গলাল ইঁহাদের নিকট হোমিওপ্যাথি শিখিয়াছিলেন। রঙ্গলালের আর-একজন বন্ধু ছিলেন ধন্বন্তরী-কল্প কবিরাজ লোকনাথ কবিরঞ্জন। কবিরঞ্জন মহাশয় রঙ্গলালকে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। চন্দননগর হইতে তিনি ইছাপুর স্কুলের পন্ডিত নিযুক্ত হইয়া যান। কিন্তু ম্যালেরিয়ার তাড়নায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। কলিকাতায় থাকাকালে তিনি টাঁকশালে পয়সা কাটিবার ঘরে এবং পয়সায় ছাপ দিবার ঘরে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। অতঃপর জ্বরের জ্বালায় তিনি গাজিপুরে জ্যেঠা মহাশয় মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের বাসায় চলিয়া যান। গাজিপুরে পা দিয়াই জ্বর গেল, প্লীহা-যকৃতের উপসর্গ গেল। রঙ্গলাল সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পুলিসে চাকুরি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সে কার্য পছন্দ হইল না, কাজেই ছাড়িয়া দিলেন।

সংসারের তখন অত্যন্ত দুরবস্থা, সংসার আর চলে না। এমন সময় ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায় বীরভূমের স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টার ছিলেন। তিনি রঙ্গলালকে বীরভূম জেলার দাঁড়কা গ্রামের ইংরাজী-বাংলা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। রঙ্গলাল তখন গেরুয়া আলখাল্লা পরিতেন, সন্ন্যাসীর বেশ। দাঁড়কা ভাল লাগিল, কিন্তু স্কুলের অবস্থা এবং আর্থিক ব্যবস্থা ভাল না থাকায় তিনি বাঁকুড়া জেলায় মালিয়াড়ার রাজকুমারের গৃহশিক্ষকতা করিতে গেলেন। নানা কারণে সেখানেও

থাকিতে পারিলেন না, পুনরায় দাঁড়কায় ফিরিয়া আসিলেন। সেই তাঁহার সৌভাগ্যের সূচনা।

বাংলা ১২৭৮ সাল। দাঁড়কা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইবার আশঙ্কা দেখা দিল। রঙ্গলাল শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। এই সময় কুইনাইন আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু দাম অনেক। তিনি দমিলেন না। ধারকর্জ করিয়া কুইনাইন কিনিয়া পরিপূর্ণ উদ্যমে চিকিৎসা চালাইয়া চলিলেন, এবং দুই হাতে টাকা কুড়াইতে লাগিলেন। রঙ্গলালের কল্পনাতীত অর্থ, তিনি প্রচুর অর্থের অধিকারী হইলেন।

গাজিপুরে অবস্থিতিকালে তিনি সেখানকার জমিদার ও পণ্ডিত ঠাকুরদাস দত্তের নিকট পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর কিছু কিছু অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল ঠাকুর দত্তের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের মল্লিনাথ-কৃত টীকা দেখিয়াছিলেন। কানপুরে বৃদ্ধ মন্নুলাল শাস্ত্রীর নিকট সংস্কৃত অধ্যয়নকালে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞানেশ্বরী টীকার সন্ধান পাইয়াছিলেন। কানপুরের নিকটবর্তী ব্রহ্মাবর্তের পণ্ডিত গিরিজা দত্ত শাস্ত্রী, নয়াগাঁয়ের বৃদ্ধ মন্নুলাল ও যুবক মন্নুলাল তাঁহাকে সিদ্ধান্তকৌমুদী, বামন জয়াদিত্যের কাশিকা, কাত্যায়ন বররুচি-কৃত বার্তিক, পতঞ্জলীর মহাভাষ্য এবং বিবিধ পুরাণ ও কাব্য-নাটকাদি অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই বিদ্যানুরাগই রঙ্গলালকে বিশ্বকোষ অভিধান সংকলনের প্রেরণা দান করে। দাঁড়কায় প্রচুর অর্থ সংগ্রহপূর্বক তিনি কলিকাতায় একটি ছাপাখানা করেন। ইহা বাংলা ১২৯০ সালের কথা। কলিকাতায় অনেক লোকসান দিয়া ছাপাখানা তিনি রাউতায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাউতা গ্রামেই বিশ্বকোষ প্রকাশ আরম্ভ হয়। অভিধানের প্রথম ভাগ শেষ করিয়া তিনি যখন দ্বিতীয় ভাগ ছাপিতেছিলেন, সেই সময় নগেন্দ্রনাথ বসু আসিয়া বিশ্বকোষের ভার গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রঙ্গলাল তাঁহাকে অভিধানের মুদ্রিত খণ্ডগুলি সহ সর্বস্বত্ব দান করেন। বিশ্বকোষের "অ" অংশ শেষ এবং "আ" আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই রঙ্গলালের নিজের রচিত। "অভাব" প্রবন্ধ নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিনাথ তর্করত্নের লেখা। অঙ্কুর এবং অণুবীক্ষণ প্রবন্ধ শ্রীশচন্দ্র দত্ত এম-এ সংকলন করিয়া দিয়াছিলেন। দুইটি প্রবন্ধই রঙ্গলাল নিজ ভাষায় লিখিয়া লইয়াছিলেন। "অথর্ব" প্রবন্ধের অনেক অংশ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের সংকলিত। অসম্পূর্ণ অংশ সহ সমগ্র প্রবন্ধ রঙ্গলালের রচনা। তাঁহার 'হরিদাস সাধু' পুস্তক কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ রাউতায় বাহির হইয়াছিল। রঙ্গলাল-রচিত পুস্তকগুলির নাম— 'শরৎশশি,' 'বিজ্ঞানদর্শক,' 'চিত্তচৈতন্য উদয়', এবং 'বৈরাগ্য বিপিন বিহার'। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপচান্দ রঙ্গলালকে "কাব্যরত্নাকর" উপাধি দিয়াছিলেন।

ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল মহাশয় মাঝে মাঝে চন্দননগরের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন। রঙ্গলাল যখন চন্দননগরে শিক্ষকতা করিতেন, সেই সময় অবসরকালে তিনি প্রায়ই রাজা বাহাদুরের সংগে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। রঙ্গলালের

তখন কতই বা বয়স! একদিন ঘোষাল মহাশয়ের সভায় কলিকাতা ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবি গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। রঙ্গলাল গিয়া যোগদান করিলেন। ঘোষাল মহাশয় পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন "সুকবি"। গোপালচন্দ্র অমনি একটি গান রচনা করিয়া সভাস্থ গায়ককে গাহিতে বলিলেন। গানটির প্রথম ছত্র "রাই কালো তোমার কিসে ভাল লাগে। ছি-ছি রাই কালো তোমার কিসে ভাল লাগে"। 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় গানটি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। 'বীরভূম-বিবরণ' ২য় খন্ড প্রকাশের পর "লাঘোষা" অঞ্চলের একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব ভিখারীর মুখে একটি গান শুনিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। বৈষ্ণব রঙ্গলালের রচিত প্রতি-উত্তর গানটিও গাহিয়াছিলেন। আমার সেই জন্য বিশ্বাস জন্মে সংগৃহীত গানটিই গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গান। হয়ত রঙ্গলালের নিকট হইতে দুইটি গানই বৈষ্ণব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঘোষাল মহাশয়ের আদেশে গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানটি গায়ক গাহিলেন। আমার সংগৃহীত গানটি এইরূপ—

"রাইলো তোমার কালো কিসে ভাল লাগে।
কালোবরণ বাঁকাগড়ন কুব্জ মজালি তার সোহাগে॥
চম্পক যিনি তোমার বর্ণ তুলনা যার হয় না স্বর্ণ
খুঁজে দেখ তন্ন তন্ন, কার লাবণ্য তোমার আগে॥
শ্যাম কি সখি তোমার তুল্য কোন্ গুণে তার এত মূল্য
কি দেখে তোর নয়ন ভুলল মরলি কালোর অনুরাগে।"

ঘোষাল মহাশয় রঙ্গলালকে বলিলেন, "আপনাকে এখনই ইহার একটি উত্তর রচনা করিয়া দিতে হইবে। রঙ্গলাল সংগে সংগে গান রচনা করিয়া দিলেন—

"কালোর রূপে জগৎ আলো।
আমার শ্যামের রূপে জগৎ আলো॥
সে হয় কুৎসিত কিসে মনে যারে লাগে ভাল।
ভালবাসার অনুরাগে ভালবাসায় ভাল লাগে
ভালবাসার ভাল সবই কালোকে না লাগে কালো।
নিয়ে আমার যুগল আঁখি শ্যামের পানে চাহ দেখি
ভাল লাগে কি কালো লাগে আমার চোখে দেখে বল॥"

বিশ্বকোষের ভার নগেন্দ্রনাথ বসুকে দিয়া রঙ্গলাল নিশ্চিন্তচিত্তে লাঘোষায় ফিরিয়া আসিয়া চিকিৎসাকার্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি বরাত দিয়া নিজ দেহের উপবেশন-উপযোগী ছোটখাটো একখানি পাল্কি তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। পাল্কির প্রবেশ-দ্বারেরও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। এই পাল্কিতে চড়িয়া ডাক্তার রঙ্গলাল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যাইতেন। দাঁড়কার আশেপাশের পাঁচ-সাত ক্রোশ দূরের বড় বড় লোকদের বাড়ির তিনি বাঁধা চিকিৎসক ছিলেন। হেতেমপুর-রাজ রামরঞ্জন চক্রবর্তী দাঁড়কার রায়-পরিবারে বিবাহ করিয়াছিলেন। রানী পদ্মসুন্দরী স্বামী-পুত্র লইয়া মাঝে মাঝে দাঁড়কায় নিজ বাস-ভবন রামনিকেতনে আসিয়া কিছুদিন থাকিয়া যাইতেন। রঙ্গলালও মাঝে মাঝে হেতমপুর-রাজবাড়িতে গিয়া দুই-দশদিন কাটাইয়া আসিতেন। রাজ-পরিবারের সংগে রঙ্গলালের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

১২৭৯ সালের ১৪ আশ্বিন রাজকুমারী ভূপবালার জন্ম হয়। ১২৮৮ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে চব্বিশ পরগনা গোবরডাঙ্গার জমিদার অন্নদাপ্রসাদের তৃতীয় পুত্র জ্ঞানদা-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সংগে ভূপবালার বিবাহ হইয়াছিল। জ্ঞানদাপ্রসন্ন উত্তরকালে সুদক্ষ শিকারীরূপে নাম কিনিয়াছিলেন। ভূপবালা বহুদিন শ্বশুরবাড়ি যান নাই। জ্ঞানদাপ্রসন্নও দীর্ঘদিন শ্বশুরবাড়ি আসেন নাই। ইহারই মাঝখানে ভূপবালা পাথরী ব্যাধিতে অসুস্থা হইয়া পড়েন। কলিকাতার ডক্তারেরা পরীক্ষার পর অস্ত্রচিকিৎসার পরামর্শ দেন। অস্ত্রচিকিৎসায় বাধা দিয়া রঙ্গলাল বলেন, আমি ঔষধ খাওয়াইয়াই রাজকুমারীকে নিরাময় করিয়া দিব, এবং আমার চিকিৎসার পর তাঁহার গর্ভধারণের ক্ষমতা জন্মিবে। সে বোধ হয়—সন ১৩০৭ সালের কথা। এই উপলক্ষ্যে রঙ্গলাল কিছুদিন হেতমপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহার চিকিৎসার পর কলিকাতার ডাক্তারেরা যখন পরীক্ষা করিয়া বলেন রাজকুমারী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তখন রঙ্গলাল দাঁড়কায় ফিরিয়া যান।

বাংলা ১৩১২ সাল, রাজা রামরঞ্জন সপরিবারে দাঁড়কায় আসিয়াছেন। কয়েকদিন পর এক জ্যোতিষী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্যোতিষী আপনাকে দ্রাবিড়দেশীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন। তিনি রাজকুমারী ভূপবালাকে দেখিয়াই বলিলেন, ইহার স্বামী নিজ বাড়িতে, বহুদিন এখানে আসেন নাই। আমি যজ্ঞ করিয়া পূর্ণাহুতির দিনেই জামাতাকে এখানে আনিয়া দিতে পারি। যজ্ঞ সমাপ্তির সাত দিন মধ্যেই রাজকুমারী গর্ভবতী হইবেন। রাজকুমার মহিমা-নিরঞ্জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এবং অপর সকল কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু রঙ্গলালের সুদৃঢ় সমর্থনে রানী পদ্মসুন্দরী এবং রাজা রামরঞ্জন জ্যোতিষীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রঙ্গ-লাল কাশীধামে একজন পরমহংসের নিকট গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে কোন এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে তারামন্ত্রে দীক্ষাদান করেন। জ্যোতিষী যজ্ঞের ফর্দ করিয়া দিলেন। বরাতমত জিনিসপত্র সংগৃহীত হইল, জ্যোতিষী যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, দিবারাত্রির জন্য যজ্ঞক্ষেত্রে

চতুর্দিকে সজাগ প্রহরী মোতায়েন রহিল। আশ্চর্যের বিষয় দুই দিন যজ্ঞের পর তৃতীয় দিনে পূর্ণাহুতির সময় জামাতা জ্ঞানদাপ্রসন্ন দাঁড়কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেকালে দাঁড়কায় আসিবার কোন সুগম পথ ছিল না। যজ্ঞের দ্বিতীয় দিনে জ্ঞানদাপ্রসন্ন হেতমপুর রাজবাড়িতে আসেন। সেখানে কেহ নাই দেখিয়া ম্যানেজারকে বলিয়া হেতমপুর হইতে দাঁড়কা প্রায় কুড়ি ক্রোশ পথ ঘোড়ার গাড়ির ডাক বসাইবার ব্যবস্থা করেন এবং তৃতীয় দিনে সেই ঘোড়ার গাড়িতে দাঁড়কায় গিয়া উপস্থিত হন। জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইয়াছিল। সন্তান-সম্ভাবনার পর ভূপবালাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতায় ১৩১৩ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে ভূপবালা এক কন্যাসন্তান প্রসব করেন। দুঃখের বিষয়, রানী পদ্মসুন্দরীর দৌহিত্রীমুখ সন্দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই। ভূপবালার কন্যা-প্রসবের দুই দিন পরই ৫ই অগ্রহায়ণ মধ্য-রাত্রিতে পদ্মসুন্দরীর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সমধিক দুঃখের বিষয় কয়েকদিনের ব্যবধানে ১৯শে অগ্রহায়ণ ভূপবালাও লোকান্তরিতা হন। কন্যা আশালতা তখন একুশ দিনের শিশু।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বীরভূমে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বীরভূমের নানাস্থানে হরিসভা ও ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রঙ্গলাল দাঁড়কায় একটি ধর্মসভা স্থাপন করেন, এই সভায় বঙ্কিম-চন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র অত্যন্ত সমাদর হইয়া-ছিল। দাঁড়কার জমিদারবংশীয় দুর্গাদাস রায় ভাল গান গাহিতে পারিতেন। রঙ্গ-লালের রচিত গানগুলি তিনি ধর্মসভায় এবং বিভিন্ন মজলিসে গাহিতেন। রঙ্গলাল অসংখ্য গান রচনা করিয়াছিলেন। সেকালের ভিখারীরা এবং সিধল গ্রামের বাজিকরের দল রঙ্গলালের গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। ধর্মসভার জন্য রচিত একটি গান—

"অকূলে পারের অর্থ ছিল নাহে ভক্তাধীন।
মন প্রাণ বান্ধা দিয়ে চরণে লইনু ঋণ॥
এ ধারে উদ্ধার পাব কিম্বা চিরঋণী রব
এই চিন্তা করে করে হইলাম বোধহীন॥
সাধ নাহি হয় চিত্তে মন প্রাণ ফিরে নিতে
ঋণের দায়ে বন্দী রব তব পাশে চিরদিন॥
এ ঋণে না আছে শান্তি খাতকের পাতক নাস্তি
রঙ্গলাল তাই ভাবিয়ে পরিশেষে উদাসীন॥"

দাঁড়কার পঞ্চানন রায় এবং মহাতাপচন্দ্র রায় রঙ্গলালের সমস্যাপূরণের কবিতাগুলি দ্রুতহস্তে লিখিয়া লইয়া 'এডুকেশন গেজেটে' পাঠাইয়া দিতেন। স্বয়ং ভূদেবচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় রঙ্গলালের কবিতার অনুরাগী ছিলেন। স্কুলপরিদর্শকের চাকুরি লইয়া তিনি দাঁড়কায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশংসা [illegible] রঙ্গলাল বহু কবিতা রচনা করেন। 'বঙ্গভাষার লেখক' হইতে দুইটি মাত্র কবিতা তুলিয়া দিতেছি। ভূদেবচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন—"গোদ হয়নি চুলে"। রঙ্গলাল সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

"সুন্দরে দেখিয়া যত পুরনারী দলে।
নিজ নিজ পতি নিন্দা করিছে সকলে॥
এক ধনী কহে সই কি কহিব দুখ।
বিধাতা আমার প্রতি বড়ই বিমুখ॥
গোদা পতি বাম বিধি দিলেন আমায়।
গোদের ভরেতে মম প্রাণ সদা যায়॥
নাকে ঝোলে লম্বা গোদ যেন পাড় শশা।
কানেতে ঝুলিছে গোদ বাবুয়ের বাসা॥
চোখে গোদ দাঁতে গোদ গোদ গ্রন্থিমূলে।
সত্যপীরে সিন্নি মেনে গোদ হয়নি চুলে॥"

ভূদেবচন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"ঠেঁটি পাঁচহাতি"। রঙ্গলাল উত্তর দিলেন—

"বেশ্যার ভাগ্যে জোটে সাচ্চা শাড়ি বেনারসী।
স্ত্রীর ভাগ্যে মুখঝামটা গালি রাশি রাশি॥
ঢুলির ভাগ্যে শাল দোশালা ছালা ছালা মেলে।
ছেলের ভাগ্যে জোটে কানি কাঁদিয়া ককালে॥
ঠাকুরের ভাগ্যে জোড়া মণ্ডা আর ঠটে কলা।
খাজা গজা পোলাও কোপ্তা ইয়ারের বেলা॥
খেমটার ভাগ্যে মণি মতি জোটে নানা জাতি।
পুরুতের ভাগ্যে ঘষা পয়সা ঠেঁটি পাঁচহাতি॥"

দাঁড়কার পঞ্চানন রায় একদিন প্রশ্ন দিয়া ছিলেন—হাতের বাঁশীটি কেন হইল সরল—

"একদিন হাসি হাসি শশি মুখীরাই।
কহিলেন শুনে শুনে প্রাণের কানাই॥
লইয়া বাঁকার হাট ওহে নটরাজ।
আগমন করিয়াছ এই ব্রজ মাঝ॥
ললাটে অলকা তব বাঁকাভাবে আঁকা।
চরণে নূপুর পর তাও শ্যাম বাঁকা॥
শিরে শিখীপুচ্ছ চূড়া বাঁকা হয়ে রয়।
সকলি তোমার বাঁকা সোজা কিছু নয়॥
বাঁকা আঁখি বাঁকা ঠাম বাঁকাই সকল।
হাতের বাঁশীটি কেন হইল সরল॥"

রঙ্গলাল জীবনান্তে আপনাকে দাহ করিতে নিষেধপূর্বক শবদেহ সমাধি দিবার আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। সমাধিফলকে লিখিত শ্লোক নিজেই রচনা করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। উদ্যোক্তাগণ মৃত্যুর সন তারিখ পরে বসাইয়া দিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার কয়েক সহস্র টাকাই মজুত ছিল।

রূপসী আমার

দেবেশ দাশ

কটা নতুন ধরণের প্রেমের গল্প।

নতুন ধরণের প্রেমের সৃষ্টি। ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে। অধরে মধুর হাসি দেখিলে আনন্দে ভাসিনে। অধরকে ধরতে পর্যন্ত চায়নি এই নায়ক তার অধরের স্পর্শের মধ্যে। কেমন-তরো প্রেমের কাহিনী হল তবে?

এই গল্পের নায়কের মনে কখনো জাগেনি কবির সেই পরম প্রাপ্তির বাণী। "তুমি মোরে করেছ সম্রাট"। অথবা প্রত্যেক কিশোরের স্বপ্নে মাখা সাধ যে একদিন প্রেমের অভিষেক হবে জীবনে। অথবা যৌবনের সিংহদ্বারে এসে প্রত্যাশার বিলাস যে কোন যাদুমন্ত্র বলে, সোণার কাঠির ছোঁয়ায় সেই দ্বার খুলে যাবে দুটি কাঁকণ পরা হাতের আবাহনে।

কিন্তু, যাই বলুন, চোখের সামনে যা ঘটতে দেখলাম তাকে কিছুতেই প্রেম বলা যায় না। সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ব্যাপার। অল্প বয়সে সংস্কৃতে পড়েছিলাম যে প্রেমিকার মধ্যে গৃহিণী সচিব সখা মিত্র প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ পেতে পারি। কিন্তু বিলেতে এই যে কান্ডটা চোখের সামনে ঘটতে দেখছি তার মধ্যে গৃহিণী নয়, সচিব নয় সখাও নয়—এই মেয়েটা যে কি তার হদিশ পাই না। প্রিয় শিষ্যা ললিত কলাতেও নয়। যেন বেত উঁচিয়ে আইবুড়ো বুড়ো পটল-ডাঙ্গার পটলীকে শাসাচ্ছে যে তুমি স্বপ্ন-লোকের পদ্মাবতী হতে শেখ।

এটা আবার একটা প্রেম হল না কি? হ্যাঁ, আমি অবশ্য বলি না যে স্কুল-মাস্টার বা পড়তে পড়তে চোখে চালসে পড়া অধ্যাপকের মনে তার পরিবারের জন্য প্রেম, থুড়ি, টান থাকবে না। বলি না যে তার বিগত যৌবনের মধ্যে সেঁধোলে সেখানে হঠাৎ কোন অনাগত প্রেমের আগাম পরশ খুঁজে পাব না। আমা-দের আটপৌরে জীবনের কাণা গলিতে শাক-চচ্চড়ী আর ধার টানাটানির টানাপড়েনের মধ্যেও কেমন করে জানি হঠাৎ হঠাৎ প্রেমের ছবি ফুটে ওঠে। আবার রামধনুর মত রঙের খেলা দেখাতে না দেখাতে মিলিয়েও যায়।

বিলেতের সেণ্ট্রাল হীটিং করা আরামের মধ্যে গা ঢেলে দিয়ে বাংলা সাহিত্যে এমন রামধনুর প্রচুর নজীর মনে পড়ল। শুধু পুঁথির পাতায় কেন, পথের উপরেও এমন অনেক নজরে পড়েছে সে কথাও মনে হল।

কিন্তু এই প্রেমের গল্পের নায়ককে দেখে আপনি কখনো প্রেমিক বলে সন্দেহও করবেন না। হ্যাংলা হাড়-জিরজিরে চেহারা। বয়স দু কুড়ি সাত কবে পেরিয়ে গেছে। কুঁজো হয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি চলেছেন বাজারে। চাইছেন চালসে পড়া চাউনিতে—যেন চোখে পুরো চশমা আঁটলেও শানাবে না।

তার নজরে পড়ল এক অল্পবয়সী ফুল-ওয়ালী। তার কিশোরী রূপ কারো মনে কোন সুর গুঞ্জন তুলবে না। তাকে সুন্দরী বলতে বাধবে। শুধু তরুণী এই বর্ণনা দিলেও আপনার মনে যে রঙ খেলে যাবে তেমন ভরসা নেই। তার বয়সটাই শুধু অল্প, আর কিছু নয়। নেই কোন যাদু তার চলনে বলনে; নেই রুচি বা রঙ তার বসনে ভাষণে। কলকাতার আমপট্টির পাশে কোন গরীব ঝিয়ের ঝিয়ারী, যদি ফুল ফেরী করে বেড়ায় তাহলে যে দৃশ্য হবে তারি বিলেতি সংস্করণ।

আমার নায়ক এ হেন ফুলওয়ালীকে পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে পংকজ সৃষ্টি করতে চাইলেন। বাজে আর বদলোকের ভিড়ে বাজারের মধ্যেই তিনি বাজী ধরলেন এক বন্ধুর সঙ্গে যে এ হেন দুর্বাসা মার্কা বস্তীর মেয়েকেও তিনি সোসাইটির সেরা মণি করে তুলতে পারবেন। মুখপুড়ীকে বানাবেন মেনকা; পাঁচীকে পাখনাকাটা পরী।

তখন অধ্যাপকের নিখুঁত ইংরেজী উচ্চারণ আর নিখাদ নিরাসক্তির মধ্যে তার ওই চোঙ্গার মত সরু বুকে আর কোন অনুভব বাসা বাঁধে নি। শব্দতত্ত্বের অধ্যাপক অবশ্য নিখুঁত কথা বলবেন, কিন্তু তার নির্মমতার মানে পেলাম না। তিনি মেয়েটার জংলী বাপকে ডাকিয়ে এনে মেয়ের সামনেই বোঝাতে লাগলেন কেন তিনি ওকে নিজের বাড়িতে এনে সভ্যতার পালিশ দিতে চান। অত্যন্ত অশ্রদ্ধা অপমানের ভঙ্গিতে আঙ্গুল তুলে মেয়ে এলিজাকে লক্ষ্য করে বাপকে বললেন,—তোমার ওই ঘোড়ার ল্যাজের মত চুলওয়ালী নর্দমাবাসিনী মেয়েকে রাজরানীর মত বানিয়ে দিতে চাই।

চতুর বাপ নিচের ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে রাজী হয়ে চলে গেল।

বস্তীর বাসিন্দারা বাকীটা আঁখির ঠারে ঠারে পরস্পরকে খোলাখুলি বুঝিয়ে দিল।

দূর থেকে এসব কাণ্ডকারখানা দেখে আমি একেবারে থ।—এ কি অত্যাচার রে বাবা! পটলডাঙ্গার পটলীকে পদ্মাবতীই বানাতে হবে এ হেন মাথার দিব্যি কে দিয়েছিল। উনি যেমন করে মেয়েটাকে শাসাতেন তাতে আমারই শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসত। আবার যখন ওকে উৎসাহ দিতে দিতে সাড়া পেতেন ওর নিছক মাস্টারীর আনন্দ যেন ওর সারা দেহে মুকুলিত হয়ে উঠত। অনেক খুঁজেও সেই সাফল্যের মধ্যে কিন্তু প্রেমের স্পর্শ পাইনি। মনে মনে তাই অবাক লাগত।

কিন্তু পঙ্কজ করে তোলা কি চাট্টিখানি কথা? অনামুখীকে রেশমে মুড়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেই কি সে সুলক্ষণা হয়ে যাবে? আচার ব্যবহার, হাবভাব চালচলন সব কিছুরই উপর পালিশ চলতে লাগল। প্রফেসার কত দীর্ঘ দিন তাকে শুধু ঠিকমত উচ্চারণ করে শুদ্ধ ইংরেজী সভ্য ভাবে বলতে শেখালেন তার হিসাব নেই। শুধু তাই নয়। নীরস শিক্ষাকে গানে গানে সহজ করে তুলতে লাগলেন। উপর তলার আইবুড়ো প্রৌঢ়ের নীচের তলার তরুণীকে উপরের উপযুক্ত করে তোলার সে কি নিষ্কাম সাধনা। মেয়েটি যখন সঠিক উচ্চারণে গেয়ে উঠল:

The Main in Spain Stays mainly in the plan.

তখন অধ্যাপক হিগিন্সের কণ্ঠেও যেন বসন্তের কোকিল কুহু কুহু রবে গেয়ে উঠল। কিন্তু খুব ভাল করে যাচাই করে দেখলাম যে এটা শুধুই সার্থকতার আনন্দ। অবশ্য আপনারা ভাববেন: এ কি প্রেম? প্রেমের আবাহন? প্রেমিকার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন?

না, কিছুই না। শুধু আইবুড়ো খামখেয়ালী প্রৌঢ়ের নিছক একটা খেয়াল। উঁহু। তবু মনে একটা সন্দেহ ছিল। ঘি আর আগুনের মধ্যে আকর্ষণ অনিবার্য। আমাদের সনাতন দেশের মহাপুরুষেরা কি আর সে কথা মিছেমিছি লিখে গেছেন? এই বিলেতে এমন কি গুণ আছে যার ফলে আগুনের তাতেও ঘি গলবে না? যে বন্ধুর সঙ্গে বাজারে বাজি ধরেছিলেন সেই বন্ধু একদিন খোলাখুলি হিগিনসকে জিজ্ঞেস করলেন,—নারীঘটিত ব্যাপারে কি তুমি সচ্চরিত্র থাকো? হিগিনস্ সমান খোলাখুলি উত্তর দিলেন,—নারীঘটিত ব্যাপারে তুমি কি কখনো কোন লোককে সচ্চরিত্র দেখেছ?

হিগিনসের কণ্ঠে আছে গান; কিন্তু প্রাণে নেই প্রেম। সংসারী মানুষ, সন্ন্যাসী ত নয়। তবু এ কেমন নায়ক? মনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি গেয়ে উঠলেন:
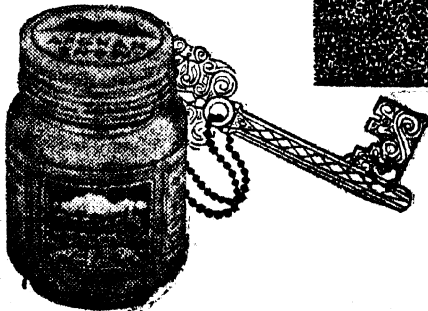
আমি শান্ত শিষ্ট জন—
যে আপন ঘরের নীরবতায়
একলা সন্ধ্যা কাটাতে চায়,
হয়ত কোন কবরখানা
খবর যার কেউ জানে না
তারি মত শান্তিপূতে
পরিবেশেতে মন।
আমি শান্ত শিষ্ট জন।

অথচ নারীবিমুখ নয় মোটেই। এমন বিচিত্রচরিত্র এই পুরুষ। চারদিকে নর-নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের আর আসক্তির দৃশ্য ছড়িয়ে আছে। অনেকে বলাবলি করতে লাগল যে ফুলওয়ালী শেষ-পর্যন্ত প্রৌঢ়কে ঠিক গেঁথে নেবে। কিন্তু সুতো কোথায়? বিনি সুতোয় কি গাঁথা যায় এ মালা? না টেকে সে মালা? প্রৌঢ় নিজেই প্রশ্ন করলেন, মেয়েরা কেন পুরুষের মত হতে পারে না? শুধু বন্ধুর মত, সখার মত?

নিজের মনের কথা বোঝাবার জন্য একদিন তিনি গান ধরলেন:

পুরুষগুলি এত ভদ্র, এত নিয়ম বাঁধা
তোমাদের সব দুঃখক্লেশে সহায়তা সাধা।
ক্ষুন্ন মন যখনি তব
করবে খুসী অবিরত;
অমনি বন্ধু হওনা কেন, সখ্যতাতে বাঁধা?

খুব ভাল করেই জানি যে প্রেমের বেলা অনেকেই ডুবে ডুবে জল খায়। তাই এত সব দেখেশুনেও আশা করেছিলাম যে প্রেমের মত একটা কিছু সূত্রপাত হবে। কিন্তু কোথায় ছাই প্রেম। এই শীতের দেশ বিলেতে আবার ফুলের সৌরভের মত প্রেমের মুকুলও ফুটতে চায় না যেন। চার দিকে এত দেহ-সেউষ্ঠবের আরতি; তবুও প্রেমের মূর্তি কত দুর্লভ।

ওদেশের খুব বড় সামাজিক ব্যাপার হচ্ছে র‍্যাসকটের ঘোড়দৌড়। সেখানে স্বয়ং রাজা-রানী আসেন। আর আসেন সব সেরা অভিজাত বংশের ওমরাহ আর বড়লোকের দল। রূপ আর রূপো, রঙ আর ঢঙের এত বড় মেলা ওদের মত স্বচ্ছল দেশেও খুব কম হয়। হিগিনসের মনে হল যে এতদিনে এলিজা খুব ভাল ভাবে কেতাদুরস্ত হয়ে গেছে। ফ্যাশানের ভাষাও রপ্ত করে নিয়েছে। উচ্চারণ হাবভাব আদবকায়দা নিখুঁত। পোষাক বানান হল সবচেয়ে বড় ফ্যাশন কোম্পানী থেকে। সত্যি সত্যি রাজ-রানীর মত ঝলমল করতে করতে এলিজা র‍্যাসকটের মাঠে উদয় হলেন। ঝনঝনে কাকলির কণ্ঠকে সুরেলা নীলরক্তবতীর ভাষার মধ্যে ধরাই গেল না।

কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। বেচারী খানিক পরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে গেঁয়ো-ভাবে সেটার ব্যালান্স সামলাতে লাগল। আশে-পাশের নতুন পরিচিত বড়লোকেরা এরকম বেচাল ভাবভঙ্গী দেখে গা টেপাটেপি করতে লাগলেন। এলিজা চটে উঠে বললেন,—আমি কি ঠিক মত করছি না নাকি?

ওপর-পালিশ ইংরেজ ভদ্রভাবে জবাব দিল,—না, না, অবশ্যই ঠিক করছেন।

হঠাৎ মুখ ভেংচির মধ্যে দিয়ে আদি ও অকৃত্রিম ককনি বেরিয়ে এল,—বটে? আমি যদি ঠিকই করছিনু, তোমরা হাসতে ছিলে কেন গা?

পেছনে দাঁড়িয়ে নিজের মাথার উপর নিজের চায়ের কাপ ব্যালান্স করতে করতে অধ্যাপক তক্ষণে ব্যাপারটার তাল সামলাতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু গিরি দরী ভেদ করে যখন পার্বত্য স্রোতস্বিনী বেরিয়ে আসে কার সাধ্য রোধে তার গতি? একেবারে খাস বনেদী টানের ঠাস বুননের কথার উচ্চারণ টানতে টানতে খুড়ীর অসুখের কথা যা টেনে আনল তা 'বনেদী নয়, বুনো। এলিজার মুখ দিয়ে যেন ভিসুভিয়াসের ছাই ভস্ম বেরোতে লাগল.— আমাগো খুড়ী, মানষে কয় তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় গত হইছুলেন। মুই কই যে তেনারে বেবাক মেরে পেলাইছিল। বাপ আমার তেনার মুয়ে মদ ঠাসতি লাগল।

সমবেত অভিজাত সজ্জনরা ফুলের মত সাজগোজ করা সুরভি ভরা মার্জিতকণ্ঠীর মুখে মার্জারের ভাষা শুনে একেবারে নির্বাক। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। যেই ঘোড়দৌড় শেষ হতে যাচ্ছে একান্ত উত্তেজনায় এলিজা পেল্লায় এইসা একখানা গেঁয়ো ভাষা আর ভঙ্গী ব্যবহার করল! মাথা হেঁট হয়ে গেল অধ্যাপকের।

উনি ত হার মেনে ফিরে এলেন। কিন্তু হৃদয় ত মানে না। তার মুখ দিয়ে শুধু ছোট্ট একটি কথা, একটি অস্পষ্ট স্বীকার, অদৃশ্য হাহাকার, বেরিয়ে এল—ওর মুখখানাতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

প্রত্যহের জীবনের শূন্যতার মাঝখানে এখানে ওখানে এলিজার স্মৃতিতে জড়ানো টুকিটাকি। মরুভূমির মাঝখানে মরূদ্যান। হিয়া-সাহারায় স্নিগ্ধ একটু মেঘ।

এদিকে ততদিনে অন্য একজন প্রেমিক জুটেছে এলিজার ভাগ্যের আকাশে। বড়লোকের ছেলে। বয়সে তরুণ, মনে রঙীন। এলিজার তাতে কোন আপত্তির কারণ থাকার কথা নয়। ধনে মানে, চটকে চমকে সব দিক দিয়েই সে প্রৌঢ় অধ্যাপকের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। আর সবার বড় সম্পদ হচ্ছে যৌবন। ইংরেজীতে বলে দি ডীপ কল্স্ আন টু দি ডীপ। গভীর গভীরকে টানে, সাগর সাগরকে। যৌবন জলতরঙ্গ কার জন্য কল্লোলিত হবে? এ প্রশ্নের ত উত্তরেরও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু প্রেমের জগতে যৌবনই শেষ কথা নয়। আকর্ষণই নয় চরম তর্ক। অন্ধ দেবতার রায়ের উপরে আপীল নেই। প্রৌঢ় যতক্ষণ প্রাণের মধ্যে অনুভব করছেন যে ফুলওয়ালীর মুখখানা তার অভ্যাস হয়ে গেছে ততক্ষণ পুষ্পধনুও নীরব হয়ে বসে নেই। শেষ পর্যন্ত এলিজার পাষাণে হয়ে গেল প্রাণপ্রতিষ্ঠা। দেখলাম যে সে নিজেকে চিনতে পেরে প্রৌঢ়ের কাছেই ফিরে এল।

কোন্ সম্পদ ছিল সেই শব্দতত্ত্বের প্রফেসরের? কোন্ যাদু? কোন্ মোহিনী? বৈষ্ণব কবি গেয়েছেনঃ
কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান?
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।
এই অবলা তার শিক্ষা আর পালিশে ঝলমল প্রতিষ্ঠার সবল মুহূর্তে ফিরে এল তারই কাছে যে কখনো ভালবাসবে বলে ভালবাসেনি, যে শুধু একটা সামান্য বাজি রেখেছিল। আর বাজি জেতার চরম মুহূর্তে যে জীবনে হেরে গিয়ে সব ফিরে পেল। যাদু ছাড়া আর কি বলব তাকে। প্রৌঢ় অধ্যাপক ঝুপ করে হাত পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। মাথার টুপী টেনে নামিয়ে চোখ পর্যন্ত ঢেকে নিলেন। তার পরে হেঁড়ে গলায় হাঁকলেন, "এলিজা, আমার লক্ষ্মীছাড়া চটি দুটো গেল কোন্ চুলোয়?"

এই হেঁড়ে গলার হাঁক শুনে হঠাৎ চমকে উঠলাম। এটা কি চাকরানীর প্রতি প্রশ্ন? অবাক হয়ে, বিস্মিত হয়ে অত বড় থিয়েটার রয়্যালের দর্শকরা যা শুনেল তা চাকরানীর প্রতি প্রশ্ন না হয়ে হৃদয়রানীর প্রতি প্রস্তাবের রূপ নিল।

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। না। আমরা যে প্রেমের কখনো গহন, কখনো গোপন বিকাশ পেয়ে এসেছি আমাদের সাহিত্যে, আমাদের সমাজের পরিবেশে, জীবনের পরিসরে এত, তা হল না। আমি তোমায় ভালবাসিনি; ভালবাসতে চাইনি। শুধু বাজী রেখে গেঁয়ো এক অশিক্ষিতাকে মেজে ঘষে সমাজের মণি করে তোলা যে যায় তা প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম। সে মণি যে পরশমণি হয়ে আমাকেই ধন্য করে তুলবে তা আগে কখনো ভাবিনি। ভাবলে এ পথে আসতামই না। তুমি আমায় সম্রাট করো নি সেদিন। আমিও তোমায় সম্রাজ্ঞী করবার স্বপ্ন দেখিনি।

তবু ত দুনিয়ার সব চেয়ে সহজ অঘটন সবচেয়ে বেশী কঠিন সাধনায় ঘটে গেল। উপোষী ফুলওয়ালী হল রূপসী রানী।

প্রেমের এই নতুন রূপের প্রতিমা বার্নার্ড শ' তাঁর পিগম্যালিয়ান নাটকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার বিরাট্ ভূমিকায় এই অমর নাট্যকার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে অধ্যাপক আইবুড়ো থেকে যাবেন আর শিষ্যা এলিজা তার প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ না হয়ে তরুণ প্রণয়ীর গৃহিণী হবে। রোম্যান্সের নায়িকা যে নায়কের পরিণীতা বধূ হবে এ কথা ভাবাও অসহ্য ছিল বার্নার্ড শ'র চোখে।

কিন্তু আমরা দর্শকরা নতুনভাবে সাজানো 'মাই ফেয়ার লেডী' এই গীতিনাট্য দেখেই তৃপ্ত হয়েছিলাম। প্রৌঢ় অধ্যাপকের অতৃপ্তি যদি মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করতে থাকত সারা রাত তাহলে বাঙ্গালী সাহিত্যরসিক হিসাবে সুখী হতাম। কিন্তু গীতিনাট্যের দর্শক হিসাবে খুসী হয়ে রাতে বাড়ি ফিরে আসতাম না। সম্রাজ্ঞী করবার সাধনা নয়, শুধু বাজি জেতার চেষ্টার মধ্যে প্রেমের ফুল এমনভাবে ফুটত না।

থিয়েটারের সামনের দিকে গোল অর্থরাস্তের [illegible]

মধ্যে দাঁড়িয়ে হাউস ফ্লের ভিড় ভাঙাতে দেখেছি। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের দু পার ভাসিয়ে এই গীতিনাট্যের সঙ্গীতধারা সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। এই বিরাট থিয়েটারের মধ্যে সগৌরবে নিয়ন লাইটে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে আগামী আট-মাসের মধ্যে কোন দশ টাকা দামের টিকিট বাকী নেই। এ কথাও জানি যে ব্ল্যাক মার্কেটে একটি ভাল সীটের সন্ধান করলে খোলাখুলি অর্থাৎ শাদা বাজারেই আড়াই শ' টাকা দিতে হবে। তাতে সম্মানের হানি হবে না। যাতে হঠাৎ কোন বড় রসিক বিদেশ থেকে এসে এহেন উচ্চাঙ্গের অভিনয় না দেখে ফিরে না যায় তার জন্য টুরিস্ট এজেন্সী চড়া দামে আগাম টিকিট কিনে রাখে চড়াতর হারে ছাড়বার জন্য। তাকে এরা কালোবাজার বলে না। শাদা চোখেই সব দেখা যায় বলে। এই নাটকের নায়ক সপ্তাহে পঁচিশ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে আর একটা গ্রামোফোন কোম্পানীই এর গানগুলির রেকর্ড থেকে দেড় কোটি টাকা কামিয়েছে।

আর এই থিয়েটারের মর্যাদাই বা কম কি। লণ্ডনের ড্রুরি লেন থিয়েটার রয়্যাল ঠিক দুশো সাতানব্বই বছরের পুরনো বনেদী থিয়েটার। রাজা দ্বিতীয় চার্লস যে সনদ দিয়ে এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন তা এখনো আপনি দেখতে পাবেন।

সত্যিই ত কত ভালবাসা দিলে, কত ভাল-বাসা পেলে এমনটি সম্ভব হয়? ভীড়ের গরম আমেজ উপভোগ করতে করতে বার বার নিজের মনে বলতে লাগলাম—রূপসী আমার, রূপসী আমার।

তাহলে এইবার আসল কথায় আসি। রূপসী কে? এই নাটক? এর অভিনয়? এর নায়িকা? না, এদের সব কিছুকেই রসিক জন যে ভালবাসা দিয়ে সার্থক করে তুলেছে সেই ভালবাসা? কে কাকে সম্রাট করে মহিমায় মুড়ে দিয়েছে?

সেই কথাটাই এখন বলি। সেটাই আসল কথা, যার জন্য এই নাটকের অবতারণা। যে কোন নাটকের চেয়ে নাটকীয় ব্যাপার।

মাত্র ক' মাসের জন্য ইয়োরোপে এসেছি। আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে নিজের দেশের দলপতির দায়িত্ব আর উদয়াস্ত খাটুনী। তার মধ্যেও ফাঁকে ফাঁকে ইংলণ্ড থেকে পাড়ি দিয়ে অন্যান্য দেশে গিয়ে কাজ সেরে আসতে হবে। 'মাই ফেয়ার লেডী'র জন্য থিয়েটার রয়্যালের দুয়ারে ধর্না দিই কি করে? আর ওই যে আড়াই শ' টাকা বললাম সে ত এই অধমের পক্ষে একটা স্বপ্নের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। মেরে কেটে টাকা দশ পনের পর্যন্ত উঠতে পারি। তা-ও সম্ভবত তার জন্য দু তিন দিন টেবিলে বসে ডিনার খাওয়ার বিলাস বিসর্জন করে সস্তা কাফে-টেরিয়াতে আমি [illegible] উঁচু কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সস্তায় খিদে মিটিয়ে ওই টাকাটা তুলতে হবে। যত ভারী সরকারী কাজেই বিদেশে যান না কেন 'ফরেন এক্সচেঞ্জের' টানাটানির কল্যাণে দিন কাবারের খরচা সামলাতে গিয়ে আপনাকে সার্কাসের তারের খেল খেলতে হবে আজকাল। অবশ্য চালাক লোকরা অন্যরকম অন্ধি সন্ধি খুঁজে বের করতে পারে।

অতএব, 'মাই ফেয়ার লেডী' যারা প্রযোজনা ক'রে এক আমেরিকাতেই আড়াই কোটি টাকা ঘরে তুলেছেন

তাদের পকেটে হিদ্'র দশ টাকা আর পৌঁছাবার মোকা পেল না। সরকার অবশ্য খুব সুবিবেচনা করেই সরকারী খরচেই দেশের মানমর্যাদার উপযুক্ত বিরাট ওয়েস্ট এণ্ডের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ফালতু নিজের সখের খরচের বেলা টানাটানি। রোজ সকালে হনহনিয়ে

কনফারেন্সের দিকে হোটেল থেকে রওনা হবার সময় গত রাতের সৌভাগ্যবান আর সৌভাগ্যবতীদের মুখে রূপসীর আলোচনা কানে আসে। পা দুটো যেন একটু থমকে দাঁড়ায়। মন কেমন যেন হয়ে যায় আর বুকের তলায় ধড়ফড় করে ওঠে।

সে ধড়ফড়ানির খবর অনেক নতুন চেনা বন্ধুই জেনেছিলেন। কিন্তু তারাও নিরুপায়। লণ্ডনে অনেকে বধূ পেয়েছে; বিবাহের চেয়ে বড় পথ আরো সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু তা বলে রূপসী আমার? নেভার, নেভার।

আহা, একজন জলজ্যান্ত বাঙ্গালী সাহিত্যরসিক, কলকাতার নাট্যরসিক তোমাদের দেশের এত বড় একটা ঘটনা যে অভিনয় হচ্ছে তা আস্বাদ না করেই দেশে ফিরে যাবে? থিয়েটারের কাউণ্টারে কদিন খবর নিয়ে গেলাম। জানিয়ে গেলাম যে যদি কেউ কোন দিন কম দামের টিকিট ক্যানসেল করতে চায় আমায় ফোন করলে কৃতার্থ হব।

ক্যানসেল? হোঃ, আপনি, স্যার, দেখছি জন্ম আশাবাদী। ওই যে দেখুন, লম্বা লাইন লেগে গেছে ক্যানসেল করা টিকিটের প্রত্যাশায়। অবশ্য শতকরা নিরানব্বইজনই রোজ রোজ ফিরে যায় হতাশ প্রেমিকের মত। আর বাকী ভাগ্যবান জনটিও অনেক বেশী প্রিমিয়াম অর্থাৎ সেলামী দিয়েই তবে টিকিট যোগাড় করতে পারে। একে ব্ল্যাক

মার্কেট বলা চলে না।

অবশ্য, অবশ্য। শনিবারে হোটেলে ফেরার বদলে রাস্তায় রাস্তায় অন্যের চোখের আলো, মুখের হাসি দেখে মন ভরে নেবার চেষ্টা করি।

একদিন রাতে থিয়েটার থেকে, থুড়ি, বুকিং অফিস থেকে ফিরে দেখি একটি অপরিচিত তরুণ আমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। বাঙালী ছাত্র, মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আর কৃষ্টির জয়টীকা। পরিচয় দিলেন বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী বলে। কিন্তু কোন্ বাঙালী ছাত্র তা নয়? পরিচয় দিলেন যে ইংলণ্ডেও সাহিত্যের ছাত্র হয়ে এসেছেন এবং সেজন্য বাংলা সাহিত্যের প্রতি আরো অনুরাগ জন্মে গেছে। সেটাও স্বাভাবিক। আমি যে ইংলণ্ডে গিয়ে সাহিত্য ছেড়ে ইতিহাস পড়তে সুরু করেছিলাম, আমারো ওদেশে বসেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আরো বেড়ে গিয়েছিল। ইয়োরোপের বাধাবন্ধনহীন মুক্ত উচ্ছল জীবনটাই যে একটা অখণ্ড পরিপূর্ণ সাহিত্য।

তাকে আদর করে এনে বসালাম। সমবয়সী না হই, সমধর্মী, সমমরমী। বেশ বছর দশেক থেকে এখানে পাবলিক স্কুল থেকে পড়া সুরু করেছিলেন। অর্থাৎ তখন বয়স ছিল প্রায় চোদ্দ। এতদিনে মাতৃভাষার উপর টান অনেকখানি কমে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকত না। একেবারে বিদেশী পরিবেশে, বিদেশে এরকম অনেক ঘটেছে। কিন্তু এই তরুণ বন্ধু যে বাঙালী। নিজের ভাষা, নিজের সাহিত্যকে ভুলতে পারেন নি।

তাই ইণ্ডিয়া অফিসের ইংরেজ পরিচালিত লাইব্রেরীতে খুঁজে খুঁজে বাংলা বই পড়েন। খুব কম বাংলা বইই সেখানে আছে। কিন্তু তার সবই তিনি পড়েছেন।

আর সেই সূত্রেই তিনি এসেছেন আমার কাছে। শুধু বই পড়ে ভাল লাগার জন্য তার লেখকের সঙ্গে পরিচয় নয়। তার চেয়ে আরো বড় কথা শুধু মুখের ভাল লাগাই নয়, মনের ভালবাসা। খুব সংকোচের সঙ্গে তিনি নিবেদন করলেন যে তিনি শুনেছেন যে আমি 'মাই ফেয়ার লেডী' দেখতে খুব উৎসুক, কিন্তু টিকিট পাচ্ছি না।

হেসে সে দুঃখটাকে হাল্কা করে দিলাম। বললাম যে এতে আফশোষের কিছু নেই; লাখ খানেক বা তার চেয়েও বেশী লোকের সঙ্গে আমার এ না-পাওয়াটা ভাগাভাগি করে নিয়েছি। দূর দেশ থেকে শুধু এই গীতিনাট্য দেখতে এসেছে এরোপ্লেনে করে আর টিকিট না পেয়ে—ওই আড়াই শ টাকার টিকিটও না পেয়ে ফিরে গেছে যারা তাদের দুঃখ আমার চেয়ে কম নয়।

তরুণ বন্ধু সেকথা মানলেন না। বড় লোকের বা অভিনয়বিলাসীর বিফলতার চেয়ে একজন বাঙালী সাহিত্যিকের রূপসীকে না দেখে ফিরে যাওয়া অনেক বেশী দুঃখের। কারণ বাঙালী সাহিত্যিকই বেশী রসিক, শিল্পের সমঝদার।

অতএব বন্ধুটি একজন বাঙালী সাহিত্যিককে তার মাস আষ্টেক আগে কেনা টিকিটটি উপহার দিতে চান। বিদেশে বসে বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার মৌন শ্রদ্ধার সামান্য চিহ্ন হচ্ছে এটুকু। বাধা দিয়ে বললাম,—এতটুকু নয়; কত বড় চিহ্ন তার প্রমাণ হচ্ছে দিনের পর দিন থিয়েটার রয়্যালের জন্য টিকিটের লম্বা লাইন।

তিনি আমার আপত্তি মানলেন না। তরুণ বন্ধুও একদিন অমনই একটা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন বহু মাস আগে। তারপর এত মাস অধীরভাবে প্রতীক্ষা করেছেন আগামী দিনটির জন্য। দিনের পর দিন ক্যালেণ্ডারে দাগ কেটেছেন। আগামীকাল যখন তার সেই প্রতীক্ষার উপর থিয়েটারের পর্দা উঠতে থাকবে তখন তার বদলে সেখানে বসবেন তার সম্পূর্ণ অচেনা, শুধু লেখার মাধ্যমে চেনা একজন সাহিত্যিক। পরিচয় শুধু সাহিত্যের পাতায়। আর একজন বাঙালী প্রবাসী তরুণের রসসিক্ত মানসে।

এমন কি উনি টিকিটের আসল দামটাও নিতে চাচ্ছিলেন না। আর দামটা ত সামান্য কথা। মোটে সোয়া আট টাকার মামলা। লণ্ডনে লাইনে দাঁড়ানোর নেই লজ্জা, নেই লড়ালড়ি। কিন্তু সেই দিনের পর দিন আবার দিন গোণা সুরু হবে। কবে সেই রূপসীর অবগুণ্ঠন আমার এই তরুণ অচেনা বাঙালী বন্ধুর জন্য উন্মোচন হবে? কোন্ সে রূপসী যার জন্য এই সাধনা?

আমিও ত তাই ভাবছি। তার পর দু বছর হয়ে গেল। ছয় হাজার মাইল দূরে দিল্লিতে বসে সেই অপরূপ গীতিনাট্য মাই ফেয়ার লেডীর কথা ভাবছি। আর সেই অচেনা বন্ধুর অজানা সাধনার কথা। কিন্তু কে সে রূপসী যার জন্য তার এই ত্যাগ, এই প্রতীক্ষা? আমার ত মনে হয় সে রূপসী নাটক নয়, অভিনয় নয়, নয় তিনঘণ্টার স্বপ্নলোক। সে হচ্ছে বাংলা সাহিত্য—সেই হচ্ছে রূপসী আমার।

জাতীয় মহোদ্যান

শ্রী সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বর্তমানে ভারতবর্ষে জাতীয়-উদ্যান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলেছে ও কয়েকটি অঞ্চলে এই জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। জাতীয় উদ্যানগুলি প্রাকৃতিক ইতিহাসের এক জীবন্ত সাক্ষ্য—জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও কল্যাণের প্রতীক। এই স্থানেই প্রাচীন ও নবীন সভ্যতার অপূর্ব সংমিশ্রণের মূলসূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকৃতির রম্য পরিবেশে চিন্তায় বিষণ্ণ, বাসনায় মলিন, কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত, সংসার জালে জড়িত মানুষ পায় চিত্তের শান্তি, হৃদয়ের স্ফূর্তি ও আত্মার তৃপ্তি। এটা শুধু সম্ভব হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবমনের সুরুচিসম্মত সংবেদনশীল সহযোগিতায়।

প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপের উপকূলে জাতীয় উদ্যান

অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে আপেনর গিরিশৃঙ্গ

ভারতের জাতীয় উদ্যানের একটু ইতিহাস আছে। প্রাচীন যুগে মধ্য এশিয়ার যে যাযাবর মানুষ হিন্দুকুশ অতিক্রম ক'রে সিন্ধু ও গঙ্গানদীর তীরে তীরে বসবাস করতে লাগলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল ও জ্ঞানী-গুণী তাঁরা মুনি ঋষি আখ্যায় আশ্রম রচনা ক'রে অধ্যাপনা ও মনন-নিদিধ্যাসনে কালাতিপাত করতে লাগলেন। সেই পর্ণকুটীর সম্বলিত আশ্রমগুলি এক একটি তপোবনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল। সেই প্রাচীন যুগে ভূমির অধিকার নিয়ে কারো সঙ্গে কারোর বিরোধ-বিবাদের অবকাশ ছিল না। লোকসংখ্যা ছিল কম, ভূমিও যথেষ্ট; আদিম অরণ্য তো সারাদেশ ছেয়ে ছিল। সাধনার জন্য আরণ্যক পরিবেশ অতীব উপযোগী। তবে তপোবনে বিচরণে সকলের সমান অধিকার ছিল কিনা বলা সুকঠিন। সকলের অধিকার ছিল নাই বা কেন? তা' না হ'লে রাজা দুষ্মন্ত মৃগের প্রতি শরসন্ধানে কণ্ব মুনির আশ্রমে কেমন ক'রে প্রবেশ করলেন? নিশ্চয়ই উপযুক্ত সীমানা নির্দেশক বেষ্টনী ছিল না এবং তখন তার প্রয়োজনও ছিল না। কোলাহল-মুখরিত কর্মব্যস্ত নাগরিক জীবনের এক যতি পাওয়া যেতো আরণ্যক পরিবেশে। বর্তমান জাতীয় উদ্যানের বীজ প্রাচীন ভারতের তপোবনের মধ্যেই নিহিত ছিল। সমাজ ব্যবস্থাপক প্রাচীন ঋষিরা তাই কর্ম-জীবনের পর আরণ্যক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য লিপিবদ্ধ করলেন "পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ"।

সুদূর বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে বুদ্ধদেবের চরণে উৎসর্গীকৃত কয়েকটি উদ্যানের সংবাদ পাই—তা হ'ল রাজগৃহে বেণুবন, জীবকাম্রবন, শ্রাবস্তীপুরে অনাথপিণ্ডদ কর্তৃক উৎসর্গীকৃত জিতবন, আম্রপালী প্রদত্ত এক রম্য উদ্যান প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত রোমক সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে —জুলিয়াস সীজারের অপঘাতমৃত্যুর পর এণ্টনীর বক্তৃতায় পাওয়া যায় যে, তথাকথিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী সীজার তাঁর উইলে সাধারণের জন্য বিশাল এক উদ্যান প্রদান করে গেছেন।

ভারতে মুসলমান আমলে প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীরে শ্রীনগরের আছোবল, শালিমারবাগ, নিশাতবাগ ও লাহোর ও এলাহাবাদের বিখ্যাত উদ্যানগুলি জাতীয় উদ্যানের সমতুল। ইংরাজ আমলেও প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত উদ্যানবাটীকাগুলি যথা শিবপুর বৃক্ষবাটীকা, কলিকাতার ইডেন উদ্যান,

দার্জিলিংয়ের বৃক্ষবাটীকা প্রভৃতি জাতীয় উদ্যান রচনার অগ্রদূত। তবে এগুলি আকারে অতি ক্ষুদ্র।

কানাডা

যাই হ'ক—এই হ'ল প্রাচীন ইতিহাস। বর্তমান আলোচনাসূত্রে কানাডা সরকারের জাতীয়-উদ্যান প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার বিবরণী খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কানাডা সরকার জাতীয় উদ্যানগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—

(১) রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্বলিত ও আমোদপ্রমোদ প্রদায়ক মহোদ্যান—১৫টি

(২) বন্যজন্তু সংরক্ষক মহোদ্যান—২টি

(৩) জাতীয় ইতিহাস সম্বলিত দুর্গ, রণক্ষেত্র ও বিরাট অট্টালিকা সংযুক্ত অঞ্চল—৯টি।

কানাডা সরকারের জাতীয় উদ্যান স্থাপনার উদ্যোগ শুরু হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম 'এলবার্টা' প্রদেশে রকী পর্বতের পূর্ব-ঢালে ২৫৬৪ বর্গমাইল জুড়ে 'ব্যাফে' উদ্যান। এখানে মধ্য-রকী পর্বতমালার পার্বত্য পরিবেশে একাধারে তুষার নদী ও উষ্ণ প্রস্রবণ, বরফে ঢাকা বিরাট তুন্দ্রা অঞ্চল, শীতে হ্রদের জলে বিরাট বরফের আস্তরণ। এখানে পর্বত আরোহণ, অশ্বচালনা, স্নান, গল্‌ফ্‌ খেলা, টেনিস খেলার মাঠ, মৎস্য-শিকার, স্কেটিং প্রভৃতি নানা আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত আছে। কানাডা সরকারের ব্যবস্থাধীনে পনেরোটি রমণীয় দৃশ্যাবলী সম্বলিত পার্ক আছে।

বন্যজন্তু সংরক্ষক পার্ক—এল্‌ক্‌ দ্বীপ পার্ক (Elk Island Park)—৭৫ বর্গ-মাইল বিস্তৃত লেমণ্ট শহরের নিকটবর্তী মধ্য এলবার্টা অঞ্চলে সংস্থাপিত এই পার্ক। এখানে অসংখ্য মৃগ, এল্‌ক্‌, মুস্‌, বন্য-মহিষ প্রভৃতি দেখা যায়। তাছাড়া অসংখ্য পক্ষীও এ অঞ্চলে বাস করে—আবার ঋতু পরিবর্তনে এরা উড়ে যায় কোন্‌ অজানা দিগন্তে। বন্যজন্তু সংরক্ষক পার্ক মোট দুটি—একটি এল্‌ক্‌ দ্বীপ পার্ক; অপরটির নাম "উড্‌ বাফেলো"। এটিও 'এলবার্টা' প্রদেশে।

ঐতিহাসিক নয়টি পার্কের মধ্যে কানাডার পূর্ব অঞ্চলেই সবকটি। বিশেষ করে নভস্কোশিয়া, কুইবেক, অন্টারিও ও ম্যানিটোবা প্রদেশে।

মনোহারী দৃশ্যসম্বলিত পার্কের তালিকা

ক। দৃশ্যসম্বলিত পার্ক	প্রদেশ	প্রতিষ্ঠাকাল	আয়তন (বর্গমাইল)
১। ব্যাঁফ (Banff)	এলবার্টা	১৮৮৫	২৫৬৪
২। যোহো (Yoho)	বৃটিশ কলম্বিয়া	১৮৮৬	৫০৭
৩। গ্লেসিয়ার (Glacier)	,,	,,	৫২১
৪। ওয়াটারটন লেক (Waterton Lake)	এলবার্টা	১৮৯৫	২০৪
৫। জ্যাসপার (Jasper)	,,	১৯০৭	৪২০০
৬। মাউণ্ট রোভেলস্টোক (Mt. Rovelstoke)	বৃটিশ কলম্বিয়া	১৯১৪	১০০
৭। সেণ্ট লরেন্স আইল্যাণ্ড (St. Lawrence Island)	অণ্টারিও	১৯১৪	ই
৮। পয়েণ্ট পীলী (Point Pelee)	দক্ষিণ অণ্টারিও	১৯১৮	৬·০৪
৯। কুটীনে (Kootenay)	বৃটিশ কলম্বিয়া	১৯২০	৫৪৩
১০। প্রিন্স এলবার্ট (Prince Albert)	সাসকাচুয়ান্	১৯২৭	১৪৯৬
১১। রীডিং মাউণ্টেন (Reading Mountain)	ম্যানিটোবা	১৯২৯	১১৪৮
১২। জর্জ বে আইল্যাণ্ড (George Bay Island)	অণ্টারিও	১৯২৯	৫·৩৭
১৩। কেপ্ বৃটেন হাইল্যাণ্ড (Cape Britain Highland)	নভস্কোশিয়া	১৯৩৬	৩৯০
১৪। প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যাণ্ড (Prince Edward Island)	প্রিন্স এডোয়ার্ড আইল্যাণ্ড	১৯৩৭	৭
১৫। ফাণ্ডী (Fundy)	নিউ ব্রান্সউইক্	১৯৪৭	৭৯·৫
খ। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পার্ক—			
১। এল্‌ক্ আইল্যাণ্ড (Elk Island)	এলবার্টা	১৯১৩	৭৫
২। উড্ বাফেলো (Wood Buffalo)	এলবার্টা ও North Western Territory	১৯২২	১৭৩০০

এই উড্ বাফেলো অঞ্চলের বিরাট বিস্তৃতি এখনও বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করা সম্ভব হয়নি।

• এখানে বহু বন্য মহিষের দল, ভালুক, বীভার, বিরাট শিংওলা হরিণ, নানা জাতীয় মৃগ, মুস্, পানকৌড়ি, বন্য মুরগী প্রভৃতি নানা বন্য পশুপক্ষীর সহিত পরিচয় হয়। এখানে বন্য অঞ্চলে বাঘ বা সিংহের প্রকোপ নেই। ভারতবর্ষের সুন্দরবন ও বাংলাদেশে, বিন্ধ্যপর্বতে, হিমালয় পর্বতে নানা শ্রেণীর বাঘ দেখা যায়. সৌরাষ্ট্রের গীর অঞ্চলে সিংহও পাওয়া যায়। রেওয়া অঞ্চলে কয়েকটি সাদা বাঘও পাওয়া গেছে। গোবিন্দগড় রাজপ্রাসাদে সাদা ব্যাঘ্রীর সাহায্যে পশুজননের বিবর্তনের ধারাটির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

গ। ঐতিহাসিক পার্ক	প্রদেশ	প্রতিষ্ঠাকাল	বিস্তৃতি (একরে)
১। ফোর্ট এনী (Fort Anne)	নভস্কোশিয়া	১৯১৭	৩১
২। ফোর্ট ব্যুজ্যুর (Fort Beauœjour)	নিউ ব্রান্সউইক	১৯২৬	৮০
৩। ফোর্ট্রেস লুইবার্গ (Fortress Louisberg)	নভস্কোশিয়া	১৯৪১	৩৪০
৪। পোর্ট রয়াল (Port Royal)	,,	১৯৪১	১৭
৫। ফোর্ট সাঁবলী (Fort Chambly)	কুইবেক্	১৯৪৯	২·৫
৬। ফোর্ট লেনক্স (Fort Lenox)	,,	,,	২১০
৭। ফোর্ট ওয়েলিংটন (Fort Wellington)	অণ্টারিও	,,	২·৫
৮। ফোর্ট ম্যালডেন্ (Fort Malden)	,,	,,	৫
৯। ফোর্ট প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ (Fort Prince of Wales)	ম্যানিটোবা	,,	৫০

কানাডায় থাকাকালে (১), (২), (৩), (৪), (৬), (৭) নং মহোদ্যানগুলি পরিদর্শনের সুযোগ আমার হয়েছিল। এলবার্টায় জ্যাসপার ও বাঁফ রমণীয় দৃশ্যসম্বলিত মহোদ্যানগুলির রঙিন চিত্র বহুবার দেখেছি সেখানে।

প্রাদেশিক সরকাররাও নানা প্রাদেশিক উদ্যান রচনা করেছেন—

প্রদেশ	সংখ্যা	প্রতিষ্ঠাকাল	বিস্তৃতি (বর্গমাইল)
নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড	১	১৯৩৯	৪২·০০
কুইবেক	৬	১৮৯৫-১৯৪৬	১০,৬৫২·৭৩
অণ্টারিও	৬	১৮৯৩-১৯৪৪	৫,২১০·১৭
সাসকাচুয়ান	৯	১৯৩২-১৯৩৯	১,৬৮৫·১৩
এলবার্টা	২৫	১৯৩৫-১৯৫৯	১৩·৪৯
বৃটিশ কলম্বিয়া	৫৭	১৯২৮-১৯৫৯	১৪,৩৭১·৩৯

কানাডার জাতীয় উদ্যানগুলি পরিচালনার দায়িত্ব National Park Service-এর। এটি Mines & Resources Department-এর Land and Development Services শাখার অন্তর্ভুক্ত। পার্কগুলি পরিচালিত হয় প্রতি পার্কের Park Superintendent-দ্বারা। তাঁর অধীনে নানা কর্মচারী থাকে। পার্কের মধ্যেই তাঁদের থাকার জায়গা।

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে কানাডা সরকারে আমায় শিক্ষণোত্তর কাজ করতে হয়েছিল। এই সূত্রে আমায় কানাডার পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ কুইবেক, নিউব্রান্সউইক, নভস্কোশিয়া, প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ড প্রভৃতি প্রদেশে কর্মোপলক্ষে সফর করতে হয়েছিল। বহু কর্মের মধ্যে জাতীয় উদ্যানে পানীয় জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশন ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধীয় প্রচলিত পদ্ধতির নিরীক্ষা ও মান নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়াও ছিল একটি কর্ম। এই কার্যব্যপদেশে আমি কয়েকটি পূর্বাঞ্চলের জাতীয় উদ্যান পরিদর্শন করি।

উত্তর আমেরিকার ভাবধারা অতি আধুনিক। তবে যদি কেউ ইউরোপ না গিয়ে প্রাচীন ফরাসী দেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, চাল-চলন, দেখতে চান তো আসুন কেপ ব্রেটনে। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্ররা বহু গবেষণার বস্তু পাবেন, নভস্কোশিয়ার এই অঞ্চলে। গ্যালিক ফরাসী রীতিনীতি এখানের শহর-গ্রাম-হ্রদ-সাগরের নামে, খেলা-ধূলায়, নাচে-গানে, আচার-ব্যবহারে, বসনে-ভূষণে প্রাচীন ফরাসী অঞ্চলের ছাপ আজও বর্তমান। 'চেটি ক্যাম্প' ও 'গ্র্যান্ড ইতাং' গ্রামে ফরাসী সভ্যতা ও ব্যবহার প্রাচীন বৃটানীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশে কেপব্রেটনই বোধ হয় প্রাচীনতম স্থান। ঐতিহাসিকদের ধারণা, নিশ্চয় দশম শতাব্দীতে, কলম্বসের ছয় শত বৎসর আগে, 'ব্যাস্কে'র ধীবরেরা এখানে আসে ও নাম দেয় 'কেপ ব্রেটন'। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী পর্যটক লেখেন যে, "আর্কেডিয়ার উপকূলে কেপ অতি নয়নাভিরাম স্থান। এখানকার সমতলভূমি ও শস্যক্ষেত্র, এখানের উপত্যকা ও অধিত্যকা, এখানের হ্রদ ও নদী, এখানের স্প্রুস, মেপেল সীডার ও ফার বৃক্ষে পূর্ণ বনানী অতি মনোরম।"

জন ও সিবাস্টীয়ান ক্যাবট কলম্বসের প্রায় সমুদ্র যাত্রার পাঁচ বছর পরে বৃস্টল বন্দর থেকে পাল তুলে পঞ্চান্ন দিন জলপথে চলার পর ১৯৪৭ সালের ২১শে জুন কেপব্রেটনের উত্তরাংশে পৌঁছান। এই অংশটির নাম দেওয়া হয় 'আবিষ্কার অন্তরীপ'। পরে নাম হয় 'উত্তর অন্তরীপ'। কেপ ব্রেটনের প্রাচীন রাজপথ হল—ক্যাবট ট্রেল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যে প্রথম বিমান চলাচল শুরু হয় এখানের 'বেডেক' শহরে ১৯০৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী। 'বেডেকের' অনতিদূরে 'বেরিয়া' অর্থাৎ সুন্দর পাহাড়।

টেলিফোনের আবিষ্কর্তা আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল শেষ বয়স এখানেই অতিবাহিত করেন এবং এরই মাটিতে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালে কানাডা সরকার কেপ ব্রেটন উপদ্বীপের উত্তরাংশকে কেপ ব্রেটন জাতীয় উদ্যান (Cape Breton Highland National Park) নামে অভিহিত করেন। এই জাতীয় উদ্যানের সীমানা ঘেঁষে 'ক্যাবট ট্রেল' চলে গেছে ৭০ মাইল দীর্ঘ পথ।

'বেডেক' থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে উদ্যানের সীমানায় ঠিক বাইরে, প্রথম রাষ্ট্রীয় প্রাসাদ হল রাজকীয় অশ্বারোহী পুলিস বাহিনীর আস্তানা। উদ্যানে ঢুকেই সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা ময়দানের মাঝে জাতীয় উদ্যানের সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বাড়ি। তারপর জাতীয় উদ্যানের অফিস এবং রাষ্ট্র-কর্মচারীদের থাকার জায়গা। এই অঞ্চলটিকে বলে 'ইনগোনিশ' অঞ্চল। 'ইনগোনিশ' গ্রামে যাবার আগে যে উচ্চ ভূখণ্ডের ফালি অতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে চলে গেছে, তারই উপর অতি প্রাচীন কাঠামোয় তৈরী আড়ম্বরপূর্ণ 'কেল্টিক লজ'। এটি একটি উচ্চাঙ্গের হোটেল। পরিচালনা করেন, নভস্কোশিয়া সরকার। দক্ষিণা দিনে ১৫ থেকে ২০ ডলার থাকা ও খাওয়া সমেত।

দূরে 'ধূম্র পর্বত' গভীর খাতে সমুদ্রে নেমে গেছে। মনে হয় এ যেন এক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্য তাকে জলমগ্ন করার প্রবল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দাঁড়িয়ে আছে।

'মিডিল হেড' অংশে বিরাট কেল্টিক লজ ও সংগে লাগানো বিস্তীর্ণ সমুদ্রস্নানের তটভূমি; নভস্কোশিয়ার এক বিশেষ আকর্ষণ। শিল্পীরা বৃথাই আপ্রাণ চেষ্টা করেন, প্রকৃতির এই অপূর্ব সৌন্দর্য, গম্ভীর নিস্তব্ধতার অসামান্য রূপকে রঙিন তুলির স্পর্শে রূপায়িত করে অমর করতে। সংসারের নিত্য কোলাহল যেখানে আপনি লয় হয়, সেখানে রঙিন মেঘ-সুশোভিত ও তরংগায়িত গিরিশৃংগের পট-ভূমিকায় অনন্ত নীলাকাশ রজতঊর্মিশোভিত সুনীল বারিধির সংগে কোলাকুলি করছে। ধরণীর এই শান্ত বিজনেই শুধু অনুভব করা যায় কলকোলাহল মুখরিত নাগরিক জীবনের উৎকট শব্দ ও অধীর চঞ্চলতার ব্যতিক্রম। এখানে গভীর নিস্তব্ধতা, শুধু ব্যাহত হয় বেলাভূমিতে আছড়ে পড়া সমুদ্র-তরংগের নিরন্তর ক্ষীণ ধ্বনি, বাতাসে-নড়া পাতার মৃদু মর্মর ও রঙিন বিহংগের মধু কলকাকলী।

'ইনগোনিশ' সমুদ্রতট ছেড়ে আমাদের উত্তরমুখী যাত্রাপথে প্রথমে পার হই 'ক্লাইবার্ণ' নির্ঝরিণী।

ফেলে আসি পিছনে উত্তর ও দক্ষিণ 'ইনগোনিশ'। আরও উত্তরে দেখা যায় 'কৃষ্ণা নদী', 'ডানডাস', 'ওয়ারেন' এবং 'মেরিয়ান' স্রোতস্বিনী। এখানে আমরা দেখলাম নতুন রাস্তা তৈরীর কাজ, দু' জায়গায়, নদী পার না হয়ে, মোহনার কাছে একটি সেতুর উপর দিয়ে রাস্তা প্রস্তুতের কাজ চলেছে। পূর্ণবেগে 'বুলডোজার' কাজ করছে। অবশেষে আমরা পৌঁছালাম নীলস্ বন্দরে'। এটি একটি প্রকৃতির রম্য নিকেতন। এখানের শান্ত নীল জলে ছোট ছোট জেলেডিঙিগুলি পালতোলা, কূলে বাঁধা 'থ্রীল্ মাস্টার'গুলি সমুদ্রে পাড়ি দেবার ডাক দেয়। এটি একটি অত-লান্তিকের মৎস্যজীবীর আদর্শ গাঁ। তা বলে এখানকার শিল্প এবং কারুকার্য কম দর্শনীয় নয়। এধারে ওধারে ফার বৃক্ষে ঢাকা দ্বীপগুলি 'অ্যাসপি' উপসাগরের উপকূলে এক শ্যাম শোভার সৃষ্টি করে। এখান থেকে এই আঁকা-বাঁকা পথ পশ্চিম-মুখী হয়ে চলে, উত্তর অ্যাসপি নদীর সর্পিল খাতের ঠিক পাশে পাশে। এর পরে আমরা এসে পড়ি 'বীগ ইণ্টারভাল' নামক স্থানে। এখানে ঢেউ খেলানো তৃণশ্রেণী আর উর্বর সবুজ শস্যক্ষেত্র দৃশ্যপটের পরিবর্তন আনে। এই 'বীগ ইণ্টারভ্যালের' পথের পাশে এক গভীর খাদে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখি। এক নবপরিণীত আমেরিকান যুবক-যুবতী তাদের মধু-যামিনী যাপনের জন্য নভস্কোশিয়ার এই সমুদ্রের ক্রীড়াভূমিতে আসেন। এই বিপদ-শঙ্কুল পথে অসতর্কভাবে মোটর চালানোর জন্য হঠাৎ গাড়িটি এক'শ' ফুটেরও অধিক গভীর খাদে পড়ে। যুবতী মৃত্যুর দরজা থেকে সামান্য আঘাত পেয়ে ফিরে আসেন, আর পড়ে থাকে খাদের মধ্যে তাঁদের গাড়ি ও তাঁর প্রাণের প্রিয়তম। মেয়েটিকে অনেক কষ্টে উপরে তোলা হয়।

আরও পশ্চিমে, সমুদ্রতটের দিকে যেতে পাহাড়ের গায়ে দেখা যায় বাড়বানলে বিধ্বস্ত অরণ্যানী। মনে হয় এই অর্ধদগ্ধ পত্রহীন পিংগল তরুশ্রেণী এক রিক্ততার প্রতীক হয়ে, বেলাভূমির পীত বালুকা-রাশির সহিত সাম্য রক্ষা করছে। ধরিত্রীর এই নগ্ন সৌন্দর্য 'সেণ্ট লরেন্স প্রণালীর' উচ্ছল তরংগরাশির দিকে তাকিয়ে যেন বিদ্রূপ করছে। এবড়োখেবড়ো পাথরে-গাঁথা দেওয়ালের উপর পাতায় ঢাকা চার-চালা বিশ্রামঘরটি বাংলার পল্লীর কথা শুধু স্মরণ

য়ে দেয় না, প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃতির সহিত ঐতিহ্যের এক যোগসূত্র করে। সরকার থেকে এখানে চড়ুইভাতি করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

যখন এই বাঁকাপথ গভীর বনের মধ্য দিয়ে 'ম্যাকেঞ্জি' পর্বতের উপর আসে তখন আমাদের গাড়ির সামনে রাস্তার পাশে দুটি মৃগ ও মৃগী এসে পড়ে। আমাদের ক্যামেরা ও বন্দুকের তাক্ করবার আগেই তারা তেমনি হঠাৎ অন্তর্হিত হয় গভীর বনে। কখন-কখন বন্য ময়ূরী গভীর জঙ্গলের মধ্য হতে কাকলী তুলতে তুলতে প্রশস্ত রাস্তার উপর এসে পড়ে।

এখানে দেখতে পাওয়া যায় প্রাচীন ও নবীন সভ্যতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ। প্রকৃতি ও মানবের সহযোগিতায় এক অপূর্ব নিদর্শন। এমনই এক প্রাকৃতিক পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে এই জাতীয় উদ্যান। সেখানে চিন্তাক্লিষ্ট, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত মানুষ পাবে হৃদয়ে শান্তি, মনের স্ফূর্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য।

যুক্তরাষ্ট্র—

যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৭২ সালে জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টায় "ইয়োলো স্টোন পার্ক" নামে প্রথম জাতীয় মহোদ্যান স্থাপিত হয়। তারপর সামান্য ভিত্তি থেকে এক বিশাল উদ্যান স্থাপনার বিরাট অভিযানের সূত্রপাত হয়েছে। ১৯১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পার্ক সার্ভিসের জন্ম হয় আন্তঃবিভাগের ব্যুরো হিসেবে। এই জাতীয় উদ্যান অধিকরণে কত পরিচালক, স্থপতি, বাস্তুকার, ভূতত্ত্ববিদ্, ভৌগোলিক, বনাজন্তুবিশারদ, ঐতিহাসিক, লেখক প্রভৃতি বহু কর্মী লিপ্ত আছেন। ১৯১৭ সালে ৭৮৪,৫৬৭ ডলার থেকে ১৯৪৬ সালে ২৫,২৮৫,৪৫৫ ডলার ব্যয় হয় সতেরো হাজার বর্গমাইল ব্যাপী সাতাশটি জাতীয় উদ্যান সংরক্ষণ পরিকল্পনায়। জাতীয় উদ্যান ছাড়াও জাতীয় ঐতিহাসিক পার্ক, জাতীয় সামরিক পার্ক, জাতীয় যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান, জাতীয় স্মারক পার্ক, জাতীয় সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি জাতীয় উদ্যান আছে। জাতীয় উদ্যানের মধ্যে একেডিয়া (মেন), বাঁগবেন্ড (উটা), ব্রাইস ক্যেনিয়ন (উটা), ক্রেটার হ্রদ (অরিগন), কার্লসবাদ কেভার্ন (নিউ মেক্সিকো), গ্লেসিয়ার (মন্টানা), গ্র্যান্ড ক্যেনিয়ন (এরিজোনা), গ্রেট স্মোকী মাউন্টেন (উত্তর ক্যারোলিনা), কিংস ক্যেনিয়ন (ক্যালিফোর্নিয়া), অলিম্পিক (ওয়াশিংটন) অন্যতম।

আর্জেন্টিনায় পাঁচটি জাতীয় উদ্যান স্থাপনার উদ্যোগ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়। প্রধান হল ৩০০০ বর্গমাইলব্যাপী নাহুয়েল হুয়াপী পার্ক (Nahuel Huapi Park) ও ইগুয়াজু (Iguazu) নদীর ঝরনা সম্বলিত ইগুয়াজু উদ্যান।

অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে অনেকগুলি জাতীয় উদ্যান আছে। এমন কি নিউজিল্যান্ডের মত ছোট জায়গায় ৫০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত ১০টি জাতীয় উদ্যান, রিজার্ভ ও সাধারণ ব্যবহার্য উদ্যান (Public domain) বিদ্যমান। নিউজিল্যান্ডের মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গমাইল।

দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাজ্যে ১৮৯৮ সালে স্থাপিত ক্রুগার পার্ক (Kruker Park) বন্যপশু শিকারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এটি ১৯২৬ সালে National Park Act অনুযায়ী জাতীয় উদ্যানে পরিণত হয়। কেনিয়া সরকার ১৯৪৫ সালে অর্ডিনান্সের বলে জাতীয় উদ্যান স্থাপনা করেন। জাতীয় উদ্যানের জন্য বেলজিয়ান কঙ্গোতে বিশেষ প্রচেষ্টা হয়েছে। সর্ববৃহৎ উদ্যান হল Parc National Albert। এটি ৩৯০০ বর্গমাইল বিস্তৃত। ভেরুঙা আগ্নেয়গিরিমালা, সেমলিকি সমতলের বৃহৎ অংশ, এডওয়ার্ড হ্রদ এই জাতীয় উদ্যানের মধ্যে পড়ে। এখানে বন্যহস্তী, গরিলা, আদিম অবিধ্বস্ত জঙ্গল, অদ্ভুত বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষী সংরক্ষিত আছে।

ইউরোপে জার্মানী, হল্যান্ড, ইতালী, পোল্যান্ড, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশের কর্তৃপক্ষ জাতীয় উদ্যান আন্দোলনে সাড়া দেন ও বিশেষ বিশেষ

অঞ্চল জাতীয় উদ্যান হিসাবে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা চলছে।

যুক্তরাজ্যের মধ্যে আয়র্ল্যান্ড এ বিষয়ে অগ্রণী। যুক্তরাজ্যে জাতীয় উদ্যান স্থাপনা আন্দোলনের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, বহু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান অতীতে (১৮৬০ খৃঃ অব্দে) ইংলন্ড ও ওয়েলসের গ্রামঅঞ্চল ও পশুপক্ষী সংরক্ষণের বিশেষ চেষ্টা করেন।

১৯২৯ সালের জুলাই মাসে ভাইকাউন্ট এডিসনের অধিনায়কতায় 'কাউন্সিল ফর দি প্রিজারভেশান অব রুরোল ইংল্যান্ড' একটি স্মারকলিপিতে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর নিকট যুক্তরাজ্যে জাতীয় উদ্যান স্থাপনের দাবী জানান। স্কটল্যান্ডেও অনুরূপ আন্দোলন চলে।

১৯৪৫ সালে ইংলন্ড ও ওয়েলসের জাতীয় উদ্যান সম্বন্ধে জন ডাওয়ার একটি বিবরণী পেশ করেন। এটি 'ডাওয়ার বিবরণী' নামে খ্যাত, এতে বলা হয়েছে যে, "জাতীয় উদ্যান বলতে বোঝাবে এমনই এক বিস্তীর্ণ মনোরম আরণ্যক অঞ্চল যা গড়ে উঠবে সমগ্র জাতির মনোরঞ্জন ও উপকারার্থে—জাতীয় উদ্যম, অনুপ্রেরণা ও কর্মক্ষমতার মাধ্যমে। এই উদ্যানে আঞ্চলিক নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য থাকবে অক্ষুণ্ণ এবং সুগম ও উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকবে জনগণের নির্দোষ আমোদপ্রমোদ ও মনোরঞ্জনের সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা। এতে একাধারে বন্য প্রাণী ও পুরাকীর্তি ও স্থাপত্যাবলী সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও অন্য দিকে প্রচলিত ও বহুঅনুসৃত কৃষিব্যবস্থার অব্যাহত স্থিতি বিরাজ করবে।"

এরপর এল ১৯৪৭ সালে হবহাউস রিপোর্ট। এই রিপোর্টে বারোটি জাতীয় উদ্যান স্থাপনের সুপারিশ করা হয় এবং এই বারোটি উদ্যান স্থাপনা তিন স্তরে কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত করা হয়।

		আয়তন (বর্গমাইলে)
প্রথম পর্যায়।		
1. Lake district	লেক অঞ্চল	৮৯২
2. North Wales	উত্তর ওয়েলস	৮৭০
3. Peak District	পীক্ অঞ্চল	৫৭২
4. Dart moor	ডার্টমুর	৩৯২
দ্বিতীয় পর্যায়।		
1. The Yorkshire Dales	ইয়র্কসায়ার ডেল	৬৩৫
2. The Pembrokshire Coast	পেমব্রোকসায়ার কোস্ট	২২৯
3. Exmoor	এক্সমুর	৩১৮
4. The South Downs	দি সাউথ ডাউনস্	২৭৫
তৃতীয় পর্যায়।		
1. The Roman Wall	রোমান প্রাচীর	১৯০
2. The North York Moors	নর্থ ইয়র্ক মুরস্	৬১৪
3. Brecon Beacons & Black Mountain	ব্রেকন বেকনস্ ও ব্ল্যাক মাউণ্টেন্	৫১১
4. The Broads	দি ব্রডস্	১৮১
	মোট	৫৬৮২

আনন্দমেলা

শুভেচ্ছা

আমার ছোট্ট ও তরুণ বন্ধুরা,

ক' বছর ধরে পুজোর আগেই বন্যায় ভাসে দেশ
এবারেও দেখি তারই তাণ্ডব, এখনও হয়নি শেষ।
তারই মাঝে আসে শারদোৎসব নিয়মের চাকা ঘুরে
দুঃখের মাঝে সুখের বাঁশিটি বাজাতে আপন সুরে।
আমাদের মাঝে যে-অসুর আছে, সে-অসুর নাশ তরে
অসুরনাশিনী রুদ্রাণী সাজে আসেন মোদের ঘরে।
আর্ত-দুঃখী, বিপন্নজনে কোলে নিয়ে দশভুজা,
বলেন,—'শুধু ত্যাগ ও সেবায়—কররে আমার পুজো।'
সে-পুজোই করো তোমরা এবার স্বার্থ ও সুখ ভুলে,
'আনন্দমেলা' প্রীতি-ডালিতেই এ-কামনা দিনু তুলে।

ইতি—মৌমাছি

লিখেছেন

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত; শ্রীযামিনীকান্ত সোম; সুনির্মল বসু; শ্রীনরেন্দ্র দেব; শ্রীঅখিল নিয়োগী; শ্রীবিমল ঘোষ; শ্রীলীলা মজুমদার; শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র; শ্রীশচীন কর; শ্রীআশা দেবী; শ্রীমনোজিৎ বসু; 'বুদ্ধু-ভুতুম'; শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র; শ্রীঅমিতা ঘোষাল; শ্রীনির্মাল্য বসু; শ্রীপ্রভাকর মাঝি; শ্রীছবি সেনগুপ্তা; শ্রীআদিত্য গঙ্গোপাধ্যায়; শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; জাদুকর এ সি সরকার; শ্রীরবিদাস সাহা রায়; শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু; শ্রীজ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য; শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামলকুমার চক্রবর্তী; শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়; শ্রীশশাঙ্কজীবন চক্রবর্তী; শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ বসু ও 'মৌমাছি'।

ছবি এঁকেছেন

শ্রীবিমল দাস; শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ; শ্রীঅহিভূষণ মালিক ও শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত।

ফটো তুলেছেন

রেবন্ত ঘোষ; শ্রীসত্যেন সেন ও শ্রীইরা রক্ষিত।

ব্রহ্মার ডাক্তারী

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

সৃষ্টির কর্তা ব্রহ্মা। সৃষ্টি রক্ষার কর্তা বিষ্ণু। তবু সৃষ্টিরক্ষার ব্যাপারেও মাঝে মাঝে ব্রহ্মার দৃষ্টি দিতে হয়। তাতেই তাঁকে একবার করতে হয়েছিল ডাক্তারের কাজ। ব্রহ্মার সেই ডাক্তারীর গল্পই বলছি।

সে-সময়ে পৃথিবীতে যিনি রাজা ছিলেন তাঁর নাম শ্বেতকি। তিনি ছিলেন মহা-যাজ্ঞিক। একটার পর একটা যজ্ঞ করেও তাঁর মনের আকাঙ্খা মিটত না।

একবার পুরো একবছর ধরে তিনি এক যজ্ঞ করলেন। সেই যজ্ঞ শেষ হতেই আবার আয়োজন করলেন আর এক যজ্ঞের, যা বারো বছর ধরে করার নিয়ম। কিন্তু এক বছরের যজ্ঞ করিয়েই পুরোহিতেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা বললেন, "মহারাজা, আপনার যজ্ঞশালায় একবছর আটকে থেকেই আমরা ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন আবার বারো বছরের যজ্ঞ করানো আমাদের অসাধ্য।"

শ্বেতকি-রাজা তখন নতুন পুরোহিতের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু বারো বছরের যজ্ঞের কথা যিনি শোনেন, তিনিই বলেন, "মাফ করুন, মহারাজ, অতদিন ধরে যজ্ঞ করাবার শক্তি আমার নেই।"

মুশকিলে পড়ে শ্বেতকি রাজা ভাবলেন—আর কোথায় পুরোহিতের খোঁজাখুঁজি করি! তার চেয়ে মহাদেবের তপস্যা করা যাক। তিনি আশুতোষ, সহজেই তুষ্ট হন। তিনি ... তাঁকেই ধরব আমার যজ্ঞ করতে।—এই না ভেবে তিনি মহাদেবের তপস্যা করতে লাগলেন।

তাঁর তপস্যায় মহাদেবের আসন টলল। তিনি শ্বেতকি-রাজাকে দেখা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বৎস, তুমি কি চাও?"

শ্বেতকি-রাজা বললেন, "দেবাদিদেব, আমি বারো বছরের এক যজ্ঞ করার সংকল্প করেছি। সে-যজ্ঞ করাবার পুরোহিত জুটছে না। আপনি আমার যজ্ঞের পুরোহিত হন।"

মহাদেব হেসে বললেন, "বাপু, যজন-যাজন করা কি আমার কাজ? সে কাজ ঋত্বিক-ব্রাহ্মণের। তুমি সেই ব্রাহ্মণের কাছে যাও।"

"দেব, সেই ব্রাহ্মণই যে মিলছে না। আপনি উপায় করে না দিলে আমি যজ্ঞ করি কী ক'রে!"

রাজার এ কথার উত্তরে মহাদেব বললেন, "তুমি যে এক যুগ ধরে যজ্ঞ করতে চাও, সে যজ্ঞ করানো কি যার-তার কর্ম! অবশ্য, আছেন বটে একজন এর যোগ্য। তিনি হলেন দুর্বাসা মুনি। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ধরে পড়ে ঋত্বিকের পদে বরণ করো।"

মহাদেবের উপদেশে শ্বেতকি-রাজা দুর্বাসা মুনির কাছে গেলেন। রাজার প্রার্থনায় দুর্বাসা তাঁর যজ্ঞ করাতে রাজী হলেন। তিনি বলেও রাখলেন—যজ্ঞশালায় প্রত্যহ যেন হাজার মণ ঘি আর দশ হাজার আঁটি সমিধ-কাঠ জোগাড় থাকে।

রাজার যজ্ঞ করাতে বসে দুর্বাসা 'ও' অগ্নয়ে স্বাহা' বলে দিনের পর দিন হাজার মণ করে ঘি যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিতে লাগলেন। যজ্ঞের দেবতা অগ্নিদেবকেও পুরো বারোটি বছর ধরে সেই হবি গ্রহণ করতে হলো। কিন্তু রোজ রোজ হাজার মণ ঘিয়ের আহুতি পেয়ে অগ্নিদেব বড়ই বিপাকে পড়লেন। রাজার যজ্ঞও শেষ হলো, আর তাঁরও হলো দারুণ অগ্নিমান্দ্য-রোগ। সে-রোগে তাঁর ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারেই লোপ হয়ে গেল। তখন তাঁর আর কারও যজ্ঞশালায় গিয়ে আহুতি গ্রহণের শক্তি রইল না। অগ্নির সাড়া না পেয়ে পৃথিবীতে যাগযজ্ঞ বন্ধ হয়ে গেল। যজ্ঞের ভাগ না পেলে স্বর্গের দেবতাদের ভোগ চলে কিসে! আবার দেবতারা ভোগ না পেলে সৃষ্টিরক্ষারই বা উপায় কি?

রোগের জ্বালায় একে সোয়াস্তি নেই, তার উপর স্বর্গে-মর্ত্যে হুলুস্থুলু ব্যাপার। ব্যস্ত হয়ে অগ্নিদেবকেই ব্রহ্মলোকে যেতে হলো। সেখানে গিয়ে তিনি ব্রহ্মাকে বললেন, "পিতামহ, শ্বেতকি-রাজার যজ্ঞে আমার কি দশা হয়েছে, দেখুন। এই অবস্থায় আমি যাগযজ্ঞে আর যাই কি করে! তাই পৃথিবীতে যাগযজ্ঞ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদেরও ভোগ জুটছে না। আপনি এর প্রতিকার করুন, নইলে সৃষ্টিরক্ষা হয় না।"

ব্রহ্মা বুঝলেন—সকল অঘটনই ঘটেছে শ্বেতকি-রাজার যজ্ঞে অগ্নির রোজ রোজ হাজার মণ করে হবি-গ্রহণের ফলে! কাজেই অগ্নির রোগই আগে সারাবার দরকার। কিসে তা করা যায়—ব্রহ্মা ভাবতে লাগলেন।

ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল ভাবীকালের এক দৃশ্য—এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষের মুখে ম্লেচ্ছভাষায় এক বিধান—সিমিলিয়া সিমিলিবাস কিউরেন্টার, অর্থাৎ যাতে রোগ তাতেই আরোগ্য। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনেও পড়ে গেল—পুরাকালের আর্যঋষিরাও তো বহু পূর্বেই সেই বিধানই দিয়ে রেখেছেন দেব-ভাষায়। 'বিষস্য বিষমৌষধম', 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম'। বিষে বিষক্ষয়, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। তিনি অগ্নিকে বললেন, "বাপু, সকল উৎপাতের মূলেই তো দেখছি তোমার ব্যামো। সে ব্যামোও হয়েছে তোমার অতিরিক্ত গুরুভোজনের ফলে। তোমাকে সারাবার জন্য তাই দরকার সেই-রকমই অতিরিক্ত গুরুপাক পথ্য। তা-ও দিতে হবে তোমার আকণ্ঠপুরে।"

সে পথ্য কি, আর কোথায়ই-বা তা মিলবে, তারও সন্ধান দিতে গিয়ে ব্রহ্মা বললেন, "পৃথিবীতে খাণ্ডব-বন নামে প্রকাণ্ড এক বন আছে। সেই বনে অসংখ্য জীবজন্তুর বাস। তুমি সেই বনটি পুড়িয়ে ফেললেই সেখানকার জীবজন্তু সব মারা পড়বে। তাদের মেদমাংসই হবে তোমার পথ্য, আর সে পথ্যই চালাতে পারবে পেটপুরে।"

ব্রহ্মার কথামত অগ্নিদেব খাণ্ডব-বন পোড়াতে গেলেন। সে-বনে সত্যিই লাখে লাখে জীবজন্তু ছিল। তাদের কেউ কেউ

রাজার প্রার্থনায় দুর্বাসা তাঁর যজ্ঞ করাতে রাজী হলেন

ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়। অগ্নির তেজে সে বন জ্বলে উঠতেই দলে দলে হাতি শুঁড় দিয়ে জল এনে আগুন নিভিয়ে দিল। খবর পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্রও অন্তরীক্ষে এসে দেখা দিলেন। তাঁর হুকুমে কড়্‌কড়্‌ করে বাজ ডেকে উঠল, ঝপ্‌ঝপ্‌ করে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল। সাত দিন ধরে চেষ্টা করেও তাই অগ্নির বন পোড়াবার সাধ্য হল না। নিরুপায় হয়ে তখন তাঁকে ছুটতে হলো আবার ব্রহ্মার কাছে।

খাণ্ডব বন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো

ব্রহ্মা তাঁকে পরামর্শ দিলেন, "পৃথিবীতে নরনারায়ণের অবতার কৃষ্ণ আর অর্জুন আছেন। তাঁদের প্রবল প্রতাপ, আর দুজনেই তাঁরা মহাবীর। তুমি তাঁদের কাছে গিয়ে সাহায্য চাও।"

অগ্নিদেব ব্রাহ্মণের বেশে পৃথিবীতে গেলেন। তারপর কৃষ্ণ আর অর্জুনের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে খাণ্ডব-বন পোড়াবার জন্য তাঁদের সাহায্য চাইলেন।

সকল কথা শুনে কৃষ্ণ আর অর্জুন তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। কিন্তু সেজন্য যুদ্ধ করতে হলে তাঁদের তো উপযুক্ত রথ আর অস্ত্রশস্ত্র চাই। অগ্নিদেব তাই বরুণ-দেবের নিকট হতে কৃষ্ণের জন্য সুদর্শনচক্র আর কৌমদকী গদা চেয়ে আনলেন, অর্জুনের জন্যও আনলেন গাণ্ডীব-ধনু, অক্ষয় তূণ আর কপিধ্বজ-রথ। সেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কৃষ্ণ আর অর্জুন গিয়ে দাঁড়ালেন খাণ্ডব-বনের দুইদিকে। তখন আর অগ্নিকে বাধা দেয় সাধ্য কার! অগ্নিদেবের তেজে খাণ্ডব-বন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সেই আগুনে পুড়ে বনের জীবজন্তু প্রায় সকলেই প্রাণ হারালো। তাদের মেদমাংসের পথ্য পেয়ে অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য-রোগ দূর হলো।

এরপর অগ্নিদেবের যাগযজ্ঞের আহুতি-গ্রহণ করতে আর বাধা রইলো না। কাজেই পৃথিবীতেও আগেরই মত যাগযজ্ঞ চলতে লাগলো। যজ্ঞের ভাগ পেয়ে স্বর্গের দেবতারাও নিশ্চিন্ত হলেন।

[এই পাতার সুনির্মল বসুর লেখা 'পুজোর দিনে' কবিতাটি অপ্রকাশিত জানিয়ে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য পাঠিয়েছেন।—মৌ]

পুজোর দিনে
সুনির্মল বসু

পুজো-বাড়ির মণ্ডপে আজ
কিসের কলরোল?
ওই শোনা যায় 'টাক্‌-ডুমা-ডুম্‌'
মিষ্টি মধুর বোল্‌।
টাক্‌-ডুমাডুম্‌ ঢোল বেজে যায়—
তাইতো আমোদ জাগছে মেজাজ
আয়রে ছুটে পাড়ার সবাই,—
করিস্‌নে আর গোল,
'টাক্‌-ডুমাডুম্‌, টাক্‌-ডুমাডুম'
বাজছে কেমন ঢোল।

শানাই বাজায় কানাই দুলে,
গাল ফুলিয়ে আজ,
'পোঁ-পোঁ-পোঁ' বাজছে বাঁশি
সকাল হতে সাঁঝ।
তালে তালে বাজছে কাঁসর
জোর জমেছে পুজোর আসর,
পাড়ায় আজি ছুটছে যেন
আনন্দ-হিল্লোল,
পোঁ-পোঁ-পোঁ' বাজছে শানাই,
'টাক্‌-ডুমাডুম্‌' ঢোল।

গতির গান
নরেন্দ্র দেব

তোমরা কেন পড়ার ঘরে আটকে আছো ভাই,
বেরিয়ে এসো দলবেঁধে সব চাঁদের দেশে যাই।
সাত সমুদ্দুর তেরো নদী
লাগতো যেতে মাসাবধি,
সাগর জলে জাহাজ টলে, ঘুরতো মাথা ভাই।

হাতি-ঘোড়ায় নৌকো চড়ায় হয়না কারু মত,
আজকে শুধু জগন্নাথই চড়েন একা রথ।
আমরা এখন হাওয়ার বেগে
আকাশ-যানে উড়ছি মেঘে,
একদিনেতেই পেরিয়ে চলি মাস ছয়েকের পথ।

সাধ মেটেনা বিদ্যুতে আজ টানলে প্যাসেঞ্জার,
রেলের সেরা 'মেল'গুলোকেও পছন্দ নয় আর।
হলেই টাকার অপ্রতুল,
চড়ছি গিয়ে 'ভেস্টিবুল'
মোটর গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটি যেন 'রেসিংকার!'

গতির বেগে পাগল তারা রকেট যারা দাগে,
নীহারিকায় বেড়িয়ে আসার স্বপন মনে জাগে।
হয়ত কবে চাঁদের দেশে
পিকনিকেতে যাবই শেষে,
দুঃখ শুধু, স্পেস-শিপেতে কুকুর গেল আগে!

বীর বাঙালী

যামিনীকান্ত সোম

বাংলার মাটিতে কি শুধু দার্শনিক জন্মায় আর কবি জন্মায়? বাংলার মাটিতে কি বীরপুরুষ জন্মায় না? অবশ্যই জন্মায়। এক বীরের গল্প বলি।

বাংলাদেশে পাল বংশের রাজারা ছিলেন খুব কীর্তিমান, খুব পরাক্রমশালী, খুব বীর। কিন্তু সব রাজা তো সমান হয় না। পাল বংশের রাজা মহীপাল দেব তাঁর পিতৃ-পিতামহের প্রথামতো না চলে বিপথে চলতে আরম্ভ করলেন।

সেই সময় উত্তরবঙ্গে কৈবর্তনায়ক দিব্বোক বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন। রাজা মহীপাল বিদ্রোহীকে দমন করবার জন্য সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। বিদ্রোহী দিব্বোকেরও সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল না। দুপক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হল—অতি নিদারুণ যুদ্ধ। সে যুদ্ধে রাজা মহীপালের সৈন্য সব ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। রাজা মহীপালও নিহত হলেন।

এবার দিব্বোক হলেন রাজা—বাংলার রাজা। হলেন তিনি অতি জনপ্রিয় রাজা। তিনি পরম সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। এক জয়স্তম্ভ তাঁর কীর্তির কথা আজও ঘোষণা করছে, উত্তরবঙ্গের এক সরোবরের বুকে দাঁড়িয়ে।

বীর দিব্বোকের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবীর ভীম বসলেন সিংহাসনে। কিন্তু পাল বংশের বংশধরেরা এখনো জীবিত। তাঁরা বড়ো হয়েছেন, বীরও হয়েছেন। কিন্তু রাজ্য যাওয়াতে তাঁদের দুর্দশার শেষ নাই। দুই ভাই রামপাল ও শূরপাল—এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়িয়ে শেষে পদ্মা ও ভাগিরথীর মধ্যে 'ব' দ্বীপে গিয়ে কোনরকমে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। রামপাল রাজা হয়ে দেখলেন, মহাবীর ভীম হলেন, তাঁর খুড়ো দিব্বোকের মতোই প্রতাপশালী কিংবা তাঁর চেয়েও বেশী। ভীমের হাত থেকে বঙ্গ-ভূমির উদ্ধারসাধন অসম্ভব।

কোন কিছু ঠিক করতে না পেরে তিনি তাঁর সামন্তদের শরণাপন্ন হলেন। এঁদের বুঝিয়ে বললেন রাজনৈতিক অবস্থার কথা। সামন্তদের সাহায্য চাইলেন। রাজা রাম-পাল দেবের ব্যবহার ছিল মনোরম। তাঁর আচরণে সামন্তরা খুশি হলেন এবং রাম-পালের পিতৃরাজ্য উদ্ধারে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সৈন্য সংগ্রহ হল। ভীমের শক্তি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হলেন শিবরাজদেব। ইনি হলেন রামপালের মামার ছেলে। শিবরাজদেব গিয়ে গ্রামগুলি দখল নেবার চেষ্টা করলেন। অনেক গ্রাম দখলও করলেন। শেষে কিন্তু ভীম প্রচণ্ডবেগে এসে তাঁকে বাধা দিলেন। বাধা পেয়ে শিবরাজদেব নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন। রামপালকে বলে গেলেন, তাঁর রাজ্য শত্রুমুক্ত হয়েছে।

কিন্তু কই হয়েছে শত্রুমুক্ত? কিছুই হয়নি। বরং ভীমের প্রতাপ আরো বেড়ে চললো। রামপাল তখন পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য বিপুল আয়োজন করতে লাগলেন।

ভীম দুর্দান্ত হাতিতে চড়ে অসংখ্য সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে নামলেন

কি রকম আয়োজন? তার আবাহনে—উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, মানভূম প্রভৃতি জায়গা থেকে বিপুল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে, সে দেশের রাজারা সব রামপালের রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর এই বিরাট বাহিনী 'নৌকা মেলক' অর্থাৎ নৌকার এক সেতুযোগে ভাগিরথী পার হয়ে ভীমের রাজ্যে উপস্থিত হল যুদ্ধ করবার জন্য।

রাজা ভীমও তার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন এতদিন ধরে। শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য এবং সর্বসাধা-রণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য, আর বন্যার প্লাবন এসে যাতে দুর্গের ভিত্-জমিতে না পৌঁছয়—তার জন্য তিনি মাটির এক চওড়া প্রাচীর তৈরী করাতে আরম্ভ করেছিলেন। সে প্রাচীর হল খুব উঁচু। তৈরী হয়ে গেল সে প্রাচীর। স্থানটি হল সুরক্ষিত। তার নাম 'ভীমের জাঙ্গাল'। সে প্রাচীরের চিহ্ন এখনো কিছু আছে।

নানা রাজ্যের রাজারা এলেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ভীম কিন্তু আদৌ ভয় পেলেন না। তিনি তাঁর অসংখ্য কৈবর্তসেনা নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর চেহারাটি ছিল সত্যই ভীমের মতো। তিনি রণসাজে সেজে, এক দুর্দান্ত হাতিতে চড়ে, ভয়ংকর এক তরোয়াল আর বিশাল এক বর্শা নিয়ে, আর অসংখ্য সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে নামলেন। ভীষণ যুদ্ধ চললো সকাল থেকে। ভীমের কী পরাক্রম। রাজা রামপালের বিপুল সৈন্যবাহিনী। কিন্তু ভীমের প্রতাপে রামপালের বহু সৈন্য মারা গেল। এদিকে বিপক্ষের প্রতাপে ভীমেরও সৈন্যসংখ্যা কমতে লাগলো। ভীম অনবরত সৈন্য চালনা করছেন।

হঠাৎ তিনি হাতির পিঠে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন আর যায় কোথায়। রাম-পালের সৈন্যদল এসে তাঁকে ঘিরে ফেললে। তাঁকে হাতির পিঠ থেকে চট্‌পট্‌ নামিয়ে বন্দী করে ফেললে। ভীম চোখ চেয়ে দেখেন, তিনি বন্দী। তাঁর সেনারা ভড়কে গিয়ে পালাতে লাগলো। ভীমকে নিয়ে গিয়ে কারাগারে রাখা হল।

কিন্তু যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। তাঁর এক দুর্ধর্ষ সেনাপতি ভীমের সেনাদের একত্র করে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল অল্প আর রাজা রামপালের সৈন্য ছিল তখনও অসংখ্য। সেনাপতি হেরে গেলেন। তাঁকেও করা হল বন্দী। রাজা রামপালের জয় হল। তিনি তখন মহাবিক্রমে গিয়ে ভীমের রাজধানী ডমর নগর ধ্বংস করে দিলেন। তারপর?

তারপর আর কি? ভীমকে বধ করা হল, আর তাঁর সেনাপতিকেও। এইভাবে কৈবর্ত-রাজ্যের যবনিকাপাত হল— মহাপ্রতাপশালী কৈবর্তরাজার রাজ্য নিশ্চিহ্ন হল।

কাক ও কোকিল

শ্রীঅখিল নিয়োগী
(স্বপনবুড়ো)

[এই নাটক অভিনয় করতে ছেলেমেয়েদের মুখোস ব্যবহার করতে হবে। মাইকে হর-বোলার ডাক উপভোগ্য হবে।

একটি বনের দৃশ্য। নাচতে নাচতে কাক আর কাক-বৌয়ের প্রবেশ]

॥ সমবেত নৃত্যগীত ॥

বনের ধারে বাস যে মোদের—
আমরা দুটি কাক—
বটের ডালে তৈরী বাসা
তাই ত' করি জাঁক!
শহর গ্রামে সবাই জানে
কাক কাক-বৌ সবাই মানে
কাকের দলে মোদের মতো
আছে যে লাখ লাখ!

কাক ॥ দেখ কাক-বৌ, তোর ত' বাচ্চা হল—
—তাই বনের ধারে নিরিবিলি ওই বট-গাছের ডালের ওপর কেমন সুন্দর বাসা তৈরী করলাম।

কাক-বৌ ॥ হ্যাঁ কাক, এ বাসা বৃষ্টিতে ভিজবে না, ঝড়ে উড়বে না। গাছের ডালে পাতার ছায়ায় দিব্যি বাচ্চাগুলো বড় হবে।

কাক ॥ হ্যাঁ, আমি ওদের জন্যে নানা দিক থেকে খাবার খুঁজে নিয়ে আসবো। তুই বাসা পাহারা দিবি।

কাক-বৌ ॥ আমার শুধু একটি ভয়—

কাক ॥ কি ভয় রে? কি ভয়? আমি থাকতে তোর আবার ডর কিসের?

কাক-বৌ ॥ আমি বলছিলাম কি, —গাছের কোটরে যদি সাপ থাকে? আমার বাচ্চাদের যদি খেয়ে ফেলে? সেবার দক্ষিণ বনে গাছের কোটর থেকে একটা সাপ এসে বাচ্চাগুলিকে গিলে ফেলেছিল, তোর মনে নেই?

কাক ॥ ঠিক! ঠিক! আমি গোটা বনটা ঘুরে দেখি—সাপটাপ কোথায়ও আছে নাকি? সাপ যদি কোথায়ও থাকে তা হলে বেজী ভায়াকে খবর দেবো—

[কাক চলে গেল]

কাক-বৌ ॥ যাই, আমিও তাড়াতাড়ি খাবার খুঁজে নিয়ে আসি। তারপর সারাদিন ত' বাসা পাহারা দিতে হবে। বাচ্চাগুলো জাগবার আগেই খাবার জোগাড় করে রাখতে হবে।

[প্রস্থান]

[কোকিল আর কোকিল-বৌয়ের নেচে গেয়ে প্রবেশ]

॥ নৃত্য-গীত ॥

সারা কানন মাতিয়ে রাখি
কুহু-কুহু তানে—
কোকিল মোরা, সবাই মোহিত
আমাদেরই গানে।
মোদের গানে ফুল যে ফোটে
মৌমাছি দল মধু লোটে—
বসন্তেরই রানী জাগেন—সবার প্রাণে প্রাণে ॥

[কোকিল আর কোকিল-বৌ নৃত্যে-গীতে বনভূমি মুখরিত করে তুললো [

কোকিল-বৌ ॥ কিন্তু কোকিল, আমাদের শুধু গান গাইলেই চলবে না। আমার যে বাচ্চা দুটো হয়েছে—তাদের মানুষ করতে হবে ত!

কোকিল ॥ ঠিক বলেছিস কোকিল-বৌ। আমরা গান গেয়ে মানুষের মনোহরণ করতে পারি, কিন্তু বাসা বাঁধতে পারি না।

কোকিল-বৌ ॥ আচ্ছা, খুঁজে-পেতে দেখ না, এই বনে কোথায় কাকের বাসা আছে।

কোকিল ॥ কিন্তু কাকের বাসা দিয়ে আবার কি হবে? ওরা আমাদের চিরকালের শত্রু।

কোকিল-বৌ ॥ শত্রু হোক, ওরা কিন্তু বাচ্চা-গুলোকে খুব ভালো ভাবে মানুষ করতে পারে। কাজেই ওদের বাসাতেই আমার বাচ্চাদুটো রেখে যাবো। একটু বড় হলেই আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

কোকিল ॥ কিন্তু নিজের বাচ্চা চিনবি কি করে?

কোকিল-বৌ ॥ নিজের বাচ্চাকে তার মা চিনতে পারবে না? এটা আবার একটা কথা হল নাকি?

কোকিল ॥ তা হলে আর দেরী নয়। কোকিল-বৌ, তুই তাড়াতাড়ি আমাদের বাচ্চা দুটিকে নিয়ে আয়—

কোকিল-বৌ ॥ কিন্তু কাকের বাসা? তার সন্ধান পেলি নাকি?

কোকিল ॥ হুঁ। আমি এক ফাঁকে দেখে নিয়েছি। এই যে বটগাছ—ওর ডালেই রয়েছে কাকের বাসা। তাতে কয়েকটি কাকের ছানাও ঘুমিয়ে আছে।

কোকিল-বৌ ॥ তাহলে ত' আর কথাই নেই। আমি এক্ষুনি বাচ্চাদুটোকে এনে কাকের বাসায় রেখে যাই— কাকের বাচ্চার সঙ্গে কোকিলের বাচ্চাও মানুষ হবে।

[কোকিল তাড়াতাড়ি ছুটে গেল, তারপর নিজের বাচ্চা দুটিকে এনে—কাকের বাসায় শুইয়ে দিল।]

কোকিল ॥ চল কোকিল-বৌ, আর দেরী নয়। এক্ষুনি কাক আর কাক-বৌ এসে হাজির হবে।

কোকিল-বৌ ॥ চল চল,—আমরা পালাই, চল—

[কোকিল আর কোকিল-বৌ চলে গেল। অন্য দিক দিয়ে কাকের প্রবেশ]

কাক ॥ সারা বনটা ঘুরে দেখে এলাম। কোনো গাছে সাপের কোটর নেই। দেখলেই ঠুকরে ওর ফণাটা ছ্যাঁদা করে দেবো। তা ছাড়া বেজী-বন্ধু আমার সহায়। আমি সাপকে ভয় করি না। **[চারদিকে চেয়ে]** কিন্তু কাক-বৌ আবার কোথায় গেল? বাচ্চাগুলো খালি বাসায় রয়েছে—

[কা-কা শব্দ করে কাক-বৌয়ের প্রবেশ]

কাক-বৌ ॥ আমি গেছি আর এসেছি। জানি, তুই বনেই আছিস! বাচ্চাদের জন্যে খাবার নিয়ে এলাম। একটা বোকা ছেলে ঠোঙায় করে সন্দেশ নিয়ে যাচ্ছিল। আমি সেই ঠোঙাটা নিয়ে এক ছুটে পালিয়ে এলাম—

কাক ॥ তাই নাকি রে—? তাই নাকি রে? আমিও যেন ওর ভাগ পাই। কাক-বৌ ভারী ভালো মেয়ে।

কাক-বৌ ॥ দেখ কাক, তুই ভারী লোভী। আমি বাচ্চাদের জন্যে সন্দেশ নিয়ে এলাম, আর তুই সেই খাবারে নজর দিচ্ছিস? ভালো হবে না কিন্তু বলছি—

[বাসার কাছে গিয়ে চিৎকার করে উঠল]

গোটা বনটা ঘুরে দেখি সাপটাপ কোথাও আছে নাকি?

কাক ॥ কি হল রে—কি হল?

কাক-বৌ ॥ আমার বাসায় দুটো বাচ্চা বেশী বেশী দেখছি কেন?

কাক ॥ কোথায় আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম,—সাপে বাচ্চা খেয়ে না ফেলে,—আর তুই কিনা বলছিস, দুটো বাচ্চা বেশী? নিশ্চয়ই তুই আগে গুণতে ভুল করেছিলি।

কাক-বৌ ॥ না-না, আমি ভুল করিনি। দুটো বাচ্চা বেশী দেখছি—

কাক ॥ না-না, বেশী কি করে হবে? আমি ত' আশপাশের গাছগুলো দেখে বেড়াচ্ছিলাম, সাপ কোথায়ও ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে কিনা!

কাক-বৌ ॥ কিন্তু দুটো বাচ্চা বেশী দেখছি যে—

কাক ॥ আচ্ছা কাক-বৌ—

কাক-বৌ ॥ কি বলবি বল—

কাক ॥ তুই এক দুই গুনতে জানিস?

কাক-বৌ ॥ হুঁ! ছেলেবেলায় আমি বায়স-পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়েছিলাম যে!

কাক ॥ আচ্ছা, গোন্ ত' এক-দুই। আমি শুনি—

কাক-বৌ ॥ এক—দুই—সাত—তিন—পাঁচ—

কাক ॥ হা-হা-হা! হো-হো-হো! হি-হি-হি! হোলো না! হোলো না!

কাক-বৌ ॥ আচ্ছা গুনতে না হয় না-ই পারি, কিন্তু দেখে ত' বলে দিতে পারি—

কাক ॥ হুঁ! চোখের দেখায় কখনো গোণা যায়! তুই বোধহয় পাঠশালায় অঙ্কে রস-গোল্লা পেতিস?

কাক-বৌ ॥ তা ত' পেতামই। আমাদের পাঠশালার পাশেই রসগোল্লার দোকান ছিল যে! নামতা পড়তে পড়তে ছোঁ মেরে গামলা থেকে রসগোল্লা ঠোঁটে করে নিয়ে আসতাম যে!

কাক ॥ হুঁ! সেই জন্যেই এক-দুই শেখা হয়নি! ও বাচ্চা দুটো আমাদেরই। তুই গুনতে ভুল করেছিস্!

কাক-বৌ ॥ তা হবেও বা!

কাক ॥ তাহলে সবগুলো বাচ্চাকেই এক-সঙ্গে শিখিয়ে পড়িয়ে তোল। কিন্তু খবরদার, ভুল নামতা শেখাসনি যেন!

[কাক ও কাক-বৌয়ের নৃত্য-গীত]

কাক-বৌ ॥ নাই বা হল নামতা শেখা
অনেক কিছু জানি—
ফল-পাকুড় আর নানান খাবার
ঠোঁটে করেই আনি!

কাক ॥ জানি—জানি —জানি'
এক-দুই-তিন না শিখলে
হিসাব কিসে রবে?
নিজের ছেলে পরের ভেবে
শঙ্কা মনে হবে!
মধ্যে এ বৌ নিয়ে আমার
আসল বিপদ মানি!

কাক-বৌ ॥ তোমার যত বুদ্ধি আছে
সকল পড়ে ধরা
উল্টো পথে চলতে গিয়ে
হোঁচট খেয়ে পড়া!
বাচ্চা মানুষ করতে পারি,
তাই ত আমি রানী॥

কাক ॥ ঘাট হয়েছে কাক-বৌ! আমার ঘাট হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে এই যে, খাইয়ে-পড়িয়ে বাচ্চাগুলোকে বড় করে তোল!

[ক্ষণিক বিরতি]

[যবনিকা উত্তোলিত হলে দেখা গেল—সেই একই বটগাছের দৃশ্য। কোকিল আর কোকিল-বৌ পা টিপে-টিপে ঢুকছে]

॥ উভয়ের নৃত্য-গীত ॥

কোকিল-বৌ ॥ বাচ্চা দুটো বড় হল—
হাঁফ ছেড়ে তাই বাঁচি!

কোকিল ॥ কাকের বাসায় কোকিল ছানা—
আয়রে দুজন নাচি॥
ধিন্‌তা-ধিনা—ধিন্‌তা-ধিনা—
ধিন্‌তা-ধিনা!

কোকিল-বৌ ॥ বাচ্চা যবে বলবে কুহু—

কোকিল ॥ কাক যে করে—উঁহুঁ! উঁহুঁ!

উভয়ে ॥ আপন ছানা নিয়ে যেতে
তখন মোরা রাজি॥
ধিন্‌তা-ধিনা—ধিন্‌তা-ধিনা—
ধিন্‌তা-ধিনা!

কোকিল ॥ আর নাচ গানে দরকার নেই। এক্ষুনি কাক আর কাক-বৌ এসে হাজির হবে —

কোকিল-বৌ ॥ চল, আড়ালে লুকিয়ে থেকে মজা দেখি—

[উভয়ের প্রস্থান]

[কাক আর কাক-বৌয়ের প্রবেশ]

কাক-বৌ ॥ বাচ্চাগুলো বড় হলে মায়ের দুঃখ ঘোচে। তখন খাবার আনা শিখিয়ে দেবো। নিজেরাই নিজেদের খাবার জোগাড় করে নিতে পারবে।

[বাসার কাছে গিয়ে আনন্দের-স্বরে

ঐ বটগাছের ডালেই কাকের বাসা

শিউলী-ঝরা দিন

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
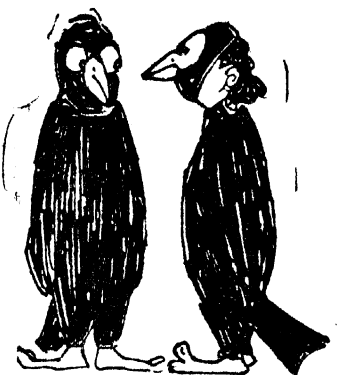
আকাশ, কবে পরলে তুমি
নীলাম্বরী শাড়ি?
হাওয়ার হাতে ভাঙল যত
মেঘের ঘরবাড়ি।
শিশির-জলে স্নানের শেষে
ঘাসের এলোচুলে,
সাজলো কবে বসুন্ধরা
শিউলিতে, কাশফুলে?
গাছের কোলে দোয়েল দোলে
কোয়েল শ্যামা নাচে,
পদ্মফুলের গন্ধে সারা
বাতাস ভরে আছে!
কনকচাঁপা রোদ-রাঙানো
মিষ্টি সকালবেলা
কোকিল-কালো দিঘির জলে
আলো-ছায়ার খেলা!
ধানের ক্ষেতের খুশীর ছোঁয়া
কিষাণ-বধূর মনে
মায়ের আগমনের সাড়া
প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে॥

কাক ॥ 'বেশ বড়-সড় হয়েছে গো বাচ্চাগুলো! সত্যি বলছি কাক-বৌ, তোর কাজের তারিফ করতে হয়। কত কষ্ট করে তুই ওগুলোকে এত বড় করে তুলেছিস!

[হঠাৎ বাসার ভেতর কুহু-কুহু ডাক শোনা গেল]

কাক-বৌ ॥ এ কি! কাকের বাসায় কোকিলের ডাক শোনা যায় কেন?

কাক ॥ তাই ত কাক-বৌ, কোকিলের ছানার গলা পেলাম যেন!

কাক-বৌ ॥ **[বাসার কাছে গিয়ে]** হুঁ! তাইত! তাইত! সেই দুটো বাড়তি বাচ্চা! আমি সেই দিনই বলেছিলাম—গুনতিতে বেশী ঠেকছে! তা তুই আমায় বললি কিনা, আমি গুনতে জানিনে!

[সঙ্গে সঙ্গে কোকিল আর কোকিল-বৌয়ের প্রবেশ]

কোকিল ॥ কাক ভায়া, কাক ভায়া, বাড়ি আছ? আমাদের দুটি বাচ্চা ভুল করে উড়ে এসেছে—

কোকিল-বৌ ॥ **[ছুটে গিয়ে]** হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ত আমার হারানো বাচ্চা—

[তুলে নিল]

কোকিল ॥ ধন্যবাদ! তাহলে আসি কাক ভাই। ওদের আবার গান গাইতে শেখাতে হবে ত! **[প্রস্থান]**

কাক ॥ তাইত! আচ্ছা বোকা বানিয়ে চলে গেল!

॥ য — ব — নি — কা ॥

পুঁটি আর পাঁঠা

শচীন কর

মজার মজার গল্প বলত বিষণপুরের হরু পাল। গল্পে তার নাম-ডাক আশপাশের দশ গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কেউ যদি ফরমাস করত—"হরুদা একটা বাঘটাগের গল্প শোনাও", হরু অমনি বলত —"তাহলে টাগের গল্পটাই শোন। বাঘ মানুষ খায়। টাগের কিন্তু হালুম-খেলুম নেই। সে মানুষ খায় না, মানুষকে হাসায়।

হরু যখন তখন গল্প বলত না। তার গল্প বলার সময় ছিল সন্ধের পর। তাও সবদিন আবার তার গল্প হতো না। হরু বলত—"আজ মেজাজটা ভালো নেই, ভাই। জান তো মেজাজ না হলে গল্প জমে না। আজ বরং গল্প ছেড়ে শপ্প করা যাক, মানে চুপচাপ শপে শুয়ে টেনে ঘুম দেওয়া যাক।"

কেউ এক ছিলিম তামাক সেজে হুঁকোটা হরুর হাতে দিয়ে বলত—"নাও হরুদা, এক-টান তামাক খেয়ে নাও, মেজাজ আসবে।" হরু অমনি বলত—"দূর বোকা কোথাকার, তামাকে কি মেজাজ আসেরে, ওতে তো শুধু কাশি আসে।"

সবাই হো হো করে হেসে উঠত হরুর কথায়।

গল্পে হরুর জুড়ি ছিল শিবু দে। সে ছ-গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে কাজ করত। জমিদারবাবু গল্প শুনতে ভালোবাসতেন। তাঁকে মজার মজার গল্প শোনানই ছিল শিবুর কাজ। প্রজারা কেউ কোন নালিশ নিয়ে ধরত গিয়ে প্রথম শিবুকে। বলত—"বাবুমশাইর মেজাজ শুনছি আজ ভালো নেই। তুমি একটা মজার গল্পটপ্প বলে মেজাজটা যদি খোশ করে দাও তবে বড় উপকার হয়। লক্ষ্মী দাদা আমার, এ কাজটা তোমায় করে দিতে হবেই।"

শিবু হেসে বলত—"চেষ্টা নিশ্চয়ই করব। তবে কি জান ভাই, জমিদারের মেজাজ তো, একবার বেঁকে বসলে সিধে করা শিবের অসাধ্য। শিবু তো কোন্ ছার!"

সেদিন জমিদারবাবুর ঘোড়াটা দড়ি ছিঁড়ে আস্তাবল থেকে পালিয়েছে। সবাই ছুটেছে ঘোড়া খুঁজতে। শিবু বললে—"ঐ পুকুরপাড়ের তালগাছটার মাথায় কাল রাতে যেন চিঁ-হিঁ-হিঁ আওয়াজ শুনলুম, দেখ না একবার খুঁজে হে।"

শিবুর রসিকতায় সবাই বিরক্ত হয়। বলে "ঘোড়া খুঁজে বার করতে না পারলে ঘোড়ার চাবুকে পড়বে সকলের পিঠে, আর তুমি কি না এই নিয়ে মস্করা করছ।"

শিবু গম্ভীর হয়ে বলে—"এক্কেবারেই না। তোরা জানিস তো শুধু খেতে আর বুঝিস বড়জোর এই রসিকতা, তোদের সঙ্গে যাবো মস্করা করতে? আমি সত্যি কথাই বলছি, কাল রাতে সত্যি সত্যি তালগাছের মাথায় ঘোড়ার চিঁহিঁহিঁ শুনেছি। জানিস তো, বাবুমশাইর ঘোড়া হলো পক্ষীরাজের সামিল। পক্ষীরাজ আকাশে উড়তে পারে; আর তালগাছে চড়তে পারে না!"

এমনি কথায় কথায় তার রসিকতা। কথায় কথায় হাসি। শিবুকে কেউ কখনো মুখ ভার করে বসে থাকতে দেখেনি। শিবু নিজেই বলে দিত—"গরিব মানুষ। ভালোমন্দ কিছু তো মুখে চাপাতে পারিনি, এ মুখ আর ভারি হবে কী করে?"

লোকের মুখে মুখে হরু পালের কথাও ছগাঁয়ের জমিদারবাবুর কানে এসেছে। তিনি সবাইকে ডেকে বললেন—"আমরা একদিন

হরু ভিন্ গাঁ থেকে এসেছে.....

হরু আর শিবুর গল্প শুনব একই আসরে বসে। তোমরা কী বল?"

সবাই খুশী হয়ে বলে—"এ বেশ হবে বাবুমশাই, খুব ভালো হবে।"

ঢোলশহরতে হরু-শিবুর গল্পের কথা চাউর করে দেওয়া হলো। জমিদারবাড়ির উঠোনে খাটানো হলো প্রকাণ্ড শামিয়ানা। বিছিয়ে দেওয়া হলো বড় বড় শপ-শতরঞ্জি। আলো জ্বালানো হলো। দশ গাঁ ভেঙে লোক এসেছে। লোকে লোকারণ্য। শিবুর দলের লোকেরা বলছে—"হরু তো হেরোরই নাম। ও তো হেরেই যাবে।" পাল্টা জবাব দেয় হরুর দল—"বিষম পাল্লায় পড়েছ গো শিবুদা। এবারে শিবনেত্র হতে হবে।" একদল আবার বলে—"হর যা, শিবও তাই। তবে আর এই নিয়ে দলাদলি কেন?"

হরু ভিন্ গাঁ থেকে এসেছে। তাই আগে গল্প বলার মান দেওয়া হলো তাকেই। জমিদারবাবু বললেন—"হরু, তোমার গল্পই আগে হোক।" হরু, জমিদার আর উপস্থিত সবাইকে নমস্কার করে গল্প শুরু করে:

ডিঙিডোবা বিলের নাম আপনারা সবাই শুনেছেন। কিন্তু সে বিলের মাছের কথাটা হয়ত অনেকেই শোনেননি। লোকে বলে—সেখানে মাছের গোণাগুনতি নেই। আকাশে যত তারা, তত মাছ সে বিলে। মাছ খেয়ে খেয়ে এক একটা বক দেখতে হয়েছে—এক একটা উট পাখির মতো। রাত-বিরেতে হঠাৎ বিলের ধারে একটা ভোঁদড় দেখে মনে হবে, ভালুক বুঝি! জলঢোঁড়া সাপ দেখে মনে হবে একটা পেয়ায় বাঁশ বুঝি জলে সাঁতার কাটছে। শুধু ও-তল্লাটের মানুষগুলো রোগাপটকা। কারণ ডিঙিডোবা বিলে কেউ মাছ ধরতে যেতে সাহস করে না। কারণ তারা শুনেছে সেখানে মানুষে মাছ খায় না, মাছে মানুষ খায়।

"এসব কথা আমাদের দমাতে পারেনি। ভাবলাম, দিন ফুরোলে আমাকে মরতে যখন হবেই তখন দেখাই যাক না মাছের হাতে মরে। ঠিক করে ফেললাম—ডিঙি-ডোবায় মাছ ধরতে যেতেই হবে, যা থাকে কপালে।

"আমাদের পাড়ার মধুদা ছিলেন ওস্তাদ মাছ-শিকারী। মাছধরার কত সরঞ্জামই না ছিল তাঁর বাড়িতে। ঘুগরি, নিউড়ি, ঝাঁঝরি, মুগরি, বেসালি, খাঁইগাতি কত নামের জাল ছিল। আর ছিল পলো, ঘনি, ঝুপি, টেঁটা, হাতছিপ, পুটুলি ছিপ, হুইল ছিপ। মধুদার ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল—মাছরাঙা মধু। আমরা গিয়ে তাঁকেই ধরে পড়লাম চার ফার তৈরি করতে। কোন্ চারে কোন্ মাছ আসে তা মধুদার মতো কেউ জানত না।

"আমাদের কথা শুনে মধুদা বললেন—'ডিঙিডোবা বিলে চার ফেলবি কিরে বোকারা। সে বিলে রাতদিন মাছ কিলবিল করে ঘোরে। মাছের ভিড়ে বঁড়শি সুতোটা ফেলবার জায়গা পাবি নে'। যা হোক চার না নিয়েই আমরা ছিপে মাছ ধরতে গেলাম। মধুদাও সঙ্গে গেলেন।

"কথাটা মধুদা মিথ্যে বলেননি। ছিপ ফেলেছি কি না ফেলেছি অমনি ফাতনাটা নড়ে উঠল। প্রথম মনে করলাম হাওয়া। কিন্তু তারপরেই দেখি ফাতনার আর পাত্তা নেই। যেমনি দেখা আর অমনি প্রাণপণে খিঁচা। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, একটা গাছের গুঁড়িতে বুঝি বঁড়শি আটকে গেছে। কিন্তু গাছ নয়, মাছ। প্রথম টানেই মাছটা এক দৌড়ে বিলের ওপারে চলে গেল। সেখান থেকে লেজটি দেখিয়ে, মনে হলো একটা গোটা তালপাতা দেখলাম,—আবার ডুব। তারপর একবার ডুব, একবার টান, আবার ডুব আবার টান। মাছ আর ওঠে না। সারাটা দিন গেল। এদিকে খবর পেয়ে পিঁপড়ের মতো গাদি লেগে গেল মানুষের। এদিকে আমরা ডাঙায় বসে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। কতক্ষণ পর পর হাত বদল করি। আর দেখি একজনেরও হাতের তেলোর চামড়া নেই। যা হোক, সারাদিন ধস্তাধস্তির পর মাছ তো

কোনরকমে বিলের ধারে ভেড়ানো গেল। কিন্তু তখন সেটাকে ডাঙায় তোলা হলো মস্ত সমস্যা। যারা তামাসা দেখতে এসেছিল তাদের হাতে-পায়ে ধরে মাছতোলায় হাত লাগাতে রাজি করানো গেল। সবাই তখন ঝাড়া দু'ঘণ্টা হেঁই-ও জোয়ান, হেঁইও হো করতে করতে কোনরকমে মাছটাকে ডাঙায় তুলে আনল। মাছটা রুই কাতলা নয়, শাল-শোল নয়, রাঘব বোয়াল নয়,—একটি সরল পুঁটি!

"হাতের কাছে ওজন করার কিছু ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে মেপে ফেললাম। দেখলাম সরল পুঁটিটা লম্বায় পাক্কা সাড়ে বিশ হাত। মাছ তোলায় হাত লাগাতে রাজি হলো সবাই। কিন্তু মাছ বয়ে নিতে কেউ কাঁধ দিতে রাজি হল না। অগত্যা পরশুরাম সাজা ছাড়া উপায় নেই, অর্থাৎ পাশের গাঁ থেকে খান চারেক কুড়ুল চেয়ে এনে মাছটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে তবে বাড়ি আনি।

"সরল পুঁটির তেল খেয়ে সেই যে মুখ মেরে দিয়েছিল, তা মনে হচ্ছে এখনো বুঝি জিব আপনা থেকে বেঁকে বসে।"

জিব বুঝি সত্যি বেঁকে গেল এমনি একটা ভঙ্গী করে হরু পাল গল্প শেষ করল।

হরু পালের পর শিবু দে তার গল্প শুরু করল:—

'বারুইহাটির ইয়ার মামুদ ছিল জাহাজের খালাসী। কত জাহাজে করে কত দেশ-বিদেশ যে সে ঘুরেছে তার লেখাজোখা নেই। ইয়ার মামুদ চাকরি করে টাকাও কামিয়েছে ঢের। কিন্তু তার একটা পয়সাও সে জমাতে পারেনি। মাছ পোষা ছিল তার শখ। সে যখন যে-দেশে গেছে সেখান থেকেই নিয়ে এসেছে মাছ—কত রঙের, কত আদলের সে মাছ। এক একটা মাছ হয়তো কড়ে আঙুলের মতো। কিন্তু ইয়া লম্বা চওড়া তার নাম, বলতে গিয়ে জিব তিনবার বেঁকে যায়। এইসব মাছ কিনে কিনেই ইয়ার মামুদ ফতুর হয়ে গেল।

"ইয়ার মামুদ ছুটিছাটায় বাড়ি এলেই এসব মাছের কেচ্ছা শোনাতে পাড়াপড়শি-দের। বলত—'ঐ যে সবুজ ডোরাকাটা মাছটা, এই জাতের একটা মাছ নিয়েই অর্জুন লক্ষ্য-ভেদ করেছিলেন। গঙ্গার জলেই এ মাছ ঘুরে বেড়াত। পরে পর্তুগীজরা ঝাড়েমূলে এর বংশ শেষ করে দিল। তাদের দেশের জলে গঙ্গার মাছ বাঁচবে কেন। যে দু-একটা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত, তারই একটা আমি নিয়ে এসেছি। আর ঐ লালে লাল মাছটা ছিল জার্মানীর। হিটলার সাহেব নিত্য তিরিশ দিন এই মাছ খেতেন। মিশ কালো মাছটা হলো আফ্রিকার'......। এমনি কত গল্প।

"মরবার আগে ইয়ার মামুদ তার দুই ছেলেকে ডেকে গোপনে বললেন—'তোমরা এই পুকুরের মাছ ধরো না, কারুকে ধরতে দিও না। বলে দিও সবাইকে, এখানে একটি ভুতুড়ে মাছও ছেড়েছি। এ মাছ ধরতে গেলে নিজেই যাবে মাছের পেটে।'

"ইয়ার মামুদ মারা যাবার পর একদিন তার ছোট ছেলে গোপনে গোপনে একটা হাতছিপ নিয়ে গিয়ে পুকুরধারে বসল। ব্যস্, ঐ শেষ বসা। ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরদিন দেখা গেল, তার লাস পুকুরের জলে ভাসছে। হাতছিপের সুতোটা তখনো তার গলায় জড়িয়ে আছে!

"তারপর কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। বছর ঘুরে আসতে-না-আসতে ইয়ার মামুদের বড় ছেলে মারা গেল। তার ছ'মাসের মধ্যেই মরল তার বৌ। ভিটেয় বাতি দিতে

বুড়ো দেখতে নাকি ইয়ার মামুদের মত!

আর কেউ রইল না। সবাই বললে—'এসব ঐ ভুতুড়ে মাছের কাণ্ড'।

"হবেও বা। সারারাত পুকুরে মাছের দাপাদাপি আর ঘাই-র আওয়াজে পাড়া-পড়শির ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু দিনের বেলা একটা মাছের নড়ন চড়ন নেই। একটা বক বসে না। একটা চিল-মাছরাঙা ওড়ে না। একটা পানকৌড়ি ডুব দেয় না। আবার ওদিকে কেউ কেউ দেখেছে, রাতে যখন মাছেরা দাপাদাপি করে তখন এক বুড়ো একটা মোটা লাঠি হাতে নিয়ে পুকুরের চার-দিক পাহারা দিচ্ছে। বুড়ো দেখতে নাকি ইয়ার মামুদের মতো!

"নিচিনপুর থানায় নতুন দারোগাবাবু এসেছেন। মাছধরায় তাঁর খুব শখ। লোকেরা বলে—চোর ডাকাত ধরার চেয়ে মাছধরাটা তাঁর আসে ভালো। দারোগাবাবু ইয়ার মামুদের পুকুরের কথা শুনেছেন। আর যায় কোথা, সে পুকুরে মাছ ধরতেই হবে। সে তল্লাটে একমাত্র মাছ-শিকারী ছিলাম আমি। মিথ্যে বলব না, রুই কাতলা কোনদিন ধরিনি। কিন্তু ন্যাটা-টেংরা কোন্ না লাখ তিন মারা পড়েছে এ বান্দার হাতে। দারোগা জহুরী, ঠিক জহর—মানে এই শিবেকে চিনে নিয়েছেন। ভুতুড়ে পুকুরে মাছ ধরতে আমাকেই তিনি সঙ্গী করে নেবেন ঠিক করলেন। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। যদিও জানতাম, ভূতের হাতে প্রাণ গেলে দেশের আইন বা দারোগা কিছু করতে পারবে না।

"দিন চার গেল চার বানাতে। চারের কত লওয়াজিম,—মেথিভাজা, ধনে ভাজা, একাঙ্গী ভাজা, পচা নারকেল, মদের গাঁজ, আরো কত কী। সবই দেখলাম। সবই বুঝলাম। শুধু মনে সন্দ থেকে গেল—ভুতুড়ে মাছ কি চারে আসে!

"যা হোক, যথা দিনে ছিপছুপ নিয়ে তো গিয়ে পুকুরপাড়ে বসা গেল। দারোগাবাবু ইয়ার মামুদের পুকুরে ভুতুড়ে মাছ ধরতে গেছেন, এ খবর গাঁয়ে গাঁয়ে চাউর হয়ে গেল। কিন্তু ভয়ে কেউ মাছধরা দেখতে এল না। এটা মস্ত বড় আশ্চর্য।

"কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যি কোন মাছের নড়ন চড়ন নেই। সারাদিন বসে থেকে থেকে একটা ঢোপ পর্যন্ত খাওয়াতে পারলাম না। আমি তো কখন থেকেই পালাই পালাই কর-ছিলাম। কিন্তু ধৈর্য দেখলাম দারোগাবাবুর। একবারও নড়লেন না। একবারও আফসোস করে বললেন না—'দূর কচুপোড়া, কী হবে আর বসে থেকে'।

"তখন সূর্য বুঝি অস্ত গেছেন! পুকুরের জলে অন্ধকার নেমেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে জল উঠল নড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফাতনাও উঠল নড়ে। টানের সঙ্গে সঙ্গেই উঠে এল ভুতুড়ে মাছ ব্যাঁ ব্যাঁ বোঁ বোঁ করতে করতে। ভুতুড়ে আর কাকে বলে, উঠে এল মাছ নয়, মিশ কালো একটি বোকা পাঁঠা!

"পণ্ডিতমশাইদের মুখে শুনেছিলাম, যে পালিয়ে যায় সেই বাঁচে। মহাজনদের কথাই সই। কিন্তু বাদ সাধলেন দারোগাবাবু। পা বাড়িয়ে ভোঁ দৌড় দিতে যাব। আর অমনি তিনি আমার চুলের মুঠি ধরে ফেললেন। আমিও বোকা পাঁঠার মতো সহজেই ধরা পড়ে গেলাম।

"দারোগাবাবু বঁড়শিটা খুলতে খুলতে পাঁঠার গলায় বাঁধা একটা পোঁটলা দেখিয়ে দিলেন। আমি আর সেটা ধরতে সাহস পেলাম না। তিনি নিজেই সেটা খুললেন। দেখলাম, সেটাতে রয়েছে কিছু হলুদ-লঙ্কা-ধনে-জিরে-তেজপাতা আর কয়েক টুকরো গরম মসলা। বুঝলাম বোকাপাঁঠারা শুধু ধরাই পড়ে না, বুদ্ধিমানের ভোজে লাগবার জন্যে মসলাপাতিটাও তারাই জোগায়"!

ডিঙিডোবা বিল কেউ দেখেনি। বারুই-হাটি বলে কোন গ্রামও নেই। কিন্তু হরু-শিবুর পুঁটি-পাঁঠার গল্প এখনো সবার মুখে মুখে ফিরছে।

আঁধারমণি

॥ লীলা মজুমদার ॥

বনের ধারে বুড়োর বাড়ি, সেখানে বুড়োর সঙ্গে থাকে তার নাতি শম্ভু আর শম্ভুর পিসি। বুড়ো বনে বনে ঘোরে; পিসি ঘরে বসে রাঁধেবাড়ে, জামার ফোঁড় তোলে, ঘরদোর গুছোয়। আর শম্ভু পাঠশালে পড়ে, টিয়াপাখিকে পড়তে শেখায়, ছোলা খাওয়ায়, বেরালের সঙ্গে খেলা করে, ঘরের চারখানি দেয়ালের মধ্যে বড় নিরাপদে বড় আরামে থাকে।

এমনি করে শীত গেছে, বসন্ত গেছে, গ্রীষ্মও গেছে, এবার বর্ষা এল বলে। গাছ-দের আর তর সয় না, সারা বনময় কিসের একটা শিরশির সরসর, ঐ বুঝি আকাশে নীল মেঘ জমা হল, বৃষ্টি বুঝি এল ঐ।

বুড়ো বনে ধূপকাঠ কাটে, মধু খোঁজে, গাছগাছড়া তোলে। একদিন কেমন করে হাত ফস্কে, গেল গাছ থেকে পড়ে। আকাশজুড়ে মেঘ জমেছে, এখুনি বিষ্টি নামবে, বুড়ো হাঁচড়পাঁচড় করতে করতে, কোনোরকমে ব্যথায় ভরা শরীরটাকে টেনে এনে ঘরে এসে উঠল।

পিসি বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল, পাখি অবাক হয়ে চেয়ে রইল, বেরাল তফাতে সরে বসল, শম্ভুর বুক টিপটিপ করতে লাগল। তার বড় ভয়।

কোবরেজকে খবর পাঠানো হল, বুড়োর পা-খানি আর নড়ে না, তা কোবরেজের দেখা নেই। দিন তার আলোর জাল গুটিয়ে নিলে, বনময় আঁধার জমে এল, তারই মধ্যে ঘনঘটা করে বাদলা নামল। দোর এঁটে সবাই মিলে সময় গোনে, কখন আসবে কোবরেজ।

বুড়ো চোখ বুজে পড়ে থাকে, কথা কয় না, পিসির ভাবনা হয়, শম্ভুর হয় ভয়। শেষটা আর থাকতে না পেরে পিসি বলে, "কি হবে শম্ভু, কোবরেজ যে এখনো এল না? শেষটা পা-টা ফুলে যদি বাড়াবাড়ি হয়ে যায়? এরপর রাত আরো বাড়বে, ঝড়ও বেড়ে যাবে, আর কি সে আসতে পারবে? তুই একবার গিয়ে ধরে নিয়ে আয় না।"

শম্ভু নড়তে চায় না, এই ভর সন্ধেয় বাইরে যেতে সে রাজী নয়। তার ওপর এখুনি বিষ্টি নামবে।

পিসি তার হাত ধরে বলে, "টোকাটা মাথায় দিয়ে একবার যা, বাপ। দেখছিসনে দাদুর কত কষ্ট।"

শম্ভু রেগে যায়। "বিকেলে একবার গেছলুম। সে বাড়ি ছিল না তো আমি কি করব? তার বৌকে বলেও এসেছিলুম।"

পিসি ছাড়তে চায় না। "গাছ থেকে পড়ে দাদুর পায়ে এত ব্যথা, তবু যাবিনে?"

শম্ভু আমতা আমতা করতে থাকে, "আমার—আমার অন্ধকারকে ভয় করে। গাছে চড়ে কেন দাদু?"

পিসি তো অবাক! "ওমা বলে কি! গাছে না চড়লে ধূপ কাটবে, মধু আনবে কেমন করে? হাটে গিয়ে ওসব বেচে তবে না আমাদের খাবারদাবার কাপড়চোপড় কিনে আনে! দাদু পড়ে থাকলে যে আমাদেরও খাওয়াদাওয়া বন্ধ!"

শম্ভু ঘাড় গুঁজে তবু বলে, "বনের মধ্যে দিয়ে যেতে বড় ভয় করে।"

পিসি বোঝে না, বন যাদের খাওয়ায় পরায়, তাদের আবার বনের ভয় কি?

সে বাড়ি ছিল না তো আমি কি করব

কোবরেজ এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। "আমি নেপাল কোবরেজ, জল এসেছে জোর, দোর খোলো গো।"

পিসি দোর খুলে দেয়, টোকার জল ঝাড়তে ঝাড়তে কোবরেজ এসে ঢোকে। বলে, "দাঠাকুর আবার পড়ল কেন? দেখি, পা-খান একবার দেখি।" দাদুর পা দেখে কোবরেজ মাথা নাড়ে, বুড়ো কথা কয় না।

পিসি ব্যস্ত হয়ে ওঠে, "কেমন দেখছ কোবরেজ? ভালো হবে তো? তোমার দুটো বড়ি খেলে সেরে যাবে নিশ্চয়?"

কোবরেজ খুশি হয়ে যায়। "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, দিদি। এবার আমার সাদা পাথরের খলে এমনি ওষুধ মেড়ে দোব—কিছু বললে দাঠাকুর?"

এতক্ষণে বুড়ো দাদু কথা কয়। থেমে থেমে বলে, "তোমার খলে মাড়া ওষুধ খেয়ে বনের ছেলেরা কখনো ভালো হয়, কোবরেজ? চোখে যাদের সবুজ রং, নাকে যাদের গাছ-গাছালির গন্ধ, কানে যারা সদাই শোনে পাতার মাঝে বাতাসের শিরশির, বন যে তাদের রক্তে মেশা! ও ওষুধে তাদের কিছু হয় না।"

কোবরেজ, পিসি, শম্ভু, বুড়োকে ঘিরে থাকে। টিয়ে দাঁড় ছেড়ে কাছে আসতে চায় বেরাল এসে বিছানার গরম খোঁজে। বুড়ো উঠে বসে, "শম্ভু, দোর খুললে কি দেখা যায়?"

"বড় বড় গাছ দেখা যায়, তাদের মাঝে মাঝে অন্ধকার দেখা দেয়।"

"আর কি দেখা যায়?"

"আর একটা পথ এঁকে বেঁকে গাছের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে, তাই দেখা যায়।"

"কোথায় গেছে ওপথ, দাদা?"

"গাছের তলা ঘেঁষে ঘেঁষে, ছোট নদীতে পাথর ফেলা, তাই পার হয়ে, শুশুনি পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে ঐ পথ।"

বুড়ো বলে, "যাবে সেখানে?"

শম্ভু ভয়ে কেঁপে ওঠে, "না, না, না আমার ভয় করে।"

"কিসের ভয়?"

শম্ভু বলে, "বনের ভয়, আঁধারের ভয় রাতে যাদের চোখ জ্বলে—তাদের ভয় ঝোপের মধ্যে খড়খড় করে যারা, পায়ের তল দিয়ে সড়সড় করে চলে যায়, তাদের ভয় যাদের নখ আছে, দাঁত আছে, তাদের ভয় আকাশ আঁধার করে, কালো ডানা মেলে ও যারা, তাদের ভয়। বন যে ভয় দিয়ে ঠাস দাদু।"

বুড়ো নিশ্বাস ফেলে বলে, "তবে সে আর হল না!"

শম্ভু ফিসফিস করে জিগগেস করে, "
হল না, দাদু?"

বুড়ো বলে, "ঐ শুশুনির চুড়োতে, কা পাথরের বুকে আঁধারমণি-গুহা আ তারই মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছিরা ব বেঁধেছে। হাজার বছরে কেউ সে নেয়নি। পুরোনো হয়ে সোনার মধুতে ব বরণ ধরেছে। সেই মধু এনে, শুশু চুড়োয় সূয্যির আলো লাগার আগে, আ পায়ে মালিশ করলে, তবেই আমি উঠব। কিন্তু কে আনবে সে মধু?"

তাই শুনে কোবরেজ উঠে পড়ে ঝো ঝুলি গুছোতে লেগে যায়। পিসি দাঁড়ায়। শম্ভু চেঁচিয়ে বলে, "আমার তাকাচ্ছ কেন তোমরা? আমি পারব আমার ভয় করে।"

কোবরেজ বলে, "রাতবিরেতে পাহাড়ে বুড়ো হাড়ের কম্ম নয়। তাছাড়া ভালো দেখিনে।"

পিসি বলে, "বনবাদাড়ে আঁধার ওষুধ আনা তো মেয়েমানুষের কাজ তাছাড়া রুগীর দেখাশুনো আছে।"

দোর খুলে কোবরেজ বিদেয় নেয়। পত্র কুড়িয়ে নিয়ে পিসিও হেঁশেলে বুড়ো বলে, "তুমি ভয় পাও, দাদু?

না, ভয়ের মুখে আলো ফেললে ভয় যায় পালিয়ে।"

শম্ভু চিৎকার করে বলে, "না, না, না, রাতের অন্ধকারে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে যেতে আমি পারব না, পারব না।"

বুড়ো বলে, "তবে থাক।" বলে পাশ ফিরে শোয়।

ঘরখানি নিঝুম হয়ে যায়। প্রদীপের আলো জ্বলে, শম্ভু সেই দিকে চেয়ে থাকে। আলোর শিখা নড়েচড়ে, দেয়ালে ছায়া দোলে, দোলে, ঘরের আসবাব যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠে, তারা কথা কয়। শম্ভুর কানেকানে কথা কয়। কথা ক্রমে জোর হয়ে ওঠে, কান ঝালাপালা হয়ে যায়, ঘরদোর, ঘরের পাখি দেয়াল সবাই যেন কথা কয়।

তারা বলে, এ ঘরেতে আরাম বড়, এখানে আরামে, গরমে, নিরাপদে শুয়ে থাকো। চেয়ে দেখে শম্ভু—চারদিক ছায়াময়, মায়াময়, তারই মাঝে আলোর শিখা চেয়ে রয়, কথা কয়। বলে শিখা, "ভয় আবার কিসের গা? যেখানে আলোর রেখা পড়ে ভয় সেখানে থাকে না।"

চারদিকে চেয়ে দেখে শম্ভু, চেনা ঘরকে নতুন করে চেনে, দেখা জিনিসকে আবার দেখে। এই তাদের ঘরখানি কি ভালো, কি ভালো! একে ছেড়ে যাওয়া যায় কখনো? বাইরে বিষ্টি নামছে, বিজলি হানছে, যদি কোনো বিপদ হয়, আর যদি না-ই ফেরা হয়?

দাদু তো ঘুমিয়ে পড়েছে, আর পা ব্যথা টের পাচ্ছে না। কাল সকালে আরামের বিছানাতে শুয়ে শুয়ে শম্ভু শুনবে—পিসি বলছে, "ওমা, দেখসে, দাদুর পা একেবারে সেরে গেছে!"

কিন্তু যদি না সারে? কিছুতেই যদি না সারে? পাহাড়চুড়োর আঁধারমণি-গুহা থেকে লাল মধু না আনলে, আর যদি নাই ভালো হয়?

আর বসে থাকতে পারে না শম্ভু। ঘুরে ঘুরে চেনা ঘরকে আবার চেনে, পুরোন জিনিসকে নতুন করে আবার দেখে। দরজার আগল একটুখানি আলগা করে, অমনি বাইরের ঝড় হুড়মুড় করে ঘরে আসতে চায়। দোর এঁটে দেয় শম্ভু।

দোর এঁটে আলোর কাছে এসে বসে শম্ভু। আলো যেন কমে যায়, সরে যায়। ঘরের কোণে দাদুও এপাশ ওপাশ করে, আলো প্রায় নিবু নিবু। দাদুর কথা মনে পড়ে,—আলোর শিখা পড়লে, ভয় যায় পালিয়ে।

তাকের ওপর থেকে ঝড়ের বাতি নামায় শম্ভু, ঘরের প্রদীপ থেকে জ্বালে। দেয়াল থেকে টোকা পাড়ে, কোনা থেকে মাটির ঘড়া নেয়। অমনি মনে হয় ঘর আলোয় আলোময়। আলো যেন কান ঝালাপালা করে গান গেয়ে ওঠে, ভয় নেই, ভয় নেই।

শম্ভু দোর খুলে বেরিয়ে পড়ে। বাইরে এসে দোরে ঠেস দিয়ে চারদিক চেয়ে দেখে।

অমনি চারদিক থেকে রাত তাকে ঘিরে ফেলে, বন তাকে ঘিরে ফেলে। পায়ের নীচে পথ দেখতে পায় না, শম্ভু। চোখে দেখে—আঁধারে ভরা, কালো কালো ছায়ার মতো গাছপালা বনবাদাড়। কানে শোনে—শিরশির সরসর খুসখুস খসখস। কে যেন ডানার ঝাপটা দেয়, কিসের বুনো গন্ধ আসে নাকে। ভয়ে শম্ভু কাঠ হয়ে যায়।

শুশুনির পাহাড়ের পেছনে বিজলি চমকায়, গাছপালার মাঝখান থেকে কারা যেন ডেকে বলে, "শম্ভু, ভয়ে ঘেরা বাইরে, সঙ্গে কেউ নাইরে?"

ভয়ে শম্ভুর হাত পা হিম হয়ে যায়, দু-পা এগোয় তো দু-পা পেছোয়। ভালো করে

লণ্ঠন তুলতেই প্যাঁচার চোখ গেছে ঝলসে

কিছু ঠাওর হয় না। সব কিছুকে অন্য রকম মনে হয়। জোর করে সাহস আনে শম্ভু, কাঁপা গলায় বলে, "কে আছ বাইরে? কে ডাকছ আমাকে? কোথায় তোমরা, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যে?"

ঝোড়ো হাওয়া তার কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "এই যে, এই যে, এই যে, চোখের সামনে নেই যে!"

শম্ভু বলে, "আলো ফেললে ভয় যায় পালিয়ে। এসো, আমার সামনে এসো, একবার ভালো করে দেখি।"

যেমনি আলো তুলে ধরে শম্ভু, ছায়ারা সব সরে সরে যায়, ভয়ের আওয়াজরা কোথায় মিলিয়ে যায়। শম্ভু দেখে, কোথাও ভয়ের কিছু নেই। লণ্ঠনের আলোতে দেখা যায়, সরু পথ বনের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে, শুশুনির পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে। সময় তো বেশী নেই, পাহাড়চুড়োয় সূর্যির আলো লাগবার আগেই বাড়ি ফেরা চাই।

দৌড়ে পাহাড় চড়তে চায় শম্ভু। মনসার ঝোপেরা বাধা দেয়। মাগো, কাঁটা ভরা, গায়ে পায়ে ব্যথা লাগে। ঝোপের তলায় আঁকা-বাঁকা কি লুকিয়ে আছে কে জানে!

মাথা ঘুরে যায় শম্ভুর। ইদিক উদিক চায়, পথ দেখতে পায় না। আবার মনে হয়, বড় বড় গাছরা বুঝি কাছাকাছি সরে আসছে, হাজার ঝুরি নামিয়ে পথ বন্ধ করে দিচ্ছে। মনে হয়, ডালের ওপর বিশাল অজগর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, কানে আসে যেন তার ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস! দারুণ ভয় করে শম্ভুর। ভাবে, পা টিপে টিপে ফিরে যাই, তা হলে কেউ কিচ্ছু বলবে না। কিন্তু তাহলে ওষুধের কি হবে?

পথ দেখবার জন্য যেই আলো তুলে ধরেছে শম্ভু, অমনি গাছদের গায়ে আলো পড়েছে। দেখে, গাছদের মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে ঐ তো পথ চলে গেছে। মাথার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে ওতো সাপ নয়, ও যে গাছেরই ডাল, পাকিয়ে জড়িয়ে তাল হয়ে রয়েছে! মনে পড়ে, দাদু বলেছিল, আলো পড়লে ভয় যায় পালিয়ে।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে হুতুম প্যাঁচা ডাকে। ওদের বাঁকা ঠোঁট, ভাঁটা চোখ, জোরালো পাখা, ধারালো নোখ, ছোট জানোয়ার পেলে তার আর বাঁচা নেই।

চিৎকার করে শম্ভু বলে, "না, না, না, ভয় পাব না, ভয় পেলে ওষুধ আনা হবে না। আলো ফেললে ভয় যায় পালিয়ে। কে আমাকে ভয় দেখায়, তাকে ভালো করে দেখি তো!"

লণ্ঠন তুলতেই যেই না প্যাঁচার চোখে আলো পড়েছে, চোখ গেছে ঝলসে। আঁধারের জীব কি আর আলো সইতে পারে? চোখ বুজে জড়োসড়ো হয়ে বসেছে প্যাঁচা। চারদিকে আলোর জয়।

শম্ভু ভাবে, আর বেশী দূর নেই, ঐ যে চুড়ো দেখা যায়। গাছের আড়ালে ঐখানে গুহা থেকে মধু নিয়ে ঘরে ফিরতে কতটুকু সময় লাগে? এখানটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ভয়গুলোকে পেছনে ছেড়ে আসা গেছে, বাঁচা গেছে! ফেরবার সময় অন্য পথ ধরব।

অমনি দূর থেকে শেয়াল ডেকে ওঠে, ক্যাহুয়া, ক্যাহুয়া। শেয়ালরা বড় খারাপ জানোয়ার, বড় শিকার ধরতে পারে না, তাই যা পায় তাই খেয়ে নেয়। অন্ধকারের বুক চিরে সে কি বিকট ডাকাডাকি। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শম্ভু, আর বুঝি মধু আনা হল না।

পাগলের মতো ছুটে পালাতে চায় শম্ভু, হাত থেকে আলো পড়ে যায়, ঘড়া পড়ে যায়, আলো প্রায় নিবু নিবু। কোন দিকে যাবে দিশে পায় না, গাছে ঠোক্কর লাগে, হোঁচট খেয়ে কিসের ওপর উবু হয়ে পড়ে যায়। হাতড়ে দেখে, এ যে তারই লণ্ঠন, তুলে ধরতেই অমনি জ্বলে ওঠে। চারদিক হয়ে

ওঠে আলোয় আলোময়, বনবেরালরা ল্যাজ গুটিয়ে দূরে পালায়, শেয়ালের ডাক থেমে যায়।

এই তো কত উপরে উঠে এসেছে শম্ভু। সামনে দেখা যায় আঁধারমণি-গুহার মুখ। এইখানেই পথের শেষ, আর ভয় নেই।

ভাবে শম্ভু, ভয় নেই, কিন্তু গুহার মুখটা অত কালো কেন? হাজার বছরে ও মধুতে কেউ হাত দেয়নি কেন? তবে কি কোনো ভয়ের কিছুতে ওখানে বাসা বেঁধেছে? কি করে যাই ওখানে?

যেই না ভাবা, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে বিরাট কালো বাদুড় গুহা থেকে বেরিয়ে এসে শম্ভুর চারদিকে ঘুরতে থাকে। কি বিশ্রী জানোয়ার সব, অন্ধকারে দাঁতের সারি চকচক করে, গায়ে বিকট সোঁদা গন্ধ, গুহার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

গুহায় থাকে কেন? আলো সইতে পারে না বলে? আলোকে ভয় পায়? নিজের চোখ ঢেকে পালিয়ে যাচ্ছিল শম্ভু, যেই না এই কথা মনে পড়েছে, অমনি হাত নামিয়ে আলো উঁচু করে ধরেছে, চারদিক আলোয় আলোয় ভরে গেছে। বাদুড়রাও অমনি ডানা গুটিয়ে আলোর পাশের ঝোপেঝাড়ে মিলিয়ে গেছে।

চারদিকে বাতির আলো ছড়িয়ে পড়ে, গুহার কালো মুখ আলো হয়। সেই আলোতে শম্ভু দেখে, গুহা ভরা থোলো থোলো মৌচাক; চাক থেকে মধু উপচে পড়ছে, তাই এক পাশ থেকে ঘড়া ভরে নেয় শম্ভু। ছোট ঘড়া ভরতে বেশী সময় লাগে না।

তারপর চেয়ে দেখে একি! অন্ধকার ফিকে হয় কেন? ভোর হয়ে এল নাকি? চুড়োর ওপর সূর্যের আলো লাগবার আগেই যে দাদুকে ওষুধ দিতে হবে। তবে আর দেরি নয়। বুকের কাছে মধুর ঘড়া আঁকড়ে ধরে, আলো উঁচু করে, মাথা উঁচু করে, পাহাড় থেকে নামে শম্ভু।

চারদিকে আলো ছড়ায়, আকাশের রং ফিকে হয়ে আসে, ভয়রা সব ভয় পেয়ে সরে যায়, বাদুড়রা ডানামুড়ে জড়োসড়ো। বন-বেরালরা লুকোবার জায়গা খোঁজে। শেয়াল-দের মুখ চুন। প্যাঁচারা গিয়ে কোটরে ঢোকে। কালো গাছ আলো হয়, ঝোপে ঝাড়ে আলো লাগে। অবাক হয়ে শম্ভু দেখে, যে পথ দিয়ে যেতে খানিক আগে এত ভয়, এখন সেখানে ফুলে ফুলময়, ভয়ের কোনো জায়গা নেই।

পাহাড়ের নীচে পেঁছতে না পেঁছতে, পাহাড়ের পায়ের কাছে, বুড়োদাদুর ছোট ঘরের দোর খুলে যায়। কোবরেজকে সঙ্গে করে পিসি বেরোয় শম্ভুর খোঁজে। শম্ভুকে দেখে তারা তো অবাক; শম্ভুর ভয় গেল কোথায়?

কোবরেজ আর পিসি ছুটে গিয়ে শম্ভুকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

ম্যাচ বাক্সের মজার ম্যাজিক

জাদুরত্নাকর
এ সি সরকার

সেবার জাপানের জাদুকর-বন্ধু মহলে 'ম্যাচ বাক্সের মজার ম্যাজিক' নামে আমার এই খেলাটি দিয়ে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলাম। টোকিও শহরের সিম্বাসী স্টেশনের কাছে আছে 'সিম্বাসী রেস্টুরান্ট' নামে অভিজাত ভোজনশালা। হোটেলের মালিক মিঃ কোডামা একজন প্রতিষ্ঠাবান জাদুকর। তাঁর ওখানে প্রতি সন্ধ্যায় বসতো জাদুকরের বৈঠক। সেই বৈঠকেই এক সন্ধ্যায় দেখিয়েছিলাম এই আজব ম্যাচের খেলা। জাপানে সর্বত্রই দেশলাই খুব সস্তা, বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলিতে তো ম্যাচ এক রকম কিনতেই হয় না। বিভিন্ন দোকানপাট ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের জিনিসপত্রের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন ছাপানো ম্যাচ তো রাস্তাঘাটে বিনি পয়সায় বিলিয়ে দেয়। এই রকম ম্যাচের ছড়াছড়ি দেখেই হঠাৎ একদিন আমার মাথায় এসেছিল এই অদ্ভুত ম্যাচের খেলাটার কৌশলের কথা।

•

দু'রকম ছবিওয়ালা দুটো ম্যাচ বাক্স দূরে থেকে দর্শকদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে উপুড় করে রাখলাম দূরে-দূরে-রাখা খবরের কাগজ বিছানো দুটো টেবিলের উপরে। কোন্ টেবিলের উপরে কোন্ ছবিওয়ালা ম্যাচ রাখলাম তা খুব ভাল করে মনে রাখতে অনুরোধ করলাম সবাইকে। —ডানদিককার টেবিলের উপর ফুজিয়ামা মার্কা আর বাঁ দিকের টেবিলে চেরী ফুল ছাপ দেশলাই— সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন একথা। এর পরে আমি পড়লাম ম্যাজিক মন্ত্র। মন্ত্রের বলে ঘটে গেল এক মজার ব্যাপার। ডানদিকের টেবিলের উপর থেকে দেশলাইটা তুলে এনে চিৎ করতে সবাই অবাক হয়ে দেখলেন যে, বাঁ দিককার টেবিলে রাখা চেরী

ফুল মার্ক। দেশলাইটা সেখানে এসে গেছে। বাঁ দিককার টেবিলের দেশলাইটা তুললাম এর পরে। কি আশ্চর্য ব্যাপার—সেখানে পাওয়া গেল ফুজিয়ামা মার্কা দেশলাইটা। দুটো তুলে দিলাম দর্শকদের হাতে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। টেবিল দুটোর উপর থেকে খবরের কাগজ দুটো ভাঁজ করে তুলে নিলাম। পড়ে রইলো শূন্য টেবিল।

বলতে পার কেমন করে এই খেলাটা দেখানো সম্ভব হয়েছিল?

এই খেলাটা তোমরা যদি দেখাতে চাও তবে আগে থেকে একটু তৈরী হয়ে নিতে হবে।

প্রথমে নেবে দু'রকম ছাপের দুটো দুটো করে চারটে ম্যাচ বাক্স। যেমন ধরো ঘোড়া মার্কা দুটো আর টেক্কা মার্কা দুটো। একটা ঘোড়া মার্কা আর একটা টেক্কা মার্কা ম্যাচ খেলার জন্য রেখে বাকী দুটোর ছবির উপরে জল লাগিয়ে আস্তে আস্তে ছবি দুটো খুলে নেবে। রোদ্দুরে শুকিয়ে নেবার পরে আঠা দিয়ে এই ছবি সাঁটবে একটা খবরের কাগজের লেখা অংশের টুকরোর উপরে আড়াআড়ি ভাবে। শুকিয়ে গেলে ধারালো কাঁচি দিয়ে খবরের কাগজশুদ্ধ এই ছবি দুটো কেটে নেবে ম্যাচের মাপ মতন। এখন ঘোড়া মার্কা ম্যাচের ঘোড়া ছাপের উপরে খবরের কাগজ সাঁটা টেক্কার ছবিটা চেপে ধরে যদি দর্শকদের দূর থেকে দেখাও, তবে দর্শকেরা সহজেই মেনে নেবেন যে, তোমার হাতের দেশলাইটা টেক্কা মার্কা। এবার সাবধানে এই ম্যাচটাকে উপুড় করে রাখতে হবে টেবিলের উপরে পাতা খবরের কাগজের লেখা অংশের উপরে (কোনও ছবি যেন না থাকে)। এর পরে ম্যাচটা তুলে নেবার সময়ে যদি আলগা ছবিটা খবরের কাগজের উপরে ছেড়ে রেখে শুধু ম্যাচটা তোল তবে দর্শকেরা দেখবেন যে, তোমার হাতে আছে ঘোড়া মার্কা ম্যাচ (ঘোড়া ছাপের উপরে চাপানো টেক্কার তাপ্পি তখন উপুড় হয়ে পড়ে আছে খবরের কাগজের উপরে, তা পীঠে খবরের কাগজ সাঁটা থাকার ফলে ও মিশে গেছে বেমালুম টেবিলে পাতা খবরে কাগজের গায়ে। এমনিধারা অন্য টেবিলে রাখ টেক্কা ছাপের উপরে ঘোড়া ছাপের আলগ তাপ্পি মারা ম্যাচ বাক্সও রূপ পাল্টায়।

খেলা দেখানোর সময়ে পাখা চালানো চল না কিন্তু। হাওয়া থাকলে টেবিলের উপ পড়ে থাকা আলগা ছবির তাপ্পি দুটো উ গিয়ে সব রহস্য ফাঁস করে দিয়ে তোমা অপ্রস্তুত করে ছাড়বে। কাজেই খুব সাবধা খবরের কাগজ ভাঁজ করে তোলার সম একটু বেশী সজাগ ও সচেতন হ দরকার।

সমঝদার
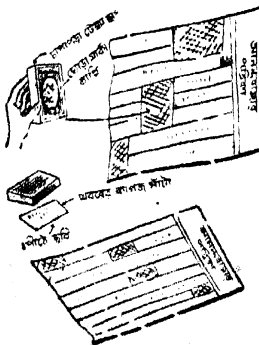
পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজামশায়ের ছবি
দেখ্‌ছে যারা বল্‌ছে সবাই—নিখুঁত আঁকা সবই!
মন্ত্রী বলেন হেঁকে—
"ছবি নয় ত, স্বয়ং রাজাই মনে হ'চ্ছে এঁকে!"
বল্‌লে সেনাপতি—
"বাঁকা ভুরু, জ্বলজ্বলে চোখ, খুঁৎ নাই এক রতি"

মুগ্ধ নগরপাল
হুমড়ি খেয়ে প্রণাম ক'রে রাখ্‌ল তরোয়াল।
কোষাধ্যক্ষ বলে—
"আঙ্গুলে সেই হীরের আংটি তেমনিতর জ্বলে!"
রাজপুরোহিত এসে
বলেন—"আহা, এমন শিল্পী আছে মোদের দেশে।"
রাজার গুরু ক'ন—
"মন্ত্রি, তুমি শিল্পীকে দাও স্বর্ণ শতেক মণ।"
বল্‌লে সূপকার—
"আমার রান্না খেয়ে রাজার স্বাস্থ্যে কি বাহার!"
রাজদর্জি হাঁকে—
"আমার তৈরী পোশাক কি আর মানায় যাকে তাকে!
রজক বলে—"ভাই,
আমার হাতে ধোলাই কি না, রূপ খুলেছে তাই!"
বল্‌লে ক্ষৌরকার—
"রোজ কামিয়ে দিই তাই ত মুখটি চমৎকার!"
রাজবাগিচার মালী
বলে, "রাজার পিছনে ওই বাগানের এক ফালি!
এমন সময় ছুটে
শিল্পী এসে ধরল রাজার গুরুর করপুটে।
থাম্‌লে পরে হাঁফ
বলে, "বিরাট ভুল হয়েছে, করতে হবে মাফ।"
সবাই অবাক মানে,
বলে, "ভুল! কই, একটুও ত নাই কো কোনো খানে!"
বল্‌লে চিত্রকর—
"আমার যিনি সহকারী মস্ত গুণধর।
নাই কোনো হুঁশ তাঁর;
দেখিয়ে দিলুম, তাও দেখছি এক ক'রতে আর!
চল্‌ছি এটা নিয়ে
নিজের হাতে রাজার ছবি যাচ্ছি আমি দিয়ে।"
শুনে সবই হাঁ!
মন্ত্রী বলে, "ভাবছিনু, তাই—এ তো রাজার না।"

সেনাপতিও হেঁকে
বলে, "আমার খট্‌কা ছিল ভুরু জোড়াটাই দেখে!"
নগরপাল ত লাজে
তরোয়ালটা খাপে পুরে বলে—"ছবিটা বাজে।"
কোষাধ্যক্ষ কয়—
"তাই ত ভাবি আংটিতে যে হীরেই ওটা নয়!"
বল্‌লে সূপকার—
"আমার রান্না পাবে কোথায়, তাই ত হাড্ডিসার!"
দর্জি তখন বলে—
"অমন বেঢপ পোশাক কি হয় আমার তৈরী হলে?"
রজক শুনে হাঁকে—
"আমার হাতে ধোলাই হলে ময়লা অত থাকে?"
"হলফ্ করতে পারি"—
বলে নাপিত, "আমি কখনও কামাইনি ওর দাড়ি।"
মালীও হেসে কয়
"আরে ছি ছি, পিছনে ওটা ফুল বাগিচাই নয়।"
গুরু পুরুতে বলে
"আমাদের চোখ থাক্‌তে কি আর যা তা দিলে চলে।"

[ইংরাজী অবলম্বনে]

চল্‌ছি এটা নিয়ে...

শরতের আকাশটি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা, সেই পাখিটা আজ আবার সকালে
এসে ব'সেছিল ওই সামনের থলপদ্ম ডালে।
এমন অবুঝ জানো, এসে কী ভীষণ ডাকাডাকি!
আমাকে এখ্‌খুনি যেন চাই ওর! মা, ওটা কী পাখি?

যেন ছবি আঁকা ওর গা ভ'রে। মাথায় বাঁধা ঝুঁটি।
চোখ দেখে মনে হয়: এত শান্ত, জানে না কিচ্ছুটি।
অথচ কী দুষ্টু দেখ: সারাক্ষণ ধ'রে
আমাকে ডাকলো; আমি যেই বার হ'য়েছি সদরে,

জানো মা, আমাকে যেন টেনে নিল ধুলোর রাস্তাটা।
ও ছিল সঙ্গেই, হেঁটে গেলাম যতটা যায় হাঁটা।
পাখি, তুই কোন্ ফাঁকে আমার সামনে এঁকে দিলি
শরতের আকাশটি সোনার রোদ্দুরে ঝিলিমিলি!

কান কট্‌কট্‌

'বুদ্ধু-ভুতুম'

"হ্যাঁ রে দাদা, তুই নাকি আজ পণ্ডিত মশায়ের ক্লাসে খুব কানমলা খেয়েছিস?" ভুতুম দুড়ুম্ দুড়ুম্ করে বুদ্ধুকে প্রশ্ন করে বসে।

বুদ্ধু, ব্যাপারটা পাঁচ কানে যাবার ভয়েই জোর গলায় কানের পোকা বার করতে বসে, "না জেনেশুনে কথা বলতে আসিসনে। তোর মতন সবাই গঙ্গারাম কি না—অমনি কানমলা খেলেই হলো!"

"নাঃ খাওনি!" ভুতুম তার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য প্রমাণ তুলে ধরে, "আমি যেন কিছু জানি না। তোমার প্রাণের বন্ধু—পটলা—দেখোগে না, পাড়াময় রটিয়ে দিয়েছে, পণ্ডিতমশায়ের কাছে কানমলা খেয়ে একেবারে কুম্ভকর্ণ হয়ে গেছ।"

"আজ্ঞে মশায় সেটা কানমলা নয়, কান-চিমটি। কানমলা অতো দেওয়াও সহজ নয় আবার খাওয়াও সহজ নয়।" বুদ্ধু একেবারে সব অভিযোগ ঝেড়ে ফেলে দেয় যেন।

ভুতুম ভেংচে ওঠে, "নাঃ সহজ নয়! বাঁ কানটি বাবুর তাহলে রাঙা করমচা হলো কি করে?"

বুদ্ধু নিজের কানটা নিজেই টেনে ধরে জবাব দেয়, "আরে, এই ঝুল-ঝুলে মাংসটাকে বুঝি কান বলে? কি বুদ্ধি তোর! এটা দিয়ে কি শোনা যায় যে এটাকে কান বলবো? আসল শোনার কান থাকে তোর সেই ভেতরে—সে-কান মলা পণ্ডিতমশায়ের কম্ম নয়। মাথা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে-পড়া টিকির মতন ঝুলঝুলে কানে চিমটি দিলে তো ভারী বয়েই গেলো—হ্যাঁঃ!"

"ওটাকে যদি কান না বলে, তবে ওটা কুলোর মতন এমনি এমনি গজিয়েছে কেন?" ভুতুম বুদ্ধুর কথাটা উড়িয়ে দিতে চায়।

"আরে, বাইরের এই কানটা আছে কেন জানিস?" বুদ্ধু বলতে থাকে, "স্রেফ্ আওয়াজ ধরবার জন্যে। বাতাসে শব্দ ভেসে এলেই এই কানের বেড়ায় আটকে গিয়ে না, ফড়্‌কে করে ফুটোর মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে।"

"ওঃ, মানে এ-কান দিয়ে ঢুকে ও-কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে, এই বলতে চাস তো?" ভুতুম বিজ্ঞের মতন বলে ওঠে।

"হ্যাঁ, তাহলে তুই কানের কথা সবই জেনে বসে আছিস দেখছি!" বুদ্ধু ভুতুমকে কথায় বসিয়ে দেয়। বলতে থাকে, "জানিসনা শুনিস না, মাঝ থেকে ট্যাঁক্ ট্যাঁক্ করিস কেন? আরে বোকা কানের ফুটোর মধ্যে একটা নল আছে। নলের ও-মাথায় না একটা পাতলা পর্দা আছে। তাকে বলে কানের ঢাক, বুঝলি?"

"আচ্ছা দাদা, কানের ঢাক বাজে?" ভুতুম প্রশ্ন করে।

"বাজে বৈকি। না বাজলে আমরা শুনতেই পেতুম না।" বুদ্ধু জবাব দেয়। "আরে মজা কি জানিস—ঢাকের পেছনে তিনটে হাড় না খুব আলতোভাবে একসঙ্গে আটকানো আছে। এই হাড়ের এক মাথা থাকে কানের ঢাকের সঙ্গে লাগানো আর এক মাথা থাকে সেই ভেতর-কানে আর এক পর্দার সঙ্গে আটকানো। ভেতর-কানের কলকব্জা ভারী ঘোরালো-প্যাঁচালো এক জলভরা শামুকের মতন। সেসব তুই বুঝবি না বাপু!"

"অ্যাতো প্যাঁচ-কাটাকাটি করে আমাদের শুনতে হয় নাকি," ভুতুম প্রশ্ন তোলে।

"তবে আসাই?" বুদ্ধু জবাব দেয়, "এই
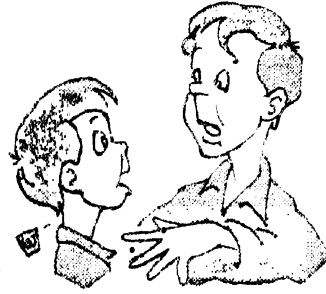
"তুই নাকি খুব কানমলা খেয়েছিস?"

যে, তুই যেমনি দাদা বলে ডাকবি অমনি শব্দের ঢেউটা যাবে বাইরে আমাদের এই কানের বেড়ায় আটকে। সেখান থেকে চলে যাবে সেটা কানের গলি দিয়ে ঢাকের কাছে। ঢাকে গিয়ে ঢেউটা ঘা মারলেই ঢাকের পিঠে কাঠির মতন মাঝের কানের সেই তিনটে হাড়ও উঠবে কেঁপে। এদের কাঁপুনির জন্যে ভেতরকার কানের জলের মধ্যে জাগবে আবার কাঁপুনি। সেই কাঁপুনি আবার খুব সরু সরু সব উপশিরা বেয়ে চলে যাবে মগজের এক জায়গায়। সেখানে গেলে পরে আমরা বুঝতে পারবো যে তুই ডাকছিস—মানে শুনতে পাবো।"

"ও—তাহলে বল, আদতে আমরা মগজ দিয়েই শুনি—কান দিয়ে ঠিক নয়।" ভুতুম যেন মস্ত কিছু একটা আবিষ্কার করেছে এমনিভাবে বলে ওঠে।

"তাই বলে মনে করো না যেন এই কানের কোনও দরকার নেই।" বুদ্ধু জবাব দেয়, "এই ধর না, তোমার কানের ঢাক যদি একবার নষ্ট হয়ে যায় বা ফুটো হয়ে যায়, তা হলে একেবারে গেলে, হয় আধ-কালা নয় পুরো কালা। খুব সাবধান বাবা, কানের মধ্যে খোঁচাখুঁচি করো না বা কানের মধ্যে কিছু পুরো না—তাহলে বুঝবে ঠেলা। তোকে বলাই বৃথা। তুই যা কান খোঁচাস—বুঝবি একদিন।"

'বা রে বাঃ! কানে খোল জমে' শেষে কালা হয়ে যাই আর কি?" ভুতুম প্রতিবাদ করে বলে ওঠে।

"আরে খোল খোল করছিস কেন? ওগুলো আসলে একরকম মোমের মতন জিনিস। আমাদের কানের গলির গায়ে এক-রকমের থলে আছে; তার থেকে ঐ তেল্-তেলা মোমের মতন জিনিস বেরোয়। বাইরের বীজাণু-টিজাণু থেকে এই মোমগুলো কানকে বাঁচিয়ে রাখে। তবে যাদের কানে বেশী খোল হয় তাদের অবিশ্যি সময় সময় শুনতে অসুবিধে হয়। তখন কি করতে হয় জানিস, একটা পিচকিরি করে গরম জল দিয়ে কানটা সাফ্ করে দিলেই সব ঠিক হয়ে যায়।"

"জানিস দাদা, আমাদের ক্লাসের ভুতোটার কান কট্‌কট্ করে। রোজ কানে তুলো সেঁটে আসে। বলি, ডাক্তারবাবুর কাছে চ'—তা কিছুতেই যাবে না—বলে, ডাক্তারবাবু কান কেটে নেবে।"

ভুতুমের কথা শেষ না হতে হতেই বুদ্ধু বলে ওঠে, "ওরে মরেছে! ওর কানে বোধ হয় পুঁজ হয়েছে। ব্যাপার হয় কি জানিস, কানের মাঝ থেকে একটা সরু রাস্তা গলার মধ্যে চলে গেছে। এই পথে কোন রকমে যদি বীজাণু ঢোকে মাঝের কানে বাসা নিতে পারে, তাহলেই কানে কট্‌কটানি শুরু করে দেবে। তেমন তেমন হলে কানের ঢাক ফুটো হয়ে বাইরের কান দিয়ে পুঁজ গড়িয়ে পড়বে। তখন বাবা চালাকি নয়। তোর ভুতোকে শিগ্‌গির ইস্কুলের ডাক্তারবাবুর কাছে ধরে নিয়ে যাবি। কানে পুঁজ পুষে রাখলে সাংঘাতিক ব্যাপার। কানের পোকা মগজে চলে গেলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়ে যাবে।"

"ওরে বাস্! গেলো—গেলো আমার কান গেলো।" বলে ভুতুম তিড়িং তিড়িং করে লাফ মারে আর বলতে থাকে "ওরে শিগ্‌গির দ্যাখ্ দাদা, কানের মধ্যে একটা পোকা ঢুকে গেছে। খালি ফর্‌র্-ফর্‌র্ করছে যে!"

"লাফাসনি, লাফাসনি। ওষুধ আছে-আছে। চল তোর কানে একটু গরম তেল ঢেলে দি, তাহলেই ব্যাটা বেরিয়ে আসবে।" বলেই বুদ্ধু ভুতুমের কান ধরে টান মারে।
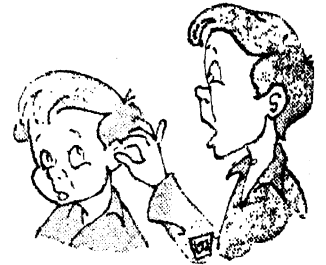
কাজ-খেলা-শেখা

॥ পরিতোষকুমার চন্দ্র ॥

খেলা বলতে আমরা বুঝি ঘরের ভেতরকার খেলা, আর ঘরের বাইরের খেলা। দু-একটি ছাড়া ঘরের ভেতরকার খেলাগুলির প্রায় সবগুলিতে কেবল সময় কাটে, আর বাইরের সব কয়টি খেলাতেই পরিশ্রম হয়, যার জন্যে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ঘরের ও বাইরের খেলাগুলি ছাড়াও এমন অনেক খেলা আছে যাতে খেলার সঙ্গে কাজ ও সেই কাজের সঙ্গে শেখাও যায়। এই কাজের সঙ্গে যা শেখা যায় তা সহজে ভোলা যায় না। আজ তোমাদের এমনি একটি কাজ শেখাবো যা করতে তোমরা আনন্দ তো পাবেই, আর সেই সঙ্গে শিখবেও কিছু। আজকাল সব স্কুলেই বিজ্ঞান শেখানো হয়। এই বিজ্ঞানের মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যাও (বোটানি) একটি। উদ্ভিদবিদ্যা পড়বার সময় এই কাজটি থেকে তোমরা অনেক উপকার পাবে।

প্রথমে যোগাড় করো বিভিন্ন জাতের গাছ থেকে নানা আকারের বিভিন্ন পাতা। যে-সব পাতা পুরু আর শক্ত মতন এবং যে-সব পাতার শিরা উপশিরাগুলি উঁচু আর স্পষ্ট, সেই রকম পাতা হলেই ভালো হয়। তারপর যোগাড় করো কিছু ভালো মাটি। মাটির ঢেলাগুলো ভেঙে বেশ করে গুঁড়িয়ে নাও আর কাঁকর ও খড়কুটো বেছে ফেলে দাও। মিহি চালুনি দিয়ে যদি ছেঁকে নাও তবে খুবই ভালো হয়। এবারে গুঁড়ো করা মাটিতে অল্প অল্প করে জল দিয়ে চটকে মাখো। খুব নরমও হবে না বা শক্তও হবে না। এখন মাখামাটি থেকে কিছুটা নিয়ে বেশ চাপ দিয়ে দিয়ে বলের মতো গোল করো। তারপরে সেটা পিঁড়ি বা মেঝের ওপরে রেখে প্রথমে হাত দিয়ে চেপে কিছুটা চ্যাপ্টা করে তার ওপরে রুল দিয়ে রুটি বেলার মতো করে আধ ইঞ্চি পুরু রেখে সমান করে বেলে দাও। 'ক' চিহ্নিত ছবিটি দেখো।

এবারে একটা পাতা নিয়ে চিৎ করে অর্থাৎ পাতার মসৃণ দিকটা ওপরে রেখে মাটির পাতের মাঝ বরাবর রেখে সেই পাতাটার ওপরে রুল চালিয়ে চেপে বসিয়ে দাও। এবারে 'খ' চিহ্নিত ছবিটি দেখো।

এবারে পাতার বোঁটাটা ধরে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে পাতাটা তুলে ফেলো। তারপর একটা ছুরি দিয়ে মাটিতে পাতার ছাপের ধার বরাবর কেটে ফেলো। 'গ' চিহ্নিত ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে। ছুরি দিয়ে কাটবার সময় মনে রাখবে যে, মাটিতে বোঁটার যে ছাপ পড়বে যদি তার ঠিক ধার দিয়ে কাটো তবে সেটা খুব সরু হয়ে যাবে, যার জন্যে বোঁটাটা সহজেই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। তাই বোঁটার কাছটা কাটবার সময় দু'পাশে কিছুটা করে ছেড়ে কাটবে ও সেখানে একটা ফুটো করবে। কোথায় ফুটো তা 'গ' ছবিতে দেখানো হয়েছে। এইভাবে যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো পাতার ছাপ তুলে ও কেটে ছায়াতে শুকুতে দেবে। মোটামুটিভাবে শুকিয়ে গেলে তবে রোদ্দুরে দিয়ে খটখটে করে শুকিয়ে নেবে। প্রথম থেকেই কড়া রোদ্দুরে দিলে ফেটে যেতে পারে। এবারে সেগুলো পোড়াতে হবে।

কুমোররা অবশ্য মাটির জিনিস পোড়ায় পাঁজায়। যাদের বাড়ির কাছে কুমোর আছে তারা কুমোর-ভাইকে অনুরোধ করে ছাঁচগুলো পুড়িয়ে নিতে পারো। যাদের তা নেই তাদেরও হতাশ হবার কারণ নেই, কারণ তারাও বাড়িতে এক ধরনের পাঁজা তৈরী করে নিতে পারো। এটা করতে গেলে চাই একটা স্লাডাইসেরী সরষের তেলের বা ঘিয়ের টিন। কাপড়কাচা সোডা ও গরমজল দিয়ে টিন থেকে তেল ধুয়ে ফেলবে ও শুকিয়ে নেবে। এই টিনের ভেতরে তোমার তৈরী ছাঁচগুলো খুব ছোট্ট ছোট্ট ঢিল দিয়ে ফাঁক রেখে রেখে একটার পর একটা সাজিয়ে দেবে। তারপর ছাঁচসুদ্ধ টিনটা সাবধানে বড় চারটে ঢিলের ওপরে বসিয়ে তার তলায়, ওপরে ও চারপাশে শুকনো কাঠকুটো বা ঘুঁটে সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে। টিনটার খোলা মুখে যদি একটা আলগা টিন ঢাকা দাও তবে ভাল হয়।

যদি এইভাবে পোড়াতে না পারো তবে একটা বড় মাটির গামলার তলায় কিছুটা ধানের তুঁষ রেখে তার ওপরে ছাঁচগুলো রেখে সবটা তুঁষ দিয়ে ঢেকে আগুন দিয়ে দেবে। এইভাবেও বেশ পোড়ানো যায়। যদি কোনো ভাবেই পোড়ানোর সুবিধা না হয় তবে আর কি করবে। ঐ শুকিয়েই রাখতে হবে।

যদি ইচ্ছা করো তবে পাতাগুলোর যে রং সেই রং দিয়ে ছাঁচগুলো রং করতে পারো। রং করলে সেগুলো কত সুন্দর হবে তা করে না দেখলে বুঝতে পারবে না। তবে মনে রেখো,—পোড়ানো ছাঁচগুলো জলরং বা তেলরং, যেটা দিয়েই হোক রং করতে পারো, কিন্তু না-পোড়ানোগুলোতে জলরং দিয়ে রং করা চলবে না, সেগুলো তেলরং দিয়ে রং করতে হবে। রং শুকিয়ে গেলে, দেয়ালে পেরেক পুঁতে সেগুলো যদি পর পর টাঙিয়ে রাখো, তবে দেখতেও ভালো দেখাবে আর সবাই দেখে তোমাকে বাহবা দেবে। জিনিসগুলি তৈরী হলে কিরকম দেখতে হবে, তাও এঁকে দেখানো হয়েছে 'ঘ' চিহ্নিত ছবিতে।

আর একটা কাজ যদি করো তবে খুবই ভালো হয়। বিভিন্ন পাতার গড়নের বিভিন্ন নাম আছে। সেই নামগুলো ছোট ছোট লেবেলে বেশ ধরে ধরে লিখে বা টাইপ করে আঠা দিয়ে যদি বোঁটার কাছে এঁটে দাও, তবে সব সময়েই সেগুলো তোমাদের সামনে থাকার জন্যে নামগুলোও তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে।
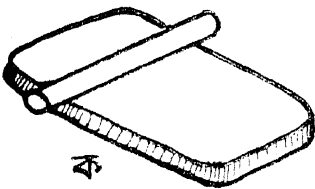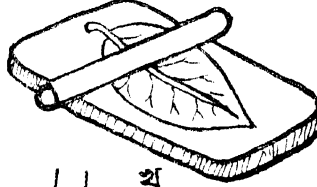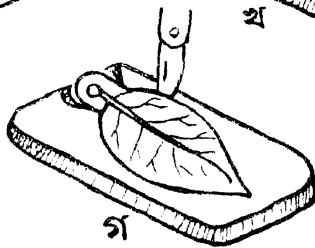
জ্যান্ত পুতুল

অমিতা ঘোষাল (পুতুলবুড়ী)

প্রথম দৃশ্য

(গলির মোড়ে—ছোট্ট তিনটি ছেলে,—তিন বন্ধু। ভীষণ ব্যস্ত ঘুড়ি নিয়ে, ধুলোকাদা মাখা অবস্থা, দুজনের খালি পা, একজনের ছেঁড়া চটি, সামান্য তফাত আর দুজনের চেয়ে)

মানিক—ধর্-ধর্-ধর্, শক্ত করে কল বাঁধতে হবে ঠিক মাঝখানটাতে, তা না হলে ঘুড়ি গোত্তা খাবে—ঘুরবে পাঁই পাঁই করে—বুঝলি?

বৈজু—তা তো বুঝেছি, কিন্তু সুতোতে ভালো মাঞ্জা ত চাই, না হলেই মরেছো জেনো—হুঁ!

তবুনা—জানি জানি, সুতোর জন্যে ভাবনা নেই। কালকে সারাদিন তাইতো সুতোই ঠিক করেছি। উঃ, কি মার মেরেছিলো মা। আচ্ছা বলতো ভাতের ফ্যান আর কাঁচের গুড়ো ছাড়া ভাল মাঞ্জা হয় কিরে? মা কিছু বোঝে না, উল্টো মারলো কি জোর, উঃ! এই দেখ পিঠে এখনো কি দাগ।

মানিক—ইস্, কালসিটে পড়ে গেছে যে, কি দিয়ে এতো জোর মারে তোর মা, ছুরি কাটারি দিয়ে নাকি?

তবুনা—না রে না, হাতা খুন্তি যখন যেটা কাছে থাকে। একদিন বেলুন দিয়েই মাথা ফাটিয়ে—থাকগে সে কথা, নে আয় আর একটা মাত্তর ঘুড়ি বাকি, চট করে বেঁধে ফেলি।

(রাস্তায় গাড়ির হর্ন শোনা গেল। ফুটপাথের উল্টোদিকে বাবলাদের বাড়ি। এদিকে তবুনাদের গলির রাস্তা। এগিয়ে এসে দাঁড়ালো দুজন)

মানিক—কি দেখছিস রে? ঐ ছেলেটাকে? হুঁ, কি আছে দেখবার? আয়, কাজ শেষ করে ফেলি, অনেক বেলা হয়ে গেছে, মা ভীষণ রাগ কোরবে।

তবুনা—দাঁড়ানা, দেখ কতো বাক্সো, প্যাকেট, পুতুল, খেলনা কিনে দিয়েছে ওর বাবা মা, আর আমাদের এখনো পুজোর জামা-ই কেনা হলো না।

মানিক—তাইতো, কি হবে? সমস্ত বাজারটাই তো ঐ ছেলেটা কিনে এনেছে রে! আমার তো এখনো জুতো কেনা হয়নি—কি হবে অ্যাঁ? হিঃ হিঃ হিঃ আয় আর দেখতে হবে না। ইয়া মাথা টিং টিং সিং, হাড় জির্ জির্ গংগা ফড়িং॥ ওস্তাদের তানপুরো যেন, জামার আড়ালে দেহটি লুকনো॥ হিঃ হিঃ হিঃ

(তবুনা আর বৈজু ভীষণ রেগে গেল)

তবুনা—এই ভাল হবে না বলছি, জানিস্ ও আমাদের ভীষণ বন্ধু, যা-তা বলবি তো ভাল হবে না বলে দিলুম।

মানিক—অ্যাঁ, তোদের বন্ধু? তা আগে কেন বলিস্নি ভাই! হ্যাঁরে, ও বুঝি খুব বড়লোক! সত্যি, কতো জিনিস কিনে এনেছে! উঃ কতো বড় বেলুনটা, ফাটলে পরে নিশ্চয় বোমার মতো শব্দ হবে নারে? ওর নাম কিরে? আমার সঙ্গে ওর ভাব করিয়ে দিবি?

তবুনা—ইস্ তোর সঙ্গে কথাও বলবে না। জানিস ও কতো বড়লোক। যা ইচ্ছে করে তাই পায়, যা খুশি বলে, যা খুশি তাই খায়।

বৈজু—সবাই চলে ওর কথা শুনে, যত খুশি
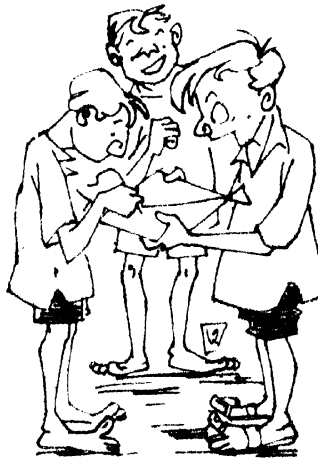
গলির মোড়ে তিনটি ছেলে......

জিনিস কেনে, ওর যা আছে তুই দেখিস্নিকো কোনখানে।

তবুনা—ওর খাবার ঘরটা ময়রার দোকান, পোশাকের ঘর বড়বাজার, শোবার ঘর বিছানায় ঠাসা, ঘুমের নিয়ম বাঁধা রাজার।

বৈজু—ঝি চাকর ওর দিনরাত পিছু পিছু, গর্দান যায়, ওর কষ্ট হলে কিছু।

তবুনা—ডাক্তার বদ্যি সদাই বাঁধা, ওষুধ বড়ি গিলছে গাদা।

বৈজু—হাঁচি কাশি রাজার মতো,—কান্না-হাসির নিয়ম বাঁধা।

মানিক—বেশ, এখন আমি চললুম, আমার বন্ধুর দরকার নেই। তোরা আমার ঘুড়ি ফিরিয়ে দে।

বৈজু—রাগ করিস্না ভাই, চল তোর সঙ্গে বাবলার ভাব করিয়ে দিই। কিন্তু সাবধান, ওর বাবা মা কিন্তু আমাদের তেমন ভালবাসে না; আর আমাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ খেললেই ওকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে। ওর মা অবশ্য আমার মার মতো হাতা খুন্তি দিয়ে মারে না। ওর জন্যে সোনার তৈরী বেত আছে। হুঁ, এক ঘা খেয়েছো কী ওমনি ভিরমি, সাবধান।

তবুনা—আর, আর আমাদেরও ছুটতে হবে পাঁই পাঁই, যখন তখন রামতাড়া খেতে হবে, বুঝলি তো? হিঃ হিঃ হিঃ। বাবলা কিন্তু খুব ভালবাসে আমাদের।

মানিক—ইস্, আমিতো তোদের মতো ভীতু নই যে ছুটবো, উল্টে লাগিয়ে দেব পায়ে এক ল্যাং। জানিস, মা বলেছে, সত্যিকারের বড়লোকেরা কখনো কাউকে অবহেলা করে না, হিংসে করে না,—নকল বড়লোকেরাই এসব করে। চল্ যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বাবলাদের বাড়ি। জিনিসপত্র, খেলনা বাক্সো ছড়ানো ঘর। একটা পুতুল নিয়ে ছোট বোনের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করছে বাবলা)

বাবলা—আয় না, কেউ নেই এদিকে। দেখে যা কী মজার সব জিনিস কিনে দিয়েছে আমায়! এবারে তিন জোড়া জুতো কিনেছি। এক একবার এক একজোড়া জুতো পরে ঠাকুর দেখতে যাবো, আর জামা তো দু ঘণ্টা পর পর পাল্টাতে হবে, তা না হলে এতো জামা কি করে পুজোর ক'দিনে পরবো বল? আর এই দেখ পুতুলটা, ভারি মজার না?

তবুনা—বাঃ, কি সুন্দর নরম নরম জামা!

বাবলা—না রে ধরিস না, মা বোকবে, তোর হাত যা ময়লা—। ঐ ছেলেটার নাম কিরে? নতুন এসেছে বুঝি কোলকাতায়?

তবুনা—ওর নাম মণিময়, আমরা 'মানিক' বলে ডাকি। ও খুব ভাল ঘুড়ি ওড়াতে পারে। আজ বিকেলে যাবি আমাদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে?

বাবলা—ওরে বাবা! মা তাহ'লে কুচি কুচি করে কেটে ফেলবে। বিকেলে যাবো স্যুট আনতে নিউ মার্কেটে, তারপর মামার বাড়ি, সেখান থেকে সিনেমা, তারপর মাসীবাড়ি। এই যে পুতুলটা সেই জন্যেই তো কেনা, দেখ্না কি সুন্দর, চোখ খোলে—বন্ধ করে, হাসে, খায়, আরো অনেক মজার কাণ্ড করে। একেবারে নতুন বেরিয়েছে—তেমনি দাম।

মানিক—দেখি দেখি, ওঃ—এর থেকে ক মজার পুতুল আমার বন্ধুর আছে—বে বিশ্বাসই করবে না পুতুল বলে। অ সবকিছু ঠিক মানুষের মতো, নাচ পারে, গাইতে পারে, কাঁদতে পা হাসতে পারে, দেখলেই আদর করতে ই করে।

তবুনা—ধ্যাৎ, সব মিথ্যে কথা। বাবু পুতুলের চেয়ে ভাল পুতুল কোথ পাওয়া যায় নাকি! তুই মন খারাপ ক

না বাবলা। ও এমনি বানিয়ে কথা বলে রাগাবার জন্যে।

মানিক—কক্ষনো না, একটুও মিথ্যে বানানো কথা নয়। চল্‌না এখুনি দেখিয়ে দোব।

বৈজু—বেশ, তুই তবে জেনে নিতে পারিস্ কোন্ দোকানে পাওয়া যায়—বাবলা তবে কিনতে পারে, যত দামই হোক। বাবলা নিশ্চয় কিনতে পারবে। তাই নারে বাবলা ?

বাবলা—ঠিক বলেছিস, আমি আজই তবে তেমন দশটা পুতুল যদি না কিনেছি। এখনো আমার কাছে অনেক টাকা আছে।

মানিক—বলছি তো, কোনও দোকানেই পাওয়া যাবে না। পুতুলওলা অমন পুতুল ঐ একটাই তৈরী করেছিল। আমার বন্ধু পুতুল-টুতুল ভালবাসে না। ইয়া পালোয়ানের মতো চেহারা তার, তেমনি জোর গায়ে। একটি ঘুষি খেয়েছো কি চিৎপাত। এইতো সেদিন ইয়া তাগড়া একটা ষাঁড় আমাদের গলিতে বসে ঘুমোচ্ছিল, ভয়ে সব্বাই পাঁচিলের ওপর দিয়ে যাতায়াত শুরু করলো, তাই না দেখে আমার বন্ধু ষাঁড়ের ন্যাজটা ধরে বাঁই বাঁই করে দিলে ঘুরিয়ে। অমনি ষাঁড়টা জোড়া খুর ঠুকে তিড়িংমিড়িং তিন লাফে পিট্‌টান দিলো। আর তাই না দেখে, পুতুলওয়ালা ঐ জ্যান্ত পুতুলটাই ওকে দিয়ে গেল, একটি পয়সাও নিলে না। উঃ সে কি মজার পুতুল! নেচে নেচে চলে দুলদুল।

(বাবলার রাগ ও কান্না)

তবলা—কাঁদিস্‌না বাবলা, তোর মাকে বললে এক্ষুনি পেয়ে যাবি। বলে দেখ্‌না, নিশ্চয় পাবি।

মানিক—না, না, না, কক্ষনো পাবে না, পাবে না, পাবে না। হিঃ হি হি-হি।

(তবলা-বৈজুর তাড়া খেয়ে মানিক ছুটে পালিয়ে গেল। বাবলা রাগে ফুলতে লাগল)

তবলা—চুপ কর বাবলা। দাঁড়া না, ওর বাবাকে বলে এমন মার খাওয়াবো যে মজা বেরিয়ে যাবে।

বৈজু—দেখ তবলা, আমার মনে হয় সব ওর মিথ্যে কথা।

তবলা—চল্‌না যাই ওর বাড়িতে সব কথা ওর মাকে বলে দিয়ে আসল কথাটাও জেনে আসি।

বৈজু—তাই চল্, এখন ঠিক ওকে ধরা যাবে, আর ওর বন্ধু নাকি ওদের বাড়ির পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। চল্ সব জেনে আসি।

তবলা—বাবলা তুই কিছু ভাবিস না, আমরা যাবো আর আসবো।

(বৈজু ও তবলার প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(মানিকের বাড়ি। একা ঘরে মানিক খালি গায়ে তেল মালিশ করছে, বিচিত্র অংগভংগ। বৈজু ও তবলা পা টিপে টিপে দুপাশে এসে দাঁড়ালো হঠাৎ। দুজনেই মারমুখো)

মানিক—ওমা, তোরা এর মধ্যে এসে গেছিস ? কী মজা, কী মজা। ও মা, মাগো আমার বন্ধুরা এসেছে, একসংগে ভাত দিও। বেশী করে মাংস দিও, লুচি আর পায়েস বেশী চাই। উঃ কি মজা লাগছে, আমি একেবারে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—আজ আমার দাদার জন্মদিন। দাঁড়া এক ছুটে নেয়ে আসি, বোস তোরা হিঃ-হিঃ-হিঃ—

(এক ছুটে চলে গেল মানিক, একটু পরে ছোট্ট গাড়িতে করে টুকটুকে এক খুকুকে নিয়ে এলো ঘরে খুকুর আয়া)

তবলা—দেখেছিস, নিশ্চয় এই পুতুলটার কথাই বলেছিল মানিক। সত্যি একেবারে জ্যান্ত।

বৈজু—তাইতো, কি সুন্দর হাসছে আর চোখ পিট্ পিট্ করে চাইছে দেখ।

তবলা—একটা বুদ্ধি করে আয়াকে সরিয়ে দিয়ে, পুতুলটাকে নিয়ে যেতে পারতুম, উঃ বাবলা কি খুশিই না হতো।

(বৈজু-তবলা এগিয়ে গিয়ে খুকুকে আদর করলো, স্নান সেরে ফিরে এলো মানিক।)

মানিক—দেখেছিস আমার বন্ধুর পুতুল কি সুন্দর ? হিঃ-হি-হি। তোদের বড়লোক বন্ধুর ভারি দেমাক নারে ? কেন বললি আমার সঙ্গে কথা ও বলবে না। দেখলি তো কেমন জব্দ করলাম, হিঃ-হিঃ-হিঃ।

তবলা—সত্যি ভাই, একেবারে জ্যান্ত পুতুল !

মানিক—দূর বোকা, ও যে আমার মাসীর মেয়ে 'তুতুল'। পুতুল নয় রে—হিঃ হিঃ হিঃ

বৈজু-তবলা—অ্যাঁ, পুতুল নয় ?

তেল মালিশ করছে বিচিত্র অংগভংগ করে

মানিক—হ্যাঁরে, হ্যাঁ, এই দেখ—তুতুলশোনা কেমন কথা শোনে।

(মানিক তুতুলকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল—ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে নাচতে লাগলো তুতুল)

। যবনিকা ।

মানুষের আইন

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

নিয়মানুবর্তিতা মানতে গেলেই যে মানুষকে তার মনুষ্যত্ব দয়া মায়া সব বিসর্জন দিতে হবে তার কোন মানে নেই। কঠোর হওয়া মানেই নিষ্ঠুর হওয়া নয়। অন্তত ইংল্যাণ্ডের মহামনীষী চার্চিল—যাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ বলা হয়—তিনি তাই মনে করেন। আর এ শিক্ষা তিনি তাঁর প্রথম জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে লাভ করেছিলেন।

চার্চিল তখন সবে স্কুলের পড়া শেষ ক'রে স্যাণ্ডহার্স্টের মিলিটারী কলেজে ঢুকেছেন।

সামরিক শিক্ষালয়—তার আইন কানুনও খুব কড়া। যে রকম আইনানুগ ও শৃংখলাবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে ভবিষ্যতে, তার অভ্যাসটাও ওখান থেকে হয়ে যাওয়া দরকার। নিয়মানুবর্তিতাই সামরিক জীবনের সবচেয়ে বড় কথা।

ওখানে ছাত্রদের বিনা হুকুমে কলেজের সীমার বাইরে যাবার নিয়ম নেই। তবে এই হুকুম নেবার সুবিধার জন্য প্রত্যেক ছুটির খাতা সৈন্যদলের জন্য একটা করে ছুটির খাতা থাকে। যে অবসর সময়ে বাইরে যেতে চায় সে তাতে নিজের নাম এবং সময় অর্থাৎ কতক্ষণের জন্য বাইরে যাবে লিখে দেবে। তারপর সেই খাতা সেই বিশেষ দলের কম্যাণ্ডার বা অধিনায়কের কাছে যাবে এবং তিনি সই ক'রে দেবেন—এই হ'ল আইন। অনেক সময় অধিনায়ক নিজের সময় মত একবার এসে সই করে দেন, সুতরাং খাতায় নামটা লিখলেই ছুটিটা মঞ্জুর হবে, এইটেই ধরে নেওয়া হয়।

চার্চিলের সময়ও এ আইন ছিল। একদিন হয়েছে কি, চার্চিল এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য তাড়াতাড়িতে বেরিয়ে পড়েছেন বিকেল বেলা—নামটা লেখবার কথা মনে পড়েনি। একটা টমটম ভাড়া ক'রে যাচ্ছেন মনের আনন্দে—হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেল তাঁরই দলের অধিনায়ক মেজর বলের সঙ্গে। তিনিও কোথায় বেরিয়েছিলেন—কলেজে ফিরছেন। অর্থাৎ তিনি চার্চিলের উল্টো দিক থেকে আসছেন। চার্চিল যথারীতি টুপী খুলে নমস্কার জানালেন, তিনিও প্রতিনমস্কার করলেন—তারপর দুজনে দুদিকে চলে গেলেন। কিন্তু খানিকটা গিয়েই চার্চিলের মনে পড়ে গেল যে—ঐ যা!

এখন অন্য কেউ হ'লেও কথা ছিল, মেজর বল সাংঘাতিক মানুষ। অত্যন্ত কেতা দুরুস্ত, আইনানুগ, কঠোর স্বভাবের

কর্তব্যপরায়ণ লোক। নিজেরও কখনও ভুল হয় না—অপর কারুর ভুল মার্জনা করতে অভ্যস্ত নন। বন্ধুত্বের ধার ধারেন না—কর্তব্যের কাছে কোন কিছুই নেই তাঁর মতে। তোষামোদ বা দয়া ভিক্ষা ক'রে কেউ তাঁকে কোনদিন নরম করতে পারেনি। তিনি নাকি কলেজের সীমানার মধ্যে হাসতেন না কোনদিন, এমনি সাংঘাতিক খ্যাতি ছিল তাঁর। ফলে সবাই তাঁকে যমের মত ভয় করত।

কথাটা মনে পড়তেই চার্চিলের মাথা ঘুরে গেল। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া তো মাথায় উঠলই। তিনি তখনই গাড়ি ঘোরালেন। দৌড় দৌড়—কেবলই চাবুক মারছেন ঘোড়াগুলোকে; কিন্তু তারাও ভাড়াটে—যাকে বলে 'ছ্যাকড়া' গাড়ির ঘোড়া—তাদের আর কতটুকু জ্ঞান?

চার্চিল সেই দুর্দান্ত শীতের দিনেও ঘেমে উঠলেন। মেজর বল নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছেন—নইলে পথেই দেখা হ'ত। না জানি কী আজ অদৃষ্টে আছে। তবে একটা সান্ত্বনা—মনে মনে একটু আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করেন চার্চিল, সাধারণত সন্ধ্যার খাবার দেওয়ার আগে ও খাতা সই করেন না অধিনায়করা।

যাই হোক, এক সময় তো গাড়ি পৌঁছল। সিঁড়ির মুখে গাড়ি বারান্দায় গাড়ি ঘোড়া সব রইল পড়ে—এক এক সঙ্গে দুটো তিনটে ধাপ ক'রে লাফিয়ে (তখন ছেলে মানুষ ছিলেন চার্চিল—এখনকার মত থপথপে হয়ে যাননি!)। ছুটে তো ওপরে উঠলেন। কিন্তু খাতাটার দিকে নজর পড়তেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল তাঁর—আজই, তাঁর কপালেই অন্য ব্যবস্থা হয়েছে, মেজর বল ফিরেই ছুটির খাতায় সই করেছেন—জ্বল জ্বল করছে তাঁর টানা হাতের ডাগর সই—"ও বি"। আর সই করেছেন শেষ নামটির ঠিক গায়ে গায়ে—কোনমতে নামটা লিখে দেওয়া যায় এমন একটু ফাঁকও নেই সেখানে।

কিন্তু, ওকী, তাঁর সইয়ের ঠিক ওপরের নামটা কার?

আরে, ঐ তো তাঁর নামই লেখা রয়েছে—উইনস্টন স্পেন্সার চার্চিল।

কিন্তু কে লিখল ঐ নামটা, তিনি যে লেখেননি এটা তো নিশ্চিত।

আর একটু লক্ষ্য করতেই দেখলেন—হাতের লেখাটা স্বয়ং মেজর বলের। তিনিই ও'র নামটা লিখে তারপর সই করেছেন।

ভুলই হয়েছে বুঝে সে ভুলটাই সংশোধন করে দিয়েছেন—ভুলটাকে অপরাধ ক'রে তুলে শাস্তি দেননি। যে ওপরওলা, শাস্তি দেওয়ার ফাঁদ পেতে বেড়ানো তাঁর উচিত নয়। ভুল যাতে না হয় ভবিষ্যতে, সেই শিক্ষা দেওয়াই তাঁর কাজ। আর চার্চিলের পক্ষে এর চেয়ে ভাল শিক্ষা আর কি হ'তে পারত? এ কী তিনি ভুলবেন কোনদিন?

বন্ধুত্ব

মনোজিৎ বসু

সে অনেক দিন আগেকার কথা।

এক সওদাগর-পুত্র, আর এক পণ্ডিত-পুত্র। দুই বন্ধু তারা। এক সঙ্গে খেলে বেড়ায়, আনন্দে আত্মহারা। ভাব তাদের গলায়-গলায়, ভাব তাদের চলায় বলায়।

পুব-আকাশ আলো করে সূর্য্য ওঠে। দুই বন্ধু তখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে,—বকুলতলার মাঠে ছোটে। রাশি রাশি বকুলফুল,—ছড়িয়ে থাকে ঘাসে ঘাসে। দুই বন্ধুতে কুড়িয়ে বেড়ায়, কোঁচড় ভরে, হাসে। কখনও যায় নদীর ধারে, কখনও যায় বনে—কত কী যে গল্প করে তারা আপন মনে।

যে দেখে, সে-ই বলে, আহা, দুটিতে কত ভাব। ঠিক যেন মানিক-জোড়!

কেউ বলে, উঁহু! ঠিক যেন লাটাই-ঘুড়ি! একজনের সঙ্গে আর একজন একই সুতোয় বাঁধা। সে-কথা শুনে, ওদের মুখে ফোটে হাসি। আনন্দে নেচে বেড়ায়, কিংবা বাজায় বাঁশি।

এইভাবেই দিন কেটে যায়।

গাছের চারা যেমন ছোট থেকে বড় হয়, ওদেরও তেমনি বয়স বাড়ে।

বালক থেকে হয় কিশোর, কিশোর থেকে হয় তরুণ।

ওদের তখনও গলায়-গলায় ভাব, অটুট ওদের বন্ধুত্ব।

সওদাগর তখন বুড়ো হয়েছেন, পণ্ডিতেরও তখন বার্ধক্য।

দুজনেই চান বিশ্রাম, দুজনেই চান আরাম।

ছেলেরা এবারে বড় হলো,—এখন তারাই এসে সংসারের দায়িত্ব বুঝে নিক, বুড়ো বাপদের ছুটি দিক। দুজনেরই মনের ইচ্ছে—তীর্থে তীর্থে ঘুরে আসি, নয়তো হই বনবাসী। শাস্ত্রে আছে, 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ, পঞ্চাশ-বছর বয়স পেরুলেই সংসার ছেড়ে বনে যাবার উপদেশ দিয়ে গেছেন শাস্ত্রকাররা। তার উদ্দেশ্য হলো, বৃদ্ধ বয়সে নির্জন বনে গিয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে ধর্মচর্চা করা। শাস্ত্রবাক্য কখনও মিথ্যা হয় না। ওদিকে সওদাগর আর পণ্ডিতেরও তাই তর সয় না।

সওদাগর তাঁর ছেলেকে ডেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সব-কিছু বুঝিয়ে দিয়ে তীর্থ-ভ্রমণে বের হলেন। আর, পণ্ডিতও তাঁর চতুষ্পাঠীর সমস্ত দায়িত্ব ছেলের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে যাত্রা করলেন হিমালয়ের পথে।

সওদাগরের ছেলে এতদিন ছিল বেশ। এবারে বাপের অগাধ ধন-দৌলত পেয়ে তার মাথা গেল বিগড়ে। অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না তার। নিজের হাতেই তুলে নেয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার। কর্মচারীদের ওপরে বিশ্বাস নেই, টাকাকড়ি ছুঁতে দেয় না কাউকে। সপ্তডিঙা নিয়ে বাণিজ্যে যায়, রাশি রাশি টাকা এনে নিজে নিজেই আগলায়। সে-টাকা খরচ করে নিজের খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদ, আর চোখ-ঝলসানো পোশাক-আশাকে। দান-ধ্যানে খরচ করে না এক-পয়সাও, গরিব-দুঃখীরা তার সিংহদ্বার থেকে ফিরে যায় শূন্য হাতে।

ওদিকে পণ্ডিতের ছেলে তার চতুষ্পাঠী নিয়েই ব্যস্ত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কতরকম কাজই না সে করে। ছেলেদের পড়ায়, নিজের হাতে ফুল তুলে গৃহদেবতার পুজো করে পুজোর প্রসাদ বিলিয়ে দেয় গরিব-দুঃখীকে। তারপর, ঘুরে বেড়ায় এখানে, ওখানে, নানা জায়গায়। কারও ছেলের অসুখ, পণ্ডিতের ছেলে অমনি ছুটল তাকে দেখে আসতে, কবরেজ ডেকে তার

রাজা নিজে এসে অভ্যর্থনা করেন তাকে

চাকংশা করাতে। কারও বাড়িতে চালের **অভাবে হাঁড়ি** চড়ে না, পণ্ডিতের ছেলে **অমনি ছুটল** সে-বাড়িতে, নিজের চাল থেকে **কিছুটা** দিয়ে আসতে। বেশী অভাব দেখলে, **সবটাই** দিলে উজাড় করে ঢেলে। লোকে তাই **ধন্য ধন্য** করে। বলে,—এমন মানুষ আর **কোথায় বা মেলে**? পণ্ডিতের ছেলে তাই **সবার** প্রিয়। ছোট থেকে বড় সবাই তাকে **মানে**।

কিন্তু, সওদাগরের ছেলে তাকে **গ্রাহ্যই** করে না আজ। বন্ধু বলে স্বীকার করতেও সে নারাজ। বলে,—ছেলেবেলায় বোকা **ছিলাম**, তাই ওর সঙ্গে মিশেছি। নইলে, একটা গরিব বামুনের ছেলের সঙ্গে আবার **বন্ধুত্ব**! একে টুলো পণ্ডিত, তায় আবার **ওর সংগীসাথী** যতসব চাষাভুষা, মুটে **মজুর**, আর ছোটলোক। আমি হলাম দেশের সেরা, শ্রেষ্ঠী এবং শ্রেষ্ঠ। ওর সঙ্গে মিশে **কেন করব সময় নষ্ট**?

ধনের অহংকারে সওদাগরের ছেলে তাই পণ্ডিতের ছেলেকে মানুষ বলেই গণ্য করতে চায় না। অথচ, দেশের লোক পণ্ডিতের **ছেলেকেই** জানে সত্যিকারের মানুষ বলে।

পণ্ডিতের ছেলে গরিব-দুঃখীদের নিয়েই **খুশি**। একজনের বন্ধুত্ব হারালেও, বহু-**জনের** বন্ধুত্ব সে পেয়েছে। তাদের সকলের **আদর** আর ভালোবাসা, স্নেহ আর আশীর্বাদ —**সেই** তো তার আসল ধনদৌলত।

ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে তার অবশ্য **খুবই** দুঃখ হয়। এতদিনকার বন্ধুত্ব, সে কি **আর** ভোলা যায় সহজে? ভাবে, অর্থই শেষে **অনর্থ** ঘটালো। ভগবান ওর সুমতি দিন।

দেশে কোনো উৎসব হবে। অমনি ডাক **পড়ে** পণ্ডিতের ছেলের। সকলে তাকেই **বসায়** সভাপতির আসনে। সম্মান জানায় পুষ্পমাল্যে আর চন্দন-তিলকে। সওদাগরের **ছেলেকে** কেউ আমন্ত্রণ জানায় না। জানালেও তার জন্যে বিশেষ কোনো আসনের ব্যবস্থা হয় না সেই সভায়। সওদাগরের **ছেলে** অপমানে ফুলতে থাকে।

রাজ-দরবারে গিয়েও দেখে পণ্ডিতের ছেলের সে কী খাতির।

রাজা নিজে এসে অভ্যর্থনা করেন তাকে, পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে পায়ের ধুলো নেন তার। নিজের সিংহাসনের পাশের আসনে বসিয়ে সম্মানিত করেন ঐ গরিব টুলো-পণ্ডিতকেই অথচ কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

সওদাগরের ছেলে ক্ষুব্ধ হয়ে পালিয়ে আসে দরবার থেকে।

রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় যেন।

এইভাবে কেটে যায় দিনের পর দিন।

সওদাগরের ছেলে ভাবে, এভাবে তো আর থাকা যায় না। পণ্ডিতের ছেলেকে যেভাবেই হোক নিজের বশে আনতে হবে। সে বশ হলে, দেশের লোকও বশে আসবে তার।

ভেবে ভেবে একদিন সে পণ্ডিতের ছেলের কাছে গেল, গোপনে আর গভীর রাত্রে।

ধনী হয়ে, দিনের বেলায় সকলের চোখের সামনে, গরিব টুলো-পণ্ডিতের কাছে যেতে তার বড় লজ্জা! পণ্ডিতের না-আছে ছিরি-ছাঁদ, না-আছে সাজ-সজ্জা!!

গিয়েই বললে,—দ্যাখো বাপু, তোমার জন্যে আমার **মান-ইজ্জত** সব যেতে **বসেছে**। তোমাকে আমি আমার সম্পত্তির চার-ভাগের একভাগ দেব, তুমি আমাকে মান্যগণ্য কর। তুমি মানলেই, আর সকলেও আমাকে মানবে।

পণ্ডিতের ছেলে তো অবাক! ভাবলে— এখনও দেখছি ওর ধনের অহংকার যায়নি। টাকার লোভ দেখিয়ে বশ করতে চায়! মনের সে-ভাবটা গোপন করে মৃদু হেসে বললে— অত কষ্টে তোমার মতো লোকের বশীভূত হতে যাব কোন্ দুঃখে ভাই? বেশ আছি আমি।

সওদাগরের ছেলে মনে করলে ওষুধে ধরেছে তাহলে! সে তখন বললে—বেশ, অর্ধেক সম্পত্তিই না-হয় দেব, তুমি আমাকে সবার সামনে মেনে চলবে বলো। তুমি খাতির করলে আর সকলেও খাতির করবে।

পণ্ডিতের ছেলে আবার মৃদু হেসে জবাব দিলে,—দুজনের সম্পত্তি সমান-সমান হলে তো মানবার প্রশ্নই ওঠে না। তুমিও যত টাকার মালিক, আমিও তত টাকার! কোন্ দুঃখে আমি মানতে যাব তোমাকে?

পণ্ডিতের ছেলের **কথা শুনে ব্যাকুল হয়ে** সওদাগরের ছেলে তখন বললে—বেশ, তোমাকে আমি **আমার সমস্ত সম্পত্তিই** লিখে দিচ্ছি, তাহলে তো মানবে, **খাতির করবে** আমাকে?

পণ্ডিতের ছেলে এবারে হো হো করে হেসে ওঠে। বলে,—তাহলে তো আর তোমার মতো কপর্দকশূন্য মানুষকে মানবার কোনো দরকারই হবে না। কারণ, সমস্ত সম্পত্তি পেলে আমি-ই হব এ-দেশের সব-চেয়ে ধনী, আর তুমি হবে গরিব ভিখিরী। ধনী কি আর ভিখিরীকে কখনও মানে, বা খাতির করে?

এতক্ষণে নিজের ভুলটা বুঝতে পারলে সওদাগরের ছেলে। বুঝতে পারলে টাকার লোভ দেখিয়ে সব মানুষকে বশ করা যায় না। পণ্ডিতের ছেলের দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো—ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমাকে। তোমার কথায় আজ আমার ধন-সম্পত্তির অহংকার চলে গেল। তুমি সত্যই মহৎ, তুমিই সত্যি শ্রেষ্ঠ।

পরদিন থেকে সবাই দেখলে—**সওদাগরের ছেলের** সে কী বিরাট **পরিবর্তন**।

সওদাগর-বাড়ির সিংহদ্বার খুলে গেছে। **সওদাগরের ছেলে গরিব-দুঃখীদের মধ্যে** বিলিয়ে দিচ্ছে **তার ধন-দৌলত, হাসিমুখে সবাইকে করছে** অভ্যর্থনা।

খবর শুনে রাজাও **এলেন সেই দৃশ্য** দেখতে।

খুশি হয়ে আলিঙ্গন করলেন **সওদাগরের ছেলেকে**। রাজ-দরবারে নিয়ে গেলেন তাকে। পণ্ডিতের ছেলের আসনের **পাশেই হলো** সওদাগরের ছেলের আসন।

জয়ধ্বনি উঠলো চতুর্দিকে।

নতুন করে বন্ধুত্ব হলো **সওদাগরের ছেলে** আর পণ্ডিতের ছেলের মধ্যে।

কেউই জানে না কবে থেকে
জন্ম থেকে আসছি দেখে
উজানতলির কাছটা:
যেখান থেকে পাঁচদিকে ঠিক
পথ গিয়েছে পাঁচটা
সেইখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে
বুড়ো অশথ গাছটা।

দেখলে পরে মনে হবে
আদ্যিকালে হয়তো কবে
পালিয়েছিলো বাড়ি থেকে
দেখতে নিরুদ্দেশটা।

পাঁচ মাথাটার মোড়ে এসে—
কোন্ পথে যাই ভাবলো শেষে;
ভেবে ভেবেই শেষকালটায়
গুলিয়ে ফেলে শেষটা।

সেই থেকে ও দাঁড়িয়ে আছে
পথ চলতি সবার কাছে
বলছে বুঝি, "দিন না বলে
নিরুদ্দেশের পথটা।"

তাইতো ওকে দেখলে পরে
জানতে ভারী ইচ্ছে করে
সেই পথটির হদিস আজো
পায়নি কি অশথটা?

একটি মাকড়সা

শ্যামলকুমার চক্রবর্তী

ফুটফুটে ফরসা
একটা মাকড়সা
আলনার পাশে;
সকাল কি সন্ধে
মনের আনন্দে
ফিকফিক হাসে।
আরশোলা ঝোলাগুড়
লজেন্স কি চানাচুর
কেক বিসকুট—
খায় সব ফেলে
টিকটিকি পেলে
কুট কুট কুট।

স্বাস্থ্য-সম্মত

শ্রীশশাঙ্কজীবন চক্রবর্তী

হ্যারে-হরি, শুনলুম, শরীরটা নাকি,
খারাপ যাচ্ছে? আরে, তাতে ভয়টা কি—?
এখুনি বাৎলে দেব সহজ উপায়,
কি করে কি হতে পারে, এইখানে আয়!

চট্ করে ব্যাঙ্ ক'টা—আন্ দেখি তুই,
ঠ্যাং কেটে জলে ভেজে দিই গোটা দুই!
এমনি না আসে, চ্যাং-দোলা করে নিস্,
ঢ্যাঙা দেখে ব্যাঙাচিও সাথে গোটা 'বিশ্'—
তাই দিয়ে রে'ধে দেব ভাল তরকারি,
শরীরের পক্ষে যা,—খুবই দরকারী!

তা না হলে,—বাসে চেপে,—বাঁশবেড়ে গিয়ে
বাসী কিছু ভাল মাছ কিনে আয় নিয়ে,—
পচা হোক্ ক্ষতি নেই, হয় যেন তাজা,
তার তেলে ভেজে দেব কিছু তেলে-ভাজা!
আনিস্ মাছের সাথে, গোটাকত মাছি।
কেটে খেলে,—ফেটে যাবে গায়ের ঘামাচি!!

না-হলে উপুড় হয়ে,—পুকুরের পাড়ে,
এখুনি দুপুর বেলা গিয়ে দাঁড়া না রে,
আগড়া জোয়ান কটা 'কাঁকড়ার ছানা,
খুজে-পেতে ধরে বে'ধে চাই ঠিক আনা!
আক্রা বাজারে শুনি,—কাঁকড়ার দর,—
পুকুরে অনেক পাবি, নরম নধর!
সেই সাথে আন কিছু, কাঁকড়া-বিছেও,
ঝোল রে'ধে দিই তোকে,—খাই তা নিজেও!
খেলে পরে ঝাল-ঝাল,—ঝোল কাঁকড়ার,
ঝাঁকড়া চুলের শোভা,—বাড়বে মাথার!

খাওনা বোকা! ফটো—শ্রীইরা রক্ষিত

খাসা হয়, খোসা কিছু চিনে বাদামের,—
কিনে এনে দিস্ যদি—দশ বিশ সের,—
ছিনে জোঁক,—চিনে পাবি,—চীনে পাড়াতেই,
সেটা বিনে চলবে না,—বলছি আগেই,—
আ—রো,—হ্যানো-ত্যানো,—এটা-ওটা-সেটা চাই,
ইত্যাদি, ইত্যাদি—খানিকটা ভাই!
তারপরে যা বানাবো, লাভ নেই বলে,
দেখবি,—সে যে কি মাল,—রাঁধা শেষ হলে,—
খেলে পরে টের পাবি,—কতখানি ফল,
বলিস্ তখন—দেহে পাস্ কিনা বল!!

হ্যালো! বিস্কুট ফটো—সত্যেন সেন

ইভার সাধ

আদিত্য গঙ্গোপাধ্যায়

আসছে পূজা, দশভূজার মূর্তি যে হয় গড়া।
খোকন খুকু নাচছে সুখে শিকেয় তুলে পড়া।
সকাল বেলার সোনার রোদে উপচে পড়ে খুশী।
লেজ নাচিয়ে শিউলিতলায় বেড়াচ্ছে ফুলটুসি।

বললে মাকে ইভা ডেকে, 'পান্টিকে তুমি চেনো।
ওর তরে মা ভাল জামা একটা পূজায় কেনো।
বড্ড গরীব, জামাটা ওর একেবারে ছে'ড়া।
তাই নিয়ে মা হাসাহাসি করে যে অন্যেরা।

পড়ার সাথী ওযে আমার, বোনের চেয়ে বড়।
পূজার ক'দিন ওকে এবার নেমন্তন্ন কর।
দাও মা ওকে জামা জুতো, ফুটুক মুখে হাসি।
সত্যি মাগো ওকে আমি বড্ড ভালবাসি।

উচিত সাজা

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

[আটুল আর বাটুল। দুই ভাই। জোছনা রাত্তিরে গলা জড়া-জড়ি ক'রে মনের আনন্দে গান জুড়ে দিয়েছে।]

॥ গান ॥

আটুল-বাটুল নাম আমাদের
আমরা দুটি ভাই,
বাঘ-ভাল্লুক, দত্যি-দানো
কিচ্ছুতে ভয় নাই।
মোদের কাছে টিঁকবে না কো
কারুর জারিজুরি,
দুম্-দুমা-দুম্ কিল লাগিয়ে
ফাঁসিয়ে দেবো ভুঁড়ি।
মোদের দেখে সবাই পালায়
যেথায় মোরা যাই।
আমরা দুটি ভাই॥

[মস্ত এক গোম্রামুখো বাঘ হঠাৎ সেখানে হাজির]

বাঘঃ হালুম্—খালুম্—হুম্...!
হাড়্—গোড়্—মাস্ খাই,
হাতের কাছে যাকে পাই—
কুড়্—মুড়্—মুড়্ চিবিয়ে খাই!

[এমন সময় আটুল-বাটুলের ওপর চোখ পড়লো তার]

আরে, আরে, আরে—
তোফা যে ভোজ নাকের ডগায়
হাজির একেবারে!

[আটুল ভারিক্কিচালে বাঘের দিকে এগিয়ে গেল]

আটুলঃ বেজায় দেখি চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি—
দেব নাকি একটি চড়
উড়িয়ে মাথার খুলি?

[বাটুলও এগিয়ে যায়]

বাটুলঃ শোন্‌রে পাজী বাঘ-বুজ্জাতী
আমায় যদি চটাস্—
পেট ফাটাবো ফটাস্!

[বাঘ ঘাবড়ে গেল বেজায়]

বাঘঃ এ যে দেখি উল্টো ক্যাসাদ,
প্রাণ বুঝি আজ যায়।
ঘাট মানছি আটুল-বাটুল,
ধরছি দুটি পায়—
দয়া ক'রে এই বারটি
ছেড়ে দে আমায়।

আটুলঃ বেশ, বেশ, বাছাধন
খুশি হলো তা'রি মন!

বাটুলঃ এইবার বাড়ি যাও,
গিয়ে দুধু—ভাতু খাও!!

[ছাড়া পেয়ে ভেগে পড়লো বাঘ]

[আটুল-বাটুল আবার গান ধরলো]

॥ গান ॥

মাঠে-ঘাটে নেচে বেড়াই,
আটুল-বাটুল আমরা;
মোদের পিছু লাগবে যারা—
তুলবো পিঠের চামড়া!

[লাঠি ঠুক্-ঠুক্ করতে করতে এক থুত্থুড়ে বুড়ো বন থেকে বেরুলো]

বুড়ীঃ বটে, বটে, কে রে তোরা?
এটা আমার ভিটে।
তিড়িং-মিড়িং করিস্ যদি—
কিল লাগাবো পিঠে।

আটুলঃ এটা আবার কে রে—
হঠাৎ এলো তেড়ে?

বাটুলঃ মাতব্বরী করলে পরে
পিটিয়ে দে না ছেড়ে।

বুড়ীঃ বটে, বটে খুব যে সাহস!
নেই বুঝি ভয়-ডর?
বন্‌বনিয়ে ঘুরবে মাথা
একটি খেলে চড়!

আটুল-বাটুল (একসঙ্গে)ঃ
আয়না দেখি শুঁটকি বুড়ী,
মটকে দেব ঘাড়।

বুড়ীঃ পিটিয়ে তোদের ভূত ছাড়াবো,
কস্‌নে কথা আর!
এবার মজা দ্যাখ্‌না—
আয় তো আমার প্যাখ্‌না...!

[বুড়ীর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই কিম্ভূতকিমাকার এক খোক্কস আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সেখানে হাজির। তার কালো কুচকুচে দুটো প্রকাণ্ড ডানা, মাথায় বাঁকানো শিং। লাট্টুর মত বন্-বন্ ক'রে ঘুরছে তার চোখ দুটো]

প্যাখ্‌নাঃ কী ব্যাপার ঝোঁটেবুড়ী,
কেন দিলে ডাক?

বুড়ীঃ পাজী-ছুঁচো ঐ দুটোর
কেটে নে তো নাক।

প্যাখ্‌নাঃ জো হুকুম! (তেড়ে গেল)

আটুলঃ ভাইরে বাটুল এবার কী?

বাটুলঃ আয়রে ক'সে দৌড় দি!

[পড়ি তো মরি ক'রে দু'জনে দে ছুট দে ছুট। ওদের পেছনে প্যাখ্‌নাও তাড়া করলো—ধর্—ধর্—ধর্...]

[নাচতে নাচতে বাঘের প্রবেশ]

বাঘঃ নাক খোয়াবে বিচ্ছু দুটো,
করবে গ্যাঙোর—গ্যাং!
যেমনি পাজী, তেমনি সাজা—
ড্যাডাং—ড্যাড্যাং—ড্যাং!!

ছুটি

আশা দেবী

তুষারের কোলে বুড়ো কালো মেঘ বসেছিল ডানামুড়ে—
হঠাৎ কখন ডেকে ওঠে গুরু গুরু ঃ
"সূর্যঘড়ির কাঁটাটা এবার আষাঢ়ে এসেছে ঘুরে—
পোড়োরা কোথায়? পাঠশালা হবে শুরু।"
পাহাড় পেরিয়ে—পার হয়ে বন—কত গ্রাম—দেশ কত
এলো সেই ডাক ঃ "পোড়োরা সবাই চলো—"
সাগর মায়ের বুক থেকে তাই মেঘের শিশুরা যত—
চলে পাঠশালে—জলে চোখ ছলোছলো।

আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে বসে গেল পাঠশালা।
বুড়ো কালো মেঘ ঘন ঘন ধমকায়—
ঝিকমিক করে বিদ্যুৎ-বেত—কখন যে কার পালা ঃ
মেঘের খোকারা আতঙ্কে চমকায়।
কাজল-পরানো ডাগর ডাগর চোখগুলি জলে ভাসে
মাটি জুড়ে নামে ঝরোঝরো বরষণ
কচি কচি ধানে লেগে যায় দোলা তাদেরি সে নিঃশ্বাসে
ব্যথায় আকুল কদম-কেতকী বন।

হঠাৎ কখন এখানে ওখানে কাশফুল মুঠি মুঠি
দিলো সে ছড়িয়ে রাশি রাশি সাদা হাসি
ডানা মেলে দিয়ে ডাকে বুনো হাঁস ঃ ছুটি—ছুটি—আজ ছুটি
বাতাস বাজালো অজানা পথের বাঁশি।
বুড়ো কালো মেঘ চোখ চেয়ে দেখে ঃ পড়ুয়া তো নেই কেউ
ভাঙা পাঠশালা—উধাও হয়েছে সব
সোনালী আলোয় উঠেছে সেখানে নতুন ধানের ঢেউ
শিশিরকণায় পোড়োদের উৎসব!

বিড়ালের মিছিল

রবিদাস সাহারায়

মাছের বেজায় দাম চড়েছে, মাছ খাওয়া যে দায়,
ঘরে ঘরে ডাল খাওয়ারই হিড়িক পড়ে যায়।
মানুষগুলোর কোন মতে তবু তো দিন কাটে
মাছ না পেয়ে বিড়ালগুলোর শোকেতে বুক ফাটে।

জুটতো আগে মাছের কাঁটা, তা-ও জোটে না আর,
এমন ভাবে বেঁচে থাকা হবেই বিষম ভার।
মানুষেরা কতই রকম সভা মিছিল করে,
তবু কেন মাছের দিকে দৃষ্টি নাহি পড়ে?
তারা যদি না-ই বা করে কোনো প্রতিকার,
বিড়ালদেরই করতে হবে যা হোক কিছু তার।
এই না ভেবে বিড়ালগুলো মনুমেণ্টের তলে,
সাড়ে ছ'টায় হাজির হলো সবাই দলে দলে।
"মাছের দাম কমাও—কমাও", "মাছ যে আরো চাই",
পোস্টারেতে ভরে গেল সারা সভাটাই।
বক্তৃতা দেয় হুলো বেরাল হয়ে সভাপতি,
ঘুচানো চাই বিড়াল জাতির বিষম এ দুর্গতি।
মন্ত্রীদেরই কাছে তারা চাইবে প্রতিকার,
তা না হলে অসহযোগ করবে যে এবার।
তাদের কাছে চোদ্দ দফা করবে দাবী পেশ,
রেজুলেশান করে পাকা করলো সভা শেষ।
সভার শেষে দলে দলে বিরাট মিছিল করে,
শ্লোগান দিয়ে বেড়ায় তারা সারা শহর ধরে।
ট্রাম ও বাস বন্ধ হলো পথে চলাই দায়,
ফটোগ্রাফার তুলতে ফটো উলটে পড়ে যায়।

সন্ধ্যারাতে

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

ঝিঁঝিঁ-ডাকা সন্ধে এল দাঁড়াওনা এইবার,
পক্ষীরাজে চেপে যাব তের নদীর পার।
চম্পাবতী-রাজকন্যে রোজ যে আমায় ডাকে,
কেমন করে আজকে বলো দিই ফিরিয়ে তাকে?
ফুল ফুটেছে থরে থরে দোলন-চাঁপার গাছে,
পাতার আড়ে হুতুম পেঁচা পাহারাতে আছে।

থমথমে রাত হলো এবার নামবে কত পরী,
আকাশ-নীলে ঝরবে কত দেয়ালী ফুলঝুরি।
হাওয়ায় হাওয়ায় তাদের খবর আসছে ভেসে যেন,
ওমা একি, সন্ধে হতেই খুকু ঘুমায় কেন?
ঘুম আসে তার দু'চোখ ভরে অনেক সে দূরে থেকে
চিরকালের রূপ-কাহিনী চোখের কোলে রেখে॥

ভুলু

ছবি সেনগুপ্ত

ভুলুকে এনেছিলেন ছোটমামা। ছোটমামা গিরিডিতে থাকেন। সেবার পুজোর ছুটিতে বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে বগলদাবা করে কুকুরছানাটাকে নিয়ে এসে হাজির।

কুকুরটা একেবারে অ্যাত্তোটুকু। বাচ্চা একটা খরগোসের মত। মামা লম্বাসম্বা মানুষ। তায়, কি গরম কি শীত, সব সময়েই ভারী ঝোলাঝাম্পি পরে কাটান। কুকুরটা মামার গলাবন্ধ কোটের চোরাপকেট থেকে পিটপিটে চোখে উঁকি ঝুঁকি মারছিল। মামার পকেটে টফি কিংবা ল্যাবেঞ্চুস আছে মনে করে আমার চোখ দুটো সবার আগে মামার পকেটের ওপরে গিয়ে পড়ল। আর চোখ-পড়া মাত্তর পল্টুকে জড়িয়ে ধরে ভয়েময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, "ওরে পল্টু, কুকুর। শিগগির সরে আয়, কুকুর কামড়াবে।"

পল্টু আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় হবে। আমার এধরনের ছেলেমানুষী কান্ড দেখে রেগে আমার মাথায় চাঁটি মেরে বললে, "কুকুর কিরে, গাধা কোথাকার? দিন দিন বড় হচ্ছ না বুদ্ধির ঢেঁকি হচ্ছ!"

পল্টুর এধরনের নিষ্ঠুর ব্যবহারে আমার ভারী দুঃখ হল। আমি প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় বললাম, "বাঃ, তুমি আমায় মারলে কেন? ওই তো কুকুর, দেখতে পাচ্ছ না, মামার পকেটে?"

"মামার পকেটে?" পল্টু তো অবাক।

মা সবে মাত্তর মামার পায়ে হাত ছুঁইয়েছিলেন। হঠাৎ কি হল—এক পায়ে হাত না ছোঁয়াতে সড়াৎ করে হাতখানা টেনে নিলেন। প্রণাম করা হল না। মামার কোটের পকেটের দিকে তাকিয়ে চোখ মুখ কুঁচকে বলে উঠলেন মা, "তুমি কি বল-ত দাদা? নোংরা কুকুরটাকে একেবারে পকেটে করে এনেছ?"

মামা এবার পকেট থেকে কান ধরে কুকুরটাকে টেনে বার করে আনলেন। এতক্ষণে কুকুরটার সবখানি দেখা গেল। কুকুরটা সত্যি পকেটে পুরে আনবার মতই ছোট্টটি। কি সুন্দর রং! আর কান দুটো কি লম্বা! সারা গা ভর্তি পেঁজা তুলোর মত ধবধবে লোম। দেখলে সত্যি আদর করতে ইচ্ছে করে। মামা হা হা শব্দে হেসে বললেন, "উহুঁ, একে যা তা কুকুর মনে কোরো না। এ একেবারে খাঁটি অ্যালসেসিয়ানের বাচ্চা। গিরিডির এক বন্ধুর বাড়িতে অনেকগুলো হয়েছিল, আমায় বললে—নিয়ে যাও একটা। ভাবলাম, এটাকে নিয়ে গেলে তোর ছেলেদের বেশ চমকে দেওয়া যাবে।

কি মজা, কি মজা! খুশিতে আমি হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। মামা আমাদের জন্যে কুকুর এনেছে। পাশের বাড়ির ভণ্টাদের একটা প্রকাণ্ড বুলডগ আছে। ওদের বাড়ি খেলতে গেলে কুকুরটা যা চ্যাঁচায়, যেন বাঘ। ভণ্টার সঙ্গে আড়ি হলে ও কেবলই বলে, "এই দ্যাখ, আমাদের কেমন কুকুর আছে। কই তোদের আছে কুকুর?" আমাদের কুকুরটা এখন ছোট, তবে বেশী করে খাইয়ে দাইয়ে ওটাকে ভণ্টাদেরটার মত বড় করে তুলতে হবে। মোট কথা, ভণ্টা এবার যখন কুকুর নিয়ে খোঁটা দিতে আসবে তখন ভণ্টার ওপর টেক্কা দেওয়া চাই-ই চাই। ভণ্টার মুখের ওপর বুক ফুলিয়ে বলা চাই, "তোর ওটা ছাই বুলডগ, এই দ্যাখ আমাদেরটা অ্যালসেসিয়ান। আয় না একবার লড়িয়ে দেখি—কারটা জেতে কারটা হারে।"

যাই হোক, কুকুর তো এল, এবার তার আদর আপ্যায়নের পালা।

কুকুরটা আমার এত পছন্দ হল যে, কি বলব। টফি-লজেঞ্চুস তো মামা বরাবরই আনেন, কিন্তু এ একেবারে জ্যান্ত একটা কুকুর-ছানা! টফি খেলেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কুকুরটা চিরদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমার সঙ্গে যাবে। আমার সঙ্গে খেলবে। আয় আয় করে ডাকলে যেখানেই থাক সুড়ুৎ করে আমার গাটি ঘেঁষে এসে দাঁড়াবে। লজেঞ্চুস খাওয়ার চেয়ে একি কম মজা, তোমরাই বল! '

কুকুরটা প্রথম প্রথম নতুন জায়গায় এসে একটু ঘাবড়ে গেল। ধরে আদর করতে গেলে ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে যেত দূরে। তারপর কিন্তু আমারই সঙ্গে বেশী ভাব হয়ে গেল ওর।

আমি আদর করে ওর নাম দিলাম, ভুলু। মা ধমকের সুরে বললেন, "আদিখ্যেতা। ভুলু না কচু। নিজে যেমন নোংরা আবার আরেক নোংরা এসে জুটল সঙ্গে।"

মামা বললেন, "আহা বকিস কেন? ছেলেমানুষ।"

মা আবার বললেন, "ছেলেমানুষ না কচু। সাত বছরের ধিঙ্গি ছেলে, ছেলেমানুষ?"

এ একেবারে খাঁটি অ্যালসেসিয়ানের বাচ্চা।

তা ধিঙ্গি হই আর যা হই ভুলুকে আমি ছাড়ছি না। ভুলুকে দিয়ে ভণ্টার খোঁতা-মুখ আগে ভোঁতা করতে হবে।

কয়েকদিন আমি শুধু তক্কে তক্কে থাকলাম কখন ভণ্টা কুকুর নিয়ে খোঁটা দেয়। ভণ্টা দেখলাম, কুকুর নিয়ে আর কোন কথাই তোলে না। সে এখন সবসময় নতুন নতুন খেলা নিয়ে আমার সঙ্গে সারা সময় ব্যস্ত থাকে। আর আমি যতই কুকুরের কথা খুঁচিয়ে তুলি, ও ততই ভেতরে ভেতরে যেন চুপসে যায়। এ-কথা সে-কথায় আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। আমি যে এখন আর যখন তখন বুলডগ নিয়ে খোঁটা দেওয়ার মত আজে-বাজে খোকা নই, রীতিমতো একটা বাঘা অ্যালসেসিয়ানের মালিক, এটা সে বেশ ভালভাবেই বুঝে নিয়েছে।

আমি তবু ছাড়ি না। একদিন ঠিকই কথায় কথায় ঝগড়া বাধিয়ে দিই।

সেদিন বিকেলে ওদের বাড়ি গেলে ওর বুলডগটা ভয়ানক ডাকাডাকি করলেও আমি আর আগের মত ভয় পাই না। বরং বুলডগের ডাকাডাকি অগ্রাহ্য করে ভণ্টাকে বলি, "তোমাদের বাড়ি আর খেলতে আসব না ভাই ভণ্টা। তোমাদের কুকুরটা ভারী ছোটলোকের মত চ্যাঁচায়।"

ভণ্টা মুখ ভার করে বলে, "ছোটলোক বোলো না আমার কুকুরকে। আমি ওকে কত ভালবাসি জান? আর জান—ওটা বুলডগ?"

সোনারঙ্ আশ্বিনেতে
পাঠালো নীল চিঠি কে?
সুখবর পৌঁছে গেল
সহসা দিগ্বিদিকে।
কী ভালো লাগছে, আহা,
কচি রোদ ঝরায় সোনা,—
দুধালি পাখ্না মেলে
বকেদের আনাগোনা!
খুশি আজ উথ্লে ওঠে
আকাশের নীল নয়নে,
শিলাইয়ের জলের সুরে,
শেফালি-কাশের বনে।
দ্যাখো, এই জান্লা দিয়ে
তুলো মেঘ পাল তুলেছে,
টলটল একশো হীরে
ঘাসে ফের ঝিলিক দেছে!
এসেছে নীল চিঠি যে
খুশিয়াল দিনটি নিয়ে,
দোয়েলের কণ্ঠ জুড়ে
সুমধুর সুর জাগিয়ে।
প্রতিমার রঙ চড়েছে,
বাবুয়া উঠলো মেতেঃ
ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে
গিয়েছে ইস্কুলেতে।
জানো কি লিখন লেখা
আছে এই নীল চিঠিতে?
—যে মুখে মেঘ জমেছে
সেখানে রৌদ্র দিতে।
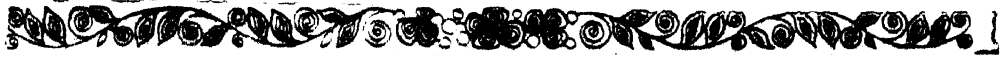
"ভারী তো বুলডগ? খালি চ্যাঁচালেই বুঝি বুলডগ হয়?" আমি মুখ বাঁকিয়ে বলি।

"হয়ই তো। চ্যাঁচালে হয়-না তো কি মুখ বুজে থাকলে হয়?"

"তা হবে কেন, তোমার কুকুর তো ভয় পেয়ে চ্যাঁচায়। দেখলে না, আমায় দেখে কেমন লেজ তুলে পালাল?"

ভণ্টা এবার চটে উঠল। "দেখ, আমার বুলডগকে কিছু বোলো না বলছি।"

আমি মজা পেয়ে বলি, "কেন, বললে কি হবে?"

ভণ্টা আরও চটে বললে, "বললে ভাল হবে না বলে রাখছি। তোমার কুকুরকে আমি কিছু বলেছি যে বলছ?"

"আমার কুকুরকে আবার বলবে কি? আমার অ্যালসেসিয়ানের কাছে তোমার বুলডগ তো পিঁপড়ে!"

ভণ্টা চোখ মুখ লাল করে চোখের জল চাপতে চাপতে বললে, "বেশ, কাল নিয়ে এসো তোমার কুকুর। দেখি, কার গায়ে কত জোর।"

পরদিন সারা দিনটা পড়াশুনোয় মন বসল না। স্কুলে বসে কেবলি ভাবছি, আমার ভুলুর কাছে হেরে গিয়ে ভণ্টার মুখের ভাব-খানা কেমন হবে। হেরে গিয়ে ওযে নিশ্চয়ই কেঁদে ফেলবে বোকার মত, ভাবতে গিয়ে আমার খুব মজা লাগতে লাগল।

তারপর বিকেলে ভণ্টাদের মাঠে আমরা দুজন হাজির হয়েছি শেকলে বাঁধা দুই কুকুর নিয়ে। ভণ্টার বুলডগটাকে দেখে আমার অ্যালসেসিয়ান ঘেউ ঘেউ করে খুব এক চোট চ্যাঁচালে। শুনে আমার বুকখানা ফুলে উঠল। আমি বললাম, "এখনও ভেবে দেখ ভাই। দেখছ তো, আমার অ্যালসেসিয়ানের রাগ?"

ভণ্টা তার বুলডগের গলায় হাত বোলাতে বোলাতে কেমন মিনমিনে গলায় বললে, "আমার বুলডগের কাল রাত্তিরে ভয়ানক

মুখে পা ঘষে আদর করছে

শরীর খারাপ করেছিল। একদম কিছু খায়নি।"

"তাহলে হার মানছ বল?"

ভণ্টা যেন ফুলে উঠল। ভয়ানক জোরে মাথা নেড়ে বলল, "কখ্‌খনো নয়। আমার বুলডগ ছাড়ছি আমি। তুমি তোমার কুকুর সামলাও।"

কুকুর দুটোকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালাম আমরা। আমার অ্যালসেসিয়ান বাঘের মত চ্যাঁচাচ্ছে। পা আছড়াচ্ছে। এক্ষুনি লাফিয়ে পড়ে ভণ্টার বুলডগের টুঁটি ছিঁড়ে নেবে। আমার দু-হাত নিশপিশ করছে। হাত-পা ঘামছে। উত্তেজনায় দাঁতে দাঁত শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে। আমি বার বার ভণ্টার মুখের দিকে তাকাচ্ছি। এবার বাছাধনের থোঁতামুখ ভোঁতা হবে। অত বড় মুখ করে কুরের বড়াই করা ছুটে যাবে।

কিন্তু আমার অ্যালসেসিয়ানের একি হল? পা আছড়ে শুধু ঘড় ঘড় করে ডাকছে। বুলডগটা ল্যাজ আছড়াচ্ছে। বার বার আমার অ্যালসেসিয়ানের মুখে পা ঘষছে। মুখ ঘষছে। আদর করছে যেন মায়ের মত।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "এই ভুলু, ওকি হচ্ছে?"

ভুলু আমার কথা শুনল না। ভণ্টার বুলডগের গায় গা ঘষে সোহাগ জানাতে লাগল। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে দুজনে খেলতে লাগল যেন লুকোচুরি খেলা।

আমি অবাক। লজ্জায় আমার চোখমুখ গরম হয়ে ওঠে। হতভাগা ভুলুর মনে এই ছিল?

ভণ্টা গুটি গুটি পায় এগিয়ে এল আমার দিকে। আমার পিঠে হাত রেখে বলল, "ওরা কেমন খেলছে, দেখছ?"

আমি কিছু বলতে পারি না।

ভণ্টা আবার বলে, "তুমি রাগ করেছ ভাই?"

আমি বলি, "না, রাগ কেন করব?"

"কুকুরের লড়াই হল না বলে? কিন্তু আমি কি করব বল? আমি তো আমার বুলডগ ছেড়েছিলাম।"

ভণ্টার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার দু'চোখ ছলছল করছে। এবার আমার মন থেকে কিসের একটা বোঝা যেন নেমে গেল। মনটা আমার পাখির মতই হাল্কা লাগতে লাগল। হাত দিয়ে ভণ্টার গলা জড়িয়ে ধরে আমি বলি, "তোমার বুলডগই জিতল তাহলে?"

ভণ্টা বলল, "না না, তোমার অ্যালসেসিয়ান—"

"উহুঁ, তোমার বুলডগ—"

কিন্তু ততক্ষণে আমি মনে মনে কি করে জেনে গেছি জানিনে, বুলডগ কিংবা অ্যাল সেসিয়ান কেউ কাউকে হারিয়ে জেতেনি। চিরদিনের মত ভণ্টা জিতে নিয়েছে আমাকে আর আমি জিতে নিয়েছি ভণ্টাকে। কুকুর দুটো উপলক্ষ্য মাত্র।

খোকার পিসী

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

সকাল থেকে কলটা খোলা জল পড়ছে তোড়ে...
পিসী ওঠে সবার আগে কাকডাকা সেই ভোরে,
কত যে কাজ—
ঝাঁটার আওয়াজ
ঝাড়ামোছা শুরু,
ইস্, কি ধুলো জমেছে সাতপুরু......
"ওঠ রে খোকন বেলা বাড়ে
পরীক্ষা কি আমার ঘাড়ে
বাঘের মত চেপে বসছে শুনি:
মরি মরি কি দিন-কাল! এঁরা হবেন গুণী"

আপন মনে এমন কথা বকতে বকতে পিসী
অন্ধকারে ভেঙে ফেললো একটি কাচের শিশি
এরই মাঝে পিসীর ঠোঁটে ঝরছে অবিরাম
দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ-শতনাম......

খোকন যখন আবছা ঘুমের ফাঁকে
কান দিল না পিসীর হাঁকেডাকে,
"চা-পরোটা ঠান্ডা হল
গরম করতে এবার বোলো
দেখিয়ে দেব কেমন মজা"—বললো পিসী রেগে
খোকার চোখের ঘুম পালালো অমনি দ্রুতবেগে।

কেষ্টো খুড়োর গান

অজিতকৃষ্ণ বসু

বিষ্টুদাসের কেষ্টো খুড়ো
বয়সে তিনি বেজায় বুড়ো।
বিষম সাহস বক্ষে তাঁর,
নেইকো ছানি চক্ষে তাঁর,
যখন তখন অনেক পাড়া
বেড়ান তিনি চশমা ছাড়া
একা একাই রাত বিরেতে,
কেউ দেখে না হোঁচট্ খেতে।
গান গাওয়া তাঁর নয়কো পেশা,
তবুও গানের এমুনি নেশা,
তানপুরোতে মিলিয়ে তান
যখন তখন খেয়াল গান:
টপ্পা, ধ্রুপদ, ঠুংরি, ভজন,
গজল জানেন ডজন ডজন।
কণ্ঠ তাঁহার এমুনি হেঁড়ে
গান যবে গান কণ্ঠ ছেড়ে
সবাই ভাবেন ছাড়িয়ে যাম
ছাড়বে খাঁচা আত্মারাম।
হাড়-কাঁপানো গানের চোটে
বাচ্চারা সব আঁত্‌কে ওঠে,
দেখেই খুড়ো একটু কেশে
বল্‌তে থাকেন মুচ্‌কি হেসে:
"বড়ো হয়ে বুঝবে যখন
এ গান শুনেই মাত্‌বে তখন।
তোমরা এখন বেজায় ছোট,
তাই তো অমন আঁতকে ওঠো।"

গল্প শোনার অল্প বিপদ

ছড়া—শ্রীবিমল ঘোষ   ফটো—শ্রীরেবন্ত ঘোষ

(১)

ভাইবোনেদের সঙ্গে তপু—গল্প শোনে, দিদা বলে—
"রাক্ষসের সেই প্রাণ-ভোমরা লুকিয়ে আছে জলের তলে।

(২)

ভাবলে তপু—মারবে ভোমর, তাই সে ছোটে সকাল হলে—
লাফ দিল সে মাঝপুকুরে, ঘূর্ণিপাকে তলায় জলে।

(৩)

দাদু আসেন—হাঁকে ডাকে, তপুর চটি ঘাটের ধারে
দেখেই ভাবেন—ছিপ্ ফেলা যাক, টোপটি গেঁথে দানাদারে।

(৪)

জলের তলায় দানাদারটা গিলতো তপু মুখটি খুলে
খ্যাচ্ মেরে ছিপ তোলেন দাদু, দেখেন—তপু সুতোয় ঝুলে।

(৫)

জল খেয়ে পেট ঢাকাই জালা, কাঁপছে তপু ভয়ে, শীতে—
যাক্ সে জলও বেরিয়ে গেল, রামপাঁঠাটা গুঁতিয়ে দিতে।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ড়ার শব্দ হ'তেই রমা উঠে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে নামল সিঁড়ি দিয়ে। খুব সাবধানে আঁচল দিয়ে চেপে খিলটা খুলল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত গন্ধ, তারপর টলতে টলতে মানুষটা ঘরে ঢুকল। দেয়ালে হেলান দিয়ে টাল সামলাল।

রমা কোন কথা বলল না। সুখময়ের হাতটা ধরে সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উঠল।

সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে সুখময় একবার কথা বলার চেষ্টা করতেই রমা আঁচল দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরে ফিস ফিস করে বলল, দুটি পায়ে পড়ি তোমার। এখানে একটি কথা নয়। ঘরে চল, সব শুনব।

কি ভাবল সুখময় কে জানে। আর একটি কথা বলারও চেষ্টা না করে রমার দেহে ভর দিয়ে ওপরে উঠে এল।

সুখময় খাটের ওপর বসতেই রমা হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। অবশ্য তার আগে ভাল করে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। কান্নার আওয়াজ যেন নীচে না পৌঁছোয়। শাশুড়ী, জা আর দেওরের কানে না যায়।

এত সাবধান হ'য়েও ভরাডুবি রমা বাঁচাতে পারেনি। কচিৎ কখনও এমন ব্যাপার হ'লে মানুষজনের চোখকান এড়ান যেত। কিছু একটা বলা যেত ইনিয়ে বিনিয়ে, কিন্তু এ প্রায় বার মাস ত্রিশদিনের ব্যাপার। নেশায় চুর হ'য়ে ফেরে সুখময়। গাড়ি ঘোড়া পেরিয়ে কি করে বাড়ি এসে পৌঁছোয়, এটাই আশ্চর্য লাগে রমার। পা দুটো যেন নিজের নয়। দেহের ওপরও নিজের কোন জোর নেই।

বছরখানেক, তার বেশী নয়। তার আগে সুখময় একেবারে অন্য মানুষ ছিল। অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরত, আবার রমাকে নিয়ে কোনদিন সিনেমা, কোনদিন ময়দান কিংবা লেক। কোন অসুবিধা ছিল না। ঝাড়া হাত পা। বিয়ে হয়েছে আট বছরের ওপর। কোলে ছেলেপুলে আসেনি। আসার সম্ভাবনাও নাকি নেই। ডাক্তারের মত তাই। তাতে কিন্তু কোন আক্ষেপ নেই। না রমার, না সুখময়ের।

সুখময় হেসে বলেছে, ছেলেপুলে আসা মানেই তোমার দূরে সরে যাওয়া। তোমার আমার মাঝখানে রক্তমাংসের পাঁচিল। তার চেয়ে এই বেশ আছি আমরা। প্রতি রাতের শয্যাই আমাদের ফুলশয্যা। বধূ চিরদিনই নববধূ।

প্রথম প্রথম একটু মন খুঁত খুঁত করত রমার। বুকের মাঝখানটা যেন খালি খালি ঠেকত। মনে হ'ত, সব থেকেও কি যেন নেই। নিজেদের মেদমজ্জা নিংড়ে আর এক প্রাণসত্তার অভাববোধটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারত না। তারপর দেওরের ছেলে হ'তেই সব ঠিক হ'য়ে গেল। তাকে ছোঁ মেরে বুকে করে নিয়ে ওপরে উঠে এল রমা। জাকে বলল, এ ছেলে আমার আড্ডা। খবরদার ফেরত চাইতে পারবি না।

কিন্তু সব জায়গায় জোর যে খাটে না, তা বুঝতে রমার একটুও দেরী হ'ল না। বুকে করে তো নিয়ে এল কিন্তু বুকে জড়ালেই ছেলে মানুষ হয় না। বুকের মমতাতেই তার জীবনধারণ সম্ভব নয়। হতভাগিনী রম নিরুপায় হ'য়ে আবার নামিয়ে নিয়ে আসত ছেলেটাকে। জায়ের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলত, নে বাবা, তাড়াতাড়ি দুধ খাইয়ে দে। এই এক জ্বালা হয়েছে।

জা হেসেছে, কি হ'ল দিদি, রাখতে পারলে না তো খোকাকে? ফেরত দিতে হ'ল তো আমার কাছে।

খোকা একটু বড় হ'তেই এ সমস্যার সমাধান হ'ল। বেশীর ভাগ সময় রমার কাছেই সে থাকত, শুধু রাত্রে শুতে যেত মা কাছে।

কিন্তু আজকাল খোকা আর এ-মুখো হয় না। খোকাও না, তারপরের বোন লিলিও না। ছেলেমেয়েদের ওপরে আসা একেবারে বন্ধ। সুখময় থাকলে তো। নয়ই, অন্য সময়েও নয়। জা আর দেওরের ধারণা সুখময় না থাকলেও নেশার উপকরণ বুঝি থরে থরে রমার ঘরে সাজান থাকে। এসব চোখে পড়লে ছেলেমেয়েরা মানুষ হবে না।

কোন আপত্তি করে না রমা। আপত্তি করার শক্তি তার নেই। মেরুদণ্ডটা চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর কোনদিন বুঝি সংসারের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

কেন এমন হ'ল সুখময়। চৌকাঠে মাথা ঠুকে, দু হাতে নিজের চুল মুঠো মুঠো ছিঁড়েও এর উত্তর পায় না রমা।

প্রথম দিন, সেদিনের কথা রমা জীবনেও ভুলবে না। একটু রাত করেই সুখময় ফিরল। বলেই গিয়েছিল, রাত হবে। ক্লাবে কি ফাংশন আছে।

চলনে, বলনে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। সহজ মানুষ। খেতে দেবার সময় কেমন একটু সন্দেহ হ'ল রমার।

নিচু হ'য়ে ডাল দিতে গিয়েই সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। বাতাসে যেন কিসের একটা গন্ধ।

বার কয়েক জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে বলল, কিসের গন্ধ?

ততক্ষণে সুখময় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বাথরুমের দিকে চলতে চলতে বলল, খেতে না বসলেই হ'ত। পেট একেবারে ভর্তি।

রমা ছাড়েনি। পিছন পিছন বাথরুমের চৌকাঠ পর্যন্ত এসেছে।

এই, শোন।

সুখময় ঘুরে দাঁড়াল, কি?

গন্ধটা তোমার গা থেকেই বেরোচ্ছে।

কিসের গন্ধ?

একটু ইতস্তত করে রমা বলল, মদ, মদের গন্ধ।

দমে গেলেও সুখময় কথাটা গায়ে মাখল না। বলল, তা হবে।

তা হবে মানে?

হবে মানে, খেয়েছি। সুখময় নির্বিকার-ভাবে হাত মুখ ধুতে লাগল।

রমা কথা বাড়াল না। ঘরে ফিরে এল। ফেলে-আসা কথার খুঁট তুলে ধরল সুখময় বিছানায় শোয়ার পর।

মশারি ফেলার ছুতোয় মুখটা সুখময়ের মুখের খুব কাছাকাছি নিয়ে গেল। নিঃসন্দেহ হ'ল। পরিহাস নয়, সত্যিই সুখময় মদ খেয়ে এসেছে। এতক্ষণ দ্বিধা আর সন্দেহের বেড়া ছিল, তার ওপর হেলান দিয়েছিল রমা, সেটুকু সরে যেতেই রমা ভেঙে পড়ল। অসহায়, অবলম্বনহীন।

দু হাতে মুখ ঢেকে রমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আছড়ে পড়ল সুখময়ের দেহের ওপর।

এ তুমি কি করলে গো? এ বিষ কেন তুমি খেয়ে এলে?

বেশী নয়, মাত্র কয়েকটা চুমুক। নেশা খুব অল্পই হ'য়েছিল। রমার আচমকা ফোঁপানিতে ফিকে নেশাটুকুও কেটে সাফ হ'য়ে গেল।

সুখময় ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানার ওপর।

আরে, আরম্ভ করলে কি? এখনই নীচে সবাই শুনতে পাবে।

পাক, পাক। আমার সর্বনাশের খবর সবাই জানুক। এ তুমি কি করলে গো? এ জিনিসে যে আমার চিরদিনের ঘেন্না।

কথার ফাঁকে ফাঁকে সশব্দে সুখময়ের দুটো পায়ের ওপর রমা মাথা ঠুকতে শুরু করল।

নেশাছুট সুখময় উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। বাথরুমে গিয়ে জল নিয়ে এসে রমার মাথায় কপালে আছড়াল। তার দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, লক্ষ্মীটি, তোমায় ছুঁয়ে বলছি, এমন কাজ আর কখনও করব না।

আজকেও বেশী নয়, বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় দু এক চুমুক দিয়েছিল সুখময়। প্রথম চুমুকে মনে হয়েছিল। সমস্ত গলাটা যেন জ্বলে উঠল। তরল অগ্নির স্রোত। তারপর একটু একটু করে ভাল লেগেছিল। বন্ধুদের কথাবার্তা, গ্লাস বোতলের ঠোকা-ঠুকিতে ঠুং ঠাং শব্দ নতুন সুর এনেছিল, নতুন ছন্দ।

আশ্চর্য হয়ে যায় রমা। যে মানুষ মা, ভাই ভাজ জানতে পারবে বলে এত সতর্ক হয়েছিল, এত সাবধান, সে আজ নেমে নেমে কোথায় এসেছে। কে জানল, না জানল, তার কোন পরোয়া করে না। জামাকাপড়ে কাদা মেখে, এক পাটি জুতো খুইয়ে টলতে টলতে বাড়ির দরজার কড়া নাড়ে।

এমনও হয়েছে, পাড়ার ছেলেরা বেহুঁশ দেহটা বাড়ির চৌকাঠে বয়ে এনেছে।

লজ্জা রাখবার আর ঠাঁই থাকেনি রমার। মনে মনে ভেবেছে, পরনের শাড়িটা গলায় বেঁধে একদিন ঝুলে পড়বে। বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখতে হবে। আরও কত কথা শুনতে হবে।

কিন্তু নিজেকে শেষ করতে পারেনি রমা। সাহস হয়নি। এমন এক বিতৃষ্ণ জীবন, তবু তার ওপর এত মায়া? দু হাতে কাদা নিয়ে শুধু নিজের গায়েই নয়, সুখময় রমার মুখেও ছড়িয়ে দিচ্ছে, তবু বাঁচবার এত মমতা! যদি মানুষটা আবার ভাল হয়, গায়ের পাঁক মুছে নতুন ভাবে জীবনযাপনের সাধনা করে। শুধু সেই আশা আর আশ্বাসে ভর করে রমা বেঁচে থাকতে চায়।

প্রথমে শনিবার, শনিবার, তারপর প্রায় রোজই এক অবস্থা। পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই, বাড়ির লোকের কাছে তো নয়ই।

শাশুড়ীই সব চেয়ে আগে টের পেলেন।

সুখময়কে জড়িয়ে ধরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়েই শাশুড়ীর সঙ্গে একেবারে চোখাচোখি হ'ল রমার।

রমার ধারণা ছিল, শাশুড়ী ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাত এগারোটা অবধি তিনি জেগে বসে থাকবেন এটা সে ভাবতেও পারেনি।

তখন শাশুড়ী একটি কথাও বললেন না। দেয়ালে পিঠ দিয়ে নিষ্পলক চোখে সব কিছু দেখলেন।

কথা বললেন তার পরের দিন।

দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে রমা শোবার আয়োজন করছিল, শাশুড়ী এসে দাঁড়ালেন।

বৌমা!

কি মা?

সুখময়ের জন্য কি পাড়ায় বাস তুলতে হবে আমাদের? কতদিন থেকে এ অভ্যাস ধরেছে? এ সর্বনেশে অভ্যাস? বিয়ের আগে তো এসব দোষ ছিল না।

একটি কথাও রমা বলেনি। বলার মতন কথাও তার কিছু ছিল না। বিয়ের আগে ছেলে ভাল ছিল, অধঃপাতে গিয়েছে বিয়ের পরে, শাশুড়ীদের এই সনাতন অভিযোগের কোনও উত্তর নেই। যেটুকু সৌভাগ্য সেটুকুর জন্য কৃতিত্ব মা-বাপের, বংশের ঐতিহ্যের। আর দুর্ভাগ্যের সামান্য আঁচড়ের দায়িত্বও পরের বাড়ির মেয়ের।

বিকেলে সুখময় সহজভাবেই বাড়ি

ফিরল। অফিস থেকে সোজা বাড়ি।

রমা সারাক্ষণ তার কাছে কাছে রইল। সেবাযত্নে ভরিয়ে তুলল। বিকালের জল-খাবার গুছিয়ে নিয়ে সুখময়ের পাশে এসে বসল।

আজ তো তাড়াতাড়ি ফিরেছ, চল কোথাও বেড়িয়ে আসি। কতদিন গঙ্গার ধারে যাইনি।

সুখময় তখনই কোন উত্তর দিল না। আড়চোখে বৌয়ের দিকে দেখল। আস্তে আস্তে বলল, আমি এখনই বেরোব।

কোথায়?

এক বন্ধুর বাড়ি।

বন্ধুর বাড়ি, না নরকে? মুহূর্তে রমা কঠিন হ'য়ে উঠল।

যা বল। প্রশ্নটা সুখময় গায়ে মাখল না।

তোমার জ্বালায় পাড়ায় কারুর কাছে মুখ দেখাবার জো নেই, জানো?

জানতাম না, জানলাম। নির্বিকারচিত্তে সুখময় চায়ের কাপে মুখ দিল।

আমার কথা নয়। মার কথা। মা আজ দুপুরে আমাকে শুনিয়ে গেছেন। তুমি বোঝ না, ঠাকুরপো, আভা কেউ আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলে না। কি জানি ওদের হয়তো ধারণা, তোমাকে এ পথে আমিই নামিয়েছি, কিংবা আমার অবহেলা আর উপেক্ষায় তুমি এমন হ'য়েছ! এততেও কি তোমার চেতনা হয় না? এত বড় চাকরি কর, অফিসে এত সম্মান, অথচ যেভাবে বাড়িতে ফের দেখলেও চোখে জল আসে। পাড়ার ছেলেরা যখন তোমাকে ধরে ধরে নিয়ে আসে তখন কিভাবে তারা মুচকি হাসে, তুমি দেখতে পাও না, আমি পাই। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে।

কথাগুলো সুখময়ের কানে গেছে তার মুখ চোখ দেখে এমন মনে হ'ল না। উঠে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবি পরতে পরতে শুধু বলল, তুমি কিন্তু বেশ বলতে পারো। তবে এমন বক্তৃতা এ অভাগার ওপর খরচ না করে, পার্কে গিয়ে যদি দিতে, দেশজোড়া নাম হ'ত।

আর দাঁড়াল না সুখময়। জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

দু হাতে মুখ ঢেকে রমা বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ল। অঝোর ধারায় কাঁদল শুয়ে শুয়ে। একবার ভাবল ভাইদের খবর দেবে, বাপকে জানাবে সব কিছু। তাদের কথায় যদি পথ বদলায় মানুষটা। যদি জীবনের মোড় ফেরায়।

রমা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল চেঁচামেচিতে।

দ্রুত পায়ে সিঁড়ির মাঝ বরাবর গিয়েই রমা দাঁড়িয়ে পড়ল।

দুটো পা ছড়িয়ে বসে শাশুড়ী তারস্বরে চিৎকার করছেন।

ওগো আমার কি সর্বনাশ হ'ল গো। আমার সোনার চাঁদ ছেলের এ অবস্থা কে করল গো।

আভা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একটি কোণে। ছেলেমেয়ে দুটো মাকে জড়িয়ে ধরে অবাকচোখে চেয়ে রয়েছে।

সিঁড়ির চাতালের ওপর সুখময়। জামা-কাপড়ে কাদা মাখা। উস্কখুস্ক চুল। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে।

দেওর সুখময়ের দুটো হাত ধরে টানাটানি করছে।

কয়েকটা মুহূর্ত যেন জ্ঞান ছিল না রমার। একবার মনে হয়েছিল ছাদের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়বে নীচে। শান বাঁধান উঠানের ওপর। আর একবার মনে হয়েছে বাথরুমে জলের পাইপের সঙ্গে পরনের শাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়বে। কিন্তু দুটোর কোনটাই করেনি। ছুটে নীচে নেমে এসে দেওরকে

সরিয়ে দিয়ে বজ্রমুষ্টিতে সুখময়ের একটা হাত চেপে ধরেছে। কোথা থেকে এত শক্তি পেয়েছে ঈশ্বর জানেন। টানতে টানতে সুখময়কে ওপরে নিয়ে গিয়ে তুলেছে। মনে হয়েছে, সুখময়কে নয়, একটা লজ্জা, একটা অপমানকেই যেন মানুষের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

সুখময় একটু প্রকৃতিস্থ হ'লে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে রমা বলেছে, এ বিষ তুমি ছাড়তে পারবে না তা বুঝতে পেরেছি। এক কাজ কর, বাড়িতে বসে তুমি খাও, দরজা বন্ধ করে। আমি নিজের হাতে তোমায় ঢেলে দেবো। এভাবে দশজনের সামনে নিজের মুখ, আমার মুখ তুমি পুড়িও না।

বালিশে হেলান দিয়ে সুখময় চুপচাপ বসে বসে শুনেছে কথাগুলো। তারপর এক সময়ে মৃদু গলায় বলেছে, দূর, বাড়িতে একলা একলা এ জিনিস খেয়ে সুখ নেই। বন্ধুবান্ধব সঙ্গে না থাকলে ওর অর্ধেক মজাই নষ্ট।

আর কথা বাড়ায়নি রমা। তবে এটুকু বুঝেছে, এপথ থেকে আর ফিরবে না সুখময়। তাকে ফেরাবার শক্তি অন্তত রমার নেই। বাকি জীবনটা এইভাবেই কাটবে। একটা অসংযত উচ্ছৃংখল জীবনকে জড়িয়ে।

পরের দিন সুখময় অফিসে বেরিয়ে যেতেই কথাটা আভা টিপে টিপে বলেছিল, বলিহারি তোমার সাহস দিদি। ওইভাবে ভাসুরঠাকুরকে টেনে ওপরে তুললে? আমি তো মরে গেলেও মাতালের কাছে যেতে পারতাম না। মাতালকে আমার চিরকাল ভয়।

এমনভাবে আভা শেষ কথাটা বলল যেন, মাতালকে ভয় নয়, ঘৃণা। এমন স্বামীকে কাছে টেনে নেওয়া নয়, যেন বর্জন করাই উচিত ছিল রমার।

আরও বলল আভা, খোকন আর লিলি খা ভয় পেয়েছিল। আমাকে কেবল জিজ্ঞাসা করছিল, জ্যাঠার কি হয়েছে মা? জ্যাঠা অমন করে বসে আছে কেন? আমি বললাম, জ্যাঠাকে পেত্নীতে পেয়েছে। একটা রোগ যখন হয়েছে, তখন আর একটা রোগ কি আর নেই। নিজের গয়নাগাটি খুব সাবধানে রেখো দিদি।

রমা মাথা নিচু করে খাচ্ছিল, টপ টপ করে চোখের জলের ফোঁটা ভাতের ওপর পড়তেই থালা সরিয়ে উঠে পড়ল। কোনরকমে হাত মুখ ধুয়ে ওপরে চলে এল। ঘরের সব জানলা বন্ধ করে মেঝের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ে অনেকক্ষণ কাঁদল। কিন্তু চোখের জলে এ নেশা তো ফিকে হবার নয়। আর মানুষ নেই সুখময়। কোমল বৃত্তি, মানবিকতা সব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে সুরার ফেনিল স্রোতে।

কান্নার পালা শেষ হ'তে ভাবতে শুরু করল রমা। কি করে বাঁচান যায় সুখময়কে, ফেরান যায়। যদি সুখময়ের বন্ধুদের চিঠি লেখে রমা। তাদের নাম রমার অজানা নয়। নেশার ঘোরে সুখময় অনেকেরই নাম করেছে। তাদের মধ্যে অন্তত জন দুয়েককে রমা চেনে। আগে আগে এ বাড়িতেও এসেছে। সুখময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু, হয়তো তাই তার অধঃপাতেরও সঙ্গী। যদি তাদের রমা চিঠি দেয়। সুখময়কে বুঝিয়ে শুনিয়ে এ পথ থেকে যেন তারা ফেরায়। এমনই করে তিলে তিলে গাঢ় অন্ধকারের গর্ভে সুখময়কে যেন টেনে না-নামায়।

একটু পরেই যুক্তির অসারতা রমা বুঝতে পেরেছে। যারা ভক্ষক তাদের কাছে রক্ষক হবার আবেদন জানান বৃথা। রমার অনুরোধ উপরোধে একটু টলবে না তারা, সামান্য বিচলিতও হবে না।

সেই রাত্রেই রমা কথাটা আবার পাড়ল।

সুখময় বাড়ি ফিরল রাত সাড়ে আটটায়। হালচাল দেখে মনে হ'ল আজ বোধ হয় আসর খুব জমেনি। দু এক চুমুকের বেশী পেটে পড়েনি।

ছাদে বসে সুখময় গুণ গুণ করে গান গাইছিল, রমা পাশে এসে বসল।

তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

মোটে একটা? সে কি বিধুমুখী, এর মধ্যেই আমি এত পুরনো হয়ে গেলাম?

অবশ্য চিরকালই সুখময় খুব রসিক লোক। যখন সহজ মানুষ ছিল তখন গল্পে পরিহাসে শুধু রমাকে নয়, গোটা সংসারটা ভরিয়ে রাখত। ইদানীং রসিকতার স্রোত একেবারে শুকিয়ে যায়নি, কিন্তু সে স্রোতে অন্য ভেজাল এসেছে।

কি পেলে তুমি মদ ছাড়তে পারো বল?

ভারতের মসনদ পেলেও নয়। সুখময় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

ঠাট্টা নয়, সত্যি কথা বল।

সুখময় সোজা হ'য়ে বসল। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ রমার দিকে চেয়ে বলল, মাঝে মাঝে আমার পেটে একটা ব্যথা হত মনে আছে? যার জন্য দু একদিন অফিস কামাইও করতে হ'ত?

মনে আছে রমার। খাবার পরে চিন চিন করত পেট। এমন যন্ত্রণা যে বসে থাকতে পারত না সুখময়। পেটে বালিশ চেপে উপুড় হ'য়ে শুয়ে থাকত। অনেকে বলত অ্যাপেণ্ডিসাইটিস, কেউ বলল গ্যাস্টিক আলসার। ডাক্তারকে দেখাবার কথা উঠেছে কিন্তু সুখময় রাজী হয়নি। বন্ধুরা বলেছে, এর একমাত্র উপায় অপারেশন। অপারেশনে সুখময়ের বড় ভয়।

সে ব্যথাটা আমার একেবারে সেরে গেছে। কিসে জান? এই জিনিসে। ব্যাপারটার চরম নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, গলার স্বরে সুখময় এমন একটা ভাব আনল।

ঠিক মনে পরতে পারল না রমা, মদ ধরার পর সেই ব্যথাটা কোনদিন হ'য়েছে কিনা। অবশ্য হ'লেও, তার প্রকোপ খুব স্বল্পস্থায়ী হয়েছে। স্বল্পস্থায়ী আর মৃদু আক্রমণ। অফিস কামাই করতে হয়নি।

বেশ, তুমি বাড়িতে বসে খাও, আমার সামনে। এভাবে পথঘাট থেকে তোমায় তুলে আনে, এতে আমার কি অবস্থা হয় জানো? তুমি যে কাদা সারা গায়ে মেখে আস, সে কাদার ছোপ আমার দেহেও লাগে। দেহে আর মনে।

সুখময় দু এক মিনিট কি ভাবল, বলল, ঠিক আছে, তাই হবে। দোকানে খাওয়া আর পোষাচ্ছে না। ক্রমেই বন্ধুর সংখ্যা বাড়ছে। সকলেরই আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙার চেষ্টা।

রমা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এতদিনে বুঝি সুখময়ের সুবুদ্ধি হ'য়েছে। তবু খারাপ স্বভাবের অর্ধেকটা কমলেও ভাল।

বলল, সেই ভাল। আমি নিজে রোজ ঢেলে দেব তোমাকে। মাত্রামাফিক। খেয়েই শুয়ে পড়বে। সংসারের কেউ জানবে না। পাড়ার কেউ নয়।

উঁহু, সুখময় ঘাড় নাড়ল, শুধু ঢেলে দিলে হবে না। খেতে হবে সঙ্গে বসে। দু এক চুমুক। নইলে নেশা জমবে না। ফুর্তি হবে না।

খেতে হবে? সব ভুলে রমা আর্তনাদ করে উঠল। বাড়ির বউকে, ঘরের লক্ষ্মীকে

এমন একটা কথা নির্দ্বিধায় কি করে সুখময় বলল! উচ্চারণ করল কিভাবে!

কেন? এতে লজ্জার কি আছে? দেখবে দুদিনে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম যৌবন ফিরে আসবে। ভরাট দেহ, নিটোল।

আবেশে সুখময় চোখ বন্ধ করল। মনে হ'ল রমার দুরন্ত শরীর যেন তার বন্ধ চোখের সামনে আলেখ্যায়িত হয়েছে।

সে রাতে কথা হ'ল না। কিন্তু অনেক ভেবেও রমা বুঝে উঠতে পারল না। কথা-গুলো সুখময় নেশার ঘোরে বলেছে, না সহজ অবস্থায়! নিজের সহধর্মিণীকে কেউ এমন কথা বলতে পারে এ যেন বিশ্বাসের অযোগ্য। বুঝি সঙ্গী চায় সুখময়, বন্ধুবান্ধব ছাড়াও আর একজনকে।

কিন্তু কি করবে রমা! একদিকে স্বামী, অন্যদিকে নৈতিক জীবন, দাঁড়িপাল্লার কোনদিকে গিয়ে বসবে। দুটো হারানই যে তার পক্ষে সমান মর্মান্তিক।

সারাটা রাত রমা বিছানায় ছটফট করল। এ পাশ আর ও পাশ। চোখের জলে বালিশ ভেজাল। কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলাল, কিন্তু সমস্যার সমাধান হ'ল না।

দিন দুয়েক সুখময় প্রায় ঠিক সময়েই ফিরল। তবে সহজ মানুষ নয়। কাছে গেলে নাকে গন্ধ আসে। দুটো চোখ অল্প লাল।

এমন হলেও রমা বাঁচে। মানুষজন জানতে পারবে না। হৈ চৈ চিৎকার নয়। সামান্য একটু টলতে টলতে ঘরের মানুষ ঘরে এসে ঢুকবে। একটু বে-এক্তিয়ার হবে, সে কেবল নিজের স্ত্রীর কাছে।

কিন্তু বরাত রমার। তৃতীয় রাতে কেলেঙ্কারি চরমে উঠল। মাঝরাতে বাড়ির সামনে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। রমার মনে হ'ল, মানুষ নয়, কাদার এক তাল বুঝি থপ করে পড়ল রাস্তার ওপর। তারপরেই চিৎকার করে গান। বেসুরো, বেতালা।

ব্যাপারটা রমা ঠিকই আন্দাজ করেছিল। দরজা খুলে এগিয়ে যেতেই দেখল দেওরও দ্রুতপায়ে নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে। রমা আর নামল না। সিঁড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সুখময়কে পাঁজাকোলা করে দেওর ওপরে উঠল। তখনও সুখময়ের গান থামেনি। কেবল হিন্দী ছেড়ে বাংলা ধরেছে।

সুখময়কে দেখেই রমা শিউরে উঠল। প্রথমে ভেবেছিল বুকের মাঝখানে রক্তের দাগ, তারপরে ভাল করে দেখল। না, পানের পিচ। সারা বুক জুড়ে।

সুখময়কে ওপরে তুলল না। সিঁড়ির চাতালে, রমার সামনে ফেলে রেখে দেওর সোজাসুজি রমার দিকে দেখল।

এর একটা বিহিত কর বৌদি। তোমরা মান অপমানের জ্ঞান হারিয়েছ, কিন্তু আমার পাড়ায় একটা মর্যাদা আছে। একদিন, দুদিন নয়, দিনের পর দিন এ ধরনের কেলেঙ্কারি আর বরদাস্ত করা যায় না। তোমরা বরং অন্য কোথাও উঠে যাও, অন্য কোন বাড়িতে। দাদার স্বভাব যে আর শোধরাবে না, সেটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে। কাল পরশুর মধ্যে একটা বন্দোবস্ত কর। এই আমি শেষ কথা তোমায় বলে দিলাম।

অশ্রু-টলমল চোখে রমা একবার চেয়ে দেখল। প্রথমে দেওরের মুখের দিকে, তারপর নীচে সিঁড়ির চাতালে দাঁড়ানো শাশুড়ী আর জায়ের দিকে। সকলের মুখেই যেন শেষ কথার ছাপ। আলাদা করে রমাকে তাদের
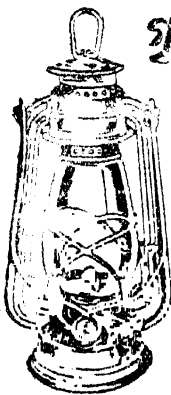
কিছু বলবার নেই। সান্ত্বনা নয়, সমবেদনা নয়, কিছু নয়।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে রমা ওপরে উঠে গেল। সশব্দে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ভিতর থেকে খিল তুলে দিল।

সুখময় তেমনই পড়ে রইল সিঁড়ির চাতালে।

নীচে শাশুড়ী জায়ের গুঞ্জন শোনা গেল। মানুষটাকে বাইরে ফেলে রেখে এ ধরনের রাগ দেখানো বাড়ির বৌয়ের কোন মানেই হয় না। এ রাগ স্বামীর ওপর নয়, দেওরের ওপর দেখানো। মতিভ্রংশ হ'লে এই হয়। হিতকথাও কানে কটু ঠেকে।

ভোরের দিকে রমা দরজা খুলল। গুড়ি মেরে সুখময় নির্বিবাদে সিঁড়ির চাতালে ঘুমচ্ছে।

সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রমা তার পাশে বসল। কপালের ওপর ঝুলে পড়া চুলগুলো অপূর্ব মমতায় সরিয়ে দিল হাত দিয়ে। আস্তে আস্তে গায়ে ঠেলা দিল। ডাকবারও সাহস হ'ল না। কি জানি কোথা দিয়ে কে শুনে ফেলবে। কার কানে যাবে।

কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর সুখময় চোখ খুলল। লালচে চোখ, স্তিমিত দৃষ্টি। হাতছানি দিয়ে রমা তাকে ওপরে উঠে আসতে বলল।

আশ্চর্য কান্ড, একবার ডাকতেই সুখময় উঠে দাঁড়াল। নেশা বোধ হয় তরল হ'য়ে এসেছে। পা দুটো একটুও অস্থির নয়। আবোল তাবোল কোন কথা বের হ'ল না মুখ দিয়ে।

রমার পিছন পিছন আস্তে আস্তে উঠে সুখময় নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

অন্যদিন এমন একটা ব্যাপারের পরে, কান্নাকাটির পালা চলে, মাথা ঠোকাঠুকি, ঠাকুরের নামে সব দিব্যি। আজ কিন্তু সে সব কিছু হ'ল না। সুখময় গভীর নিদ্রায় মগ্ন আর রমা বালিশে পিঠ দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। দু হাঁটুর ওপর মুখটা রেখে।

পরের দিন সুখময় অফিসে বেরিয়ে যেতেই রমা খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গোটা চার পাঁচ বাড়ি পার হ'য়ে দুতলা এক বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

চৌবাচ্চার ধারে মাথার ঘোমটা-খোলা একটি বৌ রাজ্যের কাপড় নিয়ে কাচতে বসে-ছিল, তাকে রমা জিজ্ঞাসা করল, চাঁপা, অমিয় ঠাকুরপো বাড়ি আছে?

চাঁপা রমাকে দেখে হাসল, বলল, হ্যাঁ, আছে পড়ার ঘরে। সোজা চলে যাও।

দাঁড়া, অমিয় ঠাকুরপোর সঙ্গে দরকারটা সেরে তোর কাছে আসছি।

দরকারটা কি তা আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। কাপড় আছড়াতে আছড়াতে চাঁপা মুচকি হাসল।

দু পা এগিয়েই রমা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আঁচলটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কি বুঝেছিস?

বই, বই, নতুন নভেল দরকার, তাই তো? লাইব্রেরির সেক্রেটারির কাছে আর মানুষের কি দরকার হয়!

রমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

অমিয় ঘরে বসে কি একটা বই পড়ছিল, রমা ঘরে ঢুকে বলল, খুব ব্যস্ত নাকি ঠাকুরপো?

না, কি আর ব্যস্ত। তারপর কি খবর বৌদি?

তোমায় একটা কাজ করতে হবে ভাই। কিন্তু কাকপক্ষীতে যেন টের পায় না।

অমিয় বিস্মিত হ'ল। কি এমন কাজ যে কেউ জানবে না। সুখময়ের ব্যাপার তো পাড়ার বাচ্চারা পর্যন্ত জানে। অমিয়ও কতদিন ট্রাম রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসেছে।

রমা অমিয়র খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আঁচল খুলে নোট বের করে বলল, এক বোতল ভাল মদের কত দাম জান ঠাকুরপো?

মদের দাম? অমিয় একবার রমার প্রসারিত হাতের নোটগুলোর দিকে চোখ বুলিয়েই রমার চোখের দিকে চোখ রাখল। কি হবে? মদ কি হবে?

তুমি তো সবই জান ঠাকুরপো। কত হাতে পায়ে ধরেছি, মাথা ঠুকেছি, এ রোগ যাবার নয়, তাই ঠিক করেছি, বাইরে এরকম কেলেঙ্কারী হওয়ার চেয়ে বরং বাড়িতে বসে খাওয়াব। যা হবার নিজের ঘরের মধ্যে হবে, বাইরের লোক হাসবে না।

সুখময়দা রাজী হয়েছেন?

কোনরকমে তো নিমরাজী করিয়েছি। সব রকমই তো করলাম, দেখি এবার বরাত ঠুকে।

অমিয় আর কথা বাড়াল না। রমার হাত থেকে নোটগুলো তুলে নিল।

ঠিক আছে বৌদি, আমি রাত্রে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেব।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে সুখময়ের খাবারটা নিয়ে রমা ওপরে চলে এল।

সন্ধ্যার ঝোঁকে এক ফাঁকে অমিয় বোতলটা দিয়ে গিয়েছিল। কেউ কোন সন্দেহ করেনি, কারণ বই নিয়ে প্রায়ই অমিয় আসত। সোজা-সুজি চলে যেত রমার ঘরে।

ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে রমা আলমারি খুলল। সন্তর্পণে কাগজে জড়ান বোতলটা বাইরে বের করল। কাগজের মোড়ক খুলে বোতলটা বের করেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল।

প্রায় আধ ঘণ্টা। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, সুখময়ের আসার এখনও অনেক দেরী। কাচের গ্লাস পেড়ে আস্তে আস্তে তরল রক্তাভ পদার্থটা ঢালল। ঠিক কতখানি খাওয়া উচিত, কিছুই জানে না, তবে একটু জানে, বিষের কোন পরিমাপ নেই। এক বিন্দু আর এক সমুদ্র প্রায়ই এক। সর্বনাশের চুলচেরা হিসাব চলে না। বিশেষ করে যে মরতে চায়, তার কাছে।

প্রথম চুমুক দিয়েই রমা মুখ চোখ কোঁচ-কাল। তরল একটা দাহ কাঁপতে কাঁপতে নীচে নেমে গেল। গলা, বুক, পাকস্থলী সমস্ত জ্বালিয়ে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আর এক ঢোঁক। এবার দাহ যেন একটু কম, কিন্তু তীব্র ঝাঁজ। রমার মনে হ'ল যেটুকু মুখে গেছে, সবটুকুই বুঝি বেরিয়ে আসবে। আর এক ঢোঁক। মনে হ'ল চোখের সামনে ঘরের সব আসবাবগুলো যেন নৃত্য করছে। ইলেকট্রিক বাতিটাও জ্বলছে নাচের ছন্দে।
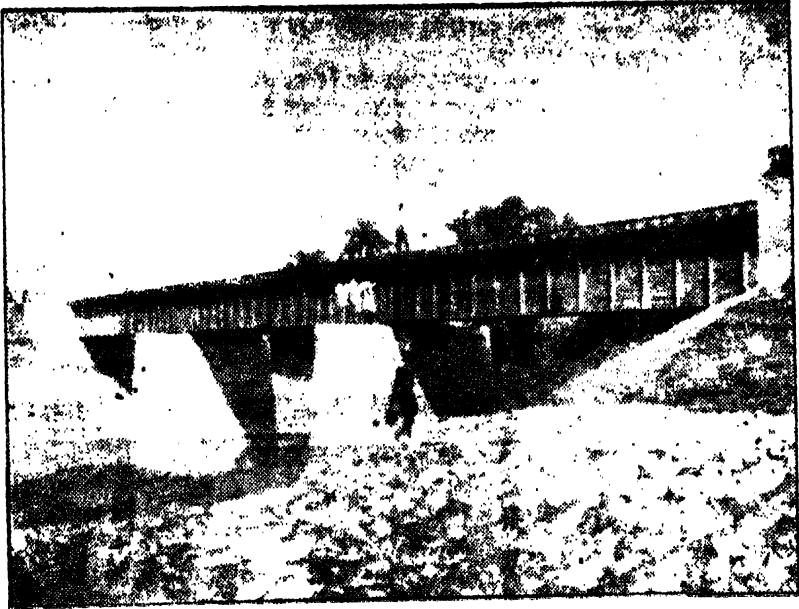
রমা উঠে পড়ল। পা দুটো বেশ টলছে। দেয়াল ধরে টাল সামলে আলমারি খুলল। বোতল, গ্লাস সব বন্ধ করল, তারপর টলতে টলতে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

তারপরের ঘটনা রমার আর কিছু মনে নেই। কখন সুখময় এসেছে, থালা ঢাকা খাবার নিজে খেয়েছে গোছ করে, তারপর রমার পাশে শুয়েছে, কিছুই খেয়াল নেই।

শুধু ভোরবেলা অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। রমা উঠে বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে ফেলল। সুখময়কে ওঠাল। কোন কথা নয়। ঘুমিয়ে পড়ার কোন কৈফিয়ৎ সুখময় চাইল না। মনে হ'ল একটু যেন চিন্তিত। একটু অন্যমনস্ক।

পর পর পাঁচ রাত এমনি চলল। একটা বোতল ফুরোতে অমিয় আর একটা বোতল এনে দিল। বোতলটা রমার হাতে তুলে দেবার সময় জিজ্ঞাসা করল, কি, বৌদি, কাজ হ'চ্ছে?

হ্যাঁ, এ একেবারে অব্যর্থ। তবে পুরো-পুরি হ'তে একটু সময় নেবে।

আজকাল রমার ভালই লাগে। সকাল থেকে প্রতীক্ষা করে কখন রাত হবে। নিজের খাবারও ওপরে নিয়ে আসে। নিজের ঘরে স্টোভে ছোলা ভেজে নেয় কিংবা ঝাল বেগুনী। জিনিসটার স্বাদ যেন দশগুণ বেড়ে যায়।

সেদিন সকাল থেকেই রমা ঠিক করল, আজই বলবে সুখময়কে। এবার আর অসুবিধা নেই। বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে রমার। সুখময়ের সঙ্গে বসে খেতেও আপত্তি নেই। বিকেল থেকে তাড়াতাড়ি শুরু হ'ল। আলাদা পয়সা দিয়ে মাংস আনাল। খুব ঝাল দিয়ে রান্না করল। দুটো গ্লাস পাশাপাশি রাখল। সব ঠিক, তবে শুরু করার আগে রমার গা ছুঁয়ে সুখময়কে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বাইরে বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গ ত্যাগ করে রোজ অফিস-ফেরত সোজা বাড়ি ফিরতে হবে। যেটুকু খাবে, রমার সঙ্গে বসে। বাইরের কারুর জানার উপায় থাকবে না, বাড়ির লোকও জানবে না।

প্রথম প্রথম রমার মনে ভয় হয়েছিল, যদি বাড়ির কেউ ধরে ফেলে। সন্দেহ করে তাকে! তাই সকালে স্নান সেরে গোটা দুয়েক পানের খিলি মুখে দিয়ে তবে নীচে নামত। পারতপক্ষে কারুর খুব কাছে যেত না।

উঠে রমা একবার ঘড়িটা দেখল। সাড়ে পাঁচটা। এখনও সুখময়ের ফিরতে অনেক দেরী। পাত্রে একটু ঢেলে রমা গালে দিল। চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে না, তাছাড়া অল্প দু এক চুমুক খেতে বেশ লাগে।

চোখের সামনে সব কিছু যেন নতুন হ'য়ে ওঠে। রংয়ে, রেখায় অনবদ্য।

কিছুক্ষণ কাটল। রমা আবার পাত্র পূর্ণ করল। সে পাত্র শূন্য হ'ল।

হঠাৎ কি মনে হ'ল, অসম্বৃতবাসে, স্খলিতচরণে উঠে গলায় আঁচল দিয়ে গণেশ-জননীর ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করল।

দোষ নিও না জননী, এ ছাড়া স্বামীকে ফেরাবার আর কোন উপায় নেই। আমার অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা কর।

ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। এ পদশব্দ রমার চেনা। রমা তাড়াতাড়ি দুটি পাত্র পূর্ণ করল। একটি নিঃশেষ করে আঁচল দিয়ে ঠোঁটটা মুছে দরজা খুলে দিল।

দরজা খুলেই বিস্মিত রমা পিছিয়ে এল।

ঘামে সুখময়ের চুলগুলো কপালের উপর লেপটে রয়েছে। বিস্ফারিত দুটি চোখ। বিরাট একটা ভয় থেকে যেন সে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছে।

সর্বনাশ হয়েছে। লালমোহনবাবু মারা গেছেন।

লালমোহনবাবু কে? রমার গলার স্বর সামান্য জড়ানো।

আমাদের আড্ডার লালমোহনবাবু। আজ দুপুরে মারা গেছে হাসপাতালে। সিরোসিস অব দি লিভার। মদ খাওয়ার ফল। আজ থেকে এই নাক কান মলছি আর ও-পথে নয়। ও বিষ কোনদিন আর ঠোঁটে ঠেকাব না। এরকম প্রতিজ্ঞা আগেও দু একবার করেছি বটে, কিন্তু তোমায় ছুঁয়ে বলছি এই আমার শেষ প্রতিজ্ঞা।

রমাকে ছুঁতে যেতেই সে ছিটকে সরে গেল। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কোথা থেকে কে শুনে ফেলবে, সে ভয় না করে।

হতভম্ব সুখময় চেয়ে চেয়ে দেখল, একটা শূন্য পাত্র, একটা পূর্ণ, পাশে চ্যাপ্টা বোতলে তরল বিষ।

খুব সাবধানে সুখময় খাটের বাজু ধরে দাঁড়াল। আজ মদের একটি ফোঁটাও গলায় যায়নি, তাও দেহটা টলছে, চোখের সামনে কি সব দেখছে, যার মানে হয় না।

রমার দিকে একটু এগিয়েই থেমে গেল সুখময়। ছোঁবে রমাকে? আজ এমন সুখবর শোনার পরেও এভাবে রমা কান্নায় ভেঙে পড়ল কেন, অনেক মাথা চুলকেও প্রকৃতিস্থ সুখময় বুঝে উঠতে পারল না।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১, আনন্দ প্রেস হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [illegible] মুদ্রিত ও [illegible]শিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং সুতারকিন স্ট্রীটস্থ কলিকাতা—১ আনন্দ প্রেস হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

Tinopal BVN
Tinopal BVN

আজই 'বাঘ' মার্কা সুপ্রারেজ ব্যাটারী কিনে আপনার টর্চে ভ'রে নিন। এতে আলোর তীব্রতা অনেক বেশী। বিশেষ প্রণালীতে এই ব্যাটারীটি তৈরী করা হ'য়েছে, এবং বহুদিন ব্যবহারেও অল্প শক্তি নষ্ট হয়, অথচ দামেও সস্তা।
অন্ধকারে অদ্বিতীয় সহায় 'বাঘ' মার্কা সুপ্রারেজ ব্যাটারী
SUPRARAYS
SUPER POWERED FLUID FREE CELL
'বাঘ' মার্কা সুপ্রারেজ
টর্চ ব্যাটারী
দি ফ্ল্যাসলাইট্‌স্ ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা।
সোল সেলিং এজেন্ট্‌স্ : হাজী হাসেম হাজী আব্দুল্লা প্রাঃ লিঃ
৫, আমড়াতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফ্রী ইণ্ডিয়া আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস্
২-৪নং বীরেন রায় রোড (পূঃ) কলিঃ ৪১
ফোন : ওয়ার্কস—৪৫-৩৬৭৯
হেড্ অফিস—৪৫-১৬৬৪

এজেণ্ট : হরিদাস সাহা
সর্বশ্রেষ্ঠ মেথিলেটেড স্পিরিট এর আমদানীকারক
পি-১০, নিউ হাওড়া ব্রীজ এপ্রোচ্ রোড, কলিকাতা-১
ফোনঃ ৩৪-৬৩১৫, ৩৪-৬৭০২; রেসিঃ ফোনঃ ৪৪-১৭২২

বহুমূত্র রোগীদিগকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান

প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি বের হলে তাকে বলা হয় ডায়বেটিস মেলিটাস এবং চিনি ছাড়া বার বার প্রস্রাব হলে তাকে বলা হয় ডায়বেটিস ইনসিপিডাস। যেসব রোগী এই রোগে ভুগে থাকেন তাঁদের পিপাসা ও ক্ষুধা অত্যন্ত বেড়ে যায়, সমস্ত শরীরে বেদনাবোধ করেন, শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কাজে আগ্রহের অভাব বোধ হয়। দিন দিন ওজন হ্রাস পেতে থাকে, চুলকানি হয়, চর্মরোগে ভুগে থাকেন, যকৃতের কাজ মন্থর হয়, মূত্রাশয় দুর্বল এবং পাকাশয়স্থ ক্লোম-যন্ত্র (প্যানক্রীজ) দোষযুক্ত হয়। এই রোগকে অবহেলা করার ফলে বাত, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতা, অনিদ্রা, কার্বাঙ্কল, দৈহিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস, দৈহিক অবসন্নতা, অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ এবং সাধারণ দুর্বলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। যাঁরা এই রোগে ভুগছেন, তাঁহাদিগকে বিনাখরচায় ডাক্তারের পরামর্শ লওয়ার জন্য আমাদের নিকট লিখিতে অনুরোধ করছি—যার ফলে তাঁরা ইনজেকশন না দিয়ে, উপোস না করে বা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ না করেও এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং সব সময় শক্তিশালী বোধ করবেন এবং কাজকর্মে আগ্রহ বেড়ে যাবে। খুব বিলম্ব না হওয়ার আগেই লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

ভেনাস লেবরেটরীজ

(A. D. P.)

পোঃ বক্স ৫৮৭

৬এ, কানাই শীল ষ্ট্রীট (কলুটোলা)
কলিকাতা—১

ওড়িশার পট

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী

মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥

ব্লক ও মুদ্রণ : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা
মহালয়া | ১৩৬৮

মাতৃপূজা

বাঙালীর ঘরে মা আসিতেছেন। মাকে পাইলে কাহার না আনন্দ হয়? আনন্দময়ী তিনি। বাঙালীর আজ দুঃখের দিন বলিয়াই মাকে আমাদের বেশী প্রয়োজন। আমাদের মা দুর্গা, দুর্গতিহারিণী তিনি। তাই মাকে পাইয়া বড় দুঃখের দিনেও বড় আনন্দ। বাঙালীর ঘরে ঘরে পূজার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু কি দিয়া আমরা মায়ের পূজা করিব! কোথায় পাইব পূজার সে ফুল? অহিংসা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ক্ষমা, শৌচ এই সব পরম পুষ্প? মনে কত সাধ ছিল। মাকে আমরা রাজরাজেশ্বরী রূপে সাজাইব। যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের পূর্বসূরী মায়ের অনুগৃহীত সন্তানগণ মাতৃপূজার সমারোহের স্বপ্নে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভাঙিয়া গেল যে সেই সুখ-স্বপ্ন—এ কি দেখিতেছি? শরচ্চন্দ্র-নিভাননা জননীর মুখ-মাধুরী মলিন হইয়া গিয়াছে। জটাজুট সমাযুক্তা তিনি। সন্তান-স্নেহে তিনি উন্মাদিনী। সন্তানের দুঃখ দূর না হইলে মায়ের সুখ কোথায়? তিনি নিজেই বলিয়াছেন, দেবতারা তাঁহাকে সকলের অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সকল সন্তানের প্রতি তাঁহার সদাজাগ্রত সস্নেহ দৃষ্টি-সম্পাত জনিত উদ্বেলিত আগ্রহে তাঁহাদের পূজার আয়োজন আহৃত হইয়াছিল। মায়ের সেবায় সংহত দেবগণের পূজোপচার-গৃহীত প্রবৃদ্ধ-প্রেমে সন্তানরক্ষাকল্পে দেবী দনুজদলনীরূপে জাগেন। মায়ের পদভরে ভূলোক দ্যুলোক প্রকম্পিত হয়। আলুলায়িত কুটিল তাঁহার কুন্তলভারের আলোড়নে মেঘ-মণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। তাঁহার খড়্গপ্রভানিকর-বিস্ফুরণে চরাচরে চমক জাগে। দেবী পদস্পর্শে উদ্দৃপ্ত সিংহের বিপুল বৈপ্লবিক বীর্যে অসুরের দল বিমর্দিত হইতে থাকে। দুষ্ট দৈত্যগণের শোণিত স্রোতে পৃথিবীর গ্লানিভার বিধৌত হয়। দেবী তখন রাষ্ট্রীমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া সন্তানদিগকে কোলে বুকে জড়াইয়া ধরেন। উন্মাদিনী জননীর লীলায় ক্ষণেকে প্রলয় সংসাধিত হয়। এমন মাকে আমরা ভুলিয়াছি, তাই তো এমন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহাকে পাইলে আমাদের এই দুর্গতি দূর হইবে।

এসো মা, সেইভাবেই আমরা তোমার পূজা করিব। তোমার দুঃখ আমরা বুঝিব। তোমার আর্তসন্তাগণের অশ্রু আমরা মুছাইব। তাহাদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিব। এসো মা, গৃহে এসো। দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ!

মহাপ্রভুর মাতৃপূজা

বঙ্কিমচন্দ্র সেন

মাতৃপূজা বলিতে আমরা সাধারণতঃ দুর্গোৎসব বুঝি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগের শুধু এই সংস্কারটি বাঙালী এখনও ছাড়িতে পারে নাই। মহাপ্রভুর মাতৃপূজা! মহাপ্রভু কি তবে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন? "মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি"। মাতৃসেবাকে প্রভু জীবনের অন্যতম মহাব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা তো সকলেই জানেন। কিন্তু—তাঁহার কৃত দুর্গোৎসবের কথা তো কোন দিন শুনি নাই। প্রভুর জীবনী লইয়া বাঙলার মনীষিসমাজ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। গবেষণাও বহুরকমের এ সম্বন্ধে হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রভু জগজ্জননী দুর্গার পূজা করিয়াছেন, একথা তো কেহই প্রকাশ করেন নাই। অনেকেরই মনে আমাদের আলোচ্য বিষয়টির সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, হাঁ, সত্যই মহাপ্রভু দুর্গোৎসব করিয়াছেন। 'অদ্ভুত অচিন্ত্য কৃষ্ণচৈতন্য বিহার, চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রলীলা তাঁর।' শুধু তাহাই নয়, সে পূজায় চণ্ডীপাঠও তিনি করিয়াছেন। প্রশ্নকর্তাদের কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ব্যাপারটি অন্যরকম, তোমারই ভুল হইয়াছে। প্রভু শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে লক্ষ্মীর অভিনয় করিতে গিয়া বিশ্বজননীরূপে প্রকটিত হন। "অম্বিকা, রুক্মিণী, রমা আদি নারায়ণী, আপনি হইলা প্রভু জগৎজননী"; এই সময় ভক্তবৃন্দ চণ্ডীর মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক প্রভুর বন্দনা করেন। কিন্তু প্রভু দুর্গা দেবীর পূজা করিয়াছেন, তিনি চণ্ডীর মন্ত্র তদুপলক্ষে উচ্চারণ করিয়াছেন, এমনটি ঘটে নাই। উত্তরে আমরা বলিব 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া', বাঙালীর সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রভাবিত মাতৃভাবনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন-লীলায় প্রবর্তিত হইবে, তাহাই তো স্বাভাবিক, সুতরাং আশ্চর্য হইবারই বা ইহাতে কি আছে? প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রভুর মাতৃ-পূজারই মন্ত্রমূর্তি-স্বরূপে আমরা মাকে পাইয়াছি। বিশ্বজননী আমাদের নিজেদের 'মা' হইয়া দুর্গোৎসবে আমাদের অঙ্গন আলো করিতেছেন; তাঁহার ঈষৎ সহাস এবং অমল মুখের মাধুরীর ছটায় আমরা ঘরে ঘরে নারীরূপে মায়ের লাবণ্যলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বস্তুতঃ শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব অকালবোধন; কিন্তু প্রভুর এই দুর্গোৎসব সর্বকালীন এবং সর্বজনীন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বাংলা হইয়া বৃন্দাবনে গমনের উদ্দেশে নীলাচল হইতে বাহির হন। কিন্তু কানাইর নাটশালা হইতে প্রভুকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু শান্তিপুরে আসেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দুর্গোৎসবটি শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। গৌরসুন্দর শান্তিপুরে আসিয়াছেন, একথা শুনিয়া নবদ্বীপস্থ মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি প্রভুর প্রিয় ভক্তগণ শচীদেবীকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈত ভবনে আগমন করেন।

শচীকে দর্শনমাত্রে প্রভু তাঁহার পদতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত চণ্ডীর স্তুতিগীতি উচ্চারিত হইল—

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।"

শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস তৎপ্রণীত চৈতন্য ভাগবতে প্রভুর এই দুর্গোৎসব লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্য ভাগবতে প্রভুর শ্রীমুখের স্তুতিতে দেবী মাহাত্ম্যের শ্লোকার্থের এইরূপ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই—

"শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া
সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবৎ হইয়া।
দণ্ডবৎ হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া
তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী,
তোমারে সে গুণাতীত সত্ত্বরূপা কহি।
তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর জীব প্রতি
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি মতি।
তুমি সে কেবল মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি
যাহা হৈতে সব হয়,—তুমি সেই শক্তি।
তোমার প্রভাব বলিবারে শক্তি কার
সবার হৃদয়েপূর্ণে বসতি তোমার।"

প্রভু শচীদেবীর চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি যে কিছু আমার
কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার।
কোটি দাস দাসেরো যে সম্বন্ধ তোমার
সেই জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার।
বারেকো যে জন তোমা করিবে স্মরণ
তার কভু নাহিবেক সংসার বন্ধন।
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী
তাঁরাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি।"

শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর মাতৃপূজার এই মধুর লীলা যে ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে পাষাণও গলিয়া যায়। প্রভাতে আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখর শচীমাতাকে লইয়া অদ্বৈত ভবনে পৌঁছিলেন।

"শচী আগে পড়ে প্রভু দণ্ডবৎ হঞা
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইল বিহ্বল
কেশ না দেখিয়া শচী হইল বিকল,
অঙ্গ মুছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন।
কান্দিয়া কহেন শচী বাছারে নিমাই
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই।
কান্দিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই।
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে
জানি বা না জানি যদি করিনু সন্ন্যাস
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস।"

প্রভুর মাতৃ-স্তুতিতে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বস্তু। শচীদেবীর আদরে পালিত শ্রীঅঙ্গের দিকে প্রভুর দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তিনি মাতৃপ্রেমে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রেমাশ্রুজলে অন্তরে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া কৃষ্ণলীলার স্মৃতি আমাদের মনে জাগ্রত হয়। সে লীলাতেও এইরূপ শ্রীঅঙ্গের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে—"রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার"। চিৎশক্তি ভগবতী বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপিণী যোগমায়া ভক্তজনের গূঢ়ধন কৃষ্ণের রূপ রতনকে নিত্যলীলা হইতে বৃন্দাবনে উদয় করাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সেজন্য আমরা যোগমায়াস্বরূপিণী দুর্গাদেবীর নিকট প্রপন্ন হইতে দেখি না। পক্ষান্তরে গোপীগণই কৃষ্ণের অঙ্গ-মাধুর্যে আকৃষ্টা হন এবং কাত্যায়নী ব্রত সাধনা করিয়া দেবীর নিকট কৃষ্ণকে পতি স্বরূপে কামনা করেন। মহাপ্রভুর লীলা কৃষ্ণলীলারই বিবর্ত বিলাস। শ্রীঅঙ্গের দিকে দৃষ্টি-সম্পাত করিয়া প্রভুর এইরূপ ভাবান্তর ঘটিল কেন? রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত অঙ্গেরই এই রঙ্গ। রাধারাণীর প্রেমের ঋণ পরিশোধ করিবার লোভটি

যে এবার তাঁহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার শ্রীঅংগের আকর্ষণটি যে সর্বচিত্তে সংবেদন-ধর্মে উদ্দীপিত করা প্রয়োজন—নাহলে অযাচিতভাবে সর্বজীবে প্রেমভক্তি বিতরণের লীলা পূর্ণ হয় না। এই কাজ সম্পন্ন করিবার অধিকার একমাত্র যোগমায়া দেবীরই রহিয়াছে। ভক্তজনের গূঢ়ধন রূপ-রতনকে ব্যক্ত করিতে তিনিই শুধু পারেন। 'কৃষ্ণভক্তি প্রদা দুর্গা, সুখদা মোক্ষদা স্মৃতা'। দুঃখ হইতে যিনি ত্রাণ করেন বৈষ্ণব সাধনায় তিনি যোগমায়া নহেন, তিনি মহামায়া। কারণ, দুঃখ হইতে ত্রাণের ক্ষেত্রে নিজের দিকেই সাধকের দৃষ্টি থাকে, পরন্তু যিনি প্রেমভক্তি জীবের চিত্তে উদ্দীপ্ত করেন এবং ভগবদুপলব্ধির পথে জীব যাহার কৃপায় সর্ববিধ দুঃখকে তুচ্ছ করিতে প্রণোদিত হয় তিনি যোগমায়া। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকেই দুর্গা বলিয়া বুঝেন। মহামায়া যিনি, তিনি জীবের বন্ধনের কারণ সৃষ্টি করেন।

মহামায়া কৃষ্ণমন্ত্রের আবরিকাশক্তি-স্বরূপিণী অর্থাৎ তাঁহার প্রভাব জীবের অন্তরে বিদ্যমান থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম চিত্তে উদ্দীপিত হইতে পারে না। দুর্গা দুই-জনেই। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আমরা একজনের শরণাপন্ন হই; আর এক-জনের আশ্রয়লাভ করিতে হইলে আমাদের বুকের পাটা বড় করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই' বলিয়া দুঃখের দুর্গম পথে নিজেদের বুকের পাঁজর জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে 'অভিসারে' বাহির হইতে হয়। জীব শেষোক্তা এই দেবীর কৃপা লাভ করিলে কৃষ্ণ সেবার একান্ত আগ্রহে অনন্যাভক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। মহামায়ার প্রভাব হইতে জীবকে মুক্ত করিয়া যোগমায়াস্বরূপিণী কৃষ্ণমন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীর আনুকূল্যে সংসারী জীবের প্রতিবেশে মহা-প্রভুর কৃপায় উন্মুক্ত হইল। প্রভু তাঁহার লীলার চাতুর্যে বিশ্বজননীকে মর্তলোকে নামাইয়া আনিলেন। আমাদের প্রত্যেকের জননীতে তিনি বিশ্বজননীর বেদনাকে প্রমূর্ত করিয়া তুলিলেন। বিকারশীল জগতে সর্বাশ্রয় স্বরূপিণী মায়ের অব্যাকৃত আদ্যা পরমা প্রকৃতি প্রকটিত হইল। এইভাবে মহাপ্রভুর কৃপায় বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকে যিনি প্রসব করিয়াছিলেন, আমাদের মায়ের মধ্যে তাঁহার সেই বেদনা উপলব্ধি করিয়া আমা-দের অন্তর বিগলিত হইল। মাতৃপ্রেমের অব্যবহিত এবং অপরোক্ষ বিজ্ঞানময় অনু-ভূতি আমাদিগকে দিব্যজীবনে উদ্বুদ্ধ করিল। দেবীসূক্তে উদ্গীত মায়ের মাধুর্য-লীলা আমরা অন্তরে অনুভব করিলাম। মাতৃকৃপার উদার মহিমায় উজ্জ্বল উন্মুক্ত আকাশ তলে আমরা সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের অংগের সান্দ্র স্পর্শ পাইলাম। শুধু স্পর্শ নয় একেবারে উপস্পর্শ, স্পর্শের উপর স্পর্শ, সুনিবিড় হার্দ্য সেই সন্নিকর্ষ। আমাদের প্রতি অংগে শিহরণ জাগিল, মুখে উচ্চারিত হইল মাতৃনাম—জয়, মা আনন্দ-ময়ী। কে বলে মায়ের রূপ নাই? রূপ-সাগরে আমাদিগকে ডুবিয়া যাইতে হইল, বিশ্বের প্রতি রূপে রূপে ফুটিল তাহারই রূপ। আমাদের ঘরে ঘরে নারী মূর্তিতে মা আত্মমাধুর্যে ব্যক্ত হইলেন। মহাপ্রভুর ক্রিয়া শক্তিস্বরূপে প্রভু নিত্যানন্দের সংবেদনে বাংলায় নূতন জীবনের উদ্বোধন ঘটিল। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর প্রেম-তরংগে অংগ ডুবাইয়া ঘরে ঘরে বিশ্বজননীর লীলা প্রকট করিলেন। যেখানেই নারী—সেখানেই মাতৃ মাধুরী। শচীদেবী, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী, অদ্বৈত প্রভুর সহধর্মিণী সীতাঠাকুরাণী সর্বত্র নিতাইয়ের কৃপায় জগজ্জননীকে চিন্ময়ী মহিমায় ব্যক্ত স্বরূপে আমরা উপলব্ধি করিলাম। বংগের অংগণে ধ্বনিত হইল মহামন্ত্র—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃসকলাজগৎসু!
ত্বয়ৈকয়াপূরিতমম্বয়ৈতৎ,
কা তে স্তুতিঃস্তব্যপরা পরোক্তিঃ"।

মহাপ্রভুর লীলা মাধুর্যকে বীজস্বরূপে অবলম্বন করিয়া বাঙালীর মাতৃপূজা জয়যুক্ত হইল; আমাদের দুর্গোৎসব সার্থকতা লাভ করিল।

স্কেচ

-শ্রীপ্রদ্যুম্ন তানা

ডঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

ভাই শহরে থাকেন, দু-একদিনের ছুটিতে গ্রামে ছোট বোনের বাড়িতে এসেছেন। বাপের বাড়ির খবরাখবর এবং অন্যান্য কথার পর বোন তার ৭।৮ বছরের ছেলের কথা বলতে লাগল। ছেলের কি অসাধারণ বুদ্ধি, এই অল্প বয়সে কত বিদ্যাই সে শিখেছে, পাঠশালায় তার গুরুমশায়েরা ত তার গুণগান করতে একেবারে পঞ্চমুখ। কোন প্রশ্নের, তা সে যত শক্ত প্রশ্নই হোক, জবাব দিতে তার এতটুকু সময়ও লাগে না। জিজ্ঞাসা করা মাত্রই সে জবাব দিয়ে দেয়। শেষে বোন বললে। 'দাদা, আমি তাকে তোমার কাছে নিয়ে আসছি, তুমি একটু জিজ্ঞেস-পড়া করে দেখ না!' বলে ডাকাডাকি করে ছেলেকে তার মামার কাছে নিয়ে এল। মামা তাকে অনেক বিষয়ে নানা রকম প্রশ্ন করলেন, সত্যিই ভাগনে তার চটপট সব জবাব দিয়ে গেল। মামা তাকে যেতে বললেন। ছেলের মা ত একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লো এবং প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বললে, 'দেখলে ত দাদা কি রকম ছেলে! আমার ত মাঝে মাঝে বড্ড ভয় করে। দাদা, ছেলেটা বাঁচবে ত?' দাদা একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে আস্তে আস্তে বললেন, আমার হাতে ত বেঁচে গেল, অন্য লোকের হাতে পড়লে কি হয় বলা যায় না।...'

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন, মার বিচারে ছেলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান কিন্তু মামার বিচারে সে একেবারেই বুদ্ধিহীন। বিচারের এতটা তারতম্য কি করে সম্ভব হল? এই বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত সহজেই প্রশ্নের একটা জবাব পাওয়া যাবে। মা লেখাপড়া জানে না, ছেলে যে প্রশ্নগুলোর কোন জবাবই দিতে পারেনি চটপট শুধু আবোল তাবোল যা হয় বলে গেছে, সেটা বোঝবার ক্ষমতা মার একেবারেই নেই, মামার যথেষ্ট আছে; তাই এই তারতম্য। একজনের মাপকাঠি হচ্ছে তাড়াতাড়ি জবাব দেওয়া, আর একজনের মাপকাঠি হচ্ছে প্রশ্নের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং প্রশ্ন ও জবাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা। দুরকমের মাপকাঠি দিয়ে একই জিনিস বিচার করলে ফল দুরকমই হবে। এক পোয়া দিয়ে ওজন করলে যেটা অত্যন্ত ভারী বলে মনে হবে, এক সের দিয়ে ওজন করলে সেটা নিশ্চয়ই ততটা ভারী বলে মনে হবে না। এমন কি খুব হালকা বলেও মনে হতে পারে।

কোন কিছু বিচার করতে গেলেই বিচারের একটা মানদণ্ড থাকা চাই। বড়, ছোট, লম্বা বেঁটে, ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতি, বুদ্ধিমান বুদ্ধিহীন, এই সব কথা যখন ব্যবহার করি তখনই একটা মানদণ্ডের সাহায্য আমরা নিয়ে থাকি। মানদণ্ডের ধারণাটা আমাদের সংজ্ঞান মনে সব সময় থাকে না। ছোটবেলা থেকেই আমরা ভালমন্দের তফাৎ করি। তখন গুরুজনেরা যেটাকে ভাল বলেন, সেটাই আমরা ভাল বলে মেনে নি, তাঁরা যেটাকে মন্দ বলেন সেটাই আমাদের কাছে মন্দ। একটু বড় হলে তখন প্রশ্ন জাগে কেন এটা ভাল, কেন ওটা মন্দ। তখন বুঝতে শিখি গুরুজনদের ভালমন্দ বিচারের একটা মানদণ্ড আছে। মানদণ্ড সম্বন্ধে তখন আমরা সচেতন হই; এবং সেই মানদণ্ডের সাহায্য নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হই।

বাড়িতে, পাড়ায়, স্কুলে, ছেলে-মেয়েদের তুলনা এবং সমালোচনা করে আমরা প্রায়ই নানারকম মন্তব্য করে থাকি। 'টিলু'টা সত্যিই বেশ বুদ্ধিমান ছেলে, আর নীলুটা এমন বকে—যেন বুদ্ধি বলে তার কোন জিনিসই নেই। বিপ্রার পরীক্ষার ফল ক্ষিপ্রার মত ভাল হয় না বটে, কিন্তু তার বুদ্ধি যে ক্ষিপ্রার চেয়ে অনেক বেশী একথা মানতেই হবে। এই ধরনের তুলনামূলক বিচার যখন করি তখন কিসের ওপর ভিত্তি করে মতামত প্রকাশ করছি সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা কি আমাদের থাকে? জিজ্ঞেস করলে একটা মাপকাঠির নির্দেশ হয়ত দেব, কিন্তু সেইটেই যে বুদ্ধি মাপবার সঠিক মাপকাঠি সে বিষয়ে আমরা একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারি কি? পারি না।

বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বুদ্ধির মানদণ্ড ঠিক করবার জন্যে মনোবিদরা বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে আরম্ভ করে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন এবং এখনও করছেন। বুদ্ধির স্বরূপ যাই হোক, বুদ্ধির বিকাশ কি রকম সব কাজ কর্ম চিন্তা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে হয় সেই সম্বন্ধে একটা ধারণা করে সেইগুলি পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ করে তাদের ভিত্তিতে মানদণ্ড সৃজন করবার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য মনোবিদরা সবাই যে ঐসব ব্যাপার সম্বন্ধে একমত একথা বলা যায় না। তবে যেসব বিবিধ রকমের অভীক্ষার সৃষ্টি বিদেশে ও আমাদের দেশেও হয়েছে সেগুলি প্রয়োগ করে পরস্পরের বুদ্ধির তারতম্যের প্রসার সম্বন্ধে একটি নির্ভরশীল বিজ্ঞানসম্মত এবং অনেকটা নির্ভুল ধারণা করা যায়। এবং সেই ধারণা ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগিয়ে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ধারা, ভবিষ্যত বৃত্তি নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে সদুপদেশ দেওয়া যায়। মনোবিদ্যা থেকে আমরা এটাও অবশ্য জেনেছি যে, শুধু বুদ্ধির ওপরেই ভবিষ্যত জীবনের সবটা নির্ভর করে না। অন্যান্য মানসিক বৃত্তির প্রতি ... সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কার কোন বিষয়ে কৌতূহল কে কি পছন্দ করে বা করে না, কার কোন দিকে প্রবণতা বেশী, কে কি পরিবেশে মানুষ হচ্ছে, উপদেশ দেবার আগে সেগুলিও বিচার করা বিশেষ দরকার। সৌভাগ্যবশত মনোবিদরা এসব বিষয় অধ্যয়ন করবার এবং পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষণ করবার বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কার করেছেন এবং নানাবিধ অভীক্ষার সৃষ্টি করেছেন। মনোবিদদের গভীর গবেষণা এবং দীর্ঘকালব্যাপী নিরীক্ষণ প্রসূত এই অভীক্ষাগুলির সৃষ্টি মনোবিদ্যাকে আজ যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী করেছে এবং ভবিষ্যত কালের উপযোগী মানব গঠনের অন্তত একটা পথের নির্দেশ দিয়েছে।

মানদণ্ডের বিভিন্নতা—বিচার তারতম্যের কারণ, একথা সহজেই বোঝা যায় এবং মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তাতে প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় কি? না প্রশ্নটিকে শুধু আর একটু পিছনে ঠেলে দিয়ে একটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি করা হয়? সে সমস্যাটি এই যে, মানদণ্ডের তফাতই বা হয় কেন? আপনি কোন কিছু বিচার করবার সময় একরকম ভাবে অগ্রসর হন, আমি অন্য পথে যাই। কাজেই আপনার এবং আমার মতের অনৈক্য হয় একই সমাজের, অনেকটা একই ধরনের পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে দুজন শিক্ষিত লোকের—মতামতের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন কৃষ্টিসম্পন্ন, বিভিন্ন সমাজের

লোকেদের মধ্যে ত কথাই নেই। একবার পৃথিবীর চারদিকের ঘটনাবলীর কথা মনে করবার চেষ্টা করলে খুব সহজেই দেখতে পাবেন ঐক্যের চেয়ে মতের অনৈক্য কত বেশী। বার্লিন তথা জার্মানী এক থাকা উচিত, না, বিভক্ত হওয়া উচিত, আফ্রিকার জাতিদের প্রতি ইউরোপীয় রাজ্যসমূহের ব্যবহার ভাল না মন্দ, প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপারের বিচারে যাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মতের ঐক্য কোথায়? ঐক্য যদি থাকত তাহলে ত ইউ এন ও'র (কেউ কেউ ওটাকে নাকি আজকাল uncle nephew organization বলেন) মত একটা প্রতিষ্ঠানের দরকার হত না। বিদেশের কথা ছেড়ে দিন—আমাদের নিজেদের দেশেই কত সমস্যা এবং প্রত্যেক সমস্যা সম্বন্ধে কত লোকের কত মত। কারও মতে প্রায়োপবেশনই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। আপনার মতেও কি তাই? তা জানি না। তবে অনেক লোকই আছেন যাঁদের মত তা নয়। তারপর হিন্দী, ইংরেজী, চীন ভারত সীমান্ত, কংগ্রেস সোস্যালিজম কমিউনিজম চলবে, না চলবে না—মাইনে বাড়বে কি বাড়বে না—জিনিসপত্রের দাম কমবে কি কমবে না—মেয়েদের অধিকারের সীমা, তাদের আধুনিক পোশাক পরিচ্ছদের শালীনতা...ইত্যাদি কত বিষয়ে আমরা রোজ বিচার করছি ও রায় দিচ্ছি। আর বিরোধী দলের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ (কোন কোন প্রতিষ্ঠানে চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়িও) করছি। যুক্ত পরিবার ত এখন নেই—'অযুক্ত' পরিবারের ভেতরেও স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে—সবাইকার মত সব সময় এক হয় না। রাজনীতি ক্ষেত্রে, সামাজিক ব্যাপারে, পারিবারিক জীবনে মতের অনৈক্যই আজকাল জাজ্জ্বল্যমান। ঐক্য অনুসন্ধান করে বার করতে হয়।

আপনারা হয়ত বলবেন অনৈক্য থাকাই ত বাঞ্ছনীয়। সংসারে সবাইকার সব বিষয়ে যদি একমত হত, তাহলে জীবনযাত্রা ত একটা একঘেয়ে বিশ্রী ব্যাপার হত। উপভোগ করবার, রসাস্বাদন করবার কোন উপকরণই থাকত না। উন্নতি করবার কোন চেষ্টাই আসত না। বুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি ব্যবহার করবার কোন প্রয়োজনই হত না। আপনাদের কথা কথা ঠিকই। পৃথিবীতে পর্বত, প্রান্তর, সমুদ্র, নদ-নদী আছে বলেই পৃথিবী সুন্দর। সব ফুলের রং এবং গন্ধ যদি একই রকম হত তা হলে ফুলের এত আদর হত না। বৈচিত্রই আনন্দ উপভোগের ভিত্তি।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই,—মতানৈক্য থাকা উচিত কিনা, তা নয়, মতানৈক্য হয় কেন? নৈসর্গিক ঘটনাবলী গভীর ভাবে অধ্যয়ন করে যুক্তির সাহায্যে বিচার করে দুজন দার্শনিক দুরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, এটা ত ঐতিহাসিক ঘটনা। এরই ছোটখাট সংস্করণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনবরতই ঘটছে। একই ঘটনার কারণ, আপনি এক কারণ ঠিক করলেন, আপনার বন্ধু অন্য কারণ নিরূপণ করলেন; কেন?

দুটো কারণে এরকম হওয়া সম্ভব। প্রথম হয়ত ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণটা আপনারা কেহই লক্ষ্য করেন নি। আপনি একদিক দেখেছেন, বন্ধু অন্যদিক দেখেছেন। কাজেই বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত হয়ত, বন্ধু যুক্তির প্রয়োগ সঠিকভাবে করেন নি। ন্যায় শাস্ত্রের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর যুক্তি ভ্রমাত্মক হয়েছে। আপনার যুক্তি হয়ত ন্যায় সঙ্গত হয়েছে; কিংবা আপনারও হয়ত ভুল হয়েছে। সুতরাং মতের মিল কি করে হবে। প্রথম কারণটা নিরসন করা সম্ভব। আবার একবার দুজনে মিলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করতে পারেন। দুজনেই স্বীকার করতে রাজী হবেন যে প্রথম পর্যবেক্ষণটা ঠিক বা সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু যুক্তি প্রয়োগ করতে ভুল হয়েছে, একথা মেনে নিতে দুজনেরই একটু বাধবে। অনেক সময় অবশ্য আমরা নিজেদের ভুল উপলব্ধি করেও তার স্বীকার করব না বলে জোর করে উত্তরোত্তর গলার আওয়াজ চড়িয়ে তর্ক করে থাকি। সে ক্ষেত্রে ভুল বুঝতে পেরেছি কিন্তু স্বীকার করছি না। যতদিন এই মনোভাব পোষণ করব ততদিন মতানৈক্য থাকবে।

কিন্তু অনেক সময় আমরা সত্যিই নিজেদের যুক্তির ভুল বুঝতে পারি না। কয়েকটি অন্তর্নিহিত কারণের প্রভাবে আমাদের যুক্তি, বিচার, চিন্তা, কল্পনা প্রভৃতি প্রায়ই ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করে। এমন কি প্রত্যক্ষ জ্ঞানও ব্যাহত হয়। প্রণয় পাত্রের আসবার অপেক্ষায় যে প্রণয়িণী ঘরে বসে মুহূর্ত গণনা করছে, বাইরের শব্দমাত্রকেই চেনা পদধ্বনি বলে সে মনে করে নেয়। তীব্র বাসনাই তার এই ভুল প্রত্যক্ষের কারণ। অসুস্থ এবং নিদ্রিত চতুর্থ হেনরীর শয্যা পার্শ্বে তাঁর পুত্র পিতার মুকুটটি দখল করছিলেন। পিতা যখন প্রশ্ন করলেন, তিনি বর্তমানে পুত্র কেন মুকুট অধিকার করলে, পুত্র বললেন—যে তাঁর মনে হয়েছিল পিতার জীবনান্ত হয়েছে। পিতা বললেন—"Thy wish was father, Harry, to thy thought' (তোমার ইচ্ছাই তোমার ঐ চিন্তার জনক, হ্যারী)।) এই রকম করেই আমাদের ইচ্ছা প্রক্ষোভ প্রভৃতি আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, যুক্তি, বিচার প্রভৃতিকে অভিভূত করে বিপথে নিয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করলে কোন্ ইচ্ছা, কোন্ প্রক্ষোভ ভ্রান্তির মূলে আছে তা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা আমরা কদাচিৎ করে থাকি। তাই ভুল, মতানৈক্য থেকেই যায়।

অন্য লোক সম্বন্ধে যখন বিচার করি, মতামত গড়ে তুলি তখনও বিশুদ্ধ, অমিশ্র যুক্তির সাহায্যেই যে সব সময়ে করি—তা করি না। বরং প্রায়শই বিপরীত পথেই যাই। প্রক্ষোভের প্রভাবে বশীভূত হয়ে মত গড়ে তুলি, পরে যুক্তির সাহায্যে সেটা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করি। ঐ লোকটির দোষই কেবল আপনি দেখতে পান এবং তাই সিদ্ধান্ত করেন যে লোকটি অতি মন্দ। ব্যাপারটি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ হতে পারে। আপনি ওকে পছন্দ করেন না, দেখতে পারেন না তাই তার দোষগুলিই কেবল আপনার চোখে পড়ে। আবার যাকে ভালবাসেন তার ত কোন দোষই নেই বলে মনে হবে। যাকে দেখতে পারেন না তার চলন ত বাঁকাই। অন্য অবস্থায় আবার ট্যারাকেও পদ্মলোচন মনে হয়।

ইচ্ছা, প্রক্ষোভ প্রভৃতির প্রভাব থেকে আমাদের যুক্তি বিচারকে যত মুক্ত করতে পারব ততই আমরা সত্যের দিকে অগ্রসর হতে পারব। আধুনিক মনোবিদ্‌দের অভীক্ষা সৃষ্টির আগেও লোকে—বুদ্ধি, মেজাজ, স্বভাব প্রভৃতির বিচার করত। কিন্তু সে সময় যুক্তি অন্যান্য মনোবৃত্তির দ্বারায় প্রভাবান্বিত হত। কাজেই মতের ঐক্য হত না। এখন মনোবিদ্‌দের একমাত্র চেষ্টাই হচ্ছে—ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা-প্রক্ষোভ-প্রভৃতি-নিরপেক্ষ অভীক্ষার (যাকে objective test বলা হয়) সৃষ্টি করা। এই চেষ্টায় যতই সফল হতে পারব, মানসিক বৃত্তিসমূহ অনুশীলনে আমাদের বিচার বুদ্ধিকে যত মুক্ত রাখতে পারব, মনোবিদ্যা ততই সত্য সন্ধানের পথে অগ্রসর হতে পারবে। শুধুই কি তাই? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনবরতই অন্য লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়, তাদের বুদ্ধি, স্বভাব, মেজাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণাও করতে হয়; তা না হলে সমাজে বাস করা যায় না। মনে করে দেখুন, কত লোক সম্বন্ধে কত ধারণা আপনি পোষণ করেন। সব ধারণাগুলিই কি ঠিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত? তা যদি হত তাহলে কার্যক্ষেত্রে, সমাজে, নিজের পরিবারেও এত অশান্তির সৃষ্টি হত না। পরস্পরকে ভুল বোঝা এবং কাজেই পরস্পরের প্রতি অপ্রত্যাশিত ব্যবহার পারিবারিক অশান্তির একটা বড় কারণ নয় কি? এই অশান্তির হাত থেকে কথঞ্চিৎ, অব্যাহতি পাবার একটা পথ আধুনিক মনোবিদ্যা দেখিয়ে দিয়েছে।

'কথঞ্চিৎ' কথাটা ইচ্ছে করেই ব্যবহার করছি। কারণ মানসিক ঘটনাবলী যে প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত হয় তা অত্যন্ত জটিল। ইচ্ছা, প্রক্ষোভ প্রভৃতি আমাদের বিচার বিবেচনাকে অভিভূত করে—সে কথা আজ জানতে পেরেছি। কিন্তু এই জ্ঞান কাজে লাগাবার সময় একটি বিশেষ রকমের বাধার

সম্মুখীন হতে হয়। প্রভাব বিস্তীর্ণকারী যে সব ইচ্ছা, প্রক্ষোভ— আমাদের সংজ্ঞান কিংবা অসংজ্ঞানে থাকে—তাদের পরিচয় চেষ্টা করলে পাওয়া যায় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণও করা যায়। কিন্তু মন-সমীক্ষণ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে, মনের আরও একটি গভীর স্তর আছে—যাকে আমরা নির্জ্ঞান বলি। এই নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত ইচ্ছা প্রভৃতি যে সব উপকরণ আছে, যে সব ঘটনা ঘটে—সংজ্ঞান স্তরের চিন্তা, ভাব, কাজকর্মের ওপর তাদেরও প্রভাব এসে পড়ে। তাদের দ্বারায় প্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের যুক্তি-বিচার যে বিপথে যাচ্ছে তা আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি না। কোন লোকের প্রতি আপনার বিরক্তি; কিন্তু সামাজিক কারণে সে বিরক্তি আপনি প্রকাশ করতে পারেন নি। ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটিই আপনার সংজ্ঞান মন থেকে সরে গিয়ে নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় নিয়েছে। অবদমিত কোন জিনিসই নির্জ্ঞান মনে স্থির থাকে না—ক্রমাগত আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করে। এই লোকটির সংগে সেই লোকটির কোন রকম বাস্তব বা কল্পিত সাদৃশ্য আপনি লক্ষ্য করেছেন; এবং এঁ'র প্রতি বিরক্তি প্রকাশের কোন বাধা নেই—; সুতরাং এই লোকটির ওপরেই আপনার সেই অবদমিত বিরক্তি এসে পড়ল, এবং লোকটির প্রতি আপনি অবিচার করতেই থাকলেন। আপনার বিরক্তির সমর্থনে নানাবিধ যুক্তি তর্কের অবতারণা করে অন্য লোককে এবং নিজেকেও বোঝালেন যে আপনার বিচার ন্যায়সঙ্গত।

বিজ্ঞানের উন্নতির খাতিরে পৃথিবীর অসংখ্য নির্বিরোধী, নিরপরাধী সাধারণ বালবৃদ্ধবনিতাকে মৃত্যু মুখে প্রেরণ করা কি সুবিচার সম্মত? দাঙ্গা হাঙ্গামায় জয়লাভ করতে পারলে ভাষার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ হবে এটা কি ন্যায়সঙ্গত যুক্তি? অনশনের ফলে বিপরীত মতাবলম্বী দুজনের মধ্যে যাঁর মৃত্যু হল তাঁর মত ভুল আর যিনি বেঁচে রইলেন তাঁর মত ঠিক এটা ধরে নেওয়া কি যুক্তি সিদ্ধ?

কোন কোন মা যে মেয়েকে অনবরতই শাসন করেন—সে কি শুধু মেয়ের ভালর জন্যেই? পিতার নিদারুণ প্রহারের কারণ কি শুধুই পুত্রের অবাধ্যতা? গৃহিণী চাকরকে যে ক্রমাগতই ধমকাচ্ছেন; সে কি শুধু চাকরের দোষের জন্যেই? যে বিচারে প্রৌঢ়া চারিদিকে 'নোংরা' দেখছেন এবং তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন,—সে বিচার কি শুধু যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত?

One world খুব ভাল কথা, খুব বড় কথা। কিন্তু যতদিন বিভিন্ন মহাপ্রদেশ, বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপন না হয়, ততদিন ওটা কল্পনার রাজত্বেই থেকে যাবে। দেশের মধ্যে, প্রদেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হলে, ঐক্যের পথে বাধা কোথায়, সে বিষয়ে সচেতন হয়ে তা অতিক্রম করবার উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। বাধা যে কোথায় তার কিছু ইঙ্গিত আমরা মনঃসমীক্ষণ থেকে পেয়েছি। ছোটখাট ব্যাপারে সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ক্রমশঃ বড় ব্যাপারে অগ্রসর হলে, আজকে যেটা আমাদের শুধু আদর্শ-মাত্র সেটা একদিন বাস্তবে পরিণত হবে এ আশা করা যায়।

রাজমহলের প্রবেশপথ —শ্রীকল্যাণ বসু

সেকালের কথা

শ্রীসরলাবালা সরকার
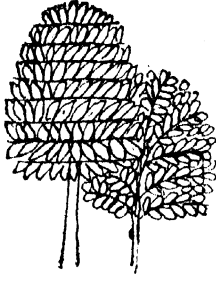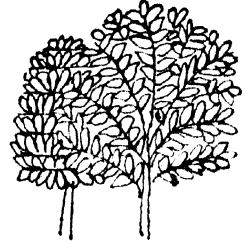
নবদ্বীপের উত্তরাংশে একটি প্রকাণ্ড মাঠ আছে। তাহার নাম বনচারীর মাঠ। সেই মাঠে চরণদাস বাবাজীর আশ্রম ছিল। মাঠ অথবা আশ্রম অথবা শিশু-সদন যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলিতে পারা যায়। চরণদাস বাবাজী আবাল্য সাধু নন। অথচ তিনি এক মহাসাধু। চরণদাস বাবাজী সম্বন্ধে নবদ্বীপে অনেক জনশ্রুতি আছে। তিনি নাকি দুই হাতে ধুলি মুঠা ভরিয়া লইয়া ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতেন, আর যাহার গায়ে সেই ধুলির কণা লাগিত সে নাকি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য করিত। আশ্রমের একটি বিশেষত্ব এই যে, আশ্রমটি পুরুষের আশ্রম; স্ত্রীলোক সেখানে নাই বলিলেই হয়। আর ছিল দুই এক বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ সাত বৎসরের শিশু। শিশুর সংখ্যা পাঁচ শতের চেয়েও বেশী হইবে। এই শিশুগুলি কোথা হইতে আসিল তাহার উত্তর এই যে, ইহাদের পিতৃ-মাতৃ পরিচয় নাই। ইহারা সকলেই পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন। ইহাদের মধ্যে বাঙালীও আছে, ওড়িয়াও আছে। ভদ্র-ঘরেরও আছে আবার অনেক নিম্নশ্রেণীর ঘরেরও আছে। ইহাদের মায়েরা কেহবা বিধবা, কেহবা কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হইয়া এই আশ্রমে আশ্রয় লইত এবং সন্তান হইবার এক মাস পরেই আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। এই শিশুগুলির ব্যয়ভার বহন করিতেন স্বয়ং চরণদাস বাবাজী। ইহাদের পালন করিতেন ললিতা সখী। ললিতা সখী নাম শুনিয়া তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া মনে হয়, আসলে তিনি একজন পুরুষ। মহাবিদ্বান পুরুষ। তিনি নাকে নথ পরিয়া এবং শাড়ি কাপড় পরিয়া সব সময়েই স্ত্রীলোকের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার গলার স্বরটি পর্যন্ত স্ত্রীলোকের মত হইয়া গিয়াছিল। এই সাধনার ভিতর কী আছে তাহা আমি যদিও জানি না, তবুও দেখিতাম, তাঁহারা অতি নিষ্ঠা সহকারেই সাধন করেন। ওই অতগুলি ছেলেকে খাওয়ানো-দাওয়ানো, এমন কী তাহাদের মলমূত্র পরিষ্কার করা পর্যন্ত তিনি এবং তাঁহার সঙ্গীরাই করিতেন। আমি একবার সন্ন্যাসিনী মার সঙ্গে ওই আশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম; সে বহুদিনের কথা। আশ্রমটির ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিল সেখানকার ধনী মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা। তাহারা সকলেই চরণদাস বাবাজী মহাশয়কে 'বড় বাবাজী মহাশয়' বলিত এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। তাঁহারই প্রধান শিষ্য রামদাস বাবাজী অল্পদিন পূর্বেই বরাহনগরের কুঠিবাড়িতে দেহরক্ষা

করিয়াছেন। রামদাস বাবাজী মহাশয়ের পরিচয় অনেকেই জানেন। সে যা হউক আমি আশ্রমে গিয়া দেখিলাম, ছেলেগুলি সকলেরই মাথা ন্যাড়া, কপালে তিলক, একটিও মেয়ে তাহার মধ্যে দেখিতে পাইলাম না। শিশু ও বালকগুলি কেহবা বাসন মাজিতেছে, কেহবা কুয়া হইতে জল তুলিতেছে, কেহবা পাণিনি বা অন্য কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিতেছে, পাঠভবন 'অম্ ঔচস্ সো ঔসস্' শব্দে মুখরিত হইতেছে। ইহার মধ্যে একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে আমাকে পিঠ দেখাইয়া বলিল দেখুন, কাল পিসীমা কী-রকম কিল মেরেছেন। পিসীমা অর্থাৎ ললিতা সখী। বাস্তবিক দেখিলাম যে, তার পিঠে কালশিরা পড়িয়া গিয়াছে। বুঝিলাম তাহাদের পালয়িত্রীর কেবল পালন নয়, প্রচণ্ড শাসনও আছে। ললিতা সখীকে আশ্রমের ছেলেরা 'পিসীমা' বলিয়া ডাকে, ইহারা সকলেই উত্তরকালে ভেক লইয়া বৈষ্ণব সাধক হইয়া যায়, তখন তাহাদের সাধন-ভজনের জন্য হিমালয়ে বা বৃন্দাবনের বনে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং বনবাসীরা বনের ফল-মূল খাইয়া কোনরূপে জীবনধারণ করেন। মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা মাঝে মাঝে বৎসরের মধ্যে দুই-একবার লাড্ডু মিঠাই এবং কমলালেবু প্রভৃতি তাহাদের বিতরণ করিবার জন্য আসেন। এই সমস্ত কথা আমি সন্ন্যাসী-মার নিকট শুনিয়াছিলাম! তিনি চরণদাস বাবাজীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এমন কী সন্তানের অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি আমাকে একবার বলিয়া-ছিলেন "চরণ যখন আমার পা টিপতে বসে তখন আমার ভয় হয়, মনে হয় চরণের মত মহাসাধু আমার পায়ে হাত দিচ্ছে। অথচ বারণও করতাম না, ভাবতাম ওদের কাছে পা-ও যা মাথাও তাই। পায়ে আর মাথায় কোনও তফাত নেই।" চরণদাস বাবাজী দেহত্যাগ করিলে, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিবার পর এই কথা বলেন, "ওরে সরলা আমার চরণ না কি পৃথিবী অন্ধকার করে চলে গেছে। এ কথা কি সত্যি?"

সে যা হউক, আমি এখন আগের কথায় ফিরিয়া আসিতেছি। আশ্রম দেখিতে গিয়া বাগানবাড়ির ভিতর হইতে একটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠ কানে গেল। কেহ যেন নারী কণ্ঠে বলিতেছে, অথচ সেই স্বরটি ঠিক নারীর নয় কতকটা পুরুষেরই মতন। বলিতেছে "ও দিদি, সেই পাগলী আবার এসেছে আশ্রমের বাসন মাজতে, ওকে দূর করে দে, এখনি দূর করে দে। ও যেন বাসনে হাত দেয় না।" ওদিকে কে যেন সুর করে গান গাহিতেছিল, "ললিতার পদযুগল ধ্যান আমার। সেই পদযুগল করিব চুম্বন জীবনে এমন দিন হবে কী কখন।" সেই সঙ্গে দূর তাড়ানোর শব্দ কানে আসিল। অর্থাৎ আশ্রমে যে বাসন মাজিতে আসিয়াছিল

লাঠির আঘাতে সে বিতাড়িত হইল।

এইবার একটি অলৌকিক কাহিনী আপনাদের শুনাইব। অনেকেই বলেন যে, কাহিনীটি পুরোপুরি সত্য। চরণদাস বাবাজীর একটি পালিত কুক্কুরী ছিল। সেই কুক্কুরীটিকে তিনি 'রাধাদাসী' নাম দিয়াছিলেন, সেটিকে না কি তিনি কটকের রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। সেই অবধি কুক্কুরীটি তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। আশ্রমে প্রসাদ খাইয়াই জীবনধারণ করিত, মাছ-মাংস স্পর্শও করিত না। পোকা-মাকড় পর্যন্ত পাছে পায় মাড়াইয়া যায় সেইজন্য বাঁচাইয়া পথ চলিত, কীর্তনের সময় "ভৌ ভৌ" শব্দ তুলিয়া দুই হাত তুলিয়া দুই পায়ে ভর দিয়া নৃত্য করিত। চরণদাস বাবাজী বলিতেন, "এই কুকুরটি প্রকৃতপক্ষে কুকুর নন। পূর্বজন্মে মহাসাধিকা ছিলেন। এবার অপরাধ ক্ষালনের জন্য কুক্কুরজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।" একদিন দেখা গেল, ঠাকুরঘরের দুয়ারের কাছে প্রণামের ভঙ্গীতে উপুড় হইয়া রাধাদাসীর মৃতদেহটি পড়িয়া আছে। চরণদাস বাবাজী শিষ্যদের লইয়া সেই মৃতদেহটি কাঁধে করিয়া নগর-সংকীর্তনে বাহির হইলেন। কীর্তনের ধুয়া এই "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" কীর্তন করিতে করিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নবদ্বীপে যেখানে যত বৈষ্ণব আছে সকলকেই এই নিমন্ত্রণপত্র বিলি করিলেন। সেই পত্রে লেখা ছিল "আপনারা সকলে দয়া করিয়া অমুকদিনে রাধাদাসীর স্মরণউৎসবে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তাহার আত্মার তৃপ্তিসাধন করিবেন। বৈষ্ণবের পদধূলিতে আশ্রম-ভবনকে ধন্য করিবেন।" সেইদিন ঘোরঘটা আরম্ভ হইল। হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি সঙ্গে সঙ্গে মালপুয়া রাঁধা হইতে লাগিল, স্তূপাকার মালপুয়া এবং ভোগের দ্রব্যাদি রন্ধনগৃহে স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল। কিন্তু, একজনও প্রসাদ গ্রহণ করিতে আসিলেন না। কেননা, নবদ্বীপের বৈষ্ণব বাবাজীরা নিজেদের অত্যন্ত অপমানিত মনে করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন "আমাদের কুকুরের মহোৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠায়, চরণদাস ভাবিয়াছে কী? এতদূর তাহার স্পর্ধা হইয়াছে, কুকুরের মহোৎসবে কুকুরকেই নিমন্ত্রণ করা হয়, মানুষকে নয়। তাহার সাধ্য থাকে কুকুর নিমন্ত্রণ করিয়া
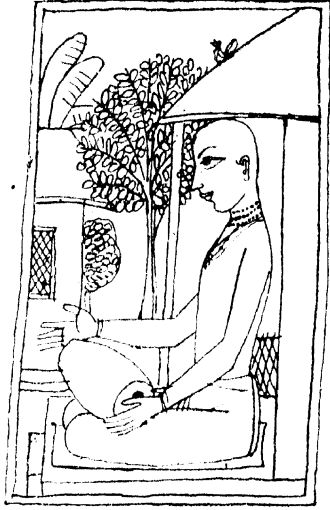
খাওয়াক। আমরা একজনও তাহার আশ্রমে যাইব না।" চরণদাস বাবাজী সবিনয়ে উত্তর দিলেন "বাবাজীদের আজ্ঞা শিরোধার্য, রাধাদাসীর মহোৎসবে কুকুরদেরই নিমন্ত্রণ করা হইবে। এই সব, ভোগের দ্রব্য গরিবদের বিলাইয়া দাও।" গরিব মানুষেরা মালপুয়া খিচুড়ি খাইয়া পরম পরিতৃপ্তি ভরে রাধা-রমণের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নিজেদের কুটিরে ফিরিয়া গেল। তাহার পরদিন আবার আশ্রমের উঠান পরিষ্কার করিয়া ঠিক সেই ভাবেই ভোগ রান্না করা হইল। মারোয়াড়ীরা বস্তা বস্তা পাঁপড় আনিয়া দিল। স্তূপাকার বেগুনী ফুলুরি ভাজা হইল, সঙ্গে সঙ্গে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা মালপুয়াও পরিবেশন করা হইল। চরণদাস বাবাজীর শিষ্যেরা গুরুর আদেশে গলিতে গলিতে যেখানে যত কুকুর আছে নিমন্ত্রণ করিয়া বেড়াইল। কিন্তু হায় রে, একটিও কুকুর আসিল না। রাশি রাশি কলাপাতা কাটা এবং কুশাসন বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কুকুররা আসন গ্রহণ করিবে। খুরিতে খুরিতে দধি ও পায়স দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে একটি কুকুর আসিল। কুকুর আসিয়া ধীরে সুস্থে কুশাসনের উপর আসন গ্রহণ করিল। তাহার পর প্রত্যেক আসনেই একটি করিয়া কুকুর আসিয়া বসিল।

কুকুরে কুকুরে মারামারি ঝগড়া-ঝগড়ি —কিছুই নাই। ভাত ছিটানো বা ছড়ানো—কিছুই নাই। সকলেই নিজ নিজ আসনে বসিয়া খিচুড়ি এবং ফুলুরি খাইতে লাগিল। পায়েসের খুরি চাটিয়া চাটিয়া খাইয়া পাত পরিষ্কার করিয়া প্রসাদ সেবা করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন নেড়া মাথা বালক সাধুদল আসিয়া সেই উঠান পরিষ্কার করিল। কেহ কেহবা কুকুরের উচ্ছিষ্ট পাতা হইতে তুলিয়া দুই-একটা অন্নও মুখে দিল। এ যেন একটা মহা-প্রসাদ। এইভাবে কুকুরের মহোৎসব সম্পূর্ণ হইল। নবদ্বীপের বাবাজীরা এই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

সেইদিন হইতে বনচারীর বাগান একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। বহু দূর হইতে লোক আসিয়া দর্শন করিয়া যাইত এবং রাধারমণকে টাকা এবং বস্ত্র প্রভৃতি উপহার দিত। এইভাবে দিনে দিনে বনচারীর বাগানের মঠের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। গভর্নমেণ্ট হইতেও কিছু কিছু সাহায্য আসিল। শুনিয়াছি, এখন সেই মঠ শূন্য পড়িয়া আছে। তাহার স্মৃতি কিন্তু আমার মনে আজও জাগরিত হইয়া আছে।

ইহার পর শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় আশ্রমের ভার লইলেন। এই রামদাস বাবাজীর আমলে প্রকাণ্ড একটি বৈষ্ণব শাস্ত্রাগার স্থাপিত হইয়াছে। বরাহনগরে প্রতি বৎসর দ্বাদশীর দিনে বহুদূর হইতে লোকসমাগম হইতেছে। মহাপ্রভু যেদিন প্রথম ওই স্থানে পদার্পণ করেন সেইদিন, সেখানে মহামহোৎসব হয়। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে একবার দর্শন করিয়া আসিতে পারেন। বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহশালা কীরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাও দেখিয়া আসিতে পারেন। এটি বৈষ্ণব সমাজের একটি স্মরণীয় কীর্তি।

শ্রীরামদাস বাবাজীর হৃদয়দ্রবকারী কীর্তন যিনি একবার শুনিয়াছেন তিনি তাহা কখনই ভুলিতে পারিবেন না। সে যেন কীর্তন নয়, সাক্ষাৎ ভগবানের সহিত আলাপ-আলোচনা। ওড়িশা দেশে থাকিবার সময় মহাপ্রভু যেসব লীলা করিয়াছিলেন সে সব যেন প্রত্যক্ষ হইয়া দর্শকের চক্ষে প্রতিভাত হয়। সেই রথাগ্রে নৃত্য, সেই গুণ্ডিচামার্জন, সেই বৈষ্ণব সমাজের ওড়িশা দেশে আগমন, সেই মহারাজা প্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণব সেবা, সেই নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি—এই সমস্ত অতীত ইতিহাস দর্শক যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পান।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু
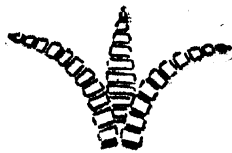
তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। তোমার পাঠসূচিও দেখা গেল। আমার বক্তব্য এই যে, অন্যান্য সকল বিষয়ের চেয়ে সংগীতশিক্ষাই তোমার প্রধান বিষয়। বিশ্বভারতীর একটি প্রধান অঙ্গ সংগীতবিদ্যা। তুমি যদি এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ কর তাহলে আমি আনন্দলাভ করব এবং বিশ্বভারতীর পক্ষে সে একটা গৌরবের বিষয় হবে। পণ্ডিতজি দিনু এবং নকুলেশ্বরের কাছ থেকে কণ্ঠসংগীত তুমি অভ্যাস কোরো—সংগীতের অবকাশে অন্যান্য বিদ্যায় হাত দিতে পার কিন্তু ঐটির প্রতিই বিশেষভাবে তোমাকে মন দিতে হবে। প্রতি মাসে ১৫টি করে গান শিখতেই হবে এমন একটা পণ করে রেখো। তাছাড়া স্বরলিপি তোমার এমন অভ্যাস করা কর্তব্য যে বই পড়ার মত স্বরলিপি থেকে যাতে গান গাইতে পার। অর্থাৎ প্রতিদিনই কিছু কিছু স্বরলিপি তোমাকে অভ্যাস করতে হবে। আজকালকার দিনে কোনো য়ুরোপীয় ভাষা ও সাহিত্য না শিখতে পারলে বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে আমাদের যোগ সাধন হয় না এবং বিদ্বানের সমাজে আমাদের আসন সংকীর্ণ হয় এই জন্যেই তোমাকে ইংরেজী ভালমত শিখতেই হবে নইলে সংগীত সাধনার খাতিরে সেটাও তোমাকে বাদ দিতে বলতুম। যাই হউক ভারতীয় বিদ্যার মধ্যে সংগীতকেই তুমি প্রধানভাবে অবলম্বন কোরো—বিশেষত আমাদের দেশে ভদ্রসমাজে এই বিদ্যার চর্চা বিলুপ্ত হওয়াতে আমাদের দেশের পক্ষে একটি গুরুতর দুর্গতির কারণ ঘটবে সেকথা আমরা মনে রাখিনে এবং এই পরম ক্ষতির জন্যে আমাদের বেদনা বোধও চলে গেছে। বিশ্বভারতী থেকে আমাদের এক একজন ছাত্রকে এক একটি বিশেষ ভার নিতে হবে—নইলে কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণ হবে না। যার যে বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ও শক্তি আছে তাকে সেই বিষয় বেছে নিতে হবে। সংগীতে তোমার নিষ্ঠা আছে বলেই আমি তোমাকে সংগীতে বিশেষজ্ঞতা লাভ করতে উৎসাহ দিচ্ছি।

আশ্রমে আমার অবর্ত্তমানে সম্ভবত বীণকর না আসতেও পারেন সেজন্যে হতাশ হোয়ো না। ততদিন নকুলেশ্বরের কাছ থেকে সুরবাহার অভ্যাস কোরো—তিনি সুরবাহার এস্রাজের চেয়ে ভালই জানেন—এর পরে বীণা শেখার সুবিধা হবে। আমার অনুপস্থিতিকালে আশ্রমে শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে কিছু কিছু ত্রুটি ঘটবার আশংকা আছে সেজন্যে তোমাদের মনে যেন কোন ক্ষোভ না জন্মায়। শুভদিনের জন্যে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কোরো। আমি সেই ভরসায় আমেরিকায় ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যাচ্ছি। এবারে রিক্ত হাতে ফিরব না এই আমার দৃঢ় সংকল্প। আমাদের অর্থদৈন্য চির-দিনের মত ঘুচিয়ে আসতেই হবে। আমার মন আশ্রমে তোমাদের কাছে—নির্ব্বাসন আমার পক্ষে বড় দুঃখের—আমেরিকার দ্বারস্থ হয়ে অর্থ সংগ্রহ করা আমার মত মানুষের পক্ষে বড় কঠিন অধ্যবসায়—কিন্তু আশ্রমের দিকে তাকিয়ে এই দুঃসহ দুঃখ বহন করতে প্রস্তুত হয়েচি। ইতিমধ্যে কিছু দুঃখ যদি তোমাদের ভাগ্যেও পড়ে তবে প্রসন্ন মনে গ্রহণ কোরো—একদিন তার পুরস্কার পাবে। বিশ্বভারতীতে

স্কেচ — শ্রীনন্দলাল বসু

তোমরা বিদ্যার সাধন করচ সে কেবল তোমাদের নিজের উপকারের জন্যে নয় দেশের কথা মনে কোরো। আজকের দিনে এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে কত তপস্বী, মানবের হিতের জন্যে কঠিন তপস্যায় প্রবৃত্ত—আমাদের দেশেও তপস্বী চাই নইলে কল্যাণ নেই—তোমরা সেই তপস্যা গ্রহণ করেচ এই কথা মনে করে ভারতের কাছে বিশ্বদেবতার কাছে আত্মনিবেদন কর এই আমার উপদেশ এবং তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হোক্ জীবন সার্থক হোক্ এই আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি অগষ্ট ৫, ১৯২০।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অনাদি, তোমার চিঠিতে বিশ্বভারতীর সংবাদ পেয়ে খুব খুসি হলেম। বীণকর ওখানে না যদি থাকেন তবে তুমি গোঁসাইজির কাছ থেকে সুরবাহার অভ্যাস কোরো—এবং বিশেষ যত্ন করে স্বরলিপি শিখো। স্বরলিপি এমন শেখা চাই যাতে দেখে দেখে বইপড়ার মত গান গাইতে পার—এদেশে অনেকেই তা পারে। সুতরাং এ কেবল অভ্যাস সাপেক্ষ। আর একটি কাজ কোরো—দিনুর কাছ থেকে ইংরেজি সংগীতের staff notation-ও শিখে নিয়ো। ঐ নোটেশনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের সংগীতকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করবার জন্যে ঐ নোটেশনের দরকার হবে। অনতিদূর ভবিষ্যতে য়ুরোপীয় সংগীতে পারদর্শী কোনো য়ুরোপীয় ওস্তাদকে আমাদের বিশ্বভারতীর জন্যে সংগ্রহ করব এ আমার মনে আছে। ইতিমধ্যে তুমি আমাদের প্রাচ্য-সংগীত যথাসম্ভব অভ্যাস ও আয়ত্ত করে নিয়ো। ভবিষ্যতে পাশ্চাত্ত্য সংগীতেও তোমাকে প্রবেশলাভ করতে হবে—তার পরে তুমি আমাদের বিশ্বভারতীতে একদা সংগীতাচার্য্য হবে এই আমার মনে আছে। স্বরলিপি যদি তোমার আয়ত্ত হয় তাহলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে লৌকিক সংগীত তুমি সংগ্রহ করে আনতে পারবে—সেই একটা মস্ত বড় কাজ আমাদের সামনে রয়েচে, এই কাজের ভার তুমি নেবে বলে সংকল্প কর। যদি একথা তোমার মনে লাগে তাহলে ইতিমধ্যে বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে তোমাকে সুরের কান দোরস্ত করে নিতে হবে, যাতে অতি সূক্ষ্ম সুরও তুমি শোনবামাত্র ধরে নিতে পার। আমাদের দেশের সংগীত ব্যবসায়ীরা সংগীতের মজুরি করে মাত্র, তোমাকে সংগীত বিদ্যার আচার্য্য হতে হবে—সে রকম কোনো লোকই আজ ভারতবর্ষে নেই। আগামী বৎসরে আমি যখন আশ্রমে ফিরব তখন যেন দেখতে পাই তুমি অনেকদূর এগিয়ে গেছ। কন্ঠ-সংগীত তুমি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পণ্ডিতজি এবং গোঁসাইজি উভয়েরই কাছ থেকেই অভ্যাস কোরো—কেননা উভয়ের মধ্যে সংগীত রীতির হয়ত কিছু পার্থক্য আছে, সে পার্থক্য তোমার জানা চাই। পণ্ডিতজীকে আমার সাদর নমস্কার সম্ভাষণ জানিয়ো এবং তুমি এবং ছাত্রেরা আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি, ৩০ আগস্ট

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Observatory Alipur 192—

কল্যাণীয়েষু,

আচ্ছা, বীণা তুই অর্ডর দিস্। তৈরি হতে বোধহয় মাস দুই লাগবে—টাকার ব্যবস্থা করা যাবে। ইতিমধ্যে ছুটিটা যদি কলকাতায় কাটাস তাহলে গোঁসাইজির কাছে তোর গান শেখার বন্দোবস্ত করতে পারব, কিছু দিতে হবে না। বিশ্বভারতী আপিসে তোর থাকবার জায়গা হবে, ওখানে ছুটির কয় সপ্তাহ ছাত্র ও ছাত্রীদের বাংলা গান শেখাবার ভার তোকে নিতে হবে—তাতে তোর কলকাতার খরচ পুষিয়ে যাবে। শুধু তাই নয় ভবিষ্যতে যদি কোনো সময়ে জীবিকার জন্য কলকাতায় গান শেখাবার কাজ গ্রহণ করতে হয় তাহলে এই উপলক্ষ্যে তার ভূমিকা হবে, তোরও পরিচয় লোকে কিছু কিছু পাবে। আগামী মঙ্গলবারে সংগীত সভার প্রথম অধিবেশন হবে। সেইদিনই যদি আসতে পারিস ত ভাল হয়—এজন্য কিছু আগে হতেই যদি ছুটি নিতে পারিস চেষ্টা করিস—এখানকার এই কাজটা বিশ্বভারতীর—অতএব এই কয়দিনের আগাম ছুটি মঞ্জুর হতে হয়ত বাধা হবে না। ইতি ১১ আশ্বিন ১৩৩০

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই তিনখানা অপ্রকাশিত চিঠি রবীন্দ্র সংগীতের অন্যতম কর্ণধার শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদারকে লেখা। শ্রীদস্তিদার যখন শান্তিনিকেতনে সংগীত-বিদ্যার চর্চায় রত, সেই সময়ই প্রথম দু'খানি চিঠি তিনি লন্ডন থেকে পান। তৃতীয় চিঠি লেখা কলকাতা থেকে।

চিঠিতে উল্লেখিত দিনু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীনকর—পণ্ডিত সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী, পণ্ডিতজী—পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী এবং নকুলেশ্বর, নকুলেশ্বর গোস্বামী। দু নম্বর চিঠিতে বর্ণিত গোঁসাইজী হচ্ছেন নকুলেশ্বর গোস্বামী এবং তিন নম্বর চিঠিতে বর্ণিত গোঁসাইজি হচ্ছেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী।

[চিঠিগুলি শ্রীদস্তিদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

শকুন্তলার আংটি

যাযাবর

রানো আমলের সাদা সাহেবেরা বলতেন, — স্যুটীর। হাল আমলের কালো মনিবেরা ডাকেন, — নোবাঁশ। আসলে নামটা সুধীর খাশনবীশ। কেরানীরা বলে,—বাঁশনবীশ। অবশ্য আড়ালে। সামনে 'স্যার' ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধন করবে তাঁকে এমন বুকের পাটা নেই কারো।

এটাচড্ আপিসের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক থেকে মিনিস্ট্রির ডেপুটি সেক্রেটারী। শিলিগুড়ির সমতলভূমি থেকে প্রায় কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংএর বেসমেণ্ট থেকে টেরেস। দুষ্প্রাপ্য প্রমোশনের সোপানে সোপানে উত্তীর্ণ হয়েছেন খাশনবীশ। শত্রুপক্ষ নিন্দা রটায়,—ইস, আঙুলে ফুলে কলাগাছ। অর্থী-প্রত্যর্থীর দল প্রশংসায় গদগদ হয়ে বলে,—ওহো, রিজেন ফ্রম দি র‍্যাঙ্কস, কী অপূর্ব কর্মক্ষমতা!

লোকটা কাজের, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। বিদেশী এবং স্বদেশী দুই রাজত্বেই সমান সুনাম আছে খাশনবীশের। উপরওয়ালারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চুনি, পান্না বসানো জড়োয়া গয়নার মতো তাঁর ক্যারেক্টার-রোলগুলি "হাইলী এফিসিয়েণ্ট", "এক্সট্রিমলী ডিলিজেন্ট" প্রভৃতি বাছা বাছা ইংরেজী বিশেষণের দ্যুতিতে ঝলমল।

সেটা কিছু অহেতুক নয়। সরকারী কাজে এমন অনান্যমতি মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। ঋতুভেদে সূর্যের উদয়-অস্তের তারতম্য ঘটে। শুধু খাশনবীশের আপিসে আসা-যাওয়ার সময়ের এদিক-ওদিক নেই। তাঁকে সকালে দশটার পাঁচ মিনিট আগে ছাড়া পরে আসতে কেউ কখনও দেখেনি।

রাতসাড়ে সাতটার আগে বাড়ি ফিরেছেন এমন ঘটনা বিরল।

সেবারে খাশনবীশের ছেলের অসুখ। তিনদিন জ্বরের বিরাম নেই। আপিসে যাওয়ার আগে স্ত্রীকে আশ্বাস দিলেন, বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন। পিছনে খাশচাপরাশীর কাঁধে ফাইলের বোঝা সহ যখন বাড়ি এলেন, রাত তখন প্রায় নটা!

স্ত্রীর কাছে এটা অভূতপূর্ব নয়। তিনি নিজেই ডাক্তারকে খবর দিয়েছিলেন। পাণ্ডে ডাক্তার পরিবারের অনেক দিনের বন্ধু, প্রায় ঘরের লোকের মতো। চিকিৎসা এবং প্রয়োজন মতো ভর্ৎসনা দুইই করে থাকেন। অবাক হয়ে বললেন, "বাড়িতে ছেলের এমন অসুখ, আর তুমি রাত নটা অবধি আপিস করছো? একী কাণ্ড?"

খাশনবীশ কৌতুক স্বরে বললেন, "বল কেন ভায়া! পৌনে পাঁচটায় চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় জয়েন্ট সেক্রেটারী ডেকে বললেন,—কাল সাড়ে দশটায় কমার্স মিনিস্ট্রিতে জরুরী মিটিং। নোট তৈরী করে সকাল সাড়ে আটটায় পৌঁছে দেওয়া চাই তাঁর বাড়িতে। দেখ দেখি একবার হুজুরের আক্কেল; মিটিং হবে, তা' সে কথা দু'দিন আগে বলবি তো। না একেবারে শিরে সংক্রান্তি! খোকা আছে কেমন? সিরিয়াস কিছু নয়তো?"

ডাক্তার সে প্রশ্নের জবাব না, দিয়ে বললেন, "তাঁকে বলতে পারলে না যে তোমার ছেলের অসুখ, ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছ। তিনি তাঁর নোট অন্য আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নিতেন।"

"তিনি করিয়ে নেবেন? তবেই হয়েছে আর কি? গাড়ি নিয়ে সেজেগুজে মেম-সাহেব আগের ভাগেই এসে বসেছিলেন। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই হর-পার্বতী চলে গেলেন পার্টিতে।" নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন খাশনবীশ।

সে হাসিতে কিছুমাত্র যোগ না দিয়ে ডাক্তার বললেন, "যাঁর মিটিং তিনি গেলেন পার্টিতে, আর যাঁর ছেলের অসুখ সে রইল তাঁর কাজ করতে। খুব চমৎকার ব্যবস্থা দেখছি!"

এবার গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন খাশ-নবীশ, "আরে ভাই এ যে তোমাদের রঘুপতি রাঘব রাজারামের রাজ্য। এখানে ঐ তো হয়েছে রেয়াজ। সেক্রেটারিয়েটে পনর আনা লোকই কাজ করে না, কেবল গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। তাই যে দু'চারজন লোক খাটে, তাদের একের ঘাড়ে দশের বোঝা চাপে। নাঃ আর পারিনে, চাকরি বাকরি ছেড়ে দিলে বাঁচি।"

বিরক্তিটা যে কপট, তা বুঝতে বাকী থাকে না কারো।

ডাক্তার রাগ করে বললেন, "রাখো তোমার ন্যাকামি। তুমি না থাকলে যেন গভর্নমেণ্ট অচল আর দুনিয়া উল্টে যাবে!"

খাশনবীশের অভাবে গভর্নমেণ্টের পতন এবং পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে এমন কথা তিনি বলেন না। তবে তিনি নজর না দিলে অসাবধান সেকশন-অফিসার আর অপরিপক্ক আণ্ডার-সেক্রেটারীরা কোথায় যে কী তাল-গোল পাকিয়ে রাখবে তার কিছু ঠিক আছে কি?

এ ধারণাটা শুধু খাশনবীশেরই নয়, তাঁর উপরওয়ালাদেরও। তাঁরা জানেন, যে কোনো দুরূহ কাজের ভার খাশনবীশকে দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাই সময়ে এবং অসময়ে তাঁরই ডাক পড়ে।

মেয়ের বিয়ের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন খাশনবীশ। দুমাস, একমাসের আর্ণড লীভ নয়। ক্যাসুয়েল। মোটে চারটি দিনের। পার্লামেণ্টে বাজেট সেশান চলছে, এ সময়ে বেশীদিনের ছুটি চাইবেন কী করে? খাশনবীশের কি বিচার বিবেচনা নেই?

কিন্তু সে চারটি দিনেও সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। আপিস জড়িয়ে থাকে খাশনবীশের অদৃষ্টে। বিয়ের দিন সকাল বেলায় পট্টবস্ত্র পরে কুশাসনে বসেছেন আভ্যুদয়িকে। পুরোহিত মশায় মন্ত্র পড়াচ্ছেন,—মধুবাতাঋতায়তে। এমন সময় টেলীফোন আসে স্বয়ং সেক্রেটারীর কাছ থেকে। পার্লামেণ্ট-কোশ্চেনের ফাইল পেশ হয়নি মন্ত্রীর কাছে। যার উপরে ভার ছিল সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেছে হাসপাতালে। আজকের দিনে খাশ-নবীশকে ওয়ারী করতে হচ্ছে এজন্যে তিনি অফুলী সরি! কিন্তু খাশনবীশ যদি—

'যদি'র কোনো অবকাশ নেই খাশনবীশের কাছে। তৎক্ষণাৎ ফাইল হাতে স্টেনোগ্রাফার এল খাশনবীশের বাড়িতে। উঠানে মেরাপ বাঁধা হচ্ছে। আত্মীয় বন্ধুরা কেউ তদারক করছেন ভিয়েনের, কেউ ছুটেছেন বাজারে, কেউ বা ফর্দ মিলিয়ে সন্দেশের থালা, দৈ-এর হাঁড়ি তুলছেন ঘরে। স্বজন-কুটুম্ব, ছেলে-মেয়ের কলকোলাহলে বিয়েরবাড়িতে কোথাও এতটুকু নির্জন জায়গা নেই। বারান্দার এক কোণে টুল পেতে বসে ওরই মধ্যে কন্যা-কর্তা লোকসভার প্রশ্নের জবাব এবং "নোট ফর সাপলিমেণ্টারী" লিখে দিলেন।

আশ্চর্য নয় যে আপিসে খাশনবীশের খাতির প্রচুর এবং প্রতিপত্তি প্রভূত। উপরস্থ কর্তারা তাঁকে যে পরিমাণে পছন্দ করেন, অধীনস্থ কর্মচারীরা ঠিক সেই পরিমাণে করে ভয়। নিজের ভুলচুক নেই, তাই অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে তিনি ক্ষমা-হীন। না বলে কয়ে এক কেরানী ক'দিন অনুপস্থিত। সে আপিসে আসতেই তাকে লিখিত কৈফিয়ৎ দিতে হল। জ্বর হয়েছিল বললেই পার পাওয়া যায় না। অসুস্থতা অপরাধ নয়। অসুখ করলে কাজে না আসাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু নিয়ম অনু-সারে ছুটির দরখাস্ত পাঠায়নি কেন? অফিস ডিসিপ্লীন নেই কি?

এক চাপরাশী কাবুলিয়ালার কাছে টাকায় চার আনা সুদে ধার নিয়েছিল। খাশনবীশ জানতে পেরে নিজে উদ্যোগী হয়ে আপিসে কো-অপারেটিভ ব্যাংক চালু করলেন। আপদে বিপদে গরীব কর্মচারীরা যাতে ঋণ পেতে পারে। কিন্তু চাপরাশীর সাসপেনশন রোধ হল না। সরকারী কর্মচারীদের কণ্ডাক্টরুলসে ধার দেওয়া এবং নেওয়া দুই-ই নিষিদ্ধ। সে কথা তো ভুললে চলে না। খাশনবীশ নির্দয় নন, নিয়মনিষ্ঠ।

প্রতাপ শুধু আপিসেই সীমাবদ্ধ নয়, নিজের বাড়িতেও প্রসারিত। সাধারণতঃ সমাজে স্ত্রী-পুরুষের কর্তৃত্বের একটা এলাকা বিভাগ থাকে। স্বামী আপিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটেন, টাকা আনেন। স্ত্রী ঘরকন্না দেখেন, ছেলে মেয়ের, স্বামী শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষা করেন। গৃহে তাঁর শাসন নিরঙ্কুশ। সদর-অন্দরের এই কার্য বিভাগের ফলে সংসার যাত্রাটা সুগম হয়। কিন্তু খাশনবীশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইউনিটারী ছাড়া অন্য কোনো গভর্নমেণ্ট নেই। প্রভিন্সিয়েল অটোনমীতে তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর স্ত্রী শৈলবালার আরাম আয়েসের আয়োজন ত্রুটিহীন। ঝি, চাকর, রাঁধুনি, মোটরগাড়ি, রেফ্রিজারেটার কোনো কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু গৃহের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে নয়। খাশনবীশ নিজে সেকরা ডেকে গিন্নীকে বার ভরি সোনার বালা গড়িয়ে দেন। সে বালা মকরমুখের হবে কি বলপ্যাটার্ণের হবে সে সিদ্ধান্তও করেন তিনিই। পূজা পার্বণে ফি বছর দামী বেনারসী, চান্দেরী কিনে আনেন দোকান থেকে। শীতের মর্শুমে কেনেন শাল বা মলিদা। কিন্তু তার পাড় বা রং পছন্দ করার স্বাধীনতা নেই স্ত্রীর। আলমারীর চাবির গোছাটা ভদ্রমহিলার আঁচলে। কিন্তু সংসারের চাবিকাঠিটি তাঁর স্বামীর পকেটে।

এই নিরবচ্ছিন্ন একাধিপত্যের মধ্য দিয়েই কেটে গেছে এতকাল। কোনোখানে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু নিশ্ছিদ্র পাথরের দেয়ালেও ফাটল দেখা দেয় একদিন, নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলেও ঢেউ ওঠে কখন কখনও।

ছুটির দিনে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ হয়েছে। পান চিবুতে চিবুতে একটা আরাম কেদারায় আধশোয়া ভাবে বিশ্রাম করছিলেন খাশনবীশ। স্ত্রী ক'দিন থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সন্তর্পণে কথাটা পাড়লেন।

"এবার পল্টুর বিয়ে দিলে হয় না?"

পল্টু অর্থাৎ ছেলে। বাড়ির একমাত্র পুত্র-সন্তান। বছর চব্বিশ বয়স। যেমন

সুদর্শন, তেমনি মেধাবী। স্কুল কলেজে স্কলারশিপ পেয়েছে বরাবর। সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে সেখানেই হাউস-সার্জেন হয়েছে।

কথাটা খাশনবীশের মনেও উদয় হয়েছে বটে। বললেন, "আমিও তাই ভাবছিলুম। সেদিন ভবেশ রায় বলছিল তার মেজ মেয়েটির কথা—"

স্ত্রী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, "রাম বল, সে মেয়ে যেমন কালো তেমনি বেঁটে। তাকে পল্টুর কখনও পছন্দ হবে না।"

পল্টুর পছন্দ অপছন্দের কথাটা অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক। তবে কালো মেয়ে ঘরের বউ করা খাশনবীশের নিজেরও ইচ্ছা নয়। তাই এসম্বন্ধে তিনিও নিরুৎসাহ ছিলেন। বললেন, "বিয়ের প্রস্তাব তো কতই আসছে। তার মধ্যে খুঁজে বেছে একটি ঠিক করলেই হবে।"

চতুর সেনাপতির সুকৌশল সৈন্য-পরিচালনার মতো গৃহিণী এবার আলোচনাটা নিজের অভীষ্ট পথে টেনে আনলেন। বললেন, "অত খোঁজাখুঁজির দরকার কী? আমাদের চেনা-জানা একটি ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে দিলেই তো হয়।"

চেনা-জানার মধ্যে মেয়ে নিশ্চয়ই আছে। হয়তো একটু অতিরিক্ত মাত্রায়ই আছে। কিন্তু ভালো মেয়ে বলতে বোঝায় কাকে? খাশনবীশ জিজ্ঞাসু নেত্রে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।

স্ত্রী বেচারী এতক্ষণ ধরে যে সাহস সঞ্চয় করেছিলেন খাশনবীশের দৃষ্টির প্রথম আঘাতেই তার অর্ধেক অন্তর্হিত হলো। কদিন ধরে নিজের মনে মনে সম্ভবপর কথা-বার্তার একটা মহড়া দিয়ে রেখেছিলেন। কোন প্রশ্নের কী জবাব দেবেন তা আগের ভাগেই ভেবেছিলেন। এখন তা সবই গুলিয়ে গেল। কোনোমতে তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, "এই ধরো যেমন দীপালী, কিম্বা—" কথাটা নিজের কানেই বড় আচমকা ঠেকল। শেষ করতে পারলেন না।

খাশনবীশ খাড়া হয়ে বসলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "দীপালী? সুরেন চৌধুরীর মেয়ে?"

স্ত্রী ঘাড় নেড়ে জানালেন, সেই।

"পাগল!" একটিমাত্র শব্দে সমস্ত নস্যাৎ করে দিলেন খাশনবীশ।

পরিবারের চিরাচরিত রীতিতে আলোচনাটার ঐখানেই ইতি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। একবার ভয় ভেঙে যেতেই শৈলবালার মনে আর দ্বিধা সংকোচ রইল না। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কেন? আপত্তি কিসের? দীপালী দেখতে সুশ্রী, স্বভাবটি মিষ্টি। তার মা গরীব বটে, কিন্তু আমাদের তিনি কম উপকার করেননি।"

সমস্তই সত্য। খাশনবীশের প্রথম কেরানী জীবনে দীপালীর মা-বাবা তাঁর পাশের বাড়িতেই থাকতেন। দীপালী মেয়েটি তখন সবে জন্মেছে। খাশনবীশের স্ত্রী তিন বছরের ছেলে কোলে নিয়ে প্রথম এলেন দিল্লী সহরে। সঙ্গে এনেছিলেন বাক্স, বিছানা, রান্নার বাসনপত্র ও ম্যালেরিয়া। কাঁপুনি-ধরা জ্বরে প্রায়ই বিছানায় পড়ে থাকতেন। অজ্ঞান-অচৈতন্য। বিদেশ-বিভুঁই, মুখে জলটুকু দেওয়ার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। সে সময়ে দীপালীর মা-বাবা আপনজনের মতো দেখাশোনা সেবাযত্ন করে-ছিলেন। নইলে খাশনবীশের স্ত্রী সেরে উঠতেন কিনা সন্দেহ। দীপালী ছোটবেলায় পল্টুর সঙ্গে খেলেছে, কিন্ডারগার্টেনে একই স্কুলে পড়েছে।

হঠাৎ সুরেন চৌধুরী মারা গেলেন। বিধবা মেয়ে তিনটিকে নিয়ে চলে গেলেন কলকাতায়। সেখানে স্বামীর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় বড়টির বিয়ে দিয়েছেন, মেজটি মাস্টারী করছে। দীপালী সর্ব-কনিষ্ঠা। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করেছে। কলেজে পড়ার খরচ অনেক, তাই নার্সিং কোর্স করছে। দূরে থেকেও দুই পরিবারের হৃদ্যতার বন্ধন একেবারে ছিন্ন হয়নি। কলেজ হোস্টেলের একঘেয়ে খাওয়ায় অরুচি ধরে, তাই পল্টু প্রায়ই পটলডাঙা থেকে কালীঘাটে যায় কাকীমার হাতের রান্না খেতে। মাঝে মাঝে মেয়ে দীপালীরা দুবোন বেড়াতে আসে দিল্লীতে জেঠাইমার বাড়িতে। দীপালী মেয়েটি লোকের মন কুড়াতে পারে সন্দেহ নেই। অমন যে দুর্ধর্ষ খাশনবীশ, নিজের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত সব সময়ে যাঁর কাছে ঘেষতে চায় না, তাঁকেও সে বশ করতে ছাড়েনি। যে কদিন দীপালী থাকে, আপিসে যাওয়ার সময় পানের কৌটো, নস্যির শিশি, সাদা ধবধবে রুমাল সবই হাতের কাছে পাওয়া যায়। সে চলে গেলে খাশনবীশেরও মনে হয় বাড়িটা যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।

কিন্তু পরের মেয়েকে স্নেহ করা এক কথা, তাকে পুত্রবধূ করা আর। বিশেষত একে ভিন্ন জাত, তায় নার্স। অসম্ভব।

খাশনবীশের মনোভাব স্ত্রী আগেও অনুমান করেছিলেন। এখন আর সে সম্পর্কে কোনো সংশয় রইল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তোমার ছেলে কিন্তু ঐ মেয়েকেই পছন্দ করে রেখেছে।"

এর চেয়ে এটম বা হাইড্রোজেন বোমা ফাটালেইবা ক্ষতি ছিল কি? হিরোশিমার লোকেরা কি এর চেয়ে বেশী অপ্রস্তুত ছিল?

উদ্দীপ্ত ক্রোধ যথাসাধ্য দমন করে খাশনবীশ জিজ্ঞাসা করলেন, "কী করে জানলে? সে তোমায় বলেছে?"

"না, চিঠিতে জানিয়েছে।" স্ত্রী জবাব দিলেন।

"কৈ, দেখি সে চিঠি।" বললেন খাশ-নবীশ।

স্ত্রী জানালেন, চিঠিটা তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন। কথাটা সত্য নয়। চিঠিটা তিনি নিজের আলমারীতে শাড়ির নীচে লুকিয়ে রেখেছেন। খাশনবীশ সে চিঠির সবখানি পড়বেন, এ তাঁর ইচ্ছা নয়।

খাশনবীশ চিঠির জন্য কোনো ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন না। স্ত্রীকে বললেন, "ছেলেকে লিখে দিও, সে এখন বড় হয়েছে। নিজের জামা, জুতো যেমন পছন্দ কিনতে পারে। আমি আপত্তি করব না। কিন্তু তার বেশী বাড়াবাড়ি আমি পছন্দ করিনে।"

সেদিন থেকে খাশনবীশ আপিসে যান, ফাইল করেন, কেরানী চরান এবং ঐ দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যবিধির ফাঁকে ফাঁকে সম্ভবপর বৈবাহিকের সন্ধান করেন। তাঁর স্ত্রী ভাঁড়ার আগলান, রান্নাবান্নার তদারক করেন এবং আড়ালে নীরবে অশ্রুপাত করেন।

ছ'মাসে প্রায় ছ'ডজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে নিজের মনোমতো একটি পাত্রী আধাআধি নির্বাচন করলেন খাশনবীশ। আপিসের সাজ পরতে পরতে স্ত্রীকে বললেন, "আজ বিকেলে মেয়ে দেখতে যেতে হবে, তুমি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তৈরী হয়ে থেকো।"

স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। খাশনবীশ জিজ্ঞাসা করলেন, "চুপ করে রইলে কেন? আজ কি কোনো অসুবিধা আছে?"

স্ত্রী বললেন, "মেয়ে দেখতে হয়, তুমি একাই দেখ গে। আমি যাব না।"

বিস্মিত খাশনবীশ প্রশ্ন করলেন, "সে কী কথা? ভদ্রলোককে বলেছি, দুজনেই যাব, এখন—"

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই স্ত্রী বলে উঠলেন, "ছেলে যখন এ মেয়েকে বিয়ে করবে না জানি, তখন মিছেমিছি তাকে দেখতে যাওয়ার বিড়ম্বনা কেন?"

খাশনবীশ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "এ মেয়েকে নয় তো কোন মেয়েকে বিয়ে করবে শুনি?"

স্ত্রীর কাছে কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

খাশনবীশ বললেন, "হুঃ, আমি ভেবেছিলুম তার বিদঘুটে মতলব সে ছেড়েছে। দেখছি তা নয়। আমার সম্মতি নেই জেনেও সে ঐ দীপালীকেই বিয়ে করতে চায়? তার সাহস তো কম নয়?

স্ত্রী বললেন "সে তো তোমারই ছেলে। জেদ তারই বা কম হবে কেন?"

খাশনবীশ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন, "সে যেন মনে না ভাবে যে, ছেলে বলেই আমি তার বিলাতী নাটুকেপনা বরদাস্ত করবো। ইনডিসিপ্লীনকে প্রশ্রয় দেব না। আমার কথা মেনে তাকে চলতে

হবে, নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।"

ফাইল এবং জীবন—কোনো ক্ষেত্রেই নিজের সিদ্ধান্তের নড়চড় করেন না খাশনবীশ। পিতা-পুত্রের সম্পর্কে ঐখানেই ছেদ। বাপ যদি চিঠি লেখা বন্ধ করলেন, ছেলে চলে গেল স্বেচ্ছাবৃত বনবাসে অর্থাৎ আসামের কোন এক চা-বাগানে। সেদিন থেকে শুরু হল দুই তীরে দুই অভিমানক্ষুব্ধ পুরুষের স্বকৃত কৃচ্ছ্রসাধন, মাঝখানে বহমান নিরুপায় জননীর স্নেহকাতর অশ্রুস্রোত।

একমাত্র পুত্রকে পরিত্যাগের বেদনা দুঃসহ। কিন্তু তার ভার রইল শুধু খাশনবীশের মনে। আপিসের কাজে তার এতটুকু প্রকাশ নেই। সেখানে তাঁর মনোযোগ আরও প্রখর, তৎপরতা আরও সুস্পষ্ট।

মাস কয়েক পরেই খাশনবীশের বয়স পঞ্চান্নর কোঠা পার হবে। সরকারী চাকরির সেটা ডুরান্ড বা ম্যাকমোহন লাইন। পার হলেই নো ম্যানস্ ল্যান্ড—চলতি বাংলায় যাকে বলা যায় 'পেন্সন'। খাশনবীশের উদ্বেগের অবধি নেই। নিজের জন্য নয়, আপিসের জন্য। কেরানী ও অন্যান্য অফিসারদের কার কতটুকু দক্ষতা সে তো তাঁর অজানা নয়। তাঁর অবর্তমানে কাজকর্মের যে কী অবস্থা হবে, তা ভাবতে তিনি প্রায় শিউরে ওঠেন। কোন চিঠির জবাবে কী লেখা হবে, কোন ফাইলে কী নোটিং তার বিস্তারিত নির্দেশ লিখে রাখেন পৃথক কাগজে। ভবিষ্যতের জন্য। যে অফিসারটি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন তাঁর পাছে ভুল না হয়, সেজন্যে জরুরী কেসগুলির কোনটি কবে সেক্রেটারীর কাছে পেশ করতে হবে তার ফর্দ করে রাখেন একটা খাতায়। রিটায়ারমেণ্টের দিন আপিসে ঘটা করে বিদায় অভিনন্দন সভা হলো, সেক্রেটারী উচ্ছ্বসিত ভাষায় খাশনবীশের প্রশংসা করলেন, নিজের সুদীর্ঘ কর্মজীবনে এমন নির্ভরযোগ্য সহকর্মী খুব কমই দেখেছেন অকপটে স্বীকার করলেন। শুনে খাশনবীশের চোখে প্রায় জল আসার উপক্রম। গলায় ফুলের মালা এবং পকেটে নামখোদাই রুপোর সিগারেট কেশ উপঢৌকন নিয়ে শেষবারের মতো বাড়ি ফিরলেন।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই খাশনবীশের মনে পড়ল, আজ আর আপিসে যেতে হবে না। দাড়ি কামাবার তাড়া নেই, স্নান আহার সেরে সাড়ে নটার মধ্যে কোট প্যাণ্টুলান গায়ে চাপাবার প্রয়োজন নেই। আজ আর নীলরংএর 'ইমিডিয়েট' ও লাল রং-এর 'প্রাইওরিটি' স্লিপ-আঁটা ফাইল ঘাটতে হবে না, "ড্র্যাফট-ফর-এ্যাপ্রুভ্যাল" সংশোধন করতে হবে না। প্রাত্যহিক কার্যক্রমের একটানা বন্ধন থেকে আজ পরিপূর্ণ মুক্তি। কিন্তু কৈ, মুক্তির আনন্দ বোধ করছেন না তো!

এতদিন সকালবেলা খবরের কাগজটা পড়ার সময় পেতেন না। শুধু হেডলাইনগুলির উপরে চোখ বুলিয়ে নিতেন। আজ সময়ের অভাব নেই। প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার নাম, তারিখ থেকে শুরু করে শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশকের নাম, ছাপাখানার ঠিকানা পর্যন্ত প্রতিটি লাইন পড়ে ফেললেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ন'টা তখন বাজেনি। বাড়িতে রেডিওটা তিনিই কিনে এনেছিলেন। কিন্তু কোনোদিনই শোনার অবকাশ হয়ে ওঠেনি। আজ নিজেই রেডিওর সুইচটি খুলে দিলেন। হিন্দী সিনেমার গান আর দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন শুনে বিরক্তি ধরল। বন্ধ করে দিলেন।

ধীরে ধীরে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। রাস্তায় আপিসযাত্রীদের সাইকেল-অভিযান শুরু হয়েছে। কেরানী, দপ্তরী, চাপরাশীরা চলেছে দলে দলে। ট্রাফিক আইন বা রোড ম্যানার্সের কোনো ধার ধারে না। রংসাইড করে ডাইনে বাঁয়ে যদৃচ্ছা সাইকেল চালায়। আপিসে যেতে প্রতিদিন খাশনবীশকে এই বেপরোয়া সাইকেলবাহিনীকে বাঁচিয়ে সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে হতো। নিরাপদে অর্থাৎ কাউকে চাপা না দিয়ে আপিস না পৌঁছনো পর্যন্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলির উপরে সে এক নিদারুণ অত্যাচার। আজ আর তার আশঙ্কা নেই।

অয়েল মিনিস্ট্রির মধু সরকার যাচ্ছিলেন। খাশনবীশকে দেখে গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, এখনও তৈরী হওনি দেখছি, আপিসে যেতে হবে না? রিটায়ার করেছ? ও, তাই নাকি? কবে থেকে? তা বেশ বেশ, এবার প্রাণ ভরে জিরিয়ে নাও; ওয়েল আর্নড রেস্ট। আমাদের তো এখনও বছর চারেক ঘানি টানতে হবে!"

খাশনবীশ মৃদু হাসির চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে নিতান্তই কাষ্ঠহাসি। রাস্তা দিয়ে পরিচিত আরও দু চারজন গেলেন। তাঁরা হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানালেন। প্রতি-সম্ভাষণে খাশনবীশও যথারীতি হাত নাড়লেন। কেমন যেন লজ্জিত বোধ করলেন। কাল বিকেল পর্যন্ত তিনি ছিলেন তাঁদের সগোত্র। একটি রাত্রির অবসানে তিনি একটা পৃথক শ্রেণীতে নেমে এসেছেন। বুকের কোণে খচ করে একটা ব্যথা বাজল।

দূরে স্কুটার-বাহন প্রীতম সিংএর চেহারা দেখা গেল। মাথায় আসমানী রং-এর পরিপাটি পাগড়িটি। মুখে দাড়ির সযত্নবিন্যাস। দেখে মনে হয় বুঝি ধোপায় কাচা কাপড়ের মতো মাড় দিয়ে ইস্তিরি করা। সুট, টাই, কলারের বাহার দেখলে তাক লাগে। এ পাড়ায়ই থাকে। খাশনবীশের সঙ্গে দেখা হলেই বলে "নোবীশবাবু বেশী খেটে লাভ কী? গভর্নমেণ্টের চাকরিতে গ্রেড বাধা মাইনে। কাজে জান দিন কিম্বা ফাঁকি দিন, বছরের শেষে ইনক্রিমেণ্টের হার যে কে সেই। এক পয়সা কমবেশী হবে না।"

অপদার্থ কোথাকার! আজ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাক এটা খাশনবীশের ইচ্ছা নয়। মানুষের মৃত্যুর মতো সরকারী চাকরিতে রিয়াটারমেণ্টও অবধারিত। তবুও কেন যে প্রীতম সিংএর কাছে অবসর গ্রহণের কথাটা গোপন রাখার জন্য খাশনবীশ ব্যগ্র হলেন তা তিনি নিজেই জানেন না। তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে সরে গেলেন।

দুপুরে আহারের পর প্রথমে একটা মাসিক পত্রিকা পড়তে চেষ্টা করলেন। মন বসল না। দিবানিদ্রার উদ্যোগ করলেন। ফল হলো না। টেলীফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠতেই সবার আগে গিয়ে রিসিভার তুললেন। রং নাম্বার। বেলা পাঁচটার মধ্যে আরও দুটো টেলীফোন এল। দুবারই খাশনবীশ ধরলেন। না, একটাও আপিস থেকে নয়। একবার ভাবলেন নিজেই একটা টেলীফোন করে খবর নিলে কেমন হয়? বহু কষ্টে সে বাসনা দমন করলেন। আশা করলেন, আপিসের শেষে দু'একজন নিশ্চয়ই আসবে দেখা করতে। কেউ এল না। খাশনবীশের হতাশা তাঁর মুখে চোখে গোপন রইল না। দুপুর থেকে রাত দশটায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে সময়টুকু ঘড়ির অঙ্কে ঘণ্টা কয়েকমাত্র। কিন্তু খাশনবীশের কাছে মনে হয় যেন কয়েক যুগ। কী করে কাটাবেন ভেবে পান না।

পাড়ায় একটা ক্লাব আছে। তার সেক্রেটারী নাছোড়বান্দা লোক। খাশনবীশকেও সদস্য না করে ছাড়েনি। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে যে কখনও আপিসের টেবিল ছাড়তে পারে না তার পক্ষে শুধু চাঁদা দেওয়াই সার হয়, ক্লাবে যাওয়ার সময় কোথায়? যাক, এতদিনে বুঝি চাঁদাটার সদ্ব্যবহার হয়। কিন্তু খাশনবীশ সারাটা জীবন শুধু কাজই করছেন। খেলাধুলোর খবরও রাখেননি। পিং পং, ক্যারম বা অকশন ব্রিজ দূরে থাক, সাধারণ টুয়েণ্টিনাইন কিম্বা ব্রে পর্যন্ত জানেন না। ক্লাবে গিয়ে করবেন কি? সরকারী কর্মচারীদের গল্পগুজব সমস্তই সেক্রেটারীয়েট কেন্দ্র করে। কোন সেক্রেটারী প্রাদেশিক গভর্নর বা বিদেশে রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন, কোন জয়েণ্ট সেক্রেটারীর কোথায় প্রমোশন আসন্ন, কোন মিনিস্ট্রিতে কোন মন্ত্রীর প্রীতিভাজনদের জন্য নূতন পদ সৃষ্টি হচ্ছে—তারই আলোচনা। সে আলোচনায় খাশনবীশ শ্রোতা মাত্র। তিনি কোনো নূতন তথ্য শোনাতে পারেন না। অস্বস্তি বোধ করেন। মনে হয় তিনি যেন আর পাঁচজনের সমকক্ষ নন। ক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিলেন।

টেলীফোনের মিস্ত্রী এসে খাশনবীশের বাড়ির টেলীফোনটি তুলে নিয়ে গেল। এটা অপ্রত্যাশিত নয়। গভর্নমেণ্ট অফিসারদের বাড়িতে সরকারী কাজের প্রয়োজনে সরকারী খরচে টেলীফোন দেওয়া হয়।

অফিসার বদলী হলে বা অবসর নিলে সে টেলীফোন তুলে নিয়ে তার অন্য অফিসারের বাড়িতে বসানো হয়। সরকারী নিয়ম কানুনে অভিজ্ঞ খাশনবীশের তা অজানা নয়। তবুও কেন যে তিনি আহত বোধ করলেন তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিগতদিনের পদমর্যাদার সর্বশেষ চিহ্ন ছিল ঐ টেলীফোনটি, আপিসের সঙ্গে তাঁর অন্তিম যোগসূত্র। আজ সেটিও ছিন্ন হওয়াতে বুকের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড ফাঁক অনুভব করলেন। রাত্রিতে শয্যায় শুয়ে চোখে ঘুম এল না। স্ত্রীকে বললেন, "চল কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আসি।"

স্ত্রী তাই চাইছিলেন। সোৎসাহে বললেন, "বেশ তো, চল না কলকাতায়। পরশু নাগাদ বেরিয়ে পড়ি।"

যে কারণে কলকাতার প্রতি স্ত্রীর আকর্ষণ, ঠিক সে কারণেই স্বামীর বিতৃষ্ণা। কলকাতা থেকে অসীম তো বাড়েই। শৈলবালার আশা,—ছেলেকে দেখতে পাবেন। খাশনবীশের আশঙ্কা,—ছেলেকে দেখতে হবে।

অবশেষে মরীয়া হয়ে স্ত্রী বললেন, "দেখ, দিনকাল বদলেছে। এখন সবাই তোমার মতে চলবে, এমন আশা করো না।"

খাশনবীশ খুশি হলেন না। বিরস কণ্ঠে বললেন, "ছেলে হয়ে সে বাপকে অগ্রাহ্য করবে, আর আমি তাই নিয়ে আনন্দে ধেই ধেই নেচে বেড়াব, এই তুমি চাও?"

স্ত্রী বললেন "আনন্দ নিরানন্দের কথা নয়। যা ঘটে তাই মানতে হয়। আর অগ্রাহ্য করার কথাই যদি বললে, একবার ভেবে দেখো তো, ছেলে যদি ভালোবাসার জোরেই বাপকে না মানে তবে শুধু কর্তৃত্বের চাপ টিকবে ক'দিন?"

সংসারে শৈলবালা কোনোদিন কোনো বিষয়েই নিজের মতামত প্রকাশ করেননি। খাশনবীশ যা স্থির করেছেন, নির্বিবাদে তাই মেনে নিয়েছেন। তাই আজ তাঁর এই স্পষ্ট ভাষণে খাশনবীশ বিস্মিত হলেন। স্ত্রীরও যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, নিজস্ব চিন্তাধারা আছে, সে কথা আজ প্রথম অনুভব করলেন। চুপ করে ভাবতে লাগলেন।

কলকাতার কথা স্ত্রী আর তুললেন না। দেশভ্রমণে খাশনবীশের কোনোকালেই আগ্রহ নেই। বাকী থাকে শুধু তীর্থ-পর্যটন। অবশেষে তাই স্থির হল। পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাওয়া যদি সম্ভব না হয় তবে অগত্যা বৃন্দাবনেই যাওয়া যাক। প্রচলিত গল্পের বিষয়াসক্ত অনিচ্ছুক তীর্থ-যাত্রীর মতো খাশনবীশ অবশ্য চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লাউ-এর মাচা দেখতে পাননি। তবে একথা ঠিক যে, কোনো তীর্থক্ষেত্রেই খাশ-নবীশের দু'একদিনের বেশী ভালো লাগল না। তাই বেনারসে শৈলবালার দিদি যখন বোনকে কিছুদিনের জন্য কাছে রাখতে চাইলেন খাশনবীশ আপত্তি করলেন না। সে অবকাশে তিনি একবার দিল্লী ঘুরে আসবেন। পেন্সনের কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

দেখা গেল, শুধু দুরাত্মার নয়, প্রয়োজন হলে সজ্জন ব্যক্তিদেরও ছলের অভাব হয় না। পেন্সনের কাগজগুলি উপলক্ষ মাত্র, আসল লক্ষ্য অন্যত্র। তাঁর অবর্তমানে আপিসটা কীভাবে চলছে তা জানার কৌতূহল দমন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

যে আপিসে খাশনবীশ তাঁর কর্মজীবনের সুদীর্ঘ কুড়িটি বছর কাটিয়েছেন ছ'মাস পরে সে আপিসে ঢুকতে গিয়ে আজ যেন একটা বিশেষ উত্তেজনা বোধ করলেন। এ-দালানের প্রতিটি কক্ষ, সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ, এমন কি দেয়ালের প্রতিটি ইটের সঙ্গেও বুঝি খাশ-নবীশের পরিচয় আছে। তবু প্রতি পদ-ক্ষেপেই তাঁর নাড়ীর গতি চঞ্চল এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হলো। পরীক্ষার হলে প্রবেশের মুখে পরীক্ষার্থীর মনে যে নার্ভাসনেস দেখা দেয়, ঠিক অনুরূপ অনুভূতি।

লিফটের মুখেই গুরুদত্তের সঙ্গে দেখা। নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল "কবে এলেন? কেমন আছেন?"

গুরুদত্ত মানুষটি ভালো, কাজেও চতুর। খাশনবীশ তাকে বরাবরই পছন্দ করতেন। খাশনবীশ খুশি হলেন। কিন্তু সে যে 'স্যার' সম্বোধন করেনি, সেটা খাশনবীশের মনোযোগ এড়াল না। ভাবলেন, ইচ্ছাকৃত নয়।

তাঁর নিজের পুরোনো ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ালেন। সাদা জমির উপরে কালো অক্ষরে "এস সি খাশনবীশ" লেখা বোর্ডটি নেই। আছে একটি নতুন বোর্ড। তাতে নতুন নাম। বিস্ময়ের কিছুই নেই। তবু খাশনবীশ যেন অবাক হলেন। ঠিক ঐখানে যে মাত্র কয়েকমাস আগে অন্য একটা নামের বোর্ড ছিল, তা বোঝার উপায় নেই তো আজ! দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। ঘরের নূতন মালিক তখনও আসেননি। খাশনবীশ নিজের হাত ঘড়িটির পানে তাকিয়ে দেখলেন দশটা বেজে ষোলো মিনিট। তাঁর কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত হলো। পাংচুয়ালিটির জ্ঞান নেই। অফিসারদের হাজিরা খাতায় সময় লিখতে হয় না বটে। কিন্তু তাঁদের নিজেদের কি সেন্স অব প্রপ্রাইটি থাকবে না? অফিসার নিজেই যদি দশটা বাজতে আপিসে না আসেন তবে কেরানীদের দেরী হলে কৈফিয়ৎ চাইবেন কোন মুখে?

খাশনবীশ ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। কৈ, কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই তো। কেলেন্ডারটি যেখানে ছিল সেখানেই ঝুলছে। তার ছবিতে তন্বঙ্গী রূপসীর মুখের হাসিটি এতটুকু ম্লান হয়নি। টেবিলে পিতলের কলমদানটি তেমনি উজ্জ্বল, চকচকে। আলমারী, শেলফ, 'ইন' ও 'আউট' লেখা কাঠের ট্রে দুটি সবই যথাস্থানে আছে। শুধু চেয়ারে এত-কাল যে মানুষটি বসতো সে নেই। কিন্তু তার অদর্শনে টেবিলের উপরে টাইমপীস ঘড়িটি বন্ধ হয়নি, মেজেতে কার্পেটের রং বিবর্ণ হয়নি। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করলেন খাশনবীশ। নির্লাজ কুলটা শুধু ভূমিই নয়। ঘরদোর, আসবাবপত্র সব কিছুই বহুবল্লভা নারীর মতো যখন যাহার তখনই তাহার। হৃদয়-হীন, শোকহীন, আনুগত্যহীন।

খাশনবীশ সেক্রেটারীর ঘরের কাছে যেতেই চাপরাশী বাধা দিয়ে বলল, "সিলীপ দিজিয়ে"।

স্লীপ, মানে কার্ড। কার্ড পাঠিয়ে ঢুকতে হবে খাশনবীশকে? অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন চাপরাশীটার পানে। চাপরাশী ছাড়বার পাত্র নয়। কেবলই বলে, বিনা সিলীপে ঢোকার অনুমতি নেই। ভাগ্যক্রমে সেইক্ষণে পুরানো চাপরাশী এসে পড়ল। সেলাম করে বলল, "এ নতুন লোক, হুজুরকে চেনে না। আপনি ভিতরে যান।" ব্যাপারটা কিছুই নয়। তবু খাশনবীশের মেজাজটা খিচড়ে গেল।

ঘরের ভিতরে খাশনবীশের অভ্যর্থনায় ত্রুটি হলো না। সেক্রেটারী হাসিমুখে করমর্দন করলেন। স্বাস্থ্যের খবর নিলেন। দুঃখ প্রকাশ করলেন, অনেক গল্প করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এক্ষুনি ঘরে বাজেট সংক্রান্ত জরুরী মিটিং হবে। বাৎসরিক ব্যাপার, খাশনবীশের তো জানাই আছে।

খাশনবীশ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বছরের পর বছর এই বাজেট-মিটিংএ খাশ-নবীশই ছিলেন ব্যবস্থাপক,—সেন্ট্রাল ফিগার বললেই হয়। বাজেটের খসড়াটা তিনিই করতেন। মিটিংটা ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে তা অনুমোদনের জন্য। আজ সেই মিটিং হবে বলে খাশনবীশকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হলো! খাশনবীশের বুকে ব্যথা বাজল। ভাগ্যক্রমে তিনি যখন এ সময়ে এসেই পড়েছিলেন, তখন তাঁকে মিটিংএ যোগ দিতে বললেই বা ক্ষতি ছিল কি? আলোচনায় তিনি যে সহায়তা করতে পারতেন সে কথা কি সেক্রেটারীর জানা নেই?

বারান্দায় বেঞ্চিতে জনচারেক চাপরাশী বসে জটলা করছিল। খাশনবীশ সম্মুখ দিয়ে চলে গেলেন। কেউ উঠে দাঁড়াল না। তাঁকে দেখতে পায়নি কি? কে জানে?

হঠাৎ মনে পড়ল, যে প্রয়োজনে এসে ছিলেন সেই পেন্সনের কাগজপত্রের খোঁজ করা হয়নি তো। ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে এক নবাগন্তুক। খাশনবীশ নিজের পরিচয়

দিতেই ভদ্রলোক খাতির করে বসালেন। ডিলিং এ্যাসিস্ট্যান্টকে ডাকতে পাঠালেন। কথায় কথায় আপিসে ডিসিপ্লীনের কথা উঠল। খাশনবীশের সেটা সদ্য ক্ষোভের কারণ। নূতন অফিসারটির সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে মনে হল না। ভয় দেখিয়ে নাকি সম্মান আদায় করা যায় না। বলে কিনা আপিসে বেশীর ভাগ সেলাম তো শুধু চেয়ারটার খাতিরে। সেটা ছেড়ে দিলে কেউ আর ফিরেও তাকায় না। যত উদ্ভট ... রাবিশ!

তৎক্ষণে ডিলিং এ্যাসিস্ট্যান্টটি এসে গেল। খাশনবীশের আমলের পুরানো কর্মচারী। খাশনবীশকে যেন চিনতে পারে না এমন ভাব। বলল, কাগজপত্র লিখে পড়ে তৈরী তো আর আজই হতে পারে না। চার পাঁচদিন পরে যেন একদিন খোঁজ নেন।

চার-পাঁচদিন? খাশনবীশের সময়ে এ কাজ যে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে হয়ে যেতো! কেরানীটি অবজ্ঞার হাসি হাসল। ভাবখানা এই যে, সে সময়ের কথা ভুলে যাওয়াই ভালো! আসল কথা, কেরানীটি অতীতে খাশনবীশের কাছে তাড়না খেয়েছে অনেক। এখন তারই শোধ নেওয়ার চেষ্টা। ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে প্রায় খাশনবীশকে শুনিয়েই বলল,—"হুঃ এখন আর ডেপুটি সেক্রেটারী নন। থোড়াই কেয়ার করি ওকে। এবার বাছাধনের জুতোর সোল ক্ষয় করিয়ে ছাড়বো।"

আপিসে আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার বাসনা নিয়ে এসেছিলেন। এখন আর সে ইচ্ছা রইল না। ফিরে চললেন। লছমন চতুর্বেদী খাশনবীশের পুরাতন অনুগত সহকর্মী। দেখতে পেয়ে বলল, "কী এখনই চললেন? আবার কবে আসছেন? ভাবীজির কুশল তো? যাবেন কী করে? একটা ট্যাক্সী আনিয়ে দেব কি?"

যথেষ্ট অমায়িক ব্যবহার। কিন্তু খাশনবীশকে আজ বুঝি শুধু খুঁত ধরার ব্যাধিতে পেয়েছে। তাঁর কেবলই মনে পড়তে লাগল, চতুর্বেদীর তো ড্রাইভার আছে। নিজের গাড়িতেই তাঁকে হোটেলে পৌঁছে দেওয়া তো কঠিন ছিল না। এর আগে যখনই খাশনবীশের গাড়ি বিকল হয়েছে তখনই চতুর্বেদী নিজে যেচে খাশনবীশকে বাড়ি থেকে আপিস এবং আপিস থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়নি কি? অভিমানে খাশনবীশের দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, ট্যাক্সীর প্রয়োজন নেই।

ভেবেছিলেন নিজেই রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সী ধরবেন। সিঁড়ির কাছে এসে বাইরে রোদের দিকে তাকিয়ে সাহস হলো না। পাশের দরজায় এক অফিসারের পিওন বসেছিল। তাকে বললেন, একটা ট্যাক্সী ডেকে আনতে। পিওনটি অনেকদিন মিনিস্ট্রিতে আছে। খাশনবীশকে চেনে। বলল, ডিউটি ছেড়ে বাইরে গেলে তার সাহেব বিশেষ গোসা হন। হুজুর যদি অন্য আর কাউকে বলেন।

খাশনবীশের গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিলেও তিনি এর চাইতে বেশী আহত হতেন না। সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে তাঁর মাথাটা যেন ঘুরতে লাগল। মনে হলো বুঝিবা মুখ থুবড়ে পড়ে যান। তাড়াতাড়ি শক্ত করে রেলিংটা ধরে ফেললেন। ধীরে ধীরে সতর্ক পদক্ষেপে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

এপ্রিলের খর রৌদ্রতাপে পথ জনবিরল। ধূলিকীর্ণ বাতাসের উষ্ণ নিশ্বাসে তৃণগুল্ম দগ্ধ, বিশীর্ণ। সমস্ত পৃথিবীটা খাশনবীশের কাছে ঐ তপ্ত পাণ্ডুর আকাশের মতো বিবর্ণ মনে হলো। যে আপিসের কাজে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্যম, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সময় নিঃশেষে দান করেছেন সেখানে আজ তাঁর কিছুমাত্র স্বীকৃতি নেই। একদা যেখানে তিনি ছিলেন অপরিহার্য, আজ সেখানে তিনি অনাবশ্যক। এই নগ্ন সত্য আবিষ্কার করে খাশনবীশ মর্মাহত হলেন। নির্ব্যক্তিক সরকারী শাসন যন্ত্রটাকে একটা নিরাট প্রবঞ্চনা মনে হলো। এতকাল যে প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত ছিল সে কি তবে তাঁর নিজের নয়? শুধু তাঁর পদাধিকারের?

মুহূর্তে খাশনবীশের দৃষ্টি থেকে মোহজাল অপসৃত হলো। মন থেকে সকল গর্ব, সকল অভিমান দূরে হয়ে গেল। ভূতপূর্ব ডেপুটি সেক্রেটারীর অতি-উন্নত কল্পলোক থেকে নেমে এলেন ধুলো-কাদার মাটিতে। ইন্ডিয়া গেজেটের পাতার বাইরেও যে হাসিকান্নায় গড়া একটা বৃহত্তর জগত আছে, সে তত্ত্ব আজ প্রথম উদ্ঘাটিত হলো খাশনবীশের জীবনে। মনের মধ্যে একটি স্নিগ্ধ সংহত প্রশান্তি অনুভব করলেন। পথের ওপারে এক ক্ষীণদেহ ভিখারী পথচারীদের দয়া উদ্রেকের চেষ্টায় ঢোলক বাজিয়ে তুলসীদাসের ভজন গাইছিল। খাশনবীশ তাকে কাছে ডেকে তার হাতে একটা টাকা দিলেন। সে বেচারী এক আনা, দু আনার বেশী কখনও প্রত্যাশা করে না। অবাক হয়ে খাশনবীশের মুখের পানে চেয়ে রইল।

সেদিন অনেক রাত্রিতে সদর দরজায় কড়ানাড়ার শব্দে বেনারসে শৈলবালার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাঁর নামে এক্সপ্রেস টেলীগ্রাম। দেখলেই দুঃসংবাদের আশংকায় বুক কাঁপতে থাকে। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে পড়লেন। পাঁচটি ইংরেজী শব্দে সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য—"দীপালীর সঙ্গে পল্টুর বিয়ে স্থির করো।"

টেলীগ্রামে প্রেরকের নাম নেই।

সেটা বোধ হয় ১৯২৪ কি ১৯২৫ সাল হবে, অবনীন্দ্রনাথের খেয়াল হল ছোট ছেলেদের জন্য নূতন ধরণের বর্ণ-পরিচয় তৈরী করতে হবে।

যেমন ভাবা অমনি কাজ। অক্ষর পরিচয়, লেখা এবং ছবি আঁকা তিন কাজ এক সঙ্গে হবে—এই রকম একটি বই প্রকাশ করতে হবে।

শিশুরা চোখে দেখে সব জিনিস চিনতে শেখে গোড়ায়, পরে বলতে ও লিখতে। অতএব অবনীন্দ্রনাথ যে বই লিখলেন তাতে ছবিকে দেওয়া হল প্রাধান্য, তার সঙ্গে অক্ষর পরিচয় ও লেখা এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকার শিক্ষা এমন সুন্দর ভাবে সংযোগ করা হল যে, শিশুরা ছবি আঁকবে ও দেখতে দেখতে অক্ষরের পরিচয় ও লেখা শিখে যাবে এই হল চিত্রাক্ষরের আদি কথা।

সে সময় লাল বাড়িতে অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে একটা জার্মান অফসেট প্রিন্টিং মেশিন অকেজো হয়ে পড়েছিল, কবি আমাকে বললেন, "তোর শুনি কলকব্জা সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, দেখ না

অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেশিনটা চালাতে পারিস কিনা। তাহলে তোর বাবার 'চিত্রাক্ষর' ঐ প্রেসে ছেপে দেওয়া যাবে বিনি পয়সায়"।

কবির কথায় লেগে গেলুম প্রেস চালাবার বিদ্যে আয়ত্ত করতে। প্রেস-এর সঙ্গে একটা বই ছিল, তাই পড়ে মেশিনটাকে পনেরো দিনের ভিতর চালু করলাম একেবারে নিখুঁত ভাবে। ঘন্টায় ২৫০০ কপি ছেপে বেরোতে লাগল। কবির হাতে লেখা কবিতা ও তার সঙ্গে রেখার সংযোগে ছবি প্রথমে ছাপা হল। এই ত গেল কবির ছবি ছাপার আদি কান্ড। এর পরেই শুরু হল 'চিত্রাক্ষর' ছাপা। বাবা রোজ সকালে জিঙ্ক শীটের উপর স্পেশাল ইংক দিয়ে ছবি এঁকে দিতেন, আমি সেটা আরকে চুবিয়ে যা করবার করে প্রেসে জুড়ে বোতাম টিপে দিতুম, আর অমনি ছবি ছাপা হয়ে কালি শুকিয়ে সাইজ মাফিক কাটা হয়ে একটা ট্রেতে জমা হতে থাকত। ওদিকে যত কপি ছাপা হল তার নম্বরও উঠে যাচ্ছে। যত কপি দরকার ছাপা হলে বোতাম টিপলেই মেশিন আবার অচল। ভারি মজা লাগত,

কি আনন্দের সঙ্গে এই কাজ তখন করেছিলাম।

যাক বলতে গিয়ে অন্য কথা, এসে পড়লুম নিজের কথায়, তবে এটা ঠিক যে সময় ঐ প্রেসটা না পেলে কবির ছবি এবং অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাক্ষর বহুদিন লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকত। কিন্তু 'চিত্রাক্ষর' ছাপা হয়েছিল নামমাত্র সংখ্যায়।

আজ ৩০।৩৫ বৎসর পরে আনন্দবাজার উদ্যোগী হয়ে চিত্রাক্ষরের স্বরবর্ণ অংশ তাঁদের পূজো-সংখ্যায় ছাপছেন, আমি খুশী হয়ে আমার কাছে রক্ষিত মূল ছবিগুলি তাঁদের ছাপতে দিয়েছি। ব্যঞ্জনবর্ণের মূল ছবিগুলির সঙ্গে আবার মজার মজার ছড়াও আছে। আমার ইচ্ছা ঘরে ঘরে ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে এই অমূল্য জিনিস পৌঁছে দেওয়া। সে কাজ একমাত্র আমাদের সরকারের দ্বারাই সম্ভব।

আশা করি এই বিষয়ে একটু চেষ্টা হবে, যাতে বইটি যাদের জন্য লেখা তাদের হাতে গিয়ে পৌঁছয়।
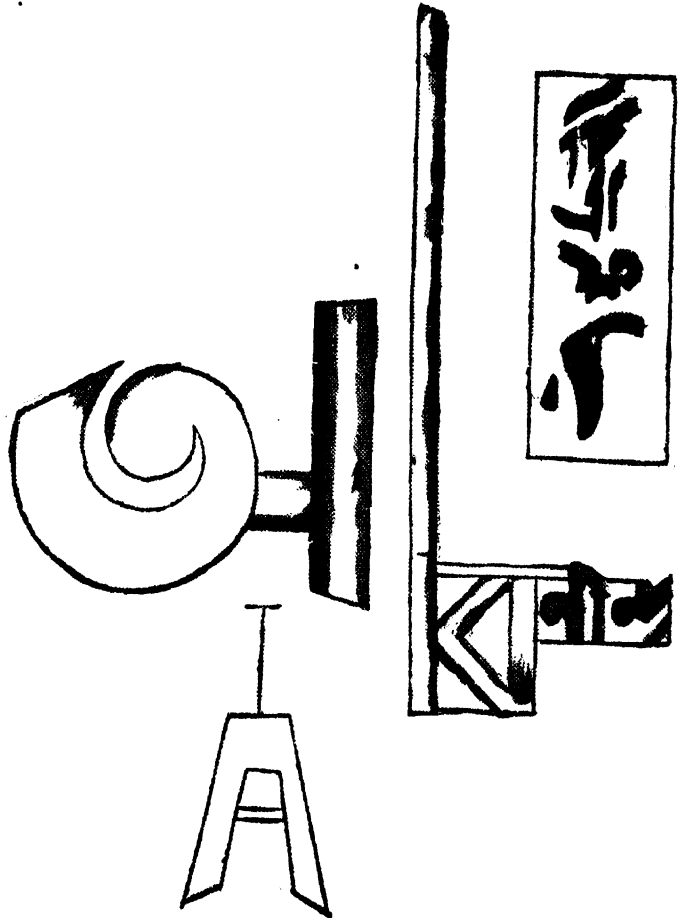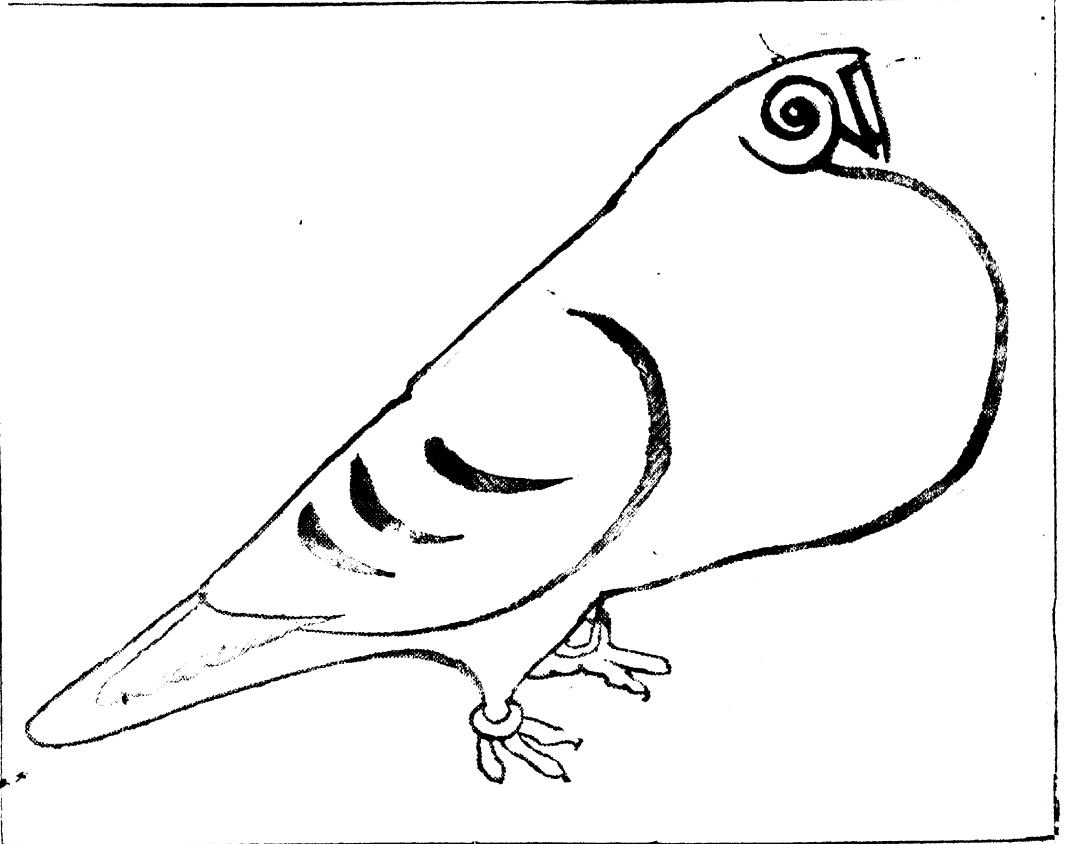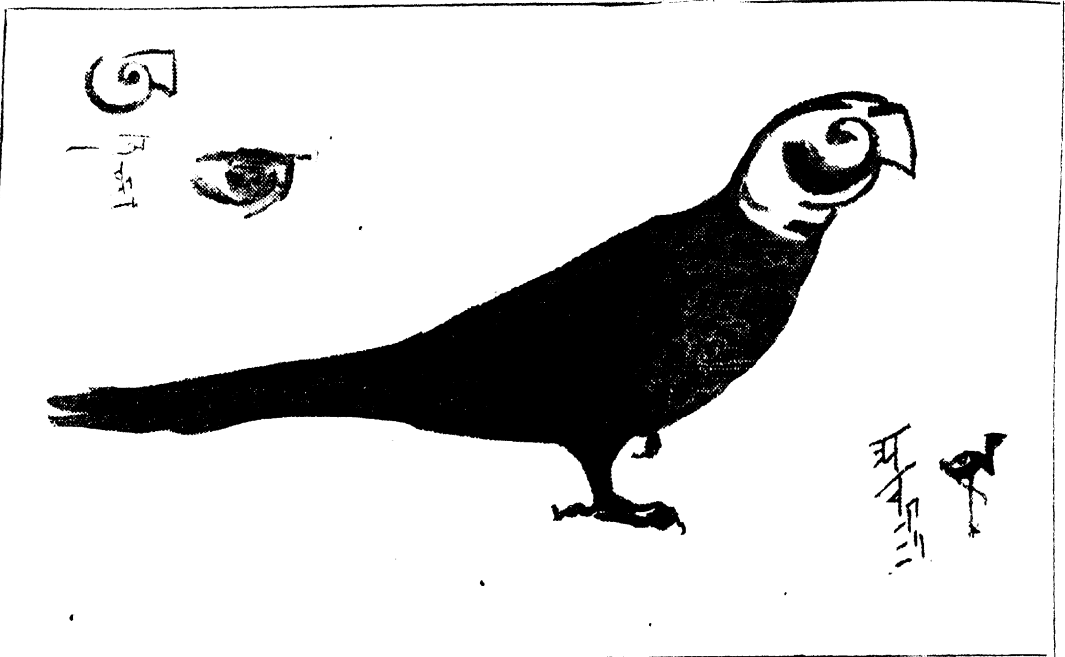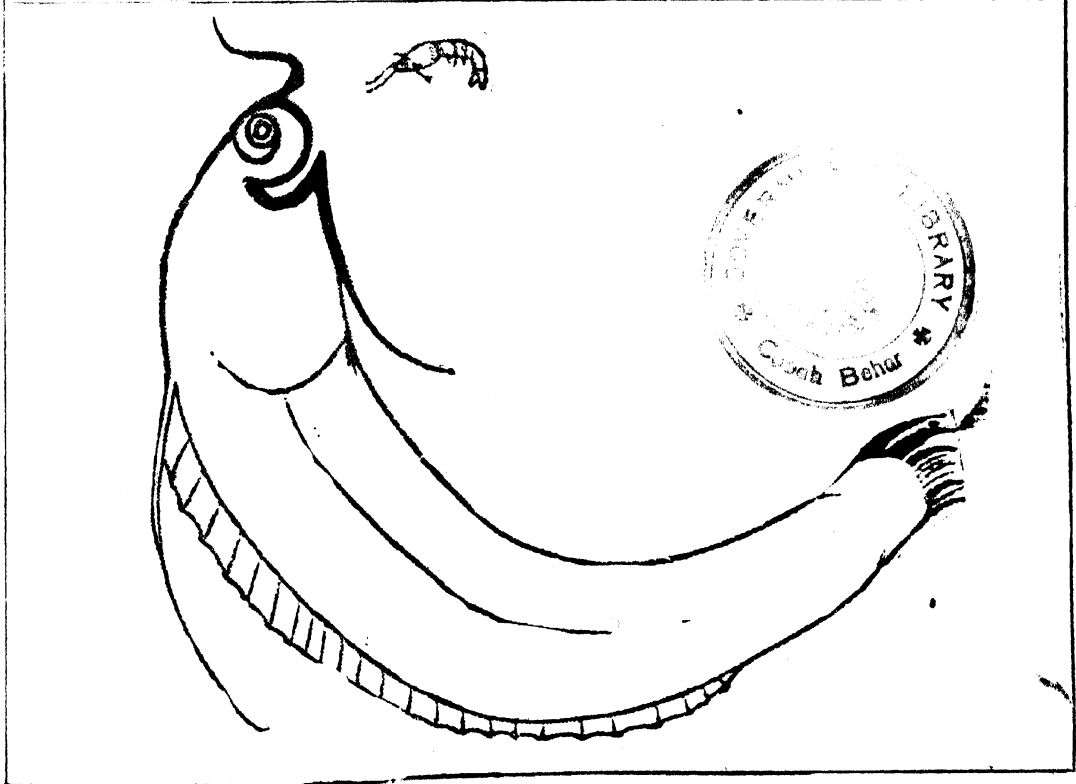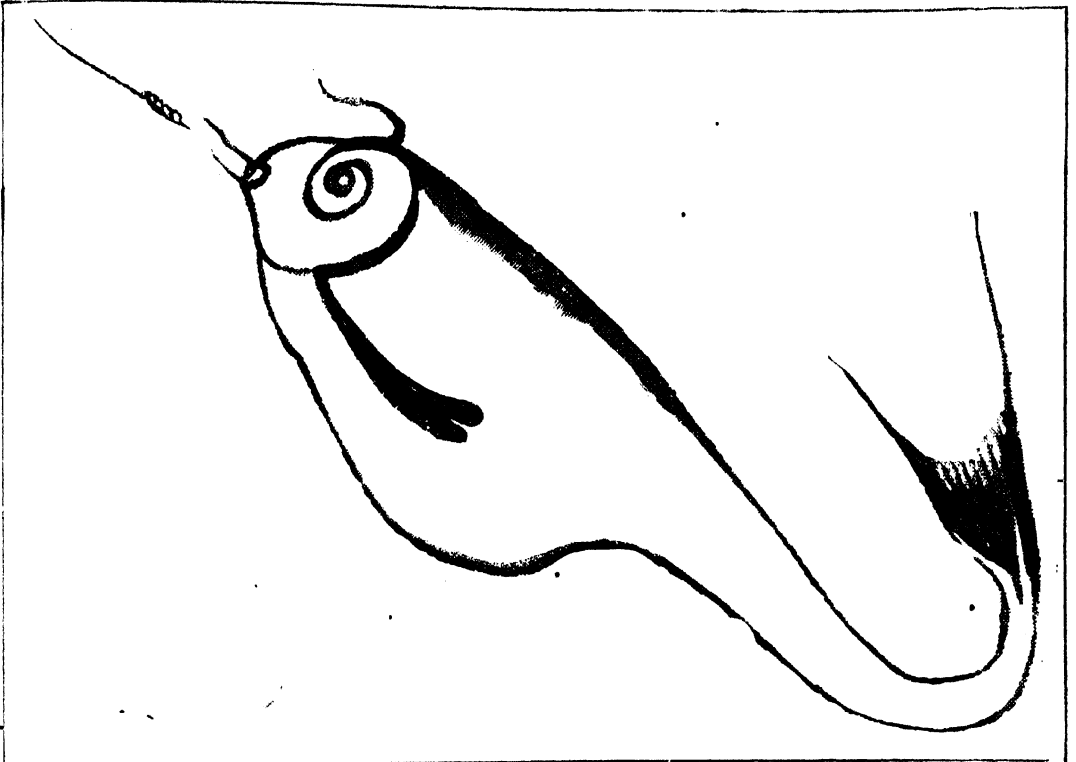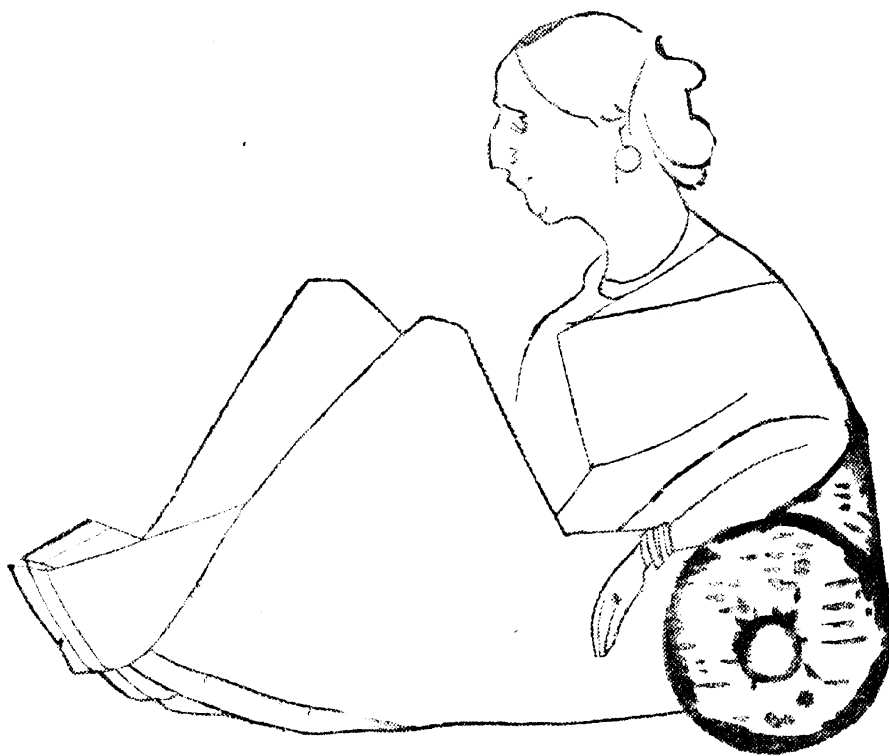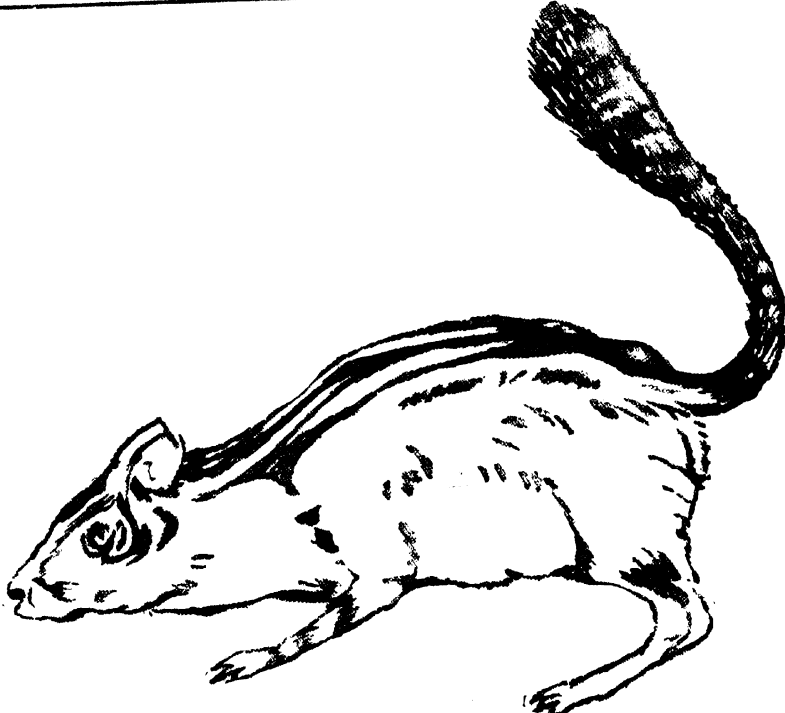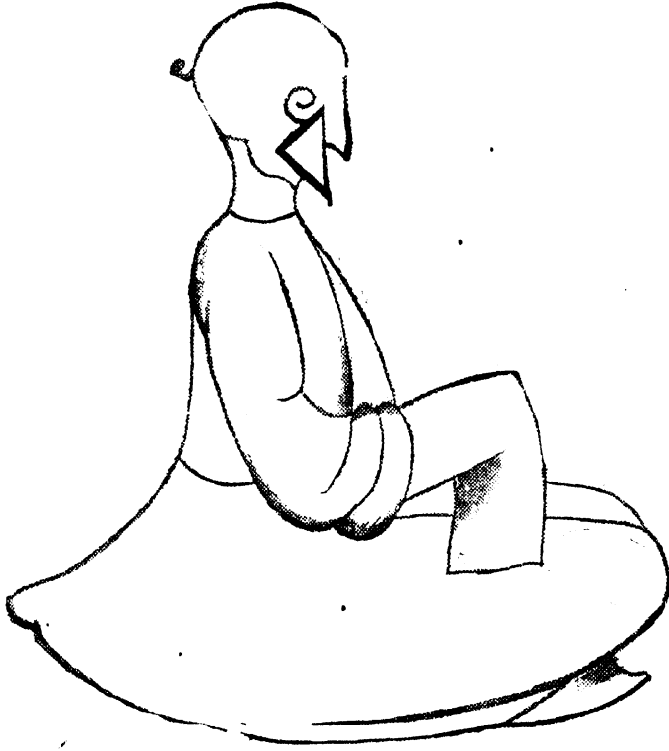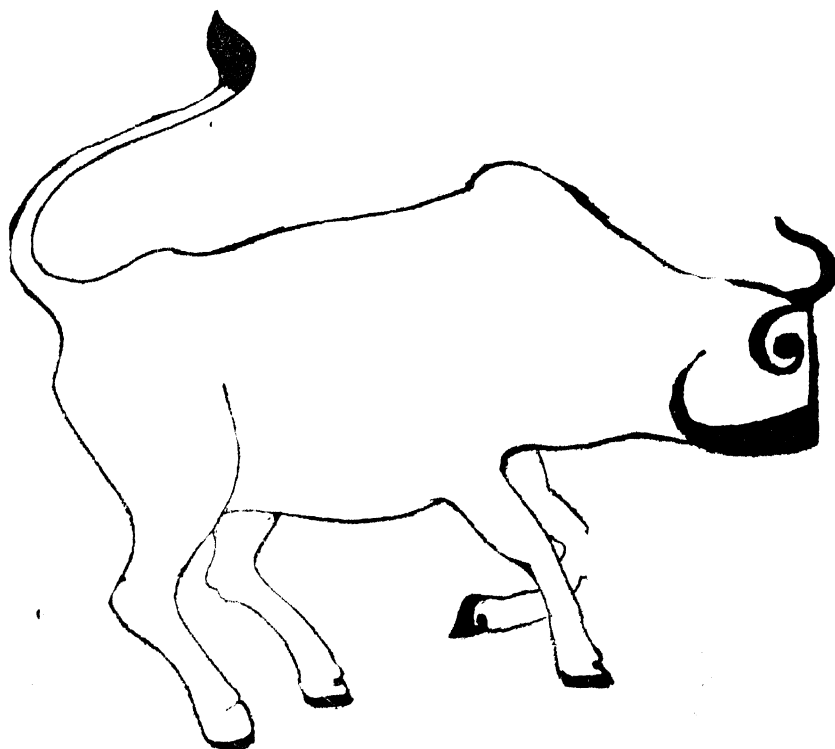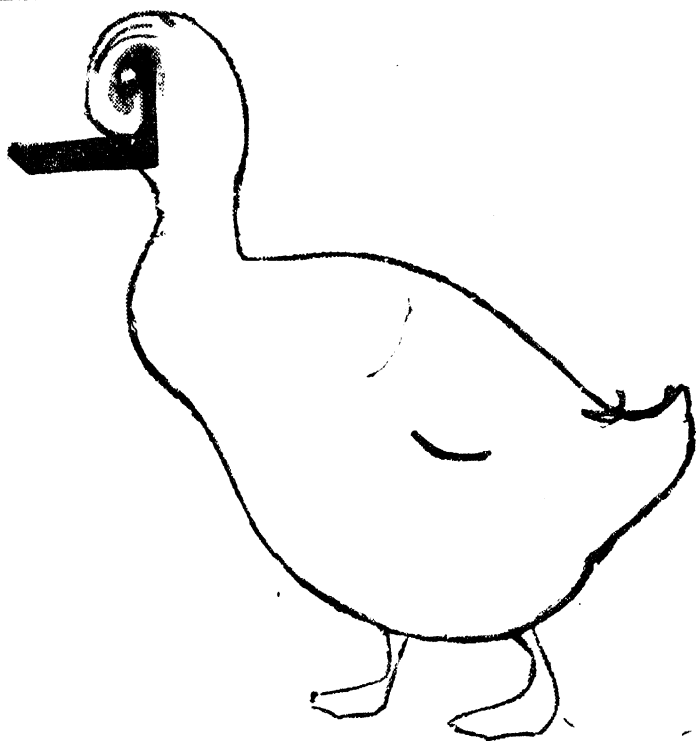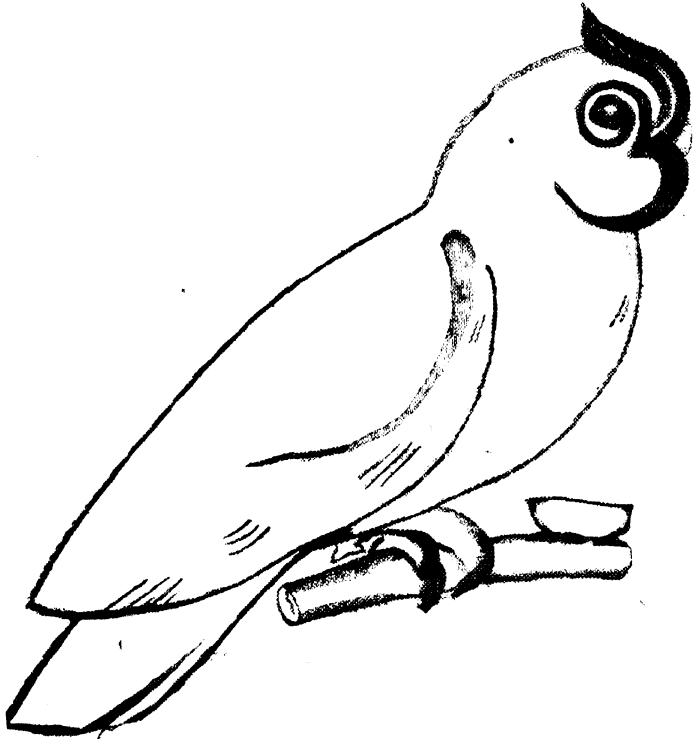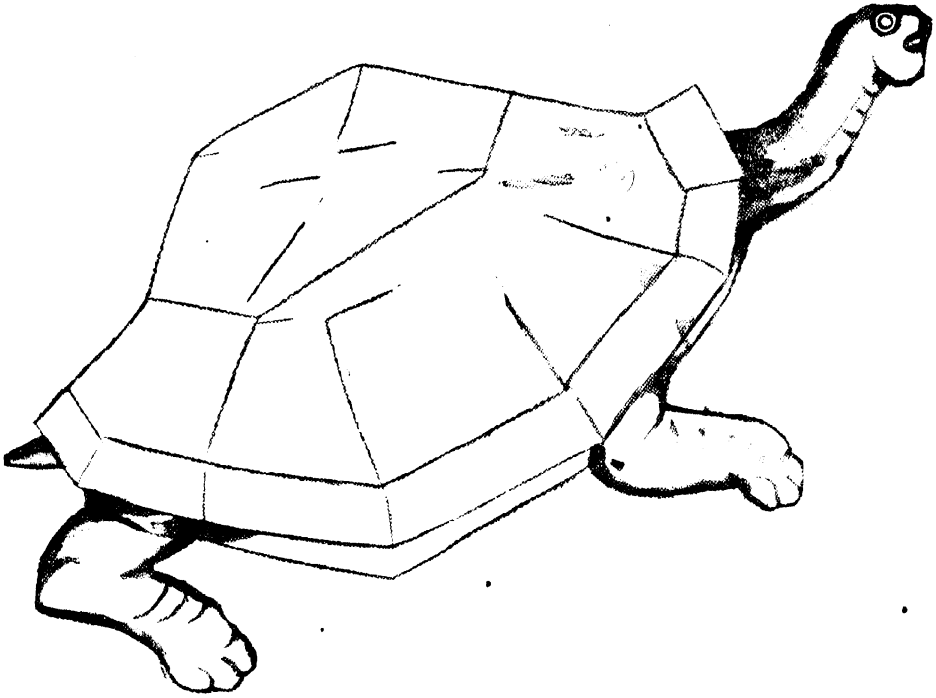
অ

সুখ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

একটা মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু,
মেলায় বাজিকরের খেলায় একটা মুখ মুখোস পরে' হাসায়।
খেয়ার নায়ে ওপারে যেতে কবে যে কোন ভিড়ে
একটা মুখ এক নিমেষে অকূল স্রোতে ভাসায়!
কার সে মুখ, কার?
জানে কি তারা-ছিটোন অন্ধকার!

সে মুখ যারা দেখেনি তারা জানে না জ্বালা নিদান যার নেই।
শীতের দিনে পোহায় রোদ উঠোনে বসে আরামে কাঁথা গায়,
ঝুমকো লতা দেয়ালে তোলে, মরাই রাখে ভরে',
ফল কি ফুল পাড়তে শুধু নাগাল ডাল নামায়।
হোক সে মুখ যার,
অনিদ রাতে কাঁপে না অন্ধকার।

সে মুখ যার পড়েছে চোখে ঘরে-ই থাকে যায় না সেও বনে,
যত্ন করে পাঁচিল ঘিরে, হিসেব করে' পুঁজি যা আছে ভাঁড়ায়।
তবুও কোন হুতাশ হাওয়া একটা ছেঁড়া ছায়া
তারার ছুঁচে সেলাই করে' রাত্রি জুড়ে টাঙায়।
কার সে ছায়া, কার?
প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার।

সনেট

বিষ্ণু দে

যখনই আকাশে বহু সুর তোলে সন্ধ্যার পশ্চিম
তখনই তোমার মুখ সত্তা পায় স্পষ্ট অবয়বে,
তন্নতন্ন আমার হৃদয়ে, জাগে নক্ষত্র উৎসবে
তোমার আনত আভা, আগের সে আয়ত রক্তিম
মিশে যায় চৈতন্যের ধারাজলে পাণ্ডুর নিঃসীম,
সমস্ত স্নায়ুর দীর্ঘ ইতিহাস ভেসে ওঠে যবে
একটি দেহের দূর মেঘময় অজন্তা বৈভবে,
যেখানে প্রবল তীব্র বিগতও বর্তমানে হিম।

এসো নেপথ্যের নিরাপত্তা ছেড়ে প্রত্যক্ষ নাটকে,
ওঠে তো উঠুক ঝড় তোমার নির্দিষ্ট রাত্রিদিন,
ডোবাব আমার নীলে অন্ধকার অথবা সন্ধ্যার
ইন্দ্রধনু বেঁধে দেব প্রাণ ভ'রে যন্ত্রণাই কিনে,
বন্যায় ঐশ্বর্যময় হয়ে যাবে হৃদয় বন্ধ্যার।

কিবা আসে যায় কিছু ভাবে যদি তোমার পাঠকে॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বর্ষার ভোরের মত বিষণ্ণ যে তুমি
তোমার মৌসুমী
রাত্রিদিন চলে!
ভিজে যাই জলে
কাছে এসে দাঁড়ালে কখনো।
ভিজে বুঝি তোমার সে মনও
যেই মনে বিষণ্ণতা পেলে।

পৃথিবীর সুরের এ সুর
তাকে অবহেলে
আনন্দিত কেউ,
জলময় মেঘময় বিষাদের ঢেউ
তবু ব্যাপ্ত আছে বহুদূর
অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘিরে;
আনন্দের নীড়ে
পৌঁছুবে সে কোনোদিন, তাই
ভালোবাসি বিষণ্ণা যে তাকেই সদাই॥

জোনাকি

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলি নিবিড় এ অন্ধকার তলে
জোনাকি পোকার মতো জ্বলে,
দেয়ালে দেয়ালে আর জানালার শার্সিতে শার্সিতে
পরিষ্কার মনের আর্শিতে,
আর সব গ্রাম ঘর, আঁকাবাঁকা পথের দুধারে
আম কাঁঠালের বনে, খেয়াঘাটে নদীর ওপারে
মাঠে ও পুকুরঘাটে বকুলতলায়
এখনো তেমনি করে মিটিমিটি হয়ত তাকায়।

এখানে কি আসে তারা পরিচিত বন্ধুর সন্ধানে?
তারাই তো ভাল করে জানে
হৃতসর্বস্বের ব্যথা, পলাতক সহস্রের দলে
কেমনে ভিড়িয়া গেছি। এ উন্মত্ত কলকোলাহলে
শান্তি নাই স্বস্তি নাই, জীবনের সকল আশ্রয়
হারায়ে ফেলেছি আমি; নিত্য অবক্ষয়
সহিতেছি নিরুপায় দর্শকের মতো
সংগ্রামের অগ্রমুখে পরাজয়-ক্ষত
জ্বালা তার অগ্নিময়, যন্ত্রণার নাহি পরিসীমা
যে সহে নির্বাক হয়ে কি তার গরিমা?

বারে বারে তাই মনে হয়
অতিক্রান্ত দিবসের যা কিছু সঞ্চয়
ফেলিয়া এসেছি আমি দিগন্তে বিলীন এক গ্রামে;
সে গ্রামের নামে
হৃদয় অস্থির মোর অশ্রুভারে মুদে আসে আঁখি
মনের ছায়ায় জ্বলে সে গ্রামের অসংখ্য জোনাকি
বিস্মৃত মুহূর্তগুলি জেগে ওঠে অপরূপ হয়ে
কী মায়া আনিল বয়ে
জোনাকিরা আলোর পাখায়
আমার নির্জন ঘরে, নিঃসঙ্গ এ জীবন-সন্ধ্যায়।

রক্তগোলাপ

জগদীশ ভট্টাচার্য

This song shall be thy rose.—Epipsychidion

আজ সারাদিন আমার চেতনার মালঞ্চে
ফুটে আছে একটি রক্তগোলাপ,
তার সুরভির ঝরণাধারায়
সুধাস্নান করে উঠলাম আমি।
জানি একদিন এ ফুল শুকিয়ে পড়বে ঝরে,
বিবর্ণ হবে তার পাপড়িগুলি,
গন্ধ যাবে শূন্যে মিলিয়ে;
রক্তগোলাপ হয়ে যাবে একমুঠো ধুলো॥

তবু আজ আমার মনের আকাশে
নূতন সূর্য উঠেছে রক্তগোলাপ হয়ে,
আমার মর্মকোষে তারি সুরঝংকৃত অরুণাভা।
তারপর একদিন
সূর্যাস্তের রঙে রাঙা হবে বিদায়-দিগন্ত,
রক্তগোলাপের বিলীয়মান বেদনা
ছড়িয়ে পড়বে আকাশ জুড়ে;
আমার হৃদয়ের উৎসমুখে
আসন্ন হবে শেষমোক্ষণের পরম লগ্ন:
ঝরে পড়বে অনিঃশেষ ঝরণায় রক্তগোলাপ,
আমার অন্তিম বেদনা লীন হয়ে যাবে তারি সুরভিতে॥

হরিজন মেয়ে

কৃষ্ণধন দে

হরিজন মেয়ে, কবির কাব্যে তোমারে ত কেউ চায় নি,
কথাশিল্পীর লিপিতে তোমারে আজো পুরোপুরি পায়নি,
শহরেই থাক', তবু চিনি না'ক, সহজে দাওনা ধরা যে,—
তোমারি জগৎ তোমারি প্রদীপে আছে শুধু আলো-করা যে'
ছোট গণ্ডীতে ভর' ছোট মন, ছোট ঘরে সরু গলিতে,
ক্বচিৎ দেখেছি বস্তির কলে, সঙ্কোচে পথ চলিতে;
অবাধ গড়ন খরা যৌবন বিষের ধোঁয়ায় শুকাবে?
হাল্‌কা হাসির আড়ালে কোথায় সর্পিণী-মন লুকাবে?
জানি এই কালো বস্তির বুকে নবযুগ-রথ চলবেই,
তোমাদের এই কর্দম-ক্ষেতে সোনার ফসল ফলবেই।

মধ্যাদিন

অরুণ মিত্র

আলোর সেতুর উপরে আমরা।

দুরবগাহ ধারা কোন্ অন্ধকারে বয়?
সে বুঝি পাতাল সমান নীচে।
আমরা তাকে দেখতে পাই না, তার কথাও বলি না;
কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হলে দুর্বোধ্য ধ্বনি শোনা যায়,
আকাশকে এক মুহূর্তে ভুললে রক্তে ঘোর লাগে।

আমি পিছিয়ে পড়তে ওরা আমায় ডাকল,
আবার আমি ভিড়ে মিশলাম।
একটা নির্জন কথা মুখ থেকে খসল
আর অমনি আগুনের ফুলের মতো ফুটল,
কল্পনার সব আঘ্রাণ তা থেকে রোদ্দুরে ধোয়া।
মুদিত চোখে যে-সূর্যকে দেখেছিলাম
অন্ধকারের কোরক তাকে বুকে রেখেছে,
সে এখানে নয়।

এখান থেকে যতদূর দৃষ্টি যায়
দিনের দুর্দান্ত রাজত্ব।
আমরা যেন কোনো প্রজ্বলন্ত মহিমার উৎসর্গের বেদীতে
নিজেদের নিয়ে চলেছি।

শুধু মনে করি জলে ছায়া কাঁপবে
যদি এই রোদের সেতু পার হই।

পাখিরা

হরপ্রসাদ মিত্র

পাখিরা আকাশে আসে
রাত্রিশেষে
যখন আকাশে
সবুজের আভা-লাগা কাকের ডিমের
মতো রঙ,
এদিকে ওদিকে হয়তো নিভে-আসা
দু'একটি তারা,—
পুবের দরজা খোলে
শুরু হয় পুনরাগমন
—সেইসব চরিত্রের, ঘটনার, ঘটনাসন্ধির—
পরস্পর সমাহারে গড়ে যারা মর্তের জীবন!

জীবনের মানে খোঁজা চাই তবু,
—জেনেও মৃত্যুকে।
তাই তার রাত্রিশেষে প্রতিদিন
এই জেগে ওঠা,
তাই তার দিনশেষে চলবার
থাকে ছায়াপথ!

তোমার চোখের পাতা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যার আরক্ত শিবির চোখ ধাঁধিয়ে দেয়
ছিন্নভিন্ন জীবনের পরে যে হৃদয়
সে তখন দীঘি পাশে বসে
আপনার চেতনাকে দেখে নির্নিমেষে।
সামনে সতেজ কত জলজ উদ্ভিদ
বাতাসেতে হেলে-দোলে
বাতাসেতে খোলে
তাদের গভীরতম শত-শত কথা।
তবু জানে তারা সেই জীবনের অনন্ত সত্তা
যেখানে সভার শেষে থাকে পড়ে
ভিখিরির মতো নিত্য অনাদরে।

কাকচক্ষু স্বচ্ছ সেই দীঘির কিনার
কী যেন বলতে চায় বারবার।
ছোটো-ছোটো ঢেউগুলি চূর্ণ-চূর্ণ করে দেয়
তার কথাগুলি
মনে হয় অর্থহীন অসংখ্য মাদুলি
তার গায়ে ভার হয়ে বসে।

সেখানে বাঁচবার কথা নেই
মরবার প্রশ্রয়ও নেই।
শ্রাবণের মর্মরিত পাতার পতাকা
মিশে যায়
যেখানে জীবন একেবারে ফাঁকা।

তোমার চোখের পাতা
সে কি আজ শ্রাবণের পত্রগুচ্ছ হোলো?
তবে কেন ভয় করো
সমুদ্রের অতল বিস্ময় নিয়ে ধীরে-ধীরে খোলো।

হিতকথা

অরুণকুমার সরকার

পালিয়ে আয়। কামড়ে দেবে। দাঁতমুখ-খিঁচোনো দলভারী
খোঁকি কবন্ধেরা বড়ো সাংঘাতিক, বিষাক্ত, একজোট।
শান্তিতে দেবে না থাকতে, পা মাড়িয়ে কোঁদল বাধাবে,
ভেংচি কাটবে, দুয়ো দেবে, তুলবে তোর স্বর্গত মা-বাপ।
চাই কি ছুঁড়বে ঢিল, টেলিফোনে বেড়াল ডাকবে,
লটকাবে পোস্টার লাল, বলবে তোকে মাতাল, লম্পট।
মানুষের মতো দেখতে, খোঁকি ওরা, অসম্ভব চিজ।
লেজ ধরে টানবে অন্যে, সামনে পেয়ে তোকেই কামড়াবে;
রাস্তায় জমাবে ভিড়, তিন মাইল মিছিলে চেঁচিয়ে
পোড়াবে খড়ের মূর্তি অবিকল তোর মতো মুখ।

মস্তিষ্ক অবশ্য নেই, আছে শুষ্ক প্রচণ্ড আক্ষেপ,
ভাটার জঞ্জাল নোংরা, অক্ষমের বিকৃত আক্রোশ
বিষোদ্গারে শান্তি চায়, উপলক্ষ যা কিছুই হোক।
যদি না ঝাঁপ দিবি জলে পালিয়ে আয় ডাঙায় এক্ষুনি।

ভিতর-বাড়িতে রাত্রি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রাত্রি হলে একা-একা পৃথিবীর ভিতর-বাড়িতে
যেতে হয়।
সারাদিন দলবদ্ধ, এখানে-ওখানে ঘুরি ফিরি,
বাজারে বাণিজ্যে যাই;
মাঝে-মাঝে রোমাঞ্চিত হবার তাগিদে
সামান্য ঝুঁকিতে বসি তাসের আড্ডায়;
কেউ বা তিন-আনা জেতে, কেউ হারে।
রাত করলে সবাই উঠে যায়।
মাথায় কান-ঢাকা টুপি, পায়ে মোজা, বারোটা-রাত্তিরে
জানি না কোথায় যায় দুরি তিরি রাজা ও রমণী।
আমি যাব ভিতর-বাড়িতে।

ভিতর-বাড়ির রাস্তা এখনও রহস্যময় যেন।
এত যে বয়স হল, তবুও অচেনা লাগে।
কোথায় কবাট-জানলা, উঠোন, মন্দির, কুয়োতলা,
কুলুঙ্গি, ঘোরানো সিঁড়ি, বারান্দা, জলের কুঁজো।
কোথায় ময়নাটা ঠায় রাত্রি জাগে।
বুঝবার উপায় নেই কিছুই, অন্তত আমি কিছুই বুঝি না।
বাড়িটা ঘুমের মধ্যে হানাবাড়ি। তবু
দুয়ার ঠেললেই কেউ ভীষণ চেঁচিয়ে উঠবে, এমন আশংকা হয়।
দুয়ার ঠেলি না, আমি সারা রাত্রি দেখি
খরস্রোত অন্ধকার বয়ে যায় ভিতর-বাড়িতে

সমুদ্র চেতনা

উমা দেবী

এ অগাধ নিশীথের সমুদ্রের জ্যোৎস্নার তরঙ্গে ভেসে ভেসে
হৃদয় দীপের মত চ'লে গেছে কোন নিরুদ্দেশে
দেহ শুধু পড়ে আছে শবের মতন
বৃথাই জড়ায় তাকে বাতাসের গাঢ় আলিঙ্গন—
চাঁদ শুধু ভাসে
হৃদয়ের গোপন আকাশে।

এ এক বিস্ময়-ভরা নিবিড় প্রহর
চেতনার সিংহদ্বার কাঁপে থরথর—
যেন বা রোদন-ভরা জীবনের কুয়াশাকে ঠেলে
একটি রঙিন আশা আসবে আলোর পাখা মেলে—
সৌরভের মত যাবে হৃদয়ের সঙ্গীত ছড়িয়ে-
নিবিড় স্পর্শের রসে নানা রঙে মন ভ'রে দিয়ে।

নগরী ঘুমিয়ে আছে গর্ভভারক্লান্ত কোনো নারীর মতন
জানে না কখন তার দেহ নিশ্চেতন
একটি চেতনা শিখা ধীরে ধীরে দিয়েছে জ্বালিয়ে—
সমস্ত আকাশ আজ তৃপ্ত হ'য়ে আছে তারই সুখস্পর্শ নিয়ে।
ধীরে ব'য়ে যাওয়া এই বাতাসে রয়েছে
তারই শীতল আশ্বাস—
জীবনের স্থূল তন্তু ছিঁড়ে দেখা দেবে যেন
এইক্ষণে গভীরের নিশ্চিত আভাস
আর এই পড়ে-থাকা দেহকে আশ্রয় ক'রে
জ্বলবে একটি শিখা উদার আশ্বাসে
চাঁদ ভেসে-ওঠা কোনো হৃদয়ের নিবিড় আকাশে।

ইঁদুর

দিনেশ দাস

কিচ্ মিচ্ শব্দের ফোয়ারা—
মাটি ফুঁড়ে উঠে এল কারা?
ঘরদোর বইখাতা টেবিল-চেয়ার
ইঁদুরে ইঁদুরে একাকার।

এতদিন গর্তের ভিতরে এলোমেলো
পুঁথি কেটে পুঁথি খেয়ে মোটা হ'য়ে এল:
এবার বিবর হ'তে বাইরে বেরিয়ে
ক্রমশ দেয়াল বেয়ে মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের ছবি
কুট কুট ক'রে কাটে ছুঁচলো ধারালো দাঁত দিয়ে

লতাপাতা কাটে এরা অঙ্কুরে অঙ্কুরে:
কখনো পায়ের চেটো খায় কুরে কুরে:
কখনো বা শামুকের শাঁসের মতই
চোখ খুলে খায়,
জীবাণু ছড়ায়।

পোকাপড়া দাঁতের মতন।

পথেঘাটে সর্বত্র ইঁদুর:
দূর! দূর!
এর চেয়ে ইয়েতির মত ঘোরো তুষার-শিখরে,
বরং লোমশ গুহামানবের মত
ঢুকে পড়ো অরণ্যপর্বতময় গুহায় গহ্বরে,
চকিতে
হারিয়ে যাও রাত্রির নাড়ীতে।

এবার সরিয়ে নাও শেষ ছায়াটুকু:
আলোয়ান মুড়ি দিয়ে নামো নিঃসাড়ে
রাত্রির গহন অন্ধকারে:
পিছু হাঁটো—ভুলে যাও সব।
একদিন শেষ হবে ইঁদুরের শীতের উৎসব,
শীতপাখি চিতার উপরে তার ঝরাবে পালক:
সেদিন এখানে এসো,
সম্মুখেতে অন্ধকার—পিছনে আলোক।

সুদেষ্ণা আমার

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আলিঙ্গনের মহোৎসবে
সকলের হৃৎকমলে হাওয়া,
রঙা কামসূত্র ওড়ে বারান্দায়
শরীরে আনন্দ কারো ধরে না ধরে না
দলের [illegible] ভেঙে ফেটে পড়ে উদীধমেখলা
আলিঙ্গনের মহোৎসবে।

এদির একপাশে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে সুদেষ্ণা একাকী
পোর্টিকোর নিচে:
বোধিপর্ণের মতো এ যে বড়ো দারুণ শীর্ণতা
সুদেষ্ণার, তার
দক্ষিণ হাতের অরত্নির দীর্ঘ অনশনসহিষ্ণু দীধিতি,
[illegible]রের তূণে
জবার মত স্নিগ্ধ রক্তাভ অক্রোধ কাঞ্চীদাম;
বাঁ পায়ের তিনটি আঙুলে অক্ষী বৈরশূন্যতার, অনানাম
কে ওকে স্পর্শ করবে?
সুদেষ্ণার মাকে দ্যাখো, তিনি
সর্বাঙ্গত, অলৌকিক সপ্রতিভ একটি যুবক
[illegible] চিবুক ছুঁয়ে ললন্তিকা গলার হারের
[illegible] পাশে গিয়ে অন্য ললনার দিকে হেসে চ'লে যায়,
সুদেষ্ণার মাতা কেন একা-একা সুন্দর হবার
মন্ত্র জানেন না?
সুদেষ্ণার মাতা কেন একাবলী হার ছিঁড়ে ফেলে
হিংসুক নরক প'রে অন্য যুবকের অন্যমনস্কতার
সুযোগ নিলেন অবহেলে?

আলিঙ্গনের মহোৎসবে
রাশি-রাশি কুর্পাসক উড়ে পড়ে পঞ্চশরের মন্ত্রণায়—
একপ্রান্তে, একা
একমাত্র ব্যতিক্রম সুদেষ্ণা আমার
আলীঢ় ভঙ্গিতে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
অথৈ বৃষ্টিতে ভিজছে, বৃষ্টি এসে কৌতূহলী দাঁত
বসায় ঘাড়ের মাংসে, পীতশিখা ভেজে,
প্রদীপের চেয়ে বড়ো পীতশিখা সকরুণ তেজে
প্রতিফলনের বস্তু অবলুপ্ত হয়ে গেছে জেনে,
জেনেও অটুট
আলীঢ় ভঙ্গিতে
এ-ঘরের উৎপীড়িত লজ্জা অপহৃত
সারি-সারি নির্যাতিত নারীদের জঙ্ঘায় জঙ্ঘায়
বুদ্ধমূর্তি জেবলে ধরে, বিদ্যুতের মতো আচম্বিতে—

সুদেষ্ণা আমার॥

দ্বীপ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

কী করে বিচ্ছিন্ন করি নতজানু রজনীগন্ধাকে
বাতাসে যে নুয়ে পড়ে অবিরত আত্মনিবেদনে,
চোখের পল্লব ছুঁয়ে দুটি অর্ধসমাপ্ত চুম্বনে
কী করে বোঝাবো তাকে,—এ জীবনে যন্ত্রণাই থাকে।

কী করে যে বলি ওকে, বিকেলের এ আলো নিভিয়ে
সেই তো ফিরতেই হবে; তবে কেন ডাকো অমনি করে?
এই মাঠ, এই ফুল-শিরীষের ছায়াতল থেকে
পাওয়া-না-পাওয়ার খেলা মুছে যাবে আরো একটু পরে।

মানুষ যে বড় একা। একাকীত্ব ভুলতে তাই আসা,
বারবার ছুঁয়ে যাওয়া মঞ্জরিত এই বনরেখা;
তাও ফেলে যেতে হবে: বলো, বলো, কবে ভালোবাসা,
ভীষণ নির্জন রাতে মুখোমুখি হবে ফের দেখা?

অলকায় মুখচ্ছবি ঢেকে রেখে, মঞ্চের আড়ালে
নিজেকে ভোলায় কেউ উগ্রতর সুরার আরকে,
সুদূরে নক্ষত্রচ্যুত লবণাক্ত শিশিরের কণা
ঝিনুকের মত কেউ আচ্ছাদিত রেখেছে কোরকে।

হে প্রেম! তুমিও যেন একবিন্দু দ্বীপের মতন
সফেন সমুদ্র-ঘেরা, শঙ্কিত গর্জন চারিধারে;
কখন ধনাবে আঁধি, তরঙ্গের হাঙরের দাঁতে
বিপন্ন অস্তিত্বটুকু মুছে নিয়ে যাবে একেবারে।

বকুল বকুল

সুনীল বসু

বকুল বকুল আর ও-গন্ধে আমায় আকুল করিস না রে
ধুলোয় কুসুম, শীতল শয়নে শ্মশানে বাসর পেতেছি আজ
ওখানে হাসুক হাস্নুহানারা, হাসতে দে ওকে—গন্ধরাজ,
আমি ধুয়ে যাই দিনের রক্ত ঝিলের জলের অন্ধকারে।

আজকে নিশীথে নিশিতে ডাকলে যাব না যাব না একলা চলে
কাঁচের প্রদীপ রাখব জ্বালিয়ে আমায় ডাকতে দেখি কে আসে?
বকুল বকুল চিতার গন্ধ ভাসবে বাতাসে দীর্ঘশ্বাসে
ফিরে যেতে তাকে বলিস কোথাও, ভস্মে কি আর আগুন জ্বলে?

বাগান থাকলো, ছয়ঋতু হবে জলধারা হবে অভিভাবক
শোক করিস নে প্রকৃতি নিজেই সযত্নে হবে পরিচারিকা।
ফিরিয়ে দিস সে নীলাঙ্গুরীয় কোনদিন এলে, শুকসারিকা—
যেন নিয়ে যায় পিঞ্জরে রাখা ভীরু শশকের ওই শাবক।

তবে খুলে বলি শোন রে বকুল, তাকেই দেখেছে কে যেন পথে
সোহাগে অধরে হাসির রঙ্গ শুভ্র ললাটে জ্বলে সিঁদুর,
আমি চলে যাব নিদ্রা-পাতালে ভুলে যাব স্মৃতি ব্যথা বিধুর
আমাকে শোয়াস ভাসমান ভেলা, আমি ধুয়ে যাব জলস্রোতে॥

তুমি স্নিগ্ধ নদী

গোবিন্দ চক্রবর্তী

হে আমার মুগ্ধ মৌন,
হে আমার ক্লান্ত আকুলতা!
এবার বল না দু'টো কথা।
প্রাণের অন্তিমে প্রাণপণে
যে-তরঙ্গ বারবার ফেরাও গোপনে,
কল্লোল শুনি যে শুধু তার-
হে আমার রুদ্ধস্বর স্বরোদ-ঝংকার!

সিন্ধুর কামনা নিরবধি—
নদি! তুমি নদী, স্নিগ্ধ নদী।
তির্যক প্রখর বাঁক,
থাক-থাক নিটোল পাহাড়,
দ্বীপ-বালুচরের সম্ভার
অতুলন সব শোভা মেলে—
শান্তি পাবে, শান্তি পাবে, তবুও কি শান্তি পাবে
—এ জীবনে আমাকে না পেলে?

ওরা কতটুকু বোঝে, রোখে যারা স্রোত:
স্নেহকে ভোলাতে চায় সুধার শপথ।
কি-দিন কি-রাত্রি উতরোল
একটু অকূলে ছোঁয়া জোয়ারের রোল
মোছাবে তা—মোছাবেও ব'লে,
পোলের পাহারাগুলি তোলে, যারা তোলে!

ফিরো না, ফিরো না নদী,
ফিরে আর যেয়ো না ওদিকে—
ওরা ত' তোমাকে মাপে
হৃদয়ের তাপে নয়, জলের নিরিখে,
চোখের জলের অক্ষরে:
কারে তবে প্রাণপদ্ম দিতে চাও ধ'রে?

আলো নেই, ছায়া নেই—মায়াও, মায়াও নেই-
ওখানে করুণা নেই কোনো,
কি অত আকাশতারা গোণো?
আমার মেরুন মৌমাছি!
আমি জেগে আছি
এ গূঢ় প্রাণের মৌচাকে।
ডাকে হৃদয়ের নীল সিন্ধু ডাকে, ডাকে।

প্রেমবিহীন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ ভালবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রির রাজপথ
ঝকমক করে কঠিন সড়ক, আলোয় সাজানো, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে
প্রতীক্ষা আছে আঁধারে লুকোনো, তবু চিরদিন
এ পথ থাকবে এমনি সাজানো, কেউ আসবে না, জনহীন,
প্রেমহীন
শেষ ভালবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে।

রূপে দেখে ভুলি, কি রূপের বান, তোমার রূপের তুলনা
কে দেবে? এমন মূঢ় নেই কেউ, চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও
চোখে চোখে যদি বিদ্যুৎ জ্বলে কে বাঁচাবে তবে, এ হেন সাহস
নেই, যে বলবো যাও ফিরে যাও
প্রেমহীন আমি যাও ফিরে যাও
বটের ভীষণ শিকড়ের মত শরীরের রস
নিতে লোভ হয়, শরীরে অমন সুষমা খুলো না
চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও!

টেবিলের 'পরে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালে তোমার
বুক দেখা যায়, বুকের মধ্যে বাসনার মত
রৌদ্রের আভা, বুক জুড়ে শুধু ফুল সম্ভার,—
কপালের নিচে আমার দু' চোখে রক্তের ক্ষত
রক্ত ছেটানো ফুল নিয়ে তুমি কোন্ দেবতার-
পূজোয় বসবে? চক্ষু ফেরাও, বন্যার স্রোত ঢাকে নীলাকাশ
আমার মগজে বিপুল ঝড়ের ঘন নিঃশ্বাস
চক্ষু ফেরাও!
তোমার ও রূপ মূর্চ্ছিত করে আমার বাসনা, তবু প্রেমহীন
মায়ায় তোমায় কাননের মত সাজাবার সাধ, তবু প্রেমহীন
চোখের মণিতে এঁকে দিতে চাই নদী মেঘ বন, তবু প্রেমহীন
এক জীবনের ভালবাসা আমি হারিয়ে ফেলেছি ধূসর বেলায়
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রির রাজপথ।

চন্দনের মতো

ঘটকৃষ্ণ দে

ভুলে যেও, বলেছে সে। নদী-ও তো সমুদ্রে মিলিয়ে
তুষার-শৃঙ্গকে ভোলে! নতুন তীরের স্মৃতি নিয়ে
বয়ে যায়, অভিসারে, নতুন প্রিয়ারে উপহারে
ভ'রে দেয়—হাস্যে, লাস্যে, সংগীতের ছন্দিত ঝংকারে।

বলেছিলো, ভুলে যেও। আকাশ যেমন ক'রে ভোলে,
শরতে, শ্রাবণ মেঘে। গ্রীষ্মে যাকে অভ্যর্থনা ভরে
আবাহন করে, যার মুহূর্তের প্রেমের স্বাক্ষরে
জীবন ভাস্বর, তারও স্মৃতি লুপ্ত কালের কপোলে!

উপমায় বলা সোজা। ভুলে যাওয়া, স্মরণের ভার
নামিয়ে, মুক্তধী হওয়া—এ যেন আপন যৌবনেরই
অঙ্গ-লাবনির ছোঁয়া বার্ধক্যের জরায় জড়ানো!
তবু জানি, ভোরে ফোটা ফুলের যৌবন ধূলিম্লান
হয়-ও যদি, প্রত্যুষার সেই প্রেম, চিত-চন্দনেরই
মতো, ডালে তার যতো হাওয়া, ততো সুগন্ধ-সম্ভার।

বিচ্ছেদ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেঁড়া কাগজের টুকরো, ঝরা পাতা, ম্লান ভালোবাসা
এলোমেলো উড়ে যায় হাওয়া দিলে কাতর বিকেলে,
শূন্য ভ'রে কালো তারে কেঁপে ওঠে হতাশ বাদুড়।
রক্তের ভিতরে শুধু ক্ষমাহীন অস্থির দুরাশা।
সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে জ্বলে ওঠে সূর্য নিভে গেলে
লবণে, ধূপের গন্ধে, মোমবাতির ম্রিয়মান সুরে।

কেন তুমি কাছে নেই? কেন বিচ্ছেদের অভিশাপ?
বৃষ্টি হ'লে ছোটো জল বালকের খেলার ভেলারে
নিয়ে যায় যত দূরে,, ততদূরে কোনো মনস্তাপ
কোনো দিনও যেতে পারে? শুধু হিংস্র বিরহের ধারে
শিরা ভ'রে রক্ত ফোটে অবিরাম চীৎকৃত বিলাপে:
সর্বস্বের ভারে ডোবে অনর্থক কাগজের ভেলা;
স্রোত ঘোরে মধ্যপথে; চোরাটানে, সংশয়ে, সন্তাপে
পাতাল বাড়ায় থাবা দারুণ হিংসুক সন্ধ্যাবেলা।

অন্ধকার হতে উঠি

ধীরেন্দ্র মল্লিক

অন্ধকার হতে উঠি
মিশে যাই অন্ধকারে ফের,
জেনলে যাই এক আলো,—
সে-আলো জ্ঞানের।

সে-আলোকে দেখি মুখ আপনার,
দেখি মুখ মানুষের, সমাজের, সভ্যতার;
নিজেকে নতুন করে করিয়াছি আবিষ্কার
বারবার।

তবু সে ত শেষ কথা নয়।
দিনান্তের শেষ রবি তবু কথা কয়,
মেঘে মেঘে কত ছবি আঁকা হয়,
দিন আর রাতগুলি বুনেছে বিস্ময়।
বারবার এই ধরণীতে আসি তাই
আপনাকে খোঁজার বিস্ময় রেখে যাই।

নীল আলো

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর থেকে এক নীল আলো বিচ্ছুরিত হয়
দেখেছে অর্কিব দুই রুশ,
আর দুশ' কোটি লোক—রমণী পুরুষ
সেই নীলময়তায় নিমগ্ন থেকেও,
জন্মাবধি দৃষ্টিহীন, বিবর্ণহৃদয়।

তবু যারা কবি তারা স্ফুলিঙ্গ দেখেছে এর আগে,
কখনো সন্ধ্যায় নীলাকাশ,
দুটি প্রীত নয়নের আসন্ন উদ্ভাস,
কভু বন্য লবণাম্বুরাশে উতরোল
বিস্ময় : দেখেছে নীল জলকন্যা জাগে।

ঘরের স্মৃতি

শিশিরকুমার দাশ

হায়রে, আশ্বিনে রোদ, চাঁপা রঙা, হাওয়া কী মধুর,
কী মৃদুমোদির গন্ধ গোলাপের বনে;
দুপাশে সবুজ মাঠ, পাহাড়ের নীলসারি ঐ ও অদূরে
ছুটেছে ঘোড়ার সারি, পাহাড়ের সরু পথ দিয়ে
সোনালি কেশর দোলে হাওয়ায় হাওয়ায়;
জোয়ান রাখাল ছোটে, লালটুপি, উঠেছে ফেনিয়ে।

ওদিকে ঝর্ণার জল, ঝিরঝির, শীর্ণা রূপবতী—
দুপাশে ভেড়ার পাল লোমশনরম,
মনে হয় মেঘ যেন হঠাৎ মাটিতে এসে হারিয়েছে গতি—
দুটি পাহাড়ের মাঝে স্বচ্ছ হ্রদ কাঁপে সে হাওয়াতে
দুজনেরই প্রিয়তমা, আনন্দরঙ্গিনী;
ছেঁড়াকেটে বুড়োমাঝি পয়সার হিসেব করে অতি ক্ষিপ্র হাতে।
বৃদ্ধের মতন একা পড়ো গীর্জা ঈশ্বরে বিশ্বাসী—
মদের দোকানে দুটি বেহুঁশ নাবিক
সমুদ্রের গান গায়, ভাবে ঝড় হাসে অট্টহাসি।

তরুণী তরুণটিকে জড়িয়েছে নীলচোখে আলো
সবুজ শস্যের মত ওরা দোলে রোদে:
এমন পৃথিবী আজ : তারই মাঝে সহসা ঘনালো
সুদূরে দেশের ছবি, লালমাটি, হাওয়া বাঁশবনে
হাঁসচরা বিলগুলি, বঁড়শি ফেলে হারু
আর শুনি সতত নদীর শব্দ, পড়ে মোর মনে॥

অভিশাপ

শংকর চট্টোপাধ্যায়

গভীর থেকে ডাক এসেছে, বিষাদ
বাসনা তাই যতেক উদ্যত
অত্যাচারী সংক্রামিত ক্লিন্ন গ্রাস
হে প্রেম দ্যাখো মৃত আগুন দর্পণে।

নে তবে নে, অতল খাদে, শূন্য শব
মলিনতর কুসুমে তারে ঢেকে রাখিস
প্রাপ্য ছিল ক্ষুধিত কৃশ নির্বাসন
প্রহার যেন, প্রহার শুধু তর্পণে।

কোনদিন

আলোক সরকার

অনায়াসে পুরুষ বদল করো। কিন্তু কোনোদিন
পুরোনো তোশক তুলে নীল কাগজের
এলোমেলো দশটি অক্ষর সেই চোখে পড়েছে কি?
একটি বিকেলবেলা বকুলগন্ধের মতো কাছে এসেছে কি?
মাঘের মন্দার রূঢ় উদ্ধত রঙিন
দশটি অক্ষর সেই গোলাপের কাছে এসে প্রীত সৌরভের
প্রণতি তোমার কানে চিরদিন সুদূর প্রশান্ত কোনো
ভাষা বলেছে কি?

বৃষ্টি আর আমি

জগন্নাথ চক্রবর্তী

দুটি প্রাণ কাঁদে শুধু অন্ধকার শ্রাবণের রাতে
দুজনেই দৃষ্টিহীন—
বৃষ্টি আর আমি।

শ্রাবণের অন্ধকারে
নির্বাপিত প্রদীপের অঙ্গারের ঘ্রাণ
সমস্ত আকাশটাকে গন্ধে ভরে—
রাত্রিলীন স্মৃতির সৌরভ।

বৃষ্টির আকাশ থেকে উড়ে আসে ভয়ার্ত ফড়িঙ্
কান্নায় সমস্ত ডানা ভিজে—
কার কান্না? তার নয়।
পৃথিবীতে এই এক রীতি,
কান্না তা সে যারই হোক
তোমাকেও নিশ্চয় ভেজাবে,
তোমারও আকাশটাকে নেভাবে সে।
এই জল শিলালিপি পাহাড়ের গায়ে
যুগ থেকে যুগান্তরে ব্যথায় ক্ষোদিত,
হায়রে হৃদয়হীন ক্ষয়হীন শিলা!
জলস্রোতে ভেসে যায় কালস্রোত
ডুবে যায় আকাশের ডানা,
বুকের বালুকাতীরে আর্তস্বর
সে শুধু ডোবে না।
তাকে আমি বারে বারে ঢেকে দিই
কী দিয়ে যে ঢাকি!
চোখের গভীরে যার জন্ম হ'ল
চোখের আড়ালে তারে রাখি।

লবণাক্ত পৃথিবীর মাটি
জলে ও প্লাবনে,
সেই মাটি ফুঁড়ে ওঠে লতার শরীর
সেই মাটি আমার জননী;
তাই আমি শ্রাবণ রাত্রিতে
বিরহিনী।

আরো এক কান্না আছে যা আমার সর্বাঙ্গে অস্থির
আমার সমস্ত সুধা, সব সুখ,
বসন্তের সমস্ত মিনতি,
যে-কান্নায় অন্ধ আমি
যা আমার ব্যথার আরতি।
আমার কান্নার প্রতিধ্বনি
আমাকেই আবার কাঁদায়,
যতোবার তার ছিঁড়ে বাজে ততোবার
নিভৃত ঝঙ্কার।

আমার কান্নার জলে যদি কেউ ভেজে
এই ব্যথা যদি কেউ ছোঁয়
সে শুধু আমাকে নয় সমস্ত ব্যথাকে পাবে,
সে শুধু আমাকে নয় পৃথিবীর সমস্ত কান্নাকে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে।
কারণ, পৃথিবী খুঁজে পাবে না তৃতীয়:
দুটি প্রাণ কাঁদে শুধু অন্ধকার শ্রাবণের রাতে
দুজনেই দৃষ্টিহীন—
বৃষ্টি আর আমি।

নদীপথ

আরতি দাস

দিন যায় মিছে কাজ আচমকা
সাঁঝের সময়
একা ঘাট ধু ধু ফাঁকা অকারণ
কী যে ভয় ভয়।
কোনো কূলে আলো নেই এ আঁধারে
ডাক দিয়ে সাড়া
মেলে না কোথাও নেই কোনখানে
তারার ইসারা।
কোনো নাম মনে নেই পরিচয়
কি ঠিকানা তার
অচেনা সে কাকে চেয়ে এতকাল
পথচলা সার।
জলে কেন এত ঢেউ? মনে নেই
কী যে সেই নাম
মুঠিভরা কালোজল মুঠি খুলে
জলেই দিলাম।
ঘাট ছেড়ে যেতে নদী ছলছল
জলচোখে ভাসে
ততদূরে পথ নেই যতদূরে
ভালবাসা আসে।
নাও খোলো ধু-ধু জল, মন মাঝি
বৈঠা কুড়াও
জলে গেছে শুধু হাত? আঁধারেই
দু হাত বাড়াও।

নোঙর

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

জানলার পাশে খাড়া গাছটায় ঘুঘু কি শালিক
কেবল ডাকছে, হৃদয় জুড়িয়ে দিক সাড়া দিক!
হাওয়া যে এখন নোঙর ফেলেই ঝিমুচ্ছে ব'সে,
একলা এখানে চুপচাপ এই গোধূলি-প্রদোষে।

দু'হাতে সময়, গাছটার দিকে পাতাদের ভিড়ে
তাকিয়ে রয়েছি, মনের গহন সমুদ্রে ভাসি,
বন্ধুরা যারা ছিল পাশাপাশি — সবাই প্রবাসী,
পুরোনো মেজাজ আঁকড়িয়ে আছি টিকে সশরীরে।

চোখের সামনে প্রসারিত মাটি — শুধু উঁইঢিপি
তাতে সুড়ঙ্গ বাসা ক'রে আছে সাপে ও ইঁদুরে,
জানলার পাশে একা ব'সে আছি বুঝি বিধিলিপি,
পরিচিত যত প্রিয় বন্ধুরা সব দূরে দূরে।

সময় কাটেনা, আকাশে—শূন্যে একঝাঁক চিল
ভেসে বেড়াচ্ছে, একলা এখানে দরজায় খিল,
খাড়া গাছটায় থেকে থেকে শুধু ঘুঘু কি শালিক
কেবল ডাকছে, হৃদয় জুড়িয়ে দিক সাড়া দিক।

শুকসারী-কথা
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
* উপন্যাস *

কোপাই নদীর হাঁসুলীবাঁকের নসুবালাকে এ অঞ্চলে সবাই চেনে। বেটাছেলে হয়ে জন্মে চিরটাকাল সেই ছেলে বয়েস থেকে এই পঁয়ষট্টি সোত্তর বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েছেলে হয়ে জীবনটা শেষ করতে চলেছে। ছেলে বয়সে মা তাকে মেয়ে সাজিয়েছিল, নাক ফুঁড়ে নোলক—কান ফুঁড়ে মাকড়ী—হাতে কাচের চুড়ি পরিয়েছিল—চুল না কেটে লম্বা চুলে বেড়া-বিনুনী বেঁধে দিত, পরিয়ে দিত একখানা গামছার মত খাটো তাঁতে বোনা 'ফেরানী' বা ফিরানী, অর্থাৎ যাতে নাকি কেবল কোমরে জড়িয়ে একটা ফেরতা দেওয়া যায়। সেই থেকেই তার মেয়েলিপনা এবং মেয়ে জীবন আরম্ভ। লোকে ভেবেছিল বয়স হলেই যথানিয়মে ছেলেটা ছেলেই হবে, বিয়ে করবে, সংসার হবে এবং তখন এই ছেলেবেলার মেয়েলিপনার জন্যে সে লজ্জা পাবে। কিন্তু তা হয় নি। ছেলে মেয়ে সেজেই থেকে গেল। ছেলেবেলা মেয়ে সাজাবার আরেকটা কারণ ছিল—ওদের মনসার ভাসানের দলে ও সাজতো বেহুলা, ছিপ্‌ছিপে দীঘল চেহারার কালো ছেলেটিকে মানাতো বড় ভাল, আর গানের গলা ছিল চমৎকার, সরু মেয়েলি গলা! ভাঁজো পরবে মেয়ে সাজিয়ে ওকে সকলে নাচাতো। এবং চৈত্রমাসে ঘেঁটু পরবেও সে মেয়ে সেজে নাচত। কোথা থেকে পাড়ার মাতব্বরেরা সলমা চুমকি দেওয়া একটা ঘাগরা এবং ঢিলে একটা বডিস্ পরিয়ে হাতে রুমাল দিয়ে নামিয়ে দিত। মাথার লম্বা চুলে বেণী তৈরী করে ঝুলিয়ে দিত, ঠোঁটে রঙ মাখত এবং গানের সঙ্গে ও নাচত গাইত—

তাই ঘুনোঘুনো বাজে লো নাগরী—
চরণে নূপুর হায় থামিতে যে চায় না।
তাই ঘুনোঘুনো তাই ঘুনোঘুনো।

এসব গান ওদের বেঁধে দিত মুকুন্দ ময়রা। বছর বছর এক এক রকম। যে বছরে যা বিশেষ কিছু ঘটত তাই নিয়ে গান। প্রথমবার নসুবালা যেবার নাচে—তার আগেরবার উঠেছিল ধূমকেতু। এবং সেবার মড়ক হয়েছিল। মুকুন্দ গান বেঁধে দিয়েছিল—

এবার উঠে বমতারা—ছেলেপিলে
বুড়োধাড়া সব গেল মারা
এবার উঠে——।

ধুয়ো সেই এক।—তাই ঘুনোঘুনো—তাই ঘুনোঘুনো। নসুবালাই ওটা গাইত এবং পায়ে তার নূপুর থাকত সেটা বাজত—ঘুনো—ঘুনো ঘুনোঘুনো ঘুনোঘুনো।

বেউলার ভাসানে লখিন্দর সাজতো করালী; বাগদীদের ছেলে, মা তাকে ছেলেবেলায় ফেলে পালিয়েছিল—পাড়ার পাঁচজনের বাড়ী কুড়িয়ে খেয়ে মানুষ—তবে একটু আদর স্নেহ পেত নসুর মায়ের কাছে—সে নসুকে বলত নসুদিদি। ওই করালীই বেউলোর দলে সাজত লখিন্দর। ভেদো ঘরে নসু সাজত মা—করালী ছেলে, কোনদিন বা নসু বউ—করালী বর। এইভাবে বড় হল। করালী হল ডাকাবুকো। নসু করালীর নসুদিদিই থেকে গেল—মেয়েদের সঙ্গেই ওঠাবসা—কথাবার্তা, হাসিখুশী, মনের কথা আর তার সঙ্গে তাকে পেয়ে বসল নাচ আর গান। ভাদ্র মাসের এবং চৈত্র মাসের মুখ চেয়ে বসে থাকত, কবে আসবে। বেউলো আর ভাঁজো আর ঘেঁটু। পাড়ায় পাড়ায়ই রেওয়াজ ছিল, নসুবালা মূলগায়েন আর নাচকরুনী হয়ে গাঁ-গাঁওলায় দল নিয়ে বেরুতে সুরু করল গোটা মাস। সঙ্গে থাকত করালী আর জন চারেক। গাঁও-গাঁওলায়—মণ্ডলদের বাড়ী মুখুজ্জেদের বাড়ী ঘোষদের বাড়ী—ঠাকুরদের বাড়ী গিয়ে দাঁড়াত। জয় হোক গো মা ঠাকরুণ, ভাঁজো এয়েছেন। তারপর গান। মেয়েরা নসুর গান আর নাচ দেখে মুখটিপে হাসত। বলত, মরণ!

নসুর মনে আছে চন্দনপুরে বাবুদের বাড়ি নতুন কলকাতার বউ তার বড় জায়ের মুখে ওই 'মরণ' কথাটা শুনে ফিস্‌ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিল—মরণ বলছিলে কেন দিদি?

—মরণ নয়? বেটাছেলের মেয়ে সেজে নাচের ঢঙ দেখ দেখি।

বউটির বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না—সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কে বেটাছেলে? যে নাচছে? তুমি ঠাট্টা করছ দিদি? বড় জা বলেছিল—ঠাট্টা? যা না ওর গালে হাত বুলিয়ে দেখ না। হাত ছড়ে যাবে দাড়ির খোঁচায়!

নসুর রাগ হয়েছিল—সে সামলাতে পারে নি, বলেছিল—কি যে বলেন বউদিদি! ভারী!—ভারী না বেরুক—মেয়েদের গোঁফ বেরোয় না? হ্যাঁ। মরণ আমার ভারীর! বলে গান ধরেছিল; তাদের ভাঁজোর গান—

কেন্টো বেড়ায় পাতায় পাতায় ডালে না দেয় পা—
ও রাধে লো, পাতার ডগায়
(ও মন রসনা আমার) ফুল হবি তুই যা!

ঢোল এর পর বেজেছিল জলদে—তাং তাং তাং তাং বোলে—আর নসু নেচেছিল ঝমঝম—ঝমঝম—করে নূপুর বাজিয়ে। ভাঁজো থেকে সে এনেছিল ভাদু। তার কারণ ভাঁজোতে পাড়ার হৈ হল্লোড়—মদের নেশা তার ভাল লাগে নি। বর্ধমান গিয়ে সে ভাঁজো এনেছিল। বলে—বর্ধমানের মহারাণীর কাছে সে প্রথম গিয়েছিল—তার ভাদু নিয়ে। মহারাণী তাকে মা কি ডেকেছিলেন—ভাদুর মা বলে। সেই 'ভাদুর মা' নামটিই তার সব থেকে প্রিয় নাম। এবং সে সেই ভাদুর মা হয়েই থেকে গেছে মেয়ে সেজে।

এখন বাস তার চন্দনপুরে। হাঁসুলীবাঁকের বাঁশবাঁদি গাঁ—যুদ্ধের সময় শেষ হয়েছে মড়কে-দুর্ভিক্ষে—তারপর এসেছিল ঝড় নসু ও বলে 'চাইকোলোন' চাইকোলোনের পর কোপাইয়ে ক্ষ্যাপা বান। যুদ্ধের কি কাজে বাঁশ লাগে—সে জানেন ভগবান আর জানে যুদ্ধ যারা করতে এসেছিল—সেই তারা—সেই আগুণ্ডলমুখোরা; সেই ডাকাবুকো করালীর 'ম্যানেরা'। বাঁশবাঁদির সেই পাঁচীরের মত বাঁশের ঘের কেটে ফাঁক করে দিলে; কোপাইয়ের ক্ষ্যাপা বান—খলখলিয়ে কলকলিয়ে একবার চুকল সন্ধ্যার মুখে—দুয়োর খোলা ঘরে হেরে-রে-রে করে ডাকাতের মত। সব লুটে-পুটে, ভেঙে-চুরে, প্রাণে মেরে নিয়ে চলে গেল। আর ঢেপে গেল বালি!

বাঁশবাঁদির কাহারেরা হল হা-ঘরে। দিগদিগন্তরে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে চলে গেল। সে, পাগল আর সুচাঁদ এসেছিল চন্দনপুর। সুচাঁদ চন্দনপুরের ইস্টিশানের ধারে বটতলাতে বসে বলত—হাঁসুলীবাঁকের উপকথা। এ শুনত ও শুনত—মুচকে মুচকে হাসত। চলে যেত। শুনত শুদু ঠায় বসে চন্দনপুরের শিবদাদাবাবু। খাতাতে লিকে নিত। নসু আর পাগল দুজনে গাঁয়ে-গাঁয়ে গান করে বেড়াত।

হাঁসুলীবাঁকের কথা বলব কারে হায়
চন্দনপুরের টেরীকাটা বাবুরা মুখ বেঁকায়।
জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই
বিধেতা বুড়োর খেলা দেখে যারে ভাই।

তারপরে সুচাঁদ পিসী মল—পাগল সাঙাত মল—থেকে গেল নসুবালা ভাদুর মা। এই চন্দনপুরেই থেকে গেল। লোকের এখন দুঃখের শেষ নাই সীমা নাই শুদু বাঁশবাঁদি নয়, সব গাঁয়েরই এখন বাঁশবাঁদির দশা। ভাঙা আর ভগ্ন, মাটির ঢিবি—নয় পড়-পড় দেওয়াল—নড়বড়ে চাল ঘর; পেটে ভাত নাই

"কে বেটাছেলে? যে নাচছে? তুমি ঠাট্টা করছ দিদি?"

পরনে কাপড় নাই, হালের বলদ গরু নাই, পুকুর মজা—জল তাতে নামে মাত্র কাদার গোলানি। দু-চার জনা বেনে-বান্তি—যারা দোকানদানী করে—তাদেরই বাড়বাড়ন্ত। জমিদারেরা ঘায়েল, মহাজনেরা দেউলে, চাষীরা মরমর। গরীবগুলোর কথাই নাই। চন্নপুরে জমিদারদের পাকাবাড়ি ছিল অনেক-গুলি—তার ওপরে ধুলো লেগে এমন দশা যে মনে হয় গায়ে মাথায় ধুলো মেখে কোন বড়লোকের কন্যে কি বউ হাতে লাউয়ের খোলা নিয়ে পথের ধারে ক্ষেপে গিয়ে বসে আছে: সাড়া নাই—নড়া নাই, মরা কি জ্যান্ত ধরতে সময় লাগে। তবু সে সময়ে লোকের কি হৈ-হৈ আর রৈ-রৈ। ধ্বজা আর পতাকা—আর মিটিং আর মিটিং। আর চীৎকার! চীৎকার বলে চীৎকার—সে আবার একটা চোঙার ভেতর দিয়ে গগনফাটা চীৎকার। কি ব্যাপার? বুঝতে পারত না নসু। জিজ্ঞাসা করত—বলি হ্যাঁ গো—ই সব কি হচ্ছে মাশয়রা? ই সব চেঁচা-মেচি হৈ চৈ— অঃ হু—কানের পর্দা ফেটে গেল! যেন দ্যাশ জুড়ে নোকের বেটার বিয়ে নেগেছে!

এখন নসুর কথাবার্তায় বাঁশবাঁদির সেই কাহারদের কথা এবং সুরের সঙ্গে চন্নপুরে শহর থেকে আমদানী কথা ও সুর মিশেছে। কেউ কেউ ঠাট্টা করলে বলে—এখন শহরের মানুষ হনু যে! সে বেশ সুর করে। কখনও কখনও ভাঁজোর পুরনো গান গেয়ে নেচেও দেয়

কালো-জলে, কটা-জলে, মিশেও মেশে না—
কালো কানাই—পায়ে ধরে—ও মন রসনা আমার—
রাধা হাসে না।

ঢোলের অভাবে মুখেই ঢোলের বোল আউড়ে শুধু পায়েই নেচে একপাক দিয়ে দেয়। তাং-তাং তাং-তাং-তাং — ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু—! তারপর বেশ নারীসুলভ ভঙ্গিতে হাত দুলিয়ে অঙ্গ দুলিয়ে চলে যায়।

যাই হোক—এই নতুন এক তাজ্জব দেখে সে প্রশ্ন করে—ই-সব কি? এই চেঁচামেচি—হৈ চৈ! যেন দ্যাশ জুড়ে নোকেদের বেটার বিয়ে নেগেছে! কি বেপার?

—ব্যাপার যে ভয়ঙ্কর—চরম, নসু।

—সে কি রকম?

—দেশ স্বাধীন হল।

—স্বাধীন হল?

—হ্যাঁ।

—তাতে কি হল? কি রকমে হল?

—সায়েবরা রাজা ছিল—তারা তল্পীতল্পা গুটিয়ে দেশে চলে গেল।

—বাবাঃ। সেই রাঙাওলমুখোরা? করালী ডাকাবুকোর ম্যানেরা! হেই বাবা!

—হেই বাবাই বটে নসু—হেই বাবাই বটে!

—তা পরেতে?

—কি তা পরেতে?

—এইবার কি হবে?

—কি হবে? দেখবি কত কি হবে। খাবার কষ্ট থাকবে না, পরবার কষ্ট থাকবে না, দেশে মুখ্যু কেউ থাকবে না।

—ওরে বাবা রে! আমি কোথাকে যাব রে!

উত্তরদাতা হাসতে থাকে। নসু হঠাৎ বলে—তা হলে বঃ—মরি।

—কেন, মরবি কেন?

—মরে আবার মায়ের কোলে ছোট হয়ে ফিরে আসি। তু

তো ইস্কুল যাব। লতুন জামা কাপড় পরব!

উত্তরদাতা এবার চুপ করে যায়। কি বলবে এতে?

বিচিত্র নসুবালা বলে—তা হ্যাঁ গা—ই সব হল কেনে? পরক্ষণেই সংশোধন করে বলে—কেন? বুয়েচ! মুখ ফসকে ক্যানে বেরিয়ে যায়। চামড়ার মুখ তো! তা হল কেন বল দিকি?

—কেন? তার উত্তর আমি জানি না।

—হুঁ। কি ক'রে জানবে? বটে। তা যাই,আমি শুধিয়ে আসি গা।

—কাকে?

—আদারবুড়ীকে। ফুল্লরাকে। খেলোয়াড়ী লইলে তো খেল হয় না! গঙ্গারামকে মনে আছে? ফাং গঙ্গারাম! ময়রার বেটা মা কামিখ্যের থানে গিয়ে খেল শিখে এয়েছিল। সেই একটা হুঁকো বসিয়ে দিত অনেক দূরে—তা পরেতে বলতো—ফেলা বেটা জল ফেলা। আর নলচের মুখ থেকে গাড়ুর ললের মত জল পড়তে লাগত। বলত আউর জোরে—আরও জোরে জল পড়ত। আবার বলত—থাম যা। থেমে যেত। আবার বলত—ফিন পড়—আউর থোড়া—আবার পড়ত। মনে আছে। খেলোয়াড়ীর খেল। তা সব খেলার মূল খেলোয়াড়ী তো আদারবুড়ী, তাকে শুধিয়ে আসি—বলি গা—আদারবুড়ী ই খেলের মানে কি মা?

আদারবুড়ী ফুল্লরা দেবী এখানকার শ্রেষ্ঠ দেবস্থান। এখানকার লোকে বলে একান্ন মহাপীঠের এক মহাপীঠ। এখানে দেবীর অধরোষ্ঠ পড়েছিল—স্থানের আসল নাম অট্ট-হাস; তার পর নাম হয়েছিল শ্যামলাবাদ, শ্যামলাবাদ ধ্বংস হলে নাম হয়েছিল চন্দনপুর, কারণ তখন অট্টহাসে দেবীর অস্তিত্ব কেউ জানত না। গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছিল। শুধু গন্ধ উঠত চন্দনের। তাই নাম হয়েছিল চন্দনপুর। তারপর এখানে কোপাই নদীর ঘাটে একটা উঁচু ঢিপিতে নৌকো লাগত বর্ষায়—আশপাশ থেকে আসত গন্ধবণিকেরা, বেচা-কেনা চলত, চাল ধান গুড় কলাই লঙ্কা কুমড়ো। তাই ঢিপিটার নাম হয়েছিল বন্দর ঢিপি—আর গাঁয়ের নাম চন্দনপুরের বদলে হয়েছিল লাভপুর। পরে কাশী থেকে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এক সন্ন্যাসী এসে ওই জঙ্গলের মধ্যে তপস্যা করে দেবীর দর্শন পান। তিনিই মা ফুল্লরাকে প্রকাশ করেন। এই মা ফুল্লরাই নসুবালার আদারবুড়ী—অর্থাৎ আদাড় বা জঙ্গলে থাকেন যে বুড়ী তিনিই আদাড়বুড়ী। বুড়ী বই কি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মা; কত তার বয়েস—সে বুড়ী বই কি। আদিকালের বাদা বুড়ো যে—তারও মা—বুড়ী বুড়ী মহাবুড়ী।

চন্দনপুরে এসে নুচাঁদ ও পাগলের মৃত্যুর পর এই মায়ের স্থানের কাছাকাছি ঘর তুলেছে একখানি। ছোট্ট ঘর, এক-টুকরো দাওয়া, তার কোণে এককালি উঠোন, তার সামনে একটি বুনো ফুলের গাছের তলায় বেদী বাঁধানো। আর একটি জবা, একটি অপরাজিতার গাছ। জবাগাছের ফুল—অপরাজিতার ফুল গ্রামের প্রৌঢ়ারা বেদীস্থানে যাবার সময় তুলে নিয়ে যায়। নসু বলে—একটি দুটি রেখে লিয়েন মা। ফুলের গাছ ফুল বিইয়েছে—ওর তো ছেলে—সব লিলে পরাণে লাগবে। আর শোভা? মা শোভা হারাবে। তা আমার লেগে মাকে বলেন। বলেন—নসুকে ভাদ্দুর মাকে পার করো।

ওই বুনো ফুলের নাম কেউ জানে না। থোকা থোকা নীলাভ সাদা যুঁই ফুলের মত—গন্ধ তার খুব। নসু তার নাম দিয়েছে 'দিলাপিয়ারা'। হাস্নুহানা নামটি থেকে এই নামটি তার মনে এসেছে। রোজ সকালে উঠে নসু ওই আদাড়বুড়ীর দরবারে যায়—প্রণাম করে এবং হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে আসে। বোবার কথা কালার কাছে। কথাটা বলে রাজপুরোহিত। অর্থাৎ নসু বোবা—ফুল্লরা কালা। মধ্যে মধ্যে রহস্য করে প্রশ্ন করে নসুকে—নসুবালার কি খবর?

নসু মাথায় ঘোমটা টেনে নতজানু হয়ে প্রণাম করে বলে-এই মাকে বলছিলাম।

—কি বলছিলে?

—বলছিলাম? —একটু চুপ করে থেকে বলে—সে শুনে কি করবেন?

—কি করব? আমি মাকে বলব তোমার হয়ে। মনে পড়িয়ে দেব।

—দেবেন? বলবেন? সত্যি বলছেন?

—নিশ্চয় সত্যি বলছি। মায়ের সামনে মিথ্যে বলতে আছে?

—আমাদের নাই—আপনাদের আছে। আপনারা যি বলেন।

—আমরা মিথ্যে বলি?

—সেই দিন যি বললেন—আমার ছামুতে।

—কাকে?

—সেই যি—আমি পেনাম করছিলাম। একজনা এসে ঠং করে রুপোর টাকা একটা আর একখানা লোট দিলে, আপনি কুড়িয়ে লিলেন; আপনকার শরীক এসে শুধালে, কি দিলে—আপুনি রুপোর টাকা দিয়ে বললেন—এই। লোটটা দিলেন না। মিছে বল, হল না?

চটে যাবার কথা, চটে যান পুরোহিত। কিন্তু কি বলবেন ভেবে পান না।

নসুবালা বলে—তা আপুনি তো সত্যি বললেই পারতেন—মায়ের হুকুমে উ টাকাটো নিয়েছেন আপুনি।

অবাক হল পুরোহিত—নসু বলেই যায়; —আপুনি মাকে জানেন, মা আপনকাকে চেনেন। সেবা পুজো তো সবই আপুনি করেন। ওরা তো করে না। শুধু ভাত পাঁঠা খায়, মদ খায়—হ্যারে-রে করে। আমি দেখি, আদারবুড়ীকে শুধিয়েও দেখিছি। সি দিনে যখন টাকাটি ট্যাঁকে গুজলেন তখন আমি হেই মা করে বাঁচি না। বাবা রে আপনকার মতন লোক চোর! তখন মাকে বললাম—মা বেপারটি কি বল! মা বললে—উঁদিকে লুকিয়েছে, কিন্তুক আমি—আমি তো ড্যাবডেবে চোখ মেলে চেয়ে সব দেখেছি। আমাকে লুকিয়ে তো চুরি করে নাই। তা হলে না হয় চোর হত! মনে হল তা বটে। মাকে তো লুকোই নাই! বুয়েচেন বাবা, তবু সন্দেহ যায় না গো। তখন বললাম—আমার মনে মনে বললে হবে না। তোমাকে বলতে হবে মা! হ্যাঁ। তা কি ক'রে বলবে? কথা কয়ে বললে অপর লোকে শুনবে। তা—। এই দেখেন এই থিলেনের মাথার ওপর থেকে থপাস করে পড়ল—এই বড় টিকটিকি। পড়ে আমার মুখের পানে—বাবা—সে কি ড্যাবড্যাবানি চাউনি গো! এই কালো মটরের মত দুটো চোখ। একদিস্টে চেয়ে রয়েছে আমার পানে। আমি আর ডরে বাঁচি না। বলি, এমন করে চোখ দিয়ে গিলে খাস না মা। তখন বলে কি—ঠিক-ঠিক-ঠিক। হাত জোড় করে বললাম—কি ঠিক মা? পুরুত মশায় পাপ করেছে? তা আর রা কাড়ে না। চুপচাপ। তখন বললাম—তবে কি বলছিস—চোর লয়? —তু ওকে দিয়েছিস! অমনি বলে—ঠিক-ঠিক-ঠিক। বাস্, বলেই দে ছুট।

পুরুত মশায় এবার হেসে বলেন—তোকে ফাঁকি দেবার জো নাই! তোর ভক্তি আছে—চোখ আছে।

—থাকবে না? চেরকাল তো ওই করেই এলাম গো। ঘর লয়, সংসার লয়, শুধু আমার ভাদুমণি, আর আমার মা আদারবুড়ী। এই দেখেন—ভাদুমণি তো আমার [illegible]—

আমি মুখের পানে চেয়ে থাকি—ঠিক বুঝতে পারি খিদে লেগেছে কি না, ঘুম পেয়েছে কি না। মধ্যে মাঝে বকি—তা মুখটি শুকিয়ে যায়। আমি দেখতে পাই। ওই থেকেই আদারবুড়ীর ইসেরাও বুঝি খানিক আদেক। কিন্তু আপনি। বাবা—মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাম কাজ আপনার। আপনার মিছেতেও পাপ নাই, সত্যিতেও পুণ্যি নাই। তাই তো বলছি বাবা, আমার কথা শুনে বলবেন—হ্যাঁ ভাদুর মা, মাকে বলব তোর কথা। তা পরেতে শুনবেন—নিয়ে ঘরে গিয়ে হাসবেন। বলবেন—মরণ দেখ দিকি—ছোটনোক ভাদুর মায়ের কথা দেখ দিকি। এই নাকি মাকে বলা যায়?

—না—না। তিন সত্যি করছি মায়ের কাছে—বলব—বলব —বলব।

—বেশ, তবে শোনেন।

'শোনেন' বলেও কিন্তু থেমে যায় নসু। একটু থেমে বলে—যেন হাসবেন না।

—না—না, হাসব কেন?

গলা নামিয়ে হাত জোড় করে বলি—মা আদারবুড়ী বল মা, আমার যাবার সময় হল কি না!

—হুঁ। তা কি বললে মা?

—রা কাড়ছে না গো। এই দেখেন কতক্ষণ 'ডাঁড়িয়ে' আছি। তা আমার ঠেকন তো ওই টিকটিকিটা, তা একবারও টকটকালো না। বললাম—হইছে মা সময়? টকটকিয়ে বল! তা চোপচাপ! তা বাদে বললাম—তা হলে বল হয় নাই? তাও চোপচাপ। রাও নাই সাও নাই!

—সে আর জেনে কি করবি? যেতে তো হবেই। আজ আর কাল!

—এই কথা বাবা, আজ আর কাল, কিন্তু আজ যেতে হলে উয্যুগ চাই। কাল হলে কাল। সেইটি জানতে চাইছি। তা হলে উয্যুগ করে বসে থাকি। মায়ের নাম করি—মা-মা-মা-মা-মা—। তা হলে হঠাৎ সেই যমদূত—। বাবা গো!

বলে শিউরে ওঠে নসু। তারপর বলে—মাশায়, আচমকা মাথার চুল খামচে ধরে টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে যাবে। মা-বাক্যি মুখে বেরুবে না—বেরুবে—না-না-না-না। মা-মা আগে থেকে বলতে লাগলে বেটা যমদূত এসে পিছু হটবে; হাত বাড়িয়ে—হাতে খিল ধরবে। তখন শিবদূত আসবে। এসে হাত ধরে বলবে—চল্ গে ভাদুর মা—মা তোকে নিতে পাঠিয়েছে। কোথা যাবি বল? কৈলেসে না বৈকুণ্ঠে না ইন্দরাজার স্বগ্গে।

হাসেন পুরুত। বলেন—তা কোথা যাবি তুই?

—আমি বাবা স্বগ্গের চন্নন-পুরে যাব।

অবাক হতে হয় পুরোহিতকে—স্বর্গের নতুন ঠিকানা শুনে। প্রশ্ন করেন, স্বগ্গে চন্ননপুর আছে নাকি?

—নাই? নিশ্চয় আছে। তা লইলে ই গাঁয়ে বাবুরা সেই সব এই—এই বাবুরা—সব সাধকরা—সব নোকজনেরা গেল কোথা? আমার মা, সুচাঁদ পিসী, পাগল স্যাঙাত, পাখিমণি, বসনদিদি, বেনোয়ারী সব গেল কোথা? কোথা কাজকাম করে খায়?

পুরোহিত হাসলেন নসুর এই অদ্ভুত পরিকল্পনা শুনে। হেসে নিয়ে বলেন—তা আমি বলব। মাকে জিজ্ঞেস করব। যদি বলে—দেরী আছে—তা হলে কি বলব? বলব দেরী ক'র না মা—বড় কষ্ট দুঃখ—

—হেই মাগো। বাধা দিয়ে নসু বলে—তা আবার কখন বললাম! আমার কষ্ট দুঃখ—বলেছি আমি?

—বলিস নাই, কিন্তু দুঃখ কষ্ট তো বটে নসু।

—বটে বটে। দুঃখও বটে কষ্টও বটে। দেখ, চালে কাঁকর, চাল মেলে না, কাপড় নাই, তেনা পরে দিন কাটছে। আজ ই মরছে—কাল সি মরছে। দুঃখও বটে, কষ্টও বটে। কিন্তু সুখ নাই? অনেক সুখ। কত দেখলাম বাবা—তা বল! 'যা দেখি নাই বাবার কালে—তাই দেখালে ছেলের পালে।' বাবা—মানুষে কি চেঁচানি চেঁচাইছে বল দেখি নি। সাহেবরা—সেই ওলমুখোরা পলাল বাবা! এই দাঙ্গা হল বাবা! ই সব? এ কি কম ভাগ্যি—কম সুখ গো!

—তা হলে বলব, এখন কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখ?

—তা—। তা—বলবে? তাই বলো। হ্যাঁ—ই সব দেখে শুনে তাক লেগেছে বাবা। আকাশে জাহাজ উড়ছে। দুমাদুম বোমা ফেলছে। মানুষ মারছে। আঙামুখো সাহেবরা পালাচ্ছে। লদী বন্ধন হচ্ছে। বাবা, ই সব দেখে তাক লেগেছে। তা বলো—আর দু দিন দেখতে দাও ভাদুর মাকে। তা পরেতে ও-পারে চন্নন-পুরে গিয়ে গান বাঁধব, নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে বেড়াব সবাইকার দুয়োরে দুয়োরে। বুয়েচেন বাবা—ধুয়োটা বেঁধে রেখেছি।—

বলেই আর অনুমতির অপেক্ষা করে না—ধরে দেয় ধুয়ো—কোমরে হাত দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নেচে নেচেই গায়।

—স্বগ্গপুরের বাসী শোন মর্তপুরের কথা—
মধুর চেয়ে মিষ্টি সে যে নিমের চেয়ে তিতা—
ও সে মর্তপুরের কথা।

তার পরই থেমে যায়। আর নাই। বলে—বটে কি না—বল বাবা। —বল। আঃ। যত তেতো, তত মেঠো। না পারে কেউ উগলে দিতে, না পারে কেউ গিলে ফেলতে। আঃ। তা লইলে মরতে বসে লোকে বলে—বাঁচাও গো বাঁচাও! 'মর' বললে সবাই কেনে বলে—গাল দিলি আমাকে! হায় রে—হায় রে! হায় রে!

বলতে বলতেই নসুবালা চলে আসে। বেলা অনেক হয়েছে। মাগুনে বের হতে হবে।

চলে আসতে আসতে থমকে দাঁড়ায় নসু। দেখ, পোড়া মনের করণখানা দেখ! বলা হয় নাই। সব কথা তো বলা হয় নাই বাবাঠাকুরকে! ফিরল সে।

—বাবা গো! ঠাকুর মশাই!

—কি? ফিরলি যে!

—ফেরলাম বাবা। সব কথা তো বলা হয় নাই।

—আবার কি?

—অভয় ঠাকুর যে বলছে—সব ঝুটা—সব ঝুটা—সব ঝুটা। এাই মুঠো বেঁধে দুই আকাশ বাগে ঘুষি মেরে বলছে—সব ঝুটো। আর কি বলছে—ইনাপ কিলাপ—জিন্দা বাদী। সায়েবরা গেল তো কি হল? ও লোক দেখানো যাওয়া। আসলে বাবুভাইদিগে গমস্তা রেখে আমাদের বাবুদের কোলকাতা যাওয়ার মত। বেলাতে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে মুনফা মারছে। তা আমি বললাম, তা মারবে না? এত বড় রাজ্যি-পাট—লাভ না নিয়ে ছেড়ে দেবে? ও বাবা! অমুনি বলে, চোপরাও! সব ঝুট, এঁটো এঁটো এঁটো! ইয়ের কি মানে বলো।

বাবাঠাকুর বললেন—উ সব আমিও জানি না ভাদুর মা। আমাকে আর জ্বালাস না। বাড়ি যা। আবার কাল শুনব।

—কাল শুনবে?

—হ্যাঁ—কাল।

—আজ রাতে যদি মরে যাই!

—তা যাবি। আর তাই যদি যাস—তবে এর জবাব শুনে কি হবে?

—তা 'মন রসনা বলে'—মন্দ বল নাই। যদি যাইই তবে শুনেই বা কি হবে! 'কিন্তুক—

—আবার কি?

—সি দেশ কেমন বটে?

—কোন দেশ?

—যেথাকে যাব।

—আমি জানি না। এবার তিক্ত হয়ে—রূঢ়ভাবে জবাব দেন পুরোহিত। ওদিকে কোথা থেকে যাত্রী এসেছে। ওই উত্তর দিকের শিবমন্দিরের ওপাশে জুতো খুলছে। এখুনি এসে দাঁড়াবে। নিশ্চয় প্রণামী পড়বে। তিনি হন হন করে এগিয়ে গেলেন।

নসু ফিরল। এবার সত্যি সত্যিই ফিরল!

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ—এসে পড়েছে মাঠের ওপর। জঙ্গলের ভিতর অন্ধকার। আলো ছায়ার খেলা। আগের কালে সে কি ঘন জঙ্গলই না ছিল। থমথম করত অন্ধকার। চলতে চলতে একজনে আর একজনের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হতে হতে—দাঁড়িয়ে বলত—কে?

অন্যজনও বলত—কে? লোক চেনা দায় হত!

ও পারেও তাই। পাগল সেঙাত গাইত—সে গান সেঙাতের সঙ্গে সেও গেয়েছে—

ওরে আমার ভাইরে?
ও তোর—আলোর তরে ভাবনা কেনে হায়রে?
অন্ধকারেই পরাণ পাখি সেই দ্যাশেতে যায়রে!
লম্ফ পিদীম চন্দ সুয্যি তাইরে নাইরে নাইরে।

তাই বটে। তাইরে নাইরে নাইরে! তা হোক।—

না থাক, আছে একজনা ভাই
এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়—
দুই চোখ তার দুইটি পিদীম—সে কি সে রোশনাইরে।
সেই জন্য মোর মনের মানুষ এইখানে খোঁজ পাইরে!

—তা—আরও কিছুদিন বাদে, মা আদাড়বুড়ী, আরও কিছুদিন বাদে। নয়ন ভরে দেখতে দে মা। দেখতে দে! আঃ—যত তেতো তত মেঠো—এ উগলে কি ফেলা যায়? গিলতে না পারি গলায় নিয়ে—গরুর মতন জাবর কাটছি। তাই আর কিছুদিন কাটি।

(এক)

—ব্যাই হে ব্যাই! ও ব্যাই! অর্থাৎ—বেয়াই হে—বেয়াই! ও বেয়াই!

ঘর থেকে 'মাঙনে' বের হবার পথে নিত্য নসুবালা বড় রাস্তার ধারে একখানা নিতান্ত ছোট, প্রায় তাসের ঘরের মত একখানা ঘরের সামনে ওই বেয়াই বলে ডাক দিয়ে উঠোনে দাঁড়ায়। ঘরখানা ছোট, উঠোনটা ছোট কিন্তু নিকানো তক্‌তকে, ঝকঝকে, পাশে পাশে কটি ফুলের গাছ। সবই বেল-ফুলের গাছ—দাওয়ার সিঁড়ির দু-পাশে দুটি করবীর ঝাড় আর বাড়ির পিছনে একটি মধুমালতীর লতা—সেটি উঠেছে বাড়ির পিছনদিকে একটি আউচ গাছকে জড়িয়ে। সব ফুল-গুলি সাদা। শুধু মধুমালতী ফুল সকালে সাদা হয়ে ফোটে—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লালচে হতে সুরু করে সন্ধেবেলা টকটকে রাঙা হয়।

ঘরখানি ফটিক বৈরেগীর বাড়ি। নসুবালার মতই বিশ্ব-সংসারে ছন্নছাড়া গোত্রছাড়া গোষ্ঠীছাড়া যা বলা যায় তাই। বৈষ্ণবী নেই। ছেলেবেলা বার দুই বিয়ে বা মালাচন্দন করেছিল—কিন্তু তারা ফটিকের ঘর করেনি। নিজেরাই পালিয়েছে। বলে গেছে—মুখে ঝাঁটা! অর্থাৎ—ফটিকের। দুই বৈষ্ণবীই বলে গেছে। এর পর আর সে বৈষ্ণবী আনে নি।

বৈরাগীর ছেলে তিলক কাটে না, ফোঁটা কাটে না, গান গায় না, ভিক্ষে করে না; পুতুল গড়ে। আগে দু-চারখানা প্রতিমা গড়ত এখন তাও গড়ে না—গড়ে শুধু পুতুল—তাই বিক্রী করে দিন চালায়। ঘাড়নাড়া—তামাক খাওয়া বুড়ো, দাঁত ফোকলা বুড়ী, টিক্‌টিকি, ব্যাঙ—এই তার পুতুল।

বৈষ্ণবত্বের মধ্যে বাড়িতে তার নিজের হাতে গড়া একটি রাখাল বালক কৃষ্ণমূর্তি আছে, তার পুজো মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে করে না, তবে ফুল দিয়ে সাজায়, নিজে চা খায় তাকেও ভোগ দেয়, ভাত খায়—তাও তাকে আগে দেয়। শুধু কৃষ্ণ রাখালবেশী। রাধা বা গোপিনী এ সব নেই।

নসুর সঙ্গে এই কৃষ্ণটিকে নিয়েই তার বেয়াই বেয়ান সম্পর্ক।

নসু হ'ল ভাদুর মা। নসুর ঘরে আছে মাটির গড়া ভাদুরাণী। যারা ভাদু পুজো করে—তারা পুজোর শেষে ভাদু ভাসায়। নসু ভাসায় না।

ভাদুর গল্পটা বাংলাদেশে মানভূম থেকে এ অঞ্চলে অনেকে জানে কিন্তু কলকাতা এ অঞ্চলের কোন শহর নয়, এ অঞ্চলের কাছাকাছি হলেও—এ দেশে হলেও, কলকাতার আসল ফটক হল সাহাগঞ্জঘাটায়, এখন হয়েছে দমদমে, হাওড়া স্টেশনে যে ফটকটা ওটা হল খিড়কী—নাচ দরজা। সুতরাং কলকাতার লোকে অনেকে জানে না হয় তো।

প্রবাদ আছে—বাংলাদেশের বন অঞ্চলে এক রাজা ছিলেন। ভাদু—ভাদ্রমাসে জন্ম বলে ভাদু, সে মেয়ে ছিল অপ্সরীর মত রূপসী। রাজার বাড়িতে ছিল যুগল বিগ্রহ। মেয়ের ছেলেবেলা থেকে এই ঠাকুরে অনুরাগ। ক্রমে সে বড় হল, যুবতী হল। বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল, কিন্তু কোন সম্বন্ধই মেয়ের পছন্দ হল না, কোন না কোন ছুঁতো করে খুঁত ধরে ফিরিয়ে দিল। জোর করলে কাঁদতে লাগল—আহার নিদ্রা বন্ধ করলে। ক্রমে লোকে কানাকানি সুরু করলে যে, তা হ'লে মেয়ে কাউকে ভালবাসে। যার কথা বলতে পারছে না বাপ মাকে। বাপ মায়েরও সন্দেহ হল। এর পর তীক্ষ্ন নজর রাখতে গিয়ে দেখা গেল, রাজকন্যা ভাদু—গভীর রাত্রে ঘরে থাকে না। দাসীরা সভয়ে রাজাকে জানালে কথাটা। রাজা সেদিন প্রায় গোপনে পুলিসের মত নজর রাখলেন। ঠিক দুপহর হল, ঘড়িতে দু' পহর বাজাল প্রহরীরা, মাঠে ডাকল শেয়ালেরা, গাছে ডাকলে পেঁচারা; রাজা দেখলেন, মেয়ে বেরিয়ে এল রাজবাড়ির খিড়কী দিয়ে। চলল সে ঠাকুরবাড়ির দিকে। রাজা আশ্চর্য হলেন—তখনও মন্দিরদরজা খোলা, ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। কন্যা ঘরে ঢুকল, দরজা বন্ধ হল; রাজা এসে সতর্ক পদক্ষেপে—দরজায় কান পেতে দাঁড়ালেন। ঘরে—খিল-খিল হাসিতে ভেঙে পড়ছে মেয়ে। তার সঙ্গে পুরুষের কণ্ঠের হাসি। তারপর সুরু হল নাচ গান, মেয়ে গাইছে, নাচছে।

রাজা দরজায় ঘা দিলেন। সব স্তব্ধ হল।

রাগে রাজার দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না, তিনি ভেবেছিলেন—পাপিষ্ঠ পুরোহিত ঘরে লুকিয়েছিল। প্রেমালাপ চলছে তার সঙ্গে। রাজা ক্রোধে অস্থির হয়ে—ছুতোর ডেকে দরজা ভাঙালেন। দেখলেন, ঘরে আছে বিগ্রহ—আর তার সামনে বিগতপ্রাণা কন্যার দেহ।

রাজবাড়িতে যুগল বিগ্রহের পাশে ভাদুরাণীর মূর্তি গড়ে স্থাপন করেছিলেন ভাদুর রাজা বাপ, সে আজও আছে।

সেই সঙ্গে ভাদুর পুজোরও প্রচলন হয়ে গেল সারা দেশে। ভাদু ভালবাসতেন নাচ গান। ওই নাচগানেই নাকি ঠাকুর ভুলেছিলেন।

নসু ভাদুর মা। তার ভাদুরাণী আছে। কিন্তু তার তো প্রেমাষ্পদ ঠাকুর চাই। দেশে বামুন কায়স্থ সদ্‌গোপ মশায়দের ঠাকুর আছে। কিন্তু তারা সদ্‌জাতের বাড়ির কৃষ্ণ। তার ভাদু—তার কন্যে—সে তো নীচকুলের ঘরের ভাদু কন্যে—তার সঙ্গে সদ্‌জাতের বাড়ির কৃষ্ণঠাকুরেরা প্রেম করবে কেন? করতে পারে অবিশ্যি—যেমন বাবুদের বা বামুন কায়েতের ছোকরারা দু চারজনে—তাদের ঘরের কন্যেদের সঙ্গে গোপনে রাত্রিকালে দেখাশুনো করে। তাতে নীচকুলের মেয়েদেরই সর্বনাশ হয়—বাবুদের ছোকরারা হাত পা ধুয়ে বাড়ি ঢোকে। দিনে চিনতে পারে না, বাড়ির দোরে গিয়ে দাঁড়ালে—লোক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ছোটতে বড়তে, রাজাতে প্রজাতে, ধনীতে ভিখিরিণীতে প্রেম হয় না; করতে নেই। তাই সে-দিকে সে তার ভাদুকে নিয়ে যায় নি। চন্দনপুরে এসে—আলাপ হল ফটিক দাসের সঙ্গে। সংসারে একা মানুষ। ভালমানুষ। কারুর ভালোয় নেই, মন্দতে নেই; পুতুল বেচে খায়। বাড়িতে বিড়ি টানে—পুতুল গড়ে। ও-ই ওর বাড়িতে এসেছিল ভাদু নিয়ে গান গাইতে।

ফটিক বলেছিল—তোমার ভাদুমণি আছে আমার যাদুমণি আছে। দেখবে?

বলে সে বের করে এনেছিল মাটির রাখালকৃষ্ণ, এক হাতে পাঁচনি—অন্য হাতে বাঁশী।

নসুবালা বলেছিল—হায় হায় হায়—আমার ভাদুমণির কি কপাল গো, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল। আঃ—ছুঁড়ির যৌবন বয়ে যেছিল—কালাচাঁদ আসে নাই। মা গো এই কি জানি যে এই বাড়ির দোরে দাসের ঘরে বাসা বেঁধে বসে আছে? লে—পেনাম কর। ভাদু—পেনাম কর। শোনা নাচ গান।

সেদিন নাচগান সেরে যখন বাড়ি ফিরেছিল—তখন তাদের বেয়াই বেয়ান পাতানো হয়ে গেছে; তার ভাদুরাণী সেদিন ফটিকদাসের বাড়ীতে যাদুমণির কাছে থেকে গিয়েছিল। রেখে এসেছিল নসুবালা।

এই বেশ হয়েছে। মেয়ের মা হিসেবে যা চেয়েছে—তাই পেয়েছে। "গরীবের মেয়ে ছোটলোকের মেয়ে,"—সে তার ভাদু পুতুলের মুখের কাছে হাত নেড়ে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—মা—বামুন কায়েত সদ্‌গোপ—এদের ঘরের ছেলেপুলের দিকে তাকাস না মা। তাকাতে নেই। ওরা সব টিয়ে পাখি। সবুজ রং লাল ঠোঁট বাহার অনেক—কিন্তুক মা—ওরা আসে ধানের সময়, ধান খায়—তার পরেতে ধান ফুরুলে ফুরুৎ ধা। তারচেয়ে আমাদের শরক ভাল শালিক ভাল। আমি যা বাছলাম—ই শরক শালিকের চেয়ে ভাল—কোকিল। হুঁ। মন পাতিয়ে থেকো। ল্যাই (ঝগড়া) করো না। নাচ গান শুনিয়ো। হোক।

পুতুলটিকে এই কথাগুলি বলে, এসেছিল নিজের বাড়ি এবং পরের দিন সকাল হ'তে-না-হতে গিয়ে ডেকে তুলেছিল ফটিক দাসকে।

—বেয়াই হে—ওঠ—ওঠ! শুনছ, ওঠ!

বিরক্ত হয়েছিল ফটিক। —কি? অঃ এখনও কাক কোকিল বাসা ছাড়ে নাই—। কি ব্যাপার? ভাদুকে রেখে ঘুম হয় নাই বুঝি?

—তুমি ব্যারসিক। আমি জানতাম তুমি রসিকজনা!

—কানে? ব্যা-রসিক তুমি! ভাদুর যাদুর ভোরের ঘুম ভাঙাতে এসেছি।

—এসেছি সাধে! কোকিলে কি বলছে শোন!

—কি বলছে?

—'কত নিদ্যে যাবে ভাদু কালো মা-নিকেরই কো-লে!' ওহে লোকজন উঠলে তাদের ছামনে ভাদু আমার তোমার যাদুমণির ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে কি করে। কোন মুখে, বলে—"পিরীতি করিবি—গোপনে রাখিবি—তবে তো থাকিবি সুখে।" ওর সব রস সব সুখ—ওই তো ওই খানে! লাও—লাও। কুঞ্জভঙ্গ কর। আমি চাদর ঢাকা দিয়ে ভাদুকে নিয়ে পালাই। তুমি দেখ যাদুমণির গালে—কি কপালে কি বুকে সিঁদুরের দাগটাগ লেগেছে কিনা। লেগে থাকলে মুছে দাও, নয়তো নীল রঙে তুলি দিয়ে ঢেকে দাও।

দুটি সৃষ্টিছাড়া মানুষের এই সৃষ্টিছাড়া খেলা। পাগলই হোক আর বর্বর হোক আর কুসংস্কারাচ্ছন্নই হোক—মরণ যতদিন না হয়—ততদিন ওরা থাকবে এবং ততদিন ওরই মধ্যেই ওদের পরম আনন্দ। পুতুল নিয়ে খেলে দিন কেটে যায়। হয়তো বিধাতার সৃষ্টির অপব্যয়, হয়তো পৃথিবীর—দেশের—এই অঞ্চলের জমাখরচের হিসেব নিকেশের খাতায়—ওরা অমার্জনীয় বাজে খরচ।

ওদিকে কাল চলেছে—দ্রুততম গতিতে। মোটরের চাকায় রেলগাড়ির চাকায় ঘণ্টায় অন্ততপক্ষে তিরিশ মাইল বেগে। এরা পুরনো কালের পুরনো ক্ষয়ে-যাওয়া বাঁশের লাঠি ধরে কোনরকমে পায়ে হেঁটে ঘণ্টায় দু মাইল গতিতে চলেছে। সব থেকে আশ্চর্য লাগে নসুর—পাশের গাঁয়ের চক্রবর্তী বাড়ির গেছো মেয়েটা বাইসিকিল চড়ে ইস্কুল আসে। এ গাঁয়ে নিত্য দত্তের আইবুড়ো ধিঙ্গি দাসা মেয়েটা বাইসিকিল চড়ে বাজার যায়। এই মেয়ে দুটো পাশ কাটিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে চলে যায়। যাবার সময় আচমকা ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়—ঠিনি-নি-নি। চমকে উঠে নসু হাত দুই সরে গিয়ে বলে—হেই মা গো! মেয়ের এত বাড়! তারপর খুব হাসতে আরম্ভ করে—বাবারে বাবা—এতও দেখালে হরি।

বেয়াই ফটিক দাস বলে—হয়েছে কি বেয়ান এখন; এই তো কলির সন্ধ্যেবেলা।

নসু বলে—না ভাই, সকাল বেলা বল। রাত দোপরে বুড়ো বয়েসে দেখবার তরে জেগে বসে থাকতে পারব না। আর রাতে বেলায় খেলু তো ছেরকালের হে! যা ঘটবার দিনের বেলায় ঘটুক, দেখে শ্যাষ করে সনুঝে বেলা ঘর যাব।

—তা তাই বলছি। সকাল বেলাই হল। দিনের বেলাতেই সব ঘটবে। ঘটছে। দেখতে তো পাচ্ছ গো।

—'তা দেখছি। কিন্তু বেলা বেড়ে যেছে—' বলেই নসু বলে—এই দেখ জিভখানার কান্ড দেখ দিকিনি। ফস্‌কে ব'লে ফেলিয়েছে—'যেছে'; যাচ্ছে—যাচ্ছে। কেমন কিনা, "চন্নপুরে ছিল বাঁশের বন—পাতা পড়লে কুলো হত, ডাল পড়লে ঢেঁকি হত, ছিল শেয়াল সাপের বিচরণ। কে জানে কি হল—মন আমার হরি বলো—সেই চন্নপুরে হয়ে গেল সিংহাসন।" দুখের মধ্যে রাজা নাই; রাণীমা নাই; গিন্নীমা নাই—আছে শুধু ফতো বাবু—আর বিবির দল। এখানে হচ্ছে-খাচ্ছে-যাচ্ছে-গেচ্ছে বলতে হবে!

মুহূর্তের নিশ্বাস নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেসে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—এখন চল। বেলা হয়ে "যা-চ্ছে"—বেরিয়ে পড়। তুমি লাও পুতুলের ডালা আমার ঝুলি কাঁধে। চল পালা সেরে আসি আর নতুন কালের খেলা দেখে আসি নয়ন ভরে।

*

সপ্তাহে দুদিন হাট—সোমবার আর শুক্রবার: এ দুদিনে

"বাবা রে বাবা! এত দেখালে হরি"
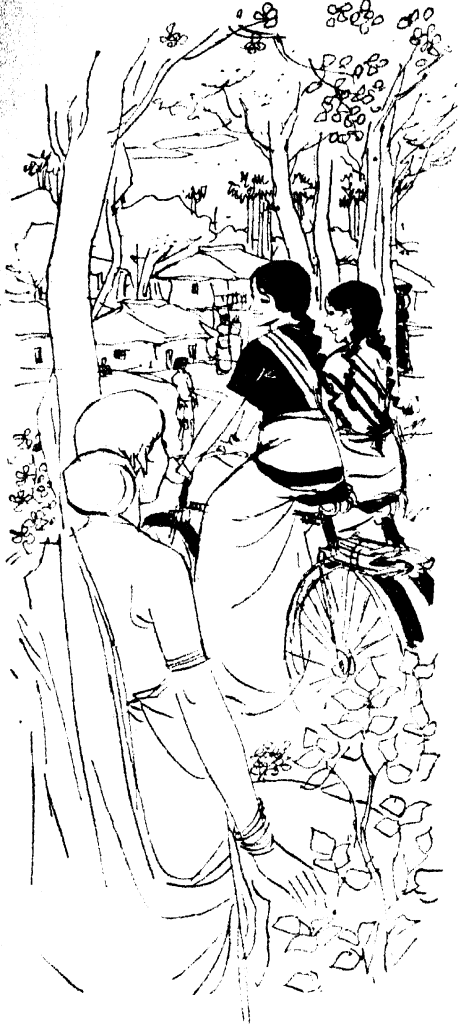
হাটেই কাটে একটা বেলা। ফটিকদাস চাটাই বিছিয়ে পুতুল সাজিয়ে বসে। নসুবালা হাতে ঘুঙুর বেঁধে ডুবকী বাজিয়ে গান গায়। বাকী পাঁচ দিনের একদিন গাঁয়ে, বাকী চার দিন চারপাশের গ্রামগুলিতে পালা করে চলে যায় তারা। কোন কোন দিন এতে ছেদ পড়ে যায়। হঠাৎ চোখে পড়ে চারপাশের গাঁয়ের লোক এসে ভিড় করেছে—বি-ডি-ও আপিসের ধারেকাছে। উত্তর দিকে বাজারের প্রধান রাস্তা, চওড়া রাস্তা—এখন আবার পিচ পড়েছে; দুপাশে দোকান পশার; মিষ্টির দোকান, কাপড় মণিহারির দোকান, দর্জির দোকান, সিমেণ্ট লোহা-লটকোনের দোকান তো অনেক। দত্ত মশায়দের ধানচালের গদী, মণ্ডলদের গদী, দাসদের গদী—একটু ভিতরে সাহা মশায়ের ধানচাল লটকোনের কারবার, বড় সাহার গাঁজা মদ আপিংয়ের সঙ্গে কাপড়ের দোকান; এরই ভিতরে মধ্যে মধ্যে চায়ের দোকান—চেয়ার টেবিল সমেত; তার মধ্যে গোটা দুয়েক চুলকাটা সেলুনও হয়েছে; দস্তুর মত ঘাড়ে পাউডার মাখিয়ে ক্লিপ দিয়ে চুল ছাটাই হয়। স্টেশনের ধারে গোটা চারেক কয়লার ডিপো। পূর্বে-পশ্চিমে-দক্ষিণে ত্রিভুজের মত আকার দিয়ে তিনটে রাইস মিল, একেবারে পশ্চিমে, পশ্চিম কোণের রাইস মিলটা ছাড়িয়ে ছেলেদের স্কুল-বোর্ডিং, তারও ওদিকে—আগে ছিল চ্যারিটেবল ডিস-পেন্সারী, এখন হয়েছে—হেল্‌থ সেণ্টার, পঁচিশটে বেড আছে—দরকার হলে বাড়িয়ে তিরিশটাও করা হয়। তারও পশ্চিমে গ্রামটা আরও খানিকটা বেড়ে গিয়েছে সড়কের পাশে পাশে। সড়কটা গিয়ে মিশেছে একটা বটগাছতলায় আরও বড় সড়কের সঙ্গে—যেটা গ্রামের দক্ষিণ দিক বেড়ে বাইরে বাইরে মাঠের বুক চিরে চলে গেছে নদী পার হয়ে—এ জেলা থেকে বর্ধমান জেলার প্রান্তভাগ দিয়ে অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমঘাট পর্যন্ত। আবার গঙ্গার ওপারে অগ্রদ্বীপ থেকে—চলে গেছে—মুরশিদাবাদ। নতুন এই বসতি শুরু করেছিল সাঁওতালরা, দুমকা জেলার জুতোসেলাই যারা করে—সেই সব আধা হিন্দুস্থানী মুচিরা—তারপর তাদের বসতি কিনে বসেছে ব্যবসায়ীরা। এরা বড় ব্যবসায়ী নয়, ছোট। খুচরো ধানচাল কেনে। খান দুই চায়ের দোকান—একটা মিষ্টির দোকান আছে। কয়েকখান লটকোনের দোকান। একজন কামার এসে কামার-শাল খুলেছে। জন দুয়েক দুমকার কাঠমিস্ত্রী কাঠের কারবার করেছে। গাড়ির চাকা, ঘরের দরজা জানালা তৈরী করে দুমকার ডাঁসা শাল থেকে। এর মধ্যে আবার আটঘড়া গাঁয়ের সেখেদের ছেলে—হাফিজ সেখ করেছে চেয়ার টেবিল তক্তাপোষের কারখানা। আবার রকমারি যত ফ্যাসানের 'বেরাকেট' তৈরী করে, জামাকাপড় ঝুলিয়ে রাখবার জন্যে—দেওয়াল আলনা, তাও তৈরী করে। কেনে প্রায় সবাই। সবাই অর্থে নসুদের পাড়ার মানুষেরা—ফটিকদাসের মত মানুষেরা বাদে সকলে, গরীব গেরস্ত যারা—যাদের কাপড়জামা ময়লা এবং ছেঁড়া সেলাই করা তারাও কিনেছে।

আরও যে কত কারখানা হবে—সে নসু ফটিক জানে না। তবে গুজব তাদের কান এড়ায় না। শুনেছে না কি কলেজ হবে, আর গেরামের দক্ষিণে যে বড় সড়ক চলে গিয়েছে গঙ্গার কূল—তার দক্ষিণে হবে সারি-সারি সরকারী আপিস।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল নসুবালা। —ও বেয়াই।

ফটিকদাসও দাঁড়িয়েছিল—সে বললে—তাই তো হে! এত ভিড়?

দূরে ভিড় জমেছে। —কি বেপার?

বি-ডি-ও আপিস থেকে ওদিকে ইস্কুল, সাবরেজেস্ট্রী আপিস হাসপাতাল পর্যন্ত ভিড় থাকেই। এখান থেকে ওখানে

রাস্তাটা মাপে বড় জোর সিকি মাইলের কিছু বেশী, এই সিকি মাইলে দেড়শো দুশো লোক ছড়িয়ে থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। দশটায় ভিড়টা বাড়ে। আবার চারটে থেকে কমতে সুরু করে। আজকের ভিড়টা বি-ডি-ও আপিস পার হয়ে একটু আগে আশু সিংয়ের ডাক্তারখানা হ'তে ওদিকে থানা পর্যন্ত জমে রয়েছে।

ফটিকদাসের অনুমানের পরিধি নসু থেকে বেশী। সে বললে—খুনখারাপী বটে!

—খুনখারাপী? হেই মা গো!

—হুঁ।

—কি করে বুঝলে?

—ইদিকে আশু ডাক্তারের ডাক্তারখানা—উদিকে থানা। ডাক্তার বেঁধেছেঁদে দিচ্ছে—আর উদিকে থানাতে নালিশ হচ্ছে। বুঝেছ?

—পালিয়ে এস। উ মুখে যেয়ো না। চল বাঁয়ে ফিরি। ইস্টিশানের দিকে যাই। এস!

—চল কেনে, দেখে আসি!

—না। কাজ নাই।

শান্ত কণ্ঠে মৃদুস্বরে কথা বলে ফটিক—কোন খোঁচাতেই—কোন বাতাসেই তার জীবন এতটুকু বেশী উত্তপ্ত হয় না, সে তেমনিভাবেই বললে—তুমি যাও। আমি তো আপিসের ছামুনে বসব—তাই বসি গে, রথ দেখা কলাবেচা দুইই হবে।

নসুর থানাকে যত ভয়—রক্তারক্তিকে তত ভয়। সে সত্যিই মোড় ফিরল। —হরিবোল—হরিবোল, ভাদুর মা—তোর দেখে কাজ নাই; চল ভিন দিকে চল।

আপন মনেই বলতে বলতে চলে—মা মনসা বেনে বেটাকে বলেছেন—সব দিক চেয়ে দেখো মা-দখিনদিক পানে নয়ন ফিরিয়ো না। যেদিকে খুনখারাপী রক্তারক্তি লালপাগড়ী—সেই দিকই দখিন দিক। পালা ভাদুর মা—পালা।

ব্যাপার বা ঘটনা একটি নয়, দুটি।

আশু সিংহীর ডাক্তারখানায় চন্দনপুরের উত্তরপাড়ার বড়বাড়ির বড় তরফের গোপাল চৌধুরীকে নিয়ে এসেছে—চৌধুরীর মাথা ফেটেছে। কপালের ঠিক উপরেই প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ক্ষত। মুখ থেকে বুক পর্যন্ত রক্তে ভেসে গেছে। সঙ্গে তার ছেলে শুভেন্দু। ম্লান মুখে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে, ডাক্তারখানার দরজার বাজুতে ঠেস দিয়ে। ভিতরে আশু সিংহী গোপালবাবুর মাথাটা ড্রেস করছে।

সামনে রাস্তায় লোক জমে আছে। টুকরো টুকরো কথা এখান ওখান থেকে উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

—নিজেই।

—নিজেই?

—হ্যাঁ, একখানা কাঠ নিজেই মাথায় মেরেছে।

—কি ব্যাপার?

ভিতর থেকে চৌধুরীর আর্ত চীৎকার ভেসে এল—না—না—এমন করে মরার উপর খাঁড়ার ঘা মেরো না। জ্বলে যাচ্ছে। ছেড়ে দাও!

বাইরে লোকজনের মধ্যে থেকে কেউ বলে উঠল—আরও জ্বলবে। এখন হয়েছে কি?

—কে—রে? প্রশ্ন করলে এদিক থেকে অন্য কেউ। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সকলের দিকে চেয়ে—নীরবে প্রশ্নটির পুনরুক্তি করলে। শুধু শুভেন্দু ফিরেও তাকালে না। এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিলে না। কিন্তু কয়েকজনই মাটির দিকে চেয়ে রইল। হয় তো বা,—তারা মুখ তুললে তাদের মুখে চাপাহাসির একটি সূক্ষ্ম রেখা দেখা যেত।

—এই এই সর তো হে। পথ দাও তো!

কণ্ঠস্বর শুনে পিছনে তাকিয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিল। ওপাশ থেকে কথা উৎক্ষিপ্ত হল—এই, এলেন।

—হুঁ। চাঁই।

—উঁহু—কংগ্রেসী মোড়ল।

—দূর—রায়বাহাদুর। কংগ্রেসী রায়বাহাদুর।

চন্দনপুরের ভবানী মুখুজ্জে [illegible] কংগ্রেসী। জেলখাটা লোক। স্বাধীনতার পর থেকে অবশ্যই মাতব্বর লোক। ভবানীবাবু একবার সেদিকে ফিরে তাকালে—কিন্তু বললে না কিছু। উঠে গেল ডাক্তারখানার বারান্দায়।

শুভেন্দু এতক্ষণে নড়ল—সে হাত বাড়িয়ে ওপাশের বাজুখানা ধরে বললে—যাবেন না আপনি।

ভবানীবাবুর কপালে কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠল—বিস্মিত হলেন—প্রশ্ন করলেন—যাব না?

—হ্যাঁ। উনি খুব উত্তেজিত হয়ে আছেন। আপনাকে দেখলে হয়তো বিশ্রী কান্ড করবেন।

—মানে? আমার দোষটা কোথায়?

—ঘটনার পর উনি চেঁচাচ্ছিলেন—এর চেয়ে যে ইংরেজ ভাল ছিল।

থমকে গেল ভবানীবাবু। কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বোধকরি কথা খুঁজে পেলে—বললে—থানায় ডায়রী করেছ?

—না।

—করবে না?

—না।

—হুঁ। তা হ'লে কি করবে?

হেসে শুভেন্দু বললে—বাবা বলছিলেন—ডায়রী ভগবানের কাছে লেখা হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভবানীবাবু নেমে চলে গেল।

ঘটনাটা বিস্ময়করও বটে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বলতে হয়—বিস্ময়েরই বা কি আছে এতে!

চৌধুরীবাড়ী এখানকার দ্বিতীয় সম্পদশালী বাড়ী ছিল। গোপাল চৌধুরীর বয়স এখন বাহান্ন চুয়ান্ন, তাঁর বাপের আমলে ও'দের প্রতাপে বাঘে বলদে একঘাটে জল না-খাক—চোর এবং গৃহস্থ শান্তিতে পাশাপাশি বাস করত। চোরকে খেতে দিতেন—গৃহস্থকে চুরি হলে থানায় ডায়রী করতে দিতেন না। এবং মাল তিনি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করতেন চোরকে। জরিমানা নিজে আদায় করতেন। তাঁর আমল চল্লিশ বছর আগেকার আমল—উনিশ শো সাত আট সাল; সে আমলে কেউ তাঁর বা গ্রামের সম্মানিত বাবুদের সামনে দিয়ে যাবার সময়—কম হেঁট হয়ে প্রণাম করে গেলে—ধরে এনে মাথাটা মাটিতে ছুঁইয়ে প্রণাম শিখিয়ে দিতেন। বছরে দুটি পার্বণে গ্রামের ব্রাত্যসমাজ থেকে সপ্তগ্রামী ব্রাহ্মণ-সমাজকে নিমন্ত্রণ করে—পরম সমাদরে খাওয়াতেন—হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করতেন পেট ভরেছে কিনা। আবার বেগারও নিতেন। ব্রাত্য সমাজের বধূ কন্যাদের নিয়ে উচ্চ সম্প্রদায়ের যুবকেরা সে-কালে ব্যভিচার করত—এটাকে তিনি দূষ্য মনে করতেন না। সে ক্ষেত্রে ব্রাত্যেরা ক্ষোভ প্রকাশ করলে—তিনি ডেকে তাদের ধমকে দিতেন—না, এসব নিয়ে গোলমাল ক'র না। নিয়ে গিয়ে টাকা যদি না দিয়ে থাকে তো বল। না-দিয়ে থাকলে টাকাটা দিয়ে দিতেন।

তিনি মারা গেলে তাঁর ছোটভাই পেয়েছিলেন অধিকার।

সে অধিকারকে তিনি তাঁর কালের উপযোগী করে সংশোধন করে নিয়েছিলেন। তাতে বাঁকা তলোয়ারের চেহারা পাল্টে সোজা তলোয়ারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তলোয়ারের স্বভাব পাল্টায়নি। তিনি এই অধিকারের উপর একটা সরকারী অধিকার পেয়েছিলেন—প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎগিরির অধিকার।

তাঁর মৃত্যুর পর—সেটাও এখন থেকে তিরিশ বছর আগে—বাইশ তেইশ সালে—অধিকার এসেছিল এই গোপাল চৌধুরীর হাতে। গোপাল চৌধুরী লেখাপড়া শেখেন নি—সেই হেতু কুনো লোক; তবুও প্রথম প্রথম আধুনিক হবার চেষ্টা করেছিলেন, ইউনিয়ন বোর্ডে—গ্রামের পাঁচটা কমিটিতে সভ্য ছিলেন, থিয়েটারও করতেন, সভা হলে যেতেন. কিন্তু কোনটাতেই সফল হন নি—নিজের পায়ের ছাপ ফেলতে পারেন নি। অধিকার আপনি গেল. তিনি ঘরে ঢুকলেন. কেবল ঘর থেকে যতটুকু হাত যায় তাঁর সম্পত্তির অধিকারের বলে—ততটুকুই আঁকড়ে রইলেন প্রাণপণে। ঘর থেকে কাছারী. কাছারী থেকে গোয়ালবাড়ি. মাঠে যেখানে তাঁর জমি আছে সেখান পর্যন্ত এবং বছরে মাস দু তিন—মহালে মহালে—নিজের গণ্ডী নির্দিষ্ট করে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই গণ্ডীর মধ্যে পূর্ব পুরুষের ধারায় এবং তাঁদের প্রতাপের স্মৃতির প্রভাবে—শাসন করেছেন. পালন করেছেন—কখনও কখনও হুঙ্কারও ছেড়েছেন যতটুকু পেরেছেন। ক্রমে তিরিশ সাল থেকে দেশের পরিবর্তনের সঙ্গে তিনি পাল্টালেন কতটুকু ভগবান জানেন—তবে সভয়ে হাতের মুঠো আলগা করলেন। এই পরিবর্তনে সব জমিদারের অবস্থা খারাপের সঙ্গে অবস্থা খারাপ হল। তিনি মন্ত্র দীক্ষা আগেই নিয়েছিলেন—এখন তাই নিয়েই মগ্ন হতে চেষ্টা করলেন। বিরোধ তিনি কারুর সঙ্গেই করতেন না। করলেও দেওয়ানী মতে আদালত মারফৎ। তারপর দেশ হল স্বাধীন। সব লোক নাকি সমান হল। হতচকিত হয়ে তিনি আরও ঘরে ঢুকলেন—হে ভগবান! সব সমান! চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, বেগার জমিদার, পায়ে মাথায়. পরিত্রাণ কর মা জগজ্জননী, আর নয়।

তারপর এই সাল গেল জমিদারী। সব জমিদারী গভর্নমেণ্ট নিলে। তিনি তাঁর গোয়ালবাড়ির বাইরের এলাকায় পা-দেওয়াই ছেড়ে দিলেন। গোয়ালবাড়ির পাশেই একটি বড় পুকুর. ভাল জল, সকল লোকে স্নান করে আর এই পুকুরের উত্তর পাড়ের উপর বাউড়ীদের বসত। বাউড়ী পাড়া। এ পাড়া চৌধুরীবাড়ির হাতের মুঠোর আমলকী। এই পুকুরে তিনি কিছু কাঠ চিরিয়ে ডুবিয়ে রাখিয়েছিলেন—পাকা কাঠকেও পাকা করবার জন্য। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন—কাঠ চুরি যাচ্ছে। নিজের সীমানায় দাঁড়িয়ে চাকরবাকরকে বেশীই একটু তম্বী করলেন। কিন্তু তাতেও বন্ধ হল না। কোন সন্ধান পেয়ে আজ ভোরে তিনি উঠে গোয়ালবাড়িতে এসেই দেখলেন—একজন বাউড়ী একখানি কাঠ কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এসে পিছন থেকে ধরলেন তার চুলের মুঠো। হারামজাদ!

ধপ্ করে কাঠখানা ফেলে দিয়ে লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে মালিককে দেখে থমকে গেল।

গোপালবাবু চুল ছেড়ে দিয়ে হেঁট হয়ে নিজের পায়ের চটি তুলে নিলেন—চোট্টা•কাঁহাকা —।

অঘটন ঘটল। লোকটা খপ ক'রে হাত বাড়িয়ে চটিটা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরই মাথায় বসিয়ে দিয়ে ছুটে পালাল।

বজ্রাহতের মত স্পন্দনহীন হয়ে গেলেন গোপালবাবু। তারপর যা হ'ল সে কল্পনাতীত। হয় তো বা গোপালবাবুর কল্পনাতেও তা ছিল না, বোধ হয় একান্ত আকস্মিকভাবে ঘটে গেল, সেইখানে পড়েছিল একটা টুকরো কাঠ। ন্যাড়া বাউড়ী বিক্রী করবার জন্য চেরাই কাঠখানা নিয়েছিল কাঁধে এবং ঘরে পোড়াবার জন্য টুকরোটা নিয়েছিল হাতে, বা দুটোই ছিল কাঁধে—ফেলবার সময় দুটোই পড়েছিল পাশাপাশি; গোপাল চৌধুরী মিনিটখানেক পর স্তম্ভিতভাব কাটতেই নিদারুণ ক্রোধে বা আত্মগ্লানির ক্ষোভে কাঠখানা কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে নিজের কপালে. যেখানে ন্যাড়া তাঁকে তাঁর চটি দিয়ে আঘাত করেছিল—সেইখানটাতে আঘাত করেছিলেন এবং চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন—এই নে!

কপালটা গেল ফেটে এবং তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে গেলেন পড়ে। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে খবর পেয়ে ছুটে এল শুভেন্দু, তার ছোট নবেন্দু; গোপালবাবুর খুড়তুতো ভাই নেপালবাবু এবং তার ছোট ভূপাল বাবু। তাঁরা এলেন—দেখলেন রক্তাক্ত মুখে গোপালবাবু পড়ে আছেন—, সমস্ত বাউড়ীপাড়ার লোক দূরে দূরে আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে নি।

শুভেন্দু কাকাদেরও ছুঁতে দেয় নি গোপালবাবুকে। ওদের ঘরে ঘরে মনোমালিন্য মর্মান্তিক। বলেছিল—না। সংসারে আমাদের কেউ নেই, আমরা একা। দয়া করে আমাদের ব্যবস্থা আমাদের নিজেদের করতে দিন।

তারপর গাড়ি করে নিয়ে এসেছে আশু সিংয়ের ডাক্তারখানায়। হাসপাতালে নিয়ে যেতে চায়নি। আশু ডাক্তারকে বাড়িতেই ডাকত—ডেকে ফি দেবার মত অবস্থা আছে, কিন্তু তাতে দেরী হত ডাক্তারকে পেতে। ডাক্তারখানার রোগীদের ফেলে চলে আসা সহজ নয়। কেমন করে এমনটা ঘটল—সে কথা শুভেন্দু গোপনে ডাক্তারকে বলেছে, কিন্তু প্রচার হয়ে গেছে, বাতাসে ভেসে এসেছে।

"আরও জ্বলবে। জ্বলার এখন হয়েছে কি?" — কথাটি যে বলেছে—তাকে অন্য কেউ না চিনুক শুভেন্দু চিনেছে। সে হল সোনাডাঙ্গার সতীশ আচার্যি। একদিন সে শুভেন্দুদের বাড়িতেই রান্না করত, ঠাকুর ছিল। সতীশদের সমাজে কন্যার জন্য পণ দিতে হয় না হ'ত। অবশ্য অবস্থা ভাল যাদের—তাদের ছেলের এবং লেখা পড়া জানা ছেলের কথা আলাদা। এবং বামুনঠাকুরের বৃত্তিধারী পাচক ছেলের কথা উল্টোদিকে আরও আলাদা—পণ দিয়েও সেখানে কন্যা মেলে না। সতীশের সম্বল ছিল একটি—পুরুষালি চেহারা। ওই মূলধনে এক অব্রাহ্মণ বাড়ির একটি ভ্রষ্ট চরিত্রা মেয়েকে নিয়ে এসেছিল ঘর বাঁধতে। গোপালবাবুর সঙ্গে তাঁদের মহালে গিয়ে সেখানেই হয় প্রেমের সূত্রপাত এবং সে-দফা নিরীহের মত বাবুর সঙ্গে ফিরে এসে, একদা রাত্রে সেই গ্রামে গিয়ে তাকে নিয়ে এসে চন্দনপুরেই লুকিয়ে রেখেছিল। কথাটা প্রকাশ হলে—গোপালবাবু রাগে কাঁপতে কাঁপতে তার গালে একটি চড় মেরে তৎক্ষণাৎ বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। এ সতীশ সেই সতীশ। সতীশ এখন যাত্রার দলে ভাত রান্না করে। সেই মেয়েটি এখনও আছে। এবং সভাসমিতিও করে বেড়ায় ঝাণ্ডা উড়িয়ে।

সে লজ্জা সঙ্কোচ কাউকে করে না। ভয়ও না। তবু মুখ নামিয়েছে। সেটা বোধ হয় অনেকদিন ওদের বাড়িতে ছিল বলে। অথবা অন্য কিছু? হয়তো সতীশও আজকের ঘটনাটিকে উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করতে পারে না।

*

আশু সিংয়ের ডাক্তারখানার ওদিকে আর একটা ভিড় জমে আছে। সে ভিড়টায় জমাট বেশী। অনেক লোক।

ওখানে বিস্ময় আছে, কৌতুক আছে। এতটুকু [illegible] উদ্বেগের কোন কারণ নাই। কৌতুক রসের পাকটা ওখানে

গায়ে-হলুদের চিহ্ন গায়ে নিয়ে থানায় বারান্দায় বসে আছে।

প্রবল উত্তাপে ধরা গন্ধ ছড়িয়েছে। মধ্যে মধ্যে এক একজন হেঁকে উঠছে—বাহা রে বাহা রে কলিকাল!

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির মত দু-চারজন ধ্বনি তুলছে—তাঁহুরে।

অনেককাল আগে এখানে একজন চানা-চুরওয়ালা আসত। আসত পুজোর সময়—ছ' মাস থেকে গেঁজলে ভর্তি টাকা নিয়ে ফিরত। তার হাঁক ছিল—বাহা রে, বাহা রে ভাজা! তারপর ছড়া বলত। সে সব ছড়ার চল তো আর নেই, 'কিন্তু—বাহা রে বাহা রে' শব্দটি এ অঞ্চলে শব্দমালার স্থায়ীভাণ্ডারে স্থান পেয়ে গেছে। কৌতুক রস কোনক্রমে গেঁজে উঠলেই—এই বাহা রে শব্দটি জনতার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। আর তাঁহুরে শব্দটি এখানে প্রচলন করেছিল কোন এক ভাবুক যুবক। কথাটা অর্থহীন। যুবকটি মাঠে ঘাটে একা হলেই আপন মনে চীৎকার করত—তাঁহুরে! বাহারের সঙ্গে তাঁহুরের ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে বলেই বোধহয় একটা বললেই আরেকটা বেরিয়ে আসে।

আরও অনেক রকম কথায় বুদ্বুদ উঠছে। উঠছে ফাটছে। অর্থহীন কথা।

—শালা মারে ডাণ্ডা!

—ভো—কাট্টা!

—হুঁ—হুঁ! কাটা ঘুড়ি লাট খেয়ে পড়ছে থানার বারান্দায়!

—গোঁত্তা খেয়ে পড়! দে পাক!

—সাত পাক। এক আধ পাকে হবে না।

কে একজন অতি উৎসাহে বা উৎসাহের মত্ততায় উল্লাস প্রকাশের ভাষা না পেয়ে বলে উঠল—চেল্—কিং—কিং—কিং কিং!

সমস্ত জীবনে যেন একটা প্রমত্ততা বহু-দিনের মজা পুকুরের পাঁকের মধ্যে গ্যাসের মত সঞ্চিত হয়ে রয়েছে; সামান্য আলোড়নেই তলা থেকে ঘুলিয়ে উঠছে উপরে—ফোয়ারার ধারায়।

ঘটনাটি অবশ্য নতুন না হলেও ঘটনাটির আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিটি নূতন। একেবারে নূতন।

একটি উনিশ কুড়ি বছরের যুবতী কুমারী।

অধিবাসের অর্থাৎ গায়ে-হলুদের চিহ্ন গায়ে নিয়ে নতুন কাপড় পরে থানার বারান্দায় বসে আছে। মাথার ঘষা চুল ফুলে ফেঁপে পিঠে এবং মুখের দু পাশ আংশিকভাবে ঢেকে ছড়িয়ে রয়েছে। সম্ভবত কাছে গেলে আমলার গন্ধও পাওয়া যাবে। না হলে সাবানের গন্ধ।

আজ তার বিয়ে।

রাত্রিতে বাড়ীর সকলে ঘুমুলে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল; লুকিয়েছিল চণ্ডী-তলার জঙ্গলে। ভোরবেলা এসে উঠেছে থানায়।

বিয়ে সে করবে না। বাপ মা তার জোর করে বিয়ে দিতে চায়। সে থানায় এসেছে আশ্রয়ের জন্য।

তার বয়স আঠারো বছরের বেশী।

সে বিয়ে করবে না। থানা যদি তাকে আশ্রয় না দেয় তবে সে আত্মহত্যা করবে। তার জন্য দায়ী হবে থানা গবর্ণমেণ্ট।

এর আগে এই ঘটনা ঘটেছে। অনেক ঘটেছে। বিয়ের রাত্রে কনে নিখোঁজ হয়েছে। অপবাদ রটেছে। কিন্তু হয়তো বা সেই দিন—নয় তো বা পর দিন তার দেহ পাওয়া গেছে নদীর দহে। কিংবা সেই

দিনই মেয়ে বিষ খেয়েছে। এমনও হয়েছে, মেয়েকে পাওয়া গেছে আট দশ মাইল দূরে ভিখারিনীর বেশে।

কারুর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া স্বতন্ত্র কথা। তার সঙ্গে এর মিল নেই। এ মেয়ে থানায় এসেছে—বাপ মা সমাজ সবার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। খারাপ মেয়ে হলে সে এই সুযোগে নিখোঁজ হত—থানায় আসত না। বাপ আসত থানায়। পথের জনতার কথাবার্তাগুলি মৃদু স্বরে হচ্ছিল না এখানে, আশু সিংয়ের ডাক্তারখানার সামনের জনতার কথার মত। এখানে কোন বেদনা নেই। এখানে উল্লাস—উচ্ছৃংখল উল্লাস রয়েছে, তার প্রকাশে কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু মেয়েটি আশ্চর্য। তার কোন চঞ্চলতা নেই। সে স্থির হয়ে বসে আছে।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে যেন পড়তে পড়তে এগিয়ে এল নসুবালা। স্টেশন থেকে খবর শুনে সে ফিরে এসেছে। তার থানা পুলিশের ভয়-ঘুচিয়ে জেগে উঠেছে কৌতূহল।

—হেই মা। বিয়ের কনে পালিয়ে এসে থানায় এয়েঁচে। বলছে বিয়ে করব না। জোর করলে মরব। গলায় দড়ি, বিষ, কাপড়ে আগুন জলে ঝাঁপ, বঁটিতে গলা কাটা, ছাদ থেকে লাফানো তার তো হাজার পথ। হাজার কেন—লাখো পথ। কিন্তু সে পথ ধরে কে? এত সাহস কার?

যার এত সাহস সে কি মেয়ে গো! ডাকিনী না যোগিনী না ভৈরবী না পিশাচী না দেবতা. সে কি? সে কি নসুবালার না দেখলে চলে!

নসুবালা এসে তার মুখের কাছে একটু হেঁট হয়ে মুখকে দেখে বললে—হেই মা—তুমি? তাই তো বলি! সাঁমে?

(দুই)

হায় মন রসনা আমার—
একি তুই পারিবি—গাহিতে—
নতুন কালের নতুন ভাদুর নতুন [illegible],
এক মুখে যে নারি ক [illegible]।
গুনগুনিয়ে গান ভাঁড়াইল—নসুবালা।
ওই দিনই সন্ধ্যা বেলা।

মেয়েটিকে নসুবালা জানে। এ চাকলায় ভিক্ষাজীবী নসুর অচেনা বড় কেউ একটা নেই। বিশেষ ক'রে আইবুড়ো বিয়ের যুগ্যি মেয়ে। কারণ সে হল ভাদুর মা। তাদের উপর একটা স্নেহের টান আছে।

ফটিকদাস মাটি তৈরী করছিল, পুতুল তৈরী করবে। আজ একদিকে ওই হাঙ্গামা অন্যদিকে সেটেলমেণ্ট আপিসে তিনখানা গাঁয়ের লোক এসেছিল। জমিদারী উচ্ছেদের পর জমি জেরাতের নতুন ব্যবস্থা বিলি হবে, তার আগে মাপ জোক হচ্ছে, কার কোন জমি—কতটা জমি—কি স্বত্বে দখল ক'রে লেখা হচ্ছে; এরপর পরচা হবে। শোনা যাচ্ছে পঁচিশ একরের বেশী জমি কেউ রাখতে পাবে না, রাখলে সরকার নিয়ে নেবে। তারপর না কি ভাগ ক'রে দেবে—যারা গরীব, চাষ ক'রে খেটে খায়, অথচ নিজের এককাঠা জমি নেই তাদের। কিন্তু—

ফটিক দাস কথাটা শুনেছে—ওই আপিসের সামনেই লোকেদের বলতে; এবং শুনে সে বুঝতেও পেরেছে ব্যাপারটা। আজ এসেছিল আকুটি গ্রামের লোকেরা; চাষী-ভূষী—গেরস্তরা এসেছিল হেঁটে; সেই সঙ্গে এসেছিল পাঁচখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী ক'রে আকুটির ঘোষাল বাবুরা পাঁচ তরফ।

সেটেলমেণ্ট আপিসের পাশে দুটো গাছ-তলায় পাঁচখানা সতরঞ্চি বিছিয়ে বসেছিল। মধ্যে মধ্যে ঝগড়া—মধ্যে মধ্যে হাসি-ঠাট্টা চলেছে। গালাগালও চলেছে। মেজতরফের মেজবাবুই এখন পাঁচ বাড়ীর মধ্যে বয়সে বড়। সারাদিন বার-চারেক আফিং খেয়েছে, আর যোগেশ দাসের দোকান থেকে বার আষ্টেক চা খেয়েছে, ঝিমেছে, সিগারেট বিড়ি টেনেছে, আর মধ্যে মধ্যে ঝিমিনির মধ্যেই বোল কেটেছে। ছোট তরফের ছোটবাবু এক-কালের শৌখীন লোক, আসবাবে বিলাতী ছবি পুতুলে ঘর সাজাবার ঝোঁক ছিল—কোট পেণ্টুল মিহিধুতি পাঞ্জাবী—দামী সাজ পোশাকের বাতিক ছিল—এখন অবস্থা খারাপ বলে ও সব ঝোঁকে মন্দা পড়েছে; সেই ফটিককে ডেকে তার পুতুল দেখে ছিল। কিনেছেও সব পুতুল দুটো ক'রে। সেই সময় কথাগুলি মন দিয়ে শুনবার অবকাশ পেয়েছিল ফটিক। ওঃ! সে কি কথা!

গমস্তা এসে বলেছিল—বাবু, আপত্তি করছে ওরা! বলছে এ হবে না।

বাবু চোখ না খুলেই বলেছিল—কটাকা চাচ্ছে রে? ক টাকা দিতে গিয়েছিলি?

—টাকা নেবে না।

—ওরে বাবাঃ। ভূতের বেটা বেহ্মদত্যি! সেটেলমেণ্ট করতে এসে টাকা নেবে না!

—বলছে ধরা পড়লে চাকরী যাবে। আর ধরা পড়বেই। বলছে, যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে ফাল চলে?

—চলে। বল গিয়ে, এ কাপড় সেলাই নয়, জমি সেলাই। ওতে ফালই লাগে। চালুনীর ফাঁক দিয়ে চালতে পারলে হাতী গলে যায়। বল গে হয়। মহাভারতে আছে। একটা মেয়ের এক সঙ্গে পাঁচটা স্বামী হয় না তো, মহাভারতে হল কি ক'রে? পাণ্ডুরাজার পাঁচ পুত্রের কোন পুত্রেরটা পাণ্ডুর নিজের? তবু পাণ্ডুর রাজ্য কোন আইনে পায়? এ তো শালা বাপ থাকতে বেটারা ভিন্ন হয়েছে। নে এই দান পত্তরটা নিয়ে যা। বলবি ভাল ক'রে ঠাণ্ডা জলে চোখ ধুয়ে পড়তে। বলবি—পারলে এমনি ক'রে ফালে সেলাই হয়। এ সুতোর সেলাই নয়। কাছির সেলাই! না—না! তারপরই খুব ঘন ঘন বারকয়েক সিগারেট টেনে বলেছিল—দে-রে ও ছোট খোকা আফিংয়ের কৌটোটা।

আফিং খেয়ে বলেছিল—কচু পোড়া খেলাম রে বাবা, সায়েবরা চলে গেল; নাড়া-বুনেরা কীর্ত্তনে হল। জমিদারী নিয়ে আশ মিটল না। জমি নেবে। পঁচাত্তর বিঘের বেশী রাখতে দেবে না। চারটে ছেলে আমার, তাদের ভাগে তা হ'লে উনিশ বিঘেও পোরে না। এক বিঘের ধান বিড়ি তামাক; পাঁচ বিঘে অন্য নেশা। তারপর তো অন্য খরচ।

আবার একটু থেমে বলেছিল—শালা তিন-দিনের যোগী গাঁও বরাবর জটা। কোথা থেকে বাউণ্ডুলে চাকুরের বেটা চাকুরে দু কলম ইংরিজী শিখে হাকিম হয়ে বসেছে। আইন মারাচ্ছে। আমরা বাবা সাতপুরুষ জমিদারী করে এলাম। মাকে মামার বাড়ী দেখায়।

এর সঙ্গে খারাপ কথার মিশেল ছিল অনেক।

চমৎকৃত হয়েছিল ফটিক কথার বাঁধুনীতে আর বাহারে। বলেই চলেছিল বাবু। তার ভিতর থেকেই ফটিক আসল তথ্যটি সংগ্রহ করেছিল।

বাবুর জমি আছে তিনশো বিঘে। পতিত জমি তাও পাঁচশো বিঘে। জমিদারীর পতিত জমি চেক কেটে বউ বেটির নামে বন্দোবস্ত দেখিয়েছে। এখন জমির বেলা দেখাচ্ছে জমিতে চার ছেলের মালিকানি। তিনি তাদের দানপত্র করেছেন। তা হ'লেই চার ছেলেতে প'চাত্তর বিঘে খেয়ে যাবে।

তা বটে—একেই বলে ফাল দিয়ে কাছির দড়ির সেলাই। এ সেলাই টেনে ছিঁড়বে না। বলিহারি বুদ্ধি। ওরা চলে ডালে ডালে তো এরা চলে পাতায় পাতায়।

আর শুনেছে যেখানে যত পতিত আছে সেখানে নানান গাছের ডাল কেটে বসাচ্ছে। আর এ গাছ সে গাছের চারা বসাচ্ছে। বাস তা হ'লেই বৃক্ষে। বাগান হয়ে গেল।

ওখানেই কে একজন ছোকরা বলেছিল—লে হালুয়া!

তাই বটে। নে—সমান কর! জমি দে, জমি দে!

ফটিক দাস মাটি তৈরী করতে করতে সেইসব কথা ভাবছে। নসুর গান তার কানে ঢুকছে না। সেও গান বাঁধছে। কিন্তু মুস্কিল হল যে, ফটিক গাইতে পারে না, গলা নেই। না থাক, তবু মন থামছে না। মনের মধ্যে কলি ঘুরছে-

"ক' টাকা চাচ্ছে রে? ক' টাকা দিতে গিয়েছিলি?"

পুরনো চালের শোন গুণ মহিমে—
ফাল কাছিতে জাম সেলাই—ছিঁড়তে নারে
ভাঁমে।

নসুবালার তখন নতুন কাল জুগিয়েছে।
নতুন কালের তপ্ত খোলায় কনক চূড়ের খই
—ভাদুর আমার মুখ ফুটেছে—
ও মন রসনা আমার—শুনে যা লো সই।

এমনি ছিল নবীনপুরে—এক আঁজলা কনকচূড়ের ধান। ওই মেয়ে, নসুবালার সেই এক আঁজলা কনকচূড়ের ধান। ডাক নাম তার সত্যিই কনক। এই চন্দনপুরের ওপাশে আকুটি গ্রামের মেয়ে।

নবীনপুরের অমর চক্কোত্তির মেয়ে—নাম —সীমা। এ সেই গেছো মেয়ে—যে আগে একটা ভাঙা সাইকেলে চড়ে ইস্কুলে আসত। গত বছর পর্যন্ত এসেছে।

অমর চক্কোত্তি এ কালের বিচিত্র মানুষ। নসু বলে, না পোলোয়া না খিচুড়ী—ভুনি খিচুড়ী। ওর মধ্যে নাই কি? চক্কোত্তি নয় কি?

চক্কোত্তি—বামুন—, হাঁ তা বটে কে বলবে নয়: ওদের বংশ চণ্ডীতলার সেবাইত ক'ঘরের একঘর,—পালা পড়লে চান ক'রে কেঁটের কাপড় প'রে কপালে সিদুরের টিপ্ প'রে চণ্ডীতলায় যায়। ভাগ নিয়ে ঘর আসে। মাসে আটদিন পালা।

ইস্কুলে পড়ে একটা-পাশ-করা লোক, রেজেস্টারী আপিসে দলিল লিখে রোজগার করে বারমাস। আটঘড়ার সেখজী—আমজেদ আলির সঙ্গে এক তক্তাপোষে বসে ওখানে কাজ করে, এক সঙ্গে বসে চা খায়: লোকে বলে মদও খায়, কোন কোনদিন রাত্রে এক সঙ্গে খায় দায়। সেখ মুরগী রাঁধে। সে অবিশ্যি আঙুলের আড় দিয়ে করে। আবার জেলার কাগজে বেনামী চিঠি লেখে। লোকে তারিফ করে, চক্কোত্তি রসিয়ে লেখে আর দারোগা হাকিম জমিদার কাউকে ছাড়ে না। ভুবনপুরে যাত্রার দল আছে, সেই দলে এ্যাক্টো করে।

বাবাঃ সে কি তেজ চক্কোত্তি ঠাকুরের! যখন বিশ্বামিত্র সেজে নামে, তখন যত গোলমাল থাকুক আসরে—সব চুপ হয়ে যায়। ওরে বাবা—

—দিনু শাপ—সবংশে নির্বংশ হবে—
অনন্ত নরকে তোর—আরেরে দুর্মতি

সে শুনে বুক গুরগুর করে ওঠে। মনে হয় হাত জোড় করে ছুটে গিয়ে বলে—হেই চক্কোত্তি ঠাকুর, থাম বাবা, রাগ খানিক থামাও। ওরে বাবা, এত রাগ! হেই মাগো! নিব্বংশ বলতে আছে! শুধু এই নয়, সে আমলে চক্কোত্তি স্বদেশী করে জেল খেটেছিল তিন মাস। তখন খদ্দর পরত। এখন খদ্দর পরে না। তবে ভোটের সময় গাজনের ঢাকীর মত ঢাক বাজিয়ে নেচে বেড়ায়। বক্তৃতাও করে।

অমর চক্কোত্তির ছেলে নাই, চার মেয়ে। সেজ তৃতীয়া। ভাল নাম সীমা। ডাক নাম কনক'। হয়তো কনকই আসল নাম। কিন্তু পর পর দুই মেয়ের পরও যখন কনক হল—তখন নাম হল সীমা। বড় মেয়ে—বনলতা—মেজ—স্বর্ণলতা—তারপর মিলিয়ে হয়েছিল কনকলতা। কিন্তু আর যেন মেয়ে না হয় সেইজন্য পাল্টে রাখা হয় 'সীমা'।

আনাকালীর মত নামগুলি অমর চক্কোত্তির পছন্দ হয়নি। সীমার পরও আবার মেয়ে হয়েছিল—তার নাম 'ক্ষমা'। তারপরও মেয়ে—কিন্তু সে মেয়ে বেঁচে নেই। মেয়ে-মা এক সঙ্গে গিয়ে অমর চক্কোত্তি খালাস পেয়েছে।

দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। তখন চক্কোত্তির জমিজমাও ছিল এবং দেশে একটু খাতির না হোক আদর ছিল। জেলখাটা লোক! জমি বেচে বিয়ে হয়েছে তাদের। তারপর থেকে চক্কোত্তি পাল্টেছে। তার আদর গেছে।

তার কারণ মদ। এবং আরও একটি কারণ। এক বিধবাকে সে ঘরে এনে রেখেছে। ওদিকে আশ্চর্যের কথা—চণ্ডীতলার পাওনা কমে কমে এসেছে। এখন চণ্ডী মায়ের একরকম নিজেরই চলে না—তা দু আনার অর্ধেক অংশের শরীক চক্কোত্তির।

চক্কোত্তি তাতে দমেনি। সে মেয়ে সীমাকে আগে থেকেই পড়াচ্ছিল। তার জন্যই তাকে সাইকেল চড়া শিখিয়ে নিজের ভাঙা সাইকেলটা তাকে দিয়েছিল। সীমা চন্দনপুর মাইনর ইস্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে পাশও করেছিল। চক্কোত্তি তাকে বই কিনে দিয়ে বলেছিল—তা হলে তুই পড়। তোর জন্যে আমি নিশ্চিন্ত। দরকার মত হাই-স্কুলে যাবি। পাশেই রেজেস্টারী আপিসে থাকি। মাস্টারদের কাছে দেখিয়ে ঠেকিয়ে নিয়ে আসবি।

সীমা মাইনর গার্লস স্কুলে পড়বার সময় রেসিটেশন করত ভাল। চক্কোত্তি শিখিয়ে-

ছিল। তখন গার্লস স্কুল—বয়েজ হাই-স্কুলের প্রাইজ হ'ত এক সংগে। দুইই মাধববাবুর প্রতিষ্ঠা করা। রেসিটেশনে সেবার নাম করেছিল সীমা—রবীন্দ্রনাথের দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে—কবিতা আবৃত্তি ক'রে। তখন দুই ইস্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন—মাধববাবুর ছোট ছেলে রায় বাহাদুর পবিত্র-[illegible]। পবিত্রবাবু বই লিখতেন তাঁর [illegible] ছিল বলে ভাল পারতেন। তিনি পরের বছর সীমাকে, [illegible]নপুরের গোপাল চৌধুরীর ছেলে শুভেন্দুকে দিয়ে—চাণক্য এবং মুরার দৃশ্য রেসিটেশন করিয়েছিলেন। তার পর বৎসর ওদের দুজনকে দিয়েই করিয়েছিলেন — 'অভিসার' রেসিটেশন। দুজনেই সুর মিলিয়ে আরম্ভ করেছিল—'সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে—একদা ছিলেন সুপ্ত।' তারপর "সন্ন্যাসী গায়ে ঠেকিতে চরণ থামিল বাসবদত্তা" আসতেই—শুভেন্দু শুয়ে পড়েছিল এবং সীমা ডান হাতখানিতে প্রদীপ ধরার ভঙ্গি ক'রে—তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলেছিল—

ক্ষমা কর মোরে কুমার কিশোর—
দয়া কর যদি গৃহে চল মোর—
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর
এ নহে তোমার সজ্জা।

এরপর শুভেন্দু উঠে বসে আরম্ভ করেছিল—

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে—
অয়ি লাবণ্য পুঞ্জে'...
সময় যেদিন আসিবে
আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।

তারপর আবার দুজনে আরম্ভ করেছিল—সহসা ঝঞ্জা তড়িত শিখায় মেলিল বিপুল আস্য। এমন ভাবেই শেষ করেছিল দুজনে গোটা আবৃত্তি। সেবার সেটি এত ভাল হয়েছিল যে—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দত্ত সাহেব খুশী হয়ে বলেছিলেন, এদের মেডেল দেওয়া উচিত। আমি আশা করি ইস্কুল কর্তৃপক্ষ এদের মেডেল দেবেন আসছে বার।

তখন সীমা ছোট ছিল। বয়স তখন দশ এগারো। তারপরও সে অনেক সুনাম অর্জন করেছে, অন্তত রেসিটেশনে। একা করেছে। দুজনে করেছে। শুভেন্দুর সংগে করেছে—সে আবার থিয়েটার। বয়েজ ইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তীতে—ওরা দুজনে করেছিল কচ দেবযানী। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে—কর্ণকুন্তী সংবাদ করেছে। সে শুভেন্দুর সংগে নয় তাপু—তপন সরকারের সংগে। সে পুরনো কথা। ১৯৫০ সালের কথা। তারপর কয়েক বছরই চলে গেছে। ১৯৫৫ সালে সীমা প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়েছিল। অমর চক্কোত্তি আশা করেছিল সীমা পাস করবে। পাস করলে, সীমাকে এখানকার গার্লস স্কুলে ঢুকিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল তার। ষাট সোত্তর যা পাবে তাই তার সংসারে আসবে। সংসারে এখন বড় টানাটানি। দিন দিন জিনিসের দর চড়ে বাঁশের ডগায় গিয়ে ঠেকেছে। আর ক্ষমাটার বিশেষ কিছু হবে না। মেয়েটা দেখতে সুন্দর, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর নয়। তার উপর—বোধ হয় রূপ আছে বলেই—সাজগুজবার খুব ইচ্ছে। ওটাকে কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। সীমা হয় তো শেষ বয়সে তাকে পুষতেও পারবে। কিন্তু যেমন ভাগ্য! ভাগ্য ছাড়া কি বলবে অমর চক্কোত্তি? নইলে যে দোষ চাপে তার ঘাড়ে। সে সব বই কিনে দিতেই পারেনি মেয়েকে। সুতরাং ভাগ্য মন্দ বলাই ভাল। ভাগ্যের জন্যেই সীমা ফেল করলে। ১৯৫৬ সালের ইলেকসনে বেশ টাকা পেয়েছিল অমর। সেই টাকায় বই কিনে দিয়ে মেয়েকে বলেছিল—এবার ফেল হলে শুনব না। কিন্তু এবারও ফেল করেছে সীমা।

চক্কোত্তির বাড়ির বিধবা কর্ত্রীটির সংগে

সীমার বনিবনাও হত না। এ কাল—সমাজ-তন্ত্রের কাল—কিন্তু সমাজের কাল নয়; ও বিষয়ে সমাজতন্ত্রের মতামত উদার। তবুও সেকেলে লোক আছে বেঁচে—একেলেদের মধ্যেও সেকেলে আছে, এবং একেলে মতা-মতের এমন লোক অনেক আছে যারা অন্যের নিন্দে যে-কোন ছুতোয় পেলেই হল—তাতেই তারা জিভ শানিয়ে কথা বলে। সেসব কথা সীমাকে শুনতে হয়। কারণ সে ইস্কুলে আসে। পরীক্ষার ছ মাস আগে সে এখানে মেয়েদের হোস্টেলে ছিল। শনি-রবিবার বাড়ি যেত। ওই বাইসিকিলে চড়ে যেত। এবং দেড় দিনে সাড়ে পাঁচ দিন শোনা কথার বিষগুলির ঝাঁঝ কোন না কোনপ্রকারে তার বলা কথার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসত।

বিধবা সহ্য করত। মধ্যে মধ্যে বলত—দেখ সীমা—আমি তোমার গুরুজন! বয়সে বড়। সম্বন্ধ কিছু না-মান, কিন্তু বয়সে বড় বাড়ির বাঁধুনী বলেও মানা উচিত। আমি তোমাদের বাড়ি যেচে আসিনি, তোমার বাবা আমাকে এনেছে। লজ্জা—রাগ—তোমার আমার উপর করে তো লাভ নেই—তোমার বাবার উপর করো। বলতো তোমার বাবাকে আমি বলব।

সীমাকে চুপ করতে হত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার একটা কোন ছুতোয় নতুন করে বাধত। ক্ষমা এ সবের মধ্যে থাকত না। তার সঙ্গে মাসীর সত্যই একটা স্নেহের সম্পর্ক আছে এবং ক্ষমা বোধ হয় এ সবের মধ্যে দোষ দেখে না। মাসী চাল ধান দিয়েও তার শখ ও সাধ মিটোয়।

চক্কোত্তি বলে—সে বাপের খাতির রাখে না। তা সত্যিই সে রাখে না—; এই বিধবা প্রসঙ্গ উঠলেই সে সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সকল-জনের সকল বাড়ির অতীত ইতিহাস আওড়াতে শুরু করে—। কার কোন রাতে বংশের নারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল—কোন অভিজাত বংশের কার কোন্ রক্ষিতা ছিল—এসব তার নখদর্পণে। সীমার সঙ্গেও এ নিয়ে তার বাকযুদ্ধ হয়নি এমন নয়। হয়েছে; লোকজন যেই উপস্থিত থাক, তাদের সামনেই উঁচু গলায় হয়েছে।

নসুবালার গানের কলিতে সেসব কথার উল্লেখ আছে। নসুবালা জোলেনি একটি বর্ণও। সে বলে—পক্ষীর মত শুনি, যা শুনি তাই বলি। ভুলি না। বুঝেচ বেয়াই। হ্যাঁ।

—সেই হাটকুড়ো জেলের বাড়ি সরক পাখি ছিল, সেই সরকের সরক আমি। মাছ নিতে গিয়ে বাড়ির উঠোনে দাঁড়ালেই, বাস্—"ভাতারখাগী, আঁটকুড়ি—! যত গাল শুনত, সব বলে যেত একে একে। আবার তারই মধ্যে বলত, হেই মা। বাবুমশাই। যাই বাবু মাছ দিয়ে আসি! আবার তখুনি বলত, মর মর মর মিনসে! বলা দেখ!

নসুবালা তাই বটে। চক্কোত্তির কথা ও গানের মালায় গেঁথে রেখেছে। সপ্তাহে একদিন সে চক্কোত্তির গাঁয়ে যায়। গেলে ওদের বাড়ি যাবেই। যত ভাব তার সীমা-ক্ষমার সঙ্গে তত ভাব তার ওই ওদের বিধবা মাসীর সঙ্গে। নসুবালার কাছে কারুর কোন দোষও নেই, বিচারও নেই। যে কেউ ওকে সমাদর করে ভাদুর মা বলে ডাকলেই হল।

নসুবালার গানে বলে—
আগে গাছের ডালে কাঁটা
তবে ডালের ডগায় ফুল—
বাঁধিলে কলঙ্ক নদী ও মন রসনা আমার
তার ভাঙলে পড়ে কূল।
পাঁতে পাবনী গঙ্গা শিব ধরিল মাথায়
কাপ দিয়ে পালালে ধনী—ও মন রসনা
শান্ত রাজা কোথায়?
চক্কোত্তির কণ্ঠখানি বাজে যেন শঙ্খ—
গঙ্গা পাঁক তিলক আঁকে
মনরসনা—পবিত্র কলঙ্ক—।

লম্বা ছড়া। গায় ওদের নিজের সেই এক ঘেয়ে সুরে। তাতে কোন কথাটি বাদ নেই। চক্কোত্তি পুরাণে কলঙ্কের কথাই বলে না; গ্রামের এবং আশপাশ গ্রামের লোকেদের গোপন প্রেমের কথা বলে না, তাদের নিজে-দের বংশের কথা বলে।

সীমাকে বলেছিল, আমার ঠাকুরদাদা কোচুনীপাড়া যেত শিবের মত। মাঠে মাঠে ঘুরত, কাঠকুড়ুনী-ঘাসকাটুনীদের পেছনে পেছনে, আমার বাবার আমল থেকে হাল আমল—বাবা সন্ধেবেলা ঝড় নাই, জল নাই, যেত শুদ্দুপাড়ায় ষোল বছরে বিধবা সৈরভীর বাড়ি; আমার পৈতের সময় মুখ দেখিয়েছিল সৈরভীকে; আমার ভিক্ষেমাকে দেখেছিস তো হারামজাদী। এ কালে আমার পালা—বাবা আজ আর রাজাপ্রজা নাই, বামুন শুদ্দু নাই, সবাই সমান। অন্যের বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে গিয়ে মাথা দোব? পতিত নাই পঞ্চায়েত নাই, ভয়টা কিসের? তোকে ভয় করতে হবে? তোর লজ্জা লাগে তুই আপনার পথ দেখ। লাজলজ্জা ভয়ডর আমার নাই। লোকে বলে আমি মদ খেয়ে চণ্ডীমায়ের মাটির ঢিপিতে কিল মেরেছিলাম। মদের ঘোর মিছে কথা, মেরে-ছিলাম জেনেশুনে, টনটনে জ্ঞান ছিল। মদ খেয়েছিলাম—যারা থাকবে, তারা তো এরপর মারবে, সেই মার সহ্য করবার জন্যে। আর যদি বলে, সেবাইত থেকে খারিজ করব, তবে বলবার পথ থাকবে—মদ খেয়ে আমার জ্ঞান ছিল না।

চণ্ডীমায়ের সেবাইত চক্কোত্তি চণ্ডীমা-রূপিণী যে স্তূপটি আছে, সেই স্তূপটির উপর একদিন মদ্যপান করে ঢুকে, দমাদম কিল মারতে শুরু করেছিল—চীৎকার কর-ছিল, লাগ্‌তো হ্যায় তো চিল্লাও—স্রিফ মাটি হ্যায় তো ভাঙো।

এইটি নসুবালা সহ্য করতে পারে না। চণ্ডীমায়ে তার অসীম ভক্তি বিশ্বাস। নিত্য সকাল বেলা গিয়ে সেখানে প্রণাম করে, মনের প্রশ্ন নিবেদন করে। আবে-দন জানায়, মায়ের ঘরের একটি টিকটিকি টক টক করলেই সে তার মধ্য হতে জবাব আবিষ্কার করে নেয়। জঙ্গলে ঘেরা চণ্ডীমায়ের স্থান, সেখানে কীটপতঙ্গের সরীসৃপের ইঁদুর বাঁদরের মেলা—টিকটিকিও সেখানে অনেক। যে-কোন টিকটিকিই টকটক করুক সেটি নসুর সেই আদি ও অকৃত্রিম টিকটিকিটি, যে নাকি মায়ের হয়ে কথা বলে। যাক্। এই ঘটনার অর্থাৎ মাকে কিল মারার পর সে চক্কোত্তির উপর খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিল। সে কিছু দিন ওদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়ে-ছিল এবং নিত্য সকালে উঠে প্রত্যাশা করত যে, শুনতে পাবে গতরাত্রে অমর চক্কোত্তি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরেছে, অথবা সর্পাঘাত হয়েছে কপালে, অথবা ওলাউঠা হয়েছে। দিনের পর দিন তা না-হওয়াতে সে বিস্মিত হয়েছিল। একদা সেই বিস্ময়বশে ওই চক্কোত্তির বাড়ি গিয়ে সরাসরি তাকেই প্রশ্ন করেছিল—তোমার কিছু হল না কেন বল দিকি?

—কি? কি হবে?

—মায়ের বুকে তুমি ঢাই ঢাই করে কিল মারলে—হুঁ—।

আর নসুকে বলতে দেয়নি চক্কোত্তি, হা-হা করে হেসে উঠেছিল। বিরক্ত হয়ে নসু বলেছিল—

—এমন করে হেসো না—হা-হা করে। হ্যাঁ।

—হাসব না?

—না। বল, রহস্যটা বল।

—এই মরেছে—

—হ্যাঁ মরেছেই বটে। বল! তুমি তাহলে—

—কি?

—সাধকটাধক বট! এ্যাঁ?

গম্ভীরভাবে কৌতুক রসটিকে প্রগাঢ় করে তুলে চক্কোত্তি বলেছিল—বলিস নে কাউকে খবরদার! একটা প্রণাম করে নসু বেরিয়ে এসেছিল। এ নিয়ে তার বেয়াইয়ের সঙ্গেও কথা হয়েছিল। ফটিক দাস হেসে বলেছিল, তোমার নিজের মহিমে আছে বেয়ান, তাই সবাইয়ের মধ্যে তুমি মহিমে দেখ!

বেয়ান রেগে বলেছিল—মরণ। মিনসের কথা শোন!

—শোন বেয়ান শোন! যাত্রার দলে রাধা বলত, শুনেছ তো, তমাল গাছ, তাকে কেষ্ট বলত; তালগাছ—তাকেও বলত, এই আমার শ্যাম। শ্যাম বিরিঞ্চির পাতা পেড়ে—শ্যাম পিদীমের কালো শিবে—শ্যামসোহাগী

"সীমা, আমি তোমার গুরুজন, বয়সে বড়।"

কাজল পড়লে তাই হয়।

—তোমার কথা আমি মানি না হে মানি না।

—মেনো না ভাই।

সীমা দ্বিতীয়বার ফেল করলে।

খবর যেদিন এল, সেদিন চক্কোত্তি মদ খেয়ে বাড়ি এসে কিছুক্ষণ কেঁদেছিল; সীমার দোষ নেই, দোষ তার। কতটুকু করেছে সে তার পড়ার জন্যে? নিজে? নিজে সে একদিন দেখিয়ে দিয়েছে? দেয়নি! তবে?—ওই যে ঘরে অলক্ষ্মী অধর্মকে পুষে রেখেছে তার ফল—? তার ফল যাবে কোথায়?

বিধবাটির নাম মনোরমা। সে কাজ করছিল—ঘর ঝাঁট দিয়ে চলেছিল, নিরুত্তরে কাজই করে গিয়েছিল, কোন উত্তর দেয়নি। চক্কোত্তির একদফা খেদোক্তি শেষ হতেই সে চাবীর গোছাটি খুঁট থেকে খুলে চক্কোত্তির সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। শুধু বলে গিয়েছিল—পাপ অধর্ম চলল ঘর থেকে, সংসার তোমার ধর্মে পুণ্যে পবিত্র হোক।

চক্কোত্তি চমকে উঠেছিল।—এ কি? এটা কি হল? এই—! এই! যেতে তাকে সে দেয়নি। মনোরমা যেতেও ভরসা করেনি, ফিরেছিল। এবং এরপর চক্কোত্তি উল্টো গাইতে শুরু করেছিল। সীমার শ্রাদ্ধের মন্ত্র নয়—ঘণ্টা বাজানো বামুনেরা চাবী দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে টাকা না পেলে যেভাবে মৃত ব্যক্তির নরকে দুর্দশার কথা বর্ণনা করে পথে দাঁড়িয়ে, তাই করেছিল।

এই বিধবাটিই এবার বলেছিল, অনেক হয়েছে। অনেক দেখালে। এই পাড়াগাঁয়ে মেয়েকে বাইসিকিল চাপা শিখিয়ে ইস্কুল পাঠালে, বোর্ডিংয়েও ক' মাস রাখলে, পাস করিয়ে মেয়েকে চাকরী করাবে—মেয়ে তোমাকে পুষবে। ওসব আশা ছাড়। এখন দেখেশুনে একটা বিয়ে দিয়ে দাও, এখনও কুড়ি পার হয়নি, বুড়ী হয়নি। ম্যাট্রিক ফেল, পাড়াগাঁয়ে দু চারজন শখ করে বিয়ে করতে চাইবে। তোমরা মেয়ের জন্যে বিয়েতে পণ নাও, পণ হয় তো বেশী পাবে।

চক্কোত্তির কথাটা ভালো লেগেছিল, সে ভালোলাগা ভয়ংকর ভালোলাগা। মনে হয়েছিল এই কথাটাই সে খুঁজছিল, খুঁজে পাচ্ছিল না। সে মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে-ছিল, আধমিনিট, তারপর বলেছিল, আচ্ছা বলেছ তো। আবার বলেছিল—ঠিক বলেছ!

পাত্র বের করতে তার দেরী হয়নি।

পাত্র—চন্দনপুর থেকে তাদের গ্রাম দু মাইল, তাদের গাঁ থেকে আরও পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে বনচাতুরা গাঁয়ের গোবিন্দ পাঠকের নাতি—ভুবন পাঠকের ছেলে রমেন পাঠক। গোবিন্দ পাঠকের শোনা যায় বিশ হাজার টাকা, পাঁচশো বিঘে জমি ছিল। ভুবন পাঠক যুদ্ধের বাজারে এবং পরে কণ্ট্রোলের সময় কালোবাজারে ধান বেচে ত্রিশ হাজার টাকাকে দু লক্ষে দাঁড় করিয়েছে। ভুবন পাঠক চন্দনপুরের ছাত্র, থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল, তার পাঠ্যাবস্থায় বাপকে সাইকেলের জন্যে ধরেছিল। বাপ একশো টাকা দাম শুনে বলেছিল, নমুনো দিস, আমার কামার খাতক আছে, তাকে লোহা দেব সে গড়ে দেবে, দশটা টাকা মজুরী। লোহা তো ভাঙা-চোরা বাড়িতেই আছে। ভুবন পাঠক বাপের মৃত্যুর পর সাইকেল কিনেছিল। খড়ের চাল তুলে টিনের চাল করেছিল। ভুবনের ছেলে—ম্যাট্রিক ফেল করে মালিক হয়ে বসেছে। মাটির দেওয়াল টিনের চাল তুলে পাকা ইটে দালান বাড়ি করেছে। সাইকেল এখন তিনখানা। রমেন গ্রামে থিয়েটারও খুলেছে। সেই সূত্রে অমর চক্কোত্তি সেখানে যাওয়া আসা করেছে। রমেন সৌখীন ছেলে। বিয়ে হয়েছিল—বউ মরে গেছে। দুটি বাচ্চা ছেলে, মানুষ করছে রমেনের মা। রমেন এখন পণ ধরেছে, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মুখ্যু মেয়ে সে বিয়ে করবে না—তার লেখাপড়া জানা মেয়ে চাই।

রমেন তার বাড়িও কয়েকবার এসেছে বাইসাইকেলে চড়ে। বেশ, মানুষ হিসেবে মেজাজটা আমিরী, দু-পুরুষের কৃপণ অপবাদ ঘুচিয়ে খরচে সাজতে চায়।...... চকচকে সাইকেল, দামী সৌখীন গীয়ার কভার ফিট করা, ইলেকট্রিক ব্যাটারী ফিট করা আলো, পোশাক-পরিচ্ছদ খাস কলকাতার বড় দোকানের তৈরী। ফ্যাশনে একটু ব্যাকডেটেড—এখনও ওপেনব্রেস্ট কোট পরে। তা হোক। দামী সিগারেট খায়। প্রথম থিয়েটার করবে—তারই জন্যে এসেছিল—অমর চক্কোত্তি কাছে, চন্দনপুরের বাবুদের অনেক ছোকরার চেয়ে তার পার্ট ভাল হত। বড় বড় পার্ট পেয়েছে। এখান থেকে

—আশেপাশে থিয়েটার যখন গজাতে লাগল, তখন সে তাদের মাস্টারী করেছে, ডিরেক্টরী করেছে। স্টেজ বাঁধা থেকে এ্যাক্টিং পর্যন্ত সবই সে তাদের শিখিয়েছে। জায়গায় জায়গায় শক্ত পার্টও করে দিয়েছে। টাকা নিয়ে অবশ্য। ফি তার মিনিমাম পঞ্চাশ টাকা। এ ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, সিগারেট, মদ এতো আছেই। রমেন যখন এসেছিল, তখন সে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার ফি জান তো?

—জানি না ঠিক। তবে শুনেছি। সে তো একরকম নয়!

—হ্যাঁ। মিনিমাম একটা আছে। তা সেখানে কাজও সেইরকম করি। বাতলে দি। তাতে যতটা হয়। যতটা পারে। সপ্তাহে দু দিন রিহারশ্যালে যাব। প্লের একদিন আগে যাব—প্লের পরদিন ভোরে চলে আসব। এক রাত্রির প্লে—পঞ্চাশ, দু রাত্তিরে পঁচাত্তর, তিন রাত্তিরে নব্বইও নি—একশোও নি। আর পুরো খাটবো—সপ্তাহে চারদিন রিহারশ্যালে যাব, দরকার হলে পার্ট করব, প্লের তিন দিন আগে যাব—প্লে হয়ে গেলে—স্টেজ খুলে দিয়ে আসব—একরাত্তিরে—একশো—দু-রাত্তিরে একশ পঁচিশ, তিন রাত্তিরে দেড়শো।

রমেশ বলেছিল, আমাদের তিন রাত্তির প্লে। আমি আপনাকে দুশো টাকা দোব। প্লে সাকসেসফুল হলে, আপনাকে কাপড়-চাদর দিয়ে বিদেয় করব।

খুশী হয়ে চক্কোত্তি বলেছিল, আর একটি কণ্ডিশন বাপু।

—বলুন।

—ওখানে যে কদিন থাকব, সিগরেট দু প্যাকেট করে। বাজে সিগরেট খাই না আমি।

—কি সিগারেট বলুন।

চক্কোত্তি বলেছিল—"আপনি কি হারাইতেছেন তাহা আপনি জানেন না" যার বিজ্ঞাপন। কচ কচ। কাঁইচি। চক্কোত্তি প্রতিপদেই রসিকতার পরিচয় দিতে ছাড়ে না। কথা শেষ করে চক্কোত্তি হেসেছিল।

—তাই দোব।

—আর—। একটি হাত উপরে অন্যটি নীচে রেখে লম্বা মাপের কিছু ইঙ্গিত দেখিয়েছিল। তারপর বলেছিল—"দব্যি"। অর্থাৎ দ্রব্য।

দ্রব্য মানে কি এবং ওই লম্বা মাপ কিসের তা রমেন সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিল। সে হেসে বলেছিল—ব্যবস্থা আমার চালাও। সে দোকানের জিনিস নয়। আমার সব 'গৃহ-জাত'। আঙুল চুবিয়ে দেশলাই জেলে দিন —দপদপ করে জ্বলবে।

চক্কোত্তি বলেছিল—বেঁচে থাক ভাই তুমি আমার সোনার চাঁদ।

রমেন বলেছিল—একটি শর্ত কিন্তু।

—এরপর তুমি দুশো শর্ত বাতলাও মেনে

—দিন এক বোতলের বেশী পাবেন না। বিকেল বেলা এক পাঁট দোব। রিহারশ্যাল শেষে এক পাঁট। সকাল বেলা থেকে না।

—এক ঢোক দিয়ো ভাই। না দিলে খোঁয়াড়ি মরবে না। সাইকেল হাঁকিয়ে আসতে হবে সাত মাইল পথ। পথ তো নয় —শালা—আরাবল্লীর পাথুরে গোপথ। না খেয়ে ঠ্যাঙাতে পারব না সাইকেল। আবার রেজেস্ট্রী আপিস চণ্ডীতলা সেরে ঠিক চারটের সময় হাজির হব। ও দুটো না-রাখলে তো চলবে না ভাই। বারো মাসের ভাতঘর!

—বেশ! তা হলে পাকা কথা দিলেন তো?

—হাতীর দাঁত দিলাম। মরদকা বাত হাতীকা দাঁত! কি বই ধরছ?

—কর্ণার্জুন—সীতা—আর একখানা আধুনিক। মানে খুব মডার্ন।

—ঠিক আছে। বায়না কিছু দিয়ে যেয়ো। আর একটা কথা। ওয়ান মোর।

—বলুন।

—প্লে সাকসেসফুল হলে কাপড়-চাদর দেবে বলেছ। তা ওটা—। মানে চণ্ডী-তলায় হাজরে দিতে হয়। ওটা যদি তসরের দাও—তো—বুয়েচ না—। কালো নরুণ পেড়ে। ওটাই এখন ফ্যাশন হয়েছে। বুয়েচ?

তাও দিতে রাজী হয়েছিল রমেন।

মেজাজ তার আমিরী। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিল আগে, এখন শুধু মেম্বর। সদর শহরে—এস ডি ও—চন্দনপুরে বি ডি ও আপিসে হরদম যাওয়া আসা। মধ্যে মধ্যে খদ্দরের কাপড় জামা পরেও আসে, থানা কংগ্রেসের মিটিংয়ে। এখন রমেন কংগ্রেসের মেম্বর।

চতুর ছেলে। শুধু ইঙ্গিত বোঝে বলেই চতুর নয়। ওর চতুরতা দেখে চক্কোত্তি যে চক্কোত্তি তারও বিস্ময় জন্মেছিল। চক্কোত্তি পলিটিকস্ বোঝে বলে অহংকার করে। পলিটিকস করে। আগে, চল্লিশ সালের আগে, কংগ্রেসের ভোটে মাতত। তারপর চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশে জনযুদ্ধের মহড়ায় নেমে পড়ে। প্রথম—আই পি টি এ। তারপর সাতচল্লিশ-আটচল্লিশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তেভাগা 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' নিয়ে মাতা-মাতির সময় এই অঞ্চলে এক কম্যুনিস্ট পকেটে নেতা হয়ে উঠছিল। কিন্তু যেই কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল, অমনি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই বলে ফতোয়া দিয়ে শান্ত নাগরিক হল। রেজেস্ট্রী আপিসে এসে জুটল এই সময়। তারপর বাহান্ন সালে কংগ্রেস আপিসে যাতায়াত শুরু করলে। কংগ্রেসের হয়ে কাজ করবে। এখানকার কংগ্রেসপ্রার্থী ছিল ধনী মারোয়াড়ী। তবে মারোয়াড়ী হলেও আজীবন কংগ্রেসকর্মী। তা হোক বা না-হোক তার টাকাটাই ছিল চক্কোত্তির সব থেকে বড় বিবেচনার বিষয়। খেটেছিল সে টাকাও পেয়েছিল এবং মেরেও ছিল উপরন্তু একখানা বাইসিকিলও সে আর ফেরত দেয়নি। তারপর ছাপ্পান্ন সালে এখানে

জাগতা হ্যায় তো চিল্লাও, স্লিফ মাটি হাম জো ভাবেগ

কংগ্রেস ক্যাণ্ডিডেট ছিল এ জেলার একজন ধনী ব্যক্তি। প্রতিদ্বন্দ্বী কম্যুনিস্ট। কংগ্রেস হারল। লোকে বললে কংগ্রেসের নিজের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার মধ্যে চক্কোত্তি একজন প্রধান। চক্কোত্তি হেসেছে। বলেছে—প্রমাণ দিলে জুতো খাব।

—তুমি জাঙ্গাল বুনের মিটিংয়ে কি বলেছ?

—কি বলেছি? তারা জিজ্ঞাসা করলে, মশায়, বাবুটি কবেকার কংগ্রেসী? বললাম—ঠিক জানি না, তবে আজীবন হতে পারে! তারা বললে—আজীবন? ওঁর বাপ নামজাদা ইংরেজের পক্ষের লোক ছিলেন না? বললাম—ছিলেন, কিন্তু তাঁর চেয়ে দেশহিতৈষী কে আছে? তারা বললে—তা হতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসী তো নয়। সেরকম তো অনেক দেশপ্রেমিক আছে মশায়। আপনি কংগ্রেসী বলছেন তাই বলছি। তাই বলছি বাপের পথ ছেড়ে—বাপ চিরকাল কংগ্রেস-বিরোধী ছিলেন, আজ উনি কংগ্রেসী হলেন কেন, এম এল এ হবার জন্যে, মন্ত্রী হবার জন্যে? ওঁর নিজের শালা, তিনি কম্যুনিস্ট বক্তৃতা করে গেলেন, তা উনি তাই হলেন না কেন? কংগ্রেসী কেন? বলুন! আমি বললাম—যদি বোঝেন কখনও কংগ্রেস মন্দ, কম্যুনিস্ট ভাল, তখন উনি নিশ্চয় তাই হবেন। যেমন বাপের মতকে ভুল বুঝে আজ উনি কংগ্রেসী হয়েছেন। তারপর হেসে বলেছে, ওঁর নিজের শালা বড় কম্যুনিস্ট লীডার, সে এসে বড়লোকীর ছান্দ করে গেল, মানে উনি বড়লোক, ওঁর ছান্দ করে গেল। লোকে ওঁকে ওঁর বাবাকে চেনে জানে। আমার বলায় কি যায় আসে বল। যদি বল যায় আসে তো বলব, আমি কোন মিথ্যে কথা বলিনি। কংগ্রেস বার করে দেয় দেবে। আমি তো জানি, আমি কোন দিন এম এল এ হব না। মন্ত্রী হবার কোন সাধ নাই, এমনকি মন্ত্রীর আরদালী হবার দরখাস্ত করব না কোন দিন। এই বলেই শেষ নয়, সে কম্যুনিস্ট এম এল এর সঙ্গে নতুন করে দহরমমহরম জুড়ে দিলে প্রকাশ্যে এবং পারমিট, রিলিফ, ক্যাশডোল প্রভৃতির ব্যাপারে একজন অন্যতম ছোটখাটো কর্তা হয়ে বসে পড়ল।

এমন অমর চক্কোত্তিও চমৎকৃত হল, এই রমেনের পলিটিক্সের বুদ্ধি দেখে। ওই থিয়েটারের সমারোহের মধ্যে কোথা দিয়ে সে কি করলে তা কেউ জানলে না, তবে, থিয়েটারের পরেই ইউনিয়ন বোর্ডের মিটিংয়ে হিসাব নিকাশ পাসের প্রস্তাবে এমন শোচনীয়ভাবে প্রেসিডেণ্টকে হারিয়ে দিলে যে, প্রেসিডেণ্টের আর পদত্যাগ না-করে উপায় রইল না। তারপরও চতুর রমেন নিজে প্রেসিডেণ্ট হয়নি, তার এক কর্মচারীকে প্রেসিডেণ্ট করে নিজে মেম্বারই থেকে গেছে। করে সবই রমেন। প্রেসিডেণ্ট আপিসে পুতুল, বাড়িতে তার মাইনে করা কর্মচারী। অন্য মেম্বারেরা থিয়েটারে পার্ট করছে। রমেনের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। এ মনুষ্যটি সাধারণ নয়। অসাধারণ। কংগ্রেস কম্যুনিস্ট পি এস পি যে পার্টিতে যাক, এ ঠিক নিজের জায়গা করে নেবে। লীডার হবেই। ভগবান সহায়—খুঁটোর জোর আছে, ভুবন আচার্যির দু লক্ষ টাকা ওর হাতে। আমিরী মেজাজ হলেও বিষয়বুদ্ধিতে আমিরী ফাঁক রাখেনি—সেখানে আমিরী সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে। চৌবাচ্চার হিসেব ওখানে রমেনের, চৌবাচ্চা হতে নির্গমনের নলে ঘণ্টায় দশ গ্যালন জল যখন নির্গত হয়, তখন জল আগমনের পথে অন্তত বারো গ্যালন প্রবেশের ব্যবস্থা রেখেছে সে। ঠাকুরদা করত মহাজনী চাষ, বাবা সেটাকে বাড়িয়েছিল, সুযোগ পেয়েছিল কণ্ট্রোলের বাজারে। তাদের বাড়িটা দুটো জেলার সীমানা ঘেঁষে। সুযোগ বুঝে ও জেলার খরিদ্দারকে সীমানা পার করে—বিক্রী করে দাঁও মেরেছিল। রমেন দোকান করেছে—চাল ধানের গদী, তার সঙ্গে মনিহারী, কাপড় লটকোন। ওঁদের গ্রাম বনচাতরা থেকে তিন মাইল পশ্চিমে সদর ঘাট। একটা রাস্তা ঘাটের দু মাথা থেকে তিন দিকে চলে গেছে, উত্তরে একটি সাঁইথিয়া অন্যটি পাঁচথুপী কাঁদী, দক্ষিণে চন্দনপুর হয়ে বুয়ে পার হয়ে সোজা বোলপুর পর্যন্ত। ঘাটের মাথায় রমেন ধান কেনে কম দামে, কাপড় মনিহারী লটকোন বেনেতি মালমসলা, বেচে অপেক্ষাকৃত বেশী দামে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কলাই লঙ্কা শাখ আলু—কেনে সে সস্তায়, চন্দনপুরে সে যায় না, নদীর ওপার থেকে যে রাস্তাটা সাঁইথিয়া গেছে, সেটা এখন ভাল রাস্তা, পিচ হয়নি, তবু সুগম পথ—ওই পথে চলে যায় সাঁইথিয়া। সেখানেই ওর বেচা-কেনা। ফলে চৌবাচ্চায় বারো গ্যালনের পথে পনের গ্যালনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তাতে খানিকটা তো চৌবাচ্চা ছাপিয়ে থিয়েটারের সমারোহে গৃহজাত মদ্যের প্রাচুর্যের মত মাটিতে পড়ে নষ্ট হবেই।

এ ছেলে যদি ভাল পাত্র না-হয় তো ভাল পাত্র কে? চেহারা একটু বেঢপ, মোটা বেঁটে; তা হোক। সাজলে গুজলে বেশ লাগে। এই তো কর্ণার্জুনে কর্ণের পার্ট করলে—সীতাতে রাম—মাটিরঘরে—অলক, কি খারাপ লেগেছিল! একটু বেঁটে। তা ওরাই যে বেঁটে ছিল না তার প্রমাণ কি! আর তার মেয়ে সীমাই বা কি এমন আশ্চর্য পদ্মাবতী বা সীতা বা ওই যে, অলকের ভালবাসার মেয়ে! বেশ হবে। শ্রীমান রমেনের বুদ্ধির সঙ্গে অমর চক্কোত্তির বুদ্ধির যোগাযোগ ঘটলে আশ্চর্য ঘটনা হবে। দুর্যোধন শকুনি, রাবণ কালনেমি মামাভাগনে, এ শ্বশুর-জামাইয়ে এমন একটা নতুন কিছু হবে, যা একটা আশ্চর্য ঘটনা!

বেশ—বেশ বলেছে মনোরমা। দিয়ে দাও বিয়ে ওই রমেনের সঙ্গে। অমর চক্কোত্তি সেদিন ওই রমেনের দেওয়া তসরের কাপড় পরে মা চণ্ডীর ওখানে গিয়ে একটা জবা-ফুল মাথায় দিয়ে বলেছিল—মা-গো সেদিন কিল্ মেরেছিলাম—সাড়া দিসনি। আজ জবাফুল চড়ালাম, প্রণাম করলাম, আজ সাড়া দে। না-হলে—।

ঠিক করতে পারেনি, চক্কোত্তি কি করবে! ভাঙবে? কিংবা—দেওয়ালে ঝুলানো খাঁড়া-খানা নিয়ে কোপ মারবে কি, কি করবে! যা হোক একটা কিছু করবে।

পরের দিনই সে গিয়েছিল, বনচাতরা। সীমাকে রমেন দেখেছে। তাকে সাইকেলে চড়ে ইস্কুলে যেতে দেখেছে। ক' বছর আগে, ইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তীতে সীমা এবং শুভেন্দু করেছিল কচ ও দেবযানী—সে অভিনয় দেখেছে। কথাটা পাড়বামাত্র রমেন ঘাড় তুলে চক্কোত্তির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, আমি কাল যাব আপনার বাড়ি, গিয়ে উত্তর দিয়ে আসব। সীমাকে দেখেছি আমি, আর একবার দেখব। কিন্তু কোন কথা কাউকে বলবেন না। তাকেও না। ওর আমি পেণ্ট করা চেহারা দেখেছি, সহজ চেহারা দেখে নিজে ভেবে নিয়ে বলব। আপনার তো দুটি মেয়ে আছে। একটি বেশ সুন্দরী।

—সেটি ছোট। ক্ষমা। সে মেয়ের রূপই আছে। বুয়েচ না, তুমি যা চাও তা নয়। এই ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। বুয়েচ।

—দুটিকেই দেখব আমি। সেই জন্যেই বলছি, কাউকে কিছু বলবেন না। সাজাবেন না। কেমন? একজনকে না-একজনকে হাঁ বললে তো একজনের মনে কষ্ট হবে।

দেখে রমেন সীমাকেই পছন্দ করলে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল চক্কোত্তি। ক্ষমার বিয়ের ভাবনা নেই—ওর পাত্র হয়ে আছে। ছেলেটির বাড়ি বোলপুরের কাছে। সে এম এ পড়ছে শান্তিনিকেতনে। ভাল ছেলে। তার সঙ্গে ক্ষমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে আছে অনেক দিন থেকে। সম্বন্ধ করে গেছে তার মা। ওই চণ্ডীতলাতেই সম্বন্ধ হয়েছিল। ছেলেটির মা এসেছিল চণ্ডীতলায়, চক্কোত্তিদের কুটুম্ব ওরা অনেক দিন থেকে, ওরা চণ্ডীতলায় এসেছে খবর পেয়ে কুটুম্বিতা করবার জন্যই মা গিয়েছেন চণ্ডীতলায়; পরের বেলাটা থেকে যাও আমাদের বাড়ি। সঙ্গে সীমা ক্ষমাকে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের বয়স তখন আট বছর, পাঁচ বছর। সেই সময় ফুটফুটে ক্ষমাকে দেখে ছেলের মা বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল চণ্ডীতলাতেই। চণ্ডীতলার কোন গুরুত্ব চক্কোত্তি মানে না, তবে মা সম্পর্কে তার দুর্বলতা আছে। তা সে অস্বীকার করতে পারে না। বাপ সম্পর্কে সে ভিক্ষেমা-সৈরভীর সংস্পর্শের

কথা অনায়াসে সহাস্যে বলতে পারে। কিন্তু মায়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও সে নিজে বলা দূরের কথা, পরে বললেও সহ্য করতে পারে না। চক্কোত্তির মা এই সেদিনও বেঁচে ছিল। পুত্রবধূর মৃত্যুর পর সে মরেছে। তার মা একটু বোকা-সোকা মানুষ ছিল, সে কথা বললেও চক্কোত্তির সহ্য হয় না, তখন আর এক মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। তিরিশ সালে ইস্কুল ছেড়ে সে আইন অমান্য আন্দোলনে নেমেছিল, তখন তাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে বলাতে চেয়েছিল, আর এ কাজ করব না। কোনও ভয়েই অমর তা বলেনি, শেষ পর্যন্ত বেত মারা হয়েছিল, পুলিসের বেত। কিন্তু তাতেও সে বলেনি। প্রতি বেতের শেষে সে চীৎকার করেছিল, করব। করব। সে তার উঁচু মাথা—সেই তার চোখের দৃষ্টি, বিশৃঙ্খল চুল, সেই চেহারা, যারা দেখেছিল, তারা কেউ ভোলেনি। মায়ের কথায় সেই চক্কোত্তি যেন উঁকি মারে। বোকা বললে বলে—না। কথা বলতেও জান না। কাকে কি বলতে হয় শিখো, বুঝলে! মা আমার দেবী ছিলেন। সাক্ষাৎ দেবী। সংসারে যদি কোন পাপ বা অন্যায় করে থাকেন, তো সে পরের গরুর গোবর কুড়িয়ে নেওয়া। বাস। সেই মায়ের দেওয়া কথা রক্ষার জন্য বটে আর ক্ষমা তার ছোট মেয়ে, দেখতে মিষ্টি চেহারা অনেকটা চক্কোত্তির মায়ের মত, তার বাল্যকালে অনুগতও ছিল একটু, এই জন্যও বটে, ক্ষমাকে তার জীবনের লাভ লোকসানের হিসেবের মধ্যে সে টানতে চায় না। কিন্তু রমেন শক্ত ছেলে; ছেলে আর কেন—বয়স চল্লিশের কাছে, সুতরাং শক্ত মানুষ, ব্যক্তি, চিজ; রমেনের কথায় গররাজী হতে চক্কোত্তি পারেনি। কিন্তু মা চণ্ডী নিজেকে সত্য প্রমাণ করলেন, অমর চক্কোত্তির কাছে, সীমাকেই সে পছন্দ করলে।

অমর চক্কোত্তি কৌশলী ব্যক্তি। পণের কথা পেড়ে পাকা করে নিলে। সীমা বেঁকে বসল। কিন্তু অমর চক্কোত্তি বলে দিলে—এর নড়চড় করতে ভগবানেরও বাবার সাধ্যি নাই। তুই তো সীমা!

একদিন মদ খেয়ে তাকে প্রহারও করলে। তারপর আবার কাঁদলে, ঘটা করে কাঁদলে—নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ফলাও করে বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। এবং সে তার অভিনয় নয়। দুটোই অকৃত্রিম অকপট।

এ যুদ্ধ চলল আট দশ দিন। শেষে হার মানলে সীমা। সে একা আর সকলে এক-দিক। বাবা, মনো-মাসী এমন কি ক্ষমা পর্যন্ত। পাড়া প্রতিবেশীর কাছেও গোপন ছিল না। চক্কোত্তিবাড়ীর কোন কথাই গোপনে হয় না—সবই হয় উচ্চ নাদে। তারাও সকলে বাবার পক্ষে। তারা এক-বাক্যে বললে—এ তো ভাগ্যির বিয়ে, গো। এমন হয় কার! অনেক ভাগ্যি মা, তোমার অনেক ভাগ্যি—এ তুমি লক্ষ্মীর আসনে বসতে যাচ্ছ, তাতে লাথি মেরো না। লাথি মেরো না। এমন তো কখনও দেখি নাই মা!

মনোরমা বললে—আমার কথা তোমার ভাল লাগে না জানি। তবু বলছি সীমা —এতে তোমার ভাল হবে—সুখে থাকবে। দেখ,—। এই আমার দিকে দেখ। আমি এমন ছিলাম না। বিয়ে দিয়েছিল—পাত্র দেখে, ঘর দেখে নি বিষয় দেখে নি—শুধু পাত্র। পাত্র সুপাত্র, ভাল লেখাপড়া—চাকরী ভাল—শ্বশুড় শাশুড়ী নেই—মনে হল এমন বিয়ে কার হয়। পাঁচ বছর যেতে-না-যেতে বিধবা হলাম। নিরাশ্রয়। ভাই—বিদেশে চাকরী করে। সেখানে ছিলাম কিছু দিন কিন্তু সে দাসী বাঁদীর চেয়ে অধম অবস্থা। রাঁধুনী ঝি-এরাও খেতে পায় কাপড় পায় মাইনে পায়। এ শুধু, পেট ভাতা। আর বউয়ের বাক্যবাণ সে অসহ্য। সেখান থেকে চলে এলাম-গাঁয়ের ভিটেতে—ভিক্ষে করে খাব, খেটে খাব। তাও তো অভ্যেস নেই, পারলাম না। একদিন মরতে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। গলায় দড়ি দিতে পারি নি। বিষ গুলে খেতে পারি নি। শেষ নদীতে ঝাঁপ খাব না হয় বর্ষার রাত্রে পথে সাপে কামড়াবে বলে রাত্রে পথে বেরিয়েছিলাম। সেই পথে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা। তোমার বাবাকে লোকে পাষণ্ড বলে। হয় তো সে পাষণ্ডই আজ হয়েছে। কিন্তু সেদিন আমার সঙ্গে পাষণ্ডের ব্যবহার কিছু করে নি। শুধু বলেছিল—আজকের দিনটা তুমি মরা ক্ষান্ত দাও। চল আমার বাড়ি চল। আমার বুড়ো মা আছে তার কাছে থাকবে রাত্রিটা, কালকের সন্ধ্যে পর্যন্ত। তারপর মরতে যদি চাও রাত্রে ঠিক এই ভাবেই বেরিয়ে আসবে। বলেও দিচ্ছি কি ভাবে মরবে। পথে বের হলেই সাপে কামড়ায় না। আমি একরকম নিশাচর, আমাকে দেখ আজও সাপে কামড়ায় নি। নদীর জলে ঝাঁপ দিয়েও মরতে না পার। ট্রেন! ওই চন্দনপুরের ধারে নদীর উপর ব্রিজের মুখে লাইনে মাথা দিয়ো। দেখ—স্বামীর যদি খুদ কুঁড়ো কিছু থাকত—তবে আমাকে এই দুঃখদশায় পড়তে হত না। আজকের দশাকে আমি দুঃখদশা বলি না। তোমরা জান না, লোকে জানে না, জানতেন তোমার ঠাকুমা। পরের দিন ভেবে ভেবে যখন মরবার সাহস ফুরিয়ে গেল—তখন তোমার বাবাকে বললাম—আমাকে একটা কাজ কর্ম দেখে দিন—আমি খেটেখুটে খাব। তোমার বাবা বললেন—কি কাজ করবে? রাঁধুনীগিরি? সেখানেও বিপদ আছে। অনেক বিপদ! তার চেয়ে একটা কথা বলব? আমার ঘরে থাক—আমার মা-মরা মেয়ে দুটোকে মানুষ কর—বুড়ো মায়ের সেবা কর। তোমার ঠাকুমা একদিন আমাদের ডেকে বললেন—বাবা, বিধবা বিয়ে তো হয় শুনেছি। তোরা দুজনে বিয়ে কর। আমার চোখে ছানি পড়ছে—তবু আমি দেখতে পাই তোরা দুজনকে ভালবাসিস। তা আমার কথা শোন। ভাল হবে। ধর্ম খুশী থাকবেন। বিয়ে আমাদের হয়েছে। তোমার ঠাকুমার সামনে—মালা বদল করে বিয়ে হয়েছিল। কথাটা গোপন রাখতে হয়েছে। চণ্ডীতলার সেবাইতগিরির জন্যে—আর তোমাদের বিয়ের জন্যে। অপবাদ মাথায় করে আমি নিয়েছি—ওই সেবাইতগিরি দশ পনের টাকা আয়ের জন্যে। সেও টাকা—সীমা। এ কালে—এ কালে কেন সব কালে—পুরুষের চরিত্রদোষ—চাঁদের কলঙ্ক; রক্ষিতা রাখলে মাপ হয় সব। কিন্তু বিধবা বিবাহ সর্বনাশ! আমার কথা শোন। এতে তোমার ভাল হবে। তুমি তো শক্ত মেয়ে। রমেনের পয়সা আছে বুদ্ধি আছে খাতির আছে—ওর দোষ টোষ তুমি শুধরে নিয়ো!

সীমা এই কথাতেই সেদিন প্রথম টলেছিল। প্রণাম করেছিল মনোরমাকে। মনোরমা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল—আমাদের বিয়ের কথা বলো না সীমা। তা হলে ওই দশ পনেরটা টাকা যাবে। ক্ষমার বিয়ে যেখানে ঠিক হয়ে আছে সেও ভেঙে যাবে।

ক্ষমা এ সব কথা শোনে নি। সে সীমাকে ভয় করত এবং দেখতেও পারত না। সীমা ওকে বলত—বিবি। সে ক্ষমার সাজ-গোজে অনুরাগের জন্য।

ক্ষমা ওকে বলত—মেয়েমদ্দ! ধিঙ্গী।

ক্ষমাও ওর হাত ধরে বলেছিল—কেন কেলেঙ্কারী করছিস দিদি? না—না—না। এ সব তুই করিস নে। বাবার মুখটা হাসাস নে। লোকে যাচ্ছেতাই বলছে তুই শুনিস নি।

সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে ভুরু দুটি তার কুঁচকে উঠেছিল—কি যা তা' বলছে।

—বলছে; চন্দনপুরে তুই বাবুদের ছেলে-দের প্রেমে পড়েছিস। ওখানে পড়তে যাস; বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে রেসিটেশন করেছিস—থিয়েটার করেছিস—সেই সব নিয়ে যা তা বলছে। সেই জন্যে তুই বিয়ে করতে চাচ্ছিস না।

তার রাগও হয়েছিল—হাসিও পেয়েছিল বাবুদের ছেলে—ওই শুভেন্দু? দূর থিয়েটারে সে কচ সেজেছিল—সে সেজেছিল দেবযানী। শুভেন্দু আবৃত্তি ভাল করে এ্যাক্টিং করে, কিন্তু রোগা লিকলিকে—কোল কুঁজো—দূর! তপনের সঙ্গে রেসিটেশন করেছে। সে তো তার থেকে বয়সে ছোট—তাকে দিদি বলে! রাম রাম রাম!

ক্ষমা তার হাত ধরে ফিস ফিস করে প্রশ্ন করেছিল—সত্যি কথা সীমা?

'সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল—ভাগ!

—তবে?

সে উত্তর দেয় নি। উঠে চলে গিয়েছিল। বিকেল বেলা মনোরমা তাকে বলেছিল—কমা একটা কথা বলছিল সীমা—

—সে সব মিছে কথা মাসী। ওটা একেবারে পচা। দিন রাত্রি প্রেমের স্বপন দেখছে। ওর জন্যেই সাবধান হয়ো।

মনোরমা মুখে প্রশ্ন করলে না—মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অর্থাৎ উত্তরটা ঠিক সম্পূর্ণ হয় নি। সীমা হেসে বলেছিল—আমাকে বললে—লোকে বলছে—তুই বাবুদের ছেলেদের প্রেমে পড়েছিস। তারপর হাত ধরে চুপি চুপি বলে—সত্যি কথা সীমা? তা কি বলব? বললাম—ভাগ্। তাতেই মনে হয়েছে ওর সত্যি। তা বল না—কি বলতে পারতাম আর? খুব চীৎকার করে বলা উচিৎ ছিল, না, কোমর বেঁধে রাস্তায় বেরিয়ে চেঁচাতে হত—কোন আবাগী বলে—কোন দেঁটোখাগী ভাতারখাগী বলে কোন ঝাঁটাখাগী পোড়ার মুখী বলে—আমি বাবুদের ছেলেদের প্রেমে পড়েছি? সে হেসে ফেললে।

মনোরমাও হাসলে। বললে—তা হলে একটা কিছু ঠিক করতে হবে তো!

—কি আর হবে? যা চিরকাল হয়। বাপ যখন হাড়কাঠে ফেলে কোপ মারে তখন বাঁচায় কে। গর্দান দিতে হবে!

—না—না। এমন তুমি ভাবছ কেন?

—না মাসী। ভাবছি নে এমন। বাবাকে বলো—তাই হবে, বিয়ে ওকেই করব। প্রেমে ট্রেমে কারুর পড়ি নি আমি। আমার ইচ্ছে ছিল—পাশ করে চাকরী করব। ম্যাট্রিকটা পাশ করলে—ছোট ইস্কুলে একটা মাস্টারি নিতাম—তারপর প্রাইভেটে—আই-এ, বি-এ পাশ করতাম। ওই চাকরী করার ভারী শখ ছিল আমার। জান—ওই দিদিমণিরা ওই সব মেয়ে অফিসাররা—কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আসে—কেমন স্বাধীন জীবন—ওই রকম হবার সাধ ছিল। বাবাও বলত—পাশটা কর, চাকরী করবি। তা বাবার দোষ তো খুব দিতে পারব না। সে তো পড়বার সুযোগ দিয়েছিল। লোক-নিন্দে মানে নি—আমাকে সাইকেল চাপা শিখিয়ে—সাইকেল দিয়েছিল—চলে যা চেপে ইস্কুল' যে যা বলে বলুক। মাস্টারদেরও বলে দিয়েছিল—দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন। আমিই পাশ করতে পারলাম না। আর একবার দিলেও পাশ করব—তাই বা কি করে বলি। তার থেকে ঠিক বলেছ—বিয়েই ভাল। লোকটাকে ভাল আমার লাগে না।

মনোরমা খুশী হয়েছিল। বলেছিল—ভাল হবে তোমার তুমি দেখো।

চক্রোত্তি সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বের হয়, ঘন্টাখানেক চণ্ডীতলায় এদিক ওদিক ঘুরে—সুবিধে মত যাত্রীদের দেওয়া প্রণামীর পয়সা কুড়িয়ে পকেটে পুরে—যাত্রীদের কাছেও দক্ষিণে কিছু আদায় করে রেজেস্ট্রী আপিসে যায়; একটার সময় চণ্ডীতলায় ফিরে প্রসাদ খেয়ে আবার রেজেস্ট্রী আপিসে ফেরে—সন্ধ্যের সময় একেবারে সাহাদের দোকানে কয়েক মাত্রা মদ্য পানান্তে চণ্ডীতলায় নেমে আমদানীর পয়সা—নৈবেদ্যের আতপ মণ্ডা কলা গামছায় বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফেরে। তখন মেজাজের পর্দা হয় সপ্তম—নয় পঞ্চম। তার নীচে নামে না। খুশী অখুশী যে দিকে হোক।

সেদিন ফিরে মনোরমার কাছে—সীমার সম্মতির কথা শুনে—খুশীতে সপ্তমে চড়ে গিয়েও কুলোয় নি—আরও চড়ায় তুলতে চেয়ে ছিল—। মনোরমার কাছে সে নেচেছিল। থিয়েটারের জন্য সে এক দুই তিন, এক দুই তিন সেধে নাচও শিখেছিল।

সীমার কাছে এসে তাকে আশীর্বাদ করে—তার নিজের মায়ের জন্য এবং সীমার মায়ের জন্য কেঁদেছিল প্রথমটায়—তারপর আস্ফালন করে বলেছিল—দেখিস তুই জামাইকে আসছে ইলেকশনে এম এল এ করবই। তারপর—তোর ভাগ্যি আর তার ভাগ্যি—নিদেন একটা ডেপুটি মিনিস্টার। এ আমার প্রতিজ্ঞা।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বক্তৃতা করে দিয়েছিল খানিকটা।

—'শুনে দেব প্রতিজ্ঞা আমার—
সূর্যের উদয় হবে পশ্চিম দিগন্তে
সমুদ্রের বক্ষ জুড়ি মরুভূমি হবে—
আমার প্রতিজ্ঞা তবু হবে না লংঘন।'

এরপর—হুর্রে করে অট্টহাস্য করেছিল।

* * *

এরপর বিয়ের দিন স্থির হয়ে আয়োজন হয়েছে, সীমা কোন কথা বলে নি। তার মনের মধ্যে একটি অতি মৃদু করুণ আক্ষেপ—অতি ক্ষীণ স্বরে বিলাপের মত ধ্বনিত হয় তো হয়েছে—কিন্তু বিয়ের আয়োজনের সানাই কাঁসি ঢোলের আওয়াজের মধ্যে সে বোধ করি নিজেও শুনতে পায় নি—বা—বুঝতেও পারে নি যে, চোখ তার যেন ভিজে-ভিজে। গায়ে হলুদও হয়ে গেল। হলুদ মাখা হল,—রঙ খেলা হল। তখন সীমা যেন কেমন হলে গেল। একটা আশংকা—তার সঙ্গে আনন্দ। সে বিচিত্র অবস্থা। অনেকটা বিহ্বলের মত বিকেল বেলা এসে উপস্থিত হল চন্নপুরের ইস্কুলের বন্ধুরা। চন্নপুরের ইস্কুলের মেয়ে ক'জন—সঙ্গে তাদের একজন শিক্ষয়িত্রী 'আরাধনা দি'। আরাধনা দি—বয়সে হয় তো দু এক বছরের বেশী, ছোটখাটো শ্যামলা মেয়েটিকে কেউ শিক্ষয়িত্রী ভাবতে পারে না, ক্লাস নাইন টেনের মেয়েরা তার থেকে মাথায় বড়। বয়সেও দু জন বেশী। আই-এ ফেল করে আরাধনা ইস্কুলে চাকরী নিয়েছে মাত্র মাস ছয়েক। এর মধ্যে সে 'ছাত্রীদের সঙ্গেই বেশী মিশে গেছে। অন্য শিক্ষয়িত্রীরাও সকলেই অল্পবয়সী—। নসুবালা বলে—সব দুধের মেয়ে গো! এই খানিকটা হাঁপাল! অর্থাৎ তার ধারণা প্রকৃত বয়স থেকে ওদের একটু বেশী বড় দেখায়। ওদের সকলেই কুমারী বলে—এ ধারণা তার হয়েছে। নসুর কথা নসুরই—

সে থাক। আরাধনার সংগে এই সব শিক্ষয়িত্রীর বয়সে পার্থক্য অল্প হলেও ওদের সংগে মেশে একটু সংকোচের সংগে। আরাধনার সংগে গত কয়েক মাসে সীমার ঘনিষ্ঠতা বেশ নিবিড় হয়েছিল। পরীক্ষার আগে মাস দেড়েক সীমা হোস্টেলে ছিল। সিট ছিল না—, তখন আরাধনাই তার সিটের চৌকির সংগে একখানা বেঞ্চি যোগ দিয়ে—সেটাকে ডবল সিট করে নিয়ে সীমাকে জায়গা করে দিয়েছিল। সীমা ওদের নিমন্ত্রণ করিয়েছিল। ওরা দল বেঁধে বিকেলে এসে হাজির হল। তাদের সংগে আরাধনা দি। অন্য দিদিমণিরা কাল সব আসবেন সন্ধ্যে বেলা। আরাধনা বললে—কাল আমি থাকছি না সীমা। আসতে পারব না।

সীমা সপ্রতিভ মেয়ে এবং প্রগলভা ঠিক নয় একটু প্রখরা। সে সেদিন কেমন লজ্জায় কোমল অবনত মুখী হয়ে গিয়েছিল। আরাধনার কথা শুনে সে জিজ্ঞাসা করেছিল—

—কেন? আসতে পারবেন না কেন?

—একটা ইন্টারভ্যু আছে। বর্ধমানে যাব। চাকরীটা ভাল। তাই আজ এলাম শুভেচ্ছা জানাতে! গুডলাক্! তোমার এ সব দুর্ভাবনা ঘুচল!

একটি ক্লাস টেনের মেয়ে—বয়স সবার বেশী, চন্দনপুরেরই মেয়ে—সে বললে—

—হ্যাঁ। গো জন্মে খালাস!

অন্য একজন বললে—হিংসে হচ্ছে না কি?

—তা ভাই হচ্ছে। পাশও করতে পারছি না—বাবাও বিয়ে দিয়ে বিদেয় করতে পারছে না। এ কি—বিচ্ছিরি কাণ্ড বলতো! আমার দাদু বলে—কি জানিস? আমাকে পড়তে শুনলে বলে—এই—এই থাম। ঘ্যান—ঘ্যানর! সেই যে কোন মান্ধাতার আমলে আরম্ভ করেছে—

One morn I met a lame man in a lane close to my farm—

—সে লেন আর পার হল না আজ পর্যন্ত। লেংচে লেংচে লেংচে চলেইছে চলেইছে। বন্ধ কর। যা ভাত রাঁধ গে যা।

সকলে হেসে উঠল।

তারপর গান হল। দুটি বোন কলকাতায় বাড়ি—ভাল গাইতে পারে—তাদেরএকজন গান গাইলে। ফিল্মের গান—

জানতাম তুমি আসবে—তুমি আসবে—
এসে হাসবে, ভালোবাসবে কোনদিন।

মেয়েরা মুচকে মুচকে হাসতে সুরু করেছিল। সীমা মুখ নত করেছিল। চেয়েছিল মাটির দিকে। তারই মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে টপ টপ করে দুটি ফোঁটা জল ঝরে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি জল মুছে সে ফেলেছিল বটে, কিন্তু মনের সেই যে চাপা দেওয়া বেদনা দুঃখ-অতৃপ্তি, যাই তার নাম হোক; আবার বের হতে সুরু করেছিল অন্নদাগারের মত, সে আর নেভে নি। সারা রাত্রি সে জেগে ছিল।

প্রেমে সে কারুর পড়ে নি; না—না—না। তবে যার প্রেমে পড়তে পারে কখনও কোনদিন—সে ওই কলো মুস্কো ওপেন ব্রেস্ট কোট পরা টাকার অহংকারে অহংকারী রমেন আচার্য নয়। তার প্রেম ওই নতুন কালের দিদিমণিত্বের সংগে। ওই যে সেদিন জীপে করে নতুন সোসাল এডুকেশন অফিসার মিস বিশ্বাস এসেছিলেন—ওই অফিসারত্বের সংগে। অফিসারত্ব তার রাজপুত্র। দিদিমণিত্ব তার মন্ত্রী পুত্র। হাসপাতালে নার্সরা আছে—ওটা তার কাছে কোটালপুত্র। কোটালপুত্রকে সে বরণ করবে না। রাজপুত্র দুর্লভ। মন্ত্রীপুত্র খুব দুর্লভ নয়।

তার বাবা ঠাট্টা করে বলে—বলে নয় বলত—পাশ তো কর। তারপর বিয়ে যদি করিস তবে রাজপুত্তুর পারব না—মন্ত্রীপুত্তুর একটা জুটিয়ে দেব। এক এক প্রভিন্সে এখন মন্ত্রী উপমন্ত্রী তিন তিন ডজন।

কিছুতেই মনকে সে শান্ত করতে পারে নি—এই নতুন কালের মেয়েদের এই আশ্চর্য সুন্দর স্বাধীন জীবনের হাতছানি কোন কিছুতেই আড়াল পড়ে নি। শেষ রাত্রে, সে ঘড়ি দেখেছিল টর্চ জেলে। গায়ে হলুদের তত্ত্বে রমেন—নানান জিনিস পাঠিয়েছিল—তার সংগে দামী রিস্ট ওয়াচও ছিল। টর্চটা-ও ছিল। না-ছিল কি? রিস্টওয়াচ থেকে হাইহিল লেডীস্ সু।

তুই বাদ্যের ছেলের প্রেমে পড়েছিস?

রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা গীতবিতান থেকে—কলার বক্স পর্যন্ত। অর্থাৎ গার্ডেন পার্টি টিপার্টি থেকে সাহিত্যসভা—শিল্পসভা পর্যন্ত যাবার সর্ববিধ উপকরণ। সেই ঘড়িতেই সময় দেখেছিল; তখন সাড়ে তিনটে। ক্ষমা পাশে ঘুমিয়ে। সে উঠে, সমস্ত গহনাগুলি খুলে রেখে—নিঃশব্দে দরজা খুলে খালি পায়ে বেরিয়ে পড়েছিল। নীচে নেমে এসে—বাড়ির দরজা খুলে চারিদিক দেখে নিয়ে সোজা পশ্চিম মুখে পথ ধরেছিল। এসে পথে উঠেছিল চণ্ডীতলায়—; নবীনপুর এবং চন্দনপুর দুই গাঁয়ের ব্যবধান দু মাইল দেড় মাইল; এরই ঠিক মাঝখানে চণ্ডীতলা। চণ্ডীতলার সঙ্গে আবাল্য পরিচয় তাদের। সেবাইতের মেয়ে। কোথায় কি আছে, কোথায় কোন নিরাপদ স্থানটি আছে সে তার সুবিদিত। সে লুকিয়েছিল চণ্ডীতলা ঢুকতেই যে শিবমন্দিরটি আছে সেই মন্দিরে। ভয় তার হয় নি। সেবাইত ঘরের মেয়ে—দেবতাদের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; হয় তো বা মূর্তির কতটা পাথরত্ব কতটা দেবত্ব সে তাদের ভাল ভাবে জানা বলেই নাড়তে ছুঁতে—গা ঘেঁষে বসতে ভয় হয় না। তার উপর সীমা হল অমর চক্কোত্তির কন্যা। চল্লিশ সালের পর চক্কোত্তি যখন থেকে দেশ-সেবক থেকে রাজনীতিজ্ঞ হল—তখনই ওর শৈশব। সে দিক থেকে চণ্ডীর পেটে কিল মারা অমর চক্কোত্তি কন্যা সে। সে মন্দিরে ঢুকে মার্কণ্ডেয়ের মত শিবের কাছে গড়িয়ে পড়ে নি—জড়িয়ে ধরে নি—তাকে অবশ্য অপমান করেও কিছু করে নি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুযায়ী দেওয়াল ঘেঁষে বসেছিল। মন্দিরটি পূর্বমুখী, ভোরের আলো দরজার ফাঁক দিয়ে পড়বামাত্র সে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। প্রথমটা পথ ধরেছিল—ইস্কুল হোস্টেলের। খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। না—। ওখানে বাবা আসবে প্রথমেই। দিদিমণিরা যদি—। যদি নয়, নিশ্চয় তাঁরা তার পক্ষ নেবেন না। কারণ অন্য মেয়ের অভিভাবকেরা বিরূপ হবেন। এবং মানে দাঁড়াবে এই যে, দিদিমণিরাই এমন শিক্ষা দিয়েছে। ও ইস্কুলে পড়তে দিলে মেয়েরা বিয়ে করবে না। আরাধনা দি'র চাকরী তো যাবেই।

তা—হলে? সে স্টেশনের পথ ধরেছিল দ্বিধার মধ্যে। ভোর পাঁচটায় ট্রেন আছে একটা। বসবে চড়ে সেই ট্রেনে।

তারপর?

তারপর যা হবার তা হবে।

হবে—? ঘষা চুলে এলো খোঁপা—পরনে কোরা তাঁতের কাপড়—তাতে হলুদের আভাস—বিয়র কনে টিকিটের পয়সা নেই বিনা টিকিটের যাত্রী—এ যে ঘর থেকে পালানো বিয়ের কনে বুঝতে দেরী হবে না এবং পরের স্টেশনে নামিয়ে পাল্টা ট্রেনে চন্দনপুর ফিরে পাঠাবে—, বাবা এসে স্টেশন থেকে ধরে নিয়ে যাবে।

তবে?

তবে—থানা। হ্যাঁ থানা। থানাই সে যাবে। ঘুরেছিল সে—এবং হন হন করে এসে থানার বারান্দায় উঠে সামনে যে সিপাই ছিল—তাকেই বলেছিল—দারোগাবাবু কোথায়?—কে আছে থানায়।

সিপাহী অবাক হয় নি—তবে ভেবেছিল অন্যরকম। না। তাও তো নয়। মেয়েটির কাপড়-চোপড় বেশ ভূষা তো বিপর্যস্ত নয়। সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কোথা বাড়ি? কি হয়েছে?

—দারোগাবাবুকে বলব—তুমি ডেকে দাও তাঁকে।

—এখনও তো ঘুম থেকে ওঠেন নি। বস তুমি?

—বসব কোথায়? মাটিতে? একটা কিছু দাও।

সিপাহীটি এবার তাকে চিনেছিল, এ তো এখানকার ইস্কুলের মেয়ে, একে তো বাইসিক্লে চড়তে দেখেছে। তাই নিয়ে রঙ্গরসিকতাও করেছে নিজেদের মধ্যে। এ তো সেই। সে একখানা মোড়া বের করে দিয়েছিল—তাদের নিজেদের মোড়া। আপিস ঘর তখনও বন্ধ।

সীমা প্রথম মোড়াটায় বসেছিল—তারপর ঢুলতে শুরু করেছিল। কিছুক্ষণ পর থাকতে পারেনি, মোড়া থেকে নেমে বারান্দার উপর শুয়ে পড়েছিল। থানায় এসে নিশ্চিন্ত বোধ করছে। সত্যই নিরাপদ বোধ করছে সে।

ছটা হতে হতে—লোকের চোখে পড়েছিল—থানার বারান্দায় একটি মেয়ে শুয়ে আছে। চুরি করেছে? ধর্ষিতা হয়েছে? কি? কি? কি? সংসারে পাপও যত—পেনাল কোডের ধারাও তত।

ঘন্টা দেড়েক সে গভীর ঘুম ঘুমিয়েছিল। তারপর জেগে উঠেছিল। সামনে খানিকটা দূরে তখন জনতা। সে পিছন ফিরে বসেছিল। চিনতে পারে কেউ এ ইচ্ছে তার ছিল না। সকলকে ঠেলে নসু এসে তার কাছে দাঁড়াল!—এই! হেই মা তুমি—সীমা!

ঘাড় ফিরিয়ে নসুকে দেখে আবার সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

এই সময়েই দারোগাবাবু এসেছিল বেরিয়ে—কি ব্যাপার?

—এই মেয়েটি ভোরবেলা থেকে এসে বসে আছে স্যার।

—আরে? তোমাকে যেন চিনি লাগছে! হ্যাঁ—। তুমি তো—ইস্কুলে পড়।

সীমা একেবারে হুড়হুড় করে বলে ফেলেছিল—আমার নাম সীমা চক্রবর্তী আমার বাবার নাম অমর চক্রবর্তী—নবীনপুর আমাদের বাড়ি। এই ইস্কুলে আমি পড়তাম। এবার ফেল করেছি। বাবা আমায় জোর করে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমি বাড়ি থেকে ভোর রাত্রে পালিয়ে এসেছি; আমাকে রক্ষা করতে হবে। জোর করে বিয়ে দিলে আমি বিষ খাব—নয় তো গলায় দড়ি দোব—নয় তো ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ব। আপনারা দায়ী হবেন।

—হেই মা—হেই মা—হেই মা। দশ হাত পিছিয়ে গিয়েছিল—নসুবালা।

দারোগাবাবু তাকেই ধমক দিয়ে উঠেছিলেন—এ্যাই ও! ঢঙ করতে এসেছে দেখ—সঙ কোথাকার!

চমকে উঠেছিল নসু। সীমাই বলেছিল—আমিই ওকে ডেকেছিলাম—ওকে চিনি। ও রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল।

দারোগা বলেছিল—ওই বুঝি মন্ত্রণাদাতা?

—না! সীমা জবাব দিয়েছিল।

নসুবালা বলেছিল—দেখ দিকি বাপু! বদনাম দেওয়া দেখ দিকি!

—চুপ কর! যা তুই এখান থেকে! যা—।

আঙুল দেখিয়ে দিলে দারোগা।

নসু যাবার জন্যই ফিরল—কিন্তু কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরে এল। এবং দারোগাকে বললে—যেতে তো আমি পারব না দারোগাবাবু। আমি থাকব।

—থাকবি?

—হ্যাঁ মাশায় আমি থাকব। দেখেন—আমি ভাদুর মা—, চির জীবন ভাদুকে নিয়ে কাটালাম। এই কন্যেটি বলছে—জোর করে বিয়ে দিলে—আমি বিষ খাব—গলায় দড়ি দোব—নইলে ট্রেনের চাকায় কাটা পড়ব। তা শুনে আমি কি করে যাব? যেতে আমি পারব না। আপনারা কি বেবস্থা করেন দেখব। সীমেকে শুধোব—মা আর তো মরবে না? সীমে বলবে—না—তবে আমি যাব। তা আপনি রাগই করেন আর রোষই করেন। আমি মাশায় বসলাম! সত্যি সত্যিই বসল নসু।

দারোগা বললে—যাও তো রাইটারবাবুকে ডাক তো। ডাইরীটা লিখে নিন। আর শোন বাপু—কি নাম তোমার গো মেয়ে? সীমা—বললে না? হ্যাঁ সীমা। শোন—ডাইরী মুহুরীবাবু লিখে নিচ্ছেন। তোমার বাবা জোর করে বিয়ে দিলে—খবর পেলে আমরা নিশ্চয় গিয়ে বন্ধ করব। তবে সময়ে খবর পাওয়া চাই। হ্যাঁ। আর আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা তো আমাদের নাই। আছে একটা হাজত ঘর—সেখানে তো চুরি ডাকাতি না করলে ঢোকানো যায় না!

—তা হলে আমি থাকব কোথায়? যাব কোথায়?

—তা তো বলতে পারব না বাপু!

জনতা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল—নসুর এগিয়ে যাওয়া ও চেপে বসবার পর।

তাই আজ এলাম শুভেচ্ছা জানাতে

এই এগিয়ে আসা দলের কে একজন জনতার মধ্যে থেকে বললে—শুভেন্দুর বাড়িতে খবর দেব?

অন্য কে বললে—শুভেন্দুর বাবার মাথা ফেটেছে, এখন তার মাথা ঘামাবার সময় নাই।

—তা হলে তপন?

সীমার কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠেছে। ঝিঁঝিঁ পোকার মত একটা কিছু ডেকে চলেছে কানের দু পাশে। সেই কথা! আর কিছু নেই সংসারে। মেয়ে আর পুরুষ হলেই বাস—সেই এক সম্বন্ধ! এক কথা! কোন কিছুর আকস্মিক দংশনে মানুষ যেমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায় তেমনি ভাবে সে উঠে দাঁড়াল—সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কে বললেন কথা? কে? বলুন এইবার বলুন!

এবার সব চুপ হয়ে গেল। একটি কথার সাড়া উঠল না। তবে চাপা হাসি গুঞ্জন উঠল। কিছু লোক মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে মাথা হেঁট করে। মধ্যে মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সকৌতুক দৃষ্টি বিনিময়ও চলছে। অন্য সকলে অন্য দিকে চেয়ে রয়েছে, তাদের মুখের হাসি গুঞ্জন মুখর নয় শুধু নীরব রেখায় ফুটে উঠেছে। কিছু লোক ভুরু কুঁচকে, তিক্ত দৃষ্টিতে সীমার দিকে চেয়ে আছে। সীমার কথা তাদের আহত করেছে।

নসুও উঠে দাঁড়িয়েছে সীমার সঙ্গে সঙ্গে। সেও সবিস্ময়ে দেখছে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে। সীমা উত্তরের প্রতীক্ষা করছে—ওরা হাসির শব্দে রেখায় বিরক্তিতে উত্তর দিচ্ছে। এরই মধ্যে নসু হাত জোড় করে বললে—কি রকম করণ। ভদ্দ সন্তান সব! এ কি কাজ! একটি কুমারী কন্যে আপনাদের কন্যে! হায় হায় হায়। টুক্‌টুকে পারা ভাল ঘরের ছেলে কেউ এগিয়ে এস—বল—চল আমার ঘরে চল—আঃ লক্ষ্মী পথে চলে যাচ্ছে—কেউ দোর খুলে ডাকে না গো!

সীমা তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল—না। ভাদুর মা তুমি থাম। চুপ কর বলছি। বিয়ে আমি করব না!

অবাক হয়ে গেল নসু—বলে উঠল—হেই মা! ওই কালোমুসকো মুনুসেকে বিয়ে করবে না—ওই যখের ঘরে পা দেব না আলাদা কথা। তাই বলে—।

—না—না—না। মধ্য পথেই বাধা দিল সীমা।—চুপ কর তুমি। তুমি যাও এখান থেকে।

দারোগাবাবুটি চুপ করেই বসে সমস্ত দেখছিল—শুনছিল। বুড়ো লোক্‌ এবং চতুর বলে খ্যাতি আছে। লোকে বলে, একটি নীলা রত্নের তুল্য কতকগুলি রত্নতুল্য ব্যক্তির একটি চক্রবলয় গঠন করে তার মাঝখানে সম্পদ ও শক্তির সৌভাগ্যের মসনদে বসে আছে। রমেন আচার্য সেই নীলা রত্নগুলির অন্যতম বড় একটি রত্ন। সে রমেনের বিয়ের কথা জানে নিমন্ত্রণও আছে, অমর চক্কোত্তির বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় বরযাত্রী যাবার কথা। বিয়ের পর বিশেষ বন্ধু সম্মেলনে নিমন্ত্রণ আছে—সেখানে সেই বোধ করি প্রধান অতিথি হয়ে বসবে। এখন এটা কি হল?

মধ্যে মাঝে মন তার খিঁচড়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হল। গণতন্ত্র হয়েছে! কচু হয়েছে। ইংরেজ আমল হলে—এক ধমকে বা একবার গলা ঝেড়ে রক্তচক্ষে লোকগুলোর দিকে তাকালে সঙ্গে সঙ্গে সব সাফ হয়ে যেত। বিলকুল সাফ। এবং সে নির্ভয়ে মেয়েটাকে হাজতে পুরে খবর পাঠিয়ে দিত অমর চক্কোত্তির কাছে—একজন চৌকীদার ছুটিয়ে দিত বনচাতরায়। কিন্তু এই ইনকিলাবের কাল—আর গণতন্ত্রের রাজত্ব; —সে করতে সাহস হয় না। কিন্তু করবে কি?

মুহুরীবাবু এসে দাঁড়াল। দারোগা রাবণারি সিংহ তাকেই ধমক দিয়ে বললে—কতক্ষণ লাগে তোমার মুখ ধুতে! এই মেয়েটার ডাইরী লিখে নাও। যাও তুমি—বলগে—ওঁকে—কি বলবে? আর শোন—,

ইস্পাত
ভারতের
শিল্পায়ণের
বনিয়াদ
দুর্গাপুর
ইস্পাত কারখানা
আপনাকে দেবে
পুল এবং ইমারত
নির্মাণের জন্য
ইস্পাত,
কৃষিকার্যের
সরঞ্জাম,
রেলওয়ের জন্য
স্লীপার, ফিশপ্লেট
এবং হুইল সেট।
ইস্কন
ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাকশন্ কোং লিঃ
এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

"খবরদার, আমার গায়ে হাত দেবে না!"

—কি?

—যদি আত্মহত্যা করবে বল—তা' হলে তোমাকে এ্যারেস্ট করব আমরা। বুঝে ডাইরী লিখিয়ো।

—বেশ তো! আমি তাই চাচ্ছি! জেলে চলে যাব। তাও আমার ভাল।

—না। তোমাকে পাগলা গারদে পাঠানো উচিত। কিন্তু ওসব কোথাও পাঠাবো না। তোমার বাপকে ডাকব—বলব, এই শুনুন আপনার মেয়ে কি বলছে।

হঠাৎ তিনি ফেটে পড়লেন—ডেঁপো—ইঁচড়ে পক্ক ফাজিল মেয়ে কোথাকার—যেমন ওই চক্কোত্তি বামুনটা—তেমনি তো হবে তার মেয়ে। মাতাল চরিত্রহীন—আবার পলিটিকাল ওয়ার্কার—আজ তেরঙগা ধরে ইনকিলাব করে কাল লালঝাণ্ডা ঘাড়ে করে—পরশু হিন্দু মহাসভার ঝাণ্ডা তুলে নাচে। পেতে হবে না তার ফল?

—আপনি চুপ করুন।

—আপনি চুপ করুন। ভেঙিয়ে উঠল দারোগা—। অনারেবল মেয়ে মন্ত্রী এলেন। হুকুম করছেন।

সীমা এবার লাফিয়ে নেমে পড়ল বারান্দা থেকে—বললে—চললাম আমি। ডাইরীতে আমার দরকার নেই। আপনারা সাক্ষী থাকুন—দারোগা যা বললেন—যে ব্যবহার করলেন আপনারা দেখেছেন শুনেছেন—! আমি যাব সদরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। পুলিস সাহেবের কাছে।

—কনেস্টবল! এ্যারেস্ট হার। পাকড়ো!

ঘুরে দাঁড়াল—সীমা।...কেন? খবরদার আমার গায়ে হাত দেবে না!

—এস তুমি—আমার সঙেগ এস। আমি তোমাকে নিয়ে যাব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

ভবানীকিংকরবাবু। এই গ্রামের এককালের উচ্চ মধ্যবিত্তের সন্তান। এখানকার পুরোনো কংগ্রেস কর্মী—সেই উনিশ শো তিরিশ থেকে।

—বাঃ! ঠিক সময়ে এসেছেন ভদ্রলোক। দারোগা বক্রহাস্যের সঙেগ বললেন—কিন্তু শুনুন ভবানীবাবু—আপনি আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন।

—বেশ তো—তার জন্যে যা হয় করবেন। চল তুমি—।

—দাঁড়ান। আপনার বিরুদ্ধে একটা নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে কেস হয়েছিল।

—সে কেস মিথ্যা। আদালত রায় দিয়েছে!

—কি? ওই মেয়েকে বলছি—। তুমি তার পরও যাবে ওঁর সঙেগ?

—যাব।

হঠাৎ জনতার পিছন দিকে একটি চাঞ্চল্য—ঘটনার প্রবাহকে যেন—বন্যার স্রোতকে যেমন—পাশের কোন বিলের আধারে টেনে নেয়—তেমনি ভাবেই মোড় ফিরিয়ে দিলে। দুটি আধুনিকা মেয়ে চলে আসছে ভিড় ঠেলে।

—দয়া করে একটু সরুন তো! একটু পথ দিন!

সুশ্রী মার্জিতরুচি আজকালকার মেয়ে। এখানকার ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। হেড মিস্ট্রেস আর কমলা।

তারা এসে দাঁড়াল—সীমার পাশে। সীমা মাথা নামালে। সে বুঝতে পারলে না—কি বলতে এসেছেন বড় দিদিমণি—কমলা দিদিমণি।—এ কি করেছ সীমা। আমাদের বদনামের যে শেষ থাকবে না! ছি—ছি—ছি।

না। তা বললেন না। কমলাদিদি বললেন—আমরা এই মাত্র খবর পেলাম।

বড় দিদিমণি বললেন—চল, আমার ওখানে চল। পাগল মেয়ে কোথাকার।

দারোগা বললেন—তা হলে ওকে বুঝিয়ে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। বুঝলেন। ওর বাপকে আমি খবর পাঠাচ্ছি। সে এসে নিয়ে যাবে।

—ও যদি যেতে না চায় তো পাঠাব কেন? কমলা দিদি বললেন। বড়দিদিমণি ভুরু কুঁচকে তাকালেন কমলার দিকে। বড়দিদিমণি কানে খাটো। কমলা খুব কাছে

এসে ওকে বললে কথাগুলি। মুখের দিকে চেয়ে—শুনে—বুঝতে পারেন তিনি।

দারোগা বললেন—একটা কথা মনে রাখবেন—মেয়েটি মাইনর!

—না। ওর বয়স আঠারো পার হয়ে গেছে।

—আপনি কি করে জানলেন?

—আমাদের স্কুলের খাতায় আছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য যে ফর্ম পূরণ করেছে—তাতে আছে। সীমা মাইনর নয়। চল সীমা!

ভবানীবাবু এতক্ষণ চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল—সে বললে—ভালো হল। তুমি তাই যাও। তোমার বাবা আমাকে ভাল চোখে দেখে না। তুমি জান। সে ভাবত, লোকেও ভাবত—আমি শত্রুতা করবার জন্যেই তোমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছি। এই জন্যে অনেকক্ষণ লোকেদের পিছনে দাঁড়িয়ে শুনেছি আর ভেবেছি। এ ভাল হল।

দিদিমণিদের সঙ্গে সীমা—বড়দিদিমণির কোয়ার্টারে এসে উঠল,—পিছনে পিছনে জনতার অংশ।

বারবার ভবানীবাবু বললে—আর কেন সব? কেন পিছনে পিছনে আসছ? যাও। যে যার বাড়ি যাও। কাজে যাও। যাও।

তাতে দু চারজনই খসল। বাকী সব একটু দূরত্ব বাড়িয়ে চলতে লাগল। নসু কিন্তু সঙ্গ ছাড়ে নি। সঙ্গে সঙ্গেই চলছিল। মাত্র দু চার পা পিছনে থেকে। আপন মনেই বলছিল—ভাদুর আমার কালের বা' লেগেছে। হায় হায় হায়।

ভাদু আমার বিয়ে করবে না!—তবে কি করবে ভাদু মা?—না লেকাপড়া শিখে চাকরী করব। হায় হায় হায়। তা চাকরী করে ভাদুর মা দুখিনীকে একখানি কাপড় দিয়ো। পরে নাচব আর তোমার মহিমে গাইব। ও মন রসনা আমার।

(তিন)

সন্ধ্যার সময় সেই গানই জুড়েছিল নসুবালা আর গুন-গুন করছিল। সীমার সঙ্গেই তার একটা বেলা কেটেছে। ভিক্ষেই আজ করা হয় নি। তা না-হোক। ভবানীবাবুর বাড়িতে আধ সের চাল পেয়েছে। তার মা দিয়েছেন। মেয়েদের বোর্ডিং আর ভবানীশংকরদের বাড়ি লাগালাগি—এক দেওয়াল। ভবানীবাবুদেরই ন' আনার শরীকদের দালান সমেত বাস্তুবাড়ি কিনে মেয়েদের বোর্ডিং হয়েছে। সে শরীকরা এখন ফকির। ভবানীবাবুর মা—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ঠাকরুণ। দুর্গা মা। দয়ার আর পারাপার নাই। ওঁর কাছে গেলেই পেটটা ভরবে। আধ সের চাল। সেই চাল ক'টি নিয়েই বাড়ি এসে ফুটিয়েছে, স্নান করে—ভাদুকে মুখ মুছিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে—খানকয়েক বাতাসার ভোগ দিয়ে—খেয়ে নিয়ে বসে বসে শুধু ভেবেছে। সীমার কথাগুলি মনের মধ্যে ঘুর-ঘুর করেছে—ফুলন্ত গাছের চারিপাশে উড়ন্ত মৌমাছির মত—প্রজাপতির মত! হায় হায়—ভাদুর আমার ভাবনা শোন দিকি! সাধ শোন দিকি!

আগের কালে লোকে বলত—লক্ষ্মী হও মা। লক্ষ্মী হও!

ভাদু বলছে—না বাবা, লক্ষ্মী নয়—বল সরস্বতী হও মা, সরস্বতী হও!

ভাদু বলে—লক্ষ্মী আমি হব না কে—
উটি বলো না—
খাটিতে নারিব আমি—ও মন রসনা আমার—
নারায়ণের তিলশুনা!

সেই লক্ষ্মীর কথায় আছে—এক গরিব ব্রাহ্মণের ক্ষেতের দুটি তিলফুল তুলে দুটি কানে পরেছিলেন বলে—নারায়ণের হুকুমে এক বছর লক্ষ্মীকে বামুনের ঘরে দাসীবৃত্তি করে 'তিলশুনো' খাটতে হয়েছিল। তা বটে—বাপের ঘরে—কন্যে লক্ষ্মী—হাত নুড়কো—নামে ছোটখাটো ফাইফরমাশের ছোট ঝি। শ্বশুর ঘর যাবার সময় বাপকে চারটি ধান দিয়ে চারটি ধান নিয়ে যায়। সেখানে ওই তিলশুনো খাটা লক্ষ্মী। তার চেয়ে সরস্বতী ভাল।

নতুন কালের ভাদু আমার
নাম হয়েছে সীমে।
মহিমে তার ঢাকে ঢোলে—ও মন
রসনা আমার তারও সঙ্গে শিঙে।

মধ্যে মধ্যে ছুটে ছুটে গিয়েছে বেয়াই-সন্ধানে।

—বেয়াই, বলি ফিরেছ?

বেয়াই ফেরে নি, ঘরের তালাটা ঝুলছে; ফিরে এসেছে।

কখনও খানিকটা এসে সেখান থেকেই হেঁকেছে—বে-য়াই-হে!

সাড়া না-পেয়ে ফিরে গেছে। বেয়াই আজ খুব বিকিকিনি পেয়েছে তা হলে। সেটেল-মেন্টের ক্যাম্প আজ ওই আকুটির বাবুরা এয়েছে। আরও এয়েছে ওই দিককার লোক। আকুটির বাবুরা পুরনো বাড়ি। আর লক্ষ্মীকে ওরা বেশ শক্ত টানে বেঁধে-ছেঁদে রেখেছিল। এবারে গেলেন মা, রাজ আজ্ঞেতে যেতে হল। ঠেকাবে কে? তারা সব এসেছিল, সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে। যতটা রাখা যায় মা লক্ষ্মীর পেসাদ! সেইখানেই জমেছে বেয়াই আজ, ফেরবার নাম নাই।

বেয়াই বলে ভাল। বলে, জান—তোমার ওই সব ভাল লাগে—আমার এই সব। খানিক খানিক বুঝি তো। তা বেয়ান, তোমার পাগলের সে গান—সেরা গান। বুয়েচ!—

যে গড়েছে সেই ভাঙে ভাই—
যে ভাঙে সেই গড়ে—
বিধেতা পাগল বুড়ো—
ও মন রসনা—খেলায় বালুচরে!
ব্রজধাম সে রচেছিল—কই সে ব্রজ হায়—
বুড়োই ভেঙেছে ব্রজ
ও মন রসনা—তবু বংশী থামে নাই।

বুয়েচ, এও তাই। বিধেতা হুকুম করলেন সেই হুকুম—সায়েবরা গেল; রাজলক্ষ্মী এলেন, গান্ধী রাজার শিষ্যসেবকদের কাছে; বিলিতি বস্ত্র ছাড়লেন—খদ্দর পরলেন—শঙ্খ পরলেন পাটে বসলেন।

রাজলক্ষ্মী হুকুম করলেন—রাজা-রাজড়ার বাবু জমিদারের বাড়ির লক্ষ্মীকে নোটিস হল—সব এস—এসে আমার সঙ্গে মিশে যাও।

ফটিক দাসের কাছে রসের আড়ংই ওই-খানে। ফটিক বলে—আমি বেয়ান বন-মৌমাছি—বাগানের ফুলে ঘুরি না। ফসলের ক্ষেতে ঘুরি! মত রস ধানেরই ভিতর, বুয়েচ বেয়ান। ধান কোথা হয়? না—জমিতে। ধান কি করে? চাল করে সিদ্ধ করে ভাত বানিয়ে খায়। আর কি হয়? বেচলে টাকা হয়। তা হলে কি হল? রসের গোড়া হল জমি—আগা হল টাকা।

বেয়ান হে, মা গঙ্গার স্তব তো তোমাকে পড়ে শুনিয়েছি।

—হ্যাঁ হে হ্যাঁ। বন্দ্য মাতা সুরধুনি—পুরাণে মহিমা শুনি—পতিত পাবন নারায়ণী—

—হ্যাঁ। মা গঙ্গা ছিলেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, পিথিমীতে নেমে পাহাড় বন দেশ ঘাট ভাসালেন—মানুষের জীবন উদ্ধার হল—কিন্তু গেলেন কোথা—না গঙ্গাসাগর।

—বটে বেয়াই বটে। বলছ ভাল। হাকিমকেও বলতে হবে ভাল।

—হ্যাঁ, মা গঙ্গার আদি হল ব্রহ্মার কমণ্ডলু, অন্ত হল গঙ্গাসাগর, চান করলে সব কামনা সিদ্ধ হয়। জমি ব্রহ্মার ঘর—টাকা গঙ্গাসাগর। আমি সার বুঝেছি—খাটি বুঝেছি। আমার ঘর হল না টাকা নাই বলে। জমি থাকলে টাকা হত। শেষ কথা বুঝে নিয়েছি। তোমার রঙের কথা—তোমাকে ভাল—তোমার ভাদুকে ভাল। ও সব দুজন একজন। তাই বুয়েচ—আমি মজা পাই ওই সবে। বসে পুতুল বেচি আর দেখি। হরি হে, তুমি সত্যি হলে, তুমি কখনও জমি কখনও টাকা। তা না হলে ব্রজধামের রাখালি ছেড়ে মথুরা পালাতে না। রাধাকে ছেড়ে কুঁজিতে মজতে না। শেষ কথা। সার কথা।

নসুবালা হাসে। কি বলছে বেয়াই। হায় হায়, দু-দুটো বষ্টুমী আনলে—দুটোই পালাল। বেয়াই বলে—টাকা জমি থাকলে পালাত না। তা আধা সত্যি বটে। কিন্তু! না-না-না। তাই হয়! তুমি জান না বেয়াই শেষ কথা তুমি জান না। শেষ কথাটি সে জানে।

সংসারে শেষ কথা জানা ভারী শক্ত। কিন্তু শেষ কথাটি না জানলে তো মানুষের ঘুম হয় না। নানান জনে নানান কথা শেষ-কথা ধ'রে নিয়ে শান্তি পায় স্বস্তি পায়। সংসারের শেষ কথাটি বুঝেছে বিশ্বাস করে আনন্দে গান গায়। কেউ গান গায় সুরে স্বরে কেউ মনে মনে।

সন্ধ্যাবেলা—সুরে স্বরে গান গাইতে গাইতে ফিরল—ফটিক দাস। সে ইচ্ছে করেই উচ্চকণ্ঠে গাইতে গাইতে ফিরল।

ফালের ফুটোয় কাছি পরাও—
দিনের আলোয় আলোয়—
ফাল কাছিতে জমি সেলাই—
ও মন রসনা—সারো ভালোয় ভালোয়।

তালা খুলে আলো জেনলে বসতে বসতে তার সাড়া পেয়ে ছুটে এল নসুবালা।—বাবাঃ কি বেসাত করলে বেয়াই। কত টাকার বেচলে?

—বিলকুল বেবাক ফাঁক। সব বেচেছি। আড়তির বাবুরা আরও বরাত দিয়েছে।

—অনেক পয়সা নয়?

—ফাল কাছিতে জমি সেলাই করে জমি-দারী শালের দোসর দোলাই তৈরী করছে। পয়সা থাকবে না? বলিহারির বুদ্ধি। বসে শুনেছি আর গান বেঁধেছি। দাঁড়াও আগে মাটিটা দেখি—ভিজিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। ওঃ চাষীদের পয়সা কত, শখ কত হে! একটা দুটো বেরাকেট ফি জনার চাই। বরাত মেলাই।

আমি আশ্চর্য্য দেখে এলাম। ফিরেছি কখন! তিনবার ফিরে গিয়েছি। শোন—আমার নতুন ভাদু—সাঁমেরানীর গান শোন।

—আমারটা আগে শোন বেয়ান। আমারটা। ফাল দিয়ে জমি সেলাই!

—উহু আমারটা আগে!

—দাঁড়াও তো, দাঁড়াও তো!

—ক্যানে—। ওই দেখ—ক্যা-নো—ক্যানো!

—ব্যাণ্ডের বাজনা বাজছে!

—ব্যাণ্ডের বাজনা?

—শোন!

—হু! দাঁড়াও দাঁড়াও। দেখি দাঁড়াও। দীঘির পাড়ে উঠে দেখি। নবীনপুরের শড়ক ফটফটে করে দেখা যায়।

—দেখতে হবে না। রমেন আচায্যি বিয়ে করতে আসছে।

—হা হা হা। হেসে গড়িয়ে পড়ল নসু।

—হাসছ?

—শোন গান শোন আমার—।

সে শুরু করল তার গান। ফটিক মাটি ঠাসতে শুরু করল। নসু গাইতে গাইতেই বললে—না মাইরি, তুমি যেন কি? বেয়াই!

—ক্যা-নো?

—এয়েছ, চা খেলে না; আমি বেয়ান—চা দিলে না। মাটি ঠাসতে বসলে!

—মাটি না ঠাসলে কালকের ডালা ফাঁক। রেতে গড়ে—আগুনে সেঁকে শুকুতে হবে। সকালে রঙ। পেট ভরাত তো রাজ-ফুর্তি। পয়সা নইলে পেট ভরে না! নাও—চা কর। আমি ওখানে খেয়েছি তো। বাবুরা খাইয়েছে। লাও—লাও। এই একটা সিগরেট লাও। এও বাবুদের।

—দাও। রেখে দি। চা খেয়ে খাব।

—আহা, ভাদু আমার চাকরি করবে উনোনশালে যাবে না।

—ওরে, তোদের দেশলাই আছে?

ভারী গলার আওয়াজে দুজনেই চমকে উঠল।

দুজন লোক—সেই কালিপড়া লণ্ঠনটির স্বল্প আলোয় আলোকিত অন্ধকারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ও রে—দেশলাই আছে?

—কে? কে বট? চমকে উঠল নসু!

—আমি রে! যোগপুরের ডাক্তারবাবু!

যোগপুরের ডাক্তারবাবু—ধ্রুব ডাক্তার! বাপরে! লোকে বলে এখানকার বিধান রায়! ফটিক দাস এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করলে—প্রণাম ডাক্তারবাবু!

—হেই মা গো! সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি গো!

—ও বাবা। নসু এগিয়ে হেসে দাঁড়িয়ে বললে—আমাকে চিনতে পারছ তো। আমি ভাদুর মা! কোথা এয়েছিলেন—কার কি হল?

—জোরে বল—আমি শুনতে পাই না। কানে কালা। এঁটে-এঁটে বল। বদ্ধ কালা আমি।

—আমি ভাদুর-মা, চিনেছ আমাকে?

—চিনেছি। দে দেখি দেশলাই না হয় আগুন। আলোটা জেবলেনি। রাস্তায় দপ করে নিভে গেল!

কালিপড়া হ্যারিকেন এবং দেশলাই—দুই আনলে ফটিক। আলো পড়ল ডাক্তারের উপর।

শক্ত কাঠামো কালো রঙের মানুষটিকে বড় তো বড়—ছোট ডাক্তার বলেও চিনবার উপায় নেই। পায়ে জুতো একজোড়া আছে কিন্তু সে জুতো কাদায় ধুলোয় বিবর্ণ শ্রীহীন। শুধু সোলখানা পুরু এটা বোঝা যায়। পরনে মোটা কাপড়, গায়ে গেঞ্জি—জামা একটা, কোট কাঁধে ফেলা, মাথায় এক-খানা চাদর বাঁধা। মুখে একজোড়া ভারী গোঁফ, মাথার চুলের ডগাগুলি চাদরের পাগড়ীর প্রান্ত থেকে বেরিয়ে কপালের উপর পড়েছে। শুবে ডাক্তারকে দেখেছে সকলে, মাথার চুল তার পাতলা এবং সেগুলি অবিন্যস্তই থাকে। পিছনে ডাক্তারের অনুচর একজন, তার হাতে কলব্যাগ।

ডাক্তার আলোটা জ্বালবার উদ্যোগ করছে—এমন সময় পিছনে থেকে অন্ধকার থেকে কে ডাকলে—ধ্রুবদা!
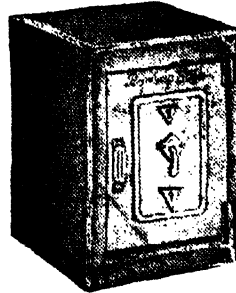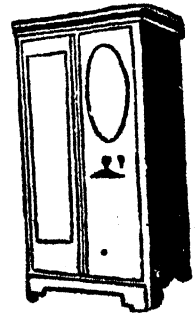
ডাক্তার শুনতে পেলে না, সংগের লোকটি উত্তর দিলে—এইখানে—।

ফটিকদাস সংগে সংগে বললে চীৎকার করে—আমি ফটিক, ডাক্তারবাবু আমার বাড়ীতে।

ডাক্তার মুখ তুলে প্রশ্ন করে তাকালে। সংগের লোকটি ঝুঁকে উঁচু গলায় বললে—ভবানীবাবু! বলতে বলতে টর্চের আলো এসে পড়ল উঠানে।

ভবানীকিঙ্কর এসে দাঁড়াল।—এই নাও, দেশলাইটা রাখ। কিনে আনলাম। পথে ও লণ্ঠন আবার নিভবে।

—দাও। ডাক্তার পকেটে পুরলে দেশলাইটা।

নসু জিজ্ঞাসা করলে—দাদাবাবু—কাকে দেখতে আইছিলেন।

—গোপাল চৌধুরীকে রে! মাথা ফেটেছে!

—মাথা ফেটেছে—তা কেমন মাথা ফাটা? বড় ডাক্তারবাবুকে—।

—একটু বেশী বটে। শিরা ছিড়েছে—রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।

শুনতে পেয়েছিল ধ্রুব ডাক্তার। মুখ দেখে বোধ হয়। বললে—বেঁচে যাবে। তবে আর কাজকর্ম করতে পারবে না। হ্যাঁ। বেঁচে যাবে! চল! বরযাত্রীরা পৌঁছুল বোধ হয়। রমেনের বাবা ভুবনের সংগে আবার ছেলে-বেলায় এক সংগে পড়েছিলাম। রমেনকে একবার টাইফয়েড থেকে বাঁচিয়েছি।

কথাগুলি বললে সে ভবানীকে।

ভবানী বললে—তা হ'লে এইটুকু রাস্তা টর্চেই চলে যেতে।

—তা যেতাম। অন্ধকারেও যেতে পারি। যাই তো। তা সেদিন একটা খালে পা পড়েছিল। বয়স হ'ল তো, আলো এবার চাই। রাত্রেই আবার বাড়ীও ফিরব—। সকালে রোগী আসবে। তা তুমি যাবে না? রমেন তো তোমার চ্যালা গো। থানা কংগ্রেসের মেম্বর, তুমি প্রেসিডেণ্ট! নেমন্তন্ন করে নাই?

—করেছে। তবে এই ব্যাপার, মানে, আসল কনে তো এখানে পালিয়ে এসেছে। মিস্ট্রেসরা সাহস ক'রে এগিয়ে এল—তাই—নইলে তো আমিই নিয়ে যাচ্ছিলাম আমার বাড়ী! এখন ছোট মেয়ের সংগে বিয়ে হচ্ছে। তা খবর তো গোপন থাকবে না। আমিও গোপন করিনি। রমেন কিছু বলুক না বলুক—অমর চক্রোত্তিকে তো জানেন। আর রমেন নামে মেম্বর, সুবিধের জন্যে মেম্বর। নইলে এখানকার যে দল আমার বিরুদ্ধে তাদের সংগে কারবার। আমি যাব না তুমি যাও।

বলতে বলতেই তারা ফটিকদাসের উঠোন থেকে রাস্তায় নেমে এল। পথে উঠে ডাক্তার বললে—চললাম রে ভাদুর মা! ফটিকচন্দ্র হে—চললাম!

ফটিক বললে—পেনাম ডাক্তারবাবু!

নসু বললে—একটা নয় ধন্বন্তরী—একশো পেনাম। রোগে ধরলে মরণে ধরলে সে তুফানে মা চণ্ডী কাণ্ডারী তুমি তার হাতের হাল বৈঠে! বাবারে!

ফটিক বললে—শুনতে পেলে না।

—না পাক! আমি তো বলেছি যা বলবার! ভগবান তো আরও কালা। তার ওপর কানে তুলো গোঁজা। তবু তো বিশ্ব-বেহ্মাণ্ড কত ইনিয়ে বিনিয়ে বলেই চলেছে।

—কিন্তুক—শুনলে তো—! রমেন্দোর বিয়ের কথা!

—শুনলাম বৈকি! ছোট মেয়ে ক্ষমার সংগে বিয়ে হচ্ছে। বেয়ান হে—যত রস ধানের ভিতর হে ধানেরই ভিতর! রমেন্দোর ধান আছে—জমি আছে—টাকা আছে। কনে পালালে বিয়ে আটকায়? তুমি নাচহ—

"হায় রমেন্দোর বিয়ে হ'ল না—
নতুন কালের বা' এসেছে ও মন রসনা—
ভাদুরা বিয়ে করবে না—কেউ তা
ব'ল' না।

—উঁহু! উঁহু!

—উঁহুঁ, কিসের উঁহুঁ!

—শোনবা? না-না-না শুনিবেন?

—শুনিব।

নসুবালা গান ধরলে

ও হায় নাকের বদলে নরুণ,
ফুলের বদলে রাঙা বিলিতী বেগুন
সীমার বদলে ক্ষমা—ও মন রসনা আমার
তাকদুমাদুম!
তাই ঘুনাঘুন—তাই ঘুনাঘুন—চরণে
নুপুর বাজে তাই ঘুনাঘুন!

ফটিক না-না জানিয়ে নীরবে ঘাড় নাড়ে আর হাসে। মাঝে মাঝে গানের ফাঁকের মধ্যে বলে—

—বিলিতী বেগুনে অনেক গুণ; পোস্টাই! রমেন্দোর ভাল হবে।

এরই মধ্যে আবার কার ভরা গলার সাড়া এল,—ফটিক চন্দ্র! নসুবালা!

জিভ কেটে থেমে গেল নসুবালা। ফটিক ব্যস্ত হয়ে সসম্ভ্রমে জবাব দিলে—দে-মশায়?

হ্যাঁ হে। রাত্রি বেশ হয়েছে বাবা! এইবার ঘুমাও। আমরাও ঘুমুই। কি বল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই থামলাম আমরা দে মশায়।

—বেশ-বেশ! আমার যে কানের কাছে কি না!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা বুঝতে পারি নাই এত রাত্তির হয়েছে।

—হ্যাঁ। জমেছিল! আমারও ভাল লাগছিল। তা ঘুমের তো দরকার আছে!

ফটিকের বাড়ীর হাত চল্লিশেক তফাতে বড় রাস্তাটার একটা তেমাথায় দে মশায়ের নতুন পাকা বাড়ী। সেই বাড়ীর বারান্দা থেকে কথা বলছে দে মশায়। দে—শিবনাথ দে এখন চন্ননপুরের প্রধান

ব্যবসায়ী—লোকে বলে ধনীও বটে। মস্ত পদী—

রাইস মিলের মালিক। আশ্চর্য অনুত্তেজিত ধীর মানুষ। নিতান্ত সামান্য অবস্থা থেকে আজ বিরাট সম্পদের অধিকারী। জীবনটা শুধু হিসেবের জীবন। জাতিতে গন্ধ বণিক; বাল্যজীবনে নিদারুণ দুঃখ কষ্ট নির্যাতন সহ্য করেছে দে। বাপ ছিল সেকালের দুর্ধর্ষ মানুষ, উচ্ছৃঙ্খল জীবন। দেনায় আকণ্ঠ ডুবে বিষয় সম্পত্তি বিক্রী করেছিল। শিবনাথ ছিল অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে। চোদ্দ পনের বছর থেকে পড়েছে, বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মহাজনের সঙ্গে মামলা লড়েছে, কিছু কিছু উপার্জনও করেছে। প্রাইভেটে নীচের ক্লাসের ছাত্র পড়িয়েছে। টুকিটাকি ব্যবসা করেছে। মেলায় মেলায় ফিরেছে। জমিদার মহাজনের বাড়ী এসে দীনভাবে আবেদন করেছে, মহাজনের নালিশের ক্ষেত্রে তার পক্ষে সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য। এরই মধ্যে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। বাড়ীতে আইন পড়েছিল ওই মহাজনের সঙ্গে মামলার জন্য। তারপর পেয়েছিল চন্দনপুরের লক্ষপতিদের বাড়ী। নায়েব হয়েছিল। তারপর সুরু করেছিল ব্যবসায়। সে ব্যবসায়ে তার সমৃদ্ধি হয়েছে ধুলো থেকে সোনার মত। কিন্তু সে কোন যাদুমন্ত্রে নয়—এ বিশ্বাস করে লোকে—ধুলো সোনা হয়েছে দে মশায়ের বুদ্ধির এবং হিসাবের অতিসূক্ষ্ম ভাগমাপের রাসায়নিক ক্রিয়ায়। গ্রামের জমিদার পিছনে লেগেছে, ইউনিয়ন বোর্ড লেগেছে, ব্যবসায়ী পিছনে লেগেছে—পুলিস লেগেছে কিন্তু এই অনুত্তেজিত স্নায়ু শান্ত মানুষটি তার হিসেবের মাপ করা অকম্পিত পদক্ষেপে বলতে গেলে সোজা চড়াই ভেঙে উঠে এসেছে বিষয় সম্পত্তি ও সম্পদের পাহাড়ের মাথায়। মাটিতে পা কাঁপেনি—উপরে আকাশের দুর্যোগে মাথা টলেনি। লম্বা মানুষ, মোটা হাড়ে শক্ত কাঠামো মেদ বর্জিত শরীর; কথা বলতে গেলে কখনও মুখের উপর কথার ভাবের ছাপ পড়ে না। ঠাণ্ডা হিমের মত লোকটি। যেখানে ঢুকব মনে করে সেখানে ঢুকে যায়—কখনও সোজা পথে —কখনও বাঁকা পথে এবং সে পথে ছুঁৎ-পবিত্রের বিচার সে করে না। যে যতই দরবার করুক—ফৌজদারি দেওয়ানি আদালতে দে তার দিকের ন্যায় এবং আইন-সম্মতত্তা প্রমাণ করে বেরিয়ে আসে, কিন্তু মুখে কোন উল্লাসের চিহ্ন দেখতে পায় না।

জীবনে দে হল দাবা খেলোয়াড়; পাশা খেলোয়াড় নয়—যারা আড়ি মারতে কচে-বারো হেঁকে কচে বারো দান ফেলে—ছাদ ফাটানো চীৎকার করে ওঠে, পাড়া চমকে দেয়। দে—প্রতিপক্ষের মন্ত্রী মারবার সময় নিঃশব্দে সেটিকে তুলে নিয়ে নিজের বলটি বসিয়ে দেয়। শেষ কিস্তি দিয়ে মৃদু-স্বরে 'মাৎ' শব্দটি উচ্চারণ করে—ফের বল সাজাতে বসে নতুন দানের।

সকালে উঠে মিলে যায় দে, দুপুরে ফিরে এসে খায়, ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করে, আবার চারটেতে মিলে গিয়ে বসে—ফিরে আসে রাত্রি দশটায়। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে।

দে গ্রামের ভিতরের বাড়ি ভাই-ভাইপোকে দিয়ে—গ্রামে পূর্ব দিকে ব্রাত্যদের পাড়া ঘেঁসে বাড়ি করেছে, এখান থেকে আরও খানিকটা পূবে তার মিল। তার মিলের কাছেই সরকারী পাকারাস্তার ওপাশে—চণ্ডীতলা।

কেউ কেউ বলে—চন্দনপুরের একটা নতুন কাল এসেছিল—পঞ্চাশ বছর কি ষাট বছর আগে স্বর্গীয় মাধববাবুর আবির্ভাবে; তিনি গ্রামের পশ্চিম দিকের পড়ো প্রান্তর কিনেছিলেন বা তাঁকে কেউ গছিয়েছিল—তাঁর জমির ক্ষুধা দেখে; সে যাই হোক পশ্চিম দিকটায় কৃষ্ণসায়র থেকে মাইল-খানেক পাকাসড়কের দুই পাশে ইস্কুল হাসপাতাল রেজেস্ট্রী আপিসকে কেন্দ্র করে বেড়েই গেছে—; এখনও সরকারী বাড়ি ঘর-দোরের বাড়ার ঝোঁক পশ্চিম দিকে। এবার নতুনকাল এসেছে নিজে; কারও পিছন পিছন আসে নি,—কালের পিছনে পিছনে যারা এসেছে তাদের মধ্যে দে মশায় একজন প্রধান। অন্তত এ কালের লক্ষ্মী যাদের আশ্রয় করেছেন—তাদের মধ্যে দে সর্ব প্রধান। দে পশ্চিম দিক থেকে গ্রামের মুখটা ফিরাতে চেয়েছেন পূর্ব মুখে। এ দিকটায় ছিল দরিদ্র এবং ব্রাত্য যারা, একাধারে তাদের পাড়া। তাই মধ্যে মধ্যে রাত্রি এক প্রহরের পর—দে মশায় ডেকে বলে —ওহে বাপুরা এবার ক্ষান্ত দাও। ফটিক নসুকে একটু স্নেহের সঙ্গে রসিকতা করেই বলে—ফটিকচন্দ্র হে—নসুবালা-ভাদুজননী। এইবার—একবার—!

নসুবালাদের পালা এক প্রহরের আগেই সাধারণত শেষ হয়। কোন কোন দিন তারা

আশ্বাস — আলোকচিত্র ঃ শ্রীকনক দত্ত

এমনই মত্ত হয়ে পড়ে বিধাতা বুড়োর ভাঙা-গড়ার খেলায় রঙ্গরস দেখে যে—খেয়াল থাকে না—কখন উড়ো জাহাজের মেঘের ডাকের মত ডাক গুরু গুরু গুরু গুরু শব্দের একটানা ডাক ডেকে বেরিয়ে চলে গেল। আকাশের দিকে চাইলে দেখা যায় চলন্ত নক্ষত্র যেন চলে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। রোজ নিত্য নিয়মিত। উত্তর-বঙ্গের প্লেন সার্ভিসের পথ—চন্নপুরের মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে। প্লেন যায় কলকাতা দমদম। প্লেনখানিও পার হয়, ওদিকে আশে পাশে শিয়ালেরাও ডাক শুরু করে। ওদিকে ইস্টিশানে গাড়ি ছাড়ে—পুঁ শব্দে সিটি দিয়ে। কিন্তু এ ট্রেন প্রায় লেট থাকে। তাই প্লেন সার্ভিস হওয়ার পর থেকে ট্রেনের সিটির দিকে মানুষের কান বা মন থাকে না। মন থাকে প্লেনের শব্দের দিকে।

নসু উঠল। আর নয়—প্রহর কখন পার হয়েছে। দে ঘর এসেছে, খেয়েছে এবার শোবে। দেরী হয়ে গিয়েছে। তার আর দোষ কোথায়? চন্নপুরে দশখানা গাঁয়ের ঢেউ এসে মরে, প্রতিদিনই কিছু না কিছু ঘটে থাকে,—মারামারি কথা কাটাকাটি, গান-বাজনা, রঙ্গরস, কোনদিন মিছিল—কোনদিন মিটিং হয়েই থাকে। সাতচল্লিশের পর থেকে এসব—ঘরোয়া ব্যাপার। বিয়ের দিন থাকলে বিয়েও হয়। কিন্তু আজকের কাণ্ড সচরাচর ঘটে না। বিয়ের কনে পালিয়ে এসে থানায় হাজির! বিয়ে করবে না পড়বে।

আর গোপাল চৌধুরী নিজে হাতে চেলা-কাঠ মাথায় মেরে এমন করে ফাটালে—যে তার রক্ত বন্ধ হয় না। ওদিকে রমেন্দ্র আচার্য বুড়ো বয়সে—ক্ষমাকে বিয়ে করতে এসেছে ব্যান্ড বাজিয়ে।

দোষ কি নসুবালার—দোষ কি ফটিক দাসের।

—চললাম বেয়াই চললাম। মা ভাদুমণি রাসমোহনের সঙ্গে ঝগড়া করো না। ঘর খুলে পালিয়ে গিয়ে ইস্কুলে উঠো না। নসুবালা এসে উঠল—নিজের বাড়ি। ঘরের উঠানে এসে দাঁড়াল। কে কাতরাচ্ছে—কাঁদছে!

—কে বটে? কে? সাবি—না—কে লো? সাবি?

আওয়াজ এল—আমি লই, দাদা!

—নিমেই?

—হ্যাঁ—বাতটো বেড়েছে।

—হে ভগবান! বলে নসুবালা ঘরে গিয়ে শুলে।

ওঃ! কি প্রহার! সাবিত্রী শংকরী তরলা ফুরি—উরি—ওই এক বংশ! এ অঞ্চলে বাবুভাইয়ের আমলে খেলু খেলেছে। ওঃ রাত দুপুরে তখন এ কান্না কাতুরানি শোনা যেত না—শোনা যেত হাসি খিল—খিলু—খিলু! সঙ্গে সঙ্গে—ছোটার শব্দ আর কাচের চুড়ির রিনিঠিনি রিনি-ঠিনি শব্দ!—আরও রাত্রে ভারী পায়ের শব্দ শোনা যেত। আসত শশী—অভিলাষ গোর শাবুলা—গোপলারা। ফিরত চুরি করে। ধান চুরি করে সামাল-দারের ঘরে মাল ফেলে টাকা নিয়ে ফিরত। ভয় লাগত নসুর তখন বাইরে উঠতে। তখন তারা বাঘ ছিল। আঃ গোটা বংশটাকে কে যেন মাথায় বাড়ি মেরে একেবারে শুইয়ে দিয়েছে।

শশী অভিলাষেরা মরেছে। গৌরো গোপলা আছে রোগে পঙ্গু। মেয়েগুলো সব কুৎসিৎ রোগে পাড়ু হয়ে গিয়েছে। তরুলার কুষ্ঠ হয়েছে। এখন ওরা রাত্রে কাঁদে, কাতুরায়।

চোর, খারাপ মেয়ে নেই তা নয় তবে এরা শুয়ে পড়েছে। ভিক্ষে করে খায়। বর্ষার সময়—মাস দু তিন সরকার থেকে গম পায়। সে গম সস্তা দরে দোকানীরাই কেনে।

দে-ও শুনতে পেয়েছিল এ কাতরানি। সে জানালাটা বন্ধ করে দিলে। তার মত শান্ত শক্ত মানুষের মনও আজ চঞ্চল হয়েছে। সে মিলের গদী থেকে বেরিয়ে আজ সরাসরি বাড়ি আসেনি। সে দেখতে গিয়েছিল গোপাল চৌধুরীকে। চৌধুরীর সঙ্গে সে এক বছর পড়েছিল ছেলেবেলায়। গোপাল ফেল করে পিছনে পড়েছিল এক বছর পর কিন্তু বয়সে এক বলে অনেকদিন পর্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। তারপর গোপাল হয়েছিল জমিদারবাবু আর সে, সে-কালে সকলজনের কাছে কূটবুদ্ধি জটিল চরিত্র অপরাধী। ইদানীং আবার একটা সম্বন্ধ হয়েছিল। গোপাল ধান বিক্রী করে, দে কেনে। দরকার মত অগ্রিমও নিয়ে যায় বিশ পঞ্চাশ একশো। সবই অবশ্য চিরকূটে লিখে—লোক মারফৎ চলে, সাক্ষাৎ দেখাশুনো হয় না ঃ গোপাল তার গণ্ডী ছেড়ে বাইরে পা দেয় না। দে'রও সময় নেই। কিন্তু আজ সকালেই সংবাদটা পেয়ে অবধি ইচ্ছে হয়েছিল গোপালকে একবার দেখে আসে। ন্যাড়া বাউড়ীকে শাসন—সামান্য কথা। সে জন্য নয়, গোপালকে দেখবার জন্যই যেতে ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু সে ইচ্ছে সম্বরণ করেছিল কারণ গোপালের দুঃখ বাড়বে—লজ্জা পাবে। সন্ধ্যার পর যোগপুরের ধ্রুব ডাক্তার যখন নবীনপুরে যাচ্ছিল—তখন পথের ধারে মিলে বসেছিল শিবনাথ দে। ধ্রুবকে দেখলে চকিত হয় সকলেই। সেও চকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—আরে ডাক্তার! তুমি কোথায় ভাই? ধ্রুবের কাছে গোপালের অবস্থার কথা শুনে—সে আর ইচ্ছা সম্বরণ করতে পারেনি—গিয়েছিল তাকে দেখতে। ওঃ গোপালের কি অবস্থা!

সেই মনেই আজ গৌরোর কাতরানি—দে-কে একটু চঞ্চল করলে। সে জানালাটা বন্ধ করে দিলে। অন্য দিন—কারুর কাতুরানি এমন বিচলিত করে না দে-কে।

(চার)

দিন পাঁচেক পর গোপাল চৌধুরীও ঠিক এমনই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে খোলা জানালার মধ্য দিয়ে তাকিয়েছিল।
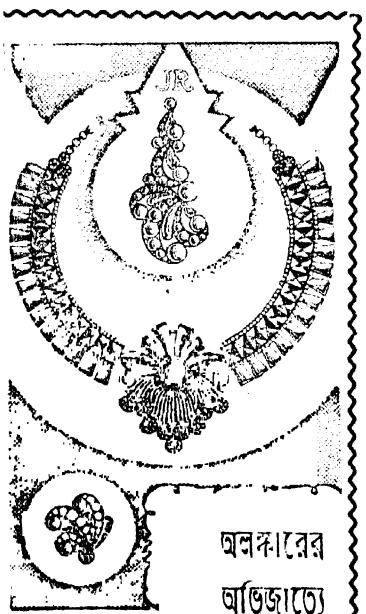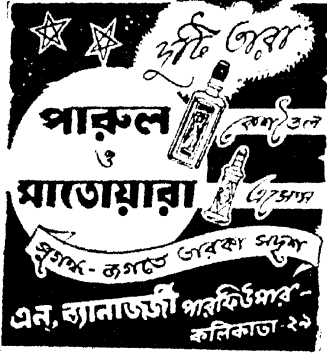
এবং মধ্যে মধ্যে বিড়বিড় করে আপন মনে বকছিল।

ধ্রুব ডাক্তারের কথা সত্য হয়েছে। চৌধুরী বেঁচে গেছে এ যাত্রা কিন্তু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। বাইরের জগতে তাকিয়ে থেকেও সব দেখেও তার সংগে তার মনের যোগ ঘটে না। অসংলগ্ন কথাও বলে যায়।

পাগল নয়। মাথায় আঘাতের জন্য এমনি ঘটে গেছে। নিজের মনের মধ্যেই বসতি।

তবে পক্ষাঘাত হয়নি এইটেই পরম ভাগ্য।

সেদিন রাত্রে দে যখন দেখতে এসেছিল—তখন চৌধুরী ওকে চিনেছিল কিন্তু ডেকেছিল ভুল নামে। ব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছিল—ঠাকুর মশাই! ওরে আসন দে, আসন দে!

ছেলে শুভেন্দু বলেছিল—কাকে কি বলছেন? উনি দে মশায়! আমাদের গ্রামের শিবনাথ দে, আপনার বন্ধু।

শুভেন্দুর কাঁধে হাত রেখে মৃদু একটু চাপ দিয়ে তাকে চুপ করতে বলেছিল দে মশায়। শুভেন্দু তার মুখের দিকে তাকালে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলেছিল—থাক।

একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসেছিল—দে মশায়। কেঁদে ফেলেছিল গোপাল চৌধুরী।

দেখুন, দেখুন আমার দশা দেখুন! আমাকে—।

হা—হা করে কেঁদে উঠেছিল চৌধুরী। এ দৃশ্য সহ্য করা দে মশায়ের পক্ষেও কঠিন হয়েছিল।

প্রতিকার করুন। এর—। আবার কান্না।

শান্ত কণ্ঠে দে বলেছিল—হবে। তবে আপনি তো বড় বংশের সন্তান, হাতী-সাপের কামড়েও বিষ হয় জ্বালা করে—তা সেটা কি ধর্তব্য! চোরে খুন করে—ডাকাতে প্রহার করে—সে কি অপমান? ওকে আপনি বাউড়ী ধরছেন কেন? ও চোর। মদ খেয়ে পড়ে পাগল হয়ে কাজটা করেছে। ডাকাত চোর—এদের কি জাত বিচার করে কেউ? বলুন!

শূন্য দৃষ্টিতে পলেস্তারা-খসা-ছাদের দিকে চেয়েছিল চৌধুরী এ কথায়। অর্থাৎ কথাটার অর্থ সে বুঝেছিল।

এরপর শিবনাথ দে উঠে চলে এসেছিল। বলে এসেছিল কাউকে এখন কাছে আসতে দিয়ো না। আমার আসাটাও ঠিক হয়নি।

তারপর চৌধুরীর ছেলে শুভেন্দুকে বলেছিল—যদি টাকাকড়ির দরকার থাকে তবে যেয়ো আমার কাছে। ধান দিয়ো পরে।

দে চলে গেলে গোপাল চৌধুরী চীৎকার করেছিল—সাপের মাথায় ভেক নৃত্য করে! ভেকের রাজত্ব! ভেকরাজ এসেছিল- ভেক-রাজ! ঠাকুর মশাই! পটোঝাড়া বামুন—ভেকরাজ!

তিনদিনে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়েছে চৌধুরী, বিপদ কেটে গেছে; কিন্তু এই গোলমাল সুরু হয়েছে। বাইরের জগত আর চিত্তলোকের গভীরের জগতের সংগে যে একটি সেতু থাকে স্মৃতি শিক্ষা ও সচেতনতার পিলারের উপর—সেই সেতুটি ভেঙে না গেলেও একেবারে বেঁকে হেলে পড়েছে। যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে।

চৌধুরীদের বাড়ী গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের শেষ বাড়ী। তিন পুরুষ আগে তৈরী দোতালা চকমিলানো পাকা বাড়ী। শরীকে শরীকে ভাগ হয়েছে; পুরনোও হয়েছে। একটা দুটো ফাটলও দেখা দিয়েছে। একটা অংশ—তার শরীকদের অংশটা, নতুন পলেস্তারায় মেরামতে অপেক্ষাকৃত শ্রীসম্পন্ন। গোপাল চৌধুরীর অংশটায় পলেস্তারাই নেই; শুধু ফাটলগুলো সেরে সিমেণ্টবালির দাগরাজিগুলি বিসর্পিল-ভঙ্গিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় বিচিত্র গঠন সরীসৃপের ফসিলের মত দেওয়ালের গায়ে জেগে রয়েছে।

এ তিনদিনে চৌধুরীর মনের সেতুটাও অনেকটা ওষুদ বিষুদ ও বিশ্রামের বালি-সিমেণ্টে মেরামত হয়ে এসেছে। তবে ডাক্তারেরা বলে—ধ্রুব ডাক্তার প্রথম দিনেই বলে গেছে যে, ও আর ঠিক সোজা হবে না—বেঁকে থাকবেই।

সকাল বেলা সেদিন চৌধুরী বালিশের উপর তাকিয়া রেখে হেলান দিয়ে বসে জানালা পথে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। পুরনো কালের বাড়ী, জানালাগুলি ছোট তিন ফুট দু ফুট বোধহয়। যে ঘরখানিতে চৌধুরী শোয় সেখানা উত্তর দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণ দিকে একটি জানালা—পূর্বদিকে দুটি। উত্তরে অন্য ঘরে ঢোকবার দরজা, পশ্চিমেও দরজা এবং একটি দেওয়াল
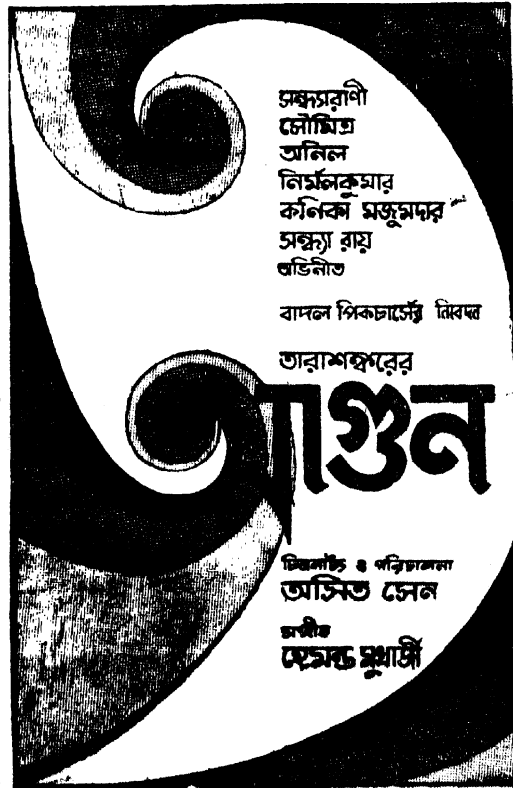
আক্ষেপের সংগে রাগের মেশানো ছিল তার প্রকাশ। সে তার মানে বুঝত। সে ইস্কুলে যেত বই নিয়ে বেণী ঝুলিয়ে—তার জন্যই আক্ষেপ রাগও তার প্রতি—হয় তো বা তার নিজের প্রতি। বড় দুঃখ এবং ঘৃণা হত নৌলির নিজের উপর। তার বিয়ে হচ্ছে না—এই তার মূল কারণ।

হঠাৎ আবার উত্তেজিত ভাবে গোপাল চৌধুরী ডাকলে—নুরো, নুরো! ও-নু-রো-!

—কি বাবা? অগত্যা উঠে কাছে গেল নৌলি।

—তুই?

—হ্যাঁ। মা নীচে গেছে ভিক্ষে দিতে। কি বাবা? কি হল?

—ওই—ওই—সেই—সেই—সেই যাচ্ছে না?

—কে?

—ওই যে! নৌলি—নৌলি।

—এই তো আমি!

—না—না। ওই যে!

নৌলি জানালা দিয়ে দেখলে—একটি আধুনিকা মেয়ে কাঁধে ঝোলা এবং হাতে একটা স্যুটকেস ঝুলিয়ে চলে যাচ্ছে।

—ওই! সেই না? শুভেন্দুর সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল! পালিয়েছে!

—না। ও সে নয়।

—কি নাম তার?

—সীমা।

—হ্যাঁ। লুকিয়ে বিয়ে হয়ে গেছে না কি? তোর দাদার সংগে?

—কি বলছ যা-তা?

—লোকে বলছে। তোরা বলছিস। তোর মা তোকেই শুধুচ্ছিল। আমি চোখ বুজে শুয়েছিলাম। আমি মরে গিয়েছি ভেবে-ছিলি!

নৌলির মনে পড়ল। কাল বিকেলে—সে ইস্কুল থেকে এলে মা তাকে ডেকে এই নিয়ে কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। কাল সে যখন ইস্কুলে গিয়েছিল—শুভেন্দু তাকে তাদের ওই সামনের ফটকটার কাছে আড়ালে ডেকে বলেছিল চিঠিখানা সীমাকে দিস! বুঝলি।

সে শংকিত এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকিয়ে ছিল।

শুভেন্দু বলেছিল, কিছু নেই চিঠিতে। কোন অন্যায় কথা লিখি নি।

—তুমি ভালবাস তাকে?

—ভালবাসার কথা নয়। লোকে পাঁচ কথা রটাচ্ছে। আমাকেই জড়াচ্ছে। কিন্তু আমি তো কিছু জানি না। তাই তার মনের কথাটা জানতে চেয়েছি। দেখ না তুই, পড়ে দেখ!

মা সেটা উপর থেকে দেখে ফেলেছিল কি করে! তাই ইস্কুল থেকে ফিরবামাত্র তাকে ডেকেছিল—শোন।

বাবা তখন ঘুমুচ্ছিল। তারা অন্তত তাই ভেবেছিল। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিচ্ছেন—দিনের বেলা খাবার পর একটা পিল খেয়ে-ছিল বাবা। ঘুমুবার কথা সাড়ে পাঁচটা ছটা পর্যন্ত। মা জিজ্ঞাসা করেছিল—চিঠির কথা। কঠোর কণ্ঠে বলেছিল—মিথ্যে বলবি নে। তোর হাতে চিঠি দিয়েছে শুভো আমি নিজে দেখেছি। বল, কাকে দিয়েছে চিঠি?

—তাকেই বটে।

—সীমাকে?

—হ্যাঁ।

—কি লিখেছে তাতে জানিস?

—জানি। আমাকে পড়তে বলেছিল।

—কি?

—লিখেছিল—। থেমে ঢোক গিলে নিল নৌলি। তারপর বললে—খারাপ কথা কিছু লেখে নি।

—সেটা কি? খারাপ নয় তো মুখে আটকাচ্ছে কেন?

—লিখেছিল—। লোকে বলছে—অনেক কথা। তুমিও শুনেছ—আমিও শুনেছি। এর মধ্যে কি সত্য কিছু আছে? যদি থাকে তবে তুমি যখন দেবযানীর মত—কচকে ভালবাসার কথা ভুলে বৃদ্ধ যযাতি রাজাকে বিয়ে করে সম্রাজ্ঞী হতে যাও নি—তখন আমিও কচের মত দেবতার দাস—আমার বংশমর্যাদার দাস হব না এটা নিশ্চয় জেনো।

—মেয়েতে ছেলেতে থিয়েটার! যা দেখা যায় তাই। আমি তখুনি জানতাম। ইংরেজ রাজত্বকে লোকে বলত ম্লেচ্ছের রাজত্ব। কিন্তু তখন কটা এমন কাণ্ড ঘটেছে? আজ স্বাধীন হয়ে পাখা বেরিয়েছে। ম্লেচ্ছের অধম। ছি—ছি—ছি।

অন্য সময় হলে নৌলি প্রতিবাদ করত।

সেকালের গল্প সে কিছু কিছু শুনেছে। যা চলে আসছে গোপন ধারায়। এখানকার ঝরনার মত। এখানে ঝর্ণা ঝরঝর করে ঝরে না। এখানে ঝর্ণা নিঃশব্দে বের হয় বড় বড় টিলার প্রান্তে সবুজ একটি কার্পেট ঘাসের মাঝখানে—একটি বা কয়েকটি গর্তের মধ্যে। জল বের হয় কুয়োর তলায় জল যেমন বের হয় তেমনি ভাবে। ছোট ছোট গর্তগুলি ছাপিয়ে ক্ষীণ কিন্তু অহরহ প্রবহমান ধারাটি বেয়ে চলে নদীর দিকে বা কোন বড় নালার দিকে। এর জল ব্যবহার কেউ করে না, কিন্তু কৌতূহল বশে এর ধারে সবাই যায়, সকলে এর জল আস্বাদন করে দেখে। গন্ধকের একটি স্বাদ আছে। গন্ধও আছে। এই সব গল্পগুলিও তাই তেমনি ধারায় বেয়ে চলে—এর আস্বাদন এখানকার পুরনো বাসিন্দাদের, নতুন মানুষেরা কেউ, বড় হলেই জানতে পারে। গল্পগুলি এখানকার কুলীন কন্যা—যারা চিরদিন পিতৃগৃহে কাটিয়েছে তাদের

অপবাদের কথা। তাদের গোপন প্রেমের গোপন কথা। কোন কোন ক্ষেত্রে এ নিয়ে ঝড় বয়েছে। বিবাহিত শ্বশুরঘরবাসিনী কন্যারাও বাদ যায় নি। এ ঝড় গ্রাম থেকে চিঠি মারফৎ সেখানে গিয়ে সে কন্যার আশ্রয়ের মাথার চাল উড়িয়ে নিয়েছে। কন্যা গ্রামে ফিরে এসেছে পিতৃগৃহে। শেষ জীবনে সেও হয়েছে সমাজের শাসনকর্ত্রী।

এসব কথা নিয়ে কতদিন তর্ক করেছে সে মায়ের সঙ্গে। সে নিজে ওপথের ধার দিয়ে হাঁটে না, ইস্কুলে বান্ধবীরা তাকে সেকেলে বলে:—সীমাই তাকে বলে শুচি ঠাকরুণ। সাক্ষাৎ শুচিতা—বা শুচিবাইগ্রস্তা। বলবার ভঙ্গিমার পার্থক্যে অর্থেরও তারতম্য হয়। যখন শুচিবাইগ্রস্তা বোঝাতে চায়—তখন তার হাত দুটো ঝাড়ে শুচিবাইগ্রস্তার মত—নয় —ডিঙিং মেরে পা ফেলে দু চার বার।

মাকে এ তর্কে হার মানতে হয়েছে তখন। শেষে মা বলেছে—তবে যাও মা—তুমিও যাও—ওই সব করগে যাও।

—আমার কথা তো বলি নি।

—বল নি। কিন্তু বলবে না-ই বা কেন? যখন দোষ নেই—ভাল পথ।

মায়ের কথায় কাল সে চুপ করেই ছিল। সাহস পায় নি। বলতে পারেনি—অন্যায় দোষ ধ'র না মা। দাদা অন্যায় করে নি। সে ন্যায় কাজই করেছে। তবে বলেছিল—ভাবতে তোমায় হবে না। সীমা পত্র পেয়ে পড়ে আমাকেই পড়তে দিয়েছিল। এবং বলেছে, তোর দাদাকে বলিস ভাই—সে যেন এসব কথা কানে না তোলে। কেন বেচারা দুঃখ পাচ্ছে। সে সব কিছু নয়। আমি পড়ব রে। পাশ করব। চাকরী করব। বিয়ে আমি করব না। তাকে ধন্যবাদ দিস। সে যে লিখেছে এ কথা এর জন্যে অনেক ধন্যবাদ তাকে। চিঠি আমি দেব না। তুই বলিস এই আমার জবাব। তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি। একটি কথা বাড়িয়ে বলি নি ঢাকি নি।

মা বলেছিল—আশ্চর্য মা! কি যে হয়েছে ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে ঝোলা কাঁধে চটি ফটফটিয়ে বেড়ানোর চাকরী করার শখ—আর ঢঙ!

তারপর ব্যঙ্গ করেই বলেছিল—'সে সব কিছু নয়। আমি পড়ব রে। পাশ করব। চাকরী করব।' হাঁ তা করবি—হাকিম হবি। এজলাসে বসে বিচার করবি! মরণ! শুভেন্দুর মত পাত্তর—আমাদের মত ঘর তোর সাতজন্মে হবে?

অবাক হয়ে গিয়েছিল নেলি। এ আবার মা কি বলে? হাসিও পেয়েছিল। বেচারী মা! গায়ে লেগেছে—তাঁর ছেলের মত ছেলের প্রেমে পড়ে নি—সীমা!

বাবা তন্দ্রার মধ্যে কথাগুলি শুনেছে। কিন্তু তার উত্তর সে কি দেবে?

এ কে বাবা! বাবাকে কি এসব কথা বলা যায়? তার উপর মানুষটি যে একটি সকরুণ বিয়োগান্ত বেদনায় একান্ত আর্ত মানুষ! সংসার যুদ্ধে ঘা খেয়ে মেরুদণ্ড ভেঙেও পুরনো কালের সংস্কারের বোঝাকে জীবন সম্বল ভেবে পিঠে বেঁধে কুঁজো হয়ে ঠাকুর দেবতা ভগবানরূপী অনেককালের পাকা লাঠিখানির উপর ভর দিয়ে হেঁটে চলেছে—বৈতরণীর ঘাটের দিকে। একমাত্র বিশ্বাস—ঘাটে তরী আছে এবং তাঁর পারানি আছে এই সংস্কারের বোঝার বহনের পারিশ্রমিক।

নেলি দেখল একটি আধুনিকা মেয়ে চলে যাচ্ছে

কথাটা নেলির নয়। নেলি শুনেছে। কথাটি বড় মানুষের।

ভবানীকিঙ্করবাবুর বড় দাদা শ্যামাকিঙ্করবাবুর। মস্ত খ্যাতি তাঁর। মস্ত বড় মানুষ। আজ আর তিনি শুধু এখানকার মানুষ নন—গোটা দেশের দাবী তাঁর উপর। মস্ত বড় লেখক। বাবার চেয়ে এক বছরের বড়। শিবনাথ দের বয়সী। গ্রামে তিনি থাকেন না। কখনও কদাচিৎ আসেন। যখন আসেন তখন তাঁর ওখানে লোকেরা যায় দলে দলে। এখানকার লোক, পাঁচখানা গ্রামের লোক, ইস্কুলের মেয়েরা দিদিমণিরা ছেলেরা মাস্টাররা। যায় না কেবল বাবা! অথচ এক সময় নাকি এমন ছিল যে—বাবা আর শ্যামাকিঙ্করবাবু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘন্টা এক সঙ্গে কাটাতেন। ভোরবেলা বেড়ানো থেকে সুরু রাত্রি দশটায় তাস খেলার পালা সাঙ্গে শেষ।

শ্যামাকিঙ্করবাবু কয়েকবার বাড়ি এসে ডেকে নিয়ে গেছেন। বাবা গিয়েছে—কিছুক্ষণ থেকেই সকলের অলক্ষ্যে উঠে চলে এসেছে। সেই নিয়ে একদিন কথা হচ্ছিল শ্যামাকিঙ্করবাবুর ওখানে। তাঁরা বসেছিলেন বাগানে। ঘরের মধ্যে ব্যাটারী সেট রেডিও বাজছিল, সে শুনতে গিয়েছিল শ্যামাকিঙ্করবাবুর ভাইঝিদের সঙ্গে। কথাটা তার কানে এসেছিল। শ্যামাকিঙ্করবাবু বলেছিলেন—গোপালকে তোমরা দোষ দিয়ো না। ওকে তোমরা বুঝতে পার না। আমি পারি। বড় দুঃখ হয়। বলে ওই কথা কটি বলেছিলেন। সেদিন তার খুব ভাল লাগে নি। হয়তো বুঝতে তারও ভুল হয়েছিল। মনে হয়েছিল—সত্য বলবার ভানে নিন্দেই তিনি করলেন। তার সঙ্গে খানিকটা করুণা। আজ সে বুঝছে। এমন সুন্দর করে সত্য বলা

আর হতে পারে না তার বাবা সম্পর্কে।

* * *

গোপাল চৌধুরী প্রশ্ন করে তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

—লুকিয়ে ওদের বিয়ে হয়ে গেছে? তোর দাদার সঙ্গে?

যেন লুকানো সত্যের স্বীকৃতি খুঁজছে তার মুখের চোখের মধ্যে। সে অস্বস্তি বোধ করলে। তবু সংযত এবং শক্ত হয়ে বললে—না বাবা ও—স—ব মিছে কথা। আমি তো সেদিন মাকে এ কথা বলি নি। বরং বলেছি ও—স—ব কথা মিথ্যে। দাদার সঙ্গে সে মেয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

—সত্যি কথা বল। তোকে আমি দুটো টাকা দেব।

—না- না—না! তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করে বলতে পারি।

—হুঁ। তোর দাদা কোথায়?

—সে তো সিউড়ি গেছে—কম্পেনশেসনের টাকার জন্য। কত টাকা দেবে বলে রসিদ এসেছে। তুমিই তো পাঠিয়েছ!

—হ্যাঁ—। ঘাড় নাড়লে চৌধুরী।—হ্যাঁ। হ্যাঁ! কত টাকা বলতো?

—আড়াই শো না—কত। আমি তো দেখি নি।

—হ্যাঁ। টাকাটা পেলেই—। হ্যাঁ—। ওটা পেলেই কলকাতা যাব। শ্যামাকিঙ্করকে ধরব—রেভেন্যু মিনিস্টার—ওই যে—কি নাম—তাকে ধরব। টাকা দিতেই হবে। তিরিশ হাজার তো পাব তার দশ হাজার দিতে হবে। তোর বিয়ে দোব। আর ব্যবসা। একটা ব্যবসা করব। হ্যাঁ।

নেলি আর সইতে পারলে না। ছুটে বেরিয়ে নীচে নেমে এল।—মা—তুমি যাও। আমি এ সব করছি—মা—।

চৌধুরী গিন্নী তখন উঠোনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে দিচ্ছেন—নসুবালাকে। নসুবালা এসেছে—। দুটি পাকা আতা হলুদ দাওয়ার উপর রেখেছে। সংগ্রহ করে এনেছে অসুস্থ বাবুর জন্যে।—খেতে দিয়ো মা। রসনায় স্বাদ হবে।

—আঃ শুনে থেকে আর আপ্‌সে (আপশোষ করে) বাঁচি না। তিনদিন বাইরে থেকে খবর নিয়েছি। আজ রাস্তা থেকে দেখলাম—জানালার কাছে বাবু উঠে বসেছেন। তাই ঘরকে এলাম। আতা দুটি কাল থেকে নিয়ে ফিরছি। ভিখ দিচ্ছ দাও। ভিখ করেই তো খাই। তা ভিখ নয় মা, বাবুর খবরের লেগে—এয়েছিলাম।

চৌধুরী গিন্নী ভিক্ষে দিয়ে চলে গেলেন।

নসু বললে—বাবু দিদি ভাল আছ।

হেসে ফেললে নেলি—আছি।

—বেশ! বেশ! তা দাদাবাবু—? সে কই?

—সিউড়ি গেছে।

——বেশ! বেশ! লোকের বারণ দেখ দিকি নি। কি সব বলে!

—সে সব মিথ্যে কথা।

—হ্যাঁ মিথ্যে কথা! বেশ বলেছ। ঠিক বলেছ! সত্যি বলেছ। তা' আজ যাই। বাবুর অসুখ—তা নইলে—ভাদু শোনাতাম। ভাদু আমার বিয়ে করবে না! তা', পরে শোনাব। হোক!

নেলি হাসলে। এই এক অদ্ভুত!

(পাঁচ)

অদ্ভুত নসুবালার গ্রামে মাগুনের পালা। ওই নতুন ভাদু গান করে বেড়াবে। নসুবালার 'মাগুন' মাগ্না মাগুন নয়—ওই গান শুনিয়ে মাগুন। বেয়াই বসেছে আজ বি ডি ও আপিসের চৌমাথায়। আজ দুদিন ধরে বেয়াইয়ের খাটুনি গিয়েছে বিষম। সেদিন—; কদিন হল? সোমবার হাট ছিল—তার ফেরা দিন মঙ্গলবার—সেদিন—তারপরে 'বুধ বেরস্পতি শক্কু শনি রবি'—চারদিন হল তা হলে—চারদিন আগে পাঁচ দিনের দিন সেই হাঙ্গামার দিন সেটেলমেন্ট আপিসে আকুটিরবাবুরা এয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক। ওই অঞ্চলের পাঁচ সাতখানা গাঁয়ের লোক। সেদিন বেয়াইয়ের মাল সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বেয়াইয়ের মালের কদর বেড়েছে। বেরাকেট পিছু দু আনা দাম চড়েছে। তারাই চোটাছুটি করে বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপরেতে সেইদিন থেকেই বেয়াই মাটি ঠাসছে—মাখছে আর ছাঁচে ফেলছে। আর শুকুতে দিচ্ছে। দুদিন আগে থেকে বেয়াই বুদ্ধির জোরে ফন্দি খাটিয়েছে ভাল। মণ দুই কয়লা এনে মজার চুলো করেছে। চারপাশে চারটে ইটের পায়া তৈরী করে তার ওপরে চাপিয়ে দিয়েছে লোহার একখানা ভারী পাত! দুহাত চওড়া—চার হাত লম্বা, চার হাত 'ক্যানো'—বেশী হবে পাঁচ হাত। পাতখানা ধার করে এনেছে দে মশায়ের ধানকল থেকে। রাজ্যের লোহালক্কড় সেখানে। কোথা থেকে পায় এত লোহা—কে জানে? সব লোহা—সব লোহা হয়ে গেল মা! সেই যোগীন্দ মলেগায়েন মাশায় গাইত—'যে দিকে ফিরাই আঁখি—কেষ্টময় ভুবন দেখি;'—সেই বৃত্তান্ত গো। বাড়িতে কড়া হাতা খুন্তি-কোদাল টামনা-কুড়ুল কাস্তে দা' কাটারী গজাল পেরেক হাতুড়ী ই সব ছাড়ান দাও, ওসব চিরকাল আছে। মাটির বাঁধ বেঁধে লোহার লাইন পেতেছে ভুবনের ই মাথা থেকে উ মাথা পর্যন্ত তার উপরে রেলগাড়ী—: ইঞ্জিনটা গোটাই লোহার, গাড়িগুলোর চাকা লিখে—তলাটা সব লোহার, মালগাড়িগুলো তো সব লোহা। সিনগাল না সিগনাল—তা আবার লোহার তারের টানায় ওঠে নামে। লোহার খুঁটি পুতে টেলিগেরাপ—, তারে তারে খবর—মিনিটে মিনিটে। সাবধানে পথ চল নইলে লোহার গজাল পেরেক পায়ে ঢুকবে। ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে পড়ে আছে। চালে টিন পড়ল সেও একরকম লোহা। লোহা না-হলে দুপুরে এমন 'তাতে'—গরম হয়? ইস্টিশানে তো উপর দিকে চেয়েছ তো মুখ থুবড়ে পড়ে নাক ভেঙেছ। 'সিনগালের' তারে পা আটকে দড়াম। আবার গাঁয়ের তিন কোণে তিনটে রাইস মিল। চন্নপুর তিন কোণা গা—পূব কোণ পশ্চিম কোণ দক্ষিণ কোণ আছে উত্তর কোণ নাই। এ মিল তিনটের তিনটে চিমনী লোহারে চোঙা কাল আলকাতরা মাখা ভুঁই ফোড়ের মত ঠেলে উঠেছে আকাশ বাগে আর লোহার ধোঁয়া ওগরাচ্ছে। মিলের লোহা ডাঁই হয়ে 'পর্বত পেমান' হয়েছে। এখানা রাস্তার ধারে নালার উপরে পাতা ছিল—উপর দিয়ে লরী ঢুকত। এই দেখ এই দেখ ভুল দেখ হায় ভোলা মনের; লরীর কথা মটরের কথা জিপগাড়ির কথা বলতে ভুল হয়েছে। বাসের কথা ভুলে গিয়েছি, লোহার পিকচাকাওলা সাইকেল রিস্‌কা—সাইকেলের কথা মনে হয় নি। হায় মন রসনা! 'কেমন করে ভুলে গেলি তোর পেছনে যম রাজারই ভেঁপু বাজায়; মোষের মতন উড়োয় ধুলো বাগ মানে না—কি গরজায়।' হায় হায় হায়!

তা' দে মশায়ের একখানা লোহার পাত দরজা হয়েছিল বলে সেখানা বাতিল হয়ে

পড়েছিল। সেখানা গিয়ে চেয়ে এনেছে বেয়াই ফটিক দাস। ইটের পায়ার উপর সেখানাকে চাপিয়ে তার তলায় একটা গর্তেতে কয়লার আঁচ করে তাতিয়ে তার উপর বেরাকেট পুতুল শুকিয়ে নিয়েছে। আর রঙ করেছে সেও প্রায় দিন রাত। ক'দিন সে বেরুতে পারে নাই। আজ বেরিয়েছে। আজ হাট বটে, সোমবার। কিন্তু আজ পাঁচ সাত দশ-খানা গাঁয়ের লোক আসছে বি ডি ও আপিস; সরকার চাষের ঋণ দেবে সেই ঋণ নেবে। দলে দলে ভাগ হয়ে 'গুরুপ' না কি বলে বেঁধে বসবে। দরখাস্ত লিখবে। ঝগড়া করবে সময়ে সময়ে হাতাহাতি করবে। এ বলবে—দোব ফাঁস করে তোমার গুপ্ত কথা? সেবার লোন নিয়েছ—আজও শোধ কর নাই। আর টাকা নিয়ে চাষ করেছ না কচু করেছ, তুমি সাইকেল কিনেছ। আবার রোখ দেখ!

—আর তুমি? হা শালো—তুমি যে টাকা নিয়ে এখান থেকেই মালদা'র আম শ দরুনে নিয়ে গেলে। লুপ্ লুপ্ করে খেলে?

—অম্বল শূল হবে খেয়ে থাকলে। জামাই রাগ করেছিল—তার মা আমার মেয়ের ওপর খাপ্পা। জামাইষষ্ঠীতে তত্ত্ব করতে পারি নাই। তাই পঁচিশটা আম—বারো টাকায় কিনে কাপড় কিনে পাঠিয়েছি। বলুক দশটা লোকে এতে আর সাইকেল কেনাতে সমান?

বেয়াই এগুলি মনের খাতায় টুকবে আর পুতুল বেরাকেট বেচবে। বাতাস থাকলে বুড়ো পুতুলের মাথা গুলি আপনি দুলবে। না থাকলে বেয়াই নিজেই বিড়ি খেয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে ফুলের বাতাসে দুলিয়ে দেবে। মনে মনে হাসবে—বলবে—যত রস ধানেরই ভিতর।

তা' আজ সকালে লোকজন কম ছিল তখন—তখন নসুবালা এক নাচন নেচে এসেছে।

ভাদু আমার বিয়ে করবে না।

গোটাটা গেয়ে এসেছে। ভিক্ষে কিছু মিলেছে। লোকে হেসেছে খুব। তাতেই নসুবালা বেশী খুসী। তারপর হাটে যাবার কথা কিন্তু একবার চৌধুরী মশায়ের খবর না নিয়ে যেতে পারে নি। খবর নেওয়া হল। চলো এবার হাট। গুন গুন করে ভাঁজতে ভাঁজতেই চলল নসু।

সে থমকে দাঁড়াল। বাবু পাড়ার ভেতর হয়ে গলিগলি সোজা পথে হাটে যাবে বলে রাজরাজেশ্বরের দোল পিঁড়ে ডাইনে রেখে কুলি সড়কটি ছেড়ে দু পা এগিয়েছে সবে—এমন সময় কে ডাকলে উত্তর দিক হতে ওই কুলীনপাড়ার মোড় থেকে—এই এই নসু-বালা এই!

—কে গ—অ! এ্যাঁ? আঃ পেছাডাকা দেখ দিকি?

—এই নসু, শোন! নসু!

অ! দুটি ছেলে ছুটতে ছুটতে আসছে' অ বাবা, কুলীন পাড়ার চাটুজ্জে মাশায়ের ছেলে আর দত্ত পাড়ার একজনা।

—কি বলছ বাবুদাদারা?

—আয় আমাদের সঙ্গে।

—কোথাকে যাব? আমি যে হাট যাচ্ছি!

—যাবি পরে। এখন আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। কি গান গেয়েছিস সকালে পাঁচ মাথার মোড়ে?

পুলকিত হল নসু! তা হলে লোকের মন ভিজেছে মজেছে। সেই কথা সকাল থেকে ঘোঁট হয়েছে—লোকে মেতেছে—শুনেবে বলে; ডাক পড়েছে।—চল—চল—চল!

চলতে চলতেই সে বললে—সে ভাদু ভাল ভাদু দাদাবাবু। ভাদু আমার বিয়ে করবে না। শুনেবেন চলুন না!

ওঃ—গোলমাল উঠছে খুব। অনেক লোক তা হলে। জয় ভাদুমণি। মান রেখো মা দশের সামনে!

তা রাখবে। নিশ্চয় রাখবে। শেষকালে সেই দু কলি—

না-কের বদলে নরুণ ফুলের বদলে রাঙা বিলিতী বেগুন—

সাঁমার বদলে ঝমা—!

ওঃ! শুনে বাবুরা সবে হেসে হবে খুন। তাই ঘুনা ঘুনা ঘুন।

পাঁচ মাথায় অনেক লোক। গ্রামের লোক বেশী।

জনতার মাঝখানে কেউ উচ্চ কণ্ঠে বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলছে।

নসুবালা থমকে গেল।—ও বাবা এ যে সতীশ ঘোষালের গলা। সে যে ভীষণ লোক! দুনিয়ার শাসনকর্তা! তেজী লোক! আগুন! হাকিম হুকিম কাউকে ভয় করে না। ভগবান মানুষটি খোঁড়া করেছে—নইলে যে কি করত—! বাবাঃ গোটা দেশকে 'টটরস্ত' করে দিত! হাটিতে পারে না মাথা ঘোরে। তবু দিনান্তে এক-বার পাঁচ মাথার মোড়ে এসে হক কথা উঁচু গলায় হেঁকে বলে যাবে। এই সব লোক—যদি মন্ত্রী হয়, তাহলে দেশের চোর ডাকাত বদমাস জোচ্চোর হাকিম-হুকিম সব ঠা—ণ্ডা হয়ে যায়! লোকটিকে নসুবালা ভয় করে। তবে ভালোও বাসে। লোকটি গান বাজনা বোঝে। তা বোঝে। কি আবার খেতাব পেয়েছে!

ওঃ গলার জোর দেখ দিকি!

ও বাবা! এ কি বলছে গো? এ্যাঁ!—

—নসুর পিঠে চাবুক মেরে চামড়া তুলে দেওয়া উচিৎ! তার সঙ্গে এই এ কালের মূর্খ যুবকদের!

ও বাবা! দাদাবাবু—আমি যাব না।

—না চল। তোকে যেতে হবে! শুনব তোর গান। দশজনের কাছে বিচার হবে। চল্!

কাতর দৃষ্টিতে চাইল তাদের দিকে নসু!

* * *

সতীশ ঘোষালের সত্যই গলার জোর আছে। নসুর চিন্তার মধ্যে গ্রাম্যতার ছোঁয়াচ থাকাতে হয় তো কিছুটা রঙচড়া হতে পারে, তবে—মোটামুটি লোকটির ওই রূপ। বিনত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বাল্যকালে পিতৃহীন মায়ের পরম আদরে লালিত। ভাই বোন নেই। ম্যাট্রিক পাশ। বয়স এখন বাহান্ন তিপান্ন। প্রথম বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে চন্ননপুরের অচলা কয়লাখনি ও ব্যবসায়ের লক্ষ্মীর প্রসাদ কামনায় কয়লা-কুঠীতে কোল মার্চেণ্টের আপিসে চাকরীতে ঢুকেছিল। চাকরীতে সে কৃতিত্ব সর্বত্রই দেখিয়েছে—কিন্তু কোনখানেই সে উপরের কর্মচারীদের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারে নি। জীবনে কোথায় কবে কিভাবে একটি প্রশ্ন তার মনে জাগ্রত হয়েছিল সেটি হল ও আমার থেকে বড় কিসে? এবং এ প্রশ্ন এখানেই শেষ নয়—এর শাখার প্রান্তে যে ফুলটি ফুটল তার বর্ণে গন্ধে এইটে প্রচারিত হল—ওরা জানে কি?

এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতি চাকরীতেই লড়াই করেছে সে, কিন্তু সতীশের মতে এ দুনিয়া অবিচারের দুনিয়া। অবিচারের দুনিয়ায় সে অবিচারই পেয়েছে। যেখানে চাকরী পেয়েছে সেখানেই মাস কয়েকের মধ্যে তার চাকরী গেছে বা সে নিজেই কোন এক মুহূর্তে সেলাম সাব, বহুৎ হুয়া খুব হুয়া—আউর নেহি' বলে চলে এসেছে। রাগলে সে হয় হিন্দী বলে নয় ইংরিজী। বাংলা বলে না। তারপর আজ বৎসর পনের ঘরেই বসে আছে। বাড়িতে বসে কিছু ছেলেকে প্রাইভেট পড়ায়; আর দুটি কাজ, একটি সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে পড়া শোনা প্রায় রিসার্চ বলা যায়। মস্ত বই সে লিখেছে। বড় সঙ্গীতাচার্য দু একজনের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিল—তাঁরা সুখ্যাতি তো করেছেনই একজন আবার সঙ্গীত রত্নাকর উপাধিও দিয়েছেন। অপর কাজটি দুনিয়ার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। নিত্য সকাল বা বিকালে পাঁচ মাথার মোড়ে এসে এই সম্পর্কে একটি বক্তৃতা সে দেয়। মাসে তার ডাকটিকিট খরচই দশ পনের টাকা। 'কোপাই' কাগজে তার ছড়ায় লেখা অনেক প্রতিবাদ বের হয়। দরখাস্ত করে এস-ডি-ও, ডি-এম এর কাছে—সেও ছড়াতে। মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত নেহেরুকেও চিঠি লেখে—অন্তত তাই শোনা যায়। সেটা বোধ হয় ছড়ায় হবে না কারণ পণ্ডিত নেহেরু তো বাংলা জানেন না। এবং ইংরিজীতে ছড়া সে লেখে না।

আজ সকালে নসুবালা এই পাঁচ মাথার মোড়ে—'ভাদু আমার বিয়ে করবে না' ভাদু গেয়ে গেছে, তখন সতীশ তার কোঠার উপরে বসে—চশমা চোখে—তার বইখানা উল্টে-পাল্টে দেখছিল। প্রথমটা সে কান করে শোনেও নি। তারপরই তার মন আকৃষ্ট হয়েছিল, মন দিয়ে শুনেছিল। গানের সে বোদ্ধা; নসুর গলা ভাল, গানে তার দখল আছে। কতবার তার পিঠ চাপড়ে সে বলেছে—বাহবা বাহবা! বা বেটি! নসু তার পায়ের ধুলো নিয়েছে। আজও তার ভাল লেগেছিল। এবং বেশ একটি কৌতুক অনুভব করেছিল। হারামজাদীর রসজ্ঞান আছে। সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে ডেকে আর একবার শুনবারও সংকল্প করেছিল। দু একটা কলি দু এক জায়গায় সুরের খোঁচখাঁজ দেখিয়ে দেবে ভেবেছিল। অকস্মাৎ সব উল্টে গেল। হঠাৎ কানে গেল—পাষণ্ড অধার্মিক রক্তচোষা মহাজন ওই শিবু দে—দেবতার যে ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর—সে কমিটিকে আমি মানি না।—

শিবু দে?—সচকিত হয়ে ঘোষাল চশমা লাগিয়ে পাঁচ মাথার দিকে তাকালে। ওঃ—অমর চক্কোত্তি পাঁচ মাথায় সাঁকোর প্যারাপেটের উপর পা রেখে একটা নতুন সাইকেলের উপর বসে—চীৎকার করছে।

শিবনাথ দে! পাষণ্ড! একশোবার। অধার্মিক! হাজার বার! শিবু দে তার শত্রু। সমাজের শত্রু! ধর্মের শত্রু। দেশের শত্রু।

বহুৎ আচ্ছা! ব্যাভো! জিতা রহো! দাঁড়াও হে। আমি যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি। লাঠির উপর ভর দিয়ে সে নামতে লাগল সিঁড়ি থেকে।

(ছয়)

মেয়ের বিয়ের পর আজ প্রথম চন্দনপুরে ঢুকছে অমর চক্কোত্তি। খারাপ মেজাজ নিয়ে ঢুকছে। তবে সে শক্ত লোক। মোটামুটি খুব চঞ্চল সে হয় নি। অন্তত গোড়ার দিকে তো নয়ই। সীমা ভোর রাত্রে পালিয়ে আসার পর সকালেই সে তাকে খুঁজতে চন্দনপুরেই আসছিল। পথে নেমে ঢুকেছিল চণ্ডীতলা। ভেবেছিল থুথু ফেলে আসবে। ওখানেই সব সংবাদ পেয়ে হঠাৎ সে খুশী হয়ে উঠেছিল। সীমা কোন ছোঁড়াটোঁড়ার সঙ্গে ভাগে নি। কোন কুজাতের সঙ্গেও না। এবং সীমা এখন তার সীমানার বাইরে। বহুৎ আচ্ছা। ঠিক হ্যায়! পাঁচশো টাকা সে অগ্রিম নিয়েছে। তাই—তাই সই। এবং সঙ্গে সঙ্গে থুথু না ফেলে চণ্ডীকে একটি প্রণাম করে—সেইখান থেকে সাইকেল ঘুরিয়ে এসে উঠেছিল বনচাতরা। ভাঙুক বিয়ে! উপায় কি? সে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে রাজী আছে। অভিনয় চাতুর্যে চরম শোক এবং ক্ষোভোন্মাদ প্রদর্শন করে সে বলেছিল—আমাকে জেলে দাও। আমার কাছে হ্যাণ্ডনোট লিখে নাও। যা—ইচ্ছে! ভালো ভালো কথা বলেছিল নাটক থেকে। "আমি অপরাধী কিন্তু সে অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত নয়। বিশ্বাস কর। আমি তোমার করুণার দুর্গে আশ্রয় চাচ্ছি। আমাকে যা করবে কর।" কিন্তু রমেন্দ্র ভোলে নি। না হ্যাণ্ডনোট নয়—পুলিস জেল নয় মশায়। কুটুম্ব সজ্জন

এসেছে। বিয়ে হতে হবে। আপনার আর একটি মেয়ে আছে। ক্ষমা রয়েছে। ওর সঙ্গে বিয়ে হতে হবে। বাস আপনারও ক্ষমা—আমারও ক্ষমা।

বিয়ে চুকে সে আজ চন্দনপুর ঢুকল। যথা নিয়মে এসে প্রথম উঠল চণ্ডীতলায়। সেদিন থুথু ফেলা হয় নি আজ ফেলবে। বিয়ের পর ঘটনা এমন ঘটেছে যে মন মেজাজ ভাল নেই। প্রথম—ক্ষমাকে সে রমেনের হাতে দিয়ে সুখী হয় নি। ক্ষমার বর ও নয়। ছোট মেয়েটাকে বড় ভালবাসত সে। দ্বিতীয় বউভাতের পরদিন রমেন তাকে অপমান করেছে। কঠিন অপমান। বউভাতের দিন মদ সে খেয়েছিল জামাই বাড়িতে। শুরু করে দিয়েছিল রমেনের বাপ! সে খেয়েছিল অনেকের সঙ্গে। থিয়েটারের সময় যাদের সঙ্গে খেয়েছে তাদের সঙ্গে। পরেরদিন সকালে তখনও খোঁয়াড়ি মরে নি, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে—সেই সময় রমেন তাকে ডেকে বলেছিল—একটা কথা বলব।

—দেখুন—আগে আগে এসেছেন—পাঞ্জা লোরাতে মানে থিয়েটার করতে। তখন মদ খেয়েছেন বমি করেছেন বেলেল্লাগিরি করেছেন কুকুরে মুখ চেটেছে কথা উঠলে বলেছি—বাবাকেই বলেছি, আমাদের স্বজাত স্বভাত ধরছ কেন? থিয়েটার নাটকে এ্যাক্টর এদের জাত আলাদা। আনন্দ করে একটু আধটু ঢলাঢলি হয়ে যায় ওদের। কিন্তু কাল কাণ্ডটা করলেন কি হিসেবে? কি ভেবেছিলেন এবার আর একটা হুঁকো নয়, দুটো হুঁকো। রমেনের শ্বশুর আর থিয়েটারের মাস্টার? লোকে কি বললে, বলছে শুনেছেন?

চক্কোত্তি সহজে দমে না। সে বলেছিল—আমি তোমার শ্বশুর নই তোমাদের থিয়েটারের মোশন মাস্টারও নই। আমি অমর চক্কোত্তি—। কোন গুণ নাই যার কপালে আগুন। আমি চণ্ডীমায়ের পেটে ঘুষি মেরেছি মদ খেয়ে। এতো লুকোছাপ নেই বাবা! তুমি তো জেনেই আমাকে শ্বশুর করেছ! হ্যাঁ—যদি নিজের চরিত্র গোপন করে তোমার শ্বশুর সাজতাম তো বলতে পারতে।

রমেন কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিল। তারপর বলেছিল—হ্যাঁ এ কথা স্বীকার করতে হবে আমাকে। তা'—। গরুর গাড়ি করে দেব—না—।

—না—না—না। তোমার সাইকেলটা দাও। তা হলেই হবে।

—ভাল—তাই নিয়ে যান। আমার খানাই নিয়ে যান। গদীর তিনখানার অনেক কাজ যান ওখানাই নিয়ে যান। ক্ষমার সঙ্গে দেখা হবে না। তবে শুনে যান—ক্ষমা খুব চটেছে। বলেছে—এমন বাপের মুখ দেখতে নেই।

—বহুৎ আচ্ছা বাবা। মেয়ের বাপের কাছে,

শাট্‌আপ—ইউ বদমাস পাষণ্ড কোথাকার!

আমার মত বাপের কাছে এর চেয়ে সুসংবাদ আর কি হতে পারে। তা' চললাম আমি। তোমার বাবার সঙ্গেও দেখা-শুনো থাক।

চলে এসেছে সে রমেন্দ্রের সাইকেলখানায় সওয়ার হয়ে। বাড়িতে মনোরমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তুমুল ঝগড়া। কিন্তু মনোরমা পরম সহিষ্ণু মেয়ে—সে তুমুল ঝগড়াটার শব্দ বাড়ির বাইরে যেতে দেয় নি। প্রহার করেছে চক্কোত্তি; সে নীরবে সহ্য করেছে। এবং বারবার বলেছে চীৎকার করো না। মারছ মার, গাল দিচ্ছ দাও, কিন্তু আস্তে করে দাও। বলে চক্কোত্তির মদ্যভাণ্ডার থেকে মদ বের করে দিয়ে বলেছে—খাও। খোঁয়াড়ি ভাঙো। খুব আকণ্ঠ খাও। আমি কিছু ভাজাভুজি করে দিচ্ছি। তারপর ঘুমোও! যা করেছ কুটুম্ব বাড়িতে তা আজকেই আসবে গাঁয়ে। নিজে চীৎকার করে সেটা জানিয়ে কি ফল হবে? নাও মদ খাও। সেটা পরশুদিনের কথা।

গতকাল একজন লোক এসেছিল সাইকেল নিতে। ক্ষমার লেখা চিঠিও সে নিয়ে এসেছিল। ক্ষমা লিখেছে—'অষ্টমঙ্গলায় আমার যাওয়া হইবে না। সাইকেলখানি ফিরাইয়া দিয়ো।' চক্কোত্তি লোকটাকে বাইরে থেকেই ভাগিয়ে দিয়েছে।

—ভাগ! যা বাড়ি যা।

—সাইকেল—

—সে আমি গিয়ে দিয়ে আসব।

—বাবুর খবে—

—হোক রে বাবা হোক অসুবিধে। বেশী হয় তো একখানা কিনতে বলগে। বেশী তাঁদড়ামি করবি তো চড় খাবি। যা।

সেই সাইকেলে চেপেই সে এসেছে আজ। মায়ের থানে ঢুকে সাইকেলে তালাচাবী দিচ্ছে সেই সময়েই শিবনাথ দে মা চন্ডীর স্থানে তার নৈমিত্তিক প্রণামটি সেরে বেরিয়ে এসেছিল। দে তার সেই শান্ত ভঙ্গিমায় বলেছিল—আরে বাপরে! চক্কোত্তি! মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। বাজনা শুনতে পাও নি? তোমার মিল থেকে তো এক দৌড়ের পথ আমার গ্রাম। রাস্তাটাতে দেখা যায় গো। আলো দেখ নি?

প্রথমেই যেন খোঁচা বিঁধেছিল চক্কোত্তির ক্ষতস্থানে।

—চোখও আছে, কানও আছে, মিলে থাকলে দেখতে শুনতে পেতাম। কিন্তু গ্রামের ভিতরে যে—বিয়ের বাড়া কান্ড আমাদের—

—তা হলে তো বৃষোৎসর্গ!

—না। দান সাগর। তোমার ওই মেয়েটি ভাল মেয়ে। প্রশংসার মেয়ে। আমরা সকলে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেছি। বেশ তো শিখুক লেখাপড়া! তোমার দায় খালাস হয়ে গেল তাকে দিয়ে। ছোট মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেল। সাইকেলটি দেখছি রমেনের। চিনি সাইকেলখানা। ভালো সাইকেল। দামী জিনিস। তা ওটি দাক্ষিণে পেলে বুঝি?

আর সহ্য হয়নি অমর চক্কোত্তির—সে চীৎকার করে উঠেছিল, শাট্ আপ—ইউ বদমাস পাষন্ড কোথাকার!

হেসে ফেলেছিল দে।—আরে—হঠাৎ শাট্-আপ-টাপ কেন হে!—কি হল কি অন্যায় বললাম?

—আই সে—ইউ শাট্ আপ! বেরিয়ে যাও এখান থেকে—বেরিয়ে যাও। আমি এখানকার পান্ডা আমি বলছি তুমি বেরিয়ে যাও। তুমি পাষন্ড—তুমি ভন্ড—তুমি ঠগ—তুমি—তুমি রক্তচোষা মহাজন এক্সপ্লয়টার বেরিয়ে যাও তুমি।

দে'র মুখের উপর থেকে একটি অদৃশ্য আবরণ যেন উঠে গেল। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, চোয়াল দুটি শিবনাথের চওড়া—সে দুটো শক্ত হয়ে উঠল, চোখের তারা দুটি বারেকের জন্য স্থির হল। সে দাঁড়িয়েছিল, দাওয়ার উপর বসল—বসে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললে—চন্ডীমায়ের স্থান এখানকার জনসাধারণের, জনসাধারণ ম্যানেজিং কমিটি করে তার উপর সব ভার দিয়েছেন। আমি কমিটির একজন সভ্য। তোমরা পান্ডা—সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুযায়ী তোমরা সেবক দেবতার। সেবক মানে চাকর। সেবায় ত্রুটি হলে সেবককে সাসপেন্ড করতে পারি, বরখাস্ত করতে পারি। তুমি দেবতায় বিশ্বাস কর না। মাচন্ডীর পিঠে তুমি কিল মেরেছিলে। তখন তোমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। আজ তুমি এসেছ—উচ্ছিষ্ট অশুচি কাপড় জামা পরে। তোমার কাপড়ে জামায় ওই দেখ—এঁটোর দাগ লেগে। মদের গন্ধও উঠছে মনে হচ্ছে। তোমাকে আমি সাধারণের দেবস্থান—এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলছি না, বলছি তুমি মন্দিরে ঢুকবে না। আর—রাজ পুরোহিত মশায়! কোথায় গো! শুনুন একবার! দেখুন—ম্যানেজিং কমিটির সভ্য হিসেবে অমর চক্কোত্তিকে আমি সাস্‌পেন্ড করে গেলাম। আমদানীর ভাগ উনি পাবেন না আজ থেকে। ওর ভাগের পয়সা টাকা মায়ের ভাগের সঙ্গে জমা থাকবে। কমিটিতে পেস করে যা হয় স্থির হবে। কমিটি আমার প্রস্তাব বাতিল করেন উনি সব ফেরৎ পাবেন। আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়—উনি সেবক পদ থেকে বরখাস্ত হবেন। তারপর মামলা মকদ্দমা যা করবার করবেন। আমরা লড়ব। বলে রাখলাম খরচ আমি দোব। আচ্ছা, আমি চললাম।

সেই ধীর পদক্ষেপেই শিবনাথ দে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। সকলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। চক্কোত্তি পর্যন্ত। শিবনাথ দে কথা বললে বিশেষ করে আইন দেখিয়ে এমনি সুরে কথা বললে—লোকে থমকে যায়। কারণ তার ধ্বনির গাম্ভীর্য আছে যা নিরেট ভারী বস্তুর ধ্বনির মত। উচ্চ নয় কিন্তু নিষ্ঠুর এবং দৃঢ়।

কয়েক মুহূর্ত পরেই চক্কোত্তি সম্বিত ফিরে পেয়েছিল। তার মোহ কেটেছিল। সে বলেছিল—দেখা যাবে! জনসাধারণের মন্দির—জনসাধারণ দখল করে নেবে। সে খেল্ অমর চক্কোত্তি খেলতে জানে।

—হ্যাঁ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ! তা বেশ! দেখা যাবে।

আরও দুপা গিয়ে দে ঘুরে দাঁড়িয়ে সদাস্য মুখে বলেছিল—নসুবালার নতুন ভাদু গান শুনেছ? 'ভাদু আমার বিয়ে করবে না?' শুনো—কাল শুনো। একটু খুঁত আছে আজ পর্যন্ত। ওকে ওই চমৎকার সাইকেলখানার কথা বলে দেব। গেঁথে নেবে। ওটা সে জানে না।

অমর চক্কোত্তি জোর করেই সেই কাপড়ে— সেই অবস্থাতেই মন্দিরে ঢুকে মায়ের মাটির স্তূপের দেহ থেকে সিঁদুর নিয়ে কপালে পরেছিল, জঙ্গলের ভিতর থেকে বুনো বেল ফুল অপরাজিতা ফুল এনে চেপে বসে— পুজোর অভিনয় করে চোখ মুজে বিড়বিড় করে মন্ত্রপড়ার ভঙ্গিতে ঠোঁট নেড়েছে—:

—মাট্যাঃ চিপয়ে নমঃ মাট্যাঃ চিপয়ে নম। মিথ্যায় নমঃ। বোগাসায় নমঃ।

এ মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করতে তার পেটের ভিতর হাসির একটা আবর্ত ঘুরপাক খাচ্ছিল; কিন্তু সে তা সম্বরণ করলে; এ ক্ষমতা তার আছে। ইলেকসনের সময় সে যখন রামদাস মহাবীরকে রুদ্র দেবতা বলে অভিহিত করে বক্তৃতা করে তখন তাদের গ্রামের মুখপোড়া-বীর হনুমানটার কথা মনে পড়ে এমনি হাসি বুকে পেট তোলপাড় করে আবর্ত তোলে। কিন্তু তার বক্তৃতা ব্যাহত হয় না। থিয়েটারে যাত্রায় সে অভিনয় করে এটা আয়ত্ত করেছে।—গম্ভীর মুখে গাঢ় ভক্তি গদগদ কণ্ঠে জয় মা—। নে মা! বলে ফুলের অঞ্জলি ছিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সে। এবং সাইকেলের চাবী খুলে চেপে সবরেজেস্ট্রী আপিস যাবার পথে—চৌমাথায় একটা সাঁকোর প্যারাপেটের উপর পা-রেখে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলেছিল—পাষণ্ড রক্তচোষা মহাজন শিবনাম দে—যে ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার —সে কমিটি দেবস্থানের কমিটি হতে পারে না। আমরা যতকাল চণ্ডীতলার সৃষ্টি ততকাল চণ্ডীর সেবায়েৎ পান্ডা। ওই শিবনাথ দে আমাকে সাসপেন্ড করবে? আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে ঠাট্টা করবে? বলে কিনা —সেই নসুটাকে দিয়ে গান বাঁধিয়ে গাওয়াবে!

বাড়ির জানালায় বসেই শুনেছিল সতীশ। সে চীৎকার করে বললে, গাওয়াবে নয়। গাওয়াচ্ছে!

অমর চক্কোত্তি শব্দ অনুসরণ করে দেখতে পেলে সতীশকে। সতীশ বললে, আমি যাচ্ছি দাঁড়াও। যাচ্ছি!

লাঠি ধরে এসে সতীশ ওই সাঁকোর প্যারাপেটের উপরে দাঁড়িয়েই শুরু করলে— একটা ছোট জাত একটা ব্রাত্য একটা নপুংসক —তার এ সাহস কোথা থেকে হয়? কি করে হয়? ব্রাহ্মণ ভদ্র রাজনৈতিক কর্মী— তার কন্যা—হয় তো সে ভুল করেছে—সে ভুল অবশ্যই শোধরাবে। কিন্তু তার নামে গান বেঁধে এমনভাবে নেচে বেড়াবে এই অন্যায়ের প্রতিকার হবে না? তাকে দেবে না সমাজ? না দিলে সবারই এই দশা হবে। এক দশা। এর মূলে আছে ধনীর চক্রান্ত। উস্‌কানি। হায় দেশ। হায় স্বাধীনতা! ভেকে পদাঘাত করছে গোক্ষুর সর্পের মাথায়!

বি-ডি-ও সাহেব—দেখুন, স্বাধীন রাজ্যে এ অঞ্চলের উন্নতি করতে এসেছেন আপনি— আপনি দেখুন কেমন—কেমন উন্নতি হচ্ছে। আপনি বসে আছেন মাটির পুতুলের মত। ধনী—ধনী আছে যে পিছনে। চমৎকার স্বাধীনতা। আর এই সব যুবক—। স্বাধীন দেশের যুবক। নির্বীর্য মূর্খ সব। শুনেছে। হাসছে! হেসো না। হেসো না! আসছে তোমাদের মাথায় পদাঘাতের দিনও আসছে। একটা ছোটলোককে শাস্তি দিতে পারে না এরা।

একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললে—সে দিন আপনি কি বলেছিলেন? আজ উল্টো বলছেন কেন?

—কি? কি উল্টো বললাম।

—সেদিন গোপাল চৌধুরীকে ন্যাড়া মেরেছিল—আমরা বলছিলাম ন্যাড়াকে ধরে এনে শাসন করা উচিৎ—করব আমরা। আপনি আজকের মতই জানালা থেকে নেমে এসে ঝগড়া করেন নি আমাদের সঙ্গে? বলেন নি—ঠিক করেছে ন্যাড়া। নতুন-কালের অগ্রদূত সে। শোধ—শোধ—প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে। অনেক মার তারা পুরুষাণুক্রমে খেয়েছে—আজ শোধ নেবে না? ছোটলোক! কে ছোটলোক? মানুষ; বলেন নি আপনি? আজ নসুকে বলছেন—ছোটলোক! কেন বলছেন?

—তুমি মূর্খ—তুমি মূর্খ, তুমি মূর্খ! তুমি শুনেছ সে ছড়া গান? সে প্রহারের চেয়েও মর্মান্তিক! লজ্জার কথা! ঘৃণার কথা!

—না। সে গান আমরা শুনেছি। কোন অপমান সে করে নি। মেয়েটির সে প্রশংসা করেছে। রমেন আচার্যিকে শুধু খানিকটা ঠাট্টা করেছে। আর ওই চক্কোত্তিকে—!

কই চক্কোত্তি? চক্কোত্তি এই অবসরে সরে পড়েছে। চলে গিয়েছে। সে বুদ্ধি রাখে। সতীশ ঘোষালকে সে জানে। জানে —ঘোষালের হাঙ্গামা বাধাবার পারঙ্গমতা। এবং হাঙ্গামায় সে লাভবান হবে না তাও জানে। এবং এতক্ষণে তার মন শান্ত হচ্ছে ক্রমশ—সে বুঝতে পারছে সকালবেলা সে উত্তেজিত না হলেই ভাল হত।

কে বললে— চক্কোত্তি পালিয়েছে। এখন যে-যার বাড়ি যাও। ঘোষাল আর বকে শরীর খারাপ করো না!

—করব না? হোয়াট ডু ইউ মীন? ডু ইউ মীন টু সে—দ্যাট আই কেয়ারড্ টু সাইড উইথ দ্যাট বাগার চক্কোত্তি? আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি। আমার ক্ষমতা থাকলে চাবুকে এই ধরনের অন্যায়কারী ওই নসুটার পিঠের চামড়া তুলে দিতাম।

—কই দিন। দিন চামড়া তুলে। এই নসুকে নিয়ে এসেছি আমরা। কই চাবুক আনুন।

ঘোষালের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সে এটা ভাবে নি। সত্য বলতে সে ভেবে কিছু করে না বা বলে না। জীবনের ব্যর্থতায় তার দুরন্ত ক্ষোভ মনের কন্দরে অবরুদ্ধ বাষ্পের মত ঘুরপাক খায়, যে কোন অজুহাতে সে ক্ষোভ বেরিয়ে আসে। কিন্তু তার অধিক কিছু না।

—নিন! মারুন!

ছেলে কয়েকটা না-ছোড়বান্দা যেন। তার কারণ আছে। সতীশ ঘোষাল ওদের সুযোগ পেলেই তিরস্কার করে। সুযোগ পেতে হয় না—সুযোগ খুঁজে নেয়। তাদের কথায়-বার্তায় অকস্মাৎ এসে যোগ দিয়ে তাদের তিরস্কার করতে শুরু করে।

ক'দিন আগে গোয়ালা দুধে জল দেয় এই

নিয়ে আলোচনার মধ্যে হঠাৎ ঘোষাল এসে গোয়ালার পক্ষ নিয়েছিল। এবং দুধের জলের জন্য দায়ী বড় ব্যবসায়ী শিবনাথ দে এইটেই প্রমাণ করতে চেয়েছিল সে। শিবনাথ দে চালে কাঁকর মেশায়,—ডালে ভেজাল দেয়, তেলে ভেজাল দেয়, ঘিয়ে চর্বি দেয়—তাতে দোষ হল না—দোষ হল গোয়ালার? আই—আই স্ট্যান্ড ফর হিম, দি গোয়ালা!

ব্যাপারটার ওখানেই শেষ হয় নি, সতীশ ঘোষাল তার জের টেনেছে 'কোপাই' পত্রিকা পর্যন্ত। তার নিজস্ব ধারায় সে একটি প্রতিবাদপত্র ছড়ায় রচনা করে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিল। চিঠিপত্রের (মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন) কলমে সেটি বেরিয়ে গেছে। দু তিন দিন আগেই পত্রিকাখানি নিয়ে এই পাঁচ মাথার মোড়ে এই প্যারাপেটে বসেই সতীশ ঘোষাল উচ্চ কণ্ঠে পড়ে শুনিয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে তার এক রসিকতা পটু (রসিক নয়) রূপ বের হয়। সে বসেই উচ্চকণ্ঠে বলে—অব ধা-ন। অব ধা-ন! নাগরিকগণ শ্রবণ করুন।

"চালে কাঁকর—ডালে কাঁকর
গব্য ঘৃতে চর্বি—
যা—যা—যা—যা ছোঁড়ারা
যা পারিস তা করবি।
কালো বাজার আলো করে
আসছে টাকা দেদার—
এতে ওতে চাঁদা বলে
ভাগা কিছু নে-তার।
ধমকে মারেন ছোকরা দিগে—
সব বাজারের সবু নাগ—
চাঁদা ভাগা না-নিবি তো
জ্বালাস নেকো জলদি ভাগ।
সাহেব গেল সুবো গেল
যত কালকের ছোকরা—
ভেজাল বলে চাঁচাস নেকো
করিস নেকো ন্যাকরা।
লেখায় ভেজাল পড়ায় ভেজাল
পাশ করা সব মুখ্যু।
গরুরা সব গরু হল
এই তো বড় দুঃখু।
হাকিম দিগে হুজুর বলে
চাকরী বরং করগে যা—
নেহাৎ লড়াই করবি যদি
গয়লা সাথে লড় গে যা।
গয়লারা সব ঘরে থাকে
দুধ বেচে গয়লানী
ব্রজলালা। জমবে ভাল—
ভান্ড ভেঙে খা ননী।
হায়রে কপাল ছোঁড়া রাখাল
ফাটিয়ে টেরী লম্বা—
মাতব্বরী করে বেড়ায়
আমরা হলাম খাম্বা।

নিচে ফুটনোট খাম্বা মানে থাম অর্থাৎ আমরা থাম হয়ে গিয়েছি। বোবা—জড়। দেখে শুনে—দেখে শুনে লজ্জায়।"

সবু নাগ, শিবু দে। তার সঙ্গে সতীশের ঝগড়া অনেক দিন থেকে। শুধু শিবু নাগ নয়—গন্ধ বণিকদের ভুলু দত্তের সঙ্গেও তার দীর্ঘকালের বিবাদ। এবং সব বিবাদের পিছনে কি আছে সে নতুন কালের ছেলেরা জানে না। কিন্তু ঝগড়াগুলির উপলক্ষ্য সতীশ ঘোষালের পথের ঝগড়া। পথ নিয়ে ঝগড়া। ভুলু দে তার একটা পথ বন্ধ করেছিল। সে অনেক দিন আগে। তখন শিবু দে তাকে সাহায্য করেছিল। সে পথ ঘোষাল পেয়েছে। এখন আবার একটা নতুন ভিটে কিনেছে শিবু দত্ত, তার ফলে সতীশের বাজারের দিকে আসবার একটা সহজ গলিপথ বন্ধ হয়েছে। তার মামলা চলছে।

শিবু দে-র সম্পর্কে কোন মোহ কোন কারণেই এ গ্রামের লোকের নেই। শিবুদের নিজেরও নেই। তাকে ভালো লোক—অর্থাৎ মহৎ লোক ভাবুক লোকে এ সেও চায় না গ্রামের লোকও তা ভাবে না। পথের মূল ঝগড়াটা পথ নিয়ে নয় একটা নালা নিয়ে। ঘরের জল নিকাশী নালা। আগের কালে শুধু বর্ষার জল বের হত। স্নান ছিল পুকুরে, এমন কি চব্বিশ ঘণ্টার জল আচরণ তাও চলত খিড়কীর পুকুরে! সেটা একেবারে বাড়ির দোরে নাও হতে পারত! তবু লোকে খেয়ে হাত ধুতে যেত সেই পুকুর ঘাটে। এখন বাথরুমের রেওয়াজ হয়েছে—বাড়িতে ইন্দারা হয়েছে সুতরাং বাড়ির ভিতর জল অহরহ পড়ে। উঠোন সিমেন্ট বাঁধানো। জল চব্বিশ ঘণ্টা নিষ্কাশন পথ খুঁজছে বের হচ্ছে। এই নালা বন্ধ করবার জন্য লাগল সতীশ। দরখাস্ত—। সত্যাগ্রহ। শেষ কাগজপত্র ঘেঁটে শিবু দে গোটা পথটাকেই বন্ধ করে দিলে। গ্রামের কেউ খুশী হল না। তবে সতীশ ঘোষালকে সহানুভূতি দেখিয়ে তার কাছে বা পাশে দাঁড়াতেও কেউ এল না। **সেও ঘোষালের প্রয়োজন নেই। সে তাই**

বলে। এবং কাঁটা গাছে যে ফুলই ফুটুক, তাতে কোল দিতে কেউ আসে না। এই কারণেই সতীশ ঘোষাল আজ অমর চক্কোত্তির পক্ষ নিয়েছে। শিবু দে-র সংশ্রব ছিল সুতরাং নেমে এসেছে তৎক্ষণাৎ। এবং শিবু দে যেহেতু বলেছে যে, নসুকে দিয়ে ভাদু বানিয়ে গাওয়াবে—সেই হেতু সে নসুর এই ভাদুর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ করতে এসেছে। অন্যথায়, সে হয়তো নসুকে বাহবাই দিত। প্রথম শুনে তো সে মনে মনে হেসে ছিল।

* * *

নসুকে যখন সামনে ধরে ছেলেরা বললে—কই মারুন। বের করুন চাবুক! তখন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল সকলের দিকে। তার একবার ইচ্ছে হল সে একটা হুঙ্কার ছাড়ে—যে হুঙ্কারে এখানকার সমস্ত লোক মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যায়। কিন্তু সে হুঙ্কার করবার শক্তি তার নেই। এবং মুহূর্তে মুহূর্তে একটা ভয়—তার সঙ্গে লজ্জা—দারুণ লজ্জা, তাকে যেন নাগপাশের মত জড়িয়ে ধরছে। একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা তার মনের সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হচ্ছে। সে তা' অনুভব করছে। তার এবার ইচ্ছে হল—সে হা-হা শব্দে হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। সে কান্নায় সব সব গাছ পাথর বেদনায় গলে যায়। কিন্তু তাও সে পারছে না। লজ্জার নাগটা তার কণ্ঠরোধ ক'রে চোখের সামনে ফণা তুলে দুলছে—না—না—না বলে দুলছে। পৃথিবী দুলছে।

পৃথিবীর কেউ তাকে বোঝে না। নিষ্ঠুর পৃথিবী! নিষ্ঠুর!

সে পড়ে যেত। তাকে কেউ ধরলে। ধরলে দেবব্রত চক্রবর্তী।

—করছেন কি আপনারা! দেখছেন না পড়ে যাবেন! সরুন সরুন। দয়া করে রাস্তা ছাড়ুন।

আশু সিংহী ডাক্তার। কাছেই তার ডাক্তারখানা। গোলমাল শুনে প্রথমটা সে বেরিয়ে একবার এসেছিল। তখন অমর চক্কোত্তি গালিগালাজ করছিল। তাতে শুনবার কিছু ছিল না। এবং বিস্ময়ের কিছু ছিল না। বরং কৌতুক বোধই করেছিল—সীমাকে যারা আশ্রয় দিয়েছে সেই কমলাদি আর হেডমিস্ট্রেস রত্না বসুকে ছেড়ে শিবনাথ দেকে নিয়ে পড়ায়। কম্পাউন্ডারকে বলেছিল, এস—এস ভেতরে এস। ও আর কি শুনবে?

তারপর সতীশ ঘোষালের কণ্ঠস্বর পেয়েও বিস্মিত হয়নি। হেসে কম্পাউন্ডারকে বলেছিল—

—ঘোষাল এল।

সেও হেসে বলেছিল—হ্যাঁ।

—আগুন জ্বললে—উনপঞ্চাশ বায়ু আসবেই। কথাটা বললে দেবব্রত চক্রবর্তী। এখানকার বাসিন্দা বটে, কিন্তু আগন্তুক চন্দনপুরের অধিবাসী নয়। শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ লম্বা মানুষ। সে বসেছিল আশু সিংহীর ডাক্তারখানায়।

আশু বলেছিল—খুব বলেছেন—সাক্ষাৎ উনপঞ্চাশ বায়ু। একে সতীশ ঘোষাল তার উপর শিবনাথ দে'র নাম। আর রক্ষা আছে! যাক। কে আছে বাইরে। এস—এস। আমাকে আবার দেবব্রতবাবুর সঙ্গে যেতে হবে। এস এস।

রোগী দেখছিল আশু। হঠাৎ কোলাহল প্রবল হল। হঠাৎ সতীশ ঘোষালের কণ্ঠস্বর নীরব হল। বাইরে থেকে কে বললে—গেল—গেল বোধ হয়। বেচারা রোগা মানুষ। থরথর ক'রে কাঁপছে।

সত্যই হুঙ্কার দিতে পারেনি, কাঁপতে পারেনি—ঘোষাল কিন্তু মর্মান্তিক ক্ষোভে দুঃখে অসম্মানে থর থর ক'রে কেঁপেছিল—কেঁপেছিল আপন অজ্ঞাতসারেই। চেয়েছিল সে পাথর হয়ে যেতে কিন্তু মানুষ পাথর হয় না।

দেবব্রত এবং আশু, দুজনেই বাইরে এসে ওই অবস্থা দেখে এক সঙ্গেই লাফ দিয়ে

মা —শ্রীইন্দ্র দুগার

পড়েছিল বারান্দা থেকে। দুজনেই তরুণ। ছুটে গিয়েছিল এগিয়ে। আরও একজন এসেছিল ওপাশ থেকে সুরেশ্বর মুখুজ্জে—সতীশের আত্মীয় প্রতিবেশী। প্রৌঢ়ত্বও পার হয়েছে কিন্তু এখনও সক্ষম এবং স্বাস্থ্যবান। মানুষটির রঙটি কটা। দূরে থেকে রঙ দেখে চেনা যায়। সে বলেছিল—করছ কি? তোমরা করছ কি?—না—না। বলতে বলতে দেবব্রত এসে পতনোন্মুখ সতীশকে ধ'রে ফেললে।

ওপাশ থেকে সুরেশ্বরও ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হল—সতীশ! সতীশ!

সতীশের ঠোঁট দুটি কাঁপল। চোখ থেকে দুটি ধারায় জল গড়িয়ে পড়ল একটিবার। দুবার নয়।

(সাত)

কিছুক্ষণ পর সুস্থ হলে—সুরেশ্বর সতীশকে বাড়ী নিয়ে গেল। আশু বললে ভয় নেই। তবে এখন তিনচার দিন ওঠা হাঁটা বকাঝকা করবেন না।

সুরেশ্বর বললে—শুনলি তো!

গম্ভীরভাবে সতীশ বললে—শুনলাম।

—হাঁ। চল তা হ'লে বাড়ী চল। ডাক্তারের কথা শুনে ঘরে শুয়ে থাকবি। কি দরকার তোর এই সব গাঁয়ের লোক শাসনে বল তো!

—তুমি বুঝবে না। গোলামী ক'রে ক'রে মনটা তোমার গোলাম হয়ে গিয়েছে।

সুরেশ্বর বললে—মারে গালে ঠাস ক'রে এক চড়!

সতীশ বললে—তা তুমি মারতে পার। তুমি গুরুজন। কিন্তু সত্য বলেছি আমি।

—বেশ। তাই হল। চোরা না-শোনে ধর্মের কাহিনী। চল বাড়ী চল—মা শুয়ে শুয়ে চেঁচাচ্ছে—ওগো সতীশকে আমার বাঁচাও গো। পরিবার বেচারা গলিরমুখে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আমি মাঠ থেকে এসে শুনে ছুটে আসছি।

সুরেশ্বর একটি নির্বিরোধী মানুষ। যা সংসারে বিরল। একান্তভাবে নিস্বপ্রায়—মধ্যবিত্তের ঘরে জন্ম; লেখাপড়া সেকেন্ড ক্লাস পর্যন্ত; কিন্তু দুটি জিনিস তার সম্বল ছিল—অটুট সবল স্বাস্থ্য। সে স্বাস্থ্য হিংসা করার মত স্বাস্থ্য। একাল হ'লে সে অলিম্পিকে যেতে পারত। সে যোগ্যতা তার ছিল। দৌড়ে, হাই জাম্প—লঙ জাম্প ফুটবলে আশ্চর্য কৃতিত্ব ছিল। আর ছিল—কর্মে নিষ্ঠা এবং এই নির্বিরোধী চরিত্র মাধুর্য। এই দুটি মূলধনেই সে এখানকার এই চন্দনপুরের সামন্ততন্ত্রের শেষ ব্যাঘ্র বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর বড়বাবুর অধীনে কাজ করেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। ঢুকেছিল সামান্য বেতন পাঁচ টাকায়। শেষ সে হয়েছিল হিসাব বিভাগের কর্তা। শুধু জমিদারী নয় তার সঙ্গে ব্যবসা। বিরাট ব্যবসা। বেতন হয়েছিল দেড়শো টাকা! দেশ স্বাধীন হল তার সঙ্গে একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য রেখে এই সামন্ততন্ত্রী ও ব্যবসায়ী পরিবারটি মুখ থুবড়ে পড়ল। তখনও সুরেশ্বর তাদের ছাড়েনি। তারপর ছেড়েছে। এমন এই নির্বিরোধী মানুষটি শুধু ওই একটি গুণেই গ্রামের মধ্যে সকলের কাছে ভালবাসার পাত্র হয়ে বেঁচে আছে। শ্রদ্ধাও আছে সে ভালোবাসার মধ্যে কিন্তু সে তা চায় না। শ্রদ্ধার প্রতি প্রতিষ্ঠা, সম্মানের প্রতি তার সত্যই মোহ নেই। সেই কারণেই সে অনায়াসে সতীশ ঘোষালের মত লোককেও বলতে পারে—মারে গালে ঠাস ক'রে এক চড়! এবং ওই কথার মিষ্টতার জন্যই সতীশের মত লোকও বলে—তা তুমি মারতে পার। তুমি গুরুজন!

পথে সুরেশ্বর বললে—দেখ তো কি কাণ্ড করলি?

—কি করলাম?

—কি করলি? মরতিস যে!

—মরতাম যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মত।

—কথায় বলে—লড়তে নাড়ে বন্দুক ঘাড়ে। তোর সেই বৃত্তান্ত। এদিকে তো ঠেঙা ভিন্ন হাঁটতে পারিস না। মরদ আমার লড়ুয়ে সেপাই! আর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক—কিসের জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলি? কার পক্ষ নিয়ে? অমর চক্রবর্তীর?

—তা ব'লে ছোট লোক—

—কে ছোট লোক? তুই নিজে কি বলিস? বলিসনি হাজার দিন—এই তো কালই বলেছিস—ওই গোপাল চৌধুরীর কথায়—ছোটলোক কেন বলবে—ন্যাড়াকে? ছোটলোক কিসের? গরীব বলতে পার। বলিসনি?

চুপ ক'রে রইল সতীশ এবার। সুরেশ্বর বললে—আসল কথা শিবুদের নাম।

সতীশ ফোঁস করে উঠেছিল—কিন্তু সুরেশ্বর বললে—চুপ কর।—এত লোকের সামনে আর—থাক।

বি—ডি—ওর সামনে তখন লোকারণ্য। দূরে একটা প্রবল সমবেত কণ্ঠের চীৎকার শোনা যাচ্ছে। মিছিল আসছে। কম্যুনিস্ট এম-এল-এ মিছিল নিয়ে আসছে—শোন আদায়—

—বন্ধ করো বন্ধ করো।

—ইনকিলাব—

—জিন্দাবাদ।

* * *

আশু সিংহী চলেছিল দেবব্রতের সঙ্গে। চন্দনপুরের প্রান্ত কোপাই নদীর ধারে—ছোট একটি আশ্রম তার। উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে এসে এখানে কিছুদিন ছিল চণ্ডীতলায় তারপর নিয়েছিল চাকরী—চাকরী নিয়েছিল ওই বড়বাবুদের পড়ো এস্টেটে। তারপর ওদের কাছে জমি নিয়ে আশ্রম করেছে। একা মানুষ। ওখানে আছে বাগ্দীপল্লী, তাদের মধ্যেই বাস করে। নাইট ইস্কুল করেছে, নিজের হাতে গরু আছে—কিছু জমি আছে, চাষ করে, মুরগী হাঁস পোষে আর পড়ে। বাগ্দীদের সুখ দুঃখের ভাগ নেয়। আগেকার কাল হ'লে লোকে বলত এনার্কিস্ট। এখন সহজে বলে কম্যুনিস্ট। দেবব্রত নিজে বলে—না। তা আমি নই। হ'লে বলতাম। ওতে লজ্জাও কিছু নেই ভয়ও নেই। কারণ স্বদেশী রাজ্যে যদিই ধরে তবে দশ পনের দশ আনা নয় অনেক বেশী খরচ করে আরামে রাখবে এবং অসম্মান করবে না। প্রশ্ন অনেকে করে—তবে আপনি কি? কেন; এইভাবে রয়েছেন—কেন?

দেবব্রত বাঁকা জবাব দেয় না, সোজা জবাব দেয়। দেখুন, আমি গোড়া থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে মানুষ। আমার ভাল লাগে।

তবু সন্দেহ মেটে না—সন্দেহ এও অনেকে করে যে, এইভাবে ওদের মধ্যে থেকে—হয়তো একদা ওদের ভূ-সম্পত্তি গ্রাস করবে। কেউ সন্দেহ করে হয় তো ব্রাত্য নারী বিলাস অন্যতম কারণ। কেউ অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দেখতে পায়, একদিন ওই লোকটি এখানকার এম-এল-এ হয়ে দাঁড়িয়ে ধ্বনি তুলেছে—ইনকিলাব—

লোকে বলছে—জিন্দাবাদ।

এখানকার কংগ্রেসী প্রধান ভবানী কিঙ্করের সঙ্গে যথেষ্ট প্রীতি কিন্তু দেবব্রতের। বিশেষ করে একটি জায়গা আছে যেখানে উভয়ে এক নেশায় আসক্ত দুই নেশাখোরের মত বন্ধু। সেটি হল ফুলের চাষ। ভবানী কিঙ্করের পৈতৃক বাড়ীর ঘর যত ভাঙছে তত জায়গা বাড়ছে এবং তত সে ফুলগাছ লাগাচ্ছে। দেবব্রতের জায়গা অনেক—। পড়ো প্রান্তর। তার মধ্যে ফুলের বাগান সেও করে। এ ওকে চারা দেয়—ও একে চারা দেয়। বিশেষ ক'রে ডালিয়া।

আজ একটি ব্রাত্য চাষীর অসুখ কঠিন হয়েছে তাই সে আশু সিংহীকে নিয়ে

যাচ্ছে। প্রৌঢ়েরা বয়স্কেরা বিষয়ীরা যে -সন্দেহই করুক দেবব্রতকে—গ্রামের তরুণেরা দেবব্রতকে ভালবাসে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তার অনেকের সঙ্গে।

দুজনেই সাইকেলে চলেছিল। সকালের এই ঘটনাটির সঙ্গে দুজনেই খানিকটা জড়িয়ে গিয়েছে। কথা ওই নিয়েই হচ্ছিল। পথে আজ ভিড় অনেক। বি-ডি-ও অপিসের ভিড়—হাটের ভিড়—মিছিলের ভিড়। এখানে এম-এল-এর যেখানে যত কর্মী আছে সকলেই কিছু লোক এবং লাল ঝাণ্ডা নিয়ে আসছে। ধ্বনি দেবে—তারপর মিটিং হবে।

দেবব্রত বললে—আর বেশী একটু হলেই ভদ্রলোক বোধহয় মারা যেতেন—না?

আশু বললে—ব্লাডপ্রেসার আছে। বলা তো যায় না! তা, প্রেসারের চেয়ে মনের ব্যাপারটাই ওঁর বেশী। কমপ্লেক্সেই খেলে ওকে। কমপ্লেক্স, ফ্রাস্ট্রেশন দুই মিলে—উনি এমন হয়েছেন! হাটিতে সম্ভবত উনি বেশ পারেন—তবে মনের ধারণা হয়ে গেছে—পারেন না। না ধারণা করেও উপায় নেই। কারণ উনি তো সবই পারেন বা পারতেন—কেবল রোগের জন্যেই পারছেন না।

দেবব্রত বললে—অমর চক্রবর্তী কিন্তু লোক সে কখন সরে পড়েছে।

—নিশ্চয়! পলিটিক্স করে। সে উদো—তার পিণ্ডি যখন বুদো খেতে বসেছে তখন তো সে বেঁচে গেছে। আবার থাকে! এ্যাণ্ড হি সেণ্ডেড ইট। সে তো জানে যতই সে শিবুদের নাম করে গাল দিক—মেয়ে যখন তার এখানে—তার জোর ক'রে বিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে—পেয়েছে, তখন সে এখানে কোন সিম্প্যাথি পাবে না!

—জাঁদরেল মেয়ে।

—মেয়ে ভাল। পড়ায় ভাল; দু বছর ফেল করলে তার কারণ বাপ। মেয়েটি সাইকেল চেপে ইস্কুল আসত। এই চন্দনপুরে। তা থেকেই বুঝছেন দুঃসাহসিকা! হেসে বললে—কে জানে ঠিক হল কিনা!—তা' বাপ পড়তে সময় না দিলে কি করবে? বই না পেলে কি করবে? মেয়েটি গান গায় ভাল। বাপও কৃতী লোক। অনেক পার্টস ছিল। তিরিশ সালে জেল হয়েছিল। দেশপ্রেম ছিল। থিয়েটার করত ভাল। গান জানে। তারপ ছেতরে গেল। বেয়াল্লিশ থেকে হল কম্যুনিস্ট। তারপর বাহান্ন সালে কংগ্রেস। মেয়েটিকে গান শিখিয়েছিল। মিটিংয়ে নিয়ে যেত—গাইত। মিটিংএ মিটিংএ ঘুরেছে মেয়ে। ও তো বাপের বিদ্যের গোড়া পর্যন্ত যায়নি। সে আদর্শবাদে মশগুল। ও মশাই আগুন হবে দেখবেন। মেয়ে থিয়েটার ক'রে ভাল। আরে—আরে—। গরু জোড়াটা সামলাও ভাই গাড়োয়ান।

সামনে কয়েকখানা গাড়ী যাচ্ছে। তরকারী বোঝাই গাড়ী। একজন গাড়োয়ান কিছুতে তার গরুকে বাগাতে পারছে না। গরু দুটো চ'কে উঠেছে। আশু নেমে পড়ে বললে—নামুন। নেমে পার হওয়াই ভাল। একবার পোস্টাপিসটাও দেখেই যাওয়া।

—চলুন। আমারও পোস্টকার্ড কিনতে হবে।

পোস্টাপিসে এখন অনেক চিঠি, অনেক কাজ। প্রায় সত্তর আশী বছরের পুরনো পোস্ট অপিস। আগে অধীনে দুটি ব্রাঞ্চ অপিস ছিল; এখন নয় বারোটা। তার সঙ্গে টেলিগ্রাফ হয়েছে আজ কয়েক বছর। টেলিফোন হচ্ছে। আজ হাটবার—অনেক লোক আজ জাকাটাকাট পোস্টকার্ড কিনবে। জানালার গিয়ে দাঁড়ান। এবং নানান দাও বিপদ!

জানালার ধারে পোস্টমাস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আর্যকুমার রায় যথারীতি বক্তৃতা করছে। ইংরিজীতে বক্তৃতা—অর্থহীন বলেই মনে হয় কিন্তু অর্থ একটা আছে—

আই বেগ টু সে স্যার—ইউ পোস্টমাস্টার—দ্যাট—এ্যাক্ট ইন দি পোস্টাল ল—এ্যাণ্ড এ্যাক্ট ইন দি পেনাল কোড—অল লেটারস—রেজিস্টার্ড লেটারস—মানি অর্ডারস ইনসিওরস এ্যাড্রেসড এ্যাক্ট ইন দি নেম অব নিউইঞ্জল্যাণ্ড কোল কোম্পানী—এ্যাক্ট ইন দি নেম অব ইস্ট রায় ডি কলিয়ারী এ্যাক্ট ইন দি নেম অব পিওর রায় ডি কোল কোম্পানী এ্যাক্ট ইন দি রেজলুশন অব দিজ কোম্পানীজ শুড বি গিভন টু শ্রীআর্যকুমার রায়। এই 'অ্যাক্ট ইন দি'র সুতোয় গাঁথা একটি বক্তৃতা। এটি আর্যকুমার নিত্য পোস্ট অপিসে এসে একবার আউড়ে যাবে। এবং শেষে চাইবে—কি আছে দাও। থাকে না কিছুই। তখন এখান থেকে থানায় গিয়ে একবার এই বক্তৃতাই করবে। তার সঙ্গে থাকবে—এখানে পোস্টঅপিসে একটি ষড়যন্ত্র রয়েছে। যার জন্য তার প্রাপ্য চিঠিপত্র সব এরা দিচ্ছে ব্যানার্জি বাবুদের। নিশ্চয় ভাগাভাগি আছে। অবিলম্বে পোস্টঅপিসের পোস্টমাস্টার পিওন এমন কি বানার্জিদের পর্যন্ত এ্যারেস্ট করা হোক।

তারপর গিয়ে বসবে নিজের বৈঠকখানায়। বিড়বিড় ক'রে বকবে এবং রাস্তায় ভদ্রজন যাকে দেখবে—ডেকে বলবে—একবার পিরেটার করুন। আমার বইটা খুব ভালো হয়েছে। আপনার একটা ভালো পার্ট আছে।

আশু ডাক্তার ডাকবিলির দরজায় দাঁড়ানো এবং বললে—রোজ কি ভাল লাগে! কতক্ষণ আরম্ভ করেছে? শেষ হ'তে দেরী কত?

—আর মিনিট চারেক লাগবে!

—তোমাদের?
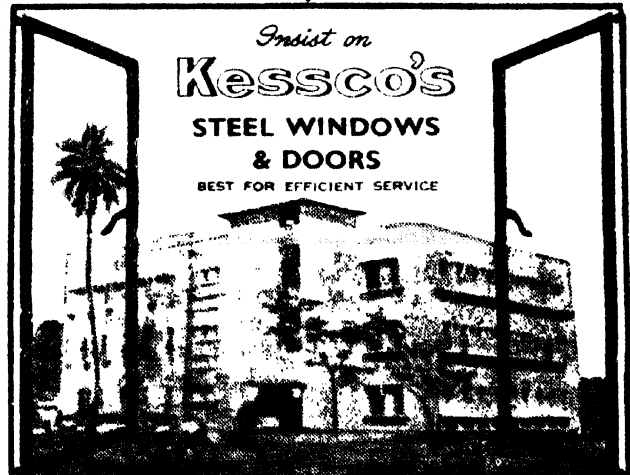
—আর হয়ে এল।

—কি বেরিয়েছে?

—আপনাদের না থাকে? কটা বিজ্ঞাপন তো থাকবেই।

ডাক্তারের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দরজায় ঝুঁকে প্রায় ঠেলে এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে।

—একটু সরুন।

ডাক্তার ঠেলা বা ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তের জন্য আধুনিকা মেয়েদের উপর বিরক্ত হল—নাঃ এরা বড়ই বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। কিন্তু তার ভাবনাটা শেষ হওয়ার আগেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে—টেলিগ্রাফ কখন থেকে হবে? কাউণ্টার কটার সময় থেকে খুলবে?

ডাক্তার কণ্ঠস্বর শুনে ঝুঁকে তার মুখের পাশটা দেখে সবিস্ময়ে বললে—নেলী?

গোপাল চৌধুরীর মেয়ে নেলী। নেলী নিজে পোস্টাপিসে,—টেলিগ্রাম!—মুহূর্তে প্রশ্ন বেরিয়ে এল মুখ থেকে—টেলিগ্রাম? বাবা কেমন আছে?

—ভালো! তারপরই বললে—সেই রকমই বিড়বিড় করে বকছে।

—ও ক্রমে ভাল হবে। কিন্তু তুমি নিজে এসেছ পোস্টঅফিসে। টেলিগ্রাফের সময় জানতে চাচ্ছ! ব্যাপার কি?

—কিছু নয়। দুটো টেলিগ্রাম করব।

—আরজেণ্ট না অর্ডিনারী। আরজেণ্ট হলে এখনি হবে।

—দুটোতে কত লাগবে?

—যা লাগুক, ভাবতে হবে না তোকে, দে আমাকে দে! নতুন কণ্ঠস্বর। পিছন থেকে বললে—কেউ।

আর কেউ নয়—নেলীর জ্ঞাতি কাকা। নিত্য চৌধুরী। আয় আমার সঙ্গে বাইরে আয়। ডাক্তার একটু এস তো ভাই। একটা টেলিগ্রাম ছকতে হবে। আমাদের তো বিদ্যে সেই সে আমলের ফার্স্টক্লাস পর্যন্ত। তাও বসে বসে—না-পড়ে সব ভুলে মেরে দিয়েছি। এস।

বাইরে এসে নিরিবিলি একটা কল্কে ফুলে গাছ তলায় দাঁড়িয়ে—নিত্যবাবু টেলিগ্রামের খসড়াখানা নিয়ে ডাক্তারের হাতে দিলে।

"শুভেন্দু ফ্রেড ফ্রম হোম—ক্যাচ হিম—ইফ হি গোজ টু ইউ। প্লিজ! এ্যান্ড ওয়্যার। গোপাল চৌধুরী।

আশু সবিস্ময়ে নিত্য চৌধুরীর মুখের দিকে তাকালে। সে দৃষ্টি তার সপ্রশ্ন। প্রশ্নটি মুখে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছে। কোথায় যেন একটা কিছু রয়েছে। যাকে যুক্ত করা যায় ওই অমর চক্কোত্তির পালিয়ে আসা কন্যাটির সঙ্গে। ফ্রেড কথার মানে কি তা নইলে?

নেলী মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে গর্ত করতে চাচ্ছিল। সেকালে হ'লে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারত—মনে মনে বলছে—মা ধরিত্রী গহ্বর বিস্তার ক'রে আমাকে গ্রাস কর, আমি মুখ লুকিয়ে বাঁচি। কিন্তু সে যখন ঘরের দেওয়ালের আত্ম-গোপনের আশ্রয় পরিত্যাগ করে এই সংবাদ 'তারে-তারে' দিগদিগন্তে ছড়াতে এসেছে—তখন ও কথা অচল। নিত্য চৌধুরী বললে—দেখ না বিপদের উপর বিপদ! দাদার ওই অবস্থা আর শুভেন্দু পালিয়েছে। কাল সিউড়ি গিয়েছিল—জমিদারের কম্পেনসেশনের আড়াইশো টাকা পাবার দিন ছিল। আজ সকালে ফিরবার কথা। তা আমাদের কর্মচারী মিশ্রও গিয়েছিল—তার হাতে দেড়শো টাকা আর এক চিঠি খামে ভরে দিয়ে বলেছে—আমি একবার কলকাতা যাচ্ছি। বলবেন বাড়ীতে। চিঠিতে লেখা—ভাগ্যের সন্ধানে আমি বাহির হইতেছি—আমার জন্যে ভাবিবেন না। ভাগ্য ফিরাইতে পারিলে ফিরিব। নহিলে মৃত্যুকালে শক্তি থাকিলে সংবাদ দিব। সুখেন্দুকে ভাল করিয়া পড়িতে বলিবেন। ইতি শুভেন্দু!

অবাক হবার কিছু নেই। শুভেন্দু থিয়েটার-পাগলা—ওই পাগলামীতেই পাশ করতে পারেনি। কিন্তু এ দিকে কোন বদ-খেয়াল অভদ্রপনা তার ছিল না। ডাক্তার থেকে পাঁচ বছরের জুনিয়র ছিল ইস্কুলে। বয়সে বছর তিনেকের ছোট। ডাক্তারদের সময়ে ইস্কুলের অভিনয় টিমে ওই ছিল হিরো। সে তাকে ভাল ক'রেই জানে। তার স্বপ্ন ছিল—সে সিনেমায় নামবে—কলকাতার থিয়েটারের অভিনেতা হবে। চেষ্টাও এর মধ্যে কম করেনি। ডাক্তার যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র তখন সে কলকাতায় গেলে তার হোস্টেলে যেত এবং গল্প করত—কোন কোন স্টুডিয়োতে গিয়েছিল—কার কার সঙ্গে দেখা হ'ল। কে কি বললে—সেইসব কথা। শেষ একবার বলেছিল—নাঃ। ও আর হল না। বুঝলি আশু!

সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেনরে?

—কাল যা দেখলাম ভাই! আর শুনলাম! নাঃ—!

—কি দেখলিরে—কি শুনলি!

শুভেন্দু বলেছিল—সে কাল গিয়েছিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বড় একজন অভিনেতা ডিরেক্টার সিনেমার গল্পকারের স্মৃতি সভায়। সভাপতি ছিল—তাদেরই শ্যামাকিংকরবাবু। আর বড় বড় ডিরেক্টার সিনেমা স্টাররা ছিল প্রধান অতিথি বক্তা—উদ্বোধক এইসব। সভার শেষে সে শ্যামাকিংকরবাবুর সঙ্গে দেখা করবে মতলবে গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। সভায় সিনেমাস্টার ডিরেক্টাররা শ্যামাকিংকরবাবুকে যে খাতির দেখিয়েছিল, তাতে তার ভক্তি বেড়েছিল শ্যামাকিংকরবাবুর উপর। এবং বুঝতেও পেরেছিল যে শ্যামাকিংকরবাবু যদি ভাল ক'রে বলে টেলে দেন—তবে নিশ্চয় সে পার্ট পাবে। ফিল্মেও পাবে—থিয়েটারেও পাবে। গেটের পাশে ভিতরে বাইরে লোকে জাম করে দাঁড়িয়ে গেছে। ফিল্ম ডিরেক্টারেরা বের হয়ে গেল—যেতে দিন—যেতে দিন। তাদের যেতে দিল—তবুও কাউকে বললে—ওরে—'রাধার' বাবা যাচ্ছে রে। মানে রাধা ছবির ডিরেক্টার। কাউকে বললে—'বড় বউয়ের' শ্বশুর যাচ্ছে। তারপর এক এক ফিল্ম এ্যাক্টর বেরোয় আর হৈ—হৈ ওঠে।—হা—! অমুক! ও দাদা! দাদামনি হে! এই যে—প্রেমের ঠাকুর! ও—কলাচাঁদ! শেষ কালে এল—সব থেকে বড় এ্যাক্টর। সে যেন ফুটবল ম্যাচে গোলে বল ঢুকে গেল!—এ—ই! তারপর সে যেন আমাদের দেশে নন্দোৎসবের নৃত্য। তিনি প্রথমটা হাসি-মুখে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। নমস্কার করলেন। বললেন—যেতে দিন দয়া ক'রে। কে কার কথা শোনে—? কেউ বলে—দাদা। কেউ বলে—ভাই ও ভাই। কেউ বলে—ও মানিক—কেউ কোন বইয়ের নায়কের নাম ক'রে ডাকে। কেউ গান ধরে দেয়—যে গান ছবিতে তার মুখে শুনেছে। তিনি এবার একটু কড়া সুরেই বললেন, এ কি? যেতে দিন! রাস্তা দিন। পথ ছাড়ুন। ব্যস—আর একখানা বল ঢুকল গোলে। রেগেছে। একজন এগিয়ে গিয়ে তার জামার হাত ধ'রে টানলে, কেউ টাই ধ'রে, কেউ কোটের পিছন ধ'রে। কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু এই সময় বেরিয়ে এলেন শ্যামাকিংকরবাবু। সঙ্গে আরও কয়েকজন নাম করা লোক। তাঁরা এসে হাত জোড় করে বললেন—পথ দিন। যেতে দিন। তারা শান্ত হল—পথ দিলে। যারা নাচছিল তারা আর একরকম হয়ে গেল। ও'রা বেরিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে পথ পেয়ে এ্যাক্টর ভদ্রলোকও বেরিয়ে গেলেন। এ'রা গাড়ীতে গিয়ে চড়লেন। চলে গেলেন। কিন্তু এ্যাক্টর ভদ্রলোকের পিছনে লোকে ধাওয়া করলে তাঁর গাড়ী পর্যন্ত। ইনি শ্যামাকিংকরবাবুর থেকে অনেক জনপ্রিয়। অনেক। অনেক। কিন্তু—।

ঘাড় নেড়ে শুভেন্দু বলেছিল—ভালোবাসা

প্রেম হলে রাহুর প্রেম। গিলে খায়। রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে—তোমার প্রেমে আঘাত আছে নেইকো অবহেলা। এদের ভাগ্যে দেখলাম প্রেমের সবটাই যেন অবহেলা না হোক ব্যঙ্গ কৌতুকে ভরা। শুধু চারজন বাদ। দেখেছি ভাদুড়ী মশাইকে। বাপরে—কি চাউনি!

একটু থেমে প্রসঙ্গটার অন্য পর্যায়ে এসে বলেছিল—শ্যামাকিংকরবাবুর বাড়ীও গিয়েছিলাম। খুব আদর করলেন। বললেন—কি খবর বল? আমি বললাম—সিনেমায় নামার কথা। তিনি বললেন—দেখ তুমি ভাল পার্ট কর আমি শুনেছি। কিন্তু সেখানকার ভালো এখানকার ভালো তো এক নয়, এটা তো মানবে। তা ছাড়া একটা গোড়ার কথা বলি। বলতো পৃথিবীতে নাচে কে—গায় কে? আমি হতভম্ব হলাম। কি বলছে?—তারপর বললাম—মানুষ! তিনি বললেন—না। নাচে রূপ—গায় স্বর—সুস্বর। কুস্বর যার তার গান কেউ শোনে না। আর যার রূপ নেই কুরূপ সে যতই ভাল নাচুক কেউ দেখে না। রূপের দুটো দিক—একটা স্বাস্থ্য—অন্যটা শ্রী-সুষমা। তোমার শরীর এমন রোগা তাতে কোন পার্ট করবে। আগে শরীর ভাল কর। আরও কথা আছে। পড়তে হবে। না পড়ে বড় অভিনেতা হওয়া যায় না। তোমাকে তো চরিত্রটিকে বুঝতে হবে—ক্যারেক্টার এ্যানালিসিস করে। পড়, শরীর ভাল কর। তা ছাড়া আরও একটা কথা বলি—।

ছবির নায়কের ছবির জীবন আর অভিনেতার বাস্তব জীবন এক নয়। মোট কথা—খুব সুখের ক্ষেত্র নয়। ছবিটা হয়তো স্বর্গ—কিন্তু অভিনেতারা মাটির মানুষ।

উত্তর কিছু দিতে পারেনি। ফিরে এসে পথে তার কাছে ওই কথাগুলি বলে বলেছিল।—নাঃ ও আর হ'ল না। বুঝলি আবু!

পরের বছর শুভেন্দু প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়ে পাশ করেছিল। কিন্তু বাড়ীর সামর্থ্যের অভাবে আর কলেজে পড়তে পারেনি। নানান চেষ্টা করেছে। অর্থোপার্জনের চেষ্টা। ব্যবসার যুগ। ব্যবসা করতে চেষ্টা করেছিল। এটা ওটা সেটা। কিন্তু সবেই ব্যর্থ হয়েছে। কিছুদিন চাষী হবার চেষ্টা করেছিল নতুন মতে। নদীর ধারে চৌধুরীদের অনেক জমি—সেই জমিটা কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে নদী থেকে জল তুলবার জন্যে মটর পাম্প কিনে চাষ করেছিল। ছোট একখানা ঘরও করেছিল। সেখানে সারাদিন থাকত। বই রাখত পড়ত। চাষে ফসলও ফলল। কুমড়ো কপি হল বড় বড়। এখানকার চণ্ডীতলার মেলায় এখন একজিবিশন হয়—সেখানে শুভেন্দুর কপি কুমড়ো ফার্স্ট হয়ে সার্টিফিকেটও পেয়েছিল। কিন্তু হিসেবনিকেশে

"লিখে যাব মরিবার মত রোমান্স নাই বলিয়াই মরিতেছি"

দেখা গেল—টাকার অনেক লোকসান ঠিক না হলেও,—পাম্পের দাম যা ইনস্টলমেন্টে দেবার কথা। সে সব বাকী পড়েছে—কোম্পানী আদালত মারফৎ নোটিশ করে পাম্প কেড়ে নিয়ে গেল, সময় তিনমাস রইল, যার মধ্যে টাকাটা শোধ করে ফিরে পাওয়া যাবে। বারোমাসের বারশো টাকা তার উপর সুদ আদালত খরচা সব নিয়ে আঠার শো টাকা। কিন্তু সে টাকা জোগাড় হল না। হয় তো চেষ্টা করলে হতে পারতো; কিন্তু গোপাল চৌধুরী সে হতে দিলে না। চাষ করার বিরোধী সে গোড়া থেকেই।—ওতে কি হবে? চাষা হবি শেষে চৌধুরী বাড়ীর ছেলে। এখন বললে—যা দিয়েছি যথেষ্ট দিয়েছি। আর এক ছটাক জমি কি গহনা আর আমি দেব না। বারো চৌদ্দ বছর লেখাপড়া শিখে শেষে চাষ। চাষা হবি তো লেখাপড়ার কি দরকার ছিল?

ইদানীং মোক্তারী পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিল শুভেন্দু। গোপাল চৌধুরী তাতেও খুসী হয়নি। বলত—ওতে কি হবে। চামচিকে পক্ষী হয়? দূর!

তবে?

তবের উত্তর গোপাল চৌধুরী দিতে পারেনি। সে উত্তর জানে না। তবে একটি কথা জানত, বলত—ভগবানকে ডাক। তিনি পথ দেখাবেন। আমি কি করে বলব?

এই ঘটনার পর চৌধুরী স্ত্রীর মুখের সামনে হাত নেড়ে বলেছে—কচু—কচু—কচু। ধর্ম — দেবতা — ভগবান—বাজে—মিছে—কচু!

শুভেন্দু ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছে—। ভগবান পথ দেখিয়েছেন! বিচিত্র।

নিত্য চৌধুরী বললে—দেখ টেলিগ্রাম। ওটা দেখ। কে লিখলে রে নেলী? তুই?

নেলী তেমনি মাটির দিকে মুখ করেই পায়ের নখে মাটি খুঁটতে খুঁটতে বললে—আমি আর সীমা।

—সীমা? অমর চক্রবর্তীর মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—সে কিছু জানে না কি? কোথায় গিয়েছে। জানেটানে কিছু। তাকে চিঠিচিঠি দিয়েছে নাকি?

—না। সে কিছু জানে না। আমি জানি সে জানে না। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব।

—কোথা কোথা টেলিগ্রাম করব?

—আমার বাড়ী—কলকাতায় মেজদার কাছে।

—মানে রঞ্জনের কাছে? হ্যাঁ তা যেতে পারে। রঞ্জন নিত্য চৌধুরীর ছেলে—ডাক্তারী পড়ে।

—আর—

—কে?

—শ্যামাকিংকরবাবুর কাছেও যেতে পারে।

—পারে। ঠিক ঠিক! তা লেখ ডাক্তার। ফর্ম আনি তিনটে।

লিখতে লাগল ডাক্তার।—বল ঠিকানা বল নেলী। আমি শ্যামাকিংকরবাবুরটা লিখে নিচ্ছি। ক্যালকাটা টু। শুভেন্দু মিসিং। ডিটেন ইফ গোজ টু ইউ। ওয়্যার—কার নাম দেব? গোপালবাবুর।

—না আমার নাম দাও।

—তাই ভাল।

ডাক্তার দ্বিতীয় ফর্ম টেনে নিলে। কি বললে—ঠিকানা বলুন—

—রঞ্জন চৌধুরী—মেডিকেল কলেজ হোস্টেল—লেখ।

ডাক্তার থেমে গেছে। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে—যেন সাধারণে যা দেখতে পায় না তেমন কিছু সে দেখতে পেয়েছে। পেয়েছে দেখতে। একটি স্মৃতির টুকরো ছবি হয়ে সামনে ভেসে উঠেছে। এই তো আটমাস আগে। সবে তখন পাম্পটা কেড়ে নিয়ে গেছে কোম্পানী; শুভেন্দু বেকার হয়েছে, সেই সময় একদিন তার ডাক্তারখানায় বসে খুব হাসতে হাসতে বলেছিল—বলতো আশু সত্যিই পটাসিয়াম সাইনাইডে যন্ত্রণা হয় না? আর ধর অন্য বিষে যখন অজ্ঞান হয়ে স্প্যাজম হয় তখন যন্ত্রণা বোধ থাকে?

শঙ্কিত হয়ে আশু বলেছিল—কেন? এ খোঁজ কেন? খাবিটাবি নাকি?

—তুই বল না!

—না! কিন্তু হল কি বল? প্রেম?

—দূর! প্রেম ট্রেম দূরে অসহ্য। ভাবিচ বেঁচে কি করব?

—ভাবিসনে। অবস্থা ভাল হবে—বিয়ে হবে—

—দূর। ওইটুকুতে কি হবে?

—তবে পলিটিক্স কর, মন্ত্রী হবি।

—ভাগ—পুরনো আমলে পলিটিক্স করে সুখ ছিল ফাঁসী গিয়ে আত্মহত্যা করে শহীদ হওয়া যেত। এ আমলে যে সে সব গোলমাল হয়ে গেল। পলিটিক্সে মরা বড় কথা নয় মারা বড় কথা। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই এ কথাটাই বাজে হয়ে গেল। লক্ষপতি কোটিপতি হলেও লোকে গাল দেয় বড়লোক বলে। টাকা পয়সায় রোমান্স নেই। একমাত্র প্রেম ক'রে মরা যায়। তাই বা তেমন প্রেমিকা কই? আমি এতদিন আত্মহত্যা করতাম। করি না কেন জানিস।

—কি ক'রে জানব—তুই না বললে।

—ওই যে কাগজে লিখবে—শুভেন্দু চৌধুরী দুঃসহ বেকার জীবনের দারিদ্র্যসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। ঐ জন্যে। মরবার মত একটা রোমান্স নেই রে একলা প্রেম আর বেকার যন্ত্রণা বাদ দিয়ে। যদি মরি আমি তবে ওই জন্যেই মরব। লিখে যাব—মরিবার মত রোমান্স নাই বলিয়াই আমি মরিতেছি। বুঝলি।

সেদিন সবটাই পরিহাস বলে মনে হয়েছিল। আশু বলেছিল—এক্সেলেন্ট হবে। খুব সেনসেশন হবে। এবং সত্যিই তোকে শহীদ বলবে লোকে।

কথাটা পরিহাস তাতে সন্দেহ ছিল না সেদিন।

তারপর মনে পড়ল—শুভেন্দুর মুখ; যেদিন সে তার বাবাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় এসেছিল গাড়ী করে।

সে তাকে তিরস্কার করেছিল—নিয়ে এলি কেন তুই? আমাকে ডাকলিনে কেন?

শুভেন্দু ম্লান হেসে বলেছিল—আনলাম। একটু হেসে আবার বলেছিল, কথাটা তো চাপা থাকবে না।

—সে থাক না-থাক, তুই আমাকে খবর দিয়ে দেখালিনে কেন? দেখ তো ভিড়!

—সে ঝগড়া পরে করবি। এখন দেখ।

তারপরই সে বেরিয়ে এসে দরজার বাজুতে ঠেস দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোপাল চৌধুরীর মাথায় কয়েকটা ঢেলা কাঠির কুচি পাওয়া গিয়েছিল। বেঁধে দিয়ে সে শুভেন্দুকে বলেছিল—না-রে ভালই করেছিলি। এখানে অনেক সুবিধে হয়েছিল।

শুভেন্দু উত্তর দেয়নি। কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল।

তা হলে—!

নিত্য চৌধুরী বললে—কি হল ডাক্তার? লেখ।

—লিখছি। সে খস খস ক'রে লিখে গেল। রঞ্জনের ঠিকানা সে জানে। সে ডাক্তার, রঞ্জন মেডিকেল স্টুডেন্ট। সেখানে সে যাবে না। জীবনের প্রতিযোগিতা তার খুড়োদের সঙ্গে বটে—কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী তার রঞ্জন। থাক সে কথা বলে কাজ নেই।

—বলুন একবার মামার বাড়ীর ঠিকানা—।

—বল্ নেলি।

(আট)

শুভেন্দুর খোঁজ কোথাও পাওয়া গেল না। সকল জায়গা থেকেই জবাব এল—দুখানা টেলিগ্রামে একখানা পত্রে। পত্রখানা মামার বাড়ীর। সব জায়গার এক খবর—না—শুভেন্দু আসেনি। গোপাল চৌধুরী শুনে খুব বেশী চেঁচামেচি করলে না। কপাল ভাল, ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে আসছে। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে ভুল হয়ে যায়। নাম ভুল হয়, দশটা কথা বলতে গেলে দুটো তিনটে কথা অসংলগ্ন হয়ে যায়। আশু বলেছে এবং যোগপুরের ধ্রুব ডাক্তার বলেছে ও একটু আধটু থাকবে। তবে সাবধানে থাকতে হবে।

চৌধুরী চটে উঠল কথাটা শুনে।—জেনে-শুনে মরবার জন্যে কেউ অসাবধান হয় নাকি। ডাক্তারগুলোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি নাই নাকি?

—না। কোন বুদ্ধি নাই ওদের। ওরা ঘোড়ার ঘাস কাটার উপযুক্ত। তা ভগবানের অবিচার। ওদেরই দালান কোঠা হয়! আর বুদ্ধিমানেরা ওদেরই ডেকে দুটাকা ষোল টাকা ফি দেয়!

চৌধুরী বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় যেন লাফ দিয়ে উঠতে চাইলে। কিন্তু খচ করে কোমরে একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব করে—কাতরে উঠল—ওরে বাবারে! ওরে বাবাঃ রে।

নেলি ছুটে গেল—কি হল বাবা? মাথায়—

—না—না—না। কোমরে! কোমরে! কোমরে রে!

—কি হল?

—শিরা—শিরা ছিঁড়ে গিয়েছে রে!

—টিপে দি।

—দে। দে।

কিছুক্ষণ পর যন্ত্রণা কমে এলে চৌধুরী কাতর আক্ষেপে বললে—এ কি বিপদ হল বল দেখি! আশ্বিন মাস, সামনে পুজো, ধান উঠবে। আখ কাটা আছে। শান আছে। মাঠ থেকে ধান চুরি যাবে। আমি যদি উঠতে না পারি—। ওঃ—এমন শত্রু পুত্র মানুষের হয়? কখনও—কখনও তোমার দুর্ভাগ্য ঘুচবে না—ঘুচবে না—ঘুচবে না।

—কি বলছ? আর্তস্বরে তিরস্কার করলে চৌধুরী গিন্নী।

—কি বলব বল? ভুলটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছে চৌধুরী। ভাঙা গলায় পরমুহূর্তে বললে—অনেক দুঃখে বলছি। তার জন্যে তো নেহাত কম করিনি। ছেলেবেলা কত ভেবেছি—আমি পারলাম না—আমার শুভেন্দু পারবে—বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে। ওই ছোটটা সুখেন্দুটার জন্য কতটুকু করেছি? নেলির বিয়ে দিতে পারছিনে। তার তুলনায় শুভেন্দুর কত করেছি তুমি বল! আজ সে পালাল। কি? না ভাগ্যের সন্ধানে। আর আমার ভাগ্য? আমাকে এই শরীরে যেতে হবে এবং কোন-দিন মাঠের উপর উপুড় হয়ে মরে পড়ে থাকতে হবে।

নেলি বললে—ভেবো না বাবা, আমি যাব মাঠে গিয়ে পাঁজা গুনে আসব। পাঁজা গোনা আমি জানি। আর মা খামারে ধান ভাগ বুঝে নেবে!

এবার আর চৌধুরীর সহ্য হল না। হাত নেড়ে ক্ষিপ্তের মত বলে উঠল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা হলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়—চোদ্দপুরুষ ওপার থেকে ধন্য ধন্য করে। আর ওই বুহুরূপীটা ভাদুগান বেঁধে গেয়ে বেড়াক নৃত্যকেমন—

ভাদু আমার মাঠে মাঠে পাঁজা গুণে
বেড়াইতেছে—
গোপাল চৌধুরীর হায় মন রসনা—
সৌভাগ্যটা একবার দেখে যাওগো!

চৌধুরী গিন্নী যে চৌধুরী গিন্নী বিরস বিষণ্ন বদনা বলে প্রসিদ্ধা তিনিও হেসে ফেললেন স্বামীর কবিত্ব শক্তি এবং সংগীত পারঙ্গমতা দেখে। নেলিও মুখ ঘুরিয়ে হাসছিল। চৌধুরী চটে গিয়েই বললে—হাসছ যে?

চৌধুরী গিন্নী বললে—তোমার ছড়ার বাহারে আর সুরের মাধুরীতে।

এবার নেলি খিল খিল করে হেসে উঠল—আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না।

চৌধুরীও হেসে ফেললে নিজে। বললে—হাস। তা হাসতে পার। তা—ও হারামজাদী ছড়া বানায় ভাল। ভয় তো সেখানে! কিছু পেলে হয়।

* * *

কথা সত্য। আজ মাসখানেক নতুন ছড়ার মত কিছুর সন্ধান পায়নি নসু। ওই যে একদিনে দুটি ঘটনা ঘটে গেছে—তারপর চন্দনপুর যেন ঝিমিয়ে গেছে। সেদিনের ঘটনার একটি নিয়েই নসু ভাদু তৈরী করেছিল—তাও গাইতে গিয়ে সতীশ ঘোষালকে নিয়ে যে বিপদ ঘটেছে তা নসুর কল্পনাতীত। এমন কখনও হয় না। অমর চক্কোত্তি রাগতে পারে—সতীশ ঘোষাল এমন আগুন হবে কেন—।

নসু বলে—ক্যানো বলো দিকিনি বেয়াই।

ফটিকদাস বলে—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে
দিতে নারে সীমা—

কি করে বলিব বল তাহার মহিমা!

—তা বলেছ ঠিক। কিন্তু লোকটি ভাই এমন নয়। বুঝেছ? গানে ভারী দখল। আমাকে মধ্যে মধ্যে শুনিয়েছেন। বুঝেচ! গলাটি সরেস নয়। একটু নীরস বিরস বটে, কিন্তু ফোঁকাচ যা দেখায় তা বলিহারি। ছড়াও লেখে। কি সব—তোমার ওই সব জজ-ম্যাজিস্টর হাকিম হুকিম; ই কে করলে—উ কি করলে তাই নিয়ে। আমি ভাই রসের ভিয়েন জানি—গুড়ের ভিয়েন—লবণ লংকা-মরিচ আদা ই নিয়ে কারবার বুঝি না। তা ভাই পারে বো। সে মানুষ এমন ক্ষেপে গেল! যা গেল! উ ভাদু আমি গাই না। লোকে ঝিবিঝিটি করে ধরে তখন গাই।

—তা ভাল কর। নতুন ভাদু তৈরী কর।

—কি নিয়ে করব? ঘটল কি? সব যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। তা তুমি তো পট আঁকছ দুন। দেখাও না হে একদিন।

ফটিক দাস শুধু পুতুলই করে না। ও পটও আঁকে। পটুয়ারা কাপড়ের উপর কাগজ সেঁটে লম্বা গুটানো পট আঁকে। ফটিক দাস—তা আঁকে না—তবে কাপড়ের উপর আটা দিয়ে সাঁটা কাগজে খাত বেঁধে তাতে তুলি দিয়েই ছবি আঁকে। ছড়াও বাঁধে। এক একটি ছবির তলায় এক একটি ছড়া। সে ও দেখায় না কাউকে। অবশ্য বেয়ান নসুবালা ছাড়া। তার সময় আছে। রাত্রিকালে পুতুল গড়ার কাজ সেরে ঘরের ভিতর একটি কাঠের পিলসুজের উপর রেড়ির তেলের প্রদীপ জেলে—রঙ তুলি খাতা নিয়ে বসে চশমা চোখে। নসুবালা সন্ধ্যের গান-বাজনার মজলিস সেরে বাড়ী গিয়ে ভাদুখানিকে পৌঁছুতে আসে—বেয়াইয়ের রসিকলালের কাছে—তখন উঁকি মেরে দেখে যায়—তার ছবি আঁকা। সন্ধ্যে বেলা আসরে যে ছড়া বেয়াই বলে—তারই পট আঁকে। সবগুলোর নয়—দুটো চারটের।

সেই আকুটির বাবুর ফালে জমি সেলাইয়ের ছড়াটির পট লিখেছে। সে দেখেছে নসু। খাসা হয়েছে। সেই থল-থলে ভুঁড়ি—সেই টাক—সেই ফোকলা মুখে সামনে একটি দাঁত—সেই শুকনো ভাইপোটি সব ঠিক। ছড়া শুনে কোট পেণ্টুল পরা সাহেবের সেই ছানাবড়া করা চোখ সব অবিকল!

ফটিক দাস বললে—বেয়ান যে কাণ্ড তোমাকে নিয়ে হল তাতে ভাই ছবি আঁকাই ছাড়তে হয়। তাতো ভাই পারি না। উটি আমার নেশা। আপিংয়ের নেশা চণ্ডুর নেশার মতন। তা ভাই তোমাকেও দেখাই না—। চামড়ার মুখ তো—লোহার তো নয়। কোথা ফসকে কাকে বলবে—বিপদ হবে।

নসুবালা বললে, উঠলাম ভাই।

—কেন? রাগ হল?

—রাগ? বাবারে—তুমি ছেলের বাপ—আমি মেয়ের মা। রাগ করতে পারি? পায়ে মাথায় সমান হয়?

—তবে অভিমান?

—অভিমান! রসের নাগর আমার! আচ্ছা বেহায়া তুমি। বদ মতলবী মানুষ কোথাকার, এই বয়েসে আমার কপালে কলঙ্ক দেবা তুমি! আমার মান ভাঙাবে! তোমার বষ্টুমী খুঁজে আনগা—এনে মান-ভঞ্জন কর!

—তবে কি করব বল!

—ক্ষমা চাও। বল এমন বাক্য বলবা না!

—বলব না।

—গোপন কিছু রাখব না।

—গোপন কিছু রাখব না।

—বেশ—তা হলে—দেখাও।

—দেখ।

—এই দেখ আকুটির বাবু। ফাল দিয়ে জমি সেলাই।

চমৎকার হয়েছে। দেখেছি পালা। উ দেখেছি।

—তা পরেতে—এই দেখ তোমার—সতীশ ঘোষালের বক্তিমে।

—হুঁ। ভাল ডেবা পারা করেছ চোখ দুটো। ওঃ হাতের আঙুলটা আকাশ বাগে তীরের খোঁচার মতন হয়েছে।

—এই তুমি।

—হ্যাঁ। তাই তো বটে। এই—আমি! তার পরেতে এটা কি হে? ই যে অনেক লোক! ও বাবা! কে গো। এই—দ্যাখো। গো বলে ফেললাম। গা—গা। হ্যাঁগা! এ কে?

—ই সব সেই ইনকিলাব জিন্দাবাদ! কৃষি

ঋণ আদায় চলবে না—চলবে না—

ঋণ আদায় করিলে ধান—ফলবে না—

ফলবে না!

ইনি হলেন সেই ভোট পাওয়া বাবু।

—আচ্ছা। এই বুঝি ঝাণ্ডা! হ্যাঁ। তা পরেতে এটা? এও যে অনেক লোক গো! আবার কবে—লাল ঝাণ্ডা এয়েছিল?

—উহুঁ। এ তে রঙ্গা হে। দেখতে পেছ না?

—তে রঙ্গা? হ্যাঁ এই তো তিন রঙ। তা এ কোন রঙ্গ—তা বল? অ—হ—হ। ভবানীবাবুর বোবো ধানের মিটিং। হ্যাঁ—হ্যাঁ বটে তো। এই তো এই বুঝি ভবানী বাবু?

—হ্যাঁ—। শোন—

কৃষি ঋণের আদায় বন্ধ আনন্দে সব

লাগাও বাঁরো ধান—

তে রঙ্গা ঝাণ্ডার পাণ্ডার কথা কর অবধান।

লাল ঝাণ্ডা মেছোদের দিকে

চাষীর বন্ধু তে রঙ্গা—

ভাত আগে না মাছ আগে—জিজ্ঞাসা করেংগা।

—ভাল ভাল রে বেয়াই আমার রসিক-লালের বাবা।

—মনে পড়েছে—লাল ঝাণ্ডারা চলে গেল,

পথের ধারে — আলোকচিত্র ঃ শ্রীঅতুল দে

বিকেলে ভবানীবাবু ঢে'রা দিলে—জাঙ্গল-হাটার বিলে বরো ধানের চাষ নিয়ে মিটিং হবে। দলে দলে যোগদান কর। জাঙ্গল-হাটার বিলে বরো চাষ করলে নদীতে বাঁধ দিতে হবে। দরকার হলে ক্যানেলের জল আনতে হবে। তাতে মেছোদের বিলে মাছ ধরার অসুবিধে। সতীনাথ চক্রবর্তী ভোট পাওয়া বাবু জেলেদের দিক। বাস—

ভবানীবাবু লেগে গেল। ভাত আগে—না—মাছ আগে!

—তা ভাই কথাটি তো ঠিক বটে! ভাত না হলে মাছ কি দিয়ে খাবা?

—তা বটে। তবে দুটি হ'লেই তো ভাল হয় ভাই!

—তা হয় ভাই। যেমন ভাই তোমার বণ্টুমীটি থাকলে হ'ত!

—ওই দেখ। ধান ভানতে শিবের গীত।

—বেশ—ছাড়ান দাও। তারপরেতে বল!

—তারপরেতে আছে একটা, তা আজও আঁকি নাই। সে তোমার ইউনাইন বোর্ডের সেই নদীর ঘাটের ডাক।

—উ তুমি এ'কো না। তার চেয়ে ধান চুরি এ'কো। কাশী হাড়ি মরে গিয়েছে—তার বেটা আপলা আছে। বাঘ নাই—নেকড়ে আছে। তাই এ'কো। শেয়ালে হাসধরা এ'কে কি করবা?

—আরও আছে।

—কি বল দিকি?

—ওই গোরো—নিমে—তরলা—সাবিত্রির—এদের ছবি। বুয়েচ বেয়ান—ই ভাই তো যেমন তেমন ক'রে হবে না। নূন গুলে সেই জলে রঙ ভিজিয়ে—তাতেই আঁকতে হবে।

—বা—বা—বা। বেশ বলেছ। নূন গুলে সেই জলে রঙ গুলতে হবে। মানুষ পাষাণ হে! এত জল পাষাণ ফেটে বেরুবে না!

—তা ভাই আমিও ভাবি—ছড়া বাঁধব। তা—ওই—এত চোখের জল পাব কোথায়? দু এক কলি মনে আসে। তা মনে ক'রে রেখে দিয়েছি। শ্যাম দাদাবাবু এলে তার কাছে যাব। দাদাবাবু তুমি পূরণ করে দাও।

—শ্যামকিংকরবাবু!

—হ্যাঁ। আমাদের হাঁসুলীর গানগুলি লিখে নিয়ে গিয়েছে।

এবারে বলব ই গান তুমি লিখে দাও।

—সেই ভাল। তা নাও—সেই পুরনো গানই ধর!

—তা বল—কোন গান? একটা ফরমাস কর। তবে তো!

—আর ই বয়সে ফরমাস। সেই গানটাই গাও। ভাই রে—আলোর তরে ভাবনা ক্যানে হায় রে! অন্ধকারেই পরাণ পাখী সেই দেশেতে যায় রে!

—না। সে তো আছেই হে। সে বললেও বটে না-বললেও বটে। আজ মন রঙ রঙ করছে।

—বল কি?

—হ্যাঁ তুমি কত আদর করলে। শুধুলে—রাগ করেছ? অভিমান করেছ? তা রঙ লাগবে না? রঙের গান ধরি।

—লাগাও। পায়ে তা হ'লে ঘুঙুরে পর।

নতুন গানের অভাবে পুরানো কালের রঙের গানে তাদের অভাবের সন্ধ্যার ভাবের ঘরটি মুখর হয়ে উঠল। রঙের গান প্রেমের গান। বাবু লোকে বিদ্বান লোকে বলবে ছড়া।

গোপনে মনের কথা বলতে দে গো আঁধার
গাছ তলায়
ঠা-ন্ডা শীতল সাঁঝ বেলায়।

শোন্—পা-খীরা, গাছের ডালে ঝোটন নেড়ে জোটন বে'ধে কলকলায়।
ঝুঁঝুকি আঁধার দিপি দিপি জোনাক মেলা
মনের কথা ফিসফিসি বলার পালা
বিনি সুতোর মালা বদল এক পহরের
রঙের খেলা

আদ্যিকালের বংশী বাজা—কদমতলার গানের পালায়।

গোপনে মনের কথা বলতে দে—গো!

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে যখন চন্দনপুরে মানুষ মাটি নদীনালা গোটা দেশ এবং দুনিয়ার সঙ্গে রকেটের বেগে ঘূরন্ত এক কুমোরের চাকে চেপেছে নতুন গড়নের জন্য—নানান বিচিত্র পাত্রের গড়নে গড়ে উঠছে এবং বিজ্ঞান বুদ্ধির চুল্লীতে পুড়ে পাকা হচ্ছে—তখন এই দুটি মানুষ আদিম কালের দুটি মাটির ঢেলার মত এক পাশে পড়ে তাদের গায়ে ঘাসের রোমাঞ্চ জাগিয়ে ফুল ফোটাচ্ছে এবং শুনেছে মৌমাছির গুঞ্জন গান এবং ভাবছে এই চিরকালের রঙের গান। আঁধার গাছতলায় সন্ধ্যাবেলা ছাড়া রঙের গান—প্রেমের পালা হয় না। ওরা জানে না এ যুগে, ডাকে—তারে—চিঠিতে চলে সে পালা। বাতাসে ভেসে আসে ওই চিঠির কথা পরস্পরের কানের পাশে।

শহরে কফি হাউসে। পার্কের বেঞ্চে, রেলিংয়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দিনেদুপুরে কথা হয়। পালা চলে। সে ওরা জানে না।

(নয়)

চিঠিতে কালির অক্ষরে মনের কথা খামের গোপনীয়তার মধ্যে দিয়ে আসে। কখনও হারায়—কখনও সন্দেহ ক্রমে কেউ খোলে বটে তবে দু চারটে ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে নয়। এবং একালে কি বিচিত্রভাবে যে প্রেম হয়!

মাস তিনেকেরও বেশী—। এরপর সীমা একখানা চিঠি পেলে। চিঠিখানা ডাকে এসেছে, কিন্তু সরাসরি ডাক মারফত তার কাছে নয়—এসেছে আশু সিংহীকে পোষ্ট বক্স ক'রে।

আশু সিংহী অপ্রত্যাশিতভাবে পত্র পেলে একখানা। বেশ বড় খাম। মোটাও বটে। চমকে উঠল প্রেরকের নাম দেখে। লেখা—রু—এস—। এ সংকেতটা আশু জানত। আগেও দু চারবার চিঠি লিখেছে শুভেন্দু কলকাতায় সিনেমার ব্যাপার নিয়ে। এখানেও কখনও সখনও ওদের বাড়ীর রাখাল কি মাহিন্দার চিরকুটের চিঠি নিয়ে এসেছে—তাতেও এই সই থাকত। এস অক্ষরটা এমনভাবে লিখত যে সেটা এস ও সি দুটোই হত, অথচ মনোগ্রামের মত এস এর তলার বাঁকা অংশটাকে বাড়িয়ে সামনে একটু টেনে দিত।

আশু চিঠিখানা খুললে। বড় খাম—মোটা খাম। অনেক কথা লিখেছে সে। যাক একটা দুর্ভাবনা গেল। খবরটা পাওয়া গেল শুভেন্দুর।

শুভেন্দুর চিঠির সঙ্গে আর একখানা আকারে একটু ছোট খাম। তাতে ছাপার হরফের মত সযত্নে খুব সুন্দর করে লেখা—সীমা। সাধারণ খাম। দুটো চিঠিতে চিঠিটা মোটা হয়েছে; আশুর চিঠিটাও বেশ বড় ছোট নয়।

লিখেছে—

ভাই আশু,

প্রথম ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করব। কিন্তু সে লজ্জা এ লজ্জার থেকে অনেক বেশী। বাবা সেটা করতে গিয়ে একটা আঘাতের পর আর আঘাত করতে ভয় পেয়েছিলেন। হয় তো প্রথম আঘাতটা কম জোরে করে ফেলেছিলেন। অথবা অভিনয় করতে গিয়ে অতি অভিনয় করে ফেলেছিলেন। আমি তা করব না। ওতে আমার ঘেন্না আছে। আমি নতুনকালের মানুষে। আমি ওকালের পুরনো রোমান্স আমার মর্যাদা গেল এ বলে তো মরব না। মরতে পারব না। বরিনি একদিন যে, খবরের কাগজে মোটা হরফে বেকার যন্ত্রণায় আত্মহত্যা লিখবে,—এ আমার কাছে অসহ্য। তার থেকে তো ডাকাতি করা ভাল;—যদি খেটে খেতে না পারি! রোগ যন্ত্রণায় আত্মহত্যা আমার কাছে ... কিন্তু এর প্রতিকার তো করতেই হবে। তা না হলে আত্মহত্যা নয়—... লোকের—দেশের লোকের আমাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলা উচিত। ... বেশী করে দিয়ে মারা উচিত। কারণ বিধাতার সৃষ্টির বাজে খরচ নাকি ইঁদুর। যুক্তিতে তা হলে আমি ইঁদুর।

আশু থামল। একটু না হেসে পারলে না। শুভেন্দু বেশ মুডের উপর চিঠিখানা লিখেছে। বিষণ্ণতার পুরোটা—তার বিষক্রিয়া কেটে গিয়েছে। সীমার চিঠিখানা ঘুরিয়ে দেখলে। তারপর আবার পড়লে।

তাই ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়েছি। আজও ভাগ্যের সন্ধান পাইনি, তবে হাঁটছি। ক্লান্ত হইনি। সিনেমার ঝোঁক কেটেছে সম্পূর্ণ তা বলছি না, তবে ওটা ভূতের মত ঘাড়ে চেপে নেই। সেটা অনেক দিনই জোর হারিয়েছে—তা তুই জানিস—। শ্যামাকিংকরবাবুর কথায় হুঁস হয়েছিল। সেদিনের মিটিংয়ের দুশোটা কিন্তু উল্টো ফল ফলিয়েছিল। যে বিতৃষ্ণার কথা তোর হোস্টেলে বলেছিলাম, সেটা পরে তৃষ্ণায় পরিণত হয়েছিল। ভেবেছিলাম কি রোমাণ্টিক ব্যাপার। কি অনুরাগ! সে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। লোকের অসাধারণ অনুরাগ। যাক ভাই—। এবার ওটা জোর হারালে—অন্য কারণে। দুটো ঘটনা এক সঙ্গে ঘটল। বাবার ঘটনা—সীমার ঘটনা। সীমার ঘটনাতেও কাণাঘুষো শুনেছিলাম—সীমা অন্য কাউকে ভালবাসে—নইলে কখনও শুধু
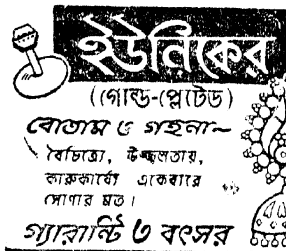
পড়ব বলে পালিয়ে আসে কেউ? এবং আমার নামটা এল তার সঙ্গে—কানের টানে মাথার সঙ্গে চুলের মত। আমার বুক কেঁপেছিল—ভয়েও বটে এবং আনন্দেও বটে। সীমা আমাকে ভালবাসে! আমি চিঠি লিখলাম। বেশ কাব্য করে এবং কৌশল করে লিখলাম—তুমি যখন দেবযানীর মত প্রেম ভুলে যযাতি রাজার রাজসম্পদে লুব্ধ হওনি তখন কচের মত আমিও দেবকার্য সাধনের জন্য অভিশাপ মাথায় করে চলে যাব না। চৌধুরী বাড়ীর গৌরব, তোমরা আমরা ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—এ সব ভুলে যাব। তোমার পাশেই দাঁড়াব কষ্টের দুনিয়ায়। নেলিকে দিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলাম। নেলি এসে বললে—পত্রের উত্তর সে দেয়নি। মুখে বলেছে—দূর—দূর। তোকে ওসব ভাবতে বারণ করিস। প্রেম টেম, নষ্ট আমার। [illegible] পড়ে।

আমার মাথায় তখন ভূত চেপেছে। বেশ সুস্থ ছিলাম না। মনে যে অবস্থায় মানুষ আত্মহত্যা [illegible] করতে পারে সেই অবস্থায়। মনে—সীমা যদি বলত—হাঁ প্রেমই বটে, তবে আমি ওকে নিয়েই [illegible] ফেলতে পারতাম। কি [illegible] কি খাব—কি হবে একবার ভাবতাম না। আমার এ উত্তর শুনে [illegible] হত। আমার প্রেম পায়নি? আমার কি—কোন যোগ্যতাই নেই। ওকে আমার [illegible] হবে। [illegible] হবে। [illegible] একদিন [illegible] হবে। বাড়ীর [illegible] সীমার প্রেমে পড়তে বাধা [illegible] এই কমপেনসেশনের একশো টাকা নিয়ে। এসেছিলাম কলকাতায়। প্রথম ছবির বাজারেই চেষ্টা করলাম ভাগ্য সন্ধানের। শ্যামকিংকরবাবুর কাছে যাইনি। সোজাই তিনি ধরে ফিরে পাঠাতেন জানতাম। খবর কি তাঁর কাছে আসবে না? গিয়েছিলাম দেশের পরিচয়ের দাবীতে স্বপন সিংহ ডিরেক্টারের কাছে। চন্দনপুরের নাম শুনে তিনি আমাকে আসতে বললেন স্টুডিওতে। গেলাম। আমাকে জনতার মধ্যে একটা পার্ট—সিনেমায় বলে একস্ট্রা দিলেন। ভদ্রলোক গরীব লোকের ভিড়। আমাকে গরীব লোক—তাও বয়স্ক লোকের পার্ট দিলেন। অনুগ্রহ একটু ছিল এর ভেতর। পার্টটার মুখে কথা ছিল। আমি পার্টটা ভাল করলাম। অনেকে তারিফ করলে। বললে টাইপ পার্টে আমি ভাল করব। প্রথমেই তারিফ কম কথা নয়। স্বপনবাবুর অ্যাসিস্টান্টরা ঠিকানা চাইলে। বললে—ওরা বলে দেবে—দু চার জায়গায় টাইপ পার্ট হলে ডাকবে। স্বপনবাবু খুসী হয়ে দশ টাকা দিলেন পাঁচ টাকার জায়গায়। কিন্তু আমার ও কথা ভাল লাগল না। টাইপ পার্ট থেকে যদি জনতার মধ্যে একটি কোন তরুণের পার্ট আমাকে দিতেন এবং পারিশ্রমিক কিছুই না দিতেন তবে আমি খুসী হতাম—আশান্বিত হতাম। আশা থাকত—কোনদিন আমি নায়ক হিরো হতে পারব। এ ছিল একটা গেঁয়ো ক্যাবলার পার্ট। মনের মধ্যে সীমার কথার নতুন মানে খুঁজে পেলাম। মেয়েরা, বলে নাকি, বরের রূপ চায়; রূপের অভাব পূর্ণ করতে পারে—এক গুণ আর বীর্য। আমার রূপ নাই। বর হবার মত রূপ নাই এ কথা স্বপনবাবুর মত চোখের লোক ব'লে দিলেন। শ্যামাকিংকরবাবুর কথাও মনে পড়ল! 'নাচে রূপ আর গায় স্বর।' সিনেমায় প্লে ব্যাকে সুস্বরের অভাব সহজে মেটানো যায়, ছবি বিশ্বাস নায়ক সেজে গান গেয়েছে কিনা বলতে পারিনে। একালের উত্তমকুমার ঠোঁট নেড়ে হেমন্তকুমারের গলায় গান গায়—কেউ ধরতে পারে না। কিন্তু রূপের অভাব মেক আপেও মেটানো যায় না। সুন্দরকে বীভৎস করা যায়, ভয়ংকর করা যায় কিন্তু সুষমা—যে সুষমায় নায়ক সাজে—তা মেক আপে আসে না। স্বাস্থ্য কিছুটা পূরণ করে। আমি তাই ও ভূতটাকে নামিয়ে দিয়ে বলেছি—তুমি এস। আমি রাম কবচ নিয়েছি। যাও!

চলে গিয়েছিলাম কলকাতা ছেড়ে। ঘুরলাম। পায়ে হেঁটে ট্রেনে বাসে। একশো টাকা ছিল তার সঙ্গে জুড়ে নিয়েছি—আংটি, দুটো আংটি ছিল পৈতের সময়ের, বোতাম ফত ফত্তে অবশ্য—ঘড়িটা—বেচে আর একশো করে ঘুরেছি। দুর্গাপুর—সেখান থেকে আসানসোল—সেখান থেকে রাউরকেল্লা এসে একটা চাকরী মিলিয়েছিলাম। মাসখানেক কাজ করেছিলাম। গতরের কাজ নিয়েছিলাম। যাতে দেহখানা ভেঙে গড়ে। বুকের ছাতিটা চওড়া হয়। কিন্তু সইল না। অসুখে পড়ে ছেড়ে দিলাম। ও দুর্দান্ত খাটুনী ওরাই পারে। ওই সায়েবরা আর আমাদের দেশে পাঞ্জাবীরা। এখানে যার কাছে কাজ মানে খাটতাম—সে একজন জার্মান সায়েব। লোকটা চিমনী রিবেট করছিল—আমি জোগাতাম তার সরঞ্জাম। একদিন লোকটা পড়ল উপর থেকে—নিচে সদ্য ভরাট করা মাটি ছিল—পড়ে মরল না—হাতের কব্জীটা ডিস-লোকেসন হল—পায়ের অ্যাঙ্কেল ছাড়ল। আমি নিচে ছিলাম—ভারার মাঝামাঝি জায়গায়। যে কারণে সায়েব পড়ল—সেই কারণে আমিও পড়লাম। সায়েব দোতলা থেকে আমি একতলা থেকে। ভাই আমারও লেগে-ছিল যথেষ্ট কিন্তু সায়েবের মত নয়। তবুও সায়েব উঠল সাতদিনে—আমি পনের-দিনে বেরিয়ে এলাম হাসপাতাল থেকে তার-পর সুরু হল জ্বর আমাশয়। সায়েব দশ দিনে কাজে লাগল। আমি আঠারো দিন পর গিয়ে বললাম—এ কাজ আমি পারব না। রিজাইন করছি। দুর্গাপুরে একজন পাঞ্জাবী লরীওলাকে দেখেছিলাম—তার দুখানা লরী—গাছতলায় গ্যারেজ আর সেইখানেই ছোট একটা টিন দিয়ে ঘিরে ঘর। শুনেছিলাম পাঞ্জাবের রেফুজী দুর্গাপুরে ডি ভি সির ব্যারাজ আরম্ভের সময় একটা গাই মোষ নিয়ে এসে ওই গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। দুধ বেচত। একটা মোষ থেকে দুটো তারপর একে একে তিনটে গাই করে গাছতলাটাকে গোয়াল বানিয়েছিল। গাছটা
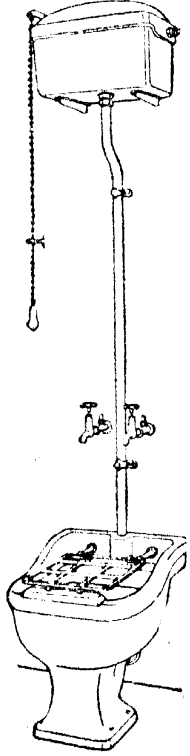
এমন ঝাঁকড়া হল যে এক ফোঁটা জল পড়ত না। তারপর সব গাই মোষ বিক্রী করে একটা লরী এবং একটা থেকে দুটো লরী ক'রে ব্যবসা চালাচ্ছে। বাঙালীকে কত্তারা দোষ দেয়—আমরা তা পারি না বলে। পারব কি করে? বত্রিশ ইঞ্চি ছাতি মেলে না—সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা বাঙালী মেলে না। তা হ'লে তো সিনেমা লাইনেই থাকতাম। ছবি বিশ্বাস বুড়ো হয়েছে। মেক আপে আর জোয়ান দেখাবে ক'দিন?

যাই হোক—ও চাকরী ছাড়লাম—আমার জার্মান মিস্ত্রী কর্তা বললে—তুমি স্টোরে কাজ কর। একটা পোস্ট খালি আছে।

বললাম—তা জানি সায়েব। কিন্তু ওটাতে গ্রাজুয়েট চাই। আমি তো ম্যাট্রিক।

সে বললে—যাও যাও। লিখবে তো হিসেব। তার আবার গ্রাজুয়েট। তুমি লেগে যাও আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। টেম্পোরারী হয়ে লাগো। তারপর কাজ ভাল হ'লে ট্রেড ইউনিয়নের যুগে তোমাকে ছাড়াবে কে?

লাগলাম। মাইনে বেশী হল। সব সুদ্ধ নিয়ে দুশো টাকার বেশী। দিন তার পড়ে কত হিসেবে—আট টাকা প্রায়। কিন্তু বিপদ হল—ওই গ্রাজুয়েট নই। সাঁতাই আশু, এ যুগে তোদের লাইনে কবরেজী চলে না—অন্যখানে অগ্র্যাজুয়েট চলে না। বিচিত্র যন্ত্রপাতি তার পার্টস—তার নাম বিচিত্র—বানানে ঠেকলাম। নাম শুনেছিলাম প্রপার নাউন—ওতে নাকি বানান ভুল হয় না। মিথ্যে কথা। দিন পনের কাজ করে নিজেরই লজ্জা হ'ল—পনের দিন পরই মাইনে মিলল মাস শেষ হল। আমিও রেজিগনেশন দিয়ে সরে পড়লাম। কলকাতায় এসেছি। পড়ছি। আই-এ দেব। এ বছর সীমা ম্যাট্রিক পাশ করবে—। ওর আগেই আমাকে গ্রাজুয়েট হ'তেই হবে। একটা কিছু তো চাইই যাতে অন্তত বলতে পারি—নায়ক হবার মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন আমার আছে। এই দেখ সীমা আমার গ্রাজুয়েট হবার সার্টিফিকেট। আর রূপ না থাক—ছাতি আমার ছত্রিশ ইঞ্চি। রমেনদের মত কালো ধুমসোকেও আমি ধরাশায়ী করতে পারব। একটা দিনের বেলার চাকরী পেয়েছি। শ্যামাকিংকরবাবুর একখানা পত্র দেখিয়েছিলাম পরিচয়পত্র হিসাবে। কাজ দিয়েছে খুব। আশী টাকা মাইনে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বই ঝাড়াঝুড়ির কাজ। রাত্রে কলেজ।

এইবার তোকে অনুরোধ—। আমার বাড়ীতে বাবা মা নেলি রইল—তাদের অসুখে বিসুখে দেখিস। টাকা পয়সার হিসেব রাখিস—আমি দোব। নিশ্চয় দোব। তুই যে দেখবি সে আমি জানি। এবং আমার পিতাকে জানি—তিনি ফি টি দেবেন বলবেন—দিতে পারবেন না। তুই সেইটে মেনে নিস।

দ্বিতীয় অনুরোধ—তোর নামে টাকা পাঠালাম। একশো টাকা। ইস্কুলে নেলির মাইনেটা দিয়ে দিস—আর হেডমিস্ট্রেসকে অনুরোধ করিস তিনি যেন নেলিকে বলে দেন—তোমাকে ফ্রি ক'রে নেওয়া হল। বাকীটা সীমার জন্য। ও এসে আশ্রয় পেয়েছে দিদিমণিদের কাছে। হয়তো প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে। কিন্তু খরচ আছে তো। পাঁচজনের দানে সীমা পড়বে—এটা আমার সহ্য হচ্ছে না। সে আমার প্রেমে পড়েনি. কিন্তু আমি তার প্রেমে ধপাস করে পড়ে গেলাম। যতক্ষণ সে না বলেছে—নোলকে—দূরে দূরে! ততক্ষণ আমার মনে প্রেমের কিছু ছিল না। বেশ দাঁড়িয়েছিলাম—চৌধুরী বাড়ীর ভাঙা দালানের ছাদে। যেন ওই কথাতে—আমি রেগে লাফ দিয়ে পড়লাম এবং হাড় গোড় ভেঙে পড়লাম।

ওকে একটা চিঠি দিলাম। এটা তোকে পৌঁছে দিতে হবে। এর মধ্যে তোকেও যা লিখেছি—তাই লিখেছি। হয়তো একটু সরসতর হয়ে থাকবে। শেষের অংশটা—অনুরোধের অংশ থেকে শেষটা থাকল না। টাকার কথাটা থাকল—লিখলাম—"যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে পড়ার খরচের জন্য আমি তোমাকে বন্ধুর দাবীতে সাহায্য করতে চাই। তুমি রাজী হলে টাকা আশু দেবে তোমাকে। তুমি আমাকে ভালোবাস না বাস—টাকাটা নিলে খুসী হব। পরে তুমি শোধ করো। গান আছে—'জীবন এত ছোট ক্যানে'। আমার কাছে জীবন ছোট নয়। মস্ত বড়। এ কালে তো মস্ত বড়। আগে বিলেত যেতে জাহাজে একমাস লাগত। এখন তিনদিনও লাগে না। সুতরাং দশ গুণের উপর বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে বদলে গেছে। সুতরাং নিলে তুমি কেনা হবে না এবং দেনা হলেও শোধের সময় পাবে।"

দেখিস কি বলে।

শিবনাথ দে'কেও একখানি পত্র লিখলাম। লোকটি অন্যের চোখে যাই হোক—আমার কাছে উপকারী মানুষ। এক পয়সা ছাড়বার মানুষ নয়। গুণবান মানুষ ধার্মিক মানুষ মহৎ মানুষ—আমি বলি না, তবে আমাদের উপকারী মানুষ। ওঁকে লিখলাম—বাড়ীর প্রয়োজন মত টাকা দিতে। বিশেষ দরকারে টাকা লাগলে ধারে শোধ হবে—বা হবে না এটা যেন না ভাবেন। আমি শোধ দেবই। রোজগার থেকে না পারি জমি আমাদের আছে—তাই বিক্রী ক'রে দেব।

বাড়ীতেও পত্র দিয়েছি। ছোট চিঠি। ভাল আছি—কিছুদিন পর যাব। আর যে একশো টাকা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম সেটা পাঠালাম।

আর একটা কথা। সীমার পত্রের ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে। ওটা যেন প্রকাশ না হয়। দোহাই। একদিকে অমর চক্কোত্তি।

অন্যদিকে গাঁয়ের প্রান্তে নসুবালা। সে খবর পেলে হয়। ভাদু গান বেঁধে গেয়ে বেড়াবে। সেদিন বাবার কান্ড এবং সীমার কান্ড হয়, সেদিন রাত্রে শিবনাথ দে বাবাকে দেখতে এসেছিল। যখন ফিরে যায় তখন তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর বাড়ীর দোর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। শুনলাম ফটিক দাসের বাড়ীতে গান হচ্ছে।

নাকের বদলে নরুন—ফুলের বদলে রাঙা বিলিতী বেগুন—

সীমার বদলে ক্ষমা—ও মন রসনা—তাই ঘুনা ঘুন—ঘুন। দোহাই। আমার ভালবাসা নিস। ইতি—

শুভেন্দু।

ভারী ভাল লাগল আশুর চিঠিখানা। আজ এক নতুন চেহারা নিয়ে শুভেন্দু তার সামনে দাঁড়াল। ভারী ভাল মুডের চিঠি। এটাই যদি তার জীবনের মনে স্থায়ী রূপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তো ও জিতে গেল। ও তো হাসি হয়ে গেছে। জলে পাঁকে দুধে যেখানে ডুব দিক পালকে লাগবে না একটি বিন্দুর দাগ। কিন্তু আশ্চর্য। কি ক'রে হ'ল? কি ক'রে হয়? "চন্দনপুরে গ্রাম—জমিদারী উচ্ছেদের আগে পর্যন্ত থেকে কর্ণওয়ালিশের আমল ছাড়িয়ে আলিবর্দীর আগে থেকে জমিদারের আড়ং। এখানকার মাটি পর্যন্ত জমিদার। আলিবর্দীর আমলে রাজনগরের নবাবের অধীনে সরকারেরা জমিদার। তারপর কর্ণওয়ালিশের আমল থেকে এ পর্যন্ত গ্রামের সব ব্রাহ্মণ বাড়ীই জমিদার বংশের ফাঁকড়া, ডাল থেকে ঝুরি-নামা কান্ডের মত সরকার বংশের দৌহিত্র বাঁড়ুজ্জে বেশী—চাটুজ্জে মুখুজ্জেরা কম জমিদার হয়েছে—নতুন জমিদারী কিনে চন্দনপুরের প্রতাপ বাড়িয়েছে, চন্দনপুরের উঠোন বাঁধিয়েছে প্রজাদের মাথা কুটিয়ে; চারদিকে পাঁচিল তুলেছে জমিদারী ইজ্জতের, ছাদের উপর চিলে কোঠা তুলেছে দম্ভের। নতুন বাঁড়ুজ্জে-বাবু মাধবলাল এসে তাতে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্ণওয়ালিশের কোটপ্যান্টের সঙ্গে গড়গড়া এবং বাঈজী নাচের সিম্বিসের মত জমিদারী কয়লার ব্যবসার আয়ে—ইংরজীয়ানা ইংরিজী ইস্কুল—ইংরিজী মেজাজ ঢুকিয়েছিলেন। সাহেব ভক্তি ও ভয়ের আনুগত্যের বিনিময়ে রায়বাহাদুরী অর্জন ক'রে চন্দনপুরকে স্বর্গ না হোক যক্ষপুরী বানিয়েছিলেন। এরা আর যাই হোক—মানুষের কিছু ছিল। যক্ষ—বলা যায়।"

কথাগুলি আশুর নয়, কথাগুলি শ্যামা-কিংকরবাবুর। তিনি বলেন—"স্বাধীনতার পর যক্ষপুরী অধিকারে এল মানুষের। যক্ষবাড়ীগুলিতে নোনা ধরল। নোনা ধরা বাড়ী হলে কি হবে—এ পুরী থেকে বেরিয়ে বাইরে এলে যক্ষেরা মানুষ হয়ে যাবে ভয়ে তারা ঘরের অধকারে লুকল। তেমনি যক্ষ-পুরী চৌধুরী বাড়ী। বাড়ীটার সর্বাঙ্গে নোনা। ঝুরঝুরে ক'রে ঝরছে। জবুথবু স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে আছে। শক্ত হাড়ের মত গাঁথুনী শক্ত। পুরনো জ্যাম ধরা লোহার ফটক।"

আগে শুভেন্দুর বোলচাল কথাবার্তা যত আধুনিক হোক যক্ষপুরীর জবুথবুত্ব ছিল এবং যক্ষপুরীর রোমান্স মায়াও ছিল। সেটা ফুটত তার রোমান্টিক নায়কের অভিনয়ে—ফুটত তার ফিল্ম জগতে নাম ক'রে মনোরম—বিশ্বপ্রিয় হবার সাধের মধ্যে। শুভেন্দুকে সে ওই তার বাবার অদৃষ্টের দুর্ঘটনার দিনেও দেখেছে। ভয় পেয়েছে। ছেলেটা না কিছু করে বসে। মারাত্মক কিছু। শ্যামাকিংকরবাবুর একখানা বইয়ে পড়েছে—অর্ধশিক্ষিত জমিদারের ছেলে—যে সৎ মা তাদের সকল দুর্দশার মূলে—গৃহত্যাগিনী বলে অপবাদ আছে—সেই সৎ মায়ের অপ-বাদের কথা কোন প্রজা উদ্ধতভাবে বলেছিল বলে সে তাকে গুলী ক'রে মেরেছিল। শ্যামাকিংকরবাবুর সকল জীবন ও চরিত্র এখানকার। ওই প্রকৃতি চন্দনপুরের যক্ষ-তনয়ের প্রকৃতি। শুভেন্দু তেমনি কিছু করে না বসে।

আশ্চর্য সেই শুভেন্দু!—কোথায় কোন রন্ধ্র পথ ভেদ করে ঢুকল—মানুষের জগতের আলো বাতাস—নতুনকালের দিন—যার স্পর্শে মোচন হয়ে গেল তার যক্ষত্বের।

(দশ)

চিঠিখানা সীমার কাছে পৌঁছে দেবে কি ক'রে? আশু চিন্তিত হল। সহজ হবে না। অন্তত সকলজনকে গোপন ক'রে দেওয়া অসম্ভব!

—ডাক্তারবাবু!

—কে?

—আমি মাশায়! নিমাই!

ও:—বাতব্যাধিগ্রস্ত নিমাই! নিজেদের স্বৈরিণী কন্যাদের যৌনব্যাধির বিষে জর্জর

নিমাই! রাত্রে কাতরায়। গ্রামপ্রান্তে ঘর— তার কাতরস্বর--গ্রামবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ করে না। কেবল শিবনাথ দে ওদের পাশের বিস্তীর্ণ জমি আয়ত্ত করে বাড়ী ক'রেছে বলে সে মধ্যে মধ্যে শুনতে পায়। আর শোনে—নসু ও ফটিক দাস।

—কি হল? কি চাই? ওষুদ?

—দেন বাবু! মরে যেছি। ওঃ। কিন্তক তার লেগে লয়। একবার সাবিকে দেখে এসেন। তার বেষম জ্বর। কেমন লাগছে! হাসপাতালে নিয়েই বা যাবে কে? আমি তো এই খোঁড়া।

—ভবানীবাবুর কাছে গিয়েছিলি? তাঁকে বলগে।

—আজ্ঞে, কাল গিয়েছিলাম বিকেলে।

—কি বললেন? পারবেন না তো বলবেন না তিনি।

—তিনি মাশায় খান্ডাখাপ্পা হয়ে বক-ছিলেন—ওই জাঙলহাটার মোড়লদিগে। আমি বলতে নেরেছি। পালিয়ে এলাম।

—এখন যা। এখন আর খান্ডাখাপ্পা হয়ে নাই।

—তিনি বাড়ীতে নাই। সিউড়ী যেয়েচেন।

—তাই তো! তবে? আমি গেলাম না হয় একবার কিন্তু তাতে তো হবে না। হাসপাতালে পাঠাতে হবে। দেখতে শুনতে তো লোক চাই!

ভবানীবাবু এগুলি করে। ঐ গুণেই এখনও এখানে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শত্রুমিত্র—সেই যে তর্পণে আছে যে অবান্ধব যে বান্ধব যে জ্ঞাতি যে অজ্ঞাতি আমার জল নাও ঠিক তেমনিভাবেই ভবানী-কিংকর মৃতের শবদেহ স্কন্ধে শ্মশানে যায়, নদীতে স্নান করে ওই মন্ত্রে জল দেয়। শুধু মৃত্যুর পরই নয়—মানুষ বিশেষ ক'রে দরিদ্র মানুষের রোগে সে শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ায়—। সে এখানকার কংগ্রেসের প্রধান, হাসপাতালে গিয়ে ব্যবস্থা করে দেয়। দুর্ভিক্ষে মহামারিতে অগ্নিদাহে জলপ্লাবনে সে সর্বাগ্রে ছুটে যায়। এক বছর আগে প্রবল বন্যা হয়েছিল—আশেপাশের দুটো জেলার একের তিন ভাগ ডুবেছিল। সরকারি কর্মচারীরা জিপে বোটে সেসব স্থানে পৌঁছে ছিলেন। তাদের আগেই ভবানীকিংকর হেঁটে বুকভর জল ঠেলে সেখানে পৌঁছেছিল—মানুষকে অন্তত 'ভয় নাই' কথাটা বলেছিল। ফিরে এসে বাড়ীতে বুকের যন্ত্রণায় অধীর হয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আশুই চিকিৎসা করে, বিনা পয়সাতেই করে; সে তাকে বহু কষ্টে সুস্থ করেছিল। তার হৃদপিণ্ডের ধ্বনির মধ্যে সে শুনেছিল, আর পারছি না। আর পারছি না।—এই কথা। ভবানীকিংকর বিচিত্র—চারদিন পর আবার বেরিয়েছিল। কিন্তু হলে কি হবে। যক্ষ-পুরীর যক্ষরক্ত দেহে আছে—তার ক্রিয়া যাবে কোথায়—লোকটি অসম্ভব ক্রোধী। যার প্রাণ রক্ষা করে সেও তার ওই ক্রোধের জন্য তার কৃতজ্ঞতা সপ্রেমে জানাতে গিয়ে ফিরে আসে। আরও একটি খুঁত আছে। সে খুঁত লোকটির লেখাপড়া বিমুখতা। কাগজ কলমের সঙ্গে তার বনিবনাও নেই। যক্ষের সম্পত্তি তাদেরও বেশ ছিল। তার কাগজ-পত্র ছিল একখানা ঘর বোঝাই। তারকিছু অবশেষে নেই—দেখবার লোকের অভাবে। কংগ্রেসের প্রধান। তারও খাতাপত্র বোধ হয় নেই। যা আছে তা ভবানীবাবুর পকেটে কুলোয়। তবে সরল মানুষ। হৃদয়বানও বটে। যারা এ যুগে অচল। তবু ওই এক কারণে চলে। যাবে সে একবার সাবিকে দেখে আসবে। সঙ্গে বরং ভবানীবাবুর ছেলে জগন্নাথকে নিয়ে যাবে। ছেলেটি বাপের গুণ পেয়েছে। তবে অগুণ ক্রোধটি পায়নি। ওকেই সঙ্গে নেবে। সেই গাড়ীর ব্যবস্থা করবে। আরও একবারের গাড়ী চাই। সে ভবানীবাবু এসে করবে। সাবিকে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। ওই সাবিরা সবই মরবে। একে একে। "যত, যক্ষপুরীর কালের যৌন অসংযমের পাপের ভারা—ওদের ঘাড়েই চাপানো আছে—যক্ষপুরীর কাল গত হওয়ার পর ওরা যাচ্ছে। ওদের ফেলছে ভবানীবাবু ভালোই করছে। পাপক্ষয় হচ্ছে যক্ষবংশের।" এও শ্যামা-কিংকরবাবুর কথা। এ কাজ তিনিই প্রথম করতেন—প্রথম যৌবনে। তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম যক্ষপুরী থেকেই বৈরাগ্যবশে ও আলোর আহ্বানে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়িয়েছিলেন। দেশসেবা সমাজসেবার ধ্বজা তিনিই এখানে উঁচু করে তুলেছিলেন। তিনি চলে গেলেন এ সব ছেড়ে সাহিত্য কর্মে। তার পরিত্যক্ত ধ্বজাপতাকা ভবানী-বাবু তুলে নিয়েছে।

—ডাক্তারবাবু! কম্পাউন্ডার ডাকলে।—কলে যাবেন না? রোগী তো সব অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে।

—ও। আচ্ছা। ডাক্তার বের হল। ঘড়ি দেখলে, এগারটা পার হয়ে গেছে।

সামনে বি-ডি-ও আপিসে লোকারণ্য আজ।—কি ব্যাপার আজ?

কম্পাউন্ডার বললে—রাস্তা। সব নতুন রাস্তা হবে। বড় রাস্তা থেকে গাঁয়ের রাস্তা। আজ মিটিং। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মেম্বাররা এসেছে।

—আচ্ছা।

—তুমি আমাদের হেমন্ত মাস্টারের ছেলে? ডাক্তার? এক সবল প্রৌঢ় মণ্ডলমশাই জাতীয় লোক।

—হ্যাঁ।

—তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিল। ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত এক সঙ্গে পড়েছিলাম। আমার নাম রঘুনাথ ঘোষ। বাড়ী রামডাঙ্গা।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। নাম শুনেছি আপনার। তিরিশ সালে পিকেটিং করতে গিয়ে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

—শুনবে বই কি। সে সব অনেক কথা। পড়াই ছেড়ে দিলাম। এখন পাকু ঘোষ ব'লে নাম। বুঝেছ! মানে সব কাজেই আমি নাকি পাক লাগাই। তা অন্যায় হলেই লাগাই। এক নম্বর আপত্তি আমি দিই। বিষয় কর্মেও মামলা মকদ্দমা করি। তা বাপু একবার তোমার দোকানে বসব। কাগজ চাই, কলম চাই। দরখাস্ত লিখব। দরখাস্ততে আপত্তি দোব। লিখিত আপত্তি। নইলে ওরা সব লিখবে না।

—বেশ তো বসুন। কম্পাউন্ডার রইল —কাগজ কলম সব দেবে! ওহে নবনী। এঁকে কাগজ কলম দাও তো।

—একখানা ভাল ফুলস্ক্যাপ কাগজ চাই। না থাকে তো কিনে আনুক। দেখ এই যে সব কান্ড দেখছ সব নিজের পাতে ঝোল। সব নিজের গাঁয়ের রাস্তা হলেই বাস। তার ওপর চুরি। এক টাকা খরচ লেখে—চার আনা ছ আনার কাজ—দশ আনা ট্যাঁক বন্দী। গত-বারে—কংগ্রেসের ওপর ক্ষেপে—কম্যুনিস্টকে ভোট দিয়েছি। সে সব তখন কত ফতোয়া। ও দুই সমান। আমার গাঁয়ের এক পোয়া

পথ, এক হাঁটু কাদা বর্ষার সময়, খরাতে ধুলো—রাজপুতনার মরুভূম। ঝড় যখন ওঠে তখন সে যদি দেখ! ওঃ। তা দেবে না—ওই এক পোয়া রাস্তায় টাকা দিতে বলবে না দু পক্ষেই। আমি লিখিত আপত্তি দোব। আর গতবারে রাস্তা যা হয়েছে তার খরচের তদন্ত করতে বলব।

—আমি যাই। কলে যাচ্ছি। আপনি বসে লিখুন।

—আচ্ছা। আচ্ছা। আমাদের ওদিকে কলে গেলে আমার বাড়ী যেয়ো। বুঝেছ।

—যাব। নিশ্চয় যাব। নমস্কার!

—মঙ্গল হোক বাবা। আমি-লিখি—তুমি যাও।

অয়েলস্কিনে মোড়া শোলা হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে আশু সাইকেল হাতে বেরিয়ে পড়ল।

সামনে অনেক লোক। বি-ডি-ও আপিসে এসেছে সব। এ অঞ্চলের বিশিষ্ট জনেরা। এখানে না চেপে সাইকেলটা ধরে নিয়েই হাঁটতে লাগল। চন্দনপুরের কুমোরের চাক ঘুরছে এখানে। পুরনো ভেঙে নতুন। মাঠ ভেঙে রাস্তা। মানুষ গাড়ীতে চড়ে ছুটবে। যেখানে যেতে চায়—কোথায় তা জানে না, তবে সামনে না-হেঁটে উপায় নেই; নইলে পিছনের ধাক্কায় পড়তে হবে মরতে হবে—। পিছনে হটাও যায় না; কারণ মানুষের পায়ের পাতাগুলো সামনের দিকে লম্বা—চোখে দুটোও সামনের দিকে। তা, যেখানে যেতে চায় (সেখানে সুখ আছে) সেখানে এমন পায়ে হাঁটা হেঁটে যাওয়া যায় না। যাবে না। তাই জীপে চড়ে ছুটবে।

এরই মধ্যে এক পাশে পুতুল নিয়ে বসে আছে ফটিক দাস। মধ্যে মধ্যে খাতা পেন্সিলে ছকছে কিছু। অন্য দোকান তো চন্দনপুরের জীবনযাত্রার যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে—পথের দুপাশে পাকা দোকানে পাতা আছে।

সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলল ডাক্তার। কিন্তু নিজেদের মধ্যে লোকেরা এমন তর্ক মগ্ন যে ঘণ্টাও কানে যাচ্ছে না।

—আশুবাবু! আপনি ডাক্তার আশু-বাবু? পিছন থেকে কেউ ডাকলে।

—হ্যাঁ।

—নমস্কার। আমি—

—আপনাকে চিনি। আপনি আমাদের এম-এল-এ সীতানাথবাবু।

—হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে দু মিনিট কথা বলব।

—বলুন।

—এখানেই? কলে যাচ্ছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। একটু পাশে চলুন দাঁড়াই! হবে না?

—না। চলুন বলতে বলতে যাই। নইলে আপনার দেরী হবে। কথা কিছু এমন নয়। একটা খবর নেব। শুনেছি আপনি মেয়েদের হোস্টেলে ডাক্তার। না?

—হ্যাঁ। ওখানে দেখি আমি।

—ঠিকই শুনেছি আমি। একটা খবর আমি চাচ্ছি—বন্ধুভাবে, ভদ্রলোক হিসেবে—

—বলুন।

—অমর চক্রোত্তির মেয়ে সীমা। সে ওখানে থাকে।

—হোস্টেলে থাকে না, হেডমিস্ট্রেস ওকে আশ্রয় দিয়েছেন।

—ওই হ'ল।

—না। হ'ল না। হেডমিস্ট্রেস ব্যক্তিগত-ভাবে আশ্রয় দিয়েছেন। ইস্কুল হোস্টেল—এ ধরনের দায়িত্ব নেয় নি। কারণ সকলে সীমার পালিয়ে আসা সমর্থন নাও করতে পারে। আপনি এখানকার এম-এল-এ। অমর আপনাদের লোক—

—প্রতিবাদ করব। অমর আমাদের লোক নয়। পার্টির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই।

—নেই? কিন্তু সে তো গতবার কংগ্রেসের টাকা খেয়েছে আপনাদের কাজ করেছে।

—করেছে। হ্যাঁ করেছে। কিন্তু আমাদের পার্টির লোক সে নয়। ওরকম লোক আমরা পার্টিতে নিই না। যেমন আগেকার কালে কংগ্রেস করত।—এখন তারা রুলিং পার্টি তারা দল বাড়ানোই বড় কাজ ভাবে। তাই যে আসে তাকেই নেয়। সৎ অসৎ বাছে না। তে-হট্টার অসীম চাটুজ্জে তিরিশ সাল থেকে খুনে পুলিশ সাহেব দোহার অনুচর ছিল। কোমরে রিভলভার বেঁধে ঘুরে বেড়াত। তার কীর্তি মুখে বললে পাপ হয়। সে লোকটা আজ গ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি। সেও গতবার কংগ্রেসের কাজ মুখে করেছে কাজে করেনি। ওখানেই ভোট আমি বেশী পেয়েছি। তেমনি অমর চক্কোত্তি কংগ্রেসের লোক—বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—আমাকে ভোট দিইয়েছে। তাতে সে আমার লোক না। আমার লোক সে নয়। কম্যুনিজমে ভগবান নেই। আমি কম্যুনিস্ট, কিন্তু বামুনের ছেলে, জাত মানি না, কিন্তু ছেলেমেয়ের বিয়ে বামুনে ছাড়া দিইনে দিতে পারিনে। ভগবানও তাই। মানিও না, আবার না-মানাও নই। বাড়ীতে শালগ্রাম আছে—জমি আছে—সেবা চালাই। পলিটিক্সে মিথ্যে বলি। কিন্তু মিথ্যে যে বলে তাকে ঘেন্না করি। আর আপনাকে আমি মিথ্যে কথা বলছি না। অমর চক্কোত্তিও কংগ্রেসের লোক—রমেশও তাই। যারা কোন পলিটিক্যাল পার্টির লোক হতে পারে না। হওয়া উচিত নয়। আর আমি অমর চক্কোত্তির হয়ে কথা বলতে আসিনি। আমি খুসী হয়েছি—সীমার সাহসে সে যা ক'রেছে তাতে। আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তা এই। শুনেছি—সীমাকে খেতে দেওয়া হয় হোস্টেলে—তার জন্যে তাকে ঝি বা রাঁধুনীর মত খাটানো হয়। একটা ভুতুড়ে ঘরে নাকি থাকতে দেওয়া হয়েছে। সেইটের সত্য মিথ্যে আমি জানতে চেয়েছি।

—ও চক্কোত্তি মশাই। ও গো!—ডাকছে ওখান থেকে সীতানাথকে।

—যাচ্ছি।...সত্য কথাটা আমি জানতে চাই।

—দেখুন, আমি বললেও তো বিশ্বাস করবেন না আপনি।

—কেন করব না। নিশ্চয় করব।

—সীমা ওখানে গিয়ে একদিন পর হেড-মিস্ট্রেসকে বললে—দেখুন—আমি এখানে থাকব—খাব—তা এমনি কেন নেব এসব। আপনার রান্নার কাজটা আমি ক'রে দি। নইলে আমার ভারী খারাপ লাগবে। আর আমার খরচও তো কিছু হবে। কাপড় বই এ সবে। আপনি রান্নার লোককে খেতে দেন থাকতে দেন মাইনে দেন। আমাকে দেবেন। হেড মিস্ট্রেস তাতে রাজী হননি। না। সে আমি পারব না। কথাটা শিবশংকরবাবুর কানে যায়। তিনি খুব খুসী হয়ে বলেন—তুমি গার্লস হোস্টেলে রান্নার তরকারী কি হবে—এসব যদি দেখাশোনা কর—তা হলে তুমি হোস্টেলে খাবে—থাকবে—মাইনেও পাবে দশ টাকা হিসেবে। কাজের লোক কাজ করবে—তুমি দেখেশুনে দেবে। আমাদের রাখতে হ'ত এরকম লোক। তা তুমিই আরম্ভ কর। আর ভুতুড়ে ঘরটর নয়। সেও প্রবাদ বাক্য। একটা ছোট ঘর পড়ে থাকত। ছোট এক কারণ দ্বিতীয় কারণ ও বাড়ী ভূতনাথ বাঁড়ুজ্জের বাড়ী—ভূতনাথের প্রথম স্ত্রী বিষ খেয়ে মরেছিল, কিন্তু ও ঘরে নয়, তবে ওই ঘরটা ছোট বলে ওইটেতে ভূত হয়ে সে বাস করছে—এই আগে লোকে বলত। যেমন বড় বড় গাছ থাকতে শেওড়া গাছে ভূতের বাসা বলে থাকে লোকে। তাও শিবশংকরবাবু আপত্তি করে-ছিলেন। সীমাই ওটা বেছে নিয়েছে নিজে।

—ও—চক্কোত্তি মশাই। মিটিং যে বসে গেল!

যথা সময়ে চাকা ঘুরতে সুরু করেছে। ও থামে না।

পুতুলের দোকানের সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেছে। ফটিক দাস শুধু বসে আছে বাইরে।

নেশা আলোকচিত্র ঃ শ্রীব্রজেন ঘোষ

(এগারো)

সীমা বসেছিল ঘরে। সেই যাকে বলেছিল সীতানাথবাবু—ভুতুড়ে ঘর। এই ঘরে নাকি ভূতনাথবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল—সে ভূত হয়ে বাস করত। কাঁদত। ছোট্ট ঘর। আগেকার চোরকুঠরী। লোকে নাকি সে কান্না শুনেছে।

বিচিত্র বিস্ময়। এই বাড়ী বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ী। যক্ষপুরীর বাঁড়ুজ্জেদের। তিন পুরুষ এক সন্তান। প্রথম পুরুষ কৃপণ। দ্বিতীয় পুরুষ মদ্যপ ব্যাভিচারী। তৃতীয় পুরুষ রোগগ্রস্ত বুদ্ধিহীন অক্ষম। তার মধ্যেও চলেছে ব্যাভিচার। নারী নির্যাতনও দু পুরুষের। লক্ষ লক্ষ টাকা না কি ছিল। কোথায় উড়ে গেল ওই অক্ষমতার পথে। ব্যাভিচার মদ্যপানে এত যায় না এবং যায়নি। গেল অক্ষমতার পথে। সেই বাড়ী হস্তান্তরিত হয়ে চন্দনপুরের নতুনকালের গড়নের পথে হয়েছে গার্লস হাইস্কুলের হোস্টেল। কলকাতা ধানবাদ আসানসোল জামসেদপুর থেকেও মেয়েরা এখানে এসেছে।

যে বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেদনার্ত নারীর দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়ে থাকত—সেই বাড়ীর কোণগুলিতে ঘুরে বেড়ায় তরুণ কণ্ঠের কলহাস্য। কখনও কখনও কান্নাও ওঠে। ছোট মেয়েরা বাড়ী থেকে এসে প্রথম প্রথম কাঁদে! বিচিত্র একটি সংযোগ তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথম যখন এ বাড়ীতে গার্লস হোস্টেল হয় তখন নসুবালা ভাদুগান একটি বেঁধেছিল।—

ভাদু আমার বিবি সাহেব হবে গো!
যে বাড়ীতে কেউ শোনে নাই বউ বিটিদের
গলা—
বউ কেঁদেছে ঘরের কোণে বাবুর হাঁকাড়
হুই বাগানে—
সেই বাড়ীতে মেয়ের মেলায় এ কি হাসির পালা!
ভাদু আমার বিবি সাহেব হবে গো!

চোর-কুঠরিটায় প্রথম জিনিসপত্র থাকত। এখন একটা জানালা ফোটানো হয়েছে: সেটাই বেছে নিয়েছে সীমা। তার তক্তাপোষের তলায় এখনও জিনিসপত্র থাকে। ওর জিনিস আর কি? এক কাপড়ে এসেছিল। প্রথম ভবানীকিংকর কিছু টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছে ওর বই খাতা এবং দুখানা কাপড়ের জন্য। সেটা সীমা নিয়েছিল। এখন মাইনে পেয়ে একটা টিনের স্যুটকেস কিনেছে। ছিট কিনে দিদিমণির কাছে ব্লাউজ কাটিয়ে নিজেই সেলাই করে নিয়েছে। কেমন করে কোথা হতে কিভাবে সে এমন সৃষ্টিছাড়া হ'ল তাও সে ভাবে মধ্যে মধ্যে। একলা হ'লে ভাবে। ওই এখানে চাকরী হওয়ায় যেতে তার দেরী হয় ইস্কুল। ইস্কুলে তার নাম নেই।

দার্জিলিং —শ্রীইন্দ্র দুগার

প্রাইভেট হিসেবে দেবে। সব সাবজেক্ট সে মোটামুটি জানে—কাঁচা সে ইংরিজীতে। দুবার ফেল সে ইংরিজীতেই হয়েছে। সংস্কৃতটা রেখে ভুল করেছে—ওটাতেই টায়ে টায়ে তেত্রিশ পেয়েছে। কিছু বেশী হলে সেকেন্ড ডিভিশন হ'ত, কম্পার্টমেন্টাল পেত। তাই সে ইংরিজীর ক্লাসের সময় যায়। সংস্কৃত ক্লাসেও যায়। সংস্কৃত ক্লাস প্রথম দিকে। সংস্কৃতের ক্লাস সেরে হোস্টেলে ফিরে স্নান করে খায়, পড়ে। সেই অবসরে ভাবে।

কালের হাওয়া আছে। তার সাধের কথা স্পষ্ট। দিদিমণিদের মত স্বাধীন হবে। বাবার আচরণ দেখেছে। সৎ মায়ের—এখন সৎ মা-ই বলবে—জীবন দেখেছে। তবু তো দিদিমণিরাও বিয়ে করে। সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে দিদিমণিও তো দেখেছে সে!

আজ শুভেন্দুর পত্র পেয়ে এই ভাবনাটাই তার নতুন ক'রে জেগেছে।

চিঠিখানা তাকে নেলি পোঁছে দিয়েছে।

নেলি বাড়ীতে দাদার চিঠি পেয়ে কাকার বাড়ী খবর দিয়ে ছুটে এসে সীমাকে খবর দিয়েছিল। সীমা খুসী হয়েছিল। কোন সন্দেহ কোন পক্ষে জাগেনি। নেলিরও মনে হয়নি সীমাকে ছুটে বলতে এল কেন? সীমারও হয়নি, বলেনি, তা সে খবরটা এত লোক থাকতে আমাকে কেন বল তো? অত্যন্ত অসংকোচে খুসী হয়েছিল। শুভেন্দুর তাকে ভালোবাসা সম্পর্কে কোন সন্দেহই ছিল না। শুভেন্দুর পত্রেও কিছু ছিল না। কচ দেবযানীর উপমা কচ দেবযানী অভিনয় নিয়ে—তার কোন দাগ তো উভয়ের মনেই পড়েনি। কতদিন তো তারপর দেখা হয়েছে কথা বলেছে। শুভেন্দুর ওটাতে প্রেমের কোন গন্ধ থাকলে শুভেন্দুই কি সেটা নেলিকে পড়তে দিত। তাই প্রথম চিঠি পাওয়ার দিন সে যেমন অসংকোচে বলেছিল—দূর দূর: তেমনি অসংকোচে খুসী হয়েছিল শুভেন্দুর চিঠি এসেছে সংবাদ শুনে। বলেছিল—বাবাঃ, বাঁচলাম

নেলি। আমার মনে ভারী কষ্ট হয়েছিল। জানিস—ওকে যদি তখন সামনে পেতাম না খুব করে যা-তা বলে দিতাম। বাড়ী থেকে না বলে পালানো খুব বাহাদুরি বুঝি! কাপুরুষ বলে দিতাম। তা তোর দাদা বাড়ী আসবে না? এলে আমি ঠিক বলব—দেখিস!

নেলি বলেছিল—দাদাকে লিখে দেব তাই। সীমা এইসব বলছিল।

—লিখিস।

নেলি চলে গিয়েছিল ইস্কুল, সীমা ঘরে বসে ছিল। ঘণ্টাখানেক পর—হেডমিস্ট্রেস ক্লাসে এসে নেলিকে ডেকেছিলেন।—নেলি শোন।

নেলিকে সঙ্গে নিয়ে অফিস রুমের দিকে যেতে যেতে বলেছিলেন—আশুবাবু ডাক্তার এসেছেন, তোমার দাদার খবর বলতে। ওঁকে চিঠি দিয়েছে তোমার দাদা—সেটা পড়তে দেবেন। যাও, ভিজিটারস রুমে রয়েছেন উনি।

আশু ডাক্তার অনেক ভেবেও এ ছাড়া পথ পায়নি। সে ইস্কুলে এসেছে—নেলি ছাড়া আর কারুর দ্বারা এ হয় না—হতে পারে না। একবার নেলিই শুভেন্দুর চিঠি সীমার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় পত্রও সেই নিয়ে যাবে। নেলি যদি গররাজী হয়, তবে সে এ চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দেবে অথবা শুভেন্দুকে ফিরে পাঠিয়ে দেবে।

নিজের চিঠিখানা নেলিকে দিয়েছিল—পড়। পড়ে দেখ।

নেলি চিঠিখানা পড়ে একটু বিহ্বল হয়েই তার দিকে তাকিয়েছিল। বোধ হয় ভেবে পায়নি কি বলবে! সেই অবসরেই আশু সীমার চিঠিখানা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেছিল—এটা দিয়ো। আর আমার চিঠিটা দাও।

নেলি তাই করেছিল। এবং আশু ডাক্তার যেতেই চিঠিখানা জামার মধ্যে পুরে হেডমিস্ট্রেসকে বলেছিল—আমি বাড়ী থেকে একবার ফিরে আসব বড়দিমণি।

—যাও। তিনি পাশের ঘরে বসেছিলেন। ওই কটা কথা যা হয়েছিল—পড়। পড়ে দেখ। তারপর—নাও দিয়ো। আমার চিঠিটা দাও। এ সবই তার কানে গেছে। তিনি তো আপত্তির কিছু পাননি। তিনি ও চিঠিখানা বাড়ীর বলেই নেলিকে বলেছিলেন, যাও।

নেলির মনের মধ্যে তখন আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছে। তরুণ কৈশোরে—এই জীবনের এই পূর্বরাগের মাধুরীলীলায় সখীত্বে যে একটি সকৌতুক আসক্তি আছে সেই সকৌতুক আসক্তি জেগে উঠেছে। সে দ্রুত-পদে যেন ছুটতে ছুটতে এসে সীমার ঘরে ঢুকে বিছানায় বসেছিল—বাবা বাবা—তোমার আর দাদার জন্যে আমার এই নাজেহালের কি মজুরী আমি পাব তা জানি না। হয়তো লবডঙ্কা। কিন্তু আমি মলাম।

—কি?

—কি?—এই দেখ কি? দাদার চিঠি। শ্রীচরণে নিবেদন। ধর।

—চিঠি?—হাতে করে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিল নেলির দিকে।

নেলি বলেছিল—পড় না। সব মালুম হবে।

চিঠিখানা রুদ্ধনিশ্বাসে পড়ে গিয়েছিল সীমা। তারপর কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর চিঠিখানা ছিঁড়তে সুরু করেছিল। নেলি অবাক হয়ে দেখছিল। আধখানা ছিঁড়ে একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমেছিল সীমা—তারপর অত্যন্ত দ্রুত টানে চিঠিখানা কুচি-কুচি করে দিয়েছিল। আবার হেঁট হয়ে বসে কুচিগুলি কুড়িয়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ আসেনি। নেলি বুঝেছিল—সে সেগুলিকে উনোনে পুড়িয়ে দিতে গেছে। কিছুক্ষণ পর সীমা ফিরে এলে নেলি বলেছিল—ওতে কি লিখেছে দাদা আমি জানি না। তবে ভালবাসার কথা আছে সেটা জানি; তবে—। কিছুক্ষণ থেমে বোধ করি সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা করেই বলেছিল—তবে এতো সংসারে আছে। লেখ চিঠি। খারাপ হলে নিশ্চয় আপত্তির কথা। কিন্তু দাদা তা লিখবে? বিশ্বাস হয় না।

সীমা বললে—তোমার দাদাকে লিখে দিয়ো—আমার প্রেম করবার সময় নেই। বিয়ের জন্যে সীমা জন্মায় নি। হলে সে বিয়ের আসর থেকে উঠে আসত না। প্রেমের জন্যেও না। হলে তার প্রথম পত্রের উত্তরেই একখানি মস্ত লম্বা চিঠি লিখতাম। আমার লক্ষ্য আমার ভবিষ্যতে অন্য রকম। তিনি যেন আমাকে উত্যক্ত না করেন। আমাকে পাস করতে হবে। পড়তে হবে। চাকরী করব আমি।

নেলি ফিরে এল। সে আর ইস্কুল গেল না। মুহ্যমান হয়ে বাড়ী এল। বারোটা বাজে। তখন—

মা তার চণ্ডীতলায় পূজো দিয়ে সদ্য ফিরেছে। ছেলের খবর এসেছে। ছেলে চাকরী করে পড়ছে। খবর পেয়েই পূজোর জিনিস কিনে আনিয়ে পূজো দিতে গিয়েছিল। বাবা নীচে নেমে এসেছে। বাবা এখন নিচে নামছে। একজন লোক রেখেছে—মাঠে ধান দেখবার জন্য, কিন্তু ধান পিটানোর পর ভাগের সময় বসে না থাকলে

হবে না। মাথার গোলমাল সব কেটেও কাটে নি। অংক ভুল হয়ে যায়। অধিকাংশ সময় কৃষাণদের ভাগ তাঁর অংকে কমে যায়। গোপাল চৌধুরী তা বোঝে। জানে। হিসেবও সেই জন্যে সেই কর্মচারীই করে, কিন্তু বসে না থাকলে তার অশান্তি বাড়ে। সমস্ত দিনই হিসেব কষতে থাকবে। খাতার পাতার পর পাতা। মজার কথা, কোন অংকের সঙ্গে কোন অংক মিলবে না। সুতরাং চৌধুরী বসে থাকে।

বাবাও বসে ছিল দাওয়ার উপরে। মা থালা নামিয়ে দিয়ে বলছে—নাও—ফুল তুমি তুলে নিজেই মাথায় ঠেকাও।

বাবাও খুশী মনে রয়েছে—সে বললে, দাও না বাবা ঠেকিয়ে—তুমিই দাও। আমি তো ছেলের অধম হয়েছি।

হা-হা-হা-হা করে হেসে কে গড়িয়ে পড়ল।

নেলি সেই মুহূর্তে বাড়ী ঢুকল। হাসছে নসুবালা। হেসে গড়িয়ে পড়ছে। বাবা বললে—তা তুই হাসছিস কেন রে?

—হাসছি! হেই মা। ইয়েতে আর না-হাসে! বলে কিনা আমি তো ছেলের অধম হয়েছি।—হা—হা—হা—হা।

—এই নেলি এসেছে। দে তো রে, আশীর্বাদ দে তো। চরণোদক দে তো। তা—তুই এ অবেলাতে কোথা থেকে এলি বল তো নসু!'

—অবেলা! নসুবালার বেলা অবেলা, হেই মা—উ কথা বলতে নাই। কত এসেছি ভর দুপুরে—মা—আমি এলাম গো!—কে? ভাদুর মা!—আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনাদের চরণের দাসী। চারটি পেসাদ পাব।—বস—বস—বস। ভাত খেলাম তো বলে—বস ভাদুর মা দুটো কথা শুনি—বিকেলে চা খেয়ে যাবি। যাবার সময় রেতের চাল দিয়ে বলত, আয়—আবার আসিস। আমার আবার অবেলা! তা আজকের কথা আছে। বউঠাকরুণ গরদের কাপড় পরে হরষপরষ চণ্ডীতলায় যেছে—। এই দ্যাকো, যেছে বেরিয়ে গেছে। যাচ্ছে—যাচ্ছে। আমার পথের ধারে ঘর—উঠোনে জবার গাছ। ডগালে চারটি ফুটে আছে। তা বললে—ভাদুর মা—ফুল চারটি নোব। আজ আমার বেটা শুভোর খবর এয়েছে। চিঠি নিকেছে। তা আমি বল্লি—কি শুভদিন মা কি শুভদিন। সব কটা নাও মা সব কটা নাও। আমিও সঙ্গে যেতাম—তা—বড় শ্রম হয়েছে, ছুটতে ছুটতে গিয়েছিলাম—সেই কানাই সায়েবের পাড়। চন্দনপুরে ইলেকটিরি আসবে, খুঁটো পুতছে, দেখতে গেলাম ছুটে। হেই মা—হেই মা —চন্দনপুর আদাড় বন। তাই হচ্ছে সিংহাসন। জনম নিয়েছি মরতে হবে—দু চোখ ভরে দেখে যাব না দাদাবাবু? বলব না গিয়ে পুরনো কালের বাবুদের মাঠাকরুণদের—মা বাবা—সে কি কাণ্ড সে কি কাণ্ড! আঃ—পারতো নতুন কালে জনম নিয়ে দেখে এস গা।

—এসব নসুর বাঁধা কথা। অহরহ বলছেই —বলছেই। যেমন পাখীতে বলে রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণরাধা, রাধাকৃষ্ণ। চৌধুরী হেসে বললে —তা দেখে এলি?

—এলাম। সে কোথায় কি গো। শুধু লোহার থাম কটা!—আলো জ্বলতে বলে

ছমাস। তা—হ্যাঁ। ফিরে আসবার সময় বউঠাকরুণ বললে—আয় ভাদুর মা—আমার বাড়ীতে দুটো খাবি।

—তা বেশ। তা ভাদু শোনা দেখি। ওই যে ভাদু আমার বিয়ে করবে না—না কি—বেঁধেছিস।

—শোনবা। তা দুয়োর বন্ধ কর বাবা। সতীশ ঘোষালের মতন কেউ শুনলে কুরুক্ষেত্র করবে।

নেলি বললে—না বাবা। ও ঘেঁটু গাইতে হবে না। না!

—তাতে কি হল? ওতে তোর বন্ধুর অপমান করে নি। ভালোই তো বলেছে।

—না—না—না।

—বেশ! বেশ—! বেশ! চীৎকার করে উঠল চৌধুরী। নসু বললে—তবে শোন—

"চল ভাদু যাই চন্দনপুরের অবাক কান্ড দেখে আসি।

বেতারে বাজিছে ফ্লুট—
মন রস না—থামা কদমতলার বাঁশী।
লে—ভাদু লে চটি পারে
পথে কাদা নাই লো।
পিচঢালা রাস্তা চল্ মন রসনা
কলিকাতা যাই লো॥"

চৌধুরী সকৌতুকে বললে—তাই বটে! শুধু পেটে ভাত নাই। দেবতা উপোষ! মেয়েতে থানায় এসে সোজা বলে—আমি বিয়ে করব না। বাবা বিয়ে দিচ্ছে জোর করে। আপনারা বাবাকে নোটিশ দেন—নইলে আত্মহত্যা করব। লিখে নাও ডাইরী! বাবা রে কাল! বলিহারি!

নসু বললে তা হলে শুনুন বাবুদাদা—
(ঘোমটা) সান্ তু কাড়িস না ভাদু
সান গিয়েছে উঠি—
আলতা পরা ঘুচেছে লো
মন রসনা পায়ে পর লো চটি—
ও মন রসনা ভাদু
চন্দনপুরের কান্ড দেখে আসি।
তাই ঘুনা ঘুন তাই ঘুনা ঘুন
তাই ঘুনাঘুন—

নদী বেঁধে—।
হেই মা গো। দ্যাকো—নদী বেরিয়ে গ্যাচে মুখ দিয়ে।—
নদী বেঁধে ক্যানেল কেটে
জল এনেছে—
হায় দেবতা পড়লে ফাঁকি
আর তোমাকে মানত মেনেছে!
ভানাড়ীদের অন্ন মেরে
মেশিন বসেছে—
বলদ মোষ বনে যাবে
কলের লাঙল আসছে।
তারে তারে খবর চলে—
আবার আসছে ইলেকটিরি—
শুভ খবর শুভোদাদা
আসছে ঘরে ফিরি।

তাই ঘুনা ঘুন—তাই ঘুনা ঘুন
—তাই ঘুনা ঘুন।

সেই দুপহরে—গোপাল চৌধুরীর বিষণ্ণ ঘরখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শুভেন্দুর খবর এসেছে।

(বারো)

মাস ছয়েক পর। আষাঢ় মাস। আকাশে বর্ষার মেঘ দেখা দিয়েছে। এলোমেলো বাতাস বইছে। গরমের ছুটির পর সদ্য ইস্কুল খুলেছে।

সীমা হোস্টেলের তার ঘরের জানালায় বসেছিল। মন তার বিষণ্ণ। বিষণ্ণ দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলে চেয়ে আছে।

অমর চক্রোত্তি, তার বাবা, গতকাল অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। গাড়ীতে তুলে বাড়ী নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে রমেন্দ্র। নইলে হয় তো হাসপাতালে যেত। মদ খায় চক্রবর্তী সে কথা বিশ্ববিদিত। কাল বেশী খেয়েছিল ঝগড়া করবার জন্য। চণ্ডীতলা নিয়ে ঝগড়া। সামান্য কারণে ঝগড়া নয়, চণ্ডীতলা নিয়ে প্রচণ্ড সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। সেই সমস্যা ভিত্তির উপর ঝগড়া। অমর চক্রবর্তীর ঝগড়া ইচ্ছা করে। তার ফল—।

দেশের নতুন আইনে—জমিদারি জমি থেকে খাজনা সব রকমের আয়—সব গিয়েছে গভর্নমেন্টের হাতে। পুরনো মতে চণ্ডীমায়ের সেবাইত বল সেবাইত, মালিক বল মালিক—ছিল জমিদারেরা। তারা একজন সাধু সন্ন্যাসীকে গদীয়ান নিযুক্ত করত। সেই পরিচালনা করত সমস্ত—পুজো-ভোগ, খাজনা, আদায় ইত্যাদি। এ ব্যবস্থা আশ্চর্য রূপে অচল হল—উপযুক্ত সাধু সন্ন্যাসীর অভাবে। সন্ন্যাসী মেলে, সাধু মেলে না। তখন হয়েছিল এক ম্যানেজিং কমিটি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর—ম্যানেজিং কমিটি জমিদারে করলে না—করলে—হিন্দু জনসাধারণ। কিন্তু সেটেলমেন্টের সময় জমিদার করলে দাবী—সেবাইত তারা। আপত্তি দিলে সেটেলমেন্টে। ফলে—যে টাকা অন্তর্বর্তী কালে অ্যানুয়িটি পাবার কথা সরকারের কাছ থেকে সে বন্ধ হল। মা চণ্ডীর দরবার—জমিদার বাড়ীর সমান হল। মায়ের অনাহারের অবস্থা। এই অবস্থায় মাছ বিক্রী ধান বিক্রী করে ম্যানেজিং কমিটি ভোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই চলছিল। হঠাৎ কমিটিতে ঝগড়া লাগল। কমিটির সভাপতি রামসুন্দর গণ্যমান্য লোক হলেও তাকে নামে ফেললে কমিটি। কয়েকটা অবিবেচনার কাজ তিনি করেছিলেন। তারা সভা থেকে তাকে দায়ী করে শুধু অপদস্থ নয়—পদ থেকে অপসারিত করবার জন্য কোমর বাঁধলে। সভাপতির দল অবশ্যই একটি ছিল। কিন্তু তারা মুষ্টিমেয়। এবং তারা খুব শ্রদ্ধেয় নয়।

উটকামণ্ড

আলোকচিত্র : শ্রীআনল দত্ত

শক্তিমানও নয়। বিপক্ষে যারা তাদের মধ্যে বড় বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর শিবশংকর, শিবনাথ দে, নিত্য চৌধুরী, ভবানীকিংকর সকলে আছে। সভাপতি সংকট বুঝে কলকাতায় গিয়ে ধরেছিলেন শ্যামাকিংকরবাবুকে। শ্যামাকিংকর এখানকার কোন কলহ সমস্যায় থাকেন না। আসেন—দুদিন থেকে সকলের সংগে হেসে খেলে গল্প করে চলে যান। তিনি এলে হোস্টেলের মেয়েরা যায়—শিক্ষয়িত্রীরা যায়—প্রণাম করে—গল্প করে চলে আসে অন্য লোক এলেই। মঞ্জু রঞ্জু দুই বোন ভাল গান গায়—তারা গান শোনায়। বন্ধুরা আসে—তার মধ্যে সুরেশ্বর প্রধান, নিত্য চৌধুরীও থাকে। বাইরের লোকও আসে। শ্যামাকিংকরবাবুর নতুন নেশা—গাছের ডাল—বটের অশথের ঝুরি থেকে সুন্দর—পুতুল তৈরী করেন। চমৎকার সেগুলি। কিন্তু কোন সমস্যা বা কলহের সমাধান করতে বললে—হাত জোড় করে বলেন—আমি তোমাদের ভালবাসার আদুরে ভাই। আমাকে তোমরা, আর চন্দনপুরের মাটির মধ্যে যে মা আছেন—সেই মা বিদেশে পাঠিয়েছেন—তোমাদের মহিমার কথা বলতে। আর সারা দেশ থেকে যে দান—যে ঋণ তারা পাঠিয়েছে—তাই শোধ করতে। আমি তোমাদের ভালবাসায় ধন্য। আমাকে এসবে টেনো না। এবার কিন্তু তিনি ঠেলতে পারেন নি এ'র কথা। কারণও ছিল। প্রথম সাহিত্যিক জীবনে—যখন তিনি সামান্য—যখন তিনি পথের মানুষ তখন—বছর দেড়েক—কলকাতায় গিয়ে তার বাসায় থাকতেন—মাসে পাঁচদিন সাতদিন কখনও দশদিন। তারও পিছনে একটু কথা আছে। এই সভাপতি—রামসুন্দরবাবুকে একবার গ্রামের প্রধানেরা পতিত করবার আয়োজন করেছিল—বিলেত ফেরতের সংগে কন্যার বিবাহ দেওয়ার জন্য। জেল ফেরত কংগ্রেসকর্মী তখন শ্যামাকিংকর। তখন চোখে তার বাহ্নিকণা বের হয়। তিনি সারা সমাজের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কথা ছিল—বিদ্যা শিক্ষার্থে বিলেত গেলে যদি জাত যায় তবে বাড়ীতে যাঁরা সাহেব ভোজন করান এবং সংগে ভোজন করেন—তাদের পতিত কর সর্বাগ্রে। আমি কারও পক্ষে নই কারও বিপক্ষে নই। আমার যুদ্ধ নীতির জন্য। রক্ষা তিনি করেছিলেন। এরপরই রামসুন্দর শ্যামাকিংকরকে সমাদর করে বাড়ীতে আহ্বান করেন। এবং অপরিসীম যত্ন করেছিলেন এই কালটিতে। তাঁর স্ত্রী মায়ের মত যত্ন করেছেন স্নেহ করেছেন। সেই সময়ে একটি হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল।

সেই হৃদাতার আকর্ষণেই—রামসুন্দরের অনুরোধে তিনি এসেছিলেন মিটিয়ে দিতে। কাল ছিল সেই সভা। বহু লোক এসেছিল। রমেন্দ্রও এসেছিল।

ঘটনাটা সম্মান রক্ষা করেই মিটিয়ে দিয়েছেন শ্যামাকিংকরবাবু। কিন্তু মাঝখান থেকে মদ খেয়ে প্রমত্ত হয়ে ঝগড়া করেছিল অমর চক্রবর্তী—অন্য একজনের সঙ্গে। নিতান্ত তুচ্ছ কারণে। সে মদ্যপ গালাগাল দিয়ে বলেছিল—তুই আর লাফাসনে। তোর কীর্তি মার্কামারা। শালা তোর নাকে চুন গালে কালি—তুই আর বলিস নে।

—খবরদার। শালা—শুয়োর কি সাজো চুপ রহো।

—চুপ রহেগা? শালা—তুই চণ্ডী মাকে কিল মারিস্‌নি।

—মেরেছি। হাজারবার মেরেছি, ফিন মারেগা। হম পাণ্ডা হ্যায়। সিদ্ধপুরুষ।

—ওরে শালা সিদ্ধ পুরুষ। তুই সিদ্ধ তোর মেয়ে ইস্কুলে সিদ্ধ হচ্ছে।

—খবরদার—

আর কথা বের হয়নি। লাফ দিয়ে পড়তে গিয়েছে লোকটার উপর কিন্তু তার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে।

রমেন্দ্র জামাই। সে তার নিজের মান সম্মান বজায় রেখে—শ্বশুরকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে দেখিয়েছে। ডাক্তার বলেছে—সাবধানে রাখবেন। কোন রকম উত্তেজনা যেন না হয়। রমেন্দ্রও মদ খেয়েছিল। বলেছে—জেনে—রমেন্দ্রের কাছে কলহকারী দুই মদ্যপই মদ খেয়ে প্রমত্ত হয়েছিল। এবং মদের নেশার উদারতায় দীর্ঘ দশ মাস পর শ্বশুর জামাইয়ে মিল হয়েছিল। দুজনেই নাকি চণ্ডীতলার জঙ্গলে বসে মিটিংয়ের পূর্বে চোখের জলও ফেলেছিল।

খবরটা সীমা পেয়েছে। বাপ সম্পর্কে এই কয়েক মাসে তার কোন আবেগ কেউ লক্ষ্য করে নি—কিন্তু চাপা সীমার মনে মনে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা খচখচ করেছে—যখনই কোন স্পর্শ তাতে পড়েছে। বাবা তাকে ভালোবাসতো। এ কথা সে অস্বীকার করতে পারবে না। কখনও ভেবে দেখে মনে হ'ত—বাবার যা গুণ ছিল—তা'তো কম ছিল না। সে অভিনয় করতে পারে, সে বক্তৃতা করতে পারে, রাজনীতিও জানে বোঝো। দেশপ্রেম—দরিদ্রের প্রতি মমতা এও তো তার ছিল। সে তো জানে। তবু কি মানুষ কি হয়ে গেল! কেন হয়ে গেল? শুধু অভাবে? না—আরও কিছু আছে! আছে! সে যদি স্থান পেত—ছোট হোক খাটো হোক একটুখানি বিশিষ্ট স্থান—যদি উচ্চ মার্গে ওঠার প্রথম ধাপটিতে সে একটু দাঁড়াবার স্থান পেত—তবে হয়তো এমন হত না। আর আছে। যদি ওই কালের, ওই কালই বা কেন, নারী লালসা তার না থাকত। যদি পবিত্র হত তবে এমন হত না! তিনটি অভাব ত্রহস্পর্শের মত তার বাবার জীবনকে এমন ব্যর্থ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। ওঃ!

বারবার তার ইচ্ছা হয়েছে। বারবার—ছুটে গিয়ে বাবাকে দেখে আসে। কিন্তু পারে নি। সাহস হয় নি। একটা সঙ্কোচ, অজেয় দুর্নিবার সঙ্কোচ তাকে জড়িয়ে ধরেছে নাগপাশের মত! সেই কারণেই তার মন বিষণ্ণ। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। মধ্যে মধ্যে মেঘ ডাকছে। বর্ষার গম্ভীর গুরু গুরু ডাক।

পাশেই রাস্তার ওপাশে শ্যামাকিংকরবাবুর বাড়ী। ওদের বৈঠকখানা কাছারিতে উনি নিজের মত অদলবদল করে নিয়েছেন

যখন আসেন ওইখানেই থাকেন। ওখান থেকে হাসির শব্দ আসছে। আনন্দ হচ্ছে। কথার মধ্যে আনন্দের স্রোত। একখানা মোটর এসে দাঁড়াল। জিপ। কোন অফিসার এসেছেন,—শুনেছেন শ্যামাকিংকরবাবু আছেন এখানে—দেখা করতে এসেছেন। হয় তো স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কেউ হবে। আজ এখানে প্রথম ইলেট্রিক আলো জ্বলবে।

নসুবালা তার ভাদু গেয়ে বেড়াচ্ছে। ইলেকট্রিকের ভাদু।

চল ভাদু যাই চন্দনপুরের
অবাক কান্ড দেখে আসি।

সে গান সকালেই সীমার কানে গেছে। এই মেয়েদের হোস্টেলেই সে গেয়ে গেছে। কিন্তু সীমা বের হয় নি। ইচ্ছা হয় নি, পারে নি। মধ্যে মধ্যে কান্না পাচ্ছে। তার পরীক্ষার খবর বের হবার সময় হয়েছে। সেই নিয়েই ছিল তার উদ্বেগ। কিন্তু সে উদ্বেগও তার আজ নেই। তার বাবা—হতভাগ্য বাবা—। ওঃ কারুর চেয়ে খাটো নয় মানুষটা অথচ কি পরিণতি হয়ে গেল তার! এমন শোচনীয় পরিণতি সে দেখে নি!

হঠাৎ মনে হল সতীশ ঘোষালের কথা।

ওই আর একটি। অবশ্য তার বাপের মত দুর্ভাগ্য তার নয়। সংসারে মা আছে স্ত্রী আছে তার গুণমুগ্ধ। আর সে তার বাপের মত পতিত নয়। হীন সে নয়। তবে ওই প্রতিষ্ঠার উদগ্র কামনায় লোকটি ব্যর্থ হয়ে গেল। পরশু সে অবাক হয়ে দেখেছে তার কান্ড। শ্যামাকিংকরের নিন্দা করছিল, শ্যামা-কিংকর না কি পথ বন্ধ করেছে। মিথ্যা কথা। সে নিজে জানে। মেয়েদের স্নানের ঘাটের উপর দিয়ে সাইকেল চড়ে যেতে তিনি বারণ করে বলেছেন—মেয়েদের স্নানের ঘাট। মেয়েদের পথ। এ পথে পুরুষের যাওয়া ঠিক নয়। চন্দনপুর এখনও পল্লী-গ্রাম। এখনও মেয়েরা ঘাটে স্নান করে!

বিচিত্র লোক। লোক বিচিত্র নয়। বিচিত্র মানুষের বার্থ প্রতিষ্ঠা-লিপ্সা। এমনি উন্মত্ত অহঙ্কারীই করে তোলে। তার জন্য কষ্ট পায়—নিন্দিত হয় তবু উদগ্র প্রতিষ্ঠা কামনায় চীৎকার করে তারস্বরে। আর এক-দিনের কথা মনে পড়ছে।

ঘোষাল বসেছিল রাস্তার ধারে—একা—। কথা বলবার লোক মেলে না। খানিকটা দূরে —কটি ছেলে গল্প করছিল। একটি ছেলে বলছিল—গতরাতে সে সাপের উপর পা দিয়েছিল। পুণ্যের জোর ছিল তাই বেঁচে গেছে।

ঘোষাল তৎক্ষণাৎ ডেকে বলেছিল—মূর্খ কোথাকার। তুমি বলতে চাও—পাপীকেই সাপে কামড়াক?

ছেলেরা সন্তুষ্ট নয় ঘোষালের উপর। তার কথায় ছেলেটি চটেই বলেছিল—তবে কি —পুণ্যাত্মা হলেই সাপে কামড়ায়?

ঘোষাল বলেছিল—মহাভারত পড়েছ? অকালপক্ক—মূর্খের দল!

—কি আছে মহাভারতে? তাই লেখা আছে বুঝি?

—নিশ্চয়! সত্যবান—অর্থাৎ—সত্য ছাড়া যে মিথ্যা বলে না—পরম পুণ্যাত্মা—তার কিসে মৃত্যু হয়েছিল? জান?

—কিসে?

—সর্পাঘাতে।

অন্য একটি ছেলে তৎক্ষণাৎ বলেছিল—না।

—হ্যাঁ।

—না।

—তুমি মূর্খ। তুমি মূর্খ। তুমি মূর্খ।

—না—না—না। দাঁড়ান, আনছি মহা-ভারত। সে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত এনে খুলে ধরেছিল—পড়ুন।

—পড়। তুমি পড়। আমার চশমা নাই। আমার পড়া আছে।

—না—নেই। শুনুন আমি পড়ি—"বীর্যবান সত্যবান কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে করিতে সাতিশয় ব্যায়াম হওয়াতে তাঁহার গাত্র হইতে স্বেদ বিনির্গত হইতে লাগিল ও মস্তকে বেদনা জন্মিল। তখন তিনি প্রাণ-

নাচ —শ্রীপ্রদ্যুম্ন টানা

প্রিয়া প্রণয়িনীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন—সাবিত্রী, প্রভূত পরিশ্রম হওয়াতে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে। ফলতঃ আমি নিতান্ত অসুস্থ হইয়াছি। আর মস্তকে যেন শূলে বিদ্ধ হইতেছে।" শুনলেন? সাপ ত্রিসীমানায় নাই। মূর্খ আমরা নই। মূর্খ—

আমি? না? মূর্খ আমি? হে ভগবান!

থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিলেন ভদ্রলোক। প্রতিবেশী সুরেশ্বর এসে ছেলেদের নিরস্ত করে তাকে ঘরে—

—টেলিগ্রাম!

টেলিগ্রাম! কোন দিদিমণির না কোন ছাত্রীর? কার কি হল। সীমার চিন্তায় ছেদ পড়ল। সে বেরিয়ে এল। হ্যাঁ। পিওন দাঁড়িয়ে।

—আপনার টেলিগ্রাম।

—আমার?

—সীমা দেবী।

—হ্যাঁ। আমি। কই? দাও।

—সই করুন।

—ভাল খবর। বকশিস নেব। পাসের খবর।

—পাশের খবর?

সে পাশ করেছে? কোন রকমে সই করে দিয়ে টেলিগ্রাম খুললে—

Passed second division—congratulation all school candidates passed except roll 26, 29, 30. Subhendu!

উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল। সব সে ভুলে গেল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মেঘ ছিঁড়ে যেন সূর্য উঠল।

কাকে বলবে? কাকে? স্কুলের সময়, মেয়েরা দিদিমণিরা সব স্কুলে। কোন একটি মেয়ে মাথা ধরেও হোস্টেলে নেই—কাকে বলবে? সামনে ছিল রতন ঠাকুর। তাকেই সে বললে—রতন আমি পাশ করেছি! তারপর ছুটে গেল ভবানীবাবুর বাড়ী। ভবানীবাবুর মাকে বলে ঠাকুমা। এ পাড়ার ঠাকুমা—তার পায়ে ঢিপ করে প্রণাম করে বললে— ঠাকুমা আমি পাশ করেছি। জোরে চিৎকার করে বললে। ঠাকুমা কালা!

—পাশ করেছ? বৃদ্ধার চিবুকটি স্নেহের আবেগে কাঁপতে লাগল। খুব ভাল! আরও পড়। আরও।

—কাকীমা আমি পাশ করেছি। ভবানীবাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করলে। তারপর ছুটল ইস্কুলে।—দিদিমণি আমি পাশ করেছি—সেকেণ্ড ডিভিশন।

মিস্ট্রেসরা বেরিয়ে এলেন। সে সকলকে প্রণাম করলে।—আমি পাশ করেছি। স্কুলের তিনটি পাশ, তিনটি ফেল।

—কোথায় খবর পেলে?

—টেলিগ্রাম। এই দেখুন।

হেড মিস্ট্রেস টেলিগ্রাম পড়ে—**বলেন**—শুভেন্দু! মানে নোলর দাদা!

কমলাদিদি হেসে বললে—কচ?

এতক্ষণে খেয়াল হল সীমার। **শুভেন্দু** টেলিগ্রাম করেছে। তার মুখখানা **লাল হয়ে** উঠল। কানের পাশ দুটো গরম হয়ে **উঠল** মুহূর্তে। ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল।—কেন? শুভেন্দুর এ হিতৈষীপনার কি দরকার ছিল। ভারী অন্যায়।

দিদিমণি বললেন—যাও প্রণাম **কর** সকলকে।

—করেছি দিদিমণি। ঠাকুমাকে, **কাকী**মাকে পাড়ার যাকে দেখেছি সকলকে প্রণাম করেছি।

—করেছ! বেশ! শ্যামাকিংকরবাবুকে করেছ? তিনি আছেন।

—না, যাব।

—যাও!

—আর—। একবার বাড়ী গিয়ে তোমার **বাবাকে প্রণাম করে আসবে না? তার** তো

অসুখ। তা ছাড়া—। চুপ করে গেলেন দিদিমণি। সেও তাঁর কথার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

দিদিমণি বললেন—যাওয়া উচিত। তুমি ওঁকে—শ্যামাকিংকরবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিয়ো।

সে হাঁপাচ্ছিল, ছুটেই এসেছে স্কুল থেকে। এসে ঠুক্ করে প্রণাম করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। শ্যামাকিংকর তাঁর বসবার প্রিয়-স্থান নিমগাছতলার বেদীটির উপরে বসে কাঠের পুতুলে রং দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে দেখে হেসে বললেন—

ধন্যা কন্যা সীমা অনন্যা?
দুখ বিজয়িনী চির প্রসন্না?
দুর্বার যার জীবন বন্যা?

কি সংবাদ গো। হঠাৎ নমো কেন? এাঁ? ওই ছড়া বলেই তিনি বরাবর তাকে অভিনন্দিত করেন। তার মাথায় হাত দিয়ে বলেন—এমন মেয়ে হয় না।

আজ হেসে সীমা বললে—আমি পাশ করেছি। সেকেন্ড ডিভিশনে।

—অভিনন্দন—কনগ্র্যাচুলেশন। বস মিষ্টি খাও। রাম। মিষ্টি আন—চা আন। সীমা ইস্কুলের সীমা পার হল—পুকুর থেকে নদীতে পড়ল। আন মিষ্টি আন।

লজ্জায় আনন্দে তার জীবন যেন বিগলিত হচ্ছিল। সার্থকতা যখন শ্যামাকিংকরবাবুদের মত বড় মানুষের অভিনন্দনে ধন্য হয়—তখন জীবন যেন হয় বিগলিতশিলা। হিমালয়ের পাথর গলে গঙ্গা নির্গমনের মত চোখের গোমুখী থেকে গঙ্গা যমুনা পাশাপাসি নেমে এল সীমার মুখ বেয়ে বুকের উপর।

শ্যামাকিংকরবাবু বললেন—চন্দনপুরের জয়যাত্রার পথে আজই ইলেকট্রিক জ্বলবে; তুমি পেলে পাশ করার খবর। এ একটা রেকর্ড। এখানকার নারী জীবনের ইতিহাসে—তুমি তেনজিং নোরকে! তেনজিং যেমন এক অখ্যাত নেপালী পল্লীর অধিবাসী এভারেস্ট জয় করলে—সঙ্গে সঙ্গে দারজিলিং বললে তেনজিং আমার। তেমনি চন্দনপুরও আজ নবীনপুরের কন্যাটিকে আত্মসাৎ করলে—বলবে নবীনপুর আমারই অংশ—ও আমার কন্যা—ধন্যা ধন্যা—সে যে অনন্যা!

সে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। শ্যামাকিংকরবাবুর পরিচারক একখানি প্লেটে মিষ্টি এবং কাচের গ্লাসে জল এনে নামিয়ে দিল। শ্যামাকিংকরবাবু বললেন—খাও।

—না। এখন খেতে পারব না। আমি প্রণাম করে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।

—না খাও! পাশে পেট ভরে না। পেট ভরাবার ওটা একটা ভাঁড়ারের চাবী মাত্র।

সে খেতে বসল। শ্যামাকিংকরবাবু বললেন—তোমার প্রশ্ন আমি সম্ভবত অনুমান করতে পারি।—যাবে, নিশ্চয় যাবে বাবাকে প্রণাম করতে, দেখতে।

থেমে থেমে তিনি বলেই গেলেন—, শুনতে শুনতে তার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল—। শ্যামাকিংকরবাবু বললেন—তোমার বাবার কাছে তোমার অনেক ঋণ। সাধারণ সন্তানের পিতৃ ঋণ থেকে বেশী। এই দুর্ধর্ষতা তার থেকে পেয়েছ তুমি। অমর দুর্ধর্ষ চিরকালের।

আবার বললেন—কাল অকস্মাৎ এমন অকস্মাৎ ঘটে গেল ঘটনাটা যে—কেউ আমরা এগিয়ে যাবার সময় পেলাম না। মদটা বেশী খেয়েছিল কাল। আমাকে দাদা বলে—ভক্তি করে—কাল নেশার তাও যেন—। চুপ করে গেলেন।

আবার বললেন—আমি নিজে অপরাধ বোধ করি অমরের এই পরিণতির জন্য। তোমরা জান না। উনিশ শো সাঁইত্রিশ সাল—তখন রাজনীতি ছেড়েছি, সাহিত্য ক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। এ অঞ্চলে অমর তখন কর্মী। জেলা কংগ্রেস ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ইলেকশনে নেমেছে। অমর চাইলো প্রতিনিধিত্ব, আর চাইলেন—রামসুন্দরবাবু। হ্যাঁ এই রামসুন্দরবাবু। কংগ্রেস কর্মী অমরকে দিল নমিনেশন। রামসুন্দরবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন। এই এবারেরই মত।—থেমে গেলেন।

হেসে আবার বললেন—জান, ভুল সংসারে সবাই করে, মানুষকে মানুষ ওই যুক্তিতে ক্ষমাও করে। কিন্তু যে ভুল করে সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। কারণ ওর মাশুল না দিয়ে তার নিজের নিস্তার নেই। বছর কয়েক আগে—রামসুন্দরবাবুকে বিলেত ফেরতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া নিয়ে পতিত করতে চেয়েছিলেন গ্রামের প্রধানেরা—

এবার সীমা বললে—জানি। আপনি ওঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

—না। আমি দাঁড়িয়েছিলাম—একটি নীতির জন্যে। এবং বিপক্ষে বলতে গেলে কোন বা কয়েকটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়—দাঁড়িয়েছিলাম সমাজের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। জিতলাম। কিন্তু তারপরই করলাম ভুল। তখন কলকাতায় যাই— দু চারদিন সাতদিন বড়জোর দশদিন থাকি চলে আসি। রামসুন্দরবাবু সমাদর করে আহ্বান করলেন—এস আমার এখানে ভাইয়ের মত থাকবে। আমি গ্রহণ করলাম নিমন্ত্রণ। বছর দেড়েক এই ভাবে—কখনও তিনদিন—কখনও সাতদিন কখনও দশদিন থেকেছি। তারপর বুঝলাম—না—এটা আমার ভুল হচ্ছে। ভুল হয়ে গেছে। গোটাটাই দাঁড়িয়ে গেছে উল্টো। মনে হল আমি যা সমাজের জন্য করেছিলাম সেটা রামসুন্দরের জন্যে

আমি ঋণী দাঁড়িয়ে গেছি। তাই সেদিন যখন রামসুন্দরবাবু অনুরোধ করলেন—এ নমিনেশন আমাকে করে দিতেই হবে; তখন আমি কর্তাদের বললাম। কর্তা সুরেন আমার বন্ধু। কিন্তু তিনি নিরুপায়, তিনি বললেন—আমার হাতে আর নেই। আপনি অমরকে ধরুন। সে আপনার কথা নিশ্চয় শুনবে। আমি একবার ভুল করেছিলাম—আবার ভুল করলাম। চন্দনপুরে এসে অমরকে ডেকে বললাম—তুমি এবারের মত ও'কে আমার অনুরোধে ছেড়ে দাও সিট। অমর আমার অনুরোধে ছেড়ে দিয়েছিল। দেড়শো কি দুশো টাকা রামসুন্দরবাবুকে দিয়ে দিইয়েছিলাম—গ্রামের স্কুলের জন্য। অমর তখনকার মত খুশী মনে গেল। কিন্তু তার ভিতরের প্রতিষ্ঠা কামনার উত্তাপ আগুন হয়ে জ্বলে উঠল। ভুল সেও করেছিল আমার অনুরোধ রেখে। সেই আগুন তাকে পুড়িয়ে দিল। সেদিন যদি সে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার হয়ে প্রতিষ্ঠার সিঁড়ির প্রথম ধাপে স্থান পেত, তবে সে উঁচুর দিকেই উঠত, নীচে নামত না। তার জন্যে দায়ী আমি খানিকটা এতো ভুলতে পারি না।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন শ্যামাকিংকরবাবু। সীমার চোখ থেকে দুটি-অশ্রুর ধারা নেমে এল। আর সে খেতে পারলে না, খাবারের থালাটি রেখে দিলে। শ্যামাকিংকরবাবু দেখলেন—বললেন— জল খাও।

আবার বললেন—যাও। তুমি সেদিন রাত্রে চলে এসেছিলে—ভুল তোমার হয়নি। ভুল করতে বিয়ে করলে। শেষ মুহূর্তেও সে ভুল তুমি সংশোধন করেছ—তাই তুমি অনন্যা। কিন্তু আজ তুমি যদি না-যাও বাবাকে প্রণাম করতে—তবে ভুল করবে। এবং চিরজীবন অন্তত মনে মনেও আমার মত মাশুল দেবে। তবে—।

হেসে বললেন—বাবা অসুস্থ। মনে রেখো। আবেগের বশে একটা এমন কিছু করো না—যাতে অমরও আবেগের বশে—উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বোধ হয়—। গোড়াতেই অমরের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। বাইরে খবর নিয়ো তোমার— সেই—

—তিনি সত্যিই আমার মা। বাবা তাকে বিধবা বিবাহ করেছেন। ঠাকুমা দিয়ে গেছেন। শুধু চণ্ডীতলার সেবাইতগিরি যাবে বলে গোপন রেখেছেন কথাটা।

নীরবে শ্যামাকিংকর কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন সীমার মুখের দিকে—তার পর বললেন—তাকে আমার আশীর্বাদ

(তেরো)

ভাগ্যক্রমে তখন ডাক্তার ছিল। দেখছিল অমর চক্রবর্তীকে। আশু সিংহী আর গোপালপুর থেকে এসেছিল—ধ্রুব ডাক্তার।

ধ্রুব ডাক্তার বলছিল—শক্ত মানুষ লড়ুয়ে মরদ, বেঁচে গিয়েছে। ক্ষতি হয়েছে, তবু দাঁড়াবে। স্ট্রং ম্যান—ফাইটিং সোলজার। কেবল ভাগ্যদোষে হয়ে গেল এমনটা!

রমেন্দ্র এনেছে ধ্রুব ডাক্তারকে। ক্ষমা এসেছে। সমস্ত ভার রমেন্দ্র নিয়েছে।

রমেন্দ্র বলছিল—ছাড়া করে দেন একবার। আমি নিয়ে যাব—বনচাতুরায় থাকবেন। আলাদা বাড়ীতে থাকবেন। সেবাই গেলে আমিই তো ছেলে। আর মেয়ে জামাইরা তো সম্বন্ধ ছেড়েই দিয়েছে। খোঁজও করে না। আর একজন—

সীমা এই সময়ে এসে দাঁড়াল। আশু বললে—সীমা!

ধ্রুব ডাক্তার বললে—তুমি সীমা! আচ্ছা! তোমার বাবা ভাল আছে!

রমেন্দ্র চুপ করে রইল। ধ্রুবই বললে—কি হে রমেন্দ্র! কথা বল! তোমার শালিকা!

রমেন্দ্র বললে—আসুন।

সীমা বলে ফেললে—আমি পাশ করেছি সেকেণ্ড ডিভিশনে।

ধ্রুব বললে—গুড নিউজ। ভেরী গুড নিউজ। দাঁড়াও। আমি গিয়ে চক্রবর্তীকে রেডী করে দিই। তারপর তুমি আসবে। ঠিক হয়ে যাবে। হি ইজ এ ভেরী স্ট্রং ম্যান। মদ ছাড়লে এখনও বিশ বছর বাঁচবে। আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।

সত্যই শক্ত মানুষ—অসাধারণ প্রাণশক্তি এই অমিতাচারী উচ্ছৃঙ্খল—ব্যর্থতার তাড়নায় অধীর এই হতভাগ্য মানুষটি। সে কাঁদল সংবাদটা শুনে। ধ্রুব ডাক্তার বললে—তাকে ডেকে পাঠাব? দেখতে ইচ্ছে তো হয়!

—হয়! কিন্তু—।

—কি?

—সে আসবে?

—নিশ্চয় আসবে। আসবে না? সে কন্যা তো তোমার পুণ্যবতী কন্যা!

—নিশ্চয়! জান ডাক্তার, ও বি-এ পাশ করুক, আমি ভাল হয়ে উঠি। উঠব সে উঠব আমি। আমি ওকে এখানে অ্যাসেম্বলীর জন্যে দাঁড় করাব। দেখবে ঠিক রিটার্ন হয়ে যাবে।

ধ্রুব হেসে বললে—সে হবে। ওসব চিন্তা এখন ছাড়। এখন ডেকে পাঠাই?

—দাঁড়াও। রমেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি! তার অমতে কিছু করতে পারব না আমি।

—রমেন্দ্র আপত্তি করবে না আমি বলছি।

—না। তাকে ডাক।

রমেন্দ্র এসে হেসে বললে—দেখুন দিকি। আমি আপত্তি করব? কেন? উনি আপনার যেমন—তেমনি আমাদেরও গৌরবের জিনিস। উনি তো এসেছেন। এতক্ষণ তো কথা বলছিলাম। ডাকি আমি, ডাকি।

ধ্রুব বললে—খবরদার নো ইমোশনাল আউট বার্স্ট।

সীমা এসে ঘরে ঢুকল।

ধ্রুব বললে—নো ইমোশন সীমা। মনে কর এক্ষুনি তোমাকে টি-এ-বি-সি-ইনজেকশন দেওয়া হবে—খুব আস্তে। হ্যাঁ আস্তে আস্তে ছোট্ট একটি প্রণাম। এবং একটি কথা—আমি পাশ করেছি বাবা! আর একটা কথা বলতে পার—আমাকে ক্ষমা কর বাবা! ব্যাস। চক্রবর্তী—তোমার ওয়ান ওয়ার্ড—ওনলি ওয়ান ওয়ার্ড।—বস। বাস। কই চক্রবর্তী গিন্নী—সীমাকে জল খেতে দাও। বাস—চলি এখন।

ডাক্তার চলে গেল। ক্ষমা, মনোরমা ঘরে এসে ঢুকল। ক্ষমা সীমাকে প্রণাম করলে। বললে—তুই পাশ করেছিস? ধন্য তুই।

রমেন্দ্র বললে আমিও তাহলে একটা প্রণাম করি! বড় শালী! সম্পর্কে বড়!

—না। লাফ দিয়ে উঠল সীমা—না! বাবাঃ!

সকলে হেসে উঠল। আশ্চর্য একটি প্রসন্নতা সেদিন—অমর চক্রবর্তীর লক্ষ্মীশ্রী বর্জিত— রুক্ষকেশা ছিন্নবাসা ভিক্ষুণীর মত ঘরখানিতে। যেন তার ভিক্ষার ঝুলি ভরে উছলে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পর—সীমা বললে—আমি যাই এখন!

—না। আজকের দিনটা থাক। আনন্দ করি। বস, আমার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দে, আমি ঘুমুই।

পরিবর্তনশীল জগতের কোন গভীরে একটি স্থির চিরকালের পৃথিবী আছে। পরিবর্তনের সকল আবেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসে। সেইটিই বোধ হয় মানুষের অনন্তকালের সংসার। বিরোধ-মতভেদ রুচি-ভেদ সব দূর হয়ে গিয়ে শুধু হৃদয়ের আনন্দই সেখানে আছে!

* * *

তবে সে বড় স্বল্পক্ষণ স্থায়ী।

ওই আনন্দ আলোকের ছায়ার মধ্যে—তার বিপরীত ধর্ম জাগে। কালো অন্ধকার।—নিঃশব্দতার মধ্যে বিকট চীৎকার করে সে জেগে ওঠে।

তখন মধ্য রাত্রি! এমনি চীৎকার উঠল চক্রবর্তী বাড়ীতে। একটা বিপুল ভারী কিছু যেন ভেঙে পড়ল। চক্রবর্তী বাড়ীর ভাঙা দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। ছুটে বেরিয়ে গেল সীমা। সে অন্ধকারের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে। চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক।—অন্ধকার ভেদ করে সে খুঁজছে পথ। প্রায় এক বছর আগে সে যেমন একদিন পালিয়ে এসেছিল—নবীনপুর থেকে চন্দনপুরে।
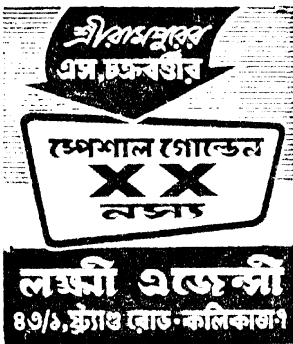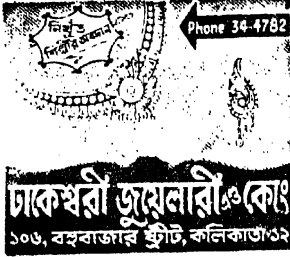
"রাত্রির অন্ধকারে পিতৃগৃহে আত্মীয়-পরমাত্মীয়দের মধ্যে নিদ্রামগ্ন কুমারী কন্যা নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। দীর্ঘকাল পর পিতার সঙ্গে মাতার সঙ্গে ভগ্নীর সঙ্গে এবং এই আসামী রমেন্দ্রর সঙ্গে বিবাদ মিটিয়া মিলন হইয়াছে। কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। সুন্দর স্বপ্ন দেখিবারই পরিবেশ। অসুস্থ পিতা কিছু সুস্থ হইয়াছেন। নীচের ঘরে মা-বাপ। উপরে দুখানি পাশাপাশি ঘর। একখানি ঘরে এই সীমা একা, অন্য ঘরে তাহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি —এই আসামী রমেন্দ্র। আসামী পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়। একখানি ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে কূটবুদ্ধি এবং সম্পদের শক্তিতে অজগরের মত প্রকৃতি নিয়া রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে। অতীত কালের সমাজ এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিততম জীব। একালেও এরা কূটবুদ্ধিতে নিজেদের বাইরের রঙ পরিবর্তন করিয়া অতীত প্রকৃতি লইয়া সুযোগমত জঘন্যতম অপরাধ করিয়া যায়। আসামী সীমাকেই বিবাহ করিতে

চন্দনপুরে ঢুকেই সে আলো পেলে।

আজ এখানে ইলেকট্রিক আলো জ্বলেছে। আলোতে এসে দাঁড়াল। তার কাপড়ে রক্ত। অনেক রক্ত। বেশভূষা বিপর্যস্ত। হাঁপাচ্ছে সে। মধ্যরাত্রি—আলোগুলি স্থির জ্বলছে। শুধু একটি বাড়ীর উঠোনে গান হচ্ছে এখনও। ফটিক দাসের বাড়ী রাস্তার ধারে। ওইখানেই একটা লাইটপোস্ট। তারই আলোয় ফটিক এবং নসু আজ সারা রাতের পালা জুড়েছে। চাঁদের আলোয় জেগে থাকা গান গাওয়া পাখীর মত তাদের চোখে ঘুম নেই। তারা আজ শিবনাথ দেকে বলে তার হুকুম পেয়েছে।—দে হেসে বলেছে—তা যখন তোমাদের ইচ্ছে, আর আলোতে ঘুমই আসবে না—তখন গেয়ো গান। আমি না হয় জানালা বন্ধ করে পাখা খুলে শোব!

তারা গান গাইছে—

ইলেকটিরির আলো এসেছে: ভাদু তুই
কেমন করে কদমতলায় যাবি।
নিশে চোর মরে বেঁচেছে—
আলো করা রাতের বেলা আঁধার
কোথা পাবি?
মন রসনা, কেমন করে কদমতলা
যাবি!

সীমা এসে থমকে দাঁড়াল।—ভাদুর মা!

—কে? হেই মা! সীমে? টলছ! ধর-ধর আমাকে ধর। সর্বাঙ্গে রক্ত! হেই মা!

—আমাকে থানায় নিয়ে চল ভাদুর মা!

—থানায়?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ থানায়। থানায়।

(চৌদ্দ)

—বেয়াই!

—বেয়ান!

—ই কি হল?

—কি হবে? যা হয়েছে—তাই হল। বিধেতার খেলা বল—তাই—

—না। এমন খেলা সে কেন খেলাবে? তা হ'লে কানার খেলা! সে কানা।

—তা হবে বেয়ান।

—না। তা হলে সি মরুক। কানার আবার খেলার সাধ কেনে? আমরা তা মানব কেনে? আজ আর নসুবালার খেয়াল নেই সে ক্যানোকে কেনে বলছে। ফটিক দাস হেসে বললে—তা সি মরেছেও হতে পারে। চণ্ডীতলার বাগে তাকিয়ে দেখ!

—তা বটে। ভোগ হয় না সময়ে। সাঁঝ পড়ে না সময়ে। মাটির ঢিপ—ঢিবি হয়ে পাড়ে আছে—নড়ে না—চড়ে না। আগে কালে শিবাভোগ না হলে চন্দনপুরে সব গেরস্তের উপোস হত। কান্না পড়ে যেত। আজ কেউ খোঁজও করে না। তা যাক ভাই—কিন্তু এ হ'ল কি!

—দেখ—এ'কে রেখেছি পটে। এই দেখ, রমেন্দ্র সি একটা পাষণ্ড পিশাচ তার ওপরে বড়লোক মহাজনের বেটা—তার যত লালস তত আক্রোশ। দেখ তুমি মুখটা দেখ! সীমেকে এতদিন বাদে দেখে অবধি তার বুকে ওই দুটো জোড়া সাপের মত ফোঁসাচ্ছিল। বেরিয়ে আসতে পথ খুঁজছিল। রাত্রে সীমা থাকল—আঁধারে সাপ দুটো উঁকি মারলে। বললে—আচ্ছা সুযোগ। এই লাও অপমানের শোধ। আর ক্ষমাটা শুধু মাংস পিণ্ডি। ওতে আবার সুখ আছে? সীমের মত মেয়ে নইলে সুখ! সীমে রাজী হবে না? তা কি সহজে হয়! তবে টাকা-গয়না এত কি সহজ? আগে কাবু কর। তারপর মুখ বন্ধ টাকাতে গয়নাতে হবে। এই দেখ—মদ খাচ্ছে ঘরে বসে। ক্ষমাই দিচ্ছে। ও তো দিত। ওটা তো মাংসপিণ্ড। জানত শুধু গয়না পরতে সাজতে আর খেতে। রমেন্দ্র বলেছিল—বন্ধ করে, দরজা বন্ধ করে। সীমা যেন বুঝতে না পারে। হাজার হলে পাশকরা মেয়ে—তার ওপর সম্বন্ধে বড়।

—ওঃ কুপাক! হায় দুর্বুদ্ধি! ই শুনি নাই কোন কালে। ই কি কাল! ই কি কাল? কলি কাল!

—তা বলো না। ই সব কালে আছে। রামায়ণে সীতা হরণ। মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ। সতী যারা তারা সীতার মতন লড়াই করে। দেবতাকে মানুষকে চীৎকার করে ডেকে বলে—আমার অপমান করছে সাক্ষী থাক। তবে জলে পাথর ভাসে—রাবণ বধ হয়। সীতা অগ্নিপরীক্ষে দিয়ে বেরিয়ে আসে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র হয় দুর্যোধনের একশো ভাই মরে। যারা চেঁচায় না—ভয়ে হোক লজ্জায় হোক—তাদের কথা কেউ জানতে পারে না, ঢাকা থাকে। বিচার হয় বলে—ধর্মরাজের আদালতে। মেয়ের সাজা হয় গোপন করেছে বলে—এমন পুরুষের সাজা হয় অত্যাচার করেছে বলে। তা সি সব তো উপকথা। মিছে কথা। ভুয়ো কথা! এই চন্দনপুরে এমন পাপ কত হয়েছে। জান তো তুমি। তুমি বলে চন্দনপুরে শুকেসারীর সারী—তুমি জানো না। এ কন্যে আচ্ছা কন্যে—ওই যে শ্যামাকিংকর বলে—ধন্যা কন্যা অনন্যা তাই।

ছ'মাস পর কথা হচ্ছিল—নসুবালা আর ফটিক দাসের মধ্যে। নসু বললে—উ কথা রাখ ভাই। এখন ক্ষমার সিঁথির সিঁদুরটা থাকলে হয়। —আঃ কচি মেয়ে হে! কাল জজ যে কি রায় দেবে—ভগবান জানেন।

* * *

আদালতের বিচারে রায়েও তাই বললেন জজ সাহেব। "এই মামলার প্রধান সাক্ষী শ্রীমতী সীমা চক্রবর্তী একটি আশ্চর্য মেয়ে। এমন মেয়ে সমাজের গৌরব। অসাধারণ সাহসের অধিকারিণী, দৃঢ় চিত্ত, সত্যবাদিনী। তাহার প্রতিটি বাক্য আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। জুরীরাও করিয়াছেন।

চাহিয়াছিল, সীমা অসহায়ভাবে প্রথম সম্মতি দিয়াও বিবাহের দিন পলাইয়া গিয়া থানায় আশ্রয় লয়—পরে আশ্রয় পায় গার্লস স্কুলে। রমেন্দ্র মৃত অমর চক্রবর্তীর কনিষ্ঠা কন্যা ক্ষমাকে বিবাহ করে। উভয়েই বিচিত্র জীব। মৃত পিতা অমর চক্রবর্তী—একজন ভ্রষ্ট রাজনৈতিক কর্মী—একজন ভ্রষ্ট মানুষ। কিছু কিছু সদগুণের অধিকারী হইয়াও ভ্রষ্ট মানুষ। অভাবী—মদ্যপ। ক্ষমা অতি সাধারণ একটি মেয়ে। তাহার নিকট সত্যের অপেক্ষা স্বার্থ বড়। স্বামীর প্রতি তাহার আনুগত্য—অন্ধ, হয়তো জৈব। মিথ্যা বলিতে দ্বিধা নাই। পুণ্যের ধর্মের চেয়ে সম্পদ বড়। সে লোভী। এই রমেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহে সে খুশী হইয়াছিল; স্বামীর ব্যাভিচার দোষ তাহাদের ঐ দূর পল্লীর অন্ধকারে অবাধে চলিত ব্রাত্য নারীদের সঙ্গে—তাহা জানিয়াও তাহার আনুগত্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অসুখী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত তাহার পিতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সে এই দেখার অভ্যাসে ইহাতে দোষ দেখে নাই। ঘটনার দিন কিন্তু স্বামীর মন্দ অভিপ্রায় বুঝিতে না পাবার জন্য দায়ী নয়। কারণ আসামী তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় শিকল বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। আসামী রমেন্দ্রকে সে প্রথম রাতে অভ্যাসমত মদ্য পানের আয়োজন করিয়া দিয়াছিল। রমেন্দ্র আকস্মিকভাবে এই মন্দ প্রবৃত্তিতে উন্মত্ত হইয়া এই কাজ করিতে উদ্যত হয় অথবা গোড়া হইতেই মতলব করিয়াছে—ইহা সঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে একটি আক্রোশ বা প্রতিশোধস্পৃহা সহজেই আবিষ্কার করা যায়। যাহা হউক ঘটনা এই—; মধ্যরাত্রে ঘুমন্ত সীমা অনুভব করে তাহার উপর যেন কেহ বা কিছু চাপিয়া বসিয়াছে এবং তাহাকে নগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিতেই মুখ চাপিয়া ধরিয়া আসামী বলে—চুপ! আমি। চীৎকার করিলে—যে কলঙ্ক তোমার হইবে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। আমি বলিব—তুমি আমাকে ডাকিয়াছ। তোমাকে অনেক টাকা দিব। চুপ।

সীমা অসাধারণ মেয়ে। সে আসামীকে মুখে কিল মারে। নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করে—সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতে থাকে। হঠাৎ তাহার হাতে ঠেকে মাথার বালিশের পাশে একটা পাথর—মশারি খাটাইবার পেরেক পুতিয়া ওটাকে শিয়রে রাখিয়াছিল ভুলবশত। সেই ভুলই তাহার পরম মঙ্গলজনক হইয়াছে। ওই পাথর দিয়া সজোরে সে অন্ধকারেই আসামীর মুখে মারে। সেটা লাগে আসামীর নাকে। প্রচুর রক্তপাত হয়। ইতিমধ্যে অসুস্থ হতভাগ্য অমর চক্রবর্তী জাগিয়া উঠিয়া উন্মত্তের মত ছুটিয়া উপরে আসে। তাহার পিছনে আসিয়াছিল তাহার স্ত্রী বা রক্ষিতা মনোরমা। তাহার হাতে আলো ছিল। হতভাগ্য অমর চক্রবর্তী নিজে পাষণ্ড—সে পাষণ্ড জামাতার চরিত্র জানিত। সুতরাং সীমার চীৎকারে ঘুম ভাঙিবামাত্র সে অনুমান করিতে পারিয়াছিল ঘটনাটা। নিহত অমর চক্রবর্তী অসুস্থ ছিল, উত্তেজনা তাহার সহজেই হইবার কথা; সেই ক্ষেত্রে এমনই এক বীভৎস নিষ্ঠুর অপমানজনক অপরাধ—তাহারই কন্যার উপর ঘটিতে দেখিয়া ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল ওই নরপশুর উপর। নরপশু তাহাকে লইয়া পড়িতেই সে সীমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এবং অসুস্থ অমর চক্রবর্তীকে আক্রমণ করিয়া ঠেলিয়া সহজেই মাটিতে ফেলিয়া দিয়া লালসা অতৃপ্তির ক্ষোভে ক্রোধে তাহার বুকের উপর বসিয়া পাইয়াছিল সীমার পরিত্যক্ত পাথরটা। তাহা দিয়াই সে তাহাকে আঘাত করে। ঠিক আগের নেশায় রক্তের চাপে তাহার মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়াছিল—ইহা আমরা ডাক্তারদের সাক্ষ্যে পাইয়াছি। সুতরাং এই পাথরের এক আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইবার কথা। রমেন্দ্র তাহাকে কয়েকটি আঘাতই করিয়াছিল। ডাক্তারী রিপোর্টে—মাথায় তিনটি—মুখের উপর দুইটি পাথরের আঘাতের কথা পাইয়াছি। সব কয়টিই রমেন্দ্র করিয়াছে নিঃসন্দেহে। এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

সাক্ষীদের মধ্যে মনোরমা বিচিত্র মানুষ। সে প্রথম এজাহারে সীমাকে বাঁচাইয়া—রমেনকে বাঁচাইয়া দোষ নিজের ঘাড়ে লইতে

চাহিয়াছে। বলিতে চাহিয়াছে—রমেনের সহিত এই কুৎসিৎ ঘটনা তাহার ঘটিয়াছিল এবং অমর জানিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিলে রমেন ছুটিয়া পলায়—অমর তাহার গলা চাপিয়া ধরে, প্রাণের দায়ে সে পাথর লইয়া অমরকে আঘাত করে। তাহাতেই ব্যাপারটা ঘটিয়াছে। পরে সে জেরায় সব সত্য স্বীকার করিয়া বলিয়াছে—তাহার জীবনে কি প্রয়োজন; ক্ষমা তাহার অনুগত স্নেহের পাত্রী। রমেন বাঁচিলে ক্ষমার তবুও স্বামী থাকিবে—সে সধবা থাকিবে এই জন্যই বলিয়াছে।

ক্ষমা শিকলবদ্ধ ছিল। তাহার সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই। তদুপরি স্বামীর মোহে যে কোন মিথ্যা বলিতে পারে এবং বলিয়াছে।

সীমা ছুটিয়া দুই মাইল দূরবর্তী চন্দনপুর আসিয়া নসুবালাকে সঙ্গে লইয়া থানায় আসে এজাহার দেয়। আমি তাহার সাক্ষ্যের প্রতিবর্ণ বিশ্বাস করিয়াছি। রমেন বলিয়াছে—সীমা তাহাকে ডাকিয়াছিল। দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। রমেন্দ্রের পক্ষ হইতে এইটির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু পুলিস সকল লোকের সমক্ষে একটি লোহার শিক—যাহা দিয়া নন্দদুয়ারের দরজা খুলিয়াছিল—তাহা পাইয়াছে।

সীমা সর্বত্র এক কথা বলিয়াছে। সুতরাং জুরীদের সহিত একমত হইয়া, আসামী রমেন্দ্রকে দোষী স্থির করিয়া—"

রায়ে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দিলেন জজ। এ ছ মাস নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে সীমার। ইস্কুলে হোস্টেলে থাকা আর সম্ভবপর হয়নি। নিজেই থাকেনি সে। গ্রামে যাওয়াও অসম্ভব হয়েছিল। তাকে আশ্রয় দিয়েছিল—সেই হেডমিস্ট্রেস। বলেছিল—কোন মেয়ের এমন বিপদে যদি মেয়েরা আশ্রয় না দেয়—পাশে না-দাঁড়ায় তবে মেয়েদের মুক্তি কোথায়—গতি কোথায়? এতে যদি ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ আমাকে না রাখেন—রাখবেন না। আমাকে শ্যামাকিংকরবাবু বলে গেছেন তোমার অন্য খরচ তিনি দেবেন। তুমি যেন না বলো না। এ অনুরোধও করে গেছেন।

রায় হয়ে গেলে সংবাদটা তার কাছে এসে পৌঁছুল পরদিন। সে এতদিনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। কেউ তার কাছ দিয়ে যায়নি। সান্ত্বনা দেয়নি। কি বলবে? মেয়েটির বর্তমান শূন্য হয়ে গেছে—ভবিষ্যৎ শূন্য হয়ে গেছে—নিজে হাতে শূন্য করে ও-ই মুছে দিয়েছে। কোথায় দাঁড়াবে? কি হবে?

হঠাৎ তার মাথায় কে হাত দিলে।

—সীমা!

চমকে উঠল সে। শ্যামাকিংকরবাবু।—ওঠ মা। কেঁদো না। ওঠো!

সালঙ্কারা — আলোকচিত্র: শ্রীবীথি সরকার

আস্তে আস্তে উঠে বসল সীমা। শ্যামাকিংকরবাবু বললেন—এখানেই আমি শিবকিংকরকে বলেছি। তোমাকে একটা চাকরী দেবে। তুমি মাথা উঁচু করে চাকরী করবে। তুমি সত্যকে কোনদিন অসম্মান করনি—এতটুকু বিকৃত করনি। তুমি সৎ—তুমি সতী। গ্লানিহীন।

আশ্বস্ত হল সে।

দিন চারেক পর সে বসেছিল—শ্যামাকিংকরের ওখানে। কথা হচ্ছিল—এইসব কথাই। সে চলে যেতে চায় অন্য কোথাও। শ্যামাকিংকরবাবু বললেন—না—না। এইখানেই তোমাকে থাকতে। পড়াতে পড়াতে পড়। আই এ পাশ কর—বি-এ পাশ কর। এখানকার লোক তোমাকে মানুক—। তবে—তবে এখান ছাড়বে।

—সীমা রয়েছিস।

—কে?

—আমি নেলি।

—কি?

—শোন না।

শ্যামাকিংকরবাবু ডাকলেন—তুমি এস না নেলি! কি ভয়?—এস।

নেলি এসে দাঁড়াল। শ্যামাকিংকর বললেন—কি সংবাদ? গোপন?

সে হাসলে উত্তর দিলে না। শ্যামাকিংকর বললেন—তা হলে তুমিই উঠে যাও। সীমা উঠল। চলে গেল ঘরের দিকে। নেলি সঙ্গে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি শুনতে পেলেন—সীমার উত্তেজিত কণ্ঠ—না—না—না!

বেরিয়ে এল সে। শ্যামাকিংকরবাবুকে বললে—আপনি বাবার চেয়ে বয়সে বড়। মানে তো বটেই। হয়তো স্নেহেও বড়। আপনার কাছে আমি নালিশ করছি, শুভেন্দুকে আপনি বারণ করুন। বারণ করুন। বুঝিয়ে বলুন। আমি বিয়ে করব না। তাকে ধন্যবাদ। সে আমাকে ত্রাণ করতে এসেছে। এই এত কাণ্ডের পর—। কিন্তু না। না।

বলে দুই হাতে মুখ ঢাকল। নেলি নিঃশব্দে চলে গেল। শ্যামাকিংকর দেখলেন ফটকের পাশ থেকে বেরিয়ে এল শুভেন্দু—

তারপর দুজনে চলে গেল। নেলিকে বলতে হয়নি কিছু—শুভেন্দু সবই শুনতে পেরেছিল।

শ্যামাকিংকর চুপ ক'রে বসে রইলেন—আকাশের দিকে তাকিয়ে।

কিছুক্ষণ পর সীমা উঠে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললে—তারপর একটু হেসে বললে—কেন বোঝে না বলুন তো?

শ্যামাকিংকর এরও উত্তর দিলেন না। সে উঠে চলে গেল। নতুন চন্দনপুর নতুন কাল—নতুন মানুষ। কোন লজ্জা কোন সংকোচ তার নেই। পুরানো কালের বিশ্বাস সংস্কার বদলে গেছে পথঘাটের মত। তবে কেন—কেন থাকবে সেই পুরনো প্রেম—পুরনো বিয়ে। কেন?—

(পনেরো)

চার বৎসর পর।

উনিশ শো একষট্টি সালের ১লা অক্টোবর।

শ্যামাকিংকরবাবু বসেছিলেন তাঁর সেই নিমতলায়। পাশে বসে সুরেশ্বর। আরও অনেকে।

শ্যামাকিংকর কিছুদিন আগে কলকাতায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। কাগজে বেরিয়েছিল। চিকিৎসকে বিশ্রাম নিতে বলেছে। তিনি এখানে এসেছেন। সঙ্গে স্ত্রী এসেছেন। এসেছেন ভোরে। জিনিসপত্র এখনো গোছানো হয়নি। গোছানো হচ্ছে। আকাশ মেঘ মেদুর। চুপ ক'রে বসে আছেন। মধ্যে মধ্যে কথা বলছেন। কমলা এল। প্রণাম করলে।

—শরীর খুব খারাপ?

—হ্যাঁ।

—এখানেই থাকুন কিছুদিন।

—থাকব। হয় তো বরাবর থাকব।

—তাই থাকুন। তাই থাকুন।

মেয়েরা এল দল বেঁধে। প্রণাম চলতে লাগল। তিনি প্রতি-প্রণাম জানিয়ে চললেন। ডাকলেন—বড় বউ! এদের মিষ্টি দাও! যাও না, সব যাও। যাও।

সুরেশ্বর বললে—এই ভাবটা তুমি ছাড়।

—কোনটা?

—এই—আর যাব না আর যাব না।

হাসলেন তিনি। কথাটা ঘোরাবার জন্যেই বললেন—কমলা, সীমার খবর কি? তার খবর অনেকদিন পাইনি।

হেসে কমলা বললে—আপনার চন্দনপুরের বিদ্রোহিনী ঠিক আছে। সে বেশ আছে। ভাগ্যও ভাল। বি-এ পাশ করেই বি টিতে এ্যাডমিশন পেয়ে গেল। তবে একটু গোলমাল শুনছি। আমার এক বন্ধু ওখানে পড়ান। তিনি লিখেছেন—বড় রামকৃষ্ণ মিশনে যাচ্ছে। নিবেদিতা স্কুলে চান্স পেলে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে—ওখানে চাকরীও করবে। ওর মতিগতিও তো ওই রকম! আপনার নেলির খবর জানেন তো? সে আই-এস-সি পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিসনে। ওর দাদা ওকে মেডিকেলে ভর্তি করছে।

—খুব ভাল।

একটু বসে থেকে কমলা উঠে গেল।

এক সারি—তিনখানা জিপ চলে গেল রাস্তা দিয়ে।

সুরেশ্বর বললে—তুমি শোও গিয়ে। আমি যাই।

—বস—বস। থাকতে কেউ আসেনি। ওই শোন!

—কি?

—শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? জিন্দাবাদ!

১৯৬২র ইলেকসনের রব উঠেছে।

আকাশে সন্ধ্যা নামছে। কৃষ্ণপক্ষ পিতৃপক্ষ চলছে।

রাস্তায় আলো জ্বলল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার কাটিয়ে চাঁদ উঠলেই রাস্তার আলো নিভবে।

ট্রেন আসছে। কলকাতার ট্রেনের প্যাসেঞ্জার আসবে।

—দাদাবাবু!

—কে? নসুবালা?

—দাদাবাবু—তুমি কখন এয়েচ? নোকে বলে গেজেটে লিখেছে—তোমার খুব অসুখ। হেই মা গো! দেখ দিকি মিছে কথা?

—নারে অসুখ হয়েছিল।

—এখন তো ভাল হয়েছে। আসতে পেরেছ। বাবাঃ!

হাসলেন শ্যামাকিংকরবাবু।

—এবার আমাকে একখানা খুব ভাল শাড়ী দিয়ো। পরে ভাদু শুনিয়ে যাব। চন্দনপুরের ভাদু। আমার বেয়াই যে মুখ চোরা। সি সি; এই দ্যাকো!—সে যে—সে যে! সে যে বেরুবে না ঘর থেকে। তাকে তুমি ডাক না কেন? তা হলে শুকসারী

কথা শুনিয়ে যাই।

—সেটা আবার কি রে?

—হ্যাঁ সে বলবে—কি আইন হল কি পথ হল—কি রকম এই সব বদল হল। আর আমি শোনাব রঙের কথা।

হঠাৎ শ্যামাকিংকরবাবুর দৃষ্টি পড়ল—ফটকের দিকে। একজন পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচির পোশাক পরা কেউ—দাঁড়িয়ে আছে। পড়ছে—সদ্য লাগানো মারবেল ট্যাবলেটটা। বিদেশী কেউ। আগন্তুক এখানে। ওটা তো এবার তাঁর জন্মদিনে লাগানো হয়েছে। এখানকার লোকের কাছে তো পুরানো। তিনি ডাকলেন—কে? আসুন ভিতরে আসুন!

ধীর পদে সলজ্জ হেসে দাঁড়াল একজন সবল সুন্দর জোয়ান ছেলে। তিনি মুহূর্তে চিনলেন!

—আরে শুভেন্দু!

—হ্যাঁ।

—কখন এলে?

—এই ট্রেনে।

—বস। বস। বাড়ী যাওনি?

—না। যাব। কাগজে আপনার অসুখ দেখেছিলাম। ভিড় করতে যাইনি। ভেবেছিলাম আপনি সুস্থ হলে খবর নিয়ে যাব। যেতাম। তা এখানে নেমেই শুনলাম—আপনি এখানে। তাই আগেই এখানে এলাম। ট্যাবলেটটা পড়ছিলাম।

হাসলেন—শ্যামাকিংকর।

—কতদিন থাকবেন এখানে?

—ঐ ট্যাবলেটেই তো লেখা আছে। তবে পড়লে কি? এম-এ পাশ করেছ। মাস্টারী করছ। চলমান ঘূর্ণমান পৃথিবীতে একটি স্থির বিন্দু আছে শুভেন্দু। ছেলের মায়ের কোলের মত বড় মানুষের বাড়ীর মত। বাড়ীর মধ্যে একখানি ঘরের মত। সভ্যতার পরিবর্তনের মধ্যেও আছে। সেই বিন্দুতে আমার চন্দনপুরের এই ঘর। চলা শেষ করে স্থির হয়ে না বসলে আকাশকে কেমন করে চেনা যায় বল! আরে! একে? কে মা আপনি? কে—কে? তুমি? সীমা!

শ্যামাকিংকরকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছে—একটি নব বধূ। সিঁথিতে সিঁদুর—চোখে কাজলের চিহ্ন। সর্বাঙ্গে নবোঢ়ার লজ্জা ও স্বপ্ন বিভোরতার পরিচয়। সীমা!

শুভেন্দু বললে—কাল সীমার আমার বিয়ে হয়ে গেল!

—বিয়ে হয়ে গেল! কি আশ্চর্য! হেসে উঠলেন শ্যামাকিংকরবাবু!

সীমা চরম লজ্জায় যেন পুষ্পভারানত লতার মত নুয়ে পড়ে গেল একটা দমকা বাতাসে।

শুভেন্দু বললে—হঠাৎ সীমা সেদিন এল। বললে শুভেন্দু—জীবন যেন আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। কিছু ভাল লাগছে না কিছুদিন থেকে। ভাবছিলাম সন্ন্যাসিনী হব। কিন্তু না। শুভেন্দু তুমি আমাকে ভালবাস বারবার বলেছ। আজ আমি বুঝেছি আমি তোমাকে ভালবাসি। হয়তো অনেককাল থেকে ভালোবাসি। হয় তো জন্মান্তর থেকে। তুমি আমাকে—!

চুপ করলে শুভেন্দু। পূরণ করে দিলেন শ্যামাকিংকরবাবু।—বিয়ে হয়ে গেল।

—হ্যাঁ। বাড়ী এসেছি। নৌলকে পাঠিয়েছি বাড়ী—খবর দিতে।

—নসু!

—দাদাবাবু।

—এই গানটি লিখে নে বে। এই গানটি লিখে নে। নতুন রঙে নতুন ঢঙে সেই পুরনো গান—

তোমার সঙ্গে কবে আমার হয়েছিল দেখা

আবার দেখ ঘুরে ফিরে হয়ে গেল দেখা—

এইটি তবে সেই বিধাতার

চিরকালের লেখা—

ঘুরে ফিরে হবেই হবে দেখা।

নসুবালা বললে—আবার বল।

আবার বললেন শ্যামাকিংকরবাবু।

নসু বললে—আর একবার।

আবার আবৃত্তি করলেন শ্যামাকিংকর বাবু।

নসু বললে—ঐ তো পুরনো কথা দাদাবাবু।

হেসে উঠলেন শ্যামাকিংকর।—তাই রে রে। নইলে চিরকালের লেখা হয় কি করে

নৌল ডাকলে—দাদা এস। বাড়ী এ বউদি!

চন্দনপুরের নতুনকালের নতুন বরব চৌধুরীদের পুরনো বাড়ীতে প্রবেশ করে চলল। ওই শাঁখ বাজতে সুরু করেছে এর মধ্যে।

অনেক আলো এগিয়ে আসছে, ধ্বনি উঠছে—জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ! চাই! চাই

ইলেকশনের মশাল মিছিল এগি আসছে। চন্দনপুরে চলছে। চন্দনপুরে স্থির বিন্দুতে বসে চলমান চন্দনপুরে দিকে তাকিয়ে রইলেন শ্যামাকিংকর।
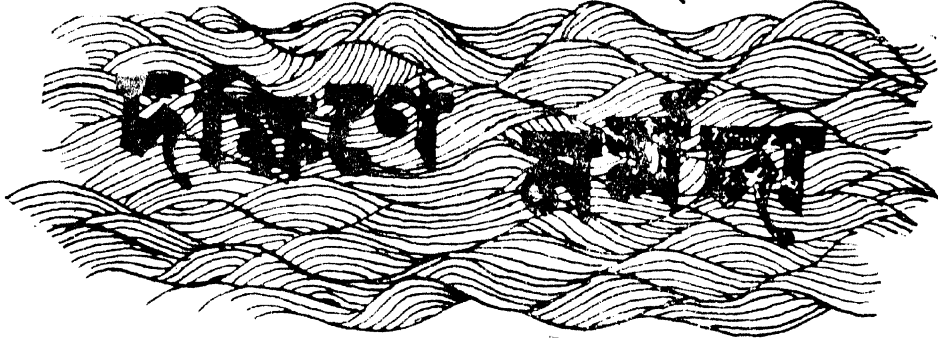
ইতার্সি স্টেশনের যাত্রীশালায় তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। বোধহয় জংশন স্টেশন মাত্রই এই। একটু আগে যেখানে জনতার ভিড়, একটু পরে খান দুই ট্রেন আনাগোনা করলেই সেই ভিড় মিলিয়ে যায়। আবার সঞ্চারিত হতে থাকে নতুন জনতা। কত যাত্রী কত 'অজানার দিকে চ'লে যায়, কোনও খোঁজই তার পাওয়া যায় না।

যাত্রীশালার এক কোণে ময়লা মেঝের উপর কম্বল বিছিয়ে জায়গা নিয়েছিলুম। এটা সাধারণ মুসাফিরখানা,—আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে মড়ার মতো অনেকেই এখানে রাত কাটায়। কেউ তাদের ডাকে না। আমি প্রায় রাত দুটোয় এসে জায়গা নিয়েছি একটি কোণ ঘেঁষে,—কোনও দুতপদীর হোঁচট না লাগে আমার গায়ে। মুড়ি দিতে না দিতেই আমার ঘুম এসেছিল ক্লান্তিতে। চারিদিকের অপরিচয়ের মাঝখানে আমি মিলিয়ে গিয়েছিলুম।

ঝাড়ুদারের গলার আওয়াজে ভোরবেলায় যখন জাগলুম, তখন ভূপালের গাড়ি সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছে। কম্বলখানা গুটিয়ে সুটকেসটি ঝুলিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যখন গিয়ে উঠলুম,—সকাল সাড়ে ছটা। আমি খুঁজতে বেরিয়েছিলুম অবন্তীদেশ। মালোয়া-বিদিশা ইতিহাসের তলায় কোথায় তলিয়ে গেছে,—অন্তত তার ভৌগোলিক সন্ধান করা যায় কিনা, সেটি আমার জানার দরকার ছিল।

ইতার্সি থেকে উত্তরের পথ ধরলে নর্মদা পেরিয়ে যেতে হয়। নর্মদার দক্ষিণে সাতপুরার গিরিদল চলে গিয়েছে দূর পশ্চিমে,—বোধ করি সেই খানদেশ পর্যন্ত। কিন্তু উত্তরে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বিন্ধ্যগিরিশ্রেণী। এ অঞ্চল ভারতের হৃৎকেন্দ্র। পূর্বদিকে এই গিরিশ্রেণী প্রসারিত হয়ে গেছে বুন্দেলখন্দ এবং বাঘেলাখন্দের দিকে। নর্মদার উত্তরপারে বিন্ধ্যগিরি, দক্ষিণে সাতপুরা। নর্মদার মতো এমন বন্য, সংকটসংকুল এবং প্রস্তরাকীর্ণ নদী উত্তর ভারতেও কম।

আমাদের ট্রেন চলেছে ভূপালের দিকে বিন্ধ্যগিরির আনাচে কানাচে। জানুয়ারির প্রারম্ভ। ঘন অরণ্যানীর রহস্যলোক চোখে পড়ছে দূরের পাহাড়তলীর আশেপাশে। কোনও কোনও জলাশয়ে পড়ছে ঘন নীলের আভা; প্রতিবিম্বিত হচ্ছে বিন্ধ্যগিরির শিরদাঁড়ারা। সেখানে যেন কোনও এক পৌরাণিক যুগ মুদিতচক্ষু সন্ন্যাসীর মতো বীজমন্ত্র পাঠ করছে আপন মনে। এক এক সময় পেরিয়ে যাচ্ছিলুম পাহাড়ের নীচেকার এক একটি ঘন অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। এমনি সুড়ঙ্গ ছিল আরাবল্লির তলায় তলায় মারোয়াড় থেকে উদয়পুর চিতোরের দিকে।

ভূপালকে এড়াবার উপায় ছিল না। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপাল। কিন্তু মধ্যভারতে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে গেলে ভূপাল হল তার প্রধান কেন্দ্র। ভূপালে গাড়ি এসে দাঁড়াল সকাল নটায়।

ভূপালের সামন্ত যুগ কেটে গেছে। সেই যুগ—যখন একদিকে দরিদ্র হতভাগ্য অর্ধাহারী জনসাধারণ নোংরা শহরের ইতর বস্তির নালা নর্দমায় মুখ থুবড়ে জীবন কাটাত, এবং অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার হীরা, মণিমুক্তা, জড়োয়ায় নবাবী আমল ঝলমল করত। সেই ইংরেজ আমলের রেসিডেন্সি আজ নেই, বড়লাটের চাটুকারের দল গর্তবাসী জন্তুর মতো এখানে-ওখানে আত্মগোপন করেছে, এবং তাদের শেষবেলাকার কূটনীতির কামড়স্বরূপ প্রিভি পার্স আদায় ক'রে নিয়ে গেছে। আজ ভূপালের চেহারা বদলে গেছে অনেকটা।

রাজস্থানের সুরুচিবোধ এবং তার স্থাপত্যশিল্পের ভিতর দিয়ে যে সৌন্দর্য সাধনা,—সেটি মধ্যভারত বা মধ্যপ্রদেশে কম। এখানে মোটা হাতের তুলি,—ছবি ফোটেনি সুন্দর হয়ে। রাজস্থানের যে কোনও শহরে নামলে মন প্রফুল্ল হয়,—এমন কি বিকানেরের মতো বালুশহরও মনে অনুপ্রেরণা আনে। কিন্তু ভূপালে এসে দাঁড়ালে প্রথমেই গা ঘুলিয়ে ওঠে। কথায় আছে "পহিলে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারি",—ভূপালের প্রথম দর্শনেই সেদিন মনটা অপ্রসন্ন হয়েছিল। নোংরা স্টেশন, তার চেয়েও নোংরা স্টেশন পল্লি, কদর্য নালা-নর্দমা দুর্গন্ধে ভরা, তার বাজারের পথ, বস্তিবাসিন্দাদের ইতর জীবনযাত্রা, জরাজীর্ণ এবং হতশ্রী তার বসবাসের ব্যবস্থা,—সমস্তটা মিলিয়ে গোড়া থেকেই মন বিমুখ হয়ে ওঠে। আমি বছর ছয়েক আগেকার কথা বলছি। কিন্তু সেদিন এখানকার মানব-সংসারের যে অবমাননা এবং অবনতি চোখে পড়েছিল সেটি ভুলিনি। বুঝতে পারা গিয়েছিল, সামন্ত নরপতিদের কোনও রাজ্যেই জনসাধারণের জীবনযাত্রার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কোনও প্রাণের যোগ ছিল না। চাতুরী এবং চাটুবাক্যের বাইরে অপর কোনও রাজনীতি থাকতে পারে এটিও তাদের অজ্ঞাত ছিল।

কিন্তু এর বাইরে আরেকটি ভূপাল আছে কয়েক ফার্লং দূরে। সেই ভূপালটি ইংরেজ আমলের নবাবী ভূপাল। সেখানে বিন্ধ্যগিরির শিরা উপশিরা এসে পৌঁছেছে। সেখানে সামন্তযুগীয় বিরাট দুর্গ রয়েছে, রয়েছে সমুদ্রবৎ সুবিশাল একটি জলাশয়,—বোধ হয় মধ্যপ্রদেশে এত বড় সরোবর অন্য কোথাও নেই। সেই সরোবরের তীরে পরম রমণীয় পাথর বাঁধানো সোপান শ্রেণী, এবং পিছন দিকে পাহাড়ের বিশাল দেওয়াল। নগরের প্রাকার হিসাবে এই দেওয়াল বোধ করি কাজ করেছে যুগযুগান্ত। এদেরই

মাঝখান দিয়ে অতি চিক্কন ও সুশ্রী রাজপথ চলে গিয়েছে দূর দূরান্তরে। এই পথেই এককালে ইংরেজ বড়লাট বিপুল রাজকীয় সমারোহ সহকারে তাঁর বসম্বদ নরপতির কাছে আসতেন মাঝে মাঝে আশনাই করতে। সেকালের সেই ভূপাল, রামপুর, হায়দরাবাদ, সেই উদয়পুর যোধপুর, বিকানের, জয়-শলমের, জয়পুর,—তাদের রাজপাট তুলে দিয়ে সাড়ে পাঁচশ' সামন্ত নরপতির সঙ্গে ইতিহাসের একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে আজ মুখ লুকিয়েছে।

নানাপথের আশেপাশে নতুন কালে ব'সে গেছে ইস্কুল, কলেজ, আর হাসপাতাল। পাহাড়ে পাহাড়ে উঠেছে একালের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় জনসাধারণ বংশ পরম্পরায় ভুলতে বসেছিল যে, ভূপাল ভারতেরই একটি ক্ষুদ্র অঙ্গমাত্র। তাদের সেই মূঢ়তা আজ ঘুচতে বসেছে। আজ ধাক্কা এসেছে নতুন যুগের, ঝড় উঠেছে ভারতবাসীর মনে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির তাড়নায় যা কিছু জীর্ণ এবং পুরাতন, মানুষের নানা ইতর কুসংস্কারের সঙ্গে জড়ানো যা কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং ধারণা—তার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটতে চলেছে। নতুন জীবনের সাড়া এসেছে ভূপালে।

নির্জন মধ্যাহ্নকালে ঠুংঠুং আওয়াজ তুলে আমার টাঙ্গা মন্থরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। গাড়িটি নতুন, এবং চালকটি বৃদ্ধ এক মুসেলমান। ওর বাড়ি এখানকার পাহাড়ি এক বস্তিতে। বাজারে ওদেরই আছে একটি দর্জির দোকান। সেখানে জরি ও মখমলের টুপি, বেলদার কামিজ এবং চুমকি বসানো ওড়না তৈরি হয়। এই গাড়িটি ঘোড়া সমেত কিনতে লেগেছিল হাজার টাকারও কিছু বেশি।—"পুরানে জমানা চলা গৈ, সাব।"—আগে এ গাড়ি-ঘোড়া সাড়ে তিনশ' টাকার মধ্যেই হ'ত! আজকাল ছয় সাত টাকার কম দৈনিক না কামালে চলে না। এখন এক টাকায় সওয়া তিন সের 'গেঁহু'!

বুড়ো আমার সঙ্গে গল্প করে আর পথ-ঘাটের খবর দেয়। ভ্রমণকালে বৃদ্ধ পথি-প্রদর্শককে আমি বেশী পছন্দ করি, কেননা তাদের কাছে জনজীবনের প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়। ওই বৃদ্ধই আমাকে দেখিয়েছিল ভূপালের সর্ববৃহৎ জুম্মা মসজিদ। সেটি দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলুম। ওরই সঙ্গে গিয়েছি সুপ্রসিদ্ধ জৈনমন্দিরে এবং হামিদামহলে। এক সময় ওরই গাড়িতে ভূপাল নবাবের প্রাসাদ প্রান্তবর্তী প্রাকারের সামনে এসে নামলুম। এই প্রাচীর শ্বেত লোহিতবর্ণ। কেউ যদি তখন বলত, এই প্রাচীরটি এক মাইল লম্বা, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে একটুও অবিশ্বাস করতুম না। প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করবার অনুমতি আমার ছিল না। হয়ত তার ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু সময় ছিল কম। বনবাগান উদ্যান পুষ্পবীথিকার আড়াল আবডাল পেরিয়ে যেটুকু চোখে পড়ল, সেটুকু আনন্দ-দায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু একালের শিক্ষায় আমাদের মন বদলিয়েছে বৈ কি। এককালে আমাদের দরিদ্র দৃষ্টি যে স্তূপাকার সম্পদের আড়ম্বর দেখে বিমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত, আজ দেশজোড়া দুর্গতির সামনে দাঁড়িয়ে সেই দৃষ্টি নবাবী সম্পদের আর তারিফ করতে চায় না। আজ ভূপালের সর্বাপেক্ষা নিম্নবিত্ত মানুষটিও যদি সাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবনযাপন করতে পারত, তবে তাই দেখেই সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা জাগত মনে। সমগ্র ভারতের লক্ষ লক্ষ অট্টালিকার পাশে কোটি কোটি অর্ধনগ্ন আর বুভুক্ষুর দলকে আর দেখতে ইচ্ছা যায় না।

কিন্তু ভূপাল সম্বন্ধে আর দু'একটি কথা না ব'লে গা ঢাকা দেওয়া চলে না। ভূপাল নামটি এসেছে এই রাজ্যের যিনি এককালের প্রতিষ্ঠাতা সেই রাজা ভুজের নাম থেকে। সঘন সবুজ নীলাভ বিন্ধ্যাগিরির কোলে একটি অতি নিরিবিলি সুন্দর অধিত্যকায় রাজা ভুজ তাঁর এই অপরূপ রাজধানীটি একদা নির্মাণ করেছিলেন। বোধহয় তৎকালে এই অধিত্যকায় একটি জলাভূমি ছিল। ভুজরাজ তার থেকেই সম্ভবত এই বিশাল ভুজসরোবরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এমন স্বচ্ছ সুন্দর জলাশয় মধ্যভারতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভূপাল রাজ্য একটি নবাব বংশের অধিকারে আসে। কালক্রমে সমগ্র ভূপাল মুসলিম সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

যে জুম্মা মসজিদটির কথা আগে বললুম, সেটির ভাস্কর্য এবং শোভা সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। এটি একশ' পঁচিশ বছর আগে নির্মাণ করেন একজন বেগম,—তাঁর নাম শ্রীমতী কুর্শাদিয়া। তাঁরই কন্যা বেগম শিকান্দ্রা দিল্লীর জুম্মা মসজিদের অনুকরণে নির্মাণ করেন মোতি মসজিদ। অতঃপর বেগম শিকান্দ্রার কন্যা শাহজহান বেগম তৃতীয় মসজিদ তাজ-উল্ নির্মাণ করেন। এই তিনটি মসজিদ ভূপালে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

একটি ছোট ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি উর্দু সাহিত্য, কাব্য ও সংস্কৃতি ভূপালের নবাবদের দ্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়। যেমন আমাদের এদিকে ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ভূপালে দুজন প্রসিদ্ধ উর্দু কবির আবির্ভাব ঘটে। একজন হলেন সিরাজমীর শের, এবং অন্যজন মহম্মদ মিঞা শহিদ। এঁদের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি দেশবিদেশে প্রসারিত হয়। আজও এই দুই বরেণ্য কবির সমাধি ক্ষেত্র দর্শনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ থেকে বহুলোক ভূপালে আসে। বাঙালীর দুর্ভাগ্য, তারা উর্দু পড়তে চাইল না।

•

প্রাচীন বিদিশা রাজ্য খুঁজে পেলুম কিনা জানিনে। কিন্তু সাঁচিতে এসে পৌঁছলুম পরদিন মধ্যাহ্নকালে। জানুয়ারীর প্রথম পাদ। তবু উত্তপ্ত রৌদ্র টা টা করছিল। ভূপাল থেকে সাঁচি মাত্র একুশ মাইল রেল-পথ।

আমার তরুণ বয়সের এক প্রিয় বন্ধু সাঁচিস্তূপের মধ্যে আশ্রমিক জীবন যাপন করতেন। তাঁর বৌদ্ধ নাম ছিল ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী উগ্রায়ন। লৌকিক নাম সুধীন্দ্র রায়। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কয়েক বছর আগে সুধীন দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যায়। সে কাশীর ছেলে। কিন্তু ওই বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে প্রায় সমগ্র পৃথিবী সে ভ্রমণ করেছিল। তার মৃত্যু সংবাদে সাঁচির সিংহলী ও ভারতীয় আশ্রমিকরা শোকে মুহ্যমা হয়েছিলেন। আজ যখন সাঁচিতে এসে দাঁড়িয়ে সুধীনের আমন্ত্রণ রক্ষা করলুম তখন সে নেই!

স্টেশন থেকে সাঁচি বোধ হয় এক মাইল নয়। উভয়ের মাঝখান দিয়ে সুন্দর রাজপ চলে গেছে। সাঁচি একটি জনবিরল গ্রাম, এ বাইরে তার অন্য পরিচয় নেই। মোট দু তিনশ' লোকের বাস,—ওরা প্রধানত চাষী ভূপালের অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জ মহকুমা মধ্যে সাঁচি পড়ে। অনেকে বিস্মিত হ এই ভেবে যে, বৌদ্ধ শাস্ত্রে অথবা ইতিহাসে কোথাও সাঁচি স্তূপের কোনও প্রকার উল্লে পাওয়া যায় না। বিন্ধ্য গিরি শ্রেণীর একটি অতি ক্ষুদ্র টুকরো পাহাড়ের উপর এ সাঁচি স্তূপটি গাছপালা, বনজঙ্গল ও মা চাপা পড়ে ছিল প্রায় ছয়শ' বছর অবধি অতঃপর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরে জেনারেল টেইলর গন্ধে-গন্ধে বিদিশা থে এসে এই সাঁচিস্তূপ নতুন ক'রে আব খুঁজে পান। এই কূর্মপৃষ্ঠ অনু পাহাড়টি চৈত্য বা চৈত্রিয়গিরি না পরিচিত। আনন্দের কথা এই, কালক্রমি জীর্ণতার প্রশ্ন বাদ দিলেও জেনারে টেইলর এই স্তূপটি একপ্রক অক্ষত অবস্থায় পুনরুদ্ধার করে এর প্রায় ষাট সত্তর বছর প অপর একজন ইংরেজ মেজর কো এই স্তূপ সংস্কারের কাজে লাগে কিন্তু তিনি এ কাজ সম্পূর্ণ করার স পান না। অতঃপর ১৯১৯ খৃষ্টা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সবে অধিনায়ক সার জন মার্শাল সাঁচিস্তূ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁরই সময় থে সাঁচির সর্বপ্রকার উন্নতি ঘটে।

একালে অর্থাৎ ১৮১৮ খৃষ্টাে পর থেকে সাঁচিস্তূপ সম্বন্ধে পৃথি ঐতিহাসিক মহলে যেমন এ

সাড়া জাগে. ঠিক তেমনি আমাদের দেশেরই একদল লোক ধনরত্নসম্ভারের লোভে এই স্তূপের প্রত্যেকটি স্তর হাঁটকিয়ে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করতে থাকে! এই লুণ্ঠনের লোভ সাঁচিস্তূপের চেহারাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে রেখেছে।

গ্রামের সমতল থেকে চৈত্যাগিরির উচ্চতা সামান্যই। হয়ত দু'শ' ফুটের চেয়ে বেশী উঁচু নয়। একালে প্রাচীন রাস্তা ছাড়াও অন্য একটি সুদৃশ্য পথ নির্মাণ করা হয়েছে। উপরে উঠে গেলে সামনেই বিস্তৃত একটি সমতল মালভূমি, এবং প্রথম বিস্ময় লাগে এই কথা ভেবে যে, এই বিরাট স্থাপত্য শিল্পকীর্তি শত শত বছর ধরে কি প্রকারে মাটি ও জঙ্গল চাপা পড়েছিল! বিগত পনেরো বছরের মধ্যে সাঁচি এবং চৈত্যাগিরির উন্নতি হয়েছে অনেক। বন-বাগান, বাঁধান পথ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সুদৃশ্য পুষ্পবীথিকা, বিশ্রাম নেবার ঘর,—এগুলি সুবন্দোবস্ত হয়েছে।

সাঁচির সম্পর্কে একটি অভিমত স্পষ্ট। সম্রাট অশোক এই বৃহৎ স্তূপের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, কিন্তু খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে সম্রাট হর্ষবর্ধনের কাল সপ্তম শতাব্দী অবধি, অর্থাৎ কম বেশী হাজার বছর ধ'রে সাঁচিস্তূপের উপরে নানা যুগের স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন নির্মাণ হতে থাকে। বিস্ময়ের কথা এই, চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বা হুয়েন-সাঙ—উভয়ের কেহই সাঁচিস্তূপের উল্লেখ কোথাও করেননি। সাঁচিস্তূপের তৎকালীন নাম ছিল, 'কাকানবা',—অনেকে বলত, 'বোধশ্রী পর্বত।' এটি নিয়ে সিংহলী পুরাণে একটি গল্প আছে। "সম্রাট অশোক বিদিশাবাসী এক শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই বধূর গর্ভে দুই পুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম হয়। দুই পুত্রের নাম উজ্জেনীয় ও মহেন্দ্র। কন্যার নাম সংঘমিত্রা। সম্রাটের স্ত্রী আপন অধ্যবসায় একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ ক'রে সেখানেই বসবাস করেন। এই বৌদ্ধবিহারটি বিদিশার নিকটবর্তী চৈত্যাগিরি নামক একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত।" সেই কারণে সাঁচিস্তূপের অপর একটি প্রাচীন নাম হল, 'চৈত্যাগিরি বিহার।' আড়াই হাজার বছর আগে এই চৈত্যাগিরিতে আগমন করেন গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং, এবং তিনি তাঁর দুই সুপ্রিয় শিষ্য সারিপুত্ত ও মহামুগ্গলায়নের অস্থির টুকরো দুটি প্রস্তরপাত্রে রেখে স্বহস্তে সমাধিস্থ করেন। সর্বাপেক্ষা বিস্ময় এই, গৌতম বুদ্ধ চৈত্যাগিরিতে কখনও এসেছিলেন, অথবা তাঁর জীবনে এই চৈত্যাগিরির কোনওদিন কোনও যোগাযোগ ঘটেছিল কিনা,—ইতিহাসের কোথাও এটির উল্লেখ নেই। সে যাই হোক, এই ঘটনার দুই শতাব্দী পরে সম্রাট অশোক এই সমাধির খোঁজ পান এবং একটি বিশাল স্তূপ বানিয়ে এই পাত্র দুটিকে স্তূপের অভ্যন্তরে গচ্ছিত রাখেন, এবং তাদের উপরে একটি সাংকেতিক প্রস্তরছত্র নির্মাণ করেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের দু' হাজার দুশো বছর পরে ইংরেজ রাজত্বকালে জেনারেল কানিংহাম এই দুটি প্রস্তরপাত্র আবিষ্কার করে সোজা বিলাতে নিয়ে চলে যান,—যেমন তাঁদের নিয়ে পালানো অভ্যাস! কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর শুভেচ্ছার নিদর্শন-স্বরূপ লণ্ডনের কর্তারা এই অস্থি-অবশেষের পাত্র দুটি ভারতীয় মহাবোধি সোসায়েটির হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বরে ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী উ নু এই পবিত্র দুটি পাত্র আপন মস্তকে ধারণ ক'রে সাঁচিস্তূপের পার্শ্ববর্তী নবনির্মিত 'বিহারে' পুনঃ স্থাপনা করার জন্য নিয়ে যান। ভারতীয় মহাবোধি সোসায়েটির তৎকালীন সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান মন্ত্রী নেহরুও এই বিরাট পুনঃ স্থাপন উৎসব সমারোহে সাঁচির স্তূপে উপস্থিত হন। সেই উপলক্ষ্যে পণ্ডিত নেহরু সিংহল থেকে আনা মূল বোধিবৃক্ষের একটি চারা উক্ত 'নবাবিহারের' সম্মুখে রোপন করেন। সেই অশ্বত্থের চারাটি ইদানীং বেশ বেড়ে উঠেছে, এই সেদিনও আবার দেখে এসেছি।

সাঁচির বৃহত্তম স্তূপটির আশেপাশে আরও কয়েকটি স্তূপ বর্তমান। তাদের মধ্যে একটিতে আছে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর দুইজন সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষু কাশ্যপ এবং মোগ্গলিপুত্তের অস্থি-অবশেষ।

একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে চৈত্যাগিরির মালভূমিটি প্রস্তর প্রাকারে বেষ্টিত করা হয়। ছোট ছোট অনেকগুলি স্তূপ এই বেষ্টনীর মধ্যে আসে। এই মালভূমিটি লম্বায় ৪০০ ও চওড়ায় ২২০ গজ। উত্তর প্রাকারের নীচেকার প্রাচীন পথটির নাম চিকনিঘাটি।

প্রধান স্তূপের চারিদিকে যে সুবৃহৎ প্রাচীর-বেষ্টনী, সেটি বৌদ্ধস্থাপত্যকলার বিশ্ববিজয়ী সাফল্যের নিদর্শন। চারিদিকে চারটি তোরণদ্বারের উপরে ভাস্কর্যের যে আলঙ্কারিক মহিমা, তার রাজকীয় সৌন্দর্য পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের পুরাকীর্তিতে নেই,—একথা পৃথিবীঘোরা বিদেশী পর্যটকরাই বলে যায়। কিন্তু এর জন্য চারজন ইংরেজের নিকট আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে পৌঁছিয়। তাঁরা হলেন, টেইলর, কোলে, কানিংহাম ও জন মার্শাল।

বেত্রবতীর পুল পার হলেই নাকি মহা-প্রাচীনের সেই রোমাঞ্চ রাজ্য বিদিশা,—তা হবে। এখানে ওখানে মধ্যভারত এবং মধ্য-প্রদেশের সংযোগে এখনও দেখা যাচ্ছে বিন্ধ্য-গিরির শাখা-উপশাখা। এ যেন একদল দুরন্ত বালক,—মা-বাপের অবাধ্য হয়ে যেখানে সেখানে বেরিয়ে পড়েছে।

মধুর বাতাস উঠেছে মধ্যভারতে। তন্দ্রা জড়ানো হাওয়ার মৃদু-গুঞ্জনে ভাসছে যেন কবেকার সেই বিস্মৃত যুগের ছোট ছোট কাহিনী। কিন্তু ট্রেন থেকে যে স্টেশনে এসে নামলুম, সেখানে প্রাচীনের কোনও কাহিনী দাঁড়িয়ে নেই। আধুনিককালের যে জনকোলাহলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালুম, সেটিকে বলা চলে রূঢ় বাস্তব। এই স্টেশনের নাম ভিলসা, এবং এটি গোয়ালীয়রের অন্তর্গত। কবেকার সেই বিদিশা কোন্ মালোয়ারাজ্যের মধ্যে ছিল, সে যেন হারিয়ে গেছে কোন্ এককালের রাষ্ট্রবিবর্তনের মধ্যে। আমার চোখের তন্দ্রা ছুটে গেল।

মস্ত বাজার বসেছে ভিলসা নগরে। মোটর বাস ছুটছে। এককালে যাদেরকে বলা হত শ্রেষ্ঠী, এখন তারা 'বেওপারি'। যারা ছিল বণিক, তারা বেনিয়া। রেডিয়োয় বা লাউড স্পীকারে গলাফাটা সংগীত চলছে দোকানে-দোকানে। বড় বড় মাড়োয়ারির গদি। জিলাপির দোকানে ভিড় জমেছে। বয়েল গাড়িতে গমের বস্তা চলেছে। ওখানে হাসপাতালে রোগীরা ঢুকছে। এ পথ দিয়ে ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। ওখানে মস্ত এক কলেজের ফটকে লেখা রয়েছে "সম্রাট অশোক টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট।" সাইন বোর্ডে সম্রাট শব্দটি বলা দরকার, নৈলে আজ অশোককে চিনবে না কেউ! ভুলে গেছে সবাই—একটি ধর্মাশোক জন্মাবার জন্য একলক্ষ নরমুণ্ডের দরকার হয়েছিল কলিঙ্গে!

পুলিশ লাইনের পাশ কাটিয়ে আধুনিক-কালের এক ডাক বাংলায় সেদিন উঠেছিলুম। বিদিশার মৃত্যু হয়েছে,—ভিলসা উঠেছে দাঁড়িয়ে। এখন নবনগর একটি গড়ে উঠছে বিদিশার সেই শ্মশান প্রান্তরে। সেই প্রান্তর মুখরিত হবে নতুন কালের মানুষের কলরবে। তারা আসছে। পায়ের শব্দ শুনছি সেই মহাজনতার। তাদেরই পথ প্রস্তুত হচ্ছে দেখে এলুম রাজস্থানে, পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে,—তারা এসে নতুন ভারত গড়বে! আরও অনেকেই আসছে মহামানবের সাগরতীরে!

কিন্তু সেই মালোয়ার অন্তর্গত ধর্মাশোকের বিদিশা,—তাকে মনে রাখবে কি কেউ? সে রইল ভিলসার বন্য অংশটায় লুকিয়ে,—যে দিকটায় মন্থর বয়েল গাড়ি ধুলো উড়িয়ে চলেছে দূরে দূরান্তরে!

মাইল চারেক মাঠ পেরিয়ে গেলে উদয়-গিরির গুহাগুলি দেখতে পাওয়া যায়। অনুচ্চ পাহাড়, হয়ত বা একশ' ফুটের বেশী উঁচু নয়। কিন্তু এমন জনহীন, লোক-পরিত্যক্ত, এমন উপেক্ষিত যে, এর উপরে গিয়ে ঘুরে বেড়াবার সময় গা ছমছম করে! মোট বোধকরি কুড়িটি গুহা উপরে ও

নীচে। এটি বৌদ্ধশ্রেণীর গুহা নয়,—যেমন অজন্তা, কার্লের, বাগ প্রভৃতি। এগুলি প্রধানত হিন্দু পুরাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই পাহাড় পাথরের জটলায় আকীর্ণ, অত্যন্ত রুক্ষ, আগাগোড়া ভগ্নাবশেষ, এবং প্রত্যেক অলিগলি বোলতা ও মৌমাছির চাকে বিপজ্জনক। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে মোগল সম্রাট আওরংগজেবের সৈন্যরা নাকি এখানে ঢুকে মূর্তিগুলি ভেঙে চুরমার করেছে। কিন্তু তারা ভাঙল কেন, তার ইতিহাসটি কোথাও স্পষ্ট শোনা যায় না। যাদের হাতে হাতুড়ি ছিল, তারাও এখানকার ধুলোয়-ধুলোয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! পাহাড়ের পাদমূলে শংকর-নারায়ণ, উপরে জৈনমন্দিরের ভগ্নাবশেষ, গহ্বরের মধ্যে পাঁচ-ছয় হাত উঁচু একটি অশোকস্তম্ভ,—পরিশেষে পার্শ্বনাথের নাক-কাটা, হাত ভাঙা,—কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি! দেখতে দেখতে ক্লান্তি আসে। সমগ্র উদয়গিরি যেন বিপুল এক ধ্বংসাবশেষ!

পঞ্চম শতাব্দীতে উদয়গিরির গুহাগুলি কাটা হয়। একটি গুহায় লিখিত, "সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মালোয়া জয় করে তাঁর সমর ও শান্তিসচিবকে সঙ্গে নিয়ে এই উদয়গিরি দর্শন করতে এসেছিলেন।" যিনি উদয়গিরির পাথর কেটে-কেটে গুহাগুলি কুঁদে বার করেছিলেন, তাঁর নাম হল, বীরসেন। নীচের দিকে এসে পাঁচ নম্বর মূর্তিটির দিকে চোখ পড়ে। এটি সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য। এই মূর্তিটিতে সাধক-ভাস্কর ও মহৎ শিল্পী বীরসেনকে চিনতে পারা যায়। ছবিটি হল একটি বরাহমূর্তির মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব। মাথাটি বরাহ, দেহ মানুষের। বামপদের দ্বারা এই মূর্তিটি নাগরাজের বহুধা-মস্তক মথিত করছে, এবং দক্ষিণের বিলম্বিত দন্তের দ্বারা দেবী ধরিত্রীর তনুদেহটিকে প্রলয়োপয়োধি জলরাশির ভিতর থেকে উদ্ধার করে তুলছে! এই মূর্তিটির মধ্যে যে-প্রবলতা, যে-তেজস্বিতা, যে পরিকল্পনা এবং ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে,—সেটি অন্য কোথাও দুর্লভ। এই মূর্তিটি সমগ্র উদয়গিরির মূল প্রকৃতিকে যেন উদ্ঘাটন করেছে। আওরংগজেবের সৈন্যরা এটিকে যে চোখেচুরে ভচনচ করেনি, তাই রক্ষা। শুধু তাই নয়, এখান থেকে মাত্র মাইল ছয়েক দূরে সাঁচিস্তূপের খবর তারা পায়নি,—পেলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যেত!

উদয়গিরির ক্ষুদ্র পাহাড়টির তলা দিয়ে বয়ে চলেছে একটি অপ্রশস্ত নদী। নদীটির নাম, "বেশ।" কেউ কেউ এটিকে বলে "ব্যাস।" এই নদীটির এপারে-ওপারে রয়েছে কয়েকটি জীর্ণ ফাটলধরা মন্দির ধোপারা কাপড় কাচছে ঘাটে, পাথুরে চ জেগে উঠেছে নদীর এখানে ওখানে,-যেমনটি দেখেছি নাসিকের পঞ্চবটি সীমানাস্থিত গোদাবরীতে। এখানে অদূরে বয়ে চলেছে বেতোয়া, প্রাচীনকালে বেত্রবতী।

বেশনদী পেরিয়ে আবার ফিরে এলা বেশনগরে। এটি সেই বিদিশারই এক অংশ। চারিদিকে অনুন্নত গ্রামাঞ্চল, ঝোপ জঙ্গল, দরিদ্র চাষীপল্লী, জীবনযাত্র দীনতা,—সব মিলিয়ে রয়েছে পাশাপাশি একটি পথ চলে গিয়েছে পূর্বদিকে বোধ হয় এখানে ওখানে স্বল্পবিত্তরা সাহস ক' দু'চারখানা ঘর তুলেছে। পথেরই দক্ষি পাশে ফিরলুম। একটি প্রাচীরঘেরা মা এসে দাঁড়ালুম। সামনেই একটি স্ত উঠেছে দাঁড়িয়ে,—নীচেটা একটি প্রস্ত বেদী। এটির নাম 'খাম্বাবা।' খাম্বাবার ত বুঝিনে, শুধু সরু লম্বা উঁচু—কিছু এব বোঝায়। ওপাশে বস্তিতে মেয়ে

"গোহরি" অর্থাৎ ঘুটে দিচ্ছে চালার দেওয়ালে; তার পাশে চ্যালাকাঠের আড়ৎ। এপাশে শ্রমিকদের ঘর। এখানে ওখানে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, এই থাম্বা পাথরের স্তম্ভটাকে [illegible] বুঝি মাঝে মাঝে পূজো [illegible] যায়। এর বেশী এ অঞ্চলের লোকেরা এই "খাম্বাবাবা"র সম্বন্ধে আর কিছু জানে না!

যুথভ্রষ্ট খাম্বাবা যেন গ্রামের মধ্যে হঠাৎ উঠেছে দাঁড়িয়ে মস্ত এক অস্ত-পাঁতের মতো। একালের জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত গ্রামবাসীদের নিত্য আনাগোনার পথে এই কুড়ি ফুট উঁচু প্রস্তরস্তম্ভটা যেন সকলের মনে কাঁটার মতো বেঁধে। এটার সম্বন্ধে ঘোরতর উপেক্ষা, অনাদর এবং ঔদাসীন্য দেখলে এই কথাই মনে হয়, এ বালাইটাকে যদি কেউ রাতারাতি ভেঙেচুরে এর পাথরের ডেলাগুলো কাজে লাগায়—তাহলে কোনওদিক থেকে ক্ষোভ করবার কিছু থাকবে না! এখানে এসে বেশ বুঝতে পারা গেল, খাম্বাবাবার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য কারও নেই।

কিন্তু ঔৎসুক্য আছে প্যারিসে, রোমে, ওয়াশিংটনে, সিডনীতে, টোকিয়োয়, মস্কোতে, ডাবলিনে, এমন কি কায়রোতে, বাগদাদেও,—যেখানে ভারত গভর্নমেন্টের ট্যুরিস্ট বিভাগের লোক এইসব দেশে প্রচারপত্র ছড়িয়ে পর্যটকদের আমন্ত্রণ করেন। তাদের দেশের লোক যখন এই "খাম্বাবাবার" সামনে এসে দাঁড়িয়ে নোটবইতে নানা কথা টুকতে থাকে, বেশনগরের গ্রামবাসীরা তখন বেশ একটু কৌতুক বোধ করে। এমন একটা অনাদৃত হতভাগ্য এবং [illegible] স্তম্ভের কাছে কোথাকার "উজবুক" এক সাহেব এসে দাঁড়ালে গ্রামের তরুণী পসারিনীরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে চলে যায়। কিন্তু আমার মতন স্বদেশী পর্যটককে দেখতে কোন দিক থেকে কেউ মুখ ফিরিয়েও তাকায় না!

অপরাহ্নকালের সেই রৌদ্রে খাম্বাবাবার বেদীর গায়ে হেলান দিয়ে সেই সেকালের মালোয়ারাজ্যের গৌরবযুগের গল্পটা আরেকবার মনে পড়ে গেল! খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তক্ষশীলা ও পাঞ্জাবের ইন্দো-ব্যাকট্রিয়ো নরপতি এণ্টিআলকিদস তাঁর নিকট আত্মীয় ডিয়ন নামক এক [illegible]দের পুত্র রূপবান তরুণ রাজকুমার শ্রীমান হেলিওডোরাসকে পাঠিয়েছিলেন মালোয়ারাজ্যে রাজদূতরূপে। তখন মালোয়ারাজ্যের বনেজঙ্গলে হস্তীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। তক্ষশীলার গ্রীক নরপতি আপন রাজ্যকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করার জন্য হস্তী-লাভের বাসনা জানিয়েছিলেন। শত্রুদমনের জন্য তাঁর একটি হস্তীবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, গ্রীক রাজকুমার সুদর্শন হেলিওডোরাস তাঁর [illegible] আয়ত চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, মধুর হাসি ও সুগৌরবর্ণ স্বাস্থ্যশ্রী নিয়ে যখন মালোয়ার রাজা ভগভদ্রের সামনে এসে উপস্থিত হলেন তখন তাঁর অ-ভারতীয় দেহকান্তি দেখে মালোয়ারাজ্যে বিস্ময়ের সাড়া উঠেছিল। তরুণী রাজকন্যা মাধবিকা এই যাত্রিক সম্পর্কে একটু যেন কৌতূহল বোধ করেন! নূতন রাজদূত অল্পকালেই জনপ্রিয় হন।

রাজা ভগভদ্রের পুত্র সমর কৌশল শিক্ষার জন্য তৎকালে তক্ষশীলায় যান, এবং সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে নিরাময় করে তোলেন হেলিওডোরাস এবং তাঁর জননী। সেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মালোয়ার রাজপরিবারে হেলিওডোরাস অপত্যস্নেহ লাভ করেন, এবং তাঁর মিষ্ট ব্যবহার, সৌজন্য এবং রূপশ্রীর প্রীতি সকলেই আকৃষ্ট হন। রাজকন্যা মাধবিকার সহিত তরুণ গ্রীক রাজকুমারের মধুর পরিচয় ঘটে।

অতঃপর বসন্তঋতুর আবির্ভাবে এই বিদিশার বনে-বনে যখন শাল-পিয়াল-তমালের শাখায়-শাখায় পুষ্পমঞ্জরী দেখা দেয়, এবং সমগ্র মালোয়ায় যেদিন বসন্তোৎসবের দিনে ফাগুয়ার রক্তবর্ণে চারিদিক রাঙা হয়ে ওঠে, সেইদিন রাজকন্যা মাধবিকা যখন ঝুলনের দোলায় আপন দেহলতাকে দুলিয়ে পুষ্পবীথিকার উপরে মাঝেমাঝে তাঁর চরণাঘাত করছিলেন, তখন পশ্চিমের রক্তরাঙা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে তরুণ গ্রীকরক্ত ওই ঝুলনের দোলনার মতোই দুলে উঠেছিল। কুণ্ঠাজড়িত পদে এগিয়ে এলেন রাজকুমার হেলিওডোরাস হাসিমুখে। কিন্তু রাজকন্যার দেহলাবণ্যশ্রীর দিকে চেয়ে তাঁর কণ্ঠের ভাষা গিয়েছিল জড়িয়ে। খৃষ্টপূর্ব সেই দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাকবি কালিদাস জন্মগ্রহণ করেননি যে, তাঁর কাব্যের একটি টুকরো হেলিওডোরাসের কণ্ঠস্থ থাকবে! রবীন্দ্রনাথও তখন ছিলেন না যে, রাজকুমার সেই মধুরলগ্নে রাজকীয় প্রণয়সম্ভাষণ জানিয়ে বলবে, "কাননে যত কুসুমে [illegible] ফুটিল তব পায়ে—" সুতরাং ছোকরাটি শুধুই বলল, "যদি আমি পুষ্পবীথিকা হতে পারতুম, দেবীর চরণ স্পর্শে ধন্য হতুম!"

মাধবিকা সলাজনম্র হাস্যে সেই প্রশস্তি-সম্ভাষণ গ্রহণ ক'রে রাজকুমারের প্রণয়াসক্ত হলেন। কিন্তু এই সংবাদে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে মালোয়ারাজ ভগভদ্র তাঁর রাজধানী থেকে হেলিওডোরাসকে বিতাড়িত করেন। বিদায় নেবার কালে মাধবিকা অশ্রুপাত ক'রে বললেন, আমি তোমার বাগদত্তা স্ত্রী। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবে না কোনদিন! তুমি আজ থেকে কায়মনোবাক্যে মালোয়ার কুলদেবতা বাসুদেবের ভজনা কর। তিনি মুখ তুলে তাকাবেন!

শ্রীবাসুদেব মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন,—ইতিহাস এইটি বলে। বিরহ-বিধুরা রাজকন্যা দীর্ঘদিনের অন্তর্বেদনায় যখন একদিন শীর্ণ তনুলতা নিয়ে শয্যাগ্রহণ করেন, সেইদিন মালোয়ারাজের [illegible] কন্যার অবস্থা দেখে মাতা ও পিতা অশ্রুনিগলিত হন। সেই অশ্রু সেইদিন হিন্দু ভারতের সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার আত্মীয় সম্পর্ককে সঞ্জীবিত করেছিল!

তরুণ হেলিওডোরাস তখন তপস্বী এবং ঘন বনপথে একটি কুটীরের অধিবাসী। বাসুদেবের পূজার্চনায় তাঁর দিন কাটে। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী,—সন্ন্যাসব্রতী। সনাতনী ব্রাহ্মণেরা তাঁকে "পরম ভাগবত" আখ্যা দান করেন। তিনি সেদিন বৈষ্ণবের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। অতঃপর হেলিওডোরাসের সঙ্গে মাধবিকার বিবাহ হয়, এবং সেই গ্রীক রাজকুমার বাসুদেব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে গরুড়স্তম্ভটি নির্মাণ করেন গ্রীক-ভারত মৈত্রীর প্রতীক স্বরূপ,—আমি সেইটির গায়ে হেলান দিয়ে একটু আগে আমার দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরিয়েছিলুম।

স্তম্ভগাত্রে ব্রাহ্মীলিপিতে এই কাহিনীর মর্ম কথাটি উৎকীর্ণ করা আছে! চারিদিকের সেই মহাধূলিরাশির মধ্যে সেদিন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সুপ্রাচীন বিদিশাকে দর্শন ক'রে অতঃপর আমি অবন্তীদেশের দিকে অগ্রসর হয়েছিলুম।

অনেকে হিউমানিজম কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে মানবতাবাদ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু মানবতা হলো হিউম্যানিটি। আমাদের আলোচ্য হিউ-মানিটি নয়, হিউম্যান। তাই হিউমানিজমের যথার্থ প্রতিশব্দ মানবিকবাদ। রবীন্দ্র-নাথের "মানুষের ধর্মে" মানবিক শব্দটি বার বার প্রয়োগ করা হয়েছে।

মানবতা বললে ঝোঁক পড়ে মানবজাতির উপরে। মানবতাবাদীরা শাদা কালো প্রাচ্য পাশ্চাত্য, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সব রকম মানুষের জন্যে ভাবেন, সকলের ভালো চান, সবাইকে ভালোবাসেন। মানবিক বললে চোখ পড়ে যে-কোনো একটি মানুষের উপরে। একটির বেলা যা ঠিক সব কটির বেলাও তাই ঠিক। যা কিছু মানবসম্পর্কীয় তাই নিয়ে মানবিকবাদীদের কাজ। মানব থেকে আরম্ভ করে সেই সূত্রে তাঁরা ঈশ্বরেও পৌঁছতে পারেন, কিন্তু মানবের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক ঈশ্বর নিয়ে তাঁদের কারবার নয়। ব্যক্তিগতভাবে একজন মানবিকবাদী খৃস্টান বা বৈষ্ণব বা ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারেন, কিন্তু সাধারণভাবে মানবিকবাদীরা ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামান না, যদি না ধর্ম হয় নৃতত্ত্ব বা সমাজ-তত্ত্বের মতো মানবসম্পর্কীয় একটা জ্ঞাতব্য বিদ্যা। অর্থাৎ মানুষকে জানতে হলে যেমন দেহতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব জানতে হয় তেমনি তার ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়।

আসলে হিউমান কথাটাকে আসরে নামানো হয়েছে ডিভাইন কথাটার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। এ জগৎ ঈশ্বরকেন্দ্রিক বা ঈশ্বরের সৃষ্টি, মানুষ ঈশ্বরের হাতে গড়া তাঁরই প্রতিমা, মানুষ এ পৃথিবীতে থাকতে আসেনি, এটা দু'দিনের সরাইখানা, মানুষের বিশেষভাবে চিন্তনীয় হচ্ছে ইহকাল বা ইহলোক নয়, পরলোক বা পরকাল—এই ধরনের তত্ত্বকথার পাল্টা হচ্ছে হিউমানিজম বা মানবিকবাদ। এর সার বক্তব্য হলো মানুষই হচ্ছে সব কিছুর মান, পরিমাপ করার আধার। ঈশ্বর থাকলে তাঁকেও মানুষের দরবারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার জ্ঞান বুদ্ধি অনুভূতির আমলে আসতে হবে। এ জগৎ মানবকেন্দ্রিক। মানুষ একে প্রত্যহ সৃষ্টি করে চলেছে। এর যদি কোনো অর্থ থাকে তবে তা মানুষের কাছে ও মানুষের জন্যে।

তারপর ঈশ্বরের মতো মানুষেরও অসীম অনন্ত বিচিত্র শক্তি। সেসব শক্তির বিকাশ ও ব্যবহার চাই। মানুষ যে আজ মহাশূন্য পরিক্রমা করে এসেছে এ সেই মানবিক শক্তির বিকাশ ও ব্যবহারের ফলে। কিন্তু আধুনিক যুগের পূর্বে মানুষকে ক্রমাগত শোনানো হয়েছে যে মানুষের শক্তি সামান্য। শক্তির জন্যে তাকে দ্বারস্থ হতে হবে ঈশ্বরের বা দেবতাদের বা শয়তানের বা অপদেবতাদের। দৈবী শক্তি বা আসুরী শক্তি কোনোটাই মানবিক বা প্রাকৃতিক নয়। দুটোই অতি-প্রাকৃত। সারা মধ্যযুগটা জুড়ে অতি-প্রাকৃতের রাজত্ব। অতিপ্রাকৃতের কাছে মাথা নোয়াতে নোয়াতে মানুষের মানবিকতা খর্ব ও অথর্ব। শক্তির সম্যক ব্যবহার না করলে শক্তিমানও দুর্বল হয়ে পড়ে। অপব্যবহার করলে প্রকৃতিরও বিকৃতি ঘটে। মানুষের বাহু যদি সমস্তক্ষণ ঊর্ধ্বে প্রসারিত হয় তা হলে তাকে বলা হয় ঊর্ধ্ববাহু। খুব বাহাদুর বলে তাকে তারিফ করতে পারা যায়, কিন্তু সে মানুষ নয়, মানুষের বিকৃতি। গোটা মধ্যযুগে বিকৃতিকে বাহাদুরি মনে করা হয়েছে। যিনি যত বেশী অস্বাভাবিক, যিনি যত বেশী অপ্রাকৃতিক তিনি তত বড় সাধু বা সাধ্বী বলে বন্দনা পেয়েছেন।

আধুনিক যুগের সঙ্গে সঙ্গে নব মানবিক যুগেরও শুরু হলো। অথবা নব মানবিক যুগের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগেরও শুরু হলো। এ যুগে প্রকৃতিকে যত সম্মান করা হয় অতিপ্রাকৃতকে তত নয়, অপ্রাকৃতিককে তত নয়। প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার জন্যে মানুষ অবিরাম পরিশ্রম করেছে, প্রাণপাত করেছে। তাই প্রকৃতিও কতক পরিমাণে তার বশে এসেছে। তার নিজের প্রকৃতিরও পরিচয় নেওয়া বন্ধ থাকেনি। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দেহবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যা মানুষকেও প্রকৃতির মতো চিরে চিরে বিশ্লেষণ করে চিনছে। এ দেখার শেষ নেই। অচেতন ও অবচেতন স্তরেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের প্রকৃতির উপর ফ্রয়েড, য়ুং প্রভৃতি মনোবিশ্লেষকরা যে আলোকপাত করেছেন তার ফলে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। হঠাৎ মনে হতে পারে এর চেয়ে সেই পুরাণ ছিল ভালো। কিন্তু এ যুগের মানুষ অতিপ্রাকৃতের মধ্যে শান্তি খুঁজবে না। তার চেয়ে এই অশান্তি ভালো। এর থেকেই আসবে আত্মজ্ঞান।

হিউমানিজম একটি নতুন ধর্ম নয়। একটি নতুন সমীক্ষা। একে বিজ্ঞানের সঙ্গে একাকার করা ঠিক নয়। এ সমীক্ষা বিজ্ঞানকেও বিচার করার দাবী রাখে। এরও এক প্রস্থ 'মূল্য' আছে। একটি মূল্যের

নাম স্বাধীনতা। আধুনিক মানুষ কায়-মনোবাক্যে স্বাধীন হতে চায়। সে স্বাধীনভাবে বিশ্বাস করবে, বিচার করবে, সিদ্ধান্ত নেবে, কাজ করবে। করার মতো না করারও স্বাধীনতা দাবী করবে। সে বরং স্বাধীনভাবে ভুল করবে ও ভুল করতে করতে শিখবে তবু গুরু পুরোহিত শাস্ত্র পূর্বপুরুষ বা রাজন্যদের দ্বারা অভ্রান্ত পথে চালিত হবে না। এই স্বাধীনতাটি ছিল না বলেই মধ্যযুগের মানুষ নিত্য নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারেনি। কেবল শোনা কথা মেনে নিয়েছে। সেইজন্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেনি, সাহিত্যও চক্রাকারে ঘুরেছে। মধ্যযুগের মানুষের জীবনে শান্তি স্বস্তি নিরাপত্তা হয়তো ছিল বেশী। সৌন্দর্য যে বেশী ছিল এবিষয়ে সন্দেহ নেই। রসেরও আধিক্য ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার অভাবে মানুষের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ হয়নি। তাই প্রকৃতির কাছে সে একান্ত অসহায় বোধ করেছে ও ধর্মকে অসহায়ের মতো আঁকড়ে ধরেছে। প্রকৃতির দুরন্তপনার সঙ্গে যোগ দিয়েছে সামন্তদের ঔদ্ধত্য, ধনিকদের শোষণ, পুরোহিতদের প্রতারণা, সন্ন্যাসীদের ভণ্ডামি।

মানবিকবাদ এলো বিদ্রোহের ধ্বজা বহন করে। মানুষকে দাও তার যথোচিত স্থান। এ বিশ্বে মানুষের স্থান কোথায় তার পুনর্বিচার হোক। নতুন করে ভাবার অধিকার দাও, বলার অধিকার দাও, সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দাও, পর্যবেক্ষণের অধিকার দাও, পরীক্ষণের অধিকার দাও। এর ফলে যদি প্রচলিত ধারণায় আঘাত লাগে, যদি চিরাচরিত প্রথা টলমল করে, যদি পুরোনো ঘুঁটি কেঁচে যায়, যদি শক্ত খুঁটি নড়নড় করে তা হলে উপায় কী? উপায় পরিবর্তন। পরিবর্তনই মানুষের ধর্ম। সহস্র পরিবর্তন সত্ত্বেও যদি কিছু অপরিবর্তনীয় থাকে সেই অপরিবর্তনীয়ও মানুষের ধর্ম। সে যদি ঈশ্বর কি অমৃত হয়ে থাকে তবে তাকে কণ্ঠ করে রক্ষা করতে হবে না। সে আপনি আপনাকে রক্ষা করবে। "গেল ধর্ম", "গেল নীতি", "গেল সমাজ", "গেল রাষ্ট্র" বলে হৈ চৈ যারা বাধায় তারা পরিবর্তনযোগ্যকে অপরিবর্তনীয় বলে জাহির করে ও পরিবর্তনের স্রোতকে রোধ করে দাঁড়ায়। এসব ঐরাবতের কপালে আছে ভেসে যাওয়া। তবু তারা যৎপরোনাস্তি ক্ষতি করে যায়। গালিলেওকে শাস্তি দেয়, ব্রুনোকে পোড়ায়। ইটালীতে যখন নবযুগের সূচনা হয় তা দেখে কর্তারা এমন রুষ্ট হন যে ইটালিয়ান ভাষায় নতুন ধরনের লেখা এক শতাব্দীর জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। যাঁর লিখতেন তাঁরা লাটিনে লিখতেন ও বাঁচিয়ে লিখতেন। জার্মানীতে যেমন একঝাঁক বিশ্ববিদ্যালয় উদয় হলো তেমনি পরবর্তীকালে এক ঝাঁক বিশ্ববিদ্যালয় রাজার আদেশে রুদ্ধদ্বার হলো। স্বাধীন চিন্তা সহ্য করা হবে না।

স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীন বাক্যের জন্যে সংগ্রাম ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে অবিরাম চলে এসেছে। দুঃখ বরণ করতে হয়েছে বহু সাহিত্যিককে, শিল্পীকে। স্বাধীন কল্পনার জন্যে, স্বাধীন প্রকাশের জন্যে। মানবিক অধিকার একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনো পুরোপুরি হয়নি। ইউরোপের লোক সংগ্রাম করেছে, আমরাও তার সুফল ভোগ করছি। দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, অভিনয়ে ও জীবনের অন্যান্য বিভাগে গত পাঁচ ছয় শতাব্দী ধরে যে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলে এসেছে তার প্রধান ধাক্কাটা পড়েছে ইউরোপের বুকে। সেই রয়েছে সামনে, আমরা রয়েছি পিছনে। ইউরোপ যে আমাদের পায়ে বেড়ী পরিয়েছে এইটেই আমরা বড় করে দেখেছি। সে যে নিজের মনের বেড়ী খুলতে গিয়ে আমাদেরও মনের বেড়ী খুলে দিয়েছে। সেটাকে আমরা ছোট করে দেখি কিংবা দেখেও দেখিনে। যেন মানবিক অধিকার বিনা উদ্যমে মেলে।

আধুনিক যুগের আলো আপনা আপনি জ্বলেনি। তাকে যত্ন করে জ্বালাতে হয়েছে। যেখানে এ চেষ্টা আগে দেখা দিয়েছে সেখানে মধ্যযুগের অবসান আগে ঘটেছে। আমাদের মধ্যযুগ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এলো নবযুগের সূচনা। মানবিকবাদ তখন ইউরোপের আকাশে বাতাসে। ইউরোপের আকাশ বাতাস ততদিনে ভারতেরও আকাশে বাতাসে সঞ্চারিত। তা বলে ভারত যে ইউরোপ বনে গেল তা নয়। ভারত ভারতই রইল। শুধু তার রূপান্তর লক্ষিত হলো। এ রূপান্তর জলে স্থলে ও আরো কিছুকাল পরে অন্তরীক্ষে। এ রূপান্তর অশনে বসনে অভ্যাসে। এ রূপান্তর জীবনধারায়, জীবনের মূল্যসমূহে। বলা যেতে পারে এ রূপান্তর এখনো একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। জনগণের দিকে তাকালে তেমন কোনো রূপান্তর স্পষ্ট নয়। কিন্তু দুদিন বাদে তাদেরও নবযুগ আসবে। একই আকাশ বাতাসে তারাও চোখ মেলছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তারা তো বিচ্ছিন্ন নয়। তারাও আধুনিক যুগের সন্তান হবে, এর দায়িত্ব বহন করবে, এর সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবে। অথচ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবে।

আধুনিক যুগ তথা মানবিকবাদ ইউরোপ থেকে এসেছে বলে মূলত ইউরোপীয় নয়। এর মূল প্রাচীন গ্রীসে তো ছিলই, প্রাচীন চীনে ও প্রাচীন ভারতেও ছিল। এমন কি মধ্যযুগের ইউরোপে বা এশিয়ায়ও বিলকুল বিলুপ্ত হয়নি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপের আকাশে নবযুগের অরুণরাগ ফোটে তার আগে যেমন একটানা রাত ছিল, তেমনি সেই রাতের আকাশে চাঁদের আলোও ছিল। আরো আগে ছিল সূর্যের কিরণ। সেই সূর্যের নাম গ্রীস। কেবল ইউরোপে কেন, পৃথিবীতে বহু নতুন জিনিস, অজস্র নতুন তথ্য, নানা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে প্রাচীন গ্রীস। একদা প্রাচীন গ্রীসই বিশ্বসভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। তার কারণ প্রাচীন গ্রীকরা ঈশ্বর ও দেবদেবী ও পরলোক স্বীকার করলেও তাদের মানবিক অধিকার ষোলো আনা আদায় করে নিয়েছিল। তাদের প্রভু ছিল তারাই। জীবন সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। নিত্য নতুন অনুসন্ধান, নিত্য নতুন পর্যবেক্ষণ, নিত্য নতুন পরীক্ষা, নিত্য নতুন সিদ্ধান্ত, নিত্য নতুন তর্ক তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজীব রেখেছিল। তেমনি দেহচর্চারও বিশ্রাম ছিল না। মানুষ যে দেহী এটা তাদের কাছে ছিল অলজ্জিত সত্য। বসনহীন নারী বা পুরুষ মূর্তি গড়তে তাদের শিল্পীদের উপর নিষেধ ছিল না। তার বদলে ছিল উৎসাহ। তা বলে তাদের সমাজে বিবেকী ব্যক্তির অভাব ছিল না। নীতি ও ন্যায় নিয়ে ভাবনা করবারও লোক ছিল। স্বাধীনতার জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল এথেন্স নগরের। গণতন্ত্রের আদিভূমি ঐ নগর বহিঃশত্রুর সঙ্গে বার বার লড়ে স্বাধীনতা রক্ষা করেছে। সে স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক নয়, জীবনধারার স্বাধীনতা। তা জীবনধারায় মানবিকতার প্রাধান্য।

এই মানবিকতার প্রাধান্য প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধদের মধ্যেও দেখি। ঈশ্বর সম্বন্ধে তারা নীরব ছিল। দেবদেবী মানত। কিন্তু সব দেবতার উপরে মানুষ বুদ্ধের স্থান। কারণ তিনি তাঁর মানবজীবনটিকে এমনভাবে যাপন করেছেন যার ফলে প্রথমে বোধি লাভ ও পরে নির্বাণ লাভ করেছেন। কোনো দেবতা যা পারেন নি। যে-কোনো মানুষ বুদ্ধের অনুসরণ করে বুদ্ধত্ব পেতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম মানুষকে ডাক দিয়েছে সেই শ্রেষ্ঠ অবস্থায় উপনীত হতে। এই মানবজীবনের ভিতর দিয়ে। বৌদ্ধদেরও কথায় যুক্তি, কথায় কথায় প্রমাণ, কথায় কথায় অনুসন্ধান। বুদ্ধ স্বয়ং যুক্তি দিয়ে মানুষের যুক্তিকে জাগ্রত করতেন। কোনো জিনিস মেনে নিতে বাধ্য করতেন না। আপ্তবাক্য দিয়ে ঘুম পাড়াতেন না। তাঁর কাছে নিম্ন অধিকারী বলে কেউ ছিল না। কাউকেই তিনি বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ভক্তি বা বিশ্বাসের দ্বারা বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ পাবার সহজ পন্থা বলে দিতেন না। কঠিন পথ, সকলেই উচ্চ অধিকারী, কেউ না কেউ চূড়ায় পৌঁছে যাবে, যদি সাধনা করে। নরনারী নির্বিশেষে। ব্রাহ্মণ শূদ্র

নির্বিশেষে। এই জন্মেই। পুরুষকারের দ্বারা।

পুরুষকারের উপর এই যে জোর এইটেই মানবিকতার বিশেষ লক্ষণ। প্রাচীন ভারতও মানবিকতার মহিমা বুঝত। কিন্তু ঝোঁকটা ক্রমশই দৈবের উপরে, অতিপ্রাকৃতের উপর পড়ে। লোকে সহজ পন্থায় মোক্ষ লাভের জন্যে ভক্তির মার্গ ধরে। ভক্তির পাত্র প্রথমে ছিলেন দেবতা, তারপরে হলেন দেবতার অবতার। সহজ পন্থা আরো সহজ হলো। মানুষ তারই মতো একজনকে অবতার বলে পূজা করতে আরম্ভ করল। যিনি স্বয়ং জরামৃত্যুব্যাধির অধীন তিনি করবেন সবাইকে ত্রাণ! অগত্যা বিশেষ বিশেষ মানুষের উপর অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক শক্তি আরোপ করতে হয়।

মধ্যযুগের ভারত, মধ্যযুগের ইউরোপ ও মধ্যযুগের চীন জাপান ভক্তি মার্গ অবলম্বন করে বিশ্বাসের ঘোড়ায় চড়ে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু দর্শনে বিজ্ঞানে রাষ্ট্রবিধানে ও জীবনের বহুবিধ প্রকাশে স্থিতিশীল বা পশ্চাৎপদ হয়। তবে শিল্পে সুন্দরের আরাধনা করেছে। অন্তত ওইএকটি জায়গায় ভক্তি মার্গের কৃতিত্ব চিরস্মরণীয়।

মধ্যযুগে প্রায় দেশেই বিজ্ঞান সৃষ্টি আচ্ছন্ন। মানুষ যদি যা পাবার তা অতিপ্রাকৃতের প্রসাদে পায় তবে প্রকৃতির দুর্গম পথে পা বাড়াবে কেন? সাগর গিরি লঙ্ঘনের কী প্রয়োজন? এরি মধ্যে বিজ্ঞানের বাতি টিম টিম করে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন আরব দেশের পণ্ডিতেরা। গ্রীক দার্শনিকদের ধারা তাঁদেরি দ্বারা রক্ষিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যারও তাঁরা ব্যাপারী ছিলেন। তাঁদেরি মধ্যস্থতায় পশ্চিম ইউরোপ সংযুক্ত হয় প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে। মানবিক ঐতিহ্যের বহমানতা চীনেও কতক পরিমাণে ছিল। চীন থেকেও ক্ষীণ একটি স্রোত পশ্চিম ইউরোপে পৌঁছায়। তাই মধ্যযুগের আবহাওয়া যদিও বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞান-সাপেক্ষ দর্শনের অনুকূল ছিল না তথাপি বরাবরই এক আধজন বিদ্বান ছিলেন যাঁরা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিশ্বজগৎ সমীক্ষা করতেন। অবশ্য তাঁরা ধার্মিকদের ইনকুইজিশন সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন। তাই গোঁড়ামির ভেক ধারণ করে প্রাণ রক্ষা করতেন।

ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজন্ম প্রকৃত-পক্ষে জ্ঞানমার্গের প্রকাশ্য রাজপথে আবার বুক ফুলিয়ে হাঁটা। মাঝখানের হাজার বছর গলিঘুঁজিতে চোরের মতো লুকিয়ে চলাফেরা করতে হয়েছিল মানুষকে। সেই-জন্যে ওটাকে বলা হয় অন্ধকার যুগ। তার-পর জ্ঞানমার্গে বিচরণ যতই অবাধ হতে লাগল ততই স্বাধীনতার মূল্য বাড়তে থাকল। আধুনিক যুগের মানুষ কেবল যে জ্ঞানব্রত তাই নয়, সে মুক্তিব্রত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে মুক্তি চায়। পারত্রিক মুক্তি নয়, ঐহিক মুক্তি। সর্বমানবের ইতিহাসে এত বড় একটা ডাইনামিক যুগ আর কখনো আসেনি। মানুষ তার প্রত্যেকটি শক্তির চালনা করেছে, দূরবীন অনুবীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেকটি শক্তিকে বহুগুণিত করেছে, আজ তাই মহাশূন্যে ধাবমান হতে পেরেছে। আরো পারবে। যদি না আপনার হাতে মরে। এ যুগ ইউরোপে আরম্ভ না হয়ে ভারতে বা চীনে আরম্ভ হতে পারত। একই ফল হতো। যার শক্তি বেশী সেই অপরকে জয় করত। চীন বা ভারত হতো সাম্রাজ্যবাদী। ইউরোপ পরাধীন। একে ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য প্রাধান্যের যুগ না বলে নব মানবিকতার যুগ বলাই সমীচীন। অথবা আধুনিক যুগ। তাতে সব মানুষের মান বাঁচে ও বাড়ে। অবশ্য নবলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শক্তিতে ভাঙিয়ে নিয়ে ভোগ করেছে কতক মানুষ, সব মানুষ নয়। কিন্তু একদিন না একদিন করবে সকল মানুষ। ভবিষ্যতে বঞ্চিত মানুষদের ভাগ্যেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ইত্যাদি জুটবে। আধুনিক যুগ সেই অভিমুখেই চলেছে।

এর থেকে মনে হতে পারে যে মানবিকবাদ হচ্ছে অভিনব জড়বাদ। বস্তুর উপরেই এর লক্ষ্য। আত্মার উপরে নয়। তাই যদি হতো তবে আত্মার স্ফূর্তি দেখা যেত না শিল্পে ও সাহিত্যে ও বিশুদ্ধ দর্শনে। আর বিজ্ঞানও কি শুধু ফলিত বিজ্ঞান? বিশুদ্ধ বিজ্ঞানও মানুষের আত্মার স্ফূর্তি। সে যেন একপ্রকার বিশ্বরূপ দর্শন। দিগন্তের পর দিগন্ত আলো হয়ে যায়, চেতনা প্রসারিত হয় দশ দিকে। রিয়ালিটির উপর দখল বাড়তে বাড়তে এমন হয়েছে যে মানুষ তাকে বদলে দেবার শুধরে দেবার কথাও জোর গলায় বলতে পারছে। এর পিছনে রয়েছে আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। আত্মশক্তি আত্মারই শক্তি। মানবিকবাদ জড়বাদ নয়। এটাও একপ্রকার অধ্যাত্মবাদ। যদিও এর থেকে অতিপ্রাকৃত বাদ পড়েছে। অতিপ্রাকৃত বলতে যদি ঐশ্বরিক বোঝায় কিংবা ঐশ্বরিক বলতে অতিপ্রাকৃত তা হলে এর থেকে ঈশ্বরও বাদ গেছেন। তা বলে যথার্থ আধ্যাত্মিকতা বাদ যায়নি। আসলে ঈশ্বরের কোনো সংজ্ঞা নেই। সংজ্ঞা আছে যাঁর তিনি ঈশ্বর নন। তেমনি আধ্যাত্মি-কতারও কোনো সংজ্ঞা নেই। সংজ্ঞা আছে যার তা আধ্যাত্মিকতা নয়। মানবিক-বাদীদের আপত্তি এইখানে যে অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে ঐশ্বরিককে সমার্থক করা হয়েছে। অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে মানবিকবাদের সন্ধি সম্ভব নয়। মানবিকবাদ প্রাকৃতিককে অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু অতিক্রম করলেও প্রকৃতির চৌহদ্দির ভিতরেই থাকে। মানুষ যদি অতিমানব হয়, দেবতা হয়, তা হলেও তাকে মানুষ বলে চেনা যায়। সে সশরীরে স্বর্গে যায় না।

তারপর মানবিকবাদের আরো একটা দিক আছে। এটা একটা জীবনযাপনের ধারা। এতে বৈরাগ্যের স্থান নেই। ইউরোপের তথা ভারতবর্ষের গোটা মধ্যযুগটা জুড়ে সন্ন্যাসীপ্রাধান্য। তাঁদের জীবনযাপনের ধারাকে তাঁরা সর্বজনের আদর্শ বলে ধরে নিয়েছিলেন। সর্বজনও তাই ধরে নিয়েছিল। সেকালের মূল্যগুলো সন্ন্যাসীপ্রধান সমাজের মূল্য। লক্ষ্য নির্বাণ বা মুক্তি বা ত্রাণ। পন্থা বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য। মানবিকবাদীরা এই লক্ষ্যও মেনে নিলেন না, এই পন্থাও মেনে নিলেন না। তাঁদের লক্ষ্য পূর্ণবিকশিত-জীবন, পূর্ণতম জীবন। একজনের জন্যে, সর্বজনের জন্যে। এইখানেই। এক্ষণেই। পন্থা তাঁদের তদনুযায়ী।

সন্ন্যাসীপ্রাধান্যের পূর্বেই বর্ণাশ্রমী যুগ আরম্ভ হয়েছিল। মধ্যযুগের ইউ-রোপে, ভারতবর্ষে ও চীনে একপ্রকার না একপ্রকার বর্ণাশ্রমী সমাজব্যবস্থা কায়েম থাকে। সন্ন্যাসীরা তাকে রদ করতে বা বদলে দিতে পারেননি। তার সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন। সেই সমাজব্যবস্থায় নারী ও শূদ্র ছিল সকলের অধম। সেবা করবার জন্যেই তাদের জন্ম। নারীর আত্মবিলোপের উপর, শূদ্রের আত্মনিমজ্জনের উপর প্রায় সব ক'টি সভ্যতারই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। নারী হবে পুরুষের ছায়ার মতো অনুগতা আর শূদ্র হবে উচ্চবর্ণের দাসানুদাস, নইলে সভ্যতার ভিৎ টলবে। অতএব তাদের মর্যাদার পরিবর্তন কাম্য নয়। কাম্য ইহকালে শুদ্ধজীবন ও পরকালে সদ্গতি। জন্মান্তরে প্রোমোশন হবে, যারা মানে তাদের। মান-বিকবাদীরা নারী ও শূদ্রের সমানাধিকারে বিশ্বাসী। বর্ণাশ্রমী নীতি তাঁদের গ্রহণ যোগ্য নয়। মানবিকবাদ প্রবর্তিত না হলে নারী ও শূদ্রের মর্যাদার পরিবর্তন হতো না। আর দাসপ্রথাও বর্ণাশ্রমের মতো সনাতন হয়ে রইত। যদিও মানবপ্রেমিক বুদ্ধ যীশু প্রভৃতি কেউ তার পক্ষপাতী ছিলেন না, কেউ তার সমর্থন করেননি।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা মানবিকবাদীদেরই ধ্বনি। আধুনিক যুগের ইতিহাস এই তিনটি ধ্বনিতে মুখর। অন্ন বস্ত্র প্রভৃতির সমস্যা মিটলেও মানুষ সুখী হবে না, যদি সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, স্বাধীনতা স্বতঃসিদ্ধ না হয়, মৈত্রী আন্তরিক না হয়। আধুনিক যুগ এখনো মানুষের অন্ন বস্ত্র প্রভৃতির সমস্যা মেটাতে পারেনি। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতাও সকলের করতলগত হয়নি। কিন্তু আশা দিয়েছে। লোকে আশা করতে, কল্পনা করতে, কামনা করতে পারছে। এ শতাব্দীতে যা সম্ভব হলো না

আগামী শতাব্দীতে তা হবে। এই যে বিশ্বাস এটাই বড় কথা! মানবিকবাদ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে পথ চলে, অতীতের দিকে নয়। আর বর্তমানকেও সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে বলে।

মানবিকবাদের বিবর্তন একদিনে হয়নি। প্রাচীন যুগেও এর অস্তিত্ব ছিল, মধ্যযুগেও এর বিলয় ঘটেনি। আধুনিক যুগেও একে বহু বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। বার বার দীপ নিবে গেছে। তাকে জ্বালিয়ে নিতে হয়েছে। এই তো সেদিন ইটালীতে, জার্মানীতেও জাপানে গেল নিবে। আবার জ্বলছে। তারপর মানবিকবাদের বীজ ধর্মের মধ্যেও ছিল। বৈদিক, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে তো নিশ্চয়ই, আরো আগে যেসব ধর্ম উদয় হয় ও অস্ত যায় তাদের মধ্যেও। ধর্মের সঙ্গে এর জাতশত্রুতা নেই। কিন্তু ধর্ম যখনি স্থানু হয়েছে আর মানবিকবাদ গতিশীল হয়েছে তখনি এর সঙ্গে বিরোধ বেধেছে।

মানবিকবাদ আমাদের দেশে বরাবরই একভাবে না একভাবে বহমান ছিল। সম্পূর্ণ অন্তর্হিত কোনোদিনই হয়নি। বৌদ্ধদের সঙ্গে সঙ্গেও না। কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকায় ও অতিপ্রাকৃতের দিকে মুখ করে থাকায় প্রকৃত মানুষকে আমরাও ভুলে যাই, আমরাও তাকে দেবতার তুলনায়, অবতারের তুলনায়, সাধুসন্তের তুলনায়, ব্রাহ্মণাদির তুলনায় নিকৃষ্ট ভাবি। যে মানুষের দেহ আছে, মন আছে, আত্মা আছে তার আত্মার মোক্ষের কথাই শুধু গ্রাহ্য করেছি, আর সব কিছু অগ্রাহ্য করেছি। বিচিত্র পরিপূর্তি, বিচিত্র পরিতৃপ্তির জন্যে ভাবিনি। বিচিত্র শক্তির বিকাশ খুঁজিনি, ব্যবহার খুঁজিনি। শক্তি আরোপ করেছি বাষ্পের বা বিদ্যুতের প্রতি নয়, বিবিধ দেবদেবীর প্রতি। সিদ্ধাই চেয়েছি। হয়তো পেয়েছি। আমাদের সাহিত্য দেবদেবীদের হস্তক্ষেপে ভরা। কথায় কথায় অলৌকিক এসে লৌকিকের সংকট কাটায়। জীবনটা কি সত্যি তাই? মানুষকে খাটো করে, ঠুঁটো করে এ রকম ধারণা।

সেইজন্যে এ দেশেও একদিন বিদ্রোহী কবি ঘোষণা করেন, "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" সহজিয়া ও বাউলদের মুখে "মানুষ" কথাটি বার বার শোনা যায়। সেই সঙ্গে দেহতত্ত্বের কথা। এই মানব-দেহেই সব কিছু রয়েছে। জাগাতে পারলে হয়। বাউলরা বলে, "এই মানুষে আছে সেই মানুষ।" মানুষের ভিতরে, তার দেহে, এমন একজন আছেন যিনি মানুষই, মানুষের ঊর্ধ্বে নন। মানুষের থেকে ভিন্ন নন। তাঁকে নিয়ে যে মানুষ সেই সবার উপর সত্য। তাহার উপর নাই। এখানে এমন কারো কথা বলা হচ্ছে না যিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বা ইন্দ্রিয়াতীত। তাই যদি হতেন তবে তাঁকে মানুষ বলা হতো না। সরাসরি ঈশ্বর বলা হতো। ব্রহ্ম বলা হতো। বৌদ্ধ, জৈন, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতির ধর্মমতে ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে টেনে আনা উচিত নয়। তাঁদের কাছে মানুষই একমাত্র প্রত্যক্ষ সত্য। অপ্রত্যক্ষকেও প্রত্যক্ষের দ্বারা পরিমাপ করতে হবে। এটাই মানবিকবাদী বৈশিষ্ট্য।

যে মানবিকবাদ আমাদের দেশে ছিল ও যে মানবিকবাদ ইংরেজের সঙ্গে আমাদের দেশে এলো তাদের মধ্যে পার্থক্যও বড় কম নয়। বহিঃপ্রকৃতির উপরে আমাদের পুরাতন মানবিকবাদীদের দৃষ্টি ছিল না। ইউরোপের নতুন মানবিকবাদীদের ছিল। প্রকৃতিকে জয় করতে গিয়েই তারা ভারতকেও জয় করে। সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, সর্ব-প্রকার বিদ্যায় তাদের মানবিকতা তাদের গতিশীল করেছিল। অপর পক্ষে আমাদের পুরাতন মানবিকবাদীরা হয়ে পড়েছিল স্থিতিশীল। তারা আধুনিক, এরা মধ্যযুগীয়।

এমন নয় যে, পশ্চিম ছিল চিরটা কাল গতিশীল ও পূর্ব ছিল আবহমান কাল স্থিতিশীল। ইউরোপও দীর্ঘকাল স্থিতিশীল ছিল। ভারতও একদা গতিশীল ছিল। কিন্তু মধ্যযুগের হাওয়া বদলের পর ইউরোপের চেহারা বদলে যায়। সে হয়ে ওঠে নওজোয়ান। দূর থেকে মনে হতে পারে, গতিশীলতাই তার স্বভাব। অপর পক্ষে বন্ধ হাওয়ায় বাস করে ভারতের হাতে পায়ে খিল ধরেছিল। স্থিতিশীলতাকেই সে মনে করে-ছিল তার স্বধর্ম। রেল লাইনের একপাশে যে মালগাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে, তার নিজের ইঞ্জিন যদি অচল হয়, তা হলে অন্য কোনো-খান থেকে অপর এক ইঞ্জিন এসে তাকে টেনে নিয়ে যায়। ইতিহাসেরও সেই নিয়ম। গতিশীল এসে স্থিতিশীলকে পিছনে বাঁধল। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল কে জানে কিসের অভিমুখে। ইঞ্জিনের ধাক্কা এসে লাগল যখন তখন মালগাড়ী ঠাওরাল ওটা পশ্চিমের ধাক্কা। ওটাকে এড়াবার একটিমাত্র উপায় ছিল। আপনার ইঞ্জিনকে অচল হতে না দেওয়া। অনড় অবস্থায় লাইন জুড়ে থাকার অধিকার কোনো মালগাড়ীর নেই।

রিয়ালিটির একটি অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্তা আছে। আমাদের দার্শনিক ও সাধকরা তা জানতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি পরিবর্তনশীল বিবর্তনশীল রূপও আছে। আমাদের জ্ঞানীরা তার সঙ্গে দৌড়তে ও পাল্লা দিতে পারেননি। তাঁরা ভেবেছেন তাঁরা বসে থাকলে তাঁদের মতো রিয়ালিটিও বসে থাকবে। জাগতিক জ্ঞান দু' দিনেই বাসি হয়ে যায় বলে তাকে প্রত্যহ তাজা রাখতে হয়। ইনটেলেকচুয়ালদের কাজ হলো তাকে তাজা রাখা। সেই সঙ্গে নিজেদের তাজা রাখা। বাসি হতে না দেওয়া। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা গেল আমাদের দেশে জাগতিক জ্ঞান কবে থেকে বাসি হয়ে রয়েছে। তামাদি বললেও চলে। ইনটেলেকচুয়ালরাও তেমনি বাসি। তেমনি তামাদি। যে জগতের সঙ্গে তাঁদের কারবার সে জগৎ আর রিয়াল নয়। ছিল এককালে রিয়াল। সেই জন্যে ইউরোপ এমন অনায়াসে এ দেশের দেহ ও মন অধিকার করতে পারল। এ দেশ যেন ইউরোপীয় শিক্ষার জন্যে চাতকের মতো সতৃষ্ণ হয়ে অপেক্ষা করছিল তিন শতাব্দী ধরে। সে শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা। মানবিক শিক্ষা। রিয়ালিটির সঙ্গে পরিচয় সাধনের শিক্ষা। অতি অল্পদিনের মধ্যে হাওয়া বদলে গেল। 'শিক্ষিত' বলতে বোঝালো ইংরেজি শিক্ষিত। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও ইংরেজি শিখতে হলো। নইলে তাঁকে লোকে পণ্ডিত বলত, কিন্তু শিক্ষিত বলত না। ইংরেজি শিক্ষার এই যে প্রতিপত্তি এটা ইংরেজ শাসনের জন্যে নয়। রিয়ালিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হলে এই শিক্ষাই ছিল একমাত্র অবলম্বন।

বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের কি ইংরেজি শেখার লেশমাত্র প্রয়োজন ছিল? কই, আগে তো সেকথা কেউ ভাবেনি? মোগল আমলে ফারসী শিক্ষা ছিল, কিন্তু দু' একজন ছাড়া আর কোনো সাহিত্যিক ফারসীনবিশ ছিলেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল, বাংলা লিখতে গেলেও ইংরেজি জানা দরকার। যাঁরা ভালো ইংরেজি জানেন না, তাঁরাও ইংরেজি বুকনি দেন। সাধু সন্ন্যাসীদের মুখেও ইংরেজি শব্দ। পরবর্তী কালে একে ইংরেজের সাংস্কৃতিক জয় বলে নিন্দা করেছি আমরা। জয় যদি কেউ করে থাকে সে মন জয় করেছে। আর মন জয় করা ক্লাইভ কর্নওয়ালিসের কর্ম নয়। এ কাজ করেছেন সেক্সপীয়ার মিলটন প্রভৃতি কবিরা, স্কট ডিকেন্স প্রভৃতি ঔপন্যাসিকরা, নিউটন ডারউইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা, রুশো ভলতেয়ার প্রভৃতি চিন্তানায়করা, কান্ট হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকরা, মাটসিনি গারিবল্ডি প্রভৃতি বিপ্লবীরা। একসঙ্গে চার শতাব্দীর ইউরোপ এসে হাজির হলো আমাদের মনোজগতের দ্বারে। দ্বার যাঁরা খুলেদেন তাঁরাই শিক্ষিত বলে গণ্য হলেন। বাংলা সাহিত্যের নব নেতৃত্ব বিজিত মনোভাবের প্রতিফলন নয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে সাগরপারের মানুষের কাছে আধুনিক যুগের গতিশীল রিয়ালিটির বার্তা উৎকর্ণ হয়ে শুনেছেন। তার মূলে দাস মনোভাব নয়। স্থিতিশীলকে গতিশীল করে তুলতে হলে ও-ছাড়া আর কোনো পন্থা ছিল না।

পাঁচ শতাব্দীর পথ আমরা এক শতাব্দীতে অতিক্রম করতে পেরেছি এমনি কয়েক জন মন-অধিনায়কের নেতৃত্বে। তাই আমরাও ইউরোপীয়দের মতো বিংশ শতকের মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারছি। পরাধীনতায় আমাদের চরিত্রের ক্ষতি হয়েছে নিশ্চয়। না হয়ে পারে না। কিন্তু লাভলোকসানের খতিয়ানে লাভের দিকটাও নগণ্য নয়। আমরা আলো পেয়েছি, আলোকিত হয়েছি। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির সন্ধান পেয়েছি, শক্তির সাধনা করে স্বাধীন হয়েছি। মানবিক মূল্য একদিনে নয়, দিনে দিনে আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়েছে ও জীবনকে রূপান্তরিত করেছে। ঐতিহ্যবাদীরাও নিজেদের অজ্ঞাতসারে সংস্কারবাদী ও বিপ্লববাদীদের কাছাকাছি এসেছেন। বর্ণাশ্রমের ও বৈরাগ্যের সে প্রেস্টিজ আর নেই। নারী ও শূদ্র সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। ব্যক্তি এখন সমাজের ও পরিবারের ইচ্ছার চালিত পুতুল নয়। দেবদেবীরা সাহিত্য থেকে বিদায় নিয়েছেন।

সমগ্র জাতি চেয়েছে আধুনিক যুগে উপনীত হতে। কার্যত উপনয়ন হয়েছে ছোট একটি শ্রেণীর। এই নতুন দ্বিজদের উপহাস করে বলা হয় ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত। কিন্তু এরা কি কারো পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে? জনগণেরও উপনয়ন হোক। মালগাড়ীর প্রত্যেকটি ওয়াগন ইঞ্জিন হোক। সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি গতিশীল হোক। স্বাধীন হোক। যে যার মানবিক অধিকার ও মানবিক দায়িত্ব বুঝে নিক। শাস্ত্র, পুরাণ, দেবতা, অবতার, গুরু, সন্ন্যাসী, পুরোহিত, রাজা সওদাগর, কোটাল প্রভৃতির একাধিপত্য থেকে মুক্ত হোক। দেবতার মধ্যে স্বামী-দেবতাও পড়েন। মেয়ে মানুষ কেবল মেয়ে হয়ে রয়েছে। এখন থেকে মানুষ হোক।

একজনের দীপ যেমন আরেক জনের দীপ জ্বালিয়ে দেয়, তেমনি ইউরোপের মানবিকবাদীরা ভারতের মানবিকবাদীদের দীপ জ্বালিয়ে দেন। তারপর থেকে দীপাবলী উৎসবের আয়োজন চলেছে। ধীরে ধীরে জনগণের দীপগুলিও জ্বলবে। ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যের বর্তিকা উজ্জ্বল হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের বর্তিকা যাদের নাগালের বাইরে, তারা তাদের দীপ জ্বালিয়ে নিতে পারে বাংলা সাহিত্যের বর্তিকা থেকে। তবে কতক লোককে এখনো বহুকাল ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত থাকতে হবে। নইলে নিত্য পরিবর্তনশীল রিয়ালিটির থেকে বিযুক্ত হবার আশঙ্কা। এই বিযুক্ততার লক্ষণ আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ করছি। আবার এক আনরিয়াল জগতের দিকে পিছুটানকে মনে করা হচ্ছে স্বাদেশিকতা বা গণকল্যাণ। মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব খর্ব না করে যে প্রগতি

সেইটেই সত্যিকার প্রগতি। তা সে একজন মানুষেই হোক আর এক কোটি মানুষেই হোক। একজনকেই বা বঞ্চিত করা হবে কেন তার মানবিক উচ্চতা থেকে, বৃদ্ধি থেকে, পরিপূর্ণতা থেকে, পরমা পরিতৃপ্তি থেকে? সমাজের নামে ব্যক্তির উপরে জুলুমেও গণ-কল্যাণ নয়। জনগণ কোনো দিন মানুষ হবে না, যদি ব্যক্তিগত মোক্ষের মতো ব্যক্তিগত সার্থকতার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়। প্রত্যেকের দেহ মন হৃদয় বিবেক আত্মা স্বয়ংচালিত হলেই সে মানুষ হবে।

এর মধ্যে ধর্মেরও স্থান আছে। ধর্মের প্রচলিত সংজ্ঞায় যাঁদের আপত্তি, তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামতো অপর একটি সংজ্ঞায় বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরকে বাদ দিলেও মানুষকে বাদ দিতে পারেন না, মনুষ্যত্বকে বাদ দিতে পারেন না। মানুষকে রাখতে হবে। রাখলে তাকে পুরোপুরি রাখতে হবে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাটলে চলবে না। তার হৃদয় মন বিবেক ছাটলে চলবে না। তার ইচ্ছাকে ছাটা উচিত নয়। তার আত্মাকে ছাটলে সর্বনাশ।

রামমোহনের মতো অগ্রগামীদের ভাবনা ছিল কেমন করে ধর্মের সঙ্গে মানবিকবাদের জোড় মেলানো যায়। ধর্ম সব দেশেই চিরকাল ছিল। মানবিকবাদও অন্তত কয়েকটি দেশে প্রাচীনকাল থেকে ছিল। কিন্তু মানবিকবাদ যেমন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কল্যাণে আধুনিক হয়, গতিশীল হয়, ধর্ম তেমন হয়নি। সেইজন্যে রোমান কাথলিক চার্চ থেকে বড় একদল খৃস্টান পৃথক হয়ে যান। তাঁরা প্রোটেস্টান্ট, অর্থাৎ প্রতিবাদকারী। তাঁদের মধ্যেও মতভেদ লক্ষিত হয়। ছোট ছোট দলগুলিকে একত্রভাবে বলা হয় নন-কনফর্মিস্ট। তাঁরা চোখ বুজে অনুবর্তন করবেন না। আপন আপন জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবেন। এমনি করে ধর্মের মধ্যেও কতকটা গতিশীলতা সঞ্চার করা হলো। ননকনফর্মিস্টদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের নাম ইউনিটারিয়ান। এঁরা ঈশ্বরের ত্রিত্ব স্বীকার করেন না, সুতরাং খৃস্টকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র বলে মানেন না। এঁরা সোজা-সুজি একেশ্বরবাদী। কোনো মানুষকেই এঁরা ঈশ্বরের আসনে বসাবেন না। ত্রিদেব-বাদে বা অবতারবাদে বিশ্বাস না থাকায় রামমোহনও নিজেকে ইউনিটারিয়ানদের একজন মনে করতেন।

ধর্মকে গতিশীল করাই রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল, সম্প্রদায় পত্তন করা নয়। পর-বর্তী কালে আপনাআপনি একটা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, তার কারণ প্রাচীনপন্থীদের আওতায় থেকে যথেষ্ট গতিশীল হতে পারা যেত না। যেই প্রাচীন ধর্মের অভ্যন্তরে গতি-শীলতা সঞ্চারিত হলো অমনি ব্রাহ্ম সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা সারা হয়ে এলো। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে পশ্চিমে ও পূর্বে মানবিকবাদ যে রকম জোর কদমে এগিয়ে চলেছিল, ধর্ম সে রকম নয়। ধর্মের পিছুটান অত্যন্ত বেশী। বৈজ্ঞানিকরা সত্যের বাঁধন ছাড়া আর কোনো বাঁধনে জড়িত নন। আর সেই সত্যেরও এক জায়গায় স্থিতি নেই। ধার্মিকরা হাজারো বাঁধনে বাঁধা। একেশ্বর-বাদী হলেই বা কী! একই ব্যক্তি বৈজ্ঞানিকও হতে পারেন, ধার্মিকও হতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের এমন এক ব্যবধান দেখা দিয়েছে যার উপর সেতু বন্ধন করা যে-কোনো মানুষের পক্ষে কঠিন। বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে ধর্মের জগতের জোড় মেলানো সম্ভব নয় দেখে বহু চিন্তাশীল এক পক্ষে না এক পক্ষে ভিড়েছেন। দু' পক্ষে যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি দুই নৌকায় পা রেখেছেন।

আধুনিক মানবিকবাদকে রামমোহন অকুণ্ঠিতভাবে বরণ করে নেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের উত্তরসাধক। কিন্তু রামমোহনের সময় যে ব্যবধান স্পষ্ট হয়নি পরে সে ব্যবধান উগ্র হয়ে ওঠে পাশ্চাত্য মনোলোকে তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মনীষায়। জগৎ কি মানবকেন্দ্রিক না ঈশ্বরকেন্দ্রিক? মানুষ

ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছে বলেই কি বিশ্ব আছে? না ইন্দ্রিয়াতীতভাবে ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষভাবে আছে! কার ইচ্ছা বলবান? মানুষের না বিধাতার? এসব প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিকরা একভাবে দেন, ধার্মিকরা আরেক ভাবে দেন। একের সঙ্গে অপরের মিল নেই। সাহিত্যের থেকে যেমন দেবদেবীদের নির্বাসন করা হয় তেমনি ঈশ্বরকেও, তাঁর ইচ্ছাকেও। ইংরেজি সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যের থেকেও। সেকালের কবিরা শ্রীমন্তকে বা সুন্দরকে বাঁচাবার জন্যে কালীকে মশানে নিয়ে আসতেন। একালের কবিরা অলৌকিকের সাহায্য নিয়ে তাঁদের নায়কনায়িকাদের সঙ্কট পার করে দিতে অনিচ্ছুক। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও অলৌকিকের প্রতি একটা টান ছিল। ঈশ্বরকে মানুষ ও মানুষকে ঈশ্বর করে তিনি একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে না ছিল অলৌকিকের প্রতি আকর্ষণ, না ছিল অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, না ছিল মানুষকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরকে মানুষ করার প্রয়াস, না ছিল সন্ন্যাসীদের ও সন্ন্যাসের সম্বন্ধে মোহ, না ছিল বিপদের দিনে ত্রাণকর্তার কাছে প্রার্থনা। তিনি তাঁর পূর্বগামীদের সকলের চেয়ে বেশী মানবিকবাদী। অথচ তিনি কারো চেয়ে কম ধার্মিক ছিলেন না। উপনিষদের উপর তাঁর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছিল আর ছিল বাউল বৈষ্ণব সাধনার উপর।

কী করে তিনি জোড় মেলালেন এ নিয়ে প্রচুর অনুসন্ধানের অবকাশ আছে। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে, তিনিও জোড় মেলাতে পারেননি, যদিও আজীবন চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বরকে "তুমি" বলে অত যে গান লিখলেন তার পরে দেখি আর "তুমি" নেই। শেষ বয়সের কবিতায় "তুমি"র সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে। একদিন তাঁকে নিভৃতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, "আপনি কি আর ভগবানে বিশ্বাস করেন না?" তিনি একটু হাসেন। তারপর পাশ কাটিয়ে যান। বলেন, "দেখ হে, আমি কবি। আমি এক্সপ্রেসন দিই।" তার পরে যা বলেন তা আমার ঠিক স্মরণ নেই। মনে হলো তিনি তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ দিয়েই ক্ষান্ত। তত্ত্ব প্রচার করতে চাননি। মোট কথা তিনি আমাকে ধরাছোঁয়া দিলেন না। আর ও প্রসঙ্গ ওঠেনি।

ভগবানে তাঁর আগের মতো বিশ্বাস থাক আর নাই থাক মানুষের উপর ছিল। মানুষের আত্মশক্তির উপর, বিজ্ঞানশক্তির উপর। তার পর তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রকৃতির উপর, প্রকৃতির আপনাকে আপনি নতুন করে তোলার চিরন্তন শক্তির উপর। উপরন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল সত্যের উপর, শ্রেয়ের উপর, সৌন্দর্যের উপর, প্রেমের উপর। মানবিকবাদী বলে তাঁকে চিনতে কোনো দিন সন্দেহ হয়নি। নিরীশ্বরবাদী বলে চীন দেশের মানুষকে বা বস্তুবাদী বলে রুশ দেশের মানুষকে তিনি আপনার চেয়ে ছোট ভাবেননি।

ধার্মিকদের বিশ্বাসসমীক্ষায় কেবল যে ঈশ্বর বা দেবতা থাকেন তাই নয়, শয়তান বা অসুরও থাকে। মানুষের ভিতরেও তাঁরা শয়তানকে অথবা অসুরকে দেখতে পান। প্রকৃতির ভিতরেও। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন শয়তানের বা অসুরের বা অপদেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির কোনোখানে এমন একটি চরিত্রের অবতারণা নেই যে, মূর্তিমান মন্দ। খারাপ লোক তিনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। কে না দেখেছে! কিন্তু লোকটাকে পুরোপুরি কালো তুলিতে আঁকা তাঁকে দিয়ে হলো না। তাঁর মনের গড়নই এরকম যে, তিনি মানুষ দেখলে তার মনুষ্যত্বই দেখেন, তার দেবত্ব বা দানবত্ব নয়। নরদেবতাও তিনি আঁকেননি। এঁকেছেন মহৎ পুরুষ, মহীয়সী নারী। এঁরাও মানুষ। এঁরাও আছেন।

মানবিকবাদী সাহিত্যিকেরা কেন যে এ জগতে মহৎ চরিত্র নিষ্কলুষ চরিত্র দেখতে পাবেন না এর অর্থ বোঝা ভার। কেন যে এত বেশী আধি ব্যাধি বিকৃতি ও বিকার দেখবেন তারও অর্থ হয় না। ন্যাচারালিজম বা রিয়ালিজম অতিপ্রাকৃতকে অস্বীকার করতে গিয়ে অপর এক চরম প্রান্তে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথ এ রকম একটা চরম প্রান্তের যাথার্থ্য মানতেন না। মানবিক-

বাদকে বিশেষ একটা সংজ্ঞা দিয়ে চিহ্নিত করলে সে আর মানবিকবাদ থাকে না। হয়ে যায় মতবাদ। ধর্মের বেলায় যেমন সাম্প্রদায়িকতা মানবিকবাদের বেলাও তেমনি মতবাদ নিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধতা। ঈশ্বর ও পরকাল নিয়ে মধ্যযুগের আবহাওয়া গরম ছিল। আধুনিক যুগের আবহাওয়াকে গরম করে তুলেছে মানুষ ও তার সত্যিকার প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিচিত্র নির্ণয়। বিজ্ঞানের উপর ঠিক সেই পরিমাণ ভক্তি লক্ষিত হচ্ছে যে পরিমাণ ছিল ধর্মের প্রতি। বহু ক্ষেত্রেই এটা অন্ধ ভক্তি। মানবিকবাদকে বিজ্ঞানের সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে হবে, জোড় মেলাতে হবে। এ এক নতুন সমস্যা।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনে বিজ্ঞানচর্চায় মনোযোগ দেখেছি। "বিশ্বপরিচয়" লেখার আগে তাঁকে দীর্ঘকাল বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার ১৯২৪ সালে। সে সময় লক্ষ করি তিনি আহারের পর বিশ্রাম করছেন হেলান দিয়ে। হাতে একখানা "সায়েন্টিফিক আমেরিকান"। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর রুচি ছিল, তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এটি আমার গৃহিণীর মুখে শোনা। কবির মহাপ্রয়াণের বছর খানেক আগে আমরা শান্তিনিকেতনে বাস করতে আসি। কয়েক মাস থাকি। বিশ্বভারতীর একটি ছাত্র আমাদের কাছ থেকে হগবেনের বিখ্যাত বই "ম্যাথেমেটিকস ফর দি মিলিয়ন" পড়তে নেয়। পরে তাই দেখে অঙ্ক কষে অধ্যাপককে অবাক করে দেয়। প্রণালীটা কোথায় পেল, জানতে চান অধ্যাপক। তখন সে বইখানা ওঁকে দেখায়। বই আর আমাদের বাড়ীতে ফিরে আসে না। খোঁজ, খোঁজ। আমার গৃহিণী অবশেষে শুনতে পান বই চলে গেছে স্বয়ং গুরুদেবের হাতে। তিনি তন্ময় হয়ে পড়ছেন।

একেই বলে "গৃহীত এব কেশেষু।" মৃত্যু যখন তাঁর কেশ স্পর্শ করেছে তখনো তিনি নিবিষ্ট চিত্তে অঙ্কশাস্ত্র পড়ে নিচ্ছেন। মহর্ষিকেও নাকি অনুরূপ অবস্থায় ভূতত্ত্ব পড়তে দেখা যায়। সুধালে উত্তর দেন, যাবার আগে নিজেকে ভরিয়ে নিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে কেবল যে আপনাকে ভরিয়ে নিয়েছিলেন তাই নয়, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেল বন্ধন করতেও উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে অনুমান করলে অযথা হবে না। "মানুষের ধর্ম" তার আভাস আছে। "ল্যাবরেটরি"তে তার ইঙ্গিত আছে। নিরীশ্বরবাদকে ও বস্তুবাদকে তিনি ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। অনুরূপ চেষ্টা গান্ধীজীর জীবনেও দেখা যায়। তিনি বলতেন, সত্যই ভগবান। তেমনি রবীন্দ্রনাথের "ল্যাবরেটরি" গল্পের নন্দকিশোরের নিষ্কাম ধর্ম ছিল বিজ্ঞানসাধনা। তাঁর ল্যাবরেটরি হলো তাঁর বিধবার পূজার দেবতা।

রবীন্দ্রনাথকে এই সময় আমি জিজ্ঞাসা করি, "যুদ্ধ করব আমরা কী দিয়ে? হিংসা দিয়ে না অহিংসা দিয়ে? তিনি উত্তর দেন, "গীতার অর্জুনের মতো"। অর্থাৎ ঈশ্বরের বা ইতিহাসের নিমিত্তমাত্র হয়ে, হিংসা দিয়ে। এই উত্তর আমার মন মেনে নিতে পারেনি। মানবিকবাদ মানুষকে আর কারো নিমিত্তমাত্র হয়ে নিজের দায়িত্ববোধ বিসর্জন দিতে বলে না। দায়িত্ববোধ যার আছে সে যদি সব দিক বিবেচনা করে হিংসার মার্গ ধরে, তা হলে তাকে আজকের দিনে মানবকুল বিধ্বংসেরও দায়িত্ব নিতে হবে। মানবিকবাদ যে-চূড়ায় এসে ঠেকেছে, তার থেকে পরিত্রাণ ঈশ্বরের বা ইতিহাসের নিমিত্তমাত্র হয়ে নয়। অর্জুনের নজির বা গীতার বচন মানবিকবাদকে গতিশীল করতে পারবে না। ধর্মের মতো মানবিকবাদও পারমাণবিক মহাযুদ্ধের দিনে অসহায়। যদি না মানুষ হিংসা প্রতিহিংসার দুষ্টবৃত্ত ভেদ করতে শেখে। না, মানবিকবাদও যথেষ্ট নয়।

ধ্রুপদ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দির নাম তো চম্পা, তোমার?' প্রেসক্রপশান লেখবার আগে জিজ্ঞেস করল ডাক্তার চক্রবর্তী। শম্পা।'

ডাক্তার এক সেকেন্ড থামল। বললে, 'সে আবার কী নাম! মানে হয়?'

'মানে হয় না মানে?' দু কালো চোখে আলো ঠিকরে পড়ল মেয়ের। 'শম্পা মানে বিদ্যুৎ।'

চেনে, চেনে দু বোনকেই চেনে। অন্তত চিনত। বিয়ের আগে চিনত। শম্পা বললেই চিনতে পারবে।

'চলো, চলো, তুমিও চলো।' শম্পা বললে নিরঞ্জনকে।

'এ তো বলাই বাহুল্য। আমি না হলে যাবে কার সঙ্গে?' ধোঁয়া ওড়াল নিরঞ্জন।

'দিন সাতেকের ছুটি নিয়েছ তো? আমার স্কুল তো আমাকে দিয়েছে।'

'তোমার স্কুল তোমাকে দিয়েছে বলে আমার আপিসও আমাকে দেবে? তা ছাড়া ব্যাপার তো একদিনের।'

'না, ডাক্তার চক্রবর্তীকে দেখাব একবার।'

'বেশ তো দেখাবে। ডাক্তার যদি বলে, বেশিদিনের মামলা, থেকে যাবে কলকাতায়।' নিরঞ্জন বললে, 'আমি একা ফিরে আসব।'

'না, তুমিও থাকবে। তুমিও দেখাবে।' মুখ করুণ করল শম্পা।

'আমি কাকে দেখাব?'

'ডাক্তার চক্রবর্তীকে।'

'মাথা খারাপ!' নিরঞ্জন সরে যেতে চাইল।

'না, না, চক্রবর্তী খুব ভালো খুব বড় ডাক্তার। স্পেশালিস্ট।' শম্পা প্রায় গদ্গদ হল। 'আমাদের কত কালের চেনা। সেই ছেলেবেলা থেকে। দিদির বয়েস যখন দশ আর আমার সাত।'

'তোমাদের চেনা তো আমার কী!' হাসতে চাইল নিরঞ্জন।

'আমাদের চেনা বলে ভালো করে দেখবে।'

'দেখলেই হল! যা মুখে আসবে বলে দেবে ঝপ করে। কাকে দুষবে ঠিক নেই।' নিরঞ্জন এবার শব্দ করে হাসল।

শম্পা চুপ করে রইল।

'কী হয় না হলে? মানবজীবন ভেসে যায়?' মুখ বেঁকাল নিরঞ্জন। 'কত লোকেরই তো হয় না। কত লোক তো বিয়েই করে না একদম।'

'কিন্তু আমরা তো করেছি।' শম্পা

বললে সরল মুখে।

'কিন্তু বিয়ের পরেও তো কত মহাপুরুষের হয় না।'

'রাখো! মহাপুরুষেরাও জন্মেছিল। না জন্মে অমনি-অমনি মহাপুরুষ হয় না। তাই,' মিনতি ঝরাল শম্পা, 'তুমিও চলো।' পরে ঘনতর হল। 'রোগের কথা ডাক্তারকে না বলব তো কাকে বলব?'

'ডাক্তার তো কত বোঝে!' তবু চূড়ান্ত টিপ্পনী কাটতে ছাড়বে না নিরঞ্জন।

'তুমি সেই শম্পা! সেই বিদ্যুৎলেখা!' ডাক্তার চক্রবর্তী উচ্ছ্বসিত হল। 'কী হয়েছে?'

'পা ফুলেছে।' চোখ নামাল শম্পা।

'কই দেখি।'

শাড়ি-সায়ার ভারটা পায়ের পাতার থেকে একটু একটু করে তুলল শম্পা।

চক্রবর্তী দেখল যত্ন করে। দেখতে-দেখতেই কটা জরুরী প্রশ্নের জবাব নিয়ে নিল।

বুক দুরুদুরু করতে লাগল শম্পার। যা সে আশা করে এসেছিল, ভর ভর চোখ তুলে তাকিয়েছিল, তা নয়।

'বিয়ে হয়েছে কদ্দিন?' জিজ্ঞেস করল চক্রবর্তী।

'সাত-আট বছর।'

শাখা পল্লব মুকুল মঞ্জরীই হয়েছে, ফল ধরেনি। ডাক্তার তার মুখে সমবেদনার ছায়া ফেলতে চাইল। একটা বুঝি শব্দও করল অস্ফুটে।

'তার জন্যে আমার কোনো কষ্ট নেই।' একমুখ খুশি হয়ে উঠতে চাইল শম্পা। 'কত কাজ আমার।'

'না, না, কষ্টের কথা নয়।' চক্রবর্তী তাকাল মুগ্ধের মত। 'কিন্তু তুমি এমন সুন্দর মেয়ে, তুমি মা হবে না?'

ওধার দিয়ে আর গেল না শম্পা। বললে, 'তা হলে এটা ফাইলেরিয়া বলছেন? আর বলছেন ফাইলেরিয়ার কোনো চিকিৎসা নেই?'

'দাঁড়াও আগে রক্তটা দেখি, কিন্তু ভাবছি—' ডাক্তার হঠাৎ মুখ ফেরাল: 'তোমরা কোথায় থাকো?'

'জামডোবায়, ধানবাদের কাছে।'

'কী করে তোমার স্বামী?'

'কলিয়ারির ম্যানেজার।'

একটু বুঝি বাড়িয়ে বললে শম্পা। হোঁচট খেয়ে বলার ধরনে ডাক্তারের তাই মনে হল। কিন্তু চাকরির অবান্তর।

'স্বাস্থ্য কেমন?'

'মোটামুটি ভালো।' হাসল শম্পা। 'এমনিতে সক্ষম সমর্থ।'

এটুকুও যেন আবার বাড়াবাড়ি করল মনে হল ডাক্তারের। জিজ্ঞেস করলে, 'অসুখ-বিসুখ আছে কিছু?'

'দেখি না তো। তবে,' ঠোঁটের হাসিটি রহস্যে সূক্ষ্ম করল শম্পা: 'তবে চিত্তে কিছু দৌর্বল্য থাকা সম্ভব।'

'তা কোন পুরুষের না আছে!' ডাক্তার উদারকণ্ঠে হাসল। বললে, 'তা তোমাকে ভালোবাসে তো?'

লজ্জার আড়ম্বর করল না শম্পা। বললে, 'তা একটু-আধটু বাসে।' বলেই চঞ্চল হয়ে উঠল: 'উনিও এসেছেন।'

'তোমার সঙ্গে? এখানে?'

'এখানে মানে আপনার ক্লিনিকে আসেননি, কলকাতায় এসেছেন।'

'তাকে একবার পাঠিয়ে দিও। তাকেও দেখব।' চক্রবর্তী এগিয়ে এল দু পা: 'এখানে উঠেছ কোথায়?'

'দিদির বাড়িতে।'

'চম্পা—চম্পা তোমার দিদি না? তাকেও দেখি না কতদিন। তার তো ছেলেপুলে হয়েছে?'

'হ্যাঁ, দুটি মেয়ে একটি ছেলে। ছেলেটা ছোট। আর তার অন্নপ্রাশনেই আমরা এসেছি। সেইটেই উপলক্ষ্য।'

'কয়েকদিন থাকবে?'

'যদি বলেন, থাকব।'

'এখানে, আমার এখানে এসেছ কার সঙ্গে?'

'নেমন্তন্ন বাড়িতে এখন অনেক আত্মীয়, একজনকে ধরে নিয়ে এসেছি।'

'সম্প্রতি একটা প্রেসক্রিপশান লিখে দি।' চক্রবর্তী কাগজকলম নিয়ে বসল। 'তোমার স্বামীর নাম কী? তাকে পাঠিয়ে দিও। এক সঙ্গেই এসো না হয়। বিজ্ঞানের যুগে লুকোছাপা কোনো কাজের কথা নয়, ফ্যাকচুয়ালি অনেস্ট হওয়াই দরকার। আর দুর্নীতি? ওর আসল নাম দুর্ঘটনা। আর, তোমার ঐ পা-ফোলা? ও কিছু নয়।' পায়ের দিকে বাঁকা করে আবার চোখ ফেলল ডাক্তার: 'ও সেরে যাবে। আসল হচ্ছে—আচ্ছা, পাঠিয়ে দিও, নাম বললে না তো—'

'নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে আসব।' প্রেসক্রিপশান নিয়ে চলে গেল শম্পা।

দিদির ছোট ছেলেটাকে নিয়ে চটকাচ্ছে আর ছড়া কাটছে শম্পা:

'খোকন খোকন ডাকছাড়ি
খোকন গেছে কার বাড়ি?
ওরে খোকন বাড়ি আয়—'

'ডাক্তার কী বলল?' জিজ্ঞেস করল নিরঞ্জন।

কে কার কথা শোনে। শম্পা তেমনি উথলে-উথলে ছড়া কাটছে:

'ওরে খোকন বাড়ি আয়,
তোর ভাত বেড়ালে খায়।
ভাত হল কর কর ব্যঞ্জন হল বাসি,
খোকার লাগি মাসি রে তোর
রইল উপবাসী॥'

'শেষ লাইনটা মোটেই ওরকম নয়।' চম্পা চাইল প্রতিবাদ করতে।

ছেলেটার উপর হামড়ে পড়ে ফের ছড়া কাটতে লাগল শম্পা:

'শেষ লাইনের দেশে রে ভাই
রেল-লাইন পাতা।
পায়ে হেঁটে চলল খোকন
মাথায় ধরা ছাতা॥'

'বলি ডাক্তার কী বলল?' প্রায় ধমকে উঠল নিরঞ্জন।

শম্পা উঠল হাসলো ছেড়ে, হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'বললে, অসুখ কঠিন, চিকিৎসা নেই। রক্ত নিয়ে দেখবে।'

'তা নিয়ে [illegible] হবে।' নিরঞ্জন অসহিষ্ণুর মত বললে।

'রাত বারোটার পর নিতে হবে নাকি। আমি বলেছি এই যাতনা হবে না।'

'কেন হবে না?' চম্পা বললে, 'থেকে যা কদিন। চিকিৎসে করিয়ে যা।'

'আমি কিন্তু কাল সকালেই চলে যাব।' নিরঞ্জন বললে।

'তুমি চলে গেলে ওকে দেখবার-শোনবার কি আর লোক থাকবে?' দেবব্রত পরিহাসের সুরে বললে, 'তোমার তুমিই ওর একমাত্র রক্ষক হয়ে এসেছ?'

'না, আমিই তো থেকে যাব।' চম্পা আবার মুখর হল।

'শুধু চিকিৎসা করানো নয়, সম্পূর্ণ ভালো হওয়া পর্যন্ত।' দৃঢ় হল দেবব্রত।

শম্পা তাকাল স্বামীর দিকে।

নিরঞ্জন বললে, 'চিকিৎসার জন্যে যখন দরকার থেকে যাও কদিন।'

শম্পা দুকের উপর কেড়ে নিল খোকনকে। খোকন খলখল করে হাসতে লাগল। শম্পা ছড়া কাটতে লাগল:

'খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ি
সঙ্গে যাবে কে?
বাড়িতে আছে বুড়ো মাসি
কোমর বেঁধেছে।
সে যে বড় মানুষের ঝি—
শাশুড়ি এল বরযাত্রী
বউ বলবে কী!'

'থেকে যাও, দেখে যাও কলকাতা।' উৎসাহে ইন্ধন দিল দেবব্রত: 'পড়ে আছ তো কালিমাময় মফস্বলে, কিছুই তো জানো না, কী রকম ভোজবাজি হচ্ছে আজকাল!'

'ভোজবাজি?'

'থিয়েটারের স্টেজে ঘোড়দৌড় হচ্ছে। কী না হচ্ছে! সিংহ বেরুচ্ছে, বাঘ বেরুচ্ছে, ট্রেন বেরুচ্ছে, বন্যা বেরুচ্ছে, ভূতপ্রেত বেরুচ্ছে। সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড। বসে আছ চুপচাপ, হঠাৎ দেখবে স্টেজে যারা নাচছিল তারা তোমার পাশে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে নাচছে।'

'সত্যি?' দু মুঠোতে খোকন মাসির দু গুচ্ছ চুল ধরে টানাটানি করতেই শম্পা

আবার খোকনের উপর উদ্বেল হল। ছড়া বানাল :

> 'ভীষণ মিষ্টি, ভীষণ পাজি,
> এই তো আমার ভোজবাজি।
> সূর্যি ওঠে রোজ রোজ
> রাজবাড়িতে কেবল ভোজ॥'

'হ্যাঁ, দেখে শুনে যাও সব। কেন কালচারে পিছিয়ে থাকবে?' দেবব্রত আবার রহস্য করল :

'একা-একা থাকিস, কদিন হৈ-হল্লা বেশ লাগবে। ওকে একবার য়্যাসেম্বলির মারা-মারিটা দেখিয়ে দিও।' চম্পাও হাসিমুখ করল। হাত বাড়াল ছেলের দিকে। বললে, 'দে ওকে এখন ছাড়। তপন এবার নাইবে।'

ছাড়বার আগে আরো খানিক চটকাল শম্পা। ছড়া কাটল :

> 'আমি এবার নাইতে যাব,
> চাঁদের ডিঙি বাইতে যাব,
> আকাশ আনব কেড়ে—
> ওলো মাসি, বনগাঁ-বাসী
> দে আমারে ছেড়ে।
> ওলো মাসি শম্পা,
> তোর নেই কি অনুকম্পা?'

খোকনকে ছেড়ে দিল শম্পা। ফিরতে স্বামীর সঙ্গে নিভৃত হল। বললে, 'ডাক্তার চক্রবর্তী তোমাকে একবার যেতে বলেছে।'

'মাথা খারাপ!' থমকে উঠল নিরঞ্জন।

'সে কি, দেখা করবে না তার সঙ্গে?'

'কোন দুঃখে? আমরা কি পা ফুলেছে, না; আমার বুক কাঁপে, না হাত-পা ঠাণ্ডা হয়?'

মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রইল শম্পা।

'যার অসুখ সে চিকিৎসা করাক। আমার কী মাথা ব্যথা!'

'তুমি তো জানো—' শম্পা তবু একবার চাইল নরম করতে।

'যা জানি আমিই জানি। তোমার ডাক্তারের চেয়েও বেশি জানি।'

'তবু একবার নিশ্চিত হওয়া।'

'তুমি নিশ্চিত হও।'

একাই ফিরে গেল নিরঞ্জন।

কদিন পরে শম্পা আবার ডাক্তার চক্রবর্তীর কাছে এল।

'কেমন আছ?' এগিয়ে এল চক্রবর্তী।

'আপনিই বলুন।' নাড়ী দেখবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল শম্পা। নিজেই পা মুক্ত করে দেখাল। অকারণেই ললিত হাসি হাসল।

দেখতে বিশেষ উৎসুক নয় চক্রবর্তী। সে অন্য কিছু দেখতে চায়।

'কই তোমার স্বামী এল না তো।' হঠাৎ নিজেকে সংশোধন করল চক্রবর্তী। বাইরে কাকে দেখে উৎসাহিত হয়ে বললে, 'ঐ যে এসেছে। তা বাইরে কেন, ভেতরে আসতে বলো।'

"আমাকে বাঁচান, আমার খোকাকে বাঁচান।

'ও দেবুদা। আমার দিদির স্বামী।'

'ও!' ডাক্তার বুঝি একটু থতমত খেল।

'আর লোক নেই কেউ নিয়ে আসে।' বলবার দরকার ছিল না তবু শম্পা বললে।

'আর তোমার স্বামী—কী না জানি নাম—'

'সে পালিয়ে গেছে।'

'সমর্থ পলায়ন।' চক্রবর্তী হাসল : 'সেই থেকেই আছ নাকি একটানা?'

'না, মাঝে একবার গিয়েছিলাম জাম-ডোবায়। আবার ছুটি নিয়ে এসেছি। ছুটিটা কিছু বাড়াতে চাই। যদি একটা সার্টিফিকেট দেন।'

'ছুটিটা বাড়াবার কী দরকার!' একটু বুঝিবা কঠিন শোনাল চক্রবর্তীকে : 'এমনিতে তো বেশ ভালোই আছ মনে হচ্ছে।'

'দিদির ছেলেটা এমন নেওটা হয়েছে না, কিছুতেই পাচ্ছি না ছেড়ে থাকতে।'

'তা শিশু সঙ্গ তো ভালোই, থাকো না ওকে নিয়ে।'

'থাকতে দিচ্ছে কে? একটা সার্টিফিকেট যদি দেন আমাকে—'

পাষাণের রেখায় হাসল ডাক্তার। বললে, 'একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করতে কষ্ট কী! অলিতে-গলিতে কিনতে পাবে। তোমার দেবুদাকে বলো না।'

'আপনি আমাকে দেখছিলেন কিনা। তাই—'

'আমি এখন কলে বেরুচ্ছি।' যেন অশোভনকে এড়াচ্ছে এমনি ভাব করল ডাক্তার 'আরেক সময় না হয় এস।'

'আচ্ছা তাই, আমরাও এখন ব্যস্ত। কলকাতায় রাত-দিন সিনেমা। আমরা এখন দশটায় লাইট হাউসে যাচ্ছি।'

ডাক্তার চক্রবর্তী কি খুব দূর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন? বললেন, 'ট্র্যামে-বাসে যেও না।'

'না, ট্যাক্সী আছে।'

ট্যাক্সীতে উঠে গনগন করতে লাগল শম্পা। দেবব্রতকে লক্ষ্য করে বললে, 'আমি ওর পেশেন্ট অথচ আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিল না। ভারী ডাক্তার হয়েছে! স্পেশালিস্ট না কচু! আর কোনোদিন আসব না ওর কাছে। কাউকে বলবও না আসতে।'

এবার যে এল ডাক্তার চক্রবর্তীর কাছে সে শম্পা নয় সে চম্পা।

শম্পার পরিচয় দিয়েই সে ঢুকল। আর ঢুকেই একেবারে কান্নায় টুকরো টুকরো হয়ে গেল। 'আমাকে বাঁচান, আমার খোকাকে বাঁচান।'

'কী হয়েছে খোকার?'

'ওর ওপরে আমার বোন শম্পার চোখ পড়েছে।' আকুল কান্নার মধ্যে থেকে বললে চম্পা।

'সে আবার হয় নাকি?' চক্রবর্তী হতভম্ব হয়ে গেল।

'হয়। হয়েছে। আপনি একবার তাকে দেখবেন চলুন।'

'চোখ পড়েছে মানে, বলতে চাও, শম্পা তার অহিত চাইছে?' কপালে চোখ তুলল ডাক্তার।

'হ্যাঁ, তাই, চাইছে ওকে ওর সঙ্গে করে ধরে নিয়ে যেতে। আপনি চলুন।'

কাকুতিতে ভেঙে পড়ল চম্পা : 'ছেলেটা কী সুন্দর ছিল! শুকিয়ে দড়ি হয়ে গিয়েছে। গা থেকে জ্বর কিছুতেই নামছে না। আগে কত সুন্দর হাসত, শব্দ করত, এখন খালি কাঁদে, চেঁচায়। গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরুতে চায় না। আপনি চলুন। শম্পা এ বাড়ি থেকে না গেলে ও ভালো হবে না।'

'শম্পা কি সেই থেকেই আছে নাকি?'

'না, যায় আর আসে। আসে আর যায়।' আঁচলে চোখ মুছল চম্পা।

'ওর স্বামীকে জানাওনি?'

'জানিয়েছি।'

'কী জানিয়েছ?'

'খোকার খুব অসুখ।'

অবাক হল চক্রবর্তী। অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'ও কী লিখেছে?'

'ও লিখেছে যখন অসুখ তখন, আপনার সুবিধে হবে শম্পা থাক খোকার কাছে। খোকাকে ছেড়ে থাকতে শম্পার খুব কষ্ট।'

'আর কিছু জানাওনি?' দাঁতে দাঁত ঘষল চক্রবর্তী। '

'তা কী আর লেখা যায়?'

'তোমার কপালে আগুন ধরিয়ে দেবে আর তুমি তা সয়ে যাবে?' ডাক্তার রি রি করে উঠল : 'নিশ্চয়ই লিখবে একশোবার লিখবে। যাকে দিয়ে তোমার ছেলের অমঙ্গল তাকে তুমি ছেড়ে দেবে কেন? তাকে তুমি বাড়ি থেকে চলে যেতে বলবে। তাড়িয়ে দেবে।'

'তা কী আর বলা যায়!'

'বা, স্বামীকে লিখবে নিয়ে যেতে।'

'কই নিরঞ্জনও উচ্চবাচ্য করে না। বলে তপনকে রোগশয্যায় রেখে দূরে থাকতে পারবে না শম্পা। কী বলব, সব সময়েই আঁকড়ে আছে ছেলেটাকে। আপনি ডাক্তার, আপনি যদি বলেন—'

'চলো, আমি যাচ্ছি। দেখছি। দেখে আসছি তোমার ছেলেকে।'

পৌঁছেই প্রথমে শম্পার খোঁজ করল চক্রবর্তী।

শম্পা নেই। খানিক আগের ট্রেনেই চলে গিয়েছে জামডোবা।

চক্রবর্তী তপনকে দেখল। অসুখ কঠিন বলে মনে হল। মনে হল দীর্ঘস্থায়ী। তবু নিরাশ হবার কিছু নেই। দেখি। চেষ্টা করি।

'কী, কই, ডাক্তার লাগল?' নিরঞ্জন আদর করল শম্পাকে : 'বলেছি না ডাক্তারবা কিছু বোঝে না। ওদের খালি সন্দেহ আর অনুমান। খালি অসুস্থ দৃষ্টি। আর,' একটু বুঝিবা থামল নিরঞ্জন : 'আর কুকথা বলা যাদের অভ্যেস তারা শুধু মুখেই বলে না, খাঁকে-খাঁকে বেনামী চিঠি পাঠায়। তাতে আমাদের কী!'

'আমাদের কী!' প্রতিধ্বনি করল শম্পা। 'কিন্তু জানো দিদিটা ভারি হিংসুক। ছোট চোখ! আমার কপাল ভাঙবার জন্যে তার কী চেষ্টা!'

হেসে হল শম্পার।

কিন্তু রইল না। পাঁচদিনের দিন, কী হল কে জানে, নীল হয়ে গেল। ছোট নিশ্বাসটুকু নিতে হাওয়ার বিন্দুটিকে খুঁজে পেল না।

খবর শুনে চম্পা বললে, 'পরের ধন যে কাড়তে চায় তার থাকে না। পাপের ধন সাপে কাটে।'

'কেন ভেঙে পড়ছ?' শম্পাকে সান্ত্বনা দেয় নিরঞ্জন : 'তোমার এই দুঃখের মধ্যেও শান্তি তো আছে।'

'আছে।' বিশাল চোখ দুটি মেলে ধরে শম্পা।

'তোমার কপাল বেঁচে আছে। ভালো আছে। আর—'

গভীরে চোখ বুজল শম্পা। বললে, 'আর, আর আমরা প্রমাণিত।'

দেবি — দেবি — দেবি — দেবি—দেবি—'

চেঁচিয়ে ডেকে চলেছে লোকটা। সকাল থেকে গল্পটা নিয়ে বসেছি কিন্তু চার লাইনের বেশি এগুতে পারিনি। তারস্বরের তরোয়ালে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে বারবার।

'না দেবে না।'

হঠাৎ পেছনে এই হুঙ্কার শুনে চমকে ফিরে তাকালাম।

'ওমা! নকুড় মামা যে! কতক্ষণ এসেছ?'

'এই আসছি।' ঘোষণা করলেন নকুড় মামাঃ 'থাকব এখানে দিনকতক। তোর মামীর জ্বালায় ত বাড়িতে তিষ্ঠোবার যো নেই। দিনরাত্তির কাঁই মাই কাঁই মাই কাঁই মাই! পাগল হবার যোগাড়। পালিয়ে এলাম তাই। বাড়ির চেয়ে বাসায় ঢের শান্তি!'

'শান্তি না ছাই! ভুল করেছো' নকুড় মামা, তপ্ত খোলার থেকে গনগনে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছো!'

মনে মনেই বললাম। খোলাখুলি বলার সাহস হল না।

'দেবি—দেবি—দেবি—!' আবার সুরু হল লোকটার। 'না দেবে না' শুনে হতভম্ব হয়ে চুপ করে ছিল একটুক্ষণ। কী দেবে না, কে দেবে না, কেন দেবে না—ইত্যাকার প্রশ্নও ইতিমধ্যে তার মনে উদিত হয়েছিল নিশ্চয়। তার কোনো বিশেষ সমাধান করতে না পেরে সদুত্তরের আশায় আবার সে আরম্ভ করেছে।

'নেই—বাড়ি নেই।' চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন নকুড় মামা। একেবারে চুপ। আর লোকটার সাড়া নেই। তারপর। চলে গেল বোধহয়।

'দেবিবাবু টের পেলে ভারী রাগ করবেন কিন্তু।'

'ভালোই করলাম ত। ভক্ত আকুল স্বরে ডাকছিল, দেবী মন্দিরে নেই। দেবীদর্শন হবে না এখন, জানিয়ে দিলাম। নিজের রাস্তা দ্যাখো, আপনালয় যাও। মন্দটা করলাম কি?'

আমি বললাম—'হুঁম্'।

'এতক্ষণ কেন থামিয়ে দিসনি ওকে?' জিগ্যেস করলেন নকুড় মামাঃ 'গান শুনতে ভালো লাগছিল বুঝি?'

'গান?'

'গান ছাড়া কি? গুঁতোর থেকেও টের পাসনি? কথায় বলে গাই-এর গুঁতো আর গাইয়ের গুঁতো। গাই-এর যেমন শিঙ থাকে তেমনি গানেরও। নইলে গান করাকে Singing বলেছে কেন ইংরেজিতে? তার মানেই ত গুঁতো মারা। গমক শুনলেই বুঝতে পারি গান কি না!'

'আর ধমক দিয়ে থামিয়ে দাও অমনি?'

'কেন দেব না? গলা ফাটিয়ে মরে যাচ্ছে লোকটা, ওর না হয় মাথা নেই, মাথায় ঘিলু নেই......'

'ঘিলু নেই কেন?'

'থাকলে অতবার ডাকে? একবার কি দুবার ডেকেই চুপ মেরে যায়, চলে যায় ফিরে। লোকটা যদি বাড়ি থাকত দু-এক ডাকেই সাড়া দিত, আর যদি বাড়িতে থেকেও সাড়া না দেয় তাহলে হাজার বার ডাকলেও দেবে না। অনর্থক ডাকা! কিন্তু এসব বুঝতে হলে মাথা লাগে। সাঙ্গীতিক লোক-দের ত মাথা থাকে না, খালি গলা।'

'মামীমার গানের ঠেলায় পালিয়ে এসেছো বুঝি?'

'এ একরকমের আত্মরতি। নিজের আওয়াজ নিজের ভালো লাগা। কস্তুরীমৃগ-সম—কস্তুরী মৃগ যেমন নিজের গন্ধে পাগল হয়ে ছুটে বেড়ায়—এরাও তেমনি নিজের শব্দে আত্মহারা হয়ে গলা ছোটায়। কানের পোকা বার করে দেয়। আমি এ নিয়ে বহুৎ গবেষণা করেছি।' নকুড়মামা তাঁর মাথার থেকে গবেষণার পোকাদের বার করে ছাড়তে থাকেন—'কিম্বা স্যাডিজম্‌ও বলতে পারিস, অপরকে পীড়ন করে সুখ পাওয়া। সভ্য সমাজে এমনি ত অপর কারো কান ধরে মলে দেয়া যায় না—যতই ইচ্ছা করুক! ভদ্রতায় বাধে। গান দিয়ে বেশ করে কষে মলে দাও। কোনো বাধা নেই।'

'কানমলা আর গানমলা এক হল?'

'না তো কি?' কিম্বা এক ধরনের হীন-মন্যতাও হতে পারে? যাদের বাল্যকাল অবদমিত হয়ে কেটেছে তারাই বড় হয়ে চেঁচামেচি গান বাজনা হাঁক ডাক ছাড়ে। বক্তৃতা করে। ঐভাবে অ্যাসার্ট করে নিজে-দের। নিজেদের জাহির করতে চায়। ভালো কথা, তোদের বাসায় কেউ গান-টান গায় না তো?'

আমাকে কিছু বলতে হল না, মামার কথাতেই যেন বাসার চাকরটা সেই মুহূর্তে গাইতে গাইতে তেতলায় উঠে গেল।

'ছোঁড়াটা এমন করে কাঁদছে কেন রে? কী হয়েছে ওর?' শুধোলেন মামা: 'কেউ মেরেছে নাকি?'

'মারবে কেন? প্রাণের আনন্দে গাইছে। চাকর বলে কি ওর ফুর্তি হতে নেই।'

'গান না বৎস, গান না।' জানালেন নকুড় মামা: 'ইহাই কান্না!'

কিন্তু কান্না ত থামতে চায় না। ফাই ফরমাজে চাকরটা একশোবার সিঁড়ি ভেঙে ওঠে নামে—কাঁদতে কাঁদতে। আবার বাসাড়েরাও তার উদ্দেশে হাঁকছাড়ে। একটানা একেক সময়।

'দেখছিস তো, সেই ব্যারাম!' নকুড় মামা আমার কানের সামনে আরেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন—'ঘিলুর অভাব। একবার ডেকে সাড়া না পেলেই বুঝতে হবে যে চাকরটা বাসায় নেই বাইরে গেছে তবুও কেমন ডেকে চলেছে দেখছিস। যেন ভুঁই ফুঁড়ে গজিয়ে উঠবে অমনি করে চেঁচালে।'

'তুমি আবার যেন 'বাড়ি নেই' বলে চেঁচিয়ে উঠো না!' মামাকে আমি আগে-ভাগেই থামাতে চাই। —'এই বাড়ির চাকর তো!'

আবার খালি চাকরটাই নয়, সিঁড়ি দিয়ে যারাই ওঠে নামে প্রাণের আনন্দে গলা ছেড়ে দেয়। কেউ গান করে, কেউ মন্ত্র পড়ে, কেউ বা অ্যাকটিং, কারো বা বক্তৃতা। নকুড় মামা ত্রাহি ত্রাহি করেন।

'এটা দেখছি একটা গাইয়ের মেস। সবার এক ব্যায়রাম। কিন্তু আমি ভাবছি এই সিঁড়িতেই এমন কেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতেই না কেন এদের গান অ্যাকটিং কান্না পাচ্ছে। আমি তাই ভাবছি?'

নকুড় মামার গবেষণার মাথা (নাকি, পোকা?) নড়তে থাকে।

'নাও। তোমার সিঁড়িয়াস গবেষণা রাখো এখন। দুখানা বিস্কুট খাও।' প্যাকেটের মোড়ক খুলতে খুলতে বলি। বিস্কুট দিয়ে মামার গবেষণার মুখ বন্ধ করি।

কিন্তু আমি ভাবিত হই। ভাবনা হয় আমার নিজের জন্যই। এইসব আওয়াজ—সুরাসুরের দ্বন্দ্ব—এমনিধারা রোজই হয়েছে কিন্তু আমি কোনো খেয়াল করিনি। কানে বাজেনি আমার। কিন্তু এখন নকুড় মামা কানে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার পর আমার নিজেরই কেমন খারাপ লাগে। এত-দিনও তো এসব কানে এসেছিল—চারধারের এই চেঁচামেচি—কিন্তু যেন কানে লাগেনি, কানের চৌকাঠ থেকেই ফিরে গেছে—কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আকুল করে আমার মর্মভেদ করতে পারেনি। কিন্তু এখন নকুড় মামার প্রসাদে আমার দিব্যকর্ণ খুলে গিয়ে মর্মভেদী খবরটা মুহুর্মুহু কর্ণগোচর হতে থাকে। এই অসহ্য শ্রাব্যের মধ্যে এর পর আমি থাকব কি করে?'

'এ এক ব্যায়রাম।' বিস্কুট গিলে নকুড় মামা আওড়ান—'এই ত ট্রামে আসছিলাম। হঠাৎ শুনি কানের কাছে একটা উঁহু কুঁহু উঁহু কুঁহু আওয়াজ! ফিরে দেখি পাশের লোকটা গুনগুন করে সুর ভাঁজছে! ইচ্ছে হল মারি কষে এইসা এক চড়। গানের চর্চা থামিয়ে দিই।'

'ভাগ্যিস মারোনি।' আমি বললাম: 'তাহলে আর রক্ষে থাকত না। ট্রামের সবাই হাঁউ মাঁউ খাঁউ করে উঠত—সে আবার তোমার রাক্ষুসে গান! চাই কি, তারা হয়ত তোমাকে ধরে চাঁদা করে পিটতেও পারত, তাহলে গান বাজনা এক সঙ্গে হয়ে সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে যেত, বুঝলে মামা?'

'যা বলেছিস! সেই ভেবেই ত সামলে গেলাম। কানে জল দিয়ে যেমন জল বার করে তেমনি গানে জল দিলে আরো আরো গান বেরোয়! চেপে গেলাম তাইত। কিন্তু ভেবে দ্যাখ ত ঝামেলা! টিকিট কেটেছি কলেজ স্ট্রীটের, কোনো জলসার নয়। শুধু শুধু রাগ-রাগিণী শুনতে যাব কেন?'

হঠাৎ রাস্তার থেকে উৎকট এক আওয়াজ—কা—গো—জ! চমকে উঠলেন নকুড়মামা।

সে যেতে না যেতেই তার পেছু পেছু আরেকজন এল তার চেয়েও বিকটতর চেঁচিয়ে—কাগোজ কাগোজ! পুরানা খবর কাগোজ!

'দ্যাখ বলছিলাম না? গাইয়েদের ব্রেনের অভাব? এই মাত্তর সামনে দিয়ে একজন গেল কাগজের জন্য হেঁকে, কাগজ পেল না, নিজের কানেই শুনলি, চোখেও দেখলি—

কোণের ঘরের ছেলেটি একটা উচ্চাঙ্গ ধরল

তবে আবার অকারণ এত চেঁচাচ্ছিস কেন? কাগজ কি এ তল্লাটে আছে? কেউ এখানে কাগজ কিনলে ত কাগজ পাবি?'

'অমন একশ জন যাবে কাগজ হেঁকে, তুমি এখনই ব্যস্ত হোয়ো না মামা।' আমি জানালাম।

গেলও। কাগজ, শিশিবোতল, শোন-পাপড়ি, শিলকোটাবো, মাট্টি—ই—, একে একে হেঁকে হেঁকে যেতে লাগল। বোম্বাই চান্দর বিছাওনেকা—তাও গেল গোটা তিনেক। আরো যে কত রকমের ফেরিওয়ালা বিচিত্র চীৎকারে ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাসের মত ধারাবাহিক ভাবে শোভাযাত্রা করে যেতে লাগল পরম্পরায়। নকুড়মামা গেলাম গেলাম করতে লাগলেন।

একটু বাদেই পাশের কালোয়ারদের কারখানাটা খুলল। ঘটাং ঘট সুরু হয়ে গেল ঘনঘটায়। লরি আসতে লাগল, যেতে লাগল, মাল নামাতে ওঠাতে থাকল—ছোট্ট গলির মধ্যে ঘোরাতে পিছু হটতে নাজেহাল হয়ে সুতীব্র হর্ন ছাড়তে লাগল গাড়িগুলো—সে এক হৈহৈকান্ড!

'এসব কিরে!' বিভ্রান্তের মতন বললেন নকুড়মামা।

'পাশেই কালোয়ারদের কারখানা কিনা!' আমি জানালাম: 'লোহালক্কড়ের ব্যাপার। সারাদিন চলবে এমনিধারা।'

'এরকম পাড়ায় আছিস কি করে তুই? পাগল হয়ে যাবি যে।' বললেন মামা—'এর চেয়ে তোর মামীর বকুনি শোনাও যে ঢের ভালো ছিল রে!'

'ছিলই ত।' সায় দিলাম আমি।

'তোর মামীর বকুনি শুনতে গেলে টাকা খসাতে হয়। এটা দাও সেটা দাও ওটা কেন। এখানে সে ভয় নেই। মেসের গেস্ট চার্জ তো তুই-ই দিয়ে দিবি, কী বলিস?'

আমি কিছু বলি না। তা তো দিয়ে দেব, কিন্তু তার আগে মোটা রকমের ধার নিয়ে নেব তোমার থেকে, সে ধার আর জীবনে শুধব না—মনে মনেই আওড়াই।

পাড়ার একটা বাচ্চা ছেলে একটানা কেঁদে যাচ্ছিল। কেঁদে কেঁদে থামলো এতক্ষণে।

'আহা, বেড়ে গাইছিল ছেলেটা। থেমে গেল এখুনি।' মুহ্যমানের মতন বললেন নকুড়মামা: 'নামজাদা গাইয়ে হবে বড় হলে। কিন্তু এত চট করে এদের থামতে দিতে নেই, থামলেই মাথায় চাঁটি মেরে আবার ফের গাইয়ে দাও—এমনিধারা রেকারিং ডেসিমেলের মতই গাঁট্টা আর গান চলতে থাক। যতক্ষণ না যাবতীয় গান শরীরের থেকে বেরিয়ে যায়। এ রোগ বাড়তে দিতে নেই, এই অল্প বয়সেই নির্মূল করা ভালো।'

মামার গানে কান না দিয়ে আমি চান করতে চলে যাই।

খেয়ে দেয়ে দুপুর বেলায় একটু শান্তি! বাসার সবাই (মামার মতে, গাইয়ে বাজিয়েরা) আপিসে গেছে, চাকরটাও ঘুমিয়েছে। কারখানাটাও বন্ধ ঘণ্টা দুয়েকের জন্য। ফেরিওলার উৎপাতও নেই এই সময়।

বেশ ঘুমঘুম আসছিল, হঠাৎ কোণের ঘরের ছেলেটি একটা উচ্চাঙ্গ ধরল। 'অ্যাঁ?

এ লোকটা আপিস যায়নি নাকি?' চমকে উঠলেন নকুড়মামা।

'এর রেলের কাজ। ডিউটি বদলায়। কখনো সকালে কখনো বিকালে কখনো রাত্তিরে কাজ পড়ে। হাওড়ার টিকিট চেকার।'

'সেরেছে তাহলে।' নকুড়মামা গুম হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর উথলে উঠলেন আপনার থেকেই। 'কোনদিক দিয়ে যাবি? এ হচ্ছে বিধাতার মুক্তধারা, বাঁধবি কত আর। এক জায়গায় বাঁধ দিবি, আরেক জায়গার থেকে ফেটে বেরুবে। গানের ভূত আছে রে ভূত আছে! একজন থামল ত আরেকজন চ্যাঁ ভ্যাঁ সুরু করল। পারবার যো নেই। আর শুধু গানেরই বা কেন, গানের, কবিতার, বক্তৃতার, ইনকিলাব জিন্দাবাদের সব কিছুরই ভূত আছে, একজনের ঘাড় থেকে নামল ত আরেক জনের ঘাড়ে ভর করল। কোত্থেকে যে নামে কেউ বলতে পারে না।'

'ভূত?' নকুড়মামার অদ্ভুতদর্শন আমায় তাক লাগায়।

'ভূতই ত। যুদ্ধ ভালোবাসা—এসবও ভূতের ব্যাপার। আমরা ইচ্ছে করেও কাউকে ভালোবাসিনে, ইচ্ছে করেও লড়াই বাধাইনে—কেমন করে যেন আপনার থেকেই হয়ে যায়।'

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুরলহরী হানা দিচ্ছিল, নকুড়মামা বিছানা ছেড়ে শুড়ে শুঁড়ে করে উঠে গেলেন। কোণের ঘর আর আমাদের ঘরের মাঝের যাতায়াতের দরজাটা সন্তর্পণে নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিয়ে এলেন।

'যাক, সুরের দাপট একটু কমবে এখন। এইসব উচ্চাঙ্গ জিনিস, বুঝলি কিনা, ঠিক মিছরির মতন, এমনি গিলতে গেলে গলায় আটকায়। এর পানা করে ছেঁকে খেতে হয়। মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলাম—এখন ওটা অনেকটা ছাঁকা হয়ে আসবে। যতটা বাঁচোয়া।'

'সুরবৎ হলেও সরবতের মত মিঠে হবে বলছো?'

নকুড়মামা কোনো উচ্চবাচ্য না করে চোখ বুজে পড়ে থাকলেন। কিন্তু কতক্ষণ আর? ক মিনিট বাদেই আবার কালোয়াতির ঝাপটা এসে কানে লাগল। 'এঃ, দরজাটা খুলে গেছে দেখছি।' বিছানা ছেড়ে উঠলেন নকুড়মামা, ভেজিয়ে দিয়ে এলেন আবার। কিছুক্ষণ সেই ছাঁকা সরবৎ, তারপরেই আবার ফের মিছরির ছুরি!

'হাওয়া নেই কিছু নেই, দরজাটা বারবার আপনার থেকেই এমন করে খুলে যাচ্ছে কেন রে? বাড়িতে ভূত আছে নাকি?' আবার উঠতে হল নকুড় মামাকে। আবার সুরধুনীর কুলুকুলু নিনাদে কুলুপ লাগিয়ে আসতে হল।

একটু বাদেই গায়ক ভদ্রলোক এসে হাজির আমাদের ঘরে—'আচ্ছা মশাই, বারবার এই মাঝের দরজাটা কে লাগিয়ে দিচ্ছে বলুন ত?

ভারি খুশী ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়ে;
গর্বিত ও! যত ওর বয়স বাড়বে উপহারটিও
বাড়তে থাকবে আর কাজে আসবে সময়মতো।

অপ্রাপ্তবয়স্কের নামেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

বাড়িতে ত খালি আমি আর আপনারা, আর ত কেউ নেই এখন। বারবার আমি খুলে দিচ্ছি আর বারবার......'

দশ বারো গজ দূরে চোখের আড়ালে দরজাটা, গানের গজগজানির ভেতর থেকে তার দু'পাটির নিঃশব্দ মিলন কি করে টের পাচ্ছে লোকটা, ভেবে আমি অবাক হই।

'আমিই বন্ধ করছি।' উঠে বসলেন নকুড়মামা—'আপনার ভালোর জন্যই করছি। মাংসের হাঁড়ির ঢাকনা খুলে রাখলে কি মাংস কখনো সেদ্ধ হয়? ভাপ বেরিয়ে যায় যে। তেমনি গানেরও। চারদিকের দরজা জানালা এয়ারটাইট করে এ'টে গান গাইতে হয়, তাই নিয়ম। তাহলে আর আপনার গানের ভাপ বাইরে বেরুতে পারবে না, সঙ্গীতে আপনি সিদ্ধি লাভ করবেন অচিরে। সেই জন্যেই......'

'সেই জন্যেই? বুঝতে পেরেছি।' ভদ্রলোক রাগে গজরান। —'গানের ভাপ বেরিয়ে যায়? গানের আপনি কি বোঝেন?'

'মাংসের বুঝি। রোস্‌ট করতে হলে অমনি করেই করতে হয়। মাংস নিজের রসে নিজেই সেদ্ধ হবে। তেমনি গায়কের বেলাও। গায়ককে আপনার সঙ্গীতরসে সেদ্ধ হতে দাও। দরজা জানালা ভালো করে এ'টে গলা কাটিয়ে সে রাগসাধনা করতে থাক......তারপর কাঁচা মাংসের থেকে যেমন পাকা রোস্‌ট বেরিয়ে আসে.....'

ভদ্রলোক আর শুনতে পারেন না দাঁড়িয়ে। নিজের ঘরে চলে যান। মামা বলেন—'দেখলি ত। ভালো করতে গেলাম ভদ্রলোকের, উনি রুষ্ট হয়ে গেলেন।'

'তাই ত হবেন।' আমি বলিঃ 'উনি ত মাংস ভাজছেন না—রাগরাগিণী ভাঁজছেন। ব্যাকরণ মতে রাগের থেকে রুষ্টই হয়, রোস্‌ট হয় না।'

'তারিণীবাবু সাধছিলেন তাঁদের সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে যেতে। তাই গেলেই ভালো করতাম'......দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন নকুড়মামা।

'মোটর গাড়িতে তাঁরা কাশ্মীর গেলেন বুঝি?'

'না। গাড়িখানা আমার হেফাজতে রেখে গেছেন।' আবার মামার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

'তবে ত ভালোই হয়েছে। তারিণীবাবুর গাড়িখানা নিয়ে চল না কেন কোথাও আমরা বেরিয়ে পড়ি। তুমি ত মোটর চালাতে জানো। চলে যাই নিঃশব্দ নির্জন কোনো গণ্ডগ্রামে। কি, সাঁওতাল পরগণায়।'

'সেই ভালো। কলকাতার এই গোলমালে আমি পাগল হয়ে যাব। তাই চল তবে। এই নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার পাই।'

সিংভূম জেলার এক অখ্যাত এলাকায় নির্জন পল্লীর নিঃশব্দ এক ডাকবাংলায় এসে উঠলাম আমরা। বিশ ফার্লংএর ভেতর কোনো জনবসতি নেই, টুঁ শব্দটি নেই কোনোখানে। দেখে শুনে নকুড়মামা ভারী খুসি।

'আঃ, বাঁচলাম।' বলে তিনি হাঁফ ছাড়লেন।

বাংলোর বেয়ারাটা মুর্গির খোঁজে বেরিয়েছে, ফিরে এলেই কুকারে রান্না চাপানো হবে। সেই চাপাবে রান্না। আমরা দুজনে বারান্দায় বসেছি দুখানা ডেক-চেয়ারে। হঠাৎ যেন কোথ্‌থেকে সুরলহরী ভেসে এসে কানে ঠেকল।

চমকে উঠে ফিরে তাকালাম। আওয়াজটা আসছে নকুড় মামার থেকেই। অ্যাঁ?

'একি নকুড়মামা? তুমি নিজেই উ'হু উ'হু লাগিয়েছ?'

চমকে উঠলেন নকুড়মামা—'ওমা! তাইত! খেয়াল ছিল না।'

'খেয়াল ছিল না বলে তুমি ভুল করে খেয়াল ধরবে—সে কি?'

'ওই যে বলেছি না? গানের ভূত আছে? গানের কবিতার ভালোবাসার। একটু ফাঁক পেলেই সে বেরিয়ে পড়বে—যেখান থেকে বেরুবার নয় সেখান থেকেও।' নকুড়মামা অপ্রতিভের মত বললেন।

'চলো, একটু বেড়িয়ে আসিগে। ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে—আজ রাত্তিরে ঘুম যা হবে একখানা। তোফা!'

কিন্তু রাত্তিরে ঘুম আর আসে না। চারিধারের নৈঃশব্দ্য ঘুমকে যেন ঠেলে রাখে। ঘণ্টা দুয়েক চোখ বুজে ছটফট করার পর পাশ ফিরে দেখি নকুড়মামা প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে।

'একি মামা? জেগে আছো যে? গোলমাল নেই গান নেই—ঘুমচ্ছ না কেন?'

'আসছে না যে ঘুম।' আপসোস করেন মামাঃ 'ঠাকুরের সেই গানটা তোর মনে নেই? সেই মেছুনীর গল্প? গোলাপ সুবাসিত দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শুয়ে তার ঘুম আসছিল না, শেষটায় নিজের মাছের চুবড়ির আঁসটে গন্ধ নাকের কাছে রেখে অকাতরে ঘুমোতে পারল।'

অত রাতে মামার সঙ্গে তত্ত্ব কথার আলোচনায় উৎসাহ হল না। চোখ বুজে পড়ে রইলাম। এমন সময় মোটরের হর্নের আওয়াজে চটকা ভেঙে গেল হঠাৎ।

'দ্যাখো এত রাত্তিরে আবার মোটরে করে কারা এল ডাকবাংলোয়। হর্ন বাজছে।'

'কেউ আসেনি। আমাদেরই গাড়ির হর্ন।' জানালেন আমার মামাঃ 'ইলেকট্রিক হর্নটা চালু করে দিয়ে এলাম গাড়ির। নইলে ত আজ ঘুম আসবে না দেখছি।' এই বলে আরামে চোখ বুজলেন নকুড়মামা।

দেখতে না দেখতে হর্নের আওয়াজকে টেক্কা মেরে নাক ডাকতে লাগল তাঁর।

অবিলম্বে আমার তরফ থেকেও সায় এল। নাক ডাকিয়ে।

ধরণীতে অন্ধকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
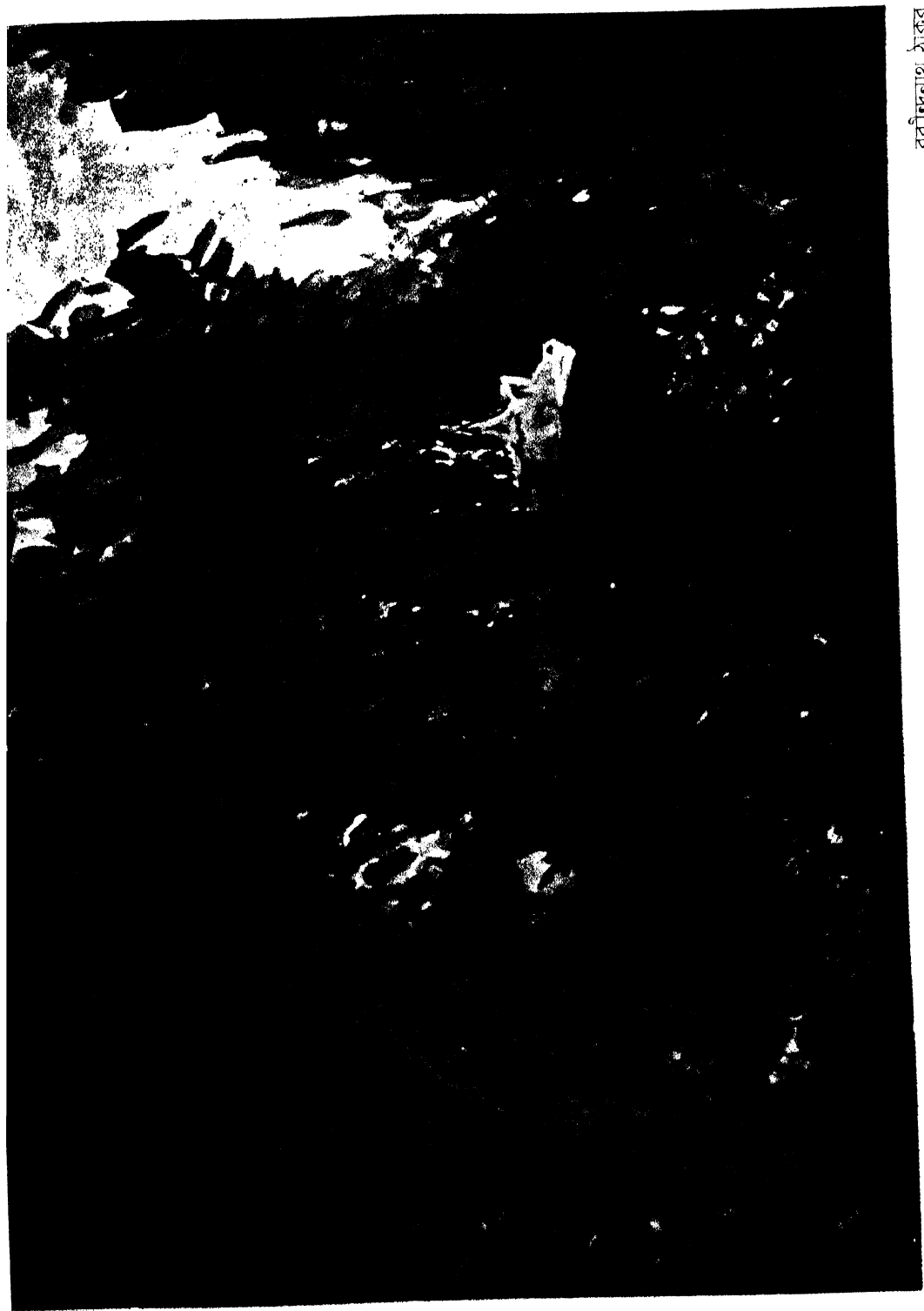
গল্পটি শুনিয়াছিলাম পুলিস ইন্স্‌পেক্টর রমণীমোহন সান্যালের মুখে। ব্যোমকেশ এবং আমি পশ্চিমের একটি বড় শহরে গিয়াছিলাম গোপনীয় সরকারী কাজে, সেখানে রমণীবাবুর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। সরকারী কাজে লাল ফিতার জট ছাড়াইতে বিলম্ব হইতেছিল, তাই আমরাও নিষ্কর্মার মত ডাকবাংলোতে বসিয়াছিলাম। রমণীবাবু প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমাদের আস্তানায় আসিতেন, গল্পসল্প হইত। তাঁহার চেহারাটাও ছিল রমণীমোহন গোছের, ভারি মিষ্ট এবং কমনীয়। কিন্তু সেটা তাঁহার ছদ্মবেশ। আসলে তিনি পুলিস বিভাগের একজন অতি চতুর এবং বিচক্ষণ কর্মচারী। তাঁহার বয়স আমাদের চেয়ে কমই ছিল, বছর চল্লিশের বেশী নয়। কিন্তু প্রকৃতিগত সমধর্মিতার জন্য তিনি আসিলে আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিত।

আমাদের কাছে তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত যে নিঃস্বার্থ সহৃদয়তা না হইতে পারে একথা অবশ্যই আমাদের মনে উদয় হইয়াছিল; উদ্দেশ্যটা যথাসময় প্রকাশ পাইবে এই আশায় প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

তারপর একদিন তিনি আমাদের গল্পটা শুনাইলেন। ঠিক গল্প নয়, একটি খুনের মামলার কয়েকটি ঘটনার পরম্পরা। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে জোড়া দিয়া একটা সুসংবদ্ধ গল্প খাড়া করা যায়।

বিবৃতি শেষ করিয়া রমণীবাবু বলিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু, কে খুন করেছে আমি জানি, কেন খুন করেছে জানি; কিন্তু তবু লোকটাকে ফাঁসি-কাঠে ঝোলাতে পারছি না। প্রমাণ নেই। একমাত্র উপায় কনফেসান, আসামীকে নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করানো। আপনার মাথায় অনেক ফন্দি-ফিকির আসে, লোকটাকে ফাঁদে ফেলবার একটা মতলব বার করতে পারেন না?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—'ভেবে দেখব।'

গল্পটি আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল; বোধ হয় ব্যোমকেশের মনেও রেখাপাত করিয়া থাকিবে। সে-রাত্রে রমণীবাবু প্রস্থান করিবার পর ব্যোমকেশ বলিল,—'রমণীবাবু যে মালমশলা দিয়ে গেলেন তা দিয়ে তুমি একটা গল্প লিখতে পার না?'

বলিলাম,—'পারি। মালমশলা ভাল। কেবল চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব জুড়ে দিতে

পারলেই গল্প হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ, লেখ। কিন্তু একটা শর্ত আছে। গল্প জমাবার অছিলায় ঘটনা বদলাতে পাবে না।'

'বদলাবার দরকার হবে না।'

গল্প লিখিতে দু'দিন লাগিল। লেখা শেষ করিয়া ব্যোমকেশকে দিলাম, সে পড়িয়া বলিল,—'ঠিকই হয়েছে মনে হচ্ছে। রমণীবাবুকে পড়িয়ে দেখা যাক, তিনি কি বলেন।'

রাত্রে রমণীবাবু আসিলে তাঁহাকে গল্প পড়িতে দিলাম। তিনি পড়িয়া উৎফুল্ল-চক্ষে আমার পানে চাহিলেন—'এই তো! ঘটনার সঙ্গে মনস্তত্ত্ব বেমালুম জোড় খেয়ে গেছে। কিন্তু—'

গল্পটি নিম্নে দিলাম—

শিবপ্রসাদ সরকার এই শহরে মদের ব্যবসা করিয়া বড়মানুষ হইয়াছিলেন। টাকার প্রতি তাঁহার যথার্থ অনুরাগ ছিল, তাই প্রকাণ্ড বাড়ি গাড়ি মোটর চড়িয়া তিনি প্রচুর টাকা জমা করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে কৃপণ বলিত, তিনি নিজেকে বলিতেন হিসাবী। এই দুই মনোভাবের মধ্যে সীমারেখা অতিশয় সূক্ষ্ম, আমরা তাহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব না।

কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে একটা ভারসাম্য আছে। শিবপ্রসাদ সরকারের একমাত্র সন্তান পুত্র যখন সাবালক হইয়া উঠিল তখন দেখা গেল তাহার চরিত্র পিতার ঠিক বিপরীত। সে অকৃপণ এবং বেহিসাবী, টাকার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই; কিন্তু টাকার বিনিময়ে যে সকল বৈধ এবং অবৈধ ভোগানন্দ পাওয়া যায় তাহার প্রতি গভীর অনুরাগ আছে। সে দু'হাতে টাকা উড়াইতে আরম্ভ করিল।

পিতা শিবপ্রসাদ দুর্বলচিত্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে মাংসপেশী [illegible] ছিল। পুত্রের চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য তিনি একটি সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাহাতে সম্যক ফল হইল না। সুনীল কিছুকাল স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া রহিল, তারপর আবার নিজ মূর্তি ধারণ করিল।

বধূর নাম রেখা। সে সুন্দরী হইলেও বুদ্ধিমতী, অন্তত তাহার সংসার-বুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। উপরন্তু সে শিক্ষিতা এবং কালধর্মে আধুনিকাও বটে। সে স্বামীর স্বৈরাচার অগ্রাহ্য করিয়া একান্তমনে বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবায় নিযুক্ত হইল। শিবপ্রসাদ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত নিজেই ব্যবসাঘটিত কাজ-কর্ম দেখিতেন; কারণ পুত্র অপদার্থ এবং কর্মচারীদের শিবপ্রসাদ বিশ্বাস করিতেন না। রেখা তাঁহার অধিকাংশ কাজের ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইল। মোটর চালাইয়া শ্বশুরকে কর্মস্থলে লইয়া যাইত, সেখানে নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিত, তারপর আবার মোটর চালাইয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিত। এইভাবে রেখা শিবপ্রসাদের পুত্রের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

তারপর, রেখা ও সুনীলের বিবাহের চার বছর পরে শিবপ্রসাদের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশ পাইল তিনি সমস্ত সম্পত্তি পুত্রবধূর নামে উইল করিয়া গিয়াছেন।

সম্পত্তি হাতে পাইয়া রেখা প্রথমেই মদের দোকানের বারো আনা অংশ বিক্রয় করিয়া দিল, চার আনা হাতে রাখিল। বড় বাড়িটা বিক্রয় করিয়া শহরের নির্জন প্রান্তে একটি সুদৃশ্য ছোট বাড়ি কিনিল, বড় মোটর বদল করিয়া একটি ছোট ফিয়েট গাড়ি লইল। স্বামীকে বলিল,—'তুমি মাসে তিনশো টাকা হাত-খরচ পাবে। যদি বাজারে ধার কর তার জন্যে আমি দায়ী হব না। খবরের কাগজে ইস্তাহার ছাপিয়ে দিয়েছি।'

তারপর তাহারা ছোট বাড়িতে উঠিয়া গিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই।

এই গেল গল্পের ভূমিকা।

সুনীলের বয়স আন্দাজ ত্রিশ বছর; অতিশয় মোটা শরীর, গোল মুখখানা প্যাঁচার মুখের মত থ্যাবড়া, মুখ দেখিয়া মনে হয় না বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু আছে। বস্তুত যাহারা বাপের পয়সা উড়াইয়া স্ফূর্তি করে তাহাদের বুদ্ধির চেয়ে প্রবৃত্তিরই জোর বেশী, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সুনীলকেও সকলে অমিতাচারী অপরিণামদর্শী নির্বোধ বলিয়া জানিত।

সুনীল কিন্তু নির্বোধ ছিল না। সদ্‌বুদ্ধি না থাক, দুষ্টবুদ্ধি তাহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। পিতার মৃত্যুর পর সে যখন দেখিল সম্পত্তি বেহাত হইয়া গিয়াছে, তখন সে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিল না, টাকার জন্য হম্বিতম্বি করিল না, কেমন যেন জবুথবু হইয়া গেল। শিবপ্রসাদ যতদিন জীবিত ছিলেন সুনীলের ধারের দেনা তিনিই শোধ করিতেন; কিন্তু রেখা খবরের কাগজে ইস্তাহার ছাপিয়া দিয়াছে, এখন বাজারে কেহ তাহাকে ধার দিবে না। দৈনিক দশ টাকায় কত স্ফূর্তি করা যায়? সুতরাং সুনীল সুবোধ বালকের ন্যায় ঘরেই দিন যাপন করিতে লাগিল। হপ্তায় একদিন কি দু'দিন বৈকালে বাহির হইত, বাকি দিনগুলি বাড়িতে রোমাঞ্চকর বিলাতী উপন্যাস পড়িয়া কাটাইত। রেখার সহিত তাহার সম্পর্কটা নিতান্তই ব্যবহারিক সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইল; বাহাত এক বাড়িতে থাকার ঘনিষ্ঠতা, অন্তরে দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব। তাহাদের শয়নের ব্যবস্থাও পৃথক ঘরে।

রেখা সকালবেলা মোটর চালাইয়া বাহির হয়; মদের ব্যবসায় সে চার-আনা অংশীদার, প্রত্যহ নিজে হিসাব পরীক্ষা করে; সেখান হইতে দুপুরবেলা ফিরিয়া আসে। অপরাহ্নে আবার বাহির হয়। এবার কিন্তু ব্যবসা নয়; মেয়েদের একটা ক্লাব আছে, সেখানে গিয়া গল্পগুজব খেলাধুলা করে, কখনও সিনেমা দেখিতে যায়; তারপর গৃহে ফিরিয়া আসে। সুনীল সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকে।

একটা বুড়ী-গোছের ঝি আছে, তাহার নাম আন্না; বাড়ির কাজ, রান্নাবান্না সব সে-ই করে, অন্য চাকর নাই। রেখা সব দিক দিয়া খরচ কমাইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার পর সুনীল নিজের ঘরে রহস্য উপন্যাস পড়িতেছিল, রাত্রি আটটার সময় রেখা ফিরিয়া আসিল। গাড়ি গ্যারাজে বন্ধ করিয়া বেশবাস পরিবর্তন করিয়া একখানা বাংলা বই হাতে লইয়া বসিল। ঘরে একটি টেবিল আছে, বসিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও কথা হইল না। টেবিল আকারের [illegible] রেখা বই খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বইখানার নাম— ব্যোমকেশের কাহিনী।

[illegible]

'রেখা—'

রেখা ভ্রূ তুলিয়া চাহিল।

সুনীল ইতস্তত করিয়া বলিল,—'তুমি কোন দিন বাড়ির সামনে একটা লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ?'

রেখা বই মুড়িয়া কিছুক্ষণ সুনীলের পানে চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল,—'না। কেন?'

সুনীল ধীরে ধীরে বলিল,—'ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছি, সন্ধ্যের পর একটা লোক বাড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে রাস্তা দিয়ে যায়, আবার খানিক পরে তাকাতে তাকাতে ফিরে যায়।'

রেখা কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—'কি রকম চেহারা লোকটার?'

সুনীল বলিল,—'গুণ্ডার মতন চেহারা। কালো মুস্কো জোয়ান, মাথায় পাগড়ী।'

অনেকক্ষণ আর কথা হইল না; তারপর রেখা মনস্থির করিয়া বলিল,—'কাল সকালে তুমি থানায় গিয়ে এত্তালা দিয়ে এস। নির্জন জায়গা, যদি সত্যিই চোর-ছ্যাঁচড় হয় পুলিসকে জানিয়ে রাখা ভাল।'

সুনীল কিছুক্ষণ থতমত হইয়া রহিল, শেষে সংকুচিত স্বরে বলিল,—'তুমি বাড়ির মালিক, তুমি পুলিসে খবর দিলেই ভাল হত না?'

রেখা বলিল,—'কিন্তু আমি তো মুস্কো জোয়ান লোকটাকে দেখিনি।—তা না হয়

দু'জনেই যাব।'

পরদিন সকালে তাহারা থানায় গেল; নিজেদের এলাকার ছোট থানায় না গিয়া একেবারে সদর থানায় উপস্থিত হইল। সেখানে বড় দারোগা রমণীবাবু বাঙালী, তাঁহার সহিত সামান্য জানাশোনা আছে।

রমণীবাবু তাহাদের খাতির করিয়া বসাইলেন। সুনীলের বাক্যালাপের ভঙ্গীটা একটু মন্থর ও এলোমেলো, তাই রেবাই ঘটনা বিবৃত করিল। এত্তেলা লিখিত হইবার পর রমণীবাবু বলিলেন,—'আপনাদের বাড়িটা একেবারে শহরের এক টেরে। যা হোক, ভয় পাবেন না। আমি ব্যবস্থা করছি, রাত্রে টহলদার পাহারালা বাড়ির ওপর নজর রাখবে।'

থানা হইতে রেবা কাজে চলিয়া গেল, সুনীল পদব্রজে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

সেদিন বৈকালে রেবা বলিল,—'এ-বেলা আমি বেরুব না, শরীরটা তেমন ভাল ঠেকছে না।'

সুনীল বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল,—'তাহলে আমি একটু ঘুরে আসি।'

রেবার মুখে অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল,—'তুমি বেরুবে! কিন্তু দেরি কোরো না বেশী, সকাল সকাল ফিরে এস।—না হয় গাড়িটা নিয়ে যাও—'

সুনীল বলিল,—'দরকার নেই, হেঁটেই যাব। মাঝে মাঝে হাঁটলে শরীর ভাল থাকে।'

উৎকণ্ঠার মধ্যেও রেবার মন একটু প্রসন্ন হইল। নিজের ছোট্ট গাড়িখানিকে সে ভালবাসে, নিজের হাতে তাহার পরিচর্যা করে; সুনীলের হাতে গাড়ি ছাড়িয়া দিতে তাহার মন সরে না।

সুনীল গায়ে একটা ধূসর রঙের শাল জড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। শীতের আরম্ভ, পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়।

সুনীল শহরের কেন্দ্রস্থিত গলিঘুঁজির মধ্যে যখন পৌঁছিল তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে। সে একটা জীর্ণ বাড়ির দরজায় টোকা মারিল; একজন মুস্কো জোয়ান লোক বাহির হইয়া আসিল। সুনীল খাটো গলায় বলিল,—'হুকুম সিং, তোমাকে দরকার আছে।'

হুকুম সিং সেলাম করিল। মুকুন্দ সিং এবং হুকুম সিং দুই ভাই শহরের নামকরা পালোয়ান ও গুণ্ডা; সুনীলের সঙ্গে তাহাদের অনেক দিনের পরিচয়। বড়মানুষের উচ্ছৃঙ্খল ছেলে এবং গুণ্ডাদের মধ্যে এমন একটি আত্মিক যোগ আছে যে, আপনা হইতেই হৃদ্যতা জমিয়া ওঠে।

সুনীল দ্রুত-হ্রস্ব কণ্ঠে হুকুম সিংকে কিছু উপদেশ দিল, তারপর তাহার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে ধূসর শাল গায়ে লোকটিকে কেহ লক্ষ্য করিল না; লক্ষ্য করিলেও সুনীল সরকার বলিয়া চিনিতে পারিত না। এই বস্তিতে সুনীলকে চিনিবে এমন লোক কটাই বা আছে!

সুনীল বাড়ি ফিরিতেই রেবা বলিল,—'এলে? এত দেরি হল যে!' সুনীল ফিরিয়া আসায় সে মনে স্বস্তি পাইয়াছে তাহা বেশ বোঝা যায়। রেবার মনে সুনীলের প্রতি তিলমাত্র স্নেহ নাই, স্বামীকে ভালবাসিতেই হইবে এরূপ সংস্কারও নাই; তাহার হৃদয় এখন সম্পূর্ণ স্বয়ত্ত ও স্বাধীন। কিন্তু মেয়েমানুষ যতই স্বাধীন হোক পুরুষের বাহুবলের ভরসা তাহারা ছাড়িতে পারে না।

সুনীল ঘড়ি দেখিয়া বলিল,—'এখনো এক ঘণ্টা হয়নি। খানিকটা ঘুরে বেরিয়েছি বৈ তো নয়।'

আর কোনও কথা হইল না। চা পান করিয়া দু'জনে বই লইয়া বসিল।

রেবা কিন্তু স্থির হইতে পারিল না। সদর দরজা বন্ধ ছিল, সে মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া জানালা দিয়া রাস্তার দিকে উঁকি মারিতে লাগিল। রাস্তাটা শহরের দিক হইতে আসিয়া রেবার বাড়ি অতিক্রম করিয়া কিছুদূর যাইবার পর মাঠ-ময়দান ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। রাস্তার শেষ দীপস্তম্ভটা বাড়ির প্রায় সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ম্রিয়মান আলো বিতরণ করিতেছে।

একবার জানালায় উঁকি মারিয়া আসিয়া রেবা সোফায় বসিল, হাতের বইখানা খুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল; তারপর যেন নিরাসক্ত কৌতূহলবশেই প্রশ্ন করিল,—'পুলিসের টহলদার রাত্রে কখন রোঁদ দিতে বেরোয়?'

সুনীল বই হইতে বোকাটে মুখ তুলিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল,—

'ওটা তুমিই রাখো, দরকার হলে তুমিই তো ব্যবহার করবে'

'তা তো জানি না। রাত্রি দশটা এগারোটা হবে বোধ হয়।'

রেবা বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিল, আর কিছু বলিল না। দুজনে নিজ নিজ পাঠে মন দিল।

রাত্রি ঠিক আটটার সময় রেবা চমকিয়া মুখ তুলিল। রাস্তা হইতে যেন একটা শব্দ আসিল। রেবা উঠিয়া গিয়া আবার জানালার পর্দা সরাইয়া উঁকি মারিল। শহরের দিক হইতে একটা লোক আসিতেছে। রাস্তার নিস্তেজ আলোয় তাহাকে অস্পষ্ট দেখা গেল; গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা, মাথায় বৃহৎ পাগড়ী মুখের উপর ছায়া ফেলিয়াছে, হাতে লম্বা লাঠি। লোকটা বাড়ির দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।

রেবা সশব্দে নিশ্বাস টানিল। সুনীল সেই দিকে ফিরিয়া দেখিল রেবার মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে; সে নীরবে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সুনীল উঠিয়া গিয়া রেবার পাশে দাঁড়াইল।

রেবা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—'বোধ হয় সেই লোকটা, তুমি যাকে দেখেছিলে।'

সুনীল ঘাড় নাড়িল। দুজনে পাশাপাশি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে আবার নাগরা জুতার আওয়াজ শোনা গেল; লোকটা ফিরিয়া আসিতেছে। রেবা নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিল।

লোকটা বাড়ির পানে চাহিতে চাহিতে শহরের দিকে ফিরিয়া গেল। তাহার পদধ্বনি মিলাইয়া যাইবার পর রেবা প্রশ্ন-বিস্ফারিত চক্ষে সুনীলের পানে চাহিল। সুনীলের মনে নিগূঢ় সন্তোষ, কিন্তু সে মুখে দ্বিধার ভাব আনিয়া বলিল,—'সেই লোকটাই মনে হচ্ছে।'

দুজনে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। রেবার মুখ শঙ্কাবিশীর্ণ হইয়া রহিল। সুনীল তাহার প্রতি একটি চোরা কটাক্ষ হানিয়া বই খুলিল।

ঝি আসিয়া প্রশ্ন করিল—খাবার দিবে কি না। অতঃপর দুজনে খাইতে গেল।

আহার করিতে করিতে সুনীল বলিল,—'বোধহয় ভয়ের কিছু নেই। পুলিস যখন দেখাশোনা করবে বলেছে।'

প্রত্যুত্তরে রেবার অন্তরের উষ্মা ঝন্ ঝন্ শব্দে বাহির হইয়া আসিল,—'পুলিস তো আর সারারাত্তি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে না, মাঝে মাঝে টহল দিয়ে যাবে। তার ফাঁকে যদি পাঁচটা ডাকাত দোর ভেঙে বাড়িতে ঢোকে, তখন কি করব!'

সুনীল মুখ হেঁট করিয়া আহার করিতে লাগিল, শেষে বলিল,—'বাড়িতে লাঠি-সোঁটা কিছু আছে?'

রেবা গভীর বিরক্তিভরে স্বামীর পানে একবার চাহিল, এই বালকোচিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না। লাঠি-সোঁটা থাকিলেও চালাইবে কে?

রাত্রে রেবা নিজ শয়নকক্ষের দ্বারে উপরে-নীচে ছিটকিনি লাগাইয়া শয়ন করিল। এত সতর্কতার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না, রমণীবাবু তাহার বাড়ি পাহারার ভাল ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। কিন্তু রেবার মনের অশান্তি দূর হইল না; বিছানায় শুইয়া সে অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল।

শহরের একান্তে বাড়িটা না কিনিলেই হইত......কিন্তু তখন কে জানিত? এখন চোর-ছ্যাঁচড়ের ভয়ে বাড়ি ছাড়িয়া গেলে মান থাকিবে না......স্বামী বিষয়বুদ্ধিহীন অপদার্থ......কি করা যায়? দুটা শক্ত-সমর্থ গোছের চাকর রাখিবে? কিন্তু চাকরের উপর ভরসা কি? যে রক্ষক সেই ভক্ষক হইয়া উঠিতে পারে। ডাকাতেরা ঘুষ খাওয়াইয়া যদি চাকরদের বশ করে, তাহারাই রাত্রে দ্বার খুলিয়া ডাকাতদের ঘরে ডাকিয়া আনিবে......তার চেয়ে বুড়ী আয়া ভাল...... শয়নঘরের লোহার সিন্দুকে দামী গহনা আছে, কিন্তু আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র নাই।...

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় রেবা উত্তেজিতভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিল।

তাহার শ্বশুরের একটা পিস্তল ছিল। ছয় মাস পূর্বে তিনি যখন মারা যান, তখন পিস্তলটা থানায় জমা দেওয়া হইয়াছিল। সেই পিস্তলটা কি ফেরৎ পাওয়া যায় না? কাল সকালেই সে থানায় গিয়া রমণীমোহন-বাবুর সঙ্গে দেখা করিবে। একটা পিস্তল বাড়িতে থাকিলে আর ভয় কি?

অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রেবা ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে রেবা সুনীলকে লইয়া আবার থানায় চলিল। পথে সুনীলের অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে রেবা বলিল,—'বাবার পিস্তলটা থানায় জমা আছে, সেটা ফেরৎ নিলে ভাল হয় না?'

যেন কথাটা সুনীলের মাথায় আসে নাই, এমনিভাবে চোখ বড় করিয়া সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—'ভাল হবে।'

থানায় রমণীবাবু প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন,—'বেশ তো, একটা দরখাস্ত করে দিন, হয়ে যাবে। কার নামে লাইসেন্স নেবেন?'

এ কথাটা রেবা চিন্তা করে নাই। সে স্ত্রীলোক, পূর্বে কখনও পিস্তল ছোঁড়ে নাই; আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে তাহার মনে একটা সন্ত্রস্ত শঙ্কার ভাব আছে। কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিতে চায় না, চট্ করিয়া বলিল,—'কেন, এঁর নামে!'

রমণীবাবু বলিলেন,—'তাই হবে। তাহলে এখনি দরখাস্ত করে দিন; আমি একবার আপনাদের বাড়িতে গিয়ে নিয়ম-রক্ষা রকমের তদারক করে আসব। কালই পিস্তল পেয়ে যাবেন।'

রেবা দরখাস্ত লিখিল, সুনীল তাহাতে সহি করিল। রমণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'সুনীলবাবু, আপনি আগে কখনো বন্দুক পিস্তল ছুঁড়েছেন?'

সুনীল আম্‌তা আম্‌তাভাবে বলিল,—'এঁ—না—হ্যাঁ—অনেক দিন আগে লুকিয়ে বাবার পিস্তল নিয়ে কয়েকবার ছুঁড়েছিলাম—তখন ছেলেমানুষ ছিলাম—এঁ—'

রমণীবাবু হাসিয়া বলিলেন,—'কাজটা বে-আইনী হয়েছিল। যার নামে লাইসেন্স সে ছাড়া আর কারুর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার হুকুম নেই। অবশ্য আতুরে নিয়মো নাস্তি, বিপদে পড়লে সকলেই সব রকম অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।'—

সেদিন বৈকালে, রমণীবাবু এন্‌কোয়ারি করিতে আসিলেন এবং চা-জলখাবার খাইয়া ঘণ্টাখানেক গল্প করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ধারণা জন্মিল সুনীল হাবাগোবা জড়-প্রকৃতির লোক, রেবা তাহাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে। হাবাগোবা লোকেরা হাতে টাকা পাইলে উচ্ছৃঙ্খল হয়, সুনীলও তাহাই হইয়াছিল, এখন শুধ্‌রাইয়া গিয়াছে। সুনীলের প্রকৃত স্বরূপ তিনি তখনও চেনেন নাই।

পরদিন সুনীল গিয়া থানা হইতে লাইসেন্স ও পিস্তল লইয়া আসিল। বন্দুকের দোকান হইতে এক বাক্স কার্তুজও কিনিয়া আনিল।

দুপুরবেলা রেবা বাড়ি ফিরিলে সুনীল পিস্তল ও কার্তুজের বাক্স তাহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল,—'এই নাও।'

রেবা সশঙ্ক চক্ষে আগ্নেয়াস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'আমি কি করব? তুমি রাখো। দরকার হলে তুমিই তো ব্যবহার করবে।'

সুনীল ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিল, সে পিস্তল ও কার্তুজ লইয়া নিজের ঘরে রাখিয়া আসিল।

ইহার দুইদিন পরে পাগড়ীধারী দুর্বৃত্তটাকে আর একবার রাস্তা দিয়া যাইতে দেখা গেল। তারপর তাহার যাতায়াত বন্ধ হইল।

এক হপ্তা নিরুপদ্রবে কাটিয়া যাইবার পর রেবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'ওরা বোধ হয় জানতে পেরেছে বাড়িতে বন্দুক আছে, তাই আশা ছেড়ে দিয়েছে।'

সুনীল বিজ্ঞের মত মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—'হুঁ।'

তারপর যত দিন কাটিতে লাগিল, রেবার মন ততই নিরুদ্বেগ হইতে লাগিল। সংসারে স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিল। রেবা সকালে কাজে বাহির হয়, বিকালে বেড়াইতে যায়। সুনীল বাড়িতে বসিয়া রহস্য-রোমাঞ্চ পড়ে; কদাচিৎ সন্ধ্যার সময় ঘণ্টাখানেকের জন্য বাড়ি হইতে বাহির হয়। তাহার বন্ধু-বান্ধব নাই; সে কখনও রেলওয়ে স্টেশনে গিয়া বইএর স্টল

হইতে বই কেনে; কখনও শহরের এঁদো-পড়া গলিতে হুকুম সিংএর সঙ্গে দেখা করে। হুকুম সিংএর সঙ্গে তাহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

এইভাবে দুই মাস কাটিয়া গেল, শীত শেষ হইয়া আসিল। রেবার মন হইতে গুণ্ডার সম্ভাবিত আক্রমণের কথা সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যাকালে রেবার দুটি বান্ধবী বাড়িতে আসিয়াছিল; রেবা তাহাদের লইয়া খাওয়াদাওয়া, হাসিগল্পে ব্যস্ত ছিল। রেবার বান্ধবীরা বাড়িতে আসিলে সুনীলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া চলে, চাকরের মর্যাদাও সে তাঁহাদের কাছে পায় না। তাই তাহারা কেহ আসিলে সুনীল নিজের ঘরে গিয়া বসিয়া থাকে কিম্বা বেড়াইতে চলিয়া যায়। আজও সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল, তারপর চুপি চুপি পিছনের দরজা দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইল। অনেক দিন হইতে সে এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সুনীল শহরে গিয়া গলির মধ্যে হুকুম সিংএর সঙ্গে দেখা করিল। দশ মিনিট ধরিয়া হুকুম সিং তাহার নির্দেশ শুনিয়া শেষে বলিল,—'খবর পেয়েছি বাড়িতে পিস্তল আছে।'

সুনীল পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইল, পিস্তল খুলিয়া দেখাইল তাহার মধ্যে টোটা নাই। বলিল,—'তুমি নির্ভয়ে বাড়িতে ঢুকতে পার।'

হুকুম সিং হাত পাতিয়া বলিল,—'আমার ইনাম?'

সুনীল দুই মাসে ছয়শত টাকা জমাইয়াছিল, তাহাই হুকুম সিংএর হাতে দিয়া বলিল,—'এই নাও। এর বেশী এখন আমার কাছে নেই। তুমি কাজ সেরে ওর গায়ের গয়নাগুলো নিও। তারপর সম্পত্তি যখন আমার হাতে আসবে তুমি দশ হাজার টাকা পাবে। আমি এখন রেলওয়ে স্টেশনে যাচ্ছি, রাত্রি আটটার পর বাড়ি ফিরব।'

হুকুম সিং বলিল,—'বহুৎ খুব।'

'যা যা বলেছি মনে থাকবে?'

'জি। আপনি বে-ফিকির থাকুন, আমি সাজসজ্জা করে এখনি বেরুচ্ছি।'

হুকুম সিং কালিঝুলি মাখিয়া ছদ্মবেশ ধারণের জন্য নিজের কোটরে প্রবেশ করিল। সুনীল স্টেশনে গেল না, দ্রুতপদে গৃহের পানে ফিরিয়া চলিল।

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছিয়া সুনীল দেখিল বান্ধবীরা এখনও আছে। সে আশ্বস্ত হইয়া রাস্তার ধারে একটা বড় গাছের পিছনে লুকাইয়া রহিল। সেখানে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল; অন্য পকেটে কার্তুজ ছিল, তাহা পিস্তলে ভরিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রেবার বান্ধবীরা চলিয়া গেল। রেবা ভিতর হইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

রাত্রি সাড়ে সাতটা। রেবা আন্নাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল,—'বাবু কোথায় রে?'

আন্না বলিল,—'বাবু বেরিয়েছে। সদর দিয়ে তোমার ওনারা এলেন, বাবু খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'ও। আচ্ছা তুই রান্না চড়াগে যা।'

রেবা উদ্বিগ্ন হইল না। চোর-ডাকাতের ভয় আর তাহার নাই। সে অন্য কথা ভাবিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। এই-ভাবে যদি জীবন চলিতে থাকে, মন্দ কি?

বাহিরে গাছের আড়ালে সুনীল ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। শহরের দিক হইতে হুকুম সিংকে আসিতে দেখা গেল। সে নিঃশব্দে আসিতেছে, নাগরা জুতার আওয়াজ নাই।

দ্বারের সামনাসামনি আসিয়া সে আগে-পিছে তাকাইল, তারপর দ্বারে মৃদু টোকা দিল।

সুনীল আসিয়াছে মনে করিয়া রেবা দ্বার খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করিয়া হুকুম সিং ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল এবং দু'হাতে রেবার গলা টিপিয়া ধরিল।

একটি অর্ধোচ্চারিত চীৎকার রেবার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, তারপর আর শব্দ নাই। আন্না রান্নাঘর হইতে চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল, সবিস্ময়ে বাহিরের ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল যমের মত কালো দুর্দান্ত একটা লোক রেবার গলা টিপিতেছে। আন্না বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া দ্বারে হুড়কা আঁটিয়া দিল।

হুকুম সিং যখন দেখিল রেবার দেহে প্রাণ নাই তখন সে তাহাকে মেঝেয় শোয়াইয়া দিল; রেবার হাতের কানের গলার গহনা-গুলো খুলিয়া লইয়া নিজের পকেটে রাখিল, তারপর সদর দরজা দিয়া বাহির হইল।

গাছের আড়ালে সুনীল এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করিতেছিল। 'কে? কে?' বলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। হুকুম সিং হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, সুনীল ছুটিয়া আসিয়া পিস্তল তুলিল, হুকুম সিংএর বুকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের সমস্ত কার্তুজ উজাড় করিয়া দিল। হুকুম সিং মুখ থুবড়াইয়া সেই-খানেই পড়িল, আর নড়িল না।

সুনীল তখন চীৎকার করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল—'কী হয়েছে! কী হয়েছে! আঁ—রেবা—!'

রান্নাঘরে আন্না সুনীলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিল। সুনীল ব্যাকুলস্বরে বলিল,—'আন্না, এ কী হল! রেবা মরে গেছে! গুণ্ডাটা রেবাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু আমিও গুণ্ডাকে মেরেছি!' সে লাফাইয়া উঠিল—'পুলিস! আমি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছি।' বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

যথাসময়ে স্থানীয় থানা হইতে পুলিস আসিল। আমরা যাহা যাহা দেখিয়াছিল পুলিসকে বলিল।

খবর পাইয়া রমণীবাবু আসিলেন। সুনীল হাবলার মত তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল,—'আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, ফিরে এসে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুতেই একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। ছুটে এসে দেখি ওই লোকটা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। আমার মাথা গোলমাল হয়ে গেল। আমি পিস্তল দিয়ে ওকে মেরেছি। তারপর ঘরে ঢুকে দেখি—' তাহার ব্যায়ত চক্ষু রেবার মৃতদেহের দিকে ফিরিল; সে দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

রমণীবাবু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন,—'আপনি পিস্তল নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন?'

সুনীল মুখ খুলিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—'হ্যাঁ। আমার নামে পিস্তল, আমি সর্বদা পিস্তল আমার কাছে রাখি।'

রমণীবাবু বলিলেন,—"পিস্তল দিন। ওটা আমি বাজেয়াপ্ত করলাম।'

সুনীল বিনা আপত্তিতে পিস্তল রমণীবাবুর হাতে সমর্পণ করিল। পিস্তলে আর তাহার প্রয়োজন ছিল না।

*

ব্যোমকেশ বলিল,—'সুনীল সরকার বোকা বটে, কিন্তু বুদ্ধি আছে।'

রমণীবাবু করুণ হাসিয়া বলিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু, আমার ধারণা ছিল আমি বুদ্ধিমান, কিন্তু সুনীল সরকার আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। তার মতলব কিছু বুঝতে পারিনি। হুকুম সিংকে খুন করার অপরাধে তাকে যে ধরব সে উপায় নেই। স্পষ্টতই হুকুম সিং তার বাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রীকে খুন করে গায়ের গয়না কেড়ে নিয়েছিল, সুতরাং তাকে খুন করবার অধিকার সুনীলের ছিল। সে এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছে; পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেছে এবং নিজের দুষ্কৃতির একমাত্র সাক্ষীকে সরিয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে-ই এখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কারণ সে-ই নিকটতম আত্মীয়। রেবার উইল ছিল না, সুনীল আদালতের হুকুম নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসেছে।

'হুঁ' বলিয়া ব্যোমকেশ চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

রমণীবাবু বলিলেন—'একটা রাস্তা বার করুন, ব্যোমকেশবাবু। যখন ভাবি একজন অতিবড় শয়তান আইনকে কলা দেখিয়ে চিরজীবন মজা লুটবে তখন অসহ্য মনে হয়।'

ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া বলিল,—'রেবা অজিতের লেখা বইগুলো পড়তে ভালবাসতো?'

রমণীবাবু বলিলেন,—'হ্যাঁ, ব্যোমকেশবাবু। ওদের বাড়ি আমি আগা-পাস্তলা সার্চ করেছিলাম; আমার কাজে লাগে এমন তথ্য কিছু পাইনি, কিন্তু দেখলাম অজিতবাবুর লেখা আপনার কীর্তিকাহিনী সবগুলিই আছে, সবগুলিতে রেবার নাম লেখা। তা থেকে মনে হয় রেবা আপনার গল্প পড়তে ভালবাসতো।'

ব্যোমকেশ আবার চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িল। আমরা সিগারেট ধরাইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম; দেখা যাক ব্যোমকেশের মস্তিষ্ক-রূপ গন্ধমাদন হইতে কোন্ বিশল্যকরণী দাবাই বাহির হয়।

দশ মিনিট পরে ব্যোমকেশ নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। আমরা সাগ্রহে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

সে বলিল,—'রমণীবাবু, রেবার হাতের লেখা জোগাড় করতে পারেন?'

'হাতের লেখা!' রমণীবাবু ভ্রূ তুলিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ধরুন, তার হিসেবের খাতা, কিম্বা চিঠির ছেঁড়া টুকরো। যাতে বাংলা লেখার ছাঁদটা পাওয়া যায়।'

রমণীবাবু গালে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন,—'চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু মতলবটা কি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মতলবটা এই।—রেবা আমার রহস্য-কাহিনী পড়তে ভালবাসতো। সুতরাং অটোগ্রাফের জন্যে আমাকে চিঠি লেখা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। মেয়েদের যে ও দুর্বলতা আছে তার পরিচয় আমরা হামেশাই পেয়ে থাকি। মনে করুন ছ'মাস আগে রেবা আমাকে চিঠি লিখেছিল; আমার অটোগ্রাফ চেয়েছিল, তারপর আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তার স্বামী তাকে খুন করবার ফন্দি আঁটছে; আমি যদি তার অপঘাত মৃত্যুর খবর পাই তাহলে যেন তদন্ত করি।'

রমণীবাবু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'বুঝেছি। জাল চিঠি তৈরি করবেন, তারপর সেই চিঠি সুনীলকে দেখিয়ে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করব। সুনীল যদি ভয় পেয়ে সত্যি কথা বলে ফেলে তবেই তাকে ধরা যেতে পারে।'

রমণীবাবু বলিলেন,—'আমি রেবার হাতের লেখার নমুনা জোগাড় করব। আর কিছু?'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'রেবার নাম-ছাপা চিঠির কাগজ ছিল কি?

'ছিল। তাও পাবেন। আর কিছু?'

'আর—একটা টেপ্ রেকর্ডিং মেশিন। যদি সুনীল কন্‌ফেস্ করে, তার পাকাপাকি রেকর্ড থাকা ভাল।'

'বেশ। কাল সকালেই আমি আবার আসব।' বলিয়া রমণীবাবু বিশেষ উত্তেজিত ভাবে বিদায় লইলেন।

পরদিন সকালে আমরা সবে মাত্র শয্যাত্যাগ করিয়াছি, রমণীবাবু আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার হাতে একটি চামড়ার স্যাচেল্। হাসিয়া বলিলেন,—'জোগাড় করেছি।'
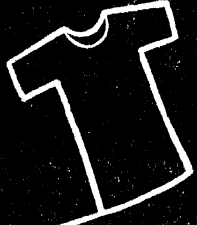
ব্যোমকেশ তাঁহাকে সিগারেট দিয়া বলিল,—'কি কি জোগাড় করলেন?'

রমণীবাবু স্যাচেল খুলিয়া সন্তর্পণে একটি কাগজের টুকরা বাহির করিয়া আমাদের সামনে ধরিলেন, বলিলেন,—'এই নিন রেবার হাতের লেখা।'

চিঠির কাগজের ছিন্নাংশ, তাহাতে বাংলায় কয়েক ছত্র লেখা আছে—'......স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যদি কর্তব্য না থাকে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য থাকবে কেন? আমরা আধুনিক যুগের মানুষ, সেকেলে সংস্কার আঁকড়ে থাকার মানে হয় না......'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'এই রেবার

হাতের লেখা। দস্তখৎ নেই দেখছি। কোথায় পেলেন?'

রমণীবাবু স্যাচেল হইতে এক তা শাদা চিঠির কাগজ লইয়া বলিলেন,—'আর এই নিন রেবার নাম-ছাপা শাদা চিঠির কাগজ। কাল রাত্রে এখান থেকে বেরিয়ে সটান সুনীলের বাড়িতে গিয়েছিলাম; তাকে সোজাসুজি বললাম, তোমার বাড়ি আর একবার খুঁজে দেখব। সে আপত্তি করল না। —কেমন, যা জোগাড় করেছি তাতে চলবে তো?'

ব্যোমকেশ ছেঁড়া চিঠির টুকরা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিল,—'চলবে। রেবার হাতের লেখা নকল করা শক্ত হবে না। যারা রবীন্দ্রীয় ছাঁদের নকল করে তাদের লেখা নকল করা সহজ। —টেপ্ রেকর্ডার পেয়েছেন?'

রমণীবাবু বলিলেন,—'পেয়েছি। যখন বলবেন তখনই এনে হাজির করব।—তাহলে শুভকর্মের দিন স্থির করে করছেন?'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল,—'আজই হোক না, শুভস্য শীঘ্রম্। আমি সুনীলকে একটা চিঠি দিচ্ছি, সেটা আপনি কারুর হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।'

একটা সাধারণ প্যাডের কাগজে ব্যোমকেশ চিঠি লিখিল—

শ্রীসুনীল সরকার বরাবরেষু—

আপনার স্ত্রীর সহিত পত্রযোগে আমার পরিচয় হইয়াছিল; তিনি সৎ-সংবৃত্ত কাহিনী পড়িতে ভালবাসিতেন। শুনিলাম তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

আমি কয়েকদিন যাবৎ এখানে আসিয়া ডাকবাংলোতে আছি। আপনি যদি আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় ডাকবাংলোতে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন, আপনার স্ত্রী আমাকে যে শেষ চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা আপনাকে দেখাইতে পারি। চিঠিখানি আপনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

নিবেদন ইতি—ব্যোমকেশ বক্সী।

চিঠি খামে ভরিয়া ব্যোমকেশ রমণীবাবুর হাতে দিল। তিনি বলিলেন,—'আচ্ছা এখন উঠি। চিঠিখানি এমনভাবে পাঠাব যাতে সুনীল বুঝতে না পারে যে, পুলিসের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে।—দুপুরবেলা টেপ্ রেকর্ডার নিয়ে আসছি।'

তিনি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ রেবার চিঠি লইয়া বসিল; নানাভাবে তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে লাগিল; আলোর সামনে তুলিয়া ধরিয়া কাগজ দেখিল, ছিন্ন অংশের কিনারা পর্যবেক্ষণ করিল। তারপর সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

বলিলাম,—'কি দেখলে?'

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল,—'চিঠিখানা আস্ত ছিল, সম্প্রতি ছেঁড়া হয়েছে। চিঠির ল্যাজা-মুড়ো কোথায় গেল তাই ভাবছি।'

আমিও ভাবিলাম। তারপর বলিলাম,—'রেবা হয়তো নিজের কোন বান্ধবীকে চিঠিখানা লিখেছিল, রমণীবাবু তার কাছ থেকে আদায় করেছেন। বান্ধবী হয়তো নিজের নাম গোপন রাখতে চায়—'

হতে পারে, অসম্ভব নয়। 'রেবার বান্ধবী হয়তো রমণীবাবুকে শর্ত করিয়ে নিয়েছে যে, তার নাম প্রকাশ পাবে না। তাই রমণীবাবু আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন—যাক, এবার জালিয়াতির হাতে-খড়ি হোক। অজিত, কাগজ-কলম দাও'

অতঃপর দু'ঘণ্টা ধরিয়া ব্যোমকেশ রেবার হাতের লেখা মক্স করিল। শেষে আসল ও নকল আমাকে দিয়া বলিল,—'দেখ দেখি কেমন হয়েছে। অবশ্য নাম-দস্তখৎটা আন্দাজে করতে হল, একটা নমুনা পেলে ভাল হত। কিন্তু এতেই চলবে বোধ হয়।'

রেবার চিঠি ও ব্যোমকেশের মক্সো পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলাম, লেখার ছাঁদে তফাৎ নাই; সাধারণ লোকের কাছে ব্যোমকেশের লেখা স্বচ্ছন্দে রেবার লেখা বলিয়া চালানো যায়। বলিলাম,—'চলবে।'

ব্যোমকেশ তখন সযত্নে চিঠি লিখিতে বসিল। রেবার নাম-ছাপা কাগজে ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া লিখিল। চিঠি এইরূপ—

মাননীয়েষু,

ব্যোমকেশবাবু, আপনার চিঠি আর অটোগ্রাফ পেয়ে কত আনন্দ হয়েছে বলতে পারি না। আমার মতন গুণগ্রাহী পাঠক আপনার অনেক আছে, নিশ্চয় আপনাকে অটোগ্রাফের জন্যে বিরক্ত করে। তবু আপনি যে আমাকে দু'ছত্র চিঠিও লিখেছেন সেজন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার অটোগ্রাফ আমি সযত্নে আমার খাতায় গেঁথে রাখলুম।

আপনার সহৃদয়তার সাহস পেয়ে আমি আমার নিজের কথা কিছু লিখছি।—

আমার স্বামী বিষয়-বুদ্ধিহীন এবং মন্দ চরিত্রের লোক, তাই আমার শ্বশুর মৃত্যুকালে তাঁর বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আমার নামে উইল করে গিয়েছেন। সম্পত্তি প্রচুর, এবং আমি তাতে আমার স্বামীকে হাত দিতে দিই না। আমার সন্দেহ হয় আমার স্বামী আমাকে খুন করবার মতলব আঁটছেন; বোধ হয় গুণ্ডা লাগিয়েছেন। কি হবে জানি না। কিন্তু আপনি যদি হঠাৎ আমার অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ পান তাহলে দয়া করে একটু খোঁজখবর নেবেন। আপনি সত্যান্বেষী, অসহায়া নারীর মৃত্যুতে কখনই চুপ করে থাকতে পারবেন না। আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি—

বিনীতা

রেবা সরকার।

চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া ব্যোমকেশ একটি পুরানো খামের মধ্যে ভরিয়া রাখিল।

বেলা তিনটার সময় রমণীবাবু আসিলেন, সঙ্গে একজন ছোকরা পুলিস। সে রেডিও মিস্ত্রী; তাহার হাতে টেপ্-রেকর্ডারের বাক্স এবং মাইক ইত্যাদি যন্ত্রপাতি।

রমণীবাবু ব্যোমকেশের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মিস্ত্রীকে বলিলেন,—'বীরেন, তুমি তাহলে লেগে যাও।'

'আজ্ঞে স্যর, বলিয়া বীরেন লাগিয়া গেল। বসিবার ঘরে টেবিলের মাথায় যে ঝোলানো বৈদ্যুতিক আলোটা ছিল তাহার তারে মাইক্ লাগানো হইল, টেপ্‌রেকর্ডার যন্ত্রটা বসানো হইল ব্যোমকেশের শয়ন ঘরে। রেকর্ডার চালু হইলে একটু শব্দ হয়, যন্ত্রটা অন্য ঘরে থাকিলে যন্ত্রের শব্দ বসিবার ঘরে শোনা যাইবে না।

সব ঠিকঠাক হইলে বীরেন পাশের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল। আমরা বসিবার ঘরে টেবিলের পাশে বসিয়া সহজ গলায় কথাবার্তা বলিলাম; তারপর পাশের ঘরে গেলাম। বীরেন যন্ত্রের ফিতা উল্টা দিকে ঘুরাইয়া আবার চালু করিল, তখন আমরা নিজেদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। বেশ স্পষ্ট আওয়াজ, কোন্‌টা কাহার গলা চিনিতে কষ্ট হয় না।

ব্যোমকেশ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—'চলবে। —চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

রমণীবাবু বলিলেন,—'দিয়েছি। আসবে নিশ্চয়। যার মনে পাপ আছে, ও চিঠি পাবার পর তাকে আসতেই হবে। আপনি তাকে ব্ল্যাকমেল করতে চান কিনা সেটা সে জানতে চাইবে। আচ্ছা, আমরা এখন যাই,
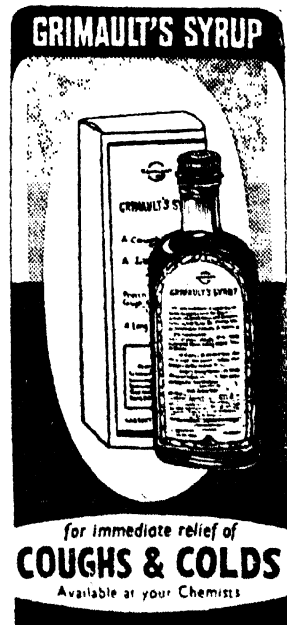
আবার সন্ধ্যের পর আসব।'—

ঠিক ছ'টার সময় বীরেনকে লইয়া রমণীবাবু আসিলেন; পুলিসের গাড়ি তাঁহাদের নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

রমণীবাবু বলিলেন,—'একটু আগেই এলাম। কি জানি সুনীল যদি সাতটার আগে এসে উপস্থিত হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ করেছেন। প্রথমে আপনারা পাশের ঘরে থাকবেন, যাতে সুনীল জানতে না পারে যে, পুলিসের সঙ্গে আমার যোগ আছে। আমি আর অজিত বসবার ঘরে থাকব; সুনীল আসার পর আপনি তাক্ বুঝে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।'

'সে ভাল কথা।' রমণীবাবু বীরেনকে লইয়া পাশের ঘরে গেলেন এবং দরজা ভেজাইয়া দিলেন। আমরা দুজনে আসর সাজাইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ক্রমে অন্ধকার হইল। আমি আলো জ্বালিয়া দিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ সকাল বেলার সংবাদপত্রটা তুলিয়া লইয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। আমি সিগারেট ধরাইলাম। কান দু'টা অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া রহিল।

সাতটা বাজিবার কয়েক মিনিট আগেই ডাকবাংলোর সদরে একটি মোটর আসিয়া থামার শব্দ শোনা গেল; আমরা দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। মিনিট দুই-তিন পরে সুনীল সরকার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রমণীবাবু যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহার সহিত বিশেষ গরমিল নাই; উপরন্তু লক্ষ্য করিলাম, তাহার বিরল ওষ্ঠাধরের ফাঁকে দাঁতগুলো কুমীরের দাঁতের মত হিংস্র। ভোঁতা মুখে ধারালো দাঁত। সব মিলাইয়া চেহারাটি নয়নরঞ্জন নয়। তার উপর দুশ্চরিত্র। পতিভক্তিতে রেবা হয়তো সীতা-সাবিত্রীর সমতুল্য ছিল না, কিন্তু সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। সুনীল সরকার স্পষ্টতই রাম কিম্বা সত্যবানের সমকক্ষ নয়।

সুনীল বোকার মত কিছুক্ষণ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু—'

ব্যোমকেশ খবরের কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল, ঘাড় ফিরাইয়া বলিল,—'সুনীলবাবু? আসুন।'

ন্যালা-ক্যাবলার মত ফ্যালফেলে মুখের ভাব লইয়া সুনীল টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; কে বলিবে তাহার ঘটে গোবর ছাড়া আর কিছু আছে! ব্যোমকেশ শুষ্ক কঠিন দৃষ্টিতে তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'আপনার অভিনয় ভালই হচ্ছে, কিন্তু যতটা অভিনয় করছেন ততটা নির্বোধ আপনি নন। —বসুন।'

সুনীল থপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল, সুবর্তুল চক্ষে ব্যোমকেশকে পরিদর্শন করিয়া স্খলিত স্বরে বলিল,—'কী —কি বলছেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিছু না। আপনি যখন বোকামির অভিনয় করবেনই তখন ও আলোচনায় লাভ নেই। —সুনীলবাবু পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্যে আপনি দু'টো মানুষকে খুন করেছেন; এক, আপনার স্ত্রী; দুই, হুকুম সিং। এখানে এসে আমি সব খবর নিয়েছি। আপনি হুকুম সিংকে দিয়ে স্ত্রীকে খুন করিয়েছিলেন, তারপর নিজের হাতে হুকুম সিংকে মেরেছিলেন। হুকুম সিং ছিল আপনার ষড়যন্ত্রের অংশীদার, তাই তাকে সরানো দরকার ছিল; সে বেঁচে থাকলে সারাজীবন ধরে আপনাকে দোহন করত। আপনি এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছেন।'

সুনীল হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, হাউমাউ করিয়া উঠিল,—'এ কি বলছেন আপনি! রেবাকে আমি মেরেছি! এ কি বলছেন! একটা গুন্ডা—যার নাম হুকুম সিং—সে আমার স্ত্রীকে গলা টিপে মেরেছিল। আয়া দেখেছে—আয়া নিজের চোখে দেখেছে হুকুম সিং রেবাকে গলা টিপে মারছে—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হুকুম সিং ভাড়াটে গুন্ডা, তাকে আপনি টাকা খাইয়েছিলেন।'

'না না, এ সব মিথ্যে কথা। রেবাকে আমি খুন করাইনি; সে আমার স্ত্রী, আমি তাকে ভালবাসতাম—'

'আপনি রেবাকে কি রকম ভালবাসতেন, তার প্রমাণ আমার পকেটে আছে'—বলিয়া ব্যোমকেশ নিজের বুক-পকেটে আঙুলের টোকা মারিল।

'কী? রেবার চিঠি? দেখি কী চিঠি রেবা আপনাকে লিখেছিল!'

ব্যোমকেশ চিঠি বাহির করিয়া সুনীলের হাতে দিতে দিতে বলিল,—'চিঠি ছিঁড়বেন না। ওর ফটো-স্ট্যাট্ নকল আছে।'

সুনীল তাহার সতর্ক-বাণী শুনিতে পাইল না, চিঠি খুলিয়া দু'হাতে ধরিয়া একাগ্রচক্ষে পড়িতে লাগিল।

এই সময় নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া রমণীবাবু ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুজনের দৃষ্টি-বিনিময় হইল; ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া সুনীল যখন চোখ তুলিল তখন প্রথমেই তাহার দৃষ্টি পড়িল রমণীবাবুর উপর। পলকের মধ্যে তাহার মুখ হইতে নির্বুদ্ধিতার মুখোস খসিয়া পড়িল; ভোঁতা মুখে ধারালো দাঁত নিষ্ক্রান্ত করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—'ও—এই ব্যাপার! পুলিসের ষড়যন্ত্র! আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা!—ব্যোমকেশবাবু, রেবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে জানেন? ঐ রমণী দারোগা!' বলিয়া রমণীবাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

আমরা সুনীলের দিক হইতে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া বলিল,—'রমণীবাবু দায়ী! তার মানে?'

সুনীল বলিল,—'মানে বুঝলেন না? রমণী দারোগা রেবার প্রাণের বন্ধু ছিল, যাকে বলে বঁধু। তাই তো আমার ওপর রমণী দারোগার এত আক্রোশ!'

ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। আমি রমণীবাবুর মুখের পানে তাকাইলাম। তিনি একদৃষ্টে সুনীলের পানে চাহিয়া আছেন; মনে হয় তাঁহার সমস্ত দেহ তপ্ত লোহার মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভয় হইল এখনি বুঝি একটা অগ্নিকাণ্ড হইয়া যাইবে।

ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে বলিল,—'তাহলে এই কারণেই আপনি স্ত্রীকে খুন করিয়েছেন?'

সুনীল বলিল,—'আমি খুন করাইনি। এই জাল চিঠি দিয়ে আমাকে ধরবেন ভেবেছিলেন!' সুনীল চিঠিখানা মুঠির মধ্যে গোলা পাকাইয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল—'সুনীল সরকারকে ধরা অত সহজ নয়। চললাম। যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে গ্রেপ্তার করুন, তারপর আমি দেখে নেব।'

আমরা নির্বাক বসিয়া রহিলাম, সুনীল ময়াল সাপের মত সর্পিল গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই কয়েক মুহূর্তে সুনীলের চরিত্র যেন চোখের সামনে মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইল। সাপের মত খল কপট নৃশংস, হঠাৎ ফণা তুলিয়া ছোবল মারে, আবার গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। সাংঘাতিক মানুষ।

রমণীবাবু একটা অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ কতকটা নিজ মনেই বলিল,—'ধরা গেল না।'

সহসা বাহির হইতে একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ আসিল। সকলে চমকিয়া উঠিলাম। সর্বাগ্রে ব্যোমকেশ উঠিয়া দ্বারের পানে চলিল, আমরা তাহার পিছন পিছন চলিলাম।

ডাকবাংলোর সামনে সুনীলের মোটর

'রেবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে জানেন?'

দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার সামনের চাকার পাশে মাটির উপর যে মূর্তিটা পড়িয়া আছে তাহা সুনীলের। তাহার পিঠের উপর হইতে একটি ছুরির মুঠ উঁচু হইয়া আছে।

মৃত্যুযন্ত্রণায় সুনীল কাৎ হইবার চেষ্টা করিল; আমি ও ব্যোমকেশ তাহাকে সাহায্য করিলাম বটে, কিন্তু অন্তিমকালে আমাদের সাহায্য কোনও কাজে আসিল না। সুনীল একবার চোখ মেলিল; আমাদের চিনিতে পারিল কিনা বলা যায় না, কেবল অস্ফুট স্বরে বলিল,—'মুকুন্দ সিং—'

তারপর তাহার হৃৎস্পন্দন থামিয়া গেল।

পথের সামনে ও পিছন দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; পথ জনশূন্য। আমার বিবশ মস্তিষ্কে একটা প্রশ্ন ঘুরিতে লাগিল—মুকুন্দ সিং কে? নামটা চেনা-চেনা। তারপর মনে পড়িয়া গেল, হুকুম সিংএর ভাইএর নাম মুকুন্দ সিং। মুকুন্দ সিং ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছে।

লাস চালান দেওয়া এবং আইনঘটিত অন্যান্য কর্তব্য শেষ করিতে সাড়ে ন'টা বাজিয়া গেল। আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। রমণীবাবুও ক্লান্তমুখে আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসিলেন। বীরেন তখনও পাশের ঘরে যন্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, রমণীবাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—'তুমি যাও, যন্তরটা থাক। আমি নিয়ে যাব।'

বীরেন চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ তিনজনে সিগারেট টানিলাম। তারপর ব্যোমকেশ বলিল,—'সুনীল আইনকে ফাঁকি দিয়েছিল বটে কিন্তু নিয়তির হাত এড়াতে পারল না। আশ্চর্য! মাঝে মাঝে গুন্ডারাও অনেক নৈতিক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে!'

রমণীবাবু বলিলেন,—'একটা সমস্যার সমাধান হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সমস্যা তৈরি হল। এখন মুকুন্দ সিংকে ধরতে হবে। আমার কাজ শেষ হল না, ব্যোমকেশবাবু।'

কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানিবার পর ব্যোমকেশ বলিল,—'সুনীলের অভিযোগ সত্যি—কেমন?'

রমণীবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ। আমার আর রেবার বাড়ি এক শহরে, এক পাড়ায়। ওকে ছেলেবেলা থেকে চিনতাম, কিন্তু ভালবাসা-বাসি ছিল না...... তারপর রেবার যখন ওই রাক্ষসটার সঙ্গে বিয়ে হল তখন এই শহরেই ওর সঙ্গে আবার দেখা হল........রেবা মন্দ ছিল না, কিন্তু কি জানি কেমন করে কী হয়ে গেল... সুনীল যে জানতে পেরেছে তা একবারও সন্দেহ হয়নি......সুনীলকে আহাম্মক ভেবে-ছিলাম, তারপর রেবা যখন মরে গেল তখন বুঝলাম সুনীল কেউটে সাপ......তাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছিলাম...শেষে আপনি এলেন, আপনার সাহায্যে শেষ চেষ্টা করলাম—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'যে চিঠির ছেঁড়া অংশটা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন সেটা রেবা আপনাকে লিখেছিল?'

রমণীবাবু বলিলেন,—'হ্যাঁ। আমাদের দেখাশোনা বেশী হত না। রেবা আমাকে চিঠি লিখত, মনের-প্রাণের কথা লিখত। অনেক চিঠি লিখেছিল।—কিন্তু রেবার কথা আর নয়, ব্যোমকেশবাবু। এখন বলুন টেপ্-রেকর্ডের কী হবে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কি আর হবে, ওটা মুছে ফেলা যাক।—আসুন।'

পাশের ঘরে গিয়া আমরা রেকর্ডার চালাইলাম। সদ্যমৃত সুনীলের জীবন্ত কণ্ঠস্বর শুনিলাম। তারপর ফিতা মুছিয়া ফেলা হইল।

বিদেশী চিত্রশালায় ভারতের অষ্টধাতুর প্রতিমা

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সম্প্রতি বহরমপুরের রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত বড় নগরের মন্দির হইতে একটি অষ্টধাতুর প্রতিমা তস্করে অপহরণ করিয়াছে। এই ঘটনায় ভারতের ধাতু নির্মিত প্রতিমা শিল্পের প্রতি রূপ রসিক-দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। ইতিপূর্বে হ্যাভেল সাহেবের ভারতীয় মূর্তি শিল্পের গুণগানে আকৃষ্ট হইয়া—বিদেশের চিত্র-শালার অধ্যক্ষ মহাশয়রা—ভারতের ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নমুনা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সংগ্রহশালার সমৃদ্ধি সাধন করিতে সুরু করিয়াছেন। ইতিমধ্যে প্রায় কয়েক সহস্র প্রতিমা বিদেশের চিত্রশালায় সসম্মানে স্থান পাইয়াছে, তাহার মধ্যে ধাতুর প্রতিমা অনেক আছে। বিদেশী সংগ্রহালয়ে ধাতু নির্মিত প্রতিমার মধ্যে দক্ষিণ দেশের প্রতিমা সংখ্যায় অধিক।

ভারতে দুই শ্রেণীর ধাতু প্রতিমা প্রসিদ্ধ হইয়াছে—দক্ষিণ ভারতে পঞ্চলোহ বা ব্রোঞ্জের মূর্তি, উত্তর ভারতে বেশীর ভাগ অষ্টধাতুর প্রতিমা। আমাদের শিল্প শাস্ত্রে ও হেমাদ্রির দানখণ্ডে প্রস্তর নির্মিত প্রতিমা অপেক্ষা ধাতু নির্মিত প্রতিমার শ্রেষ্ঠত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে :—

"শৈলযাৎ লোহজম্ শ্রেষ্ঠম্"।

ইহার কারণ বোধহয় এই যে পাথরের প্রতিমা ধাতু-প্রতিমা হইতে ক্ষণ ভঙ্গুর।

বাংলা দেশের কয়েকটি অষ্টধাতুর প্রতিমার উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই উপাদানের—(১) তাম্র, (২) সীসা, (৩) টিন, (৪) পিতল, (৫) দস্তা, (৬) লৌহ, (৭) রৌপ্য, (৮) স্বর্ণ,—এই আট-প্রকার ধাতু নিবেশিত থাকে। সাধারণতঃ পিতল নির্মিত বস্তু—শীঘ্র কলঙ্কিত হইয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য হারায়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের সমাবেশে বস্তুর ঔজ্জ্বল্য অনেকটা স্থায়ী থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ অষ্টধাতুর প্রতিমায় স্বর্ণ বা রৌপ্যের অংশ এত অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয় যে, তাহার ফলে প্রতিমার ঔজ্জ্বল্য স্থায়ী হয় না।

কয়েক বৎসর পূর্বে পুরীর সমুদ্রতীরে একদল ধীবর জালে করিয়া একটি অষ্টধাতুর বেণু গোপাল মূর্তি উদ্ধার করে। বহুদিন জলমগ্ন থাকিলেও ঐ মূর্তিটির ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস হয় নাই।

এই মূর্তিটি এবং আশুতোষ চিত্রশালার কয়েকটি মূর্তি বাংলা দেশের অষ্টধাতুর শিল্পের উত্তম নিদর্শন। রূপার ও সোনার প্রাধান্য হেতু অষ্টধাতুর মূর্তি প্রায় মলিন হয় না। কিন্তু যেখানে অষ্টধাতুর উপাদানে

অষ্টধাতুর লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি

ঐ উত্তম ধাতুর অভাব হয় সেসব মূর্তি নামে অষ্টধাতু হইলেও আসলে কেবল পিতলের নির্মিত বলিয়া শীঘ্র ঔজ্জ্বল্য হারাইয়া বিবর্ণ হইয়া যায়।

বাংলাদেশে সুবর্ণ নির্মিত প্রতিমা বড় দেখা যায় না,—পুরীধামের চক্রতীর্থের নিকট বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠিত "সোনার গৌরাঙ্গের" বিগ্রহ অনেকেই দেখিয়াছেন। সম্ভবতঃ বাংলাদেশের গৌরাঙ্গদেবের সোনার প্রতিমা পূর্বে প্রচলিত ছিল—এখন তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে নির্মিত রূপার একটি ছোট সূর্যের মূর্তি (পাল শিল্পের শৈলীতে নির্মিত) কলিকাতার যাদুঘরের চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে।

একস্থানে বহুসংখ্যক অষ্টধাতুর প্রতিমার সংগ্রহ না থাকায় এই শ্রেণীর মূর্তি শিল্পের সম্যক আলোচনা হয় নাই। ১৯১১ সালে রংপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি অষ্টধাতুর বিষ্ণু-মূর্তি অবলম্বন করিয়া ডাঃ ডি বি স্পুনার অষ্টধাতুর প্রতিমার আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া—ঐ মূর্তিগুলির উপাদান সঠিক নির্ণয় করিয়া দেন ডাঃ স্পুনার। তাঁহার পর ৺নলিনীকান্ত ভট্টশালী ব্যতীত আর কোনও পণ্ডিত এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নাই।

বাংলাদেশে ব্যাপক অনুসন্ধান করিয়া অদ্যাপি আবিষ্কৃত অষ্টধাতুর প্রতিমার ছায়াচিত্র অবলম্বন করিয়া এই শ্রেণীর শিল্পের সম্যক আলোচনা হওয়া উচিত। বাংলাদেশের প্রাপ্ত ত্রিপুরার সিতাপ-এর প্রতিমা চণ্ডীমুড়ার সূর্যবিগ্রহ, সোনারঙের চামুণ্ডা ও গৌরীর মূর্তি এবং দেউল বাড়ীর সর্বাণীর প্রতিমা অষ্টধাতুর প্রতিমার শ্রেষ্ঠ নমুনা বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর মূর্তির ব্যাপক অনুসন্ধান এখনও হয় নাই।

বিদেশের কয়েকটি চিত্রশালায় দুই একটি অষ্টধাতুর নির্মিত মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু দক্ষিণ দেশের পঞ্চলোহের মূর্তির যে রূপ সংগ্রহ গড়িয়া উঠিয়াছে অষ্টধাতুর প্রতিমার সেরূপ সংগ্রহ এখনও গড়িয়া ওঠে নাই। নিউ ইয়র্কের একটি চিত্রশালায় ৪।৫টি উৎকৃষ্ট অষ্টধাতুর প্রতিমা আছে। য়ুরোপের অন্যান্য সংগ্রহে আরও কয়েকটি ঐরূপ প্রতিমা সংগৃহীত হইয়াছে। জার্মানীর একটি সংগ্রহালয়ে একটি উৎকৃষ্ট প্রতিমার পরিচয় লইয়া আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

গরুড়ের স্কন্ধে আসীন লক্ষ্মীনারায়ণের এই ধাতু মূর্তিটি এই শ্রেণীর প্রতিমা শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। করণ্ড-মুকুটধারী কুণ্ডলে শোভিত এবং হার ও বিস্তৃত উপবীতে অলংকৃত নারায়ণের মূর্তিটি সংযম ও ভাব গাম্ভীর্যে সমৃদ্ধ অলৌকিক প্রতিমা। তিন হাতে শঙ্খ, চক্র এবং গদা ধারণ করিয়া নারায়ণ চতুর্থ হস্তে লক্ষ্মী দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। বিশেষ লক্ষণীয় নীচে অপূর্ব ভঙ্গীতে আসীন গরুড়বাহন,—ভক্তি গদগদ চিত্তে এক হাতে ধারণ করিয়া আছেন—নারায়ণের দক্ষিণ চরণ—অন্য হস্তে ধরিয়া আছেন লক্ষ্মীর চরণপদ্ম। আরাধ্যের শ্রীচরণ প্রাপ্তিই ভক্তের সাধনার শ্রেষ্ঠ লাভ। প্রতিমাটি সম্ভবতঃ মধ্যদেশ বা রাজস্থানে নির্মিত হইয়াছিল। নির্মাণ কাল সম্ভবতঃ ১০—১১ শতক।

কথাগুলি শুনিয়া মহেন্দ্র কিছু বলিল না। মুখে কিছু না বলিলেও তাহার ঈষৎ বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি, ঈষৎ ব্যায়ত আনন যাহা প্রকাশ করিল তাহাই যথেষ্ট। মহেন্দ্র মিতবাক ব্যক্তি, সহজে কথা বলে না।

তাহার পিতা যোগেন্দ্র (যোগীন) তিন-দিনের ছুটি লইয়া ঘোঘা গিয়াছিল, কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়াছে। 'বহু' (বউ) আসে নাই। শুধু তাহাই নয়, মহেন্দ্রের শালা বিষুণ ভাব-ভঙ্গীতে যাহা প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যতে আর আসিবেও না। সংবাদটা শুধু নিদারুণ নয়, ভয়াবহ। মহেন্দ্র তাহার একমাত্র পুত্র। শেষে কি তাহাকে নির্বংশ হইতে হইবে? মহীনের যদি একটা পুত্র (কিংবা কন্যাও) থাকিত তাহা হইলে পরিস্থিতি অন্যরূপ হইত। সেটাকে আটকাইয়া রাখিলে 'বহু' এমনভাবে বাপের বাড়ি বসিয়া থাকিতে পারিত না। নাড়ীর টানেই তাহাকে আসিতে হইত। দুই দুইবার তাহার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াওছিল, কিন্তু দুইবারই অকালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এজন্য ডাক্তারবাবু তাহার রক্ত পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। রক্তে দোষ আছে। চিকিৎসার ব্যবস্থাও হইতেছিল, এমন সময় 'বহু' একদিন পলাইয়া গেল। তাহার পর হইতে আর আসিতেছে না। যোগীন একবার ভাগিনেয়কে আর একবার তাহার এক দূর-সম্পর্কের দাদাকে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। এবার সে নিজে গেল তাহাতেও কিছু হইল না। মহেন্দ্রর শালারা একরকম স্পষ্টই বলিয়া দিল বোনকে তাহারা পাঠাইবে না। যোগীন যদি থানা-পুলিশ বা পঞ্চায়েত করিতে চায় করুক। তাহাদের যাহা বক্তব্য তাহা তাহারা সেখানেই বলিবে। কথাটা যদি খাওয়া-দাওয়ার পূর্বে বলিত তাহা হইলে যোগীন সেখানে অন্নগ্রহণই করিত না। অভুক্ত চলিয়া আসিত। কিন্তু কথাটা তাহারা যখন ভাঙিল তখন যোগীন ভর-পেট খাইয়া ফেলিয়াছে। প্রচুর দই, চিঁড়া, আম এবং কলা। যোগীন আত্মসম্মানী লোক। যাহারা তাহাকে এমনভাবে অপমান করিল তাহাদের দেওয়া দই চিঁড়া আম কলা সে হজম করিবে? কখনই না। 'হরগিজ নেহি'। সে গলায় আঙুল দিয়া সমস্ত বমি করিয়া দিয়া আসিয়াছে তাহাদের উঠানেই। তাহার ক্ষীণ আশা ছিল এই নাটকীয় কাণ্ডের পর তাহারা হয়তো মিটমাট করিয়া ফেলিবে। কিন্তু সেদিক দিয়া তাহারা গেলই না। ঘোঘার বাজারের কাছাকাছি আসিতেই পুরাতন বন্ধু মিঠাই-লালের সহিত দেখা হইল। মিঠু ঘোঘাতেই একটা পান-বিড়ির দোকান খুলিয়াছে আজকাল। মিঠু আসল কথাটা প্রকাশ করিল। সে বলিল, উহার (মহীনের) শালাদের বদ্ধধারণা যে দুর্বারির (মহীনের স্ত্রী) যে দুই-দুইবার গর্ভপাত হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য মহীনই দায়ী। দুর্বারির রক্তে যে দোষ পাওয়া গিয়াছে তাহাও মহীনের জন্য। মহীনের দুষ্ট রক্তই দুর্বারির রক্তকে কলুষিত করিয়াছে। এই-জন্যই সে পলাইয়া আসিয়াছে এবং এই জন্যই ছবিলাল (মহীনের আর এক শালা) দুর্বারিকে আর পাঠাইতে চাহিতেছে না। ঘোঘা হাস-পাতালের ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন মহীনের রক্তও পরীক্ষা করা উচিত। খবরটা শুনিয়া যোগীনের চক্ষু চড়ক গাছ হইয়া গিয়াছে। মহীনের রক্ত খারাপ? ইহা তো অসম্ভব! মনিহারী গ্রামে কে না জানে যে যোগীনের বংশ নিষ্কলঙ্ক? তাহাদের চরিত্র খারাপ হইলে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে তাহারা কি

তিনপুরুষে কাজ করিতে পারিত? যোগীনের বাবা জগন্নাথ ডাক্তারবাবুর প্রিয় ভৃত্য ছিল। জগন্নাথ পূর্বে ঘোড়া 'লাদিত', অর্থাৎ একটা বেতো ঘোড়ার পিঠে নানারকম জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। একবার জগন্নাথ বর্ষার জলে আপাদমস্তক ভিজিয়া জ্বরে পড়ে। জ্বর শেষে নিউমোনিয়ায় দাঁড়াইল। যমে-মানুষে লড়াই করিয়া ডাক্তারবাবু জগন্নাথকে বাঁচান। ইহার পর ডাক্তারবাবু জগন্নাথকে আর ঘোড়া লাদিতে দেন নাই। বলিয়াছিলেন, তুমি আমার বাড়িতেই থাক। তোমার ঘোড়াটাও আমার হাতায় চরিয়া বেড়াক। তুমি যতটুকু কাজ করিতে পার কর, আর যদি না পার বসিয়া থাক। ডাক্তারবাবু ঘোড়াটার জন্য তাহাকে বারোটা টাকা দিয়াছিলেন। সে যুগে এই দামই যথেষ্ট ছিল। জগন্নাথ ঘোড়াটারই তদারক করিত। তাহার সামনের পা দুইটি ছাঁদিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিত এবং সে ফড়িংয়ের মতো লাফাইয়া লাফাইয়া চরিয়া বেড়াইত। জগন্নাথ ডাক্তারবাবুর ডিস-পেন্সারির বারান্দায় বসিয়া বসিয়া কানে দেশলাইকাঠি ঢুকাইয়া ধীরে ধীরে সেটি ঘুরাইত এবং মাঝে মাঝে ঘোড়াটির দিকেও চাহিয়া দেখিত। ঘোড়া ফুল-বাগানের বেড়ার ধারে গেলে, কিংবা হাতার বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিলে জগন্নাথ দেশলাই-কাঠিটি কান হইতে বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত এবং গাছের একটা শুকনো ডাল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিত—"হেট্ হেট্ হেই হেই"। ইহাতেই কাজ হইত। ঘোড়াটা বুঝিত যে সে স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আবার স্বস্থানে আসিয়া চরিতে আরম্ভ করিত। এইভাবে শুইয়া বসিয়া জগন্নাথের দিন কাটিতেছিল। ডাক্তারবাবু তাহাকে কোনও কাজের ভারও দেন নাই। কিন্তু তিনি লোক চিনিতেন এবং ইহা জানিতেন যে মানুষ বরাবর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কিছুদিন পরে দেখা গেল জগন্নাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাগান পরিষ্কারে মন দিয়াছে। বাগান লইয়া কিন্তু তাহাকে বেশীদিন থাকিতে হইল না। ডাক্তারবাবুর শিশুপুত্র বল্টুবাবুর সহিত তাহার ভাব হইয়া গেল।

বল্টুবাবু একদিন ঘোড়াটি দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, "ঘো। কার ঘো?"

জগন্নাথ হাসিমুখে উত্তর দিল, "খোকাবাবুর—"

"আমার ঘো?"

"হাঁ, তোমারই"

বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বল্টুবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিল—"কার ঘো?"

"তোমার"

"আমার ঘো?"

"হাঁ, তোমারই তো"

"আমার? আমার ঘো!"

কথাটা যেন বল্টুবাবুর বিশ্বাসই হয় না।

"চড়বে? এস, চড়িয়ে দিই"

জগন্নাথ সত্য সত্যই বল্টুকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া দিল। সেইদিন হইতেই শুরু হইল জগন্নাথের নূতন কাজ। সে প্রত্যহ বল্টুবাবুকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া হাতার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ডাক্তারবাবুকে বলিয়া একটি রঙীন 'জিন' এবং রঙীন লাগামেরও ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। ইহার পর জগন্নাথ বল্টুবাবুর খাস চাকর হইয়া গেল। রাত্রে বল্টুবাবু জগন্নাথের কাছেই শুইত। ঘুমাইয়া পড়িবার পর গভীর রাত্রে জগন্নাথ তাহাকে বাড়ির ভিতর দিয়া আসিত।

বহুবার-শ্রুত এই ঘটনা যোগীনের মনে পড়িয়া গেল। এ সব ঘটিয়াছিল প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে। তখন যোগীনের জন্মও হয় নাই। কিন্তু গল্পটা সে এতবার শুনিয়াছে যে মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে মনে হয় নিজের চোখে যেন দেখিয়াছে সব। সে যখন বল্টুবাবুকে দেখিয়াছে তখন তাঁহার বয়স ত্রিশের উপর। কিন্তু কল্পনায় সে শিশু বল্টুবাবুকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়।

আর একটা গল্প যোগীনের মনে পড়িয়া গেল। জগন্নাথেরই গল্প। জগন্নাথ যে কত বড় সচ্চরিত্র কর্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিল তাহারই কাহিনী। একবার সে দুই হাতে দুই কাপ চা লইয়া বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছিল। বাহিরে বৈঠকখানায় কয়েকজন ভদ্রলোক অতিথি আসিয়াছিলেন। ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার পথে একটা খোড়ো চালা ছিল। সেই চালার বাতায় বোলতার চাক ছিল একটা। হঠাৎ সেখান হইতে কয়েকটা বোলতা উড়িয়া আসিয়া জগন্নাথের গালে কপালে চিবুকে কামড়াইয়া ধরিল। অন্য লোক হইলে চায়ের পেয়ালা দুইটা ফেলিয়া দিত। কিন্তু জগন্নাথ কিছুই করিল না। চায়ের পেয়ালা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহার পর বাহিরে আসিয়া মুখ হইতে বোলতাগুলোকে হাত দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখ ফুলিয়া তাহার যে চেহারা হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। সাতদিন কোনও কাজ করিতে পারে নাই। চোখ দুইটা একেবারে বুজিয়া গিয়াছিল। জ্বরও হইয়াছিল খুব।

একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়াই যোগীনের এত কথা মনে হইতেছিল। এরকম লোকের বংশে যাহার জন্ম তাহার কি চরিত্র খারাপ হইতে পারে? মতীনের রক্তেও দোষ আছে এ কথা তাহারা বলিল কি করিয়া? তাহাদের স্পর্ধা তো কম নয়। ইহার একটা বিহিত করিতেই হইবে।

কিন্তু এখন আসল যে প্রশ্নটির সমাধান অবিলম্বে প্রয়োজন সেটি হইতেছে—করা যায় কি! এই জটিল জালকে ছাড়ানো যায় কি করিয়া! যোগীনের জীবনের সমস্ত জটিল প্রশ্নের সমাধান এতদিন যে ব্যক্তিটি করিয়াছে তাহার নিকট যাওয়া ছাড়া উপায় কি। মণিবাবুর কাছেই যাইতে হইবে।

মণিবাবু বল্টুবাবুর পুত্র এবং যোগীনের মনিব। আইনত ইহাই তাহাদের সম্পর্ক। আসলে কিন্তু যোগীন মণিবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সেই আসলে মালিক। পারিবারিক এবং বৈষয়িক ব্যাপারে যোগীন মণিবাবুর দক্ষিণ হস্ত। কারণ আছে। মণির যখন জন্ম হয় তখন যোগীনের বয়স দশ এগারো বৎসর। জগন্নাথের একমাত্র পুত্র সে, সুতরাং মাতৃ-অঙ্ক ছাড়িয়াই সে ডাক্তারবাবুর আঙিনায় আসিয়া হাজির হইয়াছিল। তাহার পর তাহার কাজও জুটিয়া গেল। মণিবাবুকে সে দেখাশোনা করিতে লাগিল। তাহার কাজ হইল মণিবাবুকে কোলে লইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ানো। সেই মণিবাবু এখন বড় হইয়াছে, বিষয়ের মালিক হইয়াছে, তাহার বউ আসিয়াছে। একটি খোকাও হইয়াছে। সবটাই যেন যোগীনের কৃতিত্ব। সুতরাং যোগীন মণিবাবুর ঠিক চাকর নয়। যোগীন বাড়ির লোক। তাহার যাবতীয় খরচ মণিই বহন করে। তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন মারা গেল, তখন শ্রাদ্ধের সমস্ত খরচ মণিই দিয়াছিল। বছর দুই পরে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে মাইজীর (মণির মায়ের) জেদে। বিবাহের সমস্ত খরচ মণির। মহীনের মাকে মাইজী পুত্রবধূর মর্যাদা দিয়া বরণ করিয়াছিলেন। সোনার হার পরাইয়া দিয়াছিলেন তাহার গলায়। মহীনও এই বাড়ির উঠানে খেলাধুলো করিয়া মানুষ হইয়াছে। যোগীনের ইচ্ছা ছিল সে যেমন মণিকে কোলে করিয়া বড় করিয়াছে, মহীনও তেমনি মণির খোকা বাবুনকে বড় করুক। কিন্তু মণিই তাহাতে আপত্তি করিল। সে বলিল আজকাল যুগ বদলাইয়াছে, হাওয়া বদলাইয়াছে, মহীনকে লেখা-পড়া শিখিতে হইবে। তাহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। ফল যাহা হইয়াছে তাহা যোগীনের অন্ততঃ মনোমত নয়। একটি বাবু তৈয়ারি হইয়াছে। গোঁফ কামায়। দিনরাত মচর মচর করিয়া পান চিবাইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া সিগারেটও খায় সম্ভবত। চুলের বেশ বাহার। ফুলেল তেল মাখে। প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরিয়া বেড়ায়। তা ছাড়া দেহে-মনে পৌরুষ বলিয়া কিছু নাই। কথা বলিতে পারে না। বকিলে ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে অবশ্য এবং মণিবাবুর সুপারিশে স্কুলের একটা মাস্টারিও জুটিয়াছে কিন্তু যোগীন এ সবে সন্তুষ্ট নয়। নিজের বউকে যে দাবাইয়া রাখিতে পারে না সে কি একটা মানুষ? স্নান করিতে রোজ একঘণ্টা লাগে, সাবান ঘসিতেছে তো ঘসিতেছেই। টর্চ রিস্টওয়াচ এসেন্স রুমাল এই সব লইয়াই আছে।

যোগীন গোপনে একজন উকিলের পরামর্শ লইল, মহীনের আবার বিবাহ দেওয়া যায় কি না। উকিল বলিলেন, আজকাল আইন বড় কড়া। প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না করিয়া দ্বিতীয় বিবাহ করা চলে না। ডিভোর্স করাও সহজ নহে। যোগীন জানিতে চাহিল ডিভোর্স না করিয়াই যদি বিবাহ দেওয়া যায়, কি হইবে? উকিল গম্ভীরভাবে বলিলেন, আইনত সাজা হওয়ার কথা। তাহা যদি নাও হয়, দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সব সন্তানাদি হইবে তাহারা জারজ বলিয়া গণ্য হইবে। বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে না। যোগীন অবাক!

মহীনের বন্ধু শ্যামলাল একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে বউ আসছে না কেন? ছেড়ে দিলে না কি তোকে?" মহীন কোন উত্তর দেয় না। ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসে কেবল। তাহার চোখ দুইটা কেবল একটু বড় বড় হইয়া যায়। চোখেই যেন রাগ প্রকাশ পায় তার। মুখে কিন্তু কিছু বলে না।

২

অবশেষে মণিকে সব খুলিয়া বলিতে হইল।

মণি গম্ভীর লোক, সব শুনিল, কোন মন্তব্য করিল না। কিন্তু সে চুপ করিয়া বসিয়াও রহিল না। মহীনকে লইয়া ভাগলপুরে চলিয়া গেল। সেখানে এক অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে তাহার রক্ত দিয়া আসিল পরীক্ষা করিবার জন্য। মহীনের নিকট ভিতরের আসল খবরটিও জানিয়া লইল। তাহার পর গেল ঘোঘা।

৩

কোথা দিয়া কি হইল তাহা যোগীন বুঝিতে পারিল না। সে সবিস্ময়ে দেখিল মণি 'বহু'কে লইয়া আসিয়াছে এবং 'বহু'র সঙ্গে আসিয়াছে একটি 'রেডিও'। 'রেডিও'র জন্যই নাকি 'বহু' পলাইয়াছিল। ঘোঘায় তাহাদের বাড়িতে রেডিও আছে যোগীনের মনে পড়িল। নগদ সাড়ে চারশত টাকা ব্যয় করিয়া মণি 'রেডিও'টি 'বহু'কে উপহার দিয়াছে।

৪

দিন তিনেক পরে শ্যামলাল মহীনকে বলিল, "যাক, তোর বউ এসে পড়ল তাহলে। কি হয়েছিল বলতো?" মহীন হিন্দীতে যাহা উত্তর দিল, তাহা অদ্ভুত। বলিল, "হামরো বিল্লি, হামকো বোলে গা মেঁও?" ইহার অর্থ শ্যামলাল ঠিক বুঝিতে পারিল না। আমরাও পারি নাই।

৫

আরও দিন চারেক পরে ভাগলপুরের ডাক্তারেরও চিঠি আসিল। মহীনের রক্তেও দোষ আছে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে লাগিল মণি।

যোগীন তো অবাক।
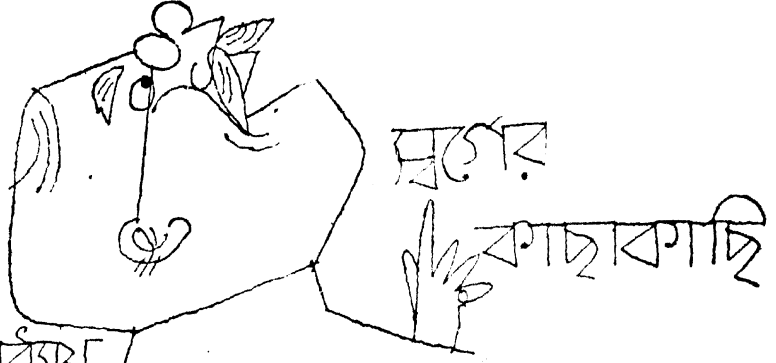
এশিয়াটিক কলেরা হয়ে চব্বিশ ঘণ্টায় হাতে পায়ে খিল ধরে এই যাই অবস্থায় স্বর্গের কাছাকাছি যাওয়া ভারি বিপদজনক। তার চেয়ে সোজাভাবে খাবি না খেয়ে বহাল তবিয়তে খোশমেজাজে অনেক শর্টকাটে স্বর্গের কাছাকাছি যাওয়ার উপায় আমাদের জানা না থাকলেও আমেরিকানদের জানা আছে। সারা আমেরিকায় যত আমেরিকান আছে তারা সবাই এমনি করে দিনের মধ্যে কতবার যে উপরে উঠছে আর অধঃপাতে নামছে তার হিসাব দেওয়া একরকম অসাধ্য। ঠিক জানবেন স্বর্গে ওঠার কোন সিঁড়ি নেই—স্বর্গ তো হাওয়ায় দুলছে, সেখানে সব কিছুই হাওয়ায় ভরা। জমিন থেকে আসমানে তুলে নেবার দুটি টিপকল আছে। একটি প্রেমে পড়ে আসমানে যাওয়া—যা বোধহয় সব দেশেই লোকে জীবনে একবার না একবার যায়। অন্য উপায়টি আমেরিকার ঘরে ঘরে—লিফট্। থুড়ি লিফট বলবো না—এরা বলে এলিভেটর। অবশ্য যার নাম মুড়ি তারই নাম চালভাজা। এলিভেটর যা, লিফটও তা। এলিভেটর ছাড়া আমেরিকানরা 'পাদমেকম্ ন গচ্ছামি'। ঘোড়া দেখলে খোঁড়া। এলিভেটর দেখে আমেরিকানদের সেই দশা। একতলা থেকে দুতলায় যেতেও সিঁড়ি মাড়াতে কেউ রাজী নয়। এলিভেটরের সামনে এসে বোতাম টিপলেই সাক্ষাৎ যমদূতের মত তিনি এসে 'জো হুজুর' করে হাজির হন নীচে বা উপরে নিয়ে যাবার জন্য। তার পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যে তলায় যাবার বাসনা সেই তলার বোতাম টিপলেই সেই তলায় গিয়ে এলিভেটর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এলিভেটর এমনি বুঝদার। প্রথম প্রথম এলিভেটরে উঠে চলাফেরা করতে কেমন হকচকিয়ে যেতে হয়—কেমন বাধো বাধো ঠেকে। তারপর এরাই হয় সকল বন্ধুর পথে একান্ত স্বজন। কাঁধে করে যেখানে যত তলায় যেতে চাও সেখানে নিয়ে যেতে রাজী—দশ বার। পনের-কুড়ি যত তলা হুকুম করা যাবে।

দিনরাত্রি এই সব এলিভেটররা অগুণতিবার কেমন ওঠ-বোস করে—কখন তাদের হার্টের অসুখ করে না। এদের শরীর অসুরের বাড়া। কদাচিত কখনও বেরসিকের মত শূন্যমার্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন নিজে নড়ে না চড়ে না। লিফট সারাবার ডাক্তার এসে বুক পরীক্ষা করে ওষুধ দেয়। বিয়ে করতে গমনোচ্ছুক এই রকম এক ভদ্রলোকের আপদ দেখুন—লিফটে মাঝ রাস্তায় ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে আটকা

নাইট ওয়াচম্যান ভোর বেলায় শুনতে পেল কে চেঁচাচ্ছে, 'হেল্প, হেল্প!'

পড়লেন। কখন? যখন জীবনের সবচেয়ে শুভ মুহূর্তে আসছে ঠিক সেই সময়। চার্চে যাবার আগে। সেদিন ছিল রবিবার। অত সহজে লিফট সারাবার লোক আনতে পারা যায়নি। হবুবর মহাশূন্যে দোদুল্যমান—এদিকে কনের অবস্থাটা একবার অনুমান করুন। অপেক্ষা আর সয় না। তারপর অনেক কষ্টে আকাশ থেকে বরকে পেড়ে এনে, মানে প্রায় যমের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে বিয়ের আসরে হাজির করা হয়।

আমেরিকানদের জীবনে এই লিফট জীবনযাত্রাকে কত সহজ করে দিয়েছে। আবার এরা কখনও কখনও মারাত্মক সব আপদও ঘটায়। তার আর একটা বিবরণ দিই। এবার লোক নয়—একজন প্রেম-ডগমগ মহিলার কথা বলি। নাম ধরুন এনিটা ব্রাউন। ইনি নিউইয়র্কের ডাউন টাউনে এক সওদাগরী অফিসে কাজ করে। সেদিনের সন্ধ্যাবেলা এনিটার কাছে অন্য সন্ধ্যার মত মামুলি ছিল না—অর্থে ভরা ভাবে ভরা একটা তাৎপর্য ছিল। অফিস ফেরতা সেজেগুজে সে চলেছে বয়ফ্রেণ্ডের কাছে কথা দিতে—'হ্যাঁ আমি রাজি।' এতদিন পর রাজী বলতে যাওয়া সাধারণ ডেটিংএর পর্যায়ের জিনিস নয় যে অকস্মাৎ কোন কারণে সে miss করতে পারে। সব কাজ শেষ করে নামতে তার বেশ খানিক দেরী হয়ে গেল। আঠারো তলার ওপর থেকে লিফটে করে সোজা নীচে রাস্তায় নেমে এল এনিটা। 'এই যা, হাত ব্যাগটা তো টেবিলের উপরে ফেলে এসেছি।' সুড়সুড় করে আবার সে লিফটে করে উপরে উঠে আসে। ত্বরিতে হাত ব্যাগটা টেনে নেয়। নিয়ে লিফটের দরজা খুলে একতলার বোতাম টিপে অধীর হয়ে অপেক্ষা করে কখন মাটির তল পাবে। চোখের ওপর দিয়ে সট সট করে সতের-ষোলো পনেরো তলা চলে গেল। ওই যা' তের আর চোদ্দ তলার মাঝে অর্থাৎ সাড়ে তেরতলার কাছে এসে লিফট বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে—নৈহি নড়েগা বলে গ্যাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দুর্দৈব ব্যাপার, মহিলার অবস্থাটা একবার অনুমান করুন—আপিস ছুটির পর কেউ কোথাও নেই। সারারাত্রি লিফটের মধ্যে দাঁড়কাক হয়ে এনিটা দাঁড়িয়ে,

তার বৃথাই রজনী গেল। ওদিকে তার বন্ধু খবরের জন্যে ত্রিভুবন তোলপাড় করে তুলল—অফিসে ফোন করে পেল না। সন্দেহ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হল তখন, যখন বাড়িতেও সারারাত্রি ফোন করে বান্ধবীর টুং-টি পাওয়া গেল না। এদিকে এনিটা সারারাত্রি সকরুণ ভাবে চীৎকার করে কেঁদে কঁকিয়ে হন্যে হয়ে গেল। কিন্তু কা কস্য পরিদেবনা। হবি তো হ অফিসের নাইট ওয়াচম্যান সারারাত্রি আসতে পারেনি—বিকেলে তার ছোট্ট মেয়েটি গরম জলের কেটলি উল্টে ফেলে পা পুড়িয়েছে। কিন্তু সত্যি যার কপাল পুড়লো সে হল এই হতভাগিনী মহিলাটি। ভোরবেলায় এসে নাইট ওয়াচম্যান সামনের দরজার চাবি খুলবার সময় স্পষ্ট শুনতে পেলেন কে যেন তার নাম ধরে তারস্বরে Sam Sam বলে চেঁচাচ্ছে। মহিলা কণ্ঠে কে ডাকছে—oh uncle sam! help—oh uncle sam! নাইট ওয়াচম্যানের নাম ছিল সামুয়েল গ্রেস। সে লিফট কোম্পানীকে তাড়াতাড়ি টেলিফোন করতে ছুটবার সময় মনে মনে ভাবতে লাগলো—বিলক্ষণ, এ মহিলা যাদু জানে—এমন করে আমার নাম ধরে ডাকছে। ব্যাপার আছে নিশ্চয়ই।

বার্কলেতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পাগলা ধরনের লিফট আছে—যা কখনও ঠিক যে তলায় লাগবার সেখানে লাগে না—একটু উপরে বা নীচে গিয়ে থামে পড়ে। তখন একটু একটু করে তুলে লাগাবার জন্য সুইচ টেপা ও বন্ধ করে সম্পাদিত করাতে হয়। বাড়ীতে মাথার ছিটওয়ালা কেউ থাকলে তাকে তো কেউ তাড়িয়ে দেয় না, এখানকার মাস্টার ছাত্র সকলকে দেখেছি এই পাগলা লিফটকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখে এবং তা চড়ে বিচলিত না হয়ে পুলকিত হয়।

স্বয়ংক্রিয় লিফট ছাড়া চালক শূন্য লিফট অনেক জায়গায় থাকে। বেশীর ভাগই নিগ্রো তারা। দিনের মধ্যে অগুণতিবার তারা টংয়ে চড়ে আর নামে। স্বর্গের কাছাকাছি গিয়ে আবার নেমে আসে। এতবার ওঠানামা করার ফলে ওঠা বা নামার উপলব্ধিটা তাদের যেন চলে গেছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তারা বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে কি ভাবে তা তারা জানে আর এই লিফটরা জানে। নিউ ইয়র্ক হস্পিটালে জগৎবিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী মারলীন মনরো সেবার এলেন পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ডে। কাতারে ক তারে লোক তাঁর ওয়ার্ডের দিকে ধাওয়া করতে লাগলো। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষরা লিফট বন্ধ করে দিলেন—২৬ তলায় পায়ে হেঁটে মারলীন মনরোর কাছে কেউ আর যেতে চাইল না।

স্বর্গের সবচেয়ে কাছাকাছি ইঁটের গাঁথুনীওয়ালা যে জায়গাটি, যেটি পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়, তা হল পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম বাড়ী এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। মাদুরা মীনাক্ষী মন্দিরের গোপুরমের চূড়া কিংবা দিল্লির কুতবমিনার এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর কাছে কিছু নয়। এর টংয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া নৈব নৈবচ। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু এই বাড়ী—১৪৭২ ফুট
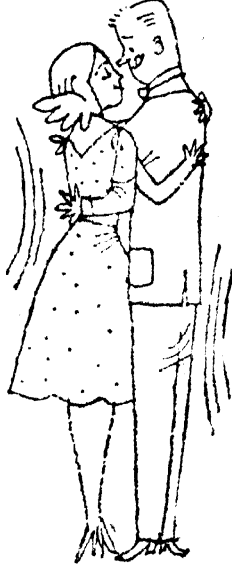
এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে

(৪৪৮ মিটার)। আগেকার দিনে চার্চ বা ক্যাথিড্রাল হত সবচেয়ে উঁচু বাড়ী। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং কত উঁচু তুলনা দিলে বোঝা যায়—প্রায় দুটো ইফেল টাওয়ার কিংবা তিনটে পিরামিড আর আটটা পিসার হেলার টাওয়ারের মত। নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি বড় শহরে কোন বাড়ী পাশে হাত-পা না ছড়াতে পেরে ইঁটের শীর্ষাসনে আকাশের দিকে যোগাভ্যাস করতে বসেছে। এমনি আকাশ ছোঁওয়া বাড়ী নির্মাণের পেছনে বড় বড় স্থপতির নানা মগজের ভেলকি খেলা আছে। এঁদের মধ্যে গ্রাপিয়ান, কুর্বিশিয়ে, মীজ ভ্যান দার, রোব নাম উল্লেখযোগ্য। তাই এত উঁচু বাড়ীতে ওঠানামার জন্য লিফট একান্ত প্রয়োজনীয়। আজকাল অতি সাধারণ বাড়ীতেও লিফট না থাকলে লোকের মন ওঠে না।

নিউইয়র্কে এলে সকলকে একবার না একবার এই ১০২ তলা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখতে আসতে হয়। শীতকালের কোন একটি ঝকঝকে দিনে যেদিন ভিসি-বিলিটি অনন্ত, সেদিন আসতে হয়। ফিফথ এ্যাভিনু আর থার্টি ফোর্থ স্ট্রীটে এলে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর তলায় পৌঁছান যায়। ওঃ সে যে কত উঁচু নীচের লোকদের উপর থেকে খুদে পিঁপড়ের মত মনে হয়। নির্মম এক ভ্রূকুটি নিয়ে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং তার উদ্ধত মহিমায় আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সংগে যে আমেরিকান ভদ্রলোকটি এক সংগে উপরে উঠেছিলেন তাঁর কাছে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর সুবিশাল উচ্চতার তারিফ করাতে উনি আমাদের কাছে উপরে উঠতে উঠতে বললেন—এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং কত উঁচু জান? যখন এর উপর দিয়ে চাঁদ পাশ করে তখন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর চূড়োটাকে একটু একটু হেলিয়ে নামিয়ে নিতে হয়—তাই স্প্রীংএর সাহায্যে চূড়োটা আটকান কি না? মুখে বললুম তাইতো। মনে মনে বিলকুল জানলুম—এতো নয় বাবা মার্কিনী—এতো আমাদের সাবেকী বাগবাজারী। মাটি থেকে না থেমে সরাসরি একটানে লিফট নিয়ে এল ৮৬ তলায়—পাগলা মেলের মত ছুটে চলা লিফটের নাম এক্সপ্রেস লিফট। এ প্রতি মিনিটে ১,২০০ ফুট চলে। ৮৬ তলা থেকে লিফট বদলে আবার স্পেশাল এলি
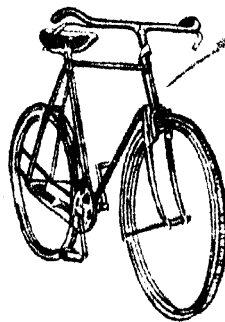
ভেটারে ১০২ তলায় গিয়ে ওঠা হয়। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর ১০২ তলা মানে ১,২৫০ ফুট উঁচুতে থাকা। রাস্তা থেকে এক-চতুরাংশ মাইল উপরে। এতখানি উপরে থাকা মানে ক্লাউড লেভেলে অর্থাৎ মেঘলোকে থাকা। আমেরিকায় প্রেমে পড়লে নিয়মানুসারে অনেক সময় এই মেঘলোকের স্বপ্ন ছায়ায় মন ভাসাতে আসতে হয়। এখানে ব্যবস্থার অভাব নেই। অবজারভেটোরী দূরবীক্ষণের সাহায্যে ভাল করে দাঁড়িয়ে দেখবার, ভাল খাবার বসবার এবং অজস্র সুভেনির সংগ্রহ করবার অফুরন্ত ব্যবস্থা আছে। সুভেনিরের অধিকাংশ জিনিসের পিছনে 'মেড ইন জাপান' লেখা আছে। ভাল স্টুডিও আছে সেখানে। পটে আঁকা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর ব্যাক গ্রাউণ্ডে দাঁড়িয়ে আপনার ছবি নেওয়া যাবে। নিজের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করবার যন্ত্র আছে যেখানে ডলার ফেললে আপনার কথা রেকর্ড হয়ে তখুনি বেরিয়ে আসবে।

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর টংয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টি ভি টাওয়ার আছে। এর উপর থেকে দর্শকরা হাজার হাজার চিঠি রোজ লেখে পৃথিবীর ভিন্ন দেশে। মানমন্দিরের পরিদর্শকরা কমসে কম আট রকম ভাষা জানে। এর শিখর দেশের আলো বিমান থেকে তিনশো মাইল দূর হতেও দেখা যায়। এর উপর থেকে সমুদ্রের চল্লিশ মাইলের ভিতরের জাহাজ দেখতে পাওয়া যায়। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর মানমন্দিরে দাঁড়িয়ে কত প্রেমিক-প্রেমিকা ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে তার ঠিকানা এক বুড়ো গাইডকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন। এই বিরাট বাড়ীর সাড়ে ছ' হাজার জানালা মাসে দু'বার পরিষ্কার করা হয়। লিফট ছেড়ে পায়ে পায়ে হাঁটলে ১৮৬০টি সিঁড়ি ভাঙতে হয় ১০২ তলা উঠতে—কেউ তা করে না, এই যা। প্রত্যেকদিন ৩৫ হাজার দর্শক এখানে চড়ে। তারা বিভিন্ন দেশের লোক। দিনের বেলার চেয়ে রাত্রে নীচেকার নিউ-ইয়র্ককে বিস্ময়ের রাজত্ব বলে মনে হয়—যেখানে আলোর মৌচাক থেকে টিপটিপ করছে নানা রঙের মৌমাছির মত আলো, উপরে দাঁড়িয়ে মনে হয় সূর্য আর তারারা হল নিউইয়র্কের মফঃস্বলের জিনিস।

উপর থেকে নিউইয়র্কের রূপ কতজনের চোখে কত রকমভাবে ধরা পড়ে। তখন হিড়িক পড়ে যায় চেনা বাড়ীকে খুঁজে বার করবার। কেউ গিয়ে সেন্ট্রাল পার্ক দেখে মুগ্ধ, কেউ টাইমস স্কোয়ার ও আর সি এ বিল্ডিং দেখে খুশী, কেউ নীচে ব্রীজের নানান অঙ্গভঙ্গীতে পুলকিত, কেউ পিঁপড়ের আকৃতির মানুষ দেখে বিমোহিত। আমরা যখন দৃষ্টির বন্ধনে তলাকার নিউ-ইয়র্ককে জরিপ করছি তখন পাশে যে ফরাসী দলটি দাঁড়িয়ে ছিল তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে—কে কি দেখতে পাচ্ছে না পাচ্ছে। কই কি দেখছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ফরাসী ছিলেন তিনি বললেন—আমি শুধু লক্ষ লক্ষ বাড়ীর জানালা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর উপরে খাওয়ার টেবিলে নানান লোকের ভীড় সর্বসময়ে। যে আমেরিকান পরিবারটির সঙ্গে আমরা বসেছিলাম তাঁরা ওহাইও থেকে এসেছেন। তাদের সঙ্গের ছ বছরের মেয়েটি জুল জুল করে আমাদের দিকে চেয়ে বসে আছে।

তার মা বললেন—জিন, এই দেখ এঁরা ইণ্ডিয়ান—সত্যিকারের ইণ্ডিয়ান। বিস্ময়ে জিন বললে—মমি, real Indians, really? ওপাশের টেবিলে তার অন্য বন্ধুদের "রিয়েল ইণ্ডিয়ান" দেখাতে ডাকতে ছুটোছুটি। আমেরিকায় "আমের-ইণ্ডিয়ান" বলে যারা খ্যাত তারা রেড-ইণ্ডিয়ান যদিও চলতি কথায় তাদের ইণ্ডিয়ান বলা হয়। তাই "রিয়েল ইণ্ডিয়ান" পেয়ে এত পুলক।

ও বিস্ফারিত নেত্রে প্রশ্ন করলো—তোমরা ইণ্ডিয়ানরা বাড়ীতে থাক? না, না, আমরা গাছের মথায় বাস করি, কিন্তু এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ে চড়ার মত লিফট আমাদের আছে মাটি থেকে উপরে ওঠার জন্যে। তোমাদের জেট প্লেন আছে? বললুম, না, আমরা জেট প্লেন ব্যবহার করতে যাব কেন? আমাদের উড়বার জন্য ম্যাজিক কারপেট আছে। (কথাটা মিথ্যে বলিনি কারণ এয়ার ইণ্ডিয়া এই ম্যাজিক কারপেটের বিজ্ঞাপন দিয়েই তো এত প্রশংসা অর্জন করেছে।)

দেখা শেষ করে, ম্যাজিক কারপেটে করে নয়—সেই লিফট করে নীচে নেমে আসা হয়। লিফটদের দেখে মনে হয় লিফটরা অনেকটা যমদূতের মত—কেবল টেনে টেনে লোকদের উপরে তুলছে। পাকা যমদূত নয় তাই উপরে তুলে আবার নীচে ফিরে আসবার সুযোগ দেয়। প্রায় যমদূতের মত জিনিসটার কাছ থেকে অন্য যা পাওয়া যায় তাতো যায়ই—উপরি হিসাবে পাওয়া যায় শূন্যে থাকার সময় ভাবশূন্যতার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি। সত্যি দূত এসে টেনে নেবার পূর্বে এসব মেকীদূতে দিয়ে প্র্যাকটিশ করানো।

এত বড় বাড়ি নিস্তব্ধ, ছুঁচ পড়লে শোনা যায়।

ঝি-চাকর ফিস ফিস করে কথা বলছে। বাচ্চা-কাচ্চাদের তেতলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারাও যে খুব গোলমাল করছে, তা নয়। সমস্ত বাড়ির উপর বিষণ্ণতার একটা কালো পুরু পর্দার আবরণ পড়েছে। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তার থেকে পরিত্রাণ পায়নি। তারা খেলছে। মাঝে মাঝে ক্রোধে অথবা আনন্দে চীৎকার করেও যে না উঠছে তা নয়। কিন্তু তখনই নিজেদের সামলে নিচ্ছে।

এই চুপ! দাদুর অসুখ।

দাদুর অসুখ। বাবার অসুখ। বাবুর অসুখ। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে আরম্ভ করে বড়রা এবং ঝি-চাকর পর্যন্ত সকলের মুখে এই কথা। ফিস ফিস করে এই কথা সমস্ত দিন রাত্রি সকলের মুখে মুখে ঘুরছে।

—বাবা কেমন আছেন এখন?

বড় ছেলে জিজ্ঞাসা করলে তার বড় বোনকে। বড় ছেলে বাপের শয্যাপার্শ্বে ছিল রাত দুটো পর্যন্ত। তারপরে বড় মেয়ে। ওরা পালা করে রাত জাগছে।

বড় মেয়ে সাড়া দিলে না। শুধু ঠোঁট উল্টে ঘাড় নাড়লে। অর্থাৎ ভালো নয়।

ভালো নয়, তা সকলেই জানে। ঝি-চাকর পর্যন্ত।

রোগীর ঘর মুছে ঝি নীচে এল।

ঠাকুর, চাকর সবাই ছুটতে ছুটতে তার কাছে এল। তাকে ঘিরে ধরল।

ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন দেখলে?

—ভালো নয়।

—এ যাত্রা পার হবেন বলে মনে হয় না।

—না। যদি বাঁচেন চিকিচ্ছের জোরে। আর ছেলে, মেয়ে, বৌ, কি সেবাটা করছে সবাই।

ঠোঁট বেঁকিয়ে ঠাকুর বললে, করবে না? এ কি আমরা, যে মাদুরে জড়িয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসবে? হাতে রেস্ত আছে যে!

—অনেক টাকা, না?

—অঢেল টাকা। —ঠাকুর বললে,— পনেরো বছর বয়েসে এ বাড়িতে ঢুকেছি, আজ পঞ্চাশ হল। বাবুকে কখনও বসে থাকতে দেখিনি। সকাল সাতটায় চা খেয়ে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন বারোটায়। আবার স্নানাহার করে একটার বেরিয়ে যেতেন, ফিরতে রাত বারোটা-একটা। মটর তো সেদিন হল। তখন কিছুই ছিল না।

—এই বাড়ি?

—এ বাড়ি তো সেদিনকার কথা। চালতা-বাগানে একটা ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। তারপরে গাড়ি, বাড়ি, ফলাও কারবার। আমার চোখের সামনে সব একে একে হল।

বলে ঠাকুর সগৌরবে ওদের সকলের দিকে চাইলে। যেন কৃতিত্বটা তারই।

বললে, তখন বাবুর চেহারাও ছিল এমনি লিকলিকে। তারপরে টাকাও আসতে লাগল, গায়েও গত্তি লাগল। টাকা বড় ভালো টনিক রে!

ঠাকুর ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলে।

—বাবুর লোহার কারবার, না ঠাকুর?

—হ্যাঁ। পরথম লড়াইতেই এই বাড়ি। দোসরা লড়াইতে আর যা সব দেখছিস। একেবারে হুড়মুড় করে এল।

ঝি বললে, টাকা যেমন এল ঠাকুরমশাই, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচটা উপসর্গও এসে জুটল।

—তা জুটল।

আরও কাছে এসে, আরও গলা নামিয়ে

ঝি বললে, সেই লজ্জায়, ঘেন্নায় আর দুঃখেই তো গিন্নিমা সকাল সকাল চলে গেলেন। আমি তো জানি, শেষের দিকে মনে তাঁর একেবারে সুখ ছিল না।

—আমিও জানি, রামীর মা।

—জানবে বই কি। শেষের দিকে কিছু জিগ্যেস করতে গেলেই বলতেন, আমি জানি না, বৌমাদের জিগ্যেস কর। নয়তো তুই যা ভালো বুঝিস কর। সংসার যেন বিষ হয়ে উঠেছিল।

ঠাকুর বললে, কিন্তু তুমি তো জান না রামীর মা। ওই গিন্নিমা-ই একদিন বাবুকে ঠেলে-ঠুলে টাকার ধান্ধায় পাঠাতেন। বাবুকে দম নিতে দিতেন না। সেও একদিন গেছে।

ঝিও উৎসাহিত হয়ে উঠল। প্রসঙ্গটা সরস। বললে, আমিও জানি ঠাকুরমশাই। নিজের কানে শোনা। রাত বারোটা বাবু টলতে টলতে বাড়ি ফিরলেন। দাঁড়াবার ক্ষ্যামতা নেই। চাকর-বাকরে ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে গিয়ে খাটে শুইয়ে দিলে। গিন্নিমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। বাবু বললেন, এখন কাঁদলে কি হবে গিন্নি! টাকা চাইলে টাকা একা আসে না। অনেক উপসর্গ নিয়ে আসে। জানতে না? সেকথা এখনও আমার কানে বাজছে ঠাকুরমশাই! কতদিনের কথা।

ঠাকুরের চক্ষুস্থির। সে এবাড়ির অনেক কথা জানে, কিন্তু এত বড় কথাটাই জানত না। বললে, তাই নাকি?

—হুঁ।

—তখন বড়বাবু ছোটবাবুর বিয়ে হয়ে গেছে?

—অনেকদিন। তার বছর দুই পরেই গিন্নিমা চলে গেলেন। তুমি জান না ঠাকুর, শেষের দিকে তাঁর মনের অবস্থা কি হয়েছিল।

ঠাকুর বললে, দেখেছি। চুপ করে একা বসে থাকতেন। আর থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। হবে না? বাবুর ওই রকম মতিগতি। কিন্তু ওই যা বললে, গিন্নিমা টাকার কথাই ভেবেছিলেন, তার উপসর্গের কথা ভাবেনি। হা-হুতাশ করে কি হবে বল?

হঠাৎ 'কলিং বেল'টা বেজে উঠল।

একজন চাকর ছুটল সদর দরজায়। মিনিট দুই পরে একটা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে ফিরে এল। তোড়ায় দাতার নাম-লেখা একখানা টিকিট বাঁধা।

ঠাকুর বললে, ফুলই কি কম আসছে! বাবা!

চাকরটা হেসে বললে, আসবে না? ওই ফুলের মধ্যেই তো মজা!

—কি রকম?

—ওরা ভাবছে, বাবু আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। আবার ওদের অনুগ্রহ করবেন! সব স্বার্থ, বুঝলে না?

এতদিন এ বাড়িতে রয়েছে। সব দেখছে। তা আর বুঝবে না?

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর দুই ছেলে আর দুই মেয়ে।

বড় মেয়ে নন্দিনী ভাই-বোনেদের মধ্যে সকলের বড়। তার যখন বিয়ে হয়, মৃত্যুঞ্জয় তখনও বড় হতে পারেন নি। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের একটি শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে নন্দিনীর বিয়ে হয়। ছেলেটি নিজের জোরে এখন ভালো চাকরী করছে। নন্দিনীর অবস্থা ভালোই।

তারপরে বিজন। সে বাপের বিরাট ফার্ম দেখাশোনা করে। সস্ত্রীক পার্টিতে যায়, জুয়া খেলে, ফাটকা বাজারে লেনদেনও করে। তার পরেরটি, বিমান, সেও বাপের ফার্ম দেখা-শোনা করে। তার নেশা রেসে।

সব চেয়ে ছোট মেয়ে বন্দনা।

অনেক ঘটা করে অভিজাত বাড়ির একটি সুদর্শন এবং সুশিক্ষিত ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে শ্বশুরের মৃত্যু হয়। এবং আরও কয়েক বৎসর পরে মৃত্যুঞ্জয় টের পান নানা দিক দিয়ে বিবাহ সুখের হয়নি। এ সব কথা তিনি পরিবারের কাউকেই জানতে দেননি, এমন কি গৃহিনীকেও না। মাঝে মাঝে মেয়ের বাড়ি যেতেন এবং গোপনে তাকে অর্থ সাহায্য করতেন।

কিন্তু কোনো কিছুই দীর্ঘকাল চেপে রাখা যায় না। বিশেষতঃ অভিজাত পরিবারের আর্থিক বিপর্যয় সাধারণত অতিরঞ্জিত আকারেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

পাশের ঘরে পাশাপাশি একটা সোফায় বসে দুই বোনে কথা হচ্ছিল।

বোনা বন্দনার একটা নেশা বলতে পারা যায়। বাপের অসুখের খবর পেয়ে এ বাড়িতে এসে পর্যন্তই সে বুনছে। সকল সময় নানা কাজের মধ্যেও সে বুনছে। ছেলের এক জোড়া মোজা হয়ে গেছে। এখন মেয়ের টুপি নিয়ে পড়েছে।

বুনতে বুনতেই জিজ্ঞাসা করলে, ভালো কিছু বুঝছ দিদি?

—না। একদিন একটু ভালোর দিকে এগুচ্ছেন তো পরদিন তার চেয়েও বেশি খারাপের দিকে যাচ্ছেন।

—আজ একটু ভালো, না দিদি?

—একটু। কে জানে, কাল কি রকম থাকবেন।

—ডাক্তার যখন আসেন, তুমি ছিলে?

—ছিলাম বই কি। একটুখানি ভরসা দিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি তো ভরসার কিছু দেখি না।

বড় বৌ ঘরে এসে দাঁড়াল। বললে, আমরা একটু বেরুচ্ছি দিদি। তোমরা রইলে, একটু লক্ষ্য রেখ।

—রাত্রি হবে না কি?

—না, না। দশটা—এগারোটার মধ্যে ফিরব। ক্লাবে একটা জরুরী মিটিং আছে। না গেলেই নয়।

বন্দনা এতক্ষণ নিঃশব্দে বুনে যাচ্ছিল। মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলে, ছোট বৌদি বিকেলে যেন কোথায় গেল। ফিরেছে কি?

বড়বৌ বাঙ্গভরে হেসে বললে, এখনই ফিরবে। বাপের বাড়ি গেছে। বাপের সর্দি না কাশি কি হয়েছে। রাত্রে না ফিরতেও পারে।

এদিক দিয়ে বড়বৌ ছোট বৌ-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার বাপের বাড়ির উপর ঝোঁক নেই। ক্লাবে একটু ফ্লাশ খেলে, ফিরে আসে যত রাত্রিই হোক। ছোট বৌ-এর কিন্তু একটু অসুবিধা হলেই বাপের সর্দি কিংবা কাশি কিংবা ওই রকম একটা কিছু হয়। সে বাপের বাড়ি চলে যায়, কখনও এক রাত্রির জন্যে কখনও বা দু'তিন রাত্রির জন্যে।

বড়বৌ চলে যেতে নন্দিনী হাসলে।

বললে, মা চলে যাবার পর থেকে এ সংসারের যেন আর বাঁধন নেই। বাবা ভালো থাকলেও একটু রেখে-ঢেকে চলে। তা তিনিও তো শয্যা নিয়েছেন।

বন্দনা বললে, বাবা শয্যা নিয়েছেন বলেই তো ওদের আরও সমীহ করে চলা উচিত। ঘন্টায় ঘন্টায় ওষুধ খাওয়ান, পথ্য দেওয়া, কত কাজ! কে করবে?

—আমরা।
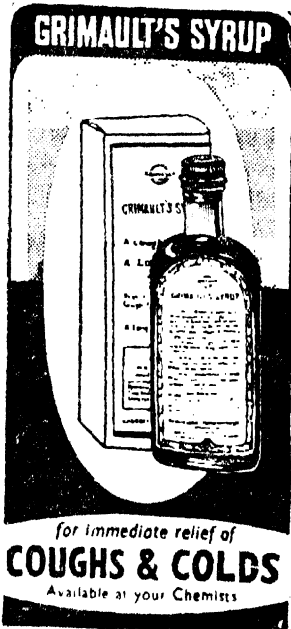
রুষ্ট মুখে দুজনে নিঃশব্দে বসে রইল।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করলে, বাবা নাকি একটা উইল করেছেন। শুনেছ কিছু?

—না।

—সেদিন বাবার এটর্নী এল, দরজা বন্ধ করে কি সব হল। তুমি কোথায় ছিলে তখন?

—বাড়িতেই ছিলাম। সে সব কি উইলের জন্যে?

—আর কিসের জন্যে?

—কে কে ছিল ঘরে?

—এটর্নী, বাবার একটি বন্ধু আর বাবা। ইনি খবর নেবার চেষ্টা করছেন উইলে কি আছে জানবার জন্যে।

নন্দিনী নিরাসক্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, জেনে আমাদের আর লাভ কি বল?

বন্দনা ফোঁস করে উঠল ঃ কেন, আমরা বাবার সন্তান নই? আমাদের কিছু প্রাপ্য নেই?

—সে আর এমন কি! খুদ-কুঁড়ো কিছু মিলতে পারে।

—সেইটেই জানা দরকার, কি রকম খুদ-কুঁড়ো।

নন্দিনী সাড়া দিলে না। বন্দনাও নিঃশব্দে বসে যেতে লাগল।

বন্দনা আবার বললে, বাবার চাবির থোলোর দিকে ছোট বৌদির নজর আছে।

—চাবি! চাবি কিসের!

—লোহার সিন্দুকের চাবি। বাবার বালিশের নীচে আছে। দেখনি?

—না।

—আছে। কিন্তু বড় বৌদিও কম চালাক নয়। তার সতর্ক দৃষ্টির সামনে সুবিধা করতে পারছে না। আমি লক্ষ্য করে যাচ্ছি তো।

বন্দনা হাসলে।

নন্দিনী বললে, কিন্তু ওরা তো চলে গেল।

—গেল। জানে বাবার এখনও জ্ঞান আছে। এখন কেউ চাবি সরাতে পারবে না। আমরাও না।

নন্দিনী হাসলে ঃ এত দিকেও তোর লক্ষ্য থাকে!

—থাকবে না! তুমি তো সেই কবে চলে গেছ। আমি যে ওদের সঙ্গে বাস করেছি।

—কি আছে লোহার সিন্দুকে জানিস?

বন্দনা ভারিক্কি ভঙ্গীতে বললে, কিছু কিছু জানি। মায়ের যত গহনা, আর সোনার বার, আর গাদা গাদা নোট, তার যত দরকারী দলিলপত্র। চাবি যে মারতে পারবে তারই কেল্লা ফতে!

নন্দিনী হেসে বললে, তুইও সেই তালে আছিস বোধ হয়!

জলের মেয়ে আলোকচিত্র ঃ ডি সোনা

বন্দনাও হেসে জবাব দিলে, কে নেই? তুমি নেই?

নন্দিনী জবাব দিলে না। দেওয়া নিরর্থক। সে যদি বলে লোহার সিন্দুকের কথা তার মনেই ওঠেনি, এই প্রথম বন্দনার কাছ থেকে শুনলে, কে বিশ্বাস করবে! এ রকম অবস্থায় চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর জন্যে দিনরাত্রির নার্স আছে। টেম্পারেচার নেওয়া, ঔষধ ও পথ্য দেওয়া এবং রোগীর অন্যান্য সমস্ত পরিচর্যা তারাই করে। সঙ্গে মেয়ে-বৌমা এরাও থাকে, পালা করে।

সর্বক্ষণ মৃত্যুঞ্জয় আচ্ছন্নের মতো থাকেন। মাঝে মাঝে একবার চোখ মেলেন। চারিদিকে চেয়ে কি যেন খোঁজেন, কি যেন দেখেন, আবার চোখ বন্ধ করেন। নাক ডাকে।

নার্স এসে টেম্পারেচার নিলে। উত্তাপ স্বাভাবিকে নেমে এসেছে। যন্ত্রের মতো একটি মেয়ে। টেম্পারেচার বেশি-কমে মুখে কোনো ভাবান্তর হয় না। চার্টে সময় আর উত্তাপটা টুকে রাখলে।

তারপরে ঔষধ।

ঔষধ খাইয়ে তারও সময় টুকে রাখলে।

তারপরে পথ্য।

পথ্য যখন খাওয়াতে এল মৃত্যুঞ্জয়বাবু চোখ মেলে চাইলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নার্সকে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

—নার্স।

প্রতিদিন মৃত্যুঞ্জয়বাবু এদের দেখেন। প্রতিদিন ভুলে যান। প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করেন, ওরা কে?

নন্দিনী ছুটে এল। বাবার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলছেন বাবা?

মাথা নেড়ে মৃত্যুঞ্জয় জানালেন, কিছু না।

—এখন কেমন আছেন?

—ভালো।

নার্স বললে, এখন টেম্পারেচারটা স্বাভাবিক।

হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় ছটফট করে উঠলেন।

নন্দিনী ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কি হচ্ছে বাবা? কষ্ট হচ্ছে?

—আমার চাবিটা?

চাবি! নন্দিনী চারিদিকে চাইলে। চাবি কিসের? কিন্তু তখনই মনে পড়ে গেল। বললে, আপনার বালিশের নীচেই তো রয়েছে।

—আমার হাতে দাও।

চাবিটা নন্দিনী মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দিলে। হাত দুটি মুঠিবন্ধ করে মৃত্যুঞ্জয় বুকের উপর রাখলেন।

তখনই চোখ বুজে এল। নাক ডাকতে লাগল।

ছোট বৌ বাপের বাড়ি থেকে ফেরেনি। বড় বৌ অনেক রাত্রে ফিরেছিল। জুয়ায় অনেক টাকা হেরে রাত্রে আর ঘুমোতে পারেনি। এখন ঘুমুচ্ছে। বন্দনার দিবা-নিদ্রা একটু চাই-ই। সেও ঘুমুচ্ছে। ভায়েরা অফিসে।

নন্দিনী নার্সকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি তো খাননি এখনও?

নার্স ঘাড় নাড়লে।

—আপনি খেয়ে আসুন। আমি রয়েছি।

নার্স খেতে গেল।

মৃত্যুঞ্জয় ঘুমুচ্ছেন হাতের মধ্যে চাবির থোলাটা আঁকড়ে। ধীরে ধীরে শিথিল মুঠির ফাঁক দিয়ে চাবিটা বিছানায় পড়ে গেল।

সেই চাবি। যার কথা বন্দনা বলছিল। যার উপর ছোট বৌ-এর দৃষ্টি আছে, কিন্তু বড়বৌ-এর সতর্কতায় পারছে না।

ওই লোহার সিন্দুকের চাবি। ওর মধ্যে সোনার বার আর থাকে-থাকে নোট সাজানো।

হঠাৎ নন্দিনীর কি যেন হয়ে গেল।

চট করে দরজার বাইরে একবার চেয়ে নিলে। কেউ কোথাও নেই। চাবিটা দিয়ে লোহার সিন্দুকটা খুলে ফেললে। বন্দনা মিথ্যা বলেনি। একটা গহনার বাক্স। ওতে বোধ হয় মায়ের গহনা আছে। ওটা নয়। তাড়াতাড়ি যতগুলো সম্ভব তাড়া-বন্দী নোট, আর সোনার বার আঁচলে ফেলে সিন্দুকটা বন্ধ করে দিলে। দ্রুতপদে নিজের ঘরে গিয়ে বড় সুটকেসটায় কাপড়ের নীচে সেগুলো রেখে দিলে।

তখনই ফিরে এসে চাবির থোলোটা মৃত্যুঞ্জয়ের বালিশের নীচে রাখতে যাবে এমন সময় মৃত্যুঞ্জয় চোখ মেলে চাইলেন।

ভয়ে নন্দিনীর মুখ ছাই-এর মত সাদা হয়ে গেল।

মৃত্যুঞ্জয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নন্দিনীর দিকে চেয়ে। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে নন্দিনী সেই দৃষ্টির সামনে।

—তুমি কে?

—আমাকে চিনতে পারছেন না বাবা? আমি নন্দিনী।

—তোমার মা কোথায়?

মা! নন্দিনী থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু তখনই মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ ফের বন্ধ হয়ে গেল। নাক ডাকতে লাগল।

বিকেল চারটে পর্যন্ত তন্দ্রা রইল।

তারপর এক সময় চোখ মেললেন। চারিদিকে চেয়ে কি যেন, কাকে যেন খুঁজলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তারা আসেনি?

—কারা?

—যাদের আসবার কথা ছিল।—বলেই যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। চোখ আবার বন্ধ হল।

বন্দনা চুপি চুপি বললে, ভুল বলছেন।

নন্দিনী বললে, দুপুর থেকেই। তখন মায়ের কথা জিগ্যেস করছিলেন।

—এতদিন পরে মায়ের কথা!

—হ্যাঁ।

চাবির থোলোর কথা নন্দিনী চেপে গেল।

মৃত্যুঞ্জয় আবার চোখ মেললেন: বিজন কোথায়?

—আপিসে।

—বিমান?

—সেও ফেরেনি। ফোন করব?

—না থাক।

মৃত্যুঞ্জয় আবার চোখ বন্ধ করলেন। একটু পরেই ছটফট করতে লাগলেন।

ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠল: কি হচ্ছে বাবা?

—আমার চাবিটা?

বন্দনা বললে, এই তো বালিশের তলায়।

—আমার হাতে দাও।

বন্দনা বালিশের নীচে থেকে বের করে তাঁর হাতে দিলে। তিনি মুঠোর মধ্যে করে বুকের উপর রাখলেন। চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে এসে বন্দনা হাসতে হাসতে নন্দিনীকে বললে, দেখলে?

—কি?

—সমস্ত ভুলের মধ্যেও চাবিটা কিন্তু ভুল হচ্ছে না।

—হুঁ।

—যেন ওটা রেখে যেতে হবে না। সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন!

—হ্যাঁ।

বন্দনা হাসল। তার সঙ্গে নন্দিনীও।

সন্ধ্যা বেলায় নার্স বললে, ডাক্তারকে একবার খবর দেওয়া দরকার। আমার ভালো ঠেকছে না।

শুনে ব্যস্তভাবে ডাক্তারকে খবর দেওয়া হল। তিনি এলেন। নাড়ী দেখলেন। বুক পরীক্ষা করলেন। মুখ গম্ভীর।

হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয়বাবু ছটফট করে উঠলেন।

কি হল?

—আমার চাবিটা?

বন্দনা তাড়াতাড়ি বালিশের নীচে থেকে চাবির থোলোটা বের করে মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দিলে। সেটা মুঠোয় করে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় যথারীতি বুকের উপর রাখলেন।

কিন্তু চোখ বন্ধ করলেন না। বড় বড় আরক্ত চোখে দুটো তারা কালো কালো ভাঁটার মতো ঘুরতে লাগল।

—ওরা আসে নি?

কাদের আসবার কথা ছিল কেউ বুঝতে পারলে না। সবাই চুপ করে রইল।

বিজন ভাবলে, যে-কাপড়ের কারবারীদের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের কারবার ছিল তারা বোধ হয়, বিমান ভাবলে, রেসের টিপ্‌স্ নিয়ে যে দুটি লোক প্রতি সপ্তাহে আসত তারা। নন্দিনী ভাবলে, আর কেউ নয় মায়ের কথা ভাবছেন উনি।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর চোখ ঘুরছে সেই অজ্ঞাত লোকটির খোঁজে বোধ হয়।

হঠাৎ মুখ কি রকম রক্তাভ হয়ে উঠল। মৃত্যুঞ্জয় চীৎকার করে উঠলেন: ড্যাম! স্টুপিড!

সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে ফেণা ভাঙল।

সব শেষ!

কিন্তু উন্মুক্ত দৃষ্টি লোহার সিন্দুকের দিকে নিবন্ধ। নার্স তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে দিলে। চাবির থোলো স্খলিত।

পরদিন লোহার সিন্দুক সকলের সামনে খোলা হল। ভিতরে জিনিসপত্র অগোছালো।। সকলেই বুঝলে। কিন্তু কেউ কিছু বললে না। মনে মনে পরস্পরকে সন্দেহ করতে লাগল।

শুধু চুপি চুপি বন্দনা এক সময় নন্দিনীকে বললে, তোমাকে আমি বলি দিদি, ছোটবৌদির চাবিটার দিকে দৃষ্টি আছে?

নন্দিনী সাড়া দিল না।

কমলার ফুলশয্যা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

।। যা হলে হতে পারতো ।।

বিয়ের পরে ফুলশয্যা না হ'লে অংগহানি হয় অজুহাতে দক্ষিণের বাড়ীর ঠানদি এসে রমেশকে রাজি করিয়ে গেলেন।

রমেশ সহজে ঘাড় পাততে চায়নি, বলে, আর বেশী কী অংগহানি হবে ঠানদি! বলে সমস্ত দেহটাই যখন গেল তখন আর একটা অংগ থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি।

তা কি হয় ভাই, যে পুজোর যে মন্তর।

ঠানদি, পুজোও দেখলাম; মন্তরও দেখলাম, কিছুই আর বাকি নেই। বিয়ে করতে বের হলাম শ্রীমন্তর সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে, ফিরে এলাম সব খোয়ানো কাঙাল।

কেন ভাই, কমলে কামিনী কি সংগে আসেনি।

রমেশ দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বলে, না আসলেই বোধ করি ভালো ছিল, ও হতভাগিনীকে এত গঞ্জনা সহ্য করতে হ'তো না।

এখন একটা যেমন তেমন ফুলশয্যা না হলে গঞ্জনার ভার যে আরও বাড়বে।

তা বটে। আচ্ছা সুশীলাকে রাজি করাও। সে মেয়ে কি আর মানুষ আছে—মাটিতে মিশিয়ে গেছে না। সেই যে কদিন আগে এসে বিছানা নিয়েছে, না বলেছে কথা, না দিয়েছে মুখে একটা দানা। দুই চোখ বুঝি এতদিনে চোখের জলে অন্ধ হ'য়ে গেল।

রমেশ বলে, তা তোমরা যদি ভালো বোঝো ব্যবস্থা করো—কিন্তু খুব সাবধান, ধুমধাম চলবে না।

ঠানদি জিব কেটে বলে, আবার ধুমধাম! নিতান্ত প্রথা রক্ষা না হ'লে নয়, তা-ই, নইলে কার প্রাণে আহ্লাদ বলো।

তারপরে একটু থেমে বললেন বেরজো যে আমার কি ছিল তোমরা তা বুঝবে না ভাই —এই বলে রমেশের স্বর্গত পিতা ব্রজমোহনের জন্য সময়োচিত অশ্রুমোচন তিনি করলেন।

॥ ২ ॥

শেষরাতে জেগে উঠে রমেশ দেখলো জানলা দিয়ে বিছানার উপরে এসে পড়া জ্যোৎস্নার ফালির সংগে মিশিয়ে আর এক ফালি ঘনীভূত জ্যোৎস্নার মতো নববধূ শ্লথ বস্ত্রে শিথিল কুন্তলে নিদ্রিত। এ কয়দিন ভালো ক'রে দেখবার অবকাশ পায়নি রমেশ, বিয়ের আগে শুনেছিল মেয়ে কালো, মুখ চোখের গড়নও সুন্দর নয়। কিন্তু আজ প্রথম সে আবিষ্কার করলো

নববধূ সুন্দরী। ভাবলো বিয়ে ভাঙানির দল অমন বলেই থাকে। সে ভাবলো ভালোই হয়েছে বিয়ের আসরে দেখলে আজকে এমন ক'রে আবিষ্কারের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'তো।

সে আস্তে আস্তে ডাকলো, সুশীলা।

সুশীলা জেগে উঠে, শাড়ী সামলে নিয়ে বললো, কি।

সুশীলা, আজ তোমার চুল বেঁধে দিয়েছিল কে?

প্রাসঙ্গিক উত্তর না দিয়ে সে বলল, আচ্ছা তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলে ডাকো কেন?

রমেশ এ প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝতে পেরে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

বধূ বললো, আমার নাম বদল হ'লেই কি আমার পয় ফিরবে? আমি তো শিশুকাল থেকেই অপয়মন্ত, না মরলে আমার অলক্ষণ ঘুচবে না।

হঠাৎ রমেশের বুক ধক ক'রে উঠল, কোথায় কী একটা দুর্মোচ্য প্রমাদ ঘটে গিয়েছে। রমেশ শুধালো, কেন শিশুকাল থেকেই তুমি অপয়মন্ত হ'লে কিসে?

নয় তো কি! আমার জন্মের আগেই বাবা মরেছেন, আমাকে জন্মদান ক'রে তার ছয়মাসের মধ্যেই আমার মা মারা গেছেন, মামার বাড়ীতে অনেক কষ্টে ছিলাম। হঠাৎ শুনলাম, কোথা থেকে এসে তুমি আমাকে পছন্দ করলে, দুইদিনের মধ্যেই বিয়ে হ'য়ে গেল, তারপরে দেখো কী সব বিপদ।

রমেশ বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো, এতক্ষণ সে উপুড় হ'য়ে শুয়ে বধূর কথা শুনছিল।

রমেশ কথা বলে না দেখে বধূ বলল, ঘুমোলে নাকি?

না।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রমেশ সে রাতের মধ্যে আর কথা বললো না। ফুলশয্যার ফুলের আস্তরণের মধ্যে থেকে অপ্রত্যাশিতে বিষধর নির্গত হয়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। রমেশের সন্দেহমাত্র নাই যে নববধূ তার বিবাহিত পত্নী নয়। সে ভাবলো হায় ভগবান, এই কথাটা যদি আজ সন্ধ্যাবেলা কেও জানাতে পারতো। এখন যে ফিরবার পথ বন্ধ!

॥ ৩ ॥

রমেশের কালরাত্রি প্রভাত হ'ল—কিন্তু দিনের আলো ফিরে এলো না তার চোখে। তার বোধ হ'ল উদয়ের দিগন্ত থেকে অস্তাচল অবধি কে যেন কালো ভুষা দিয়ে লেপে দিয়েছে—বিশ্বের যে লিপিকার মানুষের অদৃষ্টের বিড়ম্বনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করছে তারই প্রকাণ্ড দোয়াতের সমস্ত কালিটা যেন উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছে চরাচরের উপরে—কোথাও এতটুকু সান্ত্বনার শাদা নাই। নিঃসঙ্গ বৈঠকখানায় তক্তপোষের উপরে একাকী চিৎ হয়ে প'ড়ে—কি ভাবছিল রমেশ। ভাবনার ধারাও তার সুসংলগ্ন নয়—চিন্তার সূত্র হাজার জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে—জোড়া দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

এটুকু সে নিশ্চয় বুঝেছে কমলা তার পত্নী নয়, কিন্তু কার পত্নী, কার কন্যা, কি সূত্রে তার অদৃষ্টে এসে জুটলো সমস্তই অজ্ঞাত। সে ভাবছিল জানা দরকার, কিন্তু জেনেই বা কি লাভ, অদৃষ্টের স্রোতে ভেসে এসেছে তাই বলে তো ওই নিরীহ মেয়েটাকে অদৃষ্টের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া যায় না। একবার ভাবলো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্ধান করলে হয়, তখনি আবার মনে হ'ল—গতকল্য হলেও বা এই পন্থা অবলম্বন করা চলতো, কিন্তু ফুলশয্যায় পত্নীরূপে গ্রহণ করবার পরে এমন তঞ্চকতা করা নিতান্ত অন্যায়—আর কমলাই বা কি ভাববে—হয়তো ক্ষোভে অপমানে লজ্জায় আত্মহত্যা ক'রে বসবে। তবু জানা দরকার কার পত্নী, কার কন্যা।

এমন সময়ে কমলা প্রবেশ করলো। জনশূন্য বাড়ীতে নূতন বধূর যাতায়াতের বাধা ছিল না।

তোমার শরীর খারাপ নাকি? এই বলে হাত দিল স্বামীর মাথায়।

রমেশ দেখলো এতদিন পরে কমলার মুখে একটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতার আভা।

না, না, বেশ আছি, ব'সো।

তারপরে বললো, আচ্ছা, তুমি তো লেখাপড়া শিখেছ বলেছিলে, বেশ তোমার নাম বানান ক'রে লেখো দেখি।

তা বুঝি আমি পারিনে। আমার নাম বানান করা খুব সহজ—এই দেখো—বলে বড় বড় অক্ষরে লিখলো শ্রীমতী কমলা দেবী।

এবারে মামার নাম লেখো।

তাও পারি, বলে লিখলো শ্রীতারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

আচ্ছা গ্রামের নাম লেখো দেখি—

কমলা লিখলো ধোবাপুকুর।

কেমন পারিনি? তুমি ভাবছিলে কি লিখতে কি লিখবো।

না, না, তা ভাববো কেন, তবে কিনা ভাবছিলাম একবার পরীক্ষা করবো কতখানি কি জানো।

দুজনে এইভাবে কথা চলছে এমন সময়ে দক্ষিণের বাড়ীর ঠানদি এসে হাজির।

তাই বলি বউকে বাড়ীর মধ্যে খুঁজে পাইনে কেন। একেবারে বৈঠকখানায় হাজির। আমাদের সময়ে ভাই এমন হওয়ার উপায় ছিল না। দিনের বেলা হেঁসেল থেকে বেরোলে কর্তাটি ঠ্যাঙা দিয়ে ঠ্যাঙ ভেঙে দিতেন।

তারপরে রমেশের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই যে ভাই, আজ যে মুখে হাসি ফুটেছে। ফুটতেই হবে, ফুলশয্যার স্বাদই আলাদা। বুঝলে না ভাই সাত পাকই বলো আর কুশণ্ডিকাই বলো ফুলশয্যা না হলে কিছুই না।

নিজের অবস্থার সঙ্গে ঠানদির বিশ্লেষণের প্রভেদ লক্ষ্য ক'রে রমেশ এত দুঃখের মধ্যেও কৌতুক বোধ করলো—শুধালো হাসি কোথায় দেখলে ঠানদি।

মেঘ চাপা রোদ আর মন চাপা হাসি দেখা যায় না, অনুভব করতে হয়। ভুলে যাও কেন ভাই আমাদেরও এক সময়ে ঐ বয়স ছিল।

ঠানদির ঐ বয়সে অনুরূপ অবস্থায় কবে কি ঘটেছিল বিস্তারিত শুনবার পরে রমেশ বললো, যাও ঠানদি বউকে একটু ঘর-গেরস্থালি শিখিয়ে দাও, আত্মীয় বলতে এখন এক তুমিই। একক আত্মীয়তার গৌরবে স্ফীত ঠানদি কমলাকে ঠেলে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

রমেশ আবার দুশ্চিন্তার আবর্তে গিয়ে পড়লো—পাক খেতে খেতে ভাবলো এখন কি কর্তব্য?

রমেশ ভাবে এ কোন্ নিষ্ঠুর অদৃষ্ট এমন বিসম সূত্রে গ্রন্থি এঁটে দিল তাদের জীবনে। ভাবে এ তার পক্ষে একটা নির্মল কৌতুক, কিন্তু এদিকে যে দুটি অসহায় প্রাণীর প্রাণান্ত। এর পরিণাম কোথায় কিভাবে হবে কিছুতেই ভেবে পায় না সে। একবার ভাবে কমলার স্বামী নিশ্চয় ডুবে মারা গিয়েছে, আর তাকে যখন সে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছে সেইভাবেই চলুক না কেন, মিছে ঘাটাঘাটি ক'রে কী লাভ? বিধবা বিবাহ তো আইন ও শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু তখনি "পরস্ত্রী" শব্দটা চোরা পাহাড়ের মতো আঘাত করে তার সঙ্কল্পের গায়ে। নাঃ কিছুতেই না—চলতে পারে না। যে সম্বন্ধটা চিরকাল চলবে গোড়াতেই তাতে একটা বিসদৃশ রন্ধ্র রাখা কিছু নয়। এ বিষয়ে পরামর্শ করা যায় এমন লোক তো চোখে পড়ে না। হঠাৎ মনে পড়লো হেমনলিনীকে। না, না, তা সম্ভব নয়। নিজের গোপন কথা তাকে বলা চলে, কিন্তু এই অসহায় বালিকার কথা তাকে বলা চলে না। মেয়েরা মেয়েদের স্খলন কিছুতেই সহ্য করে না। তখনি হঠাৎ মনে পড়লো আজ আবার শয্যায় তাকে পত্নীরূপে পাশে স্থান দিতে হবে। যতক্ষণ না জানতো একরকম ছিল, কিন্তু এখন জানবার পরে আর কিছুতেই সম্ভব নয়। তখনি সে কর্তব্য স্থির ক'রে ফেলল।

বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বলল, কমলা, আমাদের একটা সম্পত্তি আছে, বাবার মৃত্যুর পরে সব বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়েছে, এখনি আমাকে সেখানে রওনা হ'তে হবে।

আজই?

হাঁ, এখনই।

ক'দিন পরে ফিরবে।

তা দিন দুই লাগবে। ঠানদি রাত্রে এখানে থাকবেন—ব্যবস্থা ক'রে যাবো।
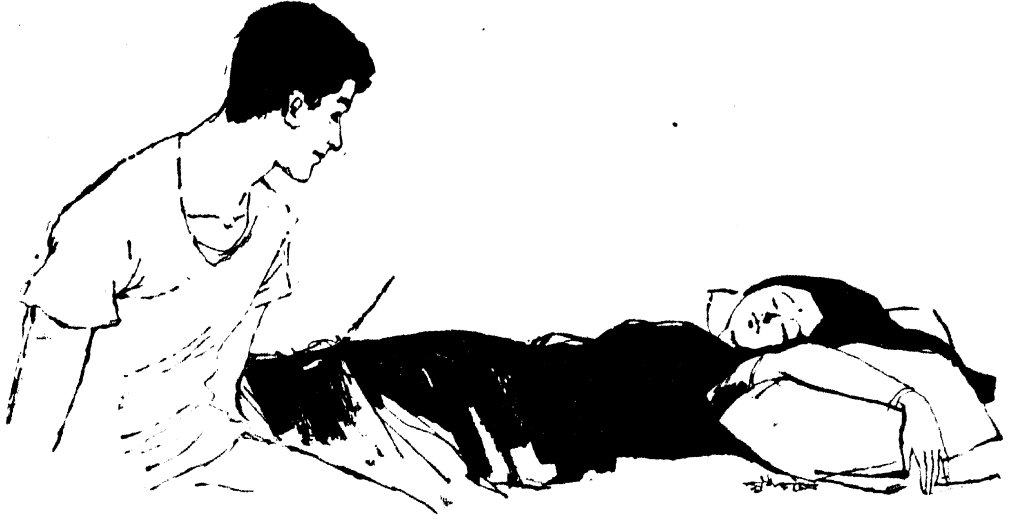
তবু রমেশ একটু দূরত্ব রক্ষা করেই চলতে চেষ্টা করে

আচ্ছা, এসো, কিন্তু দুদিনের বেশী দেরী ক'রো না।

না, আর বেশী দেরী হবে না।

রমেশ রওনা হ'য়ে গেল। মোটে দুইদিন, ফাঁসির আসামীর পক্ষে দুইদিন দুই বছর, অনেক কিছু ঘটতে পারে এই সময়ের মধ্যে।

॥ ৪ ॥

দিন দুই পরে রমেশ বাড়ী ফিরে এল। এই দুইদিনের নিঃসঙ্গতায় সে ভাববার অবকাশ পেয়েছে। সে স্থির ক'রে ফেলেছে যে, কমলাকে পত্নীর আসনে বসানো উচিত হবে না, নীতি, ধর্ম, আইন, সংসারের ভালো মন্দ যেদিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন—কমলাকে পত্নী বলে চালিয়ে দেওয়া নিতান্ত গর্হিত হবে। তবে এখন কর্তব্য কি? কর্তব্যের ঠিকঠিকানা খুঁজে পায় না সে। কমলাকে সব খুলে বললে এখনি একটা অনর্থ বাধবে, তাতে গ্রন্থি আরও জটিল হয়ে উঠবে। অথচ এমন দম্পতির অভিনয়ের জেরই বা টেনে চলা যায় কতদিন? এই সব বিষয় এই দুদিন সে উল্টে পাল্টে নানাভাবে চিন্তা করেছে। তারপরে তার হঠাৎ মনে হল কমলাকে নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়। এখানেও দু'জনে একা, মাঝে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর গ্রন্থি, সেখানেও দু'জনে একা হবে, মাঝে থাকবে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর গ্রন্থি। তবু এখানকার জীবনের নৈষ্কর্মের চেয়ে দেশ ভ্রমণের বৈচিত্র্য শ্রেয়ঃ—অদৃষ্টের নিষ্ঠুর গ্রন্থিটা ভুলে থাকা বোধ করি অসম্ভব হবে না। তারপরে? কিন্তু তারপরের কথা ভাববার অধিকার কি মানুষের আছে। যখন সে বিয়ে করতে চলেছিল—তখন কি এই তারপরের কথাটা মনের কোন একটা কোণেও ছিল? তবে এখনই বা তারপরের কথা কেন? অদৃষ্ট যে দুর্মোচ্য গ্রন্থি এ'টে দিয়েছে—ভবিতব্যের আঙুল হয়তো তা খুলে দেবে। কে বলতে পারে?

দেশ ভ্রমণের কথা শুনে কমলা আনন্দে নেচে উঠল, বলল—চলো।

রমেশ শুধালো, এখনি বের হবে নাকি?

ঈষৎ হতাশভাবে কমলা বলে, দেরী কিসের? অবশ্য দেরী নেই, কিন্তু বাঁধা-ছাঁদা তো করতে হবে।

কমলা পুনরায় উৎসাহ অনুভব করে—তা তো করতেই হবে।

এই বলে হঠাৎ এমন ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে যে এখনি সে গোছগাছ করতে লেগে যাবে।

রমেশ বলে, তবে সব গোছগাছ ক'রে নাও, পরশুদিন বেরিয়ে যাবো।

বাঙালীর কাছে দেশ ভ্রমণ মানেই পশ্চিম ভ্রমণ আর পশ্চিম মানে ইতিহাস ও কিম্বদন্তীর কুহেলিকায় বিচিত্র এক স্বপ্ন-রাজ্য। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে করতে দিল্লী আগ্রা গয়া কাশী প্রভৃতি যে কয়েকটি শহরের নাম জানা আছে তাই আবৃত্তি করতে থাকে কমলা! তারপরে যথাসময়ে তারা বেরিয়ে পড়ে পশ্চিম ভ্রমণে।

এলাহাবাদ থেকে অমৃতসর পর্যন্ত নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে তারা এসে কাশীতে একটা বাড়ী ভাড়া করলো, কমলা বলেছিল, আর ঘুরে বেড়াতে পারিনে, রমেশ বলল, আচ্ছা তবে এসো, এখানে কিছুদিন জিরিয়ে নেওয়া যাক। রানা-মহল্লায় রমেশ একটি বাড়ী ভাড়া করলো।

এদিকে রমেশের মূল সমস্যার কোন কিনারা মিলল না বরঞ্চ বিদেশে অপরিচিতের মধ্যে দু'জনের ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়লো। তবে ভরসার মধ্যে এই যে নূতন নূতন জায়গায়, কখনো স্টেশনের প্লাটফর্মে, কখনো প্রতীক্ষালয়ে, কখনো ধর্মশালায়, কখনো গাড়ীর কামরায় রাত্রি যাপন, এক শয্যায় শয়নের গুরুতর সমস্যাটা একরকম-কেটে যায়। তবু রমেশ একটু দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলতেই চেষ্টা ক'রে। সেটা এড়ায় না কমলার চোখে। একদিন সে হেসে বলেছিল, তুমি এমন দূরে দূরে থাকো, যেন আমি পরস্ত্রী।

রমেশ মনে মনে চমকে ওঠে, কিন্তু চমকটাকে চেপে দিয়ে হেসে উত্তর দেয়—সত্যি পরস্ত্রী ভাবলে কি আর দূরে রাখতাম।

তবে তাই ভাবো না কেন।

হাসির হাওয়ায় যে ঢেউগুলো উঠলো তা খুব রুদ্র নয়, তবে বুঝতে কষ্ট হয় না যে জল গভীর।

কমলা জ্বরে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়লো।

রমেশ বলল, ঝি রইলো, ভিখনু রইলো, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

আবার ডাক্তার কেন, এমন কী হয়েছে?

সেটা ডাক্তার এসে বুঝবে, বলে রমেশ বেরিয়ে গেল।

পাড়ায় খোঁজ ক'রে জানলো যে ডাক্তার চক্রবর্তী সবচেয়ে বড় ডাক্তার। ডাক্তার চক্রবর্তীর ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে বাড়ীর দরজায় এসে দেখল, দেবনাগরী ও ইংরাজী অক্ষরে লিখিত আছে "ডক্টর এন চক্রবর্তী।"

ডাক্তারের ঘরে ঢুকে রমেশ চমকে ওঠে, আরে নলিনাক্ষ যে ?

নলিনাক্ষ ডাক্তারও চমকে ওঠে, রমেশ, তুমি কোত্থেকে।

সে অনেক কথা ভাই।

ব'সো ব'সো।

তার চেয়ে তুমি ওঠো, আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

নলিনাক্ষ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, বিয়ে করেছ নাকি ? কতদিন হ'ল ?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলো রমেশ, কেন, তুমি বিয়ে করোনি নাকি ?

অপরের মুখে চোখে মনস্তত্ত্বের লীলা লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা রমেশের থাকলে সে দেখতে পেতো যে রমেশের প্রশ্নে নলিনাক্ষের মুখমণ্ডলে চকিতের মধ্যে একটা বিষাদের ছায়া খেলে গেল—

সে বলল, না, এখনো করা হয়নি।

গাড়ী ক'রে দু'জনে চলেছে। অনেক-দিন পরে দুই বন্ধুতে দেখা। বাল্যকালে রংপুরে ইস্কুলে দুইজন একসঙ্গে পড়তো। তারপরে ছাড়াছাড়ি।

রমেশ বলল, তোমাকে পেয়ে পুনর্জীবলোকং প্রবিশামি। নতুবা একলা বিদেশে কি করতাম।

অন্য ডাক্তার দেখাতে।

ডাক্তার তো অনেক মেলে—কিন্তু বন্ধু পাই কোথায় ?

তারপরে শুধোয়, নিতান্ত সন্ন্যাস ব্রত যদি না নিয়ে থাকো তবে বিয়ে ক'রে ফেলো, আর বিলম্ব ক'রো না।

অন্যমনস্কভাবে সে উত্তর দেয়, না, আর বিলম্ব করবো না।

ওষুধপত্রের ব্যবস্থা দিয়ে ডাক্তার ফিরে গেলে কমলা বলল, আর ডাক্তার ডেকো না।

কেন বলো দেখি, রমেশ শুধায়।

কমলা উত্তর দিতে চায় না, অবশেষে অনেক পীড়াপীড়িতে বলে, কে কোথাকার একটা অপরিচিত মানুষ এসে গায়ে হাত দেবে, আমার ভালো লাগে না।

পাগল কোথাকার ? নাড়ী না দেখলে, বুক পরীক্ষা না করলে রোগ ঠাওরাবে কি ক'রে ?

আর রোগ ঠাউরে দরকার নেই, বলে সে পাশ ফিরে শোয়।

রমেশ বলে, লেডী ডাক্তার এসে আমার গায়ে হাত দিয়ে যদি পরীক্ষা করতো, সত্যি বলছি আমার মন্দ লাগতো না।

সে তো বুঝতেই পারছি। নিজের স্ত্রীর কাছে যাদের ঘেষতে ইচ্ছা করে না পরস্ত্রীর হাওয়া তাদের মধুর লাগবেই।

এই দেখো রাগ করলে তুমি ? নলিনাক্ষ আমার বাল্যকালের বন্ধু।

আমার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ?

নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে। তুমি রুগী, সে ডাক্তার।

থাক থাক। তাকে আর ডাকতে হবে না, আমি আদবে সহ্য করতে পারি না।

কি সহ্য করতে পারো না, লোকটাকে না তার ওষুধ।

ওষুধ তো এখনো খাইনি।

কেবল বাঁশী শুনেছ! বলে রমেশ।

নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বুঝি এইভাবে ঠাট্টা করে, বলে কেঁদে ফেলে কমলা।

রমেশ এবারে সত্যই অপ্রস্তুত হয়—কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না প্রথম দৃষ্টিতেই নলিনাক্ষকে ভালো না লাগবার কারণ কী কমলার।

কমলা সুস্থ হয়ে উঠেছে, তবে আরও কিছুদিন ওষুধ খাওয়া দরকার। কমলার অনিচ্ছা থাকাতে নলিনাক্ষকে আর বাড়ীতে নিয়ে আসেনি রমেশ, তার বাড়ীতে গিয়ে ওষুধপত্র নিয়ে আসে। সেদিন নলিনাক্ষর ঘরে ঢুকে রমেশ চমকে উঠল, হেমনলিনী ও অন্নদাবাবু।

একি রমেশ তুমি এখানে কোথা থেকে—শুধালেন অন্নদাবাবু।

নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি হে ? সেই যে আসছি বলে চায়ের টেবিল থেকে উঠে গেলে তারপর এই ক'মাস পরে হঠাৎ এখানে দেখা।

ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে আমার জীবনে তাই আপনাদের সংবাদ নিতে পারিনি।

এতক্ষণে সে হেমনলিনীর দিকে তাকালো, দেখলো, বসন্ত শেষের ফুল ঝরে যাওয়া মাধবীলতার মতো তার ক্ষীণ অবস্থা। ছোট একটি নমস্কার ক'রে শুধালো, কেমন আছেন ?

হেমনলিনী বলে, ভালই আছি।

হেমনলিনীর প্রসাদ অর্জনের আশায় রমেশ বলল, ইতিমধ্যে আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে।

বলো কি রমেশ!

শুধু তাই নয়—নৌকাডুবির দুর্ঘটনায় পরিবারের অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয়ও ডুবে মারা গিয়েছেন বাবার সঙ্গে।

কেমন বাবা, আমি বলেছিলাম না যে একটা বড় রকমের বিপদ কিছু ঘটেছে—নইলে রমেশ বাবুর তো এমন নীরব থাকা স্বভাব নয়।

তা বলেছিলে বটে মা।

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার আশায় রমেশ বলল, নলিনাক্ষ বুঝি আপনাদের পূর্ব পরিচিত ?

অপূর্ব পরিচিত হে, অপূর্ব পরিচিত। এখানে বেড়াতে এসে হেম অসুস্থ হ'য়ে পড়েন, তখন থেকেই পরিচয়ের সূত্রপাত। ক'দিনই বা—কিন্তু মনে হয় যেন কতকালের পরিচয়। দেবতুল্য লোক হে; দেবতুল্য লোক।

অন্নদা বাবুর মুখে নলিনাক্ষর এ হেন প্রশংসা কেন জানি রমেশের কানে কটু লাগলো।

হেমনলিনী বলল,—মনে হচ্ছে আপনারও ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরিচয় আছে ?

অনেককালের পরিচয়—বলে প্রবেশ করলো নলিনাক্ষ। আপনাদেরও সঙ্গেও দেখছি রমেশের পরিচয় আছে ?

অন্নদাবাবু বলেন, আছে বই কি ? মাঝখানে ও'র জীবনে কতকগুলি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে তাই সাময়িক ছাড়াছাড়ি হয়েছিল।

তারপরে বলেন, নিশ্চয় শুনেছেন যে, হঠাৎ নৌকাডুবিতে ও'র পিতা ও আত্মীয়েরা ডুবে মারা গিয়েছেন!

চমকে উঠে নলিনাক্ষ বলে, কই আমাকে তো কিছু বলেনি। তাছাড়া এখানে এসেও তো বিপদ কম যাচ্ছে না। নিউমোনিয়ার মতো হ'য়ে পড়েছিল ওর স্ত্রীর ?

স্ত্রীর ? কার স্ত্রীর! অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে জড়িত প্রশ্ন করেন অন্নদাবাবু।

হেমনলিনী নীরব প্রশ্নে তাকায় রমেশের মুখে।

রমেশ সমস্ত সঙ্কোচ সমস্ত সন্দেহ দুই হাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলে, আমার স্ত্রীর। ঐ দুর্ঘটনার মুখেই বিবাহ, তাই কাউকে সংবাদ দিতে পারিনি।

অন্নদাবাবু গম্ভীর হয়ে রইলেন—কোন কথা বললেন না।

হেমনলিনী হাসবার চেষ্টা করে বলল, অভিনন্দন জানাবারও সুযোগ পেলাম না, রমেশবাবু। একদিন নিমন্ত্রণ করুন, আপনার স্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে আসি।

রমেশ বলল, তিনি আর একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই আহ্বান করবো—যদি অবশ্য দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দেন।

অন্নদাবাবু সে কথার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না, নলিনাক্ষকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমাদের সারনাথ দেখিয়ে আনবার কি হ'ল ?

বেশ তো চলুন না আজ বিকালেই। কিন্তু তার আগে রমেশকে বিদায় ক'রে নিই।

ঔষধ ও ব্যবস্থা নিয়ে রমেশ যখন ফিরে রওনা হল, তার মনে হল তার মতো এমন নিঃসঙ্গ লোক সংসারে বুঝি আর দুটি নাই। সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণের সঙ্গী যার নাই সেই সত্যকার হতভাগ্য।

কয়েকদিন পরে রমেশ দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিল, হঠাৎ শুনতে পেলো—রমেশ যে, এসো, এসো।

অন্নদাবাবু ও হেমনলিনী।

আশা করি তোমার স্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

সুস্থ হয়ে উঠেছেন, কিন্তু এখনো সবল হননি, আরো কিছুদিন লাগবে।

হেমনলিনী বলল, তারপরে আমাদের নিমন্ত্রণ করতে ভুলবেন না যেন।

নিশ্চয়ই নয়।

রমেশ, তোমার কি খুব তাড়া আছে? তবে ব'সো। দেখো রমেশ, এই কাশীর মতো জায়গায় এলে বুঝতে পারা যায় যে হিন্দু ধর্মটা এখনো সজীব।

রমেশ ভাবলো এ কথাটা ব্রাহ্ম অন্নদাবাবুর মুখে নতুন বটে। কতবার তাঁর কাছেই সে শুনেছে, হাঁ এক সময়ে প্রাচীনকালে উপনিষদের যুগে হিন্দুধর্মে প্রাণের লক্ষণ ছিল—কিন্তু আজ সমস্তই প্রাণহীন, সমস্তই নির্জীব।

দেখো গঙ্গার পবিত্রতা স্বীকার না করলেও তার ঐতিহ্য না মেনে তো উপায় নাই।

রমেশ ভাবলো, অন্নদাবাবুর এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের কারণ কি। কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবতে হ'ল না—শীঘ্রই রহস্যের কিনারা মিলল।

রমেশকে পাশে বসিয়ে অন্নদাবাবু বললেন, তোমাকে একটা সুখবর দিই। নলিনাক্ষবাবুর সঙ্গে হেমের বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছে।

সময়োচিত সংকোচে হেমনলিনী মুখ নীচু ক'রে রইলো।

এমন মানুষ হয় না হে, তোমার হিন্দু তবু একটা মানুষের মতো মানুষ।

রমেশ বলল—আজ্ঞে হাঁ, মানুষ হিসাবে নলিনাক্ষ সত্যি বড়।

তারপরে হেমনলিনীকে বলল, আপনাকে অভিনন্দন জানাবার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হলাম।

তাই বলে কমলা দেবীকে অভিনন্দন জানাবার সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না হই।

অবশ্যই হবেন না, সেদিন আপনাদের তিনজনকেই নিমন্ত্রণ করবো।

রমেশ স্ত্রীর অসুস্থতার অজুহাতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো—গঙ্গার ঘাটের হাজার হাজার লোকের মধ্যে তার মতো অসহায় সেদিন আর কেউ ছিল না। নদীর এক কূল ভাঙে, মানুষের ভাগ্য যখন ভাঙে তখন একেবারে দুই কূল ভেঙে পড়ে।

॥ ৫ ॥

রমেশের আমন্ত্রণে হেমনলিনী ও অন্নদাবাবু এসেছেন, নলিনাক্ষ এখনো এসে পৌঁছায়নি। অন্নদাবাবু বলেছিলেন ডাক্তারের ঘড়ি চলে রুগীর সুবিধা অসুবিধা অনুসারে। তবে নলিনাক্ষ এলো বলে, সে বলল আপনারা এগোন, আমি আসছি।

অন্নদাবাবু ও হেমনলিনীর সঙ্গে পরিচয়ের কথা কমলাকে জানিয়েছিল রমেশ—আর সেই সঙ্গে জানিয়েছিল হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষর আসন্ন বিবাহের সংবাদ।

কমলা বলেছিল হেমনলিনী দেবীকে অভিনন্দন জানাতে মন সরছে না।

কেন বলো তো?

তোমরা যাই বলো, এই নলিনাক্ষ ডাক্তারকে আমার ভালো লোক মনে হয় না।

রমেশ হেসে উঠে বলেছিল—এ যে নতুন কথা। কাশীর লোকে তাকে একটা ছোট-খাটো বিশ্বনাথ বলে মনে করে।

নকল বিশ্বনাথ ভক্তির পাত্র নয়।

রমেশ বলে, কমলা তোমার এই উষ্মার কারণ আজো বুঝতে পারলাম না। নলিনাক্ষর ওষুধগুলো কি খুবই তিতো।

তাদের এ তর্কের মীমাংসা হওয়ার নয়।

হেমনলিনী ও কমলা পাশাপাশি বসে সুখ দুঃখের কথা বলছে। অল্প বয়সে সুখের কথাই বেশী।

কমলা দেবী, আপনার সৌভাগ্য যে রমেশবাবুর মতো স্বামী পেয়েছেন।

আর কাশীর লোকে একবাক্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাবে—নলিনাক্ষবাবুর মতো স্বামী লাভে।

কমলা মত বদলেছে কিনা জানি না তবে বলল তো ঐ রকম কথা।

মা কমলা তুমি আর একটু সুস্থ হ'য়ে উঠলে দুজনে মিলে চুনারে যাও। ওরকম জলটি ভারতবর্ষে আর কোথাও পাবে না।

হেমনলিনী হেসে বলল—ঐ আরম্ভ হ'ল বাবার জল আর হাওয়া।

হাওয়া তো এখনো আরম্ভ করিনি।

তবে আর আরম্ভ ক'রে কাজ নেই।

আচ্ছা তবে থাক।

তারপরে রমেশকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, দেখো তোমাদের উপর দিয়ে দুর্ঘটনা কম যায়নি, কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না। এই দেখো না নলিনাক্ষ তাকে দেখলে কি মনে হয় প্রকান্ড দুর্ঘটনার ঝড় বয়ে গিয়েছে তার উপর দিয়ে।

গিয়েছে নাকি, শুধায় রমেশ।

কেন, তোমাকে কিছু বলেনি?

না।

বাবা, সবাইকে তিনি ব্যক্তিগত দুঃখের কথা বলে বেড়ানো ভালো মনে করেন না।

তা বটে। তবে আমাকে বলেছে। অবশ্য আমাকে বলতেই হবে। আগের বিয়ের কথা চাপা দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব [illegible]তো উচিত নয়।

বিস্মিত রমেশ শুধায়—নলিনাক্ষ কি আগে একবার বিয়ে করেছিল নাকি?

করেছিল বই কি, তবে সে মেয়েটি জীবিত নেই।

মারা গিয়েছে? কি হয়েছিল?

ঐ যে বললাম দুর্ঘটনা!

কি ব্যাপার খুলে বলুন তো, বলে রমেশ।

এখানেও তাঁর মনুষ্যত্বের প্রকাশ, যিনি মানুষ হন তাঁর ষোল আনাই মানুষ। গোড়াতে ভেবেছিলেন বিয়ে করবেন না, দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করবেন। কিন্তু শেষে মায়ের চোখের জল আর সহ্য করতে পারলেন না, দেশে গিয়ে মাতুলালয়ে পালিত একটি গরীবের মেয়েকে হঠাৎ বিয়ে ক'রে ফেললেন।

রুদ্ধশ্বাসে রমেশ শুধায় তারপরে?

বধূকে নিয়ে ফিরবার পথে অতর্কিত কালবৈশাখীর মুখে প'ড়ে নৌকাডুবিতে মেয়েটি মারা গেল।

কমলার মুখের দিকে তাকাবার সাহস হল না রমেশের—জিজ্ঞাসা করলো এ কতদিন আগেকার কথা।

তা মাস তিনেক হবে।

হেমনলিনী বলল—বাবা—ও'দের বোধহয় বিশ্বাস হচ্ছে না, বড়ই নাটকীয় মনে হচ্ছে।

বিশ্বাস না হলে চলবে কেন? মেয়ের নাম, তার মাতুলের নাম, গাঁয়ের নাম, সমস্তই বলেছিল, এমন কি পুলিশের যে থানায় ফার্স্ট ইনফরমেশন দিয়েছিল তাও জানিয়েছে—নইলে হেম বিয়ে করতে রাজি হবে কেন?

পাহাড়ে পথে ঘুমের ঘোরে যেন চলেছে রমেশ—সে পথও বুঝি শেষ হয়ে এলো! শুধালো, গাঁয়ের নাম?

সে এক বিচিত্র নাম শুনলে হাসি পায়—বলে হেমনলিনী।

অন্নদাবাবু বলেন—ধোবাপুকুর।

এই যে এসো এসো নলিনাক্ষ, তোমার কথাই হচ্ছিল—বলেন অন্নদাবাবু।

নলিনাক্ষ ঘরে ঢুকেই বলে উঠলো একি, একি, উনি মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন যেন।

কথাটা সত্য, কমলা মূর্ছিতা, কেউ লক্ষ্য করেনি।

এবারে সকলে সচেতন হয়ে উঠল—জল! পাখা! ওডি কোলোন!

নলিনাক্ষ রুগীকে ধীরভাবে পরীক্ষা ক'রে বলল—ভয়ের কারণ নাই, শক পেয়েছেন।

কেন বাবা তুমি ঐ নৌকাডুবির ঘটনা বলতে গেলে, উনি সবে গুরুতর অসুখ থেকে উঠেছেন।

এমন যে হবে বুঝতে পারিনি মা।

একি, একি, রমেশ তুমি এমন কাঁপছ কেন?

রমেশ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, তখনি আবার ভেঙে গিয়ে বসে পড়লো। সকলে দেখলো তার মুখ শাদা কাগজের মতো বিবর্ণ।

মেয়ে একই সহরের, যদিও একই পাড়ার নয়। তেমনি আবার সহরটিও ছোট, পাড়ায় পাড়ায় বিশেষ দূরত্ব নেই। কাজেই দেখাশোনা, মেলামেশা হয়ে এসেছিল বেশ খানিকটা। শৈশবে, কৈশোরে। অবশ্য দুটি পরিবারের মধ্যে পূর্ব থেকেই খানিকটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, বলেই, পাড়া ডিঙিয়ে দু বাড়ির মধ্যে যাতায়াত ছিল বলেই।

তারপর যেমন হয়, অবহমান কাল থেকে যেমন হয়ে আসছে—

"তোমার সুবোকে আমায় দিতে হবে দিদি, আমার দ্বিজুর জন্যে বলছি। ও মেয়ে আর আমি অন্যত্র যেতে দিচ্ছিনে।" "সে তো ওর ভাগ্য ভাই। অত ভাগ্যের কথা ভাবতে পারা যায় না বলেই, ছেলে দুটিতে ঐ রকম গলাগলি খেলা করে জামরুল তলাটিতে, দৃষ্টি গিয়ে পড়ে, আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না তো চোখ। তবে বলব যে, বলবার ভরসা পাব তবে তো।"

তারপর এইভাবেই একদিন শুরু হয়ে, এইভাবেই চলে কথা। এদিকে ওঁদের গল্পের আসর আরও পাঁচজনকে নিয়ে, ওদিকে ওদের খেলাঘর, পাড়ার আরও পাঁচটি জোটে—কর্তা-গিন্নী ছেলেমেয়ে নিয়ে খেলাঘর, কিংবা পাঠশালা, কিংবা চণ্ডীমণ্ডপের দুর্গাপূজোর মিটিং; যেদিন যেমন মনের হাওয়া বয়। গল্পের আসরেও নানা-রকম শাখাপ্রশাখা বেরোয় গল্পের, তবে যতই না কেন বেরুক, শেষ সেই দু'তিনটি কথায় —"কী সুন্দর!...কী চমৎকার মানায় দুটিতে!"

সবারই যে অন্তরের কথা এমন বলা যায় না; তবে বসু-গিন্নীর মনটি বড় ভালো, পান-জর্দাও বড় মিষ্টি, সবাই এ-দুটির খাতির রাখবার চেষ্টা করে একটু। আর, দুটো মুখের কথা বের করে দিতে লাগেই বা কার কি?

হবে যে আশামাফিক মানানসই এমন নয়ও তো। তাই কথাগুলো আরও লাগে ভালোই।

আগে সুবোর কথাই ধরা যাক। ওর পুরো নাম সুবর্ণা। সুবর্ণা যে সুন্দরী একথা আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি।

প্রথমে রঙের কথাই ধরা যাক। ওর বাপ-মা পর্যন্ত না মেনে পারেন না যে ওখানে ওঁদের আন্দাজে ভুল হয়ে গেছে। তারপর নাক, মুখ, চোখ। কোন বিশেষত্ব নেই, নাকটি বরং মাঝখানে একটু চাপাই। হয়তো কিছু না থাকলেও এক একটা মুখে যেমন একটু মিষ্টতা লেগে থাকে সেটুকু আছে; হয়তো তেমন চোখে দেখলে সেটা আর একটু স্পষ্টও হয়ে ওঠে, কিন্তু সে তো এমন কিছু নয়।

অপর পক্ষে দ্বিজেন রীতিমতো সুন্দর; যৌবনে এসে সে এখন সুপুরুষ।

বঙ্কিম যে বলেছেন ছেলেবেলার ভালোবাসায় একটা অভিশাপ আছে, সেটা খুবই সত্য। এবং আরও ব্যাপকভাবেই সত্য, শুধু প্রতাপ-শৈবলিনী অর্থেই নয়।

যে সময় চোখে নূতন রং লাগে, সাদা-কালোর প্রভেদ বুঝতে দেয় না, শৈশব-কৈশোরের সেই মাহেন্দ্র লগ্নে দ্বিজেনও ভালোবেসেছিল সুবর্ণাকে। দু বাড়ির আলোচনায়, খানিকটা [illegible] দিয়েও তো যাচ্ছিল। বেশ ভালো লাগত ওকে দেখতে, ওর কথা ভাবতে। তারপর স্কুল যাবার খানিকটা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে অভিশাপটা আস্তে আস্তে এসে পড়তে লাগল।

এরপর দ্বিজেন যখন ভালো করে বুঝল যে সুন্দর তেইশ বৎসরের যুবক, কলকাতার কোন এক কলেজের ওপরতলার ছাত্র, তখন তার ভালোবাসার অভিশাপ সম্পূর্ণ।

ছেলেবেলার ভালোবাসার কথা বলছি। এমনি বয়সের সব ভালোবাসা তো একের জায়গায় পাঁচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য কলকাতা জায়গা বলেই, মফঃস্বলের এক ছোট সহরে এত ব্যাপক বিস্তৃত ভালোবাসার সুযোগ বা অবসরই বা কোথায়? ও ভালোবাসে ওর কলেজের ছাত্রী সরমা হালদারকে। দুজনে একই ইয়ারে পড়ে, যদিও একই

শ্রেণীতে নয়; দ্বিজেন হল, গণিতের ছাত্র সরমা ইতিহাসের। কিন্তু ইতিহাস-গণিতের দূরত্ব অন্যদিক দিয়ে যতই দুরতিক্রম্য হোক, ভালোবাসার পক্ষে তো কিছুই নয়; খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে ওর সঙ্গে।

সরমার বাবা ভারত সরকারের দপ্তরে কাজ করেন। বড় কাজ, তবে বদলি হয়ে বেড়াতে হয়। পুণাতে ছিলেন, বছর-খানিক হল কলকাতায় বদলি হয়ে পার্ক-সার্কাসের দিকে সাহেব পাড়ায় বাড়ি নিয়ে রয়েছেন। নিজের গাড়ি আছে; সরমা তাতেই কলেজে যাওয়া-আসা করে।

কোন কোন দিন তাতে করেই দ্বিজেনও যায় ওদের বাড়ি, নয়তো ট্রামেবাসেই। পরিবারটি দিল্লী-বোম্বাই-লক্ষ্ণৌ-পুণা ঘুরে একটু সাহেবী ভাবাপন্ন। এদিকে মাঝারি গোছের পরিবার; সরমার বাবা, মা, দুই-ভাই, তিনটি বোন, বড় ভাজ, তার দুটি ছেলে মেয়ে। সরমার দাদা ডাক্তার লক্ষ্ণৌ হাসপাতালের, কিছুদিন হল বিলাত থেকে বড় খেতাব নিয়ে আসতে গেছে।

স্মার্ট ছেলে, কলেজেও ভালো, চেহারাটাও রয়েছে, দ্বিজেন বেশ ভালো করেই মিশে গেছে পরিবারটির সঙ্গে।

এমন অবস্থায় এসব পরিবারে যেমন হয়ে থাকে, সরমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধের সূত্রটুকু স্বীকৃত হয়ে গেছে। দ্বিজেনের বাড়ির অবস্থাও মন্দ নয়। মফঃস্বল সহরের পরিবার বলে যে ত্রুটিটুকু রয়েছে, ছেলেকে একবার বিদেশ ঘুরিয়ে আনলে সেটুকু যাবে চ'লে। এটা ও'দের ভবিষ্যৎ প্ল্যানের মধ্যে এসেও গেছে।

সবই ঠিক, বেশ এগিয়েও চলেছে দ্বিজেন, তবু মাঝে মাঝে পা যাচ্ছে বেধে।

এটা শুরু হয়েছে যেদিন সরমার দাদা বিলাত যাওয়ার আগে স্ত্রীপুত্র কন্যাকে লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় নিয়ে এল, তারপর থেকেই। ভাজ সরোজিনীর সঙ্গে এল তার ছোট বোন মৃণাল। দ্বিজেনের মনে হল সে এতদিন থেকে যা খুঁজছিল যেন এইবার পেল। প্রকৃত ভালোবাসার, প্রথম দৃষ্টিতেই ভালোবেসে ফেলার, না বেসে উপায় না থাকার যা লক্ষণ আর কি।

অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি। সরমার চেয়ে বয়সেও কম। তারপর সরমার রূপের যেমন একটা তীব্রতা আছে, মৃণালের তা একেবারেই নেই। নরম, একটু লাজুক, এক নজরেই ভালোবেসে ফেলার ঝোঁকে সে পদ্যটা লিখে ফেলল দ্বিজেন (সরমাকে নিয়েও লিখেছে, তার আগে স্কুলে সুবর্ণাকে নিয়েও লিখেছিল)। তাতে মৃণালকে গলা পর্যন্ত সমস্তটা পদ্মের ডাঁটা মৃণাল এবং তার ওপরের বাকিটুকু ফুটন্ত শতদল বলে কমপ্লিমেন্ট দিল। অবশ্য কবিতাটা হাতে দিল না, নিজের মনের ভাবটা গুপ্তই রাখল, কিন্তু কয়েকদিন ধ'রে অবস্থা নিতান্ত সঙ্গীন গেল।

তবে মৃণাল এসেছিল ওর জীবনে যেন ক্ষণ-বসন্ত রূপে। গোনা ঠিক সতেরোটি দিন ছিল বোনের বাড়িতে—যেদিন চলে গেল, বিকালের গাড়িতে যায়, সে হিসাবে পুরো সতেরও নয়—তারই মধ্যে বর্ণে গন্ধে সঙ্গীতে ওর মনে একটা বিপ্লব বাধিয়ে, পরে দিন কতকের জন্য মনটাকে একেবারে বর্ণ-গন্ধ-সঙ্গীতহীন মরুভূমি করে দিয়ে গেল চলে।

আবার মনটা এসে সরমায় আগেকার মতো বসতে কিছু দেরি হল। তবে একবার যখন বসল, একটানাভাবেই চলল। কৃষ্টিসম্পন্ন অভিজাত পরিবার, আত্মীয়-স্বজনের যাওয়া-আসা আছে, নূতন নূতন রূপের ঢেউয়ের ধাক্কা লাগছে, সরমার ওপর ভালোবাসাটা ট'লেও যাচ্ছে একটু-আধটু ক'রে, তবে স্থায়ী কোনও ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে না। এই করে বছর খানেক কেটে গেল।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, সরমা ইতিমধ্যে করেছে কি। উত্তরটা এক কথাতেই দেওয়া যায়। ভালোবেসেই যাচ্ছে সরমা তার নিজের পদ্ধতিতে। কথাটা হচ্ছে, ভালোবাসার আবার প্রকার-ভেদ আছে। এক ভালোবাসা নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট; সরমার তাই। দ্বিজেন এদিকে ক্রমাগত নিত্য-নূতনের মধ্যে দিয়ে ভালোবাসাটাকে রীতিমতো একটা আর্টের পর্যায়ে তুলে ধরেছে। আর্টের, বিশেষ করে যে ভালোবাসা আর্টের স্তরে উঠে গেছে তার একটা শক্তি হচ্ছে সে একই সময়ে আত্মপ্রকাশ আর আত্মগোপন—দুটোতেই সমর্থ। দ্বিজেন এই শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠায়, এই যে এতগুলি মুখ এল-গেল ওর মনে এর বার্তা গোপনই রইল সরমার কাছে, সে দেখল ভালোবাসার প্রদীপটি নির্ঘাত নিষ্কম্পই রয়েছে দ্বিজেনের বুকে; নিশ্চিন্তই রইল। আর্ট হল জয়ী।

এই সময় ওর জীবনে একটা দিক পরিবর্তনের অবসর এল। ওরা দুজনেই পাস ক'রে কলেজ থেকে বেরিয়ে এল। এবং সরমার পিতা ওদের বিবাহের প্রস্তাবটা তুললেন। তার সঙ্গে দ্বিজেনকে বিদেশে পাঠাবারও। দ্বিজেন প্রায় রাজিও ছিল; আর্টের পেছনে পড়ে থাকার একটা ক্লান্তিও তো আছে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত, কিন্তু এই সময় লিসা এসে উপস্থিত হল।

লিসার সঙ্গে পরিচয় হল সরমাদের বাড়িতেই। বাঙালীর মেয়েই, ওর নাম শীলা। সেইটেই উলটে লিসা হয়ে গেছে। শোনা যায় নাকি একটা কারণও আছে, ওর ঠোঁটের হাসি নাকি মোনালিসার হাসি। সরমাদের সঙ্গে লিসাদের পরিচয় এইখানেই এবং এই ক'দিনের মাত্র। ওর পিতা ডাক্তার বরাট কলকাতারই লোক, এইদিকেই ফিরিঙ্গী পাড়াতে একটা বাসা বাড়িতে থেকে প্র্যাকটিস করছিলেন, তারপর একটা বাড়ি কিনে সরমাদের প্রতিবেশী হয়েছেন।

মোনালিসার রহস্য শুধু তার ঠোঁটের হাসিটুকুতে, লিসা সর্বাংশেই রহস্যময়ী। বাহ্যত ও যাকে ইংরাজীতে বলা যায় গ্ল্যামারাস তাই। রূপে ভঙ্গিতেও যেন চারিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলে নিজেকে। কিন্তু তার পাশেই এমন আত্ম-সংহত, এমন নির্লিপ্ত সে, মনে হয় ওর দেহ-মনের মাঝখানটিতে একটা খুব শক্তিশালী চুম্বক আছে এবং তা লিসার সমস্ত সত্তাটিকে নিজের চারিধারে আকৃষ্ট ক'রে রেখেছে।

চুম্বকই যখন, আকৃষ্ট করেছে দ্বিজেনকেও। তবে মৃণাল-ঘটিত ব্যাপারটুকু হয়ে যাওয়ার পর থেকে দ্বিজেনের ভালবাসা অনেকটা সতর্ক দেখাল। এক্ষেত্রেও আবার যদি সরমাতেই ফিরে আসতে হয়তো সে বড় বিশ্রী হবে। একবার দিল ধুলো সরমার চোখে, বার বার নাও পড়তে পারে।

তবু দুর্বার লিসার আকর্ষণ, বড় নিরুপায় বোধ করছে দ্বিজেন তার সামনে। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে, দুদিকের ভালোবাসার সঙ্গে আপাতত একটা রফা ক'রে মাঝামাঝি একটা পথ আবিষ্কার ক'রে ফেলল দ্বিজেন। সরমার কাছে সময় চাইল। জানাল—রিসার্চের কাজটা নূতন পেয়েছে,

'তোমার জন্যেই প্রতীক্ষা করে বসে আছি এতদিন'

এর মধ্যে বিয়ের ব্যাপারটা এনে ফেললে একটু ব্যস্মাত হয়ে যেতে পারে; একনিষ্ঠ মনোযোগ তো দরকার প্রথমটা।

কিন্তু এই উত্তরনিষ্ঠ ভালোবাসা নিয়ে একনিষ্ঠ গবেষণার গুরুত্বটা টিকল না।

অবশ্য সরমার কাছে নয়। সে বেচারি আর্ট-দক্ষ ভালোবাসিয়ে নয়, সুতরাং চোখ কান বুজে শুধু ভালোবেসেই যাচ্ছে। তবে তার বাবার তো আর দ্বিজেনকে ভালোবেসে ফেলা নয়, দৃষ্টি বেশ স্বচ্ছই আছে, সন্দিগ্ধই হয়ে পড়েছেন। হয়তো এ কথাও ঠিক যে পুরুষ মানুষই তো, এক সময় নিজেও ভালোবাসাটাকে আর্ট হিসাবেই চর্চা করেছিলেন, চেনেন তার স্বরূপ, ধ'রে ফেলেছেন।

রাজি হলেন না সময় দিতে। তাড়াতাড়ি ভালোবাসা-নিয়ে-নেই এমন একটি পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে দিলেন।

সরমাদের বাড়ি বন্ধ হয়ে গেল দ্বিজেনের কাছে। সরমা গেল তো লিসাও গেল। হয়তো এক বাড়ির সংশয় অন্য বাড়িতেও সংক্রামিত হ'য়ে গিয়ে থাকবে।

সরমা যাক, লিসা যাক, মৃণাল যাক, কিন্তু আর্ট তো যেতে পারে না; যার সাধনায় লোকে সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েও ক্ষান্ত হতে পারছে না, মনে করছে পরজীবন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে তার সাধনা। দ্বিজেনও লেগে রইল। কিন্তু হিসাবে ভুল হয়ে গেল।

সব সাধনাই জীবন ভোর চলে, জীবনের ওদিকে যদি থাকেই কিছু তো সেখানেও টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু এ সাধনায় যে তা চলে না সে কথাটা বুঝল না দ্বিজেন।

সরমা-মৃণাল-লিসারা বুঝতে দেয়নি, ও পর্ব শেষ হলে দ্বিজেন একদিন হঠাৎ উপলব্ধি করল—প্রায় চারটে বছর টেনে নিয়েছে ওরা, সে এখন সাতাশ-আটাশ বছরের—যদি যুবকই বলতে হয় ত যৌবনের প্রান্ত সীমায়।

এবার কাহিনীটাকে সংক্ষিপ্ত করা য যদিও সময়ের দীর্ঘতায় প্রায় দশ বৎসে কাহিনী।

তবে একরকম বৈচিত্র্যহীনই, ঐ বছর চ ধরে যা হল তারই পুনরাবৃত্তি বলতে পা যায়।

এবার যা সাধনা সেটাকে যদি অভ্যা যোগও বলা যায় তো নিতান্ত ভুল হয় না ডিগ্রি শেষ করে ভালো আপিসে ঢুকেছে দ্বিজেন এবং ধাপে ধাপে উন্নতি করে সে এখন একটা ডিপার্টমেন্টের হর্তাকর্তা। তার অধীনে এখন একজন মেয়ে টাইপিস্টও রয়েছে—রীতা সেন।

এই দশটা বৎসরের প্রতিটি দিন ভালো-বাসার একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে, শুধু মনস্থির করে উঠতে পারেনি দ্বিজেন। সেই সরমাদের পরে মৃণালরা আসে, মৃণাল-দের পরে লিসারা। যখন মনে হয় এর ভালোবাসায় আকণ্ঠ ডুবে আছি, দেখা যায় একেবারে তলিয়ে যাওয়ার মতোও পাত্রী আছে।

কতদূর চলত বলা যায় না, একদিন হঠাৎ দেখল উল্টা দিক থেকেও ঠিক এই ব্যাপারটা চলতে পারে। ওর শেষ পরীক্ষা চলছিল রীতা সেনকে নিয়ে; একদিন সে এল না। এল তার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চিঠি। শুনল রীতা অন্য ডিপার্টমেন্টের যুবক টাইপিস্ট হিল্লোল গুপ্তর সঙ্গে বিবাহ করতে যাচ্ছে।

চেম্বারটা বন্ধ ক'রে দিয়ে দ্বিজেন আপিসের গোল আয়নাটার সামনে দাঁড়াল, দ্বিজেন লক্ষ্য করল—সাধনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে যা চোখে পড়েনি এতদিন—রগের কাছে চুলগুলোয় অল্প অল্প পাক ধরেছে, কপালে গালেও অল্প অল্প বলিরেখা। সাধনার অবসাদ আছে তো; এদিকেও তো প্রায় চল্লিশ।

সুবর্ণার কাছে ফিরে গেল দ্বিজেন।

দুটো পাশ দিয়ে সুবর্ণা এখন ওদের ছোট মফঃস্বল সহরেই মাস্টারি করছে। গরীবের মেয়ে, বিবাহ হয়নি। কিংবা করেইনি বিবাহ।

দ্বিজেন যে ভালোবাসা নিয়েই এসেছে একথা শপথ করে বলা যায় না! কোথায় সরমা-মৃণাল-লিসা-রীতা, কোথায় সুবর্ণা। ভালোবাসা নয়, নিতান্ত প্রয়োজন একটা। তবু, দক্ষ আর্টিস্টই তো, বলল—"তোমার জন্যে এই প্রতীক্ষা করে বসে আছি এতদিন সুবা।"

সুবর্ণাও ঐ কথাটাই বলতে পারত, কিন্তু সে তো আর্ট চর্চা করবার অবসর পায়নি জীবনে, অল্প হেসে মুখটা শুধু একটু নিচু করে নিল।
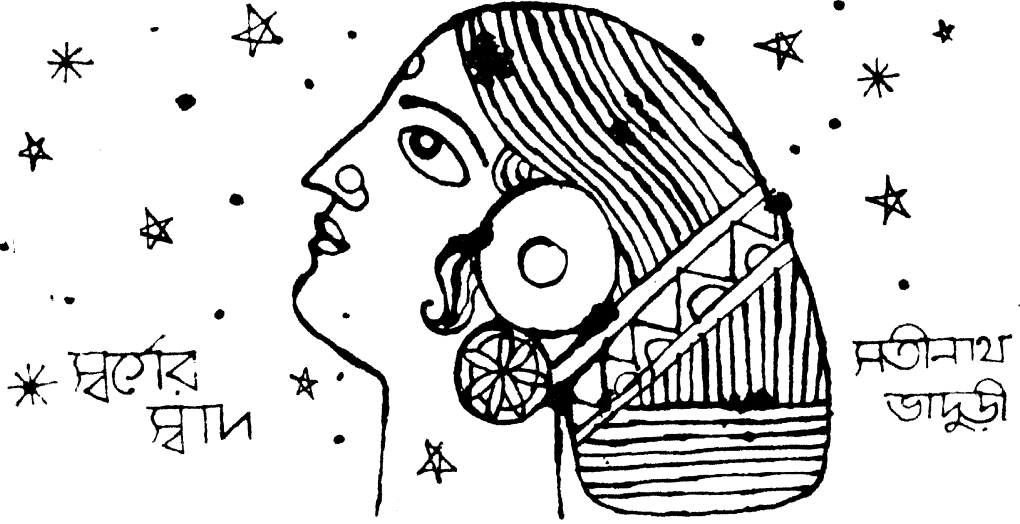
যে চুল্লীগুলোতে ঘোড়ার মাংস রাঁধা হচ্ছে তার চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। স্থানীয় আবালবৃদ্ধবনিতা কেউ বোধহয় বাদ নাই। দর্শকদের মধ্যে রবাহূত, অনাহূত, পথিক, পরদেশী সকলেই আছে। দেবতাদের দিবার পর, পাক-করা অশ্ব-মাংস উপস্থিত সকলকে খেতে দেওয়া হয়। যজ্ঞবাড়ির লোকরা আহার করে সর্বশেষে। তাই এত ভিড়। দর্শকদের সকলেরই গায়ের রঙ ফরসা; নাক টিকালো। পুরুষরা সকলেই সশস্ত্র। পথিকদের চেনা যাচ্ছে তাদের কাঁধের চর্মনির্মিত সুরাভাণ্ড থেকে। ক্ষোণী নামক বাদ্যযন্ত্র যার হাতে, সে বোধহয় ভিক্ষুক। আকাশে কাক চিল উড়ছে। দূরে থেকে বিকট হ্রেষাধ্বনি অবিরাম শোনা যাচ্ছে। গ্রামের সমস্ত ঘোড়াগুলোকে একটু দূরে এক জায়গায় বেঁধে রাখা হয়েছে। ঘোড়ার রক্তের গন্ধে তারা ভয় পায়। হাতে-লাঠি যে দীর্ঘকেশ ব্যক্তিটির উপর কুকুর তাড়াবার ভার পড়েছে, তার নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নাই। মাংসের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। কতকগুলি ভাণ্ডে মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। আর একদিককার অগ্নিকুণ্ডে শূলে আবদ্ধ মাংসখণ্ড ঝলসান হচ্ছে। বসা, মজ্জা গলে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ছে আগুনের মধ্যে। লোকে কাছে গিয়ে তার গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে উপভোগ করতে চায়। ছেলেপিলেদের ঠেকিয়ে রাখাই সবচেয়ে শক্ত। তারা চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিয়েছে। এতক্ষণ তারা ছিল, যেখানে ঘোড়ার মাংস কেটে খণ্ড খণ্ড করা হচ্ছে, সেইখানে। এখনও একটা ঘোড়ার দেহ সেখানে ঘাসের উপর পড়ে রয়েছে। আকাশের কাক চিলের লক্ষ্য সেই দিকেই। মাছি ভন ভন করছে চতুর্দিকে। দুইজন মিলে ঘোড়ার ছাল ছাড়াচ্ছে। একজন স্তূপীকৃত নাড়িভুঁড়িগুলোকে সযত্নে পরিষ্কার করতে বসেছে। এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বেতস-শাখা দিয়ে অশ্বদেহ চিহ্নিত করে-দিলেন। ওই দাগ অনুযায়ী কাটতে হবে। কিন্তু মাছির জ্বালায় কিছু কি সুস্থির হয়ে করবার জো আছে!

যে সদা-হাস্যমুখ বৃদ্ধটি ঘুরে ঘুরে অগ্নিকুণ্ডগুলিতে সমিধ যোগাচ্ছেন, তাঁর চেহারা এত লোকজনের মধ্যেও সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁর মাথা-জোড়া টাকের জন্য। এমন মসৃন এবং সর্বব্যাপী টাক সচরাচর দেখা যায় না। চুল্লীর আগুনের ঝিলিক লেগে আরও চকচকে দেখাচ্ছে। তাঁর আসল নাম অত্রি, কিন্তু গ্রামের লোকে তাঁর নাম দিয়েছে ইন্দ্রলুপ্ত। এই নামে ডাকলে কিংবা তাঁর ইন্দ্রলুপ্ত নিয়ে উপহাস করলে এই সদাশিব ঋষি কখনও রুষ্ট হন না। তাঁর অবুঝ মেয়ে এর জন্য ব্যথা পেলে তিনি কত সময় বোঝান, যে দরিদ্রদের এত স্পর্শাতুর হওয়া সাজে না। মেয়েটা বুঝতে চায় না। আরে, দুটো লোক যদি তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করে আনন্দ পায় তো পেতে দে না!

গ্রামের সর্বাধিক গোধন, ও সর্বশ্রেষ্ঠ শস্যক্ষেত্রের অধিকারী গঙ্গুর বাড়ির দশ-মাসব্যাপী ইন্দ্র-যজ্ঞ আজ শেষ হ'ল। তাই আজ সেখানে এত সমারোহ। দশ মাস থেকে গ্রামের লোকে এই দিনটির প্রতীক্ষা করছিল। এখন দুইদিন ধরে এখানে খাওয়া-দাওয়া চলবে। আজ সোমরস ও অশ্বমাংসের ভোজ; কাল হবে অপূপ, পুরোডাশ, পক্তি, দধি ও ক্ষীরের ভোজনোৎ-সব।

দলে ভারী হলে কিশোরদের প্রগল্‌ভতা বাড়ে। একটি প্রগল্‌ভ কিশোর অত্রির টাকের দিকে তাকিয়ে নিজের কেশপ্রসাধন করবার ভঙ্গী দেখাচ্ছে। ভাবখানা যে টাকের আয়নায় সে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে। তার অঙ্গভঙ্গী দেখে দর্শকরা হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে। মাংস-পাকরত এক প্রবীণ ব্যক্তি অত্রিকে বলেন—"ইন্দ্রলুপ্ত, দেখছ তো সব?"

"হ্যাঁ দেখছি বইকি। শুনছিও সব। প্রতিবেশী আর তালুকীট উভয়কেই প্রতিবাদ করা বৃথা।"

অত্রি হাসছেন। দর্শকরা নূতন করে হাসির খোরাক পেল। চারিদিক থেকে রব উঠল 'ইন্দ্রলুপ্ত'! 'ইন্দ্রলুপ্ত'! অত্রি হাসতে হাসতে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন—"মরুভূমি। আমার শস্যক্ষেত্রে পুঁতি যব, হয় কাঁটাগাছ। এবার একবার ভাবছি কাঁটাগাছ লাগিয়ে দেখি, কী হয়। আমার এই ইন্দ্রলুপ্তের মতনই, আমার ক্ষেত। দুটো দর্ভতৃণ জন্মালেও ঘোষটাকে চরাতে রাতদুপুরে অরণ্যে যেতে হ'ত না; দুটো মুঞ্জতৃণ জন্মালেও সোমরস শোধন করবার কাজে লাগত; দুটো শরের ঝাড় জন্মালেও জীর্ণ কুটির সংস্কারের সময় আর্জীকীয়া নদীতীরে ছুটতে হত না। মরুভূমিতে বৃক্ষোদ্গম করবার চেষ্টা করাও যা, আর এই ইন্দ্রলুপ্তে কেশোদ্গম করবার চেষ্টা করাও তাই।"

"সে চেষ্টা কি আর করেননি যৌবনে।"

"হ্যাঁ, নিজের অভিজ্ঞতার কথাই তো বলছি।"

হেসে উড়িয়ে দিতে চান অত্রি প্রতিবেশী-দের ঠাট্টা বিদ্রূপে। তবু কানে আসে খুচরো টীকা টিপ্পনি।

"অনুর্বর ভূমিতে তবু তো কাঁটাগাছ জন্মায়, কিন্তু ইন্দ্রলুপ্তের যোজন-বিস্তারী মরুভূমি যে মসৃন শিলার মত।"

সকলের উচ্চ হাস্যে তিনি নিজেও যোগ দেন। এইটাই অত্রির আত্মরক্ষার কৌশল। অপালা কাছাকাছি কোথাও নাইতো? তিনি একবার লোকজনের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন। দেখতে পেলেন না অপালাকে। না থাকলেই ভাল। গৃহগুরু গৃহাভ্যন্তরে পাড়ার মেয়েরা যেখানে অক্ষক্রীড়ায় মত্ত, সে বোধহয় তাহলে সেইখানে। ওই মা-মরা অভিমানিনী মেয়েটিকে নিয়েই অত্রির যত দুশ্চিন্তা। নিজের দারিদ্র্যের জন্য তিনি ভাবেন না—তিনি আর কত দিনই বা বাঁচবেন; কিন্তু মেয়েটির সারা জীবন যে এখনও সম্মুখে পড়ে। অবস্থা-পন্ন ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জামাই নেয় না। বিয়ের পর একবার দিনকয়েকের জন্য অপালা পতিগৃহেও গিয়েছিল; কিন্তু একটা ত্বকরোগের জন্য তার দেহ সম্পূর্ণ নির্লোম বলে, জামাই তার সঙ্গে ঘর করতে অস্বীকার করে। সেই থেকে পিতার কাছেই আছে। পতি-পরিত্যক্তা বলে পাড়ার মেয়েরা তাকে খোঁটা দেয়, এবং অমঙ্গুলে বলে ভাবে। চর্মরোগ ও রোম শূন্যতার জন্য সকলে তাকে নিয়ে উপহাস করে। বৃদ্ধ অত্রি আর কত আড়াল করে রাখতে পারেন তাকে! তবু তো এখনও তিনি বেঁচে আছেন; তিনি গেলে যে মেয়েটার কপালে কী আছে সে কথা ভাবতেও ভয় পান অত্রি। মানুষের সঙ্গে তবু লড়াই করা চলে, কিন্তু দেবতাদের কাছে যে স্তবস্তুতি ছাড়া আর কোন উপায়ই নাই! অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ আদি ত্রয়স্ত্রিংশ দেব যদি শত যজ্ঞস্তুতি সত্ত্বেও তাঁর উপর বিরূপ থাকেন, তবে তাঁর মত সামান্য মানুষ কতটুকু কি করতে পারেন! তাঁদের তুষ্ট করতে পারেননি এ তাঁর অক্ষমতা; এর জন্য অন্য কাউকে দায়ী তিনি করেন না।

বালকবালিকারা স্বভাবত বড় নির্দয় হয়। যে যত দুর্বল, তত তার পিছনে লাগতে ভালবাসে তারা। সেজন্য অত্রি অন্তর থেকে চান না যে তাঁর মেয়ে লোক-জনের ভিড়ের মধ্যে বেশী আসে। কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে সব সংকল্প বজায় রাখা শক্ত। তাঁর শস্যক্ষেত্র অনুর্বর। কর্মক্ষমতা কম। দুই বেলা দুই মুঠো ভৃষ্টযবের সংস্থান করাও তাঁর পক্ষে শক্ত। দানে প্রাপ্ত একটা গরু, ও একটা মহিষ আছে বলেই কোন রকমে কায়ক্লেশে দিন কেটে যায়।

এক প্রবীণ কর্মকর্তা হাঁক পাড়লেন—"ইন্দ্রলুপ্ত! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি! ওদিককার চুলোটাতে একটু আঁচ ঠেলে দাও!"

হন্তদন্ত হয়ে অত্রি ছুটলেন সেইদিকে।

চুল্লীতে চড়ান পাত্রগুলো থেকে রাঁধা মাংসের সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। পাক-রত ব্যক্তিরা দর্শকদের প্রশ্নবাণে ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। যজ্ঞকর্তা গর্গ ও তাঁহার স্ত্রী একবার নিজেরা এসে করজোড়ে দর্শকদের রন্ধন স্থান থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করে গেলেন। অপর এক ব্যক্তি এসে উচ্চকণ্ঠে সকলকে জানিয়ে গেলেন যে এক বৃক্ষতলে দ্যূতক্রীড়া হচ্ছে; সেখানে মৈরেয়ী ও কর্কীর বাদ্যেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কে কার কথায় কান দেয়। ভিড় পাতলা হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

ইতোমধ্যে দর্শকদের মধ্যে থেকে কে একজন যেন পাচককে বলল—"মাংস সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে; এইবার নামিয়ে ফেলুন।"

নারী কণ্ঠস্বর। চমকে উঠেছেন অত্রি। অপালার গলা। উৎসাহের আতিশয্যে বলে ফেলেছে অপালা কথাটা। তার ধৃষ্টতায় অবাক হয়ে সকলে তাকিয়েছে তার দিকে। অযাচিত উপদেশে রুষ্ট হয়ে পাচক বলে—"দেবতাদের দেবার আগে তোমাকেই দিই, কি বলো?"

"দাও এক হাতা গরম ঝোল ওর জিভের উপর ঢেলে!"

"হ্যাঁ, নোলায় ছেঁকা দেওয়া দরকার এই চিরশিশুটির!"

"শুধু নোলায় নয়, গায়ের চামড়াতেও। গায়ের এ চামড়া উঠে গেলে, এক যদি ওর নীরোগ চামড়া গজায়!"

"কৃষ্ণ নামক অসুরের কালো চাম ইন্দ্রদেব যেমন করে ছাড়িয়ে ফেলেছিলে তেমন যদি করেন আবার, তবেই ও রো সারতে পারে; নইলে নয়।"

এসবই মেয়েদের গলা।

উচ্চ হাসির রোল ওঠে। গৃহগুরুপত্নী একবার অপাঙ্গে অত্রিকে দেখে নিয়ে সকলকে থামতে বলেন! প্রয়োজনের চেয়েও অধিক মনোযোগ দিয়ে অত্রি উননের আঁচ ঠেলতে আরম্ভ করেছেন তখন। ইচ্ছা হয় একবার দেখেন অপালা এখন কী করছে; কিন্তু কুণ্ঠায় লোকজনের দিকে তাকাতে পারেন না।

অপালা অপ্রস্তুত হয়েছে বিলক্ষণ। তার চোখ ফেটে জল আসছে। পরিহাসগুঞ্জনরত লোকজন ঠেলে, সে কোন রকমে বাইরে বেরিয়ে আসে। যা ভয় করা যায়, ঠিক কি তাই হবে! এই ভয়েই সে সব সময় তটস্থ হয়ে থাকে!

বিমনা হয়ে পড়েছেন অত্রি; চেনেন তো নিজের মেয়েকে। ঘা খেয়ে খেয়ে ওর স্বভাবটাই গিয়েছে বদলে। একটু লোক-জনের সঙ্গ এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়ায়। সব সময় ভয় পাচ্ছে আবার কেউ ওকে কিছু বলে। কিছু না বললেও অনেক সময় অপালা মনে করে নেয় যে তার রোগ নিয়েই বুঝি সকলে উপহাস করছে। দিন দিনই কেমন যেন একটু অধীরা হয়ে পড়ছে। কথায় কথায় চোখে জল। একবার যজ্ঞকালে প্রতিবেশী শুনঃশেপের পত্নী এবং আরও কয়েকজন রমণী প্রস্তর নিষ্পীড়িত সোমলতা কলসের মুখে স্থিত মেষলোমের ছাঁকনিতে ঢাল-ছিলেন। তখন অপালাকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন। যেখানে সোম অভিষুত হয় সেখানে বাজে কথা বলা বারণ; সেজন্য নাকি তাকে সেখান থেকে অঙ্গুলি সংকেতেই চলে যেতে বলেছিলেন। কুটিরে ফিরে সেদিন তার কী কান্না! কত বোঝাই। অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করতে বলি। তাঁদের কৃপার কত দৃষ্টান্ত দেখাই। কক্ষী-বান-দুহিতা ঘোষার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করবার কথা, খেলরাজার স্ত্রী বিশপলার যুদ্ধে ছিন্ন পা সারিয়ে দেবার কথা, নপুংসক নারী বধ্রিমতীর পুত্রবতী হবার কথা, নৃষদ-পুত্রের শ্রবণশক্তি ফিরে পাবার কথা, সব কথা তাকে বলি। নাসত্যদ্বয়ের অনুগ্রহ হলে কোন্ রোগ না সারে! অপালা কোন কথা বলে না। সব শোনে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। দেবতাদের অনুগ্রহের উপর ভরসা রাখতে বলা ছাড়া আর কী সান্ত্বনা দিতে পারি তাকে। সেইদিন থেকে কোন যজ্ঞ-বাড়ির সোমাভিষব স্থলে সে আর যায় না। পাথরে থেঁতলানো সোমপাতা, মেয়েরা দশ আঙুলে না চটকে দিলে শুদ্ধ হয় না; কিন্তু ওকাজে অপালাকে কেউ কোনদিন হাত দিতে দেখেনি আর। এত অভিমানিনী সে।

আরে, কার উপর অভিমান করিস!...

অত্রির তখন ভোজবাড়ি থেকে নড়বার উপায় ছিল না। কুটিরে ফিরলেন রাত্রি দ্বিপ্রহরেরও পরে! অনুমান করেছিলেন যে মেয়ে কিছু খায়নি। সেইজন্য যজ্ঞবাড়ী থেকে একটি চর্মপাত্রে কিছু করম্ভ এবং আর-একটি আধারে খানিকটা সোমরস নিয়ে এসেছিলেন তার জন্য। মেয়েকে ভালভাবে চেনেন বলেই, তার জন্য গৎগুর বাড়ীর অশ্বমাংস আনেননি। এসে দেখেন যে অপালা তখনও বাড়ী ফেরেনি। তবে কি সে রাত্রি জেগে গৎগুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে মেয়েদের দ্যূতক্রীড়া দেখছে? মনে তো হয় না। বোধহয় যজ্ঞবাড়ীতে কোথাও বসে গল্প করছে মেয়েদের সঙ্গে। নিশ্চয়ই কুটিরে ফিরে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। ভয়ডর তার চিরদিনই কম। রাত্রিতে একলা চলাফেরা করবার মত সাহস তার আছে। সেই রকম শিক্ষাই সে পেয়েছে ছোটবেলা থেকে। অত্রি সযত্নে মেয়েকে ধনুর্বিদ্যা ও অসিচালনা বিদ্যা শিখিয়েছেন। তবু তিনি মেয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। নিশ্চয়ই সে অভুক্ত আছে এখনও। যার পতির গোশালায় সহস্র গোধন, তাকে আজ ভাগ্যবিড়ম্বনায় অন্নলোলুপ বলে উপহাস করে নিমন্ত্রণ বাড়ীর লোকে! কেন যে সে দেবানুগ্রহে বঞ্চিত, সে কথা কেবল দেবতারাই বলতে পারেন!...

আর অপালা সেই যে যজ্ঞবাড়ীর থেকে বেরিয়েছিল, তারপর সোজা চলেছে গ্রামের বাইরের অরণ্য পথ ধরে। এই অরণ্য পার হলে আর্জীকীয়া নদী। নিমন্ত্রণ বাড়ীর কোলাহল, কর্মব্যস্ততা ও সমারোহ মুহূর্তের মধ্যে বিষ হয়ে উঠেছিল তার কাছে। লোকসংসর্গ ছেড়ে, যেখানে দু'চোখ তাকে নিয়ে যায় সেখানে সে চলে যেতে চায়। তার দেহ-ত্বকের প্রতি সকলের পরিহাস-কুতূহলী অপাঙ্গ দৃষ্টিতে অপালার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। এত সুন্দর পৃথিবী, এমন উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, সব অন্য লোকদের জন্য! সবাই বেশ আছে। দেবতাদের তো কথাই নাই! তরুণী রোদসী তাঁর স্বামী মরুৎগণের সঙ্গে পালাক্রমে আলিঙ্গন করতে পান; শত কাজের মধ্যেও দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের ও তাঁদের পোষা শাখামৃগটাকে নিয়ে হাসা-পরিহাসের সময় পান; দূরে চক্রবালে আকাশ, পৃথিবীর সঙ্গে নির্জনে মিলনের সুযোগ পান। শুধু মানবী অপালার জন্য নিয়ম আলাদা!

পথ চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আরম্ভ হ'ল শ্বাপদসংকুল অরণ্য। এর মধ্যে দিয়ে একটা পায়ে চলার পথ গিয়েছে নদী-তীর পর্যন্ত। ও পথে আজ প্রহরারত প্রতিবেশী আছে, যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস, দস্যু ও অন্যান্য কৃষ্ণচর্মধারী লোকদের গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্য। সেজন্য অপালা ওই পথ এড়িয়ে চলল এখন। কৃষ্ণচর্মধারী দস্যুদের সে ভয় পায় না। কেননা তারা যে পুরুষ মানুষ। বয়সে যুবতী হলেও সে

শ্রান্ত অপালা এখানে একটু বিশ্রাম করতে চায়।

পুরুষ মানুষকে ভয় পাবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। চাঁদ উঠছে আকাশে। ঘোলাটে জ্যোৎস্না, আর মিশকালো গাছের পাতার ছায়া জাল বুনে চলেছে অরণ্য ভূমিতে। গুমোট গরম। একটা গাছের পাতা নড়ছে না। রাত্রিতে পথ চলতে হলে লোকে কত মন্ত্রোচ্চারণ করে, কত নাম স্মরণ করে। কিন্তু শৃঙ্গধারী পশুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আজ অপালা অগ্নিদেবকে স্মরণ করল না। সর্প বৃশ্চিকাদির বিষ থেকে রক্ষা পাবার জন্য শকুন্ত, নদী, ময়ূর, ও নকুলকে স্মরণ করল না। বিষধরের বিষকে মধুবিদ্যা দ্বারা অমৃতে পরিবর্তিত করবার জন্য সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা জানাল না। প্রতিবেশিনীদের রসনার পরিহাস-বিষ, নিরাসক্ত পুরুষের চোখের কৌতূহল-বিষ, ও উদাসীন পতির চাহনির উপেক্ষা-বিষে যে জর্জর, সে কি কখনও সাপের ছোবলে ভয় পায়। এ অরণ্য তাদের এত জানা যে পথ হারাবার ভয় নাই। ধ্রুবতারা যেদিকে, সেদিকে সোজা গেলে আর্জীকীয়া নদী পাওয়া যাবেই যাবে, কোন না কোন স্থানে। পাথরে হোঁচট লাগছে, পায়ে কাঁটা ফুটছে, কণ্টক গুল্মে দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন একটু মরিয়া হবার আবেশ এসেছে তার। ঠিক কার উপর রাগ করে, তার এই নিজেকে কষ্ট দেওয়া, সে কথা নিজেও সঠিক জানে না।

বনের মধ্যের এক গাছতলায় গিয়ে অপালা থামল। জায়গাটা পরিষ্কার। গোচারণে বা সমিধ-সংগ্রহে এসে জনপদের লোকরা এই বৃক্ষতলেই বিশ্রাম করে। গাছের গুঁড়িটা আর্য বালকদের শরসন্ধান অভ্যাসের কল্যাণে ক্ষতবিক্ষত। শ্রান্ত অপালা এখানে একটু বিশ্রাম করতে চায়; এখানে বসে সে এখন একটু আকাশপাতাল ভাবতে চায়। বসতে গিয়ে প্রথম বুঝতে পারল, যে অরণ্যপথে আসবার সময় তার দেহের বস্ত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। অতসী-তন্তু দিয়ে বোনা বস্ত্র তার এই একখানিই। গৃহকর্মের বল্কল-বেশ ত্যাগ করে নিমন্ত্রণবাড়িতে যাবার সময় এই কাপড়খানা পরেছিল। কতদিন পরে আবার এক একখান ক্ষৌমবস্ত্র যোগাড় করে উঠতে পারবে, কে জানে। অথচ লোকালয়ে থেকে, ঋত, যজ্ঞ, স্তুতি ও প্রার্থনার জীবন বজায় রাখতে গেলে, ক্ষৌম-বস্ত্রের প্রয়োজন প্রত্যহ। যে সঙ্গীতসম্পন্ন ব্যক্তিদের যজ্ঞে প্রচুর সুবর্ণ, গো, এবং হবি ব্যয়িত হয়, দেবতারা কি শুধু তাঁদেরই উপর সন্তুষ্ট? সম্পূর্ণ নিয়মানুগো হয়ে, নিষ্ঠার সঙ্গে, সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দে কত স্তুতি জানিয়েছি ইন্দ্রদেবকে! হে অভীষ্ট-বর্ষী মেঘবাহন! তুমি পঞ্চক্ষিতির সর্ব-প্রকার ধনের অধিপতি; তোমার দানশীলতার খ্যাতি শিশুকাল থেকে আমাদের কণ্ঠস্থ; তবে তুমি আমাদের বেলায় এমন কৃপণ কেন? বলো! আমার প্রশ্নের উত্তর দাও! বজ্রনির্ঘোষে উত্তর দাও! তুমি নীরব! অশ্বিদ্বয় বধির! কতকাল থেকে কত প্রার্থনা জানিয়েছি অশ্বিদ্বয়ের কাছে! সব নিষ্ফল হয়েছে! নাগদ্বন্দ্বয়কে আমার উপর বিরূপ জেনে, স্তুতি করেছিলাম ঋভুগণের। ঋভুগণ নিজেদের বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে আবার যুবা করেছিলেন; তাঁরা মৃত ধেনুর চর্ম থেকে জীবিত ধেনু উৎপাদন করতে পেরেছিলেন; পারেননি শুধু আমার দেহ-ত্বকে পরিবর্তন আনতে। হয়ত প্রতি ক্ষেত্রে আমার যজ্ঞস্তুতিতে কোন ত্রুটি থেকে যাচ্ছে; নইলে তেত্রিশজন দেবতার মধ্যে একজনের মনও কি গলত না! অগ্নি, মিত্র, বরুণ, সকলের পায়ে মাথা কুটেছি! কিন্তু অপালার যজ্ঞ যে কখনও ত্রুটিহীন হতে পারে না। তার সান্নিধ্যে যজ্ঞস্থলীতে স্পর্শদোষ লাগে যে! সে ছুঁলে পিষ্ট সোম অপবিত্র হয়ে যায় যে! দেবতারা তার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেছেন যখন, তখন আর তার কী করবার আছে!

আকাশে মেঘ নাই, কিন্তু গরম গুমোট ভাবটা ক্রমেই বাড়ছে। ইন্দ্রদেব বোধহয়

পত্নীর সঙ্গে এখন সুখশয্যায় সুপ্ত। সেজন্যই বোধহয় আকাশে মেঘ নাই। শচীপতি যখন নিদ্রামগ্ন হন, তাঁর অনুচর মরুৎগণও তখন নিজ নিজ স্থানে বিশ্রাম করেন। সেই জন্যই বোধহয় আবহমণ্ডলের গুমোট ভাবটা ক্রমেই বাড়ছে। নদীতীর এখান থেকে বেশী দূরে নয়। সেখানে যেতে পারলে বোধহয় শরীর একটু শীতল হ'ত। তৃষ্ণাও পেয়েছে; কিন্তু এখান থেকে এখন আর নড়তে ইচ্ছা করছে না। এই গরমে দেহে বস্ত্র রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। একটা ব্যাঙের ডাক কানে এল। অভ্যাসবশে অপালা হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল। এ ডাক শুনলেই প্রণাম করতে হয়; মণ্ডুকরা পর্জন্যদেবের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করে কিনা, সেইজন্য। দূর থেকে ব্যাঙের ডাকটা শুনতে লাগছে বেদমন্ত্রপাঠের ধ্বনির মত।

শরীর বড় বিকল লাগছে তার। জোনাক-পোকা জ্বলছে নিভছে; ঝিল্লী ডেকে চলেছে অবিরাম; শুকনো পাতার উপর দিয়ে কি যেন একটা খরখর করে চলে যাবার শব্দ হ'ল। শৃগাল দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করছে। দূরের কোন এক গাছে একটা চাতক ডেকে ডেকে সারা হ'ল। সঙ্গীকে ডাকছে; কিন্তু সাড়া পাচ্ছে না। ভূমিতে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে অপালা, আকাশের দিকে তাকিয়ে। অগণিত তারা আকাশে। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে যে ওগুলো ইন্দ্রের সহস্র চোখ। সহস্র-লোচন সহস্র চক্ষু দিয়ে দেখছেন তাদের দিকে। এক সঙ্গে বহু দিকে তাঁর দৃষ্টি নিয়োজিত। কত কাজ তাঁর। রাক্ষস-দের নগরী ধ্বংস করা, দস্যুদের নাশ করা, নদী ও সমুদ্র পূর্ণ করা, মেঘ বিদীর্ণ করে জল বর্ষণ করা, প্রকুপিত পর্বতদের নিয়মিত করা। তিনি অহিকে বিনাশ করেছেন, বৃত্রকে বধ করেছেন, বল নামক অসুরের কাছ থেকে অপহৃত গোযূথ উদ্ধার করেছিলেন। স্তুতিমন্ত্রে গাঁথা আছে বলে এ সব কীর্তি-কাহিনী সকলের মুখস্থ। কিন্তু লোকে ভুলে যায়, সাধারণ লোকের উপর বর্ষিত তাঁর অসাধারণ কৃপাগুলি। বিবাহেচ্ছু, অন্ধ ও পঙ্গু পুরাবৃজ ঋষিকে ইন্দ্রদেব সোম-পানের আনন্দে দৃষ্টিশক্তি ও চলচ্ছক্তি পাইয়ে দিয়েছিলেন। পিতা অত্রির স্বচক্ষে দেখা ঘটনা এটা; মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে অপালার প্রার্থনা নিষ্ফল হয় কেন? সোমপানের আনন্দ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হয়; আর সে যে সমাজের উপর অভিমানে সোমাভিষব-প্রস্তর স্পর্শ করা ছেড়ে দিয়েছে অনেক কাল থেকে। ইন্দ্র যে জন্মাবার পরই মাতৃস্তন্য থেকে সোমপান করেছিলেন। বিনা সোমে তাঁকে আহ্বান করে বলেই বোধহয় তিনি অপালার ডাকে সাড়া দেন না। সে যে এখন এখানে মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তা কি ওই সহস্র চোখের একটা চোখেও মুহূর্তের জন্য দৈবাৎ পড়তে পারে? ভাবতেও গায়ে শিহর লাগে। কিন্তু দেবতার দৃষ্টি পড়বার মত মানবী অপালা নয়। নিষ্পলক চাউনি তারা-গুলির—নিরাসক্ত—ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। সোমপা ইন্দ্রের কি এখন মানুষের দিকে ফিরে তাকাবার সময় আছে! সময় যখন পান, তখনও বোধহয় তাঁর সহস্র চোখ পঞ্চ-জন-পদের সর্বত্র সোমপূর্ণ কলসের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে! কে জানে!...

শুয়ে শুয়ে কত কী যে অসংলগ্ন কথা মনে আসছে তার ঠিক নাই। নিজের দুঃসহ জীবনের কথা, পতিগৃহের কয়েক দিবসের স্মৃতি, পিতা অত্রির ইন্দ্রলুপ্তের কথা, সুরভি গাইটির কথা—এসব বিচ্ছিন্ন চিন্তার কি কূলকিনারা আছে! আজ পিতা অত্রির সারারাত্রি নিশ্চয়ই যজ্ঞবাড়ীতেই কাটবে; সুতরাং অপালা নিশ্চিন্ত। বাড়ী ফেরবার তাগাদা নাই তার এখন। চোখের পাতা কখন ভারী হয়ে এসেছে বুঝতেও পারেনি।

যখন ঘুম ভাঙল তখন ভোর হয়েছে। একটা শ্যেনপক্ষী মাথার উপর আকাশে বৃত্তাকারে উড়ছে। অরুণালোকের সঙ্গে নগ্নতার লজ্জার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কাপড়-খান এমনভাবে ছিঁড়েছে যে তা' দিয়ে লজ্জা-নিবারণ করা দুঃসাধ্য। তবে ঘুম ভাঙতেই শ্যেনপক্ষী দেখেছে; দিনটা আজ তার যাবে ভাল। নদীতে একটা ডুব দিয়েই সে বাড়ী ফিরবে। ছিন্ন বস্ত্রের জন্যই আরও তাড়া-তাড়ি বাড়ি ফেরবার ইচ্ছা। পিতাও নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। রাত্রির নিদ্রার পর মন শান্ত হয়েছে। মনে পড়ছে যে কাল থেকে আহার হয়নি। কাল রাত্রিতে পথ চলবার সময় কাঁটা আর পাথরে ভয় করবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। আজ চলছে ভাল করে পথ দেখে দেখে।

নদী থেকে ফেরবার পথে হঠাৎ নজরে পড়ল! একী! ইন্দ্রজাল নাকি?

চোখ রগড়ে নিল সে। ঠিক সেই রকম জোড়া জোড়া পাতা! এ পাতা চিনতে কি কারও ভুল হবার জো আছে! এ যে সোমলতা! পথের ঠিক মধ্যখানে পড়ে রয়েছে! সোমলতা এখানে এল কি করে? তবে কি পরশু প্রত্যূষে যজ্ঞবাড়ির লোকেরা সোমলতা ধোয়ার জন্য যখন নদীতীরে আসছিল, তখন পথে পড়ে গিয়েছে? কিন্তু এ পাতাগুলো তো বেশ তাজা দেখাচ্ছে! এ যে না চাইতেই পাওয়া! উচ্চ পর্বত থেকে কত পরিশ্রম করে খুঁজে খুঁজে সোমলতা সংগ্রহ করতে হয়। আজ তার দিনটা সত্যই ভাল। শিশুকাল থেকে কণ্ঠস্থ সোমলতার স্তুতির একটা ঋক গুন গুন করে গেয়ে উঠল সে—"যাহা নগ্ন তাহা তিনি আচ্ছাদিত করেন; যাহা রুগ্ন তাহা তিনি আরোগ্য করেন; অন্ধ হইয়াও দর্শন করেন; পঙ্গু হইয়াও গমন করেন।"

পথ থেকে তুলে নিয়ে সোমের পাতা কয়টা মুখে পুরল। সোমপাতা চিবুলে শ্রান্তি দূর হয়, ক্ষুৎ-পিপাসা কমে।

লোকমুখে চিরকাল শুনে আসছে যে মুজবান পর্বত থেকে শ্যেনপক্ষী চঞ্চুতে করে প্রথম সোমলতা এনেছিল আর্য মানব-দের জন্য। যদি আজকের এই সোমপাতা-গুলোও খানিক আগে দেখা শ্যেনপক্ষীটি মুখে করে এনে থাকে মুজবান পর্বত থেকে! যদি অপালার জন্য এনে থাকে! পুলকে দেহ শিউরে ওঠে একথা ভেবে। দূর! তাও কি হয়! কিন্তু যদি সোম-দেবতার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে এর মধ্যে! এক অজানা ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। অন্যমনস্ক হয়ে সে জোরে জোরে চিবুচ্ছে
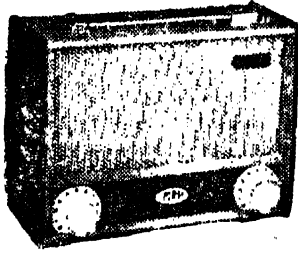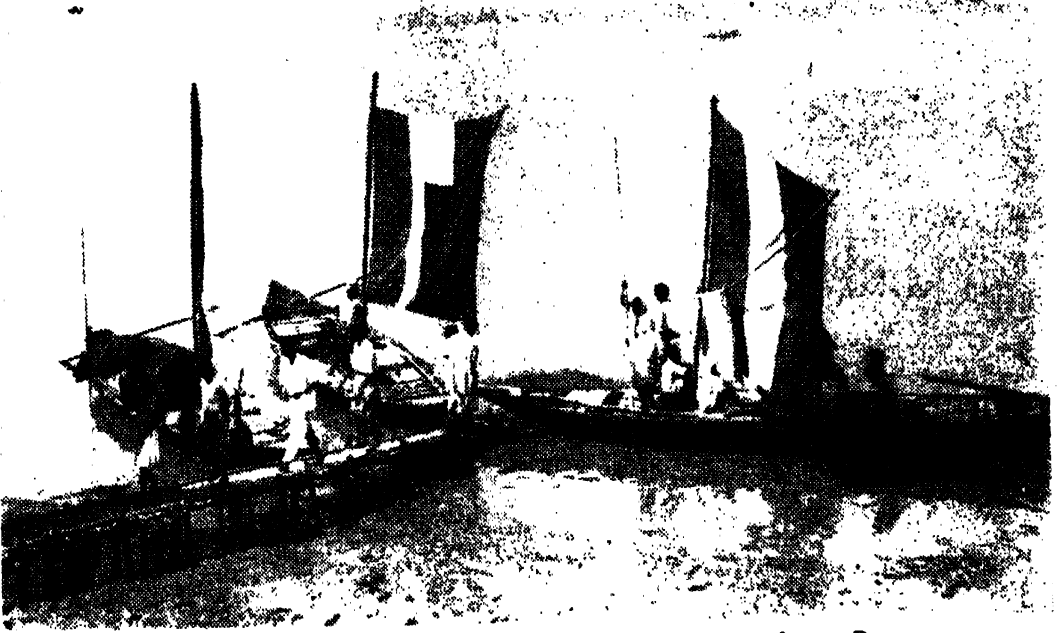
পারাপার

আলোকচিত্র : শ্রীঅরুণ সেনগুপ্ত

পাতাগুলোকে। চিবুবার সময় দন্তঘর্ষণ-জনিত একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। মুখের চর্বিত পাতা আঠা আঠা হয়ে দাঁতের সঙ্গে লেগে লেগে যাচ্ছে। অপালা আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই শ্যেনপক্ষীটি এখনও কোথাও আছে কিনা দেখবার চেষ্টা করে। না নাইতো! এ কী! আকাশের রঙ এমন হয়ে গেল কেন হঠাৎ? ঝড় উঠবে নাকি? দূর থেকে ঝড় আসবার সময়ের মত একটা শব্দ আসছে। এক খণ্ড মেঘও দিগন্ত থেকে ছুটে আসছে এই দিকে!

গাছের পাতা কাঁপল; শাখা দুলল; নদীর জলের ঢেউ তটভূমির উপর আছড়ে পড়ল; অপালার বস্ত্রাঞ্চল উড়ল; এক ঝাঁক বলাকা হঠাৎ আকাশে তাদের গতিমুখ পরিবর্তিত করল; গুরুভার রথচক্রের ধ্বনির মত চাপা মেঘগর্জন কানে এল; মুখ ঢাকলেন সূর্য-দেব। অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। শুকনো পাতার ঝাঁক অপালাকে ঘিরে কানামাছি খেলা আরম্ভ করেছে; ঝড়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে সে। বিদ্যুৎ চমকাল: কড় কড় করে বাজ পড়ল কাছেই। একটা উত্তাপের হলকা তার গায়ে এসে যেন সজোরে ধাক্কা দিল। মুহূর্তের জন্য বুকের স্পন্দন থেমে গিয়েছে তার।

কী? কে? কেন?

বজ্র-স্তননে দ্যাবা পৃথিবী তখনও থরথর করে কাঁপছেন। হ্রেষাধ্বনি দিয়ে উজ্জ্বল বর্ণের এক অধীর অশ্ব থামল এসে সম্মুখে। স্বর্ণময় রথ থেকে নামলেন. কে উনি? শ্মশ্রুল বদন মণ্ডল—বজ্রবাহু—সুঠাম দেহ—পানার্থী ঋষভের মনোরম দ্রুত নর্তিত গতিভঙ্গী! একেবারে অপালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে সোম অভিষুত হচ্ছে?"

অপালা ঘাড় নেড়ে জানাল—"না"।

"সে কী! আমি যে অভিষব-প্রস্তরে সোম নিষ্পীড়িত করবার ধ্বনি শুনতে পেয়েছি। সেই শব্দ শুনেই তো আমি এলাম।"

"গঙ্গুর বাড়ি সোম ছেঁচবার শব্দ শোনেননি তো?"

"না"।

"আপনি, শুনলেন কোথা থেকে?"

"শুনলাম ইন্দ্রপুরী থেকে। সোম-নিস্যন্দী প্রস্তরের আহ্বান এখান থেকেই গিয়েছিল। আমার ভুল হয় না।"

ইন্দ্রপুরী থেকে! দেবরাজ ইন্দ্র! তার সম্মুখে! হাতে বজ্র! হরিবাহন ইন্দ্র! এই অশ্বই হরি!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অপালা। এতকাল. যে দেবতার কত স্তবস্তুতি করেছে তাঁকে সম্মুখে দেখে প্রণাম করতেও ভুলে গেল।

দেবতাদের তো ভুল হয় না! সে সোমপাতা চিবুচ্ছিল ঠিকই। তার দন্ত-ঘর্ষণজাত শব্দটাই তাহলে ইন্দ্রের কানে গিয়েছে।

"অপালা, সোমপানের জন্যই আমি এসেছি"।

ইন্দ্রের চোখে দুষ্টামির হাসি।

এরকম সঙ্কটের জন্য অপালা তৈরী ছিল না; কোন মানুষ তৈরী থাকতে পারে না। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে সে। দেবতাদের সঙ্গে কেমনভাবে কথা বলতে হয় জানা নাই! কী বলবে সে?

অতি কষ্টে অস্ফুট স্বরে বলে—"তাহলে আপনি গঙ্গুর বাড়ীতে যান। সেখানে পবিত্র গোচর্মের উপরে স্থিত কলসে, মদকর সোমরস রাখা আছে। সেখানে দুধ মেশানো সোমও আছে, আবার দই আর ছাতু মেশানো

সোমও আছে। যা আপনার ইচ্ছা, পেতে পারেন।"

"না, সেখানে আমি যাব না।"

"কত স্তুতি দিয়ে আপনার পরিচর্যা করবে সেখানে গগ্গু আর তার স্ত্রী।"

"আমি তোমার মুখের সোমই পান করব।"

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে অপালার। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

"এ কি কথা বলছেন, শচীপতি! উচ্ছিষ্ট সোম? আমার মুখের লালাসিক্ত সোম? পান করবেন? আপনি? আমাকে অপরাধী করবেন না একথা বলে! আপনার যে পান করবার নিয়ম, অপর বত্রিশজন দেবতাদেরও আগে। আপনার যে পান করবার রীতি, হোতার হাত থেকে স্বাহাকারে অগ্নিতে প্রদত্ত সোম, কিংবা বষটকার দ্বারা প্রক্ষিপ্ত সোম। মরুৎগণের সঙ্গে মিলে অগ্নির জিহ্বা স্বধা দিয়ে সোমপান করাই যে আপনার অভ্যাস!"

ইন্দ্র অবিচল।

"আমি তোমার মুখ থেকেই সোমপান করব।"

"আপনার যে পান করবার বিধি চমু এবং চমস নামক পাত্র থেকে। আমার মুখ থেকে খেতে যাবেন কেন? অভিষব পাথরে-এ সোম বাটা হয়নি; মেয়েরা দশ আঙুলে দিয়ে এ সোমকে চটকায়নি; মেষলোমের পবিত্র ছাঁকনি দিয়ে এ সোম ছাঁকা হয়নি; মুঞ্জ-তৃণ দিয়ে এ সোম শোধিত হয়নি; গোচর্মের উপর একে রাখা হয়নি। এ সোম পান করা কি আপনার সাজে? গগ্গুর বাড়ীর সোম সূর্যকিরণ-সেবিত ও মদকর; আমার মুখের সোমের মত সদ্য-নিষ্পীড়িত নয়। সোম-রসের সঙ্গে ক্ষীর দই না মিশালে কি আপনার যোগ্য পানীয় তৈরী হয়। গগ্গুর বাড়ীর সোম পান করে আপনি নিশ্চয়ই তৃপ্ত হবেন।"

"তোমার মুখ থেকেই আমি পান করব।"

ইন্দ্রের চোখে প্রত্যাশিত ঔদাসীন্য নাই। এতক্ষণে অপালার মনে পড়ল নিজের গায়ের কাপড় টেনে দেবার কথা। শতচ্ছিন্ন হলেও কাপড় তো। সে জানে সোমপানেচ্ছু ইন্দ্র কোনদিন কোন বাধা মানেননি। এখন তাঁকে আটকাবে কে? অপালা তো সামান্য মানবী। বজ্রের মত কঠোর ইন্দ্র। ইনি নিজের মাতাকে বিধবা করতেও দ্বিধা করেননি। নিজের উদ্দেশ্য সাধনে হলে তিনি নির্দয়। এঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করা বৃথা। এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করাও সম্ভব নয় এখন। কী করতে পারে সে অবলা নারী। তবু বলে—"আপনি পরিহাস করছেন আমার সঙ্গে?"

"পরিহাস কৌতুকের কোন কথা নাই এর মধ্যে। আমি তৃষার্ত।"

তৃষার্ত ইন্দ্রের আর অপেক্ষা করবার ধৈর্য নাই। হরিও অধীরতা জানাচ্ছে, খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। অপালা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে। পায়ের দিকটা তার দুর্বল লাগছে। জঘন কাঁপছে থরথর করে। কড়কড় করে মেঘ ডাকল। হুহু শব্দে পবন বইল। মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। ইন্দ্রাশ্ব হরির দেহ থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে; সে অন্য দিকে তাকিয়ে। সোমরসের প্রবাহ সংযত রাখবার কথা অপালার খেয়াল আছে এখনও।

বর্ষণ থেমেছে। হরি হ্রেষাধ্বনি দিচ্ছে; যাবার সময় হল। তৃপ্ত দেবরাজের কাছে অপালা তিনটি বর চাইল।

"আমার পিতার মস্তক কেশপূর্ণ হউক"!

"তথাস্তু।"

"আমার পিতার অনুর্বর শস্যক্ষেত্র উর্বরা হউক!"

"তথাস্তু।"

"দেহত্বকের রোগের জন্য আমি পতি পরিত্যক্তা।"

অপালার গায়ের চামড়া ইন্দ্র, একবার নয়, দুইবার নয়, তিন তিনবার সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ফেললেন—ফলের খোসা ছাড়ানর মতন করে নির্দয়ভাবে।

অপালার দেহত্বকের অসম্পূর্ণতা ঘুচল। রথে চড়বার সময়ের ইন্দ্রের মুখের স্মিত হাসিটুকু তার দৃষ্টি এড়াল না। পরম পরিতৃপ্তির হাসি।

নির্জন নদীপথে অপালা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। মেঘ কেটেছে। গাছের পাতা থেকে মুক্তা ঝরছে ইন্দ্রধনুর রঙের, অপালার গায়ের রঙ হয়েছে সোনার মত। সারা গায়ে তার সোনার গহনা—মাথায় শিপ্র, বুকে রুক্ম, গলায় নিষ্ক, দুই হাতে স্বর্ণ—খাদি। দানে ইন্দ্র অকৃপণ।

মর্তের মদকর স্বাদ নিয়ে ইন্দ্র পরম পরি-তৃপ্ত হয়ে চলে গিয়েছেন; কিন্তু অপালা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেই-খানটায়। একটা গভীর অতৃপ্তিতে তার মন ভারাক্রান্ত—এত সৌভাগ্যের মধ্যেও। লোকালয়ের দিক থেকে একটা কোলাহল ক্রমেই এগিয়ে আসছে। অত্রি বোধহয় দল-বল নিয়ে মেয়ের খোঁজে বেরিয়েছেন। স্বর্গের পরশ পাওয়া মর্তটুকুও অপালার কাছে স্বর্গই। বাধা না হওয়া পর্যন্ত সে সেই জায়গাটা থেকে নড়তে চায় না। এর পরই তো সকলের প্রশ্নবাণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হবে। মর্তে নকল স্বর্গ গড়বার জন্য যা কিছু দরকার সব সে পেয়েছে; কিন্তু আসল স্বর্গের স্বাদ যে এখনও তার মুখে লেগে। এই স্বাদটুকু সে যতক্ষণ পারে ধরে রাখতে চায়, অতি সংগোপনে। অন্য কিছু মুখে দিয়ে এ স্বাদকে নষ্ট হতে দিতে চায় না। তাই সে ঠিক করে ফেলেছে যে পিতা অত্রি তাকে আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করলে, সে বলবে যে তার উপবাস আজ।

'কে বললে যে প্রত্যূষে সোমপাতা খেয়ে ইন্দ্রস্তুতির উপবাস হয় না? ভুল কথা।' এই হবে ব্রহ্মবাদিনী অপালার জীবনের প্রথম এবং শেষ মিথ্যাচার—মানুষের কাছে এবং ইন্দ্রাণীর কাছেও।

আমাদের বাড়িতে দুটো মেয়ে আছে, দুটোর সম্পর্কেই ঘরপর আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই একই কথা বলে থাকেন। বলেন 'আহা—যেমনি রূপ তেমনি গুণ!'

কিন্তু বলা হয়ে থাকে দুটি বিপরীত ব্যঞ্জনায়। যে দুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য।

মেয়ে দুটো আমারই ভাইঝি।

বৈমাত্রেয় নয়, একই মাতৃগর্ভজাত। আর শুনতে পাই নাকি দুটোতে মাত্র তেরো মাসের ছোট বড়। এত কম সময়ের ব্যবধানে বিধাতা বদল হওয়া আশ্চর্য বটে, কিন্তু দু'জনকে একই বিধাতা গড়েছেন এটাও একেবারে বিশ্বাসের অযোগ্য। হয়তো বা ঠিক সেই সময় আসল বিধাতা ছুটিতে ছিলেন, অস্থায়ী কর্মভার গ্রহণ করেছিল আনাড়ি কেউ।

আমার মেজদি বলেন 'বড় মেয়ের জন্মের পর তুমি যে বোতল বোতল টনিক খেয়েছিলে বড়বৌ, সে বোধ করি আলকাতরার নির্যাস। তোমার ওই ছোট মেয়ে সেই গোলায় গড়াগড়ি খেয়ে বেড়েছে।'

'ছোট' মেয়েই বলা চলে, কারণ ওদের জন্মের পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, ছোটকে মেজ করে ফেলবার জন্যে আর কারো আবির্ভাব ঘটেনি। মেজদি বলেন 'ওকে দেখে ওর পর ভয়ে আর কারো আসতে সাহস হয়নি।'

বড় বৌদির মেয়েদের নামকরণটাও মেজদির অনিন্দ্য অবদান। বড়র নাম মল্লিকা, ছোটর ঘেঁটু

ফুলের নামে নাম।

বয়স হিসেবে ঘেঁটুই ছোট বটে, কিন্তু ঘেঁটুকেই বড় দেখায়। ঘেঁটু মাথায় দিগগজ, ঘেঁটুর হাতপা লম্বা লম্বা, হাড়-চওড়া কাঁধ চার চৌকো। আর ওর চৌকো চৌকো মুখের গড়নে মেয়েলি লালিত্যের বালাই মাত্র নেই। রক্ষেকালীর মত একরাশ চুল না থাকলে ঘেঁটুকে মনে করা চলতো মেয়ে-সাজা ছেলে।

ওর ওই শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ চেহারার পাশে মল্লিকার গোলাপী গোলাপী নরম তুল-তুলে ছোটখাট দেহটিকে প্রায় বিলিতি ডল-এর মত দেখতে লাগে। মল্লিকার চোখ টানা টানা, নাক টিকলো, ঠোঁট পাতলা। শুধু গালটি একটু ভারী, কিন্তু সে ভার যেন আভিজাত্যের ভার। মল্লিকার গড়নে পেটনে চলনে বলনে আমাদের বংশের আভিজাত্য পরিস্ফুট।

মল্লিকার মত এতটা না হলেও আমাদের পিসিরা দিদিরা সকলেই প্রায় সুন্দরী।

বহিরাগতরাও, অর্থাৎ বৌদিরাও খারাপ কেউ নয়। কিন্তু ঘেঁটু যেন এই আর্য বংশে এক অনার্য।

ছেলেবেলা থেকে মল্লিকার খেলা ছিল খেলাঘর পাতিয়ে, পুতুল সাজিয়ে, ধুলো-মাটির থেকে বিশহাত দূরে খাটচৌকীতে বসে, আর ঘেঁটুর ছিল ধুলো মাটি নিয়েই কারবার। সারা সকাল ঘেঁটু বাড়ির পিছনের 'ওঁচলা' ফেলা পড়ো জমিটায় ডাংগুলি খেলছে, ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে তিন-তলার ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, বিকেল-বেলা রাস্তায় নেমে পাড়ার অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেদের সঙ্গে মার্বেল খেলছে।

বকুনি, মার, ঘরে বন্ধ, খেতে না দেওয়া, কোনও শাস্তিতেই ঘেঁটুকে এঁটে উঠতে পারা যেত না। বড় বৌদি হতাশ হয়ে মিষ্টি কথা ধরতেন, বলতেন 'অমন ছোট-লোকের মতন রাস্তায় খেলে বেড়াস কেন ঘেঁটু, দুই বোনে ঘরে বসে খেলা কর না মা'!

শুনে ঘেঁটু অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টে বলতো 'দিদির সঙ্গে খেলা! দিদি খেলার কি জানে?'

অপর পক্ষে মল্লিকা ভুরু কুঁচকে বলতো, 'ঘেঁটির সঙ্গে খেলা? রক্ষে করো।'

তা' এসব অবিশ্যি বেশ ছোটবেলায়।

স্কুলে ভর্তি হয়ে স্বেচ্ছাবিহারটা কিছু কমেছিল ঘেঁটুর, তবে একেবারে কি আর?

ছুটির সময় পুষিয়ে নিত। এদিকে স্কুলেও নিত্য নতুন কমপ্লেন। ঘেণ্টু ক্লাশে গোল-মাল করেছে! ঘেণ্টু ক্লাশে বসে আলু-কাবলি খেয়েছে! ঘেণ্টু দিদিমণির মুখের ওপর চোপা করেছে!

তা ছাড়া বই হারিয়ে ফেলা, পড়া তৈরি না করা, দিদিমণি বকলে কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকা, ইত্যাদি নানাবিধই করছে ঘেণ্টু।

মল্লিকা এসে গোলাপী মুখ লাল করে বলতো, 'আমি ওর সঙ্গে এক ইস্কুলে পড়বো না। ওর অসভ্যতায় আমার মাথা কাটা যায়।'

মল্লিকার এই মাথা কাটা যাওয়াটা সমর্থিতও হত প্রত্যেকের কাছে, কিন্তু চট করে দু বোনকে দু ঠাঁই করা তো সহজ নয়। স্কুল বদল কম হ্যাঙ্গামার নয়। তাই প্রথম প্রথম ঘেণ্টুকেই সংশোধনের চেষ্টা চলতো, শাস্তি শাসন খোসামোদ প্রলোভন নানা পথে।

অবশেষে সবাই হার মানল।

তবে ততদিনে মল্লিকারও অভিযোগ ফুরোল। মল্লিকা ততদিনে পাশ করে বেরিয়ে গেল স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে, আর ঘেণ্টু প্রত্যেক ক্লাশে দু তিন বছর থেকে থেকে 'ইস্কুল ভাল লাগে না' বলে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি এসে গল্পের বই গেলায় মনো-নিবেশ করল।

অতএব কেন লোকে দুই বোনের ব্যাখ্যানায় দু'রকম সুর ব্যবহার করবে না? ব্যাখ্যাকারদের বাচনভঙ্গীর গুণেই ধরা পড়ে কার কেমন রূপ গুণ!

মল্লিকার প্রত্যেকটি কাজ সুচারু সুছাঁদের। ওর ওই চাঁপার কলির মত আঙুলে যে ছুঁচের কাজগুলি করে, তা সূক্ষ্মতায় কলের কাজকেও হার মানায়, রং তুলি কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো হরপার্বতী, যুগল মিলন, সিন সিনারির ছবিগুলি এমন নিপুণভাবে 'কপি' করে যে, পাশাপাশি রেখে বোঝা যায় না কোনটা আসল কোনটা নকল।

আর ঘেণ্টু?

ঘেণ্টু ছুঁচের একটা ফোঁড়ও জীবনে তুলেছে কিনা সন্দেহ। সূক্ষ্ম ধার দিয়েও যায় না কোনদিন। একদিন দিদির ছবি আঁকা নিয়ে ওকে ধিক্কার দেওয়ায় ওর নিজস্ব পদ্ধতিতে অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টে বলল, "ওঃ ছবি আঁকা তো ভারীই কাজ! বসে বসে গুণে গুণে রাধিকার চোখের ভোমা আঁকা আবার ছবি আঁকা!"

বলে খপ করে দিদির রং তুলি কাগজ পেন্সিল নিয়ে খস খস করে একটা মোষ এঁকে বসল! মোষটায় আর কিছুই ছিল না, ছিল শুধু ঘাড় নীচু করে একটা তেড়ে ছুটে যাওয়ার ভঙ্গী!

তা ওই ভঙ্গীটা নিয়ে কম ব্যঙ্গতামাসা চলল না বাড়িতে। কেউ বলল 'ওইটাই ওর চিন্তাধারার প্রতীক'...কেউ বললো 'ওটা ঘেণ্টুর অন্তর্নিহিত সত্তার গঠন-ভঙ্গী'...কেউ বলল...'ওটা ঘেণ্টুর আত্মার ছবি!' শুধু বড়দা বললেন 'ছবিটা ছিঁড়ে ফেল বাবা, নইলে চোখে পড়লেই মনে হবে যমের বাহন তাড়া করে এসেছে!'

মল্লিকা ওই পেন্সিলটা আর একবার সরু করে কেটে নিল, আর তুলিটা ফেলে দিল। কারণ দুটো জিনিসই ভোঁতা, ঘেণ্টুর একবারের ব্যবহারে একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে।

চেঁচামেচি বকাবকি কি রাগ প্রকাশ করবার মেয়ে মল্লিকা নয়। ওর যা কিছু বিরক্তি প্রকাশ সবই ভুরুর সামান্যতম ভঙ্গিমায়। সেই ভঙ্গিমাটুকু করে মসৃণ, মৃদু গলায় বোনকে বলল, 'তুমি আর আমার ঘরে ঢুকো না।'

শোবার ঘর নয়, পড়ার ঘর একটা আলাদা পেয়েছে মল্লিকা, কারণ কলেজে পড়ছে এমন মেয়ে এ বাড়িতে এই প্রথম। সম্ভ্রম আর সমীহের দৃষ্টিতে দেখে সবাই। ছোট্ট ঘর, কিন্তু ছিমছাম সুন্দর। নিজের রুচি পছন্দে সাজিয়েছে মল্লিকা। বেশীর ভাগ সেখানেই থাকে।

দিদির নিষেধে ঘেণ্টু ওর অনার্য গলায় জবাব দিয়ে উঠল, 'কে ঢুকতে চায় তোর পেঁচার কোটরে? ছবি আঁকা কাকে বলে তাই দেখিয়ে দিলাম তোকে।'

এই ধরনের কথা ঘেণ্টু সবাইয়ের সঙ্গেই কয়। আমাদের, মানে গুরুজনদের, সামনেও এমন কিছু আর্যকণ্ঠ বার করে না। তবু অস্বীকার করব না, মেয়েটা আমাকে ভাল-বাসে। হ্যাঁ ভালবাসে, তার বেশী নয়। ভক্তি মান্য করা ওর কুষ্ঠিতে লেখে না।

আমাকে ঘেণ্টু একটু পদমর্যাদা দেয় বলেই বড় বৌদি মাঝে মাঝে এসে আমাকেই আক্রমণ করেন, 'মেয়েটা তা হলে এইভাবেই উচ্ছন্ন যাবে? কেউ আর তোমরা শোধরাতে পারবে না? এত বই লেখ, আর একটা বেয়াড়া মেয়েকে কাকা হয়ে একটু শায়েস্তা করতে পার না?'

বই লেখার সঙ্গে বেয়াড়া মেয়ে শাসন করার কি সম্পর্ক আছে অবশ্য জানি না, তবে বই লেখার কথাটা বড় বৌদি যখন তখনই তোলেন।

আমি হেসে বলি, 'বই লিখি, কতকগুলো মিথ্যে মানুষের মিথ্যে কাহিনী লিখি। বিধাতার সত্যি লেখাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে লিখতে পারি এমন কলম আমার হাতে নেই বৌদি!'

বৌদি রেগে বলেন, 'তোমার তো খালি প্যাঁচালো কথা! আর তোমার দাদা দুটি হয়েছেন 'কাদের সাপ'! বড় মেজ দুটিই সমান। তাসে বসলে আর জ্ঞান', থাকে না। এসব কথা বলিই বা কখন? এই যে অত বড় মেয়ে সারাক্ষণ পাড়াসুদ্ধু ছেলের সঙ্গে হৈ হৈ করছে, ক্যারম পিটতে যাচ্ছে, দেখ-না-দেখ ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, আর নয়তো পাড়া ঝেঁটিয়ে রাজ্যের গল্পের বই এনে গিলছে, এ মেয়ের হবে কি?

তার ওপর ওই তো রূপের অবতার! বিয়ে হবে ওর?'

বিয়ে ঘেণ্টুর হবে কিনা, অর্থাৎ হওয়া সম্ভব কিনা এ বিষয়ে আমার নিজেরই ঘোর-তর সন্দেহ ছিল, তবু বৌদিকে আপাত সান্ত্বনা দিই, 'আরে বাবা, তোমরাই তো বল বিয়ে ভবিতব্যের ব্যাপার!'

'সেটা মানুষের, চিড়িয়াখানার জানো-য়ারের নয়।'

বলে রাগ করে চলে যান বৌদি।

খানিক পরে ওকে ধরে ফেলি, 'এই চিড়িয়াখানার জানোয়ার! যাচ্ছিস কোথায়?'

ঘেণ্টু আমার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলে 'তবলা শিখতে!'

তবলা শিখতে!

চোখ কপালে ওঠে আমার, 'তবলা শিখতে

যাচ্ছিস। সত্যিই কি বদ্ধপাগল তুই?'

ঘেণ্টু সতেজে বলে, কেন, 'পাগল ছাড়া আর কেউ তবলা বাজায় না?'

'মেয়ে মানুষ বাজাবে তা' বলে?'

'তবে মেয়েমানুষে কি করবে শুনি? শুধু দিদির মতন পিড়িং পিড়িং করে বেরাল কান্না কাঁদবে?'

জানতাম না, বুঝলাম মল্লিকা কোন তারের বাজনা ধরেছে। বললাম, সে যা করে ঘরে বসে করে, তোর মতন তো এমন পাড়া বেড়াতে বেরোয় না। যাচ্ছিস কাদের বাড়ি?'

'পিণ্টুদের বাড়ি।'

'পিণ্টুদের বাড়ি!' সত্যি বলতে শুনে আমারও বৌদির মতন ভাবনা ধরে গেল। বকে বললাম, 'ওই বখা ছেলেটার বাড়ী যাবার কি দরকার পড়েছে তোর?'

'বখা আবার কি? কি বখামি করেছে তোমার সঙ্গে?'

'আমার সঙ্গে আবার কি বখামি করবে? রাতদিন তো রকে বসে আড্ডা দিচ্ছে আর সিগারেট ওড়াচ্ছে।'

'সিগারেট!' ঘেণ্টু হি হি করে হেসে উঠল 'চালুনি বলে ছুঁচ! সিগারেট তোমরা কে না ওড়াও? সিগারেট ধরে ধরে তো আঙুলে কড়া!'

'আমাদের বয়েস আর ওর বয়েস?'—রেগে উঠে বলি।

ঘেণ্টু হাসি থামিয়ে বলে 'তার মানে তোমরা বেশী বখা। ও মুখ্যু অবোধ ছেলে-মানুষ না বুঝে যা করছে, তোমরা বিদ্বান বুদ্ধিমান বুড়ো ধাড়ি হয়ে তাই করছ!'

এরকম মুখোমুখি আক্রমণে চটে না উঠে কোন মহাপুরুষ থাকতে পারে? বললাম চটে মটে 'তবলা শিখতে যাওয়া তোমার চলবে না।'

'বেশ যাবো না।' বলে ঘেণ্টু টুলের ওপর রাখা আমার নতুন সুটকেশটার ওপর চেপে বসল। তর্কও করল না, অবাধ্যতাও করল না।

এতে অসুবিধে আছে। কারণ এ পরিস্থিতিতে ভাল ভাল উপদেশগুলো কাজে লাগান যায় না। অথচ সেগুলো কাজে লাগানো দরকার। তাই একটু নরম সুরে বলি 'কখনো শুনেছিস ভদ্রলোকের মেয়ে তবলায় চাঁটি দেয়?'

'বললাম তো যাবো না—' ঝঙ্কার দিল ঘেণ্টু, 'আবার ও প্রসঙ্গ কেন?'

'আজ যাবি না, আবার কাল যাবি তো?'

'ঠিক আছে, কোনদিনই যাবো না।'

বলল ঘেণ্টু পা দোলাতে দোলাতে।

ঘেণ্টুর অভিমান, এ একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার। বুকটা কেমন কেমন করল। আরও নরম সুরে বললাম, 'রাগ করছিস কেন?'

'রাগ? মোটেই না। রাগ করতে যাবো কেন?'

'ওই যে বারণ করলাম।'

'ওঃ ওই তবলা? দূর, বারণ করলেই কি শুনতাম? ও আমার তেমন ভালও লাগে না। নেহাৎ কি করি কি করি তাই।'

'কেন, কি করি কেন? আর সব মেয়েরা কি করে? তোর দিদি কি করে?'

'ওরা বিদুষী, পরীক্ষার পড়া তৈরি করে।'

আগ্রহ ভরে বলি, 'বেশ তো তুইও কর না তাই। প্রাইভেট পড়ে, দে না পরীক্ষা। পড়বি তো বল, আমি ব্যবস্থা করতে রাজী আছি।'

'রক্ষে মধুসূদন।'

দু' হাত কপালে তুলল ও।

'তবে এই রকম গেছো বাঁদর হয়েই থাকবি? তোর মা বলেছে তোর বিয়ে হবে না।'

হঠাৎ ঘেণ্টু ওর ওই অনার্য মুখে একটু আর্য হাসি হাসল। হেসে বলল, 'দেখো হয় কি না।'

এবার আমার প্রমাদ গণবার পালা।

এ হাসি কিসের ইঙ্গিত বহন করছে? কোথাও কোনও ধড়িবাজ ছেলে বোকা মেয়েটাকে নিয়ে খেলাচ্ছে না তো? বিয়ের লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে—

চেপে ধরলাম ওর বিনুনিটা। বললাম, 'উঠে পালালে চলবে না, এ কথার মানে কি তাই বল।'

'মানে আবার কি?'

'তোর মতন এই রক্কেকালীকে কে বিয়ে করতে যাবে শুনি?'

'বললাম তো দেখতেই পাবে।'

'নাম বলবি না?'

'আচ্ছা বাবু আচ্ছা, একদিন ধরেই নিয়ে আসবো। তুমি কিন্তু বাড়িময় রাষ্ট্র করে বেড়াতে পাবে না। ওর বড় লজ্জা।'

পা দোলাতে লাগল ও।

সত্যিই চিন্তায় পড়লাম।

এ আবার কি অঘটন!

মল্লিকা থাকতে প্রেমে পড়তে গেল ঘেণ্টু!

অবশ্য মল্লিকা সম্পর্কেও আমার ধারণা ভুল হয়েছে। প্রেমে পড়ার মত গর্হিত কাজ মল্লিকা করবে না। মল্লিকা সভ্য, মল্লিকা ভদ্র, মল্লিকা অভিজাত। মল্লিকা জানে, ও বি এ পাশ করে বেরোবার সঙ্গে

সঙ্গেই বাজারসেরা দামী পাত্র খুঁজে আনা হবে ওর জন্যে। কনে দেখা, পাকা দেখা, দেনা পাওনা, তত্ত্বতাবাস, গায়ে হলুদ, গাঁটছড়া, ইত্যাদির মাধ্যমে ওর বিয়েটা আসবে একেবারে 'প্রপার চ্যানেলে।' মল্লিকা গলায় জুঁয়ের গোড়ে পরে নাপিতের নির্দেশ অনুযায়ী বোজা চোখ খুলে শুভ-ক্ষণে শুভলগ্নে শুভ দৃষ্টি করবে। তারপর এই এতদিন ধরে আয়রন সেফে তুলে রাখা অটুট কুমারী হৃদয়খানি তুলে দেবে ন্যায্য দাবীদারের হাতে।

বিয়ের আগে সে হৃদয় ভাঙিয়ে বসবে এমন অধৈর্য মল্লিকা নয়, এমন হ্যাংলাও নয়। এসব পরে বুঝলাম মল্লিকাকে লক্ষ্য করে।

দেখলাম মল্লিকার সেই ছোট্ট ঘরে হপ্তায় তিনদিন করে দু দুটো মাস্টার আসে— একটা পড়ার, একটা গানের। ইয়ংম্যান, দেখতেও নেহাৎ মন্দ নয়। কিন্তু ভুলেও মল্লিকা কোনদিন ওদের দিকে চোখ তুলে তাকায় না।

নিটোল গাম্ভীর্যে বসে বসে শিক্ষা গ্রহণ করে, প্রশ্ন থাকলে মসৃণ মৃদু কণ্ঠে দু'-একটি প্রশ্ন করে। সামনের চোখ জোড়া যে ওরই ওই গোলাপী মুখটার দিকে 'হাঁ' করে তাকিয়ে আছে, সেটা বুঝতে পেরেছে কি পারেনি বোঝাও যায় না।

বাস্তবিকই মল্লিকা সম্ভ্রমের যোগ্য, সমীহের যোগ্য, প্রশংসার যোগ্য। মল্লিকাকে বুঝতে পারি।

কিন্তু ঘেণ্টু?

ওকে বোঝা যে প্রায় দুঃসাধ্য হচ্ছে। ওর মধ্যে 'মেয়েত্ব' কোথায় যে, একটা ছেলের প্রেমে পড়বে! তাছাড়া ওর দিকে চোখ তুলে তাকাবে, এমন অভাগাই বা কে আছে জগতে!

নাঃ নিশ্চয় ওর ওই ঘুড়ি ওড়ানো কি তবলা পেটানোর আড্ডার কোন বদ ছেলে! কি করে এখন রক্ষা করা যায় মেয়েটাকে?

আবার একদিন গ্রেপ্তার করলাম।

বললাম 'কই, তুই যে বলেছিলি একটা বাঁদর না উল্লুক কাকে যেন ধরে এনে দেখাবি, কই আনলি না?

ঘেণ্টু ঈষৎ মলিনভাবে বলল, 'না, ওর অসুখ করেছে।'

'অসুখ! কি অসুখ?'

'কি জানি। বলে তো জ্বর হয়।'

নাঃ মহা ফ্যাসাদ বাধালে তো মেয়েটা! কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, কে জানে বাবা! বললাম, 'তোর মাকে বলেছিস?'

'মাকে! মাকে আবার কি বলবো?'

'এই সব কথা। ওই ছেলেটার কথা—'

ঘেণ্টু মলিনতা ত্যাগ করে সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বলে 'আহা হা, এই মাত্তর একেবারে নন্দনকানন থেকে খসে পড়লেন! জগতের কিচ্ছু জানেন না! বললে তোমার বৌদিটি যে আমায় কড়াপাকের সন্দেশ খাওয়াবেন!'

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'কিন্তু ন্যাকামিটা ভাল নয় ঘেণ্টু! আর তোর তো এ স্বভাবও নয়।'

ঘেণ্টু ফের মলিন হ'ল। বলল 'এ স্বভাব হয়েছে কি আর সাধে? হয়েছে ওর হাতে পায়ে পড়ায়। বলে, বাড়ির লোক টের পেলে আর আসতে দেবে না তোমায়। বলেছে অসুখ সারলে আমাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে।'

যতদূর নয় ততদূর চমৎকৃত হই। চট করে মুখে কথা জোগায় না। তারপর হতাশ কণ্ঠে বলি, 'পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবি! ছি ছি ঘেণ্টু, আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে এই জঘন্য কথাটা তুই বলতে পারলি?'

ঘেণ্টু অনমিত কণ্ঠে বলল, 'তা কি করবো? না পালালে তোমরা দেবে ওর সঙ্গে বিয়ে? মান খাটো হবে না তোমাদের?'

গম্ভীর হয়ে বলি, 'তার মানে আমাদের মান খাটো হয়, এমন ছেলের সঙ্গে তুমি মিশছ?'

'তোমাদের কিসে না মান খাটো হয়? আমার বদলে দিদির মতন আর একটি মোমের পুতুল জন্মালেই তোমাদের ভাল হতো।'

আর একবার চমৎকারের পালা আমার। ধারণা ছিল দিদির প্রতি ওর কিছুটা ঈর্ষা আছে, অন্ততঃ থাকাই স্বাভাবিক। তা নয়, অবজ্ঞা! মল্লিকাকে কি ও নিজের থেকে নিকৃষ্ট মনে করে নাকি? হাসবো না কাঁদবো!

কিন্তু না, এখন কর্তব্য রয়েছে, লক্ষ্য থেকে সরে গেলে চলবে না। বললাম 'কি তার নাম, কি বা ঠিকানা বল আমায়।'

'বলব বাবা বলব। বলি তো তোমাকেই বলব। কিন্তু এখন ছাড়ো। ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ নিয়ে যেতে হবে।'

'ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ! তুই নিয়ে যাবি!'

'যাবো না তো আনবে কে? ওর কটা চাকর আছে শুনি?' বলেই ঠিকরে বেরিয়ে গেল ঘেণ্টু। আমাকে প্রস্তুত হতে না দিয়ে। পরে মনে হল ঘেণ্টুকে অনুসরণ করা উচিত ছিল আমার। দেখা উচিত ছিল কি করে বেড়াচ্ছে ও। কিন্তু ততক্ষণে চলেই গেছে। ভগবান জানেন কিভাবে কখন ঘেণ্টু আমাদের এই উঁচু বংশের মুখে কালি মাখবে। মল্লিকার ঔজ্জ্বল্যে কি সে কালি ঢাকা পড়বে?

ঢাকা পড়ত কি না কে জানে, তবে সহসা মল্লিকার ঔজ্জ্বল্যে আমাদের বাড়ির সব কিছুই জমজমাট হয়ে উঠল! মল্লিকা সম্পর্কে খুবই একটা আশা ছিল আমাদের সত্যি, কিন্তু এ যেন আশারও অতীত!

মেজবৌদির যে ইঞ্জিনীয়ার মামাতো ভাইপো বিলেতে না আমেরিকায় কোথায় যেন ভয়ঙ্কর মোটা মাইনের কী যেন চাকরী করছিল, সে তিনমাসের ছুটি নিয়ে বিয়ে করতে এসে, পাত্রী হিসেবে প্রার্থনা করেছে মল্লিকাকে! বিয়ে করেই একেবারে নব-পরিণীতাকে নিয়ে চলে যাবে সাগর ডিঙিয়ে।

সত্যিই বাড়িসুদ্ধ সবাই আহ্লাদে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি। কলেজে পড়ছে এমন মেয়ে আমাদের বাড়িতে এই প্রথম, কিন্তু সাগর ডিঙিয়ে শ্বশুরবাড়ি, এমন দুর্লভ মেয়ে যে আমাদের তিনকুলে এই প্রথম।

এমন দুর্লভ বিয়ের প্রস্তুতি বড় সোজা নয়। জামাইয়ের মহিমার উপযুক্ত আয়োজন করতে গিয়ে বারে বারেই অবস্থার সীমা লঙ্ঘিত হয়ে যায়। বড়দা হয়তো খরচ নিয়ে একটু খুঁৎ খুঁৎ করেন, কিন্তু মেজদার আর মহিলাদের প্রবল যুক্তির স্রোতে সমুদ্রে তৃণখণ্ডের মত ভেসে যান তিনি।

মেজদি বড়লোকের গিন্নী, তিনি সদর্পে বলেন, 'টাকা না থাকে আমি ধার দিচ্ছি। তা' বলে তো যেমন তেমন গেরস্থ জামাইয়ের মতন করলে চলবে না।' মল্লিকার জন্মাবধি শুনে এসেছি, ওর বিয়েয় এক পয়সাও লাগবে না, ওকে অমনি নিয়ে যাবে।......কিন্তু দেখা গেল চারটে মেয়ে-পারের কড়ি মল্লিকার জন্যে লাগল।

বড়দা বলেন, 'আমার গলায় যে আর একটি রক্ষেকালী ঝুলছেন! ভাবনা তো তাঁকে নিয়েই।'

মেজদির ব্যঙ্গ হাসিতে ভেসে যায় সে কথা। মেজদি "রাধা নাচা ও সাত মণ তেল পোড়ার" উপমাটা দেন, হেসে গড়িয়ে পড়ে।

মার্কেটিং ছাড়া বাড়িতে আর দ্বিতীয় কথা শুনতে পাই না। অনবরতই ওই লীলা চলছে। সপরিবারেই চলছে। মেজবৌদি কখনো পরের ব্যাপারে থাকেন না, কিন্তু এবারে তিনিও ইন্টারেস্টেড। তিনি কাকে কাকে যেন চিঠি লেখালেখি করে বেনারস থেকে মেয়ের বেনারসী আনিয়েছেন, কাশ্মীর থেকে জামাইয়ের স্যুটের কাপড়।

এইসব দহরম মহরমে ঘেঁটুর কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। ও যে কখন বাড়ি থাকে, কখন থাকে না, কখন খায় কখন খায় না, কেউ গ্রাহ্যই করিনি। হঠাৎ ঘেঁটু একদিন পাদ প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াল।

বিয়ের আগের দিন!

বাড়িতে তুমুল গোলমাল উঠল!

মেজবৌদির পার্স থেকে নাকি শ'খানেক টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। টাকাটা অবশ্য বড়দার, তবে মেজবৌদি মার্কেট থেকে ফিরে এসে রেখেছিলেন। নিজের ঘরের টেবিলে।

রসাতল তলাতল শুরু হয়ে গেল।

মেয়ের বিয়েতে বাইশ পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে বলে যে, একশো টাকাটাকে 'যাক গে যাক' বলে উড়িয়ে দেওয়া হবে, তা'তো আর নয়। সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় খোঁজাখুঁজির শেষে, আটকানো হল চাকর বাকরদের। জেরার চোটে তাদের বাবার নাম ভুলিয়ে দিতে বসলেন মেজদা, ঠিক এমনি সময়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কোথা থেকে যেন ঘেঁটুর আবির্ভাব।

মুখটা শুকনো, চোখের কোল বসা, স্বভাব-রুক্ষ চুলগুলো আরও রুক্ষ। কুশ্রী ঘেঁটুকে যেন কুৎসিতের অবতার মনে হচ্ছে।

ওর দিকে আমরা কেউ গ্রাহ্য করে তাকাইনি। ওর সঙ্গে বাড়ির কোন সম্পর্কটাই বা আছে? কোনদিনই আমরা ওর দিকে দৃকপাত করি না, ও-ও আমাদের দিকে দৃকপাত করে না। কিন্তু আজ দেখি নিজেই আমাদের ঘটনার মধ্যে এসে দাঁড়াল!

বলল, 'কি হচ্ছে এখানে?'

বড় বৌদি তীব্র স্বরে বলে উঠলেন, "এই যে, শ্মশানকালীর মতন এসে দাঁড়ালেন মেয়ে! ছিলি কোথায় এতক্ষণ?'

'শ্মশানে!' বলে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলো ঘেঁটু, 'কই বললে না?'

কি হয়েছে বললাম।

ঘেঁটু ওর স্বভাব বহির্ভূত শান্ত কণ্ঠে বলল 'কত টাকা?'

'একশো! পুরো একশো টাকা। মেজ-বৌদির—'

ঘেঁটু তেমনি শান্তভাবেই বলল 'ওদের উৎখাত করতে হবে না। মেজ কাকিমার টেবিল থেকে টাকা আমি নিয়েছি।'

ঘরে যেন বাজ পড়ল।

'তুই নিয়েছিস টাকা!'

'তুই!'

'তুই নিয়েছিস, আর এতক্ষণ আমরা—' বড় বৌদি প্রখর গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কি জন্যে নিয়েছিস এত টাকা?'

'বলব না।'

'বলবি না? বলবি না?' বৌদি ক্ষেপে ওঠেন, যত কিছু বলি না তত বাড় বাড়িয়ে চলেছিস? পাজী ছোটলোক মেয়ে! শেষ

পর্যন্ত চোর হলি?'
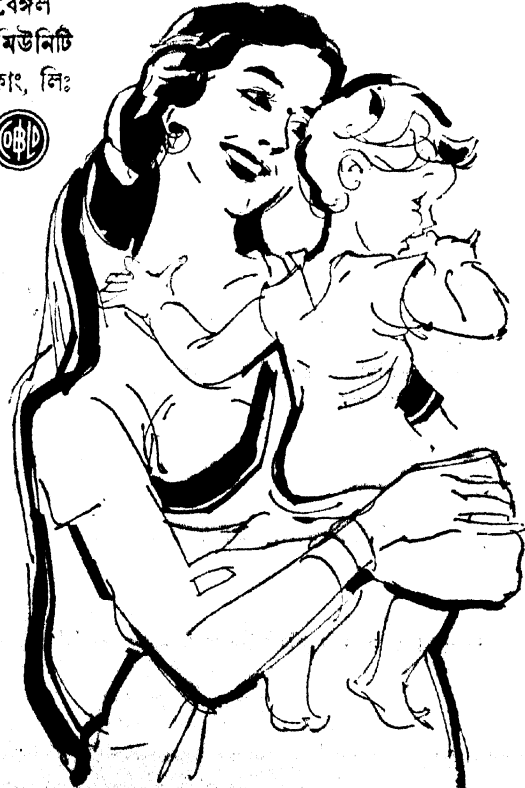
হঠাৎ মল্লিকার ভঙ্গীতে ভুরু কোঁচকালো ঘেঁটু, বলল, 'ও টাকা তো বাবার!'

'বাঃ বাঃ চমৎকার আর্গুমেণ্ট!' মেজকাকা বলে ওঠেন, 'বাবার টাকা বলে না-বলে নিয়ে নেবে তুমি?'

ঘেঁটু মেজকাকাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বড়দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যদি তোমার ভাল মেয়ে হতাম বাবা, তা হলে তো বিয়ে দিতে খরচা হতো! মনে করো ওটা সেই হিসেবেই গেছে।'

আর একবার বাজ পড়ল! বাপের মুখের ওপর এই কথা! ছি ছি, এত নির্লজ্জতা! কী কটু, কী অরুচিকর!

বড়বৌদি প্রায় নেচে উঠে বললেন, 'মনে অমনি করলেই হ'ল? দে বলছি টাকা!'

'নেই! খরচ হয়ে গেছে।'

'খরচ হয়ে গেছে! অত টাকা খরচ হয়ে গেছে! কি করেছিস এত টাকা?'

'বলেছি তো বলব না।'

মেজদা সব্যঙ্গে বলেন, 'বেশ বলার অসুবিধে হয় বোলো না। কিন্তু নেবার সময় অনুগ্রহ করে বললেই হতো! এতগুলো লোক তাহ'লে চোর বনত না।'

ঘেঁটু সহসা ওর ওই শুকনো কাঠ বার করা মুখে একটু অনার্য হাসিই হাসল। তারপর বলল 'ভেবেছিলাম সমুদ্দুরের এক ঘটি জল কমলো কি রইল টের পাওয়া যাবে না। কুড়ি পঁচিশ হাজার খরচ করছো তোমরা, মোমের পুতুলের প্লাশ কেসের জন্যে, সেখানে একশো টাকা—'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ও-ঘরে ঢুকে গেল ঘেঁটু।

আর এ ঘরে বইতে লাগল ধিক্কারের ঝড়।

উঃ কী হিংসে! কী হিংসে!

দিদির ভাল বিয়ে হচ্ছে, দিদির বিয়েতে ঘটা হচ্ছে, তাই হিংসেয় একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসেছে!

কিন্তু অতগুলো টাকা নিয়ে করল কি ঘেঁটু!

সর্ববাদী মতে সাব্যস্ত হ'ল নিশ্চয় লুকিয়ে কোন শাড়ি কি গহনা কিনেছে।

বড়বৌদি তীব্র ক্ষোভে বললেন, 'ভেবেছিলাম মল্লির পাওনা শাড়ি গহনা থেকে ওকেও কিছু দেব, কিচ্ছু দেব না। ছি ছি, লজ্জায় আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে গো! চাকরগুলোর সামনে কী মুখ হেঁট!'

এতক্ষণে মল্লিকা একটা কথা বলল, মৃদু মসৃণ গলায়—'অথচ এমন ভাব দেখায় যেন জগতের কোন কিছুতেই ওর লোভ নেই।'

কিন্তু 'লোভ আছে' একথা সবাই মেনে নিলেও আমি তা পারছি না।

স্পষ্ট করে স্বীকার করে ওকে সমর্থন করবার সাহস না থাক, অস্বীকারও তো করতে পারি না—নিপুণ বিধাতার হাতের নিখুঁৎ সৃষ্টি আমার ওই বড় ভাইঝিটির চাইতে আনাড়ি বিধাতার হাতে গড়া এই বিটকেল ছোটটাকেই আমি বেশী ভালবাসি।

তাই এখানের ঝড় মিটলে ওর কাছে গিয়েই পড়লাম। বললাম, 'আমি তোকে বকতে আসিনি, শুধু জিগ্যেস করছি টাকাটা কি কেউ তোকে ভোগা দিয়ে নিয়েছে?'

ও আমার দিকে ওর কোটরগত চোখ দুটো তুলে বলল, 'না'।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'সেই ছেলেটার অসুখে খরচ করেছিস বুঝি?'

চোখটা নামিয়ে জানলার দিকে মুখ ফেরাল ঘেঁটু, ফিরিয়ে থেকেই খুব শান্ত গলায় বলল, 'না, তখন আর পেলাম কই! আজই তো শুধু—! পোড়াবার কাঠ আর আরও কি কি দরকারের জন্যে দিতে হ'ল ওর বন্ধুদের হাতে। দশটা টাকা শুধু ফুলটুল—'

জীবনে অনেক শোকাবহ ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, অহঙ্কার ছিল আমার চোখ কখনো লজ্জায় পড়ে না।

অহঙ্কারটা চূর্ণ হ'ল।

কষ্টে বললাম, 'আগে কেন আমায় বলিসনি ঘেঁটু?'

ঘেঁটু বোধকরি একটু চমকালো। চমকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বলবো ভেবেছিলাম। তোমরা তখন বিয়ের কথা নিয়ে ব্যস্ত, একবারও একলা পাইনা তোমায়! এ টাকাটাও যদি আগে পেতাম! পেলে হয়তো বাঁচাতে পারতাম ওকে!'

টাকায় পরমায়ু কেনা যায় না এ তত্ত্বকথাটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারলাম না। নিজের লজ্জা সামলাতে মাথাটা নিচু করে রইলাম।

ঘেঁটু একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বোধকরি একটু হেসেই বলে উঠল, 'যাকগে ছোটকা মন খারাপ কোর না। এ বরং ভালই হ'ল। বাঁচলে, একটা লণ্ড্রির দোকানের ছেলেকে বিয়ে করে তোমাদের উঁচু মাথাটা হেঁট করতাম বৈ তো নয়!'

ওর ওই অনাসৃষ্টি হাসি আঁকা মুখটার দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, এতদিন যাকে আনাড়ি ভেবে এসেছি, সে কি সত্যিই তাই?

রাজপুত্র

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শুরু হয়েছিল ঠিক এই রকমভাবে।

অফিস ফেরৎ রাজপুত্র স্টেশনের পাশের একটা দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনছেন। সেই সময় প্রশ্নটা এল : এখানকার বেদান্ত মঠটা কোথায় হবে বলতে পারেন?

রাজপুত্র ঘাড় ফিরিয়ে কোনো মঠযাত্রিনী সন্ন্যাসিনী দেখতে পেলো না। এমন কি মঠে আশ্রয়প্রার্থিনী কোনো বৈরাগিনী রাজকন্যাকেও নয়। দেখল অত্যন্ত সাধারণ একটি বাঙালী মেয়েকে। তার পরনে নীল শাড়ী, গায়ে একটা ছাই রঙের কোট, হাতে ছোট একটি ছাতা। কোনো চেঞ্জারই হবে নিশ্চয়।

আঙুল বাড়িয়ে রাজপুত্র বললে, নীচের রাস্তা দিয়ে নেমে যান। স্যানাটোরিয়াম বাঁয়ে রেখে ভিক্টোরিয়া ফলসের দিকে খানিকটা এগোলেই বেদান্ত মঠ পাবেন।

মেয়েটি হাসল। ছোটখাটো চলনসই চেহারা, পাশ দিয়ে চলে গেলে লক্ষ্য না করলেও চলে। কিন্তু রাজপুত্র এবার দেখল মেয়েটির দাঁতগুলো খুব পরিষ্কার আর হাসিটি মিষ্টি।

—আমি কেবল কালই এসেছি এখানে। কিছুই চেনা জানা নেই।

রাজপুত্র একটু ভাবল। তারপর বললে, আচ্ছা চলুন, দেখিয়ে দিই আপনাকে।

—আপনার কষ্ট হবে না তো?—মেয়েটি কুণ্ঠিত হল।

—না—না, কষ্ট আর কিসের? আমিও তো প্রায় ওইদিকটাতে থাকি! চলুন।

একটু ঘুরিয়ে বললে কথাটা। তার মেস ওদিকে নয়—আধ মাইল হেঁটে আবার তাকে উজিয়ে আসতে হবে স্টেশনের কাছেই! কিন্তু তাদের বংশ স্ত্রীজাতি সম্পর্কে ভদ্রতার জন্যে বিখ্যাত। পাল্কীর সামনে কাদা ছিল বলে তার কোন্ এক পূর্বপুরুষ নাকি স্যার ওয়ালটার র‍্যালের মতো বাঈজীর শ্রীপাদপদ্মের তলায় গায়ের হাজার টাকা দামের শাল পেতে দিয়েছিলেন। আর কিছু এখন না থাক, অন্তত বংশের ধারাটা সে এখনো ভোলেনি।

তিব্বতী উদ্বাস্তুদের ছেঁড়া তাঁবুর নোংরা উপনিবেশ পাশে রেখে নীচের দিকে নামতে লাগল দুজনে।

—বেদান্ত মঠেই বুঝি যাবেন আপনি?

নিবিড় একরাশ ফগ ঘনিয়ে এসে মেয়েটির চুলে-কপালে-চশমার কাচে ছড়িয়ে দিয়েছিল একমুঠো হীরের গুঁড়ো। হাতের ছোট রুমালটি দিয়ে সেগুলো মুছতে মুছতে আবার নিঃশব্দ উজ্জ্বল হাসি হাসল সে।

—নাঃ, মঠে নয়। সেখানে গিয়ে আমি

কী করব বলুন? আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় থাকেন 'পত্রলেখা কটেজে।' শুনেছিলুম মঠের কাছে গিয়ে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।

—বুঝেছি।—রাজপুত্র খুশি হয়ে উঠল : হাঁ-হাঁ, দেখেছি বাড়ীটা। সামনের বারান্দার টবে নানারকম ক্যাকটাস আর লিলি আছে—তাই না?

সেই হাসিটুকু মুখে টেনে রেখেই কোমল গলায় মেয়েটি বললে, কী করে বলব বলুন। কখনো তো দেখিনি এর আগে।

—তাই বটে—তাই বটে।—রাজপুত্র লজ্জা পেলো। ভারী বোকামি হয়ে গেছে একটা।

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ এগিয়ে চলা। কুয়াশা আর রোদের খেলা চলতে লাগল পাহাড়ে। পাথরের গায়ে ফুটন্ত ডেইজিগুলো খুশি হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা ঝর্ণার শব্দ কোথায় বেজে চলল নেপথ্য সংগীতের মতো।

—এখানে এসে ভালো লাগছে আপনার? —রাজপুত্র আবার জানতে চাইল।

—মন্দ কী। বেশ নতুন রকমের। এর আগে আমি কখনো পাহাড়ে আসিনি।

—কতদিন থাকবেন?

—তা তো জানি না—মেয়েটি দু চোখ সম্পূর্ণ করে মেলে দিয়ে তাকালো : আমি এখানকার একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে এসেছি। যতদিন তাড়িয়ে না দেয়—

—ও-ও।—আবার কিছুক্ষণ চুপ করে চলার পালা। মেয়েটি চেঞ্জার নয় জেনে রাজপুত্রের মনে একটুখানি খুশি দুলে উঠতে লাগল অকারণেই। তারপর জানালো : আমিও এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। মানে চাকরি করি। বছর দুই আছি।

—তাই বুঝি? তা হলে তো মাঝে মাঝে দেখা হবে।—মেয়েটির গলায় অন্তরঙ্গতার সুর বাজল। তিন পা এক সঙ্গে হাঁটলে বন্ধুত্ব হয়; তার চেয়ে অনেক বেশী হাঁটা হয়ে গেছে।

—হবে বই কি। এই যে—এসে পড়েছি। ডানদিকের ওই বাড়ীটাই পত্রলেখা কটেজ।

—ধন্যবাদ আপনাকে—অনেক ধন্যবাদ। কষ্ট করে—

—কিছু না, কিছু না। আচ্ছা চলি তবে, নমস্কার।

—নমস্কার।

আবার স্টেশনের দিকে ফিরে আসতে আসতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেল রাজপুত্র, রাস্তার ধারে একটা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাহাড়ের কোলে কোলে ঘুমন্ত মেঘের ওপর বেলা শেষের রোদ—দূরে থেকে একটা ঝর্ণার ঝংকার কানে আসছে। বিশেষ কোনো ভাবনাই তার এখন ছিল না, তবুও কী একটা সে ভাবছিল। আর সেই আকারহীন অর্থছাড়া ভাবনাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভেসে উঠছিল ছেলেবেলার একটা স্মৃতি। মাঝরাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে সবে থেমেছে, আকাশে গুরু গুরু করছে মেঘ, মশারির ভেতরে চমকে চমকে পড়ছে বিদ্যুতের আলো। আর নীচের বাগান থেকে তাদের দোতলার ঘরে হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসছে বৃষ্টিভেজা হাসনুহানার গন্ধ।

সেই রাতের সঙ্গে এই বিকেলের কোনো মিল নেই। তবু মনের ভেতরে হারানো গন্ধেরা কখনো কখনো ফিরে আসে। কখনো কখনো আবার সেই অন্ধকার বাগানের ওপর প্রথম বর্ষার ধারা নামে—ভয় পাওয়ার অথচ ভালো লাগার বিদ্যুৎ চোখের পাতার ওপর ঝিলিক দিয়ে যায়—বাইরের চেনা পৃথিবীটা অপরিচয়ের বিস্ময়ে ভরে ওঠে। দুরু দুরু করতে থাকে বুক। মানুষের দ্বিতীয় শৈশব।

আর সেই দ্বিতীয় শৈশব হল প্রেম।

রাজপুত্রের সামাজিক নাম প্রতাপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। এই নামটা ইংরেজিতে শুদ্ধ করে লিখবার জন্যে অনেক মেহনত করতে হয়েছিল প্রথম স্কুল জীবনে। ম্যাট্রিক থেকে বি এ পর্যন্ত ডিপ্লোমা আর সার্টিফিকেটে ধরে ধরে নামটা যাদের লিখতে হয়েছিল, তারাও বিশেষ খুশি হতে পারেনি নিশ্চয়। বোধ হয় ভেবেছিল, এই রকম নামদার ছেলের ফেল করা উচিত—পাশ করে মিছেমিছি জ্বালাচ্ছে।

কিন্তু পাঠান রাজাদের কাছ থেকে যিনি প্রথম জায়গীর নিয়ে পদ্মার ধারে তাঁর জমিদারী পত্তন করেন, তাঁর নাম ছিল মনুজেন্দ্রনারায়ণ চণ্ড রায়চৌধুরী। তাঁকে ইংরেজি শিখতে হয়নি, ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের ঝামেলাও তাঁর ছিল না। সেরেস্তায় যারা চাকরি করত, তারা নামের আগে আরো সমারোহ করে বিশেষণ দিত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীমন্মহারাজ। আসলে শুধু 'চণ্ড'টুকু দিয়েই কাজ চলে যেত মনুজেন্দ্রনারায়ণের। অর্থাৎ তিনি জমিদারী করতেন, ডাকাতি করতেন আর নবাবের কাছ থেকে ডাক এলে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়তেন। ওদের কুল-পঞ্জিকায় এ সবের বেশ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে।

তারপর পদ্মা কূল ভাঙতে লাগল আর জমিদারীতেও ভাঙন শুরু হল সেই সঙ্গে। ডাকাতি আর যুদ্ধটা বাঘ-কুমীর শিকার পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়ালো। 'চণ্ড'টা কার হাত থেকে কখন যে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল—কে সে অপদার্থ অ-'চণ্ড', তোষাখানার লোহার সিন্দুকে পুরোনো-পচা দলিল-পত্রের মধ্যে তা গবেষণার বিষয় হয়েই রইল। তারও পরে টুকরো টুকরো হয়ে গেল জমিদারী, সাত মহল বাড়ীর বাকীটুকুও পদ্মা টেনে নিলে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান এবং—

এবং বেলেঘাটায় একটা একতলা ভাড়াটে বাড়ী। শেয়ালদা কোর্টে ওকালতী করে পরিবার বাঁচানোর জন্যে বাবার প্রাণান্তিক প্রয়াস। দুর্দান্ত মনুজেন্দ্রনারায়ণের বংশধর প্রতাপেন্দ্রের টিউশনের আশ্রয়ে বি এ পাশ করা। একটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা আর এই অকুলীন সরকারী চাকরী।

তবু পুরোনো গল্পের জের চলে সংসারে। পদ্মার জলে নতুন মোহর ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ছিনিমিনি খেলা। হাতির পিঠে রুপোর হাওদা। একমণ ওজনের একটি সন্দেশ দিয়ে নৈবেদ্য সাজানো। বাঈজীর পায়ের তলায় সোনার জরি বোনা হাজার টাকার শাল পেতে দেওয়া।

দুর্বল মুহূর্তে এইসব গল্পের লোভ

প্রতাপেন্দ্রনারায়ণও সামলাতে পারত না। তাই শুনে ক্লাসের ছেলেদের চোখে মুখে ঠাট্টার হাসি ঠিকরে পড়ত। নাম দিয়েছিল রাজপুত্র।

—ট্রামে চড়ে কলেজে এলে যে বড়ো? তোমার রোলস-রয়েসটা কোথায় হে?

—ওটা স্পেশ্যাল অর্ডারে তৈরি হচ্ছে কিনা! তাই আসতে একটু সময় নিচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে।

কিংবা:

—ওহে, আমাদের একটা পার্টি দাওনা একদিন। মোটে হাজার দুই খরচ করলেই আমরা খুশি হয়ে যাব।

—সে পার্টি তোদের সইবে না—সহানুভূতি নিয়ে হয়তো এগিয়ে আসত কেউ: লোক বুঝে তো পার্টি দিতে হয়। দে তো ভাই প্রতাপ ওদের দু আনা পয়সা, চীনে বাদাম কিনে খাক গে। ওদের পেটে ওর বেশী সহ্য হবে না।

জমিদারী গেছে তিনপুরুষ আগে, কাজেই খোঁচাটাও তিনপুরুষ ধরেই শুনতে হয়। গায়ে আর লাগে না এখন। শেয়ালদা বারের উকিলেরা পর্যন্ত বাবার নাম দিয়েছেন 'মহারাজ।' তাই রাজপুত্র হওয়ার অধিকার তারও আছে বইকি।

কিন্তু সাধারণ একটি ছোটখাটো বাঙালী মেয়ে—যার হাসিটি ভারী সুন্দর আর উজ্জ্বল—যে এখানকার স্কুলে চাকরী নিয়ে এসেছে আর যার বাড়ী তার মতো পাকিস্তানে হারিয়ে গেছে—তার কাছে রাজপুত্রের কোনো ভূমিকাই নেই। তাই দুদিন বাদে আবার যখন ম্যালের রাস্তায় দেখা হল, তখন:

—এই যে—নমস্কার—খুশির হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করল মেয়েটি।

—নমস্কার—নমস্কার!—প্রতাপের মনে দোলা লাগল একটুখানি: বেড়াতে বেরিয়েছেন?

—হাঁ, ঘরে বসে কী আর করা। আপনি?

—আমিও তাই।

বসবার জন্যে একটি বেঞ্চির আশায় চারদিকে তাকালো দুজনেই। কিন্তু একটি জায়গাও খালি নেই কোথাও। একে সীজন টাইম, তার ওপর নির্মল নির্মেঘ রবিবারের সকাল। রং-বেরঙের পোশাকপরা স্ত্রী-পুরুষের মেলা বসে গেছে—হাসি গল্প, ফোটো তোলা, ছেলেমেয়েদের চ্যাঁচামেচি, ঘোড়ায় চড়বার উত্তেজনা। ম্যালে মেলা বসে গেছে দস্তুরমতো।

—ঘোড়ায় চাপবেন?—প্রতাপ কিছু ভেবে না পেয়ে জানতে চাইল।

—না, পোষাবে না—মেয়েটির গালে লজ্জার রং পড়ল: আছাড় খেয়ে মরব এক্ষুনি। আপনি বুঝি খুব ভালোবাসেন ঘোড়ায় চড়তে?

—বিশেষ নয়; কখনো সখনো। চলুন তা হলে—হেঁটেই বেড়ানো যাক একটুখানি।

হাঁটতে হাঁটতে কখন মানুষের ভীড় কমে গেল, থেমে এল ছুটন্ত ঘোড়ার উপদ্রব। গাছের পাতায় পাতায় আলোর জাফরি দুলতে লাগল পথের ওপর, ফরগেট মি নটের গুচ্ছগুলো খুশি ভরা চোখে চেয়ে রইল ঝোপেঝাড়ে, পাখী ডাকতে লাগল আশপাশে আর দুজনে ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

মেয়েটি মাধবী দাশগুপ্ত। হাবড়ার এক কলোনীতে থাকে। বাবা সামান্য স্কুল মাস্টার। অনেকগুলি ভাইবোন। কীভাবে যে চলে—এইখানেই মাধবী থামল।

সহানুভূতিতে ভিজে উঠল মন। মনুজেন্দ্রনারায়ণ চন্ড রায়চৌধুরীর পরিচয় দেবার কথা ভাবতেও লজ্জায় মাথা কাটা গেল। একটি মাত্র সম্পর্কের একাত্মতাই সত্য হয়ে দেখা দিলে। পাকিস্তানের বাস্তুহারা মানুষ।

আমাদেরও একই দশা। কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কী দিনকালই যে পড়েছে!

—আমরা তো তবু বেঁচে আছি।—মাধবী আস্তে আস্তে বললে, আমি এখানে আসার ক'দিন আগেই ওখানকার এক ভদ্রলোক সুইসাইড করলেন গলায় দড়ি দিয়ে। ঘরে বিধবা মা, স্ত্রী, দুটি ছেলে—তাদের অবস্থা ভাবাই যায় না। ভিক্ষেও তো এখন দিতে চায় না কেউ।

রবিবারের নির্মেঘ সকাল। পাহাড়ের বুকে অফুরন্ত খুশির মতো রোদ ঝরছে। ম্যালের মানুষগুলো যেন ফুটে আছে একরাশ সীজন ফ্লাওয়ারের মতো—সমতলের বাংলা দেশ তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু গুচ্ছ গুচ্ছ ফরগেট-মি-নট পাশে রেখে, শাল-সরল পাতার জাফরিকাটা পথ দিয়ে চলতে চলতে যে এইবার অন্যমনস্ক হল সে নিতান্তই একজন সামান্য সরকারী কর্মচারী প্রতাপ চৌধুরী। মনে পড়ছে বেলেঘাটার একতলা ভাড়াটে বাড়ীতে অপরিচ্ছন্ন বিষণ্ন সন্ধ্যাটা। বারান্দায় আলোটা জ্বলেনি, কোর্ট থেকে প্রায় শূন্য হাতে ফিরে বাবা চেয়ারে ছায়ামূর্তির মতো নিঝুম হয়ে বসে আছেন—কালকের বাজার হওয়ারও আশা নেই। আর ঘরের ভেতরে চোখের জল আঁচলে মুছতে মুছতে মা লক্ষ্মীর কৌটোয় সিঁদুর মাখানো টাকা খুঁজছেন একটা। বাবা তেমনি একভাবে বসে কী যেন ভেবেই চলেছেন। কী ভাবছেন তিনি? আত্মহত্যার কথা?

মাধবী ঘোর ভাঙিয়ে দিলে।

—অনেকটা তো হাঁটা হল। ফিরবেন না?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—চলুন।

আবার টুকরো টুকরো গল্প করতে করতে ফিরে আসা। 'আপনাদের টীচার্স মেসে কি রকম খেতে দেয়?' 'না—মাছ এখানে ভালো পাওয়া যায় না।' 'আপনি মাংস খেতে ভালোবাসেন না? আমিও না।' 'ফোটোর দোকানের এই ছবিটার কথা বলছেন? তা বটে—টাইগার হিলের সানরাইজ খুব সুন্দর।' 'না—আমি তো দুবছর আছি এখানে—একদিনও যাওয়া হয়নি।' 'বেশ তো, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে একদিন।'

স্টেশনের কাছে এসে দুজনের পথ দুদিকে। বিদায় নেবার আগে একবার ইতস্তত করল মাধবী।

—আজ বিকেলে আপনার সময় হবে?

—কেন বলুন তো?

মাধবী আর একবার দ্বিধা করল।

—চা খাওয়া যেত এক সঙ্গে। বেশ ভালো লাগত।

—বেশ তো—বেশ তো। কিন্তু আপনার কোনো অসুবিধে—

—অসুবিধে হলে আর আসতে বলব কেন?—সেই উজ্জ্বল সুন্দর হাসিটা হাসল মাধবী ঃ অন্য টীচার যাঁরা আছেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরাও তো মাঝে মাঝে আসেন। আপনার সময় হবে?

ছেলেবেলার সেই বৃষ্টিভেজা বাগান থেকে আবার রাতের অন্ধকারে হাসনুহানার গন্ধ এল। আত্মীয়-স্বজন—বন্ধু-বান্ধব! অনেকখানি অধিকার যেন এইটুকুর মধ্যেই মেয়েটি হাতে তুলে দিয়েছে।

—আমার আর সময়ের অভাব কী? কারু সঙ্গে তো বিশেষ মিশতে পারি না এখানে।

—আমিও না। তা হলে আপনি আসছেন? এই ধরুন সাড়ে চারটায়?

—নিশ্চয় আসব। নিশ্চয়।

রাজপুত্রের দ্বিতীয় শৈশব শুরু হল। না—রাজপুত্র নয়, প্রতাপ চৌধুরীর। যার বাবা বেলেঘাটার একতলা বাড়ীর বিষণ্ন সন্ধ্যায় বসে কখনো কখনো আত্মহত্যার কথা ভাবেন। আর সেই অন্ধকার ছোট উঠোনটাতে মাটির প্রদীপ হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় নীল শাড়ীপরা সাধারণ একটি বাঙালী মেয়ে—যার নাম মাধবী দাশগুপ্ত—যার কালো চোখের তারাকে আরো কালো করে রেখেছে আর একটি দুঃসহ আত্মহত্যা দেখবার ভয়।

তারপর বোটানিকসের সেই জায়গাটা। যেখানে 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ।'

—আমি এর আগে কখনো রডোডেনড্রন দেখিনি।—মাধবী বলেছিল, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যখন প্রথম পড়ি, তখন ভারী রাগ হয়েছিল ওই কটকটে নামটার জন্যে। ভেবেছিলুম, ভালো কোনো নামের কোনো ফুল কি কবি খুঁজে পেলেন না?

—এখনো রাগ হচ্ছে নাকি?

—না। নাম দেখে বিচার করলে ঠকতে হয় দেখছি। যদি নাম শুনেতুম প্রতাপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী আর মানুষটাকে চোখে দেখা না থাকত, তা হলে কী ভাবতুম বলুন তো?

—আপনিই বলুন।

—লম্বা চওড়া একটা মস্ত লোক, প্রকান্ড ভুঁড়ি, কান অবধি পাকানো গোঁফ আর চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতো ঘুরপাক খাচ্ছে।—

মাধবী হেসে উঠেছিল ঃ ভারী অন্যায় হত সেটা।

একটুখানি কাছে সরে এসেছিল প্রতাপ।

—এখন কী মনে হচ্ছে সেইটে বলুন।

—বদলে দিতে ইচ্ছে করছে নামটা।

—বেশ তো দিন না বদলে—প্রতাপের চোখ আলো হয়ে উঠেছিল।

মাধবী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। এক দৃষ্টিতে দেখেছিল রক গার্ডেনের গায়ে হাজার হাজার ফুলের মণি-মাণিক্য কিভাবে থরে থরে ফুটে রয়েছে। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে এক সময় বলেছিল, আজ নয়, আর একদিন বদলে দেব।

একমাস কাটল—দু মাস কাটল। বৃষ্টি-ভেজা হেনার গন্ধ ফিরে এল বার বার। ম্যালের পথে, স্টেপ-অ্যাসাইডের নির্জন নিরালা ছোট রাস্তাটি দিয়ে, সিঞ্চন লেকের জলের দিকে তাকিয়ে, ঘুম মনাস্টারির তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবদেবীদের দেখতে দেখতে। শেষে একদিন আড়ালটুকু সরে গেল বার্চ হিলে—বার্চ লজের পাতায় পাতায় আঁকড়ে থাকা মেঘের জল যখন টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে আর কাঞ্চনজঙ্ঘা সামনের সারা আকাশ জুড়ে তার রাজসভা সাজিয়ে বসেছে—সেই তখন।

মাধবী হাতটা সরিয়ে নেয়নি। বলেছিল, জানি।

—কিন্তু তোমার কথা তো জানি না এখনো।

—যদি এতদিনেও না জেনে থাকো, তা হলে এখুনি কিন্তু আপনি বলতে আরম্ভ করব।

—আচ্ছা, থাক—থাক।

বার্চের পাতা থেকে টুপ টুপ করে জল পড়ছে। সেই বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে মনের ভেতরে। শুধু হেনারই নয়—আরো চেনা-অজানা অসংখ্য ফুলের গন্ধে এখন ভরে উঠেছে চারদিক।

—কতদিন দেরী করতে হবে?

—অন্তত এক বছর।

—এক বছর?—যন্ত্রণা ফুটে উঠেছিল প্রতাপের গলায়।

—কী করা যায় বলো। ছোট ভাইটা অ্যাপ্রেন্টিস খাটছে এখনো। তার চাকরিটা হয়ে গেলে আমরা একটুখানি দাঁড়াতে পারব এদিকে। আর তোমার অবস্থাও তো জানি। আমার মাইনের টাকাটা তখন দিতে পারব তোমাদের সংসারে।

প্রতাপের নিঃশ্বাস পড়েছিল।

—এমনিভাবে হিসেব করতে হবে সব সময়? হিসেব ছাড়া কি কিছুই থাকবে না কোথাও?

—উপায় তো নেই।—প্রতাপের আঙুল-গুলো নিয়ে খেলা করতে করতে মাধবী বলেছিল, আমাদের সময়টাই যে আলাদা। অনেক দাম না দিয়ে আজ কিছুই আমরা পেতে পারি না আর।

প্রতাপ কথা বলেনি কিছুক্ষণ। সামনের কাঞ্চনজঙ্ঘার সেই রাজবেশ আর দেখতে পাচ্ছে না সে। বেলেঘাটার একতলা বাড়ীটা থেকে একমুঠো মলিন অন্ধকার এসে ছড়িয়ে পড়ছে তার ওপর। ঠিক। আমাদের সময়টাই আলাদা।

খুলল গীতবিতানের প্রথম পাতা—

আদর করে প্রতাপের কপালে ছোট একটা টোকা দিয়েছিল মাধবী।

—রাগ হয়ে গেল তো? এখন ভুলে যাও ওসব কথা। আমি বরং একটা গান গাই, তুমি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে শোনো।

গান শুনতে শুনতে প্রতাপ চমকে উঠেছিল।

—এত ভালো গাইতে পারো তুমি? এত ভালো?

—ভালো কিছু নয়। অল্প অল্প চর্চা ছিল এক সময়। এখন আর—একটু চুপ করে থেকে বলেছিল: অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল একটা 'গীতবিতান' কিনব। এক সঙ্গেই বেরিয়েছে সব খণ্ডগুলো। কিন্তু এত দাম!

—কত দাম?—পৌরুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল প্রতাপের।

—বোধ হয় টাকা ষোলো হবে। সেই রকমই যেন শুনেছিলুম।

ষোলো টাকা। তৎক্ষণাৎ বরফের ছোঁয়া লেগেছিল। মিথ্যে করেও বলতে পারা যায়নি, আমি একখানা কিনে দেব তোমাকে। গলার ভেতরটা শুকিয়ে আসতে চেয়েছিল, মনে পড়ে গিয়েছিল, অন্তত পঞ্চাশটি টাকা বাড়ীতে পাঠাবার পরে মাসের শেষ সপ্তাহে প্রতিটি বিড়ির পয়সা তাকে হিসেব করতে হয়।

মাধবী উঠে দাঁড়িয়েছিল: চলো—ফিরি এবার।

পথে যেতে যেতে ক্ষুণ্ণ হয়ে কেবল প্রতাপ একবার বলেছিল, রবীন্দ্রনাথের বই কেন পয়সা দিয়ে কিনতে হবে বাংলা দেশের মানুষকে? ঘরে ঘরে কেন তাঁর বই বিলিয়ে দেওয়া হবে না? তিনি তো সকলের?

মাধবী হেসে বলেছিল, পাগলামি রাখো। এখন একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও দেখি। কতটা রাস্তা যেতে হবে খেয়াল আছে? দারুণ খিদে পেয়েছে আমার।

আরো কদিন পরে।

ব্যাপারটা ঘটল কার্ট রোডে। দুজনের মগ্ন কথালাপকে ঘা দিয়ে পেছন থেকে কার উল্লসিত মোটা গলার ডাক শোনা গেল: হ্যালো—হ্যালো—আরে, আমাদের রাজপুত্র যে!

চমকে ফিরে তাকাবার আগেই পিঠে হাত রাখল বীরেশ সোম। কলেজে সহপাঠী

ছিল—রোলস রয়েস নিয়ে যে ঠাট্টা করত সব চাইতে বেশী। কিন্তু আজকের এই সম্ভাষণে খুশিতে মন ভরে উঠল না প্রতাপের, অপমানের অনুভূতিতে মুখটা কালো হয়ে উঠল।

—এই যে বীরেশ! তুমি কবে এলে?

সুখ আর প্রাচুর্য উপচে পড়ছে বীরেশের চোখে মুখে, দামী সুটে। হাওয়ায় রঙিন টাই উড়ছে, মুখে পাইপ। আর সেই পাইপ সুদ্ধ ঠোঁটটাকে একদিকে চেপে রেখে, আর একদিকের ঠোঁট খানিকটা বিস্তীর্ণ করে—খঃ খঃ খঃ শব্দে খানিকটা অদ্ভুত হাসি হাসল বীরেশ।

—নেকসট উইকে যে এখানে ক্যাবিনেট আসছে রাদার। তাই আগেই আসতে হল আমাদের, বলতে পারো স্যাপার্স! তারপর তোমার খবর কী? বেড়াতে এসেছো বুঝি এখানে?

—না বেড়াতে নয়। চাকরী করছি। আছি বছর দুই।

—য়্যাঁ—চাকরী?—বীরেশ সোম যেন আকাশ থেকে পড়ল: ইজ ইট পসিবল্? রাজপুত্র চাকরী করবে কি হে? করণ সিং এর মতো কোথাও রাজপ্রমুখ হয়ে বসবে যে তুমি। না—না—এ ভারী অন্যায়! খঃ—খঃ—খঃ—

—চলি বীরেশ, কাজ আছে একটু।

—আরে এত ব্যস্ত কেন? দাঁড়াও—আমার ম্যাডামের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন শ্রীলা সোম, আর এ হল আমার কলেজের ফ্রেন্ড প্রতাপেন্দু—সরি কুমার প্রতাপেশ্বর—আই মীন—

শুকনো স্বরে প্রতাপ বললে, প্রতাপেন্দ্র-নারায়ণ রায়চৌধুরী।

—হাঁ—হাঁ, প্রতাপেন্দ্রনারায়ণ। আই স্ট্যান্ড কারেক্টেড। রাজা-রাজপুত্তুরের নাম মনে রাখা—ওফ্!—টানা টানা হাসির সঙ্গে পাইপটা নাচতে লাগল গালের পাশে: খঃ খঃ খঃ!

বীরেশের উড়ন্ত টাইটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাসি থামিয়ে দেবার জৈব ইচ্ছাটা দমন করল প্রতাপ। আর তখন বীরেশের পেছন থেকে এগিয়ে এলেন চোখে সানগ্লাস চড়ানো সুতনুকা শ্রীলা সোম। ঘন রক্তিম ঠোঁটে বিতরণ করলেন খানিকটা রঙিন হাসির দাক্ষিণ্য:

নমস্কার। কিন্তু মিসেস রায়চৌধুরীর সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন না।

একটু সরে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়ে চোখ মেলে রেখেছিল মাধবী। যে মুহূর্তে জবাব দিতে গিয়ে প্রতাপের কান দুটো ং হয়ে উঠল, সেই মুহূর্তেই সে ফি তাকালো এদিকে।

—ভুল করছেন। আমার নাম মাধ দাশগুপ্ত—এখানকার স্কুলের টীচ একজন।

—দুঃখিত, অত্যন্ত দুঃখিত। এক্সকিউ মী—লজ্জা পেলেন শ্রীলা সোম: একদ বুঝতে পারিনি।

—কিছু না, কিছু না। ভুল তো হতেই পারে। আচ্ছা—নমস্কার—

—নমস্কার—সরু মোটা গলায় ভদ্রতার দ্বৈততান।

মাথা নীচু করে এগিয়ে চলল প্রতাপ, যেন মাধবীর দিকে তাকাতে তার সাহস হচ্ছে না। আর খানিকটা যেতেই কানে এল পেছনে মোটা গলায় কী যেন রসিকতা করছে বীরেশ সোম—তার স্ত্রী হেসে উঠছে খিল-খিল করে। পায়ের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল প্রতাপের—এক পলকের জন্যে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মাধবী বললে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? রাগ করবে না?

—না, রাগ করব না।

—তোমাকে রাজপুত্র বলছিলেন কেন ভদ্র-লোক? মানে কী ওর?

সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ জবাব দিতে পারল না। সেই প্রথম দিন—অফিস থেকে ফেরার পথে মাধবীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত—রাজপুত্রে পরিচয়ের জন্যে কোথাও কোনো লজ্জা ছিল না। কেরানীগিরির এই তুচ্ছতার ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ত পদ্মার ধারে একটা সাত মহলা বাড়ী—ঘাটে সারি সারি বজরা—সিংহ দরজার সামনে প্রহরী, পিলখানা থেকে হাতির গম্ভীর ডাক। তখন চারপাশের বংশমর্যাদাহীন সহকর্মীদের দিকে একটা চাপা অনুকম্পা নিয়ে সে তাকাতো—অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে নিজের আভিজাত্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠত সে। কিন্তু হাবড়া কলোনীর একটি মেয়ে এসে রাজ-পুত্রকে কখন নামিয়ে আনল সিংহাসন থেকে, এক দুঃখ, এক বঞ্চনা, এক দুর্ভাগ্যের মধ্যে তাকে মিলিয়ে নিলে। মাধবীর কাছে এই বংশ গৌরবের অহংকার এক মুহূর্তেই দুজনকে আলাদা করে দেবে—আর মাধবী তাকে বিশ্বাস করবে না। তাই বীরেশের সম্ভাষণ এমনভাবে ঘা দিয়েছে তাকে—মনে হয়েছে তার আর মাধবীর মাঝখানে একটা কালো ছায়া দুলিয়ে দিয়েছে বীরেশ।

—কী ভাবছিলে?

—কিছু না।—প্রতাপ নিঃশ্বাস ফেলল: চলো ওই চায়ের দোকানটায়। রাজপুত্রের গল্প বলি।

রাত এগারোটাও বাজেনি—এর মধ্যেই পাহাড়ী শহর ঘুমের কবরে তলিয়েছে।

মেসের এই ঘরটাতে প্রতাপরা তিনজনে শোয়—দুজন লেপের তলায় আপাদমস্তক সমাহিত। প্রতাপ জেগে আছে কেবল। চোখ বুজতে গেলেই উত্তেজিত স্নায়ুগুলো স্প্রীঙের মতো পাতা দুটোকে টেনে খুলে দিচ্ছে তার।

চা খেতে খেতে মাধবী শুনেছিল রাজপুত্রের কথা। হেসেছিল একটুখানি।

—হাসছ যে?

—ভাবছি—রাজ্য নেই, তবু রাজপুত্রের কত দুর্ভোগ। যখন ছিল তখন না জানি কত বিড়ম্বনাই সইতে হত।

—তুমিও ঠাট্টা করছ আমাকে?

—না—না। ওদের কথা বলছি। বড়ো সরকারী চাকরী পেয়ে ওরা মিথ্যে রাজপুত্র সেজেছে—তাই সত্যিকারের রাজপুত্রকে সইতে পারে না। জানে না, নকল রাজপুত্র একদিন ফাঁকির মধ্যে ডুবে যায়। আর আসল রাজপুত্র ইতিহাসের নতুন পালায় প্রায়শ্চিত্ত শুরু করে—এক সময় অনেক বেশী নিয়েছে বলে অনেক বেশী দেবার দায়িত্বও তাকে বইতে হয়। কলেজে ওরা তোমায় যত ঠাট্টা করেছে, ততই একটু একটু করে তোমার দেনা শোধ হয়ে এসেছে। বুঝতে পেরেছ?

—না।

—আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দেব তোমায়।—একটু চুপ করে থেকে মাধবী বলেছিল: হয়তো সারাজীবন ধরেই। সব সময় ধরেই। সব সময় হয়তো তোমার তা ভালো লাগবে না। তখন আমায় সইতে পারবে কিনা জানি না।

—তোমার কাছ থেকে সব সইতে পারি। কিন্তু ওরা—

—ওরা অন্যায় করছে না, আমার কাজ সহজ করে দিচ্ছে।

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—বলেছি তো আমিই বুঝিয়ে দেব। অনেকদিন ধরে।

প্রতাপের রাত জাগা উত্তেজিত স্নায়ুতে মাধবীর কথাগুলো দুর্বোধ্য অস্বস্তির মতো জেগে আছে। প্রতাপ খুশি হচ্ছে না ব্যথা পাচ্ছে বুঝতে পারছে না। বাবার এক উকিল বন্ধুর কথা ভেসে আসছে স্মৃতিতে। বেলেঘাটার একতলা বাড়ীটার সামনে এসে গলা ছেড়ে ডাক দিচ্ছেন: মহারাজ—ও মহারাজ! রাজশয্যায় শুয়ে পড়লেন নাকি? এই অধম প্রজা একটা আর্জি নিয়ে এসেছে, দয়া করে একবার কর্ণপাত করুন।

একটা অদ্ভুত লজ্জা—অদ্ভুত অস্বস্তি। বীরেশ সোমের সেই বিশ্রী হাসিটা। কী বলছিল তাকে মাধবী—কী বোঝাতে চেয়েছিল?

পাশের কাচের জানলা থেকে পর্দাটা সরিয়ে দিলে প্রতাপ। রিঙে আর তারে কর্কশ হাসির মতো একটা শব্দ পিছলে চলে গেল। নড়তে গিয়ে কচকচ করে উঠল খাটটা—আবার একটা হাসির আওয়াজ যেন। বীরেশের সেই কুশ্রী হাসিটা তাকে এখনো মুক্তি দেয়নি—এই ঘরটা পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছে—ওই পর্দার রিঙে, এই খাটে—সব জায়গায় কোনো সংক্রামক ব্যাধির বীজাণুর মতো সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে! কিন্তু মাধবী কী বলতে চেয়েছিল?

দূরে ফাল্গুট পাহাড়ের বুকের ভেতর প্রকাণ্ড একটা লাল আলো টকটক করছে—আগুন জ্বলছে নিশ্চয়। নিজের সঙ্গে ওর একটা সাদৃশ্য খুঁজে পেলো প্রতাপ। তারও ভেতরে ওই রকম একটা আগুন জ্বলছে—তার উত্তাপ বয়ে আসছে প্রতিটি শিরা দিয়ে। কিন্তু ঠিক কোথায় জ্বলছে আগুনটা—কিসের ইন্ধনে যে জ্বলছে বুঝতে পারছে না।

মাধবী কী বলতে চেয়েছিল?

আকাশভরা তারা—কত তারা! বার্চ হিলের দূরপ্রান্তের ইলেকট্রিকের আলোগুলো তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছে। বার্চ হিল! মাধবী গান গাইছিল: 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে—'

একখানা মাত্র গীতবিতান। ষোলো টাকা দাম। মাসের শেষ সপ্তাহে যাকে হিসেব করে বিড়ি কিনতে হয়—দাম শুনেই গলাটা তার শুকিয়ে গিয়েছিল। কী বলছিল মাধবী? ভালো বুঝতে পারেনি। কিন্তু স্মৃতিসর্বস্ব রাজপুত্রের আর একটা নিষ্ঠুর লজ্জা, আর একটা কঠিন অসম্মান।

বীরেশ সোমের হাসিটা এবার ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ল। ছড়িয়ে পড়ল রাত্রিতে—অন্ধকারে—ফাল্গুট পাহাড়ে। রাজপুত্রই বটে! যাত্রার দলের যে রাজপুত্র সকালে পোশাক খুলে ফেলে কামারশালায় হাতুড়ি নিয়ে বসে—সেও সুখী। কিন্তু অচ্ছেদ্য কবচের হাত থেকে তার মুক্তি নেই। খোলাও যাবে না—অথচ সারাক্ষণ দম বন্ধ করে আনবে।

গীতবিতান।

যে কথা সেদিন সে বলেছিল মাধবীকে। রবীন্দ্রনাথ তো বাঙালীর প্রাণেমনে মিশে গেছেন—ছড়িয়ে গেছেন প্রত্যেকটি রক্তকণায়, প্রতিটি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। কেন তাঁর বই কিনতে হবে পয়সা দিয়ে—কেন তা সূর্যের আলো হয়ে আমাদের ঘরে আসবে না? আসবে না আপনা থেকেই?

কিন্তু তাই বা কেন? কেন এই কাঙালের কল্পনা? একটি শ্লোকের জন্যে রাজা চিরকাল কবির গলায় পরিয়েছেন গজ-মোতির মালা। তাদের বাড়ীতেও সে দেখেছে পুরোনো বই, ভূমিকায় সেকালের কবি জানিয়েছেন 'পরম দানশীল বিদ্যোৎসাহী রাজাবাহাদুর (তার এক পূর্বপুরুষ) অকৃপণ অর্থানুকূল্যে করায় গ্রন্থখানি জন-সমক্ষে প্রকটিত হইল।'

—না—কবির কাছে সে ভিক্ষা চায় না। তখন মনে পড়ল।

সেই আংটিটা—কবে যেন মা দিয়েছিলেন তাকে। আজ তিন বছর ধরে পড়ে আছে তার ট্রাঙ্কের তলায়। আঙুলে আর লাগে না—ঢিলে হয়ে গেছে এখন, গত তিন বছরে অনেকটাই রোগা হয়ে গেছে সে।

বেশ খানিক সোনা ছিল আংটিটায়। কত দাম হবে এখন কে জানে। সোনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, তবু জানে আজকাল বাজার খুব চড়া। হোক পুরোনো, তবু ষোলো টাকার বেশী বোধ হয় পাওয়া যাবে—অন্তত ষোলো টাকা পাওয়া যাবেই।

তখনই নেমে পড়ল বিছানা থেকে। আলো জ্বালল, ট্রাঙ্ক খুলল। ট্রাঙ্কের তলায় বিছানো পুরোনো খবরের কাগজের নীচ থেকে বের করে আনল আংটিটা।

সাবেকী গড়নের মোটা আংটি। লাল পাথরটা মলিন হয়ে গেছে। মা বলেছিলেন, ঠাকুর্দার শখের জিনিস নাকি ছিল ওটা। লাল পাথরটার জায়গাতে তখন বসানো ছিল দামী দুর্লভ একখানা কমল-হীরা। আলো ঠিকরে পড়ত তা থেকে।

কী বলছিল মাধবী? কী বোঝাতে চেয়েছিল?

কিন্তু মাধবী থাকুক। কমলহীরা আর নেই—কবে দেনার দায়ে তা উধাও হয়ে গেছে। তবু তার শেষ আলোটা জ্বলে উঠুক একবার—উজ্জ্বল হয়ে উঠুক গীত-বিতানের গানে গানে।

ঘরে আলোটা জেলে দেওয়ায় পাশের খাটের বন্ধুটি কখন জেগে উঠেছিল। একটা ঘুম জড়ানো হাসিতে চমকে উঠল প্রতাপ। বীরেশ সোম? না—বীরেশ নয়।

—এত রাতে হাতে একটা আংটি নিয়ে কিসের ধ্যান করছেন মশাই?

ত্রস্ত হয়ে আংটিটা লুকিয়ে ফেলল প্রতাপ।

—সেই স্কুল টীচার বান্ধবীটির উপহার নাকি? বাঃ—বাঃ—লাকি ম্যান!

ছোট শহর, কিছুই কারো চোখ এড়ায় না। দুটো-চারটে বাঁকা কথা প্রায়ই কানে এসেছে কিছুদিন ধরে। তবু তীক্ষ্ণ বিরক্তিতে এই মুহূর্তে জ্বলে উঠল প্রতাপ।

—চুপ করুন।

—চুপ করে ঘুমুতেই তো চাইছি। কিন্তু আপনার ছটফটানিতে ঘুমোবার জো কী! তার ওপর আলোটাও জেলে দিয়েছেন। দয়া করে ওটা নিবিয়ে দিন। আমি ঘুমিয়ে বাঁচি, আপনি আংটিটাকে বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকুন।

আবার জড়ানো জড়ানো হাসির আওয়াজ। বীরেশ নেই, কিন্তু হাসিটাকে এই ঘরে সে পৌঁছে দিয়েছে।

আলো নিবিয়ে প্রতাপ নিজের বিছানায় ফিরে এল।

পর্দা সরানো কাচের জানলার বাইরে ফালুটের কালো পাহাড় অন্ধকারে দেখা যায় দেখা যায় না। তার বুকে সেই আগুনটা আরো বড়ো হয়ে উঠেছে—যেন রাত্রির আংটি থেকে কমলহীরেটা ঠিকরে পড়েছে ওখানে। আর যেন তারই আলোয় তারাগুলো দীপ্তি পাচ্ছে আরো। যেন সারা আকাশ গীতবিতানের পাতা—তারাগুলো তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি উজ্জ্বলন্ত গানের মতো, যেন অন্তবিহীন অগ্নিধারায় সুরের ঝঙ্কার বেজে চলেছে অবিশ্রাম।

'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে—'

আর দেরী করা চলবে না। কাল। কালকেই। কমলহীরার আলোয় স্নান করিয়ে ওই তারাগুলোকে এনে দিতে হবে মাধবীর মুঠোয়।

সে কাঙাল নয়। সূর্যের কাছে সে ভিক্ষে চায় না।

রোজকার মতো এক সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে মাধবী প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল আজকের খবরের কাগজটা কিংবা এক আধটা খাতা-পেন্সিল কিছু কিনবে প্রতাপ। এখানকার বইয়ের দোকানে সবই কিনতে পাওয়া যায় এক সঙ্গে।

গীতবিতান দেখে সে আঁতকে উঠল।

—কী ব্যাপার? কার জন্যে?

রাজবংশের শেষ আংটিটার শেষ আলোয় জ্বলে উঠল প্রতাপের মুখ।

—আগে নেওয়া যাক তো বইটা। পরে দেখা যাবে এখন।

বুঝতে বাকী রইল না মাধবীর। প্রতিবাদ করে বললে, না—না—না। খুব অন্যায় এ সমস্ত। আপনি—

প্রতাপ দুখানা দশ টাকার নোট মেলে ধরল কাউন্টারের ওপর। ঠাকুর্দার আংটি তাকে ঠকায়নি।

—শুনুন—মাধবী শেষ চেষ্টা করল: শুনুন, আমি বলছিলুম—

—পরে শুনব এখন। এই যে—দামটা নিন। না—বই আর প্যাক করতে হবে না, এমনিই নিয়ে যাচ্ছি।

—হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো—

কাল রাত থেকে আজকের বিকেল পর্যন্ত যে সুরে মনের তারটা বাঁধা ছিল, সেই সুর কাটল, তার ছিঁড়ল। আবার সেই ছায়াটা। বীরেশ সোম আর শ্রীলা সোম। সেই পাইপ, সেই সুট, সেই ঝিলমিল বিলিতী টাই, প্রসাধন আর পোড়া টোব্যাকোর গন্ধ, সূক্ষ্ম সিফন আর সৌখীন শাল, গাঢ় লাল ঠোঁটে রঙিন হাসি।

কয়েকটা রেখা ফুটল প্রতাপের কপালে, শান্ত আর কঠিন হয়ে এল মাধবীর মুখ।

—তা হলে আবার আজই দেখা হয়ে গেল অ্যাঁ!—বীরেশের উল্লাস: গুড—গুড—ভেরী গুড।

—দার্জিলিং শহরটা বড়ো জায়গা নয়।—প্রাণহীন উত্তর এল প্রতাপের।

—রাইট—রাইট—বৃত্তটা বড্ড ছোট! খঃ খঃ খঃ—বীরেশ সোম হাসল। শ্রীলা সোমও একটি দাক্ষিণ্যের হাসি বিস্তার করে দিলেন।

তারপর প্রতাপ আর মাধবীকে এক সঙ্গে চমকে দিয়ে বীরেশ দোকানদারকে বললে, ও মশাই, এক কপি গীতবিতান দিন তো আই মীন, ট্যাগোরের গীতবিতান।

দোকানদার ভদ্রলোক প্রতাপের জন্যে চেঞ্জ গুণছিলেন। মাথা তুলে হেসে বললেন, মাপ করবেন। একটা কপি মাত্র আমাদের স্টকে ছিল, এই মাত্র এঁরা কিনে নিলেন।

—ও—হাউ আনফরচুনেট! এ বিট লেট!—গাল থেকে পাইপটা নামালো বীরেশ সোম: তা হলে আর কোনো দোকানে—

—পাবেন না। এখানে বাংলা বই কেবল আমরাই রাখি। যদি অর্ডার দেন তা হলে তিন চারদিনের ভেতরে আনিয়ে দিতে পারি কলকাতা থেকে।

—তিনদিন বলছেন কি মশাই! আই ওয়াণ্ট ইট রাইট নাউ! আজ সন্ধ্যেবেলায় একটুখানি গানের আসর বসাবো ভাবছি—মাই ওয়াইফ—এ স্টুডেন্ট অব শান্তি-নিকেতন—তিনি বলছেন স্বরবিতান না হোক একখানা গীতবিতান অন্তত না হলে কিছুতেই গাইতে পারবেন না! হোয়াট এ ফিকস!

—কারো বাড়ী থেকে—

—হুঁ—লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে চাইতে যাই এখন।—বলতে বলতেই বুদ্ধিটা নড়ে উঠল বীরেশ সোমের মগজে: ওয়েল ওয়েল রাজ-পুত্র, তুমি তো ভাই তিন চারদিন ওয়েট করতে পারো, আজ যদি বইটা আমায়—

মরক্কো চামড়ার একটা মোটা মণিব্যাগ বেরিয়ে এল বীরেশের পকেট থেকে।

আর সমস্ত সংযমের শেষ প্রান্তটায় পৌঁছে এইবারে কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল প্রতাপের—হাতের মুঠো লোলুপ হয়ে উঠল বীরেশের টাইয়ের দিকে। কিন্তু দুর্ঘটনাটা ঘটার আগেই মাধবী তার মুঠো চেপে ধরল। প্রতাপের ওপর তার অধিকারের কোনো আবরণই আর রাখল না, শান্ত শাসনে বললে, তুমি থামো—থামো বলছি।

প্রায় দু মিনিট ধরে ঘর নিস্তব্ধ। তার মধ্যে নিজের ব্যাগ থেকে কলম বের করল মাধবী, খুলল গীতবিতানের প্রথম পাতা, লিখল 'বন্ধুপত্নী শ্রীযুক্তা শ্রীলা সোমকে উপহার'। তারপর কলমটা প্রতাপের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, সই করো। ভালো করে লেখো নিজের নামটা।

চোখ দুটো গোল করে চেয়ে রইল বীরেশ সোম। স্বপ্ন দেখছে যেন। বেকুবের মতো বললে, কিন্তু দামটা—

—সহপাঠী বন্ধু না আপনি?—ঘরের স্তব্ধ মেঘের ভেতরে বিদ্যুতের মতো ছুটে গেল ধারালো গলা: বন্ধুর কাছ থেকে উপহার নিয়ে দাম দিতে চাইছেন? তার ওপর আপনার বন্ধু যে রাজপুত্র—সে কথাই বা ভুলে যাচ্ছেন কেন?

চোয়াল ঝুলে পড়ল বীরেশের। কিছু বলতে চাইল, কথা খুঁজে পেলো না। এক-খানা অসাড় হাত বাড়িয়ে গীতবিতানটা নিলেন শ্রীলা সোম—রঙিন হাসিটা জমে রইল ঠোঁটের কোণায়। ধন্যবাদটা পর্যন্ত ভালো করে বেরিয়ে এল না।

—আশা করি, গানের জলসাটা এবার ভালোই জমবে আপনাদের।—একটি সাধারণ বাঙালী মেয়ের এক ঝলক উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল ঘরখানা: আচ্ছা—নমস্কার।

ভিক্টোরিয়া ফলসের পথ দিয়ে যেতে যেতে বনের ধারটায় যখন নির্জন সন্ধ্যা নামল, তখন প্রতাপের মুখোমুখি দাঁড়ালো মাধবী।

—এতদিন ধরে ভেবেছি কী নাম তোমার। আজ সেটা খুঁজে পেয়েছি। এতদিন রাজ-পুত্র ছিলে, আজ থেকে তুমি রাজা। তোমাকে আমার রাজা করে নিলুম।

একটা কমলহীরে এখন দুটো হয়ে জ্বলছে মাধবীর চোখে। আর তারই আভায় আকাশের তারাগুলো গীতবিতানের গান হয়ে গেছে—সুর বাঁধছে অন্তবিহীন অগ্নিধারায়।

পুঁথির জন্যে

ইন্দ্র মিত্র

সে দিন আর নেই। ছাপাখানার দাপটে বাঙলা পুঁথির স্বর্ণ-যুগ অস্ত গেছে। মোটরগাড়ির সঙ্গে গোরুর গাড়ি পাল্লা দিতে পারেনি; এবং সম্ভবত অনুরূপ কারণেই মুদ্রিত গ্রন্থের কাছে পরাস্ত হয়েছে হস্ত-লিখিত পুঁথি।

কিন্তু এককালে পুঁথিই এদেশে সর্ব-জনের একমাত্র সম্বল ছিল। গুরুমশায়ের পাঠশালায় হাতের লেখা পুঁথি দেখে বিদ্যারম্ভ। কবিরাজের হাতে কবরেজি পুঁথি। ঘটকের বগলে হাতে লেখা কুলজি। বৈষ্ণবের আখড়ায় চৈতন্যচরিত, পদাবলী। বাউলের আখড়ায় গোর্খ-গোপীচাঁদের হেঁয়ালি। সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে কাশী-দাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, নানা-রকম ধর্মগ্রন্থ। সব পুঁথি, হাতে লেখা পুঁথি। ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্রোত পুঁথির পাতা থেকেই প্রবাহিত হয়েছে একদা। এদেশে এসে সাহেবেরাও প্রথম যুগে ওসব হাতে লেখা পুঁথিই কাজে লাগিয়েছেন।

একখানা পুঁথি থেকে নকল করে আরেকখানা পুঁথি তৈরি হয়েছে। নকল থেকে আবার নকল। এইভাবেই পুঁথি প্রচারিত হয়েছে।

পুঁথি লেখা হত তুলোট কাগজে, তাল-পত্রে, ভূর্জপত্রে, নানারকম গাছের বাকলে, এমন কি জন্তু-জানোয়ারের চামড়ায়। লেখা হত শর, শকুনের পালক, কঞ্চি বা লোহার কলমে। পুঁথি লেখার জন্যে বিশেষ রকম কালি তৈরি করে নিতে হত। কালি তৈরির একাধিক ছড়া আছে। একটা তুলে দিচ্ছি :

> কাজল গোমূত্র লায়ের জল
> ভৃঙ্গ ভেলা দিয়ে তোল
> পীত কাষ্ঠ দিয়ে রসি
> তোটে পত্র না তোটে মসি॥

পুঁথির নকল করতেন লিপিকররা। হস্তাক্ষর ভালো হলেই লিপিকরের কাজ পাওয়া যেত। মহিলারা পুঁথি নকল করেছেন—এমন ঘটনাও আছে। পুঁথি নকল করা পেশা ছিল অনেকের। সকলেই এ কাজে আনন্দ পেতেন কি না জানি না, কিন্তু কেউ-কেউ এ কাজে অবশ্যই আনন্দ পেয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে পঞ্চানন আস মশায়ের নাম করা যেতে পারে।

দীর্ঘকাল পঞ্চানন পুঁথি নকলের কাজ করেছেন। অতি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি এ কাজে লোভ করেছেন, এবং জন্মান্তরেও যেন এই লোভ বজায় থাকে এমনি কামনা করেছেন। "অতি বৃদ্ধ মুঞি নিকট মরণ, লোভে মাত্র লিখি কিছু না জানি মরম। যদি জন্ম হয় পুনু সংসার ভিতর, ইহাতেই লোভ জেন থাকে নিরন্তর।"

লিপিকরদের সম্পর্কে আরেকটি তথ্য চিত্তাকর্ষক : ফারসী অক্ষরে মুসলমানদের জন্যে পুঁথি নকল করেছেন হিন্দুরা; এবং রামায়ণাদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ নকল করেছেন মুসলমানেরা।

যুগের পর যুগ হাতে লেখা পুঁথি রাজত্ব করেছে এদেশে। তারপর একদিন এদেশে ছাপাখানা এল। ১৭৭৮ সালে হুগলিতে প্রথম বাঙলা টাইপে বই ছাপানো হলো। ছাপাখানার প্রথম যুগে এ দেশের অনেক ধর্মান্ধ ভদ্রলোক ছাপার অক্ষর দেখলে চোখ বন্ধ করে ফেলতেন, কেননা ছাপার অক্ষর দেখলে ধর্মনাশ হবার ভয় আছে! নানা বাধা-বিঘ্ন পার হয়ে শেষ পর্যন্ত ছাপাখানার জয় হল; ছাপার অক্ষরের বই একটানে হাতে

পুঁথির প্রচ্ছদচিত্র

লেখা পুঁথির ভাগ্য অন্ধকার করে দিল। ভালোই হয়েছে। হাতে লেখা পুঁথির যুগ থেকে মুদ্রিত গ্রন্থের যুগে উত্তীর্ণ হতে না পারলে আমাদের ভাগ্যই থাকত অন্ধকার হয়ে। পুঁথির যুগ বিগত বলে দুঃখ করার না; আমাদের অবিবেচনায়, অবজ্ঞায়, উপেক্ষায় অজস্র পুঁথি বিনষ্ট হয়েছে বলে আক্ষেপ করি। অজস্র পুঁথি নিশ্চিতরূপে ভেসে গেছে। কালস্রোতে ভেসে গেছে। জলস্রোতে ভেসে গেছে। কীটের উদর পূর্ণ করছে। অগ্নিগর্ভে ভস্ম হয়েছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার নবদ্বীপে দেখে-ছেন, এক বাড়ির পিছনে রাস্তার ধারে রাশি-রাশি পুঁথির পাতা। কৌতূহল হল। অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, ওই বাড়ির গিন্নী পুঁথির কাঠের পাটাগুলো খুলে নিয়ে উনুনে নিক্ষেপ করেছেন; পুঁথির পাতাগুলো উনুনে দেননি, কারণ ওই বাড়ির গিন্নীর বিবেচনায়, ওগুলো হল মা সরস্বতী।

বাঙলাদেশের সব গিন্নীর বিবেচনা নিশ্চয়ই নবদ্বীপের ওই বাড়ির গিন্নীর মতো নয়। সেক্ষেত্রে অনেক পুঁথির পাতা যে উনুনের আগুনে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, এ তো নিতান্ত স্বাভাবিক।

কয়েকজন কর্মীর সযত্ন পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের ফলে অনেক পুঁথি আজ একাধিক পুঁথিশালায় সুরক্ষিত। তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকলে অনেক ঐশ্বর্য নিশ্চয়ই লোকচক্ষুর অগোচরে বিনষ্ট হয়ে যেত, বিনষ্ট হয়ে যাবে। অন্তিম মুহূর্তে পর্যন্ত বাঙলাদেশ তাঁদের সাধনায় উপকৃত হতে থাকবে। তাঁদের সাধনাকে নমস্কার।

দীর্ঘকালের বঙ্গসমাজের জ্ঞান-কর্ম, মিলন-বিরহ, সুখ-দুঃখ, বাসনা-বৈরাগ্যের বহুলাংশ পুঁথিপত্রে বিম্বিত হয়ে আছে। যেসব জীর্ণপত্র কীটদষ্ট বাঙলা পুঁথির উদ্ধারসাধন যে আমাদের অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্গত, এই বোধে বাঙলাদেশে প্রথম উদ্যম দেখা গেল উনিশ শতকের শেষদিকে।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে বাঙলা পুঁথি খোঁজার কাজ আরম্ভ হয় ১৮৯৪ সালে। এই বছরের রিপোর্টে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন :

The work of searching Bengali Mss. has only commenced.

হরপ্রসাদ ট্রাভেলিং পন্ডিতদের বলে দিলেন—তোমরা বাঙলা পুঁথির সন্ধান আনবে এবং পারো তো কিনবে।

তাঁরা প্রথমেই মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্ম-মঙ্গল' এনে দিলেন। পুঁথির মালিক হাত-ছাড়া করতে চাননি। বিদ্যাসাগরের সেজো ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন জামিন হয়ে মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় হরপ্রসাদকে ওই পুঁথি পাঠিয়ে দেন। হরপ্রসাদ পুঁথিখানার একখানা নকল তৈরি করিয়ে নিয়েছেন। বাঙলাদেশে যদি কখনো পুঁথি-সংগ্রাহকদের ইতিহাস রচিত হয়, নিঃসন্দেহে হরপ্রসাদের নাম সেখানে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। পুঁথির অনুসন্ধানে সাকুল্যে চারবার নেপালে গিয়েছেন হরপ্রসাদ। ১৮৯৭ সালে, ১৮৯৮ সালে, ১৯০৭ সালে এবং ১৯২২ সালে। নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদাবলীর পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছেন হরপ্রসাদ। মহামূল্যবান সংগ্রহ, কেননা ওর মধ্যেই আছে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম প্রমাণ।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পুঁথি সম্পর্কে হরপ্রসাদ যা বলেছেন আজো তা সমান সত্য : "আপনাকে জানিতে হইলে দেশের পুঁথি খোঁজার দরকার। তাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায় মন চিত্ত লাগাইয়া পুঁথি খুঁজিতে হইবে ও পুঁথি পড়িতে হইবে।"

খাঁটি কথা বলেছেন হরপ্রসাদ। পুঁথি নষ্ট করার মতো ধন নয়, রক্ষা করার মতো সম্পদ। গুণীর হাতে পুঁথি রক্ষিত হয়। আনাড়ির হাতে পুঁথি নষ্ট হয়। কথায় বলে—পুঁথি কলম খাড় নারী, নষ্ট করে যে আনাড়ি।

কিন্তু বিনাশের মুখ থেকে পুঁথি উদ্ধারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। পথে-পথে বাধা। পদে-পদে বিপদ। নির্বিঘ্নে পুঁথি-উদ্ধারের উদাহরণ বিরল।

পুঁথিসংগ্রাহককে বিষম সন্দেহের চোখে দেখেন কেউ-কেউ। তাদের ধারণা, পুঁথি-টুথি বাজে কথা, পুঁথি খোঁজার ছলে সরকারী চর আসে। দেখে-শুনে গিয়ে রিপোর্ট করে ট্যাক্স বসিয়ে দেবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা দরজা থেকেই পুঁথি-সংগ্রাহককে হাঁকিয়ে দেন।

অকারণে ভয় পেয়েছেন কেউ-কেউ। একজনের বাড়িতে দীনেশচন্দ্র পুঁথি পেয়েছেন একখানা। পুঁথির মালিক কী ভেবেছেন কে জানে, তিনি দীনেশচন্দ্রের পা জড়িয়ে ধরেছেন, সজল চোখে প্রার্থনা করেছেন যেন তাঁর নামে মামলা দায়ের না হয়।

বিলেতে চড়া দরে বাঙলা পুঁথি বিক্রী হয়, এই বিশ্বাসে কেউ-কেউ সহসা পুঁথি হাত ছাড়া করতে চান না, মোটা দাম চান পুঁথির জন্যে। পুঁথিতে অপদেবতা ভর করেছেন, এই বিশ্বাসেও বাঙালীর ঘরে স্তূপাকৃত পুঁথি শ্রদ্ধা সহকারে ভস্মীভূত হয়েছে!

কারো-কারো সংস্কার, পুঁথিও মন্ত্রের মতো গোপন রাখার বস্তু। কাউকে পুঁথি দেখালে ঘোরতর অমঙ্গল। কোনো-কোনো গোঁড়া হিন্দু অন্য জাতের মানুষের সামনে পুঁথি আনতে আপত্তি করেছেন। মুন্সী আব্দুল করিমের নাম মনে পড়ে যাচ্ছে। পুঁথিই ছিল ভদ্রলোকের জপতপধ্যান। সারাজীবন পরম নিষ্ঠায় তিনি পুঁথি উদ্ধার করেছেন। অথচ কোনো-কোনো গোঁড়া হিন্দু তাঁকে পুঁথি দেখতে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেননি। তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে দরজার সামনে পুঁথি মেলে ধরেছেন, মুন্সী আব্দুল করিম দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পুঁথির বিবরণ নোট করে নিয়েছেন।

আপন কর্মের গুণে তিনি জ্ঞানী গুণী-দের বিপুল শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। কলকাতায় যেবার প্রথম সাহিত্য-সম্মেলন হল, সভাস্থ প্রত্যেকে মুন্সী আব্দুল করিমকে স্পষ্টভাবে দেখতে চাইলেন একবার। সকলের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে তাঁকে সভার মধ্যে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়াতে হল।

মূল্যবান বাঙলা পুঁথির একটি উল্লেখ-যোগ্য অংশ গোড়ার দিকে যাঁদের উদ্যমে সংগৃহীত হয়েছে, তাঁদের প্রায় সকলেই ইতিমধ্যে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, রামকুমার দত্ত, আব্দুল করিম, বসন্তরঞ্জন রায় এবং আরো অনেকে। এঁরাই বাঙলা পুঁথি সংগ্রহের আদিপর্বের কর্মী। এ যজ্ঞের এঁরাই পুরোহিত।

আদিপর্বের সকল কর্মীর পুঁথি সংগ্রহের ইতিবৃত্তান্ত সবিস্তারে বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। আপাতত আমার তেমন সুযোগও নেই, সামর্থ্যও নেই; সামান্য সম্বলের উপর নির্ভর করে এই মুহূর্তে প্রধানত দীনেশচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি।

দীনেশচন্দ্র সে সময়ে কুমিল্লায় থাকেন। একটা ইস্কুলে কাজ করেন।

হঠাৎ কে একজন 'মুগলুব্ধ' নামে এক-খানা হাতে লেখা পুঁথির খবর দিয়ে গেলেন। সেই পুঁথির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন দীনেশচন্দ্র। একখানা পুঁথি খুঁজতে গিয়ে আরো অনেক অপ্রকাশিত পুঁথির খোঁজ পেয়ে গেলেন।

পুঁথি খোঁজ পেলেই হল না, পুঁথি কিনে রাখা দরকার। দীনেশচন্দ্র সেই মর্মে চিঠি লিখলেন এশিয়াটিক সোসাইটির হোরনলি সাহেবকে। হোরনলি সাহেব ভার দিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে। হরপ্রসাদ বিনোদ-বিহারী কাব্যতীর্থকে দীনেশচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পুঁথির আশায় দুজনে হাটে-মাঠে-ঘাটে এক সঙ্গে কতদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন।

বিনোদবিহারী কলকাতা থেকে মাঝে-মাঝে দীনেশচন্দ্রের কাছে আসতেন, দু-তিনমাস থাকতেন, আবার চলে যেতেন। দীনেশচন্দ্র সারা বছর একা-একা পুঁথি জোগাড় করে বেড়াতেন।

সমাজের নীচের তলায় যাদের বসতি সাধারণত তাদের ঘরেই বেশি পাওয়া যায় বাঙলা পুঁথি। ভদ্রলোক সেজে গেলে তাদের কাছে কাজ উদ্ধার করা দুরূহ। চাষাভূষাদের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসতেন দীনেশচন্দ্র। কখনো-কখনো নিচু জাতের কারো বাড়িতে ঢুকে পৈতে-পরা খালি গায়ে সটান একটা মাদুরে শুয়ে পড়েছেন, যেন তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এসেছেন এমনি ভান করেছেন। পুঁথি জোগাড় করার জন্যে এই কৌশলে বাড়ির লোকদের কৃপা কুড়িয়েছেন, ভালোবাসা আদায় করেছেন।

হাত বাড়ালেই পুঁথি পাওয়া যায় না। কে আর সহসা পুঁথি হাতছাড়া করে। একেকখানা পুঁথি জোগাড় করতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। গলায় তুলসীর মালা.

বুকে-কপালে কৃষ্ণনামের ছাপ, হাতে খঞ্জনী —একেবারে পুরোপাক্কা বৈষ্ণববেশে দীনেশ-চন্দ্রকে কখনো-কখনো বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর দলে মিশতে হয়েছে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্য দীনেশচন্দ্র অনন্যসাধারণ পরিশ্রম করেছেন। পুঁথি খুঁজেছেন এখানে-ওখানে, জঙ্গলে পথে আনাগোনা করেছেন, ঝড়বৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ করেননি, শরীরের কষ্ট উপেক্ষা করেছেন। পুঁথি খোঁজার দিনগুলি নানাভাবে নানা জায়গায় কেটেছে —কখনো নৌকোয়, কখনো তাঁবুতে, কখনো পর্ণকুটিরে।

রাত্রে পুঁথির পাঠোদ্ধার করতেন। বাড়িতে সন্ধ্যায় মেটে প্রদীপের ম্লান আলোর সামনে ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে পুঁথি পড়তে বসতেন। মাঝে-মাঝে কাঠি দিয়ে প্রদীপের সলতেটি উস্কে দিতেন। কেরোসিনের আলো সে সময়ে দীনেশচন্দ্রের চোখে সহ্য হত না। মোমবাতির আলো হলে অবশ্য ভালো হত, কিন্তু হায়, সারারাত মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখেন দীনেশচন্দ্রের তখন সে রকম অবস্থা নয়।

দীননাথ সেন সে সময়ে স্কুল-ইনস্পেক্টর। তিনি একদিন দীনেশচন্দ্রকে বললেন—দীনেশ, তুমি কী কান্ডটা করছ, বলো দেখি। শুনেছি, রাত নেই, দিন নেই, তুমি এই সকল পাহাড়ে দেশের জঙ্গলে-জঙ্গলে পুঁথি খুঁজে বেড়াও। রাত তিনটে অবধি পুঁথি পড়ো। চোখ দুটি যাবে; নয়তো সাপ কিম্বা বাঘের মুখে প্রাণটি দেবে। বাঙলা-ভাষা কি সত্যিই এত বড়ো একটা জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এর একটা ইতিহাস লেখা চলে আর লিখলেও কে সে বই পড়বে বলো দেখি! তার চেয়ে আমার কথা শোনো, আমি বেঁচে থাকতে একখানা পাঠ্য বই লিখে ফেলো, তাতে এমন হাড়ভাঙা খাটুনিও খাটতে হবে না, আর বেশ দু পয়সা হবে।

একা দীননাথ সেন কেন, আরো অনেকেই সে সময়ে দীনেশচন্দ্রকে নিরুৎসাহ করেছেন, কিন্তু দীনেশচন্দ্র কারো কথায় কর্ণপাত করেননি।

কালীশংকর সেন দীনেশচন্দ্রের খুড়ো-মশায়। ত্রিপুরায় সেটেলমেণ্ট-অফিসার ছিলেন কিছুকাল। তিনি একদিন দীনেশ-চন্দ্রকে বললেন—আমি আমার ক্লার্ক আর কনস্টেবলদের লাগিয়ে দেব, ওরা তোমায় পুঁথি উদ্ধার করে এনে দেবে।

দীনেশচন্দ্র বারণ করলেন। বললেন—না, ওভাবে পুঁথি উদ্ধার করা যাবে না।

কালীশংকর দীনেশচন্দ্রের কথা শুনলেন না। তিনি অধীনস্থ জনকয়েক কর্মচারীকে পুঁথি জোগাড় করে আনতে বলে দিলেন। ঘণ্টাতিনেক খোঁজাখুঁজি করে এসে তাঁরা রিপোর্ট দিলেন, এ অঞ্চলে কারো বাড়িতে পুরোনো পুঁথির একটা পাতা পর্যন্ত নেই।

কালীশংকর মন্তব্য করলেন—এ জায়গাটা অত্যন্ত ব্যাকোয়ার্ড, এ জায়গার সঙ্গে সম্ভবত কালচারের কোনোকালে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

পরদিন কালীশংকর সরকারী কাজে আরেক গ্রামে চলে গেলেন। দীনেশচন্দ্র কিন্তু গেলেন না। দীনেশচন্দ্রের বিশ্বাস,

পুঁথির অলংকরণ

এখানে পুঁথি আছে। কিন্তু পুঁথি উদ্ধার কনস্টেবল লাগিয়ে জোর-জবরদস্তি করে হবার নয়।

ছেঁড়াখোঁড়া ধুতি-চটিতে গরীব ব্রাহ্মণ সেজে দীনেশচন্দ্র একজন ছুতোর-মিস্ত্রির বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আলাপ জমিয়ে ফেললেন। কথায়-কথায় পুঁথির কথা এসে গেল। হ্যাঁ, এই বাড়িতেই পুঁথি আছে, পুরুষানুক্রমে আছে। আরো কয়েক বাড়িতে পুঁথি পাওয়া গেল। পুঁথির পাতা থেকে দীনেশচন্দ্র দরকারী খবর টুকে নিলেন নোটবইতে, নোটবই ভর্তি হয়ে গেল।

খুব সম্ভব ১৮৯৭ সালে অসুস্থ শরীর নিয়ে দীনেশচন্দ্র চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় এসেছেন। প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় এসেছেন। সেই সময়েই রামকুমার দত্ত —সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আর সাত বছরের একটি ছেলে—এসে দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন একদিন; বললেন—বাবু, আমরা আজ দুদিন কিছু খাইনি, আমাদের একটু আশ্রয় দেবেন কি? যদি চাকর করে রাখেন তবে আমাকে তিন টাকা মাইনে দেবেন, আর দুজনকে কিছু দিতে হবে না, ওরা শুধু খেয়ে-পরে থাকবে আর কাজ করবে।

রামকুমার জাতিতে তাঁতী, বাঁকুড়ায় বাড়ি। নিজের সংসার চালানোই তখন দীনেশচন্দ্রের পক্ষে দুঃসাধ্য, তবু তিনি রামকুমারকে আশ্রয় দিলেন। এই যোগাযোগের ফল যে অত্যন্ত শুভ হয়েছে, এ সত্যে আজ আর তিলার্ধ সন্দেহ নেই।

দীনেশচন্দ্র একদিন কয়েকখানা পুঁথি দেখালেন রামকুমারকে। জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের দেশে এরকম কিছু আছে জানো?

আছে। এ জাতীয় বস্তু রামকুমারের অদেখা নয়। কিছুকাল পরে রামকুমার যখন দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলেন, দীনেশচন্দ্র তাঁকে আপন গ্রাম এবং আশে-পাশের অঞ্চল থেকে পুঁথিপত্র জোগাড় করে আনতে বলে দিলেন। কীভাবে পুঁথি জোগাড় করতে হয়, সে বিষয়েও দীনেশচন্দ্র বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

প্রথমবারেই বলতে গেলে রামকুমার রাজাজয় করে ফেলেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের অপ্রকাশিত একগাদা হলদে পুঁথির পাতা জোগাড় করে এনেছেন। দীনেশচন্দ্র খুশি হলেন। ঘন-ঘন ছুটি দিতে লাগলেন রাম-কুমারকে। রামকুমার পুঁথি খুঁজতে বেরিয়ে পড়তেন; এবং কোনোবারই তিনি শূন্য হাতে ফিরে আসেননি।

কিন্তু ঘোরাঘুরিতে খরচ আছে। তাছাড়া পুঁথিও বিনা পয়সায় নিয়ে আসা যায় না। দীনেশচন্দ্রের তখন এমন অবস্থা নয় যে রাম-কুমারকে এই বাবদে খরচ দিতে পারেন। অথচ এ কাজে রামকুমার পাকা হয়ে উঠেছেন; পয়সার অভাবে তাঁর কাজ বন্ধ হয়ে যাক, দীনেশচন্দ্রের তা মনঃপুত নয়।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু দীনেশচন্দ্রের বন্ধু। পুঁথি বিষয়ে তিনি বিশেষ উৎসাহী। হয়তো তিনি রামকুমারকে কাজে লাগাতে পারেন। তাঁর কাছে প্রস্তাব করে দেখা যেতে পারে।

দীনেশচন্দ্রের প্রস্তাবে রাজি হলেন নগেন্দ্রনাথ। রামকুমার তিন-চার বছরের মধ্য প্রায় তিন হাজার পুঁথি জোগাড় করে দিয়েছেন নগেন্দ্রনাথকে। আরো কিছুকাল পরে নগেন্দ্রনাথের সমস্ত পুরোনো বাঙলা পুঁথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিনে নিল।

সহজ সুন্দর পদ্ধতিতে পুঁথি সংগ্রহ করেছেন রামকুমার। পুঁথির জন্যে বেরোবার আগে রামকুমার বটতলা থেকে সস্তা দামে কিনে নিতেন একগাদা বাঙলা বই আর ছবি। সেসব বস্তু মাথায় নিয়ে রামকুমার গ্রামে-গ্রামে ফেরি করে বেড়াতেন। একখানা সস্তা ছাপানো বই কিম্বা ছবির বদলে রামকুমার পেয়ে যেতেন গাদা-গাদা পুঁথিপত্র। সাধারণত পুঁথিপত্রের মালিকেরা ভাবতেন, আজেবাজে জঞ্জালের বদলে কেমন সুন্দর নতুন বই কিম্বা ছবি পাওয়া গেল, দিব্যি মুনাফা হল, নির্ঘাত লোকসান হল ফেরি-অলার।

মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে বেড়াতেন রামকুমার। যদি সাঁতার কেটে কোনো নদী পার হওয়া সম্ভব হত তো সেক্ষেত্রে রামকুমার খেয়ানৌকোয় উঠে একটি পয়সা পর্যন্ত খরচ করতেন না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্যেও রামকুমার বিস্তর পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্যেও করেছেন। এখানে বলে রাখা ভালো, মৃত্যুর আগে দেশবন্ধু দু হাজার পুঁথি সাহিত্য পরিষদে দান করে গেছেন।

পুঁথি যত পুরোনো হত, রামকুমার তত উচ্চহারে দক্ষিণা পেতেন। তিনশো বছরের পুরোনো পুঁথি হলে দক্ষিণার পরিমাণ হত অত্যন্ত লোভনীয়।

রামকুমারের সংগৃহীত একখানা কাশীদাসী মহাভারতের পুঁথি নিয়ে একবার একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

পরিষদের অন্যতম কর্মকর্তা ব্যোমকেশ মুস্তাফী দীনেশচন্দ্রকে বললেন—খুব পুরোনো একখানা কাশীদাসী মহাভারতের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে পরিষদ লাইব্রেরিতে। কাশীরাম দাসকে আপনি যে কালের কবি বলেছেন, এ পুঁথি তার আরো অনেক কাল আগে লেখা।

দীনেশচন্দ্র বললেন—না, অত ভুল হতে পারে না। ভুলের অংক বড়ো জোর দশ বছর হতে পারে।

ব্যোমকেশ মুস্তাফী সে কথা মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর একান্ত বিশ্বাস, কাশীদাসী মহাভারতের বহু পুরোনো একখানা পুঁথি পাওয়া গিয়েছে।

তখন দীনেশচন্দ্র বললেন—পুঁথিখানা একবার দেখব।

ব্যোমকেশ মুস্তাফী নিয়ে এলেন পুঁথিখানা। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল, পুঁথির শেষাংশের সাল-তারিখের জায়গাটুকু ঘষে মেজে সেখানে বসানো হয়েছে নতুন সাল-তারিখ। অর্থাৎ নতুন করে পুরোনো সাল-তারিখ!

স্যার আশুতোষ ওই পুঁথিখানা ছাপানোর জন্যে সব খরচ দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু সাল-তারিখের আসল ঘটনা বেরিয়ে পড়ার পর সেসব ভণ্ডুল হয়ে গেল।

রামকুমারের সংগৃহীত পুঁথি নিয়ে এ জাতীয় ঘটনা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে রামকুমার বাঙলা পুঁথি সংগ্রাহকদের মধ্যে অন্যতম নমস্য ব্যক্তি। একা রামকুমারের দৌলতেই কয়েক হাজার বাঙলা পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, রামকুমারকে পুঁথি সংগ্রহের কাজ শিখিয়েছেন স্বয়ং দীনেশচন্দ্র সেন।

পুঁথি সংগ্রহের সূত্রে দীনেশচন্দ্রের জীবনে অন্তত একটি রঙিন দিন এসেছিল। সিঁদুরে আর রক্তে রঙিন। সেই ঘটনা অবশ্যই বিস্তারিত বর্ণনার যোগ্য।

দীনেশচন্দ্র যখন কুমিল্লায় থাকতেন, সেই সময়ের ঘটনা। বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেলেন, শহর থেকে প্রায় তেরো মাইল দূরে এক গোপের বাড়িতে একখানা বড়ো পুঁথি আছে। একদিন দুপুর একটায় সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন দীনেশচন্দ্র। বাড়ির পুরুষমানুষেরা তখন বাইরে চলে গেছে, বাড়িতে আছে একজন বৃদ্ধা আর তার একটি সুন্দরী তরুণী নাতনী।

দীনেশচন্দ্র খাঁটি খবর পেয়েই এসেছেন। সত্যিই একখানা বড়ো পুঁথি আছে ওই বাড়িতে। কিন্তু এখন বোধ করি পুঁথি দেখার সুবিধে হবে না।

বৃদ্ধা বলল—বাবু, বাড়িতে আমার ছেলে নেই, পুঁথি এখন দেখাবে কে?

কিন্তু সেই মেয়েটি বলল—উনি তেরো মাইল হেঁটে এসে বুঝি এই দেড়টার সময় এমনি ফিরে যাবেন! দেখছো না ওঁর মুখ শুকিয়ে গেছে, কিছু খাননি।

অতখানি বেলা পর্যন্ত দীনেশচন্দ্রের খাওয়া হয়নি, একথা সত্যি!

বৃদ্ধা বলল—বাবু, কিছু খাবেন কি?

দীনেশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের ঘরে কী আছে, আমি কী খেতে পারি?

—গাছের ভালো পাকা চাটিম কলা আছে, ঘন আউটান দুধ আছে, চিঁড়ে আছে, আর খেজুর গুড় আছে।

উপাদেয় খাদ্যের ফর্দ, সন্দেহ নেই। মেয়েটি সযত্নে আসন পেতে দিল, একটা গ্লাস খুব মেজে-ঘষে চকচকে-ঝকঝকে করে দিল, কড়া থেকে একটা বড়ো পুরু সর কলার পাতে করে তুলে আনল, চিঁড়ে-গুড় দুধ-কলা নিয়ে এল।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটা উঁচু মাচা দেখিয়ে মেয়েটি দীনেশচন্দ্রকে বলল—ওই দেখুন ওই মাচার ওপর বইখানা আছে।

কাঠের পাটায় আবদ্ধ একখানা বড়ো পুঁথি। চন্দনলিপ্ত পুঁথি, চতুর্দিকে শুকনো ফুল-বেলপাতা। একখানা মই লাগিয়ে পুঁথিখানা পেড়ে আনলেন দীনেশচন্দ্র।

বৃদ্ধা পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল—ও হচ্ছে আমাদের সাতপুরুষের পুঁথি, কখনো নামানো হয় না, শনি-মঙ্গলবার ফুল-বেলপাতা-চন্দন ছড়িয়ে ওর পুজো করে থাকি। ওই পুঁথির ডুরি কখনো খোলা হয় না, আপনার গলায় পৈতে আছে তা খুলতে পারেন, কিন্তু যেমনভাবে আছে ঠিক তেমনিভাবে রাখতে হবে...

পুঁথি পেয়ে দীনেশচন্দ্র সব ভুলে গেছেন। ডুরি খুলে দেখলেন পুঁথিখানা একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ। কিছু-কিছু দরকারী তথ্য নোট করে নিলেন।

এখন আবার পুঁথি যেমন ছিল তেমনিভাবে ডুরি বেঁধে রেখে দিতে হবে। কিন্তু ডুরি বাঁধতে গিয়ে মহা মুস্কিল। ঠিক যেমন ছিল তেমনিভাবে ডুরি বাঁধবার শক্তি দীনেশচন্দ্রের শরীরে নেই।

কিন্তু বৃদ্ধা ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছে—যেমন করে বাঁধা ছিল তেমনি করে বাঁধো।

শক্ত করে বাঁধবার জন্য দীনেশচন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, পারছেন না, বৃদ্ধা বারংবার বলে যাচ্ছে 'হল না' 'হল না', ঘাড় নেড়ে 'হায় হায়' করে উঠছে। টানাটানিতে দীনেশচন্দ্রের হাত লাল হয়ে গেল, বিন্দু-বিন্দু রক্ত বেরোলো।

মেয়েটি এসে বলল—ও কি, আপনার হাত থেকে যে রক্ত বেরোচ্ছে! একটা দিক দিন আমাকে, আমার হাত আপনার চাইতে শক্ত।

দড়ির একদিক ধরল মেয়েটি। আরেকদিক দীনেশচন্দ্র। মাথা নিচু করে খুব জোরে দড়ি টানতে লাগলেন দীনেশচন্দ্র। দু-একবার মেয়েটির কপালের সিঁদুর দীনেশচন্দ্রের হাতে লাগল। দীনেশচন্দ্রের হাত রক্তবিন্দু আর সিঁদুর বিন্দুতে লাল হয়ে উঠল।

কষ্টেসৃষ্টে পুঁথির শেষ ডুরি বাঁধা হয়ে গেল।

দীনেশচন্দ্রের হাত দেখে মেয়েটি বলল—উঃ, আপনার হাতে কতো রক্ত।

দীনেশচন্দ্র সহাস্যে বললেন—সবটুকুই রক্ত নয়!

আমরা ভাবতাম, কলকাতায় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কারণ উনিশশো ত্রিশ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত অনেক দূরের যে মফস্বলে আমরা থাকতাম, ফী বর্ষায় সেখানে খুব জল হত। সদর রাস্তা ভেসে আমাদের বাড়ি পৌঁছবার নিচু পথটা তলিয়ে যেত। নড়বড়ে সাঁকো ধরে পার হতাম। উঠোন থৈ-থৈ, জলে দাওয়া ধরো-ধরো, এ-ঘর ও-ঘরের মধ্যে কাঠের পাটা পাতা হত। একবার কাঁটাল গাছটা মরে গেল, পেয়ারা গাছে খুব পিঁপড়ে হল।

সেবার রেলগাড়ি চলাচলও দিন তিন-চার বন্ধ রইল। বৃষ্টি আর বৃষ্টি! আর ঝড়। ঘরের খুঁটি থরথর করে কাঁপছে, টিনের চালা দন্ত কিড়মিড় করে শোঁ-শোঁ শব্দকে করছে শাপান্ত, খাটের ওপর পা তুলে বসে আমরা ভয়ে কাঠ, সাপে-গেলা ব্যাঙের গোঙানি শুনি। এক চাপড়া দাওয়া চিরচির করে ধসে মেঝের অনেকখানি হাঁ হয়ে গেল।

মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মা কিছু না বলে মাথায় হাত রাখল।

ছপ-ছপ, ছপ-ছপ শব্দ। দূর থেকে কাছে এল, তত কাছে, যত কাছে এলে গায়ে কাঁটা দেয়, আবার দূরে মিলিয়ে গেল। বাইরে অন্ধকার যেন হাঁড়ির তলার কালি, সাধ্য কী কারও ছায়াটাও দেখি।

মা বলল চোর। দিদি বলল চৌকিদার। আমি তার চেয়েও অশরীরী কিছু ভাবলাম। চোর হলে কি পায়ে জল ভাঙার এত শব্দ তুলত! চৌকিদার হলে জানান দিত।

সকালে উঠে দেখি, রান্নাঘরের ভিটেটা ন্যাড়ামাথা, উধাও চালটা ওবাড়ির নারকেল গাছের মাথার ছাতা। বারান্দার কোণে সারা-রাত ধরে ভেজা বেরালটা আধমরা হয়ে এক পাশে পড়ে।

ভাল লাগত না, একটুও না। টাপুর, টুপুর করে বিষ্টি পড়ে শুধু ছড়াতেই। অনেক দিন পরে ভাবতে ভাল লাগে। তখন সব স্মৃতিই লেবেঞ্চুস হয়ে যায় কিনা! অথচ সে সময়? জ্বর আর জ্বর। কুইনিন মিকশ্চারে তেতো আর বার্লিতে বিস্বাদ দিনগুলিকে ভালবাসা শক্ত। কাঁথার তলায় কম্পজ্বরের কয়েদী হয়ে কতবার পুজোই দেখতে পাইনি!

শীত আসত, দোলাই নেই। লণ্ঠনের তেল ফুরোত, আলো নিবত। বাটির মুড়ি হাওয়ায় উড়ত, উড়তে না পেলে মন-মরা হয়ে মিইয়ে থাকত।

মা বলত, এখনও তবু তো খেতে পাচ্ছিস। এর পর তোদের কী দেব জানিনে। দু'মাস তোর বাবার মনি অর্ডার আসেনি জানিস?

'—কী হবে!

—একটা কিছু হবেই। বরাবর আমরা এখানে থাকব নাকি! আ-ম-রা ক-ল-কা-তা যা-ব।

শেষের কথা ক'টি মা বলত ধীরে ধীরে, বিশ্বাস দিয়ে মেখে মেখে। যেন আলুসিদ্ধ ভাতে চটকে বড় বড় গ্রাস করে আমাদের মুখে তুলে দিচ্ছে।

আর আমরা ভাবতাম, কলকাতা গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেখানে ছিটেবেড়ার গায়ে সাপের খোলস দেখে আঁতকে ওঠা নেই। গা ছম্‌ছম্‌ শিরশিরে ভয় এসব কিছু না।

সন্ধ্যার পর কুয়োতলায় তেলাকুচো গাছটার নীচে মা একবার কাকে দেখল। সপসপে ভিজে কাপড়েই তাড়াতাড়ি ঘরে উঠে এল। দিদিকে ঠাস করে চড় মারল। আর এক দিন। ইস্কুলের টীমের দুটো প্লেয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বার্ডসাই টানছিল। দিদিকে দেখে তারা শিস দিয়েছিল। দেয় দিক, দিদিও ইশারা বুঝে ফিক করে হাসল কেন।

কলকাতায় এসব কাণ্ড নেই। মা দিদিকে মারবে না। মনি অর্ডারের জন্যে পিওনের পথ চেয়ে চোখ কানা হবে না। আমাদের ওই গ্রাম, গ্রামের বাড়ি বড় স্যাঁতিসেঁতে আর উদলা, বেআব্রু।

ঝকঝকে, খটখটে কলকাতা দেয়ালে-দেয়ালে ঘেরা, আলোয় আলো। সেখানে সশরীরে যাওয়া যায়, কিন্তু সবাই যেতে পারে না।

আমরা যাবই। জানতাম। একদিন।

—মা, তুমি কোনদিন গিয়েছ?

মা মাথা নাড়ত, যে মাথার চুলে তেল বেশি নেই, সেই মাথা।

গিয়েছিল, মনে নেই। খুব ছোটবেলা কাদের সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে। কালীঘাট মনে ছিল মার, আর হাওড়ার পুল। আর ঘোড়ার গাড়ি।

সে কলকাতার আর কিছু মার মনে ছিল না, থাকলে আর-একটা কলকাতা সে মুখে মুখে বানাতে পারত না। খানিকটা তৈরি করে খেলার পুতুলের মত আমাদের হাতে মা তুলে দিত, আমরা তখন বাকীটা বানাতাম।

এই কলকাতায় কবে আসব, আমরা দিন গুনতাম।

এলামও। একদিন মা একটা চিঠি নিয়ে এল, চোখমুখ লাল, খুব উত্তেজিত। দিদিকে কী বলল, আমাকে ডাকল। আমরা মাকে ঘিরে বসলাম। চিঠিটা আবার পড়া হল। শুনলাম। তখন আমাদেরও চোখমুখ লাল হল। বাবা চাকরি পেয়েছে, চিঠি দিয়েছে।

সেই কলকাতায় এলাম। দূর থেকে যে ইঞ্জিনটা ভয় ধরাত আর ধোঁয়া ওড়াত, যে ট্রেনটা কেঁপে কাঁপিয়ে চলে যেত, সেই ইঞ্জিনে টানা ট্রেন একদিন কলকাতায় আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেল।

মা বলল, বাসরে এই!

দিদি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে মার কাছে ঘেঁষতে ঘেঁষতে মারই শরীরের একটা অংশ হয়ে গেল আর বাবা কুলীদের বকতে বকতে, গাড়োয়ানের সঙ্গে দর কষাকষি করতে করতে, আমাকে পিলপিল মানুষের জামা, জুতো, মাথা, কনুই গুঁতোর ভিতর দিয়ে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

আমাদের বাসা হল।

যে রাস্তা সারাদিন পাগলের মত বকে, সে রাস্তায় না। যে রাস্তায় আলোর জেল্লায় রাতগুলো আসলে নকল দিন সেজে থাকে, সে রাস্তায় নয়। বাবা বলল, সাবান জলে ক্রমাগত মুখ ধুয়ে কালো মেয়ে ফর্সা হতে চায়, দেখলি? ওসব রাস্তাও তেমনি। হা-হা।

তাই বলে সাপের বাচ্চার মত কালো কিলবিলে এই গলি? যেমন নোংরা, তেমনই গা ঘুলিয়ে দেওয়া গন্ধ। গ্যাসপোস্ট দুটো আছে—যেন এক পায়ে খাড়া মরা সেপাই, দেয়ালে ঠেকিয়ে রাখা, আধ-বোজা চোখ, ঠেলা দিলেই ধড় থেকে খসে পড়ে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাবে।

একটা ঘুপচি ঘর, একটাই মোটে, আমাদের সকলের জন্যে। ভাড়াটে আরও ছ ঘর আছে কিন্তু কলতলাটা এজমালি, সাঁতলার ছোপ-ধরা এবং একটাই—থাক, লিখব না, তবে তার ঝাঁপ তোলা।

আকাশ দেখতে হলে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা ছাতে উঠতাম।

কারণ ঘুপচি ঘরটারও দরজা বন্ধ রাখতে হত। অনেক ভাড়াটে, তারা যে যার সুবিধা-মত সময়ে ফোড়ন দিত। খালি সেই জন্যেই না। ভেজানো দরজা খুলে গিয়েছিল বলে বাবা একদিন বাজার থেকে ফিরে আমাকে খুব বকল। পরে মাকে সাঁটে বলল, ও-বাড়ির মেয়েরা চান করে, খোকা দেখছিল।

—তুমি দেখলে বুঝি দোষ নেই? মা আস্তে আস্তে বলল। তখন আমিও বুঝলাম। বাবাও ওদের চান করা দেখত। আমিও টের পেলাম বলে লজ্জা পেল কিনা! তাই অত রেগেছিল।

আমরা তবু এদিক-ওদিক ঘুরেটুরে শহরটা খানিক চিনলাম, মার আর বেরুনোও হল না। মাসখানেক ধরে শুধু হাঁড়িই ঠেলল। ঠেলে ঠেলে তার হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি।

মনে আছে, খুব তেতে পুড়ে মা আঁচলের খুঁট দিয়ে কপাল মুছত, ঘামের সঙ্গে সঙ্গে সিঁদুরও মুছে যেত, জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে মা ঘন ঘন নিশ্বাস নিত।

বাবাকে বলত, চলো না একটু বেড়াতে যাই!

বাবা বলত, যাব-যাব। এই রোববার ঠিক। তোমাকে নিয়ে থিয়েটার দেখাব। কলকাতার থিয়েটার তো দেখনি! মেয়েদের পার্ট মেয়েরা করে (মা বলত, ওমা তারা আবার কেমন মেয়ে বাপু!), থিয়েটার না হলে বায়োস্কোপে তো নির্ঘাত, তার মানে টকী। আজকাল কথা বলে।

মার চোখ বড় বড় হত, চোখের পাতা দপ দপ করত। দিদি চাইত মিটমিট করে, ঘরের এক কোণ থেকে। ফস করে বসে বলত, তোমার কোমরের ব্যথা বুঝি সেরে গেল, না মা?

আসলে মাও যেত না, দিদিও না। ওরা মিছিমিছি হিংসে করে মরত। রবিবার ভোর থেকে সারাদিন, অনেক রাত অবধি তার টিকিটিও দেখা যেত না। বলত, স্পেশাল ডিউটি নিয়েছি। তবে তোমাদের নিয়ে যাব, আসছে রবিবারে ঠিক।

শেষ পর্যন্ত মা হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতেই অসুখে পড়ল, দিদিকে ধরতে হল খুন্তি, মার মাথার অনেক চুল উঠে গেল, হাড্ডিসার দেখাত।

চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে মা দিদিকে বলল, তোর বাবা আমাকে সুবাসিত তেল

এনে দেবে বলেছে। দিদি বলল, আমি সেই কবে থেকে পামলিভ সাবান চেয়ে রেখেছি। তেল বুঝি সাবানের চেয়ে শস্তা, না?

চিরুনিতে উঠে-আসা লালচে চুলগুলো ডেলা পাকিয়ে মা তাতে থুথু দিয়ে বলল, যা বাইরে ফেলে দিয়ে আয়।

চুলে থুথু ছিটিয়ে দিলে আর অমঙ্গলের ভয় থাকে না, মা জানত।

তেলও এল না, সাবানও না, কারণ এই সময়েই বাবা যে কারখানায় কাজ করত তার হাত বদল হল।

বাবা বলল, ওরা আমাদের আবার নিয়ে নেবে, একটু গুছিয়ে নিয়েই। দেখো, বড়-বড় সাইনবোর্ড পড়বে। আর মা সব বিশ্বাস করল, চোখ বুঁজে নমস্কার করল দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণেই কালীঘাট। বলল, বিপদ কেটে যাক, মাকে পুজো দেব।

অথচ বাবা দিন দিন গম্ভীর হচ্ছিল। তার মেজাজ চড়ছিল। বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত, বাড়িতে যতক্ষণ ততক্ষণই টং। ওর ব্লেডে পেন্সিল কেটেছিলুম বলে আমাকে এক দিন শুয়োর-কা বাচ্ছা বলল।

কেন বলল? মা, সে নিজেও তখন ভয়ে আড়ষ্ট, আমাকে বোঝাতে বসল, বলেছে বলুক। বাবা তো! বলতে পারেই। আসলে ঘা খেয়ে খেয়ে ও-রকম হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা কী রকম ছিল তোরা তো দেখিসনি।

দেখিনি, তবে শুনেছি। খুব চওড়া ছাতি ছিল, আর জওয়ান। পুকুরটা বার দশেক পারাপার করে উঠে আসত। চোখ টকটকে হত, কিন্তু হাঁপাত না।

আর প্রাণ দিয়ে লোকের জন্যে করত। সমাজসেবা, দেশপ্রেম। তাই তো নিজের কিছু হল না। রাখলই না কিছু। কোনও চাকরিতে মন লাগল না, ব্যবসার পর ব্যবসা ধরল আর গণেশের পর গণেশ উলটিয়ে শুধু মনের জোরে লড়ে গেল। এক টাকা পেলে চার টাকা ওড়ায়, একে ওকে দেয়। আজ ছাড়া বাবার ক্যালেন্ডারে আর কোন তারিখ নেই। আগামীকাল যে আসবেই জোর করে বলা যায় না, সুতরাং ভেবে লাভ কী।

মার মুখে এই মানুষটির অনেক গল্প শুনতাম; দেশে থাকতে। চিতোনো ছাতি আর দরাজ মনওয়ালা একটি মানুষের ছবি চোখের সামনে যেন লটকানো থাকত।

সেই ছবিটা কেমন চিমসে-কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের চোখের সামনেই। হো-হো করে তখনও বাবা হাসত বটে, আওয়াজ তত জোরালো হত না।

কোনদিন এসে বলত, ছাপাখানায় কাজ নেবে, কোন দিন বলত, বাসে কন্ডাক্টরির কথা পাকা করে এলাম। আবার এক বন্ধুর সঙ্গে দিনকতক চায়ের দোকান খোলার শলাপরামর্শ হল। ঘরের এক কোণে মাদুর

দিদি খুব সাজল। জি-পি-ও বৌয়ের একটা চটকদার শাড়ি পরে......

পেতে কত এসটিমেট, হিসাবের কাটাকুটি, দোকানঘরের প্ল্যান!

শেয়ারের দোকান। টাকা বন্ধুর, বাবা ওয়ার্কিং পার্টনার।

পাশের একটা ঘরে নতুন একটি বউ এসেছিল। কমবয়সী, হাসিখুশী, তার বর জি পি-ওতে কাজ করে। বউটি যখন অয়েল ক্লথ শুকোতে দিতে বাইরে এসেছিল, মা ছাই আর নারকোলের ছোবড়া নিয়ে বাসন ধুতে চলেছিল কলতলায়, তখন মা একটু দাঁড়িয়ে বউটিকে চায়ের দোকানের প্ল্যানের কথা শোনাল। ঘরে ফিরে বউটি কথাটা বলে থাকবে তার স্বামীকে। আর সেদিনই দুপুরে পান খাওয়ার নাম করে এসে বউটি মাকে বলল, আচ্ছা আপনাদের উনি অন্য কোন কাজ পান না, মানে লেখাপড়ার কোন কাজ? আমাদের উনি তো ছুটির পর ম্যাট্রিকের একটি ছেলেকে ইংরিজী পড়ান। উনি অবিশ্যি গ্রাজুয়েট।

গ্রাজুয়েট কাকে বলে মা তাই জানত না, সুতরাং বাবার কাছে রিপোর্ট করল। বাবা শুধু বলল, বলতে দাও।

আমরা জানতাম, বাবা কেন চুপ করে গেল। আই এ পড়ে তাকে পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তখনকার দিনে মোটামুটি চলে

এমন সংসারেও বাড়ির মোটে একটি ছেলেরই বেশি দূর অবধি লেখাপড়ার সুযোগ হত, একটি-মেয়েরই ভাল ঘরে-বরে বিয়ে হত। আর কুলোত না। বাবার পরে ছোট-ছোট কাকারা ছিল। তাদের পড়াশুনার ভার বাবা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল। কম বয়সে চাকরিতে ঢুকে স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছিল তাকে।

বাবা চুপ করে গেল আরও এই জন্যে যে, পাস-টাস দেবার পর কাকারা যে যার মত আলাদা হয়ে গেছে, সম্পর্ক বা খোঁজখবর বিশেষ রাখেনি।

চায়ের দোকান কিন্তু খুলেছিল না, কারণ বন্ধুর পকেট থেকে খালি প্ল্যানই বেরুচ্ছিল, একটাও টাকা না। ওই দশার মধ্যে থেকেও মা কেবল কাপের পর কাপ চা তৈরি করে আরও কাহিল আর ফতুর হয়ে পড়ছিল।

বাবা শেষে একদিন বলল, তুমি নিজেই সামনে এসে ওকে চা দিয়ে যাও না!

মা বলল, ওরে বাবা, কারও সামনে বেরোতে আমি পারব না।

বাবা তখন চাপা গলায় মাকে গাল দিল। আর মা? তবু সামনে আসতে রাজী হল না বটে, কিন্তু আড়াল থেকে খুব শব্দ করে চা তৈরি করত। পেয়ালায় চামচ নাড়ত

জোরে জোরে, হাতে ছিল নোয়া, শাঁখা আর একগাছি তো মোটে রুলি, তাই ঠুনঠুন করে বাজাত।

দোকানঘর অথচ খোলা হল না। শেষে ওই লোকটাই একদিন আসা বন্ধ করল।

কেন করল আমি জানতাম না। দিদির খুব জ্বর হল, ওকে আমি লুকিয়ে মাছের কানকো চুষতে দিলাম। দিদি তখন বলল। লোকটা বাড়াবাড়ি করেছিল।

—বাড়াবাড়ি?

—মানে অসভ্যতা। তুই বুঝবি না।

পাকা আমিও তখন কম না। চেপে ধরলাম দিদিকে। বলতেই হবে।

—লোকটা, বাবার বন্ধু, নাকি খপ করে হাত চেপে ধরেছিল।

কার, মার? আমি গলা যতদূর সম্ভব চেপে জিজ্ঞাসা করলাম।

—না, আমার।

বলেই দিদি কাশতে শুরু করে দিল, আমার আর কিছু জানা হল না।

বন্ধুকে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল, বাড়ি-ওয়ালাকে একদিন শালা বলল। তখন তিনমাসের ভাড়া বাকী।

চেঁচামেচি অনেকক্ষণ ধরেই শুরু হয়েছিল, মা খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দ তুলেও চাপা দিতে পারছিল না। জি-পি-ও বাবু ভুরু কুঁচকে জুতো মশমশ করে বেরিয়ে গেলেন, তাঁর বউ ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইল আধভেজানো দরজার ফাঁকে চোখ রেখে, আর এক পাশের কলেজে পড়া ছেলেটি, যাকে আমি নিমাইদা বলতাম, তাড়াতাড়ি ক্লাস বলে কলতলায় এসেছিল কিন্তু মগটা আর মাথার উপরে উপুড় করছিল না, আর আমি ছাদে ওঠার কাঠের সিঁড়িটার নীচে কাঁপছিলাম।

বাবা যখন মোটাসোটা বাড়িওয়ালাকে ঠেলতে ঠেলতে কলতলার ধারে নিয়ে এল, মুখে বলল শালা, আমি তখন কী করছি টের না পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম। লোকটা নিশ্চয় এবার ফিরে মারবে। নিমাইদাও ঠকাস করে মগটা নামিয়ে ছুটে আসছিল।

কিন্তু বাড়িওয়ালা কিছু বলল না। খুব অমায়িক হাসল।

—সম্বন্ধ পাতালেন? তা সম্বন্ধটা তো ভালই, কিন্তু সমান না হলে কি পাল্‌টি ঘর হয়! বেকারকে তো বোনাই করতে পারব না!

এই কথা বলে সে চলে গেল। দিদি আমাকে ওর আঁচলের কোনাটা দেখাল তখন। বাড়তি সব ক'টা সুতো ও খেয়ে শেষ করেছে।

ওরই মধ্যে হঠাৎ আত্মীয় স্বজন, লোকজন কেউ এসে পড়লে ভাল লাগত। গল্পগুজব হৈ-হৈ খুব হত। তেতো-তেতো ভাবটা কেটে যেত।

রাঙা জ্যাঠাইমা, মনে আছে, মাটির কয়েকটা পুতুল এনেছিলেন। আর আচার। পুঁটলিটা আমরাই তাঁকে তাড়াতাড়ি খোলালাম।

মা পাখা নিয়ে ছুটে এল।

—সর না, সর না তোরা। দিদিকে আগে জিরোতে দে।

উনুনের কয়লা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যে পাখার ডগা পুড়ে গিয়েছিল, তাই নিয়ে তাড়া করল আমাদের, উল্টো দিক দিয়ে জ্যাঠাইমাকে হাওয়া দিতে শুরু করল।

আপন নয়, জ্ঞাতি সম্পর্কে জা। দু'জনের খুব ভাব ছিল। আমরা তা দেখিনি। আমরা যখন একটু বড় হলাম, জ্যাঠাইমা তার আগেই দেশের পাট তুলে দিয়ে চা-বাগানে মেয়ের কাছে থাকতেন।

—ঠাকুরপো এখন কী করে, রে?

—অর্ডার সাপ্লাই। মা বাবার শেখানো কথাটাই বলল।

মা পাখা নেড়ে গেল, নিজের তৈরি হাওয়া নিজেও খানিক খেতে থাকল, আর বলল, কালই কিন্তু হুট করে যাওয়া চলবে না, দিদি। অ্যাদ্দিন বাদে এসেছ, ক'দিন থাক। দু'বোনের কত বচ্ছরের কথা জমে আছে জান?

মা হেসে হেসে বলছিল, চোখে মুখে এমন একটা আভা দেখলাম যা এখানে এসে কখনও দেখিনি।

তখন বাবা এল। হাসি-ঠাট্টা হল কিছু-ক্ষণ। জ্যাঠাইমা পুরনো সময়ের অনেক গল্প বলছিল, মজা করছিল মা আর বাবাকে নিয়ে, মা লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ছিল।

দেখলাম, জ্যাঠাইমা মা বাবা দুজনকেই সেই লাজুক বয়সে নিয়ে গেল, যখন মা ছিল কনে বউ, আর বাবা অনভিজ্ঞ যুবক মাত্র।

জ্যাঠাইমা এল বলেই বাবা-মার সেই বয়সের এক সঙ্গে তোলা একটা ছবি যেন দেখতে পেলাম, নতুন বিয়ের পর যেরকম ছবি তুলে লোকে বাঁধিয়ে রাখে।

সকালে উঠেও দেখি, ওদের আসর আবার বসেছে। এত কথাও জমা ছিল, এত টান নিজেদের মধ্যে?

বাবা বলল, যাই বাজারে যাই। হাই তুলল।—বউদি, কী খাবে বল? মোচা? এঁচোড়?

—যা তোমার খুশি ভাই। তবে কাঁচকলা মনে করে অবিশ্যি এনো। বলে জ্যাঠাইমা উঠে কলতলায় গেল।

—কতদিন থাকবে বলছে? এ গলাও আবার, মাকে এক ধারে ডেকে নিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করছে।

—কিছু ভাঙছে না তো, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কতবার তো জানতে চাইলাম, দেখলে না?

মা খুব আস্তে বলছিল, মাঝে মাঝে আমাদের দিকে চাইছিল, মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে রেখেছিল যেন বাজার থেকে কী আনতে হবে বাবাকে তার ফর্দ শোনাচ্ছে বই নয়।

—হুঁ। গম্ভীরভাবে বলে বাবা থলেটা তুলে নিল। ফোড়ন চড়িয়ে মা বলল, কম হাঙ্গামা! বিধবা মানুষ, তার জন্যে আলাদা চাল, আলাদা রান্না, ঘি ঢালো, আলু সেদ্ধ দাও!

বাবা বিশ্রী রকমের হেসে বলল, তুমি বুঝি শুধু রান্নার হাঙ্গামের কথাই ভাবছ?

বলে, বাবা পাঞ্জাবির পাশ-পকেটের ভিতরটা বাইরে টেনে আনল। ফাঁকা আর তখনই মা বাবাকে ইশারায় বলল চুপ করতে।

—দিদি, তুমি তো এখন পুজোয় বসবে। আসনখানা পুবমুখী করে পেতে দিই?

এ-ঘরেও দিকের হিসেব মা সব সময়ে কী করে রাখত, সেই জানে। কখনও ভুল হত না।

এই ব্যাপারটা লিখে রাখার যোগাই হত না, যদি বরুণমামা না এসে পড়ত।

বরুণমামা এসেছিল সেদিনই বিকেলে। প্যাণ্টকোট-পরা, খুব সুন্দর চশ্‌মা চোখে। বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মার সঙ্গে গল্প করে গেল।

বরুণমামা। মা বলে দিল বলেই তাকে আমরা বললাম বরুণমামা। প্রণাম করলাম। যাবার সময় সে আমার আর দিদির নামে দু'টো করে রুপোর টাকা মার হাতে দিয়ে গেল। আমাদের জন্যে কিছু নিয়ে আসেনি তো, তাই।

বরুণমামার দেওয়া টাকা মা সিঁদুরের কৌটোর মধ্যে তুলে রাখল। আমাদের নামে।

বরুণমামা কেমন মামা জানিনে। শুনলুম চাটগা থাকে, মামলার তদ্বিরে এসেছে।

—চশমায় ওকে খুব চমৎকার মানিয়েছিল, না, রে?

দিদি বলল, দূর! ও-রকম সুন্দর ঢেড্‌ঢের দেখেছি। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, টাকা দু'টো মার হাতে দিল কেন?

—আমাদের নামেই ত তোলা রইল।

—ওই নামেই। টান পড়লেই জলে

সিঁদুর ধুয়ে ধুয়ে মা বাবার হাতে টাকা তুলে দেবে, তুই দেখিস!

বরুণমামাকে চলে যেতে দিয়েছে শুনে বাবা ফিরে এসে খুব রাগ করল।— কত-দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, ওকে ধরে রাখতে পারলে না? ওর সঙ্গেই আমার একরকম বন্ধুত্বের সম্পর্কই তো ছিল, তুমি জানতে না?

—কী করে থাকতে বলি, জায়গা কোথায়। দিদি রয়েছে না?

—উনি এখন কোথায়?

—আরতি দেখতে গেছেন মন্দিরে। খুকিকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

—সকালে গঙ্গাচ্চান আর বিকেলে মন্দির। পরের খরচায় পুন্যি করছেন করুন, কিন্তু খুকিকে নিয়ে টানাটানি কেন। হা-হা।

বাবা বলল হা-হা। আমি বুঝলাম, যে গাল বাবা মুখে আনতে পারল না, হা-হা হল ঘুরিয়ে-বলা সেই গাল।

পরদিন ভোরে উঠেই বাবা যেন কোথায় বেরিয়ে গেল। দশটা নাগাদ ফিরে এসে বলল, যা ভেবেছি তাই। বরুণ উঠেছে তোমার সেই কেমন মামাতো বোন বাণীর ওখানে।

—উঠুক না!

—বাঃ, বাণী হল বরুণের বাবার পিসতুতো বোনের—দাঁড়াও হিসেব করে বলছি। আর তুমি ওর সাক্ষাৎ—তা ছাড়া ও তো আমার বন্ধু।

—চুপ করো তো।

—এ-ক-মা-স থাকবে শুনে এলাম। হাই-কোর্টের মামলা।

—একমাস!

—কম পক্ষে।

মা বলল, তা বাণীর ওখানে তো উঠবেই। ওর বরের শুনেছি বড় কারবার। ওখানে থাকবে ভাল।

—কাঁচকলার কারবার। বাবা বুড়ো আঙুল নাড়ছিল, সব জানি। ফেল পড়ে এসেছে। এখন ভেতরে ফাঁপা। বাজার তো করে আনল বরুণই। এক ঝুড়ি তারকারি। আস্ত একটা ইলিশ।

—আত্মীয় কুটুমের বাড়ি, শখ করে এক-আধদিন তো করবেই।

—শখ না। আজ করেছে। রোজ করবে।

রোজ করবে, বলতে বলতে বাবা কেমন পাগলের মত হয়ে গেল।—তা ছাড়া বরুণ নানা জিনিসের লিস্টি তুলে দিল যে, তোমার ওই বাণীর বরের হাতে। এবার অনেক কেনা-কাটা করবে। একশো টাকার নোট দিয়ে দিল।

—একশো টাকারও নোট হয় বুঝি? ক'টা দিল?

—বড়মানুষ পার্টি[illegible]। কয়েকটা তো হবে। তোমার ওই বাণীর বরের চোখ চকচক করছিল। ও এবার বেশ একটা দাঁও মারবে বলে রাখলুম।

মা বোকার মত তাকিয়ে ছিল। বাবা যখন বলল, অথচ দ্যাখ, আমার পেশাই হল অর্ডার সাপ্লাই, মাকে তখন সত্যিকারের দোষীর মত দেখাল।

—তোমার জন্যে, তোমার জন্যেই তো।

দোষের ভারে মা নুয়ে পড়েছিল, আর নিজেকে ধরে পারল না। আত্মীয় স্বজন কোথায় থাকবে তা-নিয়েও কাড়াকাড়ি? ওসব আমাকে দিয়ে হবে না বাপু!

বাবা রেগে গিয়ে কী করবে না করবে ঠিক করতে পারছিল না, ঠিক তখনই জ্যাঠাইমা গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে এল। দুটো চালতে আর এক আঁটি ডাঁটা কোচড় থেকে নামিয়ে বলল, একটু টক খাব ইচ্ছে হল ঠাকুরপো, তাই আসবার পথে—

জ্যাঠাইমা কথাটা শেষ করতে পারেনি। চালতে দুটো ছিটকে কলতলায় পড়েছিল, আমরা দেখলাম। বাবা বোধহয় নিজেকে সামলাতে পারেনি, পা ছুঁড়েছিল।

জ্যাঠাইমাও দেখলেন। কী বুঝে নিলেন।

বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল তখনই। জ্যাঠাইমা সেদিন দুপুরের পরের গাড়িতেই রওনা হয়ে গেলেন।

জ্যাঠাইমার দেওয়া মাটির পুতুল ক'টা আরও কিছুদিন ছিল।

একটি একটি করে নাটকে ব্যাপার ঘটছিল। একটু-একটু করে আমরা চারজন আলাদা আলাদা হয়ে পড়ছিলাম। দিনের বেশির সময় মা মেঝেয় আঁচল পেতে পড়ে থাকত। বাবা থাকত বাইরে বাইরে। নিমাইদার কিনে দেওয়া ঘুড়ি নিয়ে আমি ছাদে গিয়ে ওড়াতাম। দিদি পাড়ার সম-বয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছিল, যখন তখন ও-বাড়ি যেত।

সবাই শুয়ে পড়ার পর বাবা যখন পা টিপে-টিপে বিছানায় এসে উঠত, খালি তখনই আমরা চারজন এক সঙ্গে হতাম।

তবু বাবা একদিন ফিরে এসে দিদির ঘুম ভাঙিয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে বাইরে বের করে দিল। তারপর—তারপর দাঁতে দাঁত চেপে মাকে কী সব বলল।—তোমার দোষে, তোমার দোষেই তো। মেয়েকে শাসনে রাখতে পারনি। হঠাৎ বাবা হাত তুলল। মাকে মারল।

মা বেরিয়ে গিয়ে আরও মারল দিদিকে।

—সিনেমা গিয়েছিলি?

—গিয়েছিলাম তো! মাধবীর সঙ্গে।

—তোর বাবা যে তোকে একটা ছেলের সঙ্গে দেখেছে। মাধবী তো ছিল না।

—বাবা বোধহয় দেখতে পায়নি।

মা হাত মুচড়ে দিতে থাকল দিদির।—কে সে, নাম বল, বল আমাকে।

দিদি কার নাম বলল, কোনো নাম বলল কিনা, শুনতে পেলাম না। দিদি কাঁদছিল।

—চুপ চুপ ওরা শুনতে পাবে।

মার তখন এই ভাবনাই বেশি হল, কাল সকালে সকলের কাছে মুখ দেখানোর
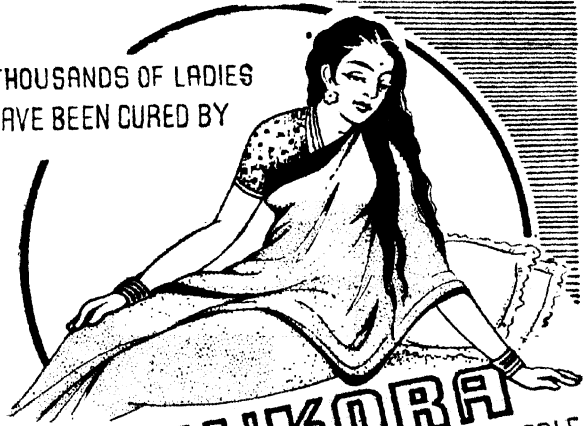
আরও অনেক ঘর ভাড়াটে আছে। মাঝ-রাত্তিরে চেঁচামেচি, ভদ্দরলোকের ঘরে? এই ভয়টাই পেয়ে বসল বলে দিদির দোষ মা তখনকার মত ক্ষমা করল। হিড়হিড় করে দিদিকে টেনে নিয়ে এল ঘরে।

বাবা একটা বিড়ি দাঁতে চেপে বালিশের তলা হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই খুঁজছিল। শোধরানো দূরে থাক, দিদির সাহস আরও বাড়ল।

মা একদিন বলল, তোর মুখে পেঁয়াজের গন্ধ। নিশ্চয় খেয়ে এসেছিস।

—খেয়েছি তো। চপ আর কাটলেট। বেশ করেছি।

—তুই কাটলেট খেলি! ঘেন্না করল না?

কাটলেটের নাম মা জানত না। খেতে কেমন, আমি জানতাম না। থেকে থেকে কেবলই লোভ হচ্ছিল, দিদির পিছু-পিছু কলতলা গেলাম। দিদি সেদিন আমাকে দিয়ে একটা নিষ্ঠুর কাজ করাল।

—আমি যা বলব তাই বলবি, সুর করে করে। কেমন? বল তো জোরে জোরে—রোজ যে ডাঁটা চিবোই—

আমি চেঁচিয়ে বললাম, রোজ যে ডাঁটা চিবোই—

—রোজ যে কচুসেদ্ধ গেলাও

বললাম, রোজ যে...গেলাও

—কাটলেট তার চেয়ে ঢের ভাল মা।

—কাটলেট তার চেয়ে...

হুবহু দিদির গলা নকল করে বললাম। দিদি আমাকে দিয়ে যেন নামতা পড়িয়ে নিল।

না ভেবে বলেছিলাম। বলে লজ্জা পেয়েছিলাম। মা ভীষণ মারবে ভেবেছিলাম। মা কাঁপছিল, সাদা হয়ে গিয়েছিল। ধপ করে যেই বসে পড়ল, ছুটে গেলাম। দাঁতে দাঁত লেগে মার ঠোঁটের কিনারায় ফেনার মত। কোনমতে একটা হাত তুলে মা বলল, তোরা যা।

মা যে ফিট হয়ে পড়ল, দিদি জলের ঝাপটা দিল, আমি ঝুঁকে পড়ে বারবার বলতে থাকলাম, মা-মা, ও-মা, চোখ খোলার পরও তিনদিন মা আমাদের সঙ্গে কথা বলল না, এ-সব অবাক কাণ্ড না। আমি অবাক হয়েছিলাম দিদি আমার একটা ধাঁধার উত্তর দিতে পারল না বলে।

—তোকে যে কাটলেট খাওয়াল, আমাদের জন্যে সে একপো পুঁটি মাছও কেন কিনে দেয়নি রে!

এই কথা শুনে দিদি আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করল।

দিদি খুব সাজল, জি-পি-ও-বৌয়ের চটকদার একটা শাড়ি পরে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বাবা জন দুই লোক ধরে এনেছিল। আর মা সেই সিঁদুরের কৌটো খুলে মুছে মুছে সত্যিই শেষ রুপোর টাকাটা দিয়েছিল বাবার হাতে।

—এই টাকায় খাবার কিনে ওদের না হয় খাওয়ালে। ওদের পছন্দও না-হয় হল। কিন্তু বিয়ে কোন্ টাকায় দেবে?

—পছন্দ হলে টাকা ওরাই দেবে। বাবা গম্ভীর হয়ে বলল।—আমার সঙ্গে কথা হয়ে আছে। মেয়ে আর ঘরে রাখা যায় না।

আমি যখন খুব ছুটোছুটি করছি, ওদের জন্যে দোকান থেকে পান কিনে আনছি আবার দৌড়চ্ছি, নিমাইদা তখন আমাকে ডাকল।

ছাদে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট খাচ্ছিল। সিগারেট ঠোঁটে ছিল বলে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক, তার গলা অন্য রকম শোনাল।

—তোর দিদিকে বলিস, নিমাইদা বলল, তোর দিদিকে বলিস, আমার কিনে দেওয়া সাবান মেখে যাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের চোখে ধরলেও সুবিধে হবে না। ওরা কারা, জানিস?

—ওরা তো পাত্তরপক্ষ। দিদির বিয়ে হবে।

—পাত্তর না ছাই। বিয়ে না ঘোড়ার ডিম। ওদের আমি চিনি। মেয়েছেলের টাউট। তোর বাবা বেচে দেবে বলে ওদের ধরে এনেছে। এই চিঠিটা ওকে দিবি, বুঝলি?

বুঝলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে নীচে যখন গেলাম, তখন ওরা নেই। বাবাও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিতে গেছে। দিদি কাপড় ছাড়ছে। জি-পি-ও বউ শাড়ি ফেরত নিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

সে চলে গেলে বললাম। হাত-পা নেড়ে, আবৃত্তির মতন করে।

ছায়াছবির মত সব ঘটছিল। বাবা ঘরে ঢুকতেই মা দড়াম করে দরজা বন্ধ করে কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। ফুঁশছিল। গড়গড় সব বলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল,—সত্যি? বাবা রাগে দিশা হারিয়ে খড়মটা ছুঁড়ল। আর তখনই মা চিৎকার করে ছুটল দিদির দিকে।

বিষটিষ কোথায় পাবে, দিদি বাবার একটা ব্লেড গলায় চেপে ধরেছিল। লালে লাল, দিদির ব্লাউজ লাল, মার আঁচল লাল, ফিনকির ছিটে আমার গায়েও লাগল।

বাবা ডাক্তার আনতে ছুটল। রক্ত বন্ধ হতে দেরি লাগল না। ভোঁতা ব্লেডে আর কত বড় ঘা হবে। ডাক্তার হাত ধুতে ধুতে বলে গেলেন, বড়ো জোর একটা দাগ থেকে যাবে।

এই কথাটা কানাকানি হতে থাকল যে, দিদি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। কেন, ওরা আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছিল। কেউ গায়ে-পড়া দরদের ঢঙে, কেউ বাঁকা করে।

—জানি তুই বলবি না। শিগগিরই মামা হতে চলেছিলি, তাই, না?

আমি বলিনি। ওদের কথাটা কত বিশ্রী তখন জানতাম না। বাবা দিদিকে বেচে দিতে গিয়েছিল, এটা আরও লজ্জার মনে হয়েছিল আমার।

তা-ছাড়া আমার বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস হয়নি ওই ধবধবে পোশাক-পরা লোকেরা মেয়েধরা। হলেও বিশ্বাস হয়নি, বাবা জেনেশুনে ওদের ডেকেছিল।

আবার, বাবা অস্বীকার করলেও মা কি বিশ্বাস করতে পারত।

দিদি অজ্ঞানের মত অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। সেদিন রাতে খুব বৃষ্টি হল। ঘর ভেসে গেল, কলকাতাতেও ভাসে। ফুটো চালে, ফাটা ছাতে তফাত নেই। বিছানাসুদ্ধ দিদিকে টানাটানি করে ওরা ঘরের এদিক-ওদিক নিয়ে গেল, যেদিকে বৃষ্টি নেই, এমন দিক খুঁজল। অথচ ওরা কথা বলছিল না। আমিও না। যেন এক ঘরের তিনজন না, ট্রেনের এক কামরায় তিনজন, যে ট্রেন আমাদের এখানে এনেছে।

★

দেশের বাড়িতে যখন ছিলাম, তখন কলকাতা ছিল। ভাবতাম কলকাতায় এলেই......এলাম, অথচ আসাও হল না। তার চেয়ে বড় কথা, এই ক'বছরে আর-একটা কলকাতা তৈরি করা হয়নি, আমাদের

দ্বিবচন

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ঘরে ঢুকতেই মিসেস চৌধুরী তাড়াতাড়ি হাতের কাগজখানা সরিয়ে রেখে বললেন, 'আসুন।'

লক্ষ্য করলাম কাগজখানা রঙীন। বোধহয় সদ্য আঁকা কোন ছবির ওপর চোখ বুলোচ্ছিলেন মিসেস চৌধুরী। বিছানার ওপরই রঙের প্যাকেট তুলি আর কাগজ। আর ছোট একখানা পাতলা কাঠ। ঈজেলের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। তাকে বুকে রেখে কাজ করা যায়।

তাড়াতাড়ি সব আড়াল করে তিনি আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে হেসে বললেন, 'বসুন।'

সামনেই নিচু একখানা চেয়ার পাতা। বসতে বসতে আমি বললাম, 'আপনার কাজের ক্ষতি করলাম না তো।'

তিনি বললেন, 'না হয় একটু করলেনই। তাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতিটা কম হবে। ডাক্তার তো কাজ করতে দিতেই চান না। দেখলেই ধমকান। ভয় দেখিয়ে বলেন, 'আপনার অসুখ আরো বেড়ে যাবে।'

বললাম, 'তা হলে কাজ করেন কেন?'

তিনি বললেন, 'ওই ডাক্তারেরই ভিজিট আর ওষুধপথ্যের দাম জোগাবার জন্যে। একেই বলে ভিসাস সার্কেল। বাংলায় অনুবাদ পড়েছিলাম বিবচক্র। বেশ কথাটি তাই না?'

বললাম, 'হুঁ।'

গলির মধ্যে একতলার ঘর। সন্ধ্যা হবার আগেই আলো জ্বালাতে হয়েছে। উঠোনে কে যেন তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছে। তার ধোঁয়া আসছিল। মিসেস চৌধুরী ঝিকে ডেকে বললেন, 'গঙ্গা, দোরটা বন্ধ করে দিয়ে যা তো। আর রানীদিকে বল, উনুনটা একটু সরিয়ে রাখতে।' আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'পাশের ঘরের ভাড়াটে। রোজ এই সময় ও'রা আঁচ দেন।'

আচ্ছা, বাইরে বোধহয় রোদ আর নেই। না?'

বললাম 'না'।

তিনি বললেন, 'কিন্তু আকাশে নিশ্চয়ই রঙ আছে। কতকাল যে আকাশ দেখিনে তার ঠিক নেই। আকাশও দেখিনে, গাছপালাও দেখিনে, শুয়ে শুয়ে শুধু চারদিকের দেয়াল দেখি।'

চুপ করে রইলাম। বছর খানেকের বেশী হয়ে গেল মিসেস চৌধুরী ভুগছেন। শক্ত রকমের অসুখ। বোন আর্থ্রাইটিস। এর আগে মাসকয়েক ছিলেন হাসপাতালে। সেখান থেকে ফের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন নিজের ঘরই হাসপাতাল। পিঠের কাছ থেকে কোমর পর্যন্ত লোহার বেল্ট পরানো। দেহের খাঁচাকে লোহার খাঁচায় ধরে রাখা হয়েছে। আগে আগে খুবই কষ্ট হত—যন্ত্রণা হত অসহ্য। এখন সবই সহ্যের সীমার মধ্যে এসেছে। ও'র স্বামী নিত্যরঞ্জনবাবুর কাছে সবই শুনেছি। হাসপাতালে আর যেতে পারিনি। এই বাড়িতেই এসে দেখে গেছি আরো একদিন।

রোগীর ঘর হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাকে যেসব ওষুধের শিশিটিশি গুলি আছে—পরিপাটি করে গুছানো। জানলায় দরজায় রঙীন পর্দা। নক্সা আঁকা পোড়া মাটির ফুলদানিতে রজনীগন্ধা। ফুলদানীটা নিশ্চয়ই বাজার থেকে কেনা। কিন্তু তার অঙ্গের ভূষণটুকু সুস্মিতা চৌধুরীর নিজের হাতে চিত্রিত। দেখে চিনতে পারলাম। এই ধরনের একটি আমিও একবার উপহার পেয়েছিলাম।

বললাম, 'আপনার সেবিকাটি খুব ভালো দেখছি। বেশ গুছিয়ে টুছিয়ে রাখে।'

তিনি বললেন, 'সেবিকা মানে? নার্সটার্স আমার নেই। অত টাকা কোথায় যে নার্স রাখব? ওই যে তের চোদ্দ বছরের মেয়েটিকে দেখলেন গঙ্গা, বাইরের কাজটাজ ওই করে দেয়।'

বললাম, 'আর ঘরের কাজ?'

মিসেস চৌধুরী একটু হাসলেন, 'পুরোন একজন সেবক আছেন। তিনিই সব করেন। আমার স্বামীর কথা বলছি।'

বললাম, 'না বললেও তা বুঝতে পারতাম। তিনি কি ঘরদোর সাজানো গুছোনো, সেবা শুশ্রূষা সব করতে পারেন?'

মিসেস চৌধুরী বললেন, 'সব। আমি অসুখে পড়বার পর থেকে তো তিনিই সব করছেন। ঘরের কাজ বাইরের কাজ—'

বললাম, 'অসাধারণ ক্ষমতা বলতে হবে। আমি তো সব ব্যাপারে ঠুঁটো জগন্নাথ।'

মিসেস চৌধুরী বললেন, 'কিন্তু কলমের বেলায়? তখন চতুর্ভুজ।'

বললাম, 'আপনি নিজেই জানেন এসব ব্যাপারে বাইরের ধারণা কত ভুল। হাত চারখানাই হোক আর আটখানাই হোক শুধু হাত দিয়েই তো আর লেখা যায় না। মন যখন দারুভূত মুরারি হয়ে থাকে তখন সহস্র বাহু দিয়েও কি তাকে টেনে তোলা যায়?'

মিসেস চৌধুরী চুপ করে রইলেন। কী ভাবছিলেন কে জানে।

লক্ষ্য করলাম এত দীর্ঘদিন ধরে অসুখে ভুগলেও মুখখানা বেশ স্বাস্থ্যবতীর মতই মনে হচ্ছে। লম্বাটে ডৌল। টানা নাক-চোখ যুগল ভ্রূ। কপালে কুঙ্কুমের ফোঁটা। বয়স তিরিশের ওপর নিশ্চয়ই। যদিও হঠাৎ দেখে অতটা বোঝা যায় না। মাথার চুল বিনুনী করা। চকোলেট রঙের একখানি শাড়ি পরেছিলেন মিসেস চৌধুরী। স্মিত-মুখী তন্বী সুশ্রী মহিলাটিকে দেখে ও'র কোন রোগ যন্ত্রণা আছে বলে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল না। শুয়ে শুয়ে অন্তরঙ্গ কোন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করবার যেন ও'র ইচ্ছা হয়েছে। সেই ইচ্ছায় বাধা দেবার কিছু নেই, কেউ নেই।

বললাম, 'আপনি বলছেন অসুখ। দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। আপনার স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়েছে।'

মিসেস চৌধুরী একটু লজ্জিত হলেন, হেসে বললেন, 'মোটা হয়েছি বুঝি? হব না? দিনরাত শুয়ে থাকি আর দুধছানা ডিম—রাশ রাশ রাজভোগ খাই। স্বাস্থ্য তো ভাল হবেই। এখন বেরোই না—রোদের মধ্যে ঘুরতে হয় না তো আর টো টো করে।'

তা অবশ্য ঠিক। বছর দেড়েক আগেও ঘুরতে আমি ও'কে দেখেছি। ট্রামে বাসে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। কাগজের অফিসে, জানাশোনা পাবলিশারের দোকানে কাজ সংগ্রহ করবার জন্যে ঘুরেছেন মিসেস চৌধুরী। বইয়ের মলাট আঁকবার কাজ, ভিতরে সচিত্র-করণের কাজ। কখনো বা দিতে গেছেন, কখনো বা পাওয়ার আশায়। বেশ ক্লান্ত মনে হত তখন। ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত। সব জায়গায় সর্ব সময় আশা পূরণ হত না। কারই বা হয়। একজন লেখক বন্ধুর মধ্যস্থতায় কলেজ স্ট্রীটের একজন প্রকাশকের দোকানে ও'র সঙ্গে একদিন আলাপ হয়েছিল। কোন কোন মাসিক সাপ্তাহিকে আমার দু একটি রচনাকে মিসেস চৌধুরী অলঙ্কৃত করেন। সৌজন্যের খাতিরে তিনি আমার লেখার সুখ্যাতি করেছিলেন, আমি ও'র রেখার।

তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। বললাম, 'হ্যাঁ, ঘোরাঘুরিটা বন্ধ হয়ে ভালোই হয়েছে।'।

বলতে হয় তাই বললাম, ঘোরাঘুরিটা তিনি শখ করে করতেন না।

মিসেস চৌধুরী বললেন, 'বন্ধ আর হয়েছে কই। আমি তো আর উঠতে পারিনে, তাই সব ছুটোছুটি ও'কেই করতে হয়। ও'র কাজ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। আমি শুধু শুয়ে শুয়ে আঁকি আর বাকি যা করবার উনিই তো করেন। দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়। আর দুশ্চিন্তা তো চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী। কোত্থেকে টাকা জোগাড় করছেন, আমার এই একসপেনসিভ ট্রিটমেণ্টের খরচ চালাচ্ছেন উনিই জানেন। আমাকে কিচ্ছু বলবেন না। কিছু জিজ্ঞেস করলে বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমাকে ওসব ভাবতে হবে না। ভাবতে তো হবে না জানি। কিন্তু আমি উঠব আর তুমি পড়বে। আমি ওঠার আগেই তুমি যদি পড় তাহলে তো চমৎকার। বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটিকে কে তখন দেখবে সে খেয়াল নেই। যা রয়সয় তাই করাই ভালো। কী বলুন কল্যাণবাবু?'

সায় দিয়ে বললাম, 'তা ঠিক।'

চা আর খাবার হাতে নিয়ে গঙ্গা ঘরে ঢুকল। কালো ক্ষীণাঙ্গী একটি মেয়ে। এর আগেও একবার এসে মিসেস চৌধুরীর বিছানার কাছে গিয়ে কী যেন ফিস ফিস করে গেছে। বুঝতে পারলাম এই আপ্যায়নের আয়োজনই হচ্ছিল। আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'এসব কী। আপনি সেরে উঠুন তখন এসব ভদ্রতা টদ্রতা করবেন।'

মিসেস চৌধুরী বললেন, 'ততদিন বুঝি সব মুলতুবী থাকবে? জানেন সেদিন এক তরুণ লেখক এসে হাজির। নাম অতনু সোম। পড়ে থাকবেন লেখাটেখা। অতনু সেদিন বলছিল সুমিতাদি, আপনার তো দারুণ ক্ষমতা, শুয়ে শুয়েই কাজ করছেন, শুয়ে শুয়েই সবদিকে নজর রাখছেন। দাঁড়ান, আমি আপনাকে নিয়ে গল্প লিখব। আমি হাত জোড় করে বললাম, দোহাই তোমার, আমাকে নিয়ে কিছু লিখতে হবে না। লিখবার মত কী আছে আমার মধ্যে? তোমরা আর একজনকে দেখছ না। শুধু আমার প্রশস্তি করে করে তোমরা আর একজনকে খাটো করে ফেলছ।'

হেসে বললাম, 'কেন খাটো করবার কী আছে?'

তিনি বললেন, 'অনেকেই করে। পাড়া-পড়শী আত্মীয় স্বজন অনেকেই আমার স্বামীকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেন না। আমি বেশ বুঝতে পারি। আমি নিজের কানে শুনেছি দু একজনের বাঁকা বাঁকা কথা। ঠাট্টা পরিহাস! আমার স্বামী আমার আঁকা ছবি নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন, এ অফিসে সে

যে কত রকমের কত কথা হয়—। বুঝতেই তো পারেন আমাদের সমাজ। এ সমাজে স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক সেই এক ধরাবাঁধা ধারণায় বাঁধা। তার আর নড়চড় হবার জো নেই। এখানে স্ত্রী শুধু রান্নাবান্না করবে, ঘরদোর গুছোবে আর স্বামী দশটা পাঁচটা অফিসে কলম পিষবে। তাতেই তার একমাত্র পৌরুষ। এই প্যাটার্ন থেকে একটু আলাদা কিছু হলেই জাত গেল।'

আমি চুপ করে রইলাম। নিত্যবাবুকে আমিও দেখেছি। সেবার একাডেমীর বার্ষিক একজিবিশনে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে ভিড়ের মধ্যে আমিই সুমিতা চৌধুরীকে আবিষ্কার করলাম। চোখা-চোখি হতে তিনিও সামনে এসে দাঁড়ালেন। হেসে বললাম, 'আপনার ছবি আছে তো?'

তিনি বললেন, 'কী যে বলেন। আমরা কি ছবি আঁকতে পারি যে থাকবে?'

বুঝতে পারলাম অভিমানের কথা। শুনেছি মিসেস চৌধুরী ফাইন আর্টস নিয়েই পাশ করেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের চাপে শিল্পের সেই চারুতা আর রাখতে পারেননি।

মিসেস চৌধুরীর পাশে এক অপরিচিত ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মৃদুস্বরে পার্শ্ববর্তিনীকে বললেন, 'তোমার দু একটা ল্যান্ডস্কেপ অন্তত পাঠিয়ে দেখলে পারতে। অত করে বললাম।'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মিসেস চৌধুরী আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার স্বামী মিঃ চৌধুরী।'

'ওঃ!' বলে জোড় হাতে নমস্কার করলাম। কিন্তু মেনে নেওয়া একটু শক্ত হল। কালো বেঁটে খাটো এক ভদ্রলোক বছর চল্লিশেক হবে বয়স। ঘষা কাঁচের মত নিষ্প্রভ অস্বচ্ছ দুটি চোখ আর তেমনি অনুজ্জ্বল মুখ। মুখ নাকি মনের সূচীপত্র। কিন্তু এ মুখ যে কোন মনের আবরণ। এই বরাঙ্গনার পরম গুরু বলে এ'কে বিশ্বাস করতে সহজে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সংসারে কত রকম অবিশ্বাস্য ব্যাপারই তো ঘটে।

ভদ্রলোক শুধু মৃদুভাষী নন, মিত-ভাষীও। প্রায় কিছুই তিনি বললেন না। আমি যে তাঁর কাছে অশ্রুতনামা নই এই-টুকুই শুধু জানিয়ে রাখলেন।

তারপরেও ফাইল হাতে ভদ্রলোককে ট্রামে বাসে, কাগজের অফিসে, পাবলিশার পাড়ায় মাঝে মাঝে দেখেছি। বেশির ভাগ সময়ই কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। সে কাজ প্রায় সবই তাঁর স্ত্রীর আঁকা ছবির চাহিদা আর সরবরাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সেদিন এক পাবলিশারের দোকানের সামনে ফের ও'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি ঢুকছি, তিনি বেরোচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম 'সব ভালো তো?'

তিনি বললেন, 'ভালো আর কই। সুস্মিতা বড্ড ভুগছে। ছমাস হাসপাতালে ছিল। এখন বাড়িতে নিয়েছি। দয়া করে আসুন না একদিন।'

বললাম, 'আপনাদের ঠিকানা তো জানিনে।'

তিনি পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে তাড়াতাড়ি নাম ঠিকানা লিখে দিলেন। অবাক হয়ে দেখলাম পুরুষের জড়ানো হস্তাক্ষরে একটি মেয়ের নাম।

আমার বিস্ময়টুকু বোধহয় তাঁর চোখে পড়েছিল। হেসে বললেন, 'ওর সঙ্গেই তো আপনার বেশি জানাশোনা। তাই ওর নামই লিখলাম। আমার নাম লিখলে দুদিন বাদে আপনি আর মনে রাখতে পারতেন না। যাবেন একদিন।'

এবার আরো অবাক হলাম। ও'র মুখের কথার সঙ্গে তো মুখের চেহারার মিল নেই। এই কালো গোলগাল ব্যঞ্জনাহীন মুখখানা কি তাহলে মুখোস? এই আটপৌরে হাবা-গোবা বেশটুকু কি তাহলে ছদ্মবেশ?

তারপর সপ্তাহ দুই আগে ও'দের এই সহরতলীর বাসায় আমি আরো একদিন এসেছিলাম। সেদিন ডাক্তার ছিলেন বাড়িতে। লোকজনের ভিড় ছিল। আজ আমি একাই আছি দর্শনার্থী অতিথি। গৃহস্বামী পর্যন্ত উপস্থিত নেই।

মিসেস চৌধুরী কী যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'সেদিন সেই তরুণ লেখককে যা বলেছিলাম আপনাকেও কিন্তু তাই বলি। আচ্ছা আপনারা সংসারে পুরুষ চরিত্র দেখতে পান না কেন? আপনাদের হাতে বেশির ভাগ পুরুষই গল্পের মধ্যে অপ্রধান, গৌণ, আর না হয় দুর্বল। কেন এমন হয় বলুন তো?'

হেসে বললাম, 'বোধহয় নিজেরা পুরুষ বলে।'

মিসেস চৌধুরী হাসলেন, 'ঈস, অত অহংকার ভালো নয়। নিজেরা পুরোপুরি পুরুষ নন বলে এমনও তো হতে পারে। ইলাসট্রেশনের জন্যে, কভার আঁকবার জন্যে আপনাদের অনেক আধুনিক গল্প উপন্যাসই তো পড়তে হয়। দেখি সব দুর্বল প্রকৃতির পুরুষ।'

বললাম, 'অপরাধ কবুল করছি। আর কারো সমালোচনা করতে চাইনে। আমার গল্পের পুরুষ চরিত্র প্রকৃতি সম্বন্ধে বড়ই দুর্বল।'

মিসেস চৌধুরীর মুখে কে যেন একটু রক্তরঙের তুলি বুলিয়ে দিল। কিন্তু সেই লজ্জাটুকু তিনি পরক্ষণেই কাটিয়ে উঠে বললেন, 'শুধু নারী সম্বন্ধেই দুর্বল নয়, তাদের দুর্বলতা জীবনের সব ব্যাপারে। আপনাদের ধারণা এই ধরনের দুর্বল পুরুষ [illegible] আপনাদের পাঠিকাদের মন টানতে পারেন?'

পলা, তো [illegible] মতলবটা কি তাই বল।

হেসে বললাম, 'তাঁদের মন? তাদের মনের কথা দেবাঃ ন জানন্তি কুতঃ লেখকাঃ। তবে পাবলিশাররা নিশ্চয়ই জানেন। এ ব্যাপারে তাঁরাই আজকাল সেরা সাইকোলজিস্ট।'

মিসেস চৌধুরী খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'ওকি সব খেলেন না? সবই যে পড়ে রইল।'

বললাম, 'যথেষ্ট খেয়েছি। আজকালকার পুরুষেরা বীর পুরুষদের মত খেতে পর্যন্ত পারেন না। আপনি এ অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে আনতে পারেন।'

মিসেস চৌধুরী হাসলেন, 'তা আনা যায় বইকি। কিন্তু হাসির কথা নয়। সত্যি-কারের পুরুষ চরিত্র কেন আধুনিক গল্প উপন্যাসে আসছে না দয়া করে ভেবে দেখবেন। তারা কি বাস্তব সমাজ সংসার থেকে লোপ পেয়েছে? যদি পেয়ে থাকে আপনারা নতুন করে তাদের সৃষ্টি করুন। উত্তর পুরুষদের সামনে তুলে ধরুন সেই আদর্শ পুরুষদের।'

আমি চুপ করে রইলাম। পৌরুষ সম্বন্ধে এই মহিলাটির বেশ একটু চিন্তা ধারণা এবং বক্তব্য আছে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যে পুরুষটিকে দেখেছি তাঁর মধ্যে তথাকথিত পৌরুষের লক্ষণ কি খুব পরিস্ফুট? অথচ কিংবদন্তী মিসেস চৌধুরী স্বয়ম্বরা। স্বামী তাঁর স্বনির্বাচিত।

বললাম, 'নিশ্চয়ই ভেবে দেখব। দেখুন মহাপুরুষদের জীবনী আমরা পড়ে থাকি। কিন্তু বাস্তব জীবনে যাদের সঙ্গে আমরা ঠেলাঠেলি করে চলি, তারা সব আমাদেরই মত রাম শ্যাম যদু মধুর দল। এদের ক্ষুদ্র পুরুষ বলুন, কাপুরুষ বলুন, কুপুরুষ বলুন এরাই সাহিত্যে আজ ভিড় জমিয়ে বসেছে। এই গণতন্ত্রে সেই রাজকীয় মহিমা নেই একথা মানতেই হবে।'

তিনি বললেন, 'রাজকীয় মহিমা না থাকতে পারে। কিন্তু কোন না কোন মহিমা থাকবেই। না হলে সব তন্ত্রই বৃথা।'

চা আমি ঠাণ্ডা করে খাই। কি খেতে খেতে আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। শেষ করে

কাপটি সরিয়ে রাখতেই সেই মেয়েটি এসে সব নিয়ে গেল।

আমি মিনিট দুই চুপ করে বসে থেকে বললাম, 'এবার চলি। আপনি হয় কাজ করুন, না হয় বিশ্রাম করুন। আমি থাকলে আপনার কোনটাই হবে না।'

মিসেস চৌধুরী বাধা দিয়ে বললেন, 'না না। বসুন। উনি এবার নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। ও'র আসার সময় হয়ে গেছে। আপনি এলেন অথচ বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না—।'

হেসে বললাম, 'সেটা অবশ্য ভালো দেখায় না।'

তিনিও হাসলেন, 'শুধু দেখাবার কথা বলছেন কেন। আপনার এই আচরণ শুধু ফর্মের দিক থেকে নয়, কনটেন্টের দিক থেকেও খারাপ হবে।'

বললাম, 'আমি অবশ্য আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি। কিন্তু আপনারই অসুবিধে হবে। ডাক্তার নিশ্চয়ই আপনাকে বেশি কথা বলতে বারণ করেছেন।'

মিসেস চৌধুরী বললেন, 'সবাইর সব বারণই যদি শুনতে পারতাম তাহলে কি এই দশা হয়? যাকগে। আমাদের কী নিয়ে যেন কথা হচ্ছিল?'

আলাপের ছেঁড়া সুতোয় আমিই ফের গিঁট বেঁধে দিলাম। বললাম, 'পুরুষ চরিত্র নিয়ে। আচ্ছা, নিজে আপনি পুরুষের মত পুরুষ কি রকম দেখেছেন তাই বলুন।'

তিনি বললেন, 'বেশি অবশ্য দেখিনি। প্রথম দেখেছি বাবাকে।'

মনে মনে হাসলাম। সব মেয়েই তাই দেখে।

মিসেস চৌধুরী বলতে লাগলেন, 'আপনি মনে মনে কী ভাবছেন জানিনে। কিন্তু আমি আমার বাবার মধ্যে সত্যিই একজন পুরুষের মত পুরুষকে দেখেছি। আমি যখন বড় হয়েছি তখন তিনি সাবজজ। পরে রিটায়ার করবার আগে জজও হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর যা রূপ আর গুণ ছিল তাতে আরো বড় রাজপুরুষের কাজও তাঁকে মানাত। লম্বা চওড়া বিরাট পুরুষের চেহারা ছিল তাঁর। গায়ের রঙ টকটক করত। আমি তাঁর রূপের কিছুই পাইনি। আমার দাদা আর দিদিও যে তেমন পেয়েছেন তা নয়। বাবাকে কিছু বলতে হত না, কিছু করতে হত না, শুধু সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেই বোঝা যেত বিশেষ একজন কেউ এসেছেন। আবার সেখান থেকে সরে গেলে মনে হত বড় একটা জায়গা শূন্য করে দিয়ে বৃহৎ একজন কেউ চলে গেছেন। কোর্টে বাবার বিচারের সুনাম ছিল। হাই-কোর্ট তাঁর রায় অগ্রাহ্য করেছেন এমন বোধ-হয় একবারও হয়নি। পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজনের কাছে বাবা ভারি রাশভারি স্বভাবের ছিলেন। লোকজনের সঙ্গে তেমন মিশতে পারতেন না। একটি কথা বলবার পর আলাপের দ্বিতীয় কথাটি ভেবে পেতেন না। অনেকেই তাই ও'কে দাম্ভিক বলে ভুল করত। কেউ কেউ বা ভয় করত। কিসের ভয় জানিনে। তিনি তো আর সব অপরাধীর বিচারক ছিলেন না। কিন্তু যারা নিরপরাধ তারাও যেন তাঁর সামনে উকিল-হীন অসহায় আসামীর বেশে এসে দাঁড়াত। বাবার বন্ধুবান্ধব কেউ ছিল না। আমি তো তাঁদের কাউকে দেখিনি। মাকেও সামান্যই দেখেছিলাম। আমার যখন ছ বছর বয়স আমার মা মারা যান। তার আগেই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। ব্যর্থ প্রেমিক দাদা কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় নিয়েছেন। আদালতের বাইরে বাবার সঙ্গী ছিলাম একমাত্র আমি আর তাঁর বই। আইনের বই ছাড়াও দর্শন আর ইতিহাস ছিল বাবার নিত্যপাঠ্য। আমার ছিল গল্প আর উপন্যাস। প্রথম প্রথম লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে পড়তাম। তারপর ধরা পড়বার পর আর লুকোতাম না। দিদি আর জামাইবাবু বলতেন, বাবা আদর দিয়ে দিয়ে আমার মাথা খেয়েছিলেন। বাবাকে আসামীর কাঠগড়ায় আমার মাসীমাও দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু তিনি নির্বিকার ছিলেন।

ছেলেবেলা থেকে বাবা একই সঙ্গে আমার বাবা আর মার জায়গা দখল করে ছিলেন। ওই রকম জাঁদরেল পুরুষের মন যখন নরম হয়, যেখানে নরম হয়, সেখানে আপনি তো জানেন মুদুনি কুসুমাদপি। বাবাকে কোনদিন খেলাধুলো করতে দেখিনি। না ইন্ডোর না আউটডোর। আমি হলাম তাঁর প্রথম খেলা। খেলার পুতুল। তারপর অবশ্য বাবাই আমার হাতের পুতুল হলেন। কোর্ট থেকে ফিরে এসে তিনি তাঁর পোশাক ছাড়তেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতাম। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই রাশভারি স্বভাবও খসে পড়ত। সে কোটের বোতাম খোলবার দরকার হত না। আমরা এক সঙ্গে খেতাম, মাঝে সাজে তাস কি লুডো খেলতাম। ছুটির দিনে বাবা ফুলের বাগানে কাজ করতেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম। মালীকে সরিয়ে দিতাম। আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গিয়ে আমি বেশি তৃপ্তি পেতাম না, তাঁরাও আমাদের বাড়িতে এসে কিসের যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতেন। মফঃস্বল শহরে সেই বড় কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়িটা আমার কাছে একটা গোটা পৃথিবীর মতই ছিল। সেই পৃথিবীতে বাবা আর আমি ছিলাম একমাত্র বাসিন্দা। আমাদের আর যেন কারোরই কোন দরকার ছিল না। তবু আরো একজন এলেন।'

মিসেস চৌধুরী থামলেন।

এই দ্বিতীয় পুরুষটি যে কে তা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু কৌতূহল জানানো কি সমীচীন?

কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা না করলে ও'র এই দ্বিধাই কি কাটবে! অবশ্য বাবার কথা যত খোলাখুলিভাবে তিনি বলতে পেরেছেন বিয়ের এত বছর পরেও পূর্বরাগের কথা ও'র পক্ষে হয়তো বলা সহজ নয়। কিন্তু কারো কারো কাছে নিজের কথা বলবারও একটা ঝোঁক আছে। সেই ঝোঁকে যদি একবার পেয়ে বসে তাও কাটিয়ে ওঠা কঠিন। না বলতে পারলে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই।

একটু বাদে আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেই অনাবশ্যক দ্বিতীয় ব্যক্তিটির সঙ্গে কী করে আলাপ পরিচয় হল?'

এতক্ষণে মিসেস চৌধুরীও খানিকটা ফের সহজ হতে পারলেন, হেসে বললেন, 'যা ভেবেছেন তা নয়। প্রথম আলাপ তেমন নাটকীয়ভাবে হয়নি। বাবা নিজেই ও'কে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। জানিস পলা এই ছেলেটি কে? আমাদের যোগেন চৌধুরীর ছেলে। আমারই কোর্টে কাজ করে। আশ্চর্য এতদিন আমি জানতামই না। ও যে বেঁচে আছে তাই আমার ধারণা ছিল না। আমি শুনেছিলাম রেঙ্গুনের বোম্বিংএ ওদের সব গেছে। সব গেছে ঠিকই। শুধু এই নিতাই আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে, অচেনা অজানা একটা দলের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে।'

আমি অবাক হয়ে ও'র দিকে তাকালাম। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর কেউ আসেনি?'

নির্লিপ্ত সহজ গলায় তিনি বললেন, 'না। কেউ আর বেঁচে ছিলেন না।'

আমি শিউরে উঠে বললাম, 'ওমা সে কি! কে কে ছিলেন আপনার?'

'বাবা মা ভাই বোন সবাই ছিলেন।'

'এখন আর কেউ নেই?'

তিনি চুপ করে রইলেন।

আমাদের ড্রয়িং রুমে সামনের সোফাটায় বসে ছিলেন তিনি। আমি অবাক হয়ে ও'কে দেখতে লাগলাম। ও'কে তো দেখেছেন। ও'র চেহারা দেখে মুগ্ধ হবার কিছু নেই। তখন অবশ্য স্বাস্থ্যটাস্থ্য এখনকার চেয়ে অনেক ভালো ছিল। কিন্তু আমি তাঁর সেই স্বাস্থ্য দেখছিলাম না। দেখছিলাম যে মানুষটি এত বড় দুর্ভাগ্যের কবল থেকে মৃত্যুর কবল থেকে বেরিয়ে এসেছে তাকে। যেন এর চেয়ে বড় রহস্য বড় রোমাঞ্চকর ব্যাপার আমার কাছে আর ছিল না। তখন আমার বয়স কত আর হবে। বছর চোদ্দ। তখনো শাড়ি ধরিনি। ফ্রক পরি, শালোয়ার পরি, মাঝে মাঝে সখ করে পরি শাড়ি। তখন যা দেখতাম তাই ভালো লাগত, যা শুনতাম তাই ভালো

লাগত। মানুষের দুঃখ দৈন্য দুর্বিপাকে সহজেই চোখের জল আসত। দয়া মায়া মমতার সংগে তীব্র ভালোবাসার যে কোন তফাৎ আছে তা বুঝতে পারতাম না। আমি চোখের সামনে এমন একজনকে দেখতে পেলাম যিনি নিঃস্ব, স্বজন বন্ধুহীন, যাঁর কোন দিক থেকে কোন বাঁধন আর অবশিষ্ট নেই। আমার বুকের মধ্যে কিসের একটা ঢেউ যেন ফুলে ফুলে উঠল। একটা নয় অনেকগুলি। আমি ঝাপসা চোখে মূর্তি ধরে ওঠা এক পরম দুর্ভাগাকে দেখতে পেলাম। আর সেই প্রথমবারের দেখাতেই তাকে ভালো বাসলাম।

দুঃস্থ দুঃখী অভাবগ্রস্থ আত্মীয়-বন্ধুদের সংগে বাবার গোপন যোগাযোগ ছিল। তিনি অনেককেই অনেক রকম সাহায্য করতেন। আমি তাঁদের সবাইর নাম ধাম জানতাম না, সাহায্যের প্রকার কি পরিমাণও জানতাম না। কিন্তু টের পেতাম। অনেকের অনেকরকমের বিলাসিতা থাকে। দয়াকে যদি বিলাসিতা বলেন বাবার সেই বিলাসিতা ছিল। দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করবার শক্তি তো আমার ছিল না। আমার ঝোঁক ছিল অন্যদিকে। একবার কলকাতায় গিয়ে চিড়িয়াখানা দেখে এসেছিলাম। সেই থেকে আমারও খেয়াল চাপল আমাদের ফুলবাগানের একটা দিকে জুলজিক্যাল গার্ডেন করতে হবে। মালী, দারোয়ান চাকর সবাইর সাহায্য পেলাম। কিন্তু দেখতে দেখতে আমার সেই চিড়িয়াখানাটা ভেটিরিনারি কলেজের হাসপাতাল হয়ে উঠল। খোঁড়া কুকুর বিড়ালেরই সংখ্যা বেশি। আমাদের ফটকের সামনে থেকে যে নেড়ী রোগা কুকুরটাকে কুড়িয়ে এনেছিলাম যার বাঁচবারই কোন আশা ছিল না দেখলাম তার গোটা তিনেক বাচ্চা হয়েছে। সেগুলির একটাও খোঁড়া নয়। বাবাকে ডেকে এনে দেখালাম। তিনি বললেন, 'তাই তো তোর নাতিনাতনীতে যে বাড়ি ভরে গেল খাওয়াবি কি।'

বাবা তাঁর বন্ধুর ছেলেকে বললেন, 'তুমি আমাদের বাড়িতে এসে থাকতে পার, এ বাড়িতে তো ঘরের অভাব নেই।'

অবাক হয়ে গেলাম। বাবা অনেককে অনেক রকম সাহায্য করেন। কিন্তু নিজের বাড়িতে কাউকে থাকতে বলেন না। এই আকস্মিক দুর্ভাগ্যের কথা শুনে বাবাও তাহলে বেশ বিচলিত হয়েছেন।

কিন্তু আশ্রয়হীন ভদ্রলোক এমন উদার আশ্রয় পেয়েও তা নিতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'আমি যে মেসটায় আছি সেটা বেশ ভালো। সেখানে আমার কোন অসুবিধে হয় না।'

আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছি বুঝতে পেরে তিনি বললেন, 'আমি মাঝে মাঝে আসব। বেশি দূরে তো নয়।'

আমি খুশী হয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই আসবেন।'

তারপর থেকে তিনি প্রায়ই আসতে লাগলেন। লক্ষ্য করলাম বাবার চেয়ে আমার সংগে গল্প করতেই তিনি ভালোবাসেন। আমি এতদিন ছাপার অক্ষরে গল্প পড়েছি উপন্যাস পড়েছি। আমি উপন্যাস পড়ি বারো বছর বয়স থেকে। ইঁচড়ে পাকা বলতে পারেন। ছাপার অক্ষরের গল্প আর মানুষের নিজের মুখে নিজের জীবনের গল্পের মধ্যে যে অনেক তফাৎ তা আমি সেই প্রথম বুঝতে পারলাম। সে গল্পের কোন ফর্ম নেই, আরম্ভ মধ্য আর শেষের সমতা রক্ষার দিকে কোন লক্ষ্য নেই। তবু সে গল্পের তুলনা হয় না। সে গল্পের সংগে একজনের গলার স্বর সব সময় মিশে থাকে, একজনের মুখের ভাবভংগি সব সময় চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

সবই তো দুঃখের কাহিনী। উনি এক বন্ধুর সংগে শহরের বাইরে গিয়েছিলেন, তাই বেঁচে গেছেন। নইলে গোটা পরিবারের সংগে ওঁরও অকাল মৃত্যু হত। ফিরে এসে দেখলেন কেউ নেই শুধু এক ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে। এমন অনেক পরিবারই সেবার ধ্বংস হয়েছিল। শুনতে শুনতে আমি ভাবতাম আমার যদি এমন মন্ত্র জানা থাকত যাতে সব ফিরে আসে, ম্যাজিসিয়ানের মত এমন যাদুদণ্ড হাতে থাকত যাতে কাটা মানুষ জোড়া লাগে, তাহলে বেশ হত। আমি ওঁকে সব ফিরিয়ে দিতাম। আমি সেই বয়সেই অবাক হয়ে ভাবতাম, থাকা আর না থাকার মধ্যে তফাৎ কত সামান্য। যার বাড়ি ছিল ঘর ছিল, ঘর ভরা ভাই বোন ছিল, বাপ মা ছিলেন, কাঠের ব্যবসা ছিল, আজ তাঁর কিছুই নেই। এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে সব মিলিয়ে গেছে। আর একটি ভালো স্বপ্ন কি দেখা যায় না যাতে আবার সব পূর্ণ হয়ে ওঠে?

আমার শুনতে ভালো লাগত, ওঁর পালিয়ে আসবার কাহিনী। তখন দলে দলে লোক বার্মা থেকে পালিয়ে আসছে। যারা যুদ্ধ করেছে আর যারা করেনি তাদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। খানিকটা প্লেনে, খানিকটা ট্রেনে, খানিকটা গরুর গাড়িতে, তারপর দিনের পর দিন পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে কলার ভেলায় ইরাবতী নদী পার হয়ে শুধু প্রাণ নিয়ে পলায়ন। কোনদিন খেতেন কোনদিন খাওয়া জুটত না,

কোনদিন পাহাড় বেয়ে উঠতেন, কোনদিন হাঁটবার শক্তি থাকত না। পথের সেই কষ্টের কথা আমি বসে বসে শুনতাম। কত নিষ্ঠুরতার নৃশংসতার কাহিনী। আত্মীয় অসুস্থ আত্মীয়কে পথে ফেলে আসছে, বন্ধু বন্ধুর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না, বাপ মা সন্তানকে পর্যন্ত ছেড়ে আসছে। শুধু কোনরকমে নিজের প্রাণটুকুকে নিয়ে আসতে পারলেই হয়। এরই মধ্যে অন্যরকমের একটু গল্প শুনলাম। কী করে ও'দের দলের মধ্যে তের চোদ্দ বছরের একটি মেয়েও এসে পড়েছিল। তার বাবা মা পথেই মারা গেছে। সঙ্গে জানাশোনা কেউ নেই, টাকা-পয়সা খাবার-টাবার তো নেইই। সেই মেয়েটি ও'র সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। উনি প্রথমে তাকে ও'র নিজের খাবার ভাগ করে দিলেন। পায়ে ঘা হওয়ার জন্যে সে যখন আর চলতে পারল না তখন উনি তাকে কাঁধে তুলে নিলেন। সঙ্গীরা ও'কে গালাগাল দিতে লাগল, চৌধুরী তুমি একটা আহাম্মক। নিজে চলতে পারছ না, আর একটা বোঝা ঘাড়ে নিলে। তুমি পড়ে থাকলে তোমাকেই বা কে দেখবে, তোমার বোঝাই বা কে দেখবে।'

শুনতে শুনতে সেই মেয়েটিকে আমার ভারি হিংসে হয়েছিল। কী অদ্ভুত মন তাই দেখুন। অমন দুর্দশায় যে পড়েছে তাকেও হিংসে, কিন্তু কাঁধের স্বর্গে উঠেছে যে।

সেই মেয়েটিকে তার নাম শুনেছি রত্না—

তাকে তিনি শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারেননি। ইরাবতীর তীরেই তাকে রেখে আসতে হয়েছিল। শক্ত অসুখে বিনা চিকিৎসায়, বিনা ওষুধপথ্যে সে মারা যায়।

তিন চার বছর আগের ঘটনা। তবু বলতে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। নিজের আত্মীয় স্বজনের সবাইর এক সঙ্গে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা যখন তিনি বলেছেন তখনো তো তাঁর চোখে এমন জল দেখিনি।

শুনতে শুনতে হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'সেকি আমার মত দেখতে ছিল?'

তিনি আমার মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'সে তোমার চেয়েও সুন্দরী ছিল।'

জানিনে ঠাট্টা করেছিলেন কি না। পরে আরো বড় হয়ে বুঝেছিলাম যে রূপের কথা তিনি বলেছিলেন সে রূপ দুঃস্থ দুঃখী অসহায়ের রূপ।

ও'দের সেই ফিরে আসবার পথের কথা, যাত্রীদের কথা, পথের মধ্যে জন্মমৃত্যু হিংসা দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা মহত্ত্বের কথা জিজ্ঞেস করে করে তখন ও'র মুখ থেকে কতবার যে শুনেছি তার আর ঠিক নেই। শুনতে শুনতে বার্মার সেই পাহাড় জঙ্গল, নদীনালাগুলি যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পেতাম। মান্দালয়, মেমিও মিচিনা মগং এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত অপরিচিত নামগুলি আমার কাছে অপূর্ব রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরে উঠত। কিন্তু সে যাত্রা তো ও'দের জয়যাত্রা ছিল না। বড় জোর সাকসেসফুল রিট্রিট। পরাজয় আর পলায়ন। তবু আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

তারপর শুধু গল্প বলা নয়; তিনি আমার সব কাজের সব অকাজের সঙ্গী হলেন। আমার চিড়িয়াখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পোস্ট তাঁকে নিতে হল, ফুল-বাগানের ভার তাঁর হাতে ছেড়ে দিলাম। তিনি না বলে দিলে ঘরদোর সাজানোটা আমার পছন্দ হয় না। পর্দার রঙ, টেবিল ঢাকনির রঙ আমার শাড়ি ব্লাউসের রঙ, তখন আমি শাড়ি পরতে শুরু করেছি—তিনি পছন্দ না করে দিলে সব বিবর্ণ হয়ে যায়। আমি প্রথম প্রথম পেনসিল দিয়ে কালিকলম দিয়ে ছবি আঁকতাম। স্কুলের খাতাপত্র বইয়ের উল্টো পিঠ সব কিছু সচিত্র করে তুলতাম। উনিই প্রথম আমাকে তুলি আর রঙের বাক্স কিনে দিলেন। বইয়ে পড়েছিলাম কালো রঙের মধ্যে সব রং লুকিয়ে থাকে। দেখলামও তাই।

বছর তিনেক কাটল। তারপর আর কাটল না। বাবা আপত্তি করতে লাগলেন। দিদি জামাইবাবু আর মাসীমা এসে আমার আড়ালে বাবাকে কী সব বললেন। বাবার মুখ থমথম করতে লাগল।

জামাইবাবু আমার ভালো ভালো সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার। জামাইবাবু নিজে একজন এডভোকেট। ভায়রার পদে বসাবার জন্যে দু একজন সমব্যবসায়ীর নামও তিনি প্রস্তাব করলেন। আমাকে দেখে অনেকেরই পছন্দ হল, আমার কাউকেই পছন্দ হল না। এই অপছন্দের কোন যুক্তি নেই।

বাবা সবই বুঝলেন। আমাকে তাঁর নিজের পড়বার ঘরে ডেকে নিয়ে দোর বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'পলা, তোমার মতলবটা কি তাই বল।'

যাঁকে আমি কোনদিন ভয় করিনি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে সত্যিই আমার সেদিন বড় ভয় হল।

আমি মুখ নিচু করে বললাম, 'আমাকে আর কোথাও বিয়ে দিয়ো না।'

বাবা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আর কোথাও! জানো তোমাকে আমি তোমার যমের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারি।'

বললাম, 'বরং তাই দাও।'

জজ হয়ে ফাঁসির হুকুম তো বাবা অনেককেই দিয়েছেন, আমাকেও যদি দিতেন আমি তাঁর সেই রায় অমান্য করতাম না। তাঁর জন্যেও তো আমার কষ্ট হচ্ছিল।

কিন্তু তিনি আমাকে সেই মৃত্যুদণ্ড দিলেন না। নিজেই মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন।

একটু বাদে বাবা বললেন, 'কোনদিক থেকেই তো যোগ্য নয়। জাত আলাদা—।'

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, 'বাবা, তুমি না বলতে তুমি জাতটাত মানো না—।'

বাবা অন্য আপত্তির কথা তুললেন, 'ও আমারই কোর্টের একজন অর্ডিনারি ক্লার্ক। সব মিলিয়ে বোধহয় সোয়াশো টাকাও পায় না। বিদ্যায় বুদ্ধিতে চেহারায় কোনদিক থেকেই—। তাছাড়া ওর তিনকুলে কেউ নেই। বাড়ি নেই ঘর নেই।'

আমি বললাম, 'বাবা, তুমি তো জানো ও'দের সবই ছিল আবার সবই হতে পারে।'

বাবা বললেন, 'হতে পারে কিনা খুব সন্দেহ আছে। ওর শক্তিসামর্থ্যের ওপর আমার ভরসা নেই। দেখলাম তো এতদিন ধরে। দেখ পলা, দয়ার পাত্রকে দয়া করা যায়, কন্যাদান করা যায় না।'

বললাম, 'বাবা, তোমার দয়া করেও দরকার নেই, কন্যাদান করেও দরকার নেই।'

বাবা রাগে ফেটে পড়লেন, 'অবাধ্য এক-গুঁয়ে মেয়ে, যাও আমার সামনে থেকে সরে যাও।'

তাঁর মমতার পরিচয় সেই দুবছর বয়স থেকেই পেয়ে আসছি। এবার নিষ্ঠুরতার নির্মমতার পরিচয় শুরু হল। আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করলেন, বাইরের সঙ্গে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেন। অবশ্য এখন আর বাবার ওপর কোন রাগ নেই। তিনি তাঁর ধারণা মত আমার ভালোর জন্যেই

সব করেছিলেন। আমি যা করতে যাচ্ছি তাতে আমার দুঃখের শেষ থাকবে না সেই আশংকায় তিনি মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। আমার দুঃখ এই আমার সুখটুকু তাঁকে দেখাতে পারলাম না।"

মিসেস চৌধুরী থামলেন।

আমি ভাবলাম সুখ! সামনে পিছনে লোহার স্ট্রাকচারের ভিতরে তাঁর ক্ষীণ দেহটুকু ভরে রাখা হয়েছে। প্রাণ পাখি যাতে উড়ে না যায় তাই ডবল পিঞ্জরের ব্যবস্থা। ওপরে অবশ্য একটা নীল চাদরের ঢাকা আছে। মিসেস চৌধুরীর নড়তে চড়তে কষ্ট হয়। এখনো তাঁর মেরুদণ্ডে মারাত্মক বীজাণু বাসা বেঁধে রয়েছে। এই মুহূর্তে তাঁর মুখে সুখের কথা শুনে আমি হঠাৎ কোন কথা বলতে পারলাম না।

একটু বাদে বললাম, 'আপনার বাবা কি আপনাদের ক্ষমা করেননি?' সে কথার জবাব না দিয়ে মিসেস চৌধুরী বললেন, 'তারপর আমাকে যখন সবাই মিলে দিদি আর জামাইবাবুর কাছে পাটনায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন, আমার সন্দেহ হল জামাই-বাবু তাঁর নির্বাচিত ভায়রাটিকেও সেখানে বসিয়ে রেখেছেন। চাকর দারোয়ান মালীকে বশ করে আমি তখন পালালাম। যার সংগে পালালাম তিনি পলায়নে ওস্তাদ। বার্মা থেকে বোমারু বিমানে তাড়া খেয়ে যিনি পালিয়ে এসেছিলেন, বাঁকুড়া থেকে আর একবার পালাতে তাঁকে বেশি বেগ পেতে হল না। তবে সেবার শুধু প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলেন, এবার—'

আমি পাদপূরণ করে বললাম, 'এবার প্রাণাধিকাকে নিয়ে। তারপর?'

তিনি বললেন, 'তারপর এলাম কলকাতায়। রেজিস্ট্রেশন হল। বয়স এক বছর কম ছিল, বাড়িয়ে দিলাম।'

হেসে বললাম, 'নিতান্ত দায়ে না পড়লে মেয়েরা অমন কুকাজ করে না। তবে রাবারের পরে বয়সই বোধহয় সবচেয়ে বেশি ইলাস্টিক।'

সুমিতা চৌধুরীর তারপরের ইতিহাস একটানা সংগ্রামের ইতিহাস। অবশ্য প্রথম কিছুদিন সেই কৃচ্ছ্রতাকে কৃচ্ছ্রতা বলে মনে হয়নি নবদম্পতীর। কৈলাস বোস স্ট্রীটের একটি পুরোন দোতলা বাড়ির কোণের দিকের দুখানি ঘরে যে প্রথম বাসা ও'রা বেঁধেছিলেন বাস করবার পক্ষে তাই ছিল অতিরিক্ত। বাইরের পৃথিবীকে আড়াল করবার জন্যে ঘরে যে চারটি দেয়াল আছে একজোড়া দরজা আছে তাই তো যথেষ্ট। এই বিরাট কলকাতা শহর যেন জনসমুদ্র নয়, সত্যিকারের সমুদ্র। আর একখানি বাসা যেন দুজনের লুকিয়ে থাকবার মত বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। স্বতন্ত্র স্বশাসিত স্বয়ং সম্পূর্ণ দুজনার বাসনা দিয়ে একটি জগৎ। চারদিকের ঢেউগুলি যেন গ্রাস করবার জন্যে এগিয়ে আসছে না, শুধু আড়াল রচনা করবার জন্যেই তাদের অস্তিত্ব। সেই দ্বীপকে সাজাবার জন্যে আলাদা মণিমুক্তার প্রয়োজন নেই, দুজনের ঘনসান্নিধ্য, দেহসৌরভ, কূজন আর গুঞ্জন গৌরবই যথেষ্ট।

দুজনের বাসনাই তো একটি মনোরম বাসা। এই পৃথিবীতে বাস করবার পক্ষে আর সবই তখন বাহুল্য। সেই দ্যুলোকে ইহলোকের অন্ন জলবায়ু নিতান্তই গ্রহণ না করলে নয়, তাই গ্রহণ করতে হয়।

সুমিতা অবশ্য বাবাকে চিঠি লিখে ক্ষমা আর তাঁর সংগে দেখা করবার অনুমতি চেয়েছিলেন। জজকোর্টে সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। মেয়ের অভাব অনটনের কথা ভেবে সুমিতার বাবা কিছু অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। দাক্ষিণ্যহীন সেই দান সুমিতা গ্রহণ করেননি। তার ফলে সুমিতার বাবা মৃত্যুর আগে তাঁর সমস্ত সঞ্চয় জনহিতে দিয়ে গেলেন।

নিজেদের সামান্য সঞ্চয় যখন শেষ হল, নিত্যরঞ্জন মরীয়া হয়ে আরো কম মাইনের একটা কেরানীগিরি নিয়ে বসলেন। একখানা ঘর ছেড়ে দিয়ে শুধু একখানি ঘরে মাথা গুঁজতে হল। ঘর ভাড়া দিয়ে যা থাকে তাতে কোনরকমে দিন গুজরান হয়।

সুমিতা স্বামীকে বললেন, 'তুমি কোন নাইট কলেজে ভর্তি হও। ভালো চাকরির জন্যে একটা ডিগ্রী তোমাকে নিতেই হবে। ম্যাট্রিকুলেশনের সার্টিফিকেটটা তো আমার আছে। কোথাও না কোথাও একটা কেরানী-গিরি পেয়েই যাব।'

নিত্যরঞ্জন বললেন, 'তোমার ছবি আঁকার ঝোঁক দেখে তোমার বাবা তোমাকে আর্ট কলেজে ভর্তি করতে চেয়েছিলেন। তোমার নিজের মনেও সেই ইচ্ছা ছিল আমি জানি। তুমি ভর্তি হও আর্ট কলেজে।'

সুমিতার বাবার চাওয়ার পিছনে যে জোর ছিল তাঁর স্বামীর আকাঙ্ক্ষার সেই নির্ভর-যোগ্য অবলম্বন নেই। কিন্তু মানুষটির সাহস আর জেদ দেখে সুমিতা অবাক হয়ে গেলেন। ভর্তি হতে হল আর্ট কলেজে। ধরাধরি করে মাইনেটাইনের ব্যাপারে সামান্য সুবিধা সুযোগ হয়তো জুটেছিল। কিন্তু সে আর কতটুকু। দু এক বছরের নয়, পাঁচ বছর পড়লে তবে ব্রত উদ্‌যাপন। নিত্য-রঞ্জন স্ত্রীকে এই পাঁচ বছর পড়িয়েছেন। শুধু অফিসের মাইনেয় কুলোয়নি। টুইশন করেছেন, পার্টটাইম টাইপিস্টের কাজ করেছেন। আরো যে কী করেছেন না

"গুঞ্জরি তান
উঠিল তোমার
সোনার বীণার তারে"
শ্বেত শুভ্র কাশের বনে হাওয়ার দোলায়,
মালতী-শেফালীর বিকীর্ণ সুরভে,
মরালের ছন্দিত ডানায় আর অবারিত
নীল আকাশে ঝংকার উঠেছে শারদ-
লক্ষ্মীর বীণার। প্রতি বছর এই শুভমুহূর্ত-
টিকে আমরা স্মরণীয় করে রাখতে চাই
আমাদের জীবনে। 'ঝংকার' রেডিওর
সুরের স্পন্দনে এই আনন্দ আপনার
কাছে আরো নিমূর্ত হয়ে উঠবে।
ঝংকার
রেডিও
অপূর্ব ম্যাগনাটোন-সহ
JHANKAR
পূর্বাঞ্চলের একমাত্র পরিবেশক:—
রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিঃ
৩ ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা—১।

করেছেন সুমিতাকে তা জানাননি। এত করেও যে স্বাচ্ছন্দ্য সুমিতার ক্লাসের আর সব ছেলেমেয়েরা পেয়েছে নিত্যরঞ্জন তাঁর স্ত্রীকে তা দিতে পারেননি। সেখানে বেশির ভাগই ধনীর ঘরের, অন্ততঃ স্বচ্ছল উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা যায়। সুমিতাকে অতিকষ্টে দারিদ্র্য গোপন করে তাদের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। হাসি গল্পে আলাপে উচ্ছলতা এনে নিজেদের কৃচ্ছ্রতাকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে। অবশ্য মেলা-মেশার অভাবে সুমিতাকে সেখানে নিঃসঙ্গ বোধ করতে হয়নি। বরং বন্ধুত্বকামীদের দাক্ষিণ্যেই তিনি বেশি বিব্রত হয়েছেন। রঙ তো সবার জীবনের ব্রত নয়, এমনকি ভবিষ্যৎ জীবিকার লক্ষ্যও নয়। অনেকের কাছেই তা উপলক্ষ্য, বিলাসের উপকরণ মাত্র। স্বামীর এত কষ্ট সত্ত্বেও কোন কোনবার সুমিতার কলেজের মাইনে বাকি পড়েছে, রঙ কিনবার টাকা জোটেনি; কলেজে যাবার বাস ভাড়ার পয়সায় পর্যন্ত টানাটানি পড়েছে। কিন্তু তা ভেবে সুমিতার কোনদিন দুঃখ হয়নি। আর এক-জন যে তাঁর জন্যে প্রাণপণ করছেন তাতেই সুখ। বাইরের আর পাঁচজনের কাছে সে প্রাণের দাম যত কমই হোক, সে পণ যত তুচ্ছ আর মর্যাদাহীনই হোক, কিছু এসে যায় না।

কলেজের পরীক্ষায় পাশ করে বেরোলে সুমিতা কিন্তু জীবিকার বৃহৎ পরীক্ষা ক্ষেত্রে সেই কলেজী সার্টিফিকেটের বিশেষ দাম রইল না। ঠেলাঠেলি বাড়াবাড়ি প্রতি-যোগিতার ভিড়। সেই ভিড়ে ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগলেন সুমিতা চৌধুরী। নিজে সখ করে যেসব ছবি এঁকেছিলেন, তার একখানিও বিক্রি হল না। ক্রমে চারুকলা ছেড়ে কারুকলায় হাত মকস করতে লাগলেন। শিক্ষানবিশী করলেন নতুন গুরুর কাছে।

তাতে একূল ওকূল দু কূলই গেল। কিন্তু কূল গেলেও হাত পা ছেড়ে দিলে চলে না, সাঁতরাতে হয়। তখন দুটি ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে। তাদের খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলবার দায়িত্ব নিতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার স্বামী কী করছেন আজকাল।'

সুমিতা একটু হাসলেন, 'উনি আজ যা করেন, কাল তা করেন না। এক সময় ছোটখাটো ব্যবসার দিকেও ঝুঁকেছিলেন, প্রেস করেছিলেন একটা। কিন্তু দাঁড়াল না। তবে এইটুকু জানি বসে থাকেন না, নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করেন না। দু দুবার পালিয়েছেন, তৃতীয়বার পালাবার ওঁর কোন মতলব নেই। পারুন আর না পারুন সমানে যুঝে চলেছেন। সেদিন আমার দিদি আমাকে দেখতে এসে [illegible] করে গেল। দিদি বলতে চায় শুরুতে নিজের বুদ্ধির দোষে আমি জীবনভর দুর্ভোগ ডেকে এনেছি। আমি কিন্তু নিজে যা করেছি তার জন্যে কোনদিন অনুতাপ করিনে। আমি দিদিকে বলি, দিদি সবাইর কি সব জিনিস হয়? আমার বাড়ি হয়নি, গাড়ি হয়নি, গা ভরা গয়না হয়নি কিন্তু এমন এক-জন তো আছে যে আমার সব দুঃখ বোঝে। জানেন ছ'মাস আমি হাসপাতালে পেয়িং বেডে ছিলাম। দিনে পাঁচ ছ টাকা করে লাগত। যখন শরীরটা একটু ভালো থাকত আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক সময় ডাক্তার আর নার্সকে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করতাম। আর উনি লুকোতেন আমাকে। নিজের প্রেস তো গেছে; সারারাত জেগে পরের প্রেসের প্রুফ দেখতেন, ফুরনে টাইপের কাজ নিয়ে টাইপ রাইটার ভাড়া নিয়ে সারাদিনরাত টাইপ করতেন।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি ওসব জানেন?'

সুমিতা বললেন, 'কাজ চালাবার মত জানেন সবই।'

আমি চুপ করে রইলাম। এমন আরো কাউকে কাউকে আমি দেখেছি। তাঁরা কাজ চালাবার মত অনেক কাজই জানেন, কিন্তু তার কোনটাই সংসার চালাবার মত নয়।

সুমিতা চৌধুরী বললেন, 'এই অসুখের শুরুতে প্রথম কিছুদিন তো বাড়িতেই ছিলাম। যন্ত্রণায় দিনরাত ছটফট করতাম। প্রথম মনে হত পিঠে, তারপর মনে হত সমস্ত শরীরে। ছেলেমেয়ে দুটি পাছে ভয় পায় তাই ওদের আমার এক বন্ধুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আর একটি মহাভীরু যে কাছেই বসে রয়েছে তাকে কোথায় পাঠাব। সেদিন ঘুমের ওষুধেও কিচ্ছু হল না। বেশি রাত্রে অসহ্য যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হল, সেই রাত্রেই আমি মরে যাব। উনি জেগেই ছিলেন। আমার যন্ত্রণা বেড়েছে দেখে ডাক্তার যা যা বলেছিলেন তাই করলেন। তাতেও যন্ত্রণা কমল না দেখে আমারই মত ছটফট করতে লাগলেন। বাড়িওয়ালার ঘরে ফোন ছিল। তাঁদের ডেকে জাগিয়ে খবর দিয়ে এলেন ডাক্তারকে। কাছে বসে কপালে হাত বুলোতে লাগলেন। চেয়ে দেখি ওঁর দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। সেদিন আমার মনে হল স্ত্রীকে যে লোকে অর্ধাঙ্গিনী বলে তা মিথ্যে নয়। একই শরীরের আমি আধখানা, উনি আধখানা। তাইতো আমার যন্ত্রণায় ওঁর যন্ত্রণা। সেদিন আমার আরো একটা ছবি মনে পড়ে গিয়েছিল। সেই যে বর্মার পথে একটি মেয়ের মৃত্যুর কথা বলতে বলতে ওঁর চোখে জল এসেছিল, সেই জলের ছবি। সেদিনের সেই হিংসে তো আমার আর নেই। সেই মেয়ে আর আমি এখন অভিন্ন। মনে মনে ভাবলাম, মৃত্যুর আগেই মৃত্যু শোক দেখে গেলাম। আমি এবার সুখে যেতে পারব।'

সুমিতা চৌধুরী থামলেন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি। কী জানি সুখেই হয়তো চোখের জল বেরিয়ে থাকবে। অস্বীকার করব না। আমি একটুকাল অভিভূত হয়েই বসে রইলাম। দাম্পত্য জীবনের আরো কত চেহারাই তো দেখেছি, তা নিয়ে গল্পও লিখেছি। যৌথ জীবনের কত ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কত ব্যর্থতা, হতাশ্বাস, জোড়াতালি, আশা ভঙ্গ, প্রকাশ্যে গোপনে যুক্তিভঙ্গের কত পুনঃ পৌনিকতা তার মধ্যে এও একটি অতি প্রচলিত, অতি পুরাতন, অতি সাধারণ একটি প্যাটার্ন। তবু কেন তা চোখকে মুগ্ধ করে, মনকে স্পর্শ করে। মনে হল স্বকীয়াই হোক, পরকীয়াই হোক প্রণয়ের প্রক্রিয়া একই। যেখানে তীব্র আর নিবিড় সেখানেই তা অভিনব নিত্যনব। কেউ অনেকের মধ্যে একই আসঙ্গতৃষ্ণার তৃপ্তিকে খোঁজে, কেউ বা একের মধ্যেই বহু বিচিত্রের স্বাদ আর সন্ধান পায়। মনে হওয়া স্বাভাবিক যারা দ্বিতীয় সারিতে তারাই প্রথম শ্রেণীর জীবন রসিক।

অবশ্য সুমিতা চৌধুরীর জবানীতে জীবনের এই সরলীকরণ হয়তো পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। এই মিলনান্তক দ্বিপদীর পয়ার ছন্দ কি কখনও ভঙ্গ হয়নি? মাত্রা হারায়নি? ঝগড়াঝাঁটিতে বাদে প্রতিবাদে, তাপে অনুতাপে এই মিলিত জীবনযাত্রা একবারও কি পথ থেকে স্খলিত হয়ে পড়েনি? নিশ্চয়ই পড়েছে। কিন্তু ছোটখাটো ভাঙচুর সত্ত্বেও প্যাটার্নটা ঠিক আছে, নকশাটা নষ্ট হয়নি।

নিত্যবাবুর কথাটাও আমার বারবার করে মনে হচ্ছিল। সংসারে কে না চায় নিজের প্রেমকে মহৎ সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে? সেই সৃষ্টি কারো বা কাব্য সংগীত চিত্রকলা কারো বা বিত্ত সম্পত্তি প্রতিপত্তি। কিন্তু এখনো তাদের দলই বহু গুণে সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা তেমন কিছুই করে উঠতে পারে না, শুধু সেই না পারার দুঃখকে নিজের মধ্যে অনুভব করে। সেই ক্রিয়া কি সব সময়েই অকর্মক ক্রিয়া?

মিসেস চৌধুরীর কাছে বিদায় নিয়ে উঠতে যাচ্ছি, ভেজানো দরজা ঠেলে এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। নতুন কোন অতিথি নন, স্বয়ং গৃহকর্তাই এবার এসে পড়েছেন। এক হাতে একটা ঠোঙা। ভিতরে বোধহয় ফলটল কিছু হবে। আর এক হাতে একটা গোলাপী রঙের ফ্লাট ফাইল। এই ফাইলে ওঁর স্ত্রীর আঁকা ডিজাইন টিজাইন থাকে। আগেও দেখেছি।

নিত্যবাবু আমাকে দেখে অমায়িকভাবে হাসলেন, বললেন, 'এই যে! কতক্ষণ এসেছেন?'

বললাম, 'অনেকক্ষণ। এবার বিদায় নিচ্ছিলাম।'

তিনি বললেন, 'আরে না না। তাই কি হয়? বসুন বসুন। চা-টা দিয়েছে?'

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ সেসব হয়ে গেছে।'

তিনি বললেন, 'তবে আবার হোক। সেই সঙ্গে আমরাও একটু ঠোঁট ভিজিয়ে নিই। গঙ্গা, দু'কাপ চা কর তো? তুমি খাবে নাকি একটু?'

নিত্যবাবু স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'তাহলে তিন কাপ।'

ফলের ঠোঙা আর হাতের ফাইলটা তাকের ওপর রাখতে রাখতে নিত্যবাবু ফের তাঁর স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালেন, 'জানো, আজ একটা সুখবর আছে।'

সুমিতা বললেন, 'কী সুখবর?'

নিত্যবাবু এবার স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এসে হাসি মুখে বললেন, 'তোমার দুখানা পোর্ট্রেট মহাজাতি সদন পছন্দ করেছেন।'

সুমিতা খুসি হয়ে বললেন, 'সত্যি?'

উৎসাহে আনন্দে লৌহবন্ধন খুলে তিনি যদি উঠতে পারতেন তাহলে তক্ষুনি উঠে বসতেন।

একটু বাদে বললেন, 'যাক, তোমার হাঁটা-হাঁটি ঘোরাঘুরির ফল এতদিনে ফলল।'

নিত্যবাবু বললেন, 'শুধু হাঁটাহাঁটি আর ঘোরাঘুরিতেই বুঝি ছবি আঁকা হয়ে যায়?'

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছি দেখে নিত্যবাবু ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'মহাজাতি সদনে বিপ্লবী নেতাদের ছবি টাঙানোর ব্যবস্থা হচ্ছে জানেন তো? তার দুখানা অর্ডার আমরা জোগাড় করে-ছিলাম। কাজটা অবশ্য সুমিতা অসুখে পড়বার আগেই করে রেখেছিল। ও ছবি তো আর চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে আঁকা যেত না?'

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, 'মিসেস চৌধুরী পোর্ট্রেটও আঁকেন নাকি? জানতাম না তো!'

স্বামীস্ত্রী হাসিমুখে আমার দিকে তাকালেন। ভাবখানা এই, 'আপনি আমাদের কতটুকুই বা জানেন কতটুকুই বা খোঁজখবর রাখেন?'

সুমিতা স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, 'উনি বোধহয় আমার আগের কোন কাজই দেখেননি!'

অনুযোগটা গৃহস্বামীকে না আমাকে নাকি দুজনকেই ঠিক বোঝা গেল না।

নিত্যবাবুর অনুরোধে চা আরো এক কাপ খেতে হল। তারপর মিসেস চৌধুরীর কাছ থেকে এবার সত্যি বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

নিত্যবাবু এলেন পিছনে পিছনে। আমি তাঁকে অগ্রবর্তী হতে দিলাম। খানিক দূর এগিয়ে নিত্যবাবু বললেন, 'আসুন, এঘরে আসুন।'

বাইরের এই ঘরখানাতেই আমি প্রথম এসে বসেছিলাম। ঠিক পাশাপাশি ঘর নয়। মাঝখানে খানিকটা ফাঁক আছে, প্যাসেজ আছে।

আমি বললাম, 'কী ব্যাপার। রাত হয়ে গেল যে।'

তিনি বললেন, 'আরে না না। আটটা আবার রাত নাকি?'

ভিতরে রোগা রোগা দুটি ছেলেমেয়ে চেয়ারে বসে পড়েছিল, নিত্যবাবু তার দিকে চেয়ে বললেন, 'বই নিয়ে তোমরা একটু ওঘরে যাও তো। যাও, মার কাছে গিয়ে বোসো।'

ছেলেমেয়ে দুটি আমার দিকে একটু কৌতূহলী হয়ে তাকাল। বাপের গায়ের রঙ, কিন্তু মুখের গড়ন মায়ের মত। চোখও মায়ের মতই কালো আর বড় বড়।

ওরা চলে গেলে নিত্যবাবু বললেন, 'বসুন! সুমিতার আঁকা দু'একখানা পোর্ট্রেট দেখবেন নাকি?'

বললাম, 'বেশ তো।'

এ ঘরেও অল্প স্বল্প আসবাব। এক-খানা তক্তপোষ। একজোড়া টৌবল্প চেয়ার। দেয়ালে একখানা ইজেল ঠেস দিয়ে রাখা রয়েছে। ওপরে কাঁচের আবরণে ঝড়ের সমুদ্র।

নিত্যবাবু কোত্থেকে পুরোন বড় একটা ফাইবারের স্যুটকেশ টেনে বার করলেন। দেখলাম স্যুটকেশ বোঝাই ছবি। কোন কোনটায় নম্বর লাগানো আছে।

নিত্যবাবু বললেন, 'একবার একজিবিশন করেছিলাম। সেই রকম সুযোগ সুবিধে তো দেওয়া গেল না—। দেখি যদি দিন ফের আসে তাহলে ওকে আর অন্য কাজ করতে দেব না। নিজের পছন্দমত কাজই ও করবে। তার চেয়ে বড় সুখ কি আর আছে?'

মনে মনে ভাবলাম যিনি নিজের পছন্দমত কাজ জীবনে খুঁজে পেলেন না একথা তার চেয়ে আর বেশি কেই বা জানে?

আমার তাড়া আছে বলে শুধু পোর্ট্রেট-গুলিই দেখালেন নিত্যবাবু। প্রথমেই দেখলাম সুমিতার বাবার ছবি। ঠিক যেমন বর্ণনা শুনেছিলাম অনেকটা সেই রকমই। দীর্ঘকায় সুপুরুষ। মুখে বেশ একটা দৃঢ়তার ছাপ আছে। সেই ব্যক্তিত্ব বিষাদ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তারপরের ছবিগুলি একটু এলোমেলোভাবে রাখা। বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ। প্রতিকৃতিগুলির গুণগত বিচার না করে আমি শুধু দেখে যাচ্ছিলাম। তারপরে আরো কয়েকটি প্রতিকৃতি দেখলাম। সেগুলিও দীর্ঘাঙ্গ, রূপবান, শৌর্যবান পুরুষের।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ'রা সব কে? এ'দের তো চিনতে পারছিনে।'

নিত্যবাবু আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, 'ও'দের আমিও ঠিক চিনিনে। ও'রা সুমিতার মন গড়া। নিজের মন থেকেই এ'কেছে।'

বললাম, 'আর আপনি যত্ন করে সব রেখে দিয়েছেন।'

নিত্যবাবু আমার দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন, তারপর ফের একটু হেসে বললেন, 'বাঃ রাখব না কেন। ও'রা তো আর আমার রাইভ্যাল নন, ও'রা [illegible]

ও'র চরিত্রে এটা যে একটা বড় খুঁত তা গাঙ্গুলি বাড়ির ছোট বউ উমার কোনদিনই মনে হয়নি। আড়ালে বড় এবং মেজ জা ওর এই আদেখলেপনা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছে, ননদরা মুখ ফুটে এবং ঠোঁট বেঁকিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি বলেও ফেলেছে কখনো কখনো। বিরাম নিজেও অনেকদিন সহ্য করেছে, তারপর যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, বিরক্ত হয়ে বলেছে, যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো, তা নইলে দুঃখ পাবে।

আঠারো বছরের নতুন বউ উমা বিরামের কথায় খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছে, মশাই, নিজে কেন তা হলে চাকরীতে প্রোমোশন হল না বলে মুখ গোমড়া করেছিলে শুনি?

বিরাম আরো বিরক্ত হয়েছে ওর কথায়। বলেছে, তোমার খরচটাও যে টানতে হয়, তাই। এই মাইনেতে যদি চলতো তা হলে চাইতাম না।

এ-কথায় উমার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে, চোখের চাউনি তীব্র। ছিপছিপে শরীরটায় ভুরে শাড়ির আঁচলটাকে আরো টেনে জড়িয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ও, বলেছে, বিয়ে না করলেই পারতে। এত ভার না সইতে পারো তালাক দিয়ে দাও, চলে যাই।

তা শুনে হেসে ফেলেছে বিরাম, কিন্তু জবাব দিতে পারেনি। কারণ, সত্যিই তো উমার কোন হাত ছিল না এ বিয়েতে. বিরাম নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছে। বাপ-মা গিয়ে কনে দেখে এসেছিল প্রথম, তারপর বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিয়ে বিরামও গিয়েছিল দেখতে।

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বাপ ইউ ডি ক্লার্ক ছিল, বছর দুয়েক হল বড়বাবু হয়েছে। বাড়ির অবস্থা যে ভাল নয়, তা মেয়ে দেখতে গিয়ে ঘরখানাকে এক নজরে দেখেই বুঝতে পেরেছিল বিরাম। সচ্ছলতা এবং রুচির অভাবটা বেশী করে চোখে পড়েছিল। যে ঘরখানায় গালিচা পেতে ওদের বসতে দেয়া হয়েছিল সে ঘরের সঙ্গে গালিচাটা ছিল একেবারে বে-মানান। এমন কি চায়ের পেয়ালাগুলো, মনে হয়েছিল, প্রতিবেশী কোন বাড়ি থেকে চেয়ে আনা। প্রথমটায় তাই মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল বিরামের। মুক্তারামবাবু স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে গলিটা, এমনিতেই আলো হাওয়া ঢোকে না ঘরে। যা-ও বা ঢুকতো, জানালার ধারে একটার ওপর আরেকটা ট্রাঙ্ক সাজিয়ে এবং তার ওপর লেপতোষক বালিশের রাশি রেখে আলো এবং হাওয়া দুটোরই পথ আটকে দিয়েছে। ছোট্ট ঘর। তার এক পাশে একখানা লম্বা-

যাওয়া আলমারী। আলমারীর গা-চাবি খারাপ হয়ে যাওয়ায় দুটো কড়া লাগিয়ে তাতে বড় একটা কুলুপ লাগানো। আর খাটের তলায় দুটো বড় বড় ঘড়া, একরাশ [illegible]। দেয়ালে তিনদিকে পাঁচটা নানা সাইজের ক্যালেন্ডার, একটা ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটের কাজ। আরেকটা কালো ভেলভেটে রঙিন সুতোয় 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' লেখা শ্লোক, তাও ফ্রেমে বাঁধানো। কপাটের মাথায় একখানা রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছবি
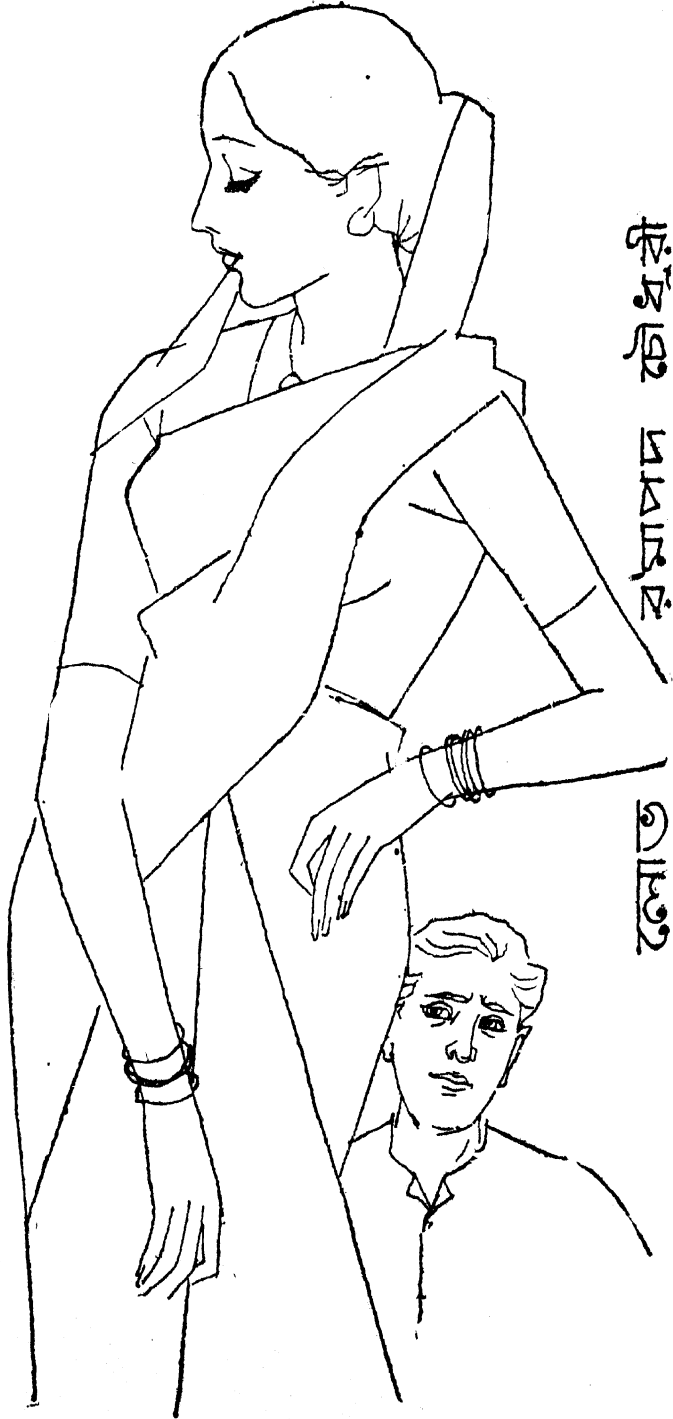
পাশেই এক বুড়ো ভদ্রলোকের ফটো। কাচের ওপর থেকেই তার কপালে চন্দনের ফোঁটা আঁকা হয়েছে।

লাজুক লাজুক চোখে মাথা নীচু করে উমা যখন এসে বসেছিল গালিচায়, তখন কিন্তু আরো বেখাপ্পা বেমানান মনে হওয়া উচিত ছিল বিরামের। হয়নি। ও বরং স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। না, রূপে উর্বশী মনে হয়নি উমাকে। কিন্তু ওর লাজুক নম্র চোখে, কিশোরী কোমল চেহারায়, আর ঈষৎ কালো ঠাণ্ডা মুখশ্রীতে কি জাদু ছিল কে জানে, বিরামের মনে হয়েছিল ঠিক এমনটিই যেন ও চেয়েছিল।

কি আশ্চর্য, সেই মেয়েটার ভেতর যে এত সব লুকিয়ে ছিল কে জানতো। কিংবা সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় মেয়েটা বদলে গিয়েছিল।

বিয়ের পর বিরামদের বাড়িতে দুটো সপ্তাহও কাটেনি, জানালার পাশটিতে বিরাম আর উমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সামনের বাড়ির কার্নিসে দুটো কাক ভিজছে বৃষ্টিতে, হঠাৎ উমা বলে উঠলো, ওদের বাড়িটা কি সুন্দর, না? আমার ভারী ইচ্ছে করে অমনি একটা বাড়িতে থাকবো।

তখন বিরামের চোখে নতুন বিয়ের ঘোর লেগে আছে, তাই ও শুধু হেসেছিল। বলেছিল, মাইনেটা বাড়লে আমরাও নয় অমনি একটা বাড়িতে উঠে যাবো।

—বা রে, তা কি করে যাবে? বুঝতে না পেরে বড় বড় ঠাণ্ডা দুটো চোখ মেলে উমা তাকিয়েছিল বিরামের মুখের দিকে।

বিরাম হেসে বলেছিল, বেশী ভাড়া দিলেই পাওয়া যাবে অমন বাড়ি।

একটু বাড়িয়েই বলেছিল বিরাম, না বলে উপায় ছিল না বলে। যদিও ও মনে মনে জানতো ওর চাকরিতে যত উন্নতিই হোক, ও-বাড়ির মত বড় আর সুন্দর বাসা ও কোনদিনই করতে পারবে না। তবু এই একটা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে উমাকে ভোলাতে চেয়েছিল।

অথচ উমা কিনা নাক সিঁটকে বলে বসলো, ভাড়া বাড়ি! ভাড়া বাড়িতে আমার একটুও থাকতে ইচ্ছে করে না। আমার বড় জামাইবাবু কি সুন্দর বাড়ি করেছে শ্যামবাজারে!

কথাটা বুকে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল। মুহূর্তের জন্যে হলেও কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল বিরাম। আর এই আঘাতটা ভুলতে পারেনি বলেই মনের মধ্যে পুষে রেখেছিল। সুযোগ খুঁজেছিল নতুন কোন স্বপন দেখিয়ে উমার মন থেকে তার দুর্বলতাটুকু মুছে ফেলার।

কথায় কথায় একদিন বলেওছিল। খাটের ওপর মুখোমুখি দুজনে আধশোয়া হয়ে একটা ছবির কাগজ দেখছিল সেদিন। তার একটা পাতায় সুন্দর একখানা ছোট্ট বাংলো টাইপের বাড়ির ছবি। ছোট্ট বাড়ি, দুখানা হয়তো ঘর, সামনে একটুকরো বাগান। ছবিটা দেখিয়ে বিরাম বলেছিল, এবার ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষাটা দিয়ে দেব। মাইনে বাড়লে মাঝে মাঝে কিছু করে জমাবো, তারপর এমনি একটা ছোট্ট বাড়ি করবো আমাদের ...একতলা বাড়ি, দুখানা ঘর, ছোট্ট একটা বারান্দা, বারান্দায় মাধবীলতার ঝাড় লাগিয়ে দেবো একটা...

আরো অনেক কিছুই হয়তো অনর্গল বলে যেত বিরাম, তার আগেই উমা বলে উঠলো, এ মা এমনি ছোট্ট বাড়ি? ছোট বাড়ি আমার একদম পছন্দ নয়, একদম না। কেন, বড় রাস্তার মোড়ের ওই নতুন বাড়িটার মত করতে পারবে না? খুব বড় বাড়ি হবে, অনেক লোক থাকবে, একরাশ ঠাকুর চাকর ঝি...রেডিও বাজবে...

উমার আকাঙ্ক্ষার যেটুকু তখন মেটাবার মত সামর্থ্য, শুধু সেইটুকু দিয়েই তাকে খুশী করতে চেয়েছিল বিরাম। একদিন তাই সত্যি সত্যি আপিস থেকে কয়েকশো টাকা লোন নিয়ে রেডিও সেট একটা কিনে আনলে। ভেবেছিল উমাকে চমকে দেবে, উমা খুব খুশী হবে।

প্রথমটা খুশী হয়েছিল উমা। এরিয়েল টাঙিয়ে রেডিওটা যখন চালু করলে বিরাম, তখন কি ফুর্তি তার। রেডিওর 'নব' নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরায়, তখনই গান, তখনই গুরুগম্ভীর বক্তৃতা, কখনো তীব্র চিৎকার, কখনো অস্পষ্ট গানের কলি। যেন কত বড় কৌতুক, হাসিতে খিলখিল করে ওঠে।

বিরামের মেজো বোন শর্মিলা এসে দেখলো, ঠোঁট টিপে হাসলো, তারপর টিপ্পনি কাটলে।—বাবা, এতদিন তো দাদার রেডিও কেনার পয়সাই ছিল না!

বিরামের মা এসে এক সময় উমাকে বললেন, বউমা, বিরুকে বলো শখ মেটানোর বয়স এখনও অনেক আছে, এখন থেকে এত পয়সা নষ্ট করলে পরে দুঃখ পেতে হবে।

শুধু বিরামের বাবা বললেন, তা ভালই করেছে বিরু, বউমা বেচারী সারাটা দিন একা একা থাকে...

ননদ দুজন অবশ্য সে কথা শুনে উমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, একা একা? কেন, দুপুরে আমরা কি আপিসে যাই নাকি? না, বাবা মা থাকে না?

উমা এসব শুনে মনে মনে চটলো বটে, কিন্তু বিরামের ওপর খুশী হয়ে উঠলো। তার জন্যেই তো রেডিওটা কিনে এনেছে বিরাম, এতদিন তো আনেনি। তাই ভেতরে ভেতরে ও যা ভেবেছিল, সেটুকু প্রকাশ করলো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কথা চাপা রাখতে পারলো না। বিরাম তখন সদ্য আপিস থেকে ফিরেছে, চায়ের কাপটা এনে বিরামের সামনে রেখে রেডিওটা খুলে দিতে গেল ও। কিন্তু যেখানেই কাঁটা ঘোরায়, হয় বক্তৃতা, নয় খবর, নয় অন্য কিছু।

বিরক্ত হয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে ও বিরামের চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ালো, বললে, আচ্ছা এই ছোট্ট রেডিওটা আনলে কেন বলো তো? দিদির বাড়িতে একটা আছে, অনেক বড়, তাতে রেডিও হয়, আবার রেকর্ড বাজানোও চলে, তেমনি একটা...

বিরাম একবার শুধু ফিরে তাকালো উমার মুখের দিকে, কোন কথা বললো না। বেশ বোঝা গেল ও চটেছে, কিন্তু কেন যে চটেছে বিরাম, তা উমা বুঝতে পারলো না। এমন কি অন্যায় কথা বলেছে ও? সারাদিনের কাজের পর রোদে পুড়ে এসেছে বিরাম, রেডিওয় গান না থাক, এখন একটা রেকর্ড তো বাজাতে পারতো ও। ক্লান্ত মানুষটার চোখে চোখ রেখে হাসি হাসি মুখে বাজনার তালে তালে পেয়ালার গায়ে চামচটা ঠনঠন করে বাজাতে তো পারতো। সেই কোন্ ছবিতে যেন দেখেছিল। কিন্তু বিরাম ওর অতশত স্বপ্নের খবর রাখবে কি করে। লোনের টাকাটা তখনও থেকে থেকেই ছারপোকার মত কামড়াচ্ছে। তাই একটু ঘা খেলো বিরাম, মনে মনে, তবু চুপ করে রইলো।

কিন্তু বিরাম কিছু না বললে কি হবে, শর্মিলা আর ঊর্মিলা দু বোন শোনাতে ছাড়বে কেন। উমাকে সঙ্গে নিয়ে পুজোর শাড়ি কিনতে গেছে বিরাম, সঙ্গে গেছে দু বোন। আর এত শাড়ি থাকতে কিনা এমন একখানা পছন্দ হয়েছে উমার, যেটার দিকে বিরামের ফিরে তাকাতেও সাহস হয়নি।

তাও চটতো না বিরাম, কিন্তু উমা ফস করে বলে বসলো, জানো, দিদি ঠিক এমনি একটা ঢাকাই শাড়ি কিনেছিল ওর ভাসুরপোর বিয়েতে যাবার জন্যে। এটা পেঁয়াজি রঙের, আর সেটা ছিল ফিকে সবুজ, কিন্তু সেটার ওপরও এমনি সাদা সাদা ফুল ছিল...

শর্মিলা সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, তোমার বাবার মত বড়লোক তো নয় আমার দাদা!

কথাটা চাবুকের মত লেগেছে উমার, সারা মুখ অপ্রতিভ হয়ে গেছে ওর। ওর বাবা যে গরীব তা তো সবাই জানে, বাবার কথা তো বলেনি উমা। বলেছে দিদির কথা। জামাইবাবু বড় চাকরি করে, একটা ঢাকাই শাড়ি দিতে পারবে না কেন দিদিকে?

উমা অবশ্য পরমুহূর্তে ওর অন্যায় বুঝতে পেরেছে, সত্যিই তো, জামাইবাবু বড়লোক হতে পারে, তা বলে বিরাম কোত্থেকে অত টাকা পাবে। না, এরপর আর কোনদিন ও না ভেবেচিন্তে কথা বলবে না।

দিন কয়েক ও সত্যিই খুব সাবধানে সাবধানে থেকেছে। যা মনে এসেছে চেপে

রেখেছে। কি জানি, কোন কথার কি মানে করে বসে ওরা।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি।

সামনের বাড়ির বউটি বেড়াতে এসেছে একদিন। বউটিকে এত সুন্দর কোনদিন তো মনে হয়নি ওর। ঠিক যেন একটা গোলাপী পদ্ম। আর কি অপূর্ব লেগেছে তাকে বেনারসী শাড়িটায়। কিন্তু তার চোখ নাক চিবুকের সৌন্দর্য, তার শাড়ির ঘটা, এসব ছাড়িয়ে উমার চোখ কখন গিয়ে পড়েছে গলার জড়োয়া নেকলেসে। এমনিতেই গোলগাল স্বাস্থ্য বউটার, চওড়া মুক্তোর নেকলেসটা কণ্ঠ থেকে প্রায় ছ আঙুল বুক ঢেকে আছে। কি অপরূপ যে লেগেছে তাকে!

গল্প করতে করতে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বসেছে উমা, তারপর তার গলার নেকলেসে হাত দিয়ে দেখেছে। কিছুতে হাত সরাতে ইচ্ছে হয়নি যেন। ইচ্ছে হয়েছে একবার খুলে নিয়ে নিজে পরে। বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে কেমন মানায়।

কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তাই মুখে বলেছে, কি সুন্দর প্যাটার্ন ভাই। বলে ঊর্মিলার দিকে তাকিয়েছে। তারপর শর্মিলা আর ঊর্মিলার ক্রুদ্ধ চোখের ভর্ৎসনায় হঠাৎ চুপসে গিয়েছে উমা।

তবু সেই মুহূর্তেই ওর মুখ দিয়ে কেন কে জানে বেরিয়ে পড়েছে, দিদির ঠিক এমনি একটা আছে, শুধু লাল পাথরের জায়গায় সবুজ।

তা শুনে শর্মিলা আরো চটে গেছে। দিদি, দিদি, দিদি। কেন বলতে পারতো না, ঊর্মিলার অমনি আছে।

কিন্তু শেষ অবধি ওর এই স্বভাবের জন্যে যে এমন একটা কান্ড ঘটে যাবে উমাও ভাবতে পারেনি। অথচ ব্যাপারটা একেবারেই তুচ্ছ। এতই তুচ্ছ যে কাউকে বলাও যায় না।

পিসতুতো বোনের বিয়ে। আর তাই বিরামই ওকে প্রশ্ন করেছিল, কি দেয়া যায় বলো তো?

উমা শুনেছিল, বিরাম নাকি ছোটবেলায় পিসীমার কাছেই থেকে পড়াশুনো করেছিল। পিসীমা নাকি বিরামকে খুব ভালবাসেন। তাছাড়া বিরামের ওই পিসতুতো বোনটিকে উমারও খুব ভাল লেগেছিল।

তাই বিরাম জিগ্যেস করতেই ও বলেছিল, কানের দুল দাও না এক জোড়া, সেই খুব ভালো।

বিরামও রাজি হয়েছিল। সত্যিই তো, সোনার কিছু একটা দেয়াই উচিত ওর। শর্মিলা ঊর্মিলা, বিরামের মা, সকলেই একমত।

শেষ পর্যন্ত উমাকে সঙ্গে নিয়েই গয়নার দোকানে [illegible]

বড়োসড়ো দোকানে। আর দামের অঙ্কটা জানিয়ে বিরাম যখন একজোড়া কমদামী দুল প্রায় পছন্দ করে ফেলেছে, তখন হঠাৎ বেঁকে বসলো উমা। উজ্জ্বল আলোয় শো-কেসের কাঁচের নীচে সারি সারি আংটি, দুল, নেকলেস সাজানো। আর সেদিকেই এতক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল উমা।

বিরাম তার পছন্দমত দুলজোড়া দেখিয়ে জিগ্যেস করলে, এটাই নিই, কি বলো?

সঙ্গে সঙ্গে উমা দোকানদারের সামনেই বলে উঠলো, দূর। ও কি দেয়া যায় নাকি কাউকে, ও ঘরে পরবার জন্যে। বলেই শো-কেসের একজোড়া পাথর বসানো দুল দেখিয়ে বললে, দিদি না, ওর বন্ধুর বোনের বিয়েতে ঠিক এমনি একজোড়া দুল দিয়েছিল, কি সুন্দর দেখো?

বিরাম একবার সেই দুলজোড়ার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বোধ হয় দামটা আঁচ করে নিলো, আর পরমুহূর্তেই রাগে ফেটে পড়লো। ক্রুদ্ধ চোখের দৃষ্টিটা একবার উমার মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে কম দামী দুল জোড়াই কিনলে, তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বললে, তোমার দিদি কাকে কি দিয়েছে সেটুকুই তোমার মনে থাকে, কই তোমার বাবা তোমাকে কি দিয়েছেন, সে-কথাটা তো মনে থাকে না।

কথাটা শুনেই ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠলো উমা। জ্বলে উঠলো, তার কারণ কথাটা মিথ্যে নয়। উমার বাবা যে গরীব তা কি উমাই জানে না। ওর বাবা যে ওকে বিশেষ কিছু দিতে পারেননি সে তো উমারও লজ্জা। কিন্তু সে কথাটা কি এত স্পষ্ট করে রূঢ় ভাষায় না বললে চলতো না?

সারা পথ একটাও কথা বললো না উমা। শেষ অবধি হয়তো ওর রাগ পড়ে যেত, কিন্তু বাড়ি ফিরে কেনা দুলজোড়া শর্মিলা আর ঊর্মিলাকে দেখাতে দেখাতে বিরাম টিপ্পনি কাটলে, তোদের বৌদির আবার হীরের দুল না হলে পছন্দ হয় না, এত কম দামী দুল দিতে ওর লজ্জায় নাক কাটা যাচ্ছে।

শর্মিলাও ছাড়তে রাজি নয়। বললে, বড়লোকের মেয়ে কিনা! সেদিন সামনের বাড়ির বউটা ঘটা করে শাড়ি গয়না দেখাতে এসেছিল, কোথায় ও-সব কিছু লক্ষ্য করিনি এমন ভাব করে বসে আছি আমরা, বউদি এমন করতে শুরু করলো যেন জীবনে

মুক্তোর হার কোথাও দেখেনি। অথচ বললে কিনা, ওর দিদির ওই রকম একটা জড়োয়া নেকলেস আছে!

. ব্যস, এইটুকুই। কিন্তু এই ছোট্ট একটু স্ফুলিঙ্গ থেকে কিভাবে যে বিস্ফোরণ ঘটে গেল বোঝা দায়! দু পক্ষেরই রাগ একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে হঠাৎ একটা তীব্র চিৎকার করে বিদ্রোহ জানালো উমা, এবং চিঠি লিখে বাবাকে আনিয়ে পরের দিনই চলে এলো মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের সেই গলির বাড়িতে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি তা বাবা-মাকে বলতে পারলো না! এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপার কি করে বলবে ও। তাছাড়া বাপের বাড়িতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওর রাগ পড়ে গিয়েছিল! কেমন যেন লজ্জাও করছিল ওর। বাবা-মা কি ভাবছেন কে জানে! গোপন ব্যথাটা প্রকাশ করে কাউকে বলতে না পেয়ে আরো বিমর্ষ হয়ে পড়লো ও। সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে জানালার ধারে, আর কেবলই মনে হয়, বিরাম আসবে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

না, বেশ কয়েকদিন কেটে গেল, তবু বিরাম এলো না। পরিবর্তে একদিন ওর দিদিই এসে হাজির হলো। ভাবলে, কিছু একটা মান-অভিমানের পালা চলছে নিশ্চয়। তাই বললে, চুপচাপ একা একা এখানে রয়েছিস, তার চেয়ে চল না আমার কাছে দিনকয়েক থাকবি।

একটু থেমে বললে, যাবি তো বল, একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলি।

—ট্যাক্সি? হঠাৎ হেসে উঠলো উমা, তারপর বললে, একটা গাড়ি কিনতে বল না জামাইবাবুকে। আমার বড় ননদাই সেদিন এসেছিল, একটা নতুন গাড়ি কিনেছে। কি চমৎকার না গাড়িটা! অনেক দাম, আজকাল নাকি পাওয়াই যায় না! আসছে বছর আমরাও...

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কি যেন বলার ইচ্ছে ছিল উমার। কিন্তু দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল। কারণ ওর দিদি তখনো স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে উমার চোখের দিকে, একটু আগে কথা বলতে বলতে যে চোখজোড়া লোভে চকচক করে উঠেছিল, তার দিকে!

ফকিরদাদা আমার সম্পর্কে জ্ঞাতি ভাই, কাজেই আমাদের গাঁয়েরই লোক। এঁর বাবা দীনবন্ধু রায় গাঁয়ের জমিদারের তৌশিলদার ছিলেন। ফকিরদা আই-এ পরীক্ষার দরজায় বারকয়েক করাঘাত করে অকৃতকার্য হয়ে শেষে তাতে পদাঘাত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তারপর মামার ডাকে ঝরিয়ায় গিয়ে কয়লার ব্যবসা শুরু করেন। শেষে গত মহাযুদ্ধের হিড়িকে সরস্বতীর ঐ পলাতক কুসন্তানটি বড় ব্যবসাদার হয়ে লক্ষ্মীর সুসন্তান হয়ে ওঠেন। গ্রামে আর যান না, গ্রামে তাঁর স্বর্গত বড় ভাইয়ের দুই ছেলে থাকে। কিন্তু গ্রামের সঙ্গে ফকিরদার সম্পর্ক এখনো আছে—কারণ, গ্রামে তাঁর পুকুর বাগান এবং জমিজায়গা আছে—সে সবের দেখাশোনার ভার দিয়েছেন পুরুতঠাকুরের ছেলে জনার্দনকে।

একদিন ঢাকুরিয়া যাবার পথে বড় রাস্তায় একটা নতুন বাড়ির গেটের এক পাশে নেম-প্লেটে দেখলাম এফ সি রায়—অন্য দিকে মার্বেল ফলকে 'দীন ধাম'। বুঝলাম, এটা ফকিরদার নতুন বাড়ি—দীনুজ্যাঠার নামাঙ্কিত স্মৃতিসৌধ। কেমন একটা দুর্বল মুহূর্তে বাড়িতে ঢুকে পড়লাম—প্রবেশের জন্য জবাবদিহি দিতে দিতে শেষে বাবুর বসবার ঘরে পর্দা ঠেলে ঢুকলাম। আপ-টু-ডেট ফ্যাশানে সাজানো ঘর। কার্ড পাঠিয়ে দিলাম উপরে। আধ ঘণ্টা পরে বাবু নেমে এলেন মুখে চুরুট, পরনে কোট-প্যান্ট, ডান হাতে ধরা শিকলিতে বাঁধা একটা কুকুর।

ফকিরদা—এই যে হৃষীকেশ। এসো এসো, পথ ভুলে গরীবের আস্তানায় যে এসে পড়েছ দেখছি। যা হোক একটা কুঁড়ে বানিয়েছি—তোমরা আপনার লোক তোমরা না দেখলে কি তৃপ্তি হয় ভাই?

আমি—ফকিরদা। তুমি যে বাড়ি করেছ এবং কোথায় করেছ—তা জানব কি করে বলো পাকপাড়া থেকে?

ফকির—তা জানবে কেন? একটা খোঁজও রাখ না, মরলাম কি বাঁচলাম। গাঁয়ের সেই লক্ষ্মীছাড়াটা কোন চুলোয় গেল তার সন্ধান তো তোমরা রাখ না। গাঁয়ের লোক—আর আত্মীয় স্বজন তো আমার শ্রীবৃদ্ধিতে খুশী নয়—তারা এড়িয়েই চলতে চায়। চলুক, ক্ষতি তাদেরই। কোথা আমার গৌরব করবে—আমি গাঁয়ের মুখোজ্জ্বল করেছি—তা না করে সব হিংসে—সব কানে আসে হে—সব শুনতে পাই। অনুগত হয়ে চললে অন্ততঃ পঞ্চাশটা ছেলেকে প্রোভাইড করতে পারতাম। যাক, কেমন আছ বলো ত—

আমি—গত মে মাসে বড় কঠিন ব্যারামে—

ফকির—তা বেশ, বেশ। কি করছ আজকাল?

আমি—আমি আজো সেই—

ফকির—আচ্ছা ঋষি বলো ত বাড়িটাতে কত খরচ পড়েছে?

আমি—তা কি করে বলব? আদার ব্যাপারী—

ফকির—আহা, তবু একটা আন্দাজ কর।

আমি—বোধ হয় ৭০।৮০ হাজার—

ফকির—দূর, জায়গার দামই পড়েছে তাই। কত খরচ পড়েছে শুনলে তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। তবু এখনও অনেক বাকি—গাড়িবারান্দা হয়নি। আউট হাউস বাড়াতে হবে—ফুলবাগান হয় নি, টেনিস লন হয়নি—অনেক বাকি। দুমাস হলো বাড়ি হয়েছে। গৃহপ্রবেশে একটা ঘটা করে পার্টি দিয়েছিলাম।

আমি—আমরা তো নিমন্ত্রণ পাই নি—জানব কি করে?

ফকির—ও সে বিলিতী প্যাটার্নে বড় বড় লোকদের জন্য—দু হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। যাদের চোখ টাটাবে তাদের কি কেউ ডাকে? দেখ—আমার নাম যে ফকির তা আমি নিজেই ভুলে গেছি—এ নাম কেউ জানে না। আমি এখন এফ সি রায় অথবা রায়সাহেব। এ বাড়িতে ও নাম উচ্চারণ কোরো না। বহুকাল পরে তোমার মুখে ও নাম শুনে চমকে উঠেছিলাম। কোথাও পুরোনাম বলতে হলে ফকির বলি না—ফটিক বলি। বাপ-মার কি অবিবেচনা দেখ—যে হবে ধনপতি—আমির, তার নাম ফকির!

আমি—এইবার বিলাত ঘুরে এসো না?

ফকির—যাওয়ার সব ঠিক করেছিলাম—খুকীর টাইফয়েড হলো। জীবনমরণ সমস্যা। পাঁচ পাঁচটা এম-বি ডাক্তারে ছুটোছুটি করে বাঁচিয়ে তুললে। বহু হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। দুটো ফিরিংগি নার্স রেখেছিলাম, আর ওয়াচ করার জন্য দিনে একটা এম-বি, রাতে একটা এম-বি। ওষুধেই লেগেছে দু হাজার টাকার। তাই ভাবি—তোমাদের মতো কারো ঘরের মেয়ে হলে বাঁচত না। এ যে টাকা দিয়ে যমের কাছ থেকে প্রাণ

কিনে নেওয়া। তাও তো—যে ডাক্তারের ফী ১২৮, টাকা, সে আমার বন্ধু, তাকে এক পয়সাও ফী দিতে হয়নি—তবে তাঁর মেয়ের বিয়েতে একটা সাড়ে নশো টাকার গয়না দিয়েছি।

আমি—যাক ভগবানের কৃপায় মেয়েটা বেঁচে গেছে—এখন তো ভালই আছে?

ফকির—ভগবানের কৃপায়? ভগবান তো বিরূপই ছিল—বলো মা লক্ষ্মীর কৃপায়। খরচ এখনো ফুরোয়নি—নাইনিতালে একটা বাড়ি ভাড়া করে রেখেছি—চেঞ্জে নিয়ে যেতে হবে। ভেবেছিলাম বিলেত গিয়ে বড় ছেলেটাকে সেখানে রেখে আসব ট্রেনিং-এর জন্য, আর ওখানে অরবিন্দকে একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দিয়ে আসব। অরবিন্দ বি এস-সিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে কিনা। তা সব পণ্ড হয়ে গেল অর্থাৎ দু'মাস দেরি হয়ে গেল। তবেই বুঝছ চোখ টাটানোর মতো আয় বটে—কিন্তু আশ্বস্ত হওয়ার মতো ব্যয়ও আমার। বড় মেয়ের বিয়েতে ৫৫ হাজার টাকা খরচ করেছি। চোখ দুটোকে ছানাবড়া করে তাকাচ্ছ যে! যাক, আমার অবসর নেই, অনেক কাজ। বিনা মতলবে তুমি এসেছ তা তো মনে হয় না—আসল কথাটা কি বলো ত। আগেই বলে রাখছি—আমার প্রিন্সিপল হচ্ছে আমি কাউকে ধার দিই না;—সাহায্য চাইলে যথাসাধ্য দিতে পারি। আর সুপারিশ চাও তো তা দিতে আপত্তি নেই। তুমি ভালো লেখাপড়া শিখেছ—তোমার জন্য সুপারিশ করা কঠিন হবে না।

আমি—কোন ব্যক্তিগত মতলব আমার নেই। তবে মতলবের কথা যখন বল্লে—তখন বলি—গাঁয়ের ইস্কুলটার জন্য তুমি কিছু টাকা দাও—তুমি ঐ স্কুলেরই ছাত্র ছিলে। ইস্কুলটার নামকরণ তোমার বাবার কিংবা মায়ের নামে করিয়ে দেব। স্কুলের বিল্ডিংটা যাতে হয়—তাই করো। তুমি অর্ধেক দিলে সরকারের কাছ থেকে অর্ধেক আদায় করা যাবে। তা ছাড়া আমরা চাঁদাও তুলছি।

ফকির—দেখ ঋষি, দেখ, স্কুল তো তোমার, তুমি সেখান থেকে পাস করে বৃত্তি পেয়েছিলে। আমাকে তোমার স্কুল 'দূর দূর ছেই ছেই'—করত, আমাকে প্রোমোশনই দিতে চাইত না, আর পরীক্ষার হলে চুরির অপবাদ দিত। সেকেণ্ড মাস্টার আমাকে হল থেকে বার করে দিয়েছিলেন —আমি দেখে নেবো বলেছিলাম। তিনি ভয় পেয়ে মিটিয়ে নিয়েছিলেন। পণ্ডিতমশায়কে মারবই বলেছিলাম। মারিনো নেই—সেই ছুতো ধরে আমাকে ডিটেন্ট (?) আটকেছিল, শেষে সেক্রেটারিকে ধরে এলাউড হলাম। এ স্কুলের জন্যে আমাকে টাকা দিতে বলো! তোমার লজ্জা হয় না? তাছাড়া, গাঁয়ের ছোটলোকের ছেলেদেয় শিক্ষার আমি পক্ষপাতী নই। শুনতে খুব অসংগত লাগছে। কিন্তু

'জামাই ভাল শিকারী'

আমার যুক্তি আছে। চাষী কারিগরদের ছেলেরা স্কুলে পড়লে গাঁয়ের সর্বনাশ হবে। সামান্য শিক্ষায় চাকরিও পাবে না—বরং তারা ছোট বড় চুল ছেটে, হ্যাফ-প্যান্ট পরে, বিড়ি সিগারেট ফুঁকে উপদ্রব করে বেড়াবে—তারা চাষ করতে বা কামার ছুতোরের কাজ করতেও পারবে না। ফলে গাঁয়ে এমন একটা বেকারের গ্যাং তৈরি হবে—যে গাঁয়ের তাতে মহা-বিপদ ঘটবে—ঐ গ্যাংই শেষ পর্যন্ত ডাকাতের দলে পরিণত হবে। গাঁয়ের মেয়েদের মানইজ্জত থাকবে না। ঠিক কি না বলো? লেখাপড়াই শিখেছ—ভবিষ্যৎ ভাবতে তো শেখোনি। ঐ গ্যাং শেষে তোমার ঠ্যাং ভাঙবে।

আমি—ভদ্রজাতির ছেলেদের জন্যও তো শিক্ষা চাই।

ফকির—তুমি বলো কি ঋষি ঐ হিংসুকে ছেলেদের জন্য আমার কাছে টাকা চাও। যাদের ধরে চাবকানো দরকার তাদের জন্য আমাকে আক্কেল সেলামি দিতে হবে? তাছাড়া আরো কথা আছে—জানো, গ্রামে আমার যে প্রপার্টি আছে—তা থেকে আমি বিশেষ কিছু পাচ্ছি না। সব মেরে দেবে ভয়ে ভাইপোদের হাতে দেখাশোনার ভার না দিয়ে জনার্দনের হাতে ভার দিয়েছি। জনার্দন জানিয়েছে—গাঁয়ের লোকে পুকুরের মাছ সব চুরি করে মেরে দিচ্ছে—বাগানের ফল একটাও পাওয়া যাচ্ছে না—কেউ বাগান জমাও নিচ্ছে না। ধান বিক্রির আয়ও ঢের কমে গিয়েছে—ধানের দর বাড়ছে—অথচ আমার আয় কমছে, বুঝতে পারছি—শুধু মাঠে নয় গোলা থেকেও ধান চুরি যাচ্ছে—তুমি চোর ডাকাতদের জন্য আমার কাছে টাকা চাচ্ছ? লজ্জা করে না? আমি জনার্দনকে লিখেছি খবিন্দার দেখ—আমি সব বিষয় আশয় বিক্রী করে দেব। গাঁয়ের সব সম্পর্ক ছেদ করব। কল্যাণী বলে—লোকে যখন লুটেপুটেই খাচ্ছে তখন সম্পত্তি দেখার ভার তোমার ভাইপোদের দাও—খায় তো নিজেদের বংশের লোকেই খাক। পাঁচ ভূতে খাওয়ার চেয়ে নিজের ভাইপোরা খাবে সেটাই ভালো। জনার্দনও যে সাধু লোক তা বুঝলে কি করে?

আমি—কল্যাণী বুদ্ধিমতী, ঠিক কথাই বলেছে।

ফকির—চমৎকার যুক্তি! তা হলে সবই তো বেহাত হয়ে যাবে। ঢাকের দায়ে মনসা-বিকি হয়ে যাবে। তুমি কি মনে কর ওরা যদি সব আত্মসাৎ করে তবে আমার ছেলেরা গাঁয়ে ছুটবে মামলা করতে? তার থেকে বিক্রি করাই কি ভালো নয়? দেখ, তুমি কিছু কিছু কেন তো কর্নাসডার করব।

আমি—আমি টাকা কোথা পাব?

ফকিরদা (মুখ ভেঙচিয়ে)—ফাস্টোকেলাস এম-এ টাকা কোথা পাব? বলতে লজ্জা করে না? ফাস্টো কেলাস এম-এ হয়ে লাভটা কি হলো? যাক। আমার অনেক কাজ—অবসর মোটে নেই—আমি কত কমিটির সেক্রেটারি, কত সমিতির সভাপতি কত কোম্পানীর ডিরেক্টার তা জানো? ঘরের খেয়ে বনের মোষ কম তাড়াই না। আমি চলি—তুমি বাড়িটার চারি পাশ ঘুরে ফিরে দেখ—ফার্নিচার-গুলো সব সাহেব বাড়ি থেকে কেনা,—লক্ষ্য কোরো। তোমার বৌদিদির সংগে দেখা কর—কল্যাণীর সংগে দেখা কর। তার একটা বাড়ি করে দেব, ভাবছি। গুডবাই।

পীনাংগী বৌদিদির সংগে গেলাম দেখা করতে—পাশে বসে আছে ক্ষীণাংগী বিধবা কল্যাণী। যেতেই কল্যাণী উঠে প্রণাম করে একটা চেয়ার এনে দিল। বৌদিদি বললেন —যাহোক এতদিন পরে গরিব বৌদিকে মনে পড়ল ঠাকুরপোর।

আমি—আমি আজ গরিব দুখীদের খোঁজ নিতেই বেরিয়েছি। কিসের ফর্দ করছেন?

বৌদিদি—আর বলো কেন? বড়মেয়ের পুজার তত্ত্বের ফর্দ। হাজার টাকার কাছাকাছি তো হয়ে গেছে। বড়লোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার যে কি হাঙ্গামা তা তো জানো না। ঠাকুরঝি বলছে—বিয়েতে পিয়ানো রেফ্রিজিরেটর থেকে পাপোশ এস-ট্রে পর্যন্ত তো দিয়েছ—

এখন আবার এত বেশি দেওয়ার কি দরকার? আমি কয়েকটিন সিগারেট ধরেছিলাম—ঠাকুরঝি বলছে—শুধু সিগারেটই তো জামাই খায় না—আরো অনেক কিছু খায়, সবই তো দিচ্ছ না?

আমি—মঙ্গলার বিয়ে হলো কোথায়?

বৌদিদি—তাও জানো না। বিয়েতে আসতে না পেরে থাক নিমন্ত্রণ চিঠিতে বেহাই-এর নাম পড়নি। কলকাতার খুব নাম-জাদা লাখ লাখ পতি পরিবার যে।

আমি—চিঠিতে বেহাই-এর আর্থিকসংগতির কথা ছাপাতো ছিল না।

বৌদিদি—কেন রায়বাহাদুর তো ছাপা ছিল। তিন পুরুষ রায়বাহাদুর—আত্মীয়দের মধ্যে ১৪টা রায়বাহাদুর, ২০জন বিলাত ফেরত, পাঁচজন জজ। পাঁচখানা মোটার, ১০খানা বাড়ি। প্রাইভেট টিউটার থেকে জমাদার পর্যন্ত ১৫০ জন চাকরবাকর। জমিদারি, ব্যবসা, চাকরি, বাড়ি ভাড়া, শেয়ার কত কি আয়। জজ ব্যারিস্টার ম্যাজিস্ট্রেটে বাড়ি গিজ্‌-গিজ্‌ করছে। বেহাই-এর বাবার নামে পিচঢালা রাস্তা। আমাদের বাজার হয় দিন ত্রিশ টাকার, ওদের হয় দিন একশো টাকার। আমাদের বাড়িতে সাহেবমেম আছে দুচারজন—ওদের বাড়িতে দলে দলে খায়, গায়, নাচে। ঠাকুর ঘর থেকে পায়খানা পর্যন্ত মার্বেলে মোড়া। আমাদের সারা বাড়িতে মোটে পনেরো হাজার টাকার ফার্নিচার—ওদের প্রতি ঘরেই ঐ দামের ফার্নিচার। ওদের কাছে আমরা গরিব মানুষ।

আমি—বিয়েতে খরচ পড়েছে ঢের তা হলে।

বৌদিদি—৬০ হাজার টাকার কম নয়। ওদের খরচ হয়েছে দু লাখ—আড়াই লাখ। বিয়েতে দশদিন ধরে খাওয়ানো দাওয়ানো—এত লোকের আমদানি যে পঞ্চাশজনের জুতো হারিয়ে গেল—বেহাই ৫০ জোড়া নতুন জুতো কিনে দিলেন। আঠারোটা ঠাকুর রেঁধে কুলুতে পারেনি। একেবারে দক্ষযজ্ঞ কান্ড রে ভাই।

আমি—ছেলের নাম কি?

বৌদিদি—শিবনাথ, নিমন্ত্রণপত্রেই তো ছিল। তাও মনে রাখনি?

আমি—তবে দক্ষযজ্ঞের চেয়েও বেশি। দক্ষযজ্ঞে শিব ছিলেন না। সে যজ্ঞ ছিল শিবহীন। লঙ্কাকান্ড বলতে পারেন। আমি তো ভেবেছিলাম—পাত্রের নাম অনিলকুমার।

বৌদিদি—এই দেখ গোল করেছ—বেহাই-এর নাম—অনিলকুমার, চিঠিখানা ভালো করে পড়নি।

আমি—ও আমারই ভুল হয়েছে—বেহাই-এর নাম অনিলকুমার। লঙ্কাকাণ্ডই বটে। জামাই করে কি?

বৌদিদি—করবে আবার কি? অতো বড়-লোকের ছেলের কিছু করতে হয় নাকি! মাঝে মাঝে সই করে হাজার টাকা দামের সোনার কলমে। জামাই-এর অনেক গুণ—ভালো শিকার করতে পারে—ভালো খেলোয়াড়। চমৎকার বাঁশী বাজায়—বাঁয়াতবলা বাজাতে পারে—বাড়িতে বাঁধা

'দু' হাজার টাকা'

স্টেজ আছে—থিয়েটারে খুব ভালো এক্টো করে। কার্তিকের মতো রূপ। তোমাদের মতো এম-এ, বি-এ পঞ্চাশজন ওর তাঁবে কাজ করছে।

আমি—মোহিতকে দেখছি না তো।

বৌদিদি—ও ভালো ফুটবল খেলে—তাই সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে খড়গপুরে খেলতে গিয়েছে। ও ত এবার বিলেত যাবে—পোষাক তৈরি হয়ে গিয়েছে—খুকীর অসুখের জন্য যাওয়া হয়নি। ওর সঙ্গে অরবিন্দও যাবে। এদেশে কি লেখাপড়া হয়? বিলেত না গেলে ভালো শিক্ষা হবে কেন?

আমি—মোহিতের ভাইকে দেখছি না তো।

বৌদিদি—সরিতের কথা বলছ? তার স্কুলে একটা কি ফাংশন আছে—সেই ছেলেদের সর্দার কিনা। সরিৎ বড় ভালো ছেলে। প্রত্যেক বৎসর পাস করে প্রোমোশন পায়—ওর প্রাইভেট মাস্টাররা বলে—ও একটু খাটলে বৃত্তি পাবে। আমি বলি যদি বৃত্তি পায়—তবে সে টাকা তোমরাই ভাগ করে নিও। ওর তো টাকার অভাব নেই। ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়ানোর আর খুকীর গান শেখানোর জন্য হাজার টাকা মাসে খরচ হয়। তবু ওরা বড় ফাঁকি দেয়। ওরা বড় গরিব, কিছু বলি না। না এলেও মাইনে কাটি না। খুকীকে ইংরাজি পড়ায় একজন মেম সাহেব—সে কিন্তু ফাঁকি দেয় না—খুকী অনেক ইংরাজি কথা শিখেছে। খুকু এখন তো পড়ে না—তবু মেমের মাইনে মাসে মাসে দুশো টাকা দিয়ে যাচ্ছি।

কল্যাণী এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল—একটি কথাও বলেনি। এইবার সে কাছে ঘেঁষে এসে বসল—বৌদিদি ঝি-চাকর শাসন করতে গেলেন।

কল্যাণী—এতক্ষণ তো আমাদের খবর শুনলে—এইবার তোমার খবর বলো। তোমার এখন ক'টি ছেলেপুলে—তাদের কার কত বয়স—কে কি পড়াশুনা করছে—বৌদিদির শরীর কেমন? আমার কথা তাঁর মনে আছে? তোমার আয় কত? সব একে একে বলো।

আমি কল্যাণীর প্রশ্নগুলির উত্তর দিলাম।

কল্যাণী—বৌদিদিকে একদিন নিয়ে এসো, দেখতে বড় ইচ্ছা হয়। সেই কনে বৌটি দেখেছি—

আমি—তোমার বৌদিদির শরীর ভালো নয়—তাছাড়া সে বড় লাজুক। বড়লোকের বাড়িতে সে কি আসতে চাবে? তার সাজসজ্জাও কিছু নেই। দূরও অনেকটা।

কল্যাণী—না—না তাঁকে আসতে হবে না। অরুকেই বলবো ট্যাক্সি করে আমাকে একদিন নিয়ে যাবে। একবার আমাদের গাঁয়ে যেতে ইচ্ছা করে—ভাইপোরা তো আছে—তাদেরও বহুদিন দেখি নি। গাঁয়ের সবার খবর জানতে ইচ্ছা করে। খাঁচার পাখী হয়ে আছি এখানে। বিমলা পিসী, নেড়া, হাবুল, পুঁটী, মাধুরী, বিধুকাকা, সুরেনদা, অনু এদের প্রত্যেকের খবর, গুপ্তদের বাড়ির, বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ির, পুরুত ঠাকুরের বাড়ির, বিশ্বাসদের বাড়ির কে কেমন আছে—সব জানতে ইচ্ছা হয়। অল্প বয়সে জীবনকাকা মারা গেলেন কাকীমা কি দুঃখে যে তোমাদের দুজনকে মানুষ করেছেন তা ভাবতে গেলে চোখে জল আসে। তোমার মামারা তোমাকে নিয়ে গেল বলে তোমার কলেজে পড়া হল। তোমার মামারাই অমিয়ার অত ভাল বিয়ে দিলেন। তুমি সারা গাঁয়ের কেন সারা অঞ্চলের মুখ উজ্জ্বল করেছ, ঋষিদা।

আমি—আমি আর কি করেছি, দিদি, আমার আয় সামান্য।

কল্যাণী—তুমি বি-এ, এম-এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে প্রোফেসার হয়েছ, কত বই লিখছ, তোমার কত ছাত্র কৃতবিদ্য হচ্ছে। অরুকে বলি তুই তোর ঋষি মামার মতো হবার চেষ্টা কর। কাকীমা আমাকে কী ভালই না বাসতেন, অমি ও আমি যেন তাঁর যমজ মেয়ে ছিলাম। কত উপদ্রবই না করেছি! কুলের আচার চুরি করে খেতাম। তিলের নাড়ুর ভাঁড় শিকেয় তোলা থাকত, চুরি করতে পারতাম না বলে কাকীমা সে ভাঁড়টা কুলুঙ্গিতে রাখ-, তেন—মোড়ায় চড়ে পেড়ে খেতাম। কাকীমা পৌষ মাসে পিঠে তৈরি করে, ভাদ্র মাসে তালের বড়া ভেজে দোলের

দিনে ফুটকলাই ছাঁচ কিনে, রথের দিনে পাঁপর ভেজে আমাদের দুই ভাইবোনকে খাওয়াতেন। কোন দিন পায়েস বা খিচুড়ি রাঁধলেও ডেকে পাঠাতেন। ভাই দ্বিতীয়ার দিন দাদার কপালে ফোঁটা দিতে গিয়েও তোমার কথা মনে পড়ে। বৌদিদি যখন নতুন বৌ, তখন সারাদিনের সঙ্গিনী ছিলাম আমি। মালতী দিদির সঙ্গে গাঁয়ের বনে বনে বৈঁচি বনকুল খেয়ে বেড়াতাম—সে মালতী দিদি আজ নেই। যশোদা বৈষ্ণবীর শিউলি গাছটা কি এখনো আছে? তা বোধ হয় তুমিও জানো না—মালতীদের পুকুরের ধারে সেই বকুল গাছটা? বকুল আর শিউলি কুড়িয়ে নিলেই চলত। এই দুই ফুলে আমাদের খেলাপাতীর ঠাকুর পুজো হত। কত কথা মনে পড়ছে। ঋষিদা, তুমি আমাদের সারা গ্রামখানিকে দুটি ছলছল চোখে ভরে নিয়ে এসেছ। আমার জীবনের সুখের দিনগুলি তালপুকুরের পাড়ে সেই খড়ো ঘরের আঙিনার ধূলো-কাদাতেই কেটেছে। আশীর্বাদ কর দাদা। অরু আমার মানুষ হোক। তাকে তোমার পায়ের ধূলো দিয়ে যাও।

আমার চোখে জল আসছিল—তাড়াতাড়ি সামলে নিলাম—সে জল দেখলে কল্যাণী ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলত।

এমন সময় বৌদিদি এসে বলে গেলেন একটু চা খেয়ে যেয়ো—এখন তো অসময় আর কিছু খাবার দিলাম না। কথায় কথায় তোমাকে চা দেওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

ঝি দুখানা বিস্কুট আর চা দিয়ে গেল।

কল্যাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল—তারপর উঠে গিয়ে তার ঠাকুরঘর থেকে দুটি সন্দেশ নিয়ে এল। কল্যাণী হাতে করে না আনলে খেতাম না।

এমন সময় কল্যাণীর পুত্র অরবিন্দ এলো। কল্যাণী অরবিন্দকে বললে—অরু, এই তোর ঋষিমামা। যাঁর কথা তোকে বলি। প্রণাম কর। এঁর ঠিকানা লিখে রাখ—একদিন ট্যাক্সি করে ঐ ঠিকানায় আমাকে নিয়ে যাবি। আমি বিদায় নিলাম—অরবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে বাসস্টপ পর্যন্ত এলো। পথে তার সঙ্গে দুইচারিটা কথা হলো—

আমি—তুমি তো বি এস-সিতে খুব ভাল করেছ—শুনলাম বিলাতে পড়তে যাওয়ার কথা হচ্ছে।

অরবিন্দ—ফল ভাল এমন কি? একটা সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পেয়েছি কেমিস্ট্রিতে। বিলাত? বিলাত যাওয়ার কথা কে বলল? এমন কথা তো হয়নি।

আমি—তোমার মামাই বলছিলেন—তিনি তোমাকে আর মোহিতকে নিয়ে বিলাত গিয়ে তোমাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করে আসবেন। কিন্তু খুকীর অসুখের জন্য যাওয়া হল না।

অরবিন্দ—মামার তেমন পরিকল্পনা কোন আছে কিনা আমি তো কখনও শুনিনি। কিন্তু ওসব তো এখন অসম্ভব।

আমি—কেন? খুকী ত বেশ সেরে উঠেছে।

অরবিন্দ—খুকীর প্যারা টাইফয়েড হয়ে ছিল—চোদ্দ দিনে জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। এমন সিরিয়াস কিছু হয় নি। তবে মামার এখন খুব দুঃসময় চলছে। ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ। জায়গাটা সস্তায় পেলেও বাড়ি করাতে মামার খুব দেনা হয়ে গিয়েছে—মেয়ের বিয়েতেও প্রায় বিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে—কেস চলছে অনেকগুলি বহুদিনের আয়কর বাকি ছিল—বহু টাকা এক সঙ্গে দিতে হয়েছে। কাজেই এখন খুব টানাটানি করে চালাতে হচ্ছে, দেশের বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রী করছেন। চাকরবাকর অনেক ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে। বাড়িটাও মরগেজ করা আছে। এম এস-সি না পড়িয়ে আমাকে ব্যবসায়ে যোগ দিতে বলেছিলেন—আমি দু বছর সময় নিয়েছি—এম এস-সি পাশ করার জন্য।

আমি—মেয়ের বিয়েটা খুব ভালো দিয়েছে।

অরবিন্দ—খুব ভালো হয়নি মামা। জামাই-এর পরিবারের অবস্থা খুব ভালই ছিল—মামলা মোকদ্দমার পর এখন শরিকদের মধ্যে পার্টিশন হওয়ায় ভালো আর নেই। তা ছাড়া ওদেরও দেনা খুব বেশি। তা ছাড়া জামাইটি বড় কুসঙ্গে পড়েছে। লেখাপড়া শেখেনি—যা আছে তাও উড়ছে।

বাস এসে পড়ল আমি উঠে পড়লাম নানা কথা ভাবতে ভাবতে।

সকালে ঘুম ভাঙলে পরিতোষ আজ তার বাবার কথা ভাবছিল। চোখের পাতা বুজে, কখনও অল্প করে মেলে, কড়ি কাঠের দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে বাবার কথা ভাববার সময় তার মনে হচ্ছিল বিকেল হয়ে গেছে। ঘরে রোদ নেই, রোদের কণাও না। আকাশ মেঘলা হলে নীচের তলার এই ঘর এমনি দেখায়—সকাল বা সন্ধ্যে বোঝা যায় না।

গঙ্গা জলের চৌবাচ্চা খুলে, খাটালের মতন নোঙরা উঠোনটায় কেউ রিকশার চাকা ধুচ্ছে, পরে চাকা খুলে মাঝ-গর্তে চার পয়সার মাখন লাগাবে। পরিতোষ প্রত্যহ শুনে শুনে এখন অভ্যস্থ, রিকশার চাকায় জল ছোড়ার, রিকশার চাকা শূন্যে তুলে ঘোরানোর শব্দ সে সঠিকভাবে ধরতে পারে।

বাবার কথা ভাবতে ভাবতে পরিতোষ বুকের ব্যথাটা অনুভব করতে পারল। অনেকদিন বাবার কথা তেমন করে ভাবা হয়নি। আজও হত না, যদি স্বপ্নটা না দেখত।

সারা রাত, না কি শেষ রাতেই স্বপ্নটা দেখেছে, পরিতোষ ঠিক করতে পারল না। বেশ বড় স্বপ্ন; দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু স্বপ্নে যা দীর্ঘ তা ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে।

অথচ বাবা, পরিতোষ দু হাত কাঁধের পাশে তুলে বালিশে আনল, জোড়া হাতের তালুতে মাথা রাখল, অথচ বাবা ক্ষণস্থায়ী ছিলেন না: প্রায় বাইশ বছর পরিতোষ সেই ছায়ার তলায় মানুষ।

উঠোনে রিকশার মুখে জলের ঝাপটা দেওয়ার পর, এখন, চাকায় মাখন লাগানো হচ্ছে, হরি গোয়ালা তার দুধের বালতি মাজছে; পরিতোষ আরও ভেবে নিতে পারল উঠোনের বাঁদিকে গড়াইদের মিষ্টির কারখানায় নালা ঘেঁষে বসানো মস্ত মস্ত উনুনগুলোর ওপর কড়াই চাপানো হয়ে গেছে, রস ফুটছে।

অনেক দিন পরে আবার বাবাকে স্বপ্ন দেখল পরিতোষ। তার মনে হল, এই স্বপ্নটা এখন তার কাছে রিকশা ধোয়ার মতন, যেন আগের দিন সারাবেলা খেটে, রাতে নোঙরা গলি ঘুঁজি ঘুরে ফিরে এসেছিল, এখন স্বপ্ন দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছে।

ঘরের মধ্যে মেঘলা সীসের রঙ ধরে রয়েছে। পরিতোষ এই ক্ষয়িত আলোর দিকে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে চেয়ে ভাবল, কে কাকে ধুয়ে নিচ্ছে? কে রিকশা? সে, না তার বাবা?

প্রথমে, সংকোচবশত, পরিতোষ নিজেকেই রিকশার সঙ্গে তুলনীয় করে নিল। বাবার স্মৃতি জলের ঝাপটার মত মনে হল। পরিতোষকে এই স্মৃতি ধোত করছে, পরিচ্ছন্ন করছে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে, বুকের ব্যথাটা আবার অনুভব করার পর, পরিতোষ তার বাবাকে রিকশার সঙ্গে তুলনা করে নিল।

মা মারা যাবার পর, দেড় কি দু বছরের মধ্যেই বিনমাসির গর্ভে বাবার পত্নীপ্রেমে

শত্রুতা করল। বিনুমাসি পালিতা আশ্রিতা **ছিল বলে, হয়ত বাবার সব কিছুকেই পালন করে গেল।**

বাবা বিনুমাসির এই বিশ্বাসঘাতকতায় **আহত** হয়েছিল; মনে করত, ইচ্ছে করে—**প্রায়** করবে বলেই বিনুমাসি বাবাকে এভাবে **জব্দ** করেছে। এ যে এক ধরনের **প্রবঞ্চনা,** বাবা সে কথা কখনও ভুলতে পারেনি। দ্বিতীয়বার বাবা প্রতিহিংসায় বিনুমাসিকে আর একবার আঁতুড় ঘরে পাঠাল। হয়ত বিনুমাসি আর বাবা, এরপর পরস্পরের ওপর আক্রোশবশত আরও কিছু করত, কিন্তু বিনুমাসি ততদিনে ধর্মমতে বাবার স্ত্রী হয়ে গেছে বলে বুঝতে পারল, তার ছুরি ভোঁতা হয়ে গেছে, কিংবা ভেঙে গেছে।

পরাজয়ের দুঃখে বিনুমাসি ম্লান হয়ে গেল। এত ম্লান মৃদু যে, ছেলে মারা যাবার পর বিনুমাসি একদিনের বেশী দুদিন শব্দ করে কাঁদতে পারেনি। তারপর প্রায় দেড় বছর পর, বিনুমাসির দ্বিতীয় সন্তান—মেয়েটি মারা গেল।

দ্বিতীয়বার কাঁদতে বিনুমাসির আটকায় নি। কারণ এটি ধর্মমতে এসেছিল। বাবা মেয়েটির জন্যে আকুলতা জানাল অনেক পরে, যখন বিনুমাসি ব্যাধিতে মরছে।

পরিতোষ উঠল। বাইরের উঠোনে রিকশার চাকা ধোওয়া হয়ে গেছে, হরি গোয়ালা দুধের বালতি মেজে খানিকটা বিশুদ্ধ কলের জল নিয়ে শিয়ালদায় দুধ কিনতে চলেছে। হরি গোয়ালা দুধ কিনতে যাবার আগে একটা ছড়া পড়ে সুর করে—দেহাতী ছড়া, যার অর্থ : জগতে অনেক মাটি, দু মুঠো মাটি দিয়ে লোটা মাজলে 'ধরতিমাতা' অশুদ্ধ হয় না।

বাইরে বোধ হয় মেঘলা আরও ঘন হয়েছে, ঘরের মধ্যে যে আবছা অন্ধকার তাতে সমস্ত নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে, যেন এই ঘরের অপরিচ্ছন্ন আলো, বাতাস, দেওয়াল—সব—সমস্ত একটা ধাতব পদার্থ। একটা ট্রাঙ্ক এক কোণে লোহালক্কড় টিন বোঝাই গুদোমের অংশীদারের মতন পড়ে আছে, সাড়ে চার টাকার টেবিলটা প্রচণ্ড মোট বওয়া কুলির মতন থুবড়ে আছে।

আয়ুর্বেদের সস্তা মাজন হাতে ঢেলে পরিতোষ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। খিল খুলল।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। তুলোর আঁশ উড়লে যেমন দেখায় সেই রকম বৃষ্টি। গড়াইদের মিছরি কারখানায় সেই লুঙ্গি পরা লোকটা রস ঘাঁটছেই।

মাজনটায় যথেষ্ট ফটকিরি থাকে বলে দু চার আঙুলে চালালেই মুখ জিব গাল কষে যায়। কিন্তু দাঁতের পক্ষে স্বাস্থ্যকর বলে পরিতোষ এই কষায় ভাবটা গ্রাহ্য করে না।

বৃষ্টি দেখতে দেখতে এবং দাঁত মাজতে মাজতে পরিতোষ বুকের ব্যথায় অস্বস্তি বোধ করছিল।

বাবা শেষের দিকে খুব ভেঙে পড়েছিল। বিনুমাসি মারা যাবার পর বাবা যেন কী একটা বুঝতে পেরেছিল। এবং অবকাশে, রাত্রে নিজের ঘরে এমন নিস্তব্ধ ভীত হয়ে বসে থাকত যে, মনে হত, বাবা নিঃসংশয়ে কোনো কিছুর প্রতীক্ষা করছে।

মুখ ধোবার সময় জলের ঝাপটায় চোখ যখন ঠান্ডা—খুব ঠান্ডা হয়ে এল, পরিতোষ বাবার সেই হতাশ নিষ্প্রাণ অসাড় মুখের অস্পষ্ট ছবি দেখতে পেল। বাবা যেন মৃত চোখে চেয়ে আছে। ভুরুর একপাশে কিছু সাদা চুল গভীর কোনো ক্ষতের মতন দেখাচ্ছিল।

মিছরির কারখানায় সেই মেয়েটার গলা কানে যেতে পরিতোষ তাকাল। গড়াই ওই মেয়েটার সঙ্গে দুপুর কাটায়। নালির পাশে টিনের বড় বড় চৌকো কানা উঁচু পাত্রে মিছরির ডেলা শুকোতে দেবার পর, মাছি ঘিন-ঘিন করলে, উনুনে রস পাক হয়ে গেলে ওরা—গড়াই আর ওই মেয়েটা—ওপাশে আস্তাবলের মতন অন্ধকার জায়গাটায় দড়ির খাটিয়ায় বসে বসে গল্প করে।

মেয়েটার গায়ে ক্রমাগত মাংস লাগছে। রঙ কালির মতন হচ্ছে। অথচ গড়াইয়ের কারখানায় তার প্রচুর খাটুনি।

পরিতোষ ধুতির কোঁচায় মুখ মুছতে মুছতে ঘরে চলে গেল।

মাথা পা বা পাশের দিকে সাধারণত ঘরের জানলা হয়ে থাকে, কিন্তু এই ঘরটার জানলা বেয়াড়া রকম; নীচু করে বসানো, কোণ ঘেঁষে; হেঁট হয়ে দেখতে হয়। আলকাতরায় রাঙানো সরু সরু দুটো পাট খোলা আছে জানলাটার, কোল ঘেঁষে ভাঙা ভাঁড় কাঁচের প্লেট একটা, শালপাতা। রাত্রের উচ্ছিষ্ট। কাল ফেরার পথে পরিতোষ মোড়ের পাঞ্জাবীর দোকান থেকে ছোট এক ভাঁড় কষা মাংস আর তিনটে রুটি কিনে এনেছিল। আজ সেই রুটির ছিটোনো টুকরো নিতে ইঁদুরগুলো সকাল থেকে ছোটাছুটি করছে।

লংক্লথের পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে নিল পরিতোষ, পকেট-চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে নিল। পকেটে একটা লন্ড্রির বিল পড়ে আছে। আজ ফেরার পথে কাপড় জামা দুটো আনতেই হবে, নিজের পাঞ্জাবির গন্ধ পরিতোষকে বিরক্ত করছিল।

চটিটা পায়ে দিয়ে ঘরের তালা খোঁজবার সময় খুবই আচমকা পরিতোষের বাবার সেই ভঙ্গিটা মনে পড়ল। আজ স্বপ্নে বাবাকে ওই রকম ভঙ্গি করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছে পরিতোষ। হেঁট মুখে, আড়ষ্ট পায়ে বাবা নামছিল। কোনোদিকে তাকাচ্ছিল না, যেন কোনো অন্ধ তার চেনা পথে নেমে যাচ্ছে। বাবার গায়ে একটা কয়েদীর জামা ছিল।

পরিতোষ জীবনে কয়েদী দেখেনি, তবু বাবার জামাটা যে কয়েদীর—স্বপ্নে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। তার ভয়ঙ্কর অপমানিত লাগছিল নিজেকে। স্বপ্নে, ঠিক সেই মুহূর্তে—বাবার গায়ে কয়েদী পোশাকটা দেখার পর আড়ালে সরে যেতে ইচ্ছে করছিল।

এখন এই জাগরণে, পরিতোষ বিন্দুমাত্র লজ্জিত হল না। মনে হল, এটা স্বাভাবিক, বাবার হাতে জেলখানার বাগান-কোদানো-কোদাল এবং পায়ে বেড়ি দেখলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

তালা খুঁজে পেল পরিতোষ। বুকের ব্যথা শ্বাস-কষ্টের মতন ভার হয়ে আছে। এই ব্যথাটা একদিন যে কোনো ব্যাধিতে দাঁড়াতে পারে, যে কোন ব্যাধি।

ঘরের বাইরে এসে পরিতোষের মনে হল, তার ছেঁড়া ছাতাটা নেওয়া উচিত ছিল। এখন বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি ঝরছে, আকাশের রঙ মাছের আঁশের মতন সাদা, যে কোনো মুহূর্তে জোরে বৃষ্টি নামতে পারে।

মিছরি কারখানার মেয়েটার নাম কদম। কদম অনেকটা দূর থেকেই তাকে দেখে চোখ ছোট করে হাসল, বুকের ওপর কাপড় টানল।

বৃষ্টিতে গলিটা খুব ময়লা হয়ে রয়েছে। পরিতোষ এই ময়লার মধ্যে একটা ছেঁড়া ক্যালেন্ডারের ছবি লক্ষ্য করল। জটাজুটধারী কোনো সাধু পানের পিচ এবং মাছের গলা পিত্ত মেখে পড়ে আছে। দুটো কাক জোড়া পায়ে লাফ মারছে, যেন নেচে নেচে সাধুর পাশ থেকে কিছু ঠুকরে নিচ্ছে।

একটি মেয়ে মুখ নীচু করে বৃষ্টির ছাট আঁচলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। পায়ে পাতলা চটি। পরিতোষ মেয়েটিকে চেনে, বাইশ নম্বর বাড়ির ভাড়াটে, মতি হালদারের বোন।

এক সময় পরিতোষ মেয়েটার জন্যে মায়া

বোধ করত। অথন আর কবে ... হরসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ে সেলাই শেখানোর কাজ পাওয়ার পর আর ওষুধের শিশি হাতে হাসপাতালে যায় না। মতি কেমন আছে কে জানে!

চায়ের দোকানে এসে বসল পরিতোষ। একটা নোনতা বিস্কুট, এক কাপ চা। ছোকরাটা প্রায়ই বলে, টোস্ট দি বাবু, কড়া করে সেঁকে দি; পরিতোষ মাথা নাড়ে, না টোস্ট নয়। টোস্ট সে একদিন খায়, রবিবার সকালে। রবিবার সকালে তার টিউশনি নেই। টিউশনিতে অন্যদিন চা এবং কয়েক মুঠো চিঁড়ে ভাজা পাওয়া যায়।

চা খেতে খেতে পরিতোষ দোকানের অন্য অন্যদের দেখল। প্রায় সকলকেই পরিতোষ চেনে। এই মহল্লারই সব। পরিতোষের সঙ্গে আলাপ আছে কারুর কারুর।

এরা, পরিতোষ একটা সেঁতসেঁতে সস্তা সিগারেট ধরাল। ইন্দুর দিকে তাকাল কয়েক পলক, ভাবল এরা এক রকম সুখী। সুখী বলেই কাগজের পাতায় খেলার খবর দেখছে, নেহরুর বাগাড়ম্বর পড়ছে, আইন আদালতের সংবাদে মজে আছে। কাল রাত্রে দেখা সিনেমার অভুক্ত কণা এখন বমির মতন চায়ের টেবিলে উপচে দিচ্ছে।

জীবনে সুখ ক্রমশ প্লাস্টিকের মতন হয়ে আসছে। পরিতোষ কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হল; তৃপ্ত হল কারণ সে প্লাস্টিক শব্দটা সুখের সঙ্গে লাগাতে পেরেছে। অর্থাৎ সুখ পাওয়া সুখী হওয়া আজকাল যে কত খেলো—সিনথেটিক ব্যাপার হয়ে গেছে এই চিন্তাকে সে প্রকাশ করতে পারল। অবশ্য প্লাস্টিক সিনথেটিক প্রডাক্ট কি না পরিতোষ জানে না।

'আরে, পরিতোষ!' চেককাটা লুঙ্গির ওপর বুকের বোতাম খোলা ঢিলে আদ্দির পাঞ্জাবি, হাত গোটানো, সুধাংশু দোকানের চৌকাঠ মাড়াল। পরিতোষ দেখল সুধাংশুকে।

'তারপর, কি খবর—?' সুধাংশু বসল সামনাসামনি। হাড়ের বাঁট দেওয়া ছাতাটা রাখল সযত্নে।

একটু হাসল পরিতোষ, ঠোঁটে পাতলা করে হাসিটা আনল।

'ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে যে, আর পাত্তাই পাই না।' সুধাংশু পকেট থেকে একটু দামী সিগারেটের প্যাকেট বার করতে করতে বলল। পরিতোষ নীরব, সুধাংশু হাতের কব্জি দেখছিল। চওড়া হাতে ঘড়িটা বেশ মানিয়েছে।

'ওরে খোকা, চা দে—। টোস্ট আর ওমলেট নরম করে ভাজবি...' সুধাংশু ব্যস্ত ছোকরার কানে কথাটা কোনো রকমে তুলে দিয়ে আবার পরিতোষের দিকে তাকাল।

'আমি উঠব।' পরিতোষ বলল।

'উঠবে কি, বসো; চা খাও।'

...

'আরে রাখো তোমার টিউশনি।' সুধাংশু নির্বিকার গলায় বলল।

প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করল, পরিতোষের দিকে ঠেলে দিল। 'শোনো মক্কেল, এই শনিবার তোমায় আসতে হবে।'

'কোথায়?'

'আমাদের থিয়েটারে। এবার একটা ম্যানস্ক্রিপ্ট গেল নামিয়েছি। চারুকে চেন, আমাদের চারু বোস, চারু লিখেছে। বেশ লিখেছে।' সুধাংশু সিগারেট ধরাল। পরিতোষ অনুমান করে নিতে পারল, চারুর লেখা নাটকে সুধাংশু নায়ক।

'তোমায় মাইরি অত করে বললাম, একটা লেখ; কিছুতেই লিখলে না।' সুধাংশু বন্ধুজনোচিত হতাশা দেখাল।

পরিতোষ গলির দিকে চেয়ে থাকল। বৃষ্টিতে সব ফিকে দেখাচ্ছে, জোলো-জোলো; পরদা ঢাকা রিকশায় কোনো কুলবধূ তার চওড়া কপাল দেখিয়ে চলে যাচ্ছে। সুধাংশু বোধ হয় কাল রাতে সেন্ট মেখেছিল, অবসিত গন্ধটুকু নাকে এল। বেশ আছে সুধাংশু! পরিপূর্ণ সুখে আছে। বাড়িতে নতুন বউ, অফিসে মামা বড়বাবু,

পরিতোষ উঠে পড়ল। এই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তাকে টিউশনিতে যেতে হবে। সর্দির মতন হয়েছে কাল থেকে। হয়ত বুকে ঠাণ্ডা লেগেছে। নির্মলা কাল আর্সাপর্বন দিতে চেয়েছিল...

'কি হে, উঠলে?' সুধাংশু তাকিয়ে আছে।

'দেরী হয়ে যাচ্ছে, যাই—' পরিতোষ চেয়ার ঠেলে পথ করে বাইরে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল।

'টিউশনির আবার এত বাঁধাধরা টাইম কি হে! নাঃ, তুমি কোনো কাজের নও!'

পরিতোষ চায়ের দোকানের বাইরে এল। সে কোনো কাজের নয়। বাবা বেশ কাজের লোক ছিল। সদর কোর্টে ওকালতির পশার করেছিল খুব। বেছে বেছে মামলা নিত, যেসব মামলায় পয়সা আছে, পাঁক আছে। মা পছন্দ করত না। বলত, যত পাপের পয়সা খাচ্ছি, ছি ছি। বাবা মার ঠোঁটের ডগায় আঙুল দিয়ে বাতাসে কি লিখত, হাসত, বলত ঃ চোখের খুব কাছে জিনিস থাকলে দেখা যায় না; আমি কি লিখলাম তুমি বলতে পার? পারো না। মামলা

নেবার সময় আমি খুব কাছ থেকে দেখি, পাপ পুণ্য কোনোটাই আমার নজরে পড়ে না।

বাবা পেরেছে; বাবা আরও অনেক কিছু পেরেছে। দশ বছরেরও বেশী মার মুখের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছে। বাবার হৃদয়কে মা মহেশ্বরের হৃদয় বলে মনে করত, মনে করে আশ্বস্ত গর্বিত ছিল। দাহের সময় মার নিমীলিত নয়নে প্রশান্তি ও লোক-বিজয়িনী হাসির অবশেষ ছিল। এই মানুষই মার পর বিনুমাসিকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারল। বিনুমাসি নিজেকে সমর্পণ করার সময় বশীভূত ও উন্মত্ত হয়ে পড়েছিল। ক্রমে, উৎসবের বাতি নিবে গেলে বিনুমাসি তার চোখের সামনে যে পুরুষকে আবিষ্কার করেছিল তার সর্বাঙ্গে কোথাও মহেশ্বরের বৈরাগ্য শুচিতা ও প্রেম ছিল না। কি দেখেছিল তবে বিনুমাসি? বাবার কোন রূপ দেখেছিল? পরিতোষের ধারণা হল, চতুর, আসক্ত, ভীরু, দাম্ভিক দেবরাজের রূপেই হয়ত বিনুমাসি দেখেছিল।

পরিতোষ বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সকালে শিয়ালদার ট্রামগুলো ফাঁকা। সেকেন্ড ক্লাস ট্রামের এক কোণায় গিয়ে বসলে পরিতোষ কাল রাতের পুরো স্বপ্নটাই মনে করতে পারে। স্বপ্নটা এখন ক্রমশ নীহারিকা থেকে জাত জগতের মতন গঠিত হয়ে আসছে।

স্টপেজের কাছে এসে দাঁড়াল পরিতোষ। সামনে কোনো চলতি সিনেমার বিজ্ঞাপন ঝুলছে। দেখল পরিতোষ : প্রসাধিত একটি মেয়ের মুখ, একটি যুবক দু বাহু শূন্যে বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে, একপাশে কোনো বৃদ্ধের কাতর মুখচ্ছবি।

একটা ট্রাম চলে গেল। ট্রামের জানলায় কপালী টোলা গলির বিজন দত্ত। বিজন রোজ গঙ্গাস্নানে যায়। বিজন সারাদিন চামড়া বিক্রি করে। বিজন সারারাত গায়ের গেঞ্জির মতন কেনা-মেয়েছেলে গায়ে নিয়ে শুয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি এল। বড় বড় ফোঁটা রাস্তার বুকে রোল তুলে ফেটে পড়ছে। বাজারের দিকে গাড়ি বারান্দার তলায় সরে এসে দাঁড়াল পরিতোষ। মাছের বাজারের আঁশটে গন্ধ ভেসে আসছে। বৃষ্টির মধ্যে কর্কশ গলা তীক্ষ্ন করে একটা কাক ডাকছে। মোড়ের মাথায় শীর্ণ পত্রবঞ্চিত বকুল গাছটা জলের ঝাপটায় ত্রস্ত ভিক্ষুণীর মতন কাঁপছে। বকুল গাছটার কালচে রোগা লিকলিকে চেহারা দেখে মায়া হচ্ছিল পরিতোষের। মাঝে মাঝে তার এমনি মায়া হয়, মায়া হয় শীর্ণতার জন্যে, বঞ্চিতের জন্যে। এক একদিন সে কোনো ভাঙা বাড়ি, কোনো পুরোনো বুড়ো ট্রাম, কোনো কৃশ কামিনী দেখলেও কেমন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

এই প্রাতঃকালীন বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে, জলের ছাট খেতে খেতে পরিতোষ তার বুকে একবার হাত রাখল। এই ব্যথাটা আশ্চর্য। আছে মনে করলে সব সময় আছে, স-ব সময়।

বৃষ্টির তাড়নায় আশেপাশে অনেক লোক জমেছে। চিংড়ি মাছের সের, পলতা পাতার আঁটি, অফিসের কেচ্ছা, পাড়ার খবর আলোচিত হচ্ছে—এবং ওরই মধ্যে কোনো বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকের কাতর প্রার্থনা মিশে গেলে একটি ক্লান্তিকর গলা চেঁচিয়ে উঠল : "শালা ভগবান..."

পরিতোষ একবার ঘাড় ঘোরাল। কালো মোটা জাঁদরেল গোছের বাবুটি টেরিকাটা চুলে বৃষ্টির জল এবং হাতে শুভ্র দীর্ঘ ইলিশ মাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পরিতোষ বৃষ্টি দেখতে লাগল। বাসের গায়ে ঢাক বাজাতে বাজাতে আধখানা শরীর বৃষ্টিকে ছুঁতে দিয়ে ছোকরা কন্ডাক্টারটা তার গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

আবার একটা কড়া সিগারেট। টাইপ শেখানো স্কুলের সাইন বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে পরিতোষ সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে লাগল।

বেলা হয়ে যাচ্ছে। নির্মলা টেবিলের সামনে বসে জানলা দিয়ে চেয়ে আছে, তার ঘরে আলো কম, কম আলোর ঘরে বসে নির্মলা বৃষ্টির শব্দ শুনছে।

সিনেমার ছবিটায় আবার চোখ পড়ল পরিতোষের। মেয়েটি কে? কি বলছে? কি বলতে চায়? ওর চোখের ভুরু এত ক্ষিপ্র বঙ্কিম, নাকের ডগা চাপা যে মনে হয় ওর হৃদয়ে একটি ঘৃণার মহীরূহ রয়েছে। কেন? কার প্রতি এই বিদ্বেষ?...ছেলেটি যেভাবে শূন্যে দু বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে তাতে মনে হয় কোনো বিশাল অস্তিত্বের সামনে নিজেকে দম্ভভরে সমর্পণ করছে। কার কাছে এই পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে যুবকটি পরিতোষ বুঝতে পারল না। তার মনে হল, এই চিন্তা অনর্থক; ওই যুবতী এবং এই যুবক সিনেমায় পাশাপাশি বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে গান গাইবে বই কিছু করবে না। বা বেশী করলে, বড় জোর ওরা বিবাহবাসরে একজন কাঁদবে, অন্যজন হাসবে।

দুঃখ, দুঃখও কত খেলো হয়ে গেছে! প্রায় মিল্ক পাউডারের মতন। জল দিয়ে ঘাঁটলেই দুধ হয়ে যায়।

বৃষ্টি ধরে আসছিল। ঈশ্বরকে যে বাবুটি শালা বলেছিল, ইলিশ মাছ হাতে সে রিকশায় উঠল। পরিতোষ অনুভব করতে পারল তার মনে কিছুটা বিরক্তি উপজাত হয়েছে। কেননা কোনো বালককে সে অপ্রসন্ন গলায় বলল, ঠিক হয়ে দাঁড়াও—পা মাড়িয়ো না।

'মাথা মুছবেন গামছা এনে দেব?'

'না, থাক।' পরিতোষ তার চেয়ারে বসল।

নির্মলা দাঁড়িয়ে থাকল একটু, হয়ত অস্বস্তি বোধ করে দাঁড়িয়ে থাকল, পরিতোষ অল্পস্বল্প ভিজেছে।

'তোমার বই পেয়েছ?' পরিতোষ বলল।

না। মাথা নাড়ল নির্মলা। টেবিলের ধার ঘেঁষে ঢুকে গেল, চেয়ার টানল।

টেবিলটা পরিচ্ছন্ন। পুরোনো কাঠের গন্ধ কখনও কখনও আচমকা নাকে আসে পরিতোষের। আজও এল। সেঁতসেঁতে ঘর, বাইরের বাদলা এ-ঘরকে আরও ম্লান করেছে, নির্মলার গায়ের নীল শাড়ি ফিকে দেখাচ্ছে। টেবিলের ওপর হাতে কাজ করা একটা সাদা টেবিল-ক্লথ, একটা অকেজো দোয়াতদান, কালির শিশি, ফুটরুল, সরস্বতীর কাঠের ছোট্ট মূর্তি। আর কিছু বইখাতা এক পাশে।

খাতা টানছিল নির্মলা। তার দুর্বল শীর্ণ হাত, হাল্কা দুটি বালা এবং ফরসা রঙটা লক্ষ্য করল পরিতোষ। নির্মলা নত হয়ে ছিল। পরিতোষ সিঁথির দীর্ঘতা দেখল।

'আজ কি—' পরিতোষ সামান্য ঝুঁকল।

'ইংরিজী।'

'পড়েছ?'

'না। কাল বিকেল থেকে জ্বর...'

'জ্বর?'

'পরশু দিন বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছে—'

পরিতোষ দু মুহূর্ত নির্মলার দিকে তাকিয়ে থাকল। অসুস্থ দেখাচ্ছে নির্মলাকে। পরিতোষ আগে বুঝতে পারেনি।

'তা হলে—?' পরিতোষ টেবিলের ওপর হাত রেখে আঙুল ঘষল, 'আজ তবে থাক।' নির্মলা শিশুর মতন চোখ করে তাকাল। ওর নাক দীর্ঘ এবং দুর্বল। ডান চোখের নীচে,

গালে, একটি তিল আছে, পাঁউরির মতন ছোট্ট। নির্মলার গালের হাড় স্পষ্ট, চামড়া পাতলা, শিরা উপশিরার নীলাভ রেখা চোখে পড়ে মাঝে মাঝে।

পরিতোষ নিশ্বাস বন্ধ রেখে নির্মলার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক।

চোখের পাতা ফেলল নির্মলা। মৃদু গলায় বলল, 'আমার একটা লেখার আছে। আমি লিখি।'

'লিখবে?'

'শেষ করে রাখি।' নির্মলা নত চোখে বলল; গলার স্বর বিনীত।

'প্রশ্নের উত্তর?' পরিতোষ আরও একটু হাত বাড়িয়ে বই টানল।

'না'। নির্মলা মাথা নাড়ল, 'রচনা...'

বুড়ো আঙুলের বইয়ের পাতা সর সর করে উলটে গেল পরিতোষ। 'বিষয়টি কি?'

'কেমন যেন—' নির্মলা মুখে চোখে বিব্রত হবার ভাব করলে, মন যে বিষয়টি গুছিয়ে ধরতে পারছে না, ওর চোখের চাঞ্চল্য এবং স্তিমিত দৃষ্টি থেকে বোঝা যাচ্ছিল। একটু সোজা হয়ে বসল নির্মলা, ফাউন্টেনপেনটা টেনে নিয়ে খুলতে লাগল, 'একটি সুখের দিনের কথা—।' নির্মলা বিষয়টা বলল, সন্দেহ হল সে ঠিক মতন গুছিয়ে বলতে পারেনি, পরিতোষের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'হ্যাপিয়েস্ট ডে।...আমি কিছছু বুঝছি না কি লিখব।'

পরিতোষ থমকে গিয়ে তাকাল। রাস্তায় যেতে যেতে আচমকা কোনো নতুন জিনিস বা কোনো ঘটনা ঘটছে দেখলে যেমন থমকে দাঁড়ায় মানুষ, তাকিয়ে দেখে—সেই রকম চোখ করে পরিতোষ তাকিয়ে থাকল।

নির্মলা যেন লজ্জিত। খোলা কলম টেবিলে রেখে সে খাতা বার করল। ঘাড়ের কাছে বাসি বিনুনি সামান্য উঁচু হয়ে আছে। চুলগুলো রুক্ষ দেখাচ্ছিল।

পরিতোষ দোয়াতদানের ওপর চোখ নামিয়ে নিল। শুকনো পাত্র। লাল কিংবা কালো কোনো কালিই ছিল না। একটা কাশির মতন এল পরিতোষের। কাশল।

'লিখতে পারবে না?' পরিতোষ শুধলো অন্যমনস্ক গলায়।

'ভাল হবে না।' নির্মলা সংকোচ করে বলল।

'কি লিখবে?' ছাত্রীর মুখের দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে থাকল পরিতোষ।

নির্মলা নিশ্চয় আগে তার বিষয় ভেবে রেখেছিল। খুব নিঃসংশয় না হলেও তার ধারণা ছিল বিষয়টা এক্ষেত্রে চলে যাবে। পরিতোষের দিকে তাকাল নির্মলা। বলল, 'আমি দীঘা-র কথা লিখব।'

'দী-ঘা!' পরিতোষ অস্ফুট স্বরে তার বিস্ময় প্রকাশ করল।

সামান্য চুপ করে থাকল নির্মলা। তার মনে হল, হয়ত তার বিষয় ঠিক করা নির্ভুল হয়নি। পরিতোষের দিকে দুর্বল দ্বিধাগ্রস্ত চোখে চেয়ে বলল, 'দীঘায় বেড়াতে গিয়েছিলাম দিদির সঙ্গে। খুব ভাল লেগেছিল।'

পরিতোষ শুকনো দোয়াতদানের দিকে চোখ নামিয়ে নিল। অদূর থেকে নির্মলার মার গলা শোনা যাচ্ছে। হয়ত সকালের বাজার এসেছে, উনুন বয়ে যাচ্ছে বলে উনি রাগ করছেন। পরিতোষ হঠাৎ নিজেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন মনে করল এখানে। সে অকারণে বসে আছে।

'লেখ। দীঘায় বেড়ানোর কথাই লেখ।' পরিতোষ বলল অন্যমনস্ক গলায়।

নির্মলা খাতা খুলে কলম হাতে তুলল।

বাবাকে এখন নিশ্চিন্ত মনে ভাবা যায়। পরিতোষ দেওয়ালের দিকে একটু তাকিয়ে থাকল। জল ধরে একটা জায়গা বেয়াড়া রকম দাগ হয়ে আছে। পুরোনো আলমারির মাথায় খান দুয়েক ছবির ফ্রেম চাপানো আছে। একটা হরিণের মাথা একপাশে। কত বছরের ধুলো জমেছে। সিং দুটো যেন ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। এক সময় কোনো একদিন এই হরিণটা জঙ্গলে ছুটে বেড়াত।

স্বপ্নের প্রথমটা চকিতে মনে পড়ল পরিতোষের। বাবা যাত্রার আসরে দাঁড়িয়ে, আলোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, বাবার হাতে ছড়ি। সেই বাবা একটু পরে ডে-লাইটের তলায় হঠাৎ রাজা দশরথ হয়ে উঠল। দশরথের পোশাক পরা বাবাকে দেখে পরিতোষ চমৎকৃত। তার বাবা রাজা দশরথ। মার মুখ থেকে পানের জরদার গন্ধ পেয়ে পরিতোষ মাকে দেখল। মরা মুখ পূর্ণিমার চাঁদের মতন গোল এবং উজ্জ্বল করে দশরথকে দেখছে।

দশরথ পিতাকে পরিতোষ পরমুহূর্তে কালো চোগা পরে দলিল হাতে আদালত যেতে দেখল। বিনুমাসি দাঁড়িয়ে আছে পাথরের টেবিলটার কাছে। রোদ্দুরে বাবার

বারাণসী   শিল্পী : ইন্দ্র দুগার

চটি জোড়া শুকোচ্ছে। বিনুমাসি সেই চটিতে পা গলিয়ে যাবার সময় আছড়ে পড়ল। পরিতোষ ছুটে এল। বিনুমাসির কপাল ফেটেছে। বাবা আদালতে চলে গেল।

তারপর আর বিনুমাসিকে দেখা গেল না। সন্ধ্যে বেলায় বাবাকে দেখল পরিতোষ। কত বুড়ো হয়ে গেছে। পিঠ কুঁজো। গরম চাদরে গা ঢেকে বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জীর্ণ পরিত্যক্ত গৃহের মতন চেহারা।

"কোথায় যাচ্ছ?"

"নীচে।"

"নীচে কি—?"

"ওরা এসেছে।"

"কারা?"

"যারা আসে।"

"এই রোগা শরীরে তুমি আর নীচে নেম না, বাবা। আজ বড় শীত।"

"তুমি তোমার বাবাকে সারাতে পারবে না, পরিতোষ। আমি শেষ হয়ে গেছি। তুমিও শেষ হবে।"

"বাবা—"

তারপর কয়েদীর বেশে বাবা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। বাবার মাথায় সহস্র বৎসরের [illegible]ল। যেন কত পুরাতন মানুষ। বাবা আমায় দেখল না, চিনল না। নীচু মুখে হাত আড়াল করে চলে গেল।

পরিতোষ তাকাল। নির্মলা রচনা লিখছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের দিন তার রচনা-খাতায় আবর্জনার মতন পড়ে থাকবে। এই সুখ—দিদির সঙ্গে দীঘায় যাবার সুখ নির্মলা একদা তার স্বামীর কাছে অন্যভাবে বলবে: আমি একবার দীঘায় গিয়েছিলুম। [illegible]টী কাদাটে জল আর বালি। কিছছু পাওয়া যায় না। বাজে জায়গা।

দরজা থেকে অমলা ডাকল। নির্মলার বড় বোন—মেজদি, দীঘার দিদি নয়। "চা নিয়ে যা—' অমলা সাড়া দিয়ে চলে গেল।

মুখ তুলল নির্মলা। হুস হুস করে এক পাতা লিখে ফেলেছে। কলম রেখে চেয়ার ঠেলে উঠল নির্মলা, চা আনতে গেল ভেতরে।

পরিতোষ খাতাখানা টানবার জন্যে হাত বাড়িয়েও হাত গুটিয়ে নিল। তার মনে পড়ল, সে কখনও কখনও এরকম ভুল করে ফেলে, কিন্তু করতে চায় না, করা অন্যায় মনে করে। নির্মলা এখনও তাকে খাতাটা দেয়নি। যতক্ষণ না দেয় ততক্ষণ পরিতোষ নিতে পারে না।

হরিণের শিঙের দিকে তাকাল পরিতোষ। কিছুদিন এই হরিণটার শিঙে কে যেন কাগজের মালা জড়িয়ে রেখে দিয়েছিল। মালাটা আর নেই।

নির্মলা চা নিয়ে ফিরল। রাখল টেবিলে। আজ চিঁড়ে ভাজার বদলে কয়েকটা ডালের বড়া।

'তুমি কবে দীঘা গিয়েছিলে?' পরিতোষ শুধলো।

'অনেক দিন আগে—বছর দুই।' নির্মলা মৃদু স্বরে জবাব দিল।

ও! পরিতোষ আর কিছু বলল না। দু বছর আগে সে নির্মলাকে চিনত না। আরও দু বছর পরে এই রচনা লিখতে দিলে নির্মলা হয়ত তার বিষয়টা অন্য রকম করে নিত। লিখত না অবশ্য। কিন্তু ভাবতে পারত। এবং স্বামীকে বলত, মশাই, আমিও সেদিন কম খুশী হইনি, কিন্তু কেন বলব হয়েছি, তা হলে তোমার বুক ফুলে উঠবে।

মানুষ কত কমে, কত অবোধ সুখী হয়। প্লাস্টিকের তুলনাটা আবার মনে পড়ল পরিতোষের। বস্তা উজাড় করে ঢেলে সুখ বেচে দিচ্ছে ব্যাপারীরা। তুমি একটি দুটি পয়সা দিয়ে কিনে নাও। হা রে বোকা, কিনে নে কিনে নে; ফুরিয়ে গেলে আপসোস হবে।

পরিতোষ সারা দিনেও সুখ কিনল না। দুপুরটা মেঘে মেঘে কাটল, ভিজে চুলের মতন এই বাদলা আর শুকলো না। স্কুলে জ্যোতি-মাস্টার কয়েকটা সুখের বস্তু দেখাল, দশটা টাকা আগাম দেবার সময় কেরানীবাবু কোকিলের মতন গলা করে বলল: যেজন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি... সবই ত নিয়ে নিলেন স্যার, আশুগৃহে আর বিশ পঁচিশ টাকার বেশী পেতে হচ্ছে না।

বিকেলে পরিতোষ বিশ্রামরত বৃদ্ধের মতন এক পরিত্যক্ত ছোট মাঠে শুয়ে থাকল। অল্প ঘাস, মাটি, কাদা, গোবর আর ভাঙা একটা মটর গাড়ি ছাড়া সেখানে কিছু ছিল না। হাওয়ায় ট্রাম-রাস্তার বিকার কিছু কিছু ভেসে আসছিল।

সন্ধ্যা হল। মেঘ বৃষ্টি দান করলে পরিতোষ ভিজতে ভিজতে বড় রাস্তায় এল। সিনেমা ঘরের দীপ্ত ললাটে টীকা জ্বলছে, পর্যাপ্ত পেট্রলের গন্ধ, ছাল ছাড়ানো উপাদেয় কাঁচ পাঁঠা কাচের অন্তরালে কবন্ধ দেহ নিয়ে ঝুলছে, রিকশায় তরুণ তরুণী, বেবি ট্যাক্সীর অন্ধকারে প্রসাধিত রঙ্গমা। অজস্র সুখান্বেষী পিপীলিকা এই জগতের সহস্র সুখকণা সংগ্রহে ছুটেছে।

রাত্রে নিত্যকার মতন পরিতোষ এক কুণ্ঠ-শালায় এল। গলিত হলুদ চক্ষুর মতন একটি বাতি জ্বলছিল।

"আজও এলে?"

"এলাম।"

"তোমায় এত করে বলি, এসো না—এসো না।"

পরিতোষ বসল। সে সারা দিনমান ভ্রমণে ক্লান্ত। সে ক্লান্ত, কিন্তু অসহিষ্ণু নয়। ভিজে জামাটা খুলল। মাথার চুলে জল, মুখে জল, গলা কণ্ঠা ভিজে আছে। ঠাণ্ডা লাগছিল। একটু শীত করল। কাশল পরিতোষ। বুকের তলায় সেই পুরাতন শিরাটা ব্যথা করে উঠল।

"তুমি একদিন আপসোস করবে।"

"কবে?" পরিতোষ গায়ের গেঞ্জি খুলে ফেলল।

"কি করে বলব কবে, তবে করবে একদিন।"

পরিতোষ মাথা নাড়ল। না, সে আপসোস করবে না।

গা মুছে, শুকনো কিছু পরে পরিতোষ শুয়ে পড়ল। তার শীত করছিল, বুকের ব্যথা কাঁটার মতন ফুটে আছে। জ্বর আসছিল পরিতোষের।

বাবাকে মনে করছিল পরিতোষ। বিনু-মাসির মৃত্যুর পর বাবা অনুভব করতে পেরেছিল, কোনো বিচারকের অমোঘ দণ্ডে বাবা দণ্ডিত। কলুষ কৃতান্ত সেই মহা-চক্ষুর অগোচরে বাবা তার নকল দলিল লিখতে পারেনি। মা, বিনুমাসির মেয়ে ও ছেলে, বিনুমাসি বাবাকে কয়েকটি কৈকেয়ীর মতন পথরোধ করল। বাবা এদের প্রত্যেকের কাছে তার বন্ধন অনুভব করল। এবং বাবা জানল, তার সমনে এই বিচারশালার ছাপ পড়ে গেছে।

পরিতোষ চোখ বন্ধ করে আছে। তার জ্বর আসছে। শরীরের অন্তরালে ইন্দ্রিয়-গুলি পুড়ছে, জ্বালা করছে, যন্ত্রণা হচ্ছে। এই যন্ত্রণা পরিতোষ সহ্য করবে। সহিষ্ণু হবে। সে সুখ কিনবে না। কেননা তার বাবা হরিণ-সুখ কিনতে গিয়ে সংসারের একটি পবিত্র তাপসকে হত্যা করেছিল। এই অভিশাপে বাবা দণ্ডিত হল। পরিতোষ দণ্ডিত পিতার সন্তান।

জ্বরের ঘোরে এবং যাতনায় পরিতোষ অনুভব করল, সে বনবাসী রামের মতন পিতাকে শোক ও মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করে বনপথে যাত্রা করেছে। সে একা। তার বনবাস দীর্ঘ।

অনেকটা জ্বরে একবার শুধু পরিতোষ জড়িত স্বরে তার বাবাকে ডাকল।

আসে লংকায়—সেই হয় রাবণ' এটা প্রবাদ বাক্য। কিন্তু যে আসে ভারতবর্ষে সেই যে রচয়িতা হয়ে ওঠে—এটা প্রবাদ বাক্য নয়, ঐতিহাসিক সত্য। পর্যটক অথবা পরিব্রাজকের পরিচ্ছদে যাঁরাই ভারত-ভূমিতে একবার পদার্পণ করেছেন, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁদেরই রূপান্তর ঘটেছে পর্যটক থেকে প্রাবন্ধিকে, রচনা করেছেন বহু-পরিচ্ছেদ সমন্বিত গ্রন্থরাজী। রম্য-বিচরণের পরিণাম এসে থেমেছে রম্য রচনায়। চোখের দেখা উৎসাহিত করেছে হাতের লেখাকে। অনেকটা যেন 'মূকং করোতি বাচালং'-এর মত। ভারতবর্ষের দ্বার চির-দিনই উন্মুক্ত ছিল বিদেশীর জন্যে। আর ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য ও স্বর্ণের ভান্ডার চিরকালই লুব্ধ করেছে বিদেশীকে—কখনও তা লুণ্ঠনের অভিসন্ধিতে, কখনও তা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করার অভিপ্রায়ে। পর্যটক-পরিব্রাজকেরা এদেশে পদার্পণ করেছেন শেষোক্ত কারণে। এবং দেশ-দেশান্তর থেকে তাঁদের আসা-যাওয়ার অবিরাম স্রোত কাল-কালান্তর ধরে প্রবাহিত হয়েছে।

গ্রীক মেগাস্থিনিস এসেছিলেন দূত-রূপে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায়। চৈনিক ফা-হিয়েন এবং হিউ-এন-সাঙ-এর আগমন ঘটেছিল যথাক্রমে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের 'সুবর্ণযুগে' ও হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে। মুসলমান অল্‌ বেরুণি এসেছিলেন মাহমুদের ভারত আক্রমণের সময়। আফ্রিকান ইবন-বতুতা দিল্লিতে দীর্ঘকাল কাটিয়ে গেছেন মহম্মদ বিন তোগলখের অনুগ্রহে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে ইউরোপীয়র সঙ্গে ভারতবর্ষের দৃষ্টি বিনিময় হল, তিনি ইতালীয় মার্কো-পোলো। মধ্য যুগে আবির্ভাব ঘটেছে পারসীক আব্দুর রজাক, রুশ আফানিসি নিকিতিন, পর্তুগীজ পায়েজ ও নুনিজ ও ইতালীয় নিকোলো কন্টির। এ'দের সকলের অভিজ্ঞতাই খন্ড কালের এবং দেশ-কালের সীমায় খন্ডিত, তবুও তাঁদের স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার স্বহস্ত রচিত বিবরণ ভারতবর্ষের ইতিহাস-রচয়িতার সম্মুখে উপস্থিত করেছে অনেক মহামূল্য উপাদান-উপকরণ।

হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটায় আবৃত

সে-যুগের গ্রামবাসী

মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে ভারতবর্ষে। সম্রাট আকবর ধর্ম-নিরপেক্ষ বলেই সর্বধর্মের সার গ্রহণে তাঁর উদার আগ্রহ। খৃষ্টধর্মের সারতত্ব কি সে বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য গোয়ার পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের কাছে তাঁদের যে-কোন একজনকে রাজসভায় প্রেরণের জন্যে আবেদন ও আমন্ত্রণ জানালেন। এলেন দুজন জেসুইট ধর্মযাজক। ফাদার রিডোল্‌ফো একোয়াভাইভা ও ফাদার এন্টোনিও মনসেরেট। মনসেরেট সম্রাট আকবরকে কতখানি ধর্ম-জ্ঞান দান করেছিলেন সেটা যতই অজ্ঞাত হোক, আকবরের রাজত্ব-কাল সম্বন্ধে তাঁর অবদান আমাদের অবিদিত নয়। কারণ সে-সম্বন্ধে তিনি ল্যাটিন ভাষায় রচনা করেছিলেন একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

জাহাঙ্গীরের রাজত্ব জমজমাট। একদিন ইংলন্ড থেকে রাজা প্রথম জেমস-এর অনুরোধ-পত্র বহন করে জাহাঙ্গীরের রাজ-দরবারে প্রকান্ড সেলাম জানালে এক ইংরেজ। নাম ক্যাপ্টেন হকিন্স। কী ব্যাপার? কী প্রার্থনা? ইংরেজরা অবাধ বাণিজ্যের অধিকার চায় ভারতবর্ষে। প্রার্থনা মঞ্জুর হতে গিয়েও সেটা বানচাল হয়ে গেল পর্তুগীজদের প্ররোচনায়। জলপথের একচেটিয়া ব্যবসাটা যে তাহলে জলাঞ্জলি দিতে হয় তাদের। তাদেরই ভাস্কো-ডা-গামা কত দুর্যোগ-দুর্ভোগকে উপেক্ষা করে আবিষ্কার করেছে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশের জলপথ। সুতরাং বাণিজ্যের অধিকার তাদেরই একচ্ছত্র। অন্য কোন বণিকের সঙ্গে তারা বনিবনা করতে রাজী নয়। হকিন্সকে অগত্যা হতোদ্যম হয়ে প্রস্থান করতে হল স্বদেশে—শূন্য হাতে। কিন্তু শূন্য হৃদয়ে নয়। ভারতবর্ষে যে তিন বছর তিনি অতিবাহিত করেছেন, তারই অভিজ্ঞতাকে রূপ দিলেন ভাষায়।

হকিন্স গেল, এল টমাস রো। পর্তুগীজ-দের বাধা সত্ত্বেও টমাস রো ছলে-বলে-কৌশলে সম্রাটের মনোরঞ্জন করে সফলকাম হলেন তাঁর অনুগ্রহ আহরণে। ভারতবর্ষে

ইংরেজদের বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্যের সম্ভাবনা রচনা করলেন তিনি। সেই সঙ্গে রচনা করলেন একটি বিরাট গ্রন্থ। তার পত্রে পত্রে মোগল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য-মর্মর।

জাহাঙ্গীরের পর সিংহাসনে সমাসীন হলেন শাজাহান। তাঁর রাজ্যে আগমন ঘটল দুজন ফরাসীর। একজনের ব্যবসা চিকিৎসা। নাম বার্নিয়ে। আর একজনের বাণিজ্য মণি-মুক্তার। নাম তাভার্নিয়ে। এ-ছাড়া আরও দুজন পর্যটক এসেছিলেন আরও দুই দেশ থেকে, তার মধ্যে একজন ইতালীয় মানুচি আর একজন ইংরেজ পিটার মাণ্ডি। এঁদের প্রত্যেকেই তাঁদের ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে স্মরণীয় করে রেখেছেন লিখিত বিবরণে। প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রও স্বতন্ত্র। কিন্তু সমকালীন সমাজের নিখুঁত বর্ণনায় প্রতিটি রচনাই সমুজ্জ্বল।

এরপর ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদের আগমন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুরাট থেকে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ থেকে সুতানটি পর্যন্ত তাদের কুঠির সংখ্যা বাড়িয়ে চলল। তারপর একদিন বিরাট এক দুর্গ বানাল গোবিন্দপুরে। অবশেষে একদিন সুতানটি, গোবিন্দপুর আর ডিহি কোলকাতার ইজারা লাভ করে গড়ে তুলল শহর কলকাতা। তারপর পলাশীর যুদ্ধ। সেই রণক্ষেত্র থেকে শুরু হল মোগল সাম্রাজ্যের পতন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উত্থান। যা কালক্রমে ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের জনক। কোম্পানীর আমলের শুরু থেকেই ভারতবর্ষে বিশেষ করে কলকাতায় ইংরেজদের আনাগোনা দশক থেকে শতক, শতক থেকে সহস্রের কোঠায় পৌঁছতে লাগল। শাসন পরিচালনার জন্যে আসে গভর্নর। বিচার ব্যবস্থার সুরাহা করা জন্যে আসে জাস্টিসেরা। পাদ্রীরা সমবেত হয় ধর্মপ্রচারের উগ্র উৎসাহে। আপিস-আদালতে কলম-পেষার কাজের জন্যে আসে তরুণ ইংরেজ 'রাইটার'রা। তাদের জীবনকে দাম্পত্যে মধুময় করে তোলার জন্যে আসে জাহাজ-বন্দী ইংরেজ ললনা। রাজ্য রক্ষা কিংবা আত্মরক্ষার জন্যে আসে সৈন্য-সেনাপতি। এ ছাড়াও যারা আসে তাদের কেউ চিত্রকর, অভিনেতা, কেউ সাংবাদিক, কেউ বা অধ্যাপক-শিক্ষক, কেউ গবেষক, কেউ রাজনীতিবিদ। কেউ ডাক্তার, কেউ বা কবি। জীবনের গন্তব্যপথ প্রত্যেকেরই ভিন্নমুখী। কেবল এদের মধ্যে অধিকাংশের মিল যে জায়গাটিতে—সেখানে তারা সকলেই রচয়িতা। কারো রচনা আত্ম-কথা, কারো বা স্মৃতিচারণ। কেউ এঁকেছেন সমাজের বাইরেটা, যা দশের চোখ ভোলায় গাড়ী ঘোড়া, নাচ-গান-থিয়েটার রঙ্গ রস, বাঙালী বাবুর বাড়ীর দুর্গোৎসবে বাঈজীর নাচ, কিংবা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নানা কেচ্ছা-কলঙ্কের কাহিনী। কেউ এঁকেছেন সমাজের ভেতরটা, যা দেশের আত্মাকে প্রকাশিত করে। শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা-দীক্ষা, স্কুল-কলেজ, সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতির ক্রমবিকাশ, শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তা-ভাবনায় বিশ্ব-নাগরিক হয়ে ওঠার বাসনা। শুধু কলকাতা নয়, কোন কোন রচনার কেন্দ্র ভারতবর্ষ অথবা মাদ্রাজ অথবা দিল্লি কিংবা অন্য কোন স্থান। কিন্তু উপলক্ষ্য যে স্থলই হোক, কলকাতা প্রায় কোনখানেই উপেক্ষিত নয়।

সম্পদ ও সাম্রাজ্যলাভের লোভে ভারতবর্ষে এসে সুসভ্য ইংরেজ শুধু যে উদ্ধত অসি চালনাতেই অমিতাচারী হয়ে উঠেছিল তাই নয়, মসী চালনার ক্ষেত্রেও সংযমী ইংরেজরা তাদের যে-উন্মাদনা উৎসারিত করেছে সেটাও অপরিমিত। 'রাইটার' অর্থাৎ কেরানী হওয়ার জন্যে সংখ্যায় যত ইংরেজ সমুদ্র ডিঙিয়ে এদেশে এসেছিল, তার চেয়ে সংখ্যায় হয়তো দ্বিগুণ হবে তারা যারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে 'রাইটার' অর্থাৎ রচয়িতা হয়ে উঠেছে। সে-সব রচনার অধিকাংশই হল ভ্রমণ কাহিনী। এবং সেসব ভ্রমণ কাহিনীর অধিকাংশই হল কোন একটি বিখ্যাত ছড়ার 'শ্রীমান সমরেশ সেন'এর মতই লিখেছেন যা দেখেছেন। যদৃষ্টং তল্লিখিতং। জবানবন্দী কেবল সেইটুকুর যে ক্যাপ্টটুকুকে নজরবন্দী করতে পারা গেছে।

জর্জ এবার্গ ম্যাক এমনি একজন ইংরেজ ও পর্যটক। কিংবা তিনি পর্যটক নন, শুধুই ইংরেজ। রাজকার্যে এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরূপেই এদেশে আগমন ঘটেছিল তাঁর। সম্ভবত এদেশের রাজ্য-শাসন পদ্ধতি তাঁর মনঃপূত না-হওয়ার ফলেই তিনি প্রস্থান করে থাকবেন স্বদেশে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতভূমিকে স্বদেশে ফিরেও তাঁর পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয়নি। সেখানকার 'ভ্যানিটি ফেয়ার' পত্রিকায় নিয়মিত ভারতবর্ষ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। ভারতবর্ষের পাঠক মহলে সে-সব রচনা তুলল প্রবল আলোড়ন তার সমাদর ও সুখ্যাতি মুখে মুখে। ভারতবর্ষের সনির্বন্ধ অনুরোধ গিয়ে পৌঁছল কর্তৃপক্ষের কাছে। এই রচনা-গুলি যেন একটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। তাই হল। গ্রন্থকারে

প্রকাশিত হয়ে তার নাম হল 'টুয়েণ্টি ওয়ান ডেজ ইন ইণ্ডিয়া'। অবিলম্বে বইখানির ললাটে একাধিক সংস্করণের রাজটীকা পড়ল। প্রকাশিত হল সচিত্র রাজ সংস্করণ। শুধু জন-সমাদর লাভে কৃতকার্য ও কৃতার্থ হয়েছে বলেই বইখানি এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। সে-রকম বই সংখ্যায় একাধিক রয়েছে। তাদের ঐতিহাসিক মূল্যে এর চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশী। ম্যাকির 'ভারতবর্ষে একুশ দিন'-এর বৈশিষ্ট্য অন্য ক্ষেত্রে। এটিকে সাধারণভাবে ঐতিহাসিক গ্রন্থ আখ্যা দেওয়া অসম্ভব। জার্নাল তো নয়ই। ভ্রমণ কাহিনী? না তাও নয়। নিছক কিছু মজাদার কাহিনীর ককটেল? সেখানেও অপ্রাপ্তি।

ম্যাকি ভারতবর্ষে একুশ দিন কাটিয়ে (রেচনা পাঠে অবশ্য এ বিশ্বাস সমার্থিত হওয়া মুস্কিল। মাত্র একুশ দিনের অভিজ্ঞতার পক্ষে এত তীব্র তিক্ত, তীক্ষ্ম ও বিস্তৃত চরিত্রলাভের দৃষ্টান্ত বিরল) চোখ দিয়ে যা দেখেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ-দানে পৃষ্ঠার সংখ্যা এবং গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি মনযোগ দেননি। এবং তাঁর কোন বিবরণই সাল তারিখে কণ্টকিত নয়। কণ্টক আছে অন্যত্র। ছদ্মবেশে, ছত্রের অন্তরালে। এবং অন্তর্ভেদী তার ক্রিয়া। আসলে এ-গ্রন্থে লেখকের ভূমিকা সংবাদ-দাতার নয়। সমালোচকের। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, যারা রাজ্যশাসন করে, রাজ্য শাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থেকে যারা পদ এবং অর্থ এই দুয়ের সম্মিলন থেকে এক অপদার্থ জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে এবং রাজ্য শাসনের পরিণামে যারা ভোগ করে অস্থির যন্ত্রণা ও অস্থিসার জীবন তারা সকলেই এই গ্রন্থের কুশীলব। তাদের কারো প্রতি লেখকের প্রখর ভ্রুকুটি, কারো প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত। কিন্তু কাউকেই তিনি লিখেছেন-যা-দেখেছেন ভাবে চিত্রিত করেন নি। বুঝেছেন যা তাই-ই লিখেছেন। এবং লেখার পিছনে প্রতি মুহূর্তে ক্রিয়াশীল ভূমিকা নিয়েছে তাঁর মস্তিষ্কের বুদ্ধি-বিচক্ষণতা, অধ্যয়ন ও সমাজবোধ। আর তারই সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি, করুণা, বেদনা ও বিরল রসবোধ। সম্পূর্ণ গ্রন্থটির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পক্ষে এ-আলোচনার পরিসর পরিমিত। এবার তাই বিভিন্ন রচনার অংশ বিশেষের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে পাঠক ও লেখকের মধ্যে পরিচয় অথবা পরিণয় সাধনেই এ প্রবন্ধের পৌরোহিত্যের পালা শেষ হবে।

ভাইসরয়

ভাইসরয়ের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে আমার দৃষ্টি কখনো ক্লান্ত হয়নি। আমাদের চেয়ে তিনি এমনই এক সৃষ্টি ছাড়া বিচিত্র জীব। তিনি এমন এক জগতের কেন্দ্রে

ভাস্কো-ডা গামা ও কালিকটের জামোরিন

অবস্থান করেন যার সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নেই। তিনি যেন এক বোরখা-ঢাকা ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্মগুরু। ভারতের অক্ষরেখা তিনিই, তাঁকে কেন্দ্র করেই সারা সাম্রাজ্যের নিত্য আবর্তন, ফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা-কিছু জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য সমস্তই তাঁর অজানা থেকে যেতে বাধ্য। তাঁর আধ আধ বাণীতে কোনদিনই কোন ভারতবাসীর ভাষা শোনা যায়নি, ভারতবর্ষে জাতি ধর্ম এবং জীবনযাত্রা কিছুই তাঁর গোচরীভূত বা জ্ঞাত নয়। সূর্যকরোজ্জ্বল সেই সব প্রদেশ যা রেলপথ-বিবর্জিত, তাঁর কাছে সেগুলি অনাবিষ্কৃত দেশ ছাড়া আর কিছু নয়। হিন্দু, মুসলিম অথবা অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর দৃষ্টির সামনে সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়ে গড়ে তোলে স্বাতন্ত্র্যহীন সাদৃশ্যহীন এক ছায়াময় জনতার ছবি।

একজন নবাব, বৈদেশিক দপ্তর একবার যাঁকে আমার কাছে উপস্থিত করেছিল, তিনি প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করতেন যে, একজন ভাইসরয়ের প্রয়োজনটা কি? আমি বিশ্বাস করিনি যে এ তাঁর নির্দোষোক্তি। হয়তো এ-প্রশ্ন বহুবার তাঁর অন্তরে আলোড়ন জাগিয়ে শেষে ওঠে উচ্চারিত হয়েছে। এর জবাবে আমি তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করতাম—ভারতবর্ষেরই বা টিকে থাকার প্রয়োজনটা কিসের? তাঁর দেখার সে চোখ নেই, আসলে এ ব্যাপারে প্রাচ্য-মনটাই এমনি দৃষ্টি-ছুট যে, ভাইসরয়-ই হল ভারতবর্ষের পরমা গতি এবং পরম পুরুষ। এরা জানে না যে ভারতবর্ষ হল সেই গাছ, ভাইসর যার ফুল।

কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ এর সঙ্গে

কলকাতা এবং সিমলায় গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রাযাপন করেন বালিশের নীচে একটি রিভলভার লুকিয়ে রেখে—সেই রিভলভারটিই হল কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ। কথিত আছে যে এ-রিভলভারে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ এবং এও অনেকের বিশ্বাস যে, এ-রিভলভারের ভেতরটা থাকে সব সময়েই ফাঁপা।

কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ একাই একশ, একটি পুরো সৈন্যবাহিনীর সমতুল্য। তাঁর আসা-যাওয়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্যে নিয়ত নিযুক্ত রয়েছে নানা দপ্তর এবং নানা দায়িত্বশীল অফিসার। 'He is a host in himself; and a corps of observation.'

গোটা পৃথিবীর চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে। তাঁর সামান্যতম নড়াচড়ার আভাসে অক্ষরের শরীরে আনবিক শক্তির বিস্ফোরণ ঘটে এবং তা প্রতিধ্বনিত হয় সংবাদপত্রের ছত্রে ছত্রে।

কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন পৃথিবী কোন রকম পরিবর্তনকে উপলব্ধি করে না। তাঁর জন্মলাভ ঘটে জগৎসংসারের অজ্ঞাতেই। বিগলিত পিতা অথবা বিবর্ণা মাতা কেউই কোনদিন তাঁদের সংসারে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের জন্ম-লাভের ঘটনাকে অনুভব করতে সক্ষম হননি।...কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ এ ব্যাপারে কবিদের ঠিক উল্টো। কিন্তু যখন একজন কমাণ্ডার-ইন-চীফের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটে—তখন সহস্র বেঠোফেনের আত্মা যেন বাতাসে বিপুল ক্রন্দনে বিলাপ জাগিয়ে তোলে, ভোঁতা কামান গভীর শোকের অতল গহ্বর থেকে গর্জন করে ওঠে থেমে থেমে, নির্বোধ রাইফেলগুলো তাঁর সমাধির উপরে একটানা দ্রুত ও অসংলগ্ন বাচালতা চালিয়ে যায় নির্দয় নিষ্ঠুর ভঙ্গীতে, আর ঝালর-ঝোলানো টুপীটা চিরকালের মত শূন্য হয়ে

চেপে বসে কফিনের উপর বেদনাকে উপহাস করার মত বিকৃত মুখভঙ্গীতে।

গভর্নমেন্ট-সেক্রেটারীর সঙ্গে।

শুনেছিলাম তিনি চতুর। এবং চতুর হওয়ার ফলেই তাঁর আচরণে এমন বিমর্ষতা, সাজসজ্জায় এত শৈথিল্য। লোকে মাঝে মাঝে ভুলতে বসে যে তিনি চতুর। অথচ তিনি সর্বক্ষণই চতুর। তাঁর বয়সে তিনি যথেষ্টই চতুর। কখনো ঘোড়ায় চড়া শেখেননি। ভাল করে কথা বলাও তাঁর শেখা নেই। তাই যেহেতু তাঁর পক্ষে ইংরেজি ভাষায় বুদ্ধিমান-সুলভ একটি গোটা বাক্য রচনা করা নিতান্তই সাধ্যাতীত, এবং যেহেতু বাস্তব ও ব্যবহারিক জ্ঞানে তিনি যথেষ্টই সমৃদ্ধ, সেহেতু আধ-ডজন শব্দের ব্যবহারেই তিনি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান এবং প্রচুর সম্মান অর্জন করলেন। এইভাবে দিনে দিনে তিনি ক্রমশই আরও চতুর আরও সক্ষম হয়ে উঠতে লাগলেন, যতদিন পর্যন্ত না সমসাময়িকেরা তাঁর অশেষ কৃতিত্বে যার-পর-নাই বিস্মিত হলেন, লেফটনান্ট গভর্নর এগিয়ে এলেন সম্মান শ্রদ্ধা জানাতে, সকন্যা বড় মেম-সাহেবরা তাঁর সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করলেন। এই সময়েই ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হল তাঁর প্রবন্ধ।...লোকের ধারণা জন্মাল যে তিনি একজন মস্ত বড় পণ্ডিত, এবং সম্ভবত সমসাময়িককালে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রের নিশ্চয়ই আদান-প্রদান চলেছে নিত্য-নিয়মিত। প্রশংসা এমনই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল চতুর্দিক থেকে যে এক সময় তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর কিছু কর্তব্য রয়ে গেছে। তিনি ধর্ম ত্যাগ করলেন। লোককে ভাববার সুযোগ দিলেন যে, তিনি হয়তো প্রত্যক্ষবাদী, অথবা বৌদ্ধ অথবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী—যা তাদের অজ্ঞাত। এইভাবে তিনি উচ্চপদ অধিকারের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে উপযুক্ত হয়ে উঠলেন।

হিজ এক্সেলেন্সী বেঙ্গলীবাবু।

আমি যখন লাসায় ছিলাম,—সেখানকার দালাই লামা আমাকে জানিয়েছিলেন যে ধর্মপ্রাণা স্ত্রী-হিপোপটেমাসেরাই তাদের পরবর্তী জন্মে প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে কলকাতা ইউনিভার্সিটির আণ্ডারগ্রাজুয়েট হয়ে জন্মায়। এবং সেই আণ্ডার গ্রাজুয়েটকে যখন কালো কুচকুচে পাম্প-সু এবং ইংরেজী আদব-কায়দা চাল-চলনে অভ্যস্থ হতে দেখা যায়—তখন সেই পদার্থটিই হল বাবু।

আমি ভুলে গেছি বাকিংহামের ডিউক অথবা মিঃ লেথবার্জ, অথবা জেনারেল সিন্ডিয়া, আমি সব সময় এই সব C I E দের এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেলি, এদেরই কেউ একজন আমাকে জানিয়েছিল যে, বাঙালী বাবুরা কদাচিৎ হাসেন, হাসির পরিবর্তে তাঁদের কণ্ঠে যা উচ্চারিত হয় তা কুমীরের মত একপ্রকার মুখ চাপা টিক টিক শব্দ। এটা খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে বাবুরা যদি একজন C I E-র কাছেও না হাসেন, তাহলে বিশ্বসংসারে আর কিছুই নেই যার প্রতি তাঁদের হাসি ফুটবে। ইন্দ্রিয় বৃত্তির এই ঘাটতি পূরণ অত্যাবশ্যক।

লর্ড মেকলে বলেছিলেন:—নারকেলের সঙ্গে দুধের যে সম্পর্ক, সৌন্দর্যের সঙ্গে মহিষের যে সম্পর্ক, মহিলাদের সঙ্গে অপবাদ-কলঙ্কের যে সম্পর্ক তেমনি ডাঃ জনসনের অভিধানের সঙ্গে সম্বন্ধ বাঙালী বাবুর। সন্দেহ নেই যে এই উক্তির মধ্যে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অতিশয়োক্তির ভেজাল যথেষ্টই, তবু এর মধ্যে সত্যের শাঁস লুকিয়ে আছে অনেকখানি। বাবুর বাক্যেই বাবু প্রকাশিত।

"The true Baboo is full of words and phrases—full of inappropriate words and phrases lying about like dead men on a battle-field....You may turn on a Baboo at any moment and be quite sure that words and phrases, and maxims and proverbs will come gurgling forth, without reference to the subject or to the occasion, to what has gone before or to what will come after."

সম্ভবত ভাষা ব্যবহারের এই জাতীয় স্বাধীনতা, সাবলীলতা ও স্ফূর্তির প্রতি দৃকপাতের ফলেই লর্ড লিটন ঘোষণা করে-ছিলেন যে বাঙালী হল "the Irishman of India".

রাজার সঙ্গে

"Dear Vanity" হেসো না। এ নিষেধে তুমি কিছু মনে করবে না তা জানি, কিন্তু ভারতবর্ষের রাজারা বড় বেশী অনুভূতি-প্রবণ। কয়েকদিন আগে এক তরুণ রাজাকে আমি অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলাম তাঁর সম্বন্ধে 'Purple India' নামক গ্রন্থে Val Prinsep যা লিখেছেন। লেখক কেবল বলেছেন যে, তিনি একটি লম্পট গর্দভ, এবং একটি কুৎসিত 'ব্যাবুন'। শুনে বালক-রাজাটি এমন আঘাত পেলেন যে তৎক্ষণাৎ তিনি কাঁদতে শুরু করে দিলেন। তখুনি একজন পারিষদকে ডেকে পাঠালুম তাঁকে শান্ত করে ও ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা করতে। তুমি যদি দার্শনিকের মন নিয়ে বিচার কর তাহলে বুঝবে এইসব রাজাদের

জীবনে কোন কিছুই কিম্ভূত-কিমাকার নয়। তুমি নিজেকে তেমনি একজন রাজা বলে কল্পনা করে নাও, যে রাজা কোনদিন সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে মদ্যপান করেননি, প্রভুত প্রভুত্ব ও আড়ম্বরের মাঝেও তিনি কোনদিন তাঁর five-and-twenty queens' 'five-and-twenty grandduchesses' এর কাছে কোনদিন অবিশ্বাসের পাত্র হননি, বক্ষে কিংবা উদরে হীরামুক্তার অলঙ্কার ঝুলিয়ে নিজেকে শোভিত করেননি, মুখে লাল পরাগের প্রলেপ লাগাননি, এবং যিনি কচিৎ-কদাচিৎ তাঁর নিজস্ব ঘটনাবলীর প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে থাকেন, আমি বুঝতে পারি না তুমি এ-রকম একজনকে ভারতীয় রাজা মনে করবে না কেন? নাকি, সমস্ত ব্যাপারটাই কাল্পনিক।

অবশ্য ভারতবর্ষ অত্যন্ত রুচিবাগিশ দেশ নয়, এতকাল পর্যন্ত তাই গভর্নমেণ্ট এ ব্যাপারে খুব তৃপ্ত। ভারতবর্ষের জনসাধারণ রাজাদের রুচি-অরুচি নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। একজন চাষী একবার আমাকে ও মিঃ কেয়ার্ডকে জানিয়েছিল—'আমরা দরিদ্র চাষী। আমাদের পক্ষে রাজাকে প্রতিপালন করা সাধ্যাতীত। রাজারা লর্ড সাহেবদের জন্যে।' Kuch Parwani'-র মহারাজা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আজকের দিনে রাজাকে আর শাসনকর্তা হিসেবে ভাবা যায় না। একজন সত্যিকারের ঐশ্বর্যপুষ্ট রাজা কেবল নিজের চিত্তবিনোদনেই তৃপ্ত। প্রথমজন সঞ্চয় করে অর্থ। অপর জন করে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে খেলা। তৃতীয়জন ঘোড়দৌড় নিয়ে ব্যস্ত। চতুর্থজন প্রণয়াসক্ত। পঞ্চমজন মদ্যপ। এটা মহারাজারই সিদ্ধান্ত। দেখ দয়া করে একথা আমিই তোমাকে জানিয়েছি কাউকে বোলো না, ফরেন-সেক্রেটারী জানেন যে এইসব রাজাদের সম্পর্কে আমি খুবই উচ্চমত পোষণ করি। আমোদপ্রিয় কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন অনুগত শ্রেণী ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই।

তারা তাদের তাসের ঘর গড়ে তুলেছে বৃটিশ শাসনের পল্কা মাটিতে যা এখন ঢেকে রেখেছে আগ্নেয়গিরির মুখ, এবং তারা সর্বদাই প্রস্তুত এক পানপাত্র জল কোন একটা ফাটা অংশের ফাঁক দিয়ে ঢেলে দেবে যাতে নীচেকার সেই ধূমায়িত বিস্ফোরক শক্তি ঠাণ্ডা হয়ে জুড়োয়।

রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে॥

রাজনীতিবিদেরা হল ভারতবর্ষে আমলাতন্ত্রের এক কৌতুককর সৃষ্টি। এর কাছে সাদাবাবু অর্থাৎ বাবু ঘেঁসা ইউরোপীয়ানরা নিতান্তই তুচ্ছ।...রাজনীতিবিদেরা হল আমাদের 'সাম্রাজ্য' নামক জনপ্রিয় প্রহসনের গ্রীক কোরাস। ফরেন সেক্রেটারী তার প্রম্পটার। দল তৈরী হয়েছে নবাব রাজা-মহারাজাদের নিয়ে সেখানে ডিউক অব বাকিংহাম একজন 'সুপার'। লর্ড মেরিডিথ-এর কাজ সীন ওঠানো-নামানো। স্যার জন, ম্যানেজার। সেক্রেটারী অব স্টেট তাঁর কাউন্সিল সহ বসেছেন স্টেজ-বক্স দখল করে। স্টলে বসেছেন হাউস-অব-কমন্স। লণ্ডন প্রেস গ্যালারীতে।

লাল চাপরাশী॥

"The red-coated chuprassie is a cancer in our Administration." এর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যে কোন রকম 'সার্জিকেল-অপারেশন' আমরা সানন্দে মেনে নিতে রাজী আছি।...ভারতবর্ষে এমন কোন শহর, কোন মফঃস্বল, শহর থেকে দূরে কোন 'সেটেলমেণ্ট' আপিস খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে চাপরাশী খুঁজে পায়নি তার শঠতার সঙ্গীকে। পুলিশ এবং 'cut-cherry' মুহুরীরা এবং দেশীয় অফিসারেরা সর্বদাই তার পিছনে।

কলেক্টরের বারান্দায় তাকে বসে থাকতে দেখা যাবে যেখানে শুল্ক বিভাগের রসিদাদির আদান-প্রদান ঘটে। কোন দেশীয় সাক্ষাৎ প্রার্থীর সেখানে প্রবেশ করার সাহস নেই যদি না চাপরাশীর হস্তে পূর্বাহ্নেই কিছু দক্ষিণা দান করা হয়ে থাকে। চাকরীর উমেদারী নিয়ে এসেছে এমন যুবক, আমাদেরই স্কুলে সে শিক্ষিত, সততা, একতা, সুবিচার এবং অর্থশাস্ত্র এবং অন্যান্য বাকী সমস্ত বিষয়েই যার জ্ঞান অসামান্য, তাকেও দেখা যায় করজোড়ে চাপরাশীকে সম্বোধন করছে 'মহারাজা' বলে। এবং দেখা যায় তার হাত থেকে চাপরাশীর পাঁচড়া-ভরা হাতের তালুতে হেঁটে যাচ্ছে রৌপ্যমুদ্রারা।... আমার নিজের বাড়ীতে আমি একটা নিয়ম চালু করেছিলাম। যখন দেখতাম চাপরাশীর শরীরে মেদবৃদ্ধি শুরু হয়ে গেছে তখনই তাকে ছাঁটাই করে দিতাম চাকরী থেকে। একজন 'নেটিভ' কখনই বড়লোক হতে পারে না শরীরে মোটা ভুঁড়ি না বাগিয়ে। কারণ অর্থবান হলেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা সেই অর্থকে উপভোগ করার প্রাথমিক পথ হিসেবে প্রচুর পরিমাণে তৈলাক্ত খাদ্য গলাধঃকরণ করে। এবং দ্বিতীয় পথটি সেই অর্থের উপরে আরোহণ করা। মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে টাকা পুঁতে রেখে তারই উপর বসে থেকে সেটাকে কাল-পেঁচার মত নিরীক্ষণ করতে থাকে। যদি কোন 'নেটিভ'কে কখনও দেখা যায় যে প্রতিদিনই কোন একটা জায়গার ওপর শক্ত হয়ে সে বসে থাকছে, সেখানকার মাটি খুঁড়লে তোমার বরাত ফিরে যাবে। মাদ্রাজের সোনার খনির চেয়ে এর জন্যে শেয়ার কেনা অনেক বেশী লাভজনক।

গ্রামবাসী॥

লর্ড বেকনের একটি সারগর্ভ উক্তি হল 'Eating maketh a full man!' এ ব্যাপারে এটাই একমাত্র করণীয় যে কমিশনের রিপোর্টের বদলে (যে রিপোর্টকে 'we cannot name without tears and laughter) যদি অনাহারক্লিষ্ট চাষীদের এনে হাজির করানো হয় লর্ড বেকনের সামনে তাহলে ব্যাপারটা ঘুরে গিয়ে যা দাঁড়াবে তা হল এই—'writing maketh a full man'...তুমি প্রশ্ন করবে, চাষীদের সঙ্গে খাদ্য কিংবা দুর্ভিক্ষের সম্পর্কটা কি? আমি বলছি—আগাগোড়াই। ভারতবর্ষীয় কৃষক-জীবনের দিগন্ত হল দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব হল তাদের পায়ের তলার মাটি। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপারটা কি জানো? এদের চারপাশে সমৃদ্ধির স্বপ্ন-লোক ছড়ানো। যেদিকে দুচোখ মেলবে—সামনে শস্যের সমুদ্র। পাথরের ঢিবির উপরে ছোট ছোট গ্রাম ও গ্রামের প্রাচীন বৃক্ষরাজী। তাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে উজ্জ্বল পোস্তগাছ আর আখের ক্ষেতের উপরে। বলিষ্ঠ দুধ-রঙের গাভীরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে মহা আড়ম্বরে। ধবধবে শরীরে ব্রাহ্মণেরা প্রসন্ন সূর্যালোকের নীচে পুকুরের জলে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপাঠ করে চলেছেন। এমন কি মহিষগুলোরও কোন কাজ নেই, কেবল শরবনের ঘন অন্তরালে চরে বেড়ানো ছাড়া। চতুর্দিকে শান্তি। মৌমাছিরা তাদের পল্লিগীতি শোনাচ্ছে ফুলের কানে কানে। ঘুঘুরা পিপুল গাছের ছায়া-ঢাকা পত্রান্তরাল থেকে শুনিয়ে চলেছে তাদের ব্যর্থ প্রেমের বেদনা। পাতকুয়ার শীতল আচ্ছাদনের নীচে থেকে পায়রাদের ডাক গ্রীষ্মের বাতাসে গিয়ে মিশছে, বহুরূপী গিরগিটিগুলো গাছের ডালে ঘুমিয়ে, পাতাকে জড়িয়ে আছে এনামেল রঙের শুঁয়োপোকাগুলো, সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল মাছরাঙা পাখিরা উড়ছে মাঝ-আকাশে, স্তব্ধ দেবতার মন্দিরের চুড়োয় বসে আছে সজ্জিত ময়ূর। চতুর্দিকের এই শব্দ বর্ণ গন্ধময় রূপরাজ্যের মাঝখানে কৃষকেরা কাজ করে ও অনাহারে পীড়িত হয়।

নগরীর অভ্যুদয় ও ভারতীয় নগরীর বিবর্তন

* শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় *

নগরী কাকে বলে? কোথা থেকে কোন্ যুগে তার উৎপত্তি? কোথায় এর প্রতিষ্ঠার সার্থকতা? এর ক্রম-বিবর্তনের সূত্র এবং ধারাটিই বা কী? কী মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় এর মাধ্যমে? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও জানা যায়নি। অন্ধকারে অনুসন্ধান ভিন্ন অন্য উপায়ও নেই। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে ঐতিহাসিক যুগের পূর্বে নগরীর উদ্ভব। প্রাচীন নগরীর অনেকগুলি আজও ভূগর্ভে প্রোথিত এবং বহুর অস্তিত্ব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধরণীতল থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে। ভবিষ্যতের গর্ভে যা নব আবিষ্কারের সম্ভাবনায় নিহিত তার মান নির্ণয় সুকঠিন।

প্রাচীন রোম কি প্রাচীন এথেন্সের সন্নিকটস্থ ভগ্নাবশেষ ঐতিহাসিক যুগের নগর-স্থাপনের কাহিনীর সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সভ্যতা নীল নদের কূলে, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর তীরে, সিন্ধু নদের তটে গড়ে উঠেছিল তার প্রকাশ কি তৎকালীন নগরকেন্দ্রিক নয়? প্রাচীন নগরী স্থাপনের উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানে জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী মানুষের লেগেছে পাঁচ হাজার বছর। তবুও তার চরম তত্ত্বটি মনে হয় আজও বর্তমান মানবের সম্যক উপলব্ধি হয়নি। তবে একথা সত্য যে, ঐতিহাসিক যুগের প্রবর্তনার পূর্বেও নগরী যে বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। লুই মামফোর্ড মনে করেন যে, "At the dawn of history the city is already a mature form." —ইতিহাসের প্রভাতে নগরী পূর্ণাঙ্গ অবয়ব ধারণ করেছিল।

বর্তমান নগরীর বিবর্তনের ধারার বিশ্লেষণে আমরা নগরী সৃষ্টির কতগুলি কারণ দেখতে পাই। আজ বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি নবনগরী নির্মাণে আমরা দেখতে পাই দুর্গাপুর, বার্নপুর, জামসেদপুর, রুরকেলা ও ভিলাই নির্মিত হয়েছে ইস্পাত-শিল্পকে কেন্দ্র করে। অতএব বর্তমানকালে বৃহৎ শিল্পকে কেন্দ্র করে শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে। যেমন তাম্রশিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ঘাটশিলা শহর। ইঞ্জিন কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'চিত্তরঞ্জন'। ভূপাল শহরের এক অংশ গড়ে উঠেছে ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্মাণের কারখানাকে কেন্দ্র করে। বৃহৎ জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভাকরা-নাঙ্গাল অঞ্চলে নাঙ্গাল শহর, দামোদর উপত্যকায় সেচ ও বিদ্যুৎ-উৎপাদনে মাইথন, পাঞ্চেত, তিলাইয়া, দুর্গাপুর নগরী প্রভৃতি। বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে গড়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন, পিলানী প্রভৃতি শহর। প্রাচীনকালে গড়ে উঠেছিল নালান্দা।

স্বাধীন ভারতে পাঞ্জাব বিভক্ত হওয়ায় পূর্ব-পাঞ্জাবের জন্য, ভাষাভিত্তিতে প্রদেশ সংগঠনে মধ্যপ্রদেশের উপযুক্ত রাজধানী না থাকায়, বিহার ও ওড়িশা পৃথক হওয়ার পর ওড়িশার জন্য রাজধানীর ব্যবস্থা না থাকায় পূর্ব-পাঞ্জাবের রাজধানী চন্ডীগড়, মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপাল, ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বর স্থাপিত হয় এবং সেখানে অনিবার্য প্রয়োজনীয় গঠন-নির্মাণ অনেকাংশে সম্পূর্ণ হয়েছে; আরও বহু করণীয় অসমাপ্ত আছে। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান যে রাজধানীকে কেন্দ্র করে এই সকল নগরী গড়ে উঠেছে। যদিও বর্তমান শাসনতন্ত্রে রাজার কোন বিশেষ স্থান নেই, তবে প্রদেশের প্রধানের নাম হয়েছে রাজ্যপাল ও কোথাও রাজপ্রমুখ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রপতি, কিন্তু রাজা, মহারাজা, মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি নয়।

পোতাশ্রয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিশাখাপত্তন বা ইংরেজীতে 'ভাইজাগ', মাদ্রাজ, কোচিন, গোয়া, বোম্বাই, কলিকাতা ইত্যাদি। তবে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতার মুখ্য সার্থকতা শুধু পোতাশ্রয়ে নয়—আরও অনেকগুলি প্রয়োজনের সন্নিবেশে এগুলি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কলিকাতার তিরিশ মাইল উত্তরে গড়ে তোলা হয়েছিল (গড়ে ওঠেনি) 'কল্যাণী' শহরের রাস্তা, গন্ধনালা, পানীয় জল সরবরাহের ও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা, বহু এক ধাঁচের পাকা বাড়ি। তবুও গড়ে ওঠেনি প্রাণবন্ত শহর, অর্থাৎ নগরীর প্রাণচঞ্চলতার ভিত্তি স্থাপন না করেই গড়ে উঠেছিল শহরের বহিরাবরণ—তাই তো সজীব হয়ে ওঠেনি। পরিকল্পনাকেরা সেই ত্রুটি হৃদয়ঙ্গম করেছেন ও বর্তমান নগরীর জীবনযাত্রায়
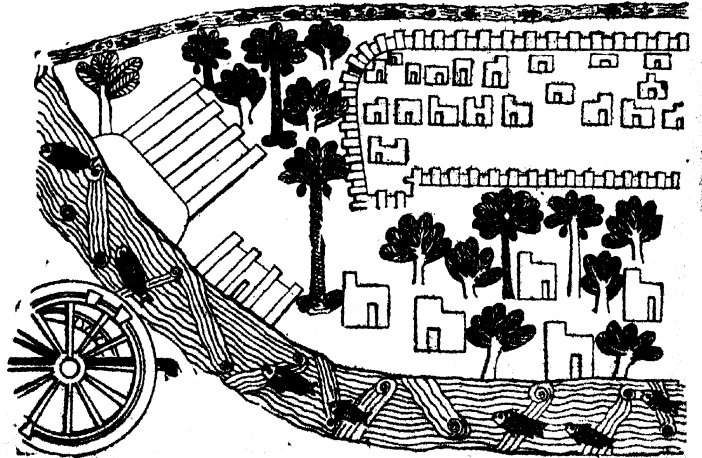
পরিখা-পরিবৃত দুর্গনগরী

অর্থনৈতিক আধার স্থাপনের সক্রিয় প্রচেষ্টা চলেছে। এরূপে কৃত্রিম উপায়ে গঠিত জন-শূন্য গৃহময় পুরীতে বর্তমানে প্রাণসঞ্চারের এবং সার্থকতার তরু মুঞ্জরিত হতে শুরু করেছে।

নানা শিল্পের মুখ্য উপাদান সংগ্রহে ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ উত্তোলন ও প্রেরণ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বীর-মিত্রপুর, হাতীবাড়ি প্রভৃতি নানা শহর।

সামরিক উদ্দেশ্যে ও সৈন্যাবাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ব্যারাকপুর, ঝাঁসি, কোয়েটা ইত্যাদি নগর। শাসনব্যবস্থা সুপরি-চালনার জন্য গড়ে উঠেছে এবং উঠেছিল বহু নগর-নগরী। ভারতের প্রধান নগর-নগরী গড়ে উঠেছিল ধর্মস্থানকে, পুণ্যক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে। সেই নগরীগুলি আজও বিদ্য-মান। অন্যান্য কারণে উদ্ভূত নগরীর আয়ু অনেক ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী। তাই মনে হয়, নাগরিকতার তরঙ্গ সারা বিশ্বে, কিন্তু ভারতবর্ষে তার প্রাবল্য কিঞ্চিৎ ন্যূন। এই সঙ্গে দেওয়া পরিসংখ্যানে তা পরিস্ফুট হবে। ▬

	দেশ	১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জনসংখ্যার অনুপাত		১৯৩০ সনের জনসংখ্যার অনুপাত	
		গ্রাম্য %	নাগরিক %	গ্রাম্য %	নাগরিক %
১	ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	৩২·১	৬৭·৯	২০·৫	৭৯·৫
২	ফ্রান্স	৬৫·২	৩৪·৮	৫০·৯	৪৯·১
৩	জার্মানি	৪১·৪	৫৮·৬	৩২·৯	৬৭·১
৪	ইটালি	৪৬·১	৫৩·৯	৩০·১	৬৯·৯
৫	সুইডেন	৮৪·৯	১৫·১	৬৭·৫	৩২·৫
৬	যুক্তরাষ্ট্র	৭০·৫	২৯·৫	৪৩·৮	৫৬·২
৭	রাশিয়া	৮৬·৫	১৩·৫	৮৩·৪	১৬·৬ (১৯২৬ সালের)
৮	কানাডা	৮৪·১	১৫·৯	৫৮·৩	৪১·৭
৯	ভারতবর্ষ	৯০·৫ (১৮৯১ সালের)	৯·৫	৮৭·৯	১২·১

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার শতকরা

	গ্রামে	ও শহরে
১৮৯১	৯০·৫	৯·৫
১৯০১	৯০·১	৯·৯
১৯১১	৯০·৫	৯·৫
১৯২১	৮৯·৮	১০·২
১৯৩১	৮৭·৯	১২·১
১৯৪১	৮৬·১	১৩·৯
১৯৫১	৮২·৭	১৭·৩

যাযাবর মানুষ যখন দলবদ্ধ হয়ে নিরন্তর চলার নেশা ছেড়ে ক্রমশ স্থিতিবান হবার চেষ্টা শুরু করল, সেখানেই গড়ে উঠল এক-একটি বর্তমান সংজ্ঞায় গ্রাম। শিকার-পর্বের সুনিশ্চয়তার অভাবে তাদের লাগতে হল ফসল-ফলানোর পর্বে . আপন বসতির ধারে পাশে ও আপন চেষ্টায়। যদি কেউ

নগর, তবে সে ধারণা ভ্রান্ত। আহার সংস্থান বা উৎপাদন এবং প্রজননের বাইরের অন্যান্য তাগিদে অর্থাৎ বেঁচে থাকা ছাড়াও আরও কিছুর তাগিদে গড়ে উঠেছিল নগর। কিন্তু জনগণের এই সংঘাতে বিশেষ সমর্থন ছিল না। তাই গড়ে ওঠেনি প্রাচীনকালে প্রচুর নগর—এমন কী নৃপতিকুলের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও। বর্তমানে ইউরোপে, আমেরিকায় এসেছে এক দুর্দমনীয় নাগরিকতার অভ্যুদয়ের প্রবাহ। নগরীর উদ্ভব, মনে হয়, প্রস্তর ও পুরপোলীয় যুগের সঙ্গমে। জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠতে লাগল নানা কর্মী-সম্প্রদায়—চাষা, মেষপালক, শিকারী সম্প্রদায় ছাড়াও গড়ে উঠল ধীবর মাঝি মাল্লা ছুতোর কামার কুমোর কসাই নাপিত তাঁতী আরও কত কী। আমাদের আগে যাকে বলা হত 'নবশাক'। কিন্তু মুখ্য বিভাগ রইল গীতার সেই "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ":

ব্রাহ্মণ—ধর্মযাজক, পুরোহিত ও অধ্যাপক সম্প্রদায়।

ক্ষত্রিয়—যোদ্ধৃ সম্প্রদায়।

বৈশ্য—বণিক সম্প্রদায়।

শূদ্র—অন্যান্য সাধারণ কর্মী সম্প্রদায়।

নানা জটিলতার সমন্বয় সাধিত হল এই নগরে। নগরেই জনগণকে একত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হল। গড়ে উঠল নেতা, যে পরিচালনা করবে নাগরিকদের। হঠাৎ কোন নেতা হয়ে উঠল রাজা—চালাতে লাগল নানা স্থানে অভিযান—বিজয়ী হয়ে অন্যের সম্পদ ও ধন লুণ্ঠন করে নিয়ে এসে নিজ অনুচরদের মধ্যে বণ্টন করে আপন রাজ-কোষের সম্পদ বৃদ্ধি করতে লাগল। রাজার বাসস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল ক্ষুদ্র নগর। ক্রমে সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে গড়ে উঠল নগরের কলেবর। প্রাকৃতিক শক্তি অভিজ্ঞান হলেন দেবতা। ভয় ভক্তি ও উপাসনার স্থান ও উপাসনার প্রতীকরূপে স্থাপিত হল মন্দিরস্থ দেবতা। আবার সেই মন্দিরকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠল অনেক নগরী। বিশেষ করে ভারতের পুণ্য নগরী তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হল—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা, দ্বারকা প্রভৃতি।

আর নারায়ণের সুদর্শনচক্র-ছিন্ন দেবীর পুণ্য অবয়বের স্মারকস্বরূপ গড়ে উঠল (৫১) একান্নটি শাক্তপীঠ ও বৌদ্ধদের 'অষ্টানি মহাস্থানানি' ও নানা ধর্মনগর।

এই নগরীকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠল জটিল ও যৌগিক সমাজব্যবস্থা, সাম্রাজ্য-বাদের সূত্রপাত; সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক হল নগরী। মুখ্য খাদ্য উৎপন্ন হয় না নগরীতে, কিন্তু আহারাদির বিরাট পর্ব চলে নগরে, বহু ক্ষেত্রে উচ্চমানে এবং কোথাও বা ধারণাতীত নিম্নমানে। প্রাচীন নগরের মুখ্য অবদান হল পুস্তক-সংগ্রহাগার, স্মরণীয় অথবা দুষ্প্রাপ্য বস্তু-সংগ্রহাগার, দেবস্থান, বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা, নগরেই গড়ে উঠল শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র, শিক্ষা ও শাসনের কেন্দ্র, রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের মুখ্য স্থান। অনেকের ধারণা, নগর হল বহু অট্টালিকা প্রাসাদ হর্ম্য ও উচ্চাঙ্গের ভবনাবলীর সমন্বয়। এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অনেকে আবার মনে করেন, অর্থনৈতিক ভিত্তি ও শিল্প-উৎপাদনে গঠিত হয়েছে নগরী, তাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। ধর্ম-সংক্রান্ত ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় মুখ্য আকর্ষণ রয়েছে নগরীতে। জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক সমুদয় বস্তু সহজে সংগৃহীত হয় নগরীতে। প্রচার ও প্রাধান্য লাভের সুযোগ আছে নগরীতে।

বস্তু ও শিল্প-জগতের নব নব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে নগরীয় জীবনে। এখানেই মানুষের কর্মচাঞ্চল্য ও কার্যকুশলতা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। নগরীকে শক্তির অভি-ব্যক্তি, সন্ত্রাস ও সম্পদের প্রতীক হিসাবে প্রতীয়মান করার জন্য নগরীকে পরিবেষ্টন করা হত প্রাচীর দিয়ে। তাকে আবার আরও দুর্লঙ্ঘ্য করার জন্য পরিবেষ্টন করা হত গভীর পরিখা খনন করে। এর মধ্যে হয়ত আরও একটু প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল যে, নগরীকে ইচ্ছামত বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হবে না; কারণ অনভিপ্রেত বৃদ্ধিতে নাগরিক জীবনযাপনের মান হবে হ্রাস ও সমস্যা হবে জটিল ও আয়ত্তের বাহিরে। তাই নগরীকে পরিখা বা প্রাচীর দ্বারা সীমিত করা হত এর কলেবরবৃদ্ধি রোধ করতে। নিকটবর্তী অঞ্চলের মহামূল্য বিভবের সংগ্রহাগারও হয়ে উঠল নগরী। নৃপকেন্দ্রিক নগরীতে সুপরিকল্পিত আক্রমণ হয়ে উঠল এক অপূর্ব কর্মণ্যতা ও দক্ষতার পরিচয়; জীবনের নিষ্ফলতা-প্রশমন ও উচ্চাভিলাষ কিঞ্চিৎ চরিতার্থের জন্য নগরের তরুণদের

পরিপ্রকাশে সাহায্য করে। মুখ্যত ঐ আক্রমণের সূত্রপাত হত শত্রুপক্ষের উপর অথবা অন্য গ্রাম ও নগরবাসীর উপর। প্রভুত্বের লালসায় যে নির্দয় নৃশংসতা সাধিত হত তার নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ষরে লিখিত। সেই একই বাণী প্রাচীন শিল্পী এসিরিয়ার প্রস্তরের বৃহৎ ফলকের উপর শিলাবদ্ধ করে গেছেন। প্রথম চিত্রে দেখা যায় পরিখা-পরিবৃত নগরী, যার পরিখার জলে ভেসে চলেছে মীন (অথবা জল বোঝানোর জন্য মৎস্য আঁকা হয়েছে), অভ্যন্তরে রয়েছে গৃহের বিচিত্র বিন্যাস ও সংস্থাপন-প্রণালী। একসঙ্গে বিলম্বিত ব্যারাকের মত বাড়ি ও বিভিন্ন ধরনের পৃথক পৃথক আবাসগৃহ। দুই দিকে মূলে নদী। অন্য এক দিকে নদী থেকে নির্গত অপ্রশস্ত কাটা খাল পরিখাস্বরূপ ব্যবহৃত। ভিতরে বহু খেজুরের মত বৃক্ষ।

দ্বিতীয় চিত্রে যুদ্ধের বিধ্বয় ফলে বিজয়ীদের সঙ্গীতমুখর অভিযান ও পরাজিতদের কী বিভীষিকাময় নিদারুণ পরিণতি—মৃত ও মুমূর্ষু অশ্ব, মানুষের ও ভগ্ন রথের কী মর্মান্তিক দুরবস্থা!

তৃতীয় চিত্রে নিনেভার প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত রয়েছে—প্রাচীর-পরিবেষ্টিত রাজধানীতে মাথার-ঝালর-ধরা রাজা গ্রহণ করছেন অতিথিদের। প্রাচীন নগরী পরিকল্পনার এটি একটি প্রাথমিক অধ্যায়। বৃহৎ অট্টালিকাটি নিশ্চয়ই রাজপ্রাসাদ আর আঁকা রয়েছে তৎকালীন গৃহনির্মাণ-কৌশল। তদানীন্তন যুগের আসবাবপত্র, বস্তু-সম্ভার, নানা শিল্প ও কার্যকলাপ, বহু প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহারের নিদর্শন ইত্যাদি।

বর্তমান সভ্যতার মানদণ্ডে যাযাবর মানুষের তুলনায় সভ্য মানুষের সংস্কৃতি হল প্রথম অগ্নিপ্রজ্বলন ও সংরক্ষণ, বীজ বপন ও কৃষিকর্ম, হালের উদ্ভাবন, কুম্ভকারের চাকার উদ্ভাবন, গাড়ির চাকার উৎপত্তি, মৃৎশিল্পের অভ্যুদয়, তন্তুবায়ের তর্কু ও মাকুর উৎপত্তি ও বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতি, কর্মকারের লৌহ ও তাম্র প্রভৃতি ধাতব বিদ্যার সূত্রপাত, মূলে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা, পঞ্জিকার সৃষ্টি, অক্ষরের উদ্ভাবন ও লেখন ইত্যাদি প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বের কথা। ওই সময় থেকেই পাওয়া যায় পৃথিবীর মাটিতে প্রাচীনতম নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

কিন্তু ঘড়ির উদ্ভাবন থেকে বর্তমান আণবিক যুগে আসতে লেগেছে মাত্র ৭০০ বছর। বিশেষ করে গত অর্ধ শতাব্দীতে যে অসামান্য বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হয়েছে তা অনস্বীকার্য। বর্তমানের মানুষ যান্ত্রিক ও আণবিক যুগের মধ্য দিয়ে চলেছে। এত দ্রুত এর গতি, নব নব উদ্ভাবনের ফলে এত সত্বর এর পরিবর্তন যে চিন্তাশীল স্থিতিস্থাপক মানবমনের কেন্দ্র থেকে নিয়ে যায় দূরে এর গতিজ শক্তি। এর অমোঘ আঘাত এসে লেগেছে নাগরিক জীবনের মজ্জায় মজ্জায় নগরের জীবনযাত্রার স্তরে স্তরে।

মৃত্তিকার আস্তরণ উত্তোলন করে আমরা আজ পর্যন্ত যে সকল প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক নগরীর সন্ধান পেয়েছি তার আয়তন বর্তমান শহরের অনুপাতে প্রায় নগণ্য। এ বিষয়ে অনুসন্ধানে দেখা যাবে যে, প্যালেস্টাইনের 'মেগিদ্দো' নগরটি মাত্র তিন একর বিস্তৃত, ক্রীট দ্বীপের 'গুর্নিয়া' শহরটি মাত্র সাড়ে ছ একরে এবং মাত্র ষাটটি গৃহের সন্নিবেশে গঠিত। গ্রীসের সর্বাপেক্ষা বর্ধিষ্ণু শহর 'মাইসিনি' বারো একর মাত্র বিস্তৃত। ইউফ্রেটিস নদীতটে বর্তমান সিরিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত 'কারকেমিস্' নগরীটি মাত্র দু শো চল্লিশ একর। তিন হাজার বৎসর খৃষ্টপূর্বে সিন্ধুনদতটে 'মহেঞ্জোদাড়ো'র ভগ্নাবশেষে নগরীর বিস্তৃতি পাই মাত্র ছ শো একর অর্থাৎ প্রায় এক বর্গ-মাইল।

ক্রমে ক্রমে নগরীর ঘনবসতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। 'উর' নগরী দু শো কুড়ি একর—এখানে ছিল বন্দর, খাল, মন্দির এবং আব্রাহামের আদিম জন্মভূমি। 'উরু'-এর প্রাচীরবেষ্টিত ভূভাগের বিস্তৃতি দু বর্গ-মাইলের কিছু বেশী। প্রায় ৭০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে এসিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত 'খোরসবাদ' শহরের সাত শো চল্লিশ একর ভূমি প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের 'নিনেভা' আঠারো শো একর ভূমিতে বিস্তৃত ছিল। এর আরও পরে পারসীক কর্তৃক ধ্বংসে হবার অনতিপূর্বে ব্যাবিলন নগরী এগারো মাইল দীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

এই তো গেল নগরীর বিস্তৃতির পরিমাপ-নির্ণয়ের কাহিনী। এই সব শহরের লোকসংখ্যার মাত্রা কেমন ছিল? 'উর' অঞ্চলের খননকার্যে বাগদাদের সন্নিকটে 'খাফাজা' ও 'এ সমৃদ্ধা' অঞ্চলে প্রতি একরে প্রায় কুড়িটি বাড়ি লক্ষ্য করা যায়। সেই ভিত্তিতে গণনায় দেখা যায়, একর-প্রতি প্রায় এক শো থেকে এক শো কুড়িজন লোকের বাস ছিল। অতএব দুই বর্গ-মাইল স্থানে উরের জনসংখ্যা হওয়া উচিত—১২৪০×১০০=১২,৪০০। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কফোর্ট সাহেবের অনুমান অনুযায়ী জনসংখ্যা চব্বিশ হাজারের বেশী ছিল না। কিন্তু 'খাফাজা' অঞ্চলে প্রায় এর অর্ধেক জনসংখ্যা ছিল। স্যার লিওনার্ড উলে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "উর অব দি চ্যালডিস"-এ উর সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা ও বিশদ আলোচনা করেছেন।

একটি পৃথক তালিকায় বিভিন্ন দেশের অতি প্রাচীন শহরের নাম ও সেই সব শহরের কত বিস্তৃতি ছিল তার বিবরণী এখানে দেওয়া হল।

নগরীর নাম	দেশের নাম	বিস্তৃতি (একরে)	মন্তব্য
মেগিডো	প্যালেস্টাইন্	৩·৫	
গুর্নিয়া	ক্রীট	৬·৫	
মাইসিনি	গ্রীস্	১২·০	
কারকেমিস্	সিরিয়া	৪০·০	
মহেঞ্জোদাড়ো	ভারতবর্ষ (প্যাকিস্তান)	৬০০·০	প্রায় ১ বর্গ-মাইল
উর	(ক্যালডিয়া) বর্তমানে ইরাক	২২০·০	
উরুকের	ইরাক	১২৮০·০	২ বর্গ-মাইল
খোরসবাদ	এসিরিয়া	৭৪০·০	
নিনেভা	ইরাক	১৮০০·০	প্রায় ৩ বর্গ-মাইল
ব্যাবিলন	ইরাক	৬ থেকে ৯ বর্গ-মাইল	১১ মাইল দীর্ঘ প্রাচীরবেষ্টিত

প্রাচীন নগরীর অভ্যুদয় ও বিবর্তন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় একই সময়ে একই পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছিল। এ শুধু মিশর, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, সুমেরীয়, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি অঞ্চলে আবদ্ধ নয়, সুদূর অনাবিষ্কৃত দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু ও মায়া সভ্যতা বিস্তারের অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল।

ভারতের প্রাচীন পুণ্যনগরী ব্যতিরেকে কত বিভিন্ন প্রয়োজনে কত নগরীই না সৃষ্ট হয়েছিল তার তথ্য সম্যক জানা নেই। যৎসামান্য যা জানা আছে তাও অতি সীমাবদ্ধ। কিন্তু সংস্কৃতির বিকাশ নদীপ্রবাহের মত যুগে যুগে নানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের তরণীতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ভবিষ্যতের অনির্দিষ্ট কূলে ভিড়তে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও বহু প্রাচীন পুঁথিপত্রের আবিষ্কার বহু অজ্ঞাত আবরণ উন্মোচন করে প্রাচীন বাস্তুবিদ্যা ও নগর পরিকল্পনার সাক্ষ্য দেয়।

প্রায় দু শো বর্ষ পূর্বে—১৭৮৭ সনে প্রকাশিত 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে'র পত্রিকার প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত উক্তি হয়তো তখন সত্য ছিল, কিন্তু বর্তমানের আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে আজ তা সত্য নয়। একটি স্থাপত্য, বাস্তুবিদ্যা ও

নগর-পরিকল্পনার পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করলে দেখা যাবে যে, কত পুঁথিই না কেবলমাত্র শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ক এবং কত পুস্তক ধর্ম, বিষয়ক।

কেবলমাত্র শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক হস্তলিখিত পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তকের তালিকার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান—

মানসার (৬ষ্ঠ শতক), ময়মতম্ (শ্রীময়মুনি), শিল্পরত্ন (শ্রীকুমার), সমরাঙ্গন সূত্রধার (মহারাজ ভোজদেব), বিশ্বকর্মা-শিল্প, অংশুমদ্ভেদ—কাশ্যপ, সকলাধিকার, সনৎকুমার বাস্তুশাস্ত্র শিল্পশাস্ত্র (মণ্ডন), অপরাজিত পৃচ্ছা (ভুবনদেব), বাস্তু শিরোমণি, শিল্পসংগ্রহ বা সংগ্রহ, বাস্তু-রাজবল্লভ—(মণ্ডন সূত্রধর), জয় পৃচ্ছা, বাস্তুরাজ, আয়াদি লক্ষণম্, বাস্তুবিদ্যা, শিল্পশাস্ত্রম্ (নারদ), শিল্পসর্বাগম, শিল্পসর্বস্ব সংগ্রহ, বাস্তুসার, বিশ্বকর্মমত, ক্ষীরার্ণব, অপরাজিত প্রভা (প্রমা), আয়ত-তত্ত্ব, জ্ঞানতলতত্ত্ব, বাস্তুপ্রকাশ, বাস্তুবিধি, বাস্তুসংগ্রহ, বাস্তুসমুচ্চয়, বাস্তুমুক্তাবলী, বাস্তুপুরুষবিধান (নারদ। এভেয়ার লাইব্রেরি), বিশ্বকর্মীয় শিল্প, বিশ্বকর্মা বিদ্যাপ্রকাশ, বৃহৎশিল্পশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র, বিমানবিদ্যা (পরাসর), পরাসর কল্প বিমানবিদ্যা, ভুবন প্রদীপ, মনুষ্যালয় চন্দ্রিকা (সম্পাদনা গণপতি শাস্ত্রী), গোপুরম লক্ষণাদি, মানসোল্লাস (সোমেশ্বর ভট্ট), প্রয়োগমঞ্জরী (এভেরায় লাইব্রেরী), প্রয়োগ পারিজাত, রূপমণ্ডল (আর-এ-এস), পৌরাণিক বাস্তু শান্তি প্রয়োগ, ঐন্দ্রম্ (ইন্দ্র)।

ত্রিবন্দরম্, তাঞ্জোর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের লাইব্রেরিতে বহু পুঁথি সংগৃহীত আছে। তাঞ্জোরের টি এম এস এস এম লাইব্রেরিতে এ-বিষয়ে গবেষণাও চলছে।

'মানসারে'র মতে নগরীকে বৃহৎ গ্রাম অর্থেই বুঝবার নির্দেশ আছে। দুর্গকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার উপযুক্ত **ব্যবস্থা সম্বলিত নগর হিসাবেই ধরার কথা বলা আছে।** মানসারে জ্যামিতিক আকৃতি অনুযায়ী গ্রাম আটটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত। যথা—(১) দণ্ডক (২) সর্বতোভদ্র (৩) নন্দ্যাবর্ত (৪) পদ্মক (৫) স্বস্তিক (৬) প্রস্তর (৭) কার্মুক (৮) চতুর্মুখ।

উদ্দেশ্যানুসারে স্থাপনের জন্য নগর আটভাগে বিভক্ত—(১) রাজধানী নগর (২) কেবলনগর (৩) পুর (৪) নগরী (৫) খেট (৬) খর্বতঃ (৭) কুব্জক (৮) পত্তন।

পত্তন নদীতটে বা সমুদ্রকূলে স্থাপিত বাণিজ্যকেন্দ্রিক শহর।

দুর্গের বিভিন্ন বিভাগে বর্ণিত আছে—(১) শিবির (২) বাহিনীমুখ (৩) স্থানীয় (৪) দ্রোণক (৫) বর্ধক (৬) কোলক (৭) নিগম (৮) স্কন্ধাবার।

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থিতি অনুযায়ী দুর্গকে (১) গিরিদুর্গ (২) বনদুর্গ (৩) জলদুর্গ (৪) রথদুর্গ (৫) পঙ্কদুর্গ (৬) দেবদুর্গ ও (৭) মিশ্রদুর্গ নামে অভিহিত করা হয়।

'ময়মতে' গ্রামের প্রকার নির্দেশে লিখিত আছে—(১) দণ্ডক (২) স্বস্তিক (৩) প্রস্তর

(৪) প্রকীর্ণক (৫) নন্দাবর্ত্ত (৬) পরাগ (৭) পদ্মক ও (৮) শ্রীপ্রতিষ্ঠা,

শ্রীকুমার-রচিত 'শিল্পরত্নে'র পঞ্চম অধ্যায় —গ্রামাদিলক্ষ্মণম' — অধ্যায়ে — লিপিবদ্ধ আছে

"দণ্ডক স্বস্তিকশ্চৈব প্রস্তরস্য প্রকীর্ণকঃ।
নন্দাবর্ত্ত পরাগস্য, পদ্মকঃ শ্রীপ্রতিষ্ঠিতঃ।
৫৭"

অর্থাৎ গ্রামের প্রকার ভেদে (১) দণ্ডক (২) স্বস্তিক (৩) প্রস্তর (৪) প্রকীর্ণক (৫) নন্দাবর্ত (৬) পরাগ (৭) পদ্মক ও (৮) শ্রীপ্রতিষ্ঠা।

৪। বিশ্বকর্মা 'বাস্তুশাস্ত্রে' গ্রামের বিভিন্ন নামবর্ণনা—(১) মণ্ডক গ্রাম (২) প্রস্তর গ্রাম (৩) বাহুলিক গ্রাম বা বাহুলীক গ্রাম (৪) পরাগ গ্রাম (৫) চতুর্মুখ গ্রাম (৬) পূর্বগ্রাম (৭) মঙ্গল গ্রাম (৮) বিশ্বকর্মাগ্রাম (৯) দেবতাগ্রাম—দেবরাগ গ্রাম (১০) বিশ্বেশগ্রাম (১১) কৈলাস গ্রাম (১২) নিত্যমঙ্গল গ্রাম।

আদ্যস্তু মণ্ডকগ্রাম প্রস্তরস্তদনন্তরম্।
বাহুলীক স্তৃতীয়স্তু পরাকস্তু
চতুর্থতঃ ॥ ৬॥
চতুর্মুখঃ পঞ্চমঃ স্যাৎ ষষ্ঠঃ পূর্বমুখস্তথা।
সাপ্তমো মঙ্গলগ্রামস্ত্বষ্টমো
বিশ্বকর্মকঃ ॥ ৭ ॥
নবমো দেবরাগুগ্রামো বিশ্বেবেশো দশমোমতঃ।
একাদশস্তু কৈলাসো দ্বাদশো নিত্যমঙ্গলঃ
॥ ৮ ॥"

কিন্তু বিশ্বকর্মা বাস্তুশাস্ত্রে নগরের বিভাগকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা আছে গ্রামের উচ্চ সংস্করণ হিসাবে নয়। এবং তাই হওয়া উচিত।

যেখানে নৃপকেন্দ্রিক নগর স্থাপিত, সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর নরপতির নিবাস-স্থল হিসাবে নগরীকে নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—

(১) নরেন্দ্রের নিবাসস্থল, যে নগরে তাহাকে পদ্মনগর, (২) মহারাজের বসতি যেখানে সেই নগরকে সর্বতোভদ্র, (৩) অষ্টগ্রহ, যেখানে বাস করেন সেই নগরকে প্রস্তর, (৪) পট্টভাকের, যেখানে রাজধানী, সেই নগরকে শ্রীপ্রতিষ্ঠা, (৫) যুবরাজ, যেখানে বাসস্থান সেই নগরীকে পুর, (৬) মণ্ডলিক, যেখানে রাজত্ব করেন সেই নগরকে অষ্টমুখ, (৭) সার্বভৌম, যেখানে অধিষ্ঠান করেন সেই নগরকে রাজধানী বলে।

গ্রামের রাজসংস্করণ যে নগরী একথা পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা মানেন না। বহু পাশ্চাত্ত্য ও আধুনিক নগর পরিকল্পনাবিদ মনে করেন নগরীর উদ্ভব নানা কারণে। বিশ্বকর্মা, বাস্তু শাস্ত্রও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাই তিনি 'নগরলক্ষণ' নামক নবম অধ্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন গ্রামের অনুরূপ নয়।

কিন্তু বিশ্বকর্মা বাস্তুশাস্ত্রে বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের উপর নগরীকে বিশটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ—

(১) পদ্মনগর (২) সর্বতোভদ্র (৩) বিশ্বেশ-ভদ্র (৪) কার্মুকে (৫) প্রস্তর (৬) স্বস্তিক (৭) চতুর্মুখ (৮) শ্রীপ্রতিষ্ঠা (৯) বলিদেব (১০) পুর (১১) দেবনগর (১২) মানুষপুর (১৩) বৈজয়ন্ত (১৪) পুটভেদন (১৫) গিরিনগর (১৬) জলনগর (১৭) গুহানগর (১৮) অষ্টমুখ (১৯) নন্দাবর্ত (২০) রাজধানী।

বিশ্বকর্মা বাস্তুশাস্ত্রের আবার শ্রীমদনন্ত-কৃষ্ণ ভট্টারক বিরচিত 'প্রমাণবোধিনী' নামক এক টীকা গ্রন্থও আছে, যা থেকে প্রমাণ হয় যে ওই পুস্তকের প্রচলন যথেষ্ট ছিল এবং যার টীকার প্রয়োজন বিস্তৃত ব্যাখ্যার।

শ্রীকুমার-রচিত "শিল্পরত্নে" পঞ্চম অধ্যায়ে 'গ্রামাদি লক্ষণম'-এ লিপিবদ্ধ আছেঃ—

দ্বিজকুল-পরিপূর্ণ বাস্তু যে স্থানে, তাকে—'মঙ্গল'; রাজা ও বণিক-অধ্যুষিত বাস্তু যেখানে, তাকে—'পুর'; অতি অল্প-লোকের বসতি যেখানে, তাকে—'গ্রাম'; তাপসেরা যেখানে বসবাস করেন, তাকে—'মঠ' বলে।

গ্রাম, দুর্গ, নগর প্রভৃতির নানা উপবিভাগ আছে, যথা—

(১) গ্রাম—দণ্ডক, স্বস্তিক, প্রস্তর, প্রকীর্ণক, নন্দাবর্ত, পরাগ, পদ্মক, শ্রীপ্রতিষ্ঠিত; (২) খেটক; (৩) খর্বক; (৪) দুর্গ—গিরিদুর্গ, বনদুর্গ, জলদুর্গ, রণদুর্গ, দিব্য বা দৈবকদুর্গ, ধাবনদুর্গ, কৃতকদুর্গ; (৫) নগর (৬) রাজধানী (৭) পত্তন (৮) দ্রোণিকামুখ (৯) শিবির (১০) স্কন্দাবার (১১) স্থানীয় (১২) বিড়ম্বক (১৩) নিগম ও (১৪) শাখানগর।

গ্রামশ্চ খেটকশ্চৈব খর্বটং দুর্গমেবচ। ৪ ॥
নগরং রাজধানী চ পত্তনং দ্রোণিকামুখম্।
শিবিরং স্কন্দবারশ্চ স্থানীয়ং চ
বিড়ম্বকম্ ॥৫।
নিগমশ্চাথঃ নির্দিষ্টঃ স্যাচ্ছাখানগরং ততঃ।
এষাং চতুর্দশানাং চলক্ষণং শৃথগুস্যতে ॥৬।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পদাবলী সাহিত্যের বৈচিত্র্য

বিপুল পদাবলী সাহিত্যে মুদ্রিত-অমুদ্রিত পদের সংখ্যা প্রায় আট হাজারের কাছাকাছি হইবে। বৈষ্ণব কবিগণ প্রধানত সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসেরই পদ রচনা করিয়াছেন। প্রার্থনা-পদগুলির মধ্যে শান্ত ও দাস্য রসের উদাহরণ পাওয়া যায়। রসের এই কয়টি বিভাগের মধ্যে মধুর রসের পদের সংখ্যাই খুব বেশী। কিন্তু এই একই রস লইয়া রচিত পদের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মধুর রসের পদসমূহ পূর্বরাগাদি কয়েকটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। এক-একটি পর্যায়ের মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। যেমন পূর্বরাগ দর্শন ও শ্রবণে পূর্বরাগের উদয় হয়। দর্শন আবার তিন প্রকার, স্বপ্নে দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, সাক্ষাদ্দর্শন। শ্রবণ, গুণীজনের গানে, ভাটমুখে বা সখীমুখে নায়ক-নায়িকার রূপগুণের কথা শ্রবণ, শ্রীরাধিকার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ ইত্যাদি। বৈষ্ণব কবিগণ এই নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই আপন আপন রচিত পদে বিবিধ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাবামাধুর্য ও ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে অলংকারপ্রাচুর্য এই সমস্ত পদকে এক-একটি মণিখণ্ডের মত উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমি পদাবলী সাহিত্যে রূপের পদ লইয়া সংক্ষেপে কবি-গণের রচনাবৈচিত্র্যের আলোচনা করিতেছি।

শ্রীমন মহাপ্রভুর সমসাময়িক পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ শিশু শ্রীগৌরাঙ্গের একটি সুন্দর চিত্র অংকন করিয়াছেন।

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা॥

শ্রীচৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি বড়ু চণ্ডীদাস নানা-ভাবে শ্রীরাধার রূপ বর্ণন করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গে সরোবরের উপমা দিতেছেন—

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুণ্ডল।
বদন কমল লোভে আলক ভমল॥
নেত্র উতপল তোর নাসা নালদণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড॥
সুন্দরী রাধা ল সরোঅর ময়ী।
দুষহ বিরহ জরে জরিলা কাহ্নাঞি॥

সুন্দরী রাধা লো, তুমি সরোবরময়ী, তোমার দুঃসহ বিরহজ্বরে কানাই জর্জরিত হইল। দেহ-সরোবরে লাবণ্য তোমার জল, কুন্তল-জাল শৈবালদাম। বদন পদ্ম, তাহাতে অলকাবন্দী অলিদল শোভা পাইতেছে। নয়ন তোমার নীলকমল, নাসিকা মৃণাল-দণ্ড। কপোলযুগল যেন অখণ্ড মহুয়া-ফুল। সরোবরের মাঝখানে মহুয়া ফুল কোথা হইতে আসিল, কবির দেখা পাইলে জিজ্ঞাসা করিতাম। কবি রাধার হাসির সঙ্গে কুমুদের উপমা দিয়াছেন। কিন্তু দন্তপংক্তিকে বলিয়াছেন কেশর (পুন্নাগ) পুষ্প। কবি একবার রাধার নাসিকাকে মৃণাল বলিয়াছেন, পুনরায় বাহুযুগলকে মৃণাল বলিতেছেন। বলিতেছেন করতল তোমার রক্তপদ্ম, অপরূপ স্তনদ্বয় যুগল চক্রবাক। নাভিতল ঈষৎ প্রস্ফুটিত পদ্ম। তোমার ত্রিবলী সরোবরঘাটের স্বর্ণরচিত সোপান, গুরু নিতম্ব ঘাটের পাট শিলা-রূপে বিদ্যমান। বিধাতা শোভন জঘনে স্বর্ণপাট আরোপণ করিল। ইত্যাদি।

এই কবিতার মূল পাওয়া যায় মহাকবি কালিদাস-রচিত শৃঙ্গারতিলকের প্রথম শ্লোকে। দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া কবিগণ তাহারই অনুকরণ করিয়া আসিতেছেন। বড়ু চণ্ডীদাস যে এই শ্লোকেরই ছায়া লইয়া উদ্ধৃত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, আমি সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ দেখি না। শ্লোকটি তুলিয়া দিলাম—

বাহু দ্বৌ চ মৃণাল মাস্য কমলং লাবণ্য লীলাজলং
শ্রোণী তীর্থ শিলাচ নেত্র শফরং ধম্মিল্য শৈবালকং।
কান্তায়াঃ স্তন চক্রবাক যুগলং কন্দর্প বাণানলৈ—
দগ্ধানা মব গাহনায় বিধিনা রম্যং সরোনির্মিতং॥

বাহু দুইটি মৃণাল, মুখ পদ্ম, লাবণ্য লীলাজল, জঘন তীর্থশিলা, নেত্র শফরী, কান্তার স্তনদ্বয় যুগল চক্রবাক, মদনের বাণে দগ্ধজনের অবগাহন জন্য বিধাতা সুন্দর সরোবর নির্মাণ করিয়াছেন।

পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস ভণিতায় আর-একটি সরোবরের বর্ণনা আছে—পিরীতি সরোবর। কবির শ্রীরাধা বলিতেছেন—

পিরীতি সুখের দেখিয়া সায়ের
নাহিতে লাম্বিলুঁ তায়।
নাহিয়া উঠিতে ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥
দেখিতে সুন্দর প্রেম সরোবর
সুখময় তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলবল॥
ঘরে গুরুজ্বালা জলের শিহালা
পড়সী জিয়ল মাছে।
কুল পানীফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলংক পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইলুঁ যদি।
অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥
চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখ লাভ তরে পিরীতি যে করে
দুখ যায় তার ঠাঁই॥

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কয়েকজন পৌরাণিক বীরের অধিষ্ঠান বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন খোঁপায় মহাদেব, কেশপাশে নীল, সিঁথায় সূর্য (সিন্দুর), ললাটে তিলকরূপ চাঁদ ইত্যাদি। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধার কুসুমিত দেহেরও বর্ণনা দিয়াছেন। কেশে তমাল পুষ্প, নয়নে নীল কুরুবক, নাসায় তিলফুল, গণ্ডযুগল মহুয়া ফুল, অধরে বান্ধুলী, কর্ণে বকপুষ্প, দন্তপংক্তিতে মুকুলিত কুন্দ, রসনে মসিনা ফুল, বাহুযুগলে হেম যূথিকার মালা, করযুগলে অশোকস্তবক, স্তনদ্বয়ে মুকুলিত স্থলপদ্ম ইত্যাদি।

শ্রীরাধা বৃন্দাবনের বনে ফুল তুলিতে-ছিলেন, তাই কবিরাজ গোবিন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি।
কুসুমহি নিরমিত সব তনু তোরি॥
আনন হেম সরোরুহ ভাস।
সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ॥
নয়ন যুগল নীল উতপল জোড়।
সহজে শোহায়ল শ্রবণক ওর॥
অপরূপ তিলফুল সুললিত নাস।
পরিমলে জিতল অমর তরু বাস॥
বান্ধুলী মিলিত অধর বাহা হাস।

মুকুলিত কুন্দ কুসুম পরকাশ॥
সব তনু ফুটল চম্পক গোর।
পাণিক তল থল কমল উজোর॥
গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমান।
পুজই পশুপতি নিজ তনুদান॥

কবি বিদ্যাপতি অপর এক ভঙ্গিমায় শ্রীরাধার রূপ অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

গেলি কামিনি গজহু গামিনি
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালিক কুসুম সায়ক
কুহকি ভেলি বরনারি।
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পুজল
যৈসে সারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে সরদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীব জুড়াএব
টুটব বিরহক ওর।
চরণ জাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জদুপতি
চীত থির নাহি হোয়।
সে জে রমনি পরম গুণমনি
পুনু কি মিলব তোয়॥

গজগামিনী কামিনী ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া গেল। সেই বরাঙ্গনা ঐন্দ্রজালিক কুসুমশায়কের (মদনের সঙ্গিনী) কুহকী হইল। (জাদুকরগণের সঙ্গে ভেল্কী দেখাইবার জন্য এক-একজন রমণী থাকে, এই রমণী যেন ঐন্দ্রজালিক মদনের সঙ্গিনী সেই কুহকিনী। অথবা এই রমণী জাদুকর মদনেরও মোহকারিণী) সেই রমণী ভুজযুগল জুড়িয়া (ঘুরাইয়া) সুছান্দে (সুন্দর ভঙ্গীতে) মুখমণ্ডল বেষ্টন করিল। যেন কামদেব চম্পকদামে শারদচন্দ্রের পূজা করিল। (অর্থাৎ তাহার শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় বদনে অর্পিত চম্পক কলিকার মত হস্তাঙ্গুলি দেখিয়া মনে হইল ইহা মদন কর্তৃক চন্দ্রের নিকট অর্পিত পূজাঞ্জলি। হস্তোত্তোলন করায় পার্শ্বদেশ অনাবৃত হইল। রমণী হাত নামাইয়া চঞ্চলভাবে অঞ্চল টানিয়া বক্ষ আবৃত করিবার কালে তাহার অর্ধপ্রকাশিত পয়োধর দেখিলাম। যেন পবন পরাভূত (পবনে অপসারিত) শরতের মেঘ সুমেরুকে প্রকাশ করিয়া দিল। পুনরায় দেখিতে পাইলে জীবন জুড়াইবে, বিরহের অন্ত হইবে। তাহার চরণের আলতা আমার হৃদয়ে আগুন জ্বালাইয়া সর্বাঙ্গ দগ্ধ

করিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, যদুপতি শোন, সেই পরম গুণবতী রমণী তোমার ভাগ্যে মিলিবে কি না চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত সুস্থির হইতেছে না।

বহু কবি নানাভাবে শ্রীরাধার কথা বলিয়াছেন। দানলীলায় রাধারূপের বর্ণনাভঙ্গী এক প্রকার। আবার মাথুরলীলায় অন্য প্রকার। এইরূপ অভিসারে, খণ্ডিতায়, মিলনে বহু পার্থক্য আছে। এইবার শ্রীকৃষ্ণরূপের কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। অনন্তদাস শ্রীকৃষ্ণরূপের কথা বলিতেছেন—

ব্রজকুল কুমুদ সুধাকর নাগর।
নাগরি পিরিতি মুরতিময় সাগর॥
জয় জয় গোকুল বল্লভ শ্যামর।
ভাবিনি ভাব বিভাবিত অন্তর॥
কান্তি করম্বিত জিত নব জলধর।
চূড়হি চারু শিখণ্ড খণ্ডধর॥
লোচন নীল কমল দল ঢর ঢর।
কত কোটি অরুণ জিতল পদতল কর॥
কাঞ্চন রুচি রুচি ধৃত পীতাম্বর।
হৃদয়ে ধরল নখ রেখ সুধাকর॥
তহি মণিরাজ রোমরাজি ভুজগেশ্বর।
মোতিম মালসহ নাভি সরোবর॥
খিন কটিতট পট কাঞ্চী মনোহর।
জানু জিতল কিয়ে রাম কদলিবর॥
চরণ নখর মণি মুকুর নিকর হর।
দাস অনন্ত চিতে নিতি নিতি জাগর॥

নাগর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজফুলরূপে কুমুদের চন্দ্র। আর ব্রজনাগরীগণের পিরীতি যেন মূর্তিমন্ত সমুদ্র। গোকুলবল্লভ শ্যামের জয় হোক, জয় হোক। ভাবিনী রাধার ভাবে তোমার অন্তর সদাই বিভাবিত। নবজলধর জিনিয়া লাবণ্যপুঞ্জে সমুজ্জ্বল তুমি। চূড়ায় সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়াছ। তোমার ঢলঢল নয়ন যেন নীলকমল। পদতল কত কোটি অরুণকে জয় করিয়াছে। পরিধানে কাঞ্চনবর্ণের সুন্দর পীতাম্বর। বক্ষে (বিলাসকালে শ্রীরাধার) নখক্ষত রেখারূপে চন্দ্র ধারণ করিয়াছ, তাহাতে কৌস্তুভ মণি। রোমরাজি (নাভির উপর লোমলতাবলী) যেন সর্পরাজ। বক্ষে মতির মালা। নাভি সরোবর তুল্য। ক্ষীণ কটিতটের পটভূমিতে মনোহর কাঞ্চী। উরু যেন শ্রেষ্ঠ রামকদলি। চরণনখর মণি দর্পণের গর্ব হরণ করে। অনন্ত দাসের চিত্তে ঐরূপে নিতি নিতি জাগ্রত হও।

জ্ঞানদাসের একটি পদে শ্রীকৃষ্ণের রূপ—
শ্যামাধাম কুন্দদাম চারু চিকুর মোহনি।
বরিহাপঙ্খ ভ্রমরী সঙ্গ মধুর মধুর সোহনি॥
দেখত লাল উরহিমাল মন্দ মন্দ আয়নি।
মোহন বংশ নিহিত অংশ মধুর মধুর গায়নি॥
মকর গণ্ড তিমির খণ্ড ভালে তিলক লায়নি।
রমণী কুল আধ দুকুল আধ মুদিত চাহনি॥
বদন চান্দ কামের ফান্দ নয়নকি শর ধায়নি।
জ্ঞানদাস পিরীতি আশ ওরূপে চিতে ভাওনি॥

শ্যামের দেহ শ্যামলিমার আলয়। মোহন চারু চিকুরে কুন্দফুলের মালা। তাহার উপর ভ্রমরীবেষ্টিত ময়ূরপুচ্ছ মধুররূপে শোভা পাইতেছে। দেখ, বক্ষে বনমালাধারী নন্দলাল মন্দ গমনে আসিতেছেন। স্কন্ধ-নিহিত মোহন বংশীতে মধুর মধুর গান করিতেছেন। গণ্ডের মকর (অলংকার) তিমির নাশ করিতেছে। ললাটে তিলক লইয়াছেন। দেখিয়া রমণীগণের কটির বসন খসিয়া পড়িতেছে। রসাবেশে তাহাদের আঁখি আধমুদিত হইয়া আসিতেছে। বদন-চাঁদ কামের ফাঁদস্বরূপ। কটাক্ষবাণ ধাইয়া আসিতেছে। জ্ঞানদাস পিরীতির আশায় ঐ রূপ চিত্তে ভাবনা করিতেছেন।

কবি গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণকে জলদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

সুরপতি ধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে।
মালতি ঝুরি কি বলাকিনি উড়ে॥
ভাল কি ঝাঁপল বিধু আধ খণ্ড।
করিবর কর কিয়ে ও ভুজদণ্ড॥
ও কি শ্যাম নটরাজ।
জলদ কলপতরু তরুণিসমাজ॥
কর কিসলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ।
মুরলি খুরলি কিয়ে চাতক ভাষ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হার কি তারক দোতিক ছন্দ॥
পদ তলে কি থল কমল ঘন রাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজরায় বসন্ত॥

শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ও কি ময়ূর পুচ্ছ, না (জলধরের গায়ে) ইন্দ্রধনু? চূড়ায় বেড়া মালতী মালা, না বলাকিনী উড়িতেছে! ললাটে চন্দনতিলক, না অষ্টমীর চাঁদ? ও কি ভুজদণ্ড, না করীশুণ্ড? (করী শুণ্ডাকৃতি জলস্তম্ভ?) ও কি শ্যাম নটরাজ, না জলধররূপে তরুণী-সমাজের কল্পতরু? ও কি করকিশলয়, না বিকশিত অরুণ? ও কি অবিরল মুরলীরব, না চাতকের কলধ্বনি? ও কি হাসি, না অমিয় মধু ঝরিতেছে? বক্ষে হার, না জ্যোতির্ময় তারকাছন্দ? পদতলে কি স্থলকমল (স্থলকমলের রক্তিমা মেঘের গায়ে লাগিয়াছে), না (আমাদের নিবিড়) অনুরাগ? তাহাতে (আকাশে উড্ডীয়মান) হংসরব, না নূপুর-শিঞ্জন? গোবিন্দদাস বলিতেছেন যাহাতে মতিমন্ত দ্বিজ বসন্তরায় ভুলিয়াছেন।

পদকর্তা শশিশেখর সংক্ষেপে এই সংশয়ই অন্যভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরাধা বলিতেছেন—

নবহুঁ রুচি মেহ সখি নীপহুঁমূলে পেখলুঁ
ভুলল মন নয়ন অভিরামং।
তরুণ তমাল কিয়ে কিয়ে দামিনী অম্বরে
লখিতে নারিনু সখি গোর কিয়ে শ্যামং॥
উচ্চ চূড়া টেড়া শিখি পুচ্ছ তহি উপরি
বিরাজিত সতত তছু বামং।
ইন্দ্রধনু আকৃতি চূড়ো পরি বিরাজই
সুশোভিত মণি মুকুতা দামং॥
অঙ্গাকৃতি ভঙ্গী বাঁকা বঙ্কিম সুচাহনি
করেতে বাঁশী অধরে হাসি শোভং।
শশিশেখর সঙ্গে হাম সোইরূপ পেখলুঁ
জাগয়ে মনে নিশি দিবস লোভং॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের কথা প্রায় প্রত্যেক কবিই বলিয়াছেন। কেহ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন কেহ মিলন বর্ণনা করিয়াছেন, কেহ বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেকের রচনাতেই কবিত্বের পরিচয় আছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণ আপন আপন পদে সুনিপুণ বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের অলংকৃত ভাবগর্ভ রচনায় ব্যঞ্জনার বিকাশ চিত্তকে চমৎকৃত করে। গোবিন্দদাসের একটি যুগল-মিলনের পদ তুলিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

জলদহি জলদ বিজুরি দিবি তাপক
মরকত কনয়া কঠোর।
এ দুঁহু তনুমন নয়ন রসায়ন
নিরুপম নওল কিশোর॥
সখি, দেখ রাধামাধব ভাতি।
কো বিহি নিরমিল কোন ঘটাওল
শ্যামর গোরি সঙ্গাতি॥
যব দুঁহু দুঁহু ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
আন আন পিবইতে চাহ।
তনু তনু পৈঠত সঘনে আলিঙ্গত
কৈছে হোয়ব নিরবাহ॥
আরতি অধর সুধারস পিবি পিবি
দুঁহুক পিরীতি উনমাদ।
গোবিন্দদাস কহ অধিক রসাবেশে
কিয়ে না করু পরমাদ॥

জলদ তো জলদই, (জল মাত্রই দান করে, তাহাও আবার না চাহিলে পাওয়া যায় না) বিজলী তো চক্ষে জ্বালা ধরায়। মরকতমণি এবং সুবর্ণ নীরস ও কঠিন। কিশোরী-কিশোর যুগলের তুলনা হয় না। এই দুইজন আমাদের দেহ মন এবং নয়নের রসায়ন। সখি, রাধামাধবের শোভা দেখ। কোন্ বিধাতা ইহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছে, এই শ্যাম গৌরীর মিলন ঘটাইয়াছে। যখন দুইজন দুইজনকে ধরিয়া নয়নাঞ্জলি ভরিয়া একে অন্যকে পান করিতে চায়, তখন সঘন আলিঙ্গনে দুই দেহ এক সঙ্গে মিশিয়া যায়, কিরূপে নির্বাহ হইবে অর্থাৎ পরস্পরের আশা মিটিবে? অনুরক্ত অধরে অমৃতরস পান করিয়া করিয়া দুইজনেই প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, অধিক রসাবেশে কি প্রমাদই না ঘটায়!
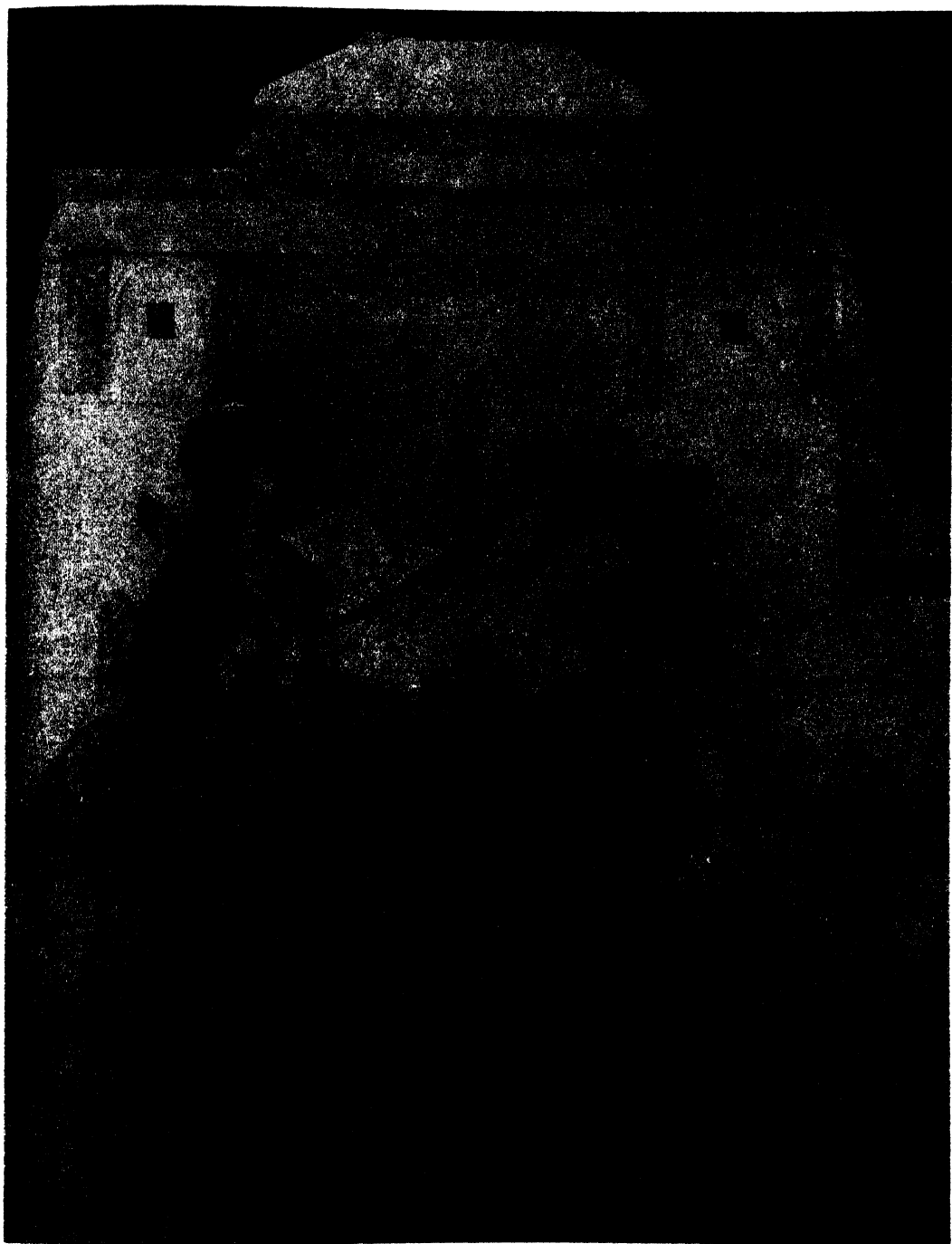
শাহজাদী (আরব্যোপন্যাস) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্লক ও মুদ্রণঃ বেঙ্গল অটোটাইপ কোং রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

আশ্রয় | 'জরাসন্ধ'
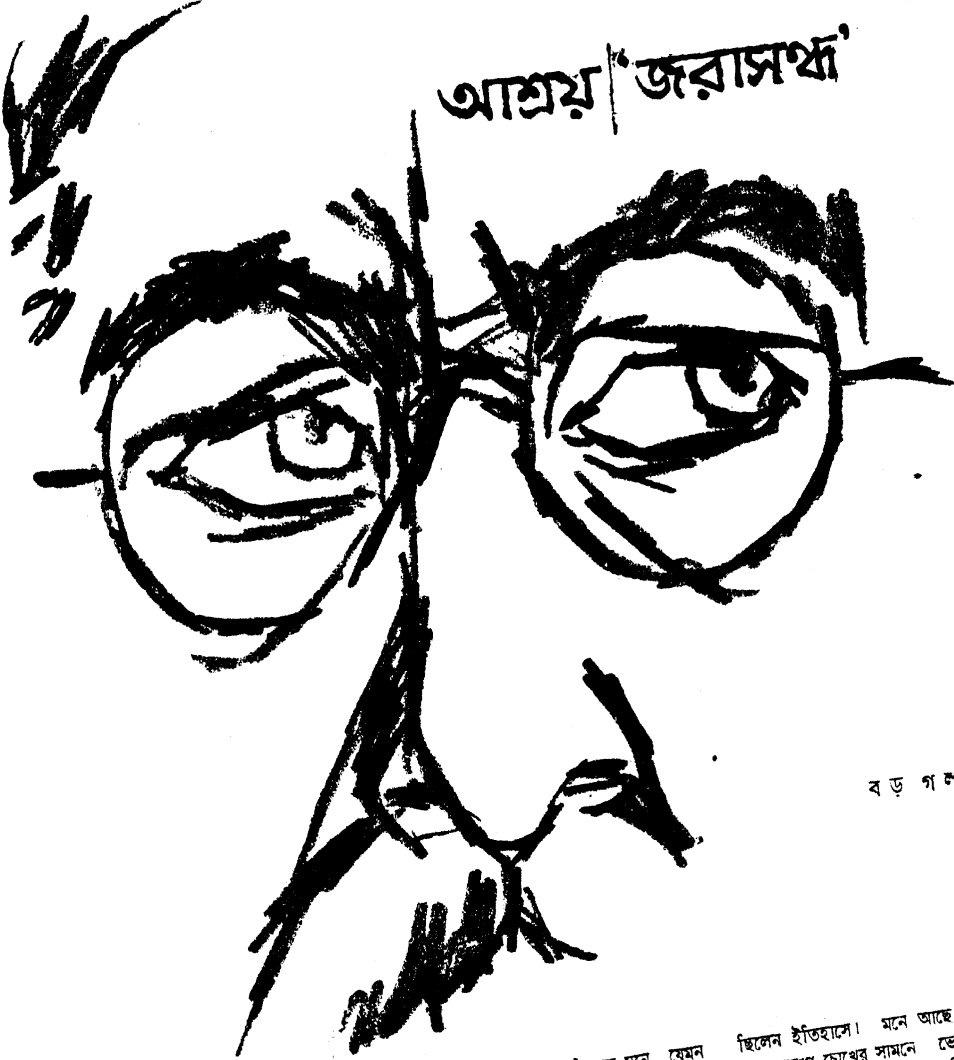
বড় গল্প

একটা চাপা গোলমাল অনেকক্ষণ থেকেই শোনা যাচ্ছিল, এবার তার সুরটা একটু চড়তেই সোমনাথ উঠে গিয়ে বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। জায়গাটা খুব দূরে নয়, বড় জোর আধ মাইল। কিন্তু এখান থেকে নজরে পড়ে না। আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে একটা বস্তি।

সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই সোমনাথের কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। উনিই ওখানকার মালিক; সেই অর্থে ওটা ও'রই সৃষ্টি, যদিও ঐ কুৎসিত অবয়বটার যথেচ্ছভাবে গড়ে ও বেড়ে ওঠার উপর ও'র কোনো হাত ছিল না। তবু কুসন্তানের পিতার মনে যেমন একটা লজ্জা ও বেদনা জড়িয়ে থাকে, ঐদিকে তাকালে তিনিও সেই ধরনের একটা অনুভূতি নিজের মধ্যে টের পান।

'বস্তি' কথাটা কে কী অর্থে প্রথম রচনা করেছিলেন, সোমনাথ জানেন না। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই। সম্ভবতঃ ওটা 'বসতি' শব্দের অপভ্রংশ, এবং 'অপ' বলেই হয়তো ওর মধ্যে একটা ইতর গন্ধ জড়িয়ে আছে। 'বসতি' কথাটার সুর আলাদা; তার মধ্যে শোভা আছে, সম্ভ্রম আছে। 'আর্যগণ সিন্ধুনদের তীরে প্রথম বসতি স্থাপন করেন'—ছেলেবেলায় পড়েছিলেন ইতিহাসে। মনে আছে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠত একটি সুন্দর ছবি, একটি সরল কিন্তু পরিচ্ছন্ন জনপদ। তার সঙ্গে কী দুস্তর তফাত ঐ কদর্য কুঁড়েগুলোর বস্তি! অর্থাৎ একরাশ বিবর্ণ টিন, ভাঙা টালি আর ফাটা খাপরার জড়ো করা জঞ্জাল। শ্রীহীন দৈন্যের নির্লজ্জ নগ্নতা।

ঐ পরিবেশ থেকে নিরাপদ দূরত্ব, ফাঁকা জায়গায় এই বাড়িখানা তিনি নিজের রুচি ও সম্পদ দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। তৈরি অংশটা এমন কিছু বিশাল নয়, কিন্তু তার চারদিক ঘিরে অনেকখানি খোলা হাতা।

কম্পাউন্ড-পাঁচিলের গা ঘেঁষে চলে গেছে পীচ-ঢালা প্রশস্ত রাস্তা। তারপরেই দীর্ঘায়ত মাঠ। ঠিক মাঠ নয়, এখানে সেখানে কাঁটাঝোপ, আর বাতিল করে দেওয়া পাথুরে কয়লার ছোট্ট ছোট স্তূপে ঘেরা উঁচুনীচু পোড়ো জমি।

কিন্তু একদিন এই মাঠের দেহে রূপ ছিল। এ অঞ্চলের জমি ঠিক সমতল নয়, যাকে বলে ঢেউ খেলানো। তার উপরে অবিশ্রান্ত সবুজ ঘাসের আস্তরণ। উদয়াস্ত গরু-মোষের স্বচ্ছন্দ বিহার। তার মধ্যে কখনো কচিৎ দুচারটি নগ্নপ্রায় কালো মানুষ। ঐ মাঠেরই যেন অংশ তারা। এই পথ দিয়ে যারা যেত, সেই কথাটি তাদের মনে হত। দূরের মানুষ যারা মোটর ছুটিয়ে আসত এই কালো মসৃণ রাস্তার উপর দিয়ে, এখানে এসেই চারদিকে একবার না তাকিয়ে পারত না। মুখ থেকে আপনা হতেই বেরিয়ে যেত—'বাঃ'!

তারপর একদিন জনকয়েক গুপ্তধন-লিপ্সু বণিক-দস্যু কেমন করে সন্ধান পেল, এ মাটি রত্নগর্ভা, এর তলায় স্তরে স্তরে সাজানো আছে তাল তাল কালো সোনা, যার নাম কয়লা। গাইতি শাবল আর তার সঙ্গে কত সব জটিল যন্ত্রের রণ-সম্ভার নিয়ে ছুটে এল তাদের পাল পাল অনুচর। কটা বছরও লাগল না। এই মাঠের বুকের ভিতর থেকে সর্বস্ব খুঁড়ে নিয়ে ফেলে রেখে গেল একটা কদর্য খোলস, আর সেই অপহরণের অক্ষয় সাক্ষী, মাঝে মাঝে এক একটা রাক্ষুসে খাদ।

সোমনাথ দত্ত সেই গাইতি-মালিকদের একজন। ঐ শ্রীহীন, অন্তঃসারশূন্য মাঠের গায়ে এখনো তার স্থূল হস্তের আঘাত-চিহ্ন লেগে আছে। ঐ খাদের গহ্বরে যে রত্ন লুকিয়ে ছিল, তার থেকেই এই রানী-গঞ্জের প্রাসাদ, বালিগঞ্জের বাড়ি এবং ব্যাংকে গচ্ছিত বিপুল সঞ্চয়।

ত্রিশ বছর আগে এর কোনোটাই ছিল না। লেখাপড়া শিখেছিলেন পরের বাড়ি থেকে। তারপর গরিব, ভদ্রবংশের বাঙালী ছেলেরা যা করে থাকে, অন্ততঃ তখন যা করত, আপিসে আপিসে ধর্ণা দিয়ে ফিরেছেন একটি ত্রিশ টাকার কেরানী-গিরির আপ্রাণ চেষ্টায়। তাই পেলেই সেদিন সন্তুষ্ট হতেন। বাপ-মা ভাইবোনের একটা গোটা পরিবারের অন্ন সংস্থান হয়ে যেত। কিন্তু পেলেন না। আর কোনো পথ না দেখে এক কণ্ট্রাক্টরের খাতা লেখার ভার নিয়ে চলে এলেন রানীগঞ্জে। পরের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। কলম ছেড়ে ধরলেন দাঁড়িপাল্লা। ছোট্ট একটি মুদি দোকান। ক্রমে সে বড় হল। তার থেকে কোলিয়ারীর কুলী বস্তিতে মাল যোগাবার ঠিকাদারি। সেখান থেকে প্রমোশন পেলেন উচ্চ মহলে। ধরে ফেললেন দুচারটে রাস্তা ও বাড়ি তৈরির কণ্ট্র্যাক্ট। টাকা কোথায় ঢালবেন, এই সমস্যা যখন দেখা দিল, কপাল ঠুকে কিনে ফেললেন এই মাঠ। তখনো এ শুধু মাটি আর তার নীচে আশা ও আশঙ্কার ওঠাপড়া। আশাই জয়ী হল। শুধু জয় নয়, প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেল প্রাপ্তি। এই মাঠের পায়ে তিনি যেমন সর্বস্ব ঢেলেছিলেন, মাঠও তেমনি নিজেকে উজাড় করে এনে দিল তাঁর হাতে।

আজ মনে হচ্ছে, কী দরকার ছিল। এতটা তো তিনি চাননি, না পেলেও কোনো ক্ষোভ ছিল না। সেদিন যে লোভ হয়নি তা নয়, কিন্তু লোভের বস্তু যখন হাতে পৌঁছল, তখন ভাবলেন, কী লাভ হল এত পেয়ে। অত বড় খনির মালিক। কয়লা ও কুলী নিয়েই প্রায় কেটে গেল সারাজীবন। তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, এ সব না করলেও হত। কী পেলেন এই খোঁড়াখুঁড়ি করে? কয়লা থেকে কাঞ্চন যেমন আসে, তার সঙ্গে আসে কালি। কুলীর দেহে যার ছোপ লাগে সে-কালি নয়, সেটা তো ধুলেই উঠে যায়. মালিকের জীবনে যার দাগ লাগে সেই কালি। তাকে মুছে ফেলা শক্ত। হাত দিয়ে না ঘাঁটলেও কোলিয়ারীর আশে পাশে যারা থাকে, কয়লার ময়লা থেকে কারো রেহাই নেই।

তাই সোমনাথের অনেক সময় মনে হয়েছে, মাটি তো মানুষকে কম দেয়নি। সভ্যতার আদি যুগ থেকে নিজের বুক চিরে যুগিয়েছে তার অন্ন, নিজেকে পুড়িয়ে গড়েছে তার আশ্রয়। সেই আদিম প্রয়োজনের বাইরে মানুষ যখন বহুধা বিস্তৃত হল, সেখানেও তার জীবনের প্রতি স্তরে তার শিল্পকলা, তার সৌন্দর্য রচনা, তার গৃহসজ্জা, তার উৎসব-অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে মাটি। তবু তার লোভের অন্ত নেই। নখীর চেয়েও হিংস্র তীক্ষ্ণ, সুদীর্ঘ নখর বসিয়ে সেই মাটির বুকের ভিতর থেকে ছিনিয়ে এনেছে সর্বংসহা ধরিত্রীর গোপন সঞ্চয়। তার থেকে মুষ্টিমেয় মানুষের অনাবশ্যক সম্পত্তির বিপুল বোঝা প্রতিদিন ভারী হয়ে উঠছে, কিন্তু সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর সম্পদ কিছু বেড়েছে কি? তাদের কথা থাক। ঐ ঐশ্বর্যের শীর্ষে যারা বসে আছে, তারা কী পেয়েছে? সুখী হয়েছে তারা? তৃপ্ত হয়েছে? স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-স্বজন-বান্ধব সবাইকে ঘিরে যে জীবন, সেখানে কি সন্ধ্যা-বেলা শোনা যায় আনন্দের সুর? নেমে আসে শান্তির ছায়া? 'গৃহ' বলতে যা বোঝায়, সেই দুর্লভ বস্তুর স্বাদ তাদের কজনের ভাগ্যে জুটেছে?

অপরের কথায় তাঁর প্রয়োজন নেই। নিজের এই দীর্ঘ জীবনের দিকে যখন পিছন ফিরে তাকান, নিজেকে যখন প্রশ্ন করেন,—

সোমনাথের চিন্তাস্রোত হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে নীচের ফটকে এসে গর্জে উঠল মোটরের এঞ্জিন। সামনের রাস্তা দিয়েই এসেছে গাড়িটা। সেইদিকেই চেয়ে ছিলেন; কিন্তু চোখ দুটো অনেক পেছনে চলে গিয়েছিল, কাছের জিনিস দেখতে পায়নি।

গাড়ি থেকে নামলেন কোলিয়ারীর ম্যানেজার, প্রশান্ত ব্যানার্জি। ট্রাউজারের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে সিঁড়ির ধাপগুলো লাফিয়ে পার হয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। সোমনাথও ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। এক নজর তাঁর ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়েই বললেন, কী হল; শুনল না?

প্রশান্ত মাথা নেড়ে বিরক্তির সুরে বললেন, নাঃ; আমি তো আপনাকে তখনই বলে গেলাম। ভালো কথায় কান দেবার মত মন-মেজাজ থাকলে তো শুনবে? কোলকাতা থেকে গোটাকয়েক পাজামা পরা ছোকরা এসে সুর আরো চড়িয়ে দিয়েছে। আমার মতে গেটটা বন্ধ করে দিলেই সব দুদিনে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—আমরা কিছুটা উঠতে রাজী আছি, জানিয়ে দিয়েছ?

—তাতেই আরো পেয়ে বসল। মনে করল, আমরাই ঠেকে পড়েছি, আরেকটু চাপ দিলেই পুরোটা আদায় হয়ে যাবে।

সোমনাথ ভাবতে লাগলেন। প্রশান্ত ক্ষণকাল অপেক্ষা করে আবার বললেন, সেই-জন্যেই বলছিলাম, আমাদের উচিত হচ্ছে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকা। ওরাই আসুক আমাদের কাছে, আমরা কেন যাবো? এখানে গরজ দেখানো মানেই ঠকা।

সোমনাথের কানে বোধহয় এই কথাগুলো সব গিয়ে পৌঁছায়নি। নিজের কোন চিন্তার সূত্র ধরে বললেন, ওদের দাবী পুরোপুরি মেটাতে গেলে কত টাকা দরকার?

প্রশান্ত বিস্ময়ে চোখ তুললেন। রীতি-মত উষ্মার সুরে বললেন, আপনি কি ওরা যা চাইছে, সব মেনে নিতে চান?

সোমনাথ ধীরভাবেই বললেন, বাড়তি খরচটা কী রকম দাঁড়াবে তাই জানতে চাইছি।

ম্যানেজার তেমনি উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন, এখানে খরচটাই বড় কথা নয়, আসল প্রশ্ন হল, পলিসি—কুলীদের সম্পর্কে আমাদের স্ট্যান্ডটা কী রকম হবে। ওরা হুমকি দিয়েছে বলেই আমরা মাথা নোয়াব না, শক্ত হয়ে দাঁড়াবো। আশেপাশে যাঁরা আছেন, পুরনো পুরনো খনি, তাঁদের সঙ্গে এক-যোগে কাজ করা দরকার। ওদের যেমন ইউনিয়ন আছে, কথায় কথায় হুমকি দেয়, মালিকরাও যদি তেমনি জোট বেঁধে—

'তোমাকে যা বললাম, তাই কর', কথার মাঝখানেই উঠে পড়লেন সোমনাথ, 'ওরা ঠিক

কতটা বেশী চাইছে, আর তাতে করে আমাদের খরচা কি রকম পড়বে তার একটা খসড়া হিসেব আজ বিকেলেই আমাকে দিও।'

বলেই, ধীরে ধীরে ভিতর বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। ম্যানেজার সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনিভাবে প্যান্টের ডান পকেটে হাত দিয়ে মনিবের পেছনে প্রায় ছুটে গিয়ে বললেন, ও, আরেকটা কথা।

সোমনাথ ফিরে দাঁড়ালেন। প্রশান্ত পকেট থেকে একখানা ধার খোলা খাম বের করে অনেকটা যেন ভয়ে ভয়ে বললেন, শুভেন্দু চিঠি দিয়েছে।

—কে?

—বড় খোকা।

—কী লিখেছে?

—'শ পাঁচেক টাকা চেয়েছে, দু'তিনদিনের মধ্যে, থেমে থেমে বললেন প্রশান্ত।

'পাঁচশ টাকা!' বিস্ময়ের সুরে বললেন সোমনাথ, 'এ মাসের টাকাটা পাঠাওনি?'

আজ্ঞে, গত সপ্তাহেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

—তবে?

প্রশান্ত ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। সোমনাথ জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই বললেন, লিখে দাও, এত টাকা কি জন্যে দরকার, আমি জানতে চাইছি। সব যেন খুলে লেখে।

—'আজ্ঞে, সে কথাও আছে', বলে, চিঠিখানা মনিবের দিকে বাড়িয়ে ধরতেই, তিনি বললেন, থাক: মুখেই বল।

প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না। কর্তার মুখের দিকে একবার তাকালেন, দুবার দ্বিধা করলেন, তারপর নীচের দিকে চেয়ে চাপা অস্ফুট স্বরে বললেন, শুভেন্দু বিয়ে করছে। সেই মেয়েটিকেই।

—কী বললে! কোনো আকস্মিক দুঃসংবাদে মানুষ যেমন আঁৎকে ওঠে, তেমনি ভাবে বেরিয়ে এল কথা দুটো। প্রশান্তর উত্তরটা আরো জড়িয়ে গেল, বিয়েটা অবিশ্যি রেজিস্ট্রি করে হচ্ছে, তাহলেও খরচ পত্তর আছে। তাছাড়া—

বলতে বলতে হঠাৎ এক লাফে এগিয়ে গিয়ে মনিবকে ধরে ফেলে বললেন, আপনি বসে পড়ুন।

সোমনাথ সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে সহজভাবেই বললেন, না, না; ও কিছু না। আচ্ছা, তুমি তাহলে এখন এসো।

আর কোনো কথা না বলে, যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ঘরে ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন, এবং ইজি চেয়ারে শুয়ে, কিছুক্ষণ আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে কথা ভাবছিলেন, তারই ছিন্নসূত্রে ফিরে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সব যেন কেমন জট পাকিয়ে গেল। না; বাড়ি আর গৃহ এক বস্তু নয়। অজস্র টাকা ঢেলে, ঘরের পর ঘর সাজিয়ে বহুমূল্য আসবাব আর নানা ভোগবিলাসের উপকরণ জড়ো করে তিনি শুধু বাড়ির পর বাড়ি তৈরি করেছেন, গৃহ রচনা করতে পারেননি।

অথচ সমস্ত জীবন ধরে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। বার বার ঘর বাঁধতে চেয়েছেন, সে ঘর বারবার ভেঙে গেছে। প্রথম যৌবনে যাকে ঘরে এনেছিলেন, তাকে সচ্ছল জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারেননি। সে সংগতি ছিল না। তখন তিনি সামান্য একটা মুদী-দোকানের মালিক। ঐ সহরের ঘিঞ্জি গলির মধ্যে ছোট্ট একখানা ভাড়াটে কোঠা। তার খানিকটা দূরেই কাদের সব প্রাসাদোপম অট্টালিকা। তার মধ্যে যারা থাকে এবং যখন গাড়ি করে বেরোয়, তাদের দেহে রূপের প্রাচুর্য নেই, কিন্তু শাড়ি গয়নার বিপুল সমারোহ। সেই দিকে সে তৃষিত চক্ষে চেয়ে থাকত। তারপর তাকাত নিজের দিকে। অজস্র রূপ দিয়েছিলেন ভগবান, কিন্তু তাকে সার্থক হবার সামর্থ্য দেননি বলে প্রচন্ড ক্ষোভ ছিল তাঁর মনে। কিন্তু ভগবানকে তো হাতের কাছে পাওয়া যায় না। তাই যাকে পাওয়া যায় তারই উপরে যখন তখন ফেটে পড়ত সেই দুর্জয় রোষ। তার থেকে বাঁচবার জন্যে ঘর ছেড়ে বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াতেন সোমনাথ, আর ভাবতেন কেমন করে নিজেকে এই দারিদ্র্যের পাঁক থেকে টেনে তুলবেন সচ্ছলতার উঁচু ধাপে! সেই একটি মাত্র চিন্তাই তাঁকে অহর্নিশি আচ্ছন্ন করে রাখত।

এমন সময় জন্ম হল শুভেন্দুর। একরাশ চাঁপা ফুলের মত ফুটফুটে ছেলে। প্রতিবেশীরা চঞ্চল হয়ে উঠল, কেউ আনন্দে, কেউ ঈর্ষায়। সবাই বললে, কী সোনার চাঁদ ছেলে! সে যেন আরো ক্ষেপে গেল। যাদের ঘরে সোনা আছে, সোনার চাঁদ তাদেরই মানায়। খেতে পরতে যারা দিতে পারে না, রূপ দিয়ে তারা করবে কী? একচোখো বিধাতার এও যেন আর একটা পরিহাস। ছেলের দিকে তাকালেই তাঁর দু চোখ জ্বলে উঠত। তারই আগুনে অহরহ দগ্ধ হতেন সোমনাথ।

বাপ হওয়ার লজ্জা যে কি দুর্বিসহ, সেদিন তিনি হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলেন। স্ত্রীর এই কঠোর অভিযোগকে অস্বীকার করতে পারেননি—মানুষ করবার ক্ষমতা যার নেই, এ সংসারে একটা বাড়তি মানুষ নিয়ে এল সে কোন্ মুখে?

ভাগ্যের এমনি খেলা, প্রথম ও একমাত্র সন্তান তার মায়ের স্নেহ পেল না। বাপও ভয়ে ভয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। অযত্নে, অনাদরে, বেশীর ভাগ প্রতিবেশীদের হাতে হাতে ছেলে মানুষ হতে লাগল। স্বামীকে সে কোনোদিন ক্ষমা করেনি, হয়তো তারই অংশ বলে ছেলের উপরেও বিরূপ হয়ে রইল। তারপর একদিন অন্তর জোড়া আকণ্ঠ অতৃপ্তি নিয়ে নিঃশব্দে বিদায় নিল। অনিয়ম, অনাহার ও অজস্র অত্যাচারে শরীরে কিছুই ছিল না। বর্ষার শেষে ধরল ম্যালেরিয়ায়। তারই মধ্যে অবস্থা হিম লাগিয়ে বুকে সর্দি বসল। বেশীদিন ভুগতে হল না। দুচার দিন যে বিছানায় পড়ে ছিল, তাতেই আশেপাশে সকলের ভোগান্তির এক শেষ করে শেষ পর্যন্ত চোখ বুজল। শুভেন্দুর বয়স তখন সবে পাঁচ ছাড়িয়েছে।
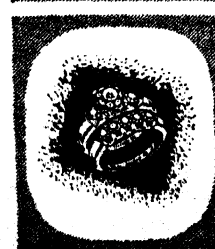
তারপরেই যেন রাতারাতি ঘুরে গেল

অদৃষ্টের চাকা। ভাগ্যলক্ষ্মী বরদা হলেন। তার কিছুদিন আগেই সোমনাথ দোকান ছেড়ে ঠিকাদারী ধরেছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বছর না ঘুরতেই সরু গলির ছোট ঘর ছেড়ে উঠে গেলেন বড় রাস্তার বড় ঘরে। কিন্তু ভুলতে পারলেন না সে ঘর ভাঙা। ছেলেকে, নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন। দুরন্ত দামাল, অযত্ন অবহেলায় উচ্ছৃঙ্খল। কে তাকে সামলায়? আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছে এতদিন বিশেষ মনে পড়েনি, এবার নিজের স্বার্থেই খোঁজ খবর শুরু করলেন। মা বাবা বেঁচে নেই। মাসী, পিসী বা ঐ জাতীয়া যাঁরা তখনো ছিলেন, নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত, পরের বোঝা ঘাড়ে নেবার ফুরসত নেই। খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেল এক জ্যাঠতুতো বড় ভাইএর বিধবা স্ত্রী। তাও যাকে 'নির্ঝঞ্ঝাট' বলে তা ঠিক নয়। তবু অনেক বলে কয়ে তাঁকেই নিয়ে এলেন। সংসারের কাজ সামান্য, তার জন্যে লোক আছে, শুধু ছেলেটাকে একটু সামলে রাখা। কিন্তু বয়সে যতই নাবালক হোক, ছেলে তখন নিজের ভার প্রায় নিজের হাতেই নিয়ে ফেলেছে। খাবার সময়টুকু বাদ দিলে

বাকী দিনটা সে কোথায় থাকে, কি করে, সে ছাড়া আর কেউ জানে না, এবং কেউ জানুক এটাও সে পছন্দ করে না। সোমনাথকে মাঝে মাঝে জানতে হয় যখন পাড়ার ছেলেদের বাবা কাকারা বাড়ি চড়াও হয়ে নালিশ করতে আসে। জেনে তিনি করবেনই বা কী। যেটুকু সময় বাড়ি থাকেন, আটকে রাখার চেষ্টা করেন, একটু আধটু মারধোরের ব্যবস্থাও করেন। ফল কিছুই হয় না।

জ্যাঠাইমা এসে রাশ টানবার চেষ্টা করলেন। কদিন গেল গায়ের ময়লা আর চুলের জট ছাড়াতে এবং অনেক ধস্তাধস্তি করে তার উপর ভদ্রগোছের একটা আচ্ছাদন চড়াতে। তারপর, খাওয়া, খেলা, পড়া ও ঘুমের সময়গুলো যথাসম্ভব বেঁধে দেবার চেষ্টা যখন করলেন, তখনই বাধল গোলমাল। ছেলে আগে মাঝে মাঝে, অন্ততঃ খাবার সময় বাড়ি ফিরত, এখন তাও আসে না। মায়ের কাছে যে অযত্ন পেয়ে মানুষ, জ্যাঠাইমার অতি যত্ন তার সহ্য হল না।

মহিলাটি ভয় পেয়ে গেলেন। অতটুকু ছেলে; যে রকম বেপরোয়া, কখন কি করে বসে কে জানে? মাস কয়েক কোনোরকমে কাটিয়ে একদিন সোজাসুজি দেওরকে এসে বললেন, আমি আর কি করবো এখানে বসে, আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আর তুমি এক কাজ কর, ঠাকুরপো। কী বা বয়স, ভগবানের আশীর্বাদে টাকাকড়িরও অভাব নেই, বড়সড় দেখে একটি বউ নিয়ে এসো। পারে তো সেই পারবে। ও ছেলেকে মানুষ করা আর কারো কম্ম নয়।

সেই পথই ধরলেন সোমনাথ। বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা। সুতরাং অবস্থাপন্ন ঘরের বয়স্থা মেয়েই পেয়ে গেলেন। সে এসে দুদিনের মধ্যেই নতুন বৌএর জড়তার আবরণ খুলে ফেলে রীতিমত গিন্নী হয়ে বসল। কিন্তু নিজের এই ছোট্ট সংসারটুকুর মধ্যে পরের ফেলে যাওয়া একটা অবাঞ্ছিত ফালতু মানুষের ভার সহজে মেনে নিতে পারল না। বিধাতার কী বিচিত্র পরিহাস! শুভেন্দুও রাতারাতি বদলে গেল। ভুলেও কোনোদিন যে ছেলে বাড়িঘর জিনিসপত্রের দিকে ফিরে তাকায়নি, নিজের জামা কাপড়ের খোঁজ রাখেনি, যা পেয়েছে তাই খেয়েছে, না পেলেও অনুমাত্র অনুযোগ করেনি, এই নতুন-মা আসবার পর থেকে হঠাৎ যেন সে নিজের এবং নিজের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠল। তার শিশু-মনের সবটুকু জুড়ে শুধু বৈরীভাব নয়, বিদ্রোহ দেখা দিল। যে এসেছে সে তাদের শত্রু, তার কর্তৃত্বকে প্রাণপণে প্রতিরোধ করতে হবে—এমনি একটা অদ্ভুত জিদ তাকে পেয়ে বসল। আজকাল যখন তখন খোকার চেঁচামেচি শোনা যায়—এটা কোথায় গেল, ওটা হয়নি কেন, সেটা কে করেছে। পান থেকে চুন খসলেই চারদিকে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তোলে, খাবার ছুঁড়ে ফেলে, জলের গেলাস উলটে দেয়, বামুন চাকরদের মারতে যায়। তারা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, খোকাবাবুর এই মূর্তি তো এতদিন দেখা যায়নি।

তাদের নতুন গিন্নীমা তাই বলে এসব উৎপাত চুপ করে সয়ে নেবার মানুষ নন। সমানে জবাব দেন, গালাগালি দেন, তেড়ে এসে সোজা দরজা দেখিয়ে বলেন, বেরো। তারা ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে, আহা! মা মরা কচি ছেলে, আদর যত্ন পায়নি; একটু বড় হলেই সব সেরে যাবে।

কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যেটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল সেটা সারবার নয়, বাড়বার লক্ষণ। সোমনাথ সবই লক্ষ্য করেছিলেন। না করে উপায় ছিল না। যেটুকু ঘটত, তাকে বেশ খানিকটা ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে স্ত্রী তাঁর কানে তুলত। ও তরফও নিশ্চেষ্ট ছিল না। যখন তখন বাবাকে গিয়ে যা লাগাত সেগুলোকে বলা যায় ছোট মুখে বড় কথা। তবু ছেলেকে ধমকে দিতে পারতেন না, স্ত্রীকেও কিছু বলতে পারতেন না। প্রায় সময়েই চুপ করে সয়ে যাওয়া, এবং আহার ও বিশ্রামের ফাঁকটুকুও যতদূর সম্ভব বাইরে কাটিয়ে দেওয়া—এ ছাড়া আর পথ রইল না।

কিন্তু কোনো সমস্যাকে এড়িয়ে গেলেই তার সমাধান হয়? মুখ বুজে থাকলেই অন্যের মুখ বন্ধ হবে, এ আশাও দুরাশা। শেষ পর্যন্ত একটা কিছু না করে পারা গেল না।

সোমনাথের প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয়ার তফাৎ ছিল অনেক। তার মধ্যে প্রধান—তার বেলায় 'বাপের বাড়ি' নামক বস্তুটির অস্তিত্ব ছিল, প্রতাপ ছিল না; এর বেলায় সেটি উগ্রভাবে প্রকট। ভগিনীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অধিকার সম্বন্ধে দুজন সম্বন্ধী এত বেশী তৎপর হয়ে উঠলেন যে, সোমনাথ আর কোনো উপায় না দেখে ছেলেকে একদিন কোলকাতায় এক 'সাহেবী' ইস্কুলের বোর্ডিংএ চালান করবার ব্যবস্থা করলেন। সায়েবিয়ানার উপর তাঁর যে কোনরকম ঝোঁক ছিল তা নয়, বরং বিরাগের অভাব ছিল না। কিন্তু প্রায় নিরক্ষর ঐ বয়সের একটা ছেলেকে জায়গা দেবার মত বোর্ডিংওয়ালা দেশী ইস্কুল কোনো পাড়াতেই জোটানো গেল না।

সেই বিচিত্র পরিবেশে একদল ফিরিঙ্গী ও আধাফিরিঙ্গী ডার্নাপিটে ছেলের সঙ্গে ভেতো বাঙালী সোমনাথ দত্তের ছেলেও 'মানুষ' হতে লাগল। কী ধরনের 'মানুষ' সে সব কথা তখন ভাববার অবসর ছিল না। যা হোক একটা আশ্রয় জুটল—এইটুকুতেই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন, এবং এই সহজ-লভ্য ফিরিঙ্গী বোর্ডিং থাকা সত্ত্বেও বৌঠাকুরাণীর পরামর্শ

"ওকি! খাবার যে পড়ে রইল।"

মত ছেলের জন্যে একটি নতুন মায়ের সন্ধান কেন করতে গিয়েছিলেন এই ভেবেই সব চেয়ে বেশী আপসোস হতে লাগল।

শুভেন্দুকে সরিয়ে দিয়ে সোমনাথ নিত্য-অশান্তির হাত থেকে বাঁচলেন। কিন্তু শান্তি পেলেন কি? অশান্তির অভাবকেই কি শান্তি বলে? সে প্রশ্নটা দুএকবার মনের মধ্যে মাথা তুলে উঠতেই তাকে জোর করে চেপে রাখলেন। মাসান্তে একটা করে মনি-অর্ডার। ব্যস; ছেলের সম্বন্ধে করণীয় আর কিছুই রইল না।

এর পরের অনেকগুলো বছর সোমনাথ অবিচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবে রইলেন। পুরস্কারও পেলেন অজস্র ধারায়। সৌভাগ্যের দীর্ঘ সোপান বেয়ে বৈষয়িক সাফল্যের শীর্ষে এসে উঠলেন। বাড়ি, গাড়ি, লোক, লস্কর, সম্মান, প্রতিপত্তি, মানুষ যা চায়। যা পেলে মনে করে সে সুখী, সবই এল। কোথাও কোনো অভাব রইল না। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় কী যেন নেই। এদিকে ওদিকে ফেরেন, আর বুকের কোন কোণে কী একটা কাঁটা খচখচু করে বেঁধে। মুখের উপর ফুটে ওঠে বেদনার ছায়া। বারান্দায় গিয়ে বসেন, কিংবা নীচের প্রশস্ত বাগানের চারধারে নিঃশব্দে পায়চারী করেন। বার বার মনে হয়, জীবনে যাকে বলে 'পূর্ণতা' তার আস্বাদ কখনো পেলেন না।

এই সময়ে স্বামীর মুখের দিকে নজর পড়লে ভামিনীর মুখের তৃপ্তিময় হাসির আলো দপ করে নিবে যায়। কণ্ঠে অনু-যোগ ও অভিমান মিশিয়ে বলে, সবসময়ে কী এত ভাব বল দিকিন?

সোমনাথ মৃদু হেসে কথাটা উড়িয়ে দেন, কই, ভাবছিনা তো কিছু।

—'আমি যেন কিছুই বুঝি না!' বলে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই চলে যায় ভামিনী। গতির বেগে ভিতরকার উষ্মা ফুটে ওঠে। তারপরেই হাঁপিয়ে পড়ে। ঝি ছুটে এসে ধীরে ধীরে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেয়। পাখাটা পুরো দমে চলতে থাকে।

কয়েক বছর ধরে দেহটা অত্যন্ত ভারী হয়ে পড়েছে। অতিরিক্ত রক্তের চাপ। সহরের সব চেয়ে বড় চিকিৎসক, ডাক্তার ধরকে প্রায় রোজই একবার করে আসতে হয়। ওষুধ, ইনজেকশন লেগেই আছে। কাজকর্ম, জোরে হাঁটা চলা চেঁচিয়ে কথা বলা, সব বন্ধ।

ভামিনীর একটিমাত্র সন্তান, দিব্যেন্দু। শুভেন্দুর ঠিক উল্টো। জন্মাবার আগে থেকেই অতিযত্নে ক্ষীণপ্রাণ। দশ ছাড়িয়ে এগারয় পড়ল; দেখে মনে হয় সাতও পেরোয়নি। নিরীহ, শান্ত, ভীতু। সারা বছর একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে। তারই জন্যে স্কুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাড়িতে মাস্টার আসে। তাও আদ্ধেক দিন মা বলে পাঠান, ছেলে আজ পড়বে না, শরীর ভালো নেই, খেলাধুলো, ছুটোছুটির পাট নেই। বাড়ির বাইরে কখনো পা দেয় না, শুধু মাঝে মাঝে চাকরের সঙ্গে মোটরে চড়ে খানিকক্ষণ বেরিয়ে আসে। এ অঞ্চলে বাড়িঘর কম। দু চারখানা যা আছে, সেখানেও ওর বয়সী ছেলেপিলের অভাব। সঙ্গী সাথীর মুখ দেখতে পায় না।

শুভেন্দু বারকয়েক ফেল করবার পর শেষ পর্যন্ত সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করে বোর্ডিং ছেড়ে দিয়েছে। ঠাকুর চাকর নিয়ে
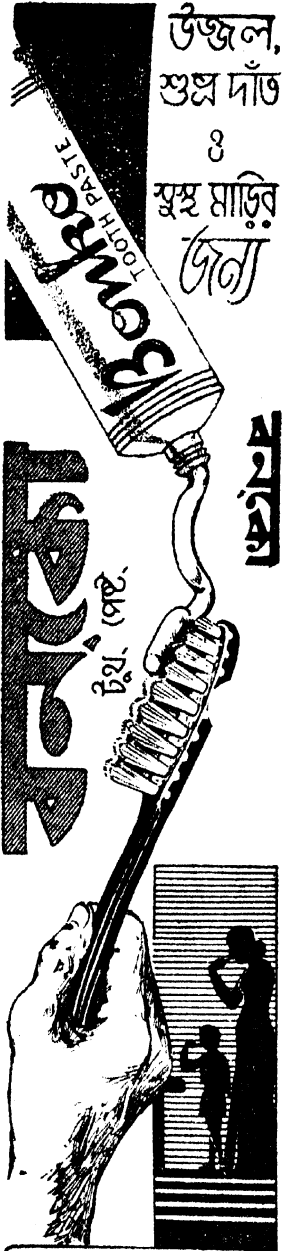
বালিগঞ্জের বাড়িতে থাকে। এ বাড়িতে বড় একটা আসে না। বছর কয়েক আগে দুএকবার এসেছিল; সোমনাথই চিঠি লিখে আনিয়েছিলেন। কিন্তু আগেকার ইতিহাস এবং বর্তমান ফিরিঙ্গী চাল চলন দুটোই দুর্ধর্ষ বাধা। ভামিনী ছেলেকে তার সঙ্গে একেবারেই মিশতে দেয়নি, নিজেও কোনো কথাবার্তা বলেনি। শুভেন্দুও তার জন্যে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। তারপরে দুএকবার যা এসেছে, বাবার সঙ্গে দেখা করে দুএকটা কাজের কথা বলে, এসটা বেলা থেকেই চলে গেছে। কালেভদ্রে দুএকখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি ছাড়া, বাপ-ছেলের মধ্যেও আর কোনো যোগসূত্র নেই। মাসহারার টাকাটা অবশ্য আছে, এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে উভয় তরফের মনে মনে খানিকটা চাপা অশান্তি। টাকার অংকটা বাপ যথেষ্ট মনে করলেও ছেলের মনঃপূত নয়।

দিন কারো পড়ে থাকে না। দত্ত পরিবারের দিনগুলোও অভঙ্গ মৃদু তালে চলে যাচ্ছিল। প্রত্যেকে আপন আপন কক্ষ-পথে, কর্তা তাঁর কুলী ও কয়লার কালো দুনিয়া, গৃহিণী তার স্থূল দেহ, ক্ষুব্ধ হৃদয় ও দুর্বল হৃৎপিন্ড, 'ছোট খোকা' তার নানা জাতের অসুখ-বিসুখ, নানা মাপের ওষুধের শিশি ও নিঃসঙ্গ দিনের একমাত্র সঙ্গী—একটি জানালার ধার, আর ওদিকে বালিগঞ্জের বাড়িতে 'বড় খোকা' তার ক্লাব, থিয়েটার, শিকার, পিকনিক, পার্টি, জলসা। হঠাৎ একদিন ছন্দ পতন হল। ভামিনী বারান্দায় একটু পায়চারী করতে করতে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। সবাই মিলে যখন টেনে তুলল, বাঁ অঙ্গ অচল, বাক্‌যন্ত্র অসাড় এবং চেতনা আচ্ছন্ন। যা করবার সবই করা হল। ডাক্তার ধর কোলকাতা থেকে স্পেশালিস্ট নিয়ে এলেন, তার সঙ্গে স্পেশাল ফীএর নার্স এবং নানারকম দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ওষুধ। রোগের গতি মাঝখানে একবার ভালোর দিকে মোড় ফিরে হঠাৎ একদিন মারাত্মক চরমে গিয়ে পৌঁছল।

সোমনাথের জীবনের আর একটা জীর্ণ পাশ ছিঁড়ে গেল। বেশী কিছু আঘাত পেলেন বলে মনে হল না। বোধশক্তিটাই ক্রমশঃ অসাড় হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া যে বন্ধনের নিজস্ব জোর অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে, প্রতিদিন তাকে জোড়া দিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে টেনে নিয়ে বেড়ানো বড় ক্লান্তিকর। সে প্রয়োজন আর রইল না। খানিকটা বোধহয় স্বস্তিই পেলেন মনে মনে।

দুই

শুভেন্দু বরাবরই বেলা করে উঠে থাকে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মুখ হাত ধোবার পাট সংক্ষেপে সেরে নিয়ে চায়ের টেবিলে গিয়ে দেখল, এষা রোজকার মত তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

'তুমি এখনো খাওনি,' কিঞ্চিৎ অনু-যোগের সুরে বলল শুভেন্দু, 'রোজ রোজ মিছিমিছি বসে থাকার দরকার কী?

এ প্রসঙ্গে কোনো জবাব না দিয়ে এষা টোস্টে মাখন মাখাতে মাখাতে বলল, তোমার একটা চিঠি আছে! এক্সপ্রেস চিঠি, আমি সই করে নিয়েছি।

—'কোথায়?' শুধু জানতে চাওয়া নয়, তার সঙ্গে আগ্রহের সুর। এষা চোখের ইশারায় টেবিলের কোণের দিকে চাপা দেওয়া খামটা দেখিয়ে দিল।

তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে ঠিকানার উপর এক পলক তাকিয়ে শুভেন্দু খামটা খুলে ফেলল। সামান্য কটা লাইন; কিন্তু পড়তে যেন বেশ খানিকটা সময় লাগল; এবং মুখের উপর ঘনিয়ে উঠল গাম্ভীর্যের ছায়া। এষা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। খামটা বন্ধ করে পকেটে রাখতেই জিজ্ঞাসা করল, কার চিঠি?

'ম্যানেজার লিখেছে', তাচ্ছিল্যের সুরে এইটুকু বলেই শুভেন্দু চায়ের কাপটা টেনে নিল এবং কয়েকটা চুমুক দিয়েই উঠে পড়ল।

—ওকি! খাবার যে পড়ে রইল। যাচ্ছ কোথায়?

—খিদে নেই, বলে শুভেন্দু আর দাঁড়াল না।

এর পরে এষারও চায়ের তৃষ্ণা থাকবার কথা নয়। স্তব্ধ হয়ে ঐখানেই বসে রইল। বিয়ের পরে একটা মাসও যায়নি৷ এরই মধ্যে স্বামীর এই আকস্মিক আচরণ তাকে শুধু বিস্ময় নয়, আঘাতও কম দিল না। একটা অমঙ্গলের আশঙ্কাও দেখা দিল সেই সঙ্গে। ম্যানেজারের চিঠি; হয়তো কোলিয়ারী সংক্রান্ত কোনো দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। তাই যদি হয়, সকলের আগে সেটা তো তারই জানবার কথা। এমন কী খবর হতে পারে, যা তার কাছে গোপন করে চলে গেল শুভেন্দু।

ঠাকুর এসে বাজারের পয়সা চাইল। এষার ব্যাগে বিশেষ কিছু নেই। কদিন আগে সংসার খরচ বাবদ যে কটা টাকা পেয়েছিল স্বামীর কাছ থেকে, এর আগেই ফুরিয়ে যাবার কথা। একটু চাপাচাপি করেই চালাচ্ছিল। বিয়ের ঠিক পর পর কদিন নানাভাবে, বিশেষ করে দুপক্ষের বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে পার্টি ইত্যাদিতে বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে। একটা নির্দিষ্ট মাসহারার উপর শুভেন্দুকে নির্ভর করতে হয় এই কথাই সে জানত, যদিও তার পরিমাণটা শুভেন্দু যা জানিয়েছিল,

দুজনের সংসার সচ্ছলভাবে চলবার পক্ষে যথেষ্ট। এ টাকাটা ওদের এস্টেট থেকে বরাবরের ব্যবস্থা, বিয়ের আগে কোন্ একটা প্রসঙ্গে একথাও বলেছিল শুভেন্দু।

ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে। বাজার খরচের টাকা নেই, একথা তাকে বলা যায় না। হঠাৎ খানিকটা ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে বলল এষা, আমি তো এখন আর ওদিকে যেতে পাচ্ছি না ঠাকুর। তুমি এক কাজ কর। এবেলার মত টাকাটা বাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাও। চট করে ফিরো।

—বাবু তো বেরিয়ে গেলেন।

'বেরিয়ে গেলেন!' ঠাকুরের কথাটাই যেন অজান্তে আউড়ে গেল এষা। ওর সামনে এ ব্যাপারে এতখানি বিস্ময়প্রকাশ যে অশোভন, একথা পর্যন্ত মনে রইল না। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতেই ঘরে গিয়ে ব্যাগ ঝেড়ে যা পেল, তার সঙ্গে ওর নিজের কাছে সামান্য যা ছিল, তাই মিলিয়ে ঠাকুরকে কোনরকমে বাজারে রওনা করে দিল।

সংসার ছোট হলেও বাড়িটা নেহাৎ ছোট নয়। ঝি চাকর আছে। কিন্তু সাজানো গোছানো, যেখানে যেটি মানায়, নিজের হাতে না করলে এষার মন ভরে না। তাছাড়া, মা চিররুগ্‌ণা বলে বিয়ের আগে ওখানকার সব কাজ তাকেই করতে হয়েছে, মায় রান্নাবাড়া পর্যন্ত। এখানে তার দরকার নেই, তবু চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে না। সকাল থেকেই একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনলস জীবনের একটা আলাদা মাধুর্য আছে! সে জীবন যে যাপন করে সেই শুধু নয়, যাদের জন্যে করে তারাও তার স্বাদ পায়। সদ্যোলব্ধা স্ত্রীর এই কর্মচাঞ্চল্য শুভেন্দুরও ভাল লাগে। জরুরী প্রয়োজনের ছলে যখন তখন ডাকাডাকি করে হুলস্থূল বাধিয়ে দেয়। এষা যখন ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ায়, তার আরক্তিম মুখের উপর মুক্তার মত ফুটে ওঠা স্বেদবিন্দুর দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে। এষা বুঝতে পারে, এ শুধু ডাকার জন্যেই ডাকা, তবু তাড়া দিয়ে বলে, কী? ডাকছিলে কেন? তাড়াতাড়ি বল, আমার কাজ আছে।

'কাকে বলি?' ছদ্ম হতাশার সুরে বলে শুভেন্দু, 'গিন্নী-ঠাকরুণ তো শুধু কাজ নিয়েই আছেন।'

এদিক ওদিক চেয়ে এষা অনেকটা কাছে সরে আসে, চাপা গলায় বলে, আর কর্তা-ঠাকুরের মাথায় খালি অকাজের ফন্দি। তাই না?

—সে সুযোগ আর পাই কই?

—কেন, সারাদিন তো কাছে কাছেই আছি।

বলেই, ছিটকে সরে যায়, একখানি হঠাৎ বেরিয়ে-আসা লুব্ধ হাতের নাগালের বাইরে।

আজও রোজকার অভ্যাস মত এষা তাদের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। কাজেও লাগল, কিন্তু অনেকটা যেন যন্ত্রের মত। সকাল বেলাকার ব্যাপারটাই বারবার চোখের সামনে আনাগোনা করতে লাগল। নিজেকে বোঝাতে চাইল, এই তুচ্ছ জিনিসটা নিয়ে মন খারাপ করা নিছক ছোট মনের পরিচয়। নিশ্চয়ই কোনো জরুরী কারণ আছে, যার জন্যে ওকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হয়েছে, ফিরে এলেই সব জানা যাবে। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বা বুদ্ধি দিয়ে মানুষ কতটুকুই বা বুঝে থাকে। সব বোঝাবার পরেও, মনের কোণে একখানা কালো মেঘ অস্পষ্ট কিন্তু অনড় হয়ে রইল।

শুভেন্দুর সঙ্গে এষার পরিচয় সময়ের দিক দিয়ে খুব দীর্ঘ নয়। - প্রথম সাক্ষাতেই এই সদা চঞ্চল, সপ্রতিভ সুদর্শন যুবকটি তাকে সবলে আকর্ষণ করেছিল। তার জন্যে অনেকখানি দায়ী বোধহয় সেদিনকার সেই নাটকীয় পরিবেশ এবং শুভেন্দুর অকুণ্ঠ এবং অপ্রত্যাশিত আচরণ, অন্য যে কোনো পুরুষের পক্ষে যেটা গায়ে পড়া অন্তরঙ্গতার অশোভন আগ্রহ বলে মনে হতে পারত। কিন্তু সেদিন তার কথা ও ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা স্বচ্ছন্দ এবং বলিষ্ঠ সুর ছিল, যার কাছে কোনো মেয়েই বোধহয় মাথা না নুইয়ে পারে না।

এষা সেদিন যে কাজে নেমেছিল তার মত একটি অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের পক্ষে সেটাও ছিল দুঃসাহসিক অভিযান। লোকের চোখেও সেটা শুধু নতুন নয়, তখনকার দিনে অসাধারণ। হয়তো সেই কারণেই সেও শুভেন্দুকে আকর্ষণ করে থাকবে। তা না হলে একজন আশৈশব বিলাতী ধরনে মানুষ রূপবান ধনী-তনয়ের চোখে পড়বার মত কী আছে তার মধ্যে? রূপ যা আছে, তা অসামান্য নয়। বেশ-ভূষার জলুস দিয়ে তাকে জাহির করবার আর্ট তার জানা নেই, সে সব উপকরণ ছিল না। হাব ভাব কিংবা চলনে বলনে চমক লাগিয়ে দেবার মত বিদ্যাও সে আয়ত্ত করেনি। তবু তার মধ্যে কী দেখেছিল শুভেন্দু, সেই জানে। হয়তো কিছুই নয়, এর মূলে আছে একটি অনুকূল মুহূর্ত, একটি বিশেষ ক্ষণ, যার আবির্ভাব ঘটলে মানুষ যা দেখে, তাতেই মুগ্ধ হয়, মনে করে, এ রকমটি আর হয়নি, হতে পারে না।

মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের মেয়ে এষা মৈত্র। বাপ ছিলেন মাঝারি ধরনের সরকারী চাকুরে। কেরানী নয়, ছোট পদের অফিসার। ফলে মাইনে যা পেতেন, তার চেয়ে চাল চলনে দেখাতে হত বেশী এবং বাড়িঘরের ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে সঞ্চয়ের ঘরে শূন্য পড়ত। অতি কষ্টে যা বাঁচিয়েছিলেন, একটি বাড়ি খাড়া করতেই সব শেষ হয়ে গেল এবং তার কিছুদিন পরে তিনিও শেষ যাত্রা করলেন। এষাই বড়। কোনো রকমে স্কুলের পড়া শেষ করেছিল, কলেজে যেতে পারেনি। তার প্রধান কারণ মায়ের ভগ্ন শরীর। সংসার দেখার ভার ছিল তারই উপর। ছোট একটি ভাই। বাবার মৃত্যুর পর তার খরচ চালিয়ে যাওয়াই শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

এক মাস্টারী ছাড়া ভদ্রঘরের মেয়েদের আর কোনো চাকরী বাকরীর রেওয়াজ তখনো দেখা দেয়নি। এষার যা বিদ্যা তাতে চেষ্টা করলে কোনো ইস্কুলে পনর কুড়ি টাকার মত একটা ব্যবস্থা হয়তো হয়ে যেত। কিন্তু সংসার তাকে সে পথে যেতে দিল না। মায়ের দেখাশুনো, ভাইএর কলেজের রান্না এবং হরেক রকমের অন্য কাজ নিয়েই তার সবখানি সময় চলে যেত। তার উপরে ছিল আর্থিক অনটন মেটাবার নানা দুরূহ চেষ্টা। বাড়ির একটা অংশ ভাড়া দিয়ে তারই সামান্য আয়ে কোনোরকমে খাওয়া-পরাটা চলে। বাকী ব্যবস্থা ওকেই ভাবতে হয়, করতেও হয় নানাভাবে।

ভাইএর বি এ পরীক্ষা আসন্ন। পাশ করতে পারলে বাবার মুরুব্বিরা একটা মোটা-মুটি সংস্থানের আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন। ছেলেটিও মেধাবী এবং সংসারের অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ। পাশ করবে এবং ভালভাবেই

করবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। সমস্যা শুধু একটি; পরীক্ষার ফী, এবং সেই সঙ্গে দেয় কয়েক মাসের মাইনে, অর্থাৎ তাদের পক্ষে বেশ বড় রকমের দায়। মেটাবার সংস্থান কোত্থেকে, তার কোনো পথই মা ও মেয়ের চোখে পড়ছিল না। আত্মীয়-স্বজন যাঁরা ছিলেন, বাবা থাকতেই তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ, এখন নেই বললেই চলে। যদি বা কিছু থেকে থাকে, সেটা বৈরী ও বিরোধের। সেদিক থেকে কোনো সাহায্য চাওয়া যায় না, চাইলেও পাওয়া যাবে না।

ভাড়াটেদের অবস্থা প্রায় ওদেরই মত। বৃহৎ পরিবার; সামান্য চাকরির উপর নির্ভর। কোনো মাসে কারো অসুখ-বিসুখ দেখা দিলেই, তার জের গিয়ে পড়ে ঐ ভাড়ার কটি টাকার উপর। তাদের কাছ থেকেও কিছু আশা করা যায় না। তবু শেষ চেষ্টা হিসাবেই এষা একবার নীচের তলায় নেমেছিল। ওর চেয়ে কিছু ছোট, ঐ বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে ওর ভাব ছিল। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে সুযোগ বুঝে তার বাবা মার কাছে কথাটা পাড়বে, এই ছিল উদ্দেশ্য। গিয়েই বুঝল সুবিধা হবে না। ভদ্রলোক মফঃস্বলে গেছেন, ফিরতে দেরী হবে। চলে আসছিল; হঠাৎ সেদিনকার ইংরেজি কাগজটার দিকে নজর পড়তেই আবার একটু বসে খবরগুলোয় চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল। উলটে পালটে রাখতে যাবে কাগজখানা, এমন সময় নজরে পড়ল একটি অদ্ভুত বিজ্ঞাপন।

এদেশে তখনো টকীর আবির্ভাব ঘটেনি। নির্বাক সিনেমার যুগ। কয়েকখানা বাংলা ছবি বেশ নাম করেছে, এবং নতুন নতুন প্রযোজক এগিয়ে আসছেন আরো ছবি তুলবার জন্যে। থিয়েটারের পেশাদার আর্টিস্টদের নিয়েই এতদিন কাজ চলছিল। ক্রমে বাইরের শিল্পীদের চাহিদা বাড়ছে। কোনো কোনো কোম্পানী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে অভিনেত্রী সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

তেমনি একটা বিজ্ঞাপন এষার চোখে পড়ল। একটি সামাজিক চিত্রে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে কয়েকজন তরুণ তরুণী আবশ্যক। শেষোক্তদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, গৌরবর্ণা বা নিখুঁত সুন্দরী না হলেও চলবে, বিশেষ জোর দেওয়া হবে মিষ্টি মুখশ্রী, লম্বা ছিপছিপে গড়ন এবং অনাড়ষ্ট চলন বলনের উপর। হালে তোলা পূর্ণাঙ্গ ছবি সহ টালিগঞ্জের কোনো স্টুডিয়োতে অবিলম্বে দেখা করবার নির্দেশ দেওয়া আছে।

ঠিকানাটা মুখস্থ করে চিন্তান্বিত মুখে এষা উপরে উঠে এল। বিজ্ঞাপনের চাহিদা মেটাবার মত সবগুলো গুণ তার আছে কিনা, সে বিচার তার হাতে নয়। তবে মোটামুটি-ভাবে কোনোটারই বোধহয় নিতান্ত অভাব নেই। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়ালে টাঙানো আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিটি অঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। চেষ্টা করল অপরের চোখ দিয়ে দেখতে। এক রঙ ছাড়া তেমন কোনো ত্রুটি চোখে পড়ল না। রঙ ওদের দরকারী লিস্টিতে নেই। তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

সিনেমা এবং তার চারদিকের আবহাওয়া তখনো ভদ্রঘরের মেয়েদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠেনি। দুচারজন যারা এ পথে পা দিয়েছেন, তাঁরা দর্শক মহলে খ্যাতিলাভ করলেও সম্ভ্রান্ত সমাজে সম্মান পাননি। বরং ছবিতে নেমেছেন বলে তাঁরা নৈতিক দিক থেকেও নেমে গেছেন, এইটাই সাধারণ মত। দু একটি মহিলা স্বামীর ইচ্ছায় এবং স্বামীর সঙ্গে একযোগে কাজ করতে গিয়েও দুর্নামের হাত এড়াতে পারেননি। সমাজের উপর তলায় বাস করেন বলে সামাজিক ভ্রূকুটি অনেকখানি অগ্রাহ্য করে চলতে পেরেছেন এই পর্যন্ত। মধ্যবিত্ত ঘরের কোনো মেয়ের পক্ষে ততটাও সম্ভব নয়।

এষা সব দিকটা নানাভাবে বিচার করে দেখল। মাকে জানাতে গেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেবেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো ভাববেন অভাবের তাড়নাতেই মেয়ের এই দুর্মতি দেখা দিয়েছে। সেটা আরো মর্মান্তিক। ভাই তাকে ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে, দিদির কোনো কাজে সে বাধা দেবে না, কিন্তু তার মনও যে এ কাজে সায় দেবে না, একথা নিশ্চয় করে বলা যায়। তার নিজের মনেরও কি সায় আছে? যে কোন দুঃসাহসিক কাজ তরুণ মনকে চিরদিন আকৃষ্ট করে। সেই হিসাবে প্রথম দৃষ্টিতেই বিজ্ঞাপনটার দিকে সে ভিতরে ভিতরে ঝুঁকে পড়েছিল। তার সঙ্গে ছিল প্রয়োজনের প্রচণ্ড তাগিদ। কিন্তু পিছন থেকে টেনে ধরবার মত বাধা শুধু বাইরে থেকেই আসেনি, তার নিজের মধ্যেও কম ছিল না।

দরজায় কার হাতের আওয়াজ শোনা গেল। এষা সাড়া দিল, কে?

—'আমি'। ছোট ভাই অভিলাষের গলা। খিল খুলে দিতেই বলল, 'অবেলায় পড়ে পড়ে নাক ডাকানো হচ্ছে, না?'

—হচ্ছেই তো। আমার তো আর এক পাল বন্ধু নেই যে আড্ডা দিয়ে বেড়াবো তোমার মত? কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি?

অভিলাষ সে কথার জবাব দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে চেয়ে সন্দেহের সুরে বলল, তোর চোখমুখ ওরকম লাল দেখাচ্ছে কেন রে, দিদি? জ্বর টর বাধিয়ে বসিসনি তো? দেখি।

এগিয়ে এসে দিদির কপালে ও হাতে হাত দিয়ে বলল, না, গা তো বেশ ভালই দেখছি।

এষা মুখ টিপে হেসে বলল, বুড়ো ঠাকুর্দা! জ্বর বাধাতে যাবো কোন দুঃখে? তুই কোথায় যাচ্ছিস, বললি না? মাথা গরম না করিস তো বলি।

—মাথা গরমের ব্যাপার হলে নিশ্চয়ই করবো।

—তাহলে ফিরে এসে।

যাবার জন্যে পা বাড়াতেই এষা তাড়া দিয়ে উঠল, এই, শিগগির বলে যা কোথায় যাচ্ছিস।

—শোন, তাহলে বলি।' আর একটু

কাছে সরে এসে গলা খাটো করে বলল, বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

—কেন?

অভিলাষ খানিকটা ইতস্ততঃ করে কাষ্ঠ হাসির সঙ্গে উত্তর দিল, একটা চাকরির চেষ্টা করছি।

—চাকরি! পরীক্ষার আগেই?

—পরীক্ষাটা এবার থাক। পরে যদি সুবিধে হয়, দেওয়া যাবে।

এষা দীপ্ত চক্ষে ভাইএর মুখের দিকে তাকাল। তারপর দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বলল, ওসব মতলব ছাড়ো। যাও, পার্ক থেকে খানিকটা ঘুরে এসে বই নিয়ে বসো।

—আহা, তুই বুঝতে পাচ্ছিস না—

—খুব পাচ্ছি।

অভিলাষ অপ্রসন্ন মুখে অনেকটা যেন আপন মনে বলল, এতগুলো টাকা; কোত্থেকে যে আসবে? তাছাড়া সংসারের যা হাল—

এষা চলে যাচ্ছিল। কথার মাঝখানেই ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, দ্যাখ অভি, একটু বেশী জ্যাঠা হয়ে পড়েছিস, মনে হচ্ছে। অনেক দিন পিঠে কিছু পড়েনি।' বলেই দ্রুত-গতিতে অন্যদিকে চলে গেল।

এর পরে আর দ্বিধা করা চলে না। এষা সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেলল। তাকে যেতে হবে। ফল কিছু হোক না হোক, চেষ্টা করে দেখতে হবে; মা এবং ভাইকে না জানিয়েই। কিন্তু ফটো? ঘরে যা দু একখানা আছে, বেশ কিছুদিন আগেকার। তাতে চলবে না। নতুন তুলতে হলে টাকা চাই। আপাততঃ খালি হাতেই যাওয়া যাক। তারপর ওদিকের অবস্থা বুঝে যা হয় করা যাবে।

•

কালীঘাটে এক পুরনো দিনের সহ-পাঠিনী সখীর সঙ্গে এষা মাঝে মাঝে দেখা করতে যেত। তার কাছে যাচ্ছে বলেই বেরিয়ে পড়েছিল। মা আপত্তি করেননি, শুধু বলেছিলেন, তাড়াতাড়ি আসিস। অভি তখন কলেজে।

খুঁজে খুঁজে নির্দিষ্ট স্টুডিয়োতে যখন পৌঁছল, তার আগেই তিন চারটি মেয়ে এসে গেছে। তাদের সঙ্গে একটা ছোট ঘরে অপেক্ষা করতে হল। কিছুক্ষণ পরে একটি ভদ্রলোক এসে সকলের নাম লিখে নিয়ে গেলেন। আরো খানিকক্ষণ বাদে একজন একজন করে ডাক পড়ল। এষার পালা এল সব শেষে।

সোফা কোচ দিয়ে সাজানো একখানা বেশ বড় সাইজের ঘর। এক কোণে একজন ভারিক্কি গোছের বয়স্ক ভদ্রলোক বসে কী লিখছিলেন। তার পাশেই ছিল শুভেন্দু। এষা ঢুকতেই তার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। বুকের ভিতরটা হঠাৎ দোলা দিয়ে উঠল। ইচ্ছা হল আরেকবার চেয়ে দেখতে। কিন্তু না; কোনো রকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। [illegible]কে চোখ রাঙিয়ে সে পূর্ণ দৃষ্টিতে তা[illegible] পাশের বয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে। তিনিও তখন চোখ তুললেন।

গোটা কয়েক প্রাথমিক প্রশ্নের পর ভদ্রলোক একটা বই থেকে ওকে খানিকটা পড়তে দিলেন। তার আগে বললেন, কোনো স্টেজে কখনো অভিনয় করেছেন?

—করেছি।

—কোথায়?

—স্কুলে।

—ও, আচ্ছা। বেশ feeling দিয়ে পড়ুন। বেশ অভিনয় করছেন, এমনিভাবে।

এষার গলাটা প্রথম দিকে একটু কেঁপে গিয়েছিল। তারপরেই বেশ সহজ সুদৃঢ় কণ্ঠে আবৃত্তির ভঙ্গিতে পড়ে গেল সবটা। তারই ফাঁকে লক্ষ্য করল, ভদ্রলোক শুভেন্দুর সঙ্গে দুএকবার ইঙ্গিতে কী বললেন, এবং সেও মাথা নেড়ে সায় দিল।

পড়া শেষ হলে ভদ্রলোক বললেন, আচ্ছা, মিস মৈত্র, আপনি এই বইএর যে কোনো একটা পাতা মনে মনে পড়তে পড়তে ঘরের ভিতর একটু পায়চারি করুন। মনে করবেন এটা আপনার নিজের বাড়ির বারান্দা, এবং সেখানে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই।

খানিকক্ষণ পড়বার পর ভদ্রলোকের নির্দেশ মত বইখানা ফেরৎ দেবার জন্যে তাঁর টেবিলের পাশে গিয়ে যখন দাঁড়িয়েছে, তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আমার এই বন্ধুটিকে আপনার কেমন লাগল?

এষা চমকে উঠল। ঘরে ঢুকেই তার মনে যে দুর্বলতার স্পর্শ লেগেছিল, সেটা কি ধরে ফেলেছেন ভদ্রলোক? পরে শুনেছিল, এটাও তার চাকরির পরীক্ষা। আচমকা অবান্তর প্রশ্নে একজন অচেনা যুবকের সামনে ঘাবড়ে যায় কিনা, তাই পরখ করে দেখছিলেন। তখন অবশ্য সেটা বুঝতে পারেনি। প্রথমে একটু ত্রস্ত এবং তারপরেই ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু সে ভাব দেখালে তার নিজেরই ক্ষতি। তাই যতদূর সম্ভব সহজভাবেই বলল, আপনি কী জানতে চান, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বিশেষ কিছুই না। এঁর সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা কি? মানে, ইনি কী করেন টরেন—। অসংকোচে বলুন; উনি কিছু মনে করবেন না।

শুভেন্দুও খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তার নিজের সম্বন্ধে একটি অপরিচিতা তরুণীর মতামত তারই সামনে জানতে চাওয়া হবে, এতটা নিশ্চয়ই আশংকা করেনি। এক পলক তার সেই অপ্রতিভ ভাবটা লক্ষ্য করে এষার সাহস বাড়ল এবং

মাথায় খানিকটা দুষ্ট বুদ্ধিও দেখা দিল। বলে ফেলল, বিশেষ কিছু করেন বলে তো মনে হয় না।

ভদ্রলোক সজোরে হেসে উঠলেন। শুভেন্দুও তাতে যোগ দিল, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল সেটা শুধু ভিতরকার দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে। এষার মুখেও মৃদু হাসির ঝিলিক খেলে গেল। তার মধ্যে বিজয়িনীর প্রচ্ছন্ন উল্লাস।

ভদ্রলোক হাসি থামিয়ে আবার কাজের কথা ফিরে গেলেন। বললেন, আপনার বাবা, মা আছেন?

—বাবা নেই, মা আছেন।

—তিনিই আপনার অভিভাবিকা?

—হ্যাঁ।

—ও'দের তরফ থেকে কোনো আপত্তি নেই তো?

এষা বলল, 'না'; যদিও আপত্তি সম্বন্ধে সে তখনো নিশ্চিত।

—আচ্ছা, এবার আপনার ছবিটা দিন। ওঘরে রেখে এসেছেন বুঝি?

—না; ছবি আনিনি।

—পরে পাঠাতে চান?

এষা মুহূর্ত কাল ভেবে নিয়ে বলল, আজকালকার কোনো ছবি আমার নেই। ওটা না হলে চলে না?

—'একটু মুস্কিল আছে। মালিক দেখতে চাইবেন।'...

একথা বলার পরেও এষা চুপ করে আছে লক্ষ্য করে বললেন, 'আচ্ছা দেখি, না হলে যদি চলে। তবে হলে ভাল হত। কদিন পরেই নাহয় পাঠিয়ে দেবেন।'

ফলাফল পরে জানানো হবে, এই পর্যন্ত জেনে, বাড়ির ঠিকানা রেখে এষা বাইরে এসে হাঁফ ছাড়ল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, যেমন করে হোক কাজটি হারালে চলবে না। এবার মনে হল, যদি লেগে যায়, তারপর?

আপন মনে নানা কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্কভাবেই রাস্তার ধার ধরে চলছিল, হঠাৎ পেছন থেকে একটি মিষ্ট গম্ভীর ডাক কানে গেল, 'শুনুন'। এষা চমকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকিয়ে দেখল, শুভেন্দু দ্রুত এগিয়ে আসছে। শুধু চেহারায় নয় কণ্ঠস্বরের মধ্যেও এমন কিছু আছে, যা কানে ঢুকেই শেষ হয় না, মনকেও নাড়া দেয়।

শুভেন্দু কাছে এসে নমস্কার করে বলল, কদ্দুর যাবেন আপনি?

'ঢাকুরিয়া'। মৃদু কণ্ঠে বলল এষা। কিছুক্ষণ আগেকার সেই সহজ সপ্রতিভ ভাবটা যেন হারিয়ে গেল। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। প্রতি নমস্কারটাও করা হল না।

শুভেন্দু বলল, চলুন, আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দিই। আপত্তি নেই তো?

—না, আপত্তি কিসের? বলে, মাথা নীচু করে চলতে শুরু করল এষা।

মিনিট দুয়েক পাশাপাশি চলবার পর শুভেন্দু হাসিমুখে বলল, একটা ব্যাপার কিন্তু আমার ভারী আশ্চর্য লাগছে। আপনি কি করে ধরলেন বলুন তো? সত্যিই আমি কিছু করি না।

—আমাকে মাপ করবেন, হঠাৎ বলে ফেলেছি—

—না, না; মাপ করবার কী আছে? আপনি ঠিকই বলেছেন। কোনো কাজ কম্ম নেই। বাবার হোটেলে খাই, আর আড্ডা দিয়ে বেড়াই। তবে এখনই একটা ছোট্ট কাজ করবার ইচ্ছা হচ্ছে। তার জন্যে আপনার অনুমতি চাইছি।

—'কী?' বলে এষা এই প্রথম চোখ তুলে তাকাল।

'আপনার একটা ছবি নেবো।' কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার দিকে চেয়ে অনুরোধের সুরে বলল শুভেন্দু।

—কী দরকার? তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল এষা।

—এমনিই। তাছাড়া, দরকারও একটু আছে বৈকি? যদ্দুর বুঝলাম, আপনাকে ওদের পছন্দ হয়েছে। কিন্তু ছবি পাঠাতে দেরী হলে কী করে বলা যায় না। অথচ সেটাতেও হ্যাঙ্গামা কম নয়। প্রথমত আপনাকে একটি ভালো স্টুডিয়োতে গিয়ে ধর্ণা দিতে হবে। কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে, ঠিক নেই। তারপর ছবি ডেলিভারীর মেয়াদ কাগজে কলমে থাকবে তিনদিন, কিন্তু অন্ততঃ আরো তিনটি দিন আপনাকে না ঘুরিয়ে ছাড়বে না। এত কাণ্ডের পর যে জিনিসটি পাবেন, সেটা ছবি ঠিকই, তবে আপনার ছবি কিনা বলা শক্ত।

বলে, শুভেন্দু রাস্তার মাঝখানেই হোহো করে হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, অতএব চলুন ঐ পার্কে। এখনো বেশ আলো আছে।

এষা আর আপত্তি করেনি, মনে মনে কৃতজ্ঞই বরং বোধ করেছিল, এই অচেনা অজানা প্রিয়দর্শন যুবকটির কাছে। খুশীও হয়েছিল বৈকি? ছবি তোলা এবং তাকে উপলক্ষ্য করে শুভেন্দুর সেই সৌন্দর্যময় ব্যবহার, তার উপরে তার সান্নিধ্য, হাসি পরিহাস, সব মিলিয়ে একটি সুন্দর অপরাহ্ণ মধুর হয়ে উঠেছিল তার অন্তরের কোণে।

দুখানা তুলবার পর তৃতীয়বার যখন পোজ নিতে বলছে, এষা মাথা নেড়ে বলল, থাক আর না। কত ফিল্ম নষ্ট করবেন?

'নষ্ট!' চমকে ওঠার ভাব দেখাল শুভেন্দু, 'তার মানে আপনি বলতে চান আমি ছবি তুলতে জানি না, ফিল্ম নষ্ট করি?'

—না, না; আমি বুঝি তাই বলছি? দেখুন না, কতগুলো ফিল্ম মিছিমিছি খরচ করলেন আমার জন্যে। রেখে দিলে অন্য কাজে লাগত।

শুভেন্দু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়নি। যখন দিল, একটা কেমন উদাস সুর লাগল তার মৃদু কণ্ঠে। বলল, জানি না, সেই অন্য কাজটা কী। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমার এই ক্যামেরাটি অনর্থক অকাজ অনেক করেছে, সার্থক কাজ বোধহয় এই একটিই করল।

কথাটা সামান্য হলেও; নিরর্থক হয়নি। এর ভিতরকার সমস্ত রসটুকুই এষার গোপন অন্তরে সঞ্চিত হয়ে রইল।

শুভেন্দু চেয়েছিল ছবিগুলো এষার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে। তারও যে দেখবার ও পাবার ইচ্ছা হয়নি, তা নয়, কিন্তু
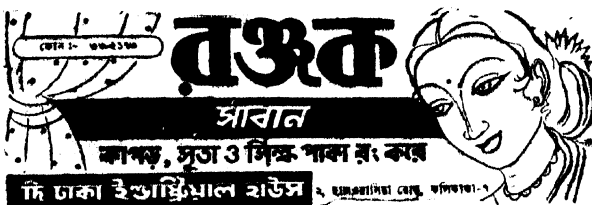
মা কিংবা অভির চোখে পড়লে ব্যাপারটার অন্য রকম অর্থ হতে পারে, এই মনে করে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে বলেছিল, তার চেয়ে যাদের দরকার তাদের হাতেই দিন না?

—বেশ। কিন্তু তার আগে আমার বিদ্যেটা নিজে একবার পরখ করে দেখবেন না? কি জানি, কী তুললাম।

—সে পরীক্ষা ওখানেই হয়ে যাবে। এসব বিষয়ে ও'রাই তো আসল সমঝদার। আমি আর কী বুঝি?

দিন সাতেকের মধ্যেই প্রোডাকশন ম্যানেজারের চিঠি এসে গেল। এষাকে ও'রা একটা মাঝারি গোছের 'রোল' দেবেন বলে স্থির করেছেন। পারিশ্রমিকের অংকটা বিশেষ লোভনীয় না হলেও ওর কাছে যথেষ্ট। অবিলম্বে সাক্ষাৎ করে চুক্তিটা সেরে ফেলবার অনুরোধ জানানো হয়েছে, এবং ঐ সঙ্গে যে আগাম প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, তার থেকে অভির প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়া যাবে। সাফল্যের আনন্দে এবং বিশেষ করে ছোটভাইএর পরীক্ষা সমস্যার যে সহজ সুরাহা হয়ে গেল, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এষা প্রথমে কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে রইল। তারপরেই ইচ্ছা হল, এখনই অভির ঘরে ছুটে গিয়ে সুসংবাদটা জানিয়ে দেয়। জীবনে আনন্দের আস্বাদ যখনই পেয়েছে, ছোট ভাইটিকে তার পুরো ভাগ না দেওয়া পর্যন্ত এষার কোনো দিন তৃপ্তি হয়নি। আজও সেই জন্যে মনটা ছটফট করে উঠল। কিন্তু না; এ ব্যাপারে তাকে সাবধান এগোতে হবে, চঞ্চল হলে চলবে না। তখনকার মত নিজেকে নিরস্ত করে চিঠিখানা লুকিয়ে ফেলল তার বাক্সের তলার দিকে। চুক্তিটা আগে হয়ে যাক, কলেজের আর পরীক্ষার দেনাটা মিটে যাক, তারপর তো বলতেই হবে।

দুটো সপ্তাহ না যেতেই বলতে হল। অনেক কৌশলে, দীর্ঘ ভূমিকার আশ্রয় নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাড়তে হল আসল কথা। সে দিনটা এষা কোনদিন ভুলবে না। বাবার মৃত্যুও বোধহয় মাকে অতটা আঘাত দেয়নি। তার চেয়েও যেন কোনো গভীর শোকের ছায়া নেমে এল সমস্ত বাড়িটার মাথার উপর। মায়ের সম্বন্ধে এতটা না হলেও এই রকম কিছু একটাই সে আশংকা করেছিল। কিন্তু অভি? সেও যে এমন করে ভেঙে পড়বে, সেটাই ছিল এষার ধারণার অতীত। ভাইকে সে যতটুকু চেনে, তার কাছ থেকে উৎসাহ না পেলেও সমর্থন পাবে, এই আশাই বরং পোষণ করে এসেছিল।

দিদিকে সে ভালবাসে, তার সব কথা সব কাজ নির্বিচারে মেনে নেওয়াই তার চিরদিনের স্বভাব। আজও সে কোনো প্রতিবাদ করল না। অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলল, একথা তুই আমাকে আগে বললি না কেন?

—'আগে বললে কী করতে শুনি? বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে। সেটা তো এখনও পার।' ক্ষুব্ধ অভিমানে এষার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। কিন্তু দিদির এত বড় আঘাতেও ওপক্ষে কোনো সাড়া জাগল না। যেন শুনতেই পায়নি কথাগুলো। আরো কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, আমার জন্যে আজ তোকে কোথায় নামতে হল!

সময়ে সব সয়ে যায়। মহাকাল তার কল্যাণ হস্তের স্পর্শ মানুষের মনের সব ক্ষত শুকিয়ে দেন। একটু দাগ হয়তো থাকে, মাঝে মাঝে মনে পড়ে, এই পর্যন্ত। আরো দিন গেলে তাও পড়ে না। জীবনের স্রোত বয়ে চলে তার চিরদিনের অভ্যস্ত পথ ধরে। যে ঝড়ের ঝাপটা একদিন সেখানে উত্তাল বিক্ষোভ তুলেছিল তার চিহ্ন মিলিয়ে যায়। এষাদের সংসারেও সেই আগের দিনের সহজগতি ফিরে এল। তার অসময়ে বেরিয়ে যাওয়া, সিনেমা কোম্পানীর গাড়ি করে অনেক রাতে ফিরে আসা, এগুলোও আস্তে আস্তে রোজকার রুটিনের মধ্যে বেমালুম খাপ খেয়ে গেল।

প্রথম যেদিন ঐ গাড়িখানা আঠারো নম্বর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল এবং তার মধ্যে গিয়ে উঠল পরলোকগত সুরেশ মৈত্রের মেয়ে এষা মৈত্র, সেদিন সমস্ত পাড়াময় কী তোলপাড়! এখানে ওখানে নাক সেঁটকানো, চোখ-রাঙানো এবং ঘোঁট পাকানো চলতে থাকল কিছুদিন। এ বাড়ি ওবাড়ির গিন্নীরা বাড়িবয়ে বেশ দু কথা শুনিয়ে গেলেন ওর মাকে, রাস্তার মোড়ে অভিকে পাকড়াও করল নিষ্কর্মা যুবকের দল। ভাড়াটেরা বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দিলেন। কিন্তু এ তরফের কোন সাড়া না পেয়ে এক দমে যাবার কোনো লক্ষণ না দেখে, সব কলরব আস্তে আস্তে থিতিয়ে পড়ল।

ক্রমশঃ দেখা গেল, ঐ বিশেষ গাড়িখানা এবং যেখানে এসে সেটা থামে, তাদের সম্বন্ধে সকলেরই কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। শুধু আসা যাওয়ার পথে আশেপাশের চোখগুলো ক্ষণেকের জন্যে হঠাৎ লুব্ধ কৌতূহলে সজাগ হয়ে ওঠে।

প্রয়োজনের তাড়ায় এষাকে যে জগতে গিয়ে পড়তে হল, তার ভিতরে সে কোনো আকর্ষণ খুঁজে পায়নি। স্টুডিয়ো এবং তার আশেপাশে যারা আনাগোনা করে, তাদের সঙ্গে তার নিছক কাজের সংযোগ ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, যদিও সেদিক দিয়ে ও তরফের চেষ্টা ও আগ্রহের অভাব ছিল না। এ বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম শুভেন্দু। সে ঠিক সিনেমা-জগতের লোক নয়, ডিরেক্টরের বন্ধু। কিন্তু এষার জন্যেই তাকে এর মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠভাবে এগিয়ে

আসতে হল। অভিনয়ে তার অভ্যাস ছিল; একটা ছোট গোছের রোলএ যখন নামতে বলা হল, আপত্তি করল না। এষার পাশে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত উৎসাহ ও উপদেশ দিয়ে যেখানে যেটুকু দরকার, তাকে সাহায্য করাই ছিল তার প্রধান কাজ। শুভেন্দু না থাকলে এষার অভিনেত্রী জীবনের প্রথম অংকেই বোধহয় যবনিকা পড়ে যেত।

স্টুডিয়ো এবং তার বাইরে কর্মে ও অবসরে ঘন ঘন তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে। তারই ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে কখন যে তাদের মন দেওয়া নেওয়া শুরু হয়েছিল ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু দুজনেই যে প্রতিদিন পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলেছে, এটা বুঝতে দেরি হয়নি। উভয় তরফেই যে দুর্লংঘ্য বাধা দাঁড়িয়ে আছে, সে বিষয়ে তারা অচেতন ছিল না। প্রথম যৌবনের যে উন্মাদনা চারদিকের সব কিছু ভুলিয়ে দেয়, সে স্তর তারা আগেই পার হয়ে এসেছিল। সুতরাং দুদিকের অবস্থা খোলাখুলি আলোচনা করবার মত ধৈর্য ও স্থিরতার অভাব হয়নি।

বাবা বড়লোক; কিন্তু তিনি যে ছেলের উপর প্রসন্ন নন, একথা শুভেন্দু এষার কাছে অস্পষ্ট রাখেনি। যাকে নিজের পায়ে দাঁড়ানো বলে আজও তা সে পেরে ওঠেনি, সেদিকে বিশেষ চেষ্টাও করেনি। মাসান্তে একটা নিশ্চিত মাসহারাই হয়তো তাকে অকর্মণ্য করে দিয়েছে। ঐ আর্থিক সূত্র-টুকু ছাড়া বাড়ির সংগে তার আর কোনো যোগ নেই। সেখানে সে জন্মেছে, কিন্তু বেড়ে ওঠেনি। অতি শৈশবে মাকে হারিয়েছে। তার আগেও মায়ের সংগে তার সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ, বাবার সংগে ক্ষীণতর। আজ সেটা এত সূক্ষ্ম যে নেই বললেই চলে। এই কলকাতা সহরে যেখানে সে বাস করে সেটা তার পৈতৃক গৃহ, কিন্তু আসলে সে শুধু একটা মাথা গোঁজবার স্থান, আশ্রয় নয়। সারাজীবনে আশ্রয় সে কোথাও পায়নি, না আপন জনের গৃহে, না তাদের অন্তরে। সংসারে কোনোখানে তার জায়গা নেই, এই কথাই জেনে এসেছে চিরদিন। আজ এষার কাছে এসে মনে হল, আছে, জায়গা আছে।

এষা মনে মনে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছিল, আছে, এবং চিরদিন, থাকবে। সেও এর বেশী কিছু চায়নি। ঐ ছন্নছাড়া নিঃসংগ মানুষটির স্নেহবুভুক্ষু অন্তরে অমনি একটু আশ্রয়। শুভেন্দুর পিতৃগৃহে যে ওর স্থান হবে না, সে বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল। একটি ভিন্ন জাতের গরিব ঘরের মেয়ে যাকে তিনি দেখেননি, পছন্দ করেননি, তার সংগে ছেলের এই বিয়েকে ওর বাবা স্বীকার করে নেবেন, তাকে বরণ করে ঘরে তুলবেন, এটা কখনই আশা করা যায় না। তা সে করেওনি। তবে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে নিশ্চয়ই অনেকখানি নির্ভর করেছিল শুভেন্দুর বর্তমান অবস্থার স্থায়িত্বের উপর। সিনেমাজগৎ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় নেবার জন্যে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বিয়ের পর দুজনের কেউ আর এই স্টুডিয়োর দরজায় এসে দাঁড়াবে না, এই ছিল তার দৃঢ়সংকল্প। সুতরাং গিয়ে উঠবার মত দুখানা ঘর এবং সচ্ছলভাবে চলবার মত কিছু আর্থিক সংস্থান—এটুকু না হলে কেমন করে চলে? শূন্যের উপর তো ঘর বাঁধা যায় না। কোনো মেয়েই তা চায় না।

প্রথম ছবির কাজ শেষ হয়েছিল। রোলটি ছোট হলেও এষার খ্যাতি কম হয়নি। ছবি যখন বেরোল, সিনেমা মহলে তার খ্যাতির ও চাহিদা সংগে সংগে বেড়ে গেল। এবার আর তাকে প্রার্থী হয়ে যেতে হল না প্রযোজকের কাছে, তাঁরাই এলেন ওর কাছে বৃহত্তর অংকের প্রস্তাব নিয়ে। ভূমিকাও জাতে উঠল—পার্শ্ব চরিত্রের নীচপদ থেকে নায়িকার কৌলিন্য। এ পথে একবার যারা পা দিয়েছে, তাদের কাছে এ আকর্ষণ দুর্নিবার। কিন্তু এষা নিজের মধ্যে তার কণা মাত্রও খুঁজে পেল না। তবু প্রত্যাখ্যান করা গেল না। যে সংকট মাথায় নিয়ে এ লাইনে সে পা বাড়িয়েছিল, তার প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে, অভিলাষ পাশ করে বেরিয়েছে, কিন্তু সংসারের হাল বদলায়নি। আবার সেই নিত্য টানাটানি, দিনান্তের সাধারণ প্রয়োজনগুলো মেটাতে গিয়ে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। অভি এম এ পড়ছে এবং বাবার মুরুব্বিদের দরজায় নিয়মিত ধর্ণা দিচ্ছে। তাঁদের কেউ কেউ ভরসা দিয়েছেন, এই পর্যন্ত, তার বেশী আর কিছু এখনো দিতে পারেননি।

কাজেই এষাকে আবার গিয়ে দাঁড়াতে হল ক্যামেরার সামনে। শুভেন্দুকেও থাকতে হল যে কোনো একটা রোল নিয়ে। প্রথমটায় তার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এষার মনোগত অভিপ্রায় জানতে পেরে আর আপত্তি করল না। এষা খুশী হল। চুক্তি ফর্মে সই দিয়ে দুজনে যখন বেরোচ্ছে, একটা নিরালা কোণ দেখে শুভেন্দুর একান্ত কাছটিতে সরে এসে চুপি চুপি বলল, কী হল? খুব যে তড়পাচ্ছিলে, আর থাকছিনে। এবার?

শুভেন্দু মৃদু হেসে সকলের অলক্ষ্যে ওর হাতে একটু চাপ দিল। নীরবে স্বীকার করে নিল তার পরাজয়। প্রকাশ্যে বলল, কেন থাকলাম, জানো না তো?

—কেন?

—রোলটি যে লোভনীয়।

—লোভনীয় মানে? কী রোল?

—নায়িকার বেয়ারা না চাপরাশী বা ঐ গোছের একটা কিছু।

—যাঃ, বাজে কথা।

—সত্যি।

—তাহলে ছেড়ে দাও। ওসব বাজে পার্ট করতে হবে না।

—কেন, মন্দ কি? অভ্যাসটা হয়ে থাক।—বলে হেসে উঠল। এষা জানত না, পার্টটা আসলে কী। শুভেন্দুর বলার ধরনে কিছুটা সন্দেহ হলেও বার বার জিদ করতে লাগল, ঐ ধরনের নগণ্য রোল নেওয়া চলবে না। শুভেন্দুকে তখন আসল কথাটা ভাঙতে হল। ওর বাহু ধরে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, চল চল। ঠিক চাপরাশী নয়, তার চেয়ে কিছু ওপরে। দূরে দাঁড়িয়ে সেলাম না ঠুকে পাশে এসে বসা চলবে। এবার হল তো?

এই ছবির কাজ শেষ হবার আগেই অভিলাষের বেকার-জীবনও শেষ হল। চাকরিটি মোটামুটি ভাল। হিসাব করে চললে কোনোদিন অভাবে পড়তে হবে না। এদিকে ওদিকে ওদের কিছু দেনা আছে। সেসব এষা ভাইয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে যাবে না। যাবার আগে নিজেই শোধ করতে পারবে। তার পরেই তার ছুটি। শুভেন্দুর একান্ত ইচ্ছা, সেটা সে প্রকাশও করেছে, ছবির নকল বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েই তারা নতুন ও আসল বন্ধনে যুক্ত হবে। তার আগে আর একটা কাজ বাকী আছে এষার। অভিলাষের বিয়ে। বৌটি বড় সড় এবং মনের মত হওয়া চাই। শুধু সংসার নয়, রুগ্‌ণা মায়ের ভারও তারই হাতে দিয়ে যেতে হবে।

বিয়ের কথা শুনে অভিলাষ তেড়ে উঠল, মাও বিশেষ আমল দিতে চাইলেন না। থাক না কিছুদিন, এত তাড়া কিসের? এষাকে তখন তার আকাঙ্ক্ষিত মিলনের অপ্রিয় কথাটা প্রকাশ করতে হল, এতদিন বলি বলি করেও যা বলতে পারেনি। মা ও ভায়ের উপর এটা তার দ্বিতীয় আঘাত। কিন্তু প্রথমবার সেটা যতখানি তীব্র বলে মনে হয়েছিল, এবার যেন ততটা বাজল না। মা গুম হয়ে রইলেন, কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। হয়তো এই রকম একটা কিছুর জন্যে তিনি নিজেকে ভিতরে ভিতরে তৈরি করে রেখেছিলেন। মেয়ে যে পথে নেমেছে এটা যেন তারই প্রত্যাশিত পরিণতি। কিংবা এও হতে পারে, মায়ের সেই পুরনো দিনের দৃঢ় সংস্কারের ধারগুলো আর তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না, কালের ধাক্কায় ক্রমে অনেকটা ভোঁতা হয়ে পড়েছিল। তাই তাঁর একমাত্র কন্যা যার গলায় মালা দিতে চলেছে, সে লোকটা জাতে ভিন্ন এবং সিনেমা-আক্টর জেনেও কোনো প্রতিবাদ করলেন না। শেষ পর্যন্ত নীরব হয়েই রইলেন।

অভি কিন্তু দিদিকে সমর্থন করল। প্রথম বারে সে যে অতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল, তার কারণ সে বুঝেছিল, দিদি যা করতে যাচ্ছে সেটা শুধু বাধ্য হয়ে, সংসারের

......পারে বৈকি ! এষা স্থির করল, আজই যাবে।

প্রয়োজনে, বিশেষ করে তার জন্যে, নিজের অন্তরের টান থেকে নয়। কিন্তু এবারকার কথা আলাদা। শুভেন্দুর কথা বলতে গিয়ে এষার মুখে যে একটি জ্বলজ্বলে মধুর স্নিগ্ধ ছায়া ফুটে উঠেছিল, তার থেকেই অভিলাষের বুঝতে কিছুই বাকী ছিল না। দিদি অনেক দুঃখ পেয়েছে, অনেক কষ্ট সয়েছে, এবার সে সুখী হোক, তার এই ঘর-বাঁধার সাধ সার্থক হোক, মনে মনে এই কামনাই করেছিল। আর একটা কথা ভেবেছিল অভিলাষ। দিদির চেয়ে সে মাত্র বছর দুয়েকের ছোট; তাছাড়া গরিবের ঘরের ছেলেমেয়েরা বেশীদিন ছেলেমানুষ থাকতে পারে না, অল্প বয়সেই অনেক কিছু দেখে ও শিখে ফেলে। অভিলাষ বুঝেছিল, এষা যে জীবন যাপন করছে সেখান থেকে তাকে পুত্রবধূ করে নেবার মত উদার বাপমায়ের একান্ত অভাব, বধূ বলে গ্রহণ করবার মত সাহসী পাত্রও দুর্লভ। সুতরাং এষার বিয়ে, (যার দায়িত্ব ছোট ভাই হলেও একান্তভাবে তারই) একটা রীতিমত কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। সে যে নিজেই তার সহজ সমাধান করে ফেলেছে, এটা সব দিক দিয়েই মঙ্গল।

সমস্যা কিন্তু অভির বেলাতেও দেখা দিল। এতটা সে কল্পনা করেনি, এষাও ধারণা করতে পারেনি। কিন্তু মা বুঝতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া যে ঘটকের উপর পাত্রী সংগ্রহের ভার ছিল, সেও তাঁকে গোপনে জানিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, কেমন করে যেন রটে গেছে, আপনার মেয়েটি বায়স্কোপে নেমেছে। ভালো ভালো সম্বন্ধ ফেঁসে যাচ্ছে।

মা এ সম্বন্ধে মুখ ফুটে কিছু না বললেও এষা কিছুদিনের মধ্যেই আঁচ পেয়ে গেল। বুঝল সে যতক্ষণ না সরে যাচ্ছে তার এমন কৃতী ভাইয়েরও পাত্রী জুটবে না। মাকে বলল, বেশ তো, আমি অন্য জায়গায় গিয়ে থাকি, তুমি অভির বিয়ে দিয়ে দাও।

মা কথাটা সরাসরি উড়িয়ে দিলেন না, একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, সেই ছেলেটি কি এখানে নেই?

—এখানেই আছে। কেন?

মা কি বলতে চান বুঝতে পারল এষা। বলল, তার দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তখন যদি আবার কথা ওঠে, ছেলের দিদি অন্য জাতে বিয়ে করেছে, ওঘরে মেয়ে দেওয়া যায় না?

মা ভাবতে লাগলেন। সে রকম একটা সম্ভাবনা যে রয়েছে, মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেন না।

অভিলাষের কানে কথাটা যেতেই সে রেগে মেগে ছুটে গেল দিদির কাছে—'তোরা কী ভেবেছিস বল দিকিন? আমার বিয়েটা কি তোদের কাছে এত বড় কন্যাদায় যে তার জন্যে সব কিছু সইতে হবে?

—কেন, কী হল?

—কী হল মানে? ভাইকে বিয়ে দিয়ে উদ্ধার করবার জন্যে বড় বোন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, কিংবা আইবুড়ো হয়ে বসে থাকে, এরকম উদ্ভট কাণ্ড কোথায় শুনেছিস?

—দরকার হলে অনেক উদ্ভট কাজও করতে হয়। লাফালাফি না করে ঠাণ্ডা মাথায় যদি ভেবে দেখিস—

অভি বাধা দিয়ে দৃঢ়ভাবে বলে উঠল, এর মধ্যে ভাববার আর কিছু নেই। বড় কে? আমি না তুই? আজ যদি বাবা থাকতেন, কার বিয়ে আগে হত, শুনি; আমার না তোর?

বাবার স্মৃতি ওদের দুজনের কাছেই শুধু পবিত্র নয়, অত্যন্ত প্রিয়। সহসা তাঁর কথা উঠে পড়তেই কারো মুখে আর কথা সরল না। অভি কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরে চলে গেল। সেই চলে যাওয়ার পথের দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এষাও যেন অকস্মাৎ আবিষ্কার করল, অভি আর সে অভি নেই, সে বড় হয়েছে। ছোট ভাইটি শুধু নয়, সে ওদের অভিভাবক, পরলোকগত পিতার প্রতিনিধি।

সেদিন আর একটি দুর্লভ বস্তু লাভ করল এষা—শুভেন্দুর চিঠি! তার মধ্যে প্রথম প্রেমপত্রের আবেগ যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল একটি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ের কামনা বাসনা ভরা অজস্র প্রশ্ন। কী ভাবছে এষা, এদিকের কতদূর কি করতে পারল, কত দেরি, আসন্ন মিলনের শুভদিনটি আর কত দূর, তার আগে একবারটি কি সে যেতে পারে না শুভেন্দুর কাছে?...

পারে বৈকি? এষা স্থির করল আজই যাবে। শুভেন্দু দুএকদিন আসতে চেয়েছে তাদের বাড়ি। সেই রাজী হয়নি। নানাভাবে এড়িয়ে গেছে প্রস্তাবটা। কখনো বলেছে তোমার মত লোককে বসতে দেবো, তেমন ঘরই নেই আমাদের, কখনো আরো হালকাভাবে বলেছে, 'ওরে বাপরে! তোমাকে ছবির পরদায় দেখেই লোকে যে রকম মেতে ওঠে, সশরীরে দেখলে কি আর রক্ষা আছে? শেষ পর্যন্ত পুলিস ডাকতে হবে।'

শুভেন্দু বুঝেছে, যে কারণেই হোক, এষা চায় না সে যায়। লোকে যে তাকে দেখে মেতে ওঠে না, তেমন আর্টিস্ট সে নয়, একথা সবাই জানে। এষাও না জানে, তা নয়। অন্য কোনো বাধা আছে। হয়তো ওর মা ব্যাপারটাকে ভালভাবে নেবেন না। এইসব কারণে এষাকেও সে তার বাড়িতে যাবার জন্যে স্পষ্টভাবে কোনো অনুরোধ করেনি। ইঙ্গিত দিয়েই বুঝেছে, এষার ইচ্ছা নয়।

আজ কী ভেবে চিঠির ভিতর দিয়ে এই ব্যাকুল আহ্বান পাঠিয়ে দিল, সেই জানে। কিংবা কোনো কিছু না ভেবেই হয়তো জানিয়েছে তার অন্তরের আকুল আকাঙ্ক্ষা। মুখে যা বলতে বাধে, কলমের মুখে তা অনায়াসে বলা যায়।

এষার মনেও কি কোনো আকাঙ্ক্ষা জাগেনি? জাগলেও চেপে রেখেছে। আজ স্থির করে ফেলল, এ ডাক সে অবহেলা করবে না। তারও যে অনেক কথা বলবার আছে, বিশেষ করে জানবার আছে, এখানকার এই অবস্থায় কী করতে বলে শুভেন্দু।

কড়া নাড়তেই একজন চাকর এসে দরজা খুলল। এষা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, বাবু আছেন? তার আগেই চাকরের ঠিক পিছন থেকে একটি ভদ্রলোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কাকে চাই?

—শুভেন্দুবাবু।

—ভেতরে আসুন।

ভদ্রলোকের অতি-সন্ধানী চোখ দুটো এষার ভাল লাগল না। কে ইনি? ভাবতে ভাবতে তার পেছন পেছন সামনেই একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। নানা আসবাবভরা ড্রইংরুম। ঠিক সাজানো নয়, অনেকটা যেন এলোমেলো অগোছালো। একটা সোফা দেখিয়ে ওকে বসতে বলে ভদ্রলোক পাশের কৌচটায় বসলেন। পকেট থেকে দেশলাই বের করে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, শুভেন্দু বাড়িতে নেই।

—কোথায় গেছেন?

—কী জানি? আমার সঙ্গেও দেখা হয়নি। কোথায় নাকি শিকার করতে বেরিয়েছে। বন্ধুরা এসে টেনে নিয়ে গেছে ভোরবেলা।

—'ও, তাহলে আমি যাই,' বলে এষা উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোক বললেন, 'যাবেন কেন? বসুন না? আমার নাম প্রশান্ত ব্যানার্জি; ওদের কোলিয়ারীর ম্যানেজার। অনেকদিন আছি, বলতে গেলে একরকম ওদের পরিবার-ভুক্ত হয়ে গেছি।'

এষা তার আগের জায়গাতেই বসে পড়েছিল। তার দিকে একবার তাকিয়ে সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে প্রশান্ত আবার বললেন, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি, মনে হচ্ছে। মানে, চেনা মুখ। আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—বলুন।

—আপনি কি একজন সিনেমা-আর্টিস্ট?

—আর্টিস্ট ঠিক নই; দুএকটা ছবিতে কাজ করেছি।

—শুভেন্দুর সঙ্গে বুঝি ওখানেই জানাশুনো?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি মাঝে মাঝে এখানে আসেন?

—না, আর কখনো আসিনি।

—ওই যায় আপনাদের বাড়ি?

—না, উনিও কোনোদিন যাননি।

এষার কণ্ঠস্বরে ভিতরকার বিরক্তির ঝাঁঝ ফুটে উঠল। আর কোনো প্রশ্নের অবসর না দিয়েই উঠে পড়ল এবং যেতে যেতে বলল, আমাকে এবার যেতে হবে।

প্রশান্তও উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে খানিকটা কষ্ট দিলাম।

এষা তখন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে, কোনো উত্তর দিল না। প্রশান্ত যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনভাবে বললেন, ও আপনার নামটাতো জিজ্ঞেস করা হয়নি।

এষা এদিকে না ফিরেই বলল, এষা মৈত্র।

—শুভেন্দুকে কিছু বলতে হবে?

—না।

মনে পড়ল, একদিন কোন্ কথা প্রসঙ্গে শুভেন্দু এই ম্যানেজারটির সামান্য মাত্র উল্লেখ করেছিল। তার সুর থেকে এষার মনে হয়েছিল, লোকটি সুবিধার নয়, কিন্তু কর্তার উপর এর প্রভাব এত প্রবল যে বাধ্য হয়েই একে খাতির করে চলতে হয়।

পরদিন সন্ধ্যার ডাকেই এষা আর একটা ছোট্ট চিঠি পেয়েছিল শুভেন্দুর কাছ থেকে। তাতে ম্যানেজারের কোনো উল্লেখ ছিল না, কিন্তু ওর যাবার খবরটা নিশ্চয়ই তার মুখেই শুনে থাকবে। শিকারের ব্যাপারটা মিথ্যা নয়। শুভেন্দুর কতগুলো নেশার মধ্যে ওটাও একটা। ইদানিং প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল, মাঝে মাঝে বন্ধুদের টানা-হেঁচড়া কাটিয়ে উঠতে পারত না। এষা এত কষ্ট করে প্রথম গেল তার কাছে, অথচ দেখা হল না। আরেক দিন যাবার বারংবার তাগিদ দিয়ে লিখেছিল, তা না হলে সেই গিয়ে হাজির হবে ঢাকুরিয়ায়। কিন্তু কি মনে করে এষা আর যায়নি, চিঠিতে দিনক্ষণ দিয়ে ওকেই ডেকে এনেছিল ইডেন গার্ডেনের একটি পরিচিত নিভৃত গাছের ছায়ায়।

অভিলাষ তার দায়িত্ব সম্বন্ধে আরো সজাগ হয়ে উঠল, এবং দিদির বিয়েটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেবার জন্যে তোড়জোড় শুরু করল। অসবর্ণ বিবাহ; আনুষ্ঠানিকভাবে শাস্ত্রমতে দেওয়া চলবে না। সে চেষ্টাও সে করেছিল। মায়ের মত নেই, আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিরোধী, পুরোহিত রাজী হলেন না। সুতরাং রেজিস্ট্রেশন ছাড়া পথ নেই। তাই হল। অভিলাষ সেখানে উপস্থিত থেকে সাক্ষী হিসেবে সই করল। মা তার যে কখানা গয়না মেয়েকে দেবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন, তাঁর ইচ্ছামত সেগুলো ভেঙে নতুন করে গড়ানো হল। কাপড় জামা এবং অন্যান্য উপহারসামগ্রী অভিলাষ সাধ্যমত সংগ্রহ করল। খরচপত্রের ব্যাপারে এষা বাধা দিতে গিয়েছিল। অভিলাষ ধমকের সুরে বলল, তুই বিয়ের কনে, চুপ করে ঘরের কোণে বসে থাকবি। তোর এ সবে কথা বলার দরকারটা কি? বললে শুনছেই বা কে?

কথাগুলো এবং বিশেষ করে বলবার ধরনটা এমন মুরুব্বির মত যে এষা না হেসে থাকতে পারেনি। কাছে সরে এসে ভাইয়ের কান দুটো ধরে মাথাটা উপরের দিকে তুলে বলেছিল, বুড়ো কনে কর্তার মুখখানা একবার দেখি।

তিন

শুভেন্দু যখন ফিরল, বেলা প্রায় দুটো। চোখ বসে গেছে, চুল উসকো খুসকো, অত ফর্সা মুখ, তার উপর কেউ যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। ক্রমাগত ঘর-বার করে করে ক্লান্ত হয়ে এষা শেষ পর্যন্ত শুয়ে পড়েছিল। পায়ের শব্দে ধড়মড় করে উঠে পড়ল এবং ছুটে বেরিয়ে এসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, কোথায় গিয়েছিলে না বলে কয়ে? কী করছিলে এতক্ষণ? একী চেহারা হয়েছে!

শুভেন্দুর মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল। বারান্দায় বসে পড়ে বলল, দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নিই। তারপর এক এক করে বলছি সব।

—থাক আর বলতে হবে না। ঘামটা একটু মরলেই চট করে চান সেরে নাও। আমি খাবার দিতে বলি।

—তুমি খেয়ে নিয়েছ?

এষা সে কথার জবাব না দিয়েই দ্রুত পায়ে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, ঘরে চল, পাখাটা খুলে দিই।

খাওয়া দাওয়া মিটে গেলে শুভেন্দু আবার দক্ষিণের বারান্দায় ফিরে গিয়ে ইজি চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাল। এষা আসতেই বলল, বসো।

—এখন থাক। আগে একটু গাড়িয়ে নাও।

—গড়াবো আবার কী? তবে তোমার যদি—

—আমার ওসব সাতজন্মেও অভ্যাস নেই।

—আর আমার বুঝি এটা শত জন্ম থেকে চলছে?

—আজ যা কাণ্ড করে এলে একটু বিশ্রাম চাই না? মানুষের শরীর তো। হঠাৎ একটা অসুখ বিসুখ বাধিয়ে বসলে—

—না, অসুখ বাধাবার মত বিলাসিতা এখন আর চলবে না। এবার থেকে একেবারে দিনমজুর।

শুভেন্দুর কথায় আগেকার সে হালকা সুর আর ছিল না। একটা গুরুতর কিছু আশংকা করে এষা ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। শুভেন্দু বাইরের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, তিনদিনের মধ্যে এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

—'কেন?' নিজের অজান্তেই যেন প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল এষার মুখ থেকে।

—কেন আবার? বাড়িওয়ালার হুকুম।

—এই কথাই বুঝি ছিল ঐ চিঠিতে?

—হ্যাঁ; তার সঙ্গে আরো আছে। বিয়ের আগে আলাদা করে কিছু টাকা চেয়েছিলাম। সেটা তো নামঞ্জুর হয়েছেই, তার সঙ্গে মাসোহারাও বন্ধ হয়ে গেল।

এষা চমকে উঠে তাকাল স্বামীর মুখের দিকে। তারপর মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল, এর মধ্যে তোমাদের ঐ ম্যানেজারটি আছেন বোধহয়।

—নাও থাকতে পারে। কর্তা নিজেও আমার ওপর কোনোদিন প্রসন্ন নন।

—আমার মনে হয় ও আছে। অন্ততঃ কান ভারী করবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করে থাকবে। সেটা আমি সেদিনই বুঝেছি।

শুভেন্দু জানতে চাইল না, কোন্‌দিন। অনুমান করল, ম্যানেজারের সঙ্গে এই বাড়িতে যেদিন ওর হঠাৎ দেখা, তার কথাই বলছে এষা। কিছুক্ষণ নীরবে কাটবার পর এষা যেন আত্মগতভাবে বলল, তার মানে, বিয়ে করে তোমাকে রাতারাতি পথে বসতে হল।

'কে বললে? কার সাধ্য আমাদের পথে বসায়?' সজোরে প্রতিবাদ করে চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসল শুভেন্দু। তারপর স্বর নামিয়ে বলল, এ ভালোই হল। পরের দানের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হবে না।

—পর বলছ কাকে? তোমার বাপ! অতবড় সম্পত্তির মালিক তিনি! তুমি তার বড় ছেলে।

—'সবই সত্যি', ম্লান হেসে বলল শুভেন্দু, 'শুধু এই কথাগুলোর মধ্যে একটা মস্ত বড় ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই নেই। যাক; কী জন্যে বেরিয়েছিলাম, কী কী করে এলাম, শোনো।

—কিন্তু ঐ ম্যানেজারের চিঠিতেই তুমি সব ছেড়ে দেবে? একটা কথা বলবে না, বাবার কাছে একবার গিয়ে দাঁড়াবে না!

—না।

—কেন? তিনি বাপ, তুমি ছেলে। তাঁর

কাছে যেতে তোমার বাধা কিসের? অনুগ্রহ না চাও, একবার গিয়ে জানতে তো পার, কোন্ অপরাধে তিনি তোমাকে তোমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন।

—'অপরাধ!' শ্লেষ-মেসানো হাসির সুরে বলল শুভেন্দু, 'অপরাধের কথাটা তো তিনি অস্পষ্ট রাখেননি। সেটা আরেকবার তার মুখ থেকে নাই বা শুনলাম। সেধে যেচে আরো খানিকটা অপমান মাথায় করে বয়ে আনবার দরকার কী?'

এষা বুঝল, কারণটা তার বিবাহ-ঘটিত বলেই শুভেন্দুর পৌরুষে বাধছে। আজ যদি সে একা হত, এবং তারই কোনো নিজস্ব ব্যাপারে বাবা তার উপর রুষ্ট হয়ে এই আদেশ দিতেন, হয়তো তাঁর কাছে মাথা নোয়ানো অসম্ভব হত না। কিন্তু এখন সে একা নয়, এবং যে কারণে তিনি এতদূর এগিয়ে গেছেন, তার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট ওর স্ত্রী। ব্যাপারটা এক্ষেত্রে শুধু পিতাপুত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন, জড়িয়ে আছে একটি নারীর মর্যাদা। যেহেতু সে মর্যাদা রক্ষার সব দায়িত্ব আজ তারই হাতে ন্যস্ত, শুভেন্দু আর যাই পারুক, প্রার্থী হওয়া দূরে থাক, বোঝাপড়ার আবেদন নিয়েও বোধহয় বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না।

এষা এই সব কথাই ভাবছিল। এমন সময় শুভেন্দু বলে উঠল, একটা বাসা মোটামুটি ঠিক করে এলাম। তুমি দেখে পছন্দ করলে, পাকাপাকি কথা হবে।

—'কোথায়?' অনেকটা নিস্পৃহ কণ্ঠে জানতে চাইল এষা।

—টালিগঞ্জে। স্টুডিয়ো থেকে বেশী দূরে নয়। দেখলাম, ঐ তল্লাটে থাকাই সুবিধে।

—কেন?

—যাতায়াতে অনেকখানি সময় বাঁচে। গোবিন্দ মল্লিকের সঙ্গেও দেখা করে এলাম। নতুন ছবি করছে। তোমাকে যেতে বলেছে।

—আমি যাবো না।

—যাবে না! বিস্ময়ের সুরে বলল শুভেন্দু।

—না; সিনেমায় আর নামবো না, সে কথা তো আগেই হয়ে গেছে।

—তা হয়েছিল; কিন্তু এখন যে চাকা ঘুরে গেল।

—যাক; তবু ওদিকে আর পা বাড়াবো না।

—বেশ; তাহলে তুমি থাক; আমি একাই যাই। তবে আমার যা বাজার দর—

—'তোমাকেও যেতে হবে না', বেশ দৃঢ়-ভাবেই বলল এষা।

শুভেন্দু সত্যিই বিস্মিত হল। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় যা মনে এল, বলে ফেলার মত লঘুচিত্ত মেয়ে এষাকে কোনোক্রমেই বলা চলে না। তার মুখ দেখেও মনে হচ্ছে না, কিছু একটা না ভেবেই বলছে কথা-গুলো। কিন্তু কী বলতে চায় সে? দাঁড়াবার মত ঐ একটি পথই তো খোলা আছে তাদের সামনে।

এষা কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, এবং কোনোদিকে দৃকপাত না করে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই শুভেন্দু বলল, এই টাকাটা রেখে দাও।

এষা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, কিসের টাকা?

—মল্লিকের কাছ থেকে কিছু আগাম নিয়ে এলাম।

—ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

—ফিরিয়ে দেবো! তারপর? তুমি বুঝি ভেবেছ তোমার এই পতিদেবতার পেটভর্তি বিদ্যে গজগজ করছে। ইচ্ছে করলে এখনই এক লাফে কোনো সরকারী কিংবা সওদাগরি আপিসে একেবারে পাঁচশ টাকার মসনদে গিয়ে বসতে পারি। নো; মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, সেখানে সব বিলকুল ঢনঢন। তিরিশ টাকার কেরানীগিরির জন্যে তিরিশ মাস আপিসে আপিসে বুকডন দিয়ে বেড়াতে হবে। সেটি পারবো না।

আমি কি বলছি, তুমি বুকডন দিয়ে বেড়াও?

—তবে কী করতে হবে?

—কিছুই করতে হবে না। যাক না দুচারদিন।

—এদিকে যে দুচার ঘণ্টাও চলছে না।

—কে বললে তোমাকে?

—বলতে হবে কেন, ঘটে কি এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি নেই? সেই কটা টাকা কবে যে দিয়েছিলাম, মনেও পড়ে না। ভেবে পাচ্ছি না, এখনো তারা টি'কে আছে কেমন করে।

—সে সব তোমাকে না ভাবলেও চলবে।

আর কোনো প্রশ্নের অবসর না দিয়ে এষা নিজের ঘরে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে বাইরে যাবার মত তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসে বলল, আমি একটু বেরোচ্ছি! তুমি তো বাড়িতেই আছ এ বেলা?

—হ্যাঁ; কোথায় যাচ্ছ?

—একটু ঢাকুরিয়া থেকে ঘুরে আসি।

শুভেন্দু বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে একটা বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতা ওলটা-চ্ছিল, হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল। স্ত্রীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বলল, অভি বেচারার ঘাড় ভাঙবার মতলব নেই তো?

—তখন বুঝি এই বুদ্ধির বড়াই করছিলে?

—না; মানে, ধারটার চাওয়াও ঠিক হবে না। এমনিতেই ও অনেক খরচ পত্তর করে ফেলেছে।

—তুমি আমাকে কী ভাব বলতো? ধার চাইতে যাবো অভির কাছে?

—অক্ষম লোকের হাতে পড়লে অনেক সময় ভাইএর কাছে হাত পাততে হয় বৈ কি?

কথাটা স্বভাবসিদ্ধ হাল্কাভাবেই বলেছিল শুভেন্দু; কিন্তু এষার কানে, তার মধ্যে থেকে যেন একটা অন্য সুর বেজে উঠল। ফিরে এসে স্বামীর পিঠের কাছে নত হয়ে মাথার উপর গাল রেখে স্নিগ্ধ অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, আমাকে মাপ কর লক্ষ্মীটি। কথাটা এমন করে বলা আমার ঠিক হয়নি। আজ তুমি এমনিতেই যে আঘাত পেয়েছ! অন্য কেউ হলে ভেঙে পড়ত।

'এই দ্যাখ, এ সব কী বলছ তুমি? মাপ করবার কোন্ কথা হল?' হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে এনে বলল শুভেন্দু, 'তুমি যতক্ষণ পাশে আছ, ভেঙে পড়তে যাবো কোন্ দুঃখে?'

পিঠে মৃদু আঘাত করে বলল, যাও, ঘুরে এসো। রাত করো না।

—না না; এই তো যাবো আর আসবো।

বলেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ল।

ঢাকুরিয়া বলাতে শুভেন্দু স্বভাবতই বুঝেছিল তার শ্বশুরে বাড়ি। এষা ইচ্ছা করেই সে ধারণা ভেঙে দেয়নি। আসলে সে যেখানে গিয়ে উঠল সেটা ঢাকুরিয়া হলেও তার বাপের বাড়ি নয়; গুপী স্যাকরার দোকান। এখানে সে আগেও অনেকবার এসেছে, দুএকখানা সোনার জিনিস রেখে যখনই দরকার কিছু টাকা নিয়ে গেছে, আবার যেমন যেমন পেরেছে শোধ দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছে গয়না। বিয়ের আগে সব হিসাব মিটিয়েই চলে গিয়েছিল, আবার কখনো আসতে হবে মনে করেনি। তাই গুপীও একটু আশ্চর্য না হয়ে পারল না। তবে মুখে সে ভাব প্রকাশ না করে হাসি মুখেই পুরনো খদ্দেরকে সমাদর করে বসালো এবং এই কদিন আগে তারই নিজের হাতে তৈরি একজোড়া বালা রেখে শ দুই টাকা তুলে দিল 'দিদিমণির' হাতে।

এষার ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। এসে দেখল, শুভেন্দু বাড়ি নেই। নিজের মনেই হাসল একটু। আড্ডার পোকা একটি। চিরদিনের অভ্যাস; এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে পারেনি বেচারা। ঘণ্টাখানেক পরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে ছুটে এসে কলকণ্ঠে বলল, কী ব্যাপার? বন্ধুরা যে আজ এত শিগগির—' চোখের দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াল, বাকীটা আর বলা হল না। এ চোখ সে চেনে। এতদিন যে জগতে কাটিয়ে এল, অনেক দেখেছে সেখানে। এও একটা কারণ, যার জন্যে ওদিকটা আর সে মাড়াতে চায় না। এটা যে শুভেন্দুর একটি পুরনো উপসর্গ, তা সে জানত। এ সম্বন্ধে মুখ ফুটে কিছু বলেনি, তবু শুভেন্দু বুঝে গিয়েছিল, এটি ছাড়তে হবে। বিয়ের কিছুদিন আগে থেকে ছেড়েও দিয়েছিল।

উপরে উঠতে উঠতে স্ত্রীর চোখমুখের দিকে একবার তাকিয়েই কৈফিয়তের মত করে বলল, অনেকদিন পরে আজ একটু খেলাম। চিঠিটা পেয়ে অবধি সকাল থেকে মনটা বড্ড টানছিল এইদিকে। পুরনো বন্ধু তো।

কণ্ঠে হাসি দিয়ে ব্যাপারটা লঘু করবার চেষ্টা করল। ওপক্ষ থেকে কোনো সাড়া পেল না। এষা ভাল মন্দ কিছুই বলল না, দ্রুত পায়ে সরে গেল অন্য দিকে। তার চেয়ে দুটো কড়া কথা যদি শুনিয়ে দিত, অনেকটা স্বস্তি পেত শুভেন্দু।

পরদিন যথানিয়মে বেলা করে চা পর্ব সেরে শুভেন্দু কাগজটা হাতে করে নীচে বাইরের ঘরে গিয়ে বসল। এক চক্কর ঘুরে আসবে কিনা ভাবছিল। কাজও ছিল খানিকটা। মল্লিকের টাকাটা ফেরৎ দেওয়া দরকার, এষার যখন ইচ্ছা নয়। তাছাড়া টাকা হাতে থাকলেই পুরনো অভ্যাসটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। কাল সন্ধ্যা থেকে এষা অত্যন্ত জরুরী দু একটা প্রশ্ন ছাড়া, আর কোনো কথাবার্তা বলছে না।

উঠতে যাবে, এমন সময় গেটের সামনে মোটর থামবার শব্দ শোনা গেল। ট্যাক্সী থেকে নামলেন প্রশান্ত ব্যানার্জি। ঘরে ঢুকতেই শুভেন্দু কলরব করে অভ্যর্থনা জানাল, এই যে আসুন, দাদা। সরজমিনে তদন্ত করতে এলেন বুঝি? কিন্তু এখনো তো একদিন বাকী।

—'কিসের?' ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারেননি, এমনিভাবে বললেন প্রশান্ত।

—আপনার নোটিশের মেয়াদটা তিনদিন ছিল না?

—বল, বল। তোমরা বলবে, আমি শুনবো। সেই কপাল করেই তো এসেছিলাম। তবে এখন আর তেমন লাগে না। গণ্ডারের চামড়া তো।

শুভেন্দুর সামনের কৌচটা দখল করে হাতের অ্যাটাচি কেসটা নামিয়ে রেখে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন ম্যানেজার। তারপর বললেন, চাকরি তো কোনোদিন করনি ভায়া। করলে বুঝতে ম্যানেজারই হই আর যাই হই, আসলে হুকুমের চাকর। মানুষ নয়, মেশিন। তার প্রাণ বলে কিছু নেই। থাকাটা অপরাধ।

কথাকটির মধ্যে যে আক্ষেপের সুর ছিল, শুভেন্দুর কানে হঠাৎ নতুন লাগল। সরাসরি কৃত্রিম বলে উড়িয়ে দিতে পারল না। বরং মনে হল, এই লোকটার সম্বন্ধে যে ধারণা সে করে রেখেছে, সেটা হয়তো পুরোপুরি সত্য নয়।

প্রশান্ত আবার বললেন, তুমি হয়তো ভেবেছ, যা কিছু করছে সব প্রশান্ত বাঁড়ুয্যে। সেইটাই স্বাভাবিক। বাপ নিজে থেকে উপযুক্ত পুত্রকে একটা তুচ্ছ কারণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন, সামান্য মাসহারাটুকু পর্যন্ত বন্ধ করে দিচ্ছেন, একথা কে বিশ্বাস করবে? বিশেষ করে ও'র মত বাপ। কী করবো ভাই, আমার কপালটাই এমনি। তাই সব রকম অপবাদ হজম করে বসে আছি। যাক, আমাকে এখ্খুনি বেরোতে হবে। এটা রাখো।' বলে, ব্যাগ খুলে এক তাড়া নোট বাড়িয়ে ধরলেন।

শুভেন্দু মনে করল, বেরোবার আগে টাকাটা ওর কাছে রেখে যাচ্ছেন। বলল, এটা আপনার রানীগঞ্জ নয়, কোলকাতা শহর। দিনেদুপুরে আপনার ব্যাগটা কেউ ছিনিয়ে নেবে না।

—না হে, না। সেজন্যে নয়। এটা তোমার। তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।

—আমার জন্যে! কিন্তু—

—কর্তা অবিশ্যি জানেন না। সে আমি যাহোক করে ম্যানেজ করবো।

—মাপ করবেন। ওসব ম্যানেজ করার ব্যাপারে আমি নেই।

—সেজন্যে তোমাকে তো কিছু করতে হবে না। যা করবার আমি করবো।

—দেখুন প্রশান্ত দা, আমার অনেক রকম বদভ্যাস আছে, অস্বীকার করি না, কিন্তু চুরিটা এখনো শুরু করিনি, তা সে নিজে হাতেই হোক, অন্যের হাত দিয়েই হোক।

প্রশান্ত টাকাটা পাশে রেখে একটা সিগারেট ধরালেন। কৌচের পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে বারকয়েক ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আমার কথাটা তুমি কিভাবে নেবে, জানি না। হয়তো মনে করবে, বাপের বিরুদ্ধে ছেলেকে উত্তেজিত করছি। তবু বলবো, নিজের যেটা হক পাওনা, সেখানে অভিমান করে হাত গুটিয়ে বসে থাকার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। ওটা মহত্ত্ব নয়, দুর্বলতা।

শুভেন্দুর তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল, এষাও ঠিক এই ধরনের কথাই বলেছিল কাল। বিনা প্রতিবাদে নিজের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দেবে কেন? কিন্তু বাবার সামনে গিয়ে ঝগড়া বিরোধ করতে তার প্রবৃত্তি হয় না। তাছাড়া আর যে কী করা যেতে পারে সে জানে না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রশান্তই কথা তুললেন, আমি কি জন্যে এসেছি, মানে আসতে বাধ্য হয়েছি, তা যদি শোনো, বুঝবে, ব্যাপারটা ঐখানেই থেমে নেই। তোমাকে পুরোপুরি ডিস-ইনহেরিট, অর্থাৎ সোজা কথায় যাকে বলে ত্যাজ্য পুত্তুর না করা পর্যন্ত উনি স্থির হতে পারছেন না। সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র
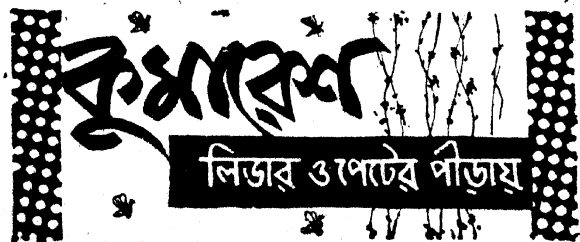
মালিক হবে ও'র ছোট ছেলে। কিন্তু ও'র অবর্তমানে তুমি পাছে গণ্ডগোল বাধাও, তাই আটঘাট বেঁধেই আমরা এগোচ্ছি। অ্যাটর্নির সঙ্গে সেই সব নিয়ে আলোচনা করতেই আমার আসা।

'ছোট ছেলে'—এই ছোট্ট কথাটা উল্লেখ মাত্র শুভেন্দুর চোখ দুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। এই অপোগণ্ড ছেলেটাকে উপলক্ষ্য করে অনেকদিন অনেক অপমান তাকে সইতে হয়েছে। জ্ঞান হবার আগে থাকতেই তার মা তাকে বুঝতে দিয়েছিল, সেই যেন বংশের একমাত্র বংশধর, শুভেন্দু কেউ নয়। সেই দিনটির কথা শুভেন্দু কোনোদিন ভুলবে না। কতটুকুন ছেলে তখন দিব্যেন্দু! সবে কথা বলতে শিখেছে, কিন্তু সেগুলো কথা নয়, এক একটি বোমা। জানালার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, শুভেন্দু বলেছিল, 'আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'না; তুমি আমাকে মেরে ফেলবে।' তার বছর দুই পড়ে, ঐ ছেলেই তাকে ঘরে ঢুকতে নিষেধ করেছিল। দুপুরের কাছাকাছি। কলকাতা থেকে সবে গিয়ে পৌঁছেছে। সিঁড়ির মুখে ও কি করছিল। দাদাকে ঢুকতে দেখেই বলে উঠল, 'বাবা বাড়ি নেই।' শুভেন্দু প্রথমটায় একটু অবাক হল। পরক্ষণেই 'জানি' বলে হাসতে হাসতে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই দিব্যেন্দু গম্ভীরভাবে বলল, ঘরে যেও না।

—কেন?

—বাঃ, তুমি যে মুরগী খাও। আমাদের সব ছোঁয়া যাবে।

—থাক, তোকে আর পাকামো করতে হবে না, বলে হেসে ফেলেছিল শুভেন্দু। কিন্তু এর পিছনে যে মনোভাব তাকে ঠিক হেসে উড়িয়ে দিতে পারেনি। ও যে তোতা-পাখির মত শেখানো বুলি আউড়ে যাচ্ছে, জেনেও ঐ অতি আদুরে, অকালপক্ক, শুধু দেহে নয়, মনের দিক দিয়েও ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গুপ্রায় ছেলেটার উপর একটা বিরূপ ভাবই মনে মনে গড়ে উঠেছিল। ওর মায়ের সম্বন্ধে তার সমস্ত অন্তর-জোড়া যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বৈরিতা, তারই খানিকটা আপনা হতেই ছেলের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। সেইগুলোই আজ আবার নতুন করে জ্বলে উঠল। মনে হল, এ শুধু পিতার আক্রোশ নয়, চিরশত্রু সৎমার ছেলের প্রতিহিংসা: পিতৃ-সম্পত্তি থেকে বহিষ্কার নয়, তার চেয়েও বেশী অক্ষম দুর্বল, নাবালক বৈমাত্র ভাইয়ের হাতে তার চরম পরাজয়।

সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে প্রশান্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন। এবার আর একটু এগিয়ে গেলেন। পোড়া টুকরোটা ছাইদানির মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, তোমাকে এখনি মনস্থির করতে বলছি না। তবে যা বললাম, ভেবে দেখো। আর আমাকে যদি বিশ্বাস কর, হিতৈষী বলে মনে কর, তাহলে—

—কিন্তু আমি কী করতে পারি? কী করতে বলেন আমাকে? কথার মাঝখানে একটু অসহিষ্ণু সুরে বলে উঠল শুভেন্দু।

—ও'র ঐ হুমকিটাকে স্রেফ অগ্রাহ্য করে এই বাড়িতেই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে পার, আর যে টাকা তুমি এতবচ্ছর থেকে নিয়মিত পেয়ে আসছ তার ওপর দাবী জানিয়ে সোজা উকিলের চিঠি পাঠাতে পার।

—বেশ পাঠালাম, আর তিনি সেটা ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ফেলে দিলেন। তাঁর টাকা; তিনি যখন খুশি বন্ধ করতে পারেন।

—না; তা পারেন না। তার জন্যে উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে।

—তার দিক থেকে কারণ তো একটা আছেই।

—কোনটা? তোমার বিয়ে? সে কারণ আইনে টিঁকবে না। ভালো কথা, বৌমা কোথায়? সেদিন হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল। অবিশ্যি, তখন তিনি তোমার হলেও আমাদের হননি।

—বেশ তো, আজ 'আপনাদের' হিসেবেই আলাপ করবেন। ওপরে চলুন।

—না, এখন আর ওপরে নয়, ফিরে এসে হবে। ওকে বলো, শুধু মুখের আলাপে চলবে না, ঐ সঙ্গে ও'র হাতের দু'একখানা স্পেশাল রান্না—

বলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন এবং ব্যাগটা তুলে নিয়ে পা বাড়িয়ে চোখের ইঙ্গিতে কৌচের পাশটা দেখিয়ে বললেন, টাকাটা তুলে রাখো।

—না, প্রশান্তদা, অনুনয়ের সুরে বলল শুভেন্দু, এভাবে ওটা নিতে চাই না।

—বুঝেছি, লড়ে নিতে চাও? দ্যাটস্ রাইট।

নোটগুলো তুলে নিয়ে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন।

চার

রানীগঞ্জের বাড়ির একতলার আফিস ঘরে বসে সোমনাথ কাগজপত্র দেখছিলেন, কিন্তু সেদিকে ঠিক মন দিতে পারছিলেন না। মাঝে মাঝে খোলা ফাইল থেকে চোখ দুটো কখন অজান্তে সরে গিয়ে ডান পাশের খোলা জানালা দিয়ে চলে যাচ্ছিল দূরে ঐ মাঠের প্রান্তে। সেখানেও দেখছিলেন না কিছুই।

কিছুক্ষণ আগে ডাক্তার ধর এসেছিলেন। দিব্যেন্দুকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে যে কটি কথা বলে গেছেন, তার থেকে, গুরুতর কিছু যে আসন্ন, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

ঘন ঘন জ্বরজারি যেগুলো হত, সে সব খানিকটা কমেছে, কিন্তু দেহের শীর্ণতা তেমনি রয়ে গেছে। হাত পাগুলো বরং আরো শুকনো বলে মনে হয়। কে জানে একদিন একেবারেই পঙ্গু হয়ে যাবে কিনা? জীবনের কোনো আশঙ্কা নেই, একথা অবশ্য উনি বরাবরই বলে আসছেন। কিন্তু কিছুদিন থেকে বিশেষ করে আজ যে আশঙ্কার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন, সেও এক ধরনের মৃত্যু। বয়স বাড়ছে, দেহের বাড় নেই, সেই সঙ্গে মনও পিছিয়ে পড়ে আছে। বোধশক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেনি। বাইরের চেহারায় কিছু কিছু বয়ঃসন্ধির লক্ষণ দেখা দিলেও ভিতরটা এখনো শিশু স্তরে রয়ে গেছে। এর কোনো কারণ খুঁজে পাননি ডাক্তার ধর। ভয় হচ্ছে বুদ্ধি-বৃত্তির এই জড়তাটা স্থায়ী হয়ে না দাঁড়ায়।

এই আশঙ্কাটাই সোমনাথকে আজ বারংবার আনমনা করে দিচ্ছিল। প্রয়োজনমত চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হবে না, ডাক্তারের মুখে এ ভরসা পেলেও আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না। এই ছেলে যে একদিন উপযুক্ত হয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে, এতটা আশা করবার মত জোর আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

যোগ্য ছেলের পিতৃত্ব থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। কিন্তু সে থেকেও নেই। বিদ্যার প্রাচুর্য না থাকলেও সব দিকেই সে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবার শক্তি রাখে। তবু দূরেই রয়ে গেল। তিনিও যে তাকে কাছে টানবার বিশেষ কোন চেষ্টা করেছেন, তা নয়। তার মতি-গতি লক্ষ্য করেই হয়তো করেননি। তাছাড়া, সে যেন ঠিক সংসারের অঙ্গ নয়, দূরের মানুষ, এই রকম ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে

পড়েছিলেন। নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে, বয়সের দিকে তাকিয়ে ইদানীং উল্টো দিকের চিন্তাটাও মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছিল। বড় খোকাকে এবার যেমন করে হোক গৃহমুখী করতে হবে। সেদিকের প্রথম ধাপ একটি বিয়ে। তারই খোঁজ খবর শুরু করে-ছিলেন। এমন সময় ঠিক ঐখানটিতেই সব চেয়ে বড় আঘাত এসে পড়ল। চির-দিনের সেই ক্ষীণ সূত্র, যাকে তিনি সবে নতুন করে বাঁধবার আয়োজন করছিলেন, এক নিমেষে ছিঁড়ে দুখানা হয়ে গেল। ছেলে তাঁর মত না নিয়ে নিজের পছন্দ মত পাত্রী ঘরে আনতে চায়—ব্যাপারটা যদি শুধু এই হত, দেশকালের হালচাল ও তাঁদের ভিতরকার শিথিল সম্পর্ক বিবেচনা করে হয়তো একদিন তিনি মনে মনে মেনে নিতে পারতেন। কিন্তু ঐ আপিসে বসে কাগজ-সই করা বিয়ে, তার উপরে একটা সিনেমা অ্যাকট্রেস!

'বাবুসাব'। সোমনাথ চমকে উঠলেন। পুখী দারোয়ান সেলাম করে জানাল, একটি জেনানা আদমী ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—জেনানা আদমী! বিস্ময় প্রকাশ করলেন সোমনাথ।

—জী, হাঁ। কলকাত্তা সে আয়া বোলতা হায়।

—আচ্ছা নিয়ে এসো।

দারোয়ান চলে যাচ্ছিল; ডেকে ফিরিয়ে বললেন, না, এখানে নয়। বাইরের ঘরে নিয়ে বসাও।

মিনিট কয়েক পরে সোমনাথ ড্রইং রুমে ঢুকে দেখলেন ওদিকের জানালায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। ওঁর সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে এগিয়ে এসে প্রণাম করল। সোমনাথ বাধা দিলেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সংকুচিত হয়ে উঠলেন। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে ওর আনত মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তোমাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারছি না।

মেয়েটি মুখ না তুলেই মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি আপনার মেয়ে।' ক্ষণিক বিরতির পর যোগ করল, 'আমার নাম এষা।'

সোমনাথ হঠাৎ চমকে উঠলেন। নামটা আগেই শোনা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের পেশীগুলো কঠিন হয়ে উঠল। এদিক ওদিক চেয়ে কাকে যেন খুঁজলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, সে কোথায়?

—আমি একাই এসেছি, বাবা।

—ও-ও, তাঁর বুঝি প্রেস্টিজে বাধল, তাই নিজে না এসে বৌকে পাঠিয়ে দিলেন।

সহসা বেরিয়ে-আসা এই ব্যঙ্গোক্তির পেছনে যে উত্তাপ ছিল, তাকেও চেপে রাখতে পারলেন না। মুখের রেখায় ফুটে উঠল। এষা এক পলক শ্বশুরের দিকে চোখ তুলে তেমনি নতমুখেই বলল, আমি এখানে এসেছি, তিনি জানেন না। কাউকে না জানিয়েই আমাকে আসতে হয়েছে।

সোমনাথ বিস্মিত হলেন, সে কি! কেন?

—'সে কথা বলবো বলেই আমি আপনার কাছে এসেছি—দাঁড়িয়ে থাকতে আপনার কষ্ট হচ্ছে, বাবা। আপনি বসুন।—বক্তব্য প্রসঙ্গের মাঝখানেই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল।

সোমনাথের শরীর সুস্থ নয়। তার উপরে এই আকস্মিক উত্তেজনার বেগ সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সত্যিই কষ্টকর হচ্ছিল। সামনেই যে শোফাটা ছিল, তার উপর বসে পড়লেন। এষা তাঁর মুখের ভাব লক্ষ্য করে উদ্বেগের সুরে বলল, এখন থাক! আপনি বিশ্রাম করুন! আমি বরং—

—'না, না, তুমি বল,' একটু জোরের সঙ্গেই বেরিয়ে এল কথাটা।

এষা কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে কুণ্ঠার সুরে বলল, নিতান্ত নির্লজ্জের মতই আপনার সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। তবু না বলে আমার উপায় নেই, বাবা। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।...আমার জন্যে আপনার ছেলেকে আপনি ত্যাগ করবেন, আগে যদি জানতাম, এ বিয়েতে আমি কখনো রাজী হতাম না।. এবার যখন জেনেছি, আপনাদের দুজনের মাঝখানে আর দাঁড়াতে চাই না। আমি চলে যাবো, স্থির করেছি।

সোমনাথের দৃষ্টি ছিল মেঝের উপর। হঠাৎ যেন তড়িৎ-স্পর্শে চমকে উঠলেন। মুখ তুলে বললেন, চলে যাবে! কোথায়?

—যেখানেই হোক, একটা আশ্রয় খুঁজে নেবো। নিতান্ত বাধ্য হয়ে, আর কোনো উপায় না দেখে, যে-পথে একদিন নামতে হয়েছিল, সেইখানেই হয়তো ফিরে যেতে হবে।

সোমনাথ জানালার বাইরে চেয়ে নিঃশব্দে বসে রইলেন। এষা একটুখানি থেমে আবার বলল, আপনি হয়তো ভাবছেন, এই কথাগুলো শোনাতেই বুঝি এসেছি আপনার কাছে। না, বাবা। একটি মাত্র ভিক্ষা চাইব বলে এসেছিলাম। আপনার ছেলেকে আপনি কাছে টেনে নিন। তাকে জানতে দিন, সে আপনার ছেলে। আপনি জানেন না, বাবা, সে বড় দুঃখী, বড় অসহায়। তার সব চেয়ে বড় অপরাধ যাকে নিয়ে, সে তো চিরদিনের তরে চলে যাচ্ছে। তার পরেও কি আপনার ছেলেকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন না?

বলতে বলতে চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি আঁচলে মুছে নিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করে বলল, এবার আমি যাচ্ছি, বাবা।

'দাঁড়াও' বলে উঠে দাঁড়ালেন সোমনাথ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন ওর মুখের দিকে। শেষের দিকের সেই অশ্রু জড়িত কথা কটির মধ্যে যেন শুনতে পেলেন কোন্ বহু দূরাগত বিস্মৃত প্রায় সুরের রেশ।

স্বপ্নের ঘোরে মানুষ যেমন করে চলে, তেমনি আচ্ছন্নের মত কয়েক পা এগিয়ে পুত্রবধূর আরো কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন, 'তোমাকে যেন কোথায়'—পরক্ষণেই মাথা নেড়ে নিজেকে সংশোধন করলেন, 'না, না; তোমাকে নয়। আচ্ছা, তোমার দাদা-মশায়ের নামটা বলতে পার?

শ্বশুরের এই আকস্মিক ভাবান্তরের কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে এষাও অনেকখানি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, ঈশ্বর দ্বিজপদ চক্রবর্তী।

—বিভা! বিভার মেয়ে। আশ্চর্য!—আপন মনে আওড়ালেন কথাগুলো। লুপ্ত স্মৃতিকে ফিরে পাবার যে আনন্দ, তারই আভায় চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেইদিকে চেয়ে এষা সাগ্রহে প্রশ্ন করল, আমার মাকে আপনি চেনেন?

সোমনাথ সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, তোমার দাদামশায়ের বাড়িতেই আমি মানুষ। বি এ পরীক্ষার মুখে সেই যে চলে এসেছিলাম, আর যাওয়া হয়নি। তোমার মা তখন তোমার মত; না, তোমার চেয়ে কিছু ছোট্ট হবে। বিয়ে হয়নি। সে কি আজকের কথা!

একটুখানি থেমে যেন সেই দিনগুলোর মধ্যে ফিরে গিয়ে বললেন, 'কাকাবাবু আমাকে ভোলেননি। বিয়েতে যাবার জন্যে অনেক করে লিখেছিলেন। আমি আর গিয়ে উঠতে পারিনি।' দরজার দিকে ফিরে ডাকলেন, শশী।

একজন ঝি ছুটে এসে বলল, আমাকে ডাকছেন, বাবা?

—তোমাদের বৌদিদিমণি। বড় খোকার বৌ। ওপরে নিয়ে সব দেখিয়ে টেখিয়ে দাও। এষার দিকে ফিরে বললেন, তুমি যাও, মা। ওপরে গিয়ে চান টান কর। আমি বাকী কাজটুকু সেরেই আসছি।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আবার গিয়ে বসলেন আপিস-কামরায় ফেলে আসা কাগজপত্রের মধ্যে, কিন্তু কোনো কাজেই মন দিতে পারলেন না। এইমাত্র পুত্রবধূকে যা বলে এলেন, সোমনাথ দত্তের সেদিনকার জীবনের সেটা অতি সামান্য অংশ। বাকী যেটুকু, যা বলতে পারেননি, কাউকে যা বলা যায় না; তারই মধ্যে ধীরে ধীরে নিবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

বিভার বাবা দ্বিজপদ চক্রবর্তী জজকোর্টের বড় উকিল ছিলেন। শেষ জীবনে সোমনাথের বাবা তাঁর সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ করতেন। অবসর নেবার পর ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন পুরনো মনিবের কাছে, যদি একটু আশ্রয় এবং দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান হয়, দুটো বছর পড়ে বি এ পরীক্ষাটা দিতে পারে। সেইবারই নিজেদের মহকুমা সহরের ছোট কলেজ থেকে ফার্স্ট ডিভিসনে আই এ পাশ করেছিলেন সোমনাথ। দ্বিজপদ খুশী হয়ে নিজের বাসাতেই তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, এবং অনুগত মুহুরীর বিনয়ী, মেধাবী ও পরিশ্রমী ছেলেটিকে আশ্রিত হিসাবে কখনো দেখেননি। তাঁর স্ত্রীও তাকে আপন জনের স্নেহ ও অধিকার দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

বিভা তখন কৈশোর ছাড়িয়ে সবে যৌবনের তোরণে এসে দাঁড়িয়েছে। বইখাতা হাতে করে পড়া বুঝিয়ে নিতে আসত। সেটা যে ছল বুঝতে অনেকদিন লেগেছিল সোমনাথের। ভীরু, নম্র শান্ত স্বভাবের মেয়ে। বুদ্ধিটাও তীক্ষ্ণ নয়। একটা অঙ্ক একবার দুবার তিনবার বোঝালেও বুঝতে পারত না। সোমনাথ ভাল ছেলে ছিলেন। এই সামান্য জিনিসটা কেন যে ওর মাথায় ঢুকছে না, ভেবে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠতেন। কখনো কখনো রূঢ় কথা বেরিয়ে যেত। ব্যস, আর যায় কোথায়! মেয়ের দু চোখ ছাপিয়ে টস্ টস্ করে ঝরে পড়ত বড় বড় জলের ফোঁটা। সোমনাথ বিপন্ন বোধ করতেন। কী করে ওকে শান্ত করবেন ভেবে পেতেন না। দুরন্ত ইচ্ছা হত নিজের হাতে চোখ দুটো মুছিয়ে দেন। কিছুতেই হাত বাড়াতে পারতেন না। ভয় হত, কি জানি কী করে বসে। হয়তো বলে বসবে, তুমি আমাকে অপমান করেছ, এখুনি বলে দেবো বাবাকে। কিন্তু ঐ মেয়ে যে সেই মধুর 'অপমানটুকুর' জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে, সে খবর উনি কেমন করে জানবেন?

তারপর একদিন জানতে পারলেন। কিন্তু কী লাভ হল জেনে? এতদিন শুধু নিজের দুঃখ নিয়ে নিজের মনে গুমরে সারা হচ্ছিলেন। এবার আরেকজনের বেদনার ভার বুকের উপর চেপে বসল। বিভাকে তিনি চেয়েছিলেন। সে শুধু মনে মনে। বুঝেছিলেন সে অপ্রাপনীয়া। তাই মুখ ফুটে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে কখনো প্রকাশ করেননি। নিজের সীমা রেখা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। হৃদয়ের প্লাবনধারাকে সংযমের বাঁধ ভেঙে এগিয়ে যেতে দেননি। কিন্তু বিভা অবুঝ, সে দুর্বল। সে তার অন্তরের কথাকে অন্তরেই বিলীন করে দিতে পারেনি। যাকে চায় তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এসেছিল ও'র কাছে। ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া সোমনাথের আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু ও যে বড় কোমল, বড় সহজে ভেঙে পড়ে। এই প্রত্যাখ্যানের রূঢ় আঘাত হয়তো সইতে পারবে না। তারপর কী করবে কে জানে? এইসব চিন্তা ও'কে প্রতিদিন দগ্ধ করেছে, তবু বলতে পারেননি, বিভা, তুমি আর এসো না। আমরা যখন দুজন দুজনের মন জানি, তার সঙ্গে এও জানি আমাদের এ চাওয়া কোনোদিন সার্থক হবে না, তখন মিথ্যার উপরে গড়া আমাদের এই গোপন সম্পর্ক যত শীঘ্র ভেঙে যায় ততই মঙ্গল। এসব কথা অনেকদিন মনে মনে আউড়ে রেখেছিল, কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হলেই বিভা যখন এসে বসত তার সামনে, আনত মুখের দিকে চেয়ে এর কোনোটাই আর বলতে পারতেন না।

তারপর একদিন কাউকে কোনো কারণ না দেখিয়ে বিভাদের আশ্রয় থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিলেন সোমনাথ। হঠাৎ মনে হল, অনাত্মীয় আশ্রিতের সীমানা তিনি অন্যায়ভাবে লঙ্ঘন করেছেন। আশ্রয়দাতা গৃহস্থের স্নেহ ও বিশ্বাসের সম্মান রাখতে পারেননি। তাঁদের কাছে তিনি অপরাধী। এখানে থাকবার তাঁর আর অধিকার নেই। তখন বি এ পরীক্ষার কয়েক মাস মাত্র বাকী। দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ। যদি না

বিভা! বিভার মেয়ে! আশ্চর্য—

পারেন একটি বহু-ভার পীড়িত দরিদ্র পরিবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। সেই ভয়াবহ সম্ভাবনাও তাকে নিরস্ত করতে পারেনি।

চলে যাবার আগেরদিন বিভাকে শুধু একটি কথা বলেছিলেন, কাল আমি চলে যাচ্ছি। বিভা জানতে চায়নি, কেন। কোনো কথাই বলতে পারেনি। শুধু তার দুচোখ ভরা ছিল জল আর কণ্ঠে অশ্রুর অবরোধ। সেই দৃশ্যটা বোধহয় সুপ্ত হয়ে ছিল সোমনাথের অবচেতন মনের কোন গভীর গুহায়। এতদিন পরে এই মেয়েটির দিকে চেয়ে হঠাৎ জেগে উঠল।

বিভাবতী চক্রবর্তীকে সেদিন সমস্ত অন্তর দিয়ে কামনা করেছিলেন সোমনাথ দত্ত। কিন্তু অন্তরের বাইরে তার প্রকাশ ঘটতে দেননি। শুধু যে অসম্ভব বলে, অর্থাৎ নিজের বাপমায়ের এবং সস্ত্রীক দ্বিজপদবাবুর প্রবল আপত্তির আশঙ্কা করেই অগ্রসর হননি, তা নয়। তাঁর নিজের বিশ্বাসও পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। এ মিলনে সুখ আছে, কিন্তু কল্যাণ নেই। তার জন্যে সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন। হয়তো বিভাও শেষ পর্যন্ত সে কথা বুঝতে পেরেছিল। আজ এই ভেবে বিস্মিত হলেন সোমনাথ—সেদিন যে বাধা তাঁদের কাছে অলঙ্ঘ্য বলে মনে হয়েছিল, তাঁরা বেঁচে থাকতেই তাঁদের ছেলে ও মেয়ে মিলে তাকে কত অনায়াসে ডিঙিয়ে চলে গেল!

কালের কি বিচিত্র গতি! ঘটনাচক্রের কি বিস্ময়কর বিবর্তন।

দোতলায় উঠে ঝিয়ের নির্দেশ মত বাঁ দিকে মোড় ফিরতেই, পেছনে ঐ দিকের একটা কোন ঘর থেকে একটা তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কিশোর কণ্ঠ এষার কানে এসে লাগল—খাবো না। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, বলছি?' সংগে সংগে শানের উপর কাঁচ ভাঙার শব্দ। এষার বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে শশী বলল, ছোট খোকা। ঐ রকম করে রোজ। পেট থেকে পড়েই অসুখ তো। ভুগে ভুগে মাথাটাও ঠিক নেই।

'চলতো দেখি' এষা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝি মাথা নেড়ে বলল, সব্বনাশ! এখন সামনে গেলে কি আর রক্ষে আছে? হাতের কাছে যা পাবে, তাই ছুঁড়ে মারবে।

এষা মৃদু হেসে বলল, তা হোক। ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দেবে, চল।

ঘরের একদিকে শোবার খাট। আরেক দিকে খাবার টেবিল। তার পাশে একখানা গদি আঁটা চেয়ারে গুম হয়ে বসেছিল দিবোন্দু। শীর্ণ শরীরের উপর মস্ত বড় একটা মাথা। শুকনো ফ্যাকাসে মুখ, তার প্রায় সবখানি জুড়ে জ্বল জ্বল করছে দুটো টানা টানা চোখ। চেহারায় মনে হবে তের চৌদ্দ বছরের বেশী নয়, কিন্তু ঠোঁটের নীচে কালো গোঁফের রেখা। সামনের টেবিলে যেন এইমাত্র প্রলয় ঘটে গেছে। ভাত ডাল, তরকারী দুধ মাছ সব একাকার। তার কিছু অংশ মেঝেতেও ছড়িয়ে গেছে। বেশ খানিকটা দূরে একজন ঠাকুর গোছের লোক সন্ত্রস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে, প্রাণটা নিয়ে পালাতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে সে অত্যন্ত সন্দিহান।

এষা ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল। শুধু বিস্ময়ে নয়, কী একরকমের ভয়, তার সংগে মেশানো একটা বেদনা-বোধ। মানুষের দেহের এতখানি বিকৃত রূপ সে কখনো

দেখেনি। একটা ছোট ছেলে এই অবস্থায় এমন দাঁড়াতে পারে, এটা তার কল্পনার বাইরে। শুভেন্দু তো এসব কিছুই বলেনি। তাচ্ছিল্যের সুরে শুধু বলেছিল, তার একটা বৈমাত্র ভাই আছে, খুব রোগা। কথার ভাবে মনে হয়েছে, এর উপরে সে খুশী নয়, চোখে মুখে কেমন একটা চাপা বিদ্বেষ। সেটা কি করে সম্ভব, এষা সত্যিই বুঝতে পারে না। একে দেখলে, একবার ঐ মুখের দিকে তাকালে শুধু একটি কথাই মনে আসে,—আহা! বেচারা!

এষা ঘরে ঢুকতেই দিব্যেন্দু এক দৃষ্টে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। শশীরও মনে হল মুহূর্তকাল আগের সেই মারমুখী ভাবটা যেন কেটে গেছে। সাহসে ভর করে এগিয়ে এসে বলল, তোমার নতুন বৌদি। কোলকাতায় যে দাদা আছে, তার বৌ।

'যাঃ', ফিক করে হেসে ফেলল দিব্যেন্দু।

—সত্যি; জোর দিয়ে বলল শশী।

—ঘোমটা কই? আমি বুঝি বৌ দেখিনি? কালই তো যাচ্ছিল ঐ রাস্তা দিয়ে বাজনা বাজিয়ে।

শশী হেসে উঠল। এষাকে বুঝিয়ে দিল, এখানকার সাধারণ লোকেরা বিয়ের পর রাস্তা দিয়ে যেসব মিছিল নিয়ে যায়, সেখানে বরের পাশে বৌকে ঘোমটা দিয়ে বসতে হয়। তারই কথা বলছে দিবু। এষার ভারী আমোদ লাগল। আঁচলটা মাথার উপর তুলে দিয়ে বলল, তাইতো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। এবার হয়েছে?

—হয়নি। ঐটুকু বুঝি?

—ও, আচ্ছা, এবার? ঘোমটাটা গলা পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে বলল এষা, 'পছন্দ হয়েছে তো'?

দিবু কথা বলল না, মুখ দেখে মনে হল, লজ্জা পেয়েছে, তেমনি খুশীও হয়েছে মনে মনে। শশীও অবাক হয়ে গেল। অনেকদিন এ বাড়িতে আছে, 'ছোট বাবুর' মুখে এমন একটা সজীব প্রফুল্ল ভাব সে যেন আজ নতুন দেখল।

এষা আরো কাছে সরে গিয়ে বলল, আমার এই কাপড়টা বিচ্ছিরি। দ্যাখ না, কত ছোট। তুমি যদি আমাকে একখানা মস্ত বড় শাড়ি কিনে দাও, এই এত্ত বড় একটা ঘোমটা দিয়ে বেড়াবো। রাস্তা দিয়ে যেসব বৌ যায়, ঠিক তাদের মত। দেবে কিনে?

—আমি যে দোকানে যেতে পারি না, অসহায়ভাবে বলল দিব্যেন্দু।

—আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। চট করে খেয়ে নাও, দিকিন। এখখুনি গাড়ি বার করতে বলছি।

খাবার কথায় দিব্যেন্দুর মুখের সেই কাঠিন্য আবার ফিরে এল। বলল, আমি খাবো না। আমার ইলিশ মাছ কই?

—তাই তো; ইলিশ মাছ দেয়নি বুঝি? কেন ঠাকুর?

কৃত্রিম রোষভরে কৈফিয়ত চাওয়ার ভঙ্গিতে ঠাকুরের দিকে তাকাতেই, সে কোণ থেকে একটুখানি এগিয়ে এসে হাত জোড় করে বলল, আজ্ঞে, ডাক্তারবাবু ইলিশ মাছ দিতে বারণ করেছেন।

দিব্যেন্দু চোখ পাকিয়ে বলল, ডাক্তার পাজি, ওকে আমি গুলী করবো।

—নিশ্চয়ই: তোমার বন্দুক আছে তো?

—আমার দাদার আছে।

—আমি এখখুনি তাকে লিখে দিচ্ছি, বন্দুকটা নিয়ে আসতে। তার আগে ভাত খেয়ে গায়ে জোর করে নিতে হবে তো। কী মাছ রেঁধেছ, ঠাকুর?

—আজ্ঞে রুই মাছ, মাগুর মাছ।

—শিগগির নিয়ে এসো; যাও। ওবেলা কিন্তু ছোটবাবুর ইলিশ মাছ চাই; বুঝলে?

—'আজ্ঞে', বলে ঠাকুর ছুটে বেরিয়ে গেল। এষার চোখের ইশারায় শশীও এসে তাড়াতাড়ি টেবিল সাফ করতে লেগে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে সোমনাথ যখন উপরে উঠে এলেন, তার আগেই দিব্যেন্দুর আরেক প্রস্থ নতুন ভাত তরকারী এসে গেছে, এবং পাশে বসে গল্প বলে বলে এষা দেওরকে খাওয়াতে ব্যস্ত। তিনি রোজকার মত ছেলের খাওয়া দাওয়ার খবর নিতে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন, এবং কয়েক মিনিট চোখ ফেরাতে পারলেন না। প্রতিদিন যা ঘটে থাকে, চেঁচামিচি, কান্নাকাটি, রোখ-নালিশের বিন্দুমাত্র শব্দ নেই। ছেলে শান্ত হয়ে বসে নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে, বাপকে দেখতেও পেল না। দরজার দিকে পিছন ফিরে ছিল বলে এষাও শ্বশুরের আগমন টের পেল না। সোমনাথ বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন। তারপর ধীরে ধীরে সরে গেলেন।

এষা সেইদিনই শুভেন্দুকে পত্রপাঠ চলে আসবার তাগিদ দিয়ে চিঠি রওনা করে দিল। শেষের দিকে লিখল, তোমাকে না জানিয়ে পালিয়ে এসেছি বলে রাগ করো না, লক্ষ্মীটি। তার জন্যে যে শাস্তি দেবে, মাথা পেতে নেবো। কেন বলিনি এলেই জানতে পারবে। আরো অনে-ক কিছু বলবার আছে। কাপড় জামা কিছু আনিনি। সব নিয়ে এসো। পথ চেয়ে থাকবো।

পরদিন সন্ধ্যার দিকে না হলেও তার পরের দিন সকালে কোনো গাড়িতে শুভেন্দু এসে পড়বে, এ বিষয়ে এষার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সমস্ত দিন গেল, সে এল না, তার বদলে রাত প্রায় আটটা নাগাদ এল টেলিগ্রাম। এষাকেই অবিলম্বে ফিরে যেতে বলেছে শুভেন্দু। শুধু এইটুকু, আর কোনো কথা নেই। শ্বশুর ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলেন, কিসের টেলিগ্রাম এবং শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। এষা সেটা লক্ষ্য করল এবং একটা মিথ্যা কথা বানিয়ে বলল, আসবার সময় শরীরটা একটু খারাপ দেখে এসেছিলাম।

—'ও, তাহলে তুমি কাল সকালের গাড়িতেই চলে যাও।'

একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, কে নিয়ে যাবে। প্রশান্ত নেই; ওর ছুটি ফুরোতে এখনো কদিন দেরি আছে। হরির সঙ্গে যেতে পারবে না?

এষা বলতে যাচ্ছিল, সে একাই যেতে পারবে, একাই তো এসেছে। সামলে নিল। সে আসা আর এই যাওয়ার মধ্যে অনেকখানি তফাৎ। বলল, কেন পারবো না? একজন কেউ থাকলেই হল সঙ্গে।

পাঁচ

টৌলিগ্রামের ঐ ছোট্ট দুটি কথার অন্তরালে নিশ্চয়ই অনেক কথা অনুক্ত ছিল, অনেক অভিযোগ ও অভিমানের পালা। তার জন্যে তৈরি হয়ে এবং উত্তরে কি বলবে সেই-গুলোই মনে মনে ঠিক করতে করতে এষা এসে পেঁৗছল তাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে। কিন্তু শুভেন্দুর ভাবগতিক দেখে তার বিস্ময়ের অবধি রইল না। কাউকে কিছু না বলে কয়ে স্বামীকে অতখানি উদ্বেগের মধ্যে ফেলে নতুন বিয়ের পর স্ত্রী হঠাৎ উধাও হয়ে গেল, সেটা যেন নিতান্তই একটা মামুলি ব্যাপার। অনুযোগ দূরে থাক, ও প্রসঙ্গে সামান্য কৌতূহলটুকুও শুভেন্দুর কথা বা আচরণে দেখা গেল না। এষা নিজে উপযাচক হয়েই ওখানকার অবস্থার একটা মোটামুটি বিবরণ স্বামীকে জানিয়ে দিল। সেখানেও কোনো সাড়া পেল না। সব ব্যাপারেই কেমন একটা নিস্পৃহ ভাব নিয়ে শুভেন্দু শুধু শুনে গেল, এই পর্যন্ত। তখন এষারই হল উল্টো অভিমান। কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শ্লেষ মিশিয়ে বলল, একা একা বেশ আরামেই ছিলে মনে হচ্ছে। এসে বোধহয় ভুল করলাম?

শুভেন্দু সিগারেট টানতে টানতে মৃদু হেসে বলল, নিজে থেকে তো আর আসনি। 'তার'এ বেঁধে আনতে হয়েছে।

—আনলে কেন?

—ও, সেটা তাহলে আমারই ভুল হয়েছে, বল?

তোমার তো এখন অন্যরকম পোজিশন। যে সে লোক নয়, দত্ত কুলবধূ।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু বরটি কোন্ কুলের শুনি?

—বোধহয় দৈত্য কুলের। তাই জন্মাবার পরেই দেখল দত্তকুলে তার জায়গা নেই।

—কে বললে, নেই? তাহলে এষা দত্ত জায়গা পেল কোথেকে? আগে ছেলে তারপরে তো বৌ।

শুভেন্দু সোজা হয়ে বসল। মুখে সে পরিহাসের ভাব, এবং কণ্ঠে সে হালকা সুর রইল না। বলল, ঐখানে তুমি ভুল করেছ, এষা। যদি কোনো জায়গা পেয়ে থাক, সেটা,—তোমার কাছে যা শুনলাম তার থেকেই বলছি,—শুভেন্দুর বৌ বলে নয়, বিভাবতী দেবীর মেয়ে বলে। যাক; দরকারী কথাটাই বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ আগে অফিস এসেছিল। তোমার মায়ের অসুখটা একটু বেড়েছে। তোমাকে যেতে বলে গেছে।

অসুখ বেড়েছে! উঠে পড়ে উদ্বেগের সুরে বলল এষা। তাহলে তো এখনই যেতে হয়।

—তাই বোধহয় ভাল।

এষা পা বাড়িয়েছিল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমিও চল না? দুজনে এক সঙ্গে যাই।

শুভেন্দু মুহূর্তকাল কি ভেবে নিয়ে বলল, এখন তুমি একাই বরং ঘুরে এসো। দ্যাখ, কি রকম আছেন। দরকার হলে, আমি কালটাল গিয়ে দেখে আসবো।

প্রশান্ত মনিবকে বলেছিলেন, দেশের বাড়িতে অসুখ বিসুখ বলে কদিনের ছুটি নিতে হচ্ছে, শুভেন্দুকে জানিয়েছিলেন কর্তার আদেশে কলকাতা এসেছেন উইলের খসড়া নিয়ে উকিলের সঙ্গে আলোচনা করতে। কোনোটাই ঠিক নয়। আসল উদ্দেশ্য ছিল, ও'র নিজের একটা গোপন প্ল্যান। বালিগঞ্জের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে তাঁরই খসড়াটা মনে মনে উলটে পালটে দেখছিলেন। শুভেন্দুকে ডাকেননি, যদিও তার কাছেই আসা। তার আগে কিছুক্ষণ একা থাকবার দরকার ছিল।

ছোট বড় সব মানুষের মনেই আকাঙ্ক্ষা বলে একটি বস্তু আছে। সেটি সর্বত্র উচ্চগামী। সকলেরই বাসনা, যেখানে আছি তার চেয়ে উপরে উঠবো। সংসারে 'অল্প লইয়া থাকি'র সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এই উচ্চাশা নামক বাষ্পে নিজেকে ফুলিয়ে নিয়ে সুতো-ছেঁড়া বেলুনের মত বেশীর ভাগ মানুষ শূন্যে উড়ে বেড়ায়, এখানে ওখানে ঠোক্কর খায়, তারপর কোথাও মুখ থুবড়ে পড়ে কিংবা হারিয়ে যায়। দুচারজন, যারা বুদ্ধিমান এবং ভাগ্যবান, একটা নির্দিষ্ট পথ আঁকড়ে ধরে উঠবার চেষ্টা করে এবং অনেক ক্ষেত্রে উঠেও যায়। প্রশান্ত ব্যানার্জি সেই পথের পথিক।

সোমনাথ দত্তের কোলিয়ারীর ভার নেবার পর থেকে তাঁর সংসারের বাইরের ও ভিতরের রূপটা যখন নজরে পড়ল, তখন থেকেই প্রশান্ত একটা মাত্র লক্ষ্য সামনে রেখে এগিয়ে চলেছেন—ভবিষ্যতে নামে না হলেও কার্যত এই সমস্ত সম্পত্তি তাকে আয়ত্ত করতে হবে। পিতাপুত্রের মধ্যে যে ব্যবধান আগে থেকেই রচিত হয়ে ছিল, তার পরিধিটা দিন দিন বাড়িয়ে যাওয়া, যে বিরোধ ছিল ধূমায়মান, তাকে ক্রমাগত ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে তোলা—এই ছিল তার কাজ। ওদিকে যে আর একটি বংশধর ক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, তার গতিবেগ যাতে বেড়ে যায়, সেদিকেও ম্যানেজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অভাব হয়নি। ডাক্তার ধর যেসব ব্যবস্থা দিয়ে যান, সেগুলো যেন যথাসম্ভব কাগজে কলমেই থাকে, যে ওষুধ খেতে বলেন, সেসব যেন গলায় না ঢুকে নর্দমায় পড়ে, এ সব বিষয়ে তিনি গোপনে গোপনে সক্রিয় ছিলেন। তার জন্যে তাকে পরলোকগত পিতার একটি মূল্যবান তত্ত্ব কাজে লাগাতে হয়েছিল—শত্রুতা করতে যে আসে, সে শত্রুবেশে আসে না, আসে বন্ধুর রূপ ধরে। প্রশান্ত উভয় তরফেই বন্ধুর রূপ ধরেছিলেন।

ইদানীং বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে বড় খোকা সম্বন্ধে কর্তার মনে কিঞ্চিৎ দুর্বলতার আভাস পেয়ে প্রশান্তের মনে খানিকটা দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ ঐ বিয়েটা এসে তার পথ অনেকখানি সুগম করে দিল। বিয়ের আগে থেকেই তার সম্ভাবনার গুজব শুনে অবধি তিনি ছেলেকে যেমন উৎসাহ দিয়েছেন, বাপকে তেমনি তাতিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। দুদিকেই কাজ হয়েছিল, এবং অস্ত্রটিকে সম্বল করে এবার তিনি ধীরে ধীরে পিতা-পুত্রের ভিতরকার বাকী সূত্রটুকু একেবারে দুখণ্ড করে দেবার আয়োজন করছিলেন।

শুভেন্দু নীচে এসে দেখল, প্রশান্ত এক মনে বসে ধোঁয়া ছাড়ছেন। বলল, কতক্ষণ এসেছেন? ডাকেননি তো? ওপরেও তো যেতে পারতেন।

প্রশান্ত এসব প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ধোঁয়ার ছোট ছোট কুণ্ডলীগুলোর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, কি ভাবছিলাম, জানো?

শুভেন্দু সামনের সোফাটায় এসে বসল।

প্রশান্ত বলে চললেন, ভাবছিলাম, অনেক-

দিন ঢের হল, আর কেন? এবার কর্তাকে সোজা গিয়ে বলবো, প্রশান্তকে বিদায় দিন। এর চেয়ে বরং আলুপটল বেচে খাবো। তবু যা অন্যায়, তার সংগে জড়িত থাকতে চাই না।

—অন্যায় কোনটাকে বলছেন?

—সবটাই অন্যায়। তেমনি আমিও উকিলকে বলে কয়ে একটা মস্ত বড় ফাঁক রেখে দিলাম। সমস্ত সম্পত্তি উনি ছোট ছেলেকে দিয়ে যাচ্ছেন। ব্যস ঐ পর্যন্ত। সেই ছেলের অবর্তমানে, তার যদি কোনো ওয়ারিস না থাকে, তখন কি হবে, উইলে তার উল্লেখ রইল না। তার মানে, অটোমেটিক্যালি বড় ছেলের হাতে ফিরে আসবে।

শুভেন্দু হেসে উঠল, এবং প্রশান্ত একটু অবাক হয়ে তাকাতেই বলল, কিন্তু সেই ফিরে আসার অপেক্ষায় বড় ছেলে তো আর অনন্তকাল বসে থাকতে পারবে না। মানুষের পরমায়ুর একটা সীমা আছে।

—'তা আছে' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন প্রশান্ত, 'তবে সেই সীমারেখাটা কার বেলায় কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, দেখাই যাক না।

—অর্থাৎ মৃত্যুটা একদম দৈবের হাত, এই সান্ত্বনা দিতে চান?

—দৈব কেন প্রয়োজন হলে মানুষের হাতও লাগানো যেতে পারে।

শুভেন্দুর মুখের হাসিটা দপ করে নিভে গেল। সন্দিগ্ধ বিস্ময়ের সুরে বলল, তার মানে?

প্রশান্ত কোন উত্তর না দিয়ে চোখের কোণ দিয়ে তার দিকে তাকালো। ঠোঁটে ও মুখের রেখায় দেখা দিল ক্রূর হাসির কুঞ্চন। পরক্ষণেই হঠাৎ এক লাফে উঠে পড়ে বললেন, যাকগে, এবার চলি। হ্যাঁ, তোমার উকিলের চিঠির বন্দোবস্ত করে এসেছি। আজ কিংবা কালই চলে যাবে।

শুভেন্দুর এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। বলল, থাকগে। ও সব করে দরকার নেই।

—সে কি! তার মানে, তুমি কিছুই চাও না? বাড়িঘর টাকা কড়ি—

—চাই বই কি? সবই চাই এবং ভীষণভাবে চাই। কিন্তু যে সম্পর্কের জোরে এগুলো পাওয়া যেত, তাই যখন নেই, তখন আর এ নিয়ে বৃথা হাংগাম করে কী লাভ? যত শিগগির পারি এ বাড়ি ছেড়ে দেবো, এই কথাই ও'কে বলবেন।

—বেশ, তাই বলবো, যদিও তোমার এই কথাগুলো আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না।

এই বলে বেরোবার উদ্যোগ করতেই শুভেন্দু বলল, এত বেলায় আবার কোথায় যাচ্ছেন? খেয়ে দেয়ে বেরোবেন।

—না, ভাই, আজকে আর এখানে খাচ্ছি না। ভাগনের ওখানে নেমন্তন্ন আছে। তারপর ওবেলা তো চলেই যাচ্ছি। বৌমা কোথায়? এখনো বুঝি ফেরেননি বাপের বাড়ি থেকে?

—ফিরে, আবার গেল।

—তোমার শাশুড়ী ঠাকরুন আছেন কেমন?

—তেমন ভালো বলে মনে হচ্ছে না।

—'তাই তো', বলে, মুখে একটু দুশ্চিন্তার ভাব ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করে প্রশান্ত ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেলেন।

রানীগঞ্জ পৌঁছবার পরদিন কর্তার সংগে গত কদিনের কতগুলো মুলতবী কাজ সম্বন্ধে দরকারী কথাবার্তা সেরে নিয়ে ম্যানেজার বললেন, বড় খোকার সংগে দেখা করে এলাম।

সোমনাথ বিশেষ কৌতূহল বা আগ্রহ দেখালেন না। সাধারণভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, কী বললে?

—গোড়াতে আমি শুধু একটু বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, হঠাৎ এই রকম একটা বিয়ে করে বাবার মনে কষ্ট দেওয়াটা ঠিক হয়নি। তার উত্তরে যা বললে—

এই পর্যন্ত এসেই থেমে গেলেন প্রশান্ত, কর্তার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলেন। সোমনাথ মৃদু হেসে বললেন, বিয়ে নিয়ে খুব বুঝি লেকচার ঝাড়লে একখানা? ফিরিংগী ইস্কুলে পড়ে ঐ সবই তো শিখেছে।

—আজ্ঞে না; সে সব কিছু বলল না। সম্পত্তি নিয়ে কথা তুলল।

—সম্পত্তি নিয়ে! বিস্মিত হলেন সোমনাথ।

—হ্যাঁ; এই সমস্ত বিষয়-আশয় টাকা কড়ি যদি সে না পায়, মামলা মোকদ্দমা করতেও পেছপা হবে না। এই রকমের অনেক আজেবাজে কথা। আপনার না শোনাই ভাল।

সোমনাথের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল, কিন্তু ম্যানেজার যা আশা করেছিলেন, সেখানে তেমন কোনো উত্তেজনার লক্ষণ দেখা গেল না। কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বললেন, এ মাসের টাকাটা কি পাঠিয়ে দিয়েছ?

—আজ্ঞে না; আপনি যখন নিষেধ করলেন—

—আজই পাঠিয়ে দাও। ঐ সংগে শ দুই টাকা বেশী পাঠিয়ো।

বলেই সোমনাথ উঠে পড়লেন। কয়েক পা গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, এক কাজ করো। টাকাটা বৌমার নামে পাঠাও।

—বৌমার নামে! আকাশ থেকে পড়লেন প্রশান্ত।

—হ্যাঁ; কদিন আগে এসেছিল এখানে। মেয়েটি বড় ভাল।

সোমনাথ চলে গেলেন। সাধু ভাষায় যাকে বলে মুখব্যাদান করে সেই দিকে চেয়ে রইলেন প্রশান্ত। তিনি জানতেন, শুভেন্দুই বলেছে তাকে, বৌ বাপের বাড়ি গেছে মায়ের সেবা করতে! আর, ভিতরে ভিতরে চলছে অন্য রকম খেলা। কিন্তু দমে যাবার পাত্র নন প্রশান্ত ব্যানার্জি। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে সেইখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। দুচোখের পিংগল তারায় আগুনের দীপ্তি ফুটে উঠল।

মায়ের অসুখ নিয়ে এষা বেশ খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়ল। দশটা বাজতে না বাজতেই অভি বেরিয়ে যায়। সে থাকলেই বা কি? মায়ের রোগশয্যায় ছেলে আর কতটুকু কাজে আসে? তখন দরকার মেয়ের। এষাকে তাই প্রায় সময়টা ওখানেই কাটাতে হয়। মাঝে মাঝে এ বাড়িতে না এলেও চলে না। শ্বশুরই বা কি ভাবছেন? বারবার করে যেতে বলে দিয়েছিলেন। শুভেন্দু যদি যেতে চায় ভাল, তা না হলে সে একাই যেন ফিরে যায়। কদিন থেকে আবার চলে আসবে। দিবুর জন্যেও
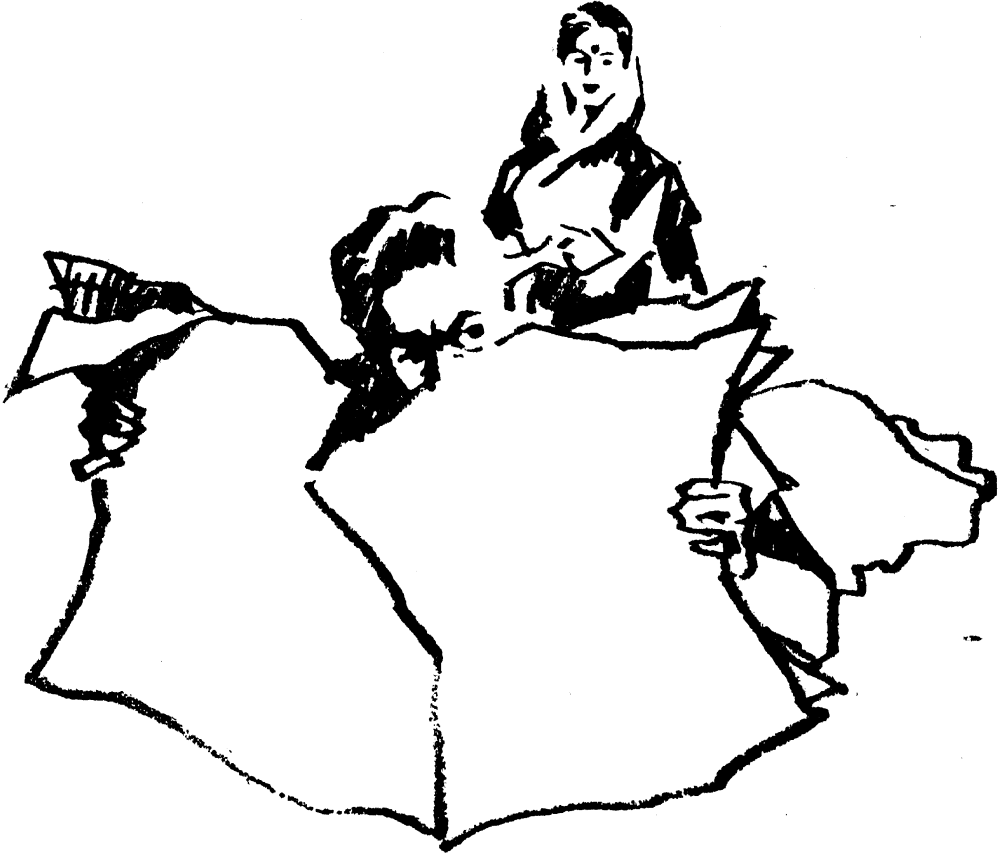
"তোমার কাছেই রাখ।"

মনটা বড় টানে। ছেলেটা একদিনেই কত নেওটা হয়ে পড়েছিল। হয়তো আবার খাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল করছে, কাপ প্লেট ভাঙছে। সময় মত ওষুধ পড়ছে না। ঝি চাকরে আর কত করবে? বিশেষ করে ঐ রকম জন্মরুগী।

দুপুরে বেলা খাওয়া দাওয়া সেরে মায়ের কাছে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে এষা ও ঘরে গিয়ে দেখল শুভেন্দু শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছে। এষা হাত-ব্যাগের ভিতর থেকে খানকয়েক নোট এগিয়ে ধরে বলল, টাকা কটা রাখো।

—কিসের টাকা?

—টাকা কিসের হয় জানো না? আগে ছিল রুপোর, এখন কাগজের।

—কাগজগুলো এল কোত্থেকে?

—এল রানীগঞ্জ থেকে। কেন, তোমার সামনেই তো মানি অর্ডারটা দিয়ে গেল সেদিন।

—সে তো তোমার।

কথাটা হঠাৎ ধক্ করে এষার বুকে গিয়ে লাগল। কিন্তু সে ভাব গোপন করে হালকা সুরেই বলল, বেশ, আমারই হল। তাড়াতাড়ি নাও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—তোমার কাছেই রাখো।

—আমার যা দরকার, তা না রেখে কি আর দিচ্ছি? এটা তোমার হাত খরচ।

—'দরকার নেই', সংক্ষেপে এইটুকু বলেই শুভেন্দু যেন কোনো একটা বিশেষ খবরে হঠাৎ মনোযোগী হয়ে পড়ল। এষা মনে মনে আহত হল এবং স্বামীর এই মনোভাবকে এই মুহূর্তে একটা ছেলেমানুষী অভিমান ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না। মুখ থেকে বেরিয়ে এল প্রত্যাঘাত—তার মানে, আমি হাতে করে দিচ্ছি বলে তুমি নেবে না?

শুভেন্দু এবার কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল। বলল, ভুল করছ। তোমার টাকা হলে নিশ্চয়ই নিতাম।

এষা বলতে যাচ্ছিল, তোমার বাবা যদি আমাকে পাঠিয়ে থাকেন, তার জন্যে কি আমি দায়ী? আমি তো তার কাছে ভিক্ষা চাইতে যাইনি। কিন্তু বলল না। চেষ্টা করে নিজেকে চেপে রাখল। বুঝল, তাতে শুধু তিক্ততা বাড়বে, আর কোনো লাভ হবে না। মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে দরজার দিকে পা বাড়াল। শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি আজ ফিরতে পারবে?

—বোধ হয় না। কেন?

—আমি সন্ধ্যা বেলা বেরোব। বাইরে যাচ্ছি; ফিরতে কদিন দেরি হবে।

—বাইরে যাচ্ছ! কোথায়?

—দার্জিলিংএর দিকে। সুটিং আছে।

এষা যেন নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না, এমনিভাবে চেয়ে রইল। অস্ফুট স্বরে অনেকটা যেন আপন মনে বলল, 'সেই নামলে শেষ পর্যন্ত!' এ তরফ থেকে কোনো জবাব এল না। তার জন্যে সে অপেক্ষাও করল না। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

রাতটা মায়ের কাছে কাটিয়ে আসবে, বেরোবার আগে মনে মনে এইটাই স্থির ছিল। সেই অনুসারে এদিকের সব ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। কিন্তু শুভেন্দু থাকবে না জেনে বাধ্য হয়েই এষাকে ফিরে আসতে হল। তাছাড়া মনটাও ভাল ছিল

না। বাপের সম্পর্কে শুভেন্দুর দিক থেকে ক্ষোভের কারণ যতই থাক, তার সাম্প্রতিক ব্যবহারগুলো যেন একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল। তার উপরে এষার সব অনুরোধ উপেক্ষা করে এই নতুন করে সিনেমায় যোগ দেওয়াটা তার সমস্ত মনটাকে ভেঙে দিয়েছিল।

বাড়ি পৌঁছতেই ঠাকুর জানাল, কিছুক্ষণ আগে বাবুর নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে। এষার মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। ঘরে না গিয়েই বলল, 'কই দেখি?' চিন্তার কথাই বটে। প্রশান্তবাবু জানাচ্ছেন, দিব্যেন্দুর অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়াতে তাকে অবিলম্বে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কাল বেলা সাড়ে বারোটার গাড়িতে ও'রা তাকে নিয়ে হাওড়ায় পৌঁছবেন, শুভেন্দু যেন স্টেশনে উপস্থিত থাকে।

কোথায় শুভেন্দু! সে সেই ছুটির সময় বাক্স বিছানা নিয়ে চলে গেছে। টেলিগ্রাম এসেছে তার দেড় ঘণ্টা পরে। এষা বড়ই ভাবনায় পড়ল। বাড়িতে টেলিফোন নেই। পাড়ায় কোনো কোনো বাড়িতে আছে। তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। এক পোস্টাপিসে গিয়ে করা যায়। তাই যেতে হল। মল্লিক স্টুডিয়োতে কাউকে পাওয়া গেল না। ক্রমাগত ফোন বেজে চলল, কেউ ধরল না। অগত্যা বাড়ি ফিরে ঠাকুর আর চাকরের সাহায্যে ঘর কখানা একটু গোছগাছ করে রাখবার চেষ্টা করল। দিব্যেন্দু যে ঘরে থাকবে, সেইটাকেই বিশেষ করে রুগীর থাকবার মত করে সাজিয়ে ফেলতে হল।

স্টেশনে না যাওয়াই স্থির করল এষা। সে না থাকলে এদিকটা কে সামলায়? ঠাকুরটা তেমন পাকা লোক নয়। রান্নাবান্নার সব ধকল একা পেরে উঠবে না। শ্বশুর আসছেন। তাছাড়া নতুন বৌএর পক্ষে এভাবে একা স্টেশনে যাওয়াটা তিনি বোধহয় পছন্দ করবেন না।

দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে এষার মুখে আর কথা সরল না। বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। কদিনের মধ্যে এই রকম একটা বিপর্যয় সে কল্পনাও করতে পারেনি। কোমর থেকে নীচের দিকটা একদম অচল। উর্ধাঙ্গও প্রায় তাই। ধরাধরি করে ট্যাক্সী থেকে নামাতে হল, এবং প্রশান্ত পাঁজাকোলা করে উপরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। শোলার মত হালকা দেহ, মাংস বলতে কিছু নেই বললেই হয়, হাড়ের উপর চামড়ার আবরণ। শুধু চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। এত কষ্টের মধ্যেও বৌদিকে দেখে মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এষা ছুটে গিয়ে পাশে বসে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সোমনাথ একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বড় খোকা বাড়ি নেই?

—কদিনের জন্যে একটু বাইরে গেছেন, নীচের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল এষা।

—তোমাকে একা রেখে!

এষা কোনো জবাব দিল না। প্রশান্ত বললেন, এই সময়েই তার বাইরে যাবার দরকার পড়ল? কবে গেছে?

—'কাল সন্ধ্যাবেলা', ও'র দিকে না তাকিয়েই বলল এষা। তার সঙ্গে যোগ করল, টেলিগ্রাম এসেছে তার পরে।

বিকালের দিকে ডাক্তার ধরও এসে পড়লেন। এখানকার চিকিৎসার ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। কিছুক্ষণ পরে সেই উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন সন্ধ্যার পর। বললেন, দুএকজন স্পেশালিস্টের সঙ্গে আলোচনা করলাম। আমি যা সন্দেহ করছি, ও'রাও তাই বলেন। পোলিও-মাইলিটিস্ বলেই মনে হচ্ছে। কাল থেকে ইনভেসটিগেশন শুরু হবে। তারপর ট্রিটমেন্ট। বেশ কিছু সময় লাগবে। রোগটি তো সোজা নয়।

সোমনাথ বললেন, আমার তো থাকবার উপায় নেই। কাল সকালেই চলে যেতে হবে। আপনি দুদিন থেকে সব বন্দোবস্ত করে তারপর ফিরবেন।

—এখানে আর কে থাকছে? জানতে চাইলেন ডাক্তার ধর।

যে ঘরে বসে আলোচনা হচ্ছিল, তার বাইরে দরজার আড়ালে এষা দাঁড়িয়ে ছিল। সোমনাথ সে দিকে তাকিয়ে বললেন, থাকবার মধ্যে রইল আমার বৌমা। আপনি তাকে এখনো দেখেননি। বৌমা, ভেতরে এস। ডাক্তারবাবুকে প্রণাম কর। শুধু ডাক্তার নন, আমাদের নিতান্ত আপনজন।

এষা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তার বললেন, রুগী যে কদিন বাড়িতে আছে, বুঝলে, সব সময়ে তার ওপর নজর রাখতে হবে। এছাড়া খাওয়ানো দাওয়ানো, ওর মেজাজ বুঝে চলা, যতটা সম্ভব ওকে খুশী রাখবার চেষ্টা করা।

সোমনাথ বললেন, সেটা ওর মত কেউ পারবে না। সে দিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত।

ডাক্তার বললেন, ব্যস, তাহলে আর কী? কিন্তু একজন পুরুষ মানুষও তো চাই। শুভেন্দু কই? তাকে তো দেখছি না।

সোমনাথ সে প্রশ্নটা এড়িয়ে ফিরে বললেন, প্রশান্তও রইল।

—কিন্তু ওদিকে আবার স্ট্রাইক ফ্রাইক চলছে। আপনি একা সামলাতে পারবেন তো?

—পারতেই হবে।

প্রশান্ত যেন ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, এমনভাবে বললেন, পারতে গিয়ে যা স্ট্রেন হবে, সেটা সইতে পারলে হয়। এদিকেও শুভেন্দু এখন কদিনে ফেরে—

—তিন চারদিনের মধ্যেই ফিরবেন, বলে গেছেন, তাড়াতাড়ি বলে ফেলল এষা। ডাক্তার ধর ম্যানেজারের দিকে চেয়ে বললেন, ব্যস। তারপরেই আপনি যেতে পারবেন।

সোমনাথ তখন উঠে পড়েছেন। চোখের ইঙ্গিতে সেই শূন্য আসনটা দেখিয়ে চাপা গলায় বললেন ডাক্তার ধর, ও'র রোগটাও সুবিধের নয়। উদ্বেগ, উত্তেজনা যত কম হয়। সব সময়ে সেদিকেই আমাদের নজর রাখতে হবে।

পরদিন সকালে যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে সোমনাথ বাইরের বারান্দায় বসে পুত্রবধূর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। ট্যাক্সী এসেছে খবর পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এষা ঘরের ভিতর থেকে চাদর ও লাঠিখানা এনে হাতে ধরিয়ে দিল এবং গলায় আঁচল জড়িয়ে মাটিতে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল। এসো মা, বলে সোমনাথ ওর কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে বললেন, সেদিন বলছিলে তুমি আমার মেয়ে। মেয়ে নও, তুমি আমার ছেলে। সে হতভাগার ওপর আমি কোনোদিন ভরসা করিনি, আজও করি না। তোমার ওপরেই নির্ভর। ঐ আধমরা ছেলেটাকে তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম।

বলতে বলতে বৃদ্ধের গলাটা ধরে এল। আর কিছু না বলে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলেন। এষাও কোনো কথা বলতে পারল না। চোখ মুছতে মুছতে তাঁর অনুসরণ করল।

পরের দিনটা সকাল থেকে সন্ধ্যা ডাক্তার ধরকে বাইরে বাইরেই কাটাতে হল। প্রশান্তকে থাকতে হল তাঁর সঙ্গে। নার্সিং হোম ঠিক করা, নার্সের ব্যবস্থা করা, ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং তার উপরে আনুষঙ্গিক আরো অনেক কিছু। সন্ধ্যার পর রুগীকে আরেকবার দেখে গেলেন। একই রকম আছে, নতুন কোনো উপসর্গ দেখা দেয়নি। ওখানকার চেয়ে একটু প্রফুল্লই বরং দেখা গেল। ওর কপালের উপর হাত বুলিয়ে চুলটা সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, দিব্যবাবু দেখছি একদিনেই দিব্যি ভালো হয়ে গেছে। এবার তাহলে চল।

—কোথায়? ক্ষীণ কণ্ঠে জানতে চাইল দিব্যেন্দু।

—রানীগঞ্জে।

রোগী মাথা নাড়ল। এষা বসে ছিল তার ঠিক পাশটিতে। তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর শীর্ণ হাতখানা তুলে তার আঁচলের একটা কোণ চেপে ধরতে চেষ্টা করল। ঝি দাঁড়িয়েছিল পায়ের কাছে। হেসে বলল, বৌদিকে ছেড়ে ও যাবে না।

—বেশ তো, বৌদিকে নিয়েই চল। হাসিমুখে বললেন ডাক্তার। দিবু এবারেও মাথা নাড়ল। ধর বললেন, না কেন?

—বৌদি আবার পালিয়ে চলে আসবে।

সকলেই হেসে উঠল। এষা ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, না, না; আমি আর পালাবো না। আচ্ছা; তুমি এখানেই থাক, আমার কাছে। আর কোথাও যেতে হবে না।

ডাক্তার বাইরে এলে এষা সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে বলল, কাল দুপুরে বেলা ওকে ঘুম টুম পাড়িয়ে আমি কয়েকঘণ্টার জন্যে আমার মাকে একটু দেখে আসতে পারি? বড্ড অসুখ যাচ্ছে কিছুদিন থেকে।

—তা পার বৈ কি?

—হঠাৎ কোনো বিপদের ভয় নেই তো?

'মনে তো হয় না', একটু দ্বিধা জড়িত সুরে বললেন ডাক্তার। 'এসব রোগের বেলায় প্রধান ভয় হল, হঠাৎ নিঃশ্বাসের কষ্ট দেখা দিতে পারে। তবে এই স্টেজে বোধহয় তেমন কোনো আশঙ্কা নেই। তাছাড়া প্রশান্তবাবু তো রইলেন।

এষা কুণ্ঠার সুরে বলল, ভাবছি, নতুন জায়গা। ঘুম থেকে উঠে আমাকে না দেখে যদি চেঁচামেচি শুরু করে, উনি কি আর সামলাতে পারবেন?

—তা বটে। শশী কোথায়? ওর সেই পুরনো ঝি?

—'সে আসেনি। কয়েকদিনের জন্য দেশে গেছে। শশী থাকলে তেমন ভাবনা ছিল না। এই নতুন ঝিটা কাজের আছে, তবে এখনো ঠিক ওর মেজাজ বুঝে চলতে শেখেনি।

—'সে ব্যাপারটা তো সোজা নয়', বলে হাসলেন ডাক্তার, সময় লাগবে।' যাই হোক, তুমি ঘুরে এসো। প্রশান্তবাবুকে একটু নজর রাখতে বলে যেও।

—সে তো নিশ্চই। ও'র ভরসাতেই যাওয়া।

ডাক্তার ধর যে বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন, তা এত শীঘ্র ঘটতে পারে বলে অনুমান করেননি, হঠাৎ বেলা তিনটে নাগাদ তারই সূত্রপাত দেখা দিল। হাঁপ ধরছে হাঁপ ধরছে' বলে কঁকিয়ে উঠল দিব্যেন্দু। তার কিছুক্ষণ আগেই এষা বেরিয়ে গেছে। তখন ও ঘুমোচ্ছিল। সেই ফাঁকে ঝিও মেঝের উপর মাদুর পেতে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। রোগীর মুখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল। তীব্র যন্ত্রণার পেষণে মুখের পেশীগুলো দুমড়ে মুচড়ে এমন একটা আকার নিয়েছে যে ওকে আর চেনা যায় না। কথা বলবার শক্তি নেই। একটা বিকৃত আওয়াজ শুধু বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। একটা নিঃশ্বাস এক ফোঁটা হাওয়ার জন্যে সে কি আকুলি বিকুলি!

প্রশান্ত একতলায় তার নিজের ঘরে শুয়ে ছিলেন। ঝি ছুটে গিয়ে ডেকে তুলল, শিগগির আসুন, বাবু!

—কী হয়েছে?

—ছোটবাবু যেন কেমন করছে?

প্রশান্ত উপরে গিয়ে রোগীর দিকে এক পলক তাকিয়েই বেরিয়ে এলেন। ঝি বলল, কোথায় যাচ্ছেন?

—ডাক্তার নিয়ে আসছি। তুমি ওর কাছে বসে থাকো।

—বৌদিদিমণিকে একটা খবর দেওয়া যায় না?

—তাকে এখন কোথায় পাবো?...বলেই নীচে নেমে গেলেন।

এই গলিটা যেখানে আর একটা গলিতে গিয়ে মিশেছে, বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছাকাছি, তারই মোড়ের মাথায় একটা ছোট্ট ডিসপেন্সারি যেতে আসতে চোখে পড়ে। ডিসপেন্সারি বললে তাকে অতিরিক্ত গৌরব দেওয়া হয়। গোটা দুই আলমারী; সামনের কয়েকখানা কাঁচ নেই, ফাঁকগুলোর উপর খাকী রংএর কাগজ আঁটা। একটা পালিস উঠে যাওয়া ছোট টেবিলের পেছনে একখানা এবং সামনে খান দুই তেমনি বিবর্ণ চেয়ার। পেছনের চেয়ারে যে ডাক্তারটি বসেন, তার চেহারা এবং পোশাক অনেকটা তার আসবাবের মত, সেখানেও পালিস নেই। প্রশান্ত যতবার এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেছেন, সকালে বিকালে কিংবা সন্ধ্যায়, ভদ্রলোকটিকে ঠিক একইভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঠায় বসে থাকতে দেখেছেন। প্রতিবারই মনে হয়েছে, দুটি মাত্র শব্দ লেখা আছে ঐ চোখের উপর—হতাশাময় প্রতীক্ষা। সামনেকার চেয়ারে মাঝে মাঝে যে দুএকজন মানুষ চোখে পড়েছে, তারা যে রুগী বা রুগীর বাড়ির লোক নয়, নিছক নিষ্কর্মা আড্ডাধারী প্রতিবেশী, এটা বুঝতেও অসুবিধা হয়নি। এই মুহূর্তে তারই কথা হঠাৎ মনে পড়ল প্রশান্তের।

রোগ এবং রোগীর মোটামুটি বর্ণনা শুনে ডাক্তার তাঁর ব্যাগে গোটা কয়েক ওষুধ এবং ইনজেকশানের সরঞ্জাম ভরে নিয়ে বললেন, চলুন। সামান্য পথ; হেঁটেই এলেন দুজনে। দরজায় এসে প্রশান্ত কড়া নাড়তে যাবেন, ঠিক সেই সময়ে উল্টো দিক থেকে একখানা ট্যাক্সী এসে থামল। তার ভিতর থেকে লাফ দিয়ে নামল শুভেন্দু। তার দিকে চোখ পড়তেই প্রশান্তের মধ্যে একটা আকস্মিক ভাবান্তর দেখা দিল। এক মুহূর্ত আগেও যে চিন্তা ছিল তার চেতনার বাইরে, অন্ধকার কক্ষে

হঠাৎ জেবলে দেওয়া বিদ্যুৎ-শিখার মত সে তার সমস্ত মনের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল।

সেখানে যে বিষধর সাপটা ঘুমিয়ে ছিল, এবং ঘুমিয়েই থাকত, সহসা আবির্ভূত আগন্তুকের পায়ের শব্দে সে যেন আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল।

মানুষের জীবনে আকস্মিক'এর প্রভাব অপরিসীম। একটি অভাবিত ঘটনা কিংবা একটি অপ্রত্যাশিত মানুষ অনেক সময় নিমেষের মধ্যে তার রূপ বদলে দেয়, তার সমস্ত ধারাটাকে টেনে নিয়ে চালিয়ে দেয় অন্য খাতে। একটি কোনো বিশেষ ক্ষণ, আয়তনে যত ক্ষুদ্রই হোক, কী বিশাল পরিণাম বহন করে নিয়ে আসে কেউ বলতে পারে না। ঠিক এই মুহূর্তে শুভেন্দুর এই নাটকীয় আবির্ভাব যদি না ঘটত, তার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলো এভাবে লেখা হত না। সমস্ত দত্ত-পরিবারের গোটা ইতিহাসটাও সমূলে বদলে যেত।

প্রশান্তকে এক অদ্ভুত আবেশময় দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে শুভেন্দু অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার? চিনতে পারছেন না নাকি? ইনি কে?

প্রশান্ত গম্ভীরভাবে বললেন, ভেতরে এসো।

ডাক্তারকে বৈঠকখানায় বসিয়ে শুভেন্দুকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পাখাটা খুলে দিলেন। সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, বসো।

—এখানে কেন? ওপরে চলুন। এইগুলো এখ্খুনি না ছাড়লে আর চলছে না, বলে নিজের ঘর্মাক্ত অপরিচ্ছন্ন জামা কাপড়গুলো দেখিয়ে দিল।

'পাঁচ মিনিট বসো', ডান হাতের আঙুলগুলো তুলে ধরলেন প্রশান্ত, আমি এখনি আসছি। একটা জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে।' বলে, ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন।

প্রশান্তর পিছন পিছন দিব্যেন্দুর ঘরে ঢুকেই ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, অনেকদিনের পুরনো রুগী মনে হচ্ছে। দেখছে কে?

—এখানে এখনো কাউকে দেখানো হয়নি। মফস্বল থেকে সবে আনা হয়েছে। তারপর হঠাৎ এই অবস্থা।

ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে রোগীর কব্জিতে একবার হাত দিয়ে বললেন, একটা ইনজেকশন আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি। তারপর—

—'এদিকে একটু শুনুন', বলে, প্রশান্ত ডাক্তারকে বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন এবং রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বললেন, মর্ফিয়া দিচ্ছেন তো?

—হ্যাঁ;আপাতত তাই দিতে হবে।

—আপনার ফী কত?

হঠাৎ ফীএর কথায় ডাক্তার একটু বিস্মিত হলেন। চোখ তুলে বললেন, চার টাকা।

—শুনুন; চার দ্বিগুণে আট-শ টাকা আপনাকে এখ্নই পাইয়ে দেবো, যদি একটা ছোট্ট কাজ করে দিতে পারেন।

ডাক্তারের মুখের ভাব সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। বললেন, কী কাজ?

—বিশেষ কিছুই না, ঐ মর্ফিয়ার ডোজটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে।

—বলেন কি!

—আপনার কোনো রিস্ক নেই। ঐ তো অবস্থা রুগীর। যে কোনো মুহূর্তে বোধ-হয় হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া যে রকম কষ্ট পাচ্ছে—

—আপনি ওর কে হন?
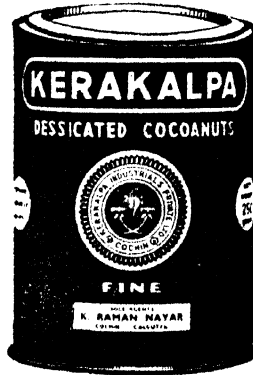
—আমি কেউ না, কর্মচারী মাত্র। প্রস্তাবটা এসেছে আমার মনিবের কাছ থেকে। ওর দাদা, নীচে যাকে দেখলেন।

—মাপ করবেন, আমি এ সবের মধ্যে নেই।

—আপনি ভুল করছেন, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ভাবতে লাগলেন। প্রশান্ত কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললেন, আচ্ছা, ঐ সঙ্গে আরো দুশ জুড়ে দিন। পুরোপুরি এক হাজার। চলুন।

—কিন্তু উনি তো কিছুই বলছেন না।

—ও, ও'র নিজের মুখে শুনতে চান। বেশ ক-মিনিট বসুন তাহলে।

শুভেন্দু বসে থেকে থেকে অধীর হয়ে উঠেছিল। খানিকটা উদ্বেগও ছিল, কী বলতে চায় ম্যানেজার। এ কদিনের পথকষ্ট, খাওয়া শোয়ার অনিয়ম এবং ঐ জাতীয় নানারকম ধকল সইতে না পেরে শরীরটা প্রায় বিকল হয়ে পড়েছিল। তার উপরে আজ এত বেলা পর্যন্ত পেটে প্রায় কিছুই পড়েনি, স্নানটাও হয়নি। মাথা দিয়ে যেন আগুন উঠছে। মনের অবস্থা আরো খারাপ। সিনেমা কোম্পানীর ব্যবহার ওর ভালো লাগেনি। প্রতিবাদ করতে গিয়ে খানিকটা অপমানও সইতে হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছে। এদিকে হাত একেবারে খালি। ধরবার মত চোখের সামনে কিছুই নেই।

উঠতে যাবে, এমন সময় প্রশান্ত ঝড়ের মত ঢুকলেন। কৈফিয়তের সুরে বললেন, ইস, তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।

—কোথায় গিয়েছিলেন?

—ওপরে, দিবুকে ডাক্তার দেখাতে।

—দিবু!

—হ্যাঁ; সেই কথা বলবো বলেই তো তোমাকে ধরে রেখেছি। দিবু এসেছে; মানে কর্তা ওকে নিজে এসে লোকজন সমেত বসিয়ে দিয়ে গেছেন, আইনের ভাষায় যাকে বলে দখল দেওয়া।

শুভেন্দুর বিস্ময়বিহ্বল চোখ দুটোর দিকে চেয়ে যোগ করলেন, আমাকে মাপ কর, ভাই। আমি হুকুমের চাকর, হুকুম তামিল করছি। বারবার বলে গেছেন, আসামাত্র যেন একথা তোমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এ বাড়িতে তোমার কোনো জায়গা নেই, টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি কোনোকিছুতে অধিকার নেই।

সহজ ভাষায়, সুস্পষ্ট কণ্ঠে কথাগুলো বলে গেলেন ম্যানেজার। কিন্তু শুভেন্দুর মাথার ভিতরটা যেন জমাট বেঁধে গেছে। এই মুহূর্তে যা শুনল, তার কোনোটারই অর্থবোধ হয়নি, এমনিভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, এক গেলাস জল দিতে বলুন। 'এই যে, জল এখানেই আছে' বলে এক লাফে উঠে

খেলা আলোকচিত্র : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

পড়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ওর হাতে দিলেন। এক নিঃশ্বাসে সবটুকু শেষ করে শুভেন্দু বলল, এরা আছে?

—না; বৌমাকেও চলে যেতে হয়েছে।

শুভেন্দুর চোখ দুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। সুর চড়িয়ে বলল, 'আমার অসাক্ষাতেই তাকে আপনারা তাড়িয়ে দিয়েছেন?' সঙ্গে সঙ্গে প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। প্রশান্ত তার কাঁধে হাত রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, বসো; উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই, ভাই। এখন কী করবে তাই ভাব।

শুভেন্দু যন্ত্রচালিতের মত সেই আসনেই বসে পড়ল। ভাববার মত শক্তি আর তখন ছিল না।

ভেঙে পড়লে চলবে না, শুভেন্দু, দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন, প্রশান্ত, আমাকে তুমি দাদা বলে ডাক, আমিও তোমাকে ছোট ভাইএর মত স্নেহ করি। সেই অধিকারে বলছি, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। কোথায় যাবে তুমি? কেন যাবে? আজ তুমি একা নও। তোমার স্ত্রী আছে, দুদিন পরে ছেলে মেয়ে হবে। এত বড় সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে তারা কেন বঞ্চিত হবে? তাদের কাছে কী কৈফিয়ত দেবে তুমি?

—কিন্তু কী করতে পারি, বলুন, ক্ষীণ, দুর্বল, হতাশার সুরে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল প্রশান্ত।

—পার, সব কিছু এক নিমেষে ফিরে পেতে পার। শুধু মনটাকে একটু শক্ত করতে হবে।

এই কটি কথার মধ্যে যেন একটা নতুন আশার আলো দেখতে পেল শুভেন্দু। সাগ্রহে তাকিয়ে কাছে সরে এসে ওর চোখে চোখ রেখে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, শোনো; দিব্যেন্দুর পেটে হঠাৎ একটা কী ব্যথা উঠেছে। ডাক্তার এসেছে; এখনি ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। আমরা যদি ইচ্ছা করি, সে ঘুম আর না ভাঙতেও পারে।

'কী বললেন!' শুভেন্দুর দেহে যেন বিদ্যুতের আঘাত লাগল।

'কেউ জানবে না,' ঝুঁকে পড়ে আরো চাপা গলায় বললেন প্রশান্ত।

শুধু তুমি, আমি আর ঐ ডাক্তার। ও'র

মুখ বন্ধ করবার ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।

শুভেন্দু অধীরভাবে ঘন ঘন মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল। এ চিন্তাও যে তার কাছে অসহ্য; শুধু অসহ্য নয়, অন্যায়, গর্হিত, পাপ।

—'ও, বুঝেছি; ভাইএর ওপরে মায়া হচ্ছে। ভাই!' তিক্তকণ্ঠে শ্লেষ ঢেলে বললেন প্রশান্ত। 'কিন্তু ভুলে যাচ্ছ শুভেন্দু, তুমি যাকে ভাই বলে দরদ দেখাচ্ছ, সে তোমাকে এতটুকু বয়স থেকে দিয়েছে শুধু ঘৃণা আর অপমান। তুমি হয়তো বলবে, সে ছেলেমানুষ। কিন্তু তার মা? সারাজীবন ধরে কী পেয়েছ তার কাছে? বাড়ি ঢুকতে গেলে সিঁড়ির মুখ থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, মনে নেই? তোমারই বাড়ি। তোমার বাবা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, অর ঘরে গিয়ে ঐ ছেলেকেই প্রাণ ভরে আদর দিয়েছেন। আজ শুধু আদর নয়, তারই হাতে তুলে দিলেন তাঁর সর্বস্ব।

ইচ্ছা করেই এমন একটা জায়গায় ঘা দিলেন প্রশান্ত, শুভেন্দুর অন্তরে যেটা সব চেয়ে দুর্বল স্থান। তার চোখ দুটো আবার জ্বলে উঠল। সারাজীবনের পুঞ্জীভূত লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার জ্বালা। প্রশান্তের তীক্ষ্ন দৃষ্টি সবই লক্ষ্য করল। অন্য সুরে গলাটাকে যথাসাধ্য করুণ করে বললেন, তোমার জন্যে দুঃখ হয়, শুভেন্দু। বুঝলে না, ভাই নয় ও তোমার চিরশত্রু। চিরদিন ওর কাছে তুমি হেরে গেছ। আজ এসেছে চরম হার। তোমাকে ভালবাসি বলেই বলছি, এ সুযোগ হারিও না।

বারান্দার ওদিকটায় জুতোর আওয়াজ কানে যেতেই প্রশান্ত বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, ডাক্তার নেমে এসে তাকেই বোধ-হয় খুঁজছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললেন, আসুন; এখখুনি যাচ্ছিলাম আপনার কাছে। মনিব বাথরুমে ছিলেন; এই বেরোলেন।

ডাক্তারকে দরজার সামনে নিয়ে গিয়ে শুভেন্দুকে উদ্দেশ করে বললেন, ডাক্তার-বাবু এসেছেন। ওঁকে দিয়েই তাহলে ইনজেকশনটা দেবার ব্যবস্থা করি?

শুভেন্দুর সমস্ত চেতনার মধ্যে তখন আগুন জ্বলছে। মুহূর্ত পূর্বে ম্যানেজারের কণ্ঠ থেকে উদ্গীর্ণ হয়েছে যে বিষ, তারই আগুন। এই সামান্য কটি কথা তার মধ্যে কোথায় যেন তলিয়ে গেল। সে যে শুনতে পায়নি, তা নয়। কিন্তু যে শুভবুদ্ধি এগিয়ে এসে বলবে, 'না' সে তখন আচ্ছন্ন!

প্রশান্ত আর অপেক্ষা করলেন না। ডাক্তারের বাহু ধরে একরকম টেনে নিয়ে চললেন দোতলার সিঁড়ির দিকে। যেতে যেতে বললেন, এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর বলে কেমন করে? হাজার হলেও ভাই তো, যদিও আপন নয়, বৈমাত্রেয়।

—বৈমাত্র ভাই? ব্যাপারটা যেন অনেক-খানি পরিষ্কার হল এমনি সুরে বললেন ডাক্তার।

—হ্যাঁ। সরে গেলেই সব কিছুর মালিক। বুঝতে পাচ্ছেন না?

আগুনের ধর্ম হল, একবার জ্বলে উঠলে আর বাইরে থেকে ক্রমাগত জ্বালিয়ে দেবার দরকার হয় না। সে আপনার বেগেই চলে। সামনে যা পায় তারই ভিতর থেকে সংগ্রহ করে তার দাহিকা শক্তি। শুভেন্দুর বুকের ভিতরে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন প্রশান্ত ব্যানার্জি, সেও ক্রমশঃ বেড়ে চলল, তার বিগত জীবনের দিনগুলোর মধ্যে সঞ্চিত হয়ে ছিল যত বিদ্বেষ, অবহেলা, বঞ্চনা ও অপমান, তাদেরই একটির পর একটি আশ্রয় করে ছড়িয়ে গেল বিক্ষুব্ধ অন্তরের প্রতিটি কোণে। তারপর এক সময়ে আপনা হতেই স্তিমিত হয়ে এল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চেতনা-প্রান্তে ফিরে এল প্রশান্তের সেই শেষ কথাগুলো। কোথা থেকে একটা বিদ্যুতের ছোঁড়া তার যেন হঠাৎ এসে পড়ল তার দেহের উপর। 'প্রশান্তদা' বলে অস্ফুট চিৎকার করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল।

কয়েক লাফে সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দায় পড়তেই দেখা গেল, ওদিকের কোণের ঘর থেকে ওঁরা বেরিয়ে আসছেন। আগে প্রশান্ত, পেছনে ব্যাগ হাতে ডাক্তার। প্রশান্ত একটু দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, হয়ে গেছে:: নীচে চল। শুভেন্দুর গলা থেকে শুধু একটা আঁৎকে ওঠার অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা গেল, আর কোনো কথা বেরোল না। পা দুটো ঐখানেই অচল হয়ে গেল। প্রশান্ত আর দাঁড়ালেন না। ডাক্তারকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন। বাইরের ঘরে তাকে অপেক্ষা করতে বলে নিজের ঘরে গিয়ে আলমারী খুললেন। সেইদিনই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা হয়েছিল। ছেলের চিকিৎসায় দরকার হবে বলে মোটা টাকার চেক সই করে ম্যানেজারের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন সোমনাথ। তার থেকে গুনে গুনে দশটা বাণ্ডিল বের করে এনে ডাক্তারের পাওনা মিটিয়ে দিলেন। ডাক্তার টাকাগুলো ব্যাগে পুরে ওঁর মুখের দিকে একবার তাকালেন। তারপর নমস্কারের ভঙ্গিতে ব্যাগ সমেত হাতটা তুলে একটু অতিরিক্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। প্রশান্ত দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

সিঁড়ির রেলিংটা আঁকড়ে ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর কোনোরকমে চলবার শক্তি ফিরে পেয়ে শুভেন্দু তার অস্নাত অভুক্ত ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে কোণের ঘরে গিয়ে পৌঁছল। পরদাটা সরিয়েই শিউরে উঠল। কে শুয়ে আছে? মানুষ না কঙ্কাল! অনেকদিন সে দিবুকে দেখেনি। শুনেছিল, দিন দিন আরো রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ জীবদ্দশায় এই অবস্থায় এসে পৌঁছতে পারে, কোনোদিন কল্পনা করতে পারেনি। বিছানার সঙ্গে মিশে যাওয়া ঐ বিবর্ণ নিশ্চল হাড়কখানার দিকে চেয়ে শুভেন্দু বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল। ঐ তার 'চিরশত্রু'! ওরই উপরে আজন্ম-লালিত দুরন্ত আক্রোশ মেটাতে গিয়ে সে ওকে জল্লাদের হাতে সঁপে দিয়েছে! শুধু কি আক্রোশ? তার পেছনে পৈশাচিক লোভ, সম্পত্তি-লিপ্সা। বুকের ভিতরটা তীব্র যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কাছেই যে চেয়ারটা ছিল তারই উপরে বসে পড়ল। হাতলের কনুই রেখে মাথাটা নামিয়ে দিল হাতের উপর।

ডাক্তারকে বিদায় করে প্রশান্ত নিজের ঘরে গিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। ভাবতে চেষ্টা করলেন, এর পরের পর্বটা কী। প্রথমে ডাক্তার ধর, তারপর পুলিশ। যাক না আরো কিছুক্ষণ। তার আগে একটু বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না। মিনিট কয়েক পরেই একটা অননুভূত অস্থিরতা তাকে ঠেলে তুলে দিল। গেঞ্জি আর ট্রাউজার পরা ছিল। তার উপরে একটা বুশসার্ট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। দরজা পর্যন্ত আসতেই বাইরে থেকে কড়া নড়ে উঠল। খুলেই দেখেন এষা। বুকের ভিতরটা হঠাৎ চমকে উঠল। কিসের একটা ভয় যেন বরফের স্রোতের মত নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। মুহূর্তমাত্র। তারপরেই নিজেকে সজোরে টেনে তুললেন। এষা মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে বলল, আপনি বেরোচ্ছেন নাকি? দিবু কেমন আছে? কান্নাকাটি করেনি তো?

—দিবুর অবস্থা ভালো নয়। তুমি তাড়াতাড়ি ওপরে যাও, বৌমা, আমি ডাক্তার ধরকে ডাকতে যাচ্ছি।

এষার কণ্ঠ থেকে শুধু একটা ভীতি-সূচক অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারল না। প্রশান্ত পা বাড়িয়েই আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, বড় খোকা এসেছে।

—'এসেছেন!' এতক্ষণে যেন বুকে বল ফিরে এল এষার।

—'এসেই কোত্থেকে একটা ডাক্তার ধরে এনে—ছেলেটার ওপর অনেককালের আক্রোশ তো—থাক; এ সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলতে চাই না। বলা উচিত নয়। তুমি ওপরে যাও। দেখি কি করা যায়।' বলে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

এষার মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল। পরক্ষণেই একটু দম নিয়ে ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে গেল। ঘরে ঢুকেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল রোগীর বিছানার উপর। গায়ে হাত দিতেই

সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। বরফের মত ঠাণ্ডা। কাঁধের কাছটা ধরে নাড়া দিয়ে ডাকতে লাগল, দিব্‌, দিব্‌, এই যে আমি এসেছি, ভাই।

এষাকে দেখে ঝি এসে দাঁড়িয়েছিল। বলল, ডাক্তারও সুই দিয়ে বেরোল, ছেলেও অমনি ন্যাতা হয়ে পড়ল। আর 'রা' করেনি।

শুভেন্দু তখন থেকে একইভাবে বসে ছিল। এষা আসতেই মুখ তুলল। সেই-দিকে চেয়ে এষার বুক ফেটে বেরিয়ে এল তীব্র আর্তনাদ—'এ তুমি কী করলে গো!' বলেই ভেঙে পড়ল দিব্যেন্দুর স্পন্দনহীন শীর্ণ দেহের উপর।

শুভেন্দু একবার চমকে উঠে তাকাল, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তেমনি আচ্ছন্নের মত নীচে নেমে গেল। সদর দরজার পাল্লা দুটো তখনো খোলা। হঠাৎ মনে হল সেটা যেন একটা নির্বাক ইঙ্গিত। কোনোদিকে না চেয়ে সেই খোলা দরজা দিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল, এবং উদ্দেশ্যহীন অশক্ত পা দুটোর উপরেই ছেড়ে দিল নিজেকে।

অনেক রাত্রে অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ যখন তাকে গ্রেপ্তার করল, বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা কোন্ অচেনা পার্কের ঝোপের পাশে আবছায়া অন্ধকারে সে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে ছিল। সেখানে কেন এসেছে, কোন্ পথ দিয়ে এসেছে, কী উদ্দেশ্যে,কোথায় যাচ্ছিল কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না।

ছয়

রাজসাহীতে বদলি হয়ে আসবার পর জেল-সুপার মলয় চৌধুরীর প্রথম সাপ্তাহিক রাউন্ড। সাধারণ কয়েদীর ব্যারাকগুলো দ্রুত শেষ করে 'ডিভিশন ওয়ার্ডে' গিয়ে ঢুকলেন। পাশাপাশি সেল। উঁচু ক্লাস, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের আস্তানা। নিজের নিজের দরজার সামনে টিকেট হাতে তারা দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা করিডোরের উপর দিয়ে সদল বলে এগিয়ে চলেছেন চৌধুরী। সবে এসেছেন। সকলের চোখেই কৌতূহল। আজই একরাশ নালিশ চাপিয়ে ভদ্রলোককে বিব্রত করবার ইচ্ছা কারো নেই। তার জন্যে তাড়া কিসের? তার আগে মানুষটাকে কিছুটা চিনে নেওয়া দরকার।

নির্বাধ গতিতে চলতে চলতে নিজেই এক জায়গায় থেমে পড়লেন চৌধুরী। সামনেই যে শীর্ণ দেহ কয়েদীটি একটু ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বললেন, শুভেন্দুবাবু না?

—'হ্যাঁ, স্যার', বিস্ময় ও আনন্দ মেশানো উত্তর। 'আমাকে এখনো মনে আছে আপনার!

—মনে থাকাটা এমন কিছু তাজ্জব ব্যাপার নয়, চিনতে পেরেছি, এইটাই আশ্চর্য। কী অসুখ করেছিল?

—অসুখ কিছু নয়, স্যার। এমনিই। দিন তো কম হল না, প্রায় পনর বছর। বুড়ো হয়ে গেছি!

—'তাই দেখছি' বলে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত আর একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন চৌধুরী। চুল প্রায় নেই বললেই চলে, চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, ভাঙা গালের পাশে নাকটা বেমানান ভাবে উদ্ধত, কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তামাটে রং, দু হাতে মোটা মোটা নীল শিরা।

মলয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল পনর বছর আগে দেখা সেই ঋজু, দীর্ঘ, গৌরতনু কান্তিমান, তরুণ শুভেন্দু, প্রথম দর্শনেই

করেছি, সে শুধু আমিই জানি। আজ এতকাল পরে আবার যখন আপনাকে পেলাম, সেই দয়া থেকে যেন বঞ্চিত না হই, এটুকু নিশ্চয়ই আশা করবো।

—না, না; এর ভেতরে দয়াটয়া কিছু নেই। ভাবছিলাম, এসব কথা জানতে চাওয়া মানে আপনাকে আবার নতুন করে দুঃখ দেওয়া। যাক, বলুন আপনি।

শুভেন্দু বলল, বাবার অফিসের একজন পুরনো কর্মচারী মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তিনিই বলে-ছিলেন, কথায় কথায়। টাকা পয়সা প্রায় সবটাই কোন্ কোন্ হাসপাতালে দিয়ে গেছেন। নিবুর নামে একটা ওয়ার্ড খোলা হয়েছে রাণীগঞ্জে। আমার নামে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে চেয়েছিলেন। সে কিছুতেই রাজী হয়নি। তাই একটা আজীবন মাসহারার ব্যবস্থা করে গেছেন। সেই সঙ্গে বালিগঞ্জের বাড়িটা।

—ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি কতদিন?

—অনেকদিন। আপনি বদলি হয়ে যাবার পর, আলিপুরে যদ্দিন ছিলাম, মাসে একবার করে আসতো। আমি বরং নিষেধ করে-ছিলাম। কী লাভ, বলুন। তারের জাল জানালার দুধারে দুজনে চুপ করে বসে থাকতাম। মিছিমিছি অন্য লোকের সময় নষ্ট করা। তারপর মেডিকাল অফিসারকে ধরে চোখের অজুহাতে চালান হয়ে গেলাম ঢাকা। সেও চলে গেল কলকাতা। সে কি আজকের কথা! এর মধ্যে চারটে বছর পোরা হয়ে গেল!

বলতে বলতে শেষের কথাগুলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। সামনের দেয়ালে একখানা পঞ্চম জর্জের ছবি ছিল। সেই দিকে চেয়ে তারই মধ্যে যেন নিবিষ্ট হয়ে ডুবে রইল অনেকক্ষণ। মলয়ও কোনো সাড়া শব্দ দিলেন না। একটা গোটা সিগারেট শেষ করে একটু কেশে নিয়ে বললেন, কোলকাতায় যাবেন?

শুভেন্দু হঠাৎ চমকে উঠল। তারপর ম্লান হেসে বলল, কী দরকার? এই বেশ আছি।

এরপর মাসখানেক মলয় কাজকর্ম নিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে রইলেন যে, আলাদাভাবে শুভেন্দুর কোনো খোঁজখবর নেবার ফুরসত হল না। সপ্তাহান্তে ওদের ওয়ার্ডে চক্কর দেবার সময় চলতে চলতে একবার দৃষ্টি দিয়েছেন, এই পর্যন্ত। তারপর একদিন সিনিয়র ডেপুটি জেলার এসে জানালেন, শুভেন্দু দত্ত বলে একজন 'ডিভিশন-টু প্রিজনার' ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। মলয় হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, এগারোটার পরে আসতে বলুন।

সুপারের নির্দেশে পাশের সেই চেয়ারটায় বসতে বসতে বলল, আপনার অনুগ্রহের ওপর আর এক দফা জুলুম করতে এলাম। মিনিট কয়েক সময় হবে তো?

মলয় সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, ওষুধপত্তর বুঝি একেবারেই খাচ্ছেন না?

—ওষুধ খেতে যাবো কোন দুঃখে? অসুখ বিসুখ তো আমার কিছু নেই। বেশ আছি।

—হুঁ; আচ্ছা বলুন, কী ব্যাপার?

শুভেন্দুর হাতে তার যে জেল-টিকেট-খানা ছিল, তারই একটা বিশেষ পাতা সুপারের সামনে খুলে দিয়ে বলল, এই কটা লাইন একটু পড়ে দেখতে হবে, স্যার।

দু বছর পরে তার খালাসের প্রস্তাব নতুন করে পাঠাবার যে সরকারী আদেশ, তারই একটা সংক্ষিপ্ত সার ওখানে টুকে রাখা হয়েছে। মলয় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, জানি; আপনার ফাইল আমি আগেই দেখেছি।

—দেখেছেন!

—সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরীতে নোট করেও রেখেছি। সময় হলেই, যা করবার করবো। আপনাকে কিছু বলতে হবে না।

—তা আমি জানি, স্যার। তবু একটা অন্যায় আব্দার করবো ভাবছিলাম।

বলে ইতস্ততঃ করতে লাগল। মলয়ের অনুমান করতে অসুবিধা হল না। পূর্ব-নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হবার আগেও অনেক সময় এসব কেস পুনর্বিবেচনার জন্যে সুপারিশ করা হয়। কখনো কখনো ফলও পাওয়া যায়। এভাবে যাদের আটকে দেওয়া হয়, সেসব কয়েদীর কাছ থেকে আবেদন নিবেদনের অন্ত থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের থামিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু শুভেন্দু দত্ত সে জাতের কয়েদী নয়। নিজের জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা দূরে থাক, যেটুকু ন্যায্য পাওনা, তাও দাবী করে না। তাছাড়া, খালাস সম্বন্ধে সে নির্বিকার। বেরোবার জন্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, হাবভাবে বা কথাবার্তায় কখনো মনে হয় না। এ বিষয়ে কেউ উল্লেখ করলে, মৃদু হেসে একটা কথাই শুধু বলে, এই বেশ আছি।

মলয় কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে?

—বাড়ি আর কোথায়, বলুন?

—কেন, চিরদিন যেখানে কাটিয়ে এলেন?

শুভেন্দু সে কথার কোনো জবাব দিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কেন জানি না, কিছুদিন থেকে মনটা বড় ছটফট করছে। কেমন আছে, একবার দেখতে ইচ্ছে করে। আর কদিনই বা বাঁচবো।

যুক্তির জোরে সরকারী আদেশের দুর পাল্লাকে টেনে কমিয়ে আনা যায়, তখন শুভেন্দুর মুখের ঐ শেষ কথাটাই যেন পথের ইঙ্গিত দিয়ে গেল। দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দীর এই দ্রুত-ক্ষীয়মান স্বাস্থ্য, তার সঙ্গে তার মানসিক অবসাদ—এই দ্বিমুখী অস্ত্র নিয়ে সরকারের বর্তমান সিদ্ধান্তকে উলটে দেবার চেষ্টা করলেন। সেক্রেটারিয়েটের উপর তলায় অভিজ্ঞ ও কৃতী অফিসার মলয় চৌধুরীর কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল। সেটাও পুরোপুরি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করলেন না।

মাস দুয়েকের মধ্যেই শুভেন্দুর খালাসের পরোয়ানা এসে গেল।

দিন দুই পরে, সেদিন যাদের মেয়াদ শেষ হল সেই সব কয়েদী, নিত্যকার রুটিন মত সুপারের অফিসে জড়ো হয়েছে। ডেপুটি বাবু একজন একজন করে নাম ডাকছেন, এবং লোকটা উঠে আসতেই, পয়সা ও পাশ দিয়ে বিদায় করছেন। বড় জমাদার যথারীতি হুঙ্কার দিচ্ছে, সেলাম করো। নিতান্তই মামুলি ব্যাপার। মলয় এ সময়টা বসে বসে অন্য কাজ করেন, সাধারণতঃ 'ডাক' দেখেন, কিংবা কোনো একটা ফাইল টেনে নিয়ে চোখ বুলিয়ে যান। আজ কী মনে করে এই বিচিত্রবেশী লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। সবাই যেন হঠাৎ বদলে গেছে, শুধু পোশাকে নয়, জেলের উর্দি ছেড়ে নিজেদের কাপড় চোপড়। মুখের চেহারায় ও চোখের দৃষ্টিতে। এরা আজ বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। অনেকেই দীর্ঘদিন পরে। চোখে মুখে আশা ও আশঙ্কার ছায়া।

দেখতে দেখতে সহসা শুভেন্দুর কথা মনে পড়ল। তার মুখে যেন শুধু আশাটাই ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে গভীর কৃতজ্ঞতা, যদিও শেষ মুহূর্তে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারেনি। বড় অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

খালাস পর্ব শেষ করেই ঘোরাঘুরির পালা। উঠতে যাবেন, এমন সময় জেলার একখানা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বলতে বলতে ঢুকলেন, শুভেন্দু দত্তের কাণ্ডটা দেখেছেন, স্যার?

—কাণ্ড!

—হ্যাঁ, এই দেখুন না?

কাগজের পাতাটা টেবিলের উপর মেলে ধরে একটি বিশেষ জায়গায় আঙুল রাখলেন জেলার বাবু। মলয় এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেলেন—

রানীগঞ্জের প্রসিদ্ধ কয়লা-ব্যবসায়ী ও কয়েকটি খনির মালিক পরলোকগত সোমনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শুভেন্দু দত্ত ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন দণ্ডকাল শেষ হইবার পূর্বেই তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রকাশ, জেল হইতে গৃহে ফিরিয়াই সে তাহাদের ভূতপূর্ব ম্যানেজার এবং পারিবারিক বন্ধু প্রশান্ত ব্যানার্জিকে বন্দুক লইয়া আক্রমণ করে। গুলী ফসকাইয়া যাওয়ায় ভাগ্যক্রমে প্রশান্তবাবু রক্ষা পাইয়াছেন। পুলিশ শুভেন্দুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ। পড়া শেষ হতেই জেলারবাবু হাতমুখ নেড়ে, চোখে বিজ্ঞ-জনোচিত ভাব ফুটিয়ে তুলে সাহেবের সামনে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন, একবার যে খুন করেছে, তাকে কোনোকালেই বিশ্বাস করা চলে না। জেলের মধ্যে ভিজে বেড়ালের মত থাকলেও, আসলে তারা যে
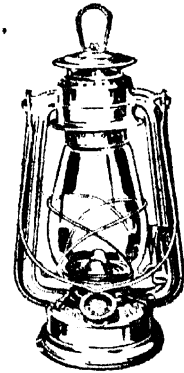
কী ভয়ংকর জীব তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ এই শুভেন্দু দত্ত।

আরো কি সব বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মনিবকে বেশ কিছুটা অমনোযোগী মনে হওয়ায় নিরস্ত হলেন। মলয় অন্যমনস্কভাবে কাগজখানা ভাঁজ করে জেলরবাবুর হাতে দিয়ে আচ্ছন্নের মত ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

আর একটা বিস্ময় যে তখন তাঁর টেবিলের উপরেই অপেক্ষা করছিল, কিছুমাত্র অনুমান করতে পারেননি। 'রাউন্ড' সেরে ফিরে এসে ডাক খুলতেই সেটা বেরিয়ে পড়ল। আলিপুরে জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তিন মাসের ছুটি নিয়েছেন, এবং ওখানকার চার্জ নেবার ভার পড়েছে চৌধুরীর উপর। সাময়িকভাবে এখানে তার জায়গায় কাজ করবেন স্থানীয় সিভিল সার্জন। সরকারী হুকুমনামায় তাঁকে অবিলম্বে রওনা দেবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

অনেকদিন আগে এই আলিপুরে এবং তারপর সেদিন রাজসাহীতে শুভেন্দুর সম্পর্কে মলয় যে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, বাইরে তার অংশ মাত্রও প্রকাশ পেল না। সাপ্তাহিক পরিক্রমায় চলতে চলতে অন্য কয়েদীকে যেমন দেখেন, ওকেও তেমনি চোখ বুলিয়ে দেখে গেলেন। কিন্তু সে দৃষ্টির মধ্যে কোনো পূর্ব পরিচয়ের ছায়াটুকুও ছিল না। অন্ততঃ শুভেন্দুর তাই মনে হল। এর চেয়ে বেশী কোনো প্রত্যাশা সে করেই বা কেমন করে? তবু একটিবার তাকে যেতে হবে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াতে হবে ওঁর চোখের সামনে। হাজার বন্দীর মধ্যে সেও একজন। সেই হিসাবে সে যাবে, এবং সেইভাবেই একটা লিখিত আবেদন পাঠিয়ে দিল সুপারের কাছে। বিশেষ প্রয়োজনে কয়েক মিনিটের জন্যে সে তাঁর দর্শন-প্রার্থী।

মলয় পরদিনই তাকে অফিসে ডেকে পাঠালেন, এবং টেবিলের ওপারে যখন সে এসে দাঁড়াল, নিস্পৃহভাবে চোখ তুললেন। শুভেন্দু বলল, নিজের আচরণের কৈফিয়ত দিতে আমি আসিনি, স্যার। শুধু আপনাকে যে আঘাত দিয়েছি, তার চেয়েও বেশী অপদস্থ করেছি সরকারের কাছে, সে দুঃখ কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ইচ্ছা করে করিনি এইটুকু মনে করে যদি পারেন আমাকে ক্ষমা করবেন। এর বেশী আমার আর কিছু বলবার নেই।

এই পর্যন্ত বলেই শুভেন্দু নত হয়ে নমস্কার করে চলে যাচ্ছিল। মলয় ডাকলেন, শুনুন। সে ফিরে দাঁড়াল।

—বসুন।

শুভেন্দু ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে পাশের একটা চেয়ারে বসল। মলয় তার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, কাগজে যা বেরিয়েছে, সত্যি?

—কাগজ তো আমি পড়িনি, স্যার।

—প্রশান্ত বাঁড়ুয্যেকে গুলী করে মারতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, স্যার।

মলয় আর কিছু না বলে হাতের পেন্সিলটা দিয়ে ব্লটিং প্যাডের উপর মৃদু আঘাত করতে লাগলেন। শুভেন্দু বলল, আপনি নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন!

মলয় তার হাতের দিকে দৃষ্টি রেখেই বললেন, এই গুলীটা যদি পনর বছর আগে মারতেন, একটুও আশ্চর্য হতাম না, বরং একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে করতাম। কিন্তু আজ—

বাকী অংশটা অসমাপ্ত রেখে ওর দিকে তাকালেন। শুভেন্দু যোগ করল, আজ এটা অস্বাভাবিক নয়, হাস্যকর। সে কথা আমিও বুঝি, স্যার। অথচ দেখুন, কী কাণ্ডটা করে ফেললাম।

কথাটা শেষ করল হাসি মুখে এবং হালকা সুরে। তারপরেই মুখের ভাবটা হঠাৎ কেমন বদলে গেল। গাম্ভীর্য ও গভীরতার স্পর্শ লাগল কণ্ঠস্বরে। বলল, বিশ্বাস করুন, মিস্টার চৌধুরী, ঐ রকম কোনো ইচ্ছা দূরে থাক, কল্পনাও আমার ছিল না। প্রবৃত্তিই হয়নি কোনোদিন। ঐ লোকটাকে মারতে যাচ্ছি, ভাবতেও কেমন গা ঘিনঘিন [illegible] অনুমতি করুন, আমি চলি। আপনার অনেক কাজ পড়ে আছে।

—এষা দেবীর সঙ্গে দেখা হল?

শুভেন্দু উঠে পড়েছিল, আবার বসল। ধীরে ধীরে বলল, হল। কিন্তু না হলেই বোধহয় ভাল ছিল।

—কেন! বিস্ময়ে চোখ তুললেন চৌধুরী।

—সে অনেক কথা, স্যার। শুনতে আপনার সময় হবে কি? তার চেয়ে বড় কথা, বোধহয় প্রবৃত্তি হবে না।

—সেটা আমি বুঝবো। আপনি বলুন না?

—তাহলে শুনুন। ভেবেছিলাম সব মানুষেরই স্নেহের এবং ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আপনার কাছে এলে—

—আহা, ভূমিকাটা না হয় পরে জুড়বেন। তার আগে আসল কথায় চলে আসুন।

শুভেন্দু আর কথা না বাড়িয়ে তার কাহিনী শুরু করল। কাহিনী বলা বোধহয় ঠিক হবে না। সময়ের মাপে ঘটনা অতি সামান্য, কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ। তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, যাকে আশ্রয় করে সে ঘটনা ঘটল, তার জীবনে এর শেষ লাইন বোধহয় কোথাও টানা হবে না।

শুভেন্দু বলল—

ট্রেন কিছুটা লেট ছিল। বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, বেলা প্রায় দশটা। সদর দরজা খোলা। ঢুকতেই একজন চাকর এগিয়ে এসে বেশ বড় বড় চোখ করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার চেহারাটা দেখে নিয়ে বলল, কাকে চাই?' বললাম, তোমার মা কোথায়?

—মা ওপরে।

আমি আর কোনো প্রশ্ন না করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। সে চেঁচিয়ে উঠল, কোথায় যাচ্ছেন? দাঁড়ান, মাকে আগে খবর দিই। আপনার নাম কি?

সে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, আমিও উঠে চলেছি। কী রকম ধারা মানুষ গো? বলতে বলতে সে তখন আমাকে পাশ কাটিয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল, মা, মা, দেখুন, কে একজন লোক আপনার নাম করে ওপরে উঠে আসছে। বারণ করছি, শুনছে না।

'কে?' বলে বেরিয়ে এল এষা। পরনে কালো পাড় দুধে-গরদ শাড়ি, কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। চেহারায় একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য তার বরাবরই ছিল, তার সঙ্গে মিশেছে পরিণত বয়সের গাম্ভীর্য। আমি তখনো সবগুলো সিঁড়ি শেষ করতে পারিনি। সেখানে দাঁড়িয়েই পলকহীন চোখ মেলে চেয়ে রইলাম। প্রথমটা সে বোধহয় চিনতে পারল না। চোখে মুখে একটা নাসের ভাব ফুটে উঠল। মাথার

বিকট চিৎকার করে—দরজার দিকে ছুটেছিল—

থেকেই আবার বলল, কে! তারপরেই এগিয়ে এল—তুমি!

বাকী ধাপকটা উঠতে উঠতে হেসে বললাম, হ্যাঁ, আমি। ভয় পেও না; পালিয়ে আসিনি।

—একটা খবরও তো কই—

—খবর দেবো কখন? হঠাৎ ছেড়ে দিলে।

—'এসো, ঘরে এসো', বলে এগিয়ে গেল সেই ঘরখানার দিকে, যেটা একদিন ছিল আমার, পরে হয়েছিল আমাদের, এখন বোধ-হয় কারো নয়। মস্ত বড় একটা তালা ঝুলছে দরজায়। এষা আঁচল থেকে চাবি নিয়ে তালাটা খুলতে খুলতে বলল, 'বংশী, যাতো, ঘরটা চট করে পরিষ্কার করে দে।' আমার দিকে ফিরে বলল, তুমি ততক্ষণ বারান্দায় একটু বসো।

চাকরটা এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মনিবের হুকুম পেয়ে বোধহয় ঝাঁটা আনতে ছুটল।

আমার নজর পড়ল, সিঁড়ির মুখে যে চওড়া জায়গাটা তার ঠিক সামনে দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরো সাইজের একখানা অয়েল পেইণ্টিং। আমার ভাই পড়ল, ঐরকম একটা ছোট ফটো একবার দেখেছিলাম রানীগঞ্জের বাড়িতে। বোধহয় সেই মডেল থেকে কোনো ভালো শিল্পীর হাতে আঁকা। সূক্ষ্ম কাজ করা চওড়া সোনালী ফ্রেম। তার চারদিকে ঘিরে শ্বেত-পদ্মের মালা। টাটকা ফুল। কিছুক্ষণ আগেই যত্ন করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এষা তখনো আমার ঘরের ভিতরে কী করছিল, দরজায় গিয়ে উঁকি দিলাম। জোড়া খাট সরে গেছে। তার বদলে আমার সেই পুরনো দিনের খাটখানা এক পাশে পড়ে আছে। বিছানা নেই। উলঙ্গ গদিটা বিবর্ণ। তার উপরে ধুলোর প্রলেপ। আর কোনো আসবাব নেই। দেয়ালের দিকে চোখ পড়তেই বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। আমার যে ছবিটা সেখানে টাঙানো ছিল তার গায়ে মাকড়সার জাল। একটা পেরেক খুলে গিয়ে ছবিটা কাৎ হয়ে পড়েছে। তার থেকে ঝুলছে এক টুকরো সুতো। ফস করে রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন মনে পড়ে গেল—মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে, রয়েছে ডোর। সে ডোরটাও ছেঁড়া।

এষা বেরিয়ে আসতে আসতে বলল, ওদিকের কোণের ঘর থেকে কিছুক্ষণ ধরে মন্ত্রপাঠ শোনা যাচ্ছিল। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘণ্টার আওয়াজ। জিজ্ঞেস করলাম, আজ কী পুজো?

—পুজো নয়', বলে একটু থামল এষা। করুণ দুটো চোখ তুলে দেয়ালের ছবিখানার দিকে তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, ছেলেটার জন্মদিন আজ। তাই কয়েক অধ্যায় গীতা পাঠের আয়োজন করেছি। সেই সঙ্গে নারায়ণকে দুটো ফুল দেওয়া হবে। চল না, দেখবে।'

—চল।

সেই ঘর, যেখানে শেষবারের মত শুয়েছিল দিব্যেন্দু। সেই খাট, যার ওপরে আমার স্ত্রীকে আছড়ে পড়তে দেখেছিলাম, শুনেছিলাম তার সেই চরম অভিযোগ। সেই দৃশ্যটা চোখের ওপর ভেসে উঠল। তীরের ফলার মত কানে এসে বিঁধল সেই কথাগুলো। হঠাৎ একটু চঞ্চল হয়ে পড়লাম। তারপরেই সামলে নিয়ে তাকালাম সামনের দিকে। খাট জোড়া পুরু গদি ধবধব করছে বিছানা বালিশ। তার ওপরে ছড়ানো একরাশ শাদা ফুল। মাঝখানে

ফ্রেমে বাঁধা একখানি মাঝারি সাইজের ফটো। দিব্যেন্দুর রোগশয্যার ছবি। চারদিকের দেয়ালে আরো কয়েকখানা তারই নানা বয়সের ফটোগ্রাফ। ওধারে মেঝের উপর পুজোর উপচার। ফলফুল নৈবেদ্যের ডালি। ধূপধুনো গুগগুলের গন্ধ। পাশে বসে পুরুত ঠাকুর গীতা পাঠ করছেন। এষা এগিয়ে গেল। নীচু হয়ে কাঠি দিয়ে প্রদীপের শিখাটা উসকে দিল। খানিকটা চন্দনের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল ধুনুচির মধ্যে। দেশলাই জেলে ধরিয়ে দিল আরো গোটা কয়েক ধূপকাঠি। তারপর বসে পড়ল এক পাশে। আমার মনে হল, খাটের ওপরে ঐ ছবি এবং তাকে ঘিরে এই যে শোকাচ্ছন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, তার মধ্যে সেও যেন এক হয়ে মিলে গেছে।

তার মুখের সেই শান্ত করুণ ছায়াটা যদি আপনার চোখে পড়ত, মিস্টার চৌধুরী আপনি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। কিন্তু আপনাকে বলতে বাধা নেই, সেদিকে চেয়ে আমার বুকের ভিতরটা জ্বালা করে উঠল। সইতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি দোর গোড়া থেকে সরে এলাম। এষা বোধহয় জানতেও পারল না।

আসতে আসতে খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরের ভিতরটা চোখে পড়ল। জানালার ধারে একখানা ছোট খাট। সাধারণ বিছানা। পাশে আলনায় কয়েকখানা শাড়ি। আরেক দিকে ছোট একটা টেবিল, তার পাশে চেয়ার। টেবিলের ওপরে যে বইগুলো সাজানো দেখলাম, চেহারা থেকে মনে হল ধর্মগ্রন্থ। বুঝতে অসুবিধে হল না, এটা ওর ঘর। তার পরেই যে বড় কামরাখানা এক সময়ে ছিল আমার পড়বার ঘর এবং পরে ওর ড্রেসিংরুম, তার মধ্যে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ালাম। আলমারী, ড্রেসিং টেবিল এবং আর যেসব আসবাব ছিল, কিছুই নেই। সবটা জুড়ে সুন্দর করে সাজানো দিব্যেন্দুর নানা জাতীয় জিনিস। তার কাপড় জামা জুতো মোজা, যে টেবিলে বসে সে খেত, যেটাতে পড়ত, যে খেলনাগুলো ছিল তার সব চেয়ে প্রিয়। একটি ছোটখাট মিউজিয়াম।

সেখানে তাকাই শুধু দিব্যেন্দু। ঐ একটা ছোট্ট মানুষ সবদিক জুড়ে আছে। বুকের ভিতরকার সেই জ্বালাটা যেন আরো বেড়ে গেল। ফিরে এসে দক্ষিণের বারান্দায় আমার সেই পুরনো চেয়ারটায় বসে পড়লাম।

মিস্টার চৌধুরী, সেই মুহূর্তে যে কথাগুলো আমার মনে হয়েছিল, জানি সে অতি ছোট মনের পরিচয়, কিন্তু চেষ্টা করেও সেগুলোকে দাবিয়ে রাখতে পারিনি। মনে হয়েছিল প্রশান্ত ব্যানার্জি'র অনেক দিন আগেকার একটা কথা—'শোনো শুভেন্দু, ঐ পঙ্গু ছেলেটার কাছে তুমি চিরদিন হেরে এসেছ। এইবার আসছে চরম হার।' প্রশান্ত মিথ্যা কথা বলেছিল। চরম হার তখন হয়নি হল আজ। বেঁচে থেকে আর কতটুকু শত্রুতা করেছিল, সে মরে গিয়ে করল তার অনেক বেশী। দিব্যেন্দুর হাতে এই আমার শেষ পরাজয়।

এষা এল বেশ কিছুক্ষণ পরে। একটু যেন কৈফিয়তের মত করে বলল, এতক্ষণে ছাড়া পেলাম। পুরুত ঠাকুরটি তেমন পাকা নন। সব হাতের কাছে গুছিয়ে না দিলে তাল পান না। এবারে রান্নার দিকে যেতে হবে। তুমি এক কাজ কর। চান করে, যা হয়েছে খেয়ে নাও। ওরা কখন আসবেন, তার জন্যে বসে থাকতে গেলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। শরীরের যা অবস্থা দেখছি!

এতক্ষণে বোধহয় আমার শরীরের দিকে
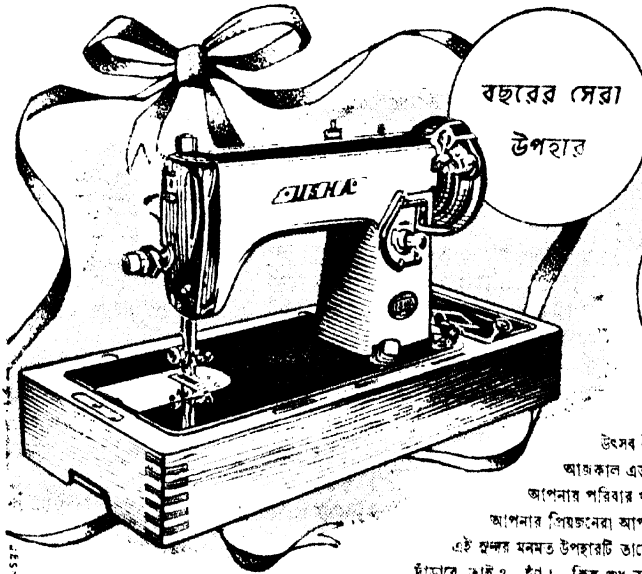
তার দৃষ্টি পড়ল। তাও, বিশেষ উদ্বেগ বোধ করছে বলে মনে হল না। অথচ রাজসাহীতে আমাকে দেখে আপনি চমকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, কী অসুখ করেছিল আপনার?

'ওরা' কারা বুঝতে না পেরে বললাম, কাদের কথা বলছ? কারা আসবে?

—বাবার আপিসে যাঁরা কাজ করতেন, যাঁদের যাঁদের চিনি, তারই মধ্যে কজন ব্রাহ্মণকে খেতে বলেছি দুপুর বেলা। তোমার ঘর পরিষ্কার হয়ে গেছে। আলনায় জামা কাপড় রেখে দিয়েছি। চান করে নাও। আমি নীচে চললাম।

বলেই সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

ভাবলাম, আমিও এই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ি। এখানে আর আমার জায়গা নেই। বাবার কর্মচারীদের কাছে (যদিও ভূতপূর্ব) আমার এই হঠাৎ আবির্ভাব মোটেই আনন্দের হবে না। বিশেষ করে এই দিনটিতে, যখন তারা তাঁর ছোট ছেলের স্মৃতি পূজায় শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন। সেই ছেলেকে যে খুন করেছে, তার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা শুধু অশোভন নয়, অপরাধ। আমার মনে হল, এরাও হয়তো সেই কথাই ভাবছে, এবং তারই জন্যে আমাকে আগে আগে খাইয়ে দিতে চায়। তাদের সামনে পড়ি, এটা বোধহয় ওর ইচ্ছা নয়।

নিঃশব্দে নীচে নেমে এলাম। সিঁড়ির নীচেই একজন বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। এঁর কথা আপনাকে বলেছি। প্রথম দিকে যিনি আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে এখানে দেখা করতে আসতেন। ছেলেবেলা থেকে সুরেশকাকা বলে ডাকি। আমাকে সত্যিই স্নেহ করতেন একদিন। ভ্রূ কুঁচকে মুখের দিকে চেয়ে যখন আমাকে চিনতে চেষ্টা করছেন, পারছেন না, আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল ভালো আছেন সুরেশকাকা? পায়ের ধুলো নিলাম। 'বড় খোকা!' বলে বুড়ো আমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন, কখন এলে বাবা?

—এই কিছুক্ষণ হল।

—বেশ! বেশ! একটা খবর দিলে না কেন? আমরা স্টেশনে যেতাম। শরীর যে একেবারে ভেঙে গেছে, বাবা। অনেক অসুখ বিসুখ গেছে নিশ্চয়ই। একখানা চিঠি দিয়েও তো জানাওনি। এদিকে কোথায় চললে? ওপরে চল। বৌমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

অতগুলো প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই দেখলাম, বংশী একটা বন্দুক হাতে করে ওদিক থেকে আসছে। দেখেই চিনলাম, আমার সব চেয়ে প্রিয় সেই জেফ্রি। কত-দিনের কত শিকারের স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে। সব মনে পড়ে গেল। বললাম, ওটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

বংশী বলল, ঐ ঘরে ছিল। মা বলছেন ওখানে খাবার জায়গা হবে। তাই ওদিকে কোথাও রাখতে যাচ্ছি।

—দেখি? আর সবগুলো কই?

সুরেশ কাকা বললেন, আরগুলো কি আর আছে, বাবা? তুমি নেই; তোমার জিনিস কে দেখে? সব কালেকটারিতে জমা দিয়ে দিয়েছি। এটাও দিতে চেয়েছিলেন তোমার মা। আমি বলে কয়ে তার নামে লাইসেন্স করিয়ে রেখে দিলাম। একা মেয়েছেলে। এত বড় বাড়িতে থাকা। এদিকে চোর ডাকাতের ভয় দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে দেখলাম, ব্যারেলের ভেতরটা ভীষণভাবে জং ধরে গেছে। লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, গুলী আছে?

—'আছে বাবু', বলে পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে দেখাল। তার থেকে একটা বল কার্টিজ নিয়ে বাকীগুলো ওর হাতে দিলাম। সুরেশকাকা যেন একটু ভয় পেলেন। বললেন, গুলী কী হবে?

—দেখছেন না, কী রকম মরচে পড়েছে। একটা ফায়ার করলেই অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

—ওসব এখন থাক, বাবা। পরে হবে। ওপরে চল। চানটানও বোধহয় হয়নি।

ততক্ষণে গুলীটা ভরে ফেলেছি। ঠিক সেই সময়ে পেছন থেকে কানে এল চেনা গলার ডাক—'কইরে? বংশী কোথায় গেলি? বন্দুকটা যে হাঁ করে খুলে রেখেছিস হতভাগা!... এই যে সুরেশবাবু এসে পড়েছেন। ও কে!'

—চিনতে পারছেন না? বড় খোকা। আহ্লাদের সুরে বললেন সুরেশকাকা।

—অ্যাঁ! বলে যেন ভূত দেখে চমকে উঠল প্রশান্ত ব্যানার্জি। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

মুহূর্তে মধ্যে কী যে হল আমার, বলতে পারবো না। মাথার ভেতরটা কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল। অথচ তার এক সেকেণ্ড আগেও ঐ লোকটার কথা ঘুণাক্ষরেও আমার মনে আসেনি। কিন্তু অস্বীকার করতে পারবো না, চোখের নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর মাথা তাক করে বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছিলাম। ও যখন বিকট চিৎকার করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটেছিল, আমিও ছুটে গিয়ে ট্রিগার টেনে দিয়েছিলাম। অনেকদিনের অনভ্যাস। তার ওপরে কিসের উত্তেজনায় সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছিল। তা না হলে শুভেন্দু দত্তের গুলী কখনো ফসকায় না।

এখানেও আমার হার হল, মিস্টার চৌধুরী। প্রশান্ত বাঁড়ুয্যের কাছেও হেরে গেলাম।

চলে যাবো বলে নীচে নেমে এসেছিলাম। কোথায় যাবো তখন স্থির করিনি। সেই মুহূর্তে স্থির করে ফেললাম। পেছন পানে আর ফিরে চাইনি। বন্দুক হাতে করে সোজা গিয়ে যেখানে হাজির হলাম, তার নাম বালিগঞ্জ থানা।

প্রশান্ত পাকা লোক। আমার আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই আর একটা চিৎকার করে দারোগার পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। ও-সি চট করে রিভলবার বের করে হাঁক দিলেন, হ্যাণ্ডস আপ।

হেসে বললাম, কেন ঘাবড়াচ্ছেন? খালি বন্দুক। গুলী থাকলে ও এতক্ষণ থাকত না।

শুভেন্দুর কাহিনী শেষ হল। মলয় চৌধুরী, যেমন ছিলেন, তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। আরো কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। শুভেন্দু মুখ নীচু করে দু হাতের পাশে আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে কী যে ভাবল, সেই জানে। তারপর মাথা তুলে বলল, এখানে যেদিন পেলাম, কি মনে হয়েছিল জানেন মিস্টার চৌধুরী? মনে হয়েছিল, এতদিন জানতাম এ সংসারে কোথাও আমার জায়গা নেই, এবারে জানলাম, আছে। সেও আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল, চিরদিন থাকবে। মুখে কিছু বলেনি। ওর ঐ চোখ দুটির মধ্যেই সে কথা লেখা ছিল। সেই ভরসাতেই ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, ভুল। সেখান থেকেও আমি ডিসলজড, বেদখল।

কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল শুভেন্দু, ভালোই হল। আপনার কাছে ফিরে এলাম, সেই পুরনো জায়গায়। এ আশ্রয় আমার নেয় কে?
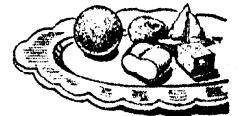
ভূষণ-দা

মনোজ বসু

আমগাছের মগডাল থেকে ভূষণ-দা পড়ে গেলেন। বয়স চুয়াত্তর। ঐ বয়সে—আপনার কথা জানিনে, নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি—অতদিন টি'কে থাকি তো দু-পাশে দু'টি মানুষ লাগবে ধরে আমায় দাঁড় করিয়ে দিতে। আর চুয়াত্তর বছরের ভূষণ ঘোষ কিনা ফনফন করে গাছের মাথায় উঠে গেলেন। ছেলে পটলা আম কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঝুড়ি ভরছে। ঝুড়ি কাঁধে আমতলা থেকেই কাটাখালির হাটে বেরিয়ে পড়বেন, এই মতলব। আগের দুটো হাটেও তাই করেছেন। চৈত্রমাস, এখনো পাকা আমের মরশুম আসেনি। কিন্তু এই বেলতলি গাছের আম সময়ের আগে পাকে, বৈশাখ পড়তে না পড়তে শেষ। আম ফলেছে এবারে খুব, এবং অসময়ের বস্তু বলে দরও ভাল। সঙ্গে সঙ্গে ভূষণ-দা'র মাথায় আবার এক নতুন কারবারের মতলব। ক্ষেতের পাট দেখে চাষীদের কিছু কিছু দাদন দিয়ে যাওয়া। তারপর ভাল মহাজন ধরে সেই পাট বাড়ি এনে তোলা, এবং দর উঠলে বিক্রি করে দেওয়া। একটি বছরে—শুধুমাত্র অবস্থা ফেরানো নয়—লাল হয়ে যাবেন একেবারে। যত ভাবেন, ততই ক্ষেপে যাচ্ছেন। দরের আম একটি যেন এদিক-ওদিক না হয়। গাছ থেকে নেমে নিজেও চতুর্দিক তন্নতন্ন করে খুঁজবেন—বলা যায় না লোভের বশে পটলা ছোঁড়াই হয়তো ঘাস-পাতার আড়ালে আম একটা সেরে রেখেছে। বললেনও তাই গেল হাটের দিন: সেরেসুরে রাখিসনি তো, সত্যি করে বল। মহাগুরু পিতার কাছে মিথ্যে করে বললে নরকে নিয়ে ঠাসবে। আবার মিষ্টি কথাও বলেছিলেন, অবস্থা ফিরিয়ে নি, এই তো আসছে বছর—যত ইচ্ছে খাস। আম খাওয়া যাচ্ছে কোথায়! একটা আম বেচতে যাব না, তখন, দেদার খাবি। তোর মা আমসত্ব দেবে, কাঁচা আম পেড়ে কাসুন্দি করবে। আমিই পেড়ে এনে দেব।

সেই হাটবারে বউদি অর্থাৎ ভূষণ-দা'র স্ত্রী কিরণমালা আমতলায় এসে বললেন, পুঁটি খেতে চেয়েছে একটা আম দিয়ে দাও। পোয়াতি মেয়ে দু'দিনের তরে এসেছে, খাওয়ার লোভ হয় এ সময়টা।

স্বামীর মন ভেজানোর জন্য রসিকতাও করলেন একটু: দেখ, পোয়াতির লোভের জিনিস না দিলে বাচ্চার মুখে নাল ঝরবে. নাতি কোলে নিতে পারবে না তখন।

কিন্তু ভূষণ-দা অবস্থা ফিরিয়ে আপাতত লাল হবার তালে আছেন, নাতি কোলে

নেবার চিন্তা পরে। খিঁচিয়ে উঠলেন; আম জষ্ঠিতে খাবে, চোতমাসে আব্দার কেন?

কিরণমালা একটি আম ইতিমধ্যে ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়েছেন। গাছ থেকে নেমে এসে ভূষণ-দা চোখ পাকিয়ে ছিনিয়ে নিলেন সেটা।

এসব হয়েছিল গেল-হাটবারের দিন। রাগ করে আজ বউদি তাকিয়েও দেখেননি। তলায় শুধু পটলা। বউয়ের তোয়াক্কা ভূষণ-দা করেন না। আজ বলে নয়, চিরকাল এই রকম। কিরণমালার যখন ভরভরন্ত যৌবন, তখনও। কিছু বেশি বয়সে ভূষণ-দার বিয়ে হয়—এই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। গাঁয়েরই মেয়ে কিরণমালা, তাঁর বয়স এগার। সেই বউ আঠার উনিশে পৌঁছলেন। আমরা তখন একফোঁটা বালক। ভূষণ-দা সেই সময়টা ঘরের কাজ করে বেড়ান এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে। আমাদের গ্রাম্য কথায় বলে ঘরের কাজ দেওয়া; দালান কোঠার ব্যাপার হলে বলতেন ইঞ্জিনীয়ারিং। খড়ো ঘরে খুঁটি পোঁতা থেকে চালের মটকায় উঠে রুয়ো বাঁধা ঘরের ইঞ্জিনীয়ারকে সমস্ত করতে হয়। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পর ভূষণ-দা আলাদা এক মানুষ। পালাগানের নামে পাগল—ক্রোশ দুই-তিনের মধ্যে যেখানে গান হচ্ছে, ঠিক তিনি সেই আসরে গিয়ে হাজির। দুপুরের ভাতব্যঞ্জন ঢাকা থাকে। শীতকালে কড়োকড়ো ভাত, গরম কাল হলে পান্তা করা থাকে। জল দিয়ে গায়ের ধুলোমাটি এবং সারাদিনের ক্লান্তি ধুয়ে মুছে ভাত খেতে বসে। খেয়েই বেরুলেন। শেষরাত্রে কখন ফেরেন ঠিকঠিকানা নেই—ঘুম ভেঙে দোর খুলে দিতে কিরণমালার কষ্ট, সেজন্য শোবার ঘরে ভারী তালা এঁটে চাবি গাঁটে গুঁজে নিয়ে চললেন। বউদি ঘরের ভিতরে রইলেন।

ছেলেমানুষ আমরা ভাল ছেলে হয়ে পড়া মুখস্থ করছি। হেরিকেনের চল হয়েছে—কিন্তু কেরোসিনের উৎকট আলোয় নাকি চোখের দীপ্তি খাট হয়, সেজন্য রেড়ির তেলের দীপের ব্যবস্থা। কানের মধ্যে গান এসে ঢোকে, বিলের পথে ভূষণ-দা গান ধরেছেন। কোনদিন কীর্তনের সুর, কোনদিন বা রামপ্রসাদী। গানের আওয়াজে জায়গা ধরতে পারি। এই গেল মরণার উপর। মরণার পাশে টিপ নিয়ে সন্ধ্যা অবধি পাঁটিমাছ ধরে এসেছি। মরণা পার হয়ে দেখা যায় কবরখানার নিমগাছে ভূষণ-দা। তারপরে খেজুরবনে। একবার নিমন্ত্রণ খেয়ে অনেক রাত্রে ঐ খেজুরবনের ভিতর দিয়ে ফিরছিলাম। বিলের বাতাসে পাতা নড়ার সাঁই-সাঁই শব্দ। জানা না থাকলে বুক কেঁপে ওঠে—চোর-ডাকাতেরা মাথায় মাথা ঠেকিয়ে শলাপরামর্শ করছে যেন বিলের কিনারায়। খেজুরবন ছাড়িয়েছেন এতক্ষণে তাহলে বাঁশতলার কবরখানা। পাথরঘাটা গাঁয়ে ঢুকে পড়লেন, গান বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক বটে, জারিখানা আজ পাথরঘাটার তারিপ ফকিরের বাড়ি। ভূষণ-দা যথারীতি আসরের এক পাশে গিয়ে বসেছেন।

গান একেকটি এই হয়ে গেল। আবার হবে শেষরাতে ভূষণ-দার বাড়ি ফিরবার সময়। দুইবার মোটমাট, দুয়ের বেশি তিন কিছুতে হবে না। দিনমানে কিংবা লোকজনের সামনে ভূষণ-দা মুখ খোলেন না, নির্জন নৈশ পথের সাথী হল গান। অন্ধকার কবরখানার পথে যখন গা ছমছম করে, কিংবা বর্ষার রাতে জল কাদায় এক একখানা পা টেনে তুলতে যখন প্রাণ বেরিয়ে যায়, গান সেই সময়টা শাঁক তার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলে। শেষরাতের গান কদাচিৎ পাতলা ঘুমের ভিতর শুনতে পাই, খেজুরবন, কবি-রাজের পুকুর, পরে মরণা পার হয়ে গ্রামের মধ্যে পড়ে নিঃশব্দ হয়ে যায়। মা বলেন, ভূষণ ফিরল—রাত তবে আর নেই, উঠি এবার। অনতিপরেই উঠে পড়ে উঠান ঝাঁট দিতে লেগে গেলেন।

বাড়ি ফিরে ভূষণ-দা ঘরের তালা খুলে তক্তাপোশে গড়িয়ে পড়েন একটু। শোওয়া যা কিছু ঐ হয়ে গেল, ঘুমের ব্যাপার আগেই চুকিয়ে এসেছেন গানের আসরে। সেখানে পালাগান, মহাপ্রলয় হলেও ভূষণ-দা সেখানে চলে যাবেন। গিয়ে আসরের পাশে নিরিবিলি একটু ঠাঁই খুঁজে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুঁজেবেন। ক্ষমতা ধরেন বটে—ঘণ্টার পর বসে বসে ঘুমানো, কোনদিকে একতিল টলবেন না। যখনই যে আসরে ভূষণ-দাকে দেখেছি, ধ্যানস্থ ঋষির মতো চোখ বুঁজে স্থির হয়ে আছেন। ক্ষণে ক্ষণে নাসাধ্বনি। শুয়ে পড়ে নয়, বসে ঘুমানোয় তাঁর আরাম।

কিরণমালা বউদি দোর খোলা পেয়েই ছুটে বেরিয়েছেন। উনুন ধরিয়ে তাড়াতাড়ি ফ্যানসাভাত রেঁধে দেবেন, খেয়েদেয়ে ভূষণ-দা কাজে যাবেন। যেদিন যে বাড়ি কাজ, দুপুরের খাওয়া সেইখানে। সমস্তটা দিন খেটে সাঁজবেলা ফিরবেন—না খাটলে অবস্থা ফিরবে কিসে? যখন একেবারে বালক, ভূষণ-দা'র বাপ ওলাওঠায় মারা গেলেন। অবস্থা ফিরিয়ে বড়লোক হবেন, দালানকোঠা হবে—তখন থেকেই মাথায় ঢুকেছে। জাত্যংশে ভাল কুলীন—বাপের

দেশী কাপড় কিনবে, এতদূরে সবুরে সয় না। হাটের মধ্যে গিয়ে বসেন। মুরুব্বিমশায়রা বেজার ঃ গাঁয়ের মধ্যে এবাড়ি-সেবাড়ি যা হোক হচ্ছিল, হাটেঘাটে গিয়ে এ কেমন কেলেঙ্কারি! ভূষণ-দাকে কিছু বলতে হয় না, আমরাই গিয়ে পড়ি ঃ বাবু হয়ে বাড়ি বসে থাকলে খেতে দেবেন আপনারা? বিয়েথাওয়া হল, সংসার বাড়ছে। বলুন, আপনারাই ওঁর সংসার চালাবেন!

মুরুব্বিরা বলেন, কুলীন কায়েতের ছেলে মাথায় মোট বয়ে হাটে হাটে কাপড় বিক্রি করে বেড়াবে, বংশ ধরে আমাদের মাথা হেঁট হয়।

আমরা বলি, হয় না। কাপড় বিক্রি তো নয়—স্বদেশী-কাপড় বিক্রি। কেনা-বেচার ফাঁকে ফাঁকে হাটুরে লোকের কাছে স্বদেশী প্রচার।

কিন্তু প্রচার যতই হোক, হাটের লোক মোটা কাপড় নেড়ে চেড়ে দরটা শুনে নিয়ে সরে পড়ে।

ভূষণ-দার রোখ চড়ে যায় ঃ নেবে না কী রকম! ধারে দেব। এক পয়সাও দিতে হবে না এখন। পৌষমাসে শোধ করবে।

এবং মুখের কথা শুধু নয়,—বাড়ির দাওয়ার খদ্দের ... 'বিক্রয় হয়'। খদ্দের রে-রে করে এসে পড়ে। ধর্মপথের পথিক ভূষণ-দা, জুয়াচুরি-ফেরেব্বাজির ধার ধারেন না। বুঝিয়ে বলেন, পৌষমাসে ধানচাল উঠলে দাম শোধ করবে, তার এখনো পাঁচ-ছ-মাস। টাকাটা এদ্দিন পড়ে থাকবে, তার একটা বাজ আছে। সেইজন্য কাপড়ের জোড়া পিছু ছ-আনা চড়িয়ে দিচ্ছি।

খদ্দেরের তাতে আপত্তি নেই। ছয়ের দুনো বার-আনা চড়িয়ে দিলেও আপত্তি হত না স্বদেশী জিনিসের উপর এতখানি প্রেম।

পৌষমাস এল, গোলা-আউড়ি ভর্তি ধান-চাল। কিন্তু হেঁটে হেঁটে ভূষণ-দার পায়ের নাল ছিঁড়ে যায়, সিকি পয়সা কেউ দেয় না। স্ফূর্তির কাল পৌষমাস, ঘরে ঘরে পালপার্বণ। কিন্তু অহরহ টাকার তাগিদে ঘুরে ঘুরে এমনি হয়েছে, এক প্রহর রাতে বাড়ি ফিরে তখন আর ভূষণ-দার ইচ্ছে করে না উঠে আবার কোন পাড়ার আসরে যান। সত্যি সত্যি হয়েছে এমনি তিন-চারটে দিন।

চরম হল, ভূষণ-দা পায়ে কাঁটা ফুটিয়ে রাতের মধ্যে পা ফুলে গোদ। টাটানি, আর সেই সঙ্গে জ্বর। শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হল দিন দশেক। এবং অটল ডাক্তারকে ডাকতে হল।

অটল ডাক্তারের ঘোড়া আছে, সাইকেল আছে। নতুন ইট কাটিয়েছেন দালান দেবেন বলে। এক শিশি জলের মধ্যে ফোঁটা কয়েক অষুধ ফেলেন—চেহারায় তাও ফটিক জল। জল বিক্রি করে অবস্থা এমন করে ফেলেছেন। সেরে উঠে এবারে ভূষণ-দা ভাবছেন ডাক্তার হলে কেমনটা হয়! খোঁজখবর নিয়েছেন, পুঁজি যৎসামান্য—ছ' টাকা বার আনা মাত্র। বাক্স সহ পঁচিশ দফা অষুধ পাঁচ টাকা। আর হোমিওপ্যাথি মেটেরিয়া মেডিকা সাতসিকা। এমন ব্যবসা এতদিন কেন মাথায় আসেনি, আশ্চর্য। সেই ডাক্তার হতে এখন কিন্তু টাকা পানের লেগে যায়। দিনকে-দিন কী রকম হচ্ছে বুঝুন।

সমস্ত ঠিকঠাক, ভি-পিতে মাল পাঠাতে কলকাতায় চিঠি লেখা হয়ে গেছে। শৈল এসে বাদ সাধল। এক ঠিকেদারের হয়ে বর্মার জঙ্গলে কাঠ কেটে বেড়াত, লড়াইয়ের দুর্যোগে চাকরিবাকরি ছেড়ে বেকার হয়ে গাঁয়ে এসে উঠেছে। শৈল বলে, আপনি কেন ভূষণ-দা, ডাক্তার আমিই হব। করতে হবে একটা কিছু, আপনি এটায় আর নজর দেবেন না।

চিরদিনের পরোপকারী মানুষ ভূষণ ঘোষ—ভাল ছাড়া কারও কখনো মন্দ করেননি। রাজী হয়ে ভূষণ-দা বললেন ভি-পি এসে পড়েছে, তুমিই তবে ওটা ছাড়িয়ে নাও।

মাপসই তক্তা কেটে তার উপরে নাম লিখে ভূষণ-দা সাইনবোর্ড বানিয়ে দিলেন ঃ ডাক্তার শৈলবিহারী মজুমদার। যেমন নিজের কাপড়ের খাতার বেলা সাইনবোর্ড হয়েছিল।

শৈল প্রসন্ন দৃষ্টিতে সাইন বোর্ড দেখে বলে, লেখা তো দিব্যি হল। কিন্তু রোগী? বিদেশে পড়েছিলাম—আমায় কে চেনে, রোগপীড়ায় আমায় কে ডাকতে যাবে?

সাইনবোর্ড লেখার ফলে সে দায়িত্বও ভূষণ-দার উপর বর্তেছে। রোগী জোটাতে হবে। হুঁ বলে তিনি সায় দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে আর এক জরুরী কাজ এসে পড়েছে। বড়লোক হবেন, তালুকমুলুক হবে, বাড়িতে দালানকোঠা দেবেন। কোনটাই হয়ে ওঠেনি এখন অবধি। তবে দালান-কোঠা তোলা বিন্দুমাত্র কঠিন নয়। ঠিক ঐ মতলব করেই ঘরের চালে খড় দেননি এবারে। সারা বর্ষাকালটা কী দুর্ভোগ—মেঝেয় সমুদ্দুর খেলেছে, একটুকু শুকনো জায়গার জন্য কিরণমালা বউদি ঘরময় বিছানা টানাটানি করেছেন। বর্ষা অন্তে কাজে লেগে পড়লেন ভূষণ-দা। পৈতৃক দালান

ভেঙেচুরে জঙ্গল হয়ে আছে, সাপসোপের বাতান। শাবল ধরে খুঁড়ে খুঁড়ে পুরোনো ইঁট জড় করলেন একধারে। বড় ছেলে পটলাটা বেশ কাজের হয়েছে, এই সুবিধা। বাপে বেটায় খাটছেন। রাজমিস্ত্রি নয়—নিজেই গাঁথতে শুরু করলেন। উঠানে গর্ত খুঁড়ে কাদা করলেন, পটলা ইট-কাদা বয়ে বয়ে যোগান দেয়। চুন সুরকির স্পর্শ নেই কেবল ছাতটুকু ছাড়া—গাঁথনির মশলা শুধু-মাত্র কাদা। খানিকটা গাঁথা হয়ে যাবার পর দরজা জানলা বসানোর দরকার হল। কড়িবরগাও লাগবে আর কিছু পরে। রাজমিস্ত্রির কাজ বন্ধ করে ছুতোর-মিস্ত্রির কাজে লেগে পড়লেন ভূষণ-দা। কাঁঠালের দরজা-জানলা, তাল-গাছের কড়ি-বরগা—বাগানের তালগাছ কাঁঠালগাছ করাত দিয়ে আগেই চিরে ফেড়ে রেখেছিলেন। গোপাল কর্মকার ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করত, সে মারা গেছে। কর্মকারবাড়ি কয়েকটা যন্তর-পত্তর পড়ে ছিল মরিচা ধরে। সেগুলো চেয়ে নিয়ে এলেন। একাজের গুরু যদি কাউকে বলতে হয়, সে ঐ মৃত গোপাল। আমাদের পাড়াগাঁয়ের ছুতোরগিরিতে এমন কিছু শৌখিন কাজ আসে না যে জ্যান্ত গুরু ধরে হাতে-কলমে শিখতে হবে। কলকৌশলের চেয়ে গায়ের জোরের ব্যাপার বেশী। বিশাল এক গাছের গুঁড়ি মাঝামাঝি চিরে দিয়ে গৃহস্থ বললেন, চৌকাঠ বানাও। বাইশ দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে সেই অতিকায় গুঁড়ি থেকে চার বাই তিন মাপের কাঠ বের করতে হল, তাতেই লেগে গেল পুরো দুটো দিন। সেই কাঠ থেকে তারপর কি মাপের কোন বস্তু বানাতে হবে সেটা পরের বিবেচনা। বাড়ির গিন্নির ভারি আনন্দ—উনুনে মাস-খানেক পোড়াবার মতো কাঠ হয়ে গেল এক জোড়া চৌকাঠ বানাতে গিয়ে।

দেখতে দেখতে ভূষণ-দা'র দালান উঠে গেল জানলা-দরজা ও পাকা ছাত সহ। আপাতত এক কুঠুরি—পরে অনেক বড় হবে, ইটের মাথা করে কায়দা রেখে দিয়েছেন। এবং আর যে দুই দফা বাকি রইল—বড়লোক হওয়া ও জমিজিরেত করা—তাও হয়ে যাবে ঠিক। নতুন কুঠুরিতে ভূষণ-দা দোকান নিয়ে গেলেন। এই দোকানও খুব বড় হবে একদিন, মহাজনী কারবার হয়ে দাঁড়াবে। সেদিনের অনেক দামের মালপত্র পাকা কুঠুরিতে না রেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। এখন দামী মাল নাই থাক, ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে রইল।

গোপাল কর্মকারের মৃত্যুর পর ছুতোরের কিছু অনটন হয়েছে। কর্মকার-বাড়ির যন্ত্রপাতি চেয়ে এনেছিলেন, সে আর ভূষণ-দা ফেরত দিলেন না। ডাক্তার হওয়া ঘটল না তো ছুতোর হলেন। একেবারে গোড়ার সেই দোকান তো রয়েছেই। অবস্থা নির্ঘাৎ ফিরবে, মুখে বলেন। কিন্তু কিছুদিন থেকে দেখছি অন্যমনস্ক ভাব—কী যেন ভাবেন সর্বদা।

যেমন, খদ্দের এসে বলছে, সৈন্ধবনুন আছে তোমার দোকানে?

পাকা-কুঠুরির ঠিক সামনে উঠানের উপর ভূষণ-দা কাঠ কোপাচ্ছেন। সেই কাঠ থেকে রাখাল দত্তর পাঠশালার একখানা বেঞ্চি হবে। ভূষণ-দা'র পাঠশালা উঠে যাবার পর রাখালের সঙ্গে ভাব হয়েছে আবার। অদূরে

"চুয়াত্তর বছরের বুড়ো মানুষ তুমি গাছে উঠতে গিয়েছিলে কেন?"

উবু হয়ে বসে রাখাল তামাক খাচ্ছেন আর ভূষণ-দা'র কাজ দেখছেন। কিরণমালা বউদি পুরো এক ঝুড়ি কাঠের কুচি রেখে এসে আবার কুড়োতে লেগেছেন। এই খানিক-ক্ষণ আগে শৈল এসে গেছে। ডাক্তার শৈল-বিহারী মজুমদার। এসে বলল, অষুধপত্তর কিনে ডাক্তার হয়ে তো বসলাম। আমায় এখানে কে চেনে—তোমার জোর না পেলে সাহস করতাম না ভূষণ-দা। কিন্তু রোগী কই? তোমার কাছে কত রকমের লোক আসে, তাদের একটু বলেকয়ে দিও।

রাখাল দত্ত নিরিখ করে দেখছিলেন বেঞ্চি গড়া। দেখে দেখে বলে উঠলেন, পায়া যেন বড্ড উঁচু হয়ে যাচ্ছে ভূষণ। এক এক ফোঁটা ছেলে—বেঞ্চিতে উঠতে পারবে তো?

সৈন্ধবনুনের খদ্দের জবাব না পেয়ে হন-হন করে চলেছে বোধ করি হাটখোলা মুখো। ভূষণ-দা যেন তন্দ্রা ভেঙে ওঠেন: অ্যাঁ, চলে গেলে নাকি? শোন, শোন।

লোকটা বেশ খানিক দূরে গিয়েছে। ভূষণ-দা রীতিমতো চেঁচাচ্ছেন। ডাক শুনে সে ফিরে চলে আসে: আছে সৈন্ধবনুন?

সে প্রশ্ন ভূষণ-দা'র আপাতত কানের নেবার সময় নয়। বললেন, আমাদের শৈল-বিহারী যে ডাক্তার হয়েছে শোননি? ভাল ডাক্তার—রোগী সব ভাল হয়ে যাচ্ছে। তোমার ছা-বাচ্চা সকলকে দেখিয়ে শৈলর অষুধ খাইয়ে দেখ।

সৈন্ধবনুন?

অনেকগুলো কথা বলে ফেলে ভূষণ-দা খুটখাট করে আবার বেঞ্চি গড়ায় মনো-নিবেশ করেছেন। নির্বাক অবস্থা বেশ খানিকক্ষণ। খদ্দের লোকটি একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। রাখাল দত্তও উঠে পড়লেন। হাটবার আজকে, বাড়িতে জামাই, সকাল সকাল হাটে গিয়ে ভাল মাছ কিছু আনতে হবে। ধৈর্য ধরে যদি বসে থাকতে পারতেন, তাঁর কথার জবাব মিলত এক

সময়। এবং ঐ যে লোকটা সৈন্ধবনন্দন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তারও কথার। একটা-কিছু বললেন, আর ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ের মতন সঙ্গে সঙ্গে তুড়ুক জবাব—এই স্বভাব ভূষণ-দার নয়।

এমনি অবস্থায় নতুন কুঠুরির খানিকটা একদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। পুরোনো নোনা-ধরা ইট, কাদার গাঁথনি, তদুপরি মিস্ত্রি হলেন আমাদের ভূষণ-দা—এহেন রত্নসমাযোগে অধিকক্ষণ লড়তে পারেনি কালবৈশাখির বৃষ্টি ও ঝড়ের সঙ্গে। ভাগ্যিস তখন কুঠুরিতে কেউ ছিল না। দোকানের মালপত্র কিছু গেল, টাকার অঙ্কে সেটা তেমন মারাত্মক নয়।

কিন্তু ভূষণ-দার তারপরে কথাবার্তা একদম ছেড়ে দেওয়ার অবস্থা। আগে জবাব পেতে হলে আধঘণ্টার মতো সময় লাগত, এখন সমস্তটা দিন মুখের পানে চেয়ে থেকেও কিছু মেলে না। হঠাৎ একদিন কী রকম মেজাজে নতুন সংকল্পের কথা আমায় বলে ফেললেন: ক্ষেতের পাট উঠে গেলে, ভাবছি, পাট কিছু ধরে রাখব। বন্ধ চোখ মেলে তাকাতে যেটুকু সময়, পাটের কারবারে অবস্থা ফেরাতে তার বেশী লাগে না।

এবং তারই প্রাথমিক আয়োজনে গাছে চড়েছিলেন ঠিক দুপুরবেলা। পশ্চিমপাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে তখন আমরা তাস খেলছি। একটু আগে কাঠ কোপানোর আওয়াজ পাচ্ছিলাম। কখন এর ভিতরে কাজকর্ম বন্ধ করে স্নানাহার সেরে গাছের মাথায় গিয়ে উঠেছেন। কিরণমালা বউদি হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন হঠাৎ। কি হল, কি হল—করছি আমরা চণ্ডীমণ্ডপের বারান্ডায় বেরিয়ে এসে: ওরে পটলা, হল কি এখানে?

বাবা আমগাছ থেকে পড়ে গেছে।

পাড়াগাঁ জায়গায় খবর বাতাসের আগে ছোটে। দূর দূরান্তরের মানুষও এসে পড়ছে। ভূষণদা-দা'র সম্বিৎ নেই। পাখা করছে, জলের ঝাপটা দিচ্ছে: সর, সরে দাঁড়াও তোমরা, ভিড় জমিয়ে বাতাস আটকে দিও না।

কয়েকজন ওদিকে ভূষণ-দা'র গোঁয়ার্তুমির কথা বলছে: ঐ খাটনি খেটেছেন সকাল থেকে, তার উপরে আগুনের মতো রোদ। এই অবস্থায় গাছে চড়তে যায় কেউ কখনো! মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন।

কেদু মোড়ল বলে, মাথা ঘোরে না ঘোষ মশায়ের। ও মাথা বড় শক্ত। উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

কে একজন জিজ্ঞাসা করে, ধাক্কা দিতে গেল কে আবার?

কেদু মোড়ল সেই মানুষটির অজ্ঞতায় অবাক হয়ে বলে, কত রকম খারাপ বাতাস আছেন, চোখে দেখা যায় না। তাঁদেরই কেউ হবেন।

ভূষণ-দা'র জ্ঞান ফিরল। ধরাধরি করে আমরা বাড়ির দাওয়ায় নিয়ে যাই। জ্ঞান ফিরেই প্রথম কথা : আম গেছে চলে হাটে? কে নিয়ে গেল?

কিরণমালা বউদি চোখ ইসারা করছেন কেবলই। আম পড়ে আছে জানলে ভূষণ-দা ক্ষিপ্ত হবেন। বলতে হল : পবন সর্দার কাটাখালি যাচ্ছিল, বলেকয়ে তার কাছে দিয়ে দেওয়া হল। এতক্ষণে হাটে পৌঁছে বেচতে লেগেছে।

পটলার উপর খিঁচিয়ে ওঠেন : তুই কেন সঙ্গে গেলি না? এই বয়সে গতরখেকো হচ্ছিস। ভাল করে প্রাণ দিয়ে খাটলে অবস্থা ফিরতে কদিন লাগে!

ডান পা-খানা ঢুলঢুল করছে—তুলে ধরলে নুয়ে পড়ছে। ভিতরের হাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে মনে হয়। আরও কি কি হয়েছে—এ অঞ্চলের শৈলবিহারীদের মত ডাক্তার দিয়ে হবে না। কলকাতার হাসপাতালে পাঠাতে হবে। ততদূর না হয়ে উঠলে যশোর। পাড়াগাঁয়ে এমনি হয়তো ঠেঙাঠেঙি মামলা-মোকদ্দমা, কিন্তু বিপদের মুখে শত্রুমিত্র সকলে কোমর বেঁধে এসে পড়বে।

লোক ছুটল কেশবপুরে—বাস এসে থাকে সেখানে। যেমনি একটা বাস পাওয়া এসে ভূষণ-দাকে নিয়ে সন্ধ্যার ট্রেন ধরিয়ে দিতে পারবে কিনা।

ভূষণ-দা ওদিকে রাগারাগি করছেন : হয়েছে কী শুনি! কলকাতা অবধি ঠেলে নিচ্ছ কেন? অকালের আমগুলো বরবাদ হয়ে যাবে। কত রকম ভেবেছিলাম—কোন-কিছু হবার জো আছে তোমাদের জ্বালায়?

নিতান্তই অশক্ত এখন তিনি, মুখের বাক্য ছাড়া কিছু নেই। তাও বেশিক্ষণ রইল না। প্রবল জ্বর এসেছে, ক্ষণে ক্ষণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন। আমি চললাম সঙ্গে। শেষরাত্রে কলকাতা পৌঁছে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে দিলাম।

রোগীর নাম-ধাম-বয়স ও রোগের যাবতীয় বিবরণ শিয়রের কার্ডে লেখা থাকে। পরের দিনের কথা। কার্ড পড়ে নার্স মেয়েটা কৌতুক-স্বরে বলে, চুয়াত্তর বছরে বুড়ো মানুষ তুমি, গাছে উঠতে গিয়েছিলে কেন?

সেই সময়টা আমিও হাসপাতালে গিয়েছি। স্পষ্ট দেখলাম, কথা শুনে চমক খেলেন ভূষণ-দা। মুখ কেমন হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বুড়ো হয়েছেন এবং বয়স চুয়াত্তর, এই যেন প্রথম শুনছেন। সত্যি তাই। কোন না কোন সময় কেউ কি আর বলেনি বয়সের কথা? কিন্তু অবস্থা ভাল করবার তালে এমন ব্যস্ত, আজেবাজে কথা আমাদের ভূষণ-দা'র কানে ঢোকেনি।

গ্যাংগ্রিনের লক্ষণ। ডান পা কেটে ফেলবে, তার জন্য অনুমোতি চায়। ভূষণ-দা'র ঘোরতর আপত্তি : কখনো না। পাটের কারবার করব, ক্ষেতেলদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হবে। পা গেলে ব্যবসা কেমন করে হবে।

জীবনের সর্বশেষ কথা তাঁর এই। •

ফুলের নামে নাম

সুশীল রায়

কল্যাণের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশী দিনের না। কিন্তু এরই মধ্যে আমি তার খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছি।

আমাকে অন্তরঙ্গ মনে করার কারণ আছে। কল্যাণকে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা করুণা করে, কিন্তু আমি তাকে করুণা করতে পারিনি। আমার কথায়-বার্তায় এর আঁচ সম্ভবত সে পেয়েছে। তার কথা কেউ শুনতে চায় না; কিন্তু আমি তার মনোযোগী শ্রোতা। তার কথা শুনতে আমার আপত্তি তো নেইই, বরঞ্চ আগ্রহই আছে।

মিস ভায়োলেটের নাম আমরা শুনেছি যখন, তখন আমরা খুব ছোট। ভায়োলেট ছিল তার স্টেজের নাম, তার নিজের নাম মনোরমা।

দেখতে ছিল টাটকা ফুলের মত নরম আর তাজা। তার গুণগ্রাহীরা তাই হয়তো একটা ফুলের নামে তার নাম ঠিক করে দিয়েছিল। এটা কোন্ দেশী ফুল আর কি ফুল, সে ফুল দেখতেই বা কেমন—তা কেউ জানত না। তারা জানত মিস ভায়োলেটকে; আর জানত যে ঐ ফুলটা হয়তো মিস ভায়োলেটের মতই দেখতে। তেমনি ফুল্ল, তেমনি জ্যান্ত, তেমনি তাজা।

মনোরমা যখন স্টেজে যোগ দেয় তখন তার নাম মনোরমাই ছিল। এ নামটাও মন্দ না, তার চেহারার সঙ্গে লাগসইও বটে—সত্যিই নাকি খুবই মনোরম দেখাত তাকে। ফুটলাইটের আলো গিয়ে যখন পড়ত তার মুখে তখন মুখটা নাকি ফুটে উঠত একটা ফুলেরই মত।

কিন্তু সেটা কি ফুল, তার নাম কেউ জানত না। গোলাপ বললে আশ মিটত না, চামেলি চম্পা বললেও বুঝি সব বলা হত না।

তখন প্রতিদ্বন্দ্বী স্টেজে মিস রোজ আসর জমিয়ে বসেছে। দেখতে সে মন্দ না, গোলাপের মত হয়তো বা হতে পারে। কিন্তু তার একটু বয়স হয়ে গেছে, তার উপরে দর্শকদের আকর্ষণ থাকলেও তার চেহারায় নাকি তেমন চার্ম ছিল না, যেমন ছিল মনোরমার।

হঠাৎ একদিন পোস্টার পড়ল শহরের দেয়ালে। তাতে লেখা হল বড় বড় হরফে

মিস ভায়োলেট

কিন্তু কে এই মিসটি? এই নতুন মেয়েটি কে? নামটি মিষ্টি বটে, কিন্তু

মেয়েটি কেমন?

রহস্য আঁচরেই খোলসা হয়ে গেল স্টেজে তাকে দেখে, সেই মনোরম চেহারাটি স্টেজ আলোয় পরখ করে।

সে অনেক দিন আগের কথা। আমরা তখন অনেক ছোট। স্টেজের নাম শুনেছি তখন, কিন্তু স্টেজ দেখিনি।

কিন্তু তার পরে দেখেছি আমরা স্টেজ। দেখেছি মিস ভায়োলেটের অভিনয়। ইতি-মধ্যে ভায়োলেটের জীবনের দশ-বারোটা বছর হয়তো কেটে গিয়েছে। তা কাটুক; তাতে খুব একটা ক্ষতি হয়েছে মনে হয় না; কেননা, তার নামের জন্যে তখনো টিকিটের কাটতি আছে। যেমন আমরা। আমরা তো গিয়েছিলাম ঐ ভায়োলেটকে দেখার জন্যেই।

বয়সে সে আমাদের চেয়ে বড়ই হবে। এর জন্যে ঠিকুজি-কুষ্ঠী বিচার করার দরকার নেই। সাদা হিসাবেই এটা পাওয়া যায়। ও যখন মিস রোজকে কাবু করে সব দর্শকের দৃষ্টি গ্রাস করে ফেলেছে, তখন আমরা পনেরোও পেরোইনি। সে যাই হোক, বছর পঁচিশ বয়স তখন আমাদের। কিন্তু ভায়োলেট যখন স্টেজে এসে দাঁড়াল, মনে হল যেন একটা কাঁচা ফুল ফুটন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে। মনে হল, যেন ছোট-একটা খুকি। কি সুন্দর হাসি, কি মধুর মূর্তি, কি মোলায়েম গড়ন।

আমরা এ-ওর হাঁটুতে চিমটি কেটে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম ঐ মূর্তিটার দিকে। আমাদের মন তখন তাজা, শরীর তবু ঝিমঝিম করে উঠল।

হল থেকে বেরিয়ে আসার পর নীহারকে খুব চিন্তিত দেখলাম। কোনো কথা বলছে না, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে না, সোজা হেঁটে চলেছে।

বললাম, "কি রে, ব্যাপার কি? অভিভূত নাকি?"

নীহার একটু ঝাঁকি দিয়ে আমার হাতটা নামিয়ে দিয়ে বলল, "স্রেফ ধাপ্পা।"

"কোনটা ধাপ্পা?"

"কোনটা নয়?" ঘুরে দাঁড়াল নীহার, বলল, "আগাগোড়া সবটাই। অমন গায়ের রং কারো হতে পারে না। অমন ভুরু, অমন নাক, অমন চিবুক—এক চাঁচিখানির কথা নাকি হবেই তবে? ওসব ছবিতে সম্ভব, কল্পনায় সম্ভব। বাস্তব পৃথিবী বড় কঠিন জায়গা রে, কাঞ্চন, এখানে অমন নারী আর পাবি? ভগবানও তৈরি করে না।"

বুঝতে পারলাম, নীহার খুবই কাবু হয়েছে। কিন্তু তা স্বীকার করতে পারছে না। এইজন্যে রেগে যাচ্ছে আমাদেরই উপর। এমন ভাব দেখাচ্ছে, যেন ভায়োলেটের ঐ চেহারার জন্যে দায়ী আমরাই।

বললাম, "ঠিক। ও একটা ছবি।"

"বেশ", নীহার বলল, "এই কথাটা স্বীকার করলেই তো আর ঝগড়া থাকে না। সত্যি, ও একটা ছবি। অর্থাৎ স্রেফ ধাপ্পা।"

"ধাপ্পা কেন?"

"ধাপ্পা না কেন? ও একটা ছবি। অর্থাৎ ও সম্পূর্ণ আঁকা। সারা মুখে রং মাখা, ভুরুটা চোখটা সব আঁকা। তার মানে সবই ফাঁকি, সবই ফাঁকা। ওর সঙ্গে আরো ধাপ্পা আছে, সেটা হচ্ছে লাইট আলোর কারি-কুরি।

রাত বেড়ে গেছে। শো শেষ হয়েছে বারোটা নাগাদ। ঘণ্টাখানেক ধরে তর্ক চলেছে আমাদের। রাস্তায় লোকজন চলছে কম। গ্যাসের আলো যেন নিস্তেজ দেখাচ্ছে। ওই আলোর রেশ নীহারের মুখে পড়ায় তাকেও একটু নিস্তেজ দেখাল।

তাকে নিস্তেজ দেখেই সম্ভবত আমার মধ্যে একটু তেজ এসে গেল, বললাম "তোমাকে এবার নামাব আমরা স্টেজে। লাইটে আর রঙে যদি সব সম্ভব হয়, তবে তুমিও একটা রাইট হীরো হয়ে উঠতে পারবে নিশ্চয়ই।"

বড় দুর্বল জায়গায় ঘা-টা লেগে গেছে। নীহারের চেহারাটা সত্যিই ভালো না। নাক নীচু, দাঁত উঁচু; হাঁ-মুখ বড়, চোখ ছোট। নিজের চেহারা নিয়ে ও নিজেই একটু বিব্রত। অন্য কারো চেহারা ভালো হলে সহজে তা ও স্বীকার করতে চায় না।

নীহার তেতে উঠল, বলল, "ভালো হচ্ছে না, কাঞ্চন। তুমি ভেবেছ কি?"

সরে দাঁড়ালাম। আদিত্য আর সিতাংশু আমার হাত ধরে টেনে বলল, "চলে আয়। এর পরে বাড়িতে আর কাউকে ঢুকতে দেবে না। ঘড়ির দিকে তাকা, রাত কত হল দ্যাখ।"

কোনো দিকে না তাকিয়ে সেদিন চলে এসেছিলাম বাড়িতে।

কিন্তু ফিরে ফিরে আমাকে আবার যেতে হয়েছে থিয়েটারে। নতুন নাটক খুললে তো গিয়েছিই, পুরনো নাটকও দেখতে হয়েছে একাধিক বার। কিসের আকর্ষণে, সে কথা স্পষ্ট করে বলার আর দরকার নেই মনে হচ্ছে।

কিন্তু একটা আক্ষেপ এই যে, মিস ভায়োলেটের জন্যে আমার বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে গেছে। নীহার আর আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমার ধারে কাছেও আসে না, তার সঙ্গে তাই আমার দেখাও হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমি তাকে দেখি—আমার দু-তিন সার আগে বসে সে মিস ভায়োলেটের অভিনয় দেখছে।

কিন্তু ফুল নাকি বাসী হয়, চাঁদও নাকি ফুরিয়ে যায় কলায় কলায়। আমাদের এই আগ্রহটা ফুলেই হোক, বা চাঁদই হোক—ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন ঘটে গেছে। ইচ্ছে করে ঘটানো হয়নি, ঘটনায় তা ঘটেছে—এই মাত্র।

মিস ভায়োলেটেরও পরিবর্তন ঘটেছে। তার নাম আর দেখা যায় না; কোনো রঙ্গ-মঞ্চের নটনটীর তালিকায় আর নাম নেই তার। কবে যে সে রিটায়ার করেছে সে তারিখটাও আমরা জানিনে। শুধু জানি, সমুদ্রের ঢেউএরই মত সব রীতিনীতি—এক যায়, আর আসে। এখন বোধ হয় অন্য কেউ এসে ঐ জায়গাটা পূরণ করেছে। বোধ হয় বলছি এইজন্যে যে, এখন ওসবের খবরই মোটে রাখিনে।

বাংলা দেশের বাইরে কেটে গেল অনেক-দিন। বিহারের এক ওষুধের কারখানার আমি প্রতিনিধি—সারা ভারত ঘুরি, কিন্তু নিজের দেশের দিকেই আসা হয় না। এবার আমার বরাতটা বোধহয় একটু খুলেছে। আমি বাংলাদেশের কলকাতা শহর এলাকার প্রতিনিধি পদ পেয়েছি। এখানে ডাক্তার-খানায় ঘুরি, অর্ডার জোগাড় করি।

ইতিমধ্যে বিশ-বাইশটা বছর যে কোন্ ফাঁক দিয়ে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে তার খোঁজই জানিনে। জীবনের অনেকগুলো বছর যেমন হারিয়ে গিয়েছে, তেমনি হারিয়ে গিয়েছে অনেকগুলি বন্ধুও। কোথায় আদিত্য, কোথায়ই বা সিতাংশু—কিছুই জানিনে। নীহারকে তো হারিয়েছি অনেক কাল আগেই। ঘটনাটা মনে পড়লে আজ হাসি পায়। দাড়ি কামাবার সময় যখন জুলপির পাকা চুল খুঁটে তুলে ফেলি, তখনই তাদের কথা মনে হয় বেশী। সেই সঙ্গে মনে পড়ে আর একটা নাম—মিস ভায়োলেট।

জীবনটা নাটক, না, নাটকই জীবন—ঠিক ধরতে পারছিনে। কল্যাণের কথা বলতে আরম্ভ করে অন্য কথায় এসে পড়েছি, সেই কল্যাণের সঙ্গে আমার আলাপ হাজরা রোডের মোড়ে ডক্টর ত্রিদিবেশ বটব্যালের ডিসপেন্সারিতে। সে এসেছিল ওষুধ কিনতে, আমি গিয়েছিলাম ওষুধ বেচতে। কেনা-বেচা করতে করতে আমাদের মধ্যে বেশ খাতির হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ অনেকদিনের, তিনি আমাদের পুরনো খদ্দের। ওঁদের কথায়বার্তায় বুঝলাম কল্যাণও ডাক্তারবাবুর পুরনো খদ্দের।

একদিন ডাক্তারবাবুই আলাপ করে দিলেন, বললেন, "ইনি কল্যাণকুমার রায়, কলকাতার এক বিখ্যাত বংশের ছেলে। কলকাতায় এঁদের বেয়াল্লিশটা বাড়ি।"

কল্যাণ বিনয় করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু বাধা দিলে কি হবে, তার চেহারা দেখেই কিছুটা আন্দাজ করা যায়। বেশ চেহারাটা—রংটাও ভালো, গড়নটাও মন্দ না। মোট কথা, চেহারার মধ্যে বেশ বনেদিত্ব আছে।

"আর ইনি।" ডাক্তারবাবু আমার বিষয় বলতে আরম্ভ করতেই আমি বাধা দিয়ে উঠলাম।
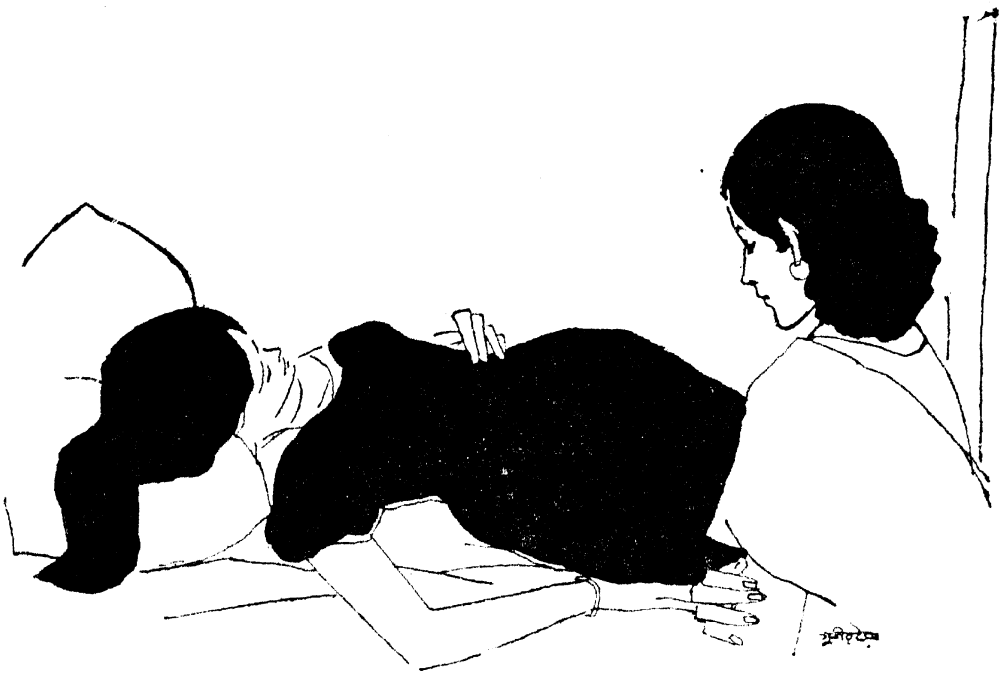
বিছানার মাঝখানে একজন শুয়ে। মেঝের এক কোণে বসে মেয়েটি।

বললাম, "আমার নাম কাঞ্চনকুমার মিত্র। কোলিশটা নয়, মাত্র দুটো। বাড়ি নয়, ঘর। দু-কামরার একটা ভাড়াটে কুঠিতে থাকি, এই কাছেই—লাইব্রেরি রোডে।"

খুব হাসাহাসি হল কিছুক্ষণ।

ডাক্তারবাবু বললেন, "আর একটা পরিচয় বলি। কল্যাণবাবু এক বিখ্যাত মহিলার স্বামী।"

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, "মিস ভায়োলেট। বাংলা মঞ্চের সম্রাজ্ঞী ছিলেন এক কালে।"

চমকেই উঠলাম যেন? চেয়ারের মধ্যেই নড়ে বসলাম, একটু ঝুঁকে বসলাম তাঁর দিকে, বললাম, "আপনি তাঁর হাজব্যান্ড? ওঃ, গ্র্যান্ড মহিলা। আমরা কতবার তাঁর অভিনয় দেখেছি। সে অনেক দিনের কথা হল—বিশ-বাইশ বছর হবে। তাঁর হাজব্যান্ড আপনি?"

কল্যাণ একটু গর্বিত চোখে চাইলেন।

হাত বাড়ালাম তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্যে। আমার হাতটা চেপে ধরে হাসল কল্যাণ রায়, বলল, "হাজব্যান্ড কি ওয়াইফ তা জানিনে। পনেরো বছর এক সঙ্গে আছি, এইটুকুই মাত্র জানি।"

নিজেকে ধন্য মনে হতে লাগল। নীহারের কথা মনে পড়ে গেল। সিতাংশুর আর আদিত্যের কথাও মনে পড়তে লাগল।

শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছেন উনি?"

ডাক্তারবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, "সে খবর আমার থেকে উনি বেশী জানেন। ডাক্তার বটব্যালই ওঁর চিকিৎসা করছেন অনেক দিন ধরে।"

ডাক্তারবাবু সংক্ষেপে বললেন, "ভালোই।"

কল্যাণকুমার রায় এখন আমার কাছে আর কল্যাণবাবু নয়, কেবল কল্যাণ। কাঞ্চন মিত্রও তার কাছে কাঞ্চন হয়ে গিয়েছে। অল্পদিনের মধ্যে আমরা বেশ জমে গিয়েছি।

নিজেকে নিয়ে আমি আজকাল বেশ গর্বিত। আমি পরিচয়হীন একজন রিপ্রেজেন্টেটিভই নয় একটা ফার্মের, আমি এখন এক বিখ্যাত মহিলার হাজব্যান্ডের ফ্রেন্ড।

অবসর সময় এখন আমার কাটে কল্যাণের সঙ্গেই। কখনো ঢাকুরিয়া পার্কের বেঞ্চে, কখনো কালীঘাট পার্কের ঘাসে।

তার কত কথা যেন জমে আছে। কাউকে পায়নি তাই বলা হয়নি। অজস্র কথা বলার জন্যে সে যেন ব্যাকুল। আমার মধ্যেও ব্যাকুলতা আছে, আমিও শুনতে চাই তার কথা, আমিও দেখতে চাই তার ডেরা। কিন্তু আমার ব্যাকুলতার কথাটা তাকে বলা হয় না।

তার কথা কিছু কিছু শুনে নিয়েছি ইতিমধ্যে। কিন্তু তার ডেরা দেখা হল না এখনো। কেন যে একদিনও সে আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে না, এত অন্তরঙ্গতা হওয়া সত্ত্বেও, তা ধরতেই পারছিনে।

কল্যাণ বলল, "আজকালকার থিয়েটার দেখি, আর হতাশ হই। ঐ কি ড্রামা? ওকে নাটক বলে? একটা প্লট নেই। এক-একবার ইচ্ছে হয়—লাগি। তৈরি করে ফেলি একটা খসড়া।"

জিজ্ঞাসা করি, "প্লট আছে বুঝি?"

"শিওর"। সে বলে, "মাই লাইফ। আমার জীবনটাই একটা প্লট। বাংলাদেশের থিয়েটারের জন্য এই লাইফটা দিয়ে দিয়েছি, সেটা যদি প্লট না, তবে প্লট কাকে বলে?"

বললাম, "বটেই তো।"

"বন্ধুবান্ধব ছিল বিস্তর—অগুন্তি—ইননিউমারেবল্। অনেক টাকার মানুষ আমি, মস্ত বংশের ছেলে, চেহারাটাও নিশ্চয় খারাপ না। বয়স এখন ফরটি সিক্স চলেছে, আশা করি অতটা দেখায় না। কিন্তু আলো নিভলেই স্টেজ অন্ধকার। আমারও সেই দশা। বন্ধুরা সটকে পড়েছে। তারা এখন আমাকে নাকি পিটি করে।"

একটু থেমে বলল, "দেখি, সিগ্রেট বের করো।"

মনে হল তার বাড়িঘর বুঝি বিক্রি হয়ে গেছে সব। সে কথা জিজ্ঞাসা করা মাত্র সে

ঘোরতর প্রতিবাদ করে উঠল, বলল, "নো। সব আছে। সব ইনট্যাক্ট। ডাক্তার বটব্যাল বলছিলেন বিয়াল্লিশ। তিনি ভুল করেছেন। মোট ছেচল্লিশটা বাড়ি আছে আমাদের। আমার এখন যা বয়স, আমার বাড়ির সংখ্যাও তাই। আমার মানে অবশ্য আমার একার না, আমাদের তিনভাইয়ের। সবার ইকোয়াল শেয়ার।"

তার এত বিষয় সম্পত্তির কথা শুনে তার উপর শ্রদ্ধা আরও যেন বেড়ে গেল। কিন্তু কেন যে এমন বাড়ে বুঝতে পারিনে। কেউ তো তার শেয়ার বিলি করে দেয় না, তবুও লোকের টাকা আছে শুনলেই তাকে আমাদের শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে। এ এক মজারই ব্যাপার।

প্রায় রোজই তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। রোজই নানা রকম গল্প শুনেছি। কখনো রোমাঞ্চকর, কখনো-বা দুঃখকর।

গল্প করতে করতে হেঁটে চলেছি ফুটপাথ ধরে, কল্যাণ বলল, "খুচরো পয়সা আছে নাকি পকেটে। দুটো মিঠে পান খাওয়া যাক।"

দুজনে পান খেলাম।

সেদিন কল্যাণের পরামর্শ অনুসারে ঢোকা গেল এক রেস্তোরাঁয়। কল্যাণ অর্ডার দিয়ে দিয়ে নানারকম খাবার আনাল। দুজনে মিলে বেশ গল্পগুজব করতে করতে খেলাম। তার পর বিল এলে টাকা দিয়ে দিলাম। কল্যাণ কিছু বলল না। আমিও না। বিত্তবান লোক সে, তাকে খাওয়াতে বেশ আনন্দই বোধ হল আমার।

নিত্য নিয়মিত তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমার। তার জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত জানা হয়ে যাচ্ছে। আঁতের কথাও বলে ফেলেছে সে। যখন তার বয়স আঠারো-উনিশ, রাজপুত্রের মত তখন তার চেহারা, আসলে রাজপুত্রও বটে—অমন ধনী পিতার নন্দন। সেই সময়ে সে মিস ভায়োলেটের প্রেমে পড়ে। কিন্তু সে নাকি এক তরফা প্রেম। ভায়োলেটের কাছে ঘেঁষবার সাধ্য তার নেই। অজস্র মানুষের ভিড় তাকে ঘিরে। অজস্র গুণগ্রাহী, অগণিত ভক্ত।

"কিন্তু!" কল্যাণ ম্লান হাসল, বলল, "ওই গুণগ্রাহী আর ভক্তদের উদ্দেশ্য তো আর কিছু না—ভোগ।"

চোখ মিটমিট করে কল্যাণ। চুপ করে গেল।

একটু পরে বলল, "আমার উদ্দেশ্য সৎ ছিল না অবশ্য। কিন্তু সব আর্টিস্ট। [illegible] তখন তার খাতির, ফিসফিস তার চাহিদা। কিন্তু আমার চাহিদার পূরণ হল না। পথ চেয়ে বসে রইলাম। প্রত্যেক শো-তে গিয়ে বসে বসে দেখতাম। অন্যেরা অভিনয় দেখত। আমি দেখতাম—"

নামটা উচ্চারণ করল না দেখে আমিই উচ্চারণ করে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভায়োলেটকে?"

"হ্যাঁ। মনোরমাকে দেখতাম আমি। আঃ, সে দেখার মত জিনিস বটে। এখনো চোখে ভাসছে সেই চেহারা।"

"এখন কেমন আছেন উনি?"

"এই যে সেদিন ডাক্তারবাবু বললেন—ভালো। ভালোই আছে। তবে রোজ ওষুধটা চাই।"

স্পষ্ট করে কিছুই বুঝতে পারছি নে যেন। খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতেও আটকাচ্ছে। রোজ যার ওষুধ চাই, সে তবে ভালো আছে কি করে—এ কথা বোঝা বড় শক্ত হচ্ছে।

তার মুখের দিকে তাকাই। বেশ শান্ত, বেশ প্রফুল্ল দেখায় সে মুখ। বেশ আনন্দে আছে বলেই মনে হয়। যাকে সে চেয়েছিল মন-প্রাণ দিয়ে, তাকে সে পেয়েছে অবশেষে, অবশেষে অর্জন করেছে তাকে—এটা কম কৃতিত্ব নয়।

আকাশে তারা ফুটে উঠেছে, চাঁদেও আলো এসে গেছে। বিকাল থেকে বসে আছি আমরা এই পার্কে।

হঠাৎ কল্যাণ উঠে দাঁড়াল, বলল, "চলো।"

বললাম, "কোথায়?"

"আরে, এসোই-না।"

ভাবলাম, হয়তো কোনো রেস্তোরাঁয় যেতে চায়, কিংবা পানের দোকানে।

কিন্তু কোথাও থামছি নে, সোজা হেঁটে চলেছি দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় চলেছি আমরা?"

"কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনে।"

"সেখানে কি?"

"সেখানে আমার বাসা।"

তার ছেচল্লিশটা বাড়ির মধ্যে এটা একটা কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে হাসল, বলল, "না। এটা আমার ভাড়া বাড়ি। তোমারই মত—দু কামরার ভাড়াটে কুঠি।"

বেশ মজা লাগল শুনতে। আরও মজা লাগল ভাবতে যে, মিস ভায়োলেটের দেখা আজ বুঝি পাব।

গলিপথে হেঁটে চললাম কল্যাণের সঙ্গে। একটা ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে খুব সরু এক-ফালি বাঁধানো পথে ঢুকলাম।

কল্যাণ কড়া নাড়ল, ডাকল, "লিলি।"

দরজা খুলে দিল একটা ফুটফুটে মেয়ে—বছর আঠারো উনিশ বয়স হবে মনে হল। দরজা খুলে দিয়েই সে চলে গেল।

দরজা পার হয়েই একটা ঘরে ঢুকলাম। ফাঁকা ঘর। আকারে খুবই ছোট। একটা মাদুর বিছিয়ে দিল কল্যাণ, বলল, "বোসো ভাই। আমি আসছি।"

একা বসে বসে চারদিকে তাকালাম। কিন্তু কিছু দেখার নেই। ঘরটা অন্ধকারও বটে। বসে বসে ভাবছি কল্যাণের কথা, এবং সেই সঙ্গে ভায়োলেটের কথাও। আর ঐ মেয়েটি কি নাম যেন লিলি তার কথাও। ও হয়তো কল্যাণের মেয়ে।

কল্যাণ এল, বলল, "একা বসিয়ে রেখে-ছিলাম। কিছু মনে করো না ভাই। এসো।"

চমকে তাকালাম।

সে বলল, "এসো! ও ঘরে চলো।"

এসে পড়লাম একেবারে অন্তঃপুরে, কল্যাণের অন্দরমহলে। মনটা কেমন ভারি হয়ে গেল।

দেয়ালময় ক্যালেণ্ডার আর ফটো। একটা মস্ত খাটে পুরু বিছানা, চাদর ময়লা হয়ে যাওয়ায় কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ঘরটাকে। বিছানার মাঝখানে একজন শুয়ে। মেঝের এক কোণে বসে সেই মেয়েটি।

এ-ঘরেও তেমন আলো নেই বলে সব যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কল্যাণ সুইচটা টিপে দিল।

দুই হাঁটু একত্র করে বসে ছিল লিলি, আলো জ্বালা মাত্র সে জোড়াসন হয়ে বসল। খাটের উপরে অস্ফুট বিরক্তির শব্দ করে পাশ ফিরে শুল কে ওটা?

"ওই যে ভাই কাঞ্চন, তোমার মিস ভায়োলেট। আর শোনো, এই সেই কাঞ্চন মিত্র।" বলতে বলতে খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে কল্যাণ বলতে লাগল, "যার কথা তোমাদের আজকাল রোজ বলছি।"

মিস ভায়োলেট ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। বললেন, "এসো ভাই। কিছু মনে কোরো না, শরীরটা আজ খারাপ করছিল, তাই শুয়েই আছি।"

বললাম, "না না। আপনি শুয়েই পড়ুন।"

তার মুখের দিকে তাকালাম। ভায়োলেট ফুল দেখিনি, শুনেছি তার পরিচয় ভায়োলেট হলেও আসলে সে ফুলের রং নাকি নীল। মিস ভায়োলেটের রংও নীল দেখাল। নীহারের কথা মনে হল, তার সঙ্গে ঝগড়ার কথাও। হয়তো অকারণেই ঝগড়া করেছি তার সঙ্গে। আলোর আর রঙের কারসাজিতে সবই তবে ওলট পালট হয়তো করা যায়।

মিস ভায়োলেট বললেন, "তিন বছর শয্যাশায়ী। রোগে ভুগে ভুগে নীল হয়ে গেলাম। অতিথি এলে আদরও করতে পারিনে, যত্নও করতে পারিনে। ওরে লিলি, ওঁকে একটু চা করে দে।"

লিলি চুপ করে বসেই রইল। কল্যাণ বারণ করল, বলল, "থাক। চায়ের দরকার নেই। আমরা রেস্তোরাঁতেই খেয়ে নেব।"

হাসতে লাগল মিস ভায়োলেট, বলল, "বেশ তো স্বার্থপর হয়েছ তোমরা। তোমরা গিয়ে দোকানে চা খাবে, আর আমরা এখানে গলা শুকিয়ে পড়ে থাকব বুঝি? আমরা বুঝি খেতে জানিনে। ভাই বুঝি একাই খাবে, বোনকে বুঝি খাওয়াবে না? লিলি, কেটলিটা দে না। আমাদের জন্যেও আসুক।"

খুব মজার কথা বলেছে যেন মিস ভায়োলেট, কল্যাণ আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

পকেট থেকে একটা টাকা বের করলাম, সেটা নিতে নিতে কল্যাণ বলল, "এত তাড়াহুড়ো কিসের। পরে দিলেও হত। আমাদের চেনা দোকান। ইয়ে, দিগিনের দোকানের কথা বলছি গো।"

মিস ভায়োলেট বলল, "বুঝেছি। তোমার বলার আগেই বুঝতে পেরেছি।"

কেটলি হাতে করে কল্যাণ চলে গেল। সোজাসুজি ভায়োলেটের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। দেয়ালে দেয়ালে চোখ বুলোচ্ছিলাম। খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা একটা মস্ত মুখ একটা রূপালি ফ্রেমের মধ্যে থেকে যেন সোজাসুজি চেয়ে আছে আমার দিকে। ঠিক যেন ভায়োলেটের কাঁধের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে তাকাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ওটা কার যেন ছবি?"

পিছন ফিরে চেয়ে, আঁচল দিয়ে ছবির ধুলো ঝেড়ে দিয়ে ভায়োলেট বলল, "জীবেন মুস্তাফি।"

"ওঃ, সেই অ্যাক্টর—কিন্তু চেহারাটা যেন—"

"হ্যাঁ। চেনা কষ্ট। একেবারে শেষের দিকের তো! গত হবার দিন পনেরো আগের।"

একটু চুপচাপ হয়ে গেল ঘরটা। আমি চুরি করে লিলিকে দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আমার একাজেত দেখাটা দেখে ফেলেছে ভায়োলেট, অমনি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার মেয়ে বুঝি?"

"হ্যাঁ।" ভায়োলেট বলল, "কাকাবাবুকে প্রণাম কর। চুপচাপ বসে আছিস কেন। চায়ের বাটিগুলো না হয় আন।"

লিলি চায়ের বাটি আনতে ঘর থেকে বেরল। বলতে বলতে গেল, "বাবা এল না, আগেই বাটির জন্যে তাড়া।"

"ভায়োলেট পাশবালিশে ঠেস দিয়ে বসে বলল, "কেটলি হাতে চা আনতে গেল। কিন্তু ও যে কী ঘরের ছেলে। প্রায় পঞ্চাশটা বাড়ি ওর এই কলকাতা শহরে। রাজার ছেলে ফকির হয়ে আছে। ভাইয়েদের মতলব, ওকে কিছু না দেওয়া।"

"কেন।"

"ভগবান জানেন। আমার সঙ্গে আছে এতেই হয়তো তাদের আপত্তি।"

চা নিয়ে এল কল্যাণ। বাটি নিয়ে এল লিলি।

চা ঢালতে লাগল কল্যাণ, বাটি পেতে ধরল লিলি।

হঠাৎ ধমকের সুরে বলল, "কি করছ বাবা। আস্তে ঢালো। পড়ে যাবে যে।"

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম, "তোমার মেয়েটি বড় লক্ষ্মী কল্যাণ। খুব শান্ত, খুব ঠাণ্ডা।"

কল্যাণ বলল, "বটে! ওর স্পেল তবে দেখনি। যত পার্ট নেবে, সব দজ্জালের আর ঝগড়াটির।"

ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠলাম। লিলিও হাসল।

আক্ষেপ করে কল্যাণ বলল, "পাবলিক স্টেজে এখনো চান্স পাচ্ছে না। কিন্তু মারভেলাস অভিনয় করে ও। এখন অ্যামেচারই খাটছে। খাটুক, একদিন বরাত খুলবেই। খাঁটিনি কখনো ফেলা যায় না।"

চুমুক দিতে দিতে তার কথায় সায় দিলাম, কিন্তু মেয়েটির অভিনয় করায় মনে-মনে কেন-যেন সায় দিতে পারলাম না। তার মাও তো এককালে অভিনয় করেছিল। কিন্তু তাতে লাভ হল কি, তাই ভাবছিলাম।

আবার আসব, সুবিধে পেলেই আসব, বলে বিদায় নিলাম। মনে হল, না এলেই হত। যা চোখে লেগে ছিল সেইটেই ভালো ছিল, চোখে দেখে না গেলেই হত আজ।

কল্যাণ বলল, "কিভাবে আছি দেখলে? কোনো রোজগার নেই। ঐ মেয়েটার আয়ই ভরসা।"

"তোমার বুঝি ঐ একটি মাত্রই মেয়ে?"

কোনো উত্তর দিল না কল্যাণ। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন পার হয়ে হাজরা রোডে এসে পড়লাম। এখানে জীবন্ত মানুষেরা চলাফেরা করছে। মনে হল, একটা নির্জীব পৃথিবীর প্রান্তে যেন নির্বাসিত হয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। এখানে এখন বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পেরে একটু আরামই লাগছিল।

কল্যাণ কোনো উত্তর দিল না দেখে বললাম, "ওকে অভিনয়ের লাইনে নাই-বা আনলে।"

"কার কথা বলছ। লিলি?" জিজ্ঞাসা করল কল্যাণ।

"হ্যাঁ। তোমার মেয়ের কথাই বলছি।"

হঠাৎ থেমে গিয়ে, যেন গোপন কথা বলছে, এমনি ভাবে সে বলল, "আমার মেয়ে নয় ও।"

গ্যাসপোস্টের গায়ে একটা হাত রেখে দাঁড়ালাম, বললাম, "তোমার মেয়ে না? তোমাকেই তো—"

"বাবা বলে ডাকে। কিন্তু বাবা হচ্ছে সেই গ্রেট অ্যাক্টর জীবেন মুস্তাফি। লাস্ট ইয়ারে মারা গেছেন।"

বললাম, "ওঃ, তাই একটা ছবি দেখলাম বুঝি তোমার ঘরে?"

কল্যাণ বলল, "ইয়েস। ঠিক ধরেছ। বছর-তিন ওরা ছিল এক সঙ্গে, মনোরমার সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি বহুকাল। আরে, বছর পনেরো তো আমারই হয়ে গেল। তারও আগে থেকে। কিন্তু ও'র মারা

ছবি। এনে দিলাম। মেয়েমানুষের মন তো। তার উপর, মনোরমার মনটা, জানলে, ভীষণ সফ্‌ট্‌।"

একটা নিশ্বাস ফেললাম। এর উপরে কিছু বলা চলে না। কিছু বললামও না।

কিন্তু কল্যাণ বলল, "যার বাবা অ্যাক্টর, মা অ্যাক্ট্রেস, সে অভিনয় করবে না তো অভিনয় করব কি তুমি-আমি? তার উপর, বললাম যে, ওর উপরে আমাদের আপাততো ডিপেন্ড্‌ করতে হচ্ছে।"

"ওর বিয়ে হয়ে গেলে?"

কল্যাণ বলল, "উঁহু। ওর বিয়ে আমরা দেব না। আমারও ইচ্ছে না, ওর মায়েরও আপত্তি।"

"কিন্তু, মেয়েরও ইচ্ছে আছে!"

কল্যাণ হাসল, বলল, "ওর মায়ের ইচ্ছেই ওর ইচ্ছে। মায়ের খুব বাধ্য।"

এর উপরে কথা চলে না। তাই এ ব্যাপারে আর কিছু বললাম না। বললাম, "ওর উপরে ডিপেন্ড্‌ করা ছেড়ে দাও।"

"ছেড়ে দিয়ে?" জিজ্ঞাসা করল কল্যাণ।

বললাম, "তোমার প্রপার্টি। তোমার ভাবনা কি। রাজার হালে থাকতে পারবে।"

কল্যাণ বলল, "হাঁটো।"

হাঁটতে লাগলাম, কল্যাণ বলল, "মজাই তো ওখানে। আমার দাদারা আমাকে ঠকাতে চায়। এক কানাকড়ি দিচ্ছে না। বড় ভাড়া পাচ্ছে জানো? কিছু নাকি দেবে না কস্মিন্‌ কালেও। কি সব নাকি হিজিবিজি দলিল তৈরি করেছে। কেস্‌ করতে বসে মনোরমা। কিন্তু ভায়েদের সঙ্গে মামলা করা কি সাজে। বিপথে চলে গেছি বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব কি খুইয়েছি একেবারেই?"

"তবে কি করবে?"

"সেই তো ভাবনা। এই পথ ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেলেই অবশ্য সব রফা হয়ে যায়। ডাকেও আমাকে।"

পরামর্শ দিলাম, বললাম, "তবে ফিরেই যাও।"

আমার এই কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল কল্যাণ, বলল, "ডাক্তারও তাই বলে। কিন্তু মনুষ্যত্ব কি খুইয়েছি একেবারেই? আমি তো একটা পতঙ্গ, রূপ দেখেছি, ঝাঁপ দিয়েছি আগুনে। পাখা পুড়ে গেছে ভাই। তাই পিঁপড়ে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু যে আমার আশ্রয়ে আছে, আজ তাকে নিরাশ্রয় করতে বলো!"

"না। কিছু বলি না।"

"থ্যাংক ইউ। এই তো মানুষের মত কথা।"

কল্যাণ আমার হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, "এবার চলি। আবার দেখা হবে ভাই।"

পতিতুণ্ডি লেনের দিকে চলে গেল কল্যাণ।

"সাবধান দেবী দশভুজা,
মহিষাসুর আমি
দেবেন্দ্র বিজয়ী"
প্রতিবছর দুর্গাপূজার উৎসবে বাংলার
কোন এক গ্রামে যাত্রা গানের পালায় চন্দ্রমোহন
মহিষাসুরের পার্ট করে। সুগঠিত
স্বাস্থ্যবান, পেশীবহুল তার দেহ, একমাথা
মিশকালো বাবড়ীচুল নিয়ে, সে
যখন তার পার্ট উদাত্ত কণ্ঠে বলে, দর্শকদের
মধ্যে পড়ে হাততালি, উচ্ছ্বসিত
সে প্রশংসা পায় সকলের নিকট থেকে।
বহুবছর ধরেই চন্দ্রমোহন ওই পার্ট
করছে। আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়ে অনেক
কিছুই ওর বদলে গেছে। মাথার ওই
ঘনকালো বাবড়ীচুল ছাড়া। এর কারণ চন্দ্রমোহন
চুলে নিয়মিত ব্যবহার করে
পৃথিবীর সর্বত্র প্রশংসিত হেয়ার
অয়েল ও হেয়ার ডার্কেনার
একমাত্র প্রতিনিধি ও রপ্তানীকারক :
এম. এম. কাম্বাটওয়ালা, আমেদাবাদ। (ভারত)
প্রতিনিধি : সি. নরোত্তম এ্যাণ্ড কোং বোম্বাই—২।
MPS

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

উপেন্দ্রনাথ দাস-কৃত "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক" অপকৃষ্ট রচনা না হইলেও বড় উৎকৃষ্ট রচনাও নয়। বোধহয় ইহাকে একখানি মোটামুটি ভাল নাটকও বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ইহার বিশিষ্ট স্থানটি এখন নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। সে প্রসঙ্গ আমরা না তুলিলে অন্যে তুলিবে না। উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে জাতীয়তা বোধ প্রবল কিন্তু জাতিবৈর নাই যিনি ইহা বলিবেন তাঁহাকে "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" পড়িতে বলি। ঐ নাটকের মূলভাব জাতিবৈর। উহার এক দৃশ্যে ইংরাজের কারাগারে একজন বিদ্রোহী বন্দীর হাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডল সাহেব নিহত হইলেন। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় দি নিউ এরিয়ান থিয়েটারে ১৮৭৫ সালের ২৯এ আগস্ট। ইহার ১৫ বৎসর পূর্বে "নীলদর্পণ" নাটকের ইংরাজী অনুবাদ প্রচারের অপরাধে লং সাহেবের কারাদণ্ড হয়। ৮ বৎসর পূর্বে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা। ইহার ঠিক পূর্ব বৎসর ভোলানাথচন্দ্র "মুখার্জি'স ম্যাগাজিন"এ লিখিলেন বিলাতি কাপড় বর্জন করিয়া ম্যাঞ্চেস্টারকে বিকল করিতে হইবে। এবং ইহার ৩২ বৎসর পর বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের আরম্ভ।

ইংরাজ সরকার এই নাটকের বিষয় দেখিয়া রুষ্ট হইলেন। সমস্ত দেশে তখন ইংরাজ-বিদ্বেষের বড় প্রাদুর্ভাব। ইংরাজ রাশিয়ার বিক্রমে কিঞ্চিৎ সন্ত্রস্ত। কলিকাতার বাংলা সংবাদপত্র শাসকের সন্ত্রাসভাবে খুশী। বাংলা-বিহারের দুর্ভিক্ষ (১৮৭৩-৭৪), লর্ড মেয়োর আয়কর (১৮৭০) স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের পথ-কর (১৮৭১) প্রভৃতিতে মধ্যবিত্ত সমাজ পীড়িত। সরকারের বিরুদ্ধে তখন অভিযোগের অন্ত ছিল না।

অপরপক্ষে সরকারও নানাভাবে উদ্বিগ্ন। ১৮৭১এ কলিকাতায় একজন হাইকোর্টের জজ নিহত হইলেন। এই ঘটনার ৫ মাসের মধ্যে বড়লাট লর্ড মেয়ো এক মুসলমান আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাইলেন। মলহর রাওকে সিংহাসনচ্যুত করায় সারাদেশে ভারত সরকার নিন্দিত (১৮৭৫)। জানুয়ারী মাসে গাইকোয়াড়ের গ্রেপ্তারের কয়েকদিনের মধ্যেই "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখিলেন যে কর্ণেল ফেয়ারকে হত্যা করার চেষ্টা এমন কোন গর্হিত অপরাধ হয় নাই। এবং ঐ বৎসরই ভারত-সচিব লর্ড সলসবেরী বড় লাটকে লিখিলেন যে কলিকাতার দেশীয় সংবাদপত্রগুলি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াইতেছে এবং এমনকি ইংরাজ কর্মচারীর হত্যায় তাহারা উৎসাহ দিতেছে।

এইরূপ রাজনৈতিক পরিবেশে "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক" ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরেই আগস্ট মাসে কলিকাতার এক থিয়েটারে অভিনীত হয়। ১৮৮০ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুই সংস্করণেই আখ্যাপত্রে লেখকের নাম দুর্গাদাস দাস। ব্লুমহার্ট-সম্পাদিত ইণ্ডিয়া অফিসের বাংলা গ্রন্থের তালিকায় "সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর" উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে 'ইহা রাজপুরুষের অন্যায় আচরণের বর্ণনামূলক নাটক'। ঐ গ্রন্থাগারে দুটি সংস্করণই এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে দ্বিতীয় সংস্করণ রক্ষিত। চৈতন্য লাইব্রেরীর খণ্ডটি কোন সংস্করণ তাহা মুদ্রিত তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই। এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতিসমূহ লেখকদের নিজ সংগ্রহের এক অনির্দিষ্ট সংস্করণ হইতে দেয়া হইয়াছে। এই তিন সংস্করণে পাঠভেদ কিছু আছে বলিয়া লক্ষ্য করি নাই। তিনটিরই পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫।

দুর্গাদাস দাস যে উপেন্দ্রনাথ দাসেরই ছদ্মনাম তাহা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস"এ বলিয়াছেন। ১৮৭৫ সালের অক্টোবর সংখ্যায় "বেঙ্গল ম্যাগাজিন" ঐ নাটকের সমালোচনায় নাট্যকারের আসল নাম উল্লেখ করেন। "প্রতিমা" পত্রিকার ১৩০৭এর শ্রাবণ সংখ্যায় 'বঙ্গকৃতা' প্রবন্ধেও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর" লেখক হিসাবে উপেন্দ্রনাথের পরিচয় দেয়া হইয়াছে।

উপেন্দ্রনাথ দাসের অপর দুইখানি নাটক➡

"শরৎ-সরোজিনী" (১৮৭৪) এবং "দাদা ও আমি" (১৮৮৯) এখন দুষ্প্রাপ্য। প্রথম নাটকখানি ৫ মাসের মধ্যে কলিকাতার বিভিন্ন থিয়েটারে সাতবার অভিনীত হয়। নানা পত্র-পত্রিকায় এই নাটকের সমালোচনা পড়িয়া অনুমান করিতে পারি বাঙালী পাঠকের কাছে ইহার কিছু আদর হইয়াছিল। "দুই একখানি ব্যতীত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক একখানিও অদ্যাবধি বাহির হয় নাই" ("অমৃতবাজার পত্রিকা"); 'এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নাটক বাংলা ভাষায় অল্প আছে ("প্রতিধ্বনি"); 'গ্রন্থকার নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় নাট্যোল্লিখিত পাত্রদিগের চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন' ("সোম প্রকাশ"); 'উপস্থিত নাটকখানিতে তিনি যে কল্পনাশক্তি ও মানবচরিত্র চিত্রণের ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসাযোগ্য ("সাপ্তাহিক সমাচার"); 'সরোজিনী তাঁহার প্রথম কন্যা, বঙ্গীয় নাটকের অন্ধকার মধ্যে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে বলিতে হইবে' ("সাধারণী"); 'এখানি যে একখানি উচ্চদরের নাটক হইয়াছে, সে পক্ষে সংশয় নাই' ("এডুকেশন গেজেট"); 'বঙ্গভাষায় প্রতি বৎসর এইরূপে একখানি নাটক প্রকটিত হইলে, আমরা যারপরনাই সৌভাগ্য বিবেচনা করিব' ("বান্ধব")। এই সমসাময়িক প্রশংসায় অত্যুক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে উপেন্দ্রনাথের নাটক সে কালে উপেক্ষিত হয় নাই।

উপেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সামান্য তথ্যও আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানি না। শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিত"এ তাঁহার বিধবা-বিবাহের বিবরণে অবশ্য কিছু সংবাদ পাইতেছি। উপেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভের কিছু পর তিনি পিতার সহিত বিবাদ করিয়া বিলাতে পলায়ন করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কলিকাতার সমাজ সংস্কারক দলের একজন নেতা বলিয়া গণ্য হয়েন। ইন্ডিয়ান র‍্যাডিক্যাল লীগ নামক এক সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার [illegible] করিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, 'আমি... সর্বদা তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম ও উপেনের মুখনিঃসৃত ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কারের সুসমাচার হাঁ করিয়া গিলিতাম। সময়ে সময়ে আমি উপেনের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিতাম।'

১৮৬৮ সালের মাঝামাঝি উপেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। উহার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এক বিধবা রমণীকে দুই পক্ষের অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করেন। ত্যাজ্যপুত্র হইয়া উপেন্দ্রনাথ দারুণ অর্থকষ্টে পড়িলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ও শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতির সাহায্যে কিছুকাল কলিকাতায় বাস করিয়া তিনি ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রের সঙ্গে [illegible] কাশী চলিয়া যান। ইহার পর কঠিন রোগে পড়িয়া স্ত্রী ও একটি শিশু পুত্র সহ কলিকাতায় শিবনাথ শাস্ত্রীর আশ্রয় ভিক্ষা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরোধে শ্রীনাথ দাস পীড়িত পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হন।

"দাদা ও আমি" নাটকের বিজ্ঞাপনে উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন 'প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পূর্বে মাতৃভূমি [illegible] এই নাটক রচিত হয় [illegible] এবং বিজ্ঞাপনের তারিখ [illegible] ১৮৮৮। ইহাতে মনে হয় "শরৎ-সরোজিনী" রচনার কয়েকমাস পরেই অর্থাৎ ১৮৭৬ সালের মার্চ

মাসের পর কোন সময় তিনি বিদেশ যাত্রা করেন। "দাদা ও আমি" নাটকে 'প্রকাশকের নিবেদন'এর তারিখ ২রা ডিসেম্বর ১৮৮৮ এবং উহাতে তিনি লিখিয়াছেন 'বহু দিবসের পর প্রিয় জন্মভূমির সন্দর্শন লাভ করিয়াছি।' ধরিয়া লইতে পারি ১৮৮৮ সালের কোন সময়ে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। নামের পাশে ঠিকানা (১৭ শ্রীনাথ-দাসের গলি) দৃষ্টে বুঝি তিনি পিতার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন নাই। (বর্তমান লেখক একখণ্ড "দাদা ও আমি" ঐ বাড়ি হইতে উপহার পাইয়া কৃতার্থ।)

"পূর্ণিমা"র 'বন্ধুকৃত্য' প্রবন্ধে উপেন্দ্রনাথের চরিত্রের যে পরিচয় পাই তাহা শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্তির অনুরূপ। উপেন্দ্রনাথের বন্ধু (বোধহয় কামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) লিখিয়াছেন : 'পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় যেটুকু মন্দ আছে উপেন্দ্রনাথ তাহা পুরোপুরি পাইয়াছিলেন; সভ্যতার উজ্জ্বল আবরণের ভিতর এমন একটা অন্ধকার অংশ তাঁহার ছিল যাহা বাহিরে বাহির করিবার একেবারেই যোগ্য নহে। কিন্তু আমার বোধহয় এই হীনতার জন্য উপেন্দ্রনাথ যতটা সমাজে প্রায় ততটা নহে। এই হীনতার জন্য তাঁহার দুর্ভোগ বড় কম হয় নাই। বিলাতে হাসপাতাল ও জেল দুই স্থানে তাঁহাকে বহুদিন কাটাইতে হইয়াছে। দেশে ফিরিয়া ও সুখ শান্তি ভাগ্যে জোটে নাই।

"সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকের কাহিনী ইংরাজ শাসকের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর বৈরভাবের কাহিনী। ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেন্ডেল উচ্ছৃঙ্খল, দুরাচার। তিনি নায়ক সুরেন্দ্রের নিকট হইতে ছয় হাজার টাকা ঋণ করিয়া তাহা অস্বীকার করিলেন। সুরেন্দ্র সাক্ষীর কথা তুলিলে তিনি বলিলেন :

'আমি বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথপূর্বক যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের দুইশত বাঙ্গালীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না।' দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে স্টিফেন সাহেবের নূতন বিধি' সম্বন্ধে কটাক্ষ হইতে বুঝিতে পারি উপেন্দ্রনাথ এই চৌরি ল মেম্বারের বিধি ব্যবস্থার কটু সমালোচনার কথা স্মরণ করিয়াই ম্যাক্রেন্ডেলকে মিথ্যা মামলা দায়ের করার অপরাধে অপরাধী বলিয়া দেখাইয়াছেন। স্যার জেমস স্টিফেনের (১৮২৯-১৮৯৪) কার্যকালের মধ্যেই এভিডেন্স এ্যাক্ট এবং সংশোধিত ক্রিমিনাল প্রোসিডিয়োর কোড পাশ হয়। ইনি পরে লর্ড লিটনের শাসন-নীতির সমর্থন করিয়া লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন।

আর একটি দৃশ্যে ম্যাক্রেন্ডেলকে বলিতে শুনি 'এ সকল সাধারণ উদ্যানে অর্ধ সভ্য বাঙ্গালীদিগের প্রবেশ নিষেধের নিমিত্ত একটা বিশেষ রাজনিয়ম বিধিবন্ধ হওয়া অতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমি

time of political excitement,
and I am not disposed
to look quite so
indifferently as Sir Wm
Herschelle at the recent
representation in Calcutta of the
Gaekwar trial —
again, the representation
of such plays as the
Nil Durpan would
be a serious evil —
The celebrated Nil
Durpan was I believe
revived some time
ago, and could have
done no good —

ল মেম্বর হবহাউসের নিকট লর্ড নর্থব্রুকের পত্রের অংশ

বরাবর বলিয়া আসিতেছি, উচ্চশিক্ষা বঙ্গ হইতে নির্বাসিত না হইলে, এই সমস্ত অশিষ্টাচারের মূলে কুঠারাঘাত হইবে না।'

ইহার পর ম্যাজিস্ট্রেট পাপাচারে লিপ্ত হইলেন। শেষে বিদ্রোহী কয়েদীর হাতে তাঁহার মৃত্যু।

এ নাটক ইংরাজ সরকারের কাছে বড় অশুভ ঠেকিল। ঐ সময় "নীলদর্পণ" নাটক প্রায়ই অভিনীত হইত। "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী"র প্রথম অভিনয়ের প্রায় তিন-মাস পূর্বে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গাইকোয়ার নাটক" অভিনীত হয়। সরকার ভাবিলেন কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ ক্রমে রাজদ্রোহের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। সংবাদপত্রে ইংরাজের নিন্দা, আবার নাটকেও ইংরাজের নিন্দা, ইহাতে ইংরাজ সরকার কি করিয়া টিকিবে?

কিন্তু ইহা বন্ধ করিবার উপায় কি কোন আইনের সাহায্যে এই অপরাধীদে শাস্তি দেয়া যায়? ১৮৭৬এর জানুয়ারীতে যুবরাজ (পরে সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতা উপস্থিত। জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ে

বাড়িতে তাঁহার অভিনন্দন লইয়া শহরে তখন ব্যঙ্গ-রসের অন্ত নাই। হেমচন্দ্রের 'বাজীমাৎ' "অমৃতবাজার পত্রিকায়" ছাপা হইল (২০শে জানুয়ারী ১৮৭৬) এবং ইহার ঠিক একমাস পরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে এই ঘটনা লইয়া লিখিত "গজদানন্দ ও রাজকুমার" নামে একটি প্রহসন অভিনীত হয় (১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬)। পুলিস এই প্রহসনের পুনরভিনয়ে আপত্তি করায় ২৩শে ফেব্রুয়ারী ভিন্ন নামে উহা অভিনীত হয়। পুলিস আবার আপত্তি করায় ২৬এ ফেব্রুয়ারী প্রহসনখানি "হনুমান চরিত্র" নামে মঞ্চস্থ হইল। তৃতীয়বার পুলিস এই অভিনয় বন্ধ করিতে আদেশ দিলে ১লা মার্চ উপেন্দ্রনাথ দাসের সম্মানার্থে পুলিসকে ব্যঙ্গ করিয়া "দি পুলিস অব পিগ এন্ড সীপ" নামে একটি প্রহসন উপস্থিত করা হয় এবং তাহার পর সেই রাত্রিতেই "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" অভিনীত হয়। (ঐ সময় পুলিস কমিশনার ছিলেন হগ সাহেব এবং পুলিস সুপার ছিলেন ল্যাম সাহেব) উহার পূর্বদিন (২৯শে ফেব্রুয়ারী) বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক এক অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন যে বাংলা সরকার 'মানহানিকর, রাজদ্রোহী ও অশ্লীল নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে।'

ইহার পর ৪ঠা মার্চ পুলিস গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর এবং আরো পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করিলেন। ৬ই মার্চ নর্দার্ন ডিভিসনের ম্যাজিস্ট্রেট ডিকেন্স সাহেবের এজলাসে ১লা মার্চ "সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর" ন্যায় একখানি 'অশ্লীল' নাটকের অভিনয় করার অপরাধে ইঁহাদের অভিযুক্ত করা হয়। ৮ই মার্চ উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল বসু একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

৯ই মার্চ উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিলেন। ২০শে মার্চ হাইকোর্টের দুই ইংরাজ জজ রায় দিলেন যে এ নাটকটিকে অশ্লীল বলা চলে না। উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল দুইজনেই মুক্তি পাইলেন।

পুলিসের অবশ্য আসল অভিযোগ ছিল নাটকটির রাজদ্রোহী ভাব সম্বন্ধে। কিন্তু সেই মামলায় সরকারের হার হইতে পারে এই আশংকায় অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হইল। ফিয়ার সাহেব ও মার্কবি সাহেবের বিচারে সে অভিযোগ গ্রাহ্য হইল না। ফিয়ার সাহেব গণিতে বড় পণ্ডিত, কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লেয়ার কলেজের ফেলো ও গণিতের অধ্যাপক। ইনি "দি ওরিয়ান ভিলেজ ইন ইণ্ডিয়া এন্ড সীলন" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। আর মার্কবি সাহেব ছিলেন অক্সফোর্ডের অল সোলস কলেজ ও বেলিয়ল কলেজের ফেলো এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার। ইনি দেশে ফিরিয়া অক্সফোর্ডে ভারতীয় আইন শাস্ত্রের রীডার নিযুক্ত হন এবং "লেকচারস অন ইণ্ডিয়ান ল" নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। এই দুই সম্মানিত ন্যায়পরায়ণ ইংরাজের সুবিচার বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সেদিন বাংলাদেশে ইংরাজ সরকার যেভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুনীতির দোহাই পাড়িলেন তাহা অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসে একেবারে নূতন নয়। এই বিষয় সম্বন্ধে সুপণ্ডিত নরম্যান সেণ্ট জন-স্টেভাস তাহার "অবসীনিটি এন্ড দি ল" নামক গ্রন্থে (১৯৫৬) লিখিয়াছেন : 'রঙ্গমঞ্চে অশ্লীলতা নিবারণের জন্য যখন সরকার আইন করিলেন তখন তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক" (পৃ ২১)। ফিল্ডিং পর পর দুইখানি নাটকে ওয়াল-পোলকে আক্রমণ করিলে ওয়ালপোল ১৭৩৭ সালে লাইসেন্সিং এ্যাক্ট পাশ করিয়া প্রতিশোধ লন। ফলে ফিল্ডিং নাটক ছাড়িয়া উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন।

প্রাচীন গ্রীসে অবশ্য কট চালের প্রয়োজন হইল না। এ্যারিস্টফানিসের "লিসিসট্রাটা" (খৃঃ পূঃ ৪১১) যেমন অশ্লীল তেমনই সরকারী নীতিবিরোধী। কিন্তু সরকার নীতির দোহাই দিয়া নাট্যকারের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহার ১৫ বৎসর পূর্বে এ্যারিস্টফানিস যখন এথেন্সের যুদ্ধনীতির সমালোচনা করিয়া "বেবিলোনিয়ানস্" নাটক লেখেন তখন ক্রিয়োনের সরকার রাজনৈতিক কারণেই তাঁহার বিচার আদেশ করেন।

লর্ড নর্থব্রুক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া এই বিষয়ে একটি আইন পাশ করিবার জন্য তৎপর হইলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভারত সচিবের সঙ্গে আফগাননীতি ও ম্যানচেস্টারের কাপড়ের উপর শুল্ক লইয়া মতান্তর হইলে নর্থব্রুক পদত্যাগ করেন। ১২ই এপ্রিল ১৮৭৬ লর্ড লিটন বড়লাট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ঐ বৎসরের শেষে ড্রামাটিক পারফরমেন্স কন্ট্রোল এ্যাক্ট পাশ হয়। তখন বাংলার ছোটলাট রিচার্ড টেম্পল, সুপ্রীম কাউন্সিলের ল মেম্বর হবহাউস। বিলাতে প্রধানমন্ত্রী তখন ডিজরেলি এবং ভারত সচিব লর্ড সলসবেরী। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ কতখানি পীড়িত

বোধ করিয়াছিলেন তাহা ঐ বৎসরের ১৪ই ডিসেম্বরের "অমৃতবাজার পত্রিকার" মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারি:

'এ আইন বিধিবদ্ধ না হয় এই জন্য অনেক আবেদন প্রদত্ত হয়, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাতে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। যুবরাজ যদি এখানে না আগমন করিতেন তাহা হইলে হয়ত এ আইনটি বিধিবদ্ধ হইত না।...ইহার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর আর একটি শাসন স্থাপন করিলেন'।

ন্যাশনাল আরকাইভস্‌এ এই আইন সম্বন্ধীয় কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করিবার সুযোগ হইয়াছিল। উহার মধ্যে বুঝিবা প্রায় সমস্ত কাগজের ছবি আনিয়াছি।

১৮৭৫এর ৯ আগস্ট তারিখে লিখিত সেক্রেটারীর নিকট নর্থব্রুক ও সুপ্রীম কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যের পত্র হইতে জানিলাম যে "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী"র প্রথম অভিনয়ের অর্থাৎ ঐ বৎসরের ১৪ই আগস্টের প্রায় ১৮ মাস পূর্ব হইতেই সরকার রাজদ্রোহমূলক বা ইংরাজ-বিরোধী নাটকের অভিনয় বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। তারপর ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "চা-কর দর্পণ নাটক" এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গাইকোয়ার নাটকের" কাহিনী শুনিয়া স্যার রিচার্ড টেম্পল প্রীত হইলেন না। তিনি সরকারী অনুবাদককে দিয়া দুইখানি নাটকের অনুবাদ করাইয়া লর্ড নর্থব্রুককে পাঠাইলেন। ২৭শে জুলাইএর এক কনফিডেন্সিয়াল নোটে বড় লাট হবহাউসকে লিখিলেন যে চা-কর দর্পণ নাটক মানহানিকর এবং এইরূপ নাটকের অভিনয় বন্ধ করিবার জন্য আইন করা প্রয়োজন। ঐ নোটের উপর সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য আরবাথনট মন্তব্য করিলেন যে গ্রন্থের প্রথম ছবিখানি যেমন মানহানিকর তেমন অশ্লীল। এই লিথো ছবিতে চা-কর সাহেব কর্তৃক কুলী রমণীর নির্যাতন দেখান হইয়াছে। গাইকোয়ার নাটকের উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিলেন যে এরূপ রাজনৈতিক নাটকের অভিনয় একান্ত অবাঞ্ছনীয়। "নীলদর্পণ" নাটক যে কলিকাতায় আবার মঞ্চস্থ হইতেছে তাহাতেও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৮৭৫এর ২১শে আগস্ট এই আড়াই বছরের মধ্যে কলিকাতার বিভিন্ন থিয়েটারে "নীলদর্পণ" ১৬ বার অভিনীত হয়। "গাইকোয়ার নাটক" এর অভিনয় হয় বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৫-এর ২২শে। "চা-কর দর্পণ নাটক" কোনদিন অভিনীত হয় নাই। কিন্তু ঐ নাটকখানিই বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। উহার ইংরাজী অনুবাদ ছাপাইয়া বিলাতের মন্ত্রীদের এবং সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যদের কাছে পাঠান হয়। লং সাহেব "নীল-দর্পণের" মাইকেলকৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া শাস্তি পাইয়াছিলেন। সটন-কার ঐ কার্যে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য নিগৃহীত হইয়াছিলেন। রিচার্ড টেম্পল অবশ্য মাত্র কর্তৃপক্ষ মহলেই এই ইংরাজী "চা-কর দর্পণ" বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু বইখানি 'প্রকাশ' করিয়া ইংরাজ পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতে না পারিয়া ছোটলাট একটি অসুবিধার মধ্যে পড়িলেন। "নীল দর্পণ" নীলকরগণ পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহারাই ওয়ালটার ব্রেটকে দিয়া লংএর বিরুদ্ধে মামলা

করাইয়াছিলেন। কিন্তু "চা-কর দর্পণ"-এর ইংরাজী চা-করের হাতে পৌঁছিল না। ১৮৭৫এর ২০শে জুলাই তারিখের এক পত্রে রিচার্ড টেম্পল বড়লাটকে লিখিলেন যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি নাট্যকারের বিরুদ্ধে মামলা আনিতেন তাহা হইলে কাজ হইত এবং এমন কোন আইন নাই যাহার বলে সরকার এইরূপ নাটকের প্রকাশ বা অভিনয় বন্ধ করিতে পারে।

সমস্ত চিঠিপত্র পড়িয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যুবরাজের অভ্যর্থনা লইয়া রচিত প্রহসনের সঙ্গে ড্রামাটিক পারফরমেন্স কণ্ট্রোল এ্যাক্টের সম্পর্ক গৌণ। অমৃতবাজার পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছিলেন যে যুবরাজ এদেশে না আসিলে এই আইন হইত না। এ কথা যে যথার্থ নয় রিচার্ড টেম্পলের পত্র হইতে প্রমাণিত হয়। "চা-কর দর্পণ নাটক", "গুইকোয়ার নাটক" ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক" এই তিনখানি গ্রন্থ সরকারের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম নাটকে ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়ের কুৎসা। দ্বিতীয় নাটকে দেশীয় রাজা সম্বন্ধে ইংরাজের মতলবের সমালোচনা। তৃতীয় নাটকে ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটের কলঙ্ক। অবশ্য "গুইকোয়ার নাটক" খুব মারাত্মক বলিতে পারি না। প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের কমিশনার জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হার্সেলের পৌত্র উইলিয়াম হার্সেল এই নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ইহার ভাষায় আপত্তিকর কিছুই নাই। এই হার্সেল সাহেবই ১৫ বৎসর পূর্বে কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে রায়তের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য নীলকর সমাজে নিন্দিত হইয়াছিলেন। তবে মলহর রাও-এর ব্যাপার লইয়া কলিকাতায় কেহ সরকারের নিন্দামন্দ করে তাহা নর্থব্রুক চাহিলেন না। ঐ ১৮৭৫ সালে এই গুইকোয়ারের ব্যাপার লইয়া চারখানি নাটক রচিত হয়। অপর তিনখানি অমৃতলাল বসুর "হীরকচূর্ণ নাটক", উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের "গুইকোয়ার নাটক" এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গুইকোয়ার বিলাপ"।

বাংলা নাটকে ইংরাজ বিদ্বেষ, রাজদ্রোহ-ভাবটি যখন গাঢ় হইয়া উঠিতেছে তখন যুবরাজ কলিকাতায় উপনীত হইলেন। মনে হয় প্রহসনে রাজভক্ত জগদানন্দবাবুকে বিদ্রূপ করা হইতেছে দেখিয়া আইন প্রণয়নের কাজটি কিছুটা ত্বরান্বিত হইয়াছিল। ১৮৭৬এর এপ্রিলে লর্ড লিটন দেখিলেন আইনটি পাশ করিবার প্রায় সব ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। নাটকে স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার পথ রোধ করিয়া তিনি দেশীয় সংবাদপত্রের দিকে দৃষ্টি দিলেন। ১৮৭৬এর ড্রামাটিক পারফরমেন্স কণ্ট্রোল এ্যাক্ট এবং ১৮৭৮এর ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট একই নীতির দুইটি নিদর্শন। দ্বিতীয় আইনটি বাংলাদেশের সংবাদপত্রসেবীর প্রতিভা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী সাংবাদিক যাহা বাংলায় লিখিতে বাধা পাইলেন তাহা ইংরাজীতে লিখিলেন। আর এ আইন চার বৎসর পর লর্ড রিপন রহিত করেন। কিন্তু প্রথম আইনটি বাংলা নাট্য সাহিত্যের কিছু ক্ষতি করিয়াছে। বাঙালীর রাজনৈতিক ভাব প্রবল এবং ঐ ভাব লইয়া রচিত গান ও কবিতা বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। ঐ ভাব লইয়া বাঙালী নাট্যকার মহৎ নাটক সৃষ্টি করিতে পারিতেন কিনা জানি না। কিন্তু "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকে যে সাহস ও কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাই তাহার উৎকৃষ্টতর প্রকাশের পথ এই আইন বন্ধ করিয়া দিল।
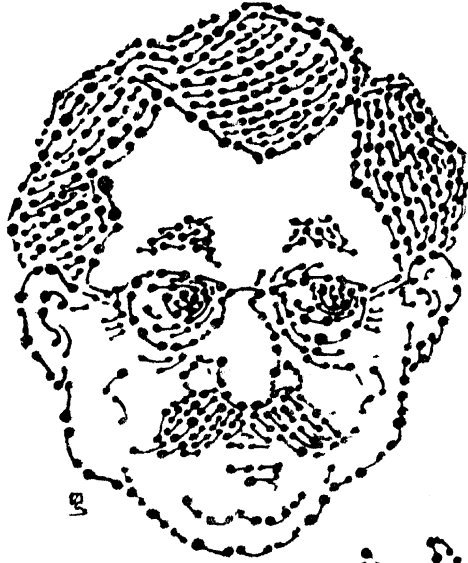
এবার উঠলেন শশাঙ্ক বাগচী। বিপদবারণ, আসামীতারণ। তালিমারা বিবর্ণ গাউনটা অঙ্গে [illegible] চশমাটা কপালের ওপর থেকে নাকের ওপর নামিয়ে আনলেন। এটা রুদ্র রূপের বিকাশ। সাক্ষীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের অবস্থা।

মফস্বল কোর্ট, কিন্তু শশাঙ্ক বাগচী দাঁড়ালে ভিড় জমে যায়। জেরার চিমটে দিয়ে অঙ্গগুলোয় মোচড় দেন আর সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীর অবস্থা কাহিল হয়। এলোমেলো কথাবার্তা বের হয়, সত্যি মিথ্যায় একাকার। ঠিক যা চান শশাঙ্ক বাগচী, সাক্ষী সেই কথাই বলে।

অবশ্য এ মামলাটা জোরালো নয়। এমন মামলায় শশাঙ্ক বাগচী সচরাচর ব্রিফ নেন না। ডাকাতি, রাহাজানি, খুন এ সবেই শশাঙ্ক বাগচীর নাম। অল্প রক্তে তাঁর পেট ভরে না। ছোট শিকারের ওপর তাই লোভও কম।

পকেট মারার ব্যাপার। বাসে অন্নদা পাকড়াশীর পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলে নিয়েছে আসামী। স্রেফ হাত সাফাইয়ের খেলা। ব্যাগে মোটা টাকা ছিল। প্রায় নশোর কাছাকাছি। আসামী ধরা পড়েছে। বামালসমেত নয়, ব্যাগ সে অন্য হাতে পাচার করে দিয়েছে।

তবে সাক্ষী আছে। জোরদার সাক্ষী। যারা দেখেছে আসামীকে অন্নদার ঘেঁষা-ঘেঁষি দাঁড়াতে। একজন, একবার যেন আসামীর হাতটা অন্নদার পকেটের কাছাকাছি যেতেও দেখেছিল। সেই গোলমালের পরেই আসামী বাস থেকে নেমে পালাবার চেষ্টা করছিল এমন ব্যাপারও এক সাক্ষী দেখেছে।

শশাঙ্ক বাগচী মিনিট খানেক চোখ বন্ধ করে রইলেন। অভিজ্ঞ লোকেরা বলে এই সময়টুকু তিনি মামলাকালীর নাম জপ করেন। রথতলার বিরাট বিগ্রহ। একেবারে জ্যান্ত। যেতে আসতে শশাঙ্ক বাগচী সাইকেল রিক্সা থামিয়ে প্রণাম করেন। একাগ্রচিত্তে। তাঁর পশারের মূলমন্ত্র ওইখানেই।

সাক্ষীর খাঁচায় অবনীমোহন ভড়। সেও ওই একই বাসে ফিরছিল। মদনতলার মেলা থেকে। দেখেছে আসামীকে অন্নদা পাকড়াশীর গা ঘেঁষে দাঁড়াতে। একবার যেন আসামীর হাতটা অন্নদার পকেট বরাবরও দেখেছিল।

আপনি মেলায় গিয়েছিলেন কেন অবনীমোহনবাবু? শশাঙ্ক বাগচী খুব মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

আজ্ঞে মেলায় আর মানুষে কি করতে যায়। অবনীমোহন খুব বিজ্ঞের মতন উত্তর দেবার চেষ্টা করল। তারিফ পাবার আশায় একবার ম্যাজিস্ট্রেটের দিকেও চাইল।

অনেক কারণে যায় অবনীমোহনবাবু। গরু বেচতে যায়, গরু কিনতে যায়। কেউ পুঁতির মালা কেনে, কেউ বেগুনী ফুলুরী খায়, আবার কেউ খাপরার ঘরের দিকে ঘোরাফেরা করে।

মুখে একটি আঁচড়ও পড়ল না। কোন ভাব নয়। কাশীদাসের মহাভারত থেকে শশাঙ্ক বাগচী যেন পড়ে গেলেন খানিকটা।

অবনীমোহনের মুখ পাংশু। মাথা নিচু করে বলল, আজ্ঞে গুড় কিনতে গিয়েছিলাম। তালের গুড়।

শশাঙ্ক বাগচীর দুটো চোখ খঞ্জন পাখীর মতন নেচে উঠল। চামর গোঁফের ওপর আলতো একবার হাত বুলিয়ে বললেন, মেলা থেকে ফেরার সময় বাস কি একেবারে খালি ছিল ভড় মশাই?

এবার অবনীমোহন সতর্ক হয়ে রইল। যেটুকু জিজ্ঞাসা করছে, সেটুকু বলাই ভাল। নয়তো কোথায় কি ভুল হয়ে যাবে, তারপর ভুলের খেসারৎ দিতে প্রাণান্ত।

অবনীমোহন হাসল, আজ্ঞে মেলার বাস খালি পাওয়া যায়? বাসের চালে পর্যন্ত লোক।

আপনি কোথায় ছিলেন—চালে না ডালে? শশাঙ্ক বাগচীর গলা বেশ গম্ভীর।

ম্যাজিস্ট্রেট হাসলেন, চালে তো বুঝলাম, ডালেটা কি মিস্টার বাগচী? সাক্ষী ঠিক বুঝতে পারছে না।

আজ্ঞে চালে হল বাসের মটকায়, আর ডালে হল পাদানীতে আর মাড গার্ডে।

আজ্ঞে আমি ভেতরেই ছিলাম। বসার সীট পাইনি, দাঁড়িয়েই ছিলাম।

হাতে গুড়ের ঝোলা? সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক বাগচীর প্রশ্ন।

আজ্ঞে। অবনীমোহনকে যেন একটু বিমর্ষ দেখাল। বেশ একটু সাজগোজ করে এসেছে সাক্ষ্য দিতে। রুমালে একটু গন্ধও মেখেছে। হুজুরের নাকে যাচ্ছে কিনা কে জানে। তা ছাড়া ভায়রাভাই এসেছে চাঁপাতলা থেকে। কোর্টে বসে আছে। তার সামনে গুড়ের ঝোলার কথাটা উকিল না তুললেই পারতেন।

মুখে নয়, ঘাড় নেড়ে অবনীমোহন উত্তর দিল।

ভিড়ের চাপে গুড়ের ঝোলা সামলাতে খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কেমন?

আবার ঝোলার কথা। বিরক্ত অবনীমোহন তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সারাক্ষণ ঝোলার দিকেই নজর রাখতে হয়েছিল? শশাঙ্ক বাগচী আবার দুটো চোখ নাচালেন। অপরূপ ভঙ্গীতে।

তা তো নিশ্চয়। অবনীমোহন এবার সোজাসুজি চাইল উকিলের দিকে, সরকারী উকিলের।

কিন্তু আমার তো মনে হয় আপনার চোখ নিজের গুড়ের ঝোলার দিকে না থেকে পরের পকেটের দিকেই ছিল।

অবনীমোহন চটল। স্পষ্ট দেখল ভায়রাভাই মুখ টিপে হাসছে।

তার মানে? অবনীমোহন সরাসরি শশাঙ্ক বাগচীকে জিজ্ঞাসা করলে। কোর্টে যেন বোমা ফাটল। একটা হাত টেবিলের ওপর সজোরে ঠুকে শশাঙ্ক উকিল গর্জন করে উঠলেন। তা না হলে বাসের মধ্যে কার হাত কার পকেটে যাচ্ছে সেদিকে নজর গেল কী করে?

অবনীমোহন নিরুত্তর।

আপনি আর অন্নদাবাবু পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন, তাই না? দুজনে গল্প করতে করতে আসছিলেন?

আজ্ঞে না, গল্প করতে করতে আসব কি। আমি এক মাথায় আর তিনি আর এক মাথায়।

মাঝখানে ফাঁকা? শশাঙ্ক বাগচী ছোট্ট একটা হুল ফোটালেন।

ফাঁকা কি আজ্ঞে। ভিড়ে মানুষ একেবারে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা।

তার মাঝখান থেকেও অবনীবাবু আপনি ঠিক দেখতে পেলেন, আসামী অন্নদা পাকড়াশীর পকেটের দিকে হাত বাড়াচ্ছে?

অবনীমোহন ঢোক গিলল বার দুয়েক। চোখ পিট পিট করল অনেকবার, তারপর বলল, ওই চোখে পড়ে গেল আজ্ঞে।

শশাঙ্ক বাগচী গাউনটা বাদুড়ের ডানার মতন প্রসারিত করলেন। ভঙ্গীটা যেন ওড়বার মতন। এ সব কোর্টে গাউন লাগে না, কিন্তু গাউন ছাড়া শশাঙ্ক বাগচীকে কল্পনাও করা যায় না। কেউ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, কি জানি, গাউন ছাড়া বড় অসহায় মনে হয়।

আর কোন জেরা নেই ভেবে অবনীমোহন নেমে যাচ্ছিল, হঠাৎ শশাঙ্কবাবুর চিৎকারে থমকে দাঁড়াল।

শশাঙ্ক বাগচীর দিকে চাওয়া যায় না। চশমাটা হাতের মুঠোয়। দুটি চোখ রক্তাভ। একটা পা পাশের চেয়ারে।

মেলায় গুড় কিনেছিলেন অন্নদা পাকড়াশীর দোকান থেকে। হ্যাঁ কি না বলুন?

ভিজে, স্যাঁতসেতে গলায় অবনীমোহন বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

নগদ দাম দেননি, বাকিতে কিনেছিলেন, ঠিক কিনা?

অবনীমোহন কড়িকাঠের দিকে নজর দিল। না, সেখানে কোন অবলম্বন নেই। আবার চোখ ফেরাল সরকারী উকিলের দিকে। তিনি সজোরে পেন্সিল চিবোচ্ছেন।

কি, চুপ করে রইলেন কেন? ধর্মাবতারদের দিকে চেয়ে উত্তর দিন।

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে অবনীমোহন বলল, হুজুরে বাকিতে। ওঁর সঙ্গে আমার বহুদিনের লেনদেন।

কাজেই অন্নদাবাবু আপনার মহাজন, তাঁকে চটানো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

এতক্ষণ পরে, এই প্রথম অবনীমোহন এক গাল হাসল। হেসে বলল, তা কি পারি।

শশাঙ্ক বাগচী কোর্টের দিকে ফিরে বললেন, দ্যাটস্ অল, ইয়োর অনার।

দ্বিতীয় সাক্ষী পাঁচু ঘরামী। ফর্সা ফতুয়া, ময়লা ধুতি পরনে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। পায়ে বিরাট এক নাগড়া। পাঁচুর কে নয়, সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না। পাঁচুই আসামীকে জাপটে ধরেছিল। মোক্ষম ধরা। অনেক টানাটানি করেও আসামী ছাড়াতে পারেনি।

সরকারী উকিলের নির্দেশে পাঁচু গড়গড় করে সেদিনের ঘটনাটা বলে গেল। শশাঙ্ক বাগচী উঠতেই পাঁচু ঘাড় নিচু করে দাঁড়াল।

কি হল পাঁচু, মুখ তোলো।

পাঁচু ঘাড় নাড়ল, না, আজ্ঞে আপনার পানে চাওয়া বারণ। সব গোলমাল হয়ে যায়।

সবাই হেসে উঠল। ম্যাজিস্ট্রেট মুখে রুমাল চাপা দিলেন।

পঞ্চানন, শশাঙ্ক বাগচী গলায় মধু ঢাললেন, তুমি মেলায় গিয়েছিলে কেন?

আজ্ঞে বাঁশী কিনতে। পাঁচু মুখ তুলল না।

পঞ্চানন, তুমি বুঝি ভাল বাঁশী বাজাও?

পাঁচু একবার চোখ তুলেই তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিল চোখ। লজ্জারক্ত মুখে বলল, কি বাপ, তখন থেকে পঞ্চানন পঞ্চানন করছ। বুকের মধ্যে কেমন সুড় সুড় করে। পাঁচু বল, পেঁচো বল, বুঝতে পারি।

আচ্ছা পাঁচু তুমি বাঁশী বাজাও, তাই না।

সে আর নিজের মুখে কি বলব বাবু। নাদুর মাকে জিজ্ঞাসা করো।

কোর্টে হাসির হর্রা ওঠার আগেই পুলিস ধমক দিল। ম্যাজিস্ট্রেটও গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

বাঁশী কেনার পরে তুমি একবার ফকির মণ্ডলের দোকানে যাও নি পাঁচু।

নাও কথা, পাঁচু মুচকি হাসল, মেলায় যাব আর ফকির মোড়লের দোকানে যাব না তা কখনও হয়!

কতক্ষণ ছিলে পাঁচু।

তা ঘণ্টা দুয়েক। ফকির কি সহজে ছাড়ে! তা ছাড়া, গোবিন্দ, নেত্য, হরেরাম —একপাল বসেছিল সেখানে।

যখন বেরিয়ে এলে তখন শরীর ঠিক ছিল তো?

এই দ্যাখো, শরীরের আবার কি হবে? তবে পা দুটোকে নিয়ে মুস্কিল। মনে হচ্ছিল, সর্বদাই যেন ভূমিকম্প হচ্ছে।

বাসে অবনীবাবুকে দেখতে পেয়েছ? গুড়ের ব্যাপারী অন্নদা পাকড়াশীকে?

সেই অবস্থায় কখনও মানুষ চেনা যায় বাবু! সব যেন লেপে পুঁছে একাকার। সারা বাস যেন একটা জমাট মানুষের চাক।

তুমি তাহলে আসামীকে চিনতে পার নি।

পাঁচু সবেগে ঘাড় নাড়ল, আজ্ঞে না। পকেট মেরেছে, পকেট মেরেছে করে এক চিৎকার উঠল, আর দেখলাম লোকটা ভিড় ঠেলে নেমে যাচ্ছে, ব্যস ধরলাম খপ করে।

তা হলে পাঁচু, পকেট মারতে কাউকে তুমি দেখ নি?

আজ্ঞে একবার দেখেছিলাম কত্তা। নন্দীপুরে। ঝমাঝম বৃষ্টি। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছি। আরো লোক রয়েছে সেখানে, হঠাৎ দেখি ল্যাঙ্গপরা একজন—

আঃ, শশাঙ্ক বাগচী গলাটা চড়ালেন, নন্দীপুরের কথা থাক। বাসে পকেট মারার তুমি কিছু দেখনি।

না, তখন এসব ছোটখাটো ব্যাপারের দিকে নজর দেবার আমার সময় কই হুজুর। কানের কাছে কতরকমের গীতবাদ্য শুনছি। মনটা ভর হয়ে আছে। লোকে বলে চরসের নেশা।

শশাঙ্ক বাগচী চেয়ারে বসে পড়লেন।

খাঁচা থেকে নামতে নামতে সরকারী উকিলের দিকে চেয়ে পাঁচু হেসে বলল, দেখলেন হুজুর, একবারও ওদের উকিলের দিকে চোখ ফেরাই নি। যেটি শিখিয়ে দেবেন, সেটি জীবনে ভুলব না।

তৃতীয় আর শেষ সাক্ষী ননীবালা দাসী। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি।

খাঁচায় উঠে প্রথম ম্যাজিস্ট্রেটকে তারপর উকিলদের, সব শেষে কোর্ট ঘরে জমায়েত হওয়া সবাইকে ঘুরে ঘুরে নমস্কার করল। ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে বলল, [illegible]

তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন বাবা, চারটের বাসে আবার মেয়ে জামাই আসছে।

ননীবালা ওই বাসেই আসছিল, মেলা থেকে নয়, মেয়ের বাড়ি মুকুন্দপুর থেকে। মেয়ের শরীর খারাপ। ছেলেপুলে হবে তাই আনতে গিয়েছিল তাকে। কিন্তু দিনটা ভাল নয় বলে জামাই পাঠাল না। বলল, ছুটি নিয়ে পরে সে নিজে রেখে আসবে। জামাই মুকুন্দপুর হাসপাতালের কম্পাউন্ডার। খুব নাম ডাক। যাত্রাও করে ভারি চমৎকার।

সরকারী উকিল বহু কষ্টে ননীবালাকে থামালেন। এ একেবারে ধান ভানতে শিবের গীত। লাগাম ছাড়লে আর রক্ষা নেই। ননীবালা হয়তো থামবেই না।

শুনুন সেদিন বাসে কি হয়েছিল বলুন। হুজুরের দিকে চেয়ে সত্যি কথা বলুন।

ননীবালা হুজুরের দিকে ফিরলেন, জানেন বাবা, বাসে এক কাণ্ড। মেলা ছাড়িয়ে খানিকটা পথ এসেছি, হঠাৎ হৈ হৈ চিৎকার। বাসের মধ্যে এক পকেটমার। সর্বনাশের মাথায় পা। আমার আঁচলে গেরোতে টাকা বাঁধা ছিল আমি তাড়াতাড়ি আঁচল সামলালুম। কিছু বলা যায় না, পকেট মারতে পারে আর আঁচল মারতে পারে না।

সরকারী উকিল এগিয়ে গেলেন। খাঁচার কাছাকাছি। বললেন কার পকেট মারা গেল জানেন?

হ্যাঁ, একটি মোটা মতন বাবুর।

কি করে জানলেন?

ওমা, হায় হায় করে বুক চাপড়াচ্ছিল, তাতেই জানতে পারলাম।

কত টাকা গেছে কিছু শুনেছেন?

চেঁচাচ্ছে তো নশো টাকা গেছে বলে। লোকে একটু বাড়িয়েই বলে। গত বর্ষায় আমার বাড়ি থেকে যখন দুখানা কাঁসার থালা চুরি গেল, সবাইকে বলে বেড়ালাম রাজ্যের তৈজসপত্র চুরি গেছে।

আঃ, শুনুন, সরকারী উকিল একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন, যেটুকু জিজ্ঞাসা করছি সেটুকু উত্তর দিন। কে পকেট মেরেছে তাকে চেনেন?

ননীবালা আসামীর দিকে আঙুলে দেখাল, ওই যে দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্দরলোকের মতন সাজপোশাক, পেটে পেটে এই বিদ্যে।

সরকারী উকিল বসলেন। উঠলেন শশাঙ্ক বাগচী।

খুব মোলায়েম গলায় বললেন, চারটের বাসে আপনার মেয়েজামাই আসবে কাজেই তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে আপনাকে। যোগাড় যন্ত্র করতে হবে তো?

তা তো হবেই বাবা। একলা মানুষ তো।

তাহলে আমার কথাগুলোর চটপট জবাব দিন, দিয়ে চলে যান বাড়ি।

ননীবালা হেসে বলল, বল বাবা, তুমি আবার কি শুধোবে?

বলছিলাম, ওই যে বর্ষাকালে দুখানা কাঁসার থালা চুরি গেল আর আপনি বলে

সব গোলমাল হয়ে যায়

বেড়ালেন অনেক কিছু গেছে, এটা কি ঠিক হল? কথাটা মিথ্যে হল না?

থামো বাপু, এ বয়সে তুমি আর আমাকে ধম্ম শিখিও না। ভাল মানুষের কাল নয় এটা। ঘোর কলি। ঘোর কলি। চোখের সামনে দেখলুম যত মিথ্যেবাদী, হাড়-হাবাতেরা গুছিয়ে নিলে।

তা হলে দরকার পড়লে মিথ্যা কথা আপনি বলেন?

কেন, বলবো না কেন? সত্যি কথা বললে কে আমার ছাতা দিয়ে মাথা রাখবে?

আমি বলছি এ মামলার ফরিয়াদী অন্নদা পাকড়াশীর কাছ থেকে আপনি দশ টাকা পেয়েছেন। শশাঙ্ক বাগচী দুটো চোখ সোজাসুজি রাখলেন ননীবালার ওপর।

সরকারী উকিল লাফিয়ে উঠে আপত্তি জানাবার আগেই ননীবালা উত্তর দিয়ে ফেলল।

সকলকে বলে বেড়াচ্ছে বুঝি দশ টাকা দিয়েছে। তিন টাকা হাতে ঠেকিয়েছে। মামলা জিতলে বাকি দু টাকা দেবে বলেছে। আমার দাতাকর্ণ রে। দশ টাকা দেবার রাজাই বটে।

মামলা বলতে আর কিছু রইল না। ছেঁড়া ছাতায় যতটা বৃষ্টি ঢাকা যায়, সরকারী উকিল সাক্ষীদের ততটা দোষ ঢাকার চেষ্টা করলেন। দু একটা মোটা আইনের বই খুলে ম্যাজিস্ট্রেটকে পড়ে শোনালেন। সাক্ষীদের সরলতার সুযোগ নিয়েছেন আসামী পক্ষের উকিল, এমন অভিযোগও করলেন।

সরকারী উকিল বললেন মিনিট কুড়ি, শশাঙ্ক বাগচী ঝাড়া দেড় ঘণ্টা। তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে কি বিরাট একটা চক্রান্তের ফল এই মামলা, সে সম্বন্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। বিদেশী, সরলচিত্ত এক ব্যক্তি। বাসে জায়গা নিয়ে সামান্য বচসা, তাতেই তাকে পকেটমার আখ্যা দিয়ে, মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করে মামলা রুজু করা হয়। শুধু আদালতের সময়ের অপব্যবহারই নয়, আইন ও শৃঙ্খলার এমন ব্যাভিচার তুলনারহিত। অন্নদা পাকড়াশী ধনী ব্যক্তি, প্রতিপত্তিশালী। শুধু সাক্ষীদের জোরে একটা লোক নিরীহ আর একটা লোককে জেলে পাঠাবে, এই যদি আইন হয়, তবে সে আইন 'জঙ্গলের আইন', মনুষ্যসমাজের নয়।

এক উত্তেজিত মুহূর্তে শশাঙ্ক বাগচী নিজের মক্কেলকে নিপীড়িত যীশু খৃস্টের সঙ্গে তুলনা করলেন। অন্নদা পাকড়াশীর মতন লোক শুধু একটা জাতের বা দেশেরই নয়, বিশ্ব সভ্যতার কলঙ্ক।

শুধু যে আসামীকে মুক্তি দেবার আবেদন জানালেন তাই নয়, যে মিথ্যার প্রহসনটুকু এই আদালত গৃহে নির্লজ্জভাবে অভিনীত হল, তার প্রতিবিধান করা ধর্মাবতারের উচিত। শপথ গ্রহণ করে যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাদের কঠিন শাস্তি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, তা না হলে যে সত্যসেবক মহান পুরুষের প্রতিকৃতি আদালতের দেয়াল অলঙ্কৃত করে আছে, সেই পবিত্র-সত্তার অবমাননা করা হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট বেশী সময় নিলেন না। আড়াই পাতা রায়। আসামী বেকসুর খালাস।

শশাঙ্ক বাগচী কোর্টের বারান্দায় পৌঁছতেই আসামী তাঁর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লেন।

হুজুর মা বাপ। আপনার উপকার জীবনে ভুলব না।

শশাঙ্ক উকিল তাঁকে হাত ধরে তুললেন, আহা হা করেন কি মশাই। আমি আর কি করেছি। কতটুকু। সবই তাঁর খেলা।

দুটো হাত জড় করে তিনি নমস্কার করলেন। এবারেও মামলা-কালী।

আসামীর নাম হরনাথ। হরনাথ ঘোষ। মেলায় এসেছিলেন রাধাকৃষ্ণের মূর্তি কিনতে। কিনেও ছিলেন, কিন্তু ধাক্কা-ধাক্কিতে বাসে সে মূর্তি চুরমার হয়ে গেছে।

এই নিয়েই অন্নদা পাকড়াশীর সঙ্গে বচসা।

ভদ্রলোক অবনীবাবুর সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে কথা বলতে বলতে আসছিলেন, একেবারে পাশে হরনাথ। হরনাথবাবু প্রথমে

সাবধান করে দিলেন। মূর্তিটা এক হাত থেকে নিয়েছিলেন আর এক হাতে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নি।

আগের রবিবার অন্নদা পাকড়াশী কি বিরাট সাইজের মাছ ধরেছিলেন, হাত দিয়ে দেখাতে গিয়েই শ্রীকৃষ্ণের মাথা আর শ্রীরাধার পায়ের তলার পদ্ম ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

অবশ্য হরনাথবাবু নিজেকে সামলাতে পারেন নি। আড়াই ঘণ্টা চনচনে রোদে মেলায় ঘুরে, অনেক খুঁজে খুঁজে মূর্তিটা কিনেছিলেন। মনের মতন জিনিস। ভারি পছন্দসই। এভাবে সেটা নষ্ট হয়ে যেতে, অন্নদা পাকড়াশীর জামা চেপে ধরেছিলেন। ভালমন্দ দু একটা কথা বলেও ছিলেন।

অন্নদা পাকড়াশী প্রথমে একটু থতমত খেয়েছিলেন। জামাটা ছাড়াবার চেষ্টায় হরনাথবাবুকে দু একটা মোলায়েম ধাক্কাও দিয়েছিলেন, তারপরই বোধ হয় মগজে বুদ্ধি খেলে গেল। পকেট চেপে চেঁচিয়ে উঠলেন, চোর, চোর বলে। সঙ্গে সঙ্গে দু একটা চুলও ছিঁড়তে আরম্ভ করলেন। অবশ্য নিজের মাথার।

বেগতিক দেখে হরনাথবাবু বাস থেকে নেমে পড়ার চেষ্টা করলেন ভিড় ঠেলে, কিন্তু পারলেন না। নামার মুখে পাঁচু ধরামী তাঁকে সজোরে জাপটে ধরেছিল।

সব কথা হরনাথ ঘোষ বলেছিলেন শশাঙ্ক উকিলকে। গোপন কিছু নেই।

মুহুরীর কাছে খবর পেয়ে হাজতে গিয়েছিলেন। এ ধরনের ছিঁচকে কেসে সাধারণত শশাঙ্কবাবু দাঁড়ান না। মজুরী পোষায় না। অল্প দিনের ব্যাপার। অল্প ফি। কিন্তু তাকে মুহুরী প্রায় জোর করে নিয়ে গেল। সে কথা দিয়ে ফেলেছে, শশাঙ্কবাবুকে কথা রাখতেই হবে।

হাজতে আসামী শশাঙ্কবাবুর দুটো হাত জাপটে ধরেছিলেন।

বাঁচান আমাকে। আপনি ছাড়া আর গতি নেই। আমি বিদেশী লোক। বিপাকে পড়েছি। মিথ্যে করে আমাকে বিপদে ফেলেছে। আপনি মা বাপ।

শশাঙ্ক বাগচী সমস্ত মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তারপর বললেন, খালাসের কেস না হয় আমি নেব, কিন্তু আমার ফি আপনি দিতে পারবেন?

আসামী শশাঙ্ক উকিলের হাত ছেড়ে নিজের হাত জোড় করলেন।

খুব অসাধ্য যদি না হয় তো চেষ্টা করব।

শশাঙ্ক বাগচী ফিয়ের অঙ্কটা বললেন।

আসামী হাত জোড় করেই রইলেন। বললেন, দেব। আমায় যদি এই মিথ্যা কলঙ্ক থেকে বাঁচান, যা আমার সাধ্য দেব।

তাই ঠিক হল। আসামী একটা ঠিকানায় টাকার জন্য চিঠি লিখে দিলেন। রায় বেরোবার আগেই টাকা এসে যাবে।

যাবার সময় শশাঙ্ক উকিল অভয় দিলেন, চিন্তিত হবেন না। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। এ ধরনের ছোট কেস আমি ছুঁই না। কিন্তু আপনি বিপদে পড়েছেন, আপনাকে সাহায্য করা আমার একটা কর্তব্য।

শশাঙ্ক বাগচীর কথায় মুহুরী মুচকে মুচকে হাসল। এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন পতিতোদ্ধারের জন্যই পৃথিবীতে এসেছেন। জীবের যন্ত্রণা দূর করাই নরদেহ ধারণের উদ্দেশ্য। অথচ যে ফি হেঁকেছেন সেটা সচরাচর বড় বড় কেসেও পান না।

কার খেলা জানি না, কিন্তু উপলক্ষ্য আপনি। হরনাথবাবু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন।

শশাঙ্ক উকিল বার বার আড়চোখে হরনাথবাবুর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। শুধু কথায় যেমন চিঁড়ে ভেজে না, তেমনি নিছক প্রশংসাতেও উকিল গলে না। ফি কই। মোটা ফি দেবার কথা। অথচ একটি পয়সাও হাতে ঠেকায় নি।

হরনাথবাবু শশাঙ্ক উকিলের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। এটুকু বোঝা গেল কোর্টের আওতা থেকে বেরিয়ে তবে টাকাটা দেবেন।

বাঁধা সাইকেল রিক্সা শশাঙ্ক উকিলের সামনে এসে দাঁড়াতেই হরনাথবাবু হাত নেড়ে বারণ করলেন। শশাঙ্ক উকিলের দিকে ফিরে বললেন, একটা ঘোড়ারগাড়ি নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাব। আর বাসে উঠব না। পথে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।

তাতো হল, কিন্তু আসল জিনিসের কি হবে। অবশ্য মুখ ফুটে শশাঙ্ক উকিল বলবেন এক সময়ে। তাঁর অত চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। তবে নিজে থেকে এলেই ভাল হয়।

মুখ ফুটে বলতে হল না। গাড়িতে উঠেই হরনাথবাবু দুখানা নোট শশাঙ্ক উকিলের পকেটে গুঁজে দিয়ে বললেন, ও আর দেখবেন না শশাঙ্কবাবু। আপনার মেহনতের তুলনায় কিছুই নয়। হাজার টাকা দিলেও আপনার ঋণ শোধ হয় না।

শশাঙ্ক উকিল আগেই দেখেছিলেন। একশ টাকার দুখানা নোট। বুকটা শীতল হল এতক্ষণ পরে। এমন আসামীর জন্য খেটেও সুখ। বোঝা গেল ভদ্রলোকের পয়সা আছে। বিদেশে গোলমালে পড়ে গিয়েছিলেন, কোনরকমে উদ্ধার পেয়ে, কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

পথে যেতে অনেক কথা হল। ভদ্রলোকের নিবাস মালীপুরে। জমিজমা আছে। পৈতৃক বাড়ি আছে। বেশ কিছু ধান জমিও রয়েছে। সারা বছরের খোরাকের সংস্থান। বিশেষ কিছু করতে হয় না।

শশাঙ্ক উকিলের কৃতিত্বের কথা আবার তুললেন ভদ্রলোক। জমিজমার ব্যাপারে মাঝে মাঝে এ কোর্ট সে কোর্ট করতে হয়। বহু দেওয়ানী আর ফৌজদারী উকিল নজরে এসেছে। কিন্তু শশাঙ্কবাবুর মতন এমন ক্রস আর এমন বক্তৃতা কোথাও দেখেন নি। এই সব ছোট কোর্টে পড়ে না থেকে শশাঙ্কবাবুর উচিত সোজা কলকাতায় যাওয়া।

প্রশংসায় পাথরও গলে, শশাঙ্ক উকিল তো মানুষ। তিনি বিগলিত-হাসি করলেন।

শশাঙ্ক বাগচীর বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই হরনাথবাবু আর একবার তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন। দরজা খুলে দিতে দিতে বললেন, আপনার বাড়িটা চিনে গেলাম, আর একদিন আসব শশাঙ্কবাবু।

আর একদিন কেন, আজই আসুন না। শশাঙ্ক উকিল নামতে নামতে বললেন।

না, আজ নয়, আমের সময় আসব বাগানের আম নিয়ে। বেগমভোগ আম। বাবা মুর্শিদাবাদ থেকে কলম এনেছিলেন। খেয়ে দেখবেন সে আম। আজ চলি।

আবার যুক্ত করে প্রণাম।

বাড়িতে পা দিতেই গৃহিণীর সঙ্গে দেখা। একেবারে মুখোমুখি।

কি, আবার রিক্সা ছেড়ে রথে যে? শাঁসালো মক্কেল জুটেছে বুঝি?

শশাঙ্ক বাগচী হাসলেন, সেই যে ভদ্রলোক মিথ্যামিথ্যি জড়িয়ে পড়েছিলেন পকেটমারার মামলায়, তাকে খালাস করিয়ে দিলাম। আহা, বেচারী। কতবার যে পায়ের ধুলো নিল তার ঠিকানা নেই।

শুধু পায়ের ধুলো? শশাঙ্ক-গৃহিণী ভ্রূ কোঁচকালেন।

পাগল নাকি। শশাঙ্ক বাগচী অত কাঁচা ছেলে নয়। একমুঠো টাকাও দিয়েছে, তার ওপর বেগমভোগ আম নিয়ে আসবে বলেছে।

গৃহিণী আঁচল পাতলেন।

শশাঙ্ক বাগচী পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা বের করতে করতে বললেন, আমি না থাকলে নিরপরাধ লোকটার ঠিক সাজা হয়ে যেত। অন্নদা পাকড়াশী মহা মামলাবাজ লোক। মিথ্যে সাক্ষী জুটিয়ে কেসটা সাজিয়ে এনেছিল বেশ।

বলতে বলতে আচমকা শশাঙ্ক উকিল থেমে গেলেন। এক দৃষ্টে আঙুলগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। নিজের আঙুল।

আশ্চর্য, এমন তো হবার কথা নয়। গোটা পকেটের তলার অর্ধেকটাই নেই।

আসামীর দেওয়া দুখানা একশ টাকার নোট, আজকের অন্য মামলার রোজগার বত্রিশ টাকা, ইনসিওরের প্রিমিয়াম বাবদ রাখা বাইশ টাকা সাত আনা, তা ছাড়াও একটা দশ টাকার নোট বাড়তি ছিল। সব উধাও।

নিরপরাধ হরনাথ ঘোষ শুধু নিজে খালাস হন নি, তাঁর উকিলকেও খালাস করে গেছেন।

আনন্দমেলা

— লিখেছেন —

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত; শ্রীযামিনীকান্ত সোম; শ্রীনরেন্দ্র দেব; শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো); শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র; শ্রীবিমল ঘোষ; শ্রীজসীমউদ্দীন; শ্রীজয়ন্ত চৌধুরী; শ্রীপ্রভাকর মাঝি; শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীরামেন্দু দত্ত; শ্রীমণীন্দ্র দত্ত; শ্রীমনোজিৎ বসু; শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র; শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়; শ্রীআশা দেবী; শ্রীরবিদাস সাহা রায়; শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়; জাদুরত্নাকর এ সি সরকার; শ্রীঅমিতা ঘোষাল; শ্রীসত্যব্রত বসু; শ্রীপলাশ মিত্র; শ্রীপবিত্র সরকার; শ্রীশান্তশীল দাশ; শ্রীনির্মাল্য বসু; শ্রীপ্রসূন মিত্র; শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়; শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ বসু ও মৌমাছি।

—ছবি এঁকেছেন —

শ্রীসুধীন ভট্টাচার্য; শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ; শ্রীবিমল দাস; শ্রীঅহিভূষণ মালিক; শ্রীনারায়ণ দেবনাথ ও শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত।

— ফটো তুলেছেন —

শ্রীরেবন্ত ঘোষ ও শ্রীতরুণ মুখোপাধ্যায়।

শুভেচ্ছা

আমার ছোট্ট ও তরুণ বন্ধুরা,

আবার এলো বছর পরে, নীল আকাশের থালে ভরে'
হাসি-খুশির খবর নিয়ে ছুটির চিঠিখানা
কাশ ফুটেছে থরে থরে, আনন্দ-গান ঘরে ঘরে
চুপ করে তাই গোমরামুখে বসে থাকা মানা।

তোদের মুখে দেখতে হাসি, চিরদিনই ভালবাসি
তাই আজ এ আনন্দমেলা সাজাই নতুন করে'
গল্প গাথা ছবির রাশি, টাটকা সবই নয়কো বাসি
তোদের হাতে তুলে দিলাম, মোর আনন্দে ভরে।

একটি কথা মনে জাগে, দিস তোরা তা সবার ভাগে
সবাই যেন ভোগ করে তা, বিবাদ বিভেদ ভুলে,
মায়ের ছেলে সবাই মোরা, মনে গেঁথে এইটি তোরা
অঞ্জলি দিস প্রেমের কুসুম মহামায়ার চরণমূলে।

তোমাদের—

মৌমাছি

সোনার বেঁজী

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

মহারাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষ হয়েছে। তারপর আরম্ভ হলো তাঁর দান। রাজভাণ্ডার উজাড় করেই সে-দানের কাজ চলল। মুনিঋষি রাজরাজড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত যাঁরা যজ্ঞ দেখার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, তাঁরা পেলেন গরুবাছুর হাতি-ঘোড়া ধনদৌলত জমিজমা। রাজ্যের লোকজনেরাও যে যা চাইলো তাই তাকে দেওয়া হলো। চারদিক থেকেই সকলের মুখে মহারাজা যুধিষ্ঠিরের জয়ধ্বনি উঠতে লাগল।

সমস্ত রাজকর্ম সেরে যুধিষ্ঠির বিশ্রাম করতে যাবেন, এমন সময়ে রাজসভায় এক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলেন। সন্ন্যাসী বললেন, "মহারাজার জয় হোক! মহারাজার দানের কথা শুনে আমি এসেছি সেই দানের ভাগ প্রার্থনা করতে।"

যুধিষ্ঠির সন্ন্যাসীকে আদরযত্ন করে বসিয়ে বললেন, "কি চাই আপনার, বলুন।"

সন্ন্যাসী বললেন, "মহারাজ, আমার একটি বেঁজী আছে। আপনি সেটাকে সোনার বেঁজী করে দিন।"

যুধিষ্ঠির সন্ন্যাসীর কথার মর্ম বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আপনার কোন খেলনা-বেঁজীর কথা বলছেন, আর চাইছেন, সেই খেলনাটাকে সোনায় মুড়ে দিতে হবে?"

"আজ্ঞে, না। বেঁজীটা জ্যান্ত প্রাণী। এই দেখুন না, সঙ্গেই আমার এনেছি।" এই বলে সন্ন্যাসী তাঁর ঝোলার ভেতর থেকে বের করলেন একটা জ্যান্ত বেঁজী। বেঁজীটার মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত আধাআধি ভাগ সোনার—সোনার জৌলুসে ঝলমল করছে, বাকী আধেকটা পাটকিলে রং-এর। সেই পাটকিলে দিকটা হাত দিয়ে দেখিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, "আমি চাই বেঁজীটার এ অংশও সোনার হোক। আপনি তা করে দেবেন বলেই আপনার কাছে এসেছি।"

বেঁজীটাকে দেখে যুধিষ্ঠির অবাক হলেন। তার অর্ধেক অংশ সত্যিই সোনার। কিন্তু তার বাকী অর্ধেক অংশও সোনার করে দিতে বলছেন সন্ন্যাসী। যুধিষ্ঠির ভাবলেন—এ যে অসম্ভব ব্যাপার। তিনি বললেন, "সাধু-মহারাজ, আপনি যা দেখালেন তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি যা চাইছেন তা-ও অসাধ্য। এ অসাধ্য সাধন কি মানুষে করতে পারে?"

"কেন পারবে না, মহারাজ?" সন্ন্যাসী জবাব দিলেন। "বেঁজীটার যে-অংশ সোনার দেখছেন তা-ও তো হয়েছে মানুষেরই দানের গুণে। আপনার দানেরও তো জয়জয়কার শুনে আসছি দেশবিদেশে, আর তা শুনেই এসেছি আপনার কাছে আমার প্রার্থনা জানাতে।"

যুধিষ্ঠিরের মনে প্রশ্ন জাগছিল—কে সেই লোক, যাঁর দানের গুণে বেঁজীটা সোনার অংগ পেয়েছে?

সন্ন্যাসী যেন যুধিষ্ঠিরের মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, "আমি যে-মানুষের কথা বললাম, আপনার হয়তো তাঁর পরিচয় জানার ইচ্ছা হয়েছে। বেশ, তা-ও আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

এই দেখুন না, সংগেই আমার এনেছি

তিনি ছিলেন এক গরিব ব্রাহ্মণ। আপনার রাজ্যের কুরুক্ষেত্র-অঞ্চলের লোক। ভিখ মেগেই তাঁর পেট চালাতে হতো—শুধু নিজের একলার নয়, সংসারের আরো তিন-জনের—তাঁর স্ত্রীর, ছেলের আর ছেলের বৌয়ের। যেদিন ভিক্ষায় কিছু জুটত সেদিন চারজনেই তা ভাগ করে খেতেন, যেদিন জুটত না সেদিন উপোসী থাকতে হতো সকলকেই। একবার একে একে তিন-দিন চারজনের উপোষ করে কাটাতে হলো। চারদিনের দিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বেরিয়ে তিন প্রহর বেলার পরে ঘরে ফিরলেন আধসের-খানেক ছাতু পেয়ে। সেই ছাতুই চার ভাগ করে চারজনের খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু তাদের খেতে বসার আগেই দুয়ারে শোনা গেল কার গলা—

'আমি অতিথি। দুমুঠো খাবার চাই।'

"অতিথির কথা শুনেই ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে তাঁকে ভেতরে নিয়ে এলেন। তারপর তাঁকে খেতে দিলেন নিজের ভাগের ছাতু। সে-ছাতু তো দুই ছটাক মাত্র। অতিথির দু গ্রাসেই তা ফুরিয়ে গেল। তিনি আরো খাবারের আশায় বসে রইলেন। তখন ব্রাহ্মণের স্ত্রী তাঁর ভাগের ছাতু-কটা এনে অতিথিকে খেতে দিলেন। তা খেয়েও অতিথির খিদে মিটল না। তা দেখে ব্রাহ্মণের ছেলে তাঁর ভাগের খাবার এনে অতিথির পাতে ঢেলে দিলেন। তখনও তাঁর খাবার চাই বুঝে ছেলের বৌও খেতে দিলেন তাঁর ভাগের ছাতু। এবারে অতিথির পেট ভরল। এইভাবে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি চলে গেলেন। তাঁকে খাওয়াতে আধসের ছাতু সমস্তই শেষ হয়েছিল। ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণের স্ত্রীর, ছেলের আর ছেলের বৌর খাওয়ার জন্য কিছুই রইলো না। কিন্তু নিজেরা উপোষী থেকেও তাঁরা যে অতিথি-সেবা করতে পেরেছেন তাতেই তাঁদের আনন্দের সীমা রইলো না। নিজেদের মুখের গ্রাস সমস্তই এভাবে দান করার ফলও মিললো হাতে-হাতেই। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তাঁদের ঘরের দুয়ারে দেখা গেল একখানা রথ। সে রথ পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনিই অতিথি সেজে ব্রাহ্মণদের পরীক্ষা করতে এসে-ছিলেন। সেই পরীক্ষায় তাঁদের যে-পরিচয় মিলেছিল, তাতেই মহাখুশী হয়ে দেবরাজ রথ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের স্বর্গে নেওয়ার জন্যে।"

ব্রাহ্মণদের অতিথিসেবার কথা শেষ করে সন্ন্যাসী আবার বলতে লাগলেন, "চার চার-দিন উপোষী থেকেও ব্রাহ্মণরা হাসিমুখেই নিজেদের খাবার তুলে দিয়েছিলেন অতিথির মুখে—সেই দানের পুণ্যে ব্রাহ্মণদের হলো স্বর্গবাস, আর যেখানে তাঁরা করেছিলেন সেই দান সেখানকার মাটির গুণে এই বেঁজীর হলো সোনার অংগ। বেঁজীটা থাকত ব্রাহ্মণের ঘরের পেছনেই। খাবারের লোভে হয়তো ঢুকেছিল তাঁর ঘরে। কিন্তু সেখানে কি কিছু ছিল যে খাবে! অতিথির পাতের গোড়ায় হয়তো দু-এক কণা ছাতু পড়েছিল, তাই মুখে দিয়ে বেঁজীটা খালি ঘর পেয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে রইলো। তাতেই তার আধা-অংগ হয়েছে সোনার। আমিও গিয়েছিলাম ব্রাহ্মণদের বাড়ি অতিথি হওয়ার আশায়। কিন্তু যেতে আমার দেরি হয়েছিল। ততক্ষণে তাঁদের অতিথি-সেবা আরম্ভ হয়েছে। আমি আর দেখা না দিয়ে আড়ালে থেকেই সব দেখতে লাগলাম। তারপর চলে গেলাম সেখান থেকে। পরদিন বেঁজীটাকে পাওয়া গেল ঘরের ভেতরেই। তখন থেকে আমার কাছেই তাকে রেখে

দিয়েছি। তার অঙ্গ সোনার হলো কেন, তা বুঝতে আমার দেরী হলো না। আমার বিশ্বাস, দানধর্মেই যিনি কুরুক্ষেত্রের সেই ব্রাহ্মণের চেয়ে ছোট নন তাঁরই পুণ্যের ফলে বেঁজীর বাকী অঙ্গও সোনার হবে। আপনি ধর্মরাজ, আপনার পুণ্যবল তো সকলের চেয়ে বেশী, আর আপনার জয়জয়কার চারদিকে আপনার দানেরই জন্যে। আপনার পক্ষে অসাধ্য সাধন করা তো সামান্য ব্যাপার।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "আমাকে ভুল বুঝবেন না, সাধুবাবা। আপনার বেঁজীকে সোনার বেঁজী ক'রে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু সেই কাজ করতে পারব না ব'লে কি আপনাকে ফিরে যেতে হবে? বরং আপনার সেবার জন্যে আমার অন্য কিছু করার থাকলে বলুন, তা এক্ষুনি করছি।"

সন্ন্যাসী বললেন, "বেশ, তা হলে আপনি যা করতে পারবেন না বলছেন, আমাকেই দিন তা করার ভার। আপনারই ধর্মের বলে আমি তা ক'রে নেবো। মহারাজ, আপনার পুণ্যফল আমাকে দান করুন। তাতেই আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে।'

সন্ন্যাসীর সে-প্রার্থনা পূর্ণ করার জন্যে যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যমুনিকে নিয়ে দান-যজ্ঞ করতে বসলেন। সেই যজ্ঞ করেই তাঁর পুণ্যফল সন্ন্যাসীর নামে উৎসর্গ করে দিতে হবে।

দানযজ্ঞের আসনে বসে ধর্মরাজ গঙ্গাজলে আচমন করেছেন, এমন সময় হঠাৎ মহর্ষি বেদব্যাস এসে উপস্থিত হলেন। মহর্ষি বললেন, "থামো বৎস! তোমাকে এ-যজ্ঞ করতে হবে না। তুমি কি চিনতে পারনি, সন্ন্যাসী সেজে কে তোমার কাছে এসেছিলেন? এসেছিলেন স্বয়ং ধর্ম। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন—অশ্বমেধ-যজ্ঞ করার পরে তুমি তোমার ধর্ম বজায় রেখেছ কিনা। সে-ধর্ম হলো ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করা আর সত্য-পালন। তুমি রাজচক্রবর্তী হয়েছ, সকলের মুখেই তোমার জয়ধ্বনি উঠছে, তা জেনেও তুমি নিজের ক্ষমতার বড়াই করোনি, আর কথা রক্ষা করার জন্যে নিজের পুণ্যফল অন্যকে উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত হয়েছিলে—তা দেখে ধর্ম বুঝে গিয়েছেন, পৃথিবীতে তুমি তাঁর যোগ্য প্রতিনিধি। তোমার ধর্মরাজ নাম সার্থক। এবার চেয়ে দেখো দেখি—কোথায় সেই সন্ন্যাসী, আর কোথায়ই-বা তাঁর সোনার বেঁজী?"

যুধিষ্ঠির চেয়ে দেখেন—সত্যিই, সন্ন্যাসীও নেই, বেঁজীও নেই! তাঁর সামনে দিব্য-দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহর্ষি বেদব্যাস। যুধিষ্ঠির যজ্ঞের আসন ছেড়ে উঠে মাথা লুটিয়ে দিলেন বেদব্যাসের পায়ের তলায়।

বীর কালাচাঁদের গল্প

● যামিনীকান্ত সোম

অতি পুরাতন এক গল্প। কালাচাঁদ কে ছিলেন? তিনি ছিলেন একটাকিয়ার ভাদুড়ীবংশের সন্তান। রাজসাহী জেলার বীরজাওন গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা নয়নচাঁদ রায় ছিলেন গৌড়বাদশাহের অধীনে একজন ফৌজদার।

কালাচাঁদ ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং সংস্কৃত ও বাংলায় বিশেষ শিক্ষিত। লোকে জানতো তিনি অত্যন্ত সাহসী। অস্ত্রচালনায় আর অশ্বারোহণে তিনি অতিশয় সুদক্ষ। দেখতে অত্যন্ত রূপবান ও সুপুরুষ। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তি ও সাহস দেখে গৌড়-বাদশাহ্ তাঁকে দরবারে এক উচ্চ পদ দিলেন।

কিন্তু তাঁর সুরূপ, শিক্ষা আর সাহস হলো তাঁর কাল। গৌড় সুলতান তাঁকে বললেন,—আমার কন্যাকে বিবাহ কর।

কালাচাঁদ পরম বৈষ্ণব, তিনি অস্বীকার করলেন। তখন কালাচাঁদকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁর মাথা কাটবার জন্য। এবার ঘটনাটা একেবারে বদলে গেল। বাধ্য হয়ে তিনি সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করলেন। এ কাজ করলেন বটে, কিন্তু নিজের ধর্ম—হিন্দুধর্ম ত্যাগ করলেন না, বরং বেশী করে আঁকড়ে রইলেন। এই কাজের জন্য তিনি ব্রাহ্মণসমাজের কাছে, হিন্দুসমাজের কাছে করজোড়ে মার্জনা চাইলেন, বহু অর্থ ব্যয় করলেন। কিন্তু সমাজ তাঁকে মার্জনা তো করলেই না, উপরন্তু নানা রকম অত্যাচার ও নিগ্রহ চালাতে লাগলো। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে শ্রীক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীধামে গিয়ে ধর্না দিলেন প্রত্যাদেশ পাবার আশায়। আহার নেই, নিদ্রা নেই—সপ্তাহকাল ধরে পড়েই রইলেন। কিন্তু বৃথা হলো সব। মন্দিরের মূর্খ পুরোহিতরা তাঁকে মারধর করে, অপমান করে, তাঁর বিশেষ রকম লাঞ্ছনা করে তাঁকে সেখান থেকে দূর করে দিল। এই অপমানে, লাঞ্ছনায় এবং অবিবেচনায় কালাচাঁদের মনে বিরাট পরিবর্তন এলো। তিনি এই মমতাহীন, বিচারবুদ্ধিহীন মানুষ ও সমাজের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অস্ত্রধারণ করলেন। হিন্দু কালাচাঁদ গ্রহণ করলেন ইসলাম ধর্ম আর নাম নিলেন মহম্মদ ফর্মুলি। আর বিপুল সৈন্য নিয়ে দেব-মন্দিরসকল ধ্বংস করে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন।

প্রথমেই গেলেন শ্রীক্ষেত্রে। সেখানে গিয়ে মন্দির ও বিগ্রহের এমন ক্ষতি করলেন যে, তার বর্ণনা করা যায় না। রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে মেরেই ফেললেন। তারপর ফিরবার মুখে মন্দির আর বিগ্রহ সব ভাঙতে ভাঙতে চললেন। পূর্ববঙ্গে এসে বহু মন্দির ধ্বংস করলেন। কালাচাঁদের নাম হলো কালাপাহাড়। কালাচাঁদের কীর্তি আর বাংলার সৈন্যদের এই সব কথা উড়িষ্যায়, পূর্ববঙ্গে, কামরূপে ও কোচবিহারের বহু জায়গায় তখন খোদিত হয়ে রইলো। কেননা কালাচাঁদ বা কালাপাহাড়ের শৌর্যকাহিনী ছিল বাঙালীর শৌর্য কাহিনী। এই রকম প্রতিশোধ নেওয়া চললো বহু বৎসর ধরে। শেষে চললেন তিনি কাশীধামে। সেখানে গিয়ে বিগ্রহ আর মন্দির সকলের বিশেষ দুর্গতি করতে লাগলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হলো।

কালাচাঁদ অর্থাৎ কালাপাহাড়ের কাহিনী থেকে এখন কি শেখবার আছে তা ভাববার কথা। কালাচাঁদ আদিতে ছিলেন বৈষ্ণব, অর্থাৎ তাঁর কাহিনী হলো বাঙালী হিন্দুর কাহিনী। কালাপাহাড়ের স্মৃতি হিন্দু-সমাজের অনুদার নীতির প্রবল উদাহরণ। এই বীর যিনি অনায়াসে হিন্দুর জয় পতাকা, বিজয়কীর্তি দেশে দেশে, দিকে দিকে প্রসারিত করতে পারতেন, তিনি হয়ে গেলেন অবহেলিত, উপেক্ষিত—এমনিই ছিল তখনকার মানুষের সমাজ।

মূর্খ পুরোহিতরা তাঁকে মারধর করে...দূর করে দিল।

সবচেয়ে আশ্চর্য গল্প

নরেন্দ্র দেব

চার বন্ধু। ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছে শিকারে। রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে, সেনাপতির ছেলে, আর রাজ্যের সব সেরা সওদাগরের ছেলে। ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে ওরা। টগ্‌বগ্‌ করে জোর কদমে ছুটছে ঘোড়া। একটা সাদা, একটা কালো, একটা লাল, আর একটা সাদায় কালোয় লালে মেশোনো ছাপ ছাপ রং। ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দের সঙ্গে সমান তালে বেজে চলেছে সোওয়ারীদের পায়ের রেকাবের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ, ঘোড়া ছুটছে। কেশর উড়ছে। ল্যাজের চামর দুলছে। মাথাটিও চলার তালে তালে নড়ছে। আর ঘোড়ার পিঠের সোওয়ারীরাও জীনের ওপর রাস হাতে তালে তালে নাচছে।

যাবে তারা ওই সামনের পাহাড়টা পার হয়ে পিছনে যে গভীর জঙ্গল আছে তার মধ্যে। ভয় ডর নেই। নির্ভয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে বাঘ, সিংহ, হাতি, গণ্ডার, বন-বরাহ, হরিণ—যে যা পারে শিকার করে আনবে।

ক্রমে তারা শহর পার হয়ে মাঠে এসে পড়লো। ক্ষেত খামার পার হয়ে গ্রামের পথে ঢুকলো। হাটবাজার, গয়লাপাড়া, কামার কুমোর চাষী কৈবর্ত তাঁতিদের বসতি পার হয়ে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়লো এক পল্লীপ্রাণ নদীর ধারে। কী সুন্দর নদী। কাচের মতো স্বচ্ছ জল। রোদের আলো পড়ে ঝিক্‌মিক্‌ করছে। ঢেউগুলি টলমল করে নেচে চলেছে। নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে সারি সারি ব্যাপারীদের মাল-বোঝাই সওদাগরী নৌকো। অনুকূল বাতাসে সবাই পাল তুলে দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন রাজহাঁসের দল পাখা মেলে সার বেঁধে সাঁতরে চলেছে। ঘোড়াগুলো জল দেখে আনন্দে 'চিঁ হিঁ হিঁ' করে চেঁচিয়ে উঠলো। এতটা পথ ছুটে এসেছে। তেষ্টা পেয়েছে ওদের। সোওয়ারীরা রাস আলগা করে দিতেই তারা ঘাড় নামিয়ে চোঁ চোঁ করে জল টানতে লাগলো।

চার বন্ধু কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে নদীর শোভা নিরীক্ষণ করলে। নদীর ওপারে ঘন জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। ওপারে কেউ বাস করে না। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার প্রায়ই বেরিয়ে আসে নদীতে জল খেতে। ব্যাধেরা অনেকেই নদীর এপারে ঘর বেঁধে থাকে। ব্যাধেরা কিন্তু এই জলপানের সময় কোনো জানোয়ারকে মারে না। তাদের ধারণা, তৃষ্ণার্তকে হত্যা করলে পাপ হয়।

কোথায় নদীর জল একটু অগভীর, যেখান দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়েই তারা নদী পার হতে পারবে, সন্ধান করতে লাগল। ...ওয়া গেল সেই ঘাট। তার নাম 'অশ্বিনী ঘাট'। ঘোড়াগুলো টপাটপ পিঠে সোওয়ারী নিয়েই জলে নেমে গেল। ওরা শিক্ষিত ঘোড়া। কতবার পারাপার করে। রাজ-কুমারেরা সদলবলে আজ তো এই প্রথম শিকারে যাচ্ছে না। কতবার কতদিকে গেছে। এবার এদিকে এসেছে অবশ্য নূতন।

ওপারে উঠেই পেলে এক মৌ-ভাণ্ডারী-দের পাড়া। এদের কাজ হচ্ছে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কোন গাছে মৌচাক আছে সন্ধান করা এবং সেই মৌচাক সংগ্রহ করে এনে তা থেকে মধু নিঙড়ে বার করে নিয়ে বিক্রী করা। এরা বেশ ধর্মভীরু এবং লোক ভালো। সবান্ধব রাজপুত্র এদের পাড়ায় এসে ঢুকলো। এদের কাছে জঙ্গলের খবর জানতে চাইলে।

তখন পূবের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

এক লাফে তার ঘাড়ে পড়ে

দিন প্রায় যায় যায়। শিকারসন্ধানী চার বন্ধু 'মৌ-ভাণ্ডারী'দের কাছে খবর পেলে, এই জঙ্গলের একটু গভীরে যেতে পারলে অনেক বড় বড় বাঘ-সিংহ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আজ প্রায় সন্ধে হয়ে এল। এ সময় জঙ্গলে ঢোকা নিরাপদ নয়। বন্য-জন্তুর ভয়ের চেয়েও বনের মধ্যে পথ হারাবার ভয়টাই বেশী। মৌ-ভাণ্ডারী'রা বললে, "আজ রাতটা আপনারা আমাদের গাঁয়েই বিশ্রাম করুন। কাল সকালে আমরা পথ চিনিয়ে আপনাদের নিয়ে যাবো বনের মধ্যে। কত বাঘ মারতে পারেন দেখবো!"

বন্ধুরা সবাই এদের কথায় রাজি হয়ে মৌ-পল্লীতেই রাত কাটাবার জন্য রয়ে গেল। মৌ-ভাণ্ডারীরা খুব যত্ন করে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ধারে কনকনে ঠাণ্ডা পড়লো। মৌ-ভাণ্ডারীরা আগুন জ্বেলে তার চার পাশে ঘিরে বসে আগুন পোয়াচ্ছে দেখে চার বন্ধুতেও ঘোড়াগুলোর দানাপানির আর ঘাসবিচুলির ব্যবস্থা করে সেখানে এসে জুটলো।

এরা রোজ রাতেই আগুন জ্বালে। কারণ আগুন দেখলে বনজন্তুরা সেদিকে ঘেঁষে না। পল্লী নিরাপদ থাকে। তাছাড়া ঠাণ্ডাটাও অনেকটা কম লাগে। মৌ-ভাণ্ডারী-দের মধু সংগ্রহের অদ্ভুত গল্প খানিকটা শোনবার পর চার বন্ধুর মধ্যে কথা উঠলো যে, এর চেয়েও অদ্ভুত এবং সবচেয়ে আশ্চর্য গল্প তাদের মধ্যে যে বলতে পারবে তাকে বন্ধুরা সে যা চাইবে তাই সংগ্রহ করে এনে উপহার দেবে। কিন্তু গল্পটি সত্য হওয়া চাই। কল্পনার সাহায্যে বানিয়ে বললে হবে না।

রাজপুত্র বললে, "আমি পারি তোমাদের সে রকম গল্প শোনাতে, কিন্তু তোমরা কি বিশ্বাস করবে? সে ভয়ানক আশ্চর্য! অথচ সত্য ঘটনা।"

সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে, "শোনাও আমাদের, আমরা বিশ্বাস করবো।"

রাজপুত্র বললে, "না ভাই, কাজ নেই বলে। আমার জীবনের সে এক মহা দুঃস্বপ্ন, তোমরা হয়তো বিশ্বাস করতে পারবে না। মনে করবে আমি বানিয়ে বলছি।"

কিন্তু বন্ধুরা রাজপুত্রকে ছাড়লে না। বললে, "গল্পটা আমাদের বলতেই হবে। আমরা বিশ্বাস করবো। কারণ আমরা জানি তুমি কখনো মিথ্যে কথা বলো না। তোমার নামই তো তাই, রাজকুমার সত্যবান।"

বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে রাজকুমার গল্প বলতে শুরু করলে। শুধু একটা শর্ত রইলো যে, গল্প বলবার সময় কেউ তাকে বাধা দেবে না এবং কোনো প্রশ্ন করবে না। বন্ধুরা তাতেই রাজী হ'ল। তখন রাজকুমার সত্যবান তার গল্পটি আরম্ভ করলে। বললে, "প্রথমেই বলে রাখি, আমার এটি গল্পের মতো শোনালেও এটি গল্প নয়। আমার জীবনের সত্য ঘটনা এবং সবচেয়ে আশ্চর্য এ কাহিনী।

"আমার সে এক অবিস্মরণীয় জন্মদিন। আমি সেদিন আঠারো বছরে পা দেওয়ায় যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হয়েছি। রাজ্যে মহাধুম। নেমন্তন্ন এল আমার মামার বাড়ি থেকে। চললুম আমার বাড়ি। সঙ্গে আমার রক্ষী প্রহরী, লোকলস্কর, পাইক বরকন্দাজ অনেক ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘোড়া ছোটাতে কেউ পারলে না। সবাই পিছিয়ে পড়লো। আমার তখন রোক চেপে গেছে। আমি বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি। যখন হুঁশ হ'ল পিছন ফিরে দেখি কেউ নেই। বিশাল প্রান্তরে আমি একা, আর ক্লান্ত ঘর্মাক্ত ঘোড়া হাঁপাচ্ছে। তার মুখে দিয়ে ফেনা ঝরছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। চারটে পা তার তখনও অস্থির হয়ে থেকে থেকে কাঁপছে। ধু ধু করছে মাঠ। এ মাঠের যেন শেষ নেই। কোনও পথও নেই। গাঁয়ে যাবার পায়ে-চলা

রাস্তাও চোখে পড়লো না। এতটা পথ ঘোড়া ছুটিয়ে আসার ফলে শরীর অবসন্ন বোধ হচ্ছিল। ধু ধু মাঠে তখন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। সমস্ত দেহ-মন বিশ্রাম চাইছে! চারদিকে চেয়ে দেখি একটু শীতল ছায়া পাওয়া যায় কোথায়? সেই বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে একটিমাত্র ঝাঁকড়া পাতা কদম গাছ চোখে পড়লো। গেলুম সেই গাছতলায়। বেশ ঠাণ্ডা ছায়া। নেমে পড়ে ঘোড়া ছেড়ে দিলুম। তৃষ্ণা পেয়েছিল। পিঠেবাঁধা জলপাত্র থেকে প্রায় সবটা জলই শেষ করে ফেললুম। বেশ আরাম বোধ হল। বসলুম সেই গাছতলায় ছায়াশীতল স্থানটুকুতে। চোখে যেন রাজ্যের ঘুম নেমে এল। মাথার পাগড়িটা খুলে বালিশ করে নিয়ে শুয়ে পড়লুম। সংগে সংগে অঘোর নিদ্রা।

"ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের গুহায় এক সিংহের গহ্বরে এসে রয়েছি। আমি যেন আর মানুষ নই। ঝর্ণার ধারে জলাশয়ে জল খেতে গিয়ে দেখি জলে আমার ছায়া পড়েছে। দেখে চমকে উঠলুম! একেবারে হুবহু এক সিংহের চেহারা! ভয় পেয়ে আমার লোকজনদের ডাকতে গেলুম, মুখ দিয়ে বেরুলো সিংহের গর্জন!

"তোমরা শুনে হয়ত অবাক হয়ে যাচ্ছো! কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই। আমি তখন সত্যই বনের পশুরাজ সিংহ। বনে বনে ঘুরে গরু, হরিণ, বরাহ, ছাগল যা দেখতে পেতুম, লাফিয়ে পড়ে ঘাড় ধরে শিকার করতুম। তাদের সেই কাঁচা মাংস, তোমরা কি বিশ্বাস করতে পারবে, আমি বেশ তৃপ্তির সংগে খেয়ে পেট ভরাতুম। হঠাৎ একদিন সেই বনে মানুষের গন্ধ পেলুম। ঝোপের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখি একদল লোক শিকারে এসেছে। ইতি-মধ্যে একটা বাঘ তাদের চোখে পড়ায় সেই দলের একজন দুঃসাহসী শিকারী ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ে বাঘটাকে মারবার জন্য তাড়া করলে। সাহসের কাছে হিংসার পরাজয় চিরদিন। বাঘ মানুষের ভয়ে পালালো। শিকারী তার পিছু পিছু দৌড়লো। সেই ফাঁকে আমি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এক লাফে তার ঘাড়ে পড়ে আরও গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে এলুম। লোকটা তখন আধমরার মতো ছটফট করছে। খুব খুশী হয়ে আমি যেই মানুষের মাংস খাবার সাধ মেটাতে যাবো, হঠাৎ আমার মনে পড়লো, আমিও তো মানুষ ছিলুম একদিন। আজ সিংহ-রূপ ধরেছি বলে মানুষ হয়ে মানুষের মাংস খাবো? মনে পড়লো 'নৃসিংহ অবতারের' কথা। ভক্ত প্রহ্লাদের নিষ্ঠুর পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাঙা থাম থেকে বেরিয়ে এসে 'নৃসিংহ'রূপে বধ করেছিলেন বটে নখ দিয়ে তার পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়ে বার ক'রে; কিন্তু তার মাংস খান নি তিনি।, আমার মনে কেমন ঘৃণা হল। চেয়ে দেখি লোকটা তখন মরে গেছে। এমন একটা দুঃসাহসী লোককে মারলুম! তাও কাপুরুষের মতো পিছন থেকে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে! মনে মনে লজ্জা হ'ল। সামনাসামনি লড়াই হ'লে হয়ত তার সংগে পারতাম না। বীরকে বধ করে তীব্র অনুতাপ হ'ল। ভাবছি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

"এমন সময় দেখি সেই মৃত বীরপুরুষের দেহ থেকে তার আত্মা যেন বেরিয়ে এল। জটাজুটধারী দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসীর বেশে। দণ্ড কমণ্ডলু সহ দু'হাত তুলে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'তুমিও মানুষ দেখছি! তোমার এ পশু প্রবৃত্তি হ'ল কেন? তুমি এদেশের রাজপুত্র না? আমি জানি অনেক রাজপুত্র আছে যাদের আচরণ পশুর চেয়েও অধম! তারা হিংস্র সিংহ-ব্যাঘ্রের মতই নিষ্ঠুর! কিন্তু, তোমার তো সে রকম স্বভাব নয়!'

"আমি লজ্জিত হয়ে বললুম, 'আমি সিংহ, আমি পশুরাজ।' তিনি হেসে উঠে বললেন, 'বটে! তুমি যদি পশুরাজ, তবে তোমার সে কেশর কই? সেই কর্কশ গুম্ফ কই? খর নখর সংযুক্ত বলিষ্ঠ থাবা কই?

সেনাপতি পুত্র মহা উত্তেজিত...

পশ্চাৎদেশে সেই চামরের মত লেজ কই? চাবুকের মতো যার কঠিন আঘাতে ছোট ছোট প্রাণী নিমেষে পঞ্চত্ব পায়? তুমি তো মানুষ! আমার কথা বিশ্বাস যদি না হয়, সামনের ওই জলাশয়ে গিয়ে নিজের মূর্তির প্রতিবিম্ব দেখে এস।'

"জলাশয়ের ধারে এক লাফে চলে এসে দেখি, জলে আমার স্পষ্ট ছায়া পড়েছে—আমি মানুষ! আমি আর সিংহ নই। যে রাজকুমার ছিলুম সেই রাজকুমারই আছি।"

রাজপুত্রের কাহিনী শেষ হ'তে না হ'তেই দেখা গেল, সেনাপতিপুত্র মহা-উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। খাপ থেকে তরোয়াল খুলে রাজপুত্রকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করছে। বলছে, "তুমি যাঁকে বনের মধ্যে হনন করেছো, তিনি ছিলেন আমার পিতা। আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই! এস আমার সংগে যুদ্ধ করো!"

বন্ধুরা হঠাৎ এ ব্যাপার দেখে বিস্মিত ও দুঃখিত হয়ে পড়লো। মন্ত্রীপুত্র তখন সেনাপতিপুত্রকে বুঝিয়ে বললে, "তোমার মহান পিতার প্রাণনাশ করেছিল বনের এক হিংস্র পশু। কিন্তু ইনি আর সে সিংহ নন। এখন মানুষ। আমাদের বন্ধু রাজ-কুমার। সুতরাং তুমি নির্বোধের মতো পশুর অপরাধের প্রতিশোধ নিতে বন্ধু হত্যায় প্রবৃত্ত হয়ো না।"

সওদাগরের পুত্রও এ কথায় সায় দিয়ে বললে, "ঠিক কথা! বনের পশু যে পাপ করেছিল এই মানুষ তার প্রায়শ্চিত্ত করবে কেন? আমরা রাজকুমারকে রক্ষা করবো। তবে এ কথা বলতেই হবে রাজপুত্রের গল্পটাই সবচেয়ে আশ্চর্য গল্প!"

মন্ত্রীপুত্র এর প্রতিবাদ করে বললে, "তা কি করে বলবে? আমার আশ্চর্য গল্পটা তো এখনও শোনো নি! সুতরাং সবচেয়ে আশ্চর্য কোনটা কি করে বুঝবে?"

বন্ধুরা উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে, "বলো বলো, শুনি!"

মন্ত্রীপুত্র বললে, "ভোর হয়ে গেছে। চলো শিকারে যাই। আমার গল্প তোমাদের কাল রাত্রে বলবো।"

শালিক শালিক

পলাশ মিত্র

শালিক শালিক দুষ্টু শালিক
সকাল-বিকেল উড়েঃ
এ-দেশ সে-দেশ নানান দেশে
বেড়াও ঘুরে ঘুরে।
কিচির মিচির তোমার ডাকে
মন কি তখন ঘরেই থাকে,
অংক রেখে যেই তোমাকে
ধরতে ছুটে যাইঃ
অমনি তোমার ফুড়ুত উড়ে
পালিয়ে যাওয়া চাই।

শালিক শালিক দুষ্টু শালিক
সকাল-বিকেল উড়েঃ
সত্যি, তোমার ভয় করে না
যাও যে অতো দূরে?
এবার ছাদে বসলে পরে
লক্ষ্মী এসো আমার ঘরে
না এলে ভাই এবার হবে
তোমার সাথে আড়ি
তখন কিন্তু চড়াবো না
কু-ঝিক্-ঝিক্ গাড়ি॥

আপন বাসা আপনি বাঁধো

শ্রীঅখিল নিয়োগী
(স্বপনবুড়ো)

[গভীর বন। পাখিদের মধ্যে যেন একটা সাড়া জেগেছে। সবাই ভয়ে ভয়ে ছুটোছুটি করছে। সামনেই যেন একটা দারুণ বিপদ। কে যে কোথায় পালাবে তা ঠিক করতে পারছে না। নানান জাতীয় পাখি গাছের ডালে বসে কিচির মিচির করছে। এমন সময় ঈগল পাখির সাড়া পাওয়া গেল।]

ঈগল ॥ তোমরা কেউ ব্যস্ত হয়ো না। পাখিদের বাঁচাবার জন্যে একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। আমি এই কিছুক্ষণ আগে আকাশে অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিলাম। আমার চোখে পড়লো, একদল মানুষ অনেক যন্ত্রপাতি নিয়ে এই বনের দিকেই আসছে। ওদের উদ্দেশ্য হল এই বন কেটে কাঠগুলো বিক্রী করে প্রচুর টাকা রোজগার করবে। এখনো তারা দূরে।

টুনটুনি ॥ তা হলে ত' পাখিদের খুব দুর্দিন বলতে হবে! পাখিরা তা হলে কী করে প্রাণে বাঁচবে?

টিয়া ॥ এই বনে গাছের ডালে-ডালে কত পাখি বাসা বেঁধে আছে। তাদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সুখে বাস করছে। মনের আনন্দে গান গাইছে, আর সুযোগ পেলেই আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের আজ কি দশা হবে ঈগল-খুড়ো?

বাজপাখি ॥ আমিও দেখে এসেছি—ওই দুষ্টু মানুষের দলকে। পাখিদের ওরা শান্তিতে থাকতে দেবে না। ওদের সঙ্গে রয়েছে—বড় বড় করাত, কুড়োল, আরো সব লোহার ধারালো অস্ত্র। সব গাছ কেটে ফেলে ওরা এই নীরব-বনকে শেষ করে দেবে!

কোকিল ॥ কি সর্বনেশে খবর! তাহলে যখন বসন্তরানী আসবেন—আমরা গান গাইব কোন্ বনে?

কোকিলের ছড়া

নানান রকম ফুটবে কুসুম বনে—
কোকিল গীতি সকল লোকে শোনে!
দখিন হাওয়া দৌড়ে আসে
এই কাননের আশে পাশে
বন না হলে জাগবে কি গান মনে?

ঈগল পাখি ॥ কোকিলের কথা খুব সত্যি! বনই যদি না থাকলো ত' আমাদের বসন্তের উৎসব জমবে কোথায়?

লোটন পায়রা ॥ তাই ত' এ যে ভারী গোলমেলে কথা হল! ভেবেছিলাম, এবার-কার বসন্তের আনন্দে আমি বনভূমিতে নাচবো। কিন্তু মানুষের দল যদি সারাবন কেটেই ফেলে, তবে কোথায় আমি নাচবো?

লোটন পায়রার ছড়া

কোথায় আমি নাচবো বলো ভাঙা হাটে
মনের দুখে ঘুরবো আমি একলা মাঠে!
তাল দেবে না বনের পাখি
এই বেদনা কোথায় রাখি
তাই ত' একা কান্নাতে মোর দিবস কাটে॥

ময়ূর ॥ তাই ত' ভাই লোটন পায়রা, আমিও ভেবেছিলাম, মেঘে মেঘে যখন আকাশ ছেয়ে যাবে, বিদ্যুৎ চমকাবে নীল গগনের কোণে,—তখন আমি বাদলধারার নাচটা নেচে দেখাবো তোমাদের। সবাই তোমরা গান ধরবে গাছের ডালে বসে—টিয়া-ময়না চন্দনা—! কিন্তু বনই যদি না থাকলো ত' কোন্ শ্যামল-অঙ্গনে আমার নাচ রূপ নেবে?

ময়ূরের ছড়া

মেঘ যবে গুরু গুরু ডাকে আকাশে-
পেখম ছড়ায়ে মোর নৃত্য আসে!
বিদ্যুৎ চমকায়—
তারাদল মূরছায়
মোর নাচে বিশ্ব যে আপনি হাসে!

—কিন্তু বন না থাকলে সেই নাচ আমি তোমাদের দেখাবো কেমন করে? আমার যে কান্না পাচ্ছে!

বৌ-কথা-কও ॥ নিঝুম দুপুর বেলা—যখন সারা ভুবন ঝিমিয়ে থাকে, তখন আমি পাতার আড়ালে বসে আমার গানের ভেলা ভাসিয়ে দিই। বড় বড় গাছ পড়বে ভেঙে, সবুজ বন চোখের সামনে থেকে উধাও হবে, —তখন গানের ধারা যাবে শুকিয়ে!

বৌ-কথা-কওয়ের ছড়া

গরব ছিল গানে-গানে মাতাই ধরণী—
আমার গানেই হয় যে ভুবন সোনার বরণী!
ফুল যে ফোটে, ফসল ফলে,
নদী দুকূল ভাসিয়ে চলে—
বাঁচার তরে এবার কোথায় মিলবে তরণী?

ঈগল পাখি ॥ আমি তোমাদের কথা শুনলাম। এবার পাখিদের দুঃখের দিন এসেছে। বন আর থাকবে না। হয়ে যাবে উদোম মাঠ। সেখানে উঠবে বিরাট-বিরাট কল-কারখানা। তাই পাখিদের নতুন করে বাঁচবার জন্যে ভাবতে হবে। এবার পাখিদের নিজের নিজের বাসা তৈরি করতে হবে।

সবাই ॥ বাসা?

কোকিল ॥ বন ছেড়ে বাসা?

ঈগল ॥ হ্যাঁ, বন ছেড়ে বাসা। নিজের নিজের হাতের কাজের কলা-কৌশল দেখিয়ে তোমাদের এবার বাসা তৈরি করতে হবে। তাই আমি তোমাদের সকলকে আজ ডাক দিয়েছি। এই বনের পাখিদের মধ্যে একটা বাসা তৈরির প্রতিযোগিতা ডাকছি আমি।

পায়রা ॥ কিন্তু বাসা কি করে তৈরি করবো আমরা? গাছের খুব উঁচু ডালে থাকতেই ত' আমাদের আনন্দ লাগে!

ঈগল ॥ সে কথা বলে পাশ কাটিয়ে গেলে ত' আর চলবে না। পাখিদের এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তাদের বাঁচার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। তাই আমি বলছি, —বনের যেখানে যত পাখি আছে—আপন বাসা আপনি বাঁধো। তারই প্রতিযোগিতা ঘোষণা করলাম আমি। তোমরা সবাই সারা-রাত জেগে বাসা তৈরি করা শেখো। যখন এ বন ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে—সেই-খানেই বেঁধে নেবে মনোমত বাসা।

বাবুই ॥ তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ ঈগল-খুড়ো?

ঈগল ॥ আমি দেখে আসছি—ওই মানুষের দল এখন কত দূরে? কতদিনের মধ্যে তারা এই বনে এসে পৌঁছুবে—সেটা আমাদের আগে থাকতেই জানা দরকার।

টুনটুনি ॥ ঠিক কথা! ঠিক কথা! ওরা এখানে আসবার আগেই আমরা পাখির দল এই বন থেকে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যাবো একেবারে দক্ষিণ দিকে।

ঈগলের ছড়া

উড়বো আমি নীল আকাশে
হালকা মেঘের দেশে,

বনের যেখানে যত পাখি আছে আপন বাসা বাঁধো

সেথায় আমি দু' পাখ মেলে
থাকবো ক্ষণেক ভেসে
দেখবো নীচে সাগর-পাহাড়
ফসল ক্ষেতের শ্যামল বাহার
মানুষগুলো আর কতদূর বলব ফিরে এসে॥

[ঈগল উড়তে উড়তে দূর আকাশের বুকে মিলিয়ে গেল।]

টিয়া॥ তাই ত' আমাদের ঈগল-খুড়ো যে মহা বিপদে ফেলে গেল। নিজের বাসা কখনো নিজে বাঁধিনি। চিরটা কাল গাছের ডালে আরাম করে থেকে এসেছি। আজ এক রাত্তিরের মধ্যে কী করে বাসা তৈরি করি?

কোকিল॥ বসন্তের সময় গান গেয়ে বেড়ানোই আমাদের কাজ। হঠাৎ বাসা বাঁধতে বললে আমরা পেরে উঠবো কেন? মানুষ-গুলোর আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই! বনের গাছ কাটতে আসছে। ওরা আসছে বলেই ত' আমাদের বনের আরাম ঘুচে যাচ্ছে।

কাক॥ বাসা আমাকে বাঁধতেই হবে। ঈগল-খুড়ো যখন বলে গেল, তখন চেষ্টা করতে দোষ কী? বনের থেকে কাঠ-কুটো, শুকনো লতা-পাতা সব জোগাড় করে নিয়ে আসি—

চড়াই॥ আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। মানুষেরা যেমন দুষ্টুমি করে আমাদের বন-ছাড়া করছে—তেমনি আমি ওদের ওপর প্রতিশোধ নেবো—

কাক॥ কী প্রতিশোধ নেবে তুমি শুনি?

চড়াই॥ এখন থেকে কাঠ-কুটো, দড়ি, লতা জোগাড় করে মানুষের ঘরের মধ্যেই বাসা বাঁধতে শুরু করবো। দেখি ওরা আমাকে কেমন করে তাড়ায়—

বাবুই॥ সে মন্দ কথা নয়। কিন্তু ঈগল-খুড়ো যে প্রতিযোগিতার কথা বলে গেল—তাতে ত' আমাদের সবাইকার যোগ দেওয়া উচিত।

পায়রা॥ ওই বাসা বাঁধার প্রতিযোগিতা?

বাবুই॥ হ্যাঁ গো—হ্যাঁ!

পায়রা॥ তাইত' বসে বসে ভাবছি—

বাবুই॥ শুধু বসে বসে ভাবলে ত' কাজ এগুবে না। উঠে-পড়ে লাগতে হবে। বাসা তৈরি করার কাজে হাত লাগাতে হবে।

কোকিল॥ তুমি ত' বলেই খালাস! আমি ত' বুঝতেই পারছি না—বাসা কী করে বাঁধবো। এত এক মহা ভাবনার কথাই হল!

বাবুই॥ কথায় কথা বাড়ে। যাই আমি কাজে হাত লাগাই। সারা রাত জেগে বাসা বাঁধার কাজ শেষ করতে হবে।

[পাখিদের কল-কাকলী দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ল। বোঝা গেল, সকলেই নিজ নিজ বাসা বাঁধার কাজে হাত লাগিয়েছে। টুক্-টাক শব্দ, এটা-ওটা আনার আওয়াজ, কিচির-মিচির ডাক—সারা রাত্তির ধরেই শোনা যেতে লাগলো। ভোরবেলা যখন লাল সুয্যিমামা পুবে আকাশে উঁকি দিল—তখন আবার নতুন করে বনের পাখিদের গান শোনা গেল। একটু বাদেই ঈগল এসে হাজির।]

ঈগল॥ আমি সবাইকার বাসা ঘুরে ঘুরে দেখবো। যার বাসা সেরা হবে—তাকেই দেবো পুরস্কার।

টুনটুনি॥ ঈগল-খুড়ো, এই যে আমার বাসা—

কাক॥ খুড়োমশাই, আমার বাসায় একবার চোখ বুলিয়ে যাও—

টিয়া॥ আমিও সারারাত জেগে বাসা বানিয়েছি—

ময়না॥ আমার বাসাটা দেখতে ভুলো না খুড়োমশাই—

চড়াই॥ বাসা আমিও একটা বুনেছি। কেমন হয়েছে দেখে নাও—

শালিক॥ শালিক পাখি নেচে বেড়ায়,—কিন্তু বাসা তৈরির কাজে সেও পেছ-পা নয়। সত্যি-মিথ্যে নিজে এসে যাচাই করো খুড়োমশাই—

ঈগল॥ সবাইকার বাসাই আমি ঘুরে ঘুরে দেখে নিয়েছি। কিন্তু বাবুই পাখির মতো তোমরা কেউ বাসা বাঁধতে পারো নি। এর হাতের কাজ সব চাইতে সেরা। জল হোক,— ভেতরে সে জল ঢুকবে না। ঝড় হোক,—বাসা শুধু দুলবে। ঝড়ে উড়ে যাবে না। আরামে থাকা যাবে ভেতরে। আবার

এই বাসাটাই সবার সেরা...

কান্ড দেখেছ—ভেতরে খানিকটা গোবর, তাতে আটকানো আছে জোনাকী। রাত্তিরের আলো দেবে বাসায়। সব ব্যবস্থা পাকা। তা ছাড়া ওর হাতের কাজের কারুশিল্পের তুলনা নেই। বাসা বাঁধার প্রতিযোগিতায় বাবুই পাখি সব সেরা পুরস্কার পাবে।

পাখির দল॥ জয় বাবুইয়ের জয়! সবার সেরা শিল্পী।

পাখিদের ছড়া

সবার সেরা বাসা এবার
বুনলো বাবুই পাখি,
ঝড়-বাদলে তালের গাছে
দুলছে থাকি থাকি!
বিষ্টি যখন পড়বে ঝরে
থাকবে বাসায় আরাম করে
রাত্তিরেতে জোনাক এসে
প্রদীপ জ্বালায় নাকি?
এই বাসাটাই সবার সেরা—
ধন্য বাবুই পাখি॥

—যবনিকা—

শরতে একি আলোয় উজল ধরা,
আহা—মধু ঝরে
মন ভরে
কি খুশী আকুল করা।
কবে যে কোথা থেকে,
ধরণী এলো মেখে
এমন চোখ ভোলানো
মন দোলানো
রূপের আলো—
সারা প্রাণ পাগল করা!
খুশীতে কোন রূপসী ছোট্ট মেয়ে
যায়না জানা,
গোপনে আড়াল থেকে
কুঁড়িদের যায় যে ডেকে—
ওড়ে তার ভোর-বাতাসে, কুয়াশার
ওড়নাখানা।
শুনে সে ডাক ঝুঝিরে—
দেখি ঐ যায় খুঁজিরে
ফুল-খুকীদের, প্রজাপতি
দুলিয়ে ডানা:
দিঘীর ঢেউয়ে দোলায় দুলে
শাপলা তাকায় পাপড়ি খুলে,
কার ইশারার চমক লেগে
উঠেছে পদ্ম ফুটে—
মনে হয় শিশিরজলে মুখ
ধুয়েছে সদ্য উঠে।
সাঁঝ না হতে প্রদীপ জেবলে
জোনাকি কি দেখতে এলে,
খোঁজে কি কোথায় গেল
রূপসী সে বালিকা?
এসে সে গেছে চলে,
কি যেন গেছে বলে—
হাসে তাই উছল হাসি
চামেলী, শেফালিকা।
শরতের এই আমোদে মেতে উঠে,
আমারও মন বুঝি চায় যেতে ছুটে—
জুঁই, কেতকীর সুবাস মাখা
হাওয়ার মত;
আকাশ পারে মেঘের ভেসে
যাওয়ার মত;
ইচ্ছে করেই হারিয়ে ফেলে
দিক ঠিকানা—।

ভারত-আত্মা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ, ১০ই মে, রবিবার; বিকেল সাড়ে পাঁচটা-ছটা। মীরাট শহরের ক্যান্টনমেন্ট বা ছাউনি এলাকার একটি ছোট ব্যারাক বাড়ির এক ঘরে দুটি ছোকরা ইংরেজ বসে গল্প করছিল। এরা সকলেই সেনা বিভাগে কাজ করে। নেহাৎ নিচুদরের অফিসার। বিকেলে গির্জায় যাবার কথা, অনেকেই গেছে। কিন্তু এরা ছেলেমানুষ, এই দুঃসহ গরমে অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে থাকা ঢের সুবিধা বলে ওরা আর বাইরে বেরোবার চেষ্টা করেনি।

বাইরে একটা হৈ-হল্লা চলছে অনেকক্ষণ ধরেই। তার আওয়াজ কানে আসছে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখার মতো উদ্যম উৎসাহ কারুর নেই। এসব দেশে হৈ-হল্লা এমন একটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়। বিশেষত এই ছাউনির ধারে-কাছে যে বাজার আছে সেখানে গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক-জন যথেষ্ট আনাগোনা করে। 'মিলিটারী' বা 'ফৌজী'দের সঙ্গে যাদের কারবার করতে হয়, সে-সব দোকানদারদেরও খুব ভাল মানুষ হ'লে চলে না। সুতরাং ঝগড়া-বিবাদ দাঙ্গা-হাঙ্গামা এখানে লেগেই থাকে বলতে গেলে।

কিন্তু হঠাৎ যেন চিৎকারটা বড় কাছে এসে পড়ছে না?

না, এবার একটু দেখা দরকার।

দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকাল: অর্থাৎ যদি অপরে যায় তো আমি আর উঠি না—এই ভাব।

শেষপর্যন্ত দুজনেই উঠে পড়ল। খালি গায়ে ঢিলে পায়জামা পরে বসেছিল এতক্ষণ—গরমের ঠেলায়। এ অবস্থায় বাইরে বেরোন যায় না। দুজনেই উঠে পোশাক আঁটতে লাগল।

এমন সময় ধুপ করে একটা আওয়াজ হল। বেশ একটা কী ভারী জিনিস পড়ল ওদের হাতায়। চমকে উঠে দরজা দিয়ে চেয়ে দেখলে, ওদের পাশে লেফটেন্যান্ট ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাংলো থেকে ওদিকের পাঁচিল ডিঙিয়ে এধারে এসে পড়েছে ওদেরই সার্জেন্ট। কিন্তু এ কী অবস্থা! শার্ট ছেঁড়া, সর্বাঙ্গে রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ছে। মুখ হয়ে গেছে ছাইয়ের মতো সাদা—ব্যাপার কী?

হাঁপাতে হাঁপাতে আর টলতে টলতে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল সার্জেন্ট: "শিগ্‌গির, শিগ্‌গির! সর্বনাশ হয়েছে। দেশী সিপাহীরা ক্ষেপে গেছে—বিদ্রোহ করেছে! ইংরেজ অফিসারদের দেখছে আর মারছে। স্ত্রী বৃদ্ধ শিশু কেউ বাদ নেই। ওধারের সব বাংলোতে আগুন লেগে গেছে—বাইরে বেরোলেই দেখতে পাবে—ধোঁয়া আর আগুনের শিখা।"

ভয় জিনিসটা বড় ছোঁয়াচে। অপরকে ভয় পেতে দেখলেই—কারণ থাক বা না থাক—মানুষ খানিকটা ভয় পেয়ে যায়। কোন ব্যাপার তলিয়ে বোঝবার অবকাশ পায় না। এরাও ভয় পেয়ে গেল। এটুকু একবারও চিন্তা করল না যে, তিনজন ইংরেজ বন্দুক নিয়ে দাঁড়ালে দু-দশ জন সিপাহী কিছু করতে পারবে না।

পালানো ছাড়া আর কোন উপায় ভাবতে পারল না। কোনমতে পোশাকগুলো গায়ে গলিয়ে ছুটে বাইরে এল।

এতক্ষণে সার্জেন্টের পিছু নিয়েই এসে পড়েছে—সিপাহী আর বাজারে-গুন্ডাদের মিলিত দলটি! সময় নেই একদম।

ঘোড়া! ঘোড়া আনবে কে! ঘোড়া না হলে পালাবে কী করে! "সইস! সইস!" অসহিষ্ণু কণ্ঠে ডাকাডাকি করল দু-একবার। কিন্তু কোথায় সহিস! তারা কখন পালিয়েছে! সবাই ছুটে আস্তাবলে গেল। ঘোড়া আছে তিনটে—কিন্তু জীন যে মোটে দু'প্রস্থ। তা-ই সই, তা-ই লাগাও তো এখন!

আনাড়ি হাতে টানাটানি করে লাগাতে গিয়ে যেন আরও দেরি হয়ে যায়। অথচ উপায়ই বা কি!......

যাই হোক, দুটো কোন মতে তৈরী হল। আর একটাতে শুধুই লাগাম লাগান হল—সার্জেন্ট সাহেব সেইটেতেই ঘোড়ার পিঠের ওপরই চড়ে বসল।

কিন্তু পালাবে কোথা দিয়ে? ততক্ষণে ওদের বাংলোর সামনের রাস্তা সিপাহীতে ভরে গেছে। চিৎকার করছে তারা। সকলের হাতেই অস্ত্র। বন্দুক, তলোয়ার, বল্লম, বর্শা। সকলেই ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়। ঐ ফটক ভাঙল বুঝি!

এক উপায় আছে, পাঁচিল টপকে পিছনের বাগানে লাফিয়ে পড়া। ওদিকটা এখনও খালি আছে। ছুটে সেই দিকেই গেল এরা; ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেছে, ঘোড়ার ওপরই ঠকঠক করে কাঁপছে বসে! যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু বিরাট উঁচু পাঁচিল। পাঁচ হাতের কম নয়। মানুষ কোন মতে বেয়ে উঠতে পারে—কিন্তু ঘোড়ার পক্ষে সম্ভব নয়, অতটা লাফানো। বিশেষত এইটুকু জায়গায়। খুব দূর থেকে ছুটে এলেও না হয় চেষ্টা করতে পারত—কিন্তু এখানে অসম্ভব! ওদিকে ফটক ভেঙে সিপাহীর দল হাতায় ঢুকে পড়েছে। আর বুঝি বাঁচা গেল না—

"সার!"

চমকে ফিরে তাকাল এরা। আরে, এ যে ওদেরই মেথর রামলগন। ওরা ভাবছিল সব চাকরবাকরই, মায় বাবুর্চি, মেথর, সইস—সকলেই পালিয়েছে। কিন্তু রামলগন এখনও রয়েছে কী ভরসায়?

"সাব, ইধার আইয়ে জল্‌দি!" ইশারা ক'রে দেখায় বাগানের ওপ্রান্তের দিকে।

এর কি ওরও কোন বদ মতলব আছে? ক্ষণিকের জন্য একটা সন্দেহ খেলে যায় ওদের মনে।

কিন্তু তখন আর উপায়ই বা কি। এক মুহূর্তের মূল্য তিনটি জীবন। ওরা ছুটে গেল সেইদিকে।

ঐ কোণটাতেই ওদের ঘর—নিচু খাপরার ঘর কয়েকটা। মেথর, ভিস্তিরা থাকে। এ বাংলা ও-বাংলোয় যাতায়াতের সুবিধার জন্য পাঁচিলের কয়েকটা ইট খসিয়ে নিচু

ওধারে লাফিয়ে পড়ে ছুটল সকলে তীরবেগে।

করে নিয়েছে একটা জায়গায়—তার ফলে খানিকমতো পথ হয়েছে খানিকটা।

"সাব, ইধারসে যাইয়ে। উস্ তরফ্ দুশমন অভি নেহি আয়া। যাইয়ে জল্‌দি! ইলোক ইধার আ গিয়া!"

এক একজন করে গেলে ঘোড়ায় চড়েই ওরা যায় সে পথে। এখন যেটুকু উঁচু আছে, ঘোড়ায় ডিঙনো কিছুমাত্র কঠিন নয়।

তা-ই গেল ওরা। ওধারে লাফিয়ে পড়ে ছুটল সকলে তীর বেগে। ওধারের বড় আমবাগানটায় পৌঁছতে পারলে আত্মগোপনের সুযোগ পাবে।

সব পিছনে ছিল কর্পোরাল ফ্রেডারিক বা ফ্রেড্—উনিশ বছরের ছেলে। সে একবার ফিরে দাঁড়াল—কী যেন বলতেও গেল কিন্তু সময় হ'ল না—রামলগন চাপা তর্জন করে উঠল। "জল্‌দি সাব, জল্‌দি!"

চোখে জল নিয়ে ফ্রেড্ পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়ল। এ-চোখের জল অকারণে আসেনি তার।

ছ'টাকা মাইনে পায় রামলগন। ওদের বাংলোর চারটে কমোড্ সাফ করে সে রোজ; ভোর ছটা থেকে বেলা এগারোটা, ওধারে চারটে থেকে রাত আটটা। অবধি বাংলোর পিছনে দুটি বাথরুমের পিছনে বসে থাকে চুপটি করে। ডাকলেই উঠে এসে কমোডের ময়লা সরাতে হয়। এছাড়া উঠান, বাগান ঝাঁট দেওয়া, এ তো আছেই। ঐ ছ'টাকা মাইনে ও বড়দিনের দু-একটাকা বকশিশ, এই ভরসা। থাকতে পায় পিছনের ঐ শুয়রের খোঁড়ের মত ঘরে।

এই রামলগনকেই মাত্র তিনদিন আগে এক টাকা জরিমানা করেছে ফ্রেড্, বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিল বেচারী, দুবার ডেকে সাড়া পায়নি বলে। শুধু জরিমানাই নয়—গালাগালিও দিয়েছিল প্রচুর। কুৎসিত সব গালাগাল!

হয়ত ফ্রেড যাবার আগে ক্ষমা প্রার্থনাই করতে চেয়েছিল নিজ কৃতকর্মের। হয়ত অনুশোচনা প্রকাশ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু সে সময় ছিল না তখন।

সময় ছিল না রামলগনেরও। সিপাহীরা এসে পড়েছে তখন, তারা দেখেছে রামলগনের এই পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা—নিজেদের চোখেই দেখেছে। রামলগনের জন্যেই পালাতে পারল ওরা। বেঁচে গেল এখনকার মতো। একবার ওপারে গেলে আর ধরবে কী করে? ওদের ঘোড়া আছে, এরা পদাতিক।

প্রচন্ড আক্রোশে দুজনে দুদিকে এসে চেপে ধরল রামলগনকে।

চুলের ঝুঁটি ধরে মাথায় ঝাঁকানি দিতে দিতে বলল, "বেইমান, বদমাশ কাঁহিকা! তুই ঐ বিদেশী হারামজাদাদের জন্যে আমাদের সঙ্গে বেইমানি করলি! কী লাভ হবে তোর ভেবেছিস? ওরা তোকে বড়লোক করে দেবে মনে করছিস? ওদের কেউ বাঁচবে না—সব ইংরেজ শেষ করব। এবার আমাদের রাজ!"

প্রশান্ত মুখে রামলগন উত্তর দিল, "কোন বকশিশের লোভে করিনি। কর্তব্য জেনেই করেছি। ওদের নিমক খাই, ওদের বাঁচাবার জন্যে যদি সাধ্যমতো চেষ্টা না করতুম, সেইটেই বেইমানি হ'ত। গত জন্মে বহু পাপ করেছিলুম তাই এ জন্মে ময়লা ঘাঁটছি—আবারও বেইমানি করে নরকে ডুবব? নিমকের দাম দিতে যদি প্রাণ যায় সে-ও ভাল, তবু তো ভগবানের কাছে গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।"

মেথরের এত ধৃষ্টতা ওদের সহ্য করবার কথা নয়, করলও না। তলোয়ারের এক আঘাতে রামলগনের মাথাটা খসে পড়ল কাঁধ থেকে।

সিপাহীরা যেমন হৈ-হৈ করতে করতে এসেছিল, তেমনিই চলে গেল আবার।

বেইমান বদমাশ কাঁহিকা!

—আর…

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, কোলন,
আর যত যতি চিহ্ন,
ভাবতে পারিস, লেখার জগৎ
কি যে হ'ত এরা ভিন্ন।
দাঁড়ি আছে তাই মানে খুঁজে পাই,
ইচ্ছেও হয় পড়তে।
তা না হ'লে দম আটকেই শুধু
হ'ত সবাইকে মরতে।
কমা আর সেমিকোলন, কোলন
এদেরও ওজন আছে রে।
কথার যা-কিছু ছিরি ছাঁদ আনে
ঢালে তাকে নানা ছাঁচে রে।
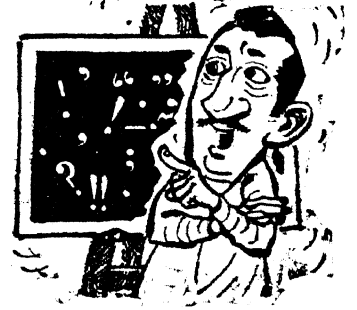
ভয়, বিস্ময়, আবেগ, উৎকণ্ঠা,
জিজ্ঞাসা, হাসি, কান্না,
খাড়া গদা দুই চিহ্নে বোঝায়—
আর কেউ কিছু চান নাকি
এদের মধ্যে বিশ্বকর্মা—
ওই ড্যাস্ আর ফুটকি;
কখনো বা এরা বিরাট কাব্য,
কখনো শুধুই চুটকি!
লেখবার ভাষা ফুরিয়ে গেলেই
ড্যাস্ ড্যাস্ দিলে চ'লবে।
বলার ক্ষমতা নাই যে-কথার
ফুটকিরা সেটা বলবে।
কেবল ড্যাস্ আর ফুটকি ছড়িয়ে
হতে পারে কি যে সৃষ্টি!
বিরাট ওদের সম্ভাবনা রে
নাই কারো তাতে দৃষ্টি।

সেই জন্যেই 'ফরেনে' চলেছি
ঘুরে ঘুরে শুধু শিখতে—
কিছু না বলেই কত বলা যায়,
কিছু না লিখেই লিখতে।
ফিরে আসি দাঁড়া, দেখাব তখন
মোক্ষম লেখা ছাড়বো।
এক ধার থেকে সব ক'টাকেই
ড্যাস্ ফুটকিতে মারবো।

রামধন মিত্তির

রামেন্দু দত্ত

দক্ষিণ দেশে গ্রাম, ছোট এক-রত্তির—
সেথা থাকে আমাদের রামধন মিত্তির।
ছিপ্‌ছিপে দেহখানা, ফুট্‌ফুটে রং তার
হাব ভাব গম্ভীর, কাজে ভারী রংদার!
গাঁ খানির লোক তার খোঁজ রাখে কীর্তির
নাওয়া-খাওয়া ভোলে তারা গাঁয়ে এলে মিত্তির!

কলকাতা হ'তে ফিরে এলো যেই সন্ধ্যায়
গল্পের তরে সেথা ভাই আর বোন ধায়!
হুঁকো হাতে কেশে কেশে আসে দীনু সরকার,
আসে লোকনাথ মামা হাতে পাঁজি চরখার!
বোসেদের জ্যাঠাছেলে নেপা সে-ও আসে ঐ
ভালোছেলে হরিহর সে-ও ফেলে আসে বই!

সোর-গোল করে সবে; রামধন এলে, আর—
চুপচাপ হয়ে সব কথা বুঝি গেলে তা'র!
তাকিয়াটা টেনে, ক'ষে দিয়ে টান সট্‌কায়
ব'সে ব'সে রামধন বাহাদুরী চট্‌কায়।
বলে, শোন্ ঘুরে ঘুরে গেনু সেই গড়পার!
ট্যাক্সির মিটারেতে উঠেছে ত টাকা চার—
ছোট-জামায়ের বাড়ি যেতে হবে, নিকটেই
ট্যাঁকে পুঁজি পাঁচ সিকে আর কাণাকড়ি নেই॥

পাঁয়জিকে ব'লে ক'য়ে গাড়ি রেখে গলিতে
পুঁট্‌লিটা না নিয়েই শুরু করি চলিতে—
ব'লে গেনু মোড়কেতে আছে নয়া কম্বল
এ দারুণ শীতকালে ভারী দামী সম্বল
গলিটার শেষ মাথা—ঐ গ্যাস জ্বলছে
ঐখানে বই হাতে ছেলেগুলো চলছে—
ঐ বাড়ি গিয়ে আমি পাঠাচ্ছি রুপিয়া
দেখো যেন পুঁটলিটা যায় নাকো উপিয়া!"

পাঁয়জি ত দাড়ি নাড়ে গাড়ি ঝাড়ে ঝট্‌পট্
তাড়াতাড়ি দিই পাড়ি গলিপথে চটপট্
নিকাশী পাড়ার গলি দ্রুত চলি বাঁকিয়া
গোলক-ধাঁধার মত আলপনা আঁকিয়া!
গলিটার আনমুখে পড়ি বড় রাস্তায়
সেথা হ'তে জামায়ের বাড়ি যেতে সস্তায়
করি এক রিক্‌শা-ই জুতসই দেখিয়া
জামায়ের বাড়ি ঢুকি বহু গলি বেঁকিয়া!
এক আনা দিয়ে, নেমে হাঁকি 'খুকী কর্ চা!'
বেলেঘাটা হ'তে এই মোট পথ-খরচা!

* * *

এইখানে রামধন ক'ষে দেয় সুখটান
গল্পেরও হয় বুঝি এইখানে অবসান।
নেপা কয় "ট্যাক্সিতে খোয়ালে ত সম্বল?"
দীনু এ'চে বলে "সেটা হবে ভুট্-কম্বল!
বড়জোর দেড়টাকা নতুনের দাম তার।"
রামধন বলে, "শোনো দীননাথ সরকার—
পুরাতন খবরের কাগজের 'বাণ্ডেল্'
তার মাঝে পোরা ছে'ড়া একজোড়া 'স্যাণ্ডেল্'
চারটাকা বিনিময়ে ছেড়ে থাকি মায়া তা'র
কী এমন্ লোক্‌সান্, দীননাথ সরকার?"

এক পয়সার এক পুতুল

জসীম উদ্দীন

এক পয়সায় এক পুতুল
তারে কিনে বিষম দায়,
খুকু খেলনা পুতুল চায়।
সে পুতুল নয় এমন তেমন যেমন তোমার গাঁয়,
যারা রঙিন জামা গায়ে পরে মিটমিটিয়ে চায়।
যারা গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে
যারা শহর বাজার চোঁড়ে
যাদের উড়োজাহাজ আকাশ পথে
ঘুরেঘুরিয়ে ঘোরে।
যাদের গায়ের সুবাস বাতাস বেয়ে
ধায় সকলের পানে,
যাদের গুণ গরিমা দেশ বিদেশে
তালা লাগায় কানে।

খুকু বলে এমন পুতুল চাই,
তোমার আমার মামার বাড়ির কার ঘরে যা নাই।
খায়না পুতুল নায়না পুতুল গায়না কোন গান
গয়না কোন চায় না, কোন নাইক তাহার মান।
ছড়ার কথায় চড়ায় না সে পড়ায় না সে পড়ে,
গড়ায় না সে সোনা রুপার গড়ার উপর চড়ে।
শীতের রাতে উদল গায়ে ঠিরঠিরিয়ে কাঁপে,
যাদের পিলে লিভার পেটটি ভরে কষ্টে জীবন যাপে।
সেই পুতুলের একটি যদি আমায় তুমি দাও,
এক পয়সায় বেচবো মোরে কিনতে যেবা চাও।

সতে

জয়ন্ত চৌধুরী

পৈতেতে পাওয়া নতুন শুঁড়-তোলা বিদ্যাসাগরী চটিটা পায়ে গলিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখলুম, মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সতে আলুকাবলী খাচ্ছে।

আমার পৈতের খাওয়ান-দাওয়ানের দিন বটা-ছটুরা সবাই এসেছিল, সতে আসেনি। আসেনি, ভালোই লেগেছিল। আসলে ওকে একটু ভয় করি। বটা-ছটুরাও করে। ভয় করি, কিন্তু ও যেদিন ইস্কুল কামাই করে, সেদিন টিফিনের সময়ে একটু একটু মন খারাপও লাগে। টিফিনের সময় ও যখন খেলার মাঠের গাছতলায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে বসে আকাশপানে তাকিয়ে কাউকে যেন শোনাচ্ছে না, এইরকমভাবে ফিসফিস গলায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানার কথা শোনাতো, তখন আমরা সবাই যে যার টিফিনের বাক্স, জলের বোতল নিয়ে এসে ওকে ঘিরে বসতুম। আর সেইসব রোমহর্ষণ গল্প শুনতে শুনতে আমাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গিয়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসে, মোয়াজ-টোয়াল ঝুলে একাক্কার হয়ে, গা শির শির করে যখন খুব ভালো লাগতো, তখন আমাদের সবাইকার টিফিনের বাক্স-গুলো কখন যে একটু একটু করে খালি হতে থাকতো আর ওদিকে সতে ঢেঁকুর তুলতো—তা খেয়ালই থাকতো না। তারপর শেষমেষ একটা লম্বা ঢেঁকুর তুলে সতে যখন কারো জলের বোতলের দিকে হাত বাড়াতো, তখন গল্পও শেষ হয়ে যেতো, ঢং ঢং করে টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টাও পড়ে যেতো। আমরাও একটা একটা করে নিঃশ্বাস ফেলে টিফিনের বাক্স ধুয়ে তাইতে করে জল খেয়ে ক্লাসে এসে বসতুম।

পৈতেতে অনেকগুলো টাকা, একটা ঘড়ি, চারটে আংটি আর বেশ কয়েকটা গোয়েন্দা গল্পের বই পেয়েছি। অবশ্য, তবু তিনটে দিন পিসীমার তৈরি কাঠের আগুনে মাটির মালসায় সেদ্ধ-করা ডেলা-পাকানো আলো-চালের ভাত, কাঁচকলা সেদ্ধ আর খাবার পর মসলার বদলে হত্তুকী খেয়ে খেয়ে পাকস্থলীটা যখন একেবারে নেতিয়ে পড়েছে, তখনই মানে আজ সকালেই, দণ্ডী-ভাসান হলো। আজ তাই মাছ-টাছ খেয়ে, ঝোলার মধ্যে থেকে আঙটি-ফাঙটি মার কাছে জমা দিয়ে, জমা দেবার সময়ে এদিক ওদিক করে গোটা ছয়েক টাকা হাতিয়ে নিয়ে, ধোপা-বাড়ির জামাকাপড় পরে, কানবেঁধানো সুতো দুটো খুলে ভুল করে একবার চিরুণী নিতে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, ছোড়দার হিন্দুস্তানী টুপিটা মাথায় চড়িয়ে গুটি গুটি বাড়ি থেকে বের হলুম। আর বেরোতেই দেখলুম, মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সতে আলুকাবলী খাচ্ছে!

কাছাকাছি আসতেই আলুকাবলীর শাল-পাতাটা শেষবারের মতো চেটে ফেলে দিয়ে জামার আস্তিনে ঠোঁটের চারপাশের লঙ্কার গুঁড়োগুলো মুছে নিলে। তারপর আমার জামার কোনায় টান দিয়ে কানের কাছে মুখ লাগিয়ে থুৎনীটা সামনের দিকে বাড়িয়ে একদিকে ইশারা করে বললে, "ঐ যে, ঐ লোকটা!"

ইশারার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, একটা নেড়ি কুকুর, একটা পড়ে থাকা ঠ্যালাগাড়ি, আর দূরে কাছে অন্ততঃ জনা পনেরো লোক। সতের দিকে তাকিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম, "কোন্ লোকটা?" কিন্তু সতে নাকি ঠোঁট ফাঁক করবার আগেই পেটের কথা টের পায়, তাই আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরোবার আগেই ঠোঁটের ওপর মর্তমানকলার মতো বড়ো বড়ো নোখওলা আঙুল লাগিয়ে এমন জোর একটা সু-সু-সু-সু করে উঠলো যে, আর একটু হলেই নতুন চটিটা পা থেকে ছিটকে যেতে পারতো।

সতে তেমনি অদ্ভুতভাবেই ফিস্‌ফিসিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বলে গেল, "কোনও কথা

ঠোঁটের ওপর আঙুল লাগিয়ে

নয়। আমাদের দুজনের কস্মিনকালেও যে চেনাশোনা থাকতে পারে এটা যেন একদম বোঝা না যায়, তাহলেই ও সাবধান হয়ে যাবে। যদি 'ফলো' করতে চাস তফাতে তফাতে আমার সঙ্গে চলে আয়।" তারপর এগোতে এগোতে আবার বললে, "আলু-কাবলীওলাকে চারটে পয়সা ফেলে দিস!"

চটপট পয়সা কটা কলাপাতার ওপর ছুঁড়ে দিয়েই সতেকে ফলো করতে লাগলুম। কিন্তু সতে যে কাকে ফলো করছে, ঠাহর পেলুম না।

যেতে যেতে কালীতলার মোড় পর্যন্ত কাউকেই দেখে তো গোয়েন্দা গল্পের মতন সন্দেহজনক মনে হলো না। শুধু একজন যখন একবার পেছন ফিরে তাকিয়েছিল, তার ইয়া মস্তো গোঁফ-জোড়া দেখে মনে একটু খটকা লাগলো। কিন্তু ও যে 'সেই লোকটা' নয়, তা বুঝলুম, যখন দেখলুম, লোকটা বাঁদিকে হ্যারিসন রোডের দিকে চলে যাবার পরেও সতে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল, আর আমার দিকে একবারও তাকালো না।

আমি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক অন্য কোনও সন্দেহজনক চেহারার লোক খুঁজতে শুরু করেছি, সতে খুব অন্যমনস্ক-ভাবে আমার কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে না তাকিয়েই বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, "ইডিয়ট কোথাকার। চোখ-কান খোলা রাখবি তো, না হাঁদার মতো দাঁড়িয়েই থাকবি! ইশারা করতে করতে আমার চোখের পাতায় আর ভুরুতে ব্যথা ধরে গেল, ধরতে পারলি না কেন? পরের ট্রামটা ধরতেই হবে, বুঝলি হাঁদা! আবার আমার পাশে বসো না যেন, পাশে না বসলেও একসঙ্গে দুজনের টিকিট কাটা চাই, দয়া করে মনে রেখো, ছাগল কোথাকার।"

আমিও সতের দিকে না তাকিয়েই ফিস-ফিস করে বললুম, "লোকটা আগের ট্রামেই উঠেছে বুঝি? হাতছাড়া হয়নি তো?"

জবাবে সতে আমার দিকে কটমট করে তাকাতে না তাকাতেই ট্রাম এসে দাঁড়ালো, আর আমরাও উঠে পড়লুম। 'আমরা' না বলে 'আমি' বলাই ঠিক, কারণ সতেকে তো এখন আমার চেনার কথা নয়। কেবল টিকিট কাটবার সময়, কিন্তু চিনতেই হলো। শুধু তাই নয়, আঙুল দিয়ে সতেকে দেখিয়েও দিতে হলো কণ্ডাক্টারকে। ভাগ্যিস সতে তখন জানলার ধারে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে কী ভাবছিল, দেখে ফেললেই হয়েছিল আর কি! সতেটার ঠিক করতে হয়, ওকে দেখলে কে বলবে যে, নানান সব জট-পাকানো সূত্রের গিঁট খোলবার জন্যে গভীরভাবে চিন্তা করছে ও এখন, মোটেই ঘুমোচ্ছে না।

হেদো, স্কটিশের চৌমাথার কাছে ট্রামের চাকাগুলো ঘটাং ঘটাং করে শব্দ করতেই সতে চট করে একেবারে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। ইশারার দরকার হলো না। বুঝলুম, পরের স্টপেজেই নামতে হবে। সে-লোকটা তো এই ট্রামে নেই এখন, এই ফাঁকে সতেকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিলে দোষ কী? পায়ে পায়ে সতের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, "লোকটার জামার রঙটা অন্ততঃ একবার আমায় বলবে কি সতু?"

সতে হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে কী একটা লক্ষ্য করে ট্রাম থামতে না থামতেই লাফিয়ে নেমে পড়লো। আমার নামতে একটু দেরি হলো। ফুটপাথের ওপর ওকে খুঁজে বার করে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বেশ টের পেলুম যে, আসল লোকটাকে ফলো করা আমার ভাগ্যে নেই, সতেকেই ফলো করে যেতে হবে। সতের মুখের দিকে তাকাতেই খ্যাঁক করে উঠলো, "বার বার ক্যাবলার মতন আমার মুখের দিকে না তাকালেই কি নয়?"

বললুম, "না, মানে, তুমিই তো বলেছিলে সতু, তোমার ইশারা-টিশারাগুলো ভালো করে লক্ষ্য করতে।"

"লক্ষ্য যা রাখছো তা তো স্পষ্টই দেখছি
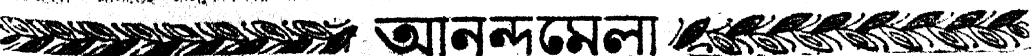
পাচ্ছ। হেঃ, উনি বুঝবেন আমার ইসারা। এই যে আমি ট্রাম থেকে নেমে ইস্তক তোকে ঐ সামনের রেষ্টুরেন্টে গিয়ে ডবল ডিমের মামলেট, টোস্ট, কেক, আর চা-টা সব অর্ডার দিতে ইসারা করছি, পেরেছিস কি ধরতে? ধরতেই যদি পারবি, তাহলে হাঁদার মতন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এখনও কি দাঁড়িয়ে থাকতিস ইডিয়েট।"

রেষ্টুরেন্টে একই টেবিলে বসলেও সতে আমায় চিনলে না, আমিও সতেকে চিনলাম না। ঝাঝরী-দেওয়া শিশি থেকে খানিকটা নুন আর মরিচ হাতের তেলোতে ঢেলে জিভের ডগা দিয়ে একটু একটু করে চাটতে চাটতে অর্ডার দেবার সময়ে শুধু বললে, "তোমার এখন এক বছর দোকানের এ-সব খাবার খেতে নেই, ভোলনি নিশ্চয়ই!"

সতে যখন ঐসব, যা আমাকে এক বছর খেতে নেই, সেইসব খাচ্ছিল, তখন অনেক কষ্টে টেবিলের ওপর থেকে চোখদুটোকে ফিরিয়ে রাখতে হলো। কিন্তু চোখ দুটোকে অন্য কোনও কাজে লাগাবো, তারও তো কোনও উপায় নেই। সতের চোখওতো অন্য-দিকে ব্যস্ত, তাহলে সেই লোকটার দিকে নজর রাখছে কে? আমি জানি, এইসব সময়ে একটা খবরের কাগজ-টাগজ হাতে নিয়ে তাতে ছোট্ট একটা ফুটো করতে হয়। তার-পর সেটা মুখের সামনে পড়বার মতো করে মেলে ধরে সেই ফুটোর ভেতর দিয়ে সন্দেহ-জনক লোকেদের দিকে নজর রাখতে হয়। বেপরোয়া হয়ে বলে ফেললুম, "সতু, একটা খবরের কাগজ-টাগজ কিনে আনবো, লোকটার দিকে নজর রাখবার সুবিধে হোত।"

সতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে এমন জোর শব্দ করে ছুরি-কাঁটাগুলো ডিসের ওপর রাখলো যে, বয়-টা একছুটে টেবিলের ধারে এসে হাজির। আর সতেও তাকে দুটো ভেজিটেবল চপ আনতে বলে সেই যে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তার দিকে তাকালে— ব্যস, চায়ে শেষ চুমুক দেওয়া পর্যন্ত আর কোনও কথা নয়, এমন কি ইসারা পর্যন্ত না। শুধু বয় যখন আমার দু-টাকার নোটের ফেরত পয়সাগুলো মসলার প্লেটের ওপরে করে নিয়ে এলো, তখন পয়সাগুলো তুলে পকেটে ভরতে ভরতে হঠাৎ কী একটা যেন দেখতে পেয়ে একলাফে দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "সামনের ফুটপাথে, শিগগীর!"

আমি যখন রাস্তা পার হবো হবো করছি, ঠিক সেই সময়ে দোতলা বাস আর ট্রামেরা এমনভাবে সব যাতায়াত শুরু করলে যে, ও-ফুটপাথে পৌঁছতে প্রায় মিনিটখানেকই লেগে গেল বোধ হয়। পৌঁছে দেখি সামনের সিনেমার টিকিট ঘরের সামনেটায় সতে অস্থিরভাবে পায়চারি করে চলেছে। আমার জানা আছে, দুর্ধর্ষ সব গোয়েন্দারা রহস্যের সমাধানের দিকে যতোই এগোতে থাকে, ততই তারা এইরকম অস্থির হতে শুরু করে, আর এই সময়ে তাদের মোটেই বিরক্ত করতে হয় না। সতের কাছ থেকেই শুনে শুনে শিখেছি এসব। বুঝলুম, সেই লোকটার জারিজুরী শেষ হতে আর দেরি নেই। সতেকে এখন চেনা উচিত কি-না ঠিক করতে পারছি না, এমন সময়ে সতেই পায়-চারি করতে করতে আমার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে বলে গেল, "লোকটা ভেতরে ঢুকেছে।"

এর মানেই যে আমাদেরও এবার ভেতরে যাবার দরকার, এটা না বোঝবার মতো বোকা আমি নিশ্চয়ই নই! টিকিট-ঘরের ফোকরের সামনে দাঁড়াতেই সতে আবার আমার গা-ঘেঁষে বলে গেল, "এক টাকা চার আনার।"

অন্ধকারে পা ঘষে ঘষে, লোকেদের হাঁটুতে কাছা আটকাতে আটকাতে ভেতরে যখন বসলুম, তখন হাফটাইম হতে আর বেশী দেরি নেই। সতেকে কিছু বলবার আগেই আলো জ্বলে উঠলো, আর সতেও টুক করে উঠে বাইরে চলে গেল। আলো নেভবার একটু আগেই যখন আবার

বললুম, "সতু সেই লোকটা..."

ফিরে এসে বসলো, তখন আর জিজ্ঞেস না করে পারলুম না। "সতু, লোকটাকে দেখতে পাচ্ছো?" উত্তরে সতে এমন একটা শিউরে-ওঠা ভাব করলে যে, মনে হলো, আমাদের পাশের লোকটাই হবে হয়তো! তারপরেই একটা সলটেড বাদামওলা সতের কাছে দাঁড়াতেই সতেটা যে কী সুন্দর একটা ইসারা করলে, তাতে বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হলো না। তবু ইসারায় একবার জিজ্ঞেস করলুম, "ওয়ান না টু?" সতে গাল চুলকো-নোর ভান করে দুটো আঙুল তুলে না দেখালে আমার অবশ্য এক প্যাকেটই কেনবার ইচ্ছে ছিল।

যাই হোক, মোদ্দা কথা, সবটা জড়িয়ে ধরে কাছাকাছি যে রহস্যটা ঘিরে রয়েছে, সেটা বেশ টের পেলুম। অন্ধকার হয়ে গেল, সতেকে দিয়ে সেই লোকটাকে যে একবার চিনে নেব, তারও উপায় রইল না। তবু, সেই অন্ধকারেই এদিক ওদিক তাকাতে লাগলুম, সেই লোকটা কাছাকাছিই যখন আছে, তখন সন্দেহজনক একটা কিছু চোখে পড়ে যেতেই বা কতক্ষণ! অথচ সতে দেখলুম দিব্যি সেই যে ছবির দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তার আর নড়চড় নেই। এদিকে ঠিক আমাদের সামনের লোকটা অনবরত পকেটে হাত দিয়ে দিয়ে কী যেন করছে মনে হলো। সতেকে চুপি চুপি সেই কথাটা জানাবার জন্যে অন্ধকারে আস্তে আস্তে আঙুলের ডগা দিয়ে যেই ওর হাতটা ছুঁয়েছি, অমনি সে আঁৎকে উঠে এমন চমকে গেল যে, তার হাতের অনেকগুলো বাদাম যে চমকে উঠে আমার পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়লো, তা বেশ টের পেলুম। গলা দিয়ে কী রকম চাপা একটা শব্দ বার করে সতে রেগে-মেগে আমার দিকে তাকাতেই দেখলুম, সেই অন্ধকারেও সতের চোখের সাদাগুলো চকচক করছে। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এমন একটা ভাব দেখাতে চেষ্টা করলুম, যেন কিছুই জানি না।

এরপর যে সতের কাছ থেকে কোনওরকম ইসারা-ইঙ্গিত আমি আশা করতে পারি না, তা কারই বা অজানা থাকতে পারে?

ফেরবার পথে কালীতলার মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে, সতে একবার আমার দিকে তাকালো দেখে একটু ভরসা পেলুম। আমা-দের বাড়ির গলির মোড়ের মাথায় এসে আর থাকতে না পেরে বললুম, "সতু, সেই লোকটা....."

চমকে উঠে সতে বললে, "কোন্ লোকটা?" বলেই সামলে নিলে,—"ওঃ, হ্যাঁ, সেই লোকটা!"—তারপর সামনের পানের দোকানের দিকে ইসারা করে বেশ সহজ গলায় বললে, "একটা সোডা খাওয়া দিকিনি, পেটটায় মোচড় দিচ্ছে; সারাটা বিকেল ধরে কী যে যাতা গিলতে হলো—"

সোডা খেতে বেশ সময় লাগে, তাড়াতাড়ি খেলে নাক দিয়ে ঝাঁঝ-টাঝ বেরিয়ে বিদি-কিচ্ছিরি সব কাণ্ড হয়। সোডা খাওয়া শেষ করে ঢেঁকুর তোলবার দু-একটা চেষ্টা করে, পানওলার কাছ থেকে দুটো ছাঁচি পান খেয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই আমি ওর জামার খোঁটটা চেপে ধরে বললুম, "কিন্তু সতু, লোকটা কে? মানে লোকটা কী?"

সতু একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "কী ন্যাকা রে তুই, যার পেটের মধ্যে ভীষণ মোচড় দিচ্ছে, তাকে যে এমনি করে বিরক্ত করতে নেই, এও কি তবে তোকে শেখাতে হবে?" বলেই বাড়ির পথ ধরলে।

কিন্তু আমি শুধু ভাবছি, ওর পেটের মধ্যে যা হচ্ছে, ও বললে। তাতে করে তো বেশ ছুটে ছুটেই ওর যাওয়া দরকার নইলে রাস্তার মাঝখানে বিপদ হতে কতক্ষণ! ও কিন্তু বেশ ধীরে সুস্থেই হাঁটতে লাগলো দেখলুম। জানি, সতেকে ফলো করেও এখন আর কোনও লাভ নেই।

মা দুর্গা সমীপেষু

শান্তশীল দাশ
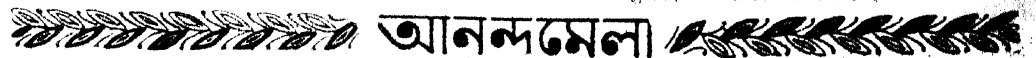
ধৈর্য ধরে মাগো, আমার কেউ শোনে না কথা;
তোকেই বলি, বল্ মা আমার অপরাধটা কোথা?
এই যে আমি বছর বছর কেবলই ফেল করি,
সেকি শুধুই ইচ্ছে করে? সময় কোথায় 'পড়ি'।
পড়তে যদি সময় পেতাম করতামই ঠিক পাশ,
কিন্তু আমার নানান কাজে যায় যে বারো মাস!
কী কাজ? মাগো, কেউ দেখে না, এ বড় আফ্‌শোস্,
মা, তুই শুনে বল্‌তো দেখি, কোথায় আমার দোষ।
খেলার 'সিজ্‌ন' এলে আমি খেলার মাঠে যাই,
একটু বোধ হয় বেশীই হবে, দোষ কি হ'ল তাই?
খেলার খবর রাখবো না মা, যুগের ছেলে হয়ে,
বইমুখো নাম রটবে, ছি ছি, থাকবো কি তা সয়ে?

এদিক ওদিক হচ্ছে কতই বিচিত্রানুষ্ঠান,
নামী নামী শিল্পীরা সব সেইখানেতে যান,
দেখতে তাদের যেতেই যে হয় পড়া কামাই করে,
সহজ কথা, কেউ বোঝে না, কেবলই দোষ ধরে।
কাগজ পড়ি দু'চারখানা মাসিক সাপ্তাহিক,
খবরাখবর দেশ বিদেশের রাখা কি নয় ঠিক?
'রক'-সভাতে সন্ধ্যা সকাল তুমুল তর্ক হয়,
হারবো কেন, তাই তো কিছু 'জ্ঞান' করি সঞ্চয়।

দেশপ্রেমিক 'দাদা'রা সব ডাকেন মাঝে মাঝে,
তাঁদের ডাকে সাড়া দিতেই হয় যে দেশের কাজে।

এর পরেতে সার্বজনীন পুজোর চাঁদা আছে,
ঘুরতেই হয় বেশ কিছুদিন এর কাছে তার কাছে
এত কাজের পরে কিছু আনন্দ তো চাই,
তাই তো মাগো, সপ্তাহেতে মাত্র দু'বার যাই।
সিনেমাতে; বল্ মা এবার কোথায় অপরাধ,
বছর বছর ফেল করি যে, সে কি আমার সাধ!

আকাশে-মাটিতে মিলনের সুর

[illegible]

পুজোর গন্ধে ভরেছে মাটির বুক
আকাশের নীল লোভে তাই দিশেহারা
শরতের মেঘ সেও হলো উৎসুক
তারো কাছে আজ এসেছে মাটির সাড়া
সেই নীল তাই নীল নদী হয়ে ভরে গেল কূলে কূলে
যত মেঘ আজ কাশ ফুল হয়ে দলে দলে উঠে দুলে
দূরের যাত্রা পাখিরা গিয়েছে ভুলে
সোনা ঢালা ধানে ডানা মেলে নামে তারা।

পুজোর গন্ধে ভরেছে মাটির কোল
রাত-জাগা তারা ঘোর ঘোর চোখে চায়
শিউলির ডালে বাতাস দিয়েছে দোল
কেন বসে থাকা সুদূরের কিনারায়?
উল্কা ঘোড়ার আগুনে কেশর কখন মুঠোয় ধরে—
খেয়ালী তারারা ছুটে নেমে এলো এই পৃথিবীর পরে
ভোরের শেফালী হয়ে ফুটে থরে থরে
পুজোর ডালায় আপনার ঠাঁই পায়।

পুজোর গন্ধে আকুল হয়েছে ধরা
সূর্যের রঙ—তারো মনে নেশা লাগে,
অলখ ধারায় ঝরে ঝরে তার ঝরা
ভরে যায় প্রাণ ধরণীর অনুরাগে।
হাজার খোকার হাসিতে হাসিতে কখন সে রঙ ফোটে
হাজার খুকুর ঘন কালো চোখে তারি তো ঝলক ছোটে—
মায়ের খুশীতে সেই রঙ দুলে ওঠে
আকাশে মাটিতে মিলনের সুর জাগে॥

দোলনা

পবিত্র সরকার

বিকেল হল, বিকেল হল, থাকবে ঘরে আর কে!
সবাই মিলে চল্ ছুটে যাই সবুজ-মাখা পার্কে;
চারদিকে তার ফুলের মেলা, মধ্যে বাঁধা দোল্‌না—
দোলায় চাপি, চুপ করো সব, এখন কোনো গোল না!

দোল খেয়ে যাই, দোল খেয়ে যাই, হেই সামালো হাই রে—
ওই আকাশে চাঁদের দেশে পৌঁছে বুঝি যাই রে!
পার্কে ফোটা ফুলগুলি কয় মাটির বুকে নামতে,
একটু নেমেই আকাশ ধরি, দোলনা কি দেয় থামতে!

আমরা বলি, 'দোলনা, তুমি সাগরপারে যাও তো।'
দোলনা ছোটে সমুদ্রে, সে মন-পবনের নাও তো!
দোল খেয়ে যাই, দোলায় চেপে পক্ষীরাজে উড়ছি,
তেপান্তরের পথহারানো গোলোক ধাঁধায় ঘুরছি।

মিষ্টি বাতাস পার্কে শুধুই ছড়ায় ফুলের গন্ধ;
সন্ধে হল, সন্ধে হল, দোলনা করো বন্ধ।
আকাশ জুড়ে পাতল বিরাট অন্ধকারের জাল কে?
ফিরছি ঘরে, ফুলগুলি কয়, "এসো আবার কালকে।"

শেষ খেলা

অমিতা ঘোষাল

নিঝুম দুপুর বেলা, ঠিক যখন খোকা-খুকুরা ঘুমোয় মায়ের পাশে। ওধারের ঘর থেকে দাদুর নাকের ডাক শোনা যায়, আর শোনা যায় মুদিখানার হামানদিস্তের শব্দ। হঠাৎ পাড়া জাগিয়ে বেজে ওঠে ধুম্ ধুম্ ধুম্ টিকিটিকি।

এবারে সর্দার এলো প্রায় দু-দুমাস পর! তাক্ লাগানো সার্কাস দেখায় রঘুসর্দার!

সর্দার হাঁকল—খোকা রাজা...

সঙ্গে আছে সেই লিকলিকে রোগা বাদল। সেই বাঁশের মই ঘাড়ে করে পিঠের ওপর মোটা তিন ময়লা পুঁটলি নিয়ে, গলায় ঝুলিয়ে লোহার রিঙ, বেঁকে ধনুকের মত হয়েছে সাড়ে তিন ফুট শরীরটা। তবু সে তাকালো এবাড়ি ওবাড়ির জানলা দরজার দিকে। ঐ তো সব চেনা চেনা মুখ, ছোট-ছোট মাথা, ঘুম ভাঙা চোখ। মুহূর্তে ভিড় জমে গেল এ বারান্দা ও বারান্দা।

রঘুসর্দার হাঁকলো,—খোকা রাজা খুকি রানী, চার চার মহলা খানদানী, যাদু খেলা সার্কাস হবে রঘুসর্দার হাজির—ধুম্ ধুম্ ধুম্ টিকিটিকি।

রোগা বাদল আর পারছে না দাঁড়িয়ে থাকতে। গলা থেকে লোহার ভারী রিঙটা খুলে হাতে ঢুকিয়ে নিলে। করুণ চোখে তাকালে, তারপর ঘাড় থেকে মইটা নামালে মাটিতে। সর্দার অমনি ধমকে উঠলো, হেই, ও দিকে নামাবিনা, এদিকে আয়—দেখছিস না খোকাখুকুরা ডাকছে, বুদ্ধু কোথাকার!

রায় বাড়ির চাতালের পাশে পানা পুকুর, ওধারে ফাঁকা জমি এক টুকরো। বর্ষায় জল জমে, তারি ওপর বিকেলে সংঘের নতুন সেক্রেটারি পাড়ার ছেলেদের ড্রিল শেখান, আবার পুজোপার্বণে চাঁদোয়া ঢেকে পাঁচালী কীর্তন ইত্যাদিও হয়।

রঘুসর্দারের ধমক খেয়ে জিনিসপত্র নামালো বাদল—ওদিক থেকে এদিকের জমিতে। চারদিক ঘিরে দাঁড়ালো কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দল। সর্দার ঘুরে ঘুরে সজোরে ঢোল পিটছে তখনো—ধুম্ ধুম্ ধুম্। প্রায়—আরো দশ মিনিট পরে সর্দারের ঢোলের তাল পালটে খেলা আরম্ভ হলো। বেচারী বাদল, সেই তালিমারা লাল জাঙিয়াটা পরেছে মাথায় ময়লা জরির টুপি।

কতবার দেখিয়েছে এই একই খেলা, তবু যেন নতুন মনে হয় আজ। সেই যেদিন মই-এর খেলা দেখাতে দেখাতে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল বাদল, কি মারই না মেরেছিল সর্দার। তারপর দুমাস আর এদিকে আসেনি সর্দার। কিন্তু সেই ছোট্ট ছেলেটি গেল কোথায়, এ তো তাদেরই বাড়ির জমি! সেই তো বাদলকে জল দিয়ে ওষুধ দিয়ে কত যত্ন করেছিল। সর্দারের ভয়ে কিছুই বলতে পারেনি বাদল সেদিন। ভেবেছিল, পরে একদিন পালিয়ে এসে কিছু বলে যাবে। হয়ে করে কিছু নিয়ে আসবে সর্দারের সময় লুকিয়ে। আজ কেন দেখছে না—অন্যমনস্ক ভাবে খেলা দেখায়, আর চারদিকে খুঁজতে থাকে। নাম-না-জানা সেই ছোট্ট ছেলেটা তবেকি পাড়া ছেড়ে চলে গেছে—?

আবার পড়তে পড়তে কোন মতে বেঁচে গেল বাদল—সর্দার হাঁকলো—হেই, পড়লে এবার পিটিয়ে মেরে ফেলবো। এবার, ঠিক করে খেলবি, সামাল করে দাঁড়া।

ঢোলের বোল পালটাচ্ছে কতরকম—দিড়িম্ দিড়িম্ তাক্ তাক্ তাক্—বাদল এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এলো মই বেয়ে, চারদিকে ঘুরে সেলাম করলো বার বার। হাততালি আর হাসিতে নিঝুম দুপুর মুখর হয়ে উঠেছে। এবার আগুনের খেলা। ভয়ে সরে দাঁড়ালো ছোটরা। সবাই তো বাদল নয়। আগুন জল ছুরি কাঁচি সব ওর গায়ে হার মানে; রঘুসর্দার ওকে যাদু করে রেখেছে, ও নাকি অমর। তা না হলে অমনি ধারালো তীরের ওপর শুয়ে থাকে, বুকের ওপর মানুষকে দাঁড় করায়—একটা নয় তিন কারটে নিয়ে সর্দার নিজে দাঁড়ায়। অবশ্য তারপরের খেলাগুলো সর্দার দেখায়।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে বাদল, সর্দার বলে—ও দেবতার সঙ্গে কথা বলে তাই চুপ করে শুয়ে থাকে মরার মত—উঃ কী ভীষণ ছেলে!

পর পর কত রকম তাক লাগানো খেলাই না দেখালে রঘুসর্দার বাদলকে দিয়ে—। আহা বেচারী, ঐ এক ফোঁটা ছেলে রোগা—হাড়-পাঁজরা বের-করা বুক পিঠ! এত পরিশ্রমে হাঁ করে নিশ্বেস নিচ্ছে! পাশের ল্যাম্পপোস্ট-এর গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো সে, রঘুসর্দার ঢোল রেখে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে পয়সা তুলছে আর একবার। এর পরেই যে বাদলের শেষ খেলাটা—।

বাদলের কিন্তু আজ একটুও খেলার দিকে মন নেই, সে শুধু খুঁজছে নাম-না-জানা সেই ছোট্ট ছেলেটিকে। ঐ তো ওদের সুন্দর বাড়িটা ঠিক তেমনি ফুলে লতায় ঢাকা বারান্দা; কিন্তু কোথায় গেল ছোট্ট নাম-না-জানা ছেলেটি? হ্যাঁ ওধারে ঐতো জানলার গরাদ ধরে বসে আছে, আর পাশে আর একজন নিশ্চয় ওর মা। আনন্দে বাদলের চিন্তিত মুখখানা সহজ হয়ে গেল।

রঘুসর্দারের ঢোলে আবার চাঁটি পড়লো—দুম্ দুম্ দুম্-দুম্। চমকে উঠলো বাদল। পুঁটলি থেকে বার করে নিলে কেরাসিনের টিনটা, আর একটা কি ওষুধ—চটপট মুখে গায়ে ঘষে নিলো সে। মাথার টুপিটাও বদলে নিয়েছে আগেই। এইবার হুড় হুড় করে কেরাসিন ঢেলে আগুনে জ্বালিয়ে দিলে নিজেই, তারপর ভারী লোহার রিঙটা নিয়ে নানা কায়দায় খেলা দেখিয়ে শেষটা যেমন ছুটে বেরিয়ে যায় তেমনিই ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকলো বাদল। সবাই প্রতীক্ষা করে আছে হঠাৎ আবার বেরিয়ে এসে বিশেষ কায়দায় দাঁড়িয়ে—সেলাম দেবে বাদল আর রঘুসর্দারের শেখানো ছড়াটা বলবে সেলাম সেলাম রাজা রানী—পয়সা দিজিয়ে দো-চার আনী,—ইত্যাদি।

কিন্তু কোথায় বাদল—? সর্দারের ঢোল বাজছে তো বাজছেই, বাদল আর আসে না, দর্শকরা ভিড় ভেঙে দিল। সর্দার হুংকার

(শেষ অংশ—পরের পাতায়)

গায়ে আগুন জ্বালিয়ে লোহার রিংয়ের নানা খেলা দেখাচ্ছে

মাছের রাজ্যে জেলে

অশোক মুখোপাধ্যায়

সবাই বলে, কুকুরের মাংস কুকুরে খায় না। কথাটা কি ঠিক? হয়তো কুকুরের বেলা তাই। কিন্তু অন্য সবার বেলা? বোধ হয় না। পাখিকে পাখির মাংস খেতে তো কতই দেখেছি। পতঙ্গ-রাজ্যের অনেকেই স্বজাতীয়ের মাংস খাই-খাই করে বেড়াচ্ছে। আর জলের গহন অতলে যারা সাঁতার কেটে বেড়ায়, তাদেরও অনেকে এই বিদ্ঘুটে স্বভাব নিয়ে বেঁচে আছে।

এখানে এমন এক মাছের কথা বলব যারা মাছের রাজ্যে জেলে, মাছ খেয়েই ওদের প্রাণ বাঁচে। ওদের নাম হল 'অ্যাঙলার' মাছ। ইংরেজীতে অ্যাঙলিং বলতে বোঝায় ছিপ দিয়ে মাছ ধরা। জেলে-মাছেরা এ বিদ্যায় ভারি পটু। তবে বাঁশের ছিপ তো ওদের নেই, আমাদের হাত-পার মত ওদের এমন একটি অঙ্গ রয়েছে, যা দিয়ে বেশ সহজেই মাছ গাঁথা চলে।

জেলে-মাছের জগতে হরেকরকম জাত রয়েছে। এক ধরনের জেলেমাছেরা ভারী হতকুচ্ছিৎ দেখতে। বেশ বড়সড় গোল মত একটা মুণ্ডু, তার তুলনায় ধড় আর কতটুকু! তবে লেজটা কিন্তু রয়েছে ঠিক, বরং বেশ জাঁকিয়েই রয়েছে বলা চলে। আর মরি মরি, মুখের কি বাহার। প্রায় সবটা জুড়ে এক বিশ্রী হাঁ। তাতে বড় বড় ইস্পাতের ফলার মত ধারালো দাঁতের সারি, দন্তপংক্তি আর কি! এগুলো মুখের ভেতর-মুখো বঁড়শির মত বাঁকানো। ফল হয়েছে এই, কেউ একবার মুখে ঢুকল তো ঢুকলই, তার আর বেরিয়ে আসার জো নেই। হাঁ-এর খানিকটা ওপরে ভাঁটার মত একজোড়া গোল গোল চোখ—আয়ত লোচন বুঝি একেই বলে। ওদের নাক নেই, তবে 'নাকের বদলে নরুন পেলাম'—এ গর্ব অনায়াসেই করতে পারে। কারণ যেখানটায় নাক থাকবে—সেখান থেকেই বেরিয়েছে ওদের ছিপকাঠি। এই ছিপকাঠির মস্ত একটা সুবিধে রয়েছে। এটা ইচ্ছেমত চারপাশে ঘোরাফেরা করতে পারে, আবার দরকার হলে পেছনে কাৎ হয়ে পিঠের সংগে মিলিয়েও থাকতে পারে।

তবে হ্যাঁ, এসবের পরও ওদের আর একটি মোক্ষম জিনিস আছে, যা মৎস্যসমাজে নেই বললেই হয়। সে হল এক গুচ্ছ দাড়ি। আর তার কি শোভা! আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা। ভেবে দেখ একবার, ঐ বিদ্ঘুটে চেহারার সংগে বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির মত লম্বা জ্বলজ্বলে দাড়ি মিলিয়ে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়! যেন রূপের কার্তিক!

অন্য এক জাতের জেলে-মাছেরা একটু লম্বাটে ধরনের। দাড়ির বাহারও নেই। তবে অভাবটা পুষিয়ে নিয়েছে আর এক দিকে। সে হল ছিপকাঠি। আশ্চর্যরকম লম্বা এবং সরু: আমাদের বঁড়শির সুতোর সংগে কোন তফাৎই নেই প্রায়। বঁড়শিতে আমরা টোপ গেঁথে দিই মাছদের ধোঁকা দেবার জন্যে। টোপটাকে ওরা কোন জলজ পোকা না হলে মাছ বলে ভুল করে গিলে ফেলুক, এই আমাদের ইচ্ছে। জেলে-মাছেরাও কম যায়না; ওদেরও টোপ আছে বৈকি! ছিপ-কাঠির আগার দিকটা গিয়ে শেষ হয়েছে টর্চের বাল্ব-এর মত একটা গোল মাংস-পিণ্ড। শুধু আকারেই বাল্ব-এর মত নয়, মাংসপিণ্ডটা বাল্ব-এর মত উজ্জ্বলও। তার ফলে অনেকদূর থেকে এটাকে চোখে পড়ে আর শিকারেরা লোভে লোভে কাছে এগিয়ে আসে।

মনে কর কোন জেলে-মাছের খিদে পেল। সে লাফালাফি শুরু করবে কি? মোটেই না, বরং করবে ঠিক উল্টোটা; নিজেকে পুঁতে ফেলবে সাগরতলের বালি-মাটির নীচে। নয়তো মাটির ওপরেই জলজ উদ্ভিদের ওপর পড়ে থাকবে চুপটি করে। ওদের গায়ের রঙ চারপাশের সংগে এমন সুন্দরভাবে মিশে যায় যে, আলাদা করে চোখেই পড়ে না। কেবল ছিপকাঠিটি জেগে থাকে খানিকটা ওপরে এবং এপাশ ওপাশ নাড়াচাড়া করে বিমানঘাঁটির 'রাডার' যন্ত্রের মত। হয়তো একদল ছোট ছোট বোকাসোকা মাছ হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। **ছিপকাঠির আগার** উজ্জ্বল টোপটা পড়ল ওদের **চোখে।** বলাবলি করলে—এটা **আবার কি? ভাবলে,** নিশ্চয় **কোন পোকামাকড় কি মাছটাছ হবে।** যেই ভাবা, **অমনি কাজ। কামড়ে ধরলে** টোপটা। বাস, সংগে সংগে **শিকারী মশাই** জেগে গেলেন খাবার রেডি, **টোপটা** নিমেষে ছুটে **এল শ্রীমুখে এবং বেচারী মাছ** তার উদর-পুরীতে **স্থান পেয়ে ধন্য হল।**

আর সত্যি যেন একটা উদরপুরী। সেখানে কত খাবার যে ধরে, ভাবলে অবাক হতে হয়। **এক একটা জেলে-মাছ** এমন **খাবার খেতে পারে, যা কিনা তার** নিজের ওজনেরও কয়েক গুণ বেশী। রবারের বেলুনে হাওয়া পুরলে যেমন সেটা ফুলতে থাকে, খাবারের ছোঁয়া পেলে জেলে-মাছের পেটটিও তেমনি ফুলে ফেঁপে একটি ছোট-খাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।

জেলে-মাছের বাস প্রায় **সব** সমুদ্রেই। পাঁচ ফুট পর্যন্ত বড় হয়। কিছুকাল আগে এক নতুন জাতের জেলে-মাছের খোঁজ পাওয়া গেছে, যাদের সমাজে মেয়েরাই হল সব। ছেলেদের আলাদা কোন অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই—ওরা মেয়েদের শরীরেরই একটা অংশ মাত্র। চেহারাতেও স্ত্রীদের তুলনায় ওরা একেবারেই লিলিপুট। হয়তো দেখা গেল স্ত্রীমাছটির শরীরের ওজন কুড়ি পাউণ্ড, আর পুরুষটি এতই ছোট যে, খালি চোখে তার দর্শন পাওয়াই ভার। তার খাওয়াদাওয়া, নিঃশ্বাসের হাওয়া, এমন কি শরীরের রক্তও জোগান দেয় স্ত্রী-মাছটি। কাজেই স্ত্রীর যদ্দিন পরমায়ু, পুরুষটিরও তদ্দিনই বেঁচে থাকার মেয়াদ। আমাদের দেশে আগেকার দিনে স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী একই চিতায় সহমরণে যেত, যার নাম ছিল 'সতীদাহ'। আর দ্যাখ, জেলে-মাছের সমাজে স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামী-বেচারাকে তার সংগে সহমরণে যেতে হয়।
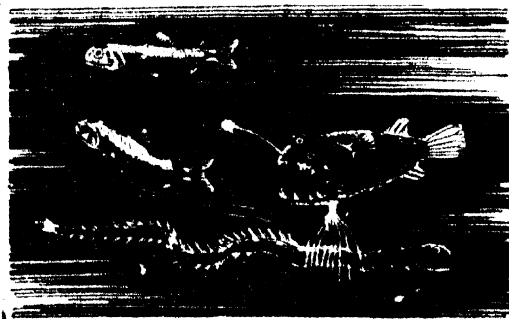
গভীর সমুদ্রের একদল মাছ। বাঁদিকে নীচেরটি অ্যাংলার ফিশ বা জেলে মাছ

(শেষ খেলা—শেষাংশ)

দিয়ে খুঁজছে চারদিক, চোখ দুটো হিংস্র পশুর মতো জ্বলছে, ঢোলের লাঠিটা শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরে ঘুরছে রঘু পাগলের মতো। আর বাদল? বাদল তখন নাম-না-জানা ছেলের বাড়িতে তার মার কাছে নিশ্চিন্তে আশ্রয়ে লুকিয়ে আছে।

অভিনব তীর-ধনুক

পরিতোষকুমার চন্দ্র

তীর-ধনুক বলতে যাত্রা থিয়েটারে কোন কোন নাটকের অভিনয়কালে বাঁশ-কঞ্চি দিয়ে তৈরী যে তীরধনুক ব্যবহার করা হয়, তোমরা কেবল সেটাই বোঝো। অন্য জিনিস দিয়ে অন্যভাবে যে তীর-ধনুক করা যায়, তা হয়তো তোমরা জানো না। কিন্তু করা যায়। এই লেখার সঙ্গে একটা নতুন ধরনের তীর-ধনুকের ছবি দেওয়া হয়েছে। তোমাদের মধ্যে হয়তো কেউ ছবিটা দেখে বুঝতে পারবে এটা কি দিয়ে ও কেমন করে করা হয়েছে, আর কেউ হয়তো পারবে না। যা হোক, কারা পারবে আর কারা পারবে না তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এই তীর-ধনুক তৈরী করবার কায়দাটা তোমাদের শিখিয়ে দি।

রীল বা কাঠিমের সুতো অনেকের বাড়িতে কেনা হয়। সুতো ফুরিয়ে গেলে কাঠিমটা ফেলে দেওয়া হয়। এই রকম ফেলে-দেওয়া একটা কাঠিম আর সামান্য একটা সরু গোল কাঠি দিয়ে তীর-ধনুক তৈরী ক'রে আমার নাতীকে উপহার দিয়েছি। কেমন ক'রে করেছি সেটা বলে দিলে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমরাও এটা তৈরী করতে পারবে। তখন তোমরা সবাই নিশ্চয়ই বলবে, ওমা, এ তো সোজা!

কাঠিম বা রীল অনেক মাপের পাওয়া যায়। তবে সুতো বড় যোগাড় করতে পারবে তীর-ধনুক ততো ভালো হবে। তীরের কাঠিটা কত বড় হবে তা নির্ভর করবে কাঠিমের মাপের ওপর। যে মাপের কাঠিম পাবে তার তিন-চার গুণ লম্বা কাঠি নেবে।
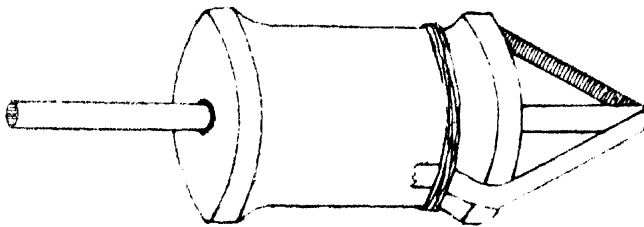
আর সেটা কাঠিমের মাঝখানের গোল ফুটোর মাপের (ব্যাস) চেয়ে সামান্য একটু সরু হবে, যাতে সেটা কাঠিমের ফুটোর ভেতর দিয়ে সহজভাবে আসাযাওয়া করতে পারে। কাঠিটা কিন্তু পেনসিলের মতো গোল ও মসৃণ হওয়া চাই। পেনসিলের কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেলো। যদি কোনো পেনসিল কাঠিমের ফুটোর ভেতরে বেশ সহজভাবেই ঢোকে তবে সেই পেনসিলটাই তীর হিসাবে ব্যবহার করতে পারো। পেনসিল দিয়ে তীর করার জন্যে তোমার বাড়ির কেউ যদি তোমাকে বকেন তবে আমাকে যেন দায়ী করো না, আগে থেকেই সে কথা বলে রাখলুম।

এবারে আধ ইঞ্চি চওড়া রবারের ফিতের চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা একটা টুকরো ও খানিকটা টোয়াইন (মোটা সুতো) যোগাড় করো। রবারের ফিতে যোগাড় হ'লে কাঠিমটার যে কোন একদিকের ফুটোর ঠিক ওপর দিয়ে সেটা রেখে তার মুখ দুটো কাঠিমের উঁচু কানার ওপর দিয়ে ভেতর দিকে এনে কাঠিমের দুদিকে বেখে টোয়াইন দিয়ে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে দাও। এই হয়ে গেলো তোমার ধনুক। এবার কাঠিটা অর্থাৎ তীরটা কাঠিমের অন্য দিকের ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে ফুটোর এদিকে এনে রবারের ফিতেসুদ্ধ ঠেলো। এতে ফিতেটা মাথায় করেই কাঠিটা এদিকে বেরিয়ে আসবে। তখন ডান হাতের আঙুল দিয়ে রবারের ফিতে সমেত তীরটা চেপে ধরে আরো খানিকটা টেনে ছেড়ে দিলে গুলতির গুলির মতো তীরটা ছুটে বেরিয়ে যাবে। কাঠিমের লম্বা ফুটোর ভেতর দিয়ে তীরটা বেরিয়ে আসে বলে সাধারণ ধনুকে ছোড়া তীরের চেয়ে এই ধনুকের তীর দিয়ে টিপ অর্থাৎ নিশানা খুব ভালো হয়। এবার ছবিটা যদি আর একবার ভালো ক'রে দেখো তবে তীর ছোড়ার কায়দাটা জলের মত পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

হুঁশিয়ার! কোন লোকের দিকে, এমন কি কোন পোষা জন্তুজানোয়ারের দিকেও লক্ষ্য ক'রে তীর ছুড়বে না। গায়ে লাগলে একটু ব্যথা পাবে, তার বেশী কিছু নয়। তবে নতুন তীরন্দাজ তোমরা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তীর যদি কারো চোখে লাগে তবে তার কি হবে তা হয়তো না বলে দিলেও চলে; কিন্তু তোমাদের কি হবে সেটা জানিয়ে দেওয়াই ভালো। তোমাদের হবে—উত্তমমধ্যম ধমাধম!

আশ্বিন

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

মাঠে মাঠে পড়ে আছে সোনা সোনা রোদ,
ছায়া আলো সাদা কালো মধুরে দুপুর,
বকম বকম ডাকে কপোত অবোধ,
শালবনে একটানা শালিকের সুর।

খোকা চেয়ে চেয়ে দেখে সাদা মেঘ ওড়ে।
ভেসে ভেসে যায় ওরা, ঘোরে বার বার,
ভাবে সে, একটা মেঘ যদি হাতে ধরে
মিতালি পাতানো যেত, হত কি মজার।

অনু দেখে টুপটাপ শিউলিরা ঝরে,
ছুটে গিয়ে সাজি আনে, তনুকেও ডাকে।
দুই বোন মিলে সাজি ফুলে ফুলে ভরে,
কাশ হাসে দুলে দুলে দূরে পথ বাঁকে।

কানে ভেসে আসে ওই পুজোর সানাই,
আজ সব ভাব ভাব, আড়ি কিছু নাই।

নির্মাল্য বসু

বাপী একদিন তারই মতো খোকা ছিলো
খোকন একথা মানবে না কোনমতেঃ
বাপী যারা হয় তারা চিরকালই বাপী,
তারা কেন যাবে তার মতো খোকা হতে!

ছোটবেলাকার বাপীর ছবিটা দেখে
বলবে সে হেসে, "দূর্—এ আমার ফোটো—
বাপী বুঝি কারু কাঠের ঘোড়ায় চড়ে,
বাপী কোনদিন হয় নাকি এত ছোটো!"

ঠাকুমা এখনো বাপীকে বলেন খোকা
তাই শুনে সে তো হেসে খুন হয় প্রায়ঃ
খোকা তো সে নিজে—তারই ডাকনাম খোকাঃ
বাপীর নাম তো শ্রীপতিভূষণ রায়।

সত্যি খোকন বুঝতে পারে না মোটে
কেন যে ঠাকুমা বাপীকে বলেন খোকা
অতো বড়োসড়ো মানুষটা তার বাপী!
তবু, কিনা তাকে......ঠাকুমাটা ভারী বোকা।

এই নিয়ে তার প্রতিদিন নালিশটি
রোজ রোজ তার নালিশ মায়ের কাছে;
ঠাকুমাটা কেন বাপীকে বলবে খোকা—
বড়মানুষকে খোকা কী বলতে আছে?

মা হেসে বলেন, "তোর কাছে উনি বাপী,
তোর কাছে নয় হলেনই মস্ত বড়ো:
ওঁর মার কাছে উনি আজো সেই খোকা
একটুও উনি হননিকো বড়োসড়ো।

তুই ভেবেছিস্ কোনদিন বড় হবি?
চিরদিনই রবি তুই যে আমার খোকা,"
খোকা শুনে বলে, "ধোৎ—তাই হয় নাকি।"
মা হেসে বলেন, "তাই হয়—ওরে বোকা।"

নাচন-নাচন

শৈলেন ঘোষ

ছোট্ট ছেলেটির নাম—বাদাম। খুব বেশী হলে আট বছর বয়েস।

কাপড়টা ছেঁড়া—কোমর বাঁধা। জামাটা ছেঁড়া—ময়লা। মাথায় টুপি—তালপাতার। টুপি খুললে একমাথা চুল—উসকো-খুসকো। ডাগর-ডাগর দুটি চোখ—বড্ড ক্লান্ত। মিষ্টি নিটোল মুখ—যত্ন নেই, শুকিয়ে গেছে। ভারি শান্ত।

বাদাম যেদিন প্রথম জেনেছিল কেউ নেই তার—সেদিন কেঁদেছিল। সক্কলের মা আছে, ওর কেন নেই? সক্কলের ভাই আছে, বোন আছে—ওর কোথা?

একা একা ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ায় উঁচু-নিচু পাহাড়ের রাস্তায়। শাল বনে। গান গায়।

বাদামের বন্ধু নেই। একটিও না। ও শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। চেয়ে দেখে তারই মত ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে। কি সুন্দর তাদের পোশাক। মাথায় লাল ফুলের সাজ। জামায় রামধনুর সাত রঙ। ঝলমল করছে।

ওর লোভ হয়। লোভ হয় ওদের সঙ্গে হাসতে। ছুটতে। গান গাইতে। কিন্তু কেউ ডাকে না। কেন?

পাহাড়। আকাশের ওপারে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। তার নীচে গ্রাম। রোজ হাঁটে সে—এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম। এক বন থেকে আরেক বন। কোনদিন খেতে পায়, কোনদিন পায় না। গাছের তলায় কোনদিন ঘুম যায়, কোনদিন ভাঙা চালার নীচে। একদিন বড্ড ইচ্ছে হয়েছিল, তাই একটি বনের ফুল তুলে জামায় এঁটেছিল। আঃ কী মিষ্টি গন্ধ! একটা প্রজাপতি উড়ে এলো। একেবারে তার গায়ে। জামায় আঁটা ফুলটার ওপর।

আঃ! প্রজাপতির কত রঙ! ফুলের রঙ, প্রজাপতির রঙ—চারদিকে রঙ! নেচে উঠলো সে প্রজাপতির পাখার মত। উড়ে গেল প্রজাপতি। ছুটলো সে প্রজাপতির পেছনে। ছুট—ছুট—ছুট। উড়ে যায় প্রজাপতি। ছুটে যায় ছোট্ট ছেলে। পড়ে থাকে সবুজ বন। পড়ে থাকে ছোট্ট গ্রাম। আরেক গ্রাম।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে। কিসের বাজনা বাজছে? কারা যেন আকাশে নানান রঙের ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে? অনেক লোক—অনেক, অ-নে-ক!

আসছে—বাদ্য বাজিয়ে বাজনাদার। ঘোড়ার পিঠে ঘোড়-সওয়ার। তার পেছনে উটের সার, তকমা এঁটে সিপাই-সেনা। শুঁড় উঁচিয়ে হাতির দল। একশো, দুশো, তিনশো, হাজার হাজার। গোনা যায় না।

রাজা ফিরছেন দেশে। বেড়াতে গেছলেন বিদেশে।

কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল বাদামের দেখে শুনে। মনে মনে ভাবছে সেই সুন্দর সাদা ধবধবে ঘোড়াটার কথা। তার যদি একটা ঘোড়া থাকতো!

হ্যাঁ, তা হলে সে-ও পারতো। সে-ও অমনি সিপাই-এর মত মাথায় পাগড়ি বাঁধতো। অমনি লাল-নীল ডোরা-কাটা পোশাক পরতো। বুকে তকমা এঁটে, কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপতো। ঘোড়া ছুটতো—টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌। কেন সে হতে পারে না—সিপাই? কেন সিপাইরা সিপাই হবে—আর সে ছোট্ট ছেলে থাকবে? কেন? কেন?

"ম্যাঁ-ও-ও", একটা বেরাল-ছানা ডেকে উঠলো বাদামের পায়ের কাছে। চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো বাদাম। ইস্‌, কী বিচ্ছিরি দেখতে—একটা বেরাল-ছানা!

আবার ডাকলো, "ম্যাঁ-ও-ও!"

বাদাম চলতে শুরু করলে।

"ম্যাঁ-ও-ও, ম্যাঁ-ও-ও", বাদামের পায়ে-পায়ে হেঁটে চললো ছানাটা।

"আঃ! জ্বালাতন করলে তো! কোথায় ঘোড়ার কথা ভাবছি, না কোথা থেকে এক বেরাল-ছানা জুটলো!"

"মিঁ-উ-উ", ভেংচি কাটলো যেন বেরালটা বাদামকে।

দাঁড়ালো বাদাম। খপ করে বেরালের গলাটা চেপে ধরলে। ছুঁড়ে দিল দূরে। বেরালটা থপ করে ছিটকে পড়ে আবার ছুটে এলো, "মঁ-য়ঁ-য়ঁ, মিঁ-উ।"।

"ওরে বাবা! এ যে দেখছি গান গাইছে। ম্যাঁ-ও-ও, মিঁ-উ-উ, মঁ-য়ঁ-য়ঁ।" রেগে-মেগে ঠ্যাং-দুটো ধরে ছুঁড়ে দিল। ছুঁড়ে দিয়েই ছুট দিল বাদাম। বেরালটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আর উঠতে পারল না। ছুটলো না। পড়ে-পড়ে কাঁদতে লাগলো, 'মিঁ-উ-উ, মিঁ-উ-উ।'

ছুটতে ছুটতে ঘুরে দাঁড়ালো বাদাম। আসছে নাকি আবার! না তো! পড়ে আছে কেন? লেগেছে নাকি! কেমন যেন মনটা করে উঠলো বাদামের।

তাড়াতাড়ি ছুটে এলো বেরালটার কাছে। কাঁদছে। লেগেছে, বড্ড লেগেছে। বাদাম তুলে নিল তাকে মাটি থেকে। বুকে জড়িয়ে ধরলো। চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মুখের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলে, "লেগেছে?" বাদামের চোখ ছল-ছল করছে।

বেরালটা ডেকে উঠলো, "ম্যাঁ-উ-হুঁ।"

"কোথা লেগেছে? এখানটা?" মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

বেরাল-ছানার ল্যাজটা খুশীতে ঢেউ খেলছে।

"তোর নাম কি রে?"

"মি-ম।"

"তোর কথা কিচ্ছু বুঝি না।— কোথায় থাকিস?"

"ম্যাঁ-উঁ।"

"হুঁ! কি যে বলে! আমার মত কথা বলতে পারিস না?"

কোন সাড়া দিল না বেরালটা। বাদামের মুখের দিকে চেয়ে রইল—ফ্যালফ্যাল করে।

"বুঝেছি কেউ নেই তোমার! তাই রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো হয়! বেশ হলো! তোরও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। তার মানে তুইও যা, আমিও তাই। মানে, তুই আমার বন্ধু, আমি তোর বন্ধু। আমার নাম বাদাম, তোর নাম মিম।"

"ম্যাঁ-উহুঁ," খুশী হয়ে ডাইনে-বাঁয়ে ল্যাজ নেড়ে দিল বেরাল-ছানা। খুশী হয়ে ছুট দিল বাদাম, বেরাল-ছানাকে বুকে জড়িয়ে, সামনে, উঁচু পাহাড়ের দিকে।

রাত হয়ে গেল। সে যেন খুশীর রাত। গাছের নীচে মিমকে বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লো বাদাম।

সকালে রোদ নাচছে গাছের পাতায়। পাতা নাচছে হাওয়ায়-হাওয়ায়। আর মিম নাচছে ঝুমুর-ঝুমুর একেবারে বাদামের চোখের সামনে।

আরে! বেরাল-ছানাটা নাচছে দেখ কেমন

বাদাম তুলে নিল তাকে মাটি থেকে। বুকে জড়িয়ে ধরলো।

করে? অবাক হয়ে গেল বাদাম। সে তো বেরালের নাচ কোনদিন দেখেনি। অমনি দু-পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নাচ! খুশী হয়ে উঠলো বাদামের মন। দু হাত দিয়ে কাঁধের ওপর তুলে নিল মিমকে। আনন্দে নাচতে লাগলো।

তারপর? বাদাম গান গায়, মিম নাচে। পাহাড়ের কোলে কোলে গ্রামে গ্রামে বেরাল-ছানা নাচে। লোকে অবাক হয়ে নাচ দেখে পয়সা দেয় বাদামকে। পয়সা জমে যায় বাদামের।

আর কদিন পরে আর কিছু পয়সা হলে বাদাম ঘোড়া কিনবে। সিপাই সাজবে। তাই বাদাম মিমের জন্যে নতুন ঝকমকে ঘুঙুর কিনে আনলে। শহরে গেল মিমকে নিয়ে।

শহরের লোক মানুষের নাচ দেখেছে। বাঁদরের নাচ দেখেছে। ভালুকের নাচ দেখেছে। কিন্তু বেরালের নাচ তো কেউ কোনদিন দেখেনি। খবর গেলো—এপাড়া থেকে ওপাড়া। এর মুখ থেকে তার মুখ। এর কান থেকে তার কান। কানে-কানে রাজার বাড়ি। রাজবাড়িতে রাজকন্যে।

মস্ত মহলো রাজবাড়ি। সাত-তলায় সাত-শো ঘর। একটি ঘরে রাজকন্যে থাকে। ছোট্টটি। বাদামের চেয়েও ছোট্ট। একলা ঘরে একলা থাকে। ঘর ভর্তি পুতুল। সোনার পুতুল। হীরের পুতুল। তাদের সঙ্গে গল্প করে নিজের মনে। পুতুলগুলো বোবা। গল্প করতে জানে না। গান গায় না। নাচ জানে না। ঠুঁটো। ভালো লাগে না রাজকন্যের। ভারি ইচ্ছে করে মাঠে মাঠে ছুটে বেড়াতে। সবুজ মাঠে। ইচ্ছে করে সবুজ ঘাসের ওপর নাচতে। কিন্তু রাজার মেয়ের বাইরে যাবার যো আছে কি! তাই ঘরেই থাকতে হয়। বন্ধ ঘরে।

রাজকন্যে বায়না ধরলে, "মা গো, বেরালের নাচ দেখবো।"

রানী ছুটলো রাজার কাছে। খবর গেলো মন্ত্রীর কাছে। সেপাই ছুটলো বাদামের কাছে। বাদামের সঙ্গে সঙ্গে মিম এলো রাজবাড়িতে।

ঝোমর বাজে ঝমাঝম, ঝাকুঝুমু। বেরালের ঘুঙুর বাজে—ঝুমঝুম, ঝুম-ঝুম। রাজা হাসে, রানী হাসে। আর রাজকন্যে মনে মনে ভাবে, আহা! ঐ ছেলেটি যদি আমার বন্ধু হতো! ঐ বেরাল-ছানাটা যদি আমার কাছে থাকতো!"

রাজকন্যা মাকে জড়িয়ে ধরলে।

"কি হয়েছে মা?" রানী মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

রাজকন্যে কান্না-কান্না গলায় আবদার করলে, "না, আমার চাই!"

"কি চাই মা?" রানী অবাক হলো!

"ঐটা!"

"কোনটা?"

"বেরালটা!"

রানী ফিসফিস করে কি বললে রাজার কানে। রাজা ফিসফিস করে কি বললে মন্ত্রীর কানে। মন্ত্রী হাসি-হাসি মুখ করে বললে, "এই ছেলেটা, তোর বেরালটা দিবি?"

নাচ থেমে গেল। বাদাম মিমকে তাড়াতাড়ি কোলে টেনে নিয়ে উত্তর দিল, "না।"

"দু-বেলা দুটো খেতে পাবি।"

"না। না।"

"রাজবাড়িতে থাকতে পাবি।"

"না। না। না।"

চুপ করে গেল মন্ত্রী। গম্ভীর গলায় রাজা বললে, "সোনা দেব ঘড়া-ঘড়া।"

"চাই না।"

"মোহর দেব বস্তা-ভরা।"

"চাই না। চাই না।"

"রাজ্য দেব একটি গোটা।"

"চাই না। চাই না। চাই না।"

রাজার চোখ লাল হয়ে উঠলো অপমানে।

"মাগো বেরালের নাচ দেখবো।"

কী! এইটুকুনি পুঁচকে ছেলে মুখের ওপর কথা বলে! হেঁকে উঠলো, "সিপাই!"

অমনি সিপাই ছুটে এলো। একদল! বাদামের হাত থেকে বেরাল-ছানা কেড়ে নিলে। রাজার কোলে বসিয়ে দিলে। বাদাম কেঁদে উঠলো। সিপাইরা তাকে টানতে-টানতে বন্দী-ঘরে বন্ধ করে রাখলে।

বাদামের কান্না দেখে রাজকন্যের চোখে জল এলো। ছুটে পালালো নিজের ঘরে। মুখ গুঁজে শুয়ে রইল সোনার খাটে। আহা! বেরাল-ছানাটা না চাইলে তো এমন হতো না!

বেরাল-ছানা রাজার কোলে বসে বসে—দুষ্টু-দুষ্টু চাইছে। মুচকি-মুচকি হাসছে। এদিক ওদিক ল্যাজ নাড়ছে।

রাজা হাসি-হাসি মুখ করে বেরালের গালে একটা টুসকি মেরে বললে, "দুষ্টু!" তারপর ডাক দিলে, "কন্যে, রাজকন্যে—"

অমনি আচমকা রাজার কোল থেকে তিড়িং করে বেরাল লাফিয়ে উঠলো। রাজার মুকুট ছিটকে গেল। বেরাল ছুট দিলে।

বেরাল ছুটে ঘর থেকে বাইরে এলো। রাজাও পেছনে ছুটে এলো। বেরাল আবার ঘরে গেল। রাজাও ছুটে গেল। বেরাল সোনার খাটে লাফ দিলে। রাজাও লাফালো।

খাট থেকে মাটিতে। রাজাও পড়লো। পা ফসকে মাটিতে—ধপাস্। রাজা চেঁচিয়ে উঠলো, "রাজরানী—"

বেরালের পেছনে রাজা ছুটলো। রানী ছুটলো।

তাই না দেখে মন্ত্রী ছুটলো। পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠলো। সিপাই ছুটলো।

বেরাল ছোটে। তার পেছনে রাজা ছোটে। রানী ছোটে। মন্ত্রী ছোটে। সিপাই ছোটে। ছেলে ছোটে। মেয়ে ছোটে। বুড়ো ছোটে। বুড়ি ছোটে। হাতি ছোটে। ঘোড়া ছোটে। অত বড় রাজবাড়িতে বেরাল ধরার জন্যে হৈ-হৈ পড়ে গেল। কিন্তু বেরাল—ভোঁ-কোঁড়া! কোথায় গেল?

রাজা হাঁফায় হাঁস-ফাঁস। রানী হাঁফায় ফুস-ফাস। মন্ত্রী ঘামে ঝর-ঝর। সিপাই ঘামে দর-দর। ছেলে ঘামে। মেয়ে ঘামে। বুড়ো ঘামে। বুড়ি ঘামে। ঘামতে-ঘামতে চিৎপাত।

ঠিক তক্ষুনি বেরাল-ছানা রাজকন্যের ঘরে এসে হাজির। রাজকন্যের বিছানায় উঠে জামা ধরে টান দিলে, "ম্যাঁ-ও-ও—ম্যাঁ-ও-ও।" যেন বলছে তাড়াতাড়ি এসো।

রাজকন্যে ধড়ফড় করে উঠে পড়লো, "কোথা যাব রে? কোথা—?"

বন্দী-ঘরে ছোট্ট ছেলে মুখ নিচু করে কাঁদছে। এমন সময় ঝন-ঝন ঝনাত করে ঘরের দরজা খুলে গেল। চমকে উঠে মুখ তুললে বাদাম। কি দেখলো সে? দেখলো সে—মিমকে কোলে নিয়ে রাজকন্যে দাঁড়িয়ে। কন্যের মুখ হাসি-হাসি। হাত বাড়ালো রাজকন্যে। রাজকন্যের হাত ধরে বেরিয়ে এলো বাদাম আলোতে।

রাজকন্যের কোল থেকে লাফিয়ে) পড়লো মিম। আনন্দে। ছুট দিল।

ছুট দিল বাদাম। বাদামের হাত ধরে ছুট দিল রাজকন্যে—রাজবাড়ির বাইরে খোলা আকাশের নীচে। ছুট-ছুট-ছুট।

রাজা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো সেই দিকে। চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। রানীকে বললে, "দেখো, দেখো, সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে আমার মেয়ে কেমন নেচে যাচ্ছে! কী সুন্দর দেখাচ্ছে! ঠিক যেন রুপালী ঝরনা!"

রানী বললে, "দেখো, দেখো, ছেলেটি কী মিষ্টি! সোনার রোদে ঝলমল করছে! ঠিক যেন রঙিন পাখি!"

কোত্থেকে মন্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। আমতা-আমতা করে বললে, "আজ্ঞে, রাজার মেয়ে বাইরে গেল! বেরালটা বোধ হয় যাদু করেছে! ছেলেটাকে ধরে এনে শূলে দেব কি?"

হো-হো করে রাজা হেসে উঠলো।

হি-হি করে রানী হেসে উঠলো।

হাসি শুনে মন্ত্রী বোকার মত নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলো। তাই তো! এতে হাসির কী আছে!
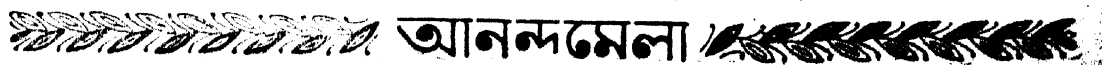
দেখে এসো সুন্দরবন

মণীন্দ্র দত্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একটি গানে লিখেছেন, 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ'। ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে চাইলেই দেখা যায়, তার তিন দিক সাগর দিয়ে ঘেরা। দেখলেই মনে হয় যেন সমুদ্রস্নান সেরে ভারতবর্ষ সবেমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে। আর বিশাল ভারতবর্ষের যে অংশটুকু সকলের শেষে উঠেছে সাগর-শয্যা ছেড়ে, যার অঙ্গে অঙ্গে আজও জড়িয়ে আছে সমুদ্রের সহস্র সস্নেহ বাহু, সেটি হল বাংলা দেশের দক্ষিণ প্রান্তের সুন্দরবন বা বাদা অঞ্চল। মাইলের পর মাইল জুড়ে সুন্দরবনের অরণ্য অঞ্চল। হাজার নদীনালা খাল-খাঁড়ি এর সর্বাঙ্গে শিরা-উপশিরার মত ছড়িয়ে আছে। কী যে অপরূপ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক শোভা। সকাল থেকে সন্ধ্যা একটানা চলেছি সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে। দুই পাশে ছেদহীন নিরন্ধ্র অরণ্য। শুধু বন আর বন। প্রায় একই জাতের গাছ। প্রায় একই ধরনের চেহারা। অথচ মুহূর্তের জন্যও ক্লান্তি আসে না চোখে। একঘেয়েমিতে ঢুলে পড়ে না মনোযোগ।

আর নদীই বা কত। বাঁকে বাঁকে নতুন নতুন নদী। নতুন নতুন খাল। কত বিচিত্র তাদের নাম। বিদ্যাধরী, মাতলা, বিদ্যা, গোসাবা, গুয়াসুবা, রায়মঙ্গল। এরা সব নদী। আবার আছে গুমোর খাল, গাজি খাল, হলদি খাল, ভুরকুণ্ডা খাল, বাঁকা খাল আরও কত। এ ছাড়া প্রতিটি নদী, প্রতিটি খালের দুই তীর থেকে বেরিয়েছে সংখ্যাহীন খাঁড়ি। জোয়ারের সময় সেগুলো জলে ভরে যায়। মৌ-চোর আর কাঠ-কাটার দল তখন জীবন হাতে নিয়ে ছোট ছোট নৌকো নিয়ে ঢোকে সেই সব খালে। আবার ভাটিরা টানে খাঁড়ির বুকে পলি মাটির নরম চাদর বিছিয়ে রেখে জল নেমে আসে খালে-নদীতে।

এমনি জলে আর জঙ্গলে মিশে সুন্দরবনের সে এক আশ্চর্যরূপ। পাহাড়ে-জঙ্গলে মেশামেশি দুনিয়াজোড়া আরও অনেক হয়তো আছে। কিন্তু জলে আর জঙ্গলে, নদী আর অরণ্যে পাশাপাশি এমন অপরূপে মেশামেশি বুঝি সুন্দরবন ছাড়া আর কোথাও নেই পৃথিবীতে।

কিন্তু সুন্দরবনের সে রূপ তো লিখে তোমাদের আমি বোঝাতে পারব না। তোমাদের ভূগোলের বইতে এর যেটুকু বিবরণ আছে সে একেবারেই কিছু না। সেজই সুন্দরবনকে যদি জানতে চাও, দুই চোখ ভরে তার অপরূপ আরণ্যক মূর্তি যদি দেখতে চাও, তাহলে দল বেঁধে নিজেরা বেরিয়ে পড়। চলো ঘুরে আসি সুন্দরবনের জল-পথে।

শিয়ালদা সাউথ স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ল সকাল ৮-৩৫ মিনিটে। ক্যানিং পৌঁছলে বেলা ১০-১৫ মিনিটে। জেটিতেই ফুলের মালায় সেজেগুজে বসে আছে স্টিম-লঞ্চ। সেই তোমাদের নিয়ে যাবে সুন্দরবনের আদি থেকে অন্তে। নির্ভয়ে চেপে বসো যে যার আসনে। মনে থাকে যেন পুরো দু'দিন আর মাটিতে পা দিতে পারবে না। কেন? জানো না বুঝি? নাম শোনোনি বাবা দক্ষিণরায়ের? সুন্দরবনের বাঘের কথা?

সুন্দর বনের পথে প্রথম ও শেষ জনবসতি হল গোসাবার হ্যামিল্টন টাউনে।

শুধু বন আর বন।

তারপর যতদূর যাবে, মানুষের দেখা আর পাবে না। জন-বসতির চিহ্নমাত্র নেই। শুধু বন আর বন। গাছ আর গাছ। আর সেই গাছের অন্তরালে বনের ফাঁকে ফাঁকে আছে 'সুন্দর বনের বাঘ'। কখন কোথায় যে সে ঘাপটি মেরে বসে আছে তা কেউ বলতে পারে না। অতএব খুব সাবধান। সুন্দরবনের জলপথে চলতে স্থলপথে যেন পা দিতে চেও না। তাহলেই বিপদ।

আর সুন্দর বনের জল? সেও কিন্তু নিরাপদ নয়। একে তো সে জলের এক-বিন্দু তুমি মুখে দিতে পারবে না। নোনা নোনা জল সব।

কিন্তু সেকথা থাক। ক্যানিং থেকে চলো আমরা এগিয়ে যাই মাতলা নদী ধরে। হুগলী নালায় পড়ে পূব দিকে খানিকটা এগিয়ে বিদ্যা নদীকে পাড়ি দিয়ে এই তো পাওয়া গেল হ্যামিল্টন টাউন। আসলে জায়গাটার নাম গোসাবা। হ্যামিল্টন নামে এক সাহেব এক সময় এখানে এসে এক বিরাট জমিদারীর পত্তন করেছিলেন। বেশ জাঁকিয়ে গড়েছিলেন হ্যামিল্টন টাউন। আজ সে সাহেবও নেই, হ্যামিল্টন টাউনের সে জৌলুসও বুঝি নেই। তবু যা আছে বাদা অঞ্চলে তাই বা আর কোথায় আছে বলো?

এইবার এগিয়ে চলো গুমোর খাল দিয়ে। চারদিকে চোখ মেলে তাকাও। সুন্দরবনের আভাস পাবে। ঘর-বাড়ি নেই, রাস্তা-ঘাট নেই, জন-মানব নেই। মাইলের পর মাইল একটানা শুধু বন আর বন।

দেখতে দেখতে এই তো এসে গেলাম সজনেখালি ফরেস্ট স্টেশনে। এখানে 'পারমিট' নিয়ে তবে ঢুকতে হবে সুন্দরবনে। ইচ্ছা করলে এখানে তোমরাও নামতে পার। অফিসার একজন থাকেন এখানে কিছু পাইক-পেয়াদা নিয়ে। বুনো গাছ-গাছালি দিয়ে তৈরী 'সেতু' পার হবে নেমে যাও স্টেশন-চত্বরে। মাটির নিচু দেওয়াল দিয়ে চারদিক ঘেরা। পাশাপাশি তিনখানা উঁচু পাটাতন-করা কাঠের ঘর। তাতেই অফিস ও বসবাস। বাঁদিকে খড়ের ছোট মণ্ডপ-ঘর। এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে 'বনবিবির মূর্তি'। কাঁচা সোনার দ্বিভুজ মূর্তি। বাঘবাহন। কোলের উপর বসে আছে ধুতি-চাদর-পাঞ্জাবী পরিহিত বাবুবেশী দক্ষিণ রায়। এই বনবিবি হলেন সুন্দরবনের অরণ্য-প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আরও এগিয়ে যাও, দেবীর আরও অনেক পীঠস্থান তোমাদের চোখে পড়বে। চোখে পড়বে দক্ষিণ রায়ের অনেক বিজয়কেতন। চোখে পড়বে আর বুক তোমাদের ধড়াস্ করে উঠবে। অজান্তেই বুকের তলা থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসবে। মনে মনে বলে উঠবে, আহারে!

কিন্তু 'পারমিট' পেয়ে গেছি আমরা। আর এখানে দেরী-করা চলবে না। লঞ্চ ছেড়ে দিয়ে চলো এগিয়ে যাই গাজি খাল দিয়ে।

সুন্দরবনের চেহারা আবার পাল্টাতে শুরু করেছে। এবার শুরু হল বিপদসংকুল এলাকা।

কেমন করে বুঝলাম? ঐ চেয়ে দেখ, গাজি খালের একেবারে মুখেই ভাঙা-চোরা ছোট্ট একটুকরো কুঁড়ে-ঘরের আভাস। ওটা কি জানো? বন-বিবির পুজোর ঘর। ফি বছর মরশুমের সময় মৌ-চোর আর কাঠকাটার দল যখন এখানে আসে মধু আর কাঠ সংগ্রহ করতে, তখন এই সব অঞ্চলে তারা রীতিমত পুরুত-পুরোহিত নিয়ে বন-বিবির পুজো দিয়ে তবে জঙ্গলে ঢোকে। তারা বিশ্বাস করে, পুজোয় বন-বিবি সন্তুষ্ট হলে বাঘের পেটে তাদের যেতে হবে না। রক্ষা করবেন মা বন-বিবি।

সব সময়েই যে ভক্তগণকে তিনি রক্ষা করেন তা নয়। হয়তো পুজোয় কোন গলতি থাকে। কিন্তু কারণ যাই হোক, ব্যাঘ্র-দেবতা বাবা দক্ষিণরায় কিছু অভুক্ত থাকেন না সারা বছর। ক্ষুধার আহার তিনি যথাসময়েই গুছিয়ে নেন।

কেমন করে জানলাম? ঐ চেয়ে দেখ,

খালের তীরে একখণ্ড বাঁশের মাথায় উড়ছে একটুকরো সাদা ন্যাকড়া। এমনি উড়ন্ত সাদা ন্যাকড়া তোমরা আরও অনেক দেখতে পাবে সুন্দরবনে চলতে চলতে। ওগুলো কি জানো? দক্ষিণরায়ের বিজয়-কেতন। বুঝলে না তো ব্যাপারটা? তবে খুলেই বলি। মৌ-চোর বা কাঠ-কাটাদের কোন দলের কেউ যদি কখনও বাঘের কবলে পড়ে তাহলে দেশে ফিরবার সময় সেই অঞ্চলের নদী বা খালের ধারে ওমনি ধারা নিশান উঁড়িয়ে রেখে যায় তারা। ওই শ্বেত-নিশান বাতাসে ওড়ে আর হাত নেড়ে নেড়ে যেন বলে, খবরদার। এখানে মাটিতে পা দিওনা। এখানে আছেন রায় রায়ন দক্ষিণরায়!

কিন্তু তোমাদের তাই বলে ভয় পাবার কিছু নেই। তোমরা তো আর সুন্দরবনের মাটিতে পা দিচ্ছ না। তোমরা তো ভাসছ জলের উপরে—লঞ্চের ভিতরে। নির্ভয়ে এগিয়ে চলো।

ক্রমে বিকেল হল। সূর্য অস্ত গেল বনের অন্তরালে। দ্বাদশীর চাঁদ উঠলো আকাশে। দূরে কোণে একটি মাত্র তারা তোমাদের দিকে চেয়ে ঝিকমিক করে হাসছে। ঝিলমিল করছে জ্যোৎস্না নদীর নীল জল। লঞ্চের সন্ধানী আলো পড়ে নদীর দুই তীরের জঙ্গল আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলায় কেমন যেন ভৌতিক রহস্যে ভরে উঠছে। গা তোমার হয়তো ছমছম করছে একটু। কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি—ভাল লেগেছে, খুব ভাল লেগেছে সেই ভয়-ভাল-লাগা মুহূর্তগুলো।

তারপর এক সময় লঞ্চ ঢুকল মায়াদ্বীপ খালে। রাতের মত নোঙর ফেলল লঞ্চ। খাওয়া-দাওয়া সেরে এইবার যার যার মত ঘুমিয়ে পড়। মনে থাকে যেন, ভোরবেলা আবার লঞ্চ ছাড়বে। আমাদের যাত্রা-পথ যে এখনও শেষ হয়নি। আমরা যাব সুন্দরবনের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত ডালহৌসি দ্বীপ পর্যন্ত। সেখান থেকে দেখতে পাব অসীম অকূল বঙ্গোপসাগর। ডালহৌসি দ্বীপের দুই পাশের ভেঙে পড়ছে সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গমালা। দূরে বহু দূরে দেখা যাবে আকাশ-সমুদ্রের অপরূপ মিলনরেখা।

কিন্তু কলমে লিখে বা মুখে বলে তো সে আনন্দের কথা তোমাদের আমি বোঝাতে পারব না। তোমরা কেন দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ো না সুন্দরবনের জল-জঙ্গলে অভিযানে। সেখানে দেখতে পাবে হরিণের দল, দেখতে পাবে কুমির, দেখতে পাবে ঝাঁক ঝাঁক পাখি, তাই কি বালুর চরে বাঘের পায়ের ছাপও দেখতে পাবে। হিল্লি-দিল্লি তো তোমরা অনেকেই দেখেছ। কিন্তু বাড়ির কাছে যে সারা পৃথিবীর সেরা এমন জল-জঙ্গলের মায়া-ঘেরা সুন্দরবন রয়েছে, তার হদিস নিতে শিখবে তোমরা আর কবে?

কোন্ বাড়ির কাক?

প্রভাকর মাঝি

কাদের বাড়ির কাক রে ওটা,
কোন্ বাড়ির ও কাক?
এই ভোরে দেয় হেঁড়ে গলায়
চৌকিদারী হাঁক।

দেখছিলাম এক মজার স্বপন,
বে-আক্কেলে চেঁচায় তখন—
ঘুম ভাঙালে ভোরে আমার
মেজাজ চটে যায়;
ধর্ ব্যাটাকে, কান দুটো ওর
পাকড়ে নিয়ে আয়।

কি ইতুরে স্বভাব ওটার
হচ্ছে দিনে দিনে,
কেবল কাজে ব্যাগড়া দেবে—
বেশ নিয়েছি চিনে।
মোদের পোষা আরসোলারা
ওর ভয়েতে হয় যে সারা,
খপ্ করে ভাগ বসায় এসে
হুলোর খাবারেতে।
জংলা দেশের হ্যাংলা ওটা,
পায় না বুঝি খেতে।
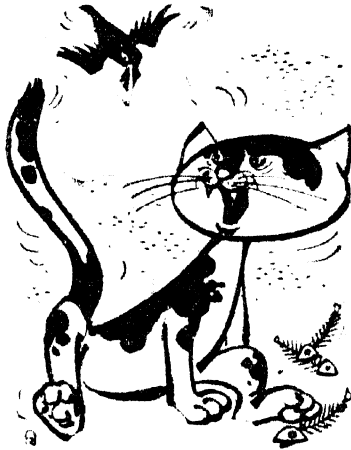
কাদের বাড়ির কাক রে ভজা
কোন্ বাড়ির ও-কাক?
কোথায় গিয়ে বসেছে দ্যাখ্
কাটাবো ওর নাক।
কর্তার বাড়ির কর্তাকে তার,
ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে কার?
ভালোয় ভালোয় সামলে রাখবে,
ফের যেন না ঢোকে
নৈলে বলিস্, এক নম্বর
নালিশ দেবো ঠুকে।

গল্প শোন

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বংকুবোসের মামা
পেটটি যেন ধামা
রাত দুপুরে হারমোনিয়াম
বাজায় সারেগামা!

মামার ছিল মাসী
নাকটি যেন বাঁশি
সকল সময় কান্না ঝরে
নাম যদিও হাসি!

মাসীর ছিল খুড়ো
চুলগুলি শনমুড়ো
কালো-সাদা মুখটিতে সে
মাখতো চুনের গুঁড়ো!

তার ছিল এক ছেলে
মাথায় পিদিম জ্বেলে—
গোঁফ জোড়াকে ডুবিয়ে ঘুমোয়
গন্ধ তিলের তেলে।

সেই ছেলেরই পিসে
যাত্রাদলে মিশে
সোনার দরে আনলো কিনে
লক্ষ টাকার সীসে।

পিসেরই এক ভ্রাতা
মস্ত বড় দাতা,
দশবছরে দান করেছে
একটি ব্যাঙের ছাতা!

তার ভায়ের-ই জামাই
দেয়না গায়ে জামা-ই!
রবিবারে অফিস করে
বাকী ছ'দিন কামাই!

গল্প হলো শোনা?
এবার আমি, সোনা।
চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়ো
দুষ্টুমি কোরো না॥

কবির ভাগ্য

রবিদাস সাহা রায়

দরিদ্র কবি মাতৃগুপ্ত। বড় লাজুক, তাই 'কারুর কাছে' কিছু চাইতে লজ্জাবোধ করেন। অভাব তাঁর দিন দিন বেড়েই চলতে থাকে।

উজ্জয়িনীর রাজা তখন হর্ষ বিক্রমাদিত্য। তাঁর রাজসভায় কবি ও গুণীজনের সমাবেশ। কোন উপায় না দেখে তাঁর দরবারে গিয়েই হাজির হলেন কবি মাতৃগুপ্ত। কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না। নীরবে রাজসভার এক ধারে বসবার জায়গা করে নিলেন।

সম্রাট হর্ষ মাতৃগুপ্তের কথা আগেই শুনেছিলেন। তিনি জানতেন,—মাতৃগুপ্তের যেমন কবিত্বশক্তি, তেমনি অপূর্ব চরিত্রবল। সেই কবিকে নিজের সভায় দেখে তিনি মনে মনে ভাবলেন—তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

এদিকে দিনের পর দিন যায়, মাতৃগুপ্ত নিরাশ হয়ে পড়েন। মহারাজ তাঁর দিকে মোটেই ফিরে তাকান না। একদিন তিনি সম্রাটের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করলেন। অথচ সেদিনও সম্রাট কোন অনুগ্রহের ভাব দেখালেন না। যাঁর উদারতার এত কাহিনী তিনি শুনেছিলেন, তাঁর এই আচরণ দেখে ভয়ানক মুষড়ে পড়লেন মাতৃগুপ্ত। তবু আশায় বুক বেঁধে দীনহীন বেশেই তিনি প্রতিদিন রাজসভায় আসতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে এসে গেল শীতকাল। একদিন রাত্রে ভয়ানক শীত পড়েছে। নগরীর সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে। কিন্তু গায়ে সাধারণ আবরণও নেই মাতৃগুপ্তের। ঘুম নেই তাঁর চোখে। রাজসভাগৃহের ভিতরে আশ্রয় নিয়ে কোনরকমে বাইরের হিমেল বাতাসের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

রাত্রে গোপনে নগর পরিভ্রমণে বের হলেন সম্রাট। সভাগৃহের কাছে এসে ডাকলেন, "কে আছ প্রহরী?"

কিন্তু প্রহরীও তখন ঘুমে অচেতন। মাতৃগুপ্ত সাড়া দিলেন, "নিদ্রিত নগরীর মধ্যে শুধু জেগে আছেন মহারাজ আর জেগে আছি আমি।"

মাতৃগুপ্তকে দেখে চমকে উঠলেন সম্রাট। জিজ্ঞেস করলেন, "কত রাত হয়েছে তার খবর রাখো বিদেশী?"

মাতৃগুপ্ত বললেন, "রাত শেষ হতে আর এক প্রহর মাত্র বাকি।"

সম্রাট অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি করে জানলে?"

তখন একটি কবিতায় মনের কথা নিবেদন করলেন মাতৃগুপ্ত: "প্রহরের পর প্রহর আমি গুণে চলেছি, কখন আশার সূর্য আঁধার ভেদ করে জেগে উঠবে।"

রাজা আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন।

পরদিন রাজসভায় এলো কাশ্মীর থেকে রাজদূত। কাশ্মীরের রাজসিংহাসন শূন্য। সেখানে কে বসবে, সম্রাট হর্ষকেই তা নির্বাচন করে দিতে হবে। সম্রাট যথারীতি তার জবাব লিখে দূতকে বিদায় দিলেন।

আরো দু'দিন কেটে গেল। নিরাশায় ভেঙে পড়লেন কবি মাতৃগুপ্ত। এমন সময় সম্রাট হর্ষ মাতৃগুপ্তকে ডেকে একটি পত্র দিয়ে বললেন, "এই পত্র নিয়ে আজই তোমাকে কাশ্মীর রাজ্যে যেতে হবে। অতি গোপনীয় এই পত্র, কিছুতেই খুলে দেখতে পারবে না। সেখানকার রাজকর্মচারীদের হাতে এই পত্র পৌঁছে দিতে হবে।"

সভার পণ্ডিতেরা ভাবলেন এইভাবে সম্রাট দরিদ্র লোকটিকে রাজসভা থেকে কৌশলে দূরে সরিয়ে দিলেন।

আজই তোমাকে কাশ্মীর যেতে হবে

কাশ্মীরের রাজধানীতে পৌঁছেই মাতৃগুপ্ত শুনলেন, রাজকর্মচারীরা সেখানেই অপেক্ষা করছেন। তাঁদের হাতেই মাতৃগুপ্ত পত্রটি দিলেন।

কিছুক্ষণ পর মাতৃগুপ্ত দেখলেন—সারি বেঁধে রাজকর্মচারীরা এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। বিনীতভাবে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই কি মহাত্মা মাতৃগুপ্ত?"

ভয়ে ও কৌতূহলে মাতৃগুপ্ত বললেন, "হ্যাঁ, এই দীন কবির নাম মাতৃগুপ্ত।"

প্রধান কর্মচারী অগ্রসর হয়ে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বলে উঠলেন, "হে মহাত্মন্, আপনি দীন কবি নন, আজ থেকে আপনি আমাদের প্রভু, কাশ্মীরের অধিপতি।"

কবি মাতৃগুপ্ত নির্বাক। মুখের ভাষা তাঁর হারিয়ে গেছে।

স্বপ্নকেও হার মানালো সেই সত্য কাহিনী। দরিদ্র কবি মাতৃগুপ্ত হলেন ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সম্রাট।

দাদুর দেয়ালঘড়ি

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

দাদুর দেয়ালঘড়ির কথা বোলো না আর মোটে
যখন খুশি যেমন-তেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে—
বারোর পরে চোদ্দ বাজে,
বাজতে বাজতে থামবে মাঝে
চলবে না সাতদিন
কে জানে ওর জন্ম কোথায় জাপান কিংবা চীন......

মাঝরাতে কার ঘুম ভেঙে যায় বাজনা শুনে ওর,
চারটি ঘণ্টা বাজলে পরে ভাবলো হল ভোর,
সকাল সকাল আপিস কে যায় কিংবা দেরী করে,
বিকেল হল জানায় ও যে বেলা দ্বিপ্রহরে—

ইচ্ছে হলে পুজোর বাদ্যি বাজিয়ে দেয় ওটা
ঢং ঢং ঢং ঢং পাঁচশো-পঞ্চাশটা......

বয়স তবু কী আর এমন
কাঁটাগুলো ঘুরছে কেমন—
দাদু বলেন, কোনো বাদশা এই বাড়িরই কাকে
ঐ ঘড়িটা দিয়েছিলেন পঁচিশ পুরুষ আগে ......

এত ঘণ্টা পেটায় তবু একটি ঘণ্টা হয় না
মাস্টারমশাই এলে পরে কোনো কথাই কয় না—
ছটার সময় নটা কেন বাজায় না ঐ ঘড়ি
ছুটির ঘণ্টা দেয় না কেন যখন আমি পড়ি?

মনোজিৎ বসু

গল্প একটি জিনিস

বহুকাল আগেকার কথা।

সূর্যপ্রতাপ রায় ছিলেন। তাম্রলিপ্তের এক নামজাদা সদাগর। ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে তিনি প্রচুর ধনদৌলতের অধিকারী হয়েছিলেন।

তাঁর কোষাগারে থাকতো বড় বড় সিন্দুক। সেই সব সিন্দুক সব সময় ভরতি থাকতো সোনার মোহরে আর বহু মূল্যবান মণি-মানিক্যে।

তাম্রলিপ্তের সমুদ্রের ধারে তাঁর কয়েকখানা অট্টালিকাও ছিল।

বাণিজ্যের মরসুমে বিদেশী সদাগরেরা এসে সেই সব প্রাসাদতুল্য বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

সংসারটা তাঁর কিন্তু খুব জমজমাট ছিল না।

যে-সময়কার কাহিনী বলতে বসেছি, সে-সময় তিনি বৃদ্ধ। পত্নীবিয়োগ হয়েছিল অনেক আগেই। একমাত্র পুত্র চন্দ্রপ্রতাপ—সে-ও ছিল বহু দূরে, নালন্দায়। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সে তখন পড়াশোনা করছিল।

কাছে থাকবার মধ্যে ছিল এক ক্রীতদাস। পুত্রেরই বয়সী। নাম ছিল তার—ছন্দক। মনিবের সেবায় বিশেষ তৎপর ছিল সে। যাকে বলে একান্ত অনুগত ভৃত্য।

সূর্যপ্রতাপ রায় একদিন অসুখে পড়লেন।

বিখ্যাত বৈদ্যেরা এলেন চিকিৎসা করতে। কিন্তু অসুখ আর কিছুতেই ভালো হয় না। স্বাস্থ্যবান বিরাট পুরুষ ক্রমশ যেন বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগলেন।

সূর্যপ্রতাপ বুঝলেন তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। পরপারের ডাক এসেছে এবার।

তিনি তাই একদিন ছন্দককে কাছে ডেকে, একখানা কাগজ তার হাতে দিয়ে, ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—এই কাগজখানা যত্ন ক'রে সিন্দুকে তুলে রাখ্‌। আমার বিষয় সম্পত্তি, বাড়িঘর, জমিজমা যেখানে যা-কিছু আছে সব তোর নামে লিখে দিয়ে গেলাম।

ছন্দক তো অবাক! ছেলে থাকতে তাকে না দিয়ে ক্রীতদাসকে দেওয়া কেন?

সে তাই মনিবের শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কিন্তু, ছোট মনিব থাকতে—

সূর্যপ্রতাপ হেসে বললেন—সে আর শেষ সময়ে থাকলো কই? এত চিঠি লেখা হলো আসবার জন্যে, কিন্তু আজও তো সে এসে পৌঁছুলো না। বাপের প্রতি এই তো তার দরদ! থাক্, তবু একেবারে বঞ্চিত করবো না তাকে। সে এসে যে-কোনো একটা জিনিস বেছে নিতে পারে আমার বিষয় সম্পত্তি থেকে। তা বাদে আর সবই তোকে দিয়ে গেলাম। আমার মৃত্যুকালীন ইচ্ছাপত্রে সে-কথা স্পষ্ট ক'রেই লেখা আছে।

নালন্দা থেকে তাম্রলিপ্ত অনেক দূর। বিশেষ করে রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অভাবে সেকালে এই দূরত্ব যেন অনেক বেশি মনে হ'তো। কাজেই, সদাগর-পুত্রের দেশে ফিরতে বেশ কিছুদিন লেগে গেল।

চন্দ্রপ্রতাপ যখন দেশে ফিরলো, তার কয়েকদিন আগেই সূর্যপ্রতাপ মারা গেছেন।

পিতৃশোকে মুষড়ে পড়লো তরুণ সদাগর-পুত্র।

সেই শোকের মধ্যে আবার তীব্র আঘাত হানলো ক্রীতদাস ছন্দক। মনিবের মৃত্যুকালীন ইচ্ছাপত্রখানি এনে চোখের সামনে যখন তুলে ধরলো সে, চন্দ্রপ্রতাপের শরীর তখন যেন ক্রমশ হিম হয়ে আসছে। পায়ের তলার মাটি যেন সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

চন্দ্রপ্রতাপের সেই অবস্থা দেখে ছন্দক বললে—অমন মুষড়ে পড়ছ কেন ছোট-মনিব? ইচ্ছামতো যে-কোনো একটি জিনিস তুমি বেছে নিতে পার। বড়মনিব তো সে-কথাও লিখে রেখে গেছেন।

কিন্তু কী নেবে চন্দ্রপ্রতাপ? মোহর ভরতি একটা সিন্দুক? সাধারণ রীতি ও নিয়ম অনুসারে সমস্ত ধনদৌলত, বাড়িঘর, জমিজমা যার পাবার কথা, একটা মাত্র সিন্দুকের মোহর নিয়ে সে কী করবে? আর, নেবেই বা কোন্ লজ্জায়? ছেলেকে উপেক্ষা করে যিনি তাঁর সর্বকিছুই একটা ক্রীতদাসকে দিয়ে গেলেন, তাঁর ঐ কৃপার কণাটুকু না নিলেও তার চলবে।

অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে চন্দ্রপ্রতাপ তখনকার মতো বিদায় নিলে।

ছন্দক তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—একটা জিনিস তুমি পাবেই। সে-জিনিস থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব না আমি। বড়মনিবের শেষ ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ কখনও করব না। যে-কোনো একটা জিনিস তুমি যে-কোনো সময়ে এসে নিয়ে যেতে পারো। কিন্তু, মনে রেখো বাকী সবই আমার।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে চন্দ্রপ্রতাপ এখানে ওখানে ঘুরে শেষটায় তার এক পিতৃবন্ধুর কাছে গিয়ে হাজির হলো।

তাঁকে সব কিছু খুলে বলে চন্দ্রপ্রতাপ জিজ্ঞাসা করলে—বলুন, এখন আমি কী করি? ক্রীতদাসের কাছে হাত পাতব? বাবার যে কী ভীমরতি হয়েছিল কে জানে! নইলে, আমি তাঁর একমাত্র পুত্র, আমাকে সব কিছু না দিয়ে—। করুণ আবেগে যেন কণ্ঠরোধ হয়ে এলো চন্দ্রপ্রতাপের। কথা শেষ করতে পারলে না সে। চোখ দুটো তার যেন ঝাপসা হয়ে এসেছে।

পিতৃবন্ধু সদানন্দের একটু হাসলেন।

তারপর চন্দ্রপ্রতাপের পিঠে হাত রেখে বললেন—বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেও দেখছি তোমার বুদ্ধি একটুও খোলেনি! বোকাই থেকে গেলে তুমি!

চন্দ্রপ্রতাপ অবাক হয়ে মুখ তুলে বললে—কী বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলছি। বোকা, বোকা, নেহাত বোকা আর ছেলেমানুষ তুমি। নইলে, সূর্যপ্রতাপের মৃত্যুকালীন ইচ্ছাপত্রের আসল অর্থটা তুমি ধরতে পারলে না? শোনো, একটিমাত্র জিনিস তুমি নিতে পার—এই কথাই তোমার বাবা লিখে রেখে গেছেন তো?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আর গোল কোথায়? সে-জিনিসটি নিলে তোমার সব কিছুই মেলে সেই জিনিসটিই তুমি নাও। ক্রীতদাস ছন্দক তোমার বাবারই কেনা লোক এবং তাঁর বিষয়সম্পত্তির মধ্যেই তাকে ধরা যায়। কাজেই, ক্রীতদাসকে পেলে, সবই তো তোমার।

চন্দ্রপ্রতাপের মুখ এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ইচ্ছাপত্রের মধ্য দিয়ে বাবা যে তার বুদ্ধির পরীক্ষাই করতে চেয়েছেন এবারে তা বুঝলো সে।
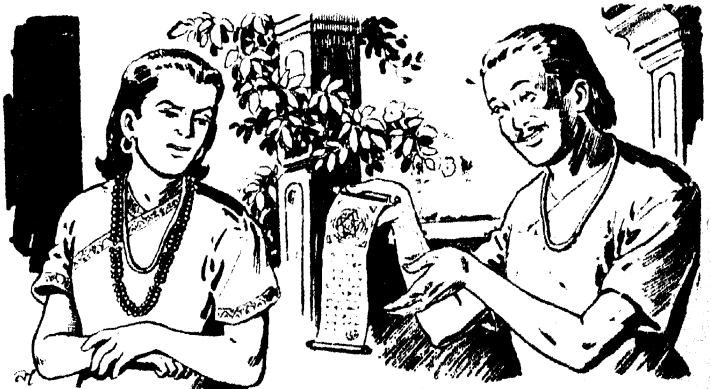
ইচ্ছা-পত্রখানি এনে চোখের সামনে ধরল

দুখ হরণ মাদুলি

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

একেবারে অভিনব, 'দুঃখ-হরণ মাদুলি!'
দশ-বিশ টাকা নয়, দাম এক আধুলি।
পরীক্ষা ক'রে দ্যাখো, ঠকবেনা ভাইরে;
বলছি যা সাচ্চাই, ফাঁকিজুকি নাইরে!
কিনে নাও যদি চাও গুণ এর জানতে;
কয়টা নিয়ম শুধু হবে রোজ মানতে।
এই ধরোঃ ঘুম থেকে খুব ভোরে উঠবে,
খোলামাঠে খানিকটা হাঁটবে কি ছুটবে।
ঘরে ফিরে কিছু খেয়ে বই নিয়ে বসবে,
লিখবে হাতের লেখা, আঁকগুলো কষবে।
ইস্কুলে যাবে রোজ, দিওনা কামাইরে;
সন্ধের পর যেন থেক না কো বাইরে!
মুখটাকে সর্বদা হাসি-খুশী রাখবে,
সব্বাইকার সাথে মিলে-মিশে থাকবে।
অন্যায় করবে না, কইবে না মিথ্যে,
বিপদের মাঝখানে বল রেখো চিত্তে।
ওকি ভাই, চললে যে? মাদুলি কি চাও না?
পয়সা না থাকে যদি এমনিতে নাওনা!!

পুজোর দালান

প্রসূন মিত্র

শিউলিতলায় মৌ মৌ খোশ্‌বাই
ভোরের হাওয়ায় হলুদ আলোর গন্ধ
প্রজাপতিদের পাখনার রোশ্‌নাই
—মনের জান্‌লা রাখব না আজ বন্ধ।
কি জানি কি এক আজগুবি মন্তরে
বিষ্টিকান্না ভুলেছে আকাশ-মেয়ে।
মেঘে মেঘে বুঝি ঢাক বাজে? শোন্‌তো রে
মিষ্টি বাতাসে শানাই উঠলো গেয়ে।
পুজোর দালানে কারা আল্‌পনা আঁকে
ছোট্ট ছেলেটা বড়ো দুটো চোখ মেলে
দেখে আর ভাবেঃ একবার কোনো ফাঁকে
ধরবেই মাকে—পুজোর দালানে এলে।
সব্বাই ওরা বলেছিলো ওকে ডেকেঃ
এমনিই এক দুগ্‌গো পুজোর দিনে
আকাশ-পারের মামাদের বাড়ি থেকে
আস্‌বে মা ফিরে—নতুন খেল্‌না কিনে।
ফি—বছরে তাই ষষ্ঠীর ভোরবেলা
ছোট্ট খোকার ঘুম থাকে নাকো চোখে
সারাদিন বসে দালানেই করে খেলা
পুজোর দালানে—ঘুমোয় সাঁঝের ঝোঁকে।
কত পুজো এলো বছর বছর ধরে
কত খোকাখুকু কত মায়েদের ভিড়ে—
ঠাকুর-দালান কলরবে গেল ভ'রে।
হারানো মা আর এল না কখনো ফিরে।
শিউলিতলায় আজো প্রজাপতি ওড়ে
পুজোর দালানে লোকজন হয় জড়ো
কত খোকা আসে মায়েদের কোলে চ'ড়ে
সেদিনের খোকা? আজ সে মস্ত বড়ো।
ষষ্ঠীর দিনে আজো কিন্তু সে—
চুপ ক'রে বসে থাকে।
মনে মনে ভাবেঃ কত পুজো দিলে
ফিরে পাওয়া যায় মাকে।

খুব হুঁশিয়ার! ফটো—তরুণ মুখার্জি

মজাদার রুমালের জাদু

জাদুরত্নাকর এ-সি সরকার

দর্শকদের কাছ থেকে একটি সাধারণ রুমাল চেয়ে নিয়ে তার দুই কোনা ধরে মেলে দেখালাম সবাইকে' এর পরে রুমালটাকে জড়ো করে ধরে পড়লাম ম্যাজিকের মন্ত্রঃ—

"হোকাস পোকাস বিলী
মিশরী মন্তর গিলী।"

এবার জড়ো করা রুমাল আস্তে খুলে ধরতে দেখা গেল যে, তার ভেতরে রয়েছে একটি পিং-পং বল। এটি আমার আবিষ্কৃত একটি খেলা। মন্তরের কি অদ্ভুত গুণ দেখলে তো? সত্যি কথা বলতে কি,
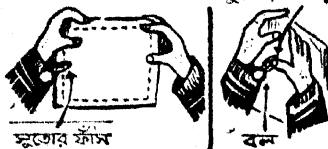
মন্তরের গুণে কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারটা হয় না মোটেই। এ খেলাটা দেখাতে হলে আগে থেকেই একটা কৌশল করে রাখা বিশেষ দরকার। সেই কৌশলটা যে কি **সেই কথাই এবার বলছি।**

একটা পিং-পং বল নিয়ে **তার গায়ে** লাগিয়ে রাখবে একটি কালো সুতোর **ফাঁস** গালা দিয়ে। খুব ছোট্ট একটুকরো **গালা** ছ ইঞ্চি লম্বা একটা সুতোর এক **প্রান্তে** লাগিয়ে নিয়ে সেই গালার টুকরোটা **একটু** তাপ দিয়ে গালিয়ে নিয়ে বলের গায়ে **চেপে** ধরলেই সেঁটে যাবে। এবারে এই সুতোটাতে গিঠ বেঁধে ফাঁস বানিয়ে নেবে। এই **ফাঁস** বাঁধা পিং-পং বলটা **লুকিয়ে রাখবে বাঁ** হাতের কোটের আস্তিনে, যাতে করে **সুতোর** ফাঁসটা থাকে বাইরে। সাবধান! **বলটা যেন** দর্শকদের নজরে না পড়ে। এখন **রুমালটা** মেলে ধরার সময়ে দর্শকদের দৃষ্টির **আড়ালে** ডান হাতের বুড়ো আঙুলে আটকে **নেবে** সুতোর ফাঁস আর রুমাল গুটোবার **সময়ে** বলটাকে টেনে বের করে এনে ঘষে ঘষে **খুলে** নেবে সুতোটা বলের গা থেকে। **আঙুল** থেকেও এই একই সময়ে সুতোটা **সরিয়ে** ফেলা চাই। রুমালের আড়ালে এসব **করার** ফলে দর্শকদের নজরে পড়ে না মোটেই।

এটি একটি খুবই উচ্চাঙ্গের জাদুকৌশল, কাজেই অনেক অভ্যাস করে তবেই **এ খেলা দেখানো উচিত।**

কত বড় হবে ?

খোকার ইচ্ছে বড়ো হওয়ার—পরবে পোশাক বড়ো
সাত রাজ্যের কোট প্যাণ্টো তাই করেছে জড়ো।
কিন্তু সবই হচ্ছে ঢিলে, লাগছে না ঠিক মতো
কী করা যায়! পায় না উপায় ভাবনা বাড়েই ততো।

'বাবার চেয়ে অনেক বড়ো—লম্বা আরও খাড়া
হাওড়ার পুল ছাড়িয়ে যাবো দিলে মাথা চাড়া।'
খোকার কথা শুনে বুড়ি ফোকলা দাঁতে হাসে—
হাত তুলে দেয় ফুস্-মন্তর! খুক্-খুকিয়ে কাশে!

তেমন সময় ইচ্ছে বুড়ি, ঠুকুস ঠাকুস আসে
খোকার মনের খবর পেয়ে মিটমিটিয়ে হাসে
বলে—'জানি ইচ্ছে তোমার অনেক বড়ো হবে—
কত বড়ো হলে খুশি? আমায় বলো তবে।'

ইচ্ছে-বুড়ির মন্তরেতেই বাড়তে থাকে খোকা
বাড়ের বহর দেখে তখন খোকার লাগে ধোঁকা।
কেমনতরো বেড়েছে সে, এই ছবিতেই দেখো,
অমন বড়ো হতে চাওতো আজই চিঠি লেখো।

কথা : শ্রীবিমল ঘোষ

ফটো : শ্রীরেবন্ত ঘোষ

অশরীরিনী

সমরেশ বসু

স্টেশনটা দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল শুভেন্দুর। মেজাজ খারাপ ছিলই নানান কারণে। শুভেন্দু সেই ধরনের সস্তা আবেগ বহুল্যবর্জিত ছেলে, ভিতরে বাইরে পুরো নাগরিক জীবন কাটাতে গিয়ে, গ্রামের নামে যাদের প্রাণ উথলে ওঠে না। গ্রাম-পুকুর-দীঘি, বাগান-পাখী-আকাশ, এসব তাকে কোনোদিনই বিস্মিত করেনি। তাক লাগায়নি। গ্রামের আকাশ দেখে, রবিঠাকুরের দু' লাইন কবিতা আবৃত্তি করে ওঠা, ওসব মধ্যবিত্তসুলভ ভাঁড়ামি বলে সে জানে। আর সে রকম অনেক ভাঁড়কেও সে দেখেছে। শহরের যে যতো সেরা পোকা, পাড়াগাঁয়ের নামে লালা ঝরে তাদেরই বেশী।

গ্রাম থাকুক গ্রামকে নিয়ে। শুভেন্দু শহরকে নিয়ে থাকতে চেয়েছিল বালি-গঞ্জের দীঘিই তার সেরা দীঘি। চৌরাঙ্গির ময়দান আর পার্ক এবং গঙ্গার ধারের, আকাশ-মুক্তি-সবুজই যথেষ্ট। কংক্রীটের ফুটপাতে যে দু চারটে শুকনো পাতা উড়ে আসে, আর ধুলি রক্তিম আকাশে যেটুকু দক্ষিন হাওয়া বহে, তার বসন্ত উথলে ওঠে তাইতেই। তাইতেই মনে হয়, আজ একটু ডাকি বনশ্রীকে। গিয়ে বসি ময়দানের মাঝখানে। কী আর! ও একটু কাজল মাখবে চোখে। আমি যাব চুলে একটু বেশী ঢেউ তুলে। ও বলবে, বিয়ের চেষ্টা কিন্তু চলছে। আমি বলব, চাকরি একটা জুটছে না কিছুতেই।

কলেজের বন্ধুত্ব ওর বেশী আর কত দূরে গড়ায়। কিংবা, কলকাতার ইমারতমোড়া আকাশে যেটুকু বর্ষা নামে, মেঘ গর্জায় আর বিদ্যুৎ চমকায়, তাইতেই শুভেন্দুর প্রাণে দাদুরী ডাহুকীরা হেঁকে ডেকে ওঠে। তাইতেই মনে হয়, জল ছপছপিয়ে, স্যান্ডেল আর কাপড় ভিজিয়ে, যাই গিয়ে ডাকি রেখাকে। বসি গিয়ে কফি হাউসে। রেখা যদি ভেজে একটু, ভালোই। স্বাস্থ্যটা তো নিটুট। গঠনটিও নিখুঁত। ওর সঙ্গে সুবিধে এই, প্রেমের ছেলেমানুষিটা রেখার একেবারেই নেই। আমার মতো, দাদাদের অন্নে পালিত, আর দাদাদের রূপোর চকচকে গ্রাজুয়েটকে অতটা বিশ্বাস ওর নেই। একটু আস্কারা দেয় অবিশ্যি। বর্ষায় কফি হাউসে সেটুকু ভাঙিয়ে খেতে একটা অনুগ্র ইচ্ছে হয়ই।

আর বনশ্রী রেখাদের ছাড়াও, কলকাতার ছক কাটা আকাশে, আঁকাজোকা মেঘ-রৌদ্রও সার্বজনীন বারোয়ারীতলার ঢাকের শব্দে যথেষ্ট ঝলকায়। শারদশ্রীর ভাগ যে তাতে কম পড়ে, মনে তো হয় না। কিংবা শীতের ধূসর কলকাতার নানান নাচ-গান-জাদু আর জনবহুলতা কিংবা বিদেশীদের ভিড় কম রোমাণ্টিক নয়।

কলকাতা, কলকাতাই। তার ধুলি জল যাই হোক, জন্ম থেকে শুভেন্দু তাই মেখে মেখে মানুষ। আর সেই শহরের মানুষেরাই তার চিরকালের চেনা। সেখানে তার পঁচিশ বছর কেটেছে। কোনোদিন মনে হয়নি যে বাংলাদেশের পাড়াগাঁ আবিষ্কার না করলে, জীবনটা বুঝি ব্যর্থ। বরং পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যেই একটি অত্যন্ত সাধারণ জীবনের স্বপ্ন সে দেখেছিল। মোটা-মুটি একটি ভদ্রগোছের চাকরি। একটি বিয়ে। বান্ধবীদের মধ্যেই কেউ এক-জন হলেই হত। একলা একটি বাসা। ছেলেমেয়ে হলেও চলে, না হলেও ক্ষতি নেই। নিরুপদ্রবে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যাওয়া। কিন্তু এই শহরেই। এই শহরেরই কেওড়াতলা অথবা নিমতলায় শেষদিনে গিয়ে পেঁছুনো।

কিন্তু এ যুগটা চোরা, যে না শোনে ধর্মের কাহিনী। নইলে, শুভেন্দুর কপালে কেন শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জরীপ বিভাগের কেরাণীগিরি জুটবে। মনের মতো নয় বলে, বেসরকারি ছোটখাটো অনেক চাকরি সে এড়িয়ে গিয়েছিল। আর যেটা সব থেকে অমনোমতো, সেটার বেলায় জেদ ধরে বসেছিলেন দাদারা। বিধবা মা তাকিয়েছিলেন অসহায়ভাবে। অতএব শেষ পর্যন্ত হুগলি জেলার এক মহকুমা শহরের অফিসে।

সেখানে প্রবাসী কর্মচারীদের একটা মেস জাতীয় আস্তানা ছিল। সেখানে মানুষ কেমন করে থাকে, সেটা শুভেন্দু ধীরে ধীরে জেনেছিল। পুরনো সেকালের অন্ধকার ঘর, কিংবা ডাইনীবুড়ির মতো সেই ব্রাহ্মণীর রান্নাতেও আপত্তি ছিল না ওর। লোকগুলি যা খায়, সব সময়ে প্রায় তারই ঢেকুর তোলে। শুধু অফিস, বড়বাবু, সার্ভেয়ার, ওভারসিয়ার, এই তাদের প্রসঙ্গ। মাঝে মধ্যে তাস দাবা বসে। তার ফাঁকেও ওই এক কথা। 'তা বলে, ওভারসিয়ারবাবু যে রকম করে উঠলেন! আরে বাবা সাত নম্বর ফাইল কি আর আমরা...এ্যাঃ, এই যে বাবা, তুমি বাবা বড় ঘুঘু হে পাইন, এইবার কিস্তী মাৎ! ঘোড়েটা বুঝি দেখতে পাওনি?' জানা না থাকলেই কথাগুলি ঘুলিয়ে যাবার ভয়। দু' একজন অবশ্য সন্ধ্যার পরেই বেরিয়ে যেত। গোপন করার তাগিদও তেমন ছিল না। শহরেরই কোন্ এক এঁদো নোংরা গলিতে তারা যেত। সেখানে

দেহপোজীবিনীরা ছিল।

শনিবারের দুপুর থেকেই প্রায় মেস ফাঁকা। সবাই যে যার বাড়ি চলে যেত। শুভেন্দু যেত। সোমবার ভোরবেলাই বেরিয়ে পড়ত আবার। আর সেটা একরকম অভ্যাস হয়ে আসছিল। তারপরেই হুকুম এল জরীপের কাজে যেতে হবে মফস্বলে। এই তো মফস্বল। আবার মফস্বল কিসের?

শুভেন্দু শুনল, এটা তো সদর মফস্বল মানে গ্রামে যেতে হবে এবার। স্বয়ং জেলা সার্ভেয়ার ওভারসিয়ারের সঙ্গে বসে একটা পার্টির লিস্ট করে ফেললেন। আর লিস্টের প্রথম দু তিনজনের মধ্যেই শুভেন্দু।

শুভেন্দু একবার, শেষবারের জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে ভেবেছিল, রিজাইন দেবে কিনা। তবু তার আগে একবার সার্ভেয়ারের কাছে আর্জি নিয়ে গিয়েছিল। সার্ভেয়ার চ্যাটার্জি শুভেন্দুর কাঁধে দুটি স্নেহের চাপড় মেরে বলেছিলেন, আ রে ইয়ংম্যান, তুমি এসব কী বলছ। কোনো ভয় নেই। আচ্ছা, অল রাইট, তুমি একেবারে শেষ লটে, আমার সঙ্গে যাবে। বুঝতে পারছি, তোমার অসুবিধে। কখনো গ্রামে যাও টাওনি। তোমাকে আমি আমার হেফাজতে রেখে দেব। তোমাদের মতো দু-চারজন না হলে আমরাই বা থাকব কেমন করে?

প্রৌঢ় চ্যাটার্জি সরল না চালাক, কিছু বুঝতে পারেনি শুভেন্দু। কিন্তু আপত্তি সে করতে পারেনি। শুধু তাই নয়। ওঁর দুটি ছোট ছোট চাপড়ের যে অনেক দাম, সেটা বোঝা গিয়েছিল কর্মচারীদের হাসি আর বিদ্রূপে।

কিন্তু স্টেশনে নেমেই শুভেন্দুর মন ভেঙে গেল। একটি প্ল্যাটফরম। তাও ইঁট পাতা। ফাঁকে ফাঁকে ঘাস গজিয়েছে প্রচুর। ইঁটগুলিতে শ্যাওলা পড়েছে। ছোটখাটো গর্তও হয়েছে এখানে সেখানে। একটা কুকুর আর গোটি দুই গরু শুয়ে রয়েছে। শেড একটি আছে। তার তলায় গোটি তিন চার কালো কালো নেংটিপরা মানুষ রয়েছে শুয়ে বসে। যেন ওরা যাত্রী নয়। ওটাই থাকবার আস্তানা।

আজ স্বয়ং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তাঁর গুটিকয় সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসেছেন সার্ভেয়ারের রিসেপশনে। এর আগে গোটা একটা অফিস এসে গেছে। তার সঙ্গে পুরোপুরি একটা মেস। ঠাকুর, চাকর, হাঁড়ি কুঁড়ি ডেয়ো ঢাকনা। শেষ লটে শুভেন্দুকে নিয়ে দুজন কেরাণী, ওভারসিয়ার আর সার্ভেয়ার।

জনাকয়েক কৃষক শ্রেণীর লোক এসে শুভেন্দুদের ব্যাগ বিছানাপত্র নিয়ে চলে গেল। অভ্যর্থনায় যারা এসেছে, তাদের কাউকে দেখে শুভেন্দুর মনে হল না যে, দুটি কথা বলা যাবে। ভাবভঙ্গিও অদ্ভুত। চাউনিগুলি মোটেই ভাল লাগল না। যেন সরকারি কেরাণী কর্মচারী কেউ কোনোদিন দেখেনি। হাত জোড় করে, হেসে বিগলিত হয়ে আসুন, আসুন করছে। যেমন জামা কাপড়, তেমনি হাতে পায়ের ছিরি।

গোল কাটা ফতুয়া পরা, ঢ্যাঙা রোগা মধ্য-বয়স্ক লোকটাই লাফালাফি করেছে বেশী। ফতুয়ার বোতাম নেই। তেলচিটে পৈতা দেখা যাচ্ছে। কপালে মাটি না কি চন্দনেরই ফোঁটা একটি। টিকিতে একটি ফুল বাঁধা। মোটা ভাঙা গলায় লোকটা অনবরত যেন বরপক্ষের অভ্যর্থনা করে চলেছে, আসুন আসুন। আহা, কী কষ্ট! এই পাড়াগাঁয়ে, না থাকবার সুখ, খাবার সুখ, আর আপনারা, আহা। আসুন আসুন।

প্রেসিডেন্ট দুবার ধমকালেন, আঃ! গাঙ্গুলি, একটু থামো না বাপু!

লোকটা তাহলে গাঙ্গুলি। শুভেন্দুরই পদবী। কী বিচ্ছিরি! কিন্তু লোকটাকে কিছুতেই নিরস্ত করা যাচ্ছে না। ধমক খেয়ে একটু থেমে, আবার শুরু করে।

স্টেশনের বাইরে এসে পচা ঘাস পাতার গন্ধ নাকে লাগল। আর তারই সঙ্গে একটা [illegible] গন্ধ। আকাশ থেকে মেঘ বিদায় নিয়েছে। রৌদ্রালোকে হেমন্তের [illegible] করছে। কিন্তু রাস্তায় লোকজন [illegible] চারদিক নিঝুম। দিনের [illegible] ঝিঁঝির চীৎকার। ওরই [illegible] চালা ঘর রয়েছে রাস্তার ধারে। একটি চায়ের দোকান বোঝা যায়। তার সঙ্গে তেলেভাজা। নোংরা চুপড়ি আর কাঠের বারকোশে কালো কালো খাবারগুলি সাজানো। মাছি ভ্যান ভ্যান করছে তার ওপরে। যে দু একজন করে লোক বসে আছে দোকানে, তারাই নিশ্চয় খায় ওগুলি। সকলেই চুপচাপ, হলদে হলদে চোখে, নির্বাক কিন্তু কৌতূহলী দৃষ্টিতে শুভেন্দু-দের দেখছে।

তিনটি গরুর গাড়ি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। শুভেন্দুদের নাকি যেতে হবে ওতেই। চ্যাটার্জি [illegible] একটা গাড়িতে উঠে ডাকলেন, কই হে শুভেন্দু, ইউ কাম উইদ মী।

ওরকম খাঁটি বাংলা আর ইংরেজী মিশিয়ে কথা বলেন উনি। কয়েকদিনের মধ্যে ওঁর সঙ্গে সম্পর্কের আড়ষ্টতা একটু ভেঙে গেছে। কিন্তু ওই গরুর গাড়িতে যাবার কথা ভাবতেই পারল না শুভেন্দু। বলল, স্যার ওতে আমি উঠতে পারব না। আমি বরং হেঁটেই যাচ্ছি।

গাঙ্গুলি হাউ মাউ করে উঠল, না না না দাদা, কিছুতেই যেতে পারবেন না। এক কোশ রাস্তা হাঁটতে হবে। আপনি উঠে পড়ুন।

চ্যাটার্জি বললেন, অবিশ্যি হেঁটে আসতে পারলেই ভাল। কারণ গা হাত পায়ের আর কিছু থাকবে না। কিন্তু এ রোদ মাথায় করে—

—তা হোক স্যার, আমি হেঁটেই যাব।

শুভেন্দু স্থির হয়ে রইল। চ্যাটার্জি বললেন, তবে তাই এস। তোমার সংগে তা হলে—

—আমি, আমি যাব ওনার সংগে, কোনো ভয় নেই।

এও সেই গাংগুলিই তাড়াতাড়ি হেঁকে উঠল। শুভেন্দু একটু থমকে গেল শুনে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর দলবল তখন গরুর গাড়িতে চড়ে চলতে আরম্ভ করেছে। শুভেন্দু দেখল, সে আর গাংগুলি দাঁড়িয়ে আছে। গাংগুলি মাথায় একটি গামছা জড়িয়ে বলল, চলুন দাদা। আমরা শর্টকাট মারব।

বলে চলতে আরম্ভ করল। শোভা দেখবার কিছু নেই। তা' ছাড়া নীচের দিকে না তাকিয়ে চললেই আছাড় খেতে হবে। আর গাংগুলির শর্টকাট-এর রাস্তাও খুব সুবিধের নয় মনে হল। বনগাঁদা আর বনশিউলীর ঝোপের, অন্ধকার সুঁড়িপথ দিয়ে লোকটা প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে চলেছে। এ পথে সারা বছরেও কাদা শুকোয় কি না, কে জানে। শুভেন্দুর পা চুলকোতে আরম্ভ করেছে। কিছুটি হয় তো আছে। তবে চলন্ত মশারাও যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। সেই সংগেই গাংগুলি চীৎকার করে এ গ্রামের পরিচয় দিয়ে চলেছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ, পণ্ডিত, বড়লোক, জমিদার, দেব-দেউল, রথ দোল, এই রকম টুকরো টুকরো শব্দ কানে যাচ্ছিল শুভেন্দুর। আর ভাবছিল, চ্যাটার্জির সংগে গরুর গাড়িই বোধহয় ভাল ছিল।

এক সময় একটু ফাঁকা জায়গায় আসা গেল। গ্রামেরই অভ্যন্তর বোধহয়। জংগল আর বড় বড় ভাঙা পোড়ো বাড়ি, জীর্ণ মন্দিরগুলি দেখে, শুভেন্দুর এক সময়ে মনে হল, অতীত ইতিহাসের কোনো একটা পরিত্যক্ত নগরে যেন সে এসেছে। যেন ভয়াবহ কোনো দুর্যোগে, একদিনেই এই নগরের চলমান মুখর জীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভূমিকম্পে কিংবা দুর্ধর্ষ কোনো শত্রুদের আক্রমণে যেন সব ধ্বংস করে, লুপ্ত করে দিয়েছিল। এবং তারপর থেকে, জংগল গজিয়েছে। মানুষ নেই। পাখীরাও যেন আচমকা ভীত স্বরে কিছু একটা জিজ্ঞাসায় ডেকে উঠছে। শুভেন্দু ভয়ে ভয়ে আশে-পাশে তাকান। নিশ্চয়ই আশেপাশে—।

গাংগুলির গ্রাম-গৌরব গাথায় বাধা দিয়ে বলেই ফেলল শুভেন্দু, এখানে সাপটাপ—

—তা' আছে। খুব আছে। তবে ভয় নেই।

—ও! তেমন বিষাক্ত—

—তা হ্যাঁ, খুব বিষাক্ত সাপই আছে। গ্রাম তো নয় দাদা, ইঁটের পাঁজা। এখানে যাঁরা থাকতে পারেন, তাঁরাই আছেন। গোখরোই বেশী। বোড়া চিতিও বেশ আছে। তবে ভয়ের কিছু নেই।

—সে রকম উপদ্রব বুঝি—

—বিশেষ কিছু নয়। এই সেদিনও তো পাঁচটা বেরালছানা খেয়ে ফেলেছিল একটা কালী গোখরোতে। তা হজম করতে পারলে তো। নড়তেই পারেনি। ধরে নিয়ে গেল সাপুড়ে এসে। ভয় কিছু নেই।

যাক, তবু বেড়ালছানার ওপর দিয়ে গেছে। শুভেন্দু বলল, যাই হোক মানুষকে তো আর—

—তা, সেও এই তো মাসখানেক আগে একটা মানুষকে খেল।

মানে? লোকটা কি তার সংগে ইয়ার্কি করছে নাকি? গাংগুলির মুখের দিকে তাকাল সে। কিন্তু গাংগুলি নির্বিকার। শুভেন্দু রুষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল, মানুষকেও কামড়ায় তা হলে?

—তা দাদা প্রতি বছরেই এক আধটা যায়। সে আর কী করা যাবে। তবে—

—ভয়ের কিছু নেই বলছেন, না?

শুভেন্দু প্রায় রেগে উঠেই বলল, কেন বলছেন?

গাংগুলি ফাঁক ফাঁক বোগরা দাঁতে হেসে বলল, এই নিজেদের দেখে বলছি, বুঝলেন না? এই গাঁয়েই দাদা বেঁচে তো আছি। ভয়ের কী আছে। ওনারা কোথায় নেই, বলুন!

শুভেন্দু বলল, কলকাতায় নেই।

নিশ্চিন্ত হয়ে বলল গাংগুলি, অ! কলকাতায় তো শুনেছি, মাটির তলায় খালি ময়লা যাবার নল আছে। কোথায় থাকবে বলুন!

এর পরে আর লোকটাকে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রবৃত্তি হল না শুভেন্দুর। কেন সে মুখ খুলেছিল, সেটাই আশ্চর্য! সে চুপচাপ চলতে লাগল।

শেষ অবধি, একটি মস্ত বড় পুরনো বাড়ির কাছাকাছি এসে গাংগুলির গতি মন্থর হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সামনের ঝোপটা কেঁপে উঠল। যেন দুলে উঠল জোরে। তারপরেই যেন কিছু সড়সড় করে চলে গেল ভিতর দিয়ে।

শুভেন্দুর বুকটা ধ্বক করে উঠল, সে দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে। গাংগুলি হেঁকে উঠল, কে রে?

বলে সে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল বুক সমান ঝোপের মধ্যে। বলল, অ! শুভেন্দুর দিকে ফিরে বলল, মানুষ। আসুন, এই বাড়ি।

কিন্তু বুকের থরথরানিটা তখনো পুরো থামেনি। মানুষ শুনেও হঠাৎ চমকানির তরংগটা সহসা থামল না। আর মানুষই বা ওখানে করছিল কী? ওই বনশিউলীর রাক্ষুসী বনে। শুভেন্দু ভাঙা নোনা ইঁটের পাঁজার ওপর দিয়ে এগোচ্ছিল। গাংগুলি ডেকে বলল, উঁহু, ওদিকে নয়। ওটা অন্দরমহল। এদিক দিয়ে আসুন। আপনাদের ব্যবস্থা বারমহলের দোতলায় হয়েছে।

কি রকম-অন্দরমহল, কিছু বুঝল না শুভেন্দু। প্রায় ভেঙে পড়া বাড়ি। দরজা জানালা একটিও আস্ত নেই। তবু ভিতরের অন্ধকার ঘোচেনি। ফাটলে গজানো অশথের ডাল জড়িয়ে জংলী লতা অন্দর-মহলে গিয়ে ঢুকেছে। মস্ত বড় একটা পিটুলী গাছের তলা দিয়ে বাড়িটাকে প্রায় প্রদক্ষিণ করে বাঁক নিল গাংগুলি। শুভেন্দু না জিজ্ঞেস করে পারল না, কার বাড়ি এটা?

—আমার ভগ্নিপতির। মানে উনি মারা গেছেন। একলা মেয়েছেলে, আমিই দেখা-শোনা করি। কিন্তু দেখুন, হুই যে আসছে আমীনবাবুদের গরুর গাড়ি। আমরা কত আগে চলে এসেছি।

শুভেন্দু দেখল, সত্যি সামনের অনেক-খানি খোলা জায়গা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, গরুর গাড়িগুলি এখনো অনেক দূরে। আধমাইল তো বটেই। এখন গাংগুলির 'শর্টকাট' কিংবা গরুর চেয়ে তাদের পায়ের জোর বেশী, সেটা বিচার্য।

দোতলা থেকে কয়েকজন হাঁক ডাক করে উঠল।—আরে শুভেন্দুবাবু যে, এসে পড়েছেন? সার্ভেয়ার সাহেব কোথায়?

গাংগুলিই জবাব দিলেন, অই আসছেন গরুর গাড়িতে করে।

দোতলার চেহারা দেখে শুভেন্দুর ভয় বাড়ল বৈ কমল না। গোটা বাড়িটা যেভাবে ফেটেছে, বেঁকেছে, তাতে সাপের ছোবল না হোক, যে কোনো মুহূর্তেই হুড়মুড় করে পড়ে যেতে পারে। অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে দেখল, তার মধ্যেই অফিস সাজানো হয়েছে। ঘরে ঘরে সারি সারি বিছানা পাতা হয়ে গেছে। দড়ি টাঙিয়ে জামা কাপড় লুংগি গামছা মেলা হয়ে গেছে।

ঘরগুলির পলেস্তারা খসেছে অনেক-দিন। উইয়ে খাওয়া কড়ি বরগাগুলিতে নিদেন আলকাতরার পোঁচড়াও পড়েনি বহুকাল। ঘরের মধ্যেই ঝিঁঝি ডাকছে গলা ফাটিয়ে। আশে পাশে দু'তিনটে পিটুলি আম গাছ দাঁড়িয়ে আছে ঘর অন্ধকার করে। নোনা ইঁট আর বুনো জংগলের একটা তীব্র গন্ধ সবখানে।

কিছু না হোক, মাস দুয়েক অন্তত থাকতেই হবে এখানে। এর নাম চাকরি। এই শ্মশানের নিস্তব্ধতা, আর এই পোড়ো বাড়িকেই বাসস্থান বলে মেনে নিতে হবে। খা খা শব্দের একটা আসল রূপ এতদিনে দেখল শুভেন্দু। সত্যি, যেন চারদিক খা খা করছে। আকাশ গাছ রোদ, সবই যেন

আড়ষ্ট, স্থবির আর শ্বাসরুদ্ধ।

অবিশ্যি, চাটার্জি সাহেবের ঘরের পাশে, পূর্ব-দক্ষিণ খোলা ছোট একটি ঘরে, ওভারসিয়ার মৈত্রবাবুর সঙ্গেই তার থাকবার জায়গা দেওয়া হয়েছে। আর তার জন্যে একজন টিপ্পনীও কাটল, দলের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে ছেলেমানুষ। একটু আগলে রাখার ব্যবস্থা না করলে কখন ভয়টয় পাবেন।

জানা গেল, স্নান খাওয়ার ব্যবস্থা নীচেই। পুকুরের জলই ভরসা। টিউব-ওয়েলের সান্ত্বনা যদিও আছে।

কাজ আরম্ভ হল পরদিন থেকেই। যে তিনজন কেরাণীর সব সময় অফিসে থাকবার ব্যবস্থা হল, তারা মধ্যে দুই প্রৌঢ় আর শুভেন্দু। বাকী সকলেই সকালবেলা বেরিয়ে যান জরীপ করতে। বেলা একটা নাগাদ আসেন। তারপরে খাওয়া দাওয়া সেরে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলে। তখনই যত গ্রামের লোকের আনাগোনা। কেউ প্রয়োজনে, কেউ অপ্রয়োজনে। কেউ সার্ভেয়ারের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে। কেউ ওভারসিয়ারের সঙ্গে ফিসফিস করে। কেরাণীদের কাছেও ঘুর ঘুর করে অনেকে। আর জরীপ নিয়ে তর্কবিতর্ক, ঝগড়া বিবাদ, অন্যায় অবিচারের গোলমাল তো আছেই।

সে আর কতটুকু সময়। সময় যেন এখানে তরঙ্গহীন স্তব্ধ অশেষ সমুদ্রের মতো চুপ করে পড়ে থাকে। কচিৎ কখনো অস্পষ্ট, বিচ্ছিন্ন, মানুষ কিংবা গরু ছাগলের প্রায় বিস্ময়কর শব্দের মতো স্বর শোনা যায়। এখানকার নৈঃশব্দ্যে তাতে বিশেষ তরঙ্গ তোলে না।

দুপুর পর্যন্ত কোনো কাজই থাকে না।

Gopal Hosiery, Calcutta-32

শুভেন্দু পা টিপে টিপে বেরিয়ে, একটু এদিকে ওদিকে ঘোরে। প্রায় নির্বাসিত। কোথায় বা যাবে। বনশিউলী বাঁশঝাড় আর আসশেওড়া বাবলা জঙ্গলে যেন জেলখানার মতো। তা ছাড়া সাপ দুলে ওঠা সেই প্রথম কাঁপুনিটা যেন এখনো তার বুকের সীমায় রিনরিন করে।

এবং আবার সেই কাঁপুনিটা লাগল তার। পায়ে পায়ে এগিয়ে দক্ষিণের বাঁশঝাড় পেরিয়ে, প্রায় একটা নতুন জায়গাই আবিষ্কার করেছিল শুভেন্দু। চারদিকে পুরনো ইঁটের পাঁজা, আর মাঝখানে বেশ খানিকটা খোলা চত্বর। কতগুলি বড় বড় চৌবাচ্চার মতো কী যেন রয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে সেই লতাপাতা ঢাকা চৌবাচ্চাগুলি কিসের সে জানে না। গাঁথনিগুলি বেশ চওড়া। এখনো মোটামুটি শক্ত মনে হয়। আস্তে লতাপাতা সরিয়ে, সবে সে উঁকি দিয়েছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ধুপ করে একটা শব্দ হল।

শুভেন্দু চমকে উঠে পিছন ফিরতেই সবচেয়ে কাছের ঝোপটা দুলে উঠেই থমকে রইল। প্রায় এক মিনিট শুভেন্দু সতর্ক নিশ্চল। মনে হল, সে যেন একটা লেজ দেখল। গরু মানুষ না বাঘ, কিছু ঠাহর হল না। কালো, না ডোরাকাটা কিছু, কিংবা ছায়া, কিছুই বুঝতে পারল না। সাপ কী? মস্ত বড় সাপ হতে পারে। কিন্তু শব্দটা?

আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলে শুভেন্দু ঝোপটার দিকে আর একবার তাকাল। মনে হল, ঝোপটা এখনো একটু একটু নড়ছে। গাংগুলি তো মানুষ দেখেছিল। শুভেন্দু পায়ে পায়ে ঝোপটার কাছে গেল। আস্তে আস্তে হাত দিয়ে একটু ফাঁক করে, উঁকি দিল। অন্ধকার। বুনো লতার তীব্র গন্ধ। মশারা গর্জাচ্ছে যেন অসময়ে ঘুম ভেঙে।

সরে আসবার আগেই, শুকনো পাতার ওপরে পায়ের শব্দ শুনতে পেল পিছনে। ফিরল শুভেন্দু। কেউ নেই। উত্তর দিকের আসশেওড়া জঙ্গল দিয়ে কেউ যাচ্ছে হয় তো। তবু মানুষ তো। আর শুভেন্দুকে ওদিকেই যেতে হবে। সে তাড়াতাড়ি চৌবাচ্চাগুলি পার হয়ে আসতে না আসতেই শব্দটা মিলিয়ে গেল। আস-শেওড়া বনে কেউ নেই। রোদে চিকচিক করছে জঙ্গল। আর ফড়িং উড়ছে।

কিন্তু আবার পায়ের শব্দ। এই জমির কয়েক ধাপ নীচেই, বাঁশঝাড়তলায়, এবার পায়ের শব্দ দ্রুত। শুভেন্দুও পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। শব্দ মিলিয়ে গেল। বাঁশ-ঝাড় একটু দুলে উঠে যেন চাপা কড়কড় শব্দে আড়মোড়া ভাঙল।

ভুল শুনল নাকি? শুভেন্দুর বুকের ধুকধুকানিটা থামল না। সে দ্রুত পায়ে একেবারে অফিস বাড়ির সামনে এসে পড়ল। এসেও থমকে দাঁড়াতে হল। দেখল, ভাঙা পাঁচিলের পাশে, যজ্ঞডুমুরের ছায়ায়, গাংগুলি হাত নেড়ে নেড়ে চুপি চুপি গলায় কী যেন বলছে যতীনবাবুকে। অর্থাৎ দুই প্রৌঢ় কেরাণীর অন্যতম যতীন রায়। বিপত্নীক ভদ্রলোক বারোমাস মেসেই থাকেন।

শুভেন্দুকে দেখা মাত্র গাংগুলি থেমে গেল। যতীনবাবু তার ঘোলা ঘোলা চোখে দেখলেন শুভেন্দুকে। খালি গায়ে লুংগী পরে আছেন ভদ্রলোক। ওইভাবেই থাকেন প্রায় সব সময়ে। এদের সম্পর্কে শুভেন্দুর কোনো কৌতূহলই হল না। তার বুকের মধ্যে এখনো সেই চমকের তরঙ্গ। একটি বিস্মিত অস্বস্তি।

গাংগুলি বলল, বেড়াচ্ছেন? বেড়ান। পুবদিকে যদি যান, তালে শ্যাম রায়ের মন্দিরটাও দেখে আসবেন।

শুভেন্দু বলল, তাই নাকি? আচ্ছা, যাব।

কিন্তু সে কথা ওরা ভয় অশরীরীদের কথাটা বলল না। হাসাহাসি করবে সবাই। আর [illegible] নইলে, এ বয়সে [illegible] হয়। দোতলায় [illegible] হাসি পেল শুভেন্দুর। [illegible] শব্দ-রহস্যটির [illegible] আর [illegible] একেবারে [illegible]।

কিন্তু পরদিনের ব্যাপারটা সত্যিমতো [illegible]। যতীনবাবুরা অফিস থেকেই [illegible] বেলা প্রায় এগারোটা। শুভেন্দু [illegible] একটা [illegible]। হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ শুনে সে ফিরে তাকাল। একটা ছায়া যেন সরে গেল [illegible]। শুভেন্দু উঠে দ্রুত দরজার কাছে এল। মনে হল, দালানের একটা দরজার পাশে ছায়াটা সরে গেল। ঠিক দেখল, না কি? শুভেন্দু দালান দিয়ে প্রায় ছুটে সেই দরজার কাছে গেল। দেখল সিঁড়ি। ছাদে ওঠার সিঁড়ি। পুরনো ভাঙা কাঠের আসবাবের অবশিষ্ট একদিকে জড়ো করা রয়েছে। শুভেন্দু উঠে গেল। দেখল, ছাদের দরজাটা খোলাই। ছাদে উঠে দেখল, একটি পাখীও নেই সেখানে। সেদিকে দিগন্ত প্রমাণ ছাদ। শ্যাওলার কালো। ফাটাফাটির সাপিল দাগ। বোধ-হয় বিশ বছরের মধ্যেও কেউ পা দেয়নি। এই সিঁড়ি দরজার ঠিক উল্টো দিকে আর একটি দরজা। দরজাটা বন্ধ।

সত্যি কি কোনো ছায়া দেখল শুভেন্দু না কি তার মন এ সব দেখাতে আর শুনতে আরম্ভ করেছে। হয় তো এই গ্রাম নিঝুমতা আর পুরনো বাড়ি তার অবচেতনে একটা খেলা জুড়েছে।

শুভেন্দু আস্তে আস্তে ছাদে একটু পায়চারি করল। বুক সমান আলসের ধারে গিয়ে উঁকি দিল। দেখল বাড়ির সামনে দিকটা। কিন্তু আবার সেই গাংগুলি আর যতীনবাবু। একটু দূরেই, একটা শিউলি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে, গাংগুলি তর্জনী দিয়ে আশেপাশে দেখাচ্ছে। আর ফিসফিস করে কী যেন বলছে। আর যতীনবাবু ঘাড় নাড়ছেন আস্তে আস্তে। কিন্তু ঘোলা ঘোলা চোখে তাকিয়ে আছেন গাংগুলির দিকে।

হয়তো গাংগুলি এ বাড়ির কোনো কাহিনী জুড়েছে, আর অতীতের গৌরব দেখাচ্ছে
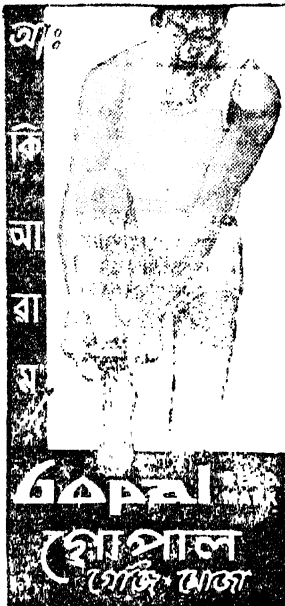
কিন্তু শুভেন্দুর কী হচ্ছে এটা? আবার মনে মনে হাসল শুভেন্দু। তবে ছাদটা তার খারাপ লাগল না। আর একটু ঘুরে সে নেমে এল। চিঠিটা শেষ করে, দক্ষিণের জানালায় দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই সরে এল। মনে থাকে না, ওখানে একটা পুকুর আছে। ভাঙা ঘাটে, অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে একটি মেয়ে। কিংবা বউ। ঘোমটা নেই। আদুর গা। বসে বসে বিনুনী খুলেছে মনে হল।

দিন দুয়েক পরে, গ্রামবাসীদের নানান ঝগড়ার গোলমালে কাজ বন্ধ করে দিলেন চাটার্জি। জানালেন, অভিযোগ থাকলে আপনারা লিখিতভাবে পেশ করুন। এভাবে অফিস চালানো যায় না।

সত্যি সত্যি কাজ বন্ধ হওয়ায়, বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে, শোবার ঘরে একবার থমকে দাঁড়াল শুভেন্দু। ভাবল, তার চেয়ে একটু ছাদে যাওয়া যাক। ফিরতে দেরিতে তা নইলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

সে ছাদে এল। ঈষৎ শীতার্ত বাতাস বইছে। বাতাসটা মন্দ লাগল না। চার পাশে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগল সে। বেলা বেশ ছোট হয়ে এসেছে। রোদ পড়েছে। গ্রামের পশ্চিমাংশ কালো দেখাচ্ছে। পূর্বাংশে রোদ চিকচিক করছে।

হঠাৎ দরজায় শব্দ শুনে ফিরে তাকাল শুভেন্দু। এবং আবার চকিতে ছায়ার অন্তর্ধান। আর এবার ছাদের সেই বন্ধ দরজাটাতে সে দেখল যেন। দেখল, সেদিনের সেই দরজাটার একটা পাল্লা খোলা। সেখানেই ছায়াটা দেখা গেল।

এক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শুভেন্দু। এবারও কি ভুল? কিন্তু কী হতে পারে? শেষটায় কি একটা উৎকট ভয় তাকে গ্রাস করল? শুভেন্দু আস্তে আস্তে দরজাটার কাছে এল। আস্তে আস্তে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, আর একটা সিঁড়ি। পিছনে ছাদের দিকে একবার দেখে দরজা খুলে নতুন সিঁড়িতে পা দিল শুভেন্দু। সিঁড়ি দেখলেই বোঝা যায় একেবারে অব্যবহৃত নয়। নীচের দিকে আলোও দেখা যাচ্ছে, যদিও মানুষের সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

পা টিপে টিপে একটা একটা করে সিঁড়ি নামল সে। প্রায় যেন ঘোরানো সিঁড়ি। কয়েক ধাপ পরে পরেই বেঁকে গেছে।

একটা ধাপে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শুভেন্দু। চমকে গিয়েছিল, তাই ধাপটার সামনেই দরজার পাল্লায় হাত রেখে দাঁড়াতে গিয়ে, সে নিজেই শব্দ করে ফেলল। আর সেই মুহূর্তেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এলি? আয়, শোন।

শুভেন্দুর পা দুটি যেন ফাঁদের বাঁধনে আটকা পড়ে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার। আর বিমূঢ়, প্রায় ভীত চোখে দেখল, দু হাত দূরেই দরজা খোলা একটি ঘর। ঘরের সামনেই মান্ধাতা আমলের একটি পুরনো খাট। ময়লা ছেঁড়া বিছানা। দেখলেই মনে হয় ছারপোকারা বংশপরম্পরা ওখানে সাম্রাজ্য বিস্তার করে আছে। আর সেই বিছানার ওপর একজন মহিলা কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন এইদিকে ফিরে। তাঁর শীর্ণ শরীর কোমর অবধি খোলা। পোড়া তামার মতো শরীর। রুক্ষু পাকানো কাঁচা পাকা চুল। আর চোখের দৃষ্টি শুভেন্দুর দিকেই স্থির নিবদ্ধ যেন।

তিনি আবার বলে উঠলেন, আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

শুভেন্দুকে ডাকছেন উনি? সে তার নিজের ডাইনে বাঁয়ে দেখল, কেউ নেই। থাকা সম্ভবও নয়। কারণ দোতলার এই শেষ ধাপ। তারপরে এক তলায় নেমে গেছে সিঁড়ি। কিন্তু পোড়া তামার মতো ওই বিধবা মহিলা কি শুভেন্দুকে ডাকছেন।

মহিলা এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলেন, ওরে, আর রাগ করে থাকিসনে বাবা, আর আমাকে জ্বালাসনে। আয়, কাছে আয়।

শুভেন্দুর ঠোঁট নড়ে উঠল। কিন্তু কথা বলতে সাহস হল না। সে আস্তে আস্তে পিছন ফিরবে কিনা, চিন্তা করল। মহিলা বালিশের তলায় হাত দিলেন। বললেন, কই, চশমাটা কোথায়। এগিয়ে এসে দেখে দে একটু। কানা মাকে একটু দয়া কর মদন। ও মদন!

মদন! শুভেন্দুকে নয়। আর মহিলা চোখে দেখতে পান না? একটু যেন স্বস্তি পেল শুভেন্দু। তবু তার মনে হল, আরো যেন জোড়া জোড়া উদ্দীপ্ত কৌতূহলী চোখ তাকে নিরীক্ষণ করছে অদৃশ্য থেকে। মনে হল, অনেক অশরীরীরা তাকে ঘিরে আছে চারদিক থেকে। আস্তে আস্তে পিছন ফেরাই সাব্যস্ত করল সে।

সেই মুহূর্তেই মহিলা আবার বললেন, হ্যাঁ রে মদন, সেই গন্ধ তেলটা মেখেছিস বুঝি? গন্ধ পাচ্ছি যেন?

শুভেন্দুর নাকে তার নিজের চুলের গন্ধ লাগল। এটা ওর বিলাসিতা নয়, প্রয়োজনীয়। তীব্র গন্ধ সে ভালোবাসে। উনি কি শুভেন্দুর চুলেরই গন্ধ পাচ্ছেন? সে তাকিয়ে দেখল ওঁকে। অপলক চোখে ওঁর দৃষ্টি নেই, তবু জিজ্ঞাসা ফুটে বেরুচ্ছে। দরজার দিকে অনড় নিশ্চল দুটি তারা। কালো নয়, অথচ ছানি পড়া ঘষাও নয়। কিন্তু জবাব দেবার সাহস হল না শুভেন্দুর।

এবার উনি হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন। জল পড়তে লাগল ওঁর চোখে। বললেন, আমার সঙ্গে তোর কিসের ঝগড়া মদন, আমি তোর কী করেছি? আমি তোর মা, আমি অন্ধ, ব্যামোয় পড়ে আছি। উপায় থাকলে কি এত বড় সর্বনাশ দেখে চুপ করে থাকতেন?...... তা' আমার কাছে না আসিস, না-ই এলি। তুই একবার চক্কোত্তি ঠাকুরপোকে ডেকে নিয়ে আয় আমার কাছে। তাকে আমি সব বলব। আমার ভাই হয়ে যে তোর সম্পত্তি ফাঁকি দিতে চায়, তাকে আমি তোর মামা বলব না। নিজের ভাই বলেও তাকে আমি খাতির করব না। আমার কাছে আবার ও আসুক কোনো কাগজপত্তর নিয়ে। সই দেয়া দূরের কথা, আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব। অমনি করে ও আমার অনেক সর্বনাশ করেছে'

বলে উনি শব্দ করে হাঁপাতে লাগলেন। ভয়ের থেকে কৌতূহলই বেশী জেগে উঠেছে তখন শুভেন্দুর। যদিও তার শহুরে রুচি-শীল মন এসব কথা লুকিয়ে, আর একজনের হয়ে শুনতে দ্বিধা এবং পীড়া বোধ করছে। কিন্তু সে সরে যেতে পারল না।

মহিলা আবার বললেন, যা, চক্কোত্তি ঠাকুরপোকে ডেকে নিয়ে আয়, তাকে আমি সব বলি। আর ওই লোকটার নাম কী বলছিলি? ওই জরীপের বাবু? বউ-মরা বুড়োটা? যার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চায় তোর মামা?

যতীনবাবু? যতীন রায় নাকি? কী আশ্চর্য! কিন্তু নাম বলছেন মদন! তার সঙ্গে আবার বউ-মরা বুড়োর বিয়ে কিসের? মদন নিশ্চয় পুরুষ!

উনি তখনো বলে চলেছেন, ও বুড়োটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোকে পার করতে চায়। তারপরে একদিন আমার গলা টিপে মেরে ও সব ভোগ দখল করে বসবে। ওই বুড়ো জরীপবাবুটার সঙ্গে তাই ওর দিনরাত ফুসুর ফুসুর গুজুর গুজুর চলেছে। জরীপে ফাঁকি দেবে। তোর বাবাকে তখনি বারণ করেছিলাম। ওকে আমার ভাই, বাস্তুর কাছে ওকে তুমি কিছু দান করো না। তখন তাঁর ভাবনা হল, কে আমাদের দেখা শোনা করবে। তাই নিজের শালাকে জমি জিরেত দিয়ে রেখে গেলেন। শকুন! পেটের ভাই হয়ে এত বড় শত্তুর। তার চেয়ে আমার প্রতি-বেশী ভাল। যা, তুই ডেকে নিয়ে আয়।

ওঁর কথা শেষ হবার আগেই, নিম্নগামী সিঁড়ির বাঁকে আবার একটা ছায়া নড়ে উঠল। এবং সেই সঙ্গেই হাল্কা পায়ের শব্দ শুনতে পেল শুভেন্দু। আবার! শুভেন্দু নড়ে উঠতেই হাতের ধাক্কায় দরজায় শব্দ হল। মহিলা বলে উঠলেন, যাচ্ছিস? যা। তাড়া-তাড়ি আসিস।

শুভেন্দু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু এবার তার পক্ষে কৌতূহল দমন করা অসম্ভব হয়ে উঠল। সে পা টিপে টিপে নীচের দিকে অগ্রসর হল। ছায়া নয়, মানুষ! নিশ্চিত কোনো মানুষ তার আশেপাশে ঘুরছে। এবং এ কোনো ভৌতিক ব্যাপার নয়। প্রথম দিন গাংগুলি ঝোপে মুখ বাড়িয়ে মানুষ বলেছিল। এও সেই মানুষ।

কিন্তু নীচে আসতে আসতেই সব শূন্য। একটি সুদীর্ঘ দালান। ভাঙা ফাটা গর্ত তার চারদিকের মেঝের ওপরে। এবং সামনে তাকিয়ে দেখল, এ সেই অংশ, যেটাকে দেখিয়ে গাংগুলি বলেছিল, অন্দরমহল। কিন্তু কোথায় গেল ছায়াটা।

হঠাৎ ফিসফিস শব্দ শুনতে পেল শুভেন্দু। যেন কেউ চুপি চুপি কথা বলছে। শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল সে। তারপরে একটি ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াল। গাংগুলি আর যতীনবাবু। প্রকাণ্ড একটা জরীপের নক্সা মাটিতে বিছানো। গুটি কয় পুরনো দলিল তার ওপরেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। গাংগুলি কী যেন বলছে চুপি চুপি। যতীনবাবু শুনছেন খোলা অপলক চোখে তাকিয়ে।

বাংলা ছবির গান

জ্যোতির্ময় বসুরায়

আজকের এই ব্যবসায়-যুগে শিল্পের সকল ক্ষেত্রেই অনধিকারীদের প্রবেশ ঘটেছে। এই অনধিকার-চর্চা চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যত তেমন বুঝি আর কোথাও নয়। চিত্রপরিচালনা, চিত্রের কাহিনী রচনা, সুরযোজনা এবং গীতি রচনা : চলচ্চিত্রশিল্পের এই প্রধান চারটি ব্যাপারেই অনধিকারীদের হাত আমরা প্রায়শঃ দেখি।

প্রথম দুটি বিষয় নিয়ে রসজ্ঞ দর্শকেরা নিজেদের মধ্যে, কখনো বা পত্র-পত্রিকায়, আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু কেন যেন সুরকারের এবং বিশেষ করেই গীতিকারের সম্পর্কে সকলেই নীরব। এই নীরবতা কি তাদের পক্ষে স্বীকৃতি?

সে যাই হোক, সাধারণভাবে বাংলা চিত্রের দুর্বলতম দিক এর সঙ্গীতাংশ। অবশ্য যখন রবীন্দ্র-সঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান, অথবা রাগসঙ্গীত কিংবা লোকসঙ্গীত চিত্রে ব্যবহার করা হয়, তখন আর এ কথা খাটে না। কিন্তু সেটা হল ব্যতিক্রমের কথা। সাধারণত, ওই ধরনের সঙ্গীতে বাংলা চিত্রের সুরকাররা বিশ্বাস করেন না। সিনেমা-জগতের জনপ্রিয় গীতিকারদের উপরই তাঁদের আস্থা বেশি। তাঁদের গানের উপর তাঁরা সুর বসান—কখনো রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কখনো দ্বিজেন্দ্রগীতি, কখনো অতুলপ্রসাদের গান, কখনো বা আর কোন একদা-জনপ্রিয় গানের সুর কিছু ধার করে, কিছু বা নিজেরা উদ্ভাবন করে। ধার করার কাজটি অনেক সময়েই সুফল দেয়, অন্তত গানগুলি শুনতে ভালো লাগে।
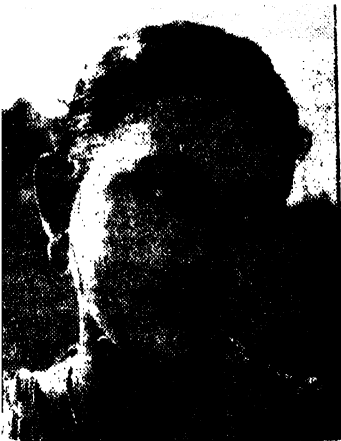
সন্ধ্যা রায়

ভালো লাগে বিশেষ করে এই কারণে যে, আমাদের অধিকাংশ গীতিশিল্পী সুকণ্ঠ। গান তেমন চিত্তগ্রাহী হয় না তখন, সুরকাররা যখন বিদেশী সুর মেশাবার চেষ্টা করেন অথবা রীতিমত মৌলিক হবার। তবু বোধ হয় বলা যেতে পারে, প্রধানত গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠের গুণে বাংলা ছবির গানও এক রকম শ্রোতব্য।

কিন্তু গানের বাণী? তার কাব্যগুণ? আধুনিক গীতিকারদের রচনায় এ বস্তুটি দুর্লভ। সেই সব গানের বাণী যেন এমন কিছু শব্দের সমষ্টি, যা শুধু অপরিণত আবেগের অপরিণত প্রকাশ ঘটাতেই সাহায্য করে। এক কাপ চাএ দশ চামচ চিনি আর পনের চামচ দুধ দিলে পানীয়টির যে অবস্থা হয়, আনন্ত চাঁদ তারা আর ফাগুনে হাওয়া, কোকিলার কুজরণ আর মধুপের গুঞ্জরণের চাপে একটি গানের অবস্থা তার চেয়ে কম শোচনীয় হয় না। যেন রসোগোল্লা খাওয়ার বদলে খানিকটা চটচটে রস হাতে লাগানো?

তবু যখন আপনি শোনেন : "হায় কোন্ সে ক্ষণে মম মৌমাছির গুঞ্জরণে, এই মন কারে দিয়েছি কে জানে। এই মন ভরেছে কুহু কুহু কোকিলা কুঞ্জরণে, তবু মন কেন কেঁদেছে কে জানে?"...অথবা "তুমি আসবে ওগো হাসবে, কবে হবে সে মিলন, কাছে যাব কবে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ!"...কিংবা "যে লোহার বঁটিতে কাটে পূজারই ফল, সে যে ব্যাধের অস্ত্রে হয় হিংসা বল:" তখন অন্তত গানের কাব্যগুণ বিচার করতে আপনার অসুবিধা হয় না।

কিন্তু বিপদ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ! তিনি হাজার দুই-আড়াই গান লিখে রেখেছেন। সেইসব গানেরই কথার এবং ভাবের কিছু কিছু ভগ্ন অংশ প্রায়ই সিনেমার গানে অনুপ্রবেশ করে। ফলে মাঝে মাঝে হঠাৎ শ্রোতাদের মনে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে—ঘটেও। ভালমন্দ বোঝবার শক্তি তাঁরা হারিয়ে ফেলেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের অংশ : "আজকে শুধু একান্তে আসীন, চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন। আজকে জীবন সমর্পণের গান গাবো নীরব অবসরে।" প্রভাত প্রোডাকশন্সের 'মা' চিত্রের একটি গানে রয়েছে : "...আজ রাতে কোন কথা নয়, আজ শুধু চোখে চোখে চাওয়া।...অন্তর বীণায় মৌন যে সুর সেই সুরে হবে গান গাওয়া।" 'তাসের ঘর' চিত্রের একটি গানে দেখি : "...আজ কোন কথা নয়, আজ শুধু গান।...আজ শুধু গুনে গুনে গুঞ্জরণে গানের মাধুরী এসো রচি দুজনে।" রবীন্দ্রনাথের একটি গানের শুরু : "তোমার বীণায় গান ছিল আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো। একই দখিন হাওয়ায় সেদিন দোঁহায় মোদের দুলে দিল গো।" 'তাসের ঘর'-এর একটি গানের আরম্ভ : "আমার গানে সুর ছিল, আমার বনে ফুল ছিল। রঙিন মনের স্বপন দোলায় সোনার তরী দুলেছিল।"

রবীন্দ্রনাথে 'মায়ার খেলা'র দুটি গীতাংশ : (১) "এ কি স্বপন, এ কি মায়া, এ কি প্রমদার ছায়া!" (২) "দিবস রজনী, আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি; তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি। চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, সদা মনে হয় যদি দেখা পাই, 'কে আসিছে' বলে চমকিয়ে চাই, কাননে ডাকিলে পাখি।" 'অগ্নিসংস্কার'-এর একটি গানের সঙ্গে মিলিয়ে নিন : "আমার দুয়ারখানি বাতাস এসে কেন যে খুলো, বন্ধু আমার এল কি না দেখি নয়ন তুলে। এ কি স্বপন, এ কি মায়া কেন শুধু মনে হয়, আজ ফুরোন সাঁঝের ছায়ায় ভরে এ হৃদয়; কে জানে কি ভাবে যে মন মনের ভুলে।"

রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'-এর একটি গানের সঙ্গে 'শেষ পর্যন্ত'র একটি গানের অংশ মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। **'তাসের দেশ'** : "আমরা নূতন যৌবনেরই দূত, আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত। আমরা বেড়া ভাঙি, আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি, ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই, আমরা বিদ্যুৎ।"... **'শেষ পর্যন্ত'** : "আমরা বাঁধন ছেঁড়ার জয়গানে, নির্মম, নির্ভীক, উদ্দাম, উচ্ছল আমরা।...দুঃসাহসের নেশা এই যে প্রাণে মেশা, হারিয়ে যেতেই জানি, বাঁধন নাহি মানি, দুর্জয়, নির্ভয়, চঞ্চল আমরা।" 'রায় বাহাদুর' ছবির দুটি গানে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর প্রতিধ্বনি শুনি। ছবির যে-গানের প্রথম কলি : "যায় দিন এমনি যদি যাক না" সেটি মনে করিয়ে দেয় "এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না" দিয়ে শুরু রবীন্দ্রসঙ্গীতটিকে। উক্ত চিত্রের আর একটি গানে রয়েছে : "বড়ই বাঁধনে বাঁধা আছি ছাড়াতে চাহি, তারে ছাড়াতে গেলে

রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাধা বাজে প্রাণে ।" রবীন্দ্রনাথের "জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই" গানটির সঙ্গে এর বাণীগত সাদৃশ্য কম নয়।

রবীন্দ্রনাথের "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন" গানটিও রেহাই পায়নি। 'পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট'-এর একটি গানে তারই ছায়া দেখবেন। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলাম : "তোমাদের নতুন কুঁড়ির নতুন মেলায় রং ছড়াবে তোমরা; তখন আর গান শোনাতে আসবে নাতো এই যে বুড়ো ভোমরা।...

যখন পড়বে খসে সুর ভরানো এই যে দুটি পাখনা; বলবে জানি তোমরা তখন যে গেছে সে যাক না। তবু চেন বা নাই চেন আমি তোমাদের কাছে কাছেই থাকবো...।"

এ-সবই অক্ষম অনুকরণের দৃষ্টান্ত। কারণ, রসের পূর্ণতা কোথাও আপনি পাবেন না। কেবল হঠাৎ আপনি পাথরকে হীরকখণ্ড বলে ভুল করে বসতে পারেন।

এই অবস্থার কারণ কী? বাংলা দেশে আজ রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়েই দিলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল-নজরুল-অতুলপ্রসাদেরও সমকক্ষ কোন কবি-সুরকার নেই। সত্য বলতে, আদৌ কোন কবি-সুরকারের নাম এখন করা সম্ভব নয়। এখনকার চলচ্চিত্র-সুরকারদের মধ্যে যাঁরা জনপ্রিয়, তাঁরা মূলত সুগায়ক বা নিপুণ সঙ্গীতশিল্পী। গানের কাব্যগুণ বিচারের দিকেও তাঁরা যথেষ্ট আগ্রহী নন। তবু এদেশে কিছু কবি, সত্যকার কবি, ত এখনও আছেন। সিনেমার জন্য ফরমাশী গানও যদি তাঁরা লিখতেন, তবু নিশ্চয় তার মধ্যেও কিছু কাব্যের স্বাদ পাওয়া যেত। তাঁরা লেখেন না কেন? কাজটাকে কি ছোট বলে তাঁরা মনে করেন? কিন্তু তাঁরা কি কখনও অনুরুদ্ধ হয়েছেন? সম্ভবত না। আধুনিক কবিদের কিছু উৎকৃষ্ট কবিতায় সুর-সংযোজন করা যায় না কি?

যে কোন কারণেই হোক, চলচ্চিত্র-সুরকাররা বিশেষ কয়েকজন গীতিকারের রচনা পছন্দ করেন এবং তাঁদেরই উপর নির্ভর করতে ভালবাসেন। এ-ব্যাপারে চিত্র-প্রযোজকরাও সুরকারদেরই পক্ষে। তাঁরাও বুঝি নিরুপায়, কারণ গীতশিল্পীর কণ্ঠের গুণে, গ্রামোফোন রেকর্ডের কল্যাণে এবং প্রচারের মহিমায় ওই সব গীতিকারও যে ইতিমধ্যে নাম করে ফেলেছেন। যাঁর লেখা গান একবার 'হিট' হয়ে গেছে, তিনি উচ্চাঙ্গের কবি নন, এ কেমন কথা? আবার 'হিট' গানের রচয়িতার উপর সুরকার এবং প্রযোজক আস্থা রাখবেন না ত, কার উপর রাখবেন শুনি?

তাই বিশেষ এক বা একাধিক গীতিকারকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। বিশেষত, যখন ফরমাশ অনুযায়ী ডজনে ডজনে তাঁদের গান লিখতে হয়? ইংরেজিতে যাকে 'ভিশাস সারকল' বলে, সিনেমা-সংগীতের ক্ষেত্রে আসলে ঠিক সেই রকম একটি চক্র রচিত হয়েছে। এই চক্র থেকে মুক্তির পথ তখনই দৃশ্যমান হবে যখন চলচ্চিত্র-পরিচালক সাহসের সঙ্গে রসবোধের পরিচয় দিতে পারবেন, শিল্পের প্রতি আনুগত্যকে তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে পারবেন। যা পেরেছেন সত্যজিৎবাবু এবং আরও কয়েকজন নিষ্ঠাবান পরিচালক। জনপ্রিয় গীতিকারের গান ছাড়াও যে অন্য গান জনপ্রিয় হয়, তার প্রমাণ ত আমরা 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ পেয়েছি। 'যে-রাতে মোর দুয়ারগুলি' যে লোকের মুখে মুখে ফিরেছে, এ-কথা কে অস্বীকার করবেন? আর অস্বীকার যদি করাই না গেল, তবে চিত্রনির্মাতাদের পক্ষে দর্শকদের রুচির দোহাই দিয়ে এ-ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা কি চলে?

সুন্দর শ্রীমণ্ডিত
কেশের জন্য
আপনার উচিত সর্বদাই একটি ভাল
কেশ তৈল ব্যবহার করা। তেলের
কথা বলতে গেলে প্রথমেই
মনে পড়ে 'কোকোলা'র নাম।
ভাল কেশ তৈল হিসাবে
'কোকোলা' অদ্বিতীয় ও
দীর্ঘ ঐতিহ্যের
অধিকারী।
কোকোলা
সর্বাধিক জনপ্রিয় কেশ তৈল
জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং প্রাইভেট লিঃ. কলিকাতা-৩৪
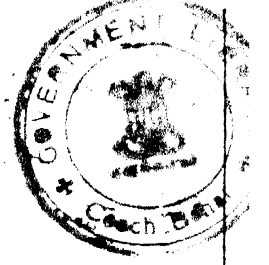
ভারতীয় রেলওয়ের আদিপর্ব

পূর্ব রেলওয়ের প্রথম যাত্রীবাহী এঞ্জিন "এক্সপ্রেস"

প্রথম যুগে বার্ন কোম্পানির প্রধান কারবার ছিল গৃহ-নির্মাণ এবং আসবাবপত্র তৈরি। ১৮২৯ সালে জন গ্রে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার পর থেকেই এঞ্জিনীয়ারিং, লোহাঢালাই, ঠিকাদারি ইত্যাদি নানা শাখায় প্রসারিত হয়ে বার্ন কোম্পানির কারবার বেশ ফলাও হয়ে ওঠে। জন গ্রে-ই ভারতের প্রথম রেলওয়ে ঠিকাদার। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির জন্য গ্রে একশো মাইল রেলপথ স্থাপন করেন। গ্রে-র এই কৃতিত্বে বার্ন কোম্পানির প্রচুর সুখ্যাতি এবং আর্থিক লাভ হয়। এই লভ্যাংশ দিয়েই হাওড়ায় একখণ্ড জমি কিনে একটি ঢালাই কারখানা স্থাপিত হয়। হাওড়ায় বার্ন কোম্পানির বর্তমান বিরাট কারখানার এই হল গোড়াপত্তন।

মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বার্ন কোম্পানির হাওড়ার এই কারখানায় তৈরী নানা জিনিসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ভারতীয় রেলওয়ের জন্য নির্মিত বিভিন্ন ধরনের মালগাড়ি এবং সরঞ্জাম। ১৯০৪ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বার্ন কোম্পানি থেকে ৫৮০০০-এরও বেশী শতাধিক বিভিন্ন ধরনের মালগাড়ি এবং ১,১২০০০-এরও বেশী ক্রসিং ও সুইচ্ দ্রুত প্রসারমান ভারতীয় রেলওয়েকে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, বড় বড় নদীর উপরে রেলওয়ে ব্রিজ তৈরি করার জন্য হাজার হাজার টন ইস্পাতের কাঠামো বার্ন কোম্পানির স্ট্রাকচারাল বিভাগ সরবরাহ করেছে।

শাখা: নয়া দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

MBCC-16A BEN.

সূচিপত্র

সূচীপত্র

যে-কোন সময়ে...
যে-কোন স্থানে...
যে-কোন অনুষ্ঠানে
আপনাকে সবচাইতে ভাল
মানাবে
খাটাউ
ভয়েল এ

সূচীপত্র

মাজদা ল্যাম্প দিয়ে
পূজা উজ্জ্বল করে তুলুন

সর্বাধুনিক সংবাদ-পরিবেশনায় অদ্বিতীয়

"আনন্দবাজার পত্রিকা"-র

জনপ্রিয়তার নিদর্শন

(দৈনিক বিক্রয়সংখ্যার গড়)

বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা জানেন যে একমাত্র টিনোপাল কাপড়চোপড়ে সেই বেশী সাদা ফুটিয়ে তোলে

প্রত্যেক গৃহিণীই তাঁর প্রতিবেশিনীর চাইতে ভালো সাজগোজ করতে চান। তাই সাদা কাপড়চোপড়ের বেলায় বুদ্ধিমতী গৃহিণীর প্রথমেই মনে পড়ে টিনোপালের কথা কারণ একমাত্র টিনোপাল কাপড়চোপড়কে সত্যিকারের ধবধবে সাদা করে তোলে।

টিনোপাল খরচের দিক দিয়েও সস্তা

সাধারণ পরিবারের গড়পড়তা প্রতি দিনের কাচা কাপড় সাদা করতে স্রেফ সিকি চামচই যথেষ্ট; টিনোপাল গোলা জলে কাপড়চোপড় একবার ডুবিয়ে নিলে ৩ থেকে ৪ ধোপ পর্যন্ত তার জের থাকে।

মনে রাখবেন—

টিনোপাল এদের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক-জে. আর. গায়গী, এস. এ. বাল, সুইজারল্যাণ্ড
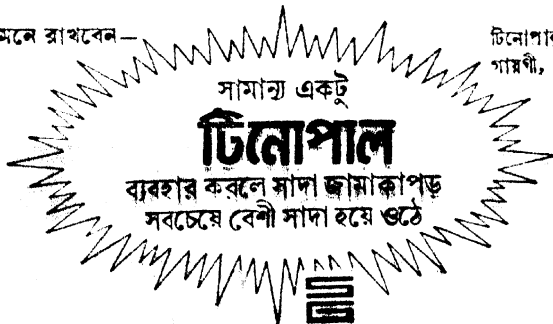
প্রস্তুতকারক:
সুহৃদ গায়গী লিমিটেড ওয়াডী ওয়াডী, বরোদা

সোল ডিষ্ট্রিবিউটারস:
সুহৃদ গায়গী ট্রেডিং লিমিটেড পো: বক্স ১১০, বোম্বাই -১ বি আর

BEN SISTA'S-SG-171 A

ষ্টকিস্টস : **হিন্দাইজ প্রাইভেট লিমিটেড**, পি-১১ নিউ হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ রোড, কলিকাতা-১
শাখা :—মচ্ছুরহাট্টা, পাটনা সিটি

শতাব্দীর
ঐতিহ্যমণ্ডিত
গুণসম্পন্ন
তৈল
M. L. BOSE & Co
M. L. BOSE & Co

G.E.C.
জীবনকে
উপভোগ্য
-বৈচিত্রময়
করে তুলবে

পট | শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী | সুরেশ দের সৌজন্যে

প্রচণ্ডদৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

মুদ্রণ : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ॥ মহালয়া ॥ ১৩৬৯

॥ মা তৃ পূ জা ॥

বাঙালীর ঘরে মা আসিতেছেন। মাকে পাইলে কাহার না আনন্দ হয়? সদানন্দময়ী তিনি। আমাদের বড় দুঃখ। তাই বৎসরের এই কয়েকটা দিনের জন্য আমরা বড় আশার সঙ্গে তাকাইয়া থাকি। শরতের স্বর্ণাভ সূর্য-কিরণ আমাদের অন্তরকে আকুল করিয়া তোলে, মেঘমালা-নির্মুক্ত শারদীয় আকাশের নীলিমা আমাদের চিত্তকে উচ্চকিত করে, শেফালী-গন্ধ বহন করিয়া শরতের বাতাস আমাদের মনে মায়ের আগমনীর মধুর ছন্দ সঞ্চার করে। কাহার আশা, কাহার ভরসায়—চারিদিকে এই ভাসা-ভাসা ভাব? ভাবময়ী তিনি। সর্বভাবে তিনি আমাদের স্বভাবের সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছেন। তিনি যে আমাদের মা।

দশভুজে দশপ্রহরণ ধারিণী আমাদের জননী। তাঁহার দক্ষিণে সর্বসম্পদস্বরূপিণী লক্ষ্মী, বামে বিদ্যাদায়িনী বাণী। সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয় এবং সিদ্ধিদাতা গণেশ।

মধুকৈটভ নাশিনী আমাদের এই জননী। তিনি মহিষাসুরমর্দিনী। কিন্তু আমাদের দেবীর রূপ-মাধুরীতে নূতন কিছু আছে। নিত্য লাবণ্য-লীলায় এই মূর্তি উদ্ভিন্ন।

অপরূপ মায়ের এই রূপ। এ রূপ কোথায় ছিল, কে আনিল? উত্তর এই যে, মায়ের এই রূপ কেহ কল্পনা করিতে পারে না। মুনিরাও নহে, ঋষিরাও নয়। সন্তানের হৃদয় আত্মমাধুর্যের উদার-প্রভাবে নির্মন্থন করিয়া মায়ের আবির্ভাব ঘটে। বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে রহিয়াছেন যিনি, যিনি মানুষের মন এবং বুদ্ধির অতীত অদ্বয়তত্ত্বস্বরূপে চরাচরে পরিব্যাপ্ত আছেন, বাঙালীর ঘরে, বাঙালীর সংসারে তিনি মা এবং মেয়ে এই দুই ভাবের মিলিত মাধুরীর চাতুরী লইয়া আসিয়া ধরা দিয়াছেন। মায়ের এই খেলা কে বুঝিবে!

মায়ের সন্তানদের সেবাই মায়ের সেবা। তোমাদের হৃদয়ের রক্ত দিয়া মায়ের দুর্গত সন্তানদের দুঃখ দূর কর। তাহাদের অশ্রু মুছাও। দুর্গতিহারিনী দুর্গা জাগিবেন।

রূপং দেহি

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র সেন

দেখাও, তোমার রূপটি দেখাও—মানুষের মনের ইহাই সনাতন প্রশ্ন। অজানাকে মানুষ জানিতে চায়। কঠোপনিষদে দেখা যায়, নচিকেতা, যমের নিকট গিয়া মানব মনের এই বিচিকিৎসাই ব্যক্ত করেন। মরণের পর কি হইবে, মানুষের ইহাই পরম জিজ্ঞাসা। কেন? কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই প্রশ্নের সমাধানের সহিত মানুষের মনে যেটি একান্তভাবে প্রয়োজন, সেই বস্তু বিশেষভাবে এমন কী অশেষভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। মানুষ মরিতে চাহে না। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মরণকে প্রতিহত করাই সে জীবনের প্রয়োজন বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা মৃত্যুগ্রস্ত এবং মৃত্যুভয়গ্রস্ত। এই মর্ত্য-ভূমিতে অমৃতের সন্ধান আমাদের পক্ষে মিলিবে কিসে?

এদেশের তত্ত্বদর্শী সাধকগণ এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, দেখিয়াছি, আদিত্যবর্ণ পুরুষকে আমরা দেখিয়াছি। আমরা অন্ধকারের পরপারে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহাকে জানিতে পারিলে আমাদের অমৃতত্ব লাভ হয়; [illegible] ছিলেন।

ঋষি-মুনিদের মুখে এমন তত্ত্ব-কথা শুনিয়া আমরা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি না; কারণ, তাঁহাদের উপলব্ধিগত সত্য আমাদের পক্ষে পরোক্ষ থাকিয়া যায়। আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান তাহাতে হয় না। ঋষি-মুনি যাঁহারা, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহাদের সাধন ছিল, ভজন ছিল। তাঁহারা সুদুষ্কর তপস্যা বলে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তদুপযোগী সুবিধাও তাঁহাদের ছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহাদের অনুকূলে ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সামাজিক প্রতিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাঁহাদের মত সাধন-ভজন করিবার সুবিধা এ যুগে আমাদের নাই। আমরা স্বল্পায়ু। অন্নগত আমাদের প্রাণ। আমাদের জীবন-সমস্যা সমধিক জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহাদের উপদেশের অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে বর্তমানে সম্ভব নয়। সুতরাং সে সব শুনিয়া আমাদের লাভ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর আমরা ভাগবতে ভক্তবর প্রহ্লাদের মুখে শুনিতে পাই। অসুর বালকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—আমার গুরু দেবর্ষি নারদ। তিনি ভগবৎ-দ্রষ্টা পুরুষ। তোমরা তাঁহার ন্যায় তপোবলের অধিকারী নহ, এ কথা সত্য। কিন্তু জীবনে সত্যকে একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে ঋষি-মুনি হইতে হয় না। মহাপুরুষ না হইলেও জীবনের মূলীভূত সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। বস্তুতঃ, আত্ম-দর্শনের অধিকার সকলেরই আছে। মহাপুরুষগণের বচনে শ্রদ্ধাপরায়ণ হইলেও জীবনের অন্ধকার বিদূরিত হয়। সত্য-স্বরূপ যিনি পরম দেবতা সকলের জন্য অগ্নিময় তাঁহার তাপ। সত্যদ্রষ্টা মহা-পুরুষগণ সেই তাপে পরম সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। খণ্ডজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া অখণ্ডভাবে সত্যকে তাঁহারা জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। অখণ্ডভাবে আত্মসত্তাকে উপলব্ধির সেই রাজ্য অগ্নিময়। আগুনের ঝরনা-ধারায় স্নান করিয়া সেই রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হয়। বহ্নিস্নানের দ্বারা প্রাণবীর্য আহরণ না করিয়া সেই রূপের রাজ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাণের ধর্মই হইল দান। বহ্নিস্নানে প্রাণবীর্যে উদ্দীপিত পুরুষগণ নিজদিগকে বিশ্বের জন্য নিঃশেষে নিবেদন করিয়া বিশ্ববীজে প্রতিষ্ঠিত হন। বিশ্ববীজ-স্বরূপিণী যিনি তিনি সকলেরই জননী। সন্তানগণের আত্মনিবেদনের অগ্নিময় আবর্তে মন্ত্রের বাঙ্ময় মূর্তিতে তাঁহার প্রকাশ এবং বিলাস ঘটে। বেদের দেবীসূক্তে আমরা বাক্‌রূপিণী এই দেবীর পরিচয় পাই। সন্তানের জন্য তিনি সতত তপঃ-পরায়ণা। এই তপস্যার আগুনে তিনি অগ্নিবর্ণা। অগ্নিবর্ণা বলিয়াই তিনি বৈরোচনী। বিশ্ব-প্রকৃতির রূপে রূপে মায়ের আত্মভাবের তাপ আমাদের অন্তরে প্রতিফলিত হইতেছে। বিভিন্ন রুচির বশে পড়িয়া আমরা তাঁহাকেই কামনা করিতেছি। তাঁহার স্নেহের অগ্নিময় উদ্দীপ্তিতে আমাদের জীবনের সর্বকর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনিই আমাদের জন্য কাজ করিতেছেন। আমাদের বেদনার অশেষ উদ্বেগ অন্তরে

চঞ্চলাপাঙ্গী এই জননী সর্বদা আমাদের ভজনা করিতেছেন। তাঁহার এই রূপটি দেখিলে আমাদের অন্তর গলিয়া যায়। আমরা লুটাইয়া পড়ি তাঁহারই পায়। এইভাবে 'সুতরসি' ত্রাণকারিণী দুর্গতি-হারিণী স্বরূপে তাঁহাকে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে নিত্যরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। দুর্গারূপে দুর্গম ভবসাগর হইতে তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করেন।

'রূপং দেহি'—প্রয়োজন এই প্রার্থনাটি আমাদের অন্তরে উদ্দীপিত করিয়া তোলা। তবেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। সাধু, গুরু, শাস্ত্রবাক্য হৃদয়ে ঐক্য করিতে পারিলে, তবে আমরা তেমন প্রার্থনার পথে আমাদের চিত্তের প্রণোদন পাই। মন্ত্রদাতা যাঁহারা গুরু, তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব অন্তরে থাকিলে মন্ত্র-পরিভব ঘটে, অর্থাৎ যে অর্থটি মন্ত্রে সত্যস্বরূপে নিহিত রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অন্তরে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতি মিলে না। গুরু-পরিভব ঘটিলে মন্ত্রের মূলীভূত বীর্য অর্থাৎ আমাদের মনকে ত্রাণ করিবার উপযোগী মন্ত্রশক্তি আমরা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই। এইরূপে মন্ত্র-পরিভব ঘটিলে দেবতা-পরিভব দেখা দেয় অর্থাৎ মন্ত্রের দেবতা আমাদের কাছে রূপ লইয়া দেখা দেন না। এই অবস্থায় অনুমোণ-প্রমাণের অন্ধকারের মধ্যে আমাদিগকে বিভ্রান্ত অবস্থায় পতিত হইতে হয়। জীবনের প্রয়োজন আমাদের মিলে না, সেটি থাকে অস্পষ্ট। সুতরাং মন্ত্রের সাধনা করিতে হইলে সাধু-গুরুর কৃপা-রূপ অর্গলে আগে মনকে বাঁধিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। চণ্ডীপাঠের পূর্বে অর্গলাস্তব পাঠ করিবার তাৎপর্য ইহাই।

'রূপং দেহি'—ইহাই প্রথমে প্রার্থনা। বস্তুতঃ মায়ের দুর্গতিহারিণী দুর্গারূপটি যদি প্রত্যক্ষ করিতে পারি, জীবন আমাদের স্বতঃই জয়যুক্ত হইবে। 'জয়ং দেহি' এই প্রার্থনা সত্য হইবে তখন। জীবন জয়যুক্ত হইলে আমাদের সর্বত্র খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে—শত্রুবর্গ নির্জিত হইবে। মন্ত্রবীর্যের পারম্পর্যসূত্রেই এই স্তরগুলি পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা মাকে পাই নাই; তাই জীবনে সকল দিক হইতে আমাদের দৈন্য। কার্পণ্যে আমরা অভিভূত। এই যে আমাদের দুর্গতি ইহার প্রতিকার করিতে হইলে মাকে প্রত্যক্ষ করাই আমাদের প্রথমে প্রয়োজন—তাঁহার রূপটি দেখা; সুতরাং 'রূপং দেহি'।

ঋক্‌বেদের ঋষি মাকে প্রত্যক্ষ করিবার ধারাটি আমাদিগকে ধরাইয়া দিয়াছেন। আচার্য সায়ন দুর্গাসূক্তের ভাষ্যে দুঃখপরি-হারিণী দেবীর সন্তানের প্রতি সতত জাগ্রত সস্নেহ দৃষ্টির প্রতি আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। মন্ত্রের শক্তিই এইরূপ দেখানো। ঋষি-প্রণিহিত বিশেষ শক্তি মন্ত্রে নিহিত থাকে। অগ্নিময় এই শক্তি। প্রাণের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া ঋষির এই দান। এই দানে মন্ত্র প্রাণাগ্নিময়। "অগ্নির্বৈ বাগ্‌ভূত্বা প্রাবিশৎ"—ইহা শ্রুতিবাক্য। প্রাণাগ্নি বাক্ হইয়া বা বচনের ভঙ্গীতে মন্ত্রে প্রকাশ পায়। মনুষ্য-দেহে যে বাগিন্দ্রিয় আছে তাহাও এই অগ্নি। বাক্‌রূপী এই অগ্নি বিশ্বব্যোমর প্রাণাগ্নিরই অংশ। ফলতঃ আমাদের বাগিন্দ্রিয় ব্যাপারে প্রাণশক্তিরই প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বাগিন্দ্রিয়ের যথাযোগ্য পরিচালনা দ্বারা প্রাণাগ্নি পুষ্টি লাভ করে। বস্তুতঃ প্রাণাগ্নি সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ব্যাপক রহিয়াছে। সব ইন্দ্রিয়ই প্রাণের অধীন। প্রাণাগ্নি উদ্দীপিত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বীর্যশালী হইয়া ওঠে। আমরা সে ক্ষেত্রে পাই প্রত্যক্ষতার পরম বল। ঋষি-প্রদত্ত মন্ত্রের সাধনার প্রভাবে উদ্দীপিত প্রাণাগ্নি মনকে ত্রাণ করিবার উপযোগী অপ্রাকৃত বীর্যময় অবলম্বনের অনুধ্যানে আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া তোলে। দুর্গাসূক্তের সাধনায় আমরা এমন একটি আলম্বন পাই। 'বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং নাবো দুরিতাতিপর্ষি'—এই মন্ত্রে সাধনা করিতে হইলে মহর্ষি অত্রির মঙ্গল-মূর্তির অনুধ্যানে আমাদের অন্তর উদ্দীপিত করিয়া লইতে হয়। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়া-ছেন—"কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি সুধান্বিত শ্রবণ-কীর্তন। অর্চন, স্মরণ, ধ্যান নববিধ মহাজ্ঞান এই ভক্তি পরম কারণ।" আচার্য সায়নকৃত দেবীসূক্তের ভাষ্যের তাৎপর্যও অনুরূপ। মহর্ষি অত্রির অনুধ্যানের ফলে দেবীর প্রতি ভক্তি আমাদের চিত্তে উদ্রিক্ত হয়।

মহর্ষি অত্রির মনন-মূলে এই বীর্যের স্বরূপ কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, তিনি মায়েরই মন্ত্র মূর্তি। মাতৃমন্ত্র জপে তাঁহার চিত্ত সর্বদা পরিনিষ্ঠিত। বিশ্বের আর্ত জীব যাহাতে সর্ববিধ সংক্লেশ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে দেবীর চরণে সেই প্রার্থনাতে মন্ত্রানুধ্যানের পথে প্রজ্ঞানঘন বহ্নিবীর্যে তিনি প্রমূর্ত। মা সন্তান ছাড়া নহেন। সুতরাং সন্তানকে আপন করিয়া পাইলে মাকেও আপন করিয়া পাওয়া যায়। ভক্তকে আশ্রয় করিয়াই আমার স্বরূপ ধর্মের উজ্জীবনোপযোগী বীর্যে মহাশক্তি-স্বরূপিণী জননীর মাধুর্য প্রকটিত হয়। চণ্ডীতে দেবগণের মাতৃ-স্তুতিতে এই সত্যই প্রকীর্তিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন—"ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা-হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি" অর্থাৎ মা তোমাকে আশ্রয় করিলে মানুষের কোন বিপদ থাকে না, কিন্তু তোমার আশ্রয় লাভ করিতে তোমার ভক্তেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তুমি নিজে আমাদিগকে আশ্রয় দিতে পার না। "বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তী বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ" অর্থাৎ তুমি বিশ্বেশ্বরের বন্দিতা, কিন্তু তোমার যাহারা ভক্ত, তাঁহারাই বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ।

'রূপং দেহি'—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া চরাচরে এই একই বেদনা ব্যক্ত হইতেছে; বিশ্বমানব এই একই মন্ত্রের সাধনা যুগে যুগে করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। একাক্ষর এই মন্ত্র। এই মন্ত্র 'মা'। সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এই মা। সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল এই বিশ্বজননীর সংবেদন—রূপং দেহি। জীবনের জন্য যে মাকে প্রয়োজন। চণ্ডীর প্রথম, মধ্যম এবং উত্তরচরিতে এই মন্ত্রবীর্যে উদ্দীপিত মাতৃ-মাধুর্যের বিকাশের ক্রম-পারম্পর্যই আমরা উপলব্ধি করি। বিশ্ব-বিসৃষ্টির মূলে বিশ্বজননীর অগ্নিময় বেদনা অন্তরে লইয়াই প্রথম নমস্কার—'মধু-কৈটভ বিধ্বংসি বিধাতৃ-বরদে নমঃ।' আমরা সকলেই স্রষ্টা। প্রত্যেকেই এক একজন ব্রহ্মা। আমাদের সৃষ্টিকর্মের মূলে মায়ের চরণে নমস্কার সত্য না হইলে কোন সৃষ্টিই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ সৃষ্টি-কর্মের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সর্বাত্মস্বরূপিণী জননীকে উপলব্ধি করিলে প্রতিকার্যে মাতৃবীর্যের উপলব্ধিতে সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হইয়া পড়ে; আত্মচৈতন্যের সঞ্চারে প্রাণের উন্মেষ ঘটে। মধ্যম চরিতে মনোময়ী মায়ের খেলা শুরু হয়। দুরিত-দলনীরূপে তিনি জাগেন। তাঁহার খড়্গ-প্রহারে আমাদের আত্মোন্নতির পথের অন্তরায় অসুরকুল বিধ্বস্ত হয়। মোহরূপে প্রচণ্ড-দোর্দণ্ড মহিষাসুরের প্রভুত্ব মনের মূল হইতে নিরাকৃত হইবার ফলে আমাদের জীবনে দেবশক্তির জাগরণ ঘটে। 'মহিষাসুর-নির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ' দেবীর চরণে এই নমস্কার সত্য হয়। অহিংসা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতিকে তন্ত্র মায়ের পূজার দশপুষ্প বলিয়াছেন। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ প্রভৃতি গীতার দৈবী-সম্পদই এই সব পুষ্প। হৃদয়-রূপ নন্দন-কানন মহিষাসুরের প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে এই সব পুষ্পের দ্বারা দেবগণ মায়ের পূজার সৌভাগ্য লাভ করেন। নন্দনোদ্ভব-কুসুমে, দিব্যধূপে এবং দেবভূমির মলয়জ-চন্দনে মায়ের পাদপদ্ম পূজা করিয়া ভক্তগণের পরিতৃপ্তি। সন্তানগণকে সুখ দিয়া মায়ের সুখ। ইহার পর উত্তরচরিতে নিঃশেষে আত্মনিবেদন। এমন আত্মনিবেদনে সন্তানের দিব্যজীবন লাভ হয়। মায়ের কোল-বুক জুড়িয়া খেলে তাঁহার সন্তান। বিশ্বভুবন দীপ্ত করিয়া আত্মমহিমায় জননীর দীপ্তি—তিনি জগজ্জননী, তিনি জগদ্ধাত্রী। 'নিশুম্ভ-শুম্ভ নির্ণাশি ত্রৈলোক্য-শুভদে নমঃ'—এই মন্ত্রে সর্বার্থ-

সাধিকা মায়ের চরণে সন্তানের তখন নমস্কার। ভক্তজনের উদ্দাম আনন্দ-বিধায়িনীরূপে দেবীর উদয়।

দেবী কখন কোন শুভক্ষণে দুর্গতি-হারিণী দুর্গারূপে বঙ্গের অঙ্গন আলো করিয়া আবির্ভূতা হইলেন জানি না। আমরা তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্যশালিনী রূপে পাইলাম। তাঁহার দক্ষিণে সমৃদ্ধি-স্বরূপিণী লক্ষ্মী, বামে বিদ্যাদায়িনী বাণী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয় এবং সিদ্ধিরূপী গণেশকে লইয়া তিনি আমাদের ঘরে আসিলেন। আমাদের মনোবুদ্ধির অতীত সে তত্ত্ব। মায়ের এই রূপায়ন 'ভক্তজনের গূঢ়ধন'। ঐতিহাসিক বিচারে বাঙালী জাতির সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মূলীভূত প্রাণের এই বিলাস-রহস্য সম্যক্‌রূপে উদ্ঘাটিত হয় না।

আত্মবিস্মৃত এই বাঙালী জাতি। মাকে পাইয়াও আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত হইলাম। পরধর্মের প্রবল সংঘাতে বাঙালীর সমাজ-জীবন এলাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। চারিদিকে ঘনাইয়া আসিল অন্ধকার। সূচীভেদ্য দুরন্তদিগন্তব্যাপী সে অন্ধকার। কোথায় আলো? দুস্তর তিমির-গর্ভে বাঙালীর সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সবই কি বিলুপ্ত হইবে, এমন উপক্রম ঘটিল। দেখা দিল মহা ভয়। আর্তকণ্ঠে সন্তান ডাকিল—কোথায় মা, তুমি—কোথায় দুর্গতিহারিণী জননী দেবী দুর্গা?

আঁধারে আলোকের রেখা ফুটিল। আছেন, তবে আছেন তিনি। সকলের হৃদয়ে তিনি অবস্থিতা—সকলের যে তিনি মা। সকল সন্তানের জন্য তাঁহার বেদনা। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই। তিনি আমাদের কাছে আছেন। শুধু তাহাই নহে, আমাদের কাছে থাকিয়াও তিনি আমাদের কাছে আসিতে চাহিতেছেন। যিনি 'ভূরিস্থাত্রা', তিনিই আবার 'ভূর্যাবেশয়ন্তী'। এমনই তাঁহার লীলা। মায়ের আত্মমায়ার প্রভাবে তাঁহার এমন লীলার আবর্তে বাংলার বায়ুমণ্ডল আলোড়িত হইল। ঋষি-কণ্ঠে নিনাদিত হইল মহামন্ত্র—"বন্দে মাতরম্"। বঙ্কিমচন্দ্র মন্ত্রের আগ্নেয় বীর্যে মাতৃমাধুর্য বাঙালীর অন্তরে ব্যক্ত করিলেন। বঙ্কিমণ্ডল মধ্যে তিনি দেখাইয়া দিলেন মায়ের রূপ। ঋষি-প্রদত্ত মন্ত্রশক্তিতে উদ্দীপিত সঞ্চারচাতুর্যে এ দেশের বৈপ্লবিক বীর্যে মাতৃমাধুর্য বিস্তার লাভ করিল। মহেন্দ্রের মাতৃদর্শনে ঋষি-প্রণিহিত মন্ত্রের অগ্নিময় স্পর্শ আমরা অন্তরে অনুভব করিলাম। মহেন্দ্রের সহিত আমাদের মনকে মিলাইয়া দিয়া আমরা দেখিলাম মায়ের রূপ। আমরা অনুভব করিলাম অগ্নিবর্ণা জননীর তাপ।

আমাদের সহিত মায়ের সমাত্ম সম্বন্ধের ছন্দটি মন্ত্র-মহিমায় ব্যক্ত হইল—জাগিল বেদন; উঠিল কম্পন। দেখিলাম মা আমাদের কঙ্কাল-মালিনী। বুঝিলাম আমরা তাঁহার বেদনা। মানুষ হইতে হইলে মায়ের এই রূপটি দেখিতে হয়। মায়ের বেদনা অন্তরে জাগাইয়া আমাদের স্বার্থগত সংস্কারগুলির বীজ বিলীন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যাঁহারা সমগ্র অন্তর দিয়া মায়ের এই রূপটি উপলব্ধি করেন নাই অবীর্য হইতে তাঁহারা মুক্ত হইতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে শক্তির উৎস থাকে অন্তরে, বাহিরে বাজার দরে সে বস্তু পাওয়া যায় না। প্রকৃত শক্তি পুঁথি-কেতাবে মিলে না; কিংবা ইঁট, পাথর, জল, আগুন, বিদ্যুৎ দ্বারা গড়িয়া তোলাও সম্ভব নয়। দিগন্ত-ব্যাপী অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষায় মায়ের এই হৃতসর্বস্বা নগ্না নিরাভরণা মূর্তি দর্শন করিয়া যাঁহাদের অন্তর বিগলিত হয়, তাঁহাদের ভিতরই মায়ের প্রলয়ঙ্করী শক্তি প্রকটিত হইয়া থাকে। সন্তান মা, মা বলিয়া কাঁদিয়া মায়ের দুঃখ দূর করিবার জন্য মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। মায়ের জন্য সব ভুলিয়া যায়। ইঁহারাই মায়ের বীর সন্তান। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্র-মহিমায় সন্তানধর্মে উদ্দীপিত-লাভের উপযোগী বীর্য আমরা অন্তরে অনুভব করিলাম। আমরা উপলব্ধি করিলাম এই সত্য যে, মন্ত্র শুধু উপদেশ নয়, মন্ত্র শক্তিকূট, মন্ত্র হইতে শক্তি ফোটে এজন্য মন্ত্রকে স্ফোট বলা হয়। 'রূপং দেহি'—এই চেতনাই মন্ত্রের প্রাণ। মন্ত্র-বীর্যে প্রণিহিত শক্তি প্রত্যক্ষভাবে মনকে স্পর্শ করে। এই প্রত্যক্ষতার মূলে থাকে রস, আত্মভাবের চিৎঘন প্রভাব। এই প্রভাব-জনিত অনুভূতি বা জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। প্রত্যভিজ্ঞা বলিতে 'তদেবইদং পদম্' এই পদই তিনি, অভীষ্টের এমন অব্যবহিত উপলব্ধিমূলক ভাব বুঝায়। ভাগবত মন্ত্রবীর্যের রূপায়নের প্রণোদনাত্মক এই স্পর্শ বা সংবেদনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"মনঃ স্পর্শস্মিতেক্ষণং" অর্থাৎ মন্ত্রবীর্যে মন্ত্রময়ী মায়ের মধুর মুখে মাখানো মধুর হাসির স্পর্শ সাধক সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অন্তরে অনুভব করেন। "অংশুমদিন্দুখণ্ডং সোপ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ" চাঁদের টুকরার মত সুন্দর মাধুর্যে মহিমামণ্ডিত মায়ের মুখখানি; এমন মুখের মধুর চাহনির পরিচয় আমরা চণ্ডীর শক্রাদি স্তুতিতে পাই। প্রত্যক্ষতার এই বল পরম বল। এই বল আমাদের অন্তর হইতে সর্ববিধ দুর্বলতা নিরসিত করিয়া অভীষ্টের ঘনিষ্ঠতা লাভে আমাদিগকে অভিষ্ঠ করিয়া তোলে। আমাদের অন্তরে সেজন্য অপরিসীম উৎকণ্ঠা জাগ্রত হয়। 'দুর্বৃত্ত-বৃত্ত শমনং তব দেবি শীলং' আমাদের দেহে মনে, প্রাণে তখন আমরা দৈত্য দল-দলনকারী মায়ের শক্তির উদ্দীপ্তি অব্যবহিত ভাবে অনুভব করি। তাঁহার শক্তিতে আমরা প্রভাবিত হই। আমরা তাঁহার খেলায় মাতিয়া যাই—'নাচে ভক্ত-বক্ষে রক্ত রণ-রঙ্গিণী'।

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রবীর্যে বাঙালী অগ্নিময়ী মায়ের সঙ্গে একদিন আগুনের এমন খেলায় মাতিয়া ছিল। 'বাহুতে তুমি মা শক্তি'—বাঙালী এ সত্য অনুভব করিয়াছিল। 'হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি'—বাঙালীর মাতৃ-সাধনায় এমন অব্যভিচারিণী ভক্তির বিলাস ঘটিয়াছিল। 'ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে' মায়ের জন্য মৃত্যুকে বরণ করিয়া সে প্রাণবীর্যের পরিচয় প্রকট করিয়াছিল। বঙ্গদেশের হৃদয় হইতে দুর্গতিহারিণী জননী অপরূপ-রূপে বাহির হইয়া একদিন এমনই আগুন ঘটাইয়াছিলেন। বাঙালী মায়ের রূপ-সাগরে ডুব দিয়াছিল। 'সুজলাং সুফলাং অমলাং অতুলাং' মাতৃরূপের আকর্ষণে বাঙালী সেদিন সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিল। হৃদয়ের রক্তপদ্মের অর্ঘ্যোপচারে সে মায়ের পূজা করিয়াছিল। সেদিন বাঙালী সমগ্র ভারতে অগ্রণীর আসন অধিকার করিয়াছিল। বিশ্বজগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল বাঙালীর দিকে।

কিন্তু এ কি সবই স্বপ্ন? কোথায় মা? কোথায় আমাদের সেই বাংলা। বাঙালী আজ দুর্গত। বাঙালী আজ অবজ্ঞাত। বাঙালী আজ উপেক্ষিত। বাংলার দিক্‌চক্রবাল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সেই আঁধারে মহিষাসুরের হুহুঙ্কার মুহুর্মুহু উত্থিত হইতেছে। বাংলার মহাশ্মশানে পিশাচদল আজ তাণ্ডবে প্রমত্ত হইয়াছে। স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রব। কোথায় মাতৃ-সাধক অগ্নি-উপাসক মায়ের সন্তানদল? কোথায় অগ্নিবর্ণা মা? ঋষি-প্রণিহিত মন্ত্রবীর্য কি ব্যর্থ হইবে? না, তাহা হয় না—মন্ত্র-মাহাত্ম্য লুপ্ত হইবার নয়। আমাদের পক্ষে অনধিগম্য হইলেও তাহা অমোঘ। ইহাই আশা। জাগো মা, মন্ত্র-মহিমায় তুমি উদ্দীপ্ত হও। মন্ত্রচ্ছন্দে আমাদের মর্মমূলে মন্থন করিয়া আবার জাগো তুমি। মধুকৈটভ বধ কর জননী, বিনাশ কর মহিষাসুরকে। শুম্ভ—নিশুম্ভ বিধ্বংসিনীরূপে জননী তোমার করে মহাখড়্গ দুলিয়া উঠুক। আমাদিগকে তুমি নাচাইয়া তোল তোমার আনন্দ লীলায়। আমাদের প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর মা—"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

সিঁদুরে মেঘ

অন্নদাশঙ্কর রায়

বশেষে এমন কথাও শুনতে হলো যে, দ্রাবিড়দের জন্যে দ্রাবিড়নাড় বলে একটা স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র চাই। তার মধ্যে থাকবে সিংহলেরও কতক অংশ।

হাসির কথা নয় কি? হাসতে চেষ্টা করছি। কিন্তু হাসি পাচ্ছে না। কারণ পনেরো বছর হাসাহাসি করার পর সামনে দেখি কান্নার নদী। রিভার অফ সরো। পাকিস্তান। সে নদী এখনো অতিক্রম করতে পারিনি।

হাঁ, বছর তিরিশ আগে কে একজন ছাত্র যখন ইংরেজী বর্ণমালার থেকে অক্ষর নিয়ে পাকিস্তান বলে একটি শব্দ বানায়, তখন হেসেছিলুম আমরা সবাই। মুসলমানরাও। ইকবাল মন থেকে স্বীকার করেননি, জিন্না ১৯৪০ সালেও উচ্চারণ করেননি, ১৯৪৬ সালে যখন "লড়কে লেংগে" চলছে, তখনো লীগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি সত্যি সত্যি কেউ অতখানি বিচ্ছেদ চান না, মুসলমান অফিসার বন্ধুরা তো ভাবতেই পারেন না। চাকা হঠাৎ ঘুরে যায় ১৯৪৭ সালের গোড়ায়। ততদিনে বোঝা গেছে ইংরেজের বিদায় আসন্ন। কে তার উত্তরাধিকারী হবে তা নিয়ে কংগ্রেস-লীগ একমত নয়। শাজাহান বাদশার পুত্রদের মধ্যে যেমন গৃহযুদ্ধ বেধেছিল তেমনি একটা গৃহযুদ্ধ বাধতে বাধ্য, যদি না বানরকে দিয়ে পিঠে ভাগ করিয়ে নেওয়া হয়। পিঠে ভাগ যেই হয়ে গেল, অমনি দিল্লির জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল, "মহাত্মা মাউণ্টব্যাটেন কী জয়!" আসল মহাত্মা তখন অরণ্যে রোদন করছেন। গৃহযুদ্ধ রোধ করার শক্তি তাঁর ছিল না। ছিল একমাত্র মাউণ্টব্যাটেনেরই।

অবশ্য পিঠের একটা উল্টো পিঠও ছিল। সেটা তখন কারো নজরে পড়েনি। শুরু হয়ে গেল পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম গণ-পলায়ন, বিপুলতম নরহত্যা ও নারীহরণ, তিন সপ্তাহের মধ্যে। দিনে বিশ হাজার মানুষ মারা মহাযুদ্ধেও ঘটে কি না সন্দেহ। সম্প্রতি একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এর জন্যে মাউণ্টব্যাটেনের অদূরদর্শিতাকে দায়ী করেছেন। কিন্তু করতেন তিনি কী? ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সৈন্যসামন্ত নিয়ে চলে যেতেন? করলে কার হাতে সঁপে দিয়ে যেতেন? কংগ্রেসের হাতে দিতে গেলে তৎক্ষণাৎ মুসলিম সৈন্য-দল বিদ্রোহ [illegible] হাতে দিতে গেলে তৎক্ষণাৎ শিখ ও হিন্দু সৈন্যদল বিদ্রোহ করত। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আক্ষেপ করেছেন যে, ইংরেজের উচিত ছিল, আরো কয়েক বছর সবুর করা। ততদিনে লীগ কমজোরী হতো, কংগ্রেস জোরদার হতো।

মজা তো ওইখানেই। আরো কয়েক বছর সবুর করলে লীগ কমজোরী হতো, কংগ্রেস জোরদার হতো। এটা লীগের ভালো করেই জানা ছিল। বিশেষত জিন্না সাহেবের। তিনি বিলেতে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে এলেন। ইংরেজ কর্তারা বুঝলেন। অপসরণের দিন ফেললেন ১৯৪৭ সালের জুন মাস বা আরো আগে। বেচারা ওয়েভেলের চাকরিটি গেল। তিনি ছিলেন অখণ্ড ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু। আমি তাঁকে অকারণে ভুল বুঝেছিলুম। তেমনি ভুল বুঝেছিলুম বহু সংখ্যক ইংরেজ সহকর্মীকে। তাঁরা চেয়েছিলেন কোয়ালিশন। পার্টিশন নয়। কোয়ালিশনের সম্ভাবনা যখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হলো, তখন গৃহযুদ্ধের বিকল্প হিসাবে পার্টিশন ভিন্ন আর কোনো গতি রইল না। ইংরেজরা চেয়েছিল পার্টিশন এ কথা যদি কেউ বলেন, তবে তিনি অন্যায় করবেন। ইংরেজরা চেয়েছিল, কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের কোয়ালিশন। ন্যাশনালিজমের সঙ্গে কাউণ্টার-ন্যাশনালিজমের সন্ধি-সমাস। তাহলে ব্যালান্স অফ পাওয়ার ইংরেজের হাতেই থেকে যেত। যদিও তাদের উপর শাসনভার থাকত না। তারা শাসনদায় থেকে মুক্ত হয়ে নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ত।

"নিউ স্টেটসম্যান" চিরকাল ভারতের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মনে আছে সেসময় "নিউ স্টেটসম্যান" গান্ধীজীর উপর কটাক্ষ করে, "এই সন্তের অভিসন্ধি আমরা আরো কিছুদিন ভারতবর্ষে থাকি। আমরা কিন্তু যত শিগগির পারি চলে আসতে চাই।" আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের মাথার উপর ওয়েভেল থাকলেও সত্যিকার ক্ষমতা পটেল ও নেহরুর হাতে পড়েছিল, তাঁদের একমাত্র কণ্টক ছিলেন অর্থ সচিব লিয়াকৎ আলী খান। লিয়াকতের বাজেটখানা ইতিহাসের বিস্ময়। সর্দারের শিরদাঁড়া কেটে যায় বাজেটের চেহারা দেখে। যেমন অর্জুনের শিরদাঁড়া কাটে বিশ্বরূপদর্শন করে। নিষ্কণ্টক হতে হলে পার্টিশন কবুল করতেই হবে, নতুবা গৃহযুদ্ধ বাধবে। সর্দারের সর্দারি এবার দেখা গেল জিন্নার হাতের তাস কেড়ে নিয়ে টেবিল ঘুরিয়ে দেওয়ার। পার্টিশনে রাজী, কিন্তু বাংলা দেশ ও পাঞ্জাবকেও ভাগ করতে হবে। জিন্নাকে ঢোঁক গেলানোর জন্যে মাউণ্ট-ব্যাটেনকে বিলেত যেতে হয়, চার্চিলকে দিয়ে চিঠি লেখাতে হয়। তা সত্ত্বেও জিন্না মুখ ফুটে সম্মতি দেননি। দিয়েছিলেন নীরবে মাথা নেড়ে। নিছক রাজনৈতিক বার্গেন হিসাবে ওটা তাঁর পক্ষে লাভজনক হয়নি। বিখ্যাত সাংবাদিক কারাকা অভিনন্দন জানাতে গিয়ে দেখেন, জিন্না মুখ হাঁড়ি করে বসে আছেন। যা বললেন, তার থেকে মনে হতে পারে পার্টিশন তিনিও চাননি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল সমান সমান ক্ষমতার ভিত্তিতে কোয়ালিশন। এবং একমাত্র মুসলিম প্রতিষ্ঠান যে তাঁর পরিচালিত লীগ এই স্বীকৃতি। ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখার শর্ত ছিল এমন একটি ফরমুলা যার অর্থ এক একজন মুসলমান তিনে তিনজন হিন্দুর সমান।

এমন একটা ফরমুলায় রাজী হলে রাজী-জেরণ্টুপীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসত একে একে আরো অনেকগুলি খরগোস। সমান সংখ্যক সৈন্যসামন্ত, সমান সংখ্যক পুলিস, সমান সংখ্যক সিভিল সার্ভিসের লোক, সমান সংখ্যক আইনসভার সদস্য, সমান সংখ্যক মন্ত্রী, সমান ওজনের দপ্তর। কোনো সিদ্ধান্তই অধিকাংশের ভোটে গ্রহণ করা চলত না। সমান সংখ্যক ভোটের দরুন নিত্য অচল অবস্থার উদ্ভব হতো। দরকার হতো কাস্টিং ভোট। দিতেন ইংরেজ বড়লাট বা লাট। প্রধান সেনাপতি হিন্দু হলে চলত না, হতেন একজন ইংরেজ। আসল ক্ষমতা রয়ে যেত ইংরেজের হাতে। পটেল ও নেহরু কেনই বা তাতে রাজী হতেন, যখন আসল ক্ষমতার বারো আনাই চলে এসেছে তাঁদের হাতে? ওরকম একটা কোয়ালিশন ধোপে টিকত না। একদিন না একদিন ভেঙে পড়তই। তখন সেই পার্টিশনই হতো, কিন্তু তার আগে কংগ্রেসকে ও অন্যান্য মুসলিম দলগুলিকে আরো দুর্বল করা হতো। লীগকে আরো সবল। স্বাধীনতার জন্যে লড়ত কারা, যাদের লড়ার কথা তারাই যদি অবল হতো? দুর্বল কাঁধ দেখলে ইংরেজও কি চেপে

বসতে চাইত না? অত সহজে বিদায় নিত? ইংরেজ বিদায় নিয়েছে স্বেচ্ছায়, সেকথা ঠিক। কিন্তু বিদায় নিয়েছে আসল ক্ষমতা হাতছাড়া হয়েছে দেখে। কংগ্রেস নেতারা পদত্যাগ করলে বা পদচ্যুত হলে ১৯৪৭ সালে বিপ্লব ঘটত। তাতে সৈনাদলও যোগ দিত। ভারতের স্বাধীনতা দয়ার দান নয়। বারুদে জমেছিল। যে বারুদ দিয়ে বিপ্লব ঘটানো যেতো, সেই বারুদটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সাম্প্রদায়িক লঙ্কাকাণ্ড ঘটায়।

কিন্তু কেন সাম্প্রদায়িক লঙ্কাকাণ্ড? কেন শ্রেণীগত লঙ্কাকাণ্ড নয়? কেন অন্যরকম লঙ্কাকাণ্ড নয়? এর উত্তর সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একটু একটু করে বলসঞ্চয় করছিল। ন্যাশনালিজম নামক একটি শক্তি যখন জার্মানীকে একাকার ও ইটালীকে স্বাধীন তথা একাকার করে, তখন ভারতবর্ষেও তার সংক্রমণ ঘটে। এর একটা বিরোধী শক্তির প্রয়োজন হয়। সেটা কাউণ্টার ন্যাশনালিজম। বা কমিউনালিজম। এটা শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। এর বিস্তার ঘটে পাঞ্জাবের শিখদের মধ্যেও, দক্ষিণ ভারতের অব্রাহ্মণদের মধ্যেও, পরে দেখা গেল সারা ভারতের এক শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও। গান্ধীজী সতর্ক ও তৎপর না হলে অস্পৃশ্যদের মধ্যেও ঘটত। আম্বেদকার তো সেই তালেই ছিলেন। এতগুলো জাতীয়তা-বিরোধী স্রোত যেদেশে সক্রিয়, সেদেশে জাতীয়তাবাদ একা কতদূর যাবে? ক'টাকে পরাস্ত করবে? হয়তো আরো কয়েক বছর সময় পেলে পারত। কিন্তু জিন্না সময় দিলেন না, ইংরেজ কর্তারা সময় দিলেন না।

জিন্নাকে একটি ব্যক্তি না ভেবে একটি শক্তি ভাবতে হবে, নইলে অত বড় একটা বিপর্যয়ের তাৎপর্য বোধগম্য হবে না। যে শক্তির সঙ্গে তিনি আপনাকে একাত্ম করেছিলেন তার প্রকৃত নাম কাউণ্টার ন্যাশনালিজম এবং তার লৌকিক রূপ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা। ইংরেজ রাজা হবার আগে মুঘল রাজবংশ ভারতের অধিকাংশের উপর প্রভুত্ব করতেন, সেই সূত্রে ভারতের সিংহাসনের উপর স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমানদের মনে মনে একটা দাবী ছিল। সংখ্যালঘু বলে দিল্লির সিংহাসন পুনরধিকার করা তাঁদের পক্ষে সহজ ছিল না, কিন্তু সংখ্যাগুরু বলে কলকাতা, লাহোর, করাচী প্রভৃতির মসনদ দখল করা সম্ভব ছিল। পিছনে ইংরেজ থাকলে তো কথাই নেই। ইংরেজকে তাঁরা শত্রু করেননি, বরং ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের শত্রুতার দিনে নিষ্ক্রিয় থেকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। ইংরেজ তো তার মিত্রকে ভুলতে পারে না।

এতদূর পর্যন্ত যা বলা গেল, তা ক্ষমতার রাজনীতির পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর যা করেন নি, এঁরা তাই করলেন। ধর্মকে ব্যবহার করলেন রাজনীতির সেবায়। খান আবদুল গফর খানের মতো ধার্মিক মুসলমান যা করেননি, এঁরা তাই করলেন। রাজনীতির ময়দানে তুললেন ধর্মের ধ্বজা। সাধারণ মুসলমানকে বোঝানো হলো এঁদের জয় হচ্ছে ইসলামের জয়। নতুবা ইসলাম বিপন্ন। দুনিয়ায় এমন দৃশ্য কমই দেখা গেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও ইসলামধর্মী জনগণ একই দলের পিছনে ও পাশে দাঁড়িয়েছে। মিশর বা ইন্দোনেশিয়ায় বা আলজেরিয়ায় এর অনুরূপ দৃশ্য দেখা যায়নি। এই সার্কাসের মতো ব্যাপার ভারতবর্ষে সম্ভব হলো কী করে? হলো এইজন্যে যে ধর্ম নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝি সাত শ' বছর ধরে বোঝাপড়ার অপেক্ষায় ছিল। এখনো কি বোঝাপড়া হয়েছে? "ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম" বা "ভজ মন রাম রহিম" বললেই কি হয়? নানক কবীর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক সাধকের জীবনেই সে বোঝাপড়া সত্য হয়েছে। সাধারণের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, তারা পরস্পরসহিষ্ণু।

সুতরাং যা হবার তাই হয়েছে। একমাত্র আশা রাজনীতির খেলায় ধর্মকে ঘুঁটি করা ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে বাতিল হয়ে যাবে। জনগণও ধর্মের বিভেদকে নেশনভেদ বলে ভাবতে কুণ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুঘটিত রেষারেষির পরিণামটাও সকলের উপলব্ধি হোক। এখনো হয়নি। পাকিস্তানেও হয়নি, ভারতেও হয়নি। আরো দুঃখ আছে কপালে।

ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইংরেজ যেসময় চলে যেতে উদ্যত, সেসময় দক্ষিণের এক দ্রাবিড় নেতা বললেন, "ও কী! আর্যদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাচ্ছ যে!" এ ঘটনার পর পনেরো বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণের দ্রাবিড় আন্দোলন আরো জোর হয়েছে। রব উঠেছে, দ্রাবিড়দের জন্যে দ্রাবিড় নাড চাই। গত সাধারণ নির্বাচনে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাঘম এই রব তুলে মাদ্রাজ আইনসভায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের মর্যাদা লাভ করেছে। পার্লামেণ্টেও মাদ্রাজের জন্যে নির্দিষ্ট আসনের বড় একটা অংশ তার ভাগে জুটেছে। এই তো সেদিন সে একটা উপনির্বাচন জিতল। ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেও নেমেছে। নেতাদের সাজা হয়েছে। কিন্তু সাজা হওয়া তো এদেশে রাজা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন। কে জানে পরের বারের সাধারণ নির্বাচনে এটা তাদের রাজটিকা হবে কি না! যদি হয় তাহলে ভাবনার কারণ হবে। অপোজিশন বলবান হলে গবর্নমেণ্ট চালানো কঠিন। বিশেষত সেই অপোজিশন যদি কথায় কথায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

তারপর সে যদি নির্বাচনে অধিকতর সংখ্যার আসন লাভ করে, তাহলে গবর্নমেণ্ট চালানোর অধিকার তারই। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বনিবনা যদি না হয়, তবে তাকে ডিসমিস করা খুব সুখের হবে না। শেষে এমন দিন আসবে, যেদিন তাকেই ডাকতে হবে তারই শর্তে শাসনের কাজ চালাতে। আর সেও সুযোগ বুঝে পেশ করবে তার চরম দাবী। দ্রাবিড় নাড।

ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। এটাকে হালকা করে দেখলে ভুল হবে। আমাদের শান্তিনিকেতনের এক চিত্রকর বছর দুই আগে মাদ্রাজ রাজ্য ঘুরে এসে আমাকে যা বলেছিলেন তা উদ্বেগজনক। দেখলেন লোকের মনোভাব তাঁর উপর বিরূপ। যেহেতু তিনি উত্তর ভারতীয়। তিনি বললেন, তিনি উত্তর ভারতীয় নন, তিনি পূর্ব ভারতীয়, তিনি বাঙালী। তখন মনোভাব বদলায়। তারপর ভাষা নিয়ে সমস্যা। ইংরেজী ওরা বোঝে, কিন্তু না বোঝার ভাণ করে। হিন্দীতে বলতে গেলে একদম বধির। বলতে হবে তামিল ভাষায়। কিন্তু আমাদের চিত্রকর বন্ধু তামিল জানেন না। তাঁকে আশ্রয় নিতে হলো কখনো সংস্কৃতের, কখনো মুদ্রার। মাছ কিনতে গিয়ে বললেন, "মীন।" ভাগ্যিস ওটা তামিল ভাষায় জলচল হয়ে গেছে। নইলে সংস্কৃতেও দ্রাবিড়দের আপত্তি। আর মাংস কেনার সময় অভিনয় করে দেখাতে হলো কেমন করে পাঁঠা কাটে। এর পরে বোধহয় তামিল ভাষার শব্দপুস্তক হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে। মোট কথা হিন্দী বা ইংরেজী ও রাজ্যে চলবে না। ওরা মনে মনে স্বতন্ত্র হয়ে বসে আছে। সম্প্রতি পড়লুম উত্তর ভারতীয়দের উপর একচোট মার হয়ে গেল। রামায়ণ, সংবিধান ইত্যাদি আগেই পোড়ানো হয়েছিল, এবার পুড়ল মনুস্মৃতি।

আরো পড়লুম, রামায়ণ নতুন করে লেখা হচ্ছে। রাবণ নাকি দ্রাবিড়দের বীর। তিনি আর্য আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে প্রাণ দেন। পাঠ্যপুস্তকগুলো নাকি দ্রাবিড়ীভাবে ভরপুর। তামিলরা নিজেদের ভাষার নিজেদের খুশিমতো লিখছে, পড়াচ্ছে, পড়ছে। দৃষ্টিকোণটা স্বাতন্ত্র্যসূচক। পাকিস্তানের পূর্বলক্ষণ ছিল—"আমরা আগে মুসলমান, তারপরে ভারতীয়।" দ্রাবিড়-নাডেরও পূর্বলক্ষণ সেইরূপ—"আমরা আগে দ্রাবিড় বা তামিল, তারপরে ভারতীয়।" কার্যকালে "ভারতীয়"টা পরিত্যক্ত হবে। হয়তো বছর তিরিশ বাদে।

আমরা ছেলেবেলা থেকেই আর্যদের গৌরবগাথা শুনে আসছি। অনার্যদের হীন ভেবে আসছি। কেমন, সত্য কি না? কিন্তু অনার্যরা তো ভারতবর্ষ থেকে [illegible]

হয়নি। তারা অন্য নামে বিদ্যমান। ওই দ্রাবিড়রাই অনার্য। ওরা শুধু অনার্য নয়, ওরা প্রাগ্‌-আর্য। ওরাই আর্যদের পূর্বে রাজত্ব করত। আর্যরা ওদের হটাতে হটাতে দক্ষিণে নিয়ে যায়, সেখানে কোণঠাসা করে। তাসত্ত্বেও তাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পারেনি। চের, চোল, পান্ড্য বলে তিনটে বড় বড় স্বাধীন রাজ্য ছিল। উত্তর ভারতের কোনো সাম্রাজ্যই তাদের গ্রাস করতে পারেনি। কিন্তু ক্ষত্রিয়রা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, ব্রাহ্মণরা সেখানে সফল হয়েছে। উত্তর ভারতের আর্য সংস্কৃতি ও ধর্ম সেখানে অনুপ্রবেশ করেছে। দ্রাবিড়দের রাজ্যে ব্রাহ্মণরা গিয়ে বসতি করেছে, কিন্তু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। তার জন্যে কঠিন কঠিন সব নিয়ম করেছে। সে-সব নিয়ম দ্রাবিড়দের পক্ষে অবমাননাকর। স্বর্গের বা জন্মান্তরের মোহে তারা এতকাল সহ্য করে এসেছে, কিন্তু এখন আর সহ্য করতে রাজী নয়। মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ হোটেলে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ দ্রাবিড়দের আজকাল ঢুকতে দেয়, কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা টেবিল। কাজেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে বসে খেতে হয় না।

অব্রাহ্মণ অর্থাৎ দ্রাবিড় বলেছি। গোড়াতে ওটা ছিল অব্রাহ্মণদের "আত্মসম্মান" আন্দোলন। তখনো দ্রাবিড় চেতনা জাগেনি। কিন্তু "অব্রাহ্মণ" বলে আত্মপরিচয় দিলেও তো ব্রাহ্মণকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই একদিন "আদিদ্রাবিড়" আন্দোলন দেখা দেয়। অব্রাহ্মণরা সকলেই দ্রাবিড়, দ্রাবিড়রা সকলেই অব্রাহ্মণ, কাজেই একই উদ্দেশ্য সাধিত হলো। এতদিনে সেই স্রোতেরই একটি শাখা দ্রাবিড়কে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরেছে। সংস্কৃত শব্দে তামিল ভাষা ভরা। এটা ওদের কানে বাজে। সংস্কৃত বাদ দিতে চেষ্টা চলেছে। তেমনি সংস্কৃতির ভিতর থেকে আর্য উপাদান। হিন্দী তো তামিলের তুলনায় শিশু। তাও সংস্কৃতের দ্বারা আচ্ছন্ন। আর্যাবর্তেই তার জন্ম। আর্য উপাদানে গড়া তার অঙ্গ। হিন্দীর প্রভাব পড়লে তামিলের স্বভাব নষ্ট হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়, দিল্লির শাসন কোনোকালেই অতি দক্ষিণে পৌঁছয়নি ব্রিটিশ আমলের আগে। যোগসূত্রটা বরাবরই ছিল সংস্কৃতিগত। ধর্মগত। সে ক্ষেত্রেও আবহমানকাল একটা ব্যবধান ছিল আর্যের সঙ্গে দ্রাবিড়ের। সেটা ধর্ম ও সংস্কৃতির সেতুবন্ধন সত্ত্বেও গভীর ছিল। রক্তের মিশ্রণ তেমন হয়নি, যেমন হয়েছিল উত্তরাপথে। ভাষার মিশ্রণও তেমন হয়নি। দ্রাবিড় ভাষাগুলি অন্য এক বংশের। তাদের দিক থেকে ইংরেজী যতখানি দূরে হিন্দীও ততখানি। ইংরেজীকে যদি তারা হটায়, তাহলে নিশ্চয় হিন্দীকে অভিষেক করার জন্যে নয়। সংস্কৃতকে তো নয়ই।

তামিল শুধু একটি আঞ্চলিক ভাষা হয়েই ক্ষান্ত হবে না। সিংহলেও তার প্রচলন আছে। তার অতীত সম্পদ ও আধুনিক বিকাশ হিন্দীর তুলনায় ক্ষীণ নয়।

তারপর ভারতের রাজধানী দক্ষিণ থেকে বড় বেশী দূরে। দ্বিতীয়ত সেটা একান্তই উত্তরে। দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে উত্তর মেরুর যেমন বৈপরীত্য মাদ্রাজের সঙ্গে দিল্লিরও তেমনি। কলকাতা বা বম্বে বা নাগপুর হলে "নিউট্রাল" হতো। ভবিষ্যতে দ্বিতীয় রাজধানীর কথা চিন্তা করতে হবে। এর সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। দিল্লির একটা ঐতিহাসিক মহিমা আছে, কিন্তু দক্ষিণ সে মহিমার শরিক নয়। রামায়ণ মহাভারতেও দক্ষিণকে ইন্দ্রপ্রস্থের বা অযোধ্যার মহিমার অংশীদার করা হয়নি। দক্ষিণ যদি মনে করে যে, সে উত্তর ভারতের একটি উপনিবেশ মাত্র, তাহলে তার মনে পূর্ব পাকিস্তানের মতো অভিমান জন্মাবেই। এর থেকে একদিন উঠবে কাশ্মীরের মতো আংশিক স্বাতন্ত্র্যের দাবী।

কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে তামিলদের সঙ্গে তেলেগুদের বনে না, কন্নাড়িগদের বনে না, মালয়ালিদেরও যে খুব একটা বনে তা নয়। দক্ষিণ ভারতের চারটি দ্রাবিড় রাজ্যের সমবায় কোনো দিন হবার নয়। "হিন্দীর সঙ্গে বাংলার যতখানি তফাৎ, তামিলের সঙ্গে তেলেগুর তফাৎ তার চেয়েও বেশী", বলেছিলেন আমাকে ডক্টর গোপাল রেড্ডি, এখন যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী। সুতরাং তামিলনাড থেকে দ্রাবিড়নাড হওয়া সুদূরপরাহত। কিন্তু সমস্যাটা তা বলে লঘু হয়ে যায় না। সিংহল কতটুকু দেশ! সেও তো স্বাধীন। তামিলনাড কি তার তুলনায় বড় নয়? একবার স্বাতন্ত্র্যের হাওয়া গায়ে লাগলে মানুষ আকার আয়তন বিবেচনা করে দেখে না। সাইপ্রাস কতটুকু দেশ! জ্যামেকা কতটুকু!

অনেকের ধারণা, আরো গোটা কতক কারখানা খুলে দিলেই তামিলদের মন পাওয়া যাবে। অসম্ভব নয়। মানুষের মন তো তার পকেটে। কিন্তু স্মরণাতীত কাল হতে ঐতিহাসিক ভুল বোঝাবুঝি যদি থাকে, বিজেতা ও বিজিত বোধ যদি থাকে, তবে তাকে দূর করাই চাই। আর্য ও দ্রাবিড় সম্বন্ধে আগেকার দিনে যা লেখা হয়েছে, তার সংশোধন দরকার। দ্রাবিড়রা যে সভ্য ছিল, কতক বিষয়ে সভ্যতর ছিল, ভারতীয় সভ্যতায় তাদের দান যে সুবৃহৎ, বহু বিষয়ে বৃহত্তর, এটা স্বীকার করতে হবে। তামিল্‌চর্চাকেও সংস্কৃতচর্চার মতো মর্যাদা ও মূল্য দিতে হবে। হিন্দীর সর্বভারতীয় দাবী খাটো করতে হবে। যেটা নিয়ে মনোমালিন্য তীব্র হলো সেই ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের ভেদটাকেও মুছে ফেলা চাই। দক্ষিণ ভারত "আপার্টহাইড" বজায় থাকবে। সমাজে ব্রাহ্মণশূদ্রের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধু তাই নয়, অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা অভেদের অভিমুখে যাত্রা করতে হবে।

দ্রাবিড়নাড আন্দোলনে ব্রাহ্মণদের অনেকে যোগ দিয়েছেন। যাঁরা যোগ দেননি, তাঁদেরও কারো কারো সহানুভূতি আছে। তাঁদের সকলের মিলনভূমি হলো ভাষা। তামিল ভাষা। সেই ভূমিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করলে সে লড়াই অনেক দূর গড়ায়। রাজাসুদ্ধ লোককে তার মধ্যে টেনে আনা যায়। হিন্দী ভাষান্ধতার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে তামিল ভাষান্ধতা। সন্ধির চেষ্টা নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সন্ধিসূত্র যদি হয়, উত্তর ভারতের কয়েকটি কলেজে বা স্কুলে নমো নমো করে তামিল শেখানো তাহলে ভবী তাতে ভুলছে না। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যম যদি হয় হিন্দী ভবীর তাতে ক্ষতি। ভারতের সরকারী ভাষা যদি হয় একমাত্র হিন্দী ভবীর তাতে অসুবিধা। সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার ও পরীক্ষার একমাত্র মাধ্যম যদি হয় হিন্দী ভবীর তাতেও আপত্তি। অগত্যা সন্ধির সূত্র হবে ইংরেজীকে অনির্দিষ্টকাল রাখা। এই তিক্ত ভেষজটি হিন্দীপ্রেমীদের গলাধঃকরণ করতে হবে।

সময়ে সন্ধি না করলে ও সন্ধির সূত্র গ্রহণযোগ্য না হলে কাউন্টার ন্যাশনালিজম এবার তামিল ভাষান্ধতার সুযোগ নিয়ে দ্রাবিড়নাডের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। আপাতত সম্ভাবনা, কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। অবাক হচ্ছি শুনে যে এর সূচনা নাকি ১৯৪৫ সাল থেকে। বোধহয় জিন্না সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বের পিঠোপিঠি। মাদ্রাজের কংগ্রেসের উপরেও পরোক্ষভাবে এর প্রভাব পড়েছে। ব্রাহ্মণকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে না। অতএব রাজাজীর গঙ্গাযাত্রা। ব্রাহ্মণরা চাকরির জন্যে উত্তরে ছুটছেন। যেখান থেকে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন। কেউ কেউ উত্তরেই বাড়ি করেছেন। তা ইহুদীরা যদি প্যালেস্টাইনে ফিরে যায় দু হাজার বছর বাদে তো এঁরাই বা কেন আর্যাবর্তে না ফিরবেন অগস্ত্যের পথ ধরে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে বিপরীত মুখে?

কার ব্রেকিং পয়েন্ট যে কখন উপস্থিত হয় কে বলতে পারে? হিন্দু মুসলমানের বা ভারত পাকিস্তানের ব্রেকিং পয়েন্ট এলো ১৯৪৭ সালে। আর্য দ্রাবিড়ের বা হিন্দী তামিলের ব্রেকিং পয়েন্ট আসতে পারে আরো তিশ বছর পরে। আমেরিকার স্বাধীনতার আশি বছর বাদে বাধল উত্তরে দক্ষিণে গৃহযুদ্ধ। সেইজন্যে খুব বেশী নিরুদ্বেগ হতে নেই। যদি কোথাও কোনো গভীর ব্যবধান থেকে থাকে, তবে তাকে ভরাট করতে হবে। শুধু সেতুবন্ধন করাই যথেষ্ট নয়।

ছিল না। তার আগে যা ছিল তাকে জাতীয় ঐক্য বলা ভুল। তলে তলে ছিল বই-কি এক প্রকার ঐক্য। সে-রকম ঐক্য ইউরোপেরও ছিল। কিন্তু ন্যাশনালিজম তা সত্ত্বেও ইউরোপকে বহু খণ্ড করেছে এবং প্রত্যেকটি খণ্ডকে অন্য এক প্রকার ঐক্য দিয়েছে, যার নাম জাতীয় ঐক্য। প্রায়ই আমরা এক প্রকার ঐক্যকে অন্য প্রকার ঐক্যের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলি। ছিল ভারতবর্ষের এক প্রকার ঐক্য, কিন্তু জাতীয় ঐক্য বা ন্যাশনাল ঐক্য তার নাম নয়। এটার আয়ুষ্কাল এক শতাব্দীরও কম। মোটের উপর এটা কংগ্রেসের সমবয়সী। এ যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে ভারত ইউরোপের মতো বহু খণ্ড হতে পারে। যাতে দুর্বল না হয়, তার জন্যে নিত্য সজাগ থাকতে হবে। ধর্মের মতো ভাষাও বিস্ফোরক হয়ে দেশ ভেঙে দিতে পারে। ভাষার দ্বন্দ্ব থেকেও অভিনব রাষ্ট্রের উৎপত্তি হতে পারে। সৈন্যসামন্ত দিয়ে একে রোধ করা যায় না। ভাবাবেগ দিয়েও বাঁধ বাঁধা যায় না। খাদ থাকলে তাকে ভরাট করতে হবে।

আমাদের ছেলেবেলায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসত, তখন একই শহরে অনুষ্ঠিত হতো নিখিল ভারত সমাজ-সংস্কার সম্মেলন, নিখিল ভারত ঈশ্বরবাদী সম্মেলন ইত্যাদি কতরকম অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্স। অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে সে পাট উঠে যায়। তার বদলে আসে খাদি, গ্রামোদ্যোগ প্রভৃতির প্রদর্শনী বা বৈঠক। এগুলিও দরকারী। কিন্তু ওগুলি কি অদরকারী? ওগুলির দরকার কি ফুরিয়েছিল? তা নয়। আমাদের নেতাদের একটা ধারণা জন্মেছিল যে, রাজনীতি আর অর্থনীতি ছাড়া একটা নেশনের তৃতীয় কোনো বুনিয়াদ নেই। থাকলে সেটা হয়তো হরিজন আন্দোলন বা নয়ী তালিম। যে নেশন গড়ে উঠছে তার গঠনের সামাজিক, নৈতিক, দার্শনিক, নন্দনতাত্ত্বিক ইত্যাদি কত রকম ভিত্তি চাই। এসব সরকারী আওতায় হবার নয়। স্বাধীন ভারতের সরকার দিল্লিতে এ সকলের আয়োজন করলেও তা সার্থক হবে না। এর জন্যে চাই বেসরকারী উদ্যোগ উদ্দীপনা। কিন্তু কংগ্রেস পর্যন্ত আজকাল সরকারী সাহায্যনির্ভর। জাতীয়তাবাদের আধার যদি জাতীয় সরকারেই নিবদ্ধ হয়, তবে জাতীয় ঐক্য নিতান্ত যান্ত্রিক হবে। যেটা সকলের সাধনা সেটা গুটিকতক রাজনীতিনিপুণের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা যায় না।

মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষ আর-একটি আয়ারল্যান্ড বা ইটালী নয়, আর-একটা ইউরোপ। এই ইউরোপসদৃশ উপমহাদেশকে আমরা নেশন করে তুলতে চেয়েছিলুম। মস্ত বড় একটা প্রাচীর খাড়া করল মুসলিম লীগ। আর-একটা বার্লিনের প্রাচীর। এখন আরো একটা প্রাচীর নির্মাণের প্রস্তাব উঠেছে দক্ষিণে। পরের দোষ দেখার আগে একবার নিজের ত্রুটি দেখলে হয় না? ত্রুটি দেখলে সংশোধন করলে হয় না? একটা ত্রুটি তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। বরাবরই আমরা বলে এসেছি যে, হিন্দী হচ্ছে ভারতের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। অর্থাৎ ইউরোপে যেমন ফরাসী ভারতে তেমনি হিন্দী। সকলেই জানেন, ফরাসী ইউরোপের সরকারী ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বা ন্যাশনাল ভাষা নয়। লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা মানে সামান্য ভাষা। ফরাসীরা যদি জেদ ধরে যে, তাদের ভাষাকেই সারা ইউরোপের রাষ্ট্রভাষা বা ন্যাশনাল ভাষা বানাতে হবে, তাহলে ইউরোপ কোনো দিনই এক নেশন হয়ে উঠবে না। যেভাষা আপোসে সামান্য ভাষা হয়েছে, সে ভাষা গায়ের জোরে ন্যাশনাল ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হতে চাইলে এ-কূল ও-কূল দুকূল হারাবে। সম্প্রতি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে একসূত্রে গাঁথার আয়োজন চলেছে। কিন্তু সেই "ইউরোপীয়" সংস্থার ভাষা কোনটি হবে তা নিয়ে তর্ক বেধে গেছে। ফরাসীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজী। তাই ফরাসীরা ইংরেজদের ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। ইংরেজরা ঢোকবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছে।

যাকে আমরা সরল মনে আমাদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা করতে রাজী ছিলুম, সে এখন হয়ে উঠতে চায় রাষ্ট্রভাষা বা ন্যাশনাল ভাষা। অর্থাৎ ভারতের ফরাসী না হয়ে ইংরেজী। আমরা তো নারাজ হবই। এই যে নারাজ ভাব এটা তামিলদের মধ্যেই সব চেয়ে ব্যক্ত। কিন্তু বাঙালীদের মধ্যেও অব্যক্ত নয়। নেশন তৈরি হয় সকলের সম্মতি নিয়ে। নেশনের প্রতিষ্ঠা সম্মতির উপরে। সংবিধান রচনা করা ভোটের জোরে সহজ। তা দিয়ে রাষ্ট্র তৈরি হয়। রাষ্ট্র তৈরি করলেই অমনি একটা নেশন তৈরি হয়ে যায় না। পাকিস্তান বলে একটা পৃথক রাষ্ট্র তৈরি করার সময় জিন্না ধরে নিয়েছিলেন যে, পৃথক একটা নেশন তৈরি হলো। কিন্তু পনেরো বছর পরেও পাকিস্তান একটা নেশনে পরিণত হয়নি। আমরাও যদি মনে করে থাকি যে, সংবিধান রচনা করে রাষ্ট্র বানালেই অমনি নেশন গড়ে উঠল, তাহলে আমরাও তেমনি ভুল করব। নেশন একটা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়, একটা আত্মিক ব্যাপার। অন্তরাত্মা সায় না দিলে কেউ তার জন্যে প্রাণ দিতে ছুটে যায় না। পাকিস্তানের জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছিল, তারা আসলে দিয়েছিল ইসলামের জন্যে। নেশন আর ধর্ম এক নয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রধানত উত্তর ভারতেরই ইতিহাস। আসাম, সিন্ধু ও তামিল রাজ্যগুলি আবহমানকাল উত্তর ভারতীয় রাজশক্তির অধিকারের বাইরে ছিল। ইংরেজরা দিল্লি থেকে নয়, কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ থেকে তাদের জয় করে রাষ্ট্রভুক্ত করে। তেমনি কাবুল, পাঞ্জাব ও বাংলা দেশ কখনো বা উত্তর ভারতীয় রাজশক্তির অধিকারে এসেছে, কখনো বা অধিকারের বাইরে গেছে। দিল্লি থেকে নয়, কলকাতা থেকে ইংরেজরা বাংলা ও পাঞ্জাব জয় করে। কিন্তু কাবুল হতে ফিরে আসে। এই যেখানকার ইতিহাস, সেখানে শুধুমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের বলে বা সংবিধান রচনার কৌশলে নেশন গড়ে তোলা যায় না। রাষ্ট্র তৈরি করা যায় বটে। নেশন গড়ে তুলতে হলে আরো কিছু চাই। তার নাম সম্মতি। তার নাম অভয়। তার নাম সমান ত্যাগ। তার নাম সমান সুযোগ। দিল্লিকে রাজধানী করে ও হিন্দীকে রাজভাষা করে উত্তর ভারতই আবহমান আধিপত্য করবে এরকম একটা সন্দেহ যদি কারো মনে জাগে, তবে সেই একটি লোক একদিন বরফের গোলার মতো বাড়তে বাড়তে এক কোটি হবে। সন্দেহটা অমূলক একথা মুখে বললেই যথেষ্ট হবে না। কাজে দেখানো চাই। কাগজে কলমে প্রমাণ করা চাই।

চল্লিশ বছর আগে যখন আমি কলেজের ছাত্র, তখন থেকেই আমি হিন্দীর অনুরাগী। স্বেচ্ছায় হিন্দী বই কিনেছি, পত্রিকার গ্রাহক হয়েছি। হিন্দীকে ফরাসী ভাষার মর্যাদা দিতে চেয়েছি। এখনো আমার সে ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটেনি। আমার আপত্তি এইখানে যে, হিন্দীপ্রেমিকরা আমাকে আমার শর্তে চান না। চান তাঁদের শর্তে। তাঁদের মতে হিন্দী হবে ভারতের ফরাসী নয়, ইংরেজী। আমার মতে হিন্দী হবে ভারতের ইংরেজী নয়, ফরাসী। হিন্দী যদি ইংরেজীর উত্তরাধিকারী হয়, তবে আমাদের উপর আধিপত্য করবে। তার সেই অসপত্ন অধিকার তামিলরা কোনোদিনই মেনে নেবে না। বাঙালীরা আত্মবিভক্ত হয়ে এক-পা পাকিস্তানে ও এক-পা ভারতে না রাখলে তামিলদের মতোই হুমকি ছাড়ত। আপাতত দুর্বল, তাই আবেদন নিবেদন করছে। কিন্তু ইতিহাস তো দু'চার দশকেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। সন্দেহের বীজ যদি মনে ঢোকে, তবে কুফল ফলতে হয়তো কিছু বেশি সময় লাগবে। নেশন গড়া যাঁদের ব্রত, তাঁদের কর্তব্য সন্দেহের বীজ না বোনা। বুনতে না দেওয়া। বুনে থাকলে তুলে ফেলা।

এক একটা ভূখণ্ডের ইতিহাসের ধারা সহজে বদলায় না। উত্তর ভারতের অধিকার অতীত থেকে বর্তমানে ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে পূর্বে-দক্ষিণে সম্প্রসারিত হতে চলেছে, ন্যাশনালিজমের ছাতার আড়ালে। পদক্ষেপটাকে সংশোধন করা চাই। [illegible] মেঘ এই কথাই বলছে।

কলঙ্ক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রথমে টের পেল যখন চায়ের পেয়ালাটা সামনে নামিয়ে রাখতেই বিশ্বনাথ মুখ সিঁটকাল। 'এ কী বিচ্ছিরি চা!'

চা তো বিশ্বনাথের নিজেরই কিনে আনা। আর তৈরি তো শর্বাণী এ নতুন করছে না। তাছাড়া রঙটা তো বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। ধোঁয়াও উঠছে পেয়ালা থেকে।

'চুমুক না দিয়েই বিচ্ছিরি বলছ কেন?'

'চুমুক দিতে লাগে না, চেহারা দেখেই বলা যায়।' বিশ্বনাথ খবরের কাগজটা টেনে নিল মুখের সামনে।

তবু দাঁড়িয়ে রইল শর্বাণী। আস্বাদ না করেই অগ্রাহ্য করার মধ্যে যুক্তি নেই যেন এইরকম একটা ভঙ্গি সেই দাঁড়ানোয়।

অগত্যা বিশ্বনাথ পেয়ালাটা ঠোঁটে ঠেকাল। আর ঠেকাতে না ঠেকাতেই ওয়াক-থু ওয়াক-থু করে উঠল।

'কেন, কী হল?'

'ভীষণ মিষ্টি। কোনো ভদ্রলোক একে চা বলবে না।'

'আবার তাহলে করে নিয়ে আসি।'

দ্বিতীয়বার চা করে আনল শর্বাণী। অপেক্ষা করতে লাগল আবার একটা মুখ-ঝামটা শুনবে। হয় ভীষণ লাইট, নয়তো ভীষণ যাচ্ছেতাই। কিন্তু অতদূর যেতে হল

না, টেবলে চা-টা রাখতেই গর্জে উঠল বিশ্বনাথঃ 'এইভাবে সার্ভ করে চা? পিরিচে চা কতটা চলকে পড়েছে দেখেছ?'

'তা ফেলে দিচ্ছি ওটা।'

ওটা ফেলতে গিয়ে আবার এক কেলেঙ্কারি।

বিশ্বনাথ এবার ক্রুদ্ধ না হয়ে গম্ভীর হল। বললে, 'দেখ খাঁটি কথা বলি। তোমাকে দিয়ে আমার চলবে না।'

এ যেন একটা ঝি-চাকর, চলবে না বললেই চলে।

'চলবে না তো আমি কী করব?'

'না, তুমি করবে না। আমিই করব।'

বিশ্বনাথ একটা বাবুর্চি রাখল।

'তার মানে তুমি আমার হাতে খাবে না?' একটু বুঝি বা অভিমানের সুর আনল শর্বাণী।

'তোমার হাতে কেন কারু হাতে খেতেই আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার ঐ গেঁয়ো রান্না শাক-শুক্তো-ঘণ্ট—এ আমার পোষাবে না।'

'আগে-আগে তো পোষাত, যখন রাণাঘাটে ছিলে।'

'তখন তো এ চাকরিটা হয়নি। আসিনি এ লাইনে।'

'আমি কিন্তু আমার আর উর্মির রান্না আলাদা করে করব।'

'তাই, তাই কোরো।' আশ্বস্ত হবার ভাব করল বিশ্বনাথঃ 'খেয়োও আলাদা। আমার সামনে আমার টেবিলে নয়।'

'ছুটির দিনেও নয়?'

'মিলিটারির আবার ছুটি কোথায়?'

'তবু, যখন পাওয়া যায় দৈবাৎ?'

'না, তখনো নয়।'

'রাণাঘাটে তো আমরা খেতাম একসঙ্গে, এক টেবিলে।' শর্বাণীর চোখে পুরোনো দিনের মমতার ছায়া পড়ল।

'সে তো বাঙালির টেবলে মেখে-চটকে শব্দ করে খাওয়া। আঙুলে দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে কাঁটা বাছা, হাত চাটা। ছি ছি।' বিকৃত মুখভঙ্গি করল বিশ্বনাথঃ 'তারপর ঢেঁকুর তোলা। ওসব ভুলে যাও।'

'আমরা কী করে ভুলব!'

'কিন্তু আমি ভুলব।'

খাওয়া-দাওয়া আলাদা হয়ে গেল।

শোওয়াও আলাদা করতে চাইল বিশ্বনাথ।

উর্মির আট বছর বয়েস হয়েছে, বড় হয়ে উঠেছে, সেই কারণে আলাদা শুতে চায়, সেটা মন্দ কী! ঘুমের নিরুপদ্রব আরামের জন্যেও এ ব্যবস্থা অন্যায় নয়। কিন্তু, না, ব্যবস্থার মূলে স্বাস্থ্য বা শালীনতা নয়, শুধু ঘৃণা, আপাদমস্তক ঘৃণা।

গম্ভীর হল শর্বাণী। বললে, 'এ বড় ঘরটায় খাট আলাদা করে নিলেই হবে। উর্মি আমার কাছে থাকবে, তুমি আলাদা খাটে শুয়ো।'

'খাট আলাদা নয়, ঘর আলাদা।' মিলিটারি কায়দায় হুকুম দেবার মত করে বললে বিশ্বনাথ।

'না, তা কী করে হয়!' ছোট্ট করে বললে শর্বাণী।

হয় কী, হল। বিশ্বনাথ ঘর আলাদা করল।

শর্বাণী বললে, 'একা শুতে আমার ভয় করবে।'

'কেন, রাণাঘাটেও তো মেয়ে নিয়ে একা এক ঘরে শুতে!'

'সে আমার শ্বশুরবাড়ির জানাশোনা পুরোনো বাড়ি, সেখানে ভয় করবে কেন?'

'আর এ কলকাতা শহর, এখানেই বা ভয় করবার কী!' বিশ্বনাথ উড়িয়ে দিতে চাইল।

'তবু শত হলেও নতুন বাড়ি—'

'বাড়িটা নতুন হলে কী হবে, পাড়াটা ভালো। য়্যাংলো ইন্ডিয়ানদের পাড়া।'

'কিন্তু কত দিন পরে তুমি এলে বলো তো।' কটাক্ষে একটি মদির রেখা আঁকল শর্বাণী।

'কত দিন? মোটে তো আঠারো মাস।'

'আঠারো মাস কম হল?' রেখাটাকে শর্বাণী আরো একটু গাঢ় করল।

'অসম্ভব। শোনো।' সরে যাচ্ছিল ফিরে দাঁড়াল বিশ্বনাথ। বললেঃ 'তোমার গায়ের গন্ধ আমার অসহ্য লাগে।'

'একদিন তো ভালো লাগত। চাঁপাফুল-চাঁপাফুল লাগত।'

'তখন প্রাণে প্রেম ছিল। এখন অসহ্য লাগছে। উলটিয়ে বমি আসছে। জানো, এই গায়ের গন্ধের জন্যেই বিলেতে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়।'

'ওখানে হোক।' নিশ্চিন্তের মত বললে শর্বাণীঃ 'তোমার কোন গন্ধটা ভালো লাগে সেই রকম সেন্ট-পাউডার কিনে দিলেই পারো।'

'শুধু সেন্ট-পাউডারে কী হবে? গালে-ঠোঁটে রঙ মাখতে পারবে?'

'তুমি যদি সঙ সাজাও কেন পারব না?'

'চুল ছেঁটে ফেলতে পারবে?'

'চুল তো উঠেই যাচ্ছে। চুলের আর আছে কী। দাও না বিদেয় দিয়ে।' এতটুকু ভড়কালনা শর্বাণী।

'চোলি পরতে পারবে? এক ফালি পিঠ আর এক চিলতে পেট দেখাতে পারবে?'

'পেট পিঠ? একটু থলথলে হয়ে গেছে না?'

'থলথলে মেয়েরাও দেখায়। পারবে?'

'তুমি যদি বলো, পারব। সব পারব। তোমার জন্যে কিছুতেই আমার বাধবে না।'

তবু নরম হল না বিশ্বনাথ। বললে, 'না, সত্যি কথা বলতে কী, তোমাকে আর আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'বা, এ এখন বলা খুব সোজা!' শর্বাণীর গায়ের রক্ত তাতল না এতটুকুঃ 'একদিন তো পছন্দ করেই এনেছিলে।'

'সে কত আগের কথা। তখন তো মার্চেন্ট-আফিসে সামান্য মাইনের কেরানি ছিলাম—'

'ছিলে তো তাই থাকতে। মিলিটারিতে যাবার দুর্মতি হল কেন?'

'দুর্মতি?' ইংরিজিতে কী একটা গাল দিয়ে উঠল বিশ্বনাথঃ 'জীবনে উন্নতি করতে মানুষ চেষ্টা করবে না? চিরকাল একটা পচা, নোংরা দুর্গন্ধ চাকরি আঁকড়ে পড়ে থাকবে?'

বিশেষণগুলো চাকরি সম্বন্ধে, না, তার নিজের সম্বন্ধে, শর্বাণী বুঝতে চাইল না। বললে, 'তাই বলে একেবারে তোমার বন্ড সই করে দেবার মানে হয় না। দেবার আগে সকলকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।'

সকলকে মানে তোমাকে?'

'নয় কী। দেখতে গেলে আমিই তো সকল।' শর্বাণী নরজাটা ধরলঃ 'তুমি তখন বিয়ে করে ফেলেছ। তোমার একটি মেয়ে হয়ে গিয়েছে।'

'যাও যাও, মিলিটারি অফিসরদের কী আর স্ত্রী-কন্যা থাকে!'

'থাকবে না কেন? সে সব স্ত্রী-কন্যাও মিলিটারি স্ত্রী-কন্যা। কিন্তু আমি কেরানির বউ, উর্মি কেরানির মেয়ে। আমাকে যখন এনেছিলে তখন কেরানির বউ করবে বলেই এনেছিলে আর উর্মি—'

'তুমি মেয়েকে টানছ কেন?' তড়পে উঠল বিশ্বনাথ।

'না, বলতে চাচ্ছি, ওর কী দোষ!'

'ওর দোষ কে বলছে? সব তোমার দোষ।'

'কিন্তু আমার মত নিয়ে তো আর মিলিটারি হওনি যে এখন আমায় দোষ দেবে! হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, বাড়ি থেকে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলে। হঠাৎ আবার একদিন বলা নেই কওয়া নেই একেবারে একটা যুদ্ধের পোশাক পরে ভয়ংকর মূর্তিতে এসে দাঁড়ালে। সংসারে প্রলয়কাণ্ড বাধালে। সবাই ভাবলে, সাময়িক খেয়াল, যাত্রার দলের পোশাক ছেড়ে ফেলে আবার গৃহস্থ বনবে, ধরবে পুরোনো চাকরি। কিন্তু একেবারে একটা বন্ড সই করে দিয়ে এসেছ তা কে জানত!'

'মানে তোমার বন্ডেই চিরকাল বাঁধা থাকতে হবে?' বিশ্বনাথ খেঁকিয়ে উঠল।

'আমার সঙ্গে তোমার চাকরির সম্পর্ক কী?' শান্ত মুখে শান্ত স্বরে শর্বাণী বললে, 'তোমার চাকরি থাক বা না থাক, তাতে তোমার উন্নতি হোক বা না হোক, তাতে আমার কী। আমি আমি।'

'তুমি তুমি!' মুখ ভেংচে উঠল বিশ্বনাথঃ 'তুমি একেবারে পার্মানেন্ট ফিকশ্চার-নট নড়নচড়ন। শোনো—' এক পা এগিয়ে এলঃ 'জীবনের উন্নতির পথে যা কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাই লাথি মেরে ফেলে দেব ছুঁড়ে। পুরোনো চাকরিটা তেমনি এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল—'

'তেমনি আরেক বাধা পুরোনো এই স্ত্রী।'

'নিজেই তো বুঝতে পেরেছ দেখছি।'

'অতএব তাকেও ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

'উপায় কী তা ছাড়া! লোকে আজকাল স্ত্রী পোষে উন্নতির জন্যে। তোমাকে দিয়ে তো সামান্য সাজগোজই হবে না, তার উপর আছে আরো কত আনুষঙ্গিক! তুমি আমার উন্নতির পথের কাঁটা. কাঁটা শুধু নয়, তুমি আমার লজ্জা—সুতরাং—'

'অত সোজা নয় ছেড়ে দেওয়া।' মুখে ভল, বলে ফেলল শর্বাণী।

সোজা নয়ই বা কেন? কে আছে শর্বাণীর পাশে এসে দাঁড়ায়? কে আছে তার হয়ে লড়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে? কী আছে তার, শত্রুকে বশ করে?

সেদিন রাত্রে বিশ্বনাথ মদ খেয়ে ফিরল। মুখে একটা ইংরিজি গানের টুকরো।

'মিলিটারিতে এত খায় নাকি?' আহতের মত জিজ্ঞেস করল শর্বাণী।

'সিভিলেও খায়। তুমি একটু খাবে, দেখবে খেয়ে?' বিকট হেসে উঠল বিশ্বনাথঃ 'তুমি তো আবার ইংরিজি জানো না। মদের বেলায়ও ইটিং বলো। ইটিং ওয়াইন! উইল ইউ ইট এ গ্লাস?' শূন্যে হাত তুলে গ্লাস ধরা দেখাল।

কথা কইল না শর্বাণী।

টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে এগুলো বিশ্বনাথ। বললে, 'মদ পেটে গেলে সকলকেই টলারেবল লাগে শুনেছি, কিন্তু, কী আশ্চর্য, স্ত্রীকে, তোমাকে, কেন তাও লাগে না? একটা কাজ করবে এস। আমার ঘরে এস।'

শর্বাণী ঘরের সামনেকার বারান্দায় স্থির হয়ে দাঁড়াল।

'এস। আমার সঙ্গে বসে এক পাত্র মদ খাও। দেখি তুমি মদ খেলে, তোমার শরীরে নেশার রঙ ধরলে তোমাকে তখন ভালো লাগে কিনা।'

'আমি মদ খাব?'

'বলেছিলে না আমার জন্যে তুমি সব কিছু করতে পারো? ইয়া-ইয়া পরে নাচতে গাইতে বলছি না, লাফ-ঝাঁপ দিতেও না. শুধু কোয়ায়েটলি একটু ড্রিঙ্ক করা। তারপর আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একটু তেরছা চোখে হাসা—'

'মদ খেতে পারলে আর তোমার দিকে তাকাব কেন?' শর্বাণী ঝলসে উঠলঃ 'বাইরে আর লোক নেই?'

'ফর গডস সেক, দয়া করে তাকাও না একবার বাইরের দিকে।' প্রায় উথলে উঠল বিশ্বনাথঃ 'আমি ডিভোর্সের একটা গ্রাউন্ড পাই।'

'নিজেই তো বুঝতে পেরেছো দেখছি'

শর্বাণী চুপ করে গেল।

নিজের মনে খুব খানিকক্ষণ হই-চই করল বিশ্বনাথ, কটা কী জিনিস ফেলল-ছুঁড়ল, গালাগাল দিল, তারপর জামাজুতো না খুলেই পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে।

শাদা চোখেও বিশ্বনাথের সেই এক কথা। তুমি সরে যাও। তুমি দূরে থাকো।

একটা খামের চিঠি হাতে করে শর্বাণীর কাছে এসে দাঁড়াল বিশ্বনাথ। বললে, 'তুমি রানাঘাটে শিগগির ফিরে যাও। মার অসুখ বেড়েছে।'

'অসুখ বেড়েছে তো মাকে এখানে নিয়ে এস।' শর্বাণী এতটুকুও উদ্বিগ্ন হল নাঃ 'এখানে ছেলের কাছেও থাকতে পারবে, চিকিৎসাও ভালো হবে।'

'এখানে নিয়ে আসব কী! মাকে রিমুভ করা সম্ভব?'

'রিমুভ করা আমাকেও সম্ভব নয়।' গম্ভীর শর্বাণীর কণ্ঠ।

'সে কী! মার শেষ অসুখের সময় তুমি তাঁর সেবা করবে না?'

'এই তো সেদিন এলাম তাঁর কাছ থেকে। তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন কোনো অবস্থাতেই আমি যেন আমার ঘরবাড়ি স্বামী সংসার না ছাড়ি।'

'ঘোরতর অসুখ হলেও নয়?'

'না। কে জানে সত্যি তাঁর অসুখ কিনা। না, চিঠিটা তোমার কারসাজি।'

'কারসাজি?' বিশ্বনাথের ইচ্ছে হল শর্বাণীর মুখের উপর একটা ঘুসি মেরে বসে।

'বেশ, কারসাজি নয়, সত্য চিঠি। কিন্তু আমি যদি অবাধ্য হই, আমি যদি যেতে না রাজি হই, কী করা যাবে? কত রকম ঠেকাতেই তো কত লোক যেতে পারে না।'

'যদি না যাও, জোর করে পাঠিয়ে দেব।'

'কী করে জোর খাটাবে তা তো জানি না।' শর্বাণী ম্লান রেখায় হাসলঃ 'আর জোর করে ধরে বেঁধে পাঠাতে পারলেও সেবা করাবে কী করে?'

'সেবা করতে হবে না তোমাকে। তুমি যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যাও তা হলেই আমি কৃতার্থ হব।' বিশ্বনাথ হাত জোড় করে মিনতির ভঙ্গি করল।

'তাই বা কী করে হতে পারে?' শর্বাণী পরম নির্লিপ্তের মত বললে।

'ঘাড় ধরে রাস্তায় ঠেলে দিয়ে সদর বন্ধ করে দিলেই হতে পারে।'

'তাই বা হবে কেন?' কোথায় কী যেন তার একটা শক্ত আশ্রয় আছে এমনি শান্ত নিশ্চিন্ততায় শর্বাণী বললে, 'স্ত্রীর বয়েস বাড়লে বা তার যৌবন যাব-যাব হলেই তাকে বর্জন করতে হবে এর মধ্যে কোনোই যুক্তি নেই।'

আসল যুক্তি হচ্ছে প্রহার—অত্যাচার। কিন্তু তা দিয়ে সাময়িক উপশম হতে পারে, শেষ সমাধান হয় না। পথটাও দীর্ঘ। নিজেরও জখম হবার ভয় থাকে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের কানে উঠলে অভিনন্দিত হবার কথা নয়।

অন্য পথ ধরতে হবে।

সেদিন রাতে মাতাল হয়ে [illegible] বাড়ি ফিরল, একা নয়। সঙ্গে একটা সাহেব আর তিনটে ছুকরি মেম নিয়ে ফিরল।

বাক্সে-ঠোঙায় করে কী সব খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে তাই খেল কাড়াকাড়ি করে। গ্লাসে-গ্লাসে ঢালল রঙিন জল। তারপর এ-ওর কোমর ধরে-ধরে নাচ সুরু করে দিল। নাচতে-নাচতে বেরিয়ে আসতে লাগল বারান্দায়। তারপর কী উৎকট গান! উৎকটতর হাসি। বেলেল্লাপনা আর কাকে বলে!

বিশ্বনাথ ভেবেছিল শর্বাণী ঘরে দোর দিয়ে থাকবে। কিন্তু তা নয়, ও দিকটা যেন আলাদা ফ্ল্যাট এমনিভাবে নিজের গণ্ডির মধ্যে চলাফেরা করতে লাগল। এত দৌরাত্ম্যকেও চাইল উপেক্ষা করতে। নিজের স্থানে স্থির থাকতে।

কিন্তু মেয়েটার জ্বর যেরকম বেড়েছে ডাক্তারকে না ডাকলেই নয়।

সাহসে ভর করে নিজেই বিশ্বনাথের ঘরের সামনে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। অকুণ্ঠ মুখে বললে, 'মেয়েটার জ্বর খুব বেড়েছে। ডাক্তারকে একবার খবর দেওয়া দরকার।'

তিনটে মেয়ের মধ্যে একটা ইংরিজিতে খাঁক করে উঠল: 'অসুখ করেছে তো হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।'

এতে হাসবার কী আছে, সবাই হেসে উঠল সমস্বরে।

আরেকটা মেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে এ?'

বিশ্বনাথই বললে, 'মেয়েটার আয়া।'

আবার একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

এতেও বিচ্যুতি নেই শর্বাণীর। কোথায় যাব? কে আছে? আর, যাবই বা কেন? আমার স্বত্বে অবস্থিত থাকব। ধৈর্য ধরে থাকলে একদিন ফল ফলবেই। সব সুগোল হয়ে আসবে।

এবার বিশ্বনাথ সত্যের পথ ধরল। সত্যের পথ মানে কান্নার পথ।

'আমাকে বাঁচাও।' শর্বাণীর হাত চেপে ধরল বিশ্বনাথ। কাঁদ-কাঁদ মুখ করে বললে, 'তুমি ছাড়া কেউ নেই যে আমাকে বাঁচাতে পারে।'

'কেন, কী হয়েছে?' দুশ্চিন্তায় মুখ কালো হয়ে উঠল শর্বাণীর।

'ঐ যে তিনটে ম্যাংলো মেয়ে দেখেছিলে সেদিন, তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে ঢ্যাঙা, নাম গ্রেস, গ্রেসি—তাকে আমি ভালোবেসেছি।'

'ভালোবাসা তো ভালোই।' শর্বাণীর নয়, একটা পাথরের মূর্তির মধ্য থেকে আওয়াজ বেরুল।

'তাকে আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি।'

'বিয়ে করবে?' পাথরের মূর্তিতে মৃদুতম রেখাও আর কোথাও রইল না: 'তা কী করে হয়?'

'হয়। তার পথ আছে। তুমি বললেই হয়।' মিলিটারি এবার গোবেচারীর ভঙ্গি ধরল: 'বলো তুমি কি আমার উন্নতির পথে বাধা হবে? তুমি কি চাও না আমি আরো বড় হই?'

'ঐ শিটে শুটকে মেয়েটাকে বিয়ে করলে তোমার উন্নতি হবে?'

'ও ভীষণ স্মার্ট মেয়ে, তুমি বুঝবে না, ইংরিজিতে যাকে বলে টিটিলেটিং। বিউটি-কম্পিটিশনে যাবে ও।'

'তা যাক।' পাথরের মূর্তি চাইল নিশ্বাস ফেলতে।

'তুমি বলতে না, আমার জন্যে তুমি সব কিছু করতে পারো, সব কিছু দিতে পারো, —এইটুকু করতে পারবে না?'

এইটুকু!

'কী করতে হবে?' একটা পরিত্যক্ত অন্ধকার গুহার মধ্যে থেকে যেন শর্বাণী বললে।

'আমাদের এই বিয়েটা ভেঙে দিতে হবে। বিয়েটা ভেঙে না দিলে আমার গ্রেসিকে পাওয়া হয় না।' গানোয়ারী কাহাতে গামাবোট হয়ে গেল বোধহয়। বিশ্বনাথের স্বরে কান্নার টান।

'আমাদের বিয়েটা ভেঙে দেওয়া যায় নাকি?'

'যায়, আজকাল যায়।' আশ্বাসের সুর আনল বিশ্বনাথ: 'আমি খৃস্টান হলেই সহজ হয়ে যায়।'

'খৃস্টান হলে?' গুহার মুখটাও বুঝি বন্ধ হয়ে এল এবার।

'খৃস্টান না হলে গ্রেসিকে বিয়ে করব কী করে? খৃস্টান হওয়াটাই সব চেয়ে সহজ উপায়। তাহলে এ পুরোনো বিয়েটাও ভাঙা যায়, করা যায় আবার নতুন বিয়ে।'

'তুমি ধর্ম ছাড়বে?' সমস্ত গুহাটাই বুঝি অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ধর্ম?' সেটা যেন কোনো একটা জিনিস, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল বিশ্বনাথ: 'সেটা আবার কী! সেটা কোথায়?' পরে শান্তস্বরে বললে, 'প্রেমের জন্যে মানুষ কত কিছু ছাড়ে, আর এ তো একটা ফাঁকা কথা —খানিকটা ধোঁয়া মাত্র।'

নিরেট স্তব্ধ হয়ে গেল শর্বাণী।

বিশ্বনাথ দিব্যি তার কাঁধের উপর হাত রাখল। বললে, 'আমি জানি কী হবে আমার অদৃষ্টে। তুমিও জানো। বিয়ের পর গ্রেসি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, আর কাউকে ধরবে। ঐ সব স্ট্রিপ-আপ গার্ল এক জায়গায় বাঁধা থাকবে না। আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসব।' একটু বা আদর করতে চেষ্টা করল বিশ্বনাথ: 'তোমার সতী শক্তিই আবার আমাকে টেনে আনবে।'

স্বামীর দিকে একবার মুখ ফেরাল শর্বাণী, কান্নায় ভেসে-যাওয়া করুণ মুখ। যেন নিঃশব্দে বলতে চাইল: 'তাই যদি হবে তবে কেন মিছিমিছি—'

সরে এল বিশ্বনাথ। বললে, 'এ যে আমার কী যন্ত্রণা তোমায় কী করে বোঝাই?'

শর্বাণীর দূর সম্পর্কের মামা, কোন কোর্টের কে উকিল, শক্তিপ্রসাদ ঘোষ, ডাক পেয়ে সাহায্যে এল।

সব দেখল-শুনল কাগজপত্র। বললে, 'মেনে নিবি?'

'উপায় কী তা ছাড়া?' শর্বাণী দাঁড়াল চেয়ার ঘেঁসে: 'লড়তে গেলেও হায়রানির একশেষ। বাইরের বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারলেও অন্তরের বিচ্ছেদ ঠেকানো যাবে না। যার মন নেই তার সঙ্গে ঘর করা যায় কী করে?'

'তাছাড়া যে ধর্মান্তরী হয়েছে—' শক্তিপ্রসাদ টিপ্পনী কাটল।

'না, শুধু তাতে আটকাত না। কিন্তু যে জিনিসে লোভ করেছে তা পেতে যদি ওকে বাধা দিই, ও আমাকে খুন করে ফেলবে। কুচি-কুচি করে কেটে এক টুকরো এখানে আরেক টুকরো ওখানে রেখে দিয়ে আসবে। হয়তো মেয়েটাকেও আস্ত রাখবে না। আর যাই হোক, গায়ের জোরে তো পারব না। তা যখন যেতে চাচ্ছে, যাক, ঘুরে আসুক।'

'লাথি খেয়ে ফিরে আসবে।'

'তা ছাড়া মারই তো সব নয়, অপমান!' চোখ মুখ জ্বলে উঠল শর্বাণীর।

'মিস গ্রেস সব ফিরিয়ে দেবেন।'

'তাই বিচ্ছেদটা আপোসেই হয়ে যাওয়াই ভালো।'

'আমিও তাই বলি।' সায় দিল শক্তিপ্রসাদ।

শর্বাণী-বিশ্বনাথ কোর্টে সংযুক্ত দরখাস্ত করলে। স্বামী ভারতীয় খৃস্টান, স্ত্রী হিন্দু, —এ বিবাহ কী করে বাঁচিয়ে রাখা চলে!

বিচ্ছেদের আরজি যখন পড়েছে তখন স্বামী-স্ত্রী একত্র বসবাস করে কী করে? না, রানাঘাট ফিরে যাবে না শর্বাণী। কলকাতাতেই কোনোখানে থাকবে মাথা গুঁজে। তার মেয়েকে, ঊর্মিকে, মানুষ করতে হবে। তার আর জীবনে রইল কী! এই মেয়েটাকে

মানুষ করে তোলাই তার একমাত্র স্বপ্ন। একমাত্র আকর্ষণ।

ভদ্র গৃহস্থ পাড়ায় একখানা ঘরের ভাড়াটে হল শর্বাণী। ঠিক হল এক বছর মাস-মাস একশো টাকা করে তাকে দেবে বিশ্বনাথ। টাকা নইলে শর্বাণী ও ঊর্মির ভরণপোষণ হবে কী করে? এই এক বছর করতে হবে অসঙ্গবাস। আইন অনুসারে এই অসঙ্গবাসটাই চূড়ান্ত বিচ্ছেদের ভূমিকা। এই এক বছরের মধ্যে পক্ষেরা যদি পরস্পরে আসক্ত হয়, সংলগ্ন হয় তা হলে মামলা আর চালাতে হল না, টেঁসে গেল। আর যদি এই এক বছরেও গোলমাল না মেটে, যদি এপার বন্যা ওপার বন্যাই থেকে যায় আগের মত, সেতু না পড়ে, তাহলে বিচ্ছেদের ডিক্রি চূড়ান্ত হতে পারবে।

দেখতে-দেখতে এক বছর কেটে গেল। বিশ্বনাথ এক মুহূর্তের জন্যেও শর্বাণীর ঘরের দরজায় উঁকি মারতে এল না।

'কেন আসবে? এখনো তো ও গোঁসাতেই মশগুল।' বললে শক্তিপ্রসাদ। 'আগে মেয়েটাকে বিয়ে করুক, নাকের জলে চোখের জলে হোক, পরে বুঝবে আগের স্ত্রী, প্রথম স্ত্রীর কদর কী! তখন যদি ফিরে না আসে তো কী বলেছি!'

এইবার আবার দুইপক্ষ মিলে আদালতে চূড়ান্ত দরখাস্ত দিতে হয়। আমাদের বিরোধ মেটেনি। পারিনি পরস্পরে অনুরক্ত হতে। সুতরাং আমাদের ছাড়াছাড়িটা পাকা করে দিন।

শক্তিপ্রসাদ বললে, 'এইবার আপোসনামায় ভরণপোষণের টাকাটা বাড়িয়ে নিবি।'

'নিশ্চয়।' কোমর বাঁধল শর্বাণী: 'একশো টাকায় কী হয়? ঘর ভাড়াই চল্লিশ টাকা।'

শক্তিপ্রসাদের বাড়িতে চূড়ান্ত দরখাস্তের মুসাবিদা হচ্ছে, শর্বাণী বললে, 'মাসে একশো ষাট টাকা চাই।'

বিশ্বনাথ ভেবেছিল যে একশো টাকা দিচ্ছিল এতদিন, তাই নথীভুক্ত হবে।

'না, সেটা নথীর বাইরে একটা সাময়িক ব্যবস্থা বাবদ দেওয়া হচ্ছিল।' বললে শর্বাণী, 'এখন সমস্ত কিছু কোর্টের শিলমোহরের নিচে আসছে, একটা ন্যায্য টাকাই ধার্য হওয়া উচিত।'

দুই হাত শূন্যে তুলে দিল বিশ্বনাথ। বললে, 'ও যে অনেক টাকা। অত টাকা আমি দিতে পারব না।'

'অত হল কোনখান দিয়ে?' শর্বাণী বললে দৃঢ়স্বরে, 'মেয়ে বড় হচ্ছে, স্কুলে পড়ছে, বাস-এ যাচ্ছে—সে খরচ কত? মেয়ে ক্রমশই বড় হবে, ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরবে, খরচও বাড়তে থাকবে। একশো ষাট টাকা মোটেই অসঙ্গত হয় নি।'

'অত টাকা দিতে হলে আমি মরে যাব।'

দুপক্ষের লোকজন মিলে রফা করে দিল। একশো টাকা করে তো দিচ্ছিলই, এখন একশো ষাটটা একটু বেশি শোনাচ্ছে, একশো পঁয়ত্রিশ করে দিক। মেয়ে যে বড় হচ্ছে দিন-দিন এ তো আর মিথ্যে নয়।

বিশ্বনাথ তবু কী আপত্তি করতে যাচ্ছিল, তাকে সবাই নিরস্ত করল।

'না টাকার কথা বলছি না।' বিশ্বনাথ উত্তেজিত হয়ে বললে, 'তবে একটা সর্ত বসান। আমি মাস-মাস ঐ টাকাটা দেব যদ্দিন পর্যন্ত শর্বাণী বিয়ে না করবে, কিংবা অন্য পুরুষে উপগত না হবে। যদি অতঃপর শর্বাণী বিয়ে করে বা ব্যভিচারিণী হয় পাবে না সে মাসোয়ারা।'

'এ বলাই বাহুল্য।' সবাই এক বাক্যে সায় দিল।

'কিন্তু আমারো একটা দাবি আছে।' শর্বাণী বললে।

'কী দাবি?'

'আমি আমার সিঁথির সিঁদুর মুছব না, ছাড়ব না বিবাহিত পদবী।'

সবাই হেসে উঠল। বিশ্বনাথ বললে, 'তোমার যা ইচ্ছে তাই কোরো। এ সব নথীর বাইরে।'

চূড়ান্ত ডিক্রি হয়ে গেল।

'চলুন হোটেলে চলুন। একটু খাওয়া-দাওয়া করা যাক।' বিশ্বনাথ দুপক্ষের উকিলকে, শক্তিপ্রসাদকে — শর্বাণীকেও নিমন্ত্রণ করল।

যেন বিরাট কিছু একটা পেয়েছে সেই আনন্দেরই উৎসব করছে বিশ্বনাথ। শর্বাণীরও মুখ গোমড়া করে থাকবার মানে হয় না। মামলা সেও জিতেছে। একশো টাকা একশো পঁয়ত্রিশ টাকায় এনেছে। এক অর্থে সেও পেয়েছে স্বাধীনতা।

এটা-ওটা যতই ফিরিয়ে দিচ্ছিল শর্বাণী, ততই তার প্লেটে ঢেলে দিচ্ছে বিশ্বনাথ। এক সময় তার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'টাকাটা কম হয়েছে বলে মন খারাপ কোরো না। আমি আরো পাঠাব ঊর্মির জন্যে। ঊর্মিকে নিয়ে আসনি কেন? ওকে কতদিন দেখিনি।'

গোঁসাকে এবার খুলে-মুলে পাবে সেই আনন্দে শর্বাণীকে আজ বোধহয় ক্ষমার যোগ্য বলে মনে হচ্ছে বিশ্বনাথের।

'চলো তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

শর্বাণীকে এক পাশে ডেকে নিল শক্তিপ্রসাদ। গম্ভীর মুখে বললে, 'যার সঙ্গে যাচ্ছ, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে আর তোমার স্বামী নয়, সে পরপুরুষ।'

অল্প হেসে শর্বাণী বললে, 'জানি।'

মুখে 'জানি' বলল বটে, কিন্তু মনে যেন পাচ্ছে না মেনে নিতে। তার এতদিনের সেই পুরুষ, শরীরের সকল প্রদীপ জেলে যার আরতি হয়েছে এতদিন, সে কলমের এক আঁচড়ে অন্যরকম হয়ে গেল? চেনা লোকটা বহু দিনের আদান প্রদানের পর অচেনা হয়ে গেল?

ট্যাক্সি করেই যাচ্ছিল দুজনে। একটা গলির মোড় আসতেই শর্বাণী বললে 'আমাকে এখানে ছেড়ে দিলেই চলে যেতে পারব।'

ড্রাইভার ট্যাক্সি থামাতেই টুক করে নেমে পড়ল শর্বাণী।

একশো পঁয়ত্রিশ টাকা।

সাত তারিখ পেরোয় না কোনোবার, সাধারণত পাঁচ-ছয় তারিখের মধ্যেই এসে পড়ে। বিশ্বনাথ নেফাতেই থাক কি কাশ্মীরেই থাক, কিংবা বাঙ্গালোর, ডিক্রির নির্দেশ অনুসারে টাকা ঠিক পাঠিয়ে দিচ্ছে হেডকোয়ার্টার্স। ঝড় হোক, জল হোক, স্ট্রাইক হোক কি রেল-দুর্ঘটনা ঘটুক, এক মাসও অন্যথা নেই। কোনো প্রমাণ নেই, কেউ নালিশ করছে না, শর্বাণী আবার বিয়ে করেছে বা অন্য পুরুষে আসক্ত হয়েছে। টাকা তাই ঠিক নিটোল পৌঁছোচ্ছে শর্বাণীতে।

সে মাসে টাকার অতিরিক্ত একটা পার্শেল এসে পৌঁছুল। সন্দেহ কি, ঠিকানাটা বিশ্বনাথের হাতের লেখা। খুলে দেখল, রঙবেরঙের ছিটের কাপড়, আর তাতে পিন দিয়ে একটি তারিখ গাঁথা।

ধক করে বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল শর্বাণী। ঊর্মির জন্মদিনটা সে ভুলে গেলেও বিশ্বনাথ মনে করে রেখেছে।

ক'মাস পরে আরো একটা পার্শেল এল শর্বাণীর নামে। পার্শেলটা খুলতে গিয়ে হাত কাঁপতে লাগল শর্বাণীর। কী না জানি সে দেখতে পাবে ভিতরে!

ঠিক একটা রঙিন দামি শাড়ি বেরিয়েছে। আর তার পাড়ের দিকে ঠিক একটি তারিখ আঁটা।

আশ্চর্য, তাদের বিয়ের তারিখটা এখনো মনে করে রেখেছে বিশ্বনাথ।

দেয়ালে টাঙানো ছোট্ট আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল শর্বাণী। কেন কে জানে, কোনো মানে হয় না, সিঁথির নিষ্প্রভ রেখাটা লালে গাঢ় করে তুলল। মনে কোনো দুরাশা নিয়ে নয়, এমনি বেশ সুন্দর দেখাবে বলে, সম্ভ্রান্ত দেখাবে বলে। মনে হয় এ যেন এক আগুনের শিখা, সমস্ত অসৎ ও অমঙ্গলকে দূরে রাখবে।

ক'মাস পরে এবার এক জলজ্যান্ত লোক এসে হাজির। মেজর বিশ্বনাথ ভটচাযের কাছ থেকে এসেছি।

এই সব জিনিসপত্র উনি আপনাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই আবার শাড়ি আর ফ্রক। এবার বাড়তি এক বাক্স সন্দেশ। জিনিস সামান্য কিন্তু ইশারাটা অনেকখানি।

'আপনিই মিস—' শর্বাণীর কুমারী নামটা ধরতে চাইল ভদ্রলোক।

'আমি মিসেস ভটচায।'

'তার মানে আপনি ফের—' আবার ধাঁধা

পড়ল ভদ্রলোক।

'না, আমি যেমন ছিলাম তেমনিই আছি।'

'তার মানে অবিবাহিতই আছেন।'

'বিবাহিত বলেন অবিবাহিত বলেন, ঠিকই আছি।'

অসহায়ের মত হাসল ভদ্রলোক।

একটু কাছাকাছি হবার চেষ্টা করল তারপর। বললে, 'আমি ভটচাযের সঙ্গে একই দলে একই বিভাগে কাজ করি। মিলিটারি পোশাকে এলে নানারকম কথা ওঠবার ভয়ে শাদা পোশাকে এসেছি।'

'তা এসেছেন—ক্ষতি কী!' একটু বুঝি হাসল শর্বাণী।

'ভটচাযের খবর জানেন?'

'কী করে জানব? চিঠিপত্র তো লেখেন না।'

'জানেন গ্রেস—গ্রেসি ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

জানত, যাবে, তবু ধাক্কা খেয়ে শর্বাণী বললে, 'চলে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, ওদের ফের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। তারপর—'

বুকের মধ্যিখানটায় সিরসির করে উঠল শর্বাণীর।

'তারপর একটা সিলোনিজ, সিংহলী মেয়েকে বিয়ে করেছে ভটচায।'

'সিংহলী?' শর্বাণীর বুকের মধ্যিখানটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'সিংহলী খৃস্টান। নাম পামেলা। কিন্তু এটাও বেশিদিন টিকবে না বলে আমাদের ধারণা।' ভদ্রলোক বিজ্ঞের মত মুখ করল: 'আমাদের সকলের ধারণা, তা আমরা বলেছিও ওকে, ওকে আবার এইখানে এই প্রথম বিন্দুতেই ফিরে আসতে হবে।'

মনে মনে হাসল শর্বাণী।

লোকের আরো একটু কাজ ছিল, বাড়ির এ-দোরে ও-দোরে গিয়ে কান পাতল, শর্বাণীর সম্বন্ধে কোনো কুকথা আছে কিনা। কেউ একটা টু শব্দও করল না। পাড়ায় একটু দূরে-অদূরে খোঁজ করল, তারাও জানাল, বিরুদ্ধে কিছুই জানি না মশাই। ছোকরাদের একটা জিমন্যাস্টিকের ক্লাব আছে, তারা জানাল, তারা ইন্টারেস্টেড নয়, ঊর্মি-মেয়েটা আরো একটু বড় হয়ে উঠুক তখন দেখা যাবে।

চলে গেল ভদ্রলোক, প্রায় হতাশ হয়ে। নিষ্পুরুষ একা একটা স্ত্রীলোক থাকে, তার নামে কলঙ্ক নেই, এ কী অদ্ভুত কলিকাল! কলঙ্কের স্পর্শ থাকলেই তো মাসোয়ারার টাকাটা বেঁচে যেত বিশ্বনাথের।

তারপর একদিন সন্ধ্যের দিকে হুড়মুড় করে এসে পড়ল বিশ্বনাথ।

'বাবা!' কতদিন হয়ে গিয়েছে, তবু ঊর্মি চিনতে পেরেছে এক নজরে। জড়িয়ে ধরেছে অসঙ্কোচে।

ব্যস্ততায় টগবগ টগবগ করছে বিশ্বনাথ। বললে, কোয়েম্বেটোর থেকে আসছি। আজ রাতটা এখানে থেকে কাল সকালেই দিল্লি চলে যাব। সমস্ত দিন প্রায় খাওয়া হয়নি। কিছু ভালোমন্দ রাঁধো আমার জন্যে। দিশি মতে পাত পেড়ে হাত দিয়ে মেখে খাই। কতদিন তোমার হাতের রান্না খাইনি। দাঁড়াও, আগে কিছু কিনে কেটে আনি—'

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল বিশ্বনাথ।

মাংস আলু পেঁয়াজ আদা গরম মশলা কিনে এনেছে। দই রাবড়ি সন্দেশও বাদ পড়েনি।

বললে, 'ছোটখাটো একটা ফিস্টি লাগিয়ে দাও। বাড়ির মধ্যে ঊর্মির যারা বন্ধু তাদেরকে নেমন্তন্ন করো। মানে যাকে যাকে তুমি ভালো বোঝো খাওয়াও। আমি আবার একটু বেরুচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সে পরে হবে।'

আবার হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল বিশ্বনাথ।

এবার দোকান থেকে শাড়িজামা নিয়ে এল। শর্বাণী আর ঊর্মি দুজনের জন্যেই। বললে, 'ঊর্মিটা কী সুন্দর হয়েছে! কোন ক্লাশে পড়ছে? কোন ইস্কুল?'

রান্না নিয়ে মেতে গিয়েছে শর্বাণী।

আর বিশ্বনাথ যত গল্প ফেঁদেছে মেয়ের সঙ্গে। পাশের বাড়ির রমার নেমন্তন্ন হয়েছে বলে সেও এসে বসেছে।

যুদ্ধের গল্প। এরোপ্লেনের গল্প। হিমালয়ের গল্প। খুব জমিয়েছে বিশ্বনাথ।

কাজের মধ্যে একটু ফাঁক করে শর্বাণী জিজ্ঞেস করলে, 'অনেক কথা আছে বলছিলে না? কী কথা?'

'সে হবে খন পরে। খাওয়াদাওয়া চুকে যাক। নিরিবিলি হোক।'

'তবু—'

'সে এমনি গল্প বলা নয়। পরামর্শের কথা। হবেখন আস্তে সুস্থে।' গল্পের আবার খেই ধরল বিশ্বনাথ।

খাওয়াদাওয়া নিঃশেষে চুকতে রাত প্রায় এগারোটা। শীতের রাত, মনে হয় যেন কত দুঃসহ গভীর।

ঊর্মি বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে। তাই সে চলে গিয়েছে পাশের বাড়ি, রমার পাশে শুতে। তাদের একা ঘরে তিনজনের শোবার মত জায়গা কই বিছানা কই?

শীতের জন্যেই দরজাটা ভেজানো ছিল। সময়মত শর্বাণীই খিল লাগাবে।

তক্তপোশের উপর বিছানা। বালিশ দুটো। লেপ একখানা। তাকিয়ে দেখল বিশ্বনাথ। তা একটা রাত চলে যাবে কোনোরকমে।

'মশারি নেই?'

'না।'

'মশা?'

'ঘুমিয়ে পড়লে টের পাই না।'

'তোমার খুব ঘুম পাচ্ছে, তাই না?' বিশ্বনাথ হাসল। বললে, 'সিগারেটটা শেষ করে আমিও এবার শুয়ে পড়ব। তখনই বলব তোমাকে কথাটা।'

সিগারেটটা শেষ করে উঠে পড়েছে বিশ্বনাথ, হাওয়ার ঝাপটায় হাট হয়ে হঠাৎ খুলে গেল দরজা।

'বন্ধ করো, বন্ধ করো।' বিশ্বনাথ চেঁচিয়ে উঠল: 'ভীষণ ঠাণ্ডা, দারুণ ঠাণ্ডা।'

দরজার দিকে এক পা-ও এগোলো না শর্বাণী। আলনায় কোট ছিল সেটা তুলে নিয়ে এগিয়ে ধরল বিশ্বনাথের দিকে। বললে, 'তুমি এবার চলে যাও।'

কনকনে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্বনাথ আর্তনাদ করে উঠল: 'চলে যাব?'

স্পষ্ট স্বরে শর্বাণী বললে, 'হ্যাঁ, চলে যাও। তোমার টাকা কটাই শুধু আসুক।'

সর্পিল

যাযাবর

রাত্রিতে তাড়াতাড়ি ঘুমোনো এবং ভোরে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা একটি মহৎ গুণ। অন্তত শিশুপাঠ্য পুঁথি-পুস্তকে সে-কথাই লেখে। আরলি টু বেড অ্যান্ড আরলি টু রাইজ মেকস্ এ ম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার পণ্ডিতেরা ক্ষমা করবেন, ও-কার্যটি আমা দ্বারা সম্ভব নয়।

অনেক দিনের অভ্যাস, সম্পাদকীয় ও নানা কথার গ্যালিপ্রুফটি নিজে 'পাস' না করা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে অফিস থেকে উঠতে পারিনে। ততক্ষণে রাস্তার শেষ ট্রাম ডিপোতে ফিরে যায়, গলির মোড়ে হিন্দুস্থানী পানওয়ালার দোকানে ঝাঁপ বন্ধ হয় এবং পাড়ায় অধিকাংশ ফ্ল্যাটে নিশুতির অন্ধকার নেমে আসে।

ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে আহার ও সিগারেট শেষ করে বিছানায় যাওয়ার আগেই ঘড়ির কাঁটা বারোটার নিশানা পার হয়ে যায়, ইংরেজী ক্যালেণ্ডারে তারিখের পরিবর্তন ঘটে।

বলা বাহুল্য, পরদিন সকালে আটটার আগে শয্যা ত্যাগ শুধু কষ্টকর নয়, রীতিমত দুঃসাধ্য। দার্জিলিঙের টাইগার-হিলে এবং পুরীর সমুদ্র তীরে সূর্যোদয় নিশ্চয়ই অতি মনোরম দৃশ্য। কিন্তু সে আমেরিকান টুরিস্ট ও কলেজ ম্যাগাজীনের তরুণ কবিদের জন্যই তোলা থাক। তা না দেখার মনোবেদনায় আমি কিছুমাত্র ম্রিয়মান নই।

আজও যখন ঘুম ভাঙল, আকাশে মার্তণ্ডদেব তখন যথেষ্ট উঁচুতে। পাশের বাড়ির হেঁসেলে কড়ায় ঘন ঘন খুন্তি আন্দোলনের শব্দ এবং মাঝে মাঝে ঝি চাকরের সরোষ হুঙ্কার থেকে বোঝা যাচ্ছে, কেরানীবাবুদের আপিস অভিযানের সময় অদূরবর্তী।

গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দৈনিক কাগজগুলির পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নি। ময়রা নিজের সন্দেশ খায় না। সেটা সুলক্ষণ। কিন্তু সম্পাদককে নিজের পত্রিকা পড়তে হয়। শুধু পড়া নয়, আর তিনখানা প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করতে হয়, কোথায় কী ভুলত্রুটি ঘটেছে। তারপরেই টেলিফোনে এক প্রস্থ প্রশ্ন, অনুযোগ, নির্দেশ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মৃদু ভৎর্সনা বা সতর্কীকরণ। কর্পোরেশনের খবরটা 'নবযুগের' ফ্রণ্ট পেজে বেরিয়েছে; আমাদের কাগজে তিনের পাতায় কেন? 'রাষ্ট্রবাণী' শ্রমমন্ত্রীর গুপ্ত চিঠি ফাঁস করেছে; আমাদের স্টাফ রিপোর্টারেরা কি ঘুমুচ্ছে? নিউজ এডিটার, চীফ-সাব, স্পেশাল রিপ্রেসেণ্টেটিভ কাউকেই রেহাই দিই নে।

কাজটা অপ্রিয় সন্দেহ নেই। অথচ অপরিহার্য। সংবাদপত্র নির্ভীক হতে পারে, কিন্তু নির্বিকল্প নয়। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর সিগারেট, সাবান বা তরল আলতার মতো পত্রিকা জগতেও কম্পিটিশান অর্থাৎ প্রতিযোগিতা আছে।

প্রাত্যহিক কর্মসূচীর এই অবধারিত টেলিফোন পর্ব সমাধা করে যখন দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের প্রতীক্ষায় আছি, তখন ভৃত্য এসে ঘোষণা করল—জনে বাবু আসিছন্তি।

জিজ্ঞাসুনেত্রে তার পানে তাকাতেই কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করে বলল,—সে দারোগাবাবু।

দারোগা? অবাক হলাম। ব্রিটিশ আমলে সম্পাদকের গৃহে দারোগা এবং তাঁর সগোত্রীয়দের আগমন একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। দিনে এবং রাত্রে, সময়ে এবং অসময়ে এ বাড়িতেও তাঁদের অতর্কিত আবির্ভাব অনেকবারই ঘটেছে। ঘরের বাক্স-পেটারা কাগজ-পত্র এমনকি ভাঁড়ারের হাঁড়ি কলসী পর্যন্ত লণ্ডভণ্ড করে তল্লাস অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা, শাসানি মায় চড়া চাপড়টা কিছুই বাদ যায়নি। সশস্ত্র পাহারায় কালো বন্ধ গাড়ি চেপে পর্যায়ক্রমে লর্ড সিংহ রোড, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট ও আলিপুর সেণ্ট্রাল অথবা প্রেসিডেন্সী জেল—কিছুরই অভিজ্ঞতা আছে।

কিন্তু কংগ্রেসী আমলে দিনকাল বদলেছে। গবর্নমেণ্টকে গাল দিলে এখন আর রাজদ্রোহ হয় না; বরং কাগজের জনপ্রিয়তা অর্থাৎ বিক্রি বাড়ে। সম্পাদকে

খ্যাতি বিস্তৃত এবং মালিকের ব্যাংক-ব্যালেন্স পরিপুষ্ট হয়।

তরোয়ালের চাইতে কলমের জোর বেশী এ-কথাটা বর্তমান অগণিত শিক্ষিত বেকারের যুগে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু পুলিসের চাইতে যে প্রেসের প্রতাপ প্রবল, সে-বিষয়ে এখন দ্বিমত নেই।

বেশীক্ষণ অবশ্য সন্দেহের অবকাশ রইল না। নমস্কার ও প্রতি নমস্কারের পরে আগন্তুক নিজেই পরিচয় দিলেন। নাম সুধীর বসু। কলকাতা পুলিসের—দারোগা নন, ইনস্পেক্টার। জানালেন, যদিও ইতি-পূর্বে আমাদের আলাপ পরিচয় ঘটেনি, তিনি আমারই নিকট প্রতিবেশী। রাস্তার ওপারে লাল বাড়িটায় থাকেন।

বিস্ময়ের কিছুই নেই। কথামালার কূপে নিমজ্জিত জ্যোতির্বিদের ন্যায় সাংবাদিক-দের দৃষ্টিও সুদূর নভোমন্ডলে নিবদ্ধ। পায়ের কাছে গুহা গহ্বরের তাঁরা খোঁজ রাখেন না। কাটাংগায় শোম্বে বা টিউনিশিয়ায় বেন খেদার নাড়ীনক্ষত্রের খবর আমাদের নখাগ্রে। পাশের বাড়ির মানুষটিকে চেনা দূরে থাক, তার নামও জানিনে।

উভয়পক্ষে ভদ্রতাসূচক সামান্য দু'একটা মামুলি কথাবার্তার পরে সুধীরবাবু বললেন, "আপনার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এসেছি।"

এবার অবাক না হয়ে উপায় নেই। সম্পাদকের কাছে প্রত্যহই লোক আসে এবং একটু অধিক সংখ্যায়ই আসে। তারা কেউ নিজের বক্তৃতা বা বিবৃতি ছাপাতে চায়, কেউ আনে নানা অভাব অভিযোগের চিঠি, কেউ বা প্রকাশ করতে চান পাড়ার ক্লাব বা মহিলা সমিতিতে সংগীত অথবা নৃত্য-কলায় নিজের অনূঢ়া কন্যার প্রাইজ পাওয়ার বিবরণ ও ফটোগ্রাফ। সম্পাদকের কাছে উপদেশ চাইতে আসাটা অভূতপূর্ব বটে! ব্যাপারটা বিস্তারিত শুনতে হয় তো!

সুধীরবাবু কিছুটা কুণ্ঠার সংগেই বললেন, "ঠিক কীভাবে যে বিষয়টা আপনাকে বোঝাব, ভেবে পাচ্ছিনে। দিন দুই হলো, একটি মেয়ে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি।"

সে কী কথা? এতকাল তো জানতাম, স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে সাধারণ মানুষেরাই পুলিসের ফ্যাসাদে পড়ে থাকে। কিন্তু সে-কথা ভদ্রলোককে বলা যায় না। তাই বিস্ময় গোপন করে ঘটনাটা জানতে চাইলাম।

সুধীরবাবু বললেন, "ঘটনাটা বড়ই অদ্ভুত। পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরেছি। দেখি, উঠোনে একটি মেয়ে বসে আছে। চুলগুলি রুক্ষ্ম এলোমেলো, হাত-পা কাঠির মতো, চোখ দুটো যেন কোটরে ঢুকে গেছে। বিশীর্ণ আকৃতি থেকে বয়স সঠিক অনুমান করা শক্ত, তবে সেটা যে পঁচিশের উপরে নয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাবলাম, ভিখারী, অনাহারে অস্থি-চর্ম সার। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা আধুলি দিতে গেলাম। নিলে না। হঠাৎ আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল—"সায়েব, আমাকে ফাঁসি দাও।"

বিস্ময়ের বিষয়, মানতেই হবে। গান্ধী-যুগে অনেকে স্বেচ্ছায় জেলে যেত বটে। কিন্তু তারা তো বেশীর ভাগই এখন মন্ত্রী, ডেপুটি মন্ত্রী কিংবা নিদেনপক্ষে এম-পি, এম-এল-এ হয়ে পারমিট ও লাইসেন্সের চেষ্টায় আছে। আপনি সেধে ফাঁসিতে মরতে চায়, এমন কথা কে কবে শুনেছে? পাগল নয় তো?

সুধীরবাবু নিজেও প্রথমে তাই ভেবে-ছিলেন। কিন্তু নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তার অপ্রকৃতিস্থতার কোনো লক্ষণ নেই। আর যাই হোক, মেয়েটা যে উন্মাদ নয়, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

ভদ্রলোক প্রথমে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে পরে রূঢ় ভাষায় শাসিয়ে মেয়েটিকে তাড়াতে চেষ্টা করেছেন। সে কিছুতেই নড়বে না।

ইনস্পেক্টার-গৃহিণী ছেলেমেয়েসহ সম্প্রতি তাঁর পিত্রালয়ে গেছেন। কলকাতার বাড়িতে একটা ঠিকে চাকর ও ইকমিক-কুকার সম্বল করে গৃহকর্তা একা বাস করছেন। তার মধ্যে হঠাৎ এ কী অপ্রত্যাশিত উপদ্রব? খালি বাড়িতে বাইরের একটা অজ্ঞাতকুল-শীল যুবতী মেয়ে মানুষ দু'দিন দু'রাত্রি কাটিয়েছে, এ খবর যদি একবার গিন্নীর কানে পেঁছায়, তবে কুরুক্ষেত্র বাধবে না? তাছাড়া দিনকাল খারাপ। কে কোথা থেকে কখন খবরের কাগজে একখানা উড়ো চিঠি ছেড়ে বসবে তার ঠিকানা আছে কি? লজ্জায় তখন কাউকে কি আর মুখ দেখানো চলবে? চাই কি, চাকরি নিয়েও হয়তো টানাটানি পড়বে। ভদ্রলোক অত্যন্ত কাতর চক্ষে আমার দিকে তাকালেন।

তার জন্যে সত্যিকার করুণা বোধ করলাম। আশ্বাস দিলাম,—আমাদের কাগজে সে চিঠি ছাপা হবে না। বললাম, "ঘাড় ধরে মেয়েটাকে সদর দরজার বাইরে পার করে দিন। নিজে না পারেন, থানা থেকে পুলিস এনে হাজতে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আপনি পুলিস অফিসার; আপনার ভাবনা কিসের?"

সুধীরবাবু বিশেষ আশ্বস্ত হলেন, এমন মনে হলো না। তাই লঘু-চপল কণ্ঠে বললাম, "ডাক্তারেরা নিজের চিকিৎসা করেন না শুনেছি, আপনাদের পুলিশেও কি সে-রকম রেয়াজ?"

সুধীরবাবু সে পরিহাসে যোগ না দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "কনস্টেবল অবশ্য হুকুম করলেই আসে। তারা এসে জোর করে মেয়েটাকে অনায়াসেই দূরে করতেও পারে। দরকার হলে, কিল, চড়, ঘুষি ইত্যাদি আমাদের চোখের সামনেই চলে। ও সব মাইন্ড করলে পুলিস ডিপার্টমেন্টে কাজ করা সম্ভব নয়। এ মেয়েটাকেও থানায় টেনে নিয়ে কয়েদ করে রাখতে পারতাম। কিন্তু সত্যি কথা কি জানেন? কেমন যেন জোর পাচ্ছিনে।"

"কেন বলুন তো? হঠাৎ তার উপরে মায়া বসে গেল না কি?" কৌতূহলের সংগে জিজ্ঞাসা করলাম।

সুধীরবাবু জবাব দিলেন, "ঠিক মায়া নয়। বোধহয় সংকোচ, মানে—একটা যেন হেলপ্লেসনেস।"

ক্ষণেক নীরবতার পরে প্রায় অর্ধস্বগত-ভাবে বললেন, "চোর, গুণ্ডা, বদমায়েশ নিয়ে আমাদের কারবার। সংসারে স্ত্রী এবং পুরুষ দুই-ই যে কত অধম, কত পাষণ্ড হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত অহরহই দেখতে পাই। সুতরাং মানুষের কোনো অপরাধেই আমরা চমকে উঠিনে। কিন্তু এ মেয়েটা নিজে থেকেই যে স্বীকারোক্তি করেছে, তা যদি সত্যি হয়, তবে সে মনুষ্যসমাজের বাইরে। অথচ তাকে কোনোমতেই স্বভাব পাপী, মানে আমাদের পুলিসী ভাষায় যাকে বলে হ্যাবিচুয়ালী ক্রিমিন্যাল, বলা যায় না।

মনে মনে বিরক্ত হলাম। এ যে কেবলই ভণিতা করে চলেছে! আসল কথাটা কী?

কিন্তু সমাজে বাস করতে গেলে মনের ভাব সব সময়ে যথাযথ প্রকাশ করা চলে না। সভ্যতার অনেক খেসারৎ আছে; তার মধ্যে এও একটা। তাই বিরক্তি গোপন করে যথাসাধ্য লঘুকণ্ঠেই বললাম, "এ তো হলো প্রস্তাবনা। এবার মূল পালাটা শুরু করুন। আমার নিজের অবশ্য আপিস বিকেলে; কোনো তাড়া নেই। কিন্তু আপনাকে যদি এবেলা কাজে যেতে হয়, তবে বেলা বড় কম হয়নি।"

ইনস্পেক্টারবাবু লজ্জিত হলেন। বললেন, "ওঃ, তাই তো! ঘটনাটা সংক্ষেপেই বলছি। আচ্ছা, আপনি তো সাহিত্যিক। বলতে পারেন, জেলাসী কথাটার কোনো বাংলা আছে কি?"

বললাম, "আছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের আলোচনা পরে হবে, আগে আপনার রহস্যময়ী মেয়ের কাহিনীটা শোনা যাক।"

তিনি মিনিট দুই চুপ করে কী যেন ভাবলেন, তারপরে প্রশ্ন করলেন, "বিন্ধ্যবাসিনীর কথা মনে আছে আপনার?"

"কোন্ বিন্ধ্যবাসিনী? সেই যাকে উপলক্ষ্য করে শহরে খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে গেল? মনে আছে বৈ কি!"

ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিংগ থেকে যেমন সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি, সামান্য টি-এন-টি কণিকায় যেমন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, সে ব্যাপারটারও সূচনা অতি সাধারণ ঘটনায়।

একটি শিশুর মৃত্যুসংবাদ। এই আধি-ব্যাধি-প্রপীড়িত দেশের শত সহস্র অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীগ্রামে নিত্য এমন কত শিশু মরে কে তার খোঁজ রাখে? কিন্তু এই বিশেষত্বহীন প্রাত্যহিক মৃত্যুতালিকার মধ্য থেকে একটি ঘটনা আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে পত্রিকার প্রথম পাতায় একেবারে ডবল কলাম হেডিং নিয়ে প্রকাশিত হল। পাঠক মহলে চাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হল।

এসেম্বলীতে প্রশ্নোত্তরকালে বিক্ষোভের ঢেউ উঠল। একথা কি সত্য যে, রসুলপুর গ্রামে জনৈক অনাথা বিধবার একমাত্র শিশু-পুত্র খাদ্যাভাবে অনাহারে মারা গিয়াছে? উইল দি অনারেবল চীফ মিনিস্টার বি প্লিজড টু স্টেট—?

গভর্নমেণ্ট প্রথমে অস্বীকার করলেন। পরে সাপ্লিমেণ্টারীর চাপে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, শিশুর বিশেষ কোনো অসুখ ছিল না। বললেন, ডাক্তারের অভিমতে যথোচিত পুষ্টির অভাবে জীবনীশক্তির হ্রাস মৃত্যুর কারণ।

এ রকম হেত্‌-ইতি-গজ যুক্তিতে বিরোধী দল শান্ত হয় না। তাঁরা অটপসীর রিপোর্ট দাবি করলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, জন-স্বার্থের খাতিরে গবর্নমেণ্ট তা প্রকাশ করতে রাজী নন। ফলে সভাকক্ষে প্রতি-বাদের ঝড় বয়ে গেল।

উত্তেজনা চরমে পৌঁছল, যখন একজন স্বতন্ত্র সদস্য অভিযোগ করলেন যে, শিশুর মৃত্যুর পরে তার মা বিন্ধ্যবাসিনীও অভাবের তাড়নায় জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। বিরোধী পক্ষের 'শেম', 'শেম' ধিক্কার ধ্বনিতে মন্ত্রীর কণ্ঠ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল।

গবর্নমেণ্টের সমর্থকেরা সংখ্যায় ভারি। তাঁরাও তারস্বরে পাল্টা অভিযোগ করতে লাগলেন,—একেবারে বাজে কথা। রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিছক চালবাজি,—পলিটিক্যাল স্টাণ্ট।

স্পীকার শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টায় বৃথাই টেবিলে ঘন ঘন হাতুড়ির শব্দ করলেন—অর্ডার, অর্ডার।

কোথায় অর্ডার? ডিসঅর্ডারের আর সীমা পরিসীমা রইল না। দুই পক্ষে প্রবল বাদবিতণ্ডা, সক্রুদ্ধ চীৎকার ও সবেগ মুষ্টি-আস্ফালনের মধ্যে বিরোধী পক্ষ এক যোগে ওয়াক-আউট করলেন।

ব্যাপারটার ঐখানেই শেষ নয়। মনুমেণ্টের তলায় বিরাট জনসভায় বিভিন্ন বক্তা দেশের খাদ্যাভাবের জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় গবর্নমেণ্টকে বিস্তর গালাগাল দিলেন এবং আপিস ভাঙবার মুখে এসেম্বলীর দিকে বিরাট শোভাযাত্রা পরি-চালনা দ্বারা ট্রাম-বাসের রাস্তা আটক করলেন। "অন্ন দাও বস্ত্র দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও" ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুহুর্মুহু বিদীর্ণ হতে লাগল।

তারপরের অধ্যায় অতি পরিচিত পুরাতন প্যাটার্নেরই পুনরাবৃত্তি। পুলিস কর্তৃক

শোভাযাত্রায় বাধাদান, ইষ্টক বর্ষণ, টিয়ার-গ্যাস, লাঠিচার্জ, রক্তপাত, এম্বুল্যান্স ও হাসপাতাল। পরের দিন হরতাল, ট্রামে অগ্নিসংযোগ, পাইকারী গ্রেপ্তার এবং গুলীবর্ষণ।

মাত্র মাস দেড়েক আগেকার ঘটনা। তাছাড়া ঐ দক্ষযজ্ঞে নিজেরও কিছুটা অংশ ছিল। একাধিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যথেষ্ট অগ্নি উদ্গিরণ করেছিলাম। সুতরাং আনুপূর্বিক সমস্তই স্মরণে ছিল।

কিন্তু তার সঙ্গে এই অর্ধ-উন্মাদ নারীর সম্পর্ক কোথায়?

সুধীরবাবু বললেন, "সম্পর্ক খুবই নিকট। এ মেয়েটিই বিন্ধ্যবাসিনী।"

"সে কী? বিন্ধ্যবাসিনী তবে মরেনি?" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন, "না। তার ছেলের অনাহারে মৃত্যুর কথাটাও সত্যি নয়।"

"তার ছেলেও বেঁচে আছে?"

অনুরূপ সহজভাবেই সুধীরবাবু বললেন, "না, ছেলে বেঁচে নেই।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললাম, "মাপ করবেন, মশাই। আমি সহজ বুদ্ধির মানুষ। হেঁয়ালির ধার ধারিনে। বিন্ধ্যবাসিনীর ছেলে মরেনি, আবার বেঁচেও নেই—এ ধরনের ধাঁধায় আমি অভ্যস্ত নই। সোজা বাংলায় যদি বুঝিয়ে বলতে পারেন, শুনতে রাজী আছি। নইলে রেহাই দিন।"

তিনি তাড়াতাড়ি অপ্রতিভভাবে বললেন, "আপনি ভুল বুঝেছেন,—মানে, আমিই গুছিয়ে বলতে পারিনি। কথাটা হচ্ছে যে, তার ছেলে অনাহারে মরেনি। কোনো অসুখ-বিসুখেও নয়। তাকে মেরে ফেলেছে।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে তাকাতেই তিনি নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "হ্যাঁ, সেটা ডেথ নয়, মার্ডার।"

বিস্ময়ের যেন আর শেষ নেই।

"শিশুকে খুন করল কে? কেনই বা খুন করল?" প্রশ্ন করলাম।

সুধীরবাবু সোজাসুজি জবাব দিলেন না। বললেন, "ব্যাপারটা বিন্ধ্যবাসিনীর নিজের মুখ থেকেই শোনা। এ দুদিনে খণ্ড খণ্ড ভাবে জেনেছি। জুড়লে যা দাঁড়ায়, তাই বলছি। গোড়া থেকেই শুনুন।"

খানিক চুপ করে থেকে ঈষৎ হেসে বললেন, "বেশী বকা মেয়েদের স্বভাব। সব বলতে গেলে আমার অনেক সময় লাগবে, আপনারও ধৈর্য থাকবে না। তাই অদরকারী অংশগুলি কেটেছেটে সংক্ষিপ্ত সারটুকুই বলছি।"—

বিন্ধ্যবাসিনীর মা দীর্ঘকাল নিঃসন্তান ছিলেন। পুজো-মানত, তাগা-তাবিজ ও নানাবিধ তুকতাক করে যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তখন বিন্ধ্যবাসিনীর জন্ম। পরিবারে বহু আকাঙ্ক্ষিত ও বহু বিলম্বিত শিশুদের আদরের পরিমাণটা সাধারণতই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সেটা তাদের ভবিষ্যতের পক্ষে হিতকর নয়। বিন্ধ্যবাসিনী তার মায়ের বক্ষের ধন, বাবার চক্ষের মণি। সে চোখের আড়াল হলে দুজনই পলকে প্রলয় জ্ঞান করেন। কে জানে, হয়তো এই স্নেহাধিক্যের ফলেই বিন্ধ্যবাসিনী ছোট-বেলা থেকে কোপনস্বভাব। যখন তার মুখে ভালো করে কথা ফোটেনি, তখনই সে চটে গেলে নিজের চুল টেনে ছিঁড়ত, গায়ের জামা বা মায়ের আঁচল দাঁতে কাটত। তার ঠাকুমা রগড় করে বলতেন, "এক ফোঁটা মেয়ের তেজ দেখে ভয়ে মরি। বড় হলে এ-মেয়ে দেবী চৌধুরানী না হয়ে যায় না।"

মায়ের চাইতে বাপের প্রতি বিন্ধ্য-বাসিনীর টানটা ছিল বেশী। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে অনেক দিন কপট কলহ ঘটেছে।

মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, প্রিয়জনের উপর আপন অখণ্ড অধিকার স্থাপনের প্রয়াস নারী-চরিত্রের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। শৈশবেই বিন্ধ্যবাসিনী বাপের উপরে নিজের দখল সম্পর্কে অতিশয় সচেতন। প্রতিবেশীদের গোবাগোপালদের কাউকে তিনি কখনও কোলে নেবেন বা একটু আদর করবেন এমন সাধ্য ছিল না। এমনকি, তার মা স্বামীর সঙ্গে একান্তে হাসিগল্প করলেও তার মুখভার ও চোখ ছলছল হত। ক্ষুদ্র বালিকার এই প্রবল ঈর্ষাকাতরতা আত্মীয় পরিজনের

কাছে কৌতুকের বিষয় ছিল। তার মা অনেক সময় ক্রোধের ভান করে মেয়েকে বলেছেন "হিংসুটে মেয়ের কাণ্ডখানা দেখ একবার! বলি, ও বাপ-সোহাগী, তোমার বাবার উপরে আমারও কিছুটা দাবি আছে যে। সে খবর রাখ কি?"

স্কুলে বিন্ধ্যবাসিনীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল পার্বতী। সে বিন্ধ্যবাসিনীর হোম-টাস্কের অঙ্ক কষে দেয়, সেলাই-এর পরীক্ষার জন্য রুমালে ফুল তুলে রাখে। বিন্ধ্যবাসিনীও আমচুরের অর্ধেক বা নারকেলতক্তির ভাগ পার্বতীকে না দিয়ে খায় না। তারা একসঙ্গে বেড়ায়, একসঙ্গে খেলে, একসঙ্গে গল্প করতে করতে স্কুলের শেষে বাড়ি ফিরে আসে। অপরিণত বয়স্কা দুই কিশোরীর এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পাড়ার বয়স্কা গৃহিণীরা ঠাট্টা করে তাদের নতুন নাম দিয়েছেন,—গঙ্গা-যমুনা।

এই নিবিড় সখিত্বের সুখ-স্বর্গে একদিন মূর্তিমতী বিঘ্নের মতো দেখা দিল মালতী। বিন্ধ্যবাসিনীদের ক্লাশে শহর থেকে নবাগতা ছাত্রী। বয়সে সে বিন্ধ্যবাসিনীর চাইতে দু'তিন বছরের বড়ই হবে। তার নিজের রূপ এবং বাবার অর্থ দুই-ই সাধারণের চাইতে বেশী। সে ফ্ল্যানেল ছেলে মতো ছিটছিট ফ্রক পরে, কথায় কথায় কলকাতার চিড়িয়াখানা বা মোটরগাড়ির গল্প শুনিয়ে সরলচিত্ত সহপাঠিনীদের তাক লাগিয়ে দেয়। স্কুলের অন্য মেয়েরা তার সঙ্গে ভাব জমাতে ব্যগ্র। শিক্ষয়িত্রী দিদিমণিরাও বুঝি তাকে একটু বেশী খাতির করেন।

সেদিন স্কুলে পৌঁছতে বিন্ধ্যবাসিনীর একটু দেরী হয়েছিল। ক্লাশে ঢুকতেই দেখল, মালতী পার্বতীর পাশে বসে আছে। বিন্ধ্যবাসিনী ভ্রুকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে বসেছ কেন?"

মালতী উদ্ধত কণ্ঠে জবাব দিল, "বসেছি আমার ইচ্ছে। তোমার তাতে কী?"

বিন্ধ্যবাসিনী রুক্ষস্বরে বলল, "এটা আমার সিট!"

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। পার্বতী ও বিন্ধ্যবাসিনী বরাবর একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে, সে কথা ক্লাশের সবাই জানে। কিন্তু বন্দোবস্তটা তো আছে শুধু দুর্বলের জন্য, প্রবলেরা চিরকালই তা যদৃচ্ছ লঙ্ঘন করে থাকে। শুধু রাষ্ট্রনীতিতে নয়, জীবনের সর্বত্র। কিশোর-কিশোরীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। মালতী বিন্ধ্যবাসিনীর সর্বজনস্বীকৃত দাবি হেলায় উপেক্ষা করল। "তোমার সিট মানে? নাম লেখা আছে কোথাও? টাকা দিয়ে কিনে রেখেছ বুঝি?" ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করল সে।

বই, খাতার মতো নাম লেখা না থাকলেই যে ক্লাশে বসার জায়গাটাও অন্য কেউ দাবি করতে পারে, সে-কথা বিন্ধ্যবাসিনী কখনও ভাবেনি এবং অর্থ দ্বারা ক্রয় না করলে কোনো জিনিসে কারো নিশ্চিত অধিকার জন্মে কি না সে সম্পর্কেও তার মনে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন জাগেনি। সে মালতীর কথার জবাব না দিয়ে আদেশের স্বরে বলল, "এখান থেকে উঠে যাও বলছি, নইলে ভালো হবে না!"

"ইস্, হুকুম শোনো মেয়ের! উঠব না তো, দেখি, কী করতে পার?" যুদ্ধের ভঙ্গিতে বলল মালতী।

রাগে বিন্ধ্যবাসিনী টান মেরে মালতীর বইপত্র মাটিতে ফেলে দিল।

মালতী সহজে হটবার পাত্রী নয়। সে তৎক্ষণাৎ ঠাস করে বিন্ধ্যবাসিনীর গালে এক চড় বসিয়ে দিল।

বিন্ধ্যবাসিনীর তখন আর স্থান-কাল বোধ রইল না। সে মালতীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সম্মুখের বারান্দা দিয়ে হেডমিস্ট্রেস যাচ্ছিলেন। অন্য মেয়েদের চেঁচামিচিতে ক্লাশে ঢুকে তিনি যুদ্ধরত দুইপক্ষকে থামিয়ে দিলেন। বিন্ধ্যবাসিনীই আগে বলপ্রয়োগ করেছে। বিচারে তার শাস্তি হল। হুকুম দিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী অন্য বেঞ্চিতে বসবে। মালতী দর্পভরে পার্বতীর পাশে বিন্ধ্যবাসিনীর এতদিনের অবিসংবাদিত আসনে উন্নত শির জয়-ধ্বজার মতো বিরাজ করতে লাগল।

তখন বিন্ধ্যবাসিনীর সমস্ত রাগটা পড়ল পার্বতীর উপরে। মালতীকে সে তার পাশে বসতে দিল কেন? কেন সে তাকে বাধা দিল না? এখনই বা সে ঐ কুচক্রী ডাইনীটার সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসে আছে কোন লজ্জায়? সে উঠে চলে আসতে পারে না বিন্ধ্যবাসিনীর পাশে? তাকে কি কেউ পায়ে বেড়ি দিয়ে রেখেছে?

ছুটির শেষে বিন্ধ্যবাসিনী পার্বতীর দিকে না তাকিয়ে হন হন করে হেঁটে একা বাড়ি চলে এল। অন্যদিনের মতো বিকেলে পার্বতী যখন তাকে খেলায় ডাকতে এল, বিন্ধ্যবাসিনী তখন মুখ ফিরিয়ে রইল। পার্বতী অনেক সাধ্য-সাধনা করেও তার প্রসন্নতা লাভ করতে পারল না।

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে বিন্ধ্যবাসিনীর রোষ দূর হয়ে গেল। বন্ধুকে যে সে অযথা লাঞ্ছনা দিয়েছে, তার সমস্ত অনুনয় অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছে, সে-কথা স্মরণ করে বিন্ধ্যবাসিনীর মন খচখচ করতে লাগল। রাত্রির বাধা না থাকলে বিন্ধ্যবাসিনী সেই দণ্ডে পার্বতীর কাছে গিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে নিতে প্রস্তুত ছিল।

পরদিন সকালে বিন্ধ্যবাসিনী অনেক আগে স্কুলে গেল। তার নতুন নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে বসে পার্বতীর আসার অপেক্ষায় রইল।

ক্লাশের ঘণ্টা বাজবার মিনিট কয়েক মাত্র আগে পার্বতী এল। তার সঙ্গে কে? বিন্ধ্যবাসিনী চোখে ভুল দেখছে কি? না, ভুল দেখার জো কোথায়? এ তো মালতী। তারা দুজনে একসঙ্গে এসেছে। পার্বতী কোনোদিকে না তাকিয়ে তার নিজের পুরোনো স্থানটিতে গিয়ে বসল। মালতী বিন্ধ্যবাসিনীর প্রতি একটা কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গর্বভরে তারই পাশের জায়গাটি দখল করল।

প্রকৃত তথ্য এই যে, পার্বতীও বিন্ধ্যবাসিনীর মন ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যগ্র ছিল না। সেদিন সে নিজে থেকেই বিন্ধ্যবাসিনীর পাশে গিয়ে বসবে, এই সংকল্প নিয়ে স্কুলে এসেছিল। কিন্তু মালতী যে বিন্ধ্যবাসিনীকে জব্দ করার মতলবে স্কুলের দরজায় তার জন্যে প্রায় ওত পেতে বসে-ছিল তা তার জানা ছিল না। মালতী পার্বতীকে প্রায় গ্রেপ্তার করা আসামীর মতো হাত ধরে ক্লাশে নিয়ে এসে নিজের পাশে বসালো।

পার্বতী মেয়েটি শান্ত নিরীহ ধরনের। প্রভুত্বপরায়ণা বিন্ধ্যবাসিনীর বন্ধুত্বের অনেক অত্যাচার সে নির্বিবাদে মেনে নিত। কোনো কিছু অপছন্দ করলেও মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারে না। সেদিক দিয়ে সে বিন্ধ্যবাসিনীর ঠিক বিপরীত। নেগেটিভ ও পজেটিভ বিদ্যুতের পারস্পরিক আকর্ষণের মতো এ কারণেই বোধহয় তাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল। মালতীর জুলুমে বিরক্ত হলেও তাকে অগ্রাহ্য করার মতো জোর পার্বতীর স্বভাবে ছিল না। বিন্ধ্যবাসিনীর অসন্তুষ্টি কল্পনা করে সে তার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারল না। তাকে না দেখার ভাণ করে বিরসচিত্তে মালতীর পাশে বসে ক্লাশের পড়া করতে লাগল।

ক্লাশের অপর প্রান্তে বসে বিন্ধ্যবাসিনী নিঃস্ফল ক্রোধের দুঃসহ আবেগে পীড়িত হতে লাগল। পার্বতী যে নিজে ইচ্ছা করেই মালতীর পাশে বসেছে, সে বিষয়ে তার মনে কোনো সংশয় রইল না। মালতীর সঙ্গে ভাব করতেই সে ব্যগ্র, বিন্ধ্যবাসিনীকে তার আর কোনো প্রয়োজন নেই এ ভাবনায় তার বুকে ছুঁচ ফুটতে থাকল। গত রাত্রিতে পার্বতীকে নির্দোষ কল্পনা করে আজ যে এতক্ষণ তার জন্যে সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সে শুধু তার নির্বুদ্ধিতা। পার্বতীর জন্য বাগান থেকে অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে সে পেয়ারা সংগ্রহ করে এনেছিল। সেগুলি সে বরং তার পরম শত্রু অঙ্কের মাস্টারণীকে দিতে রাজী আছে। কিন্তু পার্বতীকে কদাচ নয়।

বাড়ি ফিরে গিয়ে সে তার টিনের বাক্সটিতে সযত্নে সঞ্চিত পার্বতীর দেওয়া পুঁতির মালা, চুলের ক্লিপ, কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি উপহার দূর করে ফেলে দিল।

"আমি তোমার? তুমি ইচ্ছেমত তছনছ করবে ভেবেছ? শেষে আমার ছেলের হাত ধরে আমি পথে পথে ভিক্ষা করে খাবো?"

রাগে, দুঃখে ও অপমানে তার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ধীরে ধীরে নতুন সঙ্গিনী মালতীর সঙ্গে পার্বতীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। বিন্ধ্যবাসিনীর মন ফিরে পেতে পার্বতী এখন আর তেমন উৎসুক নয়। বিন্ধ্যবাসিনীর ক্রোধকে পার্বতী ভয় করতো। একবার রাগলে সে যে দুহাতে যে কোনো সমবয়স্কা মেয়েকে ধরে তার কপালটা দেয়ালে ঠুকে দিতে পারে, সে অভিজ্ঞতা পার্বতীর ছিল। কিন্তু এবার সে অবাক হয়ে দেখল, বিন্ধ্যবাসিনী ঝগড়া, মারামারি কিছুই করল না; শুধু কথা বলা বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে রইল। পার্বতী নিশ্চিন্ত হল। মালতীর সঙ্গে তার বন্ধুত্বে আর কোনো দ্বিধা রইল না। তাকে দোষ দেওয়া চলে না। মালতীর দেওয়ার হাতটা দরাজ, দানের সামগ্রীগুলিও লোভনীয়। নানা রঙের লজেন্স ও নানা স্বাদের চকোলেটের কাছে সামান্য আমসত্ত ও কুলের আচারের আকর্ষণ কতদিন টিকতে পারে? বেচারী বিন্ধ্যবাসিনী।

শুধু কেক, বিস্কুট বা টফীর প্রাচুর্যই নয়, মালতীর অন্য উপহারগুলিও যে-কোনো সহপাঠিনীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে সক্ষম। বিন্ধ্যবাসিনী লক্ষ করল, পার্বতী নতুন ধরনে চুল বেঁধে এসেছে। কেশচর্চার এ ফ্যাশানটা কার অনুকরণ তা বুঝতে বাকী থাকে না। স্কুলের অন্য মেয়েদের মা-মাসিরা জবজবে তেল মাখা চুল কষে টেনে খোপা বেঁধে দেয়। নেহাতই যে সৌখীন, সে তারই উপরে বড় জোর একখানা মোষের শিং-এর চিরুণি চড়ায়। মালতীর রকম আলাদা। সে ঘাড়ের কাছে রঙিন ফিতা ফুলের আকারে গেরো দিয়ে চুলগুলিকে সাপের মতো পিছনে ঝুলিয়ে দেয়। তার নাম বুঝি "পনি-টেল"! আহা, ছিরি দেখে মরে যাই যেন! নির্লজ্জ পার্বতীটাও ঐ ঢং নকল করছে দেখে কদিন থেকেই বিন্ধ্যবাসিনী মনে মনে গর্জাচ্ছিল। আজ তার উপরে চুলে জড়ানো নীল রিবণটা দেখামাত্র বিন্ধ্যবাসিনীর সর্বাঙ্গে যেন আগুনের জ্বালা ধরে গেল। মাথায় খুন চাপল। সে তড়িৎবেগে সেলাই-এর বাক্স থেকে কাঁচিটা বের করে পার্বতীর দিকে ছুটে গেল। পার্বতী ডেস্কের উপরে ঘাড় হেঁট করে খাতায় নোট লিখছিল। মুখ তুলে তাকাবার অবকাশমাত্র পেল না। বিন্ধ্যবাসিনী নিমেষে তার চুলের মধ্যে ঘ্যাচ ঘ্যাচ শব্দে কাঁচি চালিয়ে দিল। গুচ্ছে গুচ্ছে ঘন কালো চুলের রাশি মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

পার্বতীর দীর্ঘ চুলের সৌন্দর্য স্কুলে বিখ্যাত ছিল। মুহূর্তের মধ্যে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শোকে পার্বতী ডুকরে কাঁদতে লাগল।

সামান্য একটা সিল্কের সরু রঙিন ফাঁস কেন যে বিন্ধ্যবাসিনীকে এমন দুর্জয়ক্রোধে আত্মহারা করল, তার ব্যাখ্যা একমাত্র সাইকো-এ্যানালিস্টেরাই জানেন। ইউনিয়ন জ্যাক যেমন ব্রিটিশ অধিকার বোঝায় কিংবা লালঝাণ্ডা যেমন কমিউনিস্ট মতবাদের চিহ্ন, বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে ঐ ফিতাটা কি তেমনি পার্বতীর উপরে মালতীর পরিপূর্ণ দখলের ইঙ্গিত বহন করেছে? কে জানে?

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বিন্ধ্যবাসিনীকে কান ধরে স্কুল থেকে দূর করে দিলেন। অন্য মেয়েরা সবাই তাকে দুয়ো দিল। বাড়িতেও তার দণ্ডবিধান কম হলো না। কিন্তু অপরাধিনীকে কিছুমাত্র অনুতপ্ত দেখা গেল না। বরং পার্বতীকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারার আনন্দে সে নিজের সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা অনায়াসে অগ্রাহ্য করল। পার্বতীর মাথাটা প্রায় কেশশূন্য হয়ে গেছে, এক মাস, দু' মাস, কিংবা তার চাইতেও বেশী, অনেক, অনেক দিন সে আর মালতীর দেওয়া বিরণ বাঁধতে পারবে না, একথা কল্পনা করে বিন্ধ্যবাসিনী গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করল।

বিয়ের পর বিন্ধ্যবাসিনী যখন স্বামীর ঘর করতে এল, তখন সে যৌবনে পরিপূর্ণা ষোড়শী। সে বয়সে চপলতা থাকে না; অধিকারস্পৃহা প্রখর হয়। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীকে সাত পাকে বাঁধল—আক্ষরিক এবং সাংকেতিক উভয় অর্থে। স্বামীর সেবা যত্নে তার ক্লান্তি নেই। যখন যে জিনিসটি চাই হাতের কাছে আগে ভাগে এগিয়ে রাখে। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে অর্থসচ্ছলতা পরিমিত। কিন্তু নিপুণ গৃহিণীপনায় বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি থাকতে দেয় না। প্রীতি দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে ছোটখাটো অভাবের ফাঁকগুলিকে সুধায় ভরে দেয়।

স্বামী গোকুল মিশুকে প্রকৃতির লোক। গ্রামের সবাই তাকে পছন্দ করে। সবার ঘরেই তার সমান সমাদর। আশ্চর্য এই যে, স্বামীর লোকপ্রিয়তায় বিন্ধ্যবাসিনী খুশি হয় না। কাব্য করে বলা যেতে পারে, গোকুল শুধু স্ত্রীর ভালোবাসার দ্যুতিতে একক চন্দ্রমার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, পাইকারী হৃদ্যতার ভিড়ে অনন্ত আকাশে লক্ষ কোটি তারকার মতো হারিয়ে যাবে না,—বিন্ধ্যবাসিনীর এই অভিলাষ। গদ্যের ভাষায় ফলটা দাঁড়ল এই যে, বধূ বিন্ধ্যবাসিনী ঘরে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই গোকুলের দাওয়ায় বহুদিনের পুরানো দৈনন্দিন তাসের আড্ডাটি উঠে গেল। বন্ধুদের পক্ষে মনসা-সংক্রান্তিতে নৌকাবাইচে এবং শিবরাত্রির গাজনের মেলায় গোকুলের সঙ্গ ক্রমশই দুর্লভ হয়ে উঠল।

সেবার বারোয়ারীতলায় গ্রামের ছেলেরা থিয়েটারের আয়োজন করল। তাতে গোকুল অভিমন্যু সাজল। দেখে সবাই ধন্য ধন্য করল। শুধু বিন্ধ্যবাসিনী নীরব রইল। উত্তরা কে সেজেছে তা সে জানে না। কিন্তু ও যে নাকী সুরে 'নাথ' 'নাথ' বলে গোকুলের গায়ে ঢলে পড়ছে সেটা তার কাছে অতিরিক্ত বেহায়াপনা মনে হল। গোকুলেরই বা এত আদিখ্যেতা কেন? এ্যাক্টো করছ, কর। তা' বলে অত 'প্রাণেশ্বরী' বলে চেঁচাবার কি দরকার রে বাপু?

বিন্ধ্যবাসিনী নির্বোধ নয়। সখের দলে ব্যাটাছেলেরাই পরচুল মাথায় পরে মেয়ের অভিনয় করে, সে কথা সে জানে। অথচ স্বামীর পাশে গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখে খড়িমাখা উত্তরাকে দেখলেই বিন্ধ্যবাসিনীর মন বিরস হয়। একথা শুনলে লোকে হাসবে, হয়তো টিটকারি দেবে। তাই তাকে চুপ করেই থাকতে হয়। কিন্তু স্বামীর থিয়েটার করায় সে আপত্তি করতে লাগল।

প্রথম অভিনয়ে প্রচুর হাততালির স্বাদ পেয়ে গোকুলের উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী নাটকে নায়কের পার্ট করার জন্য তার মন আকুলিবিকুলি করতে থাকে। কিন্তু রিহার্সেলে যাওয়ার সময়টাতে বিন্ধ্যবাসিনী মাথাধরার ভাণ করে এমন কান্নাকাটি শুরু করে যে, গোকুল বেচারী আর বাড়ির বাইরে যেতে ভরসা পায় না।

গোকুল মানুষটা শান্তিপ্রিয়। ঝগড়া বিবাদকে সে অত্যন্ত ভয় করে। তাই ক্ষুণ্ণচিত্তে সে ধীরে ধীরে খেলা-ধুলো, বন্ধু-বান্ধব, আমোদ-প্রমোদ সমস্ত বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীর নিশ্ছিদ্র একাধিপত্যের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল।

বছর দুই সুখেই কাটল।

শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, সংসারে কিছুই একটানা নয়। সবই চাকার মতো ঘুরছে। সুখানিচ দুঃখানিচ। বিন্ধ্যবাসিনী তা জানত কি?

অল্প বয়সেই গোকুলের একমাত্র ছোট বোন সুভদ্রার স্বামী মারা গেল। দু'দিন বাদেই দেওরেরা সুভদ্রার গয়না ও টাকা-কড়ি কেড়ে নিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। নিরুপায় বিধবা ভাই-এর সংসারে ফিরে এল।

সুভদ্রা বিন্ধ্যবাসিনীর চাইতে বয়সে অনেক ছোট। অত্যন্ত ভীরুস্বভাব। ভাই-এর গলগ্রহ হয়েছে বলে তার কুণ্ঠার সীমা নেই। সংসারের সমস্ত কাজের বোঝা সে মাথায় তুলে নিল। রান্না করা, ঘর নিকানো, কাপড় কাচা, মায় গোয়ালে গরুকে জাবনা দেওয়া, ক্ষেতের ধান ঝেড়ে মেপে মরাইতে তোলা সবই নিজে করে। বিন্ধ্যবাসিনীকে কুটোটি নড়াতে দেয় না। এমন মেয়েকে ভালো না বেসে পারা যায় না। বিন্ধ্যবাসিনীর মনে সত্যিকার করুণা হয়। আহা, দুঃখিনীর আর কোথাও ঠাঁই নেই। এক বেলা দুমুঠো ভাতে ভাত দেওয়া বই তো নয়।

গোকুল স্বভাবতই স্নেহপ্রবণ। বোনকে সে বরাবরই ভালবাসতো। তার দুর্ভাগ্যে তার প্রতি স্নেহটা আরও বেড়েছে। সে তার জন্যে মাঝে মাঝে একটু দই, পাটালি বা তিলের বরফি কিনে আনে। কখন কী খেল তার খোঁজ খবর নেয়।

বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে সেটা অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি মনে হয়। ভাবখানা দেখ একবার! সে যেন গোকুলের বোনকে না খাইয়ে রেখেছে। বাস্তবিক বিন্ধ্যবাসিনী সুভদ্রার খাওয়া দাওয়ার যথেষ্ট যত্ন নেয়। বিধবার রাত্রিতে ভাত খেতে নেই। বাগানের কলাটা, শশাটা বিন্ধ্যবাসিনী তারই জন্যে তুলে রাখে। একাদশীর দিনে নিজের দুধটুকু জোর করেই সুভদ্রার বাটিতে ঢেলে দেয়। কচি মেয়েটা, নির্জলা উপোস দিতে পারে কি?

বৌঠানকে সুভদ্রা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কখনও সে তাকে আদর করে। স্নেহের স্বরে বলে, "ও সুবি, দু'দণ্ড বসে একটু জিরিয়ে নে দিকিন। মুখখানি যে একেবারে শুকিয়ে গেছে। তোকে এখন ঐ চাকি-বেলন নিয়ে পড়তে হবে না। রুটি ক'খানা আমি নিজেই করে নেবো'খন।"

আবার তার পরমুহূর্তেই গোকুল যদি তাকে কাছে ডেকে দুটো কথা বলেছে তো অমনি বিন্ধ্যবাসিনীর অন্য মূর্তি। মুখ ভার করে তিক্তস্বরে বলে, "বসে বসে ভাই-এর সোহাগ কুড়ানো হচ্ছে। ওদিকে উনুনে দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছে, তার হুঁশ নেই।" সুভদ্রা অনেক আগেই দুধের কড়া নামিয়ে সরা ঢাকা দিয়ে তুলে রেখেছিল। সেটা কখন আবার কী করে যে উনুনে উঠল ভেবে পায় না।

তবে এইটুকু বুঝতে বাকী থাকে না যে, দাদার কাছে বেশী ঘেঁষাটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। গোকুল ডাকলেও এখন সে কাজের ছুঁতো করে তাকে এড়িয়ে চলে।

স্ত্রীর আচরণ গোকুলের কাছেও হতবুদ্ধিকর। বিন্ধ্যবাসিনী দয়ামায়াহীনা নয়। গ্রামের দুস্থ দরিদ্রদের অনেককেই সে সাধ্যমতো সাহায্য করে সে তো গোকুল নিজের চোখেই দেখেছে। অনাথা ননদিনীর প্রতি তার বিরূপতার গোকুল কোনো সংগত কারণ খুঁজে পায় না।

একই সঙ্গে শ্যাম এবং কুল বজায় রাখা কঠিন কাজ, সে কথা গোকুল শুনেছে। বউ ও বোনকে একই বাড়িতে রাখা তার কাছে কঠিনতর মনে হল। অবশেষে বোনকে আবার তার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসাই স্থির করল।

সেদিন সকালেই তাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীতে এক পালা কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তাই যাওয়ার আগে সুভদ্রা যখন বৌঠানকে প্রণাম করতে গেল, বিন্ধ্যবাসিনী মুখ গম্ভীর করে রইল। কিন্তু সে যখন তার শাড়ি দুখানা, জল খাওয়ার পাথরের ছোট ঘটিটি, একখানা রাধাকৃষ্ণের পট ও অনুরূপ দু' একটা অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তির সামান্য পুঁটুলিটি হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বিদায়

হয়ে গেল, বিন্ধ্যবাসিনীর বুকে ব্যথা বাজল।

বিন্ধ্যবাসিনী সুভদ্রাকে একটি ছোট টিনের বাক্স দিয়েছিল। তার পরিত্যক্ত ঘরটিতে গিয়ে দেখল সেটি কুলুঙ্গির উপরে ঠিক তেমনি রয়েছে। বিন্ধ্যবাসিনী বাক্সের ডালাটি তুলে দেখল, দুটি দুই সুতী জামা, কাঠের ফ্রেমে আঁটা ছোট একটি আরসি, একটি পশমের জীর্ণ আলোয়ান এবং একটি ছোট কৌটায় কয়েক আনা ও পয়সা মিলিয়ে দু টাকার কাছাকাছি অর্থ পড়ে আছে। জিনিসগুলি বিন্ধ্যবাসিনীরই নানা সময়ের দান। সুভদ্রা কিছুই নিয়ে যায়নি, ফেলে রেখে গেছে।

বিন্ধ্যবাসিনীর অশ্রু আর বাধা মানল না। অকারণ বৈরিতায় যে নিরাশ্রয় বিধবাকে সে এ-বাড়িতে তিষ্ঠতে দেয়নি তারই বিচ্ছেদবেদনায় মেঝেতে বসে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আগুনের মতো অসুবিধাজনক খবর-গুলিও কিছুতেই চাপা থাকে না। শারদীয় পুজো আসন্ন। বিন্ধ্যবাসিনী সুভদ্রার জন্য একজোড়া থান, কিছুটা আখের গুড়, নিজের গাছের দুটি কয়েক পেঁপে ও পাঁচটি টাকা গুছিয়ে রেখেছিল। দত্তদের বাড়ির একটি ছেলের হাতে পাঠাবে। সেখানেই কথাটা শুনে এল। সুভদ্রার হৃদয়হীন দেওরেরা হঠাৎ কেন যে বিধবা ভ্রাতৃবধূকে আবার বাড়িতে স্থান দিতে রাজী হয়েছে সে উদারতার রহস্য এতদিনে উদ্ঘাটিত হল। স্ত্রীকে লুকিয়ে গোকুল তাদের হাতে নগদ একশ' টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছে।

গোকুল গোড়াতে প্রতিবাদ করল। শেষটায় বলল, একশ' নয়; নব্বুই। জানাল, টাকাটা সুভদ্রার স্বামীর। মৃত্যুর আগে গোকুলের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

জগতে স্বামী মাত্রেই জানেন যে, স্ত্রীর কাছে সময় বিশেষে দু'একটা মিথ্যা কথা না বলে সংসারে বাস করা দুরূহ। কিন্তু ধরা পড়লে যে আর রক্ষা থাকে না, সে-কথাও তাদের অবিদিত নেই। গোকুল যে মহাজনের কাছে জমিজমা বন্ধক রেখে চড়া সুদে ধার করেছিল সে গুপ্ত খবরটুকু বিন্ধ্যবাসিনীর অগোচর ছিল না। সে দুচক্ষে ঘৃণা বর্ষণ করে স্বামীকে মিথ্যাবাদী বলে গাল দিল।

গোকুলের মনে অনেক দিনের বিক্ষোভ জমা ছিল। নদীর মতো সহিষ্ণুতার বাঁধ একবার ভাঙলে রাখা শক্ত। সে উদ্ধত কণ্ঠে বলল, "আমার জমি, আমি বাঁধা দিয়েছি। বেশ করেছি।"

স্বামীর এ প্রকাশ্য বিদ্রোহ বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। রাগে তার শরীর থর থর কাঁপতে লাগল। প্রায় চীৎকার করে বলল, "জমি তোমার? তুমি ইচ্ছামতো তছনছ করবে ভেবেছ? শেষে আমার ছেলের হাত ধরে আমি পথে পথে ভিক্ষা করে খাই—এই তোমার মনের বাসনা? বেশ তো। তোমার আদরের বোনকে নিয়ে এসে ঘর সংসার চালাও। আমি যেদিকে দু' চোখ যায় চলে যাব।"

গোকুলেরও মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে আরও বেশী চেঁচিয়ে বলল, "তুমি যাবে কেন? আমিই চলে যাচ্ছি। এ অশান্তির পুরীতে আর এক মুহূর্ত নয়।" দড়ির আলনায় হাতের কাছে যে জামাটা ঝুলছিল তাই টেনে নিয়ে গোকুল ঝড়ের বেগে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বিন্ধ্যবাসিনী ভেবেছিল, স্বামী বড় জোর দু' চার দিন বন্ধুবান্ধবের বাড়ি কাটিয়ে রাগ পড়লে আপনি ঘরে ফিরে আসবে। দিনের পর মাস কেটে গেল। মাসের পর বছর। গোকুল ফিরল না। কেউ বলল, সে অপেরার অধিকারীর যাত্রাদলে নলরাজার পার্ট করছে। কেউ বলল, সে শহরের চটকলে দিনমজুরি খাটছে। কেউবা বলল, সে বানুগেছের হাটে মুগ-মসুরের কিস্তি নিয়ে যাচ্ছিল, নৌকাডুবিতে মারা গেছে।

স্বামীবিরহিতা বিন্ধ্যবাসিনীরও দিন কাটে। সঙ্গহীন, শান্তিহীন জীবন যখন দুর্বিষহ মনে হয়, একমাত্র শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে অশ্রুমোচন করে।

পৃথিবীতে শোকের যদি বা শেষ আছে, দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। বর্ষার শেষে গ্রামে ম্যালেরিয়ার মড়ক লেগেছিল। বিন্ধ্যবাসিনীও শয্যা নিল।

হঠাৎ একদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই চোখ চেয়ে বিন্ধ্যবাসিনী দেখল, সুভদ্রা। হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিচ্ছে। সে বিন্ধ্যবাসিনীর অসুখের খবর পেয়েছিল, কিংবা শ্বশুরবাড়ি অসহ্য হওয়াতে পালিয়ে এসেছে তা সে-ই জানে। বিন্ধ্যবাসিনী সজল চক্ষে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার অসন্তোষের ভয়েই সুভদ্রাকে একদিন চলে যেতে হয়েছিল, সে অনুশোচনায় বিন্ধ্য-বাসিনীর হৃদয় ভারাক্রান্ত। তার জন্যেই ভাই নিরুদ্দেশ, এ ভাবনায় সুভদ্রার মন অপরাধী। অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে দুই অনুতপ্তা নারীর পুনর্মিলন ঘটল।

সুভদ্রা ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়ায়, সাবু বার্লি দিয়ে পথ্য তৈরী করে; রাত জেগে বিন্ধ্যবাসিনীর শিয়রে বসে হাওয়া করে বা সোরাই-এর ঠাণ্ডা জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জ্বর-তপ্ত কপাল মুছে দেয়। মায়ের চেয়ে ছেলের পরিচর্যাটা সর্বক্ষণের। দুরন্ত শিশুর আব্দার অসংখ্য। তাকে সামলাতেই সুভদ্রার দিনের বেশীর ভাগ সময় কেটে যায়।

দুর্ভাগারা চিরকালই দীর্ঘজীবী। তা নইলে দুঃখ কষ্ট সইবে কে? হতভাগিনী বিন্ধ্যবাসিনীও হপ্তাত মাস যমে মানুষে টানাটানির পরে সেরে উঠল। সুভদ্রার চিবুক ধরে বিন্ধ্যবাসিনী সস্নেহ কণ্ঠে বলল, "খোকনকে আজ আমার বিছানায়ই শুইয়ে দিস। ও যে তোকে রাত্তিরেও ঘুমুতে দেয় না।"

খোকনের সে-প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি দেখা গেল। সে তার ঝাঁকড়া চুলভরা ছোট মাথাটি নেড়ে জানিয়ে দিল, "পিসির কাছে ঘুমুবো।"

শুনে বিন্ধ্যবাসিনী ও সুভদ্রা দু'জনেই হাসল।

হায়, হাসিটা বেশী দিন স্থায়ী হলো না। মায়ের চাইতে মাসির দরদটা চিরকালই হাস্যকর। দেখা গেল, পিসির প্রতি বেশী অনুরাগটাও গৃহে শান্তিরক্ষার পক্ষে অনুকূল নয়। বিন্ধ্যবাসিনীর পুত্রগত প্রাণ। এতদিন অসুখে নিজের শক্তি ছিল না; তাকে দূরে রাখতে হয়েছে। এখন একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই ছেলেকে সর্বক্ষণ নিজের কাছে রাখতে ব্যাকুল হল।

বিন্ধ্যবাসিনীর স্নেহ অধিক; ধৈর্য পরিমিত। সুভদ্রা শিশুর সমস্ত দৌরাত্ম্য হাসিমুখে সহ্য করে। আশ্চর্য নয় যে, মায়ের চাইতে পিসির সঙ্গে তার ভাব বেশী। সেটা বিন্ধ্যবাসিনীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয়।

বিন্ধ্যবাসিনী ছেলেকে খাওয়াতে বসেছিল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে দু গ্রাস গেলাতে পারল না। শিশু খাবার ছড়িয়ে, ফেলে একাকার করল। বিন্ধ্যবাসিনী ক্লান্ত হয়ে হার মানল। সুভদ্রা এসে কাক দেখিয়ে, চিল দেখিয়ে, টুনটুনির গল্প বলে অনায়াসে খাইয়ে দিল। বিন্ধ্যবাসিনী ছেলেকে স্নান করাতে গেলে সে ছুটে পালায়, ঘুম পাড়াতে গেলে দাপাদাপি শুরু করে। সুভদ্রার হাতে সেগুলি নিরুপদ্রবে নিষ্পন্ন হয়।

দিনে দিনে বিন্ধ্যবাসিনীর মন তিক্ততায় ছেয়ে যায়।

সুভদ্রা দেখে, বিন্ধ্যবাসিনী আজকাল অকারণে রেগে যায়, অনর্থক বকুনি দেয়, খামকা গুম হয়ে বসে থাকে। বৌঠানের এ চেহারার সঙ্গে অতীতে তার নিষ্ঠুর পরিচয় ঘটেছিল। অজানা আশংকায় তার বুক কাঁপতে থাকে।

শংকাটা অমূলক। বিন্ধ্যবাসিনীর মনে পড়ল, সুভদ্রাই তার জীবনের দুষ্টগ্রহ, ভাগ্যাকাশে শনি। সে যতদিন আসেনি গোকুলের সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর বিরোধ ছিল না। তারই জন্য সে স্বামী খুইয়েছে। তার কাছে কি বিন্ধ্যবাসিনীর শেষ অবলম্বন ছেলেকেও হারাতে হবে? ভাবতেই বিন্ধ্যবাসিনী শিউরে উঠল।

পুরানো শাড়ির পাড় থেকে সুতো খুলে খুলে সুভদ্রা নিজের ঘরে কাঁথা সেলাই করছিল। বিন্ধ্যবাসিনীর ছেলে পাশে বসে খেলছে। হঠাৎ তার কী খেয়াল হল। বায়না ধরল, বেড়াতে যাবে। শিশুকে ভোলাতে তার কথায় সায় দিতে হয়। সুভদ্রা বলল "যাবে বৈ কি। মা এখন ঘুমুচ্ছে। মা ঘুম থেকে উঠলে আমরা সবাই বেড়াতে যাব। খোকন

যাবে, মা যাবে, আমি যাব।"

খোকন বাধা দিয়ে বলল, "মা যাবে না।"

সুভদ্রা বলল, "মা না গেলে, খোকনকে কোলে নেবে কে?"

সে-টা খোকনের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। সে প্রশ্নের জবাবও তাকে ভাবতে হয় না। সে নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিল, "তুমি কোলে নেবে।"

সুভদ্রা বলল, "বেশ, আমিই খোকনকে কোলে নেব। কিন্তু মাকে সঙ্গে না নিলে মা কাঁদবে যে!"

জননীর ক্রন্দন সম্ভাবনায় শিশুপুত্রকে কিছুমাত্র বিচলিত দেখা গেল না। সে তার পূর্বসংকল্পে অটল রইল। বলল, "না, মা যাবে না। মা আমাকে মেরেছে।"

কথাটা অতিরঞ্জিত। সকাল বেলা সে মায়ের ওষুধের শিশিটা নিয়ে খেলা করছিল। মা দেখতে পেয়ে তা হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল মাত্র। শিশুর মন থেকে সে ক্ষোভ দূর হয়নি।

সুভদ্রা বলল, "ওমা, তাই নাকি! তবে তো মাকে কিছুতেই সঙ্গে নেওয়া হবে না। মাকে খুব বকে দিতে হবে। মা বড্ড মন্দ, বড্ড দুষ্টু।"

বিন্ধ্যবাসিনী দোরের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্তই শুনছিল। শেষ কথাটা কানে যেতেই একেবারে যেন ক্ষেপে গেল। মা মন্দ, মা দুষ্টু! এ সব উপায়েই যে সুভদ্রা ছেলেকে তার কাছে পর করে দিচ্ছে সে বিষয়ে তার মনে সন্দেহ রইল না। সুভদ্রার সেবা, যত্ন প্রীতি ও শ্রদ্ধা সমস্তই একটা বিরাট ছলনা মনে হল। বিন্ধ্যবাসিনীর ছেলের উপরেই সুভদ্রার লোভ! তাকে কেড়ে নেওয়ার জন্যেই মায়াবিনী তার স্নেহের মায়া জাল পেতেছে। নইলে শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে সে আবার এখানে আসবে কেন? বিন্ধ্যবাসিনী বোকা, তাই এতদিন বুঝতে পারেনি। সে প্রতিজ্ঞা করল, রাক্ষসীকে আর এক দণ্ড এখানে থাকতে দেওয়া নয়।

হতচকিত সুভদ্রা বুঝতে পারল না, কোথায় কখন তার কী অপরাধ ঘটেছে। সে কাঁদতে লাগল। মেয়েদের চোখে জল দেখলে পুরুষের হৃদয় গলে যায়; স্ত্রীলোকের মন শক্ত হয়ে ওঠে। সুভদ্রার অশ্রুকাতর প্রার্থনায় বিন্ধ্যবাসিনী কিছুমাত্র নরম হল না। তাকে বাড়ি থেকে দূর করে না দিয়ে সে থামল না।

আপদ গেল। কিন্তু বিপদ কাটল না। মুশকিল বাধালো বিন্ধ্যবাসিনীর ছেলে। কিছু না বুঝেও সে এটুকু বুঝতে পারল যে, মা পিসিকে বকেছে। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা তাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। শ্রান্ত বিন্ধ্যবাসিনী অভুক্ত শিশুকেই ঘুম পাড়াবার উদ্যোগ করল। বিছানায় শুয়ে ছেলে পিসির কাছে যাওয়ার জন্য কান্না জুড়ে দিল।

বিন্ধ্যবাসিনী তাকে কী উপায়ে শান্ত করবে ভেবে পায় না। কোলে নিয়ে ঘুম-পাড়ানি ছড়া শোনাল, বৈয়ম থেকে মিছরির খণ্ড হাতে দিল, কাঠের ঘোড়া, টিনের ঝুমঝুমি যেখানে যত খেলনা ছিল সব জড় করল। সমস্তই বৃথা। পিসি তার জন্য মুড়কি কিনতে গেছে, এক্ষুনি আসবে ইত্যাদি স্তোকবাক্যেও ক্রন্দনরত শিশুকে ভোলানো গেল না।

বিন্ধ্যবাসিনীর শরীর দীর্ঘ অসুস্থতার জের সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠেনি। মানসিক উত্তেজনা ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অবসাদে দুর্বল দেহ আরও অবসন্ন হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এ অবস্থায় চিত্ত প্রসন্ন ও মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা সহজ সাধ্য নয়। সে বিরক্ত হয়ে কড়া স্বরে বলল, "চুপ কর বলছি, নইলে মার খাবে।"

তোষণ এবং শাসন উভয় পন্থাই বিফল। ছেলের কান্না থামে না।

ধৈর্যচ্যুত বিন্ধ্যবাসিনী ছেলের পিঠে নিজের হাতের দু'এক ঘা বসিয়ে না দিয়ে থাকতে পারল না।

শিশু আরও উচ্চ স্বরে 'পিসি' 'পিসি' ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল।

বিন্ধ্যবাসিনীর দুই কানে কে যেন গরম লোহার পেরেক বেঁধাতে লাগল। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শাসাল "ফের পিসির নাম নিয়েছ কি মেরে খুন করব। চুপ, চুপ।" হাত দিয়ে সে ছেলের মুখে চেপে ধরল।

বাপরে! ঐ টুকু শিশুর গায়ে যেন অসুরের জোর এসেছে। ক্ষীণ স্বাস্থ্য বিন্ধ্যবাসিনী তাকে এঁটে উঠতে পারল না। মায়ের হাতটা সজোরে ঠেলে ফেলে দিয়ে সে চীৎকার করল—পিসি।

বিন্ধ্যবাসিনীর তখন আর হিতাহিত জ্ঞান রইল না। "তবে রে, তোমার গায়ে বড় জোর বেড়েছে? দাঁড়াও তোমার পিসি ডাকা

স্কেচ—কৃষ্ণা ঘোষাল

আমি বন্ধ করছি।" মাথার বালিশটা বিন্ধ্যবাসিনী ছেলের মুখে চাপা দিয়ে পাগলের মতো বলতে লাগল, "ডাক, ডাক দেখি এবার তোর পিসিকে।"

শিশু নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় সবলে হাত পা ছুঁড়তে লাগল। ধস্তাধস্তির ফলে বালিশটা এদিক ওদিক একটু সরে গেলেই ছেলের গোঁ-গোঁ কান্নার শব্দ বিন্ধ্যবাসিনীর কানে আসে। দুর্জয় ক্রোধে উন্মত্ত বিন্ধ্যবাসিনী আরও প্রাণপণ শক্তিতে চাপতে থাকে।

কতক্ষণ এ যুদ্ধ চলেছে? এক মিনিট? এক যুগ? বিন্ধ্যবাসিনী তা জানে না। সে শুধু স্মরণ করতে পারে ক্রমে অবাধ্য শিশুর প্রতিরোধের বেগ কমে এল। হাত পা ছোঁড়া শান্ত হয়ে গেল। বালিশের নীচে থেকে অবরুদ্ধ কান্নার ক্ষীণতম শব্দও শোনা গেল না। পাজী, হতভাগা ছেলে কোথাকার! এতক্ষণে টিট হয়েছে। বিছানার পাশে বসে বিন্ধ্যবাসিনী হাঁপাতে লাগল। উত্তেজনায় ও পরিশ্রান্তিতে তার দেহ স্বেদসিক্ত ও কণ্ঠ তৃষ্ণায় শুষ্ক হয়েছে।

হঠাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর খেয়াল হল, ছেলের কোনো সাড়া শব্দ নেই তো। তাড়াতাড়ি তার মুখের উপর থেকে বালিশ চাপাটা সরিয়ে দিল। শিশুর ছোট চোখ দুটি মুদ্রিত। শরীর অসাড়। ঘুমুচ্ছে কি? কৈ, নিঃশ্বাস পড়ছে না তো। আতঙ্কে বিন্ধ্যবাসিনীর বুকটা ধড়াস করে উঠল। নরম হাত দুটি তুলে নিজের গালের উপরে রাখল। ঠাণ্ডা কিংবা গরম ঠিক বুঝতে পারল না। পায়ের তলায় হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করল। নিশ্চিত হল না। তার বুকের উপর কান পেতে শুনল। হৃদস্পন্দনের আভাস মাত্র পেল না। কানের কাছে 'খোকন' বলে বার বার ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকল। সাড়া পেল না। ক্ষুদ্র নিথর নিস্পন্দ দেহটিকে দু'হাতে ঝাকুনি দিয়ে বুঝি শিশুকে জাগাতে চেষ্টা করল। তার পরে "ওঃ মাগো" বলে চেঁচিয়ে উঠে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

বিন্ধ্যবাসিনীর যখন জ্ঞান হল, তখন রাত্রি গভীর। ঊর্ধ্বে কৃষ্ণপক্ষের আকাশ চন্দ্রহীন। নিঃশব্দ রজনীর নিবিড় তিমিরা-বেষ্টনে সমস্ত গ্রামখানি নিদ্রালস। সেই সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু শূন্য গৃহে পুত্রহন্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর অসহ্য শোকভার নিষ্ফল আর্তনাদে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

পরদিন রাত্রে প্রতিবেশিনীদের অলক্ষ্যে বিন্ধ্যবাসিনী চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্যহীনভাবে চলতে চলতে নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি নদীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে ঝুরিজটে ঘেরা বিপুল প্রাচীন বট গাছটির নবপল্লবের মৃদু আন্দোলনে

কিসের নির্দেশ? পরপারে অস্পষ্ট তরুশ্রেণীর ঝাপসা ছায়াছবিতে দুর্ভাগিনী বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য কিসের ইঙ্গিত? স্রোতস্বতীর কালো জলের উপরে ঘন সন্নদ্ধ অন্ধকারে কোন অজ্ঞাত জগতের আহ্বান?

ঝুপ্ করে একটা শব্দ হল। শান্ত নদীর নিস্তরঙ্গ জলে ক্ষণিকের একটা আলোড়ন উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

রসের বিচারে বিন্ধ্যবাসিনীর কাহিনীর এখানেই ভাবসঙ্গত সমাপ্তি। কিন্তু পুলিশের কাছে সাহিত্যিক সার্থকতার চাইতে ঘটনার দাম বেশী। অক্ষম গ্রন্থকারের মতো তারাও উপাখ্যানের কোথায় থামতে হয় জানে না। ইন্সপেক্টারবাবু আরও তথ্য যোগ করতে লাগলেন। বৃহদায়তন উপন্যাসের শেষে যেমন পরিশিষ্ট, চিঠির তলায় যেমন পুনশ্চ।

যে মেয়ে ছোটবেলায় মাছের মতো সাঁতার কেটে প্রত্যহ দীঘির এপার-ওপার করেছে, তার পক্ষে জলে ডুবে আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। জলের নীচে দম আটকে এলে বিন্ধ্যবাসিনীর হাত-পাগুলি আপনি সচল হয়ে দেহটাকে উপরে ভাসিয়ে তোলে। জেলেদের নৌকায়—"

বাধা দিয়ে বললাম, "থাক, কে কোথায় কী ভাবে তাকে জল থেকে উদ্ধার করল, কী করে কবে সে গ্রাম থেকে শহরে এল এসব বৃত্তান্ত থানায় ডায়েরী করার পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কোর্টে উকীলের জেরার পক্ষেও বোধহয় মূল্যবান মাল-মশলা। আমার কাছে সে সব অনাবশ্যক খুঁটিনাটি মাত্র।"

সুধীরবাবু ক্ষুণ্ণ হলেন কি না জানিনে। দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন "বিন্ধ্যবাসিনীর কনফেশান—"

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম "আমি বিশ্বাস করি কি? করি। তার এক বর্ণও মিথ্যা মনে হয় না।"

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করে তিনিই আবার প্রশ্ন করলেন "এখন আমার কী করা উচিত, বলুন তো?"

তা আমার বুদ্ধির অতীত। বললাম, "আমরা সম্পাদকেরা সর্ববিদ্যাবিশারদ। ভেন্যাসন থেকে কিউবিজম্ এবং কমন মার্কেট থেকে ডেফিসিট ফাইন্যান্স সব বিষয়েই আমরা অনায়াসে উপদেশ বা এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিতে পারি। কিন্তু স্বীকার করছি, বিন্ধ্যবাসিনী সম্পর্কে কী করা উচিত তা জানিনে।"

ভদ্রলোক হতাশ হলেন। তাঁকে সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিতে গেলাম। দু'পা গিয়ে হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন "খবরটা আপনার কাগজে কালই বেরোবে বোধহয়?" তাঁর কণ্ঠে উদ্বেগের চিহ্ন গোপন রইল না।

আমার চোখের সামনে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা ব্লক টাইপের ব্যানার-হেডিং ভেসে উঠল,—"নিরুদ্দেশ বিন্ধ্যবাসিনীর চাঞ্চল্যকর আত্মপ্রকাশ।" "পদস্থ পুলিশ অফিসারের গৃহে অতর্কিতে আবির্ভাব।" পথে পথে হিন্দুস্থানী হকারেরা সাইকেলে কাগজের গোছা নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে ছুটেছে—"টিলীগ্রাফ, বিন্ধ্বাসিনীকা খবর নিকলেছে। জনমভূমি পড়ুইয়ে, জনম্-ভূমি—"

কিন্তু মনস্থির করতে সময় লাগল না। একটা চাঞ্চল্যকর 'স্কুপ' এবং পত্রিকার হাজার দশেক কপি অতিরিক্ত বিক্রির নিশ্চিত সুযোগ স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করলাম। জানি, সম্পাদকীয় কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটল। সার্কুলেশান ম্যানেজার জানতে পারলে আমার আর মুখ দেখবেন না।

সাঁওতাল নৃত্য — আলোকচিত্র: শ্রীঅমিয় তরফদার

রোদ

প্রেমেন্দ্র মিত্র
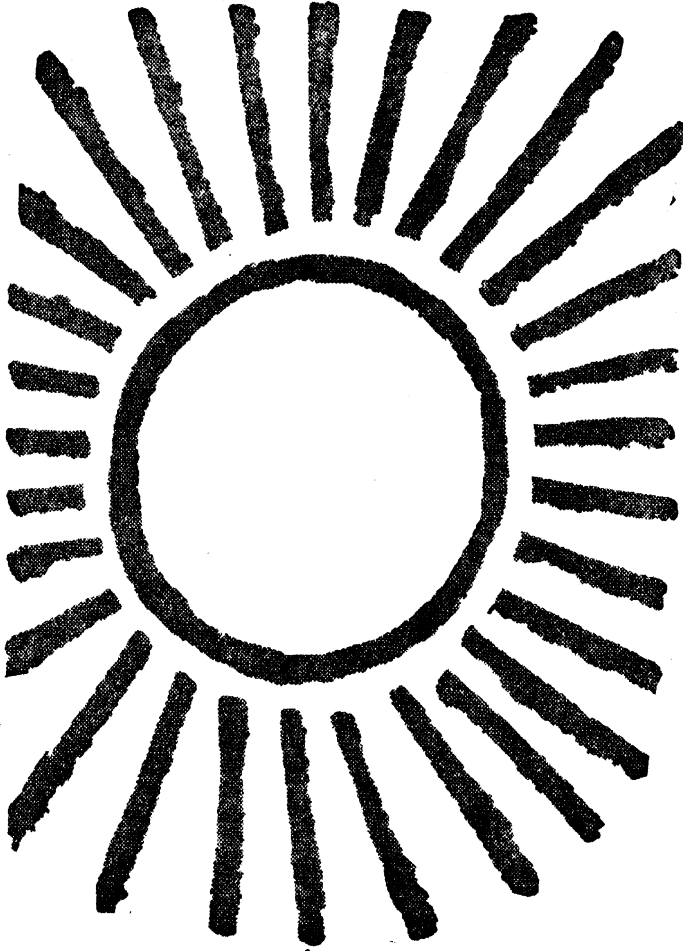
এখন আর ফেরা যায় না। সামনেও যতখানি, ফিরে গেলে পেছনেও ততখানি পথ।

কিন্তু সত্যিই যদি মাথা ঘুরে রাস্তার মাঝে পড়ে যায়। কি কেলেঙ্কারী-টাই হবে! মাথাটা রীতিমত ঝিম ঝিম করছে। কোথাও এতটুকু ছায়া পেলে বেঁচে যেত। এ পোড়া রাস্তায় একটা গাছ ত দূরের কথা বিজলী বাতির পোস্টে একটা বিজ্ঞাপনের কিয়স্কও নেই যার আড়ালে একটু দাঁড়ান যায়।

পূব পশ্চিমের রাস্তা। সবে বস্তি অঞ্চল ভেঙে তৈরী হচ্ছে। দুধারে দূরে দূরে টিন কি খাপরার চালের কুঁড়ে। আশ্রয় নেবার মত বারান্দা গোছের কিছু এ অঞ্চলে মেলবার নয়।

বাড়ি থেকে না বার হলেই অবশ্য পারত। বেরুনটাই তখন ভুল হয়েছিল। রোদের তেজ যে কি তা ত দরজাটা খুলতেই টের পেয়েছিল। চোখ মুখ ঝলসে গেছল আগুনের ঝাপটায়। রোদ নয় যেন হিংস্র একটা আক্রোশ।

তখনই মনে হয়েছিল না গেলে হয় না? আজ যে জন্যে যাওয়া সে উদ্দেশ্য না গিয়েও এক দিক দিয়ে ত সিদ্ধ হতে পারে!

কি করবে বিজয়? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। হতাশ হয়ে পায়-চারি করবে এদিক ওদিক। বাড়ি পর্যন্ত ত আসতে পারবে না। নতুন ঠিকানা তাকে জানান হয়নি। ঠিকানা যদি লুকিয়ে জেনেও নিয়ে থাকে এর মধ্যে, তবু সাহস করবে না আসতে। তিনটের পরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সাড়ে তিনটে কি চারটে, নাগাদ ওই পেট্রোল পাম্পের লোকেদের সন্দেহ জাগাবার ভয়ে শেষে বাধ্য হবে চলে যেতে।

ক্ষুব্ধ অপমানিত বোধ করে তাতেই যদি সম্পর্ক চুকিয়ে দেয় বিজয়, তাহলেই ত সব সমস্যা সহজে মিটে যায়।

নিজের মুখে স্পষ্ট করে কথাগুলো তাহলে আর বলতে হবে না। সে বলার যন্ত্রণার চেয়ে তাকে ভুল বুঝে বিজয়ের চিরকালের মত সরে যাওয়ার বেদনাও বুঝি সহনীয়।

কিন্তু বিজয় যাই বুঝুক এই কথায় খেলাপে সম্পর্ক চুকিয়ে যে দেবে না তা শুভা জানে।

বিজয়, অভিযোগ অনুযোগ কিছুই করবে না পরের দিন অফিসে দেখা হবার পর। টিফিনের সময় সুযোগ পেলে শুধু সেই শান্ত গাঢ় চোখ তার দিকে তুলে একটু হেসে বলবে,—কাল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?

শুভাকে যাহোক একটা কৈফিয়ৎ তখন দিতে হবে। অবিশ্বাস্য কৈফিয়ৎ দিলেও বিজয় তা নীরবে মেনে নেবে কোন প্রশ্ন না তুলে।

না, বিজয়কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছু বোঝানো যাবে না। যা বলবার তাকে স্পষ্ট করেই বলতে হবে সোজাসুজি। তাতে যার যতখানি আঘাত লাগে লাগুক।

আজ সেই জন্যেই বিশেষ করে না গেলে নয়।

রোদের তেজ দেখে আবার ভেতরে গিয়ে ছাতিটা খুঁজতে খুঁজতে শুভা এসব কথা ভেবেছিল।

ছাতিটা খুঁজে পেয়েও কিন্তু নিতে পারেনি। হাতলটা চিড় খেয়ে কাপড়ের রঙ জ্বলে গিয়ে যা চেহারা হয়েছে, ওটা নিয়ে অন্তত সিনেমা হলে ঢোকা যায় না। সাজ পোশাক এমন কিছু বাহারে তার নয়, কিন্তু ছাতাটা যেন দৈন্যদশার মূর্তিমান প্রতীক হিসাবে সে সাধারণ বেশভূষার সঙ্গেও বেমানান।

ছাতা না নিয়েই তাই বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু খানিক বাদেই মনে হয়েছে সস্তার খাতিরে সুদূরে শহরতলিতে যাদের এমন বাসা নিতে হয় যে ক্রোশখানেক না হাঁটলে সম্ভাভব্য পাড়ার নাগাল পাওয়া যায় না, ছাতার চেহারা বিচার করে ব্যবহার করার সৌখিনতা তাদের সাজে না।

তখন অর্ধেক পথ প্রায় এসে পড়েছে। আর ফেরার কথা ভেবে লাভ নেই।

হাতের হ্যান্ডব্যাগটাই মাথার ওপর তুলে ধরে যতটুকু পারে রোদটা আড়াল করবার চেষ্টা করেছে এতক্ষণ। কিন্তু তাতে কতটুকু ছায়া আর হয়! আকাশ যেন বিরাট একটা জ্বলন্ত ইস্পাতের পাত, তা থেকে অদৃশ্য তরল আগুন ঝরে পড়ছে। মাথা থেকে সুরু করে সর্বাঙ্গে একটা জ্বালা।

এ দেশের এই রোদই যদি এত দুঃসহ তাহলে মরুভূমিতে লোক কি করে ভেবে শুভা শক্ত হবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে লাভ কি! রোদটা তার একটু বেশীই লাগে। একেবারে সহ্য হয় না। তাছাড়া আজকের রোদ সত্যিই একটা যেন অস্বাভাবিক কিছু। কাল খবরের কাগজে হয়ত কারণটা পড়বে। পশ্চিমের একটা উষ্ণ বায়ুস্রোত মরুভূমির উত্তাপ নিয়ে এ অঞ্চলে হানা দিয়েছে গোছের কিছু খবর। সেই বায়ু স্রোত একটু থাকলেও ত হত। তার বদলে সমস্ত আকাশ পৃথিবী নিস্পন্দ নিথর, যেন উত্তাপের চাপেই জমাট।

কষ্টটা এই জন্যেই এত বেশী। নইলে রবিবারের দিন দুপুরের ম্যাটিনি শো-তে সে ত আগেও অনেকবার গেছে এই ... এই নতুন বাসায় উঠে

বিজয়ের সঙ্গে অফিসেই পরিচয় হবার পর এইটুকু ঘনিষ্ঠতাতেই তারা পেঁছেছে। অফিসে সামান্য দুচারটে কথা, অন্য সকলের কৌতূহল বা কৌতুক জাগাবার কোন সুযোগ না দিয়ে, কখনো একটু চোখোচোখি আর ফাইল চালাচালির মধ্যে, কখনো একটা চিরকুটে বিজয়ের সংক্ষিপ্ত একটু চিঠি—সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকব।

কিছুই থেকে সে চিঠিও থাকে না। শুধু দুটো টিকিট থাকে ফাইলের ভেতরে লুকোনো। শুভাই টিকিট নিয়ে যথাস্থানে যায়। সাধারণত চৌরঙ্গী অঞ্চলের ইংরেজি ছবির-ই হলে। তারপর পাশাপাশি বসা। অন্ধকারে একটু হাত ধরা। ছবিতে গভীর প্রেমের দৃশ্য কিছু থাকলে সে হাত ধরায় একটু চাপ, কখনো অন্ধকারেই ছবি না দেখে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চাওয়া। তারপর বেরিয়ে এসে কোনো একটা রেস্তোরাঁয় একটু চা বা কফি খেতে খেতে একটা দুটো কথা। দুজনের কেউই তারা বেশী কথা বলে না। একজন কেউ মুখর হলে ভালো হত। তবু ওরই মধ্যে শুভাই একটু-আধটু যা আলাপ চালায়। গাঢ় গভীর কোন কথা নয়, কোন আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের কথাও না। সেসব কথা বলে কোন লাভ নেই তারা জানে।

দুজনেই নিজের নিজের সংসারের দায়িত্বে এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা যে অদূর ভবিষ্যতে তা থেকে মুক্তি পাবার কোন আশা নেই যদি না নিজেরাই জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে পারে। কিন্তু সে সাহস বা স্বার্থপরতা তাদের কারুরই নেই।

আছে শুধু এই সান্নিধ্যটুকুর বিলাস। বিলাস, যেমন তেমনি যন্ত্রণাও। তাই গভীর কথার বদলে কোন সময়ে শুভার মুখ দিয়ে হয়ত বেরোয়,—ফি হপ্তা এমন করে ছবি দেখতে আর ভাল লাগে না!

বিজয় সেই শান্ত গাঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলে,—তাহলে! তাহলে আর কি করতে চাও বলো?

কিছু করতেই বা হবে কেন?—শুভা চীৎকার করে বলতে পারলে হয়ত দুজনেই একটু স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতায় পেঁছোতে পারত। তার বদলে শুভাকে একটু ম্লান হেসে বলতে হয়,—না আর কিছু করবার নেই।

কিন্তু আর কিছু করবার সময় এবার এসেছে। আর কিছু মানে এই করুণ প্রহসন একেবারে শেষ করে দেওয়ার সময়।

আগের রবিবারেই শুভা তার আভাস একটু দিয়েছে। ইচ্ছে ছিল স্পষ্ট করে বলার। কিন্তু আভাসটুকু দেওয়ার পরই কথাগুলো তার গলায় আটকে গেছে।

... আকাঙ্ক্ষা ...

করতে শুধু বলেছিল,—সুপার কাল বলছিলেন—

বিজয় বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। প্রথমটা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছে,—কে বলছিলেন?

সুপার, আমাদের মিঃ ঘোষ আগের রবিবার বোধহয় আমাদের দেখেছিলেন। কাল বলছিলেন,— আপনি ত খুব সিনেমা দেখেন! এ রবিবারে কোথায় যাচ্ছেন?

বিজয় কিছুই না বলে পরের কথাটার জন্যে অপেক্ষা করেছিল।

শুভা বলেছিল আবার,—মিঃ ঘোষের গলার স্বর কেমন বিরক্ত মনে হল। উনি বোধহয় এসব পছন্দ করেন না।

তা' ত না করতেই পারেন। ওঁর তাঁবে যারা কাজ করে তারা খুশিমত সিনেমা দেখবে কেন?

শুভা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু বিজয়ের গলা যেমন স্বাভাবিক, তার মুখেও তেমনি কোন ভাবান্তর দেখতে পায়নি।

একটু থেমে বিজয় আবার বলেছিল,— ঘোষ আমাকেও সিনেমার কথা বলেছেন।

তোমাকেও!—শুভা সত্যিই বিস্মিত হয়েছিল।

হ্যাঁ, বললেন,—আপনার ত একটা লিফ্‌টের সময় এসেছে। মাইনে বাড়লে সিনেমা দেখা, হোটেলে যাওয়ার আরো সুবিধে হবে কেমন!

এই কথা বললেন!—শুভা স্তম্ভিত,— তুমি! তুমি কি বললে?

কিছু না!—বিজয় একটু হেসেছিল,— এসব কথার কি উত্তর দেওয়া যায়!

শুভা এইবার যা বলবার বলতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি কিছুতেই। কথাগুলো যেন গুছিয়েই নিতে পারেনি মনের মধ্যে। তা সত্ত্বেও বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে গলাটা যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আজ কিন্তু সে তৈরী হয়েই যাচ্ছে। নিজেকে তৈরী করেই নিয়েছে এই কদিন ধরে। যত বড় রূঢ় আঘাতই হোক আজ নিজের ও বিজয়ের খাতিরেই নির্মম তাকে হতে হবে।

মনস্থির করে ফেলেছে সে এই হপ্তার গোড়া থেকেই। গত রবিবারের পর সোমবার অফিসে গিয়ে পরের দিন একটু বেলা করে আসবার অনুমতি চেয়েছিল। ছোট বোন রুনুকে নতুন স্কুলে ভর্তি করাতে হবে তাই। মার অসুখের সময় পাওনা ছুটি সে প্রায় সব খরচ করে ফেলেছে। কামাই না করে একটু দেরী করে আসবার ওই সুবিধে টুকু তাই চায়। এর আগে মিঃ ঘোষ উদার হয়েই এ ধরনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন তাই এই সাহস।

ঘোষ কিন্তু আর্জিটা শুনেও যে

শোনেন নি। ফর্মটা একটু যেন বেশী মনোযোগ দিয়ে দেখে সই করে শুভার হাতে দিয়েছেন।

শুভাকে বাধ্য হয়ে আর একবার আবেদনটা জানাতে হয়েছে।

ঘোষ বিরক্তি দেখাননি, বরং বেশ একটু সহাস্য প্রসন্ন মুখেই বলেছেন,—বাড়ির এসব কাজগুলো ছুটির দিন করবার বুঝি সময় পান না?

স্কুলে ভর্তি করান যে ছুটির দিনে সম্ভব নয়, শুভা সে কথা সসঙ্কোচে বোঝাবার চেষ্টা করার আগেই ঘোষ আবার হাসতে হাসতেই বলেছেন,—ওঃ ছুটির দিনগুলোয় ত আপনার আবার অন্য সব কাজ! বেশ দেরী করেই আসবেন কাল। ভর্তি করা ত বছরে একবারের বেশী নয়। না, কি আরো ভাইবোন আছে ক্রমশঃ প্রকাশ্য?

শুভার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। অস্ফুট গলায়, 'না আর নেই' বলে চলে আসবার জন্যে পা বাড়াতেই ঘোষ আবার ডেকে বলেছেন,—হ্যাঁ শুনুন।

শুভাকে ফিরে দাঁড়াতে হয়েছে সন্ত্রস্ত হয়ে।

ঘোষ বলেছেন,—আমাদের গার্ডেনরীচের অফিস থেকে ফাইলিং-এর জন্যে ভালো একজন কাউকে চেয়ে পাঠিয়েছে। ভাবছি আপনার নামটা দিয়ে পাঠাব কি না! ওখানে কাজ খুব হাল্কা। বলতে গেলে সারাদিনই ছুটি। কি বলেন, আপনার নামটাই দিই?

রাগে ক্ষোভে তখন শুভার চোখে জল এসেছে। 'না।' বলে কোন রকমে নিজেকে সামলে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে ঘোষের কামরা থেকে। আর সেই মুহূর্তেই সংকল্প করেছে বিজয়ের সঙ্গে এই ক্ষীণ হৃদয়ের সম্পর্কটুকুও ঘুচিয়ে দেবার। বিজয়কে স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেবে সে নিস্ফল একটা স্বপ্নবিলাসের জন্যে জীবিকাকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি ও সাহস তার নেই। হপ্তার আর ছটা দিনের মত জীবনের রবিবারগুলোও ধূসর বিস্বাদ হয়ে যাওয়া তার উচিৎ, কিন্তু জেনে শুনে নিজের চাকরীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারবে না।

বিজয়ের সঙ্গে সব বোঝাপড়া শেষ করবার জন্যেই আজ আসা। বিজয় নিশ্চয়ই অনেক আগে থাকতে পেট্রোল পাম্পের ধারে উৎসুক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দেখা হতেই কিছু বলবে না। আজ শেষ দিন। এই দিনটির প্রতিটি মুহূর্ত যেন স্মৃতিতে সঞ্চিত হয়ে থাকে। দুজনে পাশাপাশি সীটে গিয়ে বসবে। ছবিও দেখবে পরস্পরের হাত ধরে। ছবি শেষ হবার পর বিজয় কোন রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে চাইবে নিশ্চয়। শুভা তখনই আপত্তি জানাবে। বলবে, না, আজ আর ভিড়ের ভেতর কোথাও নয়, তার চেয়ে মাঠে কোথাও গিয়ে বসি চলো। বিজয় হয়ত অবাক হবে একটু, কিন্তু বাধা দেবে না। তারপর একটু নির্জনতা কি কোথাও পাওয়া যাবে না, মুক্ত আকাশের তলায়, যেখানে ক্রমশঃ ঘনায়মান অন্ধকারে নিষ্ঠুরতম আঘাত দিয়ে ও নিয়ে পরস্পরের কাছে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসা যায়?

আর বেশী দূর নয়। পেট্রোল পাম্পের লাল তেল মাপা যন্ত্র দুটো দেখা যাচ্ছে। ও দুটোও যেন রক্তিম শিখার মত জ্বলছে। হ্যান্ডব্যাগটা মাথার ওপর ধরে আর সুবিধে হয়নি। শুভাকে আঁচলটাও মাথায় তুলে ঢাকা দিতে হয়েছে। তাতেও রোদ আর কতটুকু আটকায়। মনে হচ্ছে দেহের সমস্ত পোশাক বুঝি এখুনি হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠবে। মুখটা বোধহয় পুড়েই গেছে ইতিমধ্যে।

পেট্রোল পাম্পে পৌঁছে কিন্তু শুভা নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বিজয় সেখানে নেই। হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে তার কাঁটাগুলোকেই মিথ্যাবাদী বলে মনে হয়। তিনটে বাজতে দশ মিনিট যেন হতে পারে না। ঘড়ির কাঁটার চেয়ে বিজয়ের আসা নির্ভুল। কোনদিন তার নড়চড় হয়নি এ পর্যন্ত। ঘড়িটাই কি তাহলে ভুল চলছে!

পেট্রোল পাম্পের পাশের একটি বাড়ির বারান্দার যে ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিজয় অপেক্ষা করে, শুভা সেইখানেই গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তার হাতঘড়িতে তিনটের ঘর পার হয়ে যায় কাঁটাগুলো।

মাথাটা তার ঝিমঝিম করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। একটুখানি এগিয়ে রাস্তাটা ঘুরে গেলেই একটা পান-সিগারেট সোডা লেমনেডের দোকান। কিন্তু শুভা তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেলেও সেটুকু যেতে সাহস করে না। বিজয়ের এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। এখন এসে দেখা না পেয়ে শুভা আসেনি মনে করে সে হতাশ হয়ে যদি চলে যায়!

কিন্তু বিজয় আসে না। বারান্দার ছায়াটা সরে যাওয়ার সঙ্গে শুভাকেও একটু সরে দাঁড়াতে হয়। আকাশ এখনও সমানে আগুন ছিটোচ্ছে।

আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে? পেট্রোল পাম্পের লোকেরা লক্ষ্য করছে নিশ্চয়। কোন মোটর ইতিমধ্যে সেখানে তেল নিতে আসেনি সুতরাং একলা একটি যুবতী মেয়ের এই দুরন্ত রোদের মধ্যে ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা তাদের কৌতূহল জাগাতে বাধ্য। কিন্তু এই রোদ মাথায় নিয়ে এখন আর বাড়ি ফিরতে পারবে না। একা একাই সিনেমা হলে যেতে পারে অবশ্য। কিন্তু এসে দাঁড়াবার পরেই প্রথম বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। এখন কতক্ষণে আবার বাস আসবে কে জানে। এলেও এত দেরীতে ছবি দেখতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। সময় থাকলেও একলা বসে ছবি দেখতে সে কি পারত আজ?

বিজয়ের হঠাৎ কোন অসুখ বিসুখ কি দুর্ঘটনা?

তীব্র উদ্বেগের একটা বিদ্যুৎ-শিহর তুলেই দুর্ভাবনাটা মিলিয়ে যায়।

না, বিজয়ের সে রকম কোন কিছুই হয়নি সে জানে।

এতক্ষণ বাদে একটা গাড়ি তেল নেবার জন্যে পাম্পে এসে দাঁড়াবার পর আর কোন সংশয় তার মনে থাকে না।

গাড়িটা তার চেনা। তেল নিয়ে ও-গাড়ি তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে হয়ত হঠাৎ থামবে। যিনি চালাচ্ছেন তিনিই হয়ত জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলবেন, একি! আপনি এখানে? কোথায় যাবেন? আসুন পৌঁছে দিই।

তিনি হয়ত দরজাটা খুলে ধরবেন।

আর এই রোদে আবার হেঁটে বাড়ি ফেরার যন্ত্রণাটা কল্পনা করে সে নীরবে বিনা প্রতিবাদে গাড়ির ভেতর গিয়ে বসবে।
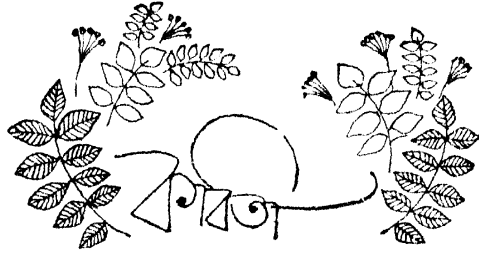
তারাই দুজন

বিষ্ণু দে

মনে হল : কেউ নেই, বিশ্বময় সমৃদ্ধ শূন্যতা,
তারা একা, মুখোমুখি পরিপূর্ণ তারাই দুজন।
অথচ মনেও হল : জলস্থল, আকাশ, মানুষ
সকলেই তলে তলে মনোযোগী, তাকায় তাদের দিকে
সমস্ত ভুবন।

ছেলেটির মনে হল। মেয়েটিরও মনে হল তাই।
এই মনে হওয়াটাই, বোধহয়, দেবার-নেবার,
হাতে হাতে সারা বিশ্ব ব্যেপে মহা ইন্দ্রধনু গড়া—
কিংবা ভিন্ন উপমায়—এর ওর শারীরিক-মানসিক
ক্যান্টিলিভার।

এদের যে মনে হওয়া, বিস্ময়, পুলক, অনন্যতাবোধ,
ঘনিষ্ঠের নবজন্ম, চৈতন্যের আরেক তীব্রতা—
এই সব স্তম্ভে স্তম্ভে ইস্পাতের জোড়ে জোড়ে বাঁধা তাই দেখি
পৃথিবীর, প্রকৃতির দীর্ঘ জয়যাত্রার ক্ষিপ্রতা।

ক্ষণস্থায়ী? হতে পারে। এদেরই একাগ্র স্নিগ্ধ
দিব্য আত্মস্থতা
ঈশ্বরের কাছে ক্ষীণ মানুষের, আপাতত, মৌল ঋণশোধ॥

দুটি কবিতা

সমর সেন

বৃষ্টি

ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি, চিলেরা চুপচাপ
রাস্তার কমে পিচের উত্তাপ।
মনের ঝামেলা কেন বাড়ে
ঝাপসা-তামাটে অন্ধকারে?
অনেকে বলছে চল্লিশের পরে
বাস করা ভালো মথুরা-নগরে।

১৯৫৬

নতুন পাতা

মৃত্যুর পরে সব শেষ;
কিছু আহা-উহু, বেশি দুর্নাম
চেলারা নতুন গুরুকে করে প্রণাম
বিধবার ঠোঁটে থাকে পানের রেশ।

১৯৫৬

এবং সবাই শুনল

অরুণ মিত্র

আমি যেতে না যেতেই ইছামতী অন্যদিকে ঘুরেছিল।
যত সূর্য তারই বুকে
প্রত্যেক আকাশের সব নক্ষত্রই তার বুকে;
তিমিরের মুহূর্ত থেকে আমি তার কাছাকাছি,
যখন বিদ্যুৎ চমকেছে বৃষ্টি পড়েছে তখন
যখন আগুন ঝরেছে তখনও।
তার সঙ্গে সংলগ্ন হবার জন্যে আমি নিজেকে
প্রস্তুত করেছিলাম।

সামনের অশ্বত্থপাতারা ঝিলমিল করলে
কিংবা পাতার আড়ালে হলদে পাখি ডাকলে
আমি সেই দিনটার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি,
অথবা ইঁটকাঠে যখন টান ধরেছে
বা রং বদলে তারা উদাসী হয়েছে
[illegible] আঁকড়েছি।

অথচ আমি একেবারে কাছে যেতেই ইছামতী ঘুরে গেল।

তারপর আমি ধুলোর উপর বসলাম
এবং, আশ্চর্য, সবাই শুনল
আমার মুঠোয় আলোর ঝুমঝুমি বাজছে
বালক বন্ধুরা এসে ঘিরে ধরল
জানতে চাইল রহস্যটা কি।
আমি কিছুই বলিনি
কেননা আমি তো শুধু এই বলতে পারতাম :
পুরোনো ডালপালা আর ঐ উঠোনটা দ্যাখো
এবং যে ইঁটপাথরগুলো ফেটে গিয়েছে তাদের শোনো।

সেই ছোট্ট জনতার পেছনে আমার মাকে এক সময় দেখো
আমি কিছুই বলিনি
কিন্তু একমাত্র আমার মা সব বুঝেছিল যেন।

এসো

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঝড় হয়ে গেছে
কয়েকটি বিস্বাদ গাছ
পাতা-ঝরা জবুথবু
বাতাসে তরঙ্গ ওঠে না
মেঘে-ঢাকা আকাশের ছেঁড়া-ছেঁড়া নীল
সবটা অমিল
—তবু এসো।

তারপর কোনো এক পাখি
বলবে : দেখবে জোনাকি?

মন এক কেরানীর ভীরু মন
দেহ এক অথর্ব শ্মশান
কামনার চিতা জ্বলে
নদীর নিটোল জলে
মুকুরিত ছায়া
—কৈশোর যৌবন আর বার্ধক্যের মায়া।

তবু এসো।
হিমানীর শ্বেত হোমশিখা
দেবে কি নতুন কৈশোর আর যৌবনের টিকা?
রক্তে আবার বেজে উঠবে কি সুর
অরণ্য সমুদ্র আর ঝড়ের ঘুঙুর?

তাই এসো
তবু এসো॥

তোমাকে যদি হারাই

দিনেশ দাস

চাঁদ দিল তোলা দুধের বাটিটি
দুদুবার উপুড় ক'রে তোমার বুকে।
সমুদ্র তার সমস্ত ফেনা
উজাড় ক'রে দিল তোমার দেহের ওপর।
তারার রাত্রি দিল
দুটি জ্বলজ্বলে তারা তোমার চোখে।
সূর্যোদয়ের জবা তোমার ঠোঁটে—
আর তোমার দেহের দীর্ঘছায়া কি আমি?

তোমাকে যদি হারাই
তা হ'লে আমি হারাব সমুদ্রকে,

আমি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বহু-ব্যবহৃত এ আকাশ
তোমার মনের দিকে তাই ত তাকাই
যেই আলো-ছায়া মেঘ পাই
তাতেই হৃদয়ে ফোটে ফুল রাশ-রাশ—
সুরভিত হয় তাতে মন।
না-ই বা করলে সব-কিছু সমর্পণ
আমি ত আমাকে পাই দেবতার মতো
যে দেবতা কবেই নিহত
যার স্থানে আমি।
তুমি স্থির থাকো হই আমিই আগামী
আমিই অতীত,
আমার নিশ্বাস নিয়ে বসন্তশরৎবর্ষাশীত
আসে যায়—আমার জীবন।
আমিই বিধাতা, তুমি মাত্র আয়োজন॥

আমরাও নক্ষত্র হয়তো

হরপ্রসাদ মিত্র

অনন্ত নিঃস্পন্দ এই মৃত্যুতোরা মৃত্যুরই অশন।
অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে সূর্যাস্তের উজ্জ্বল হিরণ।
শিকলে সুন্দরী তুমি,—মনে হচ্ছে, আমার মতন
আনন্দস্বরূপা,—কিংবা হয়তো শুধু সন্ধ্যার নিয়ন।
এ প্রাণাগারে তারা আলো যারা নিয়ত চমকে—
চেতনা উচ্ছল রাগে ঝলকে ঝলকে।

সত্যিই প্রাচীন এই প্রবৃত্তির মাধুরী শিকার।
বইছে রঙ্কিনী নদী,—চেয়ে আছে দুর্জয় পাহাড়।
খাঁচার জাগরী বুদ্ধি,—সে তো বহু বিবিধের দাসী
তারই শীর্ণ ঠোঁটে আজ দেখা দেয় হেমন্তের হাসি।
ক্রমশ উত্তুরে হাওয়া মনে হয়—
আসছেই, আসছেই!
কী দ্রুত ফুরোয় বেলা,—এই রূপ দেখতে-না-দেখতেই।

আমরাও নক্ষত্র হয়তো জ্বলছি বহু বিন্দুতে বিন্দুতে,
সত্যিই ঢেউয়ের দোলা উত্তাল এ-সময়সিন্ধুতে।
যেমন সূর্য বা চাঁদ,—গ্রহ-তারা আকাশে ছড়ানো।
এখানে মাটিতে দাঁড়িয়ে ঘুড়ি কিংবা পায়রা ওড়ানো,
নিজেকে বিস্তৃত করা—অন্তহীন এ-সম্প্রসারণে
সভ্য শিষ্ট বিবেচিত হতাহত এ প্রাণধারণে—
সুখ থেকে অবসাদে, ভয়েতে, সন্দেহে
কিংবা উত্তেজনা খুঁজে মহোল্লাসে ফিরতি টিকিটে
উঠছি দূরের ট্রেনে, ছুটি খুঁজছি ছুটতে ছুটতে—
একথা মানতেই হয়—

আর-এক যাত্রার ভূমিকা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বড় শূন্য ছিল সব। আবার উঠেছে ভ'রে। দরজা-জানালা
এখন সমস্ত দিন খোলা রয়।
এখন সংসার যেন বড়-বেশী ঝল্সিত। আলো
ভিতরে-বাহিরে। যেন সকলেই
দ্বিগুণ সজোরে হেসে কথা কয়। এখন সহসা
সকলে ভীষণ খুশী, সকলে ভীষণ ব্যস্ত। এখন কাহারও
দুঃখিত হবার বোধ বেঁচে নেই।

"হারু, কোথা যাও তুমি?" "বাজারে।" হারুর
পিছনে পরেশ। "তুমি কোথায় চলেছ
পরেশ?" "ফুলের খোঁজে।" "বাসু, তুমি?......
রঘু, তুমি?......বিমল, বিমল, তুমি কোথা যাও?"

সবাই ভীষণ ব্যস্ত। সবাই বাহিরে যায়। ঘরে আসে।
সবাই এখন
দ্বিগুণ সজোরে হেসে কথা কয়। আলো
ভিতরে-বাহিরে জ্বলে। অথচ আমার'
একটাও বলবার কথা নেই যেন। অথচ আমার
কোথাও যাবার নেই। অথচ আমার
দুঃখিত হবার বোধ, তাও নেই। অথচ আমার .....

"তুমিও কোথাও যাও, চলে যাও, তুমিও...তুমিও..."
কে যেন ভীষণ জোরে রক্তের ভিতরে
সমস্ত কিছুকে ভেঙে-মুচড়ে দিয়ে রক্তের ভিতরে
বলে ওঠে, "যাও!...
না-গেলে ফেরে না কেউ ঘরে।"

আলোর সভায়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যদি পারি আলোর সভায়
যাবো একবার। দেখবো প্রান্তরে জ্যোৎস্নাধারা
সজ্জিত মেয়ের মতো হৃদয়-উত্তাপে
উচ্ছ্বসিত কিনা। মেঘের সিঁড়িতে
প্রেমের কৌতুক চোখে নিয়ে
মগ্ন প্রেমিকের মতো
মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে চাঁদ দাঁড়িয়েছে কিনা।

এখানে নিঃসঙ্গ ঘর। ঠাণ্ডা বারান্দায়
অতিরিক্ত অন্ধকার; আসবাব, ঘরের দেয়াল
সবই সন্তপ্ত, বোবা। দেখা যায়
কণ্ঠলগ্ন অভিজ্ঞতা শর্বরীর সান্নিধ্যে উত্তাল।
দেয়ালে টাঙানো ফটোগুলি
বিবর্ণ, মলিন। পিতৃপুরুষের সেই বিরল মহিমা
ধূসরিত, ক্ষীণ। ভাঙা টবগুলো বারান্দায়
ঝরা পালকের স্মৃতি মুখেচোখে
লুপ্ত গন্ধ, বন্ধ্য ফুলহীন।

ঘর থেকে বেরোলেই বারান্দার শেষে
খোলা মাঠ, অবারিত নীল। এবং সেখানে
হয়তো জীবনব্যাপী ধৈর্যের নির্মাণে
সমগ্র প্রকৃতি ওঠে হেসে।

যদি পারি সেই মগ্ন আলোর সভায়
যাবো একবার॥

অন্ত্যেষ্টি

অরুণকুমার সরকার

দুহাতে ছিঁড়ছে চুল। বলছে, আর পারছি না, নেবাও
অদ্রাব্য আলোর ধূর্ত ক্রূর চোখ। বিষম বাজনা,
বিজোড় শব্দের রাশি স্তব্ধতার ধ্বনিতে ডোবাও।
আমি বড়ো অসহায়, নগ্ন, নিঃস্ব, অসুস্থ, অস্থির।

কিন্তু শুনছে না কেউ। তারস্বরে বাজছে দামামা,
নাকাড়া, জয়ঢাক, শিঙা মদমত্ত ঘোর স্বৈরাচারী।
চলছে উদ্দাম নৃত্য, অট্টহাসি, বিদ্রূপ, চীৎকার।
এবং মশাল জ্বলছে, অগ্নিকুণ্ডে লেলিহান শিখা।

তথাপি সে গান ধরল। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সুর।
হা-হা ক'রে হেসে উঠল নিশাচর অন্ত্যজ আক্রোশ।
চিত্রিত ফুলের পাপড়ি মুহূর্তেই কৃষ্ণবর্ণ হয়ে
ঝরে পড়ল একরাশ গন্ধহীন কিম্ভূত হতাশ।

হ্যাঁ, সেও স্বাধীন, তাই ঝাঁপ দিল স্বেচ্ছায় আগুনে।
নরমাংসলুব্ধ শত জিহ্বাদের লালাস্রাব হল।
[illegible]

চতুর্দোলা চড়ে ও

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

চতুর্দোলা চড়ে ও কে চলে গেল রাজার দুলালী,
পথের দুধারে লোক বুক চাপড়ে হা-হুতাশ করে,
সংসার কাঁদিয়ে গেল: ছলে-বলে কে ওরে ভুলালি-
ঘুমন্ত বাছারে তুলে নিয়ে যাস কোন স্বয়ম্বরে?

প্রগাঢ় তন্দ্রায় মগ্ন, স্নিগ্ধ মুখে চন্দনের সারি,
সর্বাঙ্গে ফুলের সাজ, বধূবেশে চলে স্বয়ম্বরা;
সেই মুখ, চোখ সব অবিকল, জাদুমন্ত্রে তারই
রুপোর কাঠিতে যেন প্রাণের পুত্তলি স্তব্ধ করা।

সাত-পুরু পালঙ্কের বুকে যার কোমল বিছানা,
বাঁশের দোলায় কেন সেই অঙ্গ রাখিস পিশাচী,
যে ওষ্ঠে ভ্রমর ঘুরতো, দেখো, সেই মুখে দেয় হানা
পুঞ্জ পুঞ্জ ছায়া ফেলে কয়েকটি বিবর্ণ কানামাছি।

ও যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে, ওকে যেতে দাও!
মত্ত হরিধ্বনি দিয়ে ভেঙো নাক স্বপ্নের কুহক;
ধীরে বও চতুর্দোলা, শব্দহীন, ওকে পৌঁছে দাও,
[illegible]

হৃদয়ের ঋতু

উমা দেবী

হৃদয়ের ঋতুরা কেমন এলোমেলো হাওয়ায় বিবাগী!
একটি রূপের নদী বয়ে যায় হৃদয়কে ঘিরে
পাঠায় ঢেউকে তার ছলছল আকাশের তীরে
—যেখানে সূর্যকে ঘিরে—সূর্যের বৃত্তকে ঘিরে
ফুলের তুলনা হয় বছর—ঋতুর পর্ণ ঝরায় নূতন ক'রে ক'রে—
আছে তার স্থিরতর পরিক্রমা
স্থিরতম পরিণামস্পৃহা।
মনের আকাশে শুধু এলোমেলো হাওয়ায় হাওয়ায়
ক্রমশ বিকল হয়ে বেদনার নীলরঙ ঢেলে ফেলে দুঃখের ছায়ায়!

হৃদয় দেহের অংশ। দেহ এই পৃথিবীর কণা—
তবে কেন—তবে কেন—ঘটে তার এই ব্যতিক্রম?
কেন গান জাগে তার চোখের সম্মুখে
নিপুণ নটের মত?
অথচ হারায় তার—হৃদয়ে এলেই—
সুরের ভঙ্গিমা যত অভিনয়-কলা ও কৌশল!

রঙ্গমঞ্চে যবনিকা ফেলা—
ওপারে কথার বেশ—টুকরো গানের সুর—
দ্রুতপদে চলার শব্দের
মনোরম সম্ভাবনা উজ্জ্বল আলোর আর সুবেশ দৃশ্যের—
যবনিকা যদি ওঠে—নামে কালো ছায়ার জোয়ার,
আনে দূর নক্ষত্রের কম্পমান আলোর কণিকা......
পাণ্ডু মুখচ্ছবি আর নিস্পৃহের স্তিমিত দৃষ্টির
অতলান্ত বিহ্বলতা—
গান......ছবি......অন্ধকার......ভাঙা আলো......বিমূঢ় সত্তা!

কেউ কারো পরিচিত নয়

দুর্গাদাস সরকার

কেউ কারো পরিচিত নয়। তবু একই সূত্রে যেন
সকলেই বাঁধা। আর গাড়ি-চাপা যে পড়েছে তার
বিকৃত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে একবার
নিজেকে সবাই। গাড়ি বদলের জন্য তৈরী কেন—
তার নির্মম উত্তর যদিও খোঁজে না, তৎক্ষণাৎ
গদী আঁটা বেঞ্চটাতে বসে, টিকিট নিজেই কাটে
তারপর কেউ যায় হাসপাতাল-আদালত-হাটে।
একমাত্র রক্তভোজী পোকাগুলি ফেরায় বরাত।

মাঝে মাঝে দেখা যায় চেনা মুখ। ঠিক এমনি চেনা
আমরা সবাই। যেন শহরের গোলমুখে বসে
এর বেশি প্রত্যাশিত নয়। যদি ভাগীদার হয়
রেসে কেউ বাজি জিতে, চক্রবৃদ্ধিহারে ধার্য দেনা
শোধ করে না কখনো—তাকে চিনে রাখে জনা দশে।

সূর্যমুখী প্রজাপতি

বটকৃষ্ণ দে

ছোটবেলায় ইচ্ছে ছিলো, বড়ো হ'য়ে হ'ব সূর্যমুখী,
সারাদিন সূর্য সহচর—তারই সাথে সাথে ঘোরা ঃ
অথচ, বয়সে, এই সংসারের শূন্য স্বয়ংবরা
কি দিল আমায়! আমি সূর্য-প্রিয় হ'তে পারি নি তো;
হয়েছি তারার কান্না, অন্ধকার ছায়ায় আবৃত
নিঃসঙ্গ করুণ মন, যাত্রী আমি বেদনাভিমুখী।

কৈশোরে ভেবেছিলাম, প্রজাপতি হ'লে বেশ হয়।
পালকে রৌদ্রের রেণু মেখে পত্রে-পুষ্পে, কচি ঘাসে
ভেসে, উড়ে-উড়ে বসা, সে এক পৃথিবী স্বপ্নাভাসে
বিভোর। অথচ, দ্যাখ, উত্তর-কৈশোরে অস্তমিত
সময়ের আবর্তনে, সে-কোমল অবুঝ হৃদয়;
আমি আজ কালের পথিক, যার অতীত বিস্মৃত!

যৌবনে হয় না হওয়া বাল্য বা কৈশোরের কিছুই,—
স্বপ্ন সব জীর্ণ জুঁই, ঝরে যায় যেই তারে ছুঁই॥

মৌমাছি মন

আরতি দাস

ছোট খোপে ভরা মউচাক
অবিরাম করি যাওয়া আসা,
মনে রাখি শ্রান্ত অলস
মক্ষিরাণীর ভালবাসা।
ফুল থেকে ফুলে
মধু খুঁজে খুঁজে ফিরি
কাঁটা বেঁধে ক্ষণেকের ভুলে,
ফিরে ফিরে গুন্ গুন্ গাই,
আমার এ মউচাক
মধু দিয়ে ভরা থাক এর সবটাই।
একে ওকে ডেকে বলি, দ্যাখ,
হুল দিয়ে ফুল বিঁধে মধুটুকু নিয়ে আসি
আমি কৃতী মৌমাছি এক।

ছিন্ন কবিতা

মানস রায়চৌধুরী

ফুলগুলি সুবাস হারিয়ে ওই পাথরে নিঃশব্দ পড়েছিলো।
হয়তো সেখানেই ওড়ে কার্পাসের ছিন্ন স্মৃতি, লুণ্ঠিত মালার
ঘন গন্ধ কার কণ্ঠ আজো ঘিরে আছে......

তুমি কি শুনেছো কিছু, যথাযথ বলে দিতে পারো?
বৃষ্টিদান করে মেঘ শেষবার প্রশ্ন করেছিলো—

নত আঁখি—কোথায় ইঁদারা? জলে অশ্রুভার রেখে
সহসা শব্দের সুর—"আমার গ্রীবায় কোনো গন্ধ নেই, শব্দ
ম্লান ক্ষত, শোণিতে কম্পিত,

তিনঘণ্টা বিচ্ছেদ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভালোবাসা ছিল কাল সন্ধেবেলা
এখন দুপুরে একটু বিরক্ত লাগছে
না হলে মাঝরাত অবধি আমাদের ভালোবাসা থাক্ না মুলতুবি
কিছুক্ষণ দুজনেই দূরে থাকি,
তুমি যাও ফিল্মে কিংবা রেস্তোরাঁয় বা বান্ধব মহলে,—
অথবা বাথরুমে গিয়ে গান গাও;
তিন ঘণ্টা কাটাবো আমি অন্য জায়গায়,
তুমি যাও,
না, চোখে থাকবে না নেশা, অথবা ক্লান্ত হবো না,
খুব ভালোবাসবো রাত্রে এসে।
এ বাড়ি নিলাম হবে যেন কাল,
এই খাট, আলনা, ঠোঁট, বুক, আলমারি
যেন কাল থাকবে না—এই ভেবে এ কি মারাত্মক আঁকড়ে থাকা
শরীরের নোনা ঘাম, এঁটো থুতু সারাক্ষণ স্বাস্থ্যকর নয়।
সন্ধ্যার আকাশ থাক,
দেখবো না পথে পথে নতমুখ মানুষের শোভা
একবার তবুও বাইরে;—নির্বোধ হুল্লোড় এত চতুর্দিকে
এর মধ্যে কিছু কি আনন্দ
খুঁটে তোলা যায় না কিংবা দেখা যাক ...
একলা থাকতে কি রকম লাগে—
কোথাও মানুষ আজ একা নেই,
যেন সাইরেনের শব্দে সকলেই হুড়োহুড়ি করে
একঘরে কাটাচ্ছে দিন, বুকের মধ্যেও একটু জায়গা নেই
খুব স্পষ্ট জানি।
অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে পুনশ্চ সিঁড়ির
উপরে দাঁড়িয়ে থাকা কোন এক পঙ্গু নিশাচর হাহাকার
কান ধরে টেনে রাখে;
সন্ধেবেলা কোথাকার তালাবন্ধ সদর দরজায়
দাঁড়িয়ে রয়েছি নিঃস্ব? তা হলে কি ফিরে যাবো
জুয়াড়ীর কপট জ্যোৎস্নায়—
সার্ট প্যান্ট এবং শরীরখানা খুলে রেখে বলে উঠবো আমি
বহুদিন কথা হয়নি, ঝিনুকের মধ্যে তুমি
কি রকম রয়েছো ভ্রমর?

দূরের দরজা

আনন্দ বাগচী

এখনো অপরাজেয় অপরাহ্ণ, হলদে-লাল বাল্বদের আলো
শব্দ ক'রে জ্বলে ওঠে তীব্রতায়, অফিস ছুটির পরে পরে
ট্রামের হ্যাণ্ডেল ছুঁয়ে বুক কাঁপে, রজনীগন্ধার ফেরীঅলা,
ফুটপাথে আরও সব দিনরজনীর চিহ্ন কাঁপে।
নির্বাসিত যুবরাজ ফিরে আসছে অপরাহ্ণ আলোকিত করে;
না-দেখা নদীর শব্দ, স্রোত, তার ভাটিয়ালী গান
পদাঘাতে চূর্ণ ক'রে মৃত্যু, অপমৃত্যু, আয়ুক্ষয়,
কীর্তিমান কেরানীরা ফিরে আসচে বিস্ফারিত নশ্বর বিকেলে।
হাতের কব্জীতে বাঁধা প্রাণ-ভোমরা, কোষমুক্ত তরবারী চোখে,
সম্মুখ সমরে স্বর্গ নানাদিকে অপেক্ষায় আছে
যৌবন এখনো বায়ামি শেষকৃত্য পথিমধ্যে হবে,
[illegible] বন্ধুজন,

জল, নদী, মাছ

জগন্নাথ চক্রবর্তী

জলে ডুবে আছে মাছ ডোবে না কিছুতে:
জল যেন মরুভূমি
বিতৃষ্ণ মাছের কাছে
জল যেন নীরোর বেহালা।

কঠিন রুদ্রাক্ষমালা আঙুলে ঘোরানো
এই শব্দে আর্দ্রতা কি স্রোতস্বতী নদী?
বাঁকে বাঁকে ঘুরে ফিরে সেই এক তরল কাহিনী—
নদী বলো?
স্রোত যেন অন্য এক স্থিতি,
দ্রুত পায়ে হেঁটে যাওয়া চলিষ্ণু বিরতি যেন,
নদী!

জলের সংসারে এসে তবে দেখ
ছদ্মবেশী বালুকণা কোটি কোটি
জল কাকে বলো?

নদীর স্বচ্ছতা এসে ঘিরেছে আমাকে
ধূসর ঢেউয়ের মতো,
আমি মাছ।

এত জল ক্রমাগত, ভাটিয়ালি জল,
কূলের উৎসব নিয়ে গরবিনী নদী।
আমি ডুবে আছি, তবু—
সারা জন্ম ডুবে আছি, তবু—
স্রোতের উৎসবে নেই, উৎসে নেই,
কূলে কিংবা কলস্রোতে, বর্ষার মৃদঙ্গে কিংবা
উৎসাহী জোয়ারে
আমি নেই, আমি শুধু
নামহীন, স্বাদহীন, বর্ণহীন জলে
ইতিহাসহীন এক আদিম নদীর স্রোতে
রুদ্ধ অবরুদ্ধ মাছ।

হয়তো বা এই নদী,
কারো কাছে;
হ'তে পারে, এরই নাম নদী:
ডাঙা থেকে যারা ডাকে তাদের গলার স্বরে মিশে
এই আর্দ্র মরুভূমি নদী হয়, হ'তে পারে।
কিন্তু আমি
সামান্য গরীব মাছ
ভাষাহীন, পরিভাষাহীন,
ইতিহাসহীন এক আদিম নদীর স্রোতে
অবরুদ্ধ।

অনেক দেখেছি ডুবে।
জলে ডুবে যদি দেখ,
জলে কোন নদী নেই—
শুধু জল:
স্রোতে কোন জ্বালা নেই, দাগ নেই,
শুধু জল।

আমি মাছ
জলে পড়ে আছি আমি, জলে পড়ে আছি,
জল যেন নীরোর বেহালা।

নিষ্কৃতি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

এখন তোমায় ছায়াপথে আসতেও বলি না—
এখন তুমি প্রেতচ্ছায়া শুধু,
কদাচিৎ কখনো তোমার তেজস্বিনী স্মৃতি
দিঘির পাড়ে উপর-নিচ মাটির সিঁড়ি ভাঙে,
কিন্তু তোমায় আমি দেখি নথিপত্র খুলে।

মাঝে-মাঝে সিজবৃক্ষে মনসামঞ্জরী
মনে করায়, মনে করায়, আমি
খুঁজতে গিয়ে দেখি তুমি খাটের নিচে অসাড়
জগদ্দল পাথর।

ভদ্রভাবে শোয়াতে যাই, হাতের মধ্যে তখন
পরস্ত্রী খরোষ্ঠী তুমি বরফ-গলা নদী।
দুস্তিল বালিশটাকে অশ্লীল দেখায়।

পিছুটান চমকে ওঠে, রেডিওগ্রাম খুলি,
(সিঁড়ির নিচে লুকোবো কি কল্পিত গুমখুন?)
যত্র-তত্র মধ্যাহ্নের ভোজন সেরে ফেলি,
গরম জলে স্নান করি না অনেক দিন হলো॥

জাগুয়ার

সুনীল বসু

ব্যাঘ্র-চর্ম পরিধানে, ড্রাগনের মুখ সিংহাসনে—
বসেছে সম্রাজ্ঞী দৃঢ়, লাবণ্যের গাঢ় দ্যুতি ঝলে।
কটা চুল, নীল চক্ষু, আঁটোসাঁটো দৃপ্ত দুটি স্তনে
যেন ধাতুর কাঠিন্য, শুয়ে আছে শান্ত করতলে—

দুটি পোষ্য জাগুয়ার, জ্বলন্ত তির্যক করাঙ্গুলে
লাল পাথরের শিখা, নখে রক্ত-রঙ সূচিচিহ্নিত;
দাঁড়িয়ে রয়েছে খোজা তলোয়ার কোষ থেকে খুলে,
ত্রস্থ বসতি, দূরে সিংহের গর্জন উদ্বেজিত।

সারাদিন ধ্বনি তোলে অশ্বক্ষুর, স্নিগ্ধ ওয়েসিস্‌
খর্জুর ছায়ায় স্থির, জেব্রা জিরাফেরা মালভূমি
চষে, শিম্পাঞ্জি বেবুন দোল খায় ডালে অহর্নিশ,
ক্ষিপ্ত নৃত্যে বাজে পাখোয়াজ, ঢাক, শিঙা, ঝুমঝুমি।

নেমে এলো তাম্র-দেহ, প্রায় নগ্ন নৃত্যে করে ঢিলা
বাঘছাল, হাতে নেয় অঙ্গারের ধোঁয়ানো ধুনুচি;
তার সঙ্গে নেচে ওঠে একপাল উদ্দাম গরিলা
ওই তনুর তন্দুরে রক্ত সেঁকে হতে চাই শুচি॥

একক

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উড়লো যখন মেঘের ফাঁকে শাদা রুমাল,
মন যে গন্ধে উধাও হ'লো দিগন্তরে।
এখানে কেউ এলো না। এই শূন্য ঘরের
অন্ধকারে কেবল ঘোরে তপ্ত হাওয়া,
আরাধনার মতন কিছু প্রতিধ্বনি।
আমার ঘুমে-জাগরণে প্রতিধ্বনি—
'তুমি কোথায়?'—'কোথায়,' বলে প্রতিধ্বনি,
'দেয়ালে কোন ব্যর্থ দিনের ব্যস্ত ছায়া?'

উড়লো যখন মেঘের ফাঁকে শাদা রুমাল,
ফুটে উঠলো, কাঁটার পরেও গন্ধসুধা।
বিদায়? সে তো ভীষণ গোলাপ! আর্ত ক্ষুধায়
ফুটলো আবার হারিয়ে-যাওয়া অন্ধকারে।
কোন দেবতা দিয়েছিলো দয়া ক'রে
তোমায় আমার স্বপ্নে, আমার ঘুমঘোরে
যেখানে রোজ নৌকা চলে স্রোতের দূরে?
সমস্তক্ষণ একা; কখন রাত্রি বাড়েঃ
জ্যোৎস্না ওড়ায় মেঘের ফাঁকে শাদা রুমাল!

সালোমি

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী

শালপ্রাংশু, চম্পাগৌর, সুঠাম যে তোমার হৃদয়
প্রেমের কুঠারে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করি,—ইচ্ছা হয়।
সেই তপ্ত, উৎসারিত, উজ্জ্বল শোণিতে ভরি আমার ভৃংগার।
রাজকন্যা সালোমি-র অনন্য শৃংগার।

জল্লাদ, অপেক্ষা করো কিছুক্ষণ। চম্পক-হৃদয়
প্রেমের সূচিকাঘাতে রক্তপদ্ম করি,—ইচ্ছা হয়।
দেখি সেই অবর্ণন আলিম্পন,—কণ্টকের মুখে মুখে গুণি
বিন্দু বিন্দু যন্ত্রণার অপর্যাপ্ত চূর্ণি।

অসহ্য সুন্দর তুমি দৃষ্টির গোচরে এলে। আমি অপারগ,
—যন্ত্রণার পুষ্প ক'রে ফোটাবোই অর্ধস্ফুট হৃদয়-কোরক।
ভোলাবো হাওয়ার দোলা, আকাশের নীল স্বপ্ন, মাটির মিনতি।
তোমাকে আমার কাছে এনেছে নিয়তি।

ছটফটে, জিজীবিষু, উড়ে-আসা প্রজাপতি তোমার হৃদয়
নিপুণ কৌশলে তার পক্ষ ছেদ করি,—ইচ্ছা হয়।
মৃত্যু-হাতে কেড়ে নিই চিত্রিত পাখনা-ভরা তার যতো সুখ।
রাজকন্যা সালোমি-র অনন্য কৌতুক॥

কখনও প্রসন্ন হলে

শংকর চট্টোপাধ্যায়

কে বলো আমাকে এই মৃত কাননের পার্শ্বে জন্ম দিয়েছিলে
নিষ্ঠুর ছলনা দেখি অতর্কিতে বক্ষে লাগে বিদায় তোমার
দশদিক শূন্য রেখে কোথা যাও, এ কেমন দণ্ড দিলে মাতা
এ হেন আবাস ছেড়ে চলে যাব এই কথা মিথ্যা মনে হয়।

এবং বিদীর্ণ স্বপ্নে কাৎরে উঠব মা, মা বলে প্রখর আহ্বানে
বিচ্ছেদ বিশাল হলে আকণ্ঠ গরল পানে শুয়ে রব মৃত
তোমাকে জননী বলে ডাকবে না কেউ আর ভয়ার্ত নিনাদে।

মাতৃহীন শব লয়ে চলে যাবে মধ্যবিংশ শতকের মেলা

নিবেদন ইতি
বিমল মিত্র

আগেকার সে-দিন আর নেই। বিপিনবাবুর সে চেহারাও এখন বদলে গিয়েছে। বিপিনবিহারী চক্রবর্তী। যারা বিপিনবাবুকে আগে দেখেছে তারা অফিস যাবার সময় এখনও দেখে। সেই ধুতিপরা, গলাবন্ধ কোট, কোটের ওপর চাদর। গলির ভেতর থেকে সকাল ন'টার সময় ভাত খেয়ে বেরিয়ে মোড়ের বড় রাস্তাটায় পড়েন। তারপর ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত যেতে দশ-বারো মিনিট সময় লাগে। মোড়ের মাথায় শচীনবাবুর বাড়ির রোয়াকে ছোট ছোট ছেলেরা বসে আড্ডা দেয়। ও-পাশে বিধুর মনিহারী দোকান। মনিহারী দোকানটার সামনে রাস্তার ওপরেই একটা বকুল গাছ। আগে ফুল হতো বকুল গাছটাতে। লাল-লাল মিষ্টি ফল হতো। এখন গাছটা মরো-মরো। কেউ আর যত্ন করে না। বিপিনবাবু যখন প্রথম এখানে বাড়ি ভাড়া নেন তখন বিধুর দোকানে মাসকাবারি বন্দোবস্ত ছিল। বিধুর দোকানের পাশেই লালার মুদিখানা। খাতা ছিল হিসেবের। চাল-ডাল-তেল-নুন-ঘি সব আসতো ধারে। খাতাটা দেখে মাস-কাবারি হিসেব শোধ করে দিলেই চলতো। এপাড়ায় তখন এত লোক ছিল না। লালা খাতির করে বসাতো দোকানে। তখন পিণ্টু ছোট। পিণ্টুকে নিয়ে বিপিনবাবু দোকানে সওদা করতে আসতেন। লালা বলতো—আসুন বড়বাবু, ভালো চাল এসেছে, নিয়ে যান—

সামনে একটা ছোট টুল পেতে দিত লালা। বলতো—বসুন এখানে, দ্বারভাঙ্গার নতুন ঘি এসেছে, দেব আধসের-টাক?

বিপিনবাবু বলতেন—না না ঘি-এর দরকার নেই, আমি বাটি আনিনি—

লালা পুরোন লোক। সুদূর কোন জয়পুর না মারোয়াড় থেকে ব্যবসা করতে এসেছে এই কলকাতার গলিতে। খদ্দেরের মতি-গতি বুঝে বুঝে তখন কারবার একচেটিয়া করে ফেলেছে। বলতো—বাটি না এনেছেন তো কী হয়েছে, আমি আধ-সেরা টিন দিচ্ছি আপনাকে—

তারপর হঠাৎ পিণ্টুর দিকে চেয়ে বলতো—এই লেও খোকা, ল্যাবেনচুষ লেও—

পিণ্টুও তখন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। লালা টিনের বাক্স থেকে লাল রং-এর একটা গুলি ল্যাবেনচুষ পিণ্টুর হাতে পুরে দিয়েছে। ভারি খুশী পিণ্টু।

বিপিনবাবু দেখতে পেয়েই কিন্তু রেগে উঠেছেন।

—ও কী করলে লালা? ওর হাতে লজেঞ্চ দিলে কেন? না না, ও দিতে হবে না—

তাড়াতাড়ি পিণ্টুর হাত থেকে লজেন্সটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে আবার লালার হাতে দিয়ে দিলেন। বললেন—না না, ওসব লোভ দেখানো ভালো নয়—

লালা বললে—তাতে কী হয়েছে বাবু, ছোট ছেলে, আমি না হয় একটা খেতেই দিলাম—

—না ওতে লোভ বাড়ে। ছোটবেলা থেকে পেয়ে পেয়ে লোভ বেড়ে যাবে ওর। তুমি নাও—আমি বলছি নাও—

প্রথমে লালা একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল। একটা সামান্য গুলি-ল্যাবেনচুষ এমন কিছু দামী জিনিস নয়। সবাইকেই অমন একটু ঘুষ দিয়ে তোয়াজ করতে হয়। কিন্তু বিপিনবাবু সে-দলের নন। লালা বললে—অমন কত জিনিসই তো ইঁদুরে-বেড়ালে খাচ্ছে বড়বাবু, ভালবেসে ছোটছেলের হাতে দিয়েছি, আপনি অমন করে কেড়ে নিলেন কেন?

বিপিনবাবু বললেন—না, ও-সব আমি পছন্দ করিনে লালা, ছোটবেলা থেকে ওই সব নিতে দিলে বড় হয়ে স্বভাব-

পিণ্টুর মুখ-চোখ তখন কান্নায় ভারি হয়ে উঠেছে। হয়ত কেঁদেই ফেলতো। কিন্তু বাবার ভয়ে তখন কেমন শিটিয়ে উঠেছে। বিপিনবাবু তাড়াতাড়ি মালপত্র নিয়ে এক হাতে পিণ্টুকে ধরলেন।

বললেন—চলো, হাত ধরে ধরে চলো, খুব সাবধান, সামনে নর্দমা আছে—

লালার দোকানের সামনে নর্দমাটা ডিঙিয়ে বাড়ির দিকে চললেন বিপিনবাবু।

এ-সবও একেবারে আগেকার কথা। সেই যখন বিপিন-বাবু এ পাড়ায় প্রথম বদলি হয়ে এলেন। বদলি হয়ে এলেন কলকাতার হেড অফিসে। চক্রধরপুর থেকে একেবারে কলকাতায়। কলকাতায় আসার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কলকাতায় কোনও দিন বাড়ি ভাড়া করে থাকবার সামর্থ্য হবে সে ধারণাই ছিল না তাঁর। চক্রধরপুরে নদীর ধারে শাল গাছের খুঁটি দিয়ে একটা ঘর তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন বিপিনবাবু। ভেবেছিলেন চক্রধরপুরেই জীবনটা বেশ কেটে যাবে চিরকাল। কিন্তু তখন নতুন বউ। ও দেশের ভাষা বোঝে না। নদীতে যখন বান আসতো তখন একেবারে বাড়ির উঠোন পর্যন্ত ভেসে যেতো। একবার ঘরের ভেতরে তক্তপোষের তলা পর্যন্ত বানের জল এসেছিল। তখন পিণ্টু সবে হয়েছে। ব্রিজের ওপারে অফিস। অফিস থেকে খবর পেয়েই বাড়িতে চলে এসেছিলেন বিপিনবাবু।

মিটফোর্ড সাহেব তখন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার।

সাহেব জিজ্ঞেস করেছিল—কেন? হোয়াই? এখন বাড়ি যাবে কেন?

বিপিনবাবু বলেছিলেন—স্যার নদীতে ফ্লাড এসেছে, আমার বাড়ি ডুবে গেছে—

—বাড়িতে কে আছে তোমার?

—আমার ওয়াইফ আছে, আর আমার সন্, আর কেউ নেই স্যার,—

বিপিনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে মিটফোর্ড সাহেবের আর কিছু বলবার মুখ রইল না। বললে—গো বাবু, গো—গো, কুইক—

নইলে হয়ত বিপিনবাবু কেঁদে ফেলতেন। প্রায় সেই রকমই মুখের চেহারা হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তখন বয়েস কম তাঁর। নতুন বিয়ে করেছেন। নতুন চাকরি সুরু করেছেন। নতুন করে বাড়ি-ঘর করে থাকবার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই নদীর ধারে সামান্য কিছু টাকা খরচ করে বাড়ি করেছিলেন। সেই বাড়িই যে একদিন বন্যায় ভেসে যাবে, তা জানতেন না। শেষ-কালে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়িতে গিয়ে দেখেন সর্বনাশ। জলে সব ডুবে গেছে। পাহাড়ী নদীর বান, কখন জল বাড়ে কখন কমে কিছুই বোঝা যায় না। সেদিন নিজে সেখানে গিয়ে না পড়লে বউকে আর বাঁচাতে পারতেন না। জলে বুক পর্যন্ত একেবারে ডুবে গিয়েছিল, আর সেই জলের ভেতরেই ছেলে কোলে করে বিন্দুবাসিনী তক্তপোষের ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল একলা।

হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার বলেছিল—খুব বেঁচে গেছেন মশাই আপনি—আপনার কপাল ভালো—

বিপিনবাবুর তখন বাড়ি গেছে। জামা-কাপড় বাসন-কোসন—যাবতীয় জিনিস বন্যায় ভেসে গেছে। টাকা-পয়সা নেই একটা হাতে। অফিসের লোক-জন বন্ধু-বান্ধব সবাই এসেছিল দেখতে। তারা বললে—আমরা তখনি বললুম, নদীর ধারে বাড়ি করবেন না, নদীর ধারে বাস ভাবনা বারোমাস—

নেই। কেউ সে-কথা মুখ ফুটে বললেও না একবার। অথচ বাজারের সামান্য একজন হিন্দুস্থানী মুদী, সেই এসে সেদিন আশ্রয় দিয়েছিল। বলেছিল—সে কি বাবু, আপনি আমার এখানে থাকুন, আমার তো নিজের ঘর রয়েছে—

বলে নিজের ঘরে এনে তুলেছিল বৃন্দাবন। বৃন্দাবন সাউ। বাজারের এ'দো গলির মধ্যে মুদিখানার দোকান ছিল তার। চক্রধরপুরের সেই বৃন্দাবন সাউ-এর দোকান থেকেই সংসারের জিনিসপত্র কিনতেন বিপিনবাবু। জিনিস কিনতেন, দাম দিতেন। এখানে এই লালার সঙ্গে যে-সম্পর্ক সেইটুকুই সম্পর্ক ছিল, তার বেশি নয়। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাকার কোন্ বিদেশী দোকানদার, সেই রাত্রেই বিপিনবাবুর জন্যে ঘর খালি করে দিয়েছিল। নিজের বিছানা, বাসন, কম্বল, তোষক সব দিয়েছিল। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে বিন্দুবাসিনীকে টাঙ্গায় তুলে নিয়ে এসেছিল। বিন্দুবাসিনী তখনও কিন্তু থর-থর করে কাঁপছে। কপালটা তখন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে সেই রাত্রে দুধ এনে গরম করে খাইয়ে দিয়েছিল। বিপিনবাবুর খাওয়ার রুচি ছিল না। তাঁকেও ডাল-রুটি খাইয়ে দিলে বৃন্দাবন সাউ।

কৃতজ্ঞতায় তখন বিপিনবাবুর বুকটা ভরে উঠেছে। বললেন—তোমাকে আমি যে কী বলে ধন্যবাদ দেব বৃন্দাবন—

বৃন্দাবন রেগে গিয়েছিল। বলেছিল—আপনি কথা বলবেন না, চুপ করুন—

সত্যিই তখন গোলমাল করবার সময় নয়। বিন্দুবাসিনীর অবস্থাও তখন সুবিধের নয়। সবাই বিনিপবাবুকে বকেছিল খুব।

—আপনি আচ্ছা মানুষ তো মশাই, বউকে একলা ছেড়ে নিজে আপিস করছেন? টাকাটাই বড় হলো আপনার কাছে? যদি আপনার ছেলে-বউ মারা যেত তো টাকা নিয়ে ধুয়ে খেতেন?

আশ্চর্য কাণ্ড! আশ্চর্য কাণ্ডই বটে। যারা জীবনে কখনও বিপিনবাবুকে একটা টাকা দিয়ে সাহায্য করেনি তার বিপদের দিনে তারাই শেষকালে উপদেশ দিয়ে উপকার করতে এল। মুখের কথা দিয়ে উপকার। অথচ যখন বাড়ি ছিল না, থাকবার জায়গা ছিল না, তখন অফিস থেকে লোন নিয়ে ওই খাবরাব ঘর তৈরি করেছিলেন। বাড়ি না বাড়ি, পায়রার খোপ। কিন্তু নিজের বাড়ি তো! নিজের বাড়ি বলতে কত আরাম। অফিসের মধ্যে একমাত্র বিপিনবাবুরই নিজের বাড়ি ছিল। নিজের বাড়িতে নিজে ঘরামিদের সঙ্গে খেটেছেন। নিজে কর্নিক ধরেছেন, নিজে চুন-সুরকি ঘেঁটেছেন। ছুটির দিন সকাল থেকে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাড়ি করিয়েছেন। সে যে কী আনন্দ! বাড়ি করা তো নয়, যেন নিজেকেই নতুন করে গড়ে তোলা। যা তিনি হন-নি, যা তিনি হতে পারেননি, তাই হওয়া। বাড়ির প্রত্যেকটা ইটের সঙ্গে যেন তিনি নিজেকে গড়ে তুলতেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বাড়িও চলে গেল। নিজেও সেই সঙ্গে গেলে ভাল হতো। নিজের হাতে গড়া বাড়ি চলে যাবার পর আর বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু তবু তখনও স্ত্রী আছে, ছোট ছেলেটা আছে। তখন থেকে তাদের জন্যেই বাঁচা। তখন থেকে পিণ্টুর জন্যেই বেঁচে আছেন বিপিনবাবু।

তারপর কলকাতায়। আসলে কলকাতায় নয়, শহরতলীতে। এ জায়গাটা বলতে গেলে শহরই নয়, শহরতলীও নয়। শহরতলীর অপভ্রংশ। যখন এ-পাড়ায় প্রথম এসেছিলেন বিপিনবাবু, তখন অপভ্রংশই ছিল এ জায়গাটা। রাত্রে শেয়াল ডাকতো। বাস থেকে নেমে মাঠ কাদা ভেঙে যখন বাড়িতে ঢুকতেন বিপিনবাবু, তখন এক বালতি জল লাগতো পা-ধুতে। তারপর আস্তে আস্তে এখানে ওখানে একটা দুটো বাড়ি হলো। একটু একটু করে লোক আসতে লাগলো। চেনা-শোনা হতে লাগলো। সেই সময়েই বিধুর দোকানটা হয় ওখানে। আর কোথা থেকে এসে জুটে গেল লালা। একটা নুন-ময়লা ধুতি পরনে, খালি গা। গোটাকতক সাবানের খালি বাক্সতে মালপত্র নিয়ে চালা বেঁধে বসলো। তখন আর জিনিস কিনতে দূরে যেতে হয় না। তখন রাত্রে অত ভয়ও করে না। পাশেই একটা পুকুর ছিল। সেই পুকুরের জলেই কাপড়-কাচা, সাবান-কাচা চলতো। খাবার জলটা বিপিনবাবু নিজে প্রথম প্রথম দেড়-মাইল দূরের মোড়ের মাথার কল থেকে নিয়ে আসতেন। তারপর যখন বসতি হলো ভাল করে তখন বাড়িওয়ালা ভাড়াও বাড়িয়ে দিলে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকেও একটা টিউবওয়েল করে দিলে সকলের জন্যে।

সেই চক্রধরপুরের সাহেবই বলেছিল—চক্রবর্তী, তোমার ফ্যামিলিতে কে আছে।

বিপিনবাবু বলেছিলেন—আজ্ঞে, আমি, আমার ওয়াইফ আর আমার একটা দু-মাসের সন্—

—তুমি কলকাতায় যাবে!

বলে বিপিনবাবুর মুখের দিকে চেয়েছিলেন!

কলকাতা! কলকাতায় যাওয়ার কথা কখনও ভাবেননি বিপিনবাবু! কলকাতায় বড়লোকেরা থাকে। সেখানে কি বিপিনবাবুর মত লোকেরা থাকতে পারে! কলকাতা সম্বন্ধে বিপিনবাবুর দুরাকাঙ্ক্ষা কখনও হয়নি। ওটা মনের চিন্তাতেও বরাবর নাগালের বাইরে ছিল। বড়লোক ছাড়া কলকাতায় কেউ থাকে নাকি! পুরুলিয়া চিনতেন বিপিনবাবু! পুরুলিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তিনি ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টায়। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে চিরকালের মত বিচ্ছেদ টেনে দিয়ে চলে এসেছিলেন। তারপর এই চাকরি। এই চাকরিতেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন। কিন্তু আবার তাঁকে যে একদিন কলকাতায় আসতে হবে তা তাঁর বিধাতা-পুরুষও বোধহয় আগে ভাবতে পারেননি।

পঞ্চাননবাবু বলেছিলেন—সে কি মশাই, এ অপরচুনিটি ছাড়তে আছে? আমাকে এ-চান্স দিলে আমি চলে যেতুম!

বিপিনবাবু বলেছিলেন—কিন্তু কলকাতাতে তো আমার জানাশোনা কেউ নেই? কোথায় থাকবো? সে যে বড়লোকদের জায়গা—

সত্যি, সাহেবের বোধহয় দয়াই হয়েছিল। সাহেব ভেবেছিল এ লোকটা নিরীহ মানুষ। জীবনে উন্নতি করবার সহজ পথটাও এ-লোকটা আয়ত্ত করতে পারেনি। নির্লজ্জ খোসামোদ, হীন চাটুকারবৃত্তি, কিছুই শেখেনি। সাহেবকে মুহুর্মুহু সেলাম করেও যে কার্যোদ্ধার করা যেতে পারে, সেই নিখরচার সস্তা খোসামোদটাও কখনও ব্যয় করেনি এ-লোকটা। বোধহয় তাই দয়া হয়েছিল। হয়ত শ্রদ্ধাও হয়েছিল। বাঙালীবাবুদের মধ্যে ঠিক সচরাচর এমন উদাহরণ আগে কখনও নজরে পড়েনি সাহেবের! হেড অফিস থেকে যখন লোক চেয়ে চিঠি এল, তখন সাহেব বিপিনবাবুকেই পছন্দ করে পাঠিয়ে দিল।

পঞ্চাননবাবু বলেছিলেন—আপনি আর গাঁইগুঁই করবেন না মশাই, ছেলে মানুষ করতে হলে কলকাতায় যাওয়ার চান্স ছাড়বেন না—অমন কাজটি করবেন না, নিজের আখের নষ্ট করবেন না—

বিপিনবাবু তবু একটু ভয় পেয়েছিলেন—সেখানে গিয়ে কোথায় উঠবো আমি? আমার যে জানাশুনো কেউ-ই নেই?

এই-ই হলো বিপিনবাবুর কলকাতায় আসার বিবরণ।

একদিন যখন হাওড়া স্টেশন, চৌরঙ্গী, ভবানীপুর, আলো-ট্রাম-বাস দেখতে দেখতে এই বাদামতলায় এসে ঠেকে গিয়েছিলেন, তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য, এই-এর নামও কলকাতা! একেও কলকাতা বলে! একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে একেবারে সোজা এসে উঠেছিলেন এই বাড়িতে। পাঞ্জাবী ড্রাইভার আর বেশি দূরে ভেতরে ঢুকতে চায়নি। সোয়ারী মালপত্র রাস্তার ওপর নামিয়ে দিয়েই ভাড়া আদায় করে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

বাড়ির মালিক বড় সাদাসিধে মানুষ। বিধবা। বন-জঙ্গলের মধ্যে একদিন স্বামীর একটা বাড়ি তৈরি করবার ইচ্ছে ছিল। তখন সে-ভদ্রলোক কল্পনাও করেননি যে কলকাতা শহর আবার একদিন এই এখানে এসে ঠোক্কর-খাবে। ছেলে-মেয়ে নেই বুড়ির। স্বামীও নেই। আত্মীয়-স্বজন নেই। সন্ধ্যেবেলাতেই দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকে। আর নিজের মনেই বিড়-বিড় করে।

বুড়ি বলে, বুড়ো মরেছে আমার হাড় জুড়িয়েছে বউ, বুড়ো বড় কষ্ট দিয়েছে, একটা পয়সা হাতে দিত না কখনও এমনি চামার ছিল—

মা বলতো—তিনি মারা গেছেন তাঁর নামে অমন করে বলবেন না দিদি—

বুড়ি রেগে যেত। বলতো—কেন বলবো না শুনি? বিয়ে করা বউকে যদি বিশ্বাস না করতে পারো তুমি তো বিয়ে করেছিলে কী করতে শুনি? আমি কি তোমার বাঁধা মেয়ে-মানুষ, যে আমার হাতে পয়সা দিয়ে বিশ্বাস করতে পারো না? আমি কি তোমার পয়সা খেয়ে ফেলবো? আমি তোমার পয়সা নিয়ে সঙ্গে যাবো?

তারপর একটু থেমে বলতো—তা এখন সে-পয়সা কোথায় গেল শুনি? যাবার সময় পয়সা তোমার সঙ্গে গেছে? সেই তো ছেঁড়া-কাঁথায় শুয়ে শ্মশানে যেতে হলো? তখন তো তোমায় কেউ সোনা-দানা দিয়ে মুড়ে দিলে না। তা আমিও তেমনি, বউ, আমিও তিন টাকা বারো আনার একটা আধলা বেশি খরচা করিনি!

—তা শ্রাদ্ধ-শান্তি কিছু হয়নি?

বুড়ি বলতো—তুমিও যেমন বউ। মুদ্দোফরাসের আবার ছেরাদ্দ! মানিষ্যি ছিল না তো সে, মুদ্দোফরাস! যদ্দিন বেঁচে ছিল, কেবল হাড়-মাস জ্বালিয়ে খেয়েছে গা! বুড়ো মরেছে, আমি বেঁচেছি বউ! আমার হাড়-মাস একেবারে ভাজা-ভাজা হয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যেবেলা বই নিয়ে পড়তে পড়তে কথাগুলো কানে আসতো পিণ্টুর।

মা রান্না করতো রোয়াকের ওপর। অন্ধকার হয়ে আসতো চারদিকে। একটা ছোট হারিকেনের আলোর সামনে বসে-বসে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেত! আশে-পাশে তখন কেবল ঘেঁটু আর কালকাসুন্দির বন। কয়েকটা ছাড়া-ছাড়া নারকোল গাছ। ডোবা পুকুর। আর কয়েকটা ছাড়া-ছাড়া বাড়ি। অন্ধকার রাত্রে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ এক-একবার শেয়ালের ডাক শোনা যেত। অনেক দূরে কোথায় চণ্ডীতলা না বাঁশধানি থেকে আওয়াজটা আসতো। ওদিকে কোথায় একটা শ্মশান ছিল। মাঝে মাঝে দেখা যেত মড়া কাঁধে করে নিয়ে কারা ওই দিকে যাচ্ছে। হাতে হারিকেন-লণ্ঠন, কাঁধে গামছা। মড়া নিয়ে যাবার সময় মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন ক্ষেপে গিয়ে গলা ছেড়ে সবাই চিৎকার করে উঠতো—বলো হরি, হরি বো...ল...। আর অন্ধকারে ঘুম ভেঙে গিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখে নিত পিণ্টু। সব দরজা-জানালা আঁটা। কোথাও চোর ঢোকবার কোনও উপায় নেই। এক পাশে বাবা ঘুমোচ্ছে, আর এক পাশে মা। দুজনেই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দুজনের মাঝখানে শুয়ে পিণ্টু যেন নিশ্চিন্ত নির্ভয় হবার চেষ্টা করতো।

—এই খোকা, খোকা!

বড় রাস্তায় বাস রাস্তার কাছে কয়েকটা দোকানপাট। মুড়কি বাতাসার দোকান, তেলেভাজার দোকান। একটা বুড়ো শিবের পুরোন ভাঙা মন্দির। সাইকেল-রিক্সাগুলো ওইখানে এসে বাসের প্যাসেঞ্জারদের জন্যে প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ করে। বাদামতলার এই দিকটা বেশ লোকজন, বেশ সোরগোল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেকখানি কাদা মাড়িয়ে এখানে এসে আরাম। এখানে এসে অনেক লোকের মুখ দেখে যেন স্বস্তি পায় পিণ্টু। সব জিনিসকে ভালো করে দেখে চোখের আশ মিটিয়ে নেয়। একটা ঘোড়ার গাড়ি, দুটো সাইকেল রিক্সা, কয়েকটা বাক, খাবারের দোকান, বাস, সব যেন নতুন ঠেকে। স্কুলে যাওয়া আসার সময় সব চেয়ে দেখে নতুন চোখ দিয়ে।

—এই খোকা!

ভাঙা একটা টিনের চালের চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চির ওপর একটা লোক বসেছিল। বসে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। পিণ্টু চেয়ে দেখলে।

—আমাকে ডাকছেন?

—কোথায় বাড়ি তোমার খোকা? নাম কী?

বাদামতলার দক্ষিণপাড়ায়। দক্ষিণপাড়ায় শুধু জঙ্গল। তা সবাই জানে। পিণ্টু রাস্তা পেরিয়ে কাছে এল। লোকটা একটু সরে বসে জায়গা করে দিলে। হাত দিয়ে বেঞ্চির ধুলো ঝেড়ে দিয়ে বললে—বসো এখানে, ইস্কুলে গিয়েছিলে বুঝি?

পিণ্টু বসলো না।

—কাদের বাড়ির ছেলে তুমি ভাই? বাবার নাম কী?

তারপরে আদর করে পিঠে হাত বুলোতে লাগলো লোকটা।

—বেশ, বেশ, বেশ চালাক ছেলে তো তুমি। আমিও ওই ইস্কুল থেকে পাশ করেছি। বেশ ভালো করে পড়বে, মন দিয়ে লেখা-পড়া করবে ভাই। লেখাপড়া না করলে জীবনে কিছুই হবে না। এই দেখ না, লেখাপড়া করেছি বলে আমি এখন এত বড় হয়েছি, মানুষ হয়েছি, বুঝলে?

লোকটা ভারি ভালো। এমন করে কেউ এর আগে কথা বলেনি পিণ্টুর সঙ্গে। কথাগুলো বলে দাঁত বার করে হাসতে লাগলো লোকটা। দাঁতগুলো কালো। বাড়িওয়ালী মাসিমার যেমন কালো দাঁত তেমনি। ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে কয়েকবার ফুঁ দিয়ে দাঁতে কামড়ালো। তারপর দেশলাই ধরালো। বললে—রাস্তায় ছেলেদের দেখলেই আমি মন দিয়ে সবাইকে লেখাপড়া করতে বলি। আরে বাবা, লেখাপড়া না শিখলে ওই লোকটার মত গরু হবে, ওই যে ওই লোকটা—

বলে সামনের একটা রিক্সাওয়ালাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

—যাও, এবার বাড়ি যাও, বলে লোকটা পিঠে হাত বুলিয়ে ঠেলে দিলে। পিণ্টু উঠলো। তারপর চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু লোকটা আবার পেছন থেকে ডাকলে—খোকা, শোন, একটা জিনিস নেবে?

বলে নিজের ট্যাঁকে হাত দিলে। পিণ্টু দেখলে কোমরে একটা ঘুনসি। কালো সরু সুতো কোমরে জড়ানো। সেই ঘুনসিতে কী একটা ঝুলছে। সেটা দেখিয়ে লোকটা বললে—এটা নেবে? এটা তোমাকে দিতে পারি।

জিনিসটা কী তা বুঝতে পারলে না পিণ্টু। ভালো করে কাছে গিয়ে চোখ নামিয়ে দেখলে।

—এটা বনমানুষের হাড়, তোমায় আমি দিতে পারি এটা।

পিণ্টু অবাক হয়ে গেল। বনমানুষের হাড় নিয়ে কী

—এটা বনমানুষের হাড়, তোমায় আমি দিতে পারি এটা।

করবে সে! কিন্তু বনমানুষের হাড়ের সঙ্গে মানুষের হাড়ের তফাৎটা কী? কিছুই তো বোঝা যায় না। পিণ্টু জিজ্ঞাসা করলে—এটা দিয়ে কী হবে?

লোকটা বললে—এগজামিনে ফার্স্ট হওয়া যাবে! আমি অনেককে দিয়েছি এটা, সবাই ফার্স্ট হয়েছে, আমিও ফার্স্ট হয়েছিলুম। পড়তে হবে বটে, কিন্তু একবার যা পড়বে, সব মুখস্থ হয়ে যাবে।

পিণ্টু এতক্ষণে লোকটার আপাদ-মস্তক আবার ভালো করে দেখতে লাগলো। কী অদ্ভুত লোকটা! বাইরে থেকে বোঝাই যায় না যে এই মানুষের কাছে এত দামী একটা জিনিস রয়েছে। লোকটা তখনও কালো দাঁত বার করে রয়েছে।

পিণ্টু বললে—ওটা দিয়ে দিলে আপনি নিজে কী করবেন?

—আরে আমার তো এগজামিন দেওয়া হয়ে গেছে, আমার আর কীসের দরকার; আমি এগজামিনের গুষ্টি পাশ করে বসে আছি—বলে লোকটা হাসতে লাগলো নিজের রসিকতায়।

—তোমার কাজে লাগবে তাই তোমাকে দিচ্ছি—বলে হাত দিয়ে নাড়াতে লাগলো হাড়টা।

পিণ্টু হাত বাড়িয়ে বললে—দিন তাহলে—

—এমনি দিলে তো চলবে না, পুজো দিতে হবে যে। মা-কালীর পুজো না দিলে তো ফল ফলবে না ভাই—

—তাহলে পুজো কবে করবেন?

লোকটা বললে—আজ বলো আজই করতে পারি, কাল বলো কাল। পুজোর খরচটা শুধু তোমাকে দিতে হবে। নিয়ম যে তাই। যে ধারণ করবে, তাকেই পুজোর খরচ দিতে হয়—

—কিন্তু আমার কাছে তো পয়সা নেই।

—আজ না দিতে পারো কাল দিও, কাল দিলেও চলবে, বেশি লাগবে না তোমার, পাঁচটা টাকা দিলেই চলবে!

পিণ্টু চমকে গেল। পাঁচ টাকা! পাঁচটা টাকা কোথায় [illegible] বাবা রেগে যাবে। আর মা?

পিণ্টু বললে—পাঁচ টাকা আমি তো দিতে পারবো না—বাবা দেবে না!

—তাহলে মার কাছে চাইবে! এতে আমার নিজের তো কোন লাভ নেই, নিজের জন্যে তো আমি নিচ্ছি না,—মাকে চুপি চুপি বলবে, যেন বাবা না জানতে পারেন—

পিণ্টু নিজের মনে ভেবে নিয়ে বললে—মার কাছে টাকা থাকে না—মা দেবে না—

—তাহলে বাবার জামার পকেট থেকে তুলে নিও, কেউ জানতে পারবে না। তোমার বাবা ভাববে রাস্তায় কেউ পকেট-কেটে নিয়েছে, বুঝলে? আর এটা তো আসলে চুরি হলো না, মা-কালীর পুজো দেওয়া কি চুরি? ভগবানকে দেবার জন্যে চুরি করলে কোনও পাপ হয় না। আর যদি পাপই হতো তো আমি কি তোমাকে তা করতে বলতে পারতুম?

পিণ্টু যেন কথাটা বুঝতে চেষ্টা করলো। অথচ যেন ঠিক পুরোপুরি বুঝতেও পারলে না।

পিণ্টু চলেই আসছিল। লোকটা মনে করিয়ে দিলে—কালকে ঠিক এইখানটায় বসে থাকবো আমি, কেমন? চিনতে পারবে তো? এই সাইন-বোর্ডটা চিনতে পারবে? কালীমাতা হার্বাল হোম—

পিণ্টু এই প্রথম ভালো করে সাইনবোর্ডটার দিকে চেয়ে দেখলে। হলদে জমির ওপর মোটা-মোটা লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে—কালিমাতা হার্বাল হোম, বাদামতলা। প্রোঃ ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম-এ বি-এল।

বিপিনবাবু তখন বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। গুছিয়ে নিয়েছেন মানে কলকাতা তখন তাঁর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। একদিন যে বাদামতলায় কাদা ভেঙে ট্যাক্সি চড়ে এসেছিলেন, তখন আর সে বাদামতলা নেই। সে কাদা তখন মুছে গেছে। অফিস থেকে ছুটির পর [illegible] করে বাসে ওঠেন। প্রথমটা

একটু কষ্ট হয়। বাসে জায়গা হবে কি হবে না। বিপিনবাবুর মত অনেকেই বাস-রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অফিসের বাবুরা বিপিনবাবুকে নিয়ে ঠাট্টা করে। চক্রধরপুর থেকে আসার পর একটু ভয় হয়েছিল। কলকাতায় নতুন আসা। রাস্তা-ঘাট কিছুই চিনতেন না। সেখানে ছিল ছোট অফিস। এখানে অনেক বড়, ছুটির সময় ডালহৌসি স্কোয়ারের অফিসের গেট দিয়ে পিলপিল করে লোক বেরিয়ে যায়। তারপর অকূলে সমুদ্র। সেই সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকেন বিপিনবাবু। তাঁর মনে হয় কলকাতাটা যেন শহর নয়, মস্ত একটা সমুদ্র। সমুদ্র অবশ্য দেখেন নি বিপিনবাবু। পুরুলিয়ার মানুষ, চক্রধরপুরে এসেছিলেন পালিয়ে। সেখানেই জীবন কেটে যেত। কিন্তু কোথা থেকে কী যে হলো। নদীর ধারের বাড়িটা বানে ভেসে গেল, আর এখানে বদলি করে দিলে তাঁকে। অথচ বদলি তো তিনি হতে চাননি। বদলি মানেই তো ঝঞ্ঝাট। নতুন করে আবার গুছিয়ে বসতে হয়, নতুন করে আবার সেই জায়গায় শেকড় গজাতে হয়।

পশুবাবু জিজ্ঞেস করেন—তাহলে এলেন কেন এখানে?

'টার্নবুল এন্ড জনসন' কোম্পানীর ক্যাশ সেকশানের হেড-ক্লার্ক আশুবাবু কখন রাতারাতি পশুবাবু হয়ে গেছে। সে মান্ধাতার আমলের কথা।

বিপিনবাবু বলেন—আমার কি আসবার ইচ্ছে ছিল মশাই? সবাই যে বললে কলকাতায় এলে ভাল হবে।

নীরদবাবু বলেন—আগে হলে ভালো হতো, সে-দিনকাল কি এখন আছে। আগে সোনার কলকাতা ছিল মশাই আমাদের। আগে অফিসে আসতেও ভালো লাগতো। নামটা সই করে বড়বাজারে বাজার করতে গেছি। মোহনবাগানের খেলা দেখতে গেছি। কেউ কিছু বলেনি—

তা সে-কালের কথা বেশি শুনলে বিপিনবাবুর কষ্ট হতো। যখন চক্রধরপুরে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তখন একটা থার্ড ক্লাশের টিকিট কেটে কলকাতার দিকে এলেই ভালো হতো! এতদিনে একটা নিজস্ব বাড়ি হয়ে যেত এখানে। একখানা ঘর ভাড়া দিলেও মোটা টাকা উপায় হতো।

—তখন পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেয়ে মেয়ের বিয়েতে দু' ~~হাজার~~ টাকা নগদ দিয়েছি জামাইকে। এখন তিন শো টাকা মাইনে পেয়েও বউ-এর অসুখ হলে ডাক্তার ডাকতে পারি না —কী দিনকাল পড়েছে যে!

বিপিনবাবু বলেন—আগে তো এ-সব জানতুম না, এখানে এসে সব উল্টো দেখছি, এখানে ছেলে মানুষ করাই বিপদ। জানেন, কী হয়েছিল আমার ছেলের? মশাই, একজন জোচ্চোর আমার ছেলেকে ঠকিয়ে টাকা নেবার চেষ্টা করেছিল।

—কী রকম? কী রকম? সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠলো।

—বলে কি না বনমানুষের একটা হাড় আছে তার কাছে, পাঁচটা টাকা দিলে সেইটে দেবে সে।

—বনমানুষের হাড় নিয়ে কী হবে?

—ভগবান জানে! আমার পকেট থেকে টাকা নেবার চেষ্টা করেছিল। আমি ঠিক সময়ে দেখতে পেলুম তাই রক্ষে!

—তারপর? নীরদবাবু চমকে উঠেছেন।—তারপর কী করলেন? পুলিসে ধরিয়ে দিলেন না কেন? সর্বনাশ কান্ড!

বিপিনবাবুর ক্যাশের কাজ। লক্ষ-লক্ষ টাকার আমদানি হয় টার্নবুল এন্ড জনসন কোম্পানীর ক্যাশ অফিসে। সেই ক্যাশ মিলিয়ে প্রতিদিন খাতায় জমা করতে হয়। বিপিনবাবু একলা নন। নীরদবাবু আছেন, হরিচরণবাবু আছেন, কেদারবাবু আছেন। অনেক লোক। লোকও অনেক, কাজও তেমনি অনেক। লোকের চেয়ে কাজই বেশি। কাজ করতে করতে পৃথিবী ভুলে যেতে হয়। এই ক্যাশ-অফিসের বাইরেই যে একটা জগৎ আছে সেটার কথাও ভুলে যেতে হয়। ওই বাড়ি যাবার সময়েই মনে পড়ে পিণ্টুর কথা, মনে পড়ে স্ত্রীর কথা। তখন আবার সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। তখন ছেলের স্কুলের কথা মনে পড়ে যায়, ছেলের ভবিষ্যতের কথা মনে পড়ে যায়। সেদিন লেজার মেলাবার পর মোট অঙ্ক দাঁড়ালো চব্বিশ হাজার তিন শো সাঁইত্রিশ টাকা দশ আনা তিন পাই। শেষ অঙ্কটা খাতায় তুলে বিপিনবাবু মাথা তুললেন। তখন মাথাটা বেশ ব্যথা করছে। জামাটা গায়ে দিয়ে আর একবার দেখে নিলেন ড্রয়ারটা বন্ধ আছে কি না। বার বার টেনে টেনে দেখলেন। কিছুই নেই ড্রয়ারে, তবু বার বার টেনে টেনে দেখাই অভ্যাস। সব জিনিসে একটু বেশি সতর্ক, একটু বেশি হিসেবি বিপিনবাবু। আর হিসেব না করে চললে সংসার চলবে কী করে?

বাইরে আসতেই মনে পড়লো কথাটা। রামদীনকে দেখেই বলতে গেলে কথাটা মনে পড়লো।

—কী বাবু?

বিপিনবাবু বললেন—দশটা টাকা দিতে পারো রামদীন?

রামদীন 'টার্নবুল এন্ড জনসন' কোম্পানীর অফিসে মেজ হেড-দারোয়ান। অনেক দিনের লোক। বলতে গেলে অন্য চাপরাশির গুরু-স্থানীয়। সবাইকে টাকা ধার দেয়। সুদ খেয়ে-খেয়ে ভুঁড়ি মোটা হয়ে গেছে। তবু টাকা ধার দিতে পারলে বাঁচে। বিশেষ করে বিপিনবাবুর মতন বাবুকে।

—এবারে সব টাকাটা আমি বেবাক শোধই করে দেব রামদীন। অনেকগুলো দেনা হয়ে গেল তোমার কাছে। কত হয়েছে বলতে পারো?

রামদীন ভুঁড়ি দুলিয়ে উঠলো। তারপর বললে—আসুন বাবু, আমার কিছু মনে থাকে না, খাতা দেখতে হবে।

মনে থাকার কথাও নয় সত্যি! এতগুলো বাবু অফিসে। সব বাবুই রামদীনের চেয়ে দশ বারোগুণ মাইনে পায়। বাবুদের মাইনে আরম্ভ সব জড়িয়ে এক শো তিরিশ থেকে। শেষ হবে তিন শো চার শো পাঁচ শো টাকায়। পশুবাবুই সব চেয়ে বেশি মাইনে পান। আর দারোয়ানরা আরম্ভ করে পঁচিশ থেকে। তারপর শেষ হয় গিয়ে পঞ্চাশে। কিন্তু তবু সেই দারোয়ানদের কাছেই গিয়ে হাত পাততে হয় সব বাবুকে।

নিজের খুপচিতে ঢুকে রামদীন খাতা বার করলে।

—এই তো বাবু আপনার নাম। এক শো পঞ্চান্ন টাকা ধার আছে।

বিপিনবাবুর মাথায় আর একবার বজ্রাঘাত হলো।

—উরেঃ বাবারেঃ একশো পঞ্চান্ন টাকা! নাঃ, আর নয়। তোমরা বেশ আছো রামদীন। তোমাদের ছেলেকে ইস্কুলে পড়াতেও হয় না, তোমাদের মাছ-মাংস-ডিম কিনতেও হয় না। বেশ আছো সত্যি। তোমরাই সুখী! তা দাও আর দশটা টাকা। দু' মাস না-হয় মাছ খাওয়া বন্ধ করবো।

রামদীন বললে—বাবুজী, মাছ খাওয়া বড় পাপ বাবুজী! মাছ কভি খাবেন না।

বিপিনবাবু বললেন—তুমি তো বলেই খালাস রামদীন, আমার ছেলে মাছ না হলে ভাত মুখেই তুলবে না—

বলে রামদীনের খাতায় একটা সই দিয়ে দশটা টাকা পকেটে পুরলেন।

নীরদবাবু বললেন—টাকাটা ভালো করে পকেটে রেখেছেন তো? এ আপনার চক্রধরপুর নয়। এই সেদিনই তো পকেট কেটেছিল আপনার—

টাকাটা আবার ভেতরের পকেটে গুঁজে রেখে দিয়ে বিপিনবাবু বললেন—একশো পঁয়ষট্টি টাকা হয়ে গেল মশাই, মহা ভাবনায় পড়েছি।

নীরদবাবু বললেন—তা হঠাৎ দশটা টাকা দরকারই ব৷ হলো কেন আজকে! আজ তো মাসের বারো তারিখ?

—আর মশাই, ছেলের ইস্কুলে ইউনিফর্ম পরে আসতে হবে, নিয়ম করে দিয়েছে। ভেবেছিলাম দু'দিন পরেই করে দেব, তা কালকে ইউনিফর্ম পরে নি বলে ছেলেকে ফাইন করে দিয়েছে। দেখুন না কাণ্ড! পড়াশোনার নামে তো ঢু ঢু, আর ইস্কুলে পড়ানো যদি দেখেন তো আপনি মাথা গরম করে ফেলবেন। দু'টাকা করে বিল্ডিং-ফাণ্ডের জন্যে নিচ্ছে মাসে-মাসে, সে টাকা যে কার গর্ভে যাচ্ছে কে জানে। বলতে গেলে বলবে আপনি ছেলেকে অন্য ইস্কুলে ভর্তি করে দিন!

নীরদবাবু বললেন—এসব আপনি দেখুন, আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে মশাই। খাতা কিনতে হয় না? ইস্কুলের নাম ছাপানো খাতা?

—হ্যাঁ, তা তো কিনতেই হয়। না-কিনলে ফাইন হয়ে যায়।

—পয়সা উপায় করার আরো কত রকম ফন্দি-ফিকির আছে। টিফিন-ফি, মেডিকাল-ফি, ফ্যান-ফি, জিমন্যাশিয়াম-ফি? এসব নেই?

—হ্যাঁ তাও আছে বৈ কি! সে-সব গুণোগার তো দিচ্ছিই। এই ইউনিফর্মটা নতুন ফন্দি হয়েছে।

—আর ইস্কুলের হেড-মাস্টারের বেনামীতে বই-এর দোকান নেই?

—হ্যাঁ, তাও হয়তো আছে। সেই দোকান থেকেই তো বই কিনি। অন্য দোকানে কিনলে চলে না।

—আর হেড-মাস্টারের লেখা গ্রামার আর ট্রানশ্লেশনের বই নেই? কোচিং ক্লাশ নেই? আমাদের শালা গভর্নমেণ্ট যেমন হয়েছে, তেমনি হয়েছে শালা মাস্টাররা, আর তেমনি হয়েছি শালা আমরা। গালাগালি কি মুখে সাধে বেরোয় মশাই? আপনি কিছু মনে করবেন না বিপিনবাবু—

নীরদবাবুর কথাগুলো ভালো লাগলো না। হঠাৎ যেন বড় হীন নীচ মনে হলো নীরদবাবুকে। ভদ্রতা কি শুধু পোশাকেই সীমাবদ্ধ থাকে? গালাগালি দেওয়া কেন মিছি-মিছি? নীরদবাবুর পাশাপাশি চলতেও ঘেন্না হলো যেন বিপিনবাবুর।

নীরদবাবু তখনও বলে চলেছেন—জানেন বিপিনবাবু, অনেক জাত আছে পৃথিবীতে, কিন্তু ছোট ছেলেদের নিয়ে এমন জালজোচ্চুরি কোথাও হয় না।

বিপিনবাবু কথা বললেন না।

নীরদবাবু বলতে লাগলেন—বনমানুষের হাড় দিয়ে আপনার ছেলেকে ঠকাচ্ছিল বলে আপনি রেগে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের ইস্কুল মাস্টাররা তার চেয়ে কি কমটা করছে বলুন তো?

—থামুন!

বিপিনবাবু যেন চটে গেলেন। বললেন—থামুন আপনি। শিক্ষকদের সম্বন্ধে অমন কথা বলবেন না। ভালো লোক কি নেই মশাই? সবাই কি খারাপ? তা কখ্খনো হতে পারে না।

আর কথা বললেন না বিপিনবাবু, তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে বাস রাস্তার দিকে চলে গেলেন। কলকাতায় বদলি হয়ে আসার পর থেকেই যেন কেমন সব ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছিল। এই তাঁর সেই কলকাতা! কেউ ভালো নয় এখানে। নীরদবাবুর ওপরেও যেন ঘেন্না হতে লাগলো বিপিনবাবুর। সমস্ত মানুষের ওপরেও ঘেন্না হতে লাগলো। এর চেয়ে তো চক্রধরপুরের সেই চাকরিই ভালো ছিল। এখানকার কংক্রিটে-জমানো মানুষ আর কংক্রিটে-জমানো বাড়িগুলোতে যেন কোনও তফাত নেই। [illegible] যেন একাকার হয়ে গিয়েছে তাঁর চোখের

বাদামতলায় আসতে গেলে আগে ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে উঠে দু'বার বাস বদলাতে হতো। তারপর যেখানে এসে নামতে হতো সেখানে দু' একটা ঘেঁষাঘেঁষি দোকান, কয়েকটা সাইকেল রিক্সা, তারপর ছাড়া-ছাড়া জঙ্গল আর তার ফাঁকে-ফাঁকে মাঠ। সেই জঙ্গল আর মাঠের মধ্যে পায়ে-চলা রাস্তা। বর্ষায় সে-পথে হাঁটতে হলে জুতো খুলে হাতে করে নিতে হতো। কিন্তু সে আর বেশি দিন নয়। বাড়ি-ওয়ালা বুড়ির বাড়ির পাশ দিয়েই রাস্তা বেরোল একদিন। চেন্-কম্পাস নিয়ে লোকজন এল। কাদা মাড়িয়ে কী যেন সব মাপ-জোপ করলে।

বুড়ি প্রথমে দেখতে পায়নি। জানতেও পারেনি। দুপুরবেলা। ভাড়াটেদের ছেলে তখন ইস্কুলে গেছে। ভাড়াটে কর্তাও অফিসে।

—ও বউ, বউ!

বাতের ব্যথায় নড়া-চড়া ভাল করে করা যায় না। নিজের তক্তপোষটার ওপর বসে-বসেই সারা দিন কাটে। বিধবা মানুষ। খাওয়া-দাওয়ার বালাই নেই। সকালবেলা দুটো ভাত ফুটিয়ে নেয় পেতলের একটা ঘটিতে। কখনও যদি বউ একটু তরকারী দেয় তো আর কিছু রান্নার দরকার হয় না।

বউ বলে—পালঙ শাকের একটু ঘণ্ট এনেছিলুম দিদি, কোথায় রাখবো?

—ও আমার পোড়া-কপাল, আমার কি সেই মুখ আছে বউ, না খেতেই আমার ভালো লাগে! ওই জাম-বাটিটা চাপা দিয়ে রাখো—

বলতে গেলে একই বাড়ি। একই উঠোনের মধ্যে আড়া-আড়ি দুটো সংসার। ও-সংসারে যখন বাপ-ছেলে দাওয়ায় খেতে বসে তখন ওখানকার হারিকেনের আলোয় এ-সংসারটাও জ্বল্-জ্বল্ করে ওঠে। ছেঁড়া কাঁথাটা গায়ে চাপা দিয়ে বুড়ি তখন কৃষ্ণের শতনাম জপে।

যশোদা রাখিল নাম নন্দের নন্দন
বাসুদেব নাম রাখে শ্রীমধুসূদন
নারদ রাখিল নাম গোলক-বিহারী...

তখনও ঠুং-ঠাং শব্দ হয় বাসনের। বাসন-মাজার শব্দটাও কানে আসে। বিপিনবাবু ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন—এগজামিন কেমন দিলে তুমি?

পিণ্টু আরো বড় হয়েছে। কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো বোবা হয়ে গেছে। অল্প-অল্প গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে যেন কী খোঁজবার চেষ্টা করেন বিপিনবাবু। হয়ত নিজেকেই খুঁজতে চেষ্টা করেন ছেলের মধ্যে। সেই ছোট ছেলেটা যেন হারিয়ে গেছে কলকাতায় এসে। কলকাতায় আসার পর থেকেই যেন সব বদলে গেছে বিপিনবাবুর। পিণ্টুও বদলে গেছে। কখন কী করে, কোথা থেকে বই-এর পড়া বুঝে নিয়ে আসে কিছুই বলে না। পড়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে বলে—হ্যাঁ। কখনও 'না' বলতে শেখেনি পিণ্টু। আর টাকা? আগে টাকা চাইতো মা'র কাছে। এখন আর তাও চায় না।

—তোমার জামাটা ময়লা কেন? সাবান দিয়ে কাচতে পারো না?

মাথা নিচু করে শুধু শোনে পিণ্টু। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে আবার বই নিয়ে বসে। কোথা থেকে সব নানান রকমের বই এনেছে। দিনরাত বই পড়া নিয়েই থাকে। তারপর রাত্রে ঘরের মধ্যে শুয়ে-শুয়ে বিপিনবাবু দেখতে পান মাটির দেয়ালের মাথার ফাঁক দিয়ে পিণ্টুর ঘরের হারিকেনের আলোটা টিনের চালে এসে পড়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে পিণ্টু!

বিপিনবাবু জিজ্ঞেস করেন—আজকাল পিণ্টু কথা বলে না কেন? কী হয়েছে ওর?

বিন্দুবাসিনী কম কথা বলার লোক। বলে—কই, কিছু তো হয়নি।

—যেন বদলে যাচ্ছে খুব!

বিন্দুবাসিনী বলে—বড় হচ্ছে তো!

—তা এমন আর কি বড় হচ্ছে। ভারি তো বয়েস! এরই মধ্যেই এত গম্ভীর হয়ে গেল কেন?

তারপর বিন্দুবাসিনীর কথা আর শোনা যায় না। বোধহয় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে ততক্ষণে। আর বিপিনবাবুও তখন ক্লান্ত। রামদীনের কাছে অনেক দেনা জমে যাচ্ছে। নীরদবাবু লোকটা আসলে কেমন যেন। কলকাতার বাসে যেন ভিড় বেড়েই চলেছে, পটলের সের আট-আনার নীচে আর নামলো না। কোথাও যেন কোনও অবলম্বন খুঁজে পান না বিপিনবাবু। এই কলকাতার অন্ধকার অন্তরাত্মার আড়ালে তিনি যেন তলিয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। ঠিক তন্দ্রার আগের মুহূর্তে যেন মনে হয় কেউ নেই পাশে। বিন্দুবাসিনীও নেই, এই বাড়িটাও নেই। বন্যায় যেন বাদামতলা ডুবে গেছে। ঠিক যেমন করে চক্রধরপুরে তাঁর বাড়ি বন্যায় ভেসে গিয়েছিল, এও তেমনি। এবার পিণ্টুও যেন নেই, বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল। বিপিনবাবু ঝাঁপিয়ে পড়ে পিণ্টুর হাতটা ধরে টান দিলেন। পিণ্টু—পিণ্টু—

আর্তনাদ করে উঠলেন বিপিনবাবু। কিন্তু গলা দিয়ে এতটুকু শব্দ বেরোল না।

—কী হলো?

বিন্দুবাসিনীও প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বিপিনবাবুর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলো।

—চেঁচাচ্ছ কেন? কী হলো?

অন্ধকারে চোখ খুলে বিপিনবাবু যেন আশ্বস্ত হলেন।

—তুমি অমন চেঁচাচ্ছিলে কেন? কী হয়েছিল?

বিপিনবাবু তখনও হাঁফাচ্ছিলেন। বললেন—পিণ্টু

বিপিনবাবু

কোথায়?

—ও তো পাশের ঘরে পড়ছে। আলো দেখতে পাচ্ছো না?

মাটির দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আবছা আলো আসছিল মাথার টিনের চালে। বিপিনবাবু সেই দিকে চেয়ে দেখলেন। আবার যেন বাস্তবের পৃথিবীতে ফিরে এলেন তিনি। আবার যেন নিজেকে খুঁজে পেলেন। বললেন—খোকা এত রাত পর্যন্ত পড়ে কেন?

বিন্দুবাসিনী সে-কথার উত্তর দিলে না। বললে, স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি?

বিপিনবাবু বললেন—শেষকালে অত পড়লে যদি চোখ খারাপ হয়ে যায় ওর?

বিন্দুবাসিনী বললে—তা সামনে একজামিন আসছে, পড়বে না?

—অ বউ, বাইরে অত লোক কেন গা?

বাদামতলা এমনিতে নিরিবিলি নিঃঝুম জায়গা। বাড়ি-ওয়ালা বুড়ি বরাবর এই রকমই দেখে আসছে। কলকাতা সহরের গোলমাল এখানে এসে পৌঁছোত না কখনও। সকাল বেলা কত্তা যখন বেরিয়ে কাজে যেত, তারপর থেকে চিরকাল বুড়ি একলাই কাটিয়েছে। মাঝে মাঝে হয়ত পুকুরে ঝপ্ করে একটা তাল পড়েছে। কিংবা নারকোল গাছের শুকনো একটা পাতা ঝরে পড়েছে। শব্দের তরঙ্গ তুলে নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরে খান খান করে দিয়েছে। তাও কচিৎ কদাচিৎ। নতুন ভাড়াটে বিপিনবাবু আসার পর থেকে তবু একটু যা মানুষের গলা শুনতে পাওয়া যেত। কিন্তু ভরা দুপুরে এত লোক কেন এল হঠাৎ?

তাড়াতাড়ি বুড়ি উঠলো তক্তপোষ ছেড়ে। তক্তপোষের তলাতেই থাকে জিনিসটা। বুড়ি আবার ভাল করে নিচু হয়ে দেখলে। বেশ কুলো ডালা দিয়ে ঢেকে রাখা ছিল। সেগুলো সরিয়ে ট্রাঙ্কের মরচে-ধরা তালাটা একবার টেনে দেখলে। তারপর কেরোসিনকাঠের জানলাটা খুলে বাইরে চেয়ে দেখলে।

—অ বউ, বউ?

বিন্দুবাসিনী মেঝের ওপর আঁচল বিছিয়ে ঝিমোচ্ছিল। উঠোন পেরিয়ে এ-ঘরে এল। জিজ্ঞেস করলে—আমাকে ডাকছেন দিদি?

—ওরা কারা বউ?

বিন্দুবাসিনীও দেখলে কোট-প্যাণ্ট পরা কয়েকজন লোক জানলার পাশের জঙ্গলে ঘোরা-ফেরা করছে। সঙ্গে জনকত কুলী মজুর। ফিতে দিয়ে কী মাপ জোপ্ করছে।

—হ্যাঁ গা, তোমরা কারা?

এই তখন থেকেই সুরু হলো বলতে গেলে। বাদামতলার মধ্যে দিয়ে রাস্তা হবে। সহর হবে। আলো, জলের কল, ড্রেন সব বসবে। এলাহী কাণ্ড হবে। সহরে আর লোক ধরছে না। পাকিস্তান থেকে বাড়তি লোক আসছে। সহর এখানকার জমিও গ্রাস করবে, সে অনেক কাণ্ড! এখানকার জমিরও দর বাড়বে। ওই যেখান দিয়ে বাস-রাস্তায় নেমে কাদা ভেঙে আসতে হয়, ওখান থেকে সোজা পাকা রাস্তা হয়ে একেবারে সোজা বাঁশধানিতে গিয়ে মিশবে। বাড়ির দোর-গোড়া পর্যন্ত বাস আসবে। আরও কত কী হবে, তার কি ইয়ত্তা আছে।

—তা হ্যাঁগা, আমার বাড়ি ভাঙবে নাকি?

কোট-প্যাণ্ট পরা লোকটা বললে—আপনার বাড়ি ভাঙবে
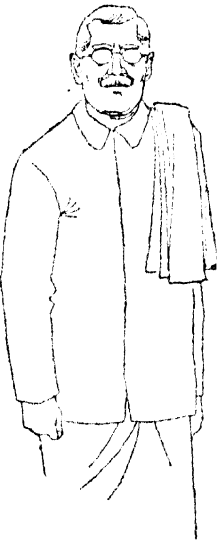
বুড়ি হাউমাউ করে উঠলো।

—তা আমি থাকবো কোথায় শুনি? আমাকে ভিটে-ছাড়া করলে আমি যাবো কোথায়? এই বুড়ো বয়েসে কি পথে বসবো গা?

বিন্দুবাসিনী বললে—ওদের কেন বলছেন দিদি? ওরা কী জানে? উনি আসুন অফিস থেকে, ওঁকে জিজ্ঞেস করবেন কী করতে হবে—

যারা সরকারী কাজ করতে এসেছিল তারা কাজ করে চলে গেল।

বুড়ি গজ্‌-গজ্‌ করতে লাগলো—পোড়ার-মুখো মিনসে নিজে মরলো, আমাকেও মেরে রেখে গেল গা. তোর কি ভাল হবে ভেবেচো, সাতজন্ম নরকে পচে মরবে পোড়ারমুখো, আমাকে জ্বালাতে এইখেনে বাড়ি করেছিল মিনসে......

তারপরে বুড়ি সারাদিন আর সে-গজ্‌গজানি থামে না। কবে তার স্বামী মারা গেছে, কবে বাড়ি করেছে, তবে বিয়ে করে বউকে এনে এখানে তুলেছে, সেই সব পুরোন কথা তুলে সারা দিনটা সরগরম করে রাখলো। যখন এখানে জঙ্গল ছিল, যখন জনমানব কেউ ছিল না, তখন এই ডাকাতের জঙ্গলে বাড়ি করে বউ নিয়ে এসেছিল। একটা-একটা করে টাকা জমিয়েছিল মানুষটা, মাটির ওপর পায়ের ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল। তার সেই বাঁচতে চাওয়াটা, সেই অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টাই সেদিন অভিশাপ হয়ে উঠলো বিধবা স্ত্রীর চোখে।

বিপিনবাবু অফিস থেকে আসতেই বুড়ি বললে—হ্যাঁ বাবা, তুমি কিছু শুনেছ? আমাকে যে ভিটে-ছাড়া করছে মুখপোড়ারা, তুমি জানো কিছু?

বিপিনবাবু জামা-কাপড় বদলাচ্ছিলেন। বললেন—এখানে খালি জমিগুলোয় সব বাড়ি হবে তাই মাপজোপ হচ্ছে—

—তা আমি ভিটে ছেড়ে কোথায় যাবো শুনি?

বিপিনবাবু বললেন—আপনি কেন অত ভাবছেন? আমি তো আছি, আমারও তো ভাবনা আছে?

—তুমি তো বাবা যেখানে ঘর ভাড়া পাবে, সেখানেই উঠে যাবে! আমার কী হবে? আমার কে আছে যে দেখবে আমাকে?

তা দেখতে আর হলো না কাউকে। বুড়ির বোধ হয় ভাগ্য ভালো ছিল। বিপিনবাবুরও ভাগ্য ভাল ছিল। রাস্তা হলো বাড়িটা ছেড়ে রেখে। খোয়া-বাঁধানো রাস্তা। একদিন দলে-দলে কুলি এল। প্লট করে করে জমি বিক্রী হলো। আটশো ন'শো টাকা করে কাঠা। গাড়ি করে ভদ্রলোকেরা এল জমি দেখতে। ফিতে নিয়ে মাপতে লাগলো। টিউব-ওয়েল বসলো। আর জলের কষ্ট নেই বুড়ির। বিপিনবাবু অফিস যাবার আগে নিজেই পাঁচ দশ বালতি জল তুলে এনে রেখে দিতেন। নতুন সব টিউব-ওয়েল। কী-রকম লোহা-লোহা গন্ধ জলে। বুড়ি বলতো—হ্যাঁ বাবা, কী-রকম গন্ধ যে জলে?

বিপিনবাবু বলতেন—নতুন টিউব-ওয়েল, ও-রকম একটু গন্ধ থাকেই—

পিণ্টুও জল আনতে যাচ্ছিল। বিপিনবাবু বললেন—তুমি পড়ো গে, তোমার এগজামিন আসছে, আমি জল আনছি—

শুধু জলের সুখই নয়। জঙ্গল কাটা হবার পর ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। ডোবা-গুলো বুজে গেল। আগে সন্ধ্যে হলেই শেয়াল ডাকতো। তারা কোথায় চলে গেল। বুড়ি বললে—বেঁচিছি বউ, রাত্তিরে ঘুম আসতো না চোখে—

দুপুরবেলা বিন্দুবাসিনী জানালার ধারে মুখ দিয়ে বসে থাকতো। কোথায় কত দূরে কাদের বাড়ির ভিত তৈরি হচ্ছে। মজুররা দুরমুস পিটছে। এই সেদিন ইঁট গাঁথা সুরু হলো, আর দেখতে-না-দেখতে এক-মানুষ-সমান বাড়ি উঠে গেল। ইঁটের পাকা-গাঁথুনির বাড়ি। বাঁশ দিয়ে ভারা বেঁধেছে।

বুড়ি ভালো করে চোখে দেখতে পায় না। তবু দুপুর বেলার রোদে হঠাৎ নজরে পড়লে বলে—ওমা, রাতারাতি ইন্দিরপুরী তৈরি হয়ে গেল যে বউ. বাদামতলা আর চেনা যায় না—

তা সত্যিই বাদামতলা আর চেনা যায় না। সহরের বড়-বড় লোকরা এসে জমিতে ঢোকে। পিলপে বসায় রাজমিস্ত্রী দিয়ে। গাড়ি-গাড়ি বাঁশ এসে নামে। সিমেণ্ট চুন সুরকী নামে। আর তারপর একদিন ইঁট গাঁথা শুরু হয়ে যায়। এতদিন দুপুরবেলায় যখন উনিও আপিসে চলে যেতেন, যখন পিণ্টুও স্কুলে চলে যেত, তখন বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগতো। কিন্তু এবার চারদিকে খুট্‌-খাট্‌ শব্দ হচ্ছে। ছাদ-পেটানোর আওয়াজ হচ্ছে। যেন সহর হঠাৎ বাদামতলায় এসে নতুন করে সেজে উঠছে। দূরে, অনেক দূরে একেবারে বাঁশধানির দিকে আগে আকাশটা কেমন করে মাটিতে মিশে যেত, এখন তাও ঢেকে গেছে। বিপিনবাবুকে এখন আর কাদায় জুতো ডুবিয়ে বাড়ি আসতে হয় না। বাড়ি এসে পা ধুতেও হয় না। এসে ভাঙা চটা-ওঠা সিমেন্টের মেঝের ওপর বসে খানিকক্ষণ হাওয়া খেয়ে নেন। তারপর যখন পিণ্টু আসে তখন ছেলের ঘরে আসেন। এ-ঘরটাতে পিণ্টু একটা সস্তা কেবাসিন-কাঠের টেবিল পেতেছে। দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা বই। আলনার হুকে কয়েকটা কাপড় জামা। একটা টিনের পুরোন ট্রাঙ্ক। তারই ভেতরে পিণ্টু তার নিজের সংসার গুছিয়ে তুলেছে।

—ওটা কার ফটো টাঙিয়েছ?

দেয়ালে একটা ফোটো টাঙানো ছিল। বিপিনবাবু সেই দিকে ভাল করে চেয়ে দেখতে লাগলেন মন দিয়ে।

পিণ্টু বললে—রামমোহন রায়ের—

—উনি কী ছিলেন?

পিণ্টু বললে—ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের বাঙলা দেশের একজন মহাপুরুষ।

—তা এত লোক থাকতে ওর ছবি টাঙালে যে? আজকাল ব্রাহ্ম-ট্রাহ্মর সঙ্গে মিশছো নাকি?

পিণ্টু বললে—না, রাস্তায় বিক্রী হচ্ছিল, সস্তায় পেলুম তাই কিনে নিয়েছি—

তাতেও যেন খুব খুশী হলেন না। কী যেন সন্দেহ হতে লাগলো। বললেন—উনি কী চাকরি করতেন?

পিণ্টু বললে—উনি জীবনে অনেক রকম চাকরি করেছেন, শেষে দিল্লীর বাদশার হয়ে কথা বলবার জন্যে বিলেতে গিয়েছিলেন।

—তা সে তো হলো, কিন্তু লোক কেমন ছিলেন?

—ভাল লোক ছিলেন।

ভাল লোক মানে সৎ লোক ছিলেন তো। ভাল লোক তো অনেক আছে আজকাল। খবরের কাগজে রোজ তাদের নাম বেরোয়। কিন্তু আসলে তো অনেকেই শুনেছি বদমাইসের ধাড়ি। সে-রকম লোক নয় তো?

পিণ্টু এ-কথার কোনও জবাব দিলে না।

সেই ছোটবেলা থেকে বিপিনবাবু ছেলেকে নিজের হাতে মনের মতন করে মানুষ করে আসছেন। কিন্তু যত সে বড় হচ্ছে ততই যেন সে নিজের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। আগে তাঁর সঙ্গে গল্প করতো, খেলা করতো, কথা বলতো। রাস্তায় বেড়াতে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাবার কী ঝোঁক ছিল পিণ্টুর। লালার দোকানে যাবার সময় পিছু নিত পিণ্টু। কিন্তু তারপর থেকেই অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন তাঁকে দেখলেই মাথাটা নিচু করে নিজের ঘরে গিয়ে বসে। তারপর হয়ত পড়তে বসে।

বিপিনবাবু বললেন—যা হোক, যারা ভাল লোক যারা সৎ লোক, মানে যারা আদর্শ পুরুষ তাঁদেরই জীবনের আদর্শ করবে—আর তা তোমার ভালোর জন্যেই বলা। আমি আর ক'দিন! আমি চলে গেলে তখন তো তোমাকে দেখবার কেউ থাকবে না—

এ-সব কথা বিপিনবাবুর এই প্রথম নয়। ছোটবেলা থেকেই এ-সব কথা শিখিয়ে এসেছেন ছেলেকে। ছেলে মানুষ করা কি অত সহজ! নীরদবাবু বলেছিলেন—খুব সাবধান মশাই, কলকাতা সহরে ছেলে মানুষ করা বড় শক্ত! এত সব বদ্‌ ছেলে আছে এখানে!

বিপিনবাবু বলেছিলেন—না মশাই, সে ভয় নেই, আমার ছেলে কারোর সঙ্গে মেশে না—

কারোর সঙ্গে পিন্টু মেশে কি না সেইটে দেখবার জন্যেই বিপিনবাবু মাঝে-মাঝে পিন্টুর ঘরে এসে বই-পত্র ঘেঁটে ঘেঁটে দেখতেন। কত সব নভেল-নাটক বেরিয়েছে। লুকিয়ে-লুকিয়ে হয়ত ওই সব পড়ে। কিন্তু না, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনও বাজে বই দেখতে পাননি কখনও। এই বয়েসে যদি একবার ডিটেক্‌টিভ্‌ বইএর নেশা ধরে তো আর রেহাই নেই।

মাঝে-মাঝে আবার জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখতেন। দেয়ালের পেরেকে পিন্টুর, সার্ট ঝোলানো থাকতো। বিপিনবাবু ঘরের ভেতরে ঢুকতেন আস্তে-আস্তে। না, সিগারেট-দেশলাই কিছু নেই। নস্যির ডিবেও নেই।

নীরদবাবু বলেছিলেন—তা সিগারেট যদি খায়ই তো আপনার ছেলে কি তা পকেটে রেখে দেবে? অত বোকা কেউ নয় মশাই—

সেইদিন থেকেই স্ত্রীকে বলে দিয়েছিলেন—পিন্টুকে যেন পয়সা-টয়সা বেশি দিও না, বুঝলে? ছোট ছেলেদের হাতে বেশি পয়সা দেওয়া উচিত নয়—ওতে কেবল লোভ বাড়ে ওদের—

সত্যিই তো, বিপিনবাবুর কাছে পিন্টু যত ছোটই থাক, ছোট তো সে সত্যি-সত্যিই নয়। সেদিন কে যেন হঠাৎ বাইরে থেকে ডাকলো—পিন্টুবাবু—

পিন্টুবাবু! কথাটা যেন নতুন। বিন্দুবাসিনী বললে—আমাদের পিন্টুকে ডাকছে নাকি?

বাড়িওয়ালী বুড়ি ও-ঘর থেকে ডাকলে—অ বউ, বউ, তোমার খোকাকে কে ডাকছে গো?

বিপিনবাবু সাবান দিয়ে কাপড়গুলো কাচছিলেন। নিজের জামা-কাপড়, পিন্টুর গেঞ্জী। একগাদা নিয়ে বসেছিলেন কাচতে। আর থাকতে পারলেন না। সেই সাবানের ফেনা ভর্তি হাত নিয়েই বাইরে এসে

মেয়েটি বললে—আপনি রোজ রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন শুনি?

দাঁড়ালেন। দেখলেন একটা ছোট ছেলে। পিণ্টুরই বয়েসী। অল্প-অল্প গোঁফের রেখা উঠেছে। হাতে একটা বই। চুলে টেড়ি বাগানো। পায়ে চকচকে জুতো। প্যাণ্ট পরা। বেশ ফর্সা ধোপদুরস্ত সাজ-গোজ।

—কাকে চাই?

ছেলেটি বললে—প্রশান্তবাবু আছেন?

বিপিনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে?

ছেলেটি যেন ঠিক এ-প্রশ্ন আশা করেনি। বললে—আমি ভবানীপুরে থাকি!

—তা তো হলো, তোমার নাম কী?

—আমার নাম তন্ময়।

—তন্ময় কী? শুধু তন্ময় বললেই হবে? পদবী নেই? নিজের নামটাও ভালো করে এখনও বলতে শেখোনি?

—আজ্ঞে তন্ময় দত্ত!

—তা কায়স্থ না—!

—কায়স্থ!

—তা পিণ্টুর সঙ্গে তোমার কীসের দরকার? তার সঙ্গে চেনা হলো কী করে?

—আজ্ঞে, আমরা একসঙ্গে পড়ি। এক কলেজে!

এক কলেজে পড়ে শুনে বিপিনবাবু যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—তোমার বাবা কী চাকরি করেন?

—আমার বাবা উকীল, ওকালতি করেন!

উকীল! কথাটা মনঃপূত হলো না বিপিনবাবুর। ওকালতি-ব্যবসাটা বিপিনবাবুর কোনও কালেই পছন্দ হয় না। ওদের নাকি যত জাল-জোচ্চুরি-মিথ্যেকথা নিয়ে কারবার। আর লোক পেলে না, শেষকালে উকীলের ছেলের সঙ্গে ভাব করেছে পিণ্টু। বড় গভর্নমেন্টের গেজেটেড অফিসারের ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেই পারতো।

—তা সে তো খেয়েদেয়ে কলেজে গেছে এখন! তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?

তন্ময় বললে—প্রশান্তবাবু তো আজ কলেজে যান নি!

—যায় নি!

—না আমি তো কলেজ থেকেই সোজা আসছি। একটা বই দেবার কথা ছিল আমাকে তাই......

বিপিনবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। প্রতি মাসে ছেলেকে মাইনে দিয়ে আসছেন। কত কষ্ট করে ছেলের লেখাপড়ার খরচ জুগিয়ে আসছেন, আর ছেলে কলেজে না-গিয়ে কোথায় যায়? হঠাৎ যেন ছেলেটির সামনে বিপিনবাবু নির্বোধের মত হাঁ করে চেয়ে রইলেন। রামদীনের কাছে অনেক দেনা হয়ে গেছে তাঁর। অফিসের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে সুদের টাকা প্রতি মাসের মাইনে থেকে কেটে নিচ্ছে। তা ছাড়া পিণ্টুর জন্যে কতদিন ডালহৌসি-স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা
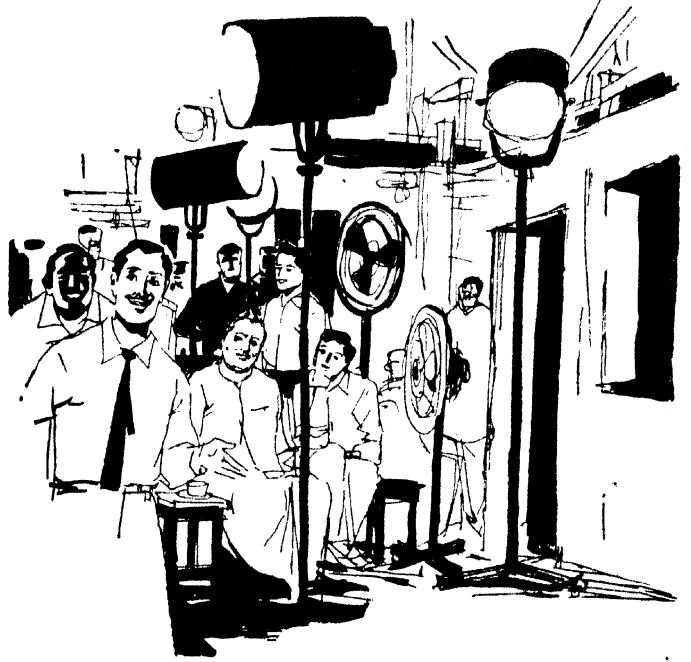
ডিরেক্টার বললে—কাট্—। সঙ্গে সঙ্গে আলোগুলো জ্বলে উঠলো।

বাঁচিয়েছেন। ধর্মতলায় এসে ট্রাম ধরেছেন। সে কীসের জন্যে? কলেজ পালিয়ে আড্ডা দেবার জন্যে?

—তাহলে বাড়ি এলে প্রশান্তবাবুকে বলে দেবেন, তন্ময় এসেছিল।

উকীলের ছেলে হলে কী হবে, কিন্তু কী লেখা-পড়ায় ঝোঁক! আর পিণ্টু কেরানীর ছেলে! কেরানীর ছেলে বলেই কি এত ফাঁকি দিতে শিখেছে সে?

ছেলেটি চলে যাবার পরও বিপিনবাবু অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন সেই দিকে। বেশি দূর দেখা গেল না। নতুন-নতুন বাড়ি হচ্ছে। ইঁট-কাঠ-বাঁশের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিপিনবাবুর এত বছরের সমস্ত আশা, যার ওপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তা সব যেন হঠাৎ নড়ে উঠলো থর থর করে।

চারদিকে বড়-বড় আলোর ফোকাস। আশেপাশে অন্ধকার। মাথার ওপর টিনের চাল। গরমে টা-টা করছে সমস্ত শরীর। তারই মধ্যে একটা ছেলে সিগ্রেট খাচ্ছিল আর চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে বই, মুখে সিগারেট—

হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই সামনের বাড়ির পেছনের দরজা খুলে একটা মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। মেয়েটি এসেই একেবারে মারমুখী হয়ে বললে—আপনি রোজ রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন শুনি? কী দেখেন?

ছেলেটি ঘাবড়ায়নি মোটেই, হাসতে হাসতে বললে—তোমাকে!

মেয়েটিও সোজা নয়। বললে—এর পরে আর কোনওদিন যদি দেখেন তো এমনি করে ঠাস করে চড় মারবো—বলে সত্যিসত্যিই ঠাস করে ছেলেটির গালে একটা চড় মারলে।

চড় মেরে মেয়েটি চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু ছেলেটি খপ করে মেয়েটির একটা হাত ধরে ফেলেছে। মেয়েটি ফিরে দাঁড়াল।

—একটা কথা শুধু বলে যাও—

—কী?

—আমি কলেজ পালিয়ে পালিয়ে তোমাকে দেখতে আসি, তার কি কোনও দাম নেই? আমার বাবা অনেক কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে আমাকে কলেজের মাইনে দেন, তারও কি কোনও দাম নেই?

মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—আগের বারে আপনাকে চড় মেরেছি, এবার জুতো না মারলে আপনি ঠাণ্ডা হবেন না—বলেই মেয়েটি আবার বাড়ির ভেতরে চলে যাচ্ছিল।

ছেলেটি চেঁচিয়ে বলে উঠলো—কিন্তু ভালবাসা কি পাপ সুলতা? বলে যাও—উত্তর দিয়ে যাও—শোন—

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বাড়ির দরজাটা ঝপা করে বন্ধ করে দিলে।

ডিরেক্টার বললে—কাট্—

আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য আলোগুলো জ্বলে উঠলো। যারা অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টার তার

এগিয়ে এল। পাখাগুলো বন্ধ ছিল এতক্ষণ। আবার সেগুলো চলতে লাগলো। যে মেয়েটা দরজা বন্ধ করে বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছিল, সে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। বললে—এক কাপ চা দিতে বলুন না—

ডিরেক্টার সুব্রত রায় বললে—ভেরি গুড্ মীনা, ভেরি গুড্—

হিরো দাঁড়িয়েছিল পাশেই। বললে—কিন্তু সুব্রতদা, চড়টা বড্ড জোরে মেরেছে মীনা, এখনও গালটা আমার চড় চড় করছে—

অন্ধকারে পেছন দিকে পিণ্টু একমনে দেখছিল।

—সিগ্রেট খাবি প্রশান্ত?

এতক্ষণে যেন পিণ্টুর ঘুম ভাঙলো। পাশের দিকে চেয়ে দেখলে। জিজ্ঞেস করলে—ওই যে মেয়েটা, ওর নাম কী?

ওকে চিনিস না? দু'একটা পিকচারে ওকে সাইড রোলে দিয়েছিল, এখনও তত নাম হয়নি। এ-ছবিটা যদি হিট হয় তো একেই আবার পনেরো হাজার টাকা দিতে হবে!

—পনেরো হাজার?

জয়ন্ত রায় অনেক জানে। কলেজে ঢোকবার প্রথম দিন থেকেই জয়ন্তর সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। চেহারার মধ্যে কোথায় যেন একটা আকর্ষণ ছিল। কলকাতা সহরের নাড়ী-নক্ষত্র চিনতো জয়ন্ত। ক্লাসের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে টেনে নিয়ে যেত চায়ের দোকানে। চা খেতে দিত, সিগ্রেট খেতে দিত। বোধ হয় প্রশান্তকে ভাল লেগে গিয়েছিল। জয়ন্ত বলতো—আপনি এখনও জীবনের কিছুই দেখেন নি দেখছি!

হাঁ করে চেয়ে থাকতো পিণ্টু।

পিণ্টু বলেছিল—না না, সিগারেট আমি খাই না—

—আরে খান্ খান্ মশাই, সিগারেট খেলে ক্যারেকটার নষ্ট হয় না, ও-সব প্রি ওয়ার আইডিয়া ছাড়ুন—যত সব ব্যাক্‌ডেটেড আইডিয়া আঁকড়ে ধরে রেখেছেন এখনও—

—না, আমার বাবা জানতে পারলে রাগ করবেন!

—বাবারা তো সব ব্যাপারেই রাগ করবে! বাবারা তো এ-যুগ দেখেনি। বাবাদের যুগে সিনেমাও ছিল না, এই সিগ্রেটও ছিল না। তখন ছিল থিয়েটার আর হুঁকো—

—আমার বাবা তামাকও খান না! খুব ট্রুথফুল লোক। আমার বাবা বিদ্যাসাগর স্বামী বিবেকানন্দ আর স্যার পি সি রায়-দের আদর্শ ফলো করতে বলেন কেবল—

জয়ন্ত বলতো—ওই জন্যেই তো বলছি ব্যাক্-ডেটেড। আপনার বাবা কেন, আমার বাবাও তাই বলে। বাবা কি আর জানতে পারছে! খান্, সিগারেট খান্—

প্রথম-প্রথম আপত্তি করে-করে অনেক জিনিস এড়িয়ে গিয়েছিল পিণ্টু। কিন্তু কোথায় বাদামতলা আর কোথায় এই কলেজ। কলেজ কম্পাউণ্ডের সামনেই একটা পার্ক। পার্কে গিয়ে বসতো দু'জনে ঘাসের ওপর। ক্লাসে প্রক্সি দেবার বন্দোবস্ত ছিল। ক্লাশে রোল-নম্বর ডাকলেই যে-কেউ একজন 'ইয়েস-স্যার' বলে দিত। তারপর ঘাসের ওপর বসে গল্পের জোয়ার বইতো।

পিণ্টু জিজ্ঞেস করতো—আপনি এত হাত-খরচের টাকা পান কোত্থেকে? আপনার বাবা দেন?

—কেন? আপনার বাবা দেয় না?

—আমার বাবা শুধু যাতায়াতের বাস ভাড়াটা দেন, আর এমনি চার আনা সঙ্গে এমারজেন্সির জন্যে—বাবা বলেন পকেটে বেশি পয়সা নিয়ে রাস্তায় বেরোন ভাল নয়—

জয়ন্ত বলতো—ওই সব ওদের ব্যাক-ডেটেড আউটলুক, জানেন কনভেণ্টে আমাদের হাত-খরচ ছিল কম্পালসারি—প্রথম প্রথম উইকে এক টাকা, তারপর ডেইলি এক টাকা। ছোটবেলা থেকে টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে হিসেব রাখার হ্যাবিট হয়—

তারপর হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে বললে—ওই দেখুন, ওই মেয়েটা আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে—

পিণ্টুও সেই দিকে চাইলে। কোথায় মেয়ে? আশে পাশে সামনে-ডাইনে-বাঁয়ে কোনও দিকেই কোনও মেয়েকে দেখা গেল না।

—ওদিকে নয়, ওই যে সামনে, তেতলা বাড়িটার পশ্চিমদিকের জানলাটার দিকে চেয়ে দেখুন—

প্রথমে তেতলা বাড়িটা খুঁজে নিতে হলো। অনেক কষ্টে তেতলা বাড়িটা খোঁজবার পর পশ্চিম দিক খোঁজা। দিক ঠিক হলো তো তার জানালা খোঁজা। জানালা খুঁজে যখন পাওয়া গেল, তখন মেয়ে আর দেখা গেল না—

—দেখলেন, হাতটা নাড়ছে!

—কই, মেয়ে কোথায় জানলাতে?

—চশমা নিন, চশমা নিন, অমন জ্বল-জ্বলে মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছেন না? ওই দেখুন, দু'টো আঙুলে দেখালো—

কোথায় মেয়ে, কোথায় আবার তার দু'টো আঙুল—কিছুই ঠাহর করতে পারলে না পিণ্টু।

—ওই দেখুন, আমার চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে চেয়ে দেখুন—

জয়ন্তর পাশে সরে এসে বসে তেতলা বাড়িটার দিকে চাইতেই জয়ন্ত বললে—ওই যাঃ, আপনাকে দেখেই পালিয়ে গেল—

কখন যে মেয়েটা ছিল আর কখন যে পালিয়ে গেল কিছুই বোঝা গেল না।

জয়ন্ত বললে—আপনি দেখতে চেষ্টা করছিলেন বলে মেয়েটা সরে গেল।

—কেন, সরে গেল কেন?

জয়ন্ত একটু হেসে আবার নতুন করে একটা সিগারেট ধরালো। বললে—আমার চেনা—

—আপনার চেনা?

—এই জন্যেই তো এখানে রোজ আসি। ওরও বাবা অফিস চলে যায়, তখন ওইখানে দাঁড়ায় এসে, আমিও এসে বসি এখানে—

তারপর বললে—চলুন, আর নয়—এবার ওর মা ঘুম থেকে উঠবে, চলে যাই—

—আপনি ওর বাবা-মা'কেও চেনেন!

জয়ন্ত বললে—চিনবো কী করে, আন্দাজ করি। আন্দাজে অনেক কিছু ধরা যায়। ওই যে দু'টো আঙুল বাড়ালো তার মানে কালকেও যাতে আমি আসি—

—আর রোববার?

—রোববার কী করে হবে? রবিবারে তো ওর বাবা বাড়িতে থাকে। খুব কড়াকড়ি যে বাড়ি থেকে বেরোতেই পারে না বাড়ি থেকে। চলুন, একটু চা খেয়ে আসি—

ছোটবেলা থেকে যে জগতের মধ্যে পিণ্টু মানুষ হয়েছিল, হঠাৎ ভবানীপুরের এই কলেজে এসে জয়ন্ত যেন আর এক নতুন জগতের সন্ধান দিলে। আর এক আবিষ্কার। এ বইয়ে পড়া পৃথিবী নয়, চোখে দেখা পৃথিবীও নয়। শোনা জগৎ। জয়ন্তর কাছে শোনা এক নতুন পৃথিবীর খবর। এ-পৃথিবীতে বাদামতলা নেই, এখানে কারো বাবা টার্নবুল এন্ড জনসন কোম্পানীর ক্লার্ক নয়। এখানে বালতি করে জল তুলে এনে পায়ের কাদা ধুতে হয় না। এখানে গুণে-গুণে বাসের ভাড়া দেয় না বাবারা। এ-পৃথিবীতে শুধু ক্লাসে প্রক্সি দিয়ে দূরের তেতলা-বাড়ির জানালার দিকে চেয়ে দেখো। আর তেষ্টা পেলেই রেস্টুরেণ্টে ঢুকে চা খাও। একজামিনেশনের সময় তখন দেখা যাবে। এখন শুধু একটা চটি খাতা পকেটে নিয়ে কলেজে এসো। বই কেনবার টাকা দিয়ে সিগারেট কিনে খাও।

পিণ্টু এক-একবার বলতো—কিন্তু এটা কি ভাল করছি?

জয়ন্ত বলতো কেন, ভালো নয় কিসে? কোন্ যুক্তিতে ভাল নয়?

—বাবা শুনলে কিন্তু মনে বড় কষ্ট পাবেন!

—ওই সব ব্যাক্-ডেটেড আইডিয়া আপনার? পৃথিবীতে যারা বড় হয়, তারা কখনও নিয়ম মেনে চলে কি? যারা সাধারণ তারা দশটা-পাঁচটা অফিস করবে, সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরবে। আমরা অসাধারণ, আমরা জিনিয়াস্—আমরা সংসারের সাধারণ নিয়ম মেনে চলবো কেন?

বাড়িতে এসে পিণ্টু ভালো করে তাকিয়ে দেখতো চারদিকে। এতদিন সংসারের দিকে কখনও চোখ দেয়নি। এখানে এসে হঠাৎ

আবিষ্কার করলে বাড়িওয়ালা বুড়ি বড় কৃপণ। গুণে গুণে পয়সা খরচ করে। বাড়ি ভাড়া দিতে দেরি হলে বুড়ি রেগে যায়। আবো দেখলে বাবার পয়সা নেই। বাবা মাইনে পায় সামান্য। এতদিন বাবা কত মাইনে পায় তাই-ই জানতো না সে। জানতে চেষ্টাও করতো না, ইচ্ছেও হতো না। কিন্তু সেদিন খেতে বসে জিজ্ঞেস করলে—মা, বাবা মাইনে পান কত?

মা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল শুনে। বললে—তা তো জানি না—

—বা রে, বাবা কত মাইনে পান তা-ও জানো না তুমি?

—তা আমার জানবার দরকার কী? আমার যা দরকার হয় চেয়ে নিই।

পিণ্টু বললে—আমার এক বন্ধু আছে, তার বাবা অনেক টাকা উপায় করে, তার বাবা উকীল—

মা শুনে বললে—তা ভালোই তো—

পিণ্টু বললে কিন্তু বাবা বেশি মাইনে পান না কেন?

মা বললে কী জানি কেন পান না—সবাই কি বেশি মাইনে পায়? কেউ বেশি পায়, কেউ কম পায়, এইটেই তো নিয়ম—। তা হঠাৎ মাইনের কথা জিজ্ঞেস করছিস্ কেন?

—বাবার বেশি মাইনে হলে বেশ হতো।

—তা তো হতোই।

—বাবা বোধ হয় দুশো টাকা মাইনে পান, না? তোমার কী মনে হয়?

—আমি অত কিছু ভাবিনি। আচ্ছা, আমি আজ জিজ্ঞেস করবো খন।

—না না তোমায় জিজ্ঞেস করতে হবে না ও-সব; আমি এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

—কেন? তোর টাকার দরকার? তোর কুলোচ্ছে না?

পিণ্টু বললে—না, তা নয়, আমাদের অনেক টাকা থাকলে বেশ ভালো হতো। বেশ ভবানীপুরে বাড়ি ভাড়া নেওয়া যেত জয়ন্তদের মত, তন্ময়দের মত—

—জয়ন্ত কে?

—সে তুমি চিনবে না। তার বাবা খুব বড়লোক। সে-ই তো আমাকে রোজ রেস্টুরেণ্টে চা খাওয়ায়। ভবানীপুরে তাদের মস্ত বড় বড় বাড়ি—

কোথায় ভবানীপুর, কেমন তার চেহারা সে-সব বিন্দুবাসিনী কিছুই জানতো না। বাদামতলার সঙ্গে ভবানীপুরের কোথায় তফাৎ তাও জানতো না।

ছেলের থালার দিকে নজর পড়তেই মা বললে—আর দুটো ভাত নিবি?

পিণ্টু কিন্তু সে-কথার উত্তর দিলে না। বললে—আমার এ-জামা পরতে লজ্জা করে মা—

—কেন? তোর জামা ছিঁড়ে গেছে?

—ছিঁড়ে যাবে কেন? কিন্তু কেনা জামা কেউ পরে না আজকাল। বাবা কোন্ হাট্ থেকে কিনে আনেন—সবাই বুঝতে পারে এ হেটো জামা। তার চেয়ে আমাকে টাকা দিও, আমি নিজে দরজির দোকান থেকে সার্ট তৈরি করে নেব—

সত্যিই খুব লজ্জা করতো পিণ্টুর। কলেজে কারো জামা এমন নয়। সবাই ইস্ত্রী করা সার্ট পরে। স্টার্চ দেওয়া পোশাক—পরলে বেশ মড়মড় করে। স্টিফ হয়ে থাকে কলারটা। সবাই ঘাড়ের কাছে উঁচু করে দেয়। কিন্তু এ যেমন কাপড়, তেমনি সাবান কাচা। হাত দিয়ে উঁচু করে দিলেও সোজা হয় না। তাদের চুল ছাঁটাও আলাদা। বাদামতলায় তো একটা নাপিত। তাকেই ডেকে-ডেকে আনতে হয়। বঙ্কিম বাবার চুলও ছাঁটে, পিণ্টুর চুলও ছাঁটে। সেই ছোটবেলা থেকে বড় বয়েস পর্যন্ত এমনি চলে আসছে। কখনও প্রতিবাদ করেনি আগে।

পিণ্টুর চুল ছাঁটার আগে বিপিনবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করেন।

বলেন—বেশ ভালো করে চুল ছেঁটে দেবে বঙ্কিম—

—আজ্ঞে, তা আর আমাকে বলে দিতে হবে না—

বঙ্কিম কাঁচি নিয়ে পিণ্টুর এ-পাশে ও-পাশে ঘুরে ঘুরে চুল ছাঁটে। বিপিনবাবুও তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তদারকি করেন। বলেন—ঘাড়ের কাছটা আরো ছোট করে দাও বঙ্কিম—বড় রইল—

তারপর হঠাৎ বলেন—ও কি, সামনে অত চুল রাখলে যে?

বঙ্কিম কিন্তু-কিন্তু করে। বলে—আজ্ঞে, অতটা থাকবে না, একটু ছেঁটে দেব—

বিপিনবাবু বলেন—ছাই, লপেটা ছেলেদের মতন চুল-ছাঁটা আমি দেখতে পারি না, দু চক্ষের বিষ—

তারপর হঠাৎ বলেন—কই, সামনের দিকে যে বড় রয়ে গেল?

বঙ্কিম হাসে। বলে—সামনে একটু বড় তো থাকবেই বড়বাবু—

—না না না, ও-সব বাহারি চুল যারা ছাঁটে তারা ছাঁটুক, আমার ছেলে সে-রকম নয়, পাড়ার অন্য ছেলেদের মতন করতে হবে না—তুমি আরো ছোট করো, আরো। আরো—

এ-সব ব্যাপারে পিণ্টুর কিছু বক্তব্য থাকে না। তার কোনও বক্তব্য থাকতে নেই। বিপিনবাবুর মতে বাপের কাছে ছেলের কোনও বক্তব্য থাকাই উচিত নয়। ছেলে কি আর বাপের চেয়ে বেশি বোঝে? ছেলের ভালো-মন্দ বাপের মতন আর সংসারে কে বেশি বুঝবে? পিণ্টু সারা গায়ে একটা ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে বঙ্কিমের কাঁচির সামনে মাথাটা সমর্পণ করে মাটির দিকে চেয়ে বসে থাকে। মাথাটা তার হলেও মাথাটার ভালো-মন্দ দেখবার ভার বাবার ওপর। বাবা যখন পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন তার আর তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নেই—

—এইবার ঠিক হয়েছে, দেখি, ভালো করে দেখি, মাথাটা উঁচু করো—

বঙ্কিম বলে—আজ্ঞে এখন তো ছোটবাবুর বয়েস হয়েছে, একটু বাহার করলে দোষটা কী?

—না না, তুমি জানো না বঙ্কিম, আমাদের বয়েস হয়েছে, আমরা বুঝি কত ধানে কত চাল। ও-সব কলকাতার বাহার অনেক দেখা গেছে, চুলের বাহার দেখিয়ে কেউ বড় হয় না জীবনে। স্বামী বিবেকানন্দও হননি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও হননি—

ছোটবেলা থেকেই এই রকম চলছিল। এতদিন কেউ এ-বিষয়ে আপত্তি করেনি। না ছেলে, না বাবা। কিন্তু কলেজে ঢোকবার পর থেকেই অন্য ছেলেদের দেখে-দেখে আয়নায় নিজেকে তুলনা করতো তাদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে এক-রকম হওয়ার ইচ্ছেয় কেমন নীরব বিদ্রোহ জমে-জমে উঠতে লাগলো পিণ্টুর মনের মধ্যে।

তারই মধ্যে একদিন একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে গেল পিণ্টুর জীবনে।

পিণ্টুর জীবনেও বটে, আবার বিপিনবাবুর জীবনেও বটে। শুধু দুজনের জীবনেই নয়, বিন্দুবাসিনীর জীবনেরও দুর্ঘটনা।

সমস্ত দুপুর, পাশের মাঠে মিস্ত্রীরা দুম্-দাম্ শব্দ করে। শব্দের চোটে আর কান পাতা যায় না ঘরে। দুপুরবেলা ঘরের ভেতর শুতে পারে না বাড়িওয়ালী বুড়ি। এমনিতেই বুড়ির শরীর খারাপ। চোখে দেখতে পায় না। রাতেও পাতলা ঘুম তার। বলে—মরণ-আর কি, পোড়ারমুখোরা মরেও না—

মা জিজ্ঞেস করে—কী হলো দিদি, কাকে কী বলছো—?

বুড়ি বলে—পোড়ারমুখোরা বড় জ্বালাচ্ছে বউ, দুটো চোখ এক করতে পারছিনে—

—কার কথা বলছো?

—এই যে, পোড়ারমুখো মিস্তিরিরা কী দুম-দাম শব্দ করছে কানের কাছে চৌপর দিন—

তা সত্যি! এ-পাশে ও-পাশে বাড়ি হচ্ছে। ইঁটের বাড়ি। লরী করে সিমেণ্টের বস্তা আসে। গরুর গাড়িতে করে ইঁট আসে। কুলী-মজুররা দুম-দাম করে কাজ করে। একটা দুটো নয়। অনেকগুলো। একটা বাড়ি শেষ হয় তো আর একটা শুরু হয়। আগে জানালা দিয়ে দেখা যেত দূরে যেখানটায় মাঠ শেষ হয়ে বাঁশ ঝাড় শুরু হয়েছে, সেইখানে একদিন কারা দমাদম

বাঁশ কেটে ফেললে। দেখতে-দেখতে ফরসা হলো জায়গাটা। আগে শেয়াল ডাকতো। আর শেয়ালের ডাক শোনা গেল না।

বুড়ির চোখে অত নজর নেই। তবু চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করতো। বলতো—ও-দিকটা ফরসা হয়ে গেল বুঝি বউ?

মা বলতো—হ্যাঁ—

—বাঁশ ঝাড় সব কেটে ফেললে ওরা?

—হ্যাঁ—

—আপদ গেল বউ, আপদ গেল। ওই-খেনে যত চোর-ডাকাতের আড্ডা ছিল গা এবার রাত্তিরে আরামে ঘুমুতে পারবো—

বাঁশ কাটার পর এল ইঁট। তারপর এল চুন-সুরকি বালি সিমেণ্ট। তারপর মিস্ত্রীদের কাজ শুরু হয়ে গেল। ভিত খোঁড়া হলো, ভারা বাঁধা হলো। দেখতে দেখতে দোতলা বাড়ি তৈরি হলো। তারপর বাড়ির দেয়ালে পলেস্তারা পড়লো। রং-চং হলো। শেষকালে একদিন মোটরে করে লোক-জন-মেয়ে-পুরুষ এসে হাজির হলো। রেডিও বাজতে লাগলো। রান্নার ধোঁয়া উঠতে লাগলো।

এমনি একটার পর একটা।

সেই যখন পিণ্টু স্কুলের ক্লাস ওয়ানে পড়তো, তখন থেকেই শুরু। তারপর একে একে ফাঁকা জমিগুলো সবই আস্তে আস্তে ভরাট হতে লাগলো। ধুলোতে বালিতে ধোঁয়াতে বাদামতলা জম-জমাট হয়ে উঠলো। নতুন-নতুন সব বাড়ি হলো। যেটুকু জায়গা তখনও ফাঁকা ছিল, সেটুকুও বিক্রী হয়ে গেল। তাতেও বাড়ি উঠতে লাগলো।

সেদিন বিপিনবাবু আর থাকতে পারলেন না। খেয়ে দেয়ে উঠে মেঝের ওপর একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। শেষকালে মনে হলো যেন কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

পাশেই কাদের বাড়ি হচ্ছিল। একেবারে লাগোয়া। অনেক দিন থেকেই শুরু হয়ে-ছিল। একতলা শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার দোতলা। বেশ ভাল বাড়িই হবে মনে হচ্ছে। সামনে একটা ঘোরানো ঘর। সেইটেই বোধ হয় বৈঠকখানা হবে। বেশ সিমেণ্ট দিয়ে মজবুত গাঁথুনির কাজ। বেশ গভীর ভিত খুঁড়েছিল। সেই ভিতের ওপর খোয়া-চুন-সুরকি দিয়ে জম্পেশ করে দুরমুশ করেছে। সে-শব্দও সহ্য করেছে বুড়ি। তখন বিপিনবাবুও কিছু বলেন নি। কিন্তু বাড়ি যেন আর শেষ হতে চায় না। দুম-দাম খুট-খাট—লেগেই আছে। বোধহয় মেজাজটা ভাল ছিল না। সেইরকম অবস্থাতেই, খালি গায়ে একেবারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু দূরেই মিস্ত্রী খাটছিল। একেবারে হুড় মুড় করে গিয়ে পড়লেন।

—এই, ক্যয়া করতা হ্যায়?

মজুররা হৈ-হল্লা করছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে এক বাবুকে আসতে দেখে তারা প্রথমে থতমত খেয়ে গেল।

—চিল্লাতা হ্যায় কেঁও?

তারা কিছু বললে না।

বিপিনবাবু আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। একেবারে সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন—এত চিল্লাচ্ছো কেন তোমরা? তোমাদের জন্যে কি বাড়িতে একটু নিরি-বিলি টিঁকতে পারবো না? তোমরা কী ভেবেছ মনে?

কুলি-মজুররা তো হতবাক।

—যদি গোলমাল না থামাও তো আমি পুলিসে রিপোর্ট করে দেব, তা জানো? এত শব্দ করতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি, সাবধান করে দিচ্ছি তোমাদের, বুঝলে?

কুলি-মজুররা কী বুঝলো আর কী বুঝলো না, তা বোঝা গেল না। তা বোঝবার জন্যে আর বিপিনবাবু সেখানে দাঁড়ালেনও না। হন্ হন্ করে নিজের ঘরের মধ্যে চলে এলেন।

বুড়ি শুনছিল সব এতক্ষণ। আপন মনেই বলতে লাগলো—দেমাক্ হয়েছে বেটাদের কোটা-দালান বানাচ্ছে বলে, আমার টিনের বাড়ি কিনা, তাই একেবারে মানুষ বলে গেরাহ্যিই করে না—ঠিক হয়েছে; ঠিক হয়েছে।

কথাগুলো বিপিনবাবুর কানে গেল। তিনি কিছু না বলে নিজের ঘরের তক্ত-পোষের ওপর শুয়ে পড়লেন গিয়ে।

স্টুডিওর ভেতরে আবার সব পাখা বন্ধ হয়ে এল।

জয়ন্ত বললে—চুপ কর, এবার আর একটা সিন্ টেক্ হবে—

আবার টেক্ হতে লাগলো। আবার ক্ল্যাপস্টিক্। মীনা আর হীরো এসে হাজির হলো। এবার আর রাস্তা নয়। এবার চায়ের দোকানে। চায়ের দোকানে ঘেরা ঘরের মধ্যে দুজনে চা খাচ্ছে আর গল্প চালাচ্ছে।

পিণ্টু চোখ ভরে দেখতে লাগলো। এ-এক অন্য জগৎই বটে। সমস্ত অতীতটা তার যেন চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। বর্তমান ভবিষ্যৎটাও মুছে গেল। পিণ্টু যেন একলা। এ পৃথিবীর মাঠ-ঘাট-রাস্তা সব যেন জনহীন। সবাই যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে। এখানে প্রত্যেক দিন সকালবেলা বাজারে গিয়ে মাছ কিনে এনে সংসারের সাহায্য করার দায় নেই। এখানে কোথা থেকে পয়সা আসে তা জানবার প্রয়োজনও অনিবার্য নয়। এখানে কত সহজে ভালবাসা জন্মায়, এখানে চোখে-চোখে মিল হলে তারা রেস্টুরেণ্টে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে চা খায়। এখানে পয়সা উপায় করবার দায়িত্ব নেই, খরচ করবার স্বাধীনতা অবাধ। এখানে এগজামিন নেই, পাশ-ফেলের দুশ্চিন্তা নেই, কলেজে প্রক্সি দিয়ে বাইরে বেড়ানোর সঙ্কোচও নেই।

পিণ্টু দেখতে দেখতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল!

এ এমন জগৎ। রাস্তার ধারে ধারে দেয়ালের গায়ে কত পোস্টার দেখে এসেছে এতদিন। বাহারি রং-চঙে পোস্টার। সিনেমা-হাউসের সামনে মেয়ে-পুরুষের ভিড় দেখে এসেছে। কোনওদিন প্রলোভন হয়নি ভেতরে ঢোকবার। বরাবর সবার কাছে শুনে এসেছে—ওটা অন্যায়। সিনেমা মানুষের রিরংসাবৃত্তিকে বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু তার আড়ালে যে এমন জগৎ আছে কে জানতো আগে। এ তো ছায়া নয়। এ যে সব জ্যান্ত মানুষ।

জয়ন্ত বললে—খা, একটা সিগারেট খা এবার—

পিণ্টু হাত বাড়িয়ে নিলে সিগারেটটা। জয়ন্ত ধরিয়ে দিলে।

বললে—রোজ তো খাচ্ছিস না, মাঝে-মাঝে একটু খাবি—

পিণ্টু জিজ্ঞেস করলে—তুই এখানে রোজ আসিস?

—যেদিন সুটিং থাকে, সেদিনই আসি—মীনা তো আমার বন্ধু—

—সে কি?

—এখনও তো ভালো নাম হয়নি, যখন একেবারে নাম ছিল না, তখন আমিই টাকা দিতাম, আমি টাকা না দিলে ওদের সংসারই চলতো না—সেই জন্যেই তো আমাকে এখানে ঢুকতে দিয়েছে...

এতদিন জয়ন্তর ওপর যতটা শ্রদ্ধা ছিল, এর পর শ্রদ্ধা যেন আরো বাড়লো। পিণ্টু জয়ন্তর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে।

জয়ন্ত বললে—সিগারেটটা কেমন লাগছে?

পিণ্টু বললে—ইস্, একটা কথা একেবারে ভুলে গেছি—

—কী?

তন্ময়কে চিনিস তো? সে আমাদের বাড়িতে যাবে বলেছিল আজকে, একেবারে ভুলে গেছি। একটা বই ফেরত নিতে যাবে কথা ছিল, এক সঙ্গে দুজনে বাড়ি যেতাম—

জয়ন্ত বললে—সে হয়ত ভুলেই গেছে, আর কলেজে যখন যাসনি, সে আজ আর তোর বাড়ি যাচ্ছে না......

হঠাৎ যেন হুড়মুড় করে মাথার ওপর একটা আঘাত লাগলো। স্বর্গ যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল পিণ্টুর চোখের সামনে! চারদিকে একটা হৈ-চৈ। প্যাক্ আপ্, প্যাক্ আপ্। পাখাগুলো আবার বন্ বন্ করে ঘুরছে। কখন সুটিং শেষ হয়ে গেছে খেয়ালই ছিল না। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে।

—এই যে বাবা জয়ন্ত, চলো!

একজন বুড়ো মতন লোক। বেশ [illegible]
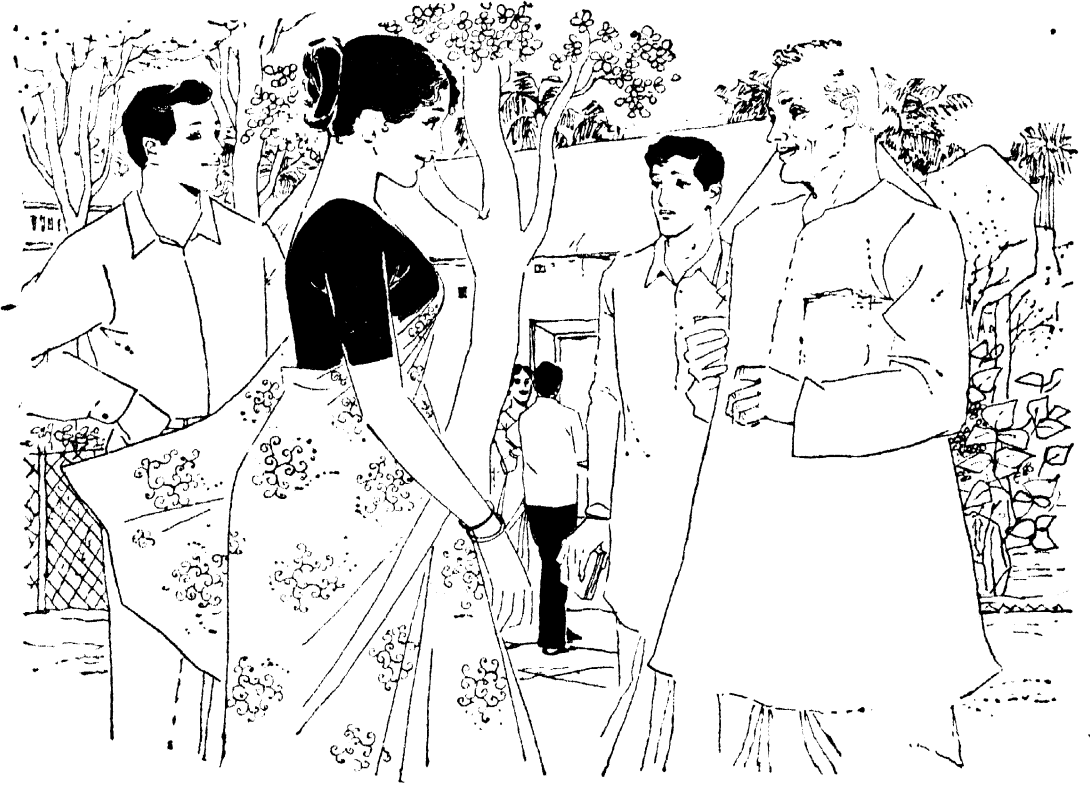
একটা সাধারণ ছাপা শাড়ি পরে একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা

পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবী পরেছেন। নতুন জুতো। ষাট-সত্তর বয়েস হবে। রোগা লম্বা। গাল তোবড়ানো ভদ্রলোক।

—কেমন দেখলে ?

জয়ন্ত বললে—ওয়াণ্ডারফুল! আজকে মীনা যা পারফর্মেন্স্ দেখিয়েছে—

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন—দেখ, তোমরা পাঁচজনে ভালো বললেই ভালো—

বলে ভদ্রলোক হাত জোড় করে উর্ধ্বনেত্রে 'মা' 'মা' বলে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করলেন।

বললেন—আজকে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছি জানো! মাকে বললুম, মা মীনা আমার মেয়ে নয়, এ তোমারই মেয়ে আমি তো তোমার ভরসাতেই আছি মা। আমি মীনাকে বলেছি বাবা—যে তোরও এক দিন নাম হবে মা, তোরও একদিন গাড়ি হবে,—

জয়ন্ত বললে—নিশ্চয়ই হবে, দেখে নেবেন, আমি ওর মধ্যে পার্টস্ দেখেছি বলেই তো নামিয়ে দিলুম—

—তাই তো আমি বলেছি ওকে, তোর যা চেহারা তোর যা গুণ, একদিন তোকে বাঙলা দেশ নেবেই, কিন্তু কখনও যেন অহঙ্কার না-হয় মা, অহঙ্কার হলেই কেরিয়ারের বারোটা বেজে যাবে।—তা আজ তোমার কলেজ নেই ?

জয়ন্ত বললে—কলেজে যাই নি আজ, প্রক্সির ব্যবস্থা করেই পালিয়ে এসেছি—

—তা ভালোই করেছ বাবা, মীনার সুটিং-এর প্রথম দিন তোমার থাকা উচিত—

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলে—মীনা কোথায় ?

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন—মেক্-আপ্ তুলতে গেছে—

জয়ন্ত বললে—দেখি, আমি কন্‌গ্র্যাচুলেট্ করে আসি—বলে চলে গেল অন্যদিকে।

পিণ্টু দাঁড়িয়েই রইল একলা। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন—আপনি কে ? জয়ন্তর বন্ধু বুঝি ?

পিণ্টু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা এক কলেজে, এক ক্লাশে পড়ি—

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন—ও, তা কেমন দেখলেন আমার মেয়েকে ? আমার বড় ভালো মেয়ে, জানেন ? আমি সিনেমায় আসতে দিতে চাইতুম না, কিন্তু জয়ন্তর চেষ্টাতেই তো এ-লাইনে এল। জয়ন্ত বললে, মীনার প্রতিভা আছে, ওকে আপনি বাধা দেবেন না—। আমি ভাবলুম, আমি সেকেলে লোক, কেন ওর কেরিয়ারে বাধা হয়ে দাঁড়াই—তা আপনার ভালো লেগেছে তো ?

পিণ্টু বললে—আমাকে আপনি 'আপনি' বলছেন কেন ?

—না না, বাবা, কার কী রকম মনোভাব বুঝতে পারি না তো! এই দেখ না বাবা, ওরা আমাকে বললে আপনি কষ্ট করে কেন স্টুডিওতে যাবেন, আপনি এই গরমে সেখানে যাবেন না—আপনি বাড়িতে শুয়ে ঘুমোন, তা আমার মেয়ে পার্ট করবে ফিল্মে, আমার কি বাড়িতে ঘুম আসে ? এই যতক্ষণ সুটিং হচ্ছিল আমার বুকটা ধুক্ ধুক্ করছিল—বয়েস তো বেশি নয় মেয়ের—

পিণ্টু সান্ত্বনা দিলে—আপনার মেয়ে একদিন নিশ্চয়ই সাইন্ করবে দেখবেন—

—তাই তোমরা বলো বাবা, তোমাদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। বহু টাকার মালিক ছিলাম একদিন, জানো বাবা, লাখ লাখ টাকা আমার ছিল—সব উড়িয়ে দিয়েছি আমি। পৈত্রিক বাড়ি—তিন লাখ টাকার সম্পত্তি সব আমি উড়িয়ে-ঝুড়িয়ে দিয়েছি, সংসার করবার ইচ্ছেই আমার ছিল না—

ভদ্রলোক সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই অনেক কথা বলে যাচ্ছিলেন।

পিণ্টু অবাক হয়ে শুনছিল। এমন অদ্ভুত লোক। এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়েই যেন স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গেছেন। এ-রকম আপনভোলা লোক তো আগে পিন্টু দেখেনি।

ভদ্রলোক তখনও বলে চলেছেন—সংসার করার ইচ্ছেই ছিল না আমার, এই মেয়ের জন্যেই আবার সংসার করছি—এখন মেয়েই আমার সব—

—বাবা, চলো—

পিন্টু চমকে উঠেছে।

পোশাক ফিরতেই দেখলে। দেখে অবাক হয়ে গেল। মুখের পেন্ট্-পাউডার সব মুছে ফেলেছে। সেই দামী সিল্কের শাড়ি, সেই সোনার গয়না সব খুলে ফেলেছে। একটা সাধারণ ছাপা-শাড়ি পরে একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। কিন্তু তবু অবাক হয়ে দেখবার মত।

পেছনে-পেছনে জয়ন্তও এসে হাজির।

বললে—চল্ প্রশান্ত—

—চলো বাবা, চলো—বলে বুড়ো ভদ্রলোকও মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বাগানের দিকে এগোতে লাগলো। পেছনে জয়ন্ত কানে কানে বললে—চল এক সঙ্গে যাই, তোকে নামিয়ে দেব—তুই বাড়ি যাবি তো?

বাড়ি যাবার কথা মনে পড়তেই হঠাৎ পিন্টু চারদিকে চাইলে। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিকে। আলো জ্বলেছে রাস্তায়। সেই কখন কলেজ থেকে দুপুরবেলা এসেছিল আর কখন এত বেলা হয়ে গেল জানতেই পারেনি সে। কলেজে ঢোকাও হয়নি ভালো করে। গেটের মুখ থেকেই ধরে এনেছিল জয়ন্ত। বাবা কী ভাবছে কে জানে। এত দেরি তো তার কখনও হয় না বাড়ি ফিরতে।

পিন্টু আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে—তুই কি এখন ওদের সঙ্গেই যাবি?

জয়ন্ত বললে—হ্যাঁ, স্টুডিও ট্যাক্সি-ভাড়া দেবে—এখনও তো গাড়ি হয়নি মীনার—

—কোথায় থাকে ওরা?

জয়ন্ত বললে—আমাদেরই বাড়িতে; ভবানীপুরে—

কথাটা শুনে পিন্টু চমকে উঠলো।—তোদের নিজেদের বাড়িতে?

—আমাদেরই বাড়ি, ওরা ভাড়াটে—

তারপর ভালো করে বুঝিয়ে বললে জয়ন্ত।

—আমাদের তিনখানা বাড়ি আছে। একটাতে আমরা থাকি, আর দুখানা বাড়ি ভাড়া খাটাই। ওরা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে—

পিন্টুর ক্রমেই যেন শ্রদ্ধা হচ্ছিল জয়ন্তর ওপর। এতদিন এক সঙ্গে পড়ে এসেছে, অথচ একবারও তো এসব কথা বলেনি তাকে। রাস্তায় বাড়ির বারান্দায় কত মেয়েদের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখেছে, হেসেছে, ইঙ্গিত করেছে। সব সময়ে ভালো লাগেনি পিন্টুর। আজ সত্যি সত্যি একটা মেয়ের সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠতা দেখে অবাক হয়ে যাবার মতন ঘটনা ঘটে গেছে যেন।

—আরে ভাড়াটে মানে নামেই ভাড়াটে। ভাড়া-ফাড়া দেয় না—

—কেন? ভাড়া দেয় না কেন?

জয়ন্ত বললে—ষাট টাকা ভাড়া দেবে কোত্থেকে? এতদিন কি টাকা ছিল?

—কিন্তু এখন তো টাকা উপায় করছে একটু-একটু—

জয়ন্ত বললে—এ তো আমিই সিনেমায় নামিয়ে দিলুম তাই পাচ্ছে। এতদিন এক্‌স্ট্রার পার্ট-ফার্ট দিচ্ছিল, এবার আমিই সুব্রত রায়কে ধরে হিরোইন্ করে দিয়েছি—

—কিন্তু এখন তো ভাড়া দেওয়া উচিত?

জয়ন্ত বললে—দূর, ওরা দিলে আমিই বা নেব কেন?

—কেন? ভাড়া নিবি না কেন?

জয়ন্ত বললে—ভাড়া দিলে আজ পাঁচ বছরের ভাড়া দিতে হয়। পাঁচ বছর ধরেই তো ভাড়া নিচ্ছি না—

—সে কি? তোর বাবা কিছু বলেন না?

জয়ন্ত হাসলো। বললে—বাবা জানতে পারলে তো! আমি মাসে-মাসে ঠিক পকেট থেকে ওদের ভাড়া দিয়ে দিই—

—কেন?

জয়ন্ত বললে—সে পরে বলবো 'খন তোকে—আর ওরা তো বাড়ি করছে শিগ্‌গির—

—নিজেদের বাড়ি?

জয়ন্ত বললে—হ্যাঁ, জায়গা-জমি কিনে, বাড়ি আরম্ভ করে দিয়েছে, এখন তো ও টাকা পেয়ে গেছে অনেক—

—কোথায় বাড়ি করছে? কোথায়?

জয়ন্ত বললে—বেহালা না সখের বাজার, কোথায় ওই দিকে—

ততক্ষণে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। জয়ন্ত বললে—তুই সামনে ওঠ প্রশান্ত—

ভেতরে মেয়েটা উঠলো আগে। একেবারে ওপাশের দরজার ধার ঘেঁষে বসলো। তারপর জয়ন্ত বললে—এবার কাকাবাবু আপনি উঠুন—

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন—না বাবা, তুমি ওঠো আগে, আমি বুড়ো মানুষ ধারের দিকে বসবো—

গাড়ি ছেড়ে দিলে। একেবারে স্টুডিওর গেট ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে মোড় ঘুরিয়ে চলতে লাগলো।

কাকাবাবু বললেন—সকাল থেকে কী ভাবনা ছিল জানো বাবা, এখন ভালোয়-ভালোয় যে চুকলো এই রক্ষে—সুব্রতবাবু তো বললেন, ভালোই করেছে মীনা, এখন যা কপালে আছে হবে—

জয়ন্ত বললে—আপনি কিছু ভাববেন না কাকাবাবু, আমি যখন আছি, তখন আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আপনি চুপ করে বসে থাকুন—এর পর থেকে আপনি আর আসবেন না—

—কী যে বলো তুমি। এই আজ সুটিং হবে, কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি, তা জানো।

জয়ন্ত বললে—আপনার মেয়েকে আমি সত্তর হাজার টাকার গাড়ি কিনে দিয়ে তবে ছাড়বো। আপনি দেখছেন না কাকাবাবু, যে-সে খেঁদি টেঁপি বুঁচি পর্যন্ত এক লাখ টাকা বেট করে বসে আছে, আর মীনার পার্টস থাকতে মীনা পাবে না?

কাকাবাবু বললেন—তখন আমি আর বেঁচে থাকবো না বাবা—

—খুব বাঁচবেন, খুব বাঁচবেন, আমি আপনাকে দেখিয়ে তবে ছাড়বো! বাঁচবেন না মানে?

কাকাবাবু বললেন—তখন কি আর আমাদের কথা তোমার মনে থাকবে বাবা! তখন তুমি সংসার করবে, তুমি আর কদিন আমাদের দেখতে পারবে—তোমারও তো নিজের সংসার হবে—

মেয়েটা এতক্ষণে কথা বললে। বললে—কিন্তু জয়ন্তদা, ওই শাড়িটা আমাকে দিতে হবে—যে-শাড়িটা পরে আমি পার্ট করেছি—

জয়ন্ত বললে—তুমি এখনই অত লোভ দেখিও না বাপু, ওতে প্রোডিউসাররা চটে যায়, সব সিনেমা-স্টারদের ওই নিয়ে বদনাম আছে এ-লাইনে—

—কিন্তু এ-সীন্ শেষ হয়ে গেলে এ-শাড়ি নিয়ে ওরা কী করবে? শাড়িটা যে খুব পছন্দ হয়ে গেছে আমার—

এতক্ষণে একটা রাস্তার মোড়ে আসতেই জয়ন্ত বললে—এখানে নেমে যা তুই প্রশান্ত, এখান থেকে বাসে উঠে পড়—

নামতে ইচ্ছে করছিল না পিন্টুর। মনে হচ্ছিল এদের সঙ্গে গাড়িতে সারা-রাত চললেও বোধহয় তার ঘুম পাবে না, খিদে পাবে না। এমনি করেই গল্প করতে-করতে চলতে পারবে সে।

—তোর কাছে বাসভাড়ার পয়সা আছে তো?

কথাটার উত্তর দিতে গিয়ে লজ্জায় কান মুখ লাল হয়ে উঠলো পিন্টুর। সে-কথার উত্তর না-দিয়ে পিন্টু সোজা ফুটপাথের ওপরে গিয়ে দাঁড়াল। এইখানেই বাদামতলার বাসটা এসে দাঁড়াবে। তারপর অনেক পরে মুখ ফিরিয়ে ট্যাক্সিটা একটা লাল বিন্দু হয়ে অনেক দূরে ট্র্যাফিকের ভিড়ে মিলিয়ে গেল।

আগেকার মত রাত দুপুরে টর্চ নিয়ে আর হাঁটতে হয় না বিপিনবাবুকে। এখন আলো হয়েছে রাস্তায়। কিন্তু অন্য বিপদ রয়েছে। নতুন বাড়ি হচ্ছে চারদিকে—

তারই খোয়া ছড়ানো থাকে রাস্তায়। পিন্টু তখনও ফিরলো না দেখে বিপিনবাবু নিজেই বেরিয়েছিলেন। একবার বাস-রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়ান। কলকাতা শহর। শহরতলী হলেও শহরই বলতে হবে। ছোটবেলায় যখন সবে এ-পাড়ায় এসেছিলেন তখন এমনি একজন লোভ দেখিয়ে কিছু টাকা হাতাবার চেষ্টা করেছিল। লালার দোকানের সামনে দিয়ে যেতেই লালা ডাকলে —কী বড়বাবু, এত রাত্তিরে কোথায় চললেন?

—এই দেখ না লালা, আমার ছেলে এখনও ফিরলো না, একটু দেখতে বেরিয়েছি—

লালা বললে—দিনকাল বহুত খারাব হয়েছে বড়বাবু, চারদিকে যত আদমী বাড়ছে, মটরগাড়ি তত বাড়ছে—

এই দোকানেই জিনিস কিনতে আসবার সময় পিন্টুকে সঙ্গে করে আনতেন বিপিনবাবু। মনে হতো—কলকাতা শহর চিনুক, এখন থেকে লোকের মতিগতি জানতে শিখুক। তারপর দেড় মাইল দূরে ইস্কুলে পাঠানোর সময়ও ভাবনার অন্ত ছিল না তাঁর। প্রথম প্রথম অফিস যাবার সময় নিজের হাতে ধরে ছেলেকে নিয়ে যেতেন। ফেরবার সময় স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে একলাই আসতো। কিন্তু ভাবনা যেত না মন থেকে। অফিসের কাজের মধ্যেও মনে হতো পিন্টু ঠিক-ঠিক বাড়ি ফিরেছে তো। নীরদবাবু পাশে বসতেন তখন। জিজ্ঞেস করতেন—কী ভাবছেন বিপিনবাবু?

বিপিনবাবু বলতেন—মশাই, ছেলেটার কথা ভাবছি, বাড়ি থেকে ইস্কুলটা অনেক দূর তো- তাই—

নীরদবাবু বলতেন—যা হবার তা হবেই, ও আপনি ভেবেও কিছুছু করতে পারবেন না মশাই—

তারপর একটু থেমে বলতেন—আপনার একটা ছেলে, আপনি তার জন্যেই ভেবে-ভেবে অস্থির, আমার মতন পাঁচটা মেয়ে আর তিনটে ছেলে হলে কী করতেন বলুন দিকিনি?

বিপিনবাবু বলতেন—সে তো ভালো ছিল, এক সঙ্গে সবাই খেলতো, পড়তো, ঘুমোতো—একলা হয়েই যে মুশকিল হয়েছে—কী যে সারাক্ষণ ভাবে ছেলেটা, বড় হলে কবি-টবি হবে বোধহয়, সেই জন্যেই তো ভয় করে—

নীরদবাবু বলেছিলেন—এক কাজ করুন, স্কুল-ফাইন্যালটা পাশ করলেই আর পড়াবেন না, একেবারে সোজা আপিসে নিয়ে এসে ঢুকিয়ে দেবেন—আর দেরি করবেন না—

বিপিনবাবু বলেছিলেন—একটি মাত্র ছেলে, তাকেও লেখাপড়া শেখাবো না! শেষকালে বড় হয়ে আমাকেই সে দুষবে, বলবে আমি তার মনের মত করে লেখাপড়া শেখাতে পারিনি। আর তা ছাড়া—

একটু থেমে বলেছিলেন—আর তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, এই জায়গায় আর ছেলেকে আনতে চাইনে—দেখছেন তো কী আবহাওয়া এখানে? নিজে যা ভুগছি ভুগছি, ছেলেকে আর ঢোকাতে চাই না মশাই, তার পরকালটা আর নষ্ট করতে চাই না—

—কিন্তু লেখাপড়া শেখালেই কি মানুষ করতে পারবেন ভেবেছেন? অফিসের ভেতরটা তো জঘন্য বলছেন। আর অফিসের বাইরেটা বুঝি ভাল আছে ভেবেছেন? সেদিন বাসে যেতে-যেতে কী দেখলাম জানেন?

বিপিনবাবু বললেন—কী?

—আরে মশাই, দেখে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। ভাবলাম ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তো রাস্তায় বেরোই, তাদের সামনেই যদি দেখে ফেলতাম।

—কী, দেখলেন কী?

—মশাই, দেখি কি, না দেয়ালের গায়ে কোন্ সিনেমার ছবি লটকে দিয়েছে। ছবিতে কী এঁকেছে জানেন?

—কী?

নীরদবাবু মাথাটা বিপিনবাবুর কানের কাছে এনে চুপি চুপি বললেন—একটা ছেলে আর একটা মেয়ে দু'জন জড়াজড়ি করে...

বিপিনবাবু আর শুনলেন না। বললেন—ছি ছি ছি......

—এই সব চলছে মশাই আজকাল। সিনেমার বাইরের যদি এই, তো ভেতরে কী কেত্তন হয় বুঝতেই পারছেন—

বিপিনবাবু কথাটা শোনা পর্যন্ত খানিকক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না। ঘেন্নায় যেন সমস্ত শরীরটা রি-রি করে উঠলো। খানিক পরে বললেন—না মশাই, আমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকি সব সময় ছেলেকে চোখে-চোখে রাখি, কারোর সঙ্গে মিশতে দিই না—ছেলের চুল পর্যন্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছাঁটাই। নাপিত কত বলে। আমি বলি—না বাপু, ওতে মানুষ বড় হয় না। মানুষ বড় হয় মনুষ্যত্বে। আমি তো ছেলেকে তাই ছোটবেলা থেকে শিখিয়ে এসেছি—লোভ করবে না কিছুতে—ওই লোভেই যত পাপ, আর পাপেই মৃত্যু!

তারপর একটু থেমে আবার বলেছিলেন—জানেন, আমি ছেলের পড়ার ঘরে পর্যন্ত ঢুকে মাঝে মাঝে দেখি, ছেলে নভেল-নাটক পড়ে কিনা। জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখি বিড়ি সিগারেট আছে কিনা—ছেলে মানুষ করা কি কলকাতা সহরে সহজ! আপনি তো জানেন—

তা সে সব অনেক বছর আগেকার কথা! তখন নীরদবাবুর সঙ্গে ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা হতো। তখন থেকেই পিন্টুর চিন্তাতেই অস্থির হতেন বিপিনবাবু। অফিস থেকে ফিরেই প্রথম কথা ছিল তাঁর—পিন্টু ফিরেছে?

তারপর যখন দেখতেন পিন্টু নিরাপদে স্কুল থেকে ফিরেছে, তখন নিশ্চিন্ত হতেন। সেই তখনই বসতেন ছেলেকে নিয়ে। কোন্ বইতে পড়েছিলেন বিপিনবাবু যে ছেলেকে সব সময় কাছে কাছে রাখা উচিত। সেই বইটা পড়বার পর থেকেই চোখে-চোখে রাখতেন পিন্টুকে।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের জীবন আর আশ্চর্য মানুষের জীবনের ভাগ্যলিপি! জীবন শুরু হয় কত প্রত্যাশা নিয়ে, কত আনন্দের আকাঙ্ক্ষায় তার পরিপুষ্টি, কত অনুভাবনায় তার পরিতৃপ্তি, কিন্তু একদিন এই জীবনেরও শেষ হয়, একদিন ফুরিয়ে গিয়েই সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। একদিন মহা-জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েই যে মাটির মানুষের পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় তা বিপিনবাবু জানতেন না, তাঁর ছেলেও সে-কথা জানতো না।

পিন্টু তো তখন ছোট। খুব ছোট, খুব ছোটবেলায় দেখেছে জীবন মানেই শাসন। জীবন মানেই বাধা। জামা পরতে, জুতো পরতে, চুল কাটতে—জীবনের সব খুঁটি-নাটির মধ্যে কেবল বাধার বেড়াজাল। বেঁচে থাকাটাই ছিল কেবল বাধার জেলখানা। কিন্তু চিরকাল তো কেউ ছোট ছেলেটি থাকে না। চিরকাল তো কেউ বাধা স্বীকার করে না। একদিন তারও বাধার বেড়াজাল অতিক্রম করতে ইচ্ছে হয়!

বাড়ির কাছে আসতেই কেমন তাই ভয়-ভয় করছিল পিন্টুর। এত দেরি কখনও হয় না তার বাড়ি ফিরতে। চারিদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। পাশের নতুন বাড়িটা তৈরি হচ্ছে। অন্ধকারে কয়েকটা নতুন বাড়ির জানালায় আলো জ্বলছে। কেউ কেউ বাড়ির সামনে বাগান করেছে।

লালার মুদিখানার দোকানটা পেরিয়ে হন্ হন্ করে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলো প্রশান্ত। লালার দোকানে তখনও ইলেকট্রিক আলো আসেনি। ঝোলানো আলোটার তলায় অন্ধকারে কাঠের জলচৌকির ওপর হাঁটুর কাপড় তুলে একমনে সারাদিনের হিসেব লিখছে সে।

তারপর শচীনবাবুদের বাড়ি। ও-বাড়িতে রেডিও এসেছে। সামনে একটা হাস্নাহানার গাছে খুব গন্ধ বেরিয়েছে।

নিজের বাড়ির দরজায় এসে পিন্টু ডাকলে—মা—

কিন্তু লজ্জায়-ভয়ে-সংকোচে যেন গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না।

—মা!

তাড়াতাড়ি মা এসে দরজা খুলে দিয়েছে।

—তুই কোথায় ছিলি বাবা? তোর জন্যে ভেবে-ভেবে আমরা অস্থির—

পিণ্টু ভেতরে ঢুকলো। প্রথমেই দেখে দেখলে ঘরের ভেতরটাতে। বাবা তো নেই। এখনও কি অফিস থেকে আসেন নি। তাড়াতাড়ি জমাটা খুলে হাত-পা ধুয়েই নিজের পড়ার টেবিলে আলোটা জেলে বই খুলে বসলো।

হঠাৎ সেই ছোট ভাঙা টিনের চালের তলাতেই, অন্ধকার ঝাপসা আবহাওয়াতেই যেন একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। পিণ্টুর মনে হলো গন্ধটা যেন চেনা-চেনা। যেন মনে হলো একটা ছোট রেস্টুরেণ্টের মধ্যে সে বসে আছে। আর ঠিক তার সামনেই আর একজন। ভালো করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলে। কে? কে ও?

তারপরেই চিনতে পারলে।

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছে মীনা

—আপনি তো ভারি দুষ্টু—

হঠাৎ যেন চমক ভাঙলো। কই, কেউ তো কোথাও নেই। সেই ভাঙা টিনের চাল। কেরাসিন কাঠের টেবিল-চেয়ার। এই পড়ার চেয়ার-টেবিলই বাবা সখের বাজারের ছুতোর-মিস্ত্রীর দোকান থেকে কিনে দিয়েছিলেন একদিন। তারপর নিজেই একদিন বাজার থেকে রং কিনে এনে সারাদিন বসে বসে রং লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আর পিছন দিকেও তো সেই পুরোন তক্তপোষ, আর তক্তপোষের ওপর বিছানা বালিশ তোষক।

—অ বউ, বউ—

—কী দিদি?

মা রান্না করছিল দাওয়ার ওপরে। পাশের ঘরের বিছানায় বসে-বসে বুড়ি মালা জপতে জপতে বললে—তোমার ছেলে ফিরলো বুঝি?

—হ্যাঁ দিদি।

—এতক্ষণ কোথায় ছিল গা?

হঠাৎ সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। মা তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে এসেছে।

—কোথাও পেলুম না পিণ্টুকে!

মা বললে—পিণ্টু তো এসেছে!

—এসেছে? কখন এল?

আর যেন দেরি সইল না। একেবারে তর-তর করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন বিপিনবাবু। বাবার এমন চেহারা কখনও দেখেনি পিণ্টু। পিণ্টু আঁতকে উঠলো বাবার মুখখানা দেখে।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কোনও কথা আর মুখ দিয়ে বেরোল না।

—কলেজ পালিয়ে কোথায় গিয়েছিলি বল? কোথায় গিয়েছিলি?

থর থর করে কাঁপছিল পিণ্টু।

মা ভেতরে এল। বললে—কোথায় গিয়েছিলে বলো না বাবা!

বাবার গলা আরো চড়া সুরে বেজে উঠলো—কথা বলছিস্ না যে? উত্তর দে কথার?

পিণ্টু তৎক্ষণে দাঁড়িয়ে উঠেছে। বললে—একজন বন্ধুর সঙ্গে অন্য জায়গায় গিয়েছিলুম।

—কোথায় গিয়েছিলি? কে সে বন্ধু? কী নাম তার?

—একজন বন্ধুর সঙ্গে ফিলম্-স্টুডিতে ছবি তোলা দেখতে।

—ছবি তোলা দেখতে? ফিলম্-স্টুডিওতে?

যেন বারুদে কেউ আগুন ধরিয়ে দিলে। আর থাকতে পারলেন না বিপিনবাবু। বললেন—আমি এই এত কষ্ট করে চাকরি করে তোমায় ফিলম্-স্টুডিওতে ছবি তোলা দেখতে পাঠাচ্ছি? এই তোমার লেখা-পড়া হচ্ছে? দাঁড়াও—

বলে কোথা থেকে একটা বাঁশের চেলা নিয়ে এলেন। এসে পিঠের ওপর দুম-দুম করে মারতে লাগলেন।

—আমি তোমার ভাবনা ভেবে ভেবে অস্থির, আর তুমি কলেজ পালিয়ে ফিলম্-স্টুডিওতে হাওয়া খেতে যাচ্ছো?

পিণ্টু দুই হাতে প্রাণপণে মাথাটা বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু মা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছে।

—ওগো, করছো কী? মেরে ফেলবে নাকি?

—তুমি ছেড়ে দাও, ও-ছেলে মরে গেলেও আমার কোনও ক্ষতি নেই—ওকে আমি মেরেই ফেলবো আজ, যা দু'চক্ষে দেখতে পারি না, তাই হয়েছে, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যা, নইলে আমি আজ আস্ত রাখবো না তোকে—

এতক্ষণ নিজের ঘর থেকে বসে-বসেই বাড়িওয়ালী বুড়ি বুঝি সব শুনছিল। আর পারলো না। সে-ও হাঁফাতে হাঁফাতে অন্ধকার হাতড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে এল।

বললে—হ্যাঁ গা, জামাই, অত বড় জোয়ান ছেলেকে মেরে ফেলবে নাকি তুমি?

বুড়ির গায়ে জোর আছে বলতে হবে। বিপিনবাবুর হাতের বাঁশের চেলাটা দুই হাতে জাপটে ধরে ফেলেছে। কিন্তু বাবা তখনও গজরাচ্ছেন—কে তোর বন্ধু বল্? বল্ শিগ্গির? কোথায় তার বাড়ি?

মনে আছে সে-রাত্রে পিণ্টু ভালো করে খেতেও পারেনি। ভালো করে ঘুমোতেও পারেনি। খাওয়া-দাওয়ার পর মা এসে মাথায় জলপটি দিয়ে অনেকক্ষণ পাশে বসে ছিল। একটা কথাও বেরোয়নি তার মুখ দিয়ে।

মা শুধু সান্ত্বনা দিয়েছিল নিজের মনেই—কেন বাবা ও'র কথা শোনো না বলো তো? দেখো না কত কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছেন, কত কষ্ট করে তোমার কলেজের মাইনে জোগাড় করছেন, কত দেনা হয়ে গেছে ও'র তোমার জন্যে—

পিণ্টু বললে—মা আমি আর কখ্খনো এমন করবো না—

মা বলেছিল—ছি বাবা ছি,—

বলে নিজের আঁচল দিয়ে পিণ্টুর চোখ মুছিয়ে দিয়েছিল। বাবার কাছ থেকে আঘাত পেয়ে যে-কান্না বুকের মধ্যে জমে উঠেছিল, তা যেন মা'র সান্ত্বনায় আর বাধা মানলো না। চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে ঝরে পড়তে লাগলো।

পিণ্টু মা'র হাত দুটো ধরে বলতে লাগলো—আমি আর এমন করবো না মা, আমি কথা দিচ্ছি মা—

ভেতরের ঘরে তখনও যেন বাবার অস্পষ্ট গলা শোনা যাচ্ছে। বাবাকে জীবনে অত রাগতে কখনও দেখেনি পিণ্টু। অমন গায়ে হাত দিতেও কখনও দেখেনি। আর ওদিকে বাড়িওয়ালী বুড়িটা তখনও গজ্ গজ্ করছে—কী রাগ বাবা জামাই-এর,—

তারপর ডাকলে—অ বউ, বউ—

মা বললে—আমাকে ডাকছো দিদি?

বুড়ি বললে—বলি তোমার খাওয়া হয়েছে?

মা বললে—এইবার খাবো—

—খেয়ে নাও বাছা, না-খেয়ে খেয়ে কি আমার মতন নিজের শরীলটাও নষ্ট করবে?

তারপর নিজের মনেই গজ্-গজ্ করতে লাগলো—আমিও মিনসের ওপর রাগ করে খেতুম না গো, না-খেয়ে না-খেয়ে এই বাতের বাথায় মরছি। মিনসে কি আমায় কম জ্বালিয়েছে গা? মিনসের জ্বালায় হাড়-মাস্ আমার ভাজা-ভাজা হয়ে গেছে চেরটা কাল—এখন কোথায় রইল শুনি তোর টাকা? আর কোথায় রইলি তুই? মরণদশা অমন মিনসের মুখে, মিনসে যেমন আমায় জ্বালিয়েছে, আমিও তেমনি নুড়ো জ্বালিয়ে দিয়েছি মিনসের মুখে—

আর তারপর আরও রাত বাড়লো। থম্ থম্ করতে লাগলো কলকাতা শহর, থম্ থম্ করতে লাগলো বাদামতলা, আর থম্ থম্ করতে লাগলো সারা পৃথিবী। জীবন আর যন্ত্রণা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল একটা সংসারের টিনের চালের তলায়। কোথা দিয়ে রাত কেটে গেল এ-বাড়ির কেউই টের পেলে না।

তারপর রোজ যেমন ভোর হয়, তেমনি করেই আবার ভোর হলো। তেমনি করেই পুব দিকের সূর্যটা তেরছা করে আলো ফেললে এই টিনের চালার উঠোনে, দাওয়ায়।

মনে আছে বিপিনবাবু আর দেরি করেন নি। বেশি দেরি করলে আরো বেশি

ক্ষতি হয়ে যেত। সেদিন খেয়ে-দেয়ে সোজা অফিসে গিয়েই একটা দরখাস্ত দিয়ে এসেছিলেন। নীরদবাবু বললেন—সে কি বিপিনবাবু, শেষকালে ছেলেকে আমাদের অফিসেই দেবেন?

বিপিনবাবু বললেন—না মশাই, ফার্গুসন সাহেবকে এখন থেকে ধরাই ভালো, চাকরির আজকাল যা বাজার, তাতে কোন্‌দিন ফার্ম উঠিয়ে নিয়ে যাবে—

ফার্গুসন সাহেব জিজ্ঞেস করলে—বি-এ পাশ করেছে তোমার ছেলে?

—আজ্ঞে, এই মাসে এগজামিন দেবে!

—ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট কী রকম করেছিল?

—ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছিল।

—তা আরো পড়াচ্ছো না কেন? এই কেরানীগিরির চাকরিতে ঢোকাবে এখনই? আরো বেটার প্রসপেক্ট হতো!

বিপিনবাবু বললেন—আর বেটার প্রসপেক্ট দরকার নেই স্যার, আমি আর ছেলের খরচ চালাতে পারছি না—

—অল রাইট—

বলে সাহেব অ্যাপ্লিকেশনখানার ওপর খস-খস করে একটা সই করে দিলে। নাম রেজিস্ট্রি হয়ে থাক এখন। অফিসের মধ্যে যেখানে ভেকেন্সি হবে, সেখানে প্রশান্ত চক্রবর্তীকে নিয়ে নেওয়া হবে। ফার্গুসন সাহেবের নিজের হাতের সই। কারো সাধ্যি নেই সে অর্ডার অমান্য করে।

বাড়িতে এসেই বললেন—পিণ্টুর চাকরির সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এলাম—

—চাকরি করে দিয়ে এলে মানে?

বিপিনবাবু বললেন—মানে পিণ্টুর চাকরি হয়ে গেল। আমাদের অফিসে ওকে ঢোকাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে, তারপর আর ভরসা করা চলে না—

পিণ্টুর ঘরে ঢুকে বললেন—কবে এগজামিন তোমার?

শুধু তাই নয়। এবার থেকে আর কোনও অপরাধ ক্ষমা করা হবে না তার। অনেক সাধ ছিল বিপিনবাবুর। অনেক বাসনা-কামনা নিজের জীবনে পূরণ হয়নি। ভেবেছিলেন ছেলেকে দিয়ে সব পূর্ণ করবেন। পিণ্টু ডাক্তার হবে, পিণ্টু ইঞ্জিনিয়ার হবে। পিণ্টু তাঁর জীবনের সব অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করবে। তাঁর এক ছেলে। এক ছেলেই তার একশো ছেলের কাজ করবে। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে। দশজনকে বলতেও ভালো। কিন্তু হলো না যখন, তখন আর কী করা যাবে, তখন যা কপালে আছে তাই-ই হবে।

বাড়িতে ভালো করে বলে দিলেন—কেউ ওকে ডিসটার্ব করবে না—দিনরাত কেবল পড়বে ও—বাজারেও পাঠাতে পারবে না ওকে, এবার থেকে আগের মত আমিই বাজারে যাবো—

পিণ্টু সকাল থেকে পড়তে বসে। দুপুরে বেলা কলেজে যায়, আর সোজা বাড়িতে চলে আসে। আর যখন শেষকালের দিকে আসতে লাগলো তখন আর কলেজে যাওয়ারও দরকার নেই। কেবল পড়া আর কেবল পড়া। দিন-রাত কোথা দিয়ে শেষ হয়ে যায় টেরই পাওয়া যায় না।

বাড়ির টিনের চালে কাক এসে ডাকলে বিপিনবাবু হুস করে তাড়িয়ে দেন। বেরো, বেরো, কেবল কা কা করে ডাকছে এখানে।

তারপর অফিস যাবার আগে সবাইকে সাবধান করে দিয়ে যান—কেউ যেন গোলমাল না করে দেখবে, আগে ওর পড়া, তারপরে আর সব কিছু—

বাড়িওয়ালী বুড়ি বলে—ধন্যি বাপ বটে। ছেলেটাকে পড়িয়ে পড়িয়ে খুন করে ফেলবে গা?

জয়ন্ত কলেজে এসেছিল। বললে—আবার সুটিং আছে আজকে, যাবি নাকি?

পিণ্টু বললে—না। সেদিন বাবা খুব রাগ করেছিলেন—

—রতনবাবু তোর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন—

—রতনবাবু কে?

—মীনার বাবা। দেখবি এ-ছবিটিতে মীনার খুব নাম হয়ে যাবে—

সে-সব কথায় কান না দিয়ে পিণ্টু বললে—তুই একলাই যা, আমার যাওয়া হবে না—

পরীক্ষার আগে কারোরই গল্প করবার সময় নেই। সবাই কলেজে আসে, নোট নেয়, তারপর আবার চলে যায়। কলেজের সামনের চায়ের দোকানে শুধু ফার্স্ট ইয়ার আর থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টদের ভিড়। কোন রকমে ক্লাস-কটা সেরেই আবার সোজা বাড়ি চলে আসে পিণ্টু। বাড়ি এসেই পড়তে বসে। আর বিপিনবাবুও অফিস থেকে এসেই সোজা পিণ্টুর ঘরে ঢোকেন।

জিজ্ঞেস করেন—পড়া কতদূর এগোল?

পিণ্টু বলে—এগিয়েছে—

—ওসব জানি না। বলি পাস করবে তো? পাস না করলে সাহেবের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। তোমার জন্যে অফিসে যাওয়া আমার বন্ধ করতে হবে। বড় মুখ করে তোমার জন্যে খুব অহঙ্কার করেছিলুম কিনা—

বুড়ি বলে—বাবা, তুমি তো আমাদের খুব বলতে পারো, আর মুখপোড়াদের কিছু বলতে পারো না?

—কে? কার কথা বলছেন?

—ওই যে হতচ্ছাড়া হাভাতেদের বাড়ি হচ্ছে। তাদের মিস্ত্রীরা যে মাথার ওপর দুরমুশ পেটে দুপুরবেলায়, তার বেলায় তো তুমি কিছু বলতে পারো না—

বিপিনবাবু বললেন—একদিন তো বলেছি। তবু বন্ধ করেনি—

সেদিন সকাল বেলা থেকেই ছাদ-পেটানোর শব্দ সুরু হয়েছে। বাজার থেকে ফিরে হাতের থলিটা রেখেই দৌড়ে বাইরে গেলেন।

—এই, এই মিস্ত্রী, তোমরা শব্দ করছো কেন? অ্যাঁ?

কে কার কথা শোনে। যেমন শব্দ হচ্ছিল, তেমনিই হতে লাগলো। কেউ বিপিনবাবুর কথায় কান পর্যন্ত দিলে না।

বিপিনবাবুর আর সহ্য হলো না। একেবারে সোজা বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন। বললেন—এই মিস্ত্রী, এই?

—কেয়া বাবু?

বিপিনবাবু বললেন—নিকালো হিঁয়াসে? নিকালো: তোমাদের জন্যে কাজকর্ম সব বন্ধ হবে ভেবেছ? থামাও শব্দ! থামাও শিগগির—

একদল লোক কাজ করছিল। তারা আচমকা বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। সকাল বেলার কড়া রোদ এসে মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো বিপিনবাবুর। সবে মাত্র বাজার থেকে ফিরেছেন। তখনও হাতে-পায়ে জল দেওয়া হয়নি।

—তোমাদের বার বার বলেছি না, আমার ছেলে এগজামিনের পড়া পড়ছে, খুব আস্তে কাজ করবে, এবার শব্দ করলে তোমাদের সকলকে আমি ঠাণ্ডা করে দেব—

একথা সোজা কথা নয়। দু'একজন লোক কথাটা শুনে সামনে এগিয়ে এল।

বললে—কেয়া বোলা বাবু?

বিপিনবাবু বললেন—খবরদার বলছি, তোমাদের সকলকে আমি ঠাণ্ডা করে দেব—

এবার তারা আরো এগিয়ে এল।

—তোমাদের বাবু কোথায়? মালিক? মালিককে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে—

কিন্তু কুলিমজুর তারা। অত মালিকের দায়িত্বের ধার ধারে না। একজন চিৎকার করে উঠলো—মারো শালাকো—

আর বলা কওয়া নেই, সবাই একেবারে বিপিনবাবুর গায়ের ওপর চড়াও হয়ে এল। হাতের কাছে জিনিসের অভাব হয়নি। কোদাল, গাঁইতি, শাবল, বাঁশ সবই তৈরি ছিল। সবসুদ্ধ এসে বিপিনবাবুর ঘাড়ের ওপর পড়লো। একটা হৈ হৈ শব্দ উঠলো চারদিকে। মার মার শব্দ। মারো শালাকো। মারো। মার ডালো।

শব্দ শুনে যে-যেখানে ছিল দৌড়ে এসেছে।

বাড়িওয়ালী বুড়ির চোখ যেমনই হোক, কান খুব সজাগ। চিৎকার করে উঠেছে।—ও বউ, বউ, বেটারা জামাইকে মেরে ফেললে যে—

বিন্দুবাসিনীও রান্না করতে করতে সদরে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর কাণ্ডকারখানা

দেখে চিৎকার করে উঠলো—ও পিণ্টু, সর্বনাশ হয়েছে রে!

পিণ্টু যখন পড়ার টেবিল ছেড়ে দৌড়ে এসেছে, তখনও মিস্ত্রীরা বিপিনবাবুকে মারতে মারতে একেবারে নীচে নেমে এসেছে। মাথা মুখ কান দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে। বিপিনবাবুর আর কথা বলবারও শক্তি নেই তখন।

মা চিৎকার করে উঠলো—ওরে পিণ্টু, ও'কে যে মেরে ফেললে, ধর,—ধর—

কিন্তু পিণ্টু যেন তখন হতবাক হয়ে গেছে। তার চোখের সামনে যেন সমস্ত নিভে যাচ্ছে। অনেকখানি আলোর সামনে যেমন হয়, এও তেমনি। যেন ধাঁধা লেগে গেছে চোখে। তার পায়ের নীচের মাটি এতটুকু কাঁপছে না, মাথার ওপরের আকাশ মাথায় ভেঙে পড়ছে না। পিণ্টুর মনে হলো, যেন কিছুই হয়নি। যেন দৈনন্দিন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাটাই শুধু তার চোখের সামনে নির্বিচারে ঘটে চলেছে আর সে শুধু প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সেই ঘটনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। কখন সবাই মিলে তার বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে তুলেছে, কখন ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে গেছে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে, কিছুতেই যেন তার হুঁশ হচ্ছে না। সে যেন আজন্ম মানুষ হয়ে এসেছিল একদিন এই ঘটনাই প্রত্যক্ষ করবে বলে। যেন এরই জন্যে তার এতদিনের প্রতীক্ষা। এতদিনের প্রত্যেকটি শাসনের যেন এই প্রায়শ্চিত্ত। যত অন্যায় যত অবিচার যত অত্যাচার করেছে পিণ্টু, এ যেন তারই প্রতিশোধ। বাইরে কোনও অন্যায় না করুক, মনে মনেও তো একদিন বিদ্রোহ করেছিল। স্বপ্নেও তো কত অপরাধ করেছিল সে—এ যেন তারই প্রতিশোধ! বাবা যেন পিণ্টুর হয়েই সব শাস্তি আজ মাথায় পেতে নিলেন।

বাড়িওয়ালী বুড়ির তেজ দেখে কে! বলে—ধন্যি ছেলে জন্ম দিয়েছিল বটে বাপ, একটা কথা পর্যন্ত বললে না গা, একটা রাম-গঙ্গা কিছু রা কাড়লে না মুখে! আমার পেটের ছেলে হলে আমি অমন ছেলেকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতুম না—মরণদশা আর কি!

সমস্ত দিনই গজ্ গজ্ করতে লাগলো বুড়ি। কিন্তু আজ তার কথা শোনবার কি প্রতিবাদ করবার লোকও বুঝি হারিয়ে গিয়েছে এ-বাড়ি থেকে।

বিপিনবাবুর তখন বেঘোর জ্বর। অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থা। মা সারাদিন পাশে বসে জলপটি দিতে লাগলো কপালে। পিণ্টুর মতন মার মুখেও যেন কথা ফুরিয়ে গিয়েছে।

শচীনবাবু পাড়ার বৃদ্ধ বিচক্ষণ লোক। তিনি দেখতে এসেছিলেন। বলে গেলেন—তুমি পুলিসে খবর দাও বাবা, এসব তো ভাল কথা নয়—এতে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় আর এক কাজ করো—কাদের বাড়ি হচ্ছে এখানে?

পিণ্টু বললে—তা তো জানি না কাকাবাবু?

—ওদেরও একটা খবর দাও গিয়ে। তাদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে। এমন হাত-পা বন্ধ করে চুপ করে থেকো না। এসব—ব্যাটাদের সাজা হওয়া ভালো!

যার যা উপদেশ দেবার সবাই দিয়ে গেল সেদিন। বিপিনবাবু ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়েছিলেন। জ্ঞান ছিল তাঁর স্পষ্ট। সবই দেখছিলেন। সবই শুনছিলেন। এতদিনের চেষ্টায় গড়ে তোলা একটা জীবন যেন তাঁর চোখের সামনে ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। তিনি চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন

সবসুদ্ধ এসে বিপিনবাবুর ঘাড়ের ওপর পড়লো, একটা হৈ হৈ শব্দ উঠলো চারদিকে

নিজের স্ত্রী মুখের দিকে, নিজের ছেলের মুখের দিকে, কিন্তু কিছুই বলতে পারছিলেন না। তিনি যেন নিজের মনেই হতবাক হয়ে ভাবছিলেন—এ কেমন করে ঘটলো? এ কেন হলো? এতদিনের চেষ্টায় যা গড়তে চেয়েছিলেন, তা এমন করে একদিনে এক মুহূর্তে ভেঙে গেল কেন? কার দোষে? কার পাপে? পিণ্টুর মুখের দিকে আবার চাইলেন বিপিনবাবু। পিণ্টু তো কই কাঁদছে না, তাঁর স্ত্রীও তো কই দুঃখ পায়নি। তবে তিনি নিজেই কি এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী! হঠাৎ তাঁর মনে হলো চোখের সামনে যেন কতকগুলো মূর্তি ভেসে উঠছে। আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন তাদের দিকে। ওরা কারা? ওরাও তাঁর অসুখের খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে এসেছে! অন্ধকার টিনের চালের ঘরখানা যেন মানুষের ভিড়ে ভরে গেল। এত লোক! এরা কারা? তিনি কি তবে মারা যাচ্ছেন? তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছে। আবার তাঁদের দিকে চেয়ে দেখলেন বিপিনবাবু, এবার যেন বড় চেনা চেনা মনে হলো তাদের। তারপর হঠাৎ চিনতে পারলেন। তিনি তো নিজেই নিজেকে দেখতে এসেছেন। ওই তো তাঁর লোভ তাঁর দিকে চেয়ে তাঁকে কটাক্ষ করছে! যত লোভ তিনি জীবনে দমন করেছিলেন, সেই সমস্ত যেন একটা মানুষের মূর্তি নিয়ে তাঁর সামনে এসেছে। কই, আমাকে তো তুমি স্বীকার করোনি, কিন্তু এবার? তার পাশেই যে দাঁড়িয়ে ছিল সেও যেন তিনিই। তাঁরই বাৎসল্য। তাঁর বাৎসল্য চাপা হাসি হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে। কই, অত্যাচার দিয়ে তুমি তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলে আমার ওপর। কিন্তু এবার? আর শুধু তারাই নয়। আরো অনেকে এসেছে। বিপিনবাবুর দুঃখ, দারিদ্র্য, ভালবাসা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা, বুদ্ধিবিবেচনা সব যেন সার দিয়ে আজ তাঁর অন্তিম সময়ে এসে তাঁকে ব্যঙ্গ করছে। কই, কিছুই তো পেলে না তুমি, কিছুই তো হলো না তোমার! তাহলে কেন তুমি আমাদের এত ভালবেসেছিলে, এত আদর করেছিলে, এত করে আঁকড়ে ধরেছিলে? কেন তুমি আমাদের অপমান করেছিলে?

বোবার মত হাঁ করে যেন বিপিনবাবু শুধু নিজেকেই প্রাণ ভরে দেখতে লাগলেন।

—একটু জল খাবে?

মা মুখের কাছে মুখ নিচু করে জিজ্ঞেস করলে—ডাবের জল খাবে?

বিপিনবাবু সে কথার উত্তর দিলেন না। বললেন—পিণ্টুর এগজামিন, ওকে পড়তে বলো—

এতক্ষণে পিণ্টুর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল টপ করে গড়িয়ে পড়লো।

পরের দিন বাড়ির মালিক এলেন। তাঁর কাছে খবর গিয়েছিল। বুড়ো মানুষ। রোগা, ডিসপেপটিক রোগী। শচীনবাবু আগ বাড়িয়ে নিজেই এসেছিলেন।

বললেন—আমি বিপিনবাবুকে জানি মশাই, তাঁর মত ভদ্রলোক হয় না, তিনি কারো সাতে পাঁচে থাকেন না—

ভদ্রলোক বললেন—আমি তো জানতুম না, মিস্ত্রীদেরই ভার দিয়েছি, তারাই সব জোগাড়-যন্ত্র করে দিচ্ছে, এর মধ্যে এমন কাণ্ড হবে কী করে জানবো বলুন?

—তা আপনার সেই মিস্ত্রীকে ডাকুন, তার সঙ্গে মুকবেলা করুন—

—তারা যে কেউ আসেনি। আজকাল মিস্ত্রী পাওয়া কি অত সহজ। হয়ত আর কাজই করবে না!

শচীনবাবু বললেন—তা হলে পুলিসে একটা ডায়েরী করে দিন! মানুষ খুন করে পালাবে আর আপনি কিছু বলবেন না?

—দেখুন তো কী ঝঞ্ঝাট, আমি বুড়ো মানুষ, এখন পুলিসের হ্যাপা কে সয় বলুন তো?

আরো কিছু লোক জুটেছিল। নতুন পাড়ার নতুন বাসিন্দা সবাই। কেউ কাউকে ঘনিষ্ঠভাবে জানে না। অনেকগুলো আধা মধ্যবিত্ত পরিবার নতুন পরিবেশে এসে জুটে জোট বাঁধবার চেষ্টা করছে। নতুন গোষ্ঠি তৈরি করছে। একের আসাতে অন্যরা এগিয়ে এসেছে। এমন না করলে নতুন পাড়ায় টিকবে কেমন করে! আজ না-হয় মিস্ত্রি-মজুররা অত্যাচার করে গেল। কিন্তু তারপর? আজ চুপ করে গেলে এর পরে কী হবে? যখন অন্য আরো অত্যাচার শুরু হবে! পরস্পরের বিপদে আমরা পরস্পরকে যদি না দেখি তো বাঁচবো কেমন করে। আপনিও ভদ্রলোক, আমরাও ভদ্রলোক। ভদ্রলোকদেরই তো আজ সমূহ বিপদ মশাই। ভদ্রলোকদের দেখবার, তাদের দুঃখ কষ্ট বোঝবার কেউ নেই। কুলি-মজুরদেরই তো আজকাল রাজত্ব। গভর্মেণ্ট তাদের সুবিধেটাই দেখছে।

বেশ গরম-গরম উত্তেজনাকর কথা সব।

—আমিও তো মশাই, আপনাদের মতন গেরস্থ লোক। এককালে পৈতৃক টাকাকড়ি ছিল—তা সে-সব কবে নষ্ট করে দিয়েছিলুম,

বিন্দুবাসিনী রান্না করতে করতে সদরে এসে দাঁড়িয়েছে

এতোদিন ভাড়াবাড়িতেই কাটাচ্ছিলাম, হঠাৎ ইচ্ছে হলো বাড়ি করবার, তা টাকা তো আমার সামান্য, তেমন কনট্রাকটারও রাখতে পারিনি, ওই মিস্ত্রীরাই যা ভরসা—

ভদ্রলোক গরমে-গুমোটে হাঁপাচ্ছিলেন।

আবার বললেন—এখন আপনারা পাঁচজনে যা বলবেন তাই-ই করবো—

একজন বিপিনবাবুর বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলো—প্রশান্তবাবু, প্রশান্তবাবু—

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—প্রশান্তবাবু কে?

—ওই বিপিনবাবুর ছেলে, একমাত্র ছেলে, তাঁর তো আবার সামনে পরীক্ষা, বি এ পরীক্ষা দিচ্ছে। ও প্রশান্তবাবু, একবার বাইরে আসুন তো—

—অ বউ, বউ, কে ডাকছে গো তোমার খোকাকে! অই পুলিস এয়েছে বোধয়—

পিন্টু পড়ছিল, বাইরে ডাক শুনেই বেরিয়ে এল।

—এই দেখুন, এই এঁরই বাড়ি হচ্ছে। খবর দিয়েছিলুম, দেখতে এসেছেন।

পিন্টু তখন যেন সামনে ভূত দেখেছে।

—কাকাবাবু, আপনি?

ভদ্রলোক প্রথমে চিনতে পারেননি, তারপরে বললেন—ও, তুমি? তোমাদের বাড়ি? তোমার বাবার নামই বিপিনবাবু?

পিন্টুকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন দুই হাতে।

বললেন—কী সর্বনাশ হলো বলো তো! আমি কি জানি বাবা যে এ তোমাদের বাড়ি? জয়ন্তও তো বলেনি! আমি যদি আগে এতটুকু জানতুম বাবা! তা তোমার বাবা এখন কেমন আছেন?

রতনবাবুর দুই হাতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ-তার স্পর্শে পিন্টু যেন ভয়ে থর-থর করে কাঁপছিল। বাবা তো জানতে পারছেন না। বাবার তো আজ ওঠবারও ক্ষমতা নেই। অথচ যদি জানতে পারতেন, রতনবাবু সেই ফিল্ম-স্টুডিওরই লোক। এই এঁর সঙ্গে মেশবার জন্যেই একদিন তাকে শারীরিক শাসন সহ্য করতে হয়েছিল বাবার কাছে। কাকাবাবু যত তাঁকে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন, পিন্টু ততই যেন শিউরে উঠতে লাগলো মনে মনে। যেন কুষ্ঠরোগীর ছোঁয়াচ লাগছে তার গায়ে। আর সমস্ত আত্মা যেন বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। তার লোভ, তার মোহ, তার আকাঙ্ক্ষা সব যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এতোদিন সমস্ত প্রলোভন জয় করেছিল সে অনেক কষ্টে। বাবার কথাই তো ঠিক। বাবাই তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী। বাবাই তো তার একমাত্র সম্বল, একমাত্র অবলম্বন। বাবার আদর্শেই তো সে জীবনের পথে চলবে ঠিক করেছে। জীবনে মিথ্যাচার নয়, আসক্তি নয়। সৎ সভ্য ভদ্র মানুষ হবে সে, এই-ই তো তার বাবা চেয়েছিলেন। বাবাই তো ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছিলেন—সদা সত্য কথা বলবে। সত্য বই মিথ্যে আচরণ করবে না। সারাজীবন সৎ আচরণই তো করে এসেছে সে। জীবনে বাবা যেমনভাবে চেয়েছিলেন, তেমনিভাবেই চলে এসেছে এতোদিন। শুধু মাঝখানে কয়েকদিন জয়ন্ত এসে ধূমকেতুর মত তার শিক্ষা-সংস্কার সমস্ত ভুলিয়ে দিয়েছিল। জয়ন্তই বলেছিল—যারা সাধারণ লোক, তারাই সত্য কথা বলে, যারা সাধারণ মানুষ, তারাই সৎ আচরণ করে। জয়ন্তই তো বলেছিল—যারা সংসারে বড় হয়েছে তাদের ধর্ম আলাদা। তারা নিয়ম মেনে চলে নি। নিয়ম তাদের মেনে চলেছে। তাদের নিজেদের নিয়ম তারা নিজেরাই তৈরি করেছে।

পিন্টুর বুকের মধ্যে আবার শির-শির করে উঠলো। তার চোখের সামনে থেকে এই বাদামতলা, এই কলকাতা, এই পৃথিবী মুছে গেল। তার মনে হলো তার যেন চূড়ান্ত অধঃপতন হয়েছে। সমস্ত কিছু অধঃপতনের মধ্যে তার বিলয় হয়ে গেছে এক নিমেষে। সে যেন আবার সেই স্টুডিওর রাজ্যে চলে গেছে। সেখানকার ঐশ্বর্য বিলাসের আপাত-আকর্ষণের ঘূর্ণিতে আবার তার মোহ জন্মেছে। আবার ডিরেক্টার সুব্রত রায় চিৎকার করে উঠেছে—মনিটর। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা ঘুরতে শুরু করেছে। আবার মীনা এসে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে। আবার দুজনের চোখে চোখ রেখে কথা হচ্ছে। রেস্টুরেন্টের এক কোণে দুজনে গল্প করতে বসেছে আবার। সে একলা আর তার সামনে মীনা। মীনা আবার তার দিকে চেয়ে চোখ পাকিয়ে বলছে—আপনি তো ভারি দুষ্টু দেখছি—

কথাটা বলেই মীনা হেসে উঠলো খিল্ খিল্ করে।

পিন্টু জিজ্ঞেস করলে—হাসছো যে?

মীনা বললে—হাসছি আপনার রকম-সকম দেখে—

—কেন? আমি কী রকম?

—অন্য ছেলেরা যে-রকম আপনি তো সে-রকম নন। এতক্ষণ সামনে বসে আছি অথচ একবারও চেয়ে দেখছেন না আমার দিকে—

—মেয়েদের দিকে চেয়ে দেখা বুঝি ভালো?

—দেখতে যদি ভালো না লাগে তো আমাকে এখানে এই নিরিবিলি ঘরে নিয়ে এলেন কেন?

পিন্টু বললে—তোমাকে নিয়ে যে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করা যায় না—

—রাস্তায় নিয়ে ঘোরাঘুরি করবার মত চেহারা নয় বুঝি আমার?

—না না সে কথা তো বলি নি!

—তাহলে? আপনি বুঝি খুব লাজুক? মেয়েদের সঙ্গে মিশতে আপনার বুঝি লজ্জা করে?

—না লজ্জা নয়, ভয়। আমার খুব ভয় করে!

—ভয়? ভয় করে কেন? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক, যে আমাকে এত ভয় আপনার?

—কাট্ !!!

আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের সব আলোগুলো জ্বলে উঠলো। পাখাগুলো ঘুরতে সুরু করলো। সুব্রত রায় এগিয়ে এল। বললে—ও কে, ভেরি গুড্—ভেরি গুড্ পারফরমেন্স্—

আর পিন্টু চারদিকে তখন ভালো করে চেয়ে দেখবার অবকাশ পেলে। সবাই দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়ে। শচীনবাবু, রতনবাবু, পাড়ার যত ছেলে-বুড়ো জড়ো হয়েছে তাদের বাড়ির সামনে। খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। বোবার মত দাঁড়িয়ে রইল সকলের মুখের দিকে চেয়ে।

একজন বললেন—বাবার জন্যে খুব মনমরা হয়ে গেছে, দেখছেন তো!

আর একজন বললেন—বিপিনবাবুর তো ওই একটিই ছেলে কিনা, মাথার ওপরে আর কেউ তো নেই

—আর তা ছাড়া আমরা তো জানি, অমন পিতৃভক্ত ছেলে আজকালকার যুগে দেখা যায় না মশাই। আর বিপিনবাবুও তেমনি, ছেলে অন্ত প্রাণ—

মনে আছে সমস্ত অবস্থাটা বুঝে নিতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লেগেছিল তার। খানিকক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল সে। জীবনে যাকে অনেক আঘাত পেতে হবে, তার যেন সেইদিন থেকেই শিক্ষানবিশি সুরু হয়ে গিয়েছিল। এ কিছু নয়। তখনি তার মনে হয়েছিল—সত্যিই এ কিছু নয়। একেই বলে মোহ। জয়ন্ত যা বলে তা সব মিথ্যে কথা। বাবা যা বলেন সেইটেই শুধু সত্যি। জীবনে সত্য-আচরণটাই সত্যি। সৎপথে থাকাটাই সত্যি! সংসারে বড় হতে গেলে ধর্ম মানতে হবে। সৎ ধর্ম, সদাচরণের ধর্ম। এই রুক্ষ কঠিন বাস্তব পৃথিবীটাই সত্যি। ফিলম্-স্টুডিওটা পৃথিবী নয়। ওটা নকল। নকল পৃথিবী। এই পৃথিবীটারও ওপরে আর একজন ডাইরেক্টর আছে, সেই ডাইরেক্টরও হঠাৎ একদিন 'কাট্' বলে চিৎকার করে ওঠে। তখন সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-গ্রহ-নক্ষত্র সব স্থির নিশ্চল হয়ে থেমে যায়। তারই নিয়মে এই পৃথিবী চলে। সে নিয়ম যে মানে না সে বড় হতে পারে না। সেই নিয়ম মেনে চললেই তবে বড় হওয়া যায়। নিয়মেরই তৈরি পৃথিবী! এই পৃথিবীতে সূর্য চন্দ্র সব নিয়ম মেনেই চলে। [illegible]

জন্ম হওয়ার আগেও তারা নিয়ম মেনে চলেছে, এখনও চলছে। সেই নিয়ম মেনে চলছে বলেই পৃথিবী আজও অক্ষয় অবিনশ্বর। সে-ই কি শুধু পৃথিবীর বাইরের লোক?

—আসুন, ভেতরে আসুন, বাবা এখন একটু ঘুমিয়েছেন!

*

নীরদবাবু সেদিন ক্যাশ অফিসে এলেন। কী একটা কাজে বোধহয় এসেছিলেন। ফিরে যাবার পথে দেখতে পেয়েছেন প্রশান্তকে।

বললেন—কী খবর তোমার? বাবা কেমন আছেন?

—আজকাল একটু উঠে বসেন।

নীরদবাবু বললেন—আমি অনেকদিন ভাবি একবার তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসবো, তা যা দূরে তোমাদের বাড়ি, কোথায় সেই বাদামতলা—

প্রশান্ত বললে—এখন তো আর সে-বাদামতলা নেই, এখন সোজা বাস-রুট হয়ে গেছে—

নীরদবাবু বললেন—তোমার বাবার কাছে ওই বাদামতলার কত গল্প শুনেছি, যখন বিপিনবাবু প্রথম কলকাতায় এলেন, তখন তুমি এই এতটুকু, তোমার জন্যে বিপিনবাবু ভেবে-ভেবে অস্থির—

নীরদবাবু দেখা হলেই সেই সব গল্প করেন। ক্যাশের কাজ। টার্নবুলে এন্ড কোম্পানীর অনেক টাকা আমদানী-রপ্তানী হয় রোজ। ডালহৌসী স্কোয়ারের ভিড়ের মধ্যে কত অফিসে কত লোক কোথায় লুকিয়ে থাকে তার হদিস পাওয়া যায় না দিনের বেলা। কিন্তু বিকেল পাঁচটার পর যখন সবাই অফিস থেকে বেরোয় তখন টের পাওয়া যায়। তখন হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ ঘৃণা আর ভালবাসা, লক্ষ-লক্ষ যন্ত্রণা আর দীর্ঘশ্বাস, লক্ষ লক্ষ অস্বস্তি আর অভিশাপ পিল্ পিল্ করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। একদিন তাদের সঙ্গে আর একটা নতুন নাম যোগ হয়ে গিয়েছিল—প্রশান্ত চক্রবর্তী, টার্নবুলে এন্ড জনসন কোম্পানীর ক্যাশ-ক্লার্ক।

ফার্গুসন সাহেব প্রথম দিন চিঠিখানা পেয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখেছিল তার দিকে খানিকক্ষণ।

—তুমি বিপিনবিহারী চক্রবর্তীর সন্?

—ইয়েস স্যার?

—বি-এ পাশ করেছ তুমি?

—ইয়েস স্যার।

—তোমার ফাদার কেমন আছে এখন, হাউ ইজ্ হি নাউ?

প্রশান্ত বলেছিল—খুব শরীর খারাপ স্যার তাঁর। আপনি যদি আমাকে একটা চাকরি দেন তাহলে বড় উপকার হয় আমার—

অনেক লজ্জা অনেক কাকুতি-মিনতি করতে চেষ্টা করেছিল প্রশান্ত। অন্তত চোখে-মুখে সেটা প্রকাশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেদিন তার ভয় হয়েছিল হয়ত মুখটা যত করুণ করার চেষ্টা করছিল তত করুণ হচ্ছে না। হয়ত সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তা হয়নি। কেন যেন তার মনে হয়েছিল এ শোক তার মিথ্যে, এ অভাবও তার মিথ্যে। এই কাকুতি-মিনতি, এই চোখ ছল্-ছল্ করা তার কেবল অভিনয়। আর কিছু নয়।

মাসের শেষে একশো কুড়িটাকা মাইনেটা নিয়ে পকেটে পুরতেও যেন ঘেন্না হয়েছিল তার। নিজের দাসখৎ লিখে দেওয়া তার যেন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল সেইদিন। মনে হয়েছিল এতদিনে সে যেন সত্যিকারের সাধারণ, সত্যিকারের বরবাদ হয়ে গেল সংসারে। সংসারে তার কোনও দামই আর রইল না। একদিন বাইরে থেকে এসে একটা মানুষ যেমন এই পৃথিবীতে নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু করেছিল, সে-ও যেন ঠিক তেমনি করে শুধু তারই পুনরাবৃত্তি করে চলেছে।

—টাকাটা ভাল করে পকেটে পুরে নিন প্রশান্তবাবু, এ-লাইনে পিক-পকেটের যা উৎপাত! আপনি নতুন লোক—

প্রশান্ত পাশ ফিরে দেখলে। রমেশবাবু। কয়েক বছরের পুরোন স্টাফ। সবাই-ই পুরোন। প্রশান্তই কেবল নতুন। একেবারে নতুন। ডালহৌসী পাড়ার নতুন আমদানী। সকাল বেলা লক্ষ-লক্ষ লোকের সঙ্গে এসে এখানে ঢোকে আর নাক-কান বুজে কাজ করে যখন অসাড় হয়ে পড়ে, তখন বেরিয়ে আসে ভিড়ের চাপের মধ্যে। এমনি রোজ। কোথা দিয়ে দিন-মাস-বছর চলে যায় জানতেও পারা যায় না। মাসের শেষ তারিখে মাইনেটা নিয়ে এসে মার হাতে তুলে দেয়। মা টাকা-ক'টা নিয়ে ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করে মাথায় ঠেকিয়ে বাক্সের ভেতর তুলে রাখে।

বাবা বলেন—পিন্টু এসেছে?

মা বলে—না, এখনও আসেনি—

অসুখের মধ্যেও ছট্‌ফট্ করেন বিপিনবাবু। আর মাঝে-মাঝে টাইম-পিস্‌টার দিকে চেয়ে দেখেন।

বলেন—আজকে পিন্টু ভাত খেয়েছিল পেট ভরে?

পিন্টু যেন এখনও তার সেই ছোট ছেলেটি আছে। শুয়ে শুয়েও তদারক করেন, শুয়ে-শুয়েও ছেলের চিন্তা করেন। রাস্তায় যা ট্রাম-বাসের ভিড়। রাস্তায় যা পিক্-পকেটের অত্যাচার। ঘরে শুয়ে শুয়েও যেন তিনি ডালহৌসী স্কোয়ারে চলে যান সশরীরে। হাত ধরে নামিয়ে নেন্ পিন্টুকে। সরুন মশাই, সরুন না একটু। পা মাড়িয়ে দেবেন নাকি ছেলে-মানুষের?

মা পাশে এসে বলে—আমাকে কিছু বলছো?

—না, তোমাকে না!

—মনে হলো, তুমি যেন কাকে কী বলছিলে?

বাবা রেগে যান। বলেন—আমি আবার কাকে কী বলবো? আমি বলে নিজের জ্বালায় জ্বলছি—

বলে আবার পাশ ফিরে শোন্। আবার নিজের ভাবনার তলায় নিজেই তলিয়ে যান। রামদীনের কাছে এখনও ধার বাকি পড়ে রয়েছে। তোমার তো কিছু ভাবনা নেই বাবা। মাসে মাসে দশ টাকা করে দিও রামদীনকে। রামদীন আমার অনেক উপকার করেছে এককালে। এই ধরো যখন তুমি ইস্কুলে পড়ছো, তোমার সমস্ত খরচ তো আমি সব মাইনে থেকে যোগাতে পারিনি। তোমার টেক্সট্‌বুক কিনতে হতো, তোমার ইউনিফর্ম কিনতে হতো। আমি নিজে ছেঁড়া জুতো পরেছি, কিন্তু তোমাকে তো আমি কখনও খারাপ জামা-কাপড়-জুতো পরাতে পারিনি। তুমি মাছ ছাড়া খেতে পারো না বলে আমি রোজ বাজার থেকে মাছ কিনে এনেছি। তোমার জন্যে সাহেবগঞ্জ থেকে খাঁটি ঘি আনিয়েছি। এত টাকা আমি কোথা থেকে পাবো। ওই রামদীনই আমাকে সব টাকা দিয়েছে। যখনই দরকার হয়েছে তখনই ওর কাছে গিয়ে হাত পেতেছি। কখনও না বলেনি!

—কোথাও কিছু খাও না তো?

—আজ্ঞে না।

—খেও না, ও-সব বাসি-তেলে ভাজা খাবার, না-খাওয়াই ভালো। ওতে পেট খারাপ হয়। তোমার মা ভালো করে পরোটা করে দেবে, তাই একটা কৌটো করে নিয়ে যেও—আর দেখ...

বিপিনবাবু আরও গম্ভীর হয়ে ওঠেন।

—আর দেখ, বাসে অফিসে যাও, না ট্রামে—

—আজ্ঞে যখন যেটা হাতের কাছে পাই—

—না বাসে যেও না, ট্রামের সেকেন্ড ক্লাশে যাবে। ট্রামে অ্যাক্সিডেন্টটা কম হয়। সস্তাও পড়বে তোমার। আর দেখবে বহু লোক বাবুয়ানি করে আবার ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে, জানো। এমন আহাম্মক লোকও আছে কলকাতা শহরে। কেনরে বাপু, ফার্স্ট ক্লাশে আর সেকেন্ড ক্লাশে তফাৎ কোথায় শুনি?

যেন পিন্টু সামনে দাঁড়িয়ে চুপ করে স শুনছে।

—একেবারে ভেতরে গিয়ে পেছন দি বসবে, বুঝলে? ওই ফতো বাবুদের ম পা'দানিতে দাঁড়িয়ে যেন হাওয়া খেতে যে না বাবা, আমি একবার মুখ থুবড়ে প

গিয়েছিলাম—খুব সাবধান, খুব সাবধান!

—আমাকে কিছু বলছো?

—না তোমাকে না!

মা বললে—মনে হলো তুমি যেন আমাকে কিছু বললে?

বিপিনবাবু রেগে যান। বলেন—তুমি থামো তো! আমি আবার কাকে কী বলবো! আমি বলে নিজের জ্বালায় জ্বলছি—

বলে আবার পাশ ফিরে শোন্‌। আবার যেন ভাবনার তলায় তলিয়ে যান্‌। রামদীনের কাছে অনেক টাকা এখনও ধার আছে। পিন্টুকে বলে দিতে হবে। টাকা ধার করা স্বভাবটা ভালো নয়। ওতে অভ্যেস খারাপ হয়ে যায়। একবার ধার করলে তার থেকে আর মুক্তি নেই। ধার করেই যেতে হবে সারা জীবন।

—পিন্টু এলো?

মা বলে—এখন কী? এখন তো বেলা তিনটে সবে—

—তিনটে? ঘড়ি চলছে তো ঠিক?

মা বলে—হ্যাঁ ঠিক চলছে, এই ঘড়ি দেখেই তো পিন্টু আপিসে গেছে আজ—

—না না তুমি ভুল বলছো। ঘড়িটা চলছে কি না একবার কানে দিয়ে দেখ না। টিক্‌টিক্‌ শব্দ হচ্ছে?

আজকাল প্রত্যেক দিনই এই রকম। তারপর যখন বিকেল হয়, ক্রমে যখন অন্ধকার হয়ে আসে ঘরটা, তখন বাইরের সদর দরজায় কড়া নড়ে ওঠে।

ওগো, দরজা খুলে দাও না, কখন থেকে পিন্টু এসে কড়া নাড়ছে—

পিন্টু ভেতরে এসে জুতো খুলে বাবার কাছে যায়। বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—কেমন আছেন আজ?

—তোমার এত দেরি হলো যে? কখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে আর এত দেরি? আমি ভাবছিলুম খুব।

পিন্টু বলে—দেরি তো হয়নি—ওই অফিসের অনেক কাজ ছিল তাই একটু দেরি হচ্ছিল, ক্যাশ না মিললে তো আসতে পারি না—

—খুব সাবধান বাবা, তোমার ক্যাশের কাজ, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করবে। অফিসে নানা-রকমের লোক থাকে, বেশ ভেবে চিন্তে মিশবে—পৃথিবীতে ভালো-লোকেরও অভাব নেই, খারাপ লোকেরও অভাব নেই, তুমি অফিস থেকে না ফেরা পর্যন্ত আমি শান্তি পাই না মনে—

পিন্টু বললে—আমি তো আর কারো সঙ্গেই মিশি না বাবা—

—খুব ভালো করো, কারো সঙ্গে মিশে আড্ডা দিয়ে কোনও লোভ নেই বাবা, আড্ডা হলো কর্মনাশা। মানুষের জীবন অনেক বড়, আড্ডা দিয়ে নষ্ট করবার জন্যে ভগবান আমাদের মানুষ তৈরি করেননি, এইটি জেনে রেখো। নিজের মনে অফিসের কাজ কর্ম করবে, তারপর সোজা বাড়ি চলে এসে খাও-দাও ঘুমোও বসে থাকো, যা খুশি করো না, দেখবে মনে কত শান্তি পাবে—

—আমি তো তাই-ই করি, আর তো কোথাও যাই না—

—না যেও না! ফার্গুসন সাহেব কেমন আছে? দেখা হয়?

—আজ্ঞে ভালোই আছেন। দেখা করবার দরকার হয় না তো!

—দরকার হোক আর না হোক, আমি যে তোমাকে বলে দিয়েছিলুম রোজ ঘরের সামনে গিয়ে একবার গুড্‌-মর্নিং করবে? আসবার সময়ও দেখা করে আসবে?

পিন্টু বললে—চাপ্‌রাশি বসে থাকে সামনে, কাজ না-থাকলে আমি কী করে যাই?

—ওই তো তোমার দোষ। চাপরাশি কে?

—দিগম্বর!

—দিগম্বরকে আমার নাম করে বলবে যে তুমি বিপিনবাবুর ছেলে, সাহেবকে সেলাম করতে ভেতরে যাবে। যা বলি কথাগুলো শোন না কেন?

তবু যা হোক বিপিনবাবু মনে মনে তৃপ্তি পেতেন এই ভেবে যে ছেলে তাঁর নিজের আদর্শ অনুযায়ী সৎ হয়েছে, বিনয়ী হয়েছে, ভদ্র হয়েছে। ভালো করে তীক্ষ্ম নজর দিয়ে দেখেন ছেলের দিকে। ছেলে কী জামা পরে, কী-রকম চুল ছাঁটে। দেখে আনন্দ হয় মনে। তারপর বলেন—যাও, মুখ হাত-পা ধুয়ে বিশ্রাম করো এবার—

নিজের ঘরে গিয়ে চুপ চাপ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে প্রশান্ত। মাথার ওপর টিনের চালের ঢেউগুলো দেখতে দেখতে ক্রমে যেন ঘুম পায়। অনেক দূর থেকে তাদের বাড়িতে বুঝি রেডি-ওর গান ভেসে আসে। একটা পোকা এসে ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে গুনগুন্‌ আওয়াজ করে।

মা এসে বলে—হ্যাঁ বাবা, ডাক্তারের কাছে আর একবার যাবে?

—কেন মা? ওষুধ ফুরিয়ে গেছে?

—ওষুধ ফুরোয় নি, কিন্তু সারছে না তো অসুখ। না-হয় অন্য ডাক্তার দেখালেও হয়, এতদিন হয়ে গেল, ভয় করে বড়—

—তা যাচ্ছি।

বলে উঠলো আবার। জামাটা গলিয়ে নিলে গায়ে। তারপর চটিটাও পায়ে দিলে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

মা বললে—আর যদি ইচ্ছে হয় তো একবার না-হয় দেখেই যান্‌, চারটে টাকা তো ভিজিট্‌—

—তাহলে তাই ডেকে আনছি, বলছি গিয়ে, দেখি কী বলেন!

ওধার থেকে বুড়ির গলা শোনা গেল—ও বউ, সদর দরজা কে খুললে গা? কে এল? ও বউ—

মা বললে—ওই আমার পিন্টু বাইরে গেল, আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি—

বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে সোজা যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল পিন্টু। বাইরের অন্ধকারে সেই অনন্ত বিস্তারের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন এক মুহূর্তের জন্যে নিজেকে খুঁজে পেলে। পাশের কোন্‌ ঝোপের মধ্যে একটা ঝিঁঝি পোকা বিকট শব্দ করে চেঁচাচ্ছে। ওদিকে শচীনবাবুদের বাড়িটার জানালায় নীল আলো জ্বলছে। ওদের বাড়িতেই বুঝি এতক্ষণ রেডিওতে গান-বাজনা চলছে। তারও ওপাশে আর একটা বাড়ি। তার ওপাশে আর একটা। দেখতে দেখতে বাদামতলা কী হয়ে গেল? এখান দিয়ে অফিসে যাওয়া-আসার পথে বাড়িগুলো চোখের সামনেই তৈরি হতে দেখেছে পিন্টু। চোখের সামনেই এই জঙ্গল-মাঠ শহরতলী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এমন করে যেন এর আগে কখনও দেখা হয়নি একে। ওরা যেন এখানে এসেও ধাওয়া করেছে—ওই কলকাতা শহর আর কলকাতা শহরের সব লোভ, সব আক্রোশ, সব অশান্তি। এখানে এসেও শেকড় গেড়েছে। শুধু বিপিনবাবুই বেঁচে গেছেন, শুধু পিন্টু আর পিন্টুর মা আর বাড়িওয়ালী বুড়িটা বেঁচে গেছে। ওরা কলকাতার আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছে। তাদের বাড়িটা এখনও পাকা বাড়ি হয়নি। তাদের কিছু স্পর্শ করতে পারেনি। বাবার শাসনের ভয়ে কিছুই ঢুকতে পারেনি সেখানে। বাড়িওয়ালী বুড়ির অনিদ্রা এখনও তেমনিই আছে। মা'র নিঃসঙ্গতা তেমনিই আছে। বাবার দারিদ্র্যের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি।

হঠাৎ ভূতের মতন সামনের বাড়িটার দিকে চেয়ে পিন্টু শিউরে উঠলো।

সেই বাঁশগুলো পচে-পচে খসে পড়ছে এখন। ইঁটগুলোতে নোনা ধরতে সুরু হয়েছে। একদিন যে বাড়ি আধখানা তৈরি হয়ে বন্ধ ছিল তা তেমনিই ভূতের বাড়ি হয়ে পড়ে আছে? আগাছা গজিয়েছে দেয়ালে। বাঁশের বেড়া দিয়ে দরজার হাঁ-টা বন্ধ করা ছিল এতদিন, সেই বাঁশের বেড়াও এখন খসে খসে পড়ছে।

—কে?

পিন্টুর মনে হলো কে যেন সেই অসমাপ্ত বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে। আশ্চর্য! চোখের দৃষ্টিটা আরো তীক্ষ্ম করে দিয়ে এক পা এগিয়ে গেল সামনে। এ-বাড়ির ভেতরেও লোক নাকি? এতদিন তো নজরে পড়েনি!

—কে আপনি?

পিন্টু আগাছাগুলো পেরিয়ে আরো সামনের দিকে এগোবার চেষ্টা করলে। ঠিক যেন রতনবাবুর মত দেখতে। রতনবাবুই

তো! রোগা লম্বা চেহারা। পাঞ্জাবীপরা। তাকে যেন চিনতে পেরেছেন। এই অন্ধকারে একলা এখানে কী করতে এসেছেন আজ? আবার কি নতুন করে বাড়ি তৈরি করবেন? হয়ত অসুখ হয়েছিল তাই কাজ বন্ধ ছিল এতদিন। আবার হয়ত মিস্ত্রী খাটতে সুরু করবে। আবার আলো জ্বলবে। আবার হয়ত দেখা হয়ে যাবে এখানে। প্রত্যেকদিন স্টুডিও থেকে ফিরে এখানেই উঠবে। এই বাড়ির ভেতরে। একেবারে তাদের বাড়ির লাগোয়া। সামনা-সামনি জানলায় দেখা যাবে মীনাকে।

বলবে—কী হলো, আর গেলেন না কেন স্টুডিওতে?

পিন্টু বলবে—জয়ন্ত যায়?

—হ্যাঁ, সে তো রোজ যায়, তার সঙ্গে তো রোজ দেখা হয় আমার—

—আপনার সেই ছবি কতদূর?

—কোন্ ছবি?

—সেই যে আপনি হিরোইন হয়েছিলেন? ছবির নাম ছিল 'সোনার হরিণ'—

—'সোনার হরিণ', সে তো কবে রিলিজ হয়ে গেছে, আপনি দেখেন নি? খুব ভাল হয়েছিল আমার পার্ট—

পিন্টু আরো এগিয়ে গেল।

—কাকাবাবু, আপনি কখন এলেন?

হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা শব্দ হলো। আর বোধহয় পিন্টুকে দেখে ভয় পেয়ে একটা গরু আগাছা ভেঙে পাশ দিয়ে ওদিকে চলে গেল। পিন্টু থমকে দাঁড়াল। ছি ছি, এমন ভুলও হয়। এমন চোখের ভুলও হয়!

তাড়াতাড়ি আবার রাস্তায় নেমে সোজা বাজারের দিকে চলতে লাগলো। ছি ছি, চোখের কানের কি এমন মর্মান্তিক ভুলও হতে আছে। সামনে আসতেই ডাইনে লালার দোকান। তারপর শচীনবাবুদের বাড়ি। তারপর বকুল গাছের তলায় বিধুর দোকানটা। তারপর বাসরাস্তা। বড়রাস্তায় সাইকেল রিক্সার ভিড়, বাস, লোকজন, 'কালীমাতা হার্বাল হোম', মানুষ। বাজার ছাড়িয়ে অন্ধকার, শুধু অন্ধকার, অন্ধকারের মাথার ওপর আকাশ, আকাশের গায়ে এক ঝাঁক তারা, এক ঝাঁক ভুল......তারপর সব ঝাপ্সা, আর কিছু নেই......

সেদিন রমেশবাবু কাজ শেষ হবার আগেই উঠলেন। টেবিল-ফেবিল গুছিয়ে সাফ-সুৎ।

—প্রশান্তবাবু, আজকে একটু সকাল-সকাল উঠছি, বুঝলেন?

—সে কি? এখন তো সবে সাড়ে চারটে, আরো তো আধঘণ্টা বাকি—

রমেশবাবু বললেন—সায়েবকে বলবেন না, আপনি আমার ক্যাশটো একটু মিলিয়ে দেখে নেবেন, আমি চললুম, কালকে এসে যা'হোক করা যাবে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না—

—কেন? এত তাড়া কীসের? কোথাও যাবেন বুঝি?

রমেশবাবু পকেট থেকে চিরুনী বার করে মাথার চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বললেন—মশাই, সিনেমায় যাবার কথা আছে, এখন গিয়ে লাইন দিতে হবে—

সিনেমার লাইন! পিন্টু অবাক হয়ে

পিন্টু

গেল। অফিসের কাজ ফাঁকি দিয়ে সিনেমার লাইন?

—খুব ভিড় হচ্ছে কি না, আগে থেকে না গেলে টিকিট পাবো না!

—কী ছবি?

—হিন্দী বই। "বজ্রদিল"—হিট্ পিক্চার—

বলে ড্রয়ারে চাবি দিয়ে উঠে যাবার জোগাড়।

চলেই যাচ্ছিলেন রমেশবাবু। কিন্তু পিন্টু ডাকলে। বললে—শুনুন রমেশবাবু—

রমেশবাবু ফিরলেন। বললেন—কী?

—আচ্ছা 'সোনার হরিণ' বলে একটা ছবি আপনি দেখেছেন? আপনি তো ছবি দেখেন-টেখেন—

সোনার হরিণ! ঠিক মনে করতে পারলেন না রমেশবাবু। বললেন—সোনার হরিণ বলে কোনও ছবি তো মনে পড়ছে না। হিরোইন্ কে? সুমিত্রা?

প্রশান্ত বললে—না, মীনাক্ষী! খুব সুন্দরী দেখতে। মানে অত সুন্দরী সচরাচর দেখা যায় না।

রমেশবাবু যেন চিন্তিত হলেন। বললেন—মীনাক্ষী? বাঙালী?

প্রশান্ত বললে—হ্যাঁ বাঙালী,—খুব সুন্দর দেখতে। মোটকথা অত সুন্দরী সাধারণত চোখে পড়ে না—

তবু রমেশবাবু বুঝতে পারলেন না। বললেন—পদ্মিনীকে দেখেছেন? পদ্মিনীর চেয়েও সুন্দরী?

—পদ্মিনী কে?

রমেশবাবু বললেন—পদ্মিনীকেই দেখেন নি?

প্রশান্ত বললে—আমি তো সিনেমা দেখিনি কখনও, আমি জীবনে কখনও সিনেমায় যাইনি—

—তাহলে মীনাক্ষীর নাম জানলেন কী করে?

—একদিন স্টুডিওয় শুধু দেখেছিলুম।

—আপনি আবার স্টুডিওয় যান নাকি! সিনেমায় যান্ না, ওদিকে স্টুডিওয় ঘোরাঘুরি করেন, অবাক ব্যাপার তো!

বলেই হঠাৎ বোধহয় মনে পড়ে গেল। ঘড়ির দিকে চেয়েই চমকে উঠলেন। তারপর বললেন—চলি—

রমেশবাবু চলে গেলেন। প্রশান্তও একবার ঘড়ির দিকে চাইলে। অজস্র কাজ। কাজের গোলকধাঁধার মধ্যে সকাল থেকে কেমন করে সময় কেটে যায় তা খাঁচার মধ্যে বসে টের পাওয়া যায় না। লেজার-খাতাটা তাড়াতাড়ি ভর্তি করে টোট্যাল্ ফিগারটা বসাতে গিয়ে বার কয়েক ভাবতে হলো। ক্যাশের কাজ, একটু অন্যমনস্ক হলেই সব গোলমাল হয়ে যায়, তারপর কাটাকুটি সাত-সতেরো।' আর ফিগারও একটা-দুটো নয়। পাঁচটা ছ'টা ফিগারের অঙ্ক। বাবা বাড়িতে বসে বসে এতক্ষণ হয়ত ভাবছেন। ছেলের ভুল হলে বাবার মাথাতেই যেন বজ্রাঘাত হয়। বাবা বলেন—মন ঠাণ্ডা রেখে কাজ করবে বাবা—অফিসের কাজ করতে করতে বাজে কথা একদম ভাববে না—

পিন্টু বলে—আমি তো বাজে কথা ভাবি না—

—ভাবো না ভালো কথা, কিন্তু মনকে তো বিশ্বাস নেই, তোমার পাশে কে বসে? পাশের চেয়ারে?

—রমেশবাবু!

রমেশবাবু! মনে করতে পারেন না বিপিনবাবু। কত নতুন-নতুন লোক ঢুকছে আজকাল। টার্নবুল কোম্পানীর অফিস তে ছোট-খাটো ব্যাপার নয়। কলকাতার সব ইংরেজদের অফিসই তো চলে গেল। টিঁকে আছে শুধু টার্নবুল কোম্পানী।

—তা সে কায়স্থ না ব্রাহ্মণ?

—ব্রাহ্মণ, বন্দ্যোপাধ্যায়—

ভালো, ভালো! যেন খানিকটা তৃপ্তি পান শুনে। সেকেলে মানুষ বিপিনবাবু

সেকালের ধারণা নিয়ে বাবা জন্মেছেন। এখনও সেই সেকালের মাপকাঠি দিয়েই বিচার করেন সব।

হঠাৎ ঢং ঢং করে ঘন্টা পড়লো বাইরের সদর গেটে। প্রশান্ত খাতা বন্ধ করে ক্যাশ-ঘরে জমা দিয়ে এল। চেক্ ক'টা আর ক্যাশ টাকাও জমা দিয়ে এল। চেক্টা দেখতে বেশি সময় লাগবার কথা নয়। কিন্তু নগদ-টাকার অনেক ঝক্কি। ঠিক সবাই-ই এই সময়ে জমা দিতে এসেছে। অনেক দিন এমন হয় টাকা জমা হয় না স্ট্রং রুমে। কাঠের ক্যাশ বাক্সটা ফিতে দিয়ে বেঁধে গালার সিল্ করে দেয়। পরের দিন যখন কারেন্সিতে ক্যাশ-ভ্যান্ যাবে, তার আগে জমা দিলেই চলে।

তারপর ড্রয়ারটা বন্ধ করে প্রশান্ত উঠলো। হাত-মুখ ধুয়ে মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া, সময় মত বেরিয়ে না-পড়লে বাসে ট্রামে ভিড় হয়ে যাবার কথা। সে-ভিড়ের মধ্যে তখন বাড়ি যাবার তাড়ায় কোনও দিকে খেয়াল থাকে না। তারপর ঝুলতে-ঝুলতে যাওয়া। জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় বাড়ি যেতে যেতে অনেক দিন প্রশান্ত ভেবেছে—একদিন এমনি করেই শেষ হয়ে যাবে তার চাকরি করা। শেষ হয়ে যাবে এই দাসত্ব-বরণ। কিন্তু কেন সে এই জীবনটাকেই আদর করে বরণ করে নিতে পারে না। এটাই বা কম কীসে? এই-ই বা ক'জন ছেলে পায়। এই আসা আর যাওয়ার অধিকার! তাদের সঙ্গে তো কত ছেলেই পড়ছিল। তন্ময় তো তাদের সঙ্গেই পড়তো। বি-এ-র পর সে এম-এ পড়ছিল। তারপর একদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল। চিনতে পেরেছে ঠিক।

—কী রে প্রশান্ত? কোথায়?

প্রশান্ত বললে—অফিস থেকে ফিরছি—

—হাতে কী?

—টিফিন-কৌটো!

খালি টিফিন-কৌটোটা উঁচু করে দেখালে প্রশান্ত!

—তুই কী করছিস?

—আমিও একটা চাকরির চেষ্টা করছি।

প্রশান্ত বললে—আমাদের অফিসে ভেকেন্সি হয়েছে কয়েকটা, অ্যাপ্লিকেশন্ করবি?

—কত মাইনে?

—একশো দশ টাকায় স্টার্টিং, পাঁচ টাকা ইন্ক্রিমেন্ট—

তন্ময়ের চোখে তাচ্ছিল্য ফুটে উঠলো। বললে—দূর, ওতে পোষাবে না, আমি ব্লক-ডেভেলপমেন্ট অফিসারের পোস্টের চেষ্টায় আছি, বোধহয় হয়ে যাবে,—

যেন গর্বের সঙ্গে কথাগুলো বললে তন্ময়। একটা কটাক্ষও বেরিয়ে পড়লো প্রশান্তর ভাগ্যের ওপর।

—তোর কেউ আছে নাকি?

—না আমার বাবা চ্যারিটি-ফাণ্ডে দশ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিল, সেই রিসিট্টা নিয়ে দেখিয়েছিলুম, আচ্ছা আসি রে, তুই এখন সেই বাদামতলাতেই আছিস তো? দেখা করবো একদিন।

হাওয়াই সার্ট আর গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার উড়িয়ে একটা চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়লো তন্ময়। শুধু তন্ময় নয়, আরো কত ছেলের সঙ্গে দেখা হয় রাস্তায়। কেউই প্রশান্তর চাকরি পাওয়াটার তারিফ করে না যেন। যারা চাকরি পায়নি তারাও একশো-দশ টাকা মাইনেটা ভালো চোখে দেখে না। যেন মনে মনে প্রকারান্তরে প্রশান্তকে তারা করুণা করে। অথচ যারা একটু বুড়ো লোক, যাদের একটু বয়েস হয়েছে, যারা বিজ্ঞ তারা তারিফ করে। বলে—ঢুকে পড়েছ, ভালো করেছ, বুদ্ধিমানের কাজ করেছ—

শচীনবাবু প্রথম দিকে শুনে উৎসাহ দিয়েছিলেন। শচীনবাবুর অবস্থা ভালো। রিটায়ার্ড গভর্নমেণ্ট অফিসার।

প্রশান্ত বলেছিল—কিন্তু মাইনেটা খুব কম, একশো দশ টাকা, আর ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স্—

—তা একশো দশ টাকা কম হলো? তুমি বলছো কী?

—আজ্ঞে, বন্ধু-বান্ধব যাদের সঙ্গেই দেখা হয়, তারা সবাই ছোট নজরে দেখে আমাকে। একেবারে মিনিমাম্ গ্রেড্ তো!

শচীনবাবু শেষ পর্যন্ত আসল কথাটা খুলে বলেছিলেন—দেখো, কম বয়েসে সবাই তো ভাবে হাতী-ঘোড়া-বাঘ অনেক কিছু হবে, দু'বছর বসে কাটাক্ তারা, তখন তোমাকেই হিংসে করবে আবার—। ও-সব অনেক দেখা আছে বাবা। জানো আমি কত টাকায় চাকরিতে ঢুকেছিলুম? শুনলে অবাক হয়ে যাবে—

—কত টাকা?

—পনেরো টাকা। বন্ধু-বান্ধব হাসতো। আমি চুপ করে থাকতুম। আমার বন্ধুরা সবাই তখন চল্লিশ টাকা পাচ্ছে—শেষকালে কত টাকায় রিটায়ার করেছি জানো? পনেরো শো টাকায়! জীবনে কখন কার কী হয়, বলা যায়? Everyman's life is a plan of God. তোমার বাবার অসুখ, মাথার ওপরে কেউ নেই, খুব ভালো করেছ চাকরি নিয়ে—আসল কথা সৎপথে থাকবে, তার মার নেই—

অনেকগুলো ট্রাম ছেড়ে দিয়েও তবু জায়গা পাওয়া গেল না। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় ধর্মতলা পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। তখনও ভিড় কমেনি। অফিসে যদি একদিন একটু বেরোতে দেরি হয়ে যায় তো আর ট্রামে জায়গা পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। ধর্মতলার মোড়ে আসতেই চারদিকের চেহারা দেখে [illegible]

এই আলো, এই গাড়ি, এই ঐশ্বর্য। গাড়ি-গুলো কী বিরাট। এত বিরাট গাড়ি কোথা থেকে আসে কে জানে। কোথা থেকে এরা ডলার পায়। বাইরের আমদানী তো সব বন্ধ, কিন্তু সবই আসছে কোন্ সুড়ঙ্গ পথে কে জানে।

হঠাৎ একটা ট্রাম আসতেই লাফিয়ে উঠে পড়েছে ভেতরে। পাদানিতে নয়। ঠেলতে-ঠেলতে একেবারে শেষের দিকে চলে গেছে। সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামের শেষ দিকটাই নিরাপদ। যা কিছু অ্যাক্সিডেন্ট্ সব হয় সামনের দিকে। আজকে হয়ত বাবা খুব ভাববেন। বার বার মাকে জিজ্ঞেস করবেন—পিণ্টু ফিরলো?

মা বলে দিয়েছিল—তুই বাবা একটু সকাল-সকাল ফিরিস, নইলে ওই মানুষ একেবারে জ্বালিয়ে খাবেন আমাকে—

বাবারই বা দোষ কী! হয়ত প্রশান্তর একটা ভাই থাকলে ভালো হতো। দু'তিনটে ভাই-বোনের সংসারে হয়ত বাপ-মা'রা ছেলে-মেয়েদের জন্যে এত ভাবে না।

—টিকিট!

পকেট থেকে পয়সা বার করে দিলে প্রশান্ত। —বেহালা।

—সে কি, এ তো বেহালা যাবে না।

—যাবে না? তো এ কোথায় যাবে?

—এ যাচ্ছে কালীঘাট, কালীঘাট থেকে গড়িয়াহাটা চলে যাবে।

প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল। সর্বনাশ! আবার অনেকগুলো পয়সা বাজে খরচ। তাড়াতাড়ি ট্রামটা থামতেই নেমে পড়লো। পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে দেখলে—ফেরবার পয়সা আছে তো? ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে নিলে। এ কোথায় এসে পড়লো সে? পাশেই একটা দোকানে ঘড়ি ঝুলছে। ছ'টা বেজে গেছে। অন্যদিন এতক্ষণ বাদামতলায় পৌঁছে গেছে। এ ভবানীপুর। তার কলেজের পাড়া। এ পাড়া তার চেনা। চার বছর এখানে আসতে হয়েছে তাকে দিনের পর দিন। অভ্যাসের শেকল দিয়ে এককালে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল এই অঞ্চলকে। এ-পাড়াতেই তন্ময়রা থাকে। এ-পাড়াতেই জয়ন্তরা থাকে। হয়ত এ-পাড়াতেই সেই মীনারাও থাকে। বড় বড় লোক এ-পাড়াতেই তো থাকে। তাদের মত যারা নিম্নমধ্যবিত্ত, তারাই থাকে বাদামতলায়। সমাজের এক-একটা স্তর থাকে। এখান থেকে আর একটু উত্তরে যাও—সেখানে আর এক ধাপ উঁচু স্তর। এই স্তর-ভাগ নিয়েই যত মারামারি চলেছে বোধহয় পৃথিবীতে। এখনকার এরাও কি তার বাবার মত সততায় বিশ্বাস করে? এরাও কি বিশ্বাস করে লোকের মধ্যে উন্নতি নেই, এরাও কি স্বীকার করে চুরি-ডাকাতি করে বড়লোক হওয়ায় গৌরব নেই? [illegible]

করে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পর্যন্ত সবাই তো সেই কথাই বলে এসেছেন। স্কুলে কলেজে টেক্সট্ বইতেও তো পড়ানো হয় ওই কথাই। কিন্তু মানবার বেলায় শুধু কি প্রশান্তরাই সে-কথা মানবে! আর কারো কি সে-উপদেশ পালন করবার দায় নেই? জয়ন্তর কথাটা আবার মনে পড়লো। দক্ষিণ দিকে হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই জয়ন্তর কথাগুলোই মনে পড়তে লাগলো। এই রাস্তা দিয়েই কলেজ পালিয়ে কতদিন জয়ন্ত আর সে দু'জনে হেঁটে হেঁটে বেড়িয়েছে। আর একটু দূরে গেলেই হাজরা পার্ক। হাজরা পার্কের মধ্যেই বসে-বসে কত দুপুরে গল্প করে কাটিয়েছে দু'জনে, কত নতুন কথা শিখেছে জয়ন্তর কাছে। জয়ন্তই বলেছে —বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও-সব কবে বাতিল হয়ে গিয়েছে, তুই আর ওদের কথা বলিস নি—

—বাতিল হয়ে গেছে মানে?

জয়ন্ত বলতো—মানে ব্যাক্ ডেটেড্ হয়ে গিয়েছে।

—যদি ব্যাক্ ডেটেড্ হয়ে গিয়ে থাকে তো এখনও স্কুল-কলেজে ওদের বায়োগ্রাফি পড়ায় কেন তাহলে?

—আসলে ওরা হলো ফসিল্। হিস্ট্রির ফসিল্ ওরা, চৌরঙ্গীতে যেমন মিউজিয়াম আছে, তেমনি ওদেরও আমরা হিস্ট্রির মিউজিয়মের মধ্যে ফসিল্স করে রেখে দিয়েছি, চার আনা করে গেট-ফি দিয়ে আমরা গিয়ে ফসিল দেখে আসি—

—ওদের বাদ দিয়ে কাদের নিয়ে থাকবো? আর কারা আছে?

জয়ন্ত বলতো—কেন? আর কেউ হিরো নেই? নতুন হিরো জন্মাচ্ছে না? তুই বলছিস কী? তাহলে ইন্ডিয়ার প্রগ্রেস হচ্ছে কী করে? হিরো তো ছড়ানো রয়েছে চোখের সামনে।

খেলার মাঠ আর সিনেমার পর্দায় ছড়ানো কয়েকটি জনপ্রিয় নাম শুনিয়েছে জয়ন্ত।

ফুটপাথটা পার হতে গিয়েই হঠাৎ নজরে পড়লো সামনেই একটা সিনেমা হল।

অনেকদিন পরে আবার যেন সিনেমা-হাউসটা নজরে পড়লো প্রশান্তর। এতদিন এটা অত ভাল করে নজর দিয়ে দেখেনি। কলেজের চার বছরের জীবনেও কখনও এত সুন্দর লাগেনি বাড়িটাকে। মাথা উঁচু করে দেখতে লাগলো বাড়িটাকে। ইলেক্ট্রিক বাল্ব্ দিয়ে মালার মতন সাজিয়ে দিয়েছে সামনেটা। জ্বল্-জ্বল্ করছে, জম্-জম্ করছে সমস্ত জায়গাটা। চারদিকে খুব জৌলুস। পাশেই পুলিসের সেই থানাটা। সেটা অন্ধকার। তার সামনে অসংখ্য গাড়ি। বিরাট-বিরাট গাড়ি। গাড়ির প্রসেসন। কত বিচিত্র, কত সৌখীন গাড়ি। গাড়ি থেকে নামছে কত মেয়ে। নেমে সোজা চলে যাচ্ছে ভেতরে। সিল্কের শাড়ি পরা, সোনার

গাড়ি থেকে নামছে কত মেয়ে। নেমে সোজা চলে যাচ্ছে ভেতরে।

হীরের গয়না ঝক্-ঝক্ করছে গায়ে। আশ্চর্য! মা'র গায়ে একটা গয়নাও নেই। মা বরাবর শুধু শাঁখাই পরে থাকে। মা'কেও বোধহয় এই রকম গাড়ি থেকে নামলে, এই রকম শাড়ি গয়না পরলে এই রকমই সুন্দর দেখাবে!

বড় বড় করে লেখা হয়েছে—'বহ্নিশিখা'—হঠাৎ একজন ভদ্রলোক সামনে এসে বললে

কটা পাঁচ সিকের টিকেট নেবেন স্যার?

প্রশান্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর ব্যাপারটা [illegible] নিলে।

—আমার একজন বন্ধুর আসার কথা ছিল, [illegible]ও এসে পৌঁছোয় নি, তাই বেচে [illegible]ছলাম!

[illegible]দ্রলোক বুঝতে পারলে, বাজে খদ্দের। [illegible] খেয়াল হলো হঠাৎ, প্রশান্ত ভেতরে [illegible]র ঢুকলো। সেখানে কাচের শোকেসের [illegible] সার-সার ছবি সাজানো রয়েছে। [illegible]রা-হিরোইনের ছবি। ভাল ভাল সব [illegible]রা। হঠাৎ প্রশান্তর মনে হলো যেন [illegible] বহুদিন আগে একবার ফিল্‌ম্-[illegible]ডিওতে গিয়ে এইরকম চেহারা সাজ-[illegible]পাক দেখেছিল। কিন্তু সে তো [illegible]-শিখা' নয়—সে তো 'সোনার হরিণ'! [illegible]পাশের এক ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে [illegible]ন্ত জিজ্ঞেস করলে—একটা কথা জিজ্ঞেস [illegible]বো আপনাকে?

[illegible]দ্রলোক মুখ ফেরালো। বললে—কী, [illegible]ন?

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলে—এ ছবির [illegible]রাইন্‌ কে?

[illegible]দ্রলোক আঙুল দিয়ে মস্ত বড় [illegible]স্টারটা দেখিয়ে দিলে।

—ওই যে লেখা রয়েছে বড়-বড় করে, [illegible]নে—

[illegible]য়ত পাড়াগাঁয়েরই লোক ভেবে ভদ্রলোক [illegible]টু কটাক্ষও করলে। কে জানে।

প্রশান্ত বললে—আচ্ছা, মীনাক্ষী বলে [illegible]নও হিরোইন্‌ আছে?

—মীনাক্ষী? হিরোইন কেউ নেই [illegible]মে বাঙলা দেশে। এক্সট্রা-কেক্সট্রা [illegible]লে থাকতে পারে—কেন? আপনি কী [illegible]তে চান?

[illegible]এক দল লোক এসে দুজনের মধ্যে ঢুকে [illegible]লো। তারা টিকিট কেটেছে। ভেতরে [illegible]বে। প্রশান্ত সরে এল বাইরে। তাহলে [illegible]তর সেই মীনাক্ষী কোথায় গেল! [illegible]রাইন্‌ হয়নি?

[illegible]ভেতরের হল্‌ থেকে বেরিয়ে আসতেই [illegible]তলার সিঁড়ি দিয়ে তিনচারজন সিগারেট [illegible]ত-খেতে নেমে রাস্তার দিকে যাচ্ছিল। [illegible] চটপটে ছটফটে মানুষ। পৃথিবীর [illegible]ডা মাটিতে যেন খই ফোটাচ্ছে। প্রশান্ত [illegible]ই দিকে চেয়ে রইল। জয়ন্তর জাতের [illegible]ল। যেন এক জয়ন্ত বহু জয়ন্ত হয়ে [illegible]র সামনে উদয় হলো। ওরাই যেন [illegible]যুগের মানুষ। হাসতে হাসতে সিগারেটের [illegible]য়া ছাড়তে ছাড়তে তারা চলে গেল। [illegible]ান্ত একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইল [illegible]াক হয়ে।

পরের দিন রমেশবাবু আসতেই প্রশান্ত [illegible]জ্ঞেস করলে। রমেশবাবুকেও যেন ভাল [illegible]গলো নতুন করে। রমেশবাবুও যেন এই নতুন পৃথিবীর মানুষ। রমেশবাবুর পাশে বসে কাজ করতে-করতে যেন প্রশান্তর নিজেকে বড় ভাগ্যবান বলে মনে হলো। নিজের সঙ্গে রমেশবাবুর তফাৎটা যাচাই করতে ভালো লাগলো। একই গ্রেড্‌, একই অফিস, একই বিল্ডিং, একই চাকরি, তবু যেন রমেশবাবু তার চেয়ে অন্যরকম।

—কী দেখছেন অমন করে?

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা রমেশবাবু, আপনার ভাল লাগে?

—কী ভাল লাগে?

—এই পৃথিবীতে বাঁচতে, বেঁচে থাকতে?

—সে কি মশাই, আপনি যে অবাক করলেন আমাকে। বেঁচে থাকতে ভাল লাগবে না কেন? আপনি বলছেন কী? আপনার বাঁচতে ভাল লাগে না?

প্রশান্ত যেন কেমন হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়ে থতমত খেয়ে গেল। বললে—না, এমনি বলছি, আপনি সব সময় কেমন হাসিখুশী থাকেন কি না, তাই জিজ্ঞেস করছি—

—আরে হাসি-খুশি না থাকলে কবে আত্মহত্যা করতুম মশাই, ওই জন্যেই তো বেঁচে আছি সংসারে! ওই সিনেমা থিয়েটার দেখে, খেয়ে-দেয়ে ফুর্তি করে কাটিয়ে দিই, যে-কটা দিন সংসারে আছি এমনি করেই কাটিয়ে দেব। এই তো, অফিস থেকে গিয়েই ক্লাবে চলে যাবো, ক্লাবে গিয়ে রিহার্শাল দেব—দেবলাদেবী থিয়েটার হচ্ছে আমাদের—!

প্রশান্ত অবাক হয়ে গেল। এতদিন পাশাপাশি বসেছে, অথচ এ-খবর জানতেও পারেনি।

—আপনি অফিস থেকে কোথায় যান?

প্রশান্ত বললে—আমি সোজা বাড়ি চলে যাই, বাড়িতে দেরি করে ফিরলে বাবা খুব ভাবনায় পড়েন! বাবার তো শরীরটা খারাপ, একবার একটা কান্ড হয়েছিল, তার পরেই স্ট্রোক হয়েছে, আর হাঁটা-চলা করতে পারেন না বেশি?

রমেশবাবু বললে—তা একদিন আসুন না আমাদের ক্লাবে—

—কিন্তু আমি তো থিয়েটার-টিয়েটার করতে পারি না—

—তা না পারুন, রোববারে আসুন। রোববার বিকেল থেকে আমাদের রিহার্শাল চলে। আসুন না, রোববারে বাড়িতে বসে কী করেন?

—কিছুই করি না। দুপুরবেলা কেবল ঘুমোই, তারপরে বাবার পাশে বসে থাকি! বাবার সঙ্গে গল্প করি—

—পাড়াতে আপনাদের কোনও ক্লাব-ট্লাব নেই? কোথাও যান্‌ না?

সত্যিই কোথাও যাবার জায়গাই নেই প্রশান্তর। এই অফিস আর বাড়ি। বাড়ি আর অফিস। এত বড় কলকাতা শহরের গোলকধাঁধায় এত হারিয়ে যাবার সুযোগ থাকতেও কখনও হারিয়ে যায় না প্রশান্ত। এখানে এত উপকরণ, এত উপচার, কিছু দেখেনি কিছু অনুভব করেনি, কিছু ভোগও করেনি জীবনে। বাদামতলার ছোট আকাশের উড়ন্ত চিলের পাখায় অনেকদিন নিজেকে শূন্যে উড়িয়ে দিয়েছে। অনেকদিন আকাশে ঘুড়ি হয়ে উড়েছে; বাতাসে শুকনো ঝরা-পাতা হয়ে লুটোপুটি খেয়েছে। কিন্তু আবার হঠাৎ ফিরে এসেছে টিনের চালের ছোট অন্ধকার ঘরখানার ভেতরে। আবার বাড়িওয়ালী বুড়ির গজ-গজানি কানে এসেছে। আবার মা'র উদয়াস্ত পরিশ্রমের জটিলতায় জট পাকিয়ে ফেলেছে, আবার বাবার অসুখের অনিশ্চয়তায় হাবুডুবু খেয়েছে।

মা'র সময় নেই অসময়ও নেই। হঠাৎ বলে বসে—আর একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাও না বাবা—

যেন ডাক্তার ডাকলেই সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে।

কিংবা অফিসে বেরোবার আগেই বললে—লালার দোকান থেকে সরষের তেল এনে দিতে পার বাবা?

সেই অবস্থাতেই সরষের তেলের টিন নিয়ে লালার দোকানে যেতে হয়। শুধু লালার দোকানই নয়, ডাইং-ক্লিনিং আছে, জুতো সেলাই আছে, রেশন আনা আছে। তেল-নুন-মশলা। সংসারে যা কিছু কাজ থাকে সবই আছে। তারপর আছে এই অফিস আর আছে ঘুম।

—কালকে কেমন সিনেমা দেখলেন?

রমেশবাবু বললেন, যা একখানা নাচ আছে! তাতে আমার পয়সা উসুল হয়ে গেছে।

—কি গল্প?

রমেশবাবু বললেন—গল্প তো দেখিনি, ওই নাচ দেখেই পেট ভরে গেছে—। আপনি তো কিছুই দেখলেন না, আধখানা জীবনই আপনার বরবাদ হয়ে গেল।

—রোববারে কতক্ষণ হবে আপনাদের রিহার্শাল?

—ধরুন রাত ন'টা কি দশটা। তার বেশি নয়। আপনি বাড়িতে বলে আসবেন ফিরতে একটু রাত হবে। বলে এলে তো আর ভাববে না কেউ! বলেই আসবেন, আমাদের ক্লাবে চা চপ্‌ কাটলেট সবই হবে, বলবেন রাতে আর বাড়িতে খাবেন না—আর এক কাজ করতে পারেন, বাড়িতে বলে আসবেন নেমন্তন্ন আছে—

অফিসের কাজ করতে-করতে প্রশান্তর যেন কেমন উৎসাহ বেড়ে গেল। বহুদিন আগে জয়ন্তর সঙ্গেও একদিন স্টুডিওতে গিয়েছিল, এবার থিয়েটার-ক্লাব। থিয়েটার-ক্লাবের মধ্যে কখনও যায়নি প্রশান্ত। এও তো এক নতুন অভিজ্ঞতা।

—তাহলে, রবিবার ক'টার সময় যাবো?

—বিকেল-বেলাই চলে আসুন, বিকেল পাঁচটা থেকেই আরম্ভ হয়ে যাবে! রাস্তাটা চিনতে পারবেন তো?

রাস্তাটা চিনতে পেরেছিল। বাড়িটাও চিনতে পেরেছিল। এক ভদ্রলোকের বাড়ির দোতলায় একখানা ঘর। ঘরের ভেতরে কার্পেট-পাতা। দেয়ালে আয়না টাঙানো আছে, মাথার ওপর ফ্রেমে বাঁধানো একটা বাণী টাঙানো আছে—'ওঁ রামকৃষ্ণায় নমঃ'। ঘর তখন বোঝাই। ঘন-ঘন সিগারেট চলছে। পানের খিলির এন্তার বাবস্থা।

একজন বললে—ক'টা বাজলো হে?

রমেশবাবু মোটা চাঁদা দেন। বললেন—এখনও অনেক টাইম আছে, চালিয়ে যান্ গোপালদা'—

—এবার চা না হলে আর চলছে না হে, আর এক ক্ষেপ হয়ে যাক্!

একজন দৌড়ে গেল চা আনতে। হরিচরণ কাছে এল। রমেশবাবুর কানে কানে বললে—ফুলটুসী আজকে আসতে পারেনি, প্রক্সির ব্যবস্থা করতে হবে—

রমেশবাবু রেগে গেলেন—কেন? পাঁচটা টাকা নিয়ে গেল আর আজকেই অ্যাবসেন্ট্? এরকম করলে প্লে হবে কী করে?

হাতীবাগানের পাড়ার ক্লাবের নাম ডাক আছে। পাড়ার লোকেরা জানে এখানে যখন প্লে হবে তখন দেখবার মতন হবে সে-বই। এদের ক্লাবেই একদিন 'সিরাজউদ্দৌলা' হয়ে গেছে। শিশির ভাদুড়ী নিজে এসে দেখে গেছেন সে প্লে। সে-সব অনেক দিন আগের কথা। তখন কলকাতা শহরে এত ক্লাব ছিল না। আজকাল পাড়ায়-পাড়ায় ক্লাব হয়ে থিয়েটারের ইজ্জত চলে যাচ্ছে। সেকালে যারা পার্ট করতো, তারা এখন বুড়ো হয়ে গেছে। যারা মাথায় টাক পড়ে গেছে। এককালে তাদের ঢেউ খেলানো চুল ছিল। শাজাহানের পার্ট করে সোনার মেডেল পেয়েছে। 'বঙ্গে বর্গী'তে ভাস্কর-পণ্ডিতের পার্ট করে ঘন-ঘন ক্ল্যাপ্ পেয়েছে। সে-সব লোক এখনও ক্লাবে আসে। ছেলে-পুলে নাতি-নাতনী হয়ে গিয়ে সংসার ভর-ভরাট হয়ে গিয়েছে, বাত হয়েছে, ডায়াবেটিস হয়েছে, ব্লাড্ প্রেশার হয়েছে। কারো-কারো অনেক টাকাও হয়েছে। কেউ-কেউ গাড়ি-বাড়িও করেছে। এখন সবাই দাদা বলে ডাকে। কিন্তু হাজার অসুবিধে হলেও সন্ধ্যেবেলাটা আর ঘরে টিঁকতে পারে না। বিকেল বেলাই চা-পান-জর্দা খেয়ে এখানে এসে ক্লাবের এক কোণে বসে। মাতব্বরি করে। রিহার্সালের সময় ভুল ধরিয়ে দেয়।

বলে—হলো না হে, হলো না—আর একটু গলাটা মোলায়েম করতে হবে—

তারপরে দু'এক কাপ চা খায়, পান-জর্দা খায়, তারপরে আবার আস্তে আস্তে যে-যার বাড়ি চলে যায়।

এবার 'দেবলাদেবী'।

'দেবলাদেবী'র নোটিশ্ পড়ে গেছে ক্লাবের বোর্ডে। জেনারেল নোটিশ্। ভালো করে হাতের লেখা নোটিশ পেয়েই সব মেম্বাররা এসে হাজির হয়েছে। আবার গম্-গম্ করছে ক্লাব। আবার জম্-জমাট হয়েছে ক্লাবের চেহারা। শতরঞ্জি কার্পেট ঝাড়া-মোছা হয়েছে। যারা অফিসে চাকরি করে তারা সকাল-সকাল এসে রিহার্সাল দিতে সুরু করেছে। বোর্ড ভাড়া করা হয়ে গিয়েছে। সপ্তাহে কোনও দিন বাদ নেই। রবিবার সকাল-সকাল রিহার্সাল বসে, ভাঙে রাত্রের দিকে।

সেক্রেটারি নোটিশ দিয়ে দিয়েছে—প্রত্যেক মেম্বারকে পাঙ্চুয়্যালি ক্লাবে আসতে হবে—

প্রশান্ত রাস্তাও চিনতো না, জায়গাটাও চিনতো না।

বিপিনবাবু শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করে-ছিলেন—রোববার আবার কিসের কাজ তোমার?

প্রশান্ত বলেছিল—কাজ নয়, ছুটির দিন একটু গল্প-টল্প করবো—

—গল্প করবে মানে? কোথায় গল্প করবে? কার সঙ্গে?

—আমাদের অফিসের রমেশবাবুর সঙ্গে। এক সঙ্গে কাজ করি দু'জনে—অনেকদিন ধরে বলছেন!

—খাওয়া?

—ওখান থেকেই খেয়ে আসবো একেবারে।

—বেশি রাত হবে না তো?

প্রথম ব্যতিক্রম প্রশান্তর। সকালবেলা যথারীতি সংসারের সব কাজই করে দিয়েছে। বাজার থেকে রোজকার মত তেল-নুন-মশলা-আলু-পটল-মাছ এনে দিয়েছে। নিজের গেঞ্জি-গামছাতে সাবান দিয়ে কেচে শুকোতে দিয়েছে। জুতোয় কালি দিয়েছে।

মা রান্না করছিল। মা'র কাছে গিয়েও জিজ্ঞেস করেছে—আর কিছু আনতে হবে মা?

মা বললে—একটা দেশলাই যদি এনে দিস্ বাবা, দেশলাইটা ফুরিয়ে গিয়েছে—

তখনি আবার লালার দোকানে দৌড়েছে দেশলাই কিনতে।

লালা জিজ্ঞেস করলে—বড়বাবু কেমন আছেন দাদাবাবু?

প্রশান্ত বললে—ভাল, এখন একটু ভালো—

—আগে বড়বাবু রোজ আসতেন আমার দোকানে, আপনার হাত ধরে নিয়ে আসতেন, সে-জমানা বদলে গেল হুজুর—

লালাও অনেক বদলে গেছে সত্যি। ছোট-বেলায় প্রশান্তও দেখেছে লালাকে। আগে মাথার চুল কালো ছিল, এখন সাদা হয়ে গেছে। পাকিয়ে-পাকিয়ে হলদে পাগড়ি পরে না আর। রোগা হয়ে গেছে। বাদামতলার যত উন্নতি হচ্ছে, লালাও যেন তত বা[illegible] হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এখন লাল[illegible] দোকানটা ছোট মনে হয়। এখন আর-এ[illegible] মস্ত দোকান হয়েছে কাছে। বিধুর দোকা[illegible] উঠে গেছে। তার জায়গায় মস্ত স্টেশনারি দোকান হয়েছে। মস্ত সাইনবোর্ড টাঙিয়েছে। বোস এণ্ড [illegible] ভেতরে ফ্লোরেসেন্ট্ লাইট্ জ্বলে। চলে মাথার ওপর। একটা গ্র্যাজুয়েট [illegible] দোকান খুলেছে। অনেক দিন প্রশা[illegible] দেখতে পেয়ে বলেছে—কই, আমার [illegible] থেকে জিনিস-টিনিস নিচ্ছেন না [illegible] বাবু—

প্রশান্ত বলেছে—লালা বহুদিনের বরাবর ওর কাছ থেকেই কিনছি, তাই

—এবার আমার কাছ থেকেই দেখুন না, শচীনবাবু-টাবু সব আমার থেকেই কেনেন—এপাড়ায় সব্বাই [illegible] দোকানের খদ্দের—

প্রশান্ত বলে—কিন্তু বাবা যে ল[illegible] দোকান থেকেই কিনতে বলে দিয়েছে আমরা এখানকার আদি লোক, [illegible] পুরোন—

—তা কিনুন না, কিন্তু আপনারাই বাঙালী হয়ে বাঙালীকে না সাপোর্ট ক[illegible] তো বাঙালীরা কোথায় যাবে বলুন?

এ-রকম প্রায়ই বলে ভদ্রলোক। [illegible] এণ্ড সন্স্। কিন্তু আসলে বোস [illegible] সন্স-এর দোকানে সব জিনিসের দাম [illegible] পয়সা দু'পয়সা বেশি। সে কথা মুখে যায় না। বললে ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হ[illegible] একই জিনিস পাশাপাশি দোকানে [illegible] বেশি দাম হবে বোঝা যায় না। [illegible] বাঙালী বলে। কিংবা হয়ত ফ্যান্ [illegible] বলে। আর কিংবা হয়ত ফ্লোরেসেন্ট্ আ[illegible] জ্বলে বলে। কিন্তু লালার দোকানে এ[illegible] সেই পুরোন আমলের হ্যারিকেনের আ[illegible] তেল্ চিট্-চিটে জলচৌকি, টিনের চাল

দেশলাইটা দিয়েই চলে যাবার ক[illegible] সকাল সকাল বেরোতে হবে। পাঁচটার [illegible] হাতীবাগান পৌঁছুতে হবে। হাতীবা[illegible] কি এখানে?

ঠিক বাড়ি থেকে বেরোতে যাবে [illegible] সময় বাইরে যেন কে ডাকলে।

—বিপিনবাবু, ঘুমোচ্ছেন নাকি?

—কে?

জামা-কাপড় পরা অবস্থাতেই প্রশ[illegible] গিয়ে দরজা খুলে দিলে। শচীনবাবু, তাঁর পাশেই একজন মহিলা।

—আসুন কাকাবাবু, বাবা জেগে আ[illegible]

—কেমন আছেন তোমার বাবা? অ[illegible] দিন দেখিনি? তুমি কোথাও বেরোচ্ছ [illegible] বাবা?

বাদামতলার সব চেয়ে পুরোন [illegible] ভাড়াটে বাড়ি। কুড়ি-পঁচিশ বছর [illegible] একদিন বিপিনবাবু এসেছিলেন

বাড়িতে। কত বর্ষা কত শীত কত বসন্ত কেটে গেল এই একই বাড়িতে। ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত অনেক পরিবর্তন অনেক উত্থান-পতন প্রশান্তর চোখের সামনে ঘটেছে। এই বাদামতলাতেই শচীনবাবুরা এসে একদিন বাড়ি তৈরি করেছেন। রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট গেজেটেড্ অফিসার শচীনবাবু। তারপর দেখতে-দেখতে কত লোক এসে বাড়ি করেছে। আগে ট্যাক্সি আসতো না এ-পাড়ায়, এখন ঘন-ঘন ট্যাক্সি আসে, গাড়ি আসে। কোথায় চলে গেল সেই শেয়ালের দল, কোথায় চলে গেল সেই মাঠ-ঘাট, বন-জঙ্গল। কিন্তু তবু কেউ একদিনের জন্যেও এ-বাড়িতে এসে ঢোকেনি। বাবার এত অসুখেও কেউ দেখতে আসেনি। পাড়ার কোনও মেয়েরাও মা'র সঙ্গে কথা বলতে আসেনি। মা যে সেই একদিন এসেছিল বাবার সঙ্গে এ-বাড়িতে, সেই থেকে দিন-মাস-বছর কেটেছে এই ছোট বাড়ির মধ্যেই। বড়জোর দুটো সুখ-দুঃখের গল্প বলেছে বাড়ি-ওয়ালী-বুড়ির সঙ্গে, আর হয়তো রান্না করেছে। রান্না করা ছাড়া যেন আর কোনও কাজের জন্যেই মা জন্মায়নি।

বিপিনবাবু যেন একটু উত্তেজিত হন। ছেঁড়া-চাদর বালিশের মধ্যে তিনি যে কী করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না।

—এই দেখুন, পড়ে আছি একলা-একলা, আর আমার জীবন তো কেটেই গেল, এখন পিন্টু বড় হয়েছে, ও যা পারে করবে।

শচীনবাবু বললেন—পিন্টু তো আপনার ছেলের মত ছেলে—পাড়ায় তো অনেক ছেলেই রয়েছে, কিন্তু অমন ছেলে হয় না। আমি তো সেই ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি—

বিপিনবাবু বললেন—আপনারা পাঁচজনে ভালো বললেই ভালো, আশীর্বাদ করুন ও যেন মানুষ হয়—

শচীনবাবু বললেন—আপনার মুখের সামনে বলে তো নয়, পাড়ার সবাই জানে, এমন ছেলে হাজারে একটা খুঁজে পাওয়া যায় না—পান-বিড়ি-নস্যি-সিগারেট কোনও দিন খেতে দেখিনি বাবাজীবনকে—

তারপর একটু থেমে বললেন—যে-জন্যে আমি এসেছি সেটা বলি, আমার এক বোনকে সঙ্গে করে এনেছি, আমার ওই এক বোন, বরানগরে শ্বশুরবাড়ি, বিধবা হয়েছে, ওকেও নিয়ে এসেছি—

বিপিনবাবু বললেন—বেশ বেশ সে তো ভালো কথা—

—ওর একটি মেয়ে আছে, আপনি যদি একবার দেখেন—

—আমি দেখবো?

—হ্যাঁ, আপনার পিন্টুর তো বিয়ে দিতেই হবে। আর বয়েস হয়েছে, ভাল চাকরি করছে, এখন বিয়ে দেওয়াও তো দরকার, উপযুক্ত বয়েসে বিয়ে না দিলে শেষে বুড়ো বয়েসে—

ভেতরের দাওয়ায় তখন বিন্দুবাসিনীও একটা মাদুর পেতে দিয়েছে।

—অ বউ, ও কারা এয়েছে গো, কার সঙ্গে গল্প করছো?

ভদ্রমহিলা বললেন—উনি কে?

বিন্দুবাসিনী বললে—ওই আমাদের বাড়িওয়ালী, ও'রই বাড়ি এটা, আমরা ভাড়াটে—!

—অনেকদিন ধরে আসবো-আসবো করছি, দাদাকে রোজই বলি, আপনার ছেলেটিকেও দেখেছি রাস্তা দিয়ে যেতে, দাদার বাড়ির পাশ দিয়েই তো অফিসে যায়, সোনার টুকরো ছেলে আপনার দিদি, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—

—আমার তো ওই এক ছেলে, সংসার-ধর্ম যা কিছু সব ওই ওরই জন্যে! আমাদের তো এবার যাবার সময় হলো।

ঘরের মধ্যে শচীনবাবু তখন বলছিলেন—মেয়েটি সুশ্রী, স্বভাব-চরিত্রও ভাল, আমার ইচ্ছে যে কাছাকাছি একটা সম্বন্ধ করি, আপনার ছেলেটিকে বড় পছন্দ হয়েছে আমার—

বিপিনবাবু অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন—সে তো আমার সৌভাগ্য শচীনবাবু, কিন্তু ওই তো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে দেড়শো টাকা মাইনে পায় পিন্টু, ওতে......

—মাইনের কথা আমি জানি না? আপনার পিন্টু নিজেই তো আমাকে মাইনের কথা বলেছে। তা ধরুন, আমি নিজে যখন চাকরিতে ঢুকলুম তখন কত মাইনেতে ঢুকেছি? পনেরো টাকা? তা আসল হচ্ছে স্বভাব-চরিত্রটাই আগে দেখি আমরা, আজ-কালকার আরো দশজন ছেলেদের তো দেখছি, তাদের সুট আর সিগারেট খরচাই তো মাসে পঞ্চাশ টাকা পড়ে যায়, আর আপনার পিন্টুর তো সবাই প্রশংসা করে, এমন ছেলে ক'জন বাপের আছে বলুন তো......

বিপিনবাবুর চোখ দুটো আনন্দে ছল্ ছল্ করে উঠলো।

আগে নজরে পড়েনি। প্রথমত হাতী-বাগানে আসতে অনেক সময় লাগে। বাস থেকে নেমে নম্বর মিলিয়ে ঠিক-ঠিকানায় পৌঁছনোও সোজা কথা নয়। হাতীবাগান ড্রামাটিক ক্লাব দোতলার ওপর।

রমেশবাবু খুবই ব্যস্ত ছিলেন। দরজার দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

—আরে আসুন আসুন—

একেবারে উঠে গিয়ে ভেতরে নিয়ে এসে বসালেন। বললেন—বসুন এখানে, চিনতে কষ্ট হয়নি তো?

প্রশান্ত জড়ো-সড়ো হয়ে বসলো এক পাশে।

—চা খাবেন তো?

রমেশবাবুকেই মনে হলো ক্লাবের কর্তা। শুধু চা নয়, চপ্ কাটলেট্ সিঙাড়া পান সিগারেট সবই দিলেন।

বললেন—আপনার দেরি হয়ে গেল আসতে, আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনার কথা ভাবছি—

—আপনি খাবেন না?

রমেশবাবু বললেন—আমরা সবাই খেয়েছি, আপনার জন্যে আলাদা রেখে দিয়েছিলুম এ-গুলো—

খেতে খেতে প্রশান্ত চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো, অনেক লোক। বিরাট একখানা ঘরের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করে অনেক লোক বসে আছে। সবাই বেশ ধোপ-দুরস্ত। সিগারেট টানছে, পান খাচ্ছে, চা খাচ্ছে। আর একপাশে তিনজন মেয়ে বসে আছে পেছন ফিরে।

—মেয়েরা কেন?

—মেয়েরা মেয়েদের পার্ট করবে!

প্রশান্তর কেমন যেন সন্দেহ হলো। বললে —ভদ্রলোকের মেয়ে?

—কী বলছেন মশাই, ভদ্রলোকের মেয়ে নয় তো কি বেশ্যা? বেশ্যা হলে আমরা আলাও করবো?

তারপর রিহার্সাল শুরু হলো। একজন বই খুলে পার্টটা বুঝিয়ে দিতে লাগলো—আর একজন মুখে বলে যেতে লাগলো।

একজন পাকা চুল বৃদ্ধ ভদ্রলোক শুনছিলেন এতক্ষণ। বেশ ভারিক্কি বয়েস। বললেন—একটু গলা খুলে বলো হরিপদ, লাভ্-সিন্ অত মিন্ মিন্ করে বলছো কেন?

প্রশান্ত বললে—আজকে বোধহয় প্রথম দিন, তাই—

রমেশবাবু বললেন—না না, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট্ নিজে রয়েছে কিনা, তাই একটু নার্ভাস হয়ে গেছে হরিপদ, নইলে আলমগীরে ওই-ই তো শাজাহানের পার্ট করেছে—

হঠাৎ কথার মধ্যেই একটা মেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। একেবারে প্রশান্তর গা ঘেঁষে। প্রশান্ত চমকে গিয়েছে। এত কাছাকাছি। একেবারে শাড়ির খস্‌খসানি, সাবানের গন্ধ পর্যন্ত যেন নাকে এসে লাগছে। প্রশান্ত থতমত খেয়ে একটু সরে বসলো। কী আশ্চর্য! এদের লজ্জাও নেই এতটুকু? তারপর হঠাৎ মুখের দিকে চাইতেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত শির-শির করে উঠেছে—মীনাক্ষী! মীনাক্ষী এখানে! এই হাতী-বাগান ড্রামাটিক ক্লাবে!

প্রশান্ত যেন নিজের চোখ দুটোকেও বিশ্বাস করতে পারলে না। ঠিক সেই টালিগঞ্জ স্টুডিওতে যেমন দেখেছে এও তেমনি। একটা হালকা বেগুনী রং-এর শাড়ি, গায়ে কাঁচা হলুদ রং-এর একটা কট্‌কী ব্লাউজ। হাতের মুঠোয় একটা ছোট

ছাপানো রুমাল। মাথার বেণীটা একেবারে পায়ের কাছ পর্যন্ত এসে ঠেকেছে। প্রশান্ত একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো মীনাক্ষীর দিকে।

মেয়েটি এসে রমেশবাবুর একেবারে সামনে ঝুঁকে বসে পড়লো।

বললে—দশটা টাকা আমাকে কিন্তু দিতে হবে আজ রমেশবাবু—

—দশটা টাকা।

রমেশবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—ওই তো তোমাদের দোষ বাপু, একেবারে রিহার্সাল আরম্ভ হতে-না-হতে টাকা! টাকা নিয়ে কি আমরা পালিয়ে যাবো?

—না, পালাবার কথা হচ্ছে না, নেহাৎ দরকার না-পড়লে চাই? বরানগর ক্লাব থেকে পঁচিশটা টাকা আজ পাবার কথা ছিল, সেখানেও আটকে গেল, অথচ কাল সকালে রেশন আনতে হবে, আমার হাতে টাকা নেই একটা—

—একটা-না-একটা ছুতো তোমার আছেই। আজ পর্যন্ত কখনও টাকা তোমার আটকে রেখেছে হাতীবাগান ক্লাব?

—তা কি আমি বলেছি? আপনি যদি দয়া করে দেন, তাই বলা......

—এ-রকম উইদাউট্ নোটিশে আমি টাকা কী করে দিই বলো তো? আমাকেও তো অ্যাকাউন্ট্ ঠিক রাখতে হবে?

মেয়েটি বললে—না সত্যি, মাইরি বলছি, আপনার গা ছুঁয়ে বলছি রমেশবাবু, আমার সত্যিই টাকার দরকার, আর নয় তো আপনার নিজের পকেট থেকেই দিন, আমি পেলেই শোধ করে দেব—

রমেশবাবুও তেমনি। ছাড়বার পাত্র নন্। বললেন—বা রে, নিজের পকেটে থাকলে আর আমি দিই না? যা আছে সব ক্লাবের টাকা, সত্যি বলছি—

—দেবেন না তাহলে?

—থাকলে তো দেব?

—তাহলে কিন্তু আজকে মেজাজই আসবে না পার্ট করতে, মাইরি বলছি রমেশবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন—

প্রশান্ত তখনও একমনে মীনাক্ষীর মুখের দিকে চেয়ে দেখছে। প্রশান্তর মনে হলো সে যেন স্বপ্নই দেখছে। সেই মীনাক্ষী একেবারে সশরীরে এসে গেছে এখানে! এখানে আসবার আগেও তো কল্পনা করেনি প্রশান্ত!

—দশটা টাকা যদি না দিতে পারেন তো পাঁচটা টাকা অন্তত দিন—

রমেশবাবু বললেন—পাঁচটা পয়সা চাইলে পাবে না আমার কাছে। চা চপ্ কাটলেট্ যত খাওয়াতে বলো খাওয়াচ্ছি তোমাকে—

—তাই খাওয়ান তাহলে! ফাউল-কাটলেট্ কিন্তু

—তাহলে চলো, বাইরে চলো, দোকানে গিয়ে খাওয়াবো!

রমেশবাবু প্রশান্তকে বললেন—একটু বসুন প্রশান্তবাবু, আমি একে বাইরে থেকে কাটলেট্ খাইয়ে নিয়ে আসি—

বলে রমেশবাবু বাইরে চলে যাচ্ছিলেন।

প্রশান্ত হঠাৎ পেছন থেকে ডাকলে। বললে—শুনুন রমেশবাবু—

রমেশবাবু ফিরলেন। বললেন—কী বলছেন?

—মেয়েটার নাম মীনাক্ষী, না?

রমেশবাবু বললেন—মীনাক্ষী কে বললে? এর নাম তো অঞ্জলি, অঞ্জলি ব্যানার্জি—

বলে আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন বাইরের দিকে। মেয়েটাও চলে গেল আগে আগে। প্রশান্তর কেমন যেন খট্‌কা লাগলো। সেই একই রকম মুখ, একই রকম চোখ, একই রকম গলার আওয়াজ! সে কি তবে ভুল শুনেছে? 'সোনার হরিণ' ছবির শুটিং-এর সময় তো সে নিজে হাজির ছিল। জয়ন্ত ছিল, মীনার বাবা ছিল। ধারে কাছে চারদিকে চেয়ে দেখলে—কই মীনার বাবা, সেই কাকাবাবু, কোথায়? কাকাবাবু যে মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, সেই কাকাবাবুই বা কোথায় গেলেন? কিন্তু দুজনের কি একরকম চেহারা হওয়া সম্ভব?

মেয়েটি এসে রমেশবাবুর একেবারে সামনে বসে পড়লো
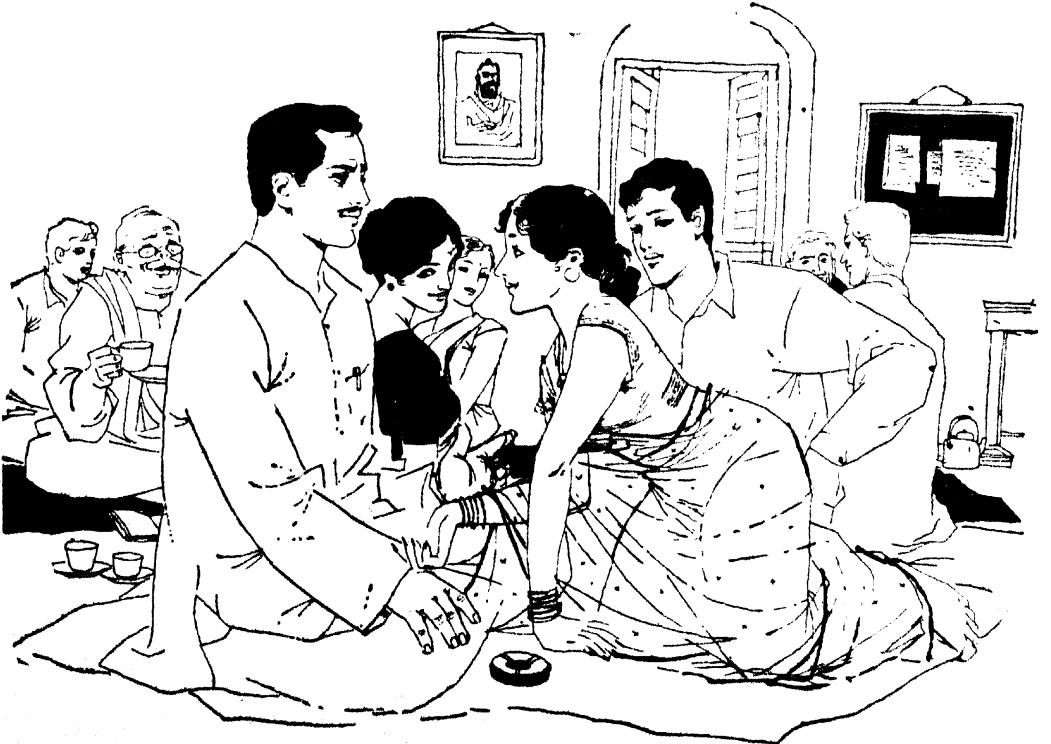
হয়ত তাই। নইলে সে মীনাক্ষী তো সিনেমার হিরোইন্। পনেরো হাজার টাকা নেয় এক-একটা ছবিতে পার্ট করতে। সে কেন এখানে আসবে? এই অ্যামেচার ড্রামাটিক ক্লাবে? এখানে দশ টাকার জন্যে খোশামোদ করবে?

তা হবে। হয়ত অঞ্জলি ব্যানার্জিই হবে।

শচীনবাবু সেই দুপুরে এসেছিলেন। কিন্তু গেলেন দেরি করে!

বললেন—অনেক দিন থেকেই আপনার ছেলেটিকে দেখছি বিপিনবাবু, আমার অনেক দিনের শখ ছিল—

শচীনবাবুর বোন বললে—নিজের মেয়ে বলে বলছি নে, কিন্তু অমন মেয়ে হয় না, এক হাতে সংসারের সব কাজ একলা করে দেবে—তার ওপর সংসারের সব ভার ছেড়ে দিয়ে আপনি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে থাকবেন—

বিন্দুবাসিনী বললে—আমার তো দিদি ওই এক ছেলে, তাই বড় ভয় করে!

—তা তো ভয় করবেই দিদি, আমি মেয়ে দেব আপনার বাড়িতে আমারও তো ভয় করে—

বিন্দুবাসিনী বললে—ওই মানুষকে তো দেখছেন দিদি, ওঁকে সেবা করতে পারলেই আমি আর কিছু চাই না। উনি লেখা-পড়াও দেখেন না, রূপও দেখেন না, উনি গুণ দেখেন শুধু, গুণ দেখেই উনি মানুষের বিচার করেন—

শচীনবাবু বললেন—তাহলে মেয়েকে কবে আনবো বলুন—

বিপিনবাবু বললেন—সে আমি একটু ভালো হয়ে উঠলেই গিয়ে দেখে আসবো, আপনি ভাববেন না, আপনার সঙ্গে সম্পর্ক হবে, সে তো আনন্দের কথা—

শচীনবাবু বললেন—না না সে কি কথা, আপনি অসুস্থ শরীর নিয়ে কেন কষ্ট করতে যাবেন, মেয়ে আমি আপনার বাড়িতে এনে দেখিয়ে যাবো—

শচীনবাবুর বোন বললেন—আজ তাহলে উঠি দিদি—মেয়েকে নিয়ে একদিন আসবো—

বিন্দুবাসিনী বললে—কর্তা একটু ভালো হয়ে উঠুন, তখনই না-হয় একদিন যাবেন উনি—

—তা কি হয় দিদি, বাড়ি তো আমার দুশো ক্রোশ দূরেও নয়, পাঁচশো ক্রোশ দূরেও নয়, এটুকু খুব হেঁটে আসতে পারবো, এখন তো রাস্তায় আলো হয়েছে, পাকা হয়েছে পথ-ঘাট কিছু কষ্ট নেই—

শচীনবাবুরা চলে গেলেন। যাবার সময় যথারীতি মিষ্টি কথা বলে গেলেন। বিন্দুবাসিনী অনেকক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। সেই পিন্টু। সেই পিন্টুরই যে আবার বউ হবে, সেই পিন্টুরই যে আবার সংসার হবে, তা যেন কল্পনা করতেও ভয় পায়। কোথায় সেই চক্রধরপুরে নদীর ধারে জন্মেছিল। মা'র দয়ায় যে এখনও বেঁচে আছে তাও যেন বিশ্বাস করতে চায় না তার মন। পিন্টু মাইনে নিয়ে এসে প্রতি মাসে তার হাতে তুলে দেয়—প্রত্যেকবার টাকা ক'টা মাথায় ঠেকিয়ে বাক্সয় তুলে রেখে দেয় মা। এবার যদি একটা বাড়ি হয় পিন্টুর। যেমন সব বাড়ি হয়েছে বাদাম-তলায়, ওই রকম। ইরকম একটা ছোট বাড়ি হবে পিন্টুর। একটি ছোট বউ। একটি ছোট সংসার। যেন অনেক আশা বিন্দু-বাসিনীর।

—অ বউ, বউ, ও কারা এয়েছিল গা?

বুড়ির ঘর থেকে গলা শোনা গেল। সদর দরজা বন্ধ করে দিলে বিন্দু-বাসিনী। বিপিনবাবু শুয়ে ছিলেন তক্ত-পোষের ওপর। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল বিন্দুবাসিনী। বিপিনবাবু তার দিকে চাইলেন। তাঁর মুখে যেন সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছে।

তারপর হঠাৎ এক সময়ে বললেন—পিণ্টু ফিরলো?

বিন্দুবাসিনী বললে—এখন তো ফিরবে না, তার তো নেমন্তন্ন, আজকে খেয়ে-দেয়ে রাত্তির হবে ফিরতে—

রাত সাড়ে আটটা বাজলো দেয়ালের বড় ঘড়িটাতে। এতক্ষণ সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারা যায়নি।

রমেশবাবু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেমন লাগছে প্রশান্তবাবু?

প্রশান্ত একেবারে অভিভূত হয়ে গেছে তখন। তার মুখে কোনও কথা বেরোল না। প্রশান্তর মনে হলো, এই কলকাতা সহরের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যেন এই হাতীবাগান ক্লাবের ছোট ঘরখানার মধ্যে অন্তর্ধান করেছে। শুধু কলকাতা সহরেই নয়, তার নিজের জীবনের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যেন চিরকালের মত অন্তর্হিত হয়ে গেছে হঠাৎ। যেন মধ্যযুগের কোন গহন অরণ্যের মধ্যে শুধু সে আর 'ওই ওরা। এ-নাটকের পাত্র-পাত্রীরা।'

—আর এক কাপ চা খাবেন?

রমেশবাবু দেখছিলেন প্রশান্তর দিকে চেয়ে। অফিসের সেই মুখচোরা ছেলেটির চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। মুখটা হাঁ করে এক দৃষ্টে দেখছে ওদের দিকে। আর ঘামছে।

—আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো প্রশান্তবাবু?

প্রশান্ত বললে—না, কিচ্ছু দেরি হয়নি—আপনি ভাববেন না—

এক-একটা করে দৃশ্যের রিহার্সাল হচ্ছে আর খানিকক্ষণ বিশ্রাম। তখন গল্প গুজব। তখন খিল্-খিল হাসি, তখন চারদিকে আবার সিগারেট টানবার ধুম পড়ে যায়। চায়ের কাপ নিয়ে হুড়োহুড়ি।

—চঞ্চলদা, আপনি কালকে অঞ্জলিকে মামলেট* খাইয়েছিলেন, আমাকে কিন্তু ফাঁকি দিয়েছিলেন!

—ওরে বাবাঃ, তোমার তো নজর আছে বেশ—

—তা আমার এত বড়-বড় দুটো চোখ ভগবান কী জন্যে দিয়েছে শুনি? আপনার মুখ দেখবার জন্যে?

নিজের রসিকতায় খিল্-খিল্ করে আবার হেসে উঠলো টগর। অঞ্জলি ব্যানার্জির পাশেই বসে ছিল টগর। একেবারে আসরের ওদিকে, দক্ষিণ দিকে। একজন বুড়ো ভদ্রলোকের মাথার আড়ালে পড়েছিল। প্রশান্ত একটু সরে বসলো ভালো করে দেখবার জন্যে। টগরের চেহারাটাও মন্দ নয়। তবে অঞ্জলি ব্যানার্জিকেই যেন বেশি ভালো দেখতে!

রমেশবাবুর কানে-কানে মুখ রেখে বললে—মেয়েগুলো কিন্তু বড্ড বেহায়া, না রমেশবাবু? আমরা যে এতগুলো লোক এখানে আছি, তার যেন খেয়ালই নেই ওদের—

রমেশবাবু বললেন—পুরুষদের সঙ্গে মিশে-মিশে ওসব বালাই চলে গেছে ওদের—

—আচ্ছা, ওদের টাকা দিতে হয় তো?

—বা রে টাকা দিতে হবে না? টাকা না দিলে কি মুখ দেখাতে আসছে এখানে। গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে, চা-চপ্-কাটলেট খেতে দিতে হবে, তার ওপর টাকা যা লাগবে দিতেই হবে—

—আর ছেলেরা?

—ওরা কেন টাকা নেবে? ওরা তো বরং আরো চাঁদা দেবে! মেয়েদের সঙ্গে পার্ট করতে পাবে, আর চাঁদা দেবে না? মোটা চাঁদা দিতে হবে—

প্রশান্তর যেন কেমন অবাক লাগলো সব দেখে-শুনে। ভদ্রঘরের সব মেয়ে, ওদেরও তো বিয়ে হবে, ওদেরও তো সংসার আছে, সত্যি, ওদেরও তো ঠিক তার মত রেশনের থলি নিয়ে দোকানে যেতে হয়!

—থামুন, অত জোরে কথা বলবেন না মশাই!

—কিন্তু মেয়েরা যে এখানে আসে, ওদের সঙ্গে এত মেলা-মেশা করেন আপনারা, তাতে আপনাদের বাড়ি থেকে আপত্তি করে না?

রমেশবাবু হাসলেন। বললেন—দূর, তা কেন আপত্তি করবে! আমরা কি খারাপ কিছু করছি? থিয়েটার করে তারপর যে-যার বাড়ি চলে যাবে, তখন কেউ কাউকে চিনবে না। আর ওরা কি শুধু এখানেই আসছে নাকি? এক সঙ্গে ছ' সাতটা ক্লাবে প্লে করে বেড়াচ্ছে যে।

তারপর প্রশান্তর দিকে চেয়ে রমেশবাবু বললেন—আপনি অফিসের পরে এখানে রোজ আসুন না, এখানে আমাদের ক্লাবের মেম্বর হবেন?

—কত করে চাঁদা?

—মাসে দু'টাকা। আর থিয়েটারের সময় দশটাকা করে দিতে হয়।

প্রশান্ত হঠাৎ বললে—আচ্ছা, অঞ্জলি ব্যানার্জিকে আপনি দশটা টাকা দিলেন না কেন! বেচারীর বড় কষ্ট, কালকে রেশন আনবার টাকা নেই—আমার কাছে টাকা থাকলে আমি দিয়ে দিতুম—

রমেশবাবু বললেন—আপনি ক্ষেপেছেন? রেশনের নাম করে আমার কাছ থেকে আগে কত টাকা নিয়েছে জানেন? একবারও উপুড়-হাত করেনি—। খেতে চাইলে খাওয়াতে পারি, টাকা দিতে নেই ওদের হাতে—

তারপরে রমেশবাবু হঠাৎ আবার মনে করিয়ে দিলেন—আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো প্রশান্তবাবু? ন'টা বেজে গেছে কিন্তু—

প্রশান্ত বললে—না না, আপনি ভাববেন না, আমি বাবাকে বলে এসেছি—। বলে এসেছি এখানে খেয়ে-দেয়ে যাবো—

—তাহলে আরো পেট ভরে খেলেন না কেন?

—খেয়েছি, তিনটে চপ, একটা কাটলেট, আর দুটো সিঙাড়া খেয়ে নিয়েছি, তাতেই পেট ভরে গিয়েছে একেবারে। আর তা ছাড়া, খুব ভালো লাগছে রিহার্সালটা আপনাদের, এখানে আপনাদের সবাই খুব ভদ্রলোক, দেখে মনে হচ্ছে সবাই খুব রেসপেকটেবল্ ভদ্রলোক—

খানিক পরেই সেদিনকার মত পালা শেষ হলো। এক ভদ্রলোক বললে—আজকে এখানেই 'প্যাক্-আপ্' হোক হে—

হৈ হৈ করে উঠলো সবাই, প্রশান্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—কী হলো?

রমেশবাবু বললেন—আপনার অনেক রাত হয়ে গেল, এখন যাবেন কী করে? যেতে পারবেন বাড়ি?

প্রশান্ত বললে—বাসে চলে যাবো, ঘণ্টা দেড়েক লাগবে—

রমেশবাবু বললেন—দাঁড়ান, আর এক কাজ করুন, আপনাকে একটা গাড়ি দিচ্ছি, ধর্মতলা পর্যন্ত আপনি সেই গাড়িতেই চলে যান, ওখান থেকে বাসে উঠবেন—যান—

সত্যিই গাড়ির একটা ব্যবস্থা করে দিলেন রমেশবাবু। নীচে একটা ভাড়াটে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। রমেশবাবু ড্রাইভারের পাশে প্রশান্তকে বসিয়ে দিলেন। আর তিনজন মেয়ে পেছনের সীটে উঠে বসলো। সেই অঞ্জলি ব্যানার্জি মেয়েটা উঠেছে, টগর উঠেছে। আর-একটা, আর একটা মেয়ের নাম জানা নেই।

—কালকে অফিসে দেখা হবে—বলে রমেশবাবু চলে গেলেন। আর গাড়িটাও ছেড়ে দিলে।

গাড়িতে চলতে চলতে অনেক গল্প করছে মেয়েরা। প্রশান্তর একবার ইচ্ছে হলো পেছন ফিরে দেখে। কিন্তু সাহস হলো না। কোথা দিয়ে কোন্ দিকে গাড়িটা চলেছে ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু চোখ সামনের দিকে থাকলেও কান পড়ে ছিল পেছন দিকে। গলা শুনে বুঝতে হয় কার গলা।

অঞ্জলি ব্যানার্জি বললে—গাড়িটা নতুন কিনলি বুঝি তুই?

টগর বললে—হ্যাঁ ভাই, কী রকম হয়েছে রে?

—ভাল, কত দাম নিলে?

—ষোল টাকা। আমার ভাই ইচ্ছে ছিল আর একটু বেশি টাকা দিয়ে একটা সিল্কের কাঞ্জিভরম কিনবো—

হঠাৎ অন্য মেয়েটা বলে উঠলো—এই এখানে দাঁড়ান, আমি নেমে যাই ভাই—

—কী রে, এখানে নামছিস কেন?

—একবার দাদার বাড়িতে যাবো, দাদার অসুখ করেছে খবর পেয়েছিলুম, দেখে যাই একবার—

অমনি করে টগরও এক জায়গায় নেমে গেল। তারপর অঞ্জলি ব্যানার্জি একলা। এবার আর কোনও কথা নেই মুখে। গাড়িটা সোঁ সোঁ করে চলেছে। পুরনো গাড়ি, কিন্তু ড্রাইভারটা এক্সপার্ট। রাত অনেক হয়েছে। ট্রাম-বাস-এর ভিড়ও পাতলা হয়ে এল। অনেকক্ষণ ধরে প্রশান্তর একটা কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল মেয়েটার সঙ্গে। দু'জনের চেহারা এক-রকম দেখতে কেমন করে হয়? সেই মীনাক্ষী, আর এই অঞ্জলি। জয়ন্তর নাম করলেই বোঝা যাবে। অর্থাৎ জয়ন্তকে চেনে কি না।

অনেক সাহস নিয়ে প্রশান্ত কথা বলবার চেষ্টা করতে গেল। কিন্তু ড্রাইভারটার মুখের দিকে চেয়ে কেমন সাহস হলো না। যদি বলে দেয় ক্লাবে গিয়ে। আর তা ছাড়া...

—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে?

—এখেনে রাখুন, এখেনে—

গাড়িটা শব্দ করে থেমে গেল।

এতক্ষণ পেছনে ফিরে দেখবার যেন সাহস হলো প্রশান্তর। অঞ্জলি ব্যানার্জি নিজেই দরজাটা খুলে নেমে পড়লো। পাড়ার রোয়াকে কতকগুলো লোক খালি গায়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে। সেদিকে না-চেয়েই অঞ্জলি ব্যানার্জি সরু একটা পায়ে-চলা পথের ওপর দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। তারপরে দরজার কড়া নাড়তেই কে যেন দরজা খুলে দিলে, স্পষ্ট দেখা গেল না। অঞ্জলি ব্যানার্জিকেও আর দেখা গেল না। ততক্ষণে গাড়িটাও স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। গাড়িটা চলতে সুরু করেছে।

প্রশান্তর যেন পুরোপুরি বিশ্বাস হলো না। আবার পেছন ফিরে দেখলে। সত্যিই অঞ্জলি ব্যানার্জি নেমে চলে গেছে।

—আপনাকে ধর্মতলায় নামিয়ে দিই?

—আচ্ছা, দেখুন তো পেছনের সীটে কী একটা পড়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে কার ভ্যানিটি-ব্যাগ যেন?

বলে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে ব্যাগটা। সত্যিই কার যেন ভ্যানিটি ব্যাগ। ভুলে ফেলে গিয়েছে। হয় টগরের নয় তো সেই মেয়েটার; নয়ত অঞ্জলি ব্যানার্জির। কার ঠিক মনে পড়লো না। একবার ভেতরে খুলে দেখবার ইচ্ছে হলো কী আছে ভেতরে, কিন্তু ড্রাইভারটা বললে—আমাকে দিন, আমি ক্লাবে ফেরত দিয়ে দেব—

প্রশান্ত বললে—আমার কাছেই থাক্ না, আমি কালকে অফিসে রমেশবাবুর কাছে দিয়ে দেব—

—না না, আপনি কেন কষ্ট করবেন, তার চেয়ে আমাকে দিন—

শেষ পর্যন্ত ফেরতই দিতে হলো। ড্রাইভারটা সেটা নিয়ে কোলের ওপর রেখে দিলে।

পরদিন সকাল বেলাই প্রশান্ত আবার এসে হাজির। আগের দিন রাত দশটার সময় যেখানে এসে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল, যেখানে অঞ্জলি ব্যানার্জি নেমে গিয়েছিল, ঠিক সেই জায়গাটায়। সেই রাতের মতন কয়েকটা পাড়ার ছেলে সেখানে বসে আড্ডা দিচ্ছে। বিডন স্ট্রীটের ব্যস্ত রাস্তার ওপরে বাস থেকে নেমে একবার-এদিকে একবার ওদিকে তাকাতে তাকাতে ঠিক-গলিটার সামনে এসে দাঁড়ালো। অফিস যাবার পোশাক। হাতে টিফিনের কৌটো।

কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। অথচ সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ও জানতো, সোজা অফিসেই যাবে সে। রোজকার মত অফিসেই গিয়ে ঢুকবে। তারপর কাজের ঘানিতে জুড়ে বেলা পাঁচটা ছ'টা পর্যন্ত চালাবে।

—দশটা টাকা দেবে মা?

মা'ও অবাক হয়ে গিয়েছিল পিণ্টুর টাকা চাওয়ায়। কখনও তো এতগুলো টাকা একসঙ্গে চায় না পিণ্টু।

—দশটা টাকা কী করবি?

—একটু দরকার আছে মা, দু' একদিন পরেই আবার দিয়ে দেব।

মা আর দ্বিধা করেনি। ছেলে জীবনে কখনও একটা পয়সাও বাজে খরচ করেনি। বাজার করে এসেও প্রত্যেকটি পয়সার হিসেব দিয়েছে মা'র কাছে। শুধু বিপিনবাবুর কাছেই নয়, বিন্দুবাসিনীর কাছেও একটা পয়সার দাম অনেক। প্রত্যেকটি পয়সা গুণে-গুণে হিসেব করে খরচ করে যে-পিণ্টুকে মানুষ করেছে, সেই পিণ্টুই আজ আবার পয়সা উপায় করতে শিখেছে, পয়সা উপায় করে বুড়ো বাপ-মা'র হাতে তুলে দিচ্ছে।

মা বলেছিল—কালকে শচীনবাবু এসেছিলেন,—

—সে তো আমি ছিলুম তখন—

—তাঁর ভাগ্নীর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা বলতে—

পিণ্টু বললে—বাবা যা বলেন তাই-ই হবে—

—তুমি যেন আজ আর দেরি কোর না আসতে, কাল তোমার জন্যে ঘুমোতে পারিনি—

সত্যিই যখন বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছিল, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। সেই হাতীবাগান থেকে বাদামতলা পর্যন্ত আসতে সময় কম লাগবার কথা নয়। কিন্তু কোথা দিয়ে যে সময়টা কেটে গিয়েছিল বুঝতেই পারা যায়নি। ধর্মতলায় যে-ট্রামে উঠেছিল, সেই ট্রাম যে কখন এসে ডিপোর মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল তারও খেয়াল ছিল না। সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামের শেষ বেঞ্চিটাতে বসে যেন তখনও সেই হাতীবাগান ড্রামাটিক ক্লাবের দৃশ্যটাই চোখের ওপর ভাসছিল। যেন পাশাপাশি দুটো ছবি। বাদামতলার সঙ্গে তার অফিসের কোনও তফাৎ নেই। একটা যেন আর-একটার পরিপূরক। কিন্তু তার পাশের চেয়ারের লোকটাই যে আর এক নতুন জগতের মানুষ, সেটাই যেন প্রশান্তর আশ্চর্য এক আবিষ্কার। অফিসে যে লোকটা নিচুতে পড়ে আছে সকলের নজরের আড়ালে, আর এক জায়গায় সে যেন সম্রাট। রমেশবাবুর মুখের কথায় একজন অঞ্জলি ব্যানার্জি বা একজন টগরের মুখে হাসি ফোটে।

—বাদামতলা, বাদামতলা,—

কণ্ডাক্টারের চিৎকারে শেষ পর্যন্ত তন্দ্রা ভেঙেছিল প্রশান্তর। বাদামতলার ভেতরে আসতেই আবার সেই পুরোন গতানুগতিক জীবন, সেই অন্ধকার ঘুপচি ঘরের মধ্যে সেই বাবা, সেই সংসারের জাঁতা-কলে পেষা মা। মোড়ের মাথায় লালার দোকানটা অত রাত্রেও খোলা রয়েছে। বিক্রির জন্যে নয়, ঝাপসা কেরাসিনের আলোয় লালা তখন টাকা-আনা-পয়সার হিসেব কষছে খেরো খাতা নিয়ে।

দরজার আর কড়া নাড়তেও হয়নি। মা অত রাত্রেও দরজাটা অল্প ফাঁক করে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

—তুই এত দেরি করলি ফিরতে, আমার ভয় করছিল বাবা, উনিও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন—

—আমি তো বলে গিয়েছিলুম তোমাকে, আর এখন তো আর ছেলেমানুষ নেই আমি—

পাশের ঘর থেকে আওয়াজ এল—অ বউ, বউ, তোমার ছেলে ফিরলো? কার সঙ্গে কথা বলছো গা?

তারপর হাত-মুখ-পা ধুয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শোওয়া। শোওয়াই শুধু, ঘুমটা ভাল হয়নি। কেমন পাতলা পাতলা তন্দ্রার মতন। তন্দ্রার ঘোরেই যেন রমেশবাবুর সঙ্গে কথা বলেছে। অঞ্জলি ব্যানার্জির সঙ্গে যেন এক মটর গাড়িতে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়িয়েছে। যেন গাড়িটা আর থামছে না। সারা রাত কলকাতার রাস্তায় চাকাগুলো ঘুরে ঘুরে কেবল শহর পরিক্রমা করেছে, জীবন পরিক্রমা করেছে, ছোটবেলা থেকে প্রশান্তর সারা জীবনটা পরিক্রমা করে এসে অঞ্জলি ব্যানার্জি হঠাৎ বললে—আপনি বড় দুষ্টু তো—

—আমি?

—হ্যাঁ আপনি। সারা রাস্তা এক গাড়িতে বসে এসেও আপনি তো একটাও কথা বললেন না আমার সঙ্গে। আপনি মানুষ খুন করতে পারেন সত্যি—

হঠাৎ কণ্ডাক্টার চিৎকার করে উঠলো—বাদামতলা, বাদামতলা—

ঘুম ভেঙে যেতেই প্রশান্ত চারদিকে চোখ মেলে দেখলে। সেই টিনের চাল, সেই তক্তপোস, সেই কেরাসিন কাঠের টেবিল, চেয়ার বই-এর র‍্যাক। সেই রামমোহন রায়ের ফ্রেমে-বাঁধানো ছবিখানা। ছোট জানালা দিয়ে অল্প-অল্প নীল আলো আসছে, বোধহয় ভোর হয়ে এল। তারপর আর দেরি করেনি প্রশান্ত। বিছানা থেকে উঠে প্রত্যেকদিনের রুটিন বাঁধা জীবন। মুখ হাত ধোয়া হয়ে গেছে। মা তারও আগে উঠে পড়ে রোজ। তারও আগে বাড়িওয়ালী বুড়ি উঠে পড়ে। তখন থেকেই সুরু হয় তার গজ গজ। মা উনুনে আগুন দেয়, পিণ্টু অফিসে যাবে। তার ভাত চাই সকাল-সকাল। তখন বাদামতলার সব বাড়িতেই ধোঁয়া দিয়েছে। কয়লার উনুনের ধোঁয়া। তখন চটিটা পায়ে গলিয়ে থলি হাতে নিয়ে বাজারে যাবার পালা। একেবারে এক-হাতে সব আনতে হবে। মাছ-আলু-পটল থেকে সুরু করে তেল-চিনি-লঙ্কা, কেরাসিন তেল সব। সেদিনও মা'র সবগুলো দরকারী জিনিস এনে দিয়েছে যথারীতি। তারপর বাবার কাছে গিয়ে যথারীতি বসেছে।

বাবা জিজ্ঞেস করেছেন—কাল অত রাত্তির হলো কেন?

প্রশান্ত বললে— খাওয়া-দাওয়া শেষ করতেই সাড়ে ন'টা বেজে গেল—

—ও রমেশবাবুটি কে? কার লোক? ফার্গুসন সাহেবের না ম্যাক্লিয়ড্ সাহেবের?

—তা তো জানি না।

—সেইটেই জানো না, তাহলে আর, কী জানলে? জিজ্ঞেস করবে তো যে কার লোক? ওর বাবার নাম কী, কোন অফিসে চাকরি করতো, এই সব। তা ব্রাহ্মণ না কায়স্থ?

—ব্রাহ্মণ, ব্যানার্জি।

—ভালো। স্বভাব-চরিত্র ভালো তো? স্বভাব-চরিত্র ভালো দেখে তবে মেলা-মেশা করবে, স্বভাব-চরিত্রটাই হলো আসল। খারাপ লোকের সঙ্গে মিশলে সে কেবল তোমায় খারাপ পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে—

এ-সব কথা বহু পুরোন, বহুবার শুনেছে। বহুবার শিখেছে। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়েই বাবা বলেছিলেন—যাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে, চান করে নাও গে যাও—

আশ্চর্য, সমস্ত সংসারটা যেন তাকে কেন্দ্র করেই ঘুরে চলে। তার অফিস যাওয়া, তার ভাত খাওয়া, তার পড়া, তার ঘুমোন—দুটি মানুষ যেন তাকে নিয়েই বিব্রত ব্যতিব্যস্ত। অথচ...

কড়া নাড়তেই একজন দরজা খুলে দিলে।

—কে আপনি? কাকে চান?

—অঞ্জলি ব্যানার্জি আছেন?

কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেও যেন গলাটা কেঁপে উঠলো। খাবারের কৌটোটা যেন হাত থেকে খসে পড়বার মত হয়েছিল।

—আপনি কে? কোথেকে আসছেন?

—আমি হাতীবাগান ড্রামাটিক ক্লাব থেকে আসছি, রমেশবাবুর বন্ধু—কালকে এক গাড়িতে করে এসেছিলুম এখানে। এখানে অঞ্জলি দেবীকে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলুম। ওঁর একটা হ্যাণ্ড-ব্যাগ গাড়িতে ফেলে গিয়েছিলেন, সেটা কি উনি পেয়েছেন?

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা। যেন কথাগুলো বলে বেশ হাঁপিয়ে উঠতে হলো।

ও মা, আপনি?

ভেতর থেকে অঞ্জলি ব্যানার্জি উঠোন পেরিয়ে একেবারে সদর-দরজার কাছ পর্যন্ত এসে গেছে। কালকে যে-লোকটা একটাও কথা বলে নি অতক্ষণ, সে-লোকটাকে একেবারে সশরীরে বাড়িতে হাজির হতে দেখে অবাক হয়ে যাওয়ারই কথা!

—আসুন, ভেতরে আসুন—

বলে দরজাটা আর একটু ফাঁক করে দিলে অঞ্জলি ব্যানার্জি।

—আমার অফিস আছে, অফিস যাবার আগে একটা কথা বলতে শুধু আপনার কাছে এসেছিলুম।

—তা অফিসে যান্ না, আমি কি আপনাকে অফিসে যেতে বারণ করছি, বেশ তো মানুষ আপনি? আমাদের বাড়িতে এলেন, আর একটু না-বসেই যাবেন? আসুন—

—আচ্ছা চলুন বসছি, কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারবো না—

বলে প্রশান্ত উঠোনের দিকে পা বাড়ালো।

অঞ্জলি ব্যানার্জি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বললে—সকালে বেলেঘাটা সংস্কৃতি সঙ্ঘ থেকে লোক আসবার কথা ছিল, আমি ভাবলাম বুঝি তারাই এল—চা খাবেন?

পিছল উঠোন। অন্ধকার একতলা বাড়ি। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে কেমন যেন রোমাঞ্চ হচ্ছিল প্রশান্তর। ঝি'টা কোথায় চলে গেছে। অঞ্জলি ব্যানার্জি একটা লাল শাড়ি পরেছে। স্নান করে ভিজে চুল পিঠে এলিয়ে দিয়েছে। উঠোন পেরিয়ে একেবারে ভেতরের একটা অন্ধকার ছোট ঘরে নিয়ে তুললো প্রশান্তকে। একটা উঁচু খাট। মোটা-মোটা কাজ করা বোম্বাই খাট। চারটে পায়ার নীচে থান-ইট পেতে অনেক উঁচু করা হয়েছে। সেখানে বসতে গেলে লাফিয়ে উঠে বসতে হয়। মেঝের ওপর একটা গোল শ্বেত-পাথরের টেবিল, আর একখানা চেয়ার। প্রশান্ত সেই চেয়ারটার ওপরেই বসলো। দেয়ালে অনেকগুলো ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি। সবগুলোতেই এক মুখ—অঞ্জলি ব্যানার্জি'র মুখ। বিভিন্ন পোশাকে, বিভিন্ন ঢং-এ তোলা। কোনটাতে শাড়িপরা, কোনওটাতে ফ্রক, কোনওটাতে সালোয়ার-পাঞ্জাবী, কোনওটাতে আবার পুরুষের মেক্-আপ্। আবার কোনওটাতে বা বিধবার সাজ।

—যদি আরাম করে বসতে চান তো বিছানায় উঠে বসুন না, আমি চা এনে দিচ্ছি—

প্রশান্ত বললে—না না, আপনি যে কী বলেন, এই দেখুন হাতে এখনও আমার টিফিনের কৌটো, আমি ভাত-টাত খেয়ে অফিসে যাবো বলে বেরিয়েছি, হঠাৎ আপনার হ্যান্ড-ব্যাগটার কথা মনে পড়লো, তাই এলুম, আমি এক্ষুনি অফিস চলে যাবো—

—আমার হ্যান্ড-ব্যাগ?

—আপনি নেমে যাবার পর হঠাৎ দেখলুম গাড়ির ভেতরে হ্যান্ড-ব্যাগটা পড়ে আছে। ভাবলাম হয়ত আপনার। আমি ওটা নিয়েই আসতাম, কিন্তু ওদের ড্রাইভারটা বললে, সে ক্লাবে গিয়ে জমা দিয়ে দেবে—

অঞ্জলি ব্যানার্জি বললে—তাহলে হয়ত লাবণ্যর, তাড়াতাড়ি দাদার অসুখ বলে নেমে গেল তো, সেই-ই ফেলে গেছে—

প্রশান্ত বললে—আমি ভেবেছিলুম আপনার, তাহলে আপনি লাবণ্য দেবীকে বলে দেবেন, আমি তাহলে উঠি এবার—এই কথাটা বলতেই এসেছিলুম আর কি!

বলে সত্যি-সত্যিই উঠছিল প্রশান্ত।

কিন্তু অঞ্জলি ডাকলে। বললে—ইচ্ছে করলে আপনি একটু বসতেও পারেন, আমার কোনও অসুবিধে নেই—

প্রশান্ত ফিরে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলে। বললে—কিন্তু আমি তো কখনও এর আগে অফিস-কামাই করিনি—

—সে কি, আপনার কোন্ অফিস?

—টার্নবুল এন্ড জনসন কোম্পানী, ইম্পোর্টার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স—

অঞ্জলি মনে মনে ভাবলে খানিকক্ষণ। বললে—আপনাদের অফিসে থিয়েটার হয় না? আপনাদের অফিসে তো কখনও থিয়েটার করেছি বলে মনে পড়ছে না—

প্রশান্ত বললে—হয়, কিন্তু মেয়েদের নিয়ে হয় না, বড়বাবু পছন্দ করেন না—

অঞ্জলি হাসলো। বললে—বড়বাবু খুব বুড়ো মানুষ বুঝি?

প্রশান্তও হাসলো। বললে—বুড়োদের একটু তো আপত্তি হবেই, সে তো জানা-কথা—

অঞ্জলি বললে—আসলে কিন্তু বুড়ো মানুষদেরই বেশি ঝোঁক, তা জানেন?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, হাতীবাগান ড্রামাটিক ক্লাবের যারা বুড়ো-বুড়ো মেম্বার, তারাই থিয়েটারে বেশি চাঁদা দেয়, ওদের আগ্রহেই তো থিয়েটার হয়। দেখেন না। ওরাই সকাল-সকাল এসে ক্লাবে বসে থাকে! সব ক্লাবে ওরাই বেশী উৎসাহী—

—কিন্তু রমেশবাবু তো বেশি বুড়ো নন্—

কথাটা বলেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বললে—হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনি কালকে রমেশবাবুর কাছে দশটা টাকা চাইছিলেন রেশন আনবার জন্য, আপনি যদি চান, আমি দিতে পারি টাকাটা...

বলে প্রশান্ত পকেট থেকে টাকাটা বার করলে।

অঞ্জলি টাকাটার দিকে চেয়ে দেখলে, বললে—টাকাটা কি আমার জন্যেই এনেছেন আপনি?

—হ্যাঁ, আপনি যে বললেন কালকে রমেশবাবুকে, আপনার টাকা দরকার, এই নিন্—

হাত বাড়াতে গিয়েও অঞ্জলি হাতটা টেনে নিলে। বললে—কিন্তু ফেরত দেব কী করে আপনাকে?

প্রশান্ত বললে—সে জন্যে ভাববেন না, আমি এর পর আর একদিন এসে না-হয় নিয়ে যাবো—

—কবে আসবেন আপনি? তখন যদি আমার হাতে টাকা না থাকে?

তারপর একটু ভেবে বললে—তার চেয়ে বরং আপনার ঠিকানাটা দিন, আমি গিয়ে দিয়ে আসবো কিংবা মনি-অর্ডার করে পাঠাবো—আপনার ঠিকানাটা আমাকে লিখে দিন—

প্রশান্ত চুপ করে রইল। বললে—না না, সে জানাজানি হয়ে যাবে, তার চেয়ে আমি এলে আপনার আপত্তি আছে?

—আপত্তি কেন থাকতে যাবে? বা রে! আপনি পাওনাদার, আপনার তো আসবার অধিকার রইলই। আপনি এসে তাগাদা দেবেন, যদি না ধার-শোধ দিতে পারি, আমাকে দুটো কথা শোনাবেন, গালাগালি দেবেন—

এতক্ষণে হাসি বেরোল প্রশান্তর মুখ দিয়ে। বললে—না না আমি সে-কথা বলিনি, টাকা আপনি যখন ইচ্ছে শোধ করবেন, আমার টাকার বিশেষ জরুরী দরকার নেই, নিন্—

অঞ্জলি টাকাটা এবার হাত বাড়িয়ে নিলে। নিয়ে আঁচলে গেরো বাঁধতে বাঁধতে বললে—আর একটু বসে যান্, আপনাকে চা করে দিই—

—এই তো ভাত খেয়েই বেরিয়েছি বললুম, আর তা ছাড়া চা আমি খাই না—

বলতে বলতে উঠতে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল প্রশান্ত।

বললে—আর একটা কথা মনে পড়লো, কাল থেকেই জিজ্ঞেস করবো ভাবছি—

—কী বলুন?

—কাল আপনাকে দেখেই আমার আর একজন মেয়ের কথা মনে পড়লো। তার মুখের সঙ্গে আপনার মুখের আশ্চর্য মিল, আমি তাই আপনাকে দেখেই রমেশবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম—আপনার নাম কী? আপনার নাম অঞ্জলি ব্যানার্জি শুনে একটু অবাক হলুম—

অঞ্জলি ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলে—কে সে? কার কথা মনে পড়লো?

প্রশান্ত বললে—সে একজন সিনেমার হিরোইন্—

—সিনেমার হিরোইন্?

—হ্যাঁ, বহুদিন আগে টালিগঞ্জের একটা ফিলম্ স্টুডিওতে প্রথম দেখেছিলুম তাকে। সে অনেক দিনের কথা। অবশ্য সেই-ই আমার প্রথম আর শেষ দেখা, তারপরে আর দেখা হয়নি—! কিন্তু আশ্চর্য মিল আপনাদের দুজনের সত্যি! তাই কাল ক্লাবের ভেতরে আপনাকে দেখেই আমি একেবারে চমকে উঠেছিলুম—।

অনেকবার আপনার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম, তারপরে গাড়িতে আসতে-আসতেও আপনাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল—

—তা গাড়িতে তো আপনি দেখলুম একেবারে শঙ্করাচার্যের মত সোজা সামনের দিকে মুখ বার করে বসেছিলেন, একবার ফিরেও চাননি আমাদের দিকে।

—ইচ্ছে করছিল খুব ফিরে দেখতে, কিন্তু ভাবছিলাম, আপনারা হয়ত কী ভাববেন!

অঞ্জলি বললে—আপনি তো খুব লাজুক দেখছি—

—না লাজুক নই—তবে...

—তবে বউ-এর ভয়ে বুঝি? অন্য মেয়েদের দিকে চাইলে বাড়িতে বউ বুঝি রাগ করবে?

প্রশান্ত বললে—না, বিয়েই এখনও হয়নি, তার বউ! না, সে-জন্যে নয়, মেয়েদের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে-চেয়ে দেখা কি উচিত?

—উচিত না হলেই বা, আমরা তো যেখানেই যাই সেখানে সবাই আমাদের দিকে হাঁ করেই চেয়ে দেখে। আপনার মত কারোর তো এত লজ্জা নেই, তারা আমাদের ডেকে-ডেকে চা খাওয়ায়, খাবার খাওয়ায়, মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন আমাদের রাত্রের খাওয়াটাই বেঁচে যায়—আমরা হাসলে সবাই কৃতার্থ হয়ে যায়!

প্রশান্ত বললে—তাহলে তো আমার সম্বন্ধেও আপনি তাই-ই ভাবছেন, আমিও তো বিনা-পরিচয়েই আপনার বাড়িতে এসেছি—

অঞ্জলি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। বললে—আপনি কি প্রথম, আগে কত লোক কতবার এমন এসেছে—

—ছি ছি, তাহলে আমি যাই—

বলে চলেই যাচ্ছিল প্রশান্ত। কিন্তু অঞ্জলি ব্যানার্জি একেবারে সামনে এসে প্রশান্তর হাতটা ধরে ফেললে। বললে—না না, আপনি দেখছি সত্যিই খুব লাজুক, সত্যি বলুন তো, আপনি কী করতে এসেছিলেন—

প্রশান্তকে আবার ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে।

—আপনি এই দশটা টাকা দিতে এসেছিলেন—না আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন, কোনটা?

প্রশান্ত যেন বোবা হয়ে গেল। চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। অঞ্জলি বাইরে চলে গেল। বাইরে যেন কার গলার আওয়াজ শোনা গেল—

—ও কে রে অঞ্জলি? কোন্ ক্লাবের?

অঞ্জলি বললে—হাতীবাগান।

—আমি ভাবলুম বেলেঘাটার সেই ছেলেটা। তা কী করতে এসেছে রে? নতুন প্লে হবে বুঝি?

—ওসব পরে বলছি, আমার এই রেশনটা এনে দাও না মাইমা, খোকাকে বলে—আমি ততক্ষণ চা'টা চড়িয়ে দিই—

ঘরের চারদিকে অঞ্জলি ব্যানার্জির ছবি ঝুলছে। নানান পোশাকে, নানান ভঙ্গিতে। বিছানাটার ওপর দুটো মাথার বালিশ, দুটো পাশ-বালিশ। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো প্রশান্তর।

পাশের ঘর থেকে কার যেন কাতর শব্দ কানে আসতে লাগলো—উঃ, আঃ—গেলুম রে বাবা—

যেন যন্ত্রণায় কেউ ছট্-ফট্ করছে। এ কেমন বাড়ি, এ কেমন আবহাওয়া? কোনও পুরুষ-মানুষ কি অভিভাবকের নাম গন্ধ পর্যন্ত কোথাও নেই। ডাল রান্নার গন্ধ আসছে। আশে-পাশে ভাড়াটে। জানালার পাল্লার ওপর একটা কাক হঠাৎ উড়ে এসে বসলো—তারপর মাথা কাত্ করে প্রশান্তর দিকে সাবধানী-দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো। কে গো তুমি? নতুন লোক দেখছি! প্রশান্ত অপরাধীর মত সেই দিকে দেখতে লাগলো চেয়ে-চেয়ে। ওরাও বুঝি ধরে ফেলেছে! ওরাও বুঝি জানতে পেরেছে! নিজের নিঃসঙ্গতায় এতক্ষণে যেন নিজেকে সত্যিই পাপী মনে হলো, অপরাধী মনে হলো। ছি-ছি কেন সে এখানে এল?

—আপনাকে অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রেখেছিলুম, কিছু মনে করবেন না।

বলে চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখে দিলে অঞ্জলি। দিয়ে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসলো।

প্রশান্ত বললে—আমি তো বললুম আপনাকে, চা আমি খাই না, আর তা ছাড়া এখুনি আমি ভাত খেয়ে আসছি—

—তা হোক, ভাত তো খেয়েছেন সেই ন'টার সময়, আর এখন বারোটা বাজে—

বারোটা? প্রশান্ত চমকে উঠলো। আশ্চর্য? আজকে অফিসে সত্যি-সত্যিই বিপদ ঘটবে! কী ভাবছে সেখানে সবাই, কে জানে! একটা খবর পর্যন্ত দেওয়া হলো না।

অঞ্জলি বললে—টিফিনের কৌটো তো রয়েইছে, ওটা খুলে খেয়ে ফেলুন না, সময় তো হয়ে এল—

প্রশান্ত গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বললে—না, ওটা অফিসে গিয়েই খাবোখন্—আমি চা'টা খেয়েই উঠবো এবার—

—উঠুন না, আমি কি বারণ করছি আপনাকে উঠতে?

হঠাৎ প্রশান্ত বললে—ওটা কার ছবি, ওই যে? ওদিকে? এ সবগুলোই কি আপনার?

—হ্যাঁ, ওগুলো সিনেমার। আগে আমি দু'একবার সিনেমায় নেমেছিলুম কি না—

—আপনি সিনেমায় নেমেছেন?

—হ্যাঁ।

—তাহলে মীনাক্ষী বলে কাউকে চেনেন? সিনেমার খুব নাম করা হিরোইন?

অঞ্জলি ব্যানার্জির চোখ দুটো কেমন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। বললে—মীনাক্ষী?

প্রশান্ত বললে—হ্যাঁ, খুব ভালো হিরোইন, তখন পনেরো হাজার টাকা নিত একটা ছবি করতে, এখন বোধহয় এক লাখ টাকা পায়, এখন নিশ্চয়ই বাড়ি গাড়ি সব করেছে, আপনি চেনেন না?

—আপনি চেনেন?

প্রশান্ত বললে—আমি চিনতাম, সে অনেকদিন আগেকার কথা, একদিন আমার এক বন্ধু আমাকে এক ফিল্ম স্টুডিওতে নিয়ে গিয়েছিল, তখন দেখেছিলাম তাকে, খুব সুন্দর দেখতে, তার বাবার সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছিল, কিন্তু আমার বাবা ও-সব পছন্দ করেন না বলেই আর যাওয়া হলো না—! এখন আমাকে দেখলে তারা হয়ত চিনতেই পারবে না—

তারপর অঞ্জলির মুখের দিকে মুখ তুলে বললে—আপনি তো নিশ্চয় সিনেমা দেখেন?

অঞ্জলি বললে—দেখি—

—সোনার হরিণ দেখেছেন? বাঙলা সিনেমা?

অঞ্জলির মুখটা কেমন যেন নির্বোধের মত ঠেকলো প্রশান্তর কাছে।

—বাঙলা সিনেমা দেখেন না বুঝি? কিন্তু তাতে একটা সিন্ ছিল ভারি চমৎকার, জানেন। একটা ছেলে একটা মেয়ের দিকে চেয়ে থাকতো রোজ, একদিন মেয়েটা বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসে কষে এক চড় মারলো ছেলেটার গালে, সে কী ভীষণ চড়, কিন্তু সেই চড় খেয়েও ছেলেটা হাসতে লাগলো! এই সিনটা খুব ভালো লেগেছিল আমার—। মীনার বাবার নাম রতনবাবু, রতনবাবুর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল আমার, খুব ভালো লোক, আমাদের পাড়াতে আমাদের বাড়ির পাশেই তিনি একটা বাড়ি করছিলেন, বেশ ইটের দোতলা বাড়ি, কিন্তু আর শেষ হলো না বাড়িটা, বোধহয় অনেক টাকা হয়ে গেল, অনেক টাকা হয়ে গেলে আর বাদামতলায় বাড়ি করবেন কেন? হয়ত বালিগঞ্জে কি নিউ আলিপুরে বাড়ি করেছেন—

চায়ের কাপে আর একবার চুমুক দিয়ে বলতে লাগলো—জীবনে প্রথমে যারা ছোট থাকে গরীব থাকে, তারা বড়লোক হবার পর পুরোন বন্ধুদের আর চিনতে পারে না, এই-ই সংসারের নিয়ম—

অঞ্জলি মন দিয়ে শুনছে প্রশান্তর কথাগুলো।

—আপনি অবশ্য এ-সব কথা ভালরকমই জানেন, এ-সব আপনাকে বলা বৃথা! তবু আপনি যদি মীনাক্ষীর মতন সিনেমায় নামতেন তাহলে আপনারও তার মতন খুব নাম হতো। কালকে আপনার পার্টও

আমার খুব ভাল লাগলো। আপনি সিনেমায় নামবার চেষ্টা করেন না কেন? দেখবেন তাহলে আপনারও একদিন খুব নাম হবে, টাকা হবে, সব হবে—

অঞ্জলি সে-কথার উত্তর না-দিয়ে বললে —মীনাক্ষীর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল?

প্রশান্ত বললে—না, আমার আলাপ করতে সাহস হয়নি, আমার আলাপ করতে ইচ্ছে হলেও সে একজন ফিলম্-স্টার, সে আমার সঙ্গে কথা বলবে কেন, বলুন? আমার এক ক্লাশ-ফ্রেণ্ড্ ছিল, তার সঙ্গে মীনাক্ষীর খুব আলাপ ছিল, বলতে গেলে সেই-ই মীনাক্ষীকে সিনেমায় নামিয়েছিল—

—আপনার সে-বন্ধুর নাম কী?

—জয়ন্ত। সে খুব বড়লোকের ছেলে কি না। তাদের বাড়িতেই মীনাক্ষীরা ভাড়া থাকতো। জয়ন্ত মীনাক্ষীদের কাছ থেকে ভাড়া নিত না। অন্য ভাড়াটেদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে ওদের টাকাটা নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিত। ওর বাবা কিছু বুঝতে পারতেন না—

—তারপর?

—তারপর জয়ন্তই চেষ্টা করে মীনাক্ষীকে সিনেমায় নামিয়ে এখন খুব নাম-টাকা-গাড়ি-বাড়ি করিয়ে দিয়েছে। এখন খুব আরামে আছে দুজনে—

—সেই জয়ন্তর সঙ্গে আপনার দেখা হয় না?

প্রশান্ত বললে—সেই ফিলম্-স্টুডিওর যাবার পর দিন থেকেই আমি জয়ন্তর সঙ্গে মেশা ছেড়ে দিয়েছি; আর দেখা হয়নি, আর দেখা করবোও না কখনও—

—কেন?

প্রশান্ত বললে—সে অনেক কাণ্ড, সে আপনার না-শোনাই ভালো—

—না, বলুন, আমার শুনতে বেশ ভালো লাগছে, বলুন আপনি—

প্রশান্ত বললে—সেদিন সেই ফিলম্-স্টুডিও থেকে বাড়ি ফিরে যেতেই বাবার কাছে খুব মার খেলুম। মার খেতে খেতে বোধহয় অজ্ঞানই হয়ে যেতাম, নেহাৎ মা এসে বাবার হাত ধরে ফেলেছিল, তাই। তার পর বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম আর কখনও ও-সব খারাপ লোকের সঙ্গে মিশবো না। জীবনে কখনও সিনেমাও দেখিনি। সিনেমার মেয়েদের সঙ্গে মিশিও নি—নিজের মনে লেখা-পড়া করেছি। আর তারপর বাবা একদিন তাঁর অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন—এখন সেই অফিসে চাকরি করছি—

—তা হাতীবাগান ক্লাবের মেম্বার হলেন কেমন করে? বাবা আপত্তি করেন নি?

—মেম্বার তো হইনি। রমেশবাবু আমার অফিসে আমার পাশের সিটে বসেন। উনি প্রায়ই সিনেমা দেখেন, হিন্দী সিনেমা,

অঞ্জলি ব্যানার্জি একেবারে সামনে এসে প্রশান্তর হাতটা ধরে ফেললে

সিনেমার গল্প করেন, আমি একদিন ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মীনাক্ষীকে চেনেন কিনা, তা উনি চিনতেই পারলেন না। বাঙলা ছবি দেখেন না তো! তারপর উনি একদিন বললেন—ওঁদের একটা ক্লাব আছে, সেখানে থিয়েটার হয়, উনিই একদিন বলেছিলেন ওদের ক্লাবে আসতে, কাল রবিবার ছিল তাই এসেছিলুম,—

—আর আজ যে এখানে এলেন, বাড়িতে বলে এসেছেন?

—না।

—রমেশবাবুকে?

—না—আমি কিন্তু নিজেই জানতুম না যে এখানে আসবো। অফিসেই আসছিলুম, হঠাৎ মনে পড়লো আপনার কথা। ভাবলাম আপনাকে জিজ্ঞেস করবো কথাটা—

—কোন্ কথাটা?

—মীনাক্ষীকে অনেকটা আপনার মতন দেখতে, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম আপনি তাকে চেনেন কি না—কিংবা আপনি তার কেউ হন কি না—

হঠাৎ বাইরে সদর দরজায় জোরে-জোরে কড়া নড়ে উঠলো।

প্রশান্ত বললে—আপনাকে কেউ ডাকছে বোধহয়, আমি এবার উঠি—

বলে প্রশান্ত উঠে দাঁড়িয়েছিল। অঞ্জলি ব্যানার্জি বললে—না আপনি বসুন—

—কিন্তু ওরা হয়ত কোনও ক্লাব থেকে

এসেছে, আমি থাকলে কাজের ক্ষতি হবে আপনার, আর আমাকেও তো অফিসে যেতে হবে—বলে খাবারের কৌটা হাতে তুলে নিতে যাচ্ছিল—

অঞ্জলি থামিয়ে দিলে। যেন ধমকের সুরে বললে—না আপনাকে যেতে দেব না, আপনার সঙ্গেও আমার কাজ আছে, আপনি বসুন, আমি আসছি—

প্রশান্ত অবাক হয়ে গেল। তার সঙ্গে আবার অঞ্জলির কী কাজ থাকতে পারে। কিন্তু সে-কথা জিজ্ঞেস করবার অবসর না দিয়েই অঞ্জলি ব্যানার্জি উঠোন পেরিয়ে সদর দরজার দিকে চলে গেল—

সেদিনও খাওয়া-দাওয়ার পর শচীনবাবু এলেন—ঘুমোচ্ছেন নাকি বিপিনবাবু?

রিটয়ার্ড লোক। বরাবর চাকরি করেছেন দশটা-পাঁচটা। সকাল বেলা অফিসে গিয়ে ফাইল্-ক্লিয়ার করেছেন প্রাণ-পণে। চাকরিতে উন্নতি করেছেন। মাথার ওপর দিয়ে স্বদেশীযুগ গেছে, যুদ্ধ গেছে, দুর্ভিক্ষ মহামারী গেছে, পার্টিশন্ গেছে, কিছুই টের পান্ নি। অর্থাৎ বাঙ্লা দেশটাই বলতে গেলে অফিসের ফাইলের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। ছেলে-মেয়েরা স্ত্রীর তাঁবে বড় হয়েছে। যা কিছু হয়েছে, সবই স্ত্রীর চেষ্টায়। একদিন চাকরি থেকে রিটায়ার করে ফাইলের বাইরের পৃথিবীর দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন—অবাক কাণ্ড। সব আমূল বদলে গিয়েছে। ছেলে-ছোকরাদের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। এ কি চুল ছাঁটা। এ কি পোশাক-পরিচ্ছদ। নতুন এক ধরনের চুল ছাঁটা হয়েছে। মাথার সামনের দিকের চুলগুলো উল্টে দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া। কোন্ নাকি সিনেমা-স্টারের নকল। আরে রাম্ রাম্—এসব কী বেলেল্লাগিরি চলছে মশাই! সব ছেলেদের এক সাজ। সাদা সার্ট আর পরনে ট্রাউজার। ধুতি-ফুতি সব কোথায় গেল! রাতারাতি বদলে গেল সব! রেডিও খুলে গান শুনতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ধমক্ দিলেন—বন্ধ কর্ বন্ধ কর ওসব—গানের না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু—এসব তোদের ভালো লাগে?

স্ত্রী বললেন—তুমি সেকেলে লোক, তুমি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

—তা মাথা ঘামাবো না? আমিও তো একজন মানুষ, না, কী? ও গান কেউ পয়সা খরচ করে শোনে?

রাস্তা দিয়ে ছেলেরা-মেয়েরা হেঁটে যায়, সামনের ঘরে বসে শচীনবাবু সমস্ত দেখেন। বেশ গরদের পাঞ্জাবী, কিড্ লেদারের জুতো পরে মশ্ মশ্ করে কেউ হেঁটে গেলেই তার আগা-পাশ্-তলা নিরীক্ষণ করেন! খুব তেজ, খুব গরম!

সেদিন ওমনি একজন গলির ভেতর ঢুকছিল। একেবারে পাড়ার লোক। অথচ চিনতে পারলেন না। কিন্তু আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতেও পারলেন না। ডাকলেন—ওহে ছোকরা—শোন—

ছেলেটি হঠাৎ আচম্‌কা পেছু-ডাক পেয়ে একটু থতমত খেয়ে গেছে।

থম্‌কে দাঁড়িয়ে বললে—আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ, তোমাকে ডাকবো না তো আবার কাকে ডাকবো? বলি, কে তুমি?

ছেলেটি বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—আজ্ঞে, কী বলছেন?

শচীনবাবু রেগে গেলেন। বললেন—বলি তুমি বাঙলা ভাষাও বোঝ না নাকি? কাদের বাড়ির ছেলে তুমি? কোথায় যাচ্ছো?

—আমি যতীশবাবুর বাড়ি যাচ্ছি!

—যতীশবাবু? যতীশ শিক্‌দার না যতীশ ভট্টাচার্য? কার বাড়ি?

—আজ্ঞে যতীশ ভট্টাচার্য! উনত্রিশ নম্বর বাদামতলা লেন—

—যতীশ ভট্টাচার্যি? তা তাই বলো! তিনি তোমার কে হন্?

—আমার শ্বশুরমশায়—

—ও, এই যে সেদিন যে-মেয়ের বিয়ে হলো? তুমিই যতীশ ভট্চার্যি মশাই-এর সেজ-জামাই? ভাল ভাল—যাও—

ছেলেটি চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু শচীনবাবু আবার ডাকলেন। বললেন—আর একটা কথা শোন বাপু, এদিকে এসো, তোমার বয়েস কম, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। এত জুতো মশ্-মশ্ করে হাঁটাটা ভাল নয়—

ছেলেটি তো অবাক। হাঁ করে চেয়ে রইল শচীনবাবুর দিকে।

—হ্যাঁ বাপু, আমি বলছি ভাল নয়, আমারও একদিন তোমার মত কম বয়েস ছিল, তোমার মত ধরাকে সরা জ্ঞান করেছি, তারপর এখন আমার বাষট্টি বছর বয়েস হয়েছে, এই দেখ চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, বুক ধড়ফড় করে, রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় না,—এ একদিন তোমারও হবে, তোমারও চুল পাকবে, দাঁত পড়বে, বুক ধড়-ফড় করবে, অনিদ্রা হবে—চিরকাল কারো যৌবন থাকে না, এই সার কথাটা মনে রেখো বাবা, আর কিছু নয়, এই জন্যেই তোমায় ডাকা—যাও, এখন যেখানে যাচ্ছিলে যাও—

ছেলেটা হতভম্বের মত যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকেই চলে গেল।

ভেতর থেকে স্ত্রী সব শুনছিলেন। বললেন—হ্যাঁ গো, তুমি ওদের জামাইকে ও-সব কথা বলতে গেলে কেন? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

শচীনবাবু বললেন—দেখ না, হেঁটে যাচ্ছো যাও না বাপু, তা অত জুতো মশ্ মশ্ করে যাওয়ার কি দরকার। একটু নম্র-বিনয়ী হয়ে গেলেই হয়। ওই তো বিপিনবাবুর ছেলে প্রশান্ত রয়েছে, কই, তাকে তো কখনও আমি বলতে যাই নি!

প্রশান্তকে দেখে কারো সম্মানে আঘাত লাগবার কথা নয়।

শচীনবাবু বলতেন—এই যে রোজ এ-রাস্তা দিয়ে ছেলেটি হেঁটে অফিসে যায় বাজারে যায়, কই কোনওদিন তো মুখ তুলে চেয়েও দেখে না, জানালার দিকে উঁকি মারে না—

মনোরমা এসেছিল দাদার কাছে, বললে—ওরা কী জাত?

—ব্রাহ্মণ। স্বজাতি—বিপিনবাবুর ছেলে, ওই টিনের বাড়িটাতে ভাড়া থাকেন—

—তাহলে দাদা, টিনের বাড়ি হোক আর যা-ই হোক, আমার বুলির সঙ্গে তুমি একটু সম্বন্ধ করে দাও না—

শচীনবাবু বললেন—কিন্তু নিজের বাড়ি নেই, ওই চাকরিটাই ভরসা,—

—তা হোক, ভাল রাজপুত্তুর ছেলে আমি কোথায় পাচ্ছি, আর বিশ্বাস তো কাউকে করতে পারছি না দাদা। বাইরে থেকে তো সকলেরই কোঁচার পত্তন, দেখছি তো চারদিকে, বাইরের চালচলন দেখে ধরবার উপায় নেই—শেষে শোনা যাবে বাড়ি মর্টগেজ্—

আসলে এই ভাবেই সম্বন্ধটা এসেছিল। সেদিন প্রশান্তকে নিজের চোখে দেখে ছিল। ছোট ছোট চুল ছাঁটা। সাদাসিধে পোশাক। ভারি পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই এসেছিল বিপিনবাবুর কাছে।

আজই আবার শচীনবাবুকে দেখে বিপিনবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

বললেন—আবার কী মনে করে ভট্চায্যি মশাই—

—সেই সম্বন্ধেই কথা বলতে এলাম আর কি! পাত্রী দেখানোর আগে অবশ্য কথাবার্তা বলে কিছু লাভ নেই জানি, তবু আমার বোন পাঠিয়ে দিলে, দেনা-পাওনার কথাগুলো ঠিক করতে—

বিপিনবাবু একটু ম্লান হাসলেন।

বললেন—আপনার সঙ্গে আবার দেনা-পাওনার কথা কী বলবো বলুন তো ভট্চায্যি মশাই, আমিও আপনাকে জানি, আপনিও আমাকে জানেন, আর আমার পিন্টুকেও তো বহুদিন ধরে দেখে আসছেন—

—তবু আপনি কিছু বলুন, আমি শুনে যাই, মনোরমাকে গিয়ে বলবো!

বিপিনবাবু বললেন—দেখুন ভট্চায্যি মশাই, আগে কখনও ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিইনি, ভাই-বোনের বিয়েও দিতে হয়নি, দেনা-পাওনার কথা কী বলতে হয় তা-ও জানি না। তবে আপনি তো জানেন, আমার জীবনে ওই এক ছেলে ছাড়া আর কিছুই আমার নেই, মনে-প্রাণে ওই ছেলেটিকেই শুধু মানুষ করেছি, আর কিছু করিনি—

—জমি-টমি কিছু কিনেছেন?

—আজ্ঞে না, সে-সামর্থ্য হয়নি।

—আপনার চোখের সামনেই তো দু'শো তিন'শো টাকা কাঠা দরে বিক্রী হয়ে গেল, তাও সামান্য কিছু কিনে রাখতে পারেন নি?

—না—তখন পিন্টু যে আমার মানুষের মত মানুষ হবে, এ-কথা স্বপ্নেও ভাবিনি, আর সেই বন-জঙ্গলভরা বাদামতলা যে আবার শহর হয়ে উঠবে তাও কল্পনা করতে পারিনি—

শচীনবাবু হঠাৎ বললেন—বাঁশধানির কাছে এখনও দেড়-হাজার টাকা করে কাঠা বিক্রি হচ্ছে, তাই-ই কাঠা-দু'এক কিনবেন?

কথাটা শুনে গলাটা ভারি হয়ে উঠলো বিপিনবাবুর। বললেন—পিন্টু মাইনে পায় কত জানেন তো?

—সে-কথা বলছি না, না-হয় আপনার ছেলেকে যৌতুক হিসেবেই দেব সেটা—

বিপিনবাবুর চোখ মুখ যেন কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেল। তাঁর যেন দম আটকে আসবে। তিনি হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠলেন।

শচীনবাবু বললেন—কী হলো বিপিন-বাবু আপনার?

বিপিনবাবু কোনও রকমে বললেন—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে ভট্‌চায্যি মশাই—আমার বড়...

ভেতর থেকে বিন্দুবাসিনী সবই শুনছিলেন। আর থাকতে পারলেন না, মাথার ঘোমটাটা বড় করে টেনে দিয়ে ভেতরে ঢুকবেন কিনা ভাবছিলেন। শচীনবাবু অবস্থা বুঝে বললেন— আমি তাহলে এখন না-হয় আসি বিপিনবাবু,—পরে আসবো......

বিপিনবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—না না ভট্‌চায্যি মশাই, আপনি বসুন, আপনি যাবেন না, বসুন,—

—আমি কালকে না হয় আবার আসবো...

—না ভট্‌চায্যি মশাই, পিন্টুর বাড়ি হবে ...পিন্টুর বউ হবে...পিন্টুর সংসার হবে... আপনি যাবেন না ভট্‌চায্যি মশাই, আপনি বসুন,......

উনিশ শো চল্লিশ-বেয়াল্লিশের কলকাতার সে চেহারাটা দেখা ছিল শচীনবাবুর। বিপিনবাবুরও দেখা ছিল। দেখা ছিল মানে শোনা ছিল। তখনকার অফিসের নীরদবাবুর কাছে শোনা। যুদ্ধও হচ্ছে একদিকে, আর একদিকে চুপি-চুপি আর একটা বিপ্লব ঘটে চলেছে দেশে। একেবারে দেশের মর্মস্থলে। সেই বোধহয় প্রথম বাড়ির মেয়েরা এসে রাস্তায় দাঁড়ালো। দাঁড়ালো পুরুষের পাশাপাশি।

নীরদবাবু নাক সিঁটকোতেন—ছি—ছি—ছি—ছি—

নীরদবাবুর ছি-ছিৎকারে বিপিনবাবুও অবাক হয়ে যেতেন।

—না মশাই ছেলে-মেয়েদের আর মানুষ করা যাবে না, এই আপনাকে বলে রাখছি বিপিনবাবু, ছেলেকে যদি মানুষ করতে চান তো কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে যান—

বিপিনবাবু বলতেন—বাইরে কোথায় যাবো বলুন? সব জায়গাতেই তো এই—

মেয়েরা প্রথম দিকে গার্ল-গাইড্ করেছে। ওয়াকাই হয়ে মিলিটারিতে ঢুকেছে। বাড়ির বাইরে এসেছে সিনেমা-বায়োস্কোপ্ থিয়েটার দেখতে। তারপর যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, সবাই ফিরে এল, তখন মাইনে বন্ধ। চালের দাম হু হু করে চড়ে গেছে বাজারে। কাপড়ের দামও চড়ে গেছে। যা যা জিনিস সংসারে নিত্য দরকার সবই আগুন। আর ছোঁয়া যায় না হাত দিয়ে। সিভিক-গার্ড এ-আর-পিও তখন ভেঙে গেছে। বাড়িতে-বাড়িতে চুরি-ডাকাতি বেড়ে গেল।

—ছি ছি মশাই, কাণ্ড শুনেছেন?

নীরদবাবুর গলার আওয়াজ যেন ঘেন্নায়-লজ্জায় নিচু হয়ে এল।

কাজ করতে-করতে বিপিনবাবু বললেন —কী হলো?

—চুপি-চুপি বলি, এদিকে সরে আসুন—

বিপিনবাবু কানটা নীরদবাবুর মুখের কাছে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

—মেয়েদের নিয়ে কী কাণ্ড হয়েছে জানেন কলকাতায়? ম্যাসাজ-ক্লিনিক্ হয়েছে—

—ম্যাসাজ-ক্লিনিক?

কথাটার মানে বুঝতে পারেন নি বিপিন-বাবু প্রথমে। কিন্তু নীরদবাবুই সব বুঝিয়ে দিলেন। সব পাড়াতেই নাকি হয়েছে। মোটা-মোটা টাকা নিয়ে বড়-বড় সব লোকেরা ম্যাসাজ-ক্লিনিক খুলেছে। আসলে ও-সব কিছু নয়, ভেতরে-ভেতরে রাস-লীলা চলছে—

—তা পুলিসে কিছু বলে না?

নীরদবাবু বললে—পুলিসের মধ্যেই যে অনেকের ভাগ আছে ওতে, বলতে যাবে কেন?

ঘটনার কথাটা শুনে সেদিন আর দাঁড়ান নি কোথাও বিপিনবাবু। সোজা একেবারে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন অফিস ফেরত। গিয়েই জিজ্ঞেস করেছিলেন—পিন্টু কোথায়?

বিন্দুবাসিনী বললে—পিন্টুকে দোকানে পাঠিয়েছি কেরাসিন তেল আনতে—

বিপিনবাবু আর দাঁড়ান নি। কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। সবে গোঁফ-দাড়ির রেখা বেরোচ্ছে। এই সময়টাই বিপজ্জনক। আলনায় পিন্টুর জামা ঝুলছিল। জামার পকেটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। পেন্সিল ছিল, নোট-বই ছিল। কিন্তু যা খুঁজছিলেন তা পেলেন না। সিগারেট পেলেন না, এমন কি দেশলাইও পেলেন না। তারপর বই-এর মধ্যেও নভেল-নাটক পেলেন না।

বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞেস করলে—কী খুঁজছো?

বিপিনবাবু বললেন—শুনেছো? ওদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে। এই অফিসে নীরদ-বাবুর মুখে আজ শুনছিলাম, চারদিকে নাকি পাড়ায়-পাড়ায় খুব ম্যাসাজ-ক্লিনিক হয়েছে,—

বিন্দুবাসিনী ইংরিজী কথা বুঝতে পারলে না।—সেটা কী?

—সে তুমি বুঝবে না! বলে বিপিনবাবু আর বোঝাবার চেষ্টাও করলেন না। তারপর ছেলে দোকান থেকে এলেই তাকে ধরলেন —কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হয় কেন তোমার?

পিন্টু অতর্কিত আক্রমণে চমকে উঠেছে।

—আজ্ঞে, আমি তো কোথাও যাই না!

—কোথাও যাও না তো? দেরী হয় কেন আসতে?

—না, সেই একদিন গিয়েছিলুম, তারপর থেকে তো আর কোথাও যাই না—

কথাটা আদায় করে নিয়ে বিপিনবাবু যেন একটু নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন।

কিন্তু বিপদ যে কখন কোথা থেকে আসে তা কি বলা যায়? ১৫৯৯ সালে কুইন এলিজাবেথের আমলে একদিন যার সূত্রপাত, সেই ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে সুরু করে অনেক উত্থান-পতন-অভ্যুদয়ের মধ্যে যেখানে এসে ইণ্ডিয়া থমকে দাঁড়াল সে বড় ভয়াবহ জায়গা। সংসার থেকে লক্ষ্মী এসে প্রথমে দাঁড়াল বাড়ির বাইরে, আর তারপর একেবারে অফিস-কোয়ার্টারের ভেতরে। সেখানে শাজাহান, বর্গে-বর্গী, নূরজাহান, সিরাজউদ্দৌলা, আর চন্দ্রগুপ্তের মহড়া চলছে। সেই অফিসের ভেতরে কমন্-রুমের আড়ালে ক্যান্টিনে-ক্যান্টিনে চা-সিঙাড়া-সরবৎ-সিগারেটের ফোয়ারা চলতে লাগলো। বিপিনবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছেলেও তখন বি-এ পাশ করেছে। ফার্গুসন সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে অফিসে ঢুকিয়ে দিলেন। অফিসে নীরদবাবু ছিলেন। তিনি বললেন—এ রকম শরীরে আপনি আর চাকরি করবেন না বিপিনবাবু, ছেলে বড় হয়েছে, আপনার কিসের ভাবনা—

বিপিনবাবু নীরদবাবুর হাতদুটো ধরে বলেছিলেন—আপনি একটু দেখবেন নীরদবাবু, বড় ভাল ছেলে, আমি ওকে খারাপ হতে দিইনি—

—না মশাই, টার্নবুল কোম্পানীতে যতদিন আমি আছি ততদিন মেয়েছেলে নিয়ে থিয়েটার ফিয়েটার করতে দেব না—

বিপিনবাবুও সব শুনে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আর তারপর শচীনবাবুর কথাটা শুনে **আরো** আশ্বস্ত হলেন। দু'কাঠা জমি। **দেড় হাজার** করে কাঠা। তিন হাজার **টাকা?** এক সঙ্গে অত টাকা কখনও চোখে দেখেন নি তিনি। চোখের সামনে **যেন ছবিটা** ভেসে উঠলো। পিন্টুর বাড়ি **হয়েছে**......পিন্টুর বউ হয়েছে......পিন্টুর **সংসার হয়েছে**......

প্রশান্ত আবার অঞ্জলিকে ডেকে বললে—না না, কেউ হয় তো কোনও ক্লাব থেকে **আপনার** সঙ্গে কথা বলতে আসছে, আমি **আপনাদের** কাজের কথার মধ্যে না-ই বা **থাকলুম**, আমি বরং উঠি—

অঞ্জলি ব্যানার্জি বললে—না, বললুম তো **আপনার** সঙ্গে আমার কথা আছে, আমি **দেখে** আসি কে—

সদর-দরজার দিকে চলে গিয়েছিল **অঞ্জলি**। প্রশান্ত ধুতির কোঁচাটা গুছিয়ে **ভাল** করে বসলো। কত রকম লোক আসে **এদের** সঙ্গে দেখা করতে! লোকের কামাই **নেই!**

—একে চিনতে পারেন?

পেছন ফিরে চাইতেই প্রশান্ত একেবারে লাফিয়ে উঠেছে—আরে জয়ন্ত!

জয়ন্তও অবাক হয়ে গেছে।—

—**তুই?** এতদিন কোথায় ছিলি? এখানে **কী করতে?**

জয়ন্তর পোশাক-পরিচ্ছদের তুলনায় **নিজের জামা-কাপড়ের** দারিদ্র্যটা যেন হঠাৎ **কট্-কট্** করে চোখে বাজলো। প্রশান্ত উঠে **দাঁড়িয়েছিল**। কিন্তু জয়ন্ত জোর করে **বসিয়ে** দিলে। দিয়ে নিজে বিছানাটার **ওপর** উঠে বসলো।

—তারপর **কী করছিস?** একেবারে ম্যান্ **অ্যাবাউট্** টাউন্ হয়ে গেছিস্ দেখছি, **একেবারে** খাবারের কৌটো-টৌটো নিয়ে। **ব্যাপার কী?**

তারপর অঞ্জলির দিকে ফিরে বললে—**তোমার এখানে প্রশান্ত** কী করতে এসেছে? **কোন্** ক্লাব?

অঞ্জলি বললে—কেন, ক্লাব না হলে **আসতে** নেই নাকি আমার কাছে?

—তাহলে তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে **বলো?**

—রূপে মুগ্ধ হয়ে তো তুমিও এসেছো, **আসো** নি!

জয়ন্ত হেসে ফেললে। বললে—শুধু **তোমার রূপে** মুগ্ধ হয়ে নয়, তোমার **ট্যালেন্টেও** মুগ্ধ হয়েছিলুম বলো!

হঠাৎ প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা **জয়ন্ত**, সেই টালিগঞ্জে ফিলম্-স্টুডিওতে **একদিন** তোমার সঙ্গে গিয়েছিলুম, মনে **আছে?** সেই 'সোনার হরিণ' বলে একটা **ছবি** তোলা হচ্ছিল—

—**হ্যাঁ খুব** মনে আছে।

—সেই মীনাক্ষী বলে একজন মেয়ে হিরোইন্ সেজেছিল, তার বাবা রতনবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল আমাদের বাড়ির কাছে, একটা নতুন বাড়ি আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তারপরে আর একদিনও দেখা হলো না। আর সে বাড়িও তেমনি সেইরকম পড়ে আছে! তা মীনাক্ষী এখন কোথায়?

জয়ন্ত অবাক হয়ে গেল।

—মীনাক্ষী? এই তো মীনাক্ষী! রতনবাবুর মেয়ে!

প্রশান্ত এর জন্যে বোধহয় প্রস্তুত ছিল না। অঞ্জলি ব্যানার্জির মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবারে দেখে নিলে। বললে—আপনি?

—কেন তুই চিনতে পারিসনি? তুই অতক্ষণ ধরে স্যুটিং দেখলি আর চিনতেই পারিস নি?

—কিন্তু আপনার নাম যে অঞ্জলি ব্যানার্জি, রমেশবাবু যে বললেন আমাকে কাল?

জয়ন্ত বললে—কে রমেশবাবু?

অঞ্জলি ব্যানার্জি বললে—না প্রশান্তবাবু, আমি মীনাক্ষী নই, আমি অঞ্জলি ব্যানার্জি, মীনাক্ষী মরে গেছে—

জয়ন্ত বললে—তুমি আর ন্যাকামী কোর না, থামো তো—

প্রশান্ত তখনও যেন ভূত দেখছে।

—কিন্তু সেই 'সোনার হরিণ' ছবিটা, তাতে যে আপনি অত ভাল পার্ট করলেন, সেই ডিরেক্টার সুব্রত রায় অত প্রশংসা করলে, তাতে আপনার নাম হয় নি?

জয়ন্ত এবার আর থাকতে পারলে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললে। বললে—দূর, তুই কিছুই খবর রাখিস না, সে ছবি তো হয়ই নি—

—হয়নি মানে?

—হয়নি মানে, সে-ছবি বাজারে বেরোয়ই নি।

—বাজারে বেরোয় নি মানে?

জয়ন্ত বললে—মানে আটকে গেল, ফাইন্যান্সিয়ার টাকা দিলে না, ছবিও আটকে গেল, ওই টাকার ওপরে নির্ভর করেই তো অঞ্জলি বাড়ি করছিল, সেই পনেরো হাজার টাকাটা পাওয়া গেল না। পনেরোটা পয়সাই এল না কারো পকেটে, একটা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলুম আর কি!

হঠাৎ অঞ্জলি যেন ক্ষেপে উঠলো। বললে—তুমি থামো!

প্রশান্ত অঞ্জলির চেহারা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ যেন অঞ্জলির চেহারাটা রাতারাতি বদলে গিয়েছে।

—কেন, থামবো কেন?

—বাইরের লোকের সামনে আর মিথ্যে কথাটা বোল না। নিজের যদি একটু আত্মসম্মান জ্ঞান থাকতো তো তোমার মুখে এমন করে মিথ্যে কথা বলতে বাধতো!

জয়ন্ত বললে—এর উত্তর তোমাকে আমি হাজার-বার দিয়েছি, আজ আর নতুন করে উত্তর দিতে চাই না!

অঞ্জলি বললে—নতুন করে কৈফিয়ৎ তোমার কাছে আমি চাইছিও না, আমি শুধু তোমাকে চুপ করতে বলছি—

—কেন? চুপ করবো কেন? আমি কি তোমার টাকা চুরি করেছি যে ভয়ে চুপ করবো?

—চুরি করার কথা আমি তোমাকে বলেছি?

জয়ন্ত আরো গলা চড়িয়ে দিলে। বললে—প্রশান্তর সামনে ও-কথা বলার মানে কী-ই বা দাঁড়ায়! ও তো জানে না আমি তোমার জন্যে কী করেছি! আমি নাকি টাকা চুরি করেছি, কিন্তু তোমার একটা পয়সা আমি কখনও নিয়েছি তা তুমি তোমার বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো?

হঠাৎ যেন তুমুল ঝগড়া বেধে গেল সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে! একদিকে জয়ন্ত আর একদিকে অঞ্জলি ব্যানার্জি। এ-অঞ্জলি ব্যানার্জি যেন আলাদা লোক। বললে—বুকে হাত দিয়ে বলবার দরকার নেই, কিন্তু কেন তুমি ভদ্রলোকের সামনে অমন মিথ্যে কথা বলতে গেলে?

—প্রশান্তর কথা বলছো? ও বাইরের লোক নয়, ও সব জানে, আগে আমি সব বলেছি ওকে—

প্রশান্ত বললে—না না আমি এর মধ্যে থাকতে চাই না ভাই, তুমি বোস, আমি চলি—

অঞ্জলি ব্যানার্জি বাধা দিলে। বললে—না, কেন যাবেন আপনি? আপনি বসুন—

জয়ন্তও বললে—হ্যাঁ, তুই বোস্ না, তোর তাড়া কীসের—

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলে—তোমার সেই 'সোনার হরিণ' ছবিটা হলো না কেন, তাই বল না? অত ভাল ছবি শেষ হলো না কেন?

জয়ন্ত অঞ্জলির মুখের দিকে চাইলে। অঞ্জলিও জয়ন্তর মুখের দিকে চাইলে। কেউই কিছু বলতে পারলে না।

প্রশান্ত বললে—তারপর থেকে কতদিন কত লোককে জিজ্ঞেস করেছি ছবিটার কথা, কত লোককে বলেছি—'সোনার হরিণ' ছবিটা দেখবেন, কিন্তু কেউ নামই শোনে নি ছবিটার, কেউ মীনাক্ষীর নামই জানে না—

অঞ্জলি বললে—লোকের মুখের কথা শুনে আপনি কী ভাবতেন?

প্রশান্ত বললে—আমার বিশ্বাসই হতো না, আমি ভাবতাম নিশ্চয়ই আপনার গাড়ি-বাড়ি লক্ষ-লক্ষ টাকা সমস্ত হয়েছে, শুনেছি সিনেমায় একবার নাম হলে নাকি অনেক টাকা হয়, তাই হয়েছে আপনার।

এক-একবার ভাবতাম সিনেমাটা যদি কখনও কোথাও হয় তো দেখে নেব—আপনার সেদিনকার পার্ট আমার খুব ভাল লেগেছিল—! তারপর একদিন একটা সিনেমা হাউসের সামনে গিয়ে অনেক ছবি টাঙানো দেখেছিলাম, কিন্তু আপনার ছবি তার মধ্যে ছিল না—তখন তো জানতুম না ছবি হয় নি—

—কেন তুই জানতিস্ না যে মীনাক্ষীর নাম হয়নি?

—না, আমি যে সিনেমাই দেখি না, বাবা দেখতে দেন না,—

—তাহলে অঞ্জলির সঙ্গে দেখা হলো তোর কী করে?

—এই তো কাল হাতীবাগান ক্লাবে দেবলাদেবীর রিহার্সাল দেখতে গিয়ে মনে হলো, ঠিক যেন মীনাক্ষীর মতন চেহারাটা, অথচ নাম শুনলুম অঞ্জলি ব্যানার্জি—কাল সারারাত কেবল ভেবেছি ব্যাপারটা কী—

জয়ন্ত একবার সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়লো, বললে—আসলে দোষ কারুরই নয়, অঞ্জলিরও নয় আমারও নয়, দোষটা প্রোডিউসারের। তার ভাঁড়ে মা-ভবানী, এদিকে ছবি করতে নেমেছে, তিন-চার রীল তোলার পরেই টাকা ফুরিয়ে গেল—তখন আর ডিস্ট্রিবিউটর টাকা দেয় না—

অঞ্জলি বাধা দিলে—আবার ওই বলে ধাপ্পা দিচ্ছো?

—ধাপ্পা মানে? আমি ধাপ্পা দিতে যাবো কেন?

—নিজের দোষটা স্বীকার করতে বুঝি লজ্জা হচ্ছে?

—এত কৈফিয়ত শুনতে চাই না, টাকা দেবে কিনা বলে দাও—

জয়ন্ত বললে—দেখ, এতদিন পরে ও-নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। জীবনে তোমার জন্যে আমি কী-কী করেছি তা আমিই জানি—কিছু কিছু তুমিও জানো—

অঞ্জলি বাধা দিয়ে বললে—বলো, তুমি তোমার বন্ধুর সামনে খুলেই বলো আমার জন্যে কী করেছ, বলো!

—কেন, তুমি জানো না কিছু? ছ'বছর তোমরা বাড়ির ভাড়া দিয়েছ? তোমার বাবা আর মা যখন যুদ্ধের সময় তোমাকে নিয়ে কলকাতায় এসে আমাদের বাড়ি ভাড়া করলেন, তখন টাকার জন্যে তুমি ম্যাসাজ-ক্লিনিকে চাকরি করতে যাও নি? ম্যাসাজ-ক্লিনিকে কাজ করে তুমি যা মাইনে পেতে তাতে তোমাদের বাড়িভাড়া দেওয়া খাওয়া পরা সব কিছু মিটতো? তখন আমি যদি সেই বিপদের সময় তোমাদের না-বাঁচাতুম তো তোমরা কলকাতায় টিঁকতে পারতে? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন, বলো?

অঞ্জলি যেন কিছু বলবার জন্যে দম নিচ্ছিল—

জয়ন্ত এবার প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললে—জানিস, প্রত্যেক মাসে আমি রসিদ-বই নিয়ে ভাড়া আদায় করতে গিয়েছি, আর নিজের পকেট থেকে ষাট টাকা দিয়ে রতন-বাবুকে রসিদ দিয়ে এসেছি! ছ'বছর এমনি চালিয়েছি, বাবা একদিনের জন্যেও জানতে পারেন নি, নইলে আমি কি মিছিমিছি বি-এতে গাড্ডু মারলুম? কলেজের মাইনেই যে দিই নি কখনও, কখনও এর জন্যে কলেজেই গেলাম না,—সে কী জন্যে শুনি? কার জন্যে?

অঞ্জলি তখনও কিছু বলছে না।

জয়ন্ত বলে যেতে লাগলো—তখন কলকাতায় অরাজক অবস্থা, তুই তো জানিস, যুদ্ধ থেকে সবাই বেকার হয়ে ফিরে এসেছে, সিভিক-গার্ড আর এ-আর-পিদের চাকরি গেছে। সেই সময়ে রতনবাবু আর কিছু না-পেয়ে ম্যাসাজ-ক্লিনিকের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন অঞ্জলিকে—কিন্তু সে-চল্লিশ টাকায় তখন কী হবে? তখন আমি যদি বাড়িভাড়াটা না বাঁচিয়ে দিতুম তো সেই সময়ে যে তোমরা উপোস করে মরতে, মরতে না? কী, কথা বলছো না যে বড়?

অঞ্জলি তখনও কথা বললে না।

—তখন আমি এই অঞ্জলিকে সিনেমায় নামিয়ে দিলুম। আমি নিজে প্রোডিউসার-দের বাড়িতে গিয়ে-গিয়ে ধন্না দিয়েছি—তখন সকলকে এর নাম বলেছি মীনাক্ষী! মীনাক্ষী সেন ছদ্মনাম দিয়ে হিরোইন করবার চেষ্টা করেছি, কত ডাইরেক্টরকে ট্যাক্সি চড়িয়েছি, হোটেলে মদ খাইয়েছি, কতদিন মীনাক্ষীকেও সেখানে যেতে হয়েছে, শেষকালে একটা সাইড্-রোল্ দিয়েছে, কি তাও দেয়নি—

প্রশান্ত এতক্ষণে কথা বললে—কেন, দেয়নি কেন?

সে-কথায় বাধা দিয়ে অঞ্জলি বললে—শেষকালে যখন 'সোনার হরিণে'র হিরোইনের চান্স্ পেলাম, তখন ছবি আটকে গেল কেন, সেটা বলো?

—প্রোডিউসারের টাকা ছিল না বলে!

অঞ্জলি বললে—না, মিথ্যে কথা, আমি তোমার হাত-ছাড়া হয়ে যাবো বলে।

—তার মানে?

—তার মানে, তোমার ভয় হলো আমি হয়ত ডাইরেক্টর সুব্রত রায়কে বিয়ে করে ফেলবো! তুমি আমাকে আর যেতেই দিলে না সুটিং-এ—

—সে ভয় কি মিছিমিছি? তুমিই বলো? বিয়ে হয়ে গেলে তোমার বাবা-মা'র অবস্থাটা কী হতো বলো তো? রতনবাবু কী খেতেন? তোমার রোজগারেই তো তাঁর পেট চলতো—

—যিনি স্বর্গে গেছেন তাঁর নামে মিথ্যে দোষ দিও না। তোমার কথাই আজ বলো! সেই পথ বন্ধ করবার জন্যেই তো তুমি টাকা দেওয়া বন্ধ করলে, বাড়ি-ভাড়া আদায় করবার ভয় দেখালে, একটা বাড়ি করে দিচ্ছিলে, সে টাকা দেওয়াও বন্ধ করলে! তাহলে দোষটা কার? আমার না তোমার?

হঠাৎ একজন বুড়ি মতন মহিলা ঘরে ঢুকলো। বললে—হ্যাঁ বাছা, খাবে না আজকে? বেলা যে গড়িয়ে বিকেল হতে চললো—

অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে বললে—তুমি খেয়ে নাও গে মাইমা, আমার এখন খিদে নেই—

তারপর জয়ন্তর দিকে ফিরে বললে—কী এবার জবাব দাও—উত্তর দাও—

জয়ন্ত বললে—তোমার জন্যে আমি যা করেছি সেটা তাহলে কিছুই না বলতে চাও? আমি তোমার কেবল ক্ষতিই করেছি? ছ'বছর বাড়ি ভাড়া আদায় করিনি, সেটাও কিছু নয়?

—কিন্তু কথাটা বলবো না-ই ভেবেছিলুম, কিন্তু আজ আর না বলে পারছি না—সেই ছ'বছরের বাড়ি-ভাড়ার টাকার বদলে তুমি কি কিছুই আদায় করোনি আমার কাছ থেকে? কিছুই উসুল করোনি?

জয়ন্তকে যে একদিন এই প্রশ্নের মুখো-মুখি হতে হবে তা বোধহয় সে কল্পনাও করেনি কখনও। প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গিয়ে তারপর সামলে নিলে নিজেকে। বললে—তার মানে?

—তার মানে জানতে চেয়ে আর লজ্জা বাড়িও না!

—তার মানে বলতে চাও যে, প্রথম থেকেই আমি খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে মিশেছি তোমার সঙ্গে?

অঞ্জলি বললে—দেখ, এখনও আমার খাওয়া হয়নি আজ, শেষকালে রাগের ঝোঁকে কী বলে ফেলবো তখন আমিও সহ্য করতে পারবো না, তুমিও সহ্য করতে পারবে না—

জয়ন্ত এবার অন্য পথ ধরলে। বললে—ঠিক আছে, চল্ প্রশান্ত চলে যাই, কিন্তু তার আগে একটা কাজের কথা বলে নিই—

—কী? আবার টাকা?

—তুমি ঠিক ধরেছ, আবার আমার কয়েকটা টাকার দরকার হয়ে পড়লো, তিরিশটা টাকা না হলেই নয়!

অঞ্জলি বললে—টাকা নেই—

—নেই মানে? সেদিন যে পঁচাত্তর টাকা পেলে বেলেঘাটা ক্লাবের কাছ থেকে, সেটা কোথায় গেল?

—তার কৈফিয়ৎও কি তোমায় দিতে হবে?

—কেন দেবে না? আজ না হয় তোমার নাম হয়েছে থিয়েটারের মহলে, কিন্তু কে তোমাকে এ-লাইনে ঢুকিয়েছে তাও কি ভুলে গেলে?

অঞ্জলি এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললে—তার খেসারৎ তো দিয়েই আসছি এতকাল, এতেও তোমার আশ মেটেনি? জানো না পাশের ঘরে মা আজ দেড় বছর অসুখে ভুগছে, তার জন্যে ওষুধ কিনতে হয়, বাড়িতে তিনটে প্রাণী খাই তারও খরচা আছে, এ-সব কি আকাশ ফুঁড়ে আসছে?

—এত কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না, টাকা দেবে কি না বলে দাও—

অঞ্জলি গলা চড়িয়ে বললে—দেব না—কী করবে তুমি?

—দেবে না তো?

—না দেব না, ভয় দেখাচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ ভয় দেখাচ্ছি, টাকা দেবে না ঠিক?

—না না কিছুতেই দেব না, তুমি আমাকে পেয়েছ কী বলো তো? আমি সারাদিন সারারাত মুখে রক্ত উঠিয়ে টাকা উপায় করছি, তোমার মদ খাওয়ার খরচা জোগাবো বলে?

—অঞ্জলি!!

যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল জয়ন্ত। প্রশান্ত পাশে দাঁড়িয়ে থর-থর করে কাঁপছিল। শেষে কি মারামারি হবে? হাতাহাতি হবে দুজনে!

—চল্ প্রশান্ত চল্, আমি দেখাচ্ছি টাকা কী করে তোমার কাছ থেকে আদায় করতে হয়। চল্—

অঞ্জলি খপ্ করে প্রশান্তর একখানা হাত ধরে ফেলেছে।

—ও'কে টানছো কেন? তোমার যেখানে যে-চুলোয় খুশি চলে যাও, উনি থাকবেন এখানে—

—না থাকবে না প্রশান্ত—বলে প্রশান্তর আর একখানা হাত ধরে জোরে টান দিলে। টান লেগে প্রশান্ত পড়েই যাচ্ছিল। কিন্তু তখনি সামলে নিয়েছে। হাত থেকে খাবারের

কৌটোটা সিমেন্টের মেঝের ওপর পড়ে গিয়েছিল, সেটা তাড়াতাড়ি তুলে নিলে আবার। ততক্ষণে অঞ্জলির হাতটা ছেড়ে গেছে। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি প্রশান্তকে ধরে টানতে টানতে একেবারে বিডন স্ট্রীটের ওপর মানুষের ভিড়ের মধ্যে নিয়ে তুলেছে।

বাইরের দোকানের ঘড়িতে তখন দু'টো বাজে।

জয়ন্ত আগে আগে চলছিল। তার মুখখানা তখনও লাল হয়ে রয়েছে। প্রশান্তও কী বলবে বুঝতে পারলে না। একটুখানি সময়ের মধ্যে যেন অনেক কিছু দেখা হয়ে গিয়েছিল। শুধু কলকাতা শহরের নয়, কলকাতা শহরের বিংশশতাব্দীর মাঝা-মাঝি সময়ের নাড়িতে গিয়ে যেন হাত ঠেকে গেছে। তার ধুকধুকুনিটাও যেন অনুভব করতে পারছে সে।

জয়ন্তই প্রথম কথা বললে।

—দেখলি তো মেয়েটার কান্ডটা! অথচ ছ'বছর ওদের কাছে বাড়ি ভাড়া নিইনি, জানিস? আমি নিজে চেষ্টা করে ওকে ফিলম্-লাইনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলুম, কত পুঁটি-খেঁদি ও-লাইনে চটক দেখিয়ে লাখ-লাখ টাকা উপায় করছে, আর ও-ই টি'কতে পারলে না। আর এই যে আজ থিয়েটারের লাইনে ঢুকিয়ে দিয়েছি, এও তো এই শর্মা!

তারপর নিজের মনের খেদ নিজেই কথা বলে মিটিয়ে নিলে।

বললে—যাক্ গে, আমাকে এখনো চেনেনি, আমি যদি ওর গরম না ভাঙি তো কী বলেছি—

তারপর হঠাৎ প্রশান্তর দিকে ফিরে বললে—তুই এখন কোথায় যাবি?

প্রশান্ত বললে—আজকে অফিসে যাওয়া হয়নি, এখন যাবো ভাবছি—

—কোন্ অফিস তোর?

—টার্বঝুল এন্ড জনসন কোম্পানীর ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে—

—কত মাইনে পাস?

প্রশান্ত বললে—এক শো সাতান্ন টাকা হাতে পাই, সব মিলিয়ে—

—বিয়ে করেছিস নাকি?

প্রশান্ত হাসলো। বললে—না ভাই, এখনও হয়নি বিয়ে, বাবা পাড়ার এক ভদ্রলোকের ভাগ্নীর সঙ্গে সম্বন্ধ করছেন—, তুই কী করছিস?

—আমি?

জয়ন্ত আবার সিগারেট ধরালো। এইটুকু সময়ের মধ্যেই দু'প্যাকেট সিগারেট শেষ করে ফেললে জয়ন্ত।

বললে—আমি ও-সব চাকরি-টাকরির পরোয়া করি না ভাই, একটা তালে আছি, একটা ছবির ডিরেকশন্ দেব। সব রেডি, হিরো-হিরোইন-মিউজিক-গল্প সিনারিও সব রেডি, শুধু টাকার জন্যে আটকে আছে—

—হিরোইন্ কে হবে?

জয়ন্ত বললে—ওই অঞ্জলি, নাম হবে মীনাক্ষী সেন—ওই নামটাই সিনেমায় চালু করতে চাই—

প্রশান্ত বললে—গল্পটা কার লেখা?

—গল্প আমার নিজের, মিছিমিছি স্টোরি-রাইটারকে পয়সা দিয়ে কী হবে, আমি একটা ইংরিজী ছবির গল্পটা একটু অদল-বদল করে খাড়া করে নিয়েছি—তা হ্যাঁরে, তুই কিছু টাকা দিতে পারিস? বেশি না, হাজার পঁচিশেক হলেই চলবে—

চমকে উঠলো প্রশান্ত। পঁচিশ হাজার টাকা চোখেই দেখেনি সে।

—প্রথম দু'তিন রীল ছবি তোলার খরচটা হলেই তারপর ডিস্ট্রিবিউটাররা হুড়-হুড় করে টাকা দিয়ে যাবে, দু'লাখ তিন লাখ, যা চাই—মাস চারেকের মধ্যেই তোকে সুদ সুদ্ধু সব টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব, তোর কোনও ভয় নেই। তা পারবি দিতে?

প্রশান্ত হাসলো। বললে—দূর, অত টাকা আমি জীবনে চোখেই দেখিনি—

—তোদের অফিসে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নেই? সেখান থেকে লোন নিতে পারিস না? আর ক্যাশ অফিসে তো কাজ করিস, মাসখানেকের জন্যেও যদি কোনওরকমে দিতে পারতিস তো অঞ্জলির কেরিয়ারটা ঘুরিয়ে দিতুম আর কি?

তারপর একটু থেমে বললে—বেচারীর জন্যে আমার দুঃখ হয়, জানিস, বেচারীর মধ্যে অনেক পার্টস ছিল, ও যদি একবার চান্স পায় তো সকলকে ছাড়িয়ে যাবে—এই তোকে বলে রাখছি—

প্রশান্ত বললে—তা আমি জানি—

—আর জানিস্, কত খেঁদি-টেঁপি-পুঁটি বাজারে করে খাচ্ছে, এক লাখ দেড় লাখ করে রেট্ করে দিয়েছে, অথচ তার তুলনায় অঞ্জলির ফিগারখানা দেখেছিস্, ও-রকম একখানা ফিগার বাজারে খুঁজলে পাবে কেউ? ও-রকম এ্যানাটমি কেউ কল্পনা করতে পারে? আর ওই চোখ? তুই বল্?

প্রশান্ত বললে—তা সত্যি!

জয়ন্ত চলতে-চলতে হঠাৎ বললে—আর ওই যে শুনলি আমাকে ও অতগুলো কথা শোনালে, আর আমি ওর জন্যে কী করেছি না-করেছি তুই তো জানিস্, এর জন্যে আমাকে বাড়ি থেকে পর্যন্ত চলে আসতে হয়েছে—

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, আমার বাবা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিয়েছে ভাই। অবশ্য বাড়িতে ঢুকতে দিলে আর না-দিলে তাতে আমার কিছু আসে যায় না—আমি এখন পরোয়াই করি না কাউকে—, একবার ছবি হলে তখন আর কাউকেই পরোয়া করবো না—

জয়ন্তর দিকে ভাল করে আর একবার চেয়ে দেখলে প্রশান্ত। একটু বয়েস বেড়েছে এই যা, কিন্তু শরীরের কোথাও চাকচিক্য চলে যায়নি। নির্বিকার মনে সিগারেট টেনে চলেছে। ফরসা ধপ্‌ধপে জামা-কাপড়।

হঠাৎ সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি যেতেই জয়ন্ত সেটাকে ডেকে চড়ে বসলো। বললে—তুই কোন দিকে যাবি?

—অফিসে, না গেলে মুশকিলে পড়বো।

—আচ্ছা আমি যাবো উল্টো দিকে। বলে ধোঁয়া ছাড়লে। তারপর প্রশান্তর চোখের সামনে ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিয়ে দূরে ট্রাফিকের ভিড়ে মিলিয়ে গেল। প্রশান্ত আর দেখতে পেলে না।

জীবনের অনেক দিক আছে। সব দিকে সকলের নজর যায় না। শুধু অফিসটা আর সংসারটি নিয়ে সন্তুষ্ট হলে কারো গায়ে আঁচড় লাগে না। কিন্তু যেখানে টাকা আছে, বিদ্যা আছে, খ্যাতি আছে, নারী আছে সেখানেই যত বিরোধ। জয়ন্ত একদিন আর সকলের মতই লেখাপড়া শিখছিল, আর সকলের মতই মানুষ হচ্ছিল। কিন্তু বিরোধ বাধলো রতনবাবুরা কলকাতায় আসবার পর থেকেই। ভাড়া আদায় করতে এসে ভাড়ার টাকা নিয়ে চলে যাওয়াই নিয়ম। কিন্তু মুস্কিলে ফেললেন রতনবাবু। রতনবাবুর তখন দুরবস্থার শেষ নেই। একদিন বললেন—ঘরের ভেতরে এসো না বাবা, তোমার অত লজ্জা কেন?

এ-সব সেই অনেকদিন আগের কথা।

তা' শুধু ভেতরে আসা নয়, ভেতরে এসে বসাও নয়, একেবারে চা খাওয়া। দুটি মাত্র প্রাণী, স্বামী আর স্ত্রী। আর একটি মেয়ে। ছেলে-নাতি-নাতনী কিছু নেই, ওই একটি মাত্র মেয়ে।

প্রথম-প্রথম ভাড়াটা দিতেন নিয়ম করে। তাও হয়ত স্ত্রীর গায়ের গয়না বেচে। একদিন জয়ন্ত জানতে পেরে বলেছিল—

ছি ছি, ও-টাকা আমি নিতে পারবো না কাকাবাবু, ওতে অন্যায় হবে, আপনি যখন পারবেন দেবেন—

রতনবাবু বলেছিলেন—কিন্তু বাড়ি তো তোমার নয় বাবা, বাড়ি তো তোমার বাবার—

জয়ন্ত বলেছিল—সে আমি আমার নিজের পকেট থেকে দিয়ে দেব—বাবার নজরে পড়বে না—

তারপর বুঝি ঠিক সেই সময়ে অঞ্জলি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল। রতনবাবু ডাকলেন—ওমা, ইদিকে এসো তো—এই তোমার দাদাকে প্রণাম করো—

অঞ্জলি হাতে ব্যাগ্ নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল, দু'হাত জোড় করে নমস্কার করলে।

রতনবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—ও কি, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতে হয়, এটাও জানো না মা তুমি?

অঞ্জলি একটু হাসলো জয়ন্তর দিকে

চেয়ে। জয়ন্ত সেই সুযোগেই দেখে নিল চোখ মুখের অ্যানাটমিটা, অঞ্জলির সারা ফিগারটা। সেই মুহূর্তেই জয়ন্ত বুঝেছিল সিনেমায় নামলে এ-মেয়ে শাইন্ করবে।

কিন্তু মুখে বললে—না না, পায়ে হাত দেবার বয়েস এখনও হয়নি আমার, ওটা বুড়োমানুষদের জন্যে থাক্—

বলে নিজেও দু'হাত তুলে নমস্কার করেছিল।

তারপর থেকে রতনবাবুও আর কখনও বাড়ি-ভাড়া দিতে পারেন নি, জয়ন্তও ভাড়া চায়নি। কিন্তু বাড়ি-ভাড়ার রসিদগুলো ঠিক মাসে-মাসে পেয়ে গেছেন। তাতে জয়ন্তর বাবার নিজের সই থাকতো। এমনি করেই কাটছিল। ছ'বছর একটা টাকাও ভাড়া লাগেনি রতনবাবুর। আরো ষোল বছরই হয়ত এমনি করেই চলতো।

জয়ন্তই রতনবাবুকে বলেছিল—আপনি কিছছু ভাববেন না কাকাবাবু, কলকাতা শহরে একদিন-না-একদিন আপনার বাড়ি হবেই—

বৃদ্ধ অথর্ব মানুষ, কথাটা শুনে কেঁদেই ফেলেছিলেন। কিন্তু উপায় না-পেয়ে কলকাতার ভিড়ের মধ্যে মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন আর কিছু না পারুক অঞ্জলি, খুঁটে খেতে তো পারবে! তিনটি পেট নিয়ে বিব্রত সেই বৃদ্ধর শেষ জীবনে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে দুষ্টলোকের হয়ত অভাব ছিল না। কিন্তু জয়ন্তর মত নিঃস্বার্থ পরোপকারী লোক আর দুটি দেখতে পাননি। এক-একদিন অনেক রাত্রে ফিরতো অঞ্জলি। তখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে একেবারে সাজ-পোশাক না ছেড়েই বিছানায় গা এলিয়ে দিত। রতনবাবু একমাত্র ইষ্ট-দেবতা মা-কালীকে ডাকতেন। কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসতেন শনিবারে-শনিবারে। অন্তর্যামীকে উদ্দেশ করে বলতেন—অঞ্জলির একটা উপায় করে দাও মা, ও যে আর পারে না—

রতনবাবু লোককে বলতেন—বাবার তিন লাখ টাকা আমি উড়িয়েছি, জানেন—

লোকে জিজ্ঞেস করতো—কীসে?

—আর কীসে, গান-বাজনায়।

ওস্তাদের কাছে গান শিখে খরচ করা এক জিনিস, আর ওস্তাদের গান শুনে খরচ করা আর এক জিনিস। সে আরো মারাত্মক। যৌবনে সেই মারাত্মক রোগেই ধরেছিল রতনবাবুকে। তারপর যখন বাড়ি গেল, টাকা গেল, সম্পত্তি গেল তিনি মেয়েকে আর স্ত্রীকে রেখে উধাও হয়ে গেলেন। কোথায় যে উধাও হয়ে গেলেন কেউ জানে না। কেউ ভাবতো তিনি মারা গেছেন, কেউ ভাবতো তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি ফিরে এলেন। কয়েক বছর পরে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন স্ত্রী বেঁচে আছে, মেয়েও বেঁচে আছে।

কিন্তু মেয়েকে আর চিনতে পারলেন না যেন। মেয়ের মনের মধ্যে তখন আবার নিজেকে খুঁজে পেলেন। সেই মেয়ের দিকে চেয়েই আর চলে যেতে পারলেন না। আটকে পড়লেন সংসারে। বলতেন—বুঝলে বাবা, অনেক কষ্ট দিয়েছি অঞ্জলির গর্ভ-ধারিণীকে—অনেক কষ্ট দিয়েছি—

জয়ন্ত বলতো—এবার আমি আপনার সব কষ্ট দূর করবো কাকাবাবু—

রতনবাবুর চোখ ছল্-ছল্ করে উঠতো—তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বাবা, তুমি দীর্ঘজীবী হও, এই আশীর্বাদ করি—

—আপনি দেখে নেবেন, আমার সব সার্কেলে জানা-শোনা আছে। কলকাতা শহরটা আপনি চেনেন নি এখনও, এখানে গুণ-টুন দরকার নেই, শুধু ম্যানিপুলেশন্, যে তদ্বির করতে পারে সেই জেতে—

—কিন্তু ও যে বাবা ম্যাট্রিক পাশও নয়, কোথায় চাকরি পাবে?

জয়ন্ত বলতো—আপনাদের সে-সব যুগ পালটে গেছে কাকাবাবু, এখন টাকা উপায় করবার অনেক রাস্তা খুলে গেছে। এখন লেখা-পড়া না জানলে কিছছু আসে যায় না, এখন ম্যানিপুলেশনই সব,—

—ম্যানিপুলেশন্ কী বাবা?

রতনবাবু ইংরিজী বুঝতেন না।

জয়ন্ত বুঝিয়ে দিত—ম্যানিপুলেশন মানে তদ্বির। এখন লেখা-পড়া না-জানলেও কোটিপতি-লাখপতি হওয়া যায়—

খবরটা যেন রতনবাবুর কাছে আশ্চর্য মনে হতো।

—এই দেখুন না, কার নাম করবো, কলকাতা-বোম্বাইয়ের যত লক্ষপতি লোক তাদের ক'টা লেখা-পড়া জানে?

রতনবাবু বলতেন—আমার লাখপতি হবার সাধ নেই বাবা, আমি নিজেও একদিন লাখপতি ছিলুম। দুবেলা মোটা ভাত মোটা-কাপড় পেলেই আমি বর্তে যাবো, আর শরীরটা যেন ভাল থাকে, বাস্, আর কিছু চাই না বাবা—

তা সেই তখন থেকেই জয়ন্ত এ-বাড়ির কর্তা হয়ে বসলো।

আগে ভালো করে সেজেগুজে সন্ধ্যে বেলা যে-মেয়েকে বেরোতে হতো, তা আর বেরোতে হলো না। তখন থেকে জয়ন্তই সঙ্গে করে নিয়ে বেরোতে লাগলো। আর ফিরে আসতে লাগলো অনেক রাত্রে।

রতনবাবু জিজ্ঞেস করতেন—কিছু সুরাহা হলো বাবা?

জয়ন্ত বলতো—আর দেরি নেই, এবার হয়ে এল—

জয়ন্ত তখন কলেজে পড়তো। অন্তত পড়বার নাম করে কলেজে আসতো। কোনও-রকমে একবার ক্লাসে মুখটা দেখিয়েই বেরিয়ে যেত। সেই সময়েই জয়ন্ত একদিন এক ভদ্রলোককে বাড়িতে নিয়ে এসে হাজির।

চেহারা দেখে রতনবাবুর মনে হলো যেন খুব বড়লোক। হাতে দু'তিনটে হীরে মুক্তোর আংটি আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবী। পায়ে চক্‌চকে জুতো। গলায় চিক্-চিক্ করছে সোনার সরু বিছে হার। বাইরের গাড়িখানা খুব দামী মনে হলো। সামনের দিকটা যেমন দেখতে পেছনের দিকটাও তেমনি। রতনবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

জয়ন্ত শশব্যস্ত হয়ে বললে—কাকাবাবু, এই ভূধরবাবুকে এনেছি—

—ভূধরবাবু?

—সেই যে আপনাকে বলেছিলুম, মস্ত বড় লোহার কারবার, তিন চারটে ফ্যাক্টরি আছে এঁর, ইনিই ছবি করবেন, 'সোনার হরিণ', ডিরেক্টার সুব্রত রায়। ইনি একবার অঞ্জলিকে দেখবেন—

যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন রতনবাবু। তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে অঞ্জলিকে ঘুম থেকে ওঠালেন। আগের দিন অনেক রাত্রে ফিরেছে। অঞ্জলি তাড়াতাড়ি একটা সিল্কের শাড়ি পরে মুখে পাউডার স্নো মেখে এসে হাজির হলো। ভূধরবাবু নমস্কার করলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন অঞ্জলিকে। বললেন—একবার হাসো তো তুমি!

অঞ্জলি কথাটা শুনেই হাসলো।

—একটু পেছন ফেরো তো?

অঞ্জলি পেছন ফিরলো।

ভূধরবাবু জয়ন্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—দৌড়লে কেমন দেখায় একবার দেখলে ভালো হতো—

জয়ন্ত বললে—তাতে আর আপত্তি কী হবে, একদিন লেকে গিয়ে ভোর বেলা দৌড়তে পারে অঞ্জলি—

বলে রতনবাবুর দিকে চাইলে জয়ন্ত। রতনবাবু বললেন—তা কেন পারবে না, খুব পারবে—

ভূধরবাবু কৈফিয়তের সুরে বললেন—একটু স্মার্ট রোল কি না, ছবিতে খুব ছুটে-ছুটে বেড়াতে হবে, অর্থাৎ খুব ছট্‌ফটে মেয়ের পার্ট, তাই, আর......

তারপর রুমাল দিয়ে গলার ঘাম মুছতে-মুছতে বললেন—আর তা ছাড়া ছবি যিনি ডাইরেক্ট্ করবেন, সুব্রত রায়, তিনিও একবার দেখবেন, আর আমার ক্যামেরাম্যানও থাকবে, টেক্‌নিশিয়ান দু'একজনও থাকবে—

এই রকম একটা-দুটো কথা বলে অঞ্জলির ফিগারখানাকে বাঁ-চোখ ডান-চোখ দিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করে তারপর গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। চলে যাবার পর রতনবাব বললেন—কী রকম মনে হলো জয়ন্ত?

জয়ন্ত বললে—পছন্দ হয়ে গেছে—

—তবে যে বলে গেলেন লেকে দৌড়তে হবে?

—ও-সব বলতে হয়, টাকা তো ভূধরবাবুর, ভূধরবাবুর যাকে পছন্দ হবে, ডাইরেক্টর

ক্যামেরাম্যানের সাধ্যি নেই তাকে রিজেক্ট করে,—

—কত টাকা দেবে?

—ও-সব কথা কিছু হয়নি, তবে পনেরো হাজারের কম আপনি নেবেন না—আপনি নিতে রাজি হবেন না—

রতনবাবু অবাক হয়ে গেলেন—বলো কী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওর চেয়ে খারাপ দেখতে সব আর্টিস্ট্রা তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা নিচ্ছে, আর ও কী দোষ করলো? এখন আপনি কিছুছু বলবেন না—দেখুন না আমি কী করি, আমি অঞ্জলিকে গাড়ি বাড়ি ফ্যান ফোন রেডিও সব করে দিয়ে তবে ছাড়বো—

এসব বহুদিন আগের ঘটনা। তখন রতনবাবু বেঁচে ছিলেন। তখন প্রশান্তও এত জানতো না। শুধু জয়ন্তর কথাগুলো মন দিয়ে শুনতো আর অবাক হয়ে যেত। যুগ বদলে গিয়েছে এ-খবর সে জানতো না। জয়ন্তই তাকে জানিয়ে দিয়েছিল—স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, পি সি রায়ের যুগ বদলে গিয়েছে। তাঁরা এখন হিস্ট্রির ফসিল। তাঁরা এখন শুধু টেক্সট-বুকের মিউজিয়ামের মধ্যে বেঁচে আছেন। এখন রেনেসাঁস এসেছে আবার। এখন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়, আর নয়তো সিনেমা-স্টাররাই আদর্শ। এরাই আজকের যুগের হিস্ট্রীকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে—। এদের আদর্শ করে এগিয়ে যেতে হবে। সায়েন্স কিছু না, ফিলজফি কিছু না, লিটারেচার কিছু না—আসল হচ্ছে টাকা। টাকা উপায় করতে পারলে সব হওয়া যাবে—বৈজ্ঞানিক হওয়া যাবে, ফিলজফার হওয়া যাবে, সাহিত্যিক হওয়া যাবে। টাকা দিয়েই ওদের কন্ট্রোল করা যাবে, ওদের কেনা যাবে। আমরা যা বলবো তাই-ই ওরা লিখবে। তাই টাকা উপায় করা আমাদের প্রথম কাজ—

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করতো—কী করে টাকা উপায় করবো?

জয়ন্ত বলতো—সে পথ আমি বার করেছি। একদিন দেখবি মীনাক্ষী সেনের নাম দেয়ালে-দেয়ালে ছেয়ে গেছে, রেস্টুরেন্টে-রেস্টুরেন্টে আলোচনা হচ্ছে, আমার বাড়িতে লাখ লাখ টাকা নিয়ে ফাইন্যান্সিয়াররা গাড়ির কিউ লাগিয়ে দিয়েছে—তখন আমাকে চিনতেই পারবি না তুই—তখন আমারই নিজের দু'তিনখানা গাড়ি—

টার্নবুল এণ্ড জনসন কোম্পানীর ক্যাশ-অফিসে বসে কাজ করতে করতে অনেকবার ভেবেছে কোথায় গেল জয়ন্ত, কোথায় গেল মীনাক্ষী সেন। রাস্তায় চলতে চলতে দেয়ালের দিকে চেয়ে দেখেছে—কোথায় চেনা সেই নাম দু'টো। কোথায় তারা আছে, কেমন আছে তারা, কে বলে দেবে?

আজ এতদিন পরে আবার তাদের সঙ্গে এমন ভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারে নি। বাস থেকে নেমে যখন টার্নবুল কোম্পানীর ক্যাশ অফিসের মধ্যে ঢুকলো তখন বড় ঘড়িটাতে আড়াইটে বেজে গেছে।

রমেশবাবু অবাক হয়ে গেছেন।

—এ কি মশাই, এত দেরি হলো যে অফিসে আসতে? কাল বাড়ি পৌঁছেছিলেন তো ঠিক? কত রাত হয়েছিল?

প্রশান্ত ভয়ে ভয়ে চারদিকে তখন চাইছে। জিজ্ঞেস করলে—পশুবাবু আজকে খোঁজ করেনি আমাকে?

রমেশবাবু বললেন—সকাল থেকেই পশুবাবু বড়সাহেবের ঘরে গিয়ে বসে আছে, ঘরে আসেনি, খুব বেঁচে গেছেন—

অনেক কাজ পড়েছিল। খাতা-পত্র নিয়ে কলম নিয়ে মন বসাতে চেষ্টা করতে লাগলো প্রশান্ত। রমেশবাবুও তখন কাজে ব্যস্ত খুব। হঠাৎ প্রশান্ত বললে—আচ্ছা রমেশবাবু, কাল যে মেয়েটা মোতিয়ার পার্ট করছিল, ওর খুব পার্টস আছে, না?

রমেশবাবু বললেন—কার কথা বলছেন, ওই অঞ্জলি ব্যানার্জির?

—হ্যাঁ।

—আরে, পার্টস না থাকলে পঁচাত্তর টাকা মুখ দেখিয়ে নেয়? তার ওপর চপ্ কাটলেট মামলেট চা পান তো আছেই,—অথচ ওদের বাদ দিলে চাঁদাও উঠবে না—

—আচ্ছা ও যদি সিনেমায় নামতো তো এক লাখ দেড় লাখ টাকা উপায় করতে পারতো, না?

রমেশবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, কেন বলুন তো? আপনি সিনেমা দেখেন নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে?

প্রশান্ত বললে—না, দেখি না, কিন্তু শুনেছি তো! শুনেছি নাকি সিনেমা-স্টাররা চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার, এক লাখ দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত পায়?

—তা পায়ই তো।

—তাহলে অঞ্জলি ব্যানার্জিই বা পাবে না কেন? ওরও তো ফিগার ভালো, ওরও তো মুখের এ্যানাটমি ভালো, ও-ও তো একদিন নাম করতে পারে? পারে কিনা বলুন?

রমেশবাবু হেসে বললেন—আপনি যে দেখছি মশাই একদিনেই সিনেমা-লাইনের নাড়ি-নক্ষত্র জেনে গেছেন একেবারে, ব্যাপার কী? খুব ভালো লেগেছে বুঝি অঞ্জলি ব্যানার্জিকে?

হঠাৎ ধরা পড়বার ভয়ে চুপ করে গেল প্রশান্ত। আবার কাজের মধ্যে মন ডুবিয়ে দিলে। আবার সব ভুলে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তবু যেন দুপুর বেলার ঘটনাগুলো সমস্ত চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো!

—তা আর-একদিন আসুন না আমাদের ক্লাবে, আবার দেখতে পাবেন অঞ্জলি ব্যানার্জিকে! আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, ওসব মেয়েরা তো ওই সবই চায়, আপনার মত মুখচোরা ছেলেদেরই ওরা বেশি পছন্দ করে—তা জানেন!

প্রশান্ত বললে—না না, সেজন্যে আমি বলিনি, আমার এমনি মনে হলো তাই বললাম—

হাতীবাগান ক্লাবে রমেশবাবু ডাকলেন—অঞ্জলি শোন,—আজ যে খুব সেজেগুজে এসেছ, ব্যাপার কী?

অঞ্জলি বললে—না দাদা, সুতীর কাপড়টা ভিজে রয়েছে তাই সিল্কের শাড়ি পরে এলাম—

—শোন, কাল একজন ভদ্রলোক আমার পাশে বসে ছিল দেখেছ?

অঞ্জলি মনে করতে পারলে না। বললে—কাকে? কার কথা বলছেন দাদা?

—সেই যে বেশ সাদাসিধে মুখচোরা দেখতে? সে তোমার খুব নাম করছিল, জানো?

—কেন, হঠাৎ আমার নাম করতে গেলেন কেন?

—তোমার অ্যাক্টিং ভালো লেগেছে তার খুব। সত্যি বলছি, হেসো না, তোমার খুব প্রশংসা করছিল, কেবল কাজ করতে করতে তোমার কথা বলছিল—

অঞ্জলি হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললে—দাদা, সবাই আমার প্রশংসা করে, এক আপনি ছাড়া—

রমেশবাবু বললেন—তোমার প্রশংসা না করলে পঁচাত্তর টাকা দিই মুখ দেখাতে—আমাদের ক্লাব থেকে এ-পর্যন্ত কত পেয়েছো বলো তো তুমি?

অঞ্জলি হঠাৎ গলায় আঁচল তুলে দিয়ে রমেশবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে—আপনাদের পাঁচজনের দয়াতেই তো বেঁচে আছি দাদা, আপনি আশীর্বাদ করুন যেন খাওয়া-পরার কোনও অভাব না থাকে, আমি আর কিছু চাই না—

রমেশবাবু তাড়াতাড়ি পা দুটো টেনে নিয়েছিলেন। বললেন—সত্যি, প্রশান্তবাবু বলছিল ঠিক—

—কী বলছিল দাদা?

—বলছিল সিনেমায় নামলে তোমার খুব নাম হতো! শুধু নাম নয় টাকা হতো, গাড়ি হতো, আরো অনেক কিছু হতো—

অঞ্জলি আরো হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললে—দিন দাদা আপনার পান একটা দিন, বৌদির হাতের পানটা বড় মিষ্টি লাগে—

ওদিক থেকে হঠাৎ রিহার্সালের ডাক পড়লো। তাড়াতাড়ি গায়ের শাড়িটা আবার ঠিক করে অঞ্জলি আসরের ভেতরে গিয়ে বসলো। আবার যেন অন্য মানুষ। শুধু অঞ্জলি নয়, টগর আছে, লাবণ্যও আছে। আবার যথানিয়মে রিহার্সাল চললো। মিনিটে

মিনিটে চা আসতে লাগলো। চা পান না হলে গলা খোলে না মেয়েদের। তারপর যখন অনেক রাত হলো তখন আবার আসর ভাঙলো। তখন আবার গাড়ি করে সকলকে পেশছে দেবার পালা। গাড়িতে ওঠবার আগে অঞ্জলি রমেশবাবুর দিকে ফিরে বললে—যাই দাদা—

—যাই বলতে নেই, আসি বলো—

—হ্যাঁ আসি—

শেষ পর্যন্ত সকলের দিকে নমস্কারটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে করে গাড়িতে গিয়ে উঠলো মেয়েরা। মেয়েরা চলে যাবার পর মেম্বাররা আর কেউ দাঁড়ায় না। তখন সকলেরই বাড়ি যাবার টান। এই ক্লাবটাই যেন মেম্বারদের পালিয়ে থাকবার জায়গা। এখানে এলে ঘণ্টা কয়েকের জন্যে সবাই যেন মুক্তি পেয়ে বাঁচে। সব রকমের মুক্তি। অফিসের বড়বাবুর অত্যাচার, বাতের ব্যথা, স্ত্রীর গঞ্জনা, অর্থাভাব—সমস্ত। ওই সময়টাতেই ছেলে-মেয়েদের পড়াতে সব বাড়িতে মাস্টার আসে। একখানা দুখানা ঘর। জায়গার অভাব। ক্লাবে এলে তবু কার্পেট বিছোন মেঝের ওপর বসে পাখার হাওয়া খাওয়া যায়। মেয়েরা আছে, চা-পান আসে। তখন দেবলা-দেবী কিংবা শাজাহান কিংবা চন্দ্রগুপ্তের আমলে গিয়ে নির্বিবাদে গা ঢাকা দেওয়া যায়। তখন আর কিছু মনে থাকে না। কোথায় লাডাকে ইণ্ডিয়ার চারশো স্কোয়ার মাইল জমি অধিকার করে নিয়েছে চায়না, কোথায় আমেরিকাতে কেনেডি প্রেসিডেন্ট হয়েছে, কোথায় ক্রুশেভ কাকে গালাগালি দিয়েছে, চালের দাম কোন্ ফাঁকে পঞ্চাশ নয়া পয়সা থেকে সত্তর নয়া পয়সায় উঠেছে, কখন বাসের-ট্রামের, পোস্টেজ-স্ট্যাম্পের দাম চড়ে গেছে, সব তলিয়ে যায় থিয়েটারের আফিং খেয়ে। কিন্তু আসর ভাঙার পরই মনে পড়ে যায় সকলের। তখন হরিশবাবু বলেন—ওহে, দোকান-টোকান সব বন্ধ হয়ে গেল নাকি, আমার ছোট মেয়েটার আবার টাইফয়েড হয়েছে কদিন থেকে, একটা হরলিকস্ কিনতে হবে—

কালীবাবু বলেন—তাই তো বটে, আমারও মনে ছিল না, বউ আসবার সময় কাঁচা বেল্ আনতে বলেছিল—

বিংশ শতাব্দীর অর্ধেকটা কেটে যাবার পর থেকেই যেন ইতিহাস আর-একদিকে মোড় ঘুরলো। কলকাতার জমির দর হু হু করে বেড়ে চললো। গ্রামগুলো সহর হয়ে উঠলো। সহরগুলো নোংরা হয়ে উঠতে লাগলো। বাসে-ট্রামে বৈঠকখানায় কেউ আর মানুষ মরতে দেখে চমকে ওঠে না। লোকের যেন সব দেখা হয়ে গেছে, সব শোনা, সব ভাবা শেষ হয়ে গেছে। জন্ম-মৃত্যু-রোগ-শোক সব যেন নির্জীব করে দিয়েছে তাদের। ওসব আর চাই না। তার চেয়ে সব ভুলিয়ে দাও আমাকে। আমাদের পারিপার্শ্বিককে ভুলিয়ে দাও। তার চেয়ে কোথায় কোন্ ছবি আসছে বলো, কোন্ সিনেমা-স্টার কাকে বিয়ে করছে, তাই শোনাও। কার ফিগারটা নিখুঁত, কোন সিনেমা-স্টারের কটা বউ, সেই খবরটা বলো। কোথায় কোন্ থিয়েটার হচ্ছে, তার পাশ দাও। তাই নিয়েই আমরা বুঁদ হয়ে থাকি, আর কিছু চাই না।

অফিস যাবার আগে যথারীতি খাবারের কৌটোটা রুমালে বেঁধে দিয়েছে মা।

—দুর্গা দুর্গা!

প্রশান্ত রোজকার মত বাবার কাছে গিয়ে বললে—আসি বাবা—

বিপিনবাবু এখন একটু-একটু ওঠেন। উঠে বেড়ান, ধীরে-ধীরে গিয়ে সদর দরজার সামনে রোদ্দুরে শরীরটা গরম করেন। বড় জোর পায়চারি করে আসেন বাস রাস্তা পর্যন্ত। কিন্তু আর অফিসে যাবার ক্ষমতা নেই। শচীনবাবুকে দেখলে নমস্কার করেন।

—তা আসছে অঘ্রাণ মাসের পাঁচ তারিখেই ঠিক করলাম বিপিনবাবু! পুরুত মশাইকে দিয়ে তারিখটা দেখিয়ে নিয়েছি।

বিপিনবাবু বললেন—আপনি যেমন বলবেন, আমার আর কীসের আপত্তি—

মেয়ে একরকম দেখা হয়েই গেছে। শচীনবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছেন বিপিনবাবু। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এতে তো মানুষের হাত নেই মশাই। কোথায় ছিলেন আপনি, আর আমি কোন্ চক্রধরপুরে পড়ে ছিলাম। আপনি এই বাদামতলায় এসে বাড়ি করলেন, আমিও এসে বাড়ি ভাড়া নিলাম—এও তো ভবিতব্য! যার যা ভবিতব্য তা হবেই!

—জমিটা কিনেছি আমার ভাগ্নীর নামে। দেড় হাজার করে কাঠা, দুদিন বাদেই দেখবেন ওর দাম দু হাজার হয়ে যাবে!

বিপিনবাবু যেন আবার সজীব হয়ে উঠলেন। একদিন চক্রধরপুরে বাড়ি করবার সময় তিনি মিস্ত্রীদের সঙ্গে নিজের হাতে ইঁট গেঁথেছেন। নিজে দাঁড়িয়ে সমস্ত তদারক করেছিলেন। তিনি যেন সেদিন নিজেকেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা পারেন নি। সেই বাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে তিনি যেন নিজেও ভেঙে গুঁড়িয়ে তলিয়ে গিয়েছিলেন একেবারে। তারপর এতদিন পরে পিণ্টু বড় হয়েছে। পিণ্টু মানুষ হয়েছে। তিনি নিজেই যেন পিণ্টু হয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আবার যেন তাঁর নতুন চাকরি হয়েছে। আবার যেন তিনি নতুন করে বিয়ে করবেন। আবার তিনি পিণ্টুর মধ্যে দিয়ে নিজেকে গড়ে তুলবেন।

খেতে বসে বলেন—আর একটু ভাত দাও তো গো, আজকাল খিদে যেন বেড়ে গেছে—

কখনো বলেন—আজকাল তোমার রান্না খুব ভাল হচ্ছে, জানো—

বাঁশধানিতে দু' কাঠা জমির ওপর বাড়ি করবেন। এবার মনের মতন করে বাড়িটা করতে হবে। তিন কামরা বাড়ি। একটাতে তিনি, একটাতে পিণ্টু। আর একটা বাইরের ঘর। সামনে একটা মাধবীলতার গাছ লাগিয়ে দেবেন। সামনে একটা মোড়ার ওপর বসে বসে দূরের দিকে চেয়ে থাকবেন। তারপর পিণ্টু অফিস থেকে এলে এক সঙ্গে জলখাবার খাবেন।

বললেন—বৌমা, আজকে চিঁড়ে ভেজে দিও তো আমাদের—

নিজের মনে-মনেই কল্পনার রঙ তৈরি করে সারা মনখানাতে মাখিয়ে দেন। বড় আশা করেন আজকাল। বড় বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। বড় নিজেকে ভালবাসতেও ভাল লাগে।

সবই ঠিক। কটা দিন। তারপর অঘ্রাণ মাস। অঘ্রাণ মাসে তরি-তরকারীও সস্তা। সামনে একটা প্যাণ্ডেল খাটিয়ে লোক খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা চলে। কোনও চিন্তা নেই।

শচীনবাবু বলেছিলেন—আপনার ছেলে নিজে যদি একবার মেয়েকে দেখতে চায় তো তাও ব্যবস্থা করতে পারি না-হয়—

বিপিনবাবু বলেছিলেন—না মশাই, আমি ছেলেকে সে-শিক্ষা দিইনি, আমার ছেলে সে-রকম ছেলেই নয়—

—তার যদি কোনও বন্ধু-বান্ধব...

—নাঃ নাঃ, তার কোনও বন্ধুবান্ধবই নেই, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করতেই দিই না তাকে, আর কার সঙ্গে মেলা-মেশা করবে বলুন, তেমন বন্ধু আজকাল কোথায়? আজকালকার ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না-করাই ভাল, যেরকম দিনকাল পড়েছে! সে শুধু অফিসটি যায় আর বাড়িতে চলে আসে, আর কোথাও যায় না, কোনও যাবার জায়গাই নেই তার—

শচীনবাবু বলেন—খুব ভালো বিপিনবাবু, খুব ভালো, এই তো সেদিনকার ঘটনা, ওই যতীশ ভট্টাচার্যি মশাইএর সেজ জামাই, বাড়ির সামনে দিয়ে সেদিন যাচ্ছিল জানালার দিকে নজর দিতে দিতে—

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ মশাই, শ্বশুরে-বাড়ি যাচ্ছিস, শ্বশুরে-বাড়ি যা না, তা না এবাড়ি ওবাড়ির জানালা-দরজার দিকে উঁকি মারা কী?

বিপিনবাবু সমর্থন করেন। বলেন—বটেই তো, বটেই তো—! তারপর কী করলেন আপনি?

—আমি চুপ করে বারান্দায় বসে-বসে সব লক্ষ্য করছিলুম!

—কিছু বললেন না?

—আজকালকার ছেলে, কী বলতে কী হবে, তাই চুপ করে রইলুম, শেষে আমার আর সহ্য হলো না মশাই, জানেন, আমি বললাম—রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছো তো

জুতো মশ মশ না করে হাঁটলে চলছে না?

—আপনি বললেন ওই কথা?

—তা বলবো না? যতীশ ভট্টাচার্যির জামাই বলে কি আমি চুপ করে থাকবো ভেবেছেন?

টার্নবুল এন্ড জনসন কোম্পানীর গেটের দরোয়ান অফিস টাইমে বরাবর সজাগ থাকে। সাহেবী অফিস। তামার পাতের ওপর অফিসের নাম লেখা। অক্ষরগুলো পালিশ করা। রাস্তার ওপর দিয়ে বাসে-ট্রামে চড়ে গেলে দরোয়ানের মস্ত একজোড়া গোঁফ আর মস্ত একটা রাইফেল নজরে পড়ে। রাইফেলটা যেন ফ্রি-ইন্ডিয়ার নিঃশব্দ প্রতিবাদ। যেন নিঃশব্দে বলে—আমার ব্যালেন্স-শীট নিয়ে কেউ যদি আপত্তি করো তো তাকে আমি গুলী করে মারবো। কোন্ চোরাগলি দিয়ে শেয়ারের সব ডিভিডেন্ড যে ইন্ডিয়ার বাইরে চলে যায়, ইন্ডিয়ার কাস্টমস অফিস তা জানতেও পারে না।

একেবারে সোজা মিলিটারি স্যালিউট দিয়ে হঠাৎ আরো সজাগ হয়ে উঠলো টার্নবুল এন্ড জনসন কোম্পানীর হেড দরোয়ান।

আর রাস্তার লোক দেখলে, এক হাতে হলদে রং-এর সিগারেটের টিন আর সার্ট ট্রাউজার-টাই পরা এক ভদ্রলোক নামলো একটা বিরাট গাড়ি থেকে। নেমে দরোয়ানের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই গট-গট করে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল।

চাপরাশি এসে ডাকতেই প্রশান্ত অবাক হয়ে গেছে। তাকে আবার কোন্ সাহেব ডাকবে এখানে।

—ফার্গুসন সাহেব?

—নেহি বাবু, বাহারকা এক সাব।

বাহারকা সাব শুনে আরো অবাক হয়ে গেল প্রশান্ত। এত বছর চাকরি হয়ে গেল, এখানে তো কই কেউ কখনও তার খোঁজে আসেনি। রমেশবাবু বললেন—যান না, দেখে আসুন না গিয়ে—

ভয়ে ভয়ে ভিজিটার্স রুমে গিয়ে অবাক। একেবারে চিনতেই পারা যায়নি। একেবারে সাহেবি পোশাক। হাতে হলদে টিন নিয়ে সিগারেট টানছে আর একটা কী ম্যাগাজিন নিয়ে চোখ বোলাচ্ছে।

—জয়ন্ত? আমি ঠিক বুঝতে পারিনি!

জয়ন্ত বললে—কীরে আর দেখা নেই কেন? আমি মিস্টার রামানির কাছে এসেছিলুম, হঠাৎ মনে পড়লো তোর কথা, তাই ভাবলুম দেখা করে যাই—

কী বলবে প্রশান্ত ভেবে উঠতে পারলে না। বললে—মিস্টার রামানি কে?

—রামানিকে চিনিস না? আমার বেঙ্গল সার্কিটের ডিস্ট্রিবিউটর, মিলিওনেয়ার লোক—

—কীসের ডিস্ট্রিবিউটার?

জয়ন্ত বললে—আমার ছবির। তিন লাখ টাকা দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে, বলছে—মিস্টার রায়, তুমি কবে প্রোডাকশনে হাত দেবে, বলো, আমার টাকা রেডি—

—তা টাকা পেয়ে গেছিস? ছবি হবে?

—আরে এ তো ডিস্ট্রিবিউটার বলবেই, কিন্তু আমি নেব কেন? টাকা নিলেই তো আমি ওর খপ্পরে পড়ে যাবো, আমি নিজের খরচে তিন-চার-পাঁচ রীল ছবি না তুলে ওর কাছ থেকে টাকা নেব না, নইলে বেটা আমাকে কব্জা করে ফেলবে—

—তারপর হঠাৎ ঘুরে হাতের ঘড়িটা দেখে বললে—আচ্ছা চলি রে, একটা

রমেশবাবু ডাকলেন—অঞ্জলি শোন, আজ যে খুব সেজেগুজে এসেছ, ব্যাপার কী?

য়্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে আবার—

—এখন কোথায় যাবি ?

—ফিল্মের জন্যে য়্যাপ্লাই করেছি, আজকাল আবার অনেক হ্যাংগাম, দেশ স্বাধীন হয়ে অনেক অসুবিধে হয়েছে, পারমিট না পেলে ফিল্ম কেউ দেবে না—যাই—

তারপর যেতে গিয়েও হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। বললে—হ্যাঁ ভাল কথা, তুই তো অনেকদিন যাসনি ওদিকে—

—কোথায় ?

—অঞ্জলির বাড়িতে! অঞ্জলি বলছিল তোর কথা, তুই নাকি দশটা টাকা ধার দিয়েছিস, সেটা শোধ নিতে যাসনি তো?......চলি—বলে হন হন করে চলে গেল জয়ন্ত। জয়ন্তর অনেক কাজ। কী অবলীলায় একটুখানির মধ্যে দামী দামী সিগারেট একটার পর একটা টেনে গেল। কোনওটা একটুখানি টেনেই ফেলে দিয়েছে। কোনওটা মাত্র আধখানা। আশ্চর্য! বাইরের দিকে রাস্তার কাচের জানলায় এসে দেখলে, জয়ন্ত একটা বিরাট দামী গাড়িতে গিয়ে উঠলো। আর উর্দিপরা ড্রাইভার গাড়িটা স্টার্ট দিতেই ট্রাফিকের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল!

প্রশান্ত কেমন হতবাক হয়ে গিয়েছিল। অঞ্জলি ডেকেছে! যেন বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হলো না।

রমেশবাবু কাজ করতে করতে বললেন—কে ডাকছিল মশাই আপনাকে? কে?

প্রশান্ত বললে—আমার এক পুরোন বন্ধু, খুব বড়লোক—

—আপনার কাছে কী করতে এসেছিল।

প্রশান্ত বললে—এমনি! শুনেছিল যে আমি এই অফিসে কাজ করি, তাই...

বলে আবার কাজে মন দিতে চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুতেই মন বসছিল না। কেবল গাড়িটার কথা মনে পড়ছিল। হঠাৎ একবার মুখ তুলে বললে—আচ্ছা রমেশবাবু, কলকাতায় একরকম বড় বড় গাড়ি চলে দেখেছেন, সামনেও যত লম্বা পেছনেও তত লম্বা—? দেখেছেন?

—হ্যাঁ দেখেছি বৈ কি! সিনেমা-স্টাররা ওই রকম গাড়ি চড়ে। ভেতরটা আবার এয়ার কন্ডিশন করা থাকে!

—ও-গুলোর কত দাম হবে আন্দাজ?

—তা এক-একটা ধরুন গিয়ে সত্তর-আশি হাজার টাকা নির্ঘাৎ, তার কমে নিশ্চই নয়—

প্রশান্ত যেন নিজের মনে-মনেই অংকটা কষতে লাগলো। সত্তর-আশি হাজারে কত-গুলো শূন্য লাগে তারও সহজ-সরল হিসেব যেন গুলিয়ে গেল তার। একক-দশক-শতক-সহস্রের ভিড়ে যেন তলিয়ে যেতে ভালো লাগলো তার। অঞ্জলি তাকে ডেকেছে। দশটা টাকা হয়ত উপলক্ষ। হয়ত কেন নিশ্চয়ই উপলক্ষ্য! নইলে জয়ন্তর মত ব্যস্ত লোককেও তার কাছে আসতে হয়েছে।

—আচ্ছা রমেশবাবু, একটা সিগারেটের আজকাল কত দাম?

রমেশবাবু বললেন—কেন, সিগ্রেটের দাম জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—না, আমার বন্ধুটা ওইটুকুর মধ্যেই তিনটে সিগ্রেট টেনে উড়িয়ে দিলে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি—

অদ্ভুত জয়ন্তর চরিত্রটা। সারা দিন মন থেকে যেন জয়ন্তর ভাবনাটা দূর করতে পারলে না। অফিসের পর রাস্তায় বেরিয়েও যেন আচ্ছন্ন করে রইল প্রশান্ত। এক-একটা বড় বড় গাড়ি রাস্তা দিয়ে হু হু করে চলে যায়, আর নিজেকে বড় ছোট মনে হতে লাগলো জয়ন্তর তুলনায়। একশো সাতান্ন টাকা বেড়ে একশো তেষট্টি হয়েছে? আরো দু বছর পরে হবে একশো ছেষট্টি। দু'শো টাকার স্বর্গে উঠতে প্রশান্তকে সারা জীবনের রক্ত দিতে হবে এই টার্নবুল কোম্পানীর কনক্রীটের তৈরি অফিসের ক্যাশ-বুকে। অথচ একদিনে একটু চেষ্টা করলেই জয়ন্তর মত হওয়া যায়। কলেজে তো জয়ন্তর চেয়ে ভালো ছেলে ছিল প্রশান্ত! জয়ন্ত তো পাশই করতে পারলো না বি-এটা। অথচ কলেজের বাইরে জয়ন্ত তাকে ছেড়ে অনেক-অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। আশি হাজার টাকার গাড়িতে চড়ে লাইফের রেসে জয়ন্ত বাজি জেতবার দিকে এগিয়ে চলেছে। আর প্রশান্ত লাস্ট হর্স।

শচীনবাবু তখন জমির দলিলটা দেখাচ্ছিলেন বিপিনবাবুকে।

—এই দেখুন সাউথ আর এই নর্থ! বাড়ি হবে আপনার সাউথ ফেসিং, বেকসুর চারখানা ঘর তুলতে পারবেন এখানে!

নিজের ভাগ্নীর নামেই কিনেছেন। কিন্তু আসলে তো ভোগ করবে সবাই। বিপিনবাবু ভোগ করবেন, বিপিনবাবুর স্ত্রী ভোগ করবেন, পিণ্টু ভোগ করবে, পিণ্টুর বউও ভোগ করবে! বিপিনবাবু যেন স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছেন। বৃষ্টি হলে টিনের ফাঁক দিয়ে জল পড়বে না। গরমের দিনে মাথার তালু ফেটে যাবে না। সে যে কী আরাম! যেন এই টিনের চালার তলায় বসে-বসেই ভবিষ্যতের আরামটা বর্তমানে ভোগ করেন। একটা নিজস্ব কলঘর। পিণ্টুর মা সেই উঠোনের পেছনের মধ্যে বাসন মাজে বসে বসে, তাও আর চোখ দিয়ে দেখতে পারেন না। একদিনের জন্যে শান্তি দিতে পারেননি স্ত্রীকে। স্ত্রী মুখ বুজে সব সহ্য করে এসেছে এতদিন। মুখ ফুটে কিছু বলেনি।

বাইরে কড়া নড়ে উঠলো।

ওই পিণ্টু এসেছে!

—অ বউ, অই তোমার ছেলে এলো গো!

মা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়েছে। ঠিক সময়েই পিণ্টু এসেছে। বাবার ঘরের দিকেই যাচ্ছিল। মাকে জিজ্ঞেস করলে, ও ঘরে কে এসেছে মা?

—ওই ও-বাড়ির শচীনবাবু!

সেদিকে না গিয়ে প্রশান্ত নিজের ঘরে ঢুকলো। অন্ধকার ময়লা দুর্গন্ধ ঘরটার চেয়ে বাইরের রাস্তা অনেক সুন্দর, অনেক পরিচ্ছন্ন মনে হলো। মনে হলো এর চেয়ে বিডন স্ট্রীটের গলির ভেতরে সেই অঞ্জলি ব্যানার্জির ঘরটাও যেন অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এ-বাড়ির সব কিছু আজ যেন কুৎসিৎ কদর্য মনে হলো প্রশান্তর কাছে। শুধু এই ঘর নয়, এই বাবা-মা নিজে—সবাই যেন বড় তুচ্ছ, বড় অকিঞ্চিৎকর।

মা হঠাৎ ঘরে ঢুকলো—এক ছটাক তেল আনতে পারবি বাবা লালার দোকান থেকে—সরষের তেল?

মুখ ফিরিয়ে প্রশান্ত বললে—কেন? এক ছটাক কেন?

মা বললে—আর ক'টা দিন তো আছে মাসের, ও-মাস পড়লে আবার একসের কিনবো—

প্রশান্ত আর কিছু বললে না। এখানে এক ছটাকের মাপে তাদের জীবন বাঁধা-ধরা, এখানে মা কেমন করে কল্পনা করতে পারবে যে আশি হাজার টাকা একটা গাড়ির দাম হতে পারে। কেমন করে ধারণা করতে পারবে যে দশ মিনিটে তিনটে দামী সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, এমন লোকও এই কলকাতা শহরে আছে!

প্রশান্ত কিছু বললে না মুখে, জামাটা ছেড়ে নিঃশব্দে তেলের কাঁসার বাটিটা নিয়ে লালার দোকানের দিকে চলে গেল।

বিডন স্ট্রীটের বাড়িতেও কড়া নড়ে উঠলো।

—কে?

—আমি!

এবার অন্য পোশাক। অন্য ঢং। তবু সিগারেট আছে মুখে। জয়ন্তর গলা শুনে কেউ প্রশ্ন করে না কোন্ ক্লাব থেকে এসেছে।

মাইমা দরজা খুলে দিলে। বিধবা বুড়ি। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলে—অঞ্জলি বেরিয়ে গেছে না আছে?

—এই তৈরি হচ্ছে!

জয়ন্ত একেবারে কথা বলতে বলতেই সোজা ঢুকে গেল। কাঠের লম্বা ফ্রেমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তখন মুখে পাউডার-স্নো ঘষছে অঞ্জলি ব্যানার্জি।

—তুমি আবার এ-সময়ে? আমি তো বেরোচ্ছি! আমার রিহার্সাল আছে—

—তা থাক, একটা জরুরী কথা বলতে এসেছিলুম?

—মার ওষুধটা এনেছো?

জয়ন্ত জিভ কাটলে।—ওঃই যাঃ, একদম

ভুলে গেছি—

—কালকে মা সারা রাত ঘুমোতে পারেনি ওষুধটার জন্যে, জানো? তা কী বলবে বলো?

বলে চোখটা আয়নার কাছে নিয়ে গিয়ে কাজল বুলোতে লাগলো।

জয়ন্ত বললে—আজকে সেই ছেলেটার অফিসে গিয়েছিলুম—

—কোন্ ছেলেটা?

—সেই যে আমাদের সংগে এক কলেজে পড়তো, সেদিন তোমার কাছে এসেছিল, প্রশান্ত—

অঞ্জলি এবার ঘুরে দাঁড়াল।

—কেন? তার অফিসে গিয়েছিলে কেন?

—তাকে গিয়ে বললুম তুমি তাকে ডেকেছ—

—আমি? আমি কখন তাকে ডাকতে গেলুম। আমি তো তোমার কাছে একবারও তার কথা বলিনি?

জয়ন্ত বললে—বলোনি, কিন্তু আমি বানিয়ে বানিয়ে বলে এলাম—

—কেন বানিয়ে বলতে গেলে?

জয়ন্ত বললে—বলেছি তুমি তার ধার শোধ করে দেবে, যে দশটা টাকা সে দিয়ে গিয়েছিল তোমাকে—

অঞ্জলি রেগে গেল। বললে—আমার ধার শোধ করি না-করি সে আমি বুঝবো, তুমি তাকে সে-কথা বলতে গেলে কেন?

জয়ন্ত বললে—কেন, এখানে তার আসাটা তুমি চাও না সত্যি সত্যি?

অঞ্জলি বললে—বেশ তো কথা, এখানে তার আসা পছন্দ করি, এ-কথা আমি কবে তোমাকে বললুম?

—তোমার কথা থাক, কিন্তু আমি চাই প্রশান্ত আসুক এখানে!

—কেন? কিসের জন্যে?

জয়ন্ত বললে—তার জন্যে উপলক্ষ্যের অভাব হবে না—ধরো তার দেনাটা শোধ করবার জন্যে!

অঞ্জলি বললে—সে আমায় ধার দিয়েছে, আমার যখন খুশি তার দেনা শোধ করবো! তা নিয়ে তোমার অত মাথাব্যথা কেন!

জয়ন্তর গলাটা মিহি হয়ে উঠলো। বললে—তুমি অত রাগ করছো কেন? আমি রাগের কথা কিছু বলেছি?

অঞ্জলি বললে—দেখ, রাগ আমি করিনি, রাগ করবার আমার অত সময়ই নেই, দেড় বচ্ছর ধরে মা রোগে ভুগছে, এই সংসারের জ্বালায় আমি ছটফট করছি, এখুনি গিয়ে আমাকে আবার হাসির পার্ট করতে হবে, সিরাজ-উদ্দৌলাতে আলেয়ার রিহার্সাল আছে, সেখানে হাসতে হবে গান গাইতে হবে, আমার অত কথা ভাববার সময় কোথায়? এখুনি গাড়ি আসবে আমাকে নিতে—

বলে আবার মুখ ফিরিয়ে গালে স্নো ঘষতে লাগলো।

জয়ন্ত আরো কাছে সরে এল। বললে—সত্যি বলছি, রাগ কোর না, আজ হোক কাল হোক সে আসবেই, আমি বলছি সে আসবে, এলে তাকে ফিরিয়ে দিও না—

—ওমা, ফিরিয়ে দেব কেন?

—না বলছি, শুধু ফিরিয়ে দেবে না তা নয়, তাকে একটু খাতির কোর, আজকে তাকে অনেক করে বলে এসেছি, একটু যত্ন করে তাকে ঘরে বসিও—

—তার মানে?

জয়ন্ত বললে—আমার স্বার্থের জন্যেই বলছি, তাতে তোমারও স্বার্থ! তোমার তাতে খারাপ হবে না, তোমার ভালোই হবে—

অঞ্জলি বললে—কী, তার কাছ থেকেও টাকা মারবার মতলব তোমার?

—না, সে একটা অন্য মতলব! তোমাকে বলবো সব! এখন তুমি ব্যস্ত, একটা প্ল্যান এ'টেছি—

—কী প্ল্যান?

—আজ মিস্টার রামানির গাড়িটা নিয়ে তার অফিসে গিয়েছিলুম। তাকে বললুম, তোমাকে হিরোইন করে আমি ছবি তুলছি—

অঞ্জলি এবার আবার ঘুরে দাঁড়াল। এতদিন জয়ন্তের সংগে মিশেছে, এত লোকের কাছে তার সঙ্গে গেছে, তাকে দিয়ে তার এত স্বার্থ সিদ্ধি করেছে, তার আর বুঝি শেষ নেই। মুখটা নীল হয়ে উঠলো অঞ্জলির। আর দু'ঘণ্টা পরে সিরাজউদ্দৌলা থিয়েটার আরম্ভ হবে। সেখানে অনেক হাসতে হবে, অনেকগুলো গানও গাইতে হবে। মনটা খারাপ করতে ইচ্ছে হলো না তার। তবু বললে—এত করেও তবু তোমার লজ্জা হলো না? একটা গরীব ছেলের সর্বনাশ না করলে তোমার ঘুম হচ্ছে না?

জয়ন্ত বললে—বা রে, সর্বনাশ বলছো কেন? তার সর্বনাশ করছি আমি?

—এরকম করে আরো কত লোকের সর্বনাশ তুমি করেছ, আমি জানি না বলতে চাও?

—কিন্তু বিজনেস-ইজ-বিজনেস! ব্যবসা করতে গেলে লাভ লোকসান তো আছেই।

—যারা বড়লোকের ছেলে, সিনেমার মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করতে চায়, বাপের লাখ লাখ টাকা আছে, তাদের ব্যবসায় নামাও না—ওকে কেন?

—সে তো করেছি, এখন যে আর কাউকে পাচ্ছি না! সবাই হাত গুটিয়ে বসেছে—

অঞ্জলি বললে—এখন বুঝি আর কেউ তোমাকে বিশ্বাস করছে না?

জয়ন্ত এবার নতুন সিগারেট ধরালে একটা। বললে—তোমার কেবল ওই কথা! আমাকে তুমি একটা চান্স দাও না!

—একটা? তোমাকে আমি হাজার-হাজার চান্স দিইনি? তোমার জন্যে আমি কীই না করেছি বলো তো? কত মারোয়াড়ীর সংগে মটরে ঘুরে বেড়িয়েছি, কত লোকের সঙ্গে হোটেলে রাত কাটিয়েছি, কত দিন কত লক্ষপতির বাগান-বাড়িতে কাটিয়েছি, তবু বলছো তোমাকে চান্স দিতে?

জয়ন্ত এবার অন্য পথ ধরলে। বললে—আজ তুমি এই কথা বলছো অঞ্জলি? আমি তোমার জন্যে কী কী করেছি সব ভুলে গেলে তুমি?

—কী করেছ তুমি আমার জন্যে শুনি? আমাকে রানীর হালে রেখেছ? আমাকে বাড়ি গাড়ি ফ্যান-ফোন-রেডিও দিয়েছ? আমি ঠাকুর-চাকর-ঝি-ড্রাইভার রেখে আরাম করে সংসার করছি? আমার নাম দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার-পোস্টারে ছড়িয়ে দিয়েছ?

জয়ন্ত বললে—তা বলছি না, কিন্তু আমার বাবারও তো লাখ-লাখ টাকা আছে। দু'তিনখানা বাড়ি আছে, তোমার জন্যে আমি কিছুই ত্যাগ করিনি?

—তুমি ত্যাগ করেছ, না তারা ত্যাগ করেছে তোমাকে? তোমাকে তো তারা কুকুর-বেড়ালের মত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সব বাপ-মা যা করে থাকে, তারাও তাই-ই করেছে। আমার ছেলে এমন করলে আমিও তাকে ত্যাগ করতুম, তাড়িয়ে দিতুম দূর করে—

—তুমি আজ এই কথা বললে?

—তা ফুর্তি করা ছাড়া আর কী করেছ তুমি জীবনে? পরের সর্বনাশ করা ছাড়া আর কী করতে পেরেছ শুনি? আমার বাবা তোমার জন্যে মারা গেছে, তা জানো তুমি?

—তোমাদের কাছে ছ' বছর বাড়ি ভাড়া না-নেওয়ার এই পরিণতি হয়েছে দেখছি!

—কেন বাড়ি ভাড়া নাওনি? নিলে হয়ত আমার এই দুর্দশা হতো না আজ। আজ আমাকে আর এই ক্লাবে ক্লাবে রং মেখে ঢং করতে ছুটতে হতো না—বুড়ো বুড়ো পুরুষদের কাছে গিয়ে ন্যাকামী করার দায় থেকে বেঁচে যেতুম—যাও, যেখানে গিয়েছিলে সেখানেই যাও, এখুনি আমার গাড়ি আসবে—

জয়ন্ত এবার অঞ্জলির একটা হাত ধরলো। বললে—তোমার সব কথা স্বীকার করছি অঞ্জলি, আজ তুমি যা বলবে মাথা পেতে নিচ্ছি, কিন্তু আমার একটা কথা শুধু রাখো, আমি শেষ চান্স নিচ্ছি, আমি কাউকে ঠকাবো না, কথা দিচ্ছি, প্রশান্তর একটা টাকাও আমি লোকসান করবো না, আমার ডিস্ট্রিবিউটার রেডি, পাঁচ-ছ রীল ছবি তোলা হলেই টাকা দেবে, আমাকে মিস্টার রামানী নিজে বলেছে —শুধু হাজার বিশেক টাকার জন্যে আটকে যাচ্ছে—

অঞ্জলি যেন একটু নরম হয়েছে মনে হলো।

—শুধু হাজার বিশেক, কি বড়জোর

পঁচিশ হাজার। তিন চার মাসের মধ্যেই আমি সব টাকা শোধ করে দেব, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে—

—কিন্তু আর কোনও লোক দেখ না। আর কাউকে পাচ্ছো না?

জয়ন্ত বললে—অনেক খুঁজেছি, পাচ্ছি না। কেউ আর বিশ্বাস করতে চাইছে না আমাকে—

—কোনও বিজনেসম্যান ধরো না। অনেক বড়লোকের আদুরে দুলাল আছে, মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চায়, আমি না-হয় তাদের সঙ্গে মদ খাবো, তুমি যা বলবে তাই-ই করবো,—এমন কাউকে পাচ্ছো না?

জয়ন্ত বললে—এতদিন তো সেই চেষ্টাই করছিলুম, আজকাল হয়েছে কি জানো, ফুর্তি করতে সবাই তৈরি, কিন্তু টাকা বার করতে চাইছে না—গাড়ি হয়ত দিতে পারে একদিনের জন্যে, এক টিন সিগ্রেটও দিতে পারে, সমস্ত রাত বাগান-বাড়িতে মাইফেল করবার সময় থাকতে দিতে পারে, কিন্তু কাঁচা টাকা দিয়ে আর কেউ বিশ্বাস করছে না—

—কেন? তোমার সেই বড়বাজারের পার্টি, কী যেন তার নাম? যাকে একদিন বাড়িতে এনেছিলে?

—আগরওয়ালা? আরে তার কথা আর বোল না, সে বিয়ে করে ফেলেছে!

—তা বিয়ে করলেই তো সুবিধে! তারাই তো এই সব বেশি চায়।

—না, এখন অন্য সার্কেলে ঘুরছে, আমাকে রাস্তায় দেখলে এড়িয়ে যায়, বাড়িতে গিয়ে কার্ড পাঠালেও দেখা করে না। আমার বাজারে খুব বদনাম হয়ে গেছে, জানো! আর আজকাল আমার মত অনেক পার্টি বাজারে নেমেছে। এই সুট সিগ্রেট দেখে আর কেউ ভুলছে না। আর বাজারে মেয়ে ছড়িয়ে গেছে অনেক। মুড়িমুড়কির মত রাস্তায়-রেস্টুরেণ্টে-লেকে-ময়দানে ছড়ানো।

হঠাৎ বাইরে গাড়ির হর্ন বেজে উঠলো।

অঞ্জলি বললে—ওই এসেছে ওরা—

বলে তাড়াতাড়ি শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিলে ভালো করে। মাথার খোঁপাটা ঠিক করতে লাগলো, চোখের ভুরুটা এঁকে দিলে, শেষবারের মত নিজের চেহারাটা ঘুরে-ফিরে দেখে নিতে লাগলো।

—তাহলে, কী বলছো? রাজী তো?

—কীসের রাজী?

—ওই প্রশান্ত যেদিন আসবে, তার কাছ থেকে আদায় করতে পারবে তো? যে-কোনও রকমে এটা করতেই হবে তোমাকে, না হলে আমি মারা পড়বো, অনেকগুলো পাওনাদার খেয়ে ফেলছে চারদিকে, ছবিটা ফ্লোরে না নামাতে পারলে আমার আর মান থাকছে না—শেষে কী যে হবে বুঝতে পারছি না—

আবার হর্ন বেজে উঠলো। অঞ্জলি হাতের ঘড়িটা একবার এক ফাঁকে দেখে নিলে।

—মাত্র তো হাজার পঁচিশেক টাকা। পঁচিশ হাজার টাকার জন্যে তুমি অত ভাবছো কেন? আমি কি আগে হলে এই সামান্য টাকার জন্যে ভাবতুম? মা আমাকে কত টাকা দিয়েছে একদিন, আমি নিজে দু'তিন লাখ টাকা উড়িয়েছি, মা বেঁচে থাকলে আমার আজ ভাবনা?

অঞ্জলি বললে—কিন্তু টাকা যদি নষ্ট হয় তো ও-বেচারীর কী সর্বনাশ হবে বলো দিকিনি? গরীবের ছেলে দেড়শো টাকা মাত্র মাইনে পায়, পঁচিশ হাজার টাকার স্বপ্নও দেখেনি জীবনে, ওর কাছে এ টাকার দাম কী তা জানো তো?

জয়ন্ত বললে—তা আর জানি না? ওর বাবা চিরকাল আগলে আগলে রেখেছে, চিরকাল দেখেছি ওর পকেটে দু'আনা ট্রাম ভাড়ার পয়সাটা থাকতো, আর কিছু থাকতো না, আমিই ওকে কত চা খাইয়েছি, কত ট্রাম ভাড়া জুগিয়েছি এককালে, আমি ওর অবস্থা জানি না?

—তাহলে এত জেনেও কেন ওর সর্বনাশ করছো?

জয়ন্ত বললে—আরে, সর্বনাশ করছি ওর, কে বললে? ছবির তো ও-ও পার্টনার থাকবে একজন। ওকেও তো আমি প্রফিট্ দেব, পঁচিশ হাজার টাকার সুদ ছাড়াও আমি প্রফিটের পার্সেণ্টেজ তো দেব ওকে। সেটা ভুলে যাচ্ছো কেন? তুমি কি মনে করেছ আমি ওকে ঠকাবো? ছি ছি, আমি কি তাই পারি?

অঞ্জলি বললে—আমি চললুম, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে,—

—তা হলে রাজি তো? প্রফিট যখন দেব বলছি তখন তো আর আপত্তি থাকবে না? আমি রীতিমত স্ট্যাম্পড্-পেপারে এগ্রিমেণ্ট করে নেব—

অঞ্জলি হেসে উঠলো—তুমি আমাকেও এগ্রিমেণ্টের কথা শোনাচ্ছো? তোমাদের সিনেমা লাইনের এগ্রিমেণ্টের কথা আমাকেও বিশ্বাস করতে বলো?

জয়ন্ত পেছন-পেছন এগিয়ে এল। বললে—তোমাকে সত্যি বলছি, প্রশান্তর সঙ্গে আমি তা করবো না। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, হলো তো? রাজি তো?

অঞ্জলি ব্যানার্জির তখন আর সময় নেই। শাড়িতে, স্নোতে, জোলুষে, সেণ্টে একেবারে ঝলমলে হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকে এগোল। গাড়িতে আরো অনেকে বসে ছিল তখন। গাড়ি গুলজার বেশ।

জয়ন্ত গলির মুখ পর্যন্ত এসে আর একবার বললে—সত্যি বলো না, রাজি তো?

—আচ্ছা সে আসুক তো আগে।

বলে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। গাড়িটা ছেড়ে দিলে। জয়ন্ত দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর কি মনে করে আবার ভেতরে এসে ঢুকছিল। সেই বুড়িটা সদর দরজা বন্ধ করে দিতে এসেছিল। জয়ন্ত অঞ্জলির ঘরের দিকে যেতে গিয়ে বললে—ঘরে চাবি দিলে কেন?

বুড়ি বললে—অঞ্জলি চাবি দিতে বলে গেছে—

—তা চাবি দিতে বললে আমি ভেতরে ঢুকবো কি করে? আমার যে জিনিস রয়েছে ভেতরে?

বুড়ি বললে—তা জানি নে বাপু, চাবি আমি খুলতে পারবো না, অঞ্জলি বারণ করে গেছে—

জয়ন্ত বিরক্তিতে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললে ফস্ করে। আবার জুতোটা পায়ে গলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। নিজের মনে-মনেই যেন কী ভাবতে লাগলো। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন কেমন উল্টো দিকে ঘুরছে। ছোটবেলা থেকে যেমন চলছিল, তেমন আর চলতে চাইছে না। একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল তাকেই ডাকলে। তারপর ভেতরে উঠতেই ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—কোন্ দিকে যাবেন?

কোন্ দিকে যাবেন? কোথায় যাবে সে? কার কাছে যাবে? ট্যাক্সিতে উঠবার আগে কথাটা তো ভাবা হয়নি। অভ্যেস হয়ে গেছে ট্যাক্সিতে ওঠা। পায়ে হাঁটলে আর মানও থাকে না। অথচ পকেটে টাকাও নেই। কারো কথাই মনে পড়লো না। কোথায় যাবে তারও ঠিক নেই। অথচ উঠে বসেছে। হঠাৎ মনে পড়লো। মিস্টার রামানীর কথা মনে পড়লো।

বললে— বেণ্টিংক স্ট্রীট—

একটা-না-একটা অফিস খোলা থাকবেই বেণ্টিংক স্ট্রীটে। অনেক অফিস ওখানে। ঘটনাচক্রে মিস্টার রামানী ছিল।

গিয়েই জয়ন্ত বললে—দশটা টাকা দিন তো মিস্টার রামানী, মানিব্যাগটা ভুলে ফেলে এসেছি—

এমন ঘটনা নতুন নয় মিস্টার রামানীর কাছে। নতুন ডিরেক্টাররা এমন আসে মাঝে-মাঝে। এসে চা-কফি-সিগারেট খেয়ে যায়। দু' দশটা টাকাও মাঝে-মাঝে নিয়ে যায়। তবে মিস্টার রামানীর এমন-কিছু লোকসান হয় না। এরই মধ্যে থেকে দু'একটা প্রোডিউসার ঘটি-বাটি বেচে, কোনও বড়লোকের ছেলেকে ধাপ্পা দিয়ে ছবি তৈরি করে—তারপর একেবারে চির-জীবনের মত লাইন ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু সেই ফ্লপ্ ছবিই আস্তে আস্তে বহুদিন ধরে খাটিয়ে তার কোনও লোকসানই হয় না। মোটামুটি একটা লাভ থাকে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তারই মধ্যে কোনও রকমে লেগে গেলে ষোল আনাই লাভ। কোন্ ছবি হিট্ হয় বলা যায় না। হিট্ হলে তখন প্রোডিউসারকেও কিছু দিতে হবে না, আর্টিস্টকেও কিছু দিতে হবে না, স্টোরি রাইটার, সিনারিও রাইটার, কাউকেই পুরো দিতে হবে না। কাগজে-কলমে খরচা দেখালেই চলবে। যে-টাকা ইন্‌ভেস্ট করেছে,

তার মোটা সুদ মায় আসল ছবিটা পর্যন্ত গ্রাস করা চলবে।

ট্যাক্সিভাড়াটা দিয়ে এসে জয়ন্ত বসলো আবার। বললে—কই আপনার লোকজন সব কোথায়? চা হবে না?

এ-সব এ-অফিসে কিছুই না। চা সিগারেট খাওয়াতে মিস্টার রামানীর কার্পণ্য নেই।

মিস্টার রামানী বললে—আমি বেশিক্ষণ বসবো না জয়ন্তবাবু—

জয়ন্ত বললে—আমি এত খরচ করে ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে এলুম, আর আপনি চলে যাবেন? আমি কাজের কথা বলতেই তো এসেছি, সেখান থেকেই আসছি এখন আমি—

—কোথা থেকে?

—সেই যে সেদিন আপনার কাছ থেকে গাড়িটা নিয়েছিলুম, সেই পার্টির কাছ থেকেই এখন আসছি। আমাকে খুব ধরেছে ছবি করবার জন্যে! বুঝলেন? স্টোরিটা খুব পছন্দ হয়েছে, এক লাখ টাকা দিতে চায়, আমি বলেছি না বাবা, অত টাকা পেলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে! টাকাকে আমি বড় ভয় করি মিস্টার রামানী! টাকা এমনই জিনিস, ও দিয়েও বিশ্বাস নেই, নিয়েও বিশ্বাস নেই। অনেকটা মেয়েছেলের মত। কখন বিগড়ে যাবে, আমি তখন বিপদে পড়বো!

মিস্টার রামানী বললে—আমি এখন একটু উঠবো জয়ন্তবাবু—

—আমিও উঠবো, আমারও অনেক কাজ রয়েছে—বলে উঠে দাঁড়াল জয়ন্ত।

—কিন্তু একটা কথা, আপনার গাড়িটা আর একদিন একটু চাই!

—কেন?

—আমার হিরোইনকে একদিন বাড়িতে নিয়ে আসবো! তার আবার গাড়ি নেই কিনা।

—কিন্তু বড় গাড়িটা তো পাবেন না—বড় গাড়িটা ওয়ার্কশপে দিয়েছি—সাত দিন অন্তত দেরি হবে,—

—তা সাতদিন পরেই না-হয় নেব! এমন কিছু তাড়াহুড়ো নেই। বড় গাড়ি না হলে ঠিক মানাবে না। আর আপনাকে একদিন দেখিয়ে দেব আমার হিরোইনকে, দেখবেন কী ফিগার, কী ফেসিয়াল য়্যানাটমি!—

মিস্টার রামানী বললেন—নতুন আর্টিস্ট, বক্স-অফিস তো হবে না—

—নতুন আর্টিস্ট হলে কী হবে, তেমনি যে শস্তায় পাবো। নতুন আর্টিস্ট না হলে তিন হাজার টাকায় কেউ কাজ করতে রাজি হবে! তেমনি আপনার কত শস্তায় হয়ে যাচ্ছে! তা ছাড়া আপনি একদিন দেখুন আমার হিরোইনকে—বলেন তো আপনার সঙ্গে একটা ইন্টারভিউ করিয়ে দিই—

—না না, সে পরে হবে।

—পরে হবে কেন? খরচ তো আমার, আপনার তো কিছু খরচ লাগছে না—

শেষবারের মত নিজের চেহারাটা ঘুরে-ঘুরে দেখে নিতে লাগলো

মিস্টার রামানী বললে—না না এখন থাক, আপনি তিন-চার রীল ছবি তুলুন তো, তখন তো দেখবোই—

—কিন্তু ছবি তোলবার আগে আমি একবার হিরোইনকে দেখাতে চাই, আপনি এক্স-ক্লুসিভ করে রাখবেন, তাতে পরে আপনার সুবিধে হবে—

মিস্টার রামানী এ-লাইনের অনেক দিনের লোক। অনেক হিট্ ছবি, অনেক ফ্লপ ছবির মালিক। অনেক হিরোইনকে তুলেছে, নামিয়েছে, অনেকের পেছনে হাজার-হাজার টাকা খরচ করেছে। এ-কথার উত্তর না দিয়ে মিস্টার রামানী উঠে চলতে লাগল দরজার দিকে। জয়ন্তও চলতে লাগলো। তেতলা থেকে একতলায় নামতে হবে। জয়ন্তও নামতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মিস্টার রামানী বললে—আপনি ছবি করুন, আমি তো বলছি, আমি পেছনে আছি—

—শেষে যেন মুশকিলে না পড়ি মিস্টার রামানী!

—না না, ঠিক আছে—বলে মিস্টার রামানী জয়ন্তকে বোধহয় এড়িয়ে যাবার জন্যেই নিজের গাড়িতে ওঠবার ব্যবস্থা করছিল।

জয়ন্ত নিচু হয়ে বললে—আপনি কোন্ দিকে যাবেন মিস্টার রামানী? আমায় একটু লিফ্ট্ দেবেন?

—আপনি কোন্ দিকে যাবেন বলুন?

—আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

মিস্টার রামানী বললে—আমি যাবো টালিগঞ্জে—

—বাস্ বাস্, আপনি আমায় হাজরা রোডের মোড়ে নামিয়ে দেবেন—ওখানে মিউজিক-ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথাটা পাকা করে আসি—

বলে গাড়িতে উঠে বসে দরজা বন্ধ করে দিতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে।

গাড়ি চলছে। মিস্টার রামানী চুপ করে বসে ছিল। জয়ন্ত ছটফট্ করতে লাগলো। হঠাৎ বললে—দেখি মিস্টার রামানী, আপনার সিগারেটটা কী ব্র্যান্ড্ দেখি—

মিস্টার রামানী সিগারেটের কেসটা এগিয়ে দিলে। জয়ন্ত সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লে হুস্ করে। বললে—আপনি এ সিগারেট কী করে খান মিস্টার রামানী, কড়া লাগে না—

তারপর একটু থেমে বললে—আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা নতুন ব্র্যান্ড্ সিগারেট খাওয়াবো, আমার এক ফ্রেন্ড্ ঈজিপ্ট্ থেকে এনেছে, কী ফ্লেভার আপনাকে কী বলবো—চোদ্দ টাকা টিন্, শস্তা বলতে হবে, কী বলেন—আর দেখুন না, আমাদের দেশের সিগ্রেটগুলোর কী অবস্থা, মনে হয় সিগ্রেট খাচ্ছি না তো ঘাস খাচ্ছি—

বক্ বক্ করেই চলেছে জয়ন্ত। মিস্টার রামানী একটা কথাতেও কান দিচ্ছে না। হাজরা-মোড় আসতেই বললে—এই তো হাজরা মোড়, নামবেন না?

—ও হ্যাঁ, মনেই ছিল না, ভাগ্যিস আপনি মনে করিয়ে দিলেন।

জয়ন্ত নামলো।—আচ্ছা, নমস্কার, আমি গাড়ির জন্যে যাবো আপনার কাছে—

গাড়িটা ছেড়ে দিলে। জয়ন্ত বাঁ দিকের রাস্তা ধরে চলতে গিয়ে আবার থেমে ফিরে এল মোড়ের মাথায়। মিস্টার রামানীর গাড়ি অনেকক্ষণ চলে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো জয়ন্ত। এবার কোথায় যাবে? রাত নটা বেজে গেছে। এখন আর কোথায় যাওয়া যায়। একটা ভিখিরি পাশে এসে খালি মগটা বাড়িয়ে দিলে—একটা নয়া-পয়সা বাবু—

—দূর্, দূর্—যা, ছুঁসনি।

তারপর পাশের এক ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললে—দেখছেন মশাই, কী ন্যুইসেন্স্ হয়েছে এই বেগার-প্রবলেম, গভর্নমেণ্ট কিচ্ছু দেখছে না—কেবল বড় বড় লেকচার দিতে পারে—

তারপর হঠাৎ একটা খালি ট্যাক্সির দিকে নজর পড়তেই ডাকলে—ট্যাক্সি-ই-ই-ই—

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেল। জয়ন্ত উঠেই বললে—জল্দি, শেয়ালদা; সুভাষ ইন্স্টি-ট্যুট্—

যেতে আরো আধ ঘণ্টা। অঞ্জলি এখনও থিয়েটার করছে নিশ্চয়ই। আধ ঘণ্টা বসলেই ফাংশন্ শেষ। তারপর টাকা পাবে অঞ্জলি। পঁচাত্তর টাকা। টাকার বাজার বড় টাইট্ হয়ে উঠেছে কলকাতায়। কোথাও টাকা নেই। আগেকার মত আর টাকা আসছে না। কেউ টাকা ছাড়ছে না আজকাল। বড় শাই হয়ে গেছে ক্যাপিটাল। অথচ খরচ বেড়ে গেছে। তা বলে তো আর বাসে-ট্রামে ভদ্রলোকদের যাওয়া চলে না। যারা ক্লার্ক তারা পারে। ওটা তাদের পোষায়। সমস্ত ওয়ার্লড্টা যেন বাঁচবার অযোগ্য হয়ে উঠছে—চলো, জল্দি চলো—জল্দি—

এ শুধু জয়ন্তর একলার নয়। ১৯৪০ থেকেই এই স্পীড্ এসেছে। চলুক লাইফ আরও ফাস্ট্ চলুক। আরো ফাস্ট্। গরুর গাড়ি নয়, ঘোড়ার গাড়ি নয়, সাইকেল নয়, ট্রাম নয়, মটর নয়, বাস নয়, প্লেন নয়, একেবারে রকেট্। রকেটের চেয়েও যদি বেশি কিছু থাকে তবে তাই। গ্রামকে শহর করো, শহরকে আমেরিকা করো। মানুষকে মেশিন করো। আরো, আরো ফাস্ট্। আরো এগিয়ে চলো। কুঁড়ে বাড়িকে একেবারে স্কাইস্ক্রেপার বানিয়ে তোলো। আকাশকে হাত দিয়ে ছোঁও। তারপর আকাশের ও-পিঠে যদি কিছু থাকে, তাকেও ছুঁতে হবে। না-ছুঁতে পারলে ছুঁতে চেষ্টা করতে হবে। মাউন্ট এভারেস্ট্ জয় করা হয়ে গেছে, এবার আরও কিছু উঁচুকে জয় করো। জয় করতে হলে যা লাগে দেব। পিল্ তৈরি করিয়েছি তোমাদের জন্যে। যদি নার্ভ ঢিলে হয়ে যায়, আমাদের পিল্ খাও, চাঙ্গা হয়ে উঠবে। ঘুম না এলে, ঘুম হবে। শরীর মন ফ্রেশ্ হবে। বিপিনবাবু, শচীনবাবুদের পৃথিবী এটা নয়, প্রশান্তদের জন্যেও এ-পৃথিবীটা নয়। এ-পৃথিবী অঞ্জলি ব্যানার্জি, জয়ন্তদের পৃথিবী, মিস্টার রামানী আর মীনাক্ষী সেনদের পৃথিবী। এ-পৃথিবীর সব ডিভিডেন্ড্ তারা একলাই ভোগ করবে। বিপিনবাবু, শচীনবাবু, প্রশান্তরা জন্মেছে হেরে যাবার জন্যে। তারা ডিফিটেড্। তারা পরাজিত। তারা এ-পৃথিবীর ডাস্টবিন—

অঞ্জলি ব্যানার্জির তখনও মেক-আপ্ মোছা হয়নি। রূপোশিল্পী ক্লাবের ম্যানেজার গ্রীনরুমে এসে বললে—বড় মার্ভেলাস্ পার্ট হয়েছে আপনার—

—কিন্তু টাকা?

—টাকা এনেছি, এই নিন—

টাকাটা নিয়ে গুনে ফেললে তাড়াতাড়ি। আগে অ্যাড্ভান্স্ নেওয়া ছিল। এখন বাকিটা দিয়েছে। একটা পয়সা বেশিও নয়, একটা পয়সা কমও নয়। কাঁটায়-কাঁটায় হিসেব করা, মুখের রক্তওঠা টাকা।

—আপনাকে একজন ডাকছেন।

—কে?

—জয়ন্তবাবু—

জয়ন্ত এসে পড়লো। একেবারে ঘরের মধ্যে। চারদিকে দেখে নিয়ে জয়ন্ত বললে—টাকা পেয়েছ?

—কেন?

—শিগ্গির ছ'টা টাকা দাও, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। আমার কাছে কিছু নেই—

—কিন্তু ট্যাক্সি করে এখানে আসতে তোমাকে কে বললে?

জয়ন্ত বললে—সে-সব পরে জিজ্ঞেস করো, মিস্টার রামানীর সঙ্গে সব ঠিক হয়ে গেছে, দু' লাখ টাকা দেবে, এখন সেখান থেকে আসছি, দাও—

টাকা ক'টা নিয়ে জয়ন্ত আবার বেরিয়ে গেল। বললে—আসছি, এক সঙ্গে যাবো—

শচীনবাবু সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক করে ফেলেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সব ছত্রখান হয়ে গেল। বিপিনবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বাড়িতে এসে মনোরমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—খবর ভাল নয়—

—কেন দাদা, কী হলো?

শচীনবাবু বললেন—বিপিনবাবু বলছেন ছেলে তার রাগারাগি করে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে—

শুনে মাথায় হাত দিলে মনোরমা। বললে—তাহলে এখন কী হবে দাদা?

যেন কান্নাকাটি পড়বার মত অবস্থা হলো বাড়িতে। আরো দুর্যোগ ঘটে গেল বিপিন-বাবুর বাড়িতে। রেগে গিয়ে যাচ্ছে-তাই বলে ফেললেন। বিপিনবাবুর স্ত্রী গিয়ে ধরলেন—ওগো, তুমি বলছো কী? তোমার শরীর খারাপ—

বিপিনবাবু তখন থর-থর করে কাঁপছেন। বললেন—আমার মুখের ওপর ওই কথা ও বলতে পারলে?

—তুমি চুপ করো!

চুপ করবার ইচ্ছে না থাকলেও চুপ করতেই হলো বিপিনবাবুকে। সারা গায়ে ঘাম ঝরতে লাগলো। তিনি বোবা হয়ে গেলেন যেন।

এসব সকালবেলার ঘটনা। বিপিনবাবু সাবেকী মানুষ। বরাবর ছেলের বিয়ের বন্দোবস্ত বাপেরাই করে থাকে। এ নিয়ম চিরাচরিত। বিপিনবাবু সেই যুগের মানুষ। শচীনবাবু ভাগ্নীর নামে জমি কিনে রেখেছেন, সে-দলিল পর্যন্ত দেখিয়ে গেছেন। এখন কী হবে? ভদ্রলোকের সঙ্গে কথার খেলাপ্ করবেন ছেলের বেয়াদপির জন্যে? এই শিক্ষাই কি এতদিন তিনি দিয়ে আসছেন ছেলেকে!

—আমি এখানে বিয়ে করবো না!

—তুমি বিয়ে করবে কি করবে না, আর কোথায় করবে, সে আমি বুঝবো, তুমি কে?

—আমি চালাতে পারবো না সংসার, এই টাকাতে!

বিপিনবাবু চিৎকার করে উঠেছিলেন।

—তোমার আসল মতলবটা কী শুনি? কে তোমার মাথায় এই সব ঢুকিয়েছে? কে তারা? কী জাত? নাম কী তাদের?

অথচ এতদিন ধরে ছেলেকে দেখে আসছেন। সেই ছেলেকে নিজের হাতে মানুষ করেছেন। নিজের মনের মত করে গড়ে তুলেছেন। সেই ছেলের কথা শুনে একেবারে

আকাশ থেকে পড়লেন তিনি।

স্ত্রী ধরতে এসেছিল। তিনি তার হাত ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন—ছাড়ো তুমি, আমাকে ধোর না, আমি এর একটা হেস্ত-নেস্ত করতে চাই, কারা ওকে এই মতলব দিয়েছে আগে তাই জানি—

মা বললে—যাক্ না, এখন অফিস যাচ্ছে, এখন না-ই বা বললে, অফিস থেকে এলে ধীরেসুস্থে কথা বোল—

কিন্তু সেই নিরীহ বাধ্য বিনয়ী পিণ্টু যে এমন করে মুখের ওপর কথা বলতে পারে, এ যেন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তাঁর। এত-দিনের সব শিক্ষা-দীক্ষা ভুবে মিথ্যে হয়ে গেল!

—একশো ছেষট্টি টাকায় বিয়ে করা যায় না তো আমরা কী করে তিরিশ টাকায় বিয়ে করেছি? আমরা কি মরে গেছি? আমরা উপোস করেছি?

প্রশান্তর মনে হলো এতদিন যেন কেউ তাকে তার ঘাড় ধরে মাথা নিচু করে রেখে-ছিল, এবার [illegible] গলা টিপে ধরেছে। এত ষড়যন্ত্র তার বিরুদ্ধে হচ্ছে তা কেন তারা আগে জানায়নি তাকে। [illegible] এই [illegible] নিজের বাড়িতেই [illegible] সংসারের [illegible] হয়েছে!

মা তাড়াতাড়ি পিণ্টুকে ধরে দরজার দিকে নিয়ে গেল—এসো, বাবা, এমন করে কথা বলো না, দেখছো ও-মানুষটা রোগে ভুগে ভুগে কাহিল হয়ে আছেন, তার ওপরে ওই রকম করে কথা বলতে হয়?

পিণ্টুর মনেও তখন রাগ গর গর করে উঠেছিল।

—ওঁদের কাছে কী করে মুখ দেখাবেন বলো তো? সব কথা ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে, মেয়ে দেখিয়ে গেছেন, মেয়ের নামে জমি কেনা হয়ে গেছে, এমন পাত্রী কেউ হাতছাড়া করে?

পিণ্টুও বেঁকে বসলো—তা বলে চিরকাল আমি এই কেরানীগিরি করবো?

—তা ভগবান যদি দিন দেন তো, তোমার চাকরিতেও উন্নতি হবে বাবা, চিরকাল কি কারো কষ্ট থাকে?

—তুমি জানো না মা, আমার বন্ধুরো কত বড় হয়ে গেছে, বাবা আমাকে এই রকম চেপে-চেপে রেখে দিয়েই আমার সর্বনাশ করেছেন, জানো তাদের কত বড় বড় গাড়ি? জানো তারা কত টাকা উপায় করে? কত দামি-দামি সিগারেট খায়? দু' হাতে কত পয়সা ওড়ায়?

মা বললে—সে-রকম তোমারও হবে বাবা—

—তুমি তাদের গাড়ি দেখলে অবাক হয়ে যাবে। তাদের কোট-প্যাণ্ট দেখলে চমকে যাবে—এত বড়লোক তারা। বিয়ে করে তুমি কি আমাকে বাবার মতন চিরকাল দেনা করে করে জীবন কাটাতে বলো?

—ছি, ও-সব কথা বলতে নেই,—

—এতদিন তো বলিনি, এতদিন তো সবই সহ্য করেছি আমি, এতদিন তো তুমি যা বলেছ তাই করেছি। একটা কথাও অমান্য করিনি, তোমার সংসারের তেল-নুন, মশলা সব কিনে এনে দিয়েছি—। কিন্তু কেন তোমরা আমার এমন সর্বনাশ করলে? আমি কী পাপ করেছিলুম? আমাকে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করা দরকার মনে করলে না? আমি এতই অপদার্থ?

—চুপ করো বাবা, মাথা গরম কোর না, অফিসে যাও, যা বলবার আপিস থেকে এলে বলবো—

বলে ছেলেকে বিন্দুবাসিনী রাস্তায় পাঠিয়ে দিলে। তারপর পিণ্টু আস্তে আস্তে বাস-রাস্তার দিকে চলতে লাগলো। বিন্দু-বাসিনী অনেকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে রইল। তারপর ঘরের ভেতরে আসতেই দেখলে, বিপিনবাবু বিছানায় পড়ে ঘেমে একেবারে

জয়ন্ত
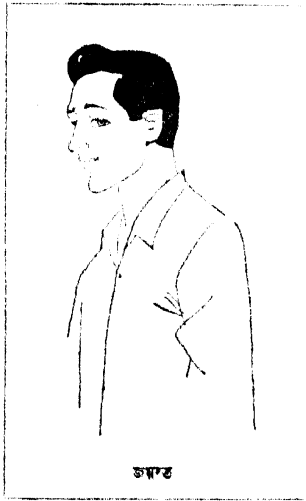
নেয়ে উঠেছেন। একটা হাতপাখা নিয়ে বিন্দু-বাসিনী হাওয়া করতে লাগলো।

বিপিনবাবু রেগে গেলেন। বললেন—তুমি একবার ওঁদের বাড়িতে খবর দাও—এক-বার কথা বলবো শচীনবাবুর সঙ্গে,—

—ওঁদের সঙ্গে এখন কী কথা বলবে? আগে পিণ্টু আপিস থেকে আসুক, ও কী বলে শোন।

বিপিনবাবু রেগে গেলেন। বললেন—পিণ্টুর কথা শুনে আমি চলবো নাকি? ওর জন্যে আমি কথার খেলাপ করতে পারবো না—আমিও কী করে শক্ত হতে হয় জানি—

অফিসে পৌঁছেই প্রশান্ত দেখলে, সেদিন-কার সেই গাড়িটা রাস্তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে—

জয়ন্ত আবার এসেছে নাকি? ঠিক তাই। ভিজিটার্স রুমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে জয়ন্ত।

—আরে, কী খবর? দেখাসাক্ষাৎ নেই। এরকম চেহারা হয়েছে কেন তোর?

প্রশান্তর হাতে খাবারের কৌটো। হঠাৎ জয়ন্তকে যেন অন্য দিনের চেয়ে বেশি ভালো লাগতে লাগল। বড় সুখী যেন সে। জয়ন্তকে দেখে মনের সব কুয়াশা যেন এক নিমেষে কেটে গেল।

—আমি যেতে পারিনি ভাই, অথচ রোজই যাবো মনে করি। এদিকে অফিসের পরেই বাড়ি ফিরতে হয় তাড়াতাড়ি—

জয়ন্ত বললে—তাহলে এখনই চল—আমার তো গাড়ি রয়েইছে—

—যাবো? কিন্তু এখন তো অফিস! এখন যাবো কী করে?

হঠাৎ নজরে পড়লো জয়ন্তর পোশাকের দিকে, জয়ন্তর সিগারেটের দিকে। মনে পড়লো বাইরে দাঁড়ানো গাড়িটার কথাও। নিজেকে যেন বড় অকিঞ্চিৎকর মনে হলো জয়ন্তর কাছে। আর বড় ছোট। নিজেকে ঘেন্না করতে ইচ্ছে হলো। সেইখানে দাঁড়িয়েই, জয়ন্তকে দেখে বড় হিংসে হতে লাগলো। যেন জয়ন্ত তার সামনে মূর্তিমান মুক্তি। জয়ন্তই তাকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে।

জয়ন্ত বললে—তোর চেহারা এরকম হলো কেন রে? শরীর খারাপ?

প্রশান্ত বললে—না শরীর নয়, মনটা ভাল নেই—

—কেন, মনের কী হলো?

প্রশান্ত বললে—সে অনেক কথা, পরে বলবো। আজ [illegible] যা কখনও করিনি, তাই করেছি ভাই। বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে এসেছি, মাথাটা টিপ টিপ করছে তখন থেকে—

জয়ন্ত বললে—তা হলে আজ আর অফিসের কাজ করবি কী করে?

এখনও চাকরির কাজে মন বসেনি [illegible] হয়নি। কিন্তু অফিসে এসে অফিস না-করাটাও কেমন লাগবে!

—ভাই, আমার বাড়ি যেতেও ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে কোথাও চলে যাই—

—কোথায় যাবি বল? যেখানে যেতে ইচ্ছে করে সেখানে আমি তোকে নিয়ে যেতে পারি, আমার গাড়ি রয়েছে—

প্রশান্ত বললে—না, তুই বরং আর এক-দিন আসিস, আমার কিছু ভাল লাগছে না, মাথা টিপ টিপ করছে, কাজ করতেও ভাল লাগছে না, কারো সঙ্গে কথা বলতেই ভাল লাগছে না—তুই এখন যা, পরে একদিন আসিস—

বলে সোজা ক্যাশ অফিসের দিকে চলে গেল। আর দাঁড়াল না, কোথা দিয়ে যে সমস্ত দিন অফিসের ভেতর কেটে গেল, তাও যেন টের পাওয়া গেল না। কখন ক্যাশ ভাউচারগুলো খাতায় পোস্ট করেছে, কখন খাতা জমা দিয়েছে পশুপতিবাবুর কাছে। কখন রমেশবাবু কী বলেছে, তাও যেন কানে গেল না। রমেশবাবু একবার বললেন—কী হলো প্রশান্তবাবু, মুখটা শুকনো দেখছি কেন?

'—না এমনি।

—রাত্তিরে ঘুম হয়নি বুঝি?

তারপর কথা বলবার ছলে অনেক গল্প করতে এল রমেশবাবু। থিয়েটারের গল্প, হিন্দী ছবির গল্প, ক্লাবের গল্প। আজ আর কোনও দিকেই ভাল করে মন গেল না।

রমেশবাবু বললেন—আমারও ওরকম এক-একদিন হয়, কিছু ভালো লাগে না, তার-পর কিছুদিন পরেই আবার সব ঠিক হয়ে যায়—

প্রশান্ত বললে—কেবল মনে হচ্ছে কোথাও চলে যাই, আর বাড়ি ফিরতেই ইচ্ছে করছে না—

হাসতে হাসতে রমেশবাবু বললেন—একটা বিয়ে করে ফেলুন—

প্রশান্ত বললে—সেই নিয়েই তো ঝগড়া বাবার সঙ্গে—বিয়ে যে করবো, খাওয়াবো কী? আপনি তো আমাদের বাড়ি যাননি, দেখেননি সে কী বাড়ি, আমার এই মাইনের টাকাতেই তিনজনের ভরসা, জানেন। যাকে বিয়ে করবো, তাকেও কষ্ট দেব, নিজেরাও কষ্ট পাবো—

—তা কলকাতায় বড়লোক ছাড়া কি আর বিয়ে করছে না কেউ? কী যে বলেন?

প্রশান্ত বললে—আপনার কথা ছেড়ে দিন, আপনারা তিন ভাই, তিন ভাইতে চাকরি করছেন, পৈতৃক বাড়ি—আপনাদের সঙ্গে আমার তুলনা? আমার মা এক ছটাক সরষের তেল সেদিন কিনতে দিয়েছে আমায়, জানেন? আমার নিজের ওপরেই নিজের ঘেন্না হয়ে গিয়েছে রমেশবাবু, তাই ভাবি আমরা সত্যিই সমাজের ডাস্টবিন—আমাদের বেঁচে থাকাও পাপ—

হাসতে লাগলেন রমেশবাবু, বললেন—আপনি তো ভালো থিয়েটার করতে পারবেন প্রশান্তবাবু—

প্রশান্ত বললে—তা থিয়েটার করতে পারলেও যে বেঁচে যেতুম রমেশবাবু, সে ক্ষমতাটুকুও ভগবান দেননি। সেদিন যদি আমাকে ফিল্ম-স্টুডিওতে যাওয়ার জন্যে বাবা বকাবকি না করতেন তো আজকে হয় ত আমি একজন নামজাদা ডিরেক্টার হয়ে যেতুম—

তারপর একটু থেমে বললে—আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম জয়ন্ত, সে অবশ্য একটু একটু মদ খায়, কিন্তু সে যে গাড়ি চড়ে, তা দেখলে আপনি চমকে যাবেন, সে যে সিগারেট খায়, তা দেখেও আপনি অবাক হয়ে যাবেন, আর আমি ট্যাক্সি চড়া দূরের কথা, সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামে চড়তেও পয়সা দিতে গা কর কর করে—

আবার একগাদা ক্যাশ-ভাউচার এসে গেল। সেই ভাউচারের মধ্যেই ডুবে গেল প্রশান্ত। সেদিন সমস্তটা বিকেল যেন ভাউচারের বন্যায় ভেসে গেল ক্যাশ-অফিস। প্রশান্তর মনে হলো—যেদিন মন খারাপ থাকে, সেই দিনই যেন যত কাজের চাপ এসে জমে।

সেদিন অঞ্জলির থিয়েটারও নেই, রিহার্সালও নেই। বলতে গেলে ছুটি। সবে তখন মাকে মাথা ধুইয়ে খাইয়ে নিজের ঘরে একটু গিয়ে গড়াবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ মনে হলো কে যেন দরজা ঠেলছে। দুপুর-বেলা আর কে আসবে।

—মাইমা, দেখ তো কে এল আবার অসময়ে?

বুড়ি মানুষ। বিধবা। আত্মীয়ও নয়, অথচ ঝিও নয়। বহুদিনের গলগ্রহ। সেই বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন থেকেই আছে। মার অসুখের পর থেকে বাজার করা, রান্না করা, রেশন আনা থেকে আরম্ভ করে সর্বকিছু মাইমারই ঘাড়ে। মাইমা না থাকলে কে দেখতো অঞ্জলির সংসার। অন্য সময় মাইমা-ই দরজা খুলে দেয়, দরজা বন্ধ করে।

—একি, তুমি?

জয়ন্ত বললে—মিস্টার রামানীর গাড়িটা নিয়ে এসেছি, চলো, আজ তো তোমার রিহার্সালও নেই, থিয়েটারও নেই—চলো—

—কোথায়, তা তো বলবে?

জয়ন্ত বললে—আর কিছু টাকা সঙ্গে নাও, কোথাও খেতে-টেতে হবে তো? কত আছে তোমার কাছে?

শেষ পর্যন্ত অঞ্জলি আর রাজি না-হয়ে পারেনি। একটা সিল্কের শাড়িও পরে নিয়ে-ছিল। থিয়েটার করতে যাবার আগে যে-সাজ পরে, সেই সাজই পরে নিয়েছিল। জয়ন্তই সাজবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল বেশি।

অঞ্জলি বললে—এত সাজ কার জন্যে শুনি? কার কাছে নিয়ে যাবে? কোনও প্রোডিউসারের কাছে?

—তুমি চলো না, পরে বলবো!

সেই ১৯৬০ সালের কলকাতার সঙ্গে এই ১৯৬২ সালের কলকাতার যেন কোনও তফাৎই আর রইল না তখন। তফাৎ যদি কিছু থেকেই থাকে তো, সে বাইরের। ভেতরে সে-কলকাতা সমান। হুতোম-প্যাঁচার সে কলকাতা যেন এই এখন আরো সত্যি হয়ে উঠল। তারপর সেই বিকেলবেলা ধার করা গাড়ি, ধার করা জেল্লুস আর-একবার রাস্তায় বেরোল অন্তঃসারশূন্যতার বিজ্ঞাপন ছড়াতে-ছড়াতে। সভ্য মানুষের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা সেদিন লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল।

মিস্টার রামানীর অফিসের সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়াল। জয়ন্ত বললে—তুমি দাঁড়াও, আমি দেখে আসি মিস্টার রামানী আছে কি না—

অঞ্জলি অবাক হয়ে গেছে। বললে—কী হলো, আবার টেস্ট দিতে হবে নাকি আমাকে?

—না, না, একটা চান্স নিচ্ছি, তোমার ফিগারটা দেখিয়ে বেটার মাথাটা ঘুরিয়ে দিতে পারি কিনা চেষ্টা করে দেখি—

—তা সেই জন্যেই আমাকে এত সাজতে বললে?

কিন্তু ততক্ষণে জয়ন্ত তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেছে। অঞ্জলি চুপ করে গাড়িতে বসে রইল। খানিক পরে জয়ন্ত আবার ফিরে এল। ফিরে এসে গাড়িতে উঠে বললে—বেটা নেই অফিসে, ভাগ্যটা ভালো, নইলে তুমি আছো, আজ ওর নির্ঘাত মাথাটা ঘুরিয়ে দিতুম। তারপর ড্রাইভারকে বললে—চলো—

—গাড়িটা কী বলে চাইলে ওর কাছে?

—বললাম পার্টিকে একটু তোয়াজ করতে চাই, পেট্রল আমি দেব। বেটা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি তো!

—তা তোমার পার্টি কে?

—পার্টি মানে ফাইন্যান্সিয়ার। আমি পঁচিশ হাজার টাকা ফেলবো, সেটাই তো ও চাইছে। তখন তোমাকে দেখিয়ে দু'লাখ টাকা আদায় করবো।

অঞ্জলি বললে—আমাকে দেখিয়ে মানে?

—তা তুমি একদিনের জন্যে ওর সঙ্গে এক মটরে ঘুরে আসতে পারবে না?

—কোথায় ঘুরবো?

—এই ধরো দু'জনে চলে গেলে আগ্রা, দিল্লী, রাঁচী, হাজারীবাগ, যেখানে হোক...

অঞ্জলি রেগে গেল। বললে—তুমি বলছো কী? আমি তো বলেছি তোমাকে ও-সব আমি আর পারবো না, আমার ভাল লাগে না ওসব, আমার এই থিয়েটারও আর ভাল লাগে না—

এ-কথার উত্তর না দিয়ে ড্রাইভারকে জয়ন্ত বললে—ডান দিকে চলো—

গাড়ি ডান দিকে ঘুরলো। তারপর একটা অফিসের সামনে এসে থামলো। সামনে দেয়ালের গায়ে তামার গোল চাকতির ওপর বড়-বড় হরফে লেখা রয়েছে—টার্নবুল এন্ড জনসন কোম্পানী। ইন্‌করপোরেটেড ইন্ ইংল্যান্ড। এক্সপোর্টার্স এন্ড ইমপোর্টার্স।

—এখানে দাঁড়াতে বললে কেন?

জয়ন্ত বললে—এখানে প্রশান্তর অফিস—পাঁচটা বাজলেই প্রশান্ত বেরোবে—একটু দাঁড়াও—

—প্রশান্তবাবুর সঙ্গে কী দরকার?

জয়ন্ত বললে—ও টাকা দেবে বলেছিল—

—কীসের টাকা?

—ছবির জন্যে ও টাকা দেবে বলেছিল—একটু দাঁড়াও—আমি এখুনি আসছি—

হঠাৎ ঢং ঢং করে ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো। লোকগুলো যেন তৈরিই ছিল। হুড় হুড় করে বেরোতে লাগলো গেট দিয়ে। পাশাপাশি যত গেট ছিল, যত সদর ছিল সব মানুষের মাথায় ভরে গেল। সব ছুটেছে। চলতি বাসের, চলতি ট্রামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো

ঊর্ধ্বশ্বাসে। এক অভাবনীয় দৃশ্য সে। ঘরে ফেরার আগ্রহ, বাড়ি ফেরার উদ্বিগ্নতা, বাসের পাদানিতে একটা পায়ের ভগ্নাংশ রাখার জায়গা পাওয়া, সব মিলিয়ে কলকাতার সে-মত্ততা অঞ্জলি ব্যানার্জির চোখের ওপর অদ্ভুত ক্রিয়া করতে লাগল। অঞ্জলি ব্যানার্জিও এ-পাড়ায় এসেছে অনেকবার থিয়েটারে রিহার্সালের প্রয়োজনে। কিন্তু এ-সময়ে কখনও আসেনি। এখান থেকেই তাকে তার অন্ন সংগ্রহ করতে হয় সত্যি, কিন্তু দিনের বেলার সেই এলাকার যে এ-চেহারা তা এতদিন দেখা হয়নি। আজ দামী গাড়ির ভেতরে বসে বসে এ-দৃশ্য দেখতে বেশ লাগছিল। জয়ন্ত চলে গেছে। অঞ্জলির আজ কাজই নেই। থিয়েটারও নেই, রিহার্সালও নেই। যেন তার আলস্যের অন্তরঙ্গতা দিয়ে এই দেখা-ডালহৌসি স্কোয়ার নতুন এক ডালহৌসি স্কোয়ারে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

—এই দেখ কাকে ধরে এনেছি।

—আসুন, আসুন নমস্কার!

জয়ন্ত একেবারে প্রশান্তকে ধরে এনে গাড়িতে তুলেছে। এনে অঞ্জলির পাশে বসিয়ে দিয়েছে একেবারে। প্রশান্তর ময়লা সার্ট, পায়ে চটি, হাতে রুমালে বাঁধা খাবারের কৌটো। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছিল তার। যে-গাড়ি সে রাস্তায় চলতে দেখেছে, আজ নিজেই সেই গাড়ির ভেতরে। এ-ও যেন অভাবনীয়। আজ সকাল বেলা বাবার সঙ্গে অত তুমুল ঝগড়া করাও যেমন অভাবনীয়, আর আজকেই বিকেলে এই গাড়ি চড়াটাও তেমনি অভাবনীয়।

—তুই অত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছিস কেন, পেছনে হেলান দে, ভাল করে হেলান দিয়ে বোস্—

অঞ্জলিও একটু সরে বসবার চেষ্টা করলে। বললে—আপনি আরাম করে বসুন না—

এই কলকাতা। ছোটবেলা থেকেই এই কলকাতায় বড় হয়েছে প্রশান্ত। বড় হয়ে কলেজে পড়েছে ভবানীপুরে। তারপর আর একটু বড় হয়ে এই ডালহৌসি স্কোয়ারে। গাড়িটা শোঁ শোঁ করে ছুটছে। এই রাস্তা-গুলো বহু দিনের বহু বছরের চেনা। বহুদিন লাফিয়ে ট্রামের সেকেন্ড ক্লাশে উঠতে হয়েছে। মানুষের ধাক্কা খেয়েছে। লোকের গালাগালি খেয়েছে। বাড়ি ফেরবার জন্যে প্রথম ট্রামটায় উঠতে গিয়ে কতদিন ট্রামের চাকার তলায় পড়ে যাবার অবস্থা হয়েছে। আজ সেই বাড়িতে ফিরে যাবার আগ্রহও যেন তার নেই। অফিসে বসে বসেই ভাবছিল, কেমন করে আবার বাড়িতে গিয়ে বাবার কাছে মুখ দেখাবে সে। কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াবে সেখানে? কোন সাহসে গিয়ে সদর দরজার কড়া নাড়বে? গলির সামনেই শচীনবাবুর বাড়ি। তাঁরাও দেখবেন সে বাড়ি ফিরছে। মাথা নিচু করে ফিরছে।

—এই দেখ কাকে ধরে এনেছি।

কিন্তু তিনি যদি হঠাৎ রাস্তায় ডেকে থামিয়ে কৈফিয়ৎ চান তো কী কৈফিয়ৎ দেবে তাঁকে প্রশান্ত? কেমন করে বলবে তাঁকে যে, সে এই পৃথিবীতে এসে টিকটিকি-গিরগিটি হয়ে বাঁচতে চায় না, তাকে যদি বেঁচে থাকতে হয় এখানে তো সে সিংহের মত বাঁচবে। নিজের সমস্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে করতে বাঁচবে। যদি এই কলকাতাতেই সে থাকে তো এই রকম কলকাতার বুকের ওপরই সদম্ভে থাকবে।

ট্রামের সেকেন্ড-ক্লাশের এক-কোণের নিরাপত্তা নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা সে করবে না। সে-ও মাথা তুলে মানুষ হবে!

ঈশ্বর বোধহয় তার মনের ইচ্ছেটা শুনতে পেয়েছিলেন। নইলে সকাল বেলা যে জয়ন্ত একবার এসেছিল সে আবার বিকেল বেলা ঠিক অফিসের ছুটির সময়েই বা আসবে কেন?

আজকে কেউ আর তাকে চিনতে পারছে না। সমস্ত অফিস-পাড়ার লোককে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো—ওগো দেখ, আমি আজ গাড়িতে চড়ে যাচ্ছি। যে গাড়িতে শুধু বড়লোকরা চড়ে, সেই গাড়িতেই। এরা আমাকে নিজেরা এসে গাড়িতে তুলে নিয়েছে। এরা আমার বন্ধু।

আমার এ-পাশে কে বসে আছে দেখো, আর ও-পাশেও কে বসে আছে দেখো! একদিন এদের দুজনেরই নাম দেয়ালে-দেয়ালে দেখতে পাবে। এদের সঙ্গে পরিচয় করতে পারলে ধন্য হবে। এদের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হবে। আমি এদেরই বন্ধু, এদের পার্টনার—এই আমি এই প্রশান্ত চক্রবর্তী—

গাড়িটা একটা জায়গায় থামতেই একটা অল্প ঝাঁকুনি লাগলো। হঠাৎ চারদিকে চেয়ে দেখলে প্রশান্ত। চৌরঙ্গী। এই

চৌরঙ্গী! এর সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কত দিন বাসের জন্যে হা-পিত্যেশ করেছে প্রশান্ত। হঠাৎ এক-একদিন ট্রাম-বাসের স্ট্রাইক হলে অকুল-পাথারে পড়েছে। আশে-পাশে হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলোর ভেতরের দিকেও চেয়ে দেখেছে। কিন্তু গাড়িটা থামতেই একটা দরোয়ান এসে গাড়ির দরজাটা খুলে দিল। দিয়ে হাতের ছড়িটা বাঁ-বগলে চেপে ডান হাতে লম্বা মিলিটারি স্যালিউট্ করলে। একপাশে জয়ন্ত আর এক পাশে অঞ্জলি, মাঝখানে প্রশান্ত সেই ময়লা সার্ট, শস্তা স্লিপার আর হাতে খাবারের কৌটো নিয়ে দামী কার্পেট মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলতে লাগলো।

—এখানে কেন নিয়ে এলে ভাই? এখানে কেন?

—এই একটু বসবো, গল্প করবো।

একটু পরেই ঠাণ্ডা এক ঝলক্ হাওয়া চল্‌কে গেল গায়ের ওপর দিয়ে। সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল। মনটাও। আশে-পাশে আরো কয়েকজন লোক, কয়েকজন ইউ-রোপিয়ান, কয়েকটা মেমসাহেব। কোথাও বিশেষ শব্দ নেই। সবাই কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটছে। একটা মিষ্টি গন্ধ চারদিকে। যেন কোথাও কেক্ ভাজা হচ্ছে। প্রশান্ত কখনও কলকাতার বাইরে যায়নি। এই ধুলো-ধোঁয়া-ময়লার সহরের বাইরের স্বপ্নও দেখেনি, বোম্বাই দেখেনি, দিল্লি দেখেনি, মাদ্রাজ দেখেনি। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন, মস্কো, টোকিও কিছুই দেখেনি। মাঝে-মাঝে অফিসে আসা ম্যাগাজিনে ছবি দেখেছে। বাদামতলার টিনের বাড়ির লোহা-কাঠের তক্তপোষে শুয়ে রাত ফর্সা করে দিয়েছে। কোথায় হাওয়াই দ্বীপে ঝিনুকের মালা গলায় দিয়ে একটা মেয়ে নাচছে, আর তার পাশে নারকোল গাছে হেলান দিয়ে কে গীটার বাজাচ্ছে, তার রঙিন ছবি ক্যালেণ্ডারের পাতায় কত ছাপা হতে দেখেছে, কিন্তু কখনও সেদিকে অপলক দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখেনি। ভেবেছে ও-জীবন বই-এর ছবিতে থাকাই নিয়ম, ক্যালেণ্ডারের পাতায় ছাপা হওয়াই রীতি, ভূগোলের ছাত্রদের পক্ষেই অপরিহার্য। কিন্তু আজকে এইখানে এই বিচিত্র জায়গায় এসে মনে হলো সে যেন সেই ক্যালেণ্ডারের ছবির জগতেই ঢুকে পড়েছে। একেবারে সশরীরে অ্যারে-বিয়ান নাইটস্-এর নায়ক হয়ে উঠেছে—

—এটা কী? সরবৎ?

লাল নরম গদী মোড়া চেয়ার বেঞ্চি সাজানো। সামনে কাচ-ঢাকা টেবিল। বোধ-হয় কোথাও গান হচ্ছে। মিষ্টি মেম-সাহেবদের গলার আওয়াজ আসছে। জয়ন্ত বয়টাকে কী যেন বললে। সে সেলাম করলে। পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে নোট এগিয়ে দিলে। সেই হলদে প্যাকেট খুলে সিগারেট খাচ্ছে। বড় সুন্দর দেখতে লাগলো জয়ন্তকে। জয়ন্তর কাছেই সে শুনেছিল প্রথম—ওরা হচ্ছে ফসিল। হিস্ট্রীর ফসিল। ওই স্বামী বিবেকানন্দ, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর। আজ জয়ন্তর কথাটা যেন সত্যি বলে মনে হলো। জয়ন্তরাই তো ইণ্ডিয়াকে প্রগ্রেস করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই জয়ন্তই ছবি তৈরি করবে। এই মীনাক্ষী সেনই হিরোইন হবে। সেই ছবি ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হবে। বার্লিন, সানফ্রান্সিসকো, মস্কো, চেকোস্লোভাকিয়ার লোক সে-ছবি দেখবে। দেখতে দেখতে কাঁদবে হাসবে, হাততালি দেবে। বলবে থ্রী চীয়ারস্ ফর ইণ্ডিয়া, থ্রী চীয়ারস্—

জয়ন্ত তাকে সব বলেছে। ইণ্ডিয়ার সামনে গ্রেট্ ফিউচার পড়ে আছে। যারা জিনিয়াস্, যারা প্রতিভা, তারা অফিসে ক্লার্কগিরি করে জীবন নষ্ট করলে ইণ্ডিয়ারই ক্ষতি। তারা সাধারণ হয়ে জন্মাতে আসেনি। ডাল-ভাত-চচ্চড়িতে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন কাটাতে আসেনি। তারাই সামনে এগিয়ে আসুক। তাদের জন্যে ছোট সংসারের নিরুপদ্রব শান্তি নয়, তাদের জন্যে সন্ধ্যে-বেলায় তুলসীতলার স্নিগ্ধ দীপালোকও নয়, তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রগ্রেসের বেদীতে। তোর মত, আমার মত, অঞ্জলির মত ছেলে মেয়ে সবাইকে দরকার। কারণ এ আর্টের প্রশ্ন, এ সংস্কৃতির প্রশ্ন। যুগ যুগ আগে বুদ্ধ চৈতন্য যা ভেবেছিলো, আজকে আমাদেরই তাই ভাবতে হবে। সেই প্রাচ্যকেই আবার পাশ্চাত্যের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির বাণী পৌঁছিয়ে দিতে হবে। আজকে পাড়ায়-পাড়ায় ক্লাবে-ক্লাবে সেই সাধনাই তো চলছে—

—কী ভাবছেন আপনি?

অঞ্জলি ব্যানার্জির গলা শুনে প্রশান্ত ফিরে দেখলে। বললে—আগে জানা থাকলে ধোপা-বাড়ির কাচানো জামা-কাপড় পরে আসতুম—

অঞ্জলি ব্যানার্জি বললে—কই, আপনার জামা-কাপড় তো ময়লা নয়—

—কিন্তু এগুলো আমি সেই সোমবারে ভেঙেছি—

—কিন্তু আপনাকে তো আমার ভালোই লাগছে দেখতে!

প্রশান্তর তবু যেন সন্দেহ গেল না। জিজ্ঞেস করলে—সত্যি বলছেন, আমাকে দেখতে ভাল লাগছে?

অঞ্জলি ব্যানার্জি সেই সিল্কের খস্-খসানি আর ঠোঁটের লিপস্টিক নিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো। সেই হাসির সঙ্গে প্রশান্তও যেন কেমন আরো অন্যমনস্ক হয়ে গেল হঠাৎ। হঠাৎ ক্যালেণ্ডারের হাওয়াই দ্বীপের ছবিগুলো চোখের ওপর ভেসে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তর মনের ভেতরের সব চাপা কামনা-বাসনাগুলো তোলপাড় করে উঠলো। আর প্রশান্তর মনে হলো যেন সে বড় সুখী, বড় সন্তুষ্ট। যা কিছু সে জীবনে চেয়েছে সব পেয়ে গেছে।

—আমার খুব ভাল লাগছে জয়ন্ত!

জয়ন্ত বললে—ভালো তো লাগবেই, যা দেখছিস এইটেই জীবন—

অঞ্জলি ব্যানার্জি বললে—আপনি স্থির হয়ে বসুন, লোকে দেখে কী ভাববে—

জয়ন্ত বললে—তুমি থামো, দেখুক গে, এখানে লাইফ আছে, এখানে কেউ কারো দিকে চেয়ে দেখে না—চেয়ে দেখবার মত সময় নেই কারো—

প্রশান্তর চোখ মুখ তখন জ্বলে উঠেছে। বললে—জানিস জয়ন্ত, তুই যা বলেছিলি, তাই দেখছি ঠিক—

—কী বলেছিলুম?

প্রশান্ত বললে—বাবার কাছে এতদিন যা কিছু শুনে এসেছি, সব মিথ্যে—! এরা কি কেউ ভালো লোক নয়? কেউ সত্যি কথা বলে না? সব্বাই মিথ্যেবাদী? যারা এখানে বসে আছে, হাসছে, গোলমাল করছে, সব মিথ্যেবাদীর দল? সব দুঃখ পাচ্ছে? সব কষ্ট পাচ্ছে?

জয়ন্ত বললে—তুই নিজের চোখেই দেখ্, এইটেই লাইফ, এতদিন কলেজের টেক্সট্ বইতে যা পড়ে এসেছিস, বাবা-মা'র কাছে যা শুনে এসেছিস সব মিথ্যে, মনে রাখিস। আসলে যারা বড়লোক, যারা কোটিপতি তারাই পয়সা খরচ করে সেই সব বইগুলো লিখিয়েছে। আমরা যাতে গরীব হয়ে থাকি, সেই জন্যে ওইগুলো আমাদের পড়িয়েছে, আমাদের মুখস্থ করিয়েছে। বইতে লেখা আছে মদ খাওয়া খারাপ, দেখেছিস তো? বইতে লেখা আছে অর্থ অনর্থ, দেখেছিস তো? আসলে সব মিথ্যে কথা—সবাই মদ খাচ্ছে, সবাই টাকা ওড়াচ্ছে—

প্রশান্ত আর একবার গেলাসটায় চুমুক দিলে। চিনেবাদাম চিবোতে লাগলো। অস্থির হয়ে উঠলো।

—ওই দেখ্, ওই যে ওইপাশে একটা লোক একটা মেয়ের পাশে বসে চিনেবাদাম খাচ্ছে, ও-লোকটা একটা স্টীল ফ্যাক্টরীর মালিক, মান্থলি আয় তিন লক্ষ টাকা। ও ওর স্টাফকে রোজ বলে—তোমরা সৎপথে থাকবে, তোমরা মন দিয়ে কাজ করবে, আর নিজে এখানে বসে......

—আর ওই দেখ, ওই যে মোটা ভুঁড়ি নিয়ে একটা লোক গোগ্রাসে গিলছে, ও লোকটা একটা প্রফেসার, কলেজে পড়ায়, এখানে এসেছে রিলাক্স করতে; ছাত্ররা দেখতে পাবে বলে এইখানে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ গিলছে।

—আর ওই দেখ্, ওই যে ওপাশে একটা

লোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লেকচার দিচ্ছে কাকে, ও একটা কমিউনিস্ট, মাঠে-মাঠে লেকচার দিয়ে বেড়ায়, জিনিসের দাম বাড়ছে বলে গভর্নমেন্টের এগেনস্টে ক্ষেপায়, ও-ও এখানে এসেছে—

—আর ওই যে একটা খদ্দর পরা বুড়ো, ও লোকটা দেশের জন্যে লাখ-লাখ টাকা কংগ্রেসকে চাঁদা দিয়েছে, জানিস্, নিজেও ব্রিটিশ আমলে জেল খেটেছে, এখন এখানে এসেছে ফুর্তি করতে, বাইরের লাইফটা ওর কিছু নয়, এইটেই ওর আসল লাইফ! এই তো অঞ্জলি জানে, অঞ্জলিকে জিজ্ঞেস কর্, অঞ্জলি আগে পয়সার অভাবে ম্যাসাজ ক্লিনিকে চাকরি করেছে, ও ওদের সকলকে চেনে—তুমি চেনো না অঞ্জলি, বলো?

অঞ্জলি যেন বিরক্ত হলো। বললে—আঃ, থামো না তুমি!

—কেন, থামবো কেন? কীসের জন্যে থামতে যাবো?

প্রশান্ত বললে—না তুই থামিস্ নি জয়ন্ত, তুই আরো বল্, আমার খুব ভাল লাগছে—

জয়ন্ত বললে—বলবোই তো, আমাদের ঠকিয়ে একদল লোক বড় হবে, তা কিছুতেই হতে দেব না, আমরাও ঠকাবো, দেখি না কে জেতে—? তোমরা বলবে এক রকম, আর করবে এক রকম—তা হবে না। দেখেছিস তো প্রশান্ত, আজকাল কত থিয়েটারের ক্লাব হয়েছে, দেখেছিস তো?

প্রশান্ত বললে—হাতীবাগান ক্লাব দেখেছি—

—শুধু হাতীবাগান কেন, নেবুবাগান, চালতা বাগান, কেরানী বাগান, বাগানের কি অভাব আছে? যত সব ড্রামাটিক ক্লাব গজিয়ে উঠলো রাতারাতি সব নাকি 'সংস্কৃতি-সংঘ'! সব লোক থিয়েটার-পাগলা হয়ে গেল। লোকে নিন্দে করে—আমি বলি বেশ হয়েছে, এবার সব ওলোট-পালোট করে দিয়ে ছাড়বো! সত্য, ধর্ম, মনুষ্যত্ব ও-সব কথাগুলো শুধু ডিক্সনারীতে লেখা থাকবে, ডিক্সনারীর বাইরে ও-সব কথা উচ্চারণ করতে দেব না কাউকে—দেখবো এরা কী করে!

প্রশান্ত হো হো করে হেসে উঠলো। একেবারে সশব্দ বুক-ফাটা হাসি। সে-হাসির তরঙ্গে হোটেলের ঘেরা-ঘরটা টইটুম্বুর হয়ে উঠলো। প্রশান্ত পিঠ চাপড়ে দিলে—এই তো চাই, ভাই! সেই-ই বুঝলি, শুধু একটু দেরি করে বুঝলি—এই যা দোষ তোর!

অঞ্জলি ব্যানার্জি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো। প্রশান্তর হাত থেকে গেলাসটা কেড়ে নিলে। বললে—আর খাবেন না আপনি, আর খেতে পারবেন না—

—কেন? আমার যে খুব ভাল লাগছে? আমি আরো খেতে পারবো। সত্যিই ভালো লাগছে।

—আগুন—

তারপর জয়ন্তর দিকে চেয়ে বললে—তুমি কী বলো তো? তোমার একটু মায়া-দয়া নেই?

জয়ন্ত বললে—ওর ভালো লাগছে, তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?

প্রশান্ত বললে—হ্যাঁ, আপনিও খান, আপনি খাচ্ছেন না কেন?

অঞ্জলি প্রশান্তর হাত ধরে টানতে লাগলো। বললে—আপনি উঠুন এবার, দের হয়েছে, উঠুন বলছি—

—অঞ্জলি!

অঞ্জলি ব্যানার্জি জয়ন্তর মুখখানার দিকে তাকিয়ে আর কথা বলতে পারলে না ভয়ে।

জয়ন্ত কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে ভয় দেখালে, বললে—খবরদার, যা বলেছি তাই করো—নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, সব ভেস্তে যাবে, আমি—আমি ডুবে যাবো একেবারে—

বাদামতলায় তখন রাত হয়ে গিয়েছে অনেক। যতীশ ভট্টাচার্য বুড়ো মানুষ। কিন্তু অন্ধকারেই লাঠি নিয়ে শচীনবাবুর বাড়িতে এলেন।

বললেন—শুনেছেন? বিপিনবাবুর ছেলের কীর্তি শুনেছেন?

শচীনবাবু বারান্দায় রোজই ইজি-চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে থাকেন। কথাটা শুনেই সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—কী হয়েছে?

—না শুনে থাকলে আর শুনে কাজ নেই, ও না-শোনাই উচিত! বিপিনবাবুর ছেলের কথা বলছিলুম......ছি ছি......

—কী, হলো কী, বলুন না?

—আমার মেজ জামাই এখুনি বাড়িতে এসেছে, আমার মেজ জামাইকে দেখেছেন তো, র‍্যালি ব্রাদার্সে কাজ করে—

—হ্যাঁ, দেখেছি, জুতো মশ্ মশ্ করে এখান দিয়ে যায়—

—নতুন জুতো একটু মশ্ মশ্ শব্দ করেই ও-রকম, আমার জুতোও করে, চিনে বাড়ির জুতো কি না, চিনে বেটারা......

—তা বিপিনবাবু ছেলে পিণ্টুর কী হয়েছে বলুন শিগগির? অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?

অ্যাকসিডেন্ট হলে তো বাঁচতুম মশাই, এ তা নয়—অফিস থেকে আসবার সময় আমার মেজ জামাই দেখে এল চৌরঙ্গীতে বিপিন-বাবুর ছেলেকে দুজনে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমার তো শুনে বিশ্বাস হলো না মশাই—কিন্তু আমার মেজ জামাই তো মিথ্যা কথা বলবার মানুষ নয়—

—কিন্তু দুজনে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন? কী হয়েছিল?

—আবার কী হবে? প্রাণে একটু ফুর্তি হয়েছে। আজকালকার ছেলেদের তো বিশ্বাস নেই মশাই—

কথাটা শুনে শচীনবাবু আর বসে থাকতে পারলেন না। সোজা দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন—পিণ্টু বাড়ি এসেছে? জানেন আপনি?

—তা কী করে জানাবো বলুন! বাড়ি আসবার অবস্থা কি আর আছে তার এখন?

শচীনবাবু বললেন—তাহলে দেখে আসতে হয়, বিপিনবাবু বোধ হয় ভাবছেন খুব, চলুন না—

যতীশবাবুর কাজ ছিল। তিনি আর গেলেন না। যাবার সময় বলে গেলেন—আজকাল মশাই মেয়ের বিয়ে এক সমস্যা, ভাল পাত্র পাওয়া কি সোজা ব্যাপার?

শচীনবাবু সোজা গিয়ে বিপিনবাবুর সদর-দরজায় কড়া নাড়তে লাগলেন—বিপিন-বাবু, কেমন আছেন?

ভেতর থেকে বিধবা বাড়িওয়ালী বুড়ির গলা শোনা গেল—অ বউ, অই তোমার পিণ্টু এসেছে গো—

হাঁফাতে হাঁফাতে বিপিনবাবু উঠে এলেন। শচীনবাবুকে দেখে একেবারে বিপদে কূল পেলেন যেন। বললেন—আমার পিণ্টু এখনও অফিস থেকে ফেরেনি, কী করি বলুন তো মশাই—আমি তখন থেকে ছটফট করছি, কোথায় যাই বলুন তো, কী করি আমি?

শচীনবাবু বললে—পিণ্টু অফিস যাবার সময় কিছু বলে গেছে যে, তার ফিরতে দেরি হবে?

—না মশাই, কিছুই তো বলেনি। যেমন রোজ অফিসে যায়, তেমনি অফিসে গেছে, ভাত খেয়েছে, জামা-কাপড় পরেছে—যাবার সময় শুধু একটু রাগারাগি করেছে, এই যা—সে তো আপনাকে বলেছি—

—সেই বিয়ে করবো না বলে? তা সে তো সব ছেলেই বলে থাকে!

বিপিনবাবু তখনও হাঁফাচ্ছিলেন। বললেন—এমনিতে বড় বিনয়ী বাধ্য ছেলে আমার, সে তো আপনি জানেন—এমনিতে আমার কথার পিঠে কিছু কথা বলেই না কখনও, বলবার সাহসই হয় না, হয়ত কী-রকম মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে গিয়েছিল, তাই বলে ফেলেছে, তারপর ওর মায়ের সঙ্গে বেশ ভালভাবেই কথা বলেছে—

—তারপর?

—তারপর খাবারের কৌটো নিয়ে যেমন অফিসে যায়, তেমনি গেছে—তারপর এখন ভাবছি কেন এল না এখনও—

এর পর আর শচীনবাবু কীই বা বলবেন। তিনি ফিরছিলেন।

বিপিনবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—তা আসবে নিশ্চয়ই, কী বলেন? আপনি কী বলেন? আসবে? একটু হয়ত দেরি হবে,—

শচীনবাবু—আসবে না তো যাবে কোথায়,

নিশ্চয়ই আসবে—

—**কিন্তু** অফিস থেকে সোজা সে বরাবর **বাড়িতেই** আসে, আর কোথাও যায় না—

শচীনবাবু বললেন—আর একটু দেখুন—

তারপর আরো রাত হলো। বাদামতলায় **লালার** দোকানের কেরাসিনের আলোটাও **এক সময়ে** নিভে এল। বিধুর দোকানের **ঝাঁপও** বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তায় শেষ বাসটা **শেষ** ট্রিপ-এর প্যাসেঞ্জার নিয়ে এসে আলো নিভিয়ে সোজা গ্যারেজে চলে গেল। সাই-কেল রিক্সাগুলোও তারপর অনেকক্ষণ হর্ন বাজিয়ে প্যাসেঞ্জার ডাকতে লাগলো। তার-পর তারাও আর থাকতে পারলে না রাস্তায়। কালীমাতা হার্বাল হোম'এর সামনের মাচায় দু'একজন ভিখিরি কাঁথা মুড়ি দিয়ে রাতের মতন বিছানা পাতলো। নিঝুম হয়ে এল বাদামতলা। নিস্তব্ধ হয়ে এলো শহর। শান্ত হয়ে পড়লো কলকাতার ১৯৬২ সালের মাত্মা। অন্ধকারে অচৈতন্য হয়ে সে-কলকাতা তখন নাক-ডাকতে শুরু করেছে, প্রলাপ বকতে আরম্ভ করেছে। আর তারপর সব কিছু অসাড় হয়ে গেল।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেল অনেক। ঘুম ভাঙতেই চারদিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখলে প্রশান্ত। অঞ্জলি মাথার কাছে মুখ নিচু করে বললে—চা খাবেন?

—চা?

প্রশান্তর বাড়িতে কখনও চায়ের পাট নেই। বললে—আমি কি কাল আপনার বাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম?

একটু লজ্জাও হলো মনে মনে। তাড়া-তাড়ি উঠে বসলো বিছানায়। জিজ্ঞেস করলে —ক'টা বাজলো?

অঞ্জলি বললে—সাড়ে আটটা—

সাড়ে আটটার সময় থেকেই প্রতিদিন অফিসে যাবার তোড়জোড় করতে হয়। তার আগে বালতি করে জল তুলে মা'র রান্নাঘরে দিয়ে আসতে হয়, বাজারে গিয়ে মাছ-তর-কারী কিনে আনতে হয়। আজ সব কাজ হয়ত মাকেই নিজেকে করতে হচ্ছে। বাজারও বা কে করছে, কে জানে। বাবার গরম জল, কাপড়-কাচা, বাসন মাজা—সমস্ত কিছু একলা মাকেই করতে হচ্ছে হয়ত।

—জয়ন্ত কোথায়?

—সে তো নেই—

—কোথায় গেল?

—সে রাত্তিরে আপনাকে এখানে রেখে দিয়ে চলে গেল।

প্রশান্ত বললে—কিন্তু আমাকে এখানে রেখে দিয়ে গেল কেন?

—আপনার তখন শরীর খারাপ খুব, সেই অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে যেতে সে চাইলে না। আর আপনিও বলছিলেন বাড়িতে যাবেন না।

—আমি বাড়িতে যাবো না বলেছিলুম?

অঞ্জলি বললে—হ্যাঁ, আপনি জোর-জবরদস্তি করে এখানে রইলেন। কিছুতেই বাড়ি যেতে চাইলেন না।

—কিন্তু আমার বাবা-মা কী ভাবছে বলুন তো। আমি জন্মে পর্যন্ত কখনো বাড়ির বাইরে রাত কাটাইনি। আমি ছাড়া তো বাড়িতে আর কেউ নেই, বাজার-করা, জল তোলা, কাপড়-কাচা সব কাজ মাকে একলা করতে হবে—

অঞ্জলি বললে—আপনি সারা রাত কেবল বাবা-মার কথা বলেছেন—

—আপনি শুনেছেন?

—বা, আমি তো আপনার পাশেই শুয়ে-ছিলাম, আপনি টের পাননি—

প্রশান্তর মনে পড়তে লাগলো কালকের সন্ধেবেলার কথাগুলো। সন্ধেবেলার সেই ঘটনাগুলো। সে যেন একদিনের জন্যে সম্রাট হয়েছিল। সে যেন আর টার্নবুল এন্ড জনসন কোম্পানীর ক্যাশ-ক্লার্ক প্রশান্ত চক্রবর্তী নয়, অন্য মানুষ। বারো ঘণ্টার মধ্যেই যেন সে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে, আজকে আর তাকে জল তুলতে হবে না টিউবওয়েল থেকে, বাজার করতে হবে না। বাবা-মার সঙ্গে কথাও বলতে হবে না।

বাইরে থেকে সেই অঞ্জলি ব্যানার্জির মাইমা এক কাপ চা নিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

অঞ্জলি বললে—চা দরকার নেই মাইমা, প্রশান্তবাবু চা খান না—

বুড়ি চা নিয়ে ফিরেই যাচ্ছিল। প্রশান্ত বললে—না, চা খাবো আমি, দিন—

—সে কি, আপনি চা কখনও খান না যে বললেন?

—তা হোক, আজ খাবো।

প্রশান্ত চা-এর কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিলে।

অঞ্জলি দেখে হাসতে লাগলো। বললে —আপনার হলো কী? আপনি হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন নাকি?

প্রশান্তও হাসলো। বললে—না, ক্ষেপিনি, এবার থেকে যা কিছু করিনি, সবই করবো ঠিক করেছি—

—হঠাৎ এ-রকম খেয়াল হলো কেন আপনার?

প্রশান্ত বললে—জয়ন্তর কথাই ঠিক। ভেবে দেখলাম, সারা জীবন যারা মুখস্থ করা বিদ্যে জীবনে অ্যাপ্লাই করে চলে, তারাই ঠকে, আমিও এতদিন ঠকে এসেছি, আর ঠকবো না—আর ঠকতে চাই না—

—তার মানে?

—কালকে চৌরঙ্গীর সেই হোটেলটার ভেতর ঢুকে তাই-ই আমার মনে হয়েছিল। বরাবর বাইরে থেকেই তো হোটেলটা দেখে এসেছি, আর ভেতরের লোকগুলোকে মনে মনে ঘেন্না করে এসেছি। কাল দেখলুম তারাই জিতে গেছে, আমরাই কেবল বোকা লোক—

—আপনি অফিসে যাবেন না?

এতক্ষণে যেন মনে পড়লো। নিজের জামা-কাপড়ের দিকে নজর পড়লো। তা হোক। তবু অফিসে তাকে যেতেই হবে।

প্রশান্ত বললে—আপনাদের চান করবার জায়গাটা দেখিয়ে দিন, আমি অফিসে যাবো, —অফিসে আমাকে যেতেই হবে—

তারপর আর বেশি দেরি হলো না। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিয়ে সেই জামা-কাপড় পরেই অফিসে চলে যাচ্ছিল। অঞ্জলি বললে—ভাত খাবেন না? আপনার জন্যে সকালে উঠে যে রান্না করেছি—

—আপনি রান্না করেছেন?

—আমি করবো না তো কে করবে? মাইমা আর আমি দুজনে মিলে করেছি—

বারান্দার ওপর একটা আসন পেতে দিয়েছিল। তার সামনে ভাতের থালা। সেখানে বসতে গিয়ে পাশের ঘরটার ভেতরে নজরে পড়লো—একজন বুড়ি মতন কে শুয়ে আছে—

অঞ্জলি বললে—আমার মা—

—আপনার মা'র কী অসুখ?

অঞ্জলি বললে—অসুখ একটা নয়, অসংখ্য, আপনি খেতে বসুন—

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো খাবারের কৌটোটার কথা। বহুদিনের অভ্যাসে ওটা নিজের শরীরের সঙ্গে যেন একীভূত হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলে —আচ্ছা, আমার খাবারের কৌটোটা কোথায় জানেন?

—আপনার খাবারের কৌটো? কই, রাত্রে তো দেখিনি, তবে বোধহয় কাল হোটেলেই ফেলে এসেছেন—

প্রশান্ত বললে—যাক্ গে, ভালোই হয়েছে, ওটা হারিয়ে যাওয়াই ভালো—

তারপর রাস্তায় বেরিয়ে আবার ফিরে এল। বললে—আর একটা কথা......

—কী বলুন?

—জয়ন্তর সঙ্গে আজ একবার দেখা করতে পারলে ভালো হতো। জয়ন্ত কাল আমাকে যে-কথাটা বলছিল, সেই কথাটার জন্যে ওর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার—

—কী কথা?

—সে পরে জানতে পারবেন। আজকে ও আর আসবে?

—হ্যাঁ রোজই তো আসে। আজকেও আসবে, রাত্রে এলেই পাবেন—

তারপর প্রশান্ত আর দাঁড়ালো না। বাস রাস্তার দিকে সোজা চলে গেল।

বাদামতলাতে ছটফট করেছেন বিপিন-বাবু। বিন্দুবাসিনীর মুখেও কোনও কথা নেই। সারা রাত যেন কোথা দিয়ে কেটে গেছে। ভোর হতে না হতে আবার আনচান করে উঠেছে মনটা। সেই পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে একটা আশা চকধরপুরে প্রথম চোখ মেলেছিল। প্রথম আশা করতে ভাল

লেগেছিল। পিণ্টুই ছিল সেই আশাটুকুর উপলক্ষ্য। এমনি করেই বোধহয় একদিন আশা করে সব মানুষ। বাড়ি করে, সংসার করে। তারপর দিনে দিনে একটা একটা করে সে-আশার পাপড়িগুলো ঝরে পড়ে, শুকিয়ে যায়। তবু আরো আশা করতে ভালো লাগে। টার্নবুল এন্ড জনসন কোম্পানীর হেড্ মেজ দরোয়ান রামদীনরা সেই আশায় ইন্ধন দেয়, তখন বাড়ি করতে ইচ্ছে করে, ছেলের বিয়ে দিয়ে সংসার আরো বড় করতে ইচ্ছে করে, পাড়ার পাঁচজনের সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। তারপর একদিন মৃত্যু আসে। মৃত্যু এসে সব আশা নিঃশেষে উপড়ে নিয়ে চলে যায়। এমনি করেই আদিকাল থেকে ইতিহাস চলে আসছে। এই পৃথিবীও এককালে বাদাম-তলাই ছিল। বাদামতলার মত পচা ডোবা আর জঙ্গলে ভরা ছিল, তারপর মানুষ-এল, জন এল, বসতি গড়ে উঠলো। তারপর মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠলো। কে বড়, কে ছোট তার বিচার চললো। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তারও হিসেব-নিকেশ হলো। কিন্তু মানুষের তৈরি হিসেব মানুষই আবার মানতে রাজি হলো না। তখন হলো লড়াই। ছোট-বড়র লড়াই, ব্রাহ্মণ শূদ্রের লড়াই, জাত-ভাগ হলো, বর্ণ-ভাগ হলো। পৃথিবীর সব মানুষ একদিন সমস্ত মানুষের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললো। তখন নিয়ম, আইন, শৃঙ্খলা, বিচার সমস্ত একাকার হয়ে গেল ১৯৬২ সালে পেঁৗছে।

—অ বউ, বলি পিণ্টু কাল বাড়ি ফিরেছিল?

বুড়ির গলার আওয়াজটা যেন আরো কর্কশ ঠেকলো দুজনের কানে। এর কী জবাব দেবে বিন্দুবাসিনী, তাও যেন কারো জানা নেই। বিপিনবাবুর এতদিনের আকাঙ্ক্ষা যেন বিদ্রূপে রূপান্তরিত হয়ে তাঁকেই আজ আঘাত করলে।

এ-সংসারের যন্ত্রে আজকে আর তেল পড়লো না। অন্য দিন সকাল থেকে কাক এসে কা-কা করে ডাকে রান্নাঘরের চালে। আজ এখানে কোনও আকর্ষণ তারা আর অনুভব করলে না।

দরজায় খুট্ করে শব্দ হতেই বিপিন-বাবুর কান খাড়া হয়ে ওঠে।

বল্লেন—কে কড়া নাড়লে না?

বিন্দুবাসিনী গিয়ে দেখে এল। একবার এপাশে একবার ওপাশে চাইলে। কেউ কোথাও নেই। পাশের অসমাপ্ত বাড়িটার ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে যেন একটা অস্বস্তিকর অশান্তির যন্ত্রণা হাহাকার করে থেমে গেল।

কলকাতা শহর কিন্তু গম্-গম্ করছে। টার্নবুল কোম্পানীর অফিসের হেড্ দরোয়ান বাইরে তামার চাকতিটার নীচে যথারীতি পাহারা দিচ্ছিল। সকাল থেকেই পাহারা দিচ্ছে। পালা করে পাহারা দেবার ডিউটি আছে এ-অফিসে। দিন হোক রাত্রি হোক পাহারা দেবার কামাই নেই। কোটি-কোটি টাকার আমদানী-রপ্তানীর কারবার। কলকাতা শহরের বুকের ওপর বসেই এমনি কত কোটি টাকা আসছে যাচ্ছে, লেন-দেন হচ্ছে তার হিসেব অফিসের ক্লার্করা জানতে পারছে না।

মেজ হেড্ দরোয়ান রামদীন সকাল বেলাই ইউনিফর্ম পরে ডিউটি দিচ্ছিল ক্যাশ অফিসের সামনে। প্রশান্ত যেতেই রামদীন একবার চেয়ে দেখলে। প্রশান্ত বললে—

বিন্দুবাসিনী

একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে রামদীন—

—আমার সঙ্গে হুজুর?

—হ্যাঁ, খুব জরুরী কথা। একটু আড়ালে বলতে হবে।

বিপিনবাবুও ঠিক এমনি করেই কথাটা পেড়েছিলেন প্রথমে। রামদীনের মনে আছে। সেই বাবুরই ছেলে। পাশেই কোয়ার্টার। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। প্রশান্ত গলা নিচু করে বললে—কিছু টাকা দিতে পারবে রামদীন আমাকে?

—কেন দিতে পারবো না হুজুর? কত বলেন না?

—একটু বেশি টাকা। কুড়ি পঁচিশ হাজার—

রামদীন একটু প্রশান্তর মুখের দিকে চাইলে।

—অত টাকা?

—হ্যাঁ, আজকের মধ্যেই দিতে হবে তোমাকে, সুদ যা নাও নিও, আর তিন-চার মাস পরেই তোমাকে টাকাটা শোধ করে দেব —আর আমার মাইনে থেকেও তুমি কেটে নিতে পারো, একশো ছেশট্টি টাকা আমি হাতে পাই, মাইনেটাই না-হয় পুরোই তুমি নিয়ে নিও—

—পুরো নিয়ে নিলে আপনি খাবেন কী হুজুর?

প্রশান্ত বললে—সে তোমায় ভাবতে হবে না রামদীন, আর তোমার এই টাকাটা শোধ হয়ে গেলে, আমি আর বেশিদিন চাকরিই করবো না—

—চাকরিই করবেন না?

—না তোমার কোনও ভয় নেই রামদীন, তোমার টাকা আমি মরে গেলেও মেরে দেব না—এটুকু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, আর আমার প্রভিডেন্ট্ ফান্ডও তো রয়েছে, গ্র্যাচুইটিও রয়েছে,—তুমি তো আমার বাবাকে চেনো, আমি তোমার টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবো না—আমি স্ট্যাম্পের ওপর সই করে দিচ্ছি—

রামদীন তখনও ভাবছিল বোধহয়, প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলে—কী ভাবছো তুমি? আমি তো বললুম তোমার কোনও ভয় নেই—

—আমি তা ভাবছি না বাবু, আমি হিসাব জুড়ছি—

—তোমার কাছে টাকা নেই অত?

রামদীন বললে — অন্য আপিসের দারোয়ানদের কাছ থেকে যোগাড় করতে হবে হুজুর, নইলে আমি টাকা দিতে কখনও কাউকে কমতি করিনি—আপনার বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন—আমার তো ব্যবসা এটা। একটু বেশি সুদ দিতে হবে—আর কিছু নয়, তারা তো আপনাকে চেনে না—

—তা কত সুদ দিতে হবে বলো না? আমি তো বেশি সুদ দিতে আপত্তি করছি না। তিন-চার মাস পরেই তো আমি সব শোধ দিয়ে দিচ্ছি, তিনটে মাস তুমি অপেক্ষা করতে পারবে না? নইলে তো আমি কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক থেকেই ধার করতে পারতুম, সে যে অনেক দেরি হবে—অনেক সই-টই লাগবে। আর তা ছাড়া তারা অত টাকা দেবেও না।

তা শেষ পর্যন্ত তাই হলো। রামদীন বহুদিনের কারবারী। বল্লে—আপনি কাজ করুন গিয়ে, আমি আপনাকে ছুটির পর ডেকে আনবো। চেক্ তো দেব না, কাঁচা টাকা দেব—চেকের কারবার নয় আমার হুজুর—

বিকেল পাঁচটার পর প্রশান্তকে ডেকে নিয়ে গেল রামদীন। ঘরের আলো জ্বালালে। দড়ির খাটিয়ার ওপর বসলো প্রশান্ত।

রামদীন একটা ময়লা ন্যাকরার পুঁটলি বার করলে—আপনি নোটগুলো গুনে নিন হুজুর—

—গুনে আর নিতে হবে না, তুমি তো গুনেছো।

—ও শুনবো না হুজুর, টাকাকড়ির

ব্যাপার, না গুনে নিলে আমার মন ভরবে না, ছেলের টাকা কি বাপকে গুনে নিতে হয়, টাকা বড় বদ্‌মাইশ জিনিস হুজুর—

সেদিন রিহার্শাল ছিল কালীঘাটে। কালীঘাটের ছোকরারা নতুন ক্লাব করেছে। নিজেরাই নাটক লিখেছে। ইংরিজী ড্রামা থেকে অনুবাদ করে নিয়ে থিয়েটার করবে। গাড়ি করে যখন অঞ্জলিকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল তখন রাত [illegible] হয়নি। প্রথম দিন। অঞ্জলি বলে দিয়েছিল রাত আটটার মধ্যে তাকে ছেড়ে দিতে হবে—মার অসুখ।

মাইমা-ই দরজা খুলে দিয়েছে।

অঞ্জলি ঢুকেই বললে—কেউ আমাকে ডাকতে এসেছিল মাইমা?

মাইমা মুখ ঘুরিয়ে বললে—ঘরে গিয়ে দেখ না কে—

—কে?

—আমার কে?

—ওমা, দরজার চাবি খুলে দিলে কেন? আমি বলেছি না যে আমি যখন বাড়িতে না থাকবো তখন ওকে ঘরে ঢুকতেই দেবে না?

মাইমা বললে—বা বাছা, ভাল-মন্দ করলে আমি কী বলবো শুনি? মদ খেয়ে একসা হয়েছে ঘরে, দেখ গে যাও—

অঞ্জলি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে দেখলো দুর্গন্ধে ভরে গেছে সমস্ত ঘরটা। বিছানার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। জুতোটা পর্যন্ত খোলবার ক্ষমতা হয়নি। বিছানা বালিশ চাদর সব গুই গুই করছে। অঞ্জলি খানিকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হলো এখনি একটা দেশলাই কাঠি জেলে সমস্ত বিছানা-বালিশ, ঘরের আসবাবপত্র সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেয়। মানুষটাকেও যেন আর চোখে দেখতে না হয়, [illegible]। মানুষটাও যেন শেষ হয়ে যায় সেই সঙ্গে।

অঞ্জলির দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল।

হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

অঞ্জলি চেঁচিয়ে বলে উঠলো—কে ডাকছে [illegible] এখন আমি [illegible] না—

[illegible] কিন্তু [illegible] কৌতূহল [illegible] নজরে পড়লো। [illegible] না, [illegible] তাড়াতাড়ি [illegible] কাছে [illegible]।

—[illegible]

সেই সময়ে [illegible] মাথা [illegible] হয়ে আছে। [illegible]

প্রশান্ত বললে—আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। জয়ন্ত এসেছে?

অঞ্জলি বললে—হ্যাঁ এসেছে, আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভেতরে আসুন—

প্রশান্তর যেন ভেতরে ঢুকতে বাধলো। অঞ্জলি ব্যানার্জির মুখখানা যেন একটু গম্ভীর অন্য দিনের চেয়ে। জিজ্ঞেস করলে—আপনার কি শরীর খারাপ?

—না, শরীর খারাপ হতে যাবে কেন? বলে প্রশান্ত একটু হাসবার চেষ্টা করলে।

অঞ্জলি বললে—আপনি বাড়ি গেলেন না কেন? অফিস থেকেই সোজা চলে এলেন এখানে?

প্রশান্ত বললে—আমি জয়ন্তর সঙ্গে দেখা করবো আপনাকে বলে গিয়েছিলুম সকালে—

অঞ্জলি জিজ্ঞেস করলে—এটা কী আপনার হাতে?

প্রশান্ত বললে—টাকা!

—টাকা? কীসের টাকা? এই পোঁটলা ভর্তি টাকা? কাকে দেবেন?

প্রশান্ত বললে—জয়ন্ত চেয়েছিল আমার কাছে, পঁচিশ হাজার টাকা, ও ছবি করবে, তাই। তিন-চার রীল ছবি করলেই ওর ডিস্ট্রিবিউটর মিস্টার রামানী তিন লাখ টাকা দেবে বলেছে, তাই ওকে টাকাটা দিতে এনেছি—

—এ টাকা আপনি কোত্থেকে পেলেন?

প্রশান্ত একটু যেন দ্বিধা করলে বলতে। তারপর বললে—ধার করেছি—

—ধার করেছেন? কার কাছে ধার করেছেন?

—আমাদের অফিসের দরোয়ানের কাছে। সে টাকা ধার দেবার ব্যবসা করে।

—কত করে সুদ?

—বেশি টাকা কিনা, তাই একটু বেশি সুদ নিলে, কুড়ি পার্সেন্ট—তা সুদও আমাকে দিতে হবে না, ডিস্ট্রিবিউটর টাকাটা দিলেই জয়ন্ত সব শোধ করে দেবে, বড় জোর তিন-চার মাস, এই চার-রীল ছবি তোলা হলেই তিন লাখ দেবে, তখন শোধ করে দেব সুদ-সুদ্ধ—

অঞ্জলি সেই অন্ধকার উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়েই শিউরে উঠলো।

—আপনার মাইনে থেকে মাসে মাসে কেটে নেবে নাকি?

প্রশান্ত বললে—আমি এই চার মাস মাইনে কিছু পাবো না হাতে—

—তাহলে বাবা-মাকে কী দেবেন?

প্রশান্ত বললে—আমি আর ও বাড়িতেই যাবো না, আমার আর সেখানে যেতেই ভাল লাগছে না, সে-বাড়ি বিষ মনে হচ্ছে, আমি আজ সকালে বাবার সঙ্গে মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছি, আমি এখন থেকে এখানেই থাকবো, আপনাদের বাড়িতে—

—আপনি বলছেন কী?

প্রশান্ত বললে—হ্যাঁ, জীবনে অনেক দিন অনেক ভুল করেছি, এবার থেকে আর ভুল করবো না। ভেবে দেখেছি জয়ন্তর কথাই ঠিক, চিরকাল এই কেরানীগিরি করে গেলে জীবনে কিছুই হবে না, আমাকে নিজেকেও বাড়তে হবে, শুধু বাঁচা নয়, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে—আমি এখানেই থাকবো বলে এসেছি—

অঞ্জলি জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু এখানে থাকলেই কি দাঁড়াতে পারবেন মনে করেন?

—হ্যাঁ, আপনাকে আর পাড়ায়-পাড়ায় থিয়েটার করে বেড়াতে হবে না, আপনার আরো নাম হবে, আপনি তখন সিনেমার হিরোইন হবেন—আপনার গাড়ি হবে বাড়ি হবে টাকা হবে—

—কিন্তু তাতে আপনার লাভ কী? আমার গাড়ি-বাড়ির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কী?

প্রশান্ত হঠাৎ এ-কথার কোনও উত্তর দিতে পারলে না। চুপ করে রইল।

অঞ্জলি আবার বললে—আমার যদি উন্নতি হয় তাতে আপনার কী লাভ বলুন? আপনি কেন এত টাকা ধার করতে গেলেন? আমার জন্যে আপনি নিজের এই সর্বনাশ কেন করতে গেলেন? আমি আপনার কে?

প্রশান্ত মাথা নিচু করে রইল।

অঞ্জলি আবার বললে—আসুন, এই দিকে আসুন, আসুন—দেখবেন আসুন—

বলে হঠাৎ প্রশান্তর বাঁ হাতটা খপ করে ধরে টান দিয়ে ঘরটার সামনে নিয়ে গেল। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই দেখুন—

প্রশান্ত দেখলে ঘরময় বমি ছড়ানো। দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে চারদিকে। বিছানা-বালিশ-আসবাবপত্র সব নোংরা হয়ে গেছে। আর তার ওপর জয়ন্ত জুতো জামা সুদ্ধ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

—জয়ন্ত মদ খেয়েছে নাকি?

অঞ্জলি বললে—আপনি নিজের চোখেই তো দেখলেন, এর পরেও ওর কথায় বিশ্বাস করবেন?

—কিন্তু হঠাৎ অত মদ খেতে গেল কেন?

—রোজই খায়, সেই জন্যেই তো আমি না থাকলে ওকে ঘরে ঢুকতে দিই না। কালকে আপনি ছিলেন, তাই অন্য কোথাও গিয়ে রাত কাটিয়েছিল। আজকে এই এখুনি আমি রিহার্শাল থেকে ফিরে এসেছি, এসেই এই দেখছি, এই দেখেও আপনি টাকাটা ওকে দেবেন?

প্রশান্ত বললে—কিন্তু আপনি এত অত্যাচার সহ্য করেন কেন?

—সহ্য করবো না? আমাকে যে কিনে নিয়েছে ও—

—তার মানে?

—একদিন ওর কথাতেই ভুলে গিয়ে ওকে বিয়ে করে ফেলেছিলুম, যেমন আপনি ওর কথায় ভুলে গিয়ে টাকা এনেছেন—

প্রশান্ত যেন সামনে ভূত দেখলে—আপনি ওকে বিয়ে করেছেন? কিন্তু আপনার মাথায়

তো......

—সিঁদুর পরি না, সে আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে বলে। কিন্তু আপনি ওর কথায় ভুললেন কেন? আপনি কেন নিজের সর্বনাশ করলেন এমন করে? ও তো আপনার কেউ-ই নয়?

প্রশান্ত কী যেন ভাবলে। তারপর বললে —আপনি রোজ এই রকম সহ্য করেন?

—হ্যাঁ প্রায়ই রোজ। সহ্য না করে উপায় কী? ওর জন্যে আমাদের ছ'বছর বাড়ি-ভাড়া দিতে হয়নি, ও আমাদের জন্যে অনেক করেছে। আজ আমাদের জন্যেই বাড়ি থেকে ওর বাবা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমি ওকে তাড়িয়ে দিলে ও খেতে পাবে না, এমনি ওর অবস্থা—! আপনি এই লোককে বিশ্বাস করে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছেন?

প্রশান্ত একটু ভেবে বললে—তা হলে আপনার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, আপনি টাকাটা রাখুন—

—আমি এ-টাকা কী করবো?

—আপনিই ছবি করুন, তিন-চার রীল ছবি করলেই ডিস্ট্রিবিউটর আপনাকে তিন লাখ টাকা দেবে, তখন আপনি আমাকে টাকাটা সুদে-সুদ্ধু শোধ করে দেবেন—আর এই চারমাস শুধু আমাকে আপনি দেড় শো টাকা করে দিন, তাহলে আমার বাবাও জানতে পারবেন না—

অঞ্জলি বললো—তবু আপনি টাকা দেবেন? এত দেখেও আমাদের ওপর আপনার ঘেন্না হচ্ছে না?

—ঘেন্না? আপনাকে ঘেন্না হবে কেন?

—তবু আপনি জিজ্ঞেস করছেন ঘেন্না হবে কেন? দেখছেন না, আমাদের টাকা নেই, আমাদের সুখ নেই, আমাদের স্বাস্থ্য নেই, আমরা শুধু গালে-মুখে রং মেখে বাইরের মানুষের মন ভোলাতে জন্মেছি? আমরা নিজেদেরও ঠকাচ্ছি বাইরের লোকদেরও ঠকাচ্ছি, আমরা নিজেরাই জানি না আমরা কী চাই? আমরা নিজেরাই জানি না অন্য লোকে আমাদের কাছে কী চায়? —আমরা যে এ-যুগের ডাস্টবিন—এটাও আপনি এখনও বুঝতে পারেন নি?

প্রশান্ত স্তম্ভিত হয়ে অঞ্জলির কথাগুলো শুনতে লাগলো।

—অন্য লোকে আমাদের রং মাখা মুখ দেখে ভুলুক, আমরা অন্য অনেক লোককে ভুলিয়েছি, আমরা তাদের ঠকিয়ে টাকা উপায় করেছি, সেইটেই আমাদের পেশা, কিন্তু আপনাকে আমি ঠকাতে পারবো না, দয়া করে আপনি আর এখানে দাঁড়াবেন না, আপনি চলে যান, আপনি যেখান থেকে টাকা নিয়ে এসেছেন, সেখানেই তাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসুন—যান—

প্রশান্ত তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

—যান, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আপনার পায়ে পড়ছি আপনি যান, আপনার দু'টি পায়ে পড়ছি প্রশান্তবাবু—

প্রশান্ত বললে—আপনি রোজ এই রকম সহ্য করেন?

তারপর প্রশান্তর পিঠে হাত দিয়ে অঞ্জলি ঠেলতে লাগলো। বললে—লক্ষ্মীটি, যান আপনি, এখানকার ছোঁয়াচও যে পাপ, এই পাপের মধ্যে আপনাকে আমি থাকতে দেব না, আপনি আপনার বাবা-মার কাছে ফিরে যান—

—কিন্তু আপনি টাকাগুলো নিন, আমি চলে যাচ্ছি—

—না, জানি আমাদের অনেক অভাব, কিন্তু সে-অভাব ওতে মিটবে না, ওর ডবল টাকা দিলেও মিটবে না। লাখ টাকা পেলে আমরা কোটি টাকার জন্যে হা-হুতাশ করবো, আমাদের সব চাই, সব পেলেও আমাদের সাধ মিটবে না, আমরা এ-সংসারে জন্মেছি জ্বলে-পুড়ে মরবার জন্যে, কিন্তু আপনি তো তা নন। আপনার বাবা আপনাকে যা শিখিয়েছেন তাই-ই ঠিক, জয়ন্তর কথায় ভুলবেন না—

—কিন্তু আপনার যে অনেক নাম হতো?

—নামে আমার দরকার নেই প্রশান্তবাবু, নামে আমার ঘেন্না ধরে গেছে, নামে আমার অরুচি ধরে গেছে আর নাম চাই না, নাম চেয়ে আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে, নাম চেয়ে যা পেয়েছি তা তো দেখলেন, এর চেয়ে বেশি নাম হলে আমায় এবার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে—

ঠেলতে-ঠেলতে ততক্ষণে প্রশান্তকে একেবারে বাইরে নিয়ে এসেছে অঞ্জলি। বাইরের রাস্তায় তখন লোক চলাচল কমে এসেছে। সামনের রোয়াকের ওপর তখনও কয়েকজন পাড়ার ছেলে আড্ডা দিচ্ছিল।

অঞ্জলি বললে—এত টাকা নিয়ে হেঁটে যাবেন না, একটা ট্যাক্সি ধরে আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি—

তারপর হাঁটতে হাঁটতে খাস রাস্তার মোড়ে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি ধরলো অঞ্জলি। প্রশান্তকে বললে—উঠুন, উঠুন—শিগ্‌গির—

প্রশান্ত যেন কাঠের পুতুল হয়ে গেছে। পোঁটলাটা নিয়ে উঠে পড়লো ভেতরে। পেছনে-পেছনে অঞ্জলিও উঠে বসলো পাশে—

রামদীনও অবাক হয়ে গেছে। আটা মেখে লোহার উনুনে তখন চাপাটি তৈরি করছিল। প্রশান্তবাবুকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

জিজ্ঞেস করলে—কী বাবু, আপনি? এত

রাস্তিরে?

—এই তোমার টাকাগুলো নাও রামদীন, আমার দরকার হলো না, ভাল করে গুণে নাও—আমি এ-পোঁটলা খুলিনি, যেমন বেঁধে দিয়েছিলে, তেমনিই নিয়ে এসেছি—

রামদীনের যেন মুখে কথা সরছে না। বললে—টাকা লাগলো না?

—না, যার জন্যে নিয়েছিলাম, সে নিলে না—মিছিমিছি তোমায় কষ্ট দিলুম রামদীন.—

রামদীন বললে—এই খাটিয়ায় বসুন বাবু, পরের টাকা, আবার সব গুণে নিতে হবে.—

প্রশান্ত বসলো। বললে—একটু তাড়াতাড়ি করো রামদীন, রাত হয়ে গেছে, বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে—

টাকাগুলো সব গুণে নিয়ে নেবার পর যখন প্রশান্ত রাস্তায় ফিরে এল তখনও অঞ্জলি ট্যাক্সির মধ্যে বসে আছে।

জিজ্ঞেস করলে—দিয়ে দিয়েছেন?

প্রশান্ত বললে—হ্যাঁ—

—রসিদটা ফেরত দিয়ে দিয়েছে?

—হ্যাঁ, এই যে—বলে অঞ্জলির হাতে দিলে রসিদটা।

অঞ্জলি সেটা দেখে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে। তারপর বললে—যান, এবার বাড়ি ফিরে যান, জীবনে আর কখনও বিডন স্ট্রীটের পাড়ায় আসবেন না, যান—এই শেষ দেখা, জয়ন্তর সঙ্গে যদি কখনও আপনার দেখা হয় তো কোনও কথা বলবেন না, যদি ও কখনও আপনার অফিসে যায় তাহলে পারেন তো গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবেন তাকে, যান—

তারপর ট্যাক্সিটা চলতে লাগলো। অঞ্জলি ব্যানার্জি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আর দেখা গেল না তাকে। প্রশান্ত সেই অন্ধকার ডালহৌসী স্কোয়ারের জনবিরল রাস্তার ওপর নিথর-নিশ্চল পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জীবনের অনেক সত্য আছে যা ভেতরের বোধ থেকে পরিস্ফুট হয়, আবার কখনও কখনও বাইরের আঘাত থেকে তার আবির্ভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের পরিচয়ের অভ্যাসে সেই সত্যটুকু মলিন হয়ে ওঠে বলেই সব সময় তা প্রত্যক্ষ হয় না। সব সময়ে তা ধরা পড়ে না। সব সময়ে তাকে চেনাও যায় না। যখন আমাদের কানে শোনা চোখে দেখার সঙ্গে না-শোনা না-দেখার মিলন ঘটে, যখন আঘাতের ঢেউ আমাদের চেতনার নিদ্রিত দরজায় এসে আলিঙ্গন করে তখনি হয় সত্যিকারের জাগা। প্রশান্তর মনে হলো—সেও যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে। কিন্তু তবু তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হলো না তখনি। বাড়ি ফিরতে সাহসও হলো না। এতখানি যন্ত্রণার মূল্য দিয়ে তাকে এই পরিত্রাণটুকু কিনতে হয়েছে, এতে যেন তার সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গেল। আর কাউকে কিছু দেবারই রইল না। কী নিয়ে সে দাঁড়াবে বাদামতলায় গিয়ে? কোন্ সম্পদ তার আজ পাথেয় হবে? এতদিনের সমস্ত অপরাধের সংকোচ সে কোথায় গিয়ে কার কাছে গিয়ে কাটাবে? কার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইবে?

হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম রাস্তার পাথরগুলোতেও যেন এক সময়ে ক্লান্তির ঢুলুনি নামলো। রাস্তার আলোগুলো যেন নিভে এল অনেকক্ষণ জেগে জেগে। সমস্ত রাতই বুঝি রোজ এমনি করে কলকাতা সহরটা হেঁটে-হেঁটে বেড়ায়। এ-ঘটনা যেন নিত্য-নৈমিত্তিক। কলকাতা কিছু প্রশ্ন করলে না,

বাড়িওয়ালী বুড়ি

কিছু কৌতূহলও দেখালে না, শুধু নির্জীব হয়ে চলতে লাগলো পেছন-পেছন। তার ফাঁপা সভ্যতা নিয়ে গালে মুখে রং মেখে হেঁটে হেঁটে চলতে লাগলো কলকাতা। এ-রাস্তা দিয়ে সে-রাস্তা। তারপর এ-গলি থেকে সে-গলি। তারপর হঠাৎ যেন কলকাতা থেমে গেল।

কোথা দিয়ে কতদূরে চলেছে ঠিক ছিল না প্রশান্তর। চলতে-চলতে যেন সমস্ত কলকাতাটাই পরিক্রমা করে ফেললে। সমস্ত জীবনটাই পরিক্রমা করে ফেললে সে। কী সে জীবনে চেয়েছিল, আর কী সে পেয়েছে? কোন্ চাওয়া তার ভুল চাওয়া, আর কোন্ পাওয়া তার না-পাওয়া? কী পেলে সব কিছু না-পাওয়া সার্থক হয়ে ওঠে? কেমন সে-জিনিস?

অন্ধকার নিরিবিলি রাস্তার দু'পাশে সার-সার ঘুমন্ত-বাড়ি। ওগুলো ঘুমন্ত-বাড়ি নয়, যেন যুগের প্রহরী। প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু যুগ-যুগান্তর ধরে পাহারা দিতে দিতে যেন এই ১৯৬২ সালে এসে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে তারা। আজ যেন প্রশান্তর কেউ নেই। তার বাবা নেই, মা নেই, জয়ন্ত নেই, অঞ্জলিও নেই। তার চাকরিটা পর্যন্ত নেই। সারা পৃথিবীতে আজ যেন একটা আশ্রয়ও নেই তার। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি কলকাতার লোকের মতন প্রশান্তও যেন অভিভাবকহীন। সে যেন রাস্তাতেই জন্মেছে, রাস্তাতেই তার পরিত্রাণ! সে এখন যা-খুশি করতে পারে। তাকে শাসন করবার কেউ নেই, সংশোধন করবারও কেউ নেই। ধ্বংসের সর্বনাশা পথেই সে পা বাড়াবে, নিজেকে নিঃশেষ করে দেবে, প্রহরীরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ জানতে পারবে না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সবাই নির্জীব। তাঁদের নামও এখন কেউ উচ্চারণ করে না। সবাই অভিভাবকহীন হয়ে গেছে প্রশান্তর মতই। প্রশান্তর মতই এই নিঃসংগ রাতে যেন জীবন-পরিক্রমা করতে বেরিয়েছে পৃথিবীর সমস্ত লোক।

কিন্তু কেমন করে আবার তার বাড়ি ফিরে যাবে সে?

হাঁটতে হাঁটতে কোথায় কত দূরে চলে গেছে প্রশান্ত, খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ মনে হলো যেন সহর সেখানে শেষ হয়ে গেছে, সভ্যতা শেষ হয়ে গেছে, শতাব্দীও শেষ হয়ে গেছে। শতাব্দীর মানুষ সবাই যেন ধ্বংসের প্রান্ত-সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর এক মুহূর্তে যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে যাবে! প্রশান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো—কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কে তাকে বুঝিয়ে দেবে? কে বলে দেবে সুখ ভালো না কল্যাণ ভালো? কে জানিয়ে দেবে প্রশান্তর নিজের সুখের সংগে পৃথিবীর কল্যাণের বিরোধ কোথায়? প্রতিদিন খাবারের কৌটো নিয়ে একশো ছেষট্টি টাকার চাকরির মধ্যেই সে কি তার পরিত্রাণ খুঁজে পাবে, না অর্থ-খ্যাতি-প্রতিপত্তির প্রতিযোগিতার উন্মত্ততার মধ্যেই সে তার নিজের ভোগের উপকরণ খুঁজে পরিতৃপ্তির আস্বাদ পাবার শেষ চেষ্টা করবে? কোনটা? কোন্ পথ তার নিজের পথ?

—ক'টা বাজলো স্যার?

প্রশান্ত চমকে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সে-পাড়া থেকে সরে এল। এখানে লোকের ভিড়ে রাস্তায় চলা দায়। পানের পিক্, বিড়ি সিগারেট, মালাই বরফ, বেল ফুলের মালা। কলকাতা আবার অন্য পথ ধরলে।

বাদামতলায় এ কদিনেই অন্য চেহারা হয়ে গেছে। তিন দিন চার দিনের মধ্যেই সব যেন ওলোটপালোট হয়ে গেছে। শচীনবাবুর বাড়িতে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। শানাই

বাজছে। শচীনবাবু বুড়ো মানুষ। বেশি নড়া-চড়া করছেন না। বলছেন—সবাই খেয়েছেন তো?

সামনের রাস্তাটা আলোয় আলো হয়ে গেছে। বরযাত্রীরাও বেশি দূরের লোক নয়। যতীশ ভট্টাচার্যির বড় ছেলের বন্ধুরা, তারাও কাছাকাছির লোক। বিকেল থেকেই লোকজন আসা-যাওয়া করছে। দত্তপুকুর থেকে ছানা আনিয়েছেন, বালিগঞ্জ থেকে দই। কোনও ত্রুটি রাখেননি কোথাও। চারদিকে নজর রাখছেন বসে বসে। কেউই যেন না-খেয়ে চলে না যায়।

প্রশান্ত প্রথম গলিতে ঢুকে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

তারপর অবস্থাটা বুঝে নিয়ে মাথাটা নিচু করে এক পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ক'দিন এখান দিয়ে আসা-যাওয়া করেনি, এরই মধ্যে যেন সব অচেনা ঠেকছে। সব যেন নতুন। প্রশান্ত যেন নতুন মানুষ হয়ে নতুন পাড়ায় ঢুকছে। বাড়ির সামনেটা অন্ধকার। সদর দরজায় কড়া নাড়তেও যেন সংকোচ হলো। যেন সে অধিকারটুকুও কেউ কেড়ে নিয়েছে তার। এতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আবার এক যুগ পরে ফিরে এসেছে।

মনে হলো সদর দরজাটা যেন খোলা। এত রাত্রে খোলা কেন?

টিপি টিপি পায়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। বাবার ঘরে তখনও টিম টিম করে হারিকেনের আলোটা জ্বলছে। আশেপাশে কোথাও মাকে দেখা গেল না। সব যেন নিঝুম। বাড়ির উঠোনে জলের বালতিটা খালি পড়ে রয়েছে। তরকারির ঝুড়িতে একটা আলু পটল কি কুমড়োর ফালি কিছুই নেই। ঘরের ভেতরে বাবার চেহারাটা দেখে বড় কষ্ট হতে লাগলো। এই ক'দিনেই যেন বড় রোগা হয়ে গেছে বাবা।

আস্তে আস্তে বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল প্রশান্ত। একেবারে পাশে।

বিপিনবাবুও চোখ ফেরালেন। হারিকেনের আলোটা পিন্টুর মুখের ওপর পড়েছে।

—এসেছো!

এর বেশি যেন কিছু বলবার ক্ষমতাও ছিল না বিপিনবাবুর। যেন তিনি ফুরিয়ে গিয়েছেন এই ক'দিনেই।

—আমি জানতুম তুমি ফিরে আসবে!

প্রশান্ত কোনও উত্তর দিলে না। বিপিনবাবু তার মুখখানার দিকে ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

—খুব কষ্ট পেয়েছ বুঝতে পারছি। তা ভালই হয়েছে। কষ্ট পাওয়াই তোমার দরকার ছিল। আমি চেয়েছিলুম যেন তোমার গায়ে আঁচ না লাগে, আমি নিজে যে কষ্ট পেয়েছি তোমাকে যেন সে-কষ্ট না করতে হয়।

[illegible] তো হবার নয়, এ ক'দিনে পৃথিবী কাকে বলে তা চিনে নিয়েছ, ভালোই করেছ। আমি আর তোমায় কিছুই বলবো না। এখন—কিছু খাবে? খাওয়া হয়েছে তোমার?

শচীনবাবুর বাড়িতে শানাইতে বেহাগ শুরু হয়েছে তখন। প্রশান্তর বড় কষ্ট হতে লাগলো।

—মা কোথায় গেল?

—মা বাজারে গেছেন, যতক্ষণ বেঁচে থাকবো ততক্ষণ খেতে তো হবে। দিনের বেলা বাজারে যেতে পারেন না, তাই এখন অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে দু' এক পয়সার শাক-তরকারী যা-হোক কিনে আনতে গেছেন—

প্রশান্ত বললে—আমি যাচ্ছি, দেখি গে—

বলে আর দাঁড়াল না। আবার সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে বিয়ে-বাড়ির পাশ দিয়ে সোজা বাস রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

পরদিন আবার সকাল হয়েছে। আবার পৃথিবী তার নিজের নিয়মে চলতে শুরু করেছে। সকাল হয়েছে টার্নবুল এন্ড জনসন কোম্পানীর অফিসে। তামার চাকতিটার নীচে হেড দারোয়ান আবার পাহারা দিতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে বাবুরা অফিসে ঢুকতে লাগলো লোহার গেটের ভেতরে। রমেশবাবুর সংগে মুখোমুখি দেখা।

—কী মশাই? হঠাৎ চারদিন কোথায় ডুব মেরেছিলেন? এ ক'দিন কোথায় ছিলেন আপনি?

প্রশান্তর উত্তর দেবার কিছু নেই। একটু হাসলো শুধু। হাসি দিয়েই যেন এই বে-আইনী অনুপস্থিতিটা ঢাকবার চেষ্টা করলে। বললে—কেউ খুঁজেছে আমাকে?

—সবাই খুঁজেছে। আপনার বাবা খুঁজতে লোক পাঠিয়েছিলেন। বাড়িতেও নেই, অফিসেও অ্যাবসেন্ট—কী ব্যাপার বলুন তো? লাভ-অ্যাফেয়ার নাকি?

বলে রমেশবাবু রহস্যময় হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন।

তারপর হঠাৎ পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে বললেন—একটা চিঠি কাল থেকে আপনার নামে এসে পড়ে আছে—খুব লোভ হচ্ছিল খুলে পড়ি, কিন্তু পড়িনি, আজকে আপনি না এলে আপনার বাড়িতেই পাঠিয়ে দিতুম—এই নিন্—

—আমার চিঠি?

সাদা খামের চিঠি! তাকে কে চিঠি দেবে? কে আছে তার?

সেখানে দাঁড়িয়েই খামখানা ছিঁড়ে ফেললে প্রশান্ত। তারপর এক ধারে গিয়ে পড়তে লাগলো। অচেনা হাতের লেখা—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনি নিশ্চয় আবার অফিসের কাজে যোগ দিয়েছেন। প্রার্থনা করি আপনার মন এতক্ষণে সুস্থ হয়ে উঠেছে। ঝোঁকের মাথায় যে-কাজ করতে চেয়েছিলেন, তাতে বাধা দেওয়ায় আপনি আমার ওপর নিশ্চয়ই রাগ করেছেন, কিন্তু আমি নিজে ছোট, তাই কাউকে ছোট হতে দেখলে মনে বড় কষ্ট পাই। আপনি ছোট হলে আমার দুঃখ রাখবার আর জায়গা থাকতো না। আমাকে ভুল বুঝবেন না দয়া করে। নিজের সাধ্যের সীমার মধ্যে থেকে সুখী হবার চেষ্টা করবেন, তাতে সুখ পেতেও পারেন। কারো বাইরের মুখোশটাকেই মুখ বলে মনে করে আত্মধিক্কারের বিড়ম্বনা যেন আপনার কখনও না ঘটে। সে যন্ত্রণার মত মর্মান্তিক যন্ত্রণা সংসারে আর দুটি নেই। আর যদি কখনও কোনও সূত্রে কোথাও আমার সংগে দেখা হয়ে যায় তো দয়া করে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন। তাতে আমি একতিল কষ্ট পাবো না।

নিবেদন ইতি—

অঞ্জলি ব্যানার্জি

কালসমুদ্রে আলোর যাত্রী — গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মোষ!

শিবানন্দ দু' পা পিছিয়ে এলেন। এটা ধারণা ছিল না। ঘুরে ঘুরে বাড়ী দেখানো শেষ করে বন্ধু যখন গোয়াল দেখাতে নিয়ে এলেন, তখন মনশ্চক্ষে দু'চারটি শ্যামলী ধবলীর মূর্তিই ভেসে উঠেছিল। গোয়ালের সামনে এসে ওই কালো কালো ছায়া দেখে সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন, 'মোষ!'

'হ্যাঁ ভাই মোষই পুষেছি', বন্ধুর মুখের প্রত্যেকটি রেখায় রেখায় একটা পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা ফুটে ওঠে, 'দেখলাম, গরু পুষে কোনও লাভ নেই। মোষ থেকে আমি দুধ খাচ্ছি, দই খাচ্ছি, ছানা সন্দেশ সব খাচ্ছি, আবার ঘি মাখন পাচ্ছি। এ বাজারে খাঁটি ঘি—'

'ঘি-ও?' সবিস্ময় প্রশ্ন না করে থাকতে পারেন না শিবানন্দ। এ সব জিনিস যে সত্যিই বাড়ীতে হতে পারে, এ তাঁর ধারণার অতীত। বন্ধুর বারবার আমন্ত্রণে এবার তাঁর এই শহরতলীর বাড়ীতে বেড়াতে এসে মুহুর্মুহু মুগ্ধ হচ্ছেন শিবানন্দ। অবাক হয়ে যাচ্ছেন।

'হয় মানে?' হরিসাধনের মুখে উল্লাসের দীপ্তি, 'এক পয়সার ঘি বাইরে থেকে কিনি না।' টাটকা মাখন, টাটকা ঘি—'

'আছ ভাল!'

শিবানন্দ হাসেন।

'তা ভাই তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে গুছিয়ে একটু নিতে পেরেছি।' হরিসাধন বলেন, 'চল খামার বাড়ীটাও দেখিয়ে আনি।'

'খামার বাড়ী!', আকাশ থেকে পড়েন শিবানন্দ, 'সেটা আবার কি বস্তু?'

'চল! দেখেই আসবে চল কি বস্তু।' উল্লাসের সঙ্গে একটা কৌতুকরহস্য ফুটে ওঠে হরিসাধনের মুখে। মনে হচ্ছে তাঁর সুখ ঐশ্বর্যের খবর আস্তে আস্তে ভাঙছেন বন্ধুর কাছে। যখন বাড়ী দেখাচ্ছিলেন, তখন গোয়ালবাড়ী, খামারবাড়ী এ সবের কথা তোলেননি।

এমনি শুধু বাড়ী দেখেই তো মোহিত হয়ে উঠেছেন শিবানন্দ। আসবার আগে ধারণা করতে পারেননি, এতবড় বাড়ী করতে পেরেছেন হরিসাধন।

স্কুলমাস্টার মানুষ, যা কিছু রোজগার করেছেন খোলাপথে, চোরাপথের কারবার নেই। অথচ সেই সামান্য আয় থেকেই চেষ্টা চরিত্র করে—

প্রথমে বাড়ীর চৌকাঠে পা দিয়েই একটা বোকার মত কথা বলে বসেছিলেন শিবানন্দ

ওই ধারণা ছিল না বলেই।

বলে ফেলেছিলেন, 'এই পুরো বাড়ীটাই তোমার না কি হে?'

আর সেই সময় হরিসাধনের ওই তেলা তেলা পরিতৃপ্তির হাসিটি প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন। যেটা আগে কখনো দেখা যেত না।

শিবানন্দর প্রশ্নে হরিসাধন কণ্ঠে মুখে বিনয় এনে বলেছিলেন, 'এই ভাই করেছি এটুকু। মাথা গোঁজবার আশ্রয়। গিন্নীর বায়না ছিল দোতলা, আমি বললাম, 'না। আগে একটু বড় করে একতলাই হোক। একটু ছড়িয়ে ছিটিয়েই যদি না থাকতে পেলাম তো, এই সুরেশপুরোয় এসে বাড়ী করা কেন? আমার শ্যামপুকুরের গণেশ ঘোষাল লেন কি দোষ করেছিল? তবে এইবার মনে করছি দোতলায় হাত দেব। অবিশ্যি এখন আমার তিনখানা ঘরেই চলে যাচ্ছে, তবে ছেলে বেটাদের তো বিয়ে দিতে হবে? তখন আবার ঘর ধার করতে যাবো কোথায়? লাগিয়ে দিলাম খান ছয়। আর সামনে ভাই এই দরদালান! তোমাদের বৌদির চিরকালের সাধ।'

শিবানন্দর মনে হল, কথার ধরনটা যেন বদলে গেছে হরিসাধনের। বেশ কেমন একটু আত্মস্থ আত্মস্থ ভাব এসেছে ভঙ্গীতে সুরেতে।

বাড়ীর খোলামেলা ভাব আর পুব দক্ষিণের প্রসাদ প্রসন্নতা দেখে ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন শিবানন্দ। আর নিজে নিজেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছেন, হরিসাধন যখন পঞ্চমুখ হয়ে ব্যাখ্যা করে চলেছিলেন, বাড়ী করতে কীভাবে তিনি ইঁট না কিনে পাঁজা পুড়িয়ে ইঁট করিয়েছেন, চুন না কিনে ঘুটিং পুড়িয়ে চুন করিয়েছেন, আর কীভাবে রোদে জলে জরজর হয়ে মিস্ত্রীদের সঙ্গে খেটে পিটে তবে এইটি করে তুলিয়েছেন, তখন বিরক্ত হয়ে ওঠার বদলে বরং বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে শুনেছেন তিনি।

ভাবেননি, উঃ হরিসাধন কত কথা কইছে!'

বরং শুনেছেন আর নিজেকে কেমন বোকা বোকা বেচারী বেচারী ঠেকেছে। মনে পড়েনি সেই স্কুলের আমল থেকে এক সঙ্গে পড়তে পড়তে হরিসাধন বি-এ ফেল করে একটা আজে বাজে স্কুলে ঢুকে পড়ে সেখানেই মাস্টারী করতে করতে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। আর শিবানন্দ দু' দুবার এম-এ পাশ করেছেন, উচ্চতর গবেষণায় ডি-ফিল হয়েছেন। আর প্রায় সেই প্রারম্ভ থেকেই ভাল কলেজে অধ্যাপনা করে এসেছেন।

মনে পড়েনি হরিসাধনের মহিমা দেখে।

এই মহিমার সামনে নিজেকে কেমন পরাজিত মনে হচ্ছে শিবানন্দের।

তা পরাজিতই বৈকি।

জীবন যুদ্ধে পরাজিত।

শিবানন্দ কী করতে পেরেছেন? কিছু না। রাসবিহারী এ্যাভিনিউর ওই দোতলার ফ্ল্যাটটুকুতেই জীবন কেটে গেল! কোনখানে এক ছটাক জমিও কিনতে পারেননি। ছেলেমেয়ে তিনটেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, এই পর্যন্ত। তাও ছেলেটাকে বাইরে পাঠিয়ে একটু কেমরা চোমরা করিয়ে আনবার ইচ্ছেটাও তো আকাশকুসুম হয়ে আছে।

অথচ হরিসাধনের পাঁচ ছটি ছেলেমেয়ে। একটা মেয়ের বিয়েও দিয়ে ফেলেছে।

নাঃ, সংসার করা এদেরই সাজে। ভেবেছেন শিবানন্দ। যখন হরিসাধন ছাতের সিঁড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে সিঁড়ির ঘরটা খুলে ধরে আকর্ণ বিশ্রান্ত হাস্যে বলেছেন, 'এইটি হচ্ছে গিন্নীর পুজোর ঘর! দেয়ালে একটা আলমারি বসিয়ে নিয়েছি, পুজোর বাসনপত্র থাকবে, সামনে ওই তুলসীমঞ্চ। হিঁদুর বাড়ী, চাই তো সব!'

কি কি মশলা সহযোগে ছাত গাঁথলে, সে ছাত আর ফাটে না, সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়ে বন্ধুকে টেনে এনেছেন হরিসাধন এই গোয়ালে!

যেখান থেকে সরে আসতে আসতে শিবানন্দ হেসে বললেন, 'গোয়াল কেন বলছ তাহলে। বরং বল খাটাল।' আর হরিসাধন বললেন, 'চল খামারবাড়ীটাও দেখিয়ে আনি। দেখলে খুশি হবে।'

খামারবাড়ীটা কি বস্তু, তা' দেখা হয় শিবানন্দর, আর দেখে খুশিও হন। বাস্তবিক ধারণা করা সম্ভব নয়। হরিসাধন অমন করে বুঝিয়ে না দিলে বোধগম্যই হত না, ওই সব বস্তা বস্তা মুগ কড়াই ছোলা মটর হরিসাধনের নিজের ক্ষেতের।

শুনেছিলেন বটে অনেকদিন আগে, হরিসাধন স্ত্রীর গহনা বিক্রী করে আর আকণ্ঠ ঋণ করে একটা বাগান পুকুর সমেত বড়সড় জমি কিনে ফেলেছেন। কিন্তু সেই বড়টা যে এত বড় তা ভাবতেই পারেননি শিবানন্দ। না কি ক্রমশ পরিসর বাড়িয়ে চলেছেন হরিসাধন, মাকড়সা যেমন জাল বাড়িয়েই চলে!

খামারবাড়ী থেকে বেরিয়েই পুকুর ধারে এসে পড়েন হরিসাধন। দিব্যি টলটলে জল ভর্তি পুকুর।

সেই পুকুরের প্রতিচ্ছবি বুঝি হরিসাধনের দুই চোখে।

'পোনা ছেড়েছি কিছু। দিব্যি মাছ দিচ্ছে ভাই। আমার মেজ ছেলেটার তো কাজই হচ্ছে ছিপ নিয়ে বসে থাকা। বঁড়শি হুইল সুতো, এই নিয়েই—'

কিন্তু ততক্ষণে কথা থামিয়ে দিয়েছেন শিবানন্দ। বিচলিত স্বরে বলে উঠেছেন, 'বল কি হরিসাধন! তুমি যে তাজ্জব করলে! ক্রমশই চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছি। পুকুরে মাছ পর্যন্ত! শিখলে কোথায় এত?'

হরিসাধনের মুখের প্রত্যেকটি রেখায় ফুটে ওঠে সেই আত্মপ্রেমে মসৃণ পরিতৃপ্তির হাসিটি।

'শিখতে হয়েছে ভাই। রীতিমত খেটেখুটে শিখতে হয়েছে। খাটা চাই। আরামকে হারাম না করতে পারলে আর সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। তা ভাই তোমাদের শুভেচ্ছায় গিন্নীটিও এটা খুব বুঝতে শিখেছেন। রাত চারটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত খাটছি দুটি মানুষে! দেখাবো, ওঁর ভাঁড়ারটিও দেখাবো। বললে বিশ্বাস করবে না, বছরের জিনিসে সব ভাঁড়ারে ভর্তি। বড়ি আচার এই সব বানাতে ছোটখাটো একটা জালাতির ঘরই করিয়ে নিয়েছেন।'

শুনতে শুনতে মুগ্ধ হচ্ছেন শিবানন্দ, মুগ্ধ হতে হতে ক্লান্ত হচ্ছেন।

কিন্তু হরিসাধন অক্লান্ত।

'এসেছোই যদি এদিকে, তো আমার হাঁস-মুরগীর ঘরটাও দেখে যাও।...না না পোলট্রি ফোলট্রি নয়, সেটা বললে একটু বেশী বলা হবে। ওই গোটাকতক পুষেছি—একটু দেখাশুনো করি। ডিম দেয়, অতিথি সজ্জন এলে, কি নিজেদের শখ সাধ হলে, দু'একজন জীবনও দেয়,' হেসে ওঠেন হরিসাধন। 'যেমন আজ একজন দিল।'

'তাহলে যা কিছু খাও সবই তোমার বাড়ীর?'

বিমুগ্ধ বিহ্বল শিবানন্দ এই বাহুল্য প্রশ্নটি করেন।

হরিসাধন হাসেন।

আত্মসমাহিতের হাসি।

'প্রায় তাই! ওই যা তেলটা নুনটা মশলাটা! তরি-তরকারির বাগান তো দেখলেই? আবার দেখ না, সেজ ছেলের সাধ হয়েছে কাঁঠাল গাছের। ওটা নেই, বেটা একে ওকে বলে বেড়াচ্ছে, কার বাড়ীতে ভাল চারা আছে। বাপের নেশাটা পেয়ে গেছে ব্যাটা!'

হা হা করে হেসে ওঠেন হরিসাধন।

নেশা।

হ্যাঁ নেশা-ই বটে।

একের নেশা অপরকে মাতাল করে।

শিবানন্দ কল্পনায় আনতে চেষ্টা করছেন, সেই ভাঙা ছাতা বগলে মাস্টারী করে ফেরা হরিসাধনকে। শিবানন্দর ঘরে এসে বসতেন মাঝে মাঝে। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলতেন, 'বেশ সাজিয়ে রেখেছ ভাই ঘরটিকে। ছবির মত। থাকেও তো সাজানো। আমার বাড়ী হলে?'......

আক্ষেপের সুর ফুটে উঠতো হরিসাধনের গলায়, 'একদিনেই বারোটা বেজে যেত। ওই তোমার ফুলদানী আর মাটির পুতুল সাত-টুকরো হয়ে গড়াগড়ি যেত ফুটপাথে।'

আজ আর হরিসাধনের কণ্ঠে আক্ষেপের সুর নেই। যেন জীবনে যা কিছু পাবার পেয়ে গেছেন হরিসাধন। আজ তিনি মুরুব্বিয়ানা চালে বন্ধুকে উপদেশ দিতে পারছেন। দেবার অধিকার অর্জন করেছেন, 'ভারী ভুল করছ ভাই! এতদিনে অন্তত একটু জমি কিনে ফেলা উচিত ছিল তোমার। মাথা গোঁজবার একটু আশ্রয় থাকা দরকার! তা নয়, তুমি জীবন ভোর বই কিনে কিনেই ফতুর হলে!'

শুনে নিজেকে ভারী অকিঞ্চিৎ মনে হচ্ছে শিবানন্দর।

না, বাহাদুরী আছে বৈকি হরিসাধনের। মুরুব্বিয়ানা করবার অধিকার আছে। এমন কিছু পয়সার মানুষ নয়, শুধু নিজের কৃতিত্বে—

'আচ্ছা ভাই তোমার আর দেরী করিয়ে দেব না—'

হরিসাধন স্মিত প্রসন্ন ডাক দেয়, 'চল এইবার খেয়ে নেওয়া যাক। তোমাদের বৌদি বসে আছে হাঁড়ি আগলে।'

শিবানন্দ কুণ্ঠিত মুখে ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'না না, আবার খাওয়া-দাওয়ার ইয়ে কেন? বেশ তো জল খাওয়া হল, বাড়ীর ছানার সন্দেশ দিয়ে—'

'বিলক্ষণ!' হরিসাধন বলেন, 'খাবে না বললেই হলো? বলে কত ভাগ্যে তোমাকে পাওয়া! কেউ আসে না ভাই—' এতক্ষণে যেন হরিসাধনের কণ্ঠে এক চিলতে আক্ষেপের সুর বাজে, 'বলে কি জানো?' 'বাবাঃ! কে যাবে? যা ধাবধাড়া গোবিন্দ-পুরে বাড়ী করেছ!' কলকাতার শহরের সেই পায়রার খোপে থাকা অভ্যাস তো! এই যে প্রাণপাত করে করে মরছি, তোমরা পাঁচজন দেখলে তবে না সার্থক!

শিবানন্দ মনে মনে একটু সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি হাসেন। নিজের প্রতি ধিক্কারের ব্যঙ্গ।

এইতে-ই এই।

আর কত অসার্থকতার বোঝাই বয়ে বয়ে চলেছেন শিবানন্দ!

এই দরদালান দেওয়া খোলামেলা বাড়ী, ওই বাগান পুকুর গোয়াল খামারবাড়ী, সব তাকিয়ে দেখতে দেখতে ভাবেন, 'নাঃ আর

কিছু না হোক, জমি একটু কিনে ফেলতে হবে।

তারপর?

তারপর আস্তে আস্তে গড়ে তুলতে হবে জয়ের প্রাসাদ।

বাগান-পুকুর, খামারবাড়ী, পোলট্রি..... ঘরের মাখন, ঘরের ঘি।

হরিসাধন শিবানন্দর চিরদিনের বন্ধু, তবু পরস্পরের গৃহিণীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের আদান-প্রদান ঘটেনি। নিজেদেরও বাইরে বাইরেই দেখাশোনা। সেকেলে ধরনের মানুষ, অনাত্মীয়া মহিলা দেখলেই কেমন থতমত খেয়ে যান।

কিন্তু আজ হরিসাধন-গৃহিণী রীতিমত আদর আবদারের মধ্য দিয়ে অতিথি সেবা করছেন।

বলছেন, 'তা' হবে না ঠাকুরপো! পারবো না বললে শুনবো না। একে তো আমার নিজের হাতের রান্না, তা ছাড়া সমস্ত বাড়ীর জিনিস! এই যে মাংস খাচ্ছেন, আপনার দাদার সাধের পোলট্রির। আর এই মাছ পুকুরের। এই লাউ কুমড়ো বেগুন শিম, মায় কাঁচালংকা কাগজি নেবুটি পর্যন্ত সব নিজের। এই যে ভাতের পাতে ঘি খেলেন, এও বাড়ীর। দুধটুকু দইটুকু সবই, ঘরের। ফেললে দুঃখে মরে যাব।'

বন্ধুপত্নীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে অগত্যাই মাপের অতিরিক্ত খেতে হয় শিবানন্দকে। তাঁর আবার একটু বেশী খেলেই অসুখ করে। কিন্তু কি করবে! সব কিছুর উপর হচ্ছে ভদ্রতা।

বন্ধুর ঘরবাড়ী দেখে কত খুশি হয়েছেন— সে-কথা বার বার বলতে বলতে ফিরবার উদ্যোগ করেন শিবানন্দ।

হরিসাধনও বন্ধুকে পেয়ে কত খুশি হয়েছেন সেটা বার বার বিবৃত করে হাঁক পাড়েন, 'ওগো শুনছো, শিবুর জন্যে যেটা গুছিয়ে রাখতে বলেছিলাম, বার করে দাও।'

শুনে শিবানন্দ নেই!

'গুছিয়ে আবার কি রাখতে বলেছিলে?'

'কিছু না কিছু না ভাই—'হরিসাধন বিনয়ে বিগলিত হন, 'ওই গাছের দুটো কচু ঘেঁচু! একলা একলা খাই, বড় মন কেমন করে ভাই। কলকাতার বাজার তো জানি, সাতদিনের বাসি আনাজ। আর এ তোমার গিয়ে একেবারে ফ্রেশ মাল। সদ্য গাছ থেকে পাড়া।'

হরিসাধন-গিন্নী একটি বাজারের থলি ভর্তি সেই ফ্রেশ মাল এনে হাজির করেন। অন্তর্নিহিত বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ থলিটা চটের। শুধু মুখের কাছে উঁকি মারছে একটা লাউডগা ও একটা মোচার ডাঁটি।

এই চটের থলিটা নিয়ে যেতে হবে!

একেই বোধ করি অকস্মাৎ বজ্রাঘাত বলে! শিবানন্দ মিনতিতে ভেঙে পড়েন। কাতর

অনুনয়ে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন বন্ধু ও বন্ধুজায়াকে। বারবার বলতে থাকেন, সবই তো খেয়ে দেয়ে গেলাম, আবার কেন? কিন্তু হরিসাধন নাছোড়বান্দা। 'বাঃ ছেলেরা খাবে না? ছেলেদের মা একটু চাখবে না?'

শিবানন্দ দৈ দস্তুর করেন, 'ওরা ওসব খায় না ভাই। বিশ্বাস করো, লাউ, মোচা এ আমি তোমার এখানে খেলাম বোধ হয় দুপাঁচ বছর পরে। ছেলেমেয়েরা খায় না বলে—'

এবার হাল ধরেন হরিসাধন-জায়া। বলেন 'তা' কেন ঠাকুরপো, মোচা কুটতে গিন্নীর হাতে দাগ হবে তাই বলুন। ছেলেরা টাটকা জিনিস পায় না তাই খায় না। খেলে বুঝবে। না নিলে ছাড়বই না।'

ওই চটের থলিটা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনে এমন কাণ্ড করতে থাকেন, মনে হয় ওইটা শিবানন্দকে গছাতে না পারলে তাদের জীবনের সব কিছুই বুঝি বৃথা হয়ে যাবে।

এই মফস্বলি স্নেহের কাছে পরাস্ত হতে হলো শিবানন্দকে। জীবনে যা না করেছেন তিনি তাই করলেন। সেই চটের থলি হাতে করে বাসে উঠলেন।

হরিসাধন অবশ্য বাসে তুলে দিতে এসেছিলেন এবং এ রাস্তাটুকু নিজেই বয়ে নিয়ে গেছেন থলিটা, সযত্নে সাবধানে।

আর সহস্রবার বলেছেন, 'তোমার আপাতত জন্যালায় কিছুই দিতে পারলাম না ভাই। অবিশ্যি করে একদিন গিন্নীকে আর ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসতে হবে। আসতে হবে, খেতে হবে। আচ্ছা আমার দোতলাটা উঠুক। ততদিনে পুকুরের মাছগুলোও বড় হবে।' একটু নিশ্বাস নেন হরিসাধন। আবার বলেন, 'দোতলায় ওই ওপর নীচ সমান করেই ঘর তুলবো ঠিক করেছি। ছ'খানা ছ'খানা বারোখানা ঘর। ভালই হবে, কি বল?'

যেন এই ভালটা সমর্থনের মুখাপেক্ষী।

কিছু না, এও একটা বিকাশ।

বাস ছেড়ে দিল।

যতক্ষণ না বাসটা চোখের আড়ালে চলে গেল হরিসাধনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন শিবানন্দ। দাঁড়িয়ে আছেন, সেই মধুর পরিতৃপ্তির তেলা তেলা ভাবটি মুখে মাখিয়ে।

বন্ধুকে ঈর্ষা করবেন, এমন নীচ শিবানন্দ নন। তবু সারাপথ যেমন একটা শূন্যতা অনুভব করতে করতে গেলেন।

এ শূন্যতা কি নিজের অক্ষমতাবোধের?

হয়তো তাই।

হরিসাধনের ওই প্রকাণ্ড দরদালান দেওয়া ছ'খানা ঘরওয়ালা বাড়ীটার পাশে নিজের সেই আড়াইখানা ঘরের ফ্ল্যাটটা কল্পনা করে মনটা গুটিয়ে আসছে শিবানন্দর।

একটা ঘরে ছেলেটা শোয়, আর একটা ঘরে দুই মেয়েকে নিয়ে শিবানন্দরা স্বামী-স্ত্রী। তা ছেলের ঘরটা তো বইয়ের গুদাম বললেই চলে। নিজের ঘরেও দেয়ালজোড়া র‍্যাক।

ভাড়াবাড়ী, তবু মিস্ত্রী লাগিয়ে উঁচুতে ব্র্যাকেট পুঁতে তাক বানিয়ে নিতে হয়েছে। আধখানা যে ঘরখানা, তাতেই রান্না ভাঁড়ার খাওয়া। চলে যাচ্ছে, চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ বন্ধু হরিসাধন এই নিশ্চিন্ত শান্তিতে ঢিল ফেলেছে!

চটের থলিটা বড় পীড়াদায়ক লাগছে।

তবু বন্ধুর দান, ফেলে দেওয়া যায় না। রীতিমত রণশ্রান্ত সৈনিকের মত বাড়ী গিয়ে ঢুকলেন শিবানন্দ। অস্ত্রের বোঝা নামানোর মত, হাতের বোঝাটা নামিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। বই-পাড়ায় ঘুরে ঘুরে পুরনো বইয়ের দোকান থেকে যখন বইয়ের পাহাড় সংগ্রহান্তে বুকে করে নিয়ে আসেন, কই এত তো ভারী লাগে না!

পড়ন্ত বেলার রোদ্দুরটা বড্ড লেগেছে।

এই মুখে স্ত্রীর ব্যঙ্গটাও একটু কড়া লাগল।
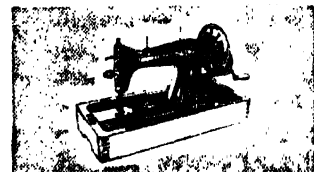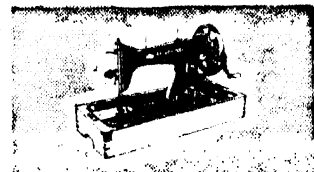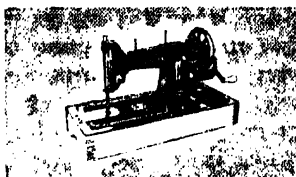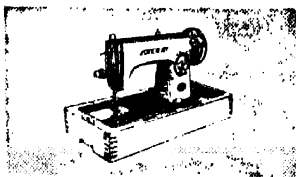
ব্যঙ্গহাসির তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করে ভদ্র-মহিলা বলেন, 'তোমার হাতে চটের থলি! বন্ধুর বাগানের লাউ কুমড়ো বোধ হয়? হরিসাধন মাস্টারের বৌ কোন মন্তরের জোরে এমন অসাধ্য সাধন করলো গো!'

'ছাড়ল না! গছিয়ে দিল!' বলে স্নানের ঘরে চলে গেলেন শিবানন্দ, গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢালতে।

ঠিক এই মুহূর্তে কিছু আর হরি-সাধনের কৃতিত্ব আর তার বৌয়ের মহিমা নিয়ে আলোচনা করতে পারা যায় না। পারা যায় না নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে।

কিন্তু আশ্চর্য, কোন সময়ই আর পারা গেল না। আজ সারাটা দিন যে হৃদয়াবেগ এত প্রবল হয়ে মনকে আন্দোলিত করলো বিচলিত করলো, দুশ্চিন্তিত করলো, সেটার আর তেমন জোর রইল না যেন।

স্নানের পর একটু বেরিয়ে পড়লেন, অনির্দিষ্ট খানিকটা ঘুরে এলেন। আর ফ্ল্যাট বাড়ীর সিঁড়িটা পার হয়ে উঠে এসে নিজের ফ্ল্যাটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুব একটা হতভাগ্য আর মনে হল না নিজেকে।

মনে হল, ছোট বাসাই বা খারাপ কি? এখানে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়। হরি-সাধনের বাড়ীর মত অত বড় দালান আর অতখানি উঠোনওলা বাড়ীতে থাকতে হলে নিজেকে নিশ্চয় হারিয়ে ফেলবেন শিবানন্দ। হারিয়ে ফেলবেন পৃথিবীটাকে।

দৃষ্টি আটকে যাবে, ওই এক মুঠো মাটির গায়ে।

দুপুরের খাওয়াটা বড় বেশী হয়ে গেছে। অস্বস্তিবোধ করছেন শিবানন্দ। রাতে 'খাব না' বলে জবাব দিয়ে শুয়ে পড়লেন সকাল সকাল। স্ত্রী আর একবার টিটকারি দিলেন, 'সাধন মাস্টারের বৌয়ের আরও ক্যাপাসিটির পরিচয় পাচ্ছি। তুমি হেন মানুষকে দু বেলার খাবার একবেলায় খাইয়ে দিতে পেরেছে!'

উত্তর দিতে ইচ্ছে হল না, ঘুমোতে ইচ্ছে হল।

কিন্তু ঘুম আসতে চায় না।

অস্বস্তিটা বেশী হচ্ছে।

ফ্যানের হাওয়াটা গরম লাগছে। উঠে পড়লেন। ওরা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

স্ত্রী আর মেয়েরা। ও ঘরে ছেলেটাও।

মৃদু নীল আলোয় ঘরটা অনেক দূরে থেকে ভেসে আসা গানের সুরের মত লাগছে।

বড় হয়ে যাওয়া মেয়ে দুটোর মুখ মোমের পুতুলের মত নরম মনে হচ্ছে। ওদের বিছানার পাশ কাটিয়ে আস্তে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন শিবানন্দ। যেমন অনেক দিন দাঁড়িয়ে থেকেছেন ঘুম না আসা

রাতে। যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জীবনের অনেক অর্থহীনতার মানে খুঁজে পেয়েছেন।

রাস্তার আলোটা মৃদু নয়, নীল নয়।

তবু গভীর রাতের এই ঘুমন্ত রাস্তাটায় নিজের ঘুমন্ত মেয়ের মুখের আদল পেলেন শিবানন্দ। মোমের মত নরম আর শান্ত।

আর ওই ঘুমিয়ে পড়ে থাকা শান্ত রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, আজকের সারাদিনের 'নিজে'টাকে ভারী হাস্যকর ঠেকলো শিবানন্দর। যে নিজেটা পরাজয়ের গ্লানিতে পীড়িত হচ্ছিল।

হরিসাধনের কী দেখে অত মুগ্ধ হচ্ছিলেন শিবানন্দ! ভাল করে আর মনে পড়ছে না। তার ক্ষেত খামার, মাছ তরকারি, হাঁস-মুরগী সব কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, অকিঞ্চিতকর ঠেকছে আর কেন কে জানে সেই ঘোরানো শিংওলা গাঢ় কালো মোষ-গুলোর ছায়াই বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। যাদের দেখেই শিবানন্দ সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়েছিলেন।

ওই ছায়ারই আশেপাশে রাত চারটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত খেটে অস্থির হয় ওরা দুজন। হরিসাধন আর তার বৌ। আর তার বদলে ওরা আর ওদের ছেলেরা খুব ভাল খেতে পায়।

এই!

আর কিছু না।

হঠাৎ শিবানন্দর ভারী কুৎসিত লাগল সমস্ত ব্যাপারটা। অবাক হয়ে ভাবলেন, কী দরকার অত বেশীতে? কত খেতে পারে মানুষ, যার জন্যে অনবরত শুধু বাড়িয়েই চলতে হয়। এই তো, এতটুকু বেশী খেলেই তো কত অস্বস্তি!

অথচ তার জন্যেই এত আয়োজন। 'কিছু কিনে খেতে হয় না!' তাতেই বা হলটা কি?...তার পরিবর্তে নিজেদেরকে তো খেয়ে ফেলছ তিল তিল করে! খাঁটি ঘি খেয়ে স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে! উত্তম কথা। কিন্তু সে স্বাস্থ্য নিয়ে করছ কি তুমি? মনে মনে বন্ধুকে প্রশ্ন করলেন শিবানন্দ। উত্তরটা নিজেই দিলেন। সে স্বাস্থ্য নিয়ে হয়তো—আর দুটো মোষ বেশী পুষবে। কী লজ্জা! কী নির্বুদ্ধিতা!

ঘরে চলে এলেন।

আলমারির মাথা থেকে একটা হোমিও-প্যাথি বাক্স পেড়ে কয়েক দানা ওষুধ খেয়ে ফেললেন, থমকে দাঁড়ালেন বইগুলোর সামনে। কাঁচের ওপর হাত বুলোলেন একবার। জানতে পারলেন না ঠিক এই মুহূর্তে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বৌয়ের সঙ্গে গল্প করছে হরিসাধন বন্ধুর প্রসঙ্গ নিয়ে। ...'বই বই! ওই এক নেশা! যত রোজগার করল তার অর্ধেক ওই বই কিনে নষ্ট করল। আখেরের কথা ভাবল না। আরে বাবা, কিনে কিনে জমিয়েই তো চলেছিস। এত বই পড়ে উঠতে পারবি সারা জীবনে? ক'দিন বাঁচবি? কত পড়বি?'

জানতে পারলেন না।

তাই আস্তে আস্তে একখানা বই বার করে নিলেন। চলে এলেন বাইরে বারান্দায়। ওদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবেন না। কারো কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মোমের মত নরম শান্ত শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারবেন শিবানন্দ বাকি জীবনটা।

শুধু একবার মনে হল, ক'দিন বা বাঁচব? কতই বা পড়ে উঠতে পারবো? তবু পৃথিবীর কোথাও কোন শূন্যতা অনুভব করলেন না।

রাস্তা থেকে এসে পড়া আলোয় পড়তে লাগলেন। ঘরের মধ্যে মৃদু নীল আলোটা জ্বলতে থাকল।

যে ব্যামোর সঠিক কোন কারণ জানা থাকে না তাকে অনেক সময় এলার্জি বলে চালান হয়। কোন কারণ অকারণ নেই রোজ সকালে উঠে হ্যাঁচো হ্যাঁচো করে একুশটি-বার হাঁচলেন। কত ডাক্তারবদ্যি আসবে যাবে, কতবার স্টেথিসকোপ বুকে পিঠে মায় কপালে পর্যন্ত লাগান হবে। কিন্তু এ হাঁচির আসল কারণটা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে যাবে। তখন সাব্যস্ত হবে, এ হল এলার্জির হাঁচি। আবার এলার্জির কাশিও হয়—কোন কারণ জানা নেই তবু খুকখুক কেশে যাব। খাওয়া দূরে যাক, চিংড়িমাছ দেখলেই অনেকের গা গতর চুলকতে সুরু করে দেয়। এর নাম গা-চুলকনর এলার্জি। আমেরিকানদের রাশিয়ানে এলার্জি, রাশিয়ান-দের আমেরিকানদের উপর। কারণটারন নেই—এ হল নাম শুনলেই এলার্জি। তরুণ-তরুণীদের আছে একে অন্যের উপর মুগ্ধ প্রাণের দৃষ্টিপরশ বুলিয়ে দেবার এলার্জি। আবার ফ্যাসান হল মন-চুলকনর এলার্জি। এই রোগে মেয়েরা বেশী ভোগে। বসনে ভূষণে প্রসাধনে কেবল সারেগামাপাধানিসা করে বদলে বদলে চলে যাওয়ার নাম ফ্যাসান-[illegible]। কেন করছি, কিসের জন্যে করছি এ সম্বন্ধে মাথামুণ্ড বিচার করবার প্রয়োজন নেই। শুধু অকারণ পুলকে এণ্ডায় গণ্ডায় দিয়ে যাও।

অন্য আর কোথায়ও এমন নেই যা আছে এই নিউ ইয়র্কের [illegible]। [illegible] পা বাড়ালেই [illegible] [illegible] পা [illegible] পরার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে। দোকানের অলিন্দে অলিন্দে যারা বিরাজ করে তারা [illegible] এলার্জি [illegible] করবার যম। সবচেয়ে আধুনিকতম [illegible] পরে যে [illegible] [illegible] দর্শকের দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে তারা ম্যানিকুইন। নিশীথরাতে পথ চলতে চলতে কখন চোখে পড়বে কাচের শো-কেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুজিদ বার্দো কিংবা সুজি পার্কার। কাছে এসে ভ্রম ভাঙবে—আরে এ ত রক্তমাংসের অদ্ভুত অনুকরণ। সত্যি নয় —মিথ্যে মিথ্যে সত্যি। বিখ্যাত বিখ্যাত সব ফ্যাসানবাদিনীদের প্রমাণ সাইজের পুতুল বানিয়ে দোকানের দাওয়ায় দাঁড় করিয়ে রাখা
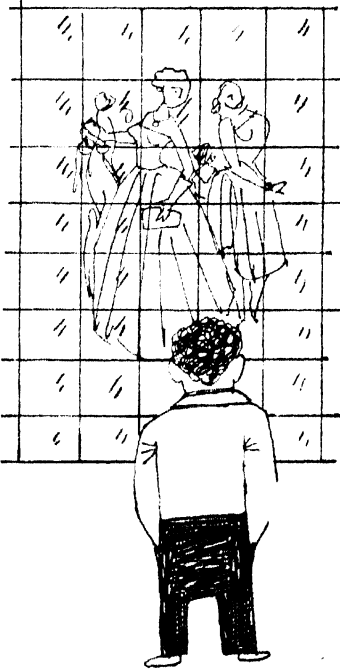
ম্যানিকুইনের প্রেমে পড়েন

হয়েছে খদ্দেরের মনে প্রাণে ফ্যাসানের যাদু পরশ বুলিয়ে দেবার জন্যে।

নিউ ইয়র্কের প্রসিদ্ধ কোন দোকানে ম্যানিকুইনরা জামা কাপড়ের ভিতর দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারে (অবশ্য বেলুনের সাহায্যে)। কোন ম্যানিকুইনের বরাত ভাল —তার গায়ে যে পরিচ্ছদই উঠুক না তা তর তর করে বিক্রী হয়ে যায়। দোকানী হালফ্যাসানের নতুন কিছু পেলে দ্রুত বিক্রী করবার জন্যে বেছে বেছে এইরকম জনপ্রিয় কোন ম্যানিকুইনের গায়ে তুলে দেয়। ম্যানি-কুইনদের আর একটা নাম আছে। তারা জামাকাপড়ের ফ্যাসান ঘাড়ে করে থাকে বলে সেই অর্থে তাদের অনেক সময় বলা হয় ক্লোজ হর্স।

আগেই বলেছি, প্রত্যেকটি ম্যানিকুইন সমানভাবে মনোহারিকা নয়—কেউ কেউ বেশী পছন্দের জন হয়ে পড়ে। আসল কথা প্রত্যেক ম্যানিকুইনের নিজের নিজের ব্যক্তিত্ব আছে। নিউ ইয়র্কের কোন কোন আধুনিক কবি আছেন, যাঁরা রক্তমাংসের জিনিসকে ভজনা না করে বিখ্যাত কোন দোকানের কোন ম্যানিকুইনের প্রেমে পড়েন। একলা রাতে শীতের মধ্যে নিজের মনোমত ম্যানিকুইনটির দিকে ঠায় বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছেন। 'পাই-পাই' ভাব করে নির্বাক প্রেম নিবেদন করেন। পুলিস এসে তখন তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ করে। দেশ হিসাবেও ম্যানিকুইনদের ব্যক্তিত্ব বদলায়। যেমন আমেরিকায় ম্যানিকুইনরা দেখতে স্বল্পবয়সী, ছিমছাম, রোগা লম্বা ধরনের মহিলার মত। কিন্তু ইটালীর ম্যানিকুইনরা সে তুলনায় দৈহিকভাবে অনেক পুরুষ্টু, ফ্রান্সের তারা বেশীভাগই বারবণিতার মত। ইংলণ্ডে তাদের চেহারায় কেমন জোয়ানমদ্দ ভাব, তাতে আভিজাত্যের লেশমাত্র নেই।

নির্জীব ম্যানিকুইনরা যতটুকু ফ্যাসান ছড়াতে পারে তার হাজারগুণ বেশী পারে রক্তমাংসের মডেলরা। যাদের অনুকরণে ম্যানিকুইনরা নির্মিত হয়। মডেলদের রকমসকমই আলাদা। কাগজে কাগজে এদের ছবি। জনসাধারণ এদের চালচলন হাবভাব

শুধু জানতে নয় অনেক ক্ষেত্রে তাদের নকল করতে প্রস্তুত। এরাই ফ্যাসানের প্রকৃত দূতী। সারা দেশ এদের 'মিমিক' করে। এদের কাজ দেশকে ফ্যাসান-কাঙাল করে তোলা। নিজের দেহটি সেফিল্ডের ছুরির মত ধারাল করে নতুন ফ্যাসানের পথ এরা পরিষ্কার করে দেয়। অপরের চোখের দৃষ্টিকে নেমতন্ন করে আনার যাবতীয় সামগ্রী এদের করতলগত। আমেরিকায় কোন মহিলা উর্বশী-সামিল বলে পরিগণিত হন যদি তিনি ছিপছিপে লম্বা বেতের মত সরু চেহারার অথচ নমনীয় হন। আমেরিকানদের চোখে এই রকম তন্বী ভাবটাই মহিলার পক্ষে সবচেয়ে ইঙ্গিত-মধুর, তাদেরই ললিত লোভনলীলা সবচেয়ে বিহ্বলতা সৃষ্টি করে। মডেল মাত্রকেই এমনি ক্ষুরধার চেহারা রাখতে হয় রোজগারের খাতিরে এবং জনপ্রিয়তা অটুট রাখতে এমন কিলকিলে চেহারা রাখা নিদারুণ কষ্টকর। মডেল মাত্রেই খাওয়াকে জুজুর ভয় করে। অতি ভোজন পাছে চেহারার সরু ফ্রেমটি ভেঙে দেয়। তাই মেদাধিক্য রোধ করার জন্য বহুলাংশে মডেলদের অপুষ্টিক থাকতে হয়। যাঁরা ফ্যাসান বিশারদ তাঁরা এর একটা কারণ আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন যে মডেল নতুন কোন ফ্যাসান চালু করার জন্য গাত্রাভরণ পরে পাঁচজনের সামনে যাবে, তার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আচ্ছাদন ভেদ করে যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে নতুন ফ্যাসান পেরিয়ে সবার দৃষ্টি অন্যত্র চলে যাবে, ফ্যাসান কারও চোখে পড়বে না, ফ্রেমটা পড়বে। অতএব ফ্যাসানের স্থান দেহের উপরে দিতে হলে গা-গতরকে সুসংবদ্ধ রাখতেই হবে। তাই মডেলদের এই কৃচ্ছ্রসাধন।

ঘণ্টা হিসাবে মডেলরা কাজ করে থাকে। এখন আমেরিকান ফ্যাসান জগতের যিনি মক্ষিরানী, যিনি কাঁধে করে নতুন নতুন ফ্যাসান লোকচক্ষুর সম্মুখে ক্রমাগত উপস্থিত করছেন, তাঁর নাম সুজি পার্কার। প্রতি ঘণ্টা ৬০০ টাকার কম ইনি কাজ করেন না। দিনদিন ফ্যাসান বদলে দেওয়া এঁর কাজ। সেই বদলানর ঢেউ তাঁর পারিবারিক জীবনেও এসে ধাক্কা দিয়েছে। ইতিমধ্যে দুবার বিবাহ ও একবার বিবাহ বিচ্ছেদ এঁর হয়েছে। সম্প্রতি এক সাংবাদিকের কাছে ইনি বলেছেন, তাঁর ভবিষ্যত সম্বন্ধে তিনি নিতান্তই অনিশ্চিত। কী করবেন তিনি ভেবে পান না।

রোজ রোজ নতুন ফ্যাসান আবিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু ফ্যাসান বস্তুটি আসলে যে কী তা কেউ জানে না। নতুন কিছু করে তার পিছনে ছুটে যাওয়ার নাম ফ্যাসান। একরকম মরীচিকা—অন্বেষণ? না, না এ একরকম এলার্জি। শুধু জামা কাপড় কেন চুলের ব্যাপারে কেরামতী করাও ফ্যাসানের অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকায় একজন ভদ্রলোক আছেন তাঁর নাম জর্জ মাস্টারস। ইনি মহিলাদের মাথার চুলের নতুন ফ্যাসান সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ ডলার কামিয়ে থাকেন। আমেরিকায় এখন এমন কোন নামকরা মহিলা নেই যিনি না এই মাস্টারের কাছে মাথা মুড়িয়েছেন। মাথা মুড়ন! এর বলার ছিরি শুনুন। সম্প্রতি ইনি ঘোষণা করেছেন, আমেরিকান মহিলাদের মাথার সর্বাত্মক ফ্যাসান খুলবে যদি তাঁরা চুল ছোট করে ফেলে ইউরোপীয় নৌজোয়ানদের মত কাটেন। এখন আমেরিকায় ঢেউ উঠেছে মহিলার চুলের গর্ব খর্ব করে ফেলাতে। সবাই সমান খাট করছেন না। তবে এই জর্জ মাস্টারস মেরিলিন মনরো থেকে মিসেস কেনেডির মাথায় কেয়ারী করে চলেছেন, সে খবর কাগজে দেখতে পাওয়া যায়।

ফ্যাসান জগতের চারজন সেরা রথী-মহারথীকে গুটিকতক প্রশ্ন করা হয়েছিল, ফ্যাসানটি কী বস্তু, লোকে কেন ফ্যাসান করে, ইত্যাদি। তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হয় এই ভেবে যে তাঁরাই ফ্যাসানের কুয়াশা ইউরোপে আমেরিকায় ছড়াচ্ছেন, তাঁদের কথা শুনে যদি বোঝা যায় এ পৃথিবীর সবাই কেন ফ্যাসান-পাগল। যে চারজনের কথা বলছিলুম এর মধ্যে ছিলেন ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের পোশাক পরিকল্পনার স্রষ্টা নরম্যান হার্টনেল। ইতালীর বিখ্যাত মহিলা ডিজাইনার শ্রীমতী সিমনিত্তা। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ফ্যাসান উদ্যোক্তা মিঃ নোরেল ও প্যারীর বিখ্যাত ফ্যাসানবিদ পিয়ের কার্দা। তাঁরাই ফ্যাসানের আগাপাশতলা সব কিছু বোঝেন। প্রশ্নের ভিতর দিয়ে যদি আঁচ করা যায় ফ্যাসান নামক বস্তুটি কী? প্রত্যেকের বক্তব্য আলাদা করে না বলে মোদ্দাকথাটা কী তাই এখানে বিবেচনা করা যাক।

প্রথম প্রশ্নটা ছিল—ফ্যাসানের কাজ কী?

এর উত্তরে তাঁরা বলেছেন, মহিলাদের মোহাবিষ্ট করে রাখার জন্যই ফ্যাসান। পুরুষ সাজে কর্তৃত্ব করতে, মহিলা আকর্ষণ করতে। ফ্যাসান বদলায় বারবার কারণ মহিলাদের মনও তো চিরস্থির নয়। ফ্যাসান মনের মধ্যে বিচিত্ররকমের অনুভূতির সঞ্চার করে। সাজা মানে নিজেকে আরও মধুময় করে তোলা। ফ্যাসান নিজেকে আবিষ্কার করাতে সাহায্য করে। ফ্যাসান মহিলার গরিমার চালচিত্তির রচনা করে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল—কোন দেশের মহিলা সবচেয়ে ফ্যাসানদুরস্ত?

এর উত্তরে যা বলা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, যে কোন দেশের মহিলারাই ফ্যাসান-দুরস্ত হতে পারেন। ইংরেজ মহিলার পক্ষে বলা হয়েছে তাঁদের সৌম্যভাব ও স্মিতবাক সবাইকে মুগ্ধ করে। ফরাসী মহিলাদের মত তাঁদেরও সঞ্চারিণী মূর্তি ধারণ করা সম্ভব। ফরাসী মেয়েরা নিজেদের সম্বন্ধে সুনিশ্চিত, তার কারণ তাঁরা জানেন ফরাসী পুরুষ মাত্রেই তাঁদের মহিলাদের সাজসজ্জা সম্বন্ধে সবসময়ে আগ্রহান্বিত। ইংরেজ পুরুষরা ততটা নন। আর মার্কিন মহিলারাও তাঁদের কর্মশক্তি, উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে নিজেদের আধুনিকা করে তুলতে পারেন ভাগ্যে পাওয়া তাঁদের নবনীয় লালিত্যে গড়া সুঠাম তনুর সাহায্যে। ইতালীর মহিলারাও নতুনভাবে সজ্জিত হতে সদাপ্রস্তুত। এ ছাড়া আরও বলা হয়েছে দুরকম মহিলারা ফ্যাসান-দুরস্ত হতে পারেন। প্রথম দলে যাঁরা

মহিলা সাজে আকর্ষণ করতে

তাঁরা জাত-সুন্দরী, তাঁদের ফ্যাসান নিতে হয় না। দ্বিতীয় পর্যায়ে যাঁরা তাঁরা জন্ম-সুন্দরী নন। সেজেগুজে-সুন্দরী। তাঁদের

ফ্যাসান ছাড়া উপায় কী? পৃথিবীর অধিকাংশ মহিলাই এই দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়েন।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল—কার জন্যে মহিলারা সাজেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে একের পর এক যা বলা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে মহিলারা সবার চোখ জুড়বার জন্যে সাজেন। এ পৃথিবীর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার অর্থ হল চোখাচোখি হওয়া। বিবাহিত কোন মহিলা আয়নার সামনে কালক্ষেপণ করার উদ্দেশ্য তাঁর মনের জনটির মনের আয়নায় তিনি যেন সবসময়ে সুন্দরী হয়ে বিরাজ করতে পারেন। কখনও বা মহিলারা সাজেন তাঁদের ভক্তের তুষ্টির জন্য। কখনওবা তাঁরা সাজেন নিজের বান্ধবীদের কাছে আরও সম্মান পাওয়ার আশায়। কখনওবা শত্রুদের জন্য—সাজগোজ করে শত্রুতা আরও বাড়িয়ে দেবার জন্য। কেউবা সাজেন অচেনা লোকের দৃষ্টি-পূজা পাবার আকাঙ্ক্ষায়। কেউ সাজেন নিজের স্বামীকে অন্য মহিলার শাণিত দৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে। কদাচিৎ কোন মহিলা বিনাকারণে নিজেকে ভূষিত করেন। যে মহিলা পুরুষ অন্বেষণ করছেন, তিনি অদেখা জনটির কথা স্মরণ করে আয়নার সামনে অবতীর্ণা হন। যেই তাকে পাওয়া হয়ে গেল তখন অন্য মহিলাদের থেকে বাঁচানর জন্য চাই সাজগোজ করা। কিন্তু বিনা কারণে আপনার মনের মাধুরী দিয়ে যদি কখনও কোন মহিলা নিজেকে চর্চিত করেন, তখনই তাঁর অনন্যা হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কদাচিৎ তা ঘটে থাকে। মরু বা দ্বীপে কোন মহিলাকে নামিয়ে দিয়ে এলেও দেখবেন সেখানে তিনি গাছের বা মাছের কাঁটা দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছেন। কানে কাটি গুঁজেছেন এবং তীরভেঙে কারও আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। মহিলাদের এমনি ফ্যাসান-প্রীতি।

স্টেথিসকোপ কপালে পর্যন্ত লাগাতে হবে

উপরের টীকাটিপ্পনী থেকে ফ্যাসান বস্তুটা জলীয় কি বাষ্পীয় তা বোঝা গেল কী গেল না! শুধু যা বোঝা গেল তা হল ফ্যাসান এক কঠিন বস্তু। যা ছাড়া গতি নেই। তাই শুধু বিদেশে কেন এদেশেও ফ্যাসানের ঢেউ এসে পড়েছে। তার কারণ কী একটু শুনলেই বুঝতে পারবেন। সেদিন মার্কেটে একটি দোকানে দেখা গেল একজন নির্ভেজাল বাঙালী মহিলা, যিনি যৌবনের এভারেস্টে সমুত্তীর্ণা, গটমট করে এলেন ঘর আলো করে কী যেন কিনতে। শুনলুম দোকানী আপ্যায়িত করে তাঁকে বলছেন—দিদি ফ্যাসানের সব সময়ে আগে আগে। এমন সুন্দর হালফ্যাসানের বেনারসীটি কবে জোগাড় করলেন? তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মহিলা বললেন—এটা আমার ঠাকুমার বেনারসী, মা এবার জন্মদিনে দিয়েছেন।

মহিলাটির কাজ সারা হলে চলে যাবার পর সেই পরিচিত দোকানীকে বললুম—আপনারও এলার্জি? উনি শুনলেন এলাচি। বেয়ারাকে জোরসে হেঁকে উনি বললেন—আভি লাও, পান, সুপারি, এলাচি, জলদি।

পুরোদস্তুর কাবুলীওলা একজন। মুখে কাঁচাপাকা চাপ দাড়ি, মাথায় বাবরি-ছাঁটা চুল, পাগড়ির ওপর লাল কুল্লার সুচালো চুড়াটা রয়েছে উঁচু হয়ে, ডান-কাঁধের ওপর নীল রঙের একটা রুমাল, কুর্তার ওপর কোমর পর্যন্ত প্রচুর কারুকার্য করা মখমলের কাবুলী মেরজাই, মায় চামড়ার স্ট্র্যাপে বাঁধা কাবুলী ব্যাগ বা বটুয়াটা পর্যন্ত ডানদিকে ঝোলানো রয়েছে। মোটকথা কাবুলীওলা নয় বলে সন্দেহ হওয়ার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। তবুও খানিকটা ধোঁকায় পড়ে যেতেই হল সে পরিবেশে, বিশেষ করে যে অবস্থায় দেখা।

গাঁয়ের বারোয়ারীতলায় কীর্তনের আসর বসেছে, দোলে রাই-রাজাতলায় মাস খানেক ধরে একটা মেলা হয় সেই উপলক্ষে। জায়গাটা বর্ধমানের কাছেই। বর্ধমানে একটা কাজে গেছি, শিউড়ি থেকে একটা নাম-করা দল এসে ক'দিন থেকে গাওনা দিচ্ছে শুনে মনে করলাম একবার হয়েই আসি। শুনে রাতারাতিই ফিরে আসা যাবে। গিয়ে আসরে ঢুকতে প্রথমেই ঐ দৃশ্য।

এক পাল ক্ষীণ স্বাস্থ্য স্বল্প-পরিচ্ছদ পাড়াগেঁয়ে বাঙালীর মাঝখানে এক বিরাট-বপু কাবুলীওলা—নজরে পড়তেই হবে যে। আরও এই জন্য যে, ভিড়ের মধ্যে হলেও ওর কাছাকাছি জায়গাটা একটু ফাঁকা, ভয়-সমীহেই হোক, বা গায়ের হিঙের গন্ধের জন্যেই হোক, ওর থেকে হাত দুই-তিন বাদ দিয়েই বসেছে সবাই। ও দিব্যি আসন-পিঁড়ি হয়ে আছে বসে, কোলের ওপর হাত আড়াইয়ের একটা খেঁটে লাঠি, গাঁঠগুলোতে পেতলের কাঁটি বসানো।

একটু থমকে দাঁড়াতে হল বৈকি। একটা সাহেব-সুবো হলে অতটা খেয়াল করতাম না। ওদের এসব দেখে বেড়াবার ঝোঁক আছে: ফটো নেয়, কীর্তন শোনবার জন্যে না হোক, আমাদের কৃষ্টি-সভ্যতার নানাদিক বোঝবার জন্যে ঢুকেও পড়ে মাঝে মাঝে। কাবুলীওলা কি উদ্দেশ্যে এমন জাঁকিয়ে বসবে! খানিক-ক্ষণ চেয়ে থেকে কিছু হদিস না পেয়ে প্রথমটা মনে করলাম—যাকগে, যা করতে এসেছি করে ফিরে যাই। কত আজগুবি ব্যাপারই তো হচ্ছে দুনিয়ায়, তার মধ্যে কাবুলীর কীর্তন শোনাও না হয় একটা রইল।

কৌতূহল চেপে কিন্তু এদিকে কান দেওয়া ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ল। একটা জায়গা নিয়ে বসে ছিলাম, যেন ফাঁকা জায়গা দেখতে পেয়ে উঠে গিয়ে একটু পাশ ঘেঁষে বসলাম। আশ্চর্য, লোকটা কাঁদছে! ওদিকে আখরের পর আখর বসিয়ে খোল-কত্তালের সঙ্গে কীর্তন গেয়ে যাচ্ছে, এ স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে হাপুস নয়নে নিঃশব্দে কেঁদে যাচ্ছে: গাল বেয়ে দাড়ি বেয়ে মখমলের মেরজাই ভিজিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। অবাক কান্ড! অনেক ভক্তি-অশ্রুর প্রস্রবণ দেখেছি, এ যেন সবকে ছাপিয়ে গেছে। কাবুলীওলার নীরেট শরীরের মধ্যে এমন একটা জলীয় অংশ আছে তাও তো জানতাম না। কীর্তন শোনা শিকেয় উঠল। লক্ষ্য করলাম অন্য কারুর বিশেষ কোন কৌতূহল নেই, যা থেকে মনে হল লোকটা কয়েকদিন থেকেই এসে বোধ হয় বসছে। জমাট-আসর, কাউকে প্রশ্ন করে বাধা সৃষ্টি করতেও মন সরছে না, হয়তো বিরক্তও হয়ে উঠবে। খানিকটা হ্যাঁ-না করে শেষ পর্যন্ত কিন্তু থাকতে পারলাম না চুপ করে। পাশের লোকটির কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"এ লোকটা কাঁদে কেন বলতে পারেন? বোঝে কিছু?"

বিরক্ত হল না, অমায়িকভাবেই হেসে বলল—"বোঝবার জো আছে কি তাঁর লীলা কার মধ্যে কিভাবে প্রকাশ করছেন?"

বললাম—"সত্যিই তো।"

সামনের লোকটি ঘুরে চাইল, বলল—"যবন-হরিদাসই বোধ হয়; ছদ্মবেশ নিয়ে এসে বসেছেন।"

দেখলাম কৌতূহল আমার মতই উদ্রেক হয়েছিল, তবে সবাই এক-একটা মীমাংসা করে নিয়ে নিশ্চিন্ত আছে।

আমার অস্বস্তিটা কিন্তু যেতে চাইছে না। লীলা তাঁর দুর্বোধ্য ঠিকই, তবে কল্পনা এবং বিশ্বাসকে পুরোপুরি লাগাম ছেড়ে দিলেও যবন-হরিদাস প্রচ্ছন্নভাবে কীর্তন শুনতে এসে বেছে বেছে কাবুলীওলার ছদ্মবেশই নিতে যাবেন কেন, যাতে সবার নজর তাঁর দিকেই গিয়ে পড়ে? কোথায় ভালো গাওনা শুনব, না, এক সমস্যা নিয়ে পড়লাম। কাবুলীওলা কাঁধের রুমালের কোণ টেনে চোখ আর দাড়ি মুছে নিল, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কাবুলী সাইজের। একটু পরে ঘুরে দেখি আবার সব ভেসে গেছে জলে।

ওকেই না হয় জিজ্ঞেস করি? তাই করতে হবে, তবে এখন ঠিক হবে না ভেবে অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরে আসরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলাম। গানের কি হচ্ছে না হচ্ছে বিশেষ হুঁশ নেই, হঠাৎ "ইয়া আল্লাহ"-র সঙ্গে সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে ফিরে চাইতে আমার দৃষ্টিটা ওর মাথার ওপর দিয়ে অন্য একজনের ওপর গিয়ে পড়ল। সেটা হল লোকটার চেহারার জন্যেই।

ওর চেহারার একেবারে উল্টো: বেঁটে, লিকলিকে রোগা, শীর্ণ মুখের মাঝখানে খাঁড়ার মত টিকলো নাক, তার ডগাটা পেট্রোম্যাক্সের কড়া আলোয় চিকমিক করছে, চোখ দুটো চঞ্চল এবং যেন ধূর্তামিতে ভরা। লোকটা এই বাইরে থেকে এসে একটু যেন ব্যস্ত হয়েই ঢুকছে আসরে, তা ছাড়া দৃষ্টিটাও যেন কাবুলীটার ওপরেই। আমার স্মৃতিটা হঠাৎ একটু সজাগ হয়ে উঠেছে; ঠায় চেয়ে আছি, ভ্রূদুটো উঠেছে কুঁচকে। তার পরেই ধাঁ করে মনে পড়ে গেল। দীনু রক্ষিত। লাখের মধ্যে একখানি চেহারা, ভুল হওয়ার জো নেই। আমার সমস্যা অর্ধেক মিটে গেল; কাবুলী-চরিত্র দীনু রক্ষিতের নখদর্পণে। যেমন অধৈর্যভাবে লোকটার দিকে দৃষ্টি ফেলে এগিয়ে আসছে তাতে মনে হল ব্যাপারটার সম্বন্ধে ওর কৌতূহলও কম নয়; এমনকি হয়তো খানিক-খানিক জানেই এবং কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়েই উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারটা বেশ জমাট বেঁধে উঠল আমার কাছে।

দীনু রক্ষিত এঁকেবেঁকে আসরের বেশ খানিকটা ভেতরের দিকেই গিয়ে এমনভাবে একটু তেরছা হয়ে বসল যাতে কীর্তন শোনাও হয় আবার কাবুলীওলার দিকেও পুরোপুরি নজর থাকে। গাওনার মাঝখানে এভাবে ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে কয়েক জনের সঙ্গে একটু বচসাও হয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্য, অনেকের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হলেও কাবুলীওলা একবারও একটু ঘাড়টা ফেরাল না, যেন আরও শক্ত হয়ে বসে একভাবে কেঁদে যেতে লাগল। আমার নজর ওদের দুজনের দিকে; দীনু রক্ষিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাবুলীওলার দিকে চেয়ে আছে, মুখে অল্প একটু হাসি; কাবুলীওলার দৃষ্টি সোজা কীর্তনীয়াদের ওপর নিবদ্ধ।

কিছুক্ষণ যেতে কিন্তু বুঝলাম বাইরে থেকে ঐরকম নির্বিকার মনে হলেও আসলে তা নয়। দেখলাম, ও আসার পর থেকে এর সেই বুকভাঙা নিঃশ্বাসের সঙ্গে "ইয়া

আশ্চর্য, লোকটা কাঁদছে!

আল্লাহ!" বলে ওঠাটা যেন বেড়ে গেছে। এর পর এর দিকে চেয়ে দীনু রক্ষিতকে সেই হাসিটুকু একটু বাড়িয়ে মাথায় অল্প অল্প ঝাঁকুনি দিতেও দেখলাম, যেন চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইসারায় উৎসাহিত করছে। বেশ বোঝা যায় সমস্ত ব্যাপারটা চলছে দুজনের যোগসাজসে। সমস্যা মিটবে কি, যেন আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। যার জন্যে আসা, সেদিকে বিশেষ মন দিতেও পারছি না, বেশ অশান্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। দীনু রক্ষিতের কাছে উঠে গেলে হয়। কিন্তু ও ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে যে বাকবিতণ্ডার ঢেউটা উঠল, তাতে বাইরের লোক হয়ে আমার আর পা বাড়াতে সাহস হল না। রয়েছেও বেশ খানিকটা দূরেই।

বিরক্তও লেগে গেছে। কি করতে এসে একটা বাজে কথা নিয়ে বসে বসে মাথা ঘামানো। ফিরেও যেতে হবে এতটা পথ। এক সময় মন থেকে সবটা ঝেড়েঝুড়ে বেরিয়েই যাব ভাবছি, এমন সময় দেখি দীনু রক্ষিতও ওদিকে মাথার ঝাঁকুনিতে সেই রকম উৎসাহের ইঙ্গিত দিয়ে উঠে পড়েছে। সেই রকম বচসা চালাতে চালাতে বাইরে গিয়ে পড়েছে, আমিও উঠে পড়লাম।

রাই-রাজার মন্দিরের কাছাকাছি গিয়ে ধরলাম ওকে, নমস্কার করে বললাম—"রক্ষিত মশাই যে, চিনতে পারেন?"

"কোথায় যেন দেখেছি....."

—ভ্রূ কুঁচকে মুখের পানে চেয়ে রইল।

বললাম—"বর্ধমানেই, গাড়িতে।"

"ও হাঁ, খাঁ-সায়েবকে টেনে তুলে যেদিন আগা-ব্যাটাকে ভাগালাম।........আমাদের মুখুজ্জে মশাই তো?"

বললাম—"হাঁ, তারপর ওয়েটিং রুমে সেই আগায়-স্কচে যুদ্ধ ঘটানো, গান নিয়ে..."

হাসতে লাগল। বলল—"ঠিক ঠিক মনে পড়ছে। দেখুন না গেরো!"

বললাম—"এবার আবার এটাকে নিয়ে কি মতলব এঁটেছেন?"

প্রশ্ন করল—"কোথায় উঠেছেন? এক কথায় তো সারা যাবে না।"

বললাম—"এসেছি বর্ধমানে। শিউড়ি থেকে ভালো দল এসেছে শুনে এসেছিলাম। তা গান শুনব কি, কাবুলীর কাণ্ড দেখে থ হয়ে বসে আছি। কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, কিছু বোঝে নাকি?"

"বুঝলে কাঁদতে যাবে কেন? মানও নয় মাথুরও নয়, হচ্ছে তো বাল্যলীলা। তা আপনাকে তো ফিরে যেতে হবে এক্ষুনি। নৈলে কাহিনীটা একটু শুনতেন বসে।"

মন্দিরের চারিধারে খোলা রক, আমরা পেছন দিকটা গিয়ে বসলাম। দীনু রক্ষিত আরম্ভ করল—

"হাজার-দুহাজার মাইল থেকে ঘরদোর ছেড়ে বাংলা মুলুকে রোজগার করতে আসছিস, তা যা করতে এসেছিস তাই করে ফিরে যা, তা নয়, নানা রকম উপদ্রব এসে ঢোকে ব্যাটাদের মাথায় মশাই। বাংলা দেশের জলটাই সেই রকম কিনা, একটু পেটে গেলেই সব ওলট-পালট করে দেয়। এর নাম করিমুদ্দিন খাঁ। বছর দুয়েক হল দেশ থেকে এসে কারবার ফেঁদেছে—এদের যা ঘরানা কারবার, ঘুরে ঘুরে হিং বেচা আর চড়া সুদে ধার দিয়ে দরজায় লাঠি ঠুকে আদায় করা। বেশ চলছিল, সম্প্রতি মাথার মধ্যে এক নতুন উপদ্রব সেঁদিয়ে এই শনির দশা যাচ্ছে—কারবারের গয়া, আর ঐ তো দেখলেনই নিজের চোখে......

"ও যা দেখলেন আপনি—প্রায় তুরীয়-ভাবের অবস্থা, ওটা শেষ পর্যন্ত আমায়ই মাথা থেকে বের করতে হল, সবটা শুনলেই বুঝতে পারবেন, কেন, কি বৃত্তান্ত। লোকটাকে এখন আপনার যেমন দেখে মনে হচ্ছে, গাওনা শেষ হওয়ার আগেই ভাবের দাপটে বোধ হয় জল হয়ে গলে মিলিয়ে যাবে, আসলে কিন্তু তেমন নয়। সুদী কারবার এ-তল্লাটে আরও ক'জন কাবুলী করছে, তার মধ্যে খাঁসায়েবকে দেখেছেনই আপনি -পিলে, ডিসপেপসিয়া, তার ওপর দীর্ঘকাল ধরে এখনকার লোকের সঙ্গে মেলামেশা, ওদিককার তেজ মরে গিয়ে এখন যেন আমাদেরই একজন; করিমুদ্দিন কিন্তু

একেবারে অন্য রকম। লাঠি হাতে সুদ আদায় করতে ওর জুড়ি নেই, কাজিয়া করে বার দুই পুলিসের হাতেও পড়েছে এই বছর দুইয়ের মধ্যে, টাকা খাইয়ে কোনরকমে রেহাই পেয়েছে। যাকে বলে বাপের কু-পুত্তুর, ওদিককার গরমাইটা এখনও কাটে নি আর কি। বলবেন—তা লোকেরা এগোও কেন ওর দিকে, আরও সব কাবুলী তো রয়েছে। আরও সব যারা, তারা এদেশে থেকে থেকে, এদেশের লোককে চিনে গেছে, টাকা বের করবার বেলা একটু বেশি হুঁশিয়ার। করিমুদ্দিন সেদিকে মুক্তহস্ত, নাওনা কত নেবে, তারপর সুদের বেলায় ঐ তো বললুম—তাগাদার চোটে অন্ধকার দেখিয়ে দেবে। মানুষের অভাব-অনটন আছে, অত অগ্রপশ্চাৎ ভেবে তো কাজ করতে পারে না, গিয়ে পড়তে হয় ওর হাতে।

আবার লোভ বলে যে মস্ত বড় এক রিপু রয়েছে মানুষের। বিশেষ অভাব, অনটন নেই, অথচ চাইলে দু'শ চারশ' এসে যাচ্ছে হাতে—অনেকে লোভের বশেও গিয়ে পড়ছে ওর খপ্পরে। একজন হল নলিনী বোষ্টমীর বর বৃন্দাবন বৈরিগী। তবে বৃন্দাবনকে আবার ঠিক ওদের মধ্যেও ফেলা যায় না। নগদ টাকা পাওয়া যাচ্ছে দেখে ওর মাথায় ব্যবসা করবার ঝোঁক চাপল হঠাৎ। করিমুদ্দিনের কাছে হাত চিঠেয় শ'তিনেক টাকা নিয়ে এখানেও নয়, বর্ধমানেও নয়, ও একেবারে খাগড়ায় গিয়ে একটা মুদিখানার দোকান খুলে বসল। বললে ওখানে কি একটা নাকি সুবিধে আছে।

চলল না ব্যবসা। সাতপুরুষে কেউ করিমুদ্দিনের কাছে সস্তা কর্জও পায় নি, করেও নি তো ও-কাজ। চলল না, কিন্তু একটা রোখ চেপে গেল। আসে, হাতচিঠেয় টাকা নেয়, করিমুদ্দিনের সুদটুকু পেয়ে গেলেই হল, গঞ্জের মধ্যে ফলাও ব্যবসা ফেঁদেছে, কি হচ্ছে না-হচ্ছে খোঁজ করে না, টাকা দিয়ে যায়। এই করে করে কর্জটা প্রায় যখন হাজারের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল, তখন আসা-যাওয়া কমাতে-কমাতে একেবারে বন্ধ করে দিল বৃন্দাবন। তাগাদাটা করতে দিত না, নিজে যখন আসত সুদের টাকাটা নিজেই দিয়ে যেত, আসা বন্ধ করে দিতে করিমুদ্দিনও বাড়ি বয়ে তাগাদা আরম্ভ করে দিল।

আমি ছিলাম না; একটা কাজে দিন তিনেকের জন্যে বাইরে গিয়েছিলাম, ফিরে শুনলাম গাঁয়ের মধ্যে একটা বড় রকম কাজিয়া হতে যাচ্ছিল, পাড়ার লোকেরা এসে কোনরকমে থামিয়ে দিয়েছে......"

আমি প্রশ্ন করলাম—"কাজিয়া'—তা বৃন্দাবনের বাড়িতে অন্য বেটাছেলে কেউ ছিল নাকি?"

একটু হাসল দীনু রক্ষিত, নাকের ডগাটা জোছনায় [illegible] চিকচিক করে উঠল।

বলল—"ব্যাটাছেলের বাবা রয়েছে যে! সবটা শুনুনেই আগে। বৃন্দাবনের বাড়িতে তার বুড়ো মা, মালা নিয়েই থাকে, বৃন্দাবনের বউ, ঐ নলিনী, আর তিনচারটি ছেলেমেয়ে—এই বছর বারো-তেরোর মধ্যে। আগের যে দু'দিন তাগাদায় আসে করিমুদ্দিন, নলিনী ছিল না। এদিনেও নয়, তবে এসে পড়েছিল। বড় পুকুর থেকে পেতলের ঘড়া করে খাবার জল আনতে গিয়েছিল, করিমুদ্দিন সদরের চৌকাঠে লাঠি ঠুকে "সুদ দেও!" বলে হাঁক দিয়েছে, নলিনী এক পর্দা চড়িয়ে উত্তর দিল, "এই নে'সাচি, দাঁড়া!!" তারপর ঘড়াটা উঠোনেই বসিয়ে কোমরে আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে পাশ থেকে বিচুলিকাটা বঁটিটা তুলে নিয়ে ছুটল। সোয়ামীর ব্যবহারে মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে রয়েছে, তার ওপর শুনেছে দুদিন এসে গালমন্দ করে গেছে করিমুদ্দিন, ছুটল সুদের হিসেবনিকেষ করে দিতে।...বিড়ির অভ্যেস আছে মুখুজ্যে মশাইয়ের?"

বললাম—"না।"

দীনু রক্ষিত পকেট থেকে একটা টিনের ডিবে বের করে ধরাল একটা, কয়েকটা টান দিয়ে বলল—"গেরো আর কাকে বলে?...... আমি বিকেলে এসে সব শুনলুম। সন্ধ্যে হয়ে গেলে মনে করলুম একবার হালচালটা বুঝে আসি বৃন্দাবনের বাড়ি থেকে; অনুগত লোক একটা গুরুতর কাণ্ডই তো হতে যাচ্ছিল। উঠতে যাব, সদর দরজায়—"রাক্ষিত মোশায় আছেন?"

করিমুদ্দিনের গলা। হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলাম। "কি খাঁ সায়েব, তুমি নাকি বৃন্দাবনের বাড়ি কাজিয়া করতে গেছলে?"

খবরটা ইচ্ছে করেই উল্টে দিলুম, তাই দিতে হবে তো? ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে, দেখলাম যেন কাহিলও হয়ে গেছে এর মধ্যে। বলল—সোব হামার কসুর রাক্ষিত মোশায়, হামায় বাঁচাতে হোবে। ইয়া আল্লা!"

বুকে ধপাস ধপাস করে দুটো ঘা।

"এই নে'সাচি, দাঁড়া।"

বললুম—"তা দেখা যাবে, ভেবো না। তুমি কিন্তু আর বৃন্দাবনের বাড়ি যেও না, আমি নিচ্ছি সন্ধান তার।"

"আমি উসকো-বাড়ির দরজায় মাথা দিয়ে পড়ে থাকবে। ইয়া আল্লাহ। আমায় বাঁচান।"

জিজ্ঞেস করলাম—"তার মানে?"

তখন ভাঙল কথাটা, ভাঙা ভাঙা হিন্দী, বাংলা আর ওদের নিজেদের ভাষা মিলিয়ে যেমন বলে। আমি আবার কিছু কিছু বুঝি তো। নলিনী বোষ্টমীকে দেখে ওর মনে প্রচণ্ড আসনাইয়ের বেগ এসেছে, তাকে না পেলে বাঁচবে না। ও বৃন্দাবনের সব টাকা মকুব করে দিচ্ছে হাত-চিটে ফিরিয়ে দিয়ে। নলিনীকে নিকে করে দেশে নিয়ে গিয়ে ...ম করে রাখবে। ওকে না পেলে কোনমতে ...বে না। সে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা।"

আমি একটু বিস্মিতই হয়ে বললাম—"অথচ নলিনী যে আঁশবঁটি নিয়ে কাটতে গেল?"

"ঐ তো কাল হয়েছে। আপনি আমি যে করতে হলে বা দিতে হলে খুঁজব গলা পর্যন্ত ঘোমটা টানা একটা প্যানপেনে মেয়ে, দাঁত চড়ে কথা কয় না, ওরা তো সে জাত নয়। ঐ যে বঁটি নিয়ে তেড়ে এসেছে ঐতেই ঘুরিয়ে দিয়েছে ব্যাটার মাথা। নলিনী বোষ্টমী দেখতেও তো সেই রকম। মাথায়

বৃন্দাবনকে ছাড়িয়ে যায়, আড়েও তেমনি, তেমনি মধুঢোলা আওয়াজ গলায়। তা হলে কি হবে? জাতটা যে আলাদা। যা আপনার আমার কাছে দোষের, ওর কাছে সেগুলোই কনের গুণ হয়ে দাঁড়াবে না?

মনে মনে বললুম—ওরে হারামজাদা, তোর পেটে পেটে এই মতলব। দাঁড়া তোর নিকে করার সাধ মেটাচ্ছি। সেদিন তো বুঝিয়ে সুজিয়ে ফিরিয়ে দিলাম—"ইয়া আল্লা, ইয়া আল্লা! করে বুক ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। ভাবলাম নেশাটা কেটে যাবে, উল্টে আরও যেন বেড়েই যেতে লাগল। আমায় তো অতিষ্ঠ করে তুললে—বলো তুমি নলিনীকে—একেবারে বেগম করে রাখব তাকে—তেন-তেন, লোভ দেখানোর আর হিসেব নেই। একরকম উদম পাগলই। আমারও হাতচিঠি-গুলো ফিরিয়ে দিলে, শ'পাঁচেক টাকার ছিল, একদিন এসে দু'শ টাকার দুখানা নোট হাতে গুঁজে দিলে—তুমি নলিনীকে বলো। নিকে হয়ে গেলে আরও দেবে।

মহা এক দুর্ভাবনায় পড়া গেল। ভয় হল কোন্ দিন নিজে গিয়ে না পাড়ে কথাটা। তাহলে নলিনী তো বিচুলি-কাটা বঁটিতে পেড়ে জ্যান্তে দু'আধখানা করে দেবে। অনেক করে বোঝালাম—তোরও তো সেখানে তিনটে বিবি রয়েছে, ছেড়ে ব্যবসা করতে এসেছিস, ভেবে দেখ না একবার। বললে, আমি তাদের তিনটেকেই তালাক দেব,—না হয় নলিনীর বাঁদী হয়ে থাকতে চায় তো থাকবে—ওকে আমার চাই-ই। অতিষ্ঠ করে তুললে মশাই। বাড়ি এসে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকে, আর অষ্টপ্রহর ঘ্যানর ঘ্যানর—ঐ একঘেয়ে আসনাইয়ের কথা। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে এই মতলবটা বের করেছি, ত... মুখে নিজের তারিফ করতে নেই, ... ধরেছে, দেখতেই তো পেলেন। তবে এখনও অনেক বাকী। মনে মনে বলি—ব্যাটা তোকে ভালো কথায় বললুম শুনলিনি, শেষ পর্যন্ত যদি কোপনি-সার না করে ছাড়ি তো আমার নাম দীনু রক্ষিত নয়।

বললুম—আগা সায়েব আসনাই একতরফা হলে তো চলবে না, ওদিকেও মন ভেজা চাই। তা সেটা শুধু হাতচিঠে ফিরিয়ে দিলেই তো হবে না। একেবারে মুষড়ে পড়ল—'বলুন কি করলে ভেজে মন, আসনাইটা ওদিকেও হয়।'

এই রাস্তা বাৎলে দিয়েছি। সাতপুরুষে বোষ্টম, যদি দেখে যবন হয়েও কেষ্ট-প্রেমে

"ব্যাপারটা তাহলে এই!"

মাতোয়ারা, তখন আর কিছু বলতে হবে না। ইতিমধ্যে হাতচিঠেগুলো ফিরে পেয়ে এমনই মনটা একটু নরম হয়ে থাকলেই তো। ঠিক এই তালের মাথায় আমিও কথাটা পাড়ব; ব্যস, আর দেখতে হবে না।

বসা-টসার ব্যবস্থাটা আমিই করে দিয়েছি। অতটা লক্ষ্য করেন নি আপনি,—আসরের ঠিক উল্টো দিকেই মেয়েরা বসে, সামনেই থাকে নলিনী। আসরে যেখানেই থাক, করিমুদ্দিনের লাসখানা নজরে পড়তেই হবে। তবে ঐ তুরীয় ভাব আর চোখের জলটাও দেখা চাই তো; ঐ ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাই। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে বসি উইয়ে দিই। এদিকে এ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে, ওদিকে নলিনী বোষ্টমী কটমটিয়ে আছে চেয়ে, যেন পায় তো ওর কল্লা-পাগাড়সুদ্ধ কাঁচা মাথাটা কচমচিয়ে চিবিয়ে খায়। দৃশ্যটা বসে বসে দেখবার মতনও তো।

কেত্তনের আসরে মোছলমান, আপাও উঠেছিল। একটা কথা চারিয়ে দিয়েছি—যবন হরিদাস এসে ভর করেন, থাকতে পারে না। অবিশ্বাসেরও কিছু নেই দেখতেই পাচ্ছেন। শুধু চোখের জল এত কোথায় পায় তার কোন হদিস পাইনি মশাই! আমি জানতুম ওটা আমাদেরই একচেটে; সে তো শুনেছি খটখটে মরুভূমির দেশ একটা!"

চোখ কপালে তুলে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল দীনু রক্ষিত, যেন এইটেই ওর কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা।

একটু হেসে বললাম—"সেই কথা তো আমিও ভাবছিলাম। তা ভিন্ন কত দিন এভাবে কেঁদেই বা যেতে পারবে?"

"আর বড় জোর হপ্তা খানেক, সেদিকে আমার ব্যবস্থা ঠিক আছে, নিশ্চিন্দি থাকুন আপনি। ইতিমধ্যে রসটা মরুক তো ভালো করে।"

বললাম—"বুঝলাম না তো কি ব্যবস্থা।"

"এই যে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কর্জ দিয়ে সুদের ব্যবসা করে বেড়ায়—এদের নাইনটি পারসেন্ট অন্যের কর্মচারী মশাই। কেউ কেউ পুরনো হয়ে গিয়ে নিজের ব্যবসাই চালায়—যেমন ধরুন খাঁ সায়েব। করিমুদ্দিন মনিবের কাজই করে যাচ্ছে, একেবারে আনকোরা তো। বাজার নষ্ট করে দিচ্ছে, অন্য সবাই চটেও আছে, তাদের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে জরুরি চিঠিও লিখিয়ে দিয়েছি—এইরকম চাল চলন তোমার কর্মচারীর,—টাকা-পয়সা বেলেল্লাগিরি করে উড়িয়ে দিচ্ছে, শিগ্গির ডেকে নাও।

তা সেদিক দিয়েও রস মেরে আনছি তো। বন্দোবস্তের তারপর আমার হাতচিঠের কথা তো শুনলেন। আরও যারা আমার জানাশুনা বা অনুগত, তাদেরগুলোও তো একে একে হাত করে নিচ্ছি। ইদিকে এই তারপর আমার যে এই মেহনৎটা হচ্ছে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো—সেটা বুঝি কিছু নয়?...... ইয়ার্কি পেয়েছে!"

—ওর উদ্দেশে চোখ পাকিয়ে রইল আমার দিকে। একটু হেসেই প্রশ্ন করলাম—"তার জন্যে কি করছেন?"

"তুই যবন হয়ে কেত্তনের আসরে জাঁকিয়ে বসছিস, একরকাঠা জমি দখল করে, দেশের মানুষও নয়—তা তাদের খেসারৎ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হবে না?...দৈনিক দশটি করে টাকা টাঁকে গুঁজছি তো—মেহনতানাই বলুন বা ঘটকালিই বলুন,—আরও ভাবছি হালকা করে নিয়ে বিদেয় করবার উপায়......"

—চোখ দুটো আস্তে আস্তে নরম হয়ে এসে ধূর্তামির হাসিতে চঞ্চল হয়ে উঠল, টান পড়ে নাকের ডগাটা চকচক করতে লাগল।

একটু হাসি মুখে করে আমিও নেমে পড়লাম রক থেকে। বললাম—"ব্যাপারটা তাহলে এই! আচ্ছা, এবার আসা যাক রক্ষিতমশাই। রাত হয়েছে। কি বলেন?"

র দূরান্তরের পুরাণ কাহিনীর মধ্যে অনেক সময়ে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। আমাদের উর্বশী ও পুরূরবার ছায়া যেন গ্রীস দেশের কিউপিড ও সাইকি, সেই গল্পেও অপ্সরা-কন্যা যেই দেখলে প্রেমিকের অনাবৃত মূর্তি, অমনি শুরু হল বিচ্ছেদ ও বিরহ। এই উপকথার প্রতিধ্বনি মেলে উত্তর য়োরোপে, পশ্চিমে ওএল্‌স দেশে, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুদের মধ্যেও। অনেক সময়ে প্রাগিতিহাসের অস্পষ্ট জগত খুঁজে এই সব সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; আমরা জানি আর্যদের বিভিন্ন শাখা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে, ইরানে, গ্রীসে ও য়োরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের পুরাণ কথা, দেব দেবী সে সব অঞ্চলে হয়তো সামান্য ভিন্ন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সর্বদা এমন সহজ ব্যাখ্যা মেলে না, যেমন যখন মিল দেখা যায় 'আর্য' ও 'অনার্য' দেশের মধ্যে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে কোন্ দূর অতীতের এক বিশ্বপ্লাবী বন্যার কিংবদন্তী। আমাদের পুরাণে মানব-পিতা বৈবস্বত মনু কি করে প্রলয় কালে সৃষ্টি বাঁচিয়েছিলেন, তা অনেকেরই জানা আছে। একদা এক ক্ষুদ্র মাছ মনুকে অনুরোধ করলে বড় মাছদের থেকে তাকে বাঁচাতে। মনু প্রথমে তাকে জালায় রাখলেন, কিন্তু সে এত বড় হতে লাগল যে ক্রমে তাকে পুকুরে, গঙ্গায় ও সমুদ্রে রাখতে হল। তখন মাছের ঈশ্বরত্ব বুঝতে পারলেন মনু। মাছ তাঁকে বললে নৌকা বানিয়ে তাতে উঠে বসতে, প্রলয় আসন্ন, দেখতে দেখতে স্থাবর-জঙ্গম সব জলমগ্ন হবে। নৌকো তৈরী করে সপ্তর্ষি ও নানা জিনিসের বীজ সঙ্গে নিয়ে মনু তাতে চড়ে বসলেন, মৎস্য-অবতার শৃঙ্গ ধারণ করে এলেন, সর্প-রজ্জু দিয়ে তার সঙ্গে নৌকা বেঁধে দ্রুত নিয়ে চললেন। বহু বছর পরে হিমালয়ের শৃঙ্গে তরী বাঁধা হল, মনু তখন সৃষ্টি করলেন মানব ও অন্যান্য প্রাণী, স্থাবর ও জঙ্গম।

বাইবেলের গল্পে আদমের বংশধর নোআ তার বিখ্যাত নাও দিয়ে প্রাণীকুলকে বাঁচিয়েছিল বন্যার কোপ থেকে, কিন্তু এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রাচীন কাহিনীর উৎপত্তি মেসোপটেমিয়া বা ইরাক অঞ্চলে, প্রত্নবিদ্‌রা এর লিখিত দলিল পর্যন্ত উদ্ধার করেছেন। প্রায় চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলন ও অন্যান্য জায়গার অধিবাসীরা পৃথিবীর প্রথম লেখ্য ভাষায় (সুমেরী) মাটির ফলকে খুদে রেখে গিয়েছে এই বন্যাকাহিনী। বর্ণনা এমন সুন্দর, এমন কাব্যময় যে সত্যিই মানুষের প্রাচীনতম সাহিত্য বলা চলে এই রচনাকে। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দে অ্যাসিরিয়ার রাজা আসুরবানিপাল এই সব দলিল দূর দূরান্তর থেকে সংগ্রহ করে ও অনুলিপি বানিয়ে রাজধানী নিনেভে শহরে গড়ে তুলেছিলেন এক 'গ্রন্থাগার'। এই আশ্চর্য ও অমূল্য সম্পদ একে একে উদ্ধার করে পাঠোদ্ধার করছেন আজকের প্রত্নবিদ্‌রা।

উপাখ্যানটি ব্যাবিলনীয় মানব-পিতা উত্‌-নাপিশ্‌তিম বলছে নিজের মুখে। একদা দেবতারা মনস্থ করলে, ঝড় আর প্লাবনের আঘাতে পৃথিবীর থেকে মানুষের বংশ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে ("মানুষের হট্টগোলে ঘুম অসম্ভব হয়ে আসছে", বললে একজন), পরে এই সিদ্ধান্ত সামান্য পরিবর্তন করে ঠিক হল শুধু উত্‌-নাপিশ্‌তিম ও তার স্ত্রীকে বাঁচতে দেওয়া হবে। ইয়া দেবতা তার কাছে আবির্ভূত হয়ে খবরটা জানালে, বললে সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে এবার প্রাণ বাঁচাবার জন্য এক নৌকা বানাও। পিচ্ আর শিলাজতুর আঠা দিয়ে এঁটে ১২০ হাত লম্বা এক নৌকা বানালে সে, তারপর শস্যের ভাণ্ডার আর নিজের পরিবার নিয়ে তাতে চড়ে বসল। পশু পাখিরা জোড়ায় জোড়ায় এল। তখন শামাশ দেব এসে জানালে যে সেদিন সন্ধ্যায় মহাপ্লাবন শুরু হবে, এবং সত্যিই দিন শেষ হতে হতে আকাশ ভয়ংকর কালো মূর্তি ধরল, তারপর আরম্ভ হল তুমুল ঝড় বাদল আর বন্যার তাণ্ডব নৃত্য। নৌকায় সব ছিদ্র বন্ধ করে দিয়ে তারা দেবতাদের হাতে ভাগ্য সমর্পণ করলে। বাইরে ক্ষীণতম আলোগুলিও একে একে গাঢ় তিমিরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, স্ত্রী পুত্র ভাই কেউ আর কাউকে দেখতে পেলে না, কালো মেঘ আর ঘূর্ণিবাত্যার ঘর্ষণে দেবতারা হুংকার করতে লাগলেন। মেঘ ভেঙে জল ঝরতে ঝরতে শেষে তা প্রায় পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠে এল, তখন দেবতারাও ভয় পেল। ছ' দিন ছ' রাত্রি এমনি চলার পরে আবার যখন সব শান্ত হল তখন চরাচরের উপর দিয়ে যেন প্রলয় ধরে গিয়েছে মানুষকে কাদা বানিয়ে দিয়ে, চতুর্দিকে শুধু উন্মুক্ত সাগর ধু ধু করছে। আরও বারো দিন নৌকা চলে শেষে নিসির পর্বতে এসে ঠেকল। উত্‌-নাপিশ্‌তিম কিন্তু আরও সাত দিন অপেক্ষা করলে, তখনও নৌকা স্থির হয়ে আছে দেখে ছোট একটি ছিদ্র খুললে। তা দিয়ে প্রথমে ঘুঘু পরে বাবুই উড়ে গেল বাইরে, কিন্তু নামবার জায়গা না পেয়ে ফিরে এল তারা; শেষে দাঁড়কাক আর ফিরে এল না—স্থল আবার মাথা তুলেছে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কি যেন খাচ্ছে সে, দেখে সবাই নামল নৌকা থেকে। দুটি লোকের মধ্যে মানুষ জাতি বেঁচে রইল, অবশ্য বেল্ দেবতা রুদ্ধ হয়ে তাদেরও ধ্বংস করতে চাইল, কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত নিরস্ত করা হল। ইয়া-র আশীর্বাদে উত্‌-নাপিশ্‌তিম ও তার স্ত্রী অমর হয়ে রইল, তাদেরই সন্তান সন্ততিতে আজ পৃথিবী পরিপূর্ণ।

এই উপকথার সঙ্গে বাইবেল-বর্ণিত ইহুদী সৃষ্টি পুরাণের কাহিনী প্রায় হুবহু মেলে—উত্‌-নাপিশ্‌তিমের জায়গায় নোআ, নিসির পর্বতের জায়গায় আরারত পর্বত বসালেই প্রায় সব মিলে যায়। এই কাহিনী বাইবেলে স্থান পাওয়াতে য়োরোপে এর সত্যতা সম্বন্ধে কারও মনে সন্দেহ ছিল না প্রায় সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত। নোআ তার তরীতে যে বিভিন্ন প্রাণীকে তুলে নিয়েছিল ১৬৭৫ সালে এক পণ্ডিত ধর্মযাজক তার এক তালিকা বানিয়েছিলেন, তার মধ্যে স্থান পেয়েছিল জলপরী ও গ্রিফিন (অর্ধেক ঈগল অর্ধেক সিংহ)। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র মত প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণও (১৭৬৮-১৭৭১) নিঃসন্দেহ নোআ-র নৌকা সম্বন্ধে। আরারত পর্বত তুরস্ক অঞ্চলে, সেখানে নাকি ঐ দেশের এক অভিযান নৌকাটি সত্যি সত্যিই দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু ভূতের দৌরাত্ম্যে বেশী তথ্য সংগ্রহ করতে পারে নি। মাত্র ১৯৪৪ সালে এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এক রুশ বৈমানিক ঐ পর্বতের উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আবার দেখেছে নৌকাটিকে। পশ্চিমে এখনও অনেক তথ্য-

মাটির ফলকে লিখিত বন্যা-কাহিনী, ফলকটি সম্ভবত নিনেভে-স্থিত গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত ছিল
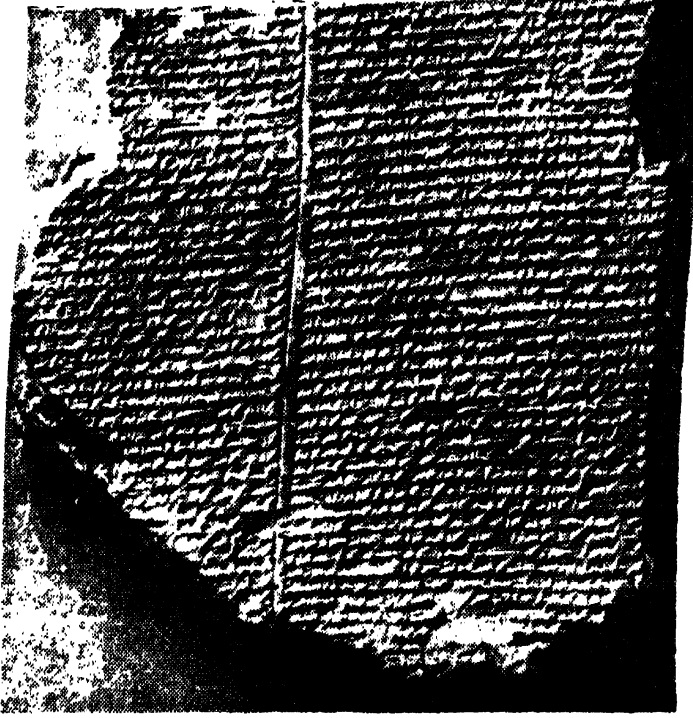
ভারী নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ঐ নৌকা সম্বন্ধে। কিন্তু বিগত শতাব্দে বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাস যা উদ্‌ঘাটিত হল তাতে অনেকের মনেই বিশ্বগ্রাসী, প্রলয়ংকর প্লাবনে বিশ্বাস রাখা কঠিন হয়ে উঠেছিল।

বাইবেল ও ব্যাবিলনের ভৌগোলিক সান্নিধ্য অবশ্য স্পষ্ট, প্রবাদ বলে ইহুদী পুরাণে কথিত আদম ও ঈভের লীলাক্ষেত্র ইডেন উদ্যান মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য এলাকার বাইরেও পূবে ও পশ্চিমে গল্পের অনেক বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত। গ্রীসীয় পুরাণে যক্ষ প্রোমিথিউস মানুষকে আগুন দান করে তার প্রভূত উপকার করেছিল, কিন্তু তার আগে মানুষকে সে প্লাবনের মুখে ধ্বংসের থেকে বাঁচিয়েছে। এই ধ্বংসের বুদ্ধি যখন দেবরাজ জিউসের মাথায় এল তখন প্রোমিথিউস মানব-কুলের মধ্যে দুটি ভাল লোককে (ডয়কেলিয়ন ও পিরা) বেছে নিয়ে তাদেরকে সব জানালে, তারপর শিখিয়ে দিলে কি করে তারা এমন তরণী বানাতে পারে যাতে ত্রাণ পাওয়া যাবে। জিউসের আদেশে বায়ু ও বৃষ্টি প্রবল বন্যার সৃষ্টি করলে, বারি-দেব পোসাইডন সাগরের জল তুলে স্থলে ঢেলে দিলে, নদীদের আদেশ করলে বাঁধ ভেঙে সব কিছু ভাসিয়ে নিতে। ক্রমে চরাচর হাবুডুবু, জলপরীরা তাদের চলাফেরার পথে অবাক হয়ে দেখলে মানুষের তৈরি শহর, লোকেরা নৌকায় চড়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু সব নৌকা ডুবল, একমাত্র ডয়কেলিয়ন ও তার স্ত্রী ভেসে রইল তাদের মায়াতরীতে। অবশেষে এক সময়ে জল সরল, তারা নামল উঁচু জমিতে, দেবরাজ উপর থেকে দেখলে শাপগ্রস্ত মানুষ জাতির দুজন তখনও বেঁচে আছে; কিন্তু তারা ন্যায়পরায়ণ, সহৃদয় ও দেবতাদের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন, তাই তাদের ছেড়ে দেওয়া হল, আবার পৃথিবী ভরে উঠল মানুষে।

পারসীক পুরাণে কথিত আছে যে, প্রথম নরনারীর পৌত্রপৌত্রীরা যখন ধর্ম ও ন্যায়ের পথ ছেড়ে শয়তানী শক্তি অরিমনের বশবর্তী হয়ে পড়ল তখন দেবাদিদেব অহুর মাজদা তাদের শাস্তি দিলে বরফ গলিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। য়োরোপের অপর প্রান্তে আইসল্যান্ডের পুরাকাহিনীতে দেখা যায়, দেবাসুরের যুদ্ধের পরে বিক্ষুব্ধ জলমগ্ন পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন, চন্দ্র সূর্যকে নেকড়েতে খেয়েছে। ক্রমে জল সরে গেল, সুন্দর সবুজ ভূমি দেখা দিল আবার, নতুন চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি হল। বনের গভীরে দুটি মাত্র নর নারী বেঁচে ছিল, তাদের সন্তান সন্ততি নতুন করে পৃথিবী পূর্ণ করলে। এমন কি অতলান্তিকের ওপারে অ্যাজটেক উপাখ্যানে বলে, এই পৃথিবীর আগে অন্যান্য পৃথিবী ছিল, তাতেও মানুষের বাস ছিল; বারে বারে বসুন্ধরা ধ্বংস হয়েছে একবার প্লাবনে, একবার ঝড়ে, একবার আগুনে।

বিভিন্ন দেশের পুরাণে বন্যার গল্প দেখে হয়তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ মানুষ যখন প্রথম ঘর বাঁধতে শিখল তখন নানা সুবিধার দায়ে সাধারণত নদীর ধারেই সে আশ্রয় নিয়েছে, এবং নদীতে আজও বান ডাকে। আশ্চর্য এই গল্প-গুলির আভ্যন্তরীণ মিল, তার থেকে মনে হয় অন্তত কয়েকটির উদ্ভব একই জায়গায়। এই ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার আমাদের কিছু কিছু নির্দেশ দিয়েছে। অনেক দিন থেকেই কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ৫০০০-৪০০০ সালের মধ্যে কোনও এক বছর টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উৎসদেশে অতি মাত্রায় তুষারপাত হয়েছিল, তার ফলে সে বারে বান ডেকেছিল অসাধারণ, ভাসিয়ে নিয়েছিল ক্ষেত খামার, গরু ভেড়া, ঘর বাড়ি। ক্রমে লোকমুখে বাড়তে বাড়তে তা বিশ্বগ্রাসী মহাপ্লাবনের আকার ধারণ করল—যেমন চিরদিন হয়, বুড়োদের মুখে আজও গল্প শোনা যায় সেই ৬০ বছর আগে যেমন বৃষ্টি হয়েছিল তেমন আর দেখা যায় নি!

বিখ্যাত প্রত্নবিদ্ সার লিওনার্ড উলি মেসোপটেমিয়ার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'আর' (Ur) রাজ্যের উদ্‌ঘাটনে এক প্রবল বন্যার প্রমাণ পেয়েছেন খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ সালেরও আগে; প্রমাণটি হল মাটির নীচে আট ফুট উঁচু পলির স্তর, এই স্তরে মানুষের ব্যবহৃত বস্তু কিছু পাওয়া যায় নি, কিন্তু নীচে উপরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই কৃষ্টির চিহ্ন—নীচে হাতে-গড়া মাটির ভাণ্ড ও চকমকির হাতিয়ার (আল্ উবাইদ কৃষ্টি), উপরের মৃৎপাত্র চাকে তৈরী, যন্ত্রপাতি উপাদান ধাতু (সুমেরী কৃষ্টি)। কি পরিমাণ জল দাঁড়ালে যে আট ফুট কাদা জমতে পারে তার থেকে বন্যার কোপ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না—সার লিওনার্ডের প্রমাণ অনুসারে নিমজ্জিত ভূমির মাপ ৪০০×১০০ মাইল, কিন্তু স্থানীয় লোকের চোখে তা নিশ্চয় বিশ্বগ্রাসী প্রলয়ের চেহারা নিয়ে এসেছিল। গ্রামাঞ্চল ও মাটির ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকলেও শহরের সভ্যতা কিছু কিছু টিঁকেছে হয়তো; সুমেরী কিংবদন্তীরও সেই রকম ইঙ্গিত, তাতে আরও বলে যে, এই প্রলয়কাণ্ডের পরে দক্ষিণ থেকে বিদেশীরা এসেছে সমুদ্রপথে, সঙ্গে এনেছে নানা বিদ্যা—কৃষি, ধাতু ও লিপি—"তখন থেকে নতুন উদ্‌ভাবন আর কিছু হয় নি"।

এই বন্যার কাহিনীই কি বহু কাল পরে মাটির ফলকে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং দেশ বিদেশে ছড়িয়েছে?

থায় আমার পাশের বাড়ির একতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছেন, নাম শম্ভুশঙ্কর লেলে। নাগপুরে না কোথায় এক কলেজে প্রিন্সিপাল ছিলেন, পঞ্চাশোর্ধে অবসর পেয়ে আমাদের পাড়ার বাসা নিয়েছেন। গাট্টাগোট্টা চেহারা, কপালে ভ্রুকুটি, হাঁটুতে বাত; লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন।

একদিন বাড়ির সামনে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। বিকেলবেলা আমি বেড়াতে বেরিয়েছি, উনিও বেরিয়েছেন; মুখোমুখি হতেই ভাবলাম, নতুন পড়শি, আলাপ পরিচয় করা দরকার। কিন্তু সম্বোধন করেই বোকা বনে গেলাম, তিনি ভুরু কুঁচকে এমন রূঢ়ভাবে জবাব দিয়ে চলে গেলেন যে তার পর আর আলাপ পরিচয় করা চলে না। বুঝলাম, লেলে মশায় কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, পণ্ডিত ব্যক্তি; সামান্য অ-পণ্ডিত পড়শির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান না।

যাহোক, পণ্ডিত ব্যক্তিদের অবহেলায় আমি অভ্যস্ত, লেলে মশায়ের রূঢ়তা গায়ে মাখলাম না। পরে জানতে পেরেছিলাম, কারুর প্রতি তাঁর পক্ষপাত নেই, সকলের সঙ্গে তিনি সমান ব্যবহার করেন। আমাদের পাড়াটা যে মূর্খের পাড়া, এ কথা তিনিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।—

এবার দারুণ গরম পড়েছে। অন্যান্য বার এই সময় মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টি হয়ে গরম চড়তে দেয় না, এবার বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। বিকেলবেলা বাড়ির মধ্যে থাকা যায় না। আমি সাধারণত বেড়াতে বেরুই; কিন্তু আজ বিশেষ একটি কারণে বাড়ির বার হইনি, বাড়ির সামনে বন্ধ ফটকের কাছে চেয়ার পেতে বসেছি।

কারণটি এই। গতরাত্রে পেশোয়া পার্কের চিড়িয়াখানা থেকে একটা হায়েনা খাঁচা ভেঙে পালিয়েছে। খবরটা আজ সকালে রাষ্ট্র হবার পর থেকে এদিকে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, চারিদিকে একটা ছমছমে ভাব। এদেশে হায়েনাকে তরস্ বলে। বোধহয় তরক্ষুর অপভ্রংশ। হায়েনা দেখতে কতকটা বড় জাতের কুকুরের মত, ঘাড় নিচু করে চলে, খট্‌খট্ হাসির মত তার ডাক। অত্যন্ত হিংস্র জন্তু, চেহারা দেখলেই ভয় করে। তাই আজ আর বাড়ি থেকে বেরুই নি, হায়েনার নৈশাহারে পরিণত হবার ইচ্ছে নেই। আমার ফটক বেশ উঁচু, তা ডিঙিয়ে হায়েনা আমাকে খাবে সে-সম্ভাবনা নেই।

একলাটি বসে আছি। আরো কয়েকটি চেয়ার সাজানো রয়েছে; কিন্তু আজ যে কেউ আসবে সে-আশা নেই। আমার কুকুর কালীচরণ প্রায়ই আমার সঙ্গে বেড়াতে
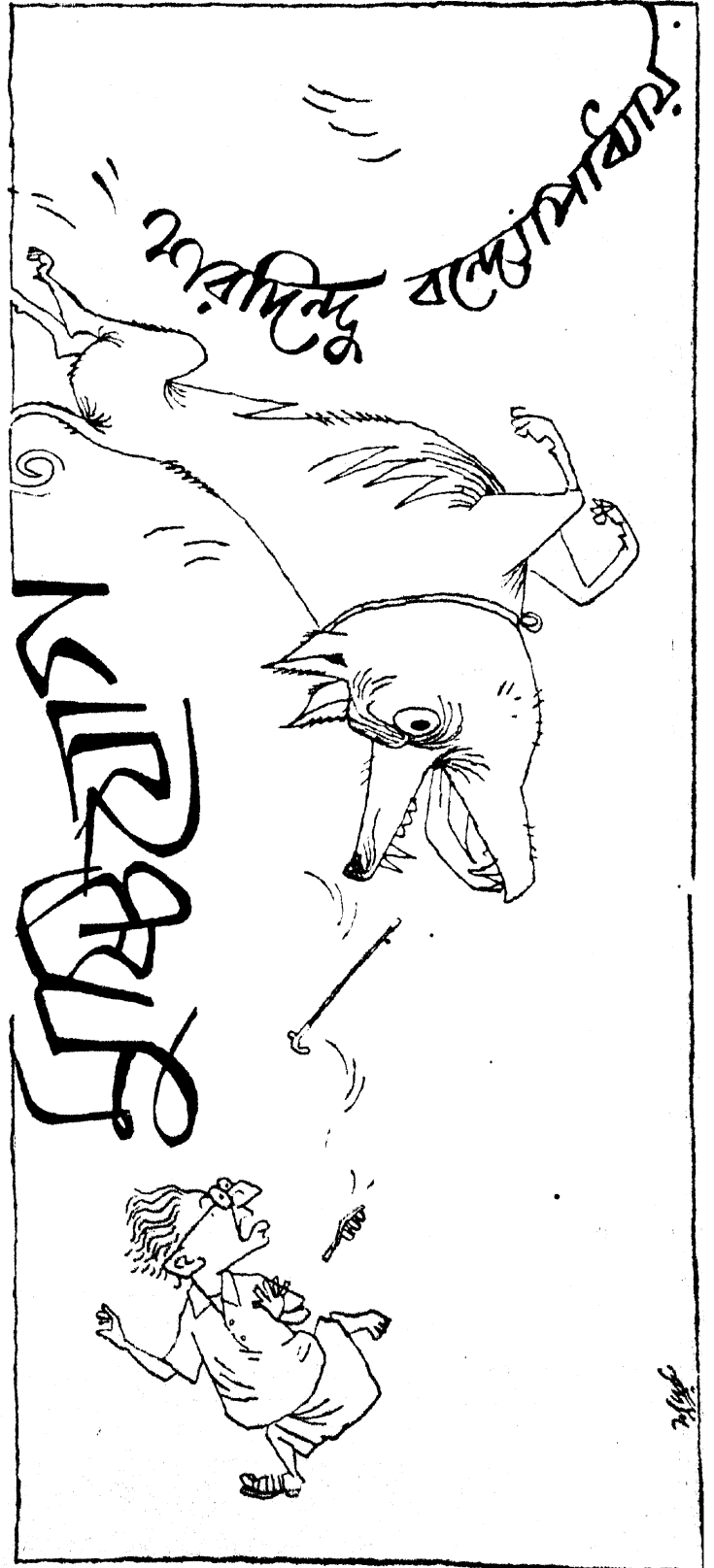
বেরোয়, আজ দেখছি একলাই বেরিয়েছে। ব্যাটাকে হায়নায় না ধরে। কালীচরণের স্বভাবটা একটু বেশি মিশুকে, হায়েনার সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব পাতাতে যায়—

ফটকের গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখলাম শম্ভুশংকর লেলে লাঠিতে ভর দিয়ে বেড়াতে চলেছেন। একবার ভাবলাম তাঁকে ডেকে হায়েনার কথাটা জানিয়ে দিই, তিনি সম্ভবত জানেন না। তারপরে ভাবলাম, কী দরকার! যে-লোক বিদ্যার অহংকারে মানুষের সঙ্গে কথা কয়না সে অহংকারের ফল ভোগ করুক। আমি মুখ-ঝামটা খেতে যাই কেন!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে এমন সময় আমার দুই মারাঠি বন্ধু এলেন। আমারই সমবয়স্ক দুজন; তাঁদের সমাদর করে বসিয়ে বললাম,—'একি! আপনাদের প্রাণে কি হায়েনার ভয় নেই?'

অভ্যংকর মশায় বললেন,—'হালের খবর আপনি শোনেন নি, হায়েনা ধরা পড়েছে।'

পাটিল বললেন,—'রাত্তিরে পালিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিল কিন্তু সেখানে খেতে পায় নি। পেটের জ্বালায় আজ বিকেলবেলা নিজেই খাঁচায় ফিরে এসেছে।'

ইতর প্রাণীদের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে খাবারের দাম বেশি এই কথা নিয়ে আলোচনা সুরু হয়েছে, অভ্যংকর মশায় বলছেন যে, মানুষ যদি পেট ভরে নিজের পছন্দসই খাবার খেতে পেতো তাহলে সেও স্বাধীনতা চাইত না; এমন সময় দূরে একটা ক্ষীণ চিৎকারের শব্দ শুনে আমরা তিনজন ফটকের বাইরে চোখ ফেরালাম। রাস্তা দিয়ে একটা লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে, আর তার পিছনে বিশ হাত দূরে লাফাতে লাফাতে আসছে কালো একটা জানোয়ার। রাস্তায় অন্য লোক নেই।

গোধূলির ঘোলাটে আলো সত্ত্বেও পলায়মান লোকটিকে চিনতে দেরি হল না, আমার নবাগত প্রতিবেশী শম্ভুশংকর লেলে। তাঁর লাঠি কোথায় গেছে জানি না, পায়ে বাতের ব্যথারও কোনো লক্ষণ নেই; তিনি ছুটে আসছেন রেস্-এর ঘোড়ার মতন।

আমরা হতভম্ব হয়ে বসে আছি, এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল। আমার ফটকের খাড়াই পাঁচ ফুটের কর্ম নয়; শম্ভুশংকর লেলে সেই ফটক এক লাফে ডিঙিয়ে আমাদের মধ্যে এসে পড়লেন এবং একটা চেয়ারে হাত-পা এলিয়ে হ্যা-হ্যা করে হাঁপাতে লাগলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন,—'তরস্—হায়েনা—'

কিন্তু কোথায় হায়েনা! ফটকের দিকে চেয়ে দেখি আমার কালীচরণ সমস্ত দাঁত বের করে হাসছে এবং প্রফুল্লভাবে ল্যাজ নাড়ছে। ব্যাপার বুঝতে পারলাম, শম্ভুশংকর কেলোকে হায়েনা মনে করে দৌড় মেরেছিলেন।

শম্ভুশংকর যে মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, একথা বোধহয় অবস্থা গতিকে ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি একটু দম নিয়ে যা বললেন তার মর্ম এই: বেড়াতে বেরিয়ে পেশোয়া পার্কের কাছাকাছি যেতেই একটা অজ্ঞ লোক তাঁকে বলল—'রাও, বাড়ি ফিরে যাও, একটা তরস্ ছাড়া পেয়ে আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' শুনেই শম্ভুশংকর তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে ফিরলেন। খানিক দূরে এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, একটা কালো জন্তু তাঁর পিছু নিয়েছে। তিনি দৌড়ুতে আরম্ভ করলেন, তারপর আমাদের দেখতে পেয়ে ফটক ডিঙিয়ে এখানে এসেছেন।

অভ্যংকর গম্ভীর মুখে বললেন,—'হায়েনা নয়, আপনাকে তাড়া করেছিল—কুকুর।'

'কুকুর!' শম্ভুশংকর ভ্রূকুটি করে সোজা হয়ে বসলেন।

পাটিল নীরস স্বরে বললেন,—'তাড়া করে নি। আপনি দৌড়ুচ্ছেন দেখে আপনার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল।'

শম্ভুশংকর ফটকের কাছে কালীচরণকে দেখলেন, আমাদের পানে কটমট করে তাকালেন; তারপর নিঃশব্দে উঠে চলে গেলেন।

এই ঘটনার পর শম্ভুশংকর আমাদের ওপর মর্মান্তিক চটে গেছেন। আমরা শুধু মুর্খই নয়, তাঁর আত্মমর্যাদায় ভীষণ আঘাত করেছি। এখন আমাদের দেখলে তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে যান।

তবে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। তাঁর হাঁটুর বাত একেবারে সেরে গেছে। তিনি আর লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন না, সোজা দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটেন। দৌড়োদৌড়ি এবং হাই-জাম্প্ করলে হাঁটুর বাত সেরে যায় একথা আগে জানতাম না।
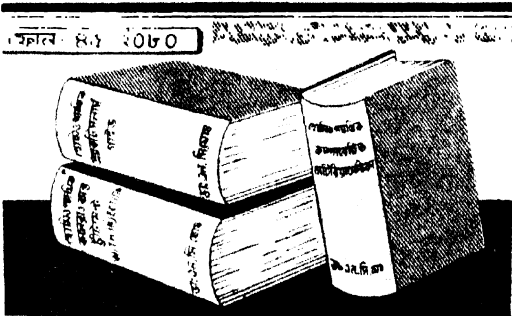
সহযাত্রী
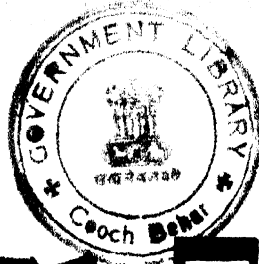
আজকালকার দিনে বোম্বাই মেলে কুপে গাড়িতে একাকী স্থান পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ভাগ্যগুণে সেই অসম্ভবটাই সম্ভব হল দেখছি আমার ভাগ্যে। ভাগ্য যে সর্বদাই বাম, এ কথা সত্য নয়। অবশ্য এলাহাবাদের পথে গেলে এমনটি কখনোই ঘটতো না, নাগপুরের পথ বলেই সম্ভব হল। একে শীতকাল তাতে আবার দু' রাত্রির পথ সমস্ত গাড়ির মালিক রূপে নিজেকে দেখে বেশ স্বস্তি অনুভব করলাম। তাড়াতাড়ি নীচের বার্থে বিছানা পেতে নিয়ে বাক্স, টিফিন বাস্কেট প্রভৃতি যথাস্থানে রেখে দিয়ে স্থির হয়ে বসলাম। কিন্তু গাড়ি না ছাড়া অবধি নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। হয়তো শেষ মুহূর্তে একজন এসে উঠে পড়বে। আটকাবার নিয়ম নাই, খালি বার্থ থাকলে পথ ছেড়ে দিতেই হবে। আপনারা ভাবছেন আপত্তির কি কারণ? অনেক কারণ, মশাই, অনেক কারণ। সমস্ত কামরাটা একা পেলে যথেচ্ছ আচরণ করা যায়। প্রথমেই ধরুন, হঠাৎ মনে আবেগ এলে গান সুরু করতে বাধা নেই, কারো ঘুম ভাঙানোর ঝুঁকি নিতে হয় না। তার পরে বিড়ি চুরুট সিগারেট যেমন খুশি যখন খুশি খাও। মশাই ওদিকে একটু সরে বসে খান শুনতে হবে না। তারপরে দুটো বার্থের মধ্যে যখন যেটাকে খুশি ব্যবহার করুন। উপরেরটাকে বেডরুম, নীচেরটাকে ড্রয়িং রুম মনে করলে ঠেকায় কে। আর এই শীতের রাত্রে হঠাৎ যদি সহযাত্রীর বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ইচ্ছা জাগে, আর সে যদি জানলাটা খুলে দেয় আমিই বা ঠেকাই কি করে? এই শেষেরটাকে আমার সবচেয়ে ভয়। নৈসর্গিক দৃশ্য, বিশুদ্ধ বায়ু প্রভৃতিকে দরজার কপাট ও জানালার খড়খড়ি ফেলে ঠেকিয়ে রাখাটা মনুষ্যত্বের অপরিহার্য অংগ, আশা করি

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ভদ্রলোকমাত্রেই তা স্বীকার করবেন। তবে কাচের শার্সি দিয়ে একটু আধটু কখনো কখনো দেখলে ক্ষতি নাই। অবশ্য একা গাড়িতে চোর ডাকাতের ভয় আছে সত্য—কিন্তু কে বলতে পারে মাঝ রাতে সহযাত্রীটিই হঠাৎ ছোরা বের করে বলবে না—ভয় নেই শীগ্‌গির যা আছে দিন নইলে—ছোরাখানা মারাত্মকভাবে ঝকঝক করে ওঠে। উঁহু, শিকলের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই, আগেই কেটে দিয়েছি। এ রকম বিপদ যে না হতে পারে তা নয়। কিন্তু মাঝ রাতে হঠাৎ জানলা খুলে দিয়ে ঠান্ডা বাতাসকে আমন্ত্রণ বা সবগুলো আলো নিবিয়ে দিয়ে মার্গ সঙ্গীত চর্চা (রবীন্দ্র সংগীতে আপত্তি নাই, অল্পক্ষণেই শেষ হয়) করার চেয়ে ভালো। সংসারে চোর ডাকাতের চেয়ে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনকারীর ও সংগীতানুরাগীর সংখ্যা অনেক বেশি আর প্রাণহরণের চেয়ে নিদ্রাহরণ কম বিরক্তিকর নয়। বলাবাহুল্য গাড়িতে উঠেই প্রাথমিক সতর্কতা হিসাবে দরজা জানলার যাবতীয় ছিটকিনি ও লক বন্ধ করে দিয়েছি, প্ল্যাটফর্মের দিকের গুলোরও। দরজা খোলা রাখা কিছু নয়—ওতে টিকিট-ধারীর প্রবেশ-প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তবু ভয় যায় কই? রেলের লোক এসে বললে খুলতেই হবে। সেই রকমই নিয়ম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম এখনো দশ মিনিট সময় বাকি। কাঁটা দুটোর গতি এমন মন্থর কেন? পা দুখানা অসমান বলেই কি! আর পাঁচ মিনিট। বোধহয় আর কেউ উঠবে না। তবু না ছাড়লে নিশ্চয় হওয়া যায় না। অবশেষে সত্য সত্যই গাড়ি ছাড়লো। সহযাত্রীহীন গাড়ির নিঃসপত্ন মালিক হয়ে প্রকান্ড একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এই চরম অবস্থাতেই মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় যে, ভগবান আছেন। বাথরুমটা আর একবার ভালোভাবে তল্লাসী করে এসে ছিটকিনিগুলো আর একবার পরীক্ষা করে শুয়ে পড়লাম। এখন দেখি একটা দরজার ছিটকিনি আর লকগুলো কেমন ঢলঢল করছে! নিজের উপরে রাগ হল, এমন ভাবে অন্য দরজাটা আঁকড়ে বসে সময় নষ্ট না করে স্টেশনে মেরামত করিয়ে নিলেই হতো। যাকগে, এক ধাক্কায় খুলতে পারবে না, ঠেলাঠেলি করতে হবে, ততক্ষণে ঘুম ভেঙে যাবে। আমার ঘুম খুব পাতলা। তারপরে কি উপায়ে দরজার প্রতিরোধ দুর্ভেদ্য করে তোলা যায় চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা আর মনে নেই।

॥ ২ ॥

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসলাম, শীতে সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট। দুখানা মোটা কম্বল ভেদ করে শীতের হিম অঙ্গুলি সমস্ত শরীরকে অবশ করে তুলেছে। হঠাৎ এত ঠান্ডার কারণ বুঝতে পারি না। অবশ্য শীতের কাল, কিন্তু আমার গায়েও যে কাবুলী কম্বল। পারিবেশের দিকে তাকাতেই শীতের কারণ বুঝতে পারলাম। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটেছে। প্ল্যাটফর্মের বিপরীত দিকের দরজা খোলা। ঢিলে ছিটকিনি ও লক গাড়ির ঝাঁকুনিতে খুলে গিয়েছে। মনে মনে রেল কোম্পানীকে অভিশাপ দিতে দিতে উঠে গিয়ে দরজাটা যথাসাধ্য বন্ধ করলাম, ভাবলাম এবারে শীতের প্রতিকার হবে। কিন্তু ওকি, ওকে? উপরের বার্থে ঘুমোচ্ছে কে?

তখন প্রথম সম্বিৎ হল রাতের নীল আলোটা জ্বলছে কেন, আমি তো সব আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়েছিলাম। তখন এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। মাঝখানে এক স্টেশনে গাড়ি থামতে ঐ লোকটি ধাক্কাধাক্কি করে দরজা খুলে উপরের বার্থটি দখল করেছে। আলো জ্বালাটাও তারই কীর্তি। বুঝলাম লোকটা নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞানহীন, দরজা ভালো করে বন্ধ করে নি। নিঃসপত্ন গাড়ির মালিক জোটাতে মনটা অপ্রসন্ন হল—তবু কিছু করবার নাই। বিছানায় এসে বসে একটা চুরুট ধরালাম। তখন সহযাত্রীর প্রতি যে মনোভাব হয়েছিল তাকে কিছুতেই সহানুভূতি বলা যায় না। এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আবার যখন হঠাৎ ঘুম ভাঙলো দেখলাম কে একজন আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোর ডাকাত নাকি? চট করে উঠে বসলাম। মনে হল ইনিই আমার সহযাত্রী, উপরের বার্থের মালিক।

কি ঘুম ভাঙলো?

বললাম, আপনি বুঝি উপরের বার্থে ছিলেন?

ঐখানেই তো ঘুমোই।

শোনো একবার কথা। বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদগুলোও অভ্যস্ত হয় নি। ঘুমোই—যেন ওখানেই ওঁর স্থায়ী বাস।

প্রকাশ্যে শুধোলাম, তা উঠলেন কি করে?

ঐদিকেই প্লাটফর্ম পড়েছিল কিনা। ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। ভালো করে বন্ধ করেন নি। তা আপনাকে আর জাগালাম না? শুয়ে পড়লাম।

দরজা এত অনায়াসে খুলে গেল? আশ্চর্য?

আশ্চর্য বইকি! রেলের দরজার রহস্য অপার—বলতে বলতে তিনি বিছানার এক পাশে বসলেন।

এবারে লোকটাকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলাম। যেমন কৃশ তেমনি ফ্যাকাশে—চোখ আর কান কোটরগত। তার উপরে গায়ে রাজ্যের জামাকাপড়, গলাটা গায়ের চাদর দিয়ে জড়ানো। শীতের বিরুদ্ধে সতর্কতার অন্ত নাই।

চুরুট খাচ্ছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, খাবেন? বলে একটা চুরুট বার করলাম।

না, না থাক্, এক সময়ে ধূমপান করতাম এখন আর করিনে।

ডাক্তারের নিষেধ বুঝি?

ডাক্তারের আমি কি ধার ধারি!

চুরুটের প্রসঙ্গ আর তো টানা যায় না, ভাবছি এবারে কোন্ প্রসঙ্গ শুরু করা যায়। মাঝ রাত্রে আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল।

এমন সময়ে সহযাত্রী বলে উঠলেন, আচ্ছা, মশাই আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?

না।

কেন?

কখনো দেখিনি, কেউ দেখেছে বলেও শুনিনি।

দেখেছে অনেকেই বুঝতে পারেনি, আপনিও দেখেছেন বুঝতে পারেন নি।

আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি।

বললাম—সেরকম ক্ষেত্রেও দেখিনি বললে কি অন্যায় হয়।

ধরুন এখানেই, এই গাড়ির মধ্যে এখনি যদি ভূত আবির্ভূত হয়!

মনে মনে বললাম, তুমিই ভূত, আর ভূত যদি বা না হও তবে বদ্ধ্।

প্রকাশ্যে বললাম, ভূত বলে পরিচয় না দিলে হয় তো বুঝতেই পারবো না, কেন না, শুনেছি যে ভূতে আর মানুষে বাইরে থেকে প্রভেদ নেই।

যা বলেছেন। আমিও ঐ কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করি, লোকে বুঝতে চায় না।

আপনি কি একজন প্রেততত্ত্বজ্ঞ? এত কথা শিখলেন কি করে?

ঠেকে শিখেছি মশায় ঠেকে শিখেছি।

ভূত দেখেছেন বুঝি?

সে কথার উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, ভূত মানুষের কাছে আসে ভয় দেখাবার জন্যে নয়।

তবে?

সে কিছু বলতে চায়।

বলবে আবার কি?

সকলে তো এক কথা বলতে আসে না। কেউ চায় নিজের পরিচয়টা দিতে, কেউ চায় জীবনকালে অপ্রকাশিত কোন গুপ্ত তথ্য জানাতে। ঐ অন্তিম আকাঙ্ক্ষার সুতোটুকু ছিঁড়তে না পারা অবধি তার ঊর্ধ্বাকাশে গতি হয় না।

এসব কথা যে না জানতাম তা নয়, তবু সেই গভীর রাত্রে, ধাবমান গাড়ির নির্জনতার মধ্যে তার মুখে কথাগুলো একটা নূতন মাত্রা লাভ করলো। খুব ঘুম পাচ্ছিল তাই প্রসঙ্গ শেষ করে দেবার ইচ্ছায় বললাম—কত দূরে যাবেন?

সামনের স্টেশনেই। নিন, আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না, বুঝতে পেরেছি আপনার ঘুম পাচ্ছে।

এই বলে লোকটি উঠে দাঁড়ালো, বার্থে উঠতে গিয়ে কাছে ফিরে এসে বললে, এই কার্ডখানা রাখুন, যদি কখনো কাজে লাগে।

তার কার্ড আমার কোন্ কাজে লাগবে! তবু ভদ্রতার খাতিরে গ্রহণ করে পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম, পড়বার ইচ্ছাও ছিল না, উপায়ও ছিল না, আলো কম।

সহযাত্রী বার্থে উঠলেন। আমিও শুয়ে পড়লাম। শয়নমাত্র গাঢ় নিদ্রা।

॥ ৩ ॥

আবার প্রচণ্ড শীতে ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসলাম। দরজাটা আবার খুলে গিয়েছে, দরজা বন্ধ করতে গিয়ে উপরের বার্থে চোখ পড়লো বার্থ খালি। লোকটা গেল কোথায়? বাথরুমে নাকি? দরজায় ধাক্কা দিতেই বাথরুম খুলে গেল—ঘর খালি। নিশ্চয় লোকটা সেই 'সামনের স্টেশনে' নেমে গিয়েছে—কিন্তু সত্যি কি দায়িত্বজ্ঞানহীন। জানিয়ে গেলেই তো চলতো! যেমন চোরের মতো এলো, তেমনি চোরের মতো গেল! Scandalous! কিন্তু ওকি বার্থের উপরে কম্বলখানা ফেলে গিয়েছে যে? এক পাগল ছাড়া আর তো কেউ শীতের রাতে কম্বল ভুলে যায় না। কিংবা হঠাৎ পা ফসকে পড়েই বা গেল। যাই হোক ঘটনাটা পরবর্তী স্টেশনে জানানো দরকার। পরবর্তী স্টেশনের অপেক্ষায় চুরুট ধরিয়ে জেগে বসে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরবর্তী স্টেশনে গাড়ি এসে থামলো।

(পাঠক, আমি ইচ্ছা করেই স্টেশনের নাম উল্লেখ করছি না। কেন যথা সময়ে বুঝতে পারবেন)।

গাড়ির দরজা খুলতেই সম্মুখে একজন টিকিট চেকারকে পেলাম। তাকে কাছে ডেকে নিয়ে যথা সম্ভব সংক্ষেপে পাগলটির বিবরণ জানালাম (এতক্ষণে তার পাগলত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছি), বললাম আপনি নোট করে নিন, এভাবে গভীর রাত্রে যাত্রীদের হয়রানি বাঞ্ছনীয় নয়। ইতিমধ্যে আর একজন চেকার কাছে এসে পড়েছে। দুজনের মধ্যে মৃদুস্বরে কি যেন কথা হল, একবার আমার কামরার নম্বরটা তারা দেখলো। কিন্তু নোট করবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তারপরে বলল, আচ্ছা আপনি যান, আমরা নোট করে নিলাম, আর কোন ভয় নাই।

একটু রূঢ়ভাবেই বললাম, ভয়ের কথা হচ্ছে না, এ আপনাদের ডিউটি, কর্তব্য।

আগে বাংলা শব্দ বলে ইংরাজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করতাম। এখন ইংরাজি শব্দ বলে বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করি। যুগধর্ম।

চেকার দুজন নিজেদের মধ্যে চোখের
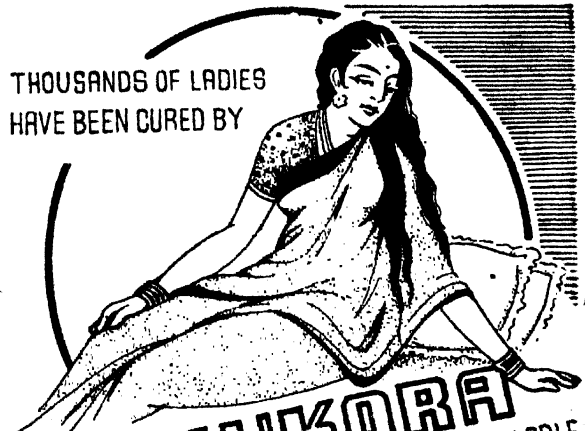
ইসারায় কি যেন বলাবলি করলো। আমি বললাম, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সামনের স্টেশনে আপনাদের ব্যবহার সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে বাধ্য হব।

আমার উষ্মায় তাদের মুখে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র বৈকল্য প্রকাশ পেলো না। ভাবলাম রেলের জগৎটাই বিচিত্র। ইতিমধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিল। দরজা বন্ধ করে মনে মনে গজরাতে গজরাতে সামনের স্টেশনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। মস্ত জংশন স্টেশনে এসে যখন গাড়ি থামলো তখন ভোর হয়ে বেশ আলো হয়েছে। তাড়াতাড়ি নেমে স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে চললাম। ঘরে ঢুকতে যাবো এমন সময়ে দরজার কাছে দেয়ালে আঁটা একখানা বড় ফটোগ্রাফ দেখে অকস্মাৎ স্থানুত্ব প্রাপ্ত হলাম। এ কি হল? এ যে আমার সহযাত্রীর ছবি! না, অনুমাত্র সন্দেহ নাই—সেই মুখ চোখ সেই কৃশতা, কেবল গায়ের জামাগুলো নাই! নীচে হিন্দি ও ইংরাজিতে লিখিত "কেহ অনুগ্রহ করে মৃত ব্যক্তির পরিচয় দিতে পারলে রেল কর্তৃপক্ষ বাধিত হবে।"

তখনি মনে পড়লো সেই কার্ডখানার কথা। পকেট থেকে বার করলাম—হাঁ নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত। এক মুহূর্তে সহযাত্রীর অদ্ভুত আচরণ ও বিবরণ যথাযথ অর্থবহন করে মনের মধ্যে উদিত হল। তবে কি নিজের ঐ পরিচয়টি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমাকে দেখা দিয়েছিল? বলতে ভুলে গিয়েছি, ছবিখানা দেখবামাত্র সেই শীতের রাত্রেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়েছিল। এখন রুমাল দিয়ে কপাল মুছে ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে স্টেশন মাস্টারের হাতে কার্ডখানা দিলাম। লোকটি বাঙালী। শুধোলেন, এ কি?

ঐ মৃত ব্যক্তির পরিচয়।

ভীত বিস্ময়ে তিনি বললেন, পেলেন কোথায়?

সব বলছি, আগে দয়া করে একজন কুলিকে আমার কামরা থেকে জিনিসগুলো নামিয়ে আনতে বলুন, আপনার দরজা বরাবর ঐ যে আমার কামরা!

ভীত-বিস্ময়ে তিনি বললেন,—পেলেন কোথায়?

॥ ৪ ॥

তারপরে স্টেশনমাস্টারের বিবরণ, আমার অভিজ্ঞতা ও কয়েক পেয়ালা গরম চা মিলিয়ে যা দাঁড়ালো তার সংক্ষিপ্ত মর্ম হচ্ছে মাসখানেক আগে বোম্বাই মেলের ঐ কামরা থেকে একজন যাত্রী পড়ে গিয়ে মারা যায়। কেউ বলে রাত্রির অন্ধকারে পা ফসকে পড়ে যায়, কেউ সন্দেহ করে আত্মহত্যা। রেলের চাকায় গলা থেকে ধড় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শীতকালে গায়ে অবশ্যই গরম জামা ছিল, পুলিস এসে পড়বার আগে তা লুট হয়ে যাওয়ায় পরিচয় কিছুই জানা যায় না। রেলের নিয়ম অনুসারে মৃতদেহের ফটোগ্রাফ নিয়ে পরিচয় জানবার উদ্দেশ্যে বড় বড় স্টেশনে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। লোকটা মারা গিয়েছিল রবিবার রাতে। সেই থেকে প্রত্যেক রবিবার রাতে ছায়াশরীরী দেখা দেয় ঐ কামরায়। আমি চতুর্থ রবিবারের যাত্রী।

শুধোলাম অন্য যাত্রীদের অভিজ্ঞতা কি রকম?

প্রথম দুই রবিবারের যাত্রী দুইজন ভয় পেয়ে মাঝপথে চেন টেনে গাড়ি থেকে নেমে অন্য কামরায় যান। তৃতীয় রবিবারে ও কামরায় যাত্রী কেউ ছিল না।

আমি বললাম, উপরের বার্থে যাত্রী থাকলে কি হতো?

ও বার্থের টিকিট বেচা বন্ধ করে দিয়েছি।

আমার মনে হয় ও কামরাখানাই লাইন থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত।

রেলওয়ে বোর্ডে লেখা হয়েছে। তাদের হুকুম পেলেই সরিয়ে ফেলা হবে।

লোকটা কেন দেখা দেয় কিছু অনুমান করতে পারেন?

স্টেশনমাস্টার বললেন, অনুমানের তো প্রয়োজন নাই, প্রমাণ আপনার হাতে। ঐ পরিচয়টি দেওয়ার জন্যেই দেখা দেয়।

বললাম, প্রেতাত্মা ভিজিটিং কার্ড পেলো কোথায়?

তিনি বললেন, যে জামাকাপড় মৃতদেহের গা থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে তা-ই বা পেলো কোথায়?

এই জন্যেই কি আগের স্টেশনের চেকার বাবুরা তেমন গা করেনি।

অবশ্যই এই জন্যে। তারা জানে যে ভয়ের কারণ চলে গিয়েছে তাই আপনাকে সাহস দিয়ে বলেছিল, যান ভয় নাই।

তারপর তিনি আর দু' পেয়ালা চায়ের হুকুম দিয়ে বললেন, কিন্তু ধন্য আপনার সাহস মশাই, আমি হলে তো ভয়েই মরে যেতাম।

আমি বললাম, এতে আর সাহস কোথায় দেখলেন। আমি তো বরাবর তাকে মানুষ বলেই ভেবেছি।

মশাই, ভূতকে মানুষ ভাবা, সে কি কম সাহসের কথা।

জ্যাঠাইমা

বনফুল
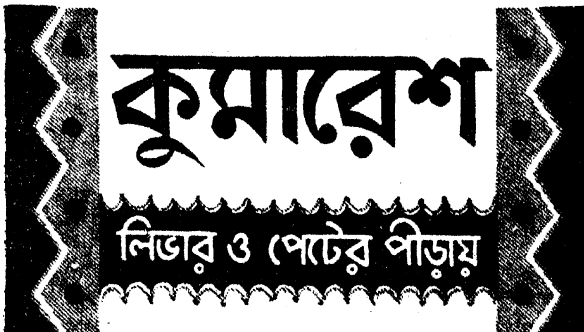
ঠাইমার কথা মনে পড়ছে।

জ্যাঠাইমার সামনে খেতে বসলে আর রক্ষা ছিল না। কত রকম যে রান্না করতেন! উচ্ছে ভাজা, পটল ভাজা, আলু ভাজা, এমন কি মাঝে মাঝে লাউয়ের খোসা-ভাজাও। তাছাড়া সড়সড়ি, চচ্চড়ি, ডালনা, ছেঁচকি, সুকতো। কি সুন্দর সুকতোই যে রাঁধতেন। মাছের ঝোলও। কম মশলা দিয়ে তরকারির অমন স্বাদ আর কেউ বার করতে পারত না। নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াতেন।

যখন স্কুলে পড়তাম, বোর্ডিংয়ে থাকতাম। রামকুমার ঠাকুরের অখাদ্য রান্না খেয়ে ছটা দিন কাটত। রবিবারটা জ্যাঠাইমার ওখানে মুখ বদলাতে যেতাম।

জ্যাঠাইমা আমার নিজের জ্যাঠাইমা নন। বাবার একজন বন্ধুর দাদার স্ত্রী। বাবা তাঁকে দাদা বলে ডাকতেন, আমরা জ্যাঠাইমা বলতাম। সেই সুবাদে জ্যাঠাইমা।

কিন্তু নিজের জ্যাঠাইমা কি এর চেয়ে বেশী স্নেহময়ী হতেন? মনে হয় না।

সকালে উঠেই চলে যেতাম জ্যাঠাইমার বাড়ি। বাবা বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে বলে দিয়েছিলেন, সুতরাং তিনি আপত্তি করতেন না। রবিবারটা সমস্ত দিনই জ্যাঠাই-মার কাছে থাকতাম।

গিয়েই প্রথমে স্নান করতে হ'ত, সাবান মেখে। "ইস্, সারা গায়ে যে পলি পড়িয়ে রেখেছিস। দে তো ঝগড়ু, ভাল করে' ঘষে' ঘষে' ময়লাগুলো উঠিয়ে দে তো!"

ঝাঁকড়া-গোঁফ-ওয়ালা চাকর ঝগড়ু, বিশাল-কায় লোক। কিন্তু অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং স্নেহপ্রবণ। "আবো, আবো, খোকাবাবু, ইধর আবো। নেই নেই ওই সে নেই করো—"

বাঘের কবলে পড়লে ছাগ-শিশুর যে অবস্থা হয়, আমারও ঠিক সেই অবস্থা হ'ত। সাবানের ফ্যানা চোখে মুখে নাকে কানে ঢুকে যেত, চোখ জ্বালা করত। কিন্তু ঝগড়ু না-ছোড়। সম্পূর্ণরূপে সর্বাঙ্গে সাবান না মাখিয়ে সে ছাড়বে না।

স্নান শেষ হলে তারপর মাথা-আঁচড়ানো পর্ব। সেটা জ্যাঠাইমা নিজে করতেন। তাঁর বিশেষ রকম ধারালো একটা সরু-চিরুনি ছিল। বাঁ হাত দিয়ে থুতনিটা চেপে ধরে সজোরে চালিয়ে যেতেন সেটা মাথার জট্-পাকানো চুলের ভিতর। মনে হ'ত প্রাণ বুঝি এখনই বেরিয়ে যাবে।

"কি করে' রেখেছিস মাথাটা? অ্যাঁ? এক-বারও কি চুলে হাত দিস না!"

আমি একটি কথাই বারম্বার বলতাম, "উঃ, বড় লাগছে, ছেড়ে দাও জ্যাঠাইমা, তোমার পায়ে পড়ি—"

"পায়ে পড়তে আর হবে না। এই দেখ, কি জঞ্জাল পুরে রেখেছিলে মাথায়। নাও, মুখটা ওই তোয়ালেতে পুঁছে খাবে চল।"

খাওয়ার একটা মোটামুটি ফর্দ আগেই দিয়েছি। আমি কি কি ভালবাসতাম তা জ্যাঠাইমা জানতেন। মটর ডালের বড়া ভাজা, সেমুইয়ের পায়েস, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, মাছের ফ্রাই—প্রতি সপ্তাহে এর কোনটা না কোনটা হতই। বোর্ডিংয়ে নিয়ে খাওয়ার জন্যে একটা ছোট জারে করে' আচার দিয়ে দিতেন। একদিন গিয়ে দেখি লাড়ু করছেন। আমাকে বললেন, কিছু লাড়ু বোর্ডিংয়ে নিয়ে যা। ক্ষিধে পেলে খাবি। আমি বললাম, বোর্ডিংয়ে কি আমি একা খেতে পারি। আমার ঘরে চারজন ছেলে। জ্যাঠাইমা বললেন, তাতে কি হয়েছে, চার-জনের মতোই নিয়ে যা। একটা পুঁটুলিতে কুড়িটা লাড়ু বেঁধে দিলেন।

শুধু খাওয়া-দাওয়াই নয়, জ্যাঠাইমার সব দিকে নজর থাকত। আমার জামার বোতাম বসিয়ে দিতেন। কাপড় ছিঁড়ে গেলে নিজে হাতে শেলাই করে' দিতেন।

অথচ জ্যাঠাইমা নিঃসন্তান ছিলেন না। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছিল তাঁর। শুধু তাঁর নয়, তাঁর জায়েদেরও। তাছাড়া বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত লেগেই থাকত। সকলেরই সেবা করতেন জ্যাঠাইমা। একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সর্বদাই তাঁর পিছু পিছু ঘুরত। জ্যাঠাইমার একটু আদর, একটু মনোযোগ সকলেরই চাই। আর সেটুকু তিনি দিতেন সবাইকে। কারও নাকটা মুছিয়ে দিচ্ছেন, কাকেও জামাটা ছাড়িয়ে দিচ্ছেন, কারও গা থেকে বা ঝেড়ে দিচ্ছেন ধুলো।

জ্যাঠাইমা মাঝে মাঝে মনিহারিতে যেতেন আমাদের বাড়ি। কত জিনিস, কত রকম অবিশ্বাস্য জিনিস যে নিয়ে যেতেন, তার ঠিক নেই। নতুন কুলো, ধামা নানা আকারের, একঝুড়ি পাহাড়ি আম, আমসি, আমসত্ত্ব, কলা, লেবু—অর্থাৎ তখন হাতের কাছে যা পেতেন তাই নিয়ে যেতেন। কুলো আর ধামা প্রায়ই নিয়ে যেতেন, ওখানে যে হাট হ'ত সে হাটের কুলো আর ধামার নাম ছিল। জ্যাঠাইমা আর একটা জিনিসও আনতেন—টোপা কুল। আর আতা। পাহাড়ি আতা।

জ্যাঠাইমার সঙ্গে আর একটা স্মৃতিও

জড়িয়ে আছে। কাঁথা। এখন পুরোনো কাপড় অনেকে বিক্রি করে' দিয়ে শৌখিন বাসনপত্র কেনেন। জ্যাঠাইমা তা দিতেন না। তিনি পুরোনো কাপড় জমিয়ে জমিয়ে কাঁথা তৈরি করতেন। কাঁথা করে' বাড়ির জন্যে তো রাখতেনই, বিতরণও করতেন অনেককে। আমার কাছে তাঁর দেওয়া একটা কাঁথা বহুদিন ছিল।

আমি যেদিন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে' আসি সেদিন জ্যাঠাইমার বাড়িতে আমার স্পেশাল নেমন্তন্ন হয়েছিল। আমি যে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছি, এটা যেন তাঁরই বিশেষ কৃতিত্ব। সকালে যখন গেলাম আশা করেছিলাম জ্যাঠাইমার হাসি-মুখ দেখব। গিয়ে কিন্তু দেখলুম, তিনি কাঁদছেন। আমাকে দেখে তাঁর কান্না যেন আরও উথলে উঠল। আমাকে জড়িয়ে ধরে' অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তারপর ভাঙাগলায় বললেন, "কালই তো তুই চলে' যাবি। তোকে আর তো দেখতে পাব না বাবা। জ্যাঠাইমাকে মনে থাকবে তো?"

মাথা নেড়ে বলেছিলাম, থাকবে।

কিন্তু থাকে নি।

॥ ২ ॥

পরবর্তী জীবনে আমাকেও নানা উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়েছিল। আই এস্-সি পড়তে পড়তেই কঠিন অসুখে পড়ি। সেরে উঠতে প্রায় ছ' মাস লাগল। তারপরই আমার বাবা মারা গেলেন। আমিই বড় ছেলে, সংসারের ভার আমার ঘাড়ে পড়ল। নিজের পড়া বন্ধ করে' প্রাইভেট ট্যুশনি করে' সংসার চালাতে লাগলাম। বাবা বড় চাকরি করতেন, তাঁর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা যখন হাতে এল তখন অর্থাভাব খানিকটা ঘুচল। আমি আবার পড়া আরম্ভ করলাম। বি এস্-সি পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার বিপদ। প্রেমে পড়ে' গেলাম। সাধারণ প্রেম নয়, গভীর পাকা প্রেম। মেয়েটিকে বিয়ে করতে হ'ল। অসবর্ণ বিবাহ। মা বউকে বাড়িতে নিলেন না। আমার পড়ার খরচও বন্ধ হল। এই সময় আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। একটা নাম-জাদা মাসিক পত্রিকায় আমার একটা গল্প প্রকাশিত হয়ে গেল এবং তা বহু রসিকজনের প্রশংসা লাভ করল। বায়রনের যেমন হয়েছিল, আমারও তেমনি হল অনেকটা—

I rose one morning and found myself famous :—

এর পর আর কলেজে না গিয়ে মাসিকপত্রের আপিসগুলিতে যাতায়াত শুরু করলাম। পশার জমে' গেল, আয়ও হ'তে লাগল কিছু কিছু। মনে শান্তি ছিল না কিন্তু। আমার যে ছেলেটি হয়েছিল, সেটি পোলিও রোগে আক্রান্ত হল। তাকে নিয়ে বম্বে গিয়ে থাকতে হল অনেকদিন। তবু বাঁচল না সে। শোকার্ত হয়ে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। আমার স্ত্রী প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেল। দু হাতে মাথার চুল মুঠো করে' ধরে' যন্ত্রণাহত পশুর মতো চীৎকার করত। ঘুমের ঘোরেও বিড়বিড় করে' বলত—মায়ের অভিশাপ, মায়ের অভিশাপ। সে-ও শেষ পর্যন্ত বাঁচল না। এই সব নিয়ে সুবৃহৎ উপন্যাস লিখে ফেললাম একটা। খ্যাতি আরও বাড়ল। টাকার অভাব রইল না, কিন্তু মনের শান্তি ছিল না একেবারে। দ্বিতীয় বার বিয়ে করলাম। এইসব সাংসারিক ঝঞ্ঝাট তো ছিলই, সাহিত্যিক জীবনের ঝঞ্ঝাটও কম ছিল না। যাঁরা বড় শহরে সাহিত্যিক আবর্তের মধ্যে থাকেন তাঁদের অবিদিত নেই যে সে-জীবনের জটিলতাও কিছু কম নয়। রসের বাজারেও 'তেজী মন্দী' আছে, সেখানেও নানারকম চক্রান্ত সর্বদা ওত পেতে থাকে, সেখানেও প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে হানা দিয়ে না বেড়ালে প্রাপ্য টাকা পাওয়া যায় না। সেখানেও স্থানে স্থানে 'চণ্ডী-মণ্ডপ' আছে এবং সাহিত্যিকরাও নিছক পর-নিন্দা পর-চর্চা করে' থাকেন সেখানে। এই সাহিত্যিক সমাজেও প্রচ্ছন্ন শত্রুর সংখ্যা কম নয়। যিনি নমস্কার করে হেসে হেসে আপনার সঙ্গে কথা কইছেন, তিনি যে একটু আগেই আপনার শ্রাদ্ধ করছিলেন, তা প্রথম প্রথম বোঝা যায় না। কিন্তু একটু অভিজ্ঞতা হলেই যায়। সাহিত্য-সমাজেও রাজনীতি আছে এবং সে-রাজনীতির দাবা খেলায় সু-সম্বন্ধ না থাকলে অনেক সময়ে বিপদে পড়তে হয়।

এই সব নিয়েই ছিলাম।

জ্যাঠাইমার কথা মনে ছিল না।

॥ ৩ ॥

প্রায় পঁচিশ বছর পরে।

নবীনগঞ্জ কলেজে এক সাহিত্যিক সভায় সভাপতিত্ব করবার নিমন্ত্রণ পেলাম। নবীনগঞ্জেই আমার স্কুল জীবন কেটেছে, সেইখানেই জ্যাঠাইমা ছিলেন। খবর পেয়েছিলাম জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশাই অনেক দিন আগে মারা গেছেন। তাঁর কৃতী ছেলেরা জীবনের নানাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেদের। নবীনগঞ্জ শহরও বদলে গেছে। পিচঢালা রাস্তা, নিওন লাইট, বড় বড় নূতন বাড়ি, সে নবীনগঞ্জকে আর চেনবার উপায় নেই।

যেসব লোকজনকে দেখলাম তাদের মধ্যেও পুরোনো চেনামুখ একটাও দেখতে পেলাম না। ভেবেছিলাম সভা শেষ হলে কোনও পুরোনো লোককে খুঁজে পুরোনো দিনের কথা আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

কিন্তু সভার কর্মসূচী এত দীর্ঘ, যে সভা শেষ হতে প্রায় রাত্রি দশটা বেজে গেল। আমার অভিভাষণটাও বেশ লম্বা হয়েছিল।

যাঁরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন আমার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তাঁরা একটা হোটেলে করেছেন। আমার ট্রেন রাত বারোটায় ছেড়ে যায়, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে' হোটেলের দিকে অগ্রসর হলাম।

প্রকাণ্ড সুসজ্জিত হোটেল। কলেজের প্রিন্সিপাল বললেন—'এখানে সব রকম খাবারই পাওয়া যাবে। ওরা মেনুটা দিয়ে যাচ্ছে, আপনি কি কি খাবেন দাগ দিয়ে দিন। বিলটা আমরা দিয়ে দেব।' মেনু এল। পোলাও পাঁচ টাকা প্লেট, ভাত দু' টাকা, রুটি প্রত্যেকটি চার আনা, ফাউল কাটলেট প্রতিটি দেড় টাকা, মটন কাটলেট প্রতিটি বারো আনা, মাংস এক প্লেট দু' টাকা, মুর্গির মাংস এক প্লেট চার টাকা, নিরামিষ তরকারি প্রতি প্লেট আট আনা। পুডিং এক প্লেট দু' টাকা। আরও নানারকম খাবারের ফর্দ ছিল। আমি কয়েকটাতে দাগ দিয়ে দিলাম।

খেতে খেতে একটি ছোকরাকে বললাম, "এই পাড়াতেই বোধহয় আমার জ্যাঠাইমার বাড়ি ছিল—সেটা কোথায় বলতে পার—"

ছোকরা বললে—"আপনার জ্যাঠামশায়ের নাম কি বলুন তো—"

"যোগেন মুকুজ্জো—"

"এইটেই তো তাঁর বাড়ি। তাঁর ছেলেরা বিক্রি করে' দিয়েছিল। সে বাড়ি ভেঙে চুরে এই পাঞ্জাবীরা হোটেল করেছে এখানে—"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

জ্যাঠাইমার বাড়ি হোটেল হয়েছে!

এখানে প্রত্যেক খাবারের জন্য দাম দিতে হয়!

"খাচ্ছেন না যে—"

"না, আর খাব না, পেট ভরে' গেছে।"

জাদু-গান্তি

সতীনাথ ভাদুড়ী

সুনীল গুহ

নন্দরানী? আজ এ বেলাতেও খাওয়ার জন্য বাড়ী যাওয়া হবে না। তোমরা অপেক্ষা কর না। না না। সে হয় না। এক মিনিট এখান থেকে নড়বার ফ্রসত নাই এখন। এই যে তোমাকে ফোন করছি, এখনও নজর রয়েছে, রাজমিস্ত্রিদের কাজের উপর। সারা-রাত আলো জেবলে কাজ করেছে ওরা। হ্যাঁ সারারাত আমিও জেগে। হ্যাঁ খেয়েছিলাম বইকি রাতিতে। হ্যাঁ এখন সকালেও খেয়েছি চা পাউরুটি। হ্যাঁ, মাটির ফাটলটা থেকে এখনও ধোঁয়া বার হচ্ছে। বস্তা বস্তা বালি ঢেলেও আগুন নিবল না দেখে ফাটলটা সিমেণ্ট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। গাঁথনির কাজ শেষ হতে আরও ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। না না তখনই বাড়ী যাওয়া যায় না খাওয়ার জন্য। তারপরও ঘণ্টা দু'তিন থাকতে হয়—বলা তো যায় না কখন কি হয়। রাতে বাড়ীতে খাইনি সে-কথা কি বাবা জানেন? হ্যাঁ সে তো ঠিকই; তিনি জানেন কি না জানেন তুমি কি করে জানবে। আচ্ছা......”

অন্যদিন হলে যদিই বা জানতে পারত, আজ তিনদিন থেকে তো কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছেন শ্বশুর তাদের সঙ্গে। বুড়ো বয়সে এমনিতেই লোকের রাগ, অভিমান বাড়ে। আর ইনি তো প্রায় দশ বছর থেকে একরকম শয্যাগত বললেই হয়। খাওয়া-দাওয়া শোয়া-বসা সব ওই ঘরের মধ্যে। মেজাজ খারাপ হওয়ারই কথা। সেই মেজাজ সপ্তমে চড়েছিল শ্বশুর, ইনামেলের থালায় তাঁকে ভাত দিতে দেখে। চিরকাল পাথরের থালা বাটিতে খাওয়া অভ্যাস। এক সময় দোর্দণ্ড প্রতাপে এখানে রাজত্ব করেছেন, সাহেবী কয়লা কোম্পানির বড়বাবু হিসাবে। চাপরাশী, কেরানী, ঠিকেদারের দল এককালে তাঁর ভয়ে কাঁপত। আজ তিনি ঢোঁড়া সাপ। যিনি জীবনে কাঁসার থালায় ভাত খাননি, তাঁকে ইনামেলের থালায় খেতে হল—নিজের বাড়ীতে; রাগে চোখ দিয়ে জল এসে গিয়েছিল। নন্দরানী বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলেন শ্বশুরকে। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। ভাবখানা যে—'ঢের হয়েছে! আর বোঝাতে হবে না!'

সত্যিই বোঝাবার দরকার ছিল না। সংসারের কোন খবর তাঁকে বলা হয় না। অথচ তিনি সব জানতে পারেন। নন্দনারী দোতলার রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে সারাদিন ঝি, চাকর, ঠাকুরের সঙ্গে বকাবকি করেন: তার থেকেই জানতে পারেন। মধ্যে মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে বলেন -'বউমা একটু আস্তে'। কিংবা হয়ত বললেন—"নীচে গিয়ে বলে আসতে পার না কথাটা খ্যাঁদার মাকে'। তখনকার মত নন্দনারী গলার স্বর নামিয়ে নেন; কিংবা হয়ত নীচে গিয়ে খ্যাঁদার মাকে বলে আসেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার যে কে সে-ই। বড়লোকের মেয়ে; পড়েছেন বড়লোকের হাতে; না করে করে এমন হয়ে গিয়েছে যে, কাজকর্মের নামে ভয় পান এখন। তবে শ্বশুরের সেবায় তিনি ত্রুটিহীন; আর সেটা করেন কর্তব্যের খাতিরে নয়, অন্তরের টানে। বুড়োরও বউমাকে নইলে এক মিনিটও চলে না। দোতলা থেকে পারতপক্ষে নীচে না নামবার এটাও একটা অজুহাত নন্দরানীর। একে বুড়ো মানুষ, তায় রুগ্ন: কখন কিসের দরকার হবে বলা তো যায় না।

বাড়ীর কর্তার ফোন পাবার পর কিন্তু নন্দরানীকে দোতলা থেকে নামতে হয়েছিল। স্বামীর জন্য চাল নিতে বারণ করলেন ঠাকুরকে। উপর থেকে চেঁচিয়ে বললে শ্বশুর শুনতে পেতেন। দরকার কি বুড়ো মানুষের দুশ্চিন্তা অনর্থক বাড়িয়ে।

রান্নাঘরের বেদীর উপর খ্যাঁদার মা সকালে বাসন মেজে রেখে গিয়েছে। ইনামেলের আর অ্যালুমিনিয়মের বাসন। ওগুলোকে দেখলেই গা জ্বালা করে, আর মন বেজার হয়ে ওঠে খ্যাঁদার মার উপর। বৈষ্ণব বাড়ীর মেয়ে তিনি। ছেলেবেলা থেকে বদ্ধমূল ধারণা যে কলাই করা বাসনের সঙ্গে খানিকটা ম্লেচ্ছতার সম্বন্ধ আছে; আর না হয় ভিখিরীদের মত যারা অপারক তারাই বাধ্য হয়ে ওসব বাসন ব্যবহার করে। এব বছর ধরে তাঁরা ওই বাসন ব্যবহার

করছেন,—এখনও ভাত খাওয়ার সময় তাঁর গা ঘিন ঘিন করে। শ্বশুরের আর দোষ কি; তিনি তো মাত্র দু'দিন কলাইকরা থালায় খেয়েছেন।

যত নষ্টের গোড়া ওই খ্যাঁদার মা। প্রথমবার যখন বাসন চুরি যায় কলতলা থেকে, তখনই শ্বশুর বলেছিলেন, ওকে ছাড়িয়ে অন্য ঝি রাখতে। ওদের গুষ্টিসুদ্ধ সবাই চোর একথা পাড়ার কে না জানে। নন্দরানী গায়ে মাখেননি শ্বশুরের কথা। খ্যাঁদার মাকে না হলে তাঁর চলে না—যদিও তাঁর সঙ্গে বকাবকি, কথা-কাটাকাটি, ঝগড়া নিত্যদিন লেগে আছে। মুখে অজুহাত দেখিয়েছিলেন—"ছাড়ালেও খ্যাঁদার মা কি নতুন কোন ঝিকে এ বাড়ীতে টিঁকতে দেবে। বস্তির খ্যাঁদার দলকে ভয় না করে, এমন লোকও পাড়ায় আছে নাকি!"

তারপরও তিনি কাঁসার বাসন কিনেছিলেন। কিছুদিন পর আবার এঁটো বাসন চুরি গেল কলতলা থেকে। থানা পুলিস করা হল। দারোগাবাবু বলে গেলেন, ঝি-চাকর বদলাতে। চোর ধরবার নামে খোঁজ নাই, উপদেশ দেবার গুরুঠাকুর! চাকর ঠাকুর ছাড়ালে নতুন লোক পাওয়া কি সোজা কথা আজকালকার দিনে! যদিই বা পেলেন, তিনি আবার কি মূর্তি ধরবেন পরে, কে জানে। যা দিনকাল। খবরের কাগজ খুললেই দেখবে, চাকরে বাড়ীর গিন্নীকে দুপুরবেলায় খুন করে গয়নাগাটি নিয়ে উধাও হয়েছে, তারই খবর। ওইসব অচেনা খুনে বাটপাড়দের চেয়ে চেনা চোর-ছ্যাঁচড়ই শত গুণে ভাল। পুরনো লোকজনরা যে এ বাড়ীর কাজকর্ম জানে। কত কষ্ট করে তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছেন। প্রতিটি 'সংসারের ব্যবস্থা যে আলাদা; প্রতিটি মানুষের খাওয়া দাওয়া ওঠাবসার ধরন-ধারণ যে আলাদা। কারও ভোর চারটেয় উঠে বেড়াতে যাবার আগে চা চাই; কেউ ঘুম থেকে উঠে খাবেন ত্রিফলার জল; কারও পান ছেঁচে দিতে হয়, কেউ ঝাল না হলে খেতে পারেন না, কেউ আবার লঙ্কা দেখলে আঁতকে ওঠেন। নতুন চাকর ঠাকুর এলে গুছিয়ে কাজ বুঝে নিতে অন্তত তিনটি মাস। তার উপর নন্দরানী নিজে কাজকর্ম করতে পারেন না। কাজেই ঝি-চাকর বদলাবার নামে তিনি ভয় পান।

চুরি বলে চুরি। একেবারে আগাগোড়া সব এঁটো বাসন একসঙ্গে। দ্বিতীয়বার চুরির পর আর তিনি স্বামীপুত্রের ইনামেলের বাসন ব্যবহার করবার স্বপক্ষে যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারেননি। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা রোজগার করে আনছে, সংসার চালাতে গেলে শেষ পর্যন্ত তাদের কথা রাখতেই হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি বাধ্য হয়েছিলেন বাড়ী থেকে কাঁসার বাসনের পাট তুলে দিতে।

তবু তারপরও শ্বশুরের জন্য কালো পাথরের থালাবাটির ব্যবস্থা বজায় ছিল। তাঁর জন্য যে ব্যবস্থা চিরকাল চলে আসছে, এক ডাক্তারের কথায় ছাড়া তাতে কোনরকম পরিবর্তন আনতে চাননি নন্দরানী। কিন্তু মানুষ যত কিছু ভেবে রাখে, সব কি করে উঠতে পারে এ সংসারে।

এ আঘাতটা এসেছিল অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। বাড়ীর চাকর-বাকরদের মধ্যে সব চেয়ে কম খারাপ হচ্ছে মধু ঠাকুর। পনর ষোল বছর বয়সে প্রথম এ বাড়ীর চাকরিতে ঢুকেছিল। তারপর দশ বছর কেটে গিয়েছে। নন্দরানীর কাছ থেকে টাকা নিয়েই বছর দুয়েক আগে বিয়ে করতে গিয়েছিল। গত মাসে একটি ছেলেও হয়েছে। সেই থেকেই সূত্রপাত। 'আদেখলের ঘটি হ'ল জল খেতে খেতে বাছা মল'। ওর হয়েছে তাই। হঠাৎ তরশুদিন বলে কিনা—"মা, বুড়োবাবুর পাথরের থালা বাটিগুলো হেঁশেল থেকে সরিয়ে না রাখলে আর আমি এ বাড়ীতে কাজ করব না।"

শুনে নন্দরানী অবাক। কেন? হল কি? ওগুলো কি দোষ করল? অন্য কোথাও বেশী মাইনের চাকরি-টাকরি জুটেছে নাকি? তা যদি হয় তো বলো এখনই, এ ক'দিনের মাইনে চুকিয়ে দিচ্ছি। ঠাকুর বলে—না মা সে-সব কিছু নয়। কালোপাথর হচ্ছেন শিবঠাকুর কেষ্টঠাকুর দুই-ই। হাত থেকে পড়ে যদি ভাঙে তাহলে অমঙ্গল হয়। ঘোর অমঙ্গল।

শোনো একবার কথা! এ ধুয়ো আবার উঠল কেন এতকাল পর নতুন করে? এ তুমি শুনলে কার কাছে? আমরা তো সাতজন্মেও শুনিনি। নিশ্চয়ই খ্যাঁদার মা তোমার কানে এ মন্ত্র দিয়েছে। ওই তো তোমাদের মন্ত্রদাতা।

মধু চুপ করে থাকে।

নিমকহারাম আর কাকে বলে! এই সেদিন তাঁর পুরনো র‍্যাপারখানা ঠাকুরকে দিয়েছেন তার বউকে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

রঘুয়া চাকর স্বীকার করল যে, খ্যাঁদার মাই প্রথম পাথর ভাঙ্গার অমঙ্গলের কথাটা তুলেছিল।

ওই সবই জটলা কর তোমরা মিলে। ঠাকুর চাকর ঝির দস্তুরই হল তাই। নিজেদের মধ্যে যত ঝগড়াই থাক, গেরস্তর বিরুদ্ধে ঘোট পাকাবার বেলা তারা সবাই এক দলে। উপর থেকে যখন তাকাও, তখন দেখ তিন মাথা এক হয়েছে।

খ্যাঁদার মা বলেছে, যার হাত থেকে পড়ে শুধু তার নয়, যে বাড়ীতে পাথর ভাঙ্গে সে বাড়ীর পর্যন্ত অকল্যাণ হয়। সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন। মুর্খ মানুষ আমরা; কিন্তু একবার শোনবার পর ছেলেপিলের বাপ হয়ে সত্যিই ভয় ভয় করে মাইজী। বেটার কসম খেয়ে রঘুয়া জানায় যে, বুড়োবাবুর পাথরের থালা সরিয়ে রাখবার সময় তার হাত সেদিন ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল।

যত শোনো, তত রাগে রি রি করে সর্বশরীর। লোকের আবদারের একটা সীমা থাকবে তো! পুরনো হয়েছেন তো মাথা কিনেছেন! যত নষ্টের গোড়া এই খ্যাঁদার মা!

চড়া গলায় কথাটা তার কাছে পাড়তে গেলেন নন্দরানী। কাউকে কালো পাথর ছুঁতে হবে না। বেঁচে বর্তে থাকুক তোমার খ্যাঁদা, আর মধু ঠাকুরের ছেলে! দিনকাল পড়েইছে এই রকম।......

কথাটা শেষ করবার আগেই হাঁ হাঁ করে উঠেছে খ্যাঁদার মা। শাপ-শাপান্ত করবেন না বলছি মা আমার খ্যাঁদাকে। সাত চড় মারুন, আমি মুখে রা কাটব না; আমার ছেলেকে নিয়ে কথা বললে কিন্তু আমি......

স্বর নামাতে হল নন্দরানীকে। শাপ-শাপান্ত আবার আমি করলাম কখন? গায়ে পড়ে কোঁদল করতে এস না খ্যাঁদার মা। আমি জিজ্ঞাসা করছি কি......

খ্যাঁদার মার সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা হল। যে কাজ অনুচিত, দরকার কি সে কাজ করে। বেবির মা যে বিধবা হলেন—মনে আছে তো? না মনে থাকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে নিও মা। পাড়ারই তো লোক। দিব্যি রমরমা জমজমা সংসার। হাত থেকে পড়ে পাথরের থালা ভাঙ্গল। সুস্থ স্বামী এতখানি চেহারা। খেয়েদেয়ে আপিসে গিয়েছেন। আপিস থেকে খবর এল বুকের ব্যথায় হঠাৎ মারা গেছেন তিনি। কিসে থেকে যে কী হয় মা কে বলতে পারে। কতটুকু কী মানুষে করতে পারে। যা করবার ওই ভগবান শিব আর কেষ্ট, তাঁরাই করেন।......যা হবার তো ঘটে গেল; ওই বেবির মার কথা বলছি; কপাল পোড়বার পর সে ভাঙ্গা পাথর গঙ্গায় ফেললেই বা কি, আর না ফেললেই কি! এখানে তো গঙ্গা নেই—তাই নদীতেই ফেলবার নিয়ম।......

খ্যাঁদার মার কথায় নন্দরানীরও আবছাভাবে মনে পড়ল—ছেলেবেলায় কোথায় যেন শুনেছেন, কালো পাথর ভেঙ্গে গেলে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে ফেলে আসতে হয়। কথাটা নিছক তাহলে খ্যাঁদার মার আবিষ্কার নয়।

নন্দরানীর স্বামী শুনে ছেলেকে বললেন—"ঝি, চাকর, ঠাকুর—সব শিয়ালের এক রা দেখছি। চাকর ঠাকুরদের কোন ইউনিয়ন-টিউনিয়ন খুলেছে নাকি এ পাড়ায়? খোঁজ নিসতো।"

ছেলে বলল—"খ্যাঁদারা যে পুরনো বাসন বেচে। বোধহয় পাথরের বাসনের খদ্দের জুটেছে এবার।"

নন্দরানী ছেলেকে বারণ করেন খ্যাঁদাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে। খ্যাঁদা গুণ্ডার দলকে পাড়ার সবাই ভয় করে।

গঙ্গায় ফেলে আসবার কথাটা শোনবার পর থেকে নন্দরানীর মনেও খটকা লেগেছে।

কালো পাথর হাত থেকে পড়ে ভাঙলে সন্তানের অকল্যাণ হয়, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। তবু ছেলের মা হয়ে ভয় না পেয়ে পারেন না। যদি কিছু হয়ে যায়, তখন আর আফসোসের সীমা থাকবে না। এ সন্দেহ একবার মনে জাগতেই যা দেরী; তারপর সেটা চলে আপন গতিতে। শেষ পর্যন্ত মনে হতে আরম্ভ হয়—সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল। দরকার কি ঠাকুর দেবতাদের ঘাঁটিয়ে। শ্বশুর চটবেন; কিন্তু উপায় কি? ও রাগ দুদিন পরে পড়ে যাবে।

এতকাণ্ডের পর শ্বশুরের ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল ইনামেলের থালায়। তাঁর পাশের ঘরখানাই নন্দরানীর শোবার ঘর। সেই ঘরেই ফোন আছে। বেলা সাড়ে ন'টার সময় আবার ফোনে খবর পেয়েছিলেন নন্দরানী স্বামীর কাছ থেকে যে, সারারাত্রির পরিশ্রম কোন কাজে আসেনি। সিমেন্টের গাঁথনি টেকেনি। সরা দিয়ে ঢাকা ভাতের হাঁড়ির যেমন ভক্ করে ভাপ উপচে ওঠে, ঠিক তেমনি করে নীচের ধোঁয়া বেরিয়ে এসেছিল। গাঁথনি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ধসে পড়েছে। যে চারজন মিস্ত্রি উপরে কাজ করছিল, তারাও সেই সঙ্গে ফাটলের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে। সেইটাই হল সবচেয়ে দুঃখের কথা।

অন্যদিন হলে শ্বশুর জিজ্ঞাসা করতেন—"বউমা, ফোন করেছিল কে; সবু নাকি?" আজ তিনি কথা বন্ধ করেছেন বলেই বাঁচোয়া।

স্বামী ফোনে কথা বলছিলেন খুব উত্তেজিতভাবে। তিনি নন্দরানীকে উদ্বিগ্ন হতে বারণ করেছিলেন। আর বাবা যাতে এ খবর জানতে না পারেন, সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন। নন্দরানীর মনে কিন্তু তখনও বিশেষ কোন উদ্বেগ আসেনি স্বামীর জন্য। এ রকম ছোটখাট দুর্ঘটনা খনিতে লেগেই থাকে। তাঁর দুশ্চিন্তা স্বামীর আজ দুপুরে সময়মত খাওয়া হবে না বলে।

নিজের বিবেক পরিষ্কার রাখবার জন্য সেদিন একটু বেশী বেলা করে খেলেন। তারপর থেকে বসে আছেন নিজের ঘরে, ফোন এলে ধরবেন বলে।

ঝনঝন করে কলতলায় বাসন ফেলবার শব্দ হল। খ্যাঁদার মা এসেছে। আজ বোধহয় ঘর মুছতে আসবে পরে। "একটু আস্তে খ্যাঁদার মা! অমন করে আছাড় মেরে ফেলছ কেন?"

"আছাড় মেরে আবার ফেললাম কখন মা! নিশ্চিন্দি হয়ে কাজ করবার জো নেই এ বাড়ীতে! যখনই কোন কাজ করতে যাবে তখনই এই! কাঁসার বাসন নয়, পিতলের বাসন নয়, ইনামেলের তো থালা বাটি। তারই কোথায় চটা উঠল, কোথায় আঁচড় পড়ল তাই নিয়ে লাথি ঝাঁটা নিত্যি তিরিশ
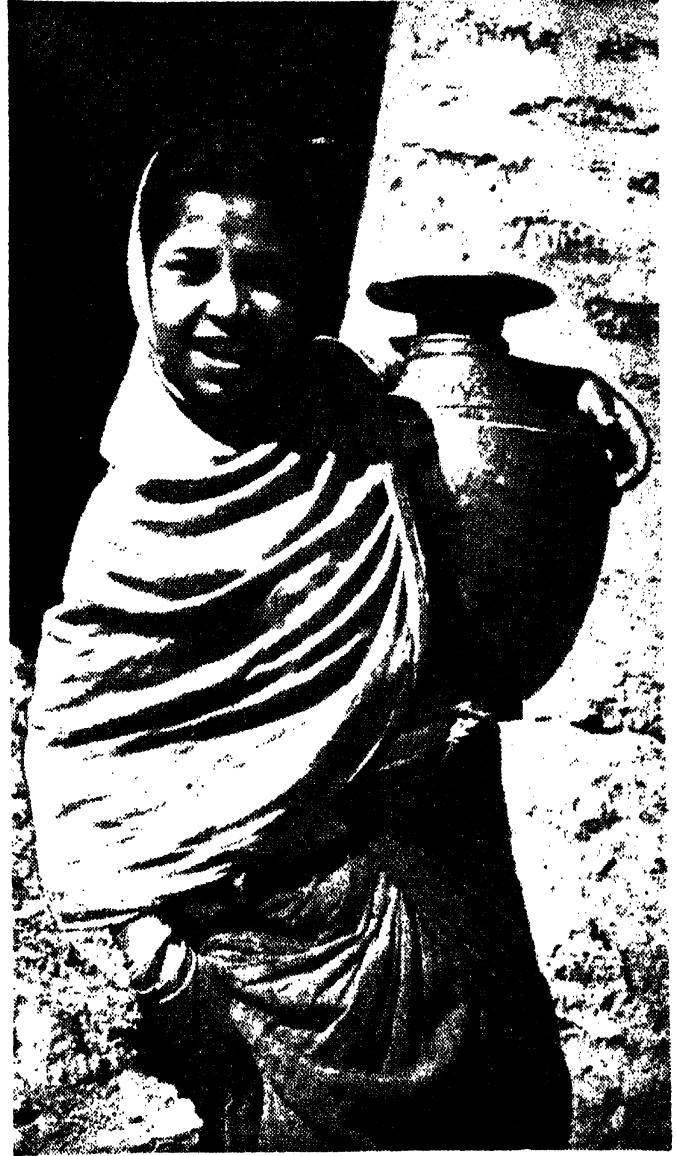
ঝর্ণাধারায় আলোকচিত্র ঃ শ্রীঅনিল বসু

দিন! পাশের বেনেবাড়ীতে যে ডাঁই ডাঁই কাঁসার বাসন মাজি, কই সে বাড়ীর গিন্নী তো কোন দিনও এমন করে টিক টিক করেন না।"

এমনিতেই পোড়া বাসন মাজবার সময় গেরস্তকে গালাগাল না দিলে খ্যাঁদার মা গতরে জোর পায় না কোনদিন। এখন তো গলা সপ্তমে চড়াবার একটা অজুহাত পেয়েছে। নন্দরানীর ভয় শ্বশুরের ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

"আমার দোষ হয়েছে, ঘাট হয়েছে; তোমার কাছে গলবস্ত্র হয়ে মাপ চাইছি; এখন তুমি একটু দয়া করে থামো! বাবার ঘুম ভেঙ্গে যাবে যে।"

"ঘুম ভাঙ্গে তো আপনার চেঁচানিতেই ভাঙবে।" বলে, কিন্তু থেমে যায় খ্যাঁদার মা, বুড়োবাবুর খাতিরে।

খ্যাঁদার মার খোঁচাটা মনের মধ্যে কির কির করে বেঁধে। যে বেনে বাড়ীকে নন্দরানী কোনদিন ধর্তব্যের মধ্যে গোনেন না, তার সঙ্গে তুলনা করে এখন হঠাৎ একটু ছোট ছোট লাগে নিজেদের। অন্যদিন তিনি

এরকম সময় বারান্দায় রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেন, ঝির উপর একটু নজর রাখবার জন্য। ঠাকুর চাকর এসময় সবাই বেরিয়ে যায়। একা খ্যাঁদার মা নীচে থাকে। সে আবার একটা চটের থলে নিয়ে আসে বাড়ী বাড়ী থেকে পোড়া কয়লা বেছে নিয়ে যাবার জন্য। অন্য যা কিছু টুকিটাকি চোখের সম্মুখে পড়ে গেরস্ত বাড়ীতে, তা কি আর সে নেয় না ওই থলের মধ্যে ভরে। সেই জনাই তার উপর একটু লক্ষ্য রাখতে হয়। তারপর খ্যাঁদার মা চলে গেলে তিনি নীচে নেমে দরজা বন্ধ করে দেন প্রত্যহ।

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল।

"কে নন্দরানী? মোটেই দুশ্চিন্তা ক'র না। সে রকম কিছু নয়। যে মিস্ত্রি চারজন ফাটলের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল, তারা পাশের গ্রামের লোক। তখনই তাদের তোলবার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু নীচে গনগনে আগুন। সে আগুনে কেউ এক মিনিটও বেঁচে থাকতে পারে না। তারা নিশ্চয়ই নীচে পড়ামাত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে থাকবে। তারপর তাদের গ্রামের লোকরা এসে জোটে সেখানে। তাদের মধ্যে একজন ফাটলের কাছে কান নিয়ে গিয়ে বলে যে, সে নীচে লোকের চীৎকার শুনতে পেয়েছে। বাজে কথা। কিন্তু গ্রামের লোকরা বুঝতে চায় না। তারা মার-মূর্তি আমাদের উপর। সশস্ত্র পুলিস এসে গিয়েছে। লোকগুলো কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছে। একটা কিছু না করে তারা ছাড়বে না মনে হচ্ছে। তাদের মাতব্বরদের সঙ্গে এখনই ঠিক হল দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা মুর্গি নামানো হবে ওই ফাটলের মধ্যে। দু'চার মিনিটের পর সেটাকে উপরে তুলে দেখা হবে বেঁচে আছে কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ মুর্গি। বাঁচবে না ঠিকই ওই গরমে। কিন্তু লোকরা শাসাচ্ছে যে, যদি মুর্গিটা বেঁচে থাকে, তাহলে একসঙ্গে আমাদের সব ক'জনকে ওরা ফাটলের মধ্যে ফেলে দেবে। ওদের ধারণা মিস্ত্রি চারজনকে আমরা একটু চেষ্টা করলেই বাঁচাতে পারতাম। বোঝালেও বুঝবে না। থাক, ভেবো না। নীচের আগুনের গরম আমরা থার্মমিটার দিয়ে মেপেছি আগেই। আচ্ছা।"......

মুর্গি! ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে। তারই সুতোয়-ঝোলান-প্রাণটুকুর উপর সব নির্ভর করছে। স্বামীর গলার স্বরে তিনি আতঙ্কের আভাস পেয়েছেন। মুখে যা বললেন, ব্যাপার নিশ্চয়ই গুরুতর তার চেয়ে। নন্দরানীদের দুশ্চিন্তা করতে বারণ করলেন বারবার। কেন? তাঁর তো কোন রকম দুশ্চিন্তা হয়নি এর আগে। পাশের ঠাকুর ঘরে গিয়ে বিপত্তারণ শ্রীমধুসূদনকে প্রণাম করে এলেন।

ছেলে এসে গেল স্কুল থেকে। ও, আজ শনিবার! তাই বলো! একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন নন্দরানী। এত তাড়া কিসের? দু-মিনিট বস্; রোদ্দুরে এলি। ছেলে শুনবে না। ফাটলের আগুনে বালি ঢালতে দেবে না মজুররা; তাই মিলিটারি আসছে; সব ছেলেরা দেখতে যাচ্ছে। না না তোর যেতে হবে না ওসব গণ্ডগোলের মধ্যে। আবার তর্ক করে! বাবা রয়েছেন সেখানে বলে তোকেও যেতে হবে! বড়রা যা করে, ছোটরাও তাই করে নাকি! আজকালকার ছেলেরা কি কারও কথা শোনে! জানে ওর দাদু বাড়ীতে কথাবার্তা বন্ধ করেছেন; সেইজন্য এত সাহস বেড়েছে; তাঁকে বলে দিতে তো পারব না আজ। এসব বুদ্ধি খুব মাথায় খেলে! কোন কথা শুনবে না। ছেলে যাবেই যাবে! কিছু খেয়ে যাবি তো; স্কুল থেকে এলি? না তারও তর সইবে না? যেদিকে কুলিমজুররা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে যাস না যেন খবরদার! হে ভগবান,

গালাগোলা যেন না চলে! ছেলেকে জলখাবার দেবার জন্য নন্দরানীকে নীচে নামতে হ'ল।

কলতলায় বাসন ছড়ান রয়েছে; খ্যাঁদার মা গেল কোথায়?

খ্যাঁদার মা তখন সদর দরজা দিয়ে বার হ'বার উপক্রম করছে চটের থলিটা হাতে নিয়ে।

"কী খ্যাঁদার মা, কাজ তো শেষ হয়নি?"

চমকে উঠে সে হাতের থলিটা ছ'ড়ে বাইরে ফেলে দিল। কী ব্যাপার? নন্দরানী ছুটে গেলেন দরজার কাছে। তাঁর ছেলে ছুটে এল। বাইরে কে যেন একটা লোক ওদের দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল পাশের গলির মধ্যে। মা আর ছেলের চীৎকারে লোক জুটতে আরম্ভ করেছে দোরগোড়ায়। ঠাকুর ছুটে আসছে তাসের আড্ডা ছেড়ে। দলবল নিয়ে রঘুয়া দৌড়ে আসছে। ছেলে বেরিয়ে গেল দেখতে থলের মধ্যে কী ছিল। কৌতূহলী দর্শকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে খ্যাঁদার মা গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছে।

"বুড়োবাবুর পাথরের থালাবাটিগুলো আমি নদীতে ফেলে দিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম। মা আপনার ছেলেকে ওই ভাঙাপাথর ছুঁয়ে অমঙ্গল ডেকে আনতে বারণ করুন! ও ছেলে! তোমাদের ভালর জন্যই ওগুলোকে নদীতে দিতে যাচ্ছিলাম।"

ছেলের গলা শুনতে পেলেন নন্দরানী দোরগোড়া থেকে। "নদীতে যাচ্ছিলে দিতে, তবে অমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেন?"

ভিড়ের ভিতর কে যেন একজন ফোড়ন দিল—"আমের আচার তৈরীর সিজন চলেছে এখন।"

খ্যাঁদার মা মুহূর্তের জন্যও স্বর নামায়নি। ...না আমি বাড়ীর মধ্যে ফেলিনি। যাদের নুন খাই তাদের গায়ে ছোঁয়াচ লাগতে দেব না। আমার হাত থেকে পড়ে ভেঙেছে, যা হবার হয় আমারই হবে! রাস্তার উপর বাড়ীর বাইরে ফেলেছি, যাতে আমার ছাড়া আর কারও অকল্যাণ না হয়। চোর হেঁচড় নই মা আমরা। বাড়ী বাড়ী কাজ করে খাই; কেউ বলুক তো যে খ্যাঁদার মা কোনদিন কারও একখানা বাসনও নিয়েছে। বললে গায়ে কুষ্ঠ বেরোবে, জিব খসে পড়ে যাবে। আচার দেবার বাসন আমার যথেষ্ট আছে। বাড়ী বাড়ী কাজ করে খাই বলে, এমন হাবাতের ঘরের মেয়ে আমাকে ভাববেন না মা।"......

বাইরের লোকজনের সম্মুখে মেয়েমানুষদের বার হবার রেয়াজ নাই এ বাড়ীতে, তাই নন্দরানী দাঁড়িয়েছেন দরজার আড়ালে। সেখান থেকে চেঁচিয়ে ছেলেকে ডাকলেন—"পটলা! পটলা, তুই ছুঁস না। ঠাকুর! রঘুয়া! পটলবাবুকে ওই থলিতে হাত দিতে দিস না।" নন্দরানীর মনে হচ্ছে যে, এই হট্টগোলের মধ্যে কেউ তাঁর কথা শুনতে পেল না। হে ভগবান!

না, রঘুয়া ঠিক শুনতে পেয়েছে। সে দরজার দিকে এগিয়ে এসে মাইজীকে জানাল যে, পটলবাবু ওসব কোন জিনিস ছোঁননি। ভগবান বাঁচিয়েছেন।

তিনি আস্তে করে দরজার কপাট খানিকটা ভেজিয়ে দিলেন, যাতে তিনি দুই কপাটের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ছেলের উপর নজর রাখতে পারেন। ভিড়ের মধ্যে ছেলেকে ঠিক খুঁজে বার করতে পারছেন না। খ্যাঁদার দলের লোকরাও নিশ্চয় আছে এই ভিড়ের মধ্যে। তিনি নিজে এখন পর্যন্ত খ্যাঁদার মাকে কোন কড়া কথা বলেননি, শুধু তাদের ভয়ে। পটলাটা আবার ওস্তাদি দেখিয়ে কিছু না বলে ফেলে। সেসব বুদ্ধি কি আর আছে পটলাটার। হঠাৎ ফট্ করে একটা শব্দ হ'ল,

কাছেই! ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছেন তিনি। বোমা ফাটবার শব্দ! খাঁদার দল! যে লোকটা গলির মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিল সে-ই বোধ হয় ফেলেছে বোমা। খাঁদা বোধহয় দলবল নিয়ে এগিয়ে এসেছে মার সাহায্যে! বোমার শব্দটা কানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য অল্প-ফাঁক-করা দরজাটা দড়াম্ করে বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। আবছা মনে পড়ছে, শব্দটা হওয়ার মুহূর্তে দরজার ফাঁক দিয়ে যেন দেখেছিলেন, যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। ভয়ে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি প্রতীক্ষা করছেন আরও দুই-একটা বোমার আওয়াজের।

এতক্ষণে মনে পড়ল পটলার কথা। একটা রক্তাক্ত দেহের ছবি তাঁর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। চারিদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তাঁর উপর! এখানে ছেলের এই; আর সেখানে ছেলের বাবার প্রাণ ঝুলছে মুগিবাঁধা সুতোর উপর! উপায়? এসব বিপদ ভাববার সময় দেয় না, বুঝে দেখবার সুযোগ দেয় না। নিতান্ত অসহায় তিনি! পাথরের-থালা-ভাঙ্গা-জনিত অকল্যাণের গতি যে এত তীব্র ও অমোঘ হতে পারে, সেকথা তিনি আগে কল্পনাও করতে পারেন নি। এর হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় নাই। তাঁর চতুর্দিক অন্ধকার! এক যদি—তাই হয়, তবেই তাঁর নড়বড়ে জগৎটুকু ভারসাম্য ফিরে পায়। অন্ধকারের ভিতর জ্বল-জ্বল করে ফুটে উঠেছে একটা প্রশ্নচিহ্ন। জটিল প্রশ্ন। সেই কঠিন প্রশ্নের আবরণের মধ্যে অজ্ঞাতে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন নন্দরানী। তাঁর মনে খটকা লেগেছে। খুট করে যেন মনের ছিটকিনি বন্ধ হয়ে গেল। বাইরের আর কোন অবান্তর জিনিসের প্রবেশাধিকার নাই সেখানে এখন। আসন্ন এবং আগত অমঙ্গলগুলো মুহূর্তের জন্য অকেজো হয়ে তাঁর সৃষ্টি করা জাদুগণ্ডির ঠিক বাইরে, থমকে দাঁড়িয়েছে। বাইরের হই-চই, উপরের ঘরের টেলিফোনের ঝনঝনানি হয়ত কানে আসছে; কিন্তু মনে সাড়া জাগাতে পারছে না।

কোন বাইরের লোক, বাড়ীর বাইরে গিয়ে যদি আছাড় মেরে কাস্তোপাথরের থালা ভাঙ্গে, তাহলে বাড়ীর লোকের অমঙ্গল হবে না ঠিকই; কিন্তু সে যদি বাড়ীর দোরগোড়ায় চৌকাঠের ভিতরের দিকে দাঁড়িয়ে, বাইরে পাথর ছুড়ে ফেলে ভাঙ্গে, তাহলে কি, সে বাড়ির লোকের অকল্যাণ হবে? এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন নন্দরাণী? উত্তর পক্ষপাতহীন হওয়া চাই, যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই, প্রমাণসিদ্ধ হওয়া চাই। তাঁর মন বলছে যে ওতে গেরস্তর অমঙ্গল হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাঁর মত যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়; ঠিক ভরসা পাচ্ছেন না। খ্যাঁদার মা'র এসব জিনিস নখদর্পণে; তাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে পারলে হ'ত! নন্দরানী বলতে চান, পাথর যে জায়গাটায় গিয়ে পড়ে, সেই জায়গাটাই আসল; আর যেখান থেকে ফেলা হল সে জায়গাটা অবান্তর, এ প্রশ্নের বিচারে। কিন্তু এর বিরুদ্ধের যুক্তিটাও তাঁর মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে। যার হাত থেকে পড়ে পাথর ভাঙ্গে তারও অমঙ্গল হয় যখন, তখন একথা জোরগলায় বলা চলে না, যে পাথর পড়বার জায়গাটাই অমঙ্গলের একমাত্র কেন্দ্র। যেখান থেকে পড়ে সেটাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখন কথা হচ্ছে যে......

নন্দরানীর চুলচেরা বিচারে বাধা পড়ল। দুর্গের দেয়ালে আঘাত পড়েছে।

"বউমা! ও বউমা!"

শ্বশুর! ঘর থেকে বার হয়েছেন! রেলিং ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন! কী যেন বলতে বলতে নামছেন। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছেন সেদিকে নন্দরানী। খেয়াল নাই যে বৃদ্ধ এখনই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যেতে পারেন; খেয়াল নাই যে শ্বশুর তিনদিন পর প্রথম কথা বলছেন এখন; খেয়াল নাই যে তাঁর কণ্ঠস্বর বেশ উত্তেজিত। শ্বশুর কেন নামছেন, কী বলছেন সেসব জানবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাঁর নাই।

"বউমা শুনছ। সুবল ফোন করেছে।"

ফোন? এতক্ষণে যেন কানে যাওয়া কথাগুলো বুঝতে আরম্ভ করলেন।

ফোন? ভাঙ্গা পাথর...চৌকাঠ...খারাপ খবর...তাঁর সংসারের। ঝাঁকি খেয়ে তাঁর মন ফিরে এল এই অবাঞ্ছিত জগতে। শ্বশুর যত দেরী করে, যত আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ খবরটা বলেন তত ভাল!

দড়াম করে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে পটলা এসে ঢুকল ব্যস্তভাবে। "মা!......"

পটলা! তাহলে তিনি যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই; চৌকাঠের ভিতর থেকে ফেললে গেরস্তর অকল্যাণ হয় না! হতে পারে না! সব জিনিসেরই একটা ইয়ে আছে তো!

পটলা কি যেন বলবে বলে ঢুকেছিল বাড়িতে; সম্মুখে দাদুকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে চুপ করে গেল। নন্দরানী ছুটে গেলেন সিঁড়ির উপর শ্বশুরকে ধরতে।

"কী যে কাণ্ড! দাঁড়ান দাঁড়ান! আর নামতে হবে না সিঁড়ি ভেঙ্গে। চলুন ঘরে যাই! পটলা তুই আয়; পিছন দিক থেকে ধরে থাক্। লাঠিগাছা পর্যন্ত নেন নি! ডাকলেই হ'ত; ঘর থেকে বার হবার কী দরকার পড়েছিল!"

"ডাকিনি কি আর। তোমরা শুনতে পেলে কি আর আমাকে ওঘরে গিয়ে ফোন ধরতে হয়। তোমরা তো আর আমাকে আজকাল কোন কথা বল না। সুবলের ফোন থেকেই জানতে পারলাম। মুর্গিটা হাত কয়েক নামানো মাত্র রোস্ট হয়ে গিয়েছে। মুর্গি রোস্ট হবার কথাটা সুবল হাসতে হাসতে বলেছিল। ও বুঝতে পারেনি কিনা প্রথমটায়, যে আমি ফোন ধরেছি।"

পটলা হাসছে। বৃদ্ধ হাসছেন। বউমার মুখেও সলজ্জ হাসি। মুর্গিটা যে মরে যাবে সে কথা নন্দরানী আগে থেকেই জানতেন। পটলা বাড়িতে ঢোকবার মুহূর্তে তিনি একথা জেনে গিয়েছিলেন কেউ বলবার আগেই। এতক্ষণে তিনি সময় পেলেন সুস্থির হয়ে পটলাকে প্রশ্ন করবার।

"হ্যাঁরে, কারো লাগে-টাগে নি তো?"

"না। মারামারি তো হয়নি কারো সঙ্গে।"

"না না, বোমা ফাটবার কথা বলছি।"

"বোমা?"

"ওই যে শব্দ হল। পটকা বুঝি?"

হেসে গড়িয়ে পড়ল পটলা।

"একজন যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে; তার সাইকেলের টায়ার ফেটে যাবার শব্দ ওটা।"

ন্দু আমাদের পাড়ার যুবকদের চাঁই অর্থাৎ নেতৃস্থানীয়। সে বছরে অন্ততঃ দুটো করে সমিতি গড়ে,—কোনটাই দু'-মাসের বেশি টেঁকে না। ইকনমিক্সে এম-এ পাস করেছে—কিন্তু তৃতীয় বিভাগে, এখনও বেকার। দাদা একজন নামজাদা উকিল। ইন্দু একদিন এসে বললে—স্যার, আমরা হিন্দু বিবাহ সংস্কার সমিতি খুলতে চাই।

অন্যমনস্ক ছিলাম, বললাম—সেকি? হিন্দু সংকার সমিতি তো একটা আছে, আবার কেন?

ইন্দু—না, স্যার, বিবাহ সংস্কার সমিতি। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

আমি—আমার সঙ্গে? আমি তো কিছু ভাবিনি এ বিষয়ে।

ইন্দু—না ভেবে থাকেন, ভাবুন। আপনি একজন সমাজ-হিতৈষী লেখক। ধরুন—বিবাহ যে কোন মাসে হবে না কেন? ক'টা মাস বাদ যাচ্ছে কেন?

আমি—শ্রাবণ-ভাদ্র বাদ দেওয়া হয় বোধহয় অতিরিক্ত বর্ষার জন্য, আশ্বিন-কার্তিক পূজা পার্বণের মাস আর পৌষ-চৈত্র ফসল তোলার মাস—সেজন্য বোধহয় পল্লী-বাংলায় এই মাসগুলো বাদ দেওয়া হ'ত। তা থেকেই বোধহয় নিয়মটা চলে এসেছে।

ইন্দু—পল্লী-বাংলায় চলে চলুক, শহরে শহরে মাসের বিধি-নিষেধ চালানোর কি প্রয়োজন? পৃথিবীতে কোথাও মাসের এরূপ অনুশাসন মানা হয় না।

আমি— মানলে ক্ষতি কি? চিরাচরিত প্রথা তো।

ইন্দু—ক্ষতি আবার নেই? বিবাহ স্থির হওয়ার পর নিষিদ্ধ মাসের ব্যবধানের জন্য উভয়পক্ষের কত ক্ষেত্রে মতিস্থির থাকছে না,—বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে,—একটা দাঁও পেয়ে পাত্র-পক্ষ কথা দিয়েও বিয়ে দিতে চাচ্ছে না। তা ছাড়া জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে অন্য কারণও আছে। নিষিদ্ধ মাসগুলোতে বাজনদার, ভিয়েনদার, সাজনদার, নানা শ্রেণীর যোগানদার, দোকানদার ও স্বর্ণকাররা বেকার হয়ে পড়ছে। ছ'মাস বাদ যাওয়ায় বাকি ছ'মাসে বছরের সব বিয়েগুলো ঠাসাঠাসি হয়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে—পৌর জীবনে অসুবিধার সৃষ্টি করছে। আবার তারিখ নির্দিষ্ট থাকায় একই দিনে হচ্ছে বহু বিবাহ। এতে যোগানদারদের লোকসান হচ্ছে। বিয়ের উপহার ছাড়া যে সব বই বিক্রী হয় না ছ'মাস সে সব বইএর দোকান বন্ধ। নিষিদ্ধ মাসে আমাদের একখানিও নভেল বিক্রী হয় না। ঐ ক'মাস পুরোহিতরাই বা খায় কি? আর্থনীতিক দিক থেকে ভাবুন। পক্ষান্তরে বাকি মাসগুলোয় বাজারে মাছ পাওয়া যায় না। দই মিঠাই-এর দাম চড়া—কলার পাতা পর্যন্ত বাজারে দুর্লভ। আনাজ তরকারীর দাম বেড়ে যায়।

আমি—বারো মাস বিয়ে হলে যে বারো মাসই বাজারের জিনিস দুর্লভ ও দুর্মূল্য হবে।

ইন্দু—তা হবে না। বরং মূল্যের অস্থিরতা দূর হলে একটা সাম্যাবস্থাই আসবে পণ্যমূল্যে। এই ত গেল মাস,—বিয়েটা দিনের বেলায় হবে না কেন?

আমি—বিয়েটা একটা রোমান্টিক ব্যাপার। রাত্রির পরিবেশে আলোকিত ভবনে অথবা চাঁদনীর আলোকে উৎসবটা বেশ শোভন হয়—দিনের প্রখর আলোয় রোমান্‌স্ নষ্ট হয়ে যায়। বোধহয় সে জন্য রাতেই বিয়ে হয়। বিয়েতো একটা থিয়েটার, থিয়েটার কি দিনে জমে?

ইন্দু—কিন্তু আসল বিয়ে তো কুশণ্ডিকা। সেটা তো দিনের বেলাতেই হয়। কেবল কন্যা দানটা হয় রাতে।

আমি—কুশণ্ডিকা তো দু'একটি জাতির অনুষ্ঠান। বিয়ে দিনে হওয়ায় লাভ কি?

ইন্দু—লাভ নিশ্চয়ই আছে। আলোর খরচটা তো বাঁচে। তা ছাড়া, বর্ষা ও শীতের রাতে তো অনেক ক্ষেত্রেই রোমান্স্ নষ্ট হয়ে যায়। ইলেকট্রিক ফিউজ হয়েও রোমান্স্ নষ্ট করে দেয়। বিয়ে দিনে হোক, বাসর হোক রাতে।

আমি—লোকের অফিস কাছারি স্কুল-কলেজ থাকে, বিয়েতে যোগ দেবে তারা কি করে?

ইন্দু—তা ভেবেছি—তার প্রতিকার কি করা যেতে পারে তা বলব। যোগ দেওয়া তো ভোজ খাওয়া? যোগদানকারীদের সংখ্যা কমানোই আমাদের পরিকল্পনার একটা অঙ্গ।

আমি—তারপর লগ্ন আছে—লগ্নটা [illegible] শুভক্ষণ। সেটাও কি বাদ দিতে চাও?

ইন্দু—লগ্নটা যে শুভক্ষণ সত্যই কি কোন শিক্ষিত লোক মনে করে? পৃথিবীতে কোথাও কি পি-এম-বাগচি বা গুপ্ত প্রেসের পঞ্জিকা দেখে শুভক্ষণ স্থির হয়? তা ছাড়া, দিনেও তো বহু শুভক্ষণ আছে? সারাদিনটা কি বারবেলায় ভরা?

আমি—লোকে মনে মনে মানুক আর নাই মানুক লগ্ন দেখেই তো বিয়ে দেয় সকলেই, এমন কি সাহেবি ধরনের বাঙালীরাও।

ইন্দু—ওটা তাদের গতানুগতিকতা মাত্র। লাভম্যারেজগুলো ও অনিবার্য বিবাহগুলো কোন লগ্নে হচ্ছে? তা তো রোধ করতে পারছেন না। কো-এডুকেশন চালাবেন, পর্দা ওঠাবেন; অবাধ মেলামেশায় বাধা রাখবেন না, এক অফিসে যুবকযুবতীরা চাকরি করবে, সংঘ, সমিতি ক্লাব ইত্যাদি সর্বত্রই তাদের সহযোগিতা-সাহচর্য ঘটছে অথচ বিবাহটা হবে সর্বসম্মতিক্রমে তথা-কথিত শুভদিনে শুভলগ্নে—তা হয় না স্যার। লগ্নের কথাই বলি—একে তো রাতে বিয়ে—তাতে লগ্ন হয়ত দুপুর রাতে কিংবা শেষ রাতে, কি অসুবিধা বলুন ত? তখন ক'জন সাক্ষী থাকবে?

তারপর কোষ্ঠী মেলানো। দেশের শতকরা নব্বইটা পরিবারে ছেলেমেয়ের

কোষ্ঠী থাকে না—কোষ্ঠী মেলানোর বাড়াবাড়িটা নিম্নজাতির মধ্যে নেই; অথচ তারাই শতকরা ৮০জন। শহরে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কোষ্ঠী মেলানোর বাড়াবাড়িটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ তাঁরাই বলেন, বহুদিন থেকে ভুল পঞ্জিকা চলছে; পঞ্জিকা সংস্কারের প্রয়োজন। কত বিয়ে জাল কোষ্ঠীতেই হয়ে যাচ্ছে। কোষ্ঠী মিলিয়ে যুবক-যুবতীরা প্রেম করে না বিয়ের প্রস্তাব করে দৃষ্টি মিলিয়ে। মেয়ের যদি রাক্ষসগণ হয়—তাহলে সে রাক্ষসী হয়ে স্বামীকে খেয়ে ফেলবে—তাই যদি হয়, তবে যে কোষ্ঠীতে রাক্ষসগণ আছে সে কোষ্ঠী আদৌ থাকবে কেন? এই কোষ্ঠীর উপদ্রবের জন্য কত পরমবাঞ্ছিত সম্বন্ধ ভেঙে যাচ্ছে। কোষ্ঠী পঞ্জিকাই আসল রাজযোটকতার অন্তরায়।

আমি—কোষ্ঠী না হোক গোষ্ঠীতো মেলাতে হবে।

ইন্দু—বেশ তো,—আচারে আচরণে, ধর্মমতে, জাতিবর্ণে, রীতিনীতি ইত্যাদিতে পরিবারে পরিবারে মিল হচ্ছে কিনা দেখলেই তো হয়। তবে যদি গোষ্ঠীর অর্থ ধরেন গোত্র, তা হলে জিজ্ঞাসা করব গোত্র বস্তুটি কি? যাকে জিজ্ঞাসা করি কেউ তা বলতে পারেন না। কেউ কেউ বলেন—আদি পুরুষ। এই আদি পুরুষটির আবির্ভাব হয়েছিল ৫।৬ হাজার বছর আগে? তারপর ঐ গোত্রের একটি পরিবার বহু শত বৎসর ধরে বাস করছেন চট্টগ্রামে আর একটি ঐ গোত্রের পরিবার বহু শতবর্ষ ধরে বংশ বিস্তার করছে মালদহে কি মানভূমে। সগোত্রতার জন্য দুই পরিবারে বৈবাহিক আদান-প্রদান চলবে না। কেন না তারা সরক্ত। এর চেয়ে রক্ত সম্বন্ধ ঢের বেশি গাঢ় অন্য গোত্রের নিকটবর্তী পরিবারগুলির সঙ্গে অথচ তাদের মধ্যে অবিরত বৈবাহিক আদান প্রদান চলছে। সব চেয়ে মজার কথা—একই গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকও রয়েছে। গোত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমরা চাই। গোত্রভেদ থাকায় বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনে খুবই অসুবিধা চলছে। আমাদের কতকগুলো অন্ধ সংস্কার সামাজিক সমস্যাকে অযথা জটিল করেছে। মানুষে মানুষে সহজ মিলন আমাদের লক্ষ্য নয়। যতরকমে সম্ভব বৈষম্য সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য।

আমি—অসবর্ণ বিবাহই যখন চালু হতে চলল, তখন আর গোত্রের কথা তুলছ কেন? বল না জাতি বর্ণভেদও তোমরা তুলে দিতে চাও।

ইন্দু—প্রথমেই বর্ণভেদ ওঠানোর কথা তুলব না আমরা,—তাতে সমিতির সভ্য সংখ্যা—বেশি হবে না। এখনো অনেকে কিছুই মানে না, কিন্তু জাত্যভিমানটি পুরোদস্তুর বজায় রেখে চলছে কিনা। জাতে হাত দেওয়া হবে না।

বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপের একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে; অবশ্য হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ পরিবারের কথা ভাবা হয়েছে এতে।

আমি—বলো তাতে আমার খুব সমর্থন আছে। অধিকাংশ পরিবার হয় গরিব, নয়ত নিম্ন মধ্যবিত্ত।

ইন্দু—বরযাত্রীরা এখন আর উপদ্রব করে না বটে। কিন্তু দল বেঁধে গিয়ে কন্যাদায়-

চা নিয়ে একজন অতিথিদের মধ্যে ঘুরবেন

গ্রস্তকে বিব্রত করে। বরের নিতান্ত আত্মীয় ছাড়া বরযাত্রী যাবে না। কন্যাপক্ষের বেলায় যাত্রী বলা যায় না—সাক্ষী বলতে হয়। সে সাক্ষীদের সংখ্যা খুব বেশি হবে না। আজকাল নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হয়। এই ছাপা চিঠিই সর্বনাশ করেছে। বাড়ীর লোকেদের প্রত্যেকের পরিচিত মাত্রই তাই নিমন্ত্রিত হয়। শুধু নাম লিখে কোনরূপে পাঠিয়ে দিলেই হ'ল। বাড়ীর কর্তা জানেন নিমন্ত্রিত ২৫০। নিমন্ত্রণ ভোজীর সংখ্যা গুণে দেখা যায় ৪০০।৪৫০, কিংবা আরো বেশি। বাড়ীর কর্তা তাদের অনেককে চেনেন না। কোনকালে আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্যে নিমন্ত্রিত হ'ত না পারিবারিক অনুষ্ঠানে। একালে দেখা যায় আত্মীয়স্বজনের চেয়ে ঢের বেশি প্রতিবেশী ও পরিচিত কিংবা মুখ-চেনা লোক। নিয়ম করতে হবে প্রত্যেক চিঠিখানা হাতে আগাগোড়া লিখতে হবে অথবা নিজে গিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে আসতে হবে। হাতে লিখতে হলেই নিমন্ত্রিত সংখ্যা কমে যাবে। কাগজে কলম ছোঁয়ানো অনেকেরই ধাতে সয়না। এই যে নির্বিচারে নিমন্ত্রণ এতে নিমন্ত্রিতদেরও আসা যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে হয় এবং বেশ কিছু খরচ করতে হয়। অতএব নিমন্ত্রণ না করলে অনেকেই খুশী হবে। নিমন্ত্রিতেরা যে উপহারাদি দেয় তাতো প্রাপ্তি নয়—তাতো অযাচিত ঋণ গ্রহণ। কাজেই নিমন্ত্রণ-সংকোচ করলে উভয়পক্ষেরই লাভ। ডিয়েনদাররা বলে এখন পাতা পিছু চার টাকা পড়ে—জানি না উপহারে তার কতটা পরিশোধ হয়। অনেকে মিলে মোটরে ঠাসাঠাসি করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলে নিমন্ত্রিতদের খরচটা হয়ত উশুল হয়। কিন্তু তাও ভুল। অর্ধেক ভোজ-ভোজীদের অসুখ হয়। ঘি, বনস্পতি, তেলের মিশ্রণে গুরুপাক ও মশলাযোগে মুখ-রোচক করে রান্না, বস্তাঝাড়া আলুর সঙ্গে বরফের শবাধারে রক্ষিত আধপচা মাছের কালিয়া, চপ, টোমেন বিষে ভরা চিংড়িমাছের কাটলেট ইত্যাদি রাত্রি ১০টায় ভোজন করে সকলেরই অল্পাধিকতর শরীর খারাপ হয়। রোচক হয়ে ওঠে রেচক। নিমন্ত্রণগুলিই গ্রন্থিসিসের উদ্যোগ পর্ব।

নিমন্ত্রণের ভোজ্যাবলীকে অতিরিক্ত লোভনীয় করা কখনও সঙ্গত নয়। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যে আয়োজনের প্রথা চলছে তা লঙ্কাবাসীদের যকৃতেরই উপযোগী। কাজেই অপচয়ও খুব বেশি হয়—পক্ষান্তরে ভোজন রসিকদেরও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। নিমন্ত্রণ ভোজনের ফলে অনেকের মৃত্যু হয়েছে তা সকলেরই জানা আছে। নিমন্ত্রণ ভোজনে যে মৃত্যুরোগের আক্রমণ এ সংবাদটা লজ্জাকর বলে অনেক ক্ষেত্রে চেপে যাওয়া হয়।

অতএব আমরা একটা মেনু ঠিক করে দেব। বিয়ে দিনেই হোক আর রাতেই হোক নিমন্ত্রণ থাকবে বৈকালী ভোজনে, সভ্যেরা যাকে বলে চায়ের পার্টি। আয়োজন হবে ভদ্রলোকেরা যা খেয়ে হজম করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে। অথচ রাতে বাড়ী গিয়ে আর কিছু খেতে না হয়। এ ব্যবস্থায় নিমন্ত্রণ বাড়ীতে হৈচৈ, হট্টগোল, ছুটোছুটি হবে না, বাড়ীঘর নোংরা হবে না। অস্বাস্থ্যকর হবে না। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত ভোজন পর্ব চলবে না, ছাদের সিঁড়িতে গুঁতোগুঁতি হবে না। জুতো হারাবে না, ৫০জন ঘর্মাক্ত দায়িত্বহীন পরিবেষকের প্রয়োজন হবে না। প্রত্যেককে দিতে হবে একটি করে মাটির ডিশ—তিনি টেবিলে রেখেও খেতে পারেন—বেড়াতে বেড়াতেও খেতে পারেন। ডিশে থাকবে ৪খানি রাধাবল্লভী-ডালপুরী, আলুরদম, আধখানা পাঁপর, বরবটীর ঘুগনি, দুখানি চপ (মাছ, মাংস কিংবা ভেজিটেবল), এক কটোরা দই, দুইরকমের মিষ্টান্ন মাঝারি আকারের। এই মেনু সঙ্গতি অনুসারে বাড়বে কমবে। অপচয় নিবারণের জন্য একটা টেবিলে একটি বড় থালা থাকবে—তাতে অতিথিগণ আগেই অপ্রয়োজনীয় খাদ্য রেখে দেবেন। যাঁর প্রয়োজন হবে তিনি রাধাবল্লভী ও আলুরদম চেয়ে নেবেন—পেট ভরাবার জন্য। যেচে এর বেশি পরিবেশিত হবে না। লুচি না,

পোলাও না, ছ্যাঁচড়া, মুড়িঘণ্ট, ডাল, চার্টনি ইত্যাদির আয়োজন থাকবে না। কেটলিভরা চা নিয়ে একজন অতিথিদের মধ্যে ঘুরবেন। মেয়ের বিয়ে ছেলের বিয়ে জন্মতিথি অন্নপ্রাশন সব ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা। শ্রাদ্ধে চিরাচরিত ব্যবস্থাই চলে, চলুক। আমাদের আলোচ্য বৈবাহিক অনুষ্ঠান। এই বৈকালী চায়ের অনুষ্ঠান কনট্রাক্ট দেওয়াও চলতে পারে।

আমি—লঙ্কা থেকে যাঁরা আসবেন তাদের এতে পেট ভরবে?

ইন্দু—তিনি ৪খানা রাধাবল্লভী আলুর দম খুগনি আরো চেয়ে নেবেন।

মোটকথা নিশীথ ভোজনকে নিশাচরদের ভোজনে পরিণত না করে বৈকালিক চা-পার্টিতে দাঁড় করাতে হবে।

আমি—তারপর আসল ব্যয়ের কি হবে? পণ যৌতুকাদি।

ইন্দু—পণতো আইন বিরুদ্ধ। গোপনে নিলে—আমাদের আর কি করবার আছে?

তবে অধিবাসের তত্ত্বে বা ফুলশয্যার তত্ত্বে কোনরূপ বিলাসদ্রব্য দিতে পাবেন না—কোনপক্ষ। যদি কেউ দিতে চান—তবে তিনি গোপনেই যেন দেন—যৌতুকের বা তত্ত্বের বিলাস দ্রব্যাদির প্রদর্শনী কেউ সাজাতে পাবেন না নিমন্ত্রিতদের সমক্ষে—বা পথ দিয়ে মিছিল করে পাঠাতে পাবেন না।

আমি—এ প্রথা তোমরা বন্ধ করবে কি করে? ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তো চলে না।

ইন্দু—প্রচারকার্যের দ্বারা আবেদন নিবেদন ইত্যাদির দ্বারা বন্ধ করবার চেষ্টা করতে হবে। জীবনে যারা কখনো বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করেনি বিবাহের পরই তারা সহসা বিলাসী বা বিলাসিনী হয়ে পড়লে তাদের বর্তমান পারিবারিক জীবন, অতীত জীবন, দেশের দুর্গত অবস্থা, পরিজনগণের চালচলন, নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির সহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য হয় না—এটা অনূঢ়দের এবং সদ্যোবিবাহিতদের বুঝাতে হবে—তাদের মনে আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে হবে। তা ছাড়া যারা বিবাহে অর্জিত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে নির্লজ্জভাবে চলবে তাদের বিদূষণ ও তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হবে আমাদের সমিতি হতে।

এই ব্যাপারে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলি যাতে ধনীদের অনুকরণ না করে সেজন্য আমরা প্রচার কার্য চালাব—সভা সমিতি করব। আমাদের কাজ সুরু হবে আমাদের সদস্য ও সদস্যাদের নিয়ে। তারাই এ বিষয়ে আদর্শ দেখাবে।

আমাদের বন্ধু-বান্ধবীরা যদি বিবাহে বহু মূল্য যৌতুকাদি গ্রহণ করে—তবে আমরা সে বিবাহ বয়কট করব।

আমাদের হিন্দুসমাজের আর্থিক দুর্গতির কারণ এই হিন্দুয়ানিটা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। দরিদ্রের পক্ষে হিন্দু হয়ে জন্মানোই দুর্ভাগ্য। আপনি দেখুন খতিয়ে,— জাতকর্ম থেকে—জাতকর্ম কেন গর্ভ থেকে অর্থাৎ প্রসূতির সাধভক্ষণ থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত একজন হিন্দুর জন্য যে ব্যয় হয় তা থেকে রেহাই পেলে তার আর্থিক দশা এত হীন হত না। অতিরিক্ত ব্যয় ও অপব্যয়ের ভয়ে কত লোক যে হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে স্বস্তির নিবাস ফেলেছে—তার ইয়ত্তা নেই। সেদিকে আপনারা ভেবেছেন? বৈদিক সংস্কার, পর্বপার্বণ, পূজোর্চনা, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান, ব্রত, মানসিক,
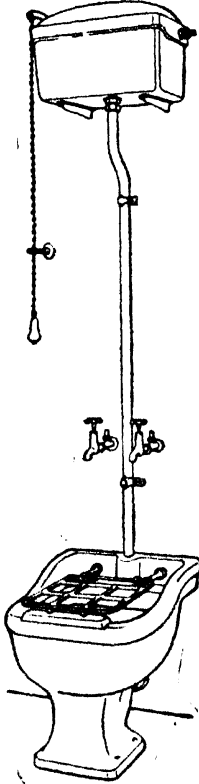
শান্তি স্বস্ত্যয়ন, গ্রহশান্তি, মৃতদোষ খণ্ডন একোদ্দিষ্ট, সপিণ্ডীকরণ, পাণ্ডা পূজন ইত্যাদি সমস্তই বহু অর্থব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়—এত অর্থ দরিদ্র হিন্দুজাতি কোথায় পাবে? জীবনের নানাবিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য অবশ্য প্রয়োজন—এমন কি ক্ষুধার অন্ন থেকে আত্মবঞ্চিত করে হিন্দুত্বের দাবি মিটাতে হয় হিন্দুকে। আমাদের শেষ পর্যন্ত ব্রত হবে হিন্দুত্বকে অর্থ-নিরপেক্ষ করে তোলা। বিনা ব্যয়ে যে হিন্দুত্ব, আমরা শুধু তা-ই মানব।

আমি—ইন্দু তুমি একখানা নতুন ইউটোপিয়া লেখ। আচ্ছা, বিবাহের আসল অনুষ্ঠানের কি সংস্কার করতে চাও?

ইন্দু—বিবাহের স্ত্রীআচার অংশটা বর্জনীয়, ওটা বিবাহের অনার্য অঙ্গ। আর বাদ দিতে হবে মুখে বিশ্রী একটা শব্দ করে নারীদের উলু দেওয়ার 'ন্যা'-অঙ্গটাকে। বিবাহের মন্ত্র বাংলায় পড়াতে হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সর্ববিদ্যা বাংলায় পড়ানো হবে—আর বিবাহের মন্ত্র পড়ানো হবে সংস্কৃতে? কেন?

আমি—বৈবাহিক অনুষ্ঠানের অনার্য অঙ্গ বাদ দেবে, আর্য অঙ্গ ও বাদ দেবে?

ইন্দু—সংস্কৃত যারা জানে তারা সংস্কৃতে মন্ত্র পড়ুক। হাজার-করা একজনও সংস্কৃত বোঝে না, জানে না—তারা কেন তোতা পাখীর নকল করবে? বাংলায় মন্ত্র পড়লে বর্তমান বঙ্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হবে বিবাহ মণ্ডপে।

আমি—মন্ত্রটা সংস্কৃতে পড়ানো হলে প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশের সৃষ্টি হবে। বর্তমান ভারতীয় পরিবেশের সৃষ্টি করতে হলে রাষ্ট্রভাষায় পড়াতে হয়। তার চেয়ে এক কাজ কর—ইংরাজিতে পড়ানোর ব্যবস্থা কর—বিশ্বজনীন পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারবে। পরিহাস নয়—আমাদের হিন্দু বিবাহের বিবিধ অনুষ্ঠানগুলি অবাধ স্বৈরাচারকে নিয়মিত করবার জন্য—বিবাহ যে জীবনের যুগসন্ধি, দশজনকে নিয়ে যে আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন, এই উপলক্ষটা যে কঠোর দায়িত্বপূর্ণ ও শুচি-সুন্দর—এই সত্যকে কয়েকদিন ধরে উপলব্ধি করানোর জন্য এর অনুষ্ঠান পরম্পরা। একটা সাত্ত্বিক পরিবেশের সৃষ্টি করে তাতে নবদম্পতীকে গার্হস্থ্য আশ্রমে দীক্ষাদানই হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য।

ইন্দু—কী চমৎকার সাত্ত্বিক পরিবেশেরই সৃষ্টি হয়? এর চেয়ে তামসিক পরিবেশ আর কি হতে পারে, স্যার?

তবে এর কতকটা রাজসিক বটে—বিলাস-দ্রব্যের ঘটায় ও আড়ম্বরে, আর ভূরিভোজ্যের আয়োজনে।

আমি—এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে এই অনুষ্ঠানে আর সাত্ত্বিকতা নেই—অনুষ্ঠানটা আগে সাত্ত্বিকই ছিল হে।

ইন্দু—আর একটা কথা। বর একটা শোলার মুকুট মাথায় পরে বিবাহের রঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশ করে—এটা যাত্রাদলের রাজার অভিনয়মাত্র—প্রহসনের এ অঙ্গটাকে বাদ দিতে হবে।

আমি—সর্বনাশ! তাহলে বরের বাপ সোনার মুকুট চাইবে কন্যার বাপের কাছে।

আচ্ছা, তোমাদের সমিতির সভ্য কারা?

ইন্দু—প্রধানতঃ অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা। ইতিমধ্যে ষাটজন নাম সই করেছে। আমাদের কৃত্যসূচি তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যেই—এখনও ছাপা হয়নি।

আমি—তাহলে বিবাহ সমস্যার মীমাংসার সঙ্গে বিবাহ সংস্কার সুরু হয়ে যাবে। সমিতিটা সত্বর গড়ে ফেল। তবে তোমার সমিতির আয়ু তো দুই মাস।

ইন্দু—না স্যার, এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবেন না। আপনার মতামত ঠিক কি ধরতে পারলুম না কিন্তু।

আমি—দেখ, আমার তিনকাল অতীত হয়েছে—আমার সামনে ভবিষ্যৎ নেই—ভবিষ্যৎ তোমরাই গড়বে। আমার মতামতের কোন মূল্য নেই। আমি শাস্ত্রজ্ঞ চিন্তাশীল মনীষী নই। কোন প্রথার মূলে কি সত্য ও কি সার্থকতা আছে জানি না। আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি—আমি প্রচলিত প্রথা ও সংস্কারগুলিকে মনে প্রাণে মানি আর নাই মানি— পারিবারিক সংহতি ও শান্তি, সামাজিক শৃঙ্খলা ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য স্বদেশের সংস্কৃতির আনুগত্য রক্ষা ইত্যাদির জন্য প্রচলিত রীতি প্রথাগুলিকে চিরদিন পালন করে এসেছি, তাই বলে তোমাদের সে সব মেনে চলতে বলতে পারি না। আমাদের মনে যে সত্য 'ভাবে' এসেছে—তা 'রূপে' আসেনি, তোমা-দের মনে যা 'ভাবে' এসেছে—তা 'রূপে'ও আসবে। আমাদের ধর্ম ছিল নির্বিচারে সমস্তের প্রতি আনুগত্য—তোমাদের ধর্ম বিচার বিশ্লেষণ করে সব কিছুর আসল মূল্য নির্ণয় এবং তদনুসারে গ্রহণবর্জন। কাজেই প্রবীণের মতামত না গ্রহণ করাই ভালো। এই পর্যন্ত বলতে পারি, তোমার উক্তিতে যুক্তি আছে—তোমার বক্তব্য চিন্তার উদ্বোধক—মাঝে মাঝে পরিহাস করেছি বটে—সে তোমার অব্যবস্থিত চিত্ততাকে লক্ষ্য করে—কিন্তু যুক্তিকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না।

হিন্দুয়ানিকে ব্যয়ভারমুক্ত করার সংকল্পটি আমার খুব ভালো লাগল—সেই আদর্শে তোমাদের কৃত্যসূচি রচনা করলেই ভালো হয়।

সেই সঙ্গে ফাইন্যাল ল'-টা পাশ করে আদালতে যাতায়াত সুরু করে দাও।

চাবি

মনোজ বসু

রুণাকিঙ্কর দাস অনেক দিন ধরে ভুগছেন। ইস্টার্ন বিল্ডার্স কোম্পানির মালিক, প্রকাশ্য ও গোপন আরও নানা কাজ-কারবার আছে, নামডাক বিস্তর। রোগেও ধরেছে তেমনি—রাজব্যাধি ক্যানসার, যার উপরে আর হয় না। ক্রমশ শেষ অবস্থা এসে গেল, পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে যাবেন। পাঁচ-সাত হপ্তাও হতে পারে—বলা যায় না এই মানুষটির কথা। কেউ কেউ বলে, মাস পাঁচ-সাত টানবেন দেখে নিও। লড়ে বেড়ানো ওঁর সারা জীবনের অভ্যাস। আট বছর বয়সে বাপ মরেছেন—তখন থেকেই লড়ে বেড়াচ্ছেন দুনিয়ার সঙ্গে। এবং বিজয়ীও হয়েছেন—ষোল আনার উপর আঠার আনা। এককালের ঘোর শত্রুরা এখন পায়ের তলার ছুঁচো। পদতল ঘিরে বসে কিচকিচ করে। কাজ করতে করতে করুণাকিঙ্কর আধখানা কথা হয়তো ছুঁড়ে দিলেন তাদের দিকে। তাতেই কৃতার্থ তারা, কথাটুকু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উল্টেপাল্টে চেখে চেখে তারিফ করে। দুঃখের দিনে করুণাকিঙ্কর খোলার ঘরে

হাতবাক্স নিয়ে হিসাবপত্র লিখতেন, এখন এয়ারকণ্ডিসন্ড ড্রইংরুম-ভরা দামি দামি আসবাব। ঐ মানুষগুলোকেও আসবাবপত্রের বেশি ভাবেন না তিনি। বড়মানুষের এ-সমস্ত রাখতে হয়।

দিন দিন অশক্ত হয়ে পড়ছেন। শোবার ঘরের বাইরে যাবারও শক্তি নেই। খাটের লাগোয়া টেবিলটায় নিজের কাজকর্ম করতেন। শুধুমাত্র বিক্রি করার কাজ। ইস্টার্ন বিল্ডার্স ছাড়াও নানান ব্যাপারে টাকা ছড়িয়েছেন. দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে যথাসম্ভব কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনা। শেয়ার ও ভূসম্পত্তি দেদার বিক্রি হচ্ছে, খদ্দেরে যে দর বলে তাতেই ছেড়ে দেন। বেচে দিয়ে নগদ টাকা আর সোনা শোবার ঘরের সিন্দুকে পুরে নিজ হাতে চাবি দিয়ে রাখেন।

নিজের ছেলেপুলে নেই. তা বলে সংসার ছোট নয়। স্ত্রী মন্দাকিনী আছেন, তার উপর আছে দুই ভাইপো আর চার ভাইঝি। এবং ঝি-চাকর একগাদা। তবে শান্তির সংসার বটে। ভাইপো-ভাইঝিরা বাপ-মায়ের অধিক মান্য করে। জেঠামণির অসুখে ভাইপো সতীকান্ত রাত জেগে জেগে লবেজান হচ্ছে। দুটো নার্স রাখা হয়েছে, পালা করে তারা ডিউটি দিচ্ছে। সতীকান্তকে তবু লহমার জন্য রোগীর ঘর থেকে নড়ানো যায় না।

নার্স সবিতা বলে. এত কষ্ট করবেন তো খরচা করে আমাদের এনেছেন কেন?

এনেছি জেঠামণির কষ্টের লাঘব হবে বলে। আমার কষ্ট দেখতে হবে না আপনার।

খবর পেয়ে পাটনা থেকে করুণাকিংকরের বড় বোন শংকরী এসে পড়লেন। বাতে পঙ্গু, তবু গাড়ি থেকে নেমেই একরকম ছুটতে ছুটতে রোগীর ঘরে। আর্তনাদ করে উঠলেন : কী হয়ে গেছে আমার সোনার চাঁদ ভাই। এমন অবস্থা—একটা খবরও দিস নি আমায়!

সতীকান্ত বলে, রোগীর ঘরে চেঁচামেচি কোরো না পিসিমা। হাত-মুখ ধুয়ে ঠান্ডা হও গে। চিঠির পরে চিঠি লেখা হচ্ছে, আর খবর কেমন করে দেব?

শংকরী বললেন, অসুখ না অসুখ—এদ্দিনেও সারে না, কী রকম অসুখ রে বাবা! পাগল হয়ে ছুটে এলাম। মায়ের পেটের ছোটভাই আমার—তোরা তার কি বুঝবি! তোরা তো পরে এসে জুড়ে বসেছিস।

করুণাকিংকর মিনমিন করে বললেন, দিদি কি একলা এসেছ?

শংকরী বললেন, সমরের ছুটি কোথা? মনের অবস্থা যা হল, তখন আর এক মিনিটের সবুর সয় না। সমরকে বললাম, তুই বাবা গাড়ির কামরায় তুলে দিয়ে আয়, ঠিক আমি পৌঁছে যাব। ভাইয়ের টানে টানে গিয়ে পড়ব ঠিক, ভাবনা করিস নে। বার বার করে বলে দিয়েছে, মামা কেমন আছেন গিয়েই চিঠি দিও। চিঠি নয়, 'তার' করব কাল সকালে। ছুটি না পেলে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসুক। চাকরি কিছু মামার চেয়ে বড় নয়।

সতীকান্ত খানিকটা আত্মগতভাবে বলে, সেবারে তা বোঝা গিয়েছিল বটে!

করুণাকিংকরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন : এলে তাকে জুতো পেটা করব। না দিদি, জুতো তোলবারও আর শক্তি নেই।

মন্দাকিনী কখন এসে দরজায় দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার না থাক আমার আছে। যদি আসে, শত্রুকে আমি ভিতরে ঢুকতে দেব না। চাকর-বাকরদের সঙ্গে বাইরের বারান্দায় থাকতে হবে।

আক্রোশ অসংগত নয়। কলেজ থেকে বেরুলেই করুণাকিংকর ভাগনেকে ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। দুটো বছর আগেও সমরের কথা ছাড়া কোন কাজ হতে পারত না। ছেলেটা সকল দিকে ভাল—বুদ্ধিমান পরিশ্রমী মিষ্টভাষী, ব্যবসায়ে বড় হতে গেলে যা-কিছু লাগে। কিন্তু এক রোগে সমস্ত মাটি—সেকেলে এক নীতির ভূত ঘাড়ে চেপে ছিল তার : অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, সাধুতাই সর্বোত্তম পথ। অপর দশজনে যেমন করে থাকে—অফিসঘরে লিখে টাঙিয়ে দেয় বচনটা, অবরে-সবরে বুকনি ছাড়ে—কিন্তু সমরের সে ব্যাপার নয়, মনেপ্রাণে খাঁটি বলে মান্য করে। এবং তাই পদে পদে লাগত মামা করুণাকিংকরের সঙ্গে। চরম হল বুধহাটা পুল তৈরির কাজটা নিয়ে। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না, নিরেশ মাল চালিয়ে যাচ্ছে—খুব একটা হৈ-চৈ উঠল, কাগজে পর্যন্ত লেখালেখি। এটি নতুন-কিছু নয়, ঠিকেদারি কাজের দস্তুরই এই। কিন্তু বীরেন পাল পিছন থেকে তদ্বির করছিল—কণ্ট্রাক্টটা সে বাগাতে পারে নি, মরিয়া হয়ে লেগেছিল তাই। তদন্ত কমিটি বসে গেল শেষ অবধি। কমিটির কাছে সাক্ষী দেবার জন্য সমরের ডাক এল। বলে, আত্মীয়তা টাকাপয়সা নিজের ভবিষ্যৎ—সকলের বড় হল সত্য। সত্য থেকে তিলেক ভ্রষ্ট হতে পারব না। আগাগোড়া সত্যি কথা বলে মামাকে ফাঁসিয়ে দিল। কিন্তু করুণাকিংকর ঝানু লোক, বিস্তর ঘাটের জল খেয়ে তবে বড় হয়েছেন। সকল ঘাটির বন্দোবস্ত রেখে তবে তিনি কাজে এগোন। জেলটেল কিছু হল না, পুল তৈরির কণ্ট্রাক্টটা বাতিল হল শুধু। পেল বীরেন পাল। করুণাকিংকর সেই একটিবার পরাজয় মানলেন বীরেন পালের কাছে। গণ্ডগোল চুকে যাবার আগেই সমর ইস্তফা দিয়ে চলে গেছে। গেছে চলে মানে মানে, নইলে করুণাকিংকরই গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াতেন। মামা-ভাগনেয় সেই থেকে আর দেখাসাক্ষাৎ হয় নি।

করুণাকিংকর প্রশ্ন করেন, কি করছে দিদি আজকাল? ইস্কুল মাস্টারি? অন্য-কিছু তোমার ছেলেকে দিয়ে হবে না। নির্জলা সাধুগিরি ঐ এক মাস্টারি কাজেই শুধু চলে।

অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। সবাই বলে, হয়ে এসেছে—আর একটা কি দুটো দিন। রোগী আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন। নার্স সবিতা ফিসফিস করে সতীকান্তকে বলছে, আপনার জেঠামণির আশ্চর্য সহ্য-শক্তি। এ রোগের মতন যন্ত্রণা আর কিছুতে নয়। ঈশ্বরকে বলি, মরার সময় যে রোগ ইচ্ছে দিও,এই ক্যান্সারটা ছাড়া। আর ওঁকে দেখুন—এত বড় রোগের সঙ্গে লড়াই করছেন, কিছুতে তা মালুম পাবেন না। হাসি-হাসি মুখ—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মিষ্টি স্বপ্ন দেখছেন যেন। এমনটা আর দেখি নি কখনো।

সতীকান্ত কাতর কণ্ঠে বলে, জেঠামণি চিরটা কাল আমাদের জন্য করে গেলেন। এমন কোন উপায় থাকত, ওঁর কষ্টের খানিকটা যদি নিজের উপর নিতে পারতাম—

সবিতা বলে, বললে তো রেগে যাবেন, নিজের প্রশংসা সইতে পারেন না। কিন্তু যে কষ্টটা নিচ্ছেন নিজের উপর সে-ও কিছু কম নয়। দিনরাত ঠায় বসে, রোগীর দিক থেকে পলক ফেরান না। কত জায়গায় তো যাই, কিন্তু এমন সেবা দেখি নি আর কখনো।

রোগী, মনে করা গিয়েছিল, একেবারে অসাড়। হঠাৎ তিনি কথা বলে ওঠেন। বিশাল ঘর, তার একপ্রান্তে সতীকান্ত আর সবিতার ফিসফিসানি কথা। অথচ শুনে নিয়েছেন করুণাকিংকর। চোখ বুজে মুখস্থ কথার মতো বললেন, অবিচার কোরো না নার্স। সেবা শুধু এক সতীকান্তর দেখলে। আরও যে কতজন কতদিকে তাকিয়ে আছে—কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে, পলক কেউ তো ফেরায় না। ডাইনের জানলার ওদিকে দেখ বড় বউ—সতীকান্তর জেঠিমা। বাঁয়ের জানলায় ভাইঝিগুলো। শিয়রের দরজা এদ্দিন খালি পড়ে থাকত, দিদি নতুন এসে সেখানে ঠাঁই করে নিয়েছেন।

তাকিয়ে পড়তে, সত্যিই বাঁয়ের জানলার আড়ালে অনেকগুলো পায়ের পালিয়ে যাওয়ার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনের জানলার কপাট খুলে দিয়ে মন্দাকিনী বললেন, না দাঁড়িয়ে করি কি—পা দুটো আমার টেনে এনে বেঁধে দেয় যেন এখানে। থাকতে পারি না।

করুণাকিংকর ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, নির্ভয়ে আছি সেজন্যে। সকল দিকে কড়া পাহারা, যমদূত ঢুকতে পারছে না।

সবিতা অবাক হয়ে গেল : আমাদের নজরে পড়ে না, আর আপনি শুয়ে শুয়ে—

করুণাকিঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে কথার পূরণ দিয়ে দেন: চোখ বুজে বুজে সমস্ত আমি দেখি। তোমরা দু-জনে অতদূরে ফিসফিস-গুজগুজ কর, তা-ও সব কানে শুনি।

কিছু আজেবাজে কথা হয়ে থাকে সত্যি দু-জনের মধ্যে। সোমত্ত মেয়ে আর জোয়ান পুরুষ এক ঘরে দিনরাত্রি থাকলে না হয়ে পারে না। করুণাকিঙ্করের কথায় সতীকান্তর মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। উচ্ছ্বাস ভরে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নেয়: জেঠামণি অন্তর্যামী। কে কি করছে, কে কি বলছে সমস্ত টের পান। ওঁর অজান্তে কিছুই হয় না।

ঘরের বাইরে পেয়ে এক সময় সবিতা সতীকান্তকে বলছে, কত রোগী দেখে থাকি, এমনটা কখনো দেখি নি। আজকেও হয়ে যেতে পারে, ডাক্তারবাবু দেখে শুনে বলে গেলেন। সেই মানুষ দেখছেন শুনছেন, টরটর করে কথা বলছেন—ডাক্তারিশাস্ত্রের প্রহেলিকা এটা।

সতীকান্ত তিক্তস্বরে বলে, মরে গেলেও দেখবেন চোখ-কান ঠিক আছে, কথা বলে চলেছেন তখনও। পুড়িয়ে ছাই করে গঙ্গায় ধুয়ে দিলে তখন যদি বন্ধ হয়।

বৈঠকখানায় ওদিকে সমারোহ ব্যাপার। উদয়াস্ত মানুষজন আসছে খবরাখবর নিতে। পাড়াপ্রতিবেশী কারও আসতে বাকি নেই, ইস্টার্ন বিল্ডার্স কোম্পানির উঁচু-নিচু সকল স্তরের সকল কর্মচারী এসে হায়-হায় করছেন। সকাল থেকে রাত্রি অবধি অবিরাম চলছে এই কাণ্ড। সতীকান্তর যমজ ভাই শশীকান্ত এই দিকটা সামলাচ্ছে। একই কথা বলতে বলতে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। এরই মধ্যে পরম শত্রু বীরেন পাল এসে দেখা দিলেন: বড্ড উতলা হয়েছি। চুপচাপ বাড়ি থাকতে পারলাম না। বলি, খবরটা নিজের কানে শুনে আসি। ভিতরে যাব না, আমায় দেখলে উত্তেজিত হবেন। হওয়া স্বাভাবিক—সম্পর্ক তো ভাল নয় আমাদের মধ্যে। কিন্তু ব্যবসা নিয়ে যত লড়ালড়ি হোক, মানুষটিকে আমি বড় শ্রদ্ধা করি। এসব মানুষ আর জন্মাবে না।

খবরের-কাগজ থেকেও লোক এসেছে: কর্মবীর পুরুষসিংহ—বাঙালী জাতির গৌরব। মন্ত্রী আর হোমরাচোমরাদের কথা অঢেল ছাপা হয়, এই মানুষটির ছবি আর জীবনী পাঠকের সামনে তুলে ধরব। মানুষ প্রেরণা পাবে। কেমন আছেন বলুন।

আজ সকাল থেকে শশীকান্ত যে জবাবটা ঠিক করে নিয়েছে: ভাল—

কাগজের লোক চটে গেছে। কণ্ঠস্বরে তবু যথাসম্ভব কোমলতা রেখে বলল, হোক তাই। অমন মানুষটা সুস্থ হয়ে উঠলেই ভাল। কিন্তু সেদিন যে বললেন এখন-তখন—

ডাক্তারের কথাই বলেছিলাম। আমরা কতটুকু কি বুঝি আর কি বলতে যাব।

লোকটা গজর-গজর করে: আজ এক কথা, কাল এক কথা—কিছু বোঝে না, আন্দাজি ঢিল ছোঁড়ে। অমন ডাক্তার ডাকেন কেন বলুন তো।

সতীকান্ত বলে, শহরের সকলের বড় ডাক্তার। একজন নয়, তিন তিনজন। ওদের মতন অর্থবার হচ্ছে।

সবিতা নার্স এই সময় বাসা থেকে ডিউটিতে এল। সে বলে উঠল, ডাক্তারের দোষ নেই, রোগী সবরকমের হিসাব বানচাল করে দিচ্ছেন। শেষটা তাই বলে গেলেন, রোগীর অবস্থা যা-ই হোক, বাইরের সকলকে বলবেন ভাল।

ঝুটো খবর ছড়াচ্ছেন?

সবিতা বলে, নইলে যে মুখ থাকে না। রোগী নিজে ভুগছেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সব ভুগিয়ে মারছেন।

করুণাকিঙ্কর সত্যিই অবশেষে মারা গেলেন। মরেছেন সেটা খোঁজ নিয়ে জানতে হয় না, কান্নার চোটে মাইল ভর মানুষের কান ফেটে যাবার দাখিল। মন্দাকিনী লুটোপুটি খাচ্ছেন মৃত স্বামীর উপর। ঠেকানো যায় না, সরিয়ে আনতে গেলে আরও কঠিন ভাবে আঁকড়ে ধরেন: এমন নিষ্ঠুর কেন হচ্ছ তোমরা; থাকতে দাও, বুকের উপর চিরজন্মের মতো একটুখানি মাথা দিয়ে রাখি।

দেখাদেখি করুণাকিঙ্করের চার ভাইঝি চার দিক থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জেঠামণির উপর। তারাও মাথা কুটবে, কিন্তু জায়গা পাচ্ছে না। বিপুল দেহ নিয়ে মন্দাকিনী মৃতের সর্বাঙ্গ জুড়ে আছেন। যেন তাঁর সম্পত্তিতে অন্যেরা জবরদখল করতে আসছে —কিছুতে সেটা হতে দেবেন না। কিন্তু বয়স হয়ে গেছে, চার চারটে তাগড়া মেয়ের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন—ঠেলাঠেলি ধাক্কা-ধাক্কি করে তারা জায়গা করে নিচ্ছে।

এহেন দৃশ্যে পাষাণ ফেটে জল বেরোয়।

সবিতার চোখেও বুঝি জল এসে যায়। কত শোকের সাক্ষী হতে হয় তাকে, বৃত্তিই তার এই।

কিন্তু সতীকান্তর চোখে জল নয়, আগুন। ইস্টার্ন লিডার্স কোম্পানির ম্যানেজার হিসাবে আপাতত সে-ই অভিভাবক সকলের উপর। ধমক দিয়ে উঠল: আদিখ্যেতা হচ্ছে জেঠাইমা। এত সমস্ত বাইরের মানুষ—উঠে যান, সরে যান। মড়া নিয়ে রওনা হয়ে পড়ুক এইবার।

মন্দাকিনী মুখ তুললেন। ফোলা-ফোলা চোখ, ঝাকড়া-মাকড়া চুল—মূর্তিমতী শোকের চেহারা। বললেন, বুড়ো মাগ আমার বেলা দোষ হল, আর নিজের যে এক গণ্ডা বোন জুটিয়ে দিয়েছ—সেটা কি?

আরও হল। বাতের ব্যথা বেড়ে শংকরী একেবারে শয্যাশায়ী—সেই অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে লাঠি ধরে তিনিও এসে দাঁড়ালেন। লড়ালড়ির ভিতরে ঢোকবার সাধ্য নেই, হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে আর্তনাদ করছেন: আমার মায়ের পেটের ভাই। সবখানি তোরা জুড়ে আছিস—আমায় একটু বসতে দে কাছে গিয়ে।

নার্স সবিতা দেখছে। যে বয়সে করুণা-কিঙ্কর গেলেন, তাকে অকালমৃত্যু বলা যায় না। কিন্তু আত্মীয়-অনাত্মীয় বিশাল এক জনতা। হা-হুতাশ করছে আর চোখ মুছছে। শেষ দেখা দেখে যাবে একবার। সার্থক জীবন করুণাকিঙ্করের—শুধু টাকাপয়সা করেন নি, ভালবাসায় বেঁধে গেছেন এত মানুষ।

সবিতার চোখেও বুঝি জল এসে যায়। কত শোকের সাক্ষী হতে হয় তাকে, বৃত্তিই তার এই। কিন্তু আজকে যেন সামলাতে পারছে না। চমক লাগল হঠাৎ। সকলের পিছনে শশীকান্ত একান্তে দাঁড়িয়ে হাসছে। হাসিই বটে, কিছুমাত্র সংশয় নেই।

হাসি দেখে সবিতা ভয় পেয়ে যায়। শোক অতিরিক্ত মাত্রায় হলে উল্টো ভাব দেখা যায় অনেক সময়। দ্রুত পায়ে সে তার কাছে গেল: কি হয়েছে আপনার?

শশীকান্ত বলে, কোন একটা ওষুধ দিতে পারেন?

আরও বাস্তসমস্ত হয়ে সবিতা প্রশ্ন করে, কিসের ওষুধ?

যাতে কান্না পেয়ে যায়। হাসি কিছুতে চেপে রাখতে পারছি নে।

অসংলগ্ন কথাবার্তা। মাথা খারাপ হয়ে না যায়।

শশীকান্ত বলছে, হাসি এ জায়গায় বড্ড বেমানান। সবাই নিজের নিজের তালে আছে, সেই জন্য এখনো নজরে পড়ে নি। কিন্তু অভিনয় আমার মোটে আসে না। কান্নার জন্য তাই ওষুধ খুঁজছি। নাঃ, রান্নাঘরে গিয়ে লঙ্কাবাটা একটু দিই চোখে। এতে যদি জল বেরোয়।

সবিতা স্তম্ভিত হয়ে বলে, কী বলছেন! শোকের অভিনয় করছে এত মানুষ?

সব, সব—একজনও বাদ নেই। জেঠামণি বুঝতেন সেটা। যত মানুষ এই এসে জমেছে—ব্যবসায়ের লোকজন, পাড়াপ্রতিবেশী—বজ্রাহত সবাই জেঠামণির উপর। [illegible] কাউকে তো কম করেন নি। কারো চাকরি খেয়েছেন, কারো জোতজমি ফাঁকি দিয়ে নিয়েছেন। নিতান্ত নিজে কিছু না পারলেন তো দু-পক্ষে মামলা বাধিয়ে দিয়ে মজা দেখেছেন। লোকের কষ্টে বড় ফূর্তি তাঁর। অত যে লোক দিনের পর দিন অসুখের খবরাখবর নিতে আসত—তার মানে, যাবেন তো সত্যি সত্যি না আবার খাড়া হয়ে উঠবেন? ভাল আছেন যেদিন বলতাম, হাসত হি-হি করে আর মনে মনে জ্বলত।

সবিতা তর্ক করে: সে না হয় বাইরের লোকের ব্যাপার। আপনি বললেন, একজনও বাদ নেই। কিন্তু ঘরের মানুষ নিশ্চয় অভিনয় করেন না। আপনার জেঠাইমা পিসিমা বোনেরা—বিশেষ করে আপনার ভাই সতীকান্তবাবু—

কিছু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে, ঐ সেবার তুলনা নেই। সব সময় রোগীর পাশে, দু-চোখের পাতা এক করতে দেখলাম না কখনো।

শশীকান্ত হেসে বলে, চোখ কিন্তু ঠিক জেঠামণির উপর নয়। জেঠামণির কোমরের ঘুনসিতে চাবি বাঁধা, সেই দিকে। সিন্দুক বোঝাই টাকাকড়ি যে চাবিতে খোলে। আপসে না মরেন তো গলাটিপে মেরে চাবি নিতেও আপত্তি ছিল না। জেঠামণি জানতেন সমস্ত—

সবিতার পাংশু মুখের দিকে চেয়ে শশীকান্ত একটুখানি উপভোগ করে নিল। বলে, সেটা অবশ্য সম্ভব ছিল না। আরও অনেক দল তাক করে ছিল বাইরে থেকে, চাবি কাড়তে গেলে রে-রে করে এসে পড়ত। জেনেবুঝে জেঠামণিও নিশ্চিন্ত ছিলেন। বাড়ির মধ্যে তীক্ষ্ণ চোখ জেঠামণির আর আমার। আমি তাই বড়-একটা কাছাকাছি হতাম না। জানি, ও-হাতে সুচ বিঁধিয়ে চলবে না। ওরা গিয়েছিল তাই করতে। ডাহা বেকুব। ফণী দত্ত এটর্নির আনাগোনা বেড়ে গেল। জানি উইল হচ্ছে। মরার আগে কোমরের চাবিও পাচার হয়ে যাবে। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। আজকে সেটা হাতে-নাতে পরখ হয়ে গেল।

সবিতা বলে, কি করে? চাবি আছে কি নেই, এখনো তো কেউ খুঁজে দেখে নি।

কী আশ্চর্য! কোমর কতবার হাতড়ানো হয়ে গেল। পাঁচ দুগুণে দশখানা হাতে। অতগুলো মানুষের চোখের উপরেই তো। দপ করে মড়ার গায়ে পড়ে জেঠাইমা মাথা কুটতে লাগল, হাত দুটো তখন কাপড়ের নিচে ঘুনসি বেয়ে ঘুরেছে। তারপরে পড়ল আমার চার বোন—ঐ একটা জায়গায় মাথা কোটবার জন্য সকলের ধস্তাধস্তি। কিন্তু

চাবি পায় নি, পেলে তক্ষুণি চুলোচুলি বেধে যেত। সেই সময়টা বুড়োথুখুড়ে পিসিমার যা অবস্থা—ক্ষমতা নেই, দাঁড়িয়ে আঁকুপাঁকু করছেন—

হাসি আর রুখতে পারে না শশীকান্ত, ছুটে বেরুল। গেল বোধকরি রান্নাঘরের দিকে লংকাবাটা জোগাড় করতে।

সমারোহে শ্মশানে নিয়ে গেল। করুণা-কিংকর চিতায় উঠে গেছেন, তখনো মানুষ গিজগিজ করছে। ডবল সাইজের চিতা, আরও দুই চিতার পরিমাণ অতিরিক্ত কাঠ এনে গাদা করেছে।

এই কাজেও সতীকান্তের বোল আনা তদারকি। চিতা জ্বলছে দাউ দাউ করে। চন্দনকাঠের টুকরো নিয়ে সতীকান্ত আগুনে ছুঁড়ছে। বলে, কী রকম চন্দনকাঠ হে, গন্ধ ওঠে কই? আজেবাজে কাঠ দিয়ে চন্দনের দাম নিয়েছে। সব শালা জোচ্চোর।

মস্ত বড় একটা বাঁশ নিয়ে মড়া সরিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। বাঁশের বাড়ি দিয়ে মাথার খুলি চুরমার করে দিল ভিতরটা ভাল মতন যাতে পোড়ে। চেঁচিয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে তদারক করছে: কাঠ দাও হে, বেশি করে কাঠ দাও। সংকারে খুঁত রেখে ফিরব না। পুড়িয়ে ছাই করে জেঠামণিকে গংগায় দিয়ে যাব।

শশীকান্ত কোন দিকে ছিল, ভাইয়ের কানের কাছে মুখ এনে বলে, অত ভয় কিসের? যা পোড়া হয়েছে, আর জেঠামণি উঠে আসবে না।

সতীকান্ত খিঁচিয়ে ওঠে: ধর্মাধর্ম মান না, অবিশ্বাসী নাস্তিক। তুমি কেন শ্মশানঘাটে এসেছ শুনি?

মুচকি হেসে শশীকান্ত বলে, এতগুলো লোক যে জন্যে এসে পড়েছে। জেঠামণির মতো মানুষ সত্যি সত্যি চিতায় উঠেছে, নিজের চোখে দেখে তবে প্রত্যয় হয়। তুমি কিন্তু ভাই মিছামিছি অত খাটুনি খাটালে। অবিচার করেছেন খুব মানি—বছর বছর তোমার কাজ বাড়িয়েছেন আর মাইনে কমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাঁশ পিটিয়ে হাতই ব্যথা হবে তোমার, মড়ার মাথায় লাগে না।

ঠিক পরের দিন এটর্নি ফণী দত্ত দেখা দিলেন। বাড়ির সকলকে ডেকে উইল পড়ে শোনাচ্ছেন। ইস্টার্ন বিল্ডার্স কোম্পানি এবং সংসার যেমন চলছে চলবে। সমস্ত ঠিক আছে। সিন্দুকের যাবতীয় সোনা ও টাকাকড়ি দিয়েছেন—পরমাশ্চর্য ব্যাপার! মন্দাকিনী, সতীকান্ত, ভাইঝিরা, শংকরী—কাউকে নয়, দিয়ে গেছেন সমরকে। সকলের বড় শত্রু যেজন—যে তাঁকে জেলে পুরতে গিয়েছিল, নিজের ক্ষমতায় বেঁচে এসেছিলেন। সিন্দুকের চাবি সিল করে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হেফাজতে পাঠান হয়েছে, উইল প্রোবেটের পর সমর নিয়ে নেবে।

ইংরেজিতে লেখা উইল। সকলে যদি না বোঝে, ফণী দত্ত জায়গায় জায়গায় বাংলা করে দিচ্ছেন: যত লোক দেখলাম, সবাই মিথ্যাচারী, স্বার্থপর। আমি সকলকে চিনেছি। একমাত্র সত্যনিষ্ঠ আমার ভাগিনেয় শ্রীমান সমর চৌধুরী। সত্যের জন্য নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে সে দ্বিধা করে নি। যাবতীয় সোনা ও টাকাকড়ি আমি পরম বিশ্বাসে তার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। ঐ অর্থে সে এমন-কিছু করবে আমার নাম যাতে চিরজীবী হয়। কী করবে সেটা সম্পূর্ণ তার বিবেচ্য। পবিত্রচেতা সে—আমার চেয়ে এই ব্যাপার সে ভাল বুঝবে। তার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর। আমার সকল আত্মীয়-স্বজনের যথোচিত ব্যবস্থা করেছি। অনুরোধ, সমরের কাজে যেন তারা সহযোগিতা করে।

শশীকান্ত দেমাক করে: আমি ঠিক এইটাই ভেবেছিলাম। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল কিনা। বলেছি তো, এ বাড়ির মধ্যে বুদ্ধিমান দুইজন—আমি আর জেঠামণি। মানুষে চিনতেন তিনি। তিনি গেলেন, এবারে এই একজন আমি শুধু রইলাম।

গল্পের আর একটু আছে। উপসংহার।

উইলের বৃত্তান্ত শুনে কন্ট্রাক্টর বীরেন পাল পাটনায় সমরের কাছে গিয়ে পড়লেন। মুচকি হেসে বললেন, মামার কী রকম স্মৃতিরক্ষা করবেন, ভেবেছেন কিছু?

সমর আজ হাসল না। বলে, করুণা-কিংকর-কনস্ট্রাকসন নাম দিয়ে নতুন ব্যবসা খুলব। ব্যবসা থাকলে মামার নামও থাকবে। পার্টনারশিপে আর কাজ করব না আমি। আপনার সঙ্গে তো নয়ই। বুধহাটা পুলের কাজটা ধরুন আমিই পাইয়ে দিলাম কত চক্রান্ত করে। কম-সে-কম বিশ হাজার নিট মুনাফা পেটলেন। আধাআধি দেবার কথা—ঠেকালেন শেষ পর্যন্ত হাজার আড়াই কি তিন। অনেস্টি ছাড়া ব্যবসা হয় না। মূলধন ছিল না বলেই আপনার মতো লোকের পিছনে এদ্দিন ঘোরাঘুরি করেছি। মামা সেটা দিয়ে গেলেন।

গানের নেশায়

শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

লে বেলায় এক পণ্ডিত মশায়ের মুখে শুনেছিলাম, শিক্ষার আরম্ভ কানমলায়। তখনকার দিনে কানমলা না খেয়ে কোনো শিশু লেখাপড়া শিখেছে এ রকম ঘটনা বাস্তবিক আমাদেরও জানা ছিল না। কিন্তু এটা লেখাপড়ার কথা। গানবাজনার ক্ষেত্রেও যে কথাটা পুরোমাত্রায় প্রযোজ্য তা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি ।

আমাদের গ্রামে গানবাজনার খুব প্রচলন ছিল। আমার ছোট কাকা ছিলেন ধ্রুপদ গায়ক, এক দাদা পাখোয়াজ, ঢোল আর ক্ল্যারিওনেট সাধক, আর এক দাদা গীত রচয়িতা ইত্যাদি। তা ছাড়া গ্রামে নানা অজুহাতে, এমনকি বিনা অজুহাতেই লেগে থাকত যাত্রা, কবি, খেউড়, বৈঠকী গান— এমনি কত কি!

এ হেন পরিস্থিতির মধ্যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একটি হারমোনিয়ম কিনলেন। তিনি অবশ্য তবলাও বাজাতেন। কিন্তু নতুন হারমোনিয়মটার প্রতি তাঁর মমতা ছিল অনন্যসাধারণ। বাজনা অভ্যাসের তুলনায় যন্ত্রটাকে রোজ বহুক্ষণ মেজে ঘষে সাফ রাখার দিকেই ছিল তাঁর নজর বেশি। যে কেউ এক নজরেই সেটা বুঝতেও পারতেন। কারণ সাঁতুই যন্ত্রটির চারপাশে বা ঢাকনার ওপর আপনি আপনার সুরৎ দেখে নিতে পারতেন। আরশির মতই সে কাঠের জেল্লা। আমরা ছোট ভায়েরা লোলুপ এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকতাম,— কিন্তু ওতে হাত দিতে সাহস করিনি কখনো।

কিন্তু লোভ এক দুর্দমনীয় বস্তু। একদিন যখন দেখা গেল বড়দা ধারে-কাছে কোথাও নেই, তখন আমি সন্তর্পণে বাক্স খুলে হারমোনিয়মটা বার করলাম। তারপর আর একবার চারদিক চেয়ে হাওয়া করে একটা পর্দা টিপতেই প্যাঁ করে যে শব্দটা বেরোলো সেইটের দিকে একটু মন দিতে না দিতেই বাঁ কানে একটা কঠিন হস্তের নির্মম স্পর্শ অনুভব করলাম। তারপর আর কিছু জানি না। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল— হারমোনিয়মের প্যাঁ থেমে গেল আর তার বদলে আমার মুখ থেকে একটা ভ্যাঁ আওয়াজ বেরিয়ে এল। এখানেই শেষ নয়। লিখিত পরীক্ষার পর যেমন মৌখিক পরীক্ষা। এরপর সুরু হল ভর্ৎসনা। তার মোদ্দা কথা হচ্ছে, এই বাচ্চা বয়সে পড়াশুনোয় মন নেই, গানবাজনার শখ!

খানিকক্ষণের জন্য মনটা দমে গেল বটে, কিন্তু শেষে মনে মনে দুটো প্রতিজ্ঞা করলাম। এক, গানবাজনা শিখতেই হবে। আর দুই, ওই অপয়া যন্ত্র হারমোনিয়মটা কখনো বাজাতে চেষ্টা করব না। এই পরিণত বয়সে সংগীতের রাজ্যে প্রবেশ করতে পেরেছি কিনা জানি না, তবে এটা হলপ করে বলতে পারি, আজ অবধি হারমোনিয়ম বাজাতে শিখিনি। সংগীত শিক্ষার ব্যাপারে শৈশবে লব্ধ কানমলাটা কার্যকরী হয়েছে কিনা তার বিচার আমার হাতে নয়। আবার হারমোনিয়মের কার্যকারিতা বিচার করা হল এমন কথাও বলতে পারি না।

তারপর কয়েক বৎসর কেটে গেল। বড়দা নিজে সংগীতরসিক ছিলেন। তাঁর এমন ইচ্ছা ছিল না যে, ছোট ভাইরা গানবাজনার সংস্পর্শে না আসুক। বরং মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন যে, আমাদের মধ্যে একটু গান বা যন্ত্রবাদনের অভ্যাস থাকলে তাঁর নিজের পক্ষে তবলা সঙ্গতের সুবিধা হয়। সঙ্গত করবার জন্য আসলে তিনি লোক খুঁজে বেড়াতেন।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন বিখ্যাত বেহালাবাদক শশী অধিকারীর শিষ্য গঙ্গাচরণ নন্দী এল আমাদের বাড়িতে। আমি তখন একটু একটু এস্রাজ বাজাই, কারো কাছে না শিখেই। পেয়াদা নীরু সরদার ভাটিয়ালি গাইত, কর্মচারী মুখুজ্যে মশাই যাত্রাদলের জুড়ীদের গান গাইতেন— তিনি এককালে যাত্রার দলেই ছিলেন,—চাকর চরণদাস বৈরাগী মালসী ইত্যাদি গাইত আর আমার দিদি অপূর্বকণ্ঠে প্রাচীন বাংলা গান, শ্যামাসংগীত গাইতেন। তাদের গানগুলো আমি কষ্টে সৃষ্টে এস্রাজে তুলতে চেষ্টা করি। গঙ্গাচরণ দেখতে পেল একজন উপযুক্ত শিষ্য। প্রস্তাব করে বসল : খোকাবাবুকে আমি এস্রাজ শেখাব। বড়দা রাজি হলেন, বাড়ির কর্তা বড় মামাও উৎসাহ দিলেন। আমি হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম।

এস্রাজের ইতিহাসটা বলে নিই। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে (সনটা যন্ত্রের গায়ে লেখা ছিল) আমার এক জ্ঞাতি দাদা এটা খরিদ করে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে ঝুলিয়ে রাখেন। তাঁকে কেউ কখনো বাজাতে দেখেনি। বহু বৎসর পরে একদিন দড়ি ছিঁড়ে এস্রাজটা দুম করে মেজেতে পড়ে যায়। সেই দুম আওয়াজের আগে বোধহয় এস্রাজটার আর কোনো আওয়াজ কেউ কখনো শুনতে পায়নি। বৈঠকখানায় বসেছিলেন ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হঠাৎ অনুরোধ করলেন, এস্রাজটা তাহলে তাঁকেই দিয়ে দেওয়া হোক—তিনি ওটা বাজিয়ে ভজন গাইবেন। ডাক্তারবাবু ভদ্রলোক। দাদা আপত্তি করলেন না।

কিন্তু ডাক্তারবাবুর বিপদ হল। পুকুর পাড়ে চারদিক খোলা তাঁর 'প্রার্থনা-মন্দিরে' তিনি একখানি আসন পেতে এস্রাজ নিয়ে বসতেন এবং ছড়ি টেনে একটা যে কোনো সুরে একবার একটু আওয়াজ বার করেই ঊর্ধ্ব মুখে নিমীলিত নয়নে যখন ভজন সুরু করতেন, তখন এস্রাজে হাত চালনা বন্ধ হয়ে যেত। ক'দিন এভাবে চলবার পর একদিন 'ধেৎ' বলে তিনি এস্রাজটা নিয়ে চলে এলেন আমাদের বাড়ি। আমাকে বললেন : দেখ তোমাদের বংশে গানবাজনার চলন আছে, আর আমার চৌদ্দ পুরুষের সংগে ও বিদ্যার সম্পর্ক কোনো কালে ছিল না। সুতরাং যন্ত্রটা তোমার কাছে রইলো। তুমি শেখো— আমি মাঝে মাঝে এসে শুধু শুনে যাব।

গঙ্গাচরণ আসবার পর থেকে এস্রাজে তালিম চলতে থাকল। গঙ্গাচরণ আমার প্রথম গুরু কিন্তু তখনকার সমাজের নিয়ম অনুসারে সে আমাদের বাড়িতে চাকরের চাইতে উচ্চ আসন পাবার অধিকারী ছিল না। আমি তাকে তুমি সম্বোধন করতাম আর সে পরম বিনয়ে হাতজোড় করে আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করে কৃতার্থ হ'ত। আজকালকার দিনে এই অচিন্তনীয় গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের কথা কারো চিন্তায়ই হয়ত আসবে না।

এইভাবে ধীরে ধীরে সংগীত জগতে প্রবেশ করবার সময় ১৯১৩ সনে একবার আমরা ঢাকা যাই। ঢাকায় তখন বৃটিশ সরকার তার সামরিক শক্তির পরিচয় দেবার জন্য একটা বিরাট আয়োজন করেছিল। রমণার মাঠে প্রায় বিশ হাজার দিশী বিলাতি সৈন্য সমাবেশ করে কৃত্রিম যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধ দেখতে যাচ্ছি—রাস্তায়

চলতে চলতে শুনলাম, লালু পালের ঠাকুর-বাড়িতে কালে খাঁ সাহেবের গান হবে। কালে খাঁ মস্ত বড় ওস্তাদ—ঢাকায় অত বড় খেয়াল গায়ক এর আগে নাকি কখনো আসেননি। কালে খাঁ ছিলেন এখনকার বিখ্যাত গায়ক গোলাম আলি সাহেবের আপন চাচা, বাড়ি লাহোরে। ইনি পাঁচ ছয় বছর ঢাকায় ছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হতেই দেশে ফিরে যান। কালে খাঁ সাহেবের গান হবে শুনে পরদিন সকাল বেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম। নবাব-পুর রোডে লালু পালের ঠাকুরবাড়ি খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে আসর বসেছে শ্বেতপাথরের মেঝের ওপর একখানি সাদা চাদর বিছিয়ে। প্রায় মাঝখানে খাঁ সাহেব বসে আছেন, আর তিন দিক ঘিরে আমরা শ্রোতার দল। আটটা থেকে বসে আছি, ন'টা বেজে গেল, গান আর আরম্ভ হয় না। যারা অফিস-যাত্রী তারা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন, হয়ত গান না শুনেই চলে যেতে হবে। এমন সময়, কি করে জানি না, একটা বোতল এল। খাঁ সাহেব সেটা এক নিঃশেষে গলায় ঢেলে দিয়ে একটা ঢেকুর তুললেন। একজন বলে উঠল : আহাহা, খাঁ সাহেবের ঢেকুরেও সারে গামা খেলে, এমন না হলে আর অত বড় ওস্তাদ হয় ?

মন্তব্য শুনে বোধহয় খাঁ সাহেবের মধ্যে গানের মেজাজ এসে গেল, তিনি তানপুরায় হাত দিলেন। এদিকে অফিস যাত্রীরা দেখল দীর্ঘ খেয়াল শুরু হলে, শেষ অবধি আর শোনা হবে না। তাই একজন শ্রোতা বললেন, খাঁ সাহেব, একখানি ঠুংরি হোক। তবে খাঁ সাহেব কি ঠুংরি গান করেন ? শ্রোতারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কিন্তু মনে হল কালে খাঁ সাহেব ঠুংরি গাইতেই রাজী। এমন সময় একজন আবদার করলেন বাংলা কথায় ঠুংরি হোক। বিপদ হল খাঁ সাহেব বাংলা জানেন না। তাই তিনি বললেন : বেশ গাইব তবে বাংলা ঠুংরির একটা লাইন বল। অনুরোধ কর্তা বললেন—কে দিল রে কাঁটা মোর গোলাপ বাগানে। একটু হেসে ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে খাঁ সাহেব ঠুংরি ধরলেন, ভৈরবী সুরে। কি অপূর্ব গান। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে গেল। অফিসযাত্রী অনেকেরই অফিস কামাই হল।

ঠুংরির পর খেয়াল। ততক্ষণ আসর অনেকটা ফাঁকা। আমরা একটু একটু করে এগিয়ে বসলাম। কি রাগ হল, কি গান, কিছুই মনে নেই। তবে একটা সাধারণ ঘটনা মনে আছে। কালে খাঁ সাহেবের বপু একটু বিরাট ধরনের ছিল। যারা তাঁর ভাইপো গোলাম আলি খাঁ সাহেবকে দেখেছেন, তাদের কাছে অনুরোধ প্রস্থে এক বিঘত আর দৈর্ঘ্যে এক হাত যোগ করুন, তাহলেই কালে খাঁ সাহেবের শারীরিক পরিচয় মিলবে। যতটা মনে আছে কালে খাঁর তানগুলি গোলাম আলি সাহেবের তানের মত ছিল না কিন্তু অত্যন্ত জোরদার এবং জবরদস্ত ছিল। আর সেই তানের সময় কালে খাঁ সাহেব তাঁর দেহখানিকে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরিয়ে আনলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল মেঝের চাদরখানি চারদিক থেকে ছিঁড়ে এসে খাঁ সাহেবের চারপাশে প্রায় বিড়ে পাকিয়ে গিয়েছে। জীবনে আর কোনো আসরের অমন দুরবস্থা দেখিনি। কালে খাঁ অতি উঁচুদরের গুণী ছিলেন। এই ঘটনার পরেও অনেকবার ঢাকায় গিয়ে তাঁর গান শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে আজকাল তাঁর মত গুণী গায়ক একজনও জীবিত নেই।

চল্লিশ বছর পরে একদিন ঢাকুরিয়া লেকের ধারে ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ সাহেবকে জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কালে খাঁই কি আপনার পিতা ?—আমার ধারণা সেই রকমই ছিল। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। তিনি আমার পিতৃতুল্যই ছিলেন। কারণ, একাধারে তিনি আমার চাচা এবং গুরু।

আমি সাহস করে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। আপনার গানের কায়দা কিন্তু কালে খাঁ সাহেবের মত নয়। আপনি কি আপনার গুরুকে অনুসরণ করেন না ?"

খাঁ সাহেব একটু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, আমিও সেই রকম গাইতে পারি। কিন্তু আজকাল কনফারেন্সের লোকদের খুশী করবার জন্য অন্য ধরনে গাই।

কথাটা আমার মনঃপূত হয়নি।

কিছুদিন পরে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে জে সি গুপ্ত মশাই'র বাড়িতে আমার পরামর্শে সেতারী বিলায়েত খাঁ তাঁকে কালে খাঁ সাহেবের শেখানো একটি বিশেষ গান গাইতে অনুরোধ করেন। খাঁ সাহেব রাজী হয়ে কিছুক্ষণ গেয়েছিলেন এবং তাইতেই কালে খাঁ সাহেবের স্মৃতি মনে জেগে উঠেছিল।

আমার দুঃখ হয়, কালে খাঁ, তসদ্দুক হোসেন খাঁ (তাজ খাঁর ভাগ্নে), আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ গোছের কোনো গায়ক বর্তমানে জীবিত নেই। এখনকার শ্রোতাদের এটা দুর্ভাগ্যই বলব। একমাত্র ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ জীবিত। কিন্তু আজ তিনিও রোগে অসমর্থ। অনেকে লক্ষ্য করেছেন প্রথম এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণীদের গানবাজনা শোনবার জন্য বাঙালী সাধারণের কি অপরিসীম আগ্রহ! কনফারেন্সের টিকেট সংগ্রহ করা কি দুঃসাধ্য ব্যাপার। যাঁরা টিকেট কিনতে পাননি, তাঁরা পাঁচ টাকার টিকেট পঞ্চাশ টাকাতেও কিনেছেন, এও আমি দেখেছি। আর যাঁদের সামর্থ্যে কুলোয়নি, তাঁরা খোলা রাস্তায় খবরের কাগজ পেতে সারারাত জেগে গান শুনেছেন। এই আগ্রহ বাঙলার বাইরে দুর্লভ। অথচ আগ্রহ মেটাবার উপযোগী গুণী বিরল।

অবশ্য গান শোনবার এই আগ্রহটা আমাদের কিছু নূতন নয়। যাত্রার আসরের কথা মনে করুন। পুরোনো আমলে যাত্রা শুনতে আট দশ মাইল হেঁটে এসে সারা দিনরাত চিঁড়ে চিবিয়ে হামেশাই লোকে যাত্রা শুনতো। অবশ্য তখনকার দিনে টিকেট কিনে গান শোনার কথা শোনাই যায় না। কবে থেকে এই প্রথা শুরু হল বোধহয় কারো জানা নেই। সঠিক স্মরণ থাকলে এটি স্মরণীয় ঘটনা।

যে ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে সেটি আমি উল্লেখ করছি—টিকেট করে গান-বাজনার আসরে ঢোকা বোধ হয় সেই প্রথম। তবে এর আগেকার অনুরূপ আসরের কথা কারো জানা থাকলে তিনি সেটা লিখে জানাতে পারেন।

১৯১৫ সনের কথা বলেই মনে হচ্ছে, তবে ঠিক মনে নেই। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়িতে কয়েক দিনের বিরাট জলসা। নেপাল দরবার, জয়পুর, গোয়ালিয়র, বরোদা, কাশী, আগ্রা প্রভৃতি স্থান থেকে অজস্র গুণী এসেছেন। টিকেটের হার সর্বোচ্চ পঞ্চাশ টাকা আর সর্বনিম্ন দশ টাকা।

বলা বাহুল্য, এই আসরে প্রবেশাধিকার লাভের সামর্থ্য আমার ছিল না। সে যুগে অনেকেরই ছিল না। বিশেষত টিকেটের যা হার! কিন্তু অনেকের না গেলেও চলত। আমার আবার কাঁধে ছিল সঙ্গীতের ভূত। যাব না মনে হতেই শরীর অসুস্থ বোধ হত।

ভাবতে লাগলাম কি উপায়ে কাজ হাসিল হয়। অবশেষে একটা ফন্দিও মনে এল। আহিরীটোলায় আমার এক বন্ধুর বাড়িতে সপ্তাহে দুদিন শশী অধিকারী বেহালা শেখাতে আসতেন। পূর্বোক্ত আসরে তাঁরও নেমন্তন্ন ছিল। আমি একদিন আস্তে আস্তে অধিকারী মশাই'র কাছে প্রস্তাব করলাম,—আমি তাঁর সাগরেদ হ'তে চাই। তিনি একটু রুখে বললেন, বেহালায় যদি হাত থাকে তবে শেখাতে পারি, আর তা নয় ত আর কারো কাছে দিন কতক হাত ঘষে এসো। আমি প্যাঁচ কষে বললাম, না, গুরুজী, যার কাছে শিখব, গোড়া থেকে শেষ অবধি তাঁরই কাছে শিখব—আপনি রাজী হলে আমি আরম্ভ করতে পারি।

এই কথায় অধিকারী মশাই খুশী হলেন। বললেনঃ বেশ, নাড়া বাঁধতে হবে।

একদিন কি দুদিন পরেই এক বৃহস্পতিবারে নাড়া বাঁধা হয়ে গেল এবং বন্ধুর যন্ত্রে ছড়ি ঘষে সারে গামা বার করে উস্তাদের প্রশংসা পেলাম। তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমার হবে। (বলে রাখা ভাল, শশী অধিকারীর মত কৃপণ গুরু যেমন কম দেখা যেত, তখনকার দিনে বেহালা শিখবার জন্য আমার মত শিষ্যও কিছু অঢেল ছিল না।)

একদিন, যে দিনটির জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি, বিকেলে উস্তাদজী বন্ধুর বাড়ি এসে আমাদের তাড়াতাড়ি শিখিয়েই বললেন, আজ এইখানেই ইতি, পাথুরিয়াঘাটার জলসায় যেতে হবে। আমাকে বললেন, একটা রিক্সা ডাক। আমি চিৎপুর থেকে একটা রিক্সা এনে কোনো কিছু না বলে উস্তাদের বেহালাটা তুলে নিয়ে বললাম, চলুন। উস্তাদ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে? বললাম, আজ্ঞে হাঁ।

আর বাক্য ব্যয় না করে আমি রিক্সার দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম। উস্তাদ শুধোলেন ভাড়া ?

ভাড়াটা আমি রিক্সাওয়ালাকে অগ্রিম দিয়েই ডেকে এনেছিলাম। রিক্সাওয়ালা কাছে 'বাবুনে দে দিয়া' শুনে উস্তাদ খুব খুসী হলেন।

তারপর সরাসরি রাজবাড়ির উঠোনের মাঝখানে, যেখানে গুণীদের বসবার স্থান সেখানে পৌঁছে গেলাম। ফন্দি সার্থক জীবনও সার্থক। এত গুণীকে একসঙ্গে এর আগে কখনো চোখেও দেখিনি। সবচেয়ে মজার কথা এই জলসায় একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল—গুণীদের মধ্যে—কার কত বেশি সংখ্যক রাগ-রাগিণী জানা আছে। শুনে রাখুন, এই প্রতিযোগিতায় উস্তাদ শশী অধিকারীই প্রথম হয়েছিলেন—সমস্ত ভারতের গুণীদের মধ্যে। ফল শুনে আমার মত কৃত্রিম শিষ্যেরও বুকটা দশ হাত ফুলে উঠেছিল। (তবুও এর পরেই উস্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে দিই। একথা আজ দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করব।)

বহু বৎসর পরে, একবার ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় আসছি। সিরাজগঞ্জে জাহাজে উঠেই দেখি এক বৃদ্ধ মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, সঙ্গে অনেক লোকজন। এই বৃদ্ধই শশী অধিকারী। তিনি তাঁর যাত্রাদল নিয়ে রাস-যাত্রা উপলক্ষে ময়মনসিংহে গিয়েছিলেন। সেখানে একদিন আসরে শ্রোতাদের মধ্যে মারামারি হয়—সেটা প্রায়ই হত,—তার ফলে একটা বাঁশ ছুটে এসে অধিকারী মশাইর মাথায় লাগে।

এ কথায় সে কথায় অধিকারী আমাকে বললেন, তোমাকে চিনি চিনি বোধ হয় ? আমি বললাম, সে কি, আমি যে আপনার নাড়া বাঁধা শিষ্য। তিনি সহজে মনে করতে পারেন নি। শেষে আহিরীটোলার প্রসঙ্গ তোলাতে তাঁর মনে পড়ল। তিনি বললেন, তাই তো, তারপরে তোমার কি হল ? আর দেখা-ই নেই যে ?

আমি প্রথমে নিরুত্তর, অধোবদন হয়ে রইলাম। পরে খোলাখুলিভাবে আমার ফন্দির ইতিহাসটা ব্যক্ত করলাম এবং মিথ্যা ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইলাম। অধিকারী মশাই হেসে বললেন, কাজটা খুব অন্যায়ই করেছ, তবে গানবাজনা শোনার যে আগ্রহের বশবর্তী হয়ে তুমি এ কাজ করেছ, সেই দিকটা ভেবে তোমাকে মাপ করলাম। এই আগ্রহটাই জাগ্রত থাকুক, এই আশীর্বাদ করি।

নতমস্তকে এই বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ বয়োবৃদ্ধের আশীর্বাদ গ্রহণ করবার সময় আমার মাথায় আর কোন ফন্দি ছিল না।

এক জঙ্গল থেকে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

লগিতে একটা ধাক্কা দিয়ে নৌকোটাকে গভীর জলে সরিয়ে আনে পাটোয়ারী। চারদিকের স্তব্ধতার ভেতরে শব্দটাকে বড্ড বেশি জোরালো বলে মনে হয়। পাটোয়ারীর টর্চের আলোয় আকৃষ্ট হয়ে যে প্রকাণ্ড বোয়াল মাছটা নৌকোর কাছে এসে ঘুরছিল, প্রকাণ্ড একটা ঘাই মারে। চমকে উঠে পাটোয়ারী ভাবে, মেয়েটাই কি জলে পড়ে গেল নাকি?

না—পড়েনি। দুটো হাঁটুর ভেতরে মুখ গুঁজে বসে আছে চুপ করে। বোয়াল মাছটার আওয়াজে সেও চমকে উঠেছে একটুখানি, তারও চোখ আকাশভরা তারার আলোয় তারার মতোই জ্বলে উঠেছে একবার।

পেছনের গ্রামটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে পাটোয়ারী। আম-কাঁটাল-বাঁশবনের একটা নিশ্ছেদ অন্ধকার তালগোল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। হাজার হাজার বন-বেড়ালের চোখ হয়ে জোনাকি জ্বলছে নিবছে। ওদের আড়ালে গ্রাম বলে কোথাও কিছু আছে সে-কথা মনেই হয় না—সবটাই একটানা একটা সুন্দরবন হয়ে গেছে এখন।

আর সুন্দরবনের বাঘের মতোই এই মেয়েটাকে মুখে করে পাটোয়ারী বিলের জলে নৌকো ভাসিয়েছে।

বাতাস ঠিক একটানা বইছে না, থেকে থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণির মতো। আর বিলের জল থেকে পচা পাতা, ঘাস, কাদার গন্ধ—সেই হাওয়ায় এসে মুখের ওপর আছড়ে পড়ছে। এই গন্ধটাকে এমন তীব্রভাবে এর আগে কখনো অনুভব করেনি পাটোয়ারী। বিলের কালো জলটাকে কেমন হিংস্র আর নিষ্ঠুর বলে মনে হতে থাকে, চাঁদ ডোবা আকাশের হাজার হাজার তারার আলোয় বড়ো বড়ো লালচে ফেনাগুলোকে সারি সারি নোংরা দাঁতের মতো দেখায়।

কিছুক্ষণ লগি ঠেলে নৌকোটাকে গভীর জলে নিয়ে আসে। তারপর লগিটাকে নৌকোয় তুলে গলুইতে বসে পড়ে—দুখানা দাঁড় ধরে টান দেয় একসঙ্গে। একটা দাঁড় খাঁড়ার মতো একবার শূন্যে কোপ দিয়ে ঝপাং করে জলে নামে, নৌকোতে ঝাঁকুনি লাগে, হাঁটুর ভেতর থেকে মাথা তুলে আবার জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে দেখে মেয়েটা।

দাঁড় টানতে টানতে শক্ত হাতের পেশীতে আর চওড়া বুকে একটা শক্তির তরঙ্গ অনুভব করে পাটোয়ারী। বিলের কালো জল কেটে তীরের মতো এগিয়ে চলেছে নৌকো, আম-কাঁটাল-বাঁশবনের আড়ালে পেছনের ঘুমন্ত গ্রামটা এখন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। পাটোয়ারী নিজেকে শক্তিমান আর নির্ভয় বলে মনে করতে থাকে, একটু হাসতেও চেষ্টা করে এবার।

'কিরে, ভয় করছে।'

মেয়েটার অস্পষ্ট স্বর কানে আসে: 'না'।

'ঘুম পাচ্ছে?'

'না, ঘুম পায়নি।'

'তবু বসে থাকবি কেন শুধু শুধু? শুয়ে পড় ওখানটায়। যদি শীত করে—ওখানে আমার পোঁটলার ওপরে একটা চাদর রয়েছে, ওইটে জড়িয়ে নে গায়ে।'

'না, শোবো না এখন। আমার শীত করছে না।'

পাটোয়ারী আর কথা বাড়ায় না। এই বিল তার চেনা—তবু পোষমানা বাঘের মতো সবখানি চেনা নয়। এই মাঝরাতে, এই অন্ধকারে, কখন একটা থাবা দিয়ে বসবে

'কেউ জানে না। ডুবো গাছে ধাক্কা লেগে নৌকোর তলা ফেঁসে যেতে পারে, কোনো প্রকাণ্ড ঘড়িয়ালের ল্যাজের ঘায়ে ডুবে যেতে পারে, আর সব চাইতে বড়ো ভয়—চোরা স্রোতের টানে কোনদিকে টেনে নিয়ে দিক ভুলিয়ে দিতে পারে; তখন সারাটা রাত দাঁড় টেনে, লগি ঠেলেও আর পথের হদিশ মিলবে না। নদীর মেজাজ বোঝা যায়, কিন্তু বর্ষার জলে মাঠ ঘাট বন-বাদাড় ডুবিয়ে দিয়ে এই যে বিশাল বিল ফেঁপে ফুলে উঠেছে, তার মতো বিশ্বাসঘাতক আর নেই।

সুতরাং এখন লক্ষ্য রাখতে হবে জলের দিকে নৌকোর দিকে। এই মেয়েটার সঙ্গে বকবক করবার সময় নেই।

'তবে বসেই থাক।' —দুটো দাঁড়ে আবার শক্ত হাতে ঝাঁকুনি দেয় পাটোয়ারী। নৌকো এগিয়ে চলে, সারি সারি নোংরা দাঁতের মতো নালচে ফেনাগুলো দাঁড়ের ঘায়ে চুরমার হয়ে যায়, পচা পাতা, দাম ঘাস আর পাঁকের গন্ধ ঘূর্ণির মতো এক-একটা হাওয়ার দমকে ফেটে পড়তে থাকে।

মেয়েটা আবার হাঁটুর মধ্যে মুখ গোঁজে। ঘুমোয় না, চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসে তার।

বাইরে বৃষ্টির আর বিরাম নেই। আকাশ একেবারে ভেঙে পড়ছে, গোটা গ্রামটাকেই ভাসিয়ে নেবে মনে হয়। খোলা দরজা দিয়ে বৃষ্টির দাপট আসছে আর সেই দরজা দিয়েই বিদ্যুতের আলোয় দেখা যাচ্ছে উঠোনভরা এক হাঁটু জল বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটায় টগবগ করে ফুটে উঠছে। তলার মাটি ধুয়ে গিয়ে দোপাটি ফুলের নরম নরম গাছগুলো লুটিয়ে পড়েছে সেই জলের ভেতর।

দরজা দিয়ে ভেতরে জল আসছে, কিন্তু বন্ধ করছে না কেউ। সংসারের দুটো লণ্ঠনই জ্বালানো রয়েছে ঘরে—একটা বাবার মাথার কাছে, আর একটা মেটে দাওয়ায়। জলের ছাট লেগে নীচের লণ্ঠনটার চিমনিটা ফট্ ফট্ করে ফেটে যাচ্ছে। পুরোনো খড়ের চাল পচে গোবরের মতো কালো হয়ে গেছে, জল চোঁয়াচ্ছে ওপর থেকেও। পচা চাল থেকে টপ করে একটা শাদা আর মোটা পোকা খসে পড়েছে নীচে—বাবার বিছানাটার দিকেই এগোচ্ছে সেটা।

দু দুটো লণ্ঠনের আলোয় বাবার খোলা চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে এখন। কিন্তু চোখদুটো স্থির আর ঘোলাটে, যেন কেউ শাদা পর্দা টেনে দিয়েছে তাদের ওপর। গালে মুখে শুকনো বমির দাগ চিকচিক করছে আলোতে। কী করে যেন গলার পৈতেটা জড়িয়ে গেছে ডান হাতের রুপোর আংটিটার সঙ্গে। শাদা মোটা পোকাটা একটা প্রকাণ্ড জোঁকের মতো শরীরটাকে একবার কুঁচকে, একবার বাড়িয়ে একভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বাবার ডানহাতটার দিকেই।

ঘরের কোণায়, চাঁচের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে এমনি করেই হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসে আছে ন বছরের মেয়েটা। ছেঁড়া ফ্রকের ভেতর দিয়ে খোলা পিঠের ওপর মধ্যে মধ্যে চাল-চোঁয়ানো জলের ফোঁটা পড়ছে এক-একটা করে। অন্য সময় হলে গা শিউরে উঠত, সরে বসত ওখান থেকে, কিন্তু মেয়েটা ও সব কিছু টেরও পাচ্ছে না এখন।

মা কাঁদছে। বাবার পায়ে মাথা খুঁড়ে পাগলের মতো কাঁদছে।

'ওগো, তুমি এমন করে কোথায় চলে গেলে গো? ওগো, আমরা এখন কোথায় দাঁড়াব গো?'

মার সমস্ত মুখটা চোখের জলে আর মাটিতে মাখামাখি। কপাল দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে—না সিঁদুরের দাগ? খোলা চুলগুলো রক্ষা-কালীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। দাপাদাপিতে এক হাতের শাঁখা আপনিই দু-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে—আগে থেকেই কাজ কমে গেছে খানিকটা।

'ওগো, তুমি যে এমন সর্বনাশ করে যাবে—'

সন্ধ্যেবেলাতেই বাবা পাশের গ্রাম থেকে পুজো সেরে এসেছিলেন। মাঝরাতে দু-তিন-বার ভেদ বমি। তারপর—

উঠোনের বৃষ্টির জলে ছপছপ করে আওয়াজ হয়। লণ্ঠনের আলো পড়ে—মানুষের গলার স্বর কানে আসে।

: কী হল বাছা—কী হল?

: ভট্চাজ মশায়ের কী হল বামুনে মা?

জিজ্ঞাসা করার আগেই উত্তর মেলে। দরজার সামনে কয়েকটা ভয়ার্ত মুখ দেখা যায়। তখন ঘরে আর বৃষ্টির ছাট আসে না। মানুষগুলিই দরজা জুড়ে থাকে।

—কলেরা!—কাকে যেন বলতে শোনা যায়। মেয়েদের মধ্যে কে যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

মা হাহাকার করতে থাকেন: ওগো তোমরা কী দেখতে এলে গো—আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল গো—

ঘরের কোণায় বসে থাকতে থাকতে ওই অবস্থাতেও মেয়েটার চোখ বুজে আসে। ঘুমোয় না—সব এলোমেলো হয়ে যায় মনের ভেতর। কথা, কান্না, বৃষ্টির শব্দ, বাইরে জল ভাঙার ছপছপ আওয়াজ। আরো অনেকগুলো লণ্ঠন যেন ঘরে এসেছে মনে হয়—বোজা চোখের ওপর আলোর ধাক্কা এসে লাগে। কট্-কটাস্-কটাস্—এই বৃষ্টির ভেতরেও কারা যেন কোথায় বাঁশ কাটছে।

ন বছরের মেয়েটা আর কিছু ভাবতে পারে না। বন্ধ চোখের সামনে সেই সাদা মোটা পোকাটা জোঁকের মতো শরীরটাকে একবার কুঁচকে একবার বাড়িয়ে এগিয়ে চলতে থাকে। কটাস্-খট্-খটাং-খটাস্! সব ছাপিয়ে বাঁশ কাটার আওয়াজটাই—

খটাস্-খট্—

মেয়েটা চোখ মেলে তাকায়। চারদিকে বিলের কালো জল ছাড়া আর কিছুই নেই—, আকাশভরা তারার আলো দোল খাচ্ছে তার ওপর। দাঁড় তুলে রেখে পাটোয়ারী আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে—লগি ঠেলে নিয়ে চলেছে নৌকো।

পাটোয়ারী বলে, উঃ, রাস্তা আর শেষ হয় না।

মেয়েটা জবাব দেয় না।

হাতের লগিটা খটাং করে কিসের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

—শালা কুমীর নাকি?—একবার ঝুঁকে পড়ে জলের দিকে তাকায় পাটোয়ারী। তারপরে নিজেই জবাব দেয়: না—কাঠ।

মেয়েটার চোখের সামনে দিয়ে একটা আলোর তীর ছুটে যায়—যেন অনেক দূরে এই বিলের জলেই আছড়ে পড়ে কোথাও। উল্কা। তারা খসতে দেখলে মা যেন কী

একটা বলতে বলত তাকে। মেয়েটা মনে আনতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই মনে আসে না সেটা। মা!

গোয়ালে চারটে গরু বাঁধা—বড়ো বড়ো লাল মাটির গামলা থেকে ভুষি খাচ্ছে তারা, ভোঁস ভোঁস করে আওয়াজ উঠছে। গোবরে লেপা তিনটে ধানের মরাই—সকালের রোদে তাদের নতুন খড়ের ছাউনি সোনার মতো ঝকঝক করছে। উঠোনে শীতের রোদের ভেতরে চাটাই পেতে তিন-চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পড়তে বসেছিল, এখন তারা আর পড়ছে না, তাকিয়ে আছে ওদের দিকেই। তাদের সামনে এনামেলের বাটিতে বাটিতে সাদা সাদা দ্রোণফুলের মতো মুড়ি, বড়ো বড়ো খেজুরের পাটালী। ওই বাটিগুলোর দিকেই চোখ আটকে থাকে মেয়েটার, পেটের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে—কাল রাতে সে কিছুই খায়নি।

মা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গায়ে তার বাবার সেই ছেঁড়া এণ্ডিটা—যেটা এখন ফুটো-ফুটো হয়ে জালের মতো দেখাচ্ছে এখন। মা শীতে কাঁপছে, টের পায় মেয়েটা। তারও শীত করছে। কোন্ বাড়ী থেকে চেয়ে-চিন্তে এনে মা তার গায়ে একটা গরম জামা পরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাতে শানাচ্ছে না—নাক দিয়ে তার জল গড়াচ্ছে। মুড়িগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুকনো জিভ দিয়ে ফাটা-ফাটা নীচের ঠোঁটটাকে একবার চাটে মেয়েটা, জিভে খড়খড় করে, রক্তের নোনতা স্বাদ লাগে।

বাড়ীর কর্তা জনার্দন একটা মোড়ার ওপর বসে হুঁকো খায়। তার টাকপড়া পরিষ্কার মাথাটাকে উবুড়ে করা একটা কাঁসার বাটির মতো দেখায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ তামাক খায় জনার্দন। ভুড়-ভুড় করে আওয়াজ ওঠে। তারপর হুঁকো নামায়। ভুরু কুঁচকে ওঠে।

—এবার ক্ষ্যামা দাও বামুন মা। আমি আর পারিনে।

ঘোমটার ভেতর থেকে মা কাঁপা গলায় বলে, কিন্তু বাবা, আপনারা না দেখলে—

—আমি আর কত দেখব?—জনার্দনের গলা সর্দিতে ঘর ঘর করে; শ্রাদ্ধের সময় পঁচিশ টাকা দিয়েছি—তারপর থেকে প্রায়ই তো কখনো দু সের চাল, কখনো দুটো টাকা—এ তো চলছেই। একজনের ওপর এত চাপ দেওয়া কি ভালো? আমারও তো কি বলে কুবেরের ভাঁড়ার নেই যে সারা জীবন তোমাদের টেনে বেড়াব।

গোয়ালের গরুগুলো ভোঁস-ভোঁস করে জাবনা খায়। তিনটে মরাইয়ের সামনে ছড়িয়ে থাকা দুটো চারটে ধানের দানার ভেতরে চড়ুয়ের হাট বসে। ছেলেমেয়েরা মুড়ির সঙ্গে সঙ্গে পাটালীগুড়ে কামড় দেয়। মেয়েটার পেটের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে, নাক দিয়ে জল গড়ায়। হাতের পিঠ দিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে কাচের চুড়ির ধাক্কা লাগে ঠোঁটে—যন্ত্রণায় মাথার ভেতরটা পর্যন্ত চিন-চিন করে ওঠে—শুকনো মুখে নোনা রং নামে।

'মেরেই ফেলব, সাতপুরুষে যা কখনো শুনিনি, তাই হলো এ বাড়িতে!'

মা তবু হাল ছাড়ে না। ঘোমটার ভেতরে থেকে বেহায়ার মতো কাঁদুনি গায়ঃ আমাদের যে কোনো উপায় নেই বাবা!

—উপায় কারই বা আছে?—জনার্দন এত বিরক্ত হয় যে তামাকের সবটা পুড়ে যাবার আগেই কল্‌কেটাকে উল্‌টে দেয় মাটির ওপর—দুটো গনগনে লাল টিকে যেন জনার্দনের হয়ে ওদের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকায়। জনার্দন খাঁকারি দিয়ে সর্দিবসা গলাটাকে সাফ করে নেয় এবার ঃ সকলকেই তো সংসার করতে হয়। দানছত্র খুলে বসলে আমার চলে কী করে? যা হোক—দু মাইল পথ ঠেঙিয়ে এসেইছ যখন—ট্যাঁক থেকে একটা চকচকে আধুলি বের করে মার দিকে ছুড়ে দেয় সে, একটা ইটের গায়ে গিয়ে সেটা ঠনাৎ করে আছাড় খায়, জনার্দন বলে, এই নিয়েই এ যাত্রা রেহাই দাও আমায়। আর কোনোদিন এসো না ইদিকে—এলে কিছু করতে পারব না—এই জানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

মা এগিয়ে এসে নিচু হয়ে আধুলিটা কুড়িয়ে নেয়—সাদা সাদা পা দুটোকে বকের পায়ের মতো দেখায়, নিচু হয়ে আধুলিটা নেবার সময় দুটো কাঁধ পাখনার মতো উঁচু হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়েগুলো মুড়ি আর পাটালীগুড় চিবোয়—তিনটে ধানের মরাইয়ের সামনে কিচিরমিচির করতে থাকে চড়ুইয়ের দল।

কাঁপা হাতের মুঠোয় শক্ত করে আধুলিটা চেপে ধরে মা। দাঁড়িয়ে থাকে।

—আবার কী?—এবারে চটেই ওঠে জনার্দন।

—যদি সেরটাক চাল—

—চাল-ফাল হবে না।—জনার্দন উঠে দাঁড়ায়, খড়ম খট্‌খটিয়ে বাড়ীর ভেতরে চলে যেতে থাকে ঃ এখন যাও, সক্কালবেলায় মানুষকে আর থামোকা বিরক্ত করো না।

মুড়ির বাটিগুলো ফুরিয়ে আসছে, একটু একটু করে ছোট হচ্ছে পাটালীগুড়। মেয়েটার চোখে আর পলক পড়ে না। চমক ভাঙে মার হাতের টানে'

—চল্।

দুজনে হাঁটতে থাকে। শীতের রোদ চড়া হয়, তেমন করে শরীরে আর কাঁপুনি জাগে না—শুধু ফাঁপা পেটের ভেতরটা জ্বালা করে। মার পা দুটো যেন আর চলে না—কখন মুখ থুবড়ে পড়বে বলে মনে হয়।

দুজনে পুরোনো দীঘিটার কাছে আসে। মেয়েটা দেখে দীঘিতে এখন আর পদ্ম নেই—সব ঝরে গেছে, শুধু কতগুলো শুকনো কালো কালো ডাঁটা সাপের মতো গলা তুলে দাঁড়িয়ে।

লাল ধুলোর রাস্তাটা দুদিকে বাঁক নিয়েছে এখানে। মা ডানদিকে পা বাড়ায়।

—বাড়ী যাবে না মা?

—একবার চণ্ডীতলার সরকারদের ওখানে ঘুরে যাই।—ফাসফেঁসে গলায় মা জবাব দেয়।

মেয়েটা প্রতিবাদ করে এবার।

—না, যেতে হবে না ওদের ওখানে। সেদিনও ওদের গিন্নী কত গালাগাল করে তাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের।

মা ঘুরে দাঁড়ায় মেয়ের দিকে। ঘোমটা সরে গেছে, দুটো কালো অন্ধকার চোখ লাল-লাল টিকে দুটোর মতোই ঝকঝক করে ওঠে।

—তাতেই মান ক্ষয়ে গেল?—মা ভাঙা গলায় গর্জায়।

—না, আমি যাব না ওখানে।

—যাবিনি? ভিক্ষে করে পেট চলে, অথচ যেন রানী ভিক্টোরিয়া!—হঠাৎ গিঁট বের করা রোগা রোগা আঙুল দিয়ে মা একটা ঠোনা দেয় মেয়ের মুখে, বলে, হারামজাদী, তোর জন্যেই তো আমার এত জ্বালা! আমার নিজের জন্যে কিসের ভাবনা? যেদিন উনি গেছেন, সেদিনই তো গলায় দড়ি দিয়ে নিশ্চিন্দি হতে পারতুম।

ফাটা ঠোঁটে ঠোনাটা লাগে, যন্ত্রণায় যেন মাথার শিরা পর্যন্ত ছিঁড়ে যায়। তারপরেই কেঁদে ওঠে মেয়েটা। কিন্তু নিজের কথা ভুলে যেতে হয় সঙ্গে সঙ্গেই। ততক্ষণে শিশিরে ভেজা-ভেজা, সেই লাল ধুলোর পথটার ওপর মা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে।

—কী হল মা—কী হল?

—বুকে গেল—বুকটা ভেঙে গেল আমার—মার মুখ দিয়ে ফেনা গড়ায়। চোখের তারা দুটো কপালে উঠতে থাকে।

—মা—মা।—মায়ের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে মেয়েটা চিৎকার করতে থাকে। তার মনে পড়ে যায়, গত দুদিন ধরে যা জুটেছে তা ই তার মা একবেলা করে খাইয়েছে তাকে, নিজে কয়েক ঘটি জল ছাড়া আর কিছুই খায়নি।

—মেঘ করল যে আবার? বৃষ্টি আসবে নাকি?

মেয়েটা না-ঘুমোনো বোজা চোখটা মেলে ধরে আবার। ঝপাং ঝপাং করে দাঁড় টেনে টেনে নৌকো বেয়ে চলেছে পাটোয়ারী। সামনে আকাশ জুড়ে বড়ো বড়ো মেঘ উঠে আসছে—একের পর আর একটা। কালো জলের ওপর একটানা হাওয়া দিয়েছে একটা, নৌকোর গায়ে শব্দ উঠছে ছলাৎ ছলাৎ। মেয়েটার মনে হয়, এই রাত ভোর হবে না কখনো, এই বিলটা কোনোদিন শেষ হবে না।

গম গম গুম গুম করে আওয়াজ ভেসে আসে। মেঘ ডাকছে? না।

পাটোয়ারী বলে, রেলগাড়ী যাচ্ছে—বুঝতে পারছিস?

রেলগাড়ী। মেয়েটা নড়ে ওঠে একটুখানি। রেলগাড়ী সে কোনোদিন দেখেনি। এই অনেকখানি জলের ওপর দিয়ে সেখানে চলেছে রেলগাড়ী? ও যেন দুলিয়ে সবকে উড়িয়ে দেবে ঢেউ করে। কিছুই দেখা যায় না। শুধু বিলের জল দুলতে থাকে, দাঁড়ের টানে টানে কেঁপে কেঁপে এগোয় নৌকো, ছলছল করে ঢেউ বাজে, ফেনার ফুল ভেসে বেড়ায় চারপাশে।

পাটোয়ারী হাসে। মেয়েটার মনের কথা বুঝতে পেরেছে সে।

—আরে রেলগাড়ী এখানে কোথায়? সে পাক্কা ছ মাইল দূরে। ফাঁকা বিলের ওপর দিয়ে আওয়াজটা ভেসে আসছে কিনা—তায় রাতের বেলা—সেই জন্যেই কাছে বলে মনে হয়। রেল লাইনের কাছে এলে তো পৌঁছেই গেলুম। তারপরেই ইস্টিশন।

—কোথায় যাব আমরা?—এতক্ষণ পরে প্রথম কথা বলে মেয়েটা : কলকাতা?

—কলকাতা। ঠিক।—পাটোয়ারী দাঁড় নামিয়ে রেখে জিরোয় একটু, নৌকোটা দাঁড়িয়ে পড়ে জলের ভেতর, একটু একটু দুলতে থাকে : সেখানে আমার বাড়ীতে নিয়ে তুলব তোকে। আমার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়েরা আছে—তারা তোকে কত আদর করবে দেখিস। আমি তোকে ইস্কুলে ভর্তি

করে দেব, ট্রামে বাসে চাপাব, যাদুঘর চিড়িয়াখানা দেখাব। কত সুখে থাকবি তুই। কেউ গাল দেবে না—কেউ মারধোর করবে না—

ঘুমপাড়ানি গানের মতো করে বলতে থাকে পাটোয়ারী, চুপ করে কান পেতে শোনে মেয়েটা। একথা আগেও শুনেছে, আবার নতুন করে শোনে। পাটোয়ারী ঝপাস করে দাঁড় দুখানাকে জলে নামায়।

ভালো ভালো কথা সাজিয়ে সাজিয়ে বলে পাটোয়ারী, আর মনের ভেতর তার হাসি ঝিলমিল্ করতে থাকে। এসব কথা বলতে আর এখন অসুবিধে হয় না, এর আগে বলে বলে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। সুখে থাকবে সন্দেহ কী। এইভাবে আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহ হওয়ার চাইতে অনেক আরামে দিন কাটবে মেয়েটার। চেহারা ভালো, কাঁচা বয়েস—কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। জায়গামত মেয়েটাকে পৌঁছে দিলে কম করে পাঁচশো টাকা হাতে আসবে পাটোয়ারীর। তেরো বছরের উঠতি বয়েস, দিব্যি মুখখানা, ফর্সা রং—দরদাম করলে আরো দু একশো টাকা বাড়বার আশাও আছে।

ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত শরীরে নতুন করে উৎসাহ আসে, কিছুক্ষণ জোরে জোরে দাঁড় টানে। আকাশে মেঘের পর মেঘ ঘনায়—মেয়েটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আধখানা আকাশের তারাগুলো সব ঢাকা পড়ে গেছে।

পাটোয়ারী বলে, ভালো পোশাক দেব তোকে, পেটভরে খেতে পাবি—

আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকায় এবার। বিলের জল ঝলমল করে ওঠে—একবারের জন্যে দেখা যায় চারদিকে ফেনার পর ফেনা—ঢেউয়ের পর ঢেউ। পাটোয়ারী বিরক্ত হয়। একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় আকাশের দিকে।

—বৃষ্টিটা এসে গেলে ভারী ঝঞ্ঝাট হবে। খোলা ডিঙি, ভিজিয়ে ভূত করে দেবে একেবারে।

মেয়েটা বিদ্যুতের চমক দেখেও দেখতে পায় না—পাটোয়ারীর শেষ কথাটাও কানে যায় না তার। বাতাসে ছেঁড়া পুরোনো ফ্রকটা। উড়ছিল, সেটাকে টেনে নামিয়ে পায়ের তলায় চেপে ধরে। কোথায় শেলাই ছিঁড়ে যাবার মতো শব্দ ওঠে একটুখানি। আবার হাঁটুর ওপরে মুখ গোঁজে মেয়েটা—চোখ বুজে আসে।

ভালো পোশাক—ভালো খাবার!

একটা পুরোনো কলাইকরা থালায় খেতে দিয়েছে দূর-সম্বন্ধের মামীমা। বেগুনপোড়া আর পান্তা ভাত।

পান্তা ভাতটায় গন্ধ হয়ে গেছে, বিচে-বেগুনের ভেতরটা শক্ত হয়ে আছে। তবু খিদের জ্বালায় কী যে ভালো লাগে! থালাটাকে চেটে চেটেও আশ মেটে না।

—থালাসুদ্ধ গিলবি নাকি? ওঠ্ এবার—মামীমা এসে দাঁড়িয়েছে রান্নাঘরের সামনে।

—মামীমা, আর দুটিখানি ভাত যদি—

মামীমা গালে হাত দেয়—চোখ দুটো গোল-গোল হয়ে ওঠে। এমন অসম্ভব কথা এর আগে যেন কখনো শোনেনি।

—বাছা, তোমার তো দেখছি হাতির খোরাক। মা-বাপকে গিলেছ—বেশ করেছ, এখন আমাকে সুদ্ধ গিলতে চাও কেন? বাইশ টাকা চালের মণ, খেয়াল আছে সেটা? এবার দয়া করে ওঠো—পুকুরঘাটে এক ডাঁই বাসন রয়েছে, মেজে দিয়ে কৃতার্থ করো আমায়।

এক মুঠো ভাত আর কড়ে আঙুলের মতো একটা বেগুনপোড়া যে হাতির খোরাক নয়—এগারো বছরের মেয়েটার সে কথা মুখে এলেও বলতে পারে না। পেটের খিদে খিদেই উঠে পড়ে—থালাটা তুলে নেয়, বাঁ হাতে নিকিয়ে দেয় জায়গাটা, তারপর পুকুরঘাটের দিকে এগোয়।

এক পাঁজা বাসন সেখানে অপেক্ষা করছে তার জন্যে। দুটো কড়াই।

প্রথম প্রথম কান্না পেত, এখন আর আসে না। মেয়েটা বাসন মাজতে বসে। আঙুলের ডগাগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে, কড়াইয়ের তেল নুন লেগে চিড়বিড় করে জ্বলতে থাকে।

—দুখানা বাসন মাজতে গিয়েই যদি বেলা গড়িয়ে যায়, তা হলে আমার চলে কী করে? ওদিকে খোকা কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে গেল, তাকে একটু ধরবার লোক নেই!—খিড়কির দরজা থেকে মামীমার গলা শোনা যায় : একটু হাত চালাও নবাব-নন্দিনী, তোমার জ্বালায় আমি তো পাগল হয়ে গেলাম।

তাড়াতাড়ি করে বাসনের পাঁজা তুলে আনতে পেছল ঘাটের রাস্তায় আছাড় খায় মেয়েটা। বাসনগুলো ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়ে, একটা আর্তনাদ বেরোয় গলা দিয়ে : মা গো!

মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে—সেদিকে লক্ষ্যও নেই মামীমার। রাগে প্রায় পাগল হয়ে গেছে।

—শেষ করলি! অত বড়ো কাঁসিটা[illegible] ভেঙে দুখানা করলি হারামজাদী?

চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলে মামীমা, সারা গায়ে বৃষ্টির মতো পড়তে থাকে কিলচড়। দাঁতে দাঁতে করাত ঘষার মতো আওয়াজ হয়।

—আজ যদি তোকে খুনই না করে ফেলি, তবে আমার নাম—

ছবিটা বদলায়। এবার দূর-সম্বন্ধের এক কাকার বাড়ী। কাকিমাই উদ্ধার করেছিলেন মামীমার হাত থেকে।

বাসনমাজা, জল তোলা, ছেলে ঠেলা, একার মতো রান্নাবান্না করা। বাড়ীটার মধ্যে দেখাশোনা করা। কাকার অনেক বিষয়—অনেক টাকা, মস্ত আড়তদার।

কাকিমার মুখ একটু মিষ্টি, কাকা কেমন যেন মেজাজে।

দিনের পর দিন বাড়ী হয়ে উঠছে, বিয়ে দেবার ঝুঁকিও আমার ঘাড়েই পড়বে নাকি শেষে?

কাকিমা বলেন, ঢের তো দেরী আছে এখনো, এর মধ্যেই মাথা গরম করছ কেন গো তুমি?

কাকা বিড়বিড় করতে থাকেন : তোমার

যেমন কান্ড! ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, একটা ধিঙ্গি মেয়েকে দুম্ করে—

ধানসেদ্ধ করতে করতে মেয়েটার মন উদাস হয়ে যায়। মা-কে মনে পড়ে! এত ধান, এত চাল এখানে! অথচ বিধবা মা-টা যদি একবেলাও পেট ভরে এক মুঠো খেতে পেতো, তা হলে অমন্ করে মরে যেত না।

কাকার বড়ো ছেলে ভোলাদা এসে উঁকি দেয়। দুবার পরীক্ষায় ফেল করেছে, এখন টেরি বাগিয়ে একটা সাইকেল নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, মুখে লেগেই থাকে গুনগুনোনি গান।

—কিরে, ধানসেদ্ধ করছিস?—ভোলাদা মুচকে মুচকে হাসে।

—দেখছই তো।

ভোলাদা একটু এগিয়ে আসে। গলা নামিয়ে বলে, যাবি বাঁশখালিতে? বায়োস্কোপ দেখিয়ে আনব।

—আমি কী করে যাব?

—আমার সাইকেলের সামনে বসিয়ে নেব, আরামসে চলে যাবি—ভোলাদার চোখ চকচক করে।

—কাকিমা যেতে দেবে না। কাকা বকবে।

—আরে, কাল দুপুর বেলায় যাব। মা তখন ঘুমুবে, বাবা আড়তে। সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব। বাবা জানতে পারবে না—মাকে আমি ম্যানেজ করে নেব।—ভোলাদার নিঃশ্বাস প্রায় গালের ওপর এসে পড়ে, গলা নামিয়ে বলে: খাসা হিন্দি ছবি, এমন সব "লাভ সীন" আছে যে মাথার চুল অবধি কেঁপে ওঠে! চল্, খুব ভালো লাগবে—

কাকার খড়মের আওয়াজ পাওয়া যায়—এদিকেই আসছেন। সঙ্গে সঙ্গেই সুট্ করে কোন দিকে যেন উধাও হয়ে যায় ভোলাদা।

বাঁশখালিতে যাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ভোলাদা হাল ছাড়ে না।

সেদিন কখন সন্ধ্যাবেলা সিঁড়ির নীচে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কে যেন গায়ে হাত দেয় তার—মুখটা চেপে ধরতে চেষ্টা করে।

মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে মেয়েটা। আবছা অন্ধকারে দেখে উঠোন পেরিয়ে ছুটে পালাচ্ছে ভোলাদা।

বাড়ীতে বিশ্রী হৈচৈ। কাকিমা বসে থাকেন পাথর হয়ে। কাকা এগিয়ে আসেন বাঘের মতো।

—আমি জানতুম—তখনই জানতুম। ধিঙ্গি একটা পরের মেয়েকে বাড়ীতে এনে—কাকার জ্বলন্ত চোখে আগুন ঠিকরায়: এক হাতে তালি বাজে কখনো? ইদিকে ইসারা না থাকলে ভোলা সাহস পায়?—ঠিক মামীমার মতো করেই চুলের মুঠিটা টেনে ধরেন, একটা চড়েই দাঁত-কপাটির উপক্রম হয় মেয়েটার।

—বাইরের আপদ জুটিয়ে এনে ছেলের কেলেঙ্কারী, বাড়ীর বদনাম। বিষের ঝাড় যদি আজই উপড়ে না ফেলেছি তো—

আর একটা চড় পড়ে। বাঁ কানের পেতলের আংটিটা ভেঙে গালের নরম মাংসের মধ্যে বিঁধে যায়। মেয়েটার চোখের সামনে সব অন্ধকারে মুছে আসতে থাকে।

আহা-হা করেন কি চক্কোত্তি মশাই—পাটোয়ারী ছুটে আসে বাইরের ঘর থেকে। লোকটার আসল নাম কী মেয়েটা জানে না, নানা রকম ব্যবসার কাজে ঘুরে বেড়ান, লোকে তাকে পাটোয়ারী বলে ডাকে।

পাটোয়ারী হাত ধরে টেনে নেয় কাকাকে: করেন কি—করেন কি! অতটুকু মেয়ে—মরে যাবে যে।

—মেরেই ফেলব!—কাকার শাঁ শাঁ করে নিঃশ্বাস পড়ে: সাতপুরুষে যা কখনো শুনিনি, তাই হল এই বাড়ীতে। সব এই হারামজাদী মেয়েটার জন্যে। আর আসুক একবার ভোলা। চামড়া যদি পিঠের সব চামড়া তুলে না দিই তো—

ঝর-ঝর-ঝড়াং

মেয়েটা দারুণভাবে জেগে ওঠে, কী একটা চিৎকার করে, তারপর আর কিছু বুঝতে পারে না। আকাশটার আধখানা জুড়ে কালো মেঘে বিদ্যুৎ চমকায়, আহা-হা করে ওঠে পাটোয়ারী, একটা ডোবা বাবলা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে বিলের জলে ডুবে যায় নৌকোটা।

মেয়েটাও ডুবে যাচ্ছিল, কতগুলো লিকলিকে বুনো ঘাস তার পা জড়িয়ে ধরে টেনে নিচ্ছিল অতলে। কিন্তু পাঁচশো-সাতশো টাকার জিনিস অত সহজে বরবাদ হতে দিতে পারে না পাটোয়ারী। দাঁড় টানতে টানতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, বিদ্যুতের ঝলকে কখন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল চোখ, আর সেই ফাঁকে পোষমানা বাঘিনীর চাইতেও বিশ্বাসঘাতক এই বিল কখন নৌকোটাকে তুলে দিলে ডুবো বাব্লা গাছের ওপর। কিন্তু ভুল যা হওয়ার হয়েই গেছে, অত সহজে পাটোয়ারী লোকসান হতে দিতে পারে না এতগুলো টাকাকে।

শক্ত বাহুতে জল টানতে টানতে ছপ ছপ করে এগিয়ে আসে, একটা ডুব দেয়, একটু খোঁজে, তারপর সেই চুল ধরেই টেনে ভাসিয়ে তোলে মেয়েটাকে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, পাটোয়ারী দেখতে পায়, হাত ত্রিশেক দূরেই বুনো মোষের পিঠের মতো এক ফালি ডাঙা জেগে রয়েছে, কয়েকটা ঝোপ-ঝাড় দেখা যাচ্ছে তার ওপর।

বিলের ভারী জল—টানা যায় না। হাত ভেরে আসে, বুকটা ফেটে যেতে চায়। মেয়েটাকে ভাসিয়ে রাখাও কম ঝঞ্ঝাট নয়। এখন হু হু করে হাওয়া দিয়েছে, বড়ো বড়ো ঢেউ উঠছে—সেগুলো পচাপাতা আর রাশি রাশি কুটো নিয়ে মুখের ওপর এসে আছড়ে পড়ে। তবু অসুরের মতো মেয়েটাকে টানতে থাকে সে—এক হাতে জল কাটে, দু পায়ের ধাক্কায় প্রাণপণে এগোয়। ত্রিশ হাত দূরের ডাঙাকে ত্রিশ মাইলের মতো মনে হয় তার।

আঃ—এই ডাঙা। আর একটু—আরো একটু।

মেয়েটাকে প্রথমে ঠেলে তুলে দেয় সে। মেয়েটা হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপে কিছুক্ষণ।

হাঁপাতে হাঁপাতে পাটোয়ারী বলে, উঠে যা—ওপরে উঠে যা। বেঁচে গেলি এ যাত্রা—তোর বাপের ভাগ্যি বলতে হবে! ভাগ্যিস এই ডাঙাটুকু সামনে ছিল, নইলে—

মেয়েটা টলতে টলতে ওপরে উঠে যায়। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ডাঙাটার ওপর।

পাটোয়ারী এবার কোমরটা পরীক্ষা করে নেয়। না—টাকার গেঁজেটা ঠিক আছে। নোটগুলো ভিজে গেছে, কিন্তু সেজন্যে বেশী ভাবনা নেই শুকিয়ে নিলেই চলবে।

তারপর পেছল মাটিতে পা দিয়ে উঠতে যেতেই আবার সারা আকাশটাকে খান খান করে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকায়।

আর সেই বিদ্যুতের তীব্র সাদা আলোয় প্রেতলোকের বিভীষিকা দেখতে পায় পাটোয়ারী। সমস্ত ডাঙাটায় সাপ—শুধুই সাপ! ঝোপের পাতা দেখা যায় না—মাটিও দেখা যায় না বলতে গেলে। কালো, লালচে, ছিটধরা, হলদে ডোরাকাটা—অসংখ্য সাপ। হাজার হাজার না লক্ষ লক্ষ? কেউটে, খরিস, চিতি, চন্দ্রবোড়া, হেলে—বান-ভাসি সমস্ত সাপ যেন ওই ডাঙাটুকুর ওপরেই আশ্রয় নিয়েছে! পৃথিবীতে এমন দুঃস্বপ্ন এর আগে কেউ কোনো দিন দেখেনি!

কোথায় শুয়ে পড়েছে মেয়েটা? কিসের ওপর?

—নেমে আয় পালিয়ে আয় ওখান থেকে—

একটা বীভৎস চিৎকার করে পাটোয়ারী। আবার বিদ্যুৎ ঝলকায়। ডাঙায় ওঠবার আগে পাটোয়ারী একটা গাছের ডাল চেপে ধরেছিল, কে যেন শিস্-শিস্ করে সেখানে তীব্র গলায় শিস্ টানে। কেউটের ফণা দুলছে!

পাটোয়ারী আর অপেক্ষা করে না। দ্বিগুণ বেগে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে জলের ভেতর।

সমস্ত আকাশ এখন আলকাৎরার চাইতেও কালো। বিলের জলে দামাল হাওয়া আর খ্যাপা ঢেউ। সেই বীভৎস সাপের ডাঙা থেকে অন্ধকার কূলহীন বিলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাটোয়ারী—প্রাণপণে সাঁতরাতে থাকে—খানিক পরে রাশি রাশি ঢেউ আর নোংরা দাঁতের মতো লালচে সাদা ফেনার ভেতর তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।

আর মেয়েটা যেখানে শুয়ে পড়েছিল, ক্লান্তিতে অবসাদে এলিয়ে থাকে সেখানেই। তার বোজা চোখ দুটোতে এতক্ষণে ঘুম নেমে এসেছে—যে ঘুম মৃত্যুর চাইতেও মনোরম।
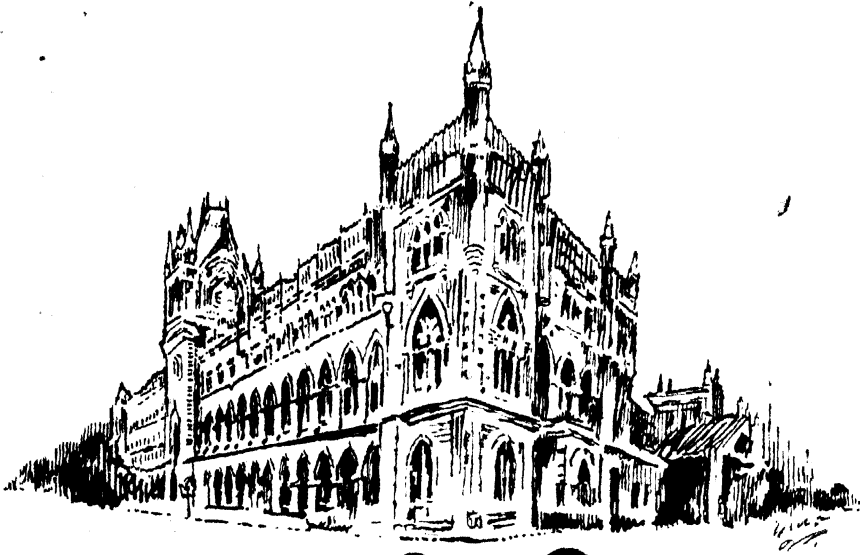
বার লাইব্রেরী ক্লাব

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

ইকোর্টের সেনটেনারী তো এই সেদিন হয়ে গেল। আসলে হাইকোর্ট কিন্তু পুরনো সুপ্রীম কোর্টেরই এক একটানা প্রতিষ্ঠান। সুপ্রীম কোর্টেরই সেই জজ সেই রেজিস্ট্রার সেই মাস্টার—সবই হাইকোর্টে এলেন, এমন কি সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার-অ্যাটর্নী পর্যন্ত। শুধু পুরনো সদর দেওয়ানী আদালতটাকেও নতুন হাইকোর্টের আওতায় এনে ফেলা হল। সেটা হল তার অ্যাপেলেট সাইড। আর সুপ্রীম কোর্ট তার নাম বদলিয়ে রয়ে গেল হাইকোর্টের ওরিজিনল সাইড হয়ে।

১৮৬২ সালে যখন হাইকোর্ট হল তখন ইংরেজ-রাজত্ব ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র বিস্তীর্ণ। সদর মফঃস্বলের প্রভেদ তখন অনেকটা কমে এসেছে। যেখানে যাওয়া যাক না কেন সবখানেই একই আইন, আদালতে অনেকটা একই রকমের কার্যবিধি। কোলকাতা শহরের চতুঃসীমার মধ্যে যেসব মামলা উঠত সে সবের বিচার হত পুরনো সুপ্রীম কোর্টে, আর মফঃস্বলের মামলার আপীলের শুনানী হত কোলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে। হাইকোর্ট হতে সব একাকার হয়ে গেল। এই হিসেবে আসলে হাইকোর্টের বাই-সেনটেনারীর দিন ঘনিয়ে এল।

কোলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৭৩ সালে এক বিলিতী রেগুলেটিং অ্যাক্টের বলে। কিন্তু কোর্ট চালু হয় ১৭৭৪ সালে। ঐ সময় সুপ্রীম কোর্টের চারজন জজ—একজন চীফ জাস্টিস আর তিনজন পিউনিজজ—ইংল্যাণ্ডের রাজার সনদ হাতে করে জাহাজে চড়ে সোজা কোলকাতার চাঁদপাল ঘাটে এসে নামলেন। তাঁদের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অন্য এক জাহাজে চড়ে এলেন জন কয়েক ব্যারিস্টার অ্যাটর্নী সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিশ জমাবার মতলবে।

সুপ্রীম কোর্ট বসার আগে দু-একজন অ্যাটর্নীর নাম পুরনো রেকর্ডে দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা আরো পুরনো মেয়র্স কোর্টে প্র্যাকটিশ করতেন। কিন্তু ব্যারিস্টার তখন একজনও ছিলেন না। মেয়র্স কোর্টের মতো ছোটো আদালতে প্র্যাকটিশ করবার জন্যে কোনো ব্যারিস্টারই সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এদেশে আসতে চাইতেন না—এলে মজুরী পোষাবে না বলেই মনে করতেন। জজেদের মধ্যে যেমন চিফ জাস্টিস, সুপ্রীম কোর্টে ব্যারিস্টারদের মাথা তেমনি অ্যাডভোকেট-জেনারেল। এই অ্যাডভোকেট-জেনারেল ব্যারিস্টারদের মধ্যে থেকে ইলেকসান করে নেওয়া হয় না, সরকার তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে ঐ পদ দেন। এই নিয়ম এখনো চলে আসছে। সুপ্রীম কোর্টের প্রথম অ্যাডভোকেট-জেনারল — চারল্‌স নিউম্যান—জজেদের সঙ্গেই এসেছিলেন। নিউম্যান সামান্য লোক, মনে করে রাখবার মতো কোনো কেরামতি তিনি দেখিয়ে যান নি। তবে তাঁর মুরুব্বির জোর ছিল, সেটা স্বীকার করতেই হয়।

ইংরেজরা পৃথিবীর যেখানে সেখানে বসতি গেড়েছেন বা কলোনী ফেঁদেছেন সেখানেই তাঁরা একটা করে বড়ো আদালত বসিয়েছেন—তা সে কি সুপ্রীম কোর্ট আর কি হাইকোর্ট। আর সেই সব আদালতে বিচারকার্যে সাহায্য করবার জন্যে বিলিতী জজদের সঙ্গে বিলিতী ধরণের আইনজীবী-দেরও অর্থাৎ ব্যারিস্টার-অ্যাটর্নীদের—আমদানি করা হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে ব্যারিস্টার অ্যাটর্নীর মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। আমাদের দেশে ভেদনীতিটা এককালে খুব প্রবল থাকায় এখন সেটা খুব তাড়াতাড়িই চলে যাচ্ছে। সুতরাং তফাতটা কি, সেটা জানবার জন্যে কারো
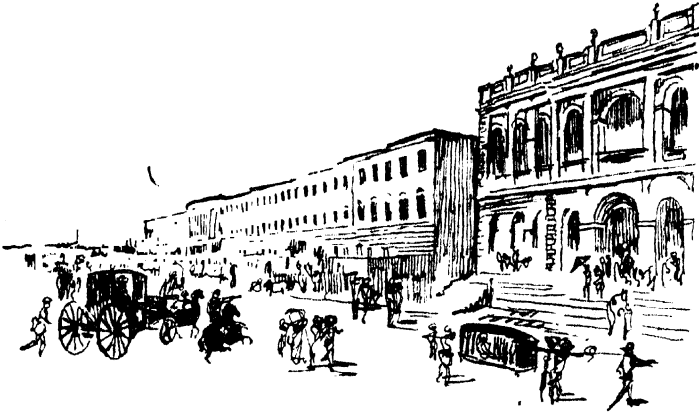
পুরনো কোর্টহাউস। মেয়র্সকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট এই বাড়ির একতলায় ছিল

তেমন আগ্রহ হবে না। এখন সবই তো একাকার হয়ে পড়ল। সবাই মিলে ভেদ দূর করার জন্যে যেমন উঠে পড়ে লেগেছেন তাতে মনে হয় নাভভেদটুকুও আর থাকবে না।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় ন্যায়-বিচারের প্রতিষ্ঠাতে আর প্রজাদের হক্ রক্ষার ব্যাপারে বড়ো-বড়ো নামজাদা জজেদের যেমন হাত, ঠিক তেমনি হাত হচ্ছে বড়ো বড়ো নামজাদা ব্যারিস্টারদের। দুর্জনের শাসন আর সুজনের প্রতিপালন যেমন জজেদের কাজ, তেমনি জজেদের কাছ থেকে প্রজাদের জন্যে সুবিচার আদায়ের কাজ ব্যারিস্টারদের। ইংল্যাণ্ডের বাইরে ইংরেজ জজ-ব্যারিস্টাররা যে এই ন্যায়ধর্মকে সব সময় বজায় রেখে চলতে পেরেছেন, তা নয়। অনাচার -অত্যাচার খানিক ঘটে গেছে, বিশেষ করে পোলিটিকল মামলায়। কিন্তু স্বীকার করতেই হয় তার পরিমাণ কম; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সুবিচার পাওয়া গেছে। আর সব চেয়ে যেটা বড়ো কথা—এই সব জজ-ব্যারিস্টাররা যেখানে যেখানে গিয়েছেন সেখানেই ন্যায়বিচারের একটা পরম্পরা সৃষ্টি করে গেছেন। এরই ফলে এদেশে অল্প দিনের মধ্যেই ইংরেজেরা এক ঘোর অব্যবস্থার মধ্যে থেকে দেশকে টেনে বের করে সেখানে নিয়মের শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কোলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট বসল বটে, কিন্তু সেখানে ব্যারিস্টারদের দুদণ্ড বসবার জন্যে আলাদা কোনো ঘর ছিল না। কেস ডাক হলে দারুণ গরমে মাথার উপর উইগ চড়িয়ে, আঁটসাঁট কোর্তাকুর্তির উপর লম্বা জোব্বা ধরনের গাউন উড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে কোর্টঘর ছোটা, আবার সেখান থেকে ঘেমে নেয়ে ফিরে আসা, আর যাঁদের চেম্বার নেই তাঁদের তো ঐ খুপরির মতো আলো-বাতাসের সম্পর্কহীন কোর্ট ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা—সে যে কি দারুণ কষ্টকর তা ভাবতে গেলেও এখন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সময় যে কতোখানি বৃথা নষ্ট হত তারও হিসেব করতে বসলে চমকে উঠতে হয়।

১৮২৫ সালে সুপ্রীম কোর্টে লংভিল ক্লার্ক বলে এক ব্যারিস্টার প্র্যাকটিশ করতেন। ইনি কেম্ব্রিজের এম-এ, ইনার টেম্পল থেকে বার-এ কল্ড। কালক্রমে এফ-আর-এস হন—যা তাঁর আগে কি তাঁর সময় এদেশে আর একজনও কেউ ছিলেন না। এ-হেন ব্যক্তি যে কি কারণে দেশে না থেকে বিদেশে চলে এলেন, তার কারণ এখন খুঁজে বের করা শক্ত। ক্লার্ক অদ্ভুত করিতকর্মা লোক। এদেশে বিচিত্ররকমের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ। তখনকার দিনের বরফঘর (আইস হাউস) এ'রই সৃষ্টি। আমেরিকা থেকে প্রায় নিঃখরচায় চাঙ চাঙ বরফ জাহাজে করে আনিয়ে আইস হাউসে জমিয়ে রাখা—এ তাঁরই মাথা থেকে বেরিয়েছিল। মেট্‌কাফ হলের প্রতিষ্ঠাও এ'রই দ্বারা। এই হল-এর দোতলায় এক পাবলিক লাইব্রেরী, এক তলায় চাষবাস সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির এক মিউসিয়ম ছিল। এই লাইব্রেরীই পরে ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরী ওরফে ন্যাশনাল লাইব্রেরী।

লংভিল ক্লার্ক সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিশ সুরু করা অবধি একটা ল-লাইব্রেরীর কথা অনেকেই বলছেন যাতে করে ব্যারিস্টাররা ঘুরপাক খেতে খেতে নাকালের একশেষ না হয়ে একটা ঘরে স্থির হয়ে বসে পড়াশুনো, ড্রাফ্‌টিং-এর কাজকর্ম করতে পারেন। আবার দরকার মতো সেখান থেকে কোর্টঘরে গিয়ে কেশ চালিয়েও আসতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টে তখন মাত্র দশজন ব্যারিস্টার। তাঁদের কারো কাছে সব রকম আইনের দরকারী বইগুলো এক সঙ্গে মজুত থাকে না। এই সব বই হাতের কাছে এক জায়গায় পেলে সকলেরই তাতে সুবিধা—শুধু ব্যারিস্টারদের নয়, জজদেরও কোর্ট অফিসারদেরও কাজে লাগে।

১৮২৫ সালের ১৫ই জুন এইসব বিষয় আলোচনার জন্যে লংভিল ক্লার্ক এক সভা ডেকে বসলেন। দশজন ব্যারিস্টার আর ছ-জন কোর্ট অফিসার (এ'দের মধ্যে আবার চারজনই ব্যারিস্টার) সভায় যোগ দিলেন। তখনকার আড্‌ভোকেট-জেনারল, জন্ পিয়ার্সন, সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। সভার উদ্দেশ্য এক ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করা—যে ক্লাবের নাম হবে বার লাইব্রেরী ক্লাব। ইংরেজদের জীবনযাত্রার একটা অঙ্গই হচ্ছে ক্লাব। ক্লাব না হলে তাঁদের কিছুতেই দিন কাটতে চায় না। সোসাল ক্লাব, স্পোর্টিং ক্লাব, প্রোফেশনাল ক্লাব—একটা না একটা ক্লাব তাঁদের চাই-ই চাই। তাঁদের দেখাদেখি এখন আমাদের এ-নেশা বড়ো কম যায় না।

লংভিল ক্লার্ক আগের থেকেই কাজ গুছিয়ে রেখেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের তখনকার রেজিস্ট্রার, জেম্‌স হগ, এক সময় ব্যারিস্টার ছিলেন। পয়সাওয়ালা লোক, তাঁর সংগ্রহে আইনের বই ছিল বিস্তর। ক্লার্ক ছ-হাজার টাকায় সেই সব বই বার লাইব্রেরীর জন্যে নেবার রফা করে রেখে-ছিলেন। খানিক টাকা নিজের পকেট থেকে বায়না দিয়ে বাকি টাকা আস্তে আস্তে দেবার কিস্তিবন্দীও করে ফেললেন। নগদ টাকা ছাড়া ক্লার্ক চারটে ডেস্ক আর কিছু বইপত্র ক্লাবকে উপহারও দিলেন। আর-একজন ব্যারিস্টার মস্ত বড়ো একটা লম্বা টেবিল দিলেন, যাতে সকলে সেই টেবিলে এক সঙ্গে বসতে পারেন। ক্লার্ক সুপ্রীম কোর্টের জজ বুলার-সাহেবকে বলে করে সুপ্রীম কোর্টের ভিতরেই একটা ঘরেরও বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন যেখানে বার লাইব্রেরী ক্লাব বসবে। এখন ক্লার্কের প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করতেই সকলে হৃষ্টচিত্তেই সেটা গ্রহণ করলেন। ঐ দিন
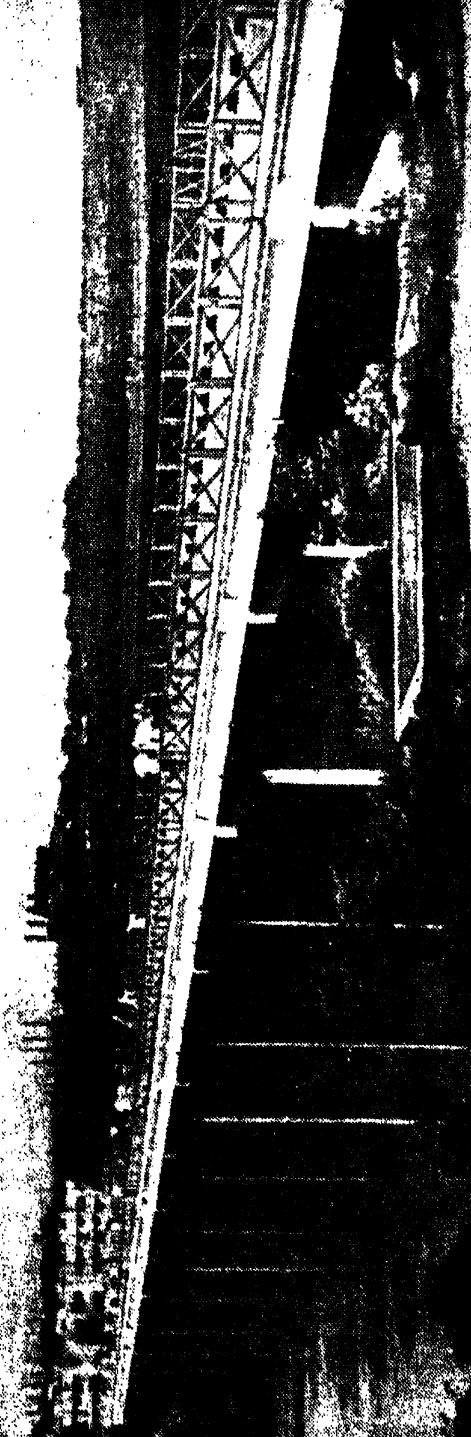
পুরনো সুপ্রীমকোর্ট, এখন এখানে বর্তমান হাইকোর্টের পশ্চিমাংশ

ঐ ঘরেই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল।

ক্লাবটা যে খুব কাজের হয়েছিল তার প্রমাণ—সেই তখন থেকে আজ পর্যন্ত একনাগাড়ে ঐ ক্লাব চলে এসেছে। দশজন প্র্যাকটিশ করছেন এমন ব্যারিস্টার আর আটজন প্র্যাকটিশ করছেন না কোর্টের অফিসার ব্যারিস্টার এই নিয়ে ক্লাবের পত্তন। সেই জায়গায় আজ প্রায় তিনশো মেম্বার। কোর্ট অফিসার আর অ্যাটর্নীদের মেম্বার করা প্রায় ক্লাব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গেছে।

ক্লাবের প্রথম দিশি মেম্বার হলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। পাথুরেঘাটার বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। ১৮৫১ সালে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে পড়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এই কারণে, তিনি পিতার ত্যাজ্যপুত্র হয়ে শেষ পর্যন্ত লন্ডনেই বসবাস করতে থাকেন আর সেইখানেই মারা যান। দিশি ব্যারিস্টার ইনিই প্রথম মিড্‌ল টেম্পল থেকে বার-এ কল্‌ড হন। ব্যারিস্টার হয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোনোদিন প্র্যাকটিশ করেন নি। এক সময় লন্ডন ইউনিভারসিটিতে হিন্দু আইনের লেকচারার ছিলেন। আর এক দিশি ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনেরই মতো কৃশ্চান, আর ঐ মিড্‌ল টেম্পল থেকেই কল্‌ড। কিন্তু আশ্চর্য এই, কি কারণে জানিনে, তিনি বার লাইব্রেরীর মেম্বার হননি।

রাইটার্স বিল্ডিংসের ঠিক পুব ধারে যেখানে আজকাল সেন্ট অ্যান্ড্রুস চার্চ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এককালে কোলকাতার চ্যারিটি স্কুলের একটা দোতলা বাড়ি ছিল। স্কুল বসতো দোতলায়, এক তলায় বসতো মেয়র্স কোর্ট। চ্যারিটি স্কুল ফ্রি স্কুলের সঙ্গে মিশে গিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে উঠে যায়। তখন কোলকাতার টাউন হলের কাজ চলতো এই বাড়িরই দোতলায়। সুপ্রীম কোর্ট হতে মেয়র্স কোর্ট উঠে গেল। তখন অনেকদিন ধরে এই বাড়িরই একতলায় যেখানে মেয়র্স কোর্ট বসতো সেখানে সুপ্রীম কোর্ট ও এজলাস চলতো। এইখানেই বসে ১৭৬৬ সালের জুন মাসের গোড়ার দিকে আটদিন গলদঘর্ম হয়ে মামলা শুনে জুরীরা নন্দকুমার রায়কে জাল করার অভিযোগে দোষী বলে সাব্যস্ত করেন। চিফ্ জাস্টিস সার্ ইলাইজা ইম্পে তাঁর ফাঁসির হুকুম দেন। সাহেবজাতের কান্ড দেখে হিন্দু প্রজারা প্রমাদ গুণলেন—এরা করে কি? গো-ব্রাহ্মণ কোনোটাকেই এরা আমল দিতে চায় না?

১৭৮২ সালে সুপ্রীম কোর্ট এখান থেকে উঠে গঙ্গার ধারের একটা বড়ো বাড়িতে গিয়ে বসে। সেটা এখন বর্তমান হাইকোর্টেরই পশ্চিম অংশ। সুপ্রীম কোর্টের পাশের একটা বাড়িতে লংভিল ক্লার্ক অনেকদিন ধরে বাস করে গেছেন। ১৭৯২ সালে মেয়র্স কোর্টের দরুন সেই পুরোনো বাড়িটা ভেঙে ফেলা হয়। তখন টাউন হল একের পর এক বাড়ি বদলাতে বদলাতে অবশেষে ১৮১৩ সালে এসপ্ল্যানেডে নিজের বাড়ি করে তাতে উঠে যায়। সে-বাড়ি এখনো কোলকাতার টাউন হল। ১৮৬২ সালে হাইকোর্ট হতে সুপ্রীম কোর্টের অবসান, সঙ্গে সঙ্গে সদর দেওয়ানী আদালতেরও শেষ। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম—এই চার প্রদেশের —হাইকোর্টকে আর ঐ পচা পুরনো বাড়িতে মানায় না, তার জন্যে বাড়ির মতো এক নতুন বাড়ির ভিত্তি পত্তন হল ১৮৬৪ সালে। বাড়ি তৈরি শেষ হল ১৮৭২ সালে। ঐ বছর হাইকোর্ট নতুন বাড়িতে উঠে গেল। তার পর থেকে আর কোথাও উঠতে হয়নি, যদিও হাইকোর্টের জুরিসডিকসন কমতে কমতে এখন শুধু পশ্চিমবাংলার চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। হাইকোর্টের বাড়ি ওঠাবার জন্যে যখন পুরনো সুপ্রীম কোর্টের বাড়িটা ভেঙে ফেলা হল তখন হাইকোর্টের ওরিজিনাল সাইড বসত টাউন হলে আর অ্যাপেলেট সাইড বসত ভবানীপুরে—এখন যেখানে প্রেসিডেন্সী জেনারেল বা শেঠ সুখলাল করনানি হাসপাতাল। তখন বার লাইব্রেরী ক্লাবও উঠে গিয়েছিল টাউন হলের ভিতরে একটা ঘরে। হাইকোর্টের বাড়ি উঠতে সেই বাড়িরই দোতলার দুটো ঘর বার লাইব্রেরীকে ছেড়ে দেওয়া হল। কালক্রমে তার পাশের আর একটা ছোট ঘরও বার লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত হল। এর পর তেতলাতেও দুটো ঘর নিতে হল, পুরনো তিনটে ঘরে আর কুললো না।

১৯২৫ সালে ক্লাবের একশো বছর পূর্ণ হওয়ায় শতবর্ষপূর্তি অর্থাৎ এক সেন্‌টেনারী উৎসব হল। ডালহৌসী ইন্সটিটিউটে এই উপলক্ষে এক মহাভোজের আয়োজন হয়। আড়াইশো ব্যারিস্টার আর নিমন্ত্রিত জজ আর অন্যান্য অভ্যাগতেরা প্রায় আরো একশো জন এক সঙ্গে এই ভোজে বসেন। ভোজসভায় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা লংভিল ক্লার্ককে স্মরণ করা হয়। সাঁইত্রিশ বছর ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে লংভিল ক্লার্ক ১৮৬২ সালে রিটায়ার করে স্বদেশে ফিরে যান। পরের বছরেই তিনি সেখানে মৃত হন।

বার লাইব্রেরী ক্লাবের সেন্‌টেনারীতে যেসব ব্যারিস্টার উপস্থিত ছিলেন, একটা লম্বা পার্চমেন্ট কাগজের উপর তাঁদের সবাইকার নামসই আছে। ফ্রেমে বাঁধিয়ে সেটা বার লাইব্রেরীতে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। এ'দের অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই, ক্লাবের বাই-সেন্‌টেনারীর সময় একজনও কেউ আর জীবিত থাকবেন না। তখন ব্যারিস্টার পদবীরই কেউ থাকবেন কি না কে জানে? বার লাইব্রেরীও শুধু ব্যারিস্টারদের জন্যেই থাকবে না। না থাকে নাই থাক। কিন্তু ১৭৭৪ সাল থেকে ন্যায়-বিচারের যে পরম্পরা সৃষ্টি হয়ে এসেছে সে-পরম্পরা, ভরসা করি, লুপ্ত হয়ে যাবে না, মাথা উঁচু করেই গৌরবে দাঁড়িয়ে থাকবে। যাঁরা তখন বার্-এ থাকবেন—তাঁদের যে নামেই ডাকা হোক না কেন—তাঁরা নিশ্চয়ই দেখবেন যাতে একটি সামান্য প্রজাও যেন সুবিচার থেকে কখনো বঞ্চিত না হয়।

নির্মাল্য

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

রামবিরিখ সিং খবরের কাগজের হকার। ছিপছিপে, কালো, লম্বা চেহারা। গায়ে খাকী কোট। পরনে নহাত ধুতি।

ভোর তিনটেয় তাকে উঠতে হয়। তারপরে গোটা কয়েক লেড়ু বিস্কুট সহযোগে এক মগ চা গলাধঃকরণ করে সাইকেল নিয়ে বার হয়। তখনও অন্ধকার থাকে। রাস্তায় কোথাও জল দেওয়া আরম্ভ হয়েছে, কোথাও বা হয়নি। হেড-লাইট জ্বালিয়ে একটি দুটি ট্রাম চলতে সুরু করেছে প্রচন্ড বেগে প্রচুর শব্দ করে। দু' একখানি বাসও চলছে।

এই সময় যেতে হয় খবরের কাগজের অফিসে। রোটারী যন্ত্র থেকে ভাঁজ হয়ে বেরুচ্ছে টাটকা খবরের কাগজ। এই সময় গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে নির্দিষ্ট সংখ্যক কাগজ পাওয়া যায় না।

কাল রাত্রে রামবিরিখের তবিয়ৎ আচ্ছা ছিল না। গা-মাথা ঘুরছিল। কিছুই না খেয়ে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে সারা রাত অঘোরে ঘুমিয়েছে।

ওটা বালিয়া জেলার একটা মেস।

যুক্তপ্রদেশের বালিয়া জেলার কয়েকটি লোক একটা ছোট ঘর নিয়ে থাকে। এক গ্রামের নয়, কিন্তু সবাই এক জেলার। বিভিন্ন সূত্রে এইখানে এসে জমেছে।

কেউ খবরের কাগজের হকার। কেউ ডাকঘরের, কেউ বা সরকারী অথবা বেসরকারী অফিসের পিওন। কেউবা অন্য কোনো কাজ করে।

দূরদেশের লোক। ঘন ঘন বাড়ি যেতে পারে না। কাজের চাপেও বটে, অর্থাভাবেও বটে। রেলের ভাড়া অনেক। বৎসরে একবার দু'বার যায়। গেলে মাস দু' তিন থাকে, নইলে খরচ পোষায় না।

যায় দল বেঁধে। কিন্তু ঘর খালি থাকে না। আর একদল বাড়ি থেকে ফেরে ইতিমধ্যে।

প্রত্যেকের পৃথক পৃথক চৌকা। কেউ কারো হাতে খায় না। সকলে এক জাত নয়। যারা এক জাত, তাদেরও মধ্যে পরস্পরের হাতে খাওয়ার রেওয়াজ নেই।

সবাই নিজের নিজের ধান্ধায় ঘুরছে। কে কখন ফেরে তার ঠিক নেই। কিন্তু ঘর কখনও বন্ধ থাকে না। সকল সময়ই কেউ না কেউ থাকে।

যে যখন ফেরে, ফিরেই নিজের চৌকা বের করে কয়লায় আগুন দেয়। তেল মেখে রাস্তার কল থেকে স্নান করে আসে রাম-নাম গাইতে গাইতে।

উনান ততক্ষণে ধরে গেছে।

তাতে হয় কিছু ভাজে, নয় একটা তর-কারী চড়ায়। আটা মেখে হাতের কৌশলে খানকয়েক মোটা মোটা রুটি বানায়।

গরম রুটি আর তরকারী খেয়ে নিয়ে বাঁ হাতের লোটা থেকে ঢকঢক করে এক পেট জল খায়। তারপরে রাস্তার কলে বর্তন মেজে ঘরের মধ্যে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে।

পরিশ্রমের শরীর। শোয়ামাত্র ঘুম।

নিতান্ত অনুগত ঘুম। কখনও তালে ভুল হয় না। যে সময় বেরুবার কথা, ঠিক তার আগেই ঘুম ভেঙে যায়। ঠিক সময়ে মুখ-হাত ধুয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ে।

রামবিরিখের প্রথম জীবনে গানের ঝোঁক ছিল। কিন্তু কাজের পাহাড় কাঁধে নিয়ে একা একা সংগীতচর্চা চলে না। এখন দেশের জন্যে মন কেমন করলে কিংবা কোনো কারণে মন খেদ জমলে আপনমনে গুনে গুনে করে তুলসীদাসের দোঁহা, কি মীরার ভজন গায়। তাতে মন কিছু ভালো হয়।

কিন্তু কাজ তার এত যে, মন-কেমন করারও সময়াভাব। সমস্ত দিনই তো সাইকেলে করে টো টো ঘোরা। রাত্রে আহারাদি সেরে দড়ির খাটিয়ায় গা গড়ানো-মাত্র চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসে।

দেশের কথা ভাবা কিংবা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জন্যে মন খারাপ করা এ বিলাস যাদের প্রচুর অবসর আছে তাদেরই জন্যে। রামবিরিখের অবসর কম। মাথার মধ্যে সকল সময় ঘুরছে নানা কাজের ফর্দ, —টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত।

রামবিরিখের শরীর ভালো নয়। একটু জ্বর হয়েও থাকতে পারে। মুখটা বিস্বাদ। শরীরও দুর্বল বোধ হচ্ছে। পা দুটো ভারি-ভারি। সাইকেল চালাতে কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু উপায় কি? যথাসময়ে কাগজ বিলি করতেই হবে। চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ না পেলে লোকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। একদিন দেরি করলে পরের দিন আর সে কাগজ নেবে না। একজন দু'জন তো নয়, অনেক খদ্দের। হাতছাড়া হয়ে গেলে সে খাবে কি?

সুতরাং শরীর খারাপ হলেও তাকে বেরুতে হল। সাইকেলে কাগজ বেঁধে ছুটতেও হল। রাস্তা মুখস্থ।

পনেরো বৎসরেরও বেশি এই কাজ সে করছে। বড় ছেলের সমবয়সী হবে কাজ! রাম আশিস্ যেবার হ'ল সেইবারই সে চাচার সঙ্গে কলকাতায় আসে। তখন থেকে এই কাজে।

সুতরাং রাস্তা তার মুখস্থ। কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে কোন্ রাস্তায়, তার-পরে কোন কোন রাস্তায় কোন কোন বাড়িতে কাগজ বিলি করতে হবে, সমস্ত মুখস্থ হয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করে যেতে পারে।

কোন বাড়ির লোক ভোরে ওঠে, হাতে কাগজ দিতে হয়, কোন বাড়িতে ঝি-চাকরের হাতে, কোন বাড়িতে জানালার খড়খড়ি খুলে ফেলে দিতে হয়, সমস্তই মুখস্থ।

রাস্তা অনেকখানি। অনেক বড় রাস্তা, অনেক গলি-ঘুঁজি পার হয়ে হয়ে যেতে হয় অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু মুখস্থ রাস্তায় ধরা-বাঁধা কাজ, রামবিরিখের কিছুমাত্র কষ্টবোধ হয় না।

কিন্তু আজ হচ্ছে। শরীরটা খুব ভালো নয়।

গোয়াবাগানে একটি চায়ের দোকানে প্রতিদিন সে চা খায়, আজ খেতে ইচ্ছে হল না। ঘণ্টা বাজিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। চায়ের দোকানদার বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে। ভাবলে, জরুরী কাজে যাচ্ছে বোধহয়। এখনি ফিরবে বোধ হয়। এ দোকানে চা খাওয়া একটা নেশা। যে একবার ধরে, আর ছাড়তে পারে না।

দোকানীর ভরসা আছে।

কিন্তু রামবিরিখ আর ফিরল না। নিজন স্ট্রীটের কাগজ বিলি করে পাশের একটা গলিতে ঢুকল।

সেখানে দত্তদের বাড়িতে কাগজ বিলি

করার অনেক ঝামেলা। সেই বাড়ির একটি ছোট ছেলে রোজ সকালে যেন তার জন্যেই সদর দরজায় অপেক্ষা করে।

দূর থেকে রামবিরিখকে দেখেই সে চীৎকার করে উঠলঃ রামবিরিখ!

রামবিরিখ হাসল বটে, কিন্তু প্রমাদ গণল।

কাল কোনোমতে পরিত্রাণ পেয়েছে বটে, কিন্তু আজ পাওয়া কঠিন।

—রামবিরিখ!

আনন্দে খোকার পা নাচছে। কাল রামবিরিখ ফাঁকি দিয়েছে বটে, কিন্তু আজ আর তা হচ্ছে না।

ব্যস্তভাবে রামবিরিখ বললে, কাগজটা বাবুকে দিয়ে দাও তো দাদাবাবু!

—না। তুমি জানলা দিয়ে ফেলে দাও।

রামবিরিখ মহা মুস্কিলে পড়ল। খোকার সাইকেলে চড়ার সখ এবং ওকে দেখলেই সাইকেলে চড়ার বায়না ধরে। মাঝে মাঝে রামবিরিখ চড়ায়। ওকে নিয়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা খানিকটা ঘুরিয়ে আবার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যায়।

কিন্তু ক'দিন থেকে ওর শরীরটা খারাপ বলে পারছে না। কাল-পরশু অনেক কৌশলে ফাঁকি দিয়েছে। আজ পারে কি না সন্দেহ।

রামবিরিখ চিন্তিত হল।

খোকা সাইকেল চেপে ধরে। তাকে কোনোমতেই ছেড়ে দেবে না। দু'দিন ঠকে আর সে রামবিরিখকে চোখের আড়াল করতে প্রস্তুত নয়।

রামবিরিখের এখনও অল্প কিছু কাগজ বিলি করার আছে। সে হতাশভাবে সিঁড়ির উপর বসে পড়ল। ক্লান্তির জন্যে সে আর দাঁড়াতে পারছিলও না।

বললে, একটু চা খাওয়াতে পার খোকাবাবু। ভারী পিয়াস পেয়েছে।

খোকা ওর চেয়ে কম চালাক নয়। বললে, ফিরে এসে।

অর্থাৎ ওকে সাইকেলে করে আগে ঘুরিয়ে আনতে হবে। তারপর ফিরে এসে চা খাওয়াবে।

রামবিরিখ সকাতরে বললে, চা না হয়, একটু পানি খাওয়াও। বড় পিয়াস পেয়েছে।

ওকে ছেলেরা সবাই ভালোবাসে। যে যে বাড়িতে কাগজ দেয়, সে সমস্ত বাড়ির সব ছেলে-মেয়ের সঙ্গেই ওর বন্ধুত্ব। কাগজ বিলি করার পরে এক এক বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সেই বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কিছুক্ষণ হৈ হুল্লোড় করে, অনেক সময় তাদের জন্যে কিছু কিছু স্বল্পমূল্যের উপহারও নিয়ে আসে।

খোকা ভয় পেলে, জল আনতে গেলে সেই ফাঁকে রামবিরিখ পালাতেও পারে। কাল যেমন করেছিল। কিন্তু ওর মুখ দেখে

একটি ছোট খুকী এসে দাঁড়াল

মমতাও হল।

বললে, তুমি পালাবে না তো?

—না, না।

—চা আনব? না জল?

—জলই আন।

খোকা ওর দিকে মুখ করে পিছু হটতে লাগল, যাতে ও না পালায়। তারপরেই একটা ছুট দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক গ্লাস জল আনবার জন্যে।

এক মিনিটও হবে না।

এক ছুটে যাওয়া আর জল নিয়ে আসা।

খোকা ফিরে এসে দেখলে, রামবিরিখ উধাও। সেও নেই, তার সাইকেলও নেই।

জলের গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খোকা চীৎকার করতে লাগলঃ রামবিরিখ, ও রামবিরিখ!

রামবিরিখ তখন সবে গলির মোড়টা ঘুরেছে। খোকার তীক্ষ্ণ চীৎকার তার কানে এসে পৌঁছুল। কিন্তু সে আর ফিরলে না। দেহ একেবারে অবসন্ন। ইচ্ছা থাকলেও তার ফেরবার ক্ষমতা নেই।

একেবার ভাবলে ডেরায় ফিরে যায়।

কিন্তু কয়েকটা তাগাদা না করলেই নয়। দেশ থেকে চিঠি এসেছে ছেলেটার জ্বর। তাকে দেশে যাবার জন্যে লিখেছে। হয়তো জ্বরের জন্যে নয়। জ্বর বেশি হতে পারে, নাও হতে পারে।

অবশ্য সাধারণত অসুখ বিসুখ বেশি না হলে বাড়ির লোক খবর দেয় না। দূরের মানুষকে অকারণ ভাবিয়ে কোনো লাভ নেই। বিশি অসুখ, ভগবানের দু' পাঁজিয়া আপনেই সেরে যায়। সুতরাং যদিও স্পষ্ট করে কিছু লেখেনি, বেশি অসুখ হওয়াও বিচিত্র নয়।

আবার এও হতে পারে যে, অনেকদিন দেশে যায়নি বলেই যাবার জন্যে লিখেছে।

ঠিক যে কি হতে পারে রামবিরিখ ঠিক করতে পারছে না। কিন্তু মনটা খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছে। ছেলেটার জন্যেও বটে, অনেকদিন দেশে যায়নি বলেও বটে।

স্থির করেছে যত শীঘ্র সম্ভব একবার বাড়ি যাবে।

তার জন্যে কিছু টাকা-পয়সা প্রয়োজন। গেলে মাস দুয়েকের মধ্যে ফিরছে না। কাগজ বিলি করার লোকের অভাব হবে না। সে লোক আছে। কিন্তু অফিসের কিছু টাকা দিয়ে যেতে হবে। তার নিজের রাস্তা-খরচ আছে। বাড়ির খরচ আছে। তাছাড়া বাড়ির প্রেজেন্টস আছে। বহুর আর বাচ্চাটার।

সাইকেলে চলতে চলতেই রামবিরিখ হাসলে।

কি কুক্ষণে একবার যে সে ফুলেল তেল, স্নো, পাউডার আর সাবান নিয়ে গিয়েছিল, এখন প্রত্যেক বারেই অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ও কটা জিনিস থাকবেই।

দিনকাল কি আশ্চর্য রকম বদলেছে।

রামবিরিখের গায়ে খাকী কোট। খালি গায়ে কোথাও বেরোয় না। ওর পিতামহ জামা গায়েই দিতেন না। পিতার এক পাঞ্জাবী আর এক পাগড়ি ছিল। মজলিসে কিংবা শহরে যেতে হলে গায়ে দিতেন।

মেয়েদের গায়ে ছিল ভারী-ভারী রুপোর

গহনা। ওরা নয় বাইরে থেকে টাকা পাঠায়। **এখন** বৌদের গায়ে হাল ফ্যাশানের হালকা সোনার গহনা।

সেনেদের বাড়ির সামনে রামবিরিখ সাইকেল থেকে নামল। কাগজের দামটা নিতে হবে।

ওদের বাড়ির সদরের গলিতে একটা বেঞ্চ পাতা থাকে। রামবিরিখ মাঝে মাঝে ওখানে শুয়ে ঘুম দিয়েছে দুপুর বেলায়। বেঞ্চটা দেখে তার ক্লান্ত দেহ আজও উসখুস করে উঠল।

একবার হাঁক দিলে, দিদিমণি!

তারপরেই বেঞ্চটা ঝেড়ে হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

দেহ ভেঙে আসছে। চোখ টানছে।

তার মধ্যে আবার হাঁক দিলে : দিদিমণি!

একটি ছোট খুকী এসে দাঁড়াল। রামবিরিখকে শুয়ে থাকতে দেখে সে বিস্মিত হল না। এই সময় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ফিরে সে মাঝে মাঝেই অমনি করে শোয়।

বললে, কি বলছ?

—বাবুর কাছ থেকে খবরের কাগজের দামটা নিয়ে এস তো।

—কত?

—চার রুপেয়া আশি নয়া পয়সা।

সেন-গৃহিনীর মনটা বড় নরম। রামবিরিখকে এই অবস্থায় ফিরতে দেখলে মাঝে মাঝে চা-খাবার খাওয়ান।

খুকু জানে তা।

জিজ্ঞেস করলে, চা খাবে রামবিরিখ?

চায়ের আহ্বান রামবিরিখ বড় একটা প্রত্যাখ্যান করে না। সকলেই তাকে ভালোবাসে। সব বাড়িতেই সে ঘরের লোকের মত। প্রায় প্রতি দিনই কোথাও না কোথাও চা-খাবার তার জোটেই। কিন্তু আজ চা খেতে তার ইচ্ছাই হল না।

ঘাড় নেড়ে জানালে খাবে না।

খুকু চলে গেল।

বাপের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যখন ফিরল, তখন রামবিরিখ অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

—রামবিরিখ, ও রামবিরিখ?

সাড়া নেই।

রামবিরিখের গাঢ় ঘুমের সঙ্গে খুকুর পরিচয় আছে। একেবারে মড়ার মতো ঘুমোয়। নিজে থেকে না ভাঙলে কারও সাধ্য নেই তার ঘুম ভাঙায়। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না।

ওরা কেউ তখন তাকে বিরক্ত করে না। ঠিক সময়ে নিজেই সে ওঠে। উঠলে আর এক মুহূর্তও বসবে না। সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়বে।

এই তার দস্তুর।

সুতরাং আর তাকে ডাকলে না। টাকা নিয়ে ফিরে গেল।

তখন বিকেল সাড়ে তিনটে।

কলে জল এসেছে। নীচে ঝিয়ের বাসন মাজার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

এই সময় সেন-গৃহিণীর ঘুম ভাঙে। কর্তার ঘুম আর একটু পরে ভাঙবে। ছেলে-মেয়েরা এতক্ষণ চুপি চুপি খেলা করছিল। বাবা মার ঘুম ভাঙার সময় হয়ে আসছে বুঝে এখন স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলছে।

চাকরটা হাসতে হাসতে গৃহিণীকে এসে জানালে : রামবিরিখ এখনও ঘুমুচ্ছে!

গৃহিণী ধড়মড় করে উঠে বসলেন : সে কি রে? এতক্ষণ তো ও ঘুমোয় না!

—না। একেবারে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

চাকরটা হাসতে লাগল।

গিন্নি বললেন, আহা! ডাকিস না। ঘুমুক। রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, সারা দিন তো সাইকেলে শহর চষে বেড়ায়। ঘুমোয় যদি ঘুমুক।

তারপরেই বললেন, দুপুরে খাওয়া হয়েছে কি না কে জানে।

—কি করে হবে? সেই দশটা থেকে তো ঘুমুচ্ছে।

—আহা রে! চা হলে একটু চা-খাবার দিস। জিজ্ঞেস করিস খাওয়া হয়েছে কি না আহা রে!

একটু পরেই চা এল।

গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন, রামবিরিখকে দিয়েছিস?

—সে তো এখনও ঘুমুচ্ছে। ডাকলাম, সাড়া পেলাম না।

—বলিস কি রে! এখনও ঘুমুচ্ছে!

—হ্যাঁ।

চাকরটা চা নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, গৃহিণী ডেকে বললেন, শোন্। এইবার ডেকে তোল। সেই দশটায় শুয়েছে আর এখন চারটে বাজে!

একটু পরেই চাকরটা ফিরে এল : মা!

—কি রে?

—রামবিরিখ তো জ্বরে বেহুঁস!

—জ্বর!—গৃহিণী চমকে উঠলেন।

—জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ডাকতে চোখ মেলে চাইলে, দুই চোখ জবাফুলের মতো লাল!

গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গের মৌজ ছুটে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, কি সর্বনাশ! চল্, চল্, দেখি গে। এ কি গেরো!

পাশের ঘরে সেন মহাশয় তখন চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে সবে গড়গড়ার নলটা মুখে তুলেছেন।

গৃহিণী তাঁর কাছে গিয়ে পড়লেন : ওগো শুনছ?

ডাকের ভঙ্গীতে কর্তা চমকে উঠলেন : কি হল?

—রামবিরিখ সেই দশটায় শুয়েছে, এখনও ওঠেনি।

—তা আমি কি করব?

—সে জ্বরে বেহুঁস। দুই চোখ জবা-ফুলের মতো লাল!

—সে আবার কি!

—হ্যাঁ।

গৃহিণী ছুটলেন। তাঁর পিছু পিছু কর্তাও।

—রামবিরিখ! ও রামবিরিখ!

অনেকবার চীৎকার করে ডাকাডাকির পর রামবিরিখ চোখ মেলে চাইলে। দুই চোখ, সত্যিই, জবাফুলের মতো লাল!

গৃহিণী কর্তার দিকে চাইলেন।

—কি করা যায়?

—হাসপাতাল। অ্যাম্বুলেন্স ডাকি।

কর্তা অ্যাম্বুলেন্সকে টেলিফোন করলেন। অ্যাম্বুলেন্স এল আধ ঘন্টা পরে।

ইতিমধ্যে রামবিরিখ ভুল বকতে সুরু করেছে :

কেয়া বাচ্চা! আব তুম আচ্ছা হো যাওগে। তুমকো ওয়াস্তে কেয়া উমদা উমদা চীজ লায়া!

রামবিরিখের রোগরিক্ত মুখ অপার্থিব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে!

কয়েক মিনিটের কঠিন স্তব্ধতা।

ও কোথায় থাকে কেউ জানে?

কেউ জানে না। জানবার কোনো প্রয়োজন কেউ কখনও বোধ করেনি। এই এতকালের মধ্যে। সে রোজ আসে, রোজ তাকে দেখা যায়, ঠিকানার কৌতূহল মেটাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

দেশের ঠিকানা?

তা তো নয়ই।

কর্তা বললেন—অ্যাম্বুলেন্স আসছে। হাসপাতালে নিয়ে যাবে। কিন্তু ওর দেশোয়ালী কেউ যদি থাকে, তাকে খবর দেওয়া দরকার। আপিসে খবর দিলে তাঁরা হয়তো ব্যবস্থা করতে পারেন।

হঠাৎ রামবিরিখ ছটফট করে উঠল। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার মুখ কুঁচকে কঠিন হয়ে উঠল :

আমি যাচ্ছি খোকাবাবু। কেঁদ না। আজ তোমাকে সারা কলকাতা ঘোরাব। রোনা মৎ।

এতক্ষণ পরে অ্যাম্বুলেন্স এল। রামবিরিখের বেহুঁস দেহটা গাড়িতে তুলে হর্ণ বাজিয়ে নিয়ে চলে গেল।

ঝড়ের পরে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গাঁয়ের একটি ছেলে পথ দেখিয়ে আনছিল। সে একেবারে ভিতরের উঠানে এনে শক্তিপদকে দাঁড় করিয়ে দিল। হাতের হোল্ডঅল আর স্যুটকেসটা নামিয়ে রাখল শক্তিপদ। চারদিকে স্তব্ধ। না, কান্নাকাটির কোন শব্দ নেই। উঠানের পশ্চিমে উত্তরে পূবে ছোট বড় খানকয়েক ঘর। টিনের চাল, বাঁখারির বেড়া, মাটির ভিত। জীর্ণ ঘরগুলি পড়ো পড়ো করছে কিন্তু পড়ছে না। তারাও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমের ঘরখানিই বড়। তার পিছনে বাঁশের ঝাড়। বিকেলের পড়ন্ত রোদ তার আগায় উঠেছে। চিকমিক করছে পাতাগুলি।

শক্তিপদ ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইয়ে একটা খবর দাও তো দেখি। বড় ছেলেটির নাম যেন কী। ঠিক মনে পড়ছে না।'

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তারাদাস। ও তারু, এদিকে আয়। তোদের বাড়িতে অতিথ এসেছে।'

হাসির সময় নয় তবু একটু হাসি পেল শক্তিপদের। ছেলেটি বড় গ্রাম্য। গ্রামের ছেলে গ্রাম্য তো হবেই।

তার হাঁক-ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে কিলবিল করে বেরিয়ে এল।

'কে? কে এসেছে রে?'

শক্তিপদ তাদের দিকে তাকাল। মেয়ে-গুলির মাথার চুল ঠিকই আছে। ছেলেদের মাথা ন্যাড়া। কিন্তু একী। এরই মধ্যে সব হয়ে গেল। সবে তো চারদিন।

বড় ছেলেটি—বোধ হয় বছর চৌদ্দ হবে তার বয়স। সামনে এগিয়ে এল। বলল, 'কে আপনি?'

শক্তিপদ বলল, 'তুমি আমাকে আরো ছোট বয়সে একবার দেখেছ। বোধ হয় মনে নেই। আমি তোমাদের রাঙামামা। তোমার মাকে গিয়ে বল আমি এসেছি।'

তারাদাস সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে শক্তিপদর ধুলোমাখা জুতো ছুঁয়ে প্রণাম করল। তারপর উঠে একটু আগে চিনতেও পারেনি তারই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পরম অভিমানে নালিশ জানাল, 'মামা, বাবা নেই।'

ঠোঁট দুটি স্ফীত, চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে।

শক্তিপদ সস্নেহে তার পিঠে হাত রাখল। ছেলেটি রোগা। হাতের তালুতে হাড় ঠেকে। শক্তিপদ একটুকাল সেই হাড় কখানায় হাত বুলোল। তারপর সান্ত্বনার বদলে একটি অকিঞ্চিৎকর তথ্য তাকে শোনাল 'আমি টেলিগ্রাম পেয়ে এসেছি।'

খবর দেওয়ার জন্যে বাকি ছেলে-মেয়েগুলি ভিতরে গিয়েছিল। কিন্তু সুবর্ণ এল না।

ছেলেরা ফিরে এসে বলল, 'মা কাঁদছে। মা আসবে না।'

বছর পাঁচছয়ের একটি মেয়ে গামছাকে শাড়ির মত করে পরেছে। সে পরম বুদ্ধিমতীর মত বলল, 'মার লজ্জা করে।'

তারাদাস বলল, 'মামা, আপনি ওদের সঙ্গে ভিতরে যান। আমি স্যুটকেস আর বিছানাটা তুলে আনছি।'

সামনে একফালি সরু বারান্দা। সামনের দিকটা খোলা, পিছনের দিকটা ঘেরা। কেমন যেন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত। সেই সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠ শোনা গেল, 'কে বাবা, কে তুমি।'

প্রথমে চমকে উঠল শক্তিপদ, শিরশির করে উঠল গা। ছোট ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'কে উনি।'

কে একজন বলল, 'ঠাকুরমা। দুদিন অজ্ঞান হয়েছিলেন। এখন কথা বলছেন।'

ওঃ। মনে পড়ল শক্তিপদর। ভগ্নীপতির আশি বছরের বৃদ্ধা মা তো এখনো বেঁচে আছেন।

শক্তিপদ নিজের পরিচয় দিল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে এগোতে সাহস পেল না।

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার কান্না শোনা গেল, 'সেই আসা এলে বাবা। কি দেখতে এলে বাবা।'

ঘরের ভিতরেও বেশ অন্ধকার। বাইরে যেটুকু রোদ ছিল এতক্ষণে তাও বোধ হয় নিঃশেষে মুছে গেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে শক্তিপদ অনুভব করল, মেঝের ওপর শোয়া অস্পষ্ট একটি নারীমূর্তির ছায়া থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

শক্তিপদ স্থির হয়ে একটুকাল দাঁড়িয়ে থেকে ভিজে চোখে ভিজে গলায় ডাকল, 'সুবর্ণ, সোনা!'

'কী দেখতে আর এলেন রাঙাদা। আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল।'

কিছু বলবার নেই। তবু কিছু বলতে হয়।

শক্তিপদ বলল, 'এর ওপর তো কারো হাত নেই বোন। সবই ভগবানের হাত।'

সঙ্গে সঙ্গে শক্তিপদের মনে হল অনেক অনেক দিন বাদে সে আজ একটি অনভ্যস্ত শব্দ উচ্চারণ করল। ভগবানে সে বিশ্বাস করে না। অন্তত হাত পাওয়ালা ভগবানে তো নয়ই। প্রচলিত অনেক কিছুতেই সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু শোকে সান্ত্বনা প্রচলিত ভাষাতেই দিতে হয়। তবেই তো সবাইর বোধগম্য হতে পারে। আর ভাষা মানেই পৌত্তলিকের ভাষা। শব্দ মানেই রূপ। ধারণা ভাবনার রূপ।

বারান্দা থেকে বৃদ্ধা চেঁচিয়ে বললেন, 'ওরে তোরা একটা আলোটালো জেলে দে। শক্তি কতক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে। শ্যামা, কোথায় গেলি শ্যামা? ঘরে সন্ধ্যে দিবি নে তোরা?'

একটি মেয়ে বলল, 'দিদি জল আনতে ঘাটে গেছে। এক্ষুণি আসবে। তুমি আর চেঁচামেচি করো না ঠামা। তোমার শরীর খারাপ করবে। আমরা আলো জেলে দিচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে দুটি হ্যারিকেন জেলে নিয়ে এল তারাদাস। একটি ঘরের ভিতরে এনে রাখল। আর একটি বারান্দায় ঠাকুরমার সামনে এনে রাখতে যাচ্ছিল, তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না না না, আমার আর আলোর দরকার নেই। আলোয় আমি আর কী দেখব। আমার যে সব অন্ধকার হয়ে গেছে।' একটু থেমে ফের তিনি আক্ষেপের সুরে বলতে লাগলেন, 'অসুখ নয় বিসুখ নয় সাক্ষাৎ যম এসে জ্যান্ত ছেলেটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল বাবা।'

শক্তিপদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কী! তাহলে কী হয়েছিল?'

টেলিগ্রামে শুধু মৃত্যুর খবরই ছিল আর শক্তিপদকে তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। রোগ ব্যাধির কোন উল্লেখ ছিল না। এবার মৃত্যুর কারণ আস্তে আস্তে সব শুনল শক্তিপদ। সে মৃত্যু অপঘাত মৃত্যু। তা যেমন বীভৎস তেমনি মর্মন্তুদ।

অফিসের কাজকর্ম সেরে রাত দশটার ট্রেনে স্টেশনে নেমেছিল নন্দলাল। তারপর চিরদিনের অভ্যাসমত রেল-ব্রীজের ওপর দিয়ে অন্ধকারে হেঁটে পার হয়ে আসছিল। উল্টোদিক থেকে কোথাকার এক মোটর ট্রলি এসে ওকে ধাক্কা দিয়ে নদীর মধ্যে ফেলে দেয়। ট্রলিটিও ব্রীজের ওপর কাত হয়ে পড়ে। শুধু নন্দ নয় ট্রলিরও একজন লোক সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে। আর একজন এখনও আছে হাসপাতালে। নন্দর দেহের আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

শক্তিপদ স্তব্ধ হয়ে রইল। মৃত্যু মাত্রই ভয়ংকর। কিন্তু কোন কোন মৃত্যুর বীভৎসতার বোধ হয় আর তুলনা নেই। একটা কথা ভেবে শক্তিপদ শিউরে উঠল। খানিক আগে সে নিজেও বোকার মত ওই ব্রীজের ওপর দিয়েই এসেছে। বীমগুলি বেশ ফাঁক ফাঁক ছিল। হেঁটে আসবার সময় বেশ ভয় ভয় করছিল শক্তিপদের। আশেপাশে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ছিল। আশ্চর্য, কিন্তু কেউ তাকে কদিন আগের দুর্ঘটনার কথা বলে সাবধান করে দেয়নি। নীচে—অনেক নীচে নদীর জল টলটল করছিল। ওপরে কি নীচে রক্তের কোন চিহ্নমাত্র ছিল

মা। মাত্র কদিন আগের ঘটনা। কালস্রোত আর জলস্রোত একই সঙ্গে সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। একটু বাদে তারাদাস সামনে এসে দাঁড়াল—বলল, 'মামা বাইরে জল তুলে দিয়েছি। আসুন হাত-মুখ ধুয়ে নিন। চান করবেন তো? ইঁদারার জল আছে। ইচ্ছা করলে নদীতেও নাইতে পারেন। বাড়ির পিছনেই নদী।'

স্নান করতে পারলেই ভালো হত। চৈত্র মাসের শেষ। এরই মধ্যে বেশ গরম পড়ে গেছে। কিন্তু অসময়ে নতুন জায়গায় এসে চান করতে সাহস পেল না শক্তিপদ। দিন কয়েক আগে ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়ে গেছে। স্নান করার চেয়ে হাতমুখ ধুয়ে ভিজে গামছায় গা মুছে ফেলবে সেই ভালো।

তারাদাস ফের তাড়া দিল, 'আসুন আর দেরি করবেন না। স্টীমারে ট্রেনে সারাদিন কেটেছে। কিছুই বোধ হয় খাওয়াটাওয়া হয় নি। গাড়িতে বেশ ভিড় ছিল না? পথে খুব কষ্ট হয়েছে না মামা?'

যেন মামার সঙ্গে তারাদাসের কতদিনের আলাপ।

ভাগ্নের কাছে স্বীকার করল না শক্তিপদ, কিন্তু কষ্ট হয়েছে ঠিকই। কলকাতা থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের এই গণ্ডগ্রামে পৌঁছতে চব্বিশ ঘণ্টা লেগে গেছে। দুবার গাড়ি-বদল করতে হয়েছে। ফেরিস্টীমারে পার হতে লেগেছে দেড় ঘণ্টা। হয়রানির এক শেষ।

উঠানে নামতে না নামতেই দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে এসে প্রণাম করল শক্তিপদকে। গা ধুয়ে শাড়িটাড়ি বদলে এসেছে। বয়স আঠের উনিশ হবে। শামলা রঙ।

শক্তিপদ বলল, 'তোমার নামই তো শ্যামা? আমাকে দেখেছ ছেলেবেলায়। মনে আছে?'

শ্যামা ঘাড় কাত করল।

সঙ্গে সঙ্গে বাকি যারা ছিল তারাও ঢিপ ঢিপ করে শক্তিপদের জুতোর ওপর মাথা রাখল।

সেই গামছাপরা মেয়েটি এবার বেশ পাল্টে এসেছে। তার পরনে এবার একটি পুরোন ফ্রক।

সে বলল, 'আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন না?'

তারাদাস ধমক দিয়ে বলল, 'যাঃ যাঃ ভারি নামওয়ালী এসেছিস। বিরক্ত করিসনে মামাকে। বিশ্রাম করতে দে।'

শক্তিপদ মেয়েটির দিকে চেয়ে সস্নেহে বলল, 'কী নাম তোমার বল।'

'উমা।'

মেয়েটির মুখে হাসি। এতক্ষণে স্বনাম-ধন্যা হবার সুযোগ পেয়েছে সে।

তারাদাস বলল, 'বোনদের নাম শ্যামা, উমা রাধা। ঠাকুরমার দেওয়া সব ঠাকুর-দেবতার নাম। আর আমাদের নামগুলিও তেমনি। তারাদাস হরিদাস গুরুদাস। সব সেকেলে।'

শক্তিপদ বলল, 'তাতে কী হয়েছে। তোমরা তো একালের। নামে কী এসে যায়।'

ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সঙ্গে আদরের সুরেই কথা বলল শক্তিপদ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তার মনে হল নন্দলাল বড় বেশি ডিপেণ্ডেন্টস রেখে গেছে। একটি ছাড়া সবাই তো অপোগণ্ড। কী যে গতি হবে এদের।

উঠানের একধারে বালতিতে জল। গামছা, একটি ঘটি। সামনে ছোট একখানি জল-চৌকীও পাতা আছে। শ্যামা হ্যারিকেনটি এনে কাছে রাখল।

চৌকির ওপর বসে ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে নিল। পা ধুলো। জুতোর ভিতর দিয়েও একগাদা ধুলো ঢুকেছে। বড্ড ধুলো এদিককার রাস্তায়। স্টেশন থেকে দেড় মাইল পথ হেঁটে এসেছে শক্তিপদ। রাস্তা ভালো নয়।

ঘরের মধ্যে সুবর্ণ এক কোণে চুপ করে বসে ছিল। তার যেন উঠবার শক্তি নেই, কথা বলবার শক্তি নেই। হ্যারিকেনের আলোয় এবার ভালো করে তাকে দেখল শক্তিপদ। দেখবার কিছু নেই। থানকাপড়ে মোড়া কখানা হাড়ের পুঁটলি। ঈস কী বুড়ীই না হয়ে পড়েছে সুবর্ণ। সামনের কয়েকটি দাঁত পড়ে গেছে, গাল ভেঙে গেছে। এত তাড়াতাড়ি এত বুড়ো হবার তো ওর কথা ছিল না। শক্তিপদের চেয়ে ও অন্তত পাঁচছ বছরের ছোট। শক্তিপদের এই তেতাল্লিশ চলছে। ওর তা হলে—। এই আকস্মিক মৃত্যুশোকই কি ওকে এমন করে জীর্ণ করেছে? নাকি আরো বহুদিন আগে থেকেই ও জীর্ণ হয়ে আসছিল? দারিদ্র্য, ব্যাধি আর অতিরিক্ত সন্তানবাহুল্য। ছটি আছে আরো গুটি চার-পাঁচ হয়ে অকালে চলে গেছে। অথচ এই বৈজ্ঞানিক যুগে—। অশিক্ষা—অশিক্ষা আর কুসংস্কারের বলি। অসহিষ্ণুভাবে মনে মনে বলল শক্তিপদ। অথচ তার এই খুড়তুতো বোনটি বেশ সুন্দরী ছিল; বেশ সুন্দরী। ওর গায়ের

রঙের জন্যেই তো নাম রাখা হয় সুবর্ণ। এখন সেই সোনা একেবারে সিসে হয়ে গেছে।

'ওরে তোরা কী ঘুটঘুট করছিস সব! শক্তিকে কিছু খেতেটেতে দে। বেচারা সেই কাল থেকে মুখ শুকিয়ে আছে।'

সুবর্ণের বুড়ী শাশুড়ী তার সুড়ঙ্গ-শয্যা থেকে চেঁচাচ্ছেন।

তারাদাসই এখন বাড়ির বড় কর্তা। সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি ব্যস্ত হয়ো না ঠাম্মা। সবই হচ্ছে।'

একটু বাদে শ্যামা এসে বলল, 'মামা আপনি এ ঘরে আসুন।'

পাশেই ছোট আর একখানা ঘর। মেঝেয় আসনপাতা। কাঁসার গ্লাসে জল। কানা উঁচু ছোট একটি থালায় মুড়ি, চিনি, নারকেলকোরা।

তারাদাসের ভাই হরিদাস বলল, 'আমরা এখানে বসছি। দিদি, তুমি চা করে নিয়ে এস।'

শক্তিপদ বলল, 'কমিয়ে নাও। এত কী আর খেতে পারব!'

কিন্তু কেউ তার কথা শোনে না। শক্তিপদ জোর করে ভাগেভাগনীদের হাতে কিছু কিছু গছিয়ে দিল।

খেতে খেতে শক্তিপদ জিজ্ঞেস করল, 'এত আগেই তোমাদের সব কাজটাজ হয়ে গেল?'

তারাদাস বলল, 'অপঘাত মৃত্যু যে। তাই তিনদিনের দিনই সব হল। ও বাড়ির কাকা পুরুত নিয়ে এলেন। তিনি আবার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন।'

শক্তিপদ প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, 'প্রায়শ্চিত্ত? প্রায়শ্চিত্ত আবার কিসের? কত খরচ হয়েছে?'

তারাদাস বলল, 'কাকা সব জানেন। এখনও হিসাবপত্তর কিছু ঠিক হয়নি।'

খাবার খেয়ে শক্তিপদ চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে, মোটা সোটা প্রৌঢ় একজন ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়ালেন, 'নমস্কার। চিনতে পারেন? অনেক আগে দেখাসাক্ষাৎ হত। আমার নাম পরিতোষ দাস।'

শক্তিপদ প্রতি নমস্কার করে বলল, 'বা চিনতে পারব না কেন? চেহারা টেহারা অবশ্য একটু বদলে গেছে। আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই তো এলাম।'

পরিতোষবাবু বললেন, 'হ্যাঁ আমিই টেলিগ্রাম করেছিলাম। চিঠিপত্তরও যেখানে যা লিখবার আমিই লিখেছি। শুনেছেন তো সব, দাদা আমার কীভাবে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে। একেবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।'

গলাটা একটু যেন ধরে গেল পরিতোষবাবুর।

তারপর ভদ্রলোক ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে লাগলেন। ছোট লাইন। দিনে একখানা গাড়ি আর রাতে একখানা গাড়ি যায়। গাড়ির সময় বাদ দিয়ে রেল-ব্রীজের ওপর দিয়ে সবাই চলাফেরা করে। কারো কিছু হয় না। কিন্তু সর্বনাশ যখন হবার। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'রাতদুপুরে খবর পেয়ে যখন গেলাম তখন আর কিছু ছিল না। চেনা শক্ত। লোকজন নিয়ে নীচ থেকে ওপরে তুললাম। রক্তে মাখামাখি। হাড়পাঁজরা একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো। মাথার খুলিটা শুদ্ধ—।'

শক্তিপদ বাধা দিয়ে বলল, 'থাক থাক। ওসব শুনে আর কী হবে।'

তবু আরো কিছু বিশদ বিবরণ শুনতে হল। নন্দলালের মৃতদেহ বাড়ি পর্যন্ত আনেন নি পরিতোষবাবু। পাছে পুলিসের হাঙ্গামা হয় তাই তখন তখনই সৎকারের ব্যবস্থা করেছেন। একেই তো যে শাস্তি হবার তা হয়েছে। তারপর যদি অস্থি কখানা নিয়ে পুলিসে টানাটানি করত, ডাক্তারে ছুরি ধরত তাহলে কি তা সহ্য করা যেত? বরং কিছু খরচপত্র করেও কাজটা তাড়াতাড়ি তিনি সেরে ফেলেছেন।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা পরিতোষবাবুর বাড়িতেই হল। তিনিই গরজ করে এই বন্দোবস্ত করালেন। বড় একখানা ঘরের মধ্যে পাশাপাশি খেতে বসে পরিতোষবাবু বললেন, 'ও বাড়িতে তো মশাই ডিম মাছ কিছু পেতেন না। আপনার খেতে কষ্ট হত। তিনদিনে শ্রাদ্ধ গেছে কিন্তু অশৌচ তো ত্রিশ দিনই। মাছ মাংস এক মাস আমিও খাব না। তবে ছেলেপুলেরা খায় খাক।'

মাছ মাংস অবশ্য শক্তিপদ নিজেও পছন্দ করে। কোন বেলায় নিরামিষ খেতে বাধ্য হলে তার পেট ভরে না। কিন্তু আজ এ বাড়িতে বসে লুকিয়ে আমিষ খেতে তার কেমন যেন রুচি হচ্ছিল না। নন্দও মাছটাছ খুব ভালোবাসত। খেতেও ভালোবাসত খাওয়াতেও ভালোবাসত। অনেক আগে পর পর কয়েক বছর এই দিনাজপুর থেকে বড় বড় সিঙ্গি আর মাগুর মাছ সে শক্তিপদের কলকাতার বাসায় পাঠাত। জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করত তখন। মাছটাছ জোগাড় করা তখন সুবিধে ছিল।

পরিতোষের বুড়ো মা এসে সামনে বসলেন। সম্পর্কে জেঠীমা হন নন্দের। তিনি সস্নেহে বললেন, 'খাও বাবা খাও। ওই মাছটুকু আধার পড়ে রইল কেন। খেয়ে ফেল। নিয়তি বাবা সবই নিয়তি। অদেষ্ট। নইলে ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে রাজ্যশুদ্ধ লোক আজন্ম চলাফেরা করে। ওই নন্দও তো কতদিন ঝড়বিষ্টির মধ্যে রাতদুপুরে বাড়ি এসেছে। খেয়া নৌকোয় পয়সা দিতে হয়। তাছাড়া কে আবার অত হাঙ্গামা করে। গাঁয়ের লোক ওই ব্রিজের ওপর দিয়েই পারাপার হয়। কই কারো তো কিছু কোন দিন হল না। কিন্তু যার ভবপারের ডাক এসে যায় তাকে কি আর ধরে রাখবার জো আছে? হতে দেখেছি বাবা, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমরা পড়ে রইলাম আর ও চলে গেল—।'

বৃদ্ধার গলা আটকে এল। আঁচলে চোখ মুছলেন তিনি। পরিতোষবাবু বললেন, 'যাও তো তুমি, এখান থেকে উঠে যাও। ভদ্রলোক খেতে বসেছেন আর তুমি—।'

খাওয়াদাওয়ার পর হ্যারিকেন হাতে শক্তিপদকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন পরিতোষবাবু। একেবারেই এ বাড়ি ও বাড়ি। [illegible]

চিহ্ন হিসাবে গোটা ছয়েক সুপারিগাছ আছে মাঝখানে।

দু-একটা কথার পরই পরিতোষবাবু বিদায় নিলেন, 'আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আজ গিয়ে শুয়ে পড়ুন। কথা-বার্তা যা আছে কাল হবে।'

শুতে যাবার আগে কী একটা কথা মনে পড়ল শক্তিপদের। পকেট থেকে একশ টাকার একখানা নোট বের করে সুবর্ণের কাছে গিয়ে তার হাতে গুঁজে দিল।

সুবর্ণ বলল, 'এ কী।'

শক্তিপদ বলল, 'রাখ, রেখে দে।'

সুবর্ণ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'টাকা দিয়ে আমি কী করব রাঙাদা।'

শক্তিপদ মনে মনে ভাবল, 'টাকা অবশ্য মৃত্যু শোকের সান্ত্বনা নয়। কিন্তু যারা শোক করবার জন্যে বেঁচে থাকে তাদের তো নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসেই ও বস্তুর দরকার হয়।'

আসবার সময় এই টাকা আর যাতায়াতের রেল-ভাড়াটা জোগাড় করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে শক্তিপদকে। সে কথা মনে পড়ল।

তারাদাস এল হ্যারিকেন হাতে, স্মিতমুখে বলল, 'চলুন মামা, আপনাকে শোয়ার ঘর দেখিয়ে দিই।'

শক্তিপদ ওর পিছনে পিছনে চলল।

উঠান ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূব কোণে আর একখানা ছোট ঘর। ভাগ্নেভাগ্নীরা তার বেডকভারটা আর খোলে নি। নিজেদের বিছানাই পেতে দিয়েছে। শীতল পাটির ওপর একজোড়া মাথার বালিস। ফর্সা ঢাকনিতে ফুলতোলা। শিয়রের কাছে একটি জানলা। আরো দু'তিনটে জানলা আছে ঘরে।

খানিক দূরে ছোট এক জোড়া টেবিল চেয়ার। কিছু বইপত্র। নারকেলের দড়িতে বেড়ার সঙ্গে তক্তা বেঁধে তাক করা হয়েছে। তার ওপর অনেকগুলি পুরোন পত্রিকা। আর দুখানা মোটা মোটা বই। বোধহয় রামায়ণ-মহাভারত।

আপনি কিন্তু ঠাম্মার ওসব কথায় কান দেবেন না

সেই বড় মেয়েটি চেয়ারে বসে কী একখানা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল, এবার লজ্জিত-ভাবে উঠে দাঁড়াল।

শক্তিপদ বলল, 'এই যে শ্যামা। তোমাদের এই বাইরের ঘরখানা ত বেশ নিরিবিলি।'

শ্যামা বলল, 'হ্যাঁ, বাবা শেষের দিকে এই ঘরেই থাকতেন। রাত্রে ঘুমোতেন। ছুটি-কাটাবার জন্যে এখানে চলে আসতেন। ধর্মগ্রন্থট্রন্থ নিয়েও বসতেন। কিন্তু বাবার কি আর পড়াশুনোর জো ছিল। ছোট ভাইবোনগুলি এসে এত উৎপাত করত! কেউ ঘাড়ের ওপর চড়ত, কেউ পিঠের ওপর উঠত। কেউ একটা পয়সার লোভে পাকা চুল তুলে দিত, কেউ বা পা টিপে দিয়ে পয়সা চাইত। ওদের জ্বালায় আমি বাবার কাছে ঘেঁষতে পারতাম না। বাবাও সবাইকে খুব ভালোবাসতেন। যেদিন ওরা নিজেরা না আসত তিনিই ওদের ডাকাডাকি করে নিয়ে আসতেন।'

তারাদাস বলল, 'দিদি, মামার যা যা লাগবে সব দিয়েছিস তো?'
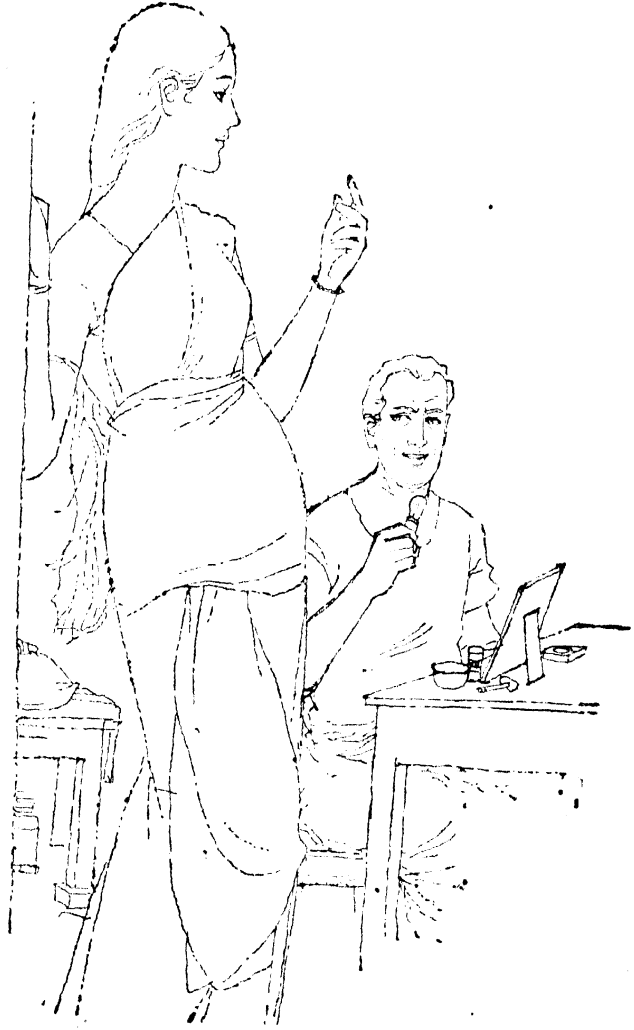
শ্যামা বলল, 'হ্যাঁ। জল আছে কুজোয়, গ্লাস রইল। পাখা, টর্চ সব আছে। মশারিটা চাঁদা করে রেখে গেলাম। শোয়ার সময় ফেলে নেবেন। না কি এখনই ফেলে দিয়ে যাব?'

শক্তিপদ বলল, 'না না থাক। আমিই ফেলে নিতে পারব। তোমরা যাও এবার। রাত হল।'

রাত অবশ্য দশটার বেশি হবে না। কিন্তু সারা গ্রাম এরই মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেছে। যেন রাত দুপুর।

তারাদাস তবু যায় না। একটু ইতস্তত করে বলল, 'একা একা থাকতে আপনার আবার ভয়টয় করবে না তো?'

শক্তিপদ হেসে বলল, 'ভয় কিসের?'

তারাদাস বলল, 'বাবা এই ঘরেই থাকতেন কিনা। দিনের বেলায় তেমন কিছু হয় না। রাত্রে একা একা আসতে আমার কিন্তু গা ছমছম করে।'

শ্যামা হাসি চেপে বলল, 'যাঃ ফাজিল কোথাকার। তুই আর মামা কি সমান? কোন কিছু দরকার হলে ডাকবেন আমাদের। দোরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেই শুনতে পাব। আমার ঘুম খুব পাতলা। আর ঠাম্মার তো রাত্রে ঘুমই হয় না। আজ আরো হবে না। সারা রাত ছটফট করবেন।'

শক্তিপদ বলল, 'কেন?'

শ্যামা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আজ ঠাকুরমার আফিং আসে নি। তারুর ভুল হয়ে গেছে আনতে।'

শক্তিপদ অবাক হয়ে বলল, 'আফিং দিয়ে আবার কী করেন উনি?'

তারাদাস দিদির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'কী আবার করবেন, খান। প্রথমে খেতেন বাতের ওষুধ হিসেবে। তারপর

পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে এখন আর বড় একটা ডেলা না হলে চলে না। বাবা রোজ রাগ করতেন আবার রোজ আনতেন। মুখে বলতেন, আমি আর পারব না। বাবা তো গেলেন, এখন ওঁর মার আফিং-এর খরচ কে যোগাবে?'

শ্যামা ধমক দিয়ে বলল, 'থাক, তোর আর বুড়োপনা করতে হবে না। চল এবার, মামাকে ঘুমোতে দে।' শক্তিপদ ভাবল আশ্চর্য এই শরীরের নিয়ম। পুত্র শোকাতুরারও নেশার বস্তুটি সময় মত না পেলে চলে না।

ওরা চলে গেলে শক্তিপদ দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। মশারিটা ফেলে নিল। একটু একটু হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। সেই সঙ্গে বেলফুলের উগ্রগন্ধ। ফুল আর ফলের বাগান করবার বেশ সখ ছিল নন্দলালের।

ক্লান্ত দেহে যত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে ভেবেছিল তা এল না। শক্তিপদ একটা সিগারেট ধরাল। সত্যিই একজন মরা-মানুষের খাটের ওপর শুয়ে আছে সে। সেই মানুষটি আর নেই। কিন্তু তার ব্যবহারের অনেক জিনিসপত্রই পড়ে আছে। এই খাট-মশারি, টেবিল-চেয়ার ঘরের কোণে ওই পুরোণ গড়গড়াটা—সবই রয়েছে। প্রাণের চেয়ে জড়বস্তু অনেক দীর্ঘজীবী আর টেকসই।

এত কোমল পেলব প্রাণের আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, তিরোভাবও তেমনি। শক্তিপদ ভাবল বড় অদ্ভুত বস্তু এই মৃত্যু। মানুষ এক হিসাবে তাকে নিয়ে ঘর করে তবু তার কথা তার মনে পড়ে না। না পড়াই ভালো। মৃত্যুকে না ভুললে জীবনকে ভুলতে হয়। শক্তিপদও ভাবে না মৃত্যুর কথা। ভাববে কি। কলকাতায় কি ওই তার মরবার সময় আছে। দুটো অফিস। একটা হোলটাইম, আর একটা পার্টটাইম। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। ছেলেমেয়ে দুটি তৎক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের মা অবশ্য ঘুমোয় না। জেগে জেগে বই পড়ে, কি সেলাই করে। শক্তিপদ টেবিল চেয়ারে স্ত্রীর মুখোমুখি বসে খায়। খেতে খেতে গল্প-টল্প হয়। কোনদিন বা সংসারের অভাব অনটনের ফিরিস্তি ওঠে। তারপর নিদ্রা। নিদ্রার কথা নিশ্চয়ই শক্তিপদের মনে হয় না। তখন যৌথ নিদ্রারই আয়োজন চলে।

কিন্তু মনে না পড়লেও, মনে না করলেও মৃত্যু আছে। তার মুখোমুখি মানুষকে দাঁড়াতেই হয়। নিজের মৃত্যুর আগে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে হয়। কী এই মৃত্যু। মৃত্যু মানে সম্পূর্ণ অবলুপ্তি। হ্যাঁ এ ছাড়া মৃত্যুর আর কোন অর্থ আছে বলে শক্তিপদ যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে ভাবতে পারে না। আগে আগে ছেলেবেলায় পারত। তখন যুক্তিটুক্তি কিছু ছিল না। তখন বাপ-দাদার মুখে যা শুনত তাই বিশ্বাস করত। জন্মজন্মান্তর, দেহহীন আত্মার অস্তিত্ব আরো কত রূপকথায় বিশ্বাস ছিল। নিস্পন্দ আকাশের দিকে তাকিয়ে কত দেবতা স্বর্গরাজ্য দেখত, কত কী কল্পনা করত। তারপর বিজ্ঞান এসে সেই কল্পনার পাখা কেটে নিয়েছে। আশ্চর্য যে বিজ্ঞানের দৌড়ই সে বেশ সেই বিজ্ঞান কিন্তু সে পড়েনি। সে আর্টসের ছাত্র। যা পড়েছে সব কাব্য গল্প উপন্যাস। ভেবেছিল ঘরে বসে বিজ্ঞানের পুঁথির দু-একটা লৌকিক সংস্করণ উলটে পালটে দেখবে। তাও হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেই গল্প উপন্যাসের ভিতর দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে একালের বিজ্ঞান দর্শনের হাওয়া ভেসে এসেছে। এই সামাজিক হাওয়াটাই সব। তাতেই মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়।

পরিতোষবাবুর মা বলছিলেন অদৃষ্ট নিয়তি। শক্তিপদ কোন কথা বলে নি। শক্তিপদ যত দূরে পারে এই সব অনাধুনিক অবৈজ্ঞানিক শব্দগুলিকে এড়িয়ে যায়। না এড়ালেই গড়াতে হবে। কিছুতেই গোলক ধাঁধার মধ্যে পথ মিলবে না। তার চেয়ে এই দৃশ্যমান বস্তুজগতকেই সর্বস্ব বলে ধরে নিয়ে ন্যায়নীতি প্রীতি প্রেম ভালোবাসা নিয়ে ঘর করা ঢের ভালো। যার যে রকম বিশ্বাসই থাকুক না দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষ তাই করে। এই বস্তুজগৎকেই সর্বস্ব মনে করে। এক অর্থে সবাই বস্তুতান্ত্রিক

তবু মাঝে মাঝে এই ধরনের একেকটা ঘটনা চমকে দেয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। সত্যি নন্দলালের এমন করে মরবার কী অর্থ হয়? অদৃষ্ট নিয়তি পূর্বজন্মের কর্মফলের শরণ না নিয়েও এর বাস্তব ব্যাখ্যা অবশ্য দেওয়া যায়। যুক্তির সঙ্গে যুক্তির শিকল গাঁথা যায়। কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় অসাধ্য হয় না। কিন্তু যা ঘটে গেল ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে ফের অঘটিত করা যায় না। চরম অমঙ্গল যা ঘটবার তা তো ঘটলই। অমঙ্গলের অস্তিত্ব মানতেই হয়। তা যেমন বাইরের জগতে নৈসর্গিক অনৈসর্গিক ঘটনার মধ্যে আছে তেমনি মানুষের ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যে আছে ষড়রিপুর আকারে। সেই রিপু কখনো প্রচ্ছন্ন ক্ষীণ, কখনো প্রবল। কে যেন বলেছিলেন মঙ্গল আছে বলেই অমঙ্গল আছে। এ ব্যাখ্যা শক্তিপদের মনঃপূত হয়নি। কেন, শুধু মঙ্গল থাকলে কী ক্ষতি ছিল? আসলে জড় প্রকৃতিতে মঙ্গলও নেই অমঙ্গলও নেই। সে তার নিজের নিয়মে কি অনিয়মে চলে। মানুষ, শুধু মানুষ কেন, সমস্ত জীবজগৎ তার ইষ্ট আর অনিষ্টের ব্যাখ্যা সেই প্রকৃতির ভিতর থেকে খুঁজে নেয়।

তত্ত্ব থেকে ঘুরে ঘুরে ফের নন্দের কথা মনে এল শক্তিপদের।

সত্যি কীভাবেই না নন্দ মারা গেল। ও নাকি মাছের তরকারিটা রাতে এসে খাবে বলে রেখে গিয়েছিল। সে আশা তার আর মেটেনি। জীবন যে অনিশ্চিত তাতে সন্দেহ কী। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক জীবন এখনো পদ্মপত্রে নীর। আর চিরকাল হয়তো তাই থাকবে। কিন্তু তাই বলে মানুষ কি তার নিশ্চিত বুদ্ধির গর্ব ছাড়বে? দীপের পর দীপ জেলে সব অন্ধকার দূর করবার, সব রহস্য ভেদ করবার স্পর্ধা কি তার কখনো শেষ হবে?

ঘুম ভাঙল পাখির ডাকের শব্দে। হয়তো ছেলেমেয়েদের কোলাহলও তার সঙ্গে মিশে ছিল। ভোর ভালো লাগতে লাগল শক্তি-পদের। শান্তস্নিগ্ধ ভোরের হাওয়া বেশ উপভোগ্য। কান জুড়ানো স্তব্ধতা, চোখ জুড়ানো সবুজ দৃশ্য। চারদিকে গাছপালা আমজাম কাঁঠালের বাগান। জানালা দিয়ে একটা বড় পুকুর দেখা যায়। বাঁধানো ঘাটে কারা এরই মধ্যে নাইতে নেমেছে। ওপারে পোস্ট অফিস। ছোট একটা পাকাবাড়ি তৈরি হচ্ছে পাশে। সামনে একখানা বেঞ্চ-পাতা। তার ওপর জনতিনেক ভদ্রলোক বসে কী আলাপ করছেন। ছবির মত দৃশ্য।

বেশ লাগতে লাগল শক্তিপদের। আশ্চর্য শোকস্তব্ধ হয়ে সে যেন একটি শোকার্ত পরিবারের মধ্যে এসে পড়ে নি। এরই মধ্যে নন্দলালের অপমৃত্যুর কথা সে ভুলতে বসেছে। লজ্জিত হল শক্তিপদ। জীবন এইরকমই নিষ্ঠুর। মৃত্যুকে সে শিশুর মত ক্ষণে ক্ষণে ভোলে। নতুন খেলনা পেয়ে হাসে। জানে না মৃত্যুর হাতে সেও শিশুর খেলনা ছাড়া কিছু নয়।

দোর খুলে বেরোতেই দেখল তারাদাস আর তার ভাই হরিদাস দাঁড়িয়ে। হরি তার দাদার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। সামনের একটা দাঁত পোকায় খাওয়া। কোত্থেকে নিমডালের একটা দাঁতন নিয়ে এসেছে। স্যুটকেসের মধ্যে অবশ্য শক্তিপদের পেস্ট আর টুথব্রাশ আছে। অন্যান্য সব গুছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভাগ্নেকে খুশি করবার জন্যে শক্তিপদ দাঁতনটাই হরিদাসের কাছে থেকে চেয়ে নিল।

তারাদাস বলল, 'দিদি জিজ্ঞেস করছিল আপনি কি মুখটুখ ধোয়ার আগে এক কাপ চা খেয়ে নেবেন?'

শক্তিপদ বলল, 'না, পরেই খাব।'

আর একটু পরে ওদের বড়ঘরের বারান্দায় তক্তপোষের ওপর বসে চা খেতে খেতে ভাগ্নেভাগ্নীদের পড়াশুনো সম্বন্ধে খোঁজখবর নিল শক্তিপদ। শ্যামা আর পড়ে না।

সেকেণ্ড থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়ে ছেড়ে দিয়েছে। কি দিতে বাধ্য হয়েছে। গাঁয়ের স্কুলে মেয়েদের আর বেশি পড়বার ব্যবস্থা নেই। ভেবেছিল বাড়িতে পড়ে স্কুল ফাইনালটা দেবে। আর হয়ে ওঠে নি। তারাদাস যায় শহরের স্কুলে। মান্থলি টিকেটে যাতায়াত করে। এত বড় পরিবারের একমাত্র সম্বল ছিল নন্দলালের সোয়া শ টাকা মাইনের চাকরি। তবু তারই মধ্যে দু একখানা করে জমি সে রেখেছে। ফসল যে বছর ভালো হয় ভেবেছিলো হঠাৎ নাম যায়। আর কোন সম্পদ নেই। লাইফ ইনসিওরেন্স হাজার দেড়েক টাকার করেছিল। অনেক আগেই ল্যাপসও হয়ে গেছে। আর যা আছে সব দেনা। জমির খাজনা বাকি, দোকানপাটে বাকি। একজন গৃহস্থকে কতরকম ফিকির ফন্দী করেই তো সংসার চালাতে হয়। ধার কর্জ কার না আছে।

নন্দর মা বললেন, 'সব কি আর নগদে চলত বাবা? সেইরকম রোজগার কি আর ছিল? তবু যতক্ষণ পেরেছে জ্ঞাতিকুটুম্ব বন্ধুবান্ধব কারো কাছে হাত পাতে নি। নিজের জামা ছিঁড়ে গেছে, পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, পায়ের জুতোয় তালি পড়েছে। তবু হাত পাতেনি। আমি একেক সময় রাগ করেছি। তুই কি একটা পিশাচ? এই ভাবে মানুষ আফিস আদালত করে? ছেলে আমার হেসে বলেছে—আমাকে যারা চেনে তারা এতেই চিনবে মা।'

একটু চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কিছুকাল ধরে মেয়ের বিয়ের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কোথাও কিছু পুঁজিপাটা তো ছিল না। কী করে বিয়ে দিত সেই জানে। মাঝে মাঝে একেক দল এসে মেয়ে দেখে যেত। চণ্ডীপুরের দত্তরা পছন্দও করে গিয়েছিল। ছেলেটি লেখাপড়া জানে। রেজিস্ট্রি অফিসে কাজ করে। দেনাপাওনা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। এখন কি আর কিছু হবে? সব কথা শেষ হয়ে গেছে বাবা।'

বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই শ্যামা সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। শক্তিপদ চুপ করে রইল। সঙ্গে সঙ্গেই কাউকে সে কোন ভরসা দিতে পারল না। তার অনেক দায়। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। বুড়ো মা আছেন, ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ আছে। টিউটরের মাইনে গুণতে

হয় পঞ্চাশ টাকা। চড়া বাড়ি ভাড়া। তাছাড়া লোক লৌকিকতা শিষ্টতা ভদ্রতা, নাগরিকতার মাশুল কি কম জোগাতে হয় নাকি?

একথা ওকথার পর শক্তিপদ বলল, 'আমায় আজ দুপুরের গাড়িতেই চলে যেতে হবে।'

সবাই স্তম্ভিত। এও যেন আকস্মিক দুর্ঘটনা।

নন্দের মা বললেন, 'সে কি আজই চলে যাবে বাবা। কোন কথাই তো হল না। কিছুই তো তোমাকে বলতে পারলাম না।'

শক্তিপদ বলল, 'যেতেই হবে মাঈমা। পরের চাকরি। দুদিনের বেশি ছুটি নিয়ে আসতে পারিনি। ফার্মের সব জরুরী কাজ কর্ম পড়ে আছে। পরে আর এক সময় আসব।'

তিনি বললেন, 'এসো বাবা। কাজের ক্ষতি করে—কী আর বলব। সেও বাবা আফিস কোনদিন কামাই করেনি। রোগ ব্যাধি নিয়েও ছুটেছে। বলত, মা আর কোন বিদ্যে তো নেই। লোকে যদি বুঝতে পারে আমার যা সাধ্য তা আমি করেছি, কাজে আমি ফাঁকি দিইনি—লোকে যদি সে কথা বিশ্বাস করে সেই আমার পুঁজি!'

সেভ করবার জিনিসপত্র সুটকেস থেকে বার করে নেবে বলে সেই ছোট ঘরখানায় ফের ঢুকল শক্তিপদ। পায়ে পায়ে এল শ্যামা। বলল, 'মামা, দিন আমি সব বার করে দিচ্ছি। আপনি এখানে বসেই শেভ করুন না। আমি জল এনে দিচ্ছি।'

বাটিতে করে জল নিয়ে এল শ্যামা। শক্তিপদের মনে পড়ল বিয়ের আগে অল্প বয়সে সুবর্ণও এমনি ফাইফরমায়েস খাটত, টেবিল গুছিয়ে দিত, বিছানা ঝেড়ে দিত ভারী বাধ্য ছিল সুবর্ণ শক্তিপদের। আজ সে অসুস্থ অশক্ত। রোগে শোকে বিছানা নিয়েছে। তার জায়গায় দাঁড়িয়েছে তার মেয়ে। রূপটা তেমন পায় নি, রঙটা তেমন পায় নি। তবে মায়ের মুখের আদলের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে।

শ্যামা ডাকল, 'মামা!'

শক্তিপদ বলল, 'কিছু বলবে? বল না!'

শ্যামা মুখ নিচু করে বলল, 'আপনি কিন্তু ঠামার ওসব কথায় কান দেবেন না।'

'কোন্ সব কথায়?'

শ্যামা মুখ নিচু করে রইল। একটু কি লজ্জায় ছোপ পড়েছে ওর মুখে?

শক্তিপদ এবার বুঝল। রাস দিয়ে গালে সাবানের ফেনা তুলতে তুলতে হেসে বলল, 'ও।'

শ্যামা বলতে লাগল, 'আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দেবেন মামা। কলকাতা কত বড় শহর, সেখানে কত রকমের কাজ—।'

শক্তিপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা। সে সব পরে হবে। তুমি ভেব না।'

ভাবল শহর বড় হলেও কাজ বড় সুলভ নয়।

মুখ ধুয়ে উঠতে না উঠতে পরিতোষবাবু এলেন, 'কী মশাই ঘুমটুম হল? আপনি নাকি আজই চলে যাচ্ছেন, সে কি কথা! আপনারা কলকাতার লোক বাইরে এলেই ছটফট করেন। আমাদের আবার কলকাতায় গেলে মন টেঁকে না। তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে কনস্টিপেশন।

শক্তিপদ হেসে বলল, 'যা বলেছেন। কলকাতার সঙ্গে কনস্টিপেশনের কুটুম্বিতা আছে।'

পরিতোষবাবু বললেন, 'চলুন ওই পোস্ট অফিসের দিকটায়। ওটা আমাদের গাঁয়ের সদর। ওখানে নীরদবাবু আছেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব চলুন। নন্দদাকে খুব ভালোবাসতেন নীরদবাবু।'

পরিতোষের সঙ্গে পুকুরের ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল শক্তিপদ। তিনি দেখাতে দেখাতে চললেন, 'ওইটা পোস্ট অফিস। ওর পাশে লাইব্রেরী বিল্ডিং হচ্ছে। গবর্নমেন্ট থেকে গ্রান্ট পেয়েছি আমরা। উত্তর দিকে ওই যে টিনের ঘরগুলি দেখছেন ওটা স্কুল। অনেকদিনের পুরোন।

বেঞ্চে কয়েকজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। সব চেয়ে বয়স যাঁর, টাকটাও বড়, খদ্দরের ফতুয়া গায়ে, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিতোষবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন।

'নীরদরঞ্জন চৌধুরী। এখানকার জমিদার। আর ইনি শক্তিপদ সরকার। নন্দদার সম্বন্ধী।

নীরদবাবু বললেন, 'আরে ছেড়ে দাও ওসব। সেই রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই।'

শক্তিপদ লক্ষ্য করল খানিক দূরে গাছপালার আড়ালে একটি জীর্ণ প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। ফাটল দিয়ে বটের চারা উঠেছে।

পরিতোষবাবু বললেন, 'পূর্ববঙ্গ থেকে প্রথমে আমরা এঁদের আশ্রয়েই এখানে আসি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। সে সব তো পূর্বজন্মের কথা।'

পরিতোষবাবু বললেন, 'নন্দদাকে উনি খুব ভালোবাসতেন।'

নীরদবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, একটি লোক ছিল বটে। গ্রামে তার শত্রু ছিল না।'

বেঞ্চে আরো যে তিনজন বসেছিলেন তাঁরাও সেই রায় দিলেন। নন্দের সঙ্গে কারো ঝগড়া বিবাদ ছিল না। ছেলেবুড়ো সবাইর সঙ্গে সে হেসে কথা বলত। কোনরকম দলাদলির মধ্যে যেত না। বরং দলাদলি মেটাতেই চেষ্টা করত। অবস্থা ভালো ছিল না। কিন্তু বাড়িতে গেলে এক কাপ চা না হলে একটা পান কি এক ছিলিম তামাক কি নিদেনপক্ষে একটি বিড়ি না নিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত না।

শক্তিপদ ভাবল, 'এর চেয়ে নন্দ আর বেশি কী পেতে পারত। এই তো যথেষ্ট। মরণশীল মানুষের এইটুকুই অমরত্ব। মৃত্যুর পর দু-এক প্রহর ধরে পাড়াপড়শীর মুখে মুখে শুধু এই সুনামটুকুর ধ্বনি প্রতিধ্বনিই আমাদের মত সাধারণ মানুষের আকাশ ছোঁয়া মনুমেন্ট। মরবার পর যে কজন বন্ধু এই দেহটাকে কাঁধে তুলে কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যাবে তারা যেন বলতে পারে লোকটা কারো ক্ষতি করে নি, লোকটা চোর ছিল না, ডাকাত ছিল না, বদমাস ছিল না—লোকটা একেবারে মন্দ ছিল না।'

শক্তিপদ বলল, 'ছেলেমেয়েগুলিকে দেখবেন। ওদের তো আর কেউ নেই। আপনারাই সবাই সম্বল।'

নীরদবাবু বললেন, 'মানুষের কতটুকু শক্তি শক্তিবাবু। যিনি দেখবার তিনিই দেখবেন। ভগবান দেখবেন।'

তিনি উঁচুতে আঙুল তুললেন।

শক্তিপদ ভাবল, আবার ভগবান। এই শব্দটির সাহায্যেই কাল সে বোনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। ইনিও আজ এই শব্দের সাহায্য নিলেন। এই শব্দের অর্থ তাদের দুজনের কাছে নিশ্চয়ই ভিন্ন ও একেবারে আলাদা। তা হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। হঠাৎ এক অদ্ভুত সহনশীলতায় শক্তিপদের মন ভরে উঠল। কোন কোন সময় কোন কোন ক্ষেত্রে এসে মানা না মানা সব সমান হয়ে যায়। দেখতে হবে মানুষ মানুষকে মানল কিনা, মানুষকে ভালোবাসল কিনা। তারপর আর কী মানল না মানল, আর কী জানল না জানল আর কাকে বিশ্বাস করল না করল—সব তুচ্ছ।

নীরদবাবু কথা দিলেন নন্দের চাষের জমিগুলি কোথায় কী অবস্থায় আছে তিনি খোঁজ খবর নেবেন। রেল কোম্পানীর কাছে একটা ক্ষতিপূরণের আবেদনের কথাও উঠল। তবে কোন সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। রেলপুলের ওপর দিয়ে যাতায়াত তো আসলে বেআইনী।

শেষে বললেন, 'ভাববেন না। যার যা সাধ্য সবাই সেটুকু নন্দের জন্যে করবে। নিমাইয়ার শত্তেক নাও।'

কিন্তু অত বিশ্বাসের জোর শক্তিপদের মনে কোথায়? নন্দ যাদের রেখে গেছে সংসার সমুদ্রে শত তরণীর ভরসা তাদের সামান্য। শক্তমত নিশ্ছিদ্র একটি তরণী পেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।'

বেলা এগারোটার গাড়ি যখন ধরতেই হবে আগে থেকেই তৈরী হওয়া ভালো। একটু বেলা হলে গামছা কাঁধে নদীতে স্নান করতে গেল শক্তিপদ। সঙ্গে সঙ্গে চলল ভাগেনভাগনীর দল। মামা খানিকবাদেই চলে যাবে শুনে তারা আর কেউ কাছ ছাড়া হচ্ছে না, সব সময়েই পাছে পাছে আছে।

বাড়ির পিছনেই নদী। নদী নয় নদ। নাম নাগর।

এই রসের নামটি ওর কে রেখেছে কে জানে।

জলে নামল শক্তিপদ। এই গ্রীষ্মের সময় সামান্যই জল আছে। এই ঘাট থেকেও উত্তর দিকে তাকালে সেই ব্রীজটিকে দেখা যায়। ছোট্ট নদীর ওপর ছোট্ট অখ্যাত এক রেল ব্রীজ। কদিন আগে একজনের জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে সেতু রচনা করে দিয়েছে।

মামার সঙ্গে নাইবে বলে তারাদাস হরিদাস দুজনেই তেল মেখে জলে নেমেছে। সাবান এনেছে সঙ্গে।

হরিদাস বলল, 'দাদা, তুই তো সব করছিস। সাবানটা আমার হাতে দেনা আমি মামার পিঠে মাখিয়ে দিই।'

শক্তিপদ বলল, 'হ্যাঁ হরিই দিক।'

হরি খুশি হয়ে সাবান মাখাতে শুরু করল। নিজের কোমল চওড়া পিঠে পাখির পালকের মত দুটি কোমল করতলের স্পর্শ অনুভব করতে লাগল শক্তিপদ।

তারাদাস বলল, 'জানেন মামা বাবা বাঁচবার জন্যে খুব চেষ্টা করেছিলেন। এপারের মাঝিমাল্লারা যারা ছিল তাদের কাছে শুনেছি বাবা অন্ধকারে বসে বসে আসছিলেন। অন্য দিন টর্চটা থাকে। সেদিন ছিল না। সন্ধ্যা-বেলায় আমি যখন এলাম বললেন, 'তুই নিয়ে যা। দূর থেকে ট্রেনটা দেখতে পেয়ে বাবা প্রথমে ছাতা ফেলে দিয়েছিলেন, তারপর জুতো জোড়া, তারপর নিজে নদীর মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন আর সময় পেলেন না।'

মৃত্যুর সঙ্গে মানুষ তো এইভাবেই লড়ে। আর শেষপর্যন্ত হারে। শক্তিপদ ভাবল। মৃত্যুও সাধারণ মানুষের কাছে একান্ত স্বাভাবিক। কারণ মৃত্যু চিররহস্যে আচ্ছন্ন। জন্মও তাই। যতদিন না বিজ্ঞান জন্মমৃত্যুর মুখের ওপর থেকে এই দুটি কালো পর্দা তুলে ফেলতে পারবে ততদিন থিয়োলজি আর মেটাফিজিকসের রাজত্ব অব্যাহত চলবে। কিন্তু এই দুই রহস্যের সমাধান হলেও মানুষ হয়তো আরও দুরূহতর কোন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। যার মাথা আছে তারই মাথা ব্যথার দরকার হয়।

স্নান শেষ হল। খাওয়াদাওয়াও শেষ হল। আজ ভাগ্নেভাগ্নীদের সঙ্গে বসে নিরামিষই খেল শক্তিপদ। পরিবেশন করতে লাগল শ্যামা। রোগা শরীর নিয়ে সুবর্ণ এসে বসল সামনে।

সুবর্ণ বলল, 'সবই তো দেখে গেলেন। বউদিকে বলবেন।'

আমি আর কী বলব। বলবার কোন শক্তি আমার আর নেই—আমার সব শেষ হয়ে গেছে।'

খেয়ে উঠে একটু বিশ্রাম করল শক্তিপদ। ট্রেনের এখনও দেরী আছে।

তারাপদ বলল, তাড়াহুড়ো করবেন না। আমরা আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেব, গাড়িতে তুলে দেব।'

হঠাৎ সুবর্ণ উঠে গিয়ে কাগজে মোড়া কি একটা জিনিস নিয়ে এল। সেখানে আর কেউ ছিল না।

শক্তিপদ বলল, 'ওটা কী সুবর্ণ?'

সুবর্ণ লজ্জিতভাবে একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর মুখ নামিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ওঁর একটা ফটো। ভালো ফটো তো ঘরে নেই। এটা অনেকদিনের আগের তোলা। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় নিয়ে যদি—'

শক্তিপদ বলল, 'নিশ্চয়ই। আমি ভালো স্টুডিয়ো থেকে এনলার্জ করে এনে পাঠিয়ে দেব।'

সুবর্ণ সরে গেলে শক্তিপদ কাগজটা খুলে দেখে নিল ফটোখানা। বাহান্ন বছরে মারা গেল নন্দলাল। এ ফটো অনেক আগের তোলা। প্রথম যৌবনের। এখন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। লম্বাটে ধরনের মুখ। নাক চোখও বেশ বড় বড়। মুখের মিষ্টি হাসিটুকু যেন এখনো চেনা যায়। ভারি ভালোবাসত স্ত্রীকে। খুব আদর যত্ন করত। শক্তিপদের এই বোকাটে বোনটির মধ্যে কী যে এক অপূর্ব রহস্য আবিষ্কার করেছিল নন্দলাল তা সেই জানে। কলেজ জীবনে এও এক বিস্ময় ছিল শক্তিপদের কাছে। এসব নিয়ে হাসি ঠাট্টাও কম করেনি। কিন্তু যতদূর জানে শক্তিপদ মোটামুটি ওদের দাম্পত্য জীবন সুখেরই ছিল। দারিদ্র্য, অভাব অনটনে দুঃখে শোকে তা জীর্ণ হয়নি। বলা যেতে পারে সুখী হওয়া ছাড়া ওদের কোন উপায় ছিল না। তবু যে যার পথে যে যার ধরনে সুখই তো মানুষ খোঁজে আর সেই সুখের তোরণে পৌঁছবার আগে সবাইকেই বহু দুঃখের দরজা পার হয়ে যেতে হয়।

যাত্রার আয়োজন বাঁধা ছাঁদা চলতে লাগল। প্রণাম আর আশীর্বাদের পর্ব শেষ হল। পথ খরচটা আছে কিনা দেখে নিয়ে পাঁচটা টাকা শক্তিপদ শ্যামার হাতে গুঁজে দিল, 'ভাইবোনদের মিষ্টি কিনে দিয়ো।'

শ্যামা আপত্তি করে বলল, 'না না না, আপনার হয়তো শেষে টানাটানি পড়বে। ও আমি নেব না।'

কিন্তু শ্যামাকে নিতেই হল।

ততক্ষণে তারাদাস আর হরিদাস দুজনে দুই ন্যাড়া মাথায় শক্তিপদের স্যুটকেস হোল্ডঅল তুলে নিয়েছে।

শক্তিপদ বলল, 'ওকি আমার কাছে একটা দাও তোমরা পারবে কেন?'

হরিদাস বলল, 'খুব পারব। আমরা এমন কত নিই।'

সুবর্ণের শাশুড়ীর কাছ থেকে বিদায় নিল শক্তিপদ, বলল, 'চলি মাউমা।'

বৃদ্ধা ছল ছল চোখে বললেন, 'এসো বাবা, আবার এসো,—মনে রেখো ওদের কথা।'

বাঁখারির বেড়া দিয়ে বাড়ির সামনের দিকটা ঘেরা। সুবর্ণ সেই বেড়ার ধার পর্যন্ত এল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'রাঙাদা একটা কথা।'

শক্তিপদ ফিরে তাকাল, 'কী কথা সোনা।'

সুবর্ণ বলল, 'দেখবেন ওরা যেন ভেসে না যায়, ওরা যেন মরে না যায়।'

শক্তিপদ বলল, 'ছিঃ মরবে কেন।'

তারাদাস আর হরিদাস বোঝা মাথায় বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে আগে আগে চলেছে। সরু পথ। দুদিকে গাছ গাছালি, ফাঁকে ফাঁকে গৃহস্থের বাড়ি। তারাদাস ডান হাতে একটা পুঁটুলি ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে। শক্তিপদ বলল, 'ওটা আবার কী।'

তারাদাস বলল, 'কয়েকটা পেঁপে দিলাম বেঁধে। আমাদের গাছের বড় বড় পেঁপে। বেশ স্বাদ আছে। যেতে যেতে পেকে যাবে। কলকাতায় এ জিনিস পাবেন না মামা।'

শক্তিপদ বলল, 'তা ঠিক।'

তারাদাস যেতে যেতে বলল, 'আমাদের জন্যে অত ভাববেন না মামা। মা আর ঠাম্মা যত ভাবে আমি তত ভাবি না। চলেই যাবে কোন রকমে। দিদিও কিছু করবে, আমিও কিছু করব। তা ছাড়া খরচ অনেক কমিয়ে ফেলব। বাবা মাছের জন্যে ভারি ব্যয় করতেন। মাছ দেখলে আর লোভ সামলাতে পারতেন না। মাছের জন্যে আমি এক পয়সাও ব্যয় করব না। নদী নালা থেকে মেরে খাব'—

হরিদাস বলল, 'আমিও মারব। আমিও বড়শি বাইতে জানি।'

শক্তিপদ হাসল। যেন মাছের খরচটাই সংসারে সব। বলল, 'খবরদার কেউ জলে টলে নেবো না।'

হরিদাস বাহাদুরি দেখিয়ে বলল, 'আমরা সবাই সাঁতার জানি।'

ডাইনে মাঠ। মাঠের ধার দিয়ে রাস্তা। বেশ কড়া রোদ উঠেছে। শক্তিপদ এগোতে লাগল। আরো কিছুদূর গেলে নদী। খেয়া নৌকোয় নদী পার হবে। ওপারে স্টেশন।

ওরা দু ভাই ফের তার আগে আগে চলেছে। শক্তিপদ ভাবল, মরবে না হয়তো। কিন্তু পদে পদে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে। ওদের সেই অনির্দিষ্ট কালের দীর্ঘস্থায়ী জীবনযুদ্ধে, নিজের সংসারের বোঝা মাথায় করে কতখানি সহায়ক হতে পারবে শক্তিপদ, বলা সহজ নয়।

লিপটন
LAOJEE
লাওজী
চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
লাওজী
চা
LAOJEE
কম দামে
সেরা চা
LLC-6 BEN
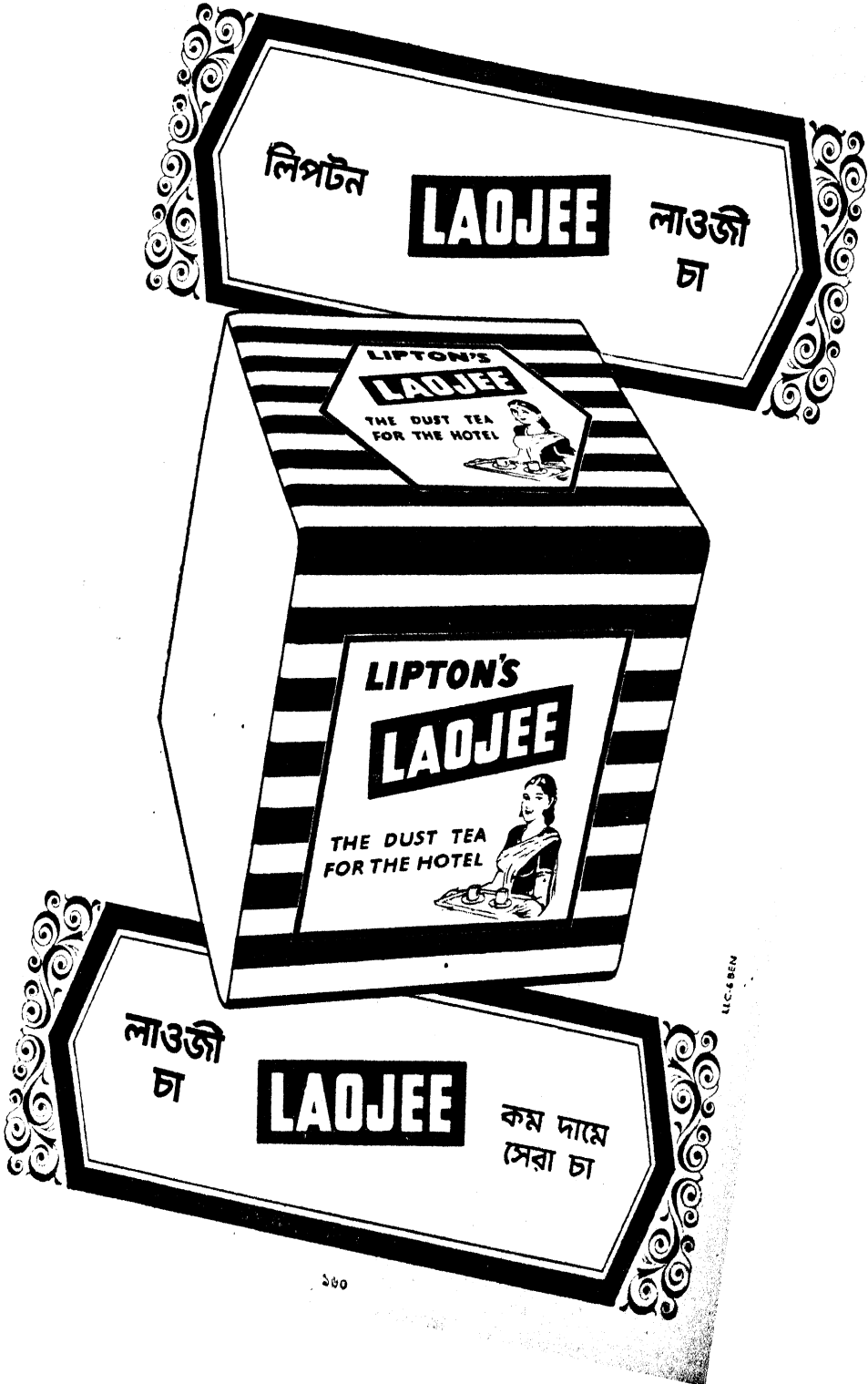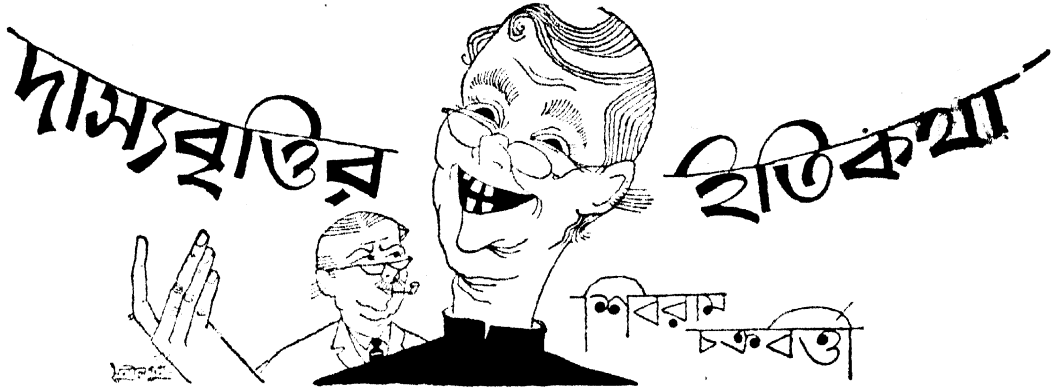
মাদের হরিপদ কেরানীর গল্প। হরিপদবাবু ব্যানার্জি সাহেবের আপিসে আজ বিশ বছর কাজ করছেন। এই বিশ বছরে একদিনের তরেও এক মিনিটের জন্য তিনি লেট হননি। আজ তিনি ইচ্ছে করেই দু ঘণ্টা লেট করে আপিসে এসেছেন।

চাকরি যাবে নির্ঘাত। আর, তাই তিনি চান। এই আপিসে অকারণে এত দেরি করে আসার একটিই মানে। বরখাস্ত হওয়াই একমাত্র পরিণাম। আর তাই তাঁর কাম্য।

নিজের থেকে আপিসের কাজে ইস্তফা দেবার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। ভাবলেই তাঁর বুক কাঁপে। তিনি চান ডিশমিশ হয়ে যান।

যেন লাখটাকার লটারি জিতেছেন এমনি ভাবখানা তাঁর। আর ঠিক তেমনি গটমট করেই তিনি আপিসে ঢুকলেন। আর, সত্যিই তাই। লটারির লাখটাকা তাঁর পকেটে সত্যিই বটে। টাকাটা ঠিক না হলেও তার পাশবই। লটারির প্রথম পুরস্কারের লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েই তিনি আসছেন এখন।

ব্যানার্জি সাহেবকে এই বিশ বছর তিনি যমের মত ভয় করে এসেছেন। 'যে আজ্ঞে সার'—ছাড়া আর একটি কথাও তাঁর মুখের ওপর বলতে সাহস করেননি কোনদিন।

ব্যানার্জি সাহেবকে জীবনে কেউ কোনদিন হাসতে দ্যাখেনি। বোধ করি বাল্যকাল থেকেই তিনি গাম্ভীর্য রক্ষার ব্রত গ্রহণ করে থাকবেন। তাঁর সম্মুখে এলে হরিপদবাবু, বুলডগের সামনে বেড়ালের মতই যেন নেতিয়ে পড়তেন।

কিন্তু আজকের কথা আলাদা। লাখটাকার মালিক হয়ে আজ নিজেকেই তাঁর বুলডগ বলে বোধ হচ্ছে। তবে তাঁকে দেখে বানার্জি সাহেব যে বেড়ালের ন্যায় নেতিয়ে পড়বেন সে ভরসা তাঁর কম।

দেখবা মাত্রই তাকে দূর করে দেবেন নিশ্চয়। এবং দূরীভূত হতেই চান আজ হরিপদ কেরানী। এই বুঝি চাকরি যায় প্রতি মুহূর্তে সেই ভয়ে আজ বিশ বছর তিনি কাটিয়েছেন। আজ তার এস্পার ওস্পার হয়ে যাক। চাকরির তাঁর আর দরকার নেই।

চেকটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েই তিনি চলে গেছেন চৌরঙ্গীর এক সাহেবী রেস্তরাঁয়। সেখানে পুরোদস্তুর লাঞ্চ সেরে (জীবনে এই প্রথম)! তিনি গেছেন এক রেডিয়ো কোম্পানীর দোকানে। একটা অলওয়েভ রেডিয়ো সেট কিনে বারোটা বাজিয়ে তার পরে তিনি ঢুকেছেন নিজের আপিসে। যে আপিসে দশ মিনিট লেট হলে দুশো কৈফিয়ৎ দিতে হয় সেখানে দুঘণ্টা লেট করে'।

রেডিয়ো সেটটা টেবিলে নিজের সামনে রেখে বসতে না বসতেই তলব এলো বানার্জি সাহেবের। 'কর্তা আপনাকে আসামাত্রই দেখা করতে বলেছেন।' জানালো এসে বেয়ারা।

'ভালো।' হাঁপ ছেড়ে বললেন হরিপদবাবু: 'আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

বানার্জি সাহেবের খাস কামরার দরজায় করাঘাত করতেই ভেতর থেকে রুক্ষ গলার সাড়া এলো: 'ভেতরে এসো।'

হরিপদবাবু কম্পিত হলেন। মৃদুকম্পন—মুহূর্তের জন্যই।

'নমস্কার সার।' চিরাচরিত অভ্যাসবশে নমস্কার জানিয়ে তিনি খাস কামরায় ঢুকলেন সাহেবের।

সাহেব ঘাড় নিচু করে লিখেই চলেছেন—হরিপদর প্রতি দৃকপাত না করেই। হরিপদবাবু দমে গেলেন বেশ।

'কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?' বাজখাঁই আওয়াজ বেরিয়ে এলো কর্তার: 'এই বিশ বছরে এমন লেট ত তুমি কখনো করো নি। এই প্রথম দেখছি।'

হরিপদবাবু কৈফিয়তের সুরে কী যেন বলতে গেলেন, কিন্তু সেটা তাঁর আমতা-আমতার বেশি আর এগুলো না।

'ঠিক আছে। যাক গে, আর যেন কখনো এমনটা না হয়। যাও।'

ঠিক বেড়ালের মতই নেতিয়ে যেন বেরিয়ে এলেন হরিপদবাবু। বসলেন এসে নিজের টেবিলে। গম্ভীর হয়ে।

চেকটা হাতে আসার পর থেকে, আজ সকাল থেকেই, কত না আশা খেলা করেছে ও'র মনে। এই দাস্যবৃত্তির থেকে চিরকালের মতন রেহাই পাবেন। একটা ছোটখাট বাড়ি কিনবেন কলকাতার কোনোখানে—বেহালা, কি, চেতলার দিকে কিংবা শহরতলীরই কোথাও। বাড়ির চারধারে ফুলের বাগান, ওরই ভেতর কেয়ারি করা। সরকারী আরামী বাসে চেপে সারা বাংলার দ্রষ্টব্য স্থানে টহল দিয়ে বেড়াবেন। ভারত ভ্রমণে বেরুবেন স্পেশাল ট্রেনে। দেখে বেড়াবেন গোটা দেশ। কাশ্মীর ভ্রমণেও যেতে পারেন। কত কি!

কিন্তু সব আশায় তাঁর ছাই পড়ল যেন হঠাৎ! চাকরি না গেলে এসব আর হবে কি করে? কিন্তু কি করে তিনি নিজের চাকরি খোয়াবেন তাই ভেবে পাচ্ছেন না।

যে কর্তা কথায় কথায় মানুষকে জবাব দেন, ভাগ্যদোষে তাঁর বেলা তাঁর জবাব আজ অন্যরকম!

লেজার বইয়ের সামনে, পাতাটি না খুলে গুম হয়ে চুপ করে বসে থাকলেন তিনি।

বসে বসে হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলল তাঁর

মাথায়। কাছাকাছি প্লাগ্‌-পয়েণ্টের সঙ্গে সংযোগ করে রেডিয়ো সেটটা তিনি চালু করে দিলেন। একটু পরেই তারস্বর আওয়াজ বার হল:

'লারে লাপ লারে লাপ লারে লাপালা!'

মুহূর্তের মধ্যে বানার্জিসাহেবের দরজা খুলে গেল, খোলার আওয়াজ কানে এল হরিপদবাবুর। বানার্জিসাহেব তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, ঘাড় না ফিরিয়েই তা টের পেয়েছেন তিনি।

হরিপদবাবু মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'কেমন সার চমৎকার না? আপিস ঘরে এমনি জিনিসের দরকার। গান বাজাও, সঙ্গে সঙ্গে কাজ বাজাও। গানের সাথে সাথে কাজ। এতে করে কর্মচারীদের মনে ফূর্তি হবে, তারা ফূর্তির সঙ্গে কাজ করবে। আপনার আপিসের কাজ ভালো হবে আরো। কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি আরো ঢের বেশী কাজ আদায় করতে পারবেন। তাই কি আপনার মনে হয় না সার?'

এতগুলি কথা একসঙ্গে কর্তাকে কোনোদিন তিনি বলেন নি। বলার সাহস করেন নি। বলবার কল্পনাও ছিল না কোনদিন। কিন্তু আজ......আজ সব খোয়াবার খেলায় তিনি মরীয়া।

বানার্জিসাহেব কিছু বললেন না। মনে হল তিনি যেন কিছু একটা ভাবছেন।

অনুরোধের আসর ততক্ষণে আরেক গানে মুখর হয়েছে:

'আ যা প্যারে পাশ হামারে কাহে ঘাবড়ায়ে...!'

'যে আজ্ঞে সার'-এর বেশি যে কোনদিন এগোয়নি সে আজ কর্তার মুখের ওপর এতগুলো কথা বলে ফেলেছে...এখন কর্তার কী আজ্ঞা হয় দেখা যাক! এই চরম মুহূর্তকে তিনি জুড়িয়ে দিতে চান না, গরম থাকতে থাকতেই চূড়ান্ত করে ফেলতে প্রস্তুত।

রেডিয়োর সুরলহরীর সঙ্গেই তাঁর সুর হয় আবার: 'দেখুন সার, হাসপাতালে, রেলগাড়িতে, এমনকি জেলখানাতেও রেডিয়ো চালু হয়েছে আজকাল। অনেক অফিসেও আপনি দেখতে পাবেন। তাতে বেশি কাজ আদায় হয় বলেই শোনা যায়। এমন কি, জেলখানার কয়েদীরা পর্যন্ত গানের তালে তালে বেশি বেশি পাথর ভাঙছে আজকাল, সরকার বেশি বেশি তেল বার করতে পারছেন তাদের থেকে...।

তেল যে বেরুচ্ছে তা যথার্থ। এমন কি, গানের চোটে হরিপদ কেরানীরও তেল দেখা দিয়েছে। কর্তা বোধহয় এতক্ষণে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন। তিনি বলেন—বেশ! এই সেটটার দাম কত পড়েছে?'

'সাড়ে তিনশো টাকা!'

'তুমি ঠিকই বলেছ হরিপদ! একটা ভাউচার করে ক্যাশিয়ারের কাছে নিয়ে যাও। সে তোমাকে টাকাটা দিয়ে দেবে।'

'যে আজ্ঞে সার।' বলেন হরিপদবাবু। এর বেশি আর বলতে পারেন না!

হরিপদবাবু লেজারের সামনে বেজার হয়ে বসে থাকেন। ঐ বিপুল বহরের বাহারী খাতাটি তাঁর দু চক্ষের বিষ আজ। ওর

খটমট করে হরিপদবাবু বড়কর্তার ঘরে ঢুকলেন

একটি পাতা ওল্টাতেও তাঁর উৎসাহ হয় না, কাজ করা দূরে থাক।

সকালবেলার দৈনিকখানা পকেট থেকে বার করে পড়তে থাকেন তিনি। পড়তে পড়তেই আভাস পান কর্তা আবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কড়া নজরে লক্ষ্য করছেন তাঁকে, নিজের পাঁজরায় পাঁজরায় টের পান তিনি।

'এটাও কি তোমার আরেকটি উদ্ভাবনা নাকি হরিপদবাবু? আপিসের ডেস্কে বসে খবরের কাগজ পড়া? এখনো কি চা-বিস্কুট টোস্ট দিয়ে যায়নি?'

'বানার্জিসাহেব, আপনি জানেন আপনার আপিসে আমাদের হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়। যদি আমাদের মাঝে মাঝে ক্ষণিকের বিশ্রাম নিতে দেন এইরকম তাতে আপনার কাজ ভালোই হবে আরো। ফূর্তিতেই মানুষ কাজ করে। মনের ফূর্তিই হচ্ছে আসল। মনের ফূর্তি থেকেই কাজের স্ফূর্তি হয়—আপনার থেকেই। তাছাড়া, বানার্জি-সাহেব, মনে রাখবেন যে কেরানী হলেও আমরাও মানুষ...'

'বেশ বেশ। তাই হবে।' মাথা নাড়লেন বানার্জিসাহেব: 'এবার থেকে মাঝে মাঝে বিরতি দেয়া হবে তোমাদের। দু ঘণ্টা কাজের পর দশ মিনিট করে'। তাছাড়া টিফিনের আধঘণ্টা তো রইলই। কিন্তু এইখানেই শেষ...এই তোমার শেষ উদ্ভাবনা। এরপর আমি আর কোন কথা শুনব না। নাও, এবার কাজে লাগো।'

হরিপদবাবু বসে ছিলেন তাই রক্ষে। দাঁড়িয়ে থাকলে মাথা ঘুরে পড়ে যেতেন এতক্ষণ।

মৃদুস্বরে 'যে আজ্ঞে সার' বলে তিনি লেজারের খাতাটা খুললেন। অলসভাবে আরম্ভ করলেন নিজের কাজ।

কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁর কলম থেমে যেতে লাগল। কলম কামড়ে তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন—কী করতে কী হল! যা চেয়েছিলেন সেটি তো হচ্ছে না কিছুতেই। চাকরি তাঁর খতম্ হচ্ছে কই!

কিন্তু বানার্জিসাহেবের কাছে যে পরিমাণ বেয়াদবি তিনি দেখিয়েছেন তার একটা পরিণাম আছেই। সাহেব কিছুতেই এতটা বরদাস্ত করবেন না। মনে মনে তিনি চটেছেন। চটবার পর যা ঘটবার—ঘটবেই। চাকরি যাবার তার বিলম্ব নেই।

এমন সময়ে বেয়ারা এসে খবর দিল—কর্তা আপনাকে আপিস ঘরে ডেকেছেন।

বাস্! এই ত এসে গেছে তার অন্তিমক্ষণ! শেষমুহূর্ত ঘনীভূত হয়ে এসেছে! এইবার চাকরি তার খতম্! হরিপদবাবু বাতাসে মুক্তির স্বাদ পান।

খটমট করে তিনি ঢোকেন কর্তার আপিস ঘরে—আবজানো দরজা সশব্দে ঠেলে। বানার্জিসাহেব চকিত হয়ে চোখ তুলে তাকান, তাঁর বেশ তাক লাগে, বলতে কি! তিনি একটু হাসবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দীর্ঘকালের অনভ্যাসের দরুন মুখের মাংসপেশীরা সহজে সাড়া দেয় না।

'ভেতরে এসো হরিপদ।' তিনি আদেশ দেন। যদিও তাঁর আদেশের অপেক্ষা না রেখেই হরিপদ অন্তর্গত হয়েছে।

'তোমার ব্যবহারে আমি বেশ অবাক হয়েছি আজ।' বলেন বানার্জিসাহেব।—'তোমাকে আমি চিরদিন গোবেচারী বলেই জানতাম, কিন্তু তুমি যে...তোমার বুকের পাটা যে এতখানি তাই দেখে আমি রীতিমতন বিস্মিত। কিন্তু আমি এইরকম জবরদস্ত লোকই চাই। আমার মুখের ওপর দাঁড়িয়ে দু কথা বলতে পারে তেমন লোককে আমি পছন্দ করি। আপিস চালাতে হলে তেমন লোকেরই দরকার। আমাদের বড়বাবুর রিটায়ার করার সময় হয়ে এসেছে। আজ থেকে তোমাকে আমার আপিসের বড়বাবু করে দিলাম।'

'যে আজ্ঞে সার।' বলেই হরিপদবাবু মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

"সুরের জাল বুনি"

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

শেক্সপীয়ারের হেনরি দি এইটথ্ নাটকে আছে ওরফিয়ুস যখন বীণায় ঝংকার তুলতেন, তখন সে ঝংকারে নবজন্ম লাভ করত তৃণাঙ্কুর। যখন তিনি গান করতেন, তখন তুষারধবল পর্বতচূড়া তাঁকে প্রণাম জানাত। তাঁর গানের সুরে ফুলেরা কুঁড়ি থেকে চোখ মেলত, তৃণলতারা মাথা তুলত।

ওরফিয়ুসের এই সাধনা যথার্থ শিল্পীর সাধনা। শিল্পী যখন সুরের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, তখন তাঁর সুর পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে চলে যায় প্রকৃতির ধ্যানলোকে। শ্রোতারা নানাজনে নানা অর্থ গ্রহণ করেন। কেউ পুলকিত হন আনন্দে, কেউ মথিত হন আবেগে, কেউ সমাহিত হন অনুভূতির প্রাবল্যে—কিন্তু তার শেষ অর্থ ধায় আরও নিভৃতালোকে। প্রকৃতির মাঝে। জড় প্রকৃতি যখন সুরের পরশে প্রাণ পায়, তখনই তো শিল্পীর বিজয় ঘোষণা।

আমার সুদীর্ঘ শিল্পী জীবনে নিত্য-কালের সুরকারের মত একই আর্তির অভিপ্রকাশ ঘটেছে : মনে করি অমনি সুরে গাই। কিন্তু সেই সঙ্গে কবির মত শিল্পীর সেই প্রবল জীবনযন্ত্রণার প্রাবল্যে আমি বার বার ক্ষতবিক্ষত হয়েছি : কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই। যে কথা যেভাবে কহিতে চাই, সেভাবে তো বলা গেল না। কবির কথায় বলা যায় : 'আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া আপনি অবশমন।'

তবু শিল্পীর জীবনে যেটি পরমকাম্য—সাধনার ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা, তাকে জীবনে গ্রহণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।

ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের শিষ্য আমি। গুরুজীর কাছে সংগীত সাধনার যে মূল কথাটা শিখেছি, তা হল প্রেম। ওই প্রেম রাগ-রাগিণীর ওপর। গুরুজী বলতেন, শিল্পীর কাছে রাগ-রাগিণীরা হল আপন সন্তানের মত। মায়ের যেমন কোন ছেলের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব নেই, তেমনি শিল্পীরও কোন বিশেষ রাগিণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। যখন যে রাগিণীতে শিল্পী দেবীকে আবাহন করবেন, তখন সেটাই তাঁর কাছে ধ্রুব সত্য।

বাদল খাঁ সাহেবের কথা এখনও মনে পড়ে। তিনি ছিলেন আমার সুরের গুরু। এখনও আমার ঘরে তাঁর অয়েল পেন্টিংয়ের দিকে আমি অনেক সময় তাকিয়ে থাকি। গানের আবহাওয়া ছিল আমাদের বাড়িতে। দাদা গান গাইতেন, মা উৎসাহ দিতেন। সে যুগে এটাই ছিল বিস্ময়। ওস্তাদ বাদল খাঁ আমাদের বাড়ি আসতেন গান শেখাতে।

ওস্তাদজী গান গাইতেন না। তিনি ছিলেন তামাম হিন্দুস্তানের সারেঙ্গীর ওস্তাদ। আমি ও দাদা (তারাপ্রসন্ন চট্টো-পাধ্যায়) ও'র কাছে বাজনা শিখতাম। ওস্তাদজীর কথা মনে পড়তেই মনে পড়ে দীর্ঘ পুরুষ, একটু কৃশ, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। আমরা যখন তাঁকে দেখি, তখন তাঁর বয়স নব্বুই বছর। কিন্তু সেই বয়সেও কি অপরিসীম মনোবল তাঁর। আমাদের বলরাম দে স্ট্রীটের বাসা থেকে তিনি বাজনা শিখিয়ে লাফিয়ে চলন্ত বাসে উঠতেন।

গুরুজীর কাছে ওঁদের ঘরানার পরিচয়

শুনেছিলাম। আগ্রার বাসিন্দা ওঁরা পুরুষানুক্রমে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এঁরা রাজরোষে পড়েন। অবশ্য যখন বৃটিশরা জানতে পারল এঁরা শিল্পী, তখন তারা সসম্মানে মুক্তি দিয়েছিল।

গুরুজী ওঁর ঠাকুর্দার কথা বলতেন। ঠাকুর্দা চাঙ্গা খাঁর ছিল হাতে পায়ে ছ'টা করে আঙুল। তিনি ছিলেন হিন্দুস্থানের পয়লানম্বর সারেঙ্গী বাজিয়ে। যখন কোথাও বাজাতে যেতেন, তখন একটা ডুলিতে তিনি যেতেন আর একটা ডুলিতে তাঁর সারেঙ্গী যেত।

শিল্পীর কাছে পূজনীয় কে? সহৃদয় শ্রোতা। যাকে বলে সমঝদার। আর এই সমঝদারের কোন জাত নেই। গুরুজী বলতেন : গবাইয়া কাফি মিলতা হ্যায়—লেকিন সমঝদার মিলনা বহুৎ মুশকিল হ্যায়।

তিনি বলতেন, আসরে গিয়ে আমি সবচেয়ে আগে দেখি সমঝদার।

সমঝদারের কথা উঠলে প্রায়ই একটা গল্প বলতেন গুরুজী। এক নবাব-দরবারে জলসা বসেছে। অনেক লোকের নেমন্তন্ন। অনেকে সমঝদার সেজে বসে গেছেন গানের আসরে। সকলেই তালে তালে ঘাড় নাড়ছেন। বিরতির সময় নবাব বললেন : গানের মাঝে যদি কেউ ঘাড় নাড়, তাহলে তার গর্দান নেব। অমনি কিছু লোকের ঘাড় নাড়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কিছু লোক সব ভুলে তবুও ঘাড় নাড়তে লাগল। নবাব তখন বললেন, যারা ঘাড় নাড়েনি, তাদের আসর থেকে বার করে দাও। যারা প্রকৃত সমঝদার, তারা গানের সুর শুনলে নিজের অজান্তে ঘাড় নাড়বেই।

এদিক থেকে আমি শিল্পী হিসাবে ধন্য যে আমি জীবনে যত আসরেই গান গেয়েছি, প্রতিটি আসরেই সমঝদার মানুষ সহৃদয় মানুষের সন্ধান পেয়েছি। হুজুগের হাততালি নয়, সস্তা প্রশংসা নয়, খবরের কাগজে নাচানাচিও নয়—শিল্পীর প্রকৃত সম্মান বোদ্ধার কাছে। বিশেষ করে রাগ-প্রধান সংগীতের ক্ষেত্রে তো বটেই।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অতীত দিনের মিউজিক কনফারেন্সগুলির কথা। সে যুগের মিউজিক কনফারেন্সগুলির এখনকার মত জৌলুষ ছিল না। তবে আভিজাত্য ছিল। সে যুগে আসরে বসে গান নিয়ে রীতিমত তর্ক-বিতর্ক হত। একেবারে টেকনিক্যাল ব্যাপার। কিন্তু শ্রোতারা তাতে বিরক্তি বোধ করতেন না। বরং উৎসাহিত হতেন।

১৯৩৪ সালে আমি প্রথম অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে গান গাই। বেনারসে হয়েছিল সেবারের কনফারেন্স। সেই প্রথম বাঙালীরা অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্সে গাইবার সুযোগ পেল।

তখন আমি মেগাফোন কোম্পানীর মিউজিক ডাইরেক্টর। মাস গেলে মাইনে পাই দেড়শ টাকা। আমার দাদা ছিলেন রেকর্ডিং ম্যানেজার। বেনারসে গেলাম দাদার সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে আরও ছিলেন বাঁশী বাদক গোপাল লাহিড়ী, সরোদ বাদক বাণীকান্ত মুখার্জি, মেগাফোন কোম্পানীর মিউজিক ডাইরেক্টর জ্ঞান দত্ত ও আমার ছাত্র নরেন (নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি)।

চাঁদনিচকের কাছে একটা বাড়িতে আমরা উঠেছিলাম। কনফারেন্স হয়েছিল এই এলাকাতেই। পাঁচ হাজার লোকের বিরাট প্যাণ্ডেল। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে লাউডস্পীকার ছিল না। তবে গাইয়েদের গলায় জোর ছিল।

সেবার হিন্দুস্থানের ওস্তাদ গাইয়েরা জড়ো হয়েছেন কনফারেন্সে। এসেছেন গোয়ালিয়র মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কৃষ্ণরাও ভাস্কর পণ্ডিত, নাসিরুদ্দীন খাঁ সাহেব, শ্রীকৃষ্ণরতন ঝঙ্কার, আলাউদ্দীন খাঁ, এনায়েত খাঁ, ওংকারনাথ ঠাকুর, পটুবর্ধন।

সকাল আটটায় কনফারেন্স সুরু হয়। বেলা একটায় ভাঙে। তারপর আবার সন্ধ্যা থেকে সারারাত।

দুদিন ধরে কনফারেন্সে যাই। দর্শক-দের মধ্যে বসে থাকি। গান শুনি। আবার চলে আসি। এ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের কাউকে ধরতে পারিনি। বলা বাহুল্য, মনে মনে বিরক্ত হচ্ছি। নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে এ কেমন ব্যবহার।

তিনদিনের দিন একটা মজার ব্যাপার হল।

কনফারেন্স থেকে বাসায় ফিরছি। এমন সময় ননী মতিলালের সঙ্গে দেখা। ননী-বাবু সজনীকান্ত মতিলালের কাকা। কনফারেন্সের একজন মেম্বার।

ননীবাবু আমাকে দেখে বললেন : কই ভীষ্ম এসেছে, একথা তো আমায় কেউ বলেনি। কোথায় উঠেছেন আপনারা?

দাদা আমাদের বাসার ঠিকানা বললেন। ননীবাবু খুব অপ্রস্তুত হয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর এলেন কনফারেন্সের সেক্রেটারী। বললেন : দেখুন তো কি লজ্জার ব্যাপার! আপনারা এসে বসে আছেন অথচ। বললেন : আমার ধারণা ছিল আপনি গাইতে রাজি হবেন না। তা আপনার প্রোগ্রাম কাল দেব ওঁঙ্কারনাথজীর সঙ্গে।

পরদিন সন্ধ্যায় ওঁঙ্কারনাথ মালকোষ ধরলেন। গতকাল এই প্যাণ্ডেলেই ওস্তাদজীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণরতন ঝঙ্কারের সঙ্গে বিতর্ক হয়ে গেছে। জৌনপুরী ও আসাওয়ারি ধৈবতের শ্রুতি কতটুকু তা নিয়ে। তবে সেদিন তাঁর মেজাজটি প্রসন্ন ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসর জমিয়ে ফেললেন।

আমিও মালকোষ গাইলাম। সম্পূর্ণ মালকোষ। রেখা পঞ্চমে চড়িয়ে। সাধারণত কেউ গায় না। রেখা পঞ্চম বর্জিত হল মালকোষ।

এক ঘণ্টা পনের মিনিট পরে গান শেষ করলাম। কেমন হল বলতে পারব না। তবে ওস্তাদ নাসিরুদ্দীন বললেন : ওঁঙ্কারনাথজী পণ্ডিতজী, আপকা বোলনা বহুৎ আচ্ছা হ্যায়, লেকিন গানা বাচ্চা গায়া হ্যায়।

পরের দিন ভোরে গাইলাম তোড়ী আর ভৈরবী। সেদিনই কনফারেন্সের শেষ দিন। যাবার তোড়জোড় করছি। এমন সময় সেক্রেটারী এসে বললেন : একটা স্পেশাল সিটিং করছি। আপনি যদি থাকেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে থাকা সম্ভব হল না।

সে যুগে আমরা ছিলাম অ্যামেচার আর্টিস্ট। আমরা গান গেয়ে পয়সা নিতাম না। অ্যামেচার আর্টিস্টদের সে যুগে সম্মান ছিল। এ যুগে ঠিক তার উল্টো। যার যত বেশী ফি তার তত খাতির। ঠিক ডাক্তার, উকিলদের মত। কিন্তু শিল্পীদের বেলায় সেকালে তা হবার উপায় ছিল না।

কানপুরে অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সের কথা মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে। কানপুরে পৌঁছে শুনলাম : আমাদের

থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে একটা বাড়িতে। আমরা বললাম : হোটেলে ছাড়া আমরা থাকব না। উদ্যোক্তারা বললেন : সব হোটেল বুকড্। আমরা বললাম : তাহলে আমরা এলাহাবাদ ফিরে চললাম।

ওঁরা তখনই তাই শুনে একটা বড় হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন।

পরদিন ভোরবেলা হোটেলের আর্দালি এসে খবর দিল যে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হোটেলে এসে আমাদের খুঁজছেন।

শুনে ভয় হল বৈকী। কি জানি হয়ত কাল রাতে হোটেলে থাকা নিয়ে কি গোলমাল করেছি, তার ফলেই বোধহয় স্বয়ং ডি এম-এর আবির্ভাব।

ডি এম হলেন একজন বাঙালী। পুরো নামটা মনে নেই। তবে তাঁকে মিঃ গাঙ্গুলী বলে জানতাম।

মিঃ গাঙ্গুলী আমাদের ঘরে এসে বললেন : শুনেলাম বাংলা দেশ থেকে নাকি ভীষ্মদেব এসেছেন।

দাদা আমাকে ডাকলেন। আমাকে দেখে ভদ্রলোক নিরাশ হলেন বলে মনে হল।

দাদা ঠাট্টা করে বললেন : আপনি হয়ত ভেবেছিলেন, ওঁর পাকা চুল-দাড়ি থাকবে। কিন্তু ও একেবারে কালের ভীষ্ম। তাই অমন বাচ্চা।

মিঃ গাঙ্গুলী হেসে উঠলেন।

মিঃ গাঙ্গুলী পরে জানালেন তাঁর প্রস্তাবটা। আমরা যদি তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠি, তাহলে তিনি আনন্দিত হবেন।

আমরা রাজি হলাম সানন্দে।

বিরাট বাড়ি। আমাদের জন্য ক'খানা ঘর ছেড়ে দেওয়া হল। একজন চাকর। আর একটা গাড়ি। আমরা তো প্রবাসে হাতে চাঁদ পেলাম।

কানপুরের কনফারেন্সের উদ্যোক্তা ছিলেন নারায়ণ রাও ব্যাস ও পটুবর্ধন। এঁরা দুজনেই বিষ্ণু দিগম্বরের ঘরানা।

মিঃ গাঙ্গুলী বললেন : উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, বাঙালীরা গাইতে পারে না। আপনাকে এই ভুল ধারণাটা ভেঙে দিতে হবে।

মিঃ গাঙ্গুলীকে বলেছিলাম : চেষ্টা করব।

এই আসরে ছিলেন ফৈয়াজ খাঁ। আমার প্রোগ্রাম খাঁ সাহেবের আগে। এখানকার শ্রোতারা আরও সমঝদার। এমনকি আস্তাই বলে দিলে তারা অন্তরা বলে দিতে পারে।

প্রথম রাত্রিতে গান গাইবার পর দুজন শ্রোতা এসে সোনার মেডেল দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি গেয়েছিলাম খেয়াল, রাগিণী খাম্বাবতী, বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে। পরের দিন সকালে গাইলাম দেশী—তোড়ী ও ভৈরবী ঠুংরী।

এরপরে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের পালা। শ্রোতারা ধরলেন এই একই রাগিণীতে খাঁ সাহেবকে গাইতে হবে। খাঁ সাহেব দেশী তোড়ী ধরলেন। ভৈরবীও গাইলেন। সুর, লয়, তৈরী ও গায়কি এই চারটি প্রধান গুণ ছিল ফৈয়াজ খাঁর। রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধতার দিকে তাঁর সতর্কতা ছিল।

অনেক গায়ক মনে করেন, তিনি যেমন-ভাবে খুশী গাইবেন, বোঝবার ভার শ্রোতার ওপর। কিন্তু আমার মনে হয়, এই সঙ্গে শিল্পীরও একটা দায়িত্ব আছে। বোঝাবার দায়িত্বও তাঁর। যাকে বলে সত্যিকারের রসসৃষ্টি। এ রসের এমন উপস্থাপনা চাই যে, ব্যাকরণ না ঘেঁটেও রসিকমনের অন্তঃস্থলে তা পৌঁছতে পারে।

সেবারের মথুরা কনফারেন্সের কথাই বলি। কানপুর থেকে আমরা গেলাম এলাহাবাদ, সেখান থেকে মথুরা। ফৈয়াজ খাঁরও সেখানে গাইবার কথা।

হলে গিয়ে দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার। যে গাইয়ে আসছে, তাকে লোকে হাততালি দিয়ে তুলে দিচ্ছে। দেখলাম, ব্যাপার দেখে খাঁ সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেছে। তারাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন : এ লোক কেয়া মাংতা? বললেন : আমি তাহলে খেয়াল গাইব না, গজল গাইব। গজলের শের বলতেই শ্রোতারা হৈ-হৈ করে উঠল। বোঝা গেল, ভাঙা আসর এবার জমেছে।

খাঁ সাহেবের পর আমার পালা। দাদা বললেন : তুই ভজন গা।

সেই প্রথমবার আমি দাদার কথা রাখতে পারিনি। বলেছিলাম : না-না। আমি খেয়ালিয়া। খেয়াল ছাড়া গাইতে পারব না।'

আমি বাহার ধরলাম—'কাসোলে যাইও গোঁইয়া।' আলাপ বাদ দিয়ে বিলম্বিত বাদ দিয়ে প্রথম থেকেই দ্রুত লয়ে।

আমি শিল্পী। আমার সামনে শ্রোতা। আমার উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি—রস বিচার নয়। দেখলাম, শ্রোতারা চুপ। এই কিছুক্ষণ আগে যাদের উগ্রমূর্তি দেখেছিলাম, প্রচণ্ড অস্থিরতায় যারা ছটফট করছিল, তারা চুপ করে আমার খেয়াল শুনল। মনে মনে প্রণাম করলাম আমার গুরুকে। ওস্তাদ বাদল খাঁকে। সেই সঙ্গে আমার মাকে—আমার শিল্পী জীবনের প্রথম প্রেরণা যিনি।

খেয়ালের পর গাইলাম ঠুংরি, তারপর ভজন।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর পর তিন বছর ফয়জাবাদ, কানপুর, এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা, দিল্লি, সিন্ধ শিকারপুরে সমস্ত মিউজিক কনফারেন্সেই আমাকে যেতে হয়েছে। প্রায় প্রতিটি আসরেই দেখা হয়েছে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে। মনে আছে, খাঁ সাহেব কলকাতায় এসে দেখা করেছিলেন গুরুজীর সঙ্গে। গুরুজী ওস্তাদ বাদল খাঁ তখন থাকতেন কলাবাগানের কাছে। ফৈয়াজ খাঁ একশ এক টাকার নজরানা এনে রাখলেন গুরুজীর পায়ে।

গুরুজী বললেন, তুমিই এখন হিন্দুস্থানের বড় খেয়ালিয়া। ফৈয়াজ খাঁ সবিনয়ে বললেন : আপনারা যে গান করেছেন বা শুনেছেন তার কাছে আমি তো আপনার ছেলের মত। আপনার কাছে সাত ঘরানার জিনিস আছে। খাঁ সাহেবের এই কথাটাই প্রতিটি প্রকৃত শিল্পীর অন্তরের কথা। যিনি সুরের গুরু, তাঁর কাছে নিজের সংগীত তো তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর।

এই দর্শনকে যদি আরও ব্যাপক করি তাহলে তো কথাই নেই। তখন বিশ্ব-স্রষ্টার অনাদি সংগীতের কাছে নিজের সুরকে কত তুচ্ছতরই না মনে হয়।

এই তুচ্ছতারই বেড়াজাল থেকে মুক্তির স্বপ্ন একদিন আমার জীবনে দুর্বার হয়ে উঠেছিল। আমার শিল্পী জীবনের পিছনে জীবনদেবতার যে নিরন্তর আশিসধারা বর্ষিত হয়ে আসছে, তারই উৎস সন্ধানে একদিন যাত্রা সুরু করেছিলাম। কিছু-দিনের জন্য মুছে যেতে চেয়েছিলাম মানুষের জীবনপট থেকে। কিন্তু সে স্বতন্ত্র ইতিহাস।

অনুলেখক : শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়

"গুঞ্জরি তান
উঠিল তোমার
সোনার বীণার তারে"
শ্বেত শুভ্র কাশের বনে হাওয়ার দোলায়
মালতী-শেফালীর বিকীর্ণ সুরভে,
মরালের ছন্দিত ডানায় আর অবারিত
নীল আকাশে ঝংকার উঠেছে শারদ-
লক্ষ্মীর বীণায়। প্রতি বছর এই শুভমুহূর্ত-
টিকে আমরা স্মরণীয় করে রাখতে চাই
আমাদের জীবনে। 'ঝংকার' রেডিওর
সুরের স্পন্দনে এই আনন্দ আপনার
কাছে আরো বিমূর্ত হয়ে উঠবে।
ঝংকার
রেডিও
JHANKAR
অপূর্ব ম্যাগনাটোন-সহ
পূর্বাঞ্চলের একমাত্র পরিবেশক:—
রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্ প্রাইভেট লি:
ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা—১

গুপ্তচর-দর্পণ

সরোজ আচার্য

প্রেম যুগে যুগে; গোয়েন্দাগিরিও। কথায় বলে পৃথিবীর প্রাচীনতম দুটি বৃত্তির একটা হল গুপ্তচরবৃত্তি। গোয়েন্দাগিরির প্রাচীনতম একটি ঘটনার লিখিত বিবরণ বাইবেলের "ওল্ড টেস্টামেন্ট" গ্রন্থের "বুক অব যোশুয়া"তে। জেরিকো নগরের সে-সময় প্রবল প্রতাপ। কিন্তু জেরিকো-রাজের সঙ্গে ইজরেলের জিহোভা-উপাসকদের দারুণ রেষারেষি। খৃষ্টপূর্ব চৌদ্দশ একত্রিশ বৎসর আগের কথা। জিহোভা-পন্থী যোশুয়া দুজন চরকে পাঠালেন গোপনে জেরিকো নগরীর খবরাখবর সংগ্রহে। তারা এসে বাসা বাঁধল জেরিকোর রাহাব নামে এক গণিকার বাড়িতে। কিন্তু জেরিকোর রাজার কাছে যোশুয়ার এই চরদের আগমনবার্তা গোপন রইল না। গুপ্তচর-দর্শনের নিয়মই এই এক পক্ষের গোয়েন্দার উপর নজর রাখা চাই অপর পক্ষের গোয়েন্দাদের—যাকে বলে "ইনটেলিজেন্স" বনাম "কাউন্টার ইনটেলিজেন্স।" যেমন এখনকার কালে তেমনি সেকালে। জেরিকোর রাজা ইজরেলের গোয়েন্দাদের আশ্রয়দাত্রী গণিকা রাহাবকে আদেশ করলেন গোয়েন্দাদের ধরিয়ে দিতে। কিন্তু গণিকা রাহাবের মন তখন জিহোভা-ভক্তিতে ভরপুর। যোশুয়ার চরদের বাড়ির ছাদের উপর শনের গাদায় লুকিয়ে রেখে জেরিকো-রাজের সিপাইদের রাহাব জানাল, গোয়েন্দারা নিখোঁজ। রাজার সিপাইরা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। আর ইজরেলের গোয়েন্দারা গণিকা রাহাবের কাছ থেকে নিয়ে গেল জেরিকো নগরীর বিখ্যাত প্রাচীর-বেষ্টনীর অন্ধিসন্ধি সম্পর্কে পাকা খবর। রাহাবের বাড়িখানা ছিল জেরিকোর এই দুর্ভেদ্য দেওয়ালের উপর। রাহাবের কাছ থেকে সংগৃহীত খবরের সাহায্যেই যোশুয়ার ইজরেলী সৈন্যবাহিনী জেরিকোর বিখ্যাত নগর-প্রাচীর অনায়াসে ভূমিসাৎ করতে পেরেছিল।

যুদ্ধে জয়পরাজয়ের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরির মূল্য অতএব নগণ্য নয়। ভারতবর্ষে ইংরেজের সঙ্গে ফরাসীদের যে-সময় ক্ষমতার লড়াই, তখন একবার চন্দননগরের কাছে গঙ্গাবক্ষে ডুবো নৌকোর বেড় তৈরী করে ফরাসীরা ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিল। করেছিল বটে কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে নি। ডুবো নৌকোর বেড়ের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ঠিক কোন্ জায়গায় ফাঁক আছে সে-খবর ইংরেজরা যোগাড় করেছিল তাদের চর মারফত। কাজেই গঙ্গাবক্ষে ক্ষমতার লড়াইয়ে গুপ্তচরের প্রসাদে বিজয়লক্ষ্মী প্রসন্ন হলেন ইংরেজদের উপর। গুপ্তচর চাকুরের বাহাদুরিতে ইংরেজরা এককালে এইরকম আরো অনেক যুদ্ধে সুবিধা করতে পেরেছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য গোয়েন্দাগিরির প্রয়োজন কেবল যুদ্ধকালে নয়, শান্তির সময়েও। রাষ্ট্র-বিরোধীদের কাজকর্মের উপর নজর রাখা, দরকারমত প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা গোয়েন্দা-দপ্তরের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। আমাদের কালের ঠাণ্ডা যুদ্ধ এবং ভাবনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রয়োজনে গোয়েন্দাগিরির কাজ তো সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়েছে। এ-কাজ যেমন রহস্যজনক, বিপদসংকুল তেমনি কখনও কখনও অদ্ভুত হাস্যকর।

মুখোশধারী

বিপ্লবী গুপ্তসমিতির চক্রবৈঠক বসেছে: যেমনতেমন সমিতি নয়, সেই যাকে বলে "অ্যানার্কিস্ট ক্লাব", মানে যারা রাজা, রাজতন্ত্র থেকে শুরু করে সবরকম গভর্নমেন্টের নিপাত চায় তাদের গুপ্তচক্র। একসময় য়ুরোপে এই অ্যানার্কিস্ট অর্থাৎ নৈরাজ্যবাদীদের নামডাক ছিল খুব। কাজেই পুলিসেরও ছিল কড়া নজর এদের উপর। যেখানে গুপ্তসমিতি সেখানেই গুপ্তচর। একবার হল কী, অ্যানার্কিস্ট ক্লাবের বৈঠকে সবাই হাজির, প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, মেম্বাররা [illegible], হঠাৎ কী করে যেন গুপ্তমণ্ডলের রহস্য রোমাঞ্চের যবনিকা খসে পড়ল; খুলে গেল অ্যানার্কিস্ট ক্লাবের বড়কর্তা ছোটকর্তা সবারই মুখোস, আর দেখা গেল বড়কর্তা, ছোটকর্তা, এবং সমাগত সদস্যরা প্রত্যেকেই পুলিসের গুপ্তচর, তবে কেউ কারো আসল পরিচয় জানে না; প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর তাই খবরদারী করেছে, আর যে যার মত খবর পৌঁছে দিয়েছে উপরওয়ালা গোয়েন্দাকর্তার কাছে।

গল্পটা জি কে চেস্টারটনের বানানো। নিতান্তই গল্প, কিন্তু গল্প হলেও গুপ্তচর-জগতের ক্রিয়াকাণ্ডের সামান্য সত্যের ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। এমন অনেক সত্য ঘটনার রেকর্ড আছে যা চেস্টারটনের গল্পের মতই অদ্ভুত। রুশ বাদশাহের আমলে সোস্যালিস্ট রেভলুশনারী দলের কর্মপদ্ধতি ছিল সন্ত্রাসবাদী। এই দলের গুপ্তচক্রের একজন নায়ক ছিলেন আজেভ। আজেভের নির্দেশে রুশসম্রাটের মন্ত্রী, পারিষদ ও পদস্থ কর্মচারীদের হত্যা-পরিকল্পনা রচিত ও প্রযোজিত হত। আজেভই আবার সন্ত্রাসবাদীদের নামধাম ও কার্যকলাপের খবর সরবরাহ করতো রুশ সম্রাটের গোয়েন্দা-পুলিস দপ্তরকে। মুখোসধারীর অভিনয়টায় বাহাদুরী ছিল। মালয়ে ১৯৪৮-৪৯ সালে ব্রিটিশ গোয়েন্দা-দপ্তরের বাহাদুরীর একটা ঘটনা চেস্টারটনের গল্পকেও হার মানায়। যুদ্ধের সময় মালয় কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সেই সুযোগে ব্রিটিশ গোয়েন্দা-দপ্তর ধাপে ধাপে মালয় কম্যুনিস্ট পার্টির একেবারে শীর্ষস্থানে তাঁদের একজন চরকে বসাতে পেরেছিলেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে স্টালিনের নির্দেশে মালয় কম্যুনিস্ট পার্টি যখন আবার "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে"র জিগীর তুলল তখন মালয় কম্যুনিস্ট পার্টির খোদ সেক্রেটারী জেনারেলের উভয়সংকট। অবশেষে একদিন মালয় কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল কাগজপত্র টাকাকড়ি নিয়ে চম্পট। লণ্ডন "ইকনমিস্ট" পত্রিকা তারিফ করে লিখেছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের এই অপূর্ব চাতুর্যকৌশলের জুড়ি নেই।

"[illegible]"

আমাদের প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি শাস্ত্রকারগণ বলে গেছেন, রাজারা চরের চোখে দেখেন এবং শোনেন ("চার চক্ষুষঃ"; "কর্ণেন পশ্যতি")। য়ুরোপীয় কূটনীতি শাস্ত্রের গুরু ম্যাকিয়াভেলির অনুজ্ঞা—রাজা হবেন

সিংহের মত বলিষ্ঠ এবং শৃগালের মত ধূর্ত। রাজারা আমাদের কালে অবশ্য ক্রমে ক্রমে বিদায় নিচ্ছেন, কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা, সে যে ধাঁচেরই হোক, তার নিরাপত্তা রক্ষার্থে চর ও চাতুর্যের প্রয়োজন ফুরায় নি। রাষ্ট্রের ভিতরের ও বাইরের নিরাপত্তার জন্য সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র, পুলিসবাহিনী ইত্যাদি প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন গুপ্তচর সংগঠনের। মাগারিজ মন্তব্য করেছেন, রাষ্ট্রের কিম্বা যাকে বলি গভর্নমেণ্ট তার দুই মুখ: একটা হল "পাব্লিক ফেস" অর্থাৎ যে মুখটা পরিচ্ছন্ন, প্রসন্ন, সকলের দর্শনীয়; আর একটা হল "প্রাইভেট ফেস", যে গোপন মুখচ্ছবি রাষ্ট্রের নায়করাও সবসময় দেখতে পান না কিম্বা দেখতেই চান না। কূটনীতির নিগূঢ় রহস্যময় অন্তঃপুরের ঘটনাবলী সাধারণত নেপথ্য নায়কেরাই পরিচালনা করেন। তাঁদের কার্জকর্মের হিসাবনিকাশ কিম্বা কৈফিয়তও নেওয়া হয় গোপনে। এই-ই চিরন্তন বিধান গুপ্তচর দর্শনের।

শঠে শাঠ্যং

যুদ্ধের সময় গোয়েন্দাগিরির কর্মকাণ্ড হয় বহুদূর বিস্তৃত এবং প্রাণান্তকর। কেবল শত্রুপক্ষের খবরাখবর সংগ্রহ নয়, শত্রুপক্ষের এলাকায় যত রকমে সম্ভব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোয়, আর্থিক লেনদেনে গোলমাল বাধানো, এসবও হয় গুপ্তচরবৃত্তির অত্যাবশ্যক কাজ। যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জাপানী জাপানী অধিকৃত এলাকায় জাল কারেন্সী-নোট ছড়িয়ে দেওয়ায় মিত্রপক্ষের গুপ্তচর বাহিনী বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছিল। কলকাতারই উপকণ্ঠ থেকে হাজার হাজার বাণ্ডিল জাল নোট ব্রহ্মদেশে চালান দেওয়া হত। জাপানী কারেন্সী নোট নিখুঁতভাবে জাল করা খুব উঁচুদরের শিল্পকৌশলের কাজ ছিল। নিখুঁতভাবে নক্সার জন্য দরকার হত এক বিশেষ ধরনের শরের কলম। যুদ্ধকালীন মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর (ও, এস, এস) অনেক অনেক চেষ্টায় নিখুঁতভাবেই কাজটা সমাধা করেছিল।

কেবল জাল নোট নয়, গোয়েন্দাগিরির বুদ্ধির যুদ্ধে আরও অনেক কিছুই লাগে— জাল প্রত্নতাত্ত্বিক, পুরাতত্ত্বান্বেষী, জাল পর্যটক, পর্বত অভিযাত্রী, শৌখীন শিকারী এবং তাছাড়া বিদেশী নাগরিকের ছদ্মবেশ ধরবার উপযুক্ত পোষাক-আশাক ও নিখুঁত ভাষাজ্ঞান। প্রথম মহাযুদ্ধের আগের কালের কথা। জার্মানরা সে-সময় বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছে। তুর্কীর খলিফার রাজত্ব সে-সময় পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়ায়। জার্মান এঞ্জিনীয়াররা এই অঞ্চলে রেলপথের জন্য জরিপের কাজকর্মে নিযুক্ত। ইংরেজদের দরকার জার্মানদের উপর নজর রাখা। কাজেই মেসোপটেমিয়ার পুরাকীর্তি সন্ধানে এলেন ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক দল। একদিকে জার্মান এঞ্জিনীয়ারদের শিবির, আর একদিকে ইংরেজদের প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি। সবাই অবশ্য জাল প্রত্নতাত্ত্বিক নয়, কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ির সঙ্গে জার্মানদের উপর নজর রাখা, খবরাখবর নেয়াও তাঁদের একটা কাজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই ধরনের কাজে লাগানো হয়েছিল নামকরা মার্কিন ও ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু অধ্যাপক ও গবেষককে। এঁদের ঘাঁটি হত প্রধানত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি, যেখানে বসে শত্রুপক্ষের ঐতিহাসিক দলিলপত্র ইত্যাদি বিশ্লেষণ ও সংকলনের সুযোগ পাওয়া যায় বেশী। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুকাল আগে ভারতবর্ষের একটি ঘটনা। ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানদের তখনও প্রকাশ্য কোন বিবাদ নেই। ইংরেজ সরকারের আমন্ত্রণে একদল জার্মান এলেন সুন্দরবন অঞ্চলে শিকার ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। মান্যগণ্য অতিথিদের পরিচর্যার জন্য তাঁদের সঙ্গে ইংরেজ কর্মচারীরাও ছিলেন। কিন্তু সুন্দরবনে শিকারটা জার্মান অতিথিদের উপলক্ষ্যমাত্র। তাঁরা কেউ কেউ ছিলেন জার্মান সমর দপ্তরের উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা। ইংরেজ সঙ্গীদের চোখ এড়িয়ে তাঁরা সুন্দরবনের নদ নদীর মোহানা ও খাড়িগুলির নক্সা তৈরী করে নিলেন। হাতের মুঠোয় ছোট্ট পেন্সিল আর শার্টের কড়া পালিশ-করা হাতা, যার পর নক্সা আঁকা সুবিধা, এই দিয়েই তাঁরা নাকি কাজ হাসিল করেছিলেন। মনে আছে খবরটা জানাজানি হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে আমরা যখন স্কুলে নিচু ক্লাসের ছাত্র।

জাল পুরাতাত্ত্বিক, জাল শিকারীর চেয়েও

রাজপুতানী শিল্পী : ইন্দ্র দুগার

পোষাক-আশাক, পাসপোর্ট এবং এমন কী নাম পর্যন্ত ভাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের এলাকার গুপ্তচরবৃত্তি, এ যেমন দুঃসাহসিক তেমনি রোমাঞ্চকর। গুপ্তচর দপ্তরকে এর জন্য কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয় না। ছদ্মবেশে সামান্য খুঁত থাকলেই শত্রুপক্ষের হাতে গুপ্তচরের প্রাণহানির সম্ভাবনা। একবার একজন ছদ্মবেশী ইংরেজ গোয়েন্দা শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ল, আর কিছু না তার পকেটে সামান্য কয়েক টুকরো ভার্জিনিয়া তামাক ছিল বলে। আর একজনের গোয়েন্দাগিরি খতম হল, কারণ তার জুতোর সুকতলা ছিল আনকোরো নতুন ব্রিটিশ মার্কা। কাজেই গোয়েন্দা দপ্তরের সাজঘরে সব দেশের সব রকমের পোযাক-আশাক, ঘড়ি, চাবির রিং, কলম, পেন্সিল, সুটকেশ ইত্যাদি মজুত রাখা চাই। ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য যেমন নিখুঁত সাজ-সরঞ্জাম দরকার, গোয়েন্দার ছদ্মবেশ নৈপুণ্য হওয়া চাই তার চেয়েও সহস্রগুণ নিখুঁত, নিশ্ছিদ্র।

ঘরভেদী বিভীষণ

ডোনাল্ড ম্যাকলীন এবং গাই বার্জেস ছিলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের উপরওয়ালা স্তরের কর্মচারী। দুজনেই বনেদী ঘরের ছেলে, সেরা স্কুল ও সম্ভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-করা, পালিশ করা। ম্যাকলীন, বার্জেসের কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ভাবসাব থাকতে পারে কিংবা তাঁরা সোভিয়েট রাশিয়াকে গোপন খবরাখবর চালান দিতে পারেন, এ-কথা তাঁর বন্ধুরা, এমন কী পররাষ্ট্রদপ্তরের বড় কর্তারা পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেন নি। যুদ্ধের সময় ম্যাকলিন ছিলেন ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী অর্থাৎ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের পরই ম্যাকলীনের পদমর্যাদা এবং কূটনৈতিক কার্যভার। সে-সময় আমেরিকায় অ্যাটম-বোমা তৈরী সম্পর্কে গোপন খবর অনায়াসে ম্যাকলীনের হাতের মুঠোয় ছিল। ব্রিটিশ পারমাণবিক বিজ্ঞানী ডঃ অ্যালান নান মের সংগেও ছিল ম্যাকলীনের বন্ধুত্ব। ডঃ মে এর পর অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত হন রাশিয়াকে পারমাণবিক তথ্যাদি গোপনে সরবরাহ করার অপরাধে। ম্যাকলীন এবং বার্জেসের উপর তখনও কারো নজর পড়ে নি। ম্যাকলীন তখন চাকুরিতে আরও একধাপ উপরে উঠেছেন—তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রদপ্তরের মার্কিন বিভাগের বড়কর্তা। অবশেষে ১৯৫১ সাল নাগাদ ব্রিটিশ এবং মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগে কানাকানি শুরু হল। কিন্তু যে ভাবেই হোক ম্যাকলীন এবং বার্জেস আঁচ পেলেন যে তাঁদের অভিনয় ভাঙবার সময় আগত। দুজনেই য়ুরোপ ভ্রমণের ছল করে উধাও হলেন ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের নজরকে ফাঁকি দিয়ে। তারপর এক ডুবে রাশিয়া: সেখানেই এখন তাঁদের আস্তানা। ম্যাকলীন ও বার্জেস পলাতক হয়েছেন শোনা মাত্র তখনকার মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডীন অ্যাচিসন হতভম্ব হয়ে বলেছিলেন, "কী সর্বনাশ! ম্যাকলীন যে সব কিছু জানত!" মার্কিন অ্যাটমবোমার রহস্য স্টালিন সম্ভবত গুপ্তচর মারফত জেনেছিলেন ১৯৪৫ সালের অনেক অনেক আগে। রুজভেল্টের ব্যক্তিগত সহকারী হ্যারী হপকিন্স তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন, স্টালিনকে যখন তিনি য়্যাটম-বোমার বিষয়ে কিছু বলতে যান, স্টালিন তখন কিছুমাত্র আশ্চর্য হন নি, হপকিন্সের কথায় কানই দেন নি। ব্রিটেনের ম্যাকলীন, ডঃ মে, ডঃ ফুক্স; আমেরিকার অ্যালগার হিস এবং আরো দুচারজন, কানাডার ফ্রেড রোজ—যতদূর জানা যায় এদের মারফত অ্যাটমবোমা সংক্রান্ত গোপনীয় সামরিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য রাশিয়ার হাতে পৌঁছয়।
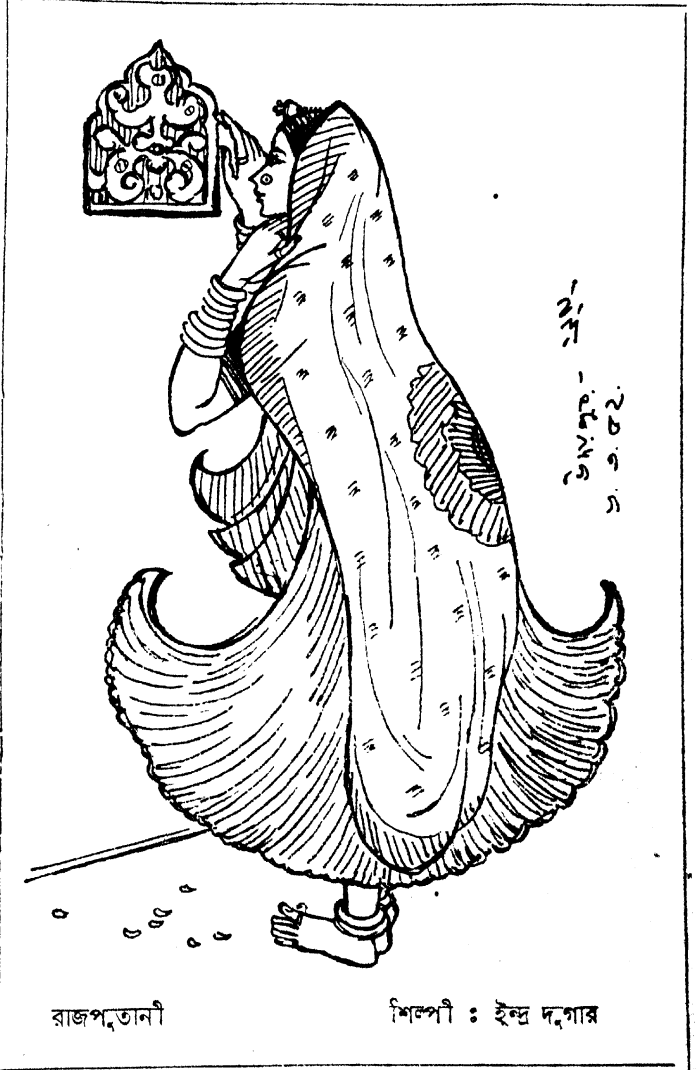
ডবল এজেন্ট

ম্যাকলীন, বার্জেসের পরেও অবশ্য ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মচারীমহল থেকে বিদেশী রাষ্ট্রকে গোপন খবর সরবরাহ চলেছে। সম্প্রতি জর্জ ব্লেকের মামলাটাই গোয়েন্দা-রহস্য আবিষ্কারের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গত বৎসর মে মাসে ওল্ড বেলীর আদালতে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মচারী জর্জ ব্লেক স্বীকার করেন, সরকারী দলিল-পত্র যখন যা কিছু তাঁর হাতে এসেছে সবই সোভিয়েট গুপ্তচরদের কাছে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার পক্ষের উকিল বলেন,

সামরিক অথবা বৈজ্ঞানিক গুপ্ত দলিলপত্র ব্লেকের জানবার সুযোগ ছিল। আদালতে ব্লেকের নিজের মুখের কথা, একাদিক্রমে দশ বছর সে গোপন সংবাদ সরবরাহ করেছে রাশিয়াকে। এই গোপন সংবাদ কী ধরনের তার আভাস থেকে বোঝা যায় ব্লেকের গুপ্তচর বৃত্তিটা একতরফা চলেনি। এদিকে যেমন রাশিয়াকে গোপন খবর যোগান দিয়েছে ব্লেক এবং অবশ্যই আরো অনেকে; ওদিকে অর্থাৎ কম্যুনিস্ট এলাকাতেও ব্রিটিশ-মার্কিন তরফ থেকে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত থেকেছে কিছু কিছু লোক। কম্যুনিস্ট এলাকায় ব্রিটিশ-মার্কিন তরফের গুপ্তচরদের নাম-ধাম, গতিবিধির খবরাখবর জর্জ ব্লেকের জানা ছিল। ব্লেক যদি এইসব নাম-ধাম ইত্যাদি রাশিয়াকে গোপনে জানিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে কম্যুনিস্ট এলাকায় ব্রিটিশ-মার্কিন গোয়েন্দাগিরি বেশ কিছু দিনের মত বানচাল হতে বাধ্য। ব্লেককে বিয়াল্লিশ বছর কারাবাস দণ্ড দিয়ে জজ লর্ড পার্কার তাঁর রায়ে ব্লেকের এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, স্বদেশ রক্ষা সংক্রান্ত অনেক জরুরী কাজ ব্লেক সম্পূর্ণ ব্যর্থ করেছে। যার মানে হয় ব্রিটিশ-মার্কিন পক্ষের গোয়েন্দাদের নাম-ধাম সে রাশিয়াকে জানিয়েছে।

ব্লেকের এমন দুর্মতি কেন হল তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা এখনও শেষ হয় নি। ব্লেকের পূর্বজীবনেতিহাস নাকি পরিচ্ছন্ন, সর্বসন্দেহ মুক্ত। তবু কেন সে বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচরবৃত্তির বিপজ্জনক পথে পা বাড়াল? অনেকের অনুমান ব্লেক ছিল "ডবল এজেণ্ট"—অর্থাৎ এ পক্ষ, ও পক্ষ দুদিকেরই গোপন সংবাদ সংগ্রহ এবং সরবরাহ তৎপর। গুপ্তচরদর্শনে ডবল এজেণ্টের ভূমিকা সব দেশের গোয়েন্দা বিভাগই স্বীকার করে; ডবল এজেণ্টের মারফত কিছু বাজে খবর চালান দিয়ে প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া গোয়েন্দা বিজ্ঞানের একটি সুপ্রচলিত প্রকৃষ্ট কৌশল। এ-কাজের ঝুঁকি কোনপক্ষের গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ থাকে না; ডবল এজেণ্টকেই এই দু' তরফা খবর লেনদেনের ক্ষুরধার পথে চলতে হয়। একটু বেসামাল হলে, পা ফসকালে, মূল্যবান গোপন খবর চালান দেওয়া ব্যাপারে এক পক্ষের দিকে বেশী ঝুঁকলেই ডবল এজেণ্টের বিপত্তি, প্রতিপক্ষের ফাঁদে পড়া থেকে নিস্তার নেই। তিন বছর আগে জর্জ ব্লেক ছিল বার্লিনে ব্রিটিশ গোয়েন্দা। কোন কোন মহলের ধারণা ব্লেককে দেওয়া হয়েছিল ডবল এজেণ্টের ভূমিকা এবং তারই ফলে কোন না কোন সময়ে তার অভিনয়ের ত্রুটিতে সে সোভিয়েট গুপ্তচর চক্রের ফাঁদে ধরা পড়ে।

সমান-সমান

ব্লেক, ম্যাকলীন, বার্জেসের মত ঘরভেদী দোসর সোভিয়েট তরফেও আছে। কানাডায় গুজেঙ্কো এবং অস্ট্রেলিয়ায় পেট্রভ সোভিয়েট গুপ্তচর সংস্থার গোপন কার্যকলাপের খবরা-খবর সব ফাঁস করে দেয় কয়েক বৎসর পূর্বে। এদের সাহায্যে ব্রিটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দাদপ্তর ব্রিটেনে এবং অন্যত্র সোভিয়েট গোয়েন্দা-চক্রের চর অনুচরদের সন্ধান পায়। পূর্ব জার্মেনীর গোয়েন্দা পুলিসের বড় কর্তা সম্প্রতি পশ্চিম জার্মেনীতে আশ্রয় নিয়েছেন। বার্লিনে সোভিয়েট গোয়েন্দাগিরির অনেক গোপন তথ্য নাকি তাঁর কাছ থেকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের হস্তগত হয়েছে। মাগারিজ লিখেছেন, গোয়েন্দাগিরি, পাল্টা গোয়েন্দাগিরি, ডবল এজেণ্ট অর্থাৎ দুপক্ষের গোপন খবর লেনদেনকারী, এবং একপক্ষের গোয়েন্দা অপর পক্ষে ভাগিয়ে নেয়া, এ-সব কাজের ভূমিকা, পদ্ধতি, ক্রিয়া কৌশল সব দেশের প্রায় একই রকম। তবে সুযোগ-সুবিধা সব দেশের নিশ্চয়ই সমান নয়। গুপ্তচরবাহিনী সংগঠনে ও পরিচালনায় বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সবার সেরা। তবে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদপ্তর বয়সে ও অভিজ্ঞতা গুণে সম্ভ্রান্ত। এককালে ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসের ও রাজনৈতিক দপ্তরের ঝানু অফিসাররাই দেশে ফিরে গিয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরে যোগ দিতেন। যুদ্ধের সময় অবশ্য অন্য কথা। দুই মহাযুদ্ধকালে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেছেন এমন অনেকে আছেন যাঁরা খ্যাতিমান সাহিত্যিক, সাংবাদিক অথবা রাজনীতিক। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধকালে স্যর কম্পটন ম্যাকেঞ্জি ও সমারসেট মম; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গ্রাহাম গ্রীণ, আয়ান ফ্লেমিং এবং ম্যালকম মাগারিজ। এঁদের গল্পে, উপন্যাসে গোয়েন্দাগিরির বাস্তব ক্রিয়াকাণ্ডের পরোক্ষ বর্ণনা কিছু কিছু পাওয়া যায়। ফ্লেমিং-এর "জেমস বণ্ড" কাহিনীর রং চড়া, কিন্তু একেবারে বানানো গল্প নয়।

নম্বর ০০০৭ ওরফে জেমস বণ্ড। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের এই চতুর চূড়ামণি ছিলেন সোভিয়েট গোয়েন্দাদের সবচেয়ে বড় দুষমন। বাইবেলের স্যামসনকে ছলাকলায় বশীভূত করেছিল যেমন ডেলিলা; তেমনি বণ্ডকে হাত করার জন্য রাশিয়ান গোয়েন্দারা নিযুক্ত করেছিল লাস্যময়ী তাতিয়ানা রোমানোভাকে। বণ্ড কিন্তু বাঁধা পড়েন নি। বণ্ডের দিগ্বিজয়ী গোয়েন্দাগিরির কীর্তি কথা নিয়ে আয়ান ফ্লেমিং খান কয়েক রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী রচনা করেছেন। ফ্লেমিং ছিলেন যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর গুপ্তচর বিভাগের অফিসার। ফ্লেমিং-এর

গোয়েন্দাকাহিনী, "ডক্টর নো", "ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ" রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র "ইজভেস্তিয়ার" ক্রোধ সঞ্চয় করেছে। কারণ ফ্লেমিং দাবি করেছেন, রুশ গোয়েন্দা দপ্তরের "স্মার্শ" নামে একটা বিভাগের কাজ ছিল প্রতিপক্ষের গোয়েন্দাদের কিম্বা সোভিয়েটবিরোধী গোপন কর্মী চর অনুচরদের দরকার হলে খুন করা। ফ্লেমিং-এর এই অভিযোগে ইজভেস্তিয়ার খাপ্পা হওয়ার কারণ দেখা যায় না। গোয়েন্দা শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের চর-অনুচরদের ঘায়েল করার চেষ্টা এমন কিছু নতুন নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের এই ধরনের কার্যকলাপের কিছু কিছু বর্ণনা গল্পচ্ছলে পাওয়া যায় সমরসেট মমের অ্যাশেনডেনে। কঙ্গোর লুমুম্বা হত্যাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগের উদ্যোগে, এ-খবর দায়িত্বশীল মহল থেকে প্রচারিত। এককালে—প্রথম মহাযুদ্ধেরও আগে—ইরানের তেল-ইজারা নিয়ে যখন নানা বৈদেশিক স্বার্থের মধ্যে প্রবল রেষারেষি সে-সময় কোন কোন জাতীয়তাবাদী ইরানী রাজনৈতিক নেতা হয়েছিলেন বিদেশী গুপ্তচর-চক্রের শিকার।

বুদ্ধির যুদ্ধ

গোয়েন্দাগিরির কাজটা মুখ্যত কিন্তু গুপ্তঘাতকতা বা নাশকতার নয়। কাজটা প্রধানত গোপন সংবাদ সংগ্রহ, আর প্রতিপক্ষের গুপ্তচরদের দরকার মত ঠকানো এবং ঠেকিয়ে রাখা। কাজেই আসলে এটা উঁচু-দরের বুদ্ধির যুদ্ধ, যার মধ্যে কপটতা আছে প্রচুর, ক্রূরতা সাধারণত প্রত্যক্ষ সমরের সংকটকালে। সেই বুদ্ধির যুদ্ধ চলে এমনই সংগোপনে যে গোয়েন্দারা নিজেরাও সব সময়ে জানতে পায় না তাদের চালাচ্ছে কে এবং কী উদ্দেশ্যে। রহস্য গভীর, আবছা আলো-আঁধারির খেলা, তাই এ-কাজের নেশায় ঘোর ধরায়; পেশা ও পারিশ্রমিকের চেয়ে সেইটেই গোয়েন্দাগিরির বড় আকর্ষণ। অর্থলোভ এবং রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারের মণিকাঞ্চনযোগও ঘটে। যেমন ট্রিবিশ-লিংকন। প্রথম জীবনে এই ধূর্ত ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন ধর্মযাজক, তারপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে লিবারেল দলের সদস্য। কিন্তু এ-সব সাদাসিধে ঘরোয়া কাজে তাঁর মনে রং ধরে নি, অতএব বার হলেন দিগ্বিজয়ে। সম্বল তাঁর অসাধারণ ধড়িবাজি-ক্ষমতা। গোপন খবরের নামে জাল দলিল আর স্রেফ বানানো গল্প চালিয়ে পয়সা এবং পসার দুই-ই তিনি বাড়িয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধান্তের জার্মেনীতে ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানে নাটের গুরু কে? ট্রিবিশ-লিংকন। চীনের সমর নায়ক চ্যাংশো লিনের দক্ষিণ হস্ত কে? ট্রিবিশ লিংকন। এর পর ভোল বদলিয়ে তিনি এক বৌদ্ধ মঠের ধর্মাধ্যক্ষ।

ট্রিবিশ-লিংকনের চেয়ে অনেক বেশী ওস্তাদ রোয়েসলার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডের লুসার্নে এঁর আড্ডা। এর আগে ছিলেন সাংবাদিক এবং কিছুকাল বার্লিনে একটা অভিনেতৃ-সংঘের কর্তা। নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে যুদ্ধের সময় নানা দেশের গোয়েন্দা চূড়ামণিদের ভিড়। রোয়েসলারের প্রকাশ্য কারবার ছিল লুসার্নে ছোটখাট একটি বই-এর দোকান; কিন্তু নাৎসী জার্মান সৈন্যবাহিনীর গতিবিধি; অভিযান ইত্যাদি সম্পর্কে ভারী ভারী গোপন খবর তাঁর হাতের মুঠোয়। সে খবর তিনি যোগান দিয়েছেন সুইজারল্যাণ্ডের সমর বিভাগকে; সে-খবর আবার নিয়মিত চালান হয়েছে রাশিয়ায়। রাশিয়ায় পাঠাত আলেকজান্দার ফুট নামে একজন ইংরেজ বেতার-যন্ত্রী। রাশিয়া থেকেই ফুট নিয়েছিল সোভিয়েট গোয়েন্দাগিরিতে দীক্ষা। প্রশ্ন হল ফুটের মারফত জার্মানী সম্পর্কে যে-সব টাটকা খাঁটি খবর রাশিয়াতে চালান যেত লুসার্নে বসে রোয়েসলার সেগুলি সংগ্রহ করত কী করে? কারো কারো অনুমান ব্রিটিশ সমর দপ্তরের গোয়েন্দা বিভাগই জার্মানী সম্পর্কে গোপন খবরগুলি রোয়েসলারের বকলমে স্টালিনের দপ্তরে পাঠাতেন। স্টালিন ঘোর

সন্দেহপরায়ণ। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ তাঁকে সরাসরি খবর সরবরাহ করা হলে সে-খবর তিনি বিশ্বাস করবেন না। অথচ জার্মেনীর মতিগতি সম্পর্কে ষ্টালিনকে সাবধান করার সে-সময় ব্রিটিশের গরজ বেশী। হয়ত তাই রোয়েসলারকে করা হয়েছিল ষ্টালিনকে গোপন খবর সরবরাহের পাইপ লাইন। রোয়েসলারও কতকটা 'ডবল এজেন্ট', সোভিয়েট পক্ষ এবং মার্কিন-ব্রিটিশ পক্ষ, দু'দিকেই গোপন খবর যোগানদার। পঞ্চাশের যুগে মার্কিন সামরিক গুপ্ত তথ্য রাশিয়ায় পাঠাতে গিয়ে রোয়েসলার ধরা পড়েন, কিন্তু ডবল এজেন্টের যুক্তি দেখিয়েই সুইস আদালতের বিচারে তিনি রেহাই পেয়েছেন। অমন যে দুর্ধর্ষ নাৎসী সমরনায়ক জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের খোদ বড়কর্তা অ্যাডমিরাল কানারিস তিনিও নাকি ছিলেন যুদ্ধের সময় আগাগোড়া ব্রিটিশ গোয়েন্দাবাহিনীর ডবল এজেন্ট। স্পেনের ডিক্টেটর জেনারেল ফ্রাংকোকে অ্যাডমিরাল কানারিসই গোপন টিপ দিয়েছিলেন, হিটলারের পক্ষে স্পেনের যুদ্ধে যোগদান নৈব, নৈব চ, কারণ হিটলারের পরাজয় অনিবার্য।

শেয়ানে-শেয়ানে

ডবল এজেন্ট নয়, উভয়পক্ষের গোয়েন্দা চূড়ামণিদের শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলির সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছিল নিরপেক্ষ তুর্কীর রাজধানী আংকারায়। একদিকে ব্রিটিশ রাজদূতের "বিশ্বস্ত" খানসামা "সিসেরো", আসলে যে কিনা জার্মান গুপ্তচর; আর একদিকে জার্মান কূটনীতিক মোয়াজিস্কের একান্ত সচিব, এলিজাবেথ, মিত্রপক্ষে মার্কিন গোয়েন্দাদের খবর সরবরাহকারী। জার্মান গোয়েন্দা "সিসেরো" ব্রিটিশ রাজদূতের খানসামাগিরির ফাঁকে ফাঁকে মনিবের গোপন সিন্দুক থেকে মহামূল্যবান সব দলিলের ফটোগ্রাফ দিনের পর দিন তুলে নিত। আংকারা থেকে মিত্রশক্তির বহু গোপন খবর জার্মানরা হাত করছে, ব্রিটিশ গুপ্তচর দপ্তর তা টের পেলেও "সিসেরোর" ধড়িবাজি ধরা পড়ে নি। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের খাস খানসামা "সিসেরো", তার হাত সাফাইয়ের গুণে ছিল সব সন্দেহের ঊর্দ্ধে। পুরো চার মাস "সিসেরো" ব্রিটিশ দূতাবাসের গোপন সিন্দুক থেকে দলিল-পত্রের নকল হাতিয়েছে। শেষ পর্যন্ত টনক নড়ল মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের কর্তৃস্থানীয় অ্যালান ডালেসের। এঁরই চেষ্টায় আংকারার জার্মান কূটনীতিক মোয়াজিশের প্রাইভেট সেক্রেটারী এলিজাবেথ যোগ দিল মিত্র শক্তি পক্ষে গোয়েন্দাগিরিতে। জার্মান গোয়েন্দা "সিসেরো" করেছিল ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সিন্দুক ফাঁক, এলিজাবেথ ফাঁসাল "সিসেরো"র উপরওয়ালা জার্মান কূটনীতিক মোয়াজিশকে। অ্যালান ডালেসের জয়জয়কার; তাঁরই বুদ্ধি কৌশলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের সবচেয়ে বাহাদুর জার্মান গোয়েন্দা "সিসেরোর" গোপন লীলা খেলার শেষ। অতঃপর "সিসেরো" উধাও।

ডুবুরী ক্র্যাব

তারিখ ১৯৫৬ সালের ১৯ এপ্রিল; স্থান ব্রিটেনের পোর্টসমাউথ বন্দর। সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতা ক্রুশ্চভ, বুলগানিন এসেছেন ব্রিটেন সফরে। পোর্টসমাউথ বন্দরে নোঙর করা আছে নতুন সোভিয়েট ক্রুজার "অর্জনিকিডসকে" এবং দু'খানা সোভিয়েট ডেস্ট্রয়ার। এমনই কড়া পাহারা যে ব্রিটিশ জাহাজীরা এদের কাছে ঘেঁষতে পারে না; নতুন সোভিয়েট ক্রুজারের যান্ত্রিক কলাকৌশল সাজ-সরঞ্জাম সবই পশ্চিমী শক্তিদের অজ্ঞাত। অতএব ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর ডুবুরী গোয়েন্দা "ফ্রগম্যান" কমান্ডার ক্র্যাব এলেন পোর্টসমাউথে। তারপর কী ঘটেছিল, কমান্ডার ক্র্যাব পোর্টসমাউথ বন্দরে জলের তলায় গেলেন, কোথায় গেলেন, সোভিয়েট ক্রুজার সংলগ্ন কোন চুম্বক যন্ত্রের জালে আটক হলেন না মারা গেলেন, সে-বিষয়ে সঠিক খবর এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। ২৮ এপ্রিল ব্রিটিশ নৌদপ্তর সংক্ষিপ্ত ইস্তাহারে ঘোষণা করলেন, কমান্ডার ক্র্যাব একটা পরীক্ষামূলক ডুব দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর নিখোঁজ, সম্ভবত তিনি জলে ডুবে মারা গেছেন। ক্র্যাবের ডুবো-গোয়েন্দাগিরির বিরুদ্ধে সোভিয়েট সরকার কড়া প্রতিবাদ-পত্র পাঠালেন। কিন্তু ক্র্যাব-রহস্য যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল। পোর্টসমাউথের সরাপখানায় দু'চারজন রুশ নাবিক নাকি তাদের ক্রুজার দেশে ফেরার সময় গল্পচ্ছলে বলেছিল, দিন কয়েক আগে একজন ব্রিটিশ ডুবুরীকে তারা পাকড়াও করেছে। ক্র্যাব জলে ডুবে মারা গেছেন, ব্রিটিশ নৌ-দপ্তরের এই আন্দাজী ঘোষণার সত্যতা প্রমাণিত হয় নি। কারো কারো অনুমান সোভিয়েট ক্রুজার সংলগ্ন চুম্বক যন্ত্রের টানে ডুবুরী ক্র্যাব দমবন্ধ হয়ে মারা গেছেন। আবার অনেকের বিশ্বাস কমাণ্ডার ক্র্যাব সোভিয়েট রাশিয়ায় কারাবন্দী। ক্রেমলিনের কোন একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত একজন ফরাসী কূটনৈতিক নাকি শুনেছিলেন, "লিফর্টোভো কারাগারের ১৪৭ নম্বর বন্দী হচ্ছেন কমাণ্ডার ক্র্যাব।"

আমাদের নখ নেই

সন্তোষকুমার ঘোষ
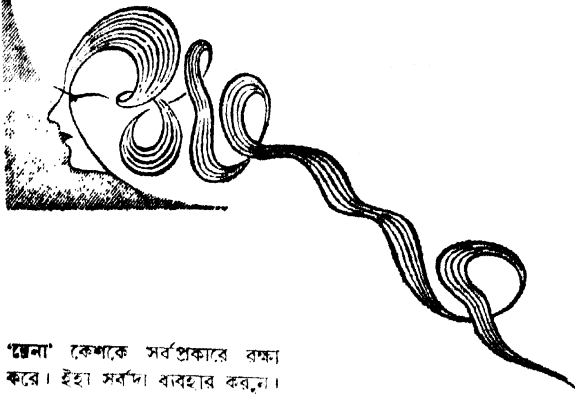
মরা নখ রাখি না। আমরা কেটে ফেলি। তবু যেটুকু বাড়তে পায়, তারই কিনারায় রক্তের ছোপ লাগতে পারে।

রক্ত যদিও নায়, আজ—এক্ষেত্রে সি'দুর। রমেন মিত্তিরের বউয়ের কৌটো থেকে উঠে আসা ধুলধুলে গ'ুড়ো। মাকড়ির গায়ে মাখা ছিল।

মাকড়িটা ডাক্তারের হাতে গেল কী করে। রমেন নিজেই যে তুলে দিল। ডাক্তার তার পসারওয়ালা হাত প্রসারিত করে দিয়েছিল। ও তার ভুল মানে করল। ডাক্তার যেন যা চাইছে, ভাবল। সুতরাং মাকড়িটা দিল।

কিন্তু সি'দুরের ছাপ মুছে দিল না; আঙুলের ডগায় দগদগে দাগ লেগে গেল। খুব লোলুপ-লোলুপ লাল। জবার মত আরাধ্য আচাকা লাল।

আসলে ডাক্তার কিন্তু একটা তোয়ালে চেয়েছিল। কিংবা গামছা। এবং জল। অসম্ভব না হলে সাবানও।

এ-সব কী-হেতু। চিকিৎসা করুক না করুক, মরা-বাচ্চাটাকে ডাক্তার ছু'য়েছিল যে। নাড়িও ধরেছিল। চোখের পাতা দিয়েছিল উল্টে। তখনই শেষ সত্যটি আবিষ্কার করে। বাচ্চাটা আর নেই। চিকিৎসা করবে কার।

এই আবিষ্কারের দায়ভাগ শ্রোতাদের দিতে হবে। ডাক্তার বিপন্ন এবং বিষণ্ণ বোধ করল। ঘোষণা আসন্ন এবং অনিবার্য এবং তার কর্তব্যও বটে।

ঘরের কোণে স্তূপীভূত একটি ছায়া। অবশ্যই পাথরের নয়। যদিও তার নিথর চোখের তারায় দৃষ্টি আছে বলে এই আধো-অন্ধকার ঘিনঘিন ঘরে প্রত্যয় হয় না। তার শ্রুতিশক্তিতেও ডাক্তার তন্মুহূর্তে সন্দিহান।

সুতরাং সেই ঘরে হাজির দ্বিতীয় সাক্ষীটিকে লক্ষ্য করে সে তার কর্তব্য সারল।

—'আর কিছু করবার নেই। সব শেষ।' যেন মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী, এমন কুসুমাদপি মৃদু স্বরে ডাক্তার বলল।

বাজীতে আগুন ধরিয়েই সরে দাঁড়ানোর মত ডাক্তার বলেই আড়ষ্ট হয়ে গেল বটে, কিন্তু আশঙ্কিত কিছু ঘটল না। স্তূপীভূত ছায়াটা নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল, বোধহয় ডুকরে উঠতে চেয়েছিল সাধ্যে কুলোল না, গলা চিরে যেতে চুপ করে গেল। আর অন্য দিকে ক্লেশলেশহীন মুখে যে চেয়েই রইল তার নাম• রমেন মিত্তির, ডাক্তারকে এই ঘিনঘিনে ঘরে যে ডেকে এনেছে।

জমাট অস্বস্তি কেটে কেটে গলছিল, ডাক্তার একটু একটু ঘামছিল। কেন না এক ফাঁকে কপালের ঘাম সে জামার আস্তিনে জমা রেখেছে। কড়কড়ে প্যাণ্টের পকেট মেরে সাহস চুরি করেছে।

তার সঙ্গত সন্দেহ হল যে, এই লোকটা সব জানে, আগেই জানত, তবু তাকে জব্দ করতে ডেকে এনেছে। অতএব সে প্রবঞ্চক, শঠ।

বাচ্চাটা বেঁচে নেই জেনেও তাকে সে কল দিল কেন, এই প্রশ্নের টোপে একটাও লাগসই উত্তর গাঁথছিল না। সে কি শ্মশান-বন্ধু না মুদ্দাফরাস? ডাক্তারের ডাক তো আসে এদের সবার আগে। প্রকৃত বিচারে ডাক্তারই তো অগ্রদানী।

কষে গাল দেবে বলে ডাক্তার রমেন মিত্তিরের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে ছিল, অথচ গালাগাল দেওয়া হল না লোকটার নিচের মাড়ি ফোকলা, সন্দেহ নেই ও শঠ এবং নিরুদ্দেশ দু'টি দাঁত আসলে ওর বিনষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং মনুষ্যত্বেরই প্রতীক, তবু ওর চোখে চোখে চাইতেই ডাক্তার তার জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে গেল?

জানল, কেন তার ডাক পড়েছে।

রমেন মিত্তিরের পাতা-না-পড়া চকচকে চোখ দু'টি একটি ডেথ সার্টিফিকেট চাইছিল। চিকিৎসা খরচ যোগাতে যে পারে নি, তারও ডেথ সার্টিফিকেট চাই। বিশ্বস্ত বিশারদের স্বহস্তে লিখিত রোগের বর্ণনা একান্তই চাই। আইনের মুখবন্ধ।

॥ মুখবন্ধ মানে তো ভূমিকা? কথাটার মানে কিন্তু ঘুষও হতে পারত। রমেনের দুটো দাঁত নেই, ফোকলা মুখের হাসি কী সরল, রমেনের চোখের ভাষা জলবত্তরল॥ বউ ডুকরে কাঁদতে পারছে না, সেই শোকে বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে এখন সত্যই

শোকাতুর, পুরোদস্তুর মূর্চ্ছাতুর। রমেন তার দিকে এগোচ্ছিল।

—কী লিখব? রিকেট?

—লিখে দিন না যা খুশি। রিকেট বসন্ত কলেরা টাইফয়েড আপনাদের বইয়ে যত নাম আছে তার সব ক'টা বা যে-কোনোটা লিখে দিন।

সুবোধ বালক ডাক্তার ঘসঘসে কলমে তাই লিখে দিল। যেহেতু সেই মুহূর্তে আর সেই সম্বলহীন সহায়হীন দন্তহীন লোকটিকে ভাঁড় বলে মনে হচ্ছিল না। লোকটা বড় স্পষ্ট গলায় কথা বলছে।

ঠিক এরই পরে ডাক্তার বাড়িয়ে দিয়েছিল তার হাত। আসলে হাত ধোবে বলে। কিন্তু যা চেয়েছে তাই পেয়ে কৃতজ্ঞ কৃতার্থ রমেন মিত্তির ভুল বুঝে তুলে দিল মাকড়ি। (একটা কেন? জোড়ার একটা কি আগেই গেছে, অথবা শোকাহত পিতা আগে থেকেই হিসাব করে রেখেছিল যে, একটা মাকড়ি যদি ডাক্তারের, আর একটা তবে সৎকারের। ডোমের ভাগ ডোম নেবে না!)

রূঢ় গলায় ডাক্তার বলে উঠল, 'মাকড়ি—মাকড়ি কেন?'

—'আপনার ফীজ।' নির্বিকার গলা কিন্তু নিশ্চিত।

ডাক্তার মাকড়িটা ছুঁড়ে দিল।

এ-সবই নাটকীয় দ্রুততায়, পূর্বনির্ধারিত অমোঘতায় ঘটছিল। ঘিনঘিনে ঘরটারও রূপান্তর হয়েছিল। তখন ঘরটি পরিকল্পিত মঞ্চসজ্জার অঙ্গ মাত্র, ডাক্তার ডাক্তার নয় অথবা ডাক্তারের ধরাচূড়া পরা অভিনেতা মাত্র, দর্শকেরা অধুনা অদৃশ্য কিন্তু আড়ালে কোথাও অবশ্যই আছে, যেন মাকড়িটা তাক-মাফিক ছুঁড়ে দিলেই হাততালি পড়বে।

কল্পিত হাততালির লোভ ডাক্তার সামলাতে পারল না, তবু আঙুলের ডগা টকটকে হল। কেন না সিঁদুর ছিল।

—"জল দিন। তোয়ালে আনুন।" ডাক্তার তর্জন করে বলল।

এ-তর্জন হৃদয়ের, বিবেকের। এই দুটি পোষা প্রাণীর চেন ডাক্তার খুলে দিয়েছে। দিতেই তারা বৈদ্যুতিক অবলীলায় লাফিয়ে পড়েছে। ডাক্তার ঈষৎ ভারসাম্য ফিরে পেল।

ঘটি উপুর করে রমেন জল ঢালছিল।

"...এই সেই।"

জল ঢালতে ঢালতে রমেন বলে উঠল দ্রুতস্বরে, কতকটা খামোখা, আপাতশ্রুতিতে যা অর্থহীন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই সংকেত মন্ত্রের মত উচ্চারিত শব্দ দুটির তাৎপর্য ডাক্তার যেন বুঝল।

"...এই সেই?"

রমেনের গলায় যা ছিল প্রতীতি, ডাক্তারের গলায় তাই প্রশ্ন হল।

আবার গাঢ় রহস্যগূঢ় আশ্বাসবাক্য উচ্চারণের ভঙ্গীতে রমেন বলল, "সেই।"

॥ হস্তপ্রক্ষালনে এত সময় অপব্যয় করছি কেন। হস্তপ্রক্ষালন, না পাপের স্খালন? পাপ! পাপ যদি, তা কার পাপ॥

* * *

"মনে পড়ছে, ডাক্তারবাবু?"

"পড়ছে।"

ডাক্তারবাবু সাবধানে চালাচ্ছিল গাড়ি, তবু থেকে থেকে স্টিয়ারিং থরথর কাঁপছে। খানা-খন্দ অন্তর্দ্বন্দ্ব এসব বাঁচাতে চাইলেও সবসময় বাঁচে না। তার মগজে হাজার গাড়ির ভেঁপু একসঙ্গে বাজছে। এ সে কোন্ মোড়ে এসে ঠেকল ডাক্তার জানে না, নিছক চলার অভ্যাসেই গাড়ি চলছিল।

"মনে পড়ছে?"
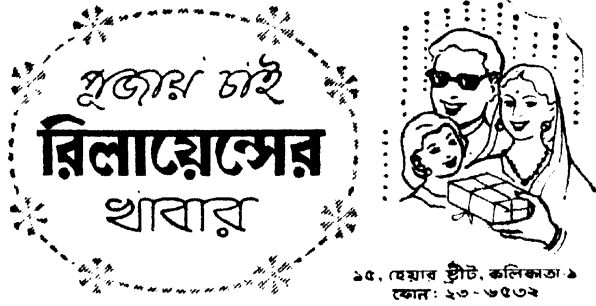
"পড়ছে।"

দ্বিতীয় গলা, ভাঙা আর বেসুরো হলেও ডাক্তার তার নিজের বলে চিনতে পারল, কিন্তু প্রথমটি কার?

আড়চোখে চেয়ে দেখল, পাশের সীটটা খালি। তবু যেন কেউ আছে, খুব কাছেই, পাশেই, জেরায় জেরায় জেরবার করবে বলে, পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দেবে বলে গাড়িতে চড়ে বসেছে।

"সেদিন আপনি কিছুতে রাজী হন নি—কেন ডাক্তারবাবু?"

মনে হল যেন রমেন মিত্তিরের গলা, ফোকলামুখো সেই ভাঁড়টা। দূর, সেই যা

ঢাক আলোকচিত্র : শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

হবে কী করে—তার মরা বাচ্চাটা না এখনও ঘরে?

"সেদিন আপনাকে আমি পায়ে জড়িয়ে ধরতেই শুধু বাকী রেখেছিলুম। আপনি টলেন নি।"

আর ভুল নেই। সেই। ডাক্তারের শার্ট গেঞ্জি পরতে-পরতে ভিজে উঠছে। যে ছিল অকিঞ্চিৎকর ভাঁড়, সে সূক্ষ্মদেহধারী হয়ে ফরিয়াদী বনে গেছে, আর ডাক্তারকে তুক করে পুরে ফেলেছে আসামীর কাঠগড়ায়।

সেইসঙ্গে স্টিয়ারিংটাও সামলাতে না হলে ডাক্তার এতটা নাজেহাল হত না। স্থূল-সূক্ষ্ম একই সঙ্গে দুটো অস্তিত্বের নৌকোয় পা রেখে দাঁড়ানো কি সহজ কর্ম।

"আপনি সেদিন টলেন নি..."

"টলি নি, কারণ কাজটা বেআইনী হত।"

"ওঃ—আইন!" অশরীরীর গলা ছিপ্‌টির মত শাঁ শাঁ করে উঠল—"ফুঃ! বেআইনী হত কিসে!"

"আপনারা বিবাহিত, প্রথম সন্তান সম্ভাবনা, তার ওপর আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য দেখেছিলুম ভাল। ...প্রসূতির প্রাণসংশয় হতে পারে, একমাত্র একথা প্রমাণ করতে পারলেই এ-কাজ আইনসিদ্ধ হতে পারত। এক্ষেত্রে রমেনবাবু—" গলা সাফ করবার জন্য একটু থেমে ডাক্তার বলল, "এক্ষেত্রে সেকথা প্রমাণ করা শক্ত হত।"

জেরায় জেরায় তাকে জেরবার করার মতলবে যে না বলে-কয়ে গাড়িতে উঠে বসেছে, অপ্রত্যক্ষ সেই ফরিয়াদী কি সহজে থামে!

"আপনাকে আমি বলি নি আমাদের সাধ্য নেই—হঠাৎ চাকরি গেছে?"

"বলেছেন।"

"বলি নি যে ধার-দেনা বন্ধকীর কুটোকাটো আঁকড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে কোন রকমে ভেসে আছি? বলি নি, আমরা একবেলা খেয়ে দুইবেলা চালাই? বলেছি, আপনি বিশ্বাস করেন নি। সত্যি করে বলুন তো ডাক্তারবাবু, আমাদের ওই ন্যাড়া-ন্যাংটা মাছি-মাকড়শা আরশোলা ছাড়া যার ওপর কারও মোহ নেই—ঘর দেখে আপনি টের পান নি?"

"পেয়েছি" শেখানো পাখির মত গড়গড়ে গলায় ডাক্তার শুধু কবুল করতে পারল, "কিন্তু এতদূর গড়াবে বুঝতে পারি নি।"

"আপনার সেদিনের কীর্তির জের দেখুন।" ফালা ফালা করে শসা কাটার মত স্বরে রমেন মিত্তির বলছিল—"আপনি রাজী হলেন না, অতএব সে এল। একেবারে রোগা টিকটিকি, লিকলিকে, উপরন্তু হতেও শিখল না। ওর মার বুকে দুধ নেই, গলায় খুকখুকে কাশি। অসুখে পড়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চ্যাঁচানো ছাড়া বাচ্চাটার প্রাণের কোন প্রমাণ দেখি নি।

"ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে এলেন, আপনার হিসেবে ও বেঁচেছিল আট মাস। আমার হিসেবে কিন্তু এই আটটা মাসের একটা দিনও বাঁচে নি—শুধু হয়েছিল। আপনাদের দয়ালু আইনে ডাক্তারবাবু, ওরা শুধু হয়। বাঁচে না।"

হিস্ হিস্ গলাটা থেমেছিল একটু। "কী বাঁচে তবে?"—বোকার মত একথা জিজ্ঞাসা করে কেন ফের তাকে উসকে দিল ডাক্তার?

"বাঁচে আপনাদের আইন। মানুষ না।" কানের কাছে একটা ফণা যেন দুলে দুলে বাঁশির সুরে সুর মিলিয়ে বলে গেল—"ওকে হতে না দিলে আইনের জাত যেত। হতে পেয়েও কিন্তু ও হল না, খালি ভুগল আর কষ্ট পেল আর মরল আর আপনাদের মজার আইনের তাতে আদৌ আপত্তি হল না।"

• • •

"থামো থামো" হঠাৎ কী হল, চোখ ঢেকে কষে ব্রেক চেপে চেঁচিয়ে উঠল ডাক্তার। কালো একটা মিছিল চোখের সামনে ছত্রভঙ্গ হতে দেখে আঁতকে উঠেছিল সে। পল অনুপলের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সময় যেন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে দীর্ণ হয়ে গেল।

গাড়ি থেমে যাবার পরও ডাক্তার থরথর করে কাঁপছিল, সর্বাঙ্গে ফিনকি দিয়ে ঘাম ছুটছে। কালো-কালো সারবন্দী সামনে এগুলো কী।

হায়-হায় হৈ হৈ করে কারা নেমে এসেছে রাস্তায়, তাদের হাতে লাঠি, কালো বিন্দুগুলোকে তারা তাড়া করে করে সুশৃঙ্খল সরল রেখায় নিয়ে এল। বিশেষ কিছু না। একপাল খাসী, পাঁঠা ছাগল। দৃষ্টির ঝাপসা-ভাব কেটে যেতে ডাক্তার দেখতে পেল, ওরা নির্বিঘ্নে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে।

"খুব বেঁচে গেছে" কপালের ঘাম মুছে ডাক্তার স্বগত বলল "আর একটু হলে নিরীহ এতগুলো জীবের অপঘাতের নিমিত্ত হয়েছিলাম আর কী। আইন আছে, পুলিস আসত। ভাগ্যিস সময়মত ব্রেক চেপেছি—খুব বেঁচে গেল।"

"হ্যাঁ, খুব।" কানের কাছে মুখ এনে মজাপাওয়া দরাজ ঢঙয়ে কে বলে উঠল, "সোজা কসাইখানায়। নিরাপদে ওরা পৌঁছে যাবে। আগে তোফা কিমা, পরে খাসা কাবাব হবে।"

ডাক্তার চমকে উঠল। সেই ভাঁড়টাই আবারও!

মায়া তলাপাত্র

প্রাচীন বাংলা কাব্যে রমনীর বেশ-প্রসাধন

জীবসৃষ্টির আদিযুগে সভ্যতার অস্ফুট ঊষালোকে যেদিন প্রাণের প্রথম স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছিল, ঘটেছিল জীবনের প্রথম আবির্ভাব, সেদিন নিরাবরণ উন্মুক্ত প্রকৃতির ন্যায় তার সন্তান মানুষও ছিল সাজসজ্জা-হীন, পোশাকের বা প্রসাধনের কোন বালাই সেদিন ছিল না। আবরণহীনতার যে সৌন্দর্য সেই মুক্ত-সৌন্দর্যই তখন মানুষকে ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে আদি জনক-জননী যেদিন মানুষের মনের গহনে অন্তর্ভূতিবোধকে জাগিয়ে তুললেন তারপর থেকে এই মুক্তসৌন্দর্যের আর কোন অস্তিত্ব রইলো না। কিছুটা আবৃত আর কিছুটা বিকৃত করে মানুষ নিজের দৈহিক সৌন্দর্যকে করে তুললো রহস্যময়। আর মনের তাগিদে সৃষ্টি-সুষমায় সেই আবরণ-টুকু শুধুমাত্র পত্রবল্কলের আচ্ছাদনেই সীমিত না থেকে পরিণত হলো বিবিধ মনোহারী প্রসাধনে-পরিচ্ছদে।

মানুষ চিরদিনই সৌন্দর্য-প্রেমিক। রূপে বিমুগ্ধ হয় না বা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয় না এমন মানুষ খুব কমই আছে—আদৌ আছে কিনা সন্দেহ। আর অপরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ যেমন হয় তেমনি মানুষ নিজেকেও করে তুলতে চায় অন্যের চোখে সুন্দর, মনোহর। তাই সৌন্দর্য-প্রিয়তা আর প্রসাধন-চর্চা মানুষমাত্রেরই চিরন্তন প্রবৃত্তি। আর এই প্রবৃত্তিরই প্ররোচনায় পুরুষ অপেক্ষা নারী চিরদিনই অধিক প্রসাধন-প্রিয়—একথা অবশ্যস্বীকার্য।

প্রসাধনের প্রলেপে দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলার আকাঙ্ক্ষা রমণীচিত্তে চিরন্তন। আরণ্যজীবনে যখন কোন তথাকথিত প্রসাধনের অস্তিত্বমাত্রও ছিল না তখনও নারীজাতি প্রসাধন থেকে বিরত থাকেনি। পুষ্পাভরণ, বিবিধ প্রস্তরের অলংকার, পাখির পালক, বৃক্ষপত্র এবং বল্কলের সাহায্যে রচিত বসন প্রভৃতির সাহায্যে নারী তখন নিজ দেহের শোভাবর্ধন করেছে। তারপর যুগে যুগে সভ্যতা যেমন এগিয়ে এসেছে ধাপে ধাপে তেমনি ধাপে ধাপে পরিবর্তন ঘটেছে পোশাকে, অলংকারে, প্রসাধনে। রমণীগণ নিজেদের সাজিয়ে তুলেছেন বিচিত্র আভরণে, বিবিধ প্রসাধনে।

এই পরিবর্তনের ফলেই একযুগের পোশাক-পরিচ্ছদ আর এক যুগের সঙ্গে কিছুটা সঙ্গতি রাখলেও কোনদিনই সম্পূর্ণ মেলে না—সেটা অবশ্য সম্ভবও নয়। তাই পূর্বযুগের খোঁজ জানতে হলে আমাদেরও পেছনে ফিরতে হবে—বর্তমানর মধ্যে তার আভাস মিললেও পরিচয় মিলবে না। আর এই খোঁজ প্রধানত পাওয়া যাবে তৎকালীন সাহিত্যের পাতায়। কারণ সাহিত্য সমাজের ছবিকে নিজের দর্পণে প্রতিফলিত করে। যত চিরন্তন সাহিত্যই হোক না কেন উপাদান এবং উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাকে প্রধানতই নির্ভর করতে হয় সমকালীন জীবনধারার উপর। তাই কিছুটা পরিবর্তন এবং অতিরঞ্জনের সম্ভাবনাসত্ত্বেও যুগের পরিচয় খুঁজে পাওয়ার প্রধান সামগ্রী যে সমকালীন সাহিত্য, এটা ঠিক।

বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রাচীন যুগের বাংলাসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যাবে তৎকালীন নারীসমাজের বেশ-ভূষা, রূপ-প্রসাধন, অলংকার আভরণ সবকিছুই স্পষ্ট পরিচয় তাদের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। এদের মধ্য থেকে সেযুগের নারীদের বেশপ্রসাধনের যে বর্ণনা পাওয়া যাবে তার দ্বারা একটি সুসম্পূর্ণ চিত্র অংকন করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়' আর প্রাচীনযুগের শেষ-গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের রচিত 'অন্নদামঙ্গল'। আর এদুটি প্রান্তের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিবিধ মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব-সাহিত্য, গীতিকা-সাহিত্য ইত্যাদি বহুপ্রকার রচনা। এদের মধ্যে আবার মঙ্গল-কাব্য কয়টি আর গীতিকাসাহিত্যই সমাজের চিত্রকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে নিপুণ-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে, নিখুঁত করে এঁকেছে। অন্যান্য রচনাগুলি জীবনের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয়, কিছুটা তত্ত্ব, কিছুটা আদর্শের সংমিশ্রণে বাস্তব সংসারের কিছুটা ঊর্ধলোকে এদের গতি। তাই সবগুলিতেই অল্পাধিকতর নিদর্শন

থাকলেও প্রাচীন বাংলাকাব্যে রমণীর বেশ-প্রসাধনের অর্থাৎ রূপ-প্রসাধন এবং বসন-ভূষণের খোঁজ করতে আমরা প্রধানত মংগল-কাব্য আর গীতিকাসাহিত্যের উপরই নির্ভর করবো।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বাংলাসাহিত্যের প্রাচীন যুগারম্ভের প্রথম নিদর্শন। যদিও এটি বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের 'ধর্মীয় গুহ্য সাধনার রূপক আত্মপ্রকাশ, তবুও বাস্তব সংসারের বিবিধ রূপচিত্রের সাহায্যেই এই রূপক রচিত হয়েছে। তাই নারীচিত্র অংকনের সুযোগ বিশেষ না থাকলেও, দু'একটি চিত্র যে না পাওয়া যায়, এমন নয়। একটি পদে তৎকালীন সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর শবর-রমণীদের বেশ-ভূষার কিঞ্চিৎ বর্ণনা পাওয়া যায়;—

"মোরংগী পীচ্ছ পরহিন সবরী
গীবত গুঞ্জরীমালী॥"

এই উল্লেখটুকু থেকে বোঝা যায়, শবর-মেয়েরা তখন যে পোশাক পরতো তা তৈরী হতো ময়ূরের পালক দিয়ে, আর গলায় ফুলের মালা দুলিয়ে দিয়ে তারা সজ্জা সম্পূর্ণ করতো। আরও একটি পদে দেখা যায় কানে তাদের থাকতো "বজ্রকুণ্ডল"।

চর্যাপদের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই কাব্যটিতে শ্রীরাধার দু'একটি চিত্র ব্যতীত নারীর রূপ-প্রসাধনের বিশেষ কোন বর্ণনা নেই। মধ্যবর্তী পর্যায়ের কাব্যগুলির মধ্যে মংগলকাব্য আর গীতিকাসাহিত্যেই এই বর্ণনার বিস্তার লক্ষণীয়। আর আছে ভারতচন্দ্রের কাব্য, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ-সভাকে আশ্রয় করে সমকালীন সমাজে বিলাসলীলার যে অকুণ্ঠ প্রকাশ চলছিল তারই বাস্তব রসচিত্র হওয়ায় এই কাব্যে নারীর বেশ-প্রসাধনের পরিপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রথমেই ধরা যাক্ পোশাক-পরিচ্ছদের কথা। বর্তমানকালের ন্যায়ই তখনও নারীর প্রধান পরিধেয় ছিল 'শাড়ী', সংগে কখনও বর্তমান যুগের ন্যায় ব্লাউজ অর্থাৎ কাঁচুলি থাকতো কখনও বা থাকতো না। এই শাড়ী কিন্তু শুধুই আটপৌরে পরিধেয় ছিল না, মূল্যবান পরিচ্ছদরূপেও এদের যথেষ্ট বাহার ছিল। রংবেরং-এর শাড়ীর মেলায় বর্তমান-যুগে যে বৈচিত্র্যের সম্ভার দেখা যায় প্রাচীন-যুগেও তা খুব কম ছিল না, অন্তত সাহিত্যিকদের সাক্ষ্যতে তো তাই মনে হয়। কত বিচিত্র মনোহারী শাড়ীর বর্ণনা যে প্রাচীন কবিরা করেছেন তার ঠিক নেই। কোনটা মেঘডম্বর, কোনটা বা গাংগেরী; কোনটা লক্ষ্মীবিলাস, কোনটা আবার চিকন শ্রীরামবসন। পট্টাম্বর আর নীলাম্বরী তো প্রায় প্রতিটি প্রাচীন বাংলা কাব্যেই উল্লিখিত। নীলাম্বরী ব্যতীত অভিসারিকা শ্রীরাধিকার চিত্রটি আমরা কল্পনাই করতে পারি না। মহাদেব-গৃহিণী উমা স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁর 'মেঘডম্বর' ছেড়ে 'বাঘাম্বর' পরিধান করেছেন। আর বিলাসী নাগরিকা-গণের—"লাক্ষার কাঁচুলী, চমকে বিজুলী, বসন লক্ষ্মীবিলাস।"

রকমারী শাড়ীর সর্বাপেক্ষা ভাল বর্ণনা পাই গীতিকাসাহিত্যে। গীতিকায় নারী-চরিত্রের যেমন বহুবিধ বৈচিত্র্য তেমনি বৈচিত্র্য অলংকারে আর বসনে-ভূষণে। গীতিকার নায়িকারা যেসকল শাড়ী পরেছেন তার মধ্যে আছে লক্ষ টাকা মূল্যের উদয়তারা শাড়ী, অগ্নিপাটের শাড়ী শুধু পাটের শাড়ী বা শুভ্র পট্টবস্ত্র প্রভৃতি বিচিত্র বসন; আর আছে অমূল্য শাড়ী "আসমান-তারা"। শুধু উল্লেখমাত্রই নয় আসমান-তারা শাড়ীর বেশ বিস্তৃত বর্ণনাও পাওয়া যায়।—

—শাড়ী নামে আসমান-তারা।
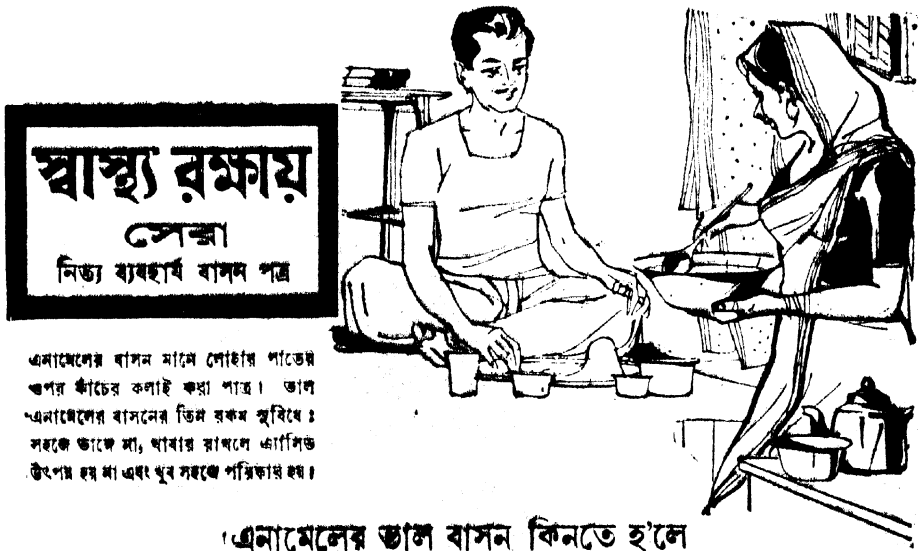
ভূমিতে থইলে যেমন ভুয়ে আসমান-পরা॥
হস্তেতে লইলে শাড়ী ঝলমল্ল করে।
শূন্যেতে থইলে শাড়ী শূন্যে উড়া করে॥

এই বর্ণনা পড়ে মনে হয় খুব সূক্ষ্ম মসলিন জাতীয় কোন শাড়ী ছিল এই 'আসমান-তারা'। এই সকল মহার্ঘ্য বস্ত্র নিশ্চয়ই সকলে ব্যবহার করতে পারতো না। দরিদ্রজীবনের বর্ণনায় মুকুন্দরাম ফুল্লরার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—'গায়ে দিতে নাহি জোটে 'খুঞার বসন'। এই বসনটি নিশ্চয়ই অতি সাধারণ আটপৌরে কোনপ্রকার শাড়ী ছিল, অথচ তাও সকলে জুটিয়ে উঠতে পারতো না।

বেশভূষার পর কেশবিন্যাস। আজ পর্যন্ত প্রসাধনের একটি প্রধানতম অংগ এই কেশ-পরিচর্যা—নারীর রূপে তার কেশের স্থান অনেকখানি, তাই তার আদরও বেশী। প্রথমেই ধূপের ধোঁয়া বা 'গন্ধতৈল' দিয়ে কেশ সুবাসিত করে নিতেন প্রাচীনযুগের রমণীরা। তারপর 'আবের কাঁকই' অর্থাৎ অভ্রের চিরুণী দিয়ে বেশ ভাল করে চুল আঁচড়ানো হতো একথা গীতিকাসাহিত্যের মারফৎ জানা যায়। এবার কেশের রূপ-রচনা। কত বিচিত্র ষ্টাইলে যে চুল বাঁধা হতো ভাবলে অবাক হতে হয়। "দুলিয়ে বেণী চলেন যিনি সেই আধুনিক বিনোদিনী"-দের অস্তিত্ব সেযুগেও যথেষ্ট ছিল। বেণীরচনার সংগে সংগে ছিল কবরীবন্ধন। তাই—"কখনও খোপা বান্ধ্যে কইন্যা, কখন্ বান্ধ্যে বেণী"। ভারতচন্দ্রও বলেছেন,—

"কারো খোপা কারো বেণী, কারো এলোচুল।"

আবার এই খোপা আর বেণীরই বা বাহার কত। খোপা বাঁধার বহুপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ছাঁদ ছিল—কোনটা চূড়া ছাঁদ, কোনটা বা কানড় ছাঁদ, কোনটা আবার অন্য কোন বিচিত্র ছাঁদে বাঁধা। চারু কবরীর অংগসজ্জা সম্পূর্ণ হতো পুষ্পমাল্যের বেষ্টনে। প্রাচীন বঙ্গরমণীগণ প্রায় সবসময়ই খোঁপায় বা বেণীতে ফুলের মালা জড়াতেন; সে ফুল—চাঁপাই হোক, মালতীই হোক আর মল্লিকা বা অন্য যে কোন ফুলই হোক না কেন। বর্তমানে অবাংগালীদের মধ্যে দেখা গেলেও বাংগালী মেয়েদের মধ্যে এই চুলে ফুল দেওয়ার প্রথাটি কিন্তু প্রায় লুপ্ত—যদিও খোঁপা এবং বেণীর বাহার অনেক বেড়েছে বই কমেনি একটুও।

বঙ্গরমনীদের সূক্ষ্মবসনপ্রীতি এবং কেশ-পরিচর্যায় পুষ্প-ব্যবহার করার প্রতি এই ঝোঁকের বর্ণনা শুধুমাত্র প্রাচীন বাংলাকাব্য-গুলিতেই পাওয়া যায় না—বহু পূর্ববর্তী সংকলনগ্রন্থ 'সদুক্তিকর্ণামৃতের' একটি শ্লোকেও তা পাওয়া যায়,—

"বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ
কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভি, মসৃনৈর্গন্ধতৈলৈঃ
শিখণ্ডঃ।"

অর্থাৎ—দেহে সূক্ষ্মবসন পরা, বাহুতে সোনার তাগা, মসৃন কেশরাশি গন্ধতেলের দ্বারা সুরভিত করে চূড়া ছাঁদে মাথার উপর বেঁধে রাখা আর তার উপরে ফুলের মালা জড়ানো।—বঙ্গরমণীর এই বর্ণনা একটি পূর্ণ চিত্র আমাদের চোখের সামনে ধরে দেয়।

বসনভূষণ এবং কেশবিন্যাসের পর বিবিধ গন্ধদ্রব্য এবং রঙের সাহায্যে সজ্জার তথা অংগের পরিমার্জনা চলতো। বর্তমান যুগের ন্যায় 'কসমেটিকস্'-এর অস্তিত্ব নিশ্চয়ই তখন ছিল না তবুও রমণীরা পিছিয়ে ছিলেন না। বহুতর প্রসাধনদ্রব্যের সন্ধান তাঁরা রাখতেন এবং তার যথাযোগ্য ব্যবহারও করতেন। রাজকন্যা প্রসাধন করবেন তাই,—

"গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তুরী—
চন্দনাদি গন্ধ সখি রাখে বাটি পুরি।"

আরও আছে কর্পূর, মৃগনাভি, কাঁচা-হরিদ্রা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য এবং রঞ্জকদ্রব্য। বিশেষতঃ চুয়া-চন্দন, মৃগনাভি এবং কর্পূরের উল্লেখ তো প্রায় সকল প্রাচীন বাংলা কাব্যেই পাওয়া যায়। অধরে রক্তিমা, নয়নে কাজল, কপালে সিন্দুর বা কুমকুম আর পদযুগলে অলক্তক তৎকালে সকল

রমণীরই বেশ-প্রসাধনের আবশ্যকীয় অঙ্গ ছিল।

বিবাহিতা রমণীগণ এই সকল প্রসাধন-দ্রব্য তো ব্যবহার করতেনই, উপরন্তু সিন্দুরও অবশ্যই ব্যবহার করতেন। সিঁথিতে এবং কপালে সিন্দুর সকল সধবা হিন্দু রমণীই ব্যবহার করতেন, কিন্তু বিধবা হলে এই সকল প্রসাধনই বন্ধ হয়ে যেত। আজ পর্যন্ত এই প্রথাটি প্রচলিত আছে।

এরপর প্রসাধনের প্রধান অঙ্গ অলংকার-সজ্জা। অলংকারের প্রতি নারীজাতির সতীব্র আকর্ষণ সর্বযুগেই সমান। সুদূর অতীতে যে অলংকরণ সম্পূর্ণ হতো শুধুই পুষ্পাভরনে, পত্রসজ্জায়, আধুনিক যুগে তাতে এসে যোগ দিয়েছে বহু বিচিত্র নূতন সৃষ্টি। অলংকারের মধ্যে প্রধান স্বর্ণালংকার, তারপর রৌপ্যালংকার। হীরামুক্তার অনেক উল্লেখ প্রাচীন বাংলা কাব্যসমূহে থাকলেও মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অতিরঞ্জন ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে এত মূল্যবান অলংকার পরবার মতো সামর্থ্য সমাজে কয়জনের ছিল সন্দেহ—বিশেষতঃ যেখানে খুঞ্চার বসনটুকু পর্যন্ত অনেকেই জুটিয়ে উঠতে পারতো না।

শরীরের প্রতিটি অঙ্গের জন্যই ছিল নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অলংকার—যাদের মধ্যে অনেকগুলিই বর্তমানে প্রায় লুপ্ত। এ সকল অলংকার প্রস্তুত হতো সোনা এবং রূপোর সাহায্যে, আর সাধ্য অনুসারে কখনও কখনও হতো হীরামুক্তাখচিত। মাথার অলংকার ছিল 'সিঁথি'—বর্তমানে বিবাহের সময় ছাড়া এই গহনাটি মোটেই ব্যবহৃত হয় না। তারপর কানের এবং নাকের গহনা। প্রিয়ার মন পাবার আশায় অলংকারের লোভ দেখানো সবচেয়ে সুফলপ্রদ, তাই নায়ক বেশ জোর গলায় ঘোষণা করে—

বসনভূষণ দিব আমি দিব নীলাম্বরী।
নাকে কানে দিবাম ফুল কাঞ্চাসোনায় গড়ি॥

এরকম প্রতিজ্ঞার পর আর অভিমান থাকে না। নাকে ফুলের সঙ্গে সঙ্গে ছিল 'নথ'। 'নথ'শোভিত বঙ্গরমণী তখন আমরা কল্পনা করতেই পারি না, কিন্তু তখন—"বাদ্যার কইন্যা ডাইক্যা বলে 'কিন্যা আইন নথ'।"

এরপর গলার গহনা। গলায় পরা হোত হার, কিন্তু তার রকম একটা নয়—মতির মালা, চন্দ্রহার, হাঁসুলি, অথবা "হীরা-নীলা পলামুক্তা" শোভিত হার প্রভৃতি বহু প্রকার হারের উল্লেখ প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। বাহুর গহনারূপে পাওয়া কেয়ূর অঙ্গদ, বাজুবন্ধ, তাড় প্রভৃতি অধুনা-অপ্রচলিত অলংকারের নাম। আর হাতে আজকের মতই 'কনকচুড়ি', 'কংকন'। সেই সঙ্গে বিবাহিতা মেয়েদের শাঁখা। শংখ বা শাঁখা শুধুমাত্র আয়তির চিহ্ন ছিল না, রীতিমতো সৌখিন গহনা ছিল। "সোনাতে বান্ধাইয়া দিবাম কামরাঙ্গা শাঁখা"—এই পদটিতে শাঁখার মর্যাদা বোঝা যায়।

এই সকল প্রধান গহনা ছাড়া কোমরের জন্য ছিল কিঙ্কিণী আর পায়ের জন্য খাড়ু, পাশুলি প্রভৃতি রূপোর গহনা। "কটিতে কিঙ্কিণী পরে, পদাগ্রে পাশুলি"—এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় পাশুলি ছিল পায়ের আঙুলের গহনা। পায়ের আর একটি গহনা সকলেই ব্যবহার করতো তা হল নূপুর। এই সকল অলংকারই কিন্তু সর্বদাই ব্যবহৃত হতো, শুধুমাত্র উৎসবে, আড়ম্বরে নয়। তার প্রমাণ পাই ভারতচন্দ্রের লেখায়—

'কিঙ্কিণী কঙ্কন হার বাজুবন্ধ সিঁথি তাড়
নূপুরাদি অলংকার নিত্য নব-পরণা।'

বিবাহে মেয়েদের সজ্জা কেমন হতো তার নিদর্শনরূপে গীতিকার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রথমে 'কন্যা'কে স্নান করিয়ে বিবিধ প্রসাধন দ্রব্যের সাহায্যে তার

অঙ্গমার্জনা করে তারপর পরানো হলো 'আসমান-তারা শাড়ী'। এবারে সখীরা বসলো অলংকারে মেয়েকে সাজিয়ে তুলতে—

'কানেতে পরাইলে দুলে চম্পক ঝুমুকো।
নাকেতে সোনার বেসর আর বলাক॥
গলায় পরাইল এক হীরার হাঁসুলি।
পায়েতে পরাইল খাড়ু গুজরী আর পাশুলি॥
হস্তেতে সোনার বাজু সোনার বাতেনা।
মস্তকেতে সিঁথিপাটি সুবর্ণের দানা॥

অন্যান্য যে সকল অলংকারের উল্লেখ এখানে নেই সেগুলিও নিশ্চয় পরানো হয়েছিল। বিবাহের কন্যা এখনও অল্পবিস্তর সর্বাঙ্গে আভরণ দ্বারা সজ্জিত হয়। ঘোমটা দেওয়ার কোন রীতি ছিল কিনা জানা যায় না, তবে কখনও কখনও উড়নী বা ওড়নার উল্লেখ দেখা যায়—"অমূল্য কাঁচুলি শাড়ী উড়নী যে আর"।

বেশভূষা এবং প্রসাধনের এই যে বিস্তারিত বর্ণনা প্রাচীন বাংলা কাব্যসাহিত্যে লিপিবদ্ধ দেখা যায়, রূপের কিছুটা পরিবর্তন-পরিমার্জন সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ সকল বর্ণনাকে সমাজ জীবনে খুঁজে পাওয়া যায়। সাজসজ্জার প্রতি রমনীচিত্তের আসক্তি আরও বেড়েছে বই কমেনি একটুও। যুগের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়েছে রুচি, বদলে গেছে ব্যবহারের রীতি, কিন্তু মূলে প্রবৃত্তি রয়েছে অব্যাহত। তাই বসনভূষণের বাহার, প্রসাধনদ্রব্যের ব্যবহার, অলংকারের সাহায্যে দেহসজ্জা প্রভৃতি রূপ-প্রসাধনের প্রত্যেকটি ধারাই প্রাচীন বঙ্গরমনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, প্রবাহিত হয়েছে বর্তমান যুগ পর্যন্ত। পরবর্তী যুগেও এই উত্তরাধিকার সমানভাবেই কার্যকরী হবে নিঃসন্দেহে। কারণ রমনীচিত্তের প্রসাধন-প্রীতি চিরন্তন, অবিনশ্বর।

রসময়ী

সুশীল রায়

"আমার এক ছোট বোন আছে, ওর নাম কি জানেন?"

"কি?"

"অনিন্দিতা। অনিন্দিতা রায়। ভারি সুন্দর দেখতে। খুব মাইল্ড্। খুব সুইট। ভারি ভালো লাগবে আপনার।"

"আর, আপনি—আপনি আপনি—। আপনি দেখতে কেমন, তা তো বলছেন না।"

"আমি? আমি ভীষণ বিশ্রী দেখতে। না, না, না, একটুও সুইট না। খুব হট্। অর্থাৎ খুব ঝাল। আমার নাম অলকানন্দা। আমরা? আমরা পাঁচ বোন। পাঁচ জনেই যাব তো? যাতায়াতের ভাড়া দিতে হবে কিন্তু।"

"নিশ্চয়।"

"বেশ। এবার আপনার কথা বলুন। আপনারা ক ভাই?"

"আমরা? আমরা চার ভাই। আমার নাম? শোভন ঘোষ।"

"ভারি বিশ্রী নামটা।"

"খারাপ বুঝি? তবে কাল যখন মীট করব তখন পালটে নেওয়া যাবে এ নাম। নতুন নাম দিয়ে দেবেন।"

"আমরা পাঁচ বোনে যদি পাঁচটা নাম দিয়ে দিই, কি করবেন তখন?"

"তখন? তখন লটারি করা যাবে।"

"বেশ। তবে কাল কখন?"

"ছটা। না না, ছটা না। কাল শনিবার —একটু আগে করা যাক—সাড়ে পাঁচটা।"

"তাই। পাঁচ জনেই যাচ্ছি তবে। কোথায় অপেক্ষা করব?"

"গড়িয়াহাটের চৌমাথায়। আমি যাদবপুর থেকে, আপনারা লেক টেরেস থেকে এলে—"

"আচ্ছা। কিন্তু আপনাকে চিনব কি করে?"

"মুশকিল। নিজের বর্ণনা দেব কি করে ভাবছি। নিজের মুখটা কেমন, মনে করতে পারছিনে। আয়নাও নেই সামনে। এক কাজ করুন, আমাকে চেনার দরকার নেই, আমি চিনে নেব আপনাদের—পাঁচ বোনের একটি ঝাঁক গুরুদাস ম্যানশনের নীচে দেখলেই আমি ছোঁ মারব।"

"এই বুঝি আপনার কাজ? এই রকমই বুঝি করে থাকেন?"

"উহুঁ। আজ খুব ইন্সপায়ার্ড হয়ে গিয়েছি।"

"ইন্সপায়ার্ড? আমিও যেন খুব ইন্সপিরেশন পাচ্ছি। কি রকম মজা বলুন তো! কি রকম অ্যাকসিডেণ্ট, তাই না? কেমন আলাপ হয়ে গেল আমাদের! কেউ কাউকে চিনিনে, কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে কতকালের চেনা, তাই না?"

"তাই। মনে হচ্ছে বহুকালের—ওকি, আর কার যেন গলা পাচ্ছি?"

"আমার বোন। তারা—সব আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে।"

"ছি ছি। কি ভাবছে ওরা।"

"ভাববার আছে কি? ওরাও তো

যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় বসব আমরা?"

"বেশ ভালো জায়গাতেই বসা যাবে।"

"খুব খাওয়াবেন বুঝি?"

"কি খেতে চান?"

"অসভ্য। কিছু না, যান!"

"আরে, চটেন কেন। বলছি, ঝাল, না, মিষ্টি। অলকানন্দা, না, অনিন্দিতা। যাক, না বললেন। বেশ ভালো খানাই হবে; তার জন্যে ভাবনা নেই।"

"ইশ। আমি যেন ভেবে সারা হয়ে গেলাম আর-কি।"

"তবে ঐ কথাই ফাইন্যাল। কাল শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় গড়িয়াহাটের চৌমাথায় গুরুদাস ম্যানশনের নীচে।"

"শিয়োর। আপনার ফোন-নম্বরটা বলুন, কাল সকালে ফোন করব।"

"সকালে না। দুপুর বারোটায়। নম্বরটা লিখে নিন—"

নম্বরটা লিখে নিল অলকানন্দা। শোভন ঘোষের টেলিফোন নম্বর।

লিখে নিয়ে, ফোন ছেড়ে দিয়ে, সে ভাবল ব্যাপারটা অশোভন হয়ে গেল না তো?

একটু ভাবতে গিয়েই ব্যাপারটা কেমন জট পাকিয়ে গেল। যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলল, সে লোকটা কি বা কে, বয়সটাই বা তার কত, বুদ্ধির দৌড়ই বা কেমন।

বুদ্ধির দৌড় একটু বুঝি আছে। কথা শুনে অন্তত তাই মনে হল। চট করে কেমন বলল লটারির কথাটা। এবং কেমন সুন্দর ভাবে মেনে নিল যে, তার শোভন নামটা ভালো না, নামটা পালটে নেবার জন্যে কেমন প্রস্তাব করে বসল। সত্যি মানুষটা দেখতে হবে, তাকে দেখার জন্যে একটু আগ্রহীই হয়ে উঠল যেন অলকানন্দা।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, একটা মৃদু আওয়াজে বাজছে যেন জলতরঙ্গ। অলকানন্দার বুকের মধ্যে ঠিক অমনি আওয়াজ করে বাজছে যেন কিসের ঢেউ।

ভাবতে মজা লাগছে যেমন, ভাবতে একটু আতঙ্কও হচ্ছে। ভালো করে ভাবতে গিয়ে তার ভাবনার তারগুলো কেবলই জট পাকিয়ে যাচ্ছে, এবং তৎক্ষণাৎ তার কানের মধ্যে অচেনা গলার শব্দ বেজে উঠছে।

এটা অ্যাকসিডেন্ট, না, আশীর্বাদ? এটা একটা শুভসূচনা, না, এটা একটা দুর্ঘটনা? এক অচেনা অজানা মানুষের সঙ্গে হঠাৎ এভাবে যোগাযোগ যে ঘটল, তা ঘটাল কে?

ঈশ্বর বলে হয়তো কেউ আছেন, কিন্তু সে সব বিশ্বাস করে না অলকা। অথচ, এখন যেন একটু বিশ্বাস করতে তার ইচ্ছে হচ্ছে। হঠাৎ কে তাদের এভাবে যুক্ত করে দিল?

বারান্দায় বেরিয়ে এল অলকা। রেলিঙের উপর ঝুঁকে তাকাল রাস্তার দিকে। চকচক করছে রাস্তা, ভিজে রাস্তার উপর আলো ঝিকমিক করছে। এই রাস্তাটা চিকচিক করতে করতে সোজা চলে গিয়েছে গড়িয়া-হাটের মোড়ের দিকে। বেশ মজা লাগল এ কথা ভেবে।

বড় চঞ্চল হয়ে উঠল অলকা। অজস্র বাজে কথা বলেছে সে শোভনকে। বানিয়ে বলেছে যে, তারা পাঁচ বোন। হঠাৎ একটা অচেনা ছেলের ডাকে একা সাড়া দেবে, এটা কেমন যেন দেখায়, সেইজন্যে সে তার বোনেদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বলল। কিন্তু বোন সে পাবে কোথায়? পাঁচজনের ঝাঁক দেখে শোভন যে ছোঁ মারবে, সে ঝাঁক সে কোথায় পাবে? এই জন্যেই তার ফোন-নম্বরটা নিয়ে নিয়েছে সে, নানা অছিলা দেখিয়ে সে বলবে তার একা যাওয়ার কথা, আর দুজন দুজনকে যাতে চিনতে পারে তারও একটা নিশানা বলে দেবে।

কাল বেলা বারোটায় ফোন করার কথা, এখন রাতই বারোটা বাজল না, অথচ অলকা কেমন-যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল, বড় চঞ্চল হয়ে উঠল।

না। এখনি সে ফোন করুক। এখনই সে খোলসা করে নিতে চায়। তা না হলে সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

বারান্দা থেকে ঝুঁকে রাস্তা দেখে আর লাভ নেই। অলকা ঘরের মধ্যে চলে এল। এখনই সে ফোন করবে।

নম্বরটা ভালো করে দেখে নিয়ে, মনে-মনে বার কয়েক আউড়ে নিয়ে সে ডায়াল করল। কিন্তু কোনো শব্দ নেই, রিং হওয়ার কোনো আওয়াজই নেই। অলকার সন্দেহ হল, তাকে তাহলে বাজে একটা নম্বর দিয়ে দিল নাকি ঐ লোকটা। রিসিভার রেখে দিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে সে কিছুক্ষণ ভাবল। তার পরেই আবার তুলল রিসিভার, আবার ডায়াল করল। ঐ একই অবস্থা, খট করে একটা শব্দ হয়েই সব যেন ঠাণ্ডা। অলকার বুকটাও যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল। কিন্তু কান থেকে নামায় না সে রিসিভারটি। কারা যেন কথা বলছে, শুনতে পেল অলকা। কান পেতে সে শুনতে লাগল—

"বুঝলি বকুল? টাইম মনে রাখলি তো? সাড়ে পাঁচটা। গুরুদাস ম্যানশনের নীচে। হেনা আর শ্যামলীকে নিয়ে তুই আয়, আমি বীথিকাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। মোট পাঁচজন হওয়া চাই। খুব ঘটা করে খাওয়া যাবে। ব্যাপারটা অশোভন বলছিস? কিন্তু শোভন ঘোষ তা ধরতে পারবে না। সে এখন ইন্সপায়ার্ড, অর্থাৎ সে এখন একেবারে বেকুব। তার ওসব বোধ এখন নেই।"

"ভীষণ হাসি পাচ্ছে আমার এখন থেকেই। তখন হাসি চেপে রাখতে পারলে হয়। শোন পুতুল, ছেড়ে দে। ওরাই

যাক।"

"না না না। তা হয় না। আমাকে ভীষণ ভুগিয়েছে। কতক্ষণ যে ওরা কথা বলেছে জানি নে। আমি তোকে বার-বার ডায়াল করছি শুভসংবাদটা দেবার জন্যে, বার-বারই শুনছি ওদের কথাই চলেছে। তার যেন শেষ নেই। এ চান্স ছাড়া হবে না। আমার পাসের খাওয়াটা ওর ঘাড় ভেঙেই হবে।"

"লাইনটা জট পাকিয়ে গিয়েছিল, তার জন্যে ওরা নিশ্চয় দায়ী না।"

"দায়ী বলছে কে? কিন্তু অতক্ষণ ধরে কথা? এর কোনো মানে হয়? তার উপর স্রেফ একটা অচেনা লোকের সঙ্গে। যাতে ছেড়ে দেয় তার জন্যে মাঝে-মাঝে আমি একটু শব্দ করছিলাম, ছেলেটা জিজ্ঞেস করছে ওটা কার গলা? মেয়েটা বলছে আমার বোনেরা। মজাটা একবার দ্যাখ।"

"মজা তো বটেই। কিন্তু তুই যা বলছিস পুতুল, তা তো আবার মজার উপরে মজা। শেষ পর্যন্ত পারবি তো সব রক্ষে করতে।"

"পারব। নিশ্চয় পারব।"

"রক্ষে করো। আমার তো শরীর এখনই হিম হয়ে আসছে।"

"কিন্তু তা বললে হবে না। এখনই হিম হলে চলবে কেন। হিমশিম খাওয়াতে হবে যে!"

"তা তো হবে। কিন্তু পাপ হবে যে। একজনের মুখের গ্রাস এভাবে কাড়বি? সেই ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর গল্পটা জানিস তো।"

"গল্প ইজ গল্প। গল্প কখনো সত্যি হয় না।"

"সত্যি হবে না কেন। এই ঘটনা নিয়ে যদি একটা গল্প লিখি তবে সেটা কি মিথ্যে হয়ে যাবে?"

"দ্যাখ বকুল, তুই বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস। যা প্ল্যান হয়েছে তা পালন করতেই হবে। ঐ বেহায়া মেয়েটাকে এইভাবে সাজা দিতে হবেই। একটা অচেনা লোকের কাছে কিরকম হ্যাংলামি করছিল। মেয়েদের নাম ডোবাবে যে!"

"অচেনা বুঝলি কি করে? অনেকদিনের চেনাও তো হতে পারে!"

"পারে না। পারে না। সব শুনে বলছি। তোর মত অনুমান করে না। মেয়েটা রিং করেছে অন্য কোথায়, কনেকশন হয়ে গেছে যাদবপুরে। বামাকণ্ঠে আর পুরুষকণ্ঠে একটু সরি-সরি কথা হবার পরই সরাসরি অন্য কথার শুরু। যারা প্রথমটা দুঃখ জানাল উভয়কে, তারাই শেষে সুক্ষ্ম তারে ঘা দিয়ে দিয়ে উভয়কে যেন জাগিয়ে আর মাতিয়ে তুলল। মেয়েটা বলল, 'এক্সকিউজ মি', ছেলেটা বলল, 'মাপ করার হয়েছে কি, কোত্থেকে বলছেন কথা?' মেয়েটা বলল, 'লেক টেরেস', ছেলেটা বলল,
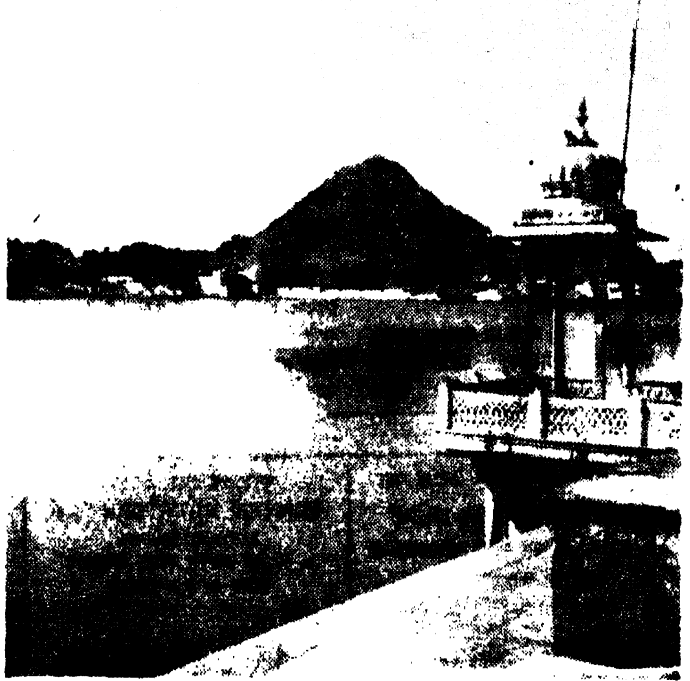
পুষ্করে আলোকচিত্র: শ্রীবিমলকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়

'যাদবপুরে'; অমনি উভয়ের জীবন যেন মধুপুর হয়ে গেল।"

"বা রে পুতুল। তুই তো বেশ কথা বলছিস আজকাল। এত ভাষা পেলি কোথায়?"

"ওরা দিল—ওই অলকানন্দা আর ওই শোভন। ওরা আমাকে জাগিয়ে দিল।"

"ভীষণ হাসি পাচ্ছে তোর রকম দেখে। তবে, তোর কথাই থাক্। হেনাকে আর শ্যামলীকে আমি ফোন করছি। তুইও বীথিকাকে বলে দে।"

"তা দিচ্ছি। কিন্তু ওদের সব কথা খুলে বলার দরকার নেই। আমি পাস করেছি ভালোভাবে, এই উপলক্ষে খাওয়া, বুঝলি? ওরা যেন সময়-মত জায়গা-মত ঠিক-মত আসে। এই কথাটুকু বলে দে। আমি বীথিকে নিয়ে নেব সঙ্গে। টোটাল পাঁচজন। আমি হচ্ছি অলকানন্দা, তুই অনিন্দিতা; আর ওদের যার যা নাম, তাই।"

"বেশ। ফোন তো ওদের করব, কিন্তু তখন যদি আবার এই রকমের দশা হয়? অন্য আর কেউ যদি আমাদের লাইনের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে সব শুনে নেয়!"

"নেবে তো নেবে। ভালোই হবে। বিরাট একটা দল নিয়ে তাহলে পৌঁছব গুরুদাস ম্যানশনের নীচে শনিবারের বারবেলায়। অতগুলো মেয়ে সেজেগুজে গিয়ে দল বেঁধে যাত্রা করলে সে তো হবে বেশ-একটা শোভাযাত্রা।"

"শোভাযাত্রা বটেই রে পুতুল। ওকে হয়তো অন্য নামও দেওয়া যায়।"

"কি?"

"শোভনযাত্রা। শোভনের আমন্ত্রণেই যখন সকলের এই যাত্রা, তখন ও-নামও দেওয়া যেতে পারে, কি বলিস?"

"বলি। তাই বলি। ঠিক বলেছিস তুই। এই কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে ওষুধ যেন ধরেছে।"

"কিসের ওষুধ?"

"তা আর বুঝলে না? ওই হ্যাংলা মেয়েটার মত সব কথা বুঝি অমন খুলে বলতে হবে? ছেলেটা বলল, 'কি খেতে চান', তার উত্তরে মেয়েটা কি বলল জানিস?"

"কি বলল?"

"ভারি অসভ্য মেয়েটা। কি বলল তা বলব কাল দেখা হলে। টেলিফোনে তা রসিয়ে বলা যাবে না।"

"মেয়েটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে বড্ড।"

"তাই বুঝি? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে ছেলেটাকে।"

"চিনে নেওয়া যাবে তো ওই ভিড়ের মধ্যে থেকে? চারমাথায় ও-সময় তো ভীষণ লোকজনের ভিড়।"

"তা নেওয়া যাবে। তার জন্যে ভাবি নে। খুব ইন্সপায়ার্ড, অর্থাৎ খুব বেকুব, বলে মনে হবে যেটাকে তাকেই ধরা যাবে। তার উপর, আমরা পাঁচজনে দাঁড়িয়ে চারদিকে ছটফট করে তাকাব, আর শোভন শোভন বলে নিজেদের মধ্যে 'আলোচনা আরম্ভ করব, বুঝলি? কাছে-ভিতেই আর একটা ঝাঁক যদি দেখি তবে তাদের দিকে ফিরেও তাকাব না। তাকাব না বটে, কিন্তু দেখে নেব তাদের।"

"বেচারা অলকানন্দা!"

"আর দুঃখ করতে হবে না তাদের জন্যে। এবার ছাড়ছি। শোভনের ফোন-নম্বরটা টুকে নে—। কাল বেলা বারোটায় আমি তাকে রিং করছি, তুইও রিং করবি—যার বরাতে লাইনটা জুটে যাবে সেই কনফার্ম করব এনগেজমেন্টটা।"

"বেশ। তাই হবে। কিন্তু ভাবছি, আমাদের এত কথা আবার কেউ শুনে ফেলল কিনা। তারাও হয়তো সকলেই এই একই রকম প্ল্যান করবে তাহলে।"

"তা করুক। তাতে আমাদের কোনো লাভ না হলেও লোকসানও নেই কিছু। আমাদের তো এটা একটা ফান। যাক গে, ছাড়ছি।"

"ছাড়্। কান ব্যথা হয়ে গেল।"

সমস্ত কথা শুনল অলকানন্দা। তার কেবল কান না, তার সমস্ত প্রাণটাই টনটন করে উঠেছে। মনে-মনে সে অভিসম্পাত দিতে লাগল ঐ মেয়ে দুটিকে। এমন অসভ্য আর বর্বর মেয়েও আছে সংসারে। অন্যের কথা আড়ি পেতে শোনে যারা তারা নিজেদের পরিচয় দেয় ভদ্রমহিলা বলে, তারা আবার পাস করে ভালোভাবে।

শক্ত হয়ে বসল অলকানন্দা। সেও সব ভণ্ডুল করতে জানে। তার হাতের কাছেও আছে এই যন্ত্রটা—এই টেলিফোনটা।

সে রিং করতে লাগল বার-বার। বার-বার এনগেজ্‌ড্-এর শব্দ হচ্ছে দেখে ভীষণ বিরক্ত আর বিব্রত হল সে। কিন্তু ছাড়বার পাত্রী সে নয়। অনবরত ডায়াল করতে লাগল অলকানন্দা। অনবরত ঐ একই শব্দ—এনগেজ্‌ড্।

রাত বেড়ে চলেছে ক্রমশ। মাথা গরম হয়ে উঠছে অলকানন্দার। হাল ছেড়ে দিয়ে সে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ঐ বকুল আর ঐ পুতুল—মনে-মনে অভিসম্পাত দিতে লাগল সে তাদের। এতে মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল আরও। ঘুম কিছুতেই এল না।

একটা কেমন রোমান্টিক আর রোমাঞ্চকর আবহাওয়া তৈরি করে নিয়েছিল সে, সেই আবহাওয়াটা এমনভাবে বিষিয়ে দিতে যারা পারে তারা আবার মানুষ, তারা আবার মেয়েমানুষ, তারা আবার ভদ্রমহিলা!

পাশবালিশ-সমেত উল্টে শুলো অলকানন্দা। ঘুম আসছে না কিছুতে।

সকালবেলা সে টেলিফোনের কাছে গেল না। শোভন সকালে বেরিয়ে যাবে কারখানায়। সুতরাং এখন ফোন করা বৃথা। আহা, যেন মস্ত একজন ইঞ্জিনিয়ার, সকালে উঠেই কাজ আরম্ভ! নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার তো বলছে, কিন্তু কে জানে সে কি! হয়তো সামান্য-একটা মেকানিক।

উস্কোখুস্কো চুল, রুক্ষ চেহারা। অলকার মা এসে বার কয়েক জেনে গেলেন তার শরীর খারাপ কি না! কোনো উত্তর দিল না অলকা।

চুপচাপ বসে থাকতে-থাকতে সময় কেটে গেল অনেক। কতটা সময় কাটল তার কোনো হিসাব তার নেই।

ঢং ঢং করে শব্দ হল দেয়ালঘড়িতে। চমকে উঠে দেখে—বারোটা।

উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল সে। কিন্তু আশ্চর্য, ডায়াল করার আগেই তার কানে এল কথা। কারা যেন কথা বলে চলেছে—

"ডোন্ট মাইন্‌ড্। ফোন রাখছি। এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। খিদিরপুরে যাব। সেখান থেকেই সরাসরি আসছি যথাস্থানে যথাসময়ে। আচ্ছা?"

"আচ্ছা। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছনো চাই কিন্তু। রাস্তার মধ্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না বলে দিচ্ছি।"

ঝনঝন করে টেলিফোন রাখার শব্দ বেজে উঠল অলকার কানের মধ্যে। সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বড়বাবুর বিরুদ্ধে

ইন্দ্রমিত্র
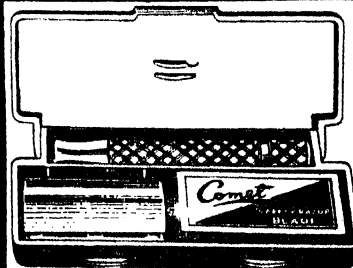
এত তাড়াহুড়ো করেও বুঝি শেষরক্ষা হল না। ঘড়ির ছোটো কাঁটাটি দশটায় আর বড়ো কাঁটাটি দুটোয় এসে লাগল এরই মধ্যে। অর্থাৎ দশটা বেজে দশ মিনিট হয়ে গেল। এতক্ষণ কি আর রক্ষা আছে? নির্ঘাৎ এতক্ষণে বড়বাবু লালকালিতে লেট-মার্ক দিয়ে রেখেছেন। এই বড়বাবুর নাম ব্রজেশ্বর হালদার। ঘড়েল ঘুঘু বলতে হয় লোকটাকে।

পাঞ্জাবির হাতায় কপালের ঘাম মুছল জগদীশ। নাঃ, বেঁচে থেকে সুখ নেই ংসারে। হাট-বাজার সেরে, লণ্ড্রি আর ক্তারখানার পাট চুকিয়ে, কাচ্চাবাচ্চার ঞ্ঝাট সামলে, ট্রামে-বাসে ধস্তাধস্তি করে— ত সব কাণ্ডের পরে যদি আপিসে হাজির তে দু-মিনিট দেরি হয়ে গেল তো জগৎ-ংসার রসাতলে গেল। ব্রজেশ্বর হালদার ক দেখুন অ্যাটেনডান্স রেজিস্টারে ক্রশ ঁটে বসে আছেন।

আচ্ছা, ব্রজেশ্বর কেমন করে প্রত্যেকদিন ঠক সময়ে আপিসে আসে বলতে পারেন? গদীশ কিছুতেই ঠাহর করে উঠতে পারে া—কেন একদিনও ব্রজেশ্বর আপিস কামাই রে না, কেন একফোঁটা অসুখ-বিসুখ করে া লোকটার। ঝড়জলে কলকাতা ভেসে যাক, াম ধর্মঘট হোক—ব্রজেশ্বর ঠিক আপিসে াজির। সর্বাত্মক হরতালের দিন শোনা যায় জেশ্বরের আপিসে আসতে একটু দেরি হয়ে যায়—সে-সব দিন নাকি সাড়ে নটার আগে তিনি এসে পৌঁছতে পারেন না।

মাথা গরম হয়ে যায় মশাই ব্রজেশ্বরের কথা ভাবলে। নটার আগে প্রত্যেক দিন আপিসে আসে, সাতটা না বাজলে কোনোদিন আপিস থেকে বেরোয় না। একেকদিন সন্দেহ হয়—আসলে হয়তো আপিস থেকে বাড়িতেই যায় না ব্রজেশ্বর, হয়তো রাত্তিরে আপিসের টেবিলেই ঘুমিয়ে থাকে, হয়তো আপিসের ক্যাণ্টিনে ঝোল ভাত খায়।

নিজে যা খুশি করুক, কারো কিছু বলবার নেই। যত ইচ্ছে তেল দিক উপরালাকে, যত ইচ্ছে উন্নতি করুক জীবনে কারো কিছু বলবার নেই। কিন্তু আর পাঁচ-জনকে সুযোগ পেলেই যা-তা বলে কেন? কেন ও চায় যে, সকলেই আপিস-আপিস করে পাগল হয়ে উঠুক? সত্যি, এমন চাল-চলন ব্রজেশ্বরের যেন এটা আপিস নয়, ইস্কুল; যেন উনি বড়বাবু নন, হেড-মাস্টার।

আপিসে ঢুকেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল জগদীশের। হায়, লিফট বন্ধ। বিকল হয়ে আছে। মাসের মধ্যে বলতে গেলে চোদ্দদিনই বিকল হয়ে থাকে। যাক, ও নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। সিঁড়ি ভেঙে এখন চার-তলায় ওঠো।

সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠল জগদীশ, হাঁপাতে-হাঁপাতে ঢুকল সেকশনে। হ্যাঁ, ব্রজেশ্বর বহাল তবিয়তে বসে আছেন নিজের চেয়ারে, সামনে একখানা মস্ত রেজিস্টার খুলে মিটমিট করে সিগারেট টানছেন। জগদীশ সই করল অ্যাটেনডান্স রেজিস্টারে। আবার বলতে হবে কেন, ক্রশ পড়ে গেছে এরই মধ্যে। ব্রজেশ্বর ঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর তাক বুঝে একটি দীর্ঘশ্বাস ঝাড়লেন। দশ-বারো মিনিট দেরিতে এসেছে বলে জগদীশের নামের পাশে যে লাল ঢ্যাঁড়া দিতে হয়েছে—বুকের এই ব্যথা ব্রজেশ্বর যেন আর সইতে পারছে না। ব্যাটা একের নম্বর হিপোক্রিট!

নিজের সীটে এসে বসল জগদীশ। হাঁক দিল—বেচারাম, বেচারাম।

কোনো সাড়াশব্দ নেই। অর্থাৎ শ্রীমান বেচারাম মাত্র সাড়ে ছ-হাত দূরে একটি টুলে বসে দপ্তরীর সঙ্গে মহানন্দে গালগল্প করে যাচ্ছে।

—বেচারাম, বেচারাম, ও বাবা বেচারাম।

এতক্ষণে বুঝি কানে নিল বেচারাম। সাড়ে ছ-হাত দূর থেকেই টুলে বসে জগদীশকে নিরীক্ষণ করে বলল—আমাকে কিছু বলছেন?

জগদীশ নিরুপায়ের মতো বলল—একটু কিছু বলতে চাইছি বাবা। একগ্লাশ জল খাওয়াও না।

—দাঁড়ান, হাতের কাজটা শেষ করে যাচ্ছি।

হাতের কাজ না হাতি। কাজ তো মুখের। আবার দপ্তরীর দিকে মুখ করে বসল বেচারাম। আবার চলল গালগল্প।

ঝাড়া পঁচিশ মিনিট বাদে জগদীশের কাছে এল বেচারাম। হাই তুলতে-তুলতে বলল—নিন, কী বলছিলেন তখন, বলুন এবার।

—তেমন কিছু না বাবা। সামান্য এক গ্লাশ জলের কথা বলছিলাম।

—ও হ্যাঁ জল।

হাই শেষ হল। নিজের মুখের সামনে বেচারাম খানিকক্ষণ তুড়ি বাজাল। যেন একটা দশমনী পাথর তুলছে এমনিভাবে, তারপর জগদীশের টেবিল থেকে কাচের গ্লাশটি নিয়ে বেচারাম হেলেদুলে জল আনতে চলে গেল। হয়তো টালার ট্যাঙ্কে গেল। কতক্ষণে ফিরে আসে দেখুন।

পাশের সীটে বসেন মহলানবীশ। জগদীশ বলল—কাণ্ডটা দেখলেন মহলানবীশদা?

সবই দেখছেন তিনি। এবং আজই নতুন দেখছেন না। বরাবর দেখছেন। মহলানবীশ বললেন—তুমি বড়ো অল্পেতে বিচলিত হও জগদীশ। কী এমন কাণ্ড হয়েছে শুনি।

—কিছুতেই আপনি বিচলিত হন না মহলানবীশদা।—জগদীশ একটুও বিচলিত না হয়ে বলল নিজের চোখেই তো দেখলেন সব। বড়বাবুর লাথি-ঝাঁটা না হয় মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছি, তা বলে বেচারামের কর্তালিও সইতে হবে? পিওনের কাছেও আমাদের একটা মান-মর্যাদা থাকবে না মহলানবীশদা?

মহলানবীশ চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। বললেন—জগদীশ ভাই, বুঝতে পারছি, ছেলেবেলায় তুমি লেখাপড়ায় দাবুনে ফাঁকি দিয়েছ। তা নাহলে তুমি জানতে, যাকে রাজায় করে হেলা তাকে পাত্তরে মারে ঢেলা। বুঝতে, বড়োবাবু যাদের লাথি মারেন, পিওন তাদের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকায় না।

মহলানবীশ চোখ খুললেন। সিধে হয়ে বসলেন। আর জগদীশ? সে মড়ার মতো চুপ করে রইল। আপিসের চেয়ারে যতদূর মড়ার মতো থাকা যায়।

ব্রজেশ্বর হালদার ভুলেও এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন না। একটা ফাইলের দিকে তাকিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। বাইরের কেউ দেখলে ভাবলেন ব্রজেশ্বর বুঝি ফাইল ছাড়া আর কিছু দেখছেন না। কিন্তু ভুল। ব্রজেশ্বর আসলে ফাইল ছাড়া আর সব কিছু দেখছেন, সব কিছু শুনছেন।

পাথুরে গলায় ব্রজেশ্বর ডাকলেন—দাশবাবু।

যাই বড়োবাবু।—বলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল জগদীশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের এই জগদীশেরই পদবী দাশ।

ব্রজেশ্বরের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল জগদীশ। বুঝতে কারো ভুল না হয়, এখানে বলে রাখা ভালো, ব্রজেশ্বরের বাঁ-পাশে একখানা ফাঁকা চেয়ার আছে। সেখানে ব্রজেশ্বরের অধীনস্থ কোনো কেরানীর বসবার কথা নয়। না, লিখিত আইনে বারণ নেই। অলিখিত আইনে বারণ আছে। বড়ো-বাবুর পাশের চেয়ারে যদি কোনো কেরানী গিয়ে ঝপাং করে বসে পড়ে, বড়োবাবুকে ইনসাল্ট করা হয় না? অলবৎ হয়।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল জগদীশ। অন্তত পাঁচ মিনিট না কাটলে ব্রজেশ্বর হালদার কিছুই বলবেন না। ফাইলে নিমগ্ন হয়ে থাকবেন। একটা কেরানীকে যদি কিছুক্ষণ সীটের সামনে দাঁড় করিয়ে না রাখা যায়, তাহলে আর বড়োবাবু হয়ে সুখ কি।

পাঁচ মিনিট বাদে ব্রজেশ্বর চোখ তুলে তাকালেন। কাচের গ্লাশের ঢাকনি খুললেন। একচুমুক জল খেলেন। ঢাকনিটি আবার গ্লাশের উপর রাখলেন। দেরাজ টেনে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করলেন। একটি সিগারেট ধরালেন। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই আবার দেরাজে বন্ধ করলেন। মস্ত একটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এখন, এতক্ষণে বললেন—হ্যাঁ, সে-কাজের জন্য আপনাকে ডেকেছি।

কিছুক্ষণের জন্য পুনরায় ধ্যানস্থ হলেন ব্রজেশ্বর। তারপর আরম্ভ করলেন—দেখুন, বললে আপনারা অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু না বললেও নয়, তাই বলছি, আপনার, আপনা-

দের লজ্জা-শরম বলে কোনো পদার্থ নেই। প্রত্যেক দিন সকলে লেটে আসবেন—দু-তিন সেকেণ্ড লেট হলে আই ডোণ্ট মাইণ্ড—কিন্তু আমাকে মাটির মানুষ পেয়ে একেবারে পাঁচ-ছ মিনিট লেটে আসা! ভেরি ব্যাড। আপনি তো আবার সকলের উপরে যান—কদিন অবধি দেখছি রোজই আপনি ন-দশ মিনিট লেটে আসেন। ভেরি ভেরি ব্যাড। আরেকজন আছেন ওই মিস বাগচী। মূর্তিমতী লেট। স্পেশ্যাল লেডিজ ট্রাম চালু হয়েছে, তবু কেন যে......

– বড়োবাবু, স্পেশ্যাল জেণ্টস ট্রাম থাকলে আমার—আমাদের ব্যাটাছেলেদের—লেট হত না।—মনে এলেও মুখ ফুটে একথা উচ্চারণ করতে পারল না জগদীশ।

—তা লেটে এসেও যদি সারাদিন মন দিয়ে কাজ করতেন, বুঝতাম, গবর্নমেণ্টের কিছু উপকার হচ্ছে।—তুবড়ি ফুটিয়ে চললেন বড়োবাবু—কিন্তু সে-গুড়ে বালি। নমো-নমো করে কোনো গতিকে দায় সেরে পাঁচটা বাজতে-না-বাজতেই দড়ি-ছেঁড়া বাছুরের মতো ছুটে বেরিয়ে পড়েন। একটা কথা বলে রাখছি মশাই, জীবনে আপনাদের কিচ্ছু হবে না। কিচ্ছু হবে না।

জীবনে কিছু হবে না, একথা যেন জগদীশ জানে না। ওরে ব্যাটাছেলে মর্কট, জীবনে কিছু হবার হলে তোর আণ্ডারে বসে কলম পিষে মরতাম না।

বড়বাবু থামলেন না।—মহলানবীশবাবুর নামেও বলবার মতো কথা আছে, কিন্তু আমি তা বলতে চাই না। তিনকাল গিয়ে ও'র আর এককাল বাকি আছে, বুড়োমানুষ, আজ বাদে কাল পেন্সন নেবেন, ও'কে আর হিতকথা শোনাবার কোনো মানে হয় না। কিন্তু আপনারা? আপনারা কী করেন? কাজের নামে অষ্টরম্ভা, এদিকে তো নরক গুলজার সব শুনতে পাই আমি। সারাদিন সিনেমা-থিয়েটারের আলোচনা চালাচ্ছেন, সাহিত্য আছে, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান আছে, হোমিওপ্যাথি আছে। ঘন ঘন বাইরে যান—চা খাওয়া আছে, ইয়ে করা আছে। আজ ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে যাচ্ছেন, কাল যাচ্ছেন ইলেকট্রিকের বিল দিতে। তা ছাড়া মাথাধরা আছে, পেটব্যথা আছে, হিস্টিরিয়া আছে।

শেষের কথাটা নির্ঘাৎ মিস বাগচিকে লক্ষ্য করে বলা। কেন না, এ-সেকশনে মিস বাগচি ছাড়া আর কারো হিস্টিরিয়া নেই।

জগদীশ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবাক্য ব্যয়ে বড়বাবুর কথামৃত পান করে যাচ্ছে। একেকবার মনে হয়, আহা, কত না জানি কষ্ট হচ্ছে বড়বাবুর, প্রত্যেকদিন একনাগাড়ে এই এক কথা বলা! একটা কাজ করলে পারেন না বড়বাবু? টেপরেকর্ড করে রাখতে পারেন না কথাগুলো? আপিসে এসে প্রত্যোকদিন যন্ত্রটা চালিয়ে দিলেই হল—

ওই ডালুকটা আমার নামে কি সব বলছিল আপনার কাছে?

বড়বাবুকে আর নিত্যনিয়মিত বকতে হয় না।

আরো কতক্ষণ বক্তৃতা দেবেন কে জানে। আরো কতক্ষণ না জানি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে জগদীশকে।

ঠিক এই সময়ে জগবন্ধু এসে হাজির। না, জগবন্ধু মন্ত্রী-টন্ত্রী কেউ নয়, জগবন্ধু খোদ বড়সাহেবের খাশ চাপরাশি। অন্যের কথা ছেড়ে দিই, ব্রজেশ্বর হালদার পর্যন্ত জগবন্ধুকে সমীহ করে কথা কয়।

জগবন্ধুর মুখ সব সময় গম্ভীর। বড়-সাহেবের খাশ চাপরাশি কোন দুঃখে মুখ হাসিখুশি করে রাখবে? দুনিয়ার কাকে সে পরোয়া করে?

জগবন্ধুকে দেখে বড়বাবু সত্যি-সত্যি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না, চেয়ার ছেড়ে উঠবার একটা ভঙ্গি করলেন। বললেন—কী ভাই জগবন্ধু, কিছু বলবে?

আহা, কী মধুর কণ্ঠ। খানিক আগে জগদীশকে যিনি প্রচণ্ড গলায় ধমকাচ্ছিলেন, ইনি যেন সেই মানুষই নন। জগবন্ধুর মুখের দিকে এমন বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন ব্রজেশ্বর যেন জগবন্ধু কলসীর কানা ছুঁড়ে মারলেও একে ইনি অকাতরে প্রেম দিতে প্রস্তুত। ধন্য!

জগবন্ধু হেঁড়ে গলায় বলল—হুজুর আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

তিং করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন ব্রজেশ্বর। বড়োসাহেবের ঘরে যেতে হবে এক্ষুণি। টেবিলের পায়ার ঘষে আধপোড়া সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললেন, নেভানো সিগারেটের টুকরো দেরাজের হাতলের উপর রেখে দিলেন। বড়সাহেবের ঘর থেকে এসে ওইটুকুই আবার টানবেন।

জগবন্ধুর পিছে-পিছে ব্রজেশ্বর চলে গেলেন। বড়সাহেবের ঘরে গেলেন যখন, ঘণ্টাখানেকের আগে আর ফিরে আসতে হচ্ছে না।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জগদীশ। যাক, আপাতত তো বাঁচা গেল। নিজের সীটে এসে বসল। ওঃ জল দিয়ে গিয়েছে বেচারাম। একটানে এক'গ্লাশ জল চোঁ করে মেরে দিল। যাক বাবা, এতক্ষণে প্রাণে একটু জল এল।

ওদিক থেকে মিস বাগচিও এসে গেল জগদীশের টেবিলের সামনে। বলল—জগদীশবাবু, ওই ডালুকটা আমার নামে কী সব বলছিল আপনার কাছে?

—একা আপনার নামে নয়, মিস বাগচি। কাউকেই ছেড়ে কথা কয়নি। আমরা সকলেই নাকি দারুন দেরি করে আপিসে আসি, কাজে ফাঁকি দিই, আপিসে বসে সারাদিন সিনেমা-থিয়েটার করি, সাহিত্য করি, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান করি, হোমিওপ্যাথি করি, ঘন-ঘন বাইরে গিয়ে চা খাই। আরো কত সব আজেবাজে কথা। আমাদের নাকি হরেকরকম ব্যামো আছে—মাথাধরা, পেটব্যথা, হিস্টিরিয়া। আমরা নাকি আজ ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে যাই, কাল ইলেকট্রিক বিল দিতে যাই।

—শালা এক নম্বর ছোটো লোক তো।
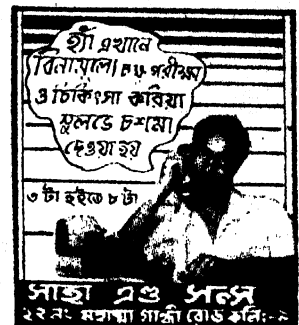
কতখানি মর্মপীড়া হলে মিস বাগচির মতো একটি সুন্দরী তরুণী একজন বড়বাবুকে 'শালা' বলতে পারে, বারেক কল্পনা করুন। একটি মেয়ের পক্ষে 'শালা' কথা বড়ো সাংঘাতিক ব্যাপার। ইহজীবনে ওদের কখনো 'শালা' পাওয়া অসম্ভব, তবু ওরা 'শালা' বলে কাউকে গালাগাল করে না। 'শালা' না হোক, 'ঠাকুরপো' তো হয় ওদের। কিন্তু 'ঠাকুরপো' বলেও আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে কাউকে গালাগাল করেছে বলে শুনিনি।

আচ্ছা, বড়সাহেব এখন ডাকলেন কেন ব্রজেশ্বরকে? জরুরী কোনো আপিসের কাজে? নাকি, এই সেকশনের উপরে বড়সাহেবও চটে আছেন? ব্রজেশ্বরকে একলা ঘরে নিরিবিলিতে ইংরেজিতে ধমক-ধামক দিচ্ছেন?

মিস বাগচি বলল—আপনি কোনো খবরই রাখেন না জগদীশবাবু। বড়সাহেবের মেজো মেয়ে ইস্কুলের পরীক্ষায় ইংরেজিতে লাড্ডু পেয়েছে। খুব সম্ভব সেইজন্যেই আমাদের বড়বাবুর তলব পড়ল।

—আমাদের বড়বাবু তার কি করবেন? ইস্কুলের ইংরেজির টিচারকে ধরে ঠ্যাঙাবেন? নাকি বড়সাহেবের মেজো মেয়ে সেজে নিজে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসবেন এবার থেকে?

মুখে আঁচল চেপে মিস বাগচি হাসতে-হাসতে নিজের কানের ডগা অবধি লাল করে ফেলল। (যাই বলুন মশায়, দারুন দেখাচ্ছে কিন্তু!) লাল-টাল করে বলল—আপনার বুদ্ধি এমন তীক্ষ্ণ বলেই বড়বাবু আপনাকে অমন কড়া-কড়া কথা বলে, জগদীশবাবু। আপনাকে দেখেই বুঝেছি, দেখতে ক্যাবলার মতো হলেই যে মাথায় ঘিলু থাকবে, এমন কোনো কথা নেই। আপনি কি দুনিয়ার কোনো খবরই রাখেন না? খবর কাগজটাও আপনি পড়েন না নাকি?

পাঞ্জাবির একটা খোলা বোতাম লাগাতে-লাগাতে জগদীশ বলল—কেন মিস বাগচি, খবর কাগজে এ-বিষয়ে কিছু লিখেছে নাকি? সত্যি বলছি, আজ সকালে আর কাগজ ওল্টাবার সময় পাইনি। রাত্তিরে গিয়ে পড়ব।

—আবার, আবার আপনি হাশাগঙ্গারামের মতো কথা বললেন জগদীশবাবু। যাক গে, কাজের কথা শুনুন। বড়সাহেবের মেজো মেয়ের প্রাইভেট টিউটর ঠিক করে দিয়েছিলেন আমাদের বড়বাবু। সেই মেয়ে ফেল করেছে, প্রাইভেট টিউটরের দোষ অতএব। বড়সাহেবের উপরে যিনি, প্রাইভেট টিউটরের চেয়েও তিনি বেশি দোষ দেখছেন আমাদের বড়বাবুর। অমন হাঁদা প্রাইভেট টিউটর যোগান দিচ্ছে, এ কেমন বড়বাবু? দেখুন না, আমাদের বড়বাবুর কী হাল হয়।

মিস বাগচি একটা ভুল করেছেন নির্ঘাৎ। বড়সাহেবের উপরে আবার কে? বড়সাহেবই তো সর্বেসর্বা। জগদীশ ভয়ে-ভয়ে বলল—মিস বাগচি, আপনি বোধ হয় একটু ভুল করেছেন। বড়সাহেবের উপরে আবার কে?

মিস বাগচি অবাক হয়ে একটুকাল জগদীশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল—আমি একটুও ভুল করিনি জগদীশবাবু, আপনি একটি জেনুইন ইডিয়ট। বড়সাহেবের উপরে কে? মেমসাহেব। বড়সাহেবের মেমসাহেব। বিয়ে করেছেন তো অনেককাল, তবু জানেন না বাড়িতে স্বামীর উপর কে, স্বামী কাকে ডরায়?

জগদীশ বীরদর্পে বলল—ওসব বড়সাহেবের বড়ঘরের বড় কথা জানি না। আমার বাড়িতে আমিই অল-ইন-অল. আমার ওয়াইফই বরং আমাকে ডরায়, রীতিমত ডরায়, বাঘের মতো ডরায়।

—ওঃ, আপনি তাহলে বাঘ, আপনিই তাহলে বাঙলার বাঘ স্যর আশুতোষ?—

ঝাঁঝালো গলায় মিস বাগচি বলল—মাপ করবেন, ঠিক চিনতে পারিনি। বোধ হয় গোঁফ কামিয়ে এসেছেন বলে চিনতে পারিনি।

—এসব আজেবাজে কথা কাটাকাটিই চলবে সারাদিন?—এতক্ষণ চুপচাপ ছিল অমিয় হাজরা, এবার পাশের টেবিল থেকে গলা বাড়িয়ে বলল—ডেভিলটাকে সায়েস্তা করার কথা কি কেউ ভাববে না? নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করে ইন্ডিয়ার কি দুর্দশা হয়েছে, স্বচক্ষে তা দেখেও কি আপনাদের শিক্ষা হয় না? বেশ, আমরা নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করি, বড়বাবু আমাদের একেক করে জ্যান্ত পুঁতুন।

মহলানবীশ এতক্ষণে টাকে হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন—অমিয় ভাই, তুমি বড়ো উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। যা করতে চাও, আস্তে-সুস্থে করো। উত্তেজিত হয়ো না। উত্তেজনা বড়ো খারাপ জিনিস।

অমিয় আস্তিন গুটিয়ে বলল—যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে এই সিচুয়েশনে সে-ই উত্তেজিত হবে। আপনি শুনেছেন, জগদীশ-বাবুকে ডেভিলটা কী বলেছে? আমরা গবর্নমেন্টের সময় নষ্ট করে ইলেকট্রিক বিল দিতে যাই, লাইফ ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে যাই—উঃ, কী দারুণ মীননেস লোকটার। হকিস্টিক চালিয়ে হারামজাদার পা খোঁড়া করে দিলে তবে গিয়ে মনটা হাল্কা হয়। কেন, ও নিজে ইলেকট্রিক বিল দেয় না। লাইফ ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেয় না?

জগদীশ আমতা-আমতা করে বলল—তা যদি বলো ভাই হাজরা, বড়বাবু কিন্তু নিজে কখনো ইলেকট্রিক বিল কিংবা ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম দিতে যান না।

—জানি।—মিস বাগচি কটমট করে বলল—নিজে যায় না, বেচারামকে পাঠায়। আরেক জঘন্য অপরাধ করে ভালুকটা। সরকারী চাকরকে প্রাইভেট কাজে লাগায়। লালবাজারের মোড় থেকে চা-টোস্ট নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেক দিন বেচারামকে পাঠায়। আর বেচারামকেও বলিহারি। নামে বেচারাম, কাজে ব্যাটাছেলে বড়বাবুর কেনারাম হয়ে আছে।

অমিয় হাজরা মহলানবীশের দিকে একটি সূক্ষ্ম কটাক্ষ করে বলল—খালি বেচাকে দোষ দিলে কী হবে, নাম ভাঁড়িয়ে আরো কেনারাম আছে। বড়বাবুর গোলাম হয়ে আছে।

যেমন আমি।—কোনোদিকে না তাকিয়ে মহলানবীশ বললেন।

পলকের জন্য অপ্রস্তুত হয়ে গেল অমিয় হাজরা।—না, মহলানবীশদা, আপনাকে আমি কিছু বলিনি কিন্তু।

—অমিয় ভাই, খোলাখুলি বলোনি, খোলাখুলি বলবে কেন। তুমি যে ইয়ংম্যান, জেন্টেলম্যান।—নিবাত নিষ্কম্প গলায় মহলা-

এক চোখে তাকালেন অমিয় হাজরার দিকে
আরেক চোখে তাকালেন মিস্ বাগচির দিকে
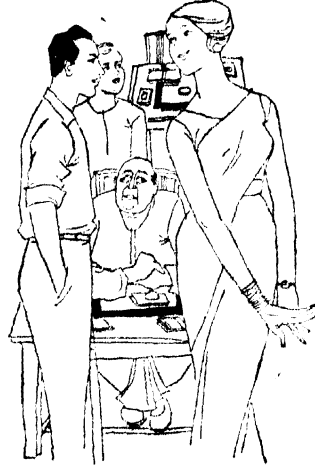
নবীশ বললেন—কিন্তু আড়াল-আবডাল দিয়ে বললেও আমি মোটামুটি বুঝে নিতে পারি। বলে যাও, বলে যাও। কথায় আমার গায়ে ফোস্কা পড়ে না। অনেক শুনেছি, অনেক দেখেছি। বেঁচে থাকলে আরো অনেক শুনব, অনেক দেখব। জগদীশ ভাই, বেঁচে থাকলে সকলেই দেখবে।

মহলানবীশ একচোখে তাকালেন অমিয় হাজরার দিকে, আরেক চোখে মিস বাগচির দিকে। একই মুহূর্তে দু-চোখে দুজনকে দেখা—এই অসাধ্যসাধন মহলানবীশ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না এ-সেকশনে।

জগদীশ হঠাৎ ধরা গলায় বলল—বেঁচে থাকলে আমিও অনেক কিছু দেখতে পাব? আপনি যথার্থ বলছেন তো? নাকি আমায় ছলনা করছেন, মহলানবীশদা?

মহলানবীশের চোখের ভঙ্গি দেখে একটু কী নার্ভাস হয়ে গেল মিস বাগচি? বোঝা গেল না। ঝট করে নিজের সীটে চলে গেল। না, পাকাপাকি গেল না। দেরাজ খুলে ব্যাগ থেকে একটুকরো সুপুরি মুখে দিয়ে আবার চলে এল অকুস্থলে। এসেই অমিয়কে বলল—দেখুন হাজরাবাবু, আপনি বা আমি ছাড়া আর কেউ টিট করতে পারবে না বড়বাবুকে। বুড়ো ধাড়ীদের দিয়ে কোনো কাজের কাজ হবে না। আপনি কি সাজেস্ট করেন হাজরাবাবু?

নিজের কপালে ডানহাতের আঙুলে দুটো টোকা দিয়ে অমিয় হাজরা বলল—আমি বলি কী, ছুটির পর একদিন আমি সিঁড়িতে পিছন থেকে বড়বাবুকে ল্যাং মেরে দিই।

—ধ্যেৎ। এই টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির সেকেন্ড হাফেও আপনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলের মতো যুদ্ধ চালাতে চাইছেন। আপনি যদি অনুমতি দেন তো আপনাকে একটা কথা বলি।

—বলুন, বলুন।

—আমার কুটুমামা বলেন, কোনো ব্যাচেলরের বুদ্ধি কখনো নিতে নেই।

—আহা, ব্যাচেলার বড়বাবুকে সায়েস্তা করার জন্য ব্যাচেলার ক্লার্কের বুদ্ধিই ভালো। বিষস্য বিষমৌষধম্। আর শুনুন, আপনি অনুমতি না দিলেও, আপনাকে একটা কথা বলব। আমার মেসোমশাই বলেন, যতদিন বিয়ে না হয় ততদিনই মেয়েদের বুদ্ধির ধার থাকে। আচ্ছা, আপনি কি সাজেস্ট করেন শুনি?

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে মিস বাগচি জগদীশবাবুকে বলল—কি, বাঙলার বাঘ যে চুপচাপ আছেন? আপনার কি কিছু বলবার নেই আর?

জগদীশ বলল—ইয়ে, যা ভালো বোঝেন আপনারা করুন, কিন্তু দেখবেন, হিতে যেন বিপরীত না হয়ে যায়। যেন আইন-আদালত পর্যন্ত না যায়। যেন চাকরি না যায়। কাচ্চা-বাচ্চার সংসারে থাকি, কোনো গোলমালের মধ্যে আছি জানলে বৌ আর আমাকে আস্ত রাখবে না।

মিস বাগচি কটকট করে উঠল—বৌয়ের ভয়ে কাঁপছেন, এদিকে মুখে তো খুব নিজেকে বাঘ বলে চালিয়ে যাচ্ছেন। বাঘ না হাতি। বাঘের মেসো—বেড়াল।

জগদীশ একবিন্দু রাগ না করে বলল—কথাটা কি জানেন, আমি বাঘ হলে কি হবে, আমার ঘরের উনিও তো মানুষ নন। উনিও যে বাঘিনী।

মিস বাগচি অমিয় হাজরাকে বলল—হাজরাবাবু, আমার উপর ছেড়ে দিন ব্যাপারটা। এক মাসের মধ্যে যদি বড়বাবুকে শায়েস্তা করতে না পারি তো—

তো?

-তো আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

এক মাস লাগল না। দিন পনের বাদেই মিস বাগচি চাকরিতে ইস্তফা দিল। আপিসে আসেনি, বাড়ি থেকেই ডাকযোগে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে।

কী কলকাঠি টিপেছে কে জানে। বড়বাবু কিন্তু সত্যি-সত্যি অনেকখানি সায়েস্তা হয়ে গিয়েছেন। আর বেশি সায়েস্তা করা যাবে না, প্রতিজ্ঞা পুরোপুরি রক্ষা করা গেল না, এই দুঃখেই কি কিছু না বলে-কয়ে মিস বাগচি ইস্তফা দিয়ে দিল?

তিন দিন পরে স্বয়ং বড়বাবু হাসিমুখে জগদীশের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

এক মাসের মধ্যে যদি বড়বাবুকে শায়েস্তা করতে না পারি তো—

অভাবনীয় কাণ্ড বলতে হবে। একজন কেরানীর টেবিলের সামনে স্বয়ং বড়বাবুর হাসিমুখ?

পকেট থেকে একগোছা হলুদ রঙের চিঠি বের করলেন বড়বাবু। লাল কালিতে ছাপা। এবং একখানার উপরে লালকালিতে হস্তাক্ষরে জগদীশ দাদার নাম লেখা।

জীবনে এই প্রথম বড়বাবুকে দেখে জগদীশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল না। জগদীশের এই ধৃষ্টতাকেও কিন্তু বড়বাবু, যতদূর মনে হল, মার্জনা করলেন, অকাতরেই মার্জনা করলেন।

—যাবেন কিন্তু দাদাবাবু। হ্যাঁ বড়বাবু বললেন, বাঘের গলাতেই বললেন না, বলতে গেলে বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে বললেন।

মহলানবীশ অমিয় হাজরা এবং সেকশনের আর সকলকে চিঠি বিলি করে বড়বাবু বেরিয়ে গেলেন।

ধাক্কা সামলে উঠতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল জগদীশের। তারপর বলল—মহলানবীশদা, বড়বাবু শেষ পর্যন্ত আমাদের মিস বাগচিকে বিয়ে করলেন?

পরম শান্ত গলায় মহলানবীশ বললেন—না, জগদীশ ভাই, মিস বাগচি ঠিকই বলেছিলেন, তুমি একটি জেনুইন ইডিয়ট। তুমি ভুল করছ।

জগদীশের মতো ইডিয়টও ক্ষেপে গেল—ভুল? আপনি বলতে চান, বড়বাবু আমাদের মিস বাগচিকে বিয়ে করছেন না?

—ঠিক ধরেছ জগদীশ ভাই। আমি বলতে চাই, তোমাদের মিস বাগচি আমাদের বড়বাবুকে বিয়ে করছেন।

অমিয় হাজরা কোনোদিকে না তাকিয়ে একমনে কাজ করে যাচ্ছে। কাজে অমিয়র এত মনোযোগ আগে কখনো দেখা যায়নি।

অমিয়কে ডাকলেন মহলানবীশ। নিতান্ত অনিচ্ছায় অমিয় হাজরা মহলানবীশের কাছে এসে দাঁড়াল।

মহলানবীশ বললেন—অমিয় ভাই, একটু প্রসন্ন হয়ে হাসো, মিস বাগচি যা সার্ভিস দিলেন তার কোনো তুলনা নেই। আহা, অমন গুম মেরে আছ কেন, মিস বাগচির স্যাক্রিফাইসটা একবার দেখো, মিস বাগচির প্রতিজ্ঞার জোরটা একবার ভাবো। ধরে নাও, বড়বাবুকে সায়েস্তা করার জন্যই—

সত্যি, নিদারুণ সায়েস্তা হয়ে গিয়েছেন ব্রজেশ্বর হালদার। মিস বাগচি, মাপ করবেন, মিসেস হালদার অসাধ্য সাধন করেছেন। ব্রজেশ্বর হালদারকে আর চেনাই যায় না। তাঁর তর্জন-গর্জন বন্ধ হয়ে গেছে। যেন সুন্দরবনের বাঘ চিড়িয়াখানার খাঁচায় ঢুকে পড়েছে।

কি আর বলব, ব্রজেশ্বর হালদারের হাল দেখে জগদীশের চোখে পর্যন্ত জল এসে যায়। বিয়ের পর মেয়ে-পুরুষ সকলেরই কিছু-কিছু পরিবর্তন হয়, ব্রজেশ্বর হালদারের সংস্করণ একেবারে আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। মিস বাগচির টাইটেল বদলে মিসেস হালদার হয়েছে। আর মিসেস হালদার ব্রজেশ্বরের খালি টাইটেল-পেজ নয়। মলাট-ফলাট পর্যন্ত আরেকরকম করে দিয়েছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, ব্রজেশ্বর হালদার নিজেই এখন লেটে আসেন আপিসে। সকলের চেয়ে বেশি লেট করে আসেন। জগদীশ পর্যন্ত ব্রজেশ্বর হালদারের অনেক আগে আপিসে এসে যায়।

আগে ঘনঘন ঘড়ির দিকে তাকাতেন ব্রজেশ্বর হালদার। আজকাল ভুলেও একবার ঘড়ির মুখ দেখেন না উনি। ঘড়ি যেন পরস্ত্রী।

সাতটা না বাজলে আগে ব্রজেশ্বর হালদার কস্মিনকালেও আপিস থেকে বেরতেন না। আর আজকাল? পাঁচটা বাজতে-না-বাজতেই, ব্রজেশ্বর হালদারের ভাষা চুরি করে বলি, দড়ি-ছেঁড়া বাছুরের মতো ছুটে বেরিয়ে পড়েন।

জরুরী কাজ পড়লে জগদীশ কখনো-কখনো পাঁচটার পরেও আপিসে থাকে, কাজ করে। কিন্তু হাজার জরুরী কাজ থাকলেও পাঁচটার পরে একতিল আপিসে রাখা যাবে না ব্রজেশ্বর হালদারকে। ঢং-ঢং করে পাঁচটা বাজতে আরম্ভ করলেই উনি উল্কাবেগে বেরিয়ে যাবেন।

ব্রজেশ্বর হালদারকে আজকাল জগদীশ পর্যন্ত কণামাত্র ভয় পায় না। জগদীশ পর্যন্ত সাহসী হয়ে উঠেছে। তা চিড়িয়াখানার বাঘকে কে আর ভয় করে।

পাঁচটা বেজেছে সেদিন। কি একটা জরুরী কাজ নিয়ে বসেছে জগদীশ। বেরতে একটু দেরি হবে। তা হোক। জগদীশ ব্রজেশ্বর হালদারকে ধরে ফেলল—বড়বাবু, এই জরুরী কেসটা নিয়ে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। এক মিনিট।

ব্রজেশ্বর হালদার, অভাবনীয় কাণ্ড, হাতজোড় করে বললেন—আমাকে ক্ষমা করুন দাশবাবু। আজ আমাকে ছেড়ে দিন। কাজের কথা কাল হবে। আজ নয়।

কাতর চোখে জগদীশের দিকে তাকালেন। বললেন—দাশবাবু, কি আর বলব আপনাকে, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে জ্যান্ত বাঘিনী, আমার আর কোনো আশা নেই। সাড়ে নটার আগে কোনোদিন বাড়ি থেকে বেরনোর হুকুম নেই, ট্রাম-বাসের অবস্থা যাই হোক, রাস্তায় মিছিল হোক, গুলিগোলা চলুক, ওদিকে ছটার মধ্যে বাড়িতে ঢুকতে না পারলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। অবশ্য হপ্তায় দুদিন—সোমবার আর শুক্রবার—আমার সাতটার সময় বাড়ি ফেরার পার্মিশন আছে।

সোমবার আর শুক্রবার এই কনসেশন কেন? এ তো আরেক রহস্য।

ব্রজেশ্বর হালদার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—না, দাশবাবু, কোনো রহস্য নেই, খুব সোজা কথা। মহারানীর হুকুমে সোমবার আর শুক্রবারে যে আমাকে আপিসফেরত বৈঠকখানা বাজার থেকে সস্তায় আলু-পটল ঝিঙে-কুমড়ো উচ্ছে-বেগুন আদা-মরিচ কিনে নিয়ে যেতে হয়।

আজ সোমবার। ডান পকেট থেকে একটা বাজারের (চটের) থলি বের করে বাঁ-হাতে ঝুলিয়ে ব্রজেশ্বর হালদার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন।

আরব্যরজনী — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

বাড়িটার নাম ভিলা মাধবী। ছোট্ট একটি পাহাড়ী টিলার উপর বাংলো ধাঁচের এই বাড়িটার চওড়া বারান্দার সামনেই আড়া-আড়ি একটি সারিতে অনেকগুলি ইউকালিপটাস। গাছের সাদা-সাদা ধড় যেমন নিরেট, তেমনই নিখুঁত ও সোজা তাদের খাড়াই চেহারা। কোনদিন কোন ঝড়ের আঘাতে যদি গাছগুলির মাথা ভেঙে পড়ে যায়, তবে মনে হবে, সাদা-সাদা নিরেট থামের ধড় দাঁড়িয়ে আছে। আর ভিলা মাধবীর এই বাংলো ধাঁচের চেহারাকেও বোধহয় ছোট একটা পার্থেননের ধ্বংস বলে মনে হবে।

ভিলা মাধবীর ফটকের কাছে সড়কের পাশে একটি সাইনপোস্টের লেখা জানিয়ে দেয়—হাজারিবাগ টাউন, টু মাইলস্। কিন্তু টাউনের প্রায় সকলেই জানে যে, এই ভিলা মাধবী হলো সেন সাহেবের বাড়ি।

সেন সাহেবের নাম যে সুজীবন সেন, এটা অবশ্য টাউনের সকলেই জানে না। কিন্তু আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু, যাঁরা দুজন একদিন এলাহাবাদের ছাত্র ছিলেন, তাঁরা জানেন, এলাহাবাদের বিখ্যাত ডাক্তার পি সেনের ছেলে সেই সুজীবন সেন অনেক শখ করে আর পয়সা খরচ করে প্রায় পাঁচ বছর হলো এই বাড়িটা তৈরী করিয়েছে আর নাম দিয়েছে; ভিলা মাধবী।

ভিলা মাধবীর ফটকের আর্চের জাফরি-গুলিকে জড়িয়ে ধরে যে লতার ভার সবুজ হয়ে দুলছে, সেটা আইভিলতা; মাধবীলতা নয়। ভিলা মাধবীর এত বড় লন আর হাতার কোথাও কোন মাধবীলতা নেই। তবু নামটা ভিলা মাধবী হলো কেন?

এটা অবশ্য টাউনের কেউই জানে না। জানেন শুধু মিসেস চৌধুরী, যিনি এক বুড়ী মেমসাহেবের কারবারের পার্টনার হয়ে টাউনের বাইরের এই চমৎকার হোটেলটিকে দশ বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন; হোটেল সিংহানি। জায়গাটার গেঁয়ো নাম সিংহানি। ভিলা মাধবীর ফটক থেকে সড়ক ধরে মাত্র দশ মিনিট হেঁটে এগিয়ে গেলেই হোটেল সিংহানিকে দেখতে পাওয়া যায়, জানালার আর দরজার যত ময়ূরকণ্ঠি রঙের পর্দা ফুরফুর করে উড়ছে।

হোটেল সিংহানির ওই মিসেস চৌধুরী জানেন, সুজীবন সেন তার স্ত্রী মাধবীর নামটিকেই ভালবেসে আর পছন্দ করে বাড়িরও নাম রেখেছে মাধবী। মাধবী যে মিসেস চৌধুরীর জেঠতুতো দিদির মেয়ে। আর, সুজীবন সেনের স্ত্রী মাধবীর কাছে এই মিসেস চৌধুরী আজও শুধু রেবা মাসিমা। বিধবা রেবা মাসিমার দুই ছেলে, গণেশদা আর কার্তিকদা, দুজনেই এখন লণ্ডনে থাকে। আর; চিরকাল সেখানেই থাকবে বলে মনে হয়।

টাউনের লোক জানে, সেনসাহেব হলেন একজন কৃতী জিওলজিস্ট। আগে জিওলজির সার্ভেতে কাজ করতেন। তারপর কিছুদিন উড়িষ্যার এক দেশী স্টেটের খনিজ সন্ধানের ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও বেশি দিন টিকে থাকতে পারেন নি সেনসাহেব। কিন্তু তাঁর কাজের সুনাম আছে। তাই এখনও মাঝে-মাঝে ডাক আসে। ঝরিয়ার মাইনস্ বোর্ড পরামর্শ নেবার জন্যে ডাকাডাকি করে। কোডারমা'র অভ্রখনির মালিকেরা প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন। তাই সেনসাহেব এখনও মাঝে-মাঝে ঘোরা-ফেরা করেন। কোথাও গিয়ে একটু সার্ভে করে দিয়ে ফিরে আসেন; কোথাও বা কিছুদিনের জন্য খনির কাজ তদারক করেন। পরামর্শ তো প্রায়ই দিয়ে থাকেন। এর জন্য যে-পারিমাণের ফী পান সেনসাহেব, সেটাও যেমন-তেমন নয়। এক হাজার টাকার কমে কোন কথাই বলতে রাজি হবেন না সেনসাহেব। এই সেনসাহেবই জানকীলাল যমুনাদাসকে অ্যাসবেসটস আর সোপস্টোনের খোঁজ দিয়েছিলেন।

কিন্তু এটাও টাউনের অনেকের জানা আছে, বিশেষ করে আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু জানেন, সেনসাহেবের জীবনের এটুকু আর্থিক রোজগার না থাকলেও বিশেষ কোন অসুবিধে হতো না। ডাক্তার পি সেন অনেক সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন। শুধু এলাহাবাদে নয়; কলকাতাতে আর পুরীর সমুদ্রের ধারে, সব মিলিয়ে তেরটি বাড়ির ভাড়া থেকে যে আয় হয়, তার উপর নির্ভর করে সেনসাহেব অনায়াসে সারাজীবন শুধু শিকার করে আর হুইস্কি খেয়ে পার করে দিতে পারবেন; টাকার কোন অভাব হবে না।

এই খবরটা কিন্তু টাউনের প্রায় সকলেই জানে, সেন-সাহেব একটু বেশি ড্রিংক করেন আর শিকারের শখে বড় বেশি পয়সা খরচ করেন। এত গুণী ও কৃতী জিওলজিস্ট হয়েও কোথাও যে একজন স্থায়ী অফিসার হয়ে টিকে থাকতে পারলেন না, তার আসল কারণ বোধহয় সেনসাহেবের ওই দুটি অভ্যাসের বাড়াবাড়ি। জ্বর হয়েছে; টেম্পারেচার এক শো একেরও বেশি; ডাক্তার বলেছেন, এক পা'ও নড়বেন না, ঘরের ভিতরে চুপটি করে শুয়ে পড়ে থাকুন; কিন্তু ডাক্তারের উপদেশে কোন ফল হয় নি। বিকেল হতেই গ্যারেজ থেকে নিজেই গাড়ি বের করে, একগাদা বুলেট আর কার্তুজ আর চারশো বোরের কর্ডাইট রাইফেলটি সঙ্গে নিয়ে শিকারে বের হয়ে গিয়েছেন। এ-খবরও টাউনের অনেকেই জানে।

বছর চল্লিশ বয়স হবে, সেনসাহেব মানুষটিকে টাউনের অনেকেই বেশ পছন্দ করে। সাজে পোশাকে একেবারে খাঁটি সাহেবী স্টাইলের মানুষ; হাতে সব সময়েই একটি পাইপ ধরে আছেন, আর চোখে ও মুখে সব সময়েই বেশ মিষ্টি একটি হাসি লেগে আছে। লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারও খুব ভাল। হাটের দিনে সড়কে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের বুড়োর কাছ থেকে কুমড়ো কিনে নিয়েই বুড়োকে হাসিমুখে ধন্যবাদ জানান—থ্যাংক ইউ। টাউন ক্লাবের ছেলেরা স্পোর্টসের জন্য চাঁদা চাইতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়ে দিয়েছেন। আর বেশ হাসিমুখেই ছেলেদের হাতের কাছে সিগারেটের ডিবে এগিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরা অবশ্য লজ্জিতভাবে হেসেছে—সিগারেট খাই না। সেনসাহেব বলেছেন—তা হলে চা খেয়ে যাও।

টাউনের কারও সঙ্গে সেনসাহেবের মেলা-মেশা নেই; কিন্তু সে-জন্য সেনসাহেবের নামে কোন নিন্দের কথা কারও মুখে শোনা যায় না। সেনসাহেব একটু অদ্ভুত মানুষ, কিন্তু বেশ ভাল মানুষ।

সেনসাহেবের এই পরিচয় ছাড়া টাউনের মানুষ আর

শুধু এইটুকু জানে যে, সেনসাহেবের স্ত্রী আছেন আর একটি মেয়ে আছে। সেনসাহেবের স্ত্রী একজন সত্যিকারের সুন্দরী; আর ছোট্ট মেয়েটিরও কী চমৎকার ফুটফুটে চেহারা।

ভিলা মাধবীর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ধানক্ষেতের আর রোগা-রোগা খেজুরগাছের ভিড়ের ওপারে সেণ্ট কলাম্বাস কলেজের রেনেসাঁ স্টাইলের বাড়িটাকে দেখা যায়। কলেজের সায়েন্সের ছাত্রেরা মাঝে-মাঝে অদ্ভুত একটা কৌতূহল নিয়ে ভিলা মাধবীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা সেন-সাহেবের মিউজিয়াম দেখতে চায়। আসল কথা হলো, ওরা এই অদ্ভুত মানুষটিকেই একটু কাছে থেকে দেখতে চায়। সেই সঙ্গে দেখে যায়, হাজার রকমের পাথর নুড়ি আর খনিজের নমুনা হাজার রকমের চেহারা নিয়ে একটি ঘরের কাঠের গ্যালারিতে, কাচের আলমারিতে আর মেহগনির টেবিলে সাজানো রয়েছে।

অনেকদিন পরে আজ আবার একদল ছাত্র সেনসাহেবের মিউজিয়াম দেখতে এসেছে। সেনসাহেব নিজেই বেশ খুশি হয়ে আর হেসে-হেসে ছেলেদের হাতে আতসী কাচ ধরিয়ে দিয়েছেন—দেখ, বেশ ভাল করে দেখে নাও। এসব খুবই অদ্ভুত জিনিস। ভেরি ভেরি ইণ্টারেস্টিং, চার্মিং অ্যাণ্ড রোমাণ্টিক।

কত রকমের সিলিকা, স্লেট আর কেওলিন। ঝকঝকে অভ্র আর কালচে ম্যাঙ্গানিজ পাথর। সেনসাহেব নিজেও বলে দেন, এদিকের এগুলি হলো যত ফেরাস আর অ্যালু-মিনাস ল্যাটারাইট। পাথরের আকার-প্রকার দেখে ছাত্র ছেলেরা কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, কিন্তু সেনসাহেবকে বেশ বুঝতে পারে। সত্যিই বেশ ইণ্টারেস্টিং আর চার্মিং মানুষটি। আর, রোমাণ্টিক তো নিশ্চয়ই। তা না হলে এমন চমৎকার এক রূপসী নারীর এত বড় একটা ছবিকে এই মিউজিয়াম ঘরের মাঝদেয়ালে টাঙিয়ে রাখবেন কেন?

ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ সাহস করে একটা প্রশ্ন করেই ফেলে—আপনি এই লাইনে কেমন করে এলেন, স্যার?

হেসে ফেলেন সেন সাহেব, সুজীবন সেন।—শখ করে। ছেলেবেলা থেকেই শখ ছিল জিওলজি শিখবো; আর পাথরের রোমান্স দেখবো।

—কেন শখ হলো স্যার?

সুজীবন সেন দাঁত দিয়ে পাইপ চেপে ধরে আবার হাসেন, —বিখ্যাত জিওলজিস্ট রায় বাহাদুর পি এন দত্ত ছিলেন আমার ঠাকুরদার বন্ধু। তাঁর নাম নিশ্চয় শুনেছ?

—না।

—তিনি বরাকর নদীর কিনারাতে কাঁকরের স্তর থেকে জুরাসিক কালের জানোয়ারের ফসিল বের করেছিলেন। দত্তদাদুর কাছে সেই যে পাথরের গল্প শুনলাম, সেই গল্পই মনে শখ ধরিয়ে দিল। হ্যাঁ...বুঝতে পারছো, চিনতে পারছো, এগুলি কী?

—না।

—এগুলি খুব দামী পাথরের ছোট ছোট ক্রিস্টাল; বাংলা ভাষায় বলে রত্নপাথর। দেখতে খুব সুন্দর, নয় কি?

—হ্যাঁ স্যার।

—কিন্তু কেন সুন্দর বলতে পার?

—না স্যার।

—ওর মধ্যে ইমপিওরিটি আছে; তার মানে ময়লা আছে;

ভেজাল আছে; তার মানে অন্য একটা ধাতু ঢুকে পড়েছে। এই ইমপিওরিটি আছে বলেই সামান্য পাথর এত সুন্দর রঙীন রত্নপাথর হয়ে গিয়েছে। কেমন? ব্যাপারটা বেশ রোমাণ্টিক কি না?

—খুব রোমাণ্টিক। আপনি জিওলজিতে নিশ্চয় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন স্যার?

—হ্যাঁ।

—মার্কের রেকর্ড ব্রেক করেছিলেন?

—হ্যাঁ। আর, চাকরি ছাড়বার রেকর্ডও ব্রেক করেছি। এই আট বছরে এগারটা চাকরি নিয়েছি আর ছেড়েছি।...আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমি এখনই বের হব। শুনলাম, চাতরার জঙ্গলে একদল নীলগাই দেখা দিয়েছে।

ড্রাইভার মতিরাম গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে ফটকের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখে। শিকারে যাবার এই ব্যস্ততার মধ্যেও সুজীবন সেন কিন্তু একটা কথা বলে যেতে ভুলে যান না।—আমি যাচ্ছি মাধু। এক একদিন অবশ্য এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, ঘরের ভিতরে এসে কথাটা বলতে পারেন না। বাইরে লনের কাছে দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে কথাটা বলে দিয়েই গাড়িতে উঠে পড়েন।

সুজীবন সেনের স্ত্রী মাধবীলতা সেন একেবারে একটি স্তব্ধ মূর্তির মত ভিতরের একটি ঘরের কোচের উপর বসে খোলা দরজার পাশে কাচের টবের মেরি গোলাপের সদ্য-ফোটা স্তবকটার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকেন। গাড়ির শব্দ যখন আর শোনা যায় না, তখন ঘরের বাইরে এসে ডাক দেন মাধবীলতা—স্টিফান।

—জী হুজুর। সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে খানসামা স্টিফান।

—সাহেব আজ কি কি চীজ সঙ্গে নিয়ে গেল?

—একটা শেরি আর একটা হুইস্কি।

—ঠিক আছে; যাও।

সুজীবন সেনের স্ত্রী, সেনসাহেবের দশ বছরের ঘরোয়া জীবনের সঙ্গিনী মাধবীলতা সেন আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে কোচের উপর চুপ করে বসে থাকেন।

সন্ধ্যা হয় যখন, ভিলা মাধবীর ঘরে-ঘরে আর বারান্দায় আলো ঝলমল করে, তখন আয়ার হাত ধরে বাইরে থেকে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসে আট বছর বয়সের রঞ্জু, সুজীবন সেনের মেয়ে রঞ্জিতা সেন; মুখটা সদ্য-ফোটা মেরি

গোলাপেরই মত একটা সুন্দর ফুললতা।

রাতের খাবার খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে রঞ্জু। মাধবীলতা সেন পিয়ানোতে হাত দিয়ে ঘুমপাড়ানী সুর বাজিয়ে একটা ঘণ্টা সময়ও পার করে দেন। কিন্তু তার পরেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতা তখন টেবিলের কাছে এগিয়ে যেয়ে আর, কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসেন।—তোমাদের আশার কোন মানে হয় না, মা। শোধরাবার কোন লক্ষণ দেখছি না। আগে কোনদিনও একথা মনে হয়নি যে, জিওলজিস্ট মানে পাথরের মানুষ। এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি। এখান থেকে সরে গিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে কিছুদিন থাকতে পারলে অন্তত একটু হাঁপ ছাড়তে পারতাম।

চাতরার জঙ্গলে নীলগাইয়ের সন্ধান পাননি সুজীবন সেন। জঙ্গলের গাঁয়ের কাছে মাচান করে আর পুরো দুটি রাত জেগে ফিরে এসেছেন। হ্যাঁ, একেবারে খালি হাতে ফেরেননি। একটা জংলী ময়ূর আর এক গাদা তিতির নিয়ে এসেছেন। বোধহয় গাঁয়ের সাঁওতালদের কাছ থেকে কিনেছেন। আর, একটা পাহাড়ী নালার কিনারা থেকে পাথরের একটা চাকলা তুলে নিয়ে এসেছেন। পাথরের ভাঁজের মধ্যে সিঁদুরের মত রঙীন একটা সুরু রেখার দাগ; সুজীবন সেন বলেন,—বুঝতে পারলে তো মাধু, পাথরটার মধ্যে কী সুন্দর মার্কারির স্ট্রেন লালচে হয়ে রয়েছে?

কিন্তু মাধবীলতার চোখে কোন বিহ্বলতার স্ট্রেন সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে না। বরং, কেমন যেন শুকনো ঝরঝরে একটা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। ভদ্রলোকের কাছে জীবন্ত ময়ূর আর তিতির যেন মিথ্যে পদার্থের একটা স্তূপ; আর এই পাথরের চাকলাটাই একটা জীবন্ত প্রাণী। গাড়ির কেরিয়ারের সঙ্গে বাঁধা পাখিগুলির পালক ধুলোয় ভরে গিয়েছে। কিন্তু পাথরের চাকলাটাকে কত যত্ন করে গাড়ির ভিতরে সীটের গদির উপরে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত মানুষই বটে। এমন মানুষ কেমন করে মনে রাখবে যে, এই এক বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও তিনি তাঁর স্ত্রীকে আর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে একটু বেড়িয়ে আসেননি।

বাড়িতে থাকলেই বা কি? কতদিন নিজের চোখেই তো বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছেন সুজীবন সেন, বিকেল বেলা লনের চারদিকে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে এক নারী, তাঁরই স্ত্রী, যার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ বছর, যার জীবনে অনেক আশা এখনও রঙীন হয়েই আছে, যাকে দেখতে পেলে পথের মানুষ এখনও চোখ অপলক করে একটা রূপের বিস্ময় দেখতে থাকে; তবু তার পাশে পাশে বেড়িয়ে একটা ঘণ্টাও খরচ করবার জন্য কোন ইচ্ছে এই মানুষকে ব্যস্ত করে তোলেনি। শুধু মাধু মাধু বলে হঠাৎ এক-একবার খামকা ডাক দিয়েছেন। বড় জোর কাছে এসে পাঁচ-দশ মিনিটের মত দাঁড়িয়েছেন। তারপরেই উসখুস করেছেন। তখুনি ঘরের ভিতরে গিয়ে আলমারি খুলে শেরির বোতল আর গেলাস বের করেছেন।

চাতরার জঙ্গল থেকে শিকার করে ফেরা আর দু'রাত জাগা সুজীবন সেনের মূর্তিটাকে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন মাধবীলতা। সুজীবনের বাঁ চোখের ভুরুর কাছে একটা ক্ষত লালচে হয়ে রয়েছে। হাত-ঘড়িটার কাচের আবরণটা নেই।

সরে যান মাধবীলতা। ড্রাইভার মতিরামকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন—কি হয়েছিল?

মতিরাম—সাহেব মাচান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।

—কেন?

—একটু বেশি খেয়েছিলেন।

—ঠিক আছে: যাও।

মাঝ রাতে যখন একটা সোফার উপরে সুজীবন সেনের নেশার শরীরটা অলস জড়তার মত এলিয়ে পড়ে থাকে, তখন মাধবীলতা বিছানা থেকে উঠে এসে সুজীবন সেনের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন।

চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে আছেন সুজীবন সেন। কে জানে এখন কিসের স্বপ্ন দেখছেন। জগতের কোন্ বনের গোপনলোকে রাত্রির অন্ধকারে বেচারা নীলগাই ক্ষিদের জ্বালায় কাঁচ শালের পাতা খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারই বুকে গুলী মারবার জন্য এই অদ্ভুত ভদ্রলোকের আত্মাটা এখনও বোধহয় এই ঘুমের মধ্যেও ছটফট করছে।

জঙ্গলের নীলগাইয়ের নাগাল পাননি ভদ্রলোক; কিন্তু এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতার প্রাণের নাগাল তো পেয়েছেন। কাজেই তার প্রাণটাকে এক-রকম মেরেই রেখেছেন।

সুজীবন সেনের ঘুমন্ত চোখ দেখতে পায় না, তাঁর মাধবীলতার চোখ দুটো এখন কেমন অদ্ভুত হয়ে জ্বলছে। মাধবীলতা বোধহয় তাঁর অদৃষ্টের একটা ভয়ানক ঠাট্টার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না মাধবীলতা। আত্মহত্যার মানুষ যেমন উতলা হয়ে চলন্ত ট্রেনের চাকার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে ছুটে যায়; মাধবীলতাও যেন তেমনই একটা প্রতিজ্ঞার আক্রোশের মত উতলা হয়ে ছুটে গিয়ে পাশের ঘরের টেবিলের দেরাজ ধরে টান দেন। রঙীন নক্সাকরা চামড়ার একটি ব্যাগ বের করেন। ব্যাগটাকে উপুড় করে নাড়া দিতেই ঝুরঝুর করে একগাদা চিঠি ঝরে পড়ে।

মাধবীলতার হাত দুটো ছটফট করতে থাকে। তবে কি, চিঠিগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে, একেবারে বাজে কাগজের কুচি করে দিয়ে, বাগানের পাঁচিলের ওপারে কালো অন্ধকার আর ঝড়ো বাতাসের মধ্যে এখনই উড়িয়ে দিতে চান মাধবীলতা?

টেবিলের এই দেরাজটি হলো সুজীবন সেনের জীবনের পাঁচটি বছরের যত অভাবিত প্রাপ্তির মিউজিয়াম। চাইতে হয়নি, চেষ্টা করতে হয়নি, এক তরুণী নারীর ভালবাসার চিঠি বার বার এসে সেদিনের সুজীবন সেনের মনটাকে বিস্ময়ে ভরে দিয়েছিল। অ্যাডভোকেট চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতা রায়েরই চিঠি। বিয়ের আগে তিন বছর আর বিয়ের পরে দু' বছর, সুজীবন সেনের কাছে লেখা মাধবীলতার চিঠির ভাষা যেন সুখী-ভালবাসার গানের ভাষা। বিয়ের আগের একটি তারিখের মাধবীলতার একটি চিঠি বলছে, "জানি না তোমার মন কি বলে? কিন্তু আমি জানি, আমি তোমাকেই ভালবাসি। ভালবাসতে পার আর না-ই বা পার, বিয়ে করতে রাজি হও বা না হও, আমাকে মিথ্যেবাদী বলে মনে করো না।" বিয়ের পরের একটি তারিখের চিঠি বলছে: "আমি তো আমার আশার বেশি কিছু পেয়ে গিয়েছি।"

একটিও চিঠি হারিয়ে যায়নি; হারিয়ে যেতে দেননি সুজীবন সেন। মোট একান্নটা চিঠি। দেখলে মনে হবে, চিঠিগুলিকে রত্নপাথরের একান্নটা ক্রিস্টাল মনে করে এই টেবিলের দেরাজের ভিতরে একটি গোপন জাদুঘরের মধ্যে পুষে রাখতে চেয়েছেন জিওলজিস্ট সুজীবন সেন।

কিন্তু ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাতে সোনার মেডাল বিজয়িনী, ইতিহাসের ছাত্রী মাধবীলতা আজ বোধহয় এই চিঠিগুলিকে একটা মিথ্যে স্বর্ণযুগের যত প্রশস্তির প্রলাপ বলে মনে করছে। টেবিলের দেরাজের ভিতরে সুজীবন

সেনের গোপন জাদুঘরের ভিতরে যেন এক-গাদা মিথ্যে শিলালিপি লুকিয়ে রয়েছে।

চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থাকেন মাধবী-লতা। তারপর, চিঠিগুলিকে আবার ব্যাগের ভিতরে ভরে দিয়ে দেরাজের সেই গোপন নিভৃতেই রেখে দিলেন।

আলো নিবিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে যাবার আগে অন্য একটি ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে একবার দেখে নিলেন মাধবীলতা, বিছানাতে শুয়ে আছেন সুজীবন সেন। না, এই পাঁচ বছরের মধ্যে কোনদিনও ওই বিছানার কাছে এগিয়ে যেতে ইচ্ছেই করেনি।

ঘুমন্ত পাথর অবশ্য নিজেই এক-একদিন চমকে জেগে উঠেছে, মাধবীলতার কাছে এসেছে আর হাত ধরেছে। কিন্তু একটুও ভাল লাগেনি মাধবীলতার; শুধু সহ্য করেছেন, এই মাত্র। আজ কিন্তু ভাবতে গা ঘিন-ঘিন করে। যেন আর সহ্য করতে না হয়।

সকালবেলা চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে মাধবীলতা বেশ গম্ভীর হয়ে কথা বলেন—আমি এলাহাবাদ যাব।

সুজীবন হাসেন—যেও। কিন্তু কথাটাকে এরকম একটা ভয় দেখানো স্বরে বলছো কেন?

মাধবী—কথা হলো, আমি এখন এলাহা-বাদেই বেশ কিছুদিন থাকবো।

—থেক।

—কিন্তু তুমি আবার সপ্তাহে একটা করে টেলিগ্রাম করে উপদ্রব করবে না।

—সেটা আমার অভ্যেস। না করে থাকতে পারবো বলে মনে হয় না।

—না; চলে আসবার জন্যে ওরকম তাড়া দেবে না। আমার বিশ্রী লাগে। বাড়ির মানুষও হাসাহাসি করে।

—তা করুক। আমার যা ভাল লাগে আমি তা করবোই।

সুজীবন সেন অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন; আর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মাধবীলতার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আরও একটা অদ্ভুত কথা বলেন—এখন এলাহা-বাদে গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকতে তোমার কি-আর এমন ভাল লাগবে? তার চেয়ে চল না কেন, মাস তিন-চারের মত অনেক দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

মাধবী—কোথায়?

সুজীবন—ইওরোপে।

মাধবী—একথা তো পাঁচ বছর ধরে শুনে আসছি। একটা মিথ্যে কথা।

সুজীবন—আঃ, এমন সুন্দর মুখে এত শক্ত কথা শোভা পায় না। সত্যি, বিশ্বেস কর মাধু, সব ব্যবস্থা প্রায় ঠিক হয়েই গিয়েছে।

মাধবীলতার মুখের গম্ভীরতা হঠাৎ চমকে ওঠে। —কথাটা আমাকে আগে বলতে কী বাধা ছিল? আমি কি আপত্তি করতাম?

—না; হঠাৎ বলে দিয়ে তোমাকে একটু আশ্চর্য করে দেবার ইচ্ছে ছিল, তাই আগে বলিনি।

আশ্চর্য হবারই কথা। যে-মানুষ তার অদ্ভুত এক সাধের জীবনের সীমানা পার হয়ে এই পাঁচ-বছরের মধ্যে একবার সিমলা-দার্জিলিংও যেতে পারেনি, সে মানুষই বিদেশে বেড়াতে যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে। জঙ্গলের জন্তু আর পাখি শিকার করবে, পাথর কুড়োবে, ভিলা মাধবীর একটি ঘরের সোফার উপর বসে যখন-তখন গেলাসে ভর্তি হুইস্কি চুমুক দিয়ে দিয়ে খাবে, আর স্ত্রী মাধবীলতা শুধু একটি রঙীন রূপের মূর্তি হয়ে চোখের সামনে ঘুর-ঘুর করবে; কী অদ্ভুত একটা জীবন তৈরী করে ফেলেছে এই ভদ্রলোক! হ্যাঁ, রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই একবার মেয়েটাকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরবে আর গালে একটা চুমো খাবে। ব্যস্, তার পরেই, কে যে স্ত্রী আর কে যে মেয়ে, সেটুকু বোঝবার দেখবার আর জানবার যেন কোন আর দরকারই বোধ করেন না এই সুজীবন সেন। সে মানুষেরই মনে
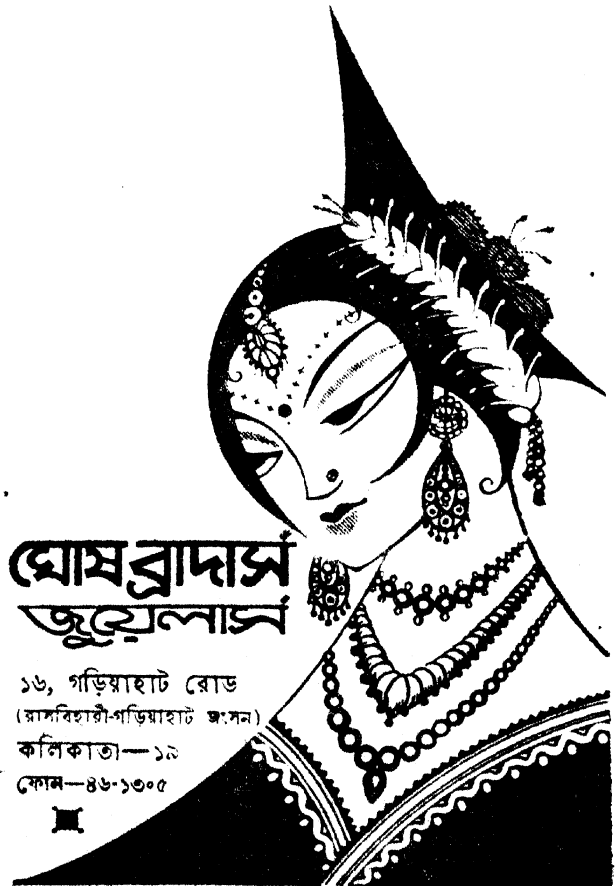
স্ত্রীকে আর মেয়েকে নিয়ে ইওরোপ বেড়াবার সাধ হয়েছে।

মাধবীলতা নিশ্চয় একটু বেশি আশ্চর্য হয়েছেন। কিন্তু একটুও খুশি হতে পেরেছেন কি? পারেননি বোধ হয়; তাঁর চোখের দৃষ্টিতে কোন প্রসন্নতার চিহ্ন সুস্মিত হয়ে ফুটে ওঠে না। এ যেন ট্রেন ছেড়ে যাবার পর টিকেট কেনবার ব্যস্ততা। আলো নিবে যাবার পর মুখ দেখবার চেষ্টা। মাধবীলতার মুখের হাসি তো সাত বছর আগেই শুকিয়ে গিয়েছে। আজ হঠাৎ সঞ্জীবন সেনের একটা খেয়ালী কথার ধ্বনি শুনেই সে রিক্ততা সব আক্ষেপ ভুলে গিয়ে হেসে উঠতে পারবে কেন? এক বছর বয়সের রঞ্জুর জন্মদিনের উৎসবে সঞ্জীবন সেনের সঙ্গে সেই যে হেসে কথা বলে-ছিলেন মাধবীলতা, তারপর আর কোনদিন কখনও হেসে কথা বলতে কিংবা কোন কথা বলে হেসে ফেলতে পেরেছেন বলে মনে পড়ে না।

মাধবীলতা বলেন—এতদিন পরে হঠাৎ বাইরে বেড়াতে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন?

সঞ্জীবন—ভেবে দেখেছি, আমার একটু পরিবর্তন দরকার।

সঞ্জীবন সেনের মুখে খুবই নতুন একটা কথা বটে; কিন্তু মাধবীলতার মনে নতুন করে কোন আশার চমক জাগিয়ে তুলতে পারবে, এমন কোন কথা নয়। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট চারু রায়ের বাড়ি থেকে সঞ্জীবন সেনের কাছে কম করেও ত্রিশটি চিঠি এসে অনুরোধ আর আবেদন করেছে, তোমার এখন একটু পরিবর্তন দরকার, সঞ্জীবন। সিংহানি হোটেলের রেবা মাসিমা নিজেও কতবার এসেছেন; সঞ্জীবনের সঙ্গে কত মিষ্টি করে কথা বলে অনুরোধ জানিয়েছেন, তোমার একটু পরিবর্তন দরকার সঞ্জীবন। কিন্তু কোন আবেদন আর অনুরোধ সঞ্জীবন সেনের জীবনে পরিবর্তনের বিন্দুমাত্রও চেষ্টা কিংবা ইচ্ছা জাগিয়ে তুলতে পারেনি। সেই মানুষ আজ হঠাৎ বলছে, একটা পরিবর্তন দরকার। ভাল কথা; কিন্তু নিতান্ত একটা কথা। ওটা কোন অনুতপ্ত জীবনের নতুন ও কঠিন একটা অঙ্গীকারের কথা নয়।

মাধবীলতা শুধু বলেন—এটুকু ভেবে দেখতে এত দেরি না করলেই ভাল ছিল।

সঞ্জীবন হেসে ওঠেন। —ঠিক কথা।

[দুই]

সঞ্জীবন সেনের পরিবর্তন? হ্যাঁ, জাহাজের দুটো-তিনটে দিন সত্যিই স্ত্রীকে আর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ডেকের উপর ঘুরে-ফিরে অনেক গল্প করেছেন। কিন্তু তারপরেই হাঁপিয়ে উঠেছেন। —নাঃ এসব কি আমার পোষায়?

মাধবীলতা—কি হলো?

—সমুদ্র দেখতে যে এত বিশ্রী লাগবে, সেটা আগে ধারণা করতে পারেনি।

একদিন বিকেলে হঠাৎ একটা আক্ষেপ করে সেই যে জাহাজের সেলুন-বারের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন সঞ্জীবন সেন, বের হয়ে এলেন রাত দশটায়। টলতে টলতে কেবিনে ফিরে এসে দেখলেন, মাধবীলতা আর রঞ্জু দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রথমে নেপলস্; জাহাজ থেকে নেমেই যেন একটা স্বস্তির আনন্দ পেলেন সঞ্জীবন সেন। যেন সমুদ্র-দেখা যন্ত্রণার গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি হয়ে গেল কঠিন পাথুরে জগতের একটি স্থলচর প্রাণ।

নেপলস্ থেকে ট্রেনের যাত্রী হয়ে আর রোমে এসে একটা হোটেলে উঠে, একটা ঘণ্টাও পার না হতেই খুশি হয়ে হেসে ফেললেন সঞ্জীবন সেন। —সত্যিই, বেশ জায়গা যাহোক। জিনিস-টিনিস যেমন ভাল তেমনই সস্তা।

মাধবীলতারও বুঝতে দেরি হয়নি, এরই মধ্যে কোন্ বিস্ময়ের স্বাদ পেয়ে এত খুশি হয়ে গিয়েছেন সঞ্জীবন সেন। হোটেলে এসেই একবার বাইরে বের হয়ে গিয়েছিলেন, আর বেশ একটি লালচে তৃপ্তির উচ্ছলতা দিয়ে চোখ-মুখ রঙীন করে নিয়ে আবার হোটেলের ঘরে ফিরে এসেছেন।

সঞ্জীবন সেনের মুখে হাসি আছে, কিন্তু মাধবীলতার মুখে কোন হাসির একটা ছায়াও নেই। রোম হলে কী হবে? মাধবীলতার প্রাণটা এখানেও এসে যেন হাজারিবাগের জঙ্গলের ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে। সে ছায়াতেও কাঁটা আছে।

সঞ্জীবন সেন অবশ্য একটা পরিবর্তনের কাণ্ড দেখাবার জন্যে মাঝে মাঝে বেশ চেষ্টা করেন; কিন্তু হাঁপিয়েও পড়েন বোধ হয়। পর পর পাঁচটা দিন সুন্দরী রোমা নগরীর অনেক পিয়াৎসার অনেক ফোয়ারার কাছে ঘুরে বেড়িয়েছেন সঞ্জীবন সেন। একটা মিউজিয়ামও দেখেছেন। কলোসিয়ামের একটি নিরালাতে দাঁড়িয়ে মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করেছেন। দেখে হেসেও ফেলেছেন, রঞ্জুর তাড়া খেয়ে একটা সাদা বিড়াল ছুটে পালিয়ে গিয়ে একেবারে এরিনার ঠিক মাঝখানে লাফিয়ে পড়েছে আর রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে মিউ-মিউ করছে।

সঞ্জীবন সেন হাসেন—তোমার হিস্টির কী দশা হয়েছে দেখ।

মাধবীলতা—কি হয়েছে?

সঞ্জীবন—দেখে নাও, সেই খুনে গ্ল্যাডিয়েটর আজ কেমন একটি বিল্লী হয়ে এরিনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিউ-মিউ করছে।

হাসবার মত একটা কথা বটে; কিন্তু মাধবীলতার মুখে কোন হাসির ঝলক উথলে ওঠে না।

কাপিটলের মিউজিয়মের কয়েকটা মূর্তির দিকে তাকাতে গিয়ে সঞ্জীবন সেন বেশ একটু শিউরে উঠে হেসে ফেলেন—ভাল ভাল জাতের পাথরকে কেটে ছেঁটে নির্লজ্জ করবার কী অদ্ভুত চেষ্টা! চল, হোটেলে ফিরে যাই।

যেখানেই যান না কেন, ক্ষণে ক্ষণে, শুধু একটি কথা বার বার বলে মাধবীলতার গম্ভীর মুখটাকে আরও গম্ভীর করে দিয়েছেন সঞ্জীবন—চল, হোটেলে ফিরে

যাই। সন্ধ্যে হলে হোটেল থেকে মাঝে মাঝে বের হলেও দূরে যেতে চান না সঞ্জীবন।

এইতো, হোটেলের সামনেই বেশ সুন্দর এই রাস্তাটি, ভিয়া নাশিওনাল। এই রাস্তা ধরে সামান্য একটু এগিয়ে গেলেই পিয়াৎসা এসেদ্রা। ফোয়ারার গায়ে রঙীন আলোর ঝিলিমিলি খেলছে। মাধবীলতা আর রঞ্জুকে সংগে নিয়ে এসেদ্রার চারদিকে ঘুরে, তারপর ফুটপাথের চাতালের উপর খোলা আকাশের নীচে কাফিবারের একটা চেয়ারে বসে কফি খেতেও মন্দ লাগে না। মাধবীলতা শুধু চুপ করে পাশের চেয়ারে বসে থাকেন। আর রঞ্জু শুধু চকোলেট খায়।

পথের ভিড়ের মেয়েরা দেখতে পেয়েই যেন বেশ আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে, এক রূপসী ভারতীয়া কাফিবারের চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। মাধবীলতার শাড়ি-জড়ানো শরীরের শোভা আর ভংগী আরও ভাল করে দেখবার জন্যে মেয়েদের ভিড় আরও কাছে এসে উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে। কোথা থেকে কোন্ এক কাগজের ফটো-গ্রাফার ব্যস্তভাবে এসে আর খুট-খাট করে ক্যামেরা ঘুরিয়ে মাধবীলতার ফটো তুলে নিয়ে চলে যায়।

উঠে দাঁড়ান সঞ্জীবন।—চল; এবার হোটেলে ফিরে যাই।

স্ত্রীকে আর মেয়েকে নিয়ে পৃথিবীর কোন কোলাহলের আর চঞ্চলতার মধ্যে বসে থাকতে বা ছুটোছুটি করতে সঞ্জীবন সেনের বোধহয় একটুও ভাল লাগে না। তাই বাইরে বেড়াতে বের হয়েও হোটেলে ফিরে যাবার জন্য তাঁর প্রাণটা এরকম চল-চল করতে থাকে। একান্তভাবে নিজেরই একটি ছোট্ট নিরালা ঠাঁই, যেখানে তিনি তাঁর শেরির বোতল ও গেলাস নিয়ে বসে থাকবেন; আর, মাধবীলতা ও রঞ্জু তাঁর চোখের কাছাকাছি কোন বারান্দা বা করিডর, কোন লন বা লতাপাতার ঝোপঝাপের কাছে ঘুরে-ফিরে বেড়াবে; বাস্, এর চেয়ে ভাল ঘরোয়া সুখ আর কি হতেই বা পারে?

কিন্তু এই কি ইউরোপ বেড়াবার রকম? এভাবে হাজারিবাগের সিংহানি হোটেলের একটা ঘরে পড়ে থাকলেই তো ইউরোপ বেড়ানো হয়ে যেত। এত দূরে আসবার কোন দরকার ছিল না। মাধবীলতার মনের ভিতরে চাপা বিক্ষোভের জ্বালাটা এই পাঁচটা দিন নীরব হয়ে থাকলেও আজ আর মুখর না হয়ে থাকতে পারে না।—এবার দেশে ফিরে গেলেই তো হয়।

সঞ্জীবন সেনও বলে ওঠেন।—ঠিক বলেছো, আমারও ফিরে যেতেই ইচ্ছে করছে।

হোটেলে ফিরে এসে রঞ্জুকে সংগে নিয়ে আর লিফ্‌ট ধরে উপরতলায় চলে যান মাধবীলতা। ঘরে ঢুকেও সমস্যায় পড়েন মাধবীলতা, সময় কাটবে কি করে?

কিন্তু সঞ্জীবন সেনের কোন সমস্যা নেই। হোটেলের বারে তিনটি ঘণ্টা সময় পার করে দিয়ে উপরতলায় আসেন; আর ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠেন—যাই বল, ভিলা মাধবীর মত আরামের জায়গা এই রোমা নগরীতেও কোথাও নেই। একেবারেই নেই। যত সব হট্টগোলের হোটেল।

পাইপ ধরিয়ে আর মুখ ভরে ধোঁয়া টেনে নিয়ে সঞ্জীবন সেন মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভেবে নিলেন; তারপর বেশ উৎসাহের সংগে বলে ওঠেন—হ্যাঁ এবার ফিরে যাবার জন্যেই তৈরী হতে হবে। কিন্তু তোমার যদি আরও কিছু দেখবার ইচ্ছে থাকে, তবে দু'চারটে দিন ঘুরে ফিরে দেখে নাও। হোটেলওয়ালা বলছেন, ইংরেজী-জানা ভাল গাইড দিতে পারবেন।

মাধবীলতা—কোন দরকার নেই।

সঞ্জীবন সেন আর হোটেল ছেড়ে বের হতে চান না। কিন্তু মেয়েটা বাইরে বেড়াবার জন্যে ছটফট করে বলেই মাধবীলতা বিকেল হলে একবার বের না হয়ে পারেন না। কোথায় আর যাবেন? হোটেলের কাছাকাছি ওই এসেদ্রা।

একদিন, সন্ধ্যার ফোয়ারার গায়ে রঙীন আলোর ঝিলিমিলির দিকে তাকিয়ে মাধবীলতার চোখ দুটো যখন ক্লান্ত হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই চমকে উঠলেন মাধবী-লতা। চোখের কাছে এসে যিনি দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে যে চেনা-চেনা বলে মনে হয়।

ভদ্রলোক বলেন—আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

মাধবীলতা—হতে পারে।

—আপনি কি গণেশদা'র কেউ হন?

আশ্চর্য হয়ে আরও চমকে ওঠেন মাধবীলতা। —হ্যাঁ, রেবা মাসিমার ছেলে গণেশদা।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে হাসেন—তা হলে তো আপনাকে ঠিকই চিনেছি। আপনার রেবা মাসিমা আমারই কাকিমা। আমি পরিতোষ রায়। আমি অনেকদিন আগে আপনাদের

এলাহাবাদের বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম।

মাধবীলতা—হ্যাঁ, এইবার মনে পড়ছে। আপনি তো তখন লখনউ-এর আর্ট স্কুলে ছিলেন।

পরিতোষ—হ্যাঁ। আমি এখানেও প্রায় পাঁচ বছর হলো রঙের আর মোজেয়িকের কাজ শিখছি।

রঞ্জুকে গাল টিপে আদর করেন পরিতোষ রায়। রঞ্জুরই একটা হাত ধরে আর মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ উৎফুল্ল স্বরে বলে ওঠেন।—চলুন, আপনাদের হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি; আর মিস্টার......।

মাধবীলতা—মিস্টার সেন।

পরিতোষ—মিস্টার সেনের সঙ্গে একবার দেখাও করে আসি।

টেবিলের উপর হুইস্কির গেলাস রেখে হোটেলের লাউঞ্জের এক কোণে বসে ছিলেন সুজীবন সেন। দুই চোখ টান করে তাকিয়ে থাকেন সুজীবন; রঞ্জুর হাত ধরে এক অচেনা ভদ্রলোক, আর সেই ভদ্রলোকেরই পাশে মাধবীলতা। যেন নতুন এক র‍্যাফায়েল অদ্ভুত একটা আশ্চর্যের রঙীন ছবি এঁকে সুজীবন সেনের চোখের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। যে মাধবীলতার মুখে আজ সাত বছরের মধ্যে কোনদিনও হাসি দেখতে পাননি সুজীবন সেন, সেই মাধবীলতার মুখটাও হাসছে।

তার মানে, মাধবীলতার মুখের হাসি দেখতে পেয়েই সুজীবন সেনের মনে পড়েছে, এই সাত বছরের মধ্যে কোনদিনও মাধবীলতার মুখে হাসি দেখতে পাওয়া যায় নি। মাধবীলতার মনের আকাশের এক কোণে হঠাৎ যেন একটা সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠেছে, তারই ঝিকিমিকি হাসিটা মাধবীলতার ঠোঁটের ফাঁকে কাঁপছে।

পরিতোষ রায়কে চিনতে পেরে খুবই খুশি হলেন সুজীবন সেন।—বিদেশে এসে হঠাৎ এভাবে একজন কুটুম্ব মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

পরিতোষ—এখানে আর কতদিন থাকবেন?

সুজীবন—আমার তো আর একটি দিনও থাকতে ইচ্ছে করে না। তবে হ্যাঁ, বেচারী হিস্ট্রির ছাত্রীর মনে বোধহয় রোমের কীর্তি আর-একটু ভাল করে দেখবার ইচ্ছে আছে।

পরিতোষ—আপনার ইচ্ছে করে না কেন?

সুজীবন—আমি তো আন-ন্যাচারাল হিস্ট্রি নই। আমি ন্যাচারাল হিস্ট্রি।

পরিতোষ—মিসেস সেন যদি বলেন, তবে আমিই গাইড হয়ে ওঁকে সাতদিনের মধ্যে রোমের আর্ট আর হিস্ট্রির অনেক ওয়ান্ডার দেখিয়ে দিতে পারি।

মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে সুজীবন সেন হাসেন,—কি বলেন মিসেস সেন?

মাধবীলতা—আমার তো ইচ্ছে করেই।

সুজীবন—তা হলে দেখে নাও। না হয়, সাতটা দিন পরেই ভাবা যাবে, রোমে আর থাকা হবে কি হবে না।

সাতটা দিন পার হয়ে যাবার পরেও কিন্তু বুঝতে পারা গেল না, ঠিক কবে রোম ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব হবে। কারণ, মাধবীলতা নিজেই হেসে-হেসে বলে ফেললেন—সাতদিনে কি রোম দেখা শেষ হতে পারে? অসম্ভব। বলতে গেলে, এখনও কিছুই দেখা হয়নি।

সুজীবন—এই যে শুনলাম, কত কী দেখে এলে! কত ব্যাসিলিকা, কত চ্যাপেল, আর কত গ্যালারি।

মাধবীলতা—কিন্তু আরও যে কত কী রয়ে গেল! এখনও সীজারের ফোরাম দেখতে যাওয়া হয়নি। পরিতোষ বাবু বললেন, ভাটিকান গ্যালারির র‍্যাফায়েল রুমের ছবি ঠিক-ঠিক বুঝে দেখতে হলে এক মাস সময় লাগবে।

সুজীবন—না; এত দেরি করলে চলবে না।

মাধবীলতা—কেন? আর একটা মাস এখানে থাকতে অসুবিধের কি আছে?

সুজীবন—ভাটিকানের র‍্যাফায়েল রুম দেখতে এত সময় নিলে ওদিকে যে ভিলা মাধবীর সুজীবন রুম চামচিকেয় ভরে যাবে।

মাধবীলতা—এরকম বাজে কথার সঙ্গে তর্ক চলে না।

সুজীবন—না মাধু; ভিলা মাধবীর জন্যে সত্যিই আমার প্রাণ আই-ঢাই করছে। যাই হোক; এক মাস নয়, আর দিন সাতের মধ্যে যা পার দেখে নাও। তারপর চল, সরে পড়ি।

সুজীবন সেনের মনটা বোধহয় সত্যিই একটা পরিবর্তন চেয়েছিল; কিন্তু সুজীবন সেনের আত্মাটাই বাধা দিয়েছে। রোমের এই হোটেলের লাউঞ্জে হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে বসে থাকলেও প্রাণটা ভিলা মাধবীর সেই ঘরটির জন্যেই আই-ঢাই করছে। আর, নেশার আবেশ যখন বেশ নিবিড় হয়ে ওঠে, তখনও বোধহয় সুজীবন সেনের তন্দ্রার চোখ দুটো পিপাসিত হয়ে দেখতে থাকে, চাতরার জংলী গাঁয়ের অড়হর ক্ষেতের উপর রাতের জ্যোৎস্নায় নীলগাই চরে বেড়াচ্ছে। মোতিরাম, আমার রাইফেল? জলদি করো ম্যান! বিড় বিড় করে কথা বলে ফেলেন সুজীবন সেন।

লাঞ্চের পর রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে মাধবীলতা লাউঞ্জে এসে দেখতে পান, সুজীবন সেন তখনও হুইস্কির গেলাস সামনে রেখে বসে আছেন। কিন্তু সেজন্যে মাধবীলতার মুখের হাসির উজ্জ্বলতা নিবে যায় না। বড় জোর আর পাঁচ-সাত মিনিট পরেই পরিতোষ রায় আসবেন, আর রোমের বিস্ময় দেখাবার গাইড হয়ে মাধবীলতাকে ও রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে যাবেন। বরং মাধবীলতাকেই একটি চমৎকার পরিবর্তন বলে মনে হয়। ঠোঁটের ফাঁকে আর ছোট তারার ঝিকিমিকি হাসি নয়, সারা মুখে যেন ভরা চাঁদের হাসি ফুটে উঠেছে।

পরিতোষ আসেন। রঞ্জু খুশি হয়ে

লোফাতে থাকে। যাবার আগে সুজীবনের দিকে তাকিয়ে রঞ্জু শুধু বলে যায়—আমরা আসি বাবা। রঞ্জুকে সংগে নিয়ে মাধবীলতা আর পরিতোষ যেন নতুন এক বিস্ময়ের জগতে বেড়াবার জন্য চলে যান।

লাঞ্চের সময় পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেজন্যে সুজীবন সেনের চিন্তায় কোন ব্যস্ততা নেই। লাউঞ্জের এক কোণের কোচের উপর বসে, আর, যেন ইচ্ছে করেই নেশার চোখের কাছে একটা তন্দ্রার সুখ তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। বিসনুনগড়ের জংগলের ভিতরে ছোট্ট নদী কোনারের স্রোত মস্ত বড় একটা পাথরের চটান ধুয়ে দিয়েছে। সুন্দর সাদা মোলায়েম পাথর। মার্বেল নাকি? জলদি করো মোতিরাম, কুলি বোলাও, ডিনামাইট লাগাও।

কল্পনার ডিনামাইট সত্যিই শব্দ করে ফেটে পড়ে না; কিন্তু চমকে ওঠেন সুজীবন সেন। না, আর এখানে এভাবে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না। কালই নেপল্‌স্‌ রওনা হতে হবে। তারপর, প্রথম যে জাহাজে জায়গা পাওয়া যাবে, সেই জাহাজেই দেশের দিকে পাড়ি দিতে হবে।

কিন্তু চলে যাবার জন্য একটা প্রতিজ্ঞা করেও কিছুই করতে পারলেন না সুজীবন সেন। আরও একটা মাস পার হয়ে গেল। কী আশ্চর্য, মাধু কি অনন্তকাল ধরে রোমের বিস্ময় দেখে বেড়াবে আর একটুও ক্লান্ত হবে না? তা ছাড়া, রঞ্জুর কথা থেকেও তো বোঝা যায়, আজকাল প্রায় রোজই সন্ধ্যাটা পরিতোষের সংগে অপেরা হাউসে কাটিয়ে দিয়ে তারপর হোটেলে ফিরে আসে মাধু। মেয়েটারও অভ্যাস বদলে দিয়েছেন মেয়ের মা; রঞ্জু আজকাল ওর মা'র সংগে রাত দশটায় হোটেলে ফিরে এসেও গুন গুন করে গান গায়, আগের মত ঘুমের ভারে রঞ্জুর চোখের পাতা আর নুয়ে পড়ে না।

সুজীবন জিজ্ঞাসা করলে রোজই একটা না একটা মিউজিয়ামের নাম বলে দেন মাধবীলতা, আজ নাকি সেখানে যাওয়া হবে। সেখানে নাকি চমৎকার মূর্তির কলেকশন আছে। মাধবীলতার ইচ্ছার কথাটা শুনতে একটুও ভাল লাগে না। ওই তো, যত সব বিবসনা ভেনাসের মূর্তি। পরিতোষের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, ইরোস আর সাইকি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। মাধুর তো বরং একটু লজ্জা পাওয়াই উচিত।

আজ সকালবেলাতেই মাধবীলতার সাজ আর হাতের ঘড়িতে বার বার সময় দেখবার ব্যাকুলতা দেখে সুজীবন সেন অনুমান করে নিয়েছেন, নিশ্চয় অনেক দূরে কোথাও বেড়াতে যাবার কথা হয়েছে। কিন্তু কোথায়? মাধবীলতাকে আর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে না।

মাধবীলতাও 'পরিতোষের অপেক্ষায় লাউঞ্জের একেবারে ওদিকের একটি চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। কেউ যেন ঠাট্টা করে সুজীবনের বুকের পাঁজরের উপর খুব জোরে একটা টোকা মেরেছে। বেশ ব্যথা লেগেছে। হাতে-ধরা হুইস্কির গেলাসটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন সুজীবন সেন।

লাউঞ্জের ওদিক থেকে ছুটে আসে রঞ্জু। সুজীবনের গায়ের উপর এলিয়ে পড়েই আদুরে স্বরে একটা অদ্ভুত কথা বলে—বাবা, বল না?

সুজীবন—কি বলবো?

রঞ্জু—আমার কাকে বেশি ভাল লাগে? তোমাকে, না পরিতোষ কাকাকে?

চমকে উঠলেন সুজীবন সেন। পাঁজর-গুলি যেন মট্‌ মট্‌ করে বেজে উঠেছে।

—এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছো রঞ্জু?

রঞ্জু—মা জিজ্ঞেস করছিল।

সঞ্জীবন—কবে?

রঞ্জু—কালকে।

সঞ্জীবন—কোথায়?

রঞ্জু—পরিতোষ কাকার স্টুডিওতে।

সঞ্জীবন—তুমি কি বললে?

রঞ্জু—আমি বলেছি, তোমাকে ভাল লাগে। পরিতোষ কাকাকেও ভাল লাগে।

রঞ্জু আবার লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেল। সঞ্জীবন সেন আবার হুইস্কির গেলাসের দিকে দুটো অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন।

পরিতোষ রায় আসেন। দূরে দাঁড়িয়েই সঞ্জীবন সেনের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আর মাথা হেলিয়ে একটা সৌজন্যের ভঙ্গী নিবেদন করেন।

চলে গেলেন পরিতোষ রায়, সঙ্গে মাধবীলতা আর রঞ্জু।

সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জীবন সেনও উঠে দাঁড়ান। হোটেলের অফিসের কাউন্টারে এসে পকেটের ব্যাগ থেকে নোটের তাড়া বের করেন।—বিল প্লীজ; আমরা কাল সকালের ট্রেনে নেপলস্ চলে যাব।

সন্ধ্যা হতেই ফিরে এসে যখন রঞ্জুর হাত ধরে হোটেলের ঘরে ঢোকেন মাধবীলতা, তখন সঞ্জীবন সেন কোন কথা না বলে তাঁর সন্ধ্যার পিপাসা মেটাবার জন্যে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যান।

পরদিন সকালে, যখন ট্যাক্সি ডাকা হয়ে গিয়েছে, তখন সঞ্জীবন সেন শুধু একটি কথা বলেন।—এখনই রওনা হব।

মাধবীলতা প্রায় এক মিনিট ধরে দুই চোখের তারা দিয়ে যেন একটা বিদ্যুতের ঝিলিক ধরে নিয়ে সঞ্জীবন সেনের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলেন। একটিও কথা বললেন না।

[তিন]

ভিলা মাধবীর লনের সবুজের চারদিকে মরশুমী কসমসের বাহার সাংঘাতিক রঙীন হয়ে উঠেছে। রোমের হোটেলের বদ্ধ বাতাসে প্রাণটা যেন ভেপসে উঠেছিল। সঞ্জীবন সেন তাই কসমসের ভিড়ের চারদিকে ঘুরে-ফিরে আর ইউক্যালিপটাসের বাতাস গায়ে মেখে এই দশদিনেরই মধ্যে মনে-প্রাণে বেশ ঝরঝরে হয়ে গিয়েছেন। হাঁপ ছেড়ে ছেড়ে শরীরেরও জড়তা কাটিয়েছেন। আর, শিকারে বের হবার জন্যে তৈরীও হতে শুরু করেছেন।

মাধবীলতা বলেন—আমি এলাহাবাদ যাব।

সঞ্জীবন—যাও।

মাধবী—আজই যাব।

সঞ্জীবন—যাও।

মাধবী—এখনই যাব।

সঞ্জীবন—যাও।

মাধবীলতা ডাক দেন—রঞ্জু, এদিকে এস।

সঞ্জীবন—রঞ্জুকে কেন?

মাধবী—ওকে খাইয়ে নিই।

সঞ্জীবন—কোন দরকার নেই।

মাধবী—কেন?

সঞ্জীবন—রঞ্জু এলাহাবাদ যাবে না।

মাধবী—কে বললে, যাবে না?

সঞ্জীবন—আমি, রঞ্জুর বাবা বলছি।

মাধবী—রঞ্জু যদি এখানে থাকতে না চায়?

সঞ্জীবন—থাকতে না চাইলেও থাকবে।

চুপ করে রইলেন মাধবীলতা। এলাহাবাদ রওনা হবার সব ব্যস্ততা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

দেখতে পেলেন মাধবীলতা, সন্ধ্যা হতেই হুইস্কির বোতল আর গেলাস নিয়ে, আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে লনের ভিতরে বসলেন সঞ্জীবন সেন। দেখলেন, মাঝ-রাতও পার হয়ে যাচ্ছে, তবু সঞ্জীবন সেনের

নেশার শরীরটা লন ছেড়ে উঠতেই পারছে না।

কিন্তু ভোর হতেই যখন বাসভোরে রঞ্জুর ঘুম ভাঙিয়ে ঘরের দরজা খুলতে গেলেন মাধবীলতা, তখন একটা বাধা পেয়ে চমকে উঠলেন। বাইরে থেকে তালা বন্ধ। একটু পরই বুঝতে পারলেন, কে-যেন তালা খুলে দিচ্ছে। দরজার বাইরে এসে দেখতে পেলেন মাধবীলতা, তালা আর চাবি হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছেন জিওলজিস্ট সেন সাহেব। পাথরের মানুষ মাঝরাত পর্যন্ত বিষ গিলেও কত শক্ত হয়ে হাঁটছে!

আজ বিকাল হলেই শিকারে বের হবেন সঞ্জীবন সেন। ড্রাইভার মোতিরামকে জিজ্ঞেস করে আগেই জেনে নিয়েছেন মাধবীলতা।

বিকেল হলো, গাড়ি নিয়ে শিকারেও বের হয়ে গেলেন সঞ্জীবন সেন। কিন্তু মাধবীলতা সরুপ হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখলেন, রঞ্জুকেও সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেল একটা নেপাল চতুর আর নির্মম সতর্কতা।

খানসামা স্টিফান মাধবীলতার কাছে এসে মাথা চুলকিয়ে যেন একটা সান্ত্বনার ভাষা শোনাতে চায়—মিস বাবার বিছানা, গরম জামা, খেলনা, কিতাব আর দুধ-বিস্কুট-মাখন-রুটি সবই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

মাধবীলতা—কোথায় কোন্ জঙ্গলে গেছে তোমার সাহেব?

স্টিফান—শুনেছি তো দানুয়া ফরেস্ট বাংলোতে দু'দিন থাকবেন।

আর তো বুঝতে কোন অসুবিধে নেই মাধবীলতার, বাপ তাঁর মেয়েকে এভাবেই আগলে রাখবেন; নেশার চোখও সব সময় জাগ থাকবে আর পাহারা দেবে;' মেয়ের মা যেন মেয়েকে নিয়ে পলাতকা হবার কোন সুযোগ না পায়।

চোখ জ্বলছে, বুকের ভিতরে দুরন্ত একটা নিঃশ্বাস তপ্ত হয়ে ছটফট করে। লনের চারদিকের যত রঙীন কসমস দু'পায়ে মাড়িয়ে সারাটা সন্ধ্যা শুধু ফুঁপিয়ে কেঁদে আর চোখ মুছে মুছে ঘুরে বেড়াতে থাকেন মাধবীলতা।

দু'দিন পরে শিকারের সফর থেকে সঞ্জীবন সেন ফিরে আসতেই মাধবীলতার চোখ দুটো ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। রঞ্জু নেই।

—রঞ্জু কোথায়? চেঁচিয়ে উঠলেন মাধবীলতা।

—রঞ্জুকে রাঁচিতে বড়দির কাছে রেখে এলাম। এখন ওখানেই থাকবে রঞ্জু।

ধীর স্থির ও প্রশান্ত স্বরে এইবার চরম কথাটা জানিয়ে দিলেন মাধবীলতা। —আমি চললাম।

সঞ্জীবন—বলবার কোন দরকার ছিল না।

ভিলা মাধবীর গেট পার হয়ে চলে গেলেন মাধবীলতা, মুখ ফিরিয়ে পিছনে একবার তাকালেনও না। ইউকালিপটাসের পাতা কেঁপে কেঁপে ঝিরিঝিরি শব্দ করে, গেটের আইভিলতা দুলে ওঠে, হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা খেয়ে গুলমোরের ঝরাপাতা মাধবীলতার পা ছুঁয়ে উড়ে চলে যায়। কিন্তু ওদেরই বা কি সাধ্য আছে যে, আজ মাধবীলতাকে থামিয়ে দিতে কিংবা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে? মাধবীলতা যে ভুলেই গিয়েছেন যে, উনিই হলেন ভিলা মাধবীর মাধবী।

সিংহানি হোটেল তো বেশি দূরে নয়। হেঁটে যেতে দশ মিনিটও লাগবে না। রেবা মাসিমাকে বললেই হবে, আপনার গাড়িটা একবার দিন, আমাকে রোড স্টেশনে পোঁছে দিয়ে আসুক।

মাধবীলতাকে হেঁটে বের হয়ে যেতে দেখে ড্রাইভার মোতিরাম নিজেরই বুদ্ধিতে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করেছে। এতক্ষণে বেশ জোরে স্পীড নিয়ে গেট পার হয়ে চলেই যেত মোতিরাম, কিন্তু চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন সঞ্জীবন সেন।

হতভম্ব মোতিরাম, আতঙ্কিত মোতিরাম সাহেবের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে।

সঞ্জীবন সেনও কি বুঝতে পারছেন যে, ভিলা মাধবীর মাধবী চলে যাচ্ছে? না, জঘন্য একটা ট্রেসপাসের মূর্তি চলে যাচ্ছে। সঞ্জীবন সেনের বাগানের ফুল চুরি করতে ঢুকেছিল; হাতে হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে; আর ধমক খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু বাঘিনী আবার মরিয়া হয়ে তার বাচ্চার খোঁজে রাঁচিতে হাজির হবে না তো? হাজির হলেও কোন সুবিধে হবে না। বড়দিকে শাসিয়ে বলে দিয়ে এসেছেন সঞ্জীবন সেন,— চারু রায়ের মেয়েকে যদি রঞ্জুর কাছে আসতে দাও, তবে তোমারই বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্রের মামলা আনবো। সাবধান, যেন কোন ভুল না হয়।

বড়দি তাঁর ভাইকে ভাল করে চেনেন। ভাইয়ের কটকটে লাল চোখ আর নিঃশ্বাসের ভুরভুরে নেশার গন্ধ পেয়ে একটা আর্তনাদ চাপতে চেষ্টা করেছেন। বেশ ভয়ে ভয়ে বলেছেন। —আমাদের ভুল হবে না। কিন্তু এসব ঝগড়া তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেললেই ভাল হয় জীবু।

—এটা ঝগড়া নয় বড়দি। চেঁচিয়ে উঠেছেন সঞ্জীবন সেন। চিৎকারের শব্দটা যেন সঞ্জীবন সেনের আহত হৃদ্‌পিণ্ডের আর্তনাদ।

বড়দি আশ্চর্য হয়ে বলেন, ঝগড়া নয়, তবে কি?

পকেট থেকে দুটো চিঠি বের করে বড়দির সামনে ফেলে দিয়েছেন সঞ্জীবন সেন। —পড়ে দেখ।

রোম থেকে মাধবীলতার কাছে পরিতোষের যে চিঠিটা ব্যাকুল হয়ে এয়ার-মেলে পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে, সেই চিঠি। আর, পরিতোষের কাছে মাধবীলতা যে সান্ত্বনার চিঠি লিখে বেয়ারা শুকদেওকে ডাকে ফেলতে দিয়েছিল, সেই চিঠি। দুটি চিঠি, যেন দুটি বিহ্বল স্বপ্নের ইচ্ছা আর স্বীকৃতির দলিল।

চিঠি দুটো পড়েই বড়দি চোখ বন্ধ করেন, কাঁপতে থাকেন। বড়দির দু'চোখ থেকে বড় বড় জলের ফোঁটাও ঝরে পড়তে থাকে।

বুঝতে পেরেছেন বড়দি, ঝগড়ার ব্যাপার নয়; জীবনে-জীবনে শত্রুতার ব্যাপার। মিটিয়ে ফেলতে বললেই মিটিয়ে ফেলা যায় না। চারু রায়ের মেয়ে ভাগ্য বদল করতে চাইছে। বড়দির ভাই নেশার খুশিতে সব আঘাত ভুলে যায়, ক্ষমা করেও দিতে পারে, কিন্তু এই অপমানের আঘাত ক্ষমা করতে পারবে না। ক্ষমা করা উচিতও নয়। দরকারই বা কি?

বড়দির চোখ দুটো এইবার বেশ শুকনো হয়ে, যেন একটা জ্বালা নিয়ে আর ক্ষমাহীন হয়ে কেঁপে ওঠে। —ঠিক আছে জীবু, রঞ্জু এখন আমার কাছেই থাকুক। চারু রায়ের মেয়েকে এ-বাড়ির গেটের কাছেও দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। কখখনো না।

চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতার ছায়া ভিলা মাধবীর গেট পার হয়ে চলেই গিয়েছে।

এখানে এখন আর কোন সমস্যা নাই। বেশ জোরে একটা হাঁপ ছাড়লেন সঞ্জীবন সেন।

চুপ করে সোফার উপর বসে হুইস্কির গেলাসে তিনটি চুমুক দিয়েই যেন চমকে ওঠেন। টেলিফোনে রাঁচির বড়দির সঙ্গে কথা বলেন। —হ্যালো বড়দি, রাক্ষুসী চলে গেল।

হুইস্কির বোতল অর্ধেক খালি হয়ে যাবার পর সঞ্জীবন সেন বেশ আশ্চর্য হয়ে সন্দেহ করেন, কি ব্যাপার? খানসামা স্টিফান কি বোতলের হুইস্কিতে জল মিশিয়ে রেখেছিল। কোন স্বাদ নেই, তৃপ্তি নেই, নেশার আরাম জমে না; এ কী অদ্ভুত অস্বস্তি!

ভিলা মাধবীর সবই তো ঠিক আছে। টবের মেরি গোলাপ আছে, কসমসের রঙীন ভিড় আছে। মালী চমনরাম, ড্রাইভার মোতি-রাম, খানসামা স্টিফান আর বেয়ারা শুক-দেও, সবাই আছে। শুধু রাক্ষুসীটা নেই বলেই কি ভিলা মাধবী এত শূন্য হয়ে খাঁ-খাঁ করছে? না, শিকারে বেরিয়ে পড়াই ভাল। ভেলোয়ারা জঙ্গলের লেপার্ড আজ-কাল নিশ্চয় রাত্রির অন্ধকারে গাঁয়ের কুয়োর কাছে চৌবাচ্চার জল খাবার জন্যে আসে। এই বোশেখ মাসের গরমে জঙ্গলের কোন নদী আর নালাতে যে এক ফোঁটাও জল নেই।

হ্যাঁ, এলাহাবাদে প্লীডার প্রসাদবাবুকে এখনই সব কথা লিখে মামলাটা দায়ের করতে বলে দেওয়াই ভাল। দেরি করবার কোন মানে হয় না

চিঠি লেখেন সঞ্জীবন। কলমটা যেন কালির বদলে রক্ত দিয়ে একটা খুনের ইতি-বৃত্ত লিখতে থাকে। উকীলের কাছে এসব কথা লেখবার কোন দরকার হয় না, তবু লিখেই ফেললেন সঞ্জীবন—চারু রায়ের এই মেয়ে, ইতিহাসের মেডালওয়ালী এই নারী বোধহয় নিজেকে একটি ক্লিওপেট্রা বলে মনে করেছে। পুরনো পুরুষকে খুন করবে আর নতুন একটাকে ধরবে, ওর প্রাণের মধ্যে এই-রকম একটা ভয়ানক ইচ্ছার উৎসব আজ সাত বছর ধরে চলছে। সাত বছরের মধ্যে একটি দিনও আমার সঙ্গে হেসে কথা বলেনি। কেন হাসেনি সেটা আগে বুঝতে পারিনি। আজ বুঝতে পেরেছি, এ নারী মানবী নয়, একটা মাদি রেপটাইল। কাজেই, ডিভোর্স চাই। কেন চাই, সে-কথা আপনি সঙ্গের এই চিঠি দুটো পড়লেই বুঝতে পারবেন। মামলার জন্যে যে-সব কাগজপত্রে আমার সই দরকার হবে, সেগুলি তাড়া-তাড়ি পাঠাবেন। যদি দরকার মনে করেন, তবে মামলা তদ্বির করবার জন্যে ব্যারিস্টার ত্রিবেদীকে বলবেন। মোট কথা, পৃথিবী জেনে ফেলুক, চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতা একটি সুন্দরী বীভৎসতা। লোকে যেন বলে; ইতরতা দাই নেম ইজ মাধবীলতা।

চিঠি লেখা শেষ করেই ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দার উপর ছটফট করে পায়চারী করেন সঞ্জীবন; যেন আগুন-লাগা একটা ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছেন, ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগিয়ে গায়ের জ্বালা একটু জুড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছেন।

খানসামা স্টিফানকে কাছেই দেখতে পেয়ে খাবার টেবিলের কাছে যখন এগিয়ে গেলেন সঞ্জীবন, তখন হুইস্কির বোতলের থিতানি-টুকুও আর নেই। সঞ্জীবন সেনের কটকটে লাল চোখ বেশ ছলছল করতে শুরু করেছে।

—স্টিফান! চেঁচিয়ে উঠলেন সঞ্জীবন।

—হুজুর। এগিয়ে আসে স্টিফান।

সঞ্জীবন—যাবার আগে মেমসাহেব কি খাবার-টাবার কিছু খেয়েছিলেন?

—না হুজুর।

—তবে? তুমি একটি বেকুব।

খাবারের ডিসের উপর এলোমেলো করে চামচ আর কাঁটা চালিয়ে যা খেলেন সঞ্জীবন সেন, সেটা খাওয়ার একটা ভঙ্গী মাত্র; প্রায় না-খাওয়া।

হাত ধুয়ে নিয়ে আবার এঘর-ওঘর করে, একটা মিথ্যে ব্যস্ততার ছুটোছুটি সহ্য করতে গিয়ে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়তে থাকেন সঞ্জীবন। বুঝতেও পারেন, হুইস্কির কড়া নেশাটাও আজকের এই শূন্যতার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হেরে যাচ্ছে আর হাঁপিয়ে পড়ছে।

কিন্তু বেশ হবে। চারু রায়ের মেয়ের কলঙ্কটা প্রচার করে দিলে রঞ্জুর বাবার আর রঞ্জুর জীবনের কি ক্ষতি হবে? চারু রায়ের মেয়ে ওর সুন্দর মুখের হাসি নিয়ে নতুন করে দীপ জ্বালাতে চায়, জেনলে ফেলুক। কিন্তু ওর মুখে বেশ ভাল করে কালি ছিটিয়ে দিতে হবে।

হঠাৎ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবলেন সঞ্জীবন। নেশায় বিভোর বুকটা বোধহয় ফুঁপিয়ে উঠলো। তখুনি, যেন একটা

অদ্ভুত ঘুমের মধ্যে টলে, টলে হেঁটে ঘরের ভিতরে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে উকীল প্রসাদবাবুর কাছে লেখা এত বড় চিঠিটাকে তুলে নিয়েই ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। নতুন করে লিখলেন —স্ত্রী স্বামীর কাছে থাকতে রাজি নয়। কেন রাজি নয়, তা জানি না। সুতরাং, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না। তাই, ডিভোর্স চাই।

—শুকদেও, ইধার আও। এই চিঠিটা এখুনি ডাকে ফেলে দিয়ে এস।

চিঠি নিয়ে চলে যায় শুকদেও।

—মোতিরাম, গাড়ি বের কর।

ড্রাইভার মোতিরাম কুণ্ঠিতভাবে বলে—আজ আর শিকারে না গেলেন হুজুর; মনে হচ্ছে, আপনার শরীরটা ভাল নয়।

—চুপ। আমি খুব ভাল আছি। চল, খাঁ সাহেবের জমিদারীর সেই জঙ্গলের গাঁয়ে; কি যেন নামটা?

—মোরাঙ্গি, হুজুর।

—সেখানে খাঁ সাহেবের একটা খামার বাড়িও তো আছে?

—জী হাঁ, হুজুর।

—বনছাগল আর কাকার হরিণ পাওয়া যায় শুনেছি।

—জী হাঁ, চিতল হরিণও পাওয়া যায়।

—ঠিক হ্যায়। জলদি কর।

কিন্তু সত্যিই তো শিকারের জন্য নয়। অন্তত আজকের এই রাতটা, ভিলা মাধবীর ভয়ানক শূন্যতার কামড়ের ভয় থেকে বুকটাকে একটু দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যেই শিকারে বের হয়ে গেলেন সুজীবন।

মোরাঙ্গি জঙ্গলে খাঁ সাহেবের খামার-বাড়ির একটি একচালার নীচে চারপায়ার উপর বসে সামনের নিরেট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শুধু রাতের প্রহরগুলিকে ক্ষয় করে দিতে থাকেন সুজীবন সেন। খামারবাড়ির ভাণ্ডারী এসে বলেছে—এখানে এভাবে একা বসে থাকবেন না সাহেব, এদিকে অনেক খারাপ জানোয়ারও আছে। তা ছাড়া, হরিণও শেষরাতের দিকে, প্রায় ভোরের সময়ে এই সব্জী ক্ষেতের শাক খেতে আসে। কাজেই, আপনি এখন ভাণ্ডারের একটি ঘরে......।

সুজীবন—ঠিক হ্যায়, কোই বাত নেহি, আমি ঠিক আছি।

হাতে ঠাণ্ডা পাইপ, পাশে অলস রাইফেল, সুজীবন সেনের জাগা চোখের সামনে রাতের অন্ধকার ফিকে হতে হতে ফরসা হয়ে আসে। চোখ দুটো ভোরের আকাশের প্রথম আলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেও প্রাণটা যেন একটা স্বপ্নের কাছে বসে থাকে।

ছোট্ট একটা শব্দ; ভিলা মাধবীর গেট কারও হাতের ঠেলায় খুলে যাবার আগে যেরকম ছোট্ট একটা শব্দ শিউরে দেয়।

চমকে উঠলেন সুজীবন। দেখতেও পেলেন, সামনের মূলো ক্ষেতের উপরে ছুটে বেড়াচ্ছে ছোট্ট একটা কাকার। শব্দটা ওরই ফূর্তির শব্দ।

রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে চারপায়া থেকে উঠে দাঁড়ান সুজীবন। কিন্তু ছোট্ট কাকার হরিণটাকে মারবার জন্যে নয়; ভিলা মাধবীতে ফিরে যাবার জন্য সুজীবনের রাত-জাগা প্রাণটা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সত্যিই কি এই ভোরে ভিলা মাধবীর গেট খুলে কেউ আবার ভিতরে চলে গেল? তা হলে তো উপদ্রবটা আরও জঘন্য হয়ে উঠবে। চারু রায়ের মেয়েকে সরিয়ে দেবার জন্য শেষে কি পুলিশ ডাকতে হবে?

ফিরে এসে আর ঘরের ভিতরে ঢুকেই রাইফেলটাকে বিছানার উপর ফেলে দিলেন সুজীবন।

না, আজকের ভোরের আলো দেখা দিতেই ভিলা মাধবীর গেট খুলে কেউ ভিতরে ঢোকে নি। সেই ছোট্ট শব্দটা একটা কল্পনার মিথ্যে ভয়ের শব্দ। কাল বিকালেও ও-ঘরের মিররের কাছে দাঁড়িয়ে পাউডার সেণ্ট আর হেয়ার ক্রীমের একটা হাল্কা গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল। সে-গন্ধ আজ এখন আর নেই।

যত সব বাজে চিন্তার কথা। ওসব আজ আর সুজীবন সেনের জীবনের কোন সমস্যার কথা নয়। জানকীলাল যমুনাদাস এসেছে; এখন ওর সঙ্গে কাজের কথা আলোচনা করতে হবে। ভাল জাতের লাল হেমাটাইটের একটা ফিল্ডের খোঁজ পেতে চায় জানকীলাল। কিন্তু এ জেলাতে তো ও জিনিস পাওয়া যাবে না। রামগড়ের দিকে ভাল বোক্সাইটের খোঁজ দিতে পারেন সুজীবন সেন।

[চার]

কাজ বেশি, শিকার কম, হুইস্কি আরও কম; সুজীবন সেনের জীবনে সত্যিই যে একটা পরিবর্তনের কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছে, এটা তিনি নিজেও বোধহয় বুঝতে পারেন না। ছটা মাস পার হয়ে যাবার পরেও বুঝতে পারেন না। টাউনের অনেকেই কিন্তু এরই মধ্যে অনেক কিছু জানতে পেরেছে আর লক্ষ্যও করেছে, সেন সাহেবের মুখে আজকাল সেই হাসি থাকলেও বেশ একটা চিন্তার ভাব দেখা যায়।

এলাহাবাদের আদালতের চিঠি, খবর আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু এরই মধ্যে পেয়ে গিয়েছেন। মামলাতে সেন সাহেবের স্ত্রী নিজেকে ডিফেণ্ড করবার কোন চেষ্টা করেননি। উনিও সম্পর্ক ছাড়তেই চাইছেন। কাজেই শিগগিরই একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। সেন সাহেবের ডিভোর্সের আবেদন মঞ্জুর হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

আর ছটা মাস পার হয়ে যেতেই আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু ছাড়া আরও অনেকেই জেনে ফেললেন, সেন সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে আদালতের রায় বের হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মেয়ের কাস্টডি পাওয়ার জন্যে সেন সাহেবের প্রাক্তনা স্ত্রী আদালতে দরখাস্ত করে ভয়ানক লড়ছেন। সেন সাহেবও ভয়ানক আপত্তি করে লড়ছেন।

একদিন বার লাইব্রেরীর ঘরে বসে আদিত্যবাবু নতুন খবরটা সকলকেই শুনিয়ে দিলেন—শুনেছেন তো, সেন সাহেবই জিতেছেন। মেয়ের মা মেয়ের কাস্টডি পাননি। কিন্তু সেন সাহেব নিজেই এবার একটা গোঁয়ার্তুমির কাণ্ড শুরু করে দিয়েছেন।

জ্ঞানবাবু—সেটা আবার কি?

আদিত্যবাবু—মা যেন মেয়েকে চোখে দেখবারও অধিকার না পান; আদালতে দরখাস্ত করে দাবি জানিয়েছেন সেন সাহেব।

জ্ঞানবাবু—এখানে সেন সাহেব সুবিধে করতে পারবেন বলে মনে হয় না। মাইনর মেয়ে; তাকে দেখবার অধিকার মায়ের তো
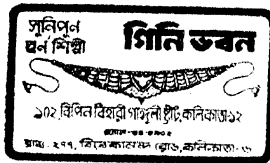
থাকবেই; এটা আদালত নাকচ করবে কেন?

ঠিকই ধারণা করেছিলেন জ্ঞানবাবু। একদিন বার লাইব্রেরীর সকলেই খবরটা জানতে পেলেন, মেয়েকে চোখে দেখার অধিকার পেয়েছেন মাধবীলতা; সঞ্জীবনের আপত্তি নাকচ করে দিয়েছে আদালত।

কিন্তু টাউনের কোন ভদ্রলোক জানেন না, খুব রাগারাগি করে উকীল প্রসাদবাবুকে একটা চিঠিও লিখে ফেলেছেন সঞ্জীবন সেন। আবার আদালতে দরখাস্ত করা হোক; মাধবীলতা যেন মেয়ের সঙ্গে কোন ঘরোয়া কথা বলাবলি করবে না বলে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয়। সঞ্জীবন সেনের মেয়ে, দশ বছর বয়সের রঞ্জিতা সেনের কাঁচা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবার সুযোগ মাধবীলতা যদি পায়, তবে তার ফলে সঞ্জীবন সেনের পারিবারিক জীবনের শান্তি নষ্ট হতে পারে; মেয়ের জীবনেরও ক্ষতি হতে পারে।

জ্ঞানবাবু একদিন ক্লাবের ঘরে বসে গল্প করতে গিয়ে হেসে ফেললেন—ওঃ, সেন সাহেব সত্যিই ভয়ানক কড়া মেজাজের মানুষ। এলাহাবাদের আদালতের খবরটা দেখেছেন তো, আদিত্যবাবু?

আদিত্যবাবু—দেখেছি, মশাই। সেন সাহেবের জেদেরই জিত হয়েছে।

টাউনের লোক কেউই জানতে পারেনি, ঠিক আর তিন মাস পরের একটি দিনে, ওই সিংহানি হোটেলের বারান্দাতে কি রকমের একটি কাণ্ড ঘটে গেল।

সেদিন ভিলা মাধবীর ঝাউয়ের কাণ্ড দেখে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন সঞ্জীবন সেন। ঝাউগুলি বিনা ঝড়েই উতলা হয়ে দুলছে। সিংহানি হোটেলের মিসেস চৌধুরীর গাড়িটা ভিলা মাধবীর গেটের সামনের রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে গেল; ঝাউগুলি কি সেই গাড়ির ভিতরে কোন চেনা মুখকে দেখতে পেয়েছে?

দু'দিন আগে মিসেস চৌধুরী চিঠি লিখে সঞ্জীবনকে জানিয়ে দিয়েছেন, এলাহাবাদ থেকে মাধবী আসছে। সিংহানি হোটেলেই তিনদিন থাকবে মাধবী। আগামী সোম-মঙ্গল-বুধ, এই তিনদিন যেন রঞ্জুকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মা ও মেয়ের সাক্ষাৎ হবে।

কাল বিকালেই রাঁচিতে টেলিফোনে বড়দিকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছেন সঞ্জীবন। কথা হয়েছে, বড়দি নিজেই রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসবেন। আর, মা ও মেয়ের সাক্ষাতের সময় বড়দি সামনেই থাকবেন। রঞ্জুকে শুধু আমার সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হবে না। রঞ্জুকে একা একা কাছে পেয়ে যা খুশি তাই বলে দেবার কোন সুবিধা চারু রায়ের মেয়েকে দেওয়া হবে না।

কিন্তু বড়দি এবার রঞ্জুকে নিয়ে এসে পড়লেই তো হয়। সকাল দশটায় রওনা হলে এরই মধ্যে তো পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল।

ঝাউয়ের শব্দ শুনে শুনে সঞ্জীবন সেনের মনের অস্বস্তিটা এরই মধ্যে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। আর তো ভিলা মাধবীর এই ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে থাকতে পারবেন না সঞ্জীবন। এখান থেকে মাত্র দশ মিনিটের পথ, এখন সিংহানি হোটেলের একটি ঘরে বসে আছে চারু রায়ের মেয়ে; ভাবতে যে গা ঘিন-ঘিন করে। নিঃশ্বাসে জ্বালা ধরে যায়।

রাঁচি থেকে বড়দির গাড়ি এসে পড়তেই হাঁপ ছাড়েন সঞ্জীবন সেন। এগিয়ে যেয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমো খান। তারপরেই চেঁচিয়ে ওঠেন—মোতিরাম, গাড়ি বের কর।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ বাবা? সঞ্জীবনের হাত ধরে ঝুলতে থাকে রঞ্জু। সঞ্জীবন হাসতে চেষ্টা করেন।—বাইরে যাচ্ছি রঞ্জু।

বড়দি বলেন—তোমার এখন বাইরে যাবার কি দরকার হলো, জীবু?

সঞ্জীবন—অন্তত তিন-চারটে দিন বাইরে থাকবো।

বড়দি—কোন মানে হয় না।

সঞ্জীবন—না বড়দি; আমার খুব খারাপ লাগছে। মানে হোক বা না হোক।

বড়দি—কিন্তু কোথায় চললে?

সঞ্জীবন—তিনটে দিন ডুমরি ডাক বাংলোতে থাকবো।

বড়দি—কিন্তু, বাজে জিনিস বেশি খেও না।

হেসে ফেলেন সঞ্জীবন—না, আজকাল বেশি খাই না। শুধু সন্ধ্যে বেলা সামান্য একটু।

গাড়িতে উঠলেন সঞ্জীবন। দেখতেও পেলেন, সিংহানি হোটেলের বেয়ারা একটি চিঠি নিয়ে ঢুকছে। বড়দিকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য চলন্ত গাড়ি থেকেই মুখ বাড়িয়ে আর একজোড়া জ্বলন্ত চোখ নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সঞ্জীবন—মনে থাকে যেন বড়দি; লোকটার সঙ্গে আর একটিও নরম কথা নয়; কোন আপোষ নয়।

আজ বিকালে সিংহানি হোটেলের বারান্দার দিকে উঁকি দিলে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতেন আদিত্যবাবু, আর জ্ঞানবাবু।

পাশাপাশি দুটি চেয়ারে মাধবীলতা আর তাঁর রেবা মাসিমা। মুখোমুখি আর-দুটো পাশাপাশি চেয়ারে, সঞ্জীবন সেনের মেয়ে রঞ্জিতা সেন আর তার পিসিমা।

রঞ্জুর মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে আছেন মাধবীলতা আর বার-বার চোখ মুছছেন। রঞ্জুর পিসিমা কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে, দুচোখে শুধু কঠোর দুটি ভ্রুকুটি ধরে রেখে এক মনে কাঁটা চালিয়ে উল বুনছেন।

মাধবীলতা বলেন—কেমন আছ রঞ্জু?

সঙ্গে সঙ্গে বড়দির গলা থেকে যেন একটা রুষ্ট আপত্তি স্বর ফেটে পড়ে।—একথা জিজ্ঞেস করবার কোন দরকার নেই।

রেবা মাসিমা মৃদুভাবে হেসে বড়দিকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন।—এ তো সামান্য একটা কথা। এর জন্যে আপনি রাগ করছেন কেন?

বড়দি—মেয়ে বাপের কাছে আছে; ভালই আছে, সেটা তো জানা কথা। জিজ্ঞাসা করবার কোন মানে হয় না।

মাধবীলতা—আজকাল কি বই পড়ছো, রঞ্জু?

রঞ্জু—নেলসনস্ রীডার, সেকেণ্ড পার্ট।

মাধবীলতা হাসেন—বেশ। খুব মন দিয়ে পড়বে। কিন্তু......কিন্তু আমার কাছে এস, একবার।

রঞ্জু একটা লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে মাধবীলতার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। মাধবীলতা বলেন—এতক্ষণ চুপ করে বসে রইলে কেন? কেউ কি আমার কাছে আসতে মানা করে দিয়েছে?

বড়দি চোখ তুলে রেবা মাসিমার দিকে কটমট করে তাকান—শুনছেন মিসেস

চৌধুরী? এরকমের অসভ্য প্রশ্ন করবার অধিকার আপনার বোনঝির নেই।

রেবা মাসিমা আবার হাসতে চেষ্টা করেন।—ওটা একটা দুঃখের প্রশ্ন মাত্র। আপনি কিছু মনে করবেন না।

বড়দি—আমি শুধু চাই যে, ভাল-মন্দ কোন রকমের ঘরোয়া কথা হবে না। তাহলেই কিছু মনে করবো না।

মাধবীলতা—বড়দি মিছিমিছি রাগ করছেন কেন?

বড়দি—তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না; আমি তোমার বড়দি নই।

মাধবীলতার মুখের হাসিটা হঠাৎ যেন আগুনের ফুল্‌কি হয়ে ঠিকরে পড়ে।—আপনিও আমাকে ধমক দিয়ে আর তুমি করে কথা বলবেন না। আপনি আমার ননদ নন।

বড়দির চোখ দুটো যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে আর সাদা হয়ে যায়। তার পরেই ভিজে গিয়ে চিকচিক করতে থাকে। একেবারে নীরব হয়ে আর মাথা হেঁটে করে আবার একমনে দু'হাতে উলের কাঁটা চালাতে থাকেন বড়দি।

রঞ্জু হঠাৎ মাধবীলতার গায়ে আদুরে ভঙ্গীতে একটা ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—তুমি কবে আসবে?

মাধবীলতা হাতের রুমালটাকে মুখের কাছে তুলে ধরেন, কোন কথা বলেন না।

রঞ্জু—তুমি কোথায় থাক?

মাধবীলতা মুখ ঘুরিয়ে দরজার রামধনু রঙের পর্দাটার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রঞ্জু—বাবার খুব খারাপ লাগছে। ডুমরি ডাক বাংলোতে চলে গেল বাবা।

মাধবীলতা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে গিয়ে আর বারান্দার কার্পেটের উপর থেকে একটা বল কুড়িয়ে নিয়ে লনের দিকে ছুঁড়ে দেন। কোথা থেকে একটা স্প্যানিয়েল ছুটে এসে বলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রঞ্জু বলে—বাবা আজকাল বাজে জিনিস বেশি খায় না। শুধু সন্ধ্যেবেলা একটু।

বারান্দা থেকে নেমে স্প্যানিয়েলটাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকেন মাধবীলতা।

রঞ্জু রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে।—চল পিসি; মা ভয়ানক দুষ্টু; আমার সঙ্গে কথাই বলছে না।

ছুটে আসেন মাধবীলতা। রঞ্জুকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে, রঞ্জুর মাথার উপর গাল পেতে দিয়ে আর চোখ বন্ধ করে; একেবারে নিঃস্পন্দ হয়ে কিছুক্ষণের জন্য যেন ঘুমিয়ে পড়েন মাধবীলতা। তারপরই রঞ্জুকে ছেড়ে দিয়ে আর চোখ মেলে কথা বলেন।—এস রঞ্জু।

বড়দি এইবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। রেবা মাসিমার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—রঞ্জু এবার কার্সিয়ং কনভেণ্টে থাকবে। বছরে শুধু তিনটে মাস, ডিসেম্বর জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী এখানে এসে বাপের কাছে থাকবে। কাজেই, আপনার বোনঝি যদি রঞ্জুকে দেখতে ইচ্ছে করেন, তবে এই তিনটে মাসের মধ্যে কোন সময়ে যেন দেখে যান। যখন-তখন এলে দেখা হবে না।

রঞ্জুর হাত ধরে সিংহানি হোটেলের গেট পার হয়ে সড়কের উপরে দাঁড়ালেন আর হাঁপ ছাড়লেন বড়দি। রঞ্জু বলে—মা তাকিয়ে আছে, পিসি।

বড়দি কোন দিকে না তাকিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—চল, রঞ্জু।

মাত্র দশ মিনিটের পথ, বড়দির আর রঞ্জুর আস্তে আস্তে হেঁটে আসতে বড় জোর পনর মিনিট হয়েছে। ভিলা মাধবীর বারান্দায় এসে উঠতেই শুনতে পেলেন বড়দি, টেলিফোন বেজেই চলেছে।

—হ্যালো, কে? প্রশ্ন করেন বড়দি।

সিংহানি হোটেল থেকে মাধবীলতার রেবা মাসিমা বললেন।—মাধু এখনই এলাহাবাদ ফিরে যাচ্ছে। কাজেই, বুঝতে পারছেন, কাল আর রঞ্জুকে এখানে নিয়ে আসবার দরকার নেই।

ভিলা মাধবীর ঝাউ আর উতলা হয়ে মাথা দোলায় না, যদিও সামনের সড়ক দিয়ে মাধবীলতাকে নিয়ে সিংহানি হোটেলের গাড়িটা ছুটে চলে গেল।

আর, মিনিট পনের পরে সিংহানি হোটেলের বেয়ারা একটি চিঠি ও একটি জিনিস হাতে নিয়ে ভিলা মাধবীর বারান্দার কাছে এসে বড়দিকে সেলাম জানালো।

মাধবীলতার রেবা মাসিমা লিখেছেন—'মাধু এই আংটিটা আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে বলে গেল। কাজেই পাঠালাম।

আংটিটাকে হাতে তুলে নিতেই বড়দির হাতটা কেঁপে ওঠে। যেন একটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো হাতে তুলে নিয়েছেন।

বিধবা মানুষ বড়দি। বড়দির স্বামী, নাগপুরের ব্যারিস্টার এস দত্ত আজ পাঁচ বছর হলো মারা গিয়েছেন। হঠাৎ একটা কঠিন অসুখে পড়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এস দত্ত। বড়দি প্রায় পুরো ষোলটি বছর মেয়ে-কলেজে পড়িয়েছেন, সংসারের খরচ চালিয়েছেন, আর একমাত্র ছেলে দশ বছর বয়সের মন্টুকে বড় করে তুলেছেন। তার উপর অন্ধ স্বামীকে নিজের হাতে স্নান করিয়ে আর খাইয়ে দিতে হয়েছে। মন্টু আজ রেলওয়ের অফিসার হয়ে রাঁচিতে আছে। মন্টুর বউও আছে। বড়দির একটি নাতিও আছে। এমন বড়দি মাধবীলতার ফেরত পাঠানো আংটিকে ভয়ানক একটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো বলে না মনে করে পারবেন কেন?

আংটিটাকে সুজীবনের বইয়ের আলমারির এক কোণে গুঁজে রেখে দিয়ে বড়দি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন।

রঞ্জু এখন খাবে। খাবার টেবিলের কাছে রঞ্জুর পাশে বসে থাকেন বড়দি; তার পর রঞ্জুকে শোবার ঘরের বিছানায় তুলে দিয়ে আবার বাইরের ঘরে এসে বসে থাকেন। রঞ্জুর আয়া বুড়িটা এখনও আছে; কিন্তু আর কত-দিন বেঁচে থাকবে? অথচ এই মেয়েটার জীবনটা যে পড়েই রইল। দুটো মায়ার কথা বলে আর আদর করে ওর হাতে দুধের গেলাসটা তুলে দেবার মত একটা মানুষও যে এবাড়িতে থাকবে না। বড়দি নিজে বার বার রাঁচি থেকে এসে কতটুকুই বা করতে পারবেন? তাঁকেও তো একটা দুষ্টু নাতির সব দুরন্তপনার দায় সামলাতে হয়।

জীবু অবশ্য হেসে-হেসে বলেছে, ছুটিতে কনভেণ্ট থেকে এসে রঞ্জু যে তিনমাস এখানে থাকবে, সে তিনমাস বড়দি যেন রাঁচির সংসার থেকে প্রিভিলেজ লীভ নিয়ে এখানে এসে থাকেন। কিন্তু ষাট বছর বয়সের মানুষ বড়দির পক্ষে আর কটা বছরই বা ওভাবে এখানে বার-বার আসা আর থাকা সম্ভব হবে?

জীবুর মনটাও তো এখন খালি হয়ে গিয়েছে। মিথ্যে বোঝার ভার নামিয়ে আর সরিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে গিয়েছে। এখন এই একলা জীবনের শূন্যতাকে ইচ্ছা করলেই তো একজন সঙ্গিনীর ভালবাসা দিয়ে ভরে ফেলতে পারে জীবু। রঞ্জু মেয়েটাও তাহলে অন্তত চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে আবোল-তাবোল কথা বলবার মত একটা মানুষকে পেয়ে যাবে। ভালই হবে। আবার বিয়ে করতে আপত্তি হবে কেন জীবুর?

পাশের ঘরের পর্দাটা হাওয়া লেগে দুলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বড়দির চোখ দুটো যেন ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। পাশের ঘরের মেজের এককোণে একজোড়া ভেলভেটের চটি। চারু রায়ের মেয়ে মাধবী যেন এখনও ওই ঘরের ভিতরে আছে।

এঘর আর ওঘর ঘুরে-ঘুরে দেখলেন বড়দি; বার বার চমকে উঠলেন বড়দি; আর চোখ দুটো আরও ভয় পেয়ে সাদা হয়ে যেতে থাকে।

কে বলবে, ভিলা মাধবীর মাধবী নেই? বড়দির ভাই এ কী ভয়ানক মাতলামির কাণ্ড করে রেখেছে! মাধবীলতার সব জিনিস যেখানে যেমন ছিল, সেখানেই তেমনই পড়ে আছে। কোন জিনিসকে এখনও সরিয়ে ফেলা হয়নি। মিররের হুকে যে তোয়ালেটা ঝুলছে, সেটা যে মাধবীরই মুখের ক্রীম-মোছা তোয়ালে। আলমারির তাক ভর্তি হয়ে মাধবীর শাড়িগুলি এক-একটা রঙীন সমাদরের মত সাজানো রয়েছে। বাথরুমের কাচের তাকের উপরে মাধবীর হেয়ার অয়েলের শিশিটার ছিপি খোলা। সুজীবনের পাথরের মিউজিয়ামের ঘরের দেয়ালে মাধবীর অয়েল পোর্ট্রেটও হাসছে। শীতের দিনে মাধবীলতা গলায় জড়াতো যে ফার, সেটাও একটা চেয়ারের উপরে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

বড়দির ভয় আর বিস্ময় কান্না হয়ে ফেটে পড়ে। এখনও এইসব ভয়ংকর জঞ্জালকে কেন পুষে রেখেছে সুজীবন? আজকাল তো খুব কমই মদ খায় সুজীবন; তবে বেহুঁস হয়ে এমন করে একটা মিথ্যের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে আছে কেন?

যেদিন ডুমরি ডাকবাংলোর প্রবাস থেকে ভিলা মাধবীতে ফিরে এলেন সুজীবন, সেদিনই বেশি দেরি না করে, আর, গলার স্বর বেশ কঠোর করে নিয়ে কথাটা বলেই দিলেন বড়দি—আংটি ফেরত পাঠিয়েছে।

হেসে ফেলেন সুজীবন সেন—বেশ করেছে। রাক্ষুসীর বুদ্ধি আছে।

বড়দি—তুমিও ওর সব জিনিস ফেরত পাঠিয়ে দাও।

চেঁচিয়ে ওঠেন সুজীবন—ফেরত নয়; ওর সব জিনিস আমি এখনই বোনফায়ার করে ছাই করে দেব।

বড়দি—তোমাকে কিছু করতে হবে না।
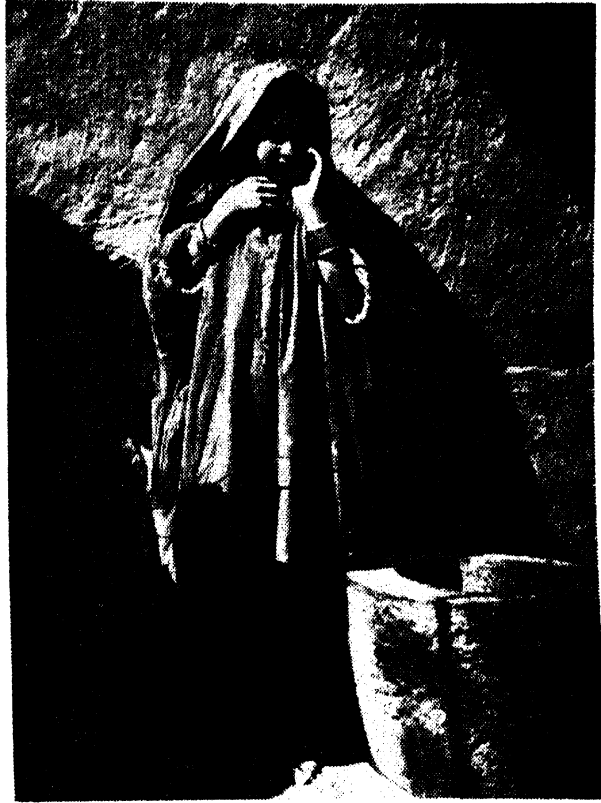
লজ্জা? আলোকচিত্র—শ্রীবীথি সরকার

তুমি চুপ করে বসে থাক। আমিই ব্যবস্থা করছি।

মালীকে আর বেয়ারাকে ডাক দিয়ে চারু রায়ের মেয়ের সব জিনিস, সেই সঙ্গে ওই অয়েল পোর্ট্রেটকেও এক সঙ্গে বাঁধা-ছাঁদা করে সিংহানি হোটেলের রেবা মাসিমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন বড়দি।

কিন্তু দেখে চমকে উঠলেন বড়দি, হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়েই বড়দির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর ভাই সুজীবন। কটকটে লাল চোখ ছলছল করছে; চেঁচিয়ে হাসছেন সুজীবন।—খুব ভাল হলো বড়দি; তুমি ছিলে বলেই কাজটা এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আমি তো ঘেন্নায় ওসব জিনিস ছুঁতেও পারতাম না।

বড়দি বল্লেন—যখন-তখন এসব খেও না জীবু। গেলাস রেখে দাও।

সুজীবন—রঞ্জুকে দেখে চারু রায়ের মেয়ে কি বললেন? বাজে কথা বলতে সাহস করেনি তো?

বড়দি—না।

সুজীবন—তুমি কি বললে?

বড়দি—আমাকে বিশেষ কিছু বলতে হয়নি। রঞ্জু যা বলে দিয়েছে, তাই যথেষ্ট। শিক্ষা পেয়ে গিয়েছে। মেয়েকে আরও ক'দিন দেখবার সাধ ছেড়ে দিয়ে চলেও গিয়েছে।

সুজীবন—আমি এই তো চাইছিলাম বড়দি; রঞ্জু যেন ওকে ভাল করে চাবুকে দেয়।

বড়দি আর কোন কথা বলেন না; কিন্তু সুজীবন সেন যেন কৃতার্থ প্রতিশোধের তৃপ্তিতে বিহ্বল হয়ে বলতে থাকেন।—আমি চাই, রঞ্জু চিরকাল ওর ওই মাতাটিকে মনে-প্রাণে ঘেন্না করবে।

বড়দি—খেতে চল, জীবু।

সুজীবন—আমাকেও খুব সাবধান থাকতে হবে বড়দি, চারু রায়ের মেয়ের নোংরা জীবনের কোন ছায়াও যেন আমার মেয়ের জীবনে ঘেঁষতে না পারে।

বড়দি—ভগবান রক্ষে করবেন; তুমি একটুও চিন্তে করবে না।

পাঁচদিন পর, ভিলা মাধবীর লনের ঘাসের সব ধুলো যেদিন বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেল, সেদিন রঞ্জুকে কার্সিয়ংয়ের কনভেণ্টে রেখে আসবার জন্য রঞ্জুকে নিয়ে রওনা হলেন বড়দি। সঙ্গে গেল বেয়ারা শুকদেও।

সেদিন সারা সকালটা রঞ্জুর হাত ধরে বসে রইলেন সঞ্জীবন সেন।

রঞ্জু বলে—তোমাকে অনেক চিঠি লিখবো, বাবা।

সঞ্জীবন—নিশ্চয়, যখনই ইচ্ছে হবে, লিখবে। এস সেন, জিওলজিস্ট, ভিলা মাধবী, সিংহানি, হাজারিবাগ।...ও, নো নো, নট ভিলা মাধবী। কখখনো না। শুধু সিংহানি, হাজারিবাগ!

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন সঞ্জীবন, গেটের কাছে এগিয়ে গেলেন, মালীকে ডাক দিলেন।

তিন পোঁচ আলকাতরা মাখিয়ে থামের গায়ে সাদা পাথরের উপর লেখা নামটাকে ঢেকে কালো করে দিলেন সঞ্জীবন। আইভিলতার শুঁড়গুলিকে টানাটানি করে নামিয়ে দিয়ে মালীটা আবার সেই নামহীন কালিমাকেও ভাল করে ঢেকে দেয়।

[পাঁচ]

শুধু কাজ, অনেক কাজ, নানাদিকে ঘুরে-ফিরে কাজ করেছেন সঞ্জীবন সেন। করন-পুরার কয়লা, খেলারির লাইম-স্টোন, গাওয়ার অভ্র আর গুমিয়ার ফায়ার-ক্লে তাঁকে ডেকেছে। প্রসপেক্টরের সঙ্গে মোটা টাকার ফী চুক্তি করে নিয়ে নতুন খাদ আর খাদানের খোঁজ দিয়েছেন। পাহাড়ের গায়ে ক্যাম্প করে থেকেছেন আর ভুট্টার খিচুড়ি খেয়ে দিন পার করে দিয়েছেন। শিকার করা যেন ভুলেই গিয়েছেন, আর হুইস্কির জন্যও কোন ছটফটানি নেই।

কার্সিয়ংয়ের কনভেন্ট থেকে রঞ্জু এসেছে। রঞ্জু এসেছে খবর পেয়ে আরা-বুড়িও এসেছে। কাজেই এই তিনটে মাস সঞ্জীবন কোন কাজের তাগিদে বাইরে আর যাবেন না।

বড়দি গল্প করেন।—রাঁচিতে কত মেয়ের সঙ্গেই তো আমার চেনা-শোনা হলো, কিন্তু শম্ভুবাবুর ভাইঝি কাবেরীর মত কেউ নয়। কাবেরীর সঙ্গে কারও তুলনা চলে না।

সঞ্জীবন রঞ্জুর হাত ধরে বসে থাকেন আর পাইপ টানেন। বড়দির গল্প শুনে হাসতেও থাকেন।

বড়দি বলেন—খুব শিক্ষিতা মেয়ে তো বটেই; তা ছাড়া কী চমৎকার স্বভাব। দেখতেও বেশ সুন্দর। সব চেয়ে ভাল ওর হাসিটি। জুইফুলের মত শান্ত মিষ্টি আর স্নিগ্ধ একটি হাসি সব সময় মুখে লেগেই থাকে। কলকাতার যে মেয়ে স্কুলে টিচার হয়ে ঢুকেছিল, এবছর সেই স্কুলেরই হেড-মিসট্রেস হবে কাবেরী। কিন্তু শম্ভুবাবু, তাঁর ভাইঝিকে আর চাকরি করতে দিতে রাজি নন।

সঞ্জীবন—মণ্টুর সার্ভিসের খবর কি? প্রমোশন পেল?

বড়দি—পেয়েছে। শম্ভুবাবু আমাকে বলেছেন, আমি যদি কাউকে পছন্দ করে দিই, তবে তিনি খুশি হয়ে তারই সঙ্গে কাবেরীর বিয়ে দেবেন।

সঞ্জীবন—মণ্টুর ছেলেটা রাস্তার লোকের গায়ে ঢিল মারবার অভ্যোস আজকাল বন্ধ করেছে? না, সেইরকমই চালিয়ে যাচ্ছে?

বড়দি—কাবেরীর মনটাকেও আমি যেটুকু চিনতে পেরেছি, তাতে অন্তত এটুকু বুঝেছি যে, এ মেয়ে যারই কাছে থাকুক, তাকে শান্তি দিতে আর সুখী করতে পারবে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন সঞ্জীবন।—বড়দি, নেড়া একবারই বেলতলায় গিয়েছিল। কিন্তু আর যাবে না।

বড়দি—এ তোমার মিথ্যে ভয়, জীবু।

সঞ্জীবন—না বড়দি, এসব কথা ছেড়ে দাও।

বড়দির সঙ্গে গল্প করে আর রঞ্জুকে আদর করে সঞ্জীবনের একটির পর একটি দিন পার হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু দিনগুলির যে আরও একটা কাজ ছিল। চারু রায়ের মেয়ে তার মেয়েকে দেখতে আসবে। বড়দি রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে সিংহানি হোটেলের বারান্দাতে কিছুক্ষণ বসে থাকবেন। কিন্তু কই, সিংহ... হোটেলের রেবা মাসিমার চিঠি নিয়ে কোন বেয়ারা আর চাপরাশী তো রঞ্জুকে আজও ডাকতে এল না? রঞ্জুর কনভেণ্টের ছুটির তিন মাসের শেষে ক'টা দিন তো শিগগিরই ফুরিয়ে যাবে; আবার কার্সিয়ং চলে যাবে রঞ্জু।

মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে গিয়েছেন সঞ্জীবন। ভাবতে একটু আশ্চর্যও লেগেছে। আদালতের কাছে ধর্ণা দিয়ে, মুখার্জীবাবুর মত উকীলকে লাগিয়ে, ছ'মাস ধরে দাবির লড়াই চালিয়ে আর আইনের জোরে মেয়েকে চোখে দেখবার যে অধিকার পেয়েছে চারু রায়ের মেয়ে, সেটা যে একটা নেকড়েনীর রক্তমাংসের সাংঘাতিক জেদ, গুলী খেয়েও বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে চায় না।

সঞ্জীবন সেন বোধহয় বিনা হুইস্কিতেই একটা অদ্ভুত নেশা জমিয়ে প্রাণের গোপনে পুষে রেখেছেন। চারু রায়ের মেয়ে যেন চিরকাল এভাবে বছরের কয়েকটি দিন সঞ্জীবনের জীবনের নীড় থেকে সামান্য একটু দূরে এক হোটেলের বারান্দায় এসে ঠাঁই নেবে, আর সঞ্জীবনের মেয়ে রঞ্জুকে আদর করে চলে যাবে। ভিলা মাধবীর ঝাউ দুলে উঠবে, আর, চারু রায়ের মেয়েকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য সামনের সড়ক দিয়ে রেবা মাসিমার গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে চলে যাবে। বসে বসে শুধু দেখবেন আর হাসবেন সঞ্জীবন; কী অদ্ভুত ধুলো!

বড়দি তো আগেই একবার সন্দেহ করে-ছিলেন, জীবু যেন এখনও একটা নেশার ভুলে আইনের অগোচর একটা রাখীর সুতো দিয়ে চারু রায়ের মেয়ের সঙ্গে একটা অদ্ভুত মিথ্যে সম্পর্কের মোহটাকেই বেঁধে রেখেছে। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার দেড় বছর পরেও মাধবীলতার অয়েল পোর্ট্রেট সরিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিল এই জীবু। তাই জীবুর আনমনা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে বড়দি আজও আবার সন্দেহ করছেন, জীবু কি, সত্যিই জানে না? এখনও জীবু কি শোনেনি যে, রঞ্জুকে দেখতে আর আসবে না চারু রায়ের মেয়ে?

বড়দি বলেন—রঞ্জুকে নিয়ে আমি রাঁচি চলে যাই। ওখান থেকেই রঞ্জুকে কার্সিয়ং পাঠিয়ে দেব। কেমন?

সঞ্জীবন—তা দিও, কিন্তু মা আর মেয়ের বাৎসরিক ইণ্টারভিউয়ের কি হলো?

বড়দি—সেটা আর কোনদিনও হবে বলে মনে হয় না।

—কেন?

—মাতৃদেবীর এখন বোধহয় আর কন্যাকে দেখবার জন্যে কোন চাড় নেই, কিংবা ফুরসতই নেই।

—কেন?

—চারু রায়ের মেয়ে তো আবার বিয়ে করেছেন।

—কি বললে?

—হ্যাঁ, সেই পরিতোষ রায়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে। ওরা এখন বাঙ্গালোরে আছে। এলাহাবাদ থেকে মন্টুর শ্বশুর সব কথাই আমাকে লিখে জানিয়েছেন।

—কথাটা তুমি এতদিন আমাকে জানাওনি কেন, বড়দি?

—আমি মনে করেছিলাম, তুমিও নিশ্চয় খবরটা জেনেছো।

—না, জানতে পাইনি। যাক্, খুব ভাল হলো, বড়দি।

বেশ শান্তভাবে হেসে পাইপ ধরালেন সুজীবন। আর বেশ শান্তভাবেই আস্তে আস্তে হেঁটে লনের চারদিকে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

অনেকক্ষণ পরে একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলেন বড়দি। ঘরের ভিতরে যেন একটা কাচের গেলাস পড়ে গিয়ে আর ঝনঝনিয়ে ভেঙ্গে গেল।

এগিয়ে যেয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে বড়দি বেশ একটু বিরক্তভরা স্বরে কথা বলেন—আবার এসব কেন শুরু করলে, জীবু? ছিঃ।

সুজীবনের কটকটে লাল চোখ হাসতে থাকে।—এবার তো প্রমাণ পেয়ে গেলে বড়দি, চারু রায়ের মেয়ের চোখে রঞ্জুও একটা জঞ্জাল। ওটা তা হলে নেকড়েনীর চেয়েও ইতর একটা প্রাণী।

বড়দি—চুপ কর। আমরা এখন রওনা হব।

সুজীবন—হ্যাঁ যাও। কিন্তু রঞ্জুকে বেশ স্পষ্ট করে বলে বুঝিয়ে দিও, ওর মা ওকে একটা অচেনা কুকুরের বাচ্চা বলে মনে করে।

বড়দি—চুপ কর। কথা বলো না। সুজীবনের হাতের কাছের ছোট টেবিল থেকে হুইস্কির বোতলটা সরিয়ে নিয়ে আলমারিতে বন্ধ করেন বড়দি।

গাড়ি বের করে তৈরী হয়েছে ড্রাইভার মোতিরাম। রঞ্জুর কপালে এক মিনিট ধরে মুখ ঠেকিয়ে চুমো খেলেন সুজীবন। রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন বড়দি।

ঝড়ের হাওয়াতে শনশন করছে ভিজা মাধবীর ঝাউ। আর, সুজীবন সেন নিজেও যেন একটা ছটফটে অস্থিরতার ঝড় হয়ে ভিজা মাধবীর এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়াতে থাকেন। ইউকালিপটাসের ছায়াতে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরান। হাত থেকে ফসকে গিয়ে পাইপটা ঘাসের উপর পড়ে যায়। তুলে নিয়েই আবার বাগানের নিরালাতে একটা বুড়ো দেবদারুর ছায়াতে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন।

বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। তবু ভিজা মাধবীর ঝাউয়ের শনশনে শব্দের মাতলামি থামতে চাইছে না।

ঘরে ঢুকলেন সুজীবন। লেখার টেবিলটার কাছে বসলেন। তারপর দেরাজের হাতলটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে দেরাজটাকে টানলেন। রঙীন নক্সা-করা চামড়ার একটা ব্যাগ বের করলেন।

শূন্য ব্যাগ। চুপসে রয়েছে ব্যাগটা। মাধবীলতার লেখা, সেই দুর্বার ভালবাসার একান্নটা চিঠির একটিও চিঠি নেই। সুজীবন সেনের গোপন জাদুঘর একেবারে খালি হয়ে পড়ে আছে।

কেউ যেন সুজীবনের জীবনের গুপ্তধন চুরি করে নিয়ে সরে পড়েছে। সুজীবনের চোখ দুটো যেন একটা নীরব হাহাকার নিয়ে আর একেবারে স্তব্ধ হয়ে সেই শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভালই করেছেন চারু রায়ের অতিচালাক আর অতিসাবধান মেয়ে। একান্নটা মিথ্যের দলিলকে একদিন সময় বুঝে সরিয়ে নিয়ে আর ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে বোধহয় কিচেনের জ্বলন্ত উনুনের ভিতরে ফেলে দিয়েছেন। খানসামা স্টিফান তখন বোধহয় কিচেনে ছিল না, ভাল টমেটো কিনতে গাঁয়ের হাটে গিয়েছিল।

চোখে নয়, বুকেরই ভিতরে একটা জ্বালা কটকট করছে। এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট চারু রায়ের মেয়ে যে নিজেই ইচ্ছে করে সুজীবন সেনকে ভালবেসেছিল আর বিয়ে করেছিল, সে-কথা বলে দেবার মত একটা সামান্য লেখার চিহ্নও আর পৃথিবীতে রইল না।

হেসে ফেলেন সুজীবন। মিররের দিকে তাকিয়ে দেখতে পান, হাসিটা যেন কুৎসিত একটা কাঁদুনে হাসির মত কাঁপছে।

চারশো বোরের কর্ডাইট রাইফেল সামনের সোফাটারই উপর পড়ে রয়েছে। রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে আর নিথর হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন সুজীবন সেন। তারপরেই টেলিফোন করে চাতরার এস ডি ও'র সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন আর খবর শুনে খুশিও হলেন, এই সাঁজনেও চাতরার জঙ্গলে একদল নীলগাই এসেছে।

রাঁচি থেকে গাড়িটা ফিরে আসতেই ডাক দিলেন সুজীবন।—মোতিরাম, এক্সকিউজ মি, তুমি তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নাও। এখনই শিকারে বের হব।

জঙ্গলের পাশে একটা গাঁয়ের একটা খড়ের মাচান। মাঝরাতে চাঁদ উঠেছে আর জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে সামনের অড়হরের ক্ষেত। রাইফেলটাকে কোলের উপর তুলে চুপ করে বসে থাকেন সুজীবন।

ঘুমিয়ে পড়েননি, স্বপ্নও দেখেননি সুজীবন। কিন্তু এ যে অদ্ভুত একটা আশার স্বপ্নময় ছবি। একটা নীলগাই খড়ের মাচান থেকে দশ হাত দূরে আস্তে-আস্তে ঘুরে-ফিরে কাঁচা অড়হর ভাঙছে ছিঁড়ছে আর খাচ্ছে। চাঁদের আলো পড়ে চিকচিকিয়ে উঠছে প্রাণীটার চোখ দুটো: তাই ঠিক কপালের মাঝখানে তাক করতে কোন অসুবিধেও নেই। ভালই হবে; এক গুলীতে কপালটাকে ফুটো করে দিলেই চলবে। বেশ নিখুঁত ও আস্ত একটা ছাল পাওয়া যাবে; কোন ফুটো-ফাটা থাকবে না। কলকাতার ট্যাক্সিডার্মিস্ট খান্নার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছালটাকে ভাল করে প্রসেস করিয়ে নিতে হবে। তারপর ওটাকে ড্রইং-রুমের পর্দা করে ঝুলিয়ে রাখলে আরও চমৎকার দেখাবে।

কিন্তু দূরে ওটা আবার কে? কি আশ্চর্য, আরও একটা নীলগাই একেবারে নিশ্চল হয়ে, গলা উঁচু করে আর মুখ তুলে এই নীলগাইটার দিকে যেন ভয়ানক সতর্ক একটা প্রেমের পাহারা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। উনি বোধহয় সঙ্গিনী আর ইনি হলেন সঙ্গী।

রাইফেলটাকে কোলের উপর থেকে তুলে নিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখেন সুজীবন। ফ্লাস্কের ছিপি খুলে হুইস্কি মেশানো ঠাণ্ডা বীয়ারের ছোট্ট একটি ঝর্ণাকে গলগল করে গিলে নিয়ে ঢেঁকুর তোলেন। তারপর হেসে ফেলেন। নাঃ, বড়দি এখন কাছে থাকলে আরও জোরে হেসে আর তামাশা করে বলে দিতে পারা যেত, ওদিকের ওটা হলো চারু রায়ের মেয়ে, আর এদিকের এটা হলো বেচারা

পরিতোষ। এটাকে গল্পে করে মারবার কোন মানে হয় না।

চেষ্টা করলে ওটাকে অবশ্য এক গল্পেতে সাবড়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দরকার কি? হাত নোংরা করে লাভ নেই।

মাচান থেকে নেমে আর আস্তে-আস্তে হেঁটে আবার গাঁয়ের মাহাতোর বাড়ির কাছে ফিরে এসে, গাড়ির বনেটের উপর আস্তে একটা চাপড় মেরে ড্রাইভার মোতিরামের ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন সঞ্জীবন।—চল, মোতিরাম।

[ছয়]

ভিলা মাধবীর মাধবী নেই। আলকাতরার কালো দিয়ে পুরু করে ঢাকা পাথরের ফলকটার নামহীন চেহারার উপর আরও একটা আবরণ হয়ে আইভিলতার শুঁড়গুলি আরও ঘন হয়ে দুলছে। তবু লোকে বলে, ভিলা মাধবী।

সঞ্জীবন সেনের জীবনে আর কাজ নেই, পাথরের রোমান্স নেই, শিকারও নেই, শুধু আছে হুইস্কি। এক-একটা নতুন বছর আসছে আর ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সঞ্জীবন বোধহয় মনে করেন, কিছুই ফুরিয়ে যাচ্ছে না। আর কী আছে যে ফুরিয়ে যাবে?

জ্ঞানকীলাল যমুনাদাস কতবার এসেছেন আর কত সাধাসাধি করেছেন; কিন্তু আর কোন কাজের দায় নিতে রাজি হননি সঞ্জীবন। ইচ্ছে করলে একদিনের জন্য ওদারনা ভ্যালিতে গিয়ে ভাল সালফাইটের খোঁজ দিতে পারতেন, কিন্তু তাও দেননি।

হ্যাঁ, শুধু বছরের তিনটে মাস রঞ্জু যখন কনভেন্ট থেকে এসে এখানে থাকে, তখন সঞ্জীবন সেনের হুইস্কির বোতল একটু আড়াল হয়ে লুকিয়ে থাকে। আর, সকাল-বেলা একবার ঘণ্টা দুতিনের মত সেণ্ট কলাম্বাস কলেজের সামনের বিরাট ময়দানে গলফ্ খেলে একটু বেড়িয়েও আসেন।

কিন্তু ভিলা মাধবীর লন আর বাগানকে রঙীন করে রেখেছে মালী চমনরাম। ঘর বারান্দা শার্সি কার্পেট আর আসবাব, সবই ঝকঝকে আর তকতকে করে রেখেছে বেয়ারা শুকদেও।

বড়দির সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে বেশ বিরক্ত হয়ে কয়েকবার চেঁচিয়ে উঠেছেন সঞ্জীবন—এ এক আপদ হয়েছে, বড়দি! এখনও যেসব চিঠি আসে, তাতে ঠিকানার সঙ্গে বাড়িটার সেই বাজে নামটাও থাকে।

বড়দি হেসে ফেলেন—ওতে কি এসে যায়? তুমিই বা এটা থামাতে পারবে কেমন করে?

টাউনের লোকে এখনও বলে, ভিলা মাধবী। সত্যিই তো, এ আপদ কি করে ঠেকাতে পারবেন সঞ্জীবন? মনে-প্রাণে জীবনে ও আইনে যেটা একেবারে নিছক মিথ্যা, সেটা যেন একটা বাতাসের অদেখা চক্রান্তে চিরকালের কথা হয়ে থেকে যাচ্ছে। এই একটা অস্বস্তি; একটা বিশ্রী বাজে ঠাট্টার ঠোকর। এছাড়া সঞ্জীবনের জীবনে কোন অস্বস্তি আর নেই।

টাউনের লোক দেখতে পায়, সেন সাহেব একটু বুড়িয়ে গিয়েছেন। মাথার দুপাশে কানের কাছের সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। তবু বেশ শক্ত আছেন। গলফ্ খেলতে বের হয়ে ময়দানের ঘাসের উপর কী সুন্দর স্টান্সে দাঁড়িয়ে আর ক্লাব তুলে ড্রাইভ দিতে পারেন সেন সাহেব! বল যেন হাউইয়ের মত শিস দিয়ে উড়ে চলে যায়।

কলেজের সায়েন্সের ছাত্র ছেলেরা এখনও মাঝে মাঝে, বছরে অন্তত একটিবার সেন-সাহেবের পাথরের মিউজিয়াম দেখতে আসে। কিন্তু সেনসাহেব নিজে আর ব্যস্ত হয়ে ছেলেদের কাছে পাথরের রোমান্সের কোন গল্প বলেন না। শুধু বেয়ারা শুকদেও এসে মিউজিয়াম ঘরের দরজা খুলে দেয়। ছেলেরা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শুধু শুকদেও দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু সেনসাহেবের সেই সৌজন্যের পুরনো হাসিটা এখনও আছে। ছেলেরা চলে যাচ্ছে দেখতে পেয়েই এগিয়ে আসেন, আর হাসিমুখে অনুরোধও করেন—আরও কিছুক্ষণ থাক। চা খেয়ে যাও।...স্টিফান, কোথায় তুমি? এদের চা খাইয়ে দাও।

ছেলেরা লনের উপর শুয়ে বসে আর গড়িয়ে অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না স্টিফান খানসামা চা নিয়ে আসে।

ছেলেরাও বলাবলি করে—সেনসাহেবকে দেখলে কিন্তু স্কলার বলে মনে হয় না। একজন রিটায়ার্ড মিলিটারী জেনারেল বলে মনে হয়। এত বয়স হয়েছে; তবু কত স্মার্ট।

কথাটা খুব ভুল বলেনি কলেজের সায়েন্সের ছেলেরা। শুধু রিটায়ার্ড নয়, বেশ টায়ার্ড জীবনও বটে। যেন লড়াই করবার আর কিছু নেই। আর, যেটুকু লড়াই করা হয়েছে তাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন সঞ্জীবন। বছরে যে কটা দিন রঞ্জু থাকে, শুধু সেই কটা দিন একটু বেশ নড়া-চড়া করেন; একটু ছুটোছুটিও করে ফেলেন। কিন্তু তারপর আর কিছু করবার থাকে না। বারান্দায় আর লনে একটি ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে থাকেন আর পাইপ টানেন।

অবশ্য, এক-আধবার উঠে গিয়ে ঘরের ভিতরেও যান; আর মুখের রঙ লাল করে আবার ফিরে আসেন। কিন্তু বড়দি স্টিফানকে আড়ালে ডেকে নিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই হুইস্কির বোতলে জল মিশিয়ে রাখে স্টিফান। তা না হলে সঞ্জীবন সেনের চোখ দুটো আজও লাল হয়ে উঠতো।

রঞ্জুর আয়া বুড়ি গত বছর মরেই গিয়েছে। আয়া বুড়িকে দেখতে না পেয়ে খুব কেঁদেছিল রঞ্জু। ড্রাইভার মোতিরামের মাথায় টাক পড়েছে। খানসামা স্টিফানের একটা পায়ে বাতে ধরেছে; আজকাল একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে স্টিফান। বেয়ারা শুকদেও সব দাঁত তুলে ফেলেছে, চুপসে গিয়েছে শুকদেও বেয়ারার মুখটা।

কিন্তু একটুও চুপসে যায় নি ভিলা মাধবীর চেহারা। ইউক্যালিপটাস আর ঝাউ-গুলির চেহারা একটুও বুড়ো হয় না। বারান্দার কার্পেট কোথাও একটুও ছিঁড়ে যায় না। এক-একটা বর্ষা পার হয়; তবু দেয়ালের গোড়াতে একটু শেওলাও ধরে না।

জ্ঞানবাবুর একটা ধারণা, বেশি ড্রিঙ্ক করে করে সেনসাহেবের চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভিলা মাধবীতে এসে একটু উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতেন, তা নয়; সেনসাহেব শুধু শান্ত হয়ে ইজি-চেয়ারে বসে, ভিলা মাধবীর যত গাছ লতা-পাতা ফুল ও আলো-ছায়ার দিকে তাকিয়ে, আর, শুধু হেসে হেসে বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

যত ডাকবাংলা আর ফরেস্ট-বাংলোর চাপরাশিদের অনেকেই মাঝে-মাঝে এসে সঞ্জীবন সেনের সামনে দাঁড়ায় আর সেলাম জানায়। ওদের আক্ষেপ, সাহেব কেন আর শিকারে যান না। সঞ্জীবন সেন সবারই হাতে একটা-দুটো টাকা বকসিস ধরিয়ে দেন আর জঙ্গলের নতুন জানোয়ারের খবর শোনেন।

শুধু শোনাই সার। সঞ্জীবন সেনের কর্ডাইট রাইফেল আর ছটফট করে ওঠে না। এক গুলীতে নীলগাইয়ের ধড় মাটিতে লুটিয়ে দেবার জন্য সঞ্জীবনের মনের মধ্যে যেন আর কোন পিপাসাই নেই।

বড়কা-গাঁওয়ের জঙ্গলে চৌশিঙ্গা দেখা দিয়েছে। গয়া থেকে এক সাহেব এসে ইচাকের কাছে খোলা মাঠের মধ্যেই একটা সাদা বাঘ পেয়েছেন আর মেরেছেন। সিমারিয়ার জঙ্গল থেকে দাঁতাল শুয়োর

বের হয়ে রোজই মাহাতোদের আলুর ক্ষেত তছনছ করছে। এই তো, এত কাছে ওই কানাইর হিলের কাছে সড়কেরই উপর দুটো ভাল্লুক রোজ রাতে একবার আসে আর চলে যায়। নতুন হাঁস নেমেছে চিত্তরপুরের ঝিলে।

খবরগুলিকে শুধু একটা ক্লান্ত হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করেন আর নীরব হয়ে বসে থাকেন সুজীবন সেন। সুজীবন সেন নিজেই যেন একটা ক্লান্তির গল্প হয়ে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে চাইছেন।

কিন্তু সুজীবন সেন তাঁর মেয়ে রঞ্জিতা সেনের জীবনটাকে সুখী করে হাসিয়ে রাখবার জন্যে যা করা দরকার তার কিছুই না করে ছাড়েন নি। বছরের নয়টি মাস কনভেন্ট, তারপর মাসখানেক রাঁচিতে পিসির কাছে; তারপর মাস দুই বাপের কাছে; তিনটি আশ্রয়ের স্নেহ আর প্রীতি রঞ্জুকে এক মুহূর্তের জন্যেও মনমরা হতে দেয় নি। আজকাল কার্সিয়ং থেকে কনভেন্টের মিসেস ডি সিলভা নিজেই রঞ্জুকে রাঁচিতে পৌঁছে দিয়ে যান। আর, রঞ্জুর কার্সিয়ং রওনা হবার ঠিক একদিন আগে কনভেন্টের মাদার মণিকা কলকাতা থেকে এখানে চলে আসেন আর রঞ্জুকে নিয়ে যান। সঙ্গে যায় বেয়ারা শুকদেও। গত বছর রঞ্জুকে দেড় হাজার টাকা দামের একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছেন সুজীবন। কলকাতার তিনটে প্রভিজন স্টোরের দোকানে টাকা জমা দিয়ে রেখেছেন সুজীবন; রঞ্জু চিঠি লিখে যখন যে-জিনিসের অর্ডার দেবে, তখনই যেন সে-জিনিস রঞ্জুকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

গত বছরের মত এ-বছরেও ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহের সোমবারের সকালবেলার রোদ যখন ভিলা মাধবীর লনের ঘাসের সব শিশির গলিয়ে দিতে থাকে, তখন সুজীবন সেনের মুখটা করুণ হয়ে যায়। কালই এসে গিয়েছেন মাদার মণিকা, আজ এখনই রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে কার্সিয়ং রওনা হয়ে যাবেন। ড্রাইভার মোতিরাম গাড়ি বের করেছে। শুনতেও পাওয়া যায়, চায়ের টেবিলের কাছে বসে গল্প করছেন মাদার মণিকা আর বড়দি। রঞ্জুর গলার স্বরও শোনা যায়। কথা বলছে রঞ্জু, যেন সকালবেলার একটা খুশির পাখি মিষ্টি স্বরে ডাকছে। বুঝতে পারেন সুজীবন, ওরা সবাই সুজীবনের অপেক্ষা করছে।

রঞ্জু ডাকে—বাবা, এস।

কী অদ্ভুত ডাক! সুজীবন সেনের বুকটা যেন মিষ্টি বাতাসে ভরে যায়।

কিন্তু আর কতক্ষণ? চা খাওয়ার পালা শেষ হবার পর রঞ্জুর হাত ধরে গাড়িটার দিকে এগিয়ে যান সুজীবন। গাড়িতে ওঠে রঞ্জু। মাদার মণিকাও উঠে বসেন। কিন্তু বিপদে পড়ে ড্রাইভার মোতিরাম। গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আর বাম্পারের উপর একটা পা তুলে দিয়ে, আনমনা, মত্ত, কে জানে কোন দিকে তাকিয়ে পাইপ টানতে থাকেন সুজীবন। সাহেব সরে না গেলে মোতিরাম যে গাড়ি স্টার্ট করতেই পারবে না।

গাড়ির ভেতর থেকে নেমে আসে রঞ্জু। সুজীবনের মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে সুজীবনের গালের উপর গাল পেতে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জু, তারপর হাসতে থাকে—আমাদের যেতে দাও বাবা। তুমি এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে বসো।

গাড়িতে ওঠে রঞ্জু। বাস্, তারপর আর কোন বাধা থাকে না। সুজীবন সেনের জীবনের নতুন নেশাটা খুশি হয়ে গিয়েছে। সরে যায় সুজীবন। অবাধ পথ পেয়ে গাড়িটা এইবার ছুটে চলে যায়।

সুজীবন বলেন—আর কি বড়দি? রঞ্জু আর-একটু বড় হলেই একদিন ওর বিয়েটা দিয়ে দেব। তারপর আমার ছুটি।

বড়দি বেশ জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন। —আমি বেঁচে থাকতে থাকতে রঞ্জুর বিয়েটা হয়ে গেলে ভাল হতো। তা কি আর হবে?

সুজীবন—নিশ্চয় হবে।

কিন্তু দেখে খুশি হয়েছেন বড়দি, তাঁর ভাইয়ের জীবনে সেই ভয়ানক কোলাহলের সব শব্দ শান্ত হয়ে গিয়েছে। জীবুর কথা শুনেই বোঝা যায়; ওর মনের সেই আগুন আর নেই। শুনে খুশি হয়েছেন বড়দি, জীবু এখন থেকেই রঞ্জুর বিয়ের কথা চিন্তা করছে। খুব ভাল কথা। বড়দির মনটাও একটা শান্তি পেয়েছে। জীবুরও তো বয়স হয়েছে। সময়ে সব তাপই শান্ত হয়ে যায়।

কিন্তু সেদিনই অনেক রাতে বড়দির চোখ দুটো হঠাৎ চমকে উঠে আতঙ্কে ভরে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলেন বড়দি, তাপ যেন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে।

ঘুম আসছে না, তাই ঘুমের একটা পিল খাবেন বলে বিছানা থেকে নেমেই দেখতে পেলেন বড়দি, পাশের ড্রইং-রুমের অন্ধকারে

সুজীবনের পাইপটার আগুন যেন একটা লালচে জ্বালা হয়ে দপ্ দপ্ করছে।

সুইচ টিপে আলো জ্বালেন বড়দি।—এ কি জীবু! তুমি এখনও ঘুমোও নি কেন?

সুজীবন হাসেন—আমি তো রাত্রিবেলা ঘুমোই না বড়দি।

—কেন? রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন বড়দি।

সুজীবন আবার হাসেন।— একটা অস্বস্তি। ভয়ানক বিশ্রী লাগে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমি দিনের বেলা সোফার উপর পড়ে একবার বেশ ভাল করে ঘুমিয়ে নিই।

বড়দি—কিন্তু অস্বস্তি আবার কেন?

এবার আর পাইপের আগুন নয়: সুজীবন সেনের চোখ দুটোই দপ্ করে জ্বলে ওঠে। —ঘেন্না করে। রাত্রিবেলা ও-ঘরে ঢুকতে, আর ওই খাটের বিছানাটাকে ছুঁতেও ঘেন্না করে।

—খুব ভুল করছো, জীবু! খুব অন্যায় করছো। কেঁদে ফেলেন বড়দি।

বড়দিরও আজকাল এটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। একটুতেই ভয় পান আর কেঁদে ফেলেন।

বড়দিরও তো বেশ বয়স হয়েছে। আজ-কাল চোখে একটু কম দেখেন। চলতে-ফিরতে বেশ হাঁপিয়েও পড়েন।

পরদিন সকালে রাঁচি রওনা হবার সময় যখন গাড়িতে উঠলেন বড়দি, তখন ভিলা মাধবীর ঝাউয়ের শব্দ শুনে আর-একবার ভয় পেয়ে চমকে উঠলেন আর চোখ মুছলেন।

[সাত]

বেড়াতে বের হয়ে টাউনের আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু গল্প করতে করতে যেদিন সিংহানি পর্যন্ত চলে এলেন, সেদিন ভিলা মাধবীর গেটের কাছে একবার থমকে দাঁড়িয়ে আর বেশ ভাল করে দেখে নিলেন, সেনসাহেব লনের ঘাসের উপর একটি চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সেন-সাহেবের মাথাটা আরও সাদা হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে, একটু ঝুঁকে পড়েছেন সেন-সাহেব।

আদিত্যবাবু—কত বয়স হলো সেন-সাহেবের?

জ্ঞানবাবু—তা পঞ্চাশ তো কবেই পার হয়ে গিয়েছে। তবু, বয়সের তুলনায় মাথাটা একটু বেশি সাদা হয়েছে।

আদিত্যবাবু—তাহলে আর বিয়ে-টিয়ে করবেন বলে মনে হয় না।

জ্ঞানবাবু হাসেন।—না, করলে তো আট বছর আগেই করতেন। এখন তো মেয়ের বিয়ে দেবার কথা।

আদিত্যবাবু—মেয়েটির বয়স কত হবে এখন?

জ্ঞানবাবু—ধরুন না, সেনসাহেবের ডিভোর্স নেবার সময় মেয়েটির বয়স প্রায় দশ বছর ছিল। তার সঙ্গে আরও আটটা বছর যোগ করুন। মেয়েটির বয়স তাহলে গিয়ে দাঁড়ায়, এই সতেরো-আঠারো।

ঠিকই হিসাব করেছেন জ্ঞানবাবু। বিকেলে রাঁচি থেকে বড়দির গাড়িটা ছুটে এসে যখন ভিলা মাধবীর লনের কাছে থামে, তখন বড়দির সঙ্গে সঙ্গে শাড়িপরা একটি আঠারো বছর বয়সের মেয়েও গাড়ি থেকে নামে। ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ি, বেশ বড় একটা খোঁপা, হাতে সোনার সরু চেন-ব্যান্ডের সঙ্গে পাতলা একটি সোনালী ঘড়ি; এক হাতে গরম ওভারকোট জড়িয়ে ধরে আর হাসতে হাসতে সুজীবনের চোখের কাছে এসে যে মেয়েটি দাঁড়ালো, সে মেয়ে আর-কেউ নয়; সুজীবন সেনেরই মেয়ে রঞ্জিতা সেন।

এগিয়ে যেয়ে সুজীবনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আর দুলে দুলে হাসতে থাকে রঞ্জু। —তোমার জন্যে আমি একটা জিনিস এনেছি, বাবা; একটা তিব্বতী টুপি।

দুই চোখ অপলক করে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুজীবন। খুশি হয়ে হাসতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হাসিটা যেন ভয়ানক এক বিস্ময়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে ছটফট করে ওঠে। আজ হঠাৎ কোথা থেকে কার চেহারা দিয়ে নিজেকে এমন করে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে রঞ্জু? সেই চোখ, সেই ঠোঁট, গলাতেও ঠিক সেইরকম দুটো খাঁজ। চোখ দুটো বন্ধ করতে ইচ্ছে করে; চেঁচিয়ে ডাকতে ইচ্ছে করে— একি হলো, বড়দি? রঞ্জু যে আমাকে ভয়ানক ঠাট্টা করছে।

হাতে-ধরা গরম জামাটাকে সুজীবনের কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে বাগানের ফুল দেখতে ছুটে যায় রঞ্জু। খানসামা স্টিফান ডাকতে থাকে—আগে চা খেয়ে নাও, মিস বাবা। তারপর যত খুশি বাগান দেখ।

বড়দি বলেন—মিসেস ডিসিলভা এবার এসে রঞ্জুর কত প্রশংসা করলেন। রঞ্জু শুধু এক অঙ্ক ছাড়া সব সাবজেক্টে ফার্স্ট হয়েছে।

সুজীবন হাসতে চেষ্টা করেন।— হিস্ট্রিতেও ফার্স্ট হয়েছে কি?

বড়দি—নিশ্চয়; শুধু অঙ্ক ছাড়া সব বিষয়ে......।

সুজীবন সেন হঠাৎ অদ্ভুতভাবে বড়দির দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত কথাই বলে ফেলেন—হিস্ট্রিতে ফেল করলেই ভাল করতো রঞ্জু।

চমকে ওঠেন বড়দি। ভাই সুজীবন কি নেশার মেজাজে কথা বলছে?

সুজীবন—কিছু মনে করো না, বড়দি। তোমার এসব খুশির কথা শুনে আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগলো না।

বড়দিও বেশ রাগ করে কথা বলেন।— তোমার এসব কথা শুনে আমারও একটুও ভাল লাগছে না।

সুজীবন—তুমি কি চাও যে, রঞ্জু ঠি[illegible] মায়ের মত মেয়ে হয়ে উঠুক?

বড়দি—কখ্খনো না। আমি কি পাগল? কেঁদে ফেললেন বড়দি।

সুজীবন হাসতে চেষ্টা করেন।—আ[illegible] আমি ঠাট্টা করে একটা কথা বললাম; তু[illegible] তাই বিশ্বাস করে কেঁদে ফেললে?

বড়দি—একথা ঠাট্টা করেও বলতে নেই।

তর্ক করে বড়দিকে আর বিরক্ত করতে চা[illegible] না সুজীবন, তাই বেশ শান্ত দুটো চো[illegible] নিয়ে, বড়দির উপদেশের বাধ্য ভাইটির ম[illegible] শুধু নীরব হয়ে বসে থাকেন। বড়দি[illegible] খুশি হয়ে বলেন—রঞ্জু হলো রঞ্জু, তোমা[illegible] মেয়ে, ডাক্তার প্রশান্ত সেনের মত মান[illegible] মানুষের নাতনি। আজে-বাজে মানুষের সঙ্গে রঞ্জুর তুলনা করা উচিত নয়।

সুজীবন—খুব সাঁচ্চা কথা।

বড়দি—কাজেই তুমি ভুল করে কোন বাজে ভয়-টয় করবে না।

সুজীবন—একটু বেশি আশ্চর্য হয়েছি বলেই ভয় করতে হচ্ছে।

বড়দি—কিসের আশ্চর্য?

হেসে ফেলেন সুজীবন—বায়োলজির আশ্চর্য।

বড়দি—তার মানে?

সুজীবন—অবিকল চারু রায়ের মেয়ের চেহারাটি পেয়েছে রঞ্জু।

বড়দি আবার ভ্রূকুটি করেন।—এটা কি রঞ্জুর ভুল?

সুজীবন আবার হেসে ফেলেন।—আমার ভুল। আমি বায়োলজি পড়িনি। শুধু সারা জীবন পাথরের লজিক নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। তাই ঠিক বুঝতে পারছি না।

বড়দিও হেসে ফেলেন।—তবে আর তর্ক করো না।

সুজীবন—কিন্তু, কী ভয়ানক বায়োলজি! চারু রায়ের মেয়েরই চেহারাটা বেচারা রঞ্জুর ঘাড়ে চেপে বসলো কেন? রঞ্জু তো তোমার চেহারা পেতে পারতো?

বড়দি হাসেন।—ভগবান তোমার প্রশ্নের জবাব দিন; আমি দিতে পারবো না।

সুজীবন—তোমাদের বেশ একটা সুবিধে আছে, বড়দি। যত গোলমালের জবাব দেবার দায় ওই একজন দারোগার উপর চাপিয়ে দিয়ে হাল্‌কা হয়ে যাও।

বড়দি—ওভাবে কথা বলো না।

সুজীবন —সে গল্পটা জানো না? গাঁয়ের লোক সব প্রশ্নের জবাবে শুধু একটি কথা বলতো, দারোগা জানে। গাঁয়ের কলেরা লাগলো কেন? দারোগা জানে। জলের বাঁধ ভেঙ্গে গেল কেন? দারোগা জানে। ধান হলো না কেন? দারোগা জানে। বেচারা ম্যাজিস্ট্রেট গাঁয়ের দুরবস্থার কারণ

তদন্ত করতে এসে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

বড়দি—আমিও একটা গল্প বলতে পারি। গাঁয়ের এক মাসি ছিল: ঝগড়া বাধাবার জন্যে যখন কাউকে দেখতে পেত না, তখন নিজেই সুপুরি গাছের সংগে চুল বেঁধে নিয়ে ছাড়-ছাড় বলে চেঁচাতো।

সঞ্জীবন—আমিও কি তাই করছি?

বড়দি—করছো বইকি। কবেকার কোন্ ছাই ব্যাপার, যেটা চুকে-বুকে মিটেও গিয়েছে, তারই সংগে এখনও মনে মনে ঝগড়া করেই চলেছ।

সঞ্জীবন—ঝগড়া নয়, ঘেন্না।

বড়দি—বড় অদ্ভুত ঘেন্না। কোন মানে হয় না।

সঞ্জীবন—মানে হোক বা না হোক: একটা ভয়ানক মেয়েলোকের চেহারার সংগে রঞ্জুর চেহারার কোন মিল না থাকলেই ভাল ছিল।

বড়দি বিড়বিড় করেন—আমি তো তেমন কিছু মিল দেখি না।

সঞ্জীবন—তুমি তো আজকাল চোখে কম দেখ।

বড়দি এবার বিরক্ত হয়ে সরেই যান।—তুমি চোখে একটু বেশি দেখছো।

বড়দি ঘরে নেই: হুইস্কির আলমারির চাবিটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। চুপ করে আবার চেয়ারের উপরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন সঞ্জীবন। বড়দির রাগের কথার ধমকটা নয়; যেন বিদ্ঘুটে একটা নিয়ম-ছাড়া ভাগ্যের ধমক সঞ্জীবনকে চুপ করিয়ে, স্তব্ধ করিয়ে, আর একলা করে দিয়ে ঘরের ভিতরে এই চেয়ারে বসিয়ে রেখেছে।

কিন্তু বড়দি যেন সব বুঝেও কিছুই বুঝতে পারলেন না। মায়ের চেহারা পেয়েছে মেয়ে, মানুষের জগতের এই সাধারণ নিয়মের সত্যটা যে সঞ্জীবনের জীবনে একটা অভিশাপের জয় ছাড়া আর কিছু নয়। রঞ্জুকে দেখলে ভয় করবে, রঞ্জুকে দেখতে চোখ ঘিন-ঘিন করে উঠবে, এ শাস্তি কেমন করে সহ্য করবেন সঞ্জীবন? বুকের ভিতরে এখন হুইস্কির নেশার জ্বালা থাকলে চেঁচিয়ে বলে দিতে পারতেন সঞ্জীবন—বুঝতে পারছো কি বড়দি; চারু রায়ের মেয়ে আমার কী ভয়ানক ক্ষতি করে দিল? আজ রঞ্জুকে চোখে দেখতেও আমার ভয় করছে।

চুপ করে বসে শুধু দেখতে থাকেন সঞ্জীবন, রঞ্জুর সংগে গল্প করে করে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বড়দি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তাই রঞ্জুর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেয়ে ভিজা মাধবীর ইউক্যালিপটাসের পাতার মর্মরও শান্ত হয়ে গিয়েছে।

সঞ্জীবন সেনও শান্ত হয়ে বসে থাকতে চাইছেন। কিন্তু পারলেন না। হঠাৎ চমকে উঠতে হলো। যেন ভিজা মাধবীর বুকটা ঝংকার দিয়ে হঠাৎ বেজে উঠেছে। পিয়ানো বাজছে।

উঠে দাঁড়ালেন সঞ্জীবন সেন। এগিয়ে গেলেন। একটা ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিলেন। দেখতেও পেলেন, সে ঘরের আলোর উপর রঙীন শেড টেনে দেওয়া হয়েছে। বড়দি একটা কোচের উপর বসে আছেন। আর, দু-হাত চালিয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছে রঞ্জু।

এক ফোঁটাও হুইস্কি খাননি সঞ্জীবন সেন, চোখ দুটোও লাল হয়ে ওঠেনি। তবু, বিনা নেশার চোখ দুটোও যেন মাঝে মাঝে ভুল করে দেখে ফেলছে, রঞ্জু যে ঠিক সেই মানুষটারই মত বিহ্বল দুটো চোখ নিয়ে একমনে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। কিসের সুর বাজাচ্ছে রঞ্জু? ঠিক যে সেইরকমই একটা সোনাটা বলে মনে হয়।

ঘরটাকে একটা হেঁয়ালির ঘর বলে মনে হয়। দেখতে আশ্চর্য লাগে আর ভয় করে। ঘেন্না করে আর ভাল লাগে। শান্তি পাওয়া যায়, আর ভয়ানক অস্বস্তি হয়। রঞ্জুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সঞ্জীবন, কিন্তু ঘরের ভিতরে আর ঢুকলেন না।

জীবু ঘরের ভিতর না এসে চলে গেল কেন? বড়দির মনে একটা খট্‌কা লেগেছে। দরজার পর্দার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর হঠাৎ ওভাবে একেবারে টলমল হয়ে চলে গেল জীবু: স্টিফান কি আলমারির লুকোনো চাবিটা বের করে দিয়েছে? না, আলমারির কাচ ভেঙে নিয়ে বোতল বের করে ফেলেছে জীবু?

ছি-ছি, ডাক্তার এত করে বলে গিয়েছেন, ও-জিনিস এখন আর স্পর্শ না করাই ভাল; নইলে শরীরের ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। জীবুর কি তবুও একটু ভয় হলো? একটুও না।

উঠলেন বড়দি; এগিয়ে যেয়েই দেখতে পেলেন, বারান্দার একটি চেয়ারে চুপ করে বসে আছে তাঁর বাহান্ন বছর বয়সের দুরন্ত অবাধ্য ভাই, কিন্তু কী ভয়ানক দুঃখী ভাই।

কিন্তু সঞ্জীবনের হাতে হুইস্কির গেলাস নেই। হাত দুটোকে শক্ত করে বুকের উপর চেপে ধরে যেন একটি সুকঠিন গ্র্যানাইট হয়ে বসে আছেন সঞ্জীবন।

বড়দি—কি হলো জীবু?

সঞ্জীবন—কিছু না।

বড়দি—এখানে এভাবে চুপ করে বসে আছ কেন? ও-ঘরে চল।

সঞ্জীবন—না।

বড়দি—রঞ্জু কী সুন্দর মিষ্টি সুর বাজাচ্ছে, শুনবে চল।

সঞ্জীবন—না।

বড়দি—রঞ্জুর সংগে একটু গল্প করবে, চল।

সঞ্জীবন—না।

বড়দি ডাকেন—রঞ্জু, এখানে এস।

সিল্কের শাড়ির আঁচল দুলিয়ে ছুটে আসে রঞ্জু।

বড়দি বলেন—বসো। তোমার কার্সিয়ংয়ের গল্প বল, শুনি।

রঞ্জু একটা চেয়ারে একটু বসে নিয়েই ছটফট করে উঠে দাঁড়ায়। —না, এখন গল্প করবো না। বাবার একটা ফটো তুলবো।

ক্যামেরা নিয়ে এসে সঞ্জীবনের সামনে দাঁড়িয়েই রঞ্জু চেঁচিয়ে ওঠে। —বুকের উপর থেকে হাত দুটো নামিয়ে দাও বাবা। বিশ্রী দেখাচ্ছে।

সঞ্জীবনের হাত দুটো সেই মুহূর্তে কেঁপে ওঠে আর শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে।

রঞ্জু বলে—আঃ, ওরকম স্টিফ হয়ে বসে আছ কেন? চেয়ারের পিঠে গা হেলিয়ে দাও।

তখনি চেয়ারের কাঁধের উপর একটা হাত তুলে দিয়ে আর গা হেলিয়ে বেশ একটু কাত হয়ে বসেন সঞ্জীবন।

রঞ্জু—পাইপটাকে ওরকম শক্ত করে খিমচে ধরে রয়েছো কেন? মুঠোটা ঢিলে করে দাও, একটু আলগা করে ধর।

পাইপটাকে বেশ আলগা করেই ধরে রইলেন সঞ্জীবন। কঠোর গ্র্যানাইট যেন রঞ্জুর এক-একটা হুকুম আর ধমকের শব্দ শুনে চমকে উঠছে আর নরম কাদা হয়ে যাচ্ছে।

রঞ্জু বলে—এবার তাকাও; ক্যামেরার দিকে নয়। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক। ভাল করে চোখ খুলে তাকাও।

দুই চোখ অপলক করে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সঞ্জীবন। ক্যামেরা ক্লিক করেই এগিয়ে আসে রঞ্জু।—কাল সকালে তোমাকে তিব্বতী টুপিটা পরিয়ে লনের উপর তোমার একটা ফটো নেব।

—তুমি আমাকে কী পেয়েছো, রঞ্জু? আমি কি একটা খোকা? রঞ্জুর একটা হাত ধরে আর রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন সঞ্জীবন।

রঞ্জু—তুমি একটি বোকা। সব সময় এত গম্ভীর হয়ে বসে থাক কেন?

বড়দি এতক্ষণ মুখ টিপে হাসছিলেন, এইবার একেবারে মুখে খুলে হেসে ওঠেন—খুব করে বল রঞ্জু; আরও বল; সেনসাহেব একটু ভাল করে বুঝুন, মিছিমিছি এত গম্ভীর হয়ে থাকবার কোন মানে হয় না।

সঞ্জীবন হাসেন—বেশ, কথা রইল, আর কোনদিন গম্ভীর হব না।

রঞ্জু—মনে থাকে যেন।

সঞ্জীবন—নিশ্চয়।

রঞ্জু—আমি তাহলে এখন যাই, তুমি পিসির সঙ্গে গল্প কর।

সঞ্জীবন—তুমিও এখানে বসো, দু'চারটে বাঘের গল্প শোনো।

রঞ্জু—শুনবো; কিন্তু নমিতাকে একটা চিঠি লিখে আসি।

সঞ্জীবন—কে নমিতা?

রঞ্জু—কলকাতার নমিতা; আমার বন্ধু। নমিতাও কনভেণ্টে পড়ে।

কলকাতার বন্ধু নমিতাকে চিঠি লিখতে বেশ দেরি হয়েছে রঞ্জুর; তাই আর এই বারান্দাতে নয়, রাতের খাবারের টেবিলের কাছে বসে, খাওয়া শেষ হবার পরও প্রায় দুটি ঘণ্টা ধরে বাঘের গল্প বললেন সঞ্জীবন। টাউন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ছাড়োয়া জঙ্গলের বাঘ একবার সঞ্জীবনের একটা সাইকেলকে একলা পেয়ে জঙ্গলের প্রায় তিন মাইল ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা কুলের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল।

রঞ্জুর হাসি থামে। দেয়ালের ঘড়িতে রাত এগারটার সংকেতও ঢং-টাং করে বাজতে থাকে। বড়দি বলেন—না আর নয়। আজকের মত তোমার গল্প থামিয়ে রাখ, জীবু।

আজও মাঝরাতে একবার; আর শেষরাতে একবার বিছানা থেকে নেমে পাইপ ধরিয়েছেন সঞ্জীবন। কিন্তু সে-ঘরের খাটের বিছানাতে নয়, অন্য একটা ঘরের খাটে নতুন করে পাতা একটা বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছে, রাত জেগে সোফার উপর বসে থাকবার সুবিধে পাননি। বড়দি আগেই শাসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়দির শাসানির জন্যে নয়, রঞ্জুরই ভয়ে এই ঘরের ভিতরে ঢুকে এই নতুন বিছানায় গড়িয়ে পড়তে হয়েছে। বড়দি স্পষ্ট করে না বলেও বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাত জেগে সোফার উপর বসে থাকলে হয়তো রঞ্জু নিজেই এসে ধমক দেবে। তখন তো রঞ্জুর কথা না শুনে পার পাওয়া যাবে না।

বড়দি ঘুমিয়ে আছেন, রঞ্জু ঘুমিয়ে আছে। উঁকি দিয়ে কেউ দেখছে না। শুধু এক ভিলা মাধবীর অন্ধকারটাই যেন দেখতে পাচ্ছে, সঞ্জীবন সেনের পাইপের মুখটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। সেই পুরনো জ্বালা জেগেই আছে। চারু রায়ের মেয়েকে ক্ষমা করতে পারবেন না সঞ্জীবন সেন।

বড়দির কাছ থেকে একটা কথা জানতে পেরে খুশি হয়েছেন সঞ্জীবন, রঞ্জু কোনদিনও ওর মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। সঞ্জীবনও তো নিজের চোখে দেখেছে, আয়া বুড়িটা মরে গিয়েছে শুনে কত কেঁদেছিল রঞ্জু। কিন্তু চারু রায়ের মেয়েকে দেখতে না পেয়ে এই আট বছরের মধ্যে কোনদিনও কাঁদেনি। শুধু সেই প্রথমবার কনভেণ্টে যাবার আগে বড়দিকে একবার শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল, মা কবে আসবে?

নমিতা নামে একটি বন্ধু আছে রঞ্জুর। কিন্তু নমিতার কাছে কি কোনদিনও বলতে পেরেছে রঞ্জু, কোথায় ওর মা? নিশ্চয় বলতে হয়েছে, মা নেই। থেকেও না-থাকা এমন একটা ভয়ানক মা'কে আরও ঘেন্না করতে শিখুক রঞ্জু।

হুইস্কির আলমারির চাবিটাকে খুঁজতে চেষ্টা করেন সঞ্জীবন; কিন্তু খুঁজে পান না।

কিন্তু ভোরের আলোর ছোঁয়া লেগে ভিলা মাধবীর ইউকালিপটাসের কুয়াশা-ভেজা পাতা চিকচিকিয়ে উঠতেই সঞ্জীবন সেনের এই রাতজাগা নিদারুণ ঘৃণার নীরব ধ্যান কোথাও যেন পালিয়ে গিয়ে আর মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও সঞ্জীবন সেনের আর গম্ভীর হয়ে থাকবার সাধ্যি হয়না। একটু আনমনা হবারও উপায় নেই। লনের চারদিকে ঘুরে-ঘুরে রঞ্জুর সঙ্গে বেড়াতেই হয়। রঞ্জুর প্রত্যেকটি হাসির সঙ্গে হাসতে হয়। তিব্বতী টুপি মাথায় দিয়ে ফটো তুলতে হয়েছে। শুধু ছাড়োয়া জঙ্গলের বাঘের গল্প নয়; পালামৌ জেলার জঙ্গলের বাইসন শিকারের গল্পও বলতে হয়েছে। ওই যে দেখা যাচ্ছে, খুব কাছেই, জোড়া পাহাড়ের একটা পাহাড়ের মাথায় অনেককাল আগের একটা বুরুজ দাঁড়িয়ে আছে, তারই ভিতরে প্রকাণ্ড একটা সাপ মেরেছিলেন সঞ্জীবন, প্রকাণ্ড একটা পাইথন।

প্রায় রোজই সকালে স্টিফান খানসামাকে রান্নার উপদেশ দিয়ে বড়দি কিচেনের বাইরে এসে দেখেছেন, রঞ্জুর ফটো তুলছে জীবু। রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যামেরা ধরেছে জীবু; যেন দুটো মুগ্ধতার চোখ রঞ্জুর মুখটাকে দেখে দেখে অনেকদিনের অদেখার শোধ তুলছে। জীবু যেন একেবারে প্রাণের সাধ মিটিয়ে রঞ্জুর মুখটাকে দেখছে আর হাসছে। বাঃ; এক-এক সময় সন্দেহ হয় বড়দির, চারু রায়ের মেয়ের মুখের সঙ্গে রঞ্জুর মুখের মিল আছে বলেই কি এত খুশির হাসি হাসছে সঞ্জীবন? যেমন সঞ্জীবনের রাগের, তেমনই সঞ্জীবনের হাসিরও কোন তাল খুঁজে পাওয়া যায় না।

থাক, তবু ভাল। শুধু মনমরা হয়ে আর মুখভার করে একটা যুগ পার করে দেবার পর বড়দির ভাই জীবু আজ হাসছে। রঞ্জুকে দেখতে ভয় করবে, ইস্, কী সব অদ্ভুত কথা! কই, এখন ভয় করছে না? বড়দির মুখটাও শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে হাসতে থাকে।

মাদার মণিকা ঠিক তারিখেই দেখা দিলেন, আর ঠিক পরের দিনই রঞ্জুকে নিয়ে কার্সিয়ং চলে গেলেন। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা সিংহানর সড়ক ধরে বেড়িয়ে বাড়ি ফেরবার সময় আদিত্যবাবু বলেন—কই? ভিলা মাধবীতে আজ পিয়ানো বাজে না কেন? সেন সাহেবের মেয়ে কি চলে গেল?

ভিলা মাধবীর মাধবী নেই, তবু নামটা ভিলা মাধবী। আদিত্যবাবুর মত মানুষ, যিনি এখন ভাল করেই জানেন যে, মাধবীলতা নয়, সেন সাহেবের মেয়ে রঞ্জিতাই ওই একটা মাস পিয়ানো বাজিয়েছে, তিনিও বলেন—ভিলা মাধবী।

[আট]

সঞ্জীবন সেনের জীবনে আর কাজ নেই, শিকার নেই, হুইস্কিও নেই; শুধু আছে একটি অপেক্ষা, রঞ্জু আবার কবে আসবে?

এই অপেক্ষার তৃপ্তি হয়ে রঞ্জুও প্রতি বছরেই ঠিক সময়ে সঞ্জীবন সেনের চোখের কাছে দেখা দেয়। দু-এক মাস থাকে, তারপর চলে যায়। কনভেন্টের মিসেস ডি'সিলভা জানিয়েছেন, কোন চিন্তা করবেন না; রঞ্জিতার জন্যে আমাদের যত্নের অন্ত নেই। রঞ্জিতা নিজেও ফুলের মত সুখী, হ্যাপি লাইক এ ফ্লাওয়ার।

হাঁ, রঞ্জু এখন আর কনভেন্টের স্কুলের ছাত্রী নয়। স্কুলের পড়া কবেই শেষ হয়ে গিয়েছে। রঞ্জু এখন কনভেন্টের স্কুলেরই একজন শখের শিক্ষিকা।

সঞ্জীবন বলেছিলেন; তাই বড়দি কনভেন্টের মিসেস ডি'সিলভাকে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন : খুবই আনন্দের কথা, রঞ্জিতা এখন ফুলের মত সুখী; এই সুখী ফুলের জন্যে আপনাদের যত্নেরও অন্ত নেই। তবু, বিশেষ অনুরোধ এই যে, ফুলের জন্যে আপনাদের একটু সাবধানতাও যেন থাকে। মনের কথাটা আপনাকে স্পষ্ট করেই বলে দিতে চাই; রঞ্জিতা যেন নিজের ইচ্ছেতে কোন কাণ্ড না করে ফেলে। বিশ্বাস করি; কনভেন্টের মেয়েরা বাইরে মেলা-মেশা করবার সুযোগ পায় না। আশা করি, আপনাদের যত্নের ফুল সব সময় শুধু আপনাদেরই চোখের কাছে থাকবে আর হাসবে। যতদিন না রঞ্জিতার বিয়ের ব্যবস্থা করছি, ততদিন রঞ্জিতাকে সাবধানে রাখবার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করবেন। ধন্যবাদ।

জ্ঞানবাবু দেখেছেন, সেন সাহেবের মাথাটা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ডাক্তার ঘোষ বলেছেন, সেন সাহেব প্রায় পাঁচ বছর হলো মদ ছেড়ে দিয়েছেন। তবে? সেন সাহেবের এই বয়সেই মাথার সবটা সাদা হয়ে গেল কেন?

আদিত্যবাবু—এখনও তো ষাট হয়নি সেন সাহেবের।

জ্ঞানবাবু—না না, ষাট কেন হবে? পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন কিংবা বড় জোর সাতান্ন-আটান্ন হবে।

আদিত্যবাবু—তাহলে মেয়েটিরও তো বেশ বয়স হয়েছে।

জ্ঞানবাবু—হ্যাঁ, তেইশ-চব্বিশ তো হবেই।

ঠিকই হিসেব করেছেন জ্ঞানবাবু। কদিন আগে রাঁচি থেকে বড়দির চিঠি পেয়েছেন সঞ্জীবন সেন—রঞ্জুর বয়স চব্বিশে দাঁড়িয়েছে। এখন বিয়েটা দিয়ে দিলেই হয়। আর দেরি করা চলে না। দেরি করা উচিতও নয়।

বড়দির চিঠি পড়ে খুশি হতে পারেননি সঞ্জীবন। কে বলছে দেরি করতে? সঞ্জীবন তো এই পাঁচ বছরের প্রত্যেক বছরেই অন্তত তিন-চারবার বড়দিকে অনুরোধ করেছেন, রঞ্জুর জন্যে একটি পাত্র খুঁজে দাও। বড়দিও বলেছেন—খোঁজ করা হচ্ছে। কোন চিন্তা করো না। মণ্টু বলেছে, রেলওয়েতে বেশ ভাল চাকরি করে, চমৎকার একটি ছেলে আছে।

সঞ্জীবনও তাই বেশ একটু বিচলিত ভাষায় বড়দির চিঠির জবাব দিয়ে দিলেন।—আমার তো অন্ত যাবার সময় হয়ে এল, বড়দি। আমি আর এখানে এ-বাড়িতে থাকতে চাই না। সিমলা স্যানাটোরিয়ামে টাকা জমা করে দিয়েছি। যত তাড়াতাড়ি পারি, সেখানে চলে যেতে চাই। কিন্তু তার আগে রঞ্জুর বিয়েটা হয়ে গেলেই কি ভাল হতো না? তুমি যে বলেছিল, মণ্টুর চেনা খুব ভাল একটি ছেলে আছে, সেই ছেলের সঙ্গে রঞ্জুর বিয়ে ঠিক করে ফেললেই তো হয়।

সঞ্জীবনের চিঠি পড়ে কেঁদে ফেললেন বড়দি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জবাবও দিয়ে দিলেন।—হ্যাঁ, বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গিয়েছে।

বড়দির চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছেন সঞ্জীবন; কিন্তু যেন একটু চমকেও উঠেছেন। চিঠিটাকে একটা হঠাৎ-আশ্চর্যের বার্তা বলে মনে হয়। একদিনের মধ্যেই কেমন করে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেললেন বড়দি?

ঠিক দু'দিন পরে বড়দির গাড়িটাও হঠাৎ

ব্যস্ত হয়ে রাঁচি থেকে ছুটে এসে ভিলা মাধবীর লনের কাছে থামে। বড়দি এসেছেন। দেখতে পেয়ে সুজীবন সেনের চোখ দুটো চমকে ওঠে। আসবার আগে টেলিফোনে একটা খবরও দেননি বড়দি। বড়দির এই হঠাৎ আবির্ভাবও যেন একটা হঠাৎ-বিস্ময়ের আগমন।

সুজীবন এগিয়ে যেয়ে আর হাত বাড়িয়ে বড়দিকে ধরে গাড়ি থেকে নামালেন।—তুমি এত হাঁপাচ্ছো কেন বড়দি?

বড়দির শরীরটা বেশ কুঁজো হয়ে গিয়েছে। বেশ চেষ্টা করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বড়দি।—হাঁপাবার বয়স হয়েছে জীবু, আমি যে তোমার চেয়ে পনেরো বছরেরও বড়।

ভাইয়ের হাত ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকেন বড়দি; বারান্দায় উঠেই একটা কোচের উপর বসে পড়েন। নিজের গাড়িতে বসে রাঁচি থেকে আসতেই কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বড়দি।

কিন্তু ক্লান্তির কথা তুলে সুজীবনের সঙ্গে গল্প করবার জন্য বড়দি আসেননি। যে কথাটা বলতে এসেছেন, সেই কথাটাই বলে দিলেন।—রঞ্জুর বিয়ের তারিখও ঠিক হয়ে গিয়েছে। তুমি এবার এদিকের সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেল।

সুজীবন—রেলওয়েতে কাজ করে, সেই চমৎকার ছেলেটির সঙ্গেই কি......।

বড়দি—না। সে ছেলে নয়। এ ছেলে হলো, রঞ্জুরই বন্ধু নমিতার দাদা দেবাশিস বসু। দেবাশিসের বাবা কলকাতার একজন সিটডেডোর। দেবাশিস হলো অটোমোবিল এঞ্জিনিয়ার। দেখতে সুন্দর। স্বাস্থ্য ভাল।

সুজীবন—এ ছেলের খোঁজও কি মণ্টু দিয়েছে।

বড়দি—না। খোঁজ হঠাৎ পাওয়া গেল। যাই হোক, ছেলে যে খুবই ভাল, তাতে একটুও সন্দেহ নেই।

বড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুজীবন। সুজীবনের চোখের পাতা যেন থরথর করে কাঁপছে। যে চোখে অনেকদিন হলো কড়া হুইস্কির নেশার কোন জ্বালা ফুটে ওঠেনি, সেই চোখ লালচে হয়ে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। চেঁচিয়ে ওঠেন সুজীবন।—রঞ্জু নিজেই বোধহয় খোঁজ দিয়েছে?

বড়দি—হ্যাঁ।

সুজীবন—ভালবাসা হয়েছে?

বড়দি—হ্যাঁ।

সুজীবন—কার ইচ্ছেতে এ ব্যাপার হলো?

বড়দি—নমিতা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, রঞ্জুর ইচ্ছে। তাই দেবাশিস রাজি হয়েছে।

সুজীবন—কবে থেকে এ ব্যাপার চলছে?

বড়দি—নমিতা লিখেছে; প্রায় তিন বছর হলো।

সুজীবন—কবে কোথায় কেমন করে দেবাশিসের সঙ্গে রঞ্জুর দেখা হলো?

বড়দি—কনভেণ্ট থেকে ছুটির সময় নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে যে-ট্রেনে কলকাতায় ফিরতো দেবাশিস, সেই ট্রেনেই রঞ্জুর সঙ্গে দেবাশিসের চেনা-শোনা হয়েছে।

সুজীবন—তারপর?

বড়দি—দেবাশিসের কাছে অনেক চিঠি লিখেছে রঞ্জু। কাজেই......।

সুজীবন—কি?

বড়দি—ছেলেটিও যখন শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে; তখন তো আর কোন সমস্যা নেই।

সুজীবন—বেশ চমৎকার গল্প শোনালে বড়দি। বাঃ। মায়ের কীর্তিতে আর মেয়ের কীর্তিতে একটুও অমিল নেই। তুমিও কি ভুলে গিয়েছ যে চারু রায়ের মেয়ে একদিন একটা ট্রেনের কামরাতে সুজীবন সেনকে দেখে আর আলাপ করে, তারপর ক্রমে ক্রমে প্রচণ্ড ভালবাসা জমিয়ে ফেলেছিলেন?

সারা গায়ে যেন আগুন লেগেছে, ছটফট করে উঠে দাঁড়ান সুজীবন। চেয়ারটার গায়ে একটা লাথি মেরেই সরে যান। ঘরের ভিতরে ঢুকে টেবিলের ফুলদানিটা তুলে নিয়ে আলমারির কাঁচের উপর আছাড় মারেন। ঝনঝনিয়ে আর্তনাদ করে আর টুকরো-টুকরো হয়ে আলমারির কাঁচ ঘরের মেজের কার্পেটের উপর ছড়িয়ে পড়ে। চিৎকার করেন সুজীবন।—স্টিফান, গেলাস দিয়ে যাও।

কিন্তু আলমারির কোথাও কোন হুইস্কির বোতল নেই। খানসামা স্টিফানও ভয়ে-ভয়ে দূরে সরেই থাকে, কাছে আসে না। বড়দি দুই হাতে মুখ ঢেকে বারান্দার কোচের উপর অনড় হয়ে বসে থাকেন, আর হাঁপাতে থাকেন।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আবার বড়দির সামনে দাঁড়িয়ে যেন টলতে থাকেন সুজীবন।— খুব ভাল কথা বলেছ, বড়দি। যখন নিজেই ইচ্ছে করে ভালবেসে বিয়ে করছে রঞ্জু, তখন আর কোন সমস্যাই থাকতে পারে না। শুধু একদিন স্বামীর সঙ্গে রোম বেড়াতে যাবে, তারপর ফিরে এসেই স্বামীকে ছাড়বে। আর ওই হতভাগা দেবাশিস সারা জীবন অপমানের জ্বালায় জ্বলবে।

বড়দির চোখ-ঢাকা দুই হাত ভিজে গিয়েছে। তবু হাত সরিয়ে নেন না বড়দি।

সুজীবন—তুমি কাঁদলে হবে কি? চারু রায়ের মেয়ে যে শুনতে পেলে হেসে হেসে লুটিয়ে পড়বে।

বড়দি—তুমি এখন একটু চুপ কর, জীবু।

সুজীবন—আমি একেবারেই চুপ হয়ে যাব বলে কয়েকটা কথা বলে নিচ্ছি। শুনতে চাও তো শোন।

বড়দি—বল।

সুজীবন—মণ্টুকে এখানে এসে রঞ্জুর বিয়ের ব্যবস্থা করতে বল। আমি ওর মধ্যে নেই।

বড়দি—না থাকলে চলবে কেন?

সঞ্জীবন—না। আমি চলে যাব।

বড়দি—তা হয় না।

—হতে হবে। এমন বিয়ে দেখতে আমার ভয় করবে। এমন বিয়ের আসরে থাকতেও আমার ঘেন্না করবে।

—এখনই কেন উতলা হয়ে ওসব বাজে কথা ভাবছো?

—আমি হুইস্কি খাইনি, বড়দি। বাজে কথা ভাবছি না, বলছিও না।

—রঞ্জুর উপর তুমি নিষ্ঠুর হতে পারবে না।

—না পারি পারবো না; কিন্তু রঞ্জুকে ক্ষমা করতেও পারবো না।

—এমন ভয়ানক কথা বলো না। রঞ্জুকে ক্ষমা করে দাও।

—তা হয় না বড়দি। ওর মা'কে আমি এজীবনে ক্ষমা করতে পারিনি, পারলাম না, পারবোও না। রঞ্জুকেই বা ক্ষমা করবো কেন? রঞ্জু যে সেই রাক্ষুসীটারই রক্তের বিষ। কথা নেই বার্তা নেই, ফট্ করে এক ভদ্রলোকের ছেলেকে ভালবেসে বসে আছে। ছেলেটার জন্যে আমার দুঃখ হয় বড়দি। আজ বেচারার একটু সন্দেহ করবারও সাধ্য নেই যে, একদিন ওকে একটা সঞ্জীবন হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

বড়দি এবার রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন।—চুপ কর, জীবু।

সঞ্জীবন—হ্যাঁ, চুপ করতেই হবে। রঞ্জু শেষ পর্যন্ত ওর মায়ের পক্ষেই চলে গেল। চারু রায়ের মেয়ে আজ বিনা মামলাতেই আমাকে হারিয়ে দিল। আমার আর কিছু বলবার নেই। শুধু শেষ কথাটি বলে দিচ্ছি: রঞ্জুর বিয়ে তোমরা দেখবে, আমি দেখবো না।

[নয়]

ভিলা মাধবীর কয়েকটা ঝাউয়ের মাথায় মাকড়সার জাল ঝুলেছে। সকালবেলার প্রথম রোদে কুয়াশা যখন গলে যায়, তখন ওই মাকড়সার জাল থেকে ছোট-ছোট জলের ফোঁটা চিকচিক করে কেঁপে-কেঁপে ঝরে পড়ে।

কিন্তু মালী চমনরাম আর দেরি করেনি। ঝাউয়ের গায়ে মই লাগিয়ে উপরে উঠেছে আর লম্বা বাঁশের খোঁচা দিয়ে দিয়ে মাকড়সার সব জাল ছিঁড়ে মুছে আর সরিয়ে ঝাউগুলিকে ছিমছাম করে দিয়েছে।

মজুর লাগিয়ে বাগানের শুকনো পাতা রোজই ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়ে, আর দূরের পাঁচিলের এক কোণে জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে মালী চমনরাম। লনের ঘাস আর যত ফুলগাছের ঝাড় নতুন করে ছেঁটে দিয়েছে। বাগানটাও পরিচ্ছন্ন হয়ে হাসছে। উৎসব আসন্ন, আর সাতটা দিনও বাকি নেই। ভিলা মাধবীও তাই খুব তাড়াতাড়ি করে তৈরী হয়ে নিচ্ছে।
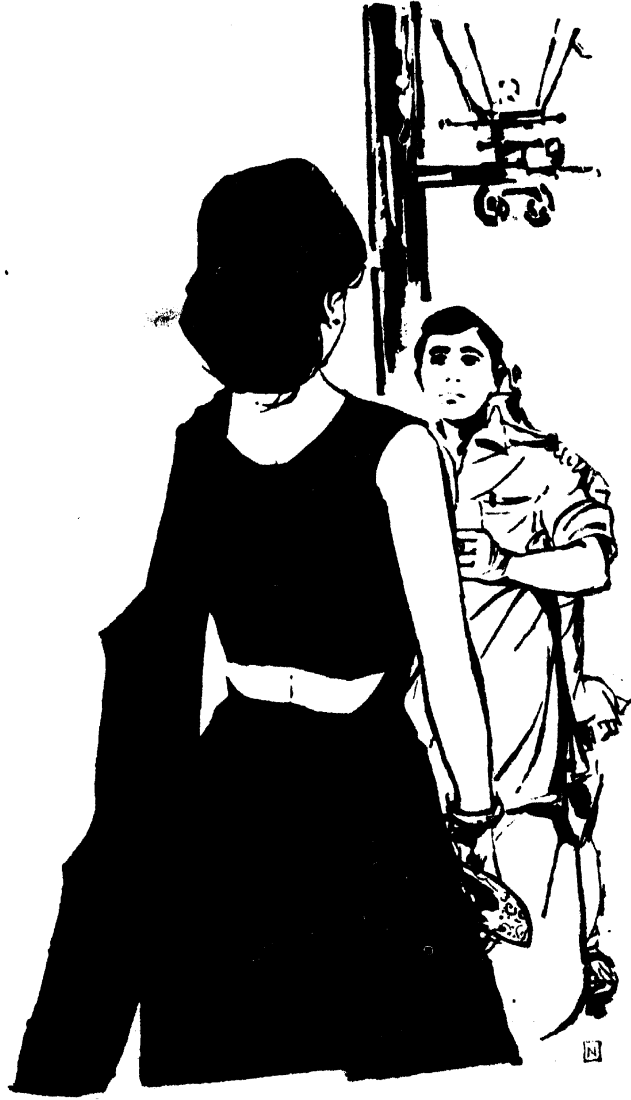
বেয়ারা শুকদেও খুব ব্যস্ত। লোক লাগিয়ে এত বড় বাড়িটার সব দরজা-জানালার কপাট খড়খড়ি আর শার্সি ঘসা-মোছা করিয়েছে শুকদেও। সব কার্পেটের ধুলো মুছে নেওয়া হয়েছে।

এরই মধ্যে রাঁচি থেকে মণ্টু একবার এসেছে আর টাউনের অনাদিবাবুকে ডেকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আবার রাঁচি চলে গিয়েছে। বাগানের ভিতরে একটা রঙীন সামিয়ানা তুলবেন অনাদিবাবু; আর চমৎকার করে ফানুস আলো আর সিল্কের ঝালর দিয়ে সাজিয়েও দেবেন।

ভিলা মাধবীর ইউক্যালিপটাস রোজ বিকালের বাতাসে আস্তে আস্তে মাথা দোলায়। বিকেলের পাখিগুলি গাছের পাতার ঝুর ঝুর শব্দের সঙ্গে ফুর্তি মিশিয়ে দিয়ে আর ডাকাডাকি করে উড়তে থাকে।

বড়দি তো আগে থেকেই আছেন। বড়দি'র টেলিগ্রাম পেয়ে এলাহাবাদ থেকে মণ্টুর শ্বশুর বিনয়বাবু এসে পড়লেন। রঞ্জু এখন বড়দির রাঁচির বাড়িতেই আছে। মণ্টুর বউ শোভা আর রঞ্জু একসঙ্গেই আসবে।
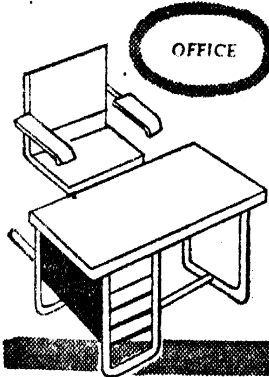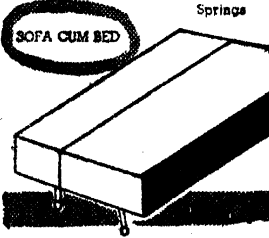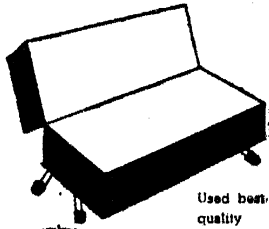
যা ব্যবস্থা করা দরকার তার সবই বড়দির সঙ্গে পরামর্শ করে বিনয়বাবু যথাসাধ্য করেছেন। ব্যবস্থা হয়েছে, কলকাতা থেকে যারা আসবে তারা জোন্স সাহেবের দিলখুশো ক্লাবের গেস্ট-হাউসে থাকবে। ওরা তো মাত্র সাতজন। দেবাশিস আর নমিতা; দেবাশিসের এক কাকা আর চারজন বন্ধু। কার্সিয়ং থেকে মিসেস ডি'সিলভাও আসবেন।

বড়দি বলেছেন, টাউনের অনেককেই নিমন্ত্রণ করা হোক। বিনয়বাবু তাই নাকি লাইব্রেরীর সবাইকে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। রেজিস্ট্রার গুপ্তবাবু শুধু একা আসবেন না; তাঁর বাড়ির মেয়েরাও সবাই আসবেন।

ভিলা মাধবীর এত ব্যস্ততার মধ্যে শুধু একটি অলস উদাস স্তব্ধতা এক কোণে একেবারে নীরব হয়ে পড়ে আছে। একটি ঘরের ভিতরে কোচের উপর চুপ করে বসে থাকেন সঞ্জীবন সেন। এক হাতে পাইপ; আর-এক হাতে শিকারের একটা পত্রিকা। হিমালয়ের স্নো-লেপার্ডের জীবনের গল্প খুব মন লাগিয়ে আর চোখে পুরু কাচের চশমা লাগিয়ে রোজই পড়ছেন সঞ্জীবন সেন।

ওই পুরু কাচের চশমার ভারেই যেন সঞ্জীবনের ঘাড়টা নুয়ে গিয়েছে, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে। সঞ্জীবন সেনের ওই শরীরে একটু টান হয়ে দাঁড়াবারও শক্তি যেন আর নেই। কোচের উপর বসে আছেন, যেন তিন ভাগ হয়ে ভেঙে পড়ে রয়েছেন সেই সঞ্জীবন সেন, একদিন যাঁর চেহারাকে একজন মিলিটারী জেনারেলের মত স্মার্ট চেহারা বলে মনে করেছিল কলেজের সায়েন্সের ছেলেরা।

কদিন আগে চলে যাবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন সঞ্জীবন। কিন্তু মণ্টুর শ্বশুর বিনয়বাবু অনেক করে বুঝিয়েছেন বলেই আবার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। বেশ মিনতি করে বুঝিয়েছেন বিনয়বাবু।—আপনি অন্তত বিয়ের দিনটা পর্যন্ত থাকুন সঞ্জীবনদা; নইলে লোকের চোখে ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাবে। আপনাকে কিছু করতে হবে না, কিছুই দেখতে হবে না, আপনি যেমন বসে আছেন তেমনই শুধু বসে থাকুন।

তাই বসে আছেন সঞ্জীবন সেন। তাঁর কাছে আজ এই ভিলা মাধবী যেন তকতকে ঝকঝকে একটি জেলবাড়ি, তারই একটি আবছায়াময় কুঠুরির ভিতরে পনর বছরের শাস্তির মেয়াদ-খাটা একটি বুড়ো কয়েদীর মত খালাস পাওয়ার দিনটির অপেক্ষায় বসে আছেন। সত্যিই, সঞ্জীবনের এই ঘরের জানালার পর্দা সব সময়েই টানা থাকে; বাইরের আলো-বাতাস হু হু করে ঢুকে পড়তে পারে না।

বড়দির গাড়িটা রাঁচি থেকে ছুটে এ... যখন লনের কাছে থেমেই ... বাজিয়ে ভিলা মাধবীর বাতাসে এব... খুশির সাড়া জাগিয়ে তোলে, তখন বড়ো... বুকটা দুরু দুরু করে কাঁপতে থাকে। জানে... বড়দি, কারা এসেছে। ঘণ্টা তিন আ... রাঁচি থেকে ফোন করেছিল মণ্টুর ... শোভা– আমরা রওনা হচ্ছি।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসছে মণ্ট... বউ শোভা, মণ্টুর ছেলেটা; আর রঞ্জু।

মিসেস ডি'সিলভা অনেকবার খুশি হ... যে-কথাটা চিঠিতে লিখতেন, সেটা একেবা... বর্ণে বর্ণে সত্য একটি কথা। রঞ্জুর মুখে... দিকে একবার তাকালেই বুঝতে আর বাকি থাকে না, মেয়েটা সত্যিই ফুলের মত সুখী; হ্যাপি লাইক এ ফ্লাওয়ার। চব্বিশ বছ... বয়সের মেয়ে; ওর ভালবাসার আশ... ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। ওর স্বপ্ন যাকে কামনা করেছে, তাকেই জীবনে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ভগবান জানে এর মধ্যে কী ভুল থাকতে পারে।

বড়দির কাছে এসেই জিজ্ঞেস করে রঞ্জু—বাবা কোথায়, পিসি?

বড়দি—ওঘরে আছে। কিন্তু......।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন বড়দি, কিন্তু বলা হলো না। রঞ্জু ওর মুখের ওই ফোটা-ফুলের হাসি উথলে দিয়ে ছুটে চলে গেল।

সঞ্জীবনের কাছে এসে দাঁড়ায় রঞ্জু। সঞ্জীবনের হাতের পত্রিকাটার দিকে একবার তাকায়। হাত বাড়িয়ে পত্রিকাটাকে সঞ্জীবনের হাত থেকে একটান দিয়ে তুলে নেয় রঞ্জু। —এখনও স্নো-লেপার্ডের ছবি দেখছো? দেখছো না, আমি এসেছি?

সঞ্জীবনের মুখের দিকে আর-একবার তাকিয়েই চমকে ওঠে রঞ্জু—কী হলো? তুমি এত গম্ভীর কেন বাবা?

সঞ্জীবন বলেন—তুমি এখন তোমার পিসির কাছে গিয়ে বসো। আমাকে একা থাকতে দাও।

—কি বললে? সঞ্জীবনের কাঁধের উপর হাত রেখে আস্তে একটা ঠেলা দেয় রঞ্জু।—তুমি বলেছিলে না, কখখনো গম্ভীর হবে না?

রঞ্জুর চোখ দুটো যেন ভয়ানক বিস্ময়ের খোঁচা লেগে একটা ব্যথা পেয়েছে; আর গলার স্বরেও একটা অভিমানের করুণ সুর বেজে উঠেছে।

বড়দি ঘরের ভিতরে ঢুকেই রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে কথা বলেন।—ভুল করছো রঞ্জু। জীবুর সঙ্গে ওভাবে কথা বলো না। জীবুর শরীর খুব খারাপ।

সঞ্জীবনের একটা হাত শক্ত করে ধরে রঞ্জু।—তাই তো দেখছি, পিসি। তোমার...

শরীর এত খারাপ হয়ে গেল কেন বাবা?

বড়দি—আমার কথা শোন, রঞ্জু; জীবুকে এখন এভাবে বিরক্ত করে কথা বললেই তো ওর শরীর ভাল হয়ে যাবে না।

সঞ্জীবনের হাত ছেড়ে দিয়ে রঞ্জু এবার সঞ্জীবনের কানের কাছে মুখ এগিয়ে খুব মৃদুস্বরে কথা বলে—আচ্ছা, আমি এখন যাই, কেমন? পরে আসবো।

সারা দুপুর, সারা বিকেল, আর সারা সন্ধ্যা: রঞ্জু বারবার বড়দিকে শুধু দুটি কথা জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করেছে।—বাবা এত গম্ভীর কেন, পিসি? বাবার শরীর হঠাৎ এত খারাপ হয়ে গেল কেন পিসি?

বড়দি বলেন—ভগবানের হাত, তুমি আর আমি কি করতে পারি বল?

রঞ্জু—কিন্তু আমার যে একটুও ভাল লাগছে না। কিছুই ভাল লাগছে না।

বড়দি—তুমি মন খারাপ করো না।

সন্ধ্যাবেলা লনের কাছে বসে রঞ্জুকে একটা কথা নিজেই ইচ্ছে করে বলে দিলেন বড়দি।—জীবুর এখন সিমলা স্যানাটোরিয়ামে চলে যাবার কথা। ওখানে থাকলেই শরীর ভাল হয়ে যাবে। এতদিনে চলেও যেত। কিন্তু তোমার বিয়ের দিনটা পর্যন্ত থাকা উচিত বলেই এখনও এখানে আছে।

কথা বলতে গিয়ে রঞ্জুর গলার স্বর উদাস হয়ে যায়।—সবই কেমন যেন হয়ে গেল, পিসি।

বড়দি—তুমি দুঃখ করো না। আর, তোমার বাবাকেও কোন কথা জিজ্ঞেসা করবে না। দেখছো না, আমিও ওর সঙ্গে খুব কম কথা বলছি। কেউ কোন কথা বললে আজকাল ওর খুব অস্বস্তি হয়।

পিসির উপদেশ মনে রেখেছে রঞ্জু। রোজই সকালে একবার, আর সন্ধ্যেবেলা একবার সঞ্জীবনের ঘরে ঢুকে, সঞ্জীবনেরই পাশে কোচের উপর চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে রঞ্জু। তারপর চলে যায়।

কিন্তু, কি আশ্চর্য! পিসির যেন তাতেও আপত্তি।—বারবার জীবুর কাছে গিয়ে ওভাবে বসে থেকো না রঞ্জু। জীবুর অস্বস্তি হয়।

পিসির এই উপদেশ যেন একটা নির্মম মিথ্যের উপদেশ। রঞ্জু গিয়ে সঞ্জীবনের পাশে কোচের উপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলে অস্বস্তি বোধ করবেন সঞ্জীবন, এমন ভয়ানক বিস্ময় সহ্য করতে রাজি নয় রঞ্জু। রঞ্জু বেশ স্পষ্ট করেই বলে দেয়।—তা হয় না, পিসি। ওতে বাবার কোন অস্বস্তি হতেই পারে না। অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না। রুমাল তুলে বার বার চোখ মুছতে থাকে রঞ্জু।

বড়দিও আর কথা বাড়িয়ে রঞ্জুর সঙ্গে তর্ক করতে চান না। চুপ করেই থাকেন। জানেন বড়দি, এই তো, আর তো মাত্র একটা দিন। রঞ্জুকে আর এই নিষ্ঠুর উপদেশের কথাটা বলতে হবে না।

সকালবেলাতেই খবর দিলেন বিনয়বাবু—ওরা সবাই এসে গিয়েছে। মিসেস ভিসিলভাও এসেছেন। দিলখুশা ক্লাবের গেস্টহাউসের ব্যবস্থাও খুব ভাল হয়েছে। দেবাশিস ওর বন্ধুদের নিয়ে লেক দেখতে বের হয়েছে। নমিতা বলেছে, সন্ধ্যার পর সবারই সঙ্গে আসবে নমিতা; আগে আসতে একটু অসুবিধে আছে।

বড়দি—তা নমিতা একটু আগে না এলেও চলবে। শোভা তো আছে, রঞ্জুকে সাজিয়ে দিতে পারবে।

সন্ধ্যা হতেই শোভা এসে রঞ্জুকে একটা ঘরের ভিতরে ডেকে নিয়ে যায়। শোভা কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রে আর সাধাসাধি করেও রঞ্জুকে খুব বেশি সাজাতে রাজি করাতে পারলো না। রঞ্জু বলে—না বউদি। একটা নতুন শাড়ি পরেছি, এই যথেষ্ট। রং-টং মাখতে পারবো না।

শোভা আশ্চর্য হয়।—কেন?

—আমার ভাগ্য। বাবার মুখে হাসি নেই।

—ও'র তো শরীর খারাপ।

—সেই জন্যেই তো বলছি: বেশি সাজাসাজি করবার মানে হয় না। ভাল দেখায় না।

ভিলা মাধবীর গেট দিয়ে এক-একটি গাড়ি ঢুকছে আর লনের পাশে থামছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা একে একে আসতে শুরু করেছেন। মণ্টু ওদিকে ব্যস্ত আছে।

ভিলা মাধবীর বাগানে সামিয়ানার তলায় চেয়ার-পাতা আসর রঙীন আলোতে ঝলমল করছে। অনাদিবাবু সত্যিই বেশ সুন্দর করে আসর সাজিয়েছেন। যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে, সেখানে মস্ত বড় একটা কার্পেট পাতা হয়েছে। কার্পেটের চারদিকে আলো আর ফুলের স্তবকের একটা ঘেরান দিয়েছেন অনাদিবাবু।

বিনয়বাবু কিন্তু একটু উদ্বিগ্ন হয়েছেন, তাই একটি ঘরের ভিতরে বড়দির সঙ্গে কথা বলছেন।—সঞ্জীবনদা বলছেন, উনি সই-টই করতে পারবেন না।

বড়দি—তাতে অবিশ্যি বিয়ে ঠেকে থাকবে না। আপনি আছেন, মণ্টু আছে, মিসেস ভিসিলভাও থাকবেন; তিন সাক্ষীর সই থাকলেই বিয়ে হয়ে যাবে।

বিনয়বাবু দেখতে পাননি, বড়দিও না, ঘরের দরজার পর্দার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জু।

তাই বিনয়বাবু বেশ গলা খুলেই কথা বলেন আর আক্ষেপ করেন।—কিন্তু সঞ্জীবনদা বিয়ের আসরে এসে একবার বসবেনও না, এটা কেমন কথা?

বড়দি—জীবু কি তাই বলছে?

বিনয়বাবু—হ্যাঁ। আমি তো আমার সাধ্যমত অনেক অনুরোধ করে বোঝাতে

চেষ্টা করলাম, কিন্তু বুঝলেন না। রাজি হলেন না।

বড়দি—থাক তবে। জীবুকে আর ঘাটাবেন না। কোন লাভ হবে না।

বিনয়বাবু—কিন্তু......।

বড়দি—না। ঘা খাওয়া মানুষ, পনরটা বছর ধরে ওর মন জ্বলছে আর পুড়ছে। চারু রায়ের মেয়েকে এখনও জীবু যে কী ভয়ানক ঘেন্না করে, সেটা আমি দেখেছি, আপনারা দেখেন নি।

বিনয়বাবু—কিন্তু সেজন্যে নিজের মেয়ের বিয়ের ওপরেও রাগ করে আর অখুশি হয়ে......।

বড়দি—বুঝতে ভুল করছেন। চারু রায়ের মেয়ে ঠিক যেমনটি নিজে ইচ্ছে করে জীবুকে ভালবেসেছিল আর বার বার চিঠি লিখে জীবুকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল, রঞ্জুও যে ঠিক তাই করেছে। দেখলেন তো, চারু রায়ের মেয়ের সে ভালবাসা কী সাংঘাতিক একটা মিথ্যে। একটা মানুষকে অপমান করে মেরে রেখে দিয়ে কোথায় সরে পড়লো।

বিনয়বাবু হাসতে চেষ্টা করেন। —ওটা একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা মাত্র। সবাই কি আর চারু রায়ের মেয়ের মত......।

বড়দি—সেটা আমরা বুঝি বিনয়বাবু। কিন্তু যে মানুষ ঘা খেয়েছে, অপমানে পুড়েছে, ভালবাসার জঘন্য কান্ড দেখে যার বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছে, সে কি করে আজ খুশি হবে? জীবু যে খুব আশা করেছিল, রঞ্জু ওর মায়ের মত হবে না। যাই বলুন আপনি, আর আমিও জীবুর গোঁয়ার্তুমিকে যতই নিন্দে করি, আমিও তো দেখছি, আজ পর্যন্ত যা হয়েছে রঞ্জু, আর যা করলো রঞ্জু, সবই ঠিক ওর মায়েরই মত। দেখতেও ঠিক মায়ের মত; ভালবাসাবাসি করলো ঠিক মায়েরই মত। এর পর, অবিশ্যি ভগবান না করুন......।

দরজার পর্দা সরিয়ে রঞ্জু বলে ওঠে।—আর বলতে হবে না, পিসি। দুঃখ করো না। কোন চিন্তেও করো না।

চলে যায় রঞ্জু।

বিনয়বাবু চমকে ওঠেন। আর বড়দির চোখ দুটো ভয় পেয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপরেই কাঁদতে থাকেন আর ডাকতে থাকেন বড়দি—রঞ্জু, রঞ্জু, একবার আমার কাছে এসে একটা কথা শুনে যাও।

রঞ্জু আসে না। বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বড়দির কান্নার চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে। —এ কী বিপদ ডেকে আনলাম বিনয়বাবু! রঞ্জু কোথায় গেল?

বিনয়বাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জবাব দেন—সুজীবনদার ঘরে। কিন্তু আপনি বিচলিত হবেন না। আপনি বরং বারান্দায় এসে শান্ত হয়ে বসে থাকুন। ভদ্রলোকেরা আসতে শুরু করেছেন।

বুকের ভিতরে দুঃসহ একটা অপরাধের জ্বালা নিয়ে বারান্দার চেয়ারে বসে থাকেন বড়দি। শান্ত হয়ে থাকতেই চেষ্টা করেন।

বিনয়বাবু এসে বলে গেলেন, রেজিস্ট্রার গুপ্তবাবু এসে গিয়েছেন।

গুপ্তবাবুর বাড়ির মেয়েরাও গাড়ি থেকে নামছে। বড়দি তাঁর উতলা মনটাকে প্রাণপণে সংযত করে ডাকতে থাকেন।—ও শোভা, কোথায় তুমি?

মণ্টুর বউ শোভা ততক্ষণে নিজেই এগিয়ে যেয়ে গুপ্তবাবুর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

ভিলা মাধবীর ঝাউ আর ইউক্যালিপটাস দুলছে। মণ্টুর ছেলেটা এলোপাথাড়ি হাত চালিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। হর্ন বাজিয়ে আর ভিলা মাধবীর গেটের উপর আলো ছড়িয়ে দিয়ে এক-একটি গাড়ি ঢুকছে।

মণ্টু এসে ব্যস্তভাবে কথা বলে—সবাই এসে গিয়েছে। দিলখুসা ক্লাব থেকে আর কারও আসতে বাকি নেই। দেবাশিস আর ওর বন্ধুরা চা খাচ্ছে। দেবাশিসের কাকা বাবার সঙ্গে গল্প করছেন।

বউদি—বেশ তো, তুমিও এখন ওদিকেই থাক। এদিকে একটু দেরি আছে।

মণ্টু—কিন্তু নমিতা আর মিসেস ডিসিলভা রঞ্জুর কাছে একবার আসতে চাইছেন। কোথায় রঞ্জু?

বড়দির গলার স্বর কাঁপে।—জীবুর কাছে বসে আছে।

—কাঁদছে নাকি?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—এখন কাঁদতে বারণ করে দাও। ওসব পরে হবে।

বড়দি—দেখি। কিন্তু তোমরা এত তাড়াহুড়ো করো না মণ্টু।

মণ্টু চলে যেতেই, বড়দি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বুকভরা আতঙ্কের ভার সামলাতে গিয়ে টলে ওঠেন। দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর খুব আস্তে-আস্তে হেঁটে সুজীবনের ঘরের দরজার কাছে এসেই পর্দা সরিয়ে ডাক দিলেন বড়দি—রঞ্জু, এস।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় রঞ্জু—যাচ্ছি, পিসি।

হাসছে রঞ্জু; সুজীবনের হাতের উপর হাত রেখে বসে আছে। কে জানে এতক্ষণ ধরে সুজীবনের কাছে কী কথা আর কত কথা বলে নিয়েছে মেয়েটা। বড়দির চোখ দুটো শুধু আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে। জীবু কিন্তু তেমনই গম্ভীর হয়ে আর চুপ করে, একটা অবিচল পাথরের মত বসে আছে।

রঞ্জু বলে—তুমি বিশ্বাস কর বাবা, আমি তোমার চেয়েও বেশী ঘেন্না করি।

উঠে দাঁড়ায় রঞ্জু। ঘরের বাইরে এসেই বড়দির দিকে তাকিয়ে আর একটা হাঁপ ছেড়ে হেসে ফেলে।—বিয়ে হবে না পিসি

বড়দি নিশ্চয়ই মাথা ঘুরে প যেতেন। রঞ্জু হাত বাড়িয়ে বড়দির এক হাত ধরে ফেলে।—

বড়দিকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যে বারান্দার চেয়ারের উপরে বসিয়ে দিয়েই রঞ্জু বেশ শান্তভাবে কথা বলে—বউদির বাবা বলে দাও, বিয়ে হবে না। যদি দরকার হ তবে আমি সবারই কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চে নেব।

বড়দি—পাগলের মত কথা বলো ন রঞ্জু।

রঞ্জু—না পিসি। এত লজ্জা আর এ ভয় নিয়ে আমি বিয়ে করতে পারবো না।

—রঞ্জু, আমার কথা শোন। কাঁদতে থাকেন বড়দি।—ভদ্রলোকের ছেলেকে এভাবে অপমান করো না।

রঞ্জু—দশ বছর পরে তাকে অপমান করে মেরে ফেলার চেয়ে, এখনই শুধু এব কথায় সামান্য একটু আশ্চর্য করে দিয়ে সরিয়ে দেওয়াই ভাল।

বড়দি—না না রঞ্জু, নিজেকে মিছিমিছি এত গালমন্দ করো না। তুমি লক্ষ্মীমণি, তুমি সুজীবন সেনের মেয়ে, তুমি প্রশান্ত সেনের মত মানুষের নাতনি। তুমি কেন নিজেকে এমন ভয়ানক অবিশ্বাস করবে?

দুহাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জু। —সব বুঝেও কিছুই বুঝতে পারছি না, পিসি।

রঞ্জুকে জড়িয়ে ধরেন বড়দি—তুমি তো মা-মরা মেয়ে। আমরা তোমাকে মানুষ করেছি। আমরা যা, তুমিও তা। সেই জঘন্য অবিশ্বাসের মানুষটার সঙ্গে তো তোমার কোন সম্পর্কই নেই।

—সত্যিই ট্রেসপাস করেছি। মাপ করবেন। বারান্দার সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে দাঁড়িয়ে কে যেন এই অদ্ভুত কথাটা বলে উঠেছে। চোখে কম দেখেন বড়দি, তাই চোখ টান করে তাকিয়ে থাকেন আর চিনতে চেষ্টা করেন।

কথা বলেছেন সিংহানি হোটেলের রেবা মাসিমা। সাদা ধবধবে আদ্দির পাড়ছাড়া শাড়ি, পায়ে সাদা জুতো, মাথায় খোঁপাটা একটা ধবধবে সাদার স্তবক; রেবা মাসিমা বেশ করুণভাবে হেসে-হেসে কথাটা বলেছেন।

রেবা মাসিমার ঠিক পিছনে আরও একজন দাঁড়িয়ে আছেন। এক প্রৌঢ়া মহিলা। চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি, সাদা লেসের ব্লাউজ, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, আর পায়ে ধূসর শামোয়ার জুতো।

বড়দির দিকে তাকিয়ে রেবা মাসিমা আবার হাসতে চেষ্টা করেন।—আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন বলেই আপনার কাছে এসে কথাটা বলতে চাইছি।

বড়দি—বলুন।

রেবা মাসিমা—শক্ত হোক, আইন-টাইনের চেঁচামিচি করে যে যা-ই বলুক না কেন, রঞ্জু তো মাধুরই মেয়ে।

বড়দি—না, রঞ্জু আপনাদের মাধুর মেয়ে নয়।

রেবা মাসিমা—এটা একটা রাগের কথা বললেন, অবিশ্যি রাগ করতে পারেন আপনারা।

বড়দি—আজ হঠাৎ এক যুগ পরে এখানে এসে আপনিই বা এসব কথা তুলছেন কেন?

রেবা মাসিমা—আজ তো রঞ্জুর বিয়ে।

বড়দি—হ্যাঁ।

রেবা মাসিমা—খবরটা অবিশ্যি কদিন আগেই পেয়েছি; কিন্তু...।

বড়দি—আমরা তো আপনাকে কোন খবর দিয়েছি বলে মনে পড়ছে না।

রেবা মাসিমা—না না, সে-কথা বলছি না। খবরটা আপনাদের খানসামা স্টিফানের কাছ থেকেই শুনেতে পেয়েছি। কাজেই খবরটা মাধুকেও জানিয়েছিলাম।

বড়দি—সে কথাটা এখানে এসে আমাদের জানিয়ে লাভ কি?

রেবা মাসিমা—তাই মাধু এসেছে।

বড়দি—কি বললেন?

রেবা মাসিমা—আপনারা বিরক্ত হবেন না: আপত্তি করবেন না। মাধু শুধু চুপ করে, বলেন তো আড়ালে এক কোণে দাঁড়িয়ে, ওর মেয়ের বিয়ে দেখেই চলে যাবে।

চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, প্রৌঢ়া মহিলা তাঁর মাথার কাপড়টা একটু টেনে বড় করে দিয়ে রেবা মাসিমার পিছন থেকে এগিয়ে এসে সিঁড়িটার শেষ ধাপের কাছে দাঁড়ালেন।

চেঁচিয়ে ওঠেন বড়দি—আপনি এসেছেন কেন? বড়দির চোখের দৃষ্টিটা জ্বলতে থাকে।

মহিলা কিন্তু বড়দির এত কঠোর ধমকের শব্দটাও শুনেতে পেয়েছেন কি না সন্দেহ। দুই চোখ অপলক করে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বড়দি তাঁর গলার স্বরে যেন এক-সাগর বিষ ঢেলে দিয়ে আবার চেঁচিয়ে ওঠেন—চারু রায়ের মেয়ের আবার এরকম ভিখিরিনীর ঢঙ কেন? না, কোন মানে হয় না, আপনার এখানে আসা একটুও উচিত হয়নি।

সিঁড়ি ধরে নামতে থাকেন বড়দি। বড়দির রুক্ষ কঠোর মুখটা যেন একটা প্রতিজ্ঞা। এই বে-আইনী আবির্ভাবকে এখনই চরম কথা বলে দিয়ে বিদায় করে দিতে চাইছেন বড়দি।

সিঁড়ি ধরে নেমে আসে রঞ্জু। মাধবী-লতার চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়! এক যুগের অন্ধকারের ওপার থেকে আজ হঠাৎ ইনি কি মনে করে মেয়ের বিয়ে দেখতে এসেছেন? জলে ভরে গিয়েও রঞ্জুর চোখ দুটো যেন চিকচিক করে আগুনের কণা ছুঁড়ছে। চেঁচিয়ে ওঠে রঞ্জু—আপনি কেন এসেছেন?

—ও কি হচ্ছে রঞ্জু? ছিঃ, ওভাবে কথা বলতে নেই। এত বড় হয়েছ, কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, জান না?

চমকে ওঠে রঞ্জু। চমকে ওঠেন বড়দি। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছেন সঞ্জীবন সেন। হাতে পাইপ, সাদা জিনের ট্রাউজার, বুকের বোতাম খোলা একটা ঢিলে কামিজ আর পায়ে স্লিপার; ঘাড়টা ঝুঁকে পড়েছে, কাঁধটা দুপাশে বেশ উঁচু হয়ে গিয়েছে। বারান্দার উপর একেবারে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে সঞ্জীবন।

কি বলতে চাইছেন সঞ্জীবন? শুধু বড়দি আর রঞ্জু নয়, এই সন্ধ্যার ভিলা মাধবীর যত আলো আর ফুলও যেন বুঝতে না পেরে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে।

সঞ্জীবন বলেন—শোভাকে একবার ডাক বড়দি। রঞ্জুকে নিয়ে যাক।

রঞ্জু চেঁচিয়ে ওঠে।—আমাকে কোথায় যেতে বলছো বাবা?

সঞ্জীবন—যাও, এবার বসো গিয়ে।

রঞ্জু—না, বিয়ে হবে না।

সঞ্জীবন—আমি বলছি, হবে।

রঞ্জুর গলার স্বর কাঁপতে থাকে।—তবু ভয় করছে, বাবা।

সঞ্জীবন—কোন ভয় নেই। আমি বলছি, কোন ভয় নেই।

শোভা নিজেই ব্যস্তভাবে ছুটে এসেছে। কারণ গুপ্তবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেছেন—আর দেরি কিসের?

সঞ্জীবন বলেন—যাও, রঞ্জু।

রঞ্জু তবু অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রেবা মাসিমা আবার করুণভাবে হাসেন।—মনে হচ্ছে, রঞ্জুরই আপত্তি। বোধহয় রঞ্জুর ইচ্ছে নয় যে, আমরা ওর বিয়ে দেখি। আমরা তাহলে যাই।

রেবামাসিমা এবার মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বললেন—চল মাধু।

মাধবীলতাও বলেন—হ্যাঁ, একটু দাঁড়ান। সিঁড়ি ধরে এগিয়ে যেয়ে, সঞ্জীবনের মুখের দিকে না তাকিয়ে, সঞ্জীবনের কাছে একবার দাঁড়ালেন মাধবীলতা। তারপর ঝুঁকে পড়লেন, পায়ে হাত দিলেন, আর সোনার চশমাটাও চোখ থেকে ফসকে গিয়ে কার্পেটের উপর পড়ে গেল।

মাধবীলতাই জানেন, এমন একটা কান্ড হঠাৎ কেন করে বসলেন? আইন-টাইন ভুলে গিয়ে এক যুগ আগের একটি চেনা মানুষকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়েছে? না, মঞ্জুর ভয় ভাঙ্গাতে ইচ্ছে হয়েছে?

কার্পেটের উপর থেকে চশমাটা তুলে নিয়েই আবার সিঁড়ি ধরে নেমে এসে রেবা-মাসিমার কাছে দাঁড়ালেন মাধবীলতা। রঞ্জুর মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে নিলেন।

মণ্টুর বউ শোভা ডাকে—চল রঞ্জু।

সঞ্জীবনের দিকে তাকায় রঞ্জু—যাই, বাবা।

সঞ্জীবন—এসো।...শুনেছো, বড়দি?

বড়দি—বল।

সঞ্জীবন—তুমি তোমার সঙ্গে ওঁদেরও নিয়ে যাও। বিয়ে দেখে তারপর ওঁরা যাবেন।

পাইপ মুখে দিয়ে সাদা মাথাটি আস্তে-আস্তে দুলিয়ে, ঘাড়কুঁজো হয়ে আস্তে-আস্তে হেঁটেহেঁটে আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন সঞ্জীবন সেন।

বিয়ে যখন শেষ হয়েছে, তখন বিয়ের আসরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন সঞ্জীবন সেন। গায়ে ফ্লানেলের লম্বা কোট, হাতে মালাক্কা বেতের একটি স্টিক। সবারই দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আর দুই হাত তুলে নমস্কার জানালেন সঞ্জীবন। স্টিকটাও সেই নমস্কারের জোড়বাঁধা হাতের সঙ্গে ঝুলতে থাকে।

জ্ঞানবাবু বলেন—ওঃ, সেন সাহেবের শরীর সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে।

আদিত্যবাবু বলেন—কিন্তু সেন সাহেবের মুখের সেই হাসিটা ঠিক তেমনই আছে।

রঞ্জু আর দেবাশিসের কাছে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন সঞ্জীবন। রেজিস্ট্রার গুপ্তবাবুকে ধন্যবাদ জানান। তারপর মালাক্কা বেতের স্টিকের উপর ভর দিয়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যান।

ড্রাইভার মোতিরাম গাড়ি ঠিক করেই রেখেছিল। গাড়িতে উঠে বসলেন সঞ্জীবন। বড়দি ছুটে এলেন, বিনয়বাবু এসে অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু সঞ্জীবনের ইচ্ছাটাকে কেউ টলাতে পারলেন না। সঞ্জীবন শুধু হেসে হেসে একটি কথা বললেন—না, আর এখানে এক মিনিটও না।

কেউ না বুঝুক, অন্তত বড়দি বুঝতে পারলেন, সঞ্জীবন যেন একটা ভয়ানক অপেক্ষার দুঃখ মুছে দিয়ে, হাল্কা হয়ে, শান্ত হয়ে, খুশি হয়ে আর তৃপ্ত হয়েই চলে যাচ্ছে। যাক সঞ্জীবন; রঞ্জু না হয় একটু কাঁদবে। কিন্তু সঞ্জীবনের শরীরটা তো সত্যিই খুব খারাপ হয়েছে। ভগবান করুন, সিমলার স্যানেটোরিয়ামে থেকে ওর শরীর যেন ভাল হয়।

ভিলা মাধবীর ফটক পার হয়ে চলে গেল সঞ্জীবনের গাড়ি।

এক রাতের উৎসবের পর ভোর হতেই ভিলা মাধবীর বাগানে কোকিল ডাকতে থাকে। আর দুপুর হতে হতেই ভিলা মাধবীর ঘরের কলরব শেষ হয়ে যায়। সবাই চলে গিয়েছে। অনাদিবাবু এসে তাঁর সামিয়ানাও নিয়ে চলে গেলেন।

আজ এ-বাড়িতে মাধবী নামে কোন মানুষ নেই, মাধবী নামে কোন লতাও নেই। মাধবী নামটা একটা লেখা হয়েও কোথাও নেই। তবু লোকে বলে, ভিলা মাধবী।

একদিন বার লাইব্রেরীর ঘরে বসে আদিত্যবাবু তাঁর হাতের খবর-কাগজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন—এ কি হলো? জিওলজিস্ট এস সেন ডেড?

জ্ঞানবাবু—তার মানে?

আদিত্যবাবু—ভিলা মাধবীর সেন সাহেব মারা গিয়েছেন।

ঠগী

শ্রীপান্থ

'ঠগস!'

না, দেখতে ভুল করিনি।—টি-এইচ-ইউ-জি-এস, —ঠগস; মানে—ঠগী।

শব্দটা অপরিচিত নয়। হালেও বিস্তর শুনেছি, শুনে থাকি। কখনও নাৎসীদের বিশেষণ হিসেবে চার্চিলের মুখে, কখনও শিকাগোর বিখ্যাত গ্যাংস্টারদের বিকল্প পরিচয় হিসেবে মার্কিনী কাগজে, কখনও বিলিতি গল্প-উপন্যাসে, কখনও বা কোন শব্দের মানে খুঁজতে গিয়ে খাস অক্সফোর্ড ডিক্সনারীতে। কিন্তু তাই বলে কলকাতার নগর কোতোয়ালের সালতামামীতে? সর্বশেষ এই পুলিস রিপোর্টে? মিথ্যে বলব না, যদিও 'ধৃত ঠগের' সংখ্যার জায়গাটায় নিটোল একটি শূন্য বসান ছিল, তাহলেও সেটি দিয়ে তৎক্ষণাৎ সমস্যা-পূরণ সহজ ছিল না। কেন না, এমনি একটি মুদ্রিত রিপোর্ট পড়েই একদিন জেনেছিলাম—১৮৩৪ সনের শেষ দিকে জব্বলপুরের জেল থেকে হঠাৎ একদিন সাতাশজন ঠগী পালিয়ে গিয়েছিল। এবং সেও এক অবিশ্বাস্য উপায়ে। হাতের সামনে একমাত্র পাওয়া সম্ভব ছিল তেল! সাধারণ এক টুকরো সুতো সেই তেলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে 'পাকিয়ে' নিয়ে ঠগীরা ঘুড়ির সুতো মাঞ্জা দেবার কায়দায় তার ওপর বেশ করে মাখিয়ে নিল মেঝের সিমেণ্ট গুঁড়ো। তারপর সেই করাতেই জেলখানার লোহার গরাদ কেটে সাহেবদের বোকা বানিয়ে একদিন পালিয়ে গেল তারা। তার আগেও ১৮২৯-৩০ থেকে '৪০ সন, এই দশ বছরে পালিয়েছিল আরও জনা বারো। কে জানে শতবর্ষ মাটি চাপা থেকে ইংরেজ-বর্জিত ভারতে স্বাধীনতার নববর্ষায় তারাই আবার শাখায় প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ওঠেনি ত! বিশেষ, উনিশ শতকের 'বাধক-দস্যু' মঙ্গল সিং-চুন্ডা যদি মানসিং-রূপার বেশে ফিরে আসতে পারে, সেই একই অরণ্যভূমি চম্বল উপত্যকায় তবে কেন আসতে পারবে না ফিরিঙ্গীয়া কল্যাণ সিং নাসির বা দুর্গা আজকের কলকাতায়?

সুতরাং লালবাজারের পুরানো রিপোর্ট-গুলো আবার নতুন করে বের করতে হল। না, সন্দেহের কোন কারণ নেই। প্রতিটি রিপোর্টেই ঠগী আছে বটে, কিন্তু প্রতি বছরই এক সংবাদ:—'নিল্'—শূন্য। বোঝা গেল শব্দটা যে এখনও ছাপা হচ্ছে সে নেহাৎই অভ্যাসবশত,—ধারাবাহিকতার স্বয়ংক্রিয় নিয়মমাফিক। ঠগী আজকের কলকাতায় সত্যিই নেই। অন্তত সেইরূপে,

সেই বেশে সেই ধর্মে। শুধু কলকাতায় কেন তামাম ভারতের কোথাও নেই।

যদি থাকত তাহলে নিশ্চয় এক কলম কি আধ কলমে আজ খবরের কাগজের হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ সংবাদ শেষ হত না, পুরো আটখানা পাতাই লেগে যেত, বেতারে শুধু নিরুদ্দেশের খবরই বলতে হত এবং তা সত্ত্বেও বছর শেষে দেখা যেত কয়েক হাজার মানুষ চিরকালের মত পরিবার-পরিজনের কোল থেকে হারিয়ে গেছে। তারা রোগে মারা যায়নি, দুর্ঘটনায় কাটা পড়েনি, লড়াই করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় প্রাণ দেয়নি—হারিয়ে গেছে। কোথায়, কি ভাবে—কেউ জানে না।

ঝাঁক ঝাঁক সিপাই হারিয়ে যেত। ছুটি নিয়ে দেশে যেত, আর ফিরত না। ফৌজের কর্তৃপক্ষ কিছুকাল অপেক্ষা করতেন, তারপর নাম কেটে দিতেন। পাশে লিখে রাখতেন—ডেসার্টার, পালিয়ে গেছে। উত্তর ভারতে তীর্থ করতে গিয়ে দক্ষিণের মস্ত দলটি কোনদিনই আর ফিরত না। আত্মীয়রা অপেক্ষা করতেন। তারপর কেঁদে কেটে আবার সংসারে মন দিতেন। মনে পড়লে মনে মনে নিজেদের সান্ত্বনা দিতেন—ভাগ্যবান ছিল, গঙ্গা স্নান করতে গিয়ে গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে। বনপথে বাণিজ্য করতে গিয়ে সওদাগর আর ফিরত না। লোকে বলত বাঘে খেয়েছে। বছর বছর তখন হাজার হাজার মানুষকে বাঘে খায়, হাজার হাজার মানুষের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়, হাজার হাজার সৈন্য কোম্পানির ফৌজ থেকে পালিয়ে যায়। ভারতবর্ষ তখন যেন এক নিরুদ্দিষ্টের দেশ; সেখানে হারিয়ে যেতে কোন মানা নেই।

তিনশ' বছর ধরে তাই যাচ্ছিল। জনৈক ইংরেজ লেখক খুব সাবধানে মনযোগ দিয়ে হিসেব কষে প্রমাণ করেছেন—ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তার আগের তিনশ' বছরের প্রতি বছর ভারতবর্ষে গড়ে চল্লিশ হাজার করে মানুষ হারিয়েছে এই পথে, অজ্ঞাত দুষমনের হাতে! হ্যাঁ, তিনশ' বছর ধরে প্রতি বছর গড়ে চল্লিশ হাজার!

হিসেবটা বাড়াবাড়ি নয়। মিডাস টেলারের 'ঠগীর জবানবন্দী' উপন্যাস হলেও নায়ক তার সাচ্চা মানুষ। সে কখনও মিথ্যে বলবে না। তাছাড়া যে কুড়িজন ঠগী রাজসাক্ষী হয়েছিল, তাদের জবানবন্দীগুলো নিশ্চয় উপন্যাস নয়। তারা নিজেরাই বলেছে, কেউ কেউ তাদের হত্যা করেছে ন'শ একত্রিশজন, কেউ ছ'শ চারজন, কেউ পাঁচশ' আটজন, কেউ চারশ' একুশজন! সবচেয়ে যে কম খুন করেছে বা দেখেছে, তার স্মৃতির তহবিলেও ছিল চব্বিশজন! পরবর্তীকালে মন্দার সময়েও প্রতি ক্ষেপে একজন ঠগীর মনে মনে থাকত কম পক্ষে দশটি প্রাণ এবং নির্বিঘ্নে সে রকম দশ ক্ষেপ সম্পন্ন হলেই তবে সে জানত তার কর্মজীবন সফল।

অপরাধের ইতিহাসে এমন নিশ্চিত নিঃশঙ্কচিত্ত খুনী বোধহয় আর হয় না। মহাযুদ্ধের বীভৎসতম অধ্যায়-গুলোতেও না।

চার্চিলের 'নাৎসী ঠগদের' সঙ্গে ভারতের ঠগীদের চরিত্রের মিল হয়ত কিছু কিছু আছে, কিন্তু নিষ্ঠায়, নিপুণতায় এবং চমৎকারিত্বে এশিয়ার এই আর্যখণ্ডের হত্যা-কারীরা যে শয়তানের আরও নিকটবর্তী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোন হেতু নেই।

উপকরণ অতি সামান্য। এক ফালি হলুদ কাপড়। কোন আগ্নেয়াস্ত্র নয়, ঢাল তলোয়ার নয়। একমাত্র হাতিয়ার হলুদ রঙের 'পেলহু' অথবা 'সিক্কা' বা রুমালটি। ডবল করে ফাঁস তৈরী করার পর লম্বায় সেটি মাত্র তিরিশ ইঞ্চি। আঠার ইঞ্চি দূরে একটি গিঁট। হাঁটু গেড়ে বসে—হাঁটুকে গলার বদলী হিসেবে মেপে সেটি তৈরী হয়েছে। গিঁট যাতে ফস্কে না যায়, তাই প্রান্তে একটি রুপোর টাকা বাঁধা হয়েছে। নয়ত একটি তামার ডবল পয়সা।

কোমরে সেই রুমালটি জড়িয়ে ছিন্ন বেশ নগ্ন-পায়ে পথে নামত ইতিহাসের নৃশংসতম, বিচক্ষণতম হত্যাকারী। সঙ্গে তার নানা বয়সের অসংখ্য অনুচর।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নির্জন বন-পথে ওরা যখন হাঁটত কিংবা ছোট ছোট ঘোড়ার পিঠে চড়ে ধীরে ধীরে পথ চলত, তখন দেখে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার উপায় ছিল না যে তারা নির্মম দস্যু, শত শত বছরের নরহত্যার দক্ষতা তাদের কালো কালো শীর্ণ হাতগুলোতে।

চলতে চলতে ওরা গল্প করত, সাধারণত হাসির গল্প। গান গাইত। সাধারণত—ভালবাসার গান, আনন্দের গান। গাছতলায় বসে মাঝে মাঝে ওরা বিশ্রাম করত, তামাক খেত, সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করত। নিঃসঙ্গ পথিক এই 'সরল প্রাণ' মানুষ-গুলোকে ইচ্ছে করলেও এড়াতে পারত না। এমন চমৎকার সঙ্গীকে কেউ-ই পারে না।

সঙ্গী হিসেবে যেমন চমৎকার, মানুষ হিসেবেও তেমনি। সকলেই চেহারায় সেই—সনাতন ভারতীয়। ভারতের আর পাঁচজন গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য নেই। সেই ছোট ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট কুটীর, ছোট্ট সংসার, শান্তির নীড়। বছরভর ওরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে সংসার করত, মাঠে কাজ করত, উৎসবে আনন্দ করত; ভিখারীকে ভিক্ষা দিত, জমিদারকে খাজনা দিত, ভারতের আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতই 'ঈশ্বরের' গুণগান করত,—তারপর বর্ষা শেষে শুভক্ষণে শুভদিনে শরতের এক ভোরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত। বাড়ির মেয়েরা সাতদিন পাড়া-প্রতিবেশীকে এড়িয়ে চলত। অন্তম দিনে কেউ খবর করলে বলত—বিদেশ গেছে।—

কাজের ধান্ধায় দেশান্তরী হয়েছে। ছোটরাও তাই জানত। বাবা— বাইরে গেছে। শীত শেষ হলেই তাদের জন্যে কত কিছু নিয়ে ঘরে ফিরবে।

বাড়ির মেয়েরা সাধারণত সবই জানত। কারণ, তারাও ঠগীর ঘরেরই মেয়ে। কিংবা ঠগীর হাতে কুড়িয়ে পাওয়া। অনেক সময় ঠগীরা তাও করত। মা বাবাকে মেরে ফেলার পরে মেয়েটিকে নিজেদেরই কারও কোলে গুঁজে দিত। সে মেয়ে বড় হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হত। যেমন বুলান্দশহর জেলার মেয়ে রাধা। ১৮৩৩ সনে দিল্লির কাছে ফরাসগঞ্জে 'ছেলেধরা ঠগীদের' (এদের তৎকালীন ইংরেজী নাম ছিল—Megpunnaism; আসলে সেটা 'মেক' (পেরেক) এবং 'ফানসা'র (ফাঁসী) বিকৃতি মাত্র) একটি দলের সংগে ধরা পড়ার পর তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়—এ দলে কি করে এল রাধা, তখন তার নিজের সঙ্গয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে দেখিয়ে বলেছিল—এদের পথেই।

—কোথায় হত্যা করা হয়েছিল তোমার মা বাবাকে?

—বুলান্দ শহরের ডুনকারি গাঁয়ের কাছে।

—কতজন ঠগী ছিল সেই দলে?

—চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন!

—তুমি কি তোমার মা বাবার হত্যাকাণ্ড নিজের চোখে দেখেছ?

—না। আমাকে ওরা রেখেছিল দলের মেয়েদের হেফাজতে। ক'দিন পরে সর্দার আমাকে নিয়ে বেচতে গিয়েছিল বেদেদের কাছে। ওরা উচিত দাম দিতে রাজী হয়নি, তাই গোঁসা হয়ে ফিরে এসে দান করে দিয়েছিল সালগা জমাদারকে। সে-ই আমাকে বিয়ে করেছে, এবং তার কাছ থেকেই আমি এ বিদ্যে শিখেছি।

বিদেশী প্রশ্নকর্তা অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলেন—তোমার নিজের মা বাবাকে খুন করেছে যারা, তাদের সংগে ঘুরে বেড়াতে, খুন দেখতে, মরা বাপ-মায়ের কোল থেকে শিশু ছিনিয়ে আনতে কষ্ট হয় না তোমার?

রাধা উত্তর দিয়েছিল—কি করব, স্বামী-ধর্ম!

রাধার দল—ঠিক ঠিক ঠগীর দল নয়। দিল্লিতে ওদের হাতে খুন হওয়া মানুষের মৃতদেহ দেখে—পাকা ঠগী রাজসাক্ষী একজন বলেছিল—এ নিশ্চয় কোন আনাড়ীর কাজ। ঠগী হলে—কখনো এমনভাবে লাস ফেলে পালিয়ে যেত না, তাছাড়া দেখছ না গলার ফাঁস-গুলো পর্যন্ত খোলেনি, এ গিঁট কখনো ঠগীর হাতে নয়। ওরা আসলে ছেলেধরারই দল; কোম্পানীর পুলিস যাদের নাম দিয়েছিল 'মেকফানসা' বা মেগপান্নাইজম! পশ্চিম বাংলার ঠ্যাঙাড়েদের মত, উত্তর ভারতের 'তামসাবাজ ঠগদের' মত বা বর্ধমানের 'ভাগনেদের' মত এরাই ঠগীদেরই রকমফের বটে, কিন্তু ভারতের ঐতিহাসিক 'ঠগী' বলতে যাদের কথা বলা হয়, তাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য বিস্তর।

ঠ্যাঙ্গাড়েদের কথা সর্বজনবিদিত। 'তামসাবাজ ঠগ'দের উৎপত্তি হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে: এবং ক্রেয়াগ (Creagh) নামে এক ইংরেজ সৈনিক ছিল তার প্রথম সৃষ্টিকর্তা। ঠগীর দেশের হাওয়ায় কানপুরে হঠাৎ এই ইংরেজ সৈন্যটিকে পেয়ে বসল। গুটি তিন দিশি শিষ্য জোগাড় করে একদিন সে তাদের এমন এক চমৎকার মন্ত্র শিখিয়ে দিল যে—এবার থেকে বিনে পরিশ্রমেই রোজগার!

দেখতে দেখতে ক্রেয়াগ সাহেবের শিষ্যে উত্তর ভারত ছেয়ে গেল। তারা সদর রাস্তায় দড়ির খেলা দেখায়। দড়ির ফাঁস তৈরী করে—বাজী ধরে পথিককে সেখানে লাঠি ধরতে বলে। নিয়ম—লাঠি বা কাঠি যদি ফাঁসে আটকাল তবে যাদুকর হারল, যদি—ফাঁস ফাঁকি প্রমাণ হয়—তবে সৌখিন দর্শক ঠকল! এ খেলাই তামসাবাজি! সব সময়ে দড়ি ধরে থাকত না বলেই, সুযোগ পেলে খুন-খারাপিও ছাড়ত না বলেই—নাম দেওয়া হয়েছিল ওদের—'তামসাবাজ ঠগ'। 'ভাগনে'রা—এতদ্দেশীয় বলেই ফিরিঙ্গী ক্রেয়াগ সাহেবের চেয়ে অনেক অনেক বেশী উন্নত। বলতে গেলে তারা পুরোদস্তুর ঠগীই। একমাত্র পার্থক্য এই—অন্যরা যখন ঘুরে বেড়াত পথে পথে, এরা তখন শিকারের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাকত জলে। কেননা, ডাঙায় যখন বাঘ রয়েছে, জলেও তখন কুমীর না থাকলে চলবে কেন?

'ভাগিনা' নামটা চালু ছিল বর্ধমানে। অন্যত্র বাংলা দেশের এই জলের ঠগীদের নাম ছিল—'ভাঙ্গু' (Bungoo), কোথাও কোথাও 'পাঙ্গু'। ওরা নৌকো নিয়ে—এদিকে কলকাতা থেকে ওদিকে বেনারস, এমনকি কানপুর পর্যন্ত শিকার খুঁজে বেড়াত। নৌকোগুলো দেখতে ছিল ভাড়াটে পানসীর মত, কোন লোক চলাচলের ঘাটে নোঙর করে যাত্রী সেজে জনাকয় ঠগ তার সামনে বসে থাকত। কিছু যাত্রী বেশেই ডাঙায় ওঁৎ পাতত। সত্যিকার কোন যাত্রী এলে তাদের সংগে নিয়ে নৌকোয় উঠত। 'বদর' 'বদর' করে নৌকো ঘাট ছাড়ত। তার-পর সুবিধে মত জায়গায় পেঁছান মাত্র হালে বসা লোকটি ইঙ্গিত দিত; মৃত্যু ফাঁস হাতে অসহায় যাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারপর আরও ক'মাইল গিয়ে পাশের জানালা দিয়ে মৃত দেহগুলো ভাসিয়ে দিয়ে অন্য ঘাটের উদ্দেশ্যে হাল ঘোরাত।। ভাগিনাদের মধ্যে কড়া কড়া নিয়ম ছিল—

কখনও যেন এক বিন্দু রক্তপাত না হয়। ১৮৩৬ সন পর্যন্ত গঙ্গার বিস্তর মৃতদেহ পাওয়া গেলেও—ভাগিনাদের অস্তিত্ব তাই জানতে পারেনি কেউ। কিন্তু প্রথম একজন ধরা পড়ার এক বছরের মধ্যে আদালতের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল একশ' একষট্টি-জন, এবং নাম পাওয়া গিয়েছিল আরও আটত্রিশজনের! তখনই জানা গিয়েছিল—গঙ্গায় ঠগী নৌকো আছে, আছে আঠারখানা এবং প্রতি নৌকোয় আছে—চোদ্দজন করে ভাগিনা!

জলে-স্থলে ভারত সেদিন সত্যিই ঠগী-ময়।

কিন্তু তাহলেও ডাঙার ঠগীরা স্বতন্ত্র। ঠগী কুলপঞ্জীতে তারাই আদি অকৃত্রিম এবং আপন বিশিষ্টতায় সম্পূর্ণ অনন্য। আগেই বলা হয়েছে স্বামী যখন বাৎসরিক দেশ ভ্রমণে বের হত—স্ত্রী তখন ঘর আগলাত। সাধারণত স্বামীর পেশা সম্পর্কে তারা জ্ঞাতব্য প্রায় সবটুকুই জানত। অবশ্য, মুলতানী ঠগের স্ত্রীরা ততখানি সৌভাগ্যবতী ছিল না। স্বামীরা আসল খবর নাকি তাদেরও বলত না। কিন্তু অন্যত্র স্ত্রী শুধু যে ওয়াকিবহাল ছিল তাই নয়, কখনও কখনও তারা দলের সঙ্গে বাইরেও যেত। সাক্ষ্য প্রমাণে জানা গেছে বারুণী নামে এক ঠগী-বৌ ছিল, নরহত্যার সময়েও সে স্বামীর পাশে থাকত, দরকার হলে সাহায্য করত। এমনকি দক্ষিণ ভারতে আর একটি মেয়ে ছিল—তার নিজের দল পর্যন্ত ছিল। সেটা সহজ কথা নয়। কেননা প্রথমত খানদানী ঘরানার না হলে কেউ 'জমাদার' বা দলপতি হতে পারত না। দ্বিতীয়ত—পথে বের হবার আগে জমাদারকে প্রত্যেকের ঘরে অন্তত দু'এক মাসের আগাম খোরপোষ রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হত।

এসব খুঁটিনাটি ব্যবস্থা হয়ে গেলেই পথিকেরা তবে পথে নামত। অবশ্য তার আগেও কিছু কিছু কৃত্য ছিল। প্রথমত কবর খোঁড়ার জন্যে একটি বিশেষ ধরনের খুন্তি তৈরী করতে হবে। সে খুন্তি তৈরী হবে একমাত্র মঙ্গল, বুধ অথবা শুক্রবারেই। এবং সেটি তৈরী হবে কামারবাড়ির ঝাঁপ বন্ধ করে ঠগীদের সামনে। সেটি তাদের সামনেই তৈরী করতে আরম্ভ করা হবে, এবং তৈরী শেষ হলে তবেই ঠগীরা ঘর ছাড়বে। অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে সেটিকে মন্ত্রঃপূত করা হবে। কালো অথবা সাদা একটি পাঁঠা কেটে—বন্ধ ঘরে ভোজ হবে। মন্ত্রঃপূত খুন্তি তারপর লুকিয়ে রাখা হবে কুয়োয়, কিংবা মাটির ভাঁড়ে করে মাটির নীচে। যাত্রার আগের দিন সেটি তোলা হবে। একজন বিশেষ লোকের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটি বহন করবার। কেননা—রুমালের মতই এই অস্ত্র জরুরী। রুমাল যদি ওদের সিক্কা বা প্রতীক হয়, তবে খুন্তি ওদের নিশান'। এই খুন্তির অনেক গুণ। সে নিঃশব্দে কাজ করে। 'লুগা' বা কবর খোঁড়ার দায়িত্ব যার, সে যদি ডাকে তবে গোপন জায়গা থেকে নিজে নিজে হাতে উঠে আসে।

—তোমরা কি কেউ তা দেখেছ? জিজ্ঞেস করেছিলেন ইংরেজ রাজপুরুষ।

—দেখিনি বটে, তবে সত্য জানবে সাহেব। ডাকলে হাতে আসতে না দেখলেও আমরা সবাই দেখেছি—রাত্তিরে যে খুন্তি কুয়োয় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সকালে সে নিজেই ডাঙায় উঠে আসছে। এমনকি নানা দলের খুন্তি রাখা হলেও সবাই নিজ নিজ দল চিনে হাতে উঠে যাচ্ছে!

শুনে সাহেব হেসেছিলেন। আমরাও আজ অবশ্যই হাসতে পারি। কিন্তু তাহলেও বিশ্বাসের এই বিচিত্র কাহিনীগুলো শোনা দরকার। কেননা, নয়ত ঠগীদের বোঝা যাবে না।

সব তৈরী হল। দল যাত্রা করল। অনেক সময় সকলের পরিবার পরিজনকে দেখা-শোনার জন্যে এক দুজনকে গাঁয়ে রেখে যাওয়া হত। তবে তারাও তাদের প্রাপ্য ভাগ পেত। অনেক সময় ছেলেবয়সে বিবেচনার যোগ্য মনে হলে তাকেও সঙ্গে নেওয়া হত। কারণ,—দেখাতেও শিক্ষা!

—এভাবে খুন দেখতে ভয় পেত না ওরা? একজন ঠগীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। ফিরিঙ্গীয়া উত্তর দিয়েছিল—একবার আমন সুবাদার আমাদের দলের সঙ্গে ওমরাও-এর চোদ্দ বছরের ভাই খারহোরাকে নিয়েছিল। জীবনে ঠগীর বাচ্চার সেই প্রথম বাইরে বের হওয়া। আমন সুবাদার তার দায়িত্ব দিয়েছিল তার নিজের ছেলে হাবসুকোর ওপর। সে ওর সমবয়সী হলেও এর আগে তিন তিনবার দুনিয়া দেখে এসেছে। পথে পাঁচজন শিখের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পরদিন ভোরেই 'ঝিরুণী' অর্থাৎ ইঙ্গিত দেওয়া হল। সে দৃশ্য দেখে ছেলেটি থর থর করে কাঁপতে লাগল। কিছু বোঝাতে গেলেই সে আরও কাঁপে, আবোলতাবোল বকে। সেদিন সন্ধ্যায়ই সে ছেলে চিরকালের মত "দল ছেড়ে চলে গেল। প্রলাপ বকতে বকতে সে মারা গেল।

—আর তার বাবা?

—বাবা আর কি করবে? বন্ধু হারসুকো ছেলেটিকে খুব ভালবাসত। সে আর দলে থাকতে পারল না।—সেদিনই বৈরাগীর বেশে সে চলে গেল। এখন নর্মদার ধারে মন্দির করেছে, সেখানেই থাকে।

এমন রুপালী ঝিলিকও আকাশ জোড়া কালো মেঘে মাঝে মাঝে দেখা যেত বটে, কিন্তু সে দৈবাৎ। সচরাচর যা ঘটত, সে-অন্য রকম,—যৌথ পারিবারিক প্রয়াস।

পিতা-পুত্র নিজ নিজ দায়িত্ব বহন করে ধীর পায়ে, পথ ধরে এগিয়ে যেত। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর প্রথম আস্তানা

তাদের মুখের দিকে তাকালে মনে হত যেন—সাধকের দল। সাতদিন তাদের মাছ খাওয়া বারণ, দাড়ি কাটা বারণ। তারা ডাল খাবে, আর গুড়। তাও বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরে যদি কারও মাথা থেকে পাগড়ী পড়ে যায়, কিংবা অসাবধানে কারও পাগড়ীতে আগুন ধরে যায়, তবে গোটা দলকে আবার ঘরে ফিরতে হবে, সাতদিন ঘরে থেকে আবার নতুন করে যাত্রারম্ভ করতে হবে।

পথে নানারকমের বিধিনিষেধ। বের হবার মুখে যদি টিকটিকি 'টিক' 'টিক' করে, কিংবা পথের বাঁ দিকে কোন জ্যান্ত গাছের ডালে বসে কাক ডাকে, কিংবা ডাইনে কোন ঘুঘু,—অথবা যদি পথে দেখা যায় বাঘ, তবে যাত্রা শুভ। শুধু শুভ নয়, এখানেই মনের মত শিকার মিলবে।

আবার যদি দেখা যায়, সামনে সাপ অথবা খরগোস রাস্তা পার হয়, মরা ডালে কাক ডাকে, পেচক ধ্বনি শোনা যায় কিংবা

কায়স্থ, ফকির, কামার, কুমোর, ছুতোর-মিস্ত্রী, মাহুৎ, নাচের ওস্তাদ, গানাদার এবং সঙ্গে গরু বা গৃহপালিত কোন পশু নিয়ে চলেছে যে পথিক তারা অবধ্য। তার চেয়েও আদিতে জরুরী নির্দেশ ছিল অবধ্য-স্ত্রীলোক। কিন্তু পরবর্তীকালে ঠগীরা এত সব মানত না। বিশেষ করে দক্ষিণের ঠগীরা সরকারী হিসেবে জানা গেছে ১৮২৬-২৭ সনে রাজপুতানা এবং মালবে মারা গিয়েছিল যারা, তাদের মধ্যে ছ'জন ছিল নারী, তারপরের বছর বেরার এবং গুজরাটে নিহত নারীর সংখ্যা ছিল একুশজন, তারপরের বছর খান্দেশে ছ'জন এবং পরের বছরগুলোতেও সংখ্যা তাদের যথেষ্ট।

—তবে না তোমরা হিন্দুস্থানী ঠগেরা নারী হত্যা কর না? হিসেবটা সামনে রেখে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বিখ্যাত ঠগ দলপতি ফিরিঙ্গীয়াকে।

—আজ্ঞে, সেই ত আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ। কালীবিবিকে ফাঁস দিলাম ত দিন

কেমন জেনানা ছেড়ে দিয়েছি। সেও খানদানী জেনানা, পেশোয়া বাজী রাওয়ের ঘরের জিনিস। যাচ্ছিলেন পুনা থেকে কানপুর। সঙ্গে কমপক্ষে দেড় লাখ টাকার জড়োয়া গহনা। কিন্তু তিন দিন তিন রাত্রি হাতে পেয়েও তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম আমরা।—কেন জান? ওঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমি। এমন মিষ্টি কথা জীবনে শুনিনি। আমি ওঁকে মনে মনে ভালবেসেছিলাম!

—কিন্তু শোনা যায়, ভাল ত তুমি মোগলানীকেও বেসেছিলে। কিন্তু কৈ তাকে ত তুমি ছেড়ে দাওনি।

—সে তুমি বুঝবে না সাহেব! মোগলানী যে মরল, সে তার নসিব,—আমারও। সঙ্গে এক বুড়ি আর ছ'জন পাল্কী বেহারা নিয়ে আগ্রার পথে যাচ্ছিল মেয়েটি। কি তার রূপ। নিজেই ডেকে ডেকে কথা বলত আমার সঙ্গে। আমার সন্দেহ হল মেয়েটি আমাকে ভালবেসে

সমগ্র ভারত জুড়ে নিক্ষিপ্ত হল নিপুণ হাতে রচিত নিখুঁত এক জাল

প্যাঁচার ডাক, তবে যাত্রা অশুভ। অশুভ নিঃসঙ্গ কোন শেয়ালের কান্না শুনলেও। তবে তার চেয়েও অশুভ যদি কুকুরের মুখে তাদের বলি দেওয়া পাঁঠার মাথাটি দেখা যায়।

এ সব ছাড়াও ঠগীর বচনে আরও অনেক নির্দেশ আছে।

যথাঃ

রাতে বোলে তিতওয়ারা,
দিন কো বোলে শিয়ার,
তুজ চৌলি ওরা দেশরা,
মৌহিন পুরী আচানকে ধা।

অর্থাৎ রাতে যদি ঘুঘু ডাকে কিংবা দিনে শেয়াল, তবে হে ঠগী ত্বরিৎ সে মুলুক ছেড়ে যাও, নয়ত সমূহ বিপদ!

খুনের সময়ও ওরা কিছু কিছু নিয়ম মেনে চলত। ঠগীর ধর্মবিশ্বাস মত নর্মদার উত্তর থেকে পশ্চিমে সিন্ধু এবং উত্তরে যমুনার মধ্যবর্তী এলাকায় নিয়ম ছিল

আমাদের ফুরাতে সুরু করল।

—কে সেই কালীবিবি?

—সাহেব, কালীবিবি ছিল হায়দরাবাদের এক খান্দানী জেনানা। একটা জড়ির চাদর গায়ে দিয়ে বিবি এলিকপুর থেকে হায়দরাবাদে যাচ্ছিল। যাওয়ার কথা ছিল তার নবাব দৌলা খাঁয়ের বাড়ি। পথে সমসের খাঁ আর গোলাপ খান সোনার চাদরের লোভে তাকে খুন করে বসল।... পাঁচ বছর কিছু অমঙ্গল হল না—ত আমরা ভাবলাম বোধহয়, এখন এইটেই নিয়ম হয়েছে। আমরাও তাই নেমে পড়লাম, আর সেই হল সাহেব,—আমাদের কাল।

সাহেব ধমকে উঠলেন—তোমরা আরও নীচ। সুন্দরী মেয়েদের পর্যন্ত তোমরা খাতির কর না।

—আলবৎ না। আপত্তি জানাল ফিরিঙ্গীয়া। সাহেব তুমি ভাবতে পার না আমন সুন্দরী আর আমি হাতে পেয়েও

ফেলেছে। কত সময় নিজেই ডেকে খেতে দিত আমাকে। আমার ভয় হল। আমিও যে দিল দিয়ে দিচ্ছি ওকে! অথচ ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না, কারণ আমি জাতে হিন্দু ব্রাহ্মণ, ওরা মুসলমান। অথচ মেয়েটিকে ছাড়তেও ইচ্ছে করে না। তাই শেষে মনস্থির করে ফেললাম। একদিন 'ঝিরনী' দিয়ে বসলাম। মাদার বক্স—ফাঁস দিয়ে দিল ওকে।—ভগবান যদি করেন, একদিন নিশ্চয় ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে।—মরার পরও তা হয়!

এ কাহিনীও ব্যতিক্রম। কারণ নায়ক ফিরিঙ্গীয়া এক বিচিত্র ব্যক্তিত্ব। অন্যদের সঙ্গে এসব রোমান্টিকতার কোন সম্পর্ক নেই। তারা খুন করতে বের হয়েছে, সুযোগ পেলেই খুন করবে। হক না সে সুন্দরী অথবা রূপহীন, ধনী অথবা গরীব।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস হাঁটছে খুনীরা। হাঁটছে, গান গাইছে, কথা

লেছে। ওরা ওরা যখন কথা বলে, তখন সে কথা কেউ বুঝতে পারবে না। ঠগীর ভাষা আলাদা। সে ভাষার নাম—রামসী (Ramasee)। তার শব্দভাণ্ডার এমন যে তা দিয়ে রীতিমত একটা অভিধান হয়।

'বোরা' বা 'আউলা' (ঠগ) যে সে ভাষা শুনেই বলে দেবে যে, দলটি আসছে তারাও ঠগ অথবা 'বিট্টো' ,বা 'কুজ';—মানে ঠগ নয়।

'বোরা'-দের ভাষায় তাদের বিচরণ ক্ষেত্রের নাম—'বাগ' বা 'ফুল', খুনীর নাম—'ভুকোত' বা 'ভুরতোত'। যেখানে খুন করা হয়, সে জায়গার নাম—'বিয়াল' বা 'বিল'। জালে পছন্দসই দল এসে পড়া মাত্র একজন চলে যাবে 'বিয়াল' পছন্দ করতে। নাম তার 'বিলহো'। তার রিপোর্ট পাওয়ার পর সেখানে ছুটবে—'লুগহা' অর্থাৎ কবর খোঁড়ার লোক। ক'টা কবর লাগবে সে হিসেব সে নিয়েই গেছে। দশ মাইল দূরে বসে সে কবর খুঁড়ছে। কবর দুরকমের হতে পারে। 'কুরওয়া' বা চৌকো, 'গব্বা' বা গোলাকার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে লোক বেশী হলে—মাঝে এক টুকরো মাটি সাক্ষী রেখে গোলাকার কবরই যুৎসই, অনেকদিন টে'কে।

ইতিমধ্যে ওদিকে যখন কবর তৈরী হচ্ছে, এদিকে শিকার এবং শিকারীরা বন্ধু হয়ে গেছে। যদি দেখা যায় দলটি 'চিসা' অর্থাৎ বেশ সম্পন্ন, তবে ত আর কথাই নেই। 'চান্দুরা (দক্ষ ঠগীরা) সব সময় তাদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকবে। অবশ্য 'লুটকুনিয়া' বা গরীব হলেও—আদর আপ্যায়নে ত্রুটি ঘটবে না। এদিকে সময় যত এগিয়ে আসবে—একদল ততই পেছনে পড়তে থাকবে। ওরা—'তিলহা' বা গুপ্তচর, পেছনে 'ডনকি' 'রনকি' বা পুলিস লেগেছে কিনা তা নজর রাখাই হবে তাদের কাজ।

বধ্যভূমিতে এসেও তারা সুযোগের অপেক্ষা করবে। হয়ত রাত্রে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে। তারপর খাওয়ার শেষে হঠাৎ শোনা যাবে—একজন বলছে—তামাকু লেও! সঙ্গে সঙ্গে চোখের নিমেষে 'ভুকোত' বা হত্যাকারী ফাঁস ছুঁড়বে সকলের গলায়। একজন এসে পায়ে ধাক্কা দিয়ে—ধরাশায়ী করে দেবে মানুষটিকে। তার নাম—'চুমিয়া'। একজন হাত ধরবে। তার নাম চুমোসিয়া বা 'সামসিয়া'। তারপর ডিভিসন অব লেবার অনুযায়ী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাজ শেষ। একদল দেহগুলো বহন করে নিয়ে যাবে কবরের দিকে। অন্য দল—কেটে কেটে তা কবরে ফেলবে, আর একদল মাটি দেবে। সব শেষ হয়ে গেলে ওরা সকলে বসে গুড় সহযোগে ভোজ করবে। ঠগীর কাছে সে গুড় নাকি অমৃতের সমান। হত্যার সময়ে ঠগীদের মধ্যে নিয়ম ছিল কোন ঘুমন্ত মানুষকে খুন করা চলবে না। খুনী তাই ফাঁস হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠত—সাপ! সাপ! অথবা—বিছা! বিছা! ধড়ফড় করে লোকটি উঠে বসেই আবার লুটিয়ে পড়ত। অতঃপর সে ঘুম আর তার কোনদিনই ভাঙত না।—এমন 'পরিচ্ছন্ন' খুন সত্যিই আর হয় না!

যে পর্যন্ত না তার মনোমত সময় আসছে ঠগীরা তার আগে কিছুতেই তাড়া-হুড়া করে কাজ সারবে না। একটা দল বারোজন মানুষকে খুন করতে কুড়ি দিনে দু'শ মাইল হেঁটে ছিল। হাঁটবার সময় ওদের নিয়ম ছিল ছোট ছোট দলে বিচ্ছিন্ন-ভাবে চলা। তবে সব দলের সঙ্গেই নিয়মিত খবরাখবর আদান-প্রদান চলত। হাঁটতে হাঁটতে চৌরাস্তায় এসে পড়লে আগের দল নিঃশব্দে বালির উপর পায়ে একটি রেখা টেনে দিয়ে যেত। সে দাগ দেখেই পেছনের দল বুঝতে পারত—কোন পথে চলতে হবে।

কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ওরা চলবেই। হয়ত আখেরে কাঁচ তামার পয়সা মাত্র মিলবে, কিন্তু তবুও যাকে ওরা পছন্দ করেছে, তাকে হত্যা করবেই। যত সাবধানীই হন তিনি, ঠগীর হাতে তাঁর নিস্তার নেই।

ঃ একদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক উচ্চ-বংশীয় মুসলিম যুবক যাচ্ছিলেন পথ দিয়ে। সঙ্গে তাঁর বিস্তর লোক লস্কর। ভদ্রলোক নিজেও সুসজ্জিত। তাঁর কোমরের এক-দিকে তলোয়ার, অন্যদিকে পিস্তল, পিঠে তীর ধনুক। ঠগীর দল স্থির করল, ওঁকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই কোন অপরিচিত লোককে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। হক না তারা—হিন্দু তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণ!

দ্বিতীয় দিনে একদল মুসলিম পথিকের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। তারা সোজাসুজি ঠগীদের কথাই তুলে বসল—যা দিনকাল পড়েছে, এমন সময় একা একা পথ চলা ঠিক নয়, আমাদের নসীব ভাল, আপনার মত সুসজ্জিত সঙ্গী পেয়ে গেলাম। ভদ্রলোক তবুও অনড়। তিনি হাঁকলেন—তফাৎ যাও!

তৃতীয় দিনে পথে এক সরাইয়ে রাত কাটালেন তিনি। ঠগীদের একটি দলও এসে আস্তানা গাড়ল সেখানে। নবাবজাদার সঙ্গে আলাপের সুযোগ হল না বটে, তাদের, কিন্তু তার চাকর-বাকর অনেকের সঙ্গেই তাদের খাতির হয়ে গেল।

চতুর্থ দিনে—আবার দুই দলের দেখা।

দলপতি বলেন—আমার কোন সঙ্গীর দরকার নেই, ভৃত্যেরা বলে—এরা আমাদের বন্ধু, লোক ভাল। তবুও নবাব তাড়িয়ে দিলেন ওদের।

পঞ্চম দিনে দেখা গেল—পথের ধারে একদল মুসলমান সেপাই একটা মড়া নিয়ে বসে কাঁদছে। নবাবজাদাকে দেখে এগিয়ে এল তারা। বলল—হুজুর আমাদের সঙ্গী হাঁটিতে হাঁটিতে মারা গেছে। কবর তৈরী, আপনি যদি শেষকৃত্যটুকু করে দেন। নিজেও মুসলমান, নবাব তাই আর এই অনুরোধ পায়ে ঠেলতে পারলেন না। তিনি তলোয়ারের বদলে কোরাণ হাতে ঘোড়া থেকে নেমে এসে প্রার্থনায় বসলেন। তাঁর দুই পাশে সিপাহীর ছদ্মবেশে দুই ঠগী। ভদ্রলোক চোখ বুজে প্রার্থনা করছেন, এমন সময় মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষিত হল। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল 'তামাকু লেও'! সঙ্গে সঙ্গে একজন ফাঁস পরিয়ে দিল তার গলায়। অন্যরা যুগপৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ভৃত্যবহরের ওপর।

এই হচ্ছে—ঠগী, ভারতের নিজস্ব, একান্ত আপন—'ঠগস!' তাই বলছিলাম—হক না শতাধিক বছর পরে, পুলিসের খাতায় ছাপার হরফে তার উল্লেখ দেখলে এখনও আপন কবরের পাশে ধ্যানমগ্ন নবাবজাদার অসহায় মূর্তিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে বৈ কি!

অথচ, অতঃপর বলা নিষ্প্রয়োজন, এ প্রতিমা একটি নয়,—শত শত, হাজার হাজার,—লক্ষ লক্ষ!

তারই একটি আজও রয়েছে ইলোরায়।

যদি কেউ আজ ইলোরা গুহায় আসেন এবং মৌন পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ সারি সারি মূর্তিগুলোর দিকে ভাল করে নজর করেন তা হলে একই দৃশ্য দেখতে পাবেন তিনি। ঠিক যেন নবাবজাদারই কোন রূপান্তর। এক ব্রাহ্মণ শিবপূজায় মগ্ন। পেছন থেকে তার ওপরে ফাঁস হাতে ঝাঁপিয়ে এক ঠগী, চমকিত মহাদেব ভক্তকে রক্ষার চেষ্টায় মত্ত!

ইলোরা সপ্তম শতকের ভারতীয় শিল্প-কীর্তি। সুতরাং, অনেকের ধারণা—ঠগী ভারতেরই নিজস্ব সৃষ্টি। বিশেষ করে, আমাদের পুরাণের 'নাগপাশ' নামক হাতিয়ারটি নাকি তাই প্রমাণ করে।

কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলেন—সেটা প্রমাণ নয়, অনুমান মাত্র। কেননা, হেরোডটাস এদের পারসিক বলে বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর ইতিকথার সপ্তম খণ্ডে তিনি লিখে গেছেন—এরা আদিতে পারসিক, এদের ভাষা পারসিক, পোশাক অনেকটা পারসিক-দের মত, অনেকটা ব্যাকট্রিয়ানদের মত। তবে আসল বৈশিষ্ট্য এদের হাতিয়ারে। ওরা লোহা বা পিতলের কোন অস্ত্র বহন করে না

—হাতিয়ার তাদের একটি চামড়ার ফিতের তৈরী ফাঁস।

হেরোডোটাস লিখেছেন—এই অদ্ভুত দস্যুদলের আদি পুরুষ হচ্ছেন সাগাতি, যিনি জারেকসাসকে আট হাজার অশ্বারোহী দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা খুঁজে পেতে সিদ্ধান্ত করেছেন—ভারতের ঠগীরাও সেই বিশ্রুত পুরুষ সাগাতি'রই উত্তরপুরুষ। পশ্চিমের মুসলিম বিজেতাদের পায়ে পায়ে তারাও একদিন এসেছিল এই দেশে, তারপর থেকে আর ফেরেনি। অনুকূল আবহাওয়ায় দিনে দিনে বেড়ে দেশটিকে অরণ্যে পরিণত করেছে মাত্র।

সুলতানদের সহযাত্রী হিসেবে এসেছিল বলেই নবাগত ঠগীদের ঠিকানা ছিল রাজধানী দিল্লির আশেপাশে। ফিরোজ খাঁর দরবারী ঐতিহাসিক জিয়া-উদ-বারনি ১৩৫৬ সনে লিখছেন—১২৯০ সনে দিল্লিতে প্রায় এক হাজার ঠগ ধরা পড়েছিল। কিন্তু কৃপাপরবশ হয়ে উদার সুলতান তাদের প্রাণদণ্ডের বদলে দণ্ডিত করেন নির্বাসন দণ্ডে, তিনি বন্দীদের চালান দিয়ে দেন পূর্ব ভারতে, লাখনাতে (Lakhnant), বাংলাদেশের ঠগ সেখান থেকেই সংক্রামিত।

মুসলিম আমলে ঠগীর কাহিনী দ্বিতীয়বার শোনা যায় সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬—১৬০৫)। সেবার ধরা পড়েছিল পাঁচ শ' এবং সব এটোয়া জেলায়।

যা হক, রাজধানী থেকে বিতাড়িত ঠগীরা নানা দলে ভাগ হয়ে এক সময় ছিটিয়ে পড়ে নানাদিকে। কয়েক শ' বছর পরে তাদের তাড়িয়ে বেড়াতে বেড়াতে কোম্পানীর কর্মচারীরা ক্রমে আবিষ্কার করেছিলেন—সাকুল্যে এদের গোত্র আছে সাতটি। (১) বাহ্‌লিম, (২) ভিন, (৩) ভুজসোত, (৪) কাচুনি, (৫) হুত্তার, (৬) গানু এবং (৭) তুর্নাদিল। ভারতে যত ঠগী তাদের আদি এই সাত পরিবার।

দিল্লির পর এদের মধ্যে পাঁচটি পরিবারই বসতি স্থাপন করে আগ্রায়। অন্য এলাকার ঠগীদের কাছে তাদের নাম—[illegible]রিয়া। এক দল চলে যায় দক্ষিণে, আর্কটে। তারাই সব চেয়ে বনেদী ঘরানা। অন্য দলের সংগে পোশাক এবং চালচলনে তাদের অনেক পার্থক্য। এরা সাধারণত ডোরাকাটা লুংগী পরত, গায়ে দিত কোম্পানীর সিপাইদের মত খাটো জ্যাকেট। বাবুয়ানার প্রতীক হিসেবে হাতে হাতে থাকত তাদের একগাছা করে বেত! রাস্তায় যখন শিকারের খোঁজে বের হত তখন তাদের সংগে থাকত নিজস্ব বাবুর্চি, হুঁকোবরদার এবং আরও নানা শ্রেণীর ভৃত্য। তবে এমন বড়মানুষি সত্ত্বেও আর্কটিদের কোন মর্যাদা ছিল না উত্তর ভারতের ঠগীদের চোখে। 'হিন্দুস্তানী ঠগেরা' বলত—ওরা আসলে অনেক নিচু

মনে হল, মেয়েটি ভালবেসে ফেলেছে আমাকে

জাত, ওদের ঘরে আমরা মেয়ে পর্যন্ত দিতে পারি না!

এই দুই 'জাতের' ঠগী ছাড়াও ছিল মালব এবং রাজপুতানার 'সুসিয়া' সম্প্রদায়, অযোধ্যার 'জুমালদেহী' সম্প্রদায় এবং মুলতানের 'চিঙ্গুরী'রা। রাজপুতদের সুসিয়াদের পদবী ছিল—নায়েক, থোরি ইত্যাদি। আর্কটিদের মত তাদেরও বাবুয়ানার খ্যাতি ছিল। দলপতিরা পাল্কী চড়ে বাণিজ্যে বের হত। মুলতানীদের বৈশিষ্ট্য ছিল—তারা কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে ভালবাসত না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমেত সংসার গরুর গাড়িতে চাপিয়ে সাধারণত পথে পথেই ঘুরে বেড়াত। দৈবাৎ মর্জি হলে কোথাও হয়ত গাঁ সাজাত।

তবে চালচলন এবং আচার ব্যবহারে রকমফের ঘটলেও বিশাল ভারতের বিস্ময়কর অন্তঃপ্রকৃতির মতই তার এই বেপরোয়া সন্তানদের বৈচিত্র্যময় জীবনের অন্তরালেও ছিল এক অচ্ছেদ্য ঐক্য সূত্র। হিন্দু হক, মুসলিম হক, তারা সকলেই ছিল—ঠগী। ফাঁসুড়ে, আরিতুলুকের, তুন্তা কালের—যে নামেই লোকে জানুক তাদের, তারা—ঠগী। তাদের হাতিয়ার এক, 'ভাষা' এক, জীবনের লক্ষ্য এক,—ধর্ম এক।

ঠগী-ধর্ম এক অদ্ভুত সমন্বয়বাদ। দুটি অপরিচিত দূরবর্তী ধর্মের নৈকট্য, সংস্পর্শ বা সংঘাত মানুষের ধ্যানের জগতে অনেক সময়েই অভাবিত তৃতীয় ধারণার জন্ম দিয়েছে। ভারতবর্ষের লৌকিক ইতিহাসেও সমন্বয়ের সেই নজীর অজ্ঞাত নয়। কিন্তু হিন্দু মুসলিমের যুগ্ম সাধনা ঠগীদের মধ্যে যেমন অন্তরঙ্গ রূপ নিয়েছিল তেমন বোধহয় আর হয় না।

ঐতিহাসিক যাই বলেন—হাজার হাজার ঠগী আদালতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছে তারা 'মা ভবানী' বা কালীমাতার সন্তান। তাদের তীর্থ সুদূর বাংলা দেশে কালীঘাট। সেখানে যে ভবানী তাঁরই নির্দেশে তাঁরই

আশীর্বাদে, তাঁরই আশ্রয়ে—তারা এ জীবনাচারী, মা তাদের হাতে ফাঁস তুলে দিয়েছেন বলেই তারা ফাঁসীগীর,—ঠগী।

কি করে ভবানীর এ আশীর্বাদ তাদের মস্তকে বর্ষিত হল সে কাহিনীও ঠগীদের মুখস্ত। পৃথিবীতে তখন আবির্ভূত হয়েছে মহাদানব রক্তবীজ। তার উপদ্রবে সৃষ্টি বিনষ্ট হওয়ার পথে। জগদম্বা কালী তার সংগে লড়াই করতে গিয়ে ক্লান্ত। কেননা, রক্তবীজের প্রতিবিন্দু রক্ত থেকে আবার উৎপন্ন হচ্ছে মহাবলী সব রাক্ষস। বিরক্ত ভবানী অতঃপর চিন্তিত হয়ে উঠলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর দেহনিঃসৃত ঘর্ম থেকে উৎপন্ন হল দুটি মনুষ্য ভবানী তাঁর হাতের রুমালটি তাদের হাতে দিয়ে বললেন —এই তোমাদের অস্ত্র, তোমরা শত্রু নিধনে তৎপর হও। ওরা মাকে প্রণাম করে—সেই হরিদ্রাবর্ণ কাপড়ের ফাঁস হাতে নিয়ে রণ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। দেখতে দেখতে রক্ত-বীজের শেষ বংশধরটিও ধরাশায়ী হল।

ঠগীরা বলে—লড়াই শেষে ভক্ত দুজন মাকে আবার তাঁর রুমাল ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভবানী বললেন—না বৎস, এই অস্ত্র আমি আর চাই না। রুমাল আমি তোমাদেরই দিলাম, যারা বিপরীত ধর্মের সৃষ্টি এর সাহায্যে তোমরা তাদের বিনাশ করবে। ঠগীরা আরও বলে—কলিযুগের গোড়ার দিকে পর্যন্ত মা ভবানী প্রতিটি হত্যায় তাদের সংগে থাকতেন। মৃতদেহের দায়িত্ব ছিল তাঁর, তখন কবরের দরকার হ'ত না। কিন্তু একদিন হঠাৎ এক ঠগী খুনের শেষে পিছন ফিরেই সর্বনাশ ঘটাল। ভবানী তখন এই মাত্র খুন করে রেখে আসা ভোগ গ্রহণ করছিলেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিত-ভাবে ভক্তের সংগে চোখোচোখি হওয়ায় তিনি যারপরনাই রুষ্ট হলেন। তিনি বললেন—এবার থেকে মৃতের দায়িত্বও তোমাদের। ঠগীরা কান্নাকাটি সুরু করল। দেবী আবার প্রসন্ন হলেন। নিজের একখানা দাঁত ওদের হাতে দিয়ে বললেন—এই তোমাদের খুন্তি, বুকের একখানা পাঁজর দিয়ে বললেন—এই তোমাদের ছুরি। খুন্তি দিয়ে কবর খুঁড়বে, ছুরি দিয়ে কেটে মৃত-দেহ সে কবরে মাটি দেবে। —সব আপদ দূর হবে।

সেই থেকে—রুমালের মত খুন্তি আর ছুরিও ঠগীদের কাছে আশীর্বাদপূত হাতিয়ার। এবং সেই থেকে ঠগীরা ভবানী বলতে উন্মাদ।

কৌতূহলী ইংরেজ জানতে চাইলেন—সাহেব খান তুমি কি মুসলিম?

—আজ্ঞে হুজুর, আমরা দক্ষিণের ঠগীরা প্রায় সবাই মুসলমান।

—তোমাদের দেবী কে?

—আজ্ঞে, ভবানী, মা কালী।

—তোমাদের কি মুসলমানদের নিয়মেই পানাহার বিয়ে সাদী হয়"

—হ্যাঁ।

—কিন্তু সেই পবিত্র শাস্ত্রে কি ভবানী আছেন?

—না।

—তবে তোমরা কেন তাঁর ভজনা কর, তাঁর মন্দিরে যাও।

—সে কথা স্বতন্ত্র। আমরা যে তারই সন্তান!

হিন্দুস্তানী এক মুসলিম ঠগীর যুক্তি আরও সুন্দর, আরও বিস্ময়কর। সে বলল —আমি মনে করি দুই ধর্মবিশ্বাসীরই একই জননী!

সুতরাং,—জয় ভবানী। পাতালের এই আলো নিয়ে সুরু হল ভারতময় হিন্দু-মুসলমানের এক বিস্ময়কর মিলিত সাধনা, —খুন! খুন! খুন! রাজস্থানের মরু-প্রদেশ, পাঞ্জাবে সিন্ধু তীরে, উত্তরে গংগা-যমুনার অববাহিকা ঘিরে, দক্ষিণে নর্মদা, এপারে গোটা দাক্ষিণাত্য জুড়ে—সমগ্র ভারতের পথে পথে তখন নিঃশব্দ পায়ে হাজার হাজার খুনী ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতি সন্ধ্যায় শত শত বৃক্ষতলে উচ্চারিত হচ্ছে—ভবানীর আদেশ, মৃত্যু পরোয়ানা,—'তামাকু লেও! —পান লেও!'

অথচ আশ্চর্য এই ভারত সে খবর জানে না। তার নিশ্চিত নির্বিকল্প মুখের দিকে তাকালে—এদেশের মাটিতে সে ঘটনা যেন ভাবাও যায় না।

একজন ভেবেছিলেন।

তিনি আর এক 'ঠগী'। ফিরিঙ্গী 'ঠগী'। ভারতের ইতিহাসে নাম তাঁর উইলিয়াম হেনরী স্লীম্যান। ইউরোপে পরিচয় তাঁর—'ঠগী স্লীম্যান'।

ভারতের নানা রাজ্যের ভবানী শিষ্যরা যখন শত শত মাইল হেঁটে, শত শত প্রাণের অর্ঘ্য হৃদয়ে বহন করে পরমানন্দে খাস কলকাতার বুকের ওপর দিয়ে কালীঘাটের পথিক, তখন কালীঘাটের অদূরেই ফোর্ট-উইলিয়ামের একটি নির্জন কক্ষে উনিশ বছরের এক ইংরেজ তরুণ বেংগল আর্মির এক শিক্ষানবীশ সৈনিক একটি ভ্রমণ-কাহিনীর পাতায় মগ্ন। পড়তে পড়তে এমন একটি জায়গায় তিনি এসে ঠেকেছেন—
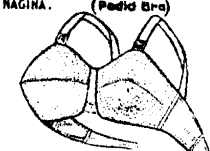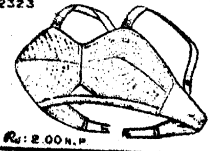
সেখান থেকে কিছুতেই আর এগোন যাচ্ছে না,—এগোন সম্ভব নয়। —কে ওরা, এই বিচিত্র পেশার মানুষগুলো কি এখনও আছে?

ভ্রমণ কাহিনীটির লেখক—এম থিভেনট নামে একজন ফরাসী পর্যটক। সপ্তদশ শতকে ভারতে এসেছিলেন তিনি। বইটি সেকালের দেখা-শোনা ভারতের বিবরণ।

কালীঘাট থেকে তীর্থ সেরে আরও বেপরোয়া ঠগীরা যখন গান গাইতে গাইতে চৌরঙ্গীর পথে নিজ নিজ কর্মভূমিতে ফিরছে—ময়দানের ওপারে তখন তরুণ স্লীম্যান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে পড়ছেন: দিল্লি আর আগ্রার মাঝামাঝি পথে বাঘ সাপের চেয়েও ভয়াল যারা তারা একজাতীয় দস্যু। পৃথিবীতে এমন নিপুণ, এমন বিচক্ষণ খুনী আর হয় না। অথচ তারা হত্যা করে শুধু মাত্র একগাছা দড়ি দিয়ে! কখনও কখনও শিকারকে আরও এক আশ্চর্য কৌশলে প্রতারিত করে তারা। পথিক চলতে চলতে হঠাৎ দেখেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটি সুন্দরী রমণী কাঁদছে। নিঃসঙ্গ বনপথে অসহায় নারীকে দেখে কে না থমকে দাঁড়াবে? ক্রমে মেয়েটি তার কাছে নিজ দুঃখের কাহিনী বিবৃত করবে, ক্রমে দুজনের আলাপ হবে। পথিক তাকে পরবর্তী গঞ্জ অথবা শহরে পৌঁছে দিতে রাজী হবে, রমণীকে পেছনে বসিয়ে সে আবার ঘোড়ায় চড়বে। ক' মিনিট পরেই সেই নারী নিজ মূর্তি ধারণ করবে, —উপকারীর গলায় রুমালটা পরিয়ে দেবে!......

যতবার পড়েন ততবারই স্লীম্যানের চোখে মুখে এক অস্ফুট জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে.—এখনও কি আছে ওরা? —আজও কি রয়েছে সেই খুনীরা? কলকাতায়, বারাকপুরে, বারাসতে—পুরানো মানুষ যাঁকেই সামনে পান তাকে জিজ্ঞাসা করেন স্লীম্যান—আজও কি এদেশে বেঁচে আছে ফাঁসীগারেরা? —সপ্তদশ শতকের সেই খুনীরা? কিন্তু বৃথাই খ্যাপার মত খুঁজে ফেরা, স্লীম্যানের এই জিজ্ঞাসার কেউ উত্তর জানে না।

ক' বছর পরে নিজেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন—ফোর্ট উইলিয়মের সেই জিজ্ঞাসার উত্তর। এবারও লাইব্রেরীতে, প্রাণহীন একটি পাণ্ডুলিপিতে। ১৮১৬-১৭ সনের কথা। সৈনিকের বেশে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে স্লীম্যান তখন এলাহাবাদে। সেখানকার কালেক্টার অফিসের লাইব্রেরীতে হঠাৎ একদিন একটি পাণ্ডুলিপি হাতে পড়ল তার। লেখক—ডাঃ রিচার্ড শেরউড, মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জের সার্জন। সমগ্র রিপোর্টটি তার ঠগীদের নিয়েই লেখা। অবশ্য মাত্র কয়েকটি পাতা, তবে রচনাকাল অত্যন্ত সাম্প্রতিক, বলতে গেলে মাত্র বছর-খানেক আগের। ডাঃ শেরউড লিখছেন—১৭৯৯ সনে শ্রীরঙ্গপত্তমের পতনের পরে প্রায় একশ' ঠগ ধরা পড়ে ছিল। বাঙ্গালোরে তাদের বন্দী রাখা কালেই ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে তাদের প্রথম মোলাকাত। তবে—ওদের অস্তিত্ব আছে, ইউরোপীয়ানরা এখনও এ খবরটুকুই মাত্র জানে। ডাঃ শের-উড বহু কষ্টে এদের কিছু কিছু তথ্য জোগাড় করেছেন। তিনি এই খুনীদের ভাষা সম্বন্ধে বলে দিয়েছেন। রিপোর্টের পরি-শিষ্টে সে ভাষার নমুনাও তিনি দিয়েছেন কিছু কিছু।

স্লীম্যান চঞ্চল হয়ে উঠলেন। রিপোর্টটি তিনি বাড়ি নিয়ে গেলেন। সে রাত্রিরে
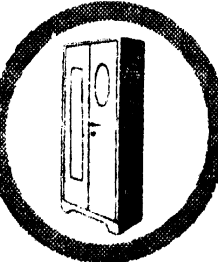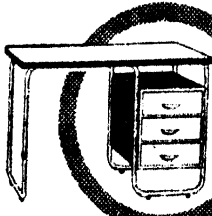
আর ঘুম হল না। ডাঃ শেরউডের সংগৃহীত শব্দগুলো তার কানের গোড়ায় যেন চিৎকার করছে—তামাকু লেও! —পান লেও! উদ্যোগী সৈনিক ইতিমধ্যেই উর্দু শিখে ফেলেছেন, হিন্দুস্থানী সরগর করে ফেলেছেন, এ ভাষাও শিখতে হবে তাঁকে, আওয়াজ ধরে খুঁজে বের করতে হবে খুনীকে।

সে সুযোগও এল একদিন। এবং এল অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। ১৮২২ সনের কথা। স্লীম্যান তখন আর সৈন্য-বাহিনীতে নেই। তিন বছর আগে সৈনিকের পোশাক ছেড়ে তিনি সিভিল সার্ভেন্টের কোট গায়ে চাপিয়েছেন। তার পদ তখন—'জুনিয়ার অ্যাসিস্টেণ্ট টু দি এজেণ্ট অব দি গভর্নর জেনারেল ইন সগর এণ্ড নর্মদা টেরিটোরিস......।' সগর থেকে তিনি সেদিন সুতরাং লোকগুলোকে দেখেই কেন জানি তাঁর সন্দেহও আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে গাছতলার পথিকেরা ছাড়া পেয়ে তাদের নিজেদের পথ ধরেছে। পিছনে একটা সিপাই বাহিনী পাঠাতে নির্দেশ দিয়ে স্লীম্যান একা ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে বসলেন।

বেশীদূর যেতে হল না। সাহেবকে দেখে ওরা সেলাম করে থেমে দাঁড়াল। স্লীম্যান বললেন—তোমরা বস, তোমাদের সঙ্গে আমার একটু আলাপ আছে। আলাপ করতে করতে চারপাশে সৈন্যরা এসে ঘিরে দাঁড়াল। স্লীম্যান বললেন—তোমরা অমুক অমুক জায়গায় ডাকাতি করেছ। ওরা খিল খিল করে হেসে উঠল।—না সাহেব, আমরা ডাকাত নই!

জানতেন। কিন্তু তবুও এদের নিয়ে জব্বল-পুরের পথে হাঁটতে হাঁটতে একবারও মৃত্যু ভয় তাঁর মনে উঁকি দেয়নি। একমাত্র ভাবনা তাঁর সেদিন—এই মানুষগুলো, শত শত বছর পরে মানুষের অবয়বে এইমাত্র তিনি যাদের আবিষ্কার করলেন! ওরা জানত না—ওদের সামনে ছোটখাট ঐ সাহেবটি তখন আনন্দে ঘোড়ার পিঠে থর থর করে কাঁপছেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন স্লীম্যান, আজ থেকে এদের রহস্য উদ্ঘাটনই তাঁর জীবন, যদি এ পাপ আজও সত্যিই থেকে থাকে তবে তার উচ্ছেদই হবে হিন্দুস্থানে তাঁর একমাত্র ধ্যান।

জব্বলপুরে এসে যে মুহূর্তে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামলেন স্লীম্যান, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি ইতিহাসের পুরুষ,—'ঠগী!'

মাত্র কয়েক মিনিটের কাজ। একজন পা ধরে থাকবে; অন্যজন......

জব্বলপুরে এসেছেন। জব্বলপুরে কাছারীর সামনে দেখেন তল্পিতল্পা নিয়ে কতকগুলো লোক বসে আছে। —কে ওরা? ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মলোনিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। মলোনি উত্তর দিলেন—সিপাইরা ধরে এনেছিল ডাকাত ভেবে, কিন্তু আমি নেড়েচেড়ে দেখেছি কেউ নয়, সেরেফ ভ্রমণকারী।

স্লীম্যান ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। তাঁর মনে তখন কলকাতার সেই বইয়ের লাইন কয়টি জ্বল জ্বল করছে, কানে ভাসছে ডাঃ শেরউডের শব্দ সংগ্রহটি। তাছাড়া ইতিমধ্যে তিনি নানা সূত্রে আরও খবর পেয়েছেন, ১৮০৭ সনে চিত্তোর এবং আর্কটে একটি দল সত্যিই ধরা পড়েছিল। এবং তারপরে ১৮১০ সনে প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল লীগার দেশওয়ালী সিপাইদের এদের সম্পর্কে সাবধানও করে দিয়েছিলেন।

স্লীম্যান নিজেও সেটা জানেন। তবুও লোকগুলোকে বসিয়ে রাখতে হবে। কারণ পুলিশ না এলে এদের নিয়ে জব্বলপুর ফেরা যাবে না। ওরা গাছতলায় বসে রইল। সামনে হাতে মাথা রেখে বসে আছে সাহেব। যেন ঘুমুচ্ছে।

ঘুম নয়, জব্বলপুরের অদূরে পাটনের পথে হিন্দুস্থানের মাটিতে বসে তরুণ সিবিলিয়ান স্লীম্যান সেদিন স্বপ্ন দেখছিলেন। লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। সে কথা এক অভাবিত স্বপ্নলোকের, অন্য জগতের। ডাঃ শেরউডের ছাত্র স্লীম্যান তার সব অর্থ না বুঝলেও এটুকু বুঝতে পারছেন, তিনি একদল ঠগীর মধ্যে বসে আছেন। সেই ঠগী যা তাঁর ধ্যান, স্বপ্ন।

যে কোন মুহূর্তে সাহেবের গলায় ফাঁস পরিয়ে দিতে পারে ওরা। স্লীম্যান তা

রহস্যময় পুরুষ 'ঠগী স্লীম্যানের' হাতে একটি দল ধরা পড়ল। তারপর দেখতে দেখতে আরও। একের পর এক,—অজস্র। '২৯-৩০ সনে গভর্নর জেনারেল বেণ্টিঙ্ক 'ঠগী'র পিঠে হাত রাখলেন। স্লীম্যানের ওপর ভার দিলেন তিনি—গাঁ উজাড় হয়ে গেলেও শেষ ঠগটি পর্যন্ত খুঁজে বার করতে হবে।

সে এক অভাবিত দায়িত্ব। এর চেয়ে অনেক সহজ যে কোন একটা দেশ জয়, কিন্তু স্লীম্যান নিজেই মনে মনে দায়বদ্ধ সুতরাং, দিকে দিকে বসান হল উৎসাহী তরুণদের। বর্থউইক, স্টুয়ার্ট, ম্যালকম হলিং, স্মিথ। তারপর ভারত জুড়ে নিক্ষিপ্ত হল 'ঠগী'র নিজের হাতে বোনা নিখুঁত জাল। একে একে ঝাঁকের পর ঝাঁক উঠে আসতে লাগল।

অসুবিধে ছিল বিস্তর। কেননা, কাজে নেমে জানা গিয়েছিল অবশিষ্ট ভারত যতটা নির্দোষ সেজেছে ঠিক ততটা নির্দোষ সে নয়। জমিদার তালুকদারেরা অনেক ক্ষেত্রেই এদের পৃষ্ঠপোষকতা করত। কেননা, খাজনা মিলত। অনেক সময় তারও বেশী। কোর্ট কাছারী থানা পুলিশের ভয়ে সাধারণ লোকও সহসা কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চাইত না। তাছাড়া, একটা অহেতুক অমংগল ভয়ও তাদের পেয়ে বসেছিল। ঠগীরাই ক্রমে তাদের মনে এই আতংক বদ্ধমূল করেছিল যে, তাদের ওপর হাত তুললে—বিনাশ নিশ্চিত। সিন্ধিয়া একবার তিরিশ জনকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। —তার তিন মাস পরেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। জালুনরাজ একবার দুজনকে মেরেছিলেন,—ক'মাসের মধ্যেই নিজেও তিনি কুষ্ঠরোগে ইহলোক ত্যাগ করেন। চতুর্দিকে তখন এমনি সব গুজব।

তারই মধ্যে অসাধ্য সাধন করলেন 'ফিরিংগী ঠগ' স্লীম্যান। দশ বছর পরে, ১৮৪০ সনে হিসেব বের হলে দেখা গেল সাকুল্যে তাঁর হাতে ধরা পড়েছে মোট তিন হাজার ছ'শ উননব্বই জন ঠগ। তার মধ্যে

সাহেবরা বলত—'ঠগ' স্লীম্যান

ফাঁসী হয়েছে—৪৬৬ জনের, দ্বীপান্তরী হয়েছে—১৫০৪ জন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে—৯৩৩ জনের, রাজসাক্ষী হয়েছে ৫৬ জন এবং পালিয়ে গেছে—১২ জন!

আজকের মত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না, দ্রুতগতি যানবাহন ছিল না, তারই মধ্যে কখনও উটে চড়ে, কখনও ঘোড়ায়, কখনও পাল্কীতে—তামাম ভারতময় হাজার হাজার মাইল ঠগ খুঁজে বেড়িয়েছেন ঠগী স্লীম্যান। দিনের শেষে তাঁবুতে বসে মোমের আলোয় নিজের হাতে ঠগের বংশতালিকা তৈরী করেছেন, ম্যাপ এঁকেছেন, রিপোর্ট লিখেছেন। সকালে আবার যাত্রা সুরু করেছেন। '—কৈ আমাকে ত ঠেকাতে পারছ না তোমরা!'—স্লীম্যান জিজ্ঞেস করেছিলেন এক ঠগীকে।

—সে সাহেব কোম্পানীর ইকবাল! —তোমার ডাকের সামনে ভূত প্রেত সব পালিয়ে যায়, ঠগী দাঁড়ায় কোথায়? তাছাড়া সাচ্চা ঠগ-ই বা আজ আর কই!

ওরা রণভংগ দিয়েছিল। কেননা, দেখে দেখে ক্রমে ওদের বিশ্বাস হয়ে গেল—এ সাহেব দেবশিষ্ট প্রেরিত পুরুষ, এর সংগে পাল্লা দেওয়া চলে না। ...কীর্তিবিন্দ। —নয়ত এমন যে দুর্ধর্ষ ঠগী ফিরিংগীয়া সেও কেন সাহেবের চোখের দিকে তাকাতে পারল না।

মাসের পর মাস পিছু তাড়িয়ে অবশেষে যখন ধরা হল ফিরিংগীয়াকে তখন সে কয়েক

'লুগহা' কবর খুঁড়ছে

শ' মানুষের হত্যাকারী,—অকুতোভয় ঠগী নায়ক।

যথাসময়ে বন্দীকে স্লীম্যান সমীপে আনা হল। সাহেব একটা ফাইল দেখছিলেন। পায়ের শব্দে একবার চোখ তুলে তাকালেনও না তাঁর এতদিনের ধ্যানের মানুষটির দিকে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিঙ্গীয়া নিজেই সাড়া দিল: সাহেব আমি ফিরিঙ্গীয়া।

নির্লিপ্তের মত স্লীম্যান ফাইল থেকে মুখ তুললেন। —কি চাই তোমার?

—সাহেব তুমি আমার মা এবং স্ত্রীকে আটকে রেখেছ, আমরা নির্দোষ গৃহস্থ......।

স্লীম্যান একবার ওর চোখের দিকে তাকালেন। —নির্দোষ? ফিরিঙ্গীয়া অবাক হয়ে শুনল—একের পর এক তার খুনের কাহিনী বলে যাচ্ছে সাহেব। সেই কাহিনী-গুলো যা তার ধারণা ভবানী ছাড়া পৃথিবীতে কেউ জানে না, জানতে পারে না। আরও অবাক কাণ্ড, সাহেব কথা বলছে তার গোপন ভাষায় 'রামসি'তে। এমন অনর্গল যেন সে নিজেও ঠগী!

মুহূর্তে এত বড় জোয়ান মানুষটা যেন চুপসে গেল। সে কাঁপতে লাগল। স্লীম্যান অন্যান্য অফিসারদের ইঙ্গিত করলেন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। তারপর ওর চোখে চোখ রেখে বললেন—রাজসাক্ষী হবে রাজী? ভেবে দেখ, এক মিনিট সময় দিচ্ছি! সাহেব পকেট থেকে ঘড়ি বের করে টেবিলে রাখলেন। খুনী ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ল!

পথিকের বেশে খুনী দল

যেন শত শত বছরের ইতিহাস সহসা কোন্ যাদুবলে চিরকালের মত মুছে গেল।

তারপরও অবশ্য মাঝে মাঝে শোনা যেত তাদের কথা। '৪৮ সনেও ধরা পড়েছিল—একশ' কুড়িজন। এমন কি ১৮৫৩ সনেও কয়েকজন ধরা পড়েছিল পাঞ্জাবে। কিন্তু সে নেহাৎই বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। ঠগীর আসল
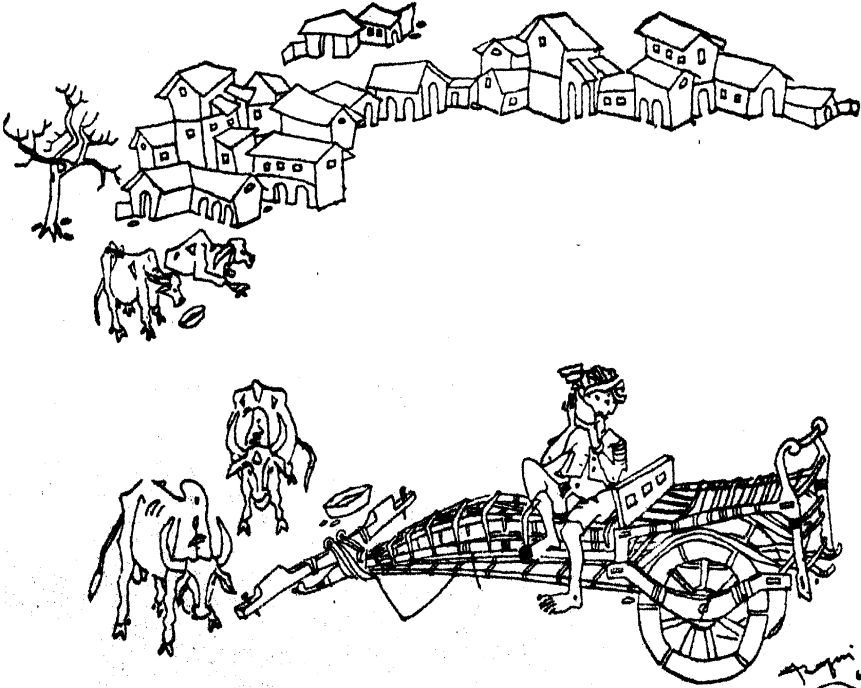
লোকায়ত

স্কেচ—তুফান রাফাই

শেকড় তার অনেক আগেই উপড়ে ফেলেছেন 'ফিরিংগী ঠগী',—এখন তাদের সম্পূর্ণ অন্য পোশাক, অন্য পরিচয়। কখনও দেখা যেত স্লীম্যান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন, গতকাল অবধিও বিনাশ ছিল যাদের ধর্ম সেই ঠগীরা পথের ধারে চারা গাছ বসাচ্ছে। নর্মদার ঝাঁসী ঘাট থেকে গংগা-তীরের মীর্জাপুর পর্যন্ত ছিয়াশী মাইল পথের দু'ধারে যত গাছ সব ঠগীদেরই হাতে বসান। স্লীম্যান তাদের ধর্মহরণ করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি তাদের নবধর্মে দীক্ষিতও করে দিয়ে গিয়েছিলেন। জব্বলপুরে মস্ত কারিগরী স্কুল বসিয়েছিলেন তিনি—ঠগীদের জন্যে। ১৮৪৭ সনে সেখানে উঁকি দিলে দেখা যেত—যে হাত ক'দিন আগেও রুমালের ফাঁস ছাড়া আর কিছু ধরতে জানত না—তারা ঠক ঠক তাঁত চালাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন 'ঠগী
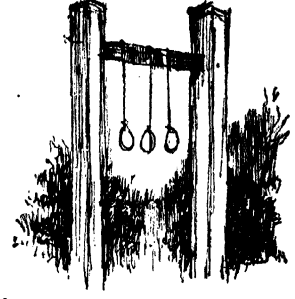
সানন্দে ওরা ফাঁসটা গলায় তুলে নিত

স্লীম্যান'। তাঁরই নির্দেশে—মহারাণীর জন্যে কার্পেট তৈরী হচ্ছে। উইন্ডসর ক্যাসেলের ওয়াটারলু চেম্বারে আজও রয়েছে ভারতের ঠগীদের হাতে বোনা দুই টন ওজনের সেই মস্ত (৮০ ফু×৪০ ফু) কার্পেট! এবং সেই সংগে মধ্যপ্রদেশের স্লীমেনাবাদ নামক কোন এক গাঁয়ের মন্দিরে আজও প্রতি সন্ধ্যায় জ্বলছে—একটি পিতলের প্রদীপ। গাঁয়ের লোকেরা স্লীম্যানকে চিরস্মরণীয় করেছিলেন—তাঁর নামে গাঁয়ের নামকরণ করে, স্লীম্যান তার জবাব দিয়েছিলেন, মন্দিরে একটি প্রদীপ উপহার দিয়ে। সুতরাং, ঠগীর ইতিহাসে শান্তি-প্রদীপ জ্বলেছে আজ অনেকদিন।

তবুও যে কলকাতার পুলিশ রিপোর্টে একটিমাত্র শব্দ এতগুলো কথা আবার ডেকে আনল—সে অন্য কারণে। ১৮৫৬ সনে ভারত ত্যাগের মাত্র ক'মাস আগে লক্ষ্ণৌর তদানীন্তন রেসিডেন্ট বিশ্ববিখ্যাত উইলিয়াম হেনরী স্লীম্যান প্রতিদিনের অভ্যেস মত সেদিনও বারান্দায় স্ত্রী-পুত্র পরিজনের সংগে সন্ধ্যে কাটিয়ে নিজের ঘরে ঢুকছেন। চারদিকে গাঢ় আঁধার নেমেছে। কি মনে করে দরজার কাছে এসে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন, তারপর এক ঝটকায় পর্দাটা একপাশে সরিয়ে ফেললেন। সংগে ছিল কন্যা এলিজাবেথ, সে সভয়ে দেখল ছোরা হাতে একটি লোক দাঁড়িয়ে।

—তুমি ঠগী! বহুকাল ভুলে যাওয়া 'রামসি'তে গর্জন করে উঠলেন স্লীম্যান। —ছোরাটা আমাকে দাও!'

আশ্চর্য, লোকটি স্লীম্যানের দিকে হাতলটি বাড়িয়ে দিল। ছোরাটা হাতে নিয়ে বাইরের দিকে অংগুলি দেখালেন স্লীম্যান, —যাও, আর যেন এই রাজ্যে তোমার মুখ না দেখা যায়! লোকটা সেলাম করে অন্ধকারে মিশে গেল। ভয়ার্ত এলিজাবেথকে কানে কানে বললেন স্লীম্যান, —মাকে বলার দরকার নেই; সম্ভবত এই বেচারাই ভারতের শেষ ঠগী!

—কে জানে সেই শেষ খুনীটি এই ক্ষমার অর্থ ত নাও বুঝতে পারে!

রায়মংগল, ৩রা মার্চ—বীরভূম জেলার রায়মংগল কেন্দ্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা আব্দুল হোসেন হায়াত সাহেব কেন মাত্র সতেরোটি ভোট পেয়ে নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন এবং তাঁর ভোট বাক্সের উপর কেন একটি হাস্যকর উপহার পাওয়া যায়, সে-রহস্য সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওই
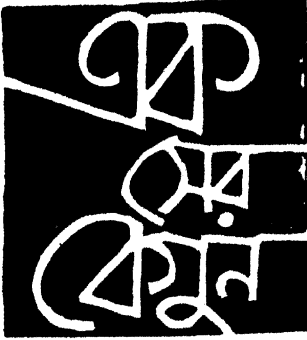
উপহারের সামগ্রীটির মধ্যেই তার পরাজয়ের কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে।

হায়াত সাহেব সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন এ-সংবাদ পাঠ করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরাই স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হয়েছেন, যদিও রাজনৈতিক দলবিশেষ ইতিমধ্যে প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে হায়াত সাহেবের পরাজয় ও তাঁদের প্রার্থীর আশাতীত জয়লাভকে তাঁদের দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার নিদর্শন বলে প্রচার করতে শুরু করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এ-ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে নির্বাচনে কোন প্রার্থীর জয়লাভের পিছনে রাজনৈতিক দলের কিংবা দলীয় প্রার্থীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই কার্যকরী হয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে জয়ী প্রার্থী আব্দুল করিম সাহেবের জনপ্রিয়তাকে ইতিপূর্বে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়েছিল এবং ঘোড়দৌড়ের ভাষায় যাকে আপসেট বলা চলে, তেমনই একটি নির্বাচনের প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য এবং এই নির্বাচনী ফলাফলকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য এই নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আমি যখন স্বয়ং করিম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি কোন উল্লাস প্রকাশ করা দূরের কথা, স্পষ্ট স্বীকার করেন যে, এই ফলাফলকে তিনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

স্মরণ থাকতে পারে, হায়াত সাহেব এ-অঞ্চলের অক্লান্ত কর্মী এবং একনিষ্ঠ সমাজসেবী হিসেবে দীর্ঘ বাইশ বছর যাবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং গত দুটি নির্বাচনেই তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কোন রাজনৈতিক পদক্ষেপে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি হয়েছে বলে শোনা যায় নি, বা তাঁর নির্বাচন-কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতে পারেন নি এমন সন্দেহও করা সম্ভব নয়। কারণ বিধানসভার অধিবেশন-কালীন সময়টুকু ব্যতীত সারা বৎসরই তিনি স্বগ্রামে বসবাস করেন এবং আপন চেষ্টায় তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাছাড়া বিধানসভাতেও তাঁর নির্ভীক ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় গ্রামবাসীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। স্থানীয় ইস্কুলের জনৈক শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে আলোচনা করে জানতে পেরেছি যে, হায়াত সাহেব যে মাঝে মাঝেই স্বদলের গ্রাম-বিরোধী ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে দলীয় প্রধানদের বিরাগভাজন হয়েছেন তাও এ-অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে অজ্ঞাত নেই।
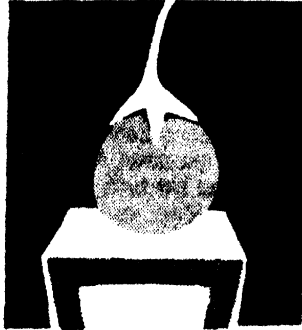
তৎসত্ত্বেও কেন যে হায়াত সাহেব এ-ভাবে পরাজিত হলেন তার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি বিচিত্র সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কোন কোন জননেতা এই সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, এমন কি দুই একজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে এ-খবরও জানা গেছে। কিন্তু হায়াত সাহেবের মত জনপ্রিয় প্রার্থীর মাত্র সতেরোটি ভোট পাওয়ার সংবাদ বোধ করি সমগ্র নির্বাচনের ইতিহাসেই একটি দুর্বোধ্য রহস্য হিসেবে স্বীকৃত হবে।

গত পরশুর সংবাদপত্রে রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এবং সে ফলাফলের তালিকায় দেখা গেছে করিম সাহেব সতেরো হাজার তিনশো বাষট্টিটি ভোট পেয়েছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীধর বসু পেয়েছেন দু' হাজার একশো একান্নটি ভোট, এবং অবিশ্বাস্য মনে হলেও হায়াত সাহেবের বাক্সে মোট সতেরোটি ভোট পড়েছে। গতকালের বিভিন্ন সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে, এবং হায়াত সাহেবের পরাজয়কে অনেকে দলীয়-জনপ্রিয়তা হ্রাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করেছেন। কিন্তু এ রহস্যের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে এসে জানা গেল যে, হায়াত সাহেবের বাক্সে কেবলমাত্র সতেরোটি ভোটপত্রই পাওয়া যায় নি, এ-ছাড়াও আরেকটি দ্রব্য পাওয়া যায়। একটি পোলিং বুথের ইলেকশন অফিসার নাকি স্থানীয় এক ভদ্রলোকের কাছে গল্পচ্ছলে জানান যে, হায়াত সাহেবের বাক্সের উপরে কোন ভোটদাতা একটি বেগুন রেখে যান। উক্ত ভোটকেন্দ্রের উভয় রাজনৈতিক দলের এজেণ্টরাই এ কাহিনী সমর্থন করেন, এবং পাঠকদেরও স্মরণ থাকতে পারে যে, কয়েকদিন পূর্বে কোন একটি পোলিং বুথে ভোটবাক্সের উপরে কেউ একটি বেগুন রেখে যায়, এ-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য সে-সংবাদে কোন্ প্রার্থীর বাক্সের উপরে বেগুনটি পাওয়া যায় উল্লেখ করা হয় নি। এবং বলা বাহুল্য, সে-সময়ে খবরটি পাঠ করে সকলেই কৌতুকবোধ করেছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে উক্ত সংবাদটি কৌতুককর মনে হলেও ঘটনাটির পিছনে কি গভীর তাৎপর্য ও করুণ কাহিনী লুকিয়ে আছে তার কিছুটা হদিস বোধহয় পাওয়া গেছে।

রায়মঙ্গল কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ষাট হাজার। তন্মধ্যে তেরো হাজার মুসলমান ও সাতচল্লিশ হাজার হিন্দু। সুতরাং কোন কোন মহলে যে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনে এবার সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক মনো-

ভাব প্রকট হয়েছে তা সত্য নয়। কারণ সাম্প্রদায়িক কারণে করিম সাহেব তেরো হাজার ভোট পেয়ে থাকলেও স্বীকার করতে হবে, অন্তত চার হাজার হিন্দু ভোটও তিনি পেয়েছেন। অথচ সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকলে স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীধর বসু হিন্দুদের ভোট অধিক সংখ্যায় পেতেন, এবং মুসলমানদের ভোট পেতেন

হায়াত সাহেব। কারণ হায়াত সাহেবের পিতা এতদঞ্চলের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মৌলবী ছিলেন এবং দরিদ্র মুসলমান চাষীদের উন্নতির জন্য হায়াত সাহেব প্রাণপাত করেছেন বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। অন্য পক্ষে করিম সাহেব কিঞ্চিৎ সাহেবী ভাবাপন্ন, দরিদ্র মুসলমান চাষীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগই তিনি রাখতে পারেন নি, কারণ ব্যারিস্টারী পেশায় নিযুক্ত থাকার ফলে তাঁকে অধিকাংশ সময় কোলকাতায় থাকতে হয়। সুতরাং এই বিস্ময়কর ঘটনাটির জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে অকারণে দায়ী করা চলে না।

আরেকটি মহলের গবেষণায় প্রকাশ, জমিদারী উচ্ছেদের পক্ষে হায়াত সাহেব যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাদি দিয়েছিলেন, তার ফলেই নাকি তিনি সম্ভ্রান্ত ও স্বচ্ছল পরিবারগুলির ভোট থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং করিম সাহেব প্রাক্-নির্বাচন সফরে ক্যানাল ট্যাক্সের বিরোধিতা করে যে-সব বক্তৃতা দেন, তা গ্রামবাসীদের কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। কিন্তু সংবাদ নিয়ে এবং সেটেলমেণ্ট আপিসের নথীপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে যে, রায়মঙ্গল কেন্দ্রের মাত্র সাতশো পরিবার জমিদারী উচ্ছেদ আইনের আওতায় পড়েন এবং আইন-অন্তর্ভুক্ত একুশ হাজার বিঘা জমির মালিক পাঁচ-ছয়শো জনের অধিক নয়। সুতরাং নীতিগত কারণে হায়াত সাহেব সাতশো পরিবারের, পরিবার পিছু পাঁচজন করে ধরলে সাড়ে তিন হাজার ভোট হারাতে পারেন, এবং করিম সাহেবও পাঁচ-ছয়শো পরিবার থেকে ক্যানাল ট্যাক্স-বিরোধী বক্তৃতার দৌলতে বড় জোর আড়াই হাজার বা তিন হাজার ভোট পেতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে করিম সাহেব পেয়েছেন সতেরো হাজারেরও বেশী ভোট, এবং হায়াত সাহেব পেয়েছেন মাত্র সতেরোটি। অথচ গত নির্বাচনে হায়াত সাহেব তেইশ হাজার ভোট পেয়েছিলেন।

অবশ্য হায়াত সাহেব মাত্র সতেরোটি ভোটই পান নি, উপরন্তু তাঁর বাক্সের উপরে পাওয়া গেছে একটি বেগুন। এই বেগুনটি অনেকের কাছে কৌতুককর মনে হলেও আমার মনে হয়, হায়াত সাহেবের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ পাওয়া যাবে এই রহস্যের সমাধান করতে পারলেই।

কোলকাতা শহরে বসে এই ঘটনাটির তাৎপর্য অনুধাবন করা অবশ্য আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা শূন্যের পরিবর্তে যেমন 'রসগোল্লা' শব্দটি ব্যবহার করে, তেমনই একটি বেগুন দান করে কোন ভোটার হায়াত সাহেবের বাক্সকে শূন্য করার পক্ষপাতী ছিল, বা প্রতিপক্ষের কেউ বেগুন দিয়ে কোন তুকতাক করতে চেয়েছিল এমন মনে করা যেতে পারতো। এমনকি হায়াত সাহেব নিজেও এই রহস্যটির এই ধরনের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি আমাকে জানান, যে রায়মঙ্গলের গ্রামবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, উন্নতির জন্য সরকার কোন চেষ্টাই করেন নি, সুতরাং তাদের মধ্যে কারও কারও তুকতাকে বিশ্বাস থাকা অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য ব্যাপারটার অন্য ব্যাখ্যাও তিনি আমাকে জানান। এ হেন পরাজয় সত্ত্বেও তিনি সহাস্য কৌতুকে বলেন যে, কোন চাষী-ভোটার হয়তো বেগুনটি তাঁকে খাবার জন্য দান করে গেছে, বা ভোট দিতে এসে ভুলক্রমে বাক্সের উপর নামিয়ে রেখে গেছে।

এই সূত্রে কথোপকথন করতে করতে তিনি নির্বাচনের কথা ভুলে বেগুন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দেন, এবং জানান যে, তাঁর বাড়ির উঠানেও কয়েকটি বেগুনচারা ছিল এবং তাতে এক সের ওজনের বেগুনও ধরতো। হায়াত সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিধানসভায় যোগ দেবার জন্য তাঁকে কোলকাতায় যেতে হতো এবং দীর্ঘদিন কলুটোলায় একটি হোটেলে বাস করতে হতো। সে-কারণে বেগুনের চারাগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি যে সেগুলির পরিচর্যা করতে পারতেন না, এ-কথা জানিয়ে তিনি মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এবং সহাস্যে জানান যে, নির্বাচনে পরাজিত হয়ে তাঁর উপকারই হয়েছে, কারণ এখন আর তাঁকে কলুটোলার নোংরা হোটেলে বাস করতে হবে না, পরম আনন্দে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র ভিটাবাড়ির সামনের বাগানে বেগুনের পরিচর্যা করতে পারবেন।

হায়াত সাহেবের এই বেগুনপ্রীতির বর্ণনা শুনতে শুনতে আমি যখন সন্দিহান হয়ে উঠছিলাম এবং এর সঙ্গে ভোটবাক্সের বেগুনটির কোন সম্পর্ক আছে কিনা মনে মনে অনুসন্ধান করছিলাম, তখন তিনি একটি বিস্ময়কর খবর প্রকাশ করেন। তিনি জানান যে, প্রায় চার বৎসর পূর্বে তিনি একবার বিধানসভার অধিবেশন সমাপ্তির পর গ্রামে ফিরছিলেন, এমন সময় গ্রামের হাটে একজনকে ঝুড়ি ভর্তি বড় বড় বেগুন বেচতে দেখে তিনি এতদূর প্রলুব্ধ হন যে, সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং কিছু বেগুন কিনতে তাঁর ইচ্ছে হওয়ায় বেগুনওয়ালাকে তিনি এক সের বেগুন দিতে বলেন। বেগুনওয়ালা একসের বেগুনের জন্য তিন আনা পয়সা চায় এবং হায়াত সাহেব কোন দরদস্তুর না করে পয়সা দিয়েই বেগুনগুলি নিয়ে চলে আসেন। ঘটনাটির উল্লেখ করে হায়াত সাহেব হাসতে হাসতে আমাকে জানান যে, সে-রাত্রে পেঁয়াজ সহযোগে তিনি শুধু বেগুন পোড়া দিয়েই ভাত খেয়েছিলেন।

এই সূত্রেই তাঁর হঠাৎ স্মরণ হয় যে, তিনি যখন বেগুন কিনছিলেন, তখন পিছন থেকে কে যেন মন্তব্য করে, হায়াত সাহেবের দেখি আজকাল এক সের বেগুন না হলে চলে না।

এই তুচ্ছ ঘটনাটিকে আমি ইতিপূর্বে বিস্ময়কর বলেছি। তার কারণ হায়াত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফেরার পথে সেই গ্রামেরই এক দরিদ্র মুসলমান চাষীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, এবং তাকে আমি স্টেশনের পথটা দেখিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করি। পরিবর্তে সে প্রশ্ন করে জানতে চায়, আমি গ্রামে কার বাড়ি গিয়েছিলাম। উত্তর শুনে চাষীটি উপহাসের হাসি হাসে এবং বলে যে, সে আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে, আমি নবাব-জাদার বাড়ি গিয়েছিলাম। 'নবাবজাদা' বলতে সে কাকে বোঝাতে চায় জিজ্ঞাসা করায় লোকটি হেসে বলে, যে গ্রামে নবাবজাদা ত একজনই আছেন। ইতিমধ্যে আরো দু'চারজন লোক এসে জড়ো হয় এবং হাসতে হাসতে বলে যে, এখন তারা হায়াত সাহেবকেই নবাবজাদা সম্বোধন করে। এবং তাঁর পরাজয়ে যে তারা খুশী হয়েছে তাও প্রকাশ করে।

আমি বিস্মিত হয়ে তাদের উল্লাসের কারণ জানতে চাই। তখন একজন সহাস্যে বলে যে, হায়াত সাহেব মানুষটি ভালই ছিলেন এবং ভালো ছিলেন বলেই তারা তাঁকে মাথায় করে রেখেছিল। কিন্তু বিধানসভার সদস্য হয়েই তিনি নাকি ধরাকে সরা ভাবতে শুরু করেন। আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ
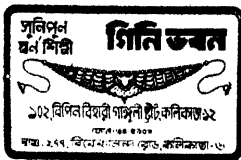
করার চেষ্টা করে বলি, যে তাদের ধারণা ভুল, হায়াত সাহেব যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। বলা বাহুল্য, তাদের প্রকৃত মনোভাব জানার জনাই আমি হায়াত সাহেবের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করি। কিন্তু এর ফলে লোকগুলি রুষ্ট হয়ে ওঠে এবং জানায় যে, হায়াত সাহেবের কথা বলতেও তাদের লজ্জা হয়। তিনি নাকি হাটে বেগুন কিনতে গিয়ে দরদস্তুরও করেন না। পাইকার তিন আনা চাইলে তিন আনাই দিয়ে দেন। এবং যিনি বাড়ির গাছের বেগুন খেতেন তাঁর নাকি বর্তমানে এক সের বেগুন না কিনলে চলে না।

এরপর আমি সমগ্র অঞ্চল সফর করে হায়াত সাহেব সম্পর্কে জনসাধারণের প্রকৃত অভিমত জানবার চেষ্টা করি, এবং জানতে পারি যে শুধুমাত্র এক সের বেগুন দরদস্তুর না করে কেনার সময় যাঁরা তাঁর আশেপাশে ছিল তারা ক্রমে ক্রমে হায়াত সাহেবের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়ের দিকেও দৃষ্টি দিতে শুরু করে। এই ভাবে নানান গুজব চতুর্দিকের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। এবং অনেকের এই ঘটনাটিকেই কেন্দ্র করে তাঁর সম্পর্কে ধারণা হয় যে বিধানসভার সদস্য হওয়ার ফলে তিনি নিশ্চয় খুব বড়লোক হয়ে গেছেন। অন্যথায় হায়াত সাহেবের মত একজন দরিদ্র জননেতা এক সের বেগুন কিনবেন কেন, এবং কিনলেও দরদস্তুর না করে তিন আনা দাম কেন দেবেন!

কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন গুজব রটনা শুরু হলে শেষ পর্যন্ত তা কত সুদূর-প্রসারী ও ক্ষতিকর হতে পারে, পরবর্তী ঘটনাটি থেকেই তা প্রমাণ হবে। হায়াত সাহেব যখন বৎসর দুই আগে প্রাণপণ চেষ্টায় একটি মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করেন, সরকার ও সাধারণের সাহায্য নিয়ে, তখন সকলেই বলতে শুরু করে যে তিনি এখান থেকেও দু'পয়সা রোজগার করছেন।

কিন্তু তাঁর জনকল্যাণ প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ কদর্থ করা হয় বৎসরখানেক পূর্বে তিনি যখন রায়মঙ্গলে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রণী হন। কারণ এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আরেকটি বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিল বটে, কিন্তু বালিকাদের জন্য নয়।

এ-পর্যন্ত হায়াত সাহেবের বিরুদ্ধে গ্রামবসীদের নানান কাল্পনিক অভিযোগ থাকলেও তাঁর চরিত্রের উপর কেউ কোন কটাক্ষ করেনি। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শুনে সকলেই রুষ্ট হয় এবং প্রশ্ন করে যে হায়াত সাহেবের দৃষ্টি হঠাৎ বালিকাদের উপর পড়েছে কেন! ফলে, তাদের সুপ্ত আক্রোশ পত্রেপুষ্পে পল্লবিত হতে শুরু করে এবং হায়াত সাহেবের মত জননেতাও অল্পদিনের মধ্যেই লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হন। এ-কারণেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ যদিও তাঁর মত অক্লান্ত কর্মী ও একনিষ্ঠ দেশসেবকের শোচনীয় পরাজয়ে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়েছে, তথাপি রায়মঙ্গল কেন্দ্রের জনসাধারণ এই পরাজয়ের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয়নি।

এই স্থানীয় অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফলের বিশ্লেষণের মধ্যেই হায়াত সাহেবের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ এবং ভোট বাক্সে রাখা বেগুনটির সব রহস্য, আমার ধারণা, সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা, জমিদারী উচ্ছেদ, ক্যানাল ট্যাক্স—বহু জনে বহু মতামত হয়তো প্রচার করবেন, রাজনৈতিক দলগুলি হয়তো এই নির্বাচনী ফলাফলের মধ্যে কোন দলবিশেষের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি বা হ্রাসের হদিস পাবেন, কিন্তু দরদস্তুর না করে তিন আনা পয়সায় এক সের বেগুন কেনার ফলে যে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা গদিচ্যুত হতে পারেন, এ-খবর অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য!

কাজল গুপ্ত

অলকানন্দা রায়

নন্দিতা বসু

নতুনত্বের জয় সর্বত্র। কিন্তু আশ্চর্য এই রুপোলী পর্দার খবর অন্য; পার্থিব জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে পুরানো, সুপরিচিত মুখের যেন জয়-জয়কার।

কারণ হয়ত আছে। সব নবাগতাই নায়িকার প্রতিজ্ঞা নিয়ে চিত্রজগতে পদার্পণ করেন না, সাধনায় ফাঁকি না থাকলেও হয়ত ক্ষমতার পুঁজিও সকলের সমান থাকে না; কিন্তু পর্দায় নতুন মুখের সংখ্যাল্পতার সেটাই বোধহয় একমাত্র কারণ নয়। প্রতিভাই সেখানে বোধহয় শেষ কথা নয়। কেননা, সমসাময়িককালেও এমন নজীর প্রচুর দেখা গেছে, যেখানে পাদপ্রদীপের আলো সঙ্কোচে ম্লান থাকলেও অভিনয়দীপ্তিতে অনেক নবগাতা বহু প্রবীণাকে পেছনে ফেলে আসার শক্তি ধরেছেন। কিন্তু অগণিত উদাহরণযোগে প্রমাণ করা যায়,—আমরা দর্শকেরা সেই বিশেষ ক্ষণগুলোতে অত্যন্ত অনুদার, দ্বিধাগ্রস্ত, কিছুটা হয়ত বা ভীতও। অথচ, আমরাই বিচারক। সব নায়িকাই নবাগত থাকেন একদিন। তবুও যে কালে কালে চিরকালীন হয়ে ওঠেন তাঁরা, তার অনেকখানি কারণ আমরা দর্শকেরা, যারা ছবি দেখি, যাদের রুচি তথা পছন্দ-অপছন্দের বনিয়াদে গড়ে ওঠে সব দেশের সর্বযুগের চিত্রলোক। সেখানে শেষ বিচারে জানা যাবে, আমাদের করতালি-ধ্বনিতেই নায়িকারা অধিষ্ঠিতা। বক্স-অফিসের মায়া নামে যে কুহকজাল সেটি পলে পলে আমাদেরই চোখে বোনা। অথচ আশ্চর্য এই, তবুও সে জাল সহসা ছিন্ন করা যায় না, একবার গড়ে উঠলে সে মায়া কাটে না।

হয়ত ব্যক্তিজীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই স্বনিষ্ঠ আনুগত্যে বিশেষ এক ধরনের চরিত্র-পরিচয় আছে, কিন্তু পুরানো মুখ প্রিয় বলেই পর্দায় আমরা যেমন মুখের দর্পণে অভিনয় দেখি এবং আনুষঙ্গিক দ্রষ্টব্য, তেমনি দর্শকের প্রশংসা-আপ্লুত চোখগুলোর কথা অবিরাম মনে থাকে বলেই বহু পরিচিতা নায়িকারা আগে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিতা নায়িকা,—তারপর নেহাৎ ঔদার্যবশত যেন অভিনেত্রী। ফলে, বাংলা ছবিতে দৈবাৎ কাহিনীর অপরিচিত চরিত্রগুলো তাদের প্রাপ্য হাতে পায়।

সুখের খবর দীর্ঘদিনের জড়তা কাটিয়ে বাংলা দেশের চলচ্চিত্রে আজ নতুন হাওয়া বইতে সুরু করেছে। এখনও যদিচ ধীরে, সসঙ্কোচে, তবুও বাংলা ছবি ক্রমেই যেন নতুন মুখের দিকে মুখ তুলে চাইবার সাহস অর্জন করছে।

—চিত্রান্বেষী

ডানদিকে ঃ শম্পা

বাঁয়ে ঃ কণিকা মজুমদার

নীচে ঃ শর্মিলা ঠাকুর

বাংলা ছবিতে নতুন মুখ

উপরে : বাঁদিকে—'এক টুকরো আগুন' চিত্রে বিশ্বজিৎ ও তন্দ্রা বর্মন, ডানদিকে—'সাত পাকে বাঁধা' চিত্রে সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র। নীচে : বাঁদিকে—'নবদিগন্ত' চিত্রে সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও বসন্ত চৌধুরী, ডানদিকে—'রক্তপলাশ' চিত্রে অনিল চ্যাটার্জি ও নিরঞ্জন রায়।

বাংলা চলচ্চিত্রে শিল্পের সঙ্কট

জ্যোতির্ময় বসু রায়

'বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পে সংকট।' কথাটা সবাই উচ্চারণ করছেন। চিত্র-প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক, শিল্পী, সিনেমা-কর্মী, সাংবাদিক—সকলে। এমন-কী মাননীয় মন্ত্রীরাও। সিনেমা-শিল্পের সর্বস্তরে অল্প-বিস্তর উদ্বেগের ছায়া।

হিসাব করে দেখা গেছে, বাংলা দেশের প্রায় ৩০,০০০ লোক জীবিকার জন্য এই শিল্পের উপর নির্ভর করে থাকেন। প্রতি মানুষের উপার্জন গড়ে যদি তিনজনের অন্ন সংস্থান করে, তবে ধরে নিতে পারি, প্রায় লক্ষ লোককে বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলা ছায়াচিত্র শিল্প। এঁদের সকলের বাঁচার ধরনটা নিশ্চয় একরকম নয়। সে যা-ই হোক, এখানে সংখ্যাটাই বড়।

সংকট যে উপস্থিত হয়েছে তার প্রমাণ কী? প্রথম প্রমাণ কতকগুলি সংখ্যায়। বাংলা ছবির প্রোডাকশন কমেছে। আট-দশ বছর আগেও বাংলা ছবি তৈরির যে সংখ্যা (৫০ থেকে ৬০) বছর-শেষের হিসাবে পাওয়া যেত, এখনকার হিসাব তার অর্ধেকে গিয়ে ঠেকতে চলেছে। আরও কম হলেও বোধ করি বিস্মিত হওয়া চলবে না। এগারোটি স্টুডিওর চারটিতে তো কুলুপ পড়েছে। বাকী সাতটি যে কী করে চলছে, যাঁরা কর্মী তাঁরাই জানেন। স্টুডিও-ফ্লোরে অতীত-দিনের সেই কর্মব্যস্ততার ছায়ামাত্রই এখন অবশিষ্ট। কত লোক বেকার হয়েছেন, আরও কত ওই দশার সামনে দাঁড়িয়ে সে-হিসাব নিলে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন না।

রাজ্য সরকার তাই চিন্তিত হয়েছেন। বেকার সমস্যা-পীড়িত এই অঞ্চলে আবার যদি সহস্র সহস্র লোক কর্মহীন হয়ে পড়েন তবে সেটা সরকারের পক্ষে ভাবনার কথা বই-কি! এ-রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী এবং তথ্য-প্রচার মন্ত্রী তাঁদের দুশ্চিন্তার কথা দেশবাসীকে জানিয়েছেন। সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। শুধু মুখের কথায় তাঁদের কাজ শেষ হয়নি। সমস্ত বিষয়টি তলিয়ে দেখবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিটি ছয় মাসের মধ্যে সরকারকে জানাবেন—সমস্যার কারণ কী, কী তার প্রতিকারের পথ।

কমিটি কী খুঁজে বার করবেন, প্রতিকারের কোন্ কোন্ পন্থার নির্দেশ দিতে পারেন, সে-বিষয়ে এই মুহূর্তে কিছু অনুমানের চেষ্টা করব না। এখানে শুধু সমস্যাটির জটিলতা সম্পর্কে বিচার করে দেখতে চাই।

বাংলা ছবির প্রোডাকশন কমেছে। কিন্তু কেন? বিলাতে যেমন সিনেমা সম্পর্কেই লোকের আগ্রহ কমের দিকে, এখানেও কি সেই অবস্থা? সে-কথা কিন্তু বলা যাবে না।

বাংলাছবিতে নতুন মুখ

প্রথম সারি : সুজাতা, শিখারানী বাগ।

দ্বিতীয় সারি : কমলা মুখোপাধ্যায়, তন্দ্রা বর্মন।

নীচে : কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী ঘোষ, অনুরাধা, অপর্ণা দাশগুপ্ত,

এ-বছরের প্রথমে রাজ্য সরকার প্রমোদকর বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে অবশ্য কলকাতার অধিকাংশ চিত্রগৃহে আগের তুলনায় বেশী দামের টিকিট (যেটা তিন টাকার ঊর্ধ্বে) খুব কম বিক্রি হয়েছে। অন্যান্য হারের টিকিট-বিক্রয়ের পতনটা কিন্তু অত স্পষ্ট নয়। টিকিট-ঘরের সাধারণ হিসাব মাত্র এইটুকু বলে যে, দর্শকরা প্রমোদকরের বৃদ্ধিটা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেননি। এটা একেবারেই অর্থনৈতিক ব্যাপার। সিনেমা-প্রীতি তাঁদের কমেছে এমন লক্ষণ এখনও দুর্লক্ষ্য। বহু, বহু প্রেক্ষাগৃহের সামনে আজও তো দেখি, ঠিক আগের দিনেরই মতো মানুষের জটলা।

যা-ই হোক, বাংলা ছবি কম পরিমাণে তৈরি হওয়ার প্রধান কারণ নিশ্চয় এই যে, চিত্রনির্মাতা লাভবান হচ্ছেন না। অথবা কথাটা ঘুরিয়ে বলা যায়—বাংলা ছবি করতে গিয়ে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তার অর্থ, বাংলা ছবির দর্শক-সংখ্যা কমে আসছে। দেশ বিভাগের পর বাংলা ছবির সংকীর্ণ ব্যবসায় ক্ষেত্র সংকীর্ণতর হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু দেশবিভাগ তো আজ হয়নি! হঠাৎ এই কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা ছবির সংকটটা এমন উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়াল কেন? আজকের দর্শকরা কি বাংলা ছবিতে মনের খোরাক খুঁজে পাচ্ছেন না? তাঁদের চাহিদা কি এখন বহুলাংশে হিন্দী চিত্রেই মেটে? অসম্ভব নয়। কলকাতা শহরের বাঙালী অধ্যুষিত এলাকায় যে-সব চিত্রগৃহ, সেই সব সিনেমায় হিন্দী ছবি তো বেশ ভালোই চলে। কয়েক বছর আগে হয়ত চলত না, কিন্তু এখন চলে।

যুদ্ধের আগে বাংলা ছবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দর্শক। অন্তত সাধারণভাবে এ-কথা বলা যায়। তাঁদেরই রুচির দিকে তাকিয়ে ছবি করা হত। তখন প্রোডাকশন-কস্ট ছিল কম। 'তারকা'রা তখনও আজকের দিনের দ্যুতি নিয়ে সপ্রকাশ হননি। তাছাড়া চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ে তখন প্রযোজকের লাভের গুড় খেয়ে নেওয়ার মতো পিঁপড়ে যথেষ্ট ছিল না। এক কথায় চিত্র-প্রযোজকের তখন অর্থ ছিল, শক্তি ছিল। ফলে অসংখ্য দর্শকের রুচির নিকট আত্মসমর্পণ করে চিত্র-নির্মাণের কথা তাঁদের ভাবতে হত না। অন্তত, না ভাবলেও চলত।

যুদ্ধের পর অবস্থাটা বদলাতে আরম্ভ করল। কাঁচা ফিল্ম থেকে শুরু করে ছবি তৈরির সাজ-সরঞ্জাম সবেরই দাম বাড়ল। সেই সঙ্গে 'তারকা'দের পারিশ্রমিক, বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদির খরচ, সব বাবদেই খরচ ক্রমে বহু গুণে বেড়ে গেল। প্রযোজক-সংস্থাগুলি আগের মতো অর্থগৌরবে আর প্রতিষ্ঠিত নন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঋণভারে জর্জর। ধীরে ধীরে অবস্থা যখন এই, আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা ছবির নির্মাতাদের অনেকেই, তখনও যেন, মধ্যবিত্ত রুচির কথাটা ভুলে যাননি। অন্তত বাংলা সাহিত্য থেকে আখ্যানবস্তু আহরণের ঐতিহ্যে তাঁরা বিশ্বাস রেখেছেন। গত কয়েক বছরের হিসাব নিলেও দেখা যাবে, এই সময়ে তোলা মোট ছবির একটি বৃহৎ সংখ্যা সাহিত্য-নির্ভর। শিক্ষিত দর্শক-সমাজকে এসব ছবি হয়ত বহুলাংশে তৃপ্ত করেছে। কিন্তু নিশ্চয় টিকিট-ঘরের ততটুকু আনুকূল্য পায়নি, যা পেলে ছবিগুলিকে ব্যবসায়িক অর্থে সফল বলা চলত।

ছবির খরচ যখন কম ছিল, তখন তার দর্শকের সংখ্যা যা হলে প্রযোজকের চলত, এখন তার চেয়ে অনেক বেশী হওয়া দরকার। বস্তুত প্রমোদ-মাধ্যম হিসাবে সিনেমার জনপ্রিয়তাও আগের তুলনায় বেড়েছে। বাঙালী চিত্রপ্রিয়ের সংখ্যাও। এখন এই কলকাতা শহরে শহরতলীতে এবং বাংলা দেশের অন্যত্র যাঁরা সিনেমা দেখছেন, সিনেমায় যাওয়াটাকে যাঁরা জীবন-যাত্রার একটি অংগ করে নিয়েছেন তাঁদের সকলকে কিন্তু ঠিক আগেকার মধ্যবিত্ত সাহিত্যানুরাগীর শ্রেণীতে ফেলা যায় না। সিনেমা-দর্শকের একটি বিরাট গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। এঁদের মধ্যে শ্রমিক আছেন, কলকারখানার নানা ধরনের কর্মী আছেন, বিভিন্ন ব্যবসায়-সংশ্লিষ্ট লোক আছেন। সিনেমা এঁদের কাছে প্রধানত প্রমোদ-মাধ্যম। আগের নিয়মে কি এঁদের চিত্ত জয় সম্ভব? সম্ভব না হলে ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের প্রতিশ্রুতি কোথায়?

ইতিমধ্যে হিন্দী চিত্রের জনপ্রিয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত। নতুন বাঙালী দর্শকরা সহজেই 'তারকা'-খচিত, সংগীত-মুখর হিন্দী চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কাজেই সহজ ব্যবসায় বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন কোন কোন প্রযোজক। মামুলি গল্পকে স্থূল ঘটনা, চড়া ভাবাবেগ আর প্রমোদ-উপদান দিয়ে চিত্রে পরিবেশনের চেষ্টা হয়েছে। জনপ্রিয় 'তারকা'দেরও সৃষ্টি হয়েছে। দেখা গেছে, 'তারকা'দের গ্ল্যামার, নামকরা নেপথ্যশিল্পীর গান এবং মেলো-ড্রামার চড়া সুর বেশ কয়েকটি বাংলা ছবিকে টিকিট ঘরের প্রসাদ এনে দিয়েছে।

গত দশকে এবং এই দশকের আরম্ভে এই ঘটনা আমরা লক্ষ্য করেছি। এক দিকে, এক দল প্রযোজক পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যে স্থিতনিষ্ঠ; পুরাতন ধারা অনুসারে ভালো, সাহিত্য-নির্ভর ছবি করতে যাঁরা সচেষ্ট। অন্য দিকে দেখেছি আর এক দলকে—যাঁদের লক্ষ্য বৃহত্তর দর্শক-গোষ্ঠীর চিত্তজয়। দ্বিতীয় দল যে কুরুচির আমদানি করেছেন, এমন কথা বলি না।

বাঁদিকে 'অভিযান' চিত্রে সৌমিত্র ও ওয়াহিদা রেহমান, ডানদিকে 'হেরে নদীর পারে' চিত্রে জ্ঞানেশ মুখার্জি।

কিন্তু ব্যবসায়ের খাতিরে স্থূলতাকে তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন। এরই মধ্যে বাংলা চলচ্চিত্রের আসরে আরও এক দলের আগমন। এ'রা বাংলা ছায়াচিত্রের 'আভাঁ গার্দ' গোষ্ঠী। গত দশকের প্রথমে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল; সেই উৎসবই এ'দের মনে এক প্রেরণা এনে দেয়। কথাচিত্রের তিনটি বিশিষ্ট উপাদান—সাহিত্য, নাট্যকলা ও সংগীতকে ছাপিয়েও চলচ্চিত্রের যে একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা আছে সেই সত্তাটা তাঁরা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এ-ব্যাপারে পথিকৃৎ শ্রীসত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎবাবুর প্রথম ছবি "পথের পাঁচালী" দেশে-বিদেশে সম্মান কুড়োবার পর এই পথে আরও অনেক চলচ্চিত্রকার এসেছেন। "পথের পাঁচালী" শুধু সম্মানই পায়নি, সেই সঙ্গে টাকাও এনেছিল। এই সাফল্য কয়েকজন চিত্র-ব্যবসায়ীকেও অনুপ্রাণিত করেছে; যাঁরা নূতন, তথাকথিত প্রগতিবাদী চলচ্চিত্রকারকে পরীক্ষামূলক চিত্র সৃষ্টির কাজে সাহায্য করেছেন।

এ-ধরনের ছবি যাঁরা করলেন বা এখনও করছেন তাঁরা মোটামুটি আপন বিশ্বাসে অটল,—টিকিট-ঘরের দাবির সঙ্গে সন্ধি করতে অসম্মত। তাঁদের ছবি যে সব সময়ে শিল্পোৎকর্ষে সমুজ্জ্বল এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু নিজস্ব বিশ্বাস এবং বোধের কাছে তাঁরা সৎ এবং সেই বোধ অনুযায়ী তাঁরা ছবি করতে চেষ্টা করেন। এ-ধরনের ছবি মাঝে মাঝে রসিকজনের কাছে শিল্প-স্বীকৃতি পায়, কিন্তু টিকিট-ঘরের আনুকূল্য কদাচিৎ।

১৯৫৫ সনে "পথের পাঁচালী" মুক্তি পেয়েছিল। তার পর এই ১৯৬২ পর্যন্ত 'প্রগতিবাদী' চলচ্চিত্রকারেরা বেশ কয়েকটি ছবি করবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু বারে বারে তাঁদের ছবি ব্যবসায়িক অর্থে বিফল হবার ফলে চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের মনে ক্রমে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের "অযান্ত্রিক", অগ্রগামী গোষ্ঠীর "হেড মাস্টার", তপন সিংহের "ক্ষণিকের অতিথি" মৃণাল সেনের "পুনশ্চ" অজস্র প্রশংসা কুড়িয়েও লক্ষ লক্ষ দর্শককে আকর্ষণ করতে পারল না। সত্যজিৎবাবুর কয়েকটি ছবি সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে।

তিন ধারার চলচ্চিত্রের মধ্যে তাই বর্তমানে তৃতীয়ের অস্তিত্ব দুর্বল। বস্তুত, কিছুদিন থেকেই রব উঠেছে, ছবিকে

আগে জনপ্রিয় করতে হবে, তার পর শিল্পের কথা। কেউ বা স্পষ্ট ভাষায় কথাটা বলছেন, কেউ বা প্রকারান্তরে। ব্যবসায়কে বাঁচাতে গেলে এ-ছাড়া হয়ত পথ নেই। প্রোডাকশন-কস্ট যদি না কমে, চলচ্চিত্র-শিল্পের লাভ বণ্টনের প্রচলিত রীতির পুনর্বিন্যাস যদি না ঘটানো যায়, বড় বড় শিল্পীর পারিশ্রমিক যদি আকাশছোঁয়া হয়েই থাকে, তবে প্রযোজক স্বভাবতই তাঁর মাথা নত করবেন লক্ষ দর্শকের রুচির পায়ে। যদি তা না পারেন, তবে আসর থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হবে।

আগেই বলেছি, তৃতীয় ধারার চলচ্চিত্রের (শিল্পের শর্ত পালন যেখানে প্রাথমিক স্বীকৃতি পায়) ভবিষ্যৎ প্রায় অন্ধকার। এই নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ অনেকেই বিভ্রান্ত। এতকাল যাঁরা মোটামুটি সাহিত্য আর রুচিটুকু নিয়ে ছিলেন, প্রথমোক্ত সেই চিত্রনির্মাতার দলও এখন দোটানার মধ্যে। লক্ষের মুখের দিকে কতটুকু তাকালেন, কতটুকু নিজের শিল্পবোধের কাছে সৎ থাকবেন—এই দোটানা তাঁদের। উপন্যাস "সপ্তপদী"র রসাস্বাদ ছবি "সপ্তপদী"তে তাই কিছু অংশে পেলাম, কিন্তু বহুলাংশেই পেলাম না। যে-চিত্রনির্মাতার দল লক্ষ দর্শকের রুচির হিসাবটি ভালোরকমে নিতে পেরেছেন, মনে মনে ব্যবসায়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তাঁরা নির্ভয়ে এগিয়ে এসেছেন অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-মূল্যের গল্প নিয়ে। অপরিণত ভাবাবেগ, মেলোড্রামা, "তারকা" দ্যুতি আর সেই সঙ্গে কিছু স্থূলে প্রমোদ-উপকরণ—এই সম্বল তাঁদের।

এই বছরেই আমরা তো দেখলাম হিন্দী ছবির চেহারা নিয়ে "সরি ম্যাডাম"-এর মুক্তি! দেখলাম "বিপাশা।" "অতল জলের আহ্বান।" "বধূ"। "মায়ার সংসার"। এ পর্যন্ত ছাব্বিশটি বাংলা ছবি এ বছর মুক্তি পেয়েছে; তার মধ্যে মুষ্টিমেয় ছয়টি যদি জন-সংবর্ধনা পেয়ে থাকে, তবে সেই ছয়ের মধ্যে অন্তত তিনটির নাম উপরের তালিকায় রয়েছে। টিকিট-ঘরের আশীর্বাদ তো কই "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র উপর বর্ষিত হল না! "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা", "আগুন"-এর উপরও না।

তবে সংকট থেকে মুক্তির উপায় কি? চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের যে-অবস্থা আমরা দেখলাম, তাতে আশংকা হচ্ছে, এই শিল্পের গোটা অর্থনৈতিক গঠনের আমূল পরিবর্তন যদি সম্ভব না হয় (রাষ্ট্রীকরণ ছাড়া তা কি সম্ভব?) তবে ওই ধরনের চিত্রের দ্বারাই বাংলা চিত্রের চলচ্চিত্র-শিল্প বুঝি এবার নিয়ন্ত্রিত হবে। দিনে দিনে লঘু প্রমোদ-উপকরণে পূর্ণ, অবাস্তব, জীবন-ভাবনাহীন কাহিনী-চিত্রের সংখ্যাই সম্ভবত বাড়বে। এখনও বাংলা ছবিতে কুরুচির অনুপ্রবেশ তেমন করে ঘটেনি। আশংকা: এবার তা-ও ঘটবে।

বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট যদি প্রধানত ব্যবসায়িক হয়ে থাকে, তবে তা থেকে মুক্তির উপায় সুতরাং ওই পথে আছে। বাংলা দেশে হিন্দী ছবি তুলে সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে নেবার কথা উঠেছে। এতে অনেকেরই সমর্থন দেখা গেল। হিন্দী ছবি এখানে শেষ পর্যন্ত উঠবে কি না জানি না। কিন্তু তার বদলে বাংলা ভাষাতেই হয়ত "হিন্দী" ছবি উঠে যেতে পারে। এইভাবে এখানকার চলচ্চিত্র-ব্যবসায় হয়ত টিঁকে যাবে, কিন্তু শিল্প? বাংলা সিনেমায় শিল্পের যে-ভয়াবহ সংকট ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করছে তার নিরসন হবে কেমন করে? বাংলা চলচ্চিত্র লক্ষ জনের অবসর-বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে হয়ত সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কিন্তু কোথায় থাকবে একটি বিশিষ্ট শিল্পমাধ্যমে হিসাবে তার গৌরব? অথবা, আদৌ থাকবে কি?
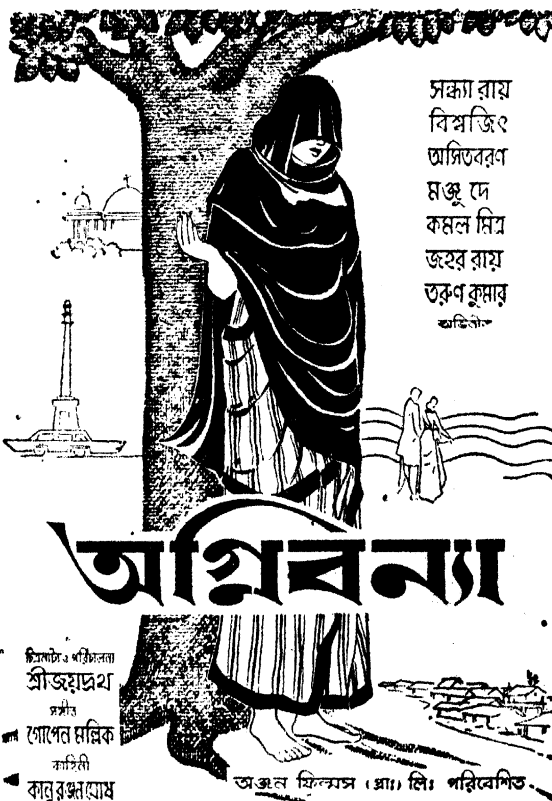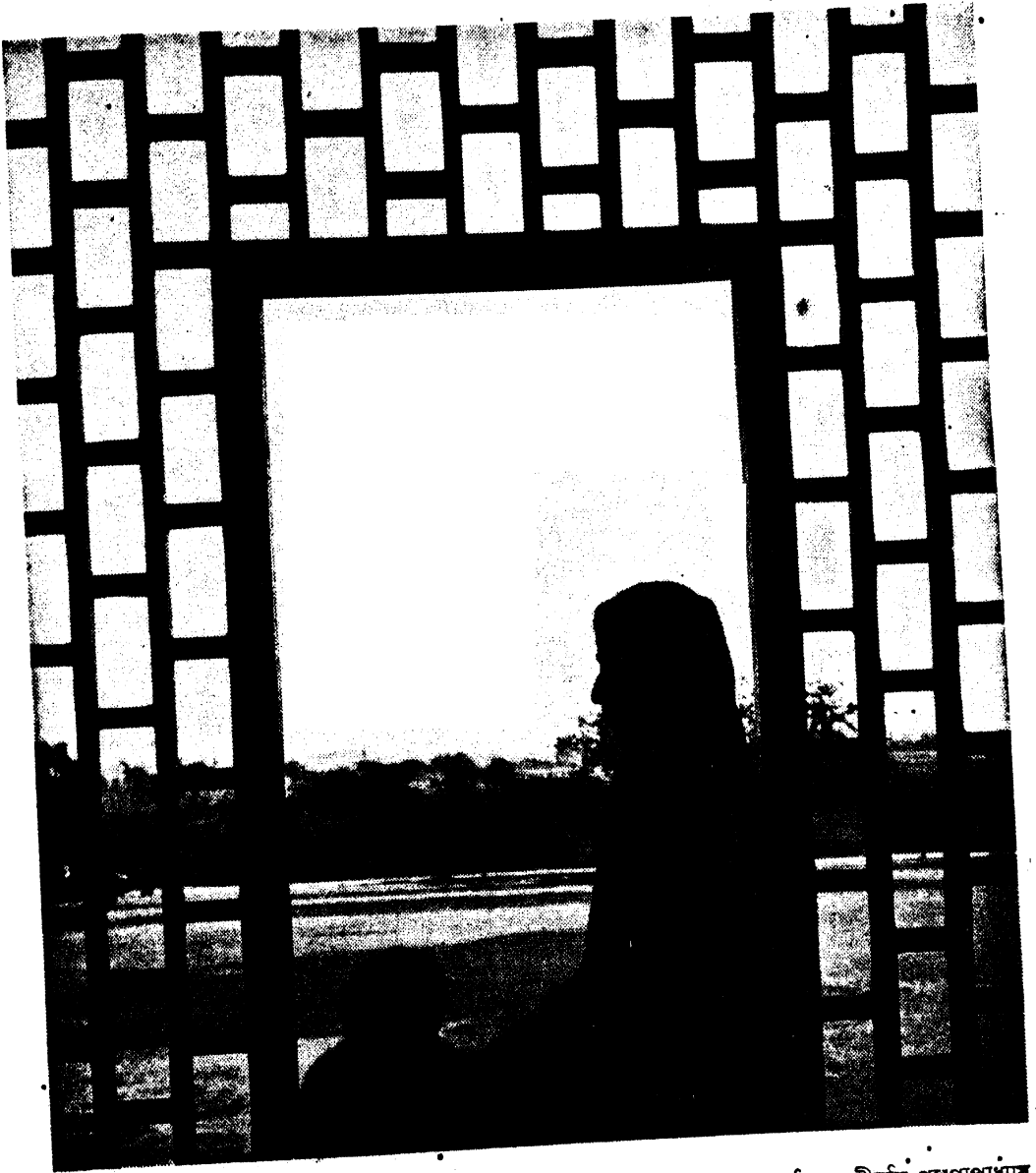
আলোকচিত্র : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

জানালায়

সৌন্দর্য্য রসিকা
যুগে যুগে.....
...এবং
Trojan
ট্রোজন
প্রসাধনী
সৌন্দর্য্য বিকাশে
এঞ্জেল কসমেটিক্স কর্পোরেশন
কলিকাতা-১
Midnight Paris
BEEVAS/EX/13

'শার্লক হোমস নামটা কাল্পনিক", কিন্তু মানুষটা রিয়েল। "আর এ-ও জেনে রাখ, তোমাদের এই ব্রজদাই সেই শার্লক হোমস।"

ব্রজদার এক মন্তব্যে আমরা একেবারে চুপ। ঘরের মেঝেয় সূঁচটি পড়লেও, সেই আওয়াজে আমরা বোধহয় তখন চমকে উঠতাম। পুরনো পাখাটা আমাদের মাথার উপর এতক্ষণ ধরে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে ঘুরপাক খাচ্ছিল, ব্রজদার কথাশুনে সেটা অব্দি থ মেরে গেল।

ব্রজদা যে কখন ঢুকেছেন, তা আমরা টের পাইনি। আজ আলোচনাটা এমনই জমেছিল।

সুনীলের বক্তব্যঃ আমাদের বাঙ্গালী জাতটা যেমন মিনমিনে, তার পোশাক-আসাকও তেমনি ফিনফিনে। এমনই ললিত-লবঙ্গলতা কছমের যে বাঙ্গালীর ছেলে রুখু রুখু চুল রেখে হয় কবিতা লিখছে, আর না হয় গিলে করা কোঁচা দুলিয়ে নেমন্তন্ন খেতে চলেছে, এই ছবিটাই খাপ খায়। "বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য যদি ধুতি আর পাঞ্জাবীতে, তাহলে একবার চোখ বুজে কল্পনা করুন তো (সুনীতের দিকে দৃষ্টি হেনে সুনীল প্রশ্ন ছুড়ল) সেই ধুতি আর পাঞ্জাবী ফ্ল্যাট প্যাট করতে করতে ওয়ার ফিল্ডে গিয়ে পড়েছে, এভারেস্টে উঠছে, সমুদ্রের অতলে নামছে, স্পেস্-শিপে উঠে চন্দ্র সূর্য তারায় তারায় পাড়ি জমাতে প্রস্তুত হচ্ছে। পারেন কল্পনা করতে? রাবিশ। এই কোঁচা দোলানো মেণ্টালিটিই বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী করে রেখেছে মানুষ হতে আর দেয়নি। বেশি কথা কি মশাই, বাংলা দেশে একটা অ্যাডভেঞ্চারের সিনেমা তুলুন দেখি, বাঙ্গালী টার্জন কোঁচা দুলিয়ে গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখবেন, আপনিই আর ও ছবি দেখতে যাবেন না। হয় না মশাই, যতদিন না ইওরোপীয় পোশাকটি গায়ে চাপাচ্ছেন, ততদিন আপনাদের রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা থেকে ভেতোমি যাবে না। যাদের নিজেদের জীবনে অ্যাডভেঞ্চার নেই, তাদের সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী, ডিটেকটিভ গল্প সৃষ্টি হবে কি করে?"

সুনীত অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবার জন্য আকুপাকু করছিল, কিন্তু সুনীলের মুখের তোড়ে সে দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছিল না এতক্ষণ। সুনীলের এই সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো ভাষণে এমন কয়েকটি বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে যেগুলির প্রতিবাদ সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত, অথচ সে করতে পারছে না। কারণ সুনীল একটা বক্তব্য শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদযোগ্য আরেকটি বক্তব্যে লাফিয়ে পড়ছে। তাই সুনীত বারবার মুখ খুলতে গিয়েও হাঁ গুটিয়ে নিয়েছে।

অবশেষে সুনীল সমে পৌঁছে দম ফেলতে না ফেলতে সুনীতের আক্রমণ সুরু হয়ে গেল।

"আপনার কথার কোন মানে হয় না।"

সুনীল চোখটা ট্যারা করে প্রশ্ন করল, "কোন কথার?"

"আপনার কোন কথারই মানে হয় না।"

সুনীল বলল, "স্পেস-শিপ, মেণ্টালিটি, অ্যাডভেঞ্চার আর ডিটেকটিভ—এই শব্দ-গুলোর মানে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে পাবেন আর বাদবাকি সব চলন্তিকায়।"

"আহা", সুনীত বিপন্ন হয়ে বলল, "আমি তা বলছি না। ওসব যে ডিকশনারিতে আছে তা আমি জানি। আর ঐসব শব্দের অর্থ সম্পর্কে ডিকশনারির যা ধারণা, আমি তা সমর্থনও করি। কিন্তু একথা মানতে আমি কিছুতেই রাজি নই যে, আপনার ইওরোপীয় পোশাক—"

সুনীল বাধা দিয়ে বলল, "না, ইওরোপীয় পোশাক আপনি ডিকশনারিতে পাবেন না। সে-কথা ঠিক। আর পেলেও তা আপনার ডে-টু-ডে কাজে লাগবে না। ওসব জিনিস পেতে হলে আপনার বরং কোন ডিপার্ট-মেণ্টাল স্টোরে যাওয়াই ভাল। এসব ক্ষেত্রে সেটাই বেশি নির্ভরযোগ্য হবে। আপনি বরং চাঁদ—"

সুনীত দেখল কথা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি হাল ঘোরাবার চেষ্টা করল।

"কি মুশকিল!"

"কিছু মুশকিল নয়। ডিকশনারিতে ঢোকা আর ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢোকা, ও প্রায় একই কথা। প্রথম প্রথম অবশ্য একটু ঘাবড়ে যেতে হয়, কিন্তু কায়দা কানুন রপ্ত হয়ে গেলে দেখবেন, আর কোন মুশকিল নেই, দেখবেন ব্যাপারটা একেবারে জলবৎ হয়ে গিয়েছে। তবে ব্যবস্থাটা একটু বোঝা দরকার।"

ফটোগ্রাফার বিশু পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সুনীলের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফোড়ন কাটলে, "যা বলেছিস্ মাইরি। আমার এক বৌদি একবার বায়না ধরলে, সাহেবের দোকান থেকে পাউডার পমেটম কিনে দিতে হবে। দাদা মেয়েছেলের কথায় নেচে হোয়াইটওয়ে লেডলতে ঢুকে পড়লে। কত বারণ করলুম, শুনলে না। তারপর মাইরি, মহা কেলেঙ্কারি। দাদা থরে থরে জিনিসপত্র সাজানো দেখেই ভিরমি খেয়ে গেছল। খোঁজাখুঁজি করে হাল্লাক। নিজের জিনিস আর পায় না। তখন এক মেম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে, 'টয়লেট হোয়ার?' মেমসাহেব বললে, 'উধর, লেফট'। দাদা সেইদিকে একটু এগুতেই দেখলে, দরজার গায়ে সাইনবোর্ড সাঁটা—টয়লেট। বাঁদিকে ফর জেণ্টস্ আর ডানদিকে ফর লেডিজ্। ইউরেকা বলে দাদা বুক চিতিয়ে যেই ফর লেডিজে ঢুকেছে আর শালা হৈ হৈ। দাদা দু-হাতে চোখ ঢেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। পিছনে গোটা চারেক মেমসাহেব। 'স্কাউণ্ড্রেল', 'বদমাস', 'পাকড়ো'। শেষে দাদা অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে বাড়ি গেল।"

সুনীল বলল, "জেলে যে দেয়নি, এই যথেষ্ট।"

সুনীত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "কেন, জেলে দেবে কেন? টয়লেট কেনা কি বেআইনি?"

সুনীল হতভম্ব হয়ে বিশুর মুখের দিকে চাইল।

বিশু বললে, "টয়লেট কেনা বে-আইনি নয়, লেডিজ টয়লেটে ঢোকা বে-আইনি।"

"কেন?"

"এর আবার কেন কি রে? ওখানে মেয়েরা—" বাকীটা বিশু সুনীতের কানে কানে বলে দিলে। "খবরদার ও জায়গায় ঢুকো না।"

সুনীত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ইস্! খুব বেঁচে গিয়েছি। এতদিনে মানেটা বুঝলাম। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসেও টয়লেট লেখা থাকে। আমি ভাবতাম, মেয়েরা ওখানে ঢুকে রুজ লিপস্টিক মাখে বুঝি।"

"হ্যাঁ, সেই জন্যেই আমি বলছিলাম", সুনীল বলল, "ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের আরেঞ্জমেণ্টটা জানা দরকার। ডিকশনারির যেমন অ্যালফাবেট্, এর তেমনি কমোডিটি, আপনি যখন যাবেন—"

"দেখুন, আপনি ভুল করছেন। আমি—"

সুনীল এই কথায় খেপে গেল।

"দেখুন মশাই, আমাকে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর চেনাবেন না।"

"আহা আমি তো বলিনি।"

"দেখুন মশাই, আপনি কি বলেন নি, সেটা আমার শোনার দরকার নেই, কি বলবেন তাই বলুন।"

"তাইতো বলতে চাইছি।"

"না, আপনি যা বলেন নি, তখন থেকে তাইতো বলছেন।"

"না।"

"হ্যাঁ।"

"না।"

"হ্যাঁ।"

"আমি আপনার কথার প্রতিবাদ করতে চাইছি। (সুনীত আর দমও নিল না) আমি বলতে চাইছি, বাঙালীদের সম্পর্কে আপনার ধারণা ভুল। ধুতি পাঞ্জাবী পরার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার না করার কোন সম্পর্ক নেই। আপনি কি বলতে চান যে শার্লক হোমস্ নামে কোন লোক ছিল, ইংরেজ জাতের মধ্যে, তাই অত ভালো ডিটেকটিভ গল্প লেখা হয়েছে ইংরেজি সাহিত্যে?"

"আমি মোটামুটি অবিশ্যি তাই বলতে চেয়েছি।"

সুনীলকে থামিয়ে সুনীত বলে চলল, "এ অত্যন্ত ভুল থিয়োরী। শার্লক হোমস্ বলে কোন লোক ছিল না। চরিত্রটি একেবারে কাল্পনিক।"

"শার্লক হোমস্ নামটা কাল্পনিক, তবে মানুষটা আসল। আর এও জেনে রাখ, তোমাদের এই ব্রজদাই সেই শার্লক হোমস্।"

আমাদের সম্বিত ফিরে আসতে দেরি

আছে দেখে ব্রজদা যদুদার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন।

কোনান ডয়েলের সংগে আমার যখন দেখা হয়, ছোকরা তখনও লিখতে সুরু করেনি। সদ্য ডাক্তারি পাশ করে, ইণ্ডিয়ান আর্মি মেডিকেল কোরে চাকরী নিয়ে দেশ ছেড়ে এখানে এসেছে। এখানে মানে অবিভক্ত ইণ্ডিয়ায়। (ব্রজদা বলতে সুরু করলেন) আমাকে একটা বিশেষ কাজে তখন ওয়াজিরিস্তানে থাকতে হয়েছিল। ঠিক ওয়াজিরিস্তান নয়, তার গায়েই। জায়গাটার নাম ফিকিরিস্তান। সেখানেই ছোকরার সংগে আলাপ হয়।

আমি তখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সির এমন এক জায়গায় বাস করছি, যার উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য আন্ত-র্জাতিক কূটনৈতিক দাবা খেলা পুরোদমে সুরু হয়ে গিয়েছে। একটি লোকের হাঁ কি না-এর উপর তখন বড় বড় রাষ্ট্রের কর্ণ-ধারদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সেই লোকটির নাম মীর মালিক পীর খওয়াব খান। ওয়াজিরিস্তানের উত্তর পশ্চিমে মাত্র সাতান্ন বর্গ মাইল ভূমি—এই ফিকির-স্তানের মালিক ছিল এই দুর্ধর্ষ সর্দারটি। ওকে দলে টানাই ছিল সকলের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সূত্রেই আমি বড়-লাটের রিকোয়েস্টে ঐ পাণ্ডববর্জিত দেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। আর কী দেশ! যেমন তার মাটি রুক্ষ, তেমনি তার লোক-গুলো কাঠখোট্টা। ঘোড়া আর রাইফেল, এ হল গে ওদের প্রাণের চাইতেও দামি। আমি সেখানে গিয়ে একটা রাইফেল শুটিং-এর ক্লাব খুলে ফেললুম। এই যে আজ ওয়ার্লডে (ব্রজদা একটু থেমে আবার সুরু করলেন) রাইফেল শুটিং-এর এত ধুম পড়ে গিয়েছে, এ কার জন্য? এই লোকটির জন্য। ব্রজদা নিজের বুকেই হাত ঠেকালেন। রাইফেল ক্লাবের গোড়াপত্তনটি ওখানেই করলুম।

ব্যস, দুদিন যেতে না যেতেই আমি সেখানে মোস্ট পপুলার ফিগার। মীর মালিক পীর খওয়াব খানের একেবারে দিল জানের দোস্ত বনে গেলুম। দোস্ত আমাকে ওর বাড়ির প্রাইভেট টিউটার করে নিলে। ওর ছেলে মেয়েদের আমি রাইফেল চালনা শিক্ষা দিতে লেগে গেলুম।

মীর মালিকের রাজ্যে স্টেট গেস্ট হয়ে বেস্ট হোটেলে তোফা আরামে দিন কাটাচ্ছি আর বৈদেশিক এজেণ্টদের নাড়িনক্ষত্রের খবর জোগাড় করছি। আমি পাঞ্জাবী মুসলমানের ছদ্মবেশ ধরেছিলাম। নাম নিয়েছিলাম খান সাহেব মহম্মদ মহরম খান।

হোটেলের লাউঞ্জে একদিন বসে আছি, এমন সময় এক বৃটিশ ছোকরা ঢুকল।

মুচকি হেসে বললুম, "মর্নিং ডাক্তার কোনান ডয়েল। যাত্রাপথ নির্বিঘ্নে কেটেছে, আশা করি।"

দেখলুম, ছোকরা বিমূঢ় হয়ে গেল।

আমতা আমতা করে বলল, 'সরি, তুমি ভুল করেছ মিঃ—, আমার নাম তো কোনান ডয়েল নয়।"

"তাই নাকি," আমি যেন ক্ষমা চাইছি, এমনিভাবে জবাব দিলাম, "তাহলে আমি সত্যই দুঃখিত ডাক্তার ওয়াটশন।"

এইবার সাহেবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এল।

ফিসফিস করে বললে, "হু আর য়ু?"

বললুম, "মাই বডি ইজ এ ব্রিটিশ সাবজেক্ট, বাট মাই আত্মাটি ভারতমাতার চারণ। হেইল মাদার আই ওয়াশিপ দী।"

বন্দে মাতরমের ইংরাজি শুনেই তো সাহেবের চোখ ট্যারা হয়ে গেল।

বললুম, "ডাক্তার মাভৈঃ! বস এখানে। চা খাও। দুটো সুখ দুঃখের কথা শুনি।"

সাহেব খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বসল। তারপর আর বেশি পেঁয়াজি করল না।

সরাসরি প্রশ্ন করল, "তুমি তো আমাকে কখনও দেখনি, তবে আমায় চিনলে কি করে?"

বললুম, "এলিমেণ্টারি, ডাক্তার কোনা—থুড়ি ডাক্তার ওয়াটসন, এলিমেণ্টারি। তুমি

এলিমেণ্টারী, ডাঃ ওয়াটসন এলিমেণ্টারী

রোগ চেন কি করে?"

সাহেব খুশি হয়ে বললে, "কোয়াইট ইণ্টারেস্টিং।"

আমি বললুম, "হোটেলে নিউ অ্যারাই-ভালের লিস্টিটা দেখা আমার অভ্যেস। কাল রাত্রে এখানে একজন মাত্র অতিথিই এসেছেন। ডাক্তার ওয়াটসনকে সেখানেই পেলাম। তারপর ডিডাকশনের মাধ্যমে পেলাম কোনান ডয়েলকে। সিম্পল

অব্‌জারভেশন।"

"বাই জিঙ্গো", ছোকরা লাফিয়ে উঠল, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এমন লোককে পেলে লুফে নিত।"

"তিন তিন বার অফার এসে গিয়েছে," আমি শান্তভাবে বললাম, "র‍্যাঙ্ক চেকে মাইনে দিতে চেয়েছে হোম ডিপার্টমেণ্ট। কিন্তু পরের গোলামি তো করব না ভাই। বেকার স্ট্রীটের ঠিকানায় থাকি, সেও ভাল।"

"নাউ নাউ, এবার তো আপনাকে চিনে ফেলেছি।' আপনিই তাহলে সেই কুখ্যাত গুণ্ডা—"

"হুড্‌লাম ডেস্‌পেরেডো", (আমি জুগিয়ে দিলাম।)

"দমনকারী বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ্‌—"

"ব্রজরাজ কারফরমা," ফিসফিস করে বললাম, তারপর একটু জোরে, "ওরফে খান সাহেব দহরম মহরম খান, রাইফেল কোচ অব্‌ হিজ হাইনেস্‌ মীর মালিক পীর খওয়াব খান্‌স্‌ রয়্যাল ফ্যামিলি।"

" মাই লা—"

"মিস্‌ জিপ্পার এল-ও আমার ছাত্রী।"

"ও! হাউ ডু ইউ নো?"

"এলিমেণ্টারি, ডাক্তার ওয়াটসন, এলিমেণ্টারি।"

ছোকরা বিস্ময়ে ভেঙেই পড়বে যেন। শান্ত করবার দাওয়াই দেবার জন্য ওকে ড্রিংকস্‌ দিতে বললাম।

তারপর সুরু করলাম, "যদি দেখা যায়, লাহোরের মত সিভিলাইজ্‌ড্‌ জায়গা ছেড়ে, বাপ মা আত্মীয় পরিজনকে ছেড়ে কোন সুন্দরী, শিক্ষিতা, কালচার্‌ড্‌ মেয়ে ওয়াজিরিস্তানের মত দুর্গম জায়গায় এসে চাকরী নেয়, তারপর যেদিন সেখানে লাহোর থেকে একটি যুবক ডাক্তার এসে পৌঁছায় অমনি মেয়েটি ফকিরিস্তানের হারেমে এসে চাকরী নেয়, তাহলে সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, ইট্‌ ইজ্‌ এ প্লেন অ্যাণ্ড সিম্‌পল্‌ গেম্‌ অব্‌ লুকোচুরি। অর্থাৎ একটি মেয়ে প্রাণপণ পালাতে চাইছে, এবং একটি ছেলে তাকে ধরতে চাইছে। এমন কি মরীয়া হয়ে সে ছদ্মবেশও ধরেছে। এখন একটি প্রশ্নই ওঠা উচিত ডাঃ ওয়াট্‌সন্‌, (বৎস, এখন থেকে তোমাকে ওয়াট্‌সনই বলব। হোয়াই?"

"হয়ত ছেলেটি," ছোকরা তিক্তভাবে বলল, "মেয়েটিকে খুন করতে চায়।"

"ঠিক বলেছ, ওয়াট্‌সন, তোমার বুদ্ধির তারিফ করি।" শুধু একটি ছোট্ট জিনিস তোমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। তোমার দোষ নেই। মিস্‌ এলেন নাম শুনে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখখানা যে সরম-রাঙা হয়ে উঠেছিল, নিজের মুখ তোমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয় বলেই সেটা বুঝতে পার নি। খুনীরা এমন কথায় কথায় ব্লাশ করে না।"

আমার কথা শুনে ছোকরা চুল ছিঁড়তে সুরু করল।

"মিস্‌ আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ব্রজদা, ডু যু মাইণ্ড, তোমাকে যদি ব্রজদা বলি।"

"সার্টেনলি নট্‌।"

"ব্রজদা, সেরেফ ভুল বোঝাবুঝিতে এই কেলেঙ্কারি। কুক্ষণে ঠাট্টার ছলে বলেছিলাম, পেগির ব্যবহার অনেক ভাল। ও ডুব্‌ল ডিলিং জানে না। বাস্‌, এই দেখুন তার পরিণতি।"

"বুঝেছি মাই ডিয়ার ওয়াটসন, বুঝেছি। মিস্‌ এল্‌ এখনও পর্যন্ত তোমার উপর বেজায় চটে আছে। আর তারই সুযোগ নিয়ে এনিমি কাণ্ট্রির এক ধূর্ত এজেণ্ট ওকে বাগিয়ে ফেলেছে প্রায়।"

"হোয়াট্‌! কি বললে তুমি!" ছোকরা রাগে ঠক ঠক করতে লাগল। "ফেলাটি দাই নেম্‌ ইজ্‌ য়োম্যান্‌।"

"ধীরে, বৎস ধীরে।" বললুম, "মাথা গরম করো না। ঠাণ্ডা হয়ে বস। এক কাপ লেমন চা খাও। বায়ুটা কিঞ্চিৎ কমবে। তারপর মন দিয়ে আমার কথা শোন। প্রথমেই জেনে রাখ, মেয়েদের কথায় রাগ করতে নেই। ওরা হচ্ছে ফ্রিক্‌ অব্‌ নেচার। ভগবানের আজব বনাওট্‌। সাচ্চা জিনিসের কদর বোঝে না। ঝুটো মালের আদর করে। এখানে এনিমি কাণ্ট্রির একটা ধুরন্ধর এজেণ্ট আছে। সে মিস্‌ এলের উপর ভর করেছে। নিদারুণ এক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে ফেলেছে ওকে। ওরা মীর মালিকের একটা গোপন দলিল মিস্‌ এলকে দিয়ে চুরি করাচ্ছে। ঐ দলিল যার কব্জায় থাকবে মীর মালিক তার গোলাম হতে বাধ্য হবে।
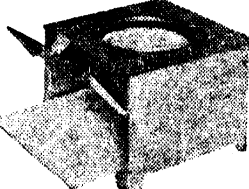
"পরশুদিন মিস্‌ এল্‌ দলিল চুরি করে ওয়াজিরিস্থানে চলে যাবে। কানা ফকিরের

সরাইখানার দোতালার ওর জন্য ঘর রিজার্ভ করা রয়েছে। তার পাশের ঘরটাই আমার। এজেন্টটা একটা জঘন্য ফন্দী এ'টেছে। কয়েকজন হানাদার ভাড়া করেছে। তাদের দিয়ে মিস্ এল্‌কে লুঠ করাবে। তারপর দলিলটা নিয়ে মিস্ এল্‌কে সেই পিশাচদের হাতে ছেড়ে দেবে, যাতে তার কুকর্মের একমাত্র সাক্ষীও মুছে যায়।

এখন প্রশ্ন করতে পার, এত কথা আমি জানলুম কি করে? এনিমি কাণ্ট্রির ঐ এজেন্ট ব্যাটার পায়ের ছাপ আমি একদিন মিস্ এলের বসবার ঘরের কার্পেটের উপর পাই। তারপর খুব কায়দা করে মিস্ এলকে রাইফেল চালনা শিক্ষা দিতে থাকি। একদিন রাইফেলের বাঁট থেকে মিস্ এলের আঙ্গুলের ছাপ তুলে নিতেই ষড়যন্ত্রটা আমার চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল। সেই আঙ্গুলের ছাপ থেকে আমি তোমার পরিচয়ও পেয়ে গেলাম।

ছোকরা "ব্রজদা, ব্রজদা, তুমি" বলে বড়-বড়ি কাটতে লাগল।

বললুম, "এখন আমড়াগাছি রাখ। আমি জানতে পেরেছি মিস এলকে হত্যা করা হবে।

"হা ঈশ্বর—" ছোকরা কঁকিয়ে উঠল। "এখন উপায়।"

"মিস্ এল্‌কে এবং দলিলটাকে উদ্ধার করা।" একটু থেমে আমি বললাম, "তুমি এখন সিধে বেরিয়ে যাও। কানা ফকিরের সরাইতে গিয়ে নিচের তলায় একখানা ঘর নাও গে। তারপর আমার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। কোনও রকম উস্কানিতেও মাথা গরম করবে না। মনে রেখো, তোমার সামান্য ভুলে সাংঘাতিক কেলেঙ্কারি হয়ে যেতে পারে। তখন অনুশোচনা ছাড়া পথ থাকবে না।"

রোলারে রিবাউণ্ড করে লাগল গিয়ে একেবারে তার পিঠে।

ছোকরা সেইদিনই চলে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে আমিও। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি পৌঁছুলাম। ঘণ্টাখানেক আগে মিস্ জিঞ্জার এল্‌ও এসে পৌঁছে গিয়েছে।

ভোররাত্রেই একটা খণ্ড যুদ্ধ বেধে গেল। হানাদারেরা দুমদাম রাইফেলের আওয়াজ করে সরাইটা আক্রমণ করল। আমি তেমন গা লাগাইনি। তারপর পাশের ঘরে হুটোপাটি সুরু হল। মিস্ এলের আর্ত চীৎকার কানে এল। টের পেলুম ওকে টেনে হিচড়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে গেল। আশঙ্কা করছিলুম, মিস্ এলের চীৎকার শুনে ছোকরাটা না বেরিয়ে পড়ে। না, সে কথা রাখল।

আমি চট করে উইঞ্চেস্টার রিপিটারটা বগলদাবা করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। সেই আবছা অন্ধকারে দেখলুম, চারটে ভাড়াটে উপজাতি গুণ্ডা মিস্ এলকে টেনে হি'চড়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলেছে। একটু দূরেই ওদের ঘোড়াগুলো বাঁধা। মতলবটা বুঝে ফেললাম। ঘোড়ায় ওরা একবার উঠতে পারলে, ওদের ধরা আমার পক্ষেও কষ্টসাধ্য হত।

তাই আমি প্রথমেই ওদের ঘোড়াগুলোকে কাত করলুম। তারপর ওরা কিছু বোঝার আগেই তিনজন মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ল। এ জীবনে আর উঠবার সাধ্য রইল না। গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল। ম্যাগাজিনে গুলি পুরতে যা দেরি। ওর মধ্যেই বাকি লোকটা আমার ভবলীলা প্রায় সাঙ্গ করে এনেছিল আর কি? ওর একটা গুলি আমার খুলিটা টাচ্ করে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটা বাঁ হাতের অনামিকায় অষ্টধাতুর আংটিতে বাধা পেয়ে ছিটকে পড়ল। কিন্তু তৃতীয় গুলিটা সোজা এসে বাঁদিকের বুকে একেবারে হার্টে লাগল।

আমার সর্বশরীর কেঁপে উঠল। চক্ষে অন্ধকার। টলে পড়ে গেলাম। যা হোক রেলিংটা ধরে কোনমতে সামলে নিলাম। ভাগ্যিস্ বুকে পকেটে একটা বুলেট প্রুফ সিগারেট কেস ছিল, স্টেইনলেস স্টীলের, অবশ্যি এ সব ক্ষেত্রে সব বড় বড় গোয়েন্দার কাছেই এমারজেন্সির জন্য এসব জিনিস থাকেই. তাই বাঁচোয়া. নইলে সেখানেই অক্কা পেয়ে যেতুম সেদিন।

উঠে দাঁড়িয়েই খুব ক্লোজ দিয়ে দুটি গুলি চালিয়ে দিলুম। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি, ব্যাটা শয়তান বিপদ দেখে মেয়েটাকে নিজের সামনে ঢালের মত ধরে রেখেছে। আমি মুস্কিলে পড়লাম। একটা গুলি সেই হানাদারের হাতে গিয়ে লাগল। রাইফেলটা ছিটকে পড়ল তার হাত থেকে। দ্যাখ, বৃথাই তোদের ব্রজদাকে বিশ্বের রাইফেল সুটাররা গুরু বলে মানে না।

রাইফেলটা পড়ে যেতেই দুর্বৃত্তটা ক্ষেপে উঠল। মেয়েটাকে চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে ফস করে একটা ছোরা বার করল। ওর মতলব বুঝতে পেরে আমি রেলিং টপকে কার্নিসে গিয়ে দাঁড়ালুম। লোকটার থেকে একটু দূরে একটা স্টীম রোলার পড়েছিল রাস্তায়। অনেকক্ষণ ধরে তার পজিশনটা লক্ষ্য করছিলুম। কারণ সামনাসামনি লোকটাকে গুলি মারার উপায় নেই, মেয়েটা মরবে। এখান থেকে অন্যদিকে সরে গিয়ে পজিশন নেবার উপায় নেই, মেয়েটার বুকে ততক্ষণে আততায়ীর ছোরা ঢুকে যাবে। একেবারে উভয় সংকট।

ব্রজদা এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর ধীরে ধীরে টানতে লাগলেন।

"তারপর কী হল ব্রজদা?" সুনীত প্রায় চেঁচিয়েই উঠল।

"মেয়েটা একটুর জন্য বেঁচে গেল," সুখটানটা দিয়ে ব্রজদা বললেন, "ঐ রোড রোলারটার জন্য।"

"কেমন করে?"

"আমি" ব্রজদা বললেন, "এক হাতে রেলিং ধরে কার্নিসের উপর ঝুঁকে পড়ে অ্যাঙ্গেলটা ঠিক করে নিয়ে রোলারের গায়ে গুলি ছুঁড়লাম। রিবাউণ্ড করে গুলিটা ওর পিঠের দিক থেকে একেবারে হার্টে গিয়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে খতম। ইস্কুলে ক্যারামে চ্যাম্পিয়ন ছিলাম। যে-কোন অ্যাঙ্গেল থেকে রিবাউণ্ড করে যে-কোন পকেটে ঘুঁটি ফেলতে পারতাম। দেখলাম বিদ্যেটা ভুলে যাইনি।"

একটু দম নিয়ে ব্রজদা বললেন, "তারপরের ঘটনাটা একেবারে ইজি। ইংরেজি সিনেমায় দি এণ্ডের আগে যা যা ঘটে, এমন কি সেন্সর বোর্ড যে-সব জায়গার কাঁচি চালায়, অবিকল তাই ঘটল। ছোকরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ও জিল্লু, ফরগিভ মি. মেয়েটা ফোঁস ফোঁস করে বললে, ও আর্থার ফরগিভ মি।

"যাবার আগে কোনান-ডয়েল বলে গেল, আমার কীর্তিকাহিনী সব লিখে প্রকাশ করবে। করলও তাই। আমার নামটা শুধু পাল্টে দিলে। বইয়ের হিরো ইংরেজ না হলে বিলেতে বই কাটানো শক্ত। তাই আমার নাম দিলে শার্লক হোম্‌স্। কথাকে কথা অবিকল বসিয়ে দিয়েছে, এমন কি ঐ যে বলেছিলুম বেকার থাকব, অমনি বেকার স্ট্রীটের বাসিন্দা করে দিয়েছে। এই হল তোদের শার্লক হোম্‌সের জন্ম বৃত্তান্ত। অরিজিন্যালি হোম্‌স্ তোদের এই কোঁচা দোলানো জেতো বঙ্গালীই, বুঝলি সুনীল। বেশি তড়পাসনি।"
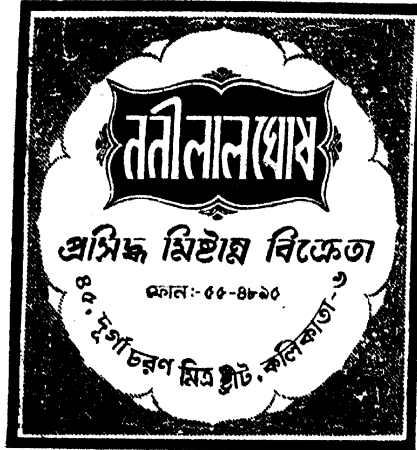
দরজার সামনের আলোয় লোকটা ভেসে উঠল। যেন গভীর অন্ধকার ফ‍ুড়ে বেরিয়ে এল আচমকা। আমার অস্বস্তি হল। কিন্তু দেখলাম, লোকটার দৃষ্টি আমারই ওপর। এবং তার লাল চোখে যেন একটি আশা ও সাফল্য ঝিলিক দিয়ে উঠল। সেই বিশ্রী চেহারাটা নিয়ে সে আমার টেবিলে, আমারই মুখোমুখি বসল।

আর আজ এই শীতার্ত রাত্রে, আমি বন্ধুবিহীন একলা বসে রয়েছি। স্বভাবতই চায়ের দোকানের সান্ধ্যকালীন আড্ডা আজ জমেনি। আমি আজ অবিশ্যি একটু দেরী করে এসেছি। কিন্তু প্রত্যহের আড্ডাবাজ বন্ধুরা যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে ভাবতে পারিনি। তা ছাড়া, গোটা রেস্টুরেন্টটাই প্রায় ফাঁকা। এদিকে-ওদিকে দু'একজন লোক বসে আছে। যেন নিতান্তই তাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। মনে মনে আশাহত আর বিরক্ত ছিলাম। তার ওপরে এই লোকটা......।

লোকটা যেন দিন বুঝে এল। ক্ষণ বুঝে ঢুকল। আর কেন জানি না, এ রকম একটা আশংকা আমি এর আগেও করেছি। লোকটা ওৎ পেতে আছে। একদিন হঠাৎ এসে ধরবে।

আর আজই দেখছি সেই অশুভ দিন ও ক্ষণ।

প্রায়-দিনই সন্ধ্যাবেলার দিকে লোকটি আসে। আমাদের টেবিলের কাছাকাছি কোনো একটা টেবিলে এসে বসে। এক কাপ চায়ের সংগে অন্তত তিন চারটি শস্তা সিগারেট সে পর পর খেয়ে যায়। বলা যায়, চায়ের এবং সিগারেটের ধোঁয়ায় লোকটা নিজেকে আবৃত করে রাখে প্রায়। বয়স বোধহয় বছর পঞ্চাশ হবে।

আমার খুব খারাপ লাগে দেখতে। কারণ, ধোঁয়ার আবছায়ায় ও রকম একটা কালো, চোয়াল উঁচনো লম্বা এবড়োখেবড়ো মুখ দেখলে, খারাপ ছাড়া কোনো ভালো চিন্তা আসে না। বসন্তে কিংবা অত্যধিক ব্রণেই লোকটার মুখের চামড়া ওরকম কি না, কে জানে। অজস্র দাগে ভরতি। নাকটা যদিও সরু এবং চোখা, চোখ দুটিও বড়ই। কিন্তু চোখের রং প্রায় লাল। রুক্ষ চুল, তেল-বিহীন, তায় আবার কোঁকড়ানো। কোঁকড়ানো চুল হলেই যে মানুষকে সুন্দর দেখায় না, এ লোকটিকে দেখলে তা বোঝা যায়। কখনো হাসতে দেখিনি। কারুর সংগে কথা বলতেও দেখিনি। জামা কাপড়ের রকমফের চোখে পড়েনি কখনো। সেই একই রকম ময়লা ময়লা সার্ট। মোটা ধুতিটা কোনোরকমে কোঁচানো। হাঁটুর একটু নীচে ঝলঝলিয়ে ঝোলে। কেবল শীতের সময় এর ওপরেই একটা কালো কোট চাপানো থাকে। যেটা তার মাপে বড়। বোধহয় কোনো কুলুঙ্গিতে গুঁজে রেখে দেয়। সেটা দলামোচড়ানো দেখায়। কলারটা তুলে গলা অবধি ঢেকে দেবার চেষ্টা করে। সব মিলিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত ছায়া যেন লোকটাকে ঘিরে থাকে।

লক্ষ্য করে দেখেছি, লোকটা মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকায় বটে। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ধোঁয়ার আড়াল থেকে তার লাল ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি থাকে আমাদের টেবিলের দিকেই। আমাদের কথাবার্তা যেন সে বেশ কান দিয়ে শোনে। প্রথম প্রথম আমাদের সকলেরই খুব অস্বস্তি হত। তারপর খানিকটা সয়েই

এসেছিল। যদিও লোকটার উপস্থিতি কখনোই ভোলা যেতো না।

আজ সেই কোটটা সে গায়ে দিয়েছে। তুলে দিয়েছে গলা অবধি। মুখের থেকে শরীরটা বেটপ মোটা দেখাচ্ছে। ঠিক আমার মুখোমুখি বসেই, সেই শস্তা সিগারেটের প্যাকেট খুলে সে মুখে দিল। আমি সেই মুহূর্তেই ওঠবার উদ্যোগ করলাম। এবং যা ভেবেছিলাম, তাই। লোকটা সিগারেটের প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এ সিগারেট আপনার চলবে স্যার?

চোখ তুলে, অবাক হবার ভান করে তাকালাম। দেখলাম, এক দৃষ্টে সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যেন আমাকে সম্মোহন করতে চাইছে। আর এই ধরনের 'স্যার' বলে উপযাচক হয়ে আলাপ করা লোকদের প্রতি বরাবরই আমি সন্দেহ পোষণ করে আসছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের লোকেরা দালাল, চাটুকার এবং মতলববাজ হয়ে থাকে।

আমি ভদ্রতা বিসর্জন দিয়ে বললাম, না। ধন্যবাদ!

—কী বললেন?

লোকটা একটু ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর। কানের কাছে একটা হাত তোলা। যেন ভালো শুনতে পায় নি।

আমি একটু জোরে বললাম, ধন্যবাদ!

—ও! আশাহত হল বলে মনে হল না। কিন্তু মোটা ঠোঁট দুটোতে একটা শ্লেষ ফুটল কি না, বুঝতে পারলাম না।

একটু রূঢ়ই শোনালো বোধহয় আমার গলা। বিরক্তিও চাপা থাকল না। আমি রেস্টুরেণ্ট 'বয়'টার উদ্দেশে মুখ ফিরিয়ে এবার সরাসরি উঠে পড়ত গেলাম।

লোকটা বলে উঠল, চলে যাচ্ছেন স্যার?

আবার আমাকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হল, হ্যাঁ।

আমি বলতে পারতাম, 'কেন?' কিন্তু তাহলে লোকটা আমাকে সহজে নাও ছাড়তে পারে। যদিও তাতে আমার লাভ হল না। লোকটা আবার বলল, আপনার খুব তাড়াতাড়ি আছে না কি?

মোটা ভাঙা ভাঙা গলা। বোধহয় খুব মদ খায়। চাউনিটা অপলক। চাইতেই আমার অস্বস্তি আরও বেশী। লোকটাকে দেখলেই কী রকম খারাপ লাগে। তাই কোনোরকম আলাপেই আমার কৌতূহল নেই।

বললাম, আপনাকে আমি চিনি বলে মনে হচ্ছে না।

এড়িয়ে যাবার এরকম অভদ্রোচিত কথা শুনেও লোকটা দমলো না। বলল, কিন্তু আমি স্যার রোজই আসি এখানে, মার্ক করে থাকবেন। আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল। মানে, পারসোন্যাল কথা ঠিক নয়। আপনারা সাহিত্যিক সমালোচকেরা এখানে বসে রোজই আড্ডা দেন। আমার মতো একটা সাধারণ লোক, মাঝে মাঝে শুনি। আর মফঃস্বল শহরের মতো এ রকম জায়গায় আপনারা আছেন বলে তবু ও সব কথাবার্তা একটু...। তাই আর কি...।

মনে মনে অবাক না হয়ে পারলাম না। একটু কৌতূহলও জাগলো। কিন্তু সেটা আমি ওকে জানতে দিতে চাইলাম না। যেভাবে লোকটা ভূমিকা করল, যা বলল, সত্যি বলতে কি, এ লোকটার কাছ থেকে আমি আশা করি নি।

আবার সে বলে উঠল, তাছাড়া আপনি একজন, কী বলব, দেশের একজন—।

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, কী বলবার আছে আপনার, বলুন।

লোকটার শেষবারের কথা বলার ঢঙ-এ আবার একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কী জানি, লেখা ছাপাবার জন্যে আমাকে মুরুব্বী ঠাওরালো কি না কে জানে। কিংবা আর কিছু।

লোকটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ কুঁচকে তাকালো। কী রকম অশ্লীল দেখালো যেন। আর আমারই চোখের ভুল কি না জানি নে। মনে হল, ওর বিশ্রী ঠোঁট জোড়ায় একটা বাঁকা কুৎসিৎ হাসির রেশ লেগে রয়েছে। বলল, আমাকে আপনি চিনবেন না। আপনার বইও আমি পড়ি নি। কিছু মনে করবেন না। নিতান্ত আপনাদের কথাবার্তা থেকেই বুঝেছি যে...। হ্যাঁ যা বলছিলাম, আপনারা...মানে এই সাহিত্যিকেরা মানুষের দুঃখ এবং অবনতির জন্যে পরের ঘাড়ে কোনোরকমে দোষ চাপিয়ে দিতে পারলে ভারি নিশ্চিন্ত। তাই না?

কথাটা একটু আক্রমণমূলক মনে হল। আর তাও এরকম একটা লোকের কাছ থেকে! মনে মনে রেগে গেলেও শান্তভাবেই বললাম, যথা?

—যথা, ধরুন, অবনতির, মানে মানুষের গোল মানে আত্মিক অবনতির কারণ হিসেবে, আপনারা অর্থনৈতিক অবস্থাকেই দায়ী করেন সব থেকে বেশী। এটা আপনাদের বাস্তববাদ।

—আপনার মতে, সেটা ভুল নাকি?

আমার রূঢ়তা চাপা থাকল না। লোকটা মাথা নিচু করে ছাই ঝাড়ল। তারপরে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি রাগ করছেন?

একটু লজ্জিত হয়ে উঠলাম। সে আবার বলে উঠল, তাহলে অবশ্য আমার বলা

তিন সঙ্গী   আলোকচিত্র : শ্রীচঞ্চল মিত্র

চলে না।

আমি এবার একটু তাড়াতাড়ি বললাম, না, রাগ করি নি তো।

সে বলল, ও! তাহলে আমারই বুঝতে ভুল হয়েছে স্যার। কিছু মনে করবেন না। আমি জানি, আপনারা সাহিত্যিক মাত্রেই অমায়িক। অন্যায় হলে ক্ষমাটমা করে দেন। আমি কি বলতে চাইছি জানেন? আপনার মতবাদ একেবারে ভুল, আমি তা বলছি না। কিন্তু ওটা বাইরের—মানে—ওপরের ব্যাপার। অনর্থটা তার ভিতরের ব্যাপার, অন্তত আমাদের এ যুগে নিশ্চয়। মানুষের লোভ লালসা, তার ভিতরের অন্ধকার...হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি, আপনি আপত্তি করবেন। বলবেন, এটা সমস্ত মানুষের সম্পর্কে খাটে না। কিন্তু আপনি এ যুগটার দিকে তাকিয়ে কথা বলুন। এ যুগের মানুষদের কতখানি ক্ষমা করা যাবে, সেটা আপনি ভেবে দেখবেন। কিন্তু বিচারটা বাইরে থেকে করবেন না। ভিতর থেকে, প্রত্যেকটি মানুষের, এমন কি আপনার বন্ধুবান্ধব, এমন কি আত্মীয়স্বজন, চাই কি, আপনার নিজের ভিতরেও ডুব দিয়ে একবার যাচাই করে দেখতে পারেন, অবনতির মূলটা কোথায়। মানুষ নিজেকে এত বেশী অসুখী ভাবছে, আর দুঃখ তৈরী করছে যে, দেশের এই বর্তমান অবস্থাটা যারা চেয়েছিল, ঠিক তাদেরই তালে তাল পড়ছে।

লোকটা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরাল। বয় এসে এক কাপ চা দিয়ে গেল তাকে। আমি হাত নেড়ে অনিচ্ছা জানালাম। লোকটা সেই ধোঁয়ার জাল সৃষ্টি করল নিজেকে ঘিরে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার [illegible] জোড়া নতুনভাবে [illegible] উঠেছে। তাকে আমি আর ঠিক আগের মতো অবহেলা করতে পারলাম না। আমি শোনবার মতো মুখ করেই তার দিকে তাকালাম।

ধোঁয়ার আড়াল থেকে সে বলল, দেখুন, আমার পাণ্ডিত্য নেই যে, আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলি তাই আমার কথাই আপনাকে বলছি। এই শহরেই, রেলওয়ে ইয়ার্ডে যুদ্ধের সময় আমি মিলিটারিতে কাজ করতাম। আর টি ও-র ক্লার্ক ছিলাম আমি। ছোট অফিস। লক্ষ্য করে থাকবেন, প্রায় ছোটখাটো একটা চার্চের মতো ঘর এখনো দেখা যায় ইয়ার্ডে, দুটো লাইনের মাঝখানে। ঘরটার নীচে মোটাই কাগজপত্র জমা হয়ে থাকতো। আর ওপরে ছিল অফিস। ফৌজের গাড়ি এবং সামরিক মালপত্রের ওয়াগনগুলোর হিসেব আমাকে রাখতে হ[illegible]। ইয়ার্ডে রোজই প্রায় ফৌজের গাড়ি আসত। বৃটিশ, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান...। কোনো কোনো সময় তাদের ইয়[illegible] চব্বিশ ঘণ্টা, আটচল্লিশ ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হত। কারণ ইয়ার্ডে এসে নানান সাফ্‌ল রিসাফ্‌লিং হত। ফৌজী সাহেবরা ইয়ার্ডে বেশীক্ষণ থাকবার পক্ষপাতী ছিল না। কেন না, শত হলেও রেলওয়ে ইয়ার্ড, সেখানে বিশ্রামও হয় না, একটু এদিক ঘোরা, তাও হয় না। হয়তো খেতে বসল, হুকুম এল, গাড়ি রেডি, আধ ঘণ্টার মধ্যেই যেতে হবে। ইয়ার্ড তো আসলে স্টেশন হিসেবে ব্যবহার হত। আমার কাজ ছিল, আর টি ও সাহেবকে রিপোর্ট করা। ওয়াগন এবং গাড়ির হিসেব করা, রেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, সব সময়েই যোগাযোগ করা। যেমন করে হোক ক্যারেজ ওয়াগন আদায় করা। তাতে একটা ক্ষমতা আমার হাতে ছিল। ইচ্ছে করলেই, ফৌজ ডিটেন না করিয়ে, ইয়ার্ড থেকে তাদের খালাস করার ব্যবস্থা করতে পারতাম। কত বেশী ওয়াগন আর ক্যারেজ পাওয়া

যেত, সেটা সব সময়েই কমিয়ে বলার চেষ্টা করতাম। যাতে কাজকর্ম একটু ধীর গতিতে হয়। কে অত খাটে। তাছাড়া আর একটা মজা টের পেয়েছিলাম। বেশী দেরী হলেই ফৌজের সাহেবরা এসে খোশামোদ করত। প্রচুর মদের বোতল, সিগারেট, লাইটার, অনেক কিছুই উপহার পাওয়া যেত। শুকনো খাবার, এই ধরুন, মাছ, চকোলেট, ফলফলারি, মেলাই কিছু। অবিশ্যি, সব সময় যে আমি ম্যানেজ করতে পারতাম, তা নয়। এক এক সময়, সত্যি ওয়াগন আর ক্যারেজ নিয়ে ভয়ংকর ফ্যাসাদে পড়তে হত। তখন আর টি ও' অধিকাংশই কোনো মেজর বা ক্যাপটেন র‍্যাঙ্ক-এর লোক, আমাকে বাপান্ত করত। রেল কর্তৃপক্ষকেও। আসলে ত আমি ভারতীয় রেলেরই লোক তা যাই লোক।... আমি বেশ ছিলাম।

লোকটা আবার সিগারেট ধরাল। আমি এ সবের বিন্দু বিসর্গও জানতাম না। কী আর টি ও আর ফৌজের ব্যাপারে ইয়ার্ডে কী ঘটত। কেনই বা বলছে। শুধু শুনে যেতে লাগলাম। আর সেও খুব তাড়াতাড়ি যেন তার বলাটা শেষ করতে চায়। যেন বলতে পারলেই, তার এতদিনের নিঃশব্দ প্রতিবাদটা ঠিক মতো করা হয়ে যায়।

বলল, আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না, আর টি ও-র সেই অফিসটা। এখন সেই ঘরটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ঘরটার কাছেই ইয়ার্ডের পাঁচিল। পাঁচিলের ওপরেই কয়েক হাত উঁচু কাঁটা-তারের বেড়া। পাঁচিলের বাইরে আমাদের এই শহরের নিরিবিলি অংশটা পড়ে। আপনাকে এসব ডেস্‌ক্রিপশন দেবার কোনো মানে হয় না। সবই দেখেছেন। আর তাই, আপনাকে আমি খুলেই বলছি। আমার অফিসটা আমার কাছে ছিল স্বর্গের মতো। কারণ ঠিক আমার অফিসের সামনাসামনি পাঁচিলের ওপারে যে একতলা বাড়িটা রয়েছে, সে বাড়িটা আমার চেনা। বাড়িটা এক ইস্কুল মাস্টারের। বুঝতেই পারছেন, মাস্টার মশাই আমার পরিচিত। এবং মাস্টার মশাইয়ের বড় মেয়ে, তার সঙ্গে আমার ওখান থেকেই দেখাশোনা হত। শোভা, মানে মাস্টার মশায়ের বড় মেয়ে, তার সঙ্গে আমার...কী বলব, প্রেম, প্রেমই ছিল। হ্যাঁ মাস্টার মশায়ও অনুমান করতেন সেটা, আর তাঁর স্ত্রী সবই জানতেন। প্রায় জানাজানিই ছিল বলা যায় যে, শোভার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। শোভা ছাড়াও মাস্টার মশায়ের আরও অনেক লেণ্ডিগেণ্ডি ছিল। আমার সাহায্যেরও প্রয়োজন ছিল তাঁর। জানেন তো, আমরা রেলের লোকেরাই একমাত্র যুদ্ধের সময় তিন বেলা ভাত খেতে পেতাম। আমাদের চালের অভাব ছিল না। এবার বুঝতে পারছেন, স্বর্গ কেন বলছি। শোভা জানালায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতো, বাঁধতো, আমি দেখতে পেতাম। মাঝে মাঝে সে ছাদে এসে দাঁড়াত। দুজনে দুজনকে দেখতাম, হাসতাম ইশারায় কথাবার্তাও বলতাম। আর শোভা, আপনাকে...কী বলব...।

লোকটার স্বর প্রায় খাদের মধ্যে চাপা পড়ে রুদ্ধশ্বাস হয়ে এল। তবু বলল, গরীব মাস্টারের মেয়ে বটে। কিন্তু স্বাস্থ্য... মানে যৌবনের জাদু, কী বলব...আশ্চর্য! অপরূপ। ডাগর দুটি চোখ! মাঝে মাঝে সে আমাকে কষ্ট দেবার জন্যেই যেন জানালা বন্ধ করে রাখত। আমি কাজ করতে পারতাম না। জানালা খোলা রাখলেই যে শোভাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তার কোনো মানে ছিল না। কিন্তু আমি শান্তি পেতাম। মাঝে মাঝে শোভার এক একটা ঝলক দেখতে পেতাম। তাহলেই বুঝতে পারছেন, অফিসটা কেন স্বর্গ ছিল আমার কাছে। যাক সে কথা—।

প্রাক্তন আর টি ও ক্লার্ক আবার সিগারেট ধরাল। গোটা ঘরটাই এবার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। দেখলাম যে, খুব চঞ্চলভাবে নড়াচড়া করছে। ইতিমধ্যে তার গলার স্বর নেমেছে কিন্তু কথা আরও দ্রুত হয়েছে। বলল, অবিশ্যি আপনি যেন ভাববেন না, আমি ফৌজদের কাছ থেকে ঘুষ নিতে খুব উন্মুখ ছিলাম। মদ আমি স্পর্শও করতাম না। আমার মনটা উদারই ছিল। কেনই বা থাকবে না। আমার মতো সুখী ক'জন...। তবু একটু আধটু নিতেই হত। বন্ধুদের বিলিয়ে দিতাম। আর ফৌজদের ব্যাপার, ওরা যেন উন্মত্ত। প্রায়ই ওরা আমাকে বলত, দ্যাখ, ক্লার্ক, আজ রাত্রিটা তো দেখছি ইয়ার্ডেই কাটবে। দু একটা মেয়ে-টেয়ে জোগাড় করতে পার? আমি সবিনয়েই প্রত্যাখ্যান করতাম। তারা আমাকে অনেক নগ্ন এবং বীভৎস ফটো দেখাত। কিন্তু আমি তাদের ও বিষয়ে উৎসাহ দেখাতাম না। বেশী কিছু বলারও যো ছিল না। তারা ক্ষেপে গিয়ে আমাকে মারধোর করলে মরেই যেতাম। কিন্তু আমি প্রত্যাখ্যান করলে কী হবে। যে যার চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামণি। একদিন সন্ধ্যার সময় অবাক হয়ে দেখি, পাঁচিলের ওপর একটি হাত রাস্তার ওপার থেকে এসে পড়ল। যেন কেউ ওপাশ থেকে পাঁচিলে ওঠবার চেষ্টা করছে। তারপরেই পাশ্চা একটি মেয়ে। দেখলেই চেনা যায়, এইসব শহরেরই বেশ্যা, ফ্রক পরে, চুল বব্‌ড করে, পাউডার মেখে, হিল তোলা জুতো পরে শিকারের সন্ধানে এসেছে। সে লাফিয়ে ইয়ার্ডের মধ্যে পড়ল। আরও অবাক হয়ে দেখলাম, সে মেয়েটার বয়সও এমন কিছু বেশী নয়। অবিশ্যি সেটা আমার পুরুষ-চোখেই দেখা। তাই

কতখানি বিশ্বাসযোগ্য বলতে পারি না। বেশ একটা ছোটখাটো নরম, কিন্তু বিষাক্ত পশুর (আমার চোখে) মতো মেয়েটা, ইতিউতি তাকাতে লাগল। আমাকে সে দেখতে পাচ্ছিল না। কেউ নেই ভেবে সে ইয়ার্ডের ভিতর দিকে লোভী শেয়ালের মতো তীক্ষ্ণ চোখ তুলে দেখল। যেন গন্ধ নেবার চেষ্টা করছে। সে সময়ে শোভাদের জানালাটা বন্ধ ছিল। তাতে আমি মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। এরকম একটা খারাপ দৃশ্য...। যাই হোক, আমার মধ্যে আইন ও নৈতিকবোধ জেগে উঠল। কোনো ফৌজের চোখে পড়লে আমার জারিজুরি খাটবে না। তার আগেই আমি বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে, রেগে বললাম, 'এখানে ঢুকেছ কেন? দাঁড়াও, এখুনি জি আর পির হাতে তুলে দিচ্ছি।' মেয়েটা ভয় পেয়ে পরিষ্কার বাঙলাতেই বলে উঠল, 'আমি আসতে চাইনি। আমাকে তুলে দিয়ে গেল।' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'ভাগো জলদি। নইলে এখুনি আর টি ও-কে ফোন করে তোমাকে জেলে পাঠিয়ে দেব।' মেয়েটা একটা ভয় পাওয়া ছাগল বাচ্চার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝলাম, আমার পুরুষ চিত্তটা সে পরিমাপ করার চেষ্টা করছিল। অর্থাৎ আমার কাছ থেকে কোনো সুযোগ পাবে কি না। আমি আবার খেঁকিয়ে উঠলাম, 'এখনো দাঁড়িয়ে। চুলের মুঠি ধরে—।' মেয়েটা বলে উঠল, 'এত উঁচু পাঁচিল ডিঙোব কী করে?' তখন আমিই মেয়েটাকে পথ দেখিয়ে দিলাম। এক জায়গায়, পাঁচিলের ধারে মাটি উঁচু করা ছিল। যেখান থেকে সহজেই টপকানো যেতো। ও জায়গাটা আমারই কাজে লাগত বেশী। মাঝে মাঝে আমি ওখান দিয়ে শোভাদের বাড়ি যেতাম। মেয়েটাকে ওখান দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। কাঁটাতারের বেড়ায় খোঁচা লেগে, ওর ফ্রকের একটা জায়গা ছিঁড়ে গেল। পরিষ্কারই শুনতে পেলাম মেয়েটা বলল, 'শালা।' তা বলুক। আমি একটা খুব স্বস্তি বোধ করলাম। আমি বেশ ছিলাম। আর সেই বেশ থাকাটা আমি খুব সযত্নে, লুকিয়ে, বেশ তারিয়ে তারিয়ে এবং ভয়ে ভয়েই উপভোগ করতাম। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, ভূমিকম্পের মতো চারদিকের মাটি কাঁপছে। আমার চারপাশে মাটি কাঁপছে। কিন্তু আমি...আমরা, অর্থাৎ আমার মা ভাই বোন, আর মাস্টার মশাইয়ের পরিবার, শোভা বিশেষ করে, আমরা যেন খুব সন্তর্পণে, সেই ভূমিকম্পের আওতার বাইরে দিয়ে, শক্ত স্থির মাটির ওপর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিলাম। যে সব ছোটখাটো সুখ দুঃখ শান্তি পবিত্রতা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছিল, সেগুলো আমাদের ছিল। আমি আর মাস্টার মশায়, প্রায় যৌথভাবেই দুটো পরিবারকে চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আর আমার আশেপাশে তখন বহু পতন দেখছিলাম। এবং আপনার মতোই ভাবছিলাম, অর্থনৈতিক অবস্থা মানুষকে...।

আবার সিগারেট ধরালো সে। গোটা ঘরটা যেন অন্ধকার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠল প্রায়। লোকটাকে একেবারে অস্পষ্ট, প্রায় ছায়ার মতো দেখাতে লাগল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কিন্তু সেই যে আপদ, সেই মেয়েটা, ও কিন্তু আশা ছাড়েনি। ও প্রায়ই পাঁচিল টপকে কিংবা এদিক ওদিক দিয়ে ইয়ার্ডে ঢুকতে লাগল। আর ওর কপাল ছিল আমার চোখের সঙ্গে বাঁধা। ঠিক ধরা পড়ে যেতো। একদিন তো শেষে কষে একটা থাপ্পড় লাগিয়েই দিলাম। সন্ধ্যাবেলার দিকে ওটা আমার একটা আলাদা কাজ হয়ে উঠল।...যাই হোক, একদিন বিকেল থেকেই আমার ঘরে জানা-

পাঁচেক ফৌজ, তিনজন আমেরিকান, দুজন ব্রিটিশ, বসে বসে মদ খেতে লাগল। আমাকে অনেক সাধাসাধি করল। অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করলাম। ওরা মদ খেতে খেতে, খারাপ খারাপ ফটো বের করে দেখতে লাগল, তাতে চুমো খেতে লাগল, আর পশুর মতো, হিস্টিরিয়া হলে যেমন করে, সেই রকম হাসতে লাগল। শহরের কোথায় ব্রথেলস্ আছে। জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, 'অনেক দূর, তোমরা খুঁজে পাবে না।' ইতিমধ্যে আর টি ও-র ফোন আসায় আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ওরা দেয়ালে হেলান দিয়ে, মেঝেয় বসে পড়ে এলোমেলো বকে চলল। আর আমার চোখে পড়ল, শেয়ালের মতো সেই মেয়েটা ইয়ার্ডে ঢুকে পাঁচিলের ধারের জংগলের কাছে দাঁড়াল। আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু জানতাম না, ওকে সেদিন ভগবান পাঠিয়েছেন। ও সেদিন ভগবানের আশীর্বাদের মতো আমার মতো এল। কারণ, হঠাৎ দেখি, ফৌজের পাঁচজনেই চুপচাপ হয়ে গেছে। ওরা সব জানালায় দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে। আর সেই মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল! দেখলাম, শোভা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে চুল বাঁধছে। ওরা তাই দেখছে একদৃষ্টে। লোভে এবং উত্তেজনায় ওরা যেন কাঁপছে। দেখলাম, শোভা একেবারে অসাবধান। একটা ফিতে কামড়ে ধরা দাঁতে, দুহাত পিছনে। বুকের একদিকের আঁচল গেছে খসে। আমি যে ইশারা করব, সে উপায়ও নেই। শোভা এদিকে ফিরেই তাকাচ্ছে না। জানি, সে তখন ভাবছিল, তার সে চুল বাঁধার দর্শক একমাত্র আমিই আছি ওখানে। এদিকে ফৌজ পাঁচজনেরই বিড়বিড় শব্দ আমি শুনলাম। একজন বলল, 'জায়গাটা নিরিবিলিই মনে হচ্ছে।' আর একজন বলল, 'পাঁচিলও খুব উঁচু নয়।' শেষ একজন বলল, 'ডেভিস আর ম্যাক্-এর কাছে রিভলবার আছে।' বলতে বলতেই ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। আমার বুক হিম। এই উন্মত্ত মাতাল উপবাসী পশুরা এখুনি একটা সর্বনাশ করবে। আমি তাড়াতাড়ি ওদের পিছু পিছু নেমে বললাম, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' যার নাম ম্যাক্, সে হঠাৎ রিভলবার তুলে বলল, 'খবরদার, একটি কথা বললে তোমার খুলি উড়িয়ে ছাড়ব। মনে রেখ, আর টি ও-কে ফোন করলে, তুমি জীবিত থাকবে না।' বলে, ওরা ক্রমেই পাঁচিলের দিকে এগোতে লাগল। তখন অল্প অন্ধকার নেমে এসেছে। আমি ছুটে গিয়ে বললাম, 'তোমরা বিবি চাও তো?' ম্যাক্ বলল, হ্যাঁ, সেইজন্যেই যাচ্ছি।' আমি বললাম, 'বিবি এখানে আছে, এস তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।' ওরা ফিরল। সন্দেহ করে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?' বললাম, 'আমাকে অনুসরণ কর।' বলে, জংগলের আড়ালে যেখানে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল, সেখানে নিয়ে গেলাম। মেয়েটা প্রথমে ভেবেছিল, ওকে সাজা দেবার জন্যে বুঝি ধরতে গিয়েছি আমরা। কিন্তু, ওঃ! সে বীভৎস! ওরা পাঁচজনেই উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে যেন তাজা মাংসের টুকরোর মতো মেয়েটাকে ওরা দেখল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটার ওপর। মেয়েটা কী সব বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার কথা শোনা গেল না। মনে হল, স্থির হয়ে আমি দাঁড়াতে পারব না। সে চীৎকার করে উঠল। আর সংগে সংগে সেই চীৎকারের ওপর কিছু সজোরে চাপা পড়ল। আমি ভাবলাম, মেয়েটা মরেই যাবে। মেয়েটা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে এল। ওদের উন্মত্ততাও একটু শান্ত হল এবং একেবারে নোট বৃষ্টি করতে লাগল মেয়েটার ওপরে। পাঁচ, দশ, এমনকি একশো টাকার নোটও ছিল। ওরা আমাকে পিঠ চাপড়ে, জড়িয়ে অনেক ধন্যবাদ দিল। আমি বললাম, 'এবার তোমরা চলে যাও তোমাদের গাড়িতে, আমি ওকে সরাবার ব্যবস্থা করছি।' ওরা তৃপ্ত বাধ্য পশুর মতো চলে গেল। আমি মেয়েটার দিকে ফিরে তাকালাম। মেয়েটা তখন উপুড় হয়েছে কোনো রকমে। এটা যেন তখন আমারই দায়! যেমন করে হোক সরাতে হবে। মিথ্যে বলব না, টাকাগুলো দেখে আমার লোভ যে একেবারে হয়নি তা নয়। আমি কিছু নিয়ে নিলেও কেউ বলবার ছিল না। কিন্তু ও টাকা নেবার প্রবৃত্তিকে আমি ধিক্কার দিলাম। বললাম, 'নাও, শখ মিটেছে? এবার ওঠ, নইলে ধরা পড়ে যাবে, আর এ অবস্থায় ট্রেসপাসের জন্যে জেলে যেতে হবে।'... একবার ভাবলাম, একটু মদ খাইয়ে দিলে বোধহয় ভালো হয়। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, মেয়েটা নিজেই একটু বাদে ঘস্‌টে ঘস্‌টে উঠল। শত হলেও বেশ্যা তো! তারপরে একটি একটি করে নোট কুড়োতে লাগল। কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে পারল না। বসে পড়ল। চোখে এক ফোঁটা জল নেই। নিতান্তই শারীরিক যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত। একটু কাটা ছেঁড়ার দাগও ছিল মুখে। কতখানি ছিল, অন্ধকারে বিশেষ ঠাওর পাইনি। বলল, 'আমার হাতটা একটু ধরবেন বাবু?' আমার ঘৃণা হল। তবু কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে। ও আমার শোভাকে বাঁচিয়েছে। তাই বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। ধরে উঠল। তারপর খুব আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাঁচিলের সামনে মাটির ঢিপির কাছে গেল আমার হাত ধরে। দাঁড়িয়ে বলল, 'সব কটা মাতাল।' আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আর দু'একজনকে সংগে করে নিয়ে এস এবার থেকে।' মেয়েটা অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। যদিও আমার মুখ ঠিক দেখতে পেল না, তবু যেন বিশ্বাস করতে পারল না। আমি নিজেও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তবু আমার ভিতর থেকে আপনি বেরিয়ে এল আবার, 'ওরা তো একজন নয়। আর দু'একজনকে সংগে আনলে...। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার, ইয়ার্ডের কেউ টের পেলে খুব গোলমাল হবে।' বোধহয় মেয়েটা কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। টাকাগুলো দুহাতে খস্‌খস্ করে

নাড়াচাড়া করল। বেশ বুঝলাম, সে আমাকে তার ভাগীদার করতে চায়। কিন্তু আমি তাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই বললাম, 'যাও, এবার ভেগে পড়!'...মেয়েটা মরল না তো বটেই, বেশ জ্যান্তই, চলে গেল। মেয়েটা চলে যাবার পরেই আমি পাঁচিল টপকে ছুটে গিয়ে শোভাকে সাবধান করে দিয়ে এলাম এবং ঘটনা সব জানালাম। সবাই ভয়ে কাঠ। শোভা তো বারে বারে কেঁপে উঠে খালি বলল, 'মাগো! কী সর্বনাশ!'...আঃ! শোভার সেই কাঁপুনিটাও কী সুন্দর। ভয়ের মধ্যেও, পরম ভরসার একটু হাসি তার ঠোঁটে ছিল।

লোকটা চুপ করল। কিন্তু সিগারেট ধরালো না। চুপ করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

শীতের রাত। স্বভাবতই রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে আসছে ইতিমধ্যেই। মনে হল, লোকটা যেন আর কিছু বলবে না। আমার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল। লোকটার সেই চরিত্রের কথা ভেবে। বললাম, ঘটনাটা খুব অদ্ভুত। কিন্তু এর সঙ্গে আপনার প্রতিবাদের কোনো যোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না। আপনি হয়তো ওই মেয়েটির দুঃসহ অর্থনৈতিক অবস্থার থেকেও, ওর নষ্ট আত্মা এবং লোভ লালসার কথা বলবেন।

লোকটা হঠাৎ যেন চমকে উঠে বলল, অ্যাঁ?

পরমুহূর্তেই সে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি জানি, এক্ষেত্রে আপনি আমাকে বলবেন, কী নিদারুণ অভাবে অনটনে মেয়েটি দেহ বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে। আর এ ধরনের করুণ গপ্পের বাজার দরও খুব চড়া। অবিশ্যি আপনার সব কথা আমি একেবারে নাকচ করছি নে, যদিও আপনি এক্ষেত্রে চরিত্রের দুর্বলতা, এ পথে আসার মনোবৃত্তি তার কেমন করে হল, বিচার করতে চাইছেন না। সে তো আত্মহত্যাও করতে পারতো। বিদ্রোহও সম্ভব ছিল। কিন্তু এ মেয়েটির কথা আমি বলছি না। আমি শোভার কথা বলছি।

—শোভা? মানে আপনার...?

—হ্যাঁ, আমার প্রেমিকা, মাস্টার মশায়ের মেয়ে। বলতে পারেন, আমি যখন জীবনকে সুন্দর ভাবছিলাম এবং দেখছিলাম, শোভা কেন ভিতরে ভিতরে এ জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল? সে কেন সোনার, গহনা, শাড়ি, টাকা এবং আরও টাকা আর সুখের জন্যে লালায়িত হয়ে উঠছিল? সে কেন সুখ এবং আরাম আর ঐশ্বর্যের জন্যে নির্লজ্জ হয়ে উঠল, শহরের চরিত্রহীন হঠাৎ বড়লোক যুবকেরা তার বন্ধু হয়ে উঠল আস্তে আস্তে, আর মাস্টার মশায় এবং তাঁর গিন্নি ব্যাপারটাকে প্রায় স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিলেন। আর... আর সেই শোভাকে দেখেই শহরের মেয়েরা বউয়েরা হিংসায় জ্বলতে লাগল, যেন সে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে রাজ্যেশ্বরী হয়ে গেছে। কেন বলতে পারেন?

ব্যাপারটা এত আচমকা যে, আমি প্রথমটা থতিয়েই গেলাম। আর আমার যুক্তি দিয়ে কিছু বলবার আগেই লোকটা বলে উঠল, দোহাই, কূপমণ্ডুকের মতো সেই শস্তা কথাটা বলবেন না। 'এটা একটি মেয়ের একটা বিশেষ ঘটনা মাত্র।' দেশ এবং কাল আর সমাজ সম্পর্কে আপনাদের ধ্যান ধারণা আমার চেয়ে কিছু কম আছে, এ-কথা ভাবতেই পারব না। কারণ ওই যে কী কথাটা, 'অবক্ষয়'—হ্যাঁ অবক্ষয় শব্দটা আপনাদের আলোচনার মধ্যে প্রায়ই শুনি। আর সেই অবক্ষয়টা কোনো বিশেষ মেয়ে কিংবা ব্যক্তির বেলাতেই খাটে না শুধু। ওটা সামগ্রিক। আর এ অবক্ষয় শুধু অর্থনীতির ষাঁড়ের ওপর পাঁচড়ার মতো, এটা মানতে পারি নে। ওটা সত্যের অপলাপ। মানুষ অসন্তুষ্ট হয়েছে, পবিত্রতা হারিয়েছে বলে নয়, তারা লড়বে বলে নয়। আরও আরও চাই। সুখ, ঐশ্বর্য......আরও বড় রকমের। আর্থিক উন্নতি দিয়ে একে রোধ করবেন? করুন না।' ছড়ান টাকা, কত বস্তুর সুখ দেবেন, দিন না, দেখি কী করে ক্ষুধা মেটান। অবক্ষয়কে রোধ করেন।

লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মনে হল, আমার কোনো কথা শোনবার আর অবসর বা ইচ্ছা তার নেই। বলল, কিন্তু জানবেন, আসল জায়গায় পচন ধরেছে। উঁচু থেকে নিচুতলা পর্যন্ত, লোভ লালসা আর বাসনা, কোটি কোটি আত্মাকে ফুটো করে দিয়েছে। সমস্ত মানুষের বৈষয়িক উন্নতি করতে চান, করুন। কিন্তু দোহাই, আপনারা নাকি মানবাত্মার কারিগর, আত্মাগুলোকে মেরামত করুন, শুদ্ধ করুন। নইলে গোটা পৃথিবীটা সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেও আত্মার দারিদ্র্য ঘোচাতে পারবেন না। আর আত্মার দারিদ্র্য, নিজেই দেখুন চারদিকে চোখ মেলে।...আচ্ছা, চলি। অনেক সময় আপনার নষ্ট করলাম। কিছু অন্যায় বলে থাকলে ক্ষমা করবেন।

কোনো অবকাশ না দিয়েই লোকটা চলে যাচ্ছে দেখে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। আমার বক্তব্য কিছু বলি বা না বলি, ওর সম্পর্কে কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। বললাম, আপনার পরিচয়টা—।

থমকে দাঁড়াল দরজার কাছে। বলল, আমার পরিচয়? তা বলতে বাধা কী? আপনি তো আর আইনে আমাকে ধরতে পারবেন না। তাই নাম এবং পেশা দুই-ই বলে যাচ্ছি। আমার নাম হরিদয়াল পাঠক। একদা রেলের কেরানী ছিলাম। মাইনে ছিল সাকুল্যে দেড়শো। এখন, যারা রেলের ওয়াগন ভেঙে মাল চুরি করে এবং যারা কেনে, তাদের মাঝখানে দালালী করি। এখন আমার মাসিক আয় দেড় থেকে দু হাজার। নমস্কার।

দরজার বাইরে, অন্ধকারে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো বোধহল। পরমুহূর্তেই আমিও বাইরে যাবার আগে পয়সা দেবার জন্যে ফিরলাম। দেখলাম, টেবিলের ওপরে একটা টাকা পড়ে রয়েছে। কিন্তু আমার যে অনেক বক্তব্য ছিল। লোকটা এভাবে আমাকে...। আমি তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। আর সেই মুহূর্তে টের পেলাম, ভিতরের গরমের তুলনায় বাইরের শীত কী প্রবল। নিষ্ঠুর কষাঘাতে কাঁপিয়ে দিল প্রায়। রাস্তায় লোকটা নেই। আর আমার মনে হল, আমার অনেক কথা বলবার আছে ঠিকই। কিন্তু ওর কথার মধ্যেও একটা অসহ্য সত্য গভীর বিশাল এবং অনেক ভিতরের দিকে জমাট হয়ে রয়েছে। সেটা আর কে না বোঝে আজকে!—

বেয়াড়া বাদলাটা টুটেছে। দেখো বাবা

আমায় কবে নিয়ে যাচ্ছ

...যাই বলিস গগন অনেক দিন পরে তোদের সংসারে বেশ একটা হাসিখুশী দেখলাম

গগনের অসুখ

বিমল কর

"এই নে, ছবিটা দেখ। আলোর জন্যে মুখগুলো ফরসা ফরসা হয়ে গেছে বেশী। মেজদিকে দেখতে পাচ্ছিস? জানলার দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে। ফুলদানির পাশে, আমাদের লতু, কেমন বড়সড় হয়ে গেছে দেখেছিস! শাড়ি পরে খোঁপা বেঁধে ফুল গুঁজে একটা লেডী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নতুনবউ মুখ আর-একটু তুলে রাখলে তুই পুরোপুরি দেখতে পেতিস। ভালোই দেখতে বুঝলি, গায়ের রঙটঙ চলনসই, কিন্তু বড্ড কচি মুখখানা, সুন্দর। নয়নটাকে দেখ, রাস্কেলটা বিয়ের মালা গলায় দুলিয়ে ফিল্মের হিরোর মতন পোজ দিয়েছে। ওটা যে কী ফাজিল হয়েছে, একেবারে ডেঁপো হয়ে গেছে। অ, তুই জানিস, বিয়ের পর নয়ন আর-একটা লিফট্ পেয়েছে; ওদের ফ্যাক্টরি নিউ স্কীমে অনেকটা এক্সটেনসান করেছে। নয়ন গ্লাসগো যাবার একটা চান্স পাবে বোধ হয়। যাই বলিস, নতুনবউ খুব ভাগ্যমন্ত। তোর বাবা ত আদর করে বউকে দু বেলা দুধের সর খাইয়ে দিচ্ছে। আমি তার কাণ্ড দেখে অবাক। জামাইবাবু আমার দিদির বেলায় একটা স্নো ক্রীমের শিশিও কোনোদিন হাতে করে কিনে আনে নি। চান্স পেয়ে তোর বাবাকে এবার খুব শুনিয়ে দিয়েছি। আজকাল ওই ওল্ড্ ম্যান হাসে; কি বলে জানিস? বলে, দেখ হে ছোটশালা—তোমার মেজদি এমনিতেই ননী ছিল, তাকে আরও দুধ সর খাওয়ালে স্নো ক্রীম মাখালে জিনিসটি গলে যেত।... শুনলি তোর বাপের কথা।...যাই বলিস গগন, অনেক দিন পরে তোদের সংসারে বেশ একটা হাসিখুশী দেখলাম। সবাই আনন্দ পেয়েছে। আমার এত ভাল লেগেছে রে, বিয়ে থা চুকে গেলে আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না।...ও হো, ভাল কথা; নয়ন বলেছে তোর কাছে চিঠি লিখেছে দুটো, জবাব পায় নি—"

গগন ফটোর দিকে তাকিয়ে নয়নকে আবার দেখল। ফুলশয্যার দিন নয়নদের শোবার ঘরে পরিবারের যাদের যাদের পাওয়া গেছে সবাইকে এক সঙ্গে জড়ো করে ফটো তুলে রেখেছে ছোটমামা। গগন আত্মীয়-স্বজনদের সকলকেই চিনতে পারছে। লতু বেশ বড় হয়ে গেছে। নয়ন মোটা হয়েছে

আগের চেয়ে। নয়নের বউ—কি যেন নাম নতুন বউটির!

'নয়নের বউয়ের কি নাম, ছোটমামা?' গগন জিজ্ঞেস করল।

'সবিতা।' ছোটমামা গগনের বিছানায় আরও একটু ঝুঁকে যেন ঢিলে ঢালা হয়ে বসল। 'বি-এ পর্যন্ত পড়েছে, রে, গগন। কোয়েট এনাফ্ ফর আওয়ার ফ্যামিলি, কি বলিস!'

গগনের জানলার ওপাশে, বাইরে, বাগানে নতুন সার ঢেলেছে। সারের গন্ধ আসছিল। কিছু মাছিও জমেছে সারের গোড়ায়। মাঝে মাঝে নীল মাছি ঢুকছিল ঘরে। গগন যখন আবার ছবিতে নয়নের বউকে দেখছে তখন একটা মাছি তার মুখের পাশ দিয়ে উড়ে গেল।

ছবিটা চোখের কাছ থেকে সরিয়ে গগন দু মুহূর্ত সামনে তাকিয়ে থাকল, দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালে তার আলনা। জামা ঝুলছে, পাজামা রাখা আছে।

'ছোটমামা—'

'বল।'

'আমায় কবে নিয়ে যাচ্ছ?'

'তোকে—!...এবার তোকে নিয়ে যাব।' ছোটমামা যেন সামান্য ভেবে নিচ্ছে। চোখে ভাবনা, কপালে হিসেবের দাগ; ছোটমামা বলল, 'তোকে পরের বার নিয়ে যাব। আমার সংগে কথা হয়ে গেছে। আর মাস দুতিন। এবারের শীতটা এখানে কাটিয়ে নে, এত ভাল ক্লাইমেট।'

গগন জানলার দিকে তাকিয়ে, পায়ের দিকের জানলা। জানলার বাইরে সরু টানা বারান্দা, মাথায় টালির চাল, গড়ানো। ঘর থেকে বাইরে তাকালে বারান্দার গড়ানো চালা দৃষ্টিকে ভূমির দিকে নত করে রাখে। দূরে একটা কুঞ্জ। গগন কুঞ্জ দেখছিল। একটি বড় ঝাউকে মাঝে রেখে চারপাশে পাঁচ ছটি ছোট ছোট পাতাবাহার, জাফরিকাটা বেড়া ধরে লতানো গাছ আলপনা বুনে রেখেছে, কিছু মরশুমি ফুল। এখান থেকে ছবিটা স্পষ্ট নয়, তবু মোটামুটি স্নিগ্ধ।

'গগন!' ছোটমামা পায়ের কাছে নামানো বেতের টুকরি থেকে বড় বড় দুটো কমলা লেবু বার করল। এবং ইতস্তত তাকিয়ে মিটশেফের মাথায় কলাই করা জাগে জল দেখতে পেয়ে উঠল। মাথার দিকের জানলায় দাঁড়িয়ে ছোটমামা লেবু দুটো ধুয়ে নিচ্ছিল।

এখন দুপুর। সূর্য হেলে পড়েছে। অগ্রহায়ণের রোদে পাকা হরিতকীর রঙ ধরেছে। পাখিরা দানা খুঁটে নিয়ে আলস্য উপভোগ করছে ও-পাশটায়, এদিকে পাখি নেই, ফাঁকা।

'নে গগন, লেবু খা—' ছোটমামা টুকরির ওপর থেকে বাসি খবরের কাগজটা বিছানার পায়ের দিকে রেখে লেবুর খোসা ছাড়াতে বসল।

'মেজদি তোর জন্যে যে জিনিসগুলো দিয়েছে, সেগুলো ওই কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে আছে। কি কি যেন বলে দিল...ফুলহাতা সোয়েটার, গরম মোজা, পাজামা, গেঞ্জি......' গগনের হাতে লেবুর কোয়া দিতে দিতে ছোটমামা একটু থেমে আবার বলল, 'ও হো গগন, নয়নের বিয়েতে তুই একটা ধুতি পেয়েছিস, নয়নই কিনেছিল। ধুতিটাও আছে ব্যাগে।'

'ধুতি আমি কি করব!'

'পরিস মাঝে মাঝে।'

'এখানে কোথায় ধুতি পরব!' গগন লেবুর রসে স্বাদ পাচ্ছিল না। মিষ্টি নয়, টকও নয়; বিস্বাদ। জলো।

'এই টুকরির মধ্যে তোর জন্যে ফলটল আছে সামান্য। তলায় বিস্কুটের টিন মাখন সব আছে।'

মাথার জানলা দিয়ে মাছি ঢুকে বিছানায় এসে বসছিল। গগন হাত নেড়ে মাছি তাড়াল। 'মা কেমন আছে, ছোটমামা?'

'শরীরের কথা বলছিস? ভালই। তবে বাড়িতে বিয়ে থা গেল কাজেকর্মে অনিয়মে একটু গোলমাল ত হবেই।'

'বাবা?'

'জামাইবাবু ভালই আছে। ডান চোখের ছানিটা এখনও কাটানোর মতন হয় নি, ওটা কাটাবার জন্যে বড় ব্যস্ত।'

মাছিটা উড়ে জানলার কাছে গিয়ে বসল। গগন দেখল একবার। নতুন সারের গন্ধ এল বাতাসে।

'দেখ গগন, এই বিয়েটা দরকার ছিল।' ছোটমামা একটা লেবু শেষ করে ফেলল। দ্বিতীয়টায় হাত দিতেই গগন হাত নেড়ে বারণ করল, আর নয়।

'খা না। দুটো তো মাত্র লেবু।'

'না, এখন আর ভাল লাগছে না।' মাথা নাড়ল গগন, 'তুমি কি বলছিলে, ছোটমামা?'

'আমি!...ও হ্যাঁ, বলছিলাম এই বিয়েটা দরকার ছিল।' ছোটমামা কাগজ সমেত লেবুর ছিবড়েগুলো তুলে ঘরের কোণে চুন ভরতি গামলাটার ওপর রেখে দিল। 'তোদের বাড়িটা কেমন একটা মেলাংকলিতে ভুগছিল। মেজদি একেবারে ভেঙে পড়েছিল প্রথম দিকে, সেটা সামলে নিল বটে, তবে মায়ের মন ত রে, যতই সংসার নিয়ে পড়ে থাকুক, মনে মনে সর্বক্ষণ একটা দুশ্চিন্তা। হাসি সুখ দেখতাম না। জামাইবাবু অবশ্য খুব রিজার্ভড, তবু বুঝতে পারতাম মনে মনে বড় দুর্ভাবনায় থাকেন। গোটা বাড়িটাই কেমন চুপচাপ থাকত, রান্নাবান্না খাওয়া স্কুল অফিস কাছারি সবই চলছে—তবু মরার মতন যেন।...নয়নের বিয়েতে এই মনমরা ভাবটা কাটল। অনেকটাই কাটল।' ছোটমামা গগনের হাত টেনে নিয়ে আদর করে নিজের করতলে চেপে রাখল। বলল, 'গোটা একটা সংসার যদি বিছানায় পড়ে থাকে গগন,

অসুখ আরও পেয়ে বসে। আমি জানি, তোকে বাদ দিয়ে তোদের বাড়ির কারুর কিছু ভাল লাগে না, লাগবে না। তবু, ওরা সবাই তোর বিছানার চারপাশে বসে থাকলেই কি সব সমস্যা মিটে যাবে!'

গগন মামার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল আস্তে করে। নয়ন তাকে বিয়ের আগে চিঠি লিখেছিল, বিয়ের পরও দুটো লিখেছে। নয়ন তার ছোট। ছোট হলেও পিঠোপিঠি, দেড় বছরের তফাৎ। দাদা বলে না, নাম ধরে ডাকে।

(গগন, আমি বিয়ে করছি রে। আমাদের ফ্যাক্টরির এক ভদ্রলোকের মেয়ে। তুই তাকে দেখেছিস। পালিত লেনে আমরা যখন থাকতুম তখন সেই পাড়াতে তারাও থাকত। তখন ছোট ছিল; এখন পাঁচ পাঁচ হাইট। গগন, আমি কেন বিয়ে করছি তোকে পরে বলব, তুই যখন ফিরে আসবি তখন।)

'আমি সে-দিনও মেজদিকে বলছিলাম—' ছোটমামা গগনের বিছানার ওপর পা তুলে উঠে বসল, 'বুঝলি গগন, আমি মেজদিকে বললাম, তোমাদের সংসার দেখে এখন মনে হচ্ছে মেজদি, বেয়াড়া বাদলাটা টুটেছে। দেখো বাবা, রোদটা যেন থাকে।'

গগন নয়নের কথা ভাবছিল। নয়নের চিঠি তার চোখের ওপর নয়নের গলায় কথা বলছে।

(গগন, আজ আমার বিয়ে। বিকেলে বর বেশে যাত্রা করব। বাড়িতে শাঁখ বাজছে, তত্ত্ব গিয়েছে গায়ে হলুদের। মা ঠাকুর ঘরে ঢুকে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে, বাবাকে দেখতে পাচ্ছি না, হয়ত নীচেতে। লতু একটু আগে এসে আমায় বলছিল, ছোড়দা, মা বলছিল, বড়দার ছবিটা পরিষ্কার করে একটা মালা পরিয়ে রাখতে।.. গগন, আমার কিছু ভাল লাগছে না। আমি তোর আগে আগে কখনও কোথাও যেতে চাই নি, যাই নি। এই ব্যাপারটায় এগিয়ে গেলাম। কেন, তা তোকে পরে বলব, তুই ফিরে এলে।)

'দেখ গগন, আমি একটা কথা বুঝি—' ছোটমামা বলল, 'শোক দুঃখ দুশ্চিন্তা এ-সব ত আছেই। সংসারে জন্মাবে আর বগল বাজিয়ে দিন কাটিয়ে দেবে এ বাপু হয় না। রাজারও দুঃখ আছে। শোক দুঃখ আছে বলে সবাই মিলে গলা জড়াজড়ি করে বসে মরার মতন কাঁদব। এতে কোনো লাভ হয় না, অ্যাটমসফেয়ারটাই যা বিশ্রী হয়ে ওঠে। নয়নের বিয়ের সময় আমি মেজদিকে বুঝিয়েছিলাম, গগন ত ভাল হয়ে উঠেছে, ফিরেও আসবে, অযথা তোমাদের নয়নের বিয়ে নিয়ে অত কিন্তু কিন্তু করার কি আছে। সংসারের দিকেও ত তোমায় তাকাতে হবে।' ছোটমামা হাতের ঘড়িটা খুলে দম দিয়ে নিল।

নয়নের বিয়ের পরের চিঠিটা যেন বাতাসে উড়ে গগনের চোখের সামনে এসে

পড়েছে দেখতে পেল। খুব পাতলা নীলচে কাগজে লেখা চিঠি। বউয়ের লেখার কাগজ থেকে নিয়েছে নিশ্চয় নয়ন।

(গগন, বিয়ের ঝামেলা চুকে গেছে। তুই কিরে, একটা চিঠিও ত দিবি! আমার কথা না হয় বাদ দে, কিন্তু সবিতাকে একটা, আশীর্বাদ করবি ত চিঠিতে। তোর কোনো জ্ঞানবুদ্ধি নেই, গগন।...তুই ফিরে আয়, তোকে আমি অনেক কিছু বলব। গগন, সবিতা তোকে চেনে। বলছিল, একবার সাইকেল চড়া শিখতে গিয়ে তুই পড়ে গিয়েছিলি। সত্যি না কি রে!)

'গগন—?' ছোটমামা গায়ে ঠেলা দিল গগনের আলতো করে।

'উঁ'।'

'তুই কোনো কথা বলছিস না।'

'বলছি।' গগন ছোটমামার দিকে তাকাল। ছোটমামার মুখ গোল, রঙ ফরসা। মার মুখের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। কপাল আর চোখ নাক অবিকল মার মতনই। তবে ছোটমামার চোখ খুব দপদপে, কেমন যেন চাঞ্চল্য দৃষ্টিতে; মার চোখ শান্ত, মার চোখে ক্লান্তি। গগন মাকে দেখছে এমন চোখ করে কয়েক পলক ছোটমামাকে দেখে নিল।

'গগন—' ছোটমামা ডাকল।

'বলো।' গগন চোখে চোখে আর তাকাতে পারল না ছোটমামার, বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'তোর এখন শরীর কেমন?'

'ভাল।'

'কোনো, কষ্ট হয়?'

'না।' গগন বলল। বলে ভাবল, তার কষ্ট হয় না বললে ছোটমামা খুশী হবে। পরে আবার ভাবল, শরীরের কথা জিজ্ঞেস করেছে ছোটমামা, শরীরে তার কোনো কষ্ট হয় কি না! হয় না।

ফটোটা বিছানা থেকে উঠিয়ে গগন আবার দেখতে লাগল। ঘরটা তার বড় চেনা। ওই ঘরে তারা দুজনে থাকত—গগন আর নয়ন। জানলার দিক করে তাদের বিছানা ছিল, পশ্চিম দেওয়ালের দিকে টেবিল, আলমারি ছিল একটা দরজার দিকে; নয়ন টেনিস খেলা শিখছিল, তার র‍্যাকেটটা কাপড় পরিয়ে টাকিতে বেঁধে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখত।

'ছোটমামা, লতুটা সত্যিই বেশ বড় হয়ে গেছে।' গগম অন্যমনস্ক গলায় বলল।

'বড় কি রে, বললাম না তোকে একটা লেডী হয়ে গেছে।'

'ওর কত বয়স হল?'

'কত—! দাঁড়া বলছি—' ছোটমামা হিসেব করে নিচ্ছিল, 'লতু হয়েছে মা মারা যাবার আগের বছর। তার মানে লতু এখন পনের।'

'আমি যখন আসি তখন লতু ফ্রক পরত—' গগন কেমন হেসে বলল, 'ওর একবার চুলে জট পড়েছিল, আমি কাঁচি দিয়ে অনেক চুল কেটে দিয়েছিলাম। তারপর যা অবস্থা হল ছোটমামা, লতু আর বিনুনি বাঁধতে পারে না।' গগন আপন মনেই হাসল, লতুর মুখ দেখতে লাগল ছবিতে, মস্ত একটা খোঁপা বেঁধেছে বোধ হয়।

'দেখ গগন—' গগন আর অন্যমনস্ক নেই দেখে ছোটমামা আবার কথা শুরু করার উদ্যম পেল। 'আমি ঠিক করেছি, এবার একবার মেজদিকে নিয়ে হরিদ্বার বেড়িয়ে আসব। জামাইবাবুর এখন আর কোনো অসুবিধে নেই, নয়নের বউ রইল।'

'নয়ন কবে গ্লাসগো যাবে, ছোটমামা?'

'এখনও কিছু ঠিক নেই। একটা কথা চলছে।...তবে নাইন্টি পার্সেন্ট চান্স রয়েছে। আরে, গরু দুধ দিতে না পারলে কি মানুষ তাকে গোয়ালে রেখে খাওয়ায়! নয়নটা যে খুব কাজের ছেলে, ফ্যাক্টরিতে ওর খুব সুনাম।'

'এখন কত মাইনে পাচ্ছে?' গগন শুধলো।

'ভালো পাচ্ছিল। নতুন লিফট পেয়ে

আরও বেড়েছে কিছু।' ছোটমামা বলল। বলে কি ভাবল। হঠাৎ যেন কোনো কথা মনে পড়ে গেছে, মজার কথা, ছোটমামা হাসি মুখ করে বলল, 'নয়নের একটা কীর্তি শুনবি!...বেটা যেদিন লিফ্‌ট্‌ পাবার খবর পেল সেদিন বাড়ি আসার সময় একটা শাড়ি কিনে এনেছে। এনে নতুনবউয়ের হাতে দিয়েছে, কোনো কথা বলে নি।...রাত্রে খাবার সময়, তুই ভেবে দেখ গগন, জামাইবাবু এক পাশে বসে খাচ্ছে, লতু রয়েছে, নয়ন নিজে, মেজদি বসে, নতুনবউ খেতে দিচ্ছে—নয়ন খেতে খেতে লিফ্‌ট্‌ পাবার খবরটা দিল। দিয়ে মেজদিকে বলল, তোমার জন্যে একটা শাড়ি এনেছি মা, পাও নি? মেজদি অবাক। শাড়ি, কই না—কিছু ত দেখে নি মেজদি। নয়নটা সংগে সংগে তার বউয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়ে বলল, ওর হাতেই দিয়েছি, ও তোমায় দেয় নি তবে, নিজে মেরে দিয়েছে। বউ বেচারী ত লজ্জায় অপ্রস্তুত...' ছোটমামা হা হা করে হাসতে লাগল। যেন রগড়টা এইমাত্র করা হয়েছে, নয়ন সামনে বসে আছে।

গগনও একটু হাসল। শব্দ করে নয়। তার মনে হল নয়ন বউকে এমনি করেই জ্বালাচ্ছে বোধ হয়। নয়ন ওই রকমই। লতুকে, যখন লতু বেশ ছোট, নয়ন বলত, হ্যাঁরে লতু, তোদের সেলাইদিদিমণিটা শালকরের দোকানে রিপুর কাজ করে কেন রে? লতু বুঝতে পারত না প্রথমে, পরে ভীষণ চটে যেত, চেঁচাত, রাগের দমকে কেঁদেই ফেলত। নয়ন তবু ছোট বোনের পিছনে লাগত।

'লতু আমার কথা কিছু বলে না, ছোটমামা?' গগন বলল। ছোটমামার দিকে না তাকিয়ে, ছবিটা দেখতে দেখতে।

'বলে না রে কিরে, প্রায়ই জিজ্ঞেস করে।' ছোটমামা পকেট হাতড়ে লবঙ্গর কৌটো বের করল, একটা দুটো তুলে নিল, 'এই যে এখান থেকে ফিরে যাব, তারপর লতুর কত কি প্রশ্ন।...বুঝলি গগন, লতুর খুব জানতে ইচ্ছে করে তুই কোথায় আছিস।'

'ও জানে না?'

'জানে, তবে ঠিক বুঝতে পারে না।'

গগন কেমন অনামনস্ক হল। এ রকম অনামনস্ক মানুষ খুব ঘনঘোর বাদলার দিনে হয়, কিংবা কোনো নদী বা বনের ধারে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যে বেলা। গগন অনামনস্ক হয়ে ভাবল সে কোথায় আছে, তার চারপাশে কি কি আছে!

দুপুরের রোদ দেখে মনে হচ্ছে, যে বিরাট চৌবাচ্চায় সারা সকাল দুপুর ভরে রোদ জমা হয়েছিল যেন তার জল বেরোবার মুখটা খুলে গেছে হঠাৎ—আর কল কল করে রোদ বেরিয়ে চৌবাচ্চা খালি হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে রোদ ফিকে হয়ে আসছিল। গগন কাতর হল। বাড়িতে ফিরে গিয়ে ছোটমামা লতুকে কি কি বলে গগনের জানতে ইচ্ছে হল।

ছোটমামা মাথার দিকের জানলা দিয়ে বাইরে ক দণ্ড তাকিয়ে থাকল। বাতাস এলোমেলো হয়ে বয়ে যাচ্ছে, নতুন সারের গন্ধ আসছে ঘরে। বার কয়েক নাক টানল ছোটমামা। 'কিসের গন্ধ রে, গগন?'

'সারের। বাগানে নতুন সার দিয়েছে।'

'তোদের এখানে বিনি সারেই যা ভেজি-টেবলস্‌ হয়.....'

'আমায় তুমি কবে নিয়ে যাবে ঠিক করে বলো, ছোটমামা?' গগন কাতর ক্ষুব্ধ চোখে ছোটমামার দিকে তাকাল।

'বললাম যে, এই শীতটা শেষ হলেই।'

'তুমি যখনই আস এই গরম এই বরষা এই শীত কর। এবারেও ঠিক তেমনি বলছ।'

'আরে না। না—না—না।' ছোটমামা প্রবল ভাবে মাথা নাড়ল। 'আমি ইচ্ছে করলে তোকে এখনও নিয়ে যেতে পারি। নিয়ে যাচ্ছি না কেন জানিস? এই শীতটা এখানে কাটিয়ে দিলে তোর হেলথ্‌ আরও ইমপ্রুভ করবে।.....দেখ গগন, ভাল জিনিস একটু বেশী হলেই ভাল। লাভ বই ক্ষতি নেই তাতে।'

গগন বিছানা থেকে উঠল। জল খেল। ছোটমামার আনা ব্যাগটা তুলল, নামিয়ে রাখল আবার। উবু হয়ে বসে ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বের করতে লাগল। মার চিঠি ছিল ব্যাগের মধ্যে।

সোয়েটারটা নতুন। উলের গন্ধ শুঁকল গগন। পাজামা গেঞ্জি সব নতুন। কোরা গন্ধ। সমস্ত নতুনের মধ্যে মার চিঠিটাই যা পুরোনো। গগন মার চিঠি হাতে করে উঠে দাঁড়াল। 'মার চিঠি, ছোটমামা।'

'মেজদির চিঠি!...আমায় কিছু বলে দেয় নি। ভুলে গেছে বোধ হয়।'

গগন খামের মুখ ছিঁড়ে ভাঁজ করা দুটো চিঠি পেল। মা আর লতুর।

মার চিঠি পড়তে পড়তে গগনের মন বিষণ্ণ হল। মার মনে বড় অশান্তি। গগনের জন্যে মার দুর্ভাবনা এক তিলও কমে নি, আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি রয়েছে। বাবার কথাও লিখেছে মা। বাবা আজকাল প্রায়ই গগনের নাম করে বলে, ও বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি নতুন বাড়ির কিছু করব না।

শীতটা খুব সাবধানে থাকিস, বাবা।

ফুলহাতা নতুন সোয়েটারটা ঢিলে করে করেছি. সারাক্ষণ পরে থাকবি। নয়নের বউ তাড়াতাড়ি করে মোজা বুনেছে, যদি পায়ে ছোট লাগে ফেলে দিস না, দু'চার দিন পরলেই ঠিক হয়ে যাবে। তোর বাবা আর নয়ন আগামী মাসে যেতে পারে তোর কাছে। যা যা দরকার চিঠিতে লিখিস পাঠিয়ে দেব।)

বাইরে পাখি এসেছে। কাকলি শোনা যাচ্ছিল। শিরীষগাছের ডালে বসে পাখিরা যেন খেলা করতে নামার আগে দু দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছিল।

'গগন!' ছোটমামা ডাকল।

'উ'—' গগন চিঠি পড়তে পড়তে সাড়া দিল।

'তোর গলার কাছে ওটা কিসের দাগ রে?'

গগন জবাব দিল না। লতুর চিঠি পড়তে পড়তে মুখে তার হাসির ছোঁয়া লাগছিল। লতুটা একেবারে সেই রকম আছে, পাগলী। এক কথা লিখতে লিখতে অন্য কথা লেখে। লতু কখনও কথা পুরো করে বলতে পারত না, অর্ধেকটা বলে বাকিটা বলার গরজ পেত না। নয়ন হেসে বলত, দেখ লতু তোর সবই যখন অর্ধেক তখন আমরা তোর বিয়ের সময় শুধু একবার তোর বরটাকে দেখিয়ে দেব, ব্যস; তারপর আর তোর কোনো কিছুর দরকার নেই।

গগন হেসে ফেলল। চিঠি শেষ করে নয়নের সেই কথা ভাবতে লাগল। লতু তার বরের কথা শুনে নয়নের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আঁচড়াত নয়নকে।

বাইরে বাগানে পাখিরা দু দলে ভাগ হয়ে যেন খেলা শুরু করে দিয়েছে। গগন সুখ অনুভব করল, গগন দুঃখ অনুভব করল।

'তোর গলায় ওটা কিসের দাগ রে, গগন?' ছোটমামা আবার বলল।

গগন অন্যমনস্ক। বাইরে রোদের চৌবাচ্চা ফুরিয়ে এল। এখন তরল করে রোদ পড়ছে, রঙ নেই। বাগানে দুটো মালি কাজ করছে। সার পড়ে আছে স্তূপ হয়ে। ঝারিতে করে জল দিচ্ছে বুড়ো মালি। বিকেল হয়ে এসেছে বলে দু একজন করে লোক দেখা যাচ্ছিল।

ছোটমামা এবার যেন অবাক হয়েই বলল, 'এই গগন? কি হল রে তোর?'

গগন ছোটমামার দিকে তাকাল।

'কথা বলছিস না কেন?' ছোটমামা বলল।

'বলছি—'

'কোথায় বলছিস। আমি চেঁচিয়ে যাচ্ছি, তুই চুপ করে আছিস।...এদিকে ত সময় হয়ে এল, এবার আমি উঠব।'

'তুমি আজ ফিরবে?'

'সন্ধ্যের ট্রেন ধরব।'

'এখনও দেরি আছে।'

'কোথায় আর দেরী। দেখতে দেখতে
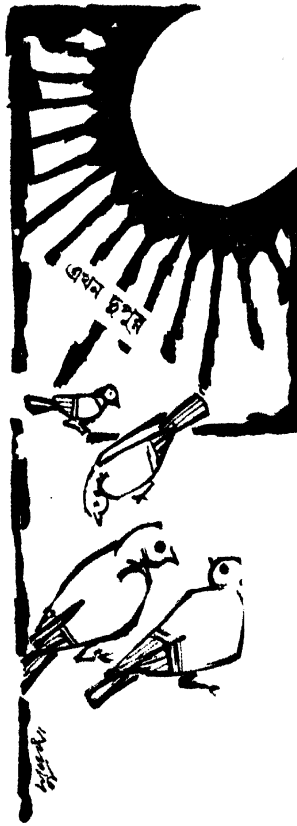
বেলা পড়ে আসছে দেখছিস না।...আমায় একবার তোদের সুপারিনটেনডেন্টের সংগে দেখা করতে হবে তাঁর বাড়িতে গিয়ে।'

বিকেল বাস্তবিকই পড়ে আসছিল। গগন দেখছিল, যাবার আগে যেন দিনের আলো তার লুকোতে দেওয়া টুকরো জিনিসগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে। শিরীষ গাছের তলা থেকে আলো চলে গেছে, ছায়াগুলো কালচে হয়ে এসেছে, পাখিরা পালাচ্ছে একে একে, জল দেওয়া ঝারি নিয়ে বুড়ো মালি চলে যাচ্ছে।

'এবারে তুমি আমায় সত্যিই নিয়ে যাবে, ছোটমামা?' গগন বলল।

'হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। তোকে আমি বলছি ত এই শীতের পরই নিয়ে যাব।'

'নয়ন গ্লাসগো যাবার আগে আমি বাড়ি যেতে পারলে খুব ভাল হয় ছোটমামা।'

'নয়ন মার্চের আগে যাচ্ছে না।'

'নয়ন আর বাবা নাকি আগামী মাসে আসছে এখানে? মা লিখেছে।' গগন জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে দিল।

'ইচ্ছে আছে ওদের। তবে এতটা আসা জামাইবাবুর পক্ষে কষ্টের। আসতে পারলে ভালই।' ছোটমামা হাই তুলল।

বিছানার ওপর লেবুটা পড়ে আছে। বিকেলের জলখাবার নিয়ে চাকর এল, মিট-শেফের ভেতর থেকে কাচের ডিশ বার করে দুটো মিষ্টি রাখল, এক গ্লাস দুধ। রেখে চলে গেল। গগন দেখল। কিছু বলল না।

'তোর গলার দাগটা কিসের রে গগন?' ছোটমামা আবার বলল।

গগন গলায় হাত দিল। দাগ ঢেকে নেবার মতন করে হাত রাখল গলায়। 'কি জানি! কালশিরে বোধ হয়।'

'আঙুলের দাগের মতন দেখাচ্ছে।'

চুপচাপ। গগন ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিচ্ছিল। ছোটমামা যেন অবেলায় ঘুম পাওয়ায় বার বার হাই তুলছিল। সমস্ত ক্লান্তি এতক্ষণে ছোটমামাকে অবশ করে ফেলেছে। ছোটমামার চোখ ছোট হয়ে আসছিল, গগনকে যেন আর ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না।

গগন বিকেলকে পুরোপুরি ফুরিয়ে যেতে দেখল। আলোর রেখা আশে পাশে কোথাও নেই। নিমের ডাল তার দৃষ্টিকে আড়াল করে ফেলেছে, সেই আড়ালের ওপাশ থেকে একটি মেয়েলী গলা শুনতে পেল গগন। 'আসব—তাড়াতাড়ি আসব আবার।'

পাশের ঘরে একবার ললিতবাবুর বউ এসেছিল। চলে যাবার সময় ললিতবাবুর কি মনে পড়ায় বউকে ডাকছিল। ডেকে কি বলছিল। ললিতবাবুর বউ নিম গাছের আড়ালে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, 'আসব—তাড়াতাড়ি আসব আবার'।

ললিতবাবু চলে গেছে। অপারেশন থিয়েটার থেকেই চলে গেছে। গগন এখনও মাঝে মাঝে ললিতবাবুর বউয়ের গলা শোনে। 'আসব—তাড়াতাড়ি আসব আবার।'

গগন দেখল ছোটমামা উঠে দাঁড়িয়েছে। ছোটমামার যাবার সময় হয়ে গেছে।

'ছোটমামা, এই শীতের পর কিন্তু আর নয়'—গগন বলল।

'পাগল নাকি। আবার কি! অনেক দিন হয়ে গেল। এবার বাড়ির ছেলে বাড়ি যাবি।'

'জানুআরিতে কিন্তু।'

'বেশ, জানুআরিতেই।'

'মাকে বলো আমি ভাল আছি। বাবাকেও বলো।'

'নয়নকে তাহলে চিঠি দিস তুই।'

'দেব।...জানো ছোটমামা, নয়নের বউ আমায় চেনে।'

'তোকে?'

'আমায় দেখেছে আর কি। পালিত লেনে যখন থাকতাম আমরা, তখন।'

'আ-চ্ছা।' ছোটমামা মাথা নাড়ল। 'নয়ন-বেটা বুঝি তখন থেকেই বউ পছন্দ করে রেখেছিল।' ছোটমামা হাসতে লাগল।

হাসি থামল এক সময়। যেতে যেতে ছোটমামা ললিতবাবুর বউয়ের মতনই বলল, 'আসব, আবার—তাড়াতাড়ি আসব।' তারপর অন্ধকার। এই ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

অন্ধকারে গগন চোখের পাতা খুলল। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। কাঁঠাল গাছের মাথার মতন বেশ ঘন বুনন্ত অন্ধকার। বাতাস আসছিল, অগ্রহায়ণের ঠাণ্ডা বাতাস। মিহি কুয়াশার মতন ধোঁয়ার রেখা দেখা যাচ্ছে অদূরে। গগনের শীত করছিল। কাছা-কাছি একটা দেবালয় আছে, ঘণ্টা বাজছিল। গগন আকাশে কয়েকটি তারা দেখতে দেখতে দেবালয়ের ঘণ্টা শুনল। প্রতিটি ঘণ্টা এমন করে বাজে যেন পায়ে পায়ে শব্দটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। গগন ভাবল, তার মনে হল, সে বোধ হয় প্রত্যহ দূরে থেকে দূরান্তে সরে যাচ্ছে।

চাকরটা এসেছে। হাতে লণ্ঠন। গগনের ঘরে পায়ের দিকে ছোট টেবিল-বাতি, কেরোসিন নাড়তে নাড়তে বাতিটা জেলে দিল চাকরটা। বাতি জ্বলল, ছোট্ট ফোঁটার মতন হলুদ বাতি। চাকরটা চলে গেল। আসার সময় সে গলায় একটা ভজনের গুন-গুনে নিয়ে এসেছিল, যাবার সময় ঘরে সেই ভজনের সুর ফেলে গেল।

বিছানার ওপর উঠে বসল গগন। বাইরে নতুন সার দেওয়া বাগান।' বাতাসে গন্ধ আসছে। শীত আসছে। অন্ধকারও এ-ঘরে গগনকে রোজকার মতন দেখতে এসেছে। দেখার সময় হয়ে গেলে, এরাই তাকে দেখতে আসে। অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ের মতন—ওই শীত, বাতাস, ওই অন্ধকার, এবং বিষণ্ণতা. তার ঘরে বিছানার পাশে এসে বসে।

বাইরে থেকে আরও একজন এ-সময় তাকে দেখতে আসে, ছোট ডাক্তারবাবু। তাঁর সাইকেলের ঘণ্টি বাজলেই গগন তৈরি হয়ে থাকে। আজ এখনও তিনি আসেননি। আসবেন।

গগন কপালে বুকে হাত দিল। তার জ্বর এসেছে। জ্বরটাও গগনকে বিকেলের ঝোঁকে রোজ দেখতে আসে। দেখতে এসে পাশে বসে থাকে। মাঝ রাতে গগনের ঘুমের মধ্যে চলে যায়।

চোখ জ্বালা করছিল গগনের। জিব বিস্বাদ লাগছিল। মাথা ধরেছে। জানলার বাইরে হাত বাড়াতে ইচ্ছে করল গগনের. ব্যথা ব্যথা লাগছিল সর্বাঙ্গ, শীত করছিল বলে গগন আর হাত বাড়াল না।

বাইরে হাত বাড়ান গেল না বলেই গগন ভেতরে হাত রাখল। কম্বলের তলায় জামার ওপর হাত রেখে বুকের তাপ ও কষ্ট অনুভব করতে লাগল। মাটিতে যেমন গাছ, মাটির তলায় যেমন শেকড়, গগনের মনে হল, তার বুকের তলায় সেই রকম কষ্টের বহু পদার্থ মিশ্রিত হয়ে আছে, এই বোধ একটা বৃক্ষের মতন অজস্র অদৃশ্য শিকড় দিয়ে সেই কষ্টকে শুষে বর্ধিত হচ্ছে। কেন? গগন বুঝতে পারল না, কেন হৃদয়ে এত কষ্ট থাকে, এত অভাব? বেদনা কেন অধিক, সুখ কম? পৃথিবীতে জলভাগ বেশীর মতন পর্যাপ্ত দুঃখ এবং অপর্যাপ্ত সুখ ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছিলেন!

গগন তার এই চিন্তাকে বেশ শিথিল এবং জ্বরে আচ্ছন্ন বলে মনে করা সত্ত্বেও ভাবতে লাগল, তার দুঃখকে সে কেমন করে সহনীয় করতে পারে। তার মনে হল, প্রত্যহ গগন এই চিন্তা করছে। প্রত্যহ। সে বড় শূন্য, তার গগনে সূর্য অথবা চন্দ্র অথবা নক্ষত্রদল নেই।

ছোট ডাক্তারবাবুর সাইকেলের ঘণ্টি বাজল। গগন বুঝতে পারল, এবার ছোট ডাক্তারবাবু ঘরে ঘরে একবার ঘুরে যাবেন। বড় ভাল লোক, বড় সুন্দর মানুষ, কখনও নিরাশ করেন না। বলেন, বাঃ—চমৎকার, আজ ত বেশ ভালই দেখছি। খুব তাড়া-তাড়ি ইম্প্রুভ করছ তুমি।

গগন বিছানায় শুয়ে পড়ল। কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে নিল। সাইকেলের ঘণ্টি শুনতে পেল আবার। শুনে গগন নয়নের বউয়ের কথা মনে করতে পারল। নয়নের বউ গগনকে পালিত লেনে সাইকেল চড়া শিখতে গিয়ে পড়ে যেতে দেখেছে।

লজ্জা পেয়ে গগন যেন নয়নের বউকে দেখাচ্ছে এমনভাবে কল্পনায় সাইকেলের পিঠে লাফ মেরে চেপে বসল। তারপর প্যাডেল ঘুরোতে লাগল।

না। গগন পারল না। গগন বালিশের মাথার পাশে হাত বাড়াতে গিয়ে তার রুমাল স্পর্শ করতে পারল। রুমালের পাশে কবে-কার একটা পুরোনো মাসিক পত্রিকা। গগন পত্রিকাটা কতবার জানলার বাইরে ফেলে দিতে চেয়েছে, পারে নি। ওর মধ্যে নরনরা আছে, নয়ন, নয়নের বউ, বাবা, মা, লতু, ছোটমামা। শুধু গগন নেই।

গগন এ-ঘরে আছে। এখানেই থাকবে গগন। শীত আসবে, শীত যাবে; আবার শীত আসবে। গগন জানে তার ছোটমামা নেই, তার ছোটমামা তাকে শীতের পর নিয়ে যেতে আসবে না।

গগন চোখ বুজতে বুজতে নয়নদের কথা ভাবল। নয়নরা থাকলে, গগন পরম দুঃখীর মতন ভাবল, তার গগন এত শূন্য হত না।

মায়ণে উল্লেখ আছে সুড়ঙ্গপথে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রকে অহিরাবণ পাতালপুরীর রাজপ্রাসাদে বলি হিসাবে উৎসর্গ করার মানসে নিয়ে গিয়েছিল। কাশীদাসী মহাভারতে জতুগৃহদাহের সময় জতুগৃহের মধ্য থেকে নিভৃত সুড়ঙ্গপথে নির্গত হয়ে পঞ্চপাণ্ডবের নৌকাযোগে নিরাপদে বারণাবতে উপস্থিত হওয়ার কাহিনী লিপিবন্ধ আছে।

"জননী সহিত হেথা পাণ্ডুর নন্দন
সুড়ঙ্গে বাহির হৈয়া প্রবেশিল বন॥"

ঐতিহাসিক যুগে দুর্গ-প্রাসাদ থেকে গুপ্তপথে বহিঃগমনের জন্য সুড়ঙ্গপথ রাখা হত। নানা প্রাচীন দুর্গে এরূপ সুড়ঙ্গপথ আজও বর্তমান। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীতে গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে সুন্দরের বিদ্যার নিকট যাওয়ার বিবরণ সকলেরই সুবিদিত। এমন কী সেদিন রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প 'গুপ্তধনে' সুড়ঙ্গ-পথে সুগোপনে সুবর্ণাগারে যাওয়ার এক অনবদ্য সুন্দর বর্ণনা করেছেন।

প্রাচীন ভারতে অজন্তা-ইলোরার গুহায় গুহানির্মাণ-কৌশল এবং সেই সঙ্গে বিচিত্র কারুকার্যখচিত গুহামন্দির সৃষ্টি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চারুকলা, বাস্তু ও সুড়ঙ্গবিদ্যার চরম পরাকাষ্ঠা শিলাবদ্ধ রয়েছে। দক্ষিণ-ভারতের নানা গুহামন্দির সুড়ঙ্গবিদ্যা-বিশারদতার পরিচয় দেয়। রাজগৃহের উপকণ্ঠে গৃধ্রকূট পর্বতে বুদ্ধদেবের ব্যবহৃত গুহাটি উত্তর-ভারতের অতি প্রাচীন গুহা। হিমালয়ের কন্দরে কত শত গুহা কত মুনিঋষিদের সাধনভজনের আশ্রমরূপে যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতের নগরবিন্যাসে 'গুহানগর' প্রাচীন নগর-পরিকল্পনার ও সুড়ঙ্গবিদ্যার এক অপূর্ব পরিচয়।

"তত্রদেশেনকণাস্কুপে গিরিসানু গুহাদিষু।
নির্মাণাৎ নগর নাম্না গুহা নগরমীরিতম্॥"

জীবজগতে সুড়ঙ্গখননের খ্যাতি আছে গজেন্দ্রবদন গণপতিবাহন মূষিকের নিভৃত নিবাস নির্মাণে। আবার সেই গহ্বরেই সময়ে সময়ে আশ্রয় গ্রহণ করে বাস্তুক অহিকুল। প্রয়োজনবোধে আশ্রয়দাতার মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও মাঝে মাঝে নিরাপদ বসবাসও শুরু করে।

অতি প্রাচীনকালে মিশরদেশে জল-সংরক্ষণের জন্য ভূগর্ভে বিস্তৃত জলাধার ও সুড়ঙ্গ খনন করা হত। সেক্সটাস জুলিয়াস ফ্রন্টিনাস রচিত পুস্তকে প্রাচীন রোমের জলসরবরাহ বিষয়ক বিবরণী লিপিবন্ধ আছে। ফ্রন্টিনাস ছিলেন খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের এক কৃতী পুরুষ। ষাট বৎসর বয়সে তিনি রোমের জলসরবর[illegible] মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার এবং সমাহর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর দায়িত্ব ছিল নয়টি (একুইডাক্ট) জলবাহী সুড়ঙ্গ নির্মাণ করা। এই সুড়ঙ্গের মোট দৈর্ঘ্য ২৬৩ মাইল। তন্মধ্যে ৩৫½ মাইল খিলানের উপর দিয়ে নির্মিত হয় ১৬ মাইল সুড়ঙ্গপথে। এটি ঐতিহাসিক এপিয়ান একুইডাক্ট নামে বিশ্ববিখ্যাত। তখনকার দিনে এই নির্মাণকীর্তি এক চমকপ্রদ অদ্ভুত পূর্তবিদ্যার প্রচেষ্টা।

নরম মাটিতে গন্ধনালা স্থাপনের ব্যাপারে ২২ ফুট উঁচু এবং ১৫ ফুট প্রশস্ত ইটের খিলানযুক্ত সুড়ঙ্গ ইউফ্রেটীস নদীতলে নিমরুদের নিকট নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রাচীন রোমকরা যে সুড়ঙ্গবিদ্যায় কত পারদর্শী ছিলেন তার নিদর্শন তাঁদের অধিকৃত আলজিরিয়া ও সুইজারল্যান্ড ও অন্যান্য স্থানে সুড়ঙ্গের ভগ্নাবশেষে পাওয়া যায়। পূর্তবিদ্যার অন্যান্য নিদর্শনেও: যথা—রাস্তা, ড্রেন, পানীয় জলসরবরাহ প্রভৃতি পৌর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় প্রাচীন রোমকরা সুপারগ ছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিত প্লিনি, ফুসিনো হ্রদের জল নিষ্কাশনের জন্য সুড়ঙ্গ রচনা তখনকারদিনে বাস্তুবিদ্যার শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে বর্ণনা করেছেন। এটি দৈর্ঘ্যে ৩½ মাইল মণ্ট্স্যালভিয়ানো পর্বত ভেদ করে পর্বতশীর্ষ থেকে ৪০০ ফুট গভীরে নির্মিত হয়েছিল। এর গভীরতা ১০ ফুট এবং প্রস্থে ৬ ফুট। নির্মাণ-কার্যে ৩০,০০০ শ্রমিক ১১ বৎসর নিযুক্ত হয়েছিল। বর্তমান কালে এরূপ সুড়ঙ্গ-নির্মাণে ১১ মাসও সময় লাগে না এবং দক্ষকর্মী লাগে সংখ্যায় নামমাত্র। রোমক-দের প্রচলিত সুড়ঙ্গনির্মাণ-পদ্ধতির উপর অধিক উন্নয়ন সম্ভব হয়নি যতদিন না বারুদের আবিষ্কার হয়। নোবেলের শক্তিশালী বিস্ফোরক আবিষ্কার সুড়ঙ্গবিদ্যার দ্রুত অগ্রগতির পথ সুগম করে।

বর্তমানে সারা বিশ্বের বিখ্যাত শহরে যানবাহন ও পথচারীর অস্বাভাবিক সংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে ভূপৃষ্ঠস্থ প্রশস্ত রাজপথে লোকসংখ্যার চাপ ধারণের ক্ষমতার মাত্রাধিক্য হওয়ায় ভূগর্ভস্থ পথ সৃষ্টির ব্রতে নিযুক্ত হতে হয়েছে ইঞ্জিনীয়ারদের। ঊর্ধ্বপথেও বর্ত্মরচনার প্রথাও কয়েকটি প্রধান শহরে প্রচলিত:—বিশেষ করে নিউইয়র্ক, চিকাগো প্রভৃতি মহানগরীতে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে সুড়ঙ্গবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছিলেন যে সব ইঞ্জিনীয়ার তাঁদের মধ্যে স্টিফেনসন, ব্রুনেল, হকস, গ্রেটহেড, ডারলিম্পল, হে প্রভৃতিই প্রধান। মার্ক ব্রুনেল ও তাঁর কৃতী পুত্র আই কে ব্রুনেল টেমস নদীর নীচে সুড়ঙ্গ রচনায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মার্ক ব্রুনেলই প্রথম ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে এক সুড়ঙ্গখনন যন্ত্রের (টানেলিং শিল্ড্) পেটেন্ট গ্রহণ করেন।

সুড়ঙ্গবিদ্যা কী?

যে বিদ্যা বলে উপরের মৃত্তিকা অথবা

[illegible]
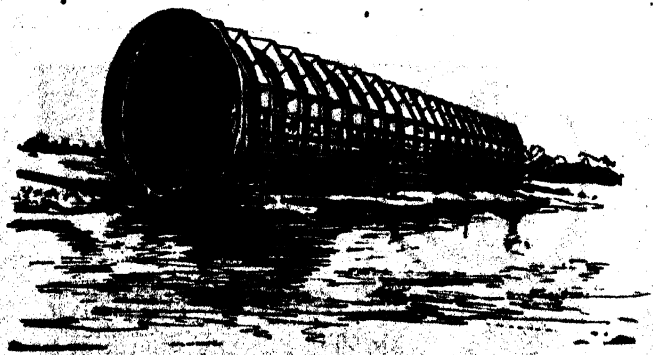
প্রস্তর-আস্তরণ উত্তোলন না করে ভূগর্ভস্থ পথ খনন করা যায় সেই বিদ্যার নাম সুড়ঙ্গ-বিদ্যা। বর্তমানে শব্দটি কিছু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপর থেকে মৃত্তিকা বা প্রস্তর-পরিখা খনন করার পর সেই মুক্ত স্থানে উপযুক্ত মাপের ইট, পাথর কংক্রীটের অথবা ইস্পাতের সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে পুনরায় মাটি ভরার ফলে যে সুদীর্ঘ গহ্বর নির্মিত হয় তাকেও সুড়ঙ্গ বলে। প্রাচীনকালে সুড়ঙ্গনির্মাণে মানবের বুদ্ধিপ্রয়োগ অপেক্ষা প্রাকৃতিক শক্তি বলে বহু সুড়ঙ্গ নির্মিত হয়েছিল। বিশেষ করে বৃষ্টির জলের সাহায্যে। ভূ-গঠনে যে দ্রব পদার্থ পৃথিবীর আস্তরণের বিশেষ স্থান অধিকার করে তা জলের দ্রাবক শক্তির ফলে সুড়ঙ্গপথের উদ্ভব হয়। তবে এ প্রথায় ইচ্ছামত প্রয়োজনানুরূপ আকৃতির সুড়ঙ্গনির্মাণ সম্ভব নয়।

খনিবিদ্যায় কয়লা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ আহরণে ভূত্বকে গহ্বরে খননের জন্য সুড়ঙ্গপথের প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে কোথাও ভূপৃষ্ঠের অতি সমান্তরাল, কোথাও তির্যক, কোথাও উল্লম্ব গহ্বর খনন করা হয় এবং আহরিত কয়লা উপরে উত্তোলন করা হয়।

সুড়ঙ্গের প্রকারভেদ:—

সুড়ঙ্গ মুখ্যত দুই প্রকারে। প্রথমত, প্রস্তরভেদী; দ্বিতীয়ত, জলের তলদেশে।

কিন্তু এরও একটি উপ-বিভাগ করা যেতে পারে। যথা ভূ-পৃষ্ঠস্থ প্রস্তরভেদী এবং মৃত্তিকাভেদী সুড়ঙ্গ।

ব্যবহার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সুড়ঙ্গকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—

(১) রেলপথের জন্য; (২) যান চলাচলের জন্য; (৩) লোক চলাচলের জন্য; (৪) পানীয় জল পরিবহণের জন্য; (৫) ময়লা জল নিষ্কাশনের জন্য; (৬) জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য; (৭) নদীপথ বিমার্গী-করণের জন্য।

আবার আকৃতি অনুযায়ী বিশ্লেষণে সুড়ঙ্গকে নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) গোলাকৃতি (সার্কুলার); (২) পরবলয়াকৃতি (প্যারাবোলিক); (৩) বৃত্তাভাসাকৃতি (এলিপটিক); (৪) অশ্বখুরাকৃতি; (৫) চতুষ্কোণাকৃতি ইত্যাদি।

সুড়ঙ্গনির্মাণ-প্রণালী:—

প্রস্তরভেদী সুড়ঙ্গনির্মাণে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া প্রয়োগের প্রয়োজন।

১। **ছিদ্রক্রিয়া।** এই কার্যে প্রয়োজন—(ক) ছিদ্রকারী জাম্বো যথাস্থানে সন্নিবেশ করা, (খ) লম্বা ড্রিলের বা বেধযন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তর গাত্রে পূর্বনির্দেশমত ছিদ্র করা। এই ছিদ্র করা হয় বায়ুর চাপের সাহায্যে।

২। **বিস্ফোরণ-ক্রিয়া**—(ক) ছিদ্রের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ বিস্ফোরক নিবদ্ধ করা। (খ) বিস্ফোরণক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা। (গ) বিস্ফোরণজনিত ধূম-নির্গমনব্যবস্থা এবং উপযুক্তমত বায়ু সঞ্চালন করা।

৩। **ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করা**—এর পরের কার্য হল বিস্ফোরণের ফলে সুড়ঙ্গ মধ্যে ভগ্নপ্রস্তরস্তূপ পরিষ্কার করা। এই প্রথাটি বহু সময়গ্রাহী। সাধারণ কোদাল-গাঁইতির সাহায্যে পরিষ্কারের পরিবর্তে এক প্রকার যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে, যাকে 'মাকিং যন্ত্র' বলা হয়। এর সাহায্যে সহজেই ভগ্নস্তূপ অল্পসময়ে পরিষ্কার করা সম্ভব।

কোথাও রেললাইন স্থাপন করে টিপিং-ওয়াগনের সাহায্যে ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করা হয়। কখনও বা ডিজেল লরির সাহায্যেও সে স্থান পরিষ্কার করা হয়। কোথাও বা 'কনভেয়ার বেল্টের' সাহায্যে ভগ্নস্তূপ অপসারিত করাও হয়।

সুড়ঙ্গ পথে বায়ু সঞ্চালনের জন্য বায়ু-প্রেরক যন্ত্র এবং কোথাও বা উল্লম্ব উন্মুক্ত আকাশের সঙ্গে সংযুক্ত গহ্বর খনন করা হয়—চিমনির মত বায়ু যাতে সঞ্চালিত হয়। এটি যথেষ্ট পরিমাণ হওয়ার প্রয়োজন, যাতে বিস্ফোরণের ধূম নির্গমন ও কর্মীদের প্রচুর বায়ু সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

৪। **সুড়ঙ্গগাত্রের অসমান প্রস্তর ছাঁটাই করা:**—এই পর্যায়ে সুড়ঙ্গের ছাদ, দুইধার ও তলদেশে পূর্বপরিকল্পিত আকৃতি ধারণ করে, তার জন্য উদ্গত প্রস্তর কাটা ও বর্জনের প্রয়োজন। সেগুলি কোথাও পুনরায় বিস্ফোরণ অথবা 'জ্যাক হাতুড়ি'র সাহায্যে অসমান অংশ সমান করা হয় এবং সুড়ঙ্গ-মুখে আনীত হয়। পরে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। এর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করা বেশ কঠিন ব্যাপার ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। প্রাচীনকালে দিনে একবার ওই বিস্ফোরণক্রিয়া ও ভগ্নস্তূপ নির্গমন সম্পাদিত হত। উনিশ শো ত্রিশ সালে সেটি প্রতি আট ঘণ্টায় দুবার এবং বর্তমানে চব্বিশ ঘণ্টায় সাত থেকে নয়বার অর্থাৎ আট ঘটায় তিনবার ওই কার্য করা সম্ভব হয়েছে, বিশেষ করে নতুন মহাদেশে। বর্তমানে ভারতবর্ষে চিরাচরিত প্রথাই প্রচলিত—দিনে একবার মাত্র বিস্ফোরণ ও ভগ্নস্তূপ নিঃসৃত করা।

বিস্ফোরক প্রয়োগের জন্য গুহার নানা স্থানে কোথাও সমান্তরাল কোথাও তির্যক দীর্ঘ ছিদ্র করা হয়। ছিদ্রগুলির ব্যাস মুখের কাছে দুই ইঞ্চি এবং ক্রমশ হ্রস্ব হয়, গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। ছিদ্রের সাধারণ গভীরতা ৮ ফুট এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ১২ ফুট গভীরও করা হয়। সাধারণত

৬ ফুট গভীর ছিদ্রই প্রচলিত। বিভিন্ন গহ্বরে বিভিন্ন 'বিলম্বের বিস্ফোরক' দ্রব্য প্রোথিত করা হয়। বিভিন্ন বিলম্বের বিস্ফোরকের সাহায্যে অল্প বিস্ফোরক দ্রব্যে বহু প্রস্তর বিচ্যুত ও চূর্ণ করা সম্ভব।

৫। **সংরক্ষণী কাঠামো:**—এই পর্যায়ে কাঠের ঠেসের সাহায্যে সুড়ঙ্গ অঙ্গ এবং মুখটি পড়ে-যাওয়া থেকে সংরক্ষণ করা। এটিও আবার নানা নৈপুণ্যের ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংসাধিত করার প্রয়োজন। কোথাও ইস্পাতের নানা আকৃতির কড়ি ও বরগা ব্যবহৃত হয়। এগুলি সংলগ্ন করার বিশেষ এবং বাধ্যতামূলক প্রয়োজন। এর কার্পণ্যে বা ত্রুটিতে কত কর্মীর না প্রাণনাশ হতে পারে!

৬। **সংরক্ষণী আস্তরণ প্রয়োগ:**—এই ঠেস-পর্বের পর সুড়ঙ্গের চতুর্দিকে পূর্ব-নির্দিষ্ট আকৃতি অনুযায়ী হয় ইস্পাতের, নয় ঢালাই লোহার অথবা বলযুক্ত কংক্রীটের সংরক্ষণী আস্তরণ প্রয়োগের প্রয়োজন। এর ফলে কোন সাধারণ প্রাকৃতিক শক্তিবলে সুড়ঙ্গগর্ভস্থ উপাদান সহজে বিচ্যুত হওয়ার ফলে সুড়ঙ্গপথ অবরুদ্ধ না হয়। প্রাথমিক প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত হয় সংরক্ষণী কাঠামো। সেই কাঠামোর মাপ সকল সময়েই পরিকল্পিত সুড়ঙ্গ-গহ্বরের মাপ অপেক্ষা আকৃতিতে বড়। সুড়ঙ্গের মুখ্য মাপ অনুযায়ী সেণ্টারিং-এর উপরে সিমেণ্ট কংক্রীটের ঢালাই করা হয়। প্রথমে পাশের প্রাচীর ঢালাইয়ের পর খিলান অংশের জন্য উপরে সেণ্টারিং স্থাপন করা হয়। চাপ প্রয়োগ করে সিমেণ্ট কংক্রীটের ঢালাইয়ের মসলা খিলানের আকৃতি ধারণের জন্য প্রেরিত হয়। ইস্পাতের ছড় সন্নিবিষ্ট থাকে সেণ্টারিং স্থাপনের পূর্বে থেকেই। ঢালাইয়ের সাতদিন এবং অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশী কিছুদিন পর সেণ্টারিং খোলা হয়। ঢালাই ঠিকমত হয়েছে কি না পরীক্ষার জন্য আবার ড্রিলের সাহায্যে ছাদের নানা জায়গায় ছিদ্র করা হয়। ছিদ্র করার সময় যদি ফোঁপরা দেখা যায়, তখন সেই ছিদ্রের মধ্যে সিমেণ্ট ও বালির তরল মিশ্রণ অধিক চাপে ঊর্ধ্বে প্রেরিত হয়, যতক্ষণ ঢালাইয়ের পশ্চাতের গহ্বর পূর্ণ না হয়। যদি এই পশ্চাতের গহ্বরের আকৃতি অতি দীর্ঘ ও বিরাট হয়, সেক্ষেত্রে শুষ্ক বালুকা ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে চাপের সাহায্যে ঢালাইয়ের উপরের গহ্বরপূরণে প্রেরণ করা হয়। সংরক্ষণী কাঠামো সংরক্ষণী আস্তরণ ঢালাইয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। যে সব সুড়ঙ্গনির্মাণে জলস্রোত পর্বতস্তরে আবদ্ধ, সেই অন্তর্বাহী জলস্রোতকেও কখন কখন রোধ করার প্রয়োজন হয়! প্রতি সুড়ঙ্গের তলে জল নির্গমনের নর্দমা প্রস্তুত ও সুড়ঙ্গগাত্রে বিদ্যুতের তার বহনের পাইপ, বায়ুচলাচলের পাইপ, প্রেষিতবায়ুর পাইপ প্রভৃতি সংযুক্ত করা হয়।

সুড়ঙ্গ খননের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে বিজলীর তার, বায়ু সঞ্চালনের নল, প্রেষিত-বায়ুর নল ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সুড়ঙ্গনির্মাণে এই সংরক্ষণী আস্তরণের মূল্য মোট সুড়ঙ্গনির্মাণের মূল্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

সুড়ঙ্গ-পরিকল্পনায় বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় হল, কোথায় ওই খোদিত প্রস্তর ও ময়লা, কাদা, জল প্রভৃতি নিষ্কাশনের জন্য সুড়ঙ্গ-মুখের কত নিকটে উপযুক্ত স্থান নির্বাচিত হয়েছে। এই নির্বাচনের উপর সুড়ঙ্গকার্যের ব্যয় ও সহজসিদ্ধির মান বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। সুড়ঙ্গ যে সকল সময় ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরাল হবে এমন কোন কথা নেই। সুড়ঙ্গ তির্যকভাবেও অগ্রসর হতে পারে।

জলতলস্থ সুড়ঙ্গনির্মাণ—ভূগর্ভস্থ যে সব সুড়ঙ্গ নদীর তলদেশে নির্মিত হয়; তা নদীতটস্থ ভূপৃষ্ঠ হতে তির্যকভাবে প্রায় নদীর অর্ধ প্রস্থের সর্বনিম্নে গমনের পর আবার নদীর বিপরীত তীরে তির্যকগতিতে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে উত্থিত হয়। কখন বা ইংরেজী ইউ-এর মত নদীতলস্থ সুড়ঙ্গ নির্মিত হয়। যেমন গঙ্গার নীচে কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ-কেবল্ নিয়ে যাওয়ার সুড়ঙ্গ—এক দিকে মেটিয়াব্রুজ উৎপাদন কেন্দ্র, অপর দিকে শিবপুর বৃক্ষবাটিকা।

জলের তলায় পূর্বে যে সব সুড়ঙ্গ নির্মিত হয়েছে, সেখানে গঠনকালে মুখ্য সমস্যা ছিল জল নিরোধ করা। কোথাও বা পাম্পের সাহায্যে জল নিষ্কাশন করা অথবা যে চাপে জল নির্গত হয়, সেই চাপ অপেক্ষা

অধিক চাপে প্রেষিতবায়ু সুড়ঙ্গে প্রেরণ করা। প্রেষিত বায়ুর সাহায্যে সুড়ঙ্গের মধ্যে খননকার্য চালনা দ্বারা জলের তলায় সুড়ঙ্গ-নির্মাণ করা বর্তমান রীতি। যে সব কর্মী বায়ুমণ্ডলের চাপের অধিক চাপে কাজ করে তাদের যত্ন নেবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে এবং বিশেষ আইনও প্রণীত হয়েছে। বায়ু-মণ্ডলের চাপ অপেক্ষা অধিক চাপে কাজ করার ফলে ওই কার্যোদ্ভূত বিশেষ এক রোগ উৎপন্ন হত, এর নাম 'বেণ্ড'। কর্মী-দের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ায় এ রোগ বর্তমানে প্রায় হতে দেখা যায় না। ১৮৭২-১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট গথার্ড সুড়ঙ্গনির্মাণে কর্মীদের প্রতি যত্ন ও সহানু-ভূতির অভাবে এবং অস্বাস্থ্যকর পরি-প্রেক্ষিতে আটশজন কর্মী জীবন বলি দিয়েছে।

নরম মৃত্তিকায় সুড়ঙ্গ খননে সাধারণত 'শীল্ড্' ব্যবহার করা হয়। এটি একটি ইস্পাতের বিরাট সুড়ঙ্গের মাপের চেয়ে কিছু মাপে বড় পিপের মত যন্ত্র, যার সম্মুখের অংশটি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। পশ্চাতের অংশটি ফাঁকা। সম্মুখের অংশের খনন-যন্ত্রপাতি যথা বেধযন্ত্র, প্ল্যাটফর্ম র‍্যাম ও ফ্রেম র‍্যাম পিছনের অংশের সঙ্গে উপযুক্ত বারিরোধক দরজার মাধ্যমে সংযুক্ত। সম্মুখের সুড়ঙ্গ খননে উদ্ভূত জল, কাদামাটি, নির্গমনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। সেগুলি উদক বা হাইড্রলিক চাপে নরম টুথপেস্টের মত পশ্চাতের প্রকোষ্ঠে নির্গত ও সুড়ঙ্গের বাহিরে যথাস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। মাটি কাটার যন্ত্রটির মাথায় শিরস্ত্রাণসন্নিবিষ্ট। এর সঙ্গে খননযন্ত্র ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। এই যন্ত্রের উদক চাপমাত্রা কখন প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৬,০০০ পাউণ্ডও প্রযুক্ত হয়। পশ্চাতে অবিচ্ছিন্ন প্রাথমিক আস্তর প্রয়োগ চলতে থাকে। সেগুলি মুখাত ঢালাই লৌহের অথবা ইস্পাত-জাতীয় বস্তুর হয়। এই আস্তর সাধারণত ৩০ ইঞ্চি প্রস্থের। প্রতি ধাপে সুড়ঙ্গ-খননক্রিয়া ৩০ ইঞ্চি ক্ষেপে অগ্রসর হয় এবং উপযুক্ত আস্তর সংযুক্ত হয়। তারপর এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি চলে। সুড়ঙ্গনির্গত কাদামাটির তাল 'বেল্ট কনভেয়ারে'র সাহায্যে সুড়ঙ্গের বাহিরে নীত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি লরি ভর্তি করে নিস্তারক্ষেত্রে নিক্ষেপ করা হয়।

নদীগর্ভে সুড়ঙ্গ স্থাপন—পূর্বে নদীতলে সুড়ঙ্গ-খনন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। বর্তমানকালে নব নব প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে, সেখানে আগে থেকে প্রস্তুত যথোপযুক্ত ব্যাসের বলযুক্ত কংক্রীট বা ইস্পাতের বিরাট চোঙা নদীগর্ভে নদী-দৈর্ঘ্যে আড়াআড়িভাবে খোদিত পরিখায় ভেলার সাহায্যে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়। জলের নীচে পাইপের মুখে মুখে যোগ করার জন্য ডুবুরি অবতরণ করানো হয়। নদীগর্ভ থেকে যখন দুই নদীতীরে ওই বিরাট সুড়ঙ্গ পাইপ স্থাপনা শেষ হয়, তখন শক্তিশালী পাইপের সাহায্যে সুড়ঙ্গের মধ্যের জল নিষ্কাশিত করা হয় এবং সেখানে পাইপের সংযোগস্থলে জলক্ষরণও বন্ধ করা হয়। নদীগর্ভে খোদিত মৃত্তিকা দ্বারা পরে ওই সুড়ঙ্গের উপরিভাগ আবারিত করা হয়।

উইণ্ডসর-ডিট্রয়েট ভাসমান প্রথায় প্রোথিত সুড়ঙ্গ—প্রসিদ্ধ ভাসমান প্রথায় সুড়ঙ্গনির্মিত হয় কানাডার উইণ্ডসর শহরের সঙ্গে যুক্ত-রাষ্ট্রের মোটর-নগরী ডিট্রয়েট সংযুক্ত করার জন্যে। আমি প্রায় এক দশক আগে এই সুড়ঙ্গের মধ্যে বাসে উইণ্ডসর থেকে যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে উপনীত হই। তখন জানি না যে, এর নির্মাণকৌশল এক অভূতপূর্ব কাহিনী। প্রথম ইস্পাতের ২৮ ফুট ব্যাসের পাইপের নির্মাণের পর তার উপরে পুনরায় ৩১ ফুট ব্যাসের ইস্পাতের এককেন্দ্রিক পাইপ দ্বারা আবারিত করা হয় এবং উপরের পাইপের নির্দিষ্ট স্থানে নরগহ্বর (ম্যানহোল) রাখা হয়। এই জ্যাকেট লাগানো পাইপকে আরও শক্ত করার জন্য তার উপর অষ্টভুজাকৃতি ইস্পাতের বেষ্টনী ১২ ফুট অন্তর সংলগ্ন করা হয়। পাশ থেকে এর আকৃতি দেখলে দেখা যাবে ২৮ ফুট ব্যাসের গোলাকৃতি পাইপের ফাঁকের উপরে অষ্টভুজাকৃতি বেষ্টনী। পাইপের দুমুখ কাঠের তক্তার সাহায্যে বারিনিরোধ করা হয়। ওই সুড়ঙ্গের ইস্পাতের কাজ নদীর ৫ মাইল নীচে এক কারখানায় সম্পাদিত হয়। নটি ভাসমান অংশ নদীর সম্পূর্ণ প্রশস্ততা আবৃত্ত করে।

সুড়ঙ্গ স্থাপনের স্থানের সন্নিকটে দুই সমকেন্দ্রিক ইস্পাত পাইপের শূন্য অংশে নরগহ্বরের মধ্য দিয়ে কংক্রীট পূর্ণ করা হয়। তারপর আবরণী-অষ্টভুজের নিম্নের তিন-ভুজ আবৃত করে সেন্টারিং ও কংক্রীট করা হয়, যাতে তলদেশটি বেশ মজবুতভাবে নদীগর্ভে শায়িত হতে পারে। এই সব কংক্রীটপর্ব শেষ করায় ও ভারবৃদ্ধির ফলে সুড়ঙ্গটি সহজেই ২৩ ফুট জলের নিম্নে গমন করে। তারপর ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে পূর্বখোদিত বিরাট নালার গর্ভে এই সুড়ঙ্গটি ধীরে ধীরে সংস্থাপন করা এবং বাকী কংক্রীটের কাজ সম্পন্ন করা হয়। সুড়ঙ্গের সর্বোচ্চ অংশটি নদীগর্ভ থেকে অন্তত ৪ ফুট নীচে থাকা বাঞ্ছনীয়। এই সুড়ঙ্গের নদীতটস্থ অংশদ্বয় খোলা। তীরের প্রতি প্রান্তে ৬০০ ফুট মৃত্তিকা খনন ও সুড়ঙ্গ স্থাপনান্তে মৃত্তিকা পূরণ করা হয়। তারপর শীল্ডের সাহায্যে বাকী ৪৬৬ ফুট দীর্ঘ যুক্তরাষ্ট্রপ্রান্ত এবং ৯৮৬ ফুট কানাডা প্রান্ত নির্মাণ করা হয়। নদীগর্ভস্থ অংশ ন'টি ২৪০ ফুট দীর্ঘ খণ্ডে গঠিত। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ড ও আলামডার ৪০৩৬ ফুট দীর্ঘ ৩২ ফুট অন্তব্যাসের সুড়ঙ্গ নির্মিত হয়। পথের জন্য ২৪ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং পথচারীর জন্য দুদিকে ফুটপাথ স্থাপিত।

ইংলণ্ডে মার্সি নদীগর্ভে লিভারপুল শহর এবং বারকেনহেড শহরকে সংযুক্ত করেছে 'মার্সি-সুড়ঙ্গ'। এটি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই সম্রাট পঞ্চম জর্জ উদ্বোধন করেন।

নদীতলে সুড়ঙ্গখননের সময় যখন সংবদ্ধ জল মাটিকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে, তখন ওই মাটির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট জল খুব ঠাণ্ডা করায় বরফের ভাব ধারণ করে এবং কঠিন হয়। ফলে কাজেরও বিশেষ সুবিধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে উত্তাপের সাহায্যেও মৃত্তিকা-অনুপ্রবিষ্ট জলের কিয়দংশ উদ্বায়ী হওয়ায় মৃত্তিকা কঠিন রূপ ধারণ করে এবং সহজভাবে সুড়ঙ্গ-খননকার্য চলে।

দীর্ঘ সুড়ঙ্গখননের সময় নানাস্থানে নানারকম তাপমাত্রা, চাপমাত্রা, অনদ্ভূত ও নানা সমস্যার নানাভাবে সমাধান করা হয়। কোথাও বা বড় সুড়ঙ্গনির্মাণে ছোট 'অনুসন্ধানী সুড়ঙ্গ'-খনন করার রীতি প্রচলিত। অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও অসুবিধার মান-নির্ণয়ের পর অবশেষে বৃহৎ উপযুক্ত মাপের সুড়ঙ্গ নির্মিত হয়। বিখ্যাত 'ডার্টফোর্ড-পার্য়ফ্লিট' সুড়ঙ্গে প্রথমে ১৯৩৭ সনে ১২ ফুট ব্যাসের 'পরীক্ষা-সুড়ঙ্গ-খননের' ফলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পর পরিশেষে ৩৫ ফুট ব্যাসের সুড়ঙ্গ নির্মিত হয়। এতে ২১ ফুট প্রশস্ত রাস্তা এবং দুধারে তিন ফুট প্রশস্ত ফুটপাথ পরিকল্পিত। এই সুড়ঙ্গের [illegible]
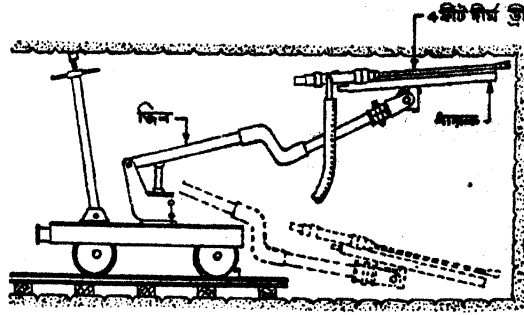
সুড়ঙ্গ খননের বেধযন্ত্র

অভ্যন্তরীণ ব্যাস ২৮ ফুট ২ ইঞ্চি। এই সুড়ঙ্গের মোট দৈর্ঘ্য ৪৭১২ ফুট।

বর্তমানে সুড়ঙ্গনির্মাণের মুখ্য কাজে বেশী লোকের প্রয়োজন হয় না। ফেজ্‌দু সুড়ঙ্গনির্মাণে ১ জন ফোরম্যান, ৪ জন ফিটার, ২ জন মাইনার, ৮ জন ড্রিল চালক, ১ জন ড্রিল ব্যবস্থাপক, ৫ জন যন্ত্র পরিষ্কারক ও ৮ জন সাধারণ মজুর নিযুক্ত ছিল। অর্থাৎ সুড়ঙ্গনির্মাণের যন্ত্র চালানোর কাজে মোট ৩৭ জন, বিস্ফোরণের কাজে ৫ জন ও ভগ্নস্তূপ সরানোর কাজে ২০ জন অর্থাৎ মোট ৬২ জন কর্মীর দরকার।

বর্তমানে কলিকাতায় দ্বিতীয় সেতু কি সুড়ঙ্গের নির্মাণ বিষয়ে পর্যালোচনা চলছে। হয়তো সেতু নির্মাণই স্থির হবে, কিন্তু সুড়ঙ্গের সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বারি-পরিবহণের জন্য দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ হল ৮৫ মাইল দীর্ঘ দিলওয়ার নদীর। এটি নিউ ইয়র্ক শহরে পানীয় জল বয়ে আনে।

নি হরিবল্লভ ভণিতা দিয়া পদরচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত নাম মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। ইঁহার সংকলিত পদাবলী গ্রন্থের নাম "ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি"। শ্রীপাদরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও কবি কর্ণপূরের পর এত বড় সাধক, এমন পণ্ডিত, এমন প্রতিভাধর সুরসিক কবি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করেন নাই।

পিতার নাম রামনারায়ণ চক্রবর্তী। জন্মস্থান দেবগ্রাম। কেহ বলেন দেবগ্রাম নদীয়া জেলায়। কেহ বলেন—দেবগ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘি থানার এক খানি গ্রাম। দেবগ্রামেই তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হয়, প্রাথমিক শিক্ষাও লাভ করেন তিনি দেবগ্রামে। অতঃপর বিশ্বনাথ মুর্শিদাবাদ সৈয়দাবাদে আগমন করেন। অধ্যাপক গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী তাঁহার শিক্ষাগুরু। সহজাত প্রতিভাবলে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, অলংকার, ছন্দ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। সৈয়দাবাদেই তিনি ভক্তি-রসামৃত সিন্ধুর বিন্দু, উজ্জ্বল নীলমণি কিরণ, নাম দিয়া দুটি গ্রন্থ এবং অলঙ্কার কৌস্তুভের টীকা প্রণয়ন করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ও কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকাও সৈয়দাবাদেই প্রণীত হইয়াছিল। অল্প বয়সেই বিশ্বনাথ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

সৈয়দাবাদের রামকৃষ্ণ আচার্যের দুইপুত্র। জ্যেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ, কনিষ্ঠ কৃষ্ণচরণ। রামকৃষ্ণ আপন কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচরণকে—অধ্যাপক গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর হস্তে পোষ্যপুত্র-রূপে অর্পণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচরণের পুত্র রাধারমণ বিশ্বনাথের দীক্ষা গুরু। শ্রীগুরু-চরণস্মরণাষ্টকে বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন—

"শ্রীরাধারমণং মুদাগুরু বরং
বন্দে নিপত্যাবনৌ"

মনে হয়—প্রবীণ অধ্যাপক গঙ্গানারায়ণের নিকট পাঠ আরম্ভ পূর্বক বিশ্বনাথ কৃষ্ণ-চরণের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এই জন্যই কৃষ্ণচরণের পুত্রকে উপযুক্ত দেখিয়া তাঁহার নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের অপর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামভদ্র ও রঘুনাথ। ইঁহাদের বংশধর বর্তমান আছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত পাতডাঙ্গা নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে বিশ্বনাথ কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। পাতডাঙ্গাতেই তিনি ইষ্টসাধনে সিদ্ধিলাভ করেন। বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল বিগ্রহ আজিও পাতডাঙ্গায় পূজাপ্রাপ্ত হইতেছেন। সৈয়দাবাদে রচিত তাঁহার স্বহস্ত লিখিত কয়েকখানি টীকা পাতডাঙ্গার আশ্রমে ছিল। এক বৈষ্ণব বেশধারী ভাক্ত পড়িবার নাম করিয়া সেগুলি লইয়াছিলেন। পরে একদিন গভীর রাত্রে টীকাগ্রন্থগুলি সহ তিনি আশ্রম হইতে পলায়ন করেন। পাতডাঙ্গার চক্রবর্তীগণ বিশ্বনাথের ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশধর।

পাতডাঙ্গা হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে,—কেহ বলেন শ্রীধাম হইতে দেশে ফিরিয়া গুরুর আদেশে এক রাত্রি তিনি পত্নীর সঙ্গে এক গৃহে বাস করিয়াছিলেন। সারা রজনী সহধর্মিণীর সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপনে অতিবাহিত হইল, প্রভাতে তিনি চিরতরে গৃহত্যাগ করিলেন। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—

সবার বিস্ময় শুনি ঐছে রাত্রিবাস।
শিষ্য জিতেন্দ্রিয় ইথে ইষ্টের উল্লাস॥

শ্রীধাম বৃন্দাবনে অতি স্বাভাবিক রূপেই তিনি বৈষ্ণব সমাজের একাংশের নেতৃপদ অধিকার করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ চরম-পন্থী পরকীয়াবাদী। রূপানুগ বৈষ্ণব সম্প্রদায়—নিত্যলীলায় স্বকীয়াবাদ ও প্রকট লীলায় পরকীয়াবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী এই মতবাদ দার্শনিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ নিত্যলীলা ও প্রকটলীলা কোন লীলাতেই গোপীগণকে এবং শ্রীমতী রাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা বলিয়া স্বীকার করেন না। অবশ্য রূপানুবর্তী বৈষ্ণবগণ বিশ্বনাথের এই মত গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থ দর্শিনী টীকা বিশ্বনাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই টীকায় তিনি পরকীয়া মতবাদেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে ১৬২৬ শকাব্দায় এই টীকা রচনা সম্পূর্ণ হয়।

বিশ্বনাথ রচিত শ্রীমদ্-ভগবদ্-গীতার টীকার নাম সারার্থ-বর্ষিণী। তৎকৃত শ্রীরূপের উজ্জ্বল নীলমণির টীকার নাম আনন্দ চন্দ্রিকা। এবং কবি কর্ণপূর রচিত আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূর টীকার নাম সুখবর্তিনী। বিদগ্ধমাধব, হংসদূত, ব্রহ্ম সংহিতারও বিশ্বনাথ রচিত টীকা আছে। বিশ্বনাথ রচিত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত কম হইবে না। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত, শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, গোপী-প্রেমামৃত, ঐশ্বর্য-কাদম্বিনী, মাধুর্য-কাদম্বিনী প্রভৃতি বিশ্বনাথ রচিত গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে আজিও বহু সমাদরে পঠিত হয়।

সে আজ অনেকদিনের কথা, বোধহয় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কালের কথা। একদিন কীর্তন শুনিতে গিয়া একজন

অভিজ্ঞ কীর্তনীয়ার মুখে মানের ব্যাখ্যা শুনিলাম: শ্রীমতী রাধা বলিতেছেন, "আমি যে অঙ্গে চন্দন দিতে ভয় করি, সেই—

"শ্রীঅঙ্গে কঙ্কনের দাগ ঐ দুঃখেতে মরি"

মনে অত্যন্ত খট্‌কা লাগিল। কাশীমবাজার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মেলনে গিয়া রাজা মণীন্দ্র নন্দীর রাজভবনে 'গান শুনিয়াছিলাম; রজনী প্রভাতে একজন সখী অন্য আর একজন সখীকে ডাকিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়ন বিলাস দেখাইতেছেন—"হের দেখসিয়া বা। নিদ যায় ধনী ও চাঁদবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা"। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে বিলাসের সময় শ্রীমতীরই বা কোন্ কাণ্ডজ্ঞান থাকে! সে সময় নখাঘাত, রদখণ্ডন—শ্রীকৃষ্ণ সুখের জন্য তিনি কি না করেন? তবে চন্দ্রাবলীর কঙ্কনাঘাত তাঁহার মানের কারণ হইবে কেন? ভাবিলাম নিশ্চয়ই মানের অন্য কারণ আছে। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রজনী অতিবাহিত করিয়া কৃষ্ণ কি সুখী হইয়াছেন? সংকেত কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধা যে দুঃখে রাত্রি যাপন করিয়াছেন, সেই দুঃখে শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে বেদনা-তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। তাই তো তিনি প্রভাতে উঠিয়াই শ্রীমতীর কুঞ্জে আসিয়া আপন অপরাধের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিয়াছেন। চন্দ্রাবলীর নিকট এ বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ কুণ্ঠার কারণ ঘটে নাই। শ্রীমতীর দুঃখ, —যেখানে আনন্দ নাই, সেখানে তোমার যাওয়া কেন? যদিই বা গেলে আমাকে বলিলে না কেন? চন্দ্রাবলীর কোন্ মধুর পরিচর্যায় তুমি পরিতুষ্ট, আমাকে জানাইলে না কেন? হয় আমি সেই সেবা চন্দ্রাবলীর নিকট শিখিয়া লইতাম, নয়তো চন্দ্রাবলীকে সমাদরে আনিয়া তোমার তৃপ্তির জন্য আমারই সমক্ষে তোমার সঙ্গে তাহার মিলন ঘটাইয়া দিতাম। শ্রীরাধার সুদৃঢ় প্রতীতি ছিল,—কৃষ্ণ যেমন আমার সর্বস্ব, আমিও তেমনই কৃষ্ণের সর্বস্ব। আমি স্বেচ্ছায় দান না করিলে অপরে কৃষ্ণকে পাইবে কেন? এই সমস্ত বিষয় কিছু আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কিছু বা আভাসমাত্র ছিল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে পরে এই বিষয়টি আমার নিকট উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। একদিন কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে পুরানো বই-এর গাদায় বই খুঁজিয়া ফিরিতেছি, হাতের কাছে ছোট একখানি গ্রন্থ পাইলাম—নাম "প্রেমসম্পুট"। গ্রন্থখানি লইয়া গিয়া পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয় প্রেমসম্পুটে শ্রীরাধার মানের নিগূঢ় মর্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন। আমার পূর্বোল্লিখিত মতবাদের সমর্থন তাহার মধ্যে পাইয়া আমি পুনঃ পুনঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে প্রণতি নিবেদন করিলাম। প্রেমসম্পুটে বাঁশবাসিনীর ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সমীপে আসিয়া ঐ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিয়াছেন। কোন্ গুণে শ্রীকৃষ্ণকে তুমি এত ভালবাস? শ্রীকৃষ্ণকে তুমি এত ভালবাস, আর শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বঞ্চনা পূর্বক চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রজনী যাপন করিয়াছিলেন, তোমার মনে নাই? উত্তরে শ্রীমতী যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহারই মর্মার্থ উপরে প্রকাশ করিয়াছি।

শ্রীখণ্ডের রাম গোপাল দাস কীর্তনের রসপর্যায়ের একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—নাম "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী"। এই গ্রন্থে পূর্বরাগাদির উদাহরণে তিনি সংস্কৃত শ্লোক না তুলিয়া বাঙ্গালী পদকর্তাগণের রচিত পদ বা পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই দিক্ দিয়া রসকল্প-

বল্লীকে প্রথম পদ সংকলনের গ্রন্থ বলিতে পারি। দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থ "ক্ষণদা-গীত চিন্তামণি"। শ্রীল বিশ্বনাথ এই গ্রন্থে শুক্লা ও কৃষ্ণা-প্রতিপদাদি তিথি অনুসারে যুগল ভজনের উপযোগী পদগুলি সাজাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য কবিদের সঙ্গে এই গ্রন্থে তিনি নিজের রচিত পদও সংকলন করিয়াছেন। পদের ভণিতায় নাম ব্যবহার করিয়াছেন হরিবল্লভ। কেহ বলেন ইহা তাঁহার বেষাশ্রয়ের (ভেক লওয়ার পরের) নাম। আমি এ কথায় বিশ্বাস করি না। অনেকেই করেন না। হরিবল্লভ তাঁহার ছদ্মনাম; পদকার বিশ্বনাথের অপর নাম। প্রসঙ্গত, বলিয়া রাখি ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের কোন পদ নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের মিলন ও সম্ভোগের দিকেই বিশ্বনাথের ঐকান্তিক আবেশ তাঁহার সিদ্ধদশার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। রসপুষ্টির জন্য তিনি শ্রীরাধার মানেরও পদ দিয়াছেন। হরিবল্লভের কয়েকটি পদ তুলিয়া দিলাম।

শ্রীগৌরচন্দ্র ॥ রাগ কেদারা ॥

দেখ দেখ সোই মূরতি ময় মেহ।
কাঞ্চন কাঁতি সুধা জিনি মধুরিম
নয়ন চষক ভরি লেহ॥
শ্যামর বরণ মধুর রস ঔখধি
পূরব যো গোকুলমাহ।
উপজল জগত যুবতী উমতাওল
যা সৌরভ পরবাহ॥
যো রস বরজ গোরী কুচমণ্ডল
মণ্ডন বর করি রাখি।
তে ভেল গৌর গৌড় অব আওল
প্রকট প্রেম-সুর শাখী॥
সকল ভুবন সুখ কীর্তন সম্পদ
মত্ত রহল দিনরাতি।
ভবদব কোন্ কোন্ কলি কলমষ
যাঁহা হরিবল্লভ ভাতি॥

সেই মূর্তিমন্ত জলধরকে দেখ, দেখ। ইহার অমৃত বিনিন্দিত মধুময় কাঞ্চনকান্তি নয়নরূপ পানপাত্র পূর্ণ করিয়া লহ। (মেঘ তো শ্যামল, তবে ইহার সোনার মত বর্ণ হইল কেন?) পূর্বে গোকুলের মধ্যে উদিত হইয়া যে শ্যাম জলধর সুধা সুমধুর সঞ্জীবন ঔষধি বর্ষণ করিয়াছিলেন, যাহার সৌরভ প্রবাহ জগতের যুবতীমণ্ডলীকে উন্মাদিনী করিয়াছে, যে রসরূপ-মৃগমদ ব্রজতরুণীবৃন্দ আপন আপন স্তনমণ্ডলে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুলেপন রূপে মাখিয়া রাখিয়াছিলেন (সেই মেঘই শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি গায়ে মাখিয়া ব্রজবধূগণের প্রেমনির্যাসরূপে) গৌর হইয়া গৌড়মণ্ডলে আসিয়া প্রেম-কল্পতরুরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। আর সকল ভুবনের সুখ-সম্পদ স্বরূপ হরি-কীর্তনে দিবারাত্রি মাতিয়া রহিয়াছেন। শ্রীহরি যেখানে বল্লভরূপে সুপ্রকাশিত (পদকর্তা হরিবল্লভ যেখানে হরিগুণ গান করিতেছেন) সেখানে ভব—(সংসার) দাবানলই বা কোথায়? আর কলির পাপরাশিই বা কোথায়? (উভয়ই বিনষ্ট হইয়াছে।)

শ্রীরাধার প্রতি সখী॥ সুহই॥

সজনি এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
তুয়া অনুরাগ তরঙ্গিণী রঙ্গিণী
কোন করব অব বন্ধ॥
ধৈরজ লাজ কুল তরু ভাঙ্গই
লঙ্ঘই গুরুগিরি রোধে।
মাধব কেলি সুধারস সাগরে
লাগত বিগত বিরোধে॥
করু অভিসার, হার মণি ভূষণ
নীল বসন ধরু অঙ্গে।
এ সুখ যামিনী বিলসহ কামিনী
দামিনী জনু ঘন সঙ্গে॥
তুয়া পথ চাই রাই রাই বলি
গদগদ বিকল পরাণ।

ক্ষণ এক কোটি কোটি যুগ মানত
হরিবল্লভ পরমাণ॥

সজনি এতদিনে আমার সংশয় গেল। রঙ্গিণি, তোমার অনুরাগ তরঙ্গিণীকে এখন কে বন্ধ করিবে? ধৈর্য ও লজ্জারূপ তীর তরুদলকে ভাঙ্গিয়া গুরু গৌরবরূপ পর্বতের অবরোধ লঙ্ঘন করিয়া তোমার অনুরাগ প্রবাহিনী সর্ববিঘ্ন মুক্ত হইয়া এখন মাধবের কেলি রস সাগরে গিয়া মিলিত হইবে। অভিসারে চল, অভিসারোচিত উপযুক্ত হার মণি-ভূষণে অঙ্গ সাজাও, নীলবসন পরিধান কর। কামিনি, এই সুখময়ী যামিনীতে মেঘের সঙ্গে দামিনীর মত শ্যামের অঙ্গে মিলিতা হও। তোমার পথ চাহিয়া সংকেতকুঞ্জে শ্যাম গদগদ বচনে রাই রাই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন। তোমার এক পল বিলম্বকে তাঁহার কোটি কোটি যুগ মনে হইতেছে। পদকর্তা হরিবল্লভ তাহার প্রমাণ।

শ্রীরাধার প্রতি সখীর অনুরোধ॥ কেদারা॥
সুন্দরি কলয় সপদি নিজ চরিতম্।
স্বমতনু কর্মনি বিদুষি রসিক মম্
মাকর্ষসি গুণ কলিতম্॥
নিজ মন্দির মনু— পদ লসদিন্দির
মপি পরিহায় বিলাসী।
অভবদপাস্ত স-মস্ত কলংগর
কন্দর তটবনবাসী॥
ভবদনুরাগ নৃ-পাতিকৃত হা কিম
কারণ বৈরমপারম্।
প্রহরতি মনসিজ ধনু রমনা প্রহি
তং যদমুং কতিবারং॥
জীবয়িতুং যদি কান্ত মনন্ত
গুণালয় মিচ্ছসি কান্তে।
অভিসর সংপ্রতি তং প্রতি ভামিনি
হরিবল্লভ ভণিতান্তে॥

সুন্দরি, বিচার কর একবার আপন স্বভাবের কথা। যে স্বভাব-জাত গুণ-রজ্জুতে বাঁধিয়া কন্দর্প কলানিপুণা তুমি, রসিকেন্দ্র চূড়ামণি ব্রজযুবরাজকে — (সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণকে) সর্বদাই আকর্ষণ করিতেছ। যাঁহার নিজ মন্দির মহালক্ষ্মীর (সৌন্দর্য সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর) লীলানিকেতন, তোমার অঙ্গ-সঙ্গ লাভের লোভে সেই বিলাসী রাজনন্দন (আপনার মহৈশ্বর্য পরিপূর্ণ ভবন ও তাহার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ পূর্বক) গোবর্ধন গিরিতটবনের অধিবাসী হইয়াছেন। তোমার অনুরাগরূপ মহারাজা (তাহাকে বনবাসে পাঠাইয়াও ক্ষান্ত হয় নাই) বৈর-নির্যাতন মানসে অনবরত মদনশর প্রহারে জর্জরিত করিতেছে। হরিবল্লভ বলিতেছেন—হে কান্তে, অনন্ত গুণের আকর সেই কান্তকে যদি বাঁচাইতে চাও, তবে এখনই (আমার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই) তাঁহার নিকট অভিসার কর।

শ্রীরাধার অভিসার॥ বেলোয়ার॥
ধনি ধনি রাধা শশিবদনী।
লোচন অঞ্চল চকিত চলত মণি
কুণ্ডল অলগনি ঝলক বনি॥

মন্দ সুগন্ধ সুশীতল মারুত
ঘুংঘট অঞ্চল নটত রসে।
নাসা মোতিম উড়ু জনু খেলত
বিম্বাধর পর হসনি লসে॥
উর মণিহার তরঙ্গিণী সংগত
কুচযুগ কোক সদা হরিষে।
রাজ হংস সম গমন মনোরম
বল্লভ লোচন সুখ বরিষে॥

চন্দ্রবদনী রাধা ধন্যা, ধন্যা তিনি। (অভিসারে চলিয়াছেন) চকিত নয়ন প্রান্ত এবং চঞ্চল মণি কুণ্ডল পরস্পর সংলগ্ন হইতেছে না, অথচ অপরূপ ঝলক দিতেছে। সুগন্ধে মন্থর সুশীতল মন্দ-পবন মস্তকের বসনাঞ্চল (ঘোমটার প্রান্ত) যেন রসভরে নাচাইতেছে। নাসার নোলকের মুক্তা যেন নক্ষত্রের মত হাস্য লাস্য মণ্ডিত বিম্বাধরের উপর খেলা করিতেছে। বক্ষের মণিহার যেন নদীর প্রবাহ, সেই প্রবাহে স্তনরূপ চক্রবাক যুগল সর্বদাই আনন্দে মিলিত রহিয়াছে। ধনীর চলনভঙ্গী রাজহংসের মত মনোরম, বল্লভের চক্ষে সুখ বর্ষণ করিতেছে।

১৬৭৬ শকাব্দার মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে এই মহাসাধক নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীবৃন্দাবনের পাথরপুরিয়া গ্রামে বিশ্বনাথের মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়। পরে এই সমাধি গোকুলনন্দে স্থানান্তরিত হইয়াছে। শেষ জীবনে গোবর্ধনের নিকট আরিট গ্রামে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য মুকুন্দদাসের সঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর কুটীরেই তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিলেন। এই কুটীরে তিনি গোকুলানন্দ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্রীবিগ্রহ—গোবর্ধন শিলাসহ সম্প্রতি শ্রীরাধাবিনোদ কুঞ্জে বিরাজ করিতেছেন।

এক সময় জয়পুরে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার পূজা শাস্ত্র সম্মত কি না? প্রশ্ন উঠিয়াছিল—শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রুতি প্রস্থান, ন্যায় প্রস্থান এবং স্মৃতি প্রস্থান—এই প্রস্থান-ত্রয়ের উপর ভাষ্য রচনার দ্বারা নিজ মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসকগণকে সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য ও মান্য করা কি সমুচিত? জয়পুর হইতে সমাগত বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া—শ্রীল বিশ্বনাথের শরণাগত হইলে—বিশ্বনাথ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণকে জয়পুরে পাঠাইয়া দেন। শিষ্য পরম্পরায় বলদেব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের সহাধ্যায়ী প্রভু শ্যামানন্দের অধস্তন চতুর্থ শিষ্যের অন্যতম শিষ্য। বিদ্যাভূষণ মহোদয় জয়পুরে গিয়া তথাকার পণ্ডিত মণ্ডলীকে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধার শাস্ত্রীয় প্রামাণ্য বুঝাইয়া দেন। তাহার পর শ্রীগোবিন্দজীর কৃপায় কয়েকদিনের মধ্যেই বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য প্রণয়ন পূর্বক শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অভিমত ও তদনুগত আচার্যগণ প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের দার্শনিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তী বৈষ্ণবগণ বিশ্বনাথের বন্দনা গাহিয়াছেন—

বিশ্বস্য নাথ রূপোঽসৌ ভক্তি বর্ত্ম প্রদর্শনাৎ
ভক্তি চক্রে বর্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্যাখ্যায়া ভবেৎ॥

শ্রাবণের রাত, কিন্তু আকাশভরা জ্যোৎস্নার প্লাবন। মাঝে মাঝে ভাসমান ভেলার মত দু' এক খণ্ড ছিন্ন মেঘ। একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম। ভোরের আগেই ঘুম ভেঙে গেল। ঘর আলোয় আলোময়। প্রথমেই চোখে পড়ল, আমার পশ্চিমের জানালার ওপারে নারকেল সুপারির ঘন বনের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একখানা সুগোল স্বর্ণথালা, দীর্ঘ নৈশ পরিক্রমায় কিঞ্চিৎ ম্লান। হঠাৎ মনে হল, আমারও নৈশ রাউণ্ডের পালাটা আজ সেরে ফেললে হত। বর্ষা ঋতুর মেজাজের ঠিক নেই। কালই হয়তো আবার বৃষ্টিবাদল শুরু হবে। শেওলা ধরা রাস্তাগুলো মারাত্মক রকম পিছল হয়ে উঠবে।

এ হেন মনোরম দৃশ্য দর্শনে যে কোনো লোকের মনে কবিত্বের উদয় হবে, এইটাই স্বাভাবিক। আমার যে এমন একটা অদ্ভুত গদ্যময় 'আইডিয়া' মাথায় এল, তার কারণ মাসে অন্ততঃ একবার ঐ 'রাউণ্ড' কর্মটি আমার অবশ্য কর্তব্য। গভীর রাত্রে সারা জেলময় টহল দিয়ে দেখতে হয়, আমার বিশ্বস্ত প্রহরীকুলের কজন জেগে আছেন।

তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাঁক ঘুরে সেল-ব্লকের দিকে রওনা হয়েছি, কানে এল আবেগ-কম্পিত গভীর কণ্ঠের আবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের 'প্রকাশ' কবিতার কটি লাইন—

* * *

হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো
কহেনি কথা,
ভ্রমর ফিরেছে মাধবী-কুঞ্জে,
তরুরে ঘিরেছে লতা।
এত-যে গোপন মনের মিলন
ভুবনে ভুবনে আছে,
সে-কথা কেমনে হইল প্রকাশ
প্রথম কাহার কাছে।

থমকে দাঁড়ালাম। কে ও! 'স্বদেশী' বাবুরা অনেকেই জেলে আসবার পর হঠাৎ 'কবি' হয়ে ওঠেন, জানি। পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তাঁদের মধ্যে এই জাতীয় কাব্যোচ্ছ্বাস বিচিত্র নয়। কিন্তু বর্তমানে তারা তো কেউ এখানে নেই। সবই সাধারণ শ্রেণীর বন্দী। চীফ হেড ওয়ার্ডার আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিল। বলল, গোপেন পাগলা, হুজুর। সারা রাত ধরেই চলছে। আজ 'পূর্ণমাসী' কিনা?

Lunacy'র উপর Lunar influence আছে শুনেছি। যদি থাকে চন্দ্রের সঙ্গে পাগলের এই জ্ঞাতি সম্পর্কের মূল কোথায় সেসব বিশেষজ্ঞেরা বলতে পারেন। আমরা জেলের লোকেরা লক্ষ্য করেছি, পূর্ণিমার দিনে সমুদ্রে যেমন উত্তাল জোয়ার দেখা দেয়, তেমনি উদ্বেল চাঞ্চল্য জাগে পাগলের মনে। রহস্য ও গভীরতার দিক থেকে উভয়ের হয়তো কোনো মিল আছে। যাই হোক, আমাদের 'মেণ্টাল' ওয়ার্ডের কর্মীরা আগে থেকেই সতর্ক হয়ে থাকেন। বেশীর ভাগ পাগলকে সেদিন সেল-এর বাইরে আনা বারণ। কাছাকাছি যাওয়াটাও নিরাপদ নয়, কি জানি কি ছুঁড়ে বসে। চীফ আমাকে সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিল, এখন আর ওদিকে গিয়ে কাজ নেই, হুজুর।

আমি তখন মুগ্ধ হয়ে শুনছি—

মেঘের মতন আপনার মাঝে
ঘনায়ে আপন ছায়া,
একা বসি কোণে জানিত রচিতে
ঘন-গম্ভীর মায়া।

বললাম, কী আর করবে? চল না, দেখে আসি।

আমাদের দিকে নজর পড়তেই মহা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল গোপেন চ্যাটার্জি—

হয়েছে প্রমাণ, হয়েছে প্রমাণ
হাসিয়া সবাই কহে,
যে কথা রটেছে, একটি বর্ণ
বানানো কাহারো নহে।

"হে', হে', আমার কাছে চালাকি চলবে না, বাবা। সব ধরে ফেলেছি। ...উঃ!"—

সহসা যেন কোন উৎকট যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল। "মেরো না, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে মেরো না..." বলতে বলতে ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ল, সমস্ত দেহটা অসাড় হয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, একটু জল, আমাকে একটু জল দে মতিদা, মতিদা...ও, সে তো নেই।

চীফকে বললাম, জল চাইছে নাকি?

—না, হুজুর, ঐরকম করে মাঝে মাঝে। এখন কি ওর জ্ঞান আছে? শুনেছি, ওর বাড়ির লোকগুলো বড্ড মারধোর করত। সারাদিন বেঁধে রেখে দিত। দেখুন না, শেকলের ঘষা লেগে লেগে বাঁ হাতের ওপর দিকটায় কী রকম ঘা হয়ে গেছে।

গোপেন চ্যাটার্জি নন-ক্রিমিন্যাল ল্যুনাটিক। অর্থাৎ ওর বিরুদ্ধে কোনো ক্রাইম বা অপরাধের অভিযোগ নেই। ওর একমাত্র অপরাধ ও পাগল। কয়েক দিন আগে এস ডি ও'র ওয়ারেণ্ট বলে জেলে ভর্তি হয়েছে। অর্ডার সীটে যে সামান্য পরিচয় আছে, তার থেকে জানা যায়, লোকটি বি-এ পাশ; এক সময়ে স্কুল মাস্টার ছিল। পরে কী কারণে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বই-এর দোকান দিয়েছিল। বছর তিরিশেক বয়স। ঘরে তরুণী স্ত্রী আর বাপের আমলের একটি চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। বছর তিনেক আগে একবার মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। ওষুধপত্র খেয়ে সেরে যায়। কিন্তু লোকটা কোনো দিনই ঠিক স্বাভাবিক নয় খেয়ালী, একগুঁয়ে। অত্যন্ত পড়াশুনোর ঝোঁক।

গত কয়েক মাস ধরে আগের সেই রোগ আবার দেখা দিয়েছে এবং ক্রমশ বেড়ে বেড়ে বর্তমানে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, তাকে বাড়িতে রাখা স্ত্রীর পক্ষে বিপদ-জনক। তাছাড়া চিকিৎসাদির ব্যবস্থা এবং ব্যয় বহনও তার সম্পূর্ণ অসাধ্য। বাধ্য হয়েই তাকে আদালতের স্মরণস্থ হতে হয়েছে।

এস ডি ও মোটামুটি পুলিস তদন্তের

পর আদেশ দিয়েছেন, গোপেন চ্যাটার্জিকে ইণ্ডিয়ান লুন্যাসি অ্যাক্টের দ্বাদশ ধারায় জেল হেফাজতে স্থানান্তরিত করা হউক। সেখানে সে সিভিল সার্জনের অবজার-ভেভশন অর্থাৎ পরীক্ষাধীনে থাকবে। তিনি যথাসময়ে তার অভিমত সহ রিপোর্ট দাখিল করবেন।

রাউণ্ডের পরদিন সকালে অফিসে বসে কাজ করছি। আরদালী এসে জানাল, একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান, সঙ্গে একটি মহিলাও আছেন। ডেকে পাঠালাম। ভদ্রলোকটি প্রায় মধ্যবয়সী। বেশ সপ্রতিভ-ভাবে ঘরে ঢুকে সঙ্গিনীকে দেখিয়ে বললেন, ইনি গোপেন চ্যাটার্জির স্ত্রী। হঠাৎ কণ্ঠে ও চোখে মুখে অনেকখানি উদ্বেগ টেনে এনে প্রশ্ন করলেন, ও কেমন আছে স্যর?

মেয়েটির মুখে বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তার ছায়া চোখে পড়ল না। সাজপোশাকের মধ্যে বাহুল্য না থাকলেও এমন একটি সযত্ন পারিপাট্য লক্ষ্য করলাম, স্বামীর এই অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষে যেটা কেমন যেন বেমানান বলে মনে হল। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ওর কে হন?

—'আমি? মানে গোপেনের? সম্বন্ধী। এর দাদা' বলে তরুণীটির দিকে আঙুল তুলে দেখালেন।

—আপন দাদা?

—আজ্ঞে না; জ্ঞাতি সম্পর্ক। সাক্ষাৎ আপন বলতে এর বিশেষ কেউ নেই। দু একজন যারা আছে, তারাও—বুঝতেই তো পারেন, স্যর—বিপদ দেখে সরে দাঁড়িয়েছে। আমি আর তা পারলাম না। খবর পেয়েই কাজকম্মো ফেলে ছুটে আসতে হল। যাক সে কথা। গোপেনকে আপনারা কবে নাগাদ রাঁচী পাঠাচ্ছেন, স্যর?

—সে এখনো অনেক দেরি।

—'অনেক দেরি!' বেশ কিছুটা নিরাশ হলেন ভদ্রলোক। তরুণীর মুখেও খানিকটা দুর্ভাবনার ছাপ পড়ল। তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ওর সঙ্গে দেখা করতে চান?

জবাব না দিয়ে সে তার জ্ঞাতিদাদার মুখের পানে তাকাল। তিনি বললেন, দেখা করে আর কী হবে! ওসব কি আর চোখে দেখা যায়? আমিই সইতে পারি না, ওতো স্ত্রী, তার ওপরে ছেলেমানুষ।

ওরা উঠে পড়তেই আমি ভদ্রলোককে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, ওকে কি খুব মারধোর করা হত?

দুজনকেই চমকে উঠতে দেখা গেল। চোখেমুখে সুস্পষ্ট ত্রাসের চিহ্ন। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বললেন, না, না; মারধোর কে করবে!

—মতি কে?

—মতি! ও, হ্যাঁ, মতি ওদের চাকর ছিল একসময়ে। কিছুদিন হল, চলে গেছে।

—নিজেই চলে গেছে, না ছাড়িয়ে দেওয় হয়েছে?

—না; মানে কাজেকম্মে গাফিলতি দেখে ও-ই বোধ হয়—

জ্ঞাতি ভগিনীর দিকে তাকিয়ে কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি প্রস্থান করলেন।

ডক্টর মিত্রকে বলতে শুনেছি, প্রতিটি পাগলের পেছনে একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস যেমনি জটিল, তেমনি রহস্যময় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অত্যন্ত মর্মান্তিক। তার অতি সামান্যই আমরা উদ্ধার করতে পারি। পুরোটা যদি পাওয়া যেত, ঐ এক একটি পাগল নিয়ে লেখা যেত এক একখানা মহাভারত।

গোপেন চ্যাটার্জির বিকৃত মানসের পেছনেও যে কোনো দুর্ভেদ্য রহস্য দাঁড়িয়ে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার কোনো আভাসও কি কোনোদিন পাওয়া যাবে না? মতি হয়তো কিছু বলতে পারত। খোঁজ করবার জন্য পুলিসের সাহায্য নেবো কিনা ভাবছি, এমন সময়ে সে নিজেই এল মনিবের সঙ্গে দেখা করতে।

সিভিল সার্জনের নির্দেশে গোপেনকে তখন সেলের বাইরে আনা একদম নিষেধ। মতিকেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। আমার উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না। তবু গেলাম। ওকে দেখেই গর্জে উঠল গোপেন, এই হতভাগা, কোথায় ছিলি অ্যাদ্দিন? তোকে আমি ডিসমিস করবো। এরা আমাকে ধরে ধরে মারে, আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখিস, না?

মতির দু চোখ ছলছল করে উঠল। বলল, এখানে তো আর তারা আসতে পারছে না। এই বাবুরা কত যত্ন করে তোমার দেখা-শুনো করছেন। এদের কথা শুনে আর কটা দিন ঠাণ্ডা হয়ে থাকো। তারপর একটু ভালো হলেই বাড়ি নিয়ে যাবো।

—'বাড়ি!' চোখদুটো কেমন উদাস হয়ে উঠল গোপেন চ্যাটার্জির, 'আমার আমার বাড়ি কোথায়? না, না; বাড়িঘর আমার কিছুই নেই। I have no home?

হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই বলে উঠল, এই যে স্যর, কেমন আছেন?

—ভালো। আপনিও তো আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়ে গেছেন, দেখছি।

'ভালো! কী হবে ভালো হয়ে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল। তারপরেই বলল, আপনারা আমাকে বই পড়তে দেন না কেন?

—বই পড়বেন আপনি?

—হ্যাঁ; আই ওয়াণ্ট টু রিড অ্যাণ্ড রিড

অ্যান্ড নো থিংস হুইচ নোবডি হ্যাজ এভার নোন।

প্রথম দিকে ওর পীড়াপীড়িতে জেল লাইব্রেরী থেকে দু একখানা উপন্যাস পাঠানো হয়েছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল তার একটা পাতাও নেই; ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাইরে উড়িয়ে দিয়েছে। মেট আপত্তি করলে বলেছিল, সব মিছে কথা; ওরা কেউ কিছু জানে না।

চাকরটিকে অফিসে ডেকে এনে দু চারটি প্রশ্ন করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেল।

গোপেনের বাপের আমলের চাকর মতি দাস। অল্প বয়সে মা মারা যাবার পর ও-ই তাকে মানুষ করে তোলে। ছোট থেকেই একটু পাগলাটে ধরনের; নানা রকম উদ্ভট খেয়াল মাথায় লেগেই আছে; আব্দার-উৎপীড়নের অন্ত নেই। অনেক সময় বাপও সেগুলো বরদাস্ত করতে পারতেন না। ওকেই বেশীর ভাগ সইতে হত। তিনি যে-দিন চলে গেলেন, তারপর থেকে সবটাই ঐ চাকরের ঘাড়ে এসে পড়ল।

কর্তা বেঁচে থাকতেই ছেলেকে বি-এ পাশ করিয়ে এই শহরে স্কুলের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ে দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। গোপেন কিছুতেই রাজি হল না। তারপর হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে খুলে বসল এক বইএর দোকান। বেশী করে বই পড়া যাবে। ঐ ছিল প্রধান বাতিক। একটি লোক রাখা হল। দোকান দেখাশুনো সেই করে. ও এক কোণে বসে বসে পড়ে। হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে করে বসল। সেও এক তাজ্জব ব্যাপার। বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিল কোন এক গ্রামে, শহর থেকে দিন-মানের পথ। সেখানেই একটি বাপ-মা মরা পরের বাড়িতে মানুষ হওয়া বয়স্থা মেয়েকে পছন্দ করে রাতারাতি বিয়ে করে নিয়ে এল।

পরদিন থেকে গোপেন একেবারে অন্য মানুষ। আগে কোথায় থাকত তার ঠিক নেই. খাবার সময়েও বাড়ি ফিরত না। এবার আর বাড়ি থেকে বেরোয় না। অনেক দিন দোকানেও যাওয়া হয় না। যখন তখন শোবার ঘরের দরজা বন্ধ। বইএর নেশা পড়ল গিয়ে বউএর উপর। সারাদিন দুজনে মিলে হাসিগল্প, খুনসুড়ি।

বৌ বেচারী বিপদে পড়ল। গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। তার ইচ্ছা রান্না-বান্না, কাজকর্ম করে, মাঝে মাঝে এবাড়ি ওবাড়ি সমবয়সী মেয়েদের সংগেও একটু মেশে, কিন্তু গোপেন ছাড়বার পাত্র নয়। কখনো যদিবা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিংবা জোর জুলুম করে রান্নার দিকে যায়, কিংবা ভাঁড়ার গোছাতে বসে, মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই জোর তলব। একটু দেরি হয়েছে কি, নিজেই এসে তাড়া লাগায়, অনেক সময় হাত ধরে টানাটানি করে। বৌ লজ্জায় মরে যায়, চাপা গলায় বিরক্তি প্রকাশ করে—'আঃ, করছ কি! কাজ রয়েছে না?' 'থাক কাজ' বলে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে যায়। কখনো বারান্দায় নিয়ে বই খুলে বসে, 'শোন না কী সুন্দর লিখেছে এইখানটা?'

মতিরও এসব বাড়াবাড়ি ভাল লাগত না। মাঝে মাঝে বোঝাতে চেষ্টা করত, দোকানটার দিকে নজর না দিলে সব যে যেতে বসেছে। সংসার চলবে কেমন করে? বৌকেও বলত, অত আস্কারা দিও না, বৌদিদিমণি। একটু শক্ত হও। চারদিকে যে নিন্দেয় কান পাতা যায় না।

বৌ কথা বলত না, কিন্তু মুখখানা
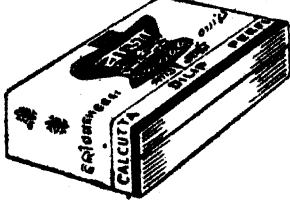
পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠত।

এর পরে শ্রুরু হল মান-অভিমান, তার সংগে ছোটখাটো ঝগড়াঝাটি। গোপেন কোনো কোনো দিন না খেয়েই দোকানে চলে যায়, সংগে সংগে বৌও ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে। মতি দ্রপক্ষকেই ঠান্ডা করবার চেষ্টা করে। দ্র চারদিন ভালোয় ভালোয় কাটে। আবার একদিন কথা বন্ধ: গোপেন রাত কাটায় রাইরের ঘরের তক্তপোষে আর বৌ শোবার ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে পড়ে থাকে।

এই অবস্থা যখন চলছে, তখন এলেন 'শালাবাব্র'। গোপেনের চেয়ে বয়সে বেশ কিছ্রটা বড়, কিন্তু চেহারায় তারুণ্যের জল্রস। অবস্থা ভালো, দিল খোলা, খরচ-পত্রে দরাজ হাত। এদিকে কথাবার্তায় যেমন আমুদে, তেমনি চটপটে। তার সামনে কারো গোমরা ম্রখে থাকবার উপায় নেই।

'শালাবাব্র'র আসবার পরের ইতিহাস বলতে গিয়ে মতি একট্র ইতস্ততঃ করতে লাগল। তাই আমিও আর পীড়াপীড়ি করলাম না। উঠবার আগে অনেকটা যেন কৈফিয়তের স্বরে বলল, ওসব বড় ঘরের বড় ব্যাপার, বাব্র। আমি চাকর, আমার কিছ্র না বলাই উচিত। তবে ছেলেটার জন্যে বড় দ্রঃখ হয়। এতট্রকু থেকে কোলেপিঠে করে মান্রষ করেছি।

'শালাবাব্র' করিতকর্মা লোক। দ্রদিন আদালত মহলে ঘোরাঘ্ররি করেই ব্রঝে ফেললেন যে, পাগলের আসল ভাগ্য-নিয়ন্তা সিভিল সার্জন। তাঁরই কলমের উপর নির্ভর করছে গোপেনের ভবিষ্যৎ গতি-বিধি। খোঁজ নিয়ে জানলেন, তখন ঐ পদটি যিনি অলংকৃত করছেন, তিনি প্রৌঢ় হলেও বিপত্নীক এবং পানাদি বিষয়ে অত্যন্ত উদার। স্রতরাং ভ্রাতি-ভগিনীকে সংগে করে সন্ধ্যার দিকে ঘনঘন তাঁর কুঠিতে গিয়ে আবেদন নিবেদন শ্ররু করলেন 'শালাবাব্র': যাতে করে এই দ্রঃস্থ পরিবারের ম্রখ চেয়ে ছেলেটাকে যত শীঘ্র সম্ভব রাঁচি পাঠিয়ে স্রচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সিভিল সার্জন গোপেনের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে যে-রকম গরম গরম নোট দিতে লাগলেন, তাতেই ব্রঝলাম, শালাবাব্রর তদ্বিরে রীতি-মত ফল হয়েছে। ডাক্তার সাহেবের 'নোট' পড়ে এস ডি ও সাহেবও তৎপর হয়ে উঠলেন এবং রাঁচি মেণ্টাল হসপিটালে একটি বেড সংগ্রহ করতে সাধারণতঃ যতটা সময় লাগে, তার অনেক আগেই গোপেন চ্যাটার্জির জায়গা হয়ে গেল।

গোপেন চলে যাবার কদিন পরে মতি এল আমার সংগে দেখা করতে। এর আগেও মাঝে মাঝে মনিবকে দেখে গেছে এবং আমাকেও দেখা দিয়ে গেছে। এবারে ওর সংগে ছিল দোকানের সরকার। তার হাতে একটা কাগজের বাণ্ডিল। বলল, দোকান ওরা বিক্রী করে দিয়েছেন। একটা টানার মধ্যে এই কাগজগ্রলো ছিল। বাব্র বসে বসে লিখত। আপনার কাছে যদি রেখে দেন—

বললাম, আমি ওগ্রলো দিয়ে কী করবো? কর্মাটি মতির ম্রখের দিকে তাকাতে সে বলল, রেখে দিন বাব্র। যদি কোনো দিন ভালো হয়ে ফিরে আসে।

বাণ্ডিলটা তখনকার মত আমিও ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলাম। কদিন পরে খ্রলে দেখবার কৌত্রহল হল। কয়েক সীট্ আলগা কাগজ। হাতের লেখাটা হিজিবিজি ধরনের। এখানে সেখানে চোখ ব্রলিয়ে মনে হল, ছাড়া ছাড়া গোছের ডায়েরী জাতীয় রচনা। মাঝে মাঝে এক একটা তারিখ বসানো আছে। সেই হিসাবে পর পর সাজিয়ে নিয়ে পড়তে শ্ররু করলাম:—

১২।৮।৪২ মতিদা জিজ্ঞেস করছিল, ও বাব্র আর কতদিন থাকবে। বললাম, আমি কেমন করে জানবো! শ্রনে গজ গজ করতে করতে চলে গেল। তাহলে কি আমার মত ও-ও কিছ্র সন্দেহ করেছে? মন্মথ আর বীণার মধ্যে—না না, এসব আমার ঈর্ষা-কাতর ছোট মনের নীচতা। বীণা আমাকে আর যেন সইতে পারছিল না। I was too much for her, আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মন্মথবাব্র এসে আমাদের দ্রজনকেই ম্রক্তি দিলেন। তাছাড়া ভদ্রলোক ভারী রসিকপ্ররুষ, সংসারে এই রকম হালকা মান্রষের দরকার আছে। আমার মত স্বভাবগম্ভীর serious প্ররুষের কাছে মেয়েরা সহজ হতে পারে না।

২০।৮।৪২ মতিদা বলছিল, পাড়ায় বড্ড নিন্দে হচ্ছে: 'শালাবাব্রকে' এবার চলে যেতে বলা দরকার। আমি হেসে উঠলাম, তা কেমন করে হবে? কুটুম্ব মান্রষ না? ওর চোখ জ্বলে উঠল—কুটুম্ব! সত্যিই বড় বাড়াবাড়ি করছে ওরা। মন্মথ লোকটা ভাল নয়। কিন্তু বীণা? বীণা তাকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছে কেন? তবে কি সে ও?—ছিঃ ছিঃ, এসব কী ভাবছি আমি। বীণা যে একান্ত-ভাবে আমার।

২৫।৮।৪২ নিজের এই সন্দিগ্ধ মনের জন্যে নিজের কাছেই লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু দ্রপ্ররবেলা হঠাৎ এসে পড়ে যা দেখলাম, তাই বা উড়িয়ে দি কেমন করে?

১।৯।৪২ মনে হচ্ছে, বীণা আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। বাধা দেবো কি? না, দেখা

থাক। কিন্তু কেমন করে বুঝবো ওরা কতদূর এগিয়েছে। আমার সামনে তো ওরা নিজেদের মেলে ধরতে পারে না, বরং ইদানীং যেন একটু সাবধান হয়ে চলছে।

এক কাজ করলে কেমন হয়? বছর কয়েক আগে একবার আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বীণা তা জানে। আমার ঠাকুর্দা পাগলা গারদে ছিলেন। সে কথাও ওকে বলেছি। আজ থেকে আমি আবার পাগল হয়ে যাই না কেন? কথাটা নিজের কাছেই বড় হাস্যকর ঠেকছে। তা হোক। তবু একবার দেখতে চাই। সে কি এত ঠুনকো? একবার নিজের চোখে যাচাই করে দেখতে চাই।

দুনিয়া বড় সাবধানী। তার অনাবৃত সত্য রূপ দেখতে হলে আত্মগোপনের প্রয়োজন। আমি তো অদৃশ্য হবার মন্ত্র জানি না। রবীন্দ্রনাথের 'প্রকাশ' কবিতার 'কবি'-ও আমি নই, যাকে দেখে,—

'হেন সংশয় ছিল না কাহারো, সে যে কোনো কথা বোঝে।' আমার হাতে একটি মাত্র উপায় আছে—পাগলের সাজ, নিজেকে গোপন করবার সবচেয়ে সহজ আবরণ।

আর একটা কাজ করতে হবে। মতিকে এখানে রাখা চলবে না। ও এসব বুঝতে পারবে না, ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু ও এই সময়ে আমাকে ফেলে বাড়ি যেতে চাইবে কি? যেমন করে হোক পাঠাতেই হবে।

৭।৯।৪২ আশ্চর্য ফল পেয়েছি। আমার আবরণের সামনে ওদের বিরূপ খুলে পড়ে গেছে। হাসছি, গাইছি, আবোলতাবোল বকছি। বীণা প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় ভেবেছিল, এবার নানারকম উৎপাত শুরু করবো। জিনিসপত্র ভাঙবো, ফেলবো, হয়তো মারধোর করবো। সে-সব কিছু করছি না দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে। মন্মথও খুশী। আমি উৎপাত করতে চাই না, শুধু দেখতে চাই। কিন্তু এ কী দেখছি! এ কী দেখলাম!

আমার শোবার ঘরের দক্ষিণে একটি খোলা বারান্দা আছে। বীণা আসবার পর মৃদু জ্যোৎস্নায় মাদুর বিছিয়ে কত নিভৃত সন্ধ্যা সেখানে আমরা কাটিয়ে দিয়েছি। সন্ধ্যা গড়িয়ে মধ্যরাতের সীমানায় গিয়ে ঠেকেছে, জানতে পারিনি। কাল দেখলাম, সেই মাদুরখানা পেতে ওরাও গিয়ে ঘন হয়ে বসল সেইখানটিতে। আমাকে দেখে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করল না। হেসে উঠলাম, যদিও সে হাসি আমার কানে শোনাল ঠিক কান্নার মত। বীণা চমকে উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল। মন্মথ তাকে আরো নিবিড়ভাবে বেষ্টন করে বলল, কী হল! ভয় পেলে নাকি? আরে ও তো একটা পাগল।

সত্যিই তো, আমি পাগল, আমার কোন অনুভূতি নেই।

১০।৯।৪২ এ আমার কী হল! অভিনয় করতে গিয়ে এ কোন্ ব্যাধি টেনে আনলাম! মাথার মধ্যে কী তীব্র যন্ত্রণা, শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে পড়ছে। ওদের এই স্বচ্ছন্দ প্রণয়লীলা আমি আর সইতে পারছি না। দেখলেই সমস্ত রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে, মাথায় খুন চেপে যায়। সেদিন ছুটে গিয়ে বীণার হাত চেপে ধরেছিলাম। ও চেঁচিয়ে উঠল। মন্মথ দৌড়ে গিয়ে ছাড়িয়ে নিল। আমার মুখের উপর ঘুষি মেরে ফেলে দিল শানের উপর। তারপর সে কি বেপরোয়া লাথি!

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে ওরা যখন ঘুমুচ্ছিল, কোনরকমে দোকানে চলে এসেছি। সর্বশরীরে ব্যথা। তার চেয়ে অনেক বেশী যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। তবে কি সত্যিই আমি পাগল হয়ে যাবো? মতিদা আসছে না কেন? এখনো কি সময় হয়নি? কদিনের ছুটি, তা-ও ভুলে গেছি। কোনো কিছুই যেন মনে করতে পারছি না।

• • •

এর পরে আরো কিছু লেখা আছে। অত্যন্ত অস্পষ্ট, পাঠোদ্ধার করা শক্ত। সম্ভবত গুছিয়ে লিখবার মত মন বা মাথার অবস্থা আর ছিল না। পাগল সেজে দুনিয়াটাকে দেখতে চেয়েছিল গোপেন চ্যাটার্জী; দেখবার পর সত্যিই হয়তো পাগল হয়ে গেল।

গোপেন চলে গেছে প্রায় বছরখানেক। তার কথা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। হঠাৎ রাঁচি মেন্টাল হসপিটাল থেকে একটা চিঠি এসে হাজির। সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানাচ্ছেন, "আপনার জেল থেকে অমুক তারিখে গোপেন চ্যাটার্জী নামে যে এন-সি-এলটিকে এখানে ভর্তি করা হয়েছিল, সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আগামী ১৭ই তারিখে তাকে ফেরৎ পাঠানো হবে। খবরটা যেন তার আত্মীয়স্বজনদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়।"

গোপেনের স্ত্রীর সন্ধানে লোক পাঠালাম। সে ফিরে এসে জানাল, বাড়িতে তালা বন্ধ, প্রতিবেশীরা কেউ কেউ বলেছে, তারা এখানে বরাবর থাকে না, মাঝে মাঝে আসে।

১৭ই সকালের স্টীমারে গোপেনের আসবার কথা। সে এল না। তার বদলে এল তার চিঠি। খামের উপরে কেবল আমার সরকারী পদের উল্লেখ থাকলেও, ভিতরটা ব্যক্তিগত—

শ্রীচরণেষু,

মতিদা একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তার কাছে আপনার কথা শুনলাম। তার থেকে কেন, জানি না, আপনাকে একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছা হল।

আপনি শুনে থাকবেন, আমি ভালো হয়ে গেছি। কিন্তু একথা কেমন করে বোঝাবো, এইটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। তবে এর সব পরিণাম আমি একাই মাথা পেতে নিলাম, আর কাউকে ভোগ করতে দেবো না। দুনিয়াটা এমনিতেই এত জটিল, নিজেকে দিয়ে সে জটিলতা আর বাড়াতে চাই না।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন।

হতভাগ্য গোপেন।

সেইদিনই কিছুক্ষণ পরে মেন্টাল হাসপাতালের টেলিগ্রাম পাওয়া গেল—গত রাত্রে গোপেন চ্যাটার্জীকে তার শয্যার মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা বর্তমানে তদন্তাধীন। ফলাফল যথাসময়ে জানানো হবে।

সুন্দরের
আত্মত্যাগ কি
দেবী
অবহেলা
করতে পারেন?
শ্রীরামচন্দ্রের
অকালবোধন
তাই যুগে যুগে
বাংলার প্রতি ঘরে
এনেছে সৌন্দর্য
আনন্দ ও শান্তি
বোরোলীন
প্রকৃত সৌন্দর্য প্রসাধনী
জি. ডি. ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিঃ

গুণগত মান

—পূর্ণেন্দুকুমার বসু—

তীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে দেশে ভারী শিল্পের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহা জানিতে হইলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থার দিকে নজর দিতে হইবে। আমাদের মোটামুটি ১৮টি দেশের সহিত বাণিজ্যের আদান প্রদান আছে। যখন আমাদের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি কম হয় তখন বৈদেশিক বাণিজ্য সন্তোষজনক। ভারী শিল্পের অবস্থা ঠিক ভাবে জানিতে হইলে আমাদের দেখা প্রয়োজন যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষের দুই বৎসরে আমদানি আর রপ্তানি বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা কি?

নিম্নের তালিকাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা দেখান হইয়াছে।

আমরা বিদেশে পাঠাই বেশীর ভাগ কাঁচা মাল, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি আর আমদানি করি ভারী যন্ত্রপাতি, খাদ্য ইত্যাদি। আমাদের দেশ হইতে যদি আমরা কাঁচা মাল ও খনিজ পদার্থ বেশী পরিমাণে চালান করি তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মহা বিপদের সম্মুখীন হইবে। কাঁচামাল ও খনিজ পদার্থ শিল্পের প্রসারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইবে। এই অবস্থার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। বৈদেশিক রপ্তানি বাণিজ্য বাড়াইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে কাঁচা মাল ও খনিজ সম্পদের পরিবর্তে তৈরী মাল ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিল্পপতিদের চিন্তা করিতে হইবে কি উপায়ে ইহা করা সম্ভব। জাতীয় সরকার এ সম্বন্ধে খুবই সচেতন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনাকালে প্ল্যানিং কমিশন লিখিয়াছেন—

"Considering the requirements on account of repayment obligations and maintenance and development imports it is estimated that by the end of the Fourth Plan the level of exports would have to rise to about Rs. 1300 to Rs. 14.00 crores, that is, to at least twice the present level. This in itself is one of the essential conditions for ensuring that India's economy becomes self-reliant and self-sustaining by Fifth Plan."

১৯৫৯, ১৯৬০ সালের কয়েকটি বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব (লাখ টাকা)

	১৯৫৯			১৯৬০		
	আ	র	বেশী বা কম	আ	র	বেশী বা কম
ইউ, কে	১৮৪১৮	১৭১৭১	– ১২৪৭	২০১৫২	১৭৪৩৯	– ২৭১৩
ইউ, এস, এ	২১৭৮৫	৯৫২৪	– ১১২২৬১	২৪০০২	১০১৬৪	–১৩৮৩৮
জাপান	৪১৭৪	৩৪২৭	– ৭৪৭	৫৪২০	৩৪২৮	– ১৯৯২
পশ্চিম জার্মানী	১২০৩১	১৯৫৬	– ১০৪৪	১৮১৩	৮৬৯	– ৯৪৪
ফ্রান্স	২১৭১	৮২৭	– ১০০৭৫	১১২৭০	১৯৫৯	– ৯৩১১
ইউ, এস, এস, আর	১৭৮৯	৩০০৫	+ ১২১৬	১৩২৭	২৯৯৪	+ ১৬৬৭

এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে আমাদের আরও নতুন জিনিস রপ্তানি করিতে হইবে এবং বর্তমানে যে জিনিসগুলি আমরা রপ্তানি করিতেছি তাহার পরিমাণও বাড়ানোর প্রয়োজন। আমরা যে জিনিসগুলি বর্তমানে বিদেশে পাঠাইতেছি তাহা হইতেছে—

খাদ্য
তামাক ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য
কাঁচা মাল নানা রকমের
খনিজ পদার্থ
যান্ত্রব তৈল সামগ্রী
রসায়নিক দ্রব্য
তৈরী মাল যেমন চামড়া, কাগজ, পাট ও তুলাজাত দ্রব্য ও ধাতুর জিনিস ইত্যাদি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬০৯ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই অঙ্কের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না, এই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৬১৪ কোটি টাকা। ভারত সরকার আশা করিতেছেন যে, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ অন্তত বাড়িয়া ১৪০০ কোটি হইবে, ইহা না হইলে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

ইহা কি উপায়ে করা সম্ভব? ভারী শিল্পের উন্নতির জন্য সরকারী ও বেসরকারী খাতে আরও অর্থ ব্যয় করিতে হইবে এবং শিল্পোৎপাদন আরও বাড়াইতে হইবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে ভারী শিল্পের প্রসারের জন্য মোট ২৯৯৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। শিল্পোৎপাদন বাড়াইতে হইবে কি ভাবে?

আমরা বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পে যাহা উৎপন্ন করিতেছি তাহা বাড়াইলেই কি সমস্যার সমাধান হইবে? না, আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যের 'গুণগত মান' ঠিক থাকে না যাহার জন্য উৎপন্ন দ্রব্য বহির্জগতে চলে না। ইহার উপর যে মূল্যে যে ধরনের জিনিস আমরা বিক্রয়ের জন্য পাঠাই তাহারও অনুপাত ঠিক নহে। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই অনুপাতটি (গুণগত মান/মূল্য) বাড়ানোর চেষ্টা করিতে হইবে। একটি বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে এই কাজটি করা হয়। ইহার নাম 'সামগ্রিক গুণগতমান-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি'। এই প্রবন্ধে এই পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

শিল্পের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উৎপাদনের প্রকরণগুলির সন্তোষজনক ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই প্রকরণগুলি কি? মানুষ, কাঁচামাল, অর্থ, যন্ত্রপাতি ও শক্তি। এই পাঁচটি জিনিসকে সুসংহত করিতে পারিলেই ভারী শিল্পের প্রসার সম্ভব। গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাহায্যে আমরা উপরোক্ত জিনিসগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারি।

সামগ্রিক গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলিতে কি বোঝা যায়? এই বিষয় নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

(১) প্রথমে আমাদের ঠিক করিতে হইবে, আমরা কি ধরনের জিনিস প্রস্তুত করিব?

এই প্রশ্নের সমাধান কে করিতে পারে? যুক্ত বৈঠকে ইহা ঠিক করা উচিত। যে কোন প্রথম পর্যায়ের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগ থাকে যেমন ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, কারিগরী, হিসাব ইত্যাদি। উপরোক্ত প্রশ্নের সমাধান করিতে প্রায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত
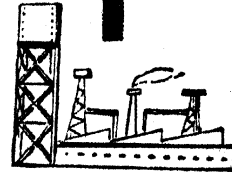
সমস্ত বিভাগগুলির মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। সেইজন্য ইহা একটি উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত। প্রথমে সবদিক চিন্তা করিয়া তবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওয়া আবশ্যক। এই জন্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির এইটাই প্রথম ধাপ।

(২) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিনিস তৈয়ারী করিতে ব্যয় কিরূপ হইবে।

ইহা ঠিক করিতে হইলে আমাদের তৈরীর খরচ এবং সেই সঙ্গে ত্রুটি-বিচ্যুতি বন্ধ করার খরচ এবং তৈরীর সময় যে সমস্ত মাল অপচয় হইবে তাহাও ধরিতে হইবে।

(৩) গুণগত মান অনুযায়ী কাঁচা মালের সরবরাহ।

কোন ভাল জিনিস প্রস্তুত করিতে হইলে আমাদের কাঁচা মালের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে। কোন্ প্রতিষ্ঠান মাল সরবরাহ করিবে এবং কাঁচা মালের গুণগত-মান কি হওয়া উচিত তাহা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঠিক করিয়া দিতে হইবে। এই কাজের জন্য রাশিবিজ্ঞানী ও উৎপাদক ইঞ্জিনীয়ার-এর যুক্ত সাহায্য প্রয়োজন।

(৪) জিনিসটির নক্সা।

কোন জিনিস ঠিক মাপের প্রস্তুত করা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব, সেইজন্য নক্সার সময় জিনিসটির বিভিন্ন অংশের মাপের সঙ্গে কতটুকু বেশী বা কম রাখা সম্ভব তাহারও নির্দেশ দিয়া দিতে হইবে। নক্সাটি যথাযথ ভাবে অংকন করা প্রয়োজন কারণ ইহার উপর তৈরী অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

(৫) সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবহার।

নক্সা অনুযায়ী মাল তৈয়ারী করিতে হইলে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। যন্ত্রপাতিগুলি কিছুদিন অন্তর অন্তর ঠিক মত কাজ করিতেছে কিনা তাহা মিলাইয়া লওয়া দরকার। নচেৎ সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি কিছুদিন পরে স্থূল হইয়া যাইবে এবং যে কাজের জন্য ইহা কেনা হইয়াছে তাহা ঠিকমত করিতে পারিবে না।

(৬) উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা।

যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী থাকে, এই কর্মীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। যেমন যারা সর্বনিম্ন শ্রেণীর কর্মী (Primary Operator) তাদের শিক্ষা প্রণালী এবং ইন্সপেক্টরের শিক্ষা প্রণালী এক রকম হইবে না। বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের শিল্প সম্বন্ধে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু পরিমাণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন নচেৎ শিল্পজাত দ্রব্য কোন রকমেই ভালভাবে তৈয়ারী হইতে পারে না।

(৭) গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ।

শিল্পে এই কাজ দুই ধাপে করা হয়। যখন কোন মেশিনে জিনিস তৈয়ারী হইতেছে তখনই ঠিক করিতে হইবে যে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির যে গুণগত মান পূর্বে ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেইমত তৈয়ারী হইতেছে কিনা? এই কাজ Control Chart-এর সাহায্যে করা হয়। যদি দেখা যায় দ্রব্যগুলির গুণগত মান ঠিক আছে তাহা হইলে মেসিনের কাজ অব্যাহত থাকিবে আর যদি ঠিক না থাকে মেসিনকে পরীক্ষা করিতে হইবে। এই ধাপের কাজকে Process Control বলা হয়।

দ্বিতীয় ধাপটি হইতেছে গুণগত মান সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেওয়া। এই কাজ করা হয় জিনিসটি সম্পূর্ণ তৈয়ারী হইবার পর। ইহাকে বলা হয় Quality Assurance। খরিদ্দাররা শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি চায় যে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মান ঠিক আছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সেই জন্য তৈয়ারী মাল হইতে নমুনা লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে যে, দ্রব্যগুলির গুণগত মান ঠিক আছে কিনা। দ্বিতীয় কাজটা করা হয় Sampling Inspection Plan-এর সাহায্যে। প্রথম কাজটিতে যেমন Process Control করা হয়, দ্বিতীয় কাজটিতে তেমন Product Control করা হয়।

সামগ্রিক গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কয়েকটি মূল কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। এই পদ্ধতির সূচনা হয়, যখন হইতে কোন একটি জিনিস তৈয়ারী করিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হইতেছে আর শেষ হয় যখন সেই জিনিসটি খরিদ্দারের হাতে পোঁছিতেছে। এই কাজ করিবার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রয়োজন। প্রত্যেকটি কর্মীর সচেতন হওয়া প্রয়োজন যে গুণগত-মানসম্পন্ন মাল ব্যতীত কোন মাল যেন কারখানা হইতে বাহির না হয়।

ভারত সরকারের বহির্বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীমনুভাই শাহ ২২শে আগস্ট জানাইয়াছেন যে ভারতীয় পার্লামেন্টে শীঘ্রই গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তিনি একটি বিল উত্থাপন করিবেন। তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ নীচে দিলাম।

"Control over the quality of products is essential before they are put in the market for sale. It is neglect of this factor that has recently brought about a decline in the export of many of India's traditional items. Within the country articles of poor quality are still having sales because of their shortage in the market. Long, pent-up demand and the requirements of a developing economy have resulted in a seller's market within India. But adulterated food stuffs and sub standard drugs are eating into the vitals of the nation. It would have been better if the manufacturers and traders themselves have excercised efficient control over the quality of goods as is done in advanced Countries of the West. But in India it seems that the need for quality control is yet to be impressed on a large section of the business community. They are yet to realise that it is in the long term interest of trade and industry to bring out products of quality. In the face of continuously declining exports of important commodities the Government has no alternative but to enforce their quality through legislation Foreign exchange is very valuable and on no account must the quality of exports be allowed to fall."

(হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ২৫শে আগস্ট, ১৯৬২)

উপরোক্ত মন্তব্য হইতে ভারত সরকারের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইবে।

ভারতবর্ষে বৃহৎ শিল্পের প্রসারের জন্য শিল্পপতিদের কোন্ দিকে নজর দিতে হইবে তাহার আভাস দিতেছি।

শিল্প সংস্থার গঠন ব্যবস্থা এমনভাবে হওয়া উচিৎ যাহাতে সামগ্রিক গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কার্যকরী করা যাইতে পারে। শিল্পের আকার অনুযায়ী সংগঠন

করিতে হইবে। শিল্পের মালিকদের তৈরী মালের মানের জন্য সচেতন হইতে হইবে, তাঁহাদের এই মর্মে ইস্তাহার প্রকাশ করা আবশ্যক। শিল্পে নিযুক্ত সমস্ত কর্মচারীদের উপযুক্ত কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব শিল্পপতিদের লইতে হইবে। যে সমস্ত নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে তাহার ব্যবহার করা দরকার, সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারী শিল্পের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার প্রয়োজন। এই পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহাতে কর্মীরা সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারে সেইজন্য বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করার দরকার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জাপানের অবস্থা কিরূপ ছিল? কুটির শিল্পে ও মাঝারি ধরনের শিল্পে বহুদিন হইতে জাপানীরা পারদর্শী, তাঁরা নানা ধরনের মালও তৈয়ারী করিতেন কিন্তু বহির্বানিজ্যে তাদের মালের কোন সমাদর ছিল না, তাহার কারণ মালের গুণগতমান সম্বন্ধে কোন ঠিক থাকিত না। একজন বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে প্রধান দেশগুলির শিল্পজাত দ্রব্যের গুণগতমান সম্বন্ধে যদি মতামত লওয়া হইত, তাহা হইলে দেখা যাইত তালিকার শীর্ষে সুইজারল্যাণ্ডের নাম আর সবচেয়ে নীচে জাপানের নাম। প্রায় ২৪ বছর পরে জাপানের অবস্থা কি?

"Now two decades later, Japan has climbed that ranking, rung by rung, until it has arrived at a position of respect in most product categories and to a position of leadership in some."

জাপানের শিল্প প্রসারের মূল কথা কি? জাপানীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেখিল যে, পৃথিবীতে যদি তাহাদের ভাল ভাবে বাঁচিতে হয় তাহা হইলে পূর্বেকার শিল্প ব্যবস্থা চালু থাকিলে তাহা কোন মতেই সম্ভব হইবে না। ১৯৪৬-৫০ এর মধ্যে তাহারা বিভিন্ন শিল্পে গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। জাপানে একটি সংস্থা গঠন করা হয় তাহার নাম Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE) ১৯৪৯ সালে। এই সংস্থা ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ঐ বৎসরেই জাপানী সরকার একটি আইনের প্রবর্তন করেন; এই আইনে বলা হইয়াছে যে বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে জাপানী সরকারের JIS মার্ক ব্যতীত কোন মাল পাঠানো যাইবে না। এই JIS মার্ক দেখিলেই বোঝা যাইবে জাপানী সরকার ঐ মালের গুণগত মান সম্বন্ধে সুপারিশ করিতেছেন। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে যদি সামগ্রিক গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু না থাকে তাহাদের কোন শিল্পজাত দ্রব্যে JIS মার্ক দেওয়া হইবে না। শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের মান যাহাতে ক্রমশ উন্নততর হইতে পারে তাহার উৎসাহ দেওয়ার জন্য জাপানী সরকার নানারকম পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রতি বৎসর উপহার দেওয়া হয়। গত ১৫ বৎসরের মধ্যে জাপানে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছে। যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে পুনর্জাগরণ হইয়াছে। তাহারা এখন 'Quality Goods' ব্যতীত কোন কিছু তৈয়ারী করিতে রাজী নয়।

'Attention to quality has become virtually national movement.'

ভারী, মাঝারী ও কুটীর শিল্পে ব্যাপক ভাবে এই পদ্ধতি চালু করা হইয়াছে। সারাদেশে প্রতি বৎসর একটি মাসে উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। এই মাসটিকে বলা হয় 'Quality Month' ঐ সময় প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে একটি 'Q' পতাকা উড়িতে থাকে। কর্মীদের এই মাসে গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। জাপানী সরকার, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় জাপানের বহির্বাণিজ্যের ধারার সম্পূর্ণ রদ্ বদল হইয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের পর জাপানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কি পরিবর্তন হইয়াছে তাহা তাহাদের নিজের ভাষায় বিবৃত করিলাম—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে

"During World War II Japan fought a total war, and when defeated, it found itself maimed with colossal losses. It lost more than 40 p.c. of its territory, and even the remaining four islands were helplessly battered by air raids and bombardments from warships. The nations railway network was entirely disrupted and many people were renders homeless with little food to live on. Production came to a virtual halt. It appeared as if the nations economy had been totally paralysed. The defeat in the war shocked the people into a state of complete apathy." ১৯৬৯ [illegible]

At present there are enough food clothing and food to meet our immediate needs. Neatly dressed workers are commuting to factorise and offices. Fresh fishes, meat and vegetables have replaced cornpone and sweet potatoes on our tables. Major cities are so full of noise generated by automobiles and radios that people are apt to get neurotic. Even in rural districts, television aerials are sticking out from the roofs of farm houses and electric washing machines are replaced beside wells."

জাপানের উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে ভারী শিল্পের যদি স্থায়ী প্রসার আমরা চাই তাহা হইলে অবিলম্বে আমাদের বিভিন্ন শিল্পে সামগ্রিক গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া শিল্পে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীকে 'Quality' সম্বন্ধে সচেতন করার দরকার। এই কাজ করিতে হইলে জাপানের মতন আমাদের দেশেও সরকার, শিল্পপতি ও বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই কাজ যদি আমরা না করিতে পারি জীবনযুদ্ধে আমরা টিঁকিয়া থাকিতে পারিব না।

আনন্দমেলা

শুভেচ্ছা
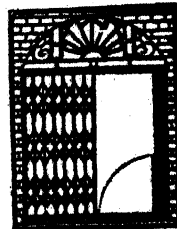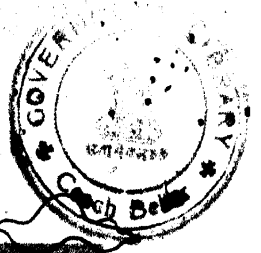
আমার ছোট্ট ও তরুণ বন্ধুরা,

শরৎ এবার বন্যা-বাদল এসেছে মাথায় ক'রে
শরৎ-আলোর বদলে বানের জল গেছে ঢুকে ঘরে!
তাই তো এবার শারদোৎসব জানি না কেমনে হবে
আর্ত-জনের দুঃখের ভাগ কতটুকু কেবা লবে!
তবু আশা মোর উৎসবদিনে তোমরা বন্ধু যতো
ভাগ করে দেবে আনন্দমধু যে-যার সাধ্য মতো।
কাছে ডেকে নেবে দূরে আছে যারা, অভাব-দুঃখ লাজে,
নিজে নয় শুধু সবারে সাজাবে পুজো-উৎসব সাজে।
মুখভরা হাসি ফুটিয়ে জাগারে তোমরা তোলো,
শারদোৎসবে স্বার্থসুখের কথাটাই কিছু ভোলো।
এই কামনাই করি আজ তাই—প্রীতিশুভেচ্ছা সাথে,
'আনন্দমেলা' সাজায়ে দিলাম তোদের সবার হাতে।

—মৌমাছি

—লিখেছেন—

শ্রীযামিনীকান্ত সোম; শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত; শ্রীনরেন্দ্র দেব; শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো); শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র; শ্রীআশা দেবী; শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীবিমল ঘোষ; শ্রীত্রিভঙ্গ রায়; শ্রীসুশীল ঘোষ; নাগার্জুন; শ্রীপ্রভাকর মাঝি; শ্রীঅমিতা ঘোষাল; শ্রীঅজয় গুপ্ত; শ্রীশৈলেন ঘোষ; শ্রীপ্রভাতকুমার বসু; জাদুরত্নাকর এ সি সরকার; শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়; শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত; শ্রীপলাশ মিত্র; শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীপবিত্র সরকার; শ্রীশান্তশীল দাশ; শ্রীসামসুল হক; শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌমাছি।

—ফটো তুলেছেন—

শ্রীরেবন্ত ঘোষ; শ্রীঅজয় মিত্র ও শ্রীতরুণ মুখোপাধ্যায়।

—ছবি এঁকেছেন—

শ্রীবিমল দাস, শ্রীঅহিভূষণ মালিক, শ্রীনারায়ণ দেবনাথ, শ্রীকানাই চক্রবর্তী ও শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত।

স্বর্গ বৈশালী

যামিনীকান্ত সোম

এক বিচিত্র দেশ আর তার বিচিত্র মানুষের কথা শোনাই। দেশটির নাম বৈশালী আর তার মানুষগুলির নাম লিচ্ছবি। এ বহু পুরোতন কথা। এত পুরাতন যে, দেশটি কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে এখন নানা লোকের নানা মত। কেউ বলেন, বৈশালী ছিল মজঃফরপুর জেলায়, কারো মতে এটি ছিল ছাপরা বা সারণ জেলায়, অধিকাংশের মত হলো—বৈশালী ছিল ত্রিহুত জেলায়।

বৈশালী নগর ছিল অতি প্রকাণ্ড। অত বড় নগর তখন ভারতে ছিল না। এখানে নানা জাতির বাস ছিল। সুখ-সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। ধন-ধান্যে ভরপুর ছিল এই দেশ। এখানকার অধিবাসীরা পরম সুখে বাস করতো, কারণ আহার-সামগ্রী এখানে প্রচুর পাওয়া যেতো। স্থানটি ছিল খুব উর্বরা। এখানে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর ও বড় বড় আবাসগৃহ, আরামকুঞ্জ অর্থাৎ বৌদ্ধ বিহার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুষ্করিণীও ছিল।

এই নগরে বহু প্রাসাদ ও তোরণ ছিল। প্রাসাদগুলি ছিল সুউচ্চ ও মনোরম। তোরণ-দ্বার ছিল তিনটি। তিনটি ভাগ বা পরগণা ছিল। প্রত্যেকটি ভাগ ছিল সুবৃহৎ। প্রথম ভাগে সাত হাজার গৃহ ছিল সুবর্ণ মিনারযুক্ত। দ্বিতীয় ভাগে ছিল চৌদ্দ হাজার গৃহ—রৌপ্য মিনারযুক্ত, আর তৃতীয় ভাগে ছিল একুশ হাজার গৃহ—তাম্র মিনারযুক্ত। এমনি অপরূপ ও ঐশ্বর্যপূর্ণ ছিল এই নগর যে, তার বর্ণনা হয় না। এখন সে সব কোথায়? নেই, কিছুই নেই। এখন শুধু গল্পকথা।

এই নগরের নাম বৈশালী হলো কেন? রামায়ণে আছে, ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিশাল এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন বলে এর নাম বৈশালী। এই নগরটি যেমন সুন্দর, এর অধিবাসী মানুষগুলিও ছিল তেমনি সুন্দর। মানুষ-গুলির চরিত্র ছিল কলঙ্কশূন্য ও নিষ্পাপ।

এই সুন্দর দেশের আইন-কানুন প্রজারাই তৈরী করতো, আর প্রজারাই করতো দেশ-শাসন। একজন রাজা হয়ে বসে হুকুম চালিয়ে যাবে, সেটি হবার যো ছিল না এদেশে। লিচ্ছবিরা ছিল অসাধারণ সাহসী ও বীর। এদের মধ্যে একতা ছিল খুব বেশী। এই একতার জন্যই এরা অজেয় ছিল। বেশ একটি নিয়ম ছিল লিচ্ছবিদের ভেতর। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো ঘোর নিনাদে। দামামা বেজে উঠলেই নগরের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়তো যুদ্ধের সাজ-পোশাক পরে। এ রকমটা করা হোত যখন-তখন, নাগরিকদের পরীক্ষা করবার জন্য—তারা শুধু গৃহস্থালী নিয়ে মেতে আছে, না দেশের কাজেও সজাগ আছে। লিচ্ছবিদের ধন-দৌলত দেখে অন্য রাজা এদের অনিষ্ট করবার সুযোগ নিতে চায়। সে জন্য সদাই এরা সজাগ।

এখানে অপরাধীর বিচার করবার রীতিটি ছিল নূতন রকমের। কোন লোক অপরাধ করেছে বলেই তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে দেওয়া হোত না বা কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোত না। তার সম্বন্ধে আগে ভালো করে তদন্ত করা হোত। তদন্ত করা হোত গোপনে। লোকটি অপরাধী বলে মনে হলে তখন তার বিচার হোত।

গঙ্গার ও-পারে লিচ্ছবিদের বাস, আর এ-পারে থাকেন অজাতশত্রু। অজাতশত্রু মগধের রাজা। এঁর নামটি অজাতশত্রু হলে কি হয়, ইনি কিন্তু সকলের সঙ্গে শত্রুতা করেই আনন্দ পেতেন। ইনি নিজের বাপকে মেরে ফেলে রাজা হয়েছিলেন। লিচ্ছবিরা খুব ক্ষমতাশালী আর তাদের মধ্যে খুব একতা। এই দেখে অজাতশত্রুর হলো মহা ভয়। অজাতশত্রুর এক মন্ত্রী ছিল, তার নাম বস্যকার। মন্ত্রীটি ছিল ভারী ধূর্ত। সে একদিন চুপি চুপি

ঘোল ঢেলে তাড়িয়ে দেওয়া হল

অজাতশত্রুকে বললে,—মহারাজ শুনুন এক কথা। লিচ্ছবিদের দেশটা আপনাকে আমি পাইয়ে দিতে পারি, যদি আপনি আমার কথা মতো চলেন। এক কাজ করুন। আপনি আমার মাথাটা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে আপনার রাজ্য থেকে আমায় তাড়িয়ে দিন। তারপর আপনি দেখে নেবেন, আমি লিচ্ছবিদের কি দশা করি।

তাই করা হলো। মন্ত্রী বস্যকারের মাথাটা নেড়া করে আর ঘোল ঢেলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। সে কাঁদতে-কাঁদতে গঙ্গার ও-পারে লিচ্ছবিদের দেশে গিয়ে হাজির হলো। মিথ্যে করে বোঝালো যে, লিচ্ছবিদের পক্ষ নিয়ে বলাতেই রাজা তাকে এভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। লিচ্ছবিরা সরল ও মহৎ প্রাণের লোক। তারা এ কথা বিশ্বাস করে নিলে, আর তাকে তাদের রাজ্যে স্থান দিল। বস্যকার কাজের লোক খুব। সে কিছুদিনের মধ্যে পেয়ে গেল এখানে প্রধান বিচারপতির পদ। এইবার তার আসল কাজ শুরু হলো।

লোকটি যেমন ধড়িবাজ, তেমনি বুদ্ধিমান। সে লিচ্ছবিদের ভেতর দলাদলি সৃষ্টি করতে লাগলো। এমনভাবে সৃষ্টি করলে যে, তা কেউ বুঝতেই পারলে না। ক্রমে একজন আর একজনকে পর ভাবতে লাগলো—শত্রু বলে মনে করতে লাগলো। শেষকালে এই মনোভাবটা দেশময় ছড়িয়ে গেল। তারপর একদিন এই কূট লোকটি যুদ্ধের দামামায় ঘা মারলে। দামামার শব্দে সকলেরই একত্র হওয়া নিয়ম। কিন্তু সেদিন বেশির ভাগই হাজির হলো না। কেন না, তাদের মন ভেঙে গেছে। লোকটি মনে মনে খুশী হলো। তারপর এক চর পাঠিয়ে দিলে অজাতশত্রুর কাছে,—মহারাজ, এইবার আসুন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে।

অজাতশত্রু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গঙ্গা পার হলেন। বৈশালীতে রণভেরী বেজে উঠলো। কিন্তু কই! লিচ্ছবিরা তো যুদ্ধের আনন্দে নেচে উঠলো না।

রাজা অজাতশত্রু হাতি, ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আট ঘোড়ার রথে চড়ে সদর্পে নগরে প্রবেশ করলেন, বিজয়ী সম্রাটের মতো। তাঁর সৈনারা বৈশালীর দুর্গগুলি অধিকার করে নিলে। বৈশালীর পতন হলো। লিচ্ছবিদের এবার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। শেষে তারা অজাতশত্রুর কাছে হার মেনে, আর কর দিতে স্বীকার করে রেহাই পেল। এমন যে সুন্দর দেশ আর এমন যে স্বাধীন ব্যবস্থা, সবই গেল নষ্ট হয়ে কেবল একজন ধূর্ত লোকের কারসাজিতে, আর একতার অভাবে।

প্রথম কিরণ

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

হালকা হাওয়ায় দুলছে কাশের বন
হলুদ রোদ জ্বলছে সারাক্ষণ
পুকুর নদী টইটুম্বুর জলে
গুটিকয়েক বোঝাই নৌকো চলে—
মেঘের দেশে হাসিখুশির মেলা
নীল আকাশে লুকোচুরির খেলা,
ঘুড়ির মত উড়ছে কিছু পাখি
নামছে না ত যতই কেন ডাকি—
নুয়ে পড়ছে শিউলিফুলের ডাল
ঘরে বাইরে আনন্দ উত্তাল,
ঐ শোনো হে ছুটির ঘণ্টা বাজে
এখন আমার মন লাগে না কাজে...
ফুল কুড়োবো, ঘর সাজাবো ফুলে,
এই ক'দিন আর যাবো না ইস্কুলে।..

শাপ, না, বর

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

হস্তিনার রাজা পরীক্ষিতের মৃগয়ার ভারী শখ। লোকলস্কর সঙ্গে নিয়েই তিনি মৃগয়া করতে বেরুতেন। কিন্তু শিকারের নেশায় সকলকে পেছনে ফেলে ধনুর্বাণ হাতে একলাই এগিয়ে পড়তেন।

একদিন লোকজনদের ফেলে তিনি একটা হরিণের পেছনে ধাওয়া করছেন। হরিণটিও লাফিয়ে লাফিয়ে এ-পথ ছেড়ে ও-পথে এ-বন থেকে ও-বনে পালাচ্ছে। পরীক্ষিত কিছুতেই হরিণটির নাগাল পাচ্ছেন না, হাতের কাছের শিকার ছুড়তেও পারছেন না। কিছুক্ষণ এইভাবে ছুটোছুটি করার পর তিনি হাঁপিয়ে পড়লেন; জলতৃষ্ণায় তাঁর গলাও শুকিয়ে কাঠ হলো। শিকারের আশা ছেড়ে দিয়ে তখন তিনি জলের খোঁজ করতে লাগলেন।

এদিক-সেদিক ঘুরেও জল পাওয়া গেল না। কিন্তু কিছু দূরেই দেখা গেল একটি কুটীর, আর তার সামনে গাছতলায় একজন লোক বসে। পরীক্ষিত সেই লোকটির কাছে গিয়ে জল চাইলেন। কিন্তু লোকটির হাঁ হুঁ কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। যেভাবে তাঁকে দেখা গিয়েছিল সেইভাবেই তিনি চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলেন।

সেই গাছতলায় যাঁকে দেখা গিয়েছিল আসলে তিনি এক মুনি। নাম তাঁর শমীক। তিনি চোখ বুজে ধ্যান করছিলেন, আর ধ্যান করতে করতে একেবারে তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন। পরীক্ষিতকে তিনি দেখতেও পাননি, তাঁর কথাও তাঁর কানে যায়নি।

পরীক্ষিত শমীক-মুনিকে চিনতেন না, তিনি যে ধ্যান করছিলেন তা-ও বুঝতে পারেননি। তিনি ভাবলেন—ইচ্ছা করেই লোকটি সাড়াশব্দ দিচ্ছেন না। এতে যে অতিথিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, আর তা করে অতিথিসেবার নিয়মভঙ্গও করা হচ্ছে! সে-নিয়ম যাতে রাজ্যের সকলেই মেনে চলে তা দেখাও তো তাঁর নিজের কর্তব্য। কিভাবে তিনি সে-কর্তব্য পালন করবেন তাই ভাবতে গিয়ে তাঁর নজরে পড়ল একটা মরা সাপ রাস্তার একপাশে পড়ে রয়েছে। তিনি লোকটির অন্যায় কাজের জন্য সাজা দিতে গিয়ে সেই সাপটাকে ধনুকের মাথায় তুলে নিলেন; তারপর লোকটির গলায় সেটা জড়িয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

শমীক-মুনির ছেলে শৃঙ্গীর বন্ধু কৃশ সেই পথে তখন যাচ্ছিল। ঘটনাটা সে দেখতে পেলো। পরীক্ষিতকেও চিনতে পারল। শৃঙ্গী বনে কাঠ যোগাড় করতে গিয়েছিল। কৃশ ছুটে গিয়ে বন্ধুর কাছে সমস্ত কথা বলল। শুনে শৃঙ্গী রাগে আগুন হয়ে উঠল। সে সূর্যের দিকে দু-হাত তুলে বলে উঠল—"এত বড় অন্যায় কাজ যে করেছে আজ থেকে সাতদিনের মধ্যেই তক্ষক-সাপের কামড়ে যেন তার মৃত্যু হয়।" এ অভিশাপ দিয়েও শৃঙ্গীর মনে শান্তি হলো না। কাঁদতে কাঁদতে বাপের কাছে ছুটে গেল।

কান্নার শব্দে শমীক-মুনির ধ্যান ভেঙে গেল। তিনি ছেলের মুখে সমস্ত কথা শুনে বললেন,—"ছিঃ, ছিঃ, এ কি করেছ তুমি! ঋষিকুমার তুমি, তোমার মনে রাগ বা হিংসা থাকবে কেন? আর, সেই হিংসাও করলে কাকে?—না, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ-সিংহাসনে যিনি বসেছেন সেই পরীক্ষিত রাজাকে! তুমি কি জান না, সেই রাজার পুণ্যেই রাজ্যের লোকের কোনো দুঃখকষ্ট নেই, আমাদের মত লোকেরও কোনো-কিছুরই ভাবনা-চিন্তা করতে হয় না। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন নিশ্চয়ই কোনো দরকারে। আমি ধ্যানে ছিলুম বলে কিছুই জানতে পারিনি, তাঁর আদরযত্ন করা হয়নি। সেজন্য কি আমারও অপরাধ কম হয়েছে?

সাপটাকে ধনুকের মাথায় তুলে লোকটির গলায় জড়িয়ে দিলেন

রাজা আমাকে উপযুক্ত সাজাই দিয়েছেন। তুমি তার প্রতিশোধ নিলে অন্যায়ভাবে তাঁকে শাপ দিয়ে? এতে যে তোমারও গুরুতর অপরাধ হয়েছে। সে অপরাধের কথা রাজাকে তো জানানো দরকার। আচ্ছা, সে ব্যবস্থা আমিই করছি।"—এই বলে শমীক-মুনি তাঁর শিষ্য গৌরমুখকে ডেকে বললেন,—"তুমি হস্তিনায় গিয়ে রাজাকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ে তাঁর মঙ্গল জেনে এসো। আমার বুদ্ধিহীন পুত্রের অভিশাপের কথাও তাঁকে জানিয়ে বলে এসো—সাতটাদিন যেন তিনি সাবধানে থাকেন।"

শমীক-মুনির কাছ থেকে চলে আসার পরই পরীক্ষিতের মনে অনুতাপ হলো—হায় হায়, এ কি করলুম আমি! দোষগুণের বিচার না করেই আমি একজন লোককে সাজা দিলুম! এতে যে আমারই অপরাধ হলো। সে অপরাধের সাজা তো আমার পাওয়া উচিত।

পরীক্ষিত এই কথা ভাবছেন, এমন সময়ে গৌরমুখ এসে গুরুর উপদেশমত সমস্ত কথা তাঁকে জানালো। শৃঙ্গীর অভিশাপের কথা শুনে পরীক্ষিতের মনে হলো—এ কি মুনিপুত্রের শাপ, না, বর? আমি রাজধর্ম পালনের অহংকারে মহা অধর্ম করে এসেছি। তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য মুনিপুত্রের বাক্য সফল হোক, তাঁর শাপ আমার পাপের সাজা দিয়ে বর-লাভেরই ফল দিক।—এই কথা ভেবে তিনি রাজসিংহাসন ছেড়ে মাটিতে বসে পড়লেন। পাত্রমিত্রদের ডেকেও বললেন,—"ভগবানের দয়ায় আমার রাজকার্যের মোহ ঘুচেছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এ-আসনে বসার অধিকার আমার নেই। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি গঙ্গাতীরে গিয়ে বাস করব। সেখানে ভগবানের মহিমা শুনতে শুনতে যাতে প্রাণত্যাগ করতে পারি—আপনারা সে-ব্যবস্থা করুন।"

পরীক্ষিত সত্যিসত্যিই সিংহাসন ছেড়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে অনাহারে অনিদ্রায় বাস করতে লাগলেন। রাজ্যের মুনিঋষিরা তাঁর কাছে এসে ধর্মকথা শোনাতে লাগলেন।

শৃঙ্গীর অভিশাপে সাতদিনের মধ্যেই পরীক্ষিতের মৃত্যু হওয়ার কথা। একে একে সে-সাতদিন তো শেষ হয়ে এলো। কিন্তু কোথায় তক্ষক-নাগ? পরীক্ষিতের মনে চিন্তা হলো—এখনও যে মুনিপুত্রের শাপ ফলছে না! এ-জন্মে কি আমার পাপের শাস্তি হবে না? তাঁর সে-চিন্তা মনে হতেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি রাজাকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন; হাতেও নিয়ে এসেছেন আশীর্বাদী ফুল। পরীক্ষিত সে-আশীর্বাদ নিতে ব্রাহ্মণের পায়ের তলায় মাথা পেতে দিলেন। সে সময়েও তাঁর মনে হচ্ছিল—ঋষিপুত্রের শাপ যেন ব্যর্থ না হয়। আমার মাথার এই আশীর্বাদী ফুলই যেন তক্ষক-নাগ হয়ে আমাকে দংশন করে।

পরীক্ষিতের এ-কামনা সফল হলো। তাঁর মাথার ফুল থেকে কিল্‌বিল্ করে বেরিয়ে এলো একটা পোকা। দেখতে-না-দেখতে সে পোকাটি হয়ে পড়ল সাপের ছানা। তারপরই তা বাড়তে বাড়তে হলো এক তক্ষক-নাগ,—রক্তবর্ণ চক্ষুদুটি তার, জিভ বের করে কামারের হাঁপরের শব্দ করছে মুখে, ছাতার মত প্রকাণ্ড ফণা তুলে দাঁড়িয়ে উঠে তক্ষক-নাগ পরীক্ষিতের তালুতে দংশন করল। কালনাগের বিষে পরীক্ষিত সেখানে ঢলে পড়লেন।

মৃত্যুর সময়ে তাঁর মনে সান্ত্বনা হলো—ঋষিপুত্রের শাপে এজন্মেই তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল। সে-শাপ বর বলেই তিনি মেনে নিলেন।

(শেষাংশ—পরের পাতায়)

[এই নাটকে আছে লংকা বংকা দু'টি যমজ ছেলে। তাদের বাপী, মা-মণি, বন্ধুরা আর একটি কানা বুড়ো (একজন ছদ্মবেশী লক্ষপতি) স্থানঃ শহরের কোনো পাড়ার একটি গলি। সময়ঃ বিকেল। দৃশ্যঃ গলি দিয়ে নানা রকমের লোক যাতায়াত করছে। অনেক ফেরিওয়ালা হে'কে যাচ্ছে। বেল বাজাতে বাজাতে সাইকেলে কেউ চলেছে। দূরে মোটরের হর্ন শোনা যাচ্ছে। একদল ছেলে হৈ-চৈ করে গলির ভিতর ছুটে এল।]

ছেলেরাঃ লংকা ভাই! বংকা ভাই! কোথায় তোমরা? আজ কি ক্রিকেট খেলবে না?

লংকা বংকাঃ (বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে) না। গলিতে আর ক্রিকেট খেলা হবে না।

ছেলেরাঃ কেন?

বংকাঃ মা-মণি নিষেধ করেছেন। সেদিন বল মারতে গিয়ে ব্রিজুটা এমন তাড়ু হাঁকড়েছিল যে, বলটা সজোরে গিয়ে দত্ত-বাড়ির বৈঠকখানার কাঁচের সার্সিতে লাগে। কাঁচ ভেঙে চুরমার।

লংকাঃ দত্তবাবুরা রেগে গিয়ে বাপীর কাছে এসে নালিশ করে। বাপীকে তাই লজ্জায় পড়ে নিজে মিস্ত্রী ডেকে পয়সা খরচ করে নতুন কাঁচ লাগাতে হয়েছে। গলিতে বল খেলতে তাই বাপীও বারণ করেছেন।

ছেলেরাঃ (হতাশ ভাবে) তবে চল্, আমাদের পাড়ার পাল্তির মাঠে যে স্বদেশী-মেলা বসেছে, দেখে আসি গে চল্। ঠাকুমার কাছে পয়সা চেয়ে এনেছি। চীনে বাদাম, চানাচুর, আলুকাবলি খাবো। মজা করে নাগরদোলায় ঘুরবো। চল্। ফেরবার সময় বাঁশি কিনে আনবো।

বংকাঃ না ভাই। তোমরা যাও। আমরা যাবো না।

লংকাঃ আমাদের তো ঠাকুমা নেই। পয়সা দেবে কে?

ছেলেরাঃ আরে চল না। তোদের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে নেব।

লংকাঃ না ভাই। তোমরা যাও। চোরের মতো লুকিয়ে ঢুকবো না সেখানে।

বংকাঃ আমরা অমন করে মেলায় যেতে চাই না।

একটি ছেলেঃ মেলায় যেতেও কি মা-মণি মানা করেছেন? দেখ, মা ঠাকুমার কথা শুনে চলতে গেলে জীবনে কিছুই করা যায় না!

২য় ছেলেঃ ঠিক বলেছিস ভাই! ও'রা বলেন, এই চড়চড়ে দুপুর রোদে তোরা ঘর থেকে কোথাও বেরুস নি—সর্দিগর্মি হবে!

৩য় ছেলেঃ আবার বলেন, এত বৃষ্টিতে

ওরা আজ স্বদেশী মেলায় যেতে চায়

যেন বাইরে গিয়ে ভিজিস নি, সর্দি হবে জ্বর হবে—

৪র্থ ছেলেঃ আর ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াতে গেলে বলেন—নেমে আয়, নেমে আয়! ন্যাড়া ছাদ—পড়লে আর বাঁচবিনে।

৫ম ছেলেঃ আরে ভাই ছুটতেও মানা! বলেন, অমন কোরে ছুটিস নি! মুখ থুবড়ে পড়বি আর মরবি!

৬ষ্ঠ ছেলেঃ দেখিস্ না, দেওয়ালীতে বাজি পোড়াতে গেলে ধমকে ওঠেন, বলেন, ফেলে দে খোকন, রংমশাল ফেলে দে। লাল নীল দেশলাই জ্বালাসনি! জামা কাপড়ে যদি আগুন ধরে যায় আর রক্ষে পাবিনি!

লংকাঃ ও'রা বলেন এসব আমাদের ভালর জন্যই।

১ম ছেলেঃ তাহ'লে তো খেলাধুলো সব বন্ধ করে ঘরের ভেতর মায়ের কোল জুড়ে থাকতে হয়।

বংকাঃ তা কেন থাকবে? বাড়ির ভেতর বসে খেলা যায় এমনও তো অনেক খেলা আছে। খেললেই পারো।

২য় ছেলেঃ তাহ'লে শরীর স্বাস্থ্য কোনও-দিনই আর ভাল হবে না।

লংকাঃ কেন ব্যায়াম করবে। ডনবৈঠক দেবে, মুগুর ভাঁজবে—

৩য় ছেলেঃ তাহ'লে মুগুরই ভাঁজো তোমরা। আমরা চললুম মেলা দেখতে।

(ছেলের দলের হৈ হৈ করে প্রস্থান)

বংকাঃ আচ্ছা লংকা, মা-মণি তো সত্যিই মেলায় যেতে আমাদের নিষেধ করেন নি?

লংকাঃ কি করে যাবি? মাথা পিছু দু'আনা ক'রে টিকিট। তাছাড়া যদি নাগরদোলায় বসে ঘুরতে চাস আরও এক আনা! এ ছাড়া চীনে বাদাম, চানাচুর, ঘুগনি-দানা, আলু-কাবলি, ফুচ্কা এ সবও তো দেখলে খেতে ইচ্ছে হবে! তারপর কিছু কিনে আনবারও তো লোভ হবে—যেমন, বাঁশি, লাট্টু, লাটাই—

বংকাঃ চ'না—মা-মণিকে ব'লে কিছু পয়সা চেয়ে নিয়ে যাই। আমার কিন্তু ভীষণ নাগরদোলায় বসে ঘোরবার ইচ্ছে হয়!

লংকাঃ আর আমার বুঝি হয় না? তবে নাগরদোলায় বসে নয়, আমি চাই মেরি গো-রাউণ্ডের ঘোড়ার পিঠে চড়ে চাবুক হাঁকড়ে ঘুরতে—

বংকাঃ চল না, একবার মা-মণিকে গিয়ে বলি—

লংকাঃ চ'ল্। কিন্তু আমার মনে হয় মা-মণি বলবেন,—তোমাদের বাপীকে জিজ্ঞেস করো—

বংকাঃ তবেই তো সেরেছে! চল্ তবু দেখি একবার চেষ্টা করে— **(উভয়ের প্রস্থান)**

দৃশ্যঃ বাড়ির ভিতর মা-মণির ঘর। মা-মণি সেলাই বোনায় ব্যস্ত। লংকা বংকা এল।

লংকাঃ মা-মণি! জানো? আমাদের বন্ধুরা আজও বল খেলতে এসেছিল—

বংকাঃ কিন্তু, তুমি গলিতে খেলতে বারণ করেছো বলে আমরা খেলিনি—

মা-মণিঃ বেশ করেছো। লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে! মা-বাবার কথা শুনলে ভালই হবে।

লংকাঃ মা-মণি! ওরা সব 'স্বদেশী মেলা' দেখতে গেল। তুমি কিছু পয়সা দাও না, তা হ'লে আমরাও যাই—

মা-মণিঃ তোরা মেলায় গিয়ে কী করবি? সেখানে তো শুধু দোকান-পসার হাট-বাজার—

বংকাঃ না মা, ম্যাজিক, জিমন্যাস্টিক, নাচ-গান, বাজনা, কবির লড়াই, থিয়েটার-যাত্রা আরও কত কি আছে। তাছাড়া নাগর-দোলা, মেরি গো রাউণ্ড, থ্রাই ইরোর লাক্—

লংকাঃ আর, আমাদের দেশে কত রকম জিনিস তৈরি হচ্ছে এটাও দেখে আসবো—

মা-মণিঃ সবই তো বুঝলুম। কিন্তু তোমাদের বাপীকে না-বলে—

(বাপীর প্রবেশ)

বাপীঃ কী, মতলব কি—ভাকাতদলের?

মা-মণিঃ ওরা আজ স্বদেশী মেলায় যেতে

(শাপ না বর—শেষাংশ)

পরীক্ষিতের নিকটে ব্রাহ্মণের বেশে এসে-ছিলেন যুগের রাজা স্বয়ং কলি। শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছেন, পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থান করেছেন, পৃথিবীতে তখন কলিরই রাজত্ব। কলি সুযোগ খুঁজছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে ঠাঁই নিতে। তাঁরই প্রভাবে পরীক্ষিতের বুদ্ধিনাশ হলো—তিনি শমীক-মুনির গলায় পরিয়ে দিলেন মরা সাপ; আর ঋষিপুত্র শৃঙ্গীও আশ্রমের ধর্ম ভুলে পরীক্ষিতকে দিল অভিশাপ। এই সুযোগে কলি নিজেই ব্রাহ্মণের বেশে এসে কাজ হাসিল করে গেলেন।

এরপরই শুরু হলো পৃথিবীতে কলি-রাজের দাপট।

চায়। আমার কাছে পয়সা চাইছিল—

বাপী: একটি পয়সাও দিও না। সেদিন বাবুদের কাঁচভাঙার দন্ড দিয়েছি। আবার পয়সা চাইছে? যেতে হবে না মেলায়— **(লংকা বংকার ভয়ে পলায়ন)**

মা-মণি: ওরা বলছিল মেলায় নাকি হরেক রকম স্বদেশী জিনিস এসেছে, একবার গেলে হ'ত না? সংসারের দরকারী জিনিস যদি কিছু সস্তায় পাই—

বাপী: ও কাজ কোর না। একদিন গেলেই, তোমার ছেলেরা পাঁচদিন যেতে চাইবে। ওরকম আস্কারা দিয়ে ছেলেদের মাথাটি খেও না। দিন তো ওদের পালাচ্ছে না। বড় হয়ে নিজেরাই সব দেখবে—এখন আমাকে কিছু খেতে দেবে চলো—

(উভয়ের প্রস্থান)

দৃশ্য: মেলার পথ। সেই পথ দিয়ে স্কুলের ছেলেরা বাড়ি ফিরছে। লংকা বংকাও ফিরছে। এমন সময় দেখতে পেলে একটি কানা বুড়োমানুষ রাস্তা পার হবার চেষ্টা করেও পারছে না। অসংখ্য গাড়িঘোড়া আর মানুষের ভিড়। লংকা বংকা বুড়োকে দেখতে পেয়ে তার কাছে এল। তার হাতে নিজেদের জলখাবারের বাঁচানো পয়সা ক'টি দিলে।

কানাবুড়ো: জয় হোক, ভগবান তোমাদের ভাল করবেন।

লংকা: আপনি কি রাস্তা পার হ'তে চান? চলুন আপনাকে আমরা ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি—

(লংকা বংকা দু'জনে বুড়োর দু'হাত ধরলে)

কানাবুড়ো: তোমরা কে বাবা? বড় ভাল ছেলে তো! চলো বাবা নিয়ে চলো—

বংকা: **(পথ পার হ'তে হ'তে)** আপনি কার সঙ্গে মেলায় এসেছিলেন?

কানাবুড়ো: আমার ছেলের সঙ্গে। কিন্তু সে নাগরদোলায় চড়ে আর নামছে না। এদিকে বেলা পড়ে এলো। এইবেলা না-ফিরলে আমি অন্ধকারে আর যেতে পারবো না।

বংকা: আপনার ছেলে বুঝি নাগরদোলায় চড়তে খুব ভালবাসে?

লংকা ও বংকা বাঁশি ও ঢোল বাজিয়ে নাচছে

বংকা: আমরাও নাগরদোলায় চড়তে ভালবাসি।

কানাবুড়ো: মেলা দেখতে গিয়ে তোমরা কি নাগরদোলায় চড়োনি?

লংকা: মেলায় তো আমাদের যাওয়া হয়নি। বাপী বারণ করেছেন।

কানাবুড়ো: সে কি? মেলা যে কাল হয়েই বন্ধ হয়ে যাবে! চলো, কাল তোমাদের আমি মেলায় নিয়ে যাবো।

বংকা: পয়সা কোথা পাবো? জলখাবারের পয়সা জমাচ্ছিলুম। সে তো তোমায় দিয়ে দিলুম। তাছাড়া মা-মণি আর বাপী আমাদের যেতে দেবেন না।

কানাবুড়ো: ও! তাই নাকি? আচ্ছা, তোমাদের বাড়ি এখান থেকে কতদূর?

লংকা: খুব কাছে। একেবারে মেলার পাশেই বললে হয়।

বংকা: কাল কি সত্যিই মেলার শেষ দিন? তবে আর আমাদের যাওয়া হল না।

কানাবুড়ো: নিশ্চয় হবে। চলো, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে চলো আগে। আমি তোমার মা-মণিকে আর বাপীকে বলে রাজী করাবো।

দৃশ্য: লংকা বংকাদের বাড়ির শোবার ঘর।
সময়: রাত্রিবেলা। লংকা বংকা বাঁশি ও ঢোল বাজিয়ে নাচছে। মা-মণি ছুটে এলেন।

মা-মণি: এ কী হচ্ছে এত রাত্রে? পাড়ার ছেলেমেয়ের ঘুম ভেঙে যাবে যে!

লংকা বংকা: **(মাকে আহ্লাদে জড়িয়ে ধরে)** কী চমৎকার মেলা দেখে এলুম মা! তুমি গেলে না! তোমার জন্য মন কেমন করছিল। এই নাও তোমার জন্য কাঞ্চন-নগরের সুপুরিকাটা জাঁতি এনেছি—

মা-মণি: এত পয়সা পেলি কোথা? ঢোল, বাঁশি, জাঁতি—

লংকা: সব—সব সেই কানাবুড়ো মানুষটি, যিনি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, তিনি কিনে দিয়েছেন। এই দেখ এয়ার-গান', এই দেখ 'পিস্তল'—আরও অনেক খেলনা পেয়েছি।

বংকা: জানো মা-মণি, আমরা আজ নাগরদোলায় দু'শো পাক ঘুরেছি।

মা-মণি: ওমা! বলিস কিরে? দু'শো পাক! মাথা ঘুরছে না তো? শুয়ে পড়, শুয়ে পড়। ওই জন্যেই মেলা যেতে দিতে চাইনি। কোথাকার এক কানাবুড়ো এসে বললে, অমনি তোমাদের ছেড়ে দিলে তোমাদের বাপী!

(বাপীর প্রবেশ)

বাপী: কানাবুড়ো বড় যে সে লোক নয়! বুঝলে? বুড়ো শিবঠাকুরও তো ভিখিরি। মা অন্নপূর্ণা তাঁকে দু'হাত ভরে অন্ন দেন। কানাবুড়ো সত্যি কানা নয়। কানা সেজেছিলেন।

লংকা বংকা: কেন বাপী, কানা সেজেছিলেন কেন?

মা-মণি: কে ও লোকটি?

বাপী: ওই তো মেলার মালিক। মস্ত বড় লোক। ছদ্মবেশে রোজ মেলায় এসে দেখে—কোথাও কেউ কিছু অন্যায় করছে কি না। লংকা-বংকাকে ওঁর খুব ভাল লেগেছে। ওরা কানাবুড়ো ভিখিরি দেখে, মেলায় যাবার জন্য ওদের জলখাবারের জমানো পয়সা সমস্ত বুড়োকে দিয়েছিল। হাত ধরে দু'ভাই ওকে রাস্তা পার করে দিয়েছিল—বুড়ো তাই ভারি খুশী—

মা-মণি: সৎকাজের পুণ্যফল এমনি করেই হাতে হাতে পাওয়া যায়!

[যবনিকা]

শরতের দিনে | অশা দেবী

শরতের দিনে শহরের পথে দুপুরের রোদ জ্বলে
দামাল হাওয়ায় শালপাতা উড়ে যায়,
ছবি ভাসে চোখে কোন দূরদেশে নীল পাহাড়ের তলে,
নিদালী নদীর কালো জল ছলকায়।
দুই পাড়ে তার মর্মর তুলে দুলে ওঠে শালবন
খেয়ালী মেঘের ডাক শুনে তার উদাসী হয়েছে মন,
ছায়ায় ছায়ায় ভীরু-ভীরু পায়ে হরিণের যাওয়া-আসা
ময়ূরের চোখে সোনা রোদ ঝলকায়।
শুকনো পাতারি তুলে নিয়ে আমি—ভাসাই গজাজলে—
উজান ঠেলে কি ফিরে যাবে তার নীল পাহাড়ের তলে?

শরতের দিনে শহরের পথে ফিরিওলা হাঁক ছাড়েঃ
'বালি হাঁস চাই, বড় ভালো বাবু খেতে'
মন চলে যায় যেখানে দূরের কমল বিলের ধারে
নূতন ধানের গন্ধ উঠেছে মেতে।
পদ্মেরা দেখে সূর্য-স্বপন রূপালী চাঁদের বানে
দল বেঁধে সেথা বুনো হাঁস নামে ভরা জ্যোৎস্নার পানে,
শিশিরেতে ভেজা ঘন কাশ বনে তারি সাথে দেয় তাল
আকুল ঝিঁঝিঁরা সুরের আসর পেতে।
বালি হাঁস জোড়া কিনে নিয়ে আমি ভাসাই আকাশ পারে—
শরতের রোদে উড়ে যাক ওরা কমল বিলের ধারে॥

পুকুরের পাড়ে

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

একটি সবুজ ছায়ায় ঢাকা গাঁয়ে সুন্দর টলটলে পুকুর। পুকুর নয় ত—যেন আয়না।

পাখ-পাখালীরা উড়ে উড়ে সেই আয়নায় মুখ দেখে। জ্যোছনা রাতে বনের পশুরা এসে নিশ্চিন্ত মনে পিপাসা মেটায় এই পুকুরের শীতল জলে। তা ছাড়া সকাল থেকে সন্ধে অবধি গাঁয়ের ছোট-বড়-মাঝারি—সবাই স্নান করে এই জলে। বৌরা এসে সাঁঝের বেলা কলসী ভরে ঠাণ্ডা জল নিয়ে যায়। দিনরাত সাঁতার কাটে দস্যি ছেলের দল। শীতল জলে ভরা পুকুর সবাকার দাবি মিটিয়ে চলে।

শীতল পুকুর শীতল পুকুর
শীতল জলে ভরা,
ঘোমটা টেনে গাঁয়ের বধূ
ভরে তাহার ঘড়া।
আকাশেতে পাখ-পাখালী
জলের তলায় মাছ—
এই পুকুরের জল খেয়ে ভাই
সবাই প্রাণে বাঁচ॥

যে গাঁয়ে এমন সুন্দর পুকুর আছে—তাদের আর ভাবনা কি? জলকষ্ট এ-গাঁয়ে কখনই হয় না!

সে-বছর বিধাতার কোপে কি হল কে জানে! বোশেখ-জ্যৈষ্ঠি মাসে আকাশ থেকে একফোঁটা জল ঝরে পড়ল না!

সূর্যিমামা শুষে যে নেয়—
সব পুকুরের জল,
নরম মাটি ফুটি-ফাটা
দেখা যে যায় তল!
পিপাসাতে পরাণ কাঁপে—
মানুষ-পশু-পাখি—
কণ্ঠ সবার শুকনো হল—
কাঁপছে থাকি থাকি!

মাছের দল জল অভাবে একেবারে ঝিমিয়ে পড়ল। অনেক মাছ প্রাণ বাঁচাবার জন্যে একেবারে কাদার তলায় সেঁধিয়ে গেল।

মাছেদের মধ্যে তখন দুটো দল হয়ে গেল। এক দলের মোড়ল রাঘব-বোয়াল। সে বললে, "প্রাণ যদি বাঁচাতে চাও—তাহলে রাতারাতি অন্য পুকুরে বা সরোবরে পালিয়ে যেতে হবে। আমি যা বলি শোনো—"

আর-এক দলের কর্তা—রাঙা রুই। সে সবাইকে হাঁক দিয়ে বললে, "বাপ-পিতেমহের ভিটে ছেড়ে কোথাও যেও না—ভাই সব। পুকুর ছেড়ে উঠলেই দেখবে—তোমাদের হাজার শত্রু ওৎ পেতে আছে। ঝোপের আড়ালে কুকুর-শেয়াল-বেড়াল; আর আকাশে উড়ছে চিল-বক-মাছরাঙার দল। ধরবে আর তোমাদের পেটে পুরবে—সাবধান!!

পুকুর ছেড়ে উঠবে যদি
বেঘোরে প্রাণ যাবে,
পাখ-পাখালী—শেয়াল-বেড়াল
ধরে ধরেই খাবে!
ঘাপটি মেরে কাদার তলে—
নিদ্রা সুখে যা—
গুগলি-শামুক যা জোটে ভাই
পেটটা ভরে খা॥"

কিন্তু রাঘব-বোয়াল রাঙা-রুইয়ের কথা শুনে ল্যাজের ঝাপট মেরে হুমকি দিয়ে উঠল। বললে, "হুঁ! ওর কথা শুনলে মরণ একেবারে শিয়রে এসে দাঁড়াবে। পুকুরের জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। আর দু'দিন অপেক্ষা করলে যেটুকু জল আছে, তাও যাবে শুকিয়ে! তখন সূর্যিমামার তেজে একেবারে শুঁটকি মাছ হয়ে যেতে হবে। রাঙা-রুই তখন তোদের বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?"

সঙ্গে সঙ্গে রাঘব-বোয়াল আবার হুমকি দিয়ে ছড়া কেটে উঠল।

বোকা রুইয়ের কথায় দেখি
যাবেই তোদের জান,
অন্য জলাশয়ে যাবো—
বাঁচবে প্রাণ আর মান।
আমার কথা শুনবি যেরে—
দল বেঁধে সব আয়—
খেলবি নতুন সরোবরে
থাকবি বনের ছায়!

রাঘব-বোয়ালের কথায় ভুলে একদল মাছ তার সঙ্গী হল। বিশেষ করে যারা কানকোতে আর কাঁটায় হাঁটতে পারে—যেমন কৈ, মাগুর, শোল,......এরা সব দল বেঁধে মিছিল করে রাঘব-বোয়ালের পেছন পেছন রওনা হল।

কিন্তু কী সর্বনাশ যে তারা ডেকে আনলো—আগে নিজেরাই কিছু বুঝতে পারেনি!

রাঘব বোয়ালের কথায় একদল মাছ তার সঙ্গী হল

মাছের মিছিল দেখে মজায়—
শঙ্খচিলে হাসে—
শেয়াল, কুকুর, বাঘের মাসি
দল বেঁধে সব আসে!
ভোজ লাগিয়ে পুকুর পাড়ে
বাধায় কলরব,
তখন রাঙা-রুই ডেকে কয়—
চুপ করে থাক্ সব॥

কিন্তু তখনো একফোঁটা বৃষ্টির দেখা নেই! রাঙা-রুইয়ের কথাও আর মাছের দল মানতে চায় না। তারা তখন মরিয়া হয়ে বললেঃ

কাদার নীচে দম আটকে
মরতে নাহি চাই,
যাবোই যাবো যেথায় সবে
নতুন ডেরা পাই॥

রাঙা-রুই তখন সবাইকে আবার বাপু-বাছা করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললে, "ভাই সব, তোমরা আর দুটো দিন অপেক্ষা করো। বৃষ্টি যে হবে, আমি তার আভাস পেয়েছি।"

মাছেরা তখন প্রাণের মায়ায় রুখে উঠেছে। জিজ্ঞেস করলে, "কি আভাস পেয়েছ, আমাদের বলতে হবে। শুধু শুধু মুখের কথায় চিঁড়ে ভিজবে না!"

রাঙা-রুই জবাব দিলে, "দেখাব তবে আয় আমার সঙ্গে।"

মাছের দলকে সে নিয়ে গেল উত্তর দিকের পুকুর পাড়ে। এই জায়গাটা একটু নির্জন। এখানে কোন ঘাটলা নেই, তাই কেউ স্নান করতে আসে না!

রাঙা-রুই দেখিয়ে দিলেঃ

পিঁপড়েরা সব খাবার মুখে
গর্ত পানে ধায়—
জল হবে তাই—আগে থেকেই
আশ্রয় যে চায়।

মাছেরা তখন বললে, "পিঁপড়েরা খাবার মুখে নিয়ে গর্তে পালাচ্ছে—তাতেই আমরা বুঝে নেবো যে বৃষ্টি হবে?"

রাঙা-রুই উত্তর দিলে, "নিশ্চয়ই। পিঁপড়েরা যে আগে থেকেই সব বুঝতে পারে। দেখছিস না, কেমন প্রাণভয়ে ওরা সার দিয়ে গর্তের দিকে চলে যাচ্ছে? জলের আভাস পেয়েছে বলেই ওরা আর বাইরে থাকবে না। পিঁপড়েরা হচ্ছে সঞ্চয়ী। জানিস ত—সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে।"

মাছেরা এত কথা শুনেও খুশী নয়। জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা রুই-খুড়ো, আর কোনো প্রমাণ দেখাতে পারো?"

রাঙা-রুই মাথা চুলকে জবাব দিলে, "হুঁ! হুঁ! নিশ্চয়ই পারি। আচ্ছা, দাঁড়া একটু তোরা। প্রমাণ আমি হাতে-হাতে দিচ্ছি। ওই যে—

ব্যাঙের দলে কাদার জলে
করছে কলরব—
জল হবে তাই জানতে পেরে—
ডাক দিয়েছে সব॥

বুড়ো রাঙা-রুই মিথ্যে কথা বলেনি।

সেই দিন খুব গরম—মাছেদের কেবলি থেকে থেকে ছটফটানি!

কিন্তু গভীর রাত্রে মেঘের গুরু গুরু শব্দ শোনা গেল।

রাঙা-রুই মাছেদের ডেকে তুললে। বললে, "কান পেতে শোন্ সবাই—"

মাছের দল কানকো নেড়ে জবাব দিলে, "ঠিক। ঠিক। মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে।

গুরু গুরু মেঘ ডেকেছে
ঈশাণ কোণে কালো,
জলের ঢলে এবার মোদের
হবেই হবে ভালো॥"

রাঙা-রুই কাদা-জলে ওলট-পালট খেয়ে বললে—

শোঁ-শোঁ করে ছুটছে হাওয়া—
গোঁ-গোঁ করেই ডাকে—
জলের তোড়ে আজ বুঝি বা
'পৃথিবমী' না থাকে।

তারপর শুরু হল—পবন দেবের খেলা। ইন্দ্রের ঐরাবত তাঁর শুঁড়ে করে রাশি রাশি জল সমুদ্র থেকে তুলে এনে মেদিনীর বুকে ছড়িয়ে দিলে।

সেই ছোট্ট শুকনো পুকুরটা জলে থৈ-থৈ করতে লাগল। সারারাত ধরে মাছেদের কী

রাঙা-রুই মাছের দল নিয়ে পুকুরের উত্তর পাড়ে গেল

সাঁতার কাটার ধুম। ওরা বললে, 'সাত দিন ধরে আমরা সন্তরণ প্রতিযোগিতা চালু রাখবো। যে প্রথম হবে—তাকেই আমরা মাছ রাজ্যের রাজা করবো।'

সবাই বললে, "মন্ত্রী হবে কে?"

ল্যাঠা মাছ চিৎকার করে উঠল—"রাঙা-রুই!!"

মাছের দলে সবাই খুশী
কে রাখে কার খোঁজ—
শ্যাওলা-শামুক-গুগলি দিয়ে
লাগালো বিরাট ভোজ॥

চলো, বেড়িয়ে আসি

॥ নাগার্জুন ॥

একলা একলা চুপটি করে বসে কেন? চলনা কেন একটু বেড়িয়ে আসি! আরে না, না, চিড়িয়াখানা বা যাদুঘর দেখতে নয়। আমরা যাব অনেক—আরও অনেক দূরে,—সেই মঙ্গল গ্রহে। খালি যাব আর আসব। তুমি আর আমি। বাবা, মা, বোনটি কেউ জানতে পারবে না। কেমন, বেশ হবে না!

চোখ পিট্‌পিট্ করে দেখছ কি! ভাবছ, মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? বলে, রাশিয়া আর আমেরিকা কত চেষ্টা চরিত্তির করে তবে কিনা পৃথিবী ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা ওপরে উঠতে পেরেছে। এখন সবে চাঁদে যাবার তোড়জোড় চলছে। আর মঙ্গল গ্রহ তো অনেক দূরের কথা। ও তো আমার সব জানা আছে।

হ্যাঁ, তা তুমি জানো সত্যি করে। কিন্তু বলো দেখি, সবচেয়ে জোরে ছুটতে পারে কি? রকেট? আরে না, না,—রকেটের চেয়ে অনেক জোরে ছুটতে পারে একটা জিনিস। কি জানো? কল্পনা গো—কল্পনা! এই দেখ না কেন, পোর্ট অব স্পেনে ভারতের সবাই যখন পটাপট করে আউট হচ্ছে, তুমি তখন বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে একশ' তিপ্পান্ন রান করে নট আউট থাকছ কিনা? সত্যি করে বল দেখি!

অতএব তোমার কল্পনার রাশ ছেড়ে দাও। মনে করো আমরা এমন একটা রকেট চড়েছি, যেটা এমন জিনিস দিয়ে তৈরী যে, উল্কা-ফুল্কা কিছুই করতে পারে না। না, না, কি জিনিস দিয়ে তৈরী হবে তা নিয়ে তোমার অত ভাবতে হবে না। ব্যোমযাত্রার ডায়েরীর সেই ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস, কচ্ছপের ডিমের খোলা আর একুইয়স্ ভেলোসিলিকা দিয়ে তৈরী বলেই মনে করে নাও না।

আচ্ছা, রকেট তো তৈরী। এবার উঠে বস। দেখ, দেখ, নীচের দিকে একবার চেয়ে দেখ, যেন সবুজ একটা জাজিম পাতা রয়েছে। কে বলবে যে এইটাই পৃথিবী। উঃ, কত তাড়াতাড়ি আমরা কতখানি ওপরে উঠে গেলুম, না? ভাবছ, কত জোরে আমাদের রকেটটা চলছে? কল্পনায় যত জোরে খুশি যাওয়া চলবে, কিন্তু সেকেণ্ডে সাড়ে সাত মাইলের যেন কম না হয়। ভাবছ কেন? তবে বলি শোন।

মন্টু নিতান্ত ভালো ছেলে। বিকেলে বেচারা হাফ প্যান্টট্যান্ট পরে ফুটবল খেলার জরুরী তাগিদে বেরিয়েছে, এমন সময় গজাদা খপ করে হাতটা ধরে ফেলে বললে, 'সুড়সুড়ি দে'! বলে তো দিব্যি কেরোসিন কেরোসিন গান ধরালে। বেচারা মন্টু অনেক এঁকে বেঁকে কত করে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু গজুদার সঙ্গে কি গায়ের জোরে পারে? তাহলে দেখ, গজুদা যত জোরে টেনে ধরে আছে, তার চেয়েও জোরে যদি মন্টু ছুটে পালিয়ে যেতে পারত তবেই মন্টু পালিয়ে যেতে পারত সেদিন। তাই না?

পৃথিবী অবশ্য গজুদার মত বদলোক নয়। কিন্তু পৃথিবী আমাদের সকলের মা তো। মা ছেলেকে কি চোখের আড়াল করতে পারেন। তাই পৃথিবীও কাউকে পালিয়ে যেতে দেয় না। সব সময়ে তার টান আমাদের ওপর রয়েছে। আরে, তোমরা তো সেই আপেল পড়ার গল্প জানো। তবে আর কি?

কিন্তু দেখো, মা কি সব সময়ে ছেলেকে কাছে রাখতে পারে। নানা প্রয়োজনেই ছেলেকে বাইরে যাবার উপায় খুঁজতে হয়। বিজ্ঞানীরাও অনেক আঁকজোক কষে বের করেছে—কি উপায়ে পৃথিবীর আকর্ষণের হাত থেকে পালান যায়? সে হিসেব তোমাদের আর জানালুম না; কারণ সে হিসেব বোঝা তোমাদের পক্ষে বড় শক্ত। তোমরা বরং বড় হয়ে যখন আরও অনেক পড়াশোনা করবে তখন তো বুঝতে পারবেই। এখন খালি জেনে রাখো—সেকেণ্ডে ৭·৬ মাইলের কম জোরে ছুটলে পৃথিবীর আকর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই। তাই আমাদের রকেটকেও

রকেট কত জোর ছুটে চলেছে

সেকেণ্ডে ৭·৬ মাইলেরও বেশী জোরে ছুটতে হবে।

আচ্ছা, ততক্ষণ আমাদের রকেট চলতে থাকুক, আমরা বরং মঙ্গল গ্রহের সম্বন্ধে পৃথিবীতে বসেই যা কিছু জানতে পেরেছি সেইগুলো ঝালিয়ে নিই।

সন্ধেবেলায় লালচে রঙের যে বড়সড় তারাটা দেখি, তার নাম সাঁঝতারা, তাই না? ঐ সাঁঝতারাটা কিন্তু সত্যি করে তারা নয়। ওটা আসলে একটা গ্রহ। আর সেই গ্রহটিই হচ্ছে 'মঙ্গল গ্রহ' যেখানে আমরা

চলেছি। এর চেহারাটা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। এর ব্যাস হচ্ছে ৪২১৬ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্ধেক। আর হ্যাঁ, ব্যাস কাকে বলে জান তো! একটা গোল জিনিসের পেটটা কতখানি চওড়া—সেইটাই হলো ব্যাস। মনে করো একটা পাতিলেবু নিলে। এবার মাঝখান থেকে সমান ভাগে দুভাগ করে ফেললে। এবার একটা ভাগ আবার সমান ভাগে ভাগ করে ফেললে। সেই চার ভাগের এক ভাগটার খোলাটার উল্টোদিকে যে খাঁজটা তৈরী হলো, লম্বালম্বি সেই খাঁজটার মাপই হলো পাতিলেবুটার ব্যাস। বুঝলে, না .থা ঘুলিয়ে গেল?

যাই হোক, ব্যাসের কথা তো বললুম। এবার বলি 'ভরে'র কথা। ওকি, 'ভর' কি জিনিস, বুঝতে পারলে না?

ভর হচ্ছে, কোন কিছুর মধ্যে সত্যিকার জিনিস যা আছে তাই। মানে, একটা জিনিস তার আয়তন বা চেহারা যতখানি—তাকে সেই জিনিসটা কতটা ঘন, তাই দিয়ে ভাগ করলেই টপ্ করে সেই জিনিসের ভর পেয়ে যাবে। বুঝলে না?

তুমি বাজারে গিয়ে আধসের মুড়ি কিনলে। ওহো, ভুল হয়ে গেছে, এখন তো আবার নতুন বাটখারাতে ওজন করা শুরু হয়েছে! আচ্ছা, ধরো তুমি বাজারে গিয়ে পাঁচশো গ্রাম মুড়ি কিনলে। দোকানদার একপাশে একটুকু এক লোহা দিল আর ওপাশে ঠোঙায় করে এক গাদা মুড়ি দিল। কেন?

তুমি বলবে, বাঃ, তা তো করবেই। মুড়ি যে লোহার চেয়ে অনেক হাল্কা। ঠিক বলেছ, মুড়ি লোহার চেয়ে হাল্কা, তার মানে লোহার মত ঘন নয়। কিন্তু মুড়িটা যদি লোহার মত ঘন করা যেত তবে মুড়িটাও লোহার আয়তনের সংগে সমান হত। তার মানে পাঁচশো গ্রাম মুড়িতে সত্যিকারের জিনিস যতখানি আছে লোহাতেও ততখানিই আছে। এই সত্যিকারের জিনিস, যাকে আর ঘন করা যায় না, তাকেই বলে ভর। মঙ্গল গ্রহের ভর হচ্ছে প্রায় ৬৪র পরে ২৫টা শূন্য বসালে যত হয়, তত গ্রাম। অর্থাৎ পৃথিবীর ভর যদি হয় এক, তবে মঙ্গল গ্রহের ভর হবে .১০৮। সংখ্যাটার আগে ফুটকিটার মানে বুঝতে পেরেছো তো?

হ্যাঁ, টানের হিসেবটাও বলি। পৃথিবীর টানের চেয়ে মঙ্গল গ্রহের টানের জোর কম। পৃথিবীর টানের পাঁচভাগের তিনভাগ। আর তা হবেই তো! কথাতেই তো আছে, মায়ের চেয়ে কি আর মাসীর টান বেশী হয়! তা' পৃথিবী যদি আমাদের মা হয় তবে মঙ্গল গ্রহ আমাদের মাসী হল না কি?

যে রাস্তা দিয়ে মঙ্গল গ্রহ সূর্যের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে রাস্তাটা গোল নয় কিন্তু, উপবৃত্তের মত। উপবৃত্ত কিরকম জান? কম্পাস দিয়ে একটা গোল এঁকে যদি সেটার মাথাটা হাত দিয়ে চেপে দেওয়া যায় তবে যে ফুলে যাওয়া পেটওয়ালা চ্যাপ্টা গোল মতনটা হবে—সেইটাকেই বলে উপবৃত্ত। তোমাদের যাদের দাদাটাদা উঁচু ক্লাশে পড়ে তাদের বইতে অনেকে উপবৃত্তের ছবি দেখে থাকবে। এইরকম রাস্তাতেই মঙ্গল গ্রহ অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানো ত', এইরকম রাস্তায় সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসলে তবেই একটা বছর হয়। মঙ্গল গ্রহের এই বছর শেষ হতে লাগে ৬৮৭ দিন। ২৪ ঘন্টা ৩৭ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে মঙ্গল গ্রহের একবার দিনরাত হয়। আর ঐ যে রাস্তা, ঐ রাস্তায় সে ছুটে চলেছে ঘন্টায় ৫৪,০০০ মাইল জোরে।

পৃথিবীর যেমন একটা চাঁদ আছে, মঙ্গল গ্রহের তেমনি দুটো চাঁদ। তবে তাদের নাম অবশ্য অত মোলায়েম নয়, একটু খটমটু, মনে রাখা কষ্টের। একটার নাম ফেবোস, আর, আর একটার নাম 'ডেমোস'।
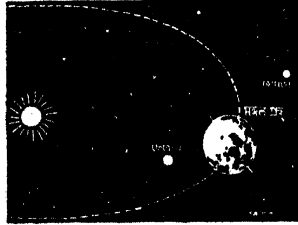
মঙ্গলের দুটি চাঁদ—ফেবোস আর ডেমোস

ওয়াশিংটনের হল বলে এক বিজ্ঞানী ১৮৭৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গল গ্রহের এই চাঁদ দুটিকে আবিষ্কার করেছেন। হোমার নামে এক কবি ইলিয়াড বলে একটা মস্ত বই লিখেছিলেন, তা জানো নিশ্চয়ই? সেই ইলিয়াড বই থেকেই এদের নাম 'ফেবোস' আর 'ডেমোস' দেওয়া হয়েছে। এদের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলব না, শুধু শুনে রাখ, 'ফেবোস' মঙ্গল গ্রহ থেকে ৫,৮২৮ মাইল দূরে আছে, আর ৩২ দিনে মঙ্গল গ্রহের চারদিকে ঘুরে আসছে। 'ডেমোস' আছে মঙ্গল গ্রহ থেকে ১৫,০০০ মাইল দূরে, আর ১২৬ দিনে মঙ্গল গ্রহের চারদিকে ঘুরে আসছে।

যে সময়ে পৃথিবী আর মঙ্গল গ্রহ খুব কাছাকাছি আসে, তখন মঙ্গল গ্রহকে ভাল করে লক্ষ্য করা হয়েছে। গ্রহটা লালচে রঙের, মাঝে মাঝে কালো রঙের ছোপ আছে। তখন সকলে ভেবেছিল যে, লালচে অংশটা হচ্ছে মরুভূমি আর কালো রঙের ছোপগুলো হচ্ছে সমুদ্র। আর একটা জিনিসও দেখতে পাওয়া যায়, সেটা হল, গ্রহটার উত্তর আর দক্ষিণের শেষে সাদা-ঢাকা। এই ঢাকাগুলো আবার বাড়ে কমে। তাতে এই ঢাকাগুলো বরফের বলেই মনে হয়।

১৮৭৭ সালে ইতালীর বিজ্ঞানী শিয়াপারেল্লি দেখতে পেলেন যে, গ্রহটার গায়ে খুব সরু সরু কালো দাগ আছে। তিনি এই দাগের নাম দিলেন 'ক্যানালি' যার ইংরেজী মানে হচ্ছে চ্যানেল অর্থাৎ কিনা প্রাকৃতিক খাল। অবশ্য তখন অনেকের মনে হয়েছিল এগুলো বোধহয় মানুষের গড়া, কিন্তু সত্যি তা' নয়।

এদিকে লাওয়েল বলে আর এক আমেরিকান বিজ্ঞানী দেখালেন যে, ঐ কালো ছোপগুলো সমুদ্র হতেই পারে না। কারণ কি জানো? তিনি দেখালেন যে, কালো ছোপের মধ্যেও সরু সরু কালো দাগ আছে। এখন সমুদ্রের মধ্যে খাল কি করে থাকবে বল? তিনি বললেন যে, আসলে ওগুলো সমুদ্র নয়, ওগুলো গাছ-আগাছায় ঢাকা জমি।

তাহলে দেখ, মঙ্গল গ্রহে জলও আছে বলে মনে হয়, গাছও থাকার সম্ভাবনা। এখন তাহলে জিজ্ঞেস করতে পার—হাওয়া আছে কি?

আগেই বলেছি, পৃথিবী থেকে কোন জিনিস বেরিয়ে যেতে তাকে সেকেণ্ডে সাড়ে সাত মাইলের বেশী জোরে ছুটতে হবে। আমাদের চারপাশে যে হাওয়া রয়েছে, সেই হাওয়া চুপ করে বসে নেই, বেশ জোরেই তারা ছুটে বেড়ায়। কিন্তু সেকেণ্ডে সাড়ে সাত মাইলের চেয়ে অনেক কম জোরে ছোটে বলে হাওয়া পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। মঙ্গল গ্রহে কোন জিনিস বেরিয়ে যেতে হলে সেকেণ্ডে ৩·২ মাইল জোরে ছুটতে হবে। হাওয়া এতখানি জোরেও ছুটতে পারে না। তাই মঙ্গল গ্রহে হাওয়া থাকা স্বাভাবিক। তাই না?

আর একটা ব্যাপার দেখ। ঐ যে উত্তর আর দক্ষিণের বরফের ঢাকা কমে বাড়ে, ওটাও হতে পারে, যদি মঙ্গল গ্রহে হাওয়া থাকে। তাই মঙ্গল গ্রহে হাওয়া আছে, একথা কেন মনে করব না বল? তাছাড়া ঐ যে কালো ছোপগুলো! সেগুলো যদি গাছ-আগাছা হয় তবে তো হাওয়া থাকবেই। হাওয়া না হলে গাছ আবার বেঁচে থাকে নাকি!

তাহলে দেখ, যেখানে জল আছে, হাওয়া আছে সেখানে প্রাণীও থাকতে পারে না কি? যদি থাকে, তবে তা খুবই নিচু ধরনের প্রাণী। এ সম্বন্ধে কিন্তু তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যার ওপর নির্ভর করা যায়।

দেখ, এইটুকু আমরা পৃথিবীর মাটি থেকেই জেনেছি। এছাড়া আর যা জেনেছি সেগুলো অবশ্য বলিনি। তোমরা বড় হয়েই পড়বে, কেমন?

আচ্ছা, এবার আমরা আমাদের কল্পনার রকেটে গিয়ে দেখি, পৃথিবী থেকে আমরা যা ভেবেছি মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে, সেগুলো ঠিক কিনা।

নাও, নেমে পড়, মঙ্গল গ্রহ এসে গেছে!

শরতের রোদ

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

রূপোলী রোদ্দুর যেন গলে গলে পড়ে
কাশফুলে অথবা এ টিয়ারঙ ঘাসের উপরে
বলাকার দুধসাদা ডানায় ডানায়
শরৎ এসেছে ভাই—এই কথা আমাকে জানায়!

সেজেছে খুকুর মত প্রজাপতি রঙিন জমায়
ডানার ইশারা দিয়ে ডেকেছে আমায়—
তুমি কেন পড়ে আছ ঘরে
চল না শিউলি বনে—সেখানে যে সোনা রোদ ঝরে।

গঙ্গার গেরুয়া জলে রূপোলী রোদ্দুর পড়ে ঝরে
দুরন্ত শিশুর মত মা-মণির কোলের ভিতরে;
দেখে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই
মুঠো মুঠো রোদ যেন তুলে নিয়ে ঘরে যেতে চাই।

শরতের রোদ যেন আমাদের সাথী
রোদের চাদর এনে ঘরে ঘরে পাতি।

পলাশ মিত্র

মনে হয় ওই মেঘগুলো আজ কাশফুল হয়ে দোলে
সূর্য ছড়ায় সোনালী সোনালী আলো
শিউলির ডালে দোল দিয়ে যায় খেয়ালী হাওয়া
এই শরতে সত্যি লাগছে ভালো।

চেয়ে দেখো ওই প্রজাপতিটা দোলায় কেমন ডানা
শাপলা বনে এদিক-ওদিক ঘোরে।
উচ্ছল ওই চামেলী শেফালি সব কিছু ভুলে গিয়ে
ওড়না ও[illegible] শরতের ভোরে।

দিনগুলো যেন মনে হয় সোনা-ঝরা
সকালটাও শিশির-ধোয়া তাই ঃ
জোনাকিদের মিষ্টি আলোর মাঝে, ইচ্ছে করে
হারিয়ে যাই হারিয়ে যাই ঃ

হারিয়ে যাই ওই পাখিদের মাঝে
উড়ছে আর উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে,
এই শরতে সত্যি লাগছে ভালো
কাকুর-দেওয়া পুজোর জামাটাকে॥

ফটো ঃ শ্রীঅজয় মিত্র

স্বপ্ন না সত্যি?

ফোর টোয়েন্টি

স্থশীল ঘোষ

পটলার নির্দেশে আধ-ছেঁড়া হাফ-হাতা আধ-ময়লা জামা কাপড় পরে এসেছে সবাই।

ছোট্ট ছবি, আট ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চির চেয়ে বড় নয়। মোটা মোটা গাঁদা ফুলের মালা ফ্রেম থেকে ঝোলানো। ছবির মুখখানা ঢাকা পড়ে গেছে প্রায়। লম্বা কাঠের বাটামের ওপর ফিট করা। যাতে বেশ খানিকটা উঁচুতে ধরে রাখা যায়। বাটাম-খানার মাঝবরাবর আর একখানা পিচ বোর্ড আঁটা। তাতে লেখা—'নীরদকুমার চৌধুরী।

শোকযাত্রা বেরল ক্লাব ঘর থেকে। দ্বিতীয় সারিতে তিনজন—মাঝখানে পটলা, হাবু আর গোবে দুপাশে। পটলার হাতে ছবির ঠ্যাং। ছবি তো সেই ফুট আড়েক উঁচু সিংহাসনে। তা থেকে মালা ঝুলে পড়েছে, বেশ হাতখানেক। হাবু আর গোবের হাতে ফুল আর ধূপকাঠি।

তারও হাত কয়েক আগে প্রমাণ সাইজের লাল শালু। চার কোনা ধরে নিয়ে চলেছে আলু, বাপ্পা, নিধে আর সিধে। শালুর পেটটা ইঁটের টুকরোর ওজনে ঝুলে গেছে।

সবার পিছনে তিনজন তিনজনের সারি। বাঁকা, উচ্ছে, অম্বল, চপ, পাঁকা, রাহুল, মণি, শিবু, উদো, বুধো। সভ্য আর অ-সভ্য মানে মেম্বার নন-মেম্বার মিলিয়ে প্রায় জন ত্রিশেক। বিলেতে নাকি ভাড়া করা শোক-যাত্রী পাওয়া যায়। হায়ারড মোরনার্স। এখানেও দশ পনেরোজন প্রায় তাই। পাশাপাশি ক্লাবের সভ্য ওরা।

রাস্তায় রোদ পড়তে শুরু করেছে। অফিস ছুটি হবার আগে ক্লাব ঘরে ফিরে যাওয়া চাই। ছুটি হয়ে গেলে বাপ কাকা জ্যাঠার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া সম্ভব।

ছোট ছোট গলি ঘুরে বিশেষ কিছু হল না। লোকজনই নেই। মায়েরা ঘুম থেকে ওঠেননি। দিদিরা গল্পের বই ফেলে বাড়ির ঝিকে দরজা খুলে দিয়ে গেছে। আবার ডুব দিয়েছে গল্পে।

ছেলেরা ঘেমে নেয়ে গেছে। ক্লান্তি অবসাদ আর নৈরাশ্যে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর।

গোবে বললে,—টাইমটাই হয়েছে ভুল। এই ভর দুপুরে কে বসে আছে তোমার জন্যে? জনমানিষ্যি নেই রাস্তায়। সাহায্য দেবে কে?

শিবু হাত উল্টোল,—তবে কি সকাল বিকেল বেরলে ভাল হ'ত? বাবা কাকারা অফিস গেলে তবে তো!

দলের সর্দার পটলা কোনদিনই বা কাড়ে না সহজে। এখনও তাকিয়ে দেখল শুধু। কথা বলল না।

এই বলতে বলতে ওরা আরেকটা গলির ছায়ায় এসে পড়ল। এই গলিতে পাঁকা অর্থাৎ পঙ্কজদের বাড়ি। পাঁকা 'আওয়ার ও'ন ক্লাব'-এর মেম্বার নয়। নেমন্তন্ন খেতে এসেছে।

তেষ্টা পেয়েছে সকলেরই। খিদেও পেয়ে গেছে জোর। এগিয়ে এসে পাঁকা কড়া নাড়ল দরজার। দোতলার জানলা খুলে গেল। উঁকি দিল চম্পার মুখ। পঙ্কজের দিদি। পাঁকা ইঙ্গিতে ডাকল দিদিকে। নেমে এল দিদি, মুখে হাসি।

সদর খুলেই দিদি অবাক—এ সব কি রে পাঁকা? হতভাগা ছেলে! এই জন্যে বাইরে বেরিয়েছ? এই যে বলে গেলি 'আওয়ার ও'ন ক্লাবে' ফিস্ট আছে—

পাঁকার খালি ভয়—মায়ের কাঁচা ঘুম ভাঙলে রক্ষে নেই আর। কাঁচা চিবিয়ে খাবেন। আকারে ইঙ্গিতে অনুনয় বিনয় হাত জোড় করছে দিদিকে,—আ-স্তে! আ-স্তে!

সদর খুলেই দিদি অবাক—

মা জেগে যাবে। দিদিভাই, তোর পয়সা কাটা দে' না। তোর তো সিঁকি আধুলী দুয়ানি নয়া পয়সা মিলিয়ে অনে-ক আছে। এই সিগ্রেটের টিনের ফুটোয় দিয়ে দে। রাত্তির বেলা তোর পয়সা আবার তোকে দিয়ে দেব। বেশ ঝম ঝম করে বাজাতে বাজাতে যাবো। লোকে আরো দেবে তাহ'লে—

—সুদ দিবি কতো?

—ঠিক জানিনে। তবে দিতে পারব কিছু বোধ হয়! টাকা পয়সায় না হলেও জিনিসে—

চম্পা বলল,—ঠিক—ঠিক—ঠিক? তিন সত্যি কর?

বাঁকা মানে বঙ্কিম। এগিয়ে এসে জল চাইল। তারপর দেখা গেল—তেষ্টা সকলের আকণ্ঠ। সকলকে জল খাওয়াতে খাওয়াতে জানতে চাইল চম্পা,—কিন্তু ব্যাপারটা কি? কে এই ঈশ্বর নীরদকুমার চৌধুরী? তার জন্যে চাঁদা তোলা হচ্ছেই বা কেন?

আঁজলা ভরে জল খাচ্ছিল আলু। জল খেয়ে ভিজে হাতের চেটো মাথায় কপালে বুলিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিল আলোকনাথ মিত্র, —আঃ, তুমি বুঝি পাঁকার দিদি। তোমার খুব পুণ্যি হবে। জল খাওয়ালে খুব পুণ্যি হয়।

চম্পা শুধোল,—হ্যাঁ রে, নীরদ চৌধুরী কে? বললি না! চাঁদা তোলাই বা কিসের জন্যে?

এদিক ওদিক তাকাল আলু। পটল বেশ খানিক দূরে। শুনতে পাবে না। সামনা-সামনি চোখে চোখ না রেখে চম্পার পাশে দেয়ালে তাকিয়ে আলু বলল,—বলে দেবে না তো? তিন সত্যি কর। পটলা শুনতে পেলে আমার দম বানিয়ে ছাড়বে, শাসিয়ে রেখেছে। আমি নাকি বেজায় বোকা—সব বলে ফেলে দিই। আমাকে দলে নিতেই চাইছিল না!

জল খাওয়া সারা। ছেলেরা অনেকেই আবার রাস্তায়। চম্পা হাসছিল মিষ্টি মিষ্টি,—তা তো হলো। নীরদ চৌধুরী-টা কে?

—ও কেউ না। এমনি একটা ছবি— বলে দৌড় লাগাল আলু। পাছে আরো জেরার মুখোমুখি হতে হয়। পাছে শেষ পর্যন্ত কানে যায় পটলার।

সিগারেটের টিনে তিন টাকা ছ'আনা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এগিয়ে যাচ্ছে পাঁকা।

এবার ওরা স্থির করলে দিদিরা খুব ভাল। আরো আশার কথা মায়েরা জেগেও নেই।

এক বাড়িতে ভীরু হাতে কড়া নাড়লে নিধে। বুড়ি ঝি বাসন মাজতে মাজতে দরজা খুলেই দেখে—খুদে ডাকাত দল।—ওরে বাবারে, ডাকাতি করতে এয়েছে গা—বলেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলে।

আর এক বাড়িতে ঘুম-শেষে দোতলার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মা। মায়ের মুখে হাসি দেখে সাহস হল এদের। মনে হল সুবিধে হতে পারে।

সিধে মানে সিদ্ধেশ্বর সাহস করে বলেই ফেলল,—কিছু সাহায্য করবেন মা?

মা হাসলেন,—কিসের গো?

চপলের ডাক নাম চপ। চপ বললে,— এই যে দেখছেন। ঈশ্বর নীরদকুমার চৌধুরী।

—তা তো দেখছি। তাতে কি হল?

—আজ্ঞে এর স্মৃতি-পূজার জন্য।

এদের কথাবার্তা শুনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন আর একজন মা। তিনি শুধোলেন,—এই ভর দুপুরে স্মৃতিপূজা কি গো? কি করবে টাকা দিয়ে?

পটলা দেখলে আশা আছে।—আমরা

ছোটরা আর কি করতে পারি বলুন না? ছবিটা বড়ো করে এনলার্জ করে ক্লাব ঘরে টাঙিয়ে রেখে দেব।

—তাতে আর কতো টাকাই বা লাগবে? টিনের কৌটোয় কতো আছে?

—গুনিনি তো। দেড় টাকা সাত সিকে হবে।

মা বারান্দা থেকে চলে গিয়েছিলেন। আবার এলেন। পাশের ভদ্রমহিলাকে বললেন,—আহা দুধের শিশু সব। দুপুরে রোদে বেরিয়েছে। মতলব একটা কিছু আছেই। এই নাও। ধরো, শালটা পেতে ধরো।

বলে সিকি দুআনি আধুলিতে গোটা কতো ছুড়ে দিলেন।

আমি দেখেছি, চ্যারিটি জিনিসটাই এমনি ছোঁয়াচে। পাশাপাশি রেলিঙে আরো মায়েরা এসে জুটেছিলেন। তাঁরাও যা হোক কিছু কিছু দিলেন। বাজার ফিরতি পয়সা। যাঁর যা কুলালো।

অনেক মায়েরা হাসলেন। এক মা তো বলেই ফেললেন,—কি গো! তোমাদের শালু তো দেখছি ইঁট পাটকেলেই বোঝাই। পয়সা কড়ি কিছুই নেই।

এমনি করে সাহস বাড়ল। বুদ্ধি বাড়ল। পয়সা বাড়ল। বেলাও বাড়ল।

দোতলার রেলিঙ থেকেই সাহায্যটা এলো বেশি। মায়েরা ভাল। দিদিরা ভাল। সবাই ভাল।

কিন্তু সবাই বুঝি ভাল নয়। একটা বাড়িতে এসে মুশকিল হল।

এবার ওদের ফেরার পথে। প্রথম প্রথম সাহস বা কায়দা জানার অভাবে কিছুই পাওয়া যায়নি। শেষের দিকটা ভালই আমদানী হয়েছে। গোনা হয়নি এখনও। তা, মনে হয় পাঁকার দিদির তিন টাকা ছ'আনা বাদ দিয়েও টাকা বারো তেরো হয়েছে।

হিসেব করে দেখা গেছে, টাকা কুড়ি বাইশ হলে উত্তম হয়। যার যার বাড়ি থেকে চাল ডাল আলু তেল আনা হয়েছে। ক্লাবের বাড়িতেই হাঁড়ি কড়া এবং মীরুদিকে পাওয়া যাবে। মাঝ উঠোনে উনুন পাতা হয়েছে ইঁট সাজিয়ে। কাঁচা মাটির লেপ দিয়ে। ফিস্টের আনন্দ ঐখেনে। মীরুদির হুকুম মতো টুকিটাকি কাজ পাওয়া যাবে। আলু পেঁয়াজ ছাড়ানো। উনুন ধরানো। শালপাতা ধোয়াধুয়ি। এটা ওটা এগিয়ে দেয়া মীরুদিকে। তারপর খোসবু উঠবে রান্নার। খোসবুর সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার সবাই জানতে পারবে 'আওয়ার ওন ক্লাবে' ফিস্ট-এর খবর। সে যে কী মজা! সেইটেই মজা।

সে যে কতো রকমের কতো গ্রেডের চাল। সরু মাঝারি। কতো রকম গন্ধের। ডালও সব এক রকমের নয়। তেল তো নয়ই। এই ছেলেদের জমায়েত যেমন বৃহৎ, বিচিত্র,

খিচুড়ির স্বাদ বর্ণ গ...

মিশ্র। মজাই তো এখ...

মুশকিল হলো...

বাড়িতে। ঐ আগে... দিদিদের মতো সবাই... হয় না কখনো। নি...

এই বাড়ির মা নী... খিড়কির দরজাটি... চেহারাই এমনি যে, ... বলত না। সাহায্য চ... কিন্তু মা-ই এদের... উদ্দেশ করে বললেন...

—কাছে এসো।—মা...

"ওগো, তোমার সেই...তে ক'টা বানর আর ...ন, তার জবাব তুমি

চোখের দৃষ্টি ছবিটা...

পালের সর্দার প... পারল। ছবিটা প... পড়ে ছিল। কে জা... নিয়ে গিয়েছিল। ... পড়ে আছে। অনেক... কাজে লাগাবার ফন্দ...

আচমকা ছবি ফে... ফুলের মালা সমেত ... ছবিটা। এই বাড়ির... তুলে নিলেন।

—ওগো, এই দ্যাখে... বেলার ছবি। মাসা... না। সেই যে খোকন... ফেলল। ওগো কী... তোমায় ঈশ্বর বানি... নীরোদকুমার চৌধুরী... ওরে মুখপোড়া হনু... অনামুখো ছিষ্টিছাড়া... হবে গো! তোমায় ঈশ... একটাকে হাতের কাছে... ঈশ্বর বানিয়ে ছাড়তা...

...থাকেন, পঞ্চরথীও—...নয়। ভগুর দাদাকে ...মিলে বধ করেছিল। ...র্তি হতে পারলে না। ...করেছিল?

...করেছিল—রামচন্দ্র ...কত বানর লাগিয়ে- ...কত টন পাথর

...ন রে বাবা!

...আর একজন তাকে ...এখানে এলে কিসে? ...খন বললে—বাসের ...বলো।

...বলতে পারে নাকি?

...যাহোক একটা বলে ...হলে বলতুম—হরিপদ

...রে বুঝবে? ...দরকার নেই, চটপট

...টা বললে কি করে

...ভদ্র ভাষা ছাড়া যা ...দিলেই চলবে। পাশ ...জিগেস করে তোমার ...। তুই কি বলবি? ...করে থাকবো।

...জন করলে সাড়ে ...গর্তিতে বাইশ লক্ষ ...ওজন করে বা গুণে

...চি হাজার সুতশ' ...র পঞ্চান্ন লক্ষ ছেষট্টি ...একান্ন টন পাথর

...প্রবেশ]

...দিচ্ছ ফণীদা? ...তে কত বানর আর

...যেটা জিগগেস

...লুম আলটু-ফালটু ...বাব। ওকে পল্টুর ...ড়ার ইংরাজি জিগেস

...ত?

...ক-এইচ-ই-সি-এইচ- ...বলে তো দিতুম।

...প্রবেশ]

...কোথায় গেছলি?

পল্টু—খেলার মাঠ থেকে এইমাত্র ফিরছি।

ফণী—এইবার পল্টুর রীলে শোনো।

পল্টু—না ফণীদা, সত্যি বলছি রীলে ছাড়ছি না।

[মন্টুর প্রবেশ]

মন্টু—রীলে ছাড়া আবার কি রে?

পল্টু—তাও জানো না মন্টুদা? রীলে ছাড়া মানে—এক দেখা এক বলা।

মন্টু—তাই আবার হয় নাকি?

ফণী—কেন হবে না মন্টুদা? যারা রীলে শুনেছে তারা তো দেখছে না—তাদের যা শোনাবে তাই শুনে যাবে।

মন্টু—তোদের সব বাজে কথা।

ফণী—ট্রানজিস্টার রেডিওটা নিয়ে একদিন খেলার মাঠে যেও...দেখবে তোমার চোখের সামনে রাম বল নিয়ে ছুটছে, অথচ রেডিওতে শুনছো সতীশের পায়ে বলটা এলো, ওদের দত্ত আর প্যাটেল লাফিয়ে এসে পড়লো...সতীশ বোধহয় প্যাটেলের রাস্তায় পড়ে গেছে...রাস্তাটা রেফারির নজরে পড়েনি...ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছ্যাচড়ার ইংরেজি জিগেস করেছিল

মন্টু—তাই নাকি? জানি না তো!

ফণী—হ্যাঁ, তুমি ছাড়া বোধহয় সবাই জানে। ঐ থেকে রীলে ছাড়া মানে, আমরা করেছি —এক দেখে আর এক বলা।

মন্টু—এটা একটা মস্ত আবিষ্কার বলতে হবে।

পল্টু—তুমি একদিন রেডিও নিয়ে মাঠে যেও, বিপুল মজা পাবে মন্টুদা।

মন্টু—যেতে হবে তো একদিন...হ্যাঁ, কালকের প্রোগ্রাম তোদের মনে আছে ত?

ভগু—মনে আছে মন্টুদা। বংকু আর আমি এক দিকে যাবো, ফণীদা আর পল্টু এক দিকে।

মন্টু—কোনোরকম গোলমাল বা মারামারি না হয়।

বঙ্কু—না মন্টুদা, মারামারির ধারে আমরা নেই।
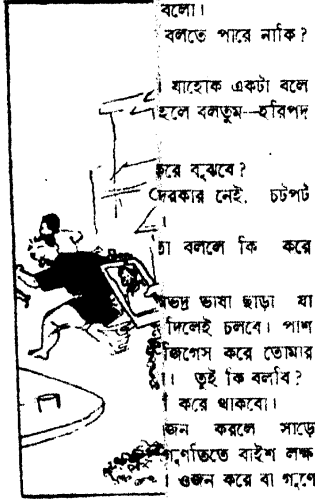
মন্টু—হ্যাঁ, খুব ভদ্রভাবে সব কাজ করবি।... যা, সব বাড়ি যা. পড়তে বসবার সময় হয়ে গেছে। মনে থাকে যেন, পরীক্ষায় যে ফেল করবে, ক্লাবে তার আর ঠাঁই নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আদালতের একটি কক্ষ : বিচার চলেছে]

হাকিম—তোমার নামটি কি?

ভগু—আজ্ঞে, ভগবান দাস—ডাক নাম ভগু।

হাকিম—কি করা হয়? লুঠপাটের মকসো?

ভগু—আজ্ঞে না স্যার।

হাকিম—তবে রবিবারে পাড়ার রকের আড্ডা ছেড়ে বাজারে মুদির দোকানে উৎপাত করতে ঢুকেছিলে কেন?

ভগু—আমরা স্যার রকে কোনোদিন আড্ডা দিই না! আমাদের ক্লাব আছে।

পেস্কার—ওহে ছোকরা, স্যার নয়, হুজুর বলবে।

ভগু—স্যার তো হুজুরের চেয়ে উঁচুদরের শোনায়।

পেস্কার—তোমাদের অত দর কষতে হবে না, হুজুর বলো।

হাকিম—ছেড়ে দাও পেস্কার, স্যারই বলুক। ...তোমাদের কেলাব আছে?

ভগু—কেলাব নয় স্যার, ক্লাব। রকবাজদের কেলাব হয়।

হাকিম—তাই বুঝি? তোমাদের ক্লাবটি কোথায়; নাম কি?

ভগু—মন্টুদার বাড়িতে...নাম "স-সে-সঙ"।

হাকিম—"স-সে-সঙ" কি আবার! নামেতেই বাঁদরামি!

ভগু—বাঁদরামি নয় স্যার। "সমাজ সেবক সঙ্ঘ"-এর প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে হয়েছে "স-সে-সঙ"।

হাকিম—'সমাজ সেবক সঙ্ঘ'—বাঃ, মুদির দোকানে হামলা করে সমাজ সেবা! তা বেশ। তোমাদের পালের গোদাটি বুঝি ওই মন্টুদা?

ভগু—মন্টুদা হলেন আমাদের সঙ্ঘপতি।

হাকিম—জ্যাঠামোর অন্ত নেই! আবার সঙ্ঘপতি! সঙ্ঘপতিটি কি করেন?

ভগু—মন্টুদা ডাক্তারি পড়ে স্যার,—ফোর্থ ইয়ার।

হাকিম—ডাক্তারি পড়াও হচ্ছে আর তোমাদের দিয়ে মুদি লোটাও হচ্ছে!

১ম মুদি—হ্যাঁ হুজুর, এদের মস্ত বড় গ্যাঙ আছে।

পেস্কার—তুমি থামো।

হাকিম—মুদির দোকানে দোকানে হামলা বাধিয়ে লুঠপাট করছিলেন?

ভগু—সব মিথ্যে কথা, স্যার। আমরা হামলা করতে যাইনি...আবেদন নিয়ে গিছলুম।

২য় মুদি—হাঁ ধর্মাবতার...আবেদন মানে ইয়াব্বড়া-বড়া সব পাথর নিয়ে...ঐ যে ঐ শয়তানের দু হাতে দুটো পাথর ছিল।

হাকিম—তুমি চুপ করে বসো......তোমাদের নালিশ সব লেখা আছে।...কিসের আবেদন নিয়ে গিছলে, বাবা? ভাষাটা তো বেশ ভালো শিখেছো দেখছি!

ভগু—হ্যাঁ স্যার, ভাষা শেখবার জন্যে কষ্ট করতে হচ্ছে খুব। আজকাল বাংলায় দুশো নম্বর।

হাকিম—সেটা আবার জানলে কি করে?

ভগু—কেন স্যার, আমরা যে ইস্কুলে পড়ি। কেউ নাইনে, কেউ টেনে, কেউ ইলেভেনে।

হাকিম—তা ইস্কুলের পড়া ছেড়ে তোমরা মুদির দোকানে কি আবেদন নিয়ে ঢুকেছিলে?

ভগু—চাল কিনবো বলেই ঢুকেছিলুম স্যার।

৩য় মুদি—ওর ওই সঙ্গীটির হাতে দুটো আড়াই-সেরী মাকড়া পাথর ছিল...... ঝাড়লেই......

পেস্কার—তোমরা থামো......

হাকিম—চাল কেনার আবার আবেদন কি?

ভগু—না স্যার, আবেদনটা ছিল কাঁকর না দেবার।

হাকিম—তার মানে! চালে কি কাঁকর দেয়!

ভগু—ভাত চিবিয়ে খেলেই টের পাবেন, স্যার।

১ম মুদি—আমরা, ধর্মাবতার, আড়ৎ থেকে এনে বেচি।

পেস্কার—ফের কোনো কথা কইবে তো বের করে দেবো।

হাকিম—তুমি কি কাঁকর দিতে নিষেধ করলে?

ভগু—না স্যার, নিষেধ করিনি। বললুম—দেখুন, ছোটো ছোটো কাঁকর বেছে বেছে মা'র চোখ খারাপ হয়ে গেছে। আপনাদের এক মণ চালে কত কাঁকর থাকে?...এই কথা জিগেস করতেই ও'রা মারমুখী হয়ে উঠলেন...

হাকিম—আর তুমি বুঝি দু হাতে পাথর নিয়ে তেড়ে গেলে?......তোমার নামটি কি?

বঙ্কু—আমার নাম বঙ্কিম ঘোষ...ডাক নাম বঙ্কু। তেড়ে যাইনি স্যার...আমি খুব বিনীত ভাবেই বললুম—দেখুন, চালের সঙ্গে বেমালুম মিশে যাবে এমন সাইজ মত কাঁকর বাছাই করে মেশাতে আপনাদের যেমন মেহনত, তা বাছতে আমাদের তেমনি কষ্ট, চোখও নষ্ট। তার চেয়ে, যত ওজনের কাঁকর থাকে সেই ওজনের একটা বড় পাথর দিয়ে দিন। চালটা কাঁকর-ফ্রি থাক।...তাই সেই পাথর নিয়ে গিছলুম।

হাকিম—কাঁকর-ফ্রি চাল! বেশ বলেছো তো!

বঙ্কু—হ্যাঁ, স্যার। আমরা ও'দের ক্ষতি করতে চাইনি। মণে যদি দু-সের কাঁকর থাকে, আমরা চাল আটত্রিশ সের আর একটা দু-সের পাথর নিয়ে হাসি মুখে এক মণের দাম দিতে রাজি। আড়াই তিন সের কাঁকর থাকলেও তাই।

হাকিম—এ তো চমৎকার প্রস্তাব।

বঙ্কু—না স্যার, এই আমাদের হামলা। ওই প্রস্তাবে ও'রা এক জোট হয়ে মারমার করে তেড়ে এলেন...ভাগ্যিস পুলিসে ধরে আমাদের হাজতে পুরলো, নইলে......

হাকিম—হাজতে তো ও'দেরই পোরা উচিত ছিল পেস্কার?......তারপর, দুধ-ওলটানো কেস।...তোমরা বসো।

পেস্কার—আসামী ফণী বড়াল, পল্টু দত্ত।

[ফণী ও পল্টুর কাঠগড়ায় প্রবেশ]

ইয়াব্বড়া-বড়া সব পাথর নিয়ে......

চড়ুই পাখি, চড়ুই পাখি,
ফুড়ুৎ, ফুড়ুৎ, উড়ছো;
টবের জলে নাইতে নেমে
ছিঃ কেন জল ছুঁড়ছো!

বকবে না মা! এমনি ক'রে
জল যদি হয় নষ্ট?
জানো না কি আনতে এ জল
মা'র কত হয় কষ্ট?

আয় না কেন আমার কাছে
ভাব যদি চাস করতে
শুকনো পাতা খড়-কুটো তুই
আনিস কেন মরতে?

থাকবি কাছে বাসবি ভালো
ভাত খাবি আর মিষ্টি,
করবো খেলা তা নয়তো
করিস অনাছিষ্টি!

কিচির মিচির করিসনেকো
ছাড় যত তোর বায়না
মায়ের কোলে দুজন মিলে
ঘুম যাবিতো আয়না?

হাকিম—তোমার নাম?

ফণী—ফণীন্দ্র বড়াল...ডাক নাম ফণী বা ফ'নে।

হাকিম—তোমরাও কি ঐ দলের নাকি?

ফণী—হ্যাঁ স্যার, আমরাও "স-সে-সঙ"-এর সভ্য।

হাকিম—তোমার নাম?

পল্টু—পল্টু দত্ত, ডাক নামও পল্টু।

হাকিম—তা গয়লার খাটালে গিয়ে দুধ ফেলে দিয়ে কি সমাজ সেবা করছিলে বাবা, বলতো শুনি?

ফণী—দুধ এক ফোঁটাও ফেলিনি, স্যার। ওটা ডাহা মিথ্যে কথা। আমরাও গিছলুম আবেদন নিয়ে?

হাকিম—তাই নাকি?

ফণী—হ্যাঁ, স্যার। আমরাও মিনতি করে ও'দের বললুম—আপনারা সেরে য-পোয়া জল দেন সেটা দুধে না মিশিয়ে আলাদা দিন—বাকিটা খাঁটি দুধ দিন। দামটা পুরো এক সেরেরই নিন।

পল্টু—আমরা স্যার দুধের পাত্র ছাড়া জলের বালতিও নিয়ে গিছলুম—ও'দের কাছে জল না থাকলে সরবরাহ করবার জন্যে।

১ম গোয়ালা—না ধর্মাবতার, ওরা জোর করে......

পেস্কার—তোমরা এখন থামো; হাকিম যখন জিজ্ঞেস করবেন তখন বলবে।

হাকিম—তোমরাও তো দেখছি চমৎকার প্রস্তাব করেছিলে!

ফণী—হ্যাঁ, স্যার। আমরা হাত জোড় করেই ও'দের সবাইকে বলছিলুম। ও'রা তখন সব লাঠি সোঁটা নিয়ে গরু-মোষ লেলিয়ে দিলেন আমাদের উপর। ভাগ্যিস পুলিস আমাদের ধরে ভ্যানে তুলে নিলে, নইলে...

হাকিম—এই তো দেখছি গরু-মোষ সমেত ও'দেরই তাড়িয়ে হাজতে ভরা উচিত ছিল!

পেস্কার—গোয়ালা আর মুদিদের জবানবন্দী-গুলো হুজুর একবার...

হাকিম—কিস্‌সু দেখবার দরকার নেই। এরা সব ভাল ছেলে। খুব ভাল কথা নিয়েই গিছলো। মিছিমিছি এদের অপমান ও হয়রানি করা হয়েছে। তার জন্যে ওদেরই শাস্তি পেতে হবে......

মুদি-গোয়ালা (সমস্বরে) — হুজুর... ধর্মাবতার......

হাকিম—পেস্কার, ওদের সব জেল হাজতে পাঠাও।

মুদি-গোয়ালা (সমস্বরে)—দোহাই ধর্মাবতার, কোনো দোষ নেই আমাদের হুজুর......

হাকিম—আরদালী, এই ছেলেদের চারজনকে আমার খাস-কামরায় নিয়ে গিয়ে বসাও। ...তারপর...পেস্কার, কি কেস?

(যবনিকা)

জীবন...
ভেলি...

জাদুরত্নাকর...

বাঁ হাতে আছে
একটা কাচে
দিয়ে টেবিলের উপ
এক ফালি খবরের
ফালিটা গ্লাসের ম
উপরে চাপালাম আ
অবস্থাতেই উল্টে
ম্যাজিকের মন্ত্র পড়ে
নিলাম ডান হাত—
সেঁটে রইলো গে
পড়লো না, কাগজও
তো জাদুর কের
কেন? ও, কায়দাটা
আচ্ছা; এবার যদি
তবে কি হবে?
ভাই, এবারই ফেল
জল পড়বে না, এম
সরিয়ে নিতে সবাই
তেমনি আছে উপ
পরে একটা গামলার
গেলাসটা ধরে আ
গড়িয়ে পড়লো গা

বলতে পার কে
ম্যাজিক দেখানো স
কাচের গ্লাসটা
আর সমান। আ
ধারে ছিল সরু
ফটোটাকে বাঁ হাতে
করে চেপে ধরে ও
করেছিলাম পরিষ্কা
কার্ডের মতন প
সেলুলয়েড নিয়ে
মুখের মাপে এক
নিয়ে সেই চাকতি
বসিয়ে দিয়েছিলা
মুখে। জল ভ
আপনা থেকেই অ
ছিল একটু ভেজ
ছোট, সেই জনাই
উপরে আটকে থে

খেলার শেষ অ
গ্লাসটা গামলার
সবার অগোচরে
সরিয়ে নিয়েছিল
হাওয়া ঢোকাতে
জলের সঙ্গে
আশ্রয় নিয়েছিল

ভালভাবে অভ
দের দেখিও—তা

...করি, আমার জীবন-বার্তিটির মতো হয়,
...চিয়ে আলো দিয়ে সবে, পুড়ে পুড়ে হোক লয়।

ফটো : শ্রীতরুণ মুখোপাধ্যায়

...বা, কবে আমি পালিয়ে
...র মতো হাসলো ভোলা।
... ভিজতেই চললো।
...শ-বোতলের থলিটা বগলে
...পা চালিয়ে চললো সে।
...চন কানু-ময়রার দোকানে
...ওয়ালার কাছে রাস্তায় বসে
...খলো কাঁচের মধ্যে চোখ
...গল খেলার মাঠে। সেখান
...কাদামাখা জামা-বই নিয়ে—
..., তখন সন্ধে। কবিরাজ
...করবার আগেই ড্যাঁ করে
... দিলো। তারও অনেক
...স—পকেট থেকে ইস্কুলের
...গেছে, তবে তার মনে হয়,
...শয়তান ভোলারই কাজ,
...শহরে যায়—আর ঠাকুর
...র খুব বন্ধু।
...জ পশুরাজের মত গর্জন

করে তখনি হাঁক দিলেন ভোলাকে। ভোলার গোবর-ভরা মাথায় কিছুই ঢুকলো না। মুখ বুজে মার খেলো, তারপর গায়ের ধুলো-কাদা মুছতে মুছতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল অন্ধকারে। ভোলা ঠিক করলো, নিধেকে জিজ্ঞেস করে নেবে, তার বাবা এমনি করে মারলে বাড়ি ছেড়ে কোথায় সে যেতো, সেখানেই যাবে আজ ভোলা।

ভোলা চলে গেল চিরকালের জন্যে কিন্তু পদ্মলোচনের মিথ্যে কথা বলার দুষ্টু ব্যাধি ক্রমশ বেড়েই চলল। তার সঙ্গে সঙ্গে সিংহ কবিরাজের মনেও সুখশান্তি সব নষ্ট হয়ে গেল। একজন শুধু মিথ্যে কথা তৈরী করে আর একজন তাই বিশ্বাস করে রাগে জ্বলে মরে, এই হলো পণ্ডিত পদ্ম-লোচন আর তার বাবা সিংহ কবিরাজের শাস্তি। আর তাদের কেউ বিশ্বাস করেনা, তারাও কাউকে বিশ্বাস করতে পারেনা, সব সময় মিথ্যে চিন্তা করে।

একছিল রাজা।

রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডার ভরা মোহরের ঘড়া, ধনরত্ন কি আঁটে—হীরে-মানিকে কথা বাটে।

রাজার ঘর-আলা পুরী-আলা লক্ষ্মী পিতিমে দু' রানী—সুয়োরানী আর দুয়োরানী।

তা সুয়োরানীর এক গং চুল, দুয়োরানীর দু গং চুল। তাই দুয়োরানীর আদরের সীমা নাই, সুয়োরানীকে—দূর—ছাই।

দুয়োরানীর গরব আর গায়ে ধরে না, দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। সাতদাসী পা টেপে, সাতদাসী পান সাজে, সাতদাসী অলতা সিন্দুর পরায়, টানা চোখে কাজল দেয়। দুয়োরানী সোনার সুতোর মেঘডুম্বুর শাড়ি পরেন, হীরে মুক্তোয় অঙ্গ ভরেন, গুয়া পান খান, এঘর ওঘর যান, ঝমর ঝমর মল বাজান।

দুয়োরানী পাটরানী আর সুয়োরানী গোয়াল-কাড়ুনী।

সুয়োরানী টেনা পরেন, এঁটোকাটা খান, গোয়ালে থাকেন, গাই-বাছুরকে খড় বিচুলি দেন, গোয়াল ঝেঁটিয়ে গোবর কুড়োন আর ঘুঁটে দেন। তবু তিন-সন্ধে দুয়োরানীর মুখ-ঝামটা খান, চোখের জল টেনার আঁচলে মোছেন আর থাকেন।

সুয়োরানীর দশার দশা, দুখের দশায় পথের শেয়াল কুকুর কাঁদে।

মানুষের পরাণ কত আর সয়—একদিন নিশুত নিবুত আঁধার রাতে গোয়াল ছেড়ে পুরী ছেড়ে সুয়োরানী বেরোন রাজপথে।

চলতে চলতে রাত পোহায়—রানী নগর পেরিয়ে বনে যান।

কিছুদূর যেতে এক আমগাছ বলে—কে গো বাছা দুখিনী মেয়ে, আমার তলায় বড় জঞ্জাল, দেবে একটু ঝাঁট দিয়ে?

সুয়োরানী শুকনো কাঠি কুড়িয়ে আঁটি বেঁধে ঝাঁটা করে গাছতলাটি ঝাঁট দিয়ে ঝকঝকে করেন, পুকুর থেকে আঁচল ভিজিয়ে জল এনে গাছের গোড়ায় দিয়ে পথ চলেন।

খানিক দূর যেতেই এক কলাগাছ বলে—কে গো মেয়ে কোথায় যাবে—আমার গোড়ায় দু'মুঠো ছাই দেবে?

সুয়োরানী খুঁজে পেতে পথের পাশে ছাইগাদা থেকে আঁচল ভরে ছাই এনে কলা গাছের গোড়ায় দিয়ে পথ চলেন।

যেতে যেতে যেতে যেতে অনেক দূরে এক বটবিরিক্ষির তলায় বসে সুয়োরানী জিরোন খানিক।

বটবিরিক্ষি বলে—কত লোক আসে, কত লোক যায়, ছায়ায় বসে হাওয়া খায়—তা তলাটি বড় নোংরা জঞ্জালে ভরা। ওগো বাছা ভালর মেয়ে, দেবে একটু ঝেঁটিয়ে?

সুয়োরানী কাঠি কুড়িয়ে আঁটি বেঁধে বটতলাটি ঝাঁট দিয়ে সাফ করে পথে চলেন। বটগাছ বলে—ঈশাণ কোণে ঈশানী, সেথায় পাবে নিশানি—পুকুর পাড়ে সন্ন্যাসী যে—তাঁর কাছে যাও। যা বলেন তা করো, এই পথেতেই ফিরো।

সুয়োরানী চলেন ঈশাণ কোণে। যেতে যেতে দেখেন মস্ত বড় পুকুরের পাড়ে যোগাসনে ধ্যান করেন সন্ন্যাসী। সে কি তেজ, যেন জ্বলন্ত আগুন। প্রণাম করে জোড় হাতে দাঁড়ান সুয়োরানী।

কতক্ষণে ধ্যান ভেঙে সন্ন্যাসী চোখ মেলে চান রানীর পানে, বলেন—যাও মা, যাও, পুকুরে যাও, তিন কোণের তিন খাবল মাটি মাথায় নাও; তিনি তিনটি ডুব দাও, দিয়ে উঠে এসো।

রানী পুকুরে গিয়ে এক কোণের মাটি মাথায় নিয়ে একটি ডুব দেন। এক ডুবেই এক মাথা কাজল-কালো কোঁকড়া চুল পিঠ ঢেকে হাঁটুর নীচে পড়ে। আর এক ডুবে দিব্যরূপে অঙ্গ ভরে, রানীর রূপ উথলে পড়ে, এত রূপ কি কারুর হয়—দেবলোকের দেবকন্যেরও নয়। আর এক ডুবে শুদ্ধ হয়ে উঠে এসে রানী প্রণাম করেন সন্ন্যাসীকে।

সন্ন্যাসী বলেন—যাও মা যাও, বাড়ি ফেরো।

রূপে দশদিক উজল করে সুয়োরানী চলেন বনের পথে।

যেতে যেতে বটতলা। বট-বিরিক্ষি বলে—কি আছে আর, কি দেব মা, এই পাতাটি নাও হাওয়া খাও।

বটগাছ পাতা দেয়, সুয়োরানী পাতা নিয়ে বাতাস করেন—আর অমনি সোনার সুতোয় বুটি তোলা কল্কাপেড়ে মেঘ ডুম্বুরে শাড়ি পড়ে। টেনা ছেড়ে শাড়ি পরে রূপে ভুবন আলো করে সুয়োরানী যান বনের পথ ধরে।

"সুয়োরানী গো সুয়োরানী, আমটি নাও।"

খানিক যেতেই কলাগাছ বলে—সুয়োরানী, পাকা কলা ছড়াটি নাও, খেয়ে দেয়ে বাড়ি যাও।

সুয়োরানী কলা নিয়ে খোসা ছাড়ান—আর অমনি হীরেমোতির তাগা তাবিজ, বাজু, বালা, কাঁকন চুড়ি কণ্ঠমালা, হার, কেয়ূর মুকুট নূপুর—অষ্ট অঙ্গের অষ্ট অলংকার বের হয়।

সুয়োরানী গয়নাগাটিতে অঙ্গ ভরে রাজরানীর বেশ ধরে বনের পথে যান। যেতে যেতে আমগাছ বলে—সুয়োরানী গো সুয়োরানী, আমটি নাও।

আমগাছ একটি পাকা আম দেয়। সুয়োরানী আমের খোসা ছাড়ান—অমনি সোনার চৌদোলা কাঁধে চার বেহারা সামনে দাঁড়ায়।

সোনার দোলায় চড়ে সুয়োরানী যান রাজপুরে।

রাজ্যের প্রজারা দেখে, রাজা দেখেন—আগ বাড়িয়ে আদর করে সুয়োরানীকে নিয়ে যান রাজ-অন্দরে।

সুয়োরানী পাটরানী হয়ে সুখে থাকেন।

হিংসের হাঁড়ি বিষের বড়ি দুয়োরানী যে—দেখে শুনে হিংসেয় জ্বলেন, হিংসেয় পোড়েন। একদিন নিশুত নিবুত আঁধার রাতে বনের পথে বেড়িয়ে পড়েন।

আমগাছ বলে—কে গো মেয়ে কোথায় যাও—তলাটি একটু ঝাঁট দাও।

আর যায় কোথা—নাটা চোখ ভাঁটা করে মুখ-ঝামটা দিয়ে দুয়োরানী বলেন—মহারাজের পাটরানী, আমি কি আর গোয়াল-কাড়ুনী? এতবড় বুকের পাটা আমাকে বলিস ধরতে ঝাঁটা?—দুম্ দুম্ পা ফেলে দুয়োরানী যান চলে। কলাগাছ বলে—কে গো মেয়ে কোথায় যাও, গোড়ায় দু মুঠো ছাই দাও। তিন থ্যাকর থ্যাকনা তিন ঝ্যাকর ঝ্যাকনা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যান দুয়োরানী। বটগাছ বলে—তলাটি একটু ঝাঁট দাও। মুখ-ঝামটা দিয়ে দুয়োরানী চলেন সেখান থেকে।

পুকুর পাড়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে দুয়োরানী বলেন—সাধুবাবা গো সাধুবাবা, যা দিয়েছেন সুয়োরানীকে তার দশগুণ দিন আমাকে।

একটু হেসে সন্ন্যাসী বলেন—পুকুরে যাও, তিন কোণের তিন খাবল মাটি মাথায় নাও, তিন তিনটি ডুব দাও, উঠে এসে বাড়ি যাও।

পুকুরে গিয়ে তিন কোণের তিন খাবল মাটি মাথায় নিয়ে দুয়োরানী ডুব দেন।

এক ডুবে চুল, দু ডুবে রূপ, তিন ডুব দিয়ে জলে ছায়া দেখেন—কি না—আহা-হা মরি, মরি—কি বা রূপ, কি বা শ্রী। তিন ডুবেই এত—চার ডুবে না জানি আরও কত। আর এক ডুব দেন দুয়োরানী—আর

(শেষাংশ—পরের পাতায়)

চালতা-দিদির কান্না

প্রভাতকুমার বসু

কাঁচ চকচকে জলে ভরা দীঘি। ভরা টলটলে জলে। দিঘির বুকে ঢেউ জাগে, জাগে বাতাসের মিতালিতে। আর ঘাসের জাজিম বোনা পাড়ের বুকে পড়ে ভেঙে।

আর তাই দেখে চালতা-বুড়ী। অনেক দিনের অনেক কিছুর সাক্ষী সে।

আর চালতা-বুড়ীর কাণ্ড-কারখানা দেখে পুকুরের তলার বাসিন্দারা। লালচে রুপোলী খুদে চোখো সব বাসিন্দারা।

সেই যে সেই লালচে রুইটি—বেটা ঘুরে বেড়ায় এদিক সেদিক—পাড়ের ঘাসে গা ঘষে গাটা একটু মেজে ঘষে নেয়; সেটা আবার বেশী করে দেখে।

রোজই পাখনা চালিয়ে জলের বুকে কাঁপন তুলে একবার করে পাক মেরে যায় এদিকটা। ঠাণ্ডা চালতা গাছের তলটি।

চালতা-বুড়ীও ওকে রোজ রোজ দেখে। আর রোজ রোজ দেখাশোনার ফলে ওদের দুজনের মধ্যে বেশ ভাবসাব হয়ে গেছে। আবার সম্বন্ধও পাতিয়েছে দুজনে। চালতা-দিদি আর লালরুই, ওর আদরের রুই-ভাই।

রোজই যখন পুকুরের পাড় থেকে রোদ্দুর নারকেল গাছের মাথার ওপর গিয়ে পড়ে—খেজুর গাছটার ছায়া যখন হেলে পড়ে—ঠিক তখন আসবে ও। আস্তে আস্তে জাগিয়ে তুলবে দাঁড়াটা—তার পরে মুখটা—তারও পরে কুচ চোখটা।

চালতা-দিদিও পাতা সরসর করে জানান দেবেঃ এসেছো।

—হ্যাঁগো, চালতা-দি।

—তা—খবর-টবর সব ভালো ত?

—হুঁ। আর আমার সেটার কি হলো?

—দাঁড়াও না; আর কয়েকদিন যাক্।

—সেবারেও তো তাই বলেছিলে। তুমি বড্ড একচোখো।

চালতা-বুড়ী হেসে ওঠে। পাতার সরসরানি।

—তাতো হাসবেই। মানুষগুলোকেই তুমি বেশী ভালবাসো—না হলে—

—কি করবো বলো রুই-ভাই। ঝণ্টুদের চাকরটা যখন জোর করে পেড়ে নেয়, তখন আমি কি করে ঠেকাই বলো।

—যা বলেছো। এই দেখ না. সেদিন ওপাড়ার কাতলাদাকে কেমন ধরে ফেললো—একটুও দয়ামায়া নেই ওদের। কাকীর অবস্থাটা একবার যদি দেখতে দিদি—আহা—কি কান্না—আর হবেই তো—একটি মাত্তর ছেলে—।

এরকম রোজই কত্তো কথা হয়। শোনে ঝিরঝিরে বাতাস—শোনে দিঘির টলটলে জল। আর শোনে পাড়ের কচি দুব্বো ঘাস।

সময় এলো। চালতা-দিদির সারা গা ভরে গেল সাদা সাদা ফুলে। রুই ভায়ের সেকি আনন্দ! উপছে পড়ে খুশীতে।

—চালতা-দিদি চালতা-দিদি—তোমায় না ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁগো চালতাদি'। তবে এবারে যেন আমার কথাটি মনে থাকে।

—হ্যাঁগো—হ্যাঁ। খুব মনে থাকবে। এবারে না পাতার আড়ালে এমন করে লুকিয়ে রাখবো—ঝণ্টু তো ঝণ্টু, ওর বাবারও সাধ্যি নেই খুঁজে বের করবে।

—দেখো দিদি। আমার অনেকদিনের সাধ কিন্তু। আর বলেও রেখেছি অনেককে—চালতার চাটনি খাওয়াবো।

তা— খবর-টবর সব ভাল তো?
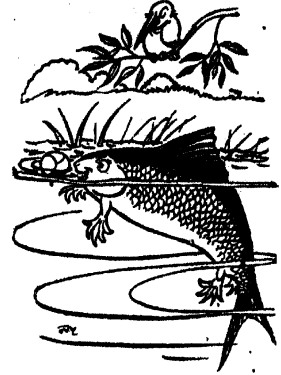
কি আনন্দ! জলের ওপর চালতা ভাসছে!

—বাবা রে বাবা! আবার সকলকে বলে রাখা হয়েছে। না—তোমার কাণ্ড দেখে হেসে আর বাঁচি না।

—আহা—একলা বুঝি খেতে আছে—

—তা ঠিক বটে।

একদিন, ছায়া যখন হেলে পড়েছে—সে-পাশের আম গাছটার ডালে বসে মাছরাঙাটা একটু ঝিমোচ্ছে—তখন রুই ভাইটি এলো। আস্তে আস্তে দাঁড়াটা জাগালো একটু, তারপর ভক্ ভক্ জল বেরোল খানিকটা—আর তারপর সে কি আনন্দ! জলের ওপর চালতা ভাসছে। শেষ নেই খুশীর।

চালতা-দিদিও খুশী। রুই-ভায়ের সাধ মিটেছে। এই ত ঝণ্টুরা পেড়ে নিয়ে গেল কয়েকটা। আর জলে পড়েছে বলে ওটা ফেলেই গেল বুঝি।

যাক্‌গে, রুই-ভাই ঠোঁট দিয়ে ঠোক্কর মারে। আরেঃ এ যে ছাই ডুবছে না। নিয়ে যায় কেমন করে? ভাবে আর ঠোক্কর মারে।

এদিকে যে ঝণ্টুদের চাকরটা ওকে দেখে ফিরে গেল জাল আনতে—সে দিকে খেয়াল নেই। চালতা-দিদি কিন্তু দেখেছে। কিন্তু সাবধান করে কি করে?. এইরে-এইরে—জাল নিয়ে এসে পড়লো যে।

রুই-ভাই যে ওর কাছ থেকে বেশ দূরে চলে গেছে। আচ্ছা অসাবধানী তো? একটুও কি হুঁশ থাকতে নেই? পাতা ফেলে সাবধান করতে চাইলো—কিন্তু এখন সময় উঠলো বাতাস। পাতা উড়ে গেল, জলে আর পড়লো না। কি করে—? এমন সময় —ঝপাং—

জাল পড়লো ওপর থেকে। আর তারপর আদরের রুই-ভাই, আর তার সাধের চালতা দুটোই এক সংগে উঠলো জালে।

সেই থেকেই শুরু হলো ওর কান্না। সেই কান্না আজও কেঁদে চলেছে বোসপুকুরের ধারের ওই প্রায়-শুকনো চালতাগাছটা। আর তার কান্না শুনে আসছে ঝিরঝিরে বাতাস—পুকুরের কাঁচ-চকচকে জল আর আম গাছের ডালে চুপটি করে-বসে-থাকা মাছরাঙা।

(সুয়ো-দুয়ো—শেষাংশ)

অমনি ও মা-মা, কোথায় যাব, কেমন করে মুখ দেখাব—রানীর বিশ্রী চেহারা, মাথা নেড়া, গা ভর্তি ঘা ফোড়া, এ-ই এ-ই নখ দশ আঙুলে।

হাউ—মাউ—কাঁদতে কাঁদতে অঝোরে গাল পাড়তে পাড়তে দুয়োরানীর যান সন্ন্যাসীর কাছে। তা কোথায় বা কে—শূন্য আসন, সন্ন্যাসী নেই।

দুয়োরানী চলেন ফিরতি পথে। বটতলায় ওঠেন—বটের ডাল মড়্ মড়্ ভেঙে পড়ে পিঠে। বাবা গো—মাগো—দুয়োরানী কেঁদে ছোটেন। কলাতলার যান—দুম্ করে কলার কাঁদি মাথায় পড়ে। বাবারে—মারে—গেলুম রে—মলুম রে—। দুয়োরানী আসেন আমতলায়। আম গাছের মোটা ডাল মড়্ মড়্ ভেঙে-মাথায় পড়ে—সকল জ্বালা জুড়োয়, দুয়োরানী মরে পড়ে থাকেন আমতলায়।

আমার কথাটি ফুরুলো
নটে গাছটি মুড়ুলো।

ঘোষবাড়ির মিণ্টু, ভাই, রূপু, তপু আর বোসবাড়ির পিকু, মিঠু। ন'টা বাজলে আর মন থাকে না পড়ায়। বাবা গেছেন স্নান করতে। মা ব্যস্ত রান্নাঘরে। বন্ধু এসে ডেকে নিয়ে গেছে দাদাকে। দিদি কোথায় তার ঠিক নেই। এই সুযোগে চোখের পলকে ওরা গুছিয়ে ফেলে বইপত্তর। রূপু একফাঁকে বারান্দায় গিয়ে পিকু মিঠুর পড়ার ঘরের দিকে চেয়ে ইশারা করে আসে, 'আমরা রেডি,—তোদের হলো?'

মিণ্টু, ভাই তখন জিনিসপত্তর গুছোতে ব্যস্ত। সেই গত পুজোতে মিণ্টু 'ডাকঘর' নাটকে পাকা মোটা গোঁফ লাগিয়ে পিসেমশাই হয়েছিল,—ড্রয়ারের এক কোণে রাখা সেই গোঁফখানা বার করে ভাইকে বলে, 'ধর।'

তারপর আলমারীর পেছন থেকে নেয় বিসর্জনের দিন চেয়ে-চিন্তে রাখা মা দুর্গার তলোয়ারখানা। বর্ষার জন্য কেনা দুজনের দুজোড়া গামবুট।

সব যখন যোগাড়যন্তর হয়ে গেল তখন, কেউ যেন না টের পায়, এত আস্তে আস্তে, পা টিপে পা টিপে ওরা বেরিয়ে আসে। সিঁড়ির কাছে দেখে পিকু মিঠুও রেডি।

বাড়ির অল্প দূরে বকুলতলা। সবাই যাবে সেখানে। গান গাইতে গাইতে ওরা ছুটল।—

'ঢং ঢং ঢং বাজল নটার ঘণ্টা,
ইস্কুলে যে চায় না যেতে মনটা;—
খেলব এখন রাজা রাজা
বকুলগাছের তলাতে—
ভাই দেখ না গান ধরেছি
ছ'জন ছ'টা গলাতে।'

সারি সারি অনেকগুলো বকুলগাছ। বেশ ছায়া এখানটায়। একটা গাছের তলায় মাটি দিয়ে বেশ উঁচুমতন বেদী করা আছে। ওটা হবে সিংহাসন। ওদের মধ্যে মিণ্টুই বড়। কাজেই ওর রাজা হওয়ায় কেউ আর বাধা দেয় না। গামবুট পায়ে দিয়ে, গোঁফ লাগিয়ে তলোয়ারটা হাতে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে ও বসে সেই বেদীতে। ভাই পেয়েছে মন্ত্রীর পদ। গামবুট পরে লাঠি হাতে সে হলো মন্ত্রী। তপু গিয়ে খানিক দূরের একটা বকুলগাছের পেছনে রইল লুকিয়ে। মিঠুর মাথা থেকে ফিতে খুলে তা দিয়ে ওর দুহাত বেঁধে দেওয়া হলো। ওকে আর রূপুকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো রাজার সামনে। প্রহরী বানিয়ে পিকুকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো পথের মুখে—খবরাখবর জানার জন্যে।

এইদিকে সব রেডি হয়ে যেতেই মিণ্টু বলল, "মন্ত্রী, এবার তাহলে আমরা আমাদের রাজকার্য শুরু করি?"

ভাই বলল, "হ্যাঁ মহারাজ।"

মিণ্টু—আজকের প্রধান কাজ কি মন্ত্রী?

ভাই—প্রধান কাজ হলো নানুর বিচার করা।

মিণ্টু—কেন? কি করেছে নানু?

ভাই—মহারাজ, আপনি তো জানেন, ওর সঙ্গে আমাদের অনেকদিন ধরে ঝগড়া চলছে—

মিণ্টু—হুঁ, জানি।

ভাই—গতকাল আপনি যখন দাদার হাতে মার খেয়ে খুব কান্নাকাটি করছিলেন—

মিণ্টু—(হুঙ্কার ছেড়ে) মন্ত্রী!

ভাই—সরি, আমার ভুল হয়ে গেছে মহারাজ—ক্ষমা করুন। মা পিঁয়াজ কাটছিলেন সেই ঝাঁঝে আপনার চোখে জল এসেছিল—।

মিণ্টু—তাই বল!

ভাই—তখন নানু এসে বলল, তোর সঙ্গে অনেকদিন ধরে ঝগড়া; আজ খাস্‌ বিকেলে লাইব্রেরীর মাঠে—আমি তোর সঙ্গে ভাব করে নেব।

মিণ্টু—বটে? তারপর?

ভাই—তারপর কথামতো গেলাম বিকেলে। গিয়ে দেখ কি!

মিণ্টু—কি দেখলে?

ভাই—দেখলাম, দুটো ছোট ছোট কলাগাছ পুঁতে একটা গেট মত বানিয়েছে নানু। আর গেটের মুখে কাঁটাভর্তি গোলাপ-গাছের ডাল, আরও সব ডালপাতা নোংরা ফেলে ভর্তি করে রেখেছে গেটটা!

মিণ্টু—বটে!

ভাই—শুধু কি তাই, মহারাজ? তার মধ্যে আবার একটা কাগজে 'স্বাগতম' লিখে লটকে রেখেছে—আর দূরে দাঁড়িয়ে হিহি করে হাসছে নানু।—এর একটা বিচার আপনাকে করতেই হবে!

মিণ্টু—নিশ্চয়ই বিচার করব! এত বড় অপমান!

এই সময় সামনে দাঁড়ান রূপু আর মিঠু হেসে উঠতেই রাজা বললেন, "মন্ত্রী—এইসব দরকারী কথার সময় প্রজারা হাসে কেন?"

ভাই—এই, এরকম হাসলে রাজ্য থেকে তোমাদের বার করে দেওয়া হবে।

মিণ্টু—আচ্ছা মন্ত্রী, এবার বল, এই প্রজাদের কি চাই?

ভাই—(রূপুর দিকে ফিরে) এই প্রজা, বল তোমার কি দরকার?

রূপু—মহারাজ, আমার পাশের বাড়ির মিনুকে ধরে এনে জেলে দিতে হবে।

মিণ্টু—কেন? কি করেছে মিনু?

রূপু—মহারাজ, আপনি তো জানেন, এখন আমাদের রাজ্যে কালোজাম পাওয়া যায় না। আর আপনিও গত রবিবার আদেশ দিয়েছেন, এরাজ্যে কেউ কালোজাম খেতে পারবে না। কিন্তু কাল মিনু আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে কালোজাম খেয়েছে!

মিণ্টু—বটে! এতবড় সাহস!

রূপু—হ্যাঁ মহারাজ।

মিণ্টু—মন্ত্রী?

ভাই—আজ্ঞে মহারাজ—

মিণ্টু—মিনুকে ধরে আনতে পার?

ভাই—মিনুর মর্নিং ইস্কুল মহারাজ! এখনো ছুটি হয়নি—

মিণ্টু—ও—তাও-তো বটে।

ভাই—আপনাকে ভাবতে হবে না মহারাজ।।

গামবুট পায়ে দিয়ে, গোঁফ লাগিয়ে, তলোয়ার নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে

আমি ব্যবস্থা করছি। (ভাই গিয়ে গাছের পেছন থেকে তপুকে ধরে নিয়ে এলো।)

মিন্টু—তুমি জান, কি ব্যাপার ঘটেছে? মিনু নাকি কাল কালোজাম খেয়েছে?

তপু—আজ্ঞে না মহারাজ।

মিন্টু—সে কি! ও যে বললো!

তপু—ও ভুল দেখেছে মহারাজ। মিনু জিবে একটা কপিং পেন্সিল ঘষে এসেছিল। তাই মনে হচ্ছিল বুঝি—

মিন্টু—(রূপুর দিকে ফিরে) ছিঃ। তুমি এত বড় হলে, এখনো এত মোটা বুদ্ধি!

তপু—ক্লাশের অঙ্কের দিদিও ওকে সেই কথা বলেন মহারাজ।

মিন্টু—আচ্ছা, তোমরা যাও তোমাদের বিচার শেষ। এবার বল মন্ত্রী, এর কেন হাত বাঁধা?

ভাই—মহারাজ, এ চুরি করেছে।

মিন্টু—চুরি!

ভাই—হ্যাঁ মহারাজ। আমার যে তুলোর খরগোসটা আছে—সেটাকে দড়ি বেঁধে রেখেছিলাম—ও তা চুরি করেছে।

মিন্টু—বলো কি, এত সাহস? কি হে তুমি চুরি করেছ?

মিঠু—না মহারাজ।

মিন্টু—সেকি? মন্ত্রী কি তবে মিথ্যে বলছে?

মিঠু—আমি খরগোস চুরি করিনি মহারাজ।

মিন্টু—তবে কি চুরি করেছ?

মিঠু—মহারাজ, কাল আমি পথে চলতে চলতে দেখলাম, একটা দড়ি পড়ে আছে। আমার দাদার লাট্টুর লেত্তি হারিয়ে গেছে, তাই আমি ওটা তুলে নিয়েছিলাম। ওর মাথায় যে একটা খরগোস বাঁধা আছে তা দেখিনি।

মিন্টু—মন্ত্রী শুনছ, এ কি বলছে?

ভাই—শুনেছি মহারাজ। এ অত্যন্ত ধূর্ত।

মিন্টু—কি! ধূর্ত! আমার রাজ্যে সবাই ভাল হোক, এই আমি চাই। কিন্তু যদি ধূর্ত লোকই থাকতে পারল তবে কিসের এই রাজ্য, আর কিসের আমি রা—

আর বলতে পারল না। সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। কারো মুখে কথা নেই। কিছুক্ষণ পরে মিন্টু নাকের নীচে যেখানটায় গোঁফ ছিল, সেখানটায় হাত বুলোতে বুলোতে পেছন ফিরে তাকাল। মন্ত্রী আর প্রজারাও রাজার সঙ্গে তাকাল সেই দিকে।

বিরক্ত হয়ে মিন্টু বলল, "পিকুটা যদি একটুও কাজের হয়!"

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে পিকু এসে হাজির। ঢোক গিলে বলল, "আমার পাশ দিয়ে ভাস্করদা চলে গেল!—তার হাতে আমাদের রাজা মশাইয়ের গোঁফটা দেখলাম কেন?"

বুদ্ধির পরখ
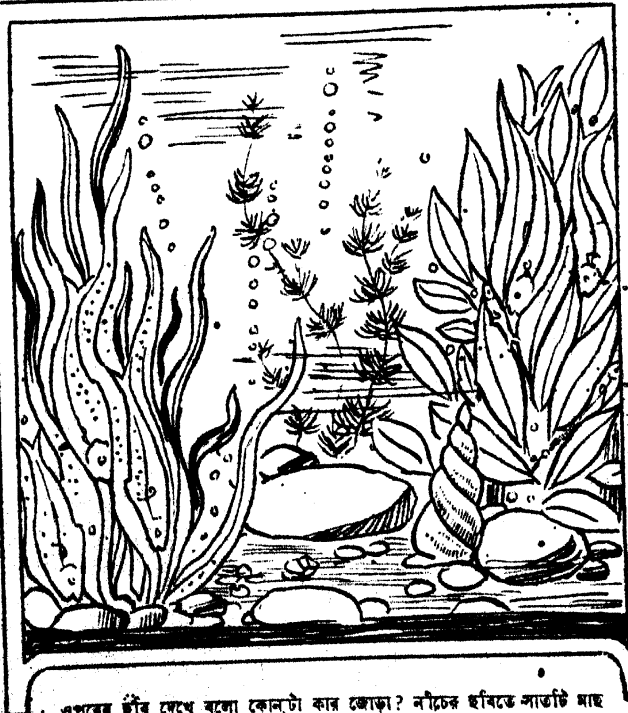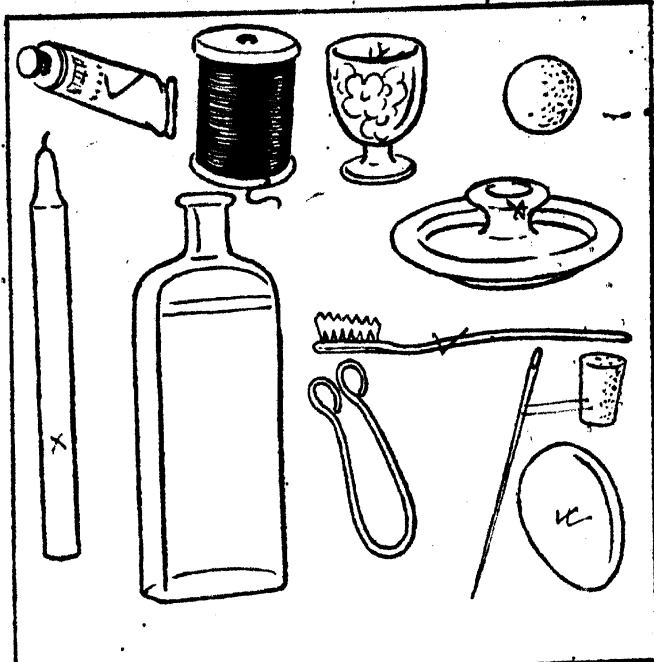
ওপরের ছবি দেখে বলো কোন্‌টা কার জোড়া? নীচের ছবিতে সাতটি মাছ লুকিয়ে আছে, খুঁজে বার করো।
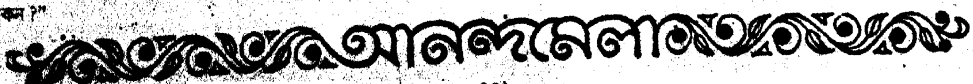
একটা ছিল ছাগলছানা। একদিন তার মনটা ভারি খারাপ-খারাপ লাগছিল। কেন লাগবে না? আহা! পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটা কী সুন্দর গান গায়! বিলিতি গান। সে-ও যদি গান গাইতে পারত! মনটা খারাপ-খারাপ লাগছিল বলেই বেড়াতে বেরুল। একা একা। কাউকে কিছু না বলে।

মাকে কিছু বললে না।

দাদাকে কিছু বললে না।

বুড়ি ঠাকুমাকেও কিছু বললে না।

বেড়াতে বেড়াতে হয়েছে কী—অনেক দূরে চলে গেছে। চলতে-চলতে যাঃ! পথ গেছে হারিয়ে। পথ হারিয়ে একটা আধা-বন, আধা-জঙ্গল মত জায়গায় হাজির। সেখানে কেউ কোথাও নেই। এতটুকু টুঁ শব্দ নেই। খালি মাঝে মাঝে গুব-গুব করে কী যেন ডাকছে।

জায়গাটা একেবারে উটকো। তার ওপর ছাগলছানাটা কেমন করে বাড়ি যাবে, তারও নেই ঠিক তো। অথচ দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, বাছার বুকে একটুও ভয়-ডর নেই। একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে, চোখ ঢৌরিয়ে, মজাসে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ কে যেন ডাকল, "ও ছাগলছানা, ছাগলছানা ভাই, একা-একা কী করছ বনে-জঙ্গলে?"

আচমকা একটা অচেনা গলা শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠল ছাগলছানাটার। তারপর চটপট নিজেকে সামলে নিয়ে ছাগুলে-ছাগুলে গলায় ডেকে উঠল, "ম্যা-এ্যা-এ্যা। কে ডাকে?"

"আমি ডাকি। ওপর দিকে চাও?"

বলতেই ছাগলছানাটা ওপর দিকে তাকিয়েছে। তাকাতেই দেখে কী—একটা এতটুকুনি জন্তু, দিব্যি মানুষ-মানুষ দেখতে, গাছের ডালে ঠ্যাং জড়িয়ে দুলছে আর হাসছে। ইয়া পেল্লাই একটা ল্যাজ তার। ল্যাজটা ছাগলছানাটার নাকের ডগায় সোজা নেমে এসেছে।

তাই না দেখে ছাগলছানাটার কেমন যেন রাগও হচ্ছে, হাসিও পাচ্ছে। পাবি তো প্যা—হাসিটা বেশি বেশি পাচ্ছে। তাই হাসিটাকে খুব কষ্টে-সৃষ্টে গলার মধ্যে আটকে রাখলে। রেগে-রেগে বললে, "কে রে তুই, আমার নাকে ল্যাজ বুলোচ্ছিস? আমি তোর কান চেটে দেব—জানিস!"

অমনি সেই ল্যাজ-ঝোলা জন্তুটা হি-হি-হি করে হেসে উঠল। হেসে উঠে গাছের ডালে মারলে বাঁই-বাঁই করে ক'টা চরকি-বাজি। মেরেই ছাগলছানার মুখের সামনে ধপাস করে লাফ দিয়ে পড়ল। পড়ে বললে, "আহা! আহা! রাগ কর কেন ভাই, আমি কী তোমার পর? তুমি ছাগলছানা, আমি বাঁদরছানা। তুমি আমার বন্ধু।"

ছাগলছানাটা বললে, "আহারে! মরে যাই দরদ দেখে। ওসব বন্ধু-টন্ধু মানি না। গান শেখাতে পার কিনা তাই বল? আমি গান শিখতে বেরিয়েছি।"

ছাগলছানার কথা শুনে বাঁদরছানা তো হেসে গড়াগড়ি। বললে, "গান শিখবে—সে কেমন কথা?"

হাসি শুনে ছাগলছানার মাথায় চড়াং করে রক্ত উঠে গেছে। চেঁচিয়ে মেচিয়ে কেলেঙ্কারী! বললে, "দাঁত খিঁচিয়ে হাসছিস—তোর দাঁতে পোকা ধরুক। গান শিখবই তো! আমাদের পাশের বাড়ির মেয়েটা যদি বিলিতি গান গাইতে পারে, আমিও পারব। আমিও বিলিতি গান শিখব।"

তখন সেই বাঁদরছানাটা বললে, "যাঃ চলে! তুমি তো ছাগলছানা। বিলিতি গানা গাইবে তুমি কেমন করে?"

"কেন এমনি করে"—বলেই ছাগলছানাটা গলায় সুর ছেড়েছে। আর যাবে কোথায়? অমনি "ভ্যাঁ-ম্যা, ভ্যাঁ-ম্যাঁ, ভ্যাঁ-ভ্যাঁ-ভ্যাঁ—ম্যাম্যা" করে বিচ্ছিরি আওয়াজ গলা ফেটে বেরিয়ে পড়ল।

আর দেখতে হয়, গান শোনা কী—তাই হাসতে হাসতে বাঁদরছানার পেট ফেটে যাবার গোত্তর।

বিচ্ছিরি বাঁদুরে-বাঁদুরে হাসি শুনে এবার ছাগলছানা রেগে-আগুন, তেলে বেগুন। "দেখো, দেখো, আদিখ্যেতা দেখো। আমার গান শুনে হাসি! বাঁদরামী! দুৎ তোর হাসির নিকুচি করেছে।" বলে ভেংচি কেটে গট-গট করে হাঁটা দিলে বনের ভেতরে।

সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরছানাটা চেঁচিয়ে উঠল, "যাসনি ছাগলছানা, বনের ভেতরে যাসনি, বাঘে খাবে।"

শুনতে বয়ে গেছে। দৌড় দিল ছাগলটা বনের ভেতর।

ছুটতে ছুটতে ছাগলছানাটা বনের ভেতর বেশ খানিকটা ঢুকে পড়েছে। এমন সময় একটা মস্ত বড় ঝিল দেখতে পেলে। ঝিলের চকচকে জল দেখে তার মনটাও কেমন যেন "জল খাই", "জল খাই" করে উঠল। আশ্চর্য কী! অনেকটা তো পথ হেঁটেছে, তা একটু তেষ্টা তো পাবেই। তাই সে খুঁজে খুঁজে বেশ একটা উঁচু মত পাথরের ঢিপি বার করলে। তার ওপর থেকে নিচু হয়ে, জলে চুমুক দেবার জন্যে যেই হেঁট হয়েছে—ব্যস একেবারে থ। জল খাবে কী। আহা! চোখ যেন তার জুড়িয়ে গেল। কাচের মত ঝকঝকে জল টলটল করছে। আর তাতে কত মাছ! রুপালি মাছ, সোনালী মাছ। ঝাঁকে ঝাঁকে জলের ভেতর সাঁতার কাটছে। নাচছে আর খেলা করছে। দেখতে দেখতে কেমন আনমনা হয়ে গেল ছাগলছানাটা। ভুলেই গেল জল খেতে। মনে হল তক্ষুনি, আহা রে! আমি যদি ওদের মত জলের মধ্যে নাচতে পারতুম! তাহলে একবার বিলিতি গান গাইয়ে

ল্যাজটা ছাগল-ছানাটার নাকের ডগায় নেমে এসেছে

গণ্শা-বিশে-ক্যাবলা-ভজা আছিস্ কে কে?
পালা এখন, পালা আমার সামনে থেকে।
এ জায়গাতেই হল্লা করিস বেছে বেছে
জানিস্, মাথায় সরস্বতী ভর করেছে?
হুঁ-হুঁ বাবা, এখন তোরা তফাৎ যা তো
লেখক হওয়ার ঝক্কি কতো বুঝিস্ না তো।
একটুখানি মনোযোগে পড়লে ভাটা
জলজ্যান্ত মানুষটা হয় স্কন্ধকাটা।
এ নয় তোদের সুর করে ঐ নামতা পড়া,
অনেকটা ঘাম ঝরলে পায়ে দাঁড়ায় ছড়া।
সবটুকু ঘি চলকে ওঠে মগজেতে,
পছন্দসই এক-একটা মিল খুঁজে পেতে।
ওকি? তবু ঠায় দাঁড়িয়ে? শুনতে না পাস?
হাড়-হাভাতে হাড়গিলে সব মুন্দোফরাস।
না শুনে এই নিষেধ যদি বাড়াস ফ্যাচাং
বানিয়ে দেব সব-কটাকে ওরাংওটাং।
তিষ্ঠোতে কেউ পারবি তখন এ তল্লাটে?
হ্যাংলা হুতোম, উচ্চিংড়ে, বদ-বখাটে,
যা-খুশি-তাই করবো তোদের। অঙ্ক-স্যার ও
আসলে স্বয়ং, রাখবো না আজ খাতির তারও।
ভেল্কিবাজির খেল দেখাবো জানিস তোরা,
যেহেতু ডান হাতে আমার কলম ধরা।

মেয়েটাকে দেখিয়ে দিতুম। তাই সে ডাকল একটা রুপোলি মাছকে, "ও রুপোলি, রুপোলি মাছ, আমাকে তোমাদের সঙ্গে খেলতে নেবে? আমি তোমাদের সঙ্গে নাচব?"

রুপোলি মাছটা বললে, "তোমরা নাচো ডাঙায়। আমরা নাচি জলে।"

ছাগলছানাটা বললে, "তাতে কী! ডাঙার চেয়ে জল ভাল।"

"জলের তলায় বিপদ!"

"হুঃ! বিপদ-টিপদ মানি না। ভয় পাই না। আমি কী মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খাই। দেখছ না—আমি বড় হয়ে গেছি?"

"মায়ের কোল আর জলের তল অনেক তফাৎ।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ খুব জানি।"

"জেনে-শুনে আসতে চাও তো আসতে পার"—বলেই সেই রুপোলি মাছটা মারলে এক ডুব-সাঁতার। হারিয়ে গেল হাজারটা মাছের ঝাঁকে।

সঙ্গে সঙ্গে ছাগলটাও মারলে এক লাফ —তিড়িং করে। জলের মধ্যে। কিন্তু এ কী হল?

কী হল?

হয়েছে কী, সেই বাঁদরছানাটা সারাক্ষণ ছাগলছানাটার পিছু পিছু ঘুরেছে। চুপি চুপি—যেন না জানতে পারে। এখনও সে চুপটি করে লুকিয়েছিল ছাগলের পেছনে। আর যেই মেরেছে ছাগলছানা জলে লাফ —অমনি সে পেছন থেকে ঝাপটে ধরে ফেলেছে। "যাস নি, যাস নি। জলে ডুবে মরবি।"

কে কার কথা কানে নেয়। ছাগলছানাটা বাঁদরছানাটার সঙ্গে সেই পাথরের ঢিপির ওপর ঝটাপটি লাগিয়ে দিলে। বাঁদরও ছাড়বে না, ছাগলও ছাড়বে না। এ বলছে যাসনি। ও বলছে, ছেড়ে দে, দে ছেড়ে দে। আম যাব। বেশ করব। কিন্তু বাঁদর নাছোড়বান্দা। ঐ টুকু পাথরের ঢিপি। ঝাপ্টাঝাপ্টি করতে-করতে একবার বাঁদরটা

অমনি পিছন

গড়িয়ে যায়-যায়
পিছলে ডোবে-ডে
করতে না-পেরে
মারলে এক ঢু।
বাস! আর কী
জলের তলায় ত
জল খেল, আব
ডুবল। ফের উঠ
করে? নির্ঘাৎ ছা
মাথায় চট করে
তিনবারের বার
মাথা তুলেছে অম
সাঁই করে ছুঁড়ে
লাগবি-তো-লাগ
টান। যাঃ চলে
পারছে না কেন
হয়ে গেল কী ক
ঠেলা।" ছাগলটা
ল্যাজ টানল—"

এখন ভোর হয়ে আসার সময়। এখন আকাশে, এখান থেকে আকাশ দেখা যায় না, হয়তো একটা—একটাই তারা কাঁপছে। আর পাখিটা, হলদে ঠোঁট, কালো ডানা, বোধ হয় ময়নাই, খাঁচার ভেতর ঝিমোচ্ছে। বেড়ালটা, কবে প্রথম এসেছিল মনে নেই, বাইরের ঘরে কিম্বা তক্তপোষের তলায় শরীর গুটিয়ে আরামে পড়ে আছে। আর, এ বাড়িটা যার সেই ভয়ংকর মানুষটা এখন ঘুমিয়ে থাকলে স্বপ্ন দেখছে কিনা কে জানে, দেখছে—নিশ্চয়ই দেখছে, সুদের একটা মস্ত বড় অংক তাকে দোলনার মতো দুলিয়ে-দুলিয়ে আরামে-আরামে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি দিচ্ছে।

শুধু সেই ভয়ংকর মানুষটাকে, সুদখোর নবীন দত্তকেই এখন দেখল না কণ্ঠি। দেখতে ইচ্ছেও করল না। করবে না। অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে এগিয়ে এল খাঁচার কাছে। কণ্ঠি দেখল পাখিটাকে। খুঁজে পেল বেড়ালটাকে। শুধু দেখলই। অস্পষ্ট। ঝাপসা। কিন্তু বেড়ালের চোখ দুটো জ্বলছে। এখনও অন্ধকার। এখনও অনেক দেরি। সময় হবে কখন!

হবে। হবেই। আরও পরে, বেশিক্ষণ নয়, সময় যাচ্ছে তর তর করে, বাইরে অল্পে অল্পে অন্ধকার কেটে যাবে, আকাশ দেখা না গেলেও, আলোর একটা মিষ্টি গন্ধ লাগবে নাকে, ভোরের একটা স্নিগ্ধ আবেশ—এ বাড়িতে আজ কণ্ঠির শেষ অন্ধকার।

শেষ। আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে শেষের সেই রেখাটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে কণ্ঠিকে মুক্তি দিতে—দুটো কালো-কালো লোমশ হাতের বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে এক নতুন পরিবেশে নিয়ে যেতে। এই অন্ধকার গহ্বরে সুদের মোটা অঙ্কে দুলে-দুলে একা-একা ঘুরপাক খাক ওই ভয়ংকর মানুষটা। মরুক। শরীরের মধ্যে কেমন-কেমন করে কণ্ঠির। এতদিন এখানে থাকার, নিজেকে বিকিয়ে দেবার, শুধু ভাত-কাপড় আর ঘরের লোভে কোন দিকে চোখ তুলে না তাকাবার গ্লানি যেন সে অনুভব করে মনে মনে আবার। মরুক—মরুক সুদখোর নবীন দত্ত। কণ্ঠি বসে থাকে আলোর আশায়। আলোর প্রথম রেখা আকাশ থেকে মাটিতে নামবে কখন? না, এখান থেকে আকাশ দেখা যায় না। দেখার দরকারও নেই।

কবে এসেছিল এখানে প্রথম আত্মীয়তার ক্ষীণ সুতোয় ভর করে, অন্ধকারে ঝড়ের ঠেলা খেতে-খেতে ডানা ভাঙা ছোট একটা

খুড়োর খেল

গড়ের মাঠেতে ফুটবল খেলা সবাই দেখতে যায়,
কত চিৎকার, কত হৈ চৈ এ পাড়ায়, ও পাড়ায়;
কথা কাটাকাটি, বাজি ধরাধরি, কত হাসি-কান্নার
স্রোত বয়ে যায়; কী এমন খেলা, এতখানি দাম যার!
নাওয়া খাওয়া ভুলে ছোটে দলে দলে রোদে পুড়ে জলে ভিজে
ছেলে বুড়ো সব—দেখতেই হবে, এ খেলায় আছে কী যে!
এই ঠিক করে, ভারি খুশী হয়ে বিশুখুড়ো সেজে গুজে
গেল একে ওকে জিজ্ঞেস করে গড়ের মাঠটি খুঁজে।

গিজ গিজ করে লোক চারিধারে, খুড়ো তো অবাক ভারি।
খেলা শুরু হবে, ভিড় ঠেলে ঠুলে বসে পড়ে তাড়াতাড়ি।
ও মা, এ কী খেলা! দুটি দল মিলে একটি মাত্র বল,
নিয়ে কাড়াকাড়ি করে আর ছোটে, আর শুধু কোলাহল

পড়ো বাড়ির ভূত—সত্যিই অদ্ভুত!

ছড়া—শ্রীবিমল ঘোষ ঃ ফটো—শ্রীরেবন্ত ঘোষ

পড়ো-বাড়ির ভূতের খবর টিটু কিছু জানে,
স্কুলের শেষে সেই খবরটা দিলে মিঠুর কানে।

একদিন তাই দলবেঁধে সব ভূতের বাড়ি যায়,
হ্যাংলা-পানা ছোক্‌রা কালো ভূতের দেখা পায়।

ভূতও খুশি ওদের পেয়ে—নেইকো ওদের ভয়।
বলে-'যা খেতে চাও, তাই খাওয়াবো শক্ত কিছু নয়!'

টিটু-মিঠু অমনি দেখে-তাদের আশে-পাশে,
থালা-হাঁড়ি ভরতি খাবার হাওয়ায় উড়ে আসে।

খাওয়ার শেষে ভূতটা বলে-যাও এবারে বাড়ি—

সেই গাড়িতে টিটু মিঠু শূন্যে দিল পাড়ি

কুমিরের ঘর

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এখন ভোর হয়ে আসার সময়। এখন আকাশে, এখান থেকে আকাশ দেখা যায় না, হয়তো, একটা—একটাই তারা কাঁপছে। আর পাখিটা, হলদে ঠোঁট, কালো ডানা, বোধ হয় ময়নাই, খাঁচার ভেতর ঝিমোচ্ছে। বেড়ালটা, কবে প্রথম এসেছিল মনে নেই, বাইরের ঘরে কিম্বা তক্তপোষের তলায় শরীর গুটিয়ে আরামে পড়ে আছে। আর, এ বাড়িটা যার সেই ভয়ংকর মানুষটা এখন ঘুমিয়ে থাকলে স্বপ্ন দেখছে কিনা কে জানে, দেখছে—নিশ্চয়ই দেখছে, সুদের একটা মস্ত বড় অংক তাকে দোলনার মতো দুলিয়ে-দুলিয়ে আরামে-আরামে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি দিচ্ছে।

শুধু সেই ভয়ংকর মানুষটাকে, সুদখোর নবীন দত্তকেই এখন দেখল না কণ্ঠ। দেখতে ইচ্ছেও করল না। করবে না। অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে এগিয়ে এল খাঁচার কাছে। কণ্ঠ দেখল পাখিটাকে। খুঁজে পেল বেড়ালটাকে। শুধু দেখলই। অস্পষ্ট। ঝাপসা। কিন্তু বেড়ালের চোখ দুটো জ্বলছে। এখনও অন্ধকার। এখনও অনেক দেরি। সময় হবে কখন!

হবে। হবেই। আরও পরে, বেশিক্ষণ নয়, সময় যাচ্ছে তর তর করে, বাইরে অল্পে অল্পে অন্ধকার কেটে যাবে, আকাশ দেখা না গেলেও, আলোর একটা মিষ্টি গন্ধ লাগবে নাকে, ভোরের একটা স্নিগ্ধ আবেশ—এ বাড়িতে আজ কণ্ঠর শেষ অন্ধকার।

শেষ। আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে শেষের সেই রেখাটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে. কণ্ঠকে মুক্তি দিতে—দুটো কালো-কালো লোমশ হাতের বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে এক নতুন পরিবেশে নিয়ে যেতে। এই অন্ধকার গহবরে সুদের মোটা অঙ্কে দুলে-দুলে একা-একা ঘুরপাক খাক ওই ভয়ংকর মানুষটা। মরুক। শরীরের মধ্যে কেমন-কেমন করে কণ্ঠর। এতদিন এখানে থাকার, নিজেকে বিকিয়ে দেবার, শুধু ভাত-কাপড় আর ঘরের লোভে কোন দিকে চোখ তুলে না তাকাবার গ্লানি যেন সে অনুভব করে মনে মনে আবার। মরুক—মরুক সুদখোর নবীন দত্ত। কণ্ঠ বসে থাকে আলোর আশায়। আলোর প্রথম রেখা আকাশ থেকে মাটিতে নামবে কখন? না, এখান থেকে আকাশ দেখা যায় না। দেখার দরকারও নেই।

কবে এসেছিল এখানে প্রথম আত্মীয়তার ক্ষীণ সুতোয় ভর করে, অন্ধকারে ঝড়ের ঠেলা খেতে-খেতে ডানা ভাঙা ছোট একটা

পাখির মতো কাঁপতে-কাঁপতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল নবীনের পায়ের ওপর লজ্জা ঢাকবার গোটা একটা, একটাই কাপড়ের কান্নার, দুটো ভাতের জন্যে, এক ফালি জায়গার আশায়—কাঞ্চির ভাল মনে পড়ে না। কিন্তু যত সে চেয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছিল নবীন। চোখে এখন আগুন জ্বলে কাঞ্চির। আর, যাবার আগে ওখানে, যে ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে আরামে গড়াচ্ছে নবীন, সেখানে দপ্ করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে চায়। পুড়ে-পুড়ে এই অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ছাই হয়ে যাক সুদের হিসেবে যত মোটা মোটা খাতা আর সুদখোর ওই ভয়ঙ্কর মানুষটা। চিৎকার করে-করে —খাঁচার মধ্যে পাখিটাও পুড়ুক। আর, ভাঙা পাঁচিল টপকে এক লাফে পালিয়ে যাক বেড়ালটা। কিন্তু সব চেয়ে আগে নিজে পালাবে কাঞ্চি. ভোর হওয়ার সময়-সময়, প্রথম আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। এইবার বুঝি সময় হল!

প্রথম কাক ডাকল কাছাকাছি কোথাও ভয়ে-ভয়ে ঘুম-চোখে ভোর হয়েছে কিনা ভাল করে না জেনে। তবু যেন ও ভোরের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে, অধীর হয়ে, ডানা ঝাপটে অন্য গাছের নতুন ডালে উড়ে যাবার জন্যেই একবার ডেকে উঠল জোর করে আকাশ থেকে আরো টেনে আনবার এক অদম্য ইচ্ছায়। সেই কাকটার মতো কাঞ্চিও একবার তার মনের ব্যগ্র বাসনার কথাটা অদ্ভুত আওয়াজ করে এখনই জানাতে চায়। দুই হাত নেড়ে-নেড়ে ধোঁয়ার মতো অন্ধকার সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ও খিড়কির দরজার পাশে একফালি বারান্দায় বসে থাকে চুপচাপ। ওর হাতে একটা ঠোঙা। তাতে এক কৌটো পাউডার। এক শিশি স্নো। আর, আরও একটা ছোট জিনিস আছে, ঠোঁটের রঙ। আর কিছু না!

এসব কাঞ্চিকে এখনও নবীন দত্তই কিনে দেয়। না বললেও ফুরিয়ে যাবার সময়-সময় ঠিক খেয়াল রাখে নবীন। মাঝে মাঝে নিজে এসে দাঁড়ায় তাকের কাছে। পাউডারের টিনটা জোরে-জোরে নাড়ে! খকখক শব্দ হয় না। স্নো-ও শেষ—শিশি খুলে চোখের কাছে তুলে দেখে নবীন।

তখন কাঞ্চিকে ও জোরে ডাকে, "কাঞ্চি, এদিকে আয়। চোখে দেখতে পাস না? এই দেখ, খালি। বলি সাজগোজ করবার একটু শখও হয় না তোর? মনে সাধ-আহ্লাদ নেই?" নবীন সোনা বাঁধানো ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসে। এক-পা এক-পা করে কাছে এগিয়ে আসে কাঞ্চির। এদিক-ওদিক তাকায়। বোধহয় নিঃসন্দেহ হয়ে ওকে কাছে টানে। আদর করে। আর একটা কঠিন যন্ত্রণায় যেন চোখ দুটো বুজে আসে কাঞ্চির। একটু পরে পিছিয়ে গিয়ে ও বলে, "তরকারী পুড়ে যাচ্ছে, আমি যাই—"

হয়তো আরও কিছুক্ষণ ওকে ধরে রাখত নবীন। সুদ আদায় করে নেবার চেষ্টা করত পুরোপুরি। কাঞ্চির থাকা-খাওয়ার জন্যে যে টাকা মাসে মাসে ঢালে সুদখোর নবীন দত্ত, তার চড়া সুদ তাকে তো দিতেই হবে। নাহলে কাঞ্চিকে এখানে রাখবে কেন নবীন। তবে প্রথম-প্রথম মনে না হলেও এখন কাঞ্চির মনে হয়, নবীনের কাছে তার সুদের হার, আর পাঁচজন, যাদের নাম লেখা আছে মোটা-মোটা খাতায়, তাদের চেয়ে বেশি, অনেক—অনেক।

কথাটা বুঝেছিল কাঞ্চি এখানে আসার পর-পর, যেদিন নবীন দত্ত তাকে যা দরকার তার অনেক বেশি দেয়, যখন তাকে চোখ পাকিয়ে বকতে থাকে, আর যখন তাকে ডেকে বাইরের ঘরে পাঁচজন মানুষের সামনে দাঁড় করায়। শুধু সুদের অঙ্কটাই ফাঁপায় নবীন দত্ত। হি-হি করে হাসে। আর সোনা-বাঁধানো দাঁত দিয়ে কাঞ্চির গোটা জীবনটাই কেটে-কেটে দেয়।

একটা নয়, দু-তিনটে শাড়ী কিনে এনেছিল নবীন প্রথম দিন। আরও এনেছিল মেয়েদের দরকারী অনেক জামা। তাছাড়া, কাঞ্চির প্রসাধনের কথাও ভোলেনি নবীন। তেল সাবান স্নো সেণ্ট পাউডার—সবই এনে তুলে দিয়েছিল কাঞ্চির হাতে। তখন জীবনে যার স্বাদ পায়নি কাঞ্চি, এই না চাইতে পাওয়ার, এই আদর আর অপচয়ের—মনের ভেতর তার একটা থরোথরো আবেগের দাপাদাপিতে চোখ থেকে জল পড়েছিল টপ টপ। নবীন দেখতে পায় নি। জিনিসগুলো খুব যত্ন করে রাখতে বলেছিল কাঞ্চিকে। ওসবের নাকি অনেক দাম।

কিন্তু যত্ন করে কি রাখা যায়! নবীন বেরিয়েছিল কোথায় কে জানে—সেই প্রথম-প্রথম, তখন সব কথা বোঝার সময় হয়নি কাঞ্চির, সে ওই সুদখোর ভয়ঙ্কর মানুষটাকে নিজের রূপ দিয়ে, প্রসাধন দিয়ে তুষ্ট দিতে চেয়েছিল,—বেঁচে থাকতে হলে যতটুকু দরকার, একেবারে প্রথমেই তার

চেয়ে বেশি দিয়েছিল বলেই, সে না চাইতেই প্রতিদানের মধুর ইচ্ছায় কোন মায়া না করে আঙুল ডুবিয়ে-ডুবিয়ে ছোট সাদা শিশি থেকে প্রয়োজনের বেশি স্নো তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ মুখে ঘষেছিল কাঞ্চ, অনভ্যাস আর অসাবধানতার জন্যেই অনেক পাউডার ছড়িয়েছিল মাটিতে। আর সেন্টের শিশি, এখনও পরিষ্কার মনে আছে কাঞ্চর, একেবারে খালিই হয়ে গিয়েছিল। সেদিন হঠাৎ আশ্রয় পাওয়ার তৃপ্তিতে একটা নিশ্চিন্ত মন অনেক কাঁটা পার হয়ে ফুটে উঠতে পেরেছিল বলেই সে নিজের দেহকেও অসংযমী প্রসাধনে ফোটাতে চেয়েছিল—একটা ভয়ঙ্কর কুৎসিত মানুষকেও মনে মনে সুন্দর করে তুলতে পেরেছিল।

কিন্তু সুদখোর নবীন কিছু দেখতে পায়নি। কাঞ্চর দেহ নয়, মনও নয়। অপচয়ের আক্রোশে আজও বুকটা একবার, একবারই ধক করে ওঠে কাঞ্চর, তাকে দেখতে-দেখতে হিংস্র হয়ে উঠেছিল নবীন। চৌচির হয়ে পড়েছিল, "এ কী! এমন করে রঙ মেখে সঙ সেজে বসে আছিস কার হুকুমে? হারামজাদী, বলি গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াবি ভর-সন্ধ্যেবেলা?"

ঠকঠক করে কাঁপছিল কাঞ্চ নবীনের মূর্তি দেখে। ভয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া গলা চিরে কোন রকমে ছোট্ট একটা প্রশ্ন শুধু ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল, "ওগুলো কার?"

আরও জোরে চিৎকার করে উঠেছিল নবীন, "যারই হোক। যত্ন করে রাখতে বলেছিলাম না তোকে? এমন ফেলে-ছড়িয়ে নষ্ট করিস—" স্নো-এসেন্সের শিশি আর পাউডারের টিন হাতে তুলে নিয়ে দেখতে-দেখতে নবীন বলেছিল, "বলি, বাপের দোকান আছে তোর—এসব জিনিস অমনি আসে সেখান থেকে?" বোধহয় আর একটু হলে কাঞ্চকে ও জোরে একটা চড় মেরে বসত।

কিন্তু তার আগেই কাঞ্চ সেখান থেকে সরে যায়। সরে যায় লজ্জায়, একটা ভয়ঙ্কর ধিক্কারে। নিজেকে শাস্তি দেবার একটা ক্ষিপ্ত ইচ্ছায় হঠাৎ কী করবে ঠিক করতে পারে না। নবীনের সামনে দাঁড়াতে, তাকে মুখ দেখাতে একেবারেই ইচ্ছে করে না কাঞ্চর। কার জন্যে, অন্য কোন মেয়ের জন্যে, ও জিনিসগুলো কিনে তার কাছে জমা রেখেছিল নবীন? বিয়ে করবে বুঝি সে? কথাটা আগে খেয়াল হয়নি কেন কাঞ্চর? তার মতো মেয়েকে ওসব জিনিস কেউ কি দেয়!

কিন্তু ওগুলো যে কাঞ্চর, ওই সেন্ট স্নো পাউডার আর ঠোঁটের পাতলা লাল রঙ, সেকথা শুধু অল্পদিন পর এক সকালে নবীন স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দেয় তাকে। তখন রান্নাঘরে উনুনের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছির। শাড়ীতে হলুদের দাগ। মাছ কাটতে গিয়ে কাঁটার খোঁচায় একটা আঙুলে কটকট যন্ত্রণা। তখন সেই ধোঁয়া আর যন্ত্রণায় আরও ভয় পায় কাঞ্চ নবীনকে সামনে দেখে।

"কাঞ্চ", চাপা গলায় ডাকে নবীন, "চট করে আয় লক্ষ্মীটি, একবার বাইরের ঘরে যেতে হবে। আয় আয়, শাড়ীটা বদলে নে। সেই নীলটা পর। তোকে যা দেখায় ওটা পরলে—" সোনা বাঁধানো দাঁত ঝকঝক করে নবীনের, "স্নো পাউডার—সব মাখবি যত পারিস, সেই সেদিনকার মতো—"

স্থির হয়ে রান্নাঘরেই দাঁড়িয়ে থাকে কাঞ্চ। নড়ে না। কথার মানে বুঝতে পারে না নবীনের। কী বলতে চায়? কিন্তু নবীন আবার তাকে মিনতি করে। হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় তাকের কাছে। নিজেই নামিয়ে দেয় প্রসাধনের জিনিস। এখন [illegible] এক কাপ চা হাতে নিয়ে কাঞ্চকে যেতে হবে বাইরের ঘরে। সেখানে কে আছে? কেউ কি দেখবে তাকে? পছন্দ করবে? নবীনের আশ্রয় থেকে তুলে নিয়ে যাবে অন...

কোথাও—তার নিজের বাড়িতে? উত্তেজনার অস্থির ব্যাপারে দিশাহারা কণ্ঠি আবার সেদিনকার মতোই দেহকে ফোটায় মুখে গলায় ঘাড়ে দ্রুত আঙুল চালিয়ে। শুধু দেহকেই। সেদিনকার মতো মনকে নয়। মন ফোটানো কি অতই সোজা!

না, এবার আঘাত নয়। লজ্জা-ধিক্কারও নয়। বরং তৃপ্তির একটা কড়া স্বাদে খাঁ খাঁ বুক ভরে যায় কণ্ঠির। নবীন তার কাছে থেকে সুদ আদায় করছে—নির্ভর করছে। আর কণ্ঠি সুদ দিতে পারছেও। নবীন তাকে আদর করে বুঝিয়ে দেয়, "তুই আমার লক্ষ্মী! তুই না থাকলে, তোকে না দেখতে পেলে কবে দেনা শোধ করে পালিয়ে যেত আমার ভাল ভাল মক্কেলগুলো—" দাঁত বের করে হিংস্র এক জানোয়ারের মতো আওয়াজ তুলে হাসে নবীন। তারপর নিজের চেহারাটাকে আরও বিকৃত করে বলে, "উঃ, সাধ কত! দেনা চুকিয়ে চলে যাবে! আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখবার কায়দা জানি না আমি? আমার খপ্পরে একবার পড়লে বেরিয়ে যেতে পারে কোন—"

চড়া হারে সুদ দিতে পারে বলে এখন আর ভয়-ডর নেই কণ্ঠির। নবীনকে থামিয়ে দিয়ে সে হাসির কলকল আওয়াজ তুলে বলে, বেঁধে রাখার বড়াই কর না।" বারুদ পোড়ে নবীনের কথায়, "থাম থাম কণ্ঠি", তার কাছে এগিয়ে এসে কী কারণে থরথর করে কাঁপে নবীন সে বোঝে না। শক্ত করে কণ্ঠির দুই হাত ধরে আবার ভিজে ঠাণ্ডা গলায় বলে, "তুই আমার লক্ষ্মী!" কিন্তু ওর চোখ দুটো জবলে। কেন, কে জানে! আর পরে, অনেক পরে যৌবনের এক-একটা দিন যখন খোঁড়া হয়ে যায়, কানা হয়ে যায় কণ্ঠির কাছে, তার জীবনে, তখন কোন উপায় না থাকলেও সুদ দিতে দিতে ফুরিয়ে যাওয়া মনটাও একটা বন্য বাসনায়, উগ্র যন্ত্রণায়, মুক্তির দুরন্ত কামনার কোন এক আসলের কথা কল্পনা করে জবলে। সুদখোর নবীন দস্তুর হিংস্র চোখের মতোই জবলতে থাকে। আর সুদ জোগাতে ইচ্ছে করে না কণ্ঠির। তখন নিজের ইচ্ছায় সে ফেলে-ছড়িয়ে পাউডার মাখে, স্নো ঘষে মুখে, সেন্টের শিশি উপুড় করে ধরে বুকের ওপর। এখন একবার তাকে বকতে আসুক নবীন! অপচয়ের আক্রোশ তার চোখে মুখে বুকে! খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ায় কণ্ঠি। পাখিটা ময়নাই। হলদে ঠোঁট। কালো ডানা। আর সাদা-সাদা পা। ময়না, কিন্তু কথা বলে না, ধৈর্য ধরে কথা বলার কৌশল ওকে কেউ শেখায়নি আজ অবধি। ক্যাঁ ক্যাঁ করে চিৎকার করে থেকে থেকে। খাঁচার মধ্যে জলের ছোট বাটিটা ডানা ঝাপটে উল্টে দেয়। ছোলাগুলো ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে। তখন চোখ পাকিয়ে কণ্ঠি তাকিয়ে থাকে পাখিটার দিকে। আর আশ্চর্য, ওর লাফা-লাফি তখুনি বন্ধ হয়ে যায়। নাচতে-নাচতে এক পাশে এসে ও দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

পাখি তো লাফালাফি করবেই। ও আকাশ দেখেছে—দেখেছে বনের সবুজ। ও তো মানুষ নয় কণ্ঠির মতো যে শুধু খাঁচায় ভরে খেতে দিলেই মুখ বুজে ওঠা-বসা করবে। আর নবীনের সুবিধার জন্যে ওর ফরমাশ মতো ধবধবে শাড়ী পরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে যাবে বাইরের ঘরে বড়শীতে গাঁথা টোপের মতো। কিন্তু শুধু ওইটুকুই। কাপটা রেখেই ভেতরে চলে আসে কণ্ঠি। যে মানুষটা বসে থাকে নবীনের সামনে তার দিকে দেখেও না চোখ তুলে। সে-লোকটা দেখে। দেখবে বলেই তো চায় ফেলেছে

নবীন দত্ত। লোকটা দেখে আর বোধহয় লেখা ঢুকিয়ে দিয়েছে বলে আঙুল কামড়ায়। তখন খাতাটা খুলেই বসে থাকে নবীন ওর নাম আবার নতুন করে লেখার জন্যে। ও আবার আসবে কণ্টিকে দেখার আশায়। নবীনের জালে হাঁসফাঁস করবে। ওকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে খোঁচিয়ে-খেলিয়ে একেবারে শেষ করে ছাড়বে সুদখোর নবীন দত্ত। লক্ষ মানুষ বাঁধা পড়বে নবীনের জালে—সোনা বাঁধানো দাঁতের আঁচড়ে-কামড়ে পাগল হয়ে যাবে।

এখন আকাশে, অনেক দূরের আকাশে আলোর ছোঁয়া হয়তো লেগেছে। রঙের অল্প-অল্প আভা ফুটছে খিড়কির ভাঙাচোরা দরজায়। পাখিটা নড়ছে। বেড়ালটা আগলে রাখতে এসেছে কণ্টিকে চোখে করুণ মিনতি ফুটিয়ে ওকে দেখতে-দেখতে, এই চাপ-চাপ অন্ধকার কেটে যাওয়ার অন্তিম মুহূর্তে কণ্টির মনে হয়। এখন সেই মানুষটার আসার সময়। এখন ভোর হয়ে আসার সময়। গাড়ির একটানা হর্ন এখুনি বেজে উঠবে দূরে। হাতের মুঠোয় ঠোঙাটা শক্ত করে চেপে ধরে কণ্টি।

নবীনের জালে বাঁধাপড়া একটা নরম মানুষ—বাঁধবার শক্তি নিয়ে একা-একা নির্জন দুপুরে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল কণ্টির। এই মানুষটাই কণ্টির মনে আছে, চায়ের কাপ ঘরে রেখে আসার সময় নবীনকে জিজ্ঞেস করছিল, "আপনার মেয়ে?" প্রশ্ন শুনে হাসির একটা বেগ ঠেলে উঠেছিল কণ্টির বুকের মধ্যে। নবীন কী উত্তর দেয় শোনবার জন্যে আড়ালে দাঁড়িয়েছিল কান খাড়া করে। আর একটু হলে হয়তো হেসেই ফেলত। কিন্তু লজ্জা আছে নাকি নবীনের। সুদের নতুন অঙ্ক লাভের আশায় খাতা খুলে হি-হি করে সে হেসেছিল, "না না, মেয়ে না। মেয়ে হবে কেন, হে' হে' এই আপনাদের চা-টা—ও আমার বোঝাক" দাঁতে দাঁত ঘষেছিল কণ্টি। আর মনে মনে হিংস্র একটা বৃত্তির তাড়নায় বলে উঠেছিল, তোমার সোনা-বাঁধানো দাঁতের পাটি আমি খুলে দিয়ে দিয়ে তবে যাব এখান থেকে।

এখন কণ্টির যাবার সময়। এখন নবীনকে মারবার সময়। সেই নরম মনের মানুষ এসে পড়বে এখন। কণ্টি বসে আছে এখানে সেই কখন থেকে। সে-মানুষ আসবে। আসবেই একটা নতুন শপথের মতো। তখন নিজের ইচ্ছায় স্নো ঘষবে কণ্টি। পাউডার মাখবে। সেণ্ট ঢালবে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও ফুটে উঠবে কণ্টির। এখন তাজা আলোয় বাইরের গন্ধে দেহমন ফোটার সময়।

সেই ফোটাবার মানুষ হাঁসফাঁস গরম দুপুরে, ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে সকালে আর সারাদিনের মধ্যে কখন কোন সময় নবীনের দাঁত ভাঙার প্রেরণা জুগিয়েছিল কণ্টিকে—হিসেব নেই। সেই জালে পড়া মানুষই আর এক নতুন জালে পড়ল—সেখানে ছাড়া পাবার কথা লেখা নেই।

"কণ্টি; নবীন তোমার কে?" "কেউ না।" "তবে?" "তবে কী?" "তার জালে আটকা পড়ে আছ কেন?" "আপনি জাল ছিঁড়তে পারেন?" "পারি না?" "ছাই!" "আমি জালে পড়ে আছি তোমার জন্যে। টাকার কোন দরকার নেই আমার। আমি সুদ দিয়ে যাই শুধু—" "নবীন সুদ খায়, আমার কী!" "তাহলে?" "তাহলে কী? আপনার মতো

মনেও অনেক দেখি আমি। নবীন দেখায়। আমার আর, কোন কিছুর ভয় নেই। সব গেছে। সে আমার কাছেও সুদ নেয়। আমি শুধু ওর দাঁতগুলো ভাঙতে চাই।"
"ভাঙবে—আমিও ভাঙব!"

এখন সে ফোটাবার মানুষ আসবে। এখন অন্ধকার ফিকে হল— নরম আলোর প্রথম রেখা ফুটে উঠল। জোর হাওয়া লাগছে গায়ে। খাঁচা দুলছে। বেড়াল শরীর টান-টান করে। কণ্ঠও নড়ে। বুক কাঁপে। মন দোলে। সুদখোর নবীন দত্ত এখনও ঘুমোয়। এখন সময়। অন্ধকার নেই। এখন আলো। ঠাণ্ডা আলো। এখন বাঁশি বাজে প্রথম। বাজবেই। কণ্ঠিকে তুলে নেবার জন্যেই সেই মানুষের গাড়ি দূরে দাঁড়ায়।

শেষের রেখাটা এখন স্পষ্ট রঙীন হয়ে কণ্ঠির চোখের সামনে কাঁপছে। অন্ধকার নেই—অন্ধকারের অল্প আভাসও নেই কোথাও। একটু নড়লেই হয় এখন। মোটে কয়েক পা। ক্ষিপ্র হাতে আলোর ছোঁয়া লাগা খিড়কির ভাঙাচোরা দরজাটা খুলতে পারলেই শেষ হবে কণ্ঠির সুদ দেয়ার দিন। শুধু আসলের একটা নতুন আলোর জগৎ তার দেহ মনের মতোই এক মুহূর্তে ফুটে উঠবে। লেনদেনের এক বুক উৎসাহ নিয়ে প্রথম ভোরের ঢালা আলোয় কণ্ঠির জন্যেই দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই নরম মানুষ তারই জীবনের স্থির শপথের মতো। আর একটা চমক ছুড়ে দ্বিতীয় হর্ন বাজে।

জলের বাটি উল্টে দিয়েছে খাঁচার পাখি। ছোলার বাটিও। বাড়িতে আর ছোলা নেই। আজ বাজার থেকে আনবে নবীন। মনে থাকবে কি-না কে জানে। কণ্ঠির ভাবনীয় তখন মাথার ঠিক থাকবে নাকি সোনা-বাঁধানো দাঁতভাঙা নবীনের! জল না পেয়ে, ছোলা-ছাতু না খেয়ে সারা দিন ক্যাঁ ক্যাঁ চিৎকার করে হঠাৎ এক সময় কণ্ঠির সাধের পাখিটা মরে কাঠ হয়ে থাকবে খাঁচার মধ্যে। তখন সময় মতো, দরকার মতো, ঠিক ঠিক সুদ মেটাবার জলজ্যান্ত কণ্ঠির অদৃশ্য হওয়ার যন্ত্রণায় আহত দিশাহারা মনটার নবীনের খাঁচার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতো মনের অবস্থা থাকবে না। সুদের সব হিসেব গোলমাল তো হয়ে যাবেই।

মোটে কয়েক পা। ইচ্ছে করলে এখুনি, নবীনকে একেবারে শেষ করে দিয়ে যেতে পারে কণ্ঠি—তার জীবনের অন্ধকারের মতোই শেষ। বিশৃঙ্খল সংসারে পায়ে-পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে নবীন। রোগে ভুগবে। পাগল হবে। মরবে। হঠাৎ একটা গোটা মানুষকে, নবীন দত্তকে, তার প্রাণটাকেই নিজের হাতের মুঠোয় অনুভব করে কণ্ঠি। যেন একটু জোরে চাপ দিলেই— ব্যস, সব শেষ। কিন্তু ইচ্ছে করলেই যখন পারে, তখন এই ক্ষমতার জোরেই, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে, ভোর-ভোর এত তাড়াতাড়ি একটা ঘুমন্ত মানুষের গলা টিপতে হাত ওঠে না কণ্ঠির! ওর মুঠি আলগা হয়ে প্রসাধনের ঠোঙাটা কখন পড়ে যায় মাটিতে।

যেন অনেক দূরে থেকে তৃতীয় হর্ন বাজে এবার। প্রথম চমকের মতো নয়। তীক্ষ্ণ কর্কশ নির্মম একটা আওয়াজ। জোরে-জোরে কণ্ঠি মাথা ঝাঁকায়। আর ঘন ঘন পা ঘষতে ঘষতে ওর মনে হয়, কী নির্মম শব্দ বেড়ালের! হঠাৎ এত আদরের ঘটায় বেড়ালের গলা থেকে তৃপ্তির তাজা স্বর বার হয়, "মিঁয়াও!" তখন ওকে কোলে তুলে নেয় কণ্ঠি। ওর চোখ দুটো দেখে। ঠাণ্ডা। ভিজে। পাথরের মতো। অন্ধকারে যেমন জ্বলে, এখন জ্বলে না তেমন। বেড়ালটা মুখ ঘষে কণ্ঠির কোলে।

ক্ষিধে না পেলেও বেড়ালের আদরের ঘটায় খাঁচার পাখিটা বোধহয় ঈর্ষায় ছটফট করতে করতে চিৎকার করে চলে, "ক্যাঁ ক্যাঁ ক্যাঁ—"

ওর দিকে তাকিয়ে টিপে-টিপে হাসে কণ্ঠি। আঙুল তুলে শাসায়, "চুপ!"

পাখি থামে না। বেড়ালটা ডাকে, মিঁয়াও—মিঁয়াও। আর ভোরের নরম মানুষের ডাক—শেষ হর্নের আওয়াজ এখন, এত দূরে, পাখি আর বেড়ালের ঈর্ষা, আদর ছাড়িয়ে কণ্ঠির কানে পৌঁছতে পারে না কিছুতেই।

নিশ্চিন্ত আরামে নবীন দত্ত তখনও ঘুমোয়।